রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

প্রবাসী

৬০শ ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৬৭

সূচীপত্র

কার্তিক—চৈত্র

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

বিষয়-সূচী

বিবিধ প্রসঙ্গ

চিত্রসূচী

রঙীন চিত্র

একবর্ণ চিত্র

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

নৃত্য-আসরে নটরাজ
(প্রাচীন কাংড়া চিত্র হইতে)

:: ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬০শ ভাগ
২য় খণ্ড

কার্ত্তিক, ১৩৬৭

১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

গৃহস্থের সংসারযাত্রা

টাটা সমাজ বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউটের ডিরেক্টর ও ভারতীয় পার্লামেণ্টের সদস্য অধ্যাপক এ. বি. ওয়াদিয়া একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বর্ত্তমানে দেশের যা অবস্থা তাহাতে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অর্থাৎ শিক্ষক, উকিল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, শিল্পী, লেখক, কেরাণী ও কর্ম্মচারী ইত্যাদি, যাহাদের আয় একটা বাঁধা-ধরার মধ্যে আছে, তাহাদের সম্মুখে এক সঙ্কটময় পরিস্থিতি দেখা দিয়াছে। বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের ব্যবস্থায়, শিল্প প্রতিষ্ঠানের ও ব্যবসায় ব্যাপারের অধিকারী ধনীদের সম্পদ বাড়িয়াই চলিয়াছে। ট্যাক্স বা মূল্যবৃদ্ধির চাপ তাঁহাদের সহ্য করার ক্ষমতা ও উপায় দুই-ই আছে। অন্যদিকে যাহাদের জীবনযাত্রার মান পূর্ব্বকালে খুব নীচুই ছিল, যথা কৃষক, চাষী, কামার ছুতার ইত্যাদি সাধারণ কারিগর তাহাদেরও পণ্যমূল্য বৃদ্ধিতে লোক-সান অপেক্ষা লাভের অঙ্কই বাড়িয়াছে এবং অধিকন্তু ট্যাক্সের প্রত্যক্ষ চাপ তাহাদের গায়ে লাগে নাই। মারা পড়িতেছে এই দুই স্তরের মাঝের ঐ মধ্যবিত্ত শ্রেণী, সাধারণ বাঙালী গৃহস্থ যে শ্রেণীর মধ্যে রহিয়াছে।

এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনযাত্রার পথে নিত্য-প্রয়োজনীয় যাহা কিছু তাহার সবই এখন মহার্ঘ্য ও দুষ্প্রাপ্য। ধনীর কাছে—বিশেষতঃ আজিকার ধনিক সম্প্রদায়ের কাছে—মূল্যবৃদ্ধি কিছু নয়, কেননা তাহাদের আয় ও জীবনযাত্রার সাধারণ ব্যয়ের মধ্যে যে ব্যবধান—জমার অঙ্কে—আগে ছিল এখন সেটা আরও বাড়িয়া চলিয়াছে। অন্যদিকের দল চিরদিনই অনেক কিছু—যথা শিক্ষা-দীক্ষা, বসনভূষণ, আহার-বিহার ইত্যাদিতে—নিত্য প্রয়োজনের প্রকরণ বাদ দিয়া চলিতে অভ্যস্ত, তাহাদেরও মূল্যবৃদ্ধিতে অতটা কাহিল করে নাই। মধ্য-বিত্তেরই জীবনযাত্রা এখন কঠোর সংগ্রামে পরিণত হইয়াছে। অনেকেরই এখন সন্তানসন্ততির খাওয়া-পরার বিষয়েও বাধ্য হইয়া অনেককিছুই বাদ দিতে হইয়াছে, শিক্ষা-দীক্ষা ত দুরূহ ব্যাপারে দাঁড়াইয়াছে।

কলিকাতায় বাঙালী গৃহস্থের দুর্দ্দশা ত চরমে পৌঁছিয়াছে। ঘরভাড়া দিয়া যাহাকে পরিবার প্রতি-পালন করিতে হয় তাহার পক্ষে ত কলিকাতায় থাকা নরকযন্ত্রণা ভোগের নামান্তর। অথচ আমাদের এই দেশে স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য আসিয়াছে আজ বারো বৎসরেরও উপর। দেশের অবস্থার বিচার কলিকাতার অবস্থার নিরিখেই করা যাউক।

কলিকাতার পথঘাট এমনিতেই ফাটল ও গর্ত্তে ভর্ত্তি, বিশেষতঃ যেখানে ট্রাম লাইন আছে। সেখানে ত পথ বলিতে যাহা বুঝায় তাহার অস্তিত্ব শুধু ঐ কয়টি লোহার ট্রাম লাইনে অঙ্কিত আছে, তার মাঝে ও লাইনের গায়ে বড় বড় গর্ত্ত আছে যেগুলি মাঝে মাঝে পাথর-কুচি ও আলকাতরা দিয়া ভরাট করা হয় আবার দু'চার দিনের মধ্যে সেগুলি আরও বড় গর্ত্তে পরিণত হয়। লাইনের দুই পাশের পথ, যেখানে সাধারণ যানবাহন চলার রাস্তা, সেখানেও বড় বড় খানা-খন্দ আছে, উপরন্তু দিনের অধিকাংশ সময় বড় পথগুলি খালি রিক্সা ও ঠেলা-গাড়ীতে পূর্ণ থাকে, ফুটপাথ ময়লা জঞ্জাল, ফিরি-ওয়ালার টুকরি বা হকারের খোলা বেসাতি বা বিরাট

ফাটলের দরুন দুর্গম হওয়ায় রাজপথে পায়ে-চলা পথিকের লম্বা সারি চলিতে থাকে।

যে সব পথে ট্রাম লাইন নাই, তার মধ্যে বড়গুলি, যথা—চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, স্থানে স্থানে দীর্ঘদিনের অবহেলার ফলে এমন অবস্থায় আসিয়াছে যে, পায়ে হাঁটিয়া পার হইতে হোঁচট খাইতে হয়, উপরন্তু যানবাহন এরকম যথেচ্ছা চলাফেরা করে যে, রাস্তা পার হওয়া আর ভবনদী পার হওয়া প্রায় একই ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে। তার উপর কলিকাতায় মোটর লরী ও মোটর বাস—বিশেষ করিয়া সরকারী পরিবহন বিভাগের বাস চালাইবার জন্য বোধ হয় সারা ভারতের মধ্যে বাছা বাছা দুর্বৃত্তদের আমদানী করা হইয়াছে। তাহাদের উৎপাতে রাস্তা পার হওয়া এক প্রাণান্ত পরীক্ষার সামিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অল্প পরিসরের পথগুলির মধ্যে কয়েকটিতে সম্প্রতি কিছুদিন যানবাহনের চলাচল খুবই বাড়িয়া গিয়াছে, তার প্রধান কারণ বড় পথগুলির বে-মেরামতির দরুন অচল অবস্থার সৃষ্টি, উপরন্তু লরী, বাস ও বেবী ট্যাক্সীচালক দস্যুদলের উৎপাত।

পথঘাট তো এমনিতেই নোংরা জঞ্জালে ভর্ত্তি, বর্ষার জলে যাহা কিছু ধোওয়া হয়। গঙ্গাজলের হাইড্রান্টে তো জল প্রায় থাকেই না, রাস্তা ধুইবার চাপ তো দূরের কথা। উপরন্তু প্রসিদ্ধ "পাঁচ আইন" বোধ হয় রদ হইয়া গিয়াছে, নচেৎ দিবালোকে প্রকাশ্য রাজপথের ধারে বসিয়া লোকে অম্লানবদনে দেহের ভার লাঘব করে কি করিয়া? পুলিস ত দেখিয়াও দেখে না, সুতরাং মনে হয় পাঁচ আইন আর বলবৎ নাই নিশ্চয়।

রাত্রে বড় রাস্তায় আলো দেয় দোকানপাটের বাতি। পথে আলো দেবার যে ব্যবস্থা আছে তার মধ্যে গ্যাসের আলো ত লোক-ঠকানো একটা প্রহসনের ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে। যে সব পথে শুধু গ্যাসের উপর নির্ভর সেখানে পথ চলিতে হইলে টর্চ্চ বা লণ্ঠন প্রয়োজন, গ্যাসের বাতি কোথায় আছে, তাও অনেক ক্ষেত্রে টর্চ্চ জ্বালাইয়া রাস্তার দুই পাশ খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। আবার বিজলীবাতিও এমন উঁচুতে ও এভাবে টাঙানো হইয়াছে যে, স্থলপথ অপেক্ষা আকাশপথেই তার টিম্‌টিমে আলো বেশী যায়।

পথঘাট ত এইপ্রকার। বাজারে ত ভেজালেরই রাজত্ব, উপরন্তু অসহায় খরিদ্দার চোরাকারবারির মুঠোর মধ্যে। সারা ভারতে এই কলিকাতার মত ভেজাল ও চোরাকারবারের প্রাদুর্ভাব আর কোথায়ও নাই একথা নিশ্চিত। লোকের খাওয়া-পরার সমস্যা যেভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে তাতে মনে হয়, এ অঞ্চলে দিগম্বর-বেশে বায়ু-ভোজনের পন্থা অবলম্বনই একমাত্র উপায়। শোনা যায়, আমাদের সংবিধানে চোরাকারবার, ভেজাল ইত্যাদির পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং কলিকাতায় সেই পরীক্ষা চলিয়াছে যে, ঐ দুই পথে খরিদ্দারের রক্তমোক্ষণ কতদূর চলিতে পারে? কলিকাতাই এই পরীক্ষার পক্ষে প্রশস্ত, কেননা "বাঙ্গালীর নাম মহাশয়, যা সওয়াবে তাই সয়" সুতরাং ভাবনা কিসের?

কতদিন আর এইভাবে চলিবে? যতদিন আমাদের বর্ত্তমান মানসিক দৈন্য থাকিবে ঠিক ততদিনই। পূজায় শক্তির আবাহনে যেদিন দেখিব বাঙ্গালী মনের শক্তি ও চিন্তার শক্তিই প্রধান কাম্য বলিয়া চাহিয়াছে, সেইদিনই বুঝিব রাত্রি শেষ হইয়া আসিল।

"চাকুরি চাই"

বাঙ্গালোরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলালের গাড়ীর সম্মুখে এক যুবক শুইয়া পড়িয়া "আমাকে একটা চাকুরি দিন" বলিয়া চিৎকার করে এবং পুলিস তাহাকে ধরিয়া লইয়া যায়। পণ্ডিত জবাহরলাল অবশ্য ইহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হয়েন নাই; কেননা তিনি প্রধানমন্ত্রীর উপযুক্ত চরিত্রবলে বিভূষিত। অল্পে বিচলিত হওয়া তাঁহাকে শোভা পায় না। এই যুবকের গাড়ীর চাকার তলায় পড়িবার চেষ্টা ত কিছুই নহে; ভারতের ২০,০০০ বর্গমাইল স্থান চীনারা জুলুম করিয়া দখল করিলে অথবা দুই-দশ হাজার বাঙ্গালীর ঘর জ্বালাইয়া তাহাদিগকে হত্যা, মারপিট ও ধর্ষণ করিলেও পণ্ডিত জবাহরলাল বিচলিত হয়েন না। মহাপুরুষের যে অবিচলিত চিত্তের কথা আমরা শুনিয়াছি তাহা জবাহরলালে পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান। অতএব আমাদেরও এই চাকুরিপ্রার্থী যুবকের কথা স্থিরভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। পণ্ডিত জবাহরলাল যখন ভারতের জনসাধারণের উপর রাজকরের বোঝা চারগুণ বাড়াইয়া, অপর দেশের নিকট শত শত কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়া এবং জাতীয় সাধারণের স্বাধীনভাবে কাজ-কারবার চালাইবার অধিকার টাকায় বার আনা নষ্ট করিয়া নিজের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ভারতের উপর চালাইলেন, তখন তিনি বহুবার বলিয়াছিলেন যে, এই সকল কারখানা গঠন, নদীদমন কার্য্য, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন, রাসায়নিক সার প্রস্তুত ইত্যাদি যথাযথভাবে হইলে পর ভারতে আর বেকার কেহ থাকিবে না। এক একটি পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হইলে লক্ষ লক্ষ লোকের নূতন চাকুরির রাস্তা খুলিয়া যাইবে। কিন্তু তাঁহার পরিকল্পনার

ভারে ভারত জর্জ্জরিত হইয়া উঠিলেও তাহার পরিবর্ত্তে চাকুরি কাহারও বিশেষ জুটিতেছে না। পক্ষান্তরে দেখা যাইতেছে যে, স্বাধীন ব্যবসায়ী ও কারিগরদিগের নানান কারণে জীবিকা অর্জ্জন অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে, যে সকল কারণের মূলে রহিয়াছে পণ্ডিত জবাহরলালের পরিকল্পনার আবেগ। আমাদের দেশের অধিকাংশ কাজ-কারবার অল্পবিস্তর বিদেশের আমদানী মালের উপর নির্ভর করে। এই সকল আমদানী মাল অনেক ক্ষেত্রে সাক্ষাৎভাবে ক্রয়-বিক্রয় করিয়া ব্যবসায়ীরা দিন গুজরান করেন। অপর ক্ষেত্রে আমদানী মালের সাহায্যে বিক্রয়ের জিনিস তৈয়ার হয় এবং যন্ত্র ইত্যাদির ব্যবস্থা ও চালনা সম্ভব হয়। আমদানী অধিকাংশ বন্ধ করিয়া দিলে বহু কাজ-কারবার অবিলম্বে অচল হইয়া যায়। প্রায় সকল আমদানি বন্ধ করিয়া পণ্ডিত জবাহরলাল শুধু নিজের পরিকল্পনার মালমশলা মাত্র আমদানি করিতেছেন। ইহার ফলে, যদি-বা তাঁহার নূতন-গঠিত কারখানায় একজনের কাজ জুটিতেছে; অপর কারখানায়ও কাজ বন্ধ হইয়া দশ জনের কাজ সেই সঙ্গে নষ্ট হইতেছে। অর্থাৎ পণ্ডিত জবাহরলালের পরিকল্পনায় মোটা মোটা চাকুরি অনেকে পাইতেছেন, যাঁহাদের অধিকাংশই কংগ্রেসের চাটুকারগোষ্ঠীর লোক, দালালিও স্বদেশে-বিদেশে অনেকে পাইতেছেন এবং সাধারণ কর্ম্মী প্রায় এক লক্ষ বা দুই লক্ষ টাকা মূলধন ব্যয়িত হইলে, হয়ত একজনের কাজ জুটিতেছে। ইহার কারণ পরিকল্পনার অতিব্যয়শীল দৃষ্টিভঙ্গি। দুই শত কোটি টাকার একটি কারখানা গঠিত হইলে যদি ১০,০০০ লোকের কাজ হয় তাহা হইলে ১০ মাথাপিছু কাজ করিতে দুই লক্ষ টাকা মূলধন প্রয়োজন হয়। এই হিসাবে বর্ত্তমান ভারতে যদি ৪ কোটির মধ্যে এক কোটি লোকের কাজ করিবার ব্যবস্থা পণ্ডিত জবাহরলাল করেন তাহা হইলে তাঁহার ১০০০০০০০ × ২০০০০০ = ২০০০০০,০০০০০০০ অর্থাৎ দুই লক্ষ কোটি টাকার প্রয়োজন হইবে। তিনি এই গরীব দেশের বক্ষে পরিকল্পনার রথ চালাইয়া মাত্র ১০ কি ২০ হাজার কোটি টাকা ছলে বলে কৌশলে কর্জ্জায় একত্র করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইহার কুড়ি গুণ টাকা কি তিনি কখনও জোগাড় করিতে পারিবেন? যদি না পারেন তাহা হইলে গরীব দেশের গরীব কারবারী ও কর্ম্মীদের সর্ব্বনাশ না করিয়া তাঁহার উচিত পরিকল্পনার আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া সকলকে স্বাধীনভাবে বাঁচিতে দেওয়া। আমাদের গরীব দেশের লোকে অল্পই ক্রয় করিতে পারে। পণ্ডিত জবাহরলালও পরিকল্পনায় ইয়োরোপ-আমেরিকার অপেক্ষা অধিক ব্যয় করিয়া কারখানা গঠন করিলেও কর্ম্মীদের বেতন অল্পই দিতে চাহেন। ক্রয় তাহা হইলে সেই বেতনে অধিক বাড়িবে না। সুতরাং যন্ত্র বসাইয়া লক্ষ লক্ষ ক্রয়-বস্তুর উৎপাদন করিয়া লাভ হইবে না। বরঞ্চ যন্ত্র শীঘ্র যাহা বিক্রয় হইতে পারে সেই পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিয়া দিয়া হাতের কারিগরদিগকে বেকার করিয়া দিবে। স্টাম্পিং মেশিনে থালা, গেলাস, বাটি ইত্যাদি তৈয়ার করিয়া কত কাঁসারির রোজী নষ্ট হইয়াছে তাহার হিসাব লইলেই এ কথার সত্যতা বিচার হইবে। পণ্ডিত জবাহরলালের রথচক্রের তলায় পড়িয়া যে যুবক "চাকুরি চাই" বলিয়া প্রাণ দিতে উদ্যত হইয়াছিল, সে যুবক ভারতের বর্ত্তমান অর্থনীতির প্রতীকের কার্য্য করিয়াছিল। কারণ পণ্ডিত জবাহরলাল সকল ভারতবাসীকেই তাঁর সরকারের চাকর বানাইতে চাহেন; কিন্তু অতগুলি চাকুরি দিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই। সরকারী কাজ যথেষ্ট বাড়াইবার সামর্থ্য নাই অথচ স্বাধীন কার্য্য করিতে বাধা দেওয়া হইবে, এই তাঁহার "নীতি"। অ

ভারতীয় প্রচেষ্টা ও প্রাদেশিক অধিকার

যে সকল প্রচেষ্টা ভারতীয় অর্থে ও ভারতীয় সর্ব্বসাধারণের উন্নতির জন্য আরম্ভ করা হইয়াছে ও চালিত হইতেছে, বহুকাল হইতেই দেখা যায় যে, সেই সকল প্রচেষ্টায় প্রাদেশিক নেতারা হস্তক্ষেপ করিয়া ভাই-ভাতিজাদিগের সুবিধা ঘটাইবার অশেষ চেষ্টা করিয়া থাকেন। একথা অবশ্যস্বীকার্য্য যে, "স্থানীয়" লোকেদের চাকুরি পাওয়া সর্ব্বত্র প্রয়োজন। কিন্তু স্থানীয় অর্থে প্রাদেশিক মনে করিবার কাহারও অধিকার নাই। অর্থাৎ ধরা যাউক জামসেদপুর ও বার্ণপুর। এই দুই স্থানে যাহারা স্থানীয় লোক তাহাদের চাকুরি পাওয়া সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন কারণ ঐ দুই জায়গার স্থানীয় লোকেরা কারখানার জন্য নিজেদের জীবনযাত্রা পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছে এবং তজ্জন্য তাহাদের চাকুরি খুঁজিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। এক্ষেত্রে তাহারা চাকুরিতে অপর লোকের অপেক্ষা অগ্রে নিযুক্ত হইবে ইহাই ন্যায়। কিন্তু জামসেদপুরের স্থানীয় লোকেরা সিংভূম জেলার, বিশেষ করিয়া ধলভূমের পুরুষানুক্রমিক অধিবাসী; এবং বার্ণপুরের স্থানীয়েরা পশ্চিম বর্দ্ধমান জেলা ও আসানসোল মহকুমার ঐ প্রকার অধিবাসী। সুতরাং যদি জামসেদপুরে বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেসের নেতা ভোজপুরী,

ভূমিহার ও কায়স্থদিগের একটা চাকুরির কেন্দ্র গড়িয়া তোলা হয় এবং বার্ণপুরেও পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস নেতাদিগের মনোনীত লোকেরা স্থানীয়দিগের উপরে স্থান লাভ করে, তাহা হইলে সর্ব্বভারতীয় এই সকল বড় বড় উৎপাদন কেন্দ্রগুলির প্রকৃত জাতীয় মূল্য ক্রমশঃ কমিয়া যাইবে। সাধারণ চাকুরিতে স্থানীয় লোকেদের জায়গা পাওয়া অবশ্যপ্রয়োজন এবং বড় বড় চাকুরি পাওয়া উচিত সুযোগ্য লোকের ভাগে। কিন্তু দেখা যায় যে, সর্ব্বক্ষেত্রেই স্থানীয় লোকেরা উপযুক্ত বলিয়া গ্রাহ্য হইতেছে না এবং বড় বড় চাকুরিতে ইংলণ্ড, বোম্বাই, চণ্ডীগড় অথবা মাদ্রাজের ভাগ বেশী করিয়া ধরা হইতেছে। জাতীয় আর্থিক প্রচেষ্টার অর্থ যদি দলগত অথবা ব্যক্তিগত সুবিধার ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে জাতীয় উন্নতি বিশেষ হইবে বলিয়া মনে হয় না। অ

ভারতের একতা

ভারতের কংগ্রেস দল ভারত বিভাগে রাজি হইয়া ইংরেজের হাত হইতে ভারতের অবশিষ্ট অংশ শাসন করিবার অধিকার অর্জ্জন করেন। ইহার জন্য তাঁহারা ভারতের জনমত জানিবার কোন চেষ্টা করেন নাই। তখনও যেমন কংগ্রেসের নেতারা যাহা ভাবেন তাহাই ভারতের মত বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল, এখনও নেহরু যাহা ভাবেন তাহাই ভারতের মত বলিয়া ধরা হয়। নেহরুর যাঁহারা সহায়ক সেই সকল বিভিন্ন দেশের কংগ্রেসের নানান দলের দলপতিরা নেহরুকে "হাঁ জি, হাঁ জি" বলিয়া সর্ব্বক্ষেত্রে সমর্থন করিয়া নেহরুর উচ্ছিষ্ট অধিকারটুকু নিজেদের জন্য তাংড়াইয়া লইয়াছেন! অর্থাৎ বড় বড় কথায় নেহরুকে সমর্থন করিয়া তাঁহারা ছোট ছোট সকল বিষয়ে নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজ নিজ রাজত্ব স্থাপন করিয়াছেন বলা চলে। এই যে রাজশক্তি বিভাগ ইহার ফলেই আজ ভারতবর্ষ একতা হারাইয়া টুকরা টুকরা হইয়া যাইতেছে। কারণ, নেহরু যেমন নিজের মত ও আদর্শকে ভারতের উপরে স্থান দিয়াছেন; অর্থাৎ তাঁহার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, তাঁহার বিশ্বপ্রেম ও পঞ্চশীল, তাঁহার ভাই-ভাই, তাঁহার পায়জামা ও গলাবন্ধ কোট পরিয়া পাশ্চাত্যের অনুকরণ, তাঁহার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যক্তির অধিকার খর্ব্ব ও দমন করিয়া আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা চেষ্টা ইত্যাদি যেমন ভারতের জনসাধারণের স্বাধীনতা ও উন্নতির উপরে স্থান পাইয়াছে তেমনি তাঁহার দলের লোকেদের বহু প্রকার রুই-কাতলা হইতে আরম্ভ করিয়া আর্থিক ছিটেফোঁটা লাভ হইয়াছে। বহু অর্দ্ধ-শিক্ষিত লোক আজ অপেক্ষাকৃত অধিক-শিক্ষিত ও যোগ্যতর লোকের উপরে হুকুম চালাইতেছে। সরকারী শক্তি ও তৎসাহায্যে লব্ধ যাহা কিছু চাকুরি, কণ্ট্রাক্ট, কমিশন, পারমিট, সাপ্লাই প্রভৃতি সবই আজ কিছুসংখ্যক নেহরুর অথবা তাঁহার নিকট-সহকর্ম্মীদের পেটোয়াদিগের জন্য আলাদা করিয়া রক্ষিত হইয়াছে। এমনকি ব্রিটিশের অন্যায় দেশ-বিভাগও পেটোয়াদিগের সুবিধার জন্য পূর্ব্বের ন্যায় সুরক্ষিত রহিয়াছে। যেমন বাংলার বহু অংশ বিহার, আসাম ও উড়িষ্যার সহিত জুড়িয়া রাখা হইয়াছে। কারণ, যদি বিহার হইতে কাটিয়া ঝরিয়া, ধানবাদ, জামসেদপুর প্রভৃতি বাংলায় যুক্ত করা হয় তাহা হইলে বিহারের অবস্থা হইবে পুনর্মূষিকের মতই। এই জন্য কংগ্রেস ব্রিটিশের অন্যায় চিরপ্রতিষ্ঠিত রাখিতে দ্বিধা করেন নাই। আজ যে বিভিন্ন প্রদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নেতারা নিজেদের ইচ্ছা, স্বার্থ ও সুবিধা অনুসারে যথেচ্ছাচার করিতেছেন, তাহার মূলে রহিয়াছে নেহরুর যথেচ্ছাচার। নেহরুর অর্থাভাব না থাকায় তাঁহার যথেচ্ছাচার তাঁহার চেলাবৃন্দের সহিত তুলনায় ততটা কদর্য্য নহে। তিনি কাহাকেও উঠান অথবা কাহাকেও নামান নিজের মতলব অনুসারে, কিন্তু অর্থোপার্জ্জনের জন্য নহে। তাঁহার চেলারা নিছক টাকার জন্য অথবা টাকার থলির উপর দখল রাখিবার জন্য সকল বিষয়ে যোগ্য ও উপযুক্তের অধিকার নষ্ট করিয়া অযোগ্য ও অনুপযুক্তের অধিকার সৃষ্টি করিয়া চলিতেছেন। বিহার ও আসামের বড় বড় সরকারী চাকুরিগুলি এবং কনট্রাক্ট ইত্যাদি কে কে পাইয়াছে ও কেমন করিয়া পাইয়াছে ইহার অনুসন্ধান করিলেই প্রমাণ হইয়া যাইবে যে, ভারতের প্রাদেশিক রাষ্ট্রগুলি কি ভাবে চালিত হইতেছে। প্রদেশের সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য রাষ্ট্রগুলি চালিত নহে। শুধু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডির দুর্নীতিপরায়ণ নেতাদিগের ও তাঁহাদের ভাই-ভাতিজাদিগের জন্যই রাষ্ট্রগুলি চালিত হয়। এই কারণে ভারতে আজ ক্ষুদ্রস্বার্থ সর্ব্বোচ্চে স্থান পাইয়াছে। রাষ্ট্রের বিনাশের জন্য ইহা অপেক্ষা আর কি অধিক অনুকূল হইতে পারে?

বাংলা দেশের কংগ্রেসও আজ বাংলায় বাঙালীকে এমন অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছেন যে, তাহাদের দুঃখের ও আর্থিক কষ্টের সীমা নাই। অধিকাংশ শিক্ষিত লোক আজ বেকার এবং যাহারা প্যাণ্ট পরিয়া অনর্গল অশুদ্ধ ইংরেজী বলিতে পারে না, যাহারা আজ মনোরঞ্জক চেহারা, বস্ত্র ও ব্যবহারিক হাবভাব ও ঢং রপ্ত করিতে না পারিয়া চাকুরির ক্ষেত্রে নিচে নামিয়া যাইতেছে।

রাইটারস্ বিল্ডিংয়ে কিন্তু অর্দ্ধমুক্তকচ্ছ ভাবে দেশভক্তি ও ত্যাগের অভিনয় করিয়া কংগ্রেস নেতারা নিজেদের ও নিজেদের ভাই-ভাতিজার সুবিধা হিন্দুস্থানী মতে পূর্ণমাত্রায় ব্যবস্থা করিয়া লইতেছেন। বাকি যাহা কিছু তাহা বড়বাজারের চোরেদের হস্তে তুলিয়া দেওয়া হইতেছে। কারণ ভারতীয় জাতীয়তা অর্থে বুঝিতে হইবে সর্ব্বভারতীয়কে একনজরে দেখা। এবং তাহার মধ্যে যে যত অধিক গোপনে উপুড়হস্ত হইতে পারে সে তত বড় দেশভক্ত ও ব্যবসায়ী।

অ.

"চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী"

ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ডঃ রাধাকৃষ্ণণ ও পণ্ডিত নেহরু গত কিছুকাল যাবত ভারতীয় একতা ও প্রাদেশিক বা অন্য প্রকার সঙ্কীর্ণতা বিষয়ে অনেক সদুপদেশ ভারতের জনসাধারণকে বিতরণ করিতেছেন। এই উপদেশের অবাধ বন্যার কারণ আসামে বাঙালী সংখ্যালঘিষ্ঠদের উপর আসামী জাতীয় লোকেদের আক্রমণ ও অমানুষিক অত্যাচার। এ কথা অতি সহজবোধ্য যে, একতা জাতির শক্তি ও সভ্যতার পুনর্গঠনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, কারণ এক মহাজাতি যদি পরস্পর বিরুদ্ধতা করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডিতে পরিণত হয় তাহা হইলে সেই মহাজাতি মিলিত ভাবে কোন কার্য্য না করিতে সক্ষম হইয়া শীঘ্রই বহুসংখ্যক অল্পবল ও সঙ্কীর্ণচেতা স্থানীয় গোষ্ঠীমাত্রে পর্য্যবসিত হইবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তথাকথিত জাতি ভারতবর্ষে কয়েক সহস্র আছে। তাহাদের মূল সভ্যতা, চিন্তা, কর্ম্ম এবং প্রগতির পথ ও ধারা এক হইলেও তাহাদের পরস্পরের সহিত বিবাদ ও কলহের বিষয়ের অভাব নাই। এই সকল ছোট ছোট বিষয়কে বড় করিয়া তুলিয়া ধরিয়া ঝগড়া সৃষ্টি করা অনেক দুষ্টলোকের পক্ষে লাভজনক। এবং যেখানেই ছোট কথাকে বড় করিয়া ঝগড়া আরম্ভ হয় সেখানেই দেখা যায় যে, কিছু দুষ্টলোক নেতৃত্ব করিতে আসরে নামিয়াছে। অর্থাৎ দুষ্টজনের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই সর্ব্বত্র বৃহত্তর আদর্শের হানি করিয়া জাতীয়তা-বিরুদ্ধ কার্য্য করা হইতেছে। এই সকল ক্ষুদ্র স্বার্থের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলি অন্যায় উপায়ে অর্থোপার্জ্জনের সুবিধালাভ চেষ্টামাত্র। অর্থাৎ অযোগ্য ব্যক্তিদিগের চাকুরি অথবা জুয়াচুরি, ঘুষ, ছলনা বা ঠকাইয়া টাকা পাইবার চেষ্টা। সমাজের অপকার ও জনসাধারণের লোকসান করিয়া নিজেদের গণ্ডির লাভ করিবার জন্য দুষ্টলোকে ক্ষুদ্র স্থানীয় বা জাতিগত ঝগড়ার সৃষ্টি করিয়া থাকে। আমাদের রাষ্ট্রপতি ও তাঁহার সহকর্মীদের এই সকল কথা অজানা নাই। এ কথাও তাঁহারা জানেন যে, "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী", অর্থাৎ দুর্জ্জনকে সদুপদেশ দান সময়ের ও বাক্‌শক্তির অপব্যবহার মাত্র। সুতরাং তাঁহাদিগকে এই যে উপদেশ-দান ইহার অর্থ কি? এই সকল উপদেশ শুনিয়া, দুর্ব্বলের উপর যাহারা অত্যাচার করে এবং লুঠ, মারপিট, খুন, গৃহদাহন, নারীধর্ষণ, শিশুহত্যা করিতে যাহারা স্কুল-কলেজে শিক্ষালাভ করিয়াও নির্লজ্জ নির্ম্মমতার সহিত আত্মনিয়োগ করে, তাহারা নিজেদের পাশবিক বৃত্তি দমন করিয়া সৎপথে চলিতে আরম্ভ করিবে, ইহাই কি নেতাত্রয়ের বিশ্বাস? তাঁহারা এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া উপদেশ-বন্টনে নিযুক্ত হইয়াছেন এ কথা আমরা স্বীকার করি না। আমরা জানি দুষ্টের দমন কি করিয়া করা সম্ভব তাহা তাঁহাদের অজানা নাই। যাহারা অতি মহা-পাপ করিতে দল বাঁধিয়া নিযুক্ত হয় তাহাদের অতি কঠোর শাস্তি ব্যতীত অপর কোন উপায়ে নিরস্ত করা সম্ভব নহে। সেই শাস্তির ব্যবস্থা করিতে যদি দেশ-নেতারা সাহস না করেন, বা যদি কোন গোপন কারণে অনিচ্ছুক হয়েন, তাহা হইলেই স্তোকবাক্য ও উপদেশের বন্যা বহাইয়া সাধারণের নিকট কর্ত্তব্য করার একটা মিথ্যা অভিনয় করিয়া দুর্জ্জনকে পাপের শাস্তি হইতে বাঁচাইয়া পলাইবার রাস্তা খুলিয়া দেওয়া হয়। আসামে দেখা যাইতেছে যে, তোড়জোড় ব্যতীত অপরাধীদিগের শাস্তির চেষ্টা বিশেষ কিছু করা হইতেছে না। কাহাকেও বদলি করিয়া অথবা অপর কাহাকেও সাময়িক ভাবে কার্য্য না করিতে দেওয়া বিরাট একটা খুন, ডাকাইতি, নারীধর্ষণ ও লুঠের পালার শাস্তির ব্যবস্থা নহে। প্রায় দশ হইতে কুড়ি হাজার লোক সকল প্রকার সাজ-সরঞ্জাম জোগাড় করিয়া দলবদ্ধ ভাবে এই সকল দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে। একথা সকলেই জানেন এবং এই সকল সমাজদ্রোহী লোকেরা কে তাহাও অনেকে জানেন। কিন্তু যে স্থলে অন্ততঃ কয়েক সহস্র লোক গ্রেপ্তার হইয়া কারাগারে আবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন, সে স্থলে কয়জনকে হাজতে রাখা হইয়াছে? এবং কতজন অপরাধী ধৃত হইয়া জামিনে খালাস হইয়াছে এবং কেন? কে কাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছে তাহা কি শ্রীচালিহা ও জনাব ফখরুদ্দিনের জানা নাই? আসামের দেশদ্রোহী অপরাধীদের সহায়তা করিয়া আরও অনেকে দেশ-দ্রোহিতা করিতেছেন। ইহার শাস্তি তাঁহাদের কোনও না কোনদিন উপভোগ করিতে হইবে। আসামের দেশ-দ্রোহীদের সহায়ক অপরাপর জাতীয় আরও অনেক

অদূরদর্শী হবু-দেশদ্রোহীদের পরিচয় এই সূত্রে আমরা পাইতেছি। তাঁহাদের সাধারণ প্রচেষ্টা লুণ্ঠিত, হতাহত ও ধর্ষিত বাঙালীদের উপরে কেমন করিয়া দোষারোপ করা যায়। ভারতের সকল জাতির লোকদের মধ্যেই দুষ্টলোক কিছু কিছু আছে, কিন্তু কোন জাতিই পূর্ণরূপে সাধু বা দোষী নহে। এ ক্ষেত্রে জাতিগত ভাবে কোন দোষারোপ চেষ্টাই সত্যের অপলাপ। আমরাও বলি না যে, সকল আসামীই মহাপাপী। কিন্তু যাহারা দোষী তাহাদের শাস্তি হওয়া অবশ্য প্রয়োজন। বাঙালীরা অহঙ্কারী অথবা অপরের ভাষা বা সভ্যতার সমঝদার নহেন বলিয়া বাঙালীদের নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা ও আক্রমণ করা অন্যায় নহে বলিয়া যাঁহারা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা শুধু নিজেদের ন্যায়জ্ঞানের অভাব ও মূর্খতা মাত্র প্রমাণ করিতেছেন। এবং কথাটাও সত্য নহে। অধিকাংশ বাঙালীই আত্মশ্লাঘা-দোষে দুষ্ট নহেন। অ.

শ্রীনেহরুর পাকিস্থান সফর

শুনা যাইতেছে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু শীঘ্রই পাকিস্থান যাইতেছেন নানা সমস্যার মীমাংসা করিতে। এ আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন স্বয়ং আয়ুব খাঁ। এতদিন পরে যদি ব্যাপক মীমাংসা সত্য সত্যই একটা হইয়া যায় তবে তো সে আনন্দেরই কথা। কিন্তু আয়ুব খাঁ সম্প্রতি বেতার ভাষণে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে আশা করিবার কিছুই দেখিতেছি না। কারণ তিনি খালের জলের মীমাংসার সঙ্গে কাশ্মীরকে জড়াইয়াছেন। এই জল-চুক্তি নিষ্পন্ন হইয়া গেলে কাশ্মীর-সমস্যার সমাধান হইতে পারিবে—তাঁহার ভাষণে এইরূপ ইঙ্গিতই আছে। কিন্তু শ্রীনেহরু বলিয়াছেন, ইহার সহিত কাশ্মীরের কোনো সম্পর্ক নাই। এই জল-চুক্তির একটি বড় অংশ হইল মঙ্গলা জল-পরিকল্পনা। এই মঙ্গলা স্থানটি ঝিলাম নদীতীরে। পাক্-অধিকৃত কাশ্মীরে ইহা অবস্থিত। পাকিস্থান কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই এখানে একটি বাঁধ তৈয়ারি করিতে আরম্ভ করে। ভারত তখন এই কাজের তীব্র প্রতিবাদ করে। কিন্তু বর্ত্তমান জল-চুক্তি অনুসারে ভারত মঙ্গলাতে আরও বৃহৎ জল-পরিকল্পনাকে মানিয়া লইল। আর তাহা মানিয়া লওয়ার অর্থই হইল অধিকৃত কাশ্মীরের উপর পাকিস্থানের অধিকারকে স্বীকার করিয়া লওয়া।

এই পাকিস্থানের সহিত প্রতিবারই মীমাংসার কথা উঠিয়াছে। এবং মীমাংসার আশায় বহু চুক্তিই ইতিপূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রতিবারই দেখা গিয়াছে, চুক্তির মূল কথা—দেওয়া আর লওয়া। আমরা দিয়াছি অনেক, পাইয়াছি সামান্যই। সম্প্রতি বিশ্ব-ব্যাঙ্কের সালিশীতে খালের জল লইয়া পাক-ভারত বিরোধের ফয়সালা হইয়াছে। যাহার নিজেরই দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন একান্ত প্রয়োজন, সেই ভারত আপনাকে বঞ্চনা করিয়া বিরাট আর্থিক দারিদ্র্যের বোঝা মাথায় তুলিয়া লইয়াছে। তোষণনীতি চরমে উঠিয়া ঠেকিয়াছে আত্মসমর্পণে। এখন শুধু স্বাক্ষরের অপেক্ষা।

এই চুক্তি-পত্র সহি করিতেই শ্রীনেহরুর পাকিস্থান যাত্রা। মীমাংসার ইচ্ছাটা প্রশংসনীয়, কিন্তু উপায় লইয়াই সংশয়। পাকিস্থান কাশ্মীরে হানাদারমাত্র এবং যে অংশ সে জোর করিয়া দখল করিয়া রাখিয়াছে, তাহাকে পাক-এক্তিয়ারভুক্ত বলিয়া ভারত কোনদিন স্বীকার করে নাই। হামলার বিরুদ্ধে সে রাষ্ট্রপুঞ্জে আবেদন করিয়াছে, শুনানির পর শুনানি চলিয়াছে, কিন্তু ন্যায়বিচার মেলে নাই। পুরানো মামলা অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি রহিয়া গিয়াছে। উপায় যাহা ছিল, বিচিত্র দ্বিধাগ্রস্ত নীতির জন্য ভারত বহুদিনই সে পথ পরিত্যাগ করিয়াছে। বিজয়ী ভারতীয় বাহিনীকে হঠাৎ 'তিষ্ঠ' বলিয়া সংবরণ না করিলে, আজ হয়ত ইতিহাস অন্য রকম হইত। ইতিহাসের পূর্ব্ব অধ্যায়গুলি স্মরণে রাখিয়া শ্রীনেহরুকে আমরা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে বলি। অতীত অভিজ্ঞতা আছে বলিয়াই, আমরা সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করিতেছি স্বীকার করি, মীমাংসার প্রয়োজন আছে। অনন্তকাল ধরিয়া একটা বিরোধকে সযত্নে রক্ষা করিতে কেহই চায় না। এবং ইহাতে দেশের গৌরবও বাড়ে না। কিন্তু দাতাকর্ণ শ্রীনেহরু যেন স্মরণে রাখেন, এদেশে জনমত বলিয়া একটা বস্তু আছে, জাতীয় সম্মানের সঙ্গে মীমাংসাসূত্রে সঙ্গতি না থাকিলে জনমত সহিবে না।

তবে এবারে নেহরু-সম্বর্দ্ধনার আয়োজন দেখিয়া মনে হয়, অন্তত খালের জল লইয়া ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে যে দীর্ঘ বিরোধ—তাহার অবসান হইলেও হইতে পারে। গ.

কঙ্গোর দ্বন্দ্ব

আফ্রিকাস্থিত উপনিবেশ কঙ্গো স্বাধীনতা লাভের পরই তাহার সর্ব্বত্র অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এই আগুন জ্বলিয়াছে, দুইটি উপজাতীয় দলের নেতা জোসেফ কাসাভুভু ও প্যাট্রিক লুমুম্বার ক্ষমতা-দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করিয়া। আগুন নিভিল বটে, কাসাভুভু প্রেসিডেণ্ট ও লুমুম্বা প্রধানমন্ত্রী হইবার সর্ত্তে। কিন্তু সে সাময়িক ভাবে। শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীরা মারপিট সুরু করিল। এই শ্বেতাঙ্গদের রক্ষা করিতে ভূতপূর্ব্ব বেলজিয়ান শাসকদের

পৃষ্ঠপোষিত শ্বেত-সৈন্যবাহিনী বাহির হইয়া আসিল এবং কোনো কোনো এলাকা তাহারা পুনর্দখল করিয়া ফেলিল। লুমুম্বা ইহাতে রাষ্ট্রসংঘের সহায়তা প্রার্থনা করেন। এবং ইহাও জানাইয়া দেন, প্রতিকার না হইলে, তাঁহারা সোভিয়েটের দ্বারস্থ হইবেন। রাষ্ট্রসংঘ অবশ্য কঙ্গোতে সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া আসেন, কিন্তু সেক্রেটারী জেনারেল হ্যামারশীল্ডের কর্ম্মনীতি লুমুম্বার সন্দেহ উদ্রেক করে। কারণ, ইতিমধ্যে খনিজসম্পদে সমৃদ্ধ কাটাঙ্গা অঞ্চলটি কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব অস্বীকার করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং তাহার প্রধানমন্ত্রী মিঃ সোম্বে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের তথা তাঁহাদের মুরুব্বিদের প্রাণের বন্ধু হইয়া উঠেন। যাহা হউক, কেন্দ্রীয় সরকার কাটাঙ্গাকে আয়ত্তে আনিবেন এবং বেলজিয়ান বাহিনীও কঙ্গো পরিত্যাগ করিবে, এমন সম্ভাবনা যখন প্রায় দেখা দিয়াছে, এমন সময় হঠাৎ জাতীয় বেতারে কাসাভুবু ঘোষণা করিলেন যে, লুমুম্বাকে পদচ্যুত করিয়া তিনি সেনেট প্রেসিডেণ্ট জোসেফ ইলিওকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছেন, ইহার পরই লুমুম্বা বেতারে ঘোষণা করিলেন, কাসাভুবু দেশদ্রোহী, সাম্রাজ্যবাদীদের দালাল। তাঁহার গবর্ণমেণ্ট আছে এবং থাকিবে, কেনন', জনগণের আস্থার উপর তাঁহার স্থিতি। অর্থাৎ উভয়ের সেই পুরানো উপজাতীয় দ্বন্দ্ব।

কথা আছে, স্বাধীনতা পাওয়া কঠিন বটে, কিন্তু আরও কঠিন সেই স্বাধীনতা বজায় রাখা। কঙ্গোতে যা ঘটিতেছে, তাহাতে আমাদেরও অনেক শিখিবার আছে। গ

মুক্তি সম্ভাবনায় গোয়া

এতদিন পরে মনে হইতেছে গোয়া সম্বন্ধে যে জটিল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল, কিছুদিন পরে তাহার বুঝি বা অবসান হইলেও হইতে পারে। গোয়ার ন্যাশনাল কংগ্রেসের নবনির্ব্বাচিত প্রেসিডেণ্ট ডাঃ পি. ডি. গায়তুণ্ডে নয়া দিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহাতে সেই সুরই ধ্বনিত হইয়াছে। ডাঃ গায়তুণ্ডে বলিয়াছেন, সাক্ষ্য প্রমাণ হইতে যতদূর জানা যায় তাহাতে মনে হইতেছে, ডাঃ সালাজারের গবর্ণমেণ্ট আর বেশীদিন টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। সালাজার-বিরোধীরা ক্রমশই শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে এবং শেষ আঘাত হানিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। তিনি বলেন, সালাজার-বিরোধীরা গোয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল। সুতরাং তাহারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলে গোয়ার স্বাধীনতাপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত। অবশ্য সালাজার-বিরোধীরা এখন গোয়ার স্বাধীনতার সমর্থক হইলেও সালাজারকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া নিজেরা শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইবার পর গোয়া সম্বন্ধে ভিন্নমূর্ত্তি ধরেন কিনা, তাহা কেহ বলিতে পারে না। বৃটিশের ভারত-শাসনের ইতিহাসে দেখা গিয়াছিল যে, রক্ষণশীল দল ক্ষমতায় আসীন থাকাকালে শ্রমিক দল ভারত-শাসনের নীতি উপলক্ষ্য করিয়া রক্ষণশীল দলকে আক্রমণ করিয়াছে। কিন্তু তাহারা নিজেরা ক্ষমতা লাভ করিয়া ভারতের প্রতি যে-নীতি প্রয়োগ করিয়াছে তাহার সহিত রক্ষণশীল নীতির বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। অবশ্য, অবশেষে ব্রিটেনের শ্রমিক দলই ভারতকে বৃটিশ-শাসন হইতে মুক্তি দিয়াছে। কিন্তু দুই-দুইটি মহাযুদ্ধের ফলে ব্রিটেনের আন্তর্জ্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ অবস্থার অভাবনীয় পরিবর্ত্তন না ঘটিলে শ্রমিকদলও ভারত ছাড়িত কিনা সন্দেহ।

যাহা হউক, বর্ত্তমানে ডাঃ গায়তুণ্ডের প্রকাশিত তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া আশা করা যায়, পর্ত্তুগালের রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন ঘটিলে, গোয়ার স্বাধীনতা আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত না হইলেও অন্ততঃ সাফল্যের পথে অনেকটা অগ্রসর হইতে পারিবে। তিনি আরও একটি আশার কথা বলিয়াছেন, যে-সমস্ত গোয়াবাসী ইউরোপের নানাস্থানে পলায়িত ও নির্ব্বাসিত জীবনযাপন করিতেছেন, তাঁহারা পর্ত্তুগালের সালাজার-বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির সহিত সংযোগ স্থাপন করিতেছেন। তাঁহারা মনে করেন, যে-মুহূর্ত্তে সালাজার গবর্ণমেণ্টের পতন ঘটিবে সেই মুহূর্ত্তেই গোয়ার স্বাধীনতার পথ বাধা-শূন্য হইবে। ইউরোপ-প্রবাসী গোয়ানিজরা ইহাও উপলব্ধি করিয়াছেন, পর্ত্তুগালের সাধারণ লোক স্বাধীনতাকামী গোয়ার প্রতি ক্রমে অধিকতর মাত্রায় সহানুভূতি দেখাইতেছে।

সালাজার গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে পর্ত্তুগালের জনসাধারণের মনে যদি সত্যই বিরাগ ও বিরোধিতার ভাব জন্মিতে থাকে তবে সালাজারের স্বৈরাচারী গবর্ণমেণ্ট যে বেশীদিন টিকিয়া থাকিতে পারিবে না, ইহা সত্য। সালাজার-বিরোধী দলগুলির শক্তিবৃদ্ধি অস্বাভাবিকও নহে। কারণ, সালাজার কেবল গোয়ার উপরই নানারকম দৌরাত্ম্য চালাইতেছেন তাহা নহে, খাস পর্ত্তুগালেই নিজের বিরোধিগণের উপর অসহনীয় অত্যাচার করিতে বিরত হইতেছেন না। সেই জন্য তাঁহার দেশবাসীই যদি অবশেষে তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তাহা বিস্ময়ের কারণ হইবে না।

ভারতবাসীর পক্ষে এইটুকুই আশার কথা। গ

খেলোয়াড় জগতে ভারত

প্রাচীন গ্রীসের স্বর্গের নাম ছিল অলিম্পাস। স্বর্গের দেবতারা গ্রীসের ক্রীড়া-প্রাঙ্গণে আসিয়া এথেন্স, স্পার্টা প্রভৃতি দেশের খেলোয়াড়দিগের সহিত মেলামেশা করিতেন বলিয়া গ্রাসের লোকেদের বিশ্বাস ছিল। এই জন্যই বোধ হয় তাঁহাদের যে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা হইত তাহার নাম দেওয়া হইয়াছিল অলিম্পিকের প্রতিযোগিতা। এই খেলাতে গ্রীসের সম্ভ্রান্ত বংশের বহু খেলোয়াড় যোগদান করিতেন ও বর্ত্তমান জগতে যে অলিম্পিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা প্রচলিত হইয়াছে তাহা নানান ভাবে ঐ প্রাচীন গ্রীসদেশীয় ক্রীড়া-মহোৎসবের অনুকরণে অনুষ্ঠিত হয়। বহু জাতির খেলোয়াড়দিগের সমাগমে এই মহাক্রীড়া-প্রতিযোগিতা আধুনিক জগতের একটা অতি বিশেষ অনুষ্ঠান এবং এই প্রতিযোগিতায় জয়পরাজয় একটা জাতীয় প্রচেষ্টার ব্যাপার। বিগত বহুবর্ষ ধরিয়া ভারতবর্ষের খেলোয়াড়দিগের অলিম্পিকে একমাত্র হকি খেলায় বিশ্বে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিবার সৌভাগ্য ঘটিয়া আসিয়াছে। এই বৎসর অলিম্পিক হকিতে ভারতবর্ষ পাকিস্থানের সহিত খেলায় হারিয়া গিয়া সেই গৌরব হারাইয়াছেন। অপরাপর ক্রীড়াতে ভারতবর্ষ পূর্ব্বের ন্যায় কোনও কিছুতেই জয়লাভ করিতে পারেন নাই। হকিতে উত্তর প্রদেশের খেলোয়াড়দিগের দক্ষতা ভারতে অতুলনীয়। উত্তর প্রদেশের খেলোয়াড়রাই চিরকাল হকিতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু বর্ত্তমান বৎসরে উত্তর প্রদেশের খেলোয়াড়দিগকে রোমের অলিম্পিকে ভারত সরকার না পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহার কারণ কি আমরা ঠিক জানি না। অবশ্য অনুমান করিতেছি যে, কোন সরকারী অথবা কংগ্রেসী কারসাজিতে ইহা ঘটিয়াছে। ভারত সরকার কেন ক্রীড়াক্ষেত্রে নিজেদের মতামত জাহির করিতে গিয়াছেন ইহাও আমরা জানি না। অপরাপর দেশে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দিগকে গভর্ণমেন্ট সাহায্য করিলেও, কে শ্রেষ্ঠ সে বিচারের অধিকার গবর্ণমেন্টের নাই। শুধু ভারতেই বোধ হয় খেলার সহিত সকল সম্বন্ধবর্জ্জিত কোন আমলার হস্তে এতটা ক্ষমতা এই বিষয়ে দেওয়া হইয়াছে যে, সেই আমলা ও তাঁহার মোসাহেবদিগের নির্ব্বুদ্ধিতায় আজ ভারত ৩২ বৎসরের স্থায়ী গৌরব হেলায় হারাইয়া পরাজয়ের কালিমায় কলঙ্কিত। ভারত সরকার শুধু এইটুকু দোষে দুষ্ট নহেন। বহুবিধ ক্রীড়ায় বিচক্ষণ খেলোয়াড় থাকা সত্ত্বেও প্রতিযোগিতায় ভারত হইতে কাহাকেও যাইতে দেওয়া হয় নাই। ভারতের খেলোয়াড়দিগকে অকারণে রোম হইতে অতি শীঘ্র দেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করা হইয়াছে। তাঁহারা অনায়াসেই বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করিয়া ও তদ্দেশীয় খেলোয়াড়দিগের সহিত আরও কয়েকবার খেলিয়া ও প্রতিযোগিতায় নামিয়া অভিজ্ঞতা আহরণ করিতে পারিতেন। ভারত সরকারের কর্ম্মকর্তাদিগের নির্ব্বুদ্ধিতায়, নিকটে থাকিয়াও ভারতীয় খেলোয়াড়গণ সে সুযোগ হারাইলেন।

আগামী ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে জাপানে আবার অলিম্পিক ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হইবে। ততদিনে ভারতের অবস্থা কি হইবে তাহা কে বলিতে পারে। হয়ত বর্ত্তমান কংগ্রেস গবর্ণমেন্ট ততদিন থাকিবেন না। থাকিলে তাঁহাদিগের পক্ষে উচিত হইবে যোগ্য হস্তে খেলোয়াড় নির্ব্বাচনের ভার দেওয়া। কংগ্রেসের নেতারা হকি, কুস্তি, ফুটবল, মুষ্টিযুদ্ধ প্রভৃতি বিশেষ বুঝেন না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। সে ক্ষেত্রে তাঁহাদের পক্ষে ন্যায় ও উচিত হইবে যোগ্য ব্যক্তিদের হস্তে নির্ব্বাচনের ভার দিয়া সরিয়া দাঁড়ান। ভারতের জনসাধারণ ও খেলোয়াড়দিগেরও চেষ্টা করা উচিত যাহাতে নির্ব্বাচনকার্য্য ও অন্যান্য ব্যবস্থা ঠিকমত করা হয়। ভারত সরকার বা প্রদেশ সরকার যদি কিছু করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সেই চেষ্টা করা উচিত যাহাতে উচ্চস্তরের খেলোয়াড়দিগের সাহায্য ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাদিগকে জগত-ক্রীড়ার ক্ষেত্রে উচ্চস্থান অধিকারে সক্ষম করিয়া তোলা যায়। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় তাহা হইবে না। কারণ মোসাহেবি ও সুপারিশবহুল ব্যবস্থায় ভারতীয় খেলোয়াড়দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যাঁহারা তাঁহাদের অলিম্পিকের দলে যাওয়ার সুবিধা ঘটে না। এই মোসাহেবি ও সুপারিশ সমূলে নির্ম্মূল করা প্রয়োজন। কিন্তু কংগ্রেসের দ্বারা তাহা সম্ভব হইবে না। সুতরাং সাধারণকে সেই ভার লইতে হইবে। অ

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় টাকার বরাদ্দ

দুইটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরে তৃতীয় পরিকল্পনার উদ্যোগ-পর্ব্বও সুরু হইয়াছে। গত ১২ই সেপ্টেম্বর নয়া দিল্লীতে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ বা ন্যাশনাল ডেভালপমেন্ট কাউন্সিলের সভায় তৃতীয় পাঁচসালা যোজনার জন্য প্রস্তাবিত মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দুই ভাগে ভাগ করিয়া কেন্দ্রের জন্য ৩৬০০ কোটি টাকা এবং রাজ্যসমূহের জন্য ৩৬৫০ কোটি টাকার বরাদ্দ মোটামুটিভাবে অনুমোদিত হইয়াছে। বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রিগণ তাঁহাদের নিজ নিজ রাজ্যের জন্য বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির দাবি

জানাইয়াছিলেন এবং প্রায় সকলেই তিক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন, যে-পরিমাণ অর্থ রাজ্যের জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছে, প্রয়োজনের তুলনায় তাহা নিতান্তই অনুপযুক্ত। অবশ্য শ্রীনেহরু আশ্বাস দিয়াছেন, প্রয়োজন হইলে আরও টাকা দিবেন। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জনের জন্য রপ্তানি বৃদ্ধির আবশ্যকতার উপর শ্রীনেহরু জোর দিয়াছেন। বলিয়াছেন, এজন্য প্রয়োজন হইলে এদেশের অধিবাসীদের উপবাসী থাকিতে প্রস্তুত হইতে হইবে।

শ্রীনেহরু এরূপ উপদেশের কথা বহুবার বলিয়াছেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করে, দুইটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দশ বৎসর অতিবাহিত হইতে চলিয়াছে—এই দশ বৎসরে দেশের দারিদ্র্য তাঁহারা কতটা দূর করিতে পারিয়াছেন ? অন্নাভাব কি ঘুচিয়াছে ? বেকার-সমস্যার সমাধানই বা কতটা হইয়াছে ? সমাজতন্ত্রের পথে সমাজ কতটা অগ্রসর হইয়াছে ? বরং সাধারণ লোকের দুঃখ-দুর্দ্দশা আরও বাড়িয়াছে, ধনীরা আরও স্ফীত হইয়াছে।

ট্যাক্সের উৎপীড়নের কথা উড়াইয়া দিয়া শ্রীনেহরু বলিয়াছেন, দেশের অভ্যন্তরে অর্থের অভাব নাই। কতকগুলি মহলে আজ যে অর্থের খেলা চলিতেছে, পূর্ব্বে সেরূপ অর্থ কোনদিনই দেখা যায় নাই। দোকানগুলিও এত পণ্যসম্ভারে পূর্ণ ছিল না। ছোট শিল্পগুলি সমৃদ্ধ হইয়াছে এবং সকলপ্রকারের খাদ্য ও পণ্যদ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে। ইহা অবশ্য অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ। সুতরাং পরনির্ভরতা দূর করিয়া স্বাবলম্বী বা আত্মনির্ভর হইবার জন্য কেন আমাদের শক্তি কেন্দ্রীভূত করা হইবে না ?

শ্রীনেহরু বার বার কয়েকশ্রেণীর উর্দ্ধমহলের কথা উল্লেখ করিয়া এই সমৃদ্ধি, পণ্যপ্রাচুর্য্য ও অর্থের ছড়াছড়ির দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু ভারতের দরিদ্র জনসাধারণ যে এই ঐশ্বর্য্য ও প্রাচুর্য্যের চিত্রের মধ্যে কোথাও নাই, তাহা তিনি নিজেও জানেন। বরং কোন ট্যাক্সের উৎপীড়ন যে শেষ পর্য্যন্ত দরিদ্র সাধারণকেই ক্লিষ্ট করে তাহাও কাহারও অজানা নহে। উর্দ্ধমহলের লোকদের—যাহাদের প্রচুর আছে, তাহাদের ট্যাক্স দিতেও হয় প্রচুর ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই ট্যাক্সের উৎপাত যে শেষে ক্রেতাদের উপরে গিয়া পড়ে, সেকথাও ত না-জানা নয়। তাহা অপেক্ষাও অধিক সত্য এই যে, প্রশাসনিক দুর্নীতির ফলে যে যত বড় ট্যাক্স ফাঁকি দিবার বা এড়াইয়া চলিবার ক্ষমতা এবং সুযোগ তাহার তত বেশী। ইহা বার বার প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার তাহার কোন প্রতিকারই করিতে পারেন নাই। যে কোন ট্যাক্সই হউক, উহার আঘাত দুর্ব্বলকেই পিষ্ট করে, সবলকে স্পর্শ করাও কঠিন হইয়া পড়ে। প্রধানমন্ত্রী অর্থের যে ছড়াছড়ির কথা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার সন্নিহিত মহলেই বিরাজিত।

পূর্ব্বের পরিকল্পনাগুলিতে জলের ন্যায় অর্থব্যয় করা সত্ত্বেও কেন দেশের জনসাধারণের বাঞ্ছিত উন্নতি সম্ভব হয় নাই, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলেই ইহা উপলব্ধি করা সহজ হইবে। যাঁহাদের নিকট উন্নতির জন্য অর্থ-ব্যয়ের ভার দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহারা যথাযথভাবে উহা ব্যয় করেন নাই। সংশ্লিষ্ট কর্ম্মচারিগণের উহাতে দুর্নীতির চক্রব্যূহ রচনার পথ প্রশস্ত হইয়াছে। যাহা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন তাহাতে সকলের আগে হাত না দিয়া যাহা পরে হইলেও চলে তাহাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে। দেশোন্নতির নামে স্থানে স্থানে অর্থ অপচয়ের কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। ইহার ফলে দরিদ্র আরও দরিদ্র হইয়াছে এবং ধনীরা আরও ধনের অধিকারী হইয়াছেন।

অতীতের এই অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও তৃতীয় পরিকল্পনার টাকাও ঐ একই পথ দিয়া বাহির করিবার চেষ্টা যাঁহারা করিতেছেন, তাঁহাদের বুদ্ধির তারিফ করিতে হয়। অর্থাৎ তাঁহারা একই পথের খবর রাখেন। দিল্লীর উচ্চমহল হইতে নীচুতলার দুঃখ-দৈন্যের দৃশ্য স্পষ্ট হইতে না পারে, কিন্তু নীচুতলায় আসিয়া দাঁড়াইলেই ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা কত শোচনীয় তাহা ধরা পড়িবে। গ

সমবায়-পদ্ধতিতে চাষের বাধা কোথায় ?

সমবায়-পদ্ধতিতে চাষ—কথাটি শুনিতে ভাল, কিন্তু তাহা প্রয়োগ করা খুব সহজসাধ্য নয়, বিশেষ করিয়া আমাদের দেশে। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ ও তাহার মূল্য-নীতি-কমিটি সমবায়-পদ্ধতিতে চাষ ও খাদ্যশস্যের সরকারী ব্যবসায় সম্বন্ধে যে দুইটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতে সে দুইটি যে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কতটা যুক্তিসঙ্গত তাহা বলা কঠিন। খাদ্যাভাব ও মূল্যবৃদ্ধি ভারতবর্ষের আর্থিক জীবনে এক বিপর্য্যয়ের সূচনা করিতেছে। যদি যথাসময়ে সমস্যা দুইটির সুষ্ঠু সমাধান করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে যে-সঙ্কটের সৃষ্টি হইবে, তাহার ঘূর্ণিপাকে আমাদের বৈষয়িক প্রগতির সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। আর অন্নকষ্ট যদি দূর না হয়, বাজারদর যদি ক্রমশঃ গগন স্পর্শ করে তাহা হইলে দেশ জুড়িয়া অসন্তোষের আগুন দিন দিন যে

বাড়িয়া যাইবে ইহা সহজেই অনুমেয়। প্ল্যানিং কমিশন ও সরকার যে তাহা না বুঝিতেছেন এমন নয়। আর বুঝিতেছেন বলিয়াই, তাঁহারা প্রতিকারের পথ খুঁজিতেছেন সমবায়-কৃষিপদ্ধতি ও সরকারী ব্যবসায়ের মধ্য দিয়া।

দুই দিন ধরিয়া বৈঠকে বক্তৃতা হইয়াছে অনেক এবং বক্তৃতার মধ্যে তত্ত্বকথাই প্রধান। তত্ত্বকথা ভাল, কিন্তু উপবাসী লোকেরা তত্ত্বকথা শুনিতে চায় না, একথা তাঁহারা দশ বৎসরেও বুঝিলেন না!

নিরপেক্ষ মন লইয়া বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে যাঁহারা বিবেচনা করিয়াছেন, তাঁহারা ভারতের খাদ্যসঙ্কট অন্ত করিবার উপায় হিসাবে সমবায়-চাষ বা সরকারী ব্যবসায়ের সমর্থন করিতে পারেন নাই। কারণ, বাধা অনেক। প্রথম বাধা, রাষ্ট্র এই সব ব্যাপারে কঠিন অনুশাসন নির্ম্মম ভাবে প্রয়োগ করিতে ইচ্ছুক নয়। আর তাহা না করিতে পারিলে, ইহা চালু করা সহজসাধ্য হইবে না।

ইহার মধ্যে খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপাতিল কিন্তু একটি সত্য কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, খাদ্যশস্যের সরকারী ব্যবসায়ের আজ কোনও প্রয়োজন নাই। যে অর্থ তাহার জন্য ব্যয় করা হইবে, তাহা বরং নিয়োগ করা উচিত খাদ্য-উৎপাদন-বৃদ্ধি-পরিকল্পনাগুলি সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য। যথেষ্ট খাদ্যশস্য যদি দেশে উৎপাদন করা যায়, তাহা হইলে তাহাদের বাজারদর আপনিই পড়িয়া যাইবে এবং অনুযোগ করিবার কাহারও কিছু থাকিবে না। তবে দুর্দ্দিনের জন্য খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখা উচিত, যাহাতে খাদ্যশস্যের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি না পায়। তিনি আরও বলিয়াছেন, সরকারী ব্যবসায়ের অন্তরায় বহু এবং যদি পুরাপুরি ব্যক্তিগত মালিকানা না তুলিয়া, সরকার একটা মাঝামাঝি রফা করিতে চাহেন, তাহাতে দুই কুলই যাইবে। ক্রেতা সন্তুষ্ট হইবে না, রুচিমত খাদ্যশস্য সংগ্রহ করিতে না পারিয়া, সরকার বিব্রত হইবেন চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে গিয়া। তাহার উপর অপচয় তো আছেই। এই বিশৃঙ্খলার সুযোগ লইয়া ব্যবসায়ীরা নানা অসদ্ উপায় অবলম্বন করিবে। এবং শেষ পর্য্যন্ত দামও কমিবে কিনা সন্দেহ। সমবায়-প্রথায় চাষ শুনিতে বেশ ভাল। কিন্তু ব্যক্তিকেন্দ্রিক চাষীকে তাহাতে রাজী করানো সহজ নয়। বেশী চাপ দিলে হিতে বিপরীত হইবে। যেমন হইয়াছে একাধিক কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে যৌথ খামার প্রথা প্রবর্ত্তন করিতে গিয়া।

সুতরাং জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের তত্ত্বকথা বলা ছাড়া, অন্য কোনো পথ তাহারা বাৎলাইতেও পারিতেছে না। গ

কোন্ কোন্ ভাষা আমাদের শিখিতে হইবে

ছেলেদের কোন্ কোন্ ভাষা পড়ানো হইবে, সে মীমাংসা আজও হইল না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই রাজ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্য্যায়ের শিক্ষায় কোন্ কোন্ ভাষা পড়ানো উচিত এবং কোন্ কোন্ শ্রেণী হইতে কোন্ ভাষার পঠন-পাঠন সুরু হওয়া উচিত, তাহা লইয়া তদন্ত ও যথাবিধি সুপারিশ করার জন্য তের জন শিক্ষাব্রতীর এক বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি সেই কমিটি রাজ্যশিক্ষা-দপ্তরে তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। রিপোর্টের সবটুকু জানা না গেলেও, যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, বাংলা, ইংরেজী, সংস্কৃত ও হিন্দী এই চারিটি ভাষাই বিশেষজ্ঞরা স্কুল-পর্য্যায়ের শিক্ষায় সমস্ত শিক্ষার্থীর জন্য অবশ্য-শিক্ষণীয় করা উচিত বলিয়া অভিমত দিয়াছেন। ইহার ১ প্রথম হইতে এগারো শ্রেণী পর্য্যন্ত বরাবর বাংলা এবং তৃতীয় হইতে এগারো শ্রেণী পর্য্যন্ত ইংরেজী অবশ্য পঠনীয় করিতে হইবে। পঞ্চম হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত এই সঙ্গে সংস্কৃত বাধ্যতামূলকভাবে পড়াইতে হইবে, তারপর তাহা থাকিবে ইচ্ছাধীন বিষয় হিসাবে। ইহা ছাড়া অষ্টম শ্রেণীতে হিন্দীর মৌখিক পঠন-পাঠন হইবে, আর নবম শ্রেণীতে হিন্দী লিখিতে ও পড়িতে শিখানো হইবে। সংস্কৃত ও হিন্দী পঠন-পাঠনে সদস্যেরা সকলে একমত হন নাই। কেউ কেউ সংস্কৃত পঞ্চম হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়ানোর উপর খুব বেশী জোর দেওয়া অনাবশ্যক বলিয়া মনে করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ হিন্দীকে লিখন-পঠন ও পরীক্ষা গ্রহণের স্তর পর্য্যন্ত না আনিয়া শুধু মৌখিক শিক্ষণের মধ্যে আবদ্ধ রাখাই শ্রেয় বলিয়াছেন। কেহ কেহ আবার হিন্দী-শিক্ষাকে সর্ব্বপ্রযত্নে স্বাগত-করারও প্রস্তাব করিয়াছেন। ইংরেজী ও বাংলার ব্যাপারে কোনো বড় রকম মতভেদ ঘটে নাই। মাতৃভাষা বাংলা সম্বন্ধে অবশ্য কোনো ভিন্নমত প্রত্যাশিতও নয়, কিন্তু ইংরেজীর গুরুত্বও আমাদের পাঠ্যতালিকা হইতে কেহ হ্রাসের প্রয়োজনবোধ করেন নাই। শুধু একজন সদস্য তৃতীয় শ্রেণীর বদলে পঞ্চম শ্রেণী হইতে ইংরেজী সুরু করার প্রস্তাব করিয়াছেন। মোটের উপর দেখা যাইতেছে, স্কুল পর্য্যায়ের শিক্ষায় তৃতীয় হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত দুইটি ভাষা, পঞ্চম হইতে অষ্টম পর্য্যন্ত তিনটি এবং তাহার পর হইতে চারটি ভাষা এক সঙ্গে

সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীর জন্য অবশ্য শিক্ষণীয় করার সুপারিশ করা হইয়াছে।

এখন কথা হইতেছে, কোনো ভাষা শেখা মানেই, সেই ভাষার ব্যাকরণ ও বাক্যরচনা-পদ্ধতি শেখা এবং তাহার গদ্য ও পদ্য সাহিত্যের নির্ব্বাচিত নিদর্শনগুলি পড়িয়া বোঝা। কিন্তু দশ হইতে ষোল-সতের পর্য্যন্ত বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য এই চারিটি ব্যাকরণ ও সাহিত্য পাঠ কি করিয়া সম্ভব? তা ছাড়া, সেই সঙ্গে রহিয়াছে, সমগ্র পৃথিবীর ভূগোল ও ইতিহাস, গণিত এবং প্রাথমিক বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, অতিরিক্ত বাংলা প্রভৃতি ঐচ্ছিক বিষয়।

কাজেই কোনো কিছু পড়িয়া শেখা যে আজ আর সম্ভাব্যতার মধ্যে নাই, শুধু প্রাণপণ করিয়া পাসের জন্য তৈরী হওয়াই যে একমাত্র গতি ইহা তো অস্বীকার করা যায় না। পাঠ্য-তালিকার এই আতিশয্যে এবং পঠনীয় বস্তুর প্রাচুর্য্যে শেখে না তাহারা কিছুই।

মাতৃভাষা বাংলা সকলকেই শিখাইতে হইবে এবং ভাল করিয়া শিখাইতে হইবে ইহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু কি ভাবে পড়াইতে হইবে, তাহা চিন্তনীয়। বর্ত্তমানেও আমরা বাংলা কম পড়াই না, কিন্তু নির্ভুল বাংলা বলিতে ও লিখিতে পারে না শতকরা দশটি ছাত্র-ছাত্রীও। স্কুল হইতে কলেজ এবং কলেজ হইতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যন্ত এই বনিয়াদের গলদ তাহাদের অপরিবর্ত্তিত থাকে। মাতৃভাষা শিক্ষার মূলগত এই ত্রুটি সংশোধনের উপায়টা ভাবা হইয়াছে কি? ইংরেজীও বর্ত্তমানে আমরা যথেষ্টই পড়াই, কিন্তু ইংরেজী শেখে না শতকরা দুইজনও। ইংরেজী ভাষার সুবৃহৎ ব্যাকরণ এবং ইংরেজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি-সাহিত্যিকদের রচনাবলীর অতলে পড়িয়া হাবুডুবু খায় প্রায় সবাই। দু'লাইন নির্ভুল ইংরেজী বলিতে বা লিখিতেও পারে না, পড়িয়াও বুঝিতে পারে না। আসলে ইংরেজী পড়ানোর মধ্যেই গলদ আছে আমাদের। বাংলা মাতৃভাষা, শিক্ষার্থীরা ওটার উপর তাই গুরুত্ব দেয় না—ধরিয়া লয় যে, না শিখিলেও বুঝি বাংলায় তাহাদের দক্ষতা আসিবেই। বাংলা শেখে না তাহারা এই জন্য। আর ইংরেজী পরের ভাষা, ওটা তাহাদের শেখানোই হয় না। কারণ, শিক্ষাদাতাদের নিজেদেরই ইংরেজীতে দখল অতি সামান্য। অতএব ইংরেজী পড়ানোর সিদ্ধান্ত যদি অপরিবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে কোন্ ইংরেজী আমরা শিখাইব, সেটা আগে ঠিক করিয়া লওয়া দরকার। সাহিত্যিক ইংরেজীতে সাধারণ পড়ুয়ার বিশেষ প্রয়োজন নাই। সুতরাং 'বেসিক' বা ভিত্তিমূলক ইংরেজী পড়াইলে ক্ষতি কি? পড়িয়া ও শুনিয়া অন্যের ভাব বোঝা এবং বলিয়া ও লিখিয়া নিজের ভাব বোঝানো, এইটুকু উহাতেই করা যাইতে পারে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই ভিত্তিমূলক ইংরেজীই আন্তর্জ্জাতিক ভাষার পদবী লইয়াছে। আর অনেক দেশেই ইহা পরীক্ষণীয় বিষয়েরও অন্তর্গত নহে। সংস্কৃত কিছুটা শেখা ভারতবাসী মাত্রেরই কর্ত্তব্য। সে হিসাবে কিছু গদ্য পদ্য রচনা নিদর্শন এবং ব্যাকরণের সাধারণ নিয়মাবলী পড়ানো হয়ত নিষ্প্রয়োজন নয়, কিন্তু ত্রিশ বা চল্লিশ নম্বরের পত্রাংশরূপে তা বাংলার সঙ্গে যুক্ত করিয়া দিলেও তো চলে। আর হিন্দীর ভবিষ্যৎই এখনো নিশ্চিত নয়, এ অবস্থায় মৌখিক শিক্ষণের বাহিরে তাহাকে অধিকতর প্রাধান্য দিবার প্রয়োজন দেখি না। আসলে মাতৃভাষাই সর্ব্বপ্রযত্নে শিখাইতে হইবে এবং সংস্কৃত, হিন্দী ও ইংরেজী প্রভৃতি ভাষা মাতৃভাষার মাধ্যমে যতটা সম্ভব শিখাইতে হইবে। ইহার মধ্যে ইংরেজীর যতটা প্রয়োজন, অন্য দুটির তত নয়। বিশেষজ্ঞদের এই দিক দিয়া চিন্তা করিতে বলি। গ

খাদ্যতালিকায় ভারতবাসী

সদ্য-প্রকাশিত বিবরণীতে জানা যায় যে, বিশ্বে অন্যান্য দেশের সহিত তুলনায় ভারতবাসীর আয়ুষ্কাল সর্ব্বাপেক্ষা কম—গড়ে মাত্র ৩২ বৎসর। কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, পুষ্টিকারিতার দিক দিয়া ভারতবাসীর খাদ্য সর্ব্বাপেক্ষা ন্যূন। এই সর্ব্বনাশা উপসর্গের সঙ্কোচেই সমগ্র ভারতীয় জাতির উপর নিয়তির নির্ম্মম খড়্গ নামিয়া আসিতেছে। জাতীয় সরকারের কর্ণধারগণ আজও ইহার সম্যক তাৎপর্য্য চিন্তা করেন নাই।

এই গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বেও ভারতবর্ষে গড় আয়ু ছিল ২৫ বৎসরের নীচে। সে তুলনায় এখন আয়ুষ্কাল গড়ে ৭ বৎসর বৃদ্ধি পাওয়ায় কর্ত্তাব্যক্তিগণ উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু কেন এইরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা তাঁহারা তলাইয়া দেখেন নাই। বর্ত্তমান যুগে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থায় প্রভূত উন্নতির এবং মারাত্মক ব্যাধি আরোগ্য করার উপযোগী অনেকগুলি অব্যর্থ ঔষধ উদ্ভাবনের ফলে অকালমৃত্যুর হার অনেক কমিয়া গিয়াছে। অন্য দিকে নবজাতকের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়াছে। কিন্তু আয়ুষ্কাল বাড়ে নাই।

ইহার দুইটি কারণ লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ, শিল্প-সভ্যতার সহগামী নানা প্রতিকূল উপসর্গের চাপে এবং খাদ্য ও পরিবেশ ঘটিত নানা কারণে বহুবিধ জটিল রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটিলেও, তাহা প্রতিকারের ব্যবস্থাও

বর্ত্তমান যুগে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু রোগকে দমাইলেও আয়ু বাড়ানো যাইতেছে না। রাষ্ট্রসঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা কর্ত্তৃক সঙ্কলিত খাদ্যসংক্রান্ত তথ্যটি বিশ্লেষণ করিলে, সাধারণ স্বাস্থ্যহানির মূল কারণ সম্পর্কে সন্দেহের আর কোনো অবকাশ থাকে না। ইহাতে বলা হইয়াছে, বিশ্বের যে সকল দেশে মাথাপিছু খাদ্য সরবরাহের হিসাব পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে ভারতের স্থান সর্ব্বনিম্নে—অর্থাৎ ভারতের অবস্থাই সর্ব্বাপেক্ষা খারাপ। শরীরে উত্তাপ সৃষ্টির উপযোগী উপাদানের দিক দিয়া ভারতবাসী দৈনিক মাত্র ১৮০০ কালোরি খাদ্য পাইয়া থাকে। অথচ অন্যান্য দেশ ইহার তুলনায় অনেক বেশী খাদ্য পাইয়া থাকে। শ্বেতসার, শর্করা, স্নেহজাতীয় পদার্থ ভেদে খাদ্যের গুণাগুণে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। শারীরিক শক্তি, বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ, চিন্তাশক্তির প্রসার ইত্যাদি উপাদান অনুযায়ী খাদ্যের প্রভাব অনস্বীকার্য্য। দুধ, মাখন ও দুগ্ধজাত স্নেহপদার্থ না পাইলে, মস্তিষ্ক চালনার ক্ষমতা স্বাভাবিক প্রসারতা লাভ করিতে পারে না। মনুষ্য-দেহের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রগুলি উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের তুলনায় অনেক সহজে দুগ্ধজাত কিম্বা আমিষ প্রোটিনের সারাংশ গ্রহণ করিতে পারে। রোগ-ব্যাধি প্রতিরোধের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য কয়েক প্রকার খাদ্য গ্রহণ করা অবশ্য প্রয়োজন। গুণগত তালিকা অনুসারে এসব অত্যাবশ্যক খাদ্য সরবরাহের দিক দিয়া ভারতের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। জনসাধারণের একটি বৃহৎ অংশ মাছ মাংস ডিম খায় না। অতীতে দুধ, মাখন, ঘৃত ও ছানা দ্বারা তাহারা প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করিত। দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের মাঝামাঝি হইতে এই সব পুষ্টিকর খাদ্য ক্রমশঃ দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে। খাঁটি মাখন, ঘৃত ও দুধ সরবরাহের পরিমাণ এত কম যে, চাহিদার এক-শতাংশও পূরণ হইবে কিনা সন্দেহ। আমিষভোজীদের পক্ষে প্রত্যহ মাছ, মাংস ও ডিম সংগ্রহ করা দুরাশা বলিলেও চলে। গুড়, চিনি, বাদাম, তৈল প্রভৃতি খাদ্যের দর অত্যধিক চড়িয়া যাওয়ায় সাধারণ লোকের পক্ষে স্বাস্থ্যের দিক দিয়া ন্যূনতম চাহিদাও পূরণ করা দুঃসাধ্য। অর্থাৎ কেবলমাত্র মোট পরিমাণের দিক দিয়া নহে, উপাদানগত গুণের দিক দিয়াও ভারতে গড়পড়তা খাদ্যের অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়।

এই সব কারণেই মৃত্যুহার কমিলেও, আয়ুষ্কাল স্বাভাবিক গতিতে উন্নীত হয় নাই। বরং সাধারণ স্বাস্থ্য ক্রমশঃ খারাপ হইয়া পড়িতেছে—চিন্তা করার ও পরিশ্রম করার শক্তিও ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। এই সব উপসর্গের সর্ব্বনাশা প্রতিক্রিয়া মাত্র পূর্ণবয়স্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই, জাতির ভবিষ্যৎ বনিয়াদ—শিশু, কিশোর এবং যুবক-যুবতীদের জীবনীশক্তি তথা কর্ম্মক্ষমতাও ইহার ফলে ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। জাতির আশা-ভরসা যাহারা তাহাদের দুধ ঘি মাখন ছানা মাছ মাংস টাট্‌কা ও শুক্‌না ফল, বাদাম, খাঁটি তৈল প্রভৃতি শরীর ও মস্তিষ্ক গঠনের উপযোগী এবং রোগ-প্রতিরোধক খাদ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া, ভবিষ্যতের একটি চমৎকার বনিয়াদ আমরা তৈয়ারি করিতেছি। আর দুই যুগ পরে স্বয়ং বিধাতাও কি এই জাতিকে রক্ষা করিতে পারিবেন! গ

কলিকাতা যাদুঘর

কলিকাতায় অবস্থিত যাদুঘরটি সংস্কৃতির দিক দিয়া তাহার অসাধারণ গুরুত্ব রহিয়াছে। বলা বাহুল্য, এই যাদুঘরটি ভারতের মধ্যে বৃহত্তম। ভারতের বাহিরেও ইহার একটা সুনাম রহিয়াছে। এই অবস্থায় যদি কলিকাতা যাদুঘরের গুরুত্ব হ্রাসের সম্ভাবনা দেখা দেয়, তাহাতে উদ্বিগ্ন না হইয়া পারা যায় না। অথচ ১৯১০ সনের ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম আইনের সংশোধনকল্পে রাজ্য-সভায় যে বিল পেশ করা হইয়াছে, তাহাতে আশঙ্কা হয়, কলিকাতা যাদুঘরের উপরে ইহা একটা আঘাত হইয়াই দেখা দিবে। বিলে মিউজিয়ামের ট্রাষ্টি-বোর্ডকে প্রায় পুরাপুরিভাবেই সরকারী করার ব্যবস্থা হইয়াছে। সেই সঙ্গে বলা হইয়াছে যে, নীতি-সংক্রান্ত ব্যাপারে ট্রাষ্টিরা ভারত সরকারের নির্দ্দেশ মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবেন। অর্থাৎ সরকারী নিয়ন্ত্রণের ফাঁসটা এবারে এই প্রতিষ্ঠানের উপরে বেশ আঁটিয়া বসিবে, এমন আশঙ্কা অযৌক্তিক নহে। মিউজিয়ামের সহিত সংশ্লিষ্ট মহল আশঙ্কা করিতেছেন, ইহার পর কলিকাতা যাদুঘরের বহু মূল্যবান দ্রব্য হয়ত অন্যান্য মিউজিয়ামে স্থানান্তরিত হইবে।

বলা বাহুল্য, এই ক্ষতির সম্ভাবনাকে কিছুতেই স্বীকার করিয়া লওয়া যায় না। শুধু তাই নয়, কলিকাতা যাদুঘরের উপরে উদ্যত এই আঘাতের সম্ভাবনাকে যে পশ্চিমবঙ্গেরই বিরুদ্ধে উদ্যত একটি আঘাত বলিয়া গণ্য করা হইবে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। গ

পূজার ছুটি

শারদীয়া পূজা উপলক্ষে 'প্রবাসী'-কার্য্যালয় আগামী ১০ই আশ্বিন (২৬শে সেপ্টেম্বর) সোমবার হইতে ২৩শে আশ্বিন (৯ই অক্টোবর) রবিবার পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। এই সময়ে প্রাপ্ত চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যবস্থা আপিস খুলিবার পর করা হইবে।

কর্ম্মাধ্যক্ষ, প্রবাসী

নাগাদের কথা

শ্রীহেম হালদার

প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু গত ৩১শে জুলাই লোকসভায় ঘোষণা করেন যে, ভারত সরকার আসামের পার্ব্বত্য নাগা অঞ্চলকে এক স্বতন্ত্র রাজ্যের মর্য্যাদা দিতে স্বীকৃত হয়েছেন। আসামের অন্তর্গত নাগা পার্ব্বত্য জেলা, নাগা উপজাতি অঞ্চল ও টুয়েনসং এলেকাকে মিলিত করিয়া এই রাজ্য গঠন করা হইবে। এই ঘোষণা লোকসভার সকল বিরোধী দলের সমর্থন লাভ করে।

আসামের অন্তর্গত নাগা পার্ব্বত্য জেলা দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৮০ মাইল, প্রস্থে ২৫ মাইল। টুয়েনসং এলেকাকে মিলিত করিলে এই সমগ্র এলেকার পরিধি ৬,৩৩১ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৪ লক্ষের কাছাকাছি।

আসামের এই পার্ব্বত্য উপজাতিদের সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বেশী দিনের নয়। অতীত ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির তারা ধারক ও বাহক নয়। কিন্তু ভারতের সভ্যতার অধিকারী অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত যখন তাহারা সমপর্য্যায়ে আসীন হয় তখন তাহাদের সম্পর্কে জানবার কৌতূহল আমাদের স্বাভাবিক।

আসামের উত্তরাঞ্চলব্যাপী হিমালয় সমুদ্রকূলবর্ত্তী হইবার পূর্ব্বে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতের সৃষ্টি করিয়াছে। উহাই ভারতের সহিত বর্ম্মার সীমান্ত। এই সমস্ত পর্ব্বতমালার গায়ে বিভিন্ন উপজাতিদের বাস। আসামের ১২টি জেলার মধ্যে ৬টি জেলায়, উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত এজেন্সী, মণিপুর, পার্ব্বত্য ত্রিপুরা ও অন্যান্য অঞ্চলে এই সমস্ত উপজাতিদের বাসস্থান। তাহাদের জীবনধারণের পদ্ধতি, ভাষা, সংস্কৃতি সবই পৃথক।

নাগা পার্ব্বত্য অঞ্চল ইহারই একটা অংশ। উত্তরে—উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত এজেন্সি, পশ্চিমে লখিমপুর ও শিবসাগর জেলা, দক্ষিণে মণিপুর দ্বারা এই অঞ্চল বেষ্টিত। ১৮৯১ সনে এই অঞ্চলে প্রথম লোকগণনা হয়। তখন জনসংখ্যা ছিল ৯৬ হাজার। ১৯৫১ সনের সেন্সাস অনুসারে উহার সংখ্যা হইতেছে ২ লক্ষ ৫ হাজার।

নাগা উপজাতিরা বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত। প্রধান গোষ্ঠী আংমী। ইহারা দেখিতে সুপুরুষ। তাহারা প্রধানতঃ কোহিমার চতুর্দ্দিকে বাস করে। অন্যান্য গোষ্ঠী হইতেছে—আউস্, সেমা ও লোটাস। ইহা ব্যতীত কাচা নাগা, রেংগামিজ প্রভৃতি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীও আছে। কোহিমার উত্তরে রেংগী ও লোটাস নাগাদের বাস। লোটাস নাগাদের উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলে ডিকু নদীর সীমানা পর্য্যন্ত আউস্ নাগাদের বাস। রেংগী নাগাদের পূর্ব্বদিকে সেমা নাগাদের বাস।

এই অঞ্চলের পাহাড়গুলির উচ্চতা খুব বেশী নয়—৪ হাজার হইতে ৬ হাজার ফুটের মধ্যে। কোহিমার নিকটবর্ত্তী জাপো পাহাড়ই সবচেয়ে উচু (৯,৮৯০ ফুট)। কয়েকটি পার্ব্বত্য নদী এই অঞ্চল দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে—তাহার মধ্যে ডয়েং ও ডিকু নদীই প্রধান। পাহাড়ের গা গভীর জঙ্গলে ঘেরা।

সামাজিক অবস্থা:—নাগাদের অতীত সম্পর্কে খুব বেশী তথ্য জানা নাই। অনেকের ধারণা ইহারা তিব্বত ও ব্রহ্ম সীমান্ত হইতে আসিয়া এই অঞ্চলে বসবাস করে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে টোডরমলের বিবরণে আসামের যে পার্ব্বত্য উপজাতিদের কথা লেখা আছে—তাহা সম্ভবতঃ এই নাগাদের সম্পর্কে। তার বিবরণে বলা হয়—ইহারা শূকরের চামড়া-নির্ম্মিত টুপি পরিধান করিত, অলঙ্কার পরিবার নিমিত্ত কাণে বড় বড় ছিদ্র করিত, আসামের অহম রাজাদের রাজত্বকালে তাহারা মাঝে মাঝে আসিয়া সমতলভূমির উপর আক্রমণ করিয়া কিছু দ্রব্য-সামগ্রী লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া যাইত।

কৃষিকার্য্যই ছিল ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। বাকি সময় তাহারা শিকার করিয়া আহার্য্য সংগ্রহ করিত। শিকারে বাহির হইবার সময় তাহারা দলবদ্ধভাবে বাহির হইত। তীর-ধনুকই প্রধান অস্ত্র। হাতীর মাংস সমেত যে কোনও পশুর মাংস তাহাদের প্রিয় খাদ্য ছিল।

ধর্ম্মবিশ্বাস:—নাগারা কোনও প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিল না। অন্ধ কুসংস্কার, নানা প্রকার ভূতপ্রেত ও আধিভৌতিক প্রেরণা তাহাদের জীবন-দর্শনকে রূপায়িত করিত। স্বপ্নকে সত্য বলিয়া মনে করা, পশু-পক্ষীর যাতায়াত দ্বারা শুভাশুভের নির্দ্দেশ, সূর্য্য ও চন্দ্র ঈশ্বরের প্রতীক, মৃত্যুর পর মানুষের পুনরাগমন প্রভৃতি

বিশ্বাসই তাহাদের আশ্রয় ছিল। মৃতদেহকে তিনদিন ধরিয়া রাখিয়া পাপাক্সপ পূজা-অর্চনা করা হইত, তার পর পুঁতিয়া ফেলা হইত। কোনও শিকারে বাহির হইবার আগে তাহারা কোনও শুভ নিদর্শনের অপেক্ষায় থাকিত। ভূমিকম্প ঈশ্বরের অভিশাপ মনে করিত।

তাহারা হিন্দুধর্মে বিশ্বাস করিত না। ১৮৭৬ সনে আমেরিকান ব্যাপটিষ্ট মিশন মালংয়ে একটা কেন্দ্র খোলেন; তার পর আরও কয়েকটি কেন্দ্র খোলা হয়। তাহাদের চেষ্টা কিছুটা ফলবতী হইয়াছে। ১৯৫১ সনের সেন্সাস রিপোর্টে দেখা যায়, মোট ২ লক্ষ ৫ হাজার অধিবাসীর মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ খ্রীষ্টধর্ম্ম মতাবলম্বী আর হিন্দুর সংখ্যা মাত্র ৮ হাজার।

অত্যন্ত কঠিন জীবন-সংগ্রামের মাধ্যমে তাহাদের অগ্রসর হইতে হয়। আদিম বর্ব্বর জীবনযাত্রার সমীপবর্ত্তী এক স্তরে তাহারা বাস করিত। নানারূপ পশুর চামড়া ও গাছের ছাল দ্বারা তাহারা দেহকে আবৃত করিত—কিন্তু পূর্ব্ব-সীমান্তবর্ত্তী কিছু অংশের নাগা সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় বাস করিত। ইহা হইতেই বোধ হয় 'নাগা' নামের উৎপত্তি।

একদিকে এই কঠিন জীবনযাত্রা, অন্যদিকে কোনও প্রচলিত শাসন ব্যবস্থার মধ্যে তাহারা বাস করিত না। গ্রামের সকলে মিলিত হইয়া একজনকে প্রধান নিযুক্ত করিত। কিন্তু তাহার ক্ষমতা নিতান্ত সীমাবদ্ধ ছিল। পরস্পর পরস্পরের ভাষা বুঝিত না—তাহাদের কোনও লিখিত ভাষা ছিল না। সেই জন্য গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে এবং একই গোষ্ঠীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ চিরস্থায়ী ছিল। একবার বিরোধ সুরু হইলে তাহা তুমুল খণ্ডযুদ্ধের আকার ধারণ করিত। বহু নর-হত্যা হইত। এই ভাবে বিরোধের মধ্যে লালিত-পালিত হওয়ায়, তাহারা অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠে।

Head-hunting বা নর-শির কর্ত্তন :—নাগাদের মধ্যে যে প্রথার বহুল আলোচিত হইয়াছে—অর্থাৎ Head-hunting বা নর-শির কর্ত্তন, তা এই অন্ধবিশ্বাস ও দুর্দ্ধর্ষ চরিত্রের পরিণতি। বিভিন্ন লেখক এই প্রথা যে বহুল প্রচলিত ছিল তার সাক্ষ্য রাখিয়া গিয়াছেন। মিঃ টি. সি. হডসন্ তাঁর "Head-hunting among the Hill Tribes of Assam." প্রবন্ধে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।

এই প্রথার উৎপত্তি তাহাদের কতকগুলি অন্ধ-বিশ্বাসেরই ফল। গ্রামে কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ হইলে, অথবা ফসলহানি দেখা দিলে, সকলে মনে করিত, তাহারা বহুদিন কোনও মনুষ্য-শির কর্ত্তন করে নাই বলিয়া এই অভিশাপ দেখা দিয়াছে। তখন গ্রামের সকলে মিলিয়া সভা করিত, কোন্ গ্রাম আক্রমণ করা হইবে স্থির হইত এবং শুভদিনক্ষণ দেখিয়া গ্রামের যুবকেরা এতদুদ্দেশ্যে বাহির হইত।

গভীর রাত্রে সকলে অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া যে গ্রাম আক্রমণ করা হইবে, তাহার সমীপবর্ত্তী কোনও জঙ্গলে আত্মগোপন করিয়া থাকিত। অতি প্রত্যুষে সেই গ্রাম আক্রমণ করিয়া যাহাকে সম্মুখে পাইত তাহাকে হত্যা করিত। ইহার ফলে উভয় গ্রামের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী খণ্ডযুদ্ধ হওয়াও স্বাভাবিক ছিল। তাহার ফলে একের স্থলে অধিক নরমুণ্ড মাটিতে লুণ্ঠিত হইত।

মৃতব্যক্তির খণ্ডিত শির লইয়া তখন তাহারা শোভা-যাত্রা সহকারে ফিরিয়া আসিত। গ্রামে ফিরিয়া সেই শির অতি যত্নের সহিত কোনও কেন্দ্রীয় স্থানে বৃক্ষোপরি অথবা শিলাখণ্ডে স্থাপন করিয়া পূজা-অর্চনা করিত। যে ব্যক্তি এই হত্যা করিতে পারিত সে "সর্ব্বোচ্চ বীর" আখ্যা পাইত। এইভাবে প্রতি গ্রামে একাধিক "বীরের" অভাব ছিল না।

বৃটিশ অনুপ্রবেশ :—১৮২৬ সনে আসাম বৃটিশ কর্তৃত্বে আসে। তাহার কিছুদিন পরেই বৃটিশ কর্তৃপক্ষ এই নাগা উপজাতিদের সম্পর্কে সচেতন হয়। নাগারা মাঝে মাঝে আসিয়া আসাম সমতলভূমির উপর হানা দিয়া ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া পাহাড়ে চলিয়া যাইত। ইহাতে আসামের শাসনকর্ত্তৃপক্ষ অত্যন্ত বিব্রত বোধ করিতে লাগিলেন। ইহা হইতেই নাগাদের সম্পর্কে তাহাদের নজর পড়িল।

এই সম্পর্ক সুরু হয় ১৮৩২ সনে। আর নাগা অঞ্চলে শাসনকর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে আরও ৫০ বৎসর কাটিয়া যায়। এই কয় বৎসর উভয় দলে বহু রক্তক্ষয়ী তীব্র সংগ্রাম হয়।

১৮৩২ সনে ক্যাপ্টেন জেনকিনস্ ও মিঃ পেমবারটন্ এই অঞ্চলে প্রথম অনুপ্রবেশ করেন। তাঁহারা বহু বাধার সম্মুখীন হন। শেষ পর্য্যন্ত কোনও রকমে এই অঞ্চল হইতে ফিরিয়া আসেন।

১৮৩৯ সনে মিঃ গ্রান্জের নেতৃত্বে এক সৈন্যদল প্রেরণ করা হয়। নাগা প্রধানেরা মিঃ গ্রানজ্‌কে দেখিতে আসেন। একজন "বীর" প্রধান—তাহার দ্বারা নিহত খণ্ডিত নর-শিরের চুল দ্বারা নির্ম্মিত মালা গলায় পরিয়া আসেন। কিন্তু মিঃ গ্রান্জের প্রধান উদ্দেশ্য—আসাম সীমান্তে নাগা আক্রমণ বন্ধ করা সফল হইল না। তিনি অন্য পথ দিয়া চলিয়া আসেন।

ইতিমধ্যে সীমান্তের উপর নাগা-কর্ত্তৃক পুন: পুন: আক্রমণ চলিতে থাকে। সীমান্ত অধিবাসী বহু নরনারীর জীবন বিপন্ন হয় ও ধনসম্পত্তি লুণ্ঠিত হইতে থাকে। ১৮৪০ সনে গ্রানজ আরও অধিক সৈন্যবাহিনী সহ আবার এই অঞ্চলে প্রবেশ করেন এবং বহু নাগাকে বন্দী করেন। ৫টি গ্রাম অগ্নিসংযোগ দ্বারা ধ্বংস করা হয়। ইহাতে অবস্থা কতকটা আয়ত্তে আসে। নাগারা কিছু 'কর' দিতে স্বীকৃত হয়। ১৮৪৪ সনে জনৈক কর্মচারী এই 'কর' আদায় করিতে গেলে তাহাকে হত্যা করা হয় এবং বৃটিশ সৈন্যের এক ঘাঁটি আক্রমণ করিয়া বহু সিপাহীকে হত্যা করা হয়। পর বৎসর ক্যাপ্টেন বার্টলার যাইয়া তাহাদের সাময়িক ভাবে দমন করিতে সমর্থ হন। তাহার বিবরণ অনুসারে সরকার সামুগোটিং পর্যন্ত এক রাস্তা নির্ম্মাণ করেন। ডিমাপুরে এক সামরিক ঘাঁটিও স্থাপন করা হয়। ভোগচাঁদ দারোগা নামে এক সুচতুর কর্ম্মচারীকে এই ঘাঁটির ভার দেওয়া হইল। কিন্তু নাগারা তাঁহাকে অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া হত্যা করে। ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য লেঃ ভিনসেণ্টকে প্রেরণ করা হয়। তাঁহার বাহিনী যে গ্রামে আশ্রয় লয় নাগারা অগ্নিসংযোগ দ্বারা উহা পুড়াইয়া দেয়।

এই অবস্থায় ১৮৫১ সনে লর্ড ডালহৌসি নাগা অঞ্চল হইতে সৈন্য অপসারণের সিদ্ধান্ত করেন। পরবর্ত্তী ১০ বৎসর আর কোনও সৈন্যদল অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নাই।

কিন্তু তা সত্ত্বেও নাগাদের প্রতি-আক্রমণ বন্ধ হইল না। আসাম সীমান্তে আবার আক্রমণ চলিতে থাকে। ১৮৬২ সনে গবর্ণর জেনারেল সিসিল বিডন এই নীতির পরিবর্ত্তন করেন এবং এতদিন বাহির হইতে নাগাদের দমন করিবার যে নীতি চলিতেছিল তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া উহার অভ্যন্তরে শাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করেন।

এই উদ্দেশ্যে লেঃ গ্রেগরী সামুগোটিং পুনরায় দখল করেন। এইখানে এক শাসনযন্ত্রের কেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

এই সময় রাজেপিমা গ্রামের নাগারা উত্তর কাছাড়ের এক গ্রাম আক্রমণ করিয়া প্রচুর ধ্বংসসাধন করে। তাহাদের বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়, তাহার বিবরণে বলা হইয়াছে :

"Razepemah was levelled to the ground ; its lands declared barren and desolate for ever ; and its people, on their making complete submission, were distributed througout other communities. (Page 121. The North-East Frontier of Bengal, by A. Mackenzie).

১৮৭৫ সনে লেঃ হলকম্ এক জরিপ কার্য্যে অগ্রসর হইতেছিলেন। নাগারা অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার ৮০ জন সহকর্মীকে নিহত করে। এক সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিয়া এই গ্রাম ধ্বংস করা হয়। ১৮৭৭ সনে মোজেমা গ্রামের নাগারা উত্তর কাছাড়ের নিকট একটি গ্রাম আক্রমণ করে। তাহাদের দমন করিবার জন্য এই গ্রাম অগ্নিসংযোগে ভস্মীভুত করা হয়।

ইহার পর আর কোনও ব্যাপক আক্রমণ হয় নাই। ১৮৭৮ সনে শাসনকেন্দ্র কোহিমায় স্থানান্তরিত করা হইল। ধীরে ধীরে বিভিন্ন অঞ্চলে স্থায়ীভাবে সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করিয়া সরকার শান্তি স্থাপন করেন।

নাগা অঞ্চলে বৃটিশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ইহাই সংক্ষিপ্ত কাহিনী। এই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘকাল ধরিয়া বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ নাগাদের উপর চরম অত্যাচার চালাইয়াছে, গ্রামের পর গ্রাম অগ্নিসংযোগে ভস্মীভুত করিয়াছে, বহু নিরীহ নাগাকে গুলী করিয়া হত্যা করিয়াছে। এই অত্যাচারের তুলনা নাই। কিন্তু অন্যদিকে নাগা সমাজ-ব্যবস্থার বর্ব্বরতার কথাও আমরা জানি যে, সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষের শির ছিন্ন করিয়া আনন্দ উৎসব করা হইত। সুতরাং ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে সেই আদিম বর্ব্বরতার অবসানকল্পে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচার যতই কঠিন ও হৃদয়বিদারক হউক না কেন, এই আদিম সমাজব্যবস্থা ছিন্ন করিয়া নূতন সমাজব্যবস্থার গোড়াপত্তনের জন্য তাহার প্রয়োজন ছিল।

ইহার পর এই অঞ্চলে ধীরে ধীরে হাসপাতাল, বিদ্যালয়, রাস্তাঘাট প্রসারের মাধ্যমে সভ্যতার অগ্রগতি হইতে থাকে। শাসনযন্ত্র সুদৃঢ় হইয়া উঠে। বৃটিশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্বাধীনতার পর :—বৃটিশ শাসনের অবসানে স্বাধীনতার পর এই অঞ্চলের উন্নতি আরও দ্রুত অগ্রগতি হইতে থাকে। রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ, শিক্ষার প্রসার ও স্বাস্থ্যোন্নতির কাজ আরও ত্বরান্বিত হয়।

বর্ত্তমানে ডিমাপুর পর্য্যন্ত রেলপথ গিয়াছে। সেখান হইতে কোহিমার মধ্য দিয়া ইম্ফল পর্য্যন্ত এক জাতীয় সড়ক এবং আরও ১৯২ মাইল নূতন রাস্তা নির্ম্মিত হইতেছে। এই অঞ্চলে মোট ১১৩৯ মাইল রাস্তা আছে, তাহার মধ্যে ৫২৬ মাইল রাস্তা জীপ-গাড়ী চলিবার উপযুক্ত।

শিক্ষাবিস্তারের কাজও দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। ১৯৫৮ সনে বিদ্যালয় ও ছাত্রের সংখ্যা নিম্নরূপ ছিল :

	সংখ্যা	ছাত্র
নিম্ন প্রাথমিক	৩৭৭	২০,৭২৮
উচ্চ প্রাথমিক	৩	৪০২
মধ্য ইংরেজি	৩৫	৩,৫৫৯
উচ্চ ইংরেজি	৭	২,৭৬০

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সমগ্র অঞ্চলে ২৯টি হাসপাতাল ও ২১টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। এই অগ্রগতির ফলে সমগ্র অঞ্চলে কিছু শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের জন্ম হইয়াছে। তাহারাই জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব করিতেছেন।

ফিজোর কার্য্যাবলী :—স্বাধীনতার পর যে নূতন চেতনার উন্মেষ হয় মিঃ এ. জে. ফিজো তাহাকে বিপথে চালিত করেন। তাহার পরিচালিত নাগা জাতীয় সম্মেলন (Naga National Council) এই অঞ্চলকে ভারত হইতে পৃথক এক স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করিতে চাহেন। এই দাবী ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক কোনও দিক হইতে সমর্থনযোগ্য না হইলেও ফিজোর দলবল ইহা লইয়া আন্দোলন সুরু করেন। শুধু আন্দোলন নয়, তাহার জন্য তাহারা ধ্বংসাত্মক কার্য্যে অগ্রসর হয়।

ভারত সরকারকে বাধ্য হইয়া ইহার বিরোধীতা করিতে হয়। ১৯৫৬ সনে জানুয়ারী মাসে আসাম গবর্ণর নাগা অঞ্চলকে এক "উপদ্রুত অঞ্চল" বলিয়া ঘোষণা করেন এবং স্থানীয় শাসনযন্ত্রকে সাহায্য করিতে সৈন্য-বাহিনী প্রেরণ করেন।

১৯৫৬ সনে ফিজোর নেতৃত্বে বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। এপ্রিল মাসে তাহারা এক পুলিস ঘাঁটি আক্রমণ করে ও একজন অনুগত নাগাকে হত্যা করে। জুন মাসে একটি মিশনারী বিদ্যালয় ও দুইটি চা-বাগান আক্রমণ করে। এইভাবে সারা বৎসর একটির পর একটি ধ্বংসাত্মক কার্য্য চলিতে থাকে।

গণতান্ত্রিক অগ্রগতি :—ফিজোর এই ধ্বংসাত্মক কার্য্যের বিরুদ্ধে দায়িত্বশীল নাগা-নেতারা প্রতিবাদ করিতে থাকেন। ১৯৫৭ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে তাহারা "নাগা জাতীয় সম্মেলন সংশোধনী কমিটি" গঠন করেন এবং ফিজোর দাবীর বিরোধীতা করেন। এই সমিতি পরে "নাগা পিপলস্ কনভেনসন" নাম গ্রহণ করে। এই বৎসর আগষ্ট মাসে এই কনভেনসনের এক অধিবেশন হয়। উহা হইতেই নিম্নলিখিত দাবীগুলি গ্রহণ করা হয় :

(১) নাগা পার্ব্বত্য জেলার সহিত নেফার অন্তর্ভুক্ত টুয়েনসঙ এলেকাকে যুক্ত করিয়া এক নূতন জেলা গঠন করিতে হইবে।

(২) উক্ত জেলার শাসনভার আসাম গবর্ণরের হাত হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের আওতায় আনিতে হইবে।

(৩) সমস্ত অপরাধীকে মুক্তি দিতে হইবে।

এই কনভেনসনের নেতা ডাঃ ইমকোনগ্লাব আও পরবর্ত্তী সেপ্টেম্বর মাসে নয়া দিল্লীতে পণ্ডিত নেহেরুর সহিত দেখা করেন। ভারত সরকার তাঁহাদের দাবী মানিয়া লন। নবেম্বর মাসে লোকসভায় ভারতীয় সংবিধান সংশোধন করিয়া উক্ত ব্যবস্থার কার্য্যকরী রূপ দেওয়া হয় এবং প্রেসিডেন্ট এই অঞ্চলের শাসনভার গ্রহণ করেন।

ইহার পর ১৯৫৯। অক্টোবর মাসে নাগা কন-ভেনসনের আর এক সম্মেলন হইল। উহাতে নাগা অঞ্চলের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের দাবী করা হয়। ইহার জন্য ১৬ দফা দাবী সম্মিলিত শাসনতন্ত্রের এক খসড়া প্রণয়ন করা হয়।

এই কনভেনসনের প্রতিনিধিগণ বর্ত্তমান বৎসরের জুলাই মাসে নয়া দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি-নিধিদের সহিত আলাপ-আলোচনা করেন। ভারত সরকার তাহাদের দাবী মানিয়া লইয়াছেন। শীঘ্রই সংবিধান সংশোধন করিয়া এই দাবীর কার্য্যকরী রূপ দেওয়া হইবে।

এইভাবে ভারতে আর একটি নূতন রাজ্য জন্মলাভের সূচনা হইল।

রবীন্দ্র-তর্পণ

(শ্রদ্ধাঞ্জলি)

শ্রীদিলীপকুমার রায়

কোন্ সালে ঠিক মনে নেই, তবে' মনে আছে, আমি বোলপুরে যাচ্ছিলাম কবির সঙ্গেই এক ট্রেনে। মন ভরে উঠেছিল বলাই বাহুল্য। নানা পরিবেশে কবিকে পাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল দেশে-বিদেশে। কিন্তু ট্রেনে সহযাত্রী হিসেবে পাই নি কখনো। আমি সে-সময়ে গেটের লেখা নিয়ে খুব মেতে উঠেছি—কেবলই পড়ি তাঁর নানা দ্যুতিময় চিন্তা ও অপরূপ প্রেমের কবিতা—মূল জর্মন ভাষায়। কবিকে সেদিন একটি কবিতা শুনিয়েছিলাম যেটি অনামীতে ছেপেছি ২৮ পৃষ্ঠায় : প্রেম।

Woher sind wir geboren
Aus Lieb.........ইত্যাদি।

আমি এর অনুবাদ করি—

কার বরে জনমি সদাই ?—প্রেমের মিলনে।
কারে বিনা আপনা হারাই ?—প্রেমের বিহনে।
কার মন্ত্রে বাধা হয় দূর ?—প্রেমের সাধনে।
কোন্ সুরে সাধি প্রীতিসুর ?—প্রেমের বন্দনে।
বেদনাশ্রু কে চূর্ণ মুছায় ?—প্রেমের অভয়।
বুকে বুকে বাসর জাগায় ?—প্রেম-পরিচয়।

সেদিন কবি গেটের সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছিলেন। তার মধ্যে একটি কথা ভুলব না : "গেটে বিজ্ঞান ও ধর্মের বিরোধে প'ড়ে দৃষ্টি হারান নি, কোথায় ধর্মের পদস্খলন হয়েছে—কোথায় বিজ্ঞানের তিনি মুক্ত দৃষ্টিতেই দেখেছিলেন। এইখানে তাঁর সঙ্গে আমার মিল আছে কিন্তু।"

কথাটি আমার মনে আছে, কেন না এই সময়ে এবং এর পরে গেটে পড়তে পড়তে যখন আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতাম তখন প্রায়ই আমার মনে হ'ত যে, গেটের সঙ্গে কবির মিল আছে নানা ভাবের রসের ক্ষেত্রেই। দু'জনেই বিরাট মনীষা নিয়ে জন্মেছিলেন ; দু'জনেই প্রকৃতিতে শ্রদ্ধালু ও ধর্মপ্রবণ ; দু'জনেই অত্যাধুনিকতার নানা জয়ধ্বনি সম্বন্ধে সন্দিহান ; দু'জনেই নারীকে শুধু জীবনের নয় আত্মার সহযাত্রিণী বলে বরণ করে এসেছেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ; সর্বোপরি দু'জনেই মহাকবি।

কবির কাছে পড়ে শুনিয়েছিলাম গেটের একটি ব্যঙ্গ কবিতা এই কথা বলে যে, তাঁকেও কবির মতনই সইতে হয়েছিল হীন নিন্দুকদের বিদ্রূপ কুৎসা পঙ্কক্ষেপ :

Wir reiten in die Kreuz und Quer
Nach Freuden und Geschaeften,
Doch immer klaefft es hinterher
Und bellt aus allen Kraften.
So will der Spitz aus unserem Stall
Uns immerfort begleiten,
Und seines Bellens lauter Schall
Beweist nur dasz wir reiten.

অর্থাৎ

আমরা অশ্বারোহী লক্ষ দিকে যতই
ছুটি লক্ষ পুলক-কর্ম-সাধনায়,
ওই কুকুরগুলোও ধায় পিছনে ততই
করে ঘেউ ঘেউ ঘেউ হিংসারি জ্বালায়।
তাদের বিবর ছেড়ে বাইরে এসে তারা
পিছু নেয় আমাদের মহিমা না সহি'
হয় তারস্বরে গর্জি নিতুই সারা
শুধু করতে প্রমাণ—আমরা অশ্বারোহী !

কবি হেসে বলেছিলেন, "গেটের মধ্যে ছিল একটি সহজ আভিজাত্য। কিন্তু এ থেকে দেখতে পাবে কুকুরদের ঘেউ ঘেউ করায় তিনি বিচলিত না হ'লেও বেশ একটু আনন্দ পেতেন দেখে যে, যথার্থ মহিমা নিন্দা-কুৎসার নাগালের বাইরে। কিন্তু আমি নিজে আরো গভীর সান্ত্বনা পাই ভেবে গীতার সান্ত্বনা যে, যেমন জ্ঞানীও চলেন তাঁর স্বভাবের নির্দেশে তেমনি অজ্ঞানীও। এইটুকু যেই বুঝতে পারি অমনি আমার ক্ষোভ গ'লে গিয়ে হয় অনুকম্পা যে, মানুষ কি অজ্ঞান, অবোধ, আত্মঘাতী !"

উত্তর জীবনে—বিশেষ করে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে পরিচয় হবার পরে আমি দেখতে পাই একটি জিনিস—যে কথা গীতায় পরিষ্কার করেই ঠাকুর বলছেন অর্জুনকে :

"দৈবীসম্পদ্ বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব।"
চিরমুক্তিদাতা দৈবী সম্পদ ঐশ্বর্য এ-জীবনে,
আসুরী সম্পদই জীবে বাঁধে বিশ্বময়।

জন্ম-অধিকার যার অভিজাত-সম্পদে ভুবনে
সে-তোমার হে মহৎ, কোথা দুঃখ ভয় ?

পণ্ডিচেরি গিয়ে প্রায়ই আমি তুলনা করতাম ভারতের এই দুই অভিজাত প্রতিভাকে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ত গেটের কথা—শেক্সপীয়রের কথা নয় কিন্তু। কারণ শেক্সপীয়র ছিলেন না গেটে শ্রীঅরবিন্দ কি রবীন্দ্রনাথের মতন জন্ম-অভিজাত, জন্ম-দার্শনিক, জন্ম-ধ্যানী। আমি জানি অনেকেই আমাকে ভুল বুঝবেন, ভাববেন আমি বলতে চাইছি গেটে ও রবীন্দ্রনাথ জন্মযোগী। না। যোগ মানুষকে যে-চেতনার উত্তরাধিকারী করে সে-চেতনায় কবি বা গেটে পৌঁছতে পেরেছিলেন বলে আমি মনে করি না। একথায় রবীন্দ্র-পূজারীদের ক্ষুব্ধ হওয়ার কারণ নেই (বলতে কি আমি নিজেকেও তাঁদের মতই কবির পূজারী বলেই মনে করি) কারণ কবি নিজেই একথা স্বীকার করেছেন যে :

"কোনো অমানব বা অতিমানব সত্যে উপনীত হওয়ার কথা যদি কেউ বলেন, তবে সে কথা বোঝবার শক্তি আমার নেই। কেন না আমার বুদ্ধি মানব-বুদ্ধি, আমার হৃদয় মানব-হৃদয়, আমার কল্পনা মানব-কল্পনা। তাকে যতই মার্জনা করি, শোধন করি, তা মানব-চিত্তকে কখনো ছাড়াতে পারে না। আমরা যাকে বিজ্ঞান বলি তা মানব-বুদ্ধিতে প্রমাণিত বিজ্ঞান, আমরা যাকে ব্রহ্মানন্দ বলি তাও মানবের চৈতন্যে প্রকাশিত আনন্দ। এই বুদ্ধিতে, এই আনন্দে যাঁকে উপলব্ধি করি তিনি ভূমা কিন্তু মানবিক ভূমা। তাঁর বাইরে অন্য কিছু থাকা না-থাকা মানুষের পক্ষে সমান। মানুষকে বিলুপ্ত ক'রে যদি মানুষের মুক্তি, তবে মানুষ হলুম কেন ?" (মানুষের ধর্ম)।

এখানে গোল বাধছে মানুষ বলতে কি বোঝায় সেই নিয়ে। কবির কথা মিথ্যা নয় যে, আজ পর্যন্ত মানুষ তার মানবিক চেতনাকে সম্পূর্ণ অতিক্রম ক'রে এক অতি-মানবিক চেতনার স্পর্শমণিতে মানবিক চেতনাকে দৈবী চেতনায় রূপান্তরিত করতে পারে নি। কিন্তু ভারতের ঋষিদের নানা সাধনায় তাঁরা পেয়েছিলেন এমন এক মানবোত্তর চেতনার আলোকদিশা যার স্পর্শে আজকের মানুষ এমনরূপে রূপান্বিত হবে যার কোনো মানবিক সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। এই রূপান্তরসাধনী জ্যোতিকে শ্রীঅরবিন্দ নাম দিয়েছিলেন Supramental Light। এ আলো জগতে নামবেই নামবে—বলেছেন তিনি বার বার। বলেছেন তাঁর সাবিত্রীতে (তৃতীয় স্কন্দ, চতুর্থ উল্লাস) অশ্বপতি বলছেন :

"জানি আমি এ-দেহের নিঃসম্বিৎ অণুপরমাণু
হ'য়ে স্বর্গসম ভুল, প্রকৃতির মর্মে অনুস্যূত
উঠিবে ভরিয়া এক অধ্যাত্ম চেতনে—বিশ্বম্ভর
অম্বরের সম যে-বিশাল—অলক্ষিত গঙ্গোত্রীর
আনন্দের তরঙ্গে বিপ্লুত—যেথা দেবতা স্বয়ং
অবতীর্ণ হয়ে হবে দেবতার চেয়েও মহান্।"

কিন্তু এই রূপান্তরিত মানবকে যদি মানব বলা হয় এই যুক্তিতে যে, মানবিক আধারেই তার প্রকাশ হয়েছে, তাহ'লে মানুষের পূর্বপুরুষ শাখামৃগকেও মানব পদবী দেওয়া চলে ঐ একই যুক্তিতে—যেহেতু গরিলা থেকেই মানুষ জন্মেছে।

কিন্তু আসলে এ নাম নিয়ে তর্ক। যে-অবতরণের অঙ্গীকার শ্রীঅরবিন্দ পেয়েছিলেন তাঁর জীবন-দেবতার কাছ থেকে সে অঙ্গীকার আজ পর্যন্ত সফল হয় নি বলেই আমরা বলতে পারি না গায়ের জোরে যে, সে অঙ্গীকার কবি-কল্পনা। তা যদি বলি তবে মানুষের সব স্বপ্নকেই হেসে উড়িয়ে দিতে হয় যতদিন না তারা জাগরণে মূর্ত হচ্ছে। শ্রীঅরবিন্দ মানুষের যে অতি-মানবিক মহাপরিচিতির আভাস পেয়েছিলেন, তার যে ভবিষ্যদ্বাণী তিনি তাঁর ঝংকৃত সাবিত্রী-কাব্যে উৎকীর্ণ করে গেছেন তাঁর দেবাত্মার রক্তশলাকায় সে-বাণী মোহ-মুগ্ধের প্রলাপ নয়, মহাঋষির প্রাতিভ দৃষ্টিলব্ধ মহাযুগের চিত্র। তাই তিনি ঘোষণা করেছিলেন তাঁর সাবিত্রীর ধ্যানশ্রুত মন্ত্রসামের ঝংকারে :

(The Book of Everlasting Day···
Savitri...11.2)

মহতী চেতনা এক আছে—মন যার দিশা কভু
পায় না—যাহার ভাষা পারে না সে উচ্চারিতে, কিবা
প্রকাশিতে চিন্তায় : ধরায় নাই এই চেতনার
আপন আবাস, নাই কেন্দ্র তার মানবতা মাঝে।
তবু সে-ই উৎস—প্রতি চিন্তার, কর্মের, সাধনার।···
নিখিল মর্ত্যের সেই জনয়িত্রী, করিছে লালন
সে-ই বিপুলেরে—ডাকে সে-ই জীবে দিতে বরদান—
আত্মার উদার মুক্তি মহামহীয়ান্ লক্ষ্য—যার
দুরাশায় কৃতার্থতা লভে তার সংকীর্ণ সাধনা।

এই মহাচেতনার অবতরণে জাগতিক চেতনার কি রূপান্তর হবে শ্রীঅরবিন্দ তার এক অপরূপ ছবি এঁকেছেন—যে-ছবি তিনি দেখেছেন তাঁর তুরীয় চেতনায়—মানবিক মানসে নয়। দেখেছেন (সাবিত্রী ১১.২) :

"মৃন্ময়ের দৃষ্টিপথে চাহিবে চিন্ময় সেই দিনে,
চিন্ময়ের দিব্যানন প্রমূর্তিবে মৃন্ময় আধার,

মানব অতিমানব লভিবে সারূপ্য—চলাচল
অনুস্যূত হবে এক অখণ্ড জীবনে…এ দেহের
প্রতি কোষে, ধমনীতে এক দিব্য শক্তি সঞ্চারিয়া
করিবে ধারণ তার প্রতি বাণী নিশ্বাস সাধনা,
প্রতি চিন্তা হবে সূর্যপ্রভ, হবে প্রতি হৃদিরাগ
স্বর্গীয় শিহরোচ্ছল…অঙ্গে অঙ্গে হবে সমুদ্বেল
এক আকস্মিক মহানন্দ…প্রকৃতির লক্ষ্য হবে
শুধু সুপ্রচ্ছন্ন দেবে প্রতি ছন্দে করিবে প্রকাশ,
মানবলীলার হবে অন্তরাত্মা নিয়ন্তা—পার্থিব
জীবনের যুগান্তর হবে দিব্য জীবনে সেদিনে।"

আমি জানি এ হ্রস্বদৃষ্টি ক্ষীণপ্রাণ রিক্তধ্যান যুগে এ শ্রেণীর মহাবাণীকে উপহাস করা খুবই সহজ। কিন্তু ইংরেজীতে বলে না সবার সেরা হাসি হাসে সেই যে সবশেষে হাসে—he laughs best who laughs last? যা আজ পর্যন্ত হয় নি সে যে হতে চলেছে একথা প্রথম ঘোষিত হয় যুগে যুগে মহাতাপসদেরই মুখে। তাঁদের সমসাময়িক সংশয়াত্মারা যে তাঁদের বিশ্বাস করতে নারাজ হবেন এতো জানা কথা। বস্তুত মানুষের স্বভাবের একটি পরম শোচনীয় প্রবণতা এই—স্বপ্নে অবিশ্বাস, ধ্যানে অবিশ্বাস, দেবত্বে অবিশ্বাস। যা হয় নি তা হ'তে পারে একথা যখন লিওনার্দো দা ভিঞ্চি বলেছিলেন প্রাক্-বিমান যুগে—যখন ভবিষ্য বিমানের ছবি এঁকে বলেছিলেন যে, অদূর ভবিষ্যতে মানুষ আকাশে উড়বে পাখীর মতন যন্ত্রের ডানা মেলে, তখন নিশ্চয়ই তাঁর সমসাময়িক অবিশ্বাসীরা তাঁকে পাগল বলেছিলেন। তাই শ্রীঅরবিন্দের ভবিষ্যদ্বাণীকে বস্তু-তান্ত্রিক বিচারকেরা যে এ-যুগে পাগল বলবেন এ তো জানাই। কিন্তু আমরা যারা শ্রীঅরবিন্দের দিব্য প্রভাময় আনন দেখেছি, হৃদয়ের স্পন্দনে পেয়েছি তাঁর ধ্যানকাব্যের ঋঙ্‌মন্ত্র ঝংকার, যারা দেখেছি মানুষ লক্ষ আধিব্যাধির কেন্দ্রে থেকেও অকুতোভয়ে হতে পারে পরাৎপরের পূজারী, অনাগতের অগ্রদূত, তারা কেমন করে মানবো যে "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই"?

কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের দিব্য ব্যক্তিরূপের দীপ্ত মহিমার কথা বর্তমান প্রসঙ্গে অবান্তর। আমি এইমাত্র তাঁর যে তর্পণটুকু করেছি সে কর্তব্যবশে—নৈলে পাছে অনেকে মনে করেন আমি তাঁকে এ-যুগের অন্য অনেক মনীষীদেরই একজন মনে করি। আমি প্রমাণ করতে পারি না একথা, কিন্তু বিশ্বাস করি যে, শ্রীরামকৃষ্ণের পরে এতবড় মহাসাধক, মহাঋষি জগতে অবতীর্ণ হন নি। এর বেশি আজ বলব না, যদি ঠাকুর দিন দেন তবে পরে কোনদিন বলব শ্রীঅরবিন্দ এ-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ধ্যানী ও স্রষ্টা হয়ে এসেছিলেন—যদিও দুঃখের বিষয় আমাদের মধ্যে খুব কম লোকই তাঁর লোকোত্তর আবির্ভাবকে সে-আন্তর পূজা দিতে সাহসী হয়েছেন যে-আন্তর পূজা তাঁর প্রাপ্য প্রণামী ছিল।

এবার ফিরে গিয়ে হারানো খেই ধরি।

আমি বলছিলাম যে, বুদ্ধি ও প্রতিভার আভিজাত্যে এ-যুগে গেটে শ্রীঅরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথকে খানিকটা সমধর্মী মনে করলে ভুল হবে না। এই আভিজাত্য আজ বিলুপ্ত-প্রায়—যেকথা গেটে ধরেছিলেন প্রায় দু'শতাব্দী আগে, লিখেছিলেন:

"Wealth and speed are what the world admires and what everybody strives for. Railways, express mails, steamships and every possible kind of facility for communication are what the civilized world is out for, to become over-civilized and so to persist in mediocrity."

এই সামান্যতার ফল কি হবে তাও তিনি লিখে গেছেন সে কবে:

"Another result of the aspiration of the masses is that an average culture becomes general."

এই দুঃখই তো জন্ম-অভিজাতের দুঃখ যে, ছোটকে যখন মাথায় বড় করা যাচ্ছে না তখন বড়কে নির্মুণ্ড করে ছোট করো। এই খেদে শেষে তিনি বলছেন যে, যা পেয়েছি যদি হারাইও তবু যেন ছোট না হই এ-যুগের অসার হাঁকডাকে সারা দিয়ে:

"It is, in fact, the century for the capable, for quick-thinking practical people who, being equipped with a certain adroitness, feel their superiority over the many although they themselves are not gifted for what is highest. Let us keep as much as possible to the mode of thought in which we grew up. With, perhaps, a few others, we shall be the last of an epoch that will not soon come again."

যে-যুগ গৌরীশৃঙ্গে পৌঁছলো,—একবার এদিক থেকে একবার ওদিক থেকে—বা ব্যোমপথে গোলক রওনা করিয়ে মনে করে মানুষের মনুষ্যত্বের শিখরসিদ্ধিতে পৌঁছনো গেল, সে-যুগে গেটে শ্রীঅরবিন্দ রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মহামনীষীদের জন্ম-আভিজাত্যের বর দুর্লভ হয়ে ওঠার আশঙ্কায় গণমন উদ্বিগ্ন হবে না। কিন্তু আমরা—যারা

শ্রীঅরবিন্দ রবীন্দ্রনাথকে জেনেছি আধ্যাত্মিক ভারতের বহু বাঞ্ছিত দুর্লভ বরপুত্র বলে—সায় দিতে যেন অঙ্গীকার করতে পারি যে, আমরা যদি মরিও তো মর্যাদা ছাড়ব না, ভারতের অধ্যাত্ম দৈবী সম্পদ ছেড়ে পাশ্চাত্ত্য গতি-দৃপ্ত বিচক্ষণতা (adroitness) ও ত্বরিৎচিন্তক কেজো লোকের (quick-thinking practical people) দ্বারস্থ হব না সস্তা একেলিয়ানার সর্বনেশে মোহে মজে। আমরা যেন গেটের সুরেই সুর মিলিয়ে বলতে পারি অকুতোভয়ে:

"Ich habe geglaubt, nun glaub'
ich erst recht,
Und geht es auch wunderlich, geht es
auch schlecht,
Ich bleibe beim glaubigen Orden."

বাল্যের প্রত্যয় আজ হয়েছে অটল আরো প্রাণের বিকাশে:

যদি ছায় অন্ধকার কি বা আসে আলোধার
শ্রদ্ধাবান্ যারা—আমি তাদেরি সতীর্থ রবো বরিয়া বিশ্বাসে।

কবিকে এই কবিতাটির কথাও উল্লেখ ক'রে বলেছিলাম: "এহেন মহামতি দার্শনিক তথা ধর্মার্থীর জীবনে নারীর প্রভাব কোনোদিনই ম্লান হয় নি। কেউ কেউ বলেন তিনি ছিলেন মেয়েদের সম্বন্ধে অত্যন্ত দুর্বল। কিন্তু আমার মনে হয় বাইরে থেকে দেখলে যাই কেন না মনে হোক আসলে তিনি ইন্দ্রিয়বিলাসী ছিলেন না, নারীর কাছে চেয়েছিলেন সেই বস্তুই যাকে কবি সৃষ্টির প্রেরণা নাম দিয়েছেন।"

এ সম্পর্কে কবি আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ আলোচনা করেছিলেন। সব কথা আমার মনে নেই, কেবল একটি কথা আমার মনে আছে যে, সাধারণের পক্ষে যা বিষ তা মহতের পক্ষে অমৃত হতে পারে এ কথার কথা নয়। তা ছাড়া বাইরের দৃষ্টি মহৎ বরেণ্য মানুষের আন্তর সত্তার কতটুকু খবর পায়—মহাপ্রতিভা কোন্ আকর্ষণ থেকে কি গভীর বিকাশের রস আহরণ করে গড়পড়তা মানুষ জানবে কেমন করে? শেষে কবি বলেছিলেন, "আমি গেটের মতন মহাপ্রাণ কবি ও দার্শনিককে বাইরের এজাহার দিয়ে বিচার করার পক্ষপাতী নই। আমার নিজের জীবনেই কি জানি না আমাকে লোকে কতভাবে কতক্ষেত্রেই ভুল বুঝেছে?"

উত্তর-জীবনে কবির সঙ্গে নানা মতান্তর মনান্তর হওয়ার পরে যেন কবির এ-মন্তব্যটি আরো বেশি ক'রে হৃদয়ঙ্গম করেছিলাম—আর কেবলই মনে হ'ত যে, কবির কথাই সত্য, গড়পড়তাকে আমরা যে-মাপকাঠি দিয়ে বিচার করে থাকি লোকোত্তর মহাজনদের সে-মাপকাঠি দিয়ে বিচার করতে যাওয়া ভুল।

কিন্তু কবি গেটে প্রমুখ মহাজনদের সম্বন্ধে একথা বললেও নিজেকে কোনোদিন ব্যতিক্রম বলে গণ্য ক'রে আলাদা বিচারবিধির কাজে হাত পাতেন নি। এ তাঁরই স্বভাবসিদ্ধ মহত্ত্ব—যার পরিচয় ফুটে উঠেছিল তাঁর একটি অপূর্ব মধুর ও গভীর পত্রে। উত্তরকালে এ-চিঠিটি বহু লেখক উদ্ধৃত করেছেন কবির জীবনবাণী ব'লে। তিনি লিখেছিলেন (১৯৩০ সালে—অনামী, ৩৩৯ পৃঃ):

"তুমি আমাকে উপরের বেদীতে বসিয়ে রাখবে কেমন করে? আমি যে তোমাদের সমবয়সী। আমার এত বড় পাকাদাড়ি নিয়েও আমি তোমাদের সঙ্গে বকাবকি করেছি, ঝগড়া করেছি, আসর জমিয়েছি, এক ইঞ্চি তফাতে স'রে বসি নি। আমার প্রবীণতায় অভিভূত হয়ে তোমরাও যে বিশেষ মুখ সামলিয়ে কথা কয়েছ আমার ইতিহাসে এমন লেখে না। এতে অনেক অসুবিধে হয়েছে, সময় নষ্ট হয়েছে বিস্তর, কিন্তু মনে একটা গর্ব অনুভব না ক'রে থাকতে পারি নে যে, তোমাদের সঙ্গে অতি সহজেই একাসনে বসতে পারি। এর থেকে বুঝেছি যে, বুড়ো হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। যারা ধর্মে-কর্মে, বিষয়-সম্পত্তিতে স্বকীয় বা স্বাজাতিক ভাগ-বখ্‌রার মামলা নিয়ে পেকে উঠল কোনোদিন তাদের ছোঁয়াচ আমাকে লাগবে না। যে-মানব একই কালে 'সনাতন' এবং 'পুনর্নব' আমি তাঁরই কাছে কবিত্বের বায়না নিয়েছি—অতএব মানুষের মধ্যে আমি বাঁচব, তোমাদের সকলের মাঝখানে, কখনো বা তোমরা আমার গায়ে দেবে ধুলো, কখনো বা মালাচন্দন। আমি মানুষের অমৃতকে পেয়েছি, তাকে সুখে-দুঃখে ভোগ করেছি—আমার রঙিন মাটির ভাঁড়ে তাকে রেখে গেলুম, অনেক চুঁইয়ে গিয়েও কিছু তার বাকি থাকবে—অল্প হলেও ক্ষতি নেই, কেন না ওজনদরে তার দাম নয়।"

এ-চিঠিটির বাণী যে তাঁর জীবন-দর্শনের একটি মর্মবাণী এ-বিষয়ে সন্দেহ করার পথ নেই—ইংরেজীতে বলতে হলে বলা যায়: it rings true, every word: না বেজে পারে?—এর মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে যে কবির একান্ত স্বকীয় কবিধর্ম যা তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে মানুষের কাছে। তিনি মানুষকে সর্বান্তঃকরণে ভালোবেসেছিলেন বলেই যে তাঁর জীবনদেবতা তাঁর চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন:

"একদিন কোনো পঁচিশে বৈশাখে ষোলো বৎসর

বয়সের মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছিলুম, অনেকগুলো পথের সামনে অনেকগুলো আন্দাজের মুখে। তার মধ্যে সবগুলোকে বাদ দিয়ে আজকে অন্ততঃ একটাতে এসে ঠেকেছে। এইটুকু নিঃসন্দেহে পাওয়া গেল যে, আমি কবি। কিন্তু শুধু কবি বললেও সংজ্ঞাটা অসম্পূর্ণ থাকে। কবির প্রেরণা কিসের এবং তার সাধনার শেষ ঠিকানাটা কোন্‌খানে এরও একটা পরিষ্কার জবাব চাই। সেও আমি জানি। আমার মত অনুভূতি ও রচনার ধারা এসে ঠেকেছে মানবের মধ্যে। বার বার ডেকেছি দেবতাকে, বার বার সাড়া দিয়েছে মানুষ—রূপে এবং অরূপে, ভোগে এবং ত্যাগে। সেই মানুষ ব্যক্তিতে, এবং সেই মানুষ অব্যক্তে।" (অনামী, ২য় সংস্করণ)।

উপলব্ধিটি গভীর সন্দেহ নাই। শুধু তার সঙ্গে এইটুকু জুড়ে দিতে হবে—যা শ্রীঅরবিন্দের জীবন-সাধনার পরম বাণী—যে মানুষ বলতে এখানে বুঝতে হবে নারায়ণকে যাঁর প্রসাদে নর নারায়ণ হ'তে চায় ও হয়ে উঠতে পারে। একথা রবীন্দ্রনাথও চিরদিনই স্বীকার করতেন—তাঁর আর একটি গভীর ভাষণে বলেছেন এ-সম্বন্ধে শেষ কথা :

"উপনিষৎ বলেছেন 'ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে'—ব্রহ্মকেই লক্ষ্য বলা হয়...নিজেকে একেবারে হারাবার জন্যে। 'শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ'। শর যেমন লক্ষ্যের মধ্যে প্রবেশ করে তন্ময় হয়ে যায় তেমনি করে তাঁর মধ্যে একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে যেতে হবে।" (শান্তিনিকেতন—১৮ই চৈত্র, ১৩১৫)।

কবি একথা বুঝতেন যে, ব্রহ্মকে না জানলে—কি তাঁর সঙ্গে মানুষের পরম ঐক্য উপলব্ধি না করলে মুক্তি নেই। কিন্তু তিনি এ মুক্তির উপলব্ধি চেয়েছিলেন মানুষের অমর আত্মাকেই শরবৎ (target) ক'রে—কেন না তাহলেই পৌঁছান যাবে সেই পরম পুরুষের কাছে যিনি "দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ"। উপনিষদের এই বাণীটি তিনি তাঁর নানা ভাষণেই সানন্দে উদ্ধৃত করেছেন—তাঁর নানা কবিতায়ও যথা—(গীতাঞ্জলি—ধূলামন্দির) :

"মুক্তি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি?
মুক্তি কোথায় আছে?
আপনি প্রভু সৃষ্টি বাঁধন প'রে
বাঁধা সবার কাছে।"

তাই মুক্তি পেতে হবে বন্ধনকে স্বীকার করে, তবে—তাকে মিথ্যা মায়া বলে প্রত্যাখ্যান করে নয়—কেন না প্রকাশ বন্ধনের অপেক্ষা না রেখে পারে না :

"প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি,
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা—
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।"

সর্ব মানবের মধ্যে দিয়ে চিরবিচিত্রের জয়যাত্রার স্তবগান করতে তিনি ক্লান্তিবোধ করেন নি কোনো দিনই। তাঁর "জন্মদিনে" কবিতায় সত্তর বৎসরে পদার্পণ করেছেন এই বলে :

"আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি,
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি..."

তাই না তিনি ডাক দিলেন ঐ সঙ্গে নিজের অন্তর্লীন সর্বাত্মীয়কে :

"এসো কবি অখ্যাত জনের
নির্বাক মনের...
মূক যারা দুঃখে সুখে,
নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে...
তুমি থেকো তাহাদের জ্ঞাতি,
তোমার খ্যাতিতে তারা পায় যেন আপনার খ্যাতি।
এই শেষ কথা নিয়ে নিশ্বাস আমার যাবে থামি'—
কত ভালোবেসেছিনু আমি!"

এখানে কবির স্নেহশীলতার প্রসঙ্গে পূর্ণচ্ছেদ দিয়ে আর একটি প্রসঙ্গে আসি—যদিও জানি এবার যা বলব তাতে রবীন্দ্রপন্থী অনেকেই সায় দেবেন না। কিন্তু স্মৃতিচারণের মধ্যে আত্মকথার স্থান আছে ব'লে একটা মস্ত সুবিধে হয়েছে এই যে, কবিগুরুর সম্বন্ধে আমার যা যা মনে হয়েছে অকপটে লেখার পথ আমার খোলা। শুধু বলে রাখি যে, আমার এ-ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করছি আরো এইজন্যে যে, আমি যা বলতে যাচ্ছি তাতে কবির গৌরব বাড়বে বলেই আমি বিশ্বাস করি। তাই বলতে চেষ্টা করি যা বহুদিন থেকেই মনে হয়েছে লিখবার কথা।

"জন্মদিনে" কাব্যগ্রন্থের আর একটি কবিতায় কবি মানুষের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্বের তর্পণে প্রণাম জানিয়েছেন সেই মহাপ্রাণ মানুষদের—

"যাঁরা যাত্রা করেছেন মরণশঙ্কিল পথে
আত্মার অমৃত-অন্ন করিবারে দান দূরবাসী অনাত্মীয় জনে,
কারণ যদিও তাঁদের নাম মুছে দিয়েছেন মহাকাল তবু—
অকৃতার্থ হন নাই তাঁরা
মিশিয়া আছেন সেই দেহাতীত মহাপ্রাণ-মাঝে
শক্তি জোগাইছে যাহা অগোচরে চিরমানবেরে।"

মানুষকে তিনি ভালোবেসেছিলেন ব'লেই নিজেকে অভিনন্দিত করেছিলেন (পরিশেষ—বর্ষশেষ কবিতা) :

"লভিয়াছি জীবলোকে মানবজন্মের অধিকার
ধন্য এই সৌভাগ্য আমার।..."

অনেকে মনে করেন এইই হ'ল ইউরোপের হিউ-ম্যানিটির বাণী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ভারতীয়, তিনি ইউরোপের কাছে যখনই যা পেয়েছেন শোষণ করে নিয়েছেন ভারতীয় আত্মার অমিতাভ শিখায়। তাই মানুষ বলতে শুধু ভীরু অসহায় দীন-দুঃখীকেই বরণ করেন নি, সেই সঙ্গে তাঁদেরও সরিক হতে চেয়েছিলেন যাঁরা মানুষের মধ্যে বরেণ্য (পরিশেষ—বর্ষশেষ কবিতা) :

"যেখানেই যে-তপস্বী করেছে দুষ্কর যজ্ঞযাগ
আমি তার লভিয়াছি ভাগ...
যাঁহারা মানুষরূপে দৈববাণী অনির্বচনীয়।
তাঁহাদের জেনেছি আত্মীয়।"

সর্বোপরি জিতাত্মাকেও তিনি অঙ্গীকার করেছিলেন আপন বলে :

"মোহবন্ধমুক্ত যিনি আপনারে করেছেন জয়
তাঁর মাঝে পেয়েছি আমার পরিচয়।"

সেইজন্যে তিনি শ্রীঅরবিন্দের দুষ্কর নিঃসঙ্গ তপস্যার মর্মবাণীটি ঠিক পরিগ্রহ করতে না পারলেও তাঁকে স্রষ্টা বলে নমস্কার করতে তাঁর বাধে নি, আমাকে লিখেছিলেন শ্রীঅরবিন্দকে তিনি কোন্ দৃষ্টিতে দেখতেন (তীর্থংকর, ১১৪ পৃ:) :

"শ্রীঅরবিন্দ আত্মসৃষ্টিতে নিবিষ্ট আছেন। তাঁর সম্বন্ধে সমাজের সাধারণ নিয়ম খাটবে না। তাঁকে সসম্ভ্রমে দূরেই স্থান দিতে হবে, তিনিও তাই। আমাদের অভিজ্ঞতা জমেছে সেইখানেই যেখানে সকলের সঙ্গে—তাঁর উপলব্ধির ক্ষেত্র সকল জনতাকে উত্তীর্ণ হয়ে। কিন্তু আমরা সেটা সহ্য করি কেন?"

অমনি উপমাসম্রাটের মনে এল অনুপম উপমা :

"যেজন্য মেঘকে সহ্য করি দূর আকাশে জমতে—শেষকালে বৃষ্টি পাওয়া যাবে চাষের জন্যে, তৃষ্ণার জন্যে। কিন্তু কলের পাইপটা যদি মেঘের মধ্যে চালান ক'রে দেওয়া যায় তাহলে মেয়র সাহেবকে কাগজে গাল দিতেই হবে।"

এখানে আমার বক্তব্য এই যে, রবীন্দ্রনাথ যখন বিশ্বমানবের জয়গানে উচ্ছ্বসিত হতেন তখনো তাঁর বাদী সুরটি ছিল ভারতীয় ব্রহ্মবাদেরই সুর—ইউরোপের নারায়ণ-নিরপেক্ষ নরের গণতান্ত্রিক স্তব নয়—যার উদ্‌গাতা ছিলেন রোলাঁ বা ওয়াল্ট হুইটম্যান। কবির বহু প্রবন্ধের, গানের, ভাষণের ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে তাঁর উচ্ছ্বসিত ব্রহ্মবাদ যার ভিত্তি পাশ্চাত্যের মানবসেবা (service) নয়—ভারতের জীবে ব্রহ্মজ্ঞান। বহু দৃষ্টান্ত দিয়ে একথা প্রমাণ করতে পারি—বিশেষ করে তাঁর "শান্তিনিকেতন" গ্রন্থের নানা চিন্তাগভীর উক্তি থেকে। কিন্তু স্মৃতিচারণে এ-গবেষণা খানিকটা অবান্তর বলে দু'একটি উদাহরণ দিয়েই থামতে হবে।

"শান্তিনিকেতন"-এ কবি "অন্তর বাহির" ভাষণে লিখছেন : "অন্তরের নিভৃত আশ্রমের সঙ্গে আমাদের পরিচয় সাধন করতে হবে। আমরা বাইরেকেই অত্যন্ত বেশি করে জানি, অন্তরের মধ্যে আমাদের যাতায়াত প্রায় নেই, সেইজন্যেই আমাদের জীবন নষ্ট হয়ে গেছে।"

এ-ধরনের বাণীবাহককে পাশ্চাত্য কর্মবাদীরা এ-যুগে রাতারাতি introvert বলে নাকচ ক'রে দিতে চান। কিন্তু কবি ওদের অবোধ মুখরতায় বিচলিত হবার পাত্র নন—কারণ তিনি যে-অন্তরে খাঁটি ব্রহ্মবাদী—তাই বার বার উদ্ধৃত করেছেন "যদ্ যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ"—যাই কেন না করো ভগবানকে উৎসর্গ করবে। কারণ এ-ব্রহ্ম যে সত্যিই আছেন আমাদের অন্তরের অন্দরমহলে যে (অন্তর বাহির) :

"আমাদের জনতাপূর্ণ কলরবমুখর কাজের ক্ষেত্রের মাঝখানে একটি অবকাশকে সর্বদা ধারণ করে আছে, বেষ্টন করে আছে। এই অবকাশ তো শূন্যতা নয়, তা স্নেহে, প্রেমে, আনন্দে পরিপূর্ণ। সেই অবকাশটিই হচ্ছেন তিনি যাঁর দ্বারা উপনিষৎ জগতের সমস্ত-কিছুকেই আচ্ছন্ন দেখতে বলেছেন—ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।...অন্তরের মধ্যে সেই প্রগাঢ় অমৃতময় অবকাশকে উপলব্ধি করতে থাকলে তবেই সংসার আর সংকটময় হয়ে উঠবে না, বিষয়ের বিষ আর জমে উঠতে পারবে না, বায়ু দূষিত হবে না, আলোক মলিন হবে না, তাপে সমস্ত মন তপ্ত হয়ে উঠবে না।"

আমার মনে আছে যখন আমি পণ্ডিচেরিতে আট বৎসর একাদিক্রমে অজ্ঞাতবাস ক'রে কলকাতায় ফিরে ভজন-কীর্তন গান সুরু করি তখন আমার অত্যাধুনিক কবি-বন্ধুরা অনেকেই শক পেয়েছিলেন। একজন স্পষ্টই বলে-ছিলেন, "এ-যুগেও কালী কৃষ্ণ শিব? ধিক্!" আমি জানি না কবির শান্তিনিকেতনের ছত্রে ছত্রে ব্রহ্ম-স্তব, ব্রহ্ম-বিহার, ব্রহ্ম-প্রণাম প'ড়ে তাঁর মন ধিক্ ধিক্ করে ওঠে কি না। জানি না রবীন্দ্রনাথের পিছনে তিনি বলতেন কিনা যে, কবি তাঁর দুর্বল মুহূর্তে ব্রহ্ম ব্রহ্ম করে ক্ষেপলেও মাথা ঠাণ্ডা হলেই সায় দেবেন লেনিনের মহাবাণীতে যে, "ধর্ম হলো

মনের আফিং।” এম্‌নি আর একজন অত্যাধুনিকের মুখে শুনেছিলাম স্বকর্ণে যে, বুদ্ধ কার্ল মার্ক্সের কাছে দীক্ষা পেলে তাঁর আর বনে গিয়ে অনশনে বাতাতপে চিঁ চিঁ করতে হ'ত না। কিন্তু মরুকগে এ-যুগের বাণীবাহকের কথা: আমরা রবীন্দ্রনাথের চরণে সেকেলে ঢঙেই অনমুতপ্ত ভক্তি অর্ঘ নিবেদন করব। তাঁর কণ্ঠে সনাতন ভারতের শাশ্বত বেদমন্ত্র নব ঝংকারে ঝংকারিত হয়েছিল ব'লেই আমরা সানন্দে তাঁকে এ-যুগের শ্রেষ্ঠ দিশারিদের সতীর্থ ব'লে বরণ করেছি—যিনি কোনো দিনই ভুলতে পারেন নি (শান্তিনিকেতন, ১ম ভাগ—১২৮ পৃ:):

"যেমন আমাদের ধ্যানের মন্ত্র 'শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্' তেম্‌নি আমাদের প্রার্থনার মন্ত্র: 'অসতো মাং সদ্‌গময়, তমসো মাং জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামমৃতং গময়'—অসত্য হতে সত্যে, পাপ হতে পুণ্যে এবং আসক্তি হতে প্রেমে নিয়ে যাও। তবেই হে প্রকাশ, তুমি আমার প্রকাশ হবে; তবেই হে রুদ্র, আমার জীবনে তুমি প্রসন্ন হয়ে উঠবে।”

মোহিতলাল তাঁকে মিষ্টিক উপাধি দিতে গভীর বেদনাবোধ করলেও আমরা ভুলতে পারব না কোনো দিনই যে, তিনি ব্রহ্মবাদী মহর্ষির ব্রহ্মকেতনই উড়িয়ে ছিলেন পিতার প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য-আশ্রমে। নৈলে তিনি পিতার জন্মোৎসবে তাঁর স্বরে স্বর মিলিয়ে এমন ঝংকৃত প্রার্থনার উদ্‌গাতা হ'তে পারতেন না: (শান্তিনিকেতন, ৪০৩-৫, ৭ই পৌষ, ১৩১৬)।

"হে শান্তিনিকেতনের অধিদেবতা, যেখানেই মানুষের চিত্ত বাধামুক্ত পরিপূর্ণ প্রেমের দ্বারা তোমাকে স্পর্শ করেছে সেখানেই অমৃতবর্ষণে একটি আশ্চর্য শক্তি সঞ্জাত হয়েছে।…জ্ঞানের যোগে আমরা জগতে তোমার শক্তিরূপ দেখি, অধ্যাত্মযোগে জগতে তোমার আনন্দরূপ দেখতে পাই।…যে সাধক আত্মার শক্তিকে জাগ্রত করে 'আত্মানং পরিপশ্যতি', 'ন ততো বিজুগুপ্সতে'—সে এমনি হয়ে ওঠে যে, আপনাকে আর গোপন করতে পারে না। আজ উৎসবের দিনে তোমার কাছে সেই শক্তির দীক্ষা আমরা গ্রহণ করব।” ব'লে শেষে প্রণাম করেছেন সেই বরেণ্য পিতাকে সনাতন ভারতের উত্তরসাধক বলে: "যে সাধক এখানে তপস্যা করেছেন…তাঁর সেই জীবন-পূর্ণ বাণীর দ্বারা বাহিত হয়ে এখানকার ছায়ায় এবং আলোকে, আকাশে এবং প্রান্তরে, কর্মে এবং বিশ্রামে, আমাদের জীবন তোমার অচল আশ্রয়ে, নিবিড় প্রেমে, নিরতিশয় আনন্দে গিয়ে উত্তীর্ণ হবে; এবং চন্দ্র সূর্য অগ্নি বায়ু তরুলতা পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ সকলের মধ্যে তোমার গভীর শান্তি, উদার মঙ্গল ও প্রগাঢ় অদ্বৈতরস অনুভব ক'রে শক্তিতে এবং ভক্তিতে সকল দিকেই পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকবে।”

কচু পাতার জল

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

পিচ-মসৃণ পথে চমৎকার নিঃশব্দ গতিতে চলছিল ভারী ক্যাডিলাক গাড়ীখানা, হঠাৎ থেমে গেল।

পথ এখানে ঈষৎ ঢালু হয়ে বাঁক নিয়েছে। কিন্তু নূতন কোন বিপদ-সঙ্কেতের বিজ্ঞপ্তি চোখে পড়ে না। পথের দু'ধারেই ফাঁকা মাঠ—এক দিকের উঁচু কঠিন জমিতে নিমগাছভরা গোরস্থান—ভাঙা ভিটের চিহ্ন আর আগাছার জঙ্গল—অপর দিকের ঢালু জমিটা মরা নদীর খাত। এক সময়ে চাষ-আবাদযোগ্য উর্ব্বর ভূমি ছিল—ক্রমাগত বন্যার জল আসাতে মানুষ চাষের আশা ছেড়ে দেওয়ায় বাবলা ও জীয়ল গাছের অরণ্যে রূপান্তরিত হয়েছে। ওটা পতিত জমি হলেও বাবলা-জীয়ল গাছ বেচে মালিকরা কিছু আয় করে থাকে।

এই ঢালু জমিটার পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে সরকারী সড়কটা শহরের কোল-বরাবর চলে গেছে।

গাড়ীখানা সামান্য একটু দোলা দিয়ে অল্প একটু শব্দ করে থামল।

ব্যাপার কি? গাড়ীর ভিতর থেকে মৃদু ভারীকণ্ঠের আওয়াজ এলো।

চালক মুখ ফিরিয়ে জবাব দিল, আজ্ঞে, বাঁকের মুখে পথটা যেন জখম বলে বোধ হচ্ছে। যা বৃষ্টি হয়ে গেল!

গাড়ীর গর্ভ থেকে ভারীকণ্ঠের আওয়াজ এলো, সে কি—গত বর্ষার জলে কিছুই হয় নি পথের—আর কাল-বৈশাখীর এক-পশলা বৃষ্টিতেই—

আজ্ঞে সন্দেহ হচ্ছে। জলের তোড়টা এখনও পথের ওপর দিয়ে মাঠের দিকে নেমে যাচ্ছে। ভাল করে পরীক্ষা না করে উপর দিয়ে গাড়ী নিয়ে যেতে ভরসা হচ্ছে না।

আচ্ছা—পরীক্ষাই কর—আমি একটু নেমে দাঁড়াই—তা হলে। ভারী কণ্ঠস্বর গাড়ীর গর্ভ থেকে উন্মুক্ত প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়লো।

কি আশ্চর্য্য—নামছ না কি? ঈষৎ-ভয়ার্ত্ত নারী-কণ্ঠের প্রশ্ন হলো সেই মুহূর্ত্তে। এই অন্ধকার—বন—ঝোপ—

ভরাটকণ্ঠের হাসি উছলে উঠলো পথে, ভয় নেই, টর্চ্চ রয়েছে—যাচ্ছিও না বেশীদূর, গাড়ীর পিছনেই দাঁড়াচ্ছি। দেহটা আড়ষ্ট হয়ে গেছে বসে বসে—একটু মেলে নিই।

ঘটাং করে দরজা বন্ধ করার শব্দ হ'ল—টর্চ্চ জ্বেলে গাড়ীর পিছনে এসে দাঁড়ালেন চৌধুরী সাহেব।

আঃ—কি চমৎকার লাগছে! কেমন ঠাণ্ডা মিষ্টি হাওয়া—কি নরম অন্ধকার! টর্চ্চ নিভিয়ে চৌধুরী সাহেব একবার আকাশের পানে—আর বার নিচু জমিটার দিকে চাইতে লাগলেন।

চালক বলল, পাঁচ মিনিট দাঁড়ান বাবু—পথটা দেখেই ফিরে আসছি।

চৌধুরী উত্তর না দিয়ে চেয়ে রইলেন আকাশের পানে। চমৎকার আকাশ! এইমাত্র বৃষ্টির জলে ধুয়ে নীল রঙটা আরও চক্ চক্ করছে—কিংবা নক্ষত্রগুলো বেশী উজ্জ্বল হয়েছে বলেই আকাশ ঝক্‌ঝকে—নতুনের মত বোধ হচ্ছে। এধারে ওধারে নরম অন্ধকারের রাশি—ঢালু জমির বাবলা-জীয়ল গাছগুলিও তার সঙ্গে লেপে-মুছে একাকার হয়ে গেছে। সামনে কোথাও আলোর বিন্দুমাত্র নাই—দিগন্তজোড়া অন্ধকারের নীরব প্রতীক্ষা। উঁচু জমি থেকে ঢালু জমিতে জল গড়িয়ে যাওয়ার এক-টানা সুমিষ্ট সুরটুকু শুধু কানে আসছে—ওইটুকুই হয়তো প্রতীক্ষার ভাষা।

চৌধুরী টর্চ্চটা জ্বালিয়ে আলোটা ঘুরিয়ে ফেললেন শব্দের অভিমুখে। জলস্রোতের উপর বৃত্তাকার আলোটা পড়ে কাঁপতে লাগল। পথের মাঝখান দিয়ে স্রোত চলেছে—ঢালু দিকে নামছে জল। সেই ঢালুর মুখে ছোট্ট একটু কচুবন। তার তলা দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে জল—কুলু কুলু শব্দ হচ্ছে—সুর তুলছে বলা যায়। কচু গাছের ডাঁটিতে জলের ধাক্কা লেগে সমস্ত কচু বনটাই থর্ থর্ করে কাঁপছে। টর্চ্চের আলো এসে পড়ল সেখানে। চৌধুরীর দু'টি চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠলো। টর্চ্চের আলো স্থির হয়ে রইল কম্পমান কচুবনের মাথায়। চৌধুরী নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন—কচুর পাতায় পাতায় সঞ্চিত ছোট বড় বৃষ্টির বিন্দুগুলিকে। গলিত হীরার মত এগুলি মসৃণ পত্রপুটে কি সুন্দর সচল হয়ে উঠেছে! কাঁপছে পাতাগুলি—মনে হচ্ছে, পাতা থেকে

গড়িয়ে পড়বে হীরকবিন্দুগুলি, কিন্তু পড়ছে না—শুধু টল্ টল্ করে এধারে ওধারে সরে সরে যাচ্ছে। দমকা বাতাসে পাতা উল্টে না যাওয়া পর্য্যন্ত এগুলি পড়ি-পড়ি হয়েও পড়বে না—অতি শুভ্র স্বচ্ছ হীরার টুকরোর মত মসৃণ পত্রসায়রে লীলা-কমলের চাপল্যে ভেসে ভেসে বেড়াবে।

আঃ, কি সুন্দর—কি সুন্দর! স্মুলতা একবার বাইরে আসবে? প্লীজ, একটুক্ষণের জন্য—জাস্ট ফর এ মিনিট!

গম্ভীর প্রকৃতির রবি চৌধুরী হঠাৎ কবি প্রকৃতি কিশোরের মত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।

কারখানা থেকে ফিরছিলেন চৌধুরী। ওখানে একটু আগে বিশেষ একটি অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়েছে। বড় রকমের একটি সভা হয়ে গেল—যার সুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত চৌধুরীকে থাকতে হয়েছে। সেই সভার জের টেনে চলছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। তথাকথিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব্বে আছে নাচ, গান, আবৃত্তি; দ্বিতীয় পর্ব্বে মাঝারি গোছের একখানি নাটক। প্রথম পর্ব্বটা মাননীয় প্রধান অতিথিকে নিয়ে উপভোগ করেছেন, দ্বিতীয় পর্ব্ব সুরু হতেই ওঁরা উৎসব-মঞ্চের বাইরে এসেছেন।

এক রকম নিজের হাতেই গড়া কারখানা—চৌধুরী ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড। সাধারণ কলকব্জা, নাট-বল্টু-স্ক্রু ইত্যাদি তৈরি করে দু'একটি কোম্পানীর সঙ্গে মাল-সরবরাহের চুক্তি করেছিলেন। ক্রমে সরকারের সঙ্গে পরিচয় ও সম্বন্ধ বন্ধন। ভাগ্যলক্ষ্মী এই পথেই করলেন প্রথম পদক্ষেপ। অতঃপর সেলাই কল—আর পাখা তৈরির ব্যবস্থা হ'ল। এখন কারখানার শৈশবকাল উত্তীর্ণ প্রায়—দেহটা ওর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু চৌধুরী সন্তুষ্ট নন। দেশে দেশে বিদ্যুৎশক্তির প্রসার ঘটছে যত—চৌধুরীর বলবতী ইচ্ছা ততই উদ্দাম হয়ে উঠছে। হাঁটি হাঁটি পা পা করে শৈশব উত্তীর্ণ হবে—সে প্রতীক্ষার সময় কই! কারখানার দেহে যৌবন আসুক শীঘ্র শীঘ্র—এইটাই তিনি চাইছিলেন। পাখা তৈরির মাধ্যমেই সেটা ত্বরান্বিত করতে হবে। শক্তিশালী একটি প্ল্যান্ট বসাবার আয়োজন করলেন। বিদেশ থেকে বিশেষজ্ঞ আনালেন জন দুই। এতে শুধু সুদৃশ্য, মজবুত ও উৎকৃষ্ট জিনিসই তৈরি হবে না, জিনিসের ফলনও বাড়বে আশাতীত ভাবে। দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে পণ্য রপ্তানী করা চলবে। প্রতিযোগিতার মাঝবার শক্তি সঞ্চয় করবে। অনেকদিন ধরেই আয়োজন চলছিল। আজ সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত যন্ত্রদেবতার শুভ প্রতিষ্ঠা-পর্ব্ব। সেই উপলক্ষ্যে এই বিচিত্র অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করলেন রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী। এই সব নানা কাজে ব্যস্ত পদস্থ মানুষকে আনতে হলে সাধ্য-সাধনা ও উদ্যম আয়োজনে নিরলস হতে হয়, রবি চৌধুরীর এই গুণটি ছিল অধিক মাত্রায়। না হলে বাংলার ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ থেকে ভাল ভাবে পাস করে মোটা মাইনের সরকারী চাকরি না নিয়ে শ্বশুরের অনুরোধে তাঁর পড়তিমুখো সামান্য কারখানায় এসে কেন যোগদান করেছিলেন? তখন সামান্য বালতি কড়াই পেরেক নাট বল্টু নিয়ে কারখানাটি কোন রকমে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছিল। শ্বশুর বুড়ো হয়েছিলেন—উৎসাহ উদ্যমে তাঁর ভাটা পড়েছিল। রবি চৌধুরী এসে হাল ধরলেন। দূরদৃষ্টি প্রসারিত করে দেখলেন এর মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিহিত। দেশে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চলছে—বিদ্যুৎ শক্তির প্রসার বাড়ছে। সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনা করে—চৌধুরী কারখানার নবজীবন সঞ্চার করলেন। চৌধুরী চাইলেন এমন একটি ক্ষেত্র আবিষ্কার করতে—যা বিদ্যুৎশক্তির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রগামী কালের তালে তালে অনায়াসে পা ফেলে চলতে পারবে। সাইকেল, সেলাই কল, পাখা, রেডিও সেট। আধুনিক জীবন-উপকরণে এগুলি অপরিহার্য্য অঙ্গ। ভোজ্যপণ্যে কৃচ্ছ্রতা এলেও এইগুলি অপরিহার্য্য অঙ্গ। ভোজ্যপণ্যে কৃচ্ছ্রতা এলেও এইসব ভোগ্য-পণ্যকে দূরে ঠেলতে পারবে না মানুষ। এক সময়ে অন্নের স্থূল উপকরণে সন্তুষ্ট ছিল মানুষ—দেহের দ্বিতীয় স্তরে সেদিন ছিল মনের বসতি। আজ মনোজগৎই তার আদি বাসভূমি। যেমন তেমন করে জীবনযাপন করতে পারলেই সে সন্তুষ্ট নয়। একটিমাত্র ঘরে মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে রাত্রিকে নিদ্রাদায়িনী বলে আরাধনা করার দিন আজ নাই—আজ বিদ্যুৎ-বাতিতে গৃহ দীপান্বিতার ঐশ্বর্য্যে ঝলমল করবে। সেই ঘরে—থাকবে বিদ্যুৎ-পাখা থাকবে রেডিও সেট—বিদ্যুৎচালিত আরও অনেক যন্ত্র—যা আরাম-আয়াসকে করবে সুলভ।

এতদিনে চৌধুরীর মনোবাসনা পূর্ণ হ'ল। কারখানায় যন্ত্র-দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করে—পরম তৃপ্তির নিশ্বাস ফেললেন।

উৎসব দিনটি পড়ল বৈশাখের মাঝামাঝি শুভ অক্ষয়-তৃতীয়ায়। নিদারুণ উত্তাপে পৃথিবী জলে-পুড়ে যাচ্ছিল। টিনের ছাউনির নীচের তার প্রতাপটা আরও অসহ্য।

চৌধুরী কিন্তু সারাটি দিন কর্ম্মীদের সঙ্গে কারখানার এপ্রান্ত ওপ্রান্ত ঘুরে ঘুরে তদারক করলেন। মাননীয় অতিথিদের আদর-আপ্যায়নের এতটুকু ত্রুটি যেন না ঘটে। শুধু তো শ্রমমন্ত্রী আসবেন না—তাঁর সঙ্গে আসবেন মহকুমার কর্ত্তা, জেলা শাসক, শান্তিরক্ষা বিভাগের ছোট বড় মাঝারি সব ব্যক্তি, জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক, বিধান সভার কয়েকজন সভ্য। ধরতে গেলে এরাই কারখানাটির আসল পৃষ্ঠপোষক—এঁদের শুভ ইচ্ছা ও মঙ্গল দৃষ্টিপাতে কারখানার ধমনীতে কর্ম্মের রক্তস্রোত সুষ্ঠুভাবে বইবে, রাজ্যে এবং কেন্দ্রে সুনাম বাড়বে, চৌধুরী ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কসের নাম ছড়িয়ে পড়বে ভারতবর্ষের বাইরেও। সুতরাং বৈশাখের রুদ্র ভ্রূকুটিকে কেন গ্রাহ্য করবেন চৌধুরী? তাছাড়া তাঁর উপস্থিতি কর্ম্মীদের মনেতেও কর্ম্মের প্রেরণা যোগাবে—সুশৃঙ্খলে সুচারু ভাবে অনুষ্ঠানটি সুসম্পন্ন হবে।

প্রথমে স্থির হয়েছিল—যন্ত্রটির শুভ-উন্মোচন ব্যাপারটি শেষ হলেই মাননীয় অতিথিরা চলে যাবেন। তার আগে অবশ্য উদ্বোধনী সঙ্গীত থাকবে একটি—মাল্যদানের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে সাদর অভ্যর্থনামূলক এক টুকরো বক্তৃতা। কারখানার শ্রমিকপক্ষ থেকে কেউ প্রশস্তি উচ্চারণ করবেন। সর্ব্বশেষ ধন্যবাদ প্রদান। কিন্তু সেই স্বল্পায়ু সূচী চৌধুরীর মনঃপূত হয় নি।

প্রধান কর্ম্মী রমেন দাসকে ডাকালেন চৌধুরী। বললেন, এ আমার ঠিক মনে লাগছে না। আমি চাই এই উপলক্ষ্যে কর্ম্মীরা আন্তরিকভাবে মেলামেশা করবেন। এই উৎসব যে সকলের—এটি সকলেই অনুভব করুন। একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কর তোমরা। নাচ, গান, আবৃত্তি, নাটক। এর বেশীর ভাগ অংশ তোমরা নেবে। খরচের জন্য চিন্তা নাই।

রমেন দাস বললে, প্রোগ্রামটা লম্বা হবে না? ওঁরা কি অতক্ষণ থাকবেন?

চৌধুরী বললেন, নিশ্চয় থাকবেন। অন্ততঃ কিছুক্ষণও যাতে থাকেন—সে ব্যবস্থা আমি করব।

রমেন দাস উৎসাহিত হয়ে বললে, আচ্ছা স্যার—বিচিত্র অনুষ্ঠানের ভারটা আমরাই নিলাম।

একটু হেসে মাথা নাড়লেন চৌধুরী। বেশ-বেশ, তোমরা আছ বলেই আমি নিশ্চিন্ত। আমি জানি, এই কারখানাকে তোমরা নিজের বলেই মনে কর।

কথাটা এক হিসাবে সত্য, এক হিসাবে সত্য নয়। যে প্রতিষ্ঠানে রুজিরোজগারের উপায়স্বরূপ—তার উপরে ভরসা না রেখে উপায় কি! দীর্ঘকালের সাহচর্য্যে অনাত্মীয় মানুষও যেমন মনেতে খানিকটা মমতার ছায়া ফেলে—দিনের বেশীর ভাগ সময় যে ছাদের নীচেয় কাটে, সেটিও তেমনি বাসগৃহের নিরাপত্তা বহন করে থাকে। অনেক বিষয়ে অনেকখানি নির্ভরতা তাঁর উপরে থাকে বই কি। তবু জীবন-সংগ্রামে মাঝে মাঝে এই নির্ভরতার মূল্য যাচাই করে না নিয়ে উপায় নাই। যেমন মাস দু'য়েক আগেকার ঘটনাটা। বেতন ও মাগ্গি-ভাতা বৃদ্ধির দাবীতে দু'পক্ষের মাঝখানে অনেকখানি ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছিল—তিক্ততা জমেছিল পর্ব্বতপ্রমাণ। এক পক্ষের অনমনীয় মনোভাব—অন্য পক্ষের ধর্ম্মঘটের হুম্‌কি কারখানার আয়ু পদ্মপত্রের জলের মত কাঁপছিল। চৌধুরী কিন্তু অবুঝ নন। শ্রমিক-সঙ্ঘকে তুচ্ছ করা যে সর্ব্বনাশের হেতু—বিশেষ করে একটি শক্তিশালী প্ল্যাণ্ট বসিয়ে কারখানাকে উচ্চ মর্য্যাদা দেবার মুখে এটি সর্ব্বদা স্মরণ রেখেছিলেন চৌধুরী। তবু সুরুতেই ওদের দাবীর কাছে নতি-স্বীকার করেন নি। ওরা চেয়েছে অনেকখানি বাড়িয়ে—উনি দিতে চেয়েছেন অনেকখানি কমিয়ে—এ হলো হাটের দরাদরি। মাঝামাঝি রফা একটা হবেই উনি জানতেন। আরও জানতেন—তাড়াতাড়ি ওদের দাবীটা মেনে নিলে আব্দারের রেশটুকু রয়ে যাবে। একটু বেগ দিতে পারলে অপরপক্ষ কিছুটা কাহিল হয়ে পড়বে—সেই ফাঁকে রফা নিষ্পত্তি হবে সহজ। হয়েছিলও তাই।

শ্রমিক-সঙ্ঘের প্রধান কর্ত্তা ছিল রমেন দাস। চৌধুরী ওকে একদিন বাড়ীতে ডাকিয়ে ঘণ্টাখানেক ধরে আলাপ-আলোচনা করলেন। বিপদের মেঘটা সরে গেল মাথার উপর থেকে। আজ প্রসন্ন আকাশের নীচেয় দু'পক্ষের মিলিত চেষ্টায় অতিথি-অভ্যর্থনার আয়োজনটা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হবে বলে মনে হচ্ছে।

আকাশ কিন্তু মেঘমুক্ত ছিল না। দিনে ছিল প্রচণ্ড তাপ—সন্ধ্যার মুখে সে তাপ প্রচণ্ডতর হয়েছিল। সুসজ্জিত চন্দ্রাতপের নীচেয় অতগুলি বৈদ্যুতিক পাখার সমাবেশও সে অসহ্য গুমোটকে দূর করতে পারছিল না। এবারকার বৈশাখ মাসটাই অকরুণ। একদিনও কাল-বৈশাখীর ঝড় তোলে নি—এক ফোঁটা বর্ষণও নয়। তার তপঃক্লিষ্ট রুদ্র রুক্ষ রূপটাই সারা দিনমান ব্যাপ্ত করে থাকে। মানুষ জীবকুল সমেত ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার সন্ধ্যায় রূপ পরিবর্ত্তন করলেন প্রকৃতি—পশ্চিম কোণে ঈষৎ মেঘের সঞ্চার হ'ল।

রমেন দাস বললে, স্যার—মনে হচ্ছে ঝড় উঠবে।

চৌধুরী বললেন, উঠুক না। শেডের মধ্যে আমাদের প্যাণ্ডেল, খানিকটা ঠাণ্ডা হলে আসর জমবে।

রমেন দাস বললে, মাননীয় অতিথিরা পৌঁছবার পর যা হয় হোক গে—তার আগে—

আমি গাড়ী নিয়ে যাচ্ছি—একটু আগেই ওঁদের আনবার ব্যবস্থা করছি।

নিজের ক্যাডিলাকখানা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন চৌধুরী। অতিথিরা নিরাপদে সভামণ্ডপে পৌঁছলেন। নিমন্ত্রিত সজ্জনেরাও দর্শকের আসন পরিপূর্ণ করলেন। শঙ্খধ্বনির মধ্যে অতিথিবরণ, মাল্যদান প্রভৃতি আচারগুলি সুসম্পন্ন হ'ল। চৌধুরী সংক্ষিপ্ত ভাষণে কারখানার ইতিবৃত্ত বর্ণনা করলেন। আজিকার শিল্পোন্নত পৃথিবীতে এর প্রয়োজনীয় ভূমিকাটুকু নিয়ে সামান্য কবিত্ব করলেন, এবং আশা জানালেন—

তার আগেই বাইরে প্রচণ্ড ঝড় উঠল—টিনের চালায় মাদল বাজল রুদ্রের, ধুলোর পুরু আস্তরণ মণ্ডপের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল—দুয়োর জানালা আছড়ানোর শব্দে চৌধুরীর কণ্ঠস্বর ডুবে গেল। এর পর সুরু হ'ল বর্ষণ—সভামণ্ডপ স্নিগ্ধ-শীতল রমণীয় হ'ল। মাননীয় শ্রমমন্ত্রী যন্ত্র-দেবতার উদ্বোধনী মুহূর্ত্তে যে ভাষণ দিলেন তাতেই চৌধুরীর দীর্ঘদিন সঞ্চিত আশা-আকাঙ্ক্ষা মূর্ত্ত হয়ে উঠল। তাঁর মনে হ'ল এমন মনোরম স্বপ্ন পরিবেশ আর কোন-কালেই বুঝি উপভোগ করেন নি। উজ্জ্বল দু'চোখ বেয়ে স্বপ্নের সুষমা নামছে—এক যুগ থেকে আর এক যুগে উত্তীর্ণ হতে চলেছে। অত্যন্ত সন্তর্পণে—লঘু পদক্ষেপে অপরিচিত একটি জগতের দুয়ারে এসে পৌঁছলেন বুঝি!

টর্চ্চের আলোটা তখনও কাঁপছিল কচুবনের মাথায়। সদ্য-জলে ধোওয়া কোমল পত্রপুটে হীরার অর্ঘ্য নিয়ে কচুবনও কাঁপছিল। স্থান কাল বিস্মৃত হলেন চৌধুরী।

ঠিক—ঠিক—কচুর পাতায় সঞ্চিত বৃষ্টি-বিন্দুকে এক-কালে হীরকখণ্ড মনে হ'ত—সেই হীরাকে হাতে নেবার আগ্রহে কচুপাতার একদিক ঈষৎ উঁচু করে ধরে সন্তর্পণে কাত করতেন। সে এক আশ্চর্য্য কাল: স্বপ্ন-বাস্তবে মেশা কল্পনার জাল দিয়ে বোনা রমণীয় কয়েকটি মুহূর্ত্ত।

তখন ঠাকুরদাদা বেঁচে। তাঁর তিন মহল বাড়ীর জাঁকজমক ম্লান হয় নি। দেউড়িতে বন্দুকধারী দরোয়ান, সদর মহলে আমলা মুহুরি পাইক প্রজার ভিড়, অন্দরে দাসদাসীর কোলাহল। তিনতলা বাড়ীটার সর্ব্বাঙ্গ উপচে পড়ছে সম্পদের ফেনা। কিন্তু লক্ষ্য করে সেদিনও দেখেছিলেন—বাড়ীটার বিশাল দেউড়ি যেন খানিকটা ঝুঁকে পড়েছে—বারান্দার কার্ণিসে মানুষের চেয়ে বেশী কলরব জমিয়েছে পারাবতকুল, তিনতলার ছাদের আলিসায়—চিলে-কোঠার মাথায় দু'একটি বট-অশ্বত্থ-শিশু কচি কচি পাতার আঙুল নেড়ে কি যেন ইঙ্গিত করছে। অনেকদিন হ'ল বাড়ীটায় চুণের কলি ফেরানো হয় নি—দেয়ালে দেয়ালে ঈষৎ ময়লা—সবুজের প্রলেপ; বিষণ্ণ-ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে বাড়ী। বয়োবৃদ্ধ ঠাকুরদাদা ওর আসল চেহারাটা দেখতে পান নি—কিশোর রবি দেখেছিল।

ঠাকুরদাদা আদর করে প্রায়ই বললেন, যা রেখে যাচ্ছি ভাই—পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে খেলেও তিন পুরুষে ফুরোবে না।

বাবা সেই ভরসাতেই জমিদারি চাল আর মেজাজ নিয়ে চলাফেরা করতেন। বেশীর ভাগ সময় কাটত অন্দরমহলে। আহার-নিদ্রা, কৌতুক-পরিহাস—নিয়ম-মত খানিকটা ব্যায়াম-চর্চ্চা, কখনো বা শিকারপর্ব্বে মেতে ওঠা। এ ছাড়া মহালে যেতেন পর্ব্বে—পুণ্যাহে। ফিরে আসতেন হাসিমুখে—বহুতর উপঢৌকন নিয়ে।

কিশোর রবির এসব ভালই লাগত। সম্পদের নেশা ওর দু'টি চোখে মোহের কাজলরেখা টেনে দিত বই কি!

শৈশবে পাল্কী ঘোড়া বা হাতী চেপে যেতে গল্পে-শোনা রাজপুত্রের কথা মনে পড়ত। কিন্তু রাজপুত্রের জীবনযাপনের রীতিটা ঠিকমত বুঝতে পারত না। শুধু দিগ্বিজয়ে যাওয়া—রাজকন্যাকে জয় করে এনে রাজ-সিংহাসনে বসে সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করা—এ কেমন যেন খাপছাড়া মনে হতো! আজকার পৃথিবী কি তেমনি আছে—শুধু সম্পদ দিয়ে মানুষের পরিচয়? জ্ঞান নয়, বিদ্যা নয়, শিল্পপ্রতিভা নয়—শুধু বিত্তমূল্যে যশের মণি-মাণিক্য সঞ্চয়? নির্ব্বিবাদে প্রজা-পালন, সর্ব্বকালের বাধ্য প্রজার শ্রদ্ধা-ভক্তিলাভ সম্ভব কি এখনও?

এই তো চোখের সামনে যা ঘটল, তার ভয়ঙ্কর রূপটা এখনও জ্বল জ্বল করছে। সংবাদ এল—নীলগঞ্জের প্রজারা অবাধ্য হয়েছে—খাজনা দিতে চাইছে না। বলছে, যে জমিদার আমাদের দুঃখের ভাগ নিতে চায় না—তাকে আমরা মানব কেন? পর পর দু'সন অজন্মা, খাজনা দেব কোথা থেকে?

ঠাকুরদার রাঙা মুখখানা ক্রোধে আরও লাল হয়ে উঠল। বললেন, বটে, আমাকে সরকারের ঘরে টাকা জমা দিতে হবে না? সরকারের আইনে দয়ার স্থান নাই, একি জানে না হতভাগারা! দাঁড়াও—ওদের

বজ্জাতি ভাঙছি। নাতি, যাবি আমার সঙ্গে? কেমন করে প্রজা-শাসন করতে হয়—শিক্ষা করবি চ।

কিশোর রবি কৌতূহল পরবশ হয়ে ঠাকুরদার সঙ্গ নিয়েছিল। না গেলেই বুঝি ভাল হ'ত। সেদিনের দুঃস্বপ্ন চোখ বুজলে আজও চোখের সামনে ভেসে ওঠে। যখনই শ্রমিকদের সঙ্গে বিরোধ ঘনায়—সেদিনের স্মৃতিটা তাজা হয়। রক্ত ফুটে ওঠে টগ্‌বগিয়ে। অতি কষ্টে আত্মসম্বরণ করেন চৌধুরী। না—ও পথ নয়। কাল বদলেছে। সরাসরি বিরোধ মানেই আত্মহত্যা। এ যুগ শৌর্য্য-বীর্য্য প্রকাশের যুগ নয়—এখন কূটনীতিকে আশ্রয় করে আত্মরক্ষার মহড়া চলছে। ক্রোধ অসহ্য হলেও মুখের হাসি থাকবে অম্লান, বাক্য হবে সংযত—শিষ্টাচারে বশীভূত করতে হবে প্রতিপক্ষকে।

গ্রাম জ্বালিয়ে প্রজা-শাসন করে বিজয়ীর গর্ব্বে বলেছিলেন ঠাকুরদাদা, কেমন—দেখলি তো—কি করে সম্পত্তি রক্ষা করতে হয়?

ওরা যদি আপনাকে মারতো? ওদের দলে অনেক লোক ছিল।

হো হো করে হেসে বলেছিলেন ঠাকুরদাদা, দলে ওরা ভারি, কিন্তু আমাদের গায়ে হাত দেবার সাহস ওদের নেই।

কেন? অবোধ প্রশ্ন তুলেছিল কিশোর।

কেন? দেখলি তো—ওরা ভীরু, ওদের একতা নেই। সরকার আমাদের দিকে—আইন আমাদের দিকে।

হেসে বলেছিলেন, নিজের ক্ষমতায় বিশ্বাস রাখবি ভাই—দেখবি, পৃথিবীটা তোর পায়ের তলায়।

ওরা যদি নিজের নিজের ক্ষমতা জানতে পারে? যদি—এক জোট হয়? আবারও অবোধ প্রশ্ন।

সে জানতে জানতে তিন পুরুষ কেটে যাবে—তোর রাজত্বে সূর্য্য অস্ত যাবে না ভাই। আশ্বাস দিলেন ঠাকুর-দাদা। বললেন, শুধু কি আমরা শাসনই করি—পালন করি না? মাঝে মাঝে রক্তচক্ষু দেখাতে হয়—ওটা শাসনের রীতি। কিন্তু চোখের কোলে জল এলে যা করে থাকি—তা আমাদের কীর্ত্তির সাক্ষী হয়ে আছে। সে কীর্ত্তি কোন কালে মুছবে না ভাই।

হাঁ—সে সব কীর্ত্তি-কাহিনী শুনেছেন—প্রত্যক্ষও করেছেন। কমলগঞ্জের দয়াময়ী পাঠশালা, হরিশপুরের ক্ষেমঙ্করী দাতব্য চিকিৎসালয়, রাণীর দীঘি, বিমলা সরোবর, পশুপতি মাতৃমঙ্গল, শুভ সুন্দর উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়, সুহাসিনী পাঠাগার···এ ছাড়া যত্রতত্র চৌধুরী পরিবারের নামাঙ্কিত ইঁদারা। সরকারী ইস্কুলে কত যে বৃত্তির ব্যবস্থা আছে—তা আঙুলে গুণে শেষ করা যায় না। তবু কিশোর কাল থেকে মনে হতো, এ সবের মূল্য কতটুকু—কতদিন এদের পরমায়ু? রাণীর দীঘির ভাঙা ঘাটে আজ শ্যাওলা-পানার মহোৎসব, ক্ষেমঙ্করী দাতব্য চিকিৎসালয়ের সাদা বাড়ীটার চুণবালী খসে পড়েছে। চিকিৎসার আড়ম্বর আছে—ঔষধের অভাবে চিকিৎসকের উৎসাহ স্তিমিত—রোগীর মনে ভরসা নাই। ইস্কুলের—সাহায্য আসে না নিয়মিত, পাঠাগারে মলাট ছেঁড়া বইয়ের রাশি। ইঁদারার কথা না বলাই ভাল—গ্রীষ্মের দারুণ উত্তাপে ওগুলিও শুষ্ককণ্ঠ গ্রামবাসীর মত তৃষ্ণার্ত্ত চোখমেলে আকাশের পানে চেয়ে থাকে!

কিশোর বায়না ধরল—গ্রামের ইস্কুল শেষ করে কলেজে পড়ব। কলেজে পড়তে পড়তে সাধ হ'ল—ইঞ্জিনীয়ারিং লাইনে যাবার।

ঠাকুরদাদা বিস্ময়ে দু'চোখ মেলে বললেন, ইঞ্জিনীয়ার হয়ে দেশ-বিদেশে ঘুরবি—তোর রাজ্য দেখবে কে ভাই?

যুবক চৌধুরী হেসে বললেন, নিজের বাহুবলে ভরসা রাখতেন আপনারা—আমরা বুদ্ধিবলের ভরসা করি দাদু।

আর সাত পুরুষের জমিদারী? কর্ণওয়ালিসের আমল থেকে বন্দোবস্ত করে নেওয়া তালুক মুলুক?

কর্ণওয়ালিসরা চলে গেলে ওসবের দাম থাকবে?

কর্ণওয়ালিস তো কবে চলে গেছেন—জমিদারী···শেষ হয়েছে কি? দাদু প্রতিবাদ করলেন।

চৌধুরী প্রতিবাদ করলেন না। শুধু বললেন, তবু ভরসা হয় না দাদু। তুমিই একদিন বলেছিলে—নিজের ক্ষমতার উপর বিশ্বাস রাখতে। তাই রাখছি। যা ধরে-ছুঁয়ে পাই না—তার উপর ভরসা করব কোন্ সাহসে?

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে ঠাকুরদাদা বললেন, বুঝেছি—তোরাই এর মর্য্যাদা নষ্ট করবি। তোদের নিজেরই উপর বিশ্বাস নাই—জমিদারী থাকবে না।

য়ুরোপ যাত্রার সময় দাদু বেঁচে ছিলেন না—বাবা মৃদু আপত্তি করেছিলেন, দেশের শিক্ষাই তো যথেষ্ট—আবার বাইরের ডিগ্রীর কি প্রয়োজন?

কম্পিটিশনের বাজারে যেন-তেন প্রকারে বেঁচে থাকার কোন মানে হয় না। যে লাইন ধরব—তার উঁচু তলায় উঠতেই হবে।

ফোর্ড হবার ইচ্ছা—না জামশেদপুর বানাবে? বাবার কণ্ঠে ঈষৎ শ্লেষের সুর ধ্বনিত হয়েছিল।

চৌধুরী ঈষৎ হেসে মাথা নামিয়ে বলেছিলেন, কিছুই বলা যায় না, দৈবের যোগাযোগ হলে সবই সম্ভব।

কথাটা মনে গাঁথা ছিল—ফোর্ড হবে—না জামশেদপুর বানাবে? ফোর্ডদের ইতিহাস তো গোড়া থেকেই তৈরী ছিল না। নিজেদের উচ্চাশা অভিনিবেশ শ্রম কর্ম্ম কৌশলে···ওঁরা ইতিহাসের পাতায় পাতায় ফেলেছেন কালির আঁচড়—নতুন লেখা পড়ছে পৃথিবী। শ্বশুরের ছোট্ট কারখানায় ঢুকবার মুখে কথাটা আর একবার মনে হয়েছিল। শ্বশুরের মৃত্যুর পর—কারখানাটা যখন পুরোপুরি ভাবে হাতে এলো—তখন থেকে কথাটা অহরহ জাগছে মনে। আজ শক্তিশালী যন্ত্র-দেবতার প্রতিষ্ঠা-বাসরে—মাননীয় শ্রমমন্ত্রীও সেই কথা উচ্চারণ করলেন—কে বলতে পারে এই প্রতিষ্ঠান একদিন টাটার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে পৃথিবীতে উচ্চ গৌরব লাভ করবে না? এক কালে আমরা—যন্ত্রপাতি কলকব্জার বিষয়ে সম্পূর্ণ ভাবে পরনির্ভর ছিলাম। বিদেশ থেকে বৈদ্যুতিক পাখা আনিয়ে নিজেদের ঘর সাজিয়েছি, আজ বিদেশের গৃহসজ্জার ভার নেবে ভারতীয় প্রতিষ্ঠান—এ আশা অবশ্যই করবো। এই ধরনের প্রতিষ্ঠান ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করবে।

মাননীয় মন্ত্রীকে সোজা পথে খানিকটা এগিয়ে দিয়ে চৌধুরী ফিরে এসেছিলেন—কারখানায়। তখন কর্মী-সংসদ পরিচালিত নাটকের একটি দৃশ্য অভিনীত হচ্ছিল। দৃশ্যের···সবটা দেখে চৌধুরী একখানি সোনার পদক উপহার দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। ঘন ঘন করতালি-ধ্বনির মধ্যে ঘোষণা-পর্ব্ব শেষ হ'ল।

মোটরে করে সস্ত্রীক চৌধুরী ফিরলেন এই নির্জ্জন পথে। এ পথে আসার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল না হয় তো—তবু মনের গভীরে কোথায় যেন হিসাব-নিকাশের সূক্ষ্মতম একটু জের লেগে ছিল। কারখানার পিছন দিকে যে বিস্তৃত মাঠ পড়ে রয়েছে—যা বাবলা-জীয়লের জঙ্গলে ভর্ত্তি, ওই প্রায় দু'হাজার বিঘে পতিত জমিটার উপর—বহু দিন থেকে দৃষ্টি পড়েছিল চৌধুরীর। জমিটা ওঁর চাই। ও জমি পেলে শুধু কারখানার কলেবর বৃদ্ধি হবে না—শ্রমিকদের বাসগৃহ হবে—স্কুল, হাসপাতাল, পাঠাগার, প্রমোদশালা, উদ্যান, হাট-বাজার—সব মিলিয়ে সম্পূর্ণ সুন্দর একটি শহর। সেই শহরের নামকরণ করা যায় যদি—চৌধুরী নগর—সে কি বে-মানান হবে? সে কি দয়াময়ী পাঠশালা, ক্ষেমঙ্করী দাতব্য চিকিৎসালয়, রাণীর দীঘি প্রভৃতির মত ক্ষণ-দীপ্তিময় ধধূপের মত মহাকাল রচিত বিশাল অন্ধকারে সহসাই মিলিয়ে যাবে? ওদের পরমায়ু তো দু'একটি দশকের সীমাতেও ধরে রাখা যায় নি—অথচ ফোর্ডরা জীবিত রয়েছেন অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল। কালের আবর্ত্ত ওঁদের আরও উজ্জ্বল করে তুলছে। শিল্পযুগের অমর স্রষ্টা ওঁরা। যদি কোনদিন শিল্পযুগের অবসান ঘটে—সেদিন পৃথিবী কি সর্ব্ব সভ্যতার ভার মুক্ত হয়ে আবার প্রলয় অন্ধকারে ডুবে যাবে না?

ছপ্—ছপ্—ছপ্!

জলের উপরে মানুষের পায়ের শব্দে হঠাৎ চমক ভাঙল চৌধুরীর। টর্চটা তখনও কচুবনের মাথা বরাবর ধরা রয়েছে। আলো কাঁপছে, কচু পাতাও কাঁপছে। পথের জলস্রোত মানুষের পায়ের ধাক্কায় যে সামান্য ঢেউ তুলেছে—তারই আঘাতে একটু বেশী করেই কাঁপছে পাতাগুলো। হীরার কুচির মত জলবিন্দু—পাতার এমুড়ো ওমুড়োয় টল টল করে ছুটে বেড়াচ্ছে। আর একটু বেশী কাঁপলেই পাতার হীরাজল নালার ঘোলা জলে গড়িয়ে পড়বে—ওর হীরক-জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

পিতামহ নাই—পিতা শহর প্রবাসী। জমিদারীর ঝামেলা পোহাতে গ্রামে বাস করার দায়িত্ব প্রায় শেষ হয়ে আসছে। স্বাধীন ভারতে শীঘ্রই জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের আইন হবে। আইনের খসড়া তৈরী হচ্ছে—বাদানুবাদ চলছে বিধান সভায়। কাগজে কাগজে অনুকূল প্রতিকূল সমালোচনা। যা কিছু পেয়েছেন গুছিয়ে নিয়ে শহরে এসে বসেছেন বাবা। অবশ্য গুছিয়ে আনার কাজটা সুরু হবার আগেই একের পর এক মহালগুলি হাত বদল হয়েছে ঋণের দায়ে। কেন ঋণ হলো? সে অনেক ইতিহাস। বাইরে জাঁকজমক ছিল—ভিতরের অন্ধকার সুড়ঙ্গপথ কোন্ অসতর্ক মুহূর্ত্তে প্রশস্ততর হচ্ছিল—সে সন্ধান কেউ রাখেন নি। যখন উদ্ঘাটিত হ'ল ক্ষত—তখন চিকিৎসার কাল অতীত। বিদেশ থেকে এসে—সব শুনলেন চৌধুরী।

এই সঙ্কট-সন্ধিক্ষণে মা বায়না নিয়েছেন—দেশের ভিটেয় বসে সাবিত্রব্রত উদ্‌যাপন করবেন।···গ্রামের যত ব্রাহ্মণ-সজ্জন—ভিন গাঁয়ের যত প্রজা-পাইক—আশ্রিত-জন সকলকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াবেন। শহরে তাঁদের পরিচয় কতটুকু! দেশের তিনি রাণী-মা, পদগৌরবে জন্মভূমির মতই গরীয়সী!···বাবা আপত্তি করেছিলেন—মা শোনেন নি। চৌধুরীও ওঁদের সঙ্গে পিতৃপুরুষের বাস্তু-ভূমিতে এলেন।

স্যার, এখানে দাঁড়িয়ে? মোটরে বসবেন আসুন। পথ ঠিক আছে। চালক সবিনয়ে জানালে।

আলোটা কাঁপতে কাঁপতে কচুবনের মাথা থেকে সরে এলো। চালকের সর্ব্বাঙ্গে আলোর তরঙ্গটা একবার বুলিয়ে নিয়ে পায়ের তলায় ফেললেন। পীচ-বাঁধানো পথের খানিকটা কালো গোল চাকতির মত চক্ চক্ করে উঠল। চৌধুরী বললেন, বেশ খানিকটা দেরী হয়ে গেল। আলোটা বাঁ হাতের কব্জির উপর ফেলে বললেন, পুরো সতেরো মিনিট দাঁড়িয়ে আছি।

আজ্ঞে—বেশ খানিকটা দূর অবধি দেখে এলাম। আরও একটি সন্দেহজনক জায়গা ছিল—সেটাও দেখলাম, সব ঠিক আছে। গাড়ীতে উঠুন—দশ মিনিটে পৌঁছে যাব।

আচ্ছা সন্তোষ, বাঁহাতি ওই মাঠটা দেখেছ দিনের বেলায়? কতখানি জমি হবে আন্দাজ কর?

টর্চ্চের মুখ মাঠের দিকে ফেরালেন। কিন্তু বিস্তীর্ণ মাঠের অন্ধকার আলোটাকে গ্রাস করে নিলে—সামান্য দূর পর্য্যন্ত আলোর রেখা পড়ল।

চালক বলল, আমাদের কারখানা থেকে মাইলটাক তো হবেই।

তা হবে। একটু থামলেন চৌধুরী। অল্প মাথা হেলিয়ে বললেন, এক মাইলের মত একটা শহর—খুব ছোট শহর তাকে বলা চলে কি?

আজ্ঞে সে তো পেল্লায় বড় শহর।

না—না—অতখানি নয়। হাসলেন চৌধুরী। তবে মাঝারি গোছের একটি শহর বলা চলে। বাটানগরের মত অন্ততঃ!

আজ্ঞে তা বটে। চালক ঘাড় কাত করলে।

মোটরে এসে বসতেই মিসেস চৌধুরী বললেন, খুব যা হোক! একলা মোটরে বসে আকাশ-পাতাল ভাবছি, আর তোমরা—

এই তো কাছেই ছিলাম—একেবারে কারের পিছনে।

তা সাড়াশব্দ না দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলে কেন? চারিদিকে এমন বিকট স্বরে পোকা আর ব্যাঙ ডাকছে—

ওরাই তো ভরসা দিচ্ছিল—তাই আর সাড়া দিই নি। চৌধুরী হাসলেন।

মুখ ফিরিয়ে নিলেন মিসেস চৌধুরী। বললেন, সব তাতে ঠাট্টা ঠিক নয়। আমার নার্ভ যাই খুব শক্ত—অন্য মেয়ে হলে প্র্যাকটিক্যাল জোকের রিস্ক বুঝতে!

চৌধুরী উত্তর দিলেন না। উত্তর দেবার অবকাশ ছিল না তখন। মোটর অল্প শব্দ করে চলতে সুরু করেছে। ঢালু বাঁকের মুখে পড়বে এখনই—পাশেই পড়বে কচুবন। কচুবনের গা ঘেঁষেই যাবে গাড়ী। মিসেস চৌধুরী যদি অভিমানই করে থাকেন সে ভাঙ্গাবার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে, কিন্তু কচুবন পার হয়ে গেলে কচুপাতায় হীরার বেসাতি-বাসর আর দেখা হবে না। কি সুদীর্ঘ কাল পরে ওরা আবার চোখের সামনে পড়ল। বিস্মৃত শৈশবের একটি লুপ্ত পাতা কে যেন খুলে ধরল সামনে। তাড়াতাড়ি টর্চ্চটার বোতাম টিপে মোটরের পাশে হাত বাড়িয়ে দিলেন চৌধুরী। ওধারটা গোলাকার একটি আলোক-চক্রে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভাসিত হ'ল সেই দিনটির শেষলগ্ন।

সাবিত্রীব্রত সারা হয়ে গেছে বহুক্ষণ। চওড়া লাল টুকটুকে পাড় দুধে-গরদের শাড়ী পরে মা এসে দাঁড়িয়েছেন দোতলার বারান্দায়। হাত ভর্ত্তি সোনার চুড়ি—মকরমুখো বালা, তাঁর কোলে সিঁদুর-মাখা লোহা কয়েকগাছা। উপর হাতে অনন্ত, গলায় চওড়া পাটি-হার, কানে চওড়া পাশা, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, সিঁথিতে সিঁদুর।

পশ্চিম দিকের বার মহলের প্রকাণ্ড উঠোনে প্রজারা জমায়েৎ হয়েছিল। সেই দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন মা। তখন সূর্য্য অস্ত যাচ্ছিল। আহার-পরিতৃপ্ত প্রজাদের দেখছিলেন মা। ওঁকে রাজেন্দ্রাণীর মত দেখাচ্ছিল।' প্রজারা আনন্দে ঘন ঘন জয়ধ্বনি করছিল।

চৌধুরী অপলকে চেয়েছিলেন মায়ের পানে। অসামান্য গৌরবে গরীয়সী মা!

ঝপ্ করে একটু শব্দ হ'ল—মোটর ঢালুতে নামছে—চাকাগুলো গড়িয়ে চলেছে জলের উপর দিয়ে। ছড়—ছড়—ছড়াৎ অদ্ভুত একটি সুর উঠছে জলের বুকে চাকার আঘাত লেগে। জল কাঁপছে—ঢেউ তুলছে। টর্চ্চটার আলোক-বৃত্তে চৌধুরীর অপলক দৃষ্টি নিবদ্ধ।

ছড়—ছড়—ছড়াৎ! গাড়ীটা গীয়ার বদলেছে। গতি বাড়িয়ে চালক ঠেলে তুলছে ওধারে উঁচু বাঁকের মাথায়। ছল ছলাৎ! করে কয়েকটা বড় ঢেউ এসে লাগল কচুবনের গোড়ায়। ওর পাতাগুলো দুলতে লাগল ভীষণ ভাবে; কাঁপতে কাঁপতে কাত হয়ে গেল পাতাগুলো। টর্চ্চটা শক্ত করে ধরে সেদিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন চৌধুরী।

মোটরটা হুস্ করে কচুবন পার হয়ে গেল। টর্চ্চ ঘুরিয়ে পিছনে ফেললেন চৌধুরী। পাতার কাঁপনি কমেছে, কিন্তু শূন্যগর্ভ পাতাগুলির দিকে আর চাওয়া যায় না।

সেদিনও ঠিক এমনি হয়েছিল। সূর্য্য অস্ত যাবার পর মায়ের রাজেন্দ্রাণী মূর্ত্তির পানে চাইতে পারেন নি

চৌধুরী। প্রজারা তখন জয়ধ্বনি দিতে দিতে প্রাঙ্গণ পার হচ্ছিল—মা নিষ্পলকে চেয়ে ছিলেন সেই দিকে। সামনে অন্ধকারের পাতলা আস্তরণ বিছিয়ে সন্ধ্যা নামছিল। মায়ের দু'গালে দু'টি জলের ধারা।

এর পরে চৌধুরীরা কোনদিন আর পল্লীভবনে ফিরে আসেন নি।

সোজা রাস্তায় এসে উঠল গাড়ী।

মিসেস চৌধুরী মুখ ফিরিয়েছেন এধারে। ওঁর কৌতুক-স্নিগ্ধ মুখে মোটরের নরম আলো এসে পড়েছে। ঠোঁট টিপে টিপে হাসছেন সুলতা চৌধুরী।

টর্চটা নিভিয়ে কোলের উপর ফেলে চৌধুরী বললেন, হাসছ যে?

তোমার ছেলেমানুষি দেখে। এই অন্ধকারে পথের ধারে এমন কি দেখবার জিনিস ছিল—যা টর্চ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিলে?

চৌধুরী হেসে বললেন, আমি মাঠটা দেখছিলাম। ওখানে শহর গড়ে উঠতে পারে একদিন। সেই শহরের নাম চৌধুরীনগর হতে পারে কিনা ভাবছিলাম।

সুলতার মুখখানা চক্‌চক করে উঠল। বললেন, সত্যি?

চৌধুরী বললেন, আরও ভাবছিলাম—আমার কারখানায় আজ যে নতুন প্ল্যান্ট বসানো হলো—ওতে তৈরী হবে যে মজবুত ও সুন্দর পাখা তার নাম যদি সুলতা ফ্যান দেওয়া যায় আর সে পাখা যদি ওয়ার্লড মার্কেট ক্যাপচার করতে পারে—

সুলতার মুখখানা অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আনন্দে মাথা দুলিয়ে কচি মেয়ের মত হেসে উঠলেন, সত্যি এই সব ভাবছিলে? সত্যি? সত্যি?

মাথা নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওঁর কানের হীরের দুল দুটো ঘন ঘন দুলতে লাগল। যেমন একটু আগে কচুবনের গোড়ায় চাকার ধাক্কা-লাগা জলের ঢেউ আছড়ে পড়ে কচু পাতাকে থরথর করে কাঁপিয়ে দিয়েছিল—তেমনি কাঁপতে লাগল দুল দুটো। মোটরের আলোর ঝিলিক লেগে হীরে থেকে ছিট্‌কে পড়তে লাগল আলোর ফুলকি। সেদিকে চেয়ে চৌধুরী খুসী হয়ে উঠলেন। হাঁ—ভরসার কথাই বটে। সূক্ষ্ম স্বর্ণসূত্রের কঠিন বাঁধনে বাঁধা আছে হীরের টুকরো দুটি; যত প্রচণ্ড শক্তি নিয়েই আসুক না কেন, যে কোন রকমের কঠিন ঢেউ—এই হীরা কিছুতেই স্থানচ্যুত হবে না।

"অস্ত্রে দীক্ষা দেহ রণগুরু"

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

১

"মহাজিজ্ঞাসা"

উনবিংশ শতাব্দীর পরপদানত দুর্ভাগা ভারতবর্ষ। তার মাথার উপরে ঘনিয়ে আসছে মৃত্যুর ছায়া। যারা তার মেরুদণ্ড, যাদের শ্রমের উপরে নির্ভর করে সমাজের সমস্ত শক্তি ও স্বাস্থ্য, না, অস্তিত্ব পর্য্যন্ত তারা যে মৃতেরই সামিল। লাঙলের পিছনে দাঁড়িয়ে ঐ যে লক্ষ লক্ষ হাসিম সেখ আর রামা কৈবর্ত্ত—ওদের দুর্গতির কি কোন সীমা আছে? ওদের তৃষ্ণার জল কর্দ্দমাক্ত, ওদের খাদ্য ভাত, নুন ও লঙ্কা—তাও যদি পেট ভরে দুবেলা খেতে পেতো! ওদের শয্যা ছেঁড়া মাদুর; শয়ন করে গোহালের এক পাশে। ওদের জীবন থেকে আনন্দ কবে গিয়েছে পালিয়ে! নিষ্প্রভ চোখে অন্তহীন নৈরাশ্য! এই দারিদ্র্যের উপরে মহাজনের এবং জমিদারের অত্যাচার! দেনার জন্যে লাঞ্ছনার অন্ত নেই! যাদের শ্রমকে আশ্রয় করে সমাজের ইমারত আছে খাড়া তারা যদি তাদের অযত্ন-পালিত গবাদি পশুর সামিল হয়ে থাকে তবে ভারতবর্ষের আশা কোথায়? আশ্রয় কোথায়?

কিন্তু হতভাগ্য দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চেতনায় নেই রামা কৈবর্ত্ত এবং হাসিম সেখ। সেই চেতনাকে অধিকার করে আছে আধুনিক সভ্যতার নানাবিধ আড়ম্বর—রেল, ষ্টীমার, টেলিগ্রাফ, মুদ্রাযন্ত্র, মহানগরীর আকাশস্পর্শী সৌধমালা, টেক্‌নলজির চমকপ্রদ উন্নতি। আর এই সব তো ইংরেজ শাসনের অবদান। অতএব শিক্ষিত সমাজের কণ্ঠে তখন ইংরেজ বাহাদুরের জয়ধ্বনি।

এই জয়ধ্বনিতে যোগ দিলেন না অনন্যসাধারণ একটি মানুষ। কি হবে রেল আর ষ্টীমার, টেলিগ্রাফ আর দূরবীণ, নবীন চিকিৎসাশাস্ত্র আর গ্যাসের চোখ-ঝলসানো আলো দিয়ে যদি লাঙলের পিছনে ঐ মানুষগুলি জীবন্ত নরকঙ্কাল হয়ে থাকে? চাষী—যে অন্ন দিয়ে সমাজকে বাঁচিয়ে রেখেছে—সে যদি অন্নাভাবে জীবন্মৃত হয়ে থাকে তবে মহানগরীর ঐ সারি সারি অট্টালিকা জীবনসংগ্রামে জয়ী হতে আমাদিগকে কি এক তিলও সাহায্য করতে পারবে?

ইংরেজ শাসনের মহিমাসম্পর্কে যে-মানুষটির মনে এই সংশয় জাগলো তিনি ছিলেন কিন্তু ইংরেজেরই আদালতের একজন চোগা-চাপকান-পরা হাকিম। এই হাকিমটি হোলেন স্বনামধন্য শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ইংরেজী শিক্ষিত সমাজের এবং ইংরেজ শাসকদের সামনে তিনি রাখলেন একটি বিষম প্রশ্ন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন:

"এই মঙ্গল ছড়াছড়ির মধ্যে আমার একটি কথা জিজ্ঞাসার আছে, কাহার এত মঙ্গল? হাসিম সেখ আর রামা কৈবর্ত্ত দুই প্রহরের রৌদ্রে, খালি মাথায়, খালি পায়ে, এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটা অস্থিচর্ম্ম-বিশিষ্ট বলদে, ভোঁতা হাল ধার করিয়া আনিয়া চষিতেছে, উহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে?"

বঙ্কিম কালপুরুষের প্রেরিত দূত। কালপুরুষ এই বাঙালী সন্তানের কণ্ঠকে আশ্রয় করে উনবিংশ শতাব্দীর মোহগ্রস্ত ভারতবর্ষের সামনে যে মোক্ষম প্রশ্নটি রাখলেন তার ফলে যুগান্তকারী বিপ্লবের ঝড় বইতে সুরু করলো শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিন্তাজগতে। ইংরেজ শাসন ভারতের অশেষ উপকার করেছে—এর উপরে কোন্ কথা চলতে পারে? টেক্‌নলজির এই সহস্র অবদান কি মিথ্যা? সেদিনের শিক্ষিত বাঙালী নিশ্চয়ই বক্রনয়নে বঙ্কিমের দিকে চেয়েছিল। সেই বক্রদৃষ্টিকে উপেক্ষা করে বঙ্কিম কিন্তু অকম্পিতকণ্ঠে রাজশক্তিকে প্রশ্ন করলেন:

"আর তুমি, ইংরাজ বাহাদুর, তুমি যে মেজের উপরে একহাতে হংসপক্ষ ধরিয়া বিধির সৃষ্টি ফিরাইবার কল্পনা করিতেছ, আর অপর হস্তে ভ্রমরকৃষ্ণ শ্মশ্রুগুচ্ছ কণ্ডূয়িত করিতেছ—তুমি বল দেখি যে, তোমা হইতে এই হাসিম সেখ আর রামা কৈবর্ত্তের কি উপকার হইয়াছে?"

ইংরেজ বাহাদুরের জবাব শুনবার মতো ধৈর্য্য ছিলো না বঙ্কিমের। সোক্রাতেসের (Socrates) সগোত্র বঙ্কিম ছিলেন আগাগোড়া যুক্তিবাদী। যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিঃসংশয়ে তিনি বুঝে নিয়েছেন, ইংরেজ শাসনের দ্বারা দেশের কিছুমাত্র উপকার হয় নি। জমিদার, মহাজন বা শিক্ষিত সম্প্রদায় নিয়ে তো এই বিশাল ভারতবর্ষ নয়। ভারতের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। সুতরাং তারাই প্রকৃতপক্ষে দেশ। আর ফল দেখেই তো বিচার করতে হবে ইংরেজ-শাসনে দেশের

উপকার হয়েছে, কি হয় নি। পিপাসা নিবারণের জন্যে যে-শাসনে কৃষিজীবীদের পান করতে হয় মাঠের কর্দ্দমাক্ত জল, দারুণ ক্ষুধায় খেতে হয় ভাত, লুন ও লঙ্কা এবং তাও আধ-পেটা, সেই শাসনসম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ করতে বঙ্কিমকে একটুও দ্বিধার মধ্যে পড়তে হয় নি। তাই ইংরেজ বাহাদুরকে মোক্ষম প্রশ্নটা করে নিজেই সঙ্গে সঙ্গে তার জবাব দিয়ে বলেছেন :

"আমি বলি, অণুমাত্র না, কণামাত্রও না। তাহা যদি না হইল, তবে আমি তোমাদের সঙ্গে মঙ্গলের ঘটায় হুলুধ্বনি দিব না। দেশের মঙ্গল কাহার মঙ্গল? তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি, তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয়জন? আর ঐ কৃষিজীবী কয়জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয়জন থাকে? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ—দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী।...যেখানে তাহাদের মঙ্গল নাই সেখানে দেশের কোন মঙ্গল নাই।"

২

"ঈশ্বরে প্রীতি ভিন্ন, দেশপ্রীতি সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম"

দেশ বলতে কাদের বোঝায়, দেশের মঙ্গল কাকে বলে, ইংরেজ শাসনে দেশের অণুমাত্র মঙ্গলও হয় নি—কেবল এই কয়টি কথা বলেই বঙ্কিম ক্ষান্ত থাকলেন না। তিনি আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বললেন। বললেন :

"আরও বুঝিয়াছি, আত্মরক্ষা হইতে স্বজনরক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম, স্বজনরক্ষা হইতে দেশরক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম। যখন ঈশ্বরে প্রীতি এবং সর্ব্বলোকে প্রীতি এক, তখন বলা যাইতে পারে যে, ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন, দেশপ্রীতি সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম।"

এর পরেই বঙ্কিম বলছেন :

"ভারতবর্ষীয়দিগের ঈশ্বরে ভক্তি ও সর্ব্বলোকে সমদৃষ্টি ছিল। কিন্তু তাঁহারা দেশপ্রীতি সেই সার্ব্বলৌকিক প্রীতিতে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা প্রীতিবৃত্তির সামঞ্জস্যযুক্ত অনুশীলন নহে।"

'ভারতকলঙ্ক' প্রবন্ধের উপসংহারে ভারতবর্ষীয়দের এই দেশবাৎসল্যের অভাবসম্পর্কে কটাক্ষপাত করে বঙ্কিম লিখেছেন :

"ইংরেজ আমাদিগকে নূতন কথা শিখাইতেছে। যাহা আমরা কখন জানিতাম না, তাহা জানাইতেছে, যাহা কখন দেখি নাই, শুনি নাই, বুঝি নাই, তাহা দেখাইতেছে, শুনাইতেছে, বুঝাইতেছে; যে পথে কখন চলি নাই, সে পথে কেমন করিয়া চলতে হয়, তাহা দেখাইয়া দিতেছে। সেই সকল শিক্ষার মধ্যে অনেক শিক্ষা অমূল্য। যে সকল অমূল্য রত্ন ইংরেজের চিন্তা-ভাণ্ডার হইতে লাভ করিতেছি, তাহার মধ্যে দুইটির আমরা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম—স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এবং জাতিপ্রতিষ্ঠা। ইহা কাহাকে বলে, তাহা হিন্দু জানিত না।"

ইংরেজের চিন্তাভাণ্ডার থেকে বঙ্কিম আহরণ করলেন স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তার এবং জাতি প্রতিষ্ঠার যুগান্তকারী দুটি আইডিয়া আর এই আইডিয়া দুটিকে ছড়িয়ে দিলেন দিক থেকে দিগন্তরে। বঙ্কিমের লেখনীর মুখে ছিল স্বর্গের আগুন। আনন্দমঠ, কৃষ্ণচরিত্র, ধর্ম্মতত্ত্ব—এই সব গ্রন্থ দেশবাসীর চিন্তাজগতে আনলো একটা বিরাট আলোড়ন। বঙ্কিমের সাহিত্য পড়ে ভারতবর্ষীয়েরা জানলো যা আগে তারা জানতো না, শুনলো যা আগে তারা শোনে নি, বুঝলো যা আগে তারা বোঝে নি। বঙ্কিম নব্যভারতকে শেখালেন সেই পথে চলতে যে পথে কখনো সে চলে নি। তিনি সত্যসত্যই আমাদের পথ প্রদর্শক, ঋষি অরবিন্দের ভাষায় The political Guru of modern India.

৩

"কি না হইতে পারিত?"

মার্কিন কবি ওয়াল্ট হুইটম্যানের মতই বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন দুর্জ্জয় আশাবাদী। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা হারিয়েছে এক জাতীয় বন্ধনে বদ্ধ হতে পারে নি বলে। যেদিন ভারতবাসী ভারতবাসীমাত্রকেই চিনবে একই দেশ-মাতৃকার সন্তান ব'লে, পরস্পর পরস্পরকে জানবে, সম্বোধন করবে ভাই বলে সেই দিন সেই পারস্পরিক প্রেমের ভিতর দিয়ে আসবে স্বাধীনতার সূর্য্যোদয়। মহারাষ্ট্রে শিবাজীর প্রেরণায় একবার এই জাতিপ্রতিষ্ঠার উদয় হয়েছিল। মহারাষ্ট্রীয়ে মহারাষ্ট্রীয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভ্রাতৃভাব। সেই আশ্চর্য্য ঐক্যভাবের যাদুতে মোগল সাম্রাজ্য গেল দিগন্তে বিলীন হয়ে। সমুদয় ভারতবর্ষ হোলো মহারাষ্ট্রের পদানত।

দ্বিতীয়বার জাতি-প্রতিষ্ঠার উদয় হোলো পঞ্চনদে রণজিৎ সিংহের নেতৃত্বে। দুর্ব্বার খালসাদের মহাবীর্য্যে ভারতবর্ষে বৃটিশশক্তি তখন টলটলায়মান।

'ভারতকলঙ্ক' প্রবন্ধে বঙ্কিম লিখলেন :

"যদি কদাচিত কোন প্রদেশখণ্ডে জাতিপ্রতিষ্ঠার উদয়ে এতদূর ঘটিয়াছিল, তবে সমুদয় ভারত এক জাতীয় বন্ধনে বদ্ধ হইলে কি না হইতে পারিত?"

সমুদয় ভারতকে একসূত্রে বাঁধবার মহামন্ত্র পাঠ করলেন বঙ্কিম আর এই মহামন্ত্র হোলো 'বন্দেমাতরম্'।

'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের সোনার কাঠির ছোঁয়ায় হৃদয়ে হৃদয়ে জাগলো দেশাত্মবোধ। বঙ্কিম আধুনিক ভারতবর্ষের রাষ্ট্রগুরুর কাজ করলেন। গান্ধীজী জাতির জনক, কিন্তু জাতির মন্ত্রদাতা গুরুদেব হচ্ছেন বঙ্কিম।

৪

"পাপের নিবারণের চেষ্টা না করা অধর্ম্ম"

মহামন্ত্র বন্দেমাতরমকে আশ্রয় করে তমসাচ্ছন্ন দিগন্তে এলো Patriotism-এর নব-অরুণোদয়। আর Patriotism-এর কি অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করলেন বঙ্কিম। বললেন,

"ছোট চোরের হাত হইতে নিজস্ব রক্ষার ইংরেজী নাম Justice, বড় চোরের হাত হইতে নিজস্ব রক্ষার নাম Patriotism।"

বঙ্কিম আরও বললেন: "উভয়েরই দেশীয় নাম স্বধর্ম্ম পালন।" স্বধর্ম পালন তো করতেই হবে। ভারতবর্ষ ইংরেজের পক্ষে পররাজ্য। পররাষ্ট্রাপহরণ পাপ এবং বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়, "ইহলোকে সকলেরই সাধ্যমত পাপের নিবারণের চেষ্টা না করা অধর্ম্ম।" এই কথাটাকে আরও পরিষ্কার করে বললেন:

"আমি তো কোন পাপ করিতেছি না, পরে করিতেছে, আমার তাতে দোষ কি? যিনি ঐরূপ মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন, তিনিও পাপী। কিন্তু সচরাচর ধর্ম্মাত্মারাও তাই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন। এই জন্য জগতে যে সকল নরোত্তম জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা এই ধর্ম্মরক্ষা ও পাপনিবারণব্রত গ্রহণ করেন।"

রবীন্দ্রনাথের—

"অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।"

৫

বঙ্কিমচন্দ্রেরই প্রতিধ্বনি।

"মহাভারতের কৃষ্ণকে কেহ স্মরণ করেনা"

ইংরেজ বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হলেও বঙ্কিমের ভাষায়, 'পররাজ্যাপহারক বড় চোরা' সে গ্রাস করেছে আমাদের জন্মভূমিকে। 'যেহেতু ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন দেশ-প্রীতি সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম' এবং যেহেতু দেশোদ্ধার স্বধর্ম্মপালন সেই হেতু জন্মভূমির জন্যে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করা গৌরবের কাজ। শুধু দেশোদ্ধারের জন্যে আত্মবিসর্জ্জনকে গৌরবের কাজ বলে বঙ্কিম ক্ষান্ত থাকেন নি। বঙ্কিম আরও বললেন, পররাষ্ট্রাপহরণের জন্যে যারা পররাজ্য প্রবেশ করে তাদের বিনাশ করাই ধর্ম্ম। বঙ্কিম-চন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রে লিখেছেন:

"অহিংসা পরমধর্ম্ম, একথায় এমন বুঝায় না যে, কোন অবস্থায় কোন প্রকারে প্রাণিহিংসা করিলে অধর্ম্ম হয়। প্রাণিহিংসা ব্যতীত আমরা ক্ষণমাত্র জীবনধারণ করিতে পারি না, ইহা ঐশিক নিয়ম।......যে শত্রু আমার বধ-সাধনে কৃতনিশ্চয় ও উদ্যতায়ুধ, আমি তাহাকে বিনাশ না করিলে সে আমাকে বিনাশ করিবে। যে দস্যু ধৃতাস্ত্র হইয়া নিশীথে আমার গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিতেছে, যদি বিনাশ ভিন্ন তাহাতে নিবারণের উপায় না থাকে, তবে তাহাকে বিনাশ করাই আমার পক্ষে ধর্ম্মানুগত। যে বিচারকের সম্মুখে হত্যাকারীকৃত হত্যা প্রমাণিত হইয়াছে, যদি তাহার বধদণ্ড রাজনিয়োগসম্মত হয়, তবে তিনি তাহার বধাজ্ঞা প্রচার করিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য; এবং যে রাজপুরুষের উপর বধার্হের বধের ভার আছে সেও তাহাকে বধ করিতে বাধ্য। সেকেন্দর বা গজনবী মহাম্মদ, আতিলা বা জঙ্গেজ, তৈমুর বা নাদের, দ্বিতীয় ফ্রেড্রিক্ বা নাপেলেয়ন্ পরস্ব বা পররাষ্ট্রাপহরণ জন্য যে অগণিত শিক্ষিত তস্কর লইয়া পররাজ্য প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা লক্ষ লক্ষ হইলেও, প্রত্যেকেই ধর্ম্মতঃ বধ্য। এখানে হিংসাই ধর্ম্ম।"

পররাষ্ট্রাপহরণ পাপ আর বঙ্কিমের মতে "পাপ-নিবারণ-ব্রতের নাম ধর্ম্মপ্রচার।" সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের দস্যুতার পাপকে ঠেকাবার চেষ্টা না করে আমরা অধর্ম্মের রাস্তায় চলছিলাম। আমরা যাতে পাপের নিবারণের চেষ্টায় অগ্রসর হয়ে যথার্থ ধর্ম্মজীবন-যাপনে ব্রতী হই সেই জন্যেই বঙ্কিমচন্দ্র মহাভারতের কৃষ্ণকে প্রতিষ্ঠিত করলেন, নব্যভারতের হৃদয়-সিংহাসনে। মহাভারতের কৃষ্ণ শত্রু-নিধনে পাণ্ডবপক্ষকে সহায়তা করেছেন। "জরাসন্ধবধের জন্য যুধিষ্ঠিরকে কৃষ্ণ যে পরামর্শ দিলেন, তাহার উদ্দেশ্য, কৃষ্ণের নিজের হিত নহে; যুধিষ্ঠিরের যদিও তাহাতে ইষ্টসিদ্ধি আছে, তথাপি তাহাও প্রধানতঃ ঐ পরামর্শের উদ্দেশ্য নহে; উহার উদ্দেশ্য কারারুদ্ধ রাজমণ্ডলীর হিত, —জরাসন্ধের অত্যাচারপ্রপীড়িত ভারতবর্ষের হিত—সাধারণ লোকের হিত।"

ইংরেজের অত্যাচারপ্রপীড়িত ভারতবর্ষের হিতের জন্যে মহাভারতের কৃষ্ণকে আদর্শ মনুষ্য হিসাবে শিক্ষিত সমাজের সম্মুখে তুলে ধরার সার্থকতা বঙ্কিমের কাছে সহজেই প্রতিভাত হয়েছিল। শিখিপুচ্ছধারী কুঞ্জ-কাননচারী জয়দেব গোঁসাইয়ের কৃষ্ণকে নিয়ে আমরা ছিলাম ব্যস্ত। সেই কৃষ্ণকে অনুসরণ করলে আমরা তো

অত্যাচারী ইংরেজের বাহুগ্রাস থেকে জন্মভূমির উদ্ধার সাধনে উৎসাহবোধ করতাম না। 'আমাদের মতো অত্যাচারপ্রপীড়িত পরপদানত জাতির বাঁধন ছেঁড়ার কাজে উৎসাহিত হবার জন্যে একান্ত প্রয়োজন ছিলো মহাভারতের কৃষ্ণকে অনুসরণ করবার। বড়ো দুঃখেই বঙ্কিম কৃষ্ণচরিত্রে লিখেছিলেন: "যে দিন সে আদর্শ হিন্দু-দিগের চিত্ত হইতে বিদূরিত হইল—সেদিন আমরা কৃষ্ণ-চরিত্র অবনমিত করিয়া লইলাম, সেই দিন হইতে আমাদের সামাজিক অবনতি। জয়দেব গোঁসাইয়ের কৃষ্ণের অনুকরণে সকলে ব্যস্ত—মহাভারতের কৃষ্ণকে কেহ স্মরণ করে না।"

৬

'উপসংহার'

কতকগুলি নাম আছে যা উচ্চারণ করলে উপাসনার কাজ করা হয়। বঙ্কিমের নাম করলে পুণ্য হয়। কি অপরিমেয় শক্তি নিয়ে আমাদের মধ্যে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন! 'বঙ্গদেশের কৃষক' থেকে 'কৃষ্ণচরিত্র'—একই সূত্রে গাঁথা! একপ্রান্তে দুইটি অস্থিচর্ম্মবিশিষ্ট বলদ, ভোঁতা হাল এবং সেই হালের পিছনে হাসিম সেখ ও রামা কৈবর্ত্ত! অপরপ্রান্তে মহাভারতের গীতাসিংহনাদ-কারী কৃষ্ণ যাঁর উদ্দেশ্য বঙ্কিমের ভাষায়, 'দেশের নৈতিক এবং রাজনৈতিক পুনর্জীবন (Moral and Political Regeneration), ধর্ম্মপ্রচার এবং ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন। আনন্দমঠ, ধর্ম্মতত্ত্ব, কৃষ্ণচরিত্র, বঙ্গদেশের কৃষক—সমস্ত কিছু রচনার মূলে দেশপ্রীতির প্রেরণা। সমস্ত হৃদয় দিয়ে তিনি অনুভব করেছিলেন লাখো লাখো সর্ব্বহারা চাষীর বেদনাকে। জেনেছিলেন এবং আমাদের জানিয়ে গেছেন, কৃষিজীবীরাই দেশ এবং দেশরক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম। দেশের স্বাধীনতা শুধু প্রেমের পথেই আসতে পারে আর ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের, প্রত্যেক ধর্ম্মের মানুষ নিজেকে সর্ব্বাগ্রে ভারতবাসী বলে জানলে, একই দেশ-মাতৃকার সন্তান বলে বুঝলে তবেই এই পারস্পরিক প্রীতির উদয় সম্ভব। তাই বঙ্কিম লিখলেন 'ভারত-কলঙ্ক', পাঠ করলেন মহামন্ত্র 'বন্দেমাতরম্'। আনন্দ মঠে সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে নূতন করে মন্ত্র দিয়েছেন, নূতন করে তাকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করেছেন, শক্তিময় বিষ্ণুর পদ-প্রান্তে তাকে টেনে এনেছেন। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের বারুদের শক্তিকে ধূলিসাৎ করবার জন্যে প্রয়োজন ছিল শক্তির। চৈতন্যদেবের প্রেমময় বিষ্ণুর করুণ-কোমল পূজারীকে দিয়ে পররাষ্ট্রাপহরণকারীকে বিতাড়িত করবার দুরূহ কাজ চলতো না। কারণ 'এ সব দৈত্য নহে তেমন।' বঙ্কিমচন্দ্র এক হাতে পুরাতন আদর্শকে ভেঙ্গেছেন, আর হাতে নূতন আদর্শ সৃষ্টি করেছেন। সে যুগে তিনি ছিলেন একক আকাশের দেদীপ্যমান সঙ্গীহীন প্রভাতী তারার মতো। তাঁর সুরের সঙ্গে অন্যদের সুরের কোন মিল ছিল না, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ থেকে সব কিছুই তিনি দেখেছিলেন আর এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। কারণ এ যুগের একজন ইংরেজ মনীষীর ভাষায়: যথার্থ প্রতিভা হচ্ছে A stranger and a pilgrim on the earth, unlike other men. বঙ্কিম ছিলেন প্রতিভার বরছত্র। নব-জীবনের গরিমার মধ্যে এই মহাজাতিকে জাগরিত করবার জন্যে দেবতার দীপহস্তে তিনি এসেছিলেন লেখনীর মুখে স্বর্গের আগুন নিয়ে।

কলির আকুতি : অলির ক্রন্দন

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

দৈনিক কাগজে ছোট্ট একটু খবর। তবু কলকাতায় বসে তাই পড়েই বুঝতে পেরেছিল প্রবোধ। কাঁথি শহরের গাঁ-লাগা গ্রামটির নাম আর মাইতি পদবী ঠিক ঠিক যখন মিলে যাচ্ছে তখন বিষ খেয়ে মরেছে লক্ষ্মী নামের যে মেয়েটি সে তার লক্ষ্মীদি না হয়েই যায় না—তাদের ও অঞ্চলে ঋষি প্রতিম দেশ-সেবক যিনি তাদের ছোট-বড় সকলেরই তারিণীদা, তাঁরই স্ত্রী লক্ষ্মীদি।

অসম্ভব নয়, অবিশ্বাস্যও নয়। মাস তিনেক আগে দেশে গিয়ে কোন কোন বৈঠকে যে রকম কানাঘুষা সে শুনেছিল এবং নিজের চোখেও যে রকম বিমর্ষ সে দেখে এসেছিল লক্ষ্মীদিকে তাতে তার নিজের মনেও একটু যে অশুভ আশঙ্কা জাগে নি তা নয়। তথাপি খবরটা তার চোখে পড়বার পরেই প্রবোধ যেন থ হয়ে গেল—এ কি হ'ল !

কিন্তু পরক্ষণেই হায় হায় করে উঠল তার মন। তারিণী-দা ও লক্ষ্মীদি দু'জনেই যে তার চেনা—দু'জনকেই যে সে শ্রদ্ধা করে এসেছে। তারিণী-দা তো তার গুরুই—দেশ স্বাধীন হবার পর নিজে সে সরকারী চাকরি এবং স্ত্রী-পুত্র-পরিজন নিয়ে চুটিয়ে সংসার করতে শুরু করে থাকলেও তার আগে তো সে ঐ তারিণীদার রাজনৈতিক চেলা হিসাবেই সৎ ও অসৎ নানা উপায়েই দেশের সেবা করেছে। সেই সম্পর্কে লক্ষ্মীদি তার গুরু-পত্নী। কিন্তু তা ছাড়াও ছোট বোনের বয়সী ঐ মেয়েটির সঙ্গে করুণার মিশাল দেওয়া মমতার অতিরিক্ত একটি সম্বন্ধও যে তার ছিল।

বছর তিনেক আগে এক শীতের অপরাহ্ণে তাদের প্রথম পরিচয়ের মুহূর্তেই সেই করুণ-মধুর সম্বন্ধের সূত্রপাত হয়েছিল। সুতরাং বৌদি ডাক মুখে আসে নি প্রবোধের, নিজে তাকে প্রথমেই লক্ষ্মীদি বলে ডেকে সে-ই তো ঐ ডাকটা চালু করেছিল তাদের গাঁয়ে।

খবরের কাগজখানা কখন যে তার হাত থেকে পড়ে গেল তার খেয়াল নেই প্রবোধের—তার মনের চোখের সামনে প্রথম দিনের সেই দৃশ্যটিই আবার যেন তেমনই স্পষ্ট দেখছে সে, বুকের মধ্যে আবার সে অনুভব করছে প্রথম দিনের সেই দুর্বোধ্য আবেগ।

মাসখানেক গ্রাম থেকে অনুপস্থিত থাকবার পর পঞ্চাশোত্তর বয়সের তারিণীদা এক তরুণী ভার্যা সঙ্গে নিয়ে বাড়ীতে ফিরছেন শুনে প্রবোধ সেদিন রীতিমত বিস্মিত হয়েই তাঁর বাড়ীতে ছুটে গিয়েছিল সংবাদের সত্যাসত্য যাচাই করবার জন্য। তারিণীদাকে দেখে আরও বিস্মিত হ'ল সে। যা করেছেন, তার জন্য একটুও কুণ্ঠা তাঁর নেই। বরং প্রবোধকে দেখে উৎফুল্ল হয়েই তিনি বললেন, আয় প্রবোধ, শুনেছিস তো ? ঘরে লক্ষ্মী এনেছি আমি।

প্রবোধকে জড়িয়ে ধরে অন্দরের দিকে যেতে যেতে তিনি ডাকলেন, লক্ষ্মী !—

দোরের দিকে পিছন ফিরে ঘরের মধ্যে বসেছিলেন যে মহিলা তিনি বসে বসেই ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন তাদের দিকে।

দূর থেকে আবছা আলোতে দেখা সাধারণ একখানি মুখ। কিন্তু ভাবের অভিব্যক্তিতে অসাধারণ হয়েছে তা। স্বভাবতঃই কোমল মুখখানিতে খুব স্পষ্ট যেন কাঠিন্যের ছাপ, বিরক্তি যেন ফুটে বের হচ্ছে চকচকে চোখের দৃষ্টি থেকে। ডাগর চোখ দুটির উপর কুঞ্চিত জোড়া ভুরু মনে হয় যেন বড় একটি প্রজাপতি উড়বার জন্য কালো পাখা দু'টি একটিবার মেলেই আবার বন্ধ করেছে, আর সেই উদ্ধত পাখা জোড়ার নীচে প্রায় ঢাকা পড়ে গিয়েছে ললাটের মাঝখানে টকটকে লাল সিঁদুরের ফোঁটাটি—সারা মুখখানিতেই যেন ছড়িয়ে পড়েছে সেই কালো পাখারই হাল্কা কালো ছায়া।

কিন্তু অপরিচিত প্রবোধের সঙ্গেই একেবারে চোখো-চোখি হয়ে গিয়েছিল লক্ষ্মীর ; সেই জন্যই সচকিতে মাথার কাপড় তৎক্ষণাৎ ভুরু পর্যন্ত টেনে দিয়ে উঠে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন তিনি।

সেই বিহ্বল মুহূর্তে কিছু একটা বলবার জন্যই প্রবোধ বলেছিল, লক্ষ্মী নাম নাকি আপনার ?

না, অলক্ষ্মী।

মৃদু কিন্তু কঠিন কণ্ঠে ঐ অসাধারণ উত্তরটি কানে যেতেই চমকে উঠে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আবার যে মুখ-খানি দেখতে পেল প্রবোধ তা ততক্ষণে হাসিতে উদ্ভাসিত

হয়ে উঠেছে—বিষাদ বা বিরক্তির চিহ্নমাত্রও তাতে আর নেই। দেখে আবার বিস্মিত হয়েছিল সে। কিন্তু তত-ক্ষণে আবারও চোখোচোখি হয়েছে দু'জনের। হাসির ছোঁয়াচ এড়াতে পারল না প্রবোধ। সেও হেসেই বললে, কি যে বলেন। আপনার অন্য নাম থাকলেও আমি ঐ লক্ষ্মী নামই দিতাম আপনাকে। আপনি আমার লক্ষ্মীদি।

শুনে হা হা করে হেসে উঠেছিলেন তারিণীদা ; বলে-ছিলেন, সর্বনাশ! আমার সঙ্গে তোর ভক্তি-শ্রদ্ধার সম্বন্ধটাকে এতদিনপর তুই উড়িয়ে দিতে চাস নাকি প্রবোধ ?

হাসিমুখে অস্বীকার করল প্রবোধ : না, আপনি আমার তারিণীদাই থাকবেন। কিন্তু উনি আমার লক্ষ্মীদি।

মাঝখানে কৌতুক, উপসংহারে যথারীতি মিষ্টিমুখ। তথাপি প্রথম পরিচয়ের সেই বেখাপ্পা সুরটিই যেন বাজতেই থেকেছিল প্রবোধের কানে। পরেও সে একেবারে ভুলতে পারে নি তা।

একটি ভ্রূভঙ্গি লক্ষ্মীর, একটি মাত্র কথা। তবু তা সেই প্রথম দিনে প্রবোধের মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। সে যেন নিপুণ সেতারীর কোমল অঙ্গুলীর একটিমাত্র মৃদু স্পর্শ। তাতেই প্রবোধের মনের তারে অনুকম্পার যে ঝঙ্কার উঠেছিল, নানা প্রতিকূল অবস্থার সংঘাতেও এতদিনেও তার রেশটুকু একেবারে মিলিয়ে যায় নি বলেই সেই তার লক্ষ্মীদির আত্মহত্যার খবর জানামাত্রই বেদনা ও সমবেদনায় হায় হায় করে উঠল তার মন।

প্রতিকূল শক্তি কাজ করেছে বই কি! পরে থেকে থেকে মনে হয়েছে প্রবোধের যে, লক্ষ্মীদিকে ঘরে এনে সুখী হতে পারেন নি তাদের তারিণীদা, যেন অনেক দিয়েও প্রতিদানে কিছুই পাচ্ছেন না তিনি।

কারণটা কিছু কিছু বুঝতে পারলেও তাকে সঙ্গত বলে মানতে পারে নি সে। তারিণীদা তার জীবনে আছেন তার শৈশব থেকেই, লক্ষ্মীদি এসেছেন মাত্র সে-দিন। সুতরাং সহানুভূতির ভারে প্রবোধের মনের পাল্লা ঝুঁকে পড়ে তারিণীদার দিকেই।

শেষের দিকে আরও নাকি কি কি বিশ্রী ব্যাপার ঘটেছিল। প্রবোধের কাছে শোনা কথা সবই, তবু শুনতে শুনতেও গা গুলিয়ে ওঠে, এমনি কথা সে সব। গাঁয়ের কেউ কেউ বাজি ধরে ভবিষ্যদ্বাণীও করেছে যে, তারিণীদার বাড়ীতে বড় রকমের একটা কেলেঙ্কারি হবেই।

কিন্তু দিন পনের পরে গাঁয়ে এসে থ হয়ে গেল প্রবোধ —যা ঘটেছে তাতে শোকের উপাদান এবং কেলেঙ্কারির গন্ধ থাকলেও একেবারে নাকি ভিন্ন প্রকৃতি তার।

লক্ষ্মীদির আত্মহত্যাকে উপলক্ষ করে স্বতঃই যে আবেগের উদ্ভব হয়েছিল, দিন পনের পরেও তা থিতিয়ে যায় নি ; বরং তখনও টগবগ করে ফুটছে। কিন্তু ও তো সমবেদনা নয়। কেলেঙ্কারির কথা তখনও মুখে মুখে ছুটতে থাকলেও ধিক্কার তেমন কানে এল না প্রবোধের। খবরটা বিশদভাবে যেই শোনাল তাকে সেই প্রারম্ভে বা উপসংহারে বললে—ধর্মের কল বাতাসে নড়েছে।

ছিঃ ছিঃ-র চেয়ে ধর্মের জয়গানেই যেন মুখরিত তাদের গাঁয়ের আকাশ ও বাতাস। আর তা হবেই বা না কেন? স্বামীকে খুন করবার জন্যই নাকি বিষ আনিয়ে-ছিলেন লক্ষ্মীদি। কিন্তু ধর্মচক্রের বিস্ময়কর আবর্তনের ফলে সেই বিষই লক্ষ্মীদির নিজের পেটে ঢুকে মৃত্যু ঘটিয়েছে তাঁর।

প্রমাণ? প্রথম বার ঐ কথা শুনবার পর প্রবোধ বিস্মিত হয়ে ঐ উদ্ধত প্রশ্নটা করতেই হেসে উঠেছিল তার সংবাদদাতা। যে ক্ষেত্রে ধর্মের কল নিজের নিয়মেই নড়েছে সেখানে প্রমাণের অভাব থাকতে পারে নাকি? কলেজের ল্যাবরেটরি থেকে বিষ এনে দিয়েছিল যে, তাদের ভাগিনেয় গৌরমোহন সে নিজের মুখেই পুলিসের কাছে তার নিজের দোষ লক্ষ্মীদিকে জড়িয়ে স্বীকার করেছে যে!

অসম্ভব নয়। স্থানীয় কলেজের বিজ্ঞানবিভাগে উঁচু ক্লাশের ছাত্র গৌরমোহন—তার পক্ষে কলেজের ল্যাবরেটরি থেকে মারাত্মক বিষ সংগ্রহ করা নিশ্চয়ই তেমন কঠিন কাজ নয়। অনুমানটা সহজেই এসেছিল পুলিসের মনে এবং এক লাফেই বিশ্বাসের পর্যায়ে উঠে গিয়েছিল সেই গৌরমোহনকে ও বাড়ীতে খুঁজে না পাবার জন্য। সুতরাং গ্রেফতারের পর তার নিজের মুখ থেকেই পুলিস তাদের অনুমানের সমর্থন পেয়েও থাকতে পারে।

তথাপি প্রত্যক্ষ প্রমাণের জন্য অস্থির হয়েছিল প্রবোধ। কিন্তু তার উৎস তখন তার আয়ত্তের বাইরে। গৌর-মোহন তখন হাজতে বন্দী, তারিণীদাও গ্রামে নেই। পুলিসের হাঙ্গাম চুকিয়ে লক্ষ্মীদির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করবার পর সেই যে তিনি উধাও হয়ে গিয়েছেন তার পর আর তাঁর খোঁজ পাওয়া যায় নি।

গাঁয়ের লোকে বলছে যে, বিবাগী হয়ে গিয়েছেন

তারিণীদা—তাঁর বয়সে এতবড় আঘাত কি সইতে পারে কেউ!

শুনে স্তব্ধ হয়ে রইল প্রবোধ।

বেচারী তারিণীদা! একা প্রবোধের চোখেই নয়, এ অঞ্চলে সকলের চোখেই ঋষিকল্প মানুষ। জন্ম থেকেই নাকি সংসার-বিরাগী ছিলেন তিনি, গেরুয়াধারণ না করেও সন্ন্যাসী। কেউ কেউ বলত যে, মুক্তপুরুষ তারিণীদা দেহ রেখেছেন কেবল জগদ্ধিতায়। ম্যাট্রিক পরীক্ষা না দিয়েই গান্ধীজীর ডাকে পড়া ছেড়েছিলেন তিনি। চরকা যেমন চালাতে পারতেন তেমনি নাকি বোমা-পিস্তলও। জীবনের অনেকগুলি বৎসর জেলে কাটিয়েছেন তিনি—প্রায় সাত বৎসর তো আন্দামানেই। দেশ স্বাধীন হবার পর জেলের পথটা যখন বন্ধ হ'ল তখন মন্ত্রীত্বের গদীর দিকে ধাওয়া না করে কোন এক সন্ন্যাসী গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন তিনি। ষাটের কাছাকাছি উপস্থিত হয়ে এ হেন লোক যে সংসার একেবারে ছেড়ে যাবেন তাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু একি দুর্ভোগ ভুগে গেলেন তিনি—জীবনের সায়াহ্নে একি বিড়ম্বনা!

উৎসব-অনুষ্ঠান কিছুই হ'ল না, আশ্রমবাসিনী কন্যার পিতৃ-পরিচয়ও এ গাঁয়ে কারও জানা নেই। সুতরাং একেবারে সস্ত্রীক গ্রামে এসে যখন তারিণীদা তাঁর বিবাহের কথা ঘোষণা করেছিলেন তখন প্রতিবেশী বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাও কথাটা যেন বিশ্বাস করতে পারেন নি। বয়সে যারা তরুণ তারা আড়ালে মুচকি হেসেছিল। প্রবোধের মত যুবক যারা দীর্ঘকাল ধরে তারিণীদার নেতৃত্বাধীনে দেশের জন্ম ভাল-মন্দ সবরকম কাজ নির্বিচারে করে এসেছে তাদেরও সময় লেগেছিল ঐ অভাবনীয় পরিণতিটাকে রীতিমত পরিপাক করতে।

গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে বেশী শিক্ষিত প্রবোধ। তার বুদ্ধি মার্জিত, মন উদার। অপরিচিত অনেক মহাপুরুষের মত তার নিজের পরিচিত রাহুল সংকৃত্যায়ন ও নেতাজীর জীবনের পরিণতিকে স্বাভাবিক ও সঙ্গত বলে স্বীকার করতে ইতিপূর্বে তার আটকায় নি। তবু—

তার তারিণীদার অতীত জীবনটাকে অনেক দিন ধরে এবং খুব কাছে থেকে সে দেখেছিল বলেই সেদিন অত বেশী বিস্মিত হয়েছিল সে।

সে তো জানে তারিণীদার বৃদ্ধা জননী বিয়ে করে সংসারী হবার জন্য তারিণীদাকে অনেক পীড়াপীড়ি করেও সফল হতে না পেরে মনে কি ক্ষোভ নিয়েই না শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেছিলেন। কথায় কথায় ধর্মের দোহাই দিতেন বৃদ্ধা, বংশ লোপ হবার আশঙ্কায় ছটফট করতেন। মাতা-পুত্রের এক দিনের কথাবার্তা কাছে থেকে শুনেছিল প্রবোধ।

বৃদ্ধা বলেছিলেন, তুই যে বিয়ে করবি নে বলছিস, তাহলে আমি জলপিণ্ড কেমন করে পাব?

হাসিমুখে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছিলেন তারিণীদা, কেন মা, আমি জলপিণ্ড দেব তোমাকে। এই তোমার পা ছুঁয়ে শপথ করছি—গয়াতে গিয়ে তোমার উদ্দেশ্যে পিণ্ড দেব আমি।

শুনে কিন্তু বৃদ্ধার দুই চোখে অশ্রুর বান ডেকেছিল, নিজের শীর্ণ হাতখানা দিয়ে পুত্রের সেই হাতখানা চেপে ধরে উত্তরে অবরুদ্ধকণ্ঠে তিনি বলেছিলেন, হ্যাঁ রে, আমি কি কেবল আমার কথা ভেবে বিয়ে করতে বলি তোকে? আমিই না হয় তোর পিণ্ড পেয়ে স্বর্গে গেলাম। কিন্তু তোর কি গতি হবে রে? তোর ছেলে না হলে কে তোকে পিণ্ডদান করবে?—ভাইও তো তোর নেই যে ভাইপোর আশা করবি তুই?

কিন্তু ঐ কথার পিঠেই একেবারে মোক্ষম অস্ত্র ছাড়লেন তারিণীদা। বললেন, তার জন্য ভাবনা কি মা? জলপিণ্ড আমি পাবই। তুমি জান না বুঝি, যে হিন্দু বাড়ীতেই শ্রাদ্ধ করুক বা গয়াতে গিয়েই পিণ্ড দিক, সঙ্গে সঙ্গে আমার মত হতচ্ছাড়া আঁটকুড়োদের সকলকে পিণ্ড না দিলে তার আসল শ্রাদ্ধ সিদ্ধই হবে না। "আব্রহ্মস্তম্ব-পর্য্যন্তং" সকলের তৃপ্তিসাধন করতে হয় হিন্দুকে। মন্ত্রই তো আছে:

ওঁ যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধুর্নৈবান্নসিদ্ধির্ন তথান্নমস্তি
তত্তৃপ্তয়েঽন্নং ভুবি দত্তমেতৎ প্রয়াস্ত লোকায় সুখায় তদ্বৎ।

তার পর

যে মে কুলে লুপ্তপিণ্ডাঃ পুত্রদার বিবর্জিতাঃ
ক্রিয়ালোপগতা যে চ জাত্যন্ধাঃ পতঙ্গস্তথা।
বিরূপা আমগর্ভাশ্চ জ্ঞাতাজ্ঞাতাঃ কুলে মম
তেষাং পিণ্ডো ময়া দত্তোঽপ্যক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাম।

দুষ্টামির একটু হাসি চিকচিক করছিল তখন তারিণীদার দুটি চোখের কোণে। কিন্তু উদাত্ত কণ্ঠস্বর তাঁর। বেশ বুঝতে পেরেছিল প্রবোধ যে, ঐ মন্ত্র থেকে তারিণীদা সত্যই তাঁর নিজের পরকাল সম্বন্ধে গভীর আশ্বাস লাভ করেছেন।

তবু সহজ হত, স্বাভাবিক হত যদি তারিণীদা তাঁর জননীর জীবদ্দশায় বৃদ্ধার পারত্রিক কল্যাণসাধনের জন্ম না হোক, ইহকালে তাঁর অবশ্য প্রয়োজনীয় সেবাশুশ্রূষার জন্মই নিজে দারপরিগ্রহ করতেন। কিন্তু তা না করে

একা হাতে স্বয়ং অসাধারণ অধ্যবসায়ের সঙ্গে অপরিমেয় পরিশ্রম করে স্বীয় মাতৃদায় থেকে উদ্ধার হবার বেশ কিছুদিন পরে অসমবয়স্কা এক নারীকে বিয়ে করে একি করলেন তাদের অত শ্রদ্ধেয় তারিণীদা !

প্রথম দিকে বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে একে একে অনেকেই জিজ্ঞাসা করেছিল তারিণীদাকে। এক একজনকে এক এক উত্তর দিয়েছিলেন তিনি। একজনকে বলেছিলেন : মহামায়ার মায়া রে ভাই—ধরা না পড়ে কি উদ্ধার আছে কোন পুরুষের ?

সমবয়স্ক এবং বয়োবৃদ্ধদের বুঝিয়ে বলেছিলেন যে, তাঁর গুরুদেবের আদেশ পালন করবার জন্যই বিয়ে করেছেন তিনি।

প্রতিবারেই সহাস্য মুখ তারিণীদার। একা প্রবোধকে বুঝাতে গিয়েই একটু যা বিমর্ষ হয়েছিল তা।

প্রবোধ মুখ ফুটে কোন প্রশ্ন করে নি। কিন্তু বুঝি তার চোখের দৃষ্টিতেই তার মনের প্রশ্ন পাঠ করবার পর তারিণীদা সেদিন একটু যেন বিষণ্ণ কণ্ঠেই বলেছিলেন, অদৃষ্টের পরিহাস রে প্রবোধ—তাছাড়া আর কি বলব একে।

পরিহাসই বটে। কিন্তু কি নির্মম পরিহাস তা !

মাস ছয়েক পর আবার যখন দেশে আসে প্রবোধ তখন সেই দৃশ্যটি চোখে পড়েছিল তার। বাইরের ঘরে তারিণীদাকে না দেখে সোজা ভেতরে চলে গিয়েছিল সে। সেখানেও এদিক-ওদিক তাকিয়ে লক্ষ্মীদিকে দেখা গেল না, দেখা গেল আর একটু এগিয়ে যাবার পর স্বয়ং তারিণীদাকে। পাতকুয়ার ধারে বসে হাঁড়িবাসন মাজছেন তিনি। দু' একখানা নয়, এক কাঁক। জায়গাটাতে ছায়া থাকলেও শ্রমসাধ্য নোংরা কাজ করতে করতে প্রৌঢ় তারিণীদা তখন গলদঘর্ম হয়ে উঠেছেন।

কিন্তু নিখুঁৎ হাতের কাজ তাঁর, আর সহাস্য মুখ। প্রবোধকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে বললেন তিনি, কবে এলি রে ? বোস ঐ দাওয়াতে। আমার এই হ'ল বলে।

বিস্মিত প্রবোধ কিন্তু ঐ সাদর সম্ভাষণকে উপেক্ষা করেই জিজ্ঞাসা করল, এ কি তারিণীদা—এখনও এ কাজ আপনিই করছেন যে ?

সহাস্য কণ্ঠে উত্তর হল : গিন্নীর শরীরটা কদিন থেকে ভাল নেই। আমি হাত না লাগালে সংসার চলবে কেমন করে ?

প্রবোধ তথাপি তাঁর দিকে চেয়ে রইল দেখে সকৌতুক কণ্ঠে তিনি আবার বললেন, তুই যে ভূত দেখেছিস মনে হচ্ছে—আমার পক্ষে এ কাজ নতুন নাকি ?

নিশ্চয়ই তা নয়। স্বয়ং গান্ধীজীর আশ্রমে কিছুদিন শিক্ষানবীশী করেছেন প্রবোধের তারিণীদা, নিজের বাড়ীতেও চিরদিনই একরকম আশ্রম জীবনই যাপন করেছেন তিনি। তথাপি নতুন কিছু ছিল বই কি তারিণীদার সেদিনকার বিশেষ ঐ কৃচ্ছ্রসাধনায়। আর তা ছিল বলেই ভাবানুষঙ্গে আর এক দিনের ঘটনাটা মনে পড়ে গিয়েছিল প্রবোধের।

তারিণীদার মাতৃবিয়োগের কিছুদিন পরের ঘটনা সেটি। সেদিনও ঠিক ঐ জায়গাতে বসেই খানকয়েক বাসন মাজছিলেন তারিণীদা। তাই দেখে পাশের বাড়ীর বৃদ্ধা পিসীমা সহানুভূতিতে যেন গলে গিয়ে বলেছিলেন, নিজের হাতে হাঁড়িকড়া আর কতদিন ঠেলবি তারিণী ? এবার তুই, বাবা, একটা বিয়ে কর।

সেই অনুরোধের উত্তরেই হাসি চেপে ভয় পাবার ভাণ করে বলেছিলেন তারিণীদা, তা হলে যে পিসীমা, দুজ'নের হাঁড়িকড়া ঠেলতে হবে আমাকে।

অক্ষরে অক্ষরে ফলে গিয়েছে তারিণীদার নিজের মুখের সেদিনের সেই ভবিষ্যদ্বাণী ; অদৃষ্টকে সময় মত দেখতে পেয়েও তাকে প্রতিরোধ করতে পারেন নি তারিণীদা। তবে তার জন্য ক্ষোভ নেই তাঁর, বিরক্তির চিহ্নমাত্রও তাঁর মুখে দেখতে পেল না প্রবোধ—সাংসারিক জীবনের অতিরিক্ত কর্তব্যের বোঝা সম্পূর্ণ প্রসন্ন মনেই মাথায় তুলে নিয়েছেন তারিণীদা।

তবু সেদিন অসহ্য লেগেছিল প্রবোধের। সেই দিনই তারিণীদাকে সে বলেছিল, অন্ততঃ এই নোংরা আর শ্রমসাধ্য কাজগুলি করবার জন্য আপনি একটি ঝি রাখুন তারিণীদা। বলেন তো আমিই একজনকে ঠিক করে দিতে পারি।

আর ঐ প্রস্তাবটা সে করেছিল বলেই সেদিন তখনই লক্ষ্মীদির মনের ভিতরটা আরও একবার তার কাছে প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। তারিণীদা তার প্রস্তাবের কোন উত্তর দেবার পূর্বেই রীতিমত বিরক্ত মুখে লক্ষ্মীদি ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠেছিলেন, সেই মানুষই আপনার এই মহাপুরুষ দাদাটি ! আমি ওকথা বলতেই উনি আমাকে তত্ত্বকথা শুনিয়ে দিয়েছেন—নিজের আরামের জন্য ঝি-চাকর খাটালে নাকি অধর্ম হয়।

সত্যই ঐ অভিমত তারিণীদার। মতের চেয়েও উঁচুস্তরের জিনিস—তাঁর জীবনদর্শন। সত্যই নবোঢ়া স্ত্রীর অনুরোধেও ঝি রাখতে রাজী হন নি তিনি। নিজের

পারিবারিক সমস্তার অন্ত একটা সমাধানের পরিকল্পনা মাথায় এসেছিল তাঁর। ঐ প্রসঙ্গে প্রবোধের কাছে সেটাই সেদিন খুলে বললেন তিনি, আমার ভাগনে গৌরমোহনকে এ বাড়ীতে এনে রাখব ঠিক করেছি। তার কাছ থেকে কাজও পাবে লক্ষ্মী, সাহচর্যও। আর লক্ষ্মীকে একটু আধটু পড়াতেও পারবে সে।

তখনই প্রবোধের চোখে পড়েছিল—আকাশ-পাতাল পার্থক্য দুখানি মুখের। বিরক্তিতে কালো ও কঠিন লক্ষ্মীদির কাঁচা মুখখানি, কিন্তু তারিণীদার স্বভাবতঃই পাকা ও গম্ভীর মুখখানি মমতায় কোমল ও প্রত্যাশায় উজ্জ্বল। সেদিন এবং তার পরের দিন প্রবোধকে আরও অনেক কথা বলেছিলেন তারিণীদা।

একটি গঠনমূলক পরিকল্পনা মাথায় এসেছিল তাঁর—গ্রামে একটি সমাজকল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন করবেন তিনি, বিশেষ ভাবে নারী ও শিশুদের কল্যাণের জন্য। অর্থের অভাব হবে না—ইতিমধ্যেই নাকি তিনি প্রচুর সরকারী সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন। দুরকম গরজ তাঁর। লোকের উপকার করবার জন্য চিরদিনের বাতিক তো তাঁর আছে, তার উপর বিশেষ করে লক্ষ্মীদির একটি উপকার তাঁকে করতে হবে—বড় কোন কাজ দিয়ে ঐ মহিলার সময় ও মন রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভরে দিতে হবে। তারিণীদা মনে মনে ঠিক করে রেখেছেন যে, নিজের হাতে গড়ে-পিটে তৈরি করে যথাসময়ে লক্ষ্মীদিকে তাঁর ঐ প্রস্তাবিত সমাজকল্যাণ কেন্দ্রের অধিনায়িকা করে দিয়ে যাবেন। সেই পরিকল্পনারই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হচ্ছে বাড়ীতে প্রাইভেট পড়িয়ে আগামী দু বছরের মধ্যে লক্ষ্মীদিকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করানো। তার জন্যও গৌরমোহনের মত একজনকে বাড়ীতে এনে রাখা দরকার।

শুনতে শুনতে স্বভাবতঃই যত সন্দেহ, যত প্রশ্ন প্রবোধের মনে জেগেছিল, প্রৌঢ় তারিণীদার উৎসাহে উৎফুল্ল মুখের দিকে চেয়ে মুখ ফুটে তার একটিও সেদিন প্রকাশ করতে পারে নি সে, সবিস্ময়ে অনুভব করেছিল—যেন এক নতুন তারিণীদাকে দেখছে সে, যিনি বুঝি রবীন্দ্রনাথের কবিতার নবীন ও কাঁচার মতই ঝড়ের থেকে বজ্রকেও যেন কেড়ে আনতে পারেন—লক্ষ্মীদিকে ভালবেসে যেন পুনর্জন্ম লাভ করেছেন তিনি।

সেদিন বিস্মিত প্রবোধের চোখের সামনে অকস্মাৎ যেন এক নতুন দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। তারিণীদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের বাড়ীতে ফেরবার পথে তো বটেই, এমনকি ছুটির শেষে কলকাতায় ফিরে গিয়েও সবিস্ময়ে সে ভেবেছে—যুবক এবং বিবাহিত হয়েও নিজের জীবনে যা তার উপলব্ধি হয় নি, অথচ আর একজনের চোখের দৃষ্টি মুখের ভাষা ও প্রতিটি আচরণে যার অস্তিত্বের প্রমাণ প্রত্যক্ষ দেখে এল সে, সেই ভালবাসার উন্মাদিনী শক্তির কথা। লক্ষ্মীদিকে কত ভালই যে বেসেছিলেন তারিণীদা তা সে নিঃসংশয়ে বুঝতে পেরেছিল বলেই তাদের গাঁয়ের যে দলটি তারিণীদাকে বৌ-পাগলা বুড়ো বলে গোপনে গোপনে বিদ্রূপ করত তার সঙ্গে পরে সে কোন সংস্রবই রাখে নি। বরং শেষের দিকে তার লক্ষ্মীদির সঙ্গে গৌরমোহনের নাম জড়িয়ে গাঁয়ের মধ্যে একটা কাণাঘুষা শুরু হবার পরেও সেদিকে একেবারে কান না দিয়ে নিজের সাধ্যমত নানা উপায়ে তারিণীদাকেই সাহায্য করে আসছিল সে, লক্ষ্মীদিকে অযোগ্য বুঝেও উৎসাহ দিচ্ছিল মন দিয়ে লেখাপড়া করে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা পাস করবার জন্য।

সেই তার তারিণীদা অত তাঁর ভালবাসার বিনিময়ে এ কি প্রতিদান পেলেন সেই তার লক্ষ্মীদির কাছ থেকে।

তাই ভাবছিল প্রবোধ, আর হায় হায় করছিল তার মন।

প্রথমে তার বিশ্বাস হয় নি। কিন্তু ওবাড়ীতে ছুটে যাবার পর নিঃসন্দেহ হ'ল সে। তারিণীদা তাঁর বাড়ীতে নেই। পুলিস তাঁর ঘরে তালা লাগিয়ে শীল করে দিয়ে গিয়েছে। খাঁ খাঁ করছে সে বাড়ীর উঠান; পনের দিনের অযত্নে আগাছা গজিয়েছে জমা ধূলা আর শুকনো পাতার ফাঁকে ফাঁকে। তবু প্রবোধ সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত ঐ খালি বাড়ীর শূন্য উঠানেই একাকী চুপ করে বসে তার পরম শ্রদ্ধেয় তারিণীদার জীবনে অমন শোচনীয় বিপর্যয়ের কথা ভেবে চোখের জল ফেলেছিল।

তার পর?

যেমন হয় তাই হয়েছিল। সময়ের প্রলেপ পড়েছিল তার মনের ক্ষতের উপর। কালক্রমে তারিণীদার কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল প্রবোধ।

কিন্তু দেড় বৎসর পর কেদার-বদরীর তীর্থযাত্রী হিসাবে ঋষিকেশে গিয়ে পৌঁছবার পর হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল।

(২)

তারিণীদার নিজের মুখ থেকেই শোনা কথা। তাঁর দীক্ষাগুরু স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের সমাজসেবা কেন্দ্র-

মাল খালাস — ফটো : রমেন বাগচী

সুরসাধা — ফটো : রমেন বাগচী

সূর্যাস্ত (পুরী)　　ফটো : প্রফুল্ল মিত্র

পহলগাঁও (শ্রীনগর, কাশ্মীর)　　ফটো : প্রফুল্ল মিত্র

গুলি ভারতবর্ষের নানা কোণে ছড়িয়ে থাকলেও তাঁর সাধনপীঠ ও মূল আশ্রম নাকি এই ঋষিকেশ এলাকাতেই কোন এক পাহাড়ের কোলে স্বামীজীর অন্তরঙ্গ শিষ্যদের আশ্রয় হয়ে আছে। ভাবানুসঙ্গে সম্মিলিত সন্দেহ ও জিজ্ঞাসা জাগল প্রবোধের মনে—তার তারিণীদাও সেই আশ্রমেই এসে আশ্রয় নেন নি তো?

খুঁজতে খুঁজতে আশ্রমের সন্ধান পাওয়া গেল, তার পর স্বয়ং তারিণীদারও।

এবারে ভেক নিয়েই সন্ন্যাসী হয়েছেন তিনি। পরণে গৈরিক বসন, এক মুখ দাড়ি-গোঁফ ; মাথার চুলে জটা না ধরলেও বেশ দীর্ঘ এবং রুক্ষতা। তবে শরীরটা তারিণীদার ভেঙে গিয়েছে। ইতিমধ্যে সময়ের হিসাবে বয়স তাঁর মোটে দেড় বছর বেড়ে থাকলেও আসলে অনেক বেশী বৃদ্ধ হয়েছেন তিনি। সব মিলিয়ে পরিবর্তন এত বেশী হয়েছে যে দেখা হবার পর প্রথমে প্রবোধ তাকে চিনতেই পারে নি।

কিন্তু তারিণীদা তাকে চিনলেন। প্রথম সম্ভাষণ এল তাঁর মুখ থেকেই ; তুই প্রবোধ না?

প্রবোধ নত হয়ে তাঁর পায়ের ধুলা নিতে গিয়েছিল, কিন্তু তারিণীদা দুই হাত বাড়িয়ে একেবারে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন তাকে। তার পর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কত কি প্রশ্ন তাঁর।

বিস্মিত হ'ল প্রবোধ—গ্রামের প্রতিটি লোকের কথাই কেবল নয়, অতীতের প্রায় প্রতিটি ঘটনার স্মৃতিও বেশ সজীব আছে তারিণীদার মনে। সমুদ্রের উপরটাই উত্তাল ; নীচে, প্রবোধ শুনেছে, শান্ত। কিন্তু তারিণীদার ক্ষেত্রে একেবারে বিপরীত। উদাসীর সাজ সত্ত্বেও তাঁর বুকের ভিতরটা বুঝি টগবগ করে ফুটছে। তবে কি সন্ন্যাস তাঁর মিথ্যা!

অতদূর পর্যন্ত না হলেও কিছুটা তারিণীদা অনুমান করে থাকবেন। তাই আবোল-তাবোল বলতে বলতে এক সময়ে হঠাৎ থেমে গেলেন তিনি ; হেসে বললেন, দেখছিস তো—'পূর্বাচলের পানে তাকাই অস্তাচলের ধারে আসি।' জপতপ যতই করি নে কেন, তোদের ভুলতে পারি নে।

তা হলে অমন করলেন কেন আপনি? কাউকে ঠিকানা পর্যন্ত না দিয়ে গ্রাম ছেড়ে, আমাদের সকলকে ছেড়ে চলে এলেন কেন আপনি?

আবদারের সুরে জিজ্ঞাসা করল প্রবোধ, যেন নিজেও সে তার জীবনের অনেকগুলি বছর পিছিয়ে গিয়ে আবার সেই আদরের ছোট ভাইটি হয়ে গিয়েছে তার তারিণীদার।

কিন্তু ঐ প্রশ্নটি শুনেই হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন তারিণীদা। প্রবোধের দৃষ্টি এড়িয়ে তিনি বললেন, ঐ রকম একটা ঘটনার পর গাঁয়ে থাকা আমার পক্ষে আর সম্ভব ছিল না। ঐ মামলাটার মধ্যে জড়িয়ে পড়তে চাই নি আমি।

শুনে আবার বদলে গেল প্রবোধ। উত্তেজিত হয়ে সে বললে, সেই জন্যই তো আমাদের রাগ, আমাদের দুঃখ। সাক্ষ্য দেবার জন্য আপনাকে পাওয়া গেল না বলেই তো পুলিস সে মামলা চালাতেই পারল না—খালাস পেয়ে গেল সেই শয়তান গৌরমোহন।

আমিও তাই চেয়েছিলাম—মৃদুস্বরে বললেন তারিণীদা।

প্রবোধ আরও চটে গিয়ে বললে, কেন—সে আপনার ভাগনে, তাই?

উত্তর হ'ল, না।

তবে?

সে নির্দোষ বলে।

নির্দোষ!

অন্ততঃ যা ঘটেছে সে সম্পর্কে নির্দোষ—বলতে বলতে চোখ নামিয়ে নিলেন তারিণীদা।

কিন্তু উত্তেজিত প্রবোধ তৎক্ষণাৎ হাত চেপে ধরল তাঁর ; বললে, তবে সব কথা আমাকে খুলে বলুন আপনি। না, বলতেই হবে আপনাকে—বলুন তারিণীদা।

কাছাকাছি কোন লোক ছিল না। তথাপি যেন সন্ত্রস্ত চোখে এদিক-ওদিক চেয়ে তারিণীদা মৃদুস্বরে বললেন, তবে চল ঐ ঝর্ণাটার ধারে বসি গে। আমার গুরুদেব ছাড়া আর কেউ যে খবর জানেন না, তা প্রায় দেড় বছর পর আশ্রমের আর কাউকে জানতে দিতে চাই নে আমি।

জায়গাটা আশ্রমের পিছন দিকে, আরও খানিকটা উঁচুতে। সেখান থেকেই নিবিড়তর হয়েছে বন। শাল না সেগুন কি সব বড় বড় গাছের মাথায় মাথায় জড়াজড়ি সেখানে। সুতরাং আকাশে সূর্য থাকলেও নীচে অন্ধকার-অন্ধকার মনে হয়। নির্জন নিস্তব্ধ জায়গাটা। গঙ্গা অনেক নীচে, মোটর সড়কও ওখান থেকে দেখা যায় না। আশ্রম মোটামুটি দেখা গেলেও আশ্রম থেকে সেই বনের ভেতরটা চোখে পড়বার কথা নয়। তথাপি অতি সন্তর্পণে বড় বড় কয়েকখানি পাথর ডিঙিয়ে অগভীর সরু

ঝর্ণাটাকে অতিক্রম করে ওপারে চলে গেলেন তারিণীদা। সেখান থেকে হাতের লাঠিখানা প্রবোধের দিকে আড়াআড়ি এগিয়ে দিয়ে বললেন, নে, এই আমার তৃতীয় হাতখানা ধরে পার হয়ে আয়। এইটুকু ঝর্ণা দেখেই অত ভয় পেলে কেদার পর্যন্ত তুই যাবি কেমন করে?

একখানি জুঁতসই শুকনো পাথরের উপরে দু'জনে পাশাপাশি বসবার পরেও তারিণীদা ঐ রকম একটা অবান্তর প্রসঙ্গ উত্থাপন করবার উপক্রম করতেই প্রবোধ অসহিষ্ণুর মত বললে, আসল কথাটা আগে বলুন, তারিণীদা। গৌর তো শুনেছি গোড়াতে তার নিজের মুখেই পুলিসের কাছে দোষ স্বীকার করেছিল। তবে আপনি তাকে নির্দোষ বলছেন কেন?

প্রশ্ন শুনেই আবার গম্ভীর হয়ে গেলেন তারিণীদা। কিন্তু একটু পরে প্রবোধের মুখের দিকে চেয়েই তিনি বললেন, সে তো বিষ এনেছিল আমাকে মারবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু দেড় বৎসর পরেও এই তো স্পষ্ট দেখছিস তুই যে দিব্যি বেঁচে আছি আমি। তবে কেমন করে দোষ বলব তাকে?

এমন ভাবে কথাটা ভাবে নি প্রবোধ; সুতরাং ঐ কুটিল যুক্তির সমুচিত প্রত্যুত্তর তৎক্ষণাৎ দিতে পারল না সে। কিন্তু তার বিব্রত মুখের দিকে চেয়ে তারিণীদাই আবার বললেন, সত্য হলেও 'এই বাহ্য'। কেবল উপরের এই মোটা খোসাটার কথা ভেবেই তাকে নির্দোষ বলি নি আমি। সূক্ষ্ম বিচারেও গৌর নির্দোষ।

বিব্রত থেকে বিহ্বল হ'ল প্রবোধ; তার পর আবার অসহিষ্ণু। সে তখন উদ্ধত ভাবে বললে, আর হেঁয়ালি করবেন না তারিণীদা। খুলে বলুন, বুঝিয়ে বলুন আমাকে।

অতঃপর বুঝিয়েই বললেন তারিণীদা, কিন্তু প্রবোধের চোখে চোখে চেয়ে আর নয়। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে মৃদু বিষণ্ণ কণ্ঠে তিনি বললেন, প্রকৃতি যদি পুতুল-নাচ নাচাতে চায় তবে সংসারে ক'টি পুরুষের সাধ্য আছে রে তা প্রতিরোধ করবার? গৌর তো লক্ষ্মীর হাতের পুতুল।

আপনি লক্ষ্মীদিকেই দোষী করছেন তাহলে?

না। তোমরা যে দোষের কথা ভেবেছ সে দোষে সেও দোষী নয়। সে তো স্বামীকে মারবার জন্য বিষ আনায় নি।

তবে?

আমাকে জিজ্ঞেস করছিস কেন?—বলতে বলতে অদ্ভুত রকমে হাসলেন তারিণীদা, তোর লক্ষ্মীদি নিজেই তোর ঐ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যায় নি?

প্রবোধ নীরব; কিন্তু তার মুখের দিকে চেয়ে একটু পরে তারিণীদাই আবার বললেন, বিষ আনবার জন্য নিশ্চয়ই লক্ষ্মীই প্ররোচনা দিয়েছিল গৌরকে, কিন্তু তা সে করেছিল নিজে আত্মহত্যা করবার জন্য। অর্বাচীন যুবক তা বুঝতেই পারে নি, আর নারীর চোখের জল ও মুখের কথায় ভুলে বিশ্বাস করেছিল যে, ঐ নারী তাকেই কামনা করছে।

এই কথাতেই প্রবোধের মনে চিন্তার মোড় ফিরে গেল। হঠাৎ মনে পড়ল তার যে, গোড়ায় যা রটেছিল তা তো ঐ কলঙ্কই যার জন্য সারা গাঁয়ের মন বিষিয়ে উঠেছিল লক্ষ্মীদির বিরুদ্ধে। একা প্রবোধই সেই কুৎসা রটনায় দশজনের শরিক হতে পারে নি বলে লক্ষ্মীদির অপঘাত মৃত্যুর প্রতিক্রিয়ায় তার মন তখন কেবলই হায় হায় করেছিল। কিন্তু এখন তারিণীদার মুখের কথাতেও সেই কলঙ্কের আভাস পেয়ে লক্ষ্মীদির বিরুদ্ধে তার মন এই প্রথম কঠিন হয়ে উঠল। ভ্রূকুঞ্চিত করে কিছুক্ষণ নীরব থাকবার পর সে কঠিন কণ্ঠেই জিজ্ঞাসা করল, ও রকম বিশ্বাসকে আপনি ভুল কেন বলছেন তারিণীদা? সবাই যা জানে—

না রে—তোরা কিছুই জানিস নে!

বাধা দিয়ে তারিণীদা যে সুরে ঐ কথাটা বললেন, তাই শুনেই প্রবোধের মাথায় আবার সব তালগোল পাকিয়ে গেল। সে বিস্মিত হয়ে বললে, কি বলছেন আপনি?

দৃপ্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন তারিণীদা, আমি জানি যে, লোকে যা মনে করেছিল তা ছিলেন না তোর লক্ষ্মীদি। কলঙ্কের ছোঁয়াও লাগে নি তাঁর—না দেহে, না মনে। দিনরাত যেখানে আগুন জলছে, বিশেষ একটি পুরুষ সেখানে ঢুকবে কেমন করে রে?

প্রবোধ একেবারে নির্বাক। তার সেই বিমূঢ় মুখের দিকে চেয়ে তারিণীদা আবার তাঁর সেই অদ্ভুত হাসি হেসে বললেন, যা পাপ, তাও কি সবাই করতে পারে রে! মেয়েদের পক্ষে কলঙ্কিনী হওয়া কি অত সোজা?

শুনে কিংকর্তব্য-বিমূঢ় অবস্থা প্রবোধের। তারিণীদার কথা সে সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করতে চায়, কেননা বিশ্বাস করলেই যেন শক্ত মাটির উপর খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারে সে। তবু বিশ্বাস হচ্ছে না তার। আস্থা ও সন্দেহের নাগরদোলায় দুলতে দুলতে আত্মরক্ষার প্রেরণাতেই যেন তারিণীদার হাতখানা আবার শক্তমুঠিতে চেপে ধরল সে। রুদ্ধ-নিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করল, কি করে জানলেন

আপনি? আপনি লক্ষ্মীদিকে ভালবাসতেন বলেই যে বিচারে ভুল করছেন না, তা আমি মানব কেন?

তুই না মানলেও আমার বিশ্বাস টলবে না,—গম্ভীর-স্বরে উত্তর দিলেন তারিণীদা, আমি যে জানি।

কি জানেন আপনি?

অনেক ঘটনাই জানি যা তোরা জানিস নে—জানবার উপায়ই ছিল না তোদের। কিন্তু তাদের কোনটাই যদি না জানতাম, কেবল ঐ তার মরবার আগের দিন বৈকালের ঘটনাটা ছাড়া, তাহলেও কেবল সেইটির জন্যই মুখে বা মনে লক্ষ্মীকে কলঙ্কিনী বলবার অধিকার আমার নেই।

শোনাবেন আমাকে সে ঘটনাটা?

বলতে বলতে উত্তেজনা ও আগ্রহে জ্বল জ্বল করতে লাগল প্রবোধের দুটি চোখ। সেই চোখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন তারিণীদা; তার পর মৃদুস্বরে বললেন, হাত ছাড় আমার—বলছি।

শোনালেন তারিণীদা। মৃদু-বিষণ্ণ কণ্ঠে থেমে থেমে, মাত্র মিনিট দু'য়েকের একটি ঘটনা প্রায় পনের মিনিট ধরে বর্ণনা করলেন তিনি।

সেদিন সন্ধ্যা হতে তখনও বুঝি ঘণ্টাখানেক দেরি ছিল। তারিণীদা তাঁর বাইরের নিত্যকর্মগুলি শেষ করে বাড়ীতে ফিরেছিলেন। হন্ হন্ করে প্রাঙ্গণ পার হয়ে এসে দাওয়ায় উঠবার জন্য পা বাড়িয়েও থমকে দাঁড়ালেন তিনি—ঘরের ভেতর থেকে একটা অস্বাভাবিক চাপা গুঞ্জন কানে এসেছে তাঁর। ঘরের দরজা বন্ধ, কিন্তু খোলা জানালা দিয়ে লক্ষ্মী ও গৌর দু'জনেরই দেহের প্রায় অর্ধেকটা করে চোখে পড়ল। সেই অংশগুলির মৃদু কম্পনও তারিণীদার চোখে কেমন যেন অস্বাভাবিক ঠেকল বলেই তিনি দাওয়ায় আর না উঠে ডান দিক দিয়ে অন্দর মহলে প্রবেশ করে পাশের আর একটি জানালার নীচে কান পেতে দাঁড়ালেন।

আজও অনুশোচনার অন্ত নেই তারিণীদার—গাঁয়ের লোকের অমূলক সন্দেহের কিছুটা তাঁর মনের মধ্যেও সংক্রমণের ফলে সেদিন ঐটুকু চৌর্যবৃত্তি তিনি যদি না করতেন তাহলে হয়তো অকালে অপমৃত্যু ঘটত না লক্ষ্মীদির। তবে অনুতাপের পাশেই অত্যন্ত কঠিন এক রকম সন্তোষও আছে তারিণীদার মনে—পরের কথা-বার্তাটুকু সেদিন তিনি চুরি করে শুনেছিলেন বলেই লক্ষ্মীদির অকলঙ্ক চরিত্র সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে পেরেছেন তিনি।

পাশ কাটিয়ে আড়ালে যেতে যেটুকু সময় লেগেছিল তারিণীদার তারই মধ্যে চুরি করে-আনা বিষটুকু গৌর-মোহনের হাত থেকে প্রথমে লক্ষ্মীদির হাতে এবং সেখান থেকে পরক্ষণেই তার ব্লাউজের নীচে চলে গিয়ে থাকবে। সুতরাং ঐ সম্পর্কে উভয়ের কথাবার্তার যেটুকু কানে এল তারিণীদার, তাতে পুরস্কার প্রার্থনা ও তা প্রত্যাখ্যানের সুর ও প্রক্রিয়া তাঁর বোধগম্য হলেও ও সবের মূল কারণটা সম্বন্ধে তখন একেবারেই অজ্ঞ থেকে গিয়েছিলেন তিনি।

ওরা কথা বলছিল আর তারিণীদা কান পেতে শুনছিলেন।

গৌর বললে, সে তো অনেক পরে। আজ এখনই আমায় একটি পুরস্কার দাও।

লক্ষ্মীদি জিজ্ঞাসা করলেন, কি?

আর কিছু না, একটি শুধু চুমো খাব।

কি বললে?—এক ক্রুদ্ধা-ফণিনী যেন গর্জন করে উঠেছে।

গৌর মুখ কাচুমাচু করে বললে, আমি যে তোমায় ভালবাসি।

ভালবাস?—তীক্ষ্ণ কণ্ঠের উত্তর শোনা গেল লক্ষ্মীদির, তুমিও ভালবাস বলছ! কিন্তু জন্ম থেকেই ও কথা শুনতে শুনতে কান যে আমার ঝালাপালা হয়ে গিয়েছে। কি আমার হবে তোমার ঐ ভালবাসা দিয়ে? আর কি দিতে পার তুমি? এই তো কাঠি-কাঠি চেহারা তোমার—ভুশণ্ডি-কাকের মত রূপ। মামার বাড়ীতে এঁটো কুড়িয়ে খাও। আমার জন্য কি করতে পার তুমি? ঘরবাড়ী দিতে পার তুমি আমাকে, গা-ভরা গয়নাগাঁটি, জমজমাট সংসার? সার্থক করতে পার তুমি আমাকে?—

বলতে বলতে লক্ষ্মীদির কণ্ঠস্বর ধাপে ধাপে নাকি ক্রমেই উপরে উঠছিল। ধ্বনি কেবল ধ্বনিই নয়, যেন তাপ আছে তাতে—নিদাঘে মধ্যাহ্ন সূর্যের উত্তাপের মত প্রচণ্ড দুঃসহ অগ্নিজ্বালা। কিন্তু যখন সে থামল তখন হঠাৎ যেন নেমে এল বরফের মত কঠিন ও শীতল, কিন্তু উত্তাপের মতই দুঃসহ স্তব্ধতা। কেবল একটি মুহূর্ত—কিন্তু তখন তারিণীদার মনে হয়েছিল যেন এক যুগ। তার পর সেই শিলা-কঠিন বরফস্তূপই যেন অকস্মাৎ বোমার মত ফেটে গিয়ে আবার আগুন হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। রূপক নয়, আকার ধরে কঠিন আঘাত গিয়ে পড়ল বেচারা গৌরমোহনের মুখের উপর।

বাতায়নের সঙ্কীর্ণ ফাঁক দিয়ে দেখলেন তারিণীদা—তাঁরই নিজের পায়ের চটিজোড়ার একখানা তক্তপোষের

তলা থেকে বিদ্যুদ্বেগে তুলে নিয়ে লক্ষ্মীদি শক্ত হাতে জুতা মারলেন গৌরমোহনের গালে।

পদাহত কুকুরের মত ঘর থেকে ছুটে বের হয়ে গেল গৌরমোহন।

বোধ করি একদমেই একেবারে গ্রাম ছেড়ে সে চলে গিয়েছিল বলেই তো পরদিন লক্ষ্মীদির অপমৃত্যুর কারণ খুঁজতে গিয়ে পুলিসের সন্দেহ প্রথমেই গিয়ে পড়েছিল গৌরমোহনের উপর। আর স্বয়ং তারিণীদার পরিবর্তে লক্ষ্মীদির মৃত্যু ঘটেছিল বলেই সংবাদ পাওয়ামাত্র অনুতপ্ত গৌরমোহন বিষ আহরণ সম্বন্ধে তার নিজের দায়িত্ব পুলিসের কাছে অকপটে স্বীকার করেছিল।

গল্পটি রুদ্ধনিঃশ্বাসে শুনছিল প্রবোধ। কিন্তু তারিণীদা নীরব হবার পরেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারল না সে। বরং বেশ যেন একটু অস্বস্তির সঙ্গেই অনুভব করল যে, মোটা মোটা কয়েকটি সন্দেহ তখনও যেন সরীসৃপের মত তার মনের তলে বিচরণ করছে। বিহ্বলের মত তারিণীদার মুখের দিকে চেয়ে সে বললে, ঐ ঘটনা থেকেই ধরে নিয়েছেন আপনি যে আপনাকে বিষ খাইয়ে মারবার মতলব ছিল না তাদের?

একটি উদ্গত দীর্ঘনিঃশ্বাস ভেতরেই চেপে রেখে তারিণীদা বললেন, ধরে নেওয়া কি রে—সবই তো দিনের আলোর মত স্পষ্ট। গৌর তো ও ব্যাপারে ছিল এক নির্জীব যন্ত্রমাত্র। যে যন্ত্রী সে তো নিজের প্রাণ দিয়েই প্রমাণ করে গিয়েছে যে, আমাকে সে মারতে চায় নি।

কিন্তু আত্মহত্যা করলেন কেন তিনি?

শুনলি নে লক্ষ্মীর নিজের কথাটা আমার মুখ থেকে? সে যে সার্থক হতে পারে নি,—হবার আশাও তো ছিল না।

প্রবোধ নিরুত্তর।

তার বিহ্বল মুখের দিকে চেয়ে তারিণীদা এবার হেসে বললেন, এত বোকা কেন রে তুই? নারী কিসে সার্থক হয় তা জানিস নে? আর নিজে সফল হবার যন্ত্র হিসাবে ছাড়া পুরুষের আর কি মূল্য আছে নারীর কাছে?

কান্নার চেয়েও বেশী যেন করুণ তারিণীদার মুখের ঐ হাসি। ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল তা। হঠাৎ চোখে জল এল বলেই বুঝি তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিলেন তিনি।

আর আসন্ন সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে সেই মুখের দিকে নির্বাক হয়ে চেয়ে রইল প্রবোধ। এত কথা শুনবার পরেও কিছুই যেন বুঝতে পারছে না সে। বরং আরও যেন গভীর জলে তলিয়ে যাচ্ছে, এমনি তার মুখের ভাব।

তলিয়ে যাচ্ছিলেন তারিণীদাও স্মৃতির লোনা জলের অতল সমুদ্রে। হাবুডুবু খেতে খেতে তখন তাঁর মনের মত দেহও বুঝি অবসন্ন। একটু পরে মৃদু-বিষণ্ণ কণ্ঠে তিনিই আবার বললেন, কিন্তু বড় কষ্ট পেয়েছে লক্ষ্মী। তুষানলে দগ্ধ হবার কথাটাই তোরা কানে শুনেছিস। আমি চোখে দেখেছি লক্ষ্মীকে দিনের পর দিন সেই তুষের আগুনে দগ্ধ হতে। আমার উপর রাগ করাটাকেই মাঝে মাঝে তোরা দেখেছিস। তার সাজ করা তো দেখিস নি,—দেখিস নি তো আমার দুই পা জড়িয়ে ধরে তার ফুলে ফুলে কান্না! কিন্তু অত চেয়েও কিছুই তো সে পায় নি। আমার স্ত্রী, গৃহিণী, সকল প্রতিষ্ঠা ও প্রতিষ্ঠানের উত্তরাধিকারিণী হয়েও কোন দিনই আমার কাছে তো আসতে পারে নি সে।

কেন?—এবার জিজ্ঞাসা করল প্রবোধ।

তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন তারিণীদা, আমাদের দু'জনের মাঝখানে পাথরের দুর্ভেদ্য দেয়াল ছিল যে—আমার চির-কৌমার্যের প্রতিজ্ঞা। সে প্রতিজ্ঞা তো আমি করেছিলাম আমাদের বিয়ের অনেক বছর আগে।

আর তখনই মেঘ কেটে গিয়ে রোদ উঠল যেন। সবই স্পষ্ট দেখতে পেল প্রবোধ।

এতক্ষণে বুঝতে পারল সে। বিশ্বাস করতেও আটকাল না—বজ্রের চেয়েও কঠিন এই তারিণীদাই তো তার আবাল্যের পরিচিত। কিন্তু আশ্চর্য! এখন বিস্ময় ও ভক্তিতে রোমাঞ্চ হ'ল না তার। বরং একেবারে বিপরীত প্রতিক্রিয়া। হঠাৎ যেন বছর পাঁচেক আগের অতীতে ফিরে গিয়েছে সে— সেই যখন পঞ্চাশোত্তর বয়সের তার অত শ্রদ্ধেয় তারিণীদা বছর পঁচিশ বয়সের যুবতী লক্ষ্মীদিকে বিয়ে করে গ্রামে নিয়ে অসেছিলেন। সেদিন প্রবোধ কেবলই বিস্মিত হয়েছিল। কিন্তু এখন রীতিমত রাগ হ'ল তার এবং তৎক্ষণাৎ তা ফেটেও পড়ল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে বললে, সব দোষ আপনার। নিষ্ফল বৈরাগ্যের সাধনাই যদি অটুট সঙ্কল্প আপনার তবে কেন লক্ষ্মীদিকে বিয়ে করেছিলেন আপনি?

জীবনে এই প্রথম তার তারিণীদার প্রতি সত্যই বীতশ্রদ্ধ হয়েছে প্রবোধ—চোখের দৃষ্টিতে তার ফুটে উঠেছে রাগের সঙ্গে বেশ যেন একটু ঘৃণাও। কিন্তু সেই তার চোখের সামনেও আবার একখানা পট উঠল।

আগের কথাও খুলে বললেন তারিণীদা।

পূর্ববঙ্গের ধর্ষিতা কুমারী যুবতী লক্ষ্মীকে নিজের এক

সেবাশ্রমে স্থায়ীভাবে গ্রহণ করবার মাস তিনেক পর স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ জানতে পেরেছিলেন যে, সেই ধর্ষণের ফলেই লক্ষ্মী অন্তঃস্বত্তা :হয়েছেন। বিব্রত স্বামীজী তখন ঐ দুর্ভাগিনীকে শাস্ত্রমতে বিয়ে করবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন তাঁর অবিবাহিত পুরুষ-শিষ্যদের। কিন্তু তাঁদের মধ্যে যাঁরা বয়সের হিসাবে অপেক্ষাকৃত যোগ্য তাঁরা নাকি কেউ রাজী হন নি। আর পাত্রহিসাবে অনুপযুক্ত যে তাদের তারিণীদা তিনি দূতমুখে ঐ সংবাদের সঙ্গে গুরুর আদেশ পেয়ে শিরোধার্য করে নিয়েছিলেন তা।

—গুরুর আদেশ ছাড়াও বিবেকের আদেশ পেয়েছিলাম যে রে,—বলতে বলতে সোজাসুজি প্রবোধের চোখের দিকে তাকালেন তারিণীদা, একজন কেউ তার গর্ভস্থ সন্তানের পিতৃত্ব স্বীকার না করলে, অভাগিনী সমাজে মাথা তুলে চলবে কেমন করে? আর ভেবেছিলাম যে, লক্ষ্মীর গর্ভে একটি সন্তানের আবির্ভাব যখন হয়েছে তখন সেইটিকে কোলে নিয়েই আমার সঙ্গে নিষ্কাম দাম্পত্য জীবনযাপন করতে পারবে সে। কিন্তু—

কথাটা সম্পূর্ণ করতে পারলেন না তারিণীদা। কৌতূহলী প্রবোধ তৎক্ষণাৎ তাঁর একখানা হাত চেপে ধরে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে জিজ্ঞাসা করল, তাহলে সে শিশুটির কি হ'ল? তাকে তো আমরা দেখি নি!

নিয়তি রে ভাই, নিয়তি—তারিণীদা মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন, জন্মের মাসখানেক পরেই সেটি মারা গিয়েছিল।

মধু আহরণ. হলো নারে তোর প্রজাপতি

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

মধু আহরণ হলো নারে তোর প্রজাপতি।
শুধুই বসালি পাখায় পাখায় হীরামতি ॥

অসীম আকাশ বোবা হ'য়ে গেছে আজ,
'চোঁ' মারা চিল কিলবিল করে বাতাসে।
দিগন্ত ভরা বিকৃত ভানের সাজ,
ধরণীর সনে কেমনে কহিবে কথা সে ॥

দগ্ধ এ মরু তবু বুক তার বিদরে,
পোড়া বালুকায় ধূম্রজালের রচনা।
'ছোঁ' মারা চিল তবু ওড়ে তার ভিতরে,
জীবনের গান হরণ করার সূচনা ॥

ফোটে না কুসুম মরমের বাণী আসে না,
মাটির বাসনা মাথা কুটে মরে হতাশে।
বাতাস আজিকে আকাশেরে ভালবাসে না,
তবু প্রজাপতি উড়ে উড়ে মরে কি আশে ॥

ওরে প্রজাপতি রং-বেরংএর পাখা তোর,
আজিকে আজব কাহিনীর মত শুনি যে।
দুটি আঁখি ভরা শতেক তারার আঁখি লোর,
তার মাঝে আজ সাগরের ঢেউ গুনি যে ॥

মধু আহরণ হলো নারে তোর প্রজাপতি।
শুধুই বসালি পাখায় পাখায় হীরামতি ॥

শিল্প-সৃষ্টির আনন্দ

শ্রীসুধীর খাস্তগীর

প্রায় কুড়ি বছর আগে, আমার এক একক ছবির প্রদর্শনীতে একজন বলেছিল—"তুমি এতো ছবি ও মূর্ত্তি করো কেন?" এঁকে কি সুখ পাও?"

লক্ষ্ণৌ গবর্ণমেণ্ট আর্ট কলেজে প্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্রনাথের ভাস্কর্য মূর্ত্তি

কথাটার জবাব দিতে গিয়ে আমাকে অনেক কথাই বলতে হয়েছিল। কিন্তু উত্তর ঠিকমত দিতে পারি নি।

—কেন আঁকি? যা দেখি চোখ দিয়ে, ভগবানের সৃষ্টি সব—তার মধ্যে যা মনকে আকৃষ্ট করে, ভালো লাগে—তাকে আরো নিবিড় ভাবে উপলব্ধি করতে চাই বলেই আঁকি বা গড়ি। ভাল না লাগলে কি আর আঁকা যায়?

—পয়সা রোজগার করবার জন্যেই কি আঁকি? পয়সা ত অন্যান্যদের মতো আমারো দরকার কিন্তু শুধু পয়সার জন্যই যদি আঁকতাম তবে ছবি আঁকা, মূর্ত্তি গড়া ছেড়ে অন্য কিছু করলে হয়তো বেশী রোজগার করা সম্ভব হ'ত। ছবি আঁকাটা বেছে নিলাম কেন?

—মনের মধ্যে যশোলিপ্সা আছে কি? নাম ডাক হবে; তা হয়তো খানিকটা থাকতেও পারে—কার না থাকে?

সবার মাঝে নিজেকে একটু উঁচু গণ্য হবার জন্যই কি এতো আকুলিবিকুলি?—সন্দেহ হয় মনে।

তবে কি পরের উপকার—নিজের দৃষ্টিকোণ দিয়ে অন্যের দৃষ্টিশক্তি বাড়াবার জন্যই কি আঁকি? ভগবানের অপূর্ব্ব সৃষ্টি এই পৃথিবীর আলোবাতাস, গাছপালা,নদনদী, পাহাড়-পর্ব্বত যা দেখে দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়—তারই খানিকটা উপলব্ধি করে—অন্যদের পরিবেশন করার চেষ্টা! আমি যা দেখে আনন্দ পেলাম—দেখ, তা তোমরাও সবাই চোখ মেলে দেখ—এই কি উদ্দেশ্য?

—ঠিক তাও নয়।

পরের উপকার করবার জন্যেও ত আঁকি না! নিজের ভালো লাগে বলেই আঁকি বা গড়ি! আঁকা বা গড়ার কাজে যখন লেগে থাকি—তখন কি প্রভূত আনন্দই না পাওয়া যায়! কাজটা যেই শেষ হয়ে যায়, তখন আধেক আনন্দ যায় চলে—"আধেক থাকে বাকী"। কাজটা' শেষ হলে—সে জিনিস ত আর আমার নয়—আমার আঁকা হতে পারে—কিন্তু তখন সে জিনিস 'সবার' হয়ে পড়ে। সবার ভালো লাগলে পাবে প্রশংসা—না যদি লাগে ভালো তবে রইলো অনাদরে পড়ে ষ্টুডিওর এক কোণেই ধুলো-ঝুল মেখে। নিজের সৃষ্টি খানিকটা নিজের সন্তানদেরই মতো ত! মনের আনন্দে সৃষ্টি ত করলে—কিন্তু মাঝে মাঝে একটু ব্যথাও বাজে মনের কোণে। দায়িত্ব কি একেবারেই নেই? ভালো না হলে ছিঁড়ে

বা ভেঙে কি সব সময় ফেলা যায়? সন্তানদের কি নিজে হাতে মানুষে মারতে পারে, না মারা উচিত?

যাই হোক—সব দিক থেকে ভেবে দেখলে কথাটা মানতেই হবে যে, শিল্পী আঁকে বা গড়ে মনের আনন্দে! মনের দুঃখে আঁকা সম্ভব নয়।

পুরুষ মূর্ত্তি

কথাটা সবাই হয়তো মানতে চাইবেন না কিন্তু খুব সত্যি। আনন্দ ছাড়াও দুঃখ আঘাত লেগে জীবনবীণায় যে ঝঙ্কার তোলে, তাতে আনন্দ থাকে বলেই তা সহনীয়, এবং উপভোগ্য! বেসুরো তারে ঝঙ্কার ওঠে না ঠিকমতো।

শিল্পীগুরু নন্দলাল বসুর কাছে শেখবার সময় উনি গল্পচ্ছলে একদিন বলেছিলেন—তিনি একবার তাঁর গুরু অবনীন্দ্রনাথের কোনো কথায় খুব আঘাত পেয়েছিলেন। মনের ভার আর যায় না—একখানা ছবি এঁকে মনের ভার লাঘব করলেন—সে ছবিখানা খুব নাম-করা ছবি তাঁর—'উমার তপস্যা'।

ছবিখানা আঁকতে বসেছিলেন দুঃখ পেয়ে কিন্তু এঁকে আনন্দ নিশ্চয় পেয়েছিলেন প্রচুর—নয়তো মনের ভার কম্‌লো কি করে?

আমার পিতার মৃত্যুর পর মাকে ব্রহ্মসঙ্গীত শুনাচ্ছিলাম একদিন; মনের ভেতর জমাট-বাঁধা দুঃখ স্বর বন্ধ করে দিয়েছিল—মা বলেছিলেন—"কেঁদে কেঁদেই গান গা—মনে শান্তি পাবি।" কাঁদলে শান্তি পাওয়া

বাউল নৃত্য

যায়! কাঁদতেও ভালো লাগে তা হলে। শিল্পীর মনে যত দুঃখই থাক—আঁকতে বা গড়তে বসে তার আনন্দই বলতে হবে—কারণ, আঁকা বা গড়াতেই তার মনের পূর্ণ মুক্তি!

কুড়ি বছর পর আবার একই প্রশ্ন আরেকজনের মুখে শুনে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলাম—কতটা বদলেছি! বদ্‌লেছি বৈকি, কিন্তু খুব বেশী নয়। ছবি বা

মূর্ত্তির অঙ্কন-পদ্ধতি বা ধরন-ধারণ একটু-আধটু বদ্‌লেছি সন্দেহ নাই কিন্তু যা চোখে পড়বার মত তা হচ্ছে, আগের ধোঁয়াটে কুয়াশাচ্ছন্ন রঙের বদলে আজকাল উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার। ছবির বিষয়বস্তুও দুঃখদায়ক নয়। অপর্য্যাপ্ত আলো, নৃত্যরতা নর্ত্তক-নর্ত্তকী ছন্দোবদ্ধ পরি-

বংশীবাদক

কল্পনা এবং অতি-উজ্জ্বল রঙের প্রভাব যেন ইচ্ছাকৃত মনে হয় অনেকের চোখে। পূর্ব্বে কখনো কখনো অন্ধ ভিখারী, দরিদ্র, দুঃখী মানবমানবী, ইত্যাদি আমার ছবির বিষয়বস্তু ছিল—এখন আর সে সব আমার ছবির বিষয়বস্তু নয়। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে আমাকে যে পথে নিয়ে গেছে তাতে এটুকু বুঝেছি যে, পৃথিবীতে দুঃখকষ্ট যথেষ্টই আছে—সেই সব ছবি বা মূর্ত্তির বিষয়বস্তু করে শিল্পসৃষ্টি করতে আর ইচ্ছে হয় না। মনের আনন্দে ছবি আঁকাও স্বাভাবিকই, মানসিক অশান্তি নিয়েও যখন ছবি আঁকতে বসেছি, তখনো তুলির টানে যা প্রকাশ পেয়েছে তাতে দুঃখের লেশমাত্র নেই—পেন্সিলের আঁচড়ে তুলির টানে প্রকাশ পেয়েছে গতি, ছন্দ, ফুলভারনত বৃক্ষ, মা ও ছেলে, বংশীবাদক, নৃত্যমত্তা পুরুষ বা নারীমূর্ত্তি। এ সম্ভব হয় কি করে?—বাংলায় কি বলে জানি না—এটাই হচ্ছে Sublimation!

যে সব ছবি বা মূর্ত্তি দেখে মনে আনন্দ জাগে, উৎসাহ জাগে, সাহস সঞ্চার হয়, অশান্তি দূর করে—সে সব আঁকেন বা গড়েন যাঁরা, তাঁরা কি নিজেরা খুব সুখী মানুষ? সাধারণতঃ সুখী বলতে যা' বোঝায় তা হয়তো তাঁরা নন। আমি দেখেছি এবং জানি যে সব শিল্পীরা সর্ব্বদা সুখের মধ্যে বাস করেন, যাঁদের দেখে মনে হয় অত্যন্ত সুখী মানুষ—তাঁরা অনেকেই যখন আঁকেন বা গড়েন তখন তাঁদের হাত থেকে বার হয় পৃথিবীর যত নোংরামি, বীভৎস ছবি বা মূর্ত্তি—কিম্বা এমন সব ছবি বা মূর্ত্তি—যা দেখে মানুষের মনে দুঃখ ভয় শোক উদ্রেক হয়! আসল কথা, সব শিল্পীরাই মনের মধ্যে নিজের নিজের রাজ্য বানিয়ে বাস করেন—তাঁদের মনের মধ্যে যখন যা ভাব আসে তারই খানিকটা বেরিয়ে পড়ে তাঁদের কাজের মধ্যে! সেই কারণেই অনেক সময় শিল্পীর সঙ্গে পরিচয় থাকলে তাঁর শিল্পসৃষ্টি বুঝতে খানিকটা সুবিধা হয়! অবশ্য সব সময় নয়!

বহুকাল আগে বোম্বাই শহরে যখন ছিলাম শান্তিনিকেতন থেকে বেরিয়ে—শ্রীমতী মৃণালিনী চট্টোপাধ্যায় (তখন সেখানকার মডার্ণ গার্ল স্কুলের Lady Principal) আমাকে বলেছিলেন, শিল্পীদের বিষয়ে কিছু কথা। মনে রয়ে গেছে। তাঁর ভাই কবি-শিল্পী ও গায়ক 'হারীন' চট্টোপাধ্যায়ের কথা বলছিলেন, আমার সঙ্গে তাঁর আলাপ তিনিই করিয়ে দিয়েছিলেন। ভাইকে তিনি অসম্ভব ভালবাসেন—কবি-শিল্পী বলে। কথায় কথায় তাঁর চোখে মুখে যে করুণা উছলে উঠতে দেখতুম এখনো মনে আছে। একদিন বলেছিলেন, "তোমাদের ছিঁড়ে-খুঁড়ে দেখতে ইচ্ছে করে—কি আছে তোমাদের মনের ভেতর—কি ভাব'? কি দেখ' ঐ দুটো চোখ দিয়ে, এই হাত দুটো দিয়ে কেমন করে আঁক এই সব"—

শুনে হেসেছিলুম।—কি দেখলেন উনি আমাদের কাজের মধ্যে—এতোই কি হেঁয়ালি আছে আমাদের কাজের মধ্যে—যা বুঝতে গেলে আমাদের ছিঁড়ে-খুঁড়ে দেখা দরকার?

—ছিঁড়ছে-খুঁড়ছে কি কম আর্ট-ক্রিটিকরা আজকাল?

এই প্রসঙ্গে একটা গল্পও মনে পড়ে গেল! কে বলেছিল, বা কোথায় পড়েছি মনে নেই। শুনেছি বা কোথাও পড়েছি, নিজের বানানো নয় এটা সত্যি।

'পমপম' নামে একজন প্রসিদ্ধ অভিনেতা ছিলেন, খুব হাসাতে পারতেন—'যাত্রা' করে বেড়াতেন শহরে শহরে—

—সারা শহরের লোকদের হাসিয়ে অস্থির করতেন তিনি। সবাই তাঁর অপেক্ষায় থাকতেন! বড় বড় মানসিক রোগের ডাক্তাররাও তাঁর অপেক্ষায় থাকতেন—তিনি শহরে অভিনয় করতে এলে সব রোগীদের বলতেন গিয়ে শুনতে—প্রাণ খুলে হাসতে। হাসিই নাকি সব চেয়ে ভালো ওষুধ মন ভালো রাখার।

একদিন কোনো এক শহরে 'পমপম' গিয়েছেন—তাঁর অভিনয়ের পালা খুব জোর চলেছে! সেই শহরের নাম-করা মানসিক রোগের ডাক্তার তাঁর সব রোগীদের 'পমপম'-এর অভিনয় দেখতে হুকুম দিয়েছেন। একজন নূতন রোগী এসেছে নাম-করা ডাক্তারের নাম শুনে তাঁর কাছে চিকিৎসার জন্য। ডাক্তার রোগীকে বললেন, 'পমপমে'র কথা। বললেন, অভিনয় দেখতে যেতে—প্রাণ ভরে হাসতে! জীবনের ভার সহজ সরল ভাবে নিতে। অভিনয় দেখে পরের দিন আসে আবার দেখা করতে।

রোগী ডাক্তারের কথায় খুসী হলো না। বললে, 'না ডাক্তার! ওসব হাসি তামাসার অভিনয় শুনে তার মনের ভার কি লাঘব হবে? কিছুতেই নয় অন্য ওষুধের ব্যবস্থা হোক!'

ডাক্তার বিরক্ত হয়ে বললেন, "চিকিৎসার জন্য যখন এসেছেন আমার কাছে, তখন আমার কথাটা শুনুনই না"—

রোগী কেঁদে ফেলে বললে, "পমপম আমার মন ভালো করবে কি করে ডাক্তার সাহেব—আমি নিজেই যে সেই 'পমপম'।"

* * দুনিয়া হাসিয়ে বেড়াচ্ছে যে লোক সে নিজেই কত বড় দুঃখী। অন্যকে হাসাবার সব রকম কল-কৌশল জানে নিজেই—কিন্তু জানে না নিজের মনের খোরাক জোটাতে। অনেক শিল্পীরাই এই জাতের। যিনি সৃষ্টির আদি ও অন্ত উপলব্ধি করতে পেরেছেন তিনিই বোধ হয় সুখ-দুঃখের উপরে উঠে যান। তিনি সব সময় আনন্দের রাজ্যে থাকেন—সুখ-দুঃখ তাঁর কাছে তখন সমান।

—তখন আর ছবি মূর্ত্তি গড়বার দরকার হয় না।

অন্যের কথায় কাজ কি। নিজের কথাই যতটা বলা যায় বলি। সুখ-দুঃখের উপরে ত আমি উঠি নি সুতরাং এখনো আঁকছি-গড়ছি। ভবিষ্যতে আরো আঁকবো আর গড়বো—'দুঃখ সুখের ঢেউ খেলানো এই সাগরের তীরে' বসে। দুঃখকে বাদ দিয়ে ত জীবন সম্পূর্ণ নয়—দুঃখ সবাইকে পেতেই হয় এড়াবার যো নেই। "দুঃখ যদি না পাবে ত দুঃখ তোমার ঘুচবে কবে?" সেই ছাত্রাবস্থায় শান্তিনিকেতনে যে গান শিখেছিলাম তার মর্ম্ম তখন ততটা বুঝি নি, এখনো যে বুঝেছি তাও নয়, তবে বোঝার ছোঁয়া লেগেছে একটু-আধটু। জীবনে দুঃখকে সম্পূর্ণরূপে বরণ করবার ক্ষমতা যাঁর হয়, তিনিই জানেন দুঃখের সার্থকতা। তিনিই তখন আবার বলেন, "আরো আঘাত সইবে আমার সইবে—আরো কঠিন সুরে বাঁধো, আমার বীণার তারে ঝঙ্কারো"—মাভৈঃ।

ভাবছেন—ছবি আঁকা ও মূর্ত্তি গড়ার আনন্দের কথা বলতে বলতে এ সব কি বলছি। আনন্দের কথা শুনবার জন্য লেখা পড়ছিলেন—দুঃখের কথা শুনতে নয়—এই ত'? এই জন্যই ত দুঃখের ছবি আঁকতে চাই না, সে থাক আমার মনের নিভৃত কোণে। জনবহুল রাস্তায় বসে কারুর কি হাপুস নয়নে কাঁদবার অধিকার আছে? না ভালো দেখায়। তার চেয়ে "যে পথ দিয়া চলিয়া যাব 'সবারে যাব তুষি'।—সেই ভালো। তাই আঁকি, নাচের ছবি, ছন্দের ছবি, ফুলের ছবি—উত্তাল তরঙ্গের ছবি, ঝড়-ঝঞ্ঝার ছবি···।"

তা দেখে যদি তুষ্ট হন তাতেই আমি সন্তুষ্ট।

সবার উপরে

শ্রীসীতা দেবী

১৩

গল্প করে, খেয়ে ঘুমিয়ে ঘণ্টাগুলো যেন হু হু করে বয়ে গেল। রাসবিহারী ট্রেনে পড়বার জন্যে গোটা দুই বই জোগাড় করে এনেছিলেন, তা তাঁরও বেশী পড়বার দরকার হ'ল না। বৌ আর ছেলেমেয়ের সঙ্গে গল্প করে তাঁরও সময় চট্‌পট্ কেটে গেল। উষা বাড়ীতে শ্বশুরকে দেখলেই ঘোমটা টেনে দিত লম্বা করে। এতে গৌরাঙ্গিনী খুসী ছিলেন, তবে রাসবিহারী বকেঝকে ঘোমটাটা খানিক কমিয়েছিলেন। স্বামীর সঙ্গে কথা বলা গুরুজনদের সামনে ত অসম্ভবই ছিল তার পক্ষে। গীতা যে অত সপ্রতিভ মেয়ে, সেও শাশুড়ীর সামনে স্বামীর সঙ্গে কথা বলত না তা নূতন বৌ কি বলবে?

কিন্তু কাতী যে বলেছিল বৃহৎ কাষ্ঠে আর গজপৃষ্ঠে নিয়ম নেই, সেটা দেখা গেল সত্যিই। শুধু যে খাওয়া শোওয়ার নিয়মভঙ্গ হ'ল তা নয়, আর সব নিয়মও রইল না। উষা ঘোমটা দিল না, শ্বশুরের সঙ্গে বেশ কথা বলল, এমন কি তাঁর সামনে হিতেনের সঙ্গেও কথা বলে ফেলল। বোধ হয় এটা বাড়ী থেকেই ঠিক করে আসা হয়েছিল।

মহারাষ্ট্রের মধ্যে এসে পড়ে ভারি ভাল লাগল সুমনার। এ জায়গাটার সঙ্গে ইতিহাসের পাতার মধ্যে দিয়ে তার কতদিনের পরিচয়। সেই শিবাজীর গল্প, আফ্‌জল খাঁয়ের গল্প, শায়েস্তা খাঁর গল্প। সেই রায়গড়-সিংহগড়। এই পার্ব্বত্য বন্ধুর দেশটার চেহারায় কি যেন আছে যা মনকে টানে। পুরনো জায়গা ভারি ভাল লাগে সুমনার। এইবার ত তারা এসে পড়ল বলে। জিনিসপত্র, বিছানা সব আবার ঠিকঠাক করে বেঁধেছেঁদে রাখা হ'ল। কাতী কাজের আছে খুব, মেয়েদের বেশী কিছু করতে হ'ল না।

সুমনার বুকের ভিতরটা দুরুদুরু করে কেঁপে উঠল কয়েকবার। আর ত দেরি নেই। ষ্টেশনে তাদের নিতে বিজয় আসবে নিশ্চয়। কত দিন হ'ল তার সঙ্গে দেখা হয় নি। ছোট ছোট চিঠির মধ্যে দিয়েই তাদের সম্বন্ধটা বজায় আছে, কিন্তু কতটুকুই বা তারা জানে একজন আর একজনকে। এবারে খুব কাছে এসে পড়তে হবে।

সুমনার ধারণা ছিল হাওড়ার ষ্টেশনের মত বড় ষ্টেশন আর বুঝি ভারতবর্ষে নেই। কিন্তু দেখল যে 'ভিক্টোরিয়া টারমিনাস্'টিও কম যায় না। চীৎকার-চেঁচামেচিও সমান বলতে হবে। কিন্তু ষ্টেশনের দিক্ থেকে চোখ ফিরিয়ে সে প্ল্যাটফর্ম্মের জনস্রোতের মধ্যে কাকে যেন খুঁজতে লাগল উৎসুক দৃষ্টিতে। ঐ ত দেখা যাচ্ছে!

হিতেন বলল, "বাঁচা গেল, বিজয়বাবু এসে না পড়লে একটু বিপদেই পড়তে হ'ত। আমি ত আবার এদিকে কখনও আসিনি।"

উষা একটু নীচু গলায় বলল, "আহা, ঠিকানাটাও জান না নাকি? যেতে পারবে না?"

বিজয় সহাস্যমুখে এসে দাঁড়ালো। রাসবিহারীকে প্রণাম করে, অন্যদের নমস্কার করে বলল, "যাক্, একেবারে ঠিক সময়ে ট্রেন এসেছে আজ। পথে কোনো কষ্ট হয় নি ত?"

রাসবিহারী বললেন, "না, বেশ ভালই এসেছি, ঘুমও হয়েছে। অনেক সময় ট্রেনে আমি ঘুমুতে পারি না।"

তার পর ট্যাক্সি ডাকা, জিনিসপত্র নামানো, সব গুছিয়ে নিয়ে যাত্রা করা। শহরটি বেশ বড়, এবং কলকাতার তুলনায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। অন্ততঃ তাঁরা যে সব রাস্তা দিয়ে চললেন সেগুলি ত বটেই। বিজয় বলল, "সমস্ত শহরটাই যে এই রকম তা নয়। ঘিঞ্জি পাড়া, নোংরা পাড়াও আছে। তবে আমার বাড়ীটা এই দিকে, কাজেই ভাল দিক্‌টাই আগে দেখলেন।"

'মেরিন ড্রাইভে' বিজয়ের বাড়ী। সুন্দর জায়গা, একেবারে সমুদ্রের সামনে। বিস্তীর্ণ বালির চড়া, নগর-বাসী আবালবৃদ্ধ-বনিতার বেড়াবার জায়গা। যেন কলকাতার গড়ের মাঠেরই মত জনবহুল।

বিজয় বলল, "এই বিখ্যাত 'চৌপাঠি স্যাণ্ডস্', ঐ যে মূর্ত্তিটা দেখছেন ওটা বিঠল্‌ভাই প্যাটেলের।"

খবরের কাগজে এ জায়গাগুলোর নাম সুমনা কতবার পড়েছে। উদ্‌গ্রীব হয়ে সে দেখতে লাগল। তবে তখনই প্রায় ট্যাক্সি থেমে যাওয়ায় আর চারিদিকে তাকানোর সুবিধা হ'ল না।

ফ্ল্যাটটা ভালই এবং বেশ বড়, পাড়াটাও ভাল। তবে প্রথমেই অনেকগুলো সিঁড়ি উঠতে হ'ল বলে রাসবিহারী

একটু হাঁপিয়ে পড়লেন। বিজয়দের বসবার ঘরে এসে একটা আরাম চেয়ারে বসে ভাবতে লাগলেন, ভাগ্যে গৌরাঙ্গিনীকে আনেন নি, তা হ'লে তিনি ত উঠতেই পারতেন না এতটা। বাড়ীতেই বেশী সিঁড়ি ওঠা-নামা করতে হ'লে তিনি হাঁসফাঁস্ করতে থাকেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মোটাও হয়ে পড়েছেন বেশী, এখন শুয়ে-বসে থাকতেই চান। তবে নাতী-নাতনীরা তাঁকে সারাক্ষণই যে বসতে দেয় তা নয়।

বিজয় বলল, "বাড়ীটার সবচেয়ে বড় দোষ এইটা। প্রথমেই মানুষকে হয়রাণ করে দেয়। অল্প বয়সীরা অবশ্য বেশী কাতর হয় না, বড়দেরই মুস্কিল।"

সুমনা বলল, "বাবা দিনে একবারের বেশী নামবে না বোধ হয়, তাঁর খুব বেশী অসুবিধা হবে না। আমাদের তো কারো কোনো অসুবিধাই হবে না।

হিতেন বলল, "হ্যাঁ, বয়সও কম, ওজনও কম।"

উষাও সুমনারই মত হাল্কা গড়নের এবং সে জন্যে তার মনে মনে জাঁক আছে। বড় জা গীতা তার চেয়ে ফরসা বটে, কিন্তু অল্প বয়সে ভারী হয়ে পড়েছে, কেমন যেন গিন্নীবান্নীর মত দেখায়।

বিজয় বলল, "ওজন আবার খুব কম হওয়া সুবিধের নয়। জগতে ভার বইতে হয় অনেক, গায়ে খানিকটা জোর থাকা চাই। চলুন, আপনাদের ঘর দেখিয়ে দিই আগে, তার পর অন্য কথা। রান্নাবান্না হয়েই আছে, স্নানটান করে নিন তাড়াতাড়ি। আজ হয়ত খাবারে নারকেল তেলের গন্ধ পাবেন, ওবেলা থেকে ঠিক হয়ে যাবে। মস্ত বড় টিন এনেছেন তেলের দেখছি।"

সুমনা বলল, "হ্যাঁ, মা তেল-ঘি অনেক কিছু গুছিয়ে দিয়েছেন, সব কাতী নিয়ে যাচ্ছে এখন রান্নাঘরে। আপনার রান্নার লোকটি কি হিন্দী বলতে পারে?"

বিজয় বলল, "হিন্দী পারে তবে বোম্বাইয়ের ধাঁচের হিন্দী। ভাঙা ভাঙা বাংলাও পারে বলতে, আমার বন্ধুর কাছে বছর তিন আছে ত?"

ফ্ল্যাটে চারখানি ঘর, তা ছাড়া দুটি বাথরুম, রান্নাঘর চাকরের থাকবার জায়গা প্রভৃতি আছে। বিজয়েরা দুই বন্ধু দুটো শোবার ঘর দখল করে থাকত, এখন সে দুটোয় অতিথিদের জন্যে ছেড়ে দিয়েছে। বসবার ঘরটা সব চেয়ে বড়, সেটাকে দু'ভাগ করে একদিকে বসবার জায়গা ও একদিকে খাবার জায়গা করে নেওয়া হয়েছে। খাবার ঘরটিকে বিজয় নিজের শয়নকক্ষে পরিণত করেছে।

গোটা দুই কাঠের স্ক্রীন্ জোগাড় করে একটা শোবার ঘরকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। বিজয় জিজ্ঞাসা করল, "দেখুন, চলবে ত?"

সুমনা বলল, "খুব চলবে। এতও ভেবেছেন আপনি, আমাদের ধারণা যে মেয়েরাই এত খুঁটিনাটি ভাবে।"

বিজয় বলল, "নিজে জোর করে টেনে এনে তার পর আপনাকে অসুবিধায় ফেলতে পারি কখনও?"

উষা আর হিতেন তখন নিজেদের ঘর দেখছে। রাসবিহারী বসবার ঘরে বসেই আছেন। সুমনা বলল, "জোর করে টেনে এনেছেন নাকি?"

বিজয় বলল, "তা ছাড়া আর কি? দু'বার আপনাকে লিখলাম, একবার আপনার বাবাকে লিখলাম, তবে ত এলেন?"

সুমনা বলল, "নইলে আসতাম কি ক'রে আপনিই বলুন? আমি ত পুরুষ মানুষ নই যে, যখন যেদিকে খুসি চ'লে যাব?

এই সময় রাসবিহারী এসে ঘরে ঢুকলেন। কাতী এবং বিজয়ের চাকর, তাঁর এবং সুমনার সব জিনিসপত্র এনে তুলল ঘরে। ঘরের ব্যবস্থা দেখে রাসবিহারী মহা খুসী, বললেন, "বাঃ, বেশ হয়েছে, হোটেলেও এত সুবিধা হ'ত না।"

তার পর জিনিস গোছানো এবং স্নানাগারের পর্ব্ব। রান্নাটা নিতান্ত মন্দ হয় নি, তবে তেলের গন্ধ একটু আছে বই কি? মাছটাও সমুদ্রের, বাঙালীর জিবে স্বাদ ভাল লাগে না।

বিজয় আফ্‌সোস্ করে বল্ল, "এখানে বাঙালীদের খাওয়ার অসুবিধা হয়ই। এক যদি ইংরিজি-খানা খান্‌ত সে একরকম হয়।"

সুমনা বল্ল, "সে আমাদের আরো ঢের বেশী খারাপ লাগবে। কেন, এ এমন কি মন্দ? এত ত তরকারি রয়েছে। কাতীকে বল্‌ব কাল দু' চারটে নিরামিষ রান্না করতে।"

দুপুরে সবাইকে খানিক বিশ্রাম করবার অবকাশ দেবার জন্য বিজয় নিজের শোবার ঘরে শুয়ে রইল। কিন্তু কি কারণে জানি না তার মনে হ'ল সবাই শোয় নি। বারান্দায় যেন কে ব'সে আছে। বেরিয়ে এসে দেখল সুমনা ব'সে আছে, কোলের উপর একখানা খোলা বই, তবে চোখ দুটো একদৃষ্টে আরব সাগরের দিকে চেয়ে আছে।

জিজ্ঞাসা করল, "কি পড়ছেন?"

সুমনা বল্ল, "পড়ছি না কিছুই, সমুদ্র দেখছি"

"কি রকম লাগছে?"

সুমনা বল্‌ল, "ভালই, তবে পুরীর সমুদ্রের মত অতখানি ভাল নয়। একেবারে স্থির হয়ে আছে পুকুরের জলের মত।"

বিজয় বল্‌ল, "তা বটে, যা স্বভাবতঃ শান্ত নয়, তাকে জোর করে শান্ত করে রাখলে ভাল দেখায় না।"

সুমনা বল্‌ল, "মানুষের পক্ষেও কি একথা খাটে?"

বিজয় বল্‌ল, "খানিকটা খাটে বই কি? বাঙালীর মেয়েদের পক্ষে খুব খাটে, তাদের জোর ক'রে বুড়ো আর শান্ত ক'রে রাখা হয়।"

সুমনা হেসে ফেল্‌ল, বল্‌ল, "আপনি ঠিকই বলেছেন। দেখুন না আমার ছোট বৌদিকে। বাড়ীতে সারাক্ষণ ঘোমটা দিয়ে থাকে, বাবার সামনে কথাই বলে না। এখানে ত শাশুড়ীর কাছে বকুনি খাবার ভয় নেই, স্বাধীনভাবে দিব্যি ঘুরছে-ফিরছে, কথা বলছে, মাথায় কাপড় দিতেও অনেক সময় ভুলে যাচ্ছে।"

বিজয় বল্‌ল, "হঠাৎ মুক্তি পাওয়ার আনন্দ। আপনার নিজের কিরকম লাগছে? কলকাতার থেকে কিছু তফাৎ বুঝছেন?"

সুমনা বল্‌ল, "তা খানিকটা লাগছে বৈকি! আমাদের বাড়ীর অন্দরমহলের সঙ্গে আপনার বেশী পরিচয় ঘটে নি। কিন্তু সেখানের আইন-কানুন বড্ড কড়া। বিশেষ ক'রে আমার পক্ষে।"

বিজয় বল্‌ল, "এই রকম কিছু একটা আছে আন্দাজ করতাম। ইচ্ছা করত একটু গণ্ডি ডিঙিয়ে ভিতরে যেতে, কিন্তু একটা অদৃশ্য বাধা অনুভব করতাম। তিন বছরের মধ্যে আপনার সঙ্গে পড়ার কথা ছাড়া আর কোন কথাই বলি নি। আপনাকে এত আটকে রাখার মানেটা কি? আজকাল ত সমাজ অত স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরোধী নয়? পড়াশুনোও করছেন—সেটা ত শুধু অন্তঃপুরিকা হবার জন্য দরকার হয় না?"

সুমনা বল্‌ল, "পড়াশুনোটা বাবার মতে, ঘরে আটকানো আর কারো সঙ্গে মিশতে না দেওয়াটা মায়ের মতে।"

বিজয় বল্‌ল, "কিন্তু আপনাকেও বাইরের জগতেই চলতে-ফিরতে হবে, মা সেটা বোঝেন না?

সুমনা বল্‌ল, "কি যে তিনি ভাবেন তিনিই জানেন। অথবা জেনেও চোখ বুজে থাকেন। আমার ভবিষ্যৎ জীবনটার কি ছবি যে তাঁর মনে আছে আমি তা ভেবেও পাই না।"

বিজয় বল্‌ল, "আপনি নিজে কিরকম জীবন বেছে নেবেন সেটা কিছু ঠিক করেছেন?"

সুমনা একটুক্ষণ চুপ ক'রে রইল, তার পর বল্‌ল, "অবস্থাগতিকে কিরকম কি দাঁড়াবে তা জানি না, কিন্তু এক বিষয়ে আমি নিজের মনকে ঠিক ক'রে রেখেছি, নিজের মনুষ্যত্বের বিরোধী কিছু আমি করবো না, তাতে মা যাই-ই বলুন।"

আরো কথাবার্ত্তা হ'ত হয়ত, তবে এই সময়ে রাসবিহারী উঠে পড়লেন, জিতেনরাও উঠে পড়ল। খাবার-ঘরে সরবে চায়ের আয়োজন হতে লাগল। কলকাতার থেকে আনীত সন্দেশ রসগোল্লার প্রাচুর্য্যে চা খাওয়ার পর্ব্বটা খুব ভাল ভাবেই সম্পন্ন হল। বিজয় বল্‌ল, "এত জিনিস এনেছেন যে একমাস খাওয়া যাবে। ভাল মিষ্টি এখানে পাওয়া যায় না, তা ঠিকই অবশ্য।"

একবেলা খেয়ে যা বাকি রইল, তা সুমনা আর উমা মিলে ফ্রিজিডেয়ারে তুলে রাখল। রাসবিহারী বললেন, "বটগাছের ছায়ায় যেমন ছোট চারাগাছ জন্মায় না, তেমনি বেশী জবরদস্ত গিন্নীর আওতায় বৌঝিরা গৃহিণীপনা শেখে না। বাড়ীতে এদের কিছু করবার জো নেই নিজের মতে, এখানে দু'জনেই কেমন গুছিয়ে কাজ করছে দেখ।"

সুমনা আর উমা হাসল। বিজয়ের সঙ্গে গৌরাঙ্গিনীর সরাসরি আলাপ ছিল না, তবে স্বামী, পুত্র, কন্যা মিলে তাঁর যে ছবিটা আঁকল সেটা খুব মনোহর মনে হ'ল না বিজয়ের কাছে।

বিকেলে বেড়াতে যাওয়া হবে কি না সেটার আলোচনা উঠল। বিজয় বলল, "অতদূর ট্রেনে এসে ক্লান্ত আছেন সকলে, আজ না হয় সামনেই একটু ঘোরা যাক্। সিঁড়ি নামতে কি খুব কষ্ট হবে?"

প্রশ্নটা রাসবিহারীকে করা; তিনি বল্‌লেন, "বেশী কিছু না, দুপুরে ত অনেকক্ষণ বিশ্রাম করেছি। একটু সমুদ্রের হাওয়াই খাওয়া যাক্। আপনার বাড়ীর সবই ভাল, শুধু যদি একটা লিফ্‌ট থাকত।"

বিজয় বল্‌ল, "আমাকে কেন যে 'আপনি' বলছেন তা জানি না, আমি ত জিতেনবাবুর চেয়ে বেশী বড় হব না?"

রাসবিহারী হেসে বল্‌লেন, "তা বটে। তুমিই বলা উচিত। আমি একটু বেশী বয়সে বিয়ে করেছিলাম, না হলে তোমার চেয়ে বড় ছেলেও আমার থাকতে পারত। তা তুমিও সুমনাকে 'তুমি' বোলো, ওর গুরুমশায় রূপেই ত তোমার সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয়।"

সুমনা হেসে সায় দিল। কথাটা সেও অনেকবার বলবে ভেবেছে, তবে সাহস করে বলে নি।

উমা বলল, "আমরা তাহলে তৈরি হয়ে নিই।" এত

শাড়ী জামা গহনা আনা হয়েছে, অথচ সেগুলো পরবার কোনো সুবিধা হচ্ছে না, এতে সে অস্থির হয়ে উঠেছিল।

রাসবিহারী উঠে প'ড়ে বললেন, "হ্যাঁ তাড়াতাড়ি কর, না হলে দিনের আলো একেবারে নিভে গেলে, বাইরে বেড়াতে ভাল লাগে না।"

তিনি গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকলেন। হিতেন স্ত্রী এবং বোনকে লক্ষ্য ক'রে বলল, "দেখছ ত, সামনে কেমন পরীর রাজ্য, নিজেরাও ভাল ক'রে সেজেগুজে চল, নইলে হেরে যাবে।"

উষা ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, "যা হাঁড়ির কালির মত রং, একেবারে চুণকাম না করলে পরী মনে হবে না কিছুতেই।"

সুমনা বলল, "ছোট বৌদি এত বাজে কথাও বলতে পারে। ওর নাকি হাঁড়ির কালির মত রং?"

উষা বলল, "তোমার পাশে ত তাই মনে হয় ভাই? মনে নেই আমার ঠাকুরমা বৌভাতের দিন কি বলেছিলেন তোমাকে আর বড় ঠাকুরঝিকে দেখে?"

সুমনা বলল, "কি আবার বললেন? শুনি নি ত?"

উষা বলল, "সেই যে ছড়া কাটুলেন, 'নিজের বাড়ীর পদ্মমুখী পরের বাড়ী যায়, আর পরের ঘরের খ্যাঁদানাকী বাটার পান খায়।' মা শুনে কত রাগ করলেন।"

হিতেন এ হেন মন্তব্য শুনে কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল, "আমাদের দেশের মেয়েরাই সবচেয়ে বড় সমালোচক মেয়েদের। চেহারার ভালমন্দ ত শুধু গায়ের রং নয়? তাহলে কৃষ্ণা যাজ্ঞসেনী কখনও সুন্দরী বলে গণ্য হতেন না।"

সুমনা বলল, "চল ত বাপু এখন ঘরে, কে কত সুন্দর তার ওজন পরে ঠিক করা যাবে। ছোড়দা ত তোমার পক্ষে রায় দিচ্ছে, তোমার আর ভাবনা কি?"

বিজয় বলল, "আমিও হিতেনবাবুকে সমর্থন করছি।" উষা এবং হিতেন হাসতে হাসতে নিজেদের ঘরে চ'লে গেল, সুমনা যেতে যেতে শুনল—বিজয় বলছে, "তবে ছোট বৌদির ঠাকুরমার কথাটা আংশিকতঃ সত্য বটে।"

সুমনাও বলে গেল, "আপনি 'ডিপ্লোম্যাট' হিসাবে খুব উৎরতেন, দু'পক্ষেরই মন রাখলেন।"

সাজগোজ করতে খানিকটা সময় লাগলই। সুমনা খুব বেশী সাজল না, রঙীন ঢাকাই শাড়ী আর বেনারসী জামা পরে বেরিয়ে এল, উষার আর সাজ শেষই হয় না। শেষে হিতেনের তাড়া খেয়ে বেরলো। অঙ্গরাগের ব্যবহার প্রচুর পরিমাণেই করেছে, দেখাচ্ছে মন্দ নয়। রাসবিহারী এক পা এক পা করে নামলেন কোনমতে, অন্যরা তাঁর পিছন পিছন।

চৌপাঠি স্যাণ্ডস্ তখন সরগরম হয়ে উঠেছে। হাঁটতে গেলে ধাক্কা খেতে হয়। সুমনা বলল, "বাপ রে, কি ভিড়। ঠিক কলকাতার গড়ের মাঠের মত। আমার একটু নিরিবিলি ভাল লাগে।"

বিজয় বলল, "পৃথিবীতে লোক যে কত বেড়ে যাচ্ছে, নিরিবিলি আর কোথাও পাওয়া যাবে না কিছুদিন পরে।"

রাসবিহারী একটু হেঁটে বললেন, "বালিতে হাঁটতে একটু বেশী জোর দিতে হয়, সেটা আমার পক্ষে করা ঠিক নয়। আমি এইখানে একটু বসি, তোমরা আরো খানিকটা ঘুরে এস।"

ছেলেমেয়েরা এগিয়ে চলল। হিতেন বলল, "বেশ খানিকটা দূরে ভিড়টা একটু পাতলা লাগছে, ঐ অবধি যাওয়া যাক।" বলে সে উষাকে নিয়ে হন্‌হনিয়ে চলতে লাগল।

বিজয় বলল, "মশায়, বিঠলভাইয়ের দিকে একটু চোখ রাখবেন, না হলে হারিয়ে যাবেন। সঙ্গে মূল্যবান্ সম্পত্তি রয়েছে।"

উষা বলল, "আপনারা আসবেন না?"

সুমনা বলল, "আসছিই ত? কিন্তু ছোড়দা যে রকম দৌড়তে আরম্ভ করেছে ওর সঙ্গে আমি পাল্লা দিতে পারব না। খুব বেশী দূরে তোমরা চলে যেও না কিন্তু।"

হিতেনরা ততক্ষণে বেশ খানিক এগিয়ে গেছে। বিজয় বলল, "তোমার কি ভয় করছে নাকি?"

সুমনা বলল, "ভয় আবার কি করতে করবে? বাবা একলা বসে আছেন, তাই বললাম।"

বিজয় বলল, "আচ্ছা সুমনা"—

সুমনা তার মুখের দিকে চেয়ে বলল, "কি?"

—"তোমাকে নাম ধরে ডাকছি বলে কিছু মনে করছ না ত? তোমার বাবা বললেন বলেই সাহস করলাম।"

সুমনা, "মনে আবার করব কি? নাম ধরাই ত স্বাভাবিক। আপনি আমার চেয়ে কত বড়।"

বিজয় বলল, "শুধু বড় হলেই কি হয়? চারদিকে বড় লোকের ত অভাব নেই। অন্য কিছু অধিকারও ত থাকা চাই?"

সুমনা ইতস্ততঃ করে বলল, "সে অধিকার কি নেই? আপনি বন্ধুত্বের অধিকারের কথা বলছেন ত?"

বিজয় বলল, "হ্যাঁ, বন্ধুত্ব বা স্নেহ যাই বল।"

সুমনা চেষ্টা করে গলার স্বরটা স্বাভাবিক করে বলল,

"তাও ত রয়েছে গোড়ার থেকেই। আপনাকে ত বন্ধু বলেই মনে করি, আপনিও ছাত্রী বলে আমাকে স্নেহের চোখেই দেখেন ধরে নিয়েছিলাম।"

বিজয় একটু রহস্যপূর্ণ হাসি হেসে বলল, "ভালই করেছিলে। যাকৃগে, এবার তোমার পরীক্ষা কেমন হ'ল বল দেখি? এতকাল ত পড়ার খবর ছাড়া আর কোনো খবর তোমার নেবার আমার ক্ষমতাই হয় নি, এবারে তাই ওটার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।"

সুমনা বললে, "খুব ভাল আর হল কই? হয়েছে মাঝারি গোছের। ফেল করব না।"

বিজয় বলল, "এইমাত্র? 'ষ্ট্যাণ্ড' করবে না?"

সুমনা বলল, "না: পড়াশুনো এবার তত ভাল হয় নি।"

বিজয় জিজ্ঞাসা করল, "কেন? শরীর ভাল ছিল না?"

সুমনা বলল, "শরীর যে খুব খারাপ ছিল তা নয়। মনটাই যেন কেমন একাগ্রতা হারিয়ে ফেলেছে। খালি ছটফট্ করে। কোনো বিষয়েই বেশীক্ষণ সবটাকে দিয়ে রাখতে পারি না।"

বিজয় বলল, "কেন এমন হয় কিছু বোঝো না? আমি যখন পড়াতাম তখন ত এ রোগ ছিল না। খুব মনোযোগী ছাত্রী ছিলে।"

সুমনা বলল, "যত বয়স বাড়ছে ততই এটা বাড়ছে। নিজের জীবন নিয়ে কি যে করব আমি যেন ভেবে পাচ্ছি না।"

বিজয় বলল, "যা করতে ইচ্ছা করবে তাই করবে, অন্ততঃ তাই করতে চেষ্টা করবে।"

সুমনা বলল, "বাধা যে অনেক। আপনি আমার জীবনের গোড়ার দিক্‌কার কথা জানেন কি?"

বিজয় একটু বিষণ্ণ ভাবে বলল, "হরিবাবুদের কাছে শুনেছি। বড় ট্র্যাজিক ব্যাপার। সব রকম খোঁজ করা হয়েছিল তাঁর?"

সুমনা বলল, "হ্যাঁ, দুবাড়ীর থেকেই যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছিল। কোনো ফল হয় নি।"

বিজয় বলল, "নিশ্চিত দুঃখও ভাল এ রকম সংশয়ের চেয়ে। তাতে মানুষ নিজের মনকে তৈরি করে নিতে পারে। জীবন নিয়ে কি করবে তা ভেবে মরতে হয় না। ভদ্রলোকের নিজের বাড়ীর লোকেরাও কি হাল ছেড়ে দিয়েছেন?"

সুমনা বলল, "কি জানি? আমাদের সঙ্গে তাঁরা কোনো সম্পর্কই রাখেন নি, আমরাও রাখি নি। আমার সচেতন মনটা তাদের ভুলে যেতেই চায়, কিন্তু অবচেতনের মধ্যে সেটা থেকে গিয়েছে, তাই মনটা আমার কখনও সুস্থ থাকে না।"

স্নিগ্ধ বলল, "তাহলে থাক, এ নিয়ে আর কথা বাড়াবো না। হিতেনবাবুরা গেলেন কোথায়? রাত হয়ে এল, রাসবিহারীবাবু ভাববেন।"

সুমনা বলল, "চলুন আমরা ত ফিরি, তার পর ওরা আসবে এখন। একবার ছাড়া পেয়েছে, সহজে কি ফেরে? বাড়ীতে ত কথাই বলতে পায় না? বেড়াতে গেলে কি সিনেমায় গেলেও এক পল্টন লোক সঙ্গে চলতে থাকে।"

বিজয় বলল, "ভাল এক বাড়ী তোমাদের! সব মান্ধাতার আমলের আইন।"

সুমনা বলল, "সবটাই মান্ধাতার আমলের হলে হ'ত এক রকম। কিন্তু একটা জানলা যে খোলা, গরাদের ভিতর দিয়ে বাইরের দিকে দেখি, আর পালাবার জন্যে মনটা আরো অস্থির হয়।"

রাসবিহারী যেখানে বসেছিলেন, সেখানেই বসে আছেন। সুমনাদের দেখে বললেন, "হিতেনরা কোথায়? রাত হয়ে যাচ্ছে।"

বিজয় বলল, "ঐ যে আসছেন, দূর থেকে ছোট বৌদির শাড়ীর রংটা দেখা যাচ্ছে।"

মিনিট কয়েকের মধ্যেই তারা বাড়ী ফিরে এল। অতঃপর খাওয়া-দাওয়া, গল্প করা। অনেক রাতে তারা শুতে গেল।

শুয়ে পড়েও সুমনার অনেকক্ষণ ঘুম এল না। সবই নূতন। অভূতপূর্ব্ব একটা মুক্তির স্বাদ পেয়েছে তার দেহ আর মন। একটা নাগপাশ বন্ধন যেন তার হৃদয়ের থেকে খসে পড়ছে। শুধু যে সে বাইরের দিক থেকে বিজয়ের অনেকখানি কাছে এসে পড়েছে তা নয়, তার মনও যেন অনেকটা এগিয়ে গেছে বিজয়ের মনের দিকে। শুধু সুমনাই কি তাকে বেশী করে চিনতে চেয়েছিল? তা ত বিজয়ের কথাবার্ত্তায় মনে হয় না। তারও যেন অনেকখানি আগ্রহ। সুমনাই যেন রাশ টেনে রাখছে। জন্মগত অভ্যাস সহজে ত যায় না? মেয়েদের "বুক ফাটে ত মুখ ফোটে না।" কথাটা গৌরাঙ্গিনীর, কিন্তু কথাটা ঠিক।

১৪

সকালবেলা বিজয় বলল, "আজ ত একবার আপিসে যেতে হবে, তবে তাড়াতাড়ি ফিরে আসব। ভাবছি দিন-কয়েক ছুটি নিয়ে নেব, ছুটিগুলো ত খালি নষ্ট হয়। অনেক কষ্টে যদি বা আপনারা এলেন তা গাইডের

অভাবে সব ভাল করে দেখা হবে না, আমি সঙ্গে না থাকলে।"

ঊষা হাততালি দিয়ে বলল, "সে খুব ভাল হবে, না ঠাকুরঝি?" সুমনা ঘাড় নেড়ে সায় দিল। ছোট বৌদি একটু বাড়াচ্ছে, মনে মনে ভাবল, খাঁচার পাখী হঠাৎ ছাড়া পেলে একটু বেশী ডানা ঝাপটায় বোধ হয়। কলকাতার বাড়ীতে এ রকম হাততালি দেওয়ার কথা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারত না।

কোন এক ফাঁকে বিজয় সুমনাকে জিজ্ঞাসা করল, "আমার ছুটি নেওয়ার কথাটা কি তোমার ভাল লাগলো না সুমনা?"

সুমনা বিস্মিত হয়ে বলল, "ভাল লাগবে না কেন? খুব ত সুবিধাই হবে। কেন আপনার এ কথা মনে হ'ল?"

বিজয় বলল, "কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেলে।"

সুমনা বলল, "সে অন্য কথা ভেবে। ছোট বৌদি ঠিক ওজন রেখে কথাবার্ত্তা বলে না, পাছে বাবা কিছু মনে করেন তাই ভাবছিলাম।"

বিজয় বলল, "অনেক বাড়ীতেই এ শিক্ষাটা হয় না। ঘরে ও বাইরে যে ভিন্ন রকম কথাবার্ত্তা বলতে হয় তা আমাদের দেশের অনেক মেয়েই জানে না। পথে-ঘাটে, বাজারে-দোকানে হামেশাই এর পরিচয় পাওয়া যায়।"

সুমনা বলল, "আসতে কি আপনার অনেক দেরি হবে?"

বিজয় বলল, "না, চায়ের সময় এসে যাব। সব বলে যাচ্ছি চাকরটাকে, কোন অসুবিধা হবে না।"

সুমনা বলল, "আমরা এতগুলো মানুষ রয়েছি, অসুবিধা ঘটতে দেব কেন?"

বিজয় বলল, "একলা থেকে থেকে এই ধারণাটা হয়েছে আর কি? নিজেকে অত্যাবশ্যক মনে করি।"

বিজয় চলে যাবার পর, সবাই নিয়ম মত স্নানাগার ও বিশ্রাম সবই করল, তবে সুমনার খালি মনে হতে লাগল সব যেন ঝিমিয়ে গেছে। বিজয় ফিরে আসার পর আবার গল্প জমে উঠল। সেদিনও খুব দূরের কোথাও যাওয়া হ'ল না। মালাবার হিল্‌স্ ঘুরে আসা হ'ল, কমলা নেহরু পার্কটাও দেখা হ'ল। জুতোর প্যাটার্ণের ঘর আর মিনার দেখে ঊষা ত ভীষণ খুসী।

রাসবিহারী উৎসাহে বোধ হয় একটু বেশী ঘোরাঘুরি করছিলেন, পরের দিন আর বেরুলেন না। তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যরাও বিশেষ কোথাও যেতে রাজী হ'ল না। বোম্বাইয়ের দোকান-বাজার দেখতে চলল, এটাও ত দেখবার জিনিস!

দোকান দেখে ঊষা মহা খুসী! কলকাতায় ত সে দোকানে বাজারে খুবই কম গিয়েছে। হিতেনের পকেট মেরে অনেক কিছুই সে কিনে ফেলল। বাড়ীর লোকেদের জন্যেও কিছু কেনা হ'ল। বড় একটি দোকান, হাজার রকম জিনিসের ষ্টল, ঊষা একটার থেকে একটাতে ছিট্‌কে বেড়াতে লাগল।

বিজয় বলল, "সুমনা, তুমি কিছু কিনবে না?"

সুমনা বলল, "কি যে কিনব ভেবেই পাচ্ছি না। ছোটবেলা যখন বাবার সঙ্গে নিউ মার্কেটে যেতাম তখন মনে হ'ত সব বাজারটা কিনতে পারলে বেশ হয়। বড় হয়ে আর কিছু নিতে ইচ্ছা করে না। মনে হয়, কি হবে নিয়ে।"

বিজয় বলল, "যা অন্য লোকের হয়। খাবার জিনিস হলে খাবে, পরবার জিনিস হলে পরবে, সাজবার জিনিস হলে তা দিয়ে সাজবে।"

সুমনা বলল, "ও সব কিছুই ইচ্ছে করে না যে?"

বিজয় বলল, "তোমার স্বাভাবিক কোনো ইচ্ছাই কি হতে নেই? না মনু-সংহিতাতে বারণ আছে?"

সুমনা বলল, "তাই বোধ হয়। বহুকাল থেকে শুনছি যে, ভাল লাগবার কোনো জিনিসই আমার ভাল লাগতে নেই।"

বিজয় বলল, "কিন্তু মানব-সংহিতাতে বলে যে, তোমার সব কিছু ভাল লাগবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।"

সুমনা বলল, "এ সংহিতাটা কি আপনি লিখেছেন?" তার মুখে একটু হাসি দেখা দিল।

বিজয় বলল, "আমার আগেও অনেকে লিখেছে, আমার অবস্থায় পড়ে।"

সুমনা বলল, "চলুন ঐদিকটায় যাই, ছোট বৌদিরা এগিয়ে গেল।"

বিজয় বলল, "তা যাক, হারাবে না। আমার কয়েকটা জিনিস কিনবার আছে কিনে নিই।"

সুমনা অবাক হয়ে দেখল যে, বিজয় বেশ কিছু টাকা খরচ করে কিনছে একজোড়া হাতীর দাঁতের চুড়ি, খুব কারুকার্য্য খচিত, আর একটি এনামেলের কাজ করা নেক্‌লেশ, তাতে অসংখ্য রং-এর আভা জল্‌ জল্‌ করছে। জিজ্ঞাসা করল, "কি হবে এগুলি?"

বিজয় বলল, "নেক্‌লেশটা ছোট বৌদিকে দিতে হবে, তাঁর বিয়েতে নিমন্ত্রণ পেয়েছিলাম, কিন্তু কোনো উপহার

পাঠান হয় নি। আর এইটি তোমায় দিতে চাই, নেবে না?"

সুমনা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আপনি দিলে নিশ্চয়ই নেব," বলে সেটা হাত বাড়িয়ে বিজয়ের হাত থেকে তুলে নিল। বলল, "মানব-সংহিতায় আমারও যে বিশ্বাস আছে তা এর থেকেই বুঝবেন।"

বিজয় বলল, "আশা করি ভবিষ্যতে আরও কিছু প্রমাণ দিতে পারবে।"

উষারা ফিরে এল। উপহার পেয়ে সে ত মহা খুসী।

হিতেন বলল, "এ সব আবার কেন? একে ত গুষ্টিশুদ্ধ এসে পড়ে আপনার ঘাড়ে গণ্ডে-পিণ্ডে গিল্‌ছি, তার উপর আবার উপহার কেন?"

বিজয় বলল, "আমার ঘাড়ের পরম সৌভাগ্য। কিন্তু ছোট বৌদিকে বিয়ের উপহারটা নিতেই হবে।"

উষা বলল, "আচ্ছা, আপনার বিয়ে হোক, তখন আমরা শোধ নেব।"

বিজয় বলল, "তা ত নিশ্চয়ই।"

সুমনা একবার তাকিয়ে দেখল বিজয়ের মুখের দিকে কিন্তু সেখানে হাস্য-কৌতুকের ভাব ছাড়া আর কিছু দেখতে পেল না।

বাড়ী ফিরে এসে উষার উপহারটা খুব ঘটা ক'রে সকলকে দেখান হ'ল, কিন্তু সুমনার উপহারটা তার হাত-ব্যাগের মধ্যেই থেকে গেল। শোবার সময় সেটা বার ক'রে একবার সে নিজের হাতে পরল,তার পর একেবারে বাক্সের তলায় ঠেশে রেখে দিল। একবার মনে হ'ল গৌরাঙ্গিনী এটা দেখলে বা শুন্‌লে কি করতেন, কিন্তু চিন্তাটাকে দূর ক'রে দিল মন থেকে। মায়ের শাসনের লৌহমুষ্টি থেকে নিজের হৃদয়টাকে অন্ততঃ সে মুক্ত ক'রে নেবে ঠিকই করেছে।

বিজয় ছুটি অবশ্য পেল, কিন্তু খুব বেশী দিনের নয়। আপিসে বেশী কাজ পড়ে গিয়েছিল, তাই দিন পাঁচের বেশী ছুটি সে পেল না। এই ক'দিনেই বোম্বাইয়ের সব ক'টা দ্রষ্টব্য সুমনাদের দেখিয়ে দেবার জন্যে সে উঠে-প'ড়ে লেগে গেল। আজ এলিফ্যান্টা, কাল সামুদ্রিক জীবের আস্তানা, পরশু মিউসিয়ম্ বা আর্ট গ্যালারি ক'রে সুমনারা ঘুরতে লাগল। রাসবিহারী তাদের সঙ্গে তাল রেখে ঘুরতে পারতেন না, মাঝে মাঝে বাড়ীতে ব'সে থাকতেন। সুমনাও মাঝে মাঝে তাঁকে একলা রেখে যেতে আপত্তি করত, কিন্তু অন্যদের টানাটানিতে তাকে যেতেই হ'ত। রাসবিহারীও তাকে আটকে রাখতে চাইতেন না, বলতেন, "বাড়ী গিয়ে ত সেই লোহার খাঁচায় বন্দী হবে, যতটা পার এখন বেড়িয়ে নাও।"

রতন তাতার আর্ট কলেক্‌শন্‌টা ভারি ভাল লাগল সুমনার। উষার সবরকম জিনিসের ভালমন্দ বোঝবার মত শিক্ষা ছিল না, কিন্তু সেও অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে উঠল, বলল, "কত টাকা থাকলে এত সব জিনিস কেনা যায়?"

হিতেন বলল, "তোমার টাকা থাকলে কিন্‌তে?"

উষা বলল, "এত পাথর লোহা লক্কড় হয়ত কিনতাম না, কিন্তু ছবিগুলো কিন্‌তাম।"

সুমনা আপন মনে এধার-ওধার ঘুরতে ঘুরতে বলল, "একসঙ্গে এতগুলি সুন্দর জিনিস আমি আগে কখনও দেখি নি।"

বিজয় তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছিল, সে হঠাৎ নীচু গলায় বলল, "তুমি যতগুলো সুন্দর জিনিস দেখেছ, আমি তার চেয়ে একটা বেশী দেখছি।"

সুমনা বিস্মিত হয়ে তার দিকে তাকাল। তার পর মুখ লাল করে বলল, "কি যে আপনি বলেন।"

বিজয় বলল, "কি আর বলি? মনে যে কথাগুলো আসে, তার কিছু কিছু মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। পুরুষ-মানুষ ত, খানিকটা সাহস তাই আছে!"

সুমনা বলল, "কিন্তু আমরা যে ভীতু মানুষ, আমাদের শুনলে ভয় করে।"

বিজয় বলল, "তা হলে বলব না। আর যাই হোক্ তোমাকে ভয় পাওয়াতে আমি চাই না।"

সন্ধ্যার পর তারা ফিরে এল। অত ওঠানামা করবেন না ব'লে রাসবিহারী ঘরেই বসেছিলেন। সুমনাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন লাগল মনু মা?"

সুমনা বলল, "বেশ ভাল বাবা, এক একটা ভাগ আশ্চর্য্য ভাল। দু'তলা, তিনতলা ক্রমাগত ওঠানামা করতে হয়, না হলে আর একদিন তোমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতাম। তোমার খুব একলা লাগছিল না বাবা?"

রাসবিহারী বললেন, "লেগেছে একটু। তা সামনের সমুদ্রের দিকে চেয়ে ব'সে থাকলে খুব খারাপ লাগে না। তবে কাছে কোন বাড়ী থেকে রেডিওতে বাজে গান বাজিয়ে বড় জ্বালিয়ে তুলেছিল।"

বিজয় বলল, "ঐ আর একটা খুঁৎ এখানকার। বাংলা গানের মত গান ত আর কোথাও নেই, কিন্তু সেটা এখানে বড়ই দুর্লভ।"

রাসবিহারী বললেন, "ও, তুমি বুঝি খুব গান ভাল-বাস? নিজেও গাও নাকি?"

বিজয় বলল, "না, ও গুণটা নেই। তবে গান খুবই ভালবাসি। ছোট বৌদি গান করেন না?"

উষা হাত নেড়ে বলল, "একেবারেই পারি না, শিখিই নি কোনোদিন। তা গানের অভাব কি? মেজ ঠাকুরঝির মত গাইয়ে ত কলকাতাতেও দুর্লভ, কি মিষ্টি গলা!"

সুমনা বলল, "এই নাও, বললেন তোমাকে, আর চাপাচ্ছ আমার ঘাড়ে।"

রাসবিহারী বললেন, "একটু শোনাও না মনু মা, কানটা একটু শুদ্ধ হোক্।"

বিজয় জিজ্ঞাসা করল, "বাজনার অভাবে অসুবিধা হবে কি? বাজনা ত এ বাড়ীতে নেই?"

রাসবিহারী বললেন, "না, কিছু অসুবিধা হবে না। বাজনা ছাড়াই ওর গান বেশী মিষ্টি লাগে।"

সুমনা বলল, "কি গাইব বাবা?"

রাসবিহারী বললেন, "রবীন্দ্রনাথের সেই, 'দাঁড়াও আমার আঁখির আগে', গানটি গাও। তোমার গলায় ওটি ভারি সুন্দর শোনায়।"

সুমনা বাবার চেয়ারের একটু পিছনে সরে বসল, নিজেকে একটুখানি আড়াল করতে চায় সে। তার পর গান আরম্ভ করল, "দাঁড়াও আমার আঁখির আগে, যেন তোমার দৃষ্টি হৃদয়ে লাগে—"

দু'বার করে গানটি গেয়ে যখন থামল সে, তখন ঘরের মানুষগুলির নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। বারান্দার দিকের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বিজয় তার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে।

রাসবিহারী বললেন, "সত্যি, বাংলা গানের তুল্য গান আর কোথাও নেই, এ আমি জোর ক'রে বলতে পারি।"

আবার সবাই কথা বলতে আরম্ভ করল। বিজয় বলল, "চমৎকার গলা ত তোমার সুমনা। এ গুণের ত আগে কোনো পরিচয় পাই নি?"

রাসবিহারী বললেন, "পাবে আর কি ক'রে? তবু রাগারাগি ক'রেও গানের মাষ্টার আমি ওর জন্যে বরাবর রেখেছি। যদি ভাল ক'রে অভ্যাস করার সুযোগ পেত, তাহলে সেরা গাইয়েদের মধ্যে ওর জায়গা হ'ত।"

বিজয় বলল, "কত প্রতিভাই যে আমাদের দেশে এরকম ক'রে চাপা প'ড়ে তার ঠিক নেই। Gray's Elegy-র 'Full many a flower is born to blush unseen'-এর ব্যাপার।"

উষার এ ধরনের গল্প খুব ভাল লাগে না, কাপড় বদ্‌লাবার ছুতো ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

খাওয়ার এখনও একটু দেরি আছে। সুমনা বারান্দায় গিয়ে সমুদ্র দেখতে বসল। ছোড়দাও গিয়ে ঘরে ঢুকেছে বোধ হয়, বাবা ত বসবার ঘরের আরাম-কেদারায় ব'সে খানিকটা ঝিমিয়ে নিচ্ছেন। বিজয়কে দেখা গেল না।

হঠাৎ একখানা বই হাতে ক'রে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সুমনার পাশে একটা চেয়ার নিয়ে ব'সে বলল, "রবীন্দ্রনাথের সব বই আমার কাছে নেই, ভাগ্যে গীতবিতানটা ছিল। এত বড় একজন সুগায়িকা আসছেন জানলে আমি আরো তৈরি থাকতাম। আচ্ছা, এই যে গানটি এখন করলে, 'দাঁড়াও আমার আঁখির আগে', এটা ব্রহ্মসঙ্গীত নাকি?"

সুমনা মৃদুকণ্ঠে বলল, "বইয়ে ত তাই বলে।"

বিজয় বলল, "অন্যভাবেও এটাকে খুব সহজেই নেওয়া যায়। 'দাঁড়াও যেখানে বিরহী এ হিয়া, তোমারই লাগিয়া একেলা জাগে', এ যেন মানুষ নিজের প্রেমাস্পদকেই বলছে। তাই মনে হয় না?"

সুমনা একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলল, "তা ভাবা যায় অবশ্য। তবে ওঁর অনেক গানই ত ঐ রকম? প্রিয় এই দেবতা ওঁর কাছে যেন একই ছিলেন। নিজেই লিখে গেছেন, 'আর পাব কোথা? দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা'।"

বিজয় বলল, "সত্যিকারের প্রেমের স্বভাবই বোধ হয় এই। দেবতা খানিকটা থাকেনই আমাদের প্রিয়ের মধ্যে।"

সুমনার গলাটা কেমন যেন অশ্রুসিক্ত শোনাল, সে বলল, "ঠিক তাই।"

এমন সময় খাবার ঘরে খাবার এসে গেল। ঝি-চাকর মিলে চেয়ার টানাটানি, বাসন ঠিক করা সুরু করল। সুমনা উঠে পড়ল, বলল, "হাতটা ধুয়ে আসি।"

বিজয় বলল, "যাও।" তাকিয়ে দেখল একটু দূরে স'রে গিয়েই সুমনা নিজের চোখটা আঁচল দিয়ে মুছে ফেলল। নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে ভাবল, নিজের বিপদ্ নিজেই টেনে আন্‌লাম। দূরে ছিলাম ভালই ছিলাম। এখন কি করা যায়? ভেবে পাওয়া শক্ত। ভেবে পেলেও সেই ভাবে চলা অত্যন্তই শক্ত।"

হিতেনের ছুটি খুব বেশী দিনের ছিল না। তিন সপ্তাহের ছুটি সে পেয়েছিল। তার বেশীর ভাগটাই পার হয়ে গেছে, অল্প কয়েকটা দিন বাকি। উষা আর হিতেন একটু দুঃখিত, যদি আর কিছুটা দিন এই মুক্তির আনন্দ

উপভোগ করা যেত। রাসবিহারী বাবুর শরীর কিছু খারাপ হয় নি, বরং কিছুটা ভালই আছেন, তবে এর পর ফিরলে মন্দ হয় না, এই তাঁর মনোভাব। একটানা বহু দিন ঘর-সংসার ও গৃহিণীকে ছেড়ে থাকা তাঁর অভ্যাস নেই।

সুমনার চেহারাটা একটু যেন বদ্‌লে গেছে। চোখের দৃষ্টিতে কি যেন একটা নূতন ভাব এসেছে। মোটাসোটা কিছুই হতে পারেনি।

বিজয়ের একটা পরিবর্ত্তন এসেছে মনে হয়। সেটা চোখে পড়ে, কিন্তু সেটা যে কি তা কেউ বলতে পারে না। সে আবার আপিস যাচ্ছে এখন। তবে যতটা তাড়াতাড়ি পারে ফিরে আসে।

দুপুরে রাসবিহারী ঘুমোন, বেশ ঘণ্টা দুই-তিন। হিতেন আর উষাও নিজেদের ঘরে চলে যায়। সুমনা কখনও বা ঘরে বসে পড়ে, কখনও বারান্দায় বসে সমুদ্র দেখে। কার্ত্তী সুমনার ঘরে সগর্জ্জনে নাক ডাকিয়ে ঘুমতে থাকে।

সেদিনও একখানা বই হাতে করে বারান্দায়ই সে বসে ছিল। হঠাৎ সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখল যে, বিজয় এরই মধ্যে ফিরে এসেছে। সুমনা বলল, "আজ এত আগে আগে যে?"

বিজয় বলল' "আপিসের এক পুরনো কর্ম্মচারী মারা যাওয়ায় ছুটি হয়ে গেল। তুমি ত দুপুরে ঘুমোও না জানিই, কাজেই তোমার অসুবিধা ঘটাবার ভয় ছিল না।"

সুমনা বলল, "ভাল কাণ্ড, নিজের ঘরে নিজে আসবেন, তার আবার অন্যের সুবিধা-অসুবিধা ভাবতে হবে নাকি?"

বিজয় বলল, তা অবস্থা বিশেষে ভাবতেও হয়। এখন বেশী জ্বালাতন করলে আর যদি না আস, সে ভয় আছে ত?"

সুমনা বলল, "জ্বালাতন না করলেও কি আর বার বার আসতে পারব? এবার কতগুলি যোগাযোগ ঘটল বলেই আসতে পেলাম, আবার সেগুলি না ঘটতেও পারে।"

আচ্ছা নাই এলে, আমার কলকাতায় যাওয়া ত আটকাতে পারবে না?"

সুমনা বলল, বেশ যাহোক, আমি কি আটকাতে চাইছি নাকি? আপনি গেলে আমার লাভ বই লোক-সান আছে কিছু?"

বিজয় বলল, "তোমার লাভ আছে কি না জানি না, তবে যেতে পারলে আমার খুব বড় লাভ।"

সুমনা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে একবার তাকাল, একটু যেন ভয়ের ছায়াও রয়েছে সে দৃষ্টিতে।

বিজয়ের তাই মনে হ'ল, সে বলল, "ভয় নেই, ভয় নেই, চুরি-ডাকাতি কিছু করব না, ইচ্ছা থাকলেও। খালি প্রাণ ভ'রে তোমার গান শুনে আসব। সব ক'টা গানের বই জোগাড় করে নিয়ে যাব। শোনাবে ত?"

সুমনা বলল, "শোনাব, যদি শোনাবার জায়গা ও সময় পাই। শোনানই উচিত। আপনাকে গুরু-দক্ষিণা হিসাবে আমার কিছু ত দেওয়া হয় নি?"

বিজয়ের চোখ দুটো যেন একবার জ্বলে উঠল। বলল, গুরু-দক্ষিণা হিসাবে? আমাকে গুরু ছাড়া আর কিছুই তুমি ভাবতে পার না বুঝি সুমনা? থাক্ তবে, দক্ষিণা পেয়ে কাজ নেই।"

সুমনা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। এক হাতে শক্ত করে বারান্দার রেলিং চেপে ধরে, বিজয়ের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রইল। শরীরটা যেন একবার কেঁপে উঠল।

বিজয় উঠে পড়ে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। সুমনার দু'চোখ বেয়ে জল ঝরছে। ডাকল, "সুমনা।"

সুমনা তার দিকে না তাকিয়েই বলল, "বলুন।"

বিজয় বলল, "তুমি আমাকে ক্ষমা কর সুমনা। আমার এ রকম করে কথা বলা উচিত হয় নি। আমি বড় উভয়-সঙ্কটে পড়েছি। আমার কাণ্ডজ্ঞান শুদ্ধ লোপ পেতে বসেছে। বল, তুমি কোনো অপরাধ নাও নি?"

সুমনা এইবার চোখ মুছে তার দিকে তাকাল। বলল, "না, রাগ কিছু করি নি, কিন্তু মনে বড় কষ্ট পেয়েছি।"

বিজয় তার হাতের উপর হাত রাখল, বলল, "আর কষ্ট কোনো দিন দেব না। বিশ্বাস কর আমাকে। আমার মনে যাই থাক, তুমি আমাকে যতটুকু কাছে আসতে দেবে, তার বেশী আমি এগোতে যাব না জোর করে। তার পর ভগবানের ইচ্ছা।" সে নিজের হাতটা সরিয়ে নিল।

সুমনা চুপ করেই রইল। কথা বলবার অবস্থা তার ছিল না। বিজয় আস্তে আস্তে তার নিজের ঘরে চলে গেল।

খেতে বসে রাসবিহারী সুমনার দিকে তাকিয়ে বললেন, "কিছুই যে খাচ্ছ না মা? শরীর ভাল নেই নাকি? মুখটাও যেন কেমন শুকনো দেখাচ্ছে?"

সুমনা বলল, "না বাবা, ভালই আছি। সব দিন সমান ক্ষিদে থাকে না ত?"

বিজয় একবার উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে সুমনার দিকে তাকাল, তবে মুখে কিছু বলল না। রাসবিহারী মনে মনে ভাবলেন, "মনুকে এতটা মিশতে দেওয়া বিজয়ের সঙ্গে উচিত হচ্ছে নাকি কে জানে? কিন্তু অনেক ভেবেই এটা করছি। ভবিষ্যতে এর থেকে মনুর অশেষ কল্যাণ হতে পারে। ছেলেটা সত্যিই বড় ভাল।"

শুতে যাবার আগে বিজয় একবার সুমনাকে একলা পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, "বিকেলের কথাটা কি এখনও মনে রেখেছ?"

সুমনা, "মনে না রেখে করব কি? মনে ত থাকবেই, তবে তার জন্যে আর কোনো কষ্ট নেই।"

বিজয় বলল, "সেই হলেই হ'ল। যা কিছু বলেছি সব ভুলে যাও, এটা অবশ্য আমিও চাই না।"

পর দিন সকালে চা খেতে বসে রাসবিহারী বললেন, "এবার ত আমাদের পোঁটলা-পুটলি বাঁধবার সময় এল। খুব আনন্দে আর খুব আরামে এ ক'টা দিন কাটিয়ে গেলাম।"

বিজয় বলল, "আনন্দ দিয়েছেন তারও বেশী।"

রাসবিহারী বললেন, "সে যদি নিজের গুণে বল। এবার কিন্তু যখন কলকাতা যাবে, তখন আমাদের বাড়ী উঠতে হবে।"

বিজয় ভাবল, 'তা হলেই হয়েছে আর কি? গৃহিণী তা হলে পাগলই হয়ে যাবেন।' মুখে বলল, "পূজার সময় কলকাতাতেই যাব ভাবছি, পালা করে সকলের বাড়ীই থাকতে পারি।"

হিতেন বলল, "আমাদের আপিস থেকে গাড়ী কিনবার টাকা ধার দিচ্ছে। ভাবছি নিয়ে নেব ভাল একটা গাড়ী কিনতে পারলে অনেক জায়গায় যাওয়া যায়। শুধু বাড়ী বসে সময় কাটাতে হয় না।"

উষা বলল, "উঃ, তা হলে কি মজাই হয়!"

এবার ফিরবার আয়োজন হতে লাগল। দু'জন মানুষের মন একেবারে ভেঙে যাবার উপক্রম হ'ল। বিজয় বলিষ্ঠ পুরুষ মানুষ, কোনো মতে নিজেকে সংযত করে রাখল। সুমনা একেবারে প্রখর রৌদ্রতাপে দগ্ধ ফুলের মত শুকিয়ে উঠতে লাগল।

যাবার আগের দিন বিজয় বলল, "শরীর, মন চেষ্টা করে একটু সুস্থ কর সুমনা। শুধু কলেজের পরীক্ষা নয়, অনেক পরীক্ষাই এখনও বাকী। দুর্বল হয়ে পড়লে চলবে না।"

সুমনা বলল, "কলেজের পরীক্ষায় তবু মাষ্টারের সাহায্য পাওয়া যায়, অন্য পরীক্ষায় যে সে সুবিধাও নেই?"

বিজয় বলল, "সে সুবিধাও আছে, যদি সাহায্য নিতে ভয় না পাও।"

সুমনা কোনো উত্তর দিল না।

যাবার দিন সকাল থেকেই সে বিজয়কে এড়িয়ে চলতে লাগল। বিজয়ও কাছে আসবার বিশেষ কোনো চেষ্টা করল না। ভগবান্‌কে ডাকতে লাগল সুমনা, আমি যেন ভেঙে না পড়ি প্রভু! লোকের সামনে মুখ রক্ষা যেন করে ফিরে যেতে পারি।"

সময়টা কাজে কর্ম্মে কেটেই গেল। যাবার সময় হ'ল, জিনিসপত্র বাঁধা-ছাঁদা করে গাড়ীতে তোলা হতে লাগল। বিজয় হিতেনকে সাহায্য করতে লাগল। ওদের ট্রেনে তুলে দিতে সঙ্গেই চলল।

প্ল্যাটফর্ম্মের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বিজয় সুমনাকে বলল, "আমি পুজোর সময় যাচ্ছি কিন্তু। গান আরো বেশী করে শিখে রেখো।"

উষা বলল, "যা জানে তাই শুনে শেষ করতে আপনার এক বছর কেটে যাবে।"

গাড়ীতে উঠল সবাই। বিজয় সকলকে নমস্কার করল, রাসবিহারীকে প্রণাম করল, তার পর গাড়ী ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্ল্যাটফর্ম্ম ছেড়ে চলে গেল।

সুমনা বলল, "আমি একটু ঘুমিয়ে নিই, মাথাটা বড় ধরে রয়েছে।" সে মুখ গুঁজে সেই যে শুয়ে পড়ল, রাত হবার আগে আর মাথা তুলল না।

রাসবিহারী একটু বিষণ্ণ দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর মনে আবার একটা দ্বিধা যেন উঁকি মেরে গেল।

ক্রমশঃ

আধুনিক বাঙালী ও বিশ্বপ্রেম

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

স্বকীয়তা বর্জ্জনের ইচ্ছা শিক্ষিত বাঙালীসমাজে অধুনা যেন কিছু প্রবলভাবে দেখা দিয়াছে। সম্প্রদায় বিশেষের ধারণা যে, বাঙালীত্ব তাহাদের মনকে ক্রমশঃ অনুদার করিয়া ফেলিতেছে; এই অশুভ সঙ্কীর্ণতার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া তাহাদিগকে সর্বভারতের, তথা বিশ্বজগতের, মানবসমাজে স্থান গ্রহণ করিতে হইবে। তাহাদের আনন্দ, কল্পনা, আশা ও আকাঙ্ক্ষা শুধু বাংলাকে ঘিরিয়া রচনা করিলেই চলিবে না, এ সকল ভাবধারার ক্ষীণ-স্রোতকে বাংলার ক্ষুদ্র বক্ষ হইতে টানিয়া আনিয়া অন্ততঃ ভারত মহাসাগরে মুক্তি দিতে হইবে। এখন আর 'সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং'-এর কথা ভাবিবার প্রয়োজন নাই; বরং 'পাঞ্জাবসিন্ধু গুজরাট মারাঠা'কে মস্তকে ধরিয়া নৃত্য করিতে পারিলে উদারতার প্রগাঢ় পরিচয় দেওয়া যাইবে।

যাহাদের মনোবৃত্তি অনেকটা এইরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাদের নিকট বাংলার ইতিহাসের বিশেষ কোন মূল্য নাই, বাংলার আদর্শ বা ভাবসাধনার বিশেষ কোন আকর্ষণ নাই; তাহাদের চিন্তা বাংলার নিজস্ব আশা, আকাঙ্ক্ষাকে অতিক্রম করিয়া একটা অনির্দিষ্ট জগতে বাসা বাঁধিতে চেষ্টা করিতেছে। সে জগতের সীমারেখা এখনও নির্দিষ্ট হয় নাই, সে জগতের প্রকৃত রূপও তাহাদের নিকট এখনও স্পষ্ট হইয়া দেখা দেয় নাই; তথাপি, পক্ষীশাবক যেমন নবোদ্গত ডানার তাগিদে নিজের পরিচিত কুলায় ছাড়িয়া ইতস্ততঃ উড়িতে চাহে, বাঙালীর সম্প্রদায় বিশেষও কতকটা সেই কারণেই বাংলার সীমারেখা ছাড়াইয়া আপনাকে চারিদিকে বিস্তৃত করিতে চাহিতেছে। বাঙালী বলিয়া পরিচয় দিতে এখনও তাহার হয়ত নিজেকে সঙ্কীর্ণমনা বলিয়া মনে হয় না, কিন্তু বাঙালীকে তাহার বিশেষ আত্মীয়গণ্ডির মধ্যে কল্পনা করিতে বাধোবাধো ঠেকে। বাংলার ভাষা, সাহিত্য বা সংস্কৃতির প্রতি তাহাদের হয়ত অশ্রদ্ধা নাই, কিন্তু যতটুকু শ্রদ্ধা থাকিলে বাঙালীর এ সকল কুল-লক্ষণকে দেশের বাহিরেও প্রতিষ্ঠা করাইবার চেষ্টা লোকে করে, তাহা তাহাদের মধ্যে নাই। উপরন্তু, বিশেষ করিয়া অবাঙালীসমাজে, বাঙালীর দোষ কীর্ত্তন করিতে পারিলে তাহাদের মনের ভার লাঘব হয়; অথচ বাঙালীর গুণের কাহিনী বলিতে তাহাদের গর্ববোধ তো হয়ই না, বরং সঙ্কোচই বোধ হয়।

এই মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় সম্প্রদায় বিশেষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় আর মাসিকপত্র ও সংবাদপত্রাদির পৃষ্ঠায় একটু সন্ধানী হইলেই ইহার রূপ সকলের চোখেই পড়িবে।

কলিকাতার রাস্তায় ট্রাম বা বাসের হয়ত কোন দুর্ঘটনা ঘটিল। দুই-চারিজন হতাহত হইল। চারিদিকে লোকারণ্য। ইহার মধ্যে জিজ্ঞাসু কোন বাঙালী যদি প্রশ্ন করেন, হতাহতের মধ্যে বাঙালী আছে কিনা, আমাদের নব্য-সম্প্রদায় তবে ইহার মধ্যে শুধু অনুদার মনোভাবেরই পরিচয় পাইবেন না, ইহাতে তাঁহারা বিস্মিত, দুঃখিত, এমনকি মর্মাহত হইবেন।

পাড়ায় হয়ত আগুন লাগিয়াছে। বাসিন্দাদের মধ্যে বাঙালী, অবাঙালী দুই-ই আছেন। দমকল আসিয়াও অগ্নিকাণ্ড নিবারণ করিতে পারিল না। দুই-একটি বাড়ীর ভয়ানক ক্ষতি হইল। কোন বাঙালী যদি প্রশ্ন করিল, ইহার মধ্যে বাঙালীর বাড়ী কয়টি, তবে আমাদের নব্যদলের লোক আতঙ্কিত হইয়া দৈনিকপত্রে চিঠি লিখিবেন; ক্ষোভ করিয়া বলিবেন, বাঙালী কি এই সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তি হইতে কখনও উদ্ধারলাভ করিবে না? ভাবটা এই যে, আমি উদ্ধারলাভ করিয়াছি, তোমরা আমার নামটা প্রাতঃস্মরণীয় করিয়া লও।

কিন্তু কথাটা এই যে, এই প্রশ্নের মধ্যে অসঙ্গতি কোথায়? ইহা কোন্ কারণে অশোভন? যে কোন বিপর্যয়ের পরে বাঙালী এ প্রশ্ন নিশ্চিতই করিবে যে, যাহারা বিপর্যস্ত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে কেহ বাঙালী আছে কিনা। এ প্রশ্ন না করাই অস্বাভাবিক। এই প্রশ্নের প্রধান কারণ এই যে, বাঙালীর আত্মীয়স্বজন বাঙালী; তাই তাহাদের সম্বন্ধে খোঁজ নেওয়াটাই তাহার প্রথম কর্ত্তব্য। ঐ একই কারণে পাঞ্জাবী আসিয়াও প্রথমে পাঞ্জাবী সম্বন্ধেই প্রশ্ন করিবে; মারাঠির প্রশ্নও অন্যরূপ হইবে না। ইহার মধ্যে উদারতা, অনুদারতার প্রশ্ন নাই; এরূপ বিপর্যয় হইতে আত্মীয়কে রক্ষা করার চেষ্টা মানবের সাধারণ ধর্ম। কাজেই এ প্রশ্ন না করিয়া যদি কেহ সেখানে বিশ্বমানবতার প্রশ্ন তোলে,

তবে তাহার মধ্যে দরদ বা সারল্যের চিহ্নমাত্র নাই বলিয়া মনে করিলে অসঙ্গত হইবে না। নিজের মায়ের দুরবস্থা মোচন না করিয়া যাহারা পরের মায়ের দুঃখ-মোচনে তৎপর হইবার ভান করে তাহারা নিজের মাকে তো কোনদিন ভালবাসেই নাই, পরের মাকেও কেবল অশ্রদ্ধা করিতেই শিখিয়াছে।

এবার অন্য উদাহরণ নেওয়া যাক্। আজকাল কথায় কথায় অন্য প্রদেশের ছেলেদের তুলনায় বাঙালী ছেলে-দের হীনপ্রভ করিয়া দেখাইবার চেষ্টা চলিতেছে—বিশেষ করিয়া চাকুরির বাজারে। সমপরিমাণ কাজের জন্য সরকারী অপেক্ষা বেসরকারী কাজে অধিক অর্থ লাভ হয় বলিয়া, সকলেরই বেসরকারী কাজের দিকেই দৃষ্টি বেশী। সেই বেসরকারী কাজে অপেক্ষাকৃত উচ্চপদে অবস্থিত বাঙালীর সংখ্যা মুষ্টিমেয়। সেই মুষ্টিমেয় বাঙালীও কিন্তু বাঙালী ছেলেদের মধ্যে করিৎকর্মা ছেলের সন্ধান পান না। তাঁহাদের এ অভিমত তাঁহারা স্পষ্টভাষায় দৈনিক কাগজের পাতায় লিপিবদ্ধ করেন; তাঁহারা বলেন, আমাদের বহুদিনের অভিজ্ঞতার ফল, বাঙালী ছেলেরা শিক্ষিত হইলেও অন্য প্রদেশের ছেলেদের তুলনায় হীন, কারণ তাহাদের জলুস কম, তাহারা দীর্ঘসূত্রী আর অপরের মনোরঞ্জন করিতে অসমর্থ। কাজেই বেসরকারী উচ্চদরবারে তাহাদের ঠাঁই হইবে না।

মীরজাফর অবশ্য মসনদ্ পাইয়াই ইংরেজের গুণকীর্তন করে, কিন্তু তাহাতে বাংলার দুঃখ ঘোচে না। এই সকল ন্যায়পরায়ণ ও উদার মনোভাব প্রকাশের অন্তরালে যে আত্মপ্রচার, স্বার্থসিদ্ধি ও গ্লানি লুকাইয়া আছে তাহার প্রকৃত স্বরূপ আরও স্পষ্ট হয় যদি এই 'জলুস' ও 'মনো-রঞ্জিনী' প্রতিভার বিশ্লেষণ করা যায়। তবে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, শিক্ষিত বাঙালী এখনও যথা-তথা সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে অভ্যস্ত হইয়া উঠে নাই আর পাশ্চাত্ত্য গানের ভাঙা আসরে দোহার হইবার ইচ্ছাও তাহার কম। বিদেশী বণিকসম্প্রদায়ের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মই বেসরকারী কর্মজগতে সর্বাপেক্ষা বেশী অর্থকরী কিন্তু সেখানে কর্মোন্নতির পন্থা যে খাতে চলে তাহা নিরতিশয় কর্দমময়। সে কর্দমের স্পর্শে সামাজিক ও ব্যক্তিগত আদর্শ আর আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা পদে পদে। শিক্ষিত বাঙালী তাই সে পথে চলে অতি সন্তর্পণে।

এখন বাঙালীর সম্প্রদায় বিশেষের এই স্বকীয়তা বিসর্জনের ও স্বজাতি বিরূপতার কারণ বিশ্লেষণ করা যাউক।

প্রাক্-রবীন্দ্রযুগে বাঙালীর মেধা ও কল্পনা প্রধানতঃ বাংলাকে ঘিরিয়াই স্পষ্ট ও পুষ্ট হইয়াছে। বিশ্বের সহিত তাহার পরিচয় ছিল অল্প, কিন্তু তাই বলিয়া সে কূপমণ্ডুক ছিল না। তাহার ঐতিহ্য তাহাকে সঙ্কীর্ণতা হইতে চিরদিন রক্ষা করিয়া আসিয়াছে; তাহার তর্পণমন্ত্র চির-কালই ছিল, "আব্রহ্মস্তম্ভপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু"। কাজেই জীবনকে সে কখনও ছোট করিয়া দেখিতে পারে নাই। বিশ্বমানবের সঙ্গে তাহার আত্মার সংযোগ সে সর্বদাই অনুভব করিয়াছে। নিজের জীবনকে সে ছোট করিয়া দেখে নাই বলিয়া, নিজের ঘরকেও সে ক্ষুদ্র বলিয়া মনে করিতে পারে নাই আর তাই সে ঘরকে সুষ্ঠু করিয়া বাঁধিবার জন্য তাহার আগ্রহের অন্ত ছিল না। প্রথমে আপন ভাইকে ভাই বলিয়া গ্রহণ না করিতে পারিলে বিশ্বমানবকে যে ভাই করিয়া তোলা যায় না, এ জ্ঞানের অভাব তাহার কোনদিন হয় নাই; কাজেই দেশ ও দেশবাসীর প্রতি মমত্ববোধকে সে কখনও অশ্রদ্ধার চোখে দেখিতে পারে নাই।

রবীন্দ্রনাথও এ স্নেহ, এ আসক্তিকে নিরতিশয় শ্রদ্ধার চোখেই দেখিতেন। তাঁহারও দীক্ষা হইয়াছিল বন্দেমাতরম্ মন্ত্রেই। তাঁহার মর্যাদাবোধ ছিল অসীম, দেশের গৌরব রক্ষার চেষ্টাও ছিল তীব্র। দেশকে অতিক্রম করিয়া তিনি বিদেশকে বড় করিয়া দেখেন নাই, আর দেশের কিয়দংশ লোক তাই দেখিত বলিয়া তাঁহার ছিল অপরিসীম লজ্জা। কাজেই যখন দেশের লোক কালিদাসকে ভারতের সেক্সপীয়র বলিত, ঋষি বঙ্কিমকে বাংলার স্কার ওয়াল্টার স্কট্ বলিত, অথবা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেই বাংলার শেলী বলিত তখন তিনি লজ্জায় ম্লান হইতেন।

দেশপ্রেমের মন্ত্রে রবীন্দ্রনাথের দীক্ষা হইলেও তাঁহার অনন্যসাধারণ কবি-প্রতিভা সে প্রেমকে বিশ্বপ্রেমে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল। সে বিশ্ব ধরা পড়িত তাঁহার সূক্ষ্ম অনুভূতিতে, তাঁহার অসামান্য কল্পনার রাজত্বে। সেই অনুভূতির অমৃতলোকে তিনি বিশ্বের যে আনন্দমূর্তি রচনা করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার নিজস্ব মানস বৃত্তি, কল্পনার সে ঊর্দ্ধলোকে উঠিয়া তিনি যে ভূমানন্দের আস্বাদ পাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রাণ, মন ভরিয়া উঠিয়া-ছিল, আর সেই আনন্দের অমৃতধারায় স্নান করিয়াই তিনি দেশবাসীর সঙ্গে বিশ্ববাসীর পরম আত্মীয়তার সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাই তাঁহার বিশ্বপ্রেম সূক্ষ্ম কবিকল্পনার চরম অনুভূতিরূপে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তাহার ভিত্তি ছিল দেশপ্রেমে। তিনি দেশকে ভালবাসিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই বিশ্বের সহিত তাঁহার অন্তরের

যোগ হইয়াছিল নিবিড়; দেশবাসীর প্রতি তাঁহার মমত্ববোধ কল্পনার ডানা মেলিয়া সমগ্র বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু বিশ্বপ্রেমের এ পরিচয় তাঁহার দেশবাসীর মনে সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারিল না।

বাঙালীর স্বকীয়তা বিসর্জন প্রয়াসের প্রথম কারণ এই বিশ্বপ্রেমের বিকৃত অনুভূতি। রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রোত্তর-যুগেই এই বিশ্বপ্রেমের ধুয়া বেশি উঠিয়াছে। উঠিবারই কথা। এ সম্প্রদায়ের লোক বিশ্বপ্রেমের কথা উঠিলেই রবীন্দ্রনাথের দোহাই দেন। তাঁহারা যে বিশ্বকবিরই স্বজাতি ও স্বগোত্র এ কথা বুঝাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন আর স্মরণ করাইয়া দেন যে, যে অমৃতলোকের চাবির সন্ধান বিশ্বকবি পাইয়াছিলেন, উত্তরাধিকারসূত্রে ইহা তাঁহাদেরই প্রাপ্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কল্পনা-রথে চড়িয়া যাঁহারা ভূমানন্দের সন্ধানে ফিরিতেছিলেন, তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে মাটির মানুষ। তাঁহাদের ধারণা হইতেছিল যে, মাটির সংস্পর্শে আসিলে আর অমৃতের আস্বাদ পাওয়া যাইবে না; এই মাটির ধূলির মধ্যে সঙ্কীর্ণতা ও ক্লেদ ছাড়া অন্য কিছু নাই। কাজেই তাঁহারা মাটিকে সযত্নে পরিহার করিয়া চাতকের ন্যায় শুধু ঊর্দ্ধলোকেই অমৃতের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ফলে তাঁহাদের লাভ হইল একটা অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি। সে দৃষ্টিভঙ্গির অবশ্যম্ভাবী পরিণাম বিশ্বধর্মের সঙ্গে স্বধর্মের সংঘাত।

রবীন্দ্রনাথ স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের দীক্ষা হইয়াছিল দেশপ্রেমে। সে দীক্ষামন্ত্রে কোন ফাঁকি ছিল না। তাঁহার স্বধর্মের নৈষ্ঠিক সাধনা তাঁহাকে বিশ্বধর্মের দ্বারে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল। তাঁহার দেশবাসীর মধ্যে যাঁহাদের সে সাধনা ছিল না, তাঁহার স্বধর্মকে ফাঁকি দিয়া বিশ্বধর্মে পৌঁছিতে তৎপর হইলেন। কিন্তু ভিত্তিহীন হইয়া ঊর্দ্ধলোকে বাস দেহের বা মনের স্বধর্ম নহে; কাজেই অচিরেই তাহাদিগকে মাটির জগতে নামিয়া আসিতে হইল। কিন্তু মাটির উপরে নামিয়া তাহাদের স্বস্তি ফিরিয়া আসিল না, স্বধর্মের সাধনার অভাবে চারিদিক শুধু ধূলিমলিন বলিয়া মনে হইল। ফলে, তাহাদের মনে যে রোগ জন্মিল, তাহা ছুঁৎমার্গের পর্যায়ে পড়ে। যাহার মধ্যে বিশ্বপ্রেম বা বিশ্বমানবতার গন্ধ নাই, তাহা তাঁহাদের নিকট অস্পৃশ্য বলিয়া বোধ হইল, আর একটা অবাস্তব জগতে বাস করিয়া জীবন তাঁহাদের নিতান্ত কল্পনাধর্মী হইয়া পড়িল। ভূমানন্দ, অমৃত, আনন্দরূপ প্রভৃতি বাক্য তাঁহাদের মুখে লাগিয়াই থাকিল বটে কিন্তু যে তত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া এ সকল ভাবধারা মূর্তি পরিগ্রহ করে তাহা তাঁহাদের প্রত্যক্ষানুভূতির এলাকায় আসিল না।

তাঁহারা একূল ও ওকূল দু'কূল হারাইয়াই মানসিক যাযাবর-বৃত্তি গ্রহণ করিলেন। যাহাদের জীবনযাত্রা কোন দেশের সঙ্গেই যুক্ত নহে, যাহারা বিশ্ববাসী হইবার লোভে আজ এদেশে কাল ওদেশে আসিয়া সাময়িক ঘর বাঁধে, যাহাদের জীবনাদর্শ বা ঐতিহ্যের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না, তাহারা যাযাবর। এই যাযাবর-বৃত্তির প্রতি কল্পনাবিলাসী লোকের যেরূপ একটা মোহ আছে মানসিক যাযাবর-বৃত্তির প্রতিও তাহাদের তেমনি একটা মমতা আছে। এই মনোভাবের ফলে তাহাদের সত্যানুভূতি ক্ষীণ হইয়া আসে, আর কণ্ঠে উচ্চারিত হইতে থাকে, "সব ঠাঁই মোর ঘর আছে আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া"। কিন্তু বাস্তব জগতে এ সঙ্গীতলহরী বাস্তুহারাকে তাহার নবগৃহের সন্ধান দিতে পারে না। গৃহহীনকে যাযাবর বলিয়া বিশ্ববাসী যেমন অশ্রদ্ধা করে, স্বদেশধর্মচ্যুত লোককেও তাহারা তেমনি অবজ্ঞার চোখে দেখে। এ কথা অবশ্য তাঁহারা বোঝেন না; তাঁহাদের ধারণা তাঁহারা ঊর্দ্ধলোকের মানুষ। আধুনিক বাঙালী শিক্ষিতসমাজে এই প্রকার মানসিক যাযাবর-বৃত্তিবিলাসী লোকের সংখ্যা কম নহে।

দ্বিতীয়তঃ, দেশের কিয়দংশ লোক চিরদিন গৌড়ীয় দাস্যরসের সাধনা করেন। সে রসের সাধনা অবশ্য অন্তরের কথা; বাহিরে যাহা প্রকাশ পায় তাহা নিতান্তই সখ্যরসের বাণী। এই দাস্যরসের সাধনায় যে সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা তাহা পারত্রিক নহে, একান্তভাবেই ঐহিক। সম্মান, অর্থ, যশ ইঁহাদের কাম্য। রাষ্ট্রনেতার দল যখন যেদিকে ঝোঁক দেন, ইঁহারা তখন সেই দিকেই ঝুঁকিয়া পড়েন। মানসিকতার দিক হইতে ইঁহারা যাযাবর-বৃত্তিবিলাসী নহেন; ইঁহাদের দৃষ্টি কল্পলোকে নহে—নিম্নে, ভাগাড়ে।

ইঁহাদের মুখোশ সখ্যের; তাহার বেশির ভাগই সর্বভারতীয়, অল্প কিছু বিশ্বমানবীয়। দরকার পড়িলে ইঁহারা বাঙালীকে মাছ-মাংস ছাড়িয়া দিয়া সর্বভারতীয় নিরামিষসমাজে যোগ দিতে পরামর্শ দিতে পারেন, বাঙালীকে ভাত ছাড়াইয়া জোয়ারী রুটি ধরাইবার চেষ্টাও করিতে পারেন, এমন কি রোমান হরফে "পুস্তু" ভাষাকেও সর্বভারতীয় ভাষায় রূপান্তরিত করিবার যুক্তিও সমর্থন করিতে পারেন। বাঙালীর দুঃখকষ্টের জন্য ইঁহারা বাঙালীকেই সর্বতোভাবে দায়ী করেন, দেশ বিভাগের যৌক্তিকতা নির্দেশ করিয়া বাঙালীকে

আরো সহিষ্ণু, আরো উদার, আরো মহানুভব হইতে উপদেশ দেন।

ইংরেজের আমলেও ইঁহারা সখ্যে ঢাকা দাস্যরসের সাধনা করিতেন। দরকার পড়িলে, আচার-বিচারে ইংরেজের প্রথা অনুসরণ করিয়া তাহারই গুণগান করিতেন, আবার সুযোগমত টিকি রাখিয়া ও নামাবলী গায়ে দিয়া পরম নিষ্ঠাবান বৈদিক ব্রাহ্মণ সাজিয়া বসিতেন। নিজের ছেলের বা জামাতার চাকুরি ব্যবস্থার জন্য প্রভুর নির্দেশে সারা বাঙালীসমাজের যে কোন আচার-ব্যবহারের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করিতে ইঁহাদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা নাই, ভারত-সংস্কৃতির পুরোধা করিয়া রাশিয়া বা আমেরিকা বা যে কোনো দেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলে, "কলিকাতার কোনও খাদ্যে ভেজাল নাই" বলিয়া একটি সার্টিফিকেট লিখিয়া দিতেও তাঁহাদের অসম্মতির অভাব। বাঙালীকে যাঁহারা পুরোপুরি বাঙালী হইতে উপদেশ দিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে ইঁহাদের লজ্জার সীমা নাই, স্বামী বিবেকানন্দ বা নেতাজীর ছবিকে পিছনে ফেলিয়া দিয়া আধুনিক রাষ্ট্র-নেতাদের ছবি সম্মুখে টাঙাইয়া তাঁহারা আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, ভারতের স্বাধীনতা-প্রচেষ্টায় বাংলার বিপ্লবের ইতিহাসকে সযত্নে পর্দার আড়ালে রাখিতে চান, আর সুযোগ বুঝিলে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ তুলসীদাসের রামায়ণের পিছনে লুকাইয়া ফেলেন। ইঁহারা চিরজীবী আর বাংলার স্বকীয়তা-বিরোধী।

তৃতীয়তঃ, দলের যশ, প্রতিপত্তি বা অর্থলাভের ইচ্ছা নাই; চিন্তারও কোন বিশিষ্টতা নাই। তাঁহাদের আছে শুধু বাহবার লোভ। ইহা নিতান্তই নিজেকে একটু জাহির, একটু প্রচার করিবার ইচ্ছা। অনেক স্বামী আছেন যাঁহারা ছোটখাটো ব্যাপারেও নিজেকে জাহির করিবার জন্য স্ত্রীকে খাটো করিয়া ফেলেন, স্ত্রী যে হেয় হইল এ কথাটা তাঁহাদের চিন্তা-জগতেই আসে না। কেহ বা অনেক সময় শুধু নিজেকে প্রচার করিবার জন্যই নিজের অজ্ঞাতে বন্ধু-বান্ধবকে নীচু করিয়া দেখান। এই হতাদর বা অবজ্ঞাকরার মধ্যে কোন বিদ্বেষবুদ্ধি নাই; এমন কি নিজের প্রচারের ফলে যে অন্য কাহারও অবমাননা হইল এ কথাটাও ইঁহাদের মধ্যে অনেকে বুঝিতে পারে না। এ সকল প্রচার অত্যন্ত স্থূলবুদ্ধির কাজ; অনেকটা রেল-গাড়ীর মধ্যে হকারের "দন্তমঞ্জন" বা "হজমী"র বিজ্ঞাপন চিৎকার করিয়া বলার মত। এই প্রচারের ফলে যাত্রী-সাধারণের কর্ণপটই যে নিরতিশয় ক্লিষ্ট হইতেছে এ ধারণা তাঁহাদের থাকিয়াও নাই। তাঁহারা একান্তভাবে শুধু নিজেদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণের পন্থাই খুঁজিয়া মরিতে-ছেন। কিন্তু এই নিছক বাহবার লোভের শক্তিও কম নহে। এই বাহবা-লোভী বাঙালীর দল সাধারণতঃ বাঙালী দোকানদারদের দোকান হইতে জিনিসপত্র কেনেন না, সস্তা বুঝিয়া পাঞ্জাবী রুটি বা মাদ্রাজী কফির তারিফে ইঁহারা পঞ্চমুখ হন, এমন কি মুর্শিদাবাদী সিল্ক অপেক্ষা ব্যাঙ্গালোরী সিল্ক অনেক ভাল, এথাও তাঁহাদের মুখে শোনা যায়। অর্থাৎ বাংলায় তাহারা থাকেন দয়া করিয়া; ভাগ্যদোষে বাঙালী হইয়া জন্মিয়াছেন বলিয়াই —নচেৎ এক পা পাঞ্জাবে আর এক পা ব্যাঙ্গালোরে দিয়া থাকিতে পারিলে জীবন সার্থক হইত।

বাংলার আচার-ব্যবহার, বিধি-ব্যবস্থা সর্ব বিষয়ের প্রতি তাঁহাদের একটা সাধারণ বিরাগ আছে আর সে কথা তাঁহারা প্রচার করেন সময়ে, অসময়ে। তাহার কারণ এই নয় যে, এসব বিষয়ে তাঁহারা ওয়াকিবহাল, অথবা বাঙালী জাতির উন্নতির জন্য তাঁহারা বিশেষ চিন্তান্বিত; তাহার কারণ এই যে, তাঁহারা এ সম্বন্ধে কোন চিন্তা বা পড়াশুনা করেন না। ইংরাজের আমলেও এই বাহবা-লোভী বাঙালীর দল বর্তমান ছিলেন। তাঁহারা তখন ম্যানচেষ্টারের কাপড়ের তারিফ করিতেন, লণ্ডনের ধূলিকে স্বর্ণরেণু বলিয়া মাথায় তুলিতেন আর সাহেবদের দোকান ছাড়া জিনিসপত্র বড় কিনিতেন না। তাঁহাদের ধারণা ছিল যে, ইহাতে দেশের লোকের কাছে সম্মান ও বিদেশের লোকের কাছে বাহবা পাওয়া যায়। আজ রাষ্ট্রজগতে পরিবর্তনের ফলে তাঁহারা তাঁহাদের ভোল ফিরাইয়াছেন মাত্র।

শুধু বাহবার লোভেই ইঁহারা সাধারণতঃ একটু অবাঙালী-ঘেঁসা। প্রতিবেশী হিসাবে ইঁহারা বাঙালী অপেক্ষা অবাঙালীকে পছন্দ করেন। কিন্তু ভুলিয়া যান যে, সম্পদে বা বিপদে কোন সময়ই বাঙালী অপেক্ষা অন্য কেহ তাহাকে বেশি সাহায্য করিবে না; যদি করে, তবে সেটা নিয়মের ব্যতিক্রমমাত্র। তাঁহাদের কার্যকলাপের মধ্যে একমাত্র বাহবা লাভ ছাড়া যে আর কোন অভিসন্ধি নাই একথা সত্য, তবে যে কথাটা তাঁহারা বিস্মৃত হন সেটা এই যে, স্বকীয়তা না থাকিলে কেহ কাহারও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে না। পাঞ্জাবী যদি আজ মাদ্রাজীর সাজে দেখা দেয়, অথবা গুজরাটি উৎকলের সাজ গ্রহণ করে, তবে তাহাদিগকে যাত্রাদলের সঙ ছাড়া আর কিছু মনে করিবার উপায় থাকিবে না। তাঁহারা না পাইবে কোন শ্রদ্ধা, না প্রচার করিবে কোন আদর্শ। ইংরেজী আমলের

টাই, টুপি ও কোর্তা পরিয়া যাঁহারা প্রচণ্ড সাহেব সাজিয়া ছিলেন, তাঁহাদিগকে আজ আর বড় চেনা যায় না। তাঁহারা কি দেশে বা বিদেশে কোথাও কখনও শ্রদ্ধা পাইয়াছেন? তাঁহাদের এই বিদেশী প্রীতি ও স্বকীয়তা বর্জন কি বিদেশীরাও কখনও সম্ভ্রমের চোখে দেখিয়াছে? সত্য বটে, বাহিরে তাঁহারা বাহবা পাইয়াছেন কিন্তু অন্তরে পাইয়াছেন অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞা।

চতুর্থতঃ, আধুনিক ভারতের রাষ্ট্রনীতি দেশের জনসাধারণদের চরিত্রগঠনে কোন সাহায্য করিতেছে না বরং চরিত্রের মধ্যে শিথিলতা আনিতেছে। বাংলা ভারত বর্ষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রপীড়িত দেশ, বাঙালী সর্বাপেক্ষা বেশি ক্ষতবিক্ষত। কাজেই এ অশুভ রাষ্ট্রনীতির ফলে বাঙালী চরিত্রের দৃঢ়তা আরও কমিয়া আসিতেছে। বাঙালীর অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, কাজেই পরনির্ভরতা তাহার ক্রমাগত বাড়িয়া যাইতেছে, দারিদ্র্যের পেষণে একদিকে তাহার পরানুকরণ-স্পৃহা জন্মিতেছে, অন্য দিকে তাহার জ্ঞান ও সংস্কৃতি চর্চা নষ্ট হইতে বসিয়াছে, তাহার জীবনে অসহায়ত্বের চিন্তা যত বাড়িতেছে, তাহার মনেপ্রাণে ততই ক্লীবতা ও তামসিকতা আসিয়া দানা বাঁধিতেছে। রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ, তাই দেশবাসীর ধর্মগঠনে তাহার কোন দায়িত্ব নাই। তাহার দায়িত্ব পালনে ও শাসনে। রাষ্ট্র একটা যন্ত্র বিশেষ মাত্র, তাহার মধ্যে বিন্দুমাত্রও মনুষ্যত্ব-বোধের চিহ্ন নাই। ধর্মের খোলসকে রাষ্ট্রধর্ম বলিয়া ধরিয়া লইয়া, মনুষ্যধর্মের অবহেলা করিতে চলিয়াছে। মনুষ্যধর্ম কি? মানুষের মধ্যে কতকগুলি শক্তি বা বৃত্তি আছে যাহা প্রথমতঃ অস্ফুট অবস্থায় থাকে। সে বৃত্তিগুলির যথাযথ বিকাশই মনুষ্যত্ব। সে প্রস্ফুরণ হয় বৃত্তিগুলির প্রকৃত অনুশীলনে। অনুশীলনের ফলে তাহাদের মধ্যে আসে সামঞ্জস্য, আর সে অনুশীলন ও সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়াই বৃত্তিগুলি মনুষ্য-জীবনে চরিতার্থতা লাভ করে। একথা রাষ্ট্র ভুলিয়া গিয়াছে, তাই বৃথা মন্দির, মসজিদ ও চার্চের তর্ক তুলিয়া ধর্মানুশীলনের কথাকে ধামা চাপা দিতে চাহিতেছে।

ধর্মনিরপেক্ষ হইয়াও রাষ্ট্রদেবতারা সর্বভারতীয় প্রেমের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহা তাঁহাদের আকাশকুসুম রচনা মাত্র। ইহা ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, প্রেম ও ধর্ম একই বস্তু; উভয়ের পরিণাম একই। ধর্মকে বাদ দিয়া প্রেম হয় না; যাহা হয়, তাহা মৌখিক প্রীতিমাত্র। তাহার সঙ্গে অন্তরের সংযোগ থাকে না। ফলে সে প্রেম স্বার্থের প্রথম সংঘাতেই বিনষ্ট হইয়া যায়। প্রেম ও ধর্ম উভয়েরই লক্ষ্য এক; উভয়েই কেবল অপরের মঙ্গল চায়। প্রেম বিস্তৃত হইয়াই মনুষ্যধর্মে পরিণত হয় আবার ধর্মও প্রসারিত হইয়া সর্বজনীন প্রেমে আত্মপ্রকাশ করে। কাজেই মনুষ্যধর্ম-নিরপেক্ষ হইয়া রাষ্ট্র কোনক্রমেই সর্ব-ভারতীয় প্রেমের সন্ধান পাইবে না। সে প্রেমের ভিত্তি স্থাপনা করিতে হইলে দেশের প্রত্যেক সমাজে স্বধর্ম প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করিতে হইবে; রাষ্ট্রকে মনুষ্যধর্মানুশীলনের পুরোধা হইতে হইবে।

তাই বলিয়াছি, রাষ্ট্রের এই মনুষ্যধর্ম-নিরপেক্ষতা দেশের পক্ষে মহা অকল্যাণকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, বিশেষ করিয়া বাঙালীর পক্ষে। স্বাধীনতা লাভের পরে দেশে অনেক রাজনৈতিক ভেল্কী-বাজীর আখড়া তৈরী হইয়াছে বটে, কিন্তু চরিত্রগঠনের জন্য কোন অনুশীলন সমিতি স্থাপিত হয় নাই। রাজনৈতিক আখড়াতে যে সব পাঠ দেওয়া হয় তাহা মনুষ্যধর্মবোধের সহায়ক নয় বরং পরিপন্থী; কাজেই বাঙালীর চরিত্রের দৃঢ়তা ও মেধার তীক্ষ্ণতা কমিয়া আসিয়া এখন এই পর্যায়ে ঠেকিয়াছে যে, কোন বিষয়ে গভীর চিন্তা করিবার ইচ্ছা বা সাহস তাহার আর নাই। শিক্ষা জগতের তো কথাই নাই, এমন কি ধর্মজগতেও "সহজ পাঠ" পুস্তকমালার প্রবর্তন হইয়াছে। গত দশ-পনরো বৎসরের মধ্যে এমন একজন ছাত্রও মিলিবে কিনা সন্দেহ যে, পরীক্ষা পাশের জন্য এই পুস্তক-মালার সাহায্য গ্রহণ করে নাই। ধর্মপরীক্ষায় পাশের জন্য "ধর্মোপন্যাস"ও সৃষ্টি হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কোঁচার কাপড়ে, দেবী সারদামণির শাড়ীতে, আর স্বামীজী বিবেকানন্দের আলখাল্লায় টান পড়িয়াছে। ধর্মোপন্যাসের পাতায় এই সকল মহাপুরুষ ও মহিয়সী নারীর মুখে শ্লেষ, অনুপ্রাস, যমক ইত্যাদি অলঙ্কারের খই ফুটিতেছে, জগতের যাবতীয় কঠিন ধর্মতত্ত্ব জলবৎ তরল হইয়া বাঙালীর মগজে প্রবেশ করিতেছে; বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, কাব্য, শিল্পকলা, সমাজনীতি প্রভৃতি একই পাত্রে সিদ্ধ হইয়া যে অপূর্ব নির্যাস তৈরী হইতেছে তাহা বোতলে ভরিয়া বাঙালী ঘরে রাখিয়া দিয়াছে—অবসর-মত তাহা পান করিয়া তাহার ধর্মপিপাসা মিটাইবে।

সন্দেহ হইতেছে, শীঘ্রই সাংখ্য, বেদান্ত উপনিষদ প্রভৃতির "সহজ পাঠ" বাঙালীর মস্তিষ্কের উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিবার চেষ্টা চলিবে, ব্যাস ও বাল্মীকি আসিয়া অচিরেই কবির লড়াই সুরু করিবেন আর বরং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভাগবদগীতাকে মঙ্গল কাব্যে পরিণত করিয়া অষ্টাহ জুড়িয়া আসর মাত করিবেন। বাংলা দেশের সর্বজনীন পূজা-প্রহসনের সঙ্গে এই জাতীয় ধর্মোপন্যাস বেশ

খাপ খাইয়া গিয়াছে। সিনেমার গানে দেবী পূজার আসর গুলজার, সংকল্পহীন বাঙালী ছেলের দল শক্তি-পূজায় মত্ত, পুরোহিত দক্ষিণান্তের কথা স্মরণ করিয়া মন্ত্র বিস্মৃত হইয়াছে। এখানেও তাই। নাচের তালে বেদের মন্ত্রপাঠ চলিতেছে, সংকল্পবিহীন বাঙালী সন্তান-কল্পনায় তীর্থযাত্রা করিয়াছে, কথক শুধু অর্থলাভের আশায় ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারিতেছে।

এই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের অধর্মের ফাঁক দিয়া বহু প্রকার অনাচার বাংলা দেশে প্রবেশ করিয়াছে ও করিতেছে। চরিত্রের দৃঢ়তা, ধর্মে ও কর্মে আচার, নিয়ম ও নিষ্ঠা ক্রমশ কমিয়া আসিতেছে। পরিবারে ও সমাজে বাঙালীর স্বধর্ম যতই লোপ পাইতেছে, ততই সে সর্বজনীন ধর্মের সহজপাঠে বিশ্বধর্মী হইয়া পড়িতেছে। পিতা তাঁহার পিতৃধর্মের সহজপাঠ ঠিক করিয়া নিয়াছেন, পুত্রও সেই পাঠেই তাঁহাকে অনুসরণ করিতেছে। যে যাহার স্বধর্মের প্রতি নিষ্ঠা হারাইয়া, নোঙর-ছেঁড়া নৌকার মত এঘাটে ওঘাটে ঘুরিয়া মরিতেছে, ঘূর্ণিপাকের কবলে কখন পড়িবে তাহার স্থিরতা নাই।

আধুনিক বাঙালীর বিশ্বপ্রেম যে ধারায় ছুটিয়া চলিয়াছে ইহাই তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এ ধারাকে অবলম্বন করিয়া চলিলে এ জাতির ধ্বংস অনিবার্য, তাহার চিহ্নও যে দেখা যাইতেছে না, তাহা নয়। দেশের বাহিরে তাহাকে পদে পদে অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইতেছে, দেশের মধ্যেও সে প্রায় পরবাসী। অথচ, সে তো ক্রমশঃ বিশ্বধর্মী হইয়া সকলের সঙ্গে মিশিবার যোগ্যতা লাভ করিতেছে বলিয়া মনে করে।

কয়েক বৎসর পূর্বেই না এই বাঙালী ভারতবর্ষে বিপ্লব আনিবার স্বপ্ন দেখিয়াছিল? তাহারই রচিত মন্ত্র "বন্দেমাতরম্" মুগ্ধকণ্ঠে গাহিয়া সেদিনও না সারা ভারতবর্ষ বিদেশীর শৃঙ্খল হইতে দেশকে মুক্ত করিতে চাহিয়াছিল, তাহারই নেতাজী না এই সেদিন ক্ষাত্রতেজে বিশ্বজগৎকে বিস্মিত করিয়া দিয়াছিল? তবে এত অল্পসময়ের মধ্যে বাংলার সে চরিত্রবল, সে মেধা, সে শক্তি কোথায় অন্তর্হিত হইল? বাঙালী যতই স্বধর্মচ্যুত হইতেছে, তাহার চরিত্রবল ততই কমিয়া আসিতেছে। সে যতই নিজেকে বিশ্বধর্মী বলিয়া চেঁচাইতেছে, দেশী-বিদেশী ততই তাহাকে বিজাতীয় সঙ বলিয়া গণ্য করিতেছে। এ কথাটা স্পষ্ট ভাবে না বুঝিতে পারিলে অনিবার্য ধ্বংস হইতে বাঙালীর নিস্তার নাই।

বাঙালী তো শারীরিক বলে কোন দিনই বলশালী ছিল না। উহা প্রধানত বাংলার জলবায়ুর দোষ। কিন্তু বাংলার শক্তি ছিল চরিত্রবল, মানসিক শক্তি। সেই শক্তির জোরেই দেশে, বিদেশে তাহার প্রতিষ্ঠা হইয়া ছিল, সেই বাহুবলেই সে স্বাধীনতা-যজ্ঞের পুরোধা হইয়াছিল। সেই প্রচণ্ড বাহুবল একদা তাহার কি কারণে জন্মিয়াছিল আর কি কারণেই বা তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে এ সম্বন্ধে প্রত্যেক বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন। এজন্য মনীষী বঙ্কিমের প্রবন্ধ হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি—

"উদ্যম, ঐক্য, সাহস ও অধ্যবসায়—এই চারিটি একত্র করিয়া শারীরিক বল ব্যবহার করার যে ফল, তাহাই বাহুবল। যে জাতির উদ্যম, ঐক্য, সাহস ও অধ্যবসায় আছে, তাহাদের শারীরিক বল যেমন হউক না কেন, তাহাদের বাহুবল আছে। এই চারিটি বাঙালীর কোন কালে নাই, এজন্য বাঙালীর বাহুবল নাই।

কিন্তু সামাজিক গতির বলে এ চারিটি বাঙালী চরিত্রে সমবেত হওয়ার অসম্ভাবনা কিছুই নাই। অতএব যদি কখন—(১) বাঙালীর কোন জাতীয় সুখের অভিলাষ প্রবল হয়, (২) যদি বাঙালীমাত্রেরই হৃদয়ে সেই অভিলাষ প্রবল হয়, (৩) যদি সেই প্রবলতা এরূপ হয় যে, তদর্থে লোক প্রাণ পণ করিতে প্রস্তুত হয়, (৪) যদি সেই অভিলাসের বল স্থায়ী হয়, তবে বাঙালীর অবশ্য বাহুবল হইবে।

বাঙালীর এরূপ মানসিক অবস্থা যে কখন ঘটিবে না, এ কথা বলিতে পারা যায় না। যে কোন সময়ে ঘটিতে পারে।" (বাঙালীর বাহুবল)।

ঘটিয়াছিলও তাই। আর অদূর ভবিষ্যতেও যে তাই আবার ঘটিবে, এই আশা লইয়াই আমরা বাংলার তরুণ-তরুণীর দিকে চাহিয়া আছি।

"ভাল করে' রাখো নোটগুলো বউ—"

শ্রীকৃষ্ণধন দে

ভাল করে' রাখো নোটগুলো বউ, বাক্সে তুলে,
আজ এ ঘরের দাও সব কটা জানলা খুলে,
বাতাস আসুক, রৌদ্র আসুক, আকাশ নীল
ছোট ছোট সাদা মেঘের ফেনায় হোক্ ফেনিল।
এই হাত দুটো হাল্কা ত নয়, ভেবেছ যত,
ফাঁসীমঞ্চের হ্যাণ্ডেল টেনে শক্ত কত!
আজকে ভোরেই পায়ের তক্তা দিয়েছি খুলে,
ফাঁসীর আসামী মরণের মুখে পড়েছে ঝুলে!
আমি জল্লাদ, তবু সরকারী তকমা আছে,
খুনী হয়ে তবু এ পোড়া প্রাণটা আইনে বাঁচে!
কোথা রাখি টাকা! রক্তঝরানো এ অভিশাপ!
থেকে থেকে বুকে ছোবল যে দেয় কেউটে সাপ!

দেখেছি কত না হাতকড়াবাঁধা শীর্ণ হাত,
শিথিল শরীর লুটায়ে পড়েছে অকস্মাৎ।
দাঁড়াতে পারে না, কাঁপে থর থর মরণ জেনে,
হুকুমের দাস প্রহরীরা তারে তুলেছে টেনে।
দেহখানা তার মঞ্চে রয়েছে পুতুল প্রায়,
হাঁটু ভেঙ্গে বুঝি লুটাবে, এখনি মঞ্চগায়!
কালো মুখোসের আড়ালে হয়ত নয়নে তার
কার কথা ভেবে ঝরে পড়ে শেষ অশ্রুধার!
মুহূর্তে আমি টানি হ্যাণ্ডেল্ হাতের চাপে
তার পর?···শুধু কালো গহ্বর, দড়িটা কাঁপে।

এই চোখ দুটো দেখেছে আবার এমন মুখ,
মৃত্যুর সাথে করে গেল যারা কি কৌতুক!
মুখের হাসিতে উজল করেছে ফাঁসির দড়ি,
একটু টলে নি, একটু কাঁপে নি, যায় নি সরি।
কণ্ঠে যাদের ধ্বনিয়া উঠেছে মাতৃনাম,
দেশজননীর চরণে করেছে শেষ প্রণাম।

শুধু চোখ দুটো জলিয়া উঠেছে কি অভিমানে,
দেশের লোকেই ফাঁসীর মঞ্চে তাদের আনে!
দেশের লোকেই বুঝিল না শুধু,—তাদেরি তরে
মুক্তি তোরণে শত তরুণের রক্ত ঝরে!
গৃহ ছাড়ি তারা সারা দেশ জুড়ে রচেছে গৃহ,
স্পৃহার বহ্নি বুকে বহি তারা কি নিস্পৃহ!

সেদিন কেঁপেছে এই হাত দু'টি নারীরে আনি
যেদিন ফাঁসীর মঞ্চে তুলিনু আইন মানি'।
বছর পঁচিশ বয়স হবে বা, ফ্যাকাশে মুখ,
ছেড়েছিল বুঝি কার ছলনায় গৃহের সুখ।
শুধু দুটি চোখে কত সাধ আঁকা ছিল বাঁচার,
বেদনাপঙ্কে এমন কমল কোথায় আর?
টাকা দিয়ে যারা কিনিতে আসিত সে রূপ-দেহ,
ওরি ঘরে হায় খুন হয়ে গেল তাদেরি কেহ!
আদালতে জোর উঠিল তর্ক ঘূর্ণিঝড়ে,
আইনের প্যাঁচে নারী-প্রাণ কেবা বিচার করে!
মাতৃহৃদয় কাঁদে ফেলে-আসা শিশুর লাগি',
ফাঁসীর মঞ্চে সন্তানে ডাকে সে হতভাগী।

ভাল করে রাখো নোটগুলো বউ, বাক্সে তুলে,
শোণিতের ছাপ আঁকা এরি বুকে যাই নি ভুলে!
পাপের পরশ, তৃষার পরশ রয়েছে কত,
কত কবন্ধ ঘোরে আশেপাশে ছায়ার মত,
রাতের আঁধারে চুপি চুপি আসে ঘুমের ঘোরে,
ফিস্ ফিস্ করে' কানে কানে বলে,—"চিনেছ মোরে?"
কেঁদে ওঠে কেউ, হেসে ওঠে কেউ, সারাটা রাত,
ছুটে আসে তারা ছুড়ে লিকলিকে লতানো হাত!
কেউ বলে সেই আসল খুনীটা কোথায় জানো?
কেউ বলে,—ভাই, হ্যাণ্ডেল্টাকে আস্তে টানো'

(গবর্ণমেণ্টের বৃত্তিভোগী যে ব্যক্তি ফাঁসীমঞ্চে জল্লাদের কাজ করে তাহারই আত্মকাহিনী।)

দিক-সংকেত

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

নিমন্ত্রণ বাড়ি। উপলক্ষ্যটা কি মনে পড়ছে না, তবে সমাবেশটা একটু বিচিত্র। একজন গৃহস্থ বাঙালীর বাড়ির নিমন্ত্রণ, অন্য দিক দিয়ে আর কি এমন বৈচিত্র্য থাকবে, তবে তৎকালীন রাজনৈতিক আবহাওয়ার হিসাবে একটু ছিল বলেই মনে আছে কথাটা। বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি সময়টা। অসহযোগ আন্দোলন পুরো দমে চলেছে। প্রথম দুই দশকের সেই অগ্নিমন্ত্র—কেউ বলছে শান্তিমন্ত্র নির্জীব হয়ে পড়েছে, কেউ বলছে হোম-ঋক্ নির্জীব হয় না, সুপ্ত আছে, স্বাধীনতার শেষ আবাহন-মন্ত্র সেই হয়ে উঠবে।

ব্রিটিশ সরকার বোধ হয় এই কথাটাই করে বিশ্বাস। শক্তিমন্ত্রেই আজ তার রাজ্য অনস্তমিতসূর্য। বিশ্বাস করে বলেই তখন তার পলিসি চলেছে শাস্তির। ছাই-চাপা আগুন ছাই-চাপাই থাক, ঘাঁটাতে গেলেই বাইরে মুক্তির মুক্ত হাওয়া আছে; কোথা থেকে যে ইন্ধন এসে পড়ে বলা যায় না। অনেক দেখেছে, ওদের সে-অভিজ্ঞতা আছে।

বাংলার অগ্নি-যুগের একটি স্ফুলিঙ্গ শান্তিমন্ত্র না মেনে ঠিকরে বেড়াচ্ছে চারিদিকে; সেও এক ভাবনা।

ওরা আর ঘাঁটায় না। কথায় কথায় জেল নেই, কথায় কথায় অন্তরীণ করা নেই।

ফল এই হয়েছে যে, দিনকতক আগের সেই "চুপ-চুপ, চাপ-চাপ" গিয়ে সবাই একটু মুখর হয়ে উঠেছে। পাঁচটা লোক একত্র হোলেই রাজনীতির আলোচনাই এসে পড়ে। কে শুনছে, কার ভালো লাগল না, সে কথা আর গ্রাহ্য করে না কেউ। যাদের ভালো না লাগবার কথা তারা প্রায় সবাই সরকারের পক্ষের লোক, হয় সোজাসুজি চাকর, না হয় খয়েরখাহ্। কর্তার নির্দেশ পালন করে হয় চুপ করেই থাকে, নয় তো নিতান্ত যদি না পারলো তো একটু বাকযুদ্ধ করে আক্রোশটা যতটুকু সাধ্য মিটিয়ে নেয়।

আমাদের আসরে রয়েছেন সহকারী সরকারী উকিল বাণীপদবাবু, গোয়েন্দা বিভাগের অটলবাবু, ডেপুটি-পুলিস সুপার নীরেন লাহিড়ী। তিন জনেরই বয়স কম এবং তিনজনেই যে সব গুণ থাকলে অল্প বয়সে সরকারের নেক-নজরে পড়া যায় সেই সব গুণের অধিকারী। যেন ঠিক উল্ট দিকের প্রতিনিধি হিসাবে রয়েছেন বিকাশ দেব। বিকাশ দেবেরও বয়স বেশি নয়, এর মধ্যে অনেক-গুলি অন্তরীণ শিবির ঘুরেছেন, সম্প্রতি মুক্তি পেয়ে বাড়ি এসে বসেছেন। বিকাশ দেব নিজে স্বল্পবাক মানুষ। মুক্ত হয়েও যেন নিজেই নিজেকে অন্তরীণ করে রেখেছেন। বাইরে যে না যান এমন নয়, তবে বাইরেই যান বা বাড়ীতে থাকুন, প্রায় চুপ করে বসেই থাকেন। কিন্তু একলা থাকেন না, বা থাকতে পান না। যেখানেই থাকুন ওঁকে ঘিরে একটি দল বসে থাকে। সবাই যে ওঁর রাজনীতিগত মত বা পন্থার সমর্থক এমনও নয়, অহিংস আন্দোলনের পর এদের সংখ্যা বরং বেড়েই গেছে, কিন্তু কী একটা যে আছে ওঁর মধ্যে, বিরোধী হলেও সবাই শ্রদ্ধা করে। তর্কের দিকে যান না, সুতরাং ওঁর সঙ্গে তর্ক হয় না; তবে দু'পক্ষেরই দল রয়েছে, ওঁকে ঘিরে কিছু না কিছু তর্ক লেগেই থাকে সর্বক্ষণ। বাইরে বাইরে বিকাশের থাকে একটা অন্যমনস্ক নির্লিপ্ত ভাব, শুধু মাঝে একবার হয় তো হঠাৎ একটু হাসি ফুটে উঠল, কিম্বা চোখের কোণে হঠাৎ একটা বিদ্যুতের রেখা। ঐ যেন ওঁর অভিমত, তাইতেই এগিয়ে চলে তর্ক।

নিমন্ত্রণ আসরে কতক এই ধরনের আরও একজন রয়েছেন চন্দ্রনাথ দে। এদেশে বৃটিশ-প্রতিপত্তির মূল অবলম্বন ছিল আই-সি-এস, অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস আর আই-পি-এস, অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান পুলিস সার্ভিস। চন্দ্রনাথ এখানকারই ছেলে। সম্প্রতি পুলিস বিভাগের এই সর্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, কোথায় পাঠানো হবে এখনও ঠিক হয় নি, বাড়িতেই রয়েছেন।

এঁরও প্রকৃতিটা অনেকটা বিকাশ দেবের মতো, শান্ত, স্তব্ধ। বিকাশের তবু ঠোঁটের কোণে হাসি আছে, চোখের কোনে বিদ্যুৎ আছে, ভেতরের খানিকটা আঁচ পাওয়া যায়; চন্দ্রনাথ একেবারে গম্ভীর। অথচ সে গাম্ভীর্যটা পুলিসী গাম্ভীর্য নয়। একখণ্ড মেঘের পেছনে চাঁদ থাকলে তার ভেতর থেকে যেমন একটা আভা বেরোয়, সেই রকম একটি আভা চন্দ্রনাথের গাম্ভীর্যের ওপর সর্বদাই একটি প্রসন্নতার প্রলেপ বুলিয়ে রাখে। আমি নিজের কথা বলছি, চন্দ্রনাথের গাম্ভীর্যকে কখনও ভালো ছেলের গুমর বলে মনে করতে পারি নি; সে-

যুগের পুলিস অফিসারদের ওপর যে একটা স্বাভাবিক বিরূপতা ছেয়ে থাকত মনে, সেটাও কখনও পারেনি আসতে। শুধু মনে হোত চন্দ্রনাথের পুলিস লাইনে যাওয়া ওঁর জীবনের একটা মস্ত বড় ট্র্যাজেডী। তখন গান্ধীজীর হিমালয়ান ব্লাণ্ডার কথাটা খুব চলেছে— হিমালয়ের মতো বিপুল এক ভ্রান্তি : আমার মনে হোত ব্যক্তিগত জীবনে চন্দ্রনাথ যেন এই রকম একটা হিমালয়ান ব্লাণ্ডার করে বসেছেন।

আমি আশা করতাম এই পাহাড়-প্রমাণ ভ্রান্তি টলিয়ে চন্দ্রনাথ একদিন বেরিয়ে আসবেন নিজের আসল জীবন-ধারায়, আই-সি-এস সুভাষের মতোই। তা অবশ্য আসেন নি, তবে এটা জানি, পুলিসের সর্বোচ্চ অফিসার হিসেবে ব্যর্থ হয়েছিলেন উনি। এটাও জানি, এ-ব্যর্থতার জন্য ওঁর কোন অনুশোচনা ছিল না : মনে হয়, উল্টে যেন এইটুকুই ছিল ওঁর জীবনের সান্ত্বনা।

আসরে আরও একজন লোক ছিল, আমাদের সরকারী দাদা অংশুমালী রায়। টকটকে রং, একটু থলথলে মোটা, সদাপ্রফুল্ল, সদামুখর। কেউ বিপ্লবী, কেউ অহিংস, কেউ রহস্যময়। অংশুদা যেন সবকিছুই, কিম্বা কিছুই নয়। ওঁর জীবনটা ছিল কাজ আর হুজুগ নিয়ে। মিটিং, চাঁদা তোলা, সেবার কাজ, ভোজসামলানো কিছু একটা থাকলেই হোল হাতে। যখন কিছু নেই তখন অন্তত পাঁচজনকে নিয়ে জটলা। অংশুদা কোনও বিশেষ দলের নয়! যে-দলের দুর্বলতার জটলার উত্তাপ কমে আসার আশঙ্কা দেখেন সেই দলকে দেন তাতিয়ে। কি হোল তার সঙ্গে ওঁর সম্বন্ধ নেই, উনি দেখেন বন্ধ নেই তো, এগিয়ে যাচ্ছে কিনা ; আসর না ঠাণ্ডা হয়ে যায়। বলেন—"বিপ্লবের ব্যাপারটা জুড়িয়ে যাচ্ছিল, ভাগ্যিস অহিংসা এসে আবার বাতাসটা গরম করে তুললে ; নয় তো কী নিয়ে থাকতাম?" এই ওঁর পলিটিক্স। কিছু হোক্, কিছু হতে থাক্।

অর্থাৎ পলিটিক্স হীন, প্রাণখোলা ; নির্বিরোধী ; সবার আপন মানুষ। জীবনটাকে তার সর্বরূপেই নিয়েছেন, কিন্তু কোন রূপেই পূর্ণ আগ্রহে নেন নি।

আসরে রয়েছেন অংশুদা ; কিন্তু আর সবার মত নয়। ভোজের বাড়ি, ওঁর কাজ বাড়ির সর্বত্র। রন্ধনের পালা শেষ হয়েছে ; উনি এখন পরিবেশনের আয়োজনে নিজের দল নিয়ে।

তার সঙ্গে, বৈঠকখানার আসরে যে জটলাটি আস্তে আস্তে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে ; সেটাকেও দিয়ে যাচ্ছেন উসকে।

ঝড়ের মতো হঠাৎ ঢুকে পড়ে—

"না, থামলে চলবে না—হাতাহাতিও করতে পার, কিছু ক্ষতি নেই, মাংসটা খুব উৎরে গেছে…"

"আর একটু চালিয়ে যাও ভাই—লুচির খোলা চড়িয়েছি—দু'টো—আর বড় জোর বিশ মিনিট…বাঃ, এই যে রথী উঠে দাঁড়িয়েছে! এই তো চাই। যতীন বলেছে—অহিংস আন্দোলন ক্লীবের আত্মপ্রসাদ? ওর মাথা দু' আধখানা ক'রে দিলে না এখনও?—আমি গিয়েই এই চেলাকাঠ পাঠিয়ে দিচ্ছি…"

মিনিট কয়েক পরেই ডাক দিয়ে গেলেন সবাইকে, জায়গা তোয়ের। গরম আসর একেবারে ভাঙতে একটু দেরি হয়ই। কিছু উঠে বেরিয়ে গেল, কিছু জের টানতে টানতে উঠি উঠি করছে, অংশুদা আবার এসে দোরের কাছে দাঁড়ালেন তোয়ালে জড়িয়ে—

"দুঃসংবাদ ভাই—আর একটু চালাতে হবে রাজ-নীতিটা। যে অভাগাদের কোন নীতি-জ্ঞান নেই, ইংরেজ বেনিয়ার মতন এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে ছিল, তারা এসে আসন সব দখল ক'রে ফেলেছে…"

আর কিন্তু জমল না।

যারা বেশি জমিয়ে তুলেছিল, তাদের কয়েক জন বেরিয়ে গেছে ; যারা রইল একটু নিঝুম মেরেই রইল। এর পর সেকেণ্ড ব্যাচ, প্রায় ঘণ্টাখানেকের ব্যাপার তো।

তবু একজন একটু করলেন চেষ্টা, গোয়েন্দাবিভাগের অটলবাবু। বিপ্লব-আন্দোলন চলে গেছে, সুতরাং উনি এখন অনেকটা নিষ্ক্রিয়ই বলে জানে সবাই ওঁকে ; নিষ্ক্রিয় এবং নির্বিষ। এজন্য ওঁকে আর আগেকার মতো কেউ ততটা এড়িয়ে চলে না। তবে বাইরে বাইরে এই ভাবটা পুষ্ট করে গেলেও নেপথ্যে ওঁর মধ্যেকার গোয়েন্দাটি তার বিষ নিয়েই থাকে তোয়ের। আজ হয়তো নেই প্রয়োজন, কিন্তু দু'দিন পরে হয়তো থাকতে পারে। অটলবাবু লোক চিনে রাখেন, মনের খাতার নোট নিতে থাকেন। অনেকে জানেও একথা, তবে গ্রাহ্য করে না। শুনিয়ে বলার একটা আনন্দ আছে তো ; তা ভিন্ন গোয়েন্দাকে শুনিয়ে বলা মানেই তো সোজাসুজি কর্তাদের কানে তোলা ; লোভ সামলাতে পারে না।

একটু চেষ্টা করলেন অটলবাবু, সবাই মুখ বন্ধ করে থাকলে তো আর নোট নেওয়ার কিছু থাকবে না। গির্দায় হেলান দিয়ে একটা দৈনিক কাগজ পড়ছিলেন, তাই থেকে একটা মুখরোচক খবর তুলে সরকারী উকিল

বাণীপদবাবুকে শুনিয়ে দিলেন। অর্থাৎ আসরের সবাইকেই, তবে একটু পাশ কাটিয়ে।

খবরটায় ঝালমসলা ছিল, অহিংসাও তো আবার হিংসার চূড়ান্ত হয়েই উঠে আন্দোলনের বুনেদে প্রবল নাড়া দিয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে; একটু উঠল আসর গরম হয়ে, কিন্তু উত্তাপটা টেঁকল না।

টেঁকল না তার আর একটা কারণ অংশুদা আর আসতে পারছেন না এদিকে, পরিবেশন নিয়ে রয়েছেন; প্রথম ঝোঁক তো। তর্কটা একটু উঠেই জুড়িয়ে গেল। কেউ কোন একটা কাগজ কি বই নিয়ে পড়ল, কেউ সঙ্গী বেছে অন্য কথা নিয়ে।

এই সময় তপেশবাবু এসে বৈঠকখানায় প্রবেশ করলেন। আসরটা আবার একটু সজীব হয়ে উঠল। অবশ্য রাজনীতি নয়, অন্যভাবে।

তপেশবাবু এখানকার জেলা-স্কুলের একজন ওপরের দিকের শিক্ষক। বয়স পঁয়তাল্লিশ-পঞ্চাশের মধ্যে। মুখে কাঁচাপাকা গোঁফদাড়ি, মাথায় একটু বড় বড় অবিন্যস্ত চুল। চোখেমুখে বেশ একটি শান্ত প্রসন্ন ভাব।

তপেশবাবু থিয়জফির চর্চা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পরলোক, অতীন্দ্রিয়, এই জাতীয় কতকগুলি ব্যাপারেরও। ওঁকে সবাই ধরে পড়ল অটোমেটিক্ রাইটিং অর্থাৎ অদৃশ্যহস্তচালিত লিপির জন্য।

আপত্তিই করলেন। নিমন্ত্রণের আসর, সবার মন ঐদিকে, এ-অবস্থায় প্রয়োজনীয় অভিনিবেশ সম্ভব নয়। কেউ কিন্তু শুনতে রাজি নয়।···তা হলে অন্ততঃ এমন কেউ পেন্সিল ধরুন যার মনটা স্বভাবতই একটু আত্মকেন্দ্রিক, অচপল।

সবাই চন্দ্রনাথকে ধরে পড়ল। লাজুক প্রকৃতির লোক, এড়িয়ে যেতেই চাইছিলেন, বাণীপদ উঠে গিয়ে ওঁকে একটু জোর করেই তুলল চেয়ার থেকে। ওঁরা দু'জনে সহপাঠী ছিলেন স্কুল-কলেজে।

বৈঠকখানাটার পাশে একটা ছোট ঘর, ছেলেদের কারুর পড়বার। একটা টেবিল, দুটা চেয়ার রয়েছে; টেবিলের ওপর কিছু বই। বইগুলো সরিয়ে আরও দুটা চেয়ার পেতে দেওয়া হ'ল—চারদিকে চারটে। তপেশবাবু নিজেই সবার মুখ দেখে আরও তিন জনকে বেছে নিলেন, তার মধ্যে একজন রইলেন গোয়েন্দাবিভাগের অটলবাবু।

ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দেওয়া হ'ল। দরজাটার ওপরে কাঠের বদলে দু'খানা নীল শার্শি বসানো; তার মধ্যে দিয়ে যেটুকু আলো প্রবেশ করে। বৈঠকের চার জন ছাড়া আরও জন-পাঁচেক ঘরের ভেতর রইলাম আমরা, তার মধ্যে একজন বাণীপদ।

প্রশ্নের বিষয় কি হবে?

কেউ বলল—পরলোক সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করা হোক, কেউ অন্য কিছু, বাণীপদ বলল—"কেন, স্বাধীনতা নিয়ে এত মাথা গরম, মাকাল ফলটা পাওয়া যাবে কিনা তাই জিজ্ঞাসা করা হোক না।

বৈঠকের বাকি দুজনের মধ্যে একজন একটু উগ্র-রকমের চরমপন্থী। সে বলল—"হলে ভিক্ষের পথে কি শক্তির পথে—সেটাও।"

প্রায়ান্ধকারের মধ্যে দু'জনের একটু দৃষ্টিবিনিময় হ'ল। একটা ফুলস্কেপ কাগজ রেখে দেওয়া হয়েছে টেবিলের ওপর, তপেশবাবু চন্দ্রনাথের হাতে একটা পেন্সিল দিয়ে বললেন—আপনি এর মুখটা কাগজে খুব আলগাভাবে ঠেকিয়ে রাখুন। কোনও চেষ্টা থাকবে না, শুধু গোড়ার দিকটায় দেখবেন যেন পড়ে না যায়।"

প্রশ্ন দুটাকে এক করে দিয়ে চারজনকে পূর্ণ অভিনিবেশের সঙ্গে সেটা মনের একটি কেন্দ্রে এনে চোখবুজে চুপ করে বসে থাকতে বললেন। বাকি যারা ছিলাম ঘরে তাদেরও ঐ কথাই বললেন। অবশ্য চোখবুজার প্রয়োজন নেই।

একবার দোরটা একটু খুলে ধূমপান করতে কিম্বা কথাবার্তা কইতে বারণ করে দিলেন পাশের ঘরে।

দশ মিনিট, পনেরো মিনিট, কুড়ি মিনিট হয়ে গেল। কোন নড়ন-চড়ন নেই। তপেশবাবু ঘুরে ঘুরে এক এক-বার সবার শিরদাঁড়ার ওপর দিয়ে হাতটা আলগা ভাবে টেনে নামিয়ে আনছেন। বার দুই যে নিঃশ্বাস পড়ল তাতে বোঝা গেল উনিও ভেতর থেকে কি যেন একটা শক্তি প্রয়োগ করছেন।

আরও পাঁচ মিনিট গেল। এই রকমই আর একটা নিঃশ্বাস ফেলে ফিস্ ফিস্ করে আরম্ভ করেছেন—"নাঃ, বড় ডিস্টার্বড···", এমন সময় পেন্সিলটা চলতে আরম্ভ করল।

খুব মন্থর গতি। অক্ষরের বাঁকে বাঁকে থেমে যায়, আবার এগোয়, সোজা লাইন পেলে যেন পিছলেই খানিকটা এগিয়ে যায়, তবে ওঠে না কাগজ থেকে। অক্ষরগুলো একটু বড়ই, তবে সমান নয়। অবশ্য কি লেখা হচ্ছে সেটা পড়া যাচ্ছে না, ঘরটায় আলোর মাত্র সামান্য একটু আভাস রয়েছে। চন্দ্রনাথ তিনটি আঙুলে শুধু ছুঁয়ে রয়েছেন পেন্সিলটাকে, সেই আঙুল ক'টাকে যেন নিয়ে যাচ্ছে চালিয়ে। একবার সট ক'রে খানিকটা

পিছনে গিয়ে কয়েক মিনিট সে থেমে রইল আর যেন এগুতে চায় না। তপেশবাবু ঝুঁকে দেখতে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় আবার চলতে আরম্ভ করল।

এবার যেন একটু দ্রুতই, তার পর ক্রমে দ্রুততর হতে হতে শেষের দিকে অর্ধবৃত্তাকারে একটা লম্বা টান দিয়ে পেন্সিলটা আপনিই ছেড়ে গেল হাত থেকে।

খুব বেশি না হলেও বৈঠকের ক'জন একটু যেন ঝিমিয়ে পড়েছেন। তপেশবাবু ঘুরে ঘুরে আবার সবার শিরদাঁড়ার ওপর দিয়ে হাতটা টেনে দিয়ে এলেন।

প্রায় হিজিবিজি গোছেরই লেখা। পেন্সিলটা আর ওঠে নি। একটা অক্ষরের সঙ্গে আর একটা গেছে জড়িয়ে। ও-ঘরে পড়া গেল না। বড় ঘরে আলোর নীচে চন্দ্রনাথই কাগজটা মেলে ধরলেন। পড়তে পারল আগে সেই চরমপন্থী গোছের ছেলেটিই। প্রায় চেঁচিয়েই উঠল—"ঐ নিন, লিখছে—আগুন জ্বলবে!"

সবাই ঝুকে পড়ল আবার। আরও কয়েকজনের কণ্ঠে ঐ উল্লাস; বিকাশ দেবের চোখে এক ঝলক বিদ্যুৎ খেলে গেল। ডেপুটি সুপার নীরেন লাহিড়ীরও, তবে একটু অন্যভাবে। বাণীপদর মুখটা রাঙা হয়ে গেছে। অটলবাবুর দৃষ্টি যেন সন্ধানী ভেতরে ভেতরে, নোট নেওয়ার এত বড় একটা সুযোগ! চন্দ্রনাথ কিন্তু নির্বিকার; শুধু মেঘের ভেতর সেই চাঁদের আভাটা যেন একটু স্পষ্ট হয়েছে। অবশ্য আমার মনের ভ্রমও হতে পারে।

তর্কের ঝড়টা প্রায় এসে পড়ল, ঠিক তার মুখে বাণীপদ এক কাণ্ড ক'রে বসল। ক্রমেই রাঙা হয়ে গিয়ে ফুলে উঠছিল, হঠাৎ এগিয়ে চন্দ্রনাথের হাত থেকে কাগজটা ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে—"মিথ্যে! বোগাস্! ননসেন্স!" বলে মুঠার মধ্যে মুড়ে মাটিতে ফেলে জুতার নীচে পিসে দিল মুখটা বিকৃত করে।

একটা বিশ্রী রকম ব্যাপার হয়ে উঠতে যাচ্ছিল উত্তেজনার মুখে, ঠিক এই সময় অংশুদা কাঁধের তোয়ালেটা কোমরে জড়াতে জড়াতে ঝড়ের মতো ছুটে এসে বললেন—"ওহে শুনেছ? জবর টাটকা খবর! পার্লামেণ্টের মধ্যে গিয়ে মাইকেল ওডায়ারকে গুলি করেছে—কে এক উত্তিম সিং সেই জালিয়ানওয়ালাবাগ—ষোল বছর পরে···"

ফিরে দু'পা এগিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন—"ধৈর্য হারাতে নেই—আমি আর পনেরো মিনিটের মধ্যেই দিচ্ছি ভোজে বসিয়ে।"

সমস্ত ঘরটা একেবারে নিস্তব্ধ, থমথমে; একটা সূচ পড়লে বোধ হয় তার শব্দটুকু শোনা যায়। বাণীপদর আগুনের মতো রাঙা মুখ ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। অটলের দৃষ্টিও নিজের ধর্ম হারিয়ে শূন্যবদ্ধ। শুধু তাই নয়, যাদের উল্লসিত হয়ে ওঠবার কথা, এখনই যারা হয়ে উঠেছিল, তারাও যেন সিদ্ধির বিপুলতা দেখে স্তিমিত হয়ে পড়েছে।

আমার দৃষ্টিটা একবার চন্দ্রনাথের মুখের ওপর গিয়ে পড়ল। শুনেছিলাম অটোমেটিক্ রাইটিঙে অনেক সময় নাকি যে পেন্সিল ধরে কিম্বা যার অভিনিবেশ সবচেয়ে বেশি তার অন্তঃস্থলের কথাটাই বেরিয়ে আসে পেন্সিলের মুখে।

ভাবছি তাই কি? না, যে মহাশক্তি অনন্ত ভবিষ্যৎ নিজের অন্তঃস্থলে নিয়ে ব'সে আছে তারই এ দিক-সংকেত?

তিন সাগর

শ্রীব্রজমাধব ভট্টাচার্য

১৪

শুয়েছি, তখন রাত আড়াইটা। ভালো ঘুম আসে নি। কেবল চিন্তা কখন গেরাঁর সঙ্গে দেখা হবে, আর কি করেই বা হবে। বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। উঠেছি যখন তখনও অন্ধকার। ঘড়িতে দেখি পাঁচটা বেজেছে। রাতে আলো নেবাই নি। জলছিলোই। সুবিধে হোলো তাতে। ভোরের বেলার মৌতাতী ঘুম আর তাততে পেলো না। উঠে পড়া গেলো।

সারাদিনের মতো তৈরী হয়ে নেওয়া গেলো। স্নানও সেরে নিলাম। বেরিয়ে পড়লাম। তখন পৌনে ছ'টা। ধাঙড়, পুলিস আর ডাক্তার ছাড়া রবিবারের ভোর পাঁচটায় প্যারীর পথে এক চোর নয় তো বন্ধু-হারানো ভারতীয় পর্যটকই বার হয়।

যেন ঘুমন্ত কোলকাতা। একেবারেই সেই অভিনবত্ব হারিয়ে গেছে, রাতে যা অদ্ভুত লাগছিলো। সেই পীচঢালা পথ, মাঝে মাঝে পাথরের টুকরো দিয়ে বাঁধানো। সেই সিমেণ্ট-করা পদচারীর পথ। তেমনি ধাঁই ধাই ঢাউশ ঢাউশ ঘুমন্ত বাড়ীর পর বাড়ী; দৌড়ে পালানো বেড়াল; ডাষ্টবিন-শোঁকা কুকুর, হঠাৎ ছুটে-যাওয়া বাস। কেবল ট্রামের ঢং ঢং নেই যেমন থিয়েটার রোড, হস্পিটাল রোড, লোয়ার সার্কুলার রোডে নেই।

রু-মঁ-ত্রাঁ—সে কোথায়? একটা পুলিস। গোল টুপির সুমুখে বারান্দা করা একফালি আচ্ছাদন। গলাবন্ধ কোট আর পাশে লম্বা ফিতে বসানো ট্রাউজার। হাতে একটা ছড়ি। লম্বা চেহারা, চোখের চাউনী বেশ নরম। গিয়ে ঠিকানা লেখা ফালি কাগজখানা দেখাই।

খানিকক্ষণ ফ্রেঞ্চে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে আমায় একটা মেট্রোর মুখে নিয়ে এলো। মেট্রো ষ্টেশনের মুখ। সিঁড়ি নেমে গেছে। সারা প্যারী শহরের অন্ত্রে অন্ত্রে রেলের লাইনের মতো লাইন ছেয়ে আছে। অনবরত গাড়ী চলছে। তার মুখে নক্সা লাগানো। পুলিস আমায় বোঝাতে থাকে—ত্রোকাদিরো, নামোৎপিকে, পাস্তর, গ্যাস্‌পেইল্‌ তার পর কি কতকগুলো বলে বুঝি না—এবং পরে বার বার, চেঁচায় আর হাসে—এ্যালেসিয়া, এ্যালেসিয়া। ওকে বেশী কষ্ট দিতে ইচ্ছে হোলো না। নমস্কার করে নামলাম সিঁড়ি দিয়ে। টিকিট নিলাম গ্যাস্‌পেইল্‌। সবই এক দাম। টিকিট কিনে ভেতরে গেলে আর হাঙ্গামা নেই। বার বার টিকিট দেখানো নেই, চেকার নেই। ভূগর্ভ থেকে যতক্ষণ না বেরুচ্ছো গাড়ীতে গাড়ীতে যতো ইচ্ছে ঘোরো। কোনো আর আলাদা চার্জ নেই।

গাড়ী পার হোলো সাইন। আলো বাতাস দেখা গেলো। এক টুকরো শহরের কুচিও দেখা গেলো। প্যাসীর পুল দিয়ে সাইন পার হোলো অবশ্য জল ওপরে, গাড়ী তলায়। একটু পরে এ পারে আসতেই ইফেল টাওয়ার আবার দেখা গেলো। পরক্ষণেই আবার ভূগর্ভে। পর পর ষ্টেশন। ত্রোকদিরো, প্যাসী, বীরহাকিম, দুপ্লে, লামোৎপিকে, পাস্তর। ঠিক ঠিকই আসছি। গাড়ী থামছে। লোক উঠছে, লোক নামছে, গাড়ী চলছে। নিজে থেকে বিজলীর সাহায্যে গাড়ী থামলে গাড়ীর দরজা খুলছে, গাড়ী চলতে আরম্ভ হলে দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। গুঁতোগুঁতি নেই; হৈ-হল্লা নেই, নিঃশব্দ, অসঙ্কোচ, সহজ। দেখে দেখে যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। বাসে চড়ার একটা অঙ্গই গুঁতোগুঁতি, ট্রামে চড়ার জন্য বাদুড়-পনা নেহাৎ পালনীয় ধর্ম। সে দুটো না পাওয়ায় কি যেন miss করতে লাগলাম। খালি খালি বোধ হয়। যেন বাঁধানো-দাঁত হারিয়ে যাওয়া বুড়োর ফোগ্‌লা হাসি।

গ্যাস্‌পেইল এসে গেছে। একজনকে ঠিকানা দেখাই। ইঙ্গিতে বুঝলাম পরের ষ্টেশন। নাম দের্ফাক্রশরু। ভদ্রলোকও নামলেন। অন্য একটা প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে বললেন—এ্যালেসিয়া। তখন বুঝলাম পুলিসপুঙ্গব আমায় গাড়ী বদলের কথা বলছিলেন। এলেসিয়ায় নেমে সিঁড়ি বেয়ে বসুমতীর জঠর থেকে বক্ষে এসে পৌছালাম। তার পর ঠিকানা দেখাই আর চলি।

প্যারীতে তখনও ভোর। দু'একখানা গাড়ী বাড়ছে। একটা গাড়ী বোঝাই কাটা কাটা গোধন। কসাই ঘর হয়ে খানা-টেবিলে পৌছতে আজকের সারাদিন কেটে যাবে হয়তো।

মঁত্রাঁ রাস্তাটা ছোটো। গেরস্ত বাড়ীতে ভরতি। বড় জোর ত্রিশখানা বাড়ী হবে। জন মানব নেই।

কুড়ি নম্বর দোকান বাড়ীটা ছোটোই; প্রেসই আছে বটে। বাকী সব ভোঁভা। কেউ কোথাও নেই।

শীত নেই বটে; কিন্তু বাতাসটা ঠাণ্ডা। ময়লা গাড়ী এসে দাঁড়ালো। আশ পাশ বাড়ী থেকে বড় বড় ড্রাম বেরুতে লাগলো, সেই ড্রাম গাড়ীতে ঢালা হতে থাকলো। গাড়ী চলে গেলো। দুধের গাড়ী থামে। নানা জনার নানা গাড়ী। বোতল নিয়ে নিয়ে বাড়ী ঢুকেও যাচ্ছে, বা জানালার ধারে রেখেও দিচ্ছে। হরকরা এসে খবরের কাগজ রেখে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত গতিশীল ছাড়া মনিষ্যি দেখলাম না যে কিছু জিজ্ঞাসা করি।

এ সব দেশে ক্লাইভ ষ্ট্রীটের বড় বড় বাড়ীর মতো সব চৌকিদার আছে কি না কে জানে। বাড়ীটার দরজা দেখে এদিক ওদিক ঘুরলাম। কেউ নেই।

দু'একজন লোক কুকুর নিয়ে বেরিয়েছেন, কুকুরের প্রাতঃকৃত্যের সময়ানুবর্তিতার তাগিদে। নৈলে প্যারীতে রবিবার ভোরবেলা ভূতে না পেলে বেরুবে না।

চেষ্টা করলাম যাতে সাহায্য পাই। কিন্তু ইংরেজী ভাষা তো ওদের গোমাংস। একেবারে জানে না।

দাঁড়িয়ে রইলাম পল গেঁরার দোকানের পাটুরির সামনের পাটুরিতে। সত্যাগ্রহীর মতো নিজের গোঁকে সামনে রেখে কেবল "রঘুপতি রাঘব" জপ করা।
সামনে পাটরিতে এক গ্রসারি আর প্রভিশনস্-এর অর্থাৎ মুদীর দোকান। দরজাটা খুলে যেতেই একটি আধা-বয়সী মহিলাকে দুধের খালি বোতল এবং একটা থলে হাতে বেরিয়ে যেতে দেখলাম।

কিন্তু তিনি ফিরে এলেন ভরা দুধের বোতল আর থলেতে কয়েকটি ফুল নিয়ে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটি আধাবয়সী লোক সাইকেলে চেপে প্রায় এক ধামা রুটি নিয়ে হাজির।

ওঁরা স্বামী-স্ত্রী। দোকানের মালিক। নিজেদের প্রাতরাশ সারবেন এইবার, বোঝা যাচ্ছে। আমি সাহস করে এগিয়ে গেলাম। কথায়, অর্থাৎ অঙ্গভঙ্গিতে জোর আনার আশায় বিশুদ্ধ বাংলায় বলি, "গের্ঁার ঠিকানা আমায় জানতেই হবে। যেখান থেকে হয় জোগাড় করে দাও। নৈলে নড়বো না।"

ওদের অঙ্গভঙ্গি আর ফরাসীর তবর্গ বোলানো অনুনাসিকে বুঝলাম যে, ওঁরা গের্ঁার ঠিকানা জানে না। হার মানছি প্রায়। হেনকালে মনে পড়ে গেলো যদিও পলগের্ঁা কুমার, শরীরটা তার ভালো, রুচি ভালো, খায় দায় ভালো ও তরিবৎ করে। সুতরাং দুপুরের খাওয়াটাও যদিচ বাইরে সারে কাছাকাছি কোনো ভালো রেস্তর্ঁাতেই সারবে। মোড়ের মাথায় এক রেস্তর্ঁা, পাশে একটা সব্জী আর ফলের দোকান। মোড়ের অন্য ধারে মস্ত বড়ো এক কসাইখানা। এক এক করে সব দোকান তল্লাস করলাম। কে খোঁজ রাখছে পলগের্ঁার! "সবার চেয়ে তুচ্ছ তারে আজিকে মোর সবার চেয়ে পরম প্রয়োজন।" আবার ফিরে এলাম সেই ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর দোকানে। হারানো প্রিয়ার হদিস রূপকথাতে চিরকার ওরা বলেছে। আমায় কেন বলবে না? গিয়ে দোকানের সামনে শুধু দাঁড়িয়ে রইলাম। চোখে চোখ রাখলাম ব্যাঙ্গমীর। ব্যাঙ্গমী তখন টেবিলে খানা খাচ্ছে। দেখতে যদিও পাচ্ছি না, বুঝতে পারছি ব্যাঙ্গমাও বসে বসে খাচ্ছে। ব্যাঙ্গমীর খাওয়া তখন মাথায় চড়েছে। চর্বন-চঞ্চল চোয়াল দেখাবে প্যারিসীয়া নারী নবাগতকে, এমনিই কি আকাল লেগেছে শালীনতার?

ন্যাপকিনে ঠোঁট মুছতে মুছতে ব্যাঙ্গমী উঠে এলেন। বেশী করে শব্দ করে আর হাত নেড়ে বোঝালেন যে, তাঁর পক্ষে সাহায্য করা কোনোমতেই সম্ভব নয়; এবং আমার পক্ষে ওখানে ঐ ভাবে দাঁড়ানো না সঙ্গত, না লাভজনক। অঙ্গভঙ্গি যে কি পটু-এ্যাসপ্রাষ্টো তার পরিচয় সেদিন খুব পেয়েছিলাম।

কিন্তু না; আমি "ন যযৌ ন তস্থৌ"—নট্ নড়নচড়ন নট্ কিচ্ছু: দাঁড়িয়েই রইলাম। বাঁহাতের চেটোয় প্রচণ্ড এক মুষ্ট্যাঘাত করে ডান হাতের মুঠো হাঁকিয়ে হাঁকিয়ে জানিয়ে দিলাম "লড়কে লেঙ্গে পল্‌গের্ঁার ঠিকানা।"

হাল্লাক হয়ে চলে গেলেন ব্যাঙ্গমী। গিয়ে খাদ্যে মনঃসংযোগ করলেন। ওদের মধ্যে যে অস্ফুট গুঞ্জরণ চলতে লাগলো তাতেই বেশ বুঝতে পারলাম agitation কাজে দিয়েছে। দেবেই না বা কেন? এই মাটিরই তো মন্ত্র "agitate, agitate and ever agitate!"

পারবে কেন খেতে? একেবারে নগণ্য তো আমুও নই। আবার ন্যাপ্‌কিন্, আবার ঠোঁট, আবার মোছা। এবার চোখ চকচকে। বিরক্তি অনেক কম।

মুখে তখনও কি যেন পোরা। চিবুতে চিবুতেই একটা কাগজে কি লিখতে লাগলো। তার পর বাইরে এসে দূরের একটা বাড়ী দেখিয়ে নিজের আঙুল গুণে গুণে বোঝালো পঞ্চমতলা। তার পর একটা খোলা জানলা দেখালো। হাতের চিঠিটা নিয়ে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে দেখালো দরজাটা।

বুঝলাম নোঙর তুলতে হবে এ বন্দর থেকে। অন্য

বন্দরে গিয়ে খোঁজ নিতে হবে বারো-হাত-কাকুঁড়ের-তেরো-হাত-বিচি কোথায় পাওয়া যায়।

ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী কাজে দিলো।

নমস্কার করে বিদায় নিলাম।

তার পর সিঁড়ি গুণে গুণে উঠছি আর উঠছি। সেই ফাষ্ট ফ্লোর বিলো দি চিমণী। বাঁ-দিকের দরজায় নাম লেখা M. Poulain। ঐ নামই হাত-চিঠিতে লেখা। দরজায় আঘাত করি।

বেরিয়ে আসেন বছর ত্রিশের এক ঝকঝকে মহিলা, লম্বায় কোনোমতেই সাড়ে চার ফুটের বেশী নয়। চুলের রংটা সোনালী নয়, প্লাটিনাম ঘেঁসে। খুব সুন্দর একরাশ চুল।

বয়সটা প্রায় হারকিউলিসের সাহস নিয়ে বলে ফেলেছি। কারণ আছে তার।

মাদাম পুলাঁর পরণে হাল্কা রং একটা গাউন ছিলো; সামনে এ্যাপ্রন বাঁধা। অগোছালো চুল। ভেতর থেকে চায়ের গন্ধ আসছে। বুঝছি রোবারের সকালে পরিষ্কার করার বড়ো গোছের একটা হাঙ্গামা পোয়াতে হয় এ দেশের মেয়ের।

বড়ো মানুষ সব জায়গাতেই বড়ো মানুষ। শূদ্রের ঘাড়ে-চাপা মানুষকে যদি ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বলা হয়, মানুষের ঘাড়ে চাপা দেবতাকে যদি কুবের বলা হয়, বলতে হয় যে মানুষের ঘাড়ে কুবেরের আসন, সে মানুষ নিজে হাঁটে না। শূদ্রের ঘাড়ে চেপে হাঁটে। কুবের প্যারীতেও আছে। দেবতা যে উনি! কোথায় নেই। কুবের অনুগৃহীত চাঁই চাঁই ইঙ্গ, মার্কিন, ফরাসী বামুনরাও চেপে থাকে মঁসিয়ে পলাঁর মতো শূদ্রের ঘাড়ে। তাদের কথা সর্বত্রই এক কথা। বড়দের পাড়ায় ধোবা, নাপিত, চাকর, বাকর, সবই আছে। কিন্তু সাধারণ ভদ্র পরিবারও ধোবা-চাকর রাখে না। একটা শার্ট ধোবার খরচ দেড় টাকা থেকে তিনটাকার মতো। তাই এ দেশে মেয়েদের গৃহস্থালী বেশ খাটুনীর, রান্না থেকে নিয়ে ঘরদোরের যাবতীয় কাজ, মায় কাপড় ধোয়া, ইস্ত্রী সব বাড়ীতেই করতে হয়। মাদাম রেণে, লীনা রেণে, মাদাম জ্যাকী প্রত্যেককেই দেখেছি ধোবার কাজ, মেথরের কাজ, বাবুর্চির কাজ, রেফুগরের কাজ, পরিচারিকার কাজ করতে। অথচ মোটামুটি এদের আয় মাসিক আড়াই হাজার টাকার মতো। নেহাৎ "ম্যয় ভুখা হুঁ" মার্কার নৌকর নয়; ব্যবসায়ী ও স্বচ্ছল।

তাই মাদাম পুলাঁর এ বেশ দেখে বোঝার জো নেই মঁসিয়ে পুলাঁ ব্যাঙ্কে ক্লার্ক না ব্যাঙ্কের মালিক। মোটেই সাজগোজ ছিলো না, তাই নির্বিবাদে বয়সটা বুঝতে পারলাম।

কাগজ দিলাম। মহিলা পড়ে ভ্রূ কুঁচকে ভেতরে গেলেন। পা টিপে টিপে আমিও ভেতরে গেলাম। সুতরাং শোবার ঘরে বিছানায় অর্ধশায়িত মঁসিয়ে পুলাঁর দিকে চেয়ে মাদাম পুলাঁ যখন কথা বলছেন তখন অর্ধ উলঙ্গ মঁসিয়ে পুলাঁর বিস্ফারিত দৃষ্টি আমার প্রতি নিবদ্ধ।

জানি যা করছি তার নাম বর্বরতা। কিন্তু রোগ যখন জবরদস্ত, হকিমীও জবরদস্ত চাই। অসম্ভব প্যারীতে ঠিকানা না জানা লোকের ঠিকানা বার করা; তার চেষ্টায় অসম্ভব ব্যবহার অবশ্যকরণীয়। এরা ইংরেজ নয়। আমারও ছ বচ্ছর ফরাসী নিয়ে নাড়াচাড়া করা নেহাৎ বৃথা যায় নি। যুধ্যস্ব। তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপে নাস্মি সাগরং। আমার উড়ুপে এ্যাটমিক ব্যবহারের ইঞ্জিন লাগাতেই হবে।

টেবিলে চা-ভরা পেয়ালা থেকে ধোঁয়া উঠছে। মঁসিয়ে পুলাঁর হাতে সকালের কাগজ। শাদা ধবধবে বুকের মাঝে সোনালী রোমগুচ্ছ বেরিয়ে আছে বাদামী আর খয়েরী চেকের কম্বলের আবরণের সীমানায়। একটা ছোটো ট্রেতে রাখা পাইপটি তুলে মুখে গুঁজে মঁসিয়ে বললেন, "গুড মর্ণিং মঁনিং মঁসিয়ে। নো আঙ্গ-লাইশ!" বলেই একটা কাগজে গেরার ঠিকানা লিখে আমার হাতে দিলেন।

ঘরটা খুব ছোটো। জিনিসে ভর্তি। দুটো আলমারিতে বই। বাকিগুলোয় বহুকালসঞ্চিত নানা বস্তুপুঞ্জের নীহারিকা। ভবিষ্যৎ গ্রহ গঠনে কাজে দিলেও, বর্তমানে চায়ের পট, খবরের কাগজ আর তাম্রকুটের পাইপের আমেজে ওর স্থান নেই। ঘরের এক কোণে দুটো খালি বোতল গত রাতের কাহিনী শোনাচ্ছিলো। জায়গা কম। মাদাম পুলাঁ আমায় জায়গা ছেড়ে এক কোণে দাঁড়ালেন, কিন্তু খুব কাছাকাছি।

যেই কাগজটি আমার হাতে এলো আমি সসম্মানে বাও করে সেটিকে মাঝখান থেকে দু'টুকরো করে ফেললাম। আবার বাও করে চারটুকরো করলাম। এবং জানলা দিয়ে বাইরে ফেলতে গিয়ে, সামলে নিয়ে অগ্নিকুণ্ডে সমর্পণ করলাম।

অল্প একটা বিচিত্র শব্দ বেরুলো মাদাম পুলাঁর কণ্ঠে।

চেয়ে আবার বাও করে বিস্মিত মঁসিয়ে পুলাঁর হাত ধরে টানলাম ? তার পর ইঙ্গিত করলাম "তুমি চলো। "পারি না এমন শুধু ঘুরে ঘুরে ফেরা !"

হেসে ফেলে মঁসিয়ে পুলাঁ।

ওরা হাসে কেন ?

আমার গাড়লপনা কি ওদের জ্ঞাত তাবৎ গাড়লপনার সীমা অতিক্রম করে যায় ? বার্লেস্ক না বাকুনারী না হার্লেকুইনাদ্ ঠিক করতে না পারার হাসি নাকি ?

যাই হোক্, দুটো কথা সত্য। এক তো লোকে অ-খুশী হয় না; দ্বিতীয়তঃ, কাজ হাসিল হয়েই যায়। "যে পথ দিয়া চলিয়া যাবো সবারে যাবো তুমি"—এ ব্রত তো রক্ষা করেই চলেছি।

মঁসিয়ে পুলাঁর চোখের সেই হাসির মধ্যে নরম একটু করুণা দেখলাম। সঙ্গে সঙ্গে ছোট্টো মাদামকে চুলশুদ্ধ দু'হাতে জড়িয়ে নিয়ে দু'গালে দুটি চুমো এঁকে মিনতি করে বললাম, "তুমি বলো, সুন্দরী, তবেই যাবে।"

স্বামী-স্ত্রীর উল্লসিত হাসিতে সেদিনের সকাল ঐ ছোটো ঘরে বাঁধা পড়ে উছলে পড়েছিলো যেন।

মঁসিয়ে পুলাঁর তাঁর গাড়ী বার করে আমায় নিয়ে গেরাঁর বাড়ী চললেন।

গেরাঁর বাড়ী মোটেই দূরে নয়। গ্যাসপেইল্ আর মপানাস্ দুটো পথের সন্ধিস্থলে ছোট্টো একটি পার্কের সামনে বাড়ী। তেতলায় গেরাঁ থাকে।

পুলাঁ গিয়ে দরজায় টোকা দিচ্ছে যখন তখন বেলা সাড়ে সাতটা। গেরাঁর অর্দ্ধেক রাত। তবু ও উঠে এসে পুলাঁকে দেখে অবাক। আমি ইচ্ছে করেই লুকিয়ে ছিলাম।

স্লিপিং সুটের ওপর গাউন চাপানো গেরাঁর ভরাট চেহারা আমায় ঝাপটে ধরলো—"বাতাশারিয়া! বাতাশারিয়া!"

ঘরে গিয়ে পুলাঁর কাছ থেকে আদ্যোপান্ত ব্যাপার শুনে হেসে বাঁচে না। "এ কাহিনী শুনলে প্যারীর পুলিস তোমায় চাকরি দিয়ে দেবে হে! করেছো কি! রীতিমতো গোয়েন্দাগিরি যে। নাও নাও পুলাঁ একটি গোটা স্যাম্পেনের বোতল নাও। বন্ধু এসেছে। বন্ধু। আর কেমন বন্ধু যদি জানতে। দাঁড়াও দাঁড়াও চায়ের জল চাপাই আগে।"

ক্রমশঃ

ত্যাগিদের কবি

শ্রীসতীন্দ্রনাথ ঘোষ

ছিল যে নির্ঝরিণী
তার শুকায়েছে ধারা,
আছে শুধু বালুচর।

পাখীর কাকলি ছিল,
ছিল সেথা সবুজের খেলা—
জীবনের যৌবন জোয়ার।

আজ সেথা গাংচিল একা—
কেঁদে মরে নিঝুম দুপুরে—
উতল বায়ে হতাশ ছাড়ে।
খেপা খুঁজে ফিরে চিল-ডাকা চরে-
হারানো দিনের সুরে।

এবে চাহ বরমণ, সখা?
লজ্জা কী লজ্জা?
ভেঙে গেছে কাব্যের মেরুদাঁড় মজ্জা

ভারতে উচ্চশিক্ষার অবস্থা

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

ভারতে শিক্ষা ও শিক্ষিতের সংখ্যা আলোচনা করতে গেলে পুরাতন কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা প্রথমেই করে নেওয়া যাক, পরে নূতনের কথা বলা যাবে। একথা একবার উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এ সকল তত্ত্ব ভারত সরকারের ঝুলি থেকে সম্প্রতি আলোকে এসেছে।

প্রায় দশ বছর আগেকার কথা, ১৯৫১ সনের আদমসুমারির তথ্যের ওপর নির্ভর করা হয়েছে। তাতে বিশেষ দোষ হচ্ছে না, কারণ চিন্তাশীল ওয়াকিবহাল মহল এই তথ্য থেকে বর্তমান সংখ্যার ওপর একটা অনুপাত অতি সহজেই টেনে নিতে পারবেন।

তথ্য সরবরাহ করছে 'Census of India : Paper No. 1, 1959', (আদমসুমারি হিসাবের ১৯৫৯ সনের প্রথম সংখ্যা), যখন লোকসংখ্যা ৩৫·৬৯ কোটি ছিল। এর পর বছরের ৪৫ থেকে, বর্তমানে বছরে ৫০ লক্ষ লোক বেড়ে চলেছে, মোটামুটি হিসাব ধরা হয় ভারতের জনসংখ্যা ৪০ কোটি রেখা অতিক্রম করেছে। যাই হউক, ১৯৫১ সনে পুরুষ ছিল ১৮·৩৩ এবং নারী ১৭·৩৫ কোটি। এর মধ্যে এখানে-ওখানে কিছু বাদ পড়ায় শিক্ষার ক্ষেত্রে ধরা হয়েছে ৩৫·৬৬ কোটি অর্থাৎ ১৮·৩২ কোটি পুরুষ, নারী ১৭·৩৪ কোটি।

হিসাবের সুবিধার জন্যে ৩৫·৬৬ কোটিকে ৩৬ কোটি ধরলে কোনও অসুবিধা নেই। এর মধ্যে মাত্র ৬ কোটি "লিটারেট" (কথাটি খুব ভাল) বা সামান্য চিঠিপত্র পড়তে পারে, হয়ত বা একটু লিখতে পারে। এ সময় লিটারেটের হার ছিল শতকরা ১৬·৬ জন। (বর্তমানে স্বাধীনতার হাওয়া পেয়ে বেড়ে দাঁড়িয়েছে, না কি, ৪০·৩ জন)।

যাঁরা পড়তে এবং লিখতে পারেন, সংখ্যা ৬ কোটি, এঁদের মধ্যে ৫ কোটি উচ্চ প্রাইমারী স্কুলের সঙ্গে পরিচয় করেন নি। যাঁরা এই স্কুলের মুখ দেখেছে বা ঐ মানপ্রাপ্ত হয়েছে তাঁদের সংখ্যা (ছিল) ৯০ লক্ষ। এর মধ্যে আবার মাত্র ৩৮ লক্ষ, অর্থাৎ প্রতি শতে একজন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

আবার বলে রাখি হিসাবটা ১৯৫১ সনের লোকসংখ্যার ওপর, ১৯৫৯ সনে প্রকাশিত। ১৯৬১ সনের আদমসুমারির শিক্ষিতের এত বিস্তারিত হিসাব পেতে হলে ১৯৬৯ সন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করবার কথা। সুবিধার মধ্যে এই ১৯৫৬ সনের ১লা নবেম্বর তারিখে পুনর্গঠিত রাজ্যের স্বতন্ত্র হিসাব এতে দেওয়া হয়েছে (লোকসংখ্যা ১৯৫১ সনের):

ভারতবর্ষের হিসাব—

মোট	৩৫,৬৮,৭৯,৩৯৪
পুরুষ	১৮,৩৩,৩৩,৮৭৪
স্ত্রী	১৭,৩৫,৪৫,৫২০

মোট জন সংখ্যা ও বিভিন্ন বিভাগে পুরুষ ও স্ত্রী শিক্ষিতের সংখ্যার একটা চুম্বক দেওয়া হচ্ছে।

	পুরুষ	স্ত্রী
ভারতের মোট জনসংখ্যা (১৯৫১) (৩৫,৬৮,৭৯,৩৯৪)	১৮,৩৩,৩৩,৮৭৪	১৭,৩৫,৪৫,৫২০
শিক্ষিত (মোট) (৫,৯২,৬১,১১৪)	৪,৫৬,১০,৪৩১	১,৩৬,৫০,৬৮৩
মাধ্যমিক মানের নিম্নে	৩,৮১,২৫,০৯৬	১,২০,৯৩,৭৬২
মাধ্যমিক মান	৪২,২০,১৩৫	১০,২২,৩৮৮
ম্যাট্রিকুলেশন, উচ্চ মাধ্যমিক ফিঃ	১৮,৬৪,৭৯৮	২,৯২,০৬০
ইণ্টারমিডিয়েট (বিজ্ঞান বা আর্টস্)	৪,০৭,০৯৮	৫৯,৩৭৯
ডিগ্রী বা ডিপ্লোমাধারী (মোট)	৯,৯৩,৩০৪	১,৮৩,০৯৪
তন্মধ্যে গ্রাজুয়েট (আর্টস্ বা বিজ্ঞান) স্নাতক	২,৮৪,০০৮	৩৬,৯৪৪
পোষ্ট গ্রাজুয়েট (স্নাতকোত্তর গ্রাজুয়েট)	৫৭,৯১৮	৬,৮৩৭
শিক্ষা বিষয়ক	১,৫০,৮১২	৩৭,৭৭৭
ইঞ্জিনীয়ারিং	৩৫,০২২	৬৩২
কৃষি	৮,২৫৯	২৪৩
পশু চিকিৎসা	৪,১১২	২২৫
কমার্স (বাণিজ্য বিষয়ক)	৩১,৫৮৩	১,০৩৫
আইন	৬৩,৭৬৩	৮৫৩
চিকিৎসা	৬৩,৮৮৪	৮,১০৬
অপরাপর	২,৯৩,১৪৩	৯০,৪৪২

মোটামুটি ৩৬ কোটি লোকের মধ্যে ডিগ্রী বা ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত শিক্ষিত অর্থাৎ যাহারা শিক্ষার নামে কিছু গর্ব্ব অনুভব করিতে পারে, তাদের সংখ্যা মাত্র ৯,৯৩,৩০৪ জন, অর্থাৎ প্রতি শতে মাত্র '৩৩। ইহা সুসভ্য ইংরেজ রাজত্বের প্রায় দুই শত বৎসর শান্তিপূর্ণ শাসনের ফল। এ অবস্থার পরিবর্ত্তন কেবল বাঞ্ছনীয় নয়, একান্ত প্রয়োজনীয়।

বিভিন্ন রাজ্যে শিক্ষার মান বা শিক্ষিতের সংখ্যার যথেষ্ট তারতম্য আছে সে কথা বলা বাহুল্য। এটা নির্ভর করে রাজ্যের অধিবাসীদের শিক্ষালাভের আকাঙ্ক্ষা ও রাজ্য সরকারের শিক্ষা-বিস্তার কার্য্যের সহায়তা বা সুযোগদানের ব্যবস্থার উপর। সরকার ও রাজ্যের অধিবাসীদের আর্থিক অবস্থাকেও ইহার সহিত বিচার করা প্রয়োজন। যাহাদের কি রাজ্য, কি নাগরিক, অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে, বা কাজ করাইবার খরচ সঙ্কুলান হয় না, তাহাদের পক্ষে শিক্ষার কথা চিন্তা করা সম্ভব নয়। সাধারণ গৃহস্থ ঘরে দেখা যায়, কোথাও ব্যয় সঙ্কুলান করিতে হইলে প্রথমেই শিক্ষার সঙ্কোচ করিবার কথা আসিয়া দেখা দেয়।

বিভিন্ন রাজ্যে, এ ক্ষেত্রেও স্কুল শেষ করিয়া কলেজও প্রায় শেষ করিয়াছে এমন যাঁহারা অর্থাৎ গ্রাজুয়েট সংখ্যা লইয়া বিচার করা হইতেছে। এ বিষয়ে দিল্লী প্রধান স্থান অধিকার করিতেছে। ইহার পরিসর ক্ষুদ্র এবং কেন্দ্রীয় শাসনে পরিচালিত, ভারতের রাজধানী এই স্থানে অবস্থিত হওয়ায় অপরাপর রাজ্যের শিক্ষিতের সমাগম এখানে বেশী। প্রকৃত দিল্লীবাসীর মধ্যে কতজন স্নাতক তাহার স্বতন্ত্র হিসাব লইলে দেখা যাইবে, ইহা ভারতের অন্যান্য অঞ্চল হইতে খুব বেশী পার্থক্য বজায় রাখিতে পারে। তবে সারা পাঞ্জাবের উচ্চ হার দিল্লীকেও প্রভাবিত করিয়া থাকিবে। ১৯৫১ সনেই দিল্লীর জনসংখ্যার শতকরা ২'৪ জন স্নাতক বা গ্রাজুয়েট। মোট সংখ্যা ১৭'৪৪ লক্ষ, তন্মধ্যে গ্রাজুয়েট ৪২,৪২৮, পুরুষ ৩৪,৪৫৯, নারী ৭,৯৭৪ মাত্র। আশা করা যায় ইহার খুব বড় একটা সরকারী বা আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানে জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া থাকে।

পাঞ্জাব রাজ্যের ভাগ্য অনেকের অপেক্ষা সুপ্রসন্ন। এই নিরক্ষর বহুল ভারতবর্ষে শতকরা একজন (অতি সামান্য কম) স্নাতক সৃষ্টি করা কম গৌরবের কথা নহে। মোট জনসংখ্যা ১৬১'৩৫ লক্ষ; তন্মধ্যে গ্রাজুয়েট (১৯৫১ সনে) ছিল ১,৬২,৩৪৯ জন। ইহা কম কৃতিত্বের কথা নহে। নিয়ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা লুঠতরাজ, রাজ্য বিভাগের সমস্ত পাপ বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও ইংরেজ চলিয়া যাইবার অব্যবহিত পরে এই পরিচয় অপর রাজ্যকে একটা উচ্চশিক্ষার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে আভাস দিতে পারে।

তাহার পর অন্ধ্রের স্থান পুরুষ ও নারী মিলিয়া গ্রাজুয়েট ছিলেন ৭০,০০৬; জনসংখ্যা এক কোটিরও প্রায় দশ লক্ষ কম, অর্থাৎ ৯০'৪৫ লক্ষ। গ্রাজুয়েটের হার দাঁড়াইতেছে '৭৭ প্রতি শতজনে। ইহা লইয়া অন্ধ্র ভারতের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল।

পশ্চিম বাংলার স্থান ইহার পরই আসিতেছে, অর্থাৎ ভারতীয় রাজ্যসমূহের মধ্যে চতুর্থ। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, রাজ্য বিভাগ সংক্রান্ত অশান্তি, অত্যাচার সব মিলিয়া রাজ্যটিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া রাখিয়াছে, তৎসত্ত্বেও গ্রাজুয়েটের সংখ্যা ১,৪৪,৭০৪ মোট লোকসংখ্যা তখন ২৬৩ লক্ষ। এই হিসাবে গ্রাজুয়েটের হার দাঁড়াইয়াছে শতকরা '৫৫ জন।

বিস্তারিত হিসাব কেরল ন্যায্য দাবী করিতে পারে কারণ এই হিসাবে তাহার স্থান পঞ্চম, লোকসংখ্যা ১৩৫'৪৯ লক্ষ, গ্রাজুয়েট ৫৭,৪৭৬ জন পুরুষ ও নারী। বোম্বাই ষষ্ঠ ('৩৬%), উত্তর প্রদেশ সপ্তম ('৩৪%), মহীশূর অষ্টম ('২৪%), মাদ্রাজ নবম ('২৩%) ও রাজস্থান দশম ('২০%) স্থান অধিকার করিতেছে।

অনুসন্ধিৎসু পাঠকের সুবিধার জন্য নিম্নে সংখ্যা-তালিকায় বিস্তারিত পরিচয় দেওয়া হইতেছে। (ইংরেজী বর্ণমালা অনুসারে রাজ্যের নাম সাজানো হইয়াছে):

রাজ্য	মোট জনসংখ্যা (হাজার)	মোট গ্রাজুয়েট	পুরুষ	স্ত্রী	শতকরা
অন্ধ্র	৩,১২,৬০	৭০,০০৬	৬২,৪১৩	৭,৫৯৩	'৭৭
আসাম	৯০,৪৪	১৬,৮০৮	১৫,৭৮৫	১,০২৪	'১৮
বিহার	৩,৮৭,৮৪	৭৪,৭১৫	৬৮,৪০২	৬,৩১৩	'১৯
বোম্বাই	৪,৮২,৬৫	১,৭২,৭২৮	১,৪০,৭৭২	৩১,৯৫৬	'৩৬
কেরল	১,৩৫,৪৯	৫৭,৪৭৬	৪৩,৬৭১	১৩,৮০৫	'৪২
মধ্যপ্রদেশ	২,৬০,৭২	৪২,১৭৭	৩১,৬৬৩	১০,৫১৪	'১৬
মাদ্রাজ	২,৯৯,৭৫	৭১,০৩১	৫৭,৩৫৪	১৩,৬৭৭	'২৩
মহীশূর	১,৯৪,০১	৪৮,১৭২	৪৩,১৩৮	৫,০৩৪	'২৪

রাজস্থান	১,৫৯,৭১	৩২,৮২৫	২৯,২৮৭	৩,৫৩৮	·২০
উত্তর প্রদেশ	৬,৩২,১৬	২,১৭,৭১০	১,৯২,৯২৩	২৪,৭৮৭	·৩৪
পশ্চিম বাংলা	২,৬৩,০২	১,৪৪,৭০৪	১,৩৩,৯৩৪	১০,৭৭০	·৫৫
		কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল			
আন্দামান নিকোবর	৩১	৮৮	৮১	৭	
দিল্লী	১৭,৪৪	৪২,৪২৮	৩৪,৪৫৪	৭,৯৭৪	২·৪৫
হিমাচল প্রদেশ	৪১,০৯	১,৫৯৫	১,৫৭৩	৩৮৬	
লাক্কাদীপ দিঃ	১১	১৫	১৫	—	
মণিপুর	৫,৭৮	৫০০	৪৮১	১৭	
ত্রিপুরা	৬,২৯	১,১২২	১,০৩৪	৯৮	
সিকিম	১,৩৬	৪৬	৩৬	১০	

ইহার পর শিক্ষার দ্রুত প্রসার হইয়াছে এবং পাঠশালা ও ছাত্রসংখ্যা উভয়ই বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪৭-৪৮ হইতে ১৯৫৬ সন পর্য্যন্ত দশ বৎসরে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষালাভার্থীর সংখ্যা নির্বাচিত বা নন্‌-নির্বাচিত বিদ্যালয়ে ১৯৪৭-৪৮ সনে ছাত্র ১,০৭,১১,৯৪৭ ও ২৪,৯৭,৪২৭ জন ছাত্রী ছিল এবং তাহার উপর সম্পূর্ণ বে-সরকারী পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২,২২,৪৭৬ ছাত্র ও ১৫,৮৯২ ছাত্রী, অর্থাৎ মোট ছাত্র ১,১০,৩৬,৪২৩ ও ছাত্রী ২৫,৪৯,৩০২ জন ছিল। দশ বৎসর বাদে ইহা ২,৬০,০৮,২৮৮ ছাত্র ও ৯৯,৯৭,১১১ জন ছাত্রী হইয়াছে, অর্থাৎ ছাত্র বাড়িয়াছে ১৫০ লক্ষ আর ছাত্রী সংখ্যা ৭৪·৪৮ লক্ষ, অর্থাৎ ছাত্র সংখ্যা দ্বিগুণের সামান্য বেশী আর ছাত্রী সংখ্যা তিনগুণের সামান্য কম।

এইবার স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যার উল্লেখ করা প্রয়োজন। বি. এ. ও বি. এস-সি. ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ১৯৪৭-৪৮ সনে ছিল ছাত্র ৪৫,৭৬১ এবং ছাত্রী ৯,২৪১। দশ বৎসরে (১৯৫৬-৫৭) ইহা যথাক্রমে ১,৩৮,৮৫০ ও ২৯,৮৬৮ হইয়াছে। মোট ছাত্র-ছাত্রী বৃদ্ধির অনুপাত এখানেও প্রায় রক্ষিত হইয়াছে; তবে ছাত্রের ক্ষেত্রে দ্বিগুণের সামান্য বেশী (৯,২৪১ হইতে ২৯,৮৬৮), ছাত্রীর ক্ষেত্রে আড়াইগুণেরও বেশ কিছু কম (৯,২৪১ হইতে ২৯,৮৬৮ জন)। তাহা হইলেও স্ত্রী-শিক্ষার ক্ষেত্রে যে আগুন চাপা ছিল, তাহা আজ অনুকূল হাওয়ায় কিরূপ দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে। আরও দশ বৎসর বাদে দেখা যাইবে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ছাত্র-ছাত্রী সমান সংখ্যক হইয়া গিয়াছে। এখনও বহু স্কুল কলেজে সহশিক্ষা প্রচলিত নাই, সেই কারণে অনেক স্থলে অল্প সংখ্যক ছাত্রীদের জন্য যেখানে স্বতন্ত্র স্কুল কলেজ খোলা সম্ভব হয় নাই, সেখানে ছাত্রীদের শিক্ষা ব্যাহত হইতেছে।

স্নাতকোত্তর শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই পরিবর্ত্তন বিশেষ লক্ষ্যণীয়। ১৯৪৭-৪৮ সনে যখন এম. এ. ও এম. এস-সি. ছাত্রী মাত্র ৯৯২ ছিল তাহার দশ বৎসরে এই সংখ্যা চতুর্গুণেরও বেশী হইয়াছে, অর্থাৎ ৪,৫২৯; সে অনুপাতে ছাত্রদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় নাই, অর্থাৎ ৬,১১১ হইতে ১৭,২১৩ হইয়াছে।

গবেষণা (research)-র ক্ষেত্রে ছাত্রীরা বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এখানে বৃদ্ধির হার আট গুণেরও বেশী। যখন কবি গাহিয়াছিলেন, "না জাগিলে সব ভারতললনা, ইত্যাদি" তখনকার দিনের সহিত আজ তুলনা করিলে তিনি নিশ্চয়ই আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িতেন এবং বলিতেন যে, এ ভারত-ভূমি সত্য সত্যই জাগিয়াছে। ১৯৪৭-৪৮ সনে ৫১টি মহিলা যখন গবেষণা কার্য্যে লিপ্তা ছিলেন, আজ তাহা ৪২৫ হইয়াছে, গবেষক ছাত্র এখানে বিশেষ সুবিধা করিতে পারে নাই, তাহার বৃদ্ধির হার চারগুণের সামান্য বেশী; মোট ৪৫৮ হইতে ২,৪৯৮ হইয়াছে।

সকল ক্ষেত্রেই স্ত্রী-শিক্ষার হার অতি দ্রুত হইয়াছে, তবে এখনও অনেক বাকী, কারণ আলোচ্য দশ বৎসরে প্রায় সাড়ে নয় কোটি লোকও ত বাড়িয়াছে এবং আজ যে সংখ্যা লইয়া আলোচনা করিতেছি, তখন ভারতের জনসংখ্যা ৪০ কোটি অতিক্রম করিতে চলিয়াছে। বিদ্যাদান শিক্ষার ক্ষেত্রে ১৯৪৮-৪৯ হইতে ১৯৫৬-৫৭, মাত্র নয় বৎসরে মহিলা সংখ্যা বাড়িয়াছে ১,৩৪৯ হইতে ২৫,৯১৪; আর পুরুষ ৩,৪৪৪ হইতে ৬৯,৫৬০ হইয়াছে, অর্থাৎ প্রত্যেকটি ১৯।২০ গুণ।

অন্যান্য সকল শিক্ষা ক্ষেত্রেই এই লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে, বর্ত্তমানে তাহার আর বিশদ পরিচয় দিয়া লাভ নাই। এই স্নাতক (B. A. or B. Sc.) বা শিক্ষার্থী

ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা দিয়াই আমরা আনন্দ লাভ করিতে পারি। বস্তুতঃ এই সংখ্যার সহিত দেশের মধ্যে উচ্চ-শিক্ষার সুফল যদি দেখিতে পাওয়া যাইত, তাহা হইলে দেশের যথেষ্ট মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা ছিল। ইংরেজ আমলে বলা হইত, বিশ্ববিদ্যালয় গোলামি শিখাইবার জন্য চালু আছে, তখন বিদেশী ছিল, অনেক গলদ তাহাদের ঘাড়ে চাপাইয়া মনকে চোখ ঠারিয়া চালাইতে পারিতাম। আজ সে বালাই নাই। শিক্ষিতের সংখ্যা, শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও শিক্ষার খাতে ব্যয়ের পরিমাণ খাতা-পত্রে দেখাইয়া যত কৃতিত্ব শেষ হইয়া যাইতেছে। উচ্চ-শিক্ষালব্ধ লোক নিজেদের যে পরিচয় দিলে দেশের মুখ উজ্জ্বল হইত তাহা হয় নাই। চাকুরির বাজারে উচ্চ-শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা সামান্য বেতন ও নিম্নশিক্ষিত লোকে যাহা সম্পন্ন করিতে পারে সেই সকল ক্ষেত্রেও ভিড় বাড়িতেছে। স্নাতক ও তদূর্ধ্ব শিক্ষিতের এক দল হইয়া পড়িয়াছে। মানুষের অন্তর্নিহিত যে সকল শক্তি আছে, তাহা স্ফুরণের সহায়তা করিতে পারে বলিয়া শিক্ষার প্রয়োজন। উচ্চশিক্ষালাভে মনের গভীরতর স্তরে যে সকল গুণ স্বল্প-শিক্ষায় ফুটিয়া উঠিবার সুযোগ পায় না, মানুষের আত্মজ্ঞান, আত্মবিশ্বাস নিজ স্থান গ্রহণে সক্ষম হয় না, উচ্চশিক্ষা তাহারই সহায়ক। আজ শিশু হইতে বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে সে বিষয়ের উপর তত গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। পড়িতে হয় তাই পড়া, শিখিতে হয় তাই শেখা। অন্য লাভজনক কাজ হাতের কাছে নাই, এমন কি মেয়েদের বিবাহের জন্য যথাসময়ে উপযুক্ত পাত্রের অভাবও উচ্চশিক্ষার পথে লইয়া যায়। মহিলা স্নাতকের একটা বড় অংশ এই পর্য্যায়ে স্থান পাইবার যোগ্য।

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আজকাল আর কাহারও সুস্পষ্ট কেন, অস্পষ্ট ধারণাও নাই। শিক্ষিত, তাহার উপর উচ্চ-শিক্ষিত বলিলে যেমন মানুষটির প্রতিকৃতি মনের মধ্যে আসিয়া এককালে উপস্থিত হইত, আজ আর তাহা হয় না। সংখ্যাবৃদ্ধিই ইহার এক মাত্র কারণ নয়, যে-গুণে ভূষিত হইলে "উচ্চশিক্ষিত" বলা যায় তাহার আজ একান্ত অভাব হইয়াছে। এই অভাব দূর করিবার কোনও চেষ্টার কথা শোনা যায় না, তৎপরিবর্ত্তে শোনা যায় যে, কলেজে গিয়া অজস্র ছাত্র-ছাত্রীর বহু মূল্য সময়, কষ্টার্জ্জিত অর্থ নষ্ট হয়, কারণ ইহাদের অধিকাংশই কলেজে ভর্ত্তি হইবার যোগ্যতা ধারণ করে না, সুতরাং উচ্চশিক্ষালাভে স্বল্পসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে সীমিত করিয়া দাও। বাকী কয়েক কোটি নানা স্তরের ছাত্র-ছাত্রী রহিয়া গেল, তাহাদের উচ্চশিক্ষা না হয় নাই-ই হউক। প্রকৃত শিক্ষার একটা পথ নির্দ্দেশ করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

খাতা

গল্প-প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প

শ্রীমতী সাধনা কর

রক্তে যেন আগুন ধরে গেল। মনে হতে লাগল—কাজ ছেড়ে বেরিয়ে যায়, এই মুহূর্তে। যদি তা পারত! মাথায় রক্ত চন্ চন্ করে উঠল। সম্ভব নয়, কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। বড়বাবু সেটা খুব ভালোভাবেই জানেন, তাই না নির্বিবাদে এমন অবিচার করতে পারলেন। এতদিন এমন একটা ভাব দেখিয়ে এসেছেন যেন পাঁচশ' টাকা গ্রেডের উচ্চতর পদটার একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি রণেনই। প্রায় সাত বছর হতে চলল রণেন এ অফিসে দক্ষতা এবং বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাজ করে চলেছে। সহকর্মিগণ অবধি অনতিবিলম্বে তার উন্নতি আশা করছিল। বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতো খবর শোনা গেল—উচ্চতর পদটিতে নূতন একজন লোক নিযুক্ত হয়েছেন—সদ্য পাস করা; যোগ্যতার মধ্যে বিলেত থেকে এসেছেন এইমাত্র। গুজব তিনি বড়বাবুর জ্ঞাতভাই। বড়বাবুর জ্ঞাতিপ্রীতি অফিসে বিখ্যাত। এ নিয়ে কিছু বলার নেই। সারাটা দিন রণেন কাজে মন দিতে পারলে না। মেজাজ একেবারেই বিগড়ে রইল।

বাড়ি ফিরে চা খেতে বসেও রণেন অত্যন্ত অন্যমনস্ক ছিল। ভাবছিল—কেমন করে বড়বাবুকে শিক্ষা দেওয়া যায়। সূক্ষ্ম অথচ তীক্ষ্ণ আঘাত—তারই মতো তিনিও সে আঘাত মর্মে মর্মে উপলব্ধি করবেন, কিছু বলতে পারবেন না, কিছু করতেও পারবেন না। শিক্ষিত ভদ্র-লোক তাঁরা—সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ঘাত-প্রতিঘাতেই যে তাঁদের সংঘাত চালাতে হয়। আপন ভাবনাতেই রণেন এত মগ্ন ছিল যে উমনী কী বললে না-বললে কানেও গেল না। মুখেই শুধু বললে—হুঁ, আচ্ছা।

পরক্ষণেই মা এসে দাঁড়ালেন। কী যে বলে গেলেন তাও কি সে শুনতে পেল, হঠাৎ বিরক্তিভরে বলে ফেললে—আঃ, শুনেছি, আর বক্ বক্ করো না, যাও।

মা রুষ্টস্বরে বললেন—আমি কথা বলতে এলেই বক্ বক্ করা হয়। কিন্তু দিনের পর দিন যে চলে যাচ্ছে। পুজোর আগেই নাকি একটা পরীক্ষা হবে, পুজোর পর আরেকটা, মাষ্টার রাখলে এখন থেকেই···

ফোঁস করে বলে উঠল উমনী—সস্তায় পাওয়া গেলেই তবে না টিউটর রাখার প্রশ্ন ওঠে।

মা রেগে উঠলেন—কেন, সংসারের উনকোটি কাজ তো চলছে! বাজে খরচও তো কম হচ্ছে না।

কী বাজে খরচ আপনি দেখছেন? এ দিকে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়! কী দিয়ে কী করতে হচ্ছে, কে খোঁজ রাখে!

—তাই বই কি? এটা না হলে নয়, ওটা না হলে নয়···

কথার পৃষ্ঠে কথায় একটা খণ্ড বচসা জমাট বেঁধে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে ধৈর্যচ্যুতি ঘটে গেল রণেনের। চরম বিরক্তিভরে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল। তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের স্বরে বললে—হবে, সবই হবে তোমাদের। যত সাধ সব পূর্ণ হবে, পথে নেমে দাঁড়ালে পরে। ভাগ্যে তাই আছে, না হলে এমন হবে কেন!

চেয়ারের পিঠে একটু আগে ঝুলিয়ে-রাখা পাঞ্জাবিটা গায়ে চড়াতে চড়াতে সে বিড় বিড় করে বললে, সকলে মিলে প্রাণটাকে অতিষ্ঠ করে তুললে।

রণেন বেরিয়ে যেতে উদ্যত হ'ল। ওঘর থেকে পড়া ফেলে ছুটে এল সন্ধ্যা—না খেয়ে যাচ্ছ যে! দাদা—শোনো, শোনো—!

সে পানের বাটা থেকে পান নিয়ে এগিয়ে এল—পান নিয়ে যাও।

পান রণেনের প্রিয়বস্তু। কিন্তু আজ সে ফিরেও তাকালে না। মা পিছনে পিছনে এসে আর্তস্বরে ডাকলেন—এই রুণু, শোন শোন্, খাবার ফেলে রেখে যাসনে, আমি ঘাট মানছি, আর যদি কখনও বলেছি···

রণেন ততক্ষণে হন্ হন্ করে নীচে নেমে এসেছে। শুনতে পেল সন্ধ্যা তীব্রস্বরে বলছে—মানুষ নও, তোমরা মানুষ নও। একজন লোক অফিস থেকে এলো, তাকে কোথায় একটু বিশ্রাম করতে দেবে, তা নয়, এখনই তোমাদের যত কথা, যত ঝগড়া! করো, যত খুশী ঝগড়া করো, চেঁচামেচি করো, ভদ্রলোক তো আর নেই!

মায়ের গলা শোনা গেল; এতদূর থেকে বোঝা গেল না কি বললেন। বকুক, যত ইচ্ছে ঝগড়া করুক সবাই—বাড়ি তো নয় যেন নরককুণ্ড। সন্ধ্যা ঠিকই বলেছে—ভদ্রলোক তো আর নেই। নেবে গেছে, ভদ্রতা-রুচি

সব বিসর্জন দিয়ে অনেকখানি নেবে গেছে। নয় তো হামেশাই এমন ঝগড়া, খিটিমিটি লেগে থাকে! প্রতি মুহূর্তে কেবল হাজার রকমের দাবি, স্তূপাকৃতি অশান্তিতে ক্ষণে ক্ষণে ধৈর্যচ্যুতি—প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের সম্পর্ক শিথিল হয়ে এ কী তিক্ত রূপ প্রকাশ পাচ্ছে দিনে দিনে!

রণেন ট্রাম-লাইনের কাছে এসে থামল। হাতঘড়িটা দেখলে—রাগের ঝোঁকে মিনিট কুড়ি পঁচিশ আগেই সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে টিউশনির জন্য। ইচ্ছে হ'ল না সেখানে এত আগে যেতে। দোকান থেকে পান কিনে মুখে পুরলে। তার পরে মন্থর গতিতে গিয়ে সামনের পার্কে ঢুকল। শ্রাবণের প্রথম দিক। ক'দিন বৃষ্টি বন্ধ। অসহ্য গুমোট। রণেন এসে নরম ঘাসের উপর বসে পড়ল। হাহাকার করে উঠল মনটা—কত দিন, কত বছর চলে গেছে—বিকেলে সে পার্কে এসে বসে নি। এক সময় এটা তার প্রধান সখ ছিল। কলেজ-জীবনে সহপাঠীরা দল বেঁধে যেত সিনেমায়, যেত খেলার মাঠে খেলা দেখতে, সে একা-একা বেরিয়ে পড়ত, বসত গিয়ে গঙ্গার তীরে, নয় তো হেদুয়ার ধারে, নয় তো বা কোনো পার্কের কোণে। নির্লিপ্তভাবে আপন মনে একান্তে বসে বিকেলের রঙ-ফেরা এবং লোকজনের চলা-ফেরা দেখে সে পেত গভীর আনন্দ। দেশে থাকতে নদী ছিল কাছে; সকাল-বিকাল একচক্কর ঘুরে আসত। দেশ ভাগ হবার পরে কলকাতায় এসে আট-ন' বছরের মধ্যে ক'টা দিনই বা ফুরসৎ মিলেছে মাঠে এসে বসবার বা হেদুয়ার ধারে যাবার! প্রথম-প্রথম কলকাতায় এসে উষসীকে নিয়ে বেড়াতে বের হ'ত; মাঝে মাঝে বসত এসে কোনো পার্কে। কোথায় হারিয়ে গেছে সে সব সাধ-আহ্লাদ; কবে-বা মিলেছে ফুরসৎ! বরঞ্চ মনে যদি বা কোনো সময় একটু রঙ ধরে আসে, ভয়ে বুক দুরু দুরু করে ওঠে। কলকাতা আসার আগে ছিল মাত্র বড় খুকী, এখানে এসে আরো তিনটি কোলে এসেছে; আর একটিও বাঞ্ছনীয় নয়। প্রথম সন্তান আগমনের আশা-আনন্দ এখন ভয়ে আতঙ্কে পরিণত হয়েছে। এখন উষসীর কেবল সংসার ছেলেমেয়ে; রণেনের আপিস, টিউশনি, হাট-বাজারের ধান্দা—বছরের পর বছর এমনি কেটে যাচ্ছে।

অতীত স্মৃতি জাগরূক হয়ে মনটা কখন শান্ত হয়ে এসেছিল। পার্কের চারপাশে রকমারি ফুল ফুটেছে। ফুলের মতোই খেলা করে বেড়াচ্ছে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা; দুলছে৷ ছুটছে, আমোদে মশগুল। রণেন সিগারেট-কেস থেকে সিগারেট নিয়ে মুখে দিলে; হাত-পা ছড়িয়ে বসল—থাকুগে টিউশনি, একদিন দেরী করে গেলে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হবে! খেটে-খেটেই না তার মেজাজটাও এমন বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছে! একুশ বছর বয়সে যে-রণেন সংসারের দায়িত্ব গ্রহণ করতে কিছুমাত্র ভয় পায়নি—ধৈর্যশীল বলে নিজেরই যার বেশ গর্ব ছিল এমন হ'ল সে কেমন করে। কারণে-অকারণে মেজাজ রুক্ষ হয়ে ওঠে। মা এবং উষসীর উপর রাগ করবার কী হয়েছিল? কি এমন অপরাধ করেছিল তারা? সকাল হতে না হতে কোনো রকমে ছোট ভাই নীলুটুকে একটু পড়া দেখিয়ে দিয়েই ছোটে বাজারে, তার পরে অফিসে; বেলাশেষে বাড়ি এসে চা খেয়েই বের হয় টিউশনিতে। ফিরতে রাত দশটা। রয়ে-সয়ে জিরিয়ে-জুড়িয়ে কথা বলার অবসর কোথায়? মা এমন কী অন্যায্য কথাই বা বলেছিলেন! নীলুটু অঙ্কে কাঁচা। এবার স্কুল ফাইন্যাল দেবে, সামনে পরীক্ষা। অন্য বিষয়ে রণেনই তাকে সাহায্য করে কিন্তু ওদের অঙ্ক সে ভুলে গেছে। একজন টিউটর রেখে দিলে ছেলেটা ভালো পাস করতে পারে। নিজেই সে একদিন টিউটর রাখার অভিপ্রায় প্রকাশ করেছিল।

কিন্তু একজন ভালো প্রাইভেট টিউটর পঁচিশ-ত্রিশ টাকার কমে পাওয়া যায় না। টিউটরিয়েল হোমে ভর্তি করানোও অসুবিধে। কাছাকাছি কোনো হোম্ নেই, উপরন্তু সেখানে গিয়ে খুব যে কিছু উপকার হবে এ ভরসাও রণেনের নেই। প্রাইভেট টিউটর রাখারই প্রয়োজন। নয়ে উঠছে না। সন্ধ্যারও এবার আই. এ. পরীক্ষা। এতদিন সে একটা প্রাইমারী স্কুলে কাজ করত, কিছুটা সাহায্য হ'ত রণেনের। মেয়েটার শরীরটা সুস্থ নয়। পড়াশুনা আর স্কুল—দুটোই একসঙ্গে চালাতে পারছিল না। রণেনই তাকে একরকম জোর করে কাজ ছাড়িয়েছে এ ক'মাসের জন্য—আই. এ., বি. এ. পাশ করতে পারলে টাকার অভাব হবে না। ভবিষ্যতের আশায় বর্তমানকে ছাড়তে হয়েছে। এখন আর সব-রকম ঝুঁকি না ভেবেচিন্তে নিতে সে সাহস পায় না। মাসখানেক ধরে তাই টিউটর রাখার গড়িমসি চলছে। মা মাঝে মাঝে সে কথা স্মরণ করিয়ে দেন। আজও বলতে এসেছিলেন। অকস্মাৎ তার ক্রোধ কেন এমন দাউ দাউ করে উঠল! একি সেই অফিসের তিক্ততার জের নয়? বড়বাবুর উপর প্রতিশোধ না নিতে পেরে মা-বউয়ের উপর আক্রোশ মিটিয়েছে সে। অন্তর সঙ্কুচিত হয়ে উঠল। ছিঃ ছিঃ, কি হয়েছে সে!

ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী শিল্পী : শ্রীচিত্রনিভা চৌধুরী

আশীর্ব্বাদ :

চিত্ত হরি নিলে তুমি দেখায়ে তব চি-
ত্র-সম্ভার, অবলীলাক্রমে কত রচি।
নিখুঁত হউক তব আলেখ্য সকল,
ভাস্কর্য্যে চিত্রণে হোক্ সমান দখল॥

শান্তিনিকেতন, বর্ষশেষ, ১৩৫২] শ্রীইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী।

চিন্তা ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল হাতঘড়ির দিকে চোখ পড়তে। চমকে দাঁড়িয়ে উঠল বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মতো। সাতটা-পাঁচ—ছাত্র পড়ানোর সময় বয়ে যায়। ট্রাম আসছে একটা—হন্ হন্ করে এগিয়ে গেল সে। অন্যদিন হেঁটেই টিউশনিতে যায়, আজ আর সময় নেই, ক'টা পয়সা খরচ করতেই হবে। মনে কামড় দিল—নিছক একটা খোস-খেয়ালের জন্য পয়সা খরচ করতে হ'ল! পার্কে ব'সে সে কি বিকেলের রং-ফেরা দেখেছে, উপভোগ করেছে লোকজনের যাতায়াত, পান করেছে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আনন্দ-মাধুরী? সময়টা তো কেটে গেল সেই বাড়ীর চিন্তাতেই, অফিসের জালাতাই খচ্ খচ্ করছে সারাক্ষণ। বিক্ষোভটা স্তূপীকৃত হয়ে উঠল নিজের উপরেই—বসে বসে চিন্তা-বিলাসিতায় টিউশনির দেরী করে ফেললে।

দ্রুতপায়ে হাঁটতে হাঁটতে পার্কের গেটের সামনে এসে থমকে দাঁড়ান রণেন। কানকে বিশ্বাস করতে পারলে না—গানের কলিটা কি সে ভুল শুনলে? পার্কের এপাশে একটা বাড়িতে কিসের উৎসব। মাইকে অনেকক্ষণ থেকেই রেকর্ড চালিয়েছিল। নূতন একটা গান সবে দিয়েছে। পদগুলি কানে যেতে অবাক হয়ে গেল সে—এ কার গান, কে গাইছে? রণেন নিস্পন্দ হয়ে শুনল! এ যে তারই কবিতা—লিখে দিয়েছিল সুনন্দার খাতায়। এও কি সম্ভব! সুনন্দা তার রচিত কবিতায় সুর বসিয়ে রেকর্ড করেছে!

গান-বাজনা একটুক্ষণ থেমে গিয়ে আবার মাইক বেজে উঠল—রেকর্ডের বিপরীত দিকটা চালানো হয়েছে নিশ্চয়। রণেনের মুখ তার আনন্দোচ্ছ্বাসে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল—আর কি ভুল হয়! এও যে তারই রচিত। স্বপ্নাবিষ্টের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনল সে। কে গেয়েছে, সুনন্দা? না, আর কাউকে দিয়েছে সে গান গাইতে! কবিতা দুটো লিখে দিয়ে সে বলেছিল—"বেসুরো গায়িকাকে দিলাম।" সত্যি সত্যি সেই দানই আজ গান হয়ে তবে ফুটে উঠেছে! সুনন্দার গলাও বেশ মিষ্টি ছিল, কিন্তু গান শিখবার ধৈর্য ছিল না একটুও। সারাক্ষণ বেসুরো-বেতালা সুর ভাঁজত। রণেন কেমন বিচলিত বোধ করলে। ভুলেই গেল,—টিউশনিতে যাচ্ছিল সে। আকাশ-কোণে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বিষ্টি আসছে ঝেঁপে। সমস্ত মন জুড়ে রেকর্ডের সুরে বেজে উঠল—সুনন্দা, সুনন্দা, তার স্বপ্নের সুনন্দা।

অল্পবয়সী একটি ছেলে যাচ্ছিল, রণেন এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—এ রেকর্ডটা কার।

—সুচন্দ্রা চ্যাটার্জির!

একটু থতমত খেয়ে গেল রণেন। সুচন্দ্রা চ্যাটার্জি! দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে বললে—কি বললে, সুচন্দ্রা, না সুনন্দা?

—সুচন্দ্রা চ্যাটার্জির নাম শোনেন নি? অল্প দিনে বেশ নাম করে উঠেছেন। রেডিওতে তো প্রায়ই গান থাকে।

রণেন অপ্রতিভ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। রেডিও তাদের পাড়ায় আছে, পথ চলতে চলতে দু'চারটে গানও কানে যায়, দাঁড়িয়ে আর শোনা হয় না। খবরের কাগজে রেডিওর প্রোগ্রামে সুচন্দ্রা চ্যাটার্জির নাম হয়তো চোখে পড়েছে—সেই যে সুনন্দা, কে তা ভাবতে পেরেছে! কিংবা সুনন্দাই কি সুচন্দ্রা, না অন্য কোনো মেয়ে।

ঔৎসুক্যে চঞ্চল হ'ল রণেন। কোথায় সঠিক খোঁজ পাওয়া যায়? মনে পড়ল, 'হিজ্ মাস্টারস ভয়েস' কোম্পানীতে তাদের গ্রামেরই একজন লোক কাজ করেন। হয়তো সুনন্দার ঠিকানা জানতে পারেন। মনের ইচ্ছা প্রবলতর হ'য়ে তাকে বাস-ষ্ট্যাণ্ডের কাছে দাঁড় করিয়ে দিলে এবং বাস আসতে তাতে সে উঠেও বসল। কি হবে! না হয় একটা দিন ছুটো টিউশনি কামাই করলে!

বহুদিন আগে একটি ছেলে গ্রাম থেকে এসে কলকাতার এক কলেজে ভর্তি হয়েছিল। অমরনাথ সোম ছিলেন হোষ্টেল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং ইংলিশের প্রফেসর। রণেন পড়াশুনায় ভালো, অল্পদিনেই সে তাঁর স্নেহ আকর্ষণ করেছিল। অমরনাথের মেজো ছেলে নন্দও পড়ত রণেনের সঙ্গে। দু'জনেরই ছিল সাহিত্য-চর্চার বাতিক। ছুটির দিনটা ওদের বাড়াতেই কাটত, নানা বই প'ড়ে নানারকম আলোচনা ক'রে আর ক্যারম-ব্যাডমিণ্টন খেলে। ভালো খেলবার জেদ রণেনের উত্তরোত্তর বেড়ে গিয়েছিল। অমরনাথ সোমের আদুরী মেয়ে সুনন্দা—ক্যারমে ওস্তাদ, ব্যাডমিণ্টনে অদ্বিতীয়। রণেনের পেছনে লাগত অষ্টপ্রহর—বই-র পোকা, ভীতু বাঙালী, ল্যাগপেগে সিং! রোগা লম্বা ছিল রণেন। আর সুনন্দার স্বাস্থ্য ছিল অত্যধিক ভালো। রণেন কেবল চেষ্টা করত খেলায় ওকে পরাজিত করতে। পারত না, জেদ চেপে যেত দুর্দমনীয়। হারাতে হবে ওকে, হারাতেই হবে। একদিন ওকে হারিয়েও ছিল—খেলায় নয়, কবিতায়। ওর মন জয় করেছিল কবিতা লিখে। কলেজে কবিতা রচনায় শ্রেষ্ঠ ছিল রণেন। মাসিক পত্রিকায়ও দু'চারটে তখন বের হতে সুরু হয়েছিল। একবার একটা বিখ্যাত মাসিক পত্রিকায় তার কবিতা

প্রকাশিত হ'ল। অমরনাথ এবং অমরনাথের স্ত্রী প্রশংসা-মুখর হয়ে তাকে আশীর্বাদ করলেন। সুনন্দা নাক সিটকে বললে, এক ঘণ্টা আকাশের দিকে চেয়ে বসে থেকে দু' লাইন কবিতা! লিখতে ও সবাই পারে! এক্ষুণি বসে যদি লিখে দিতে পার তো বুঝি ক্ষমতা!

রণেন ওর খাতা টেনে নিয়ে তক্ষুণি লিখে দিয়েছিল একটা নয়, দুটো কবিতা। দুষ্টুমি করে বলেছিল, "বেসুরো গানের উত্তরে!"

হো হো ক'রে হেসেছিল সবাই। সুনন্দার গলা মিষ্টি, তাতে কাজও ছিল সুন্দর। কিন্তু ধৈর্য ধরে মনোযোগ দিয়ে তালে-মানে গান শিখবেই বা কে, গাইবেই বা কে? সুনন্দা গানে টান দিলেই নন্দন আর রণেন হৈ-চৈ করে উঠত। সুনন্দার চোখে সেদিন সেই প্রথম প্রশংসা ফুটে উঠেছিল তার ক্ষমতা দেখে। কিন্তু ঠাট্টা শুনে পাল্টা সেও বলে উঠেছিল—আচ্ছা, আমিও গানের রেকর্ড করব। তখন দেখে নিও!

হো হো করে নন্দন আর রণেন আবার হেসে উঠল। নন্দন বললে, তুই যেদিন গানের রেকর্ড করবি, রণেন সেদিন কবিতা লিখে নোবেল-প্রাইজ পাবে।

রণেনও কৃত্রিম গাম্ভীর্যে সজোরে মাথা নেড়ে বললে, নিশ্চয়, নিশ্চয়!

সুনন্দা প্রতিবাদ করে নি, একটু হেসে বলেছিল, সুনন্দা সোম যদি রণেন রায়ের রচিত গান রেকর্ড করে সেটা হবে তার পক্ষে পরম সম্মানের, নোবেল-প্রাইজ পাবারই সামিল হবে।

প্রত্যেকটি কথা প্রত্যেকটি ঘটনা স্পষ্ট মনে আছে তো! সুনন্দা তার সেই কথা তবে ভোলে নি! সুনন্দা! সুনন্দা! সুনন্দা!—রণেনের সমস্ত মন-প্রাণ যেন জল-তরঙ্গের মতো বেজে চলল।

গন্তব্যস্থানে নেমে কিছুটা হেঁটেই গ্রামোফোন-কোম্পানীর বাড়ী। খোঁজখবর নিয়ে জানল—সুচন্দ্রা চ্যাটার্জিই মাস দু'তিন আগে গান দু'খানি রেকর্ড করেছে। গানের রচয়িতা কোনো এক রণেন রায়। সে ভদ্রলোক এসে তো টাকা নিয়ে গেলেন না! রণেনের বুকের ভিতর শত শত মত্ত হস্তী দাপাদাপি শুরু করে দিলে—টাকা! গানের রচয়িতা টাকা পায়? সংযত ভাবে নিরুৎসুক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে—গান পিছু কত দেওয়া হয় রচয়িতাকে?

—দশ। তবে গান লোকপ্রিয় হলে একটু বেশী দেওয়া চলে।

রণেনের কেমন একটা আত্মমর্য্যাদা জেগে উঠল। গম্ভীরভাবে নিজের পরিচয় দিলে। উপস্থিত সকলের চোখে, একটা সম্ভ্রমসূচক চাহনি প্রকাশ পেল। তার গাঁয়ের লোকটি তো অবাক হয়েই চেয়ে রইল। দু'এক-জন জিজ্ঞেস করলে—আপনি লেখেন বুঝি? কোন্ কাগজে বের হয়? সিনেমার গান লেখেন? ওতেই তো আজকাল পয়সা!

রণেন তাৎপর্যপূর্ণ গলায় উত্তর দিলে—কমার্শিয়ালের যুগ মশাই, গান কবিতাই বা তার থেকে বাদ যাবে কেন?

—তা অবশ্য, তা অবশ্য।

—সুচন্দ্রা চ্যাটার্জি আপনার আত্মীয় হন? ছাত্রী তো তিনি রাধানাথ গোস্বামীর।

কথায়-কথায় রণেন সুচন্দ্রার ঠিকানা জেনে নিলে। আরো কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা হ'ল। এক সময় বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল রণেন। এক পশলা বিষ্টি হয়ে গিয়েছে। হাওয়া বইছে আরামদায়ক। পথে নেবে মনে হতে লাগল পায়ের তলার মাটিতে যেন ফুলের রেণু বিছানো। মাসের শেষ সপ্তাহ—পকেট শূন্যগর্ভ, আকস্মিক ত্রিশটি টাকায় প্রচণ্ড ভারী হয়ে উঠল সেটা। রণেন ট্রামে চেপে বসল। সুনন্দার ঠিকানা যখন পাওয়া গেছে এবং এদের বর্ণনাতেও যখন সুনন্দা বলেই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে তখন এ মুহূর্তে তার সঙ্গে দেখা না করে কি বাড়ি ফেরা যায়? তার প্রথম-যৌবনের স্বপ্ন, তার কাব্যের উৎস—সুনন্দা সোম। চারটে বছর কি আনন্দেই কেটে গিয়েছে। কি আবেশভরা ছিল মন। ফোর্থ-ইয়ারে উঠে রণেন দেখেছিল সেই সুনন্দার মধ্যে রূপসী উদ্ভিন্নযৌবনা প্রীতিমুগ্ধা নারীকে। তাকে ঘিরে রণেনের কত বিহ্বল রজনী বিনিদ্র কেটে গিয়েছে, কত কবিতা জেগেছে। নন্দন আর সে মিলে সে-সবের মূল্য যাচাই করেছে। সুনন্দাকে শুনিয়েছে সবার আগে। তাকে আগে না শুনিয়ে কোথাও কোনো কবিতা প্রকাশ করতে পাঠালে অভিমানের নিগূঢ়তা তার চোখের আভাসে ধরা পড়তে বাকী থাকত না রণেনের কাছে। সুনন্দার জন্মদিনে শেষ যেবার সে উপস্থিত ছিল, সুনন্দা একটা কবিতা লিখে দিতে বলেছিল। সুদৃশ্য বাঁধানো খাতা এনেছিল কিনে। বি. এ. পরীক্ষা তখন আসন্ন, ইংরেজীতে অনার্স। অমন সুন্দর খাতায় লিখবার মতো কবিতা রচনা করার সময় ছিল না। সুনন্দার চাপা ঠোঁটের কোণে চোখের পাতায় অভিমান ফুটি-ফুটি হতেই রণেন তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল—পরীক্ষা শেষে এই খাতায় এক-খাতা কবিতা লিখে দেবে সে। সুনন্দার আনন্দোজ্জল

মুখখানি মনে হয়েছিল সেদিন সদ্যফোটা স্থলপদ্ম। আপন মনে হেসে ফেললে রণেন—কি ছেলে মানুষই ছিল তখন তারা! কোথায় ভেসে গেছে সে প্রতিজ্ঞা, আর কোথায় বা সে সুনন্দা, রণেন! বড় অফিসার এবং দেশবরেণ্য কবি হবার স্বপ্ন কোনোদিন যে তার জেগেছিল সে কথাও আর স্মরণ নেই। আজ সে সামান্য কেরাণী। ইংরেজীতে অনর্স পেয়েছিল ভালই, কিন্তু এম. এ. পাস করা ভাগ্যে হ'ল না। ফিফথ ইয়ারে উঠতে না উঠতে রণেনের বাবা আকস্মিক রোগে আক্রান্ত হয়ে বহুদিন পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবস্থায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন। তখন থেকে সংসারের দায়িত্ব চাপল রণেনের উপরে। তার পরে এল যুদ্ধ, দেশভাগ, বছর ঘুরতে ঘুরতে কখন যৌবন অতিক্রম করে প্রৌঢ়ত্বের দ্বারে সে উপনীত হয়েছে, আজ সে চার ছেলেমেয়ের পিতা। পাঁচ শ' টাকা গ্রেডের উচ্চপদ লাভই তার পক্ষে অতি উচ্চাশা। আঠারো-উনিশ বছরের মধ্যে একবারও সুনন্দার সঙ্গে দেখা হয় নি। ক বছর আগে উড়ো খবর শুনেছিল, সুনন্দা এম. এ. পড়তে পড়তে স্বেচ্ছায় কাকে বিয়ে করেছে। সেও কবেকার কথা! আজ কোথেকে তার আবির্ভাব ঘটল রণেনের কাছে। সমস্ত অন্তর আকুল হয়ে উঠল তাকে দেখতে। একটুক্ষণ-মাত্র—একটুক্ষণের দেখা হলেও দেখা চাই। দু'জনের জীবনে আজ দু'জনের বিশেষ কোনো মূল্য নেই—শুধু চোখের দেখা। শুধু গানের জন্য একটু অভিনন্দন জানানো, অতীত দিনের দু'চারটি গল্পের মাধুর্য উপভোগ, আর কিছু নয়!

ঠিকানা মিলিয়ে বাড়ীর সামনে এসে রণেন হকচকিয়ে গেল। অতি আধুনিক ধরনের বাড়ী—গেটে পিতলের গায়ে নাম-খোদাই করা—ডাঃ এইচ. চ্যাটার্জি, দু'লাইন জুড়ে ডাক্তারী উপাধির জের। রাত্রে ভালো না বুঝতে পারলেও আভাস পেলে বাড়ীতে ঢুকবার বাঁধানো রাস্তার দু'পাশে মনোরম উদ্যান। নানা ফুলের সুগন্ধ আলো অন্ধকারে মেলা। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল রণেন। ঘড়িতে সওয়া আটটা বাজে। এমন কিছু রাত নয়। কি নিঝুম পাড়া—দু'একটা রেডিয়োর চাপা মিঠে আওয়াজ, আশে-পাশে কোথায় গীটার না সেতার বাজছে রণেন ঠিক বুঝতে পারলে না, দু'একবার অদূরবর্তী ট্রাম-বাসের পথের দূরাগত ঘর্ঘর ধ্বনি। শান্তি ও সৌন্দর্যের মধ্যে ডুবে থাকাটাই এ পাড়ার ধর্ম। তাদের পাড়া থেকে কত তফাৎ। রণেনের সমস্ত অন্তঃকরণ যেন সচেতন হয়ে সঙ্কোচ বোধ করলে। এ সে কি করেছে। কোন্ আবেশের ঘোরে কোথায় চলে এসেছে। সুনন্দা যে এখন ডাঃ এইচ. চ্যাটার্জির স্ত্রী—সুচন্দ্রা চ্যাটার্জি। তার সঙ্গে একটুক্ষণ দেখা করতে হলেও বহু ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হবে। সুনন্দার কাছে যাবার যোগ্যতা তার কি আছে! তার পোশাক-পরিচ্ছদ, তার চাকুরীর পদমর্যাদা এদের কাছে তুচ্ছাতিতুচ্ছ। আজ সুনন্দার কাছে ঘনিষ্ঠতা আশা করাও বাতুলতা। যে সম্মান, যে শ্রদ্ধা একদিন রণেন নবীনা কিশোরী যৌবনসমাগতা সুনন্দার কাছে পেয়েছিল এতটুকুও যদি বা তার অবশিষ্ট থেকে থাকে, আজকের সাক্ষাতে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে সব। কৃপা এবং তাচ্ছিল্য স্তূপীকৃত হবে। তার কবিতা সুর দিয়ে রেকর্ড করেছে সে কি তাকে স্মরণ করে? তার প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ না নিছক কৌতূহল? বড়লোকের গিন্নীর নেহাৎ একটা খেয়াল, কৌতুক! পদগুলি হয়তো নিতান্তই ভালো লেগেছে, সুরে বসিয়ে দিয়েছে। রণেন রায় এর মধ্যে কোথায়? নাঃ, সুনন্দার সঙ্গে কিছুতেই দেখা করা চলে না। ফিরে যেতে উদ্যত হয়ে পিছন ফিরতেই দেখতে পেল একটা প্রকাণ্ড মোটর একেবারে তার পিঠের উপর। নিঃশব্দে কখন গাড়ীটা এত কাছে এসে গেছে টের পায় নি। চমকে উঠে রণেন একটু সরে দাঁড়াল। চলেই যাচ্ছিল, গাড়ীতে একজন সুসজ্জিতা মহিলাকে দেখে অদম্য কৌতূহলে ফিরে তাকিয়ে দেখলে—সুনন্দা কি?—কত বছরের অদেখা! একটু দেখাতেই কি চিনতে পারা যায়! মোটর-চালক ভদ্রলোক মুখ বের করলেন—কাউকে চান? কোন্ বাড়ী খুঁজছেন?

ইংরেজী সুরে বাঁকা উচ্চারণ। রণেনের মুখে ব্যঙ্গের হাসি ফুটল—মা-বউকে এরা বিদেশিনী সাজিয়ে খুশী, মাতৃভাষা বিকৃত স্বরে বলে এরা গর্বিত। রণেন চিরকালের সপ্রতিভ! নমস্কার দিয়ে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল—"সুনন্দা, সরি, সুচন্দ্রা চ্যাটার্জির বাড়ী এটা?"

—"হ্যাঁ, আসুন।"

গাড়ী ভিতরে ঢুকে গেল। রণেনের আর ফিরে যাওয়া হ'ল না। ধীরে ধীরে সেও ভিতরে গেল। বয় এসে বসবার ঘর দেখিয়ে দিল। রণেন গরম বোধ করলে, নীলাভ আলোতে ঘরটি স্নিগ্ধ শান্তিপূর্ণ। মূল্যবান গদি-আঁটা কুশন-দেওয়া চেয়ার, মাঝখানে শ্বেতপাথরের টেবিলে কারুকার্য-করা হাইনানি। জয়পুরী কাজের ফুলদানিতে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা। দামী পর্দা জানালায়-দরজায়, দেয়ালে ফ্রেস্কো আঁকা। বহুদিন সে এরকম একটি বাড়ীতে ঢোকে নি। ভিতরে ভিতরে উত্তেজনা তাকে বিচলিত করলে একটু। ভিতর দিকের না কে

ঘর থেকে বহুকণ্ঠের নম্র মার্জিত হাসি, এবং মোলায়েম সুরের কথাবার্তা ভেসে এল, যেন একরাশ পাতা-ঝরার মৃদুমর্মর শব্দ। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কারা সব এসেছেন—সুনন্দা তাঁদের নিয়ে ব্যস্ত। রণেনকে বসে থাকতে হবে কতক্ষণ কে জানে! অনুমানেই সে বুঝলে—এটা বাইরের বসবার ঘর, অপরিচিত সাক্ষাৎপ্রার্থীরা এসে এখানে অপেক্ষা করে। বয় প্যাড এনে সামনে ধরল। রণেন আগে একটা সিগারেট ধরিয়ে মুখের কোণে রাখলে তার পরে প্যাডটা নিয়ে বেশ একটু কায়দা করে নামটা লিখে ফেললে। মনের মধ্যে ছেলেমানুষটা যে লুকিয়ে থাকে কোথায়, আচমকা জেগে ওঠে কৌতুকে। নয়তো রণেন এ মুহূর্তে ভুলে গেল কেমন করে যে, সে আটত্রিশ বছরের অকাল জড়ত্বপূর্ণ প্রৌঢ়, চারটি সন্তানের পিতা। কেন তার ভিতরে এসে উপস্থিত হ'ল কলেজ জীবনের সেই স্বপ্নাবিষ্ট ষ্টাইলিষ্ট রণেন রায়। হাতের লেখা তার চিরকালই সুন্দর বলে উচ্চ প্রশংসিত ছিল।

কায়দামাফিক নাম-লেখাটা চমৎকার হ'ল। ভিতরে হাসি-গল্প ফোয়ারার কলধ্বনির মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। সুনন্দা নিশ্চয় ওখানে আছে। বয় নিয়ে কার্ডখানি ধরবে। হাতের লেখা দেখে কেউ কি বলে উঠবে না—বাঃ চমৎকার লেখাটি তো, বেশ ষ্টাইল আছে!

সুনন্দা কি সচকিত হয়ে বিস্মৃতির পাতায় চোখ বুলিয়ে ভাববে না—কার যেন এ রকম হাতের লেখা ছিল, চেনা-চেনা বোধ হচ্ছে!

ওই উচ্চ ধনী সুশিক্ষিত সুদৃশ্য নারী ও পুরুষদের কাছে তার হাতের লেখাটি উপযুক্ত মর্যাদা পাক্। নিমেষের জন্য হলেও ওদের কাছে ফুটে উঠুক রণেনের অনন্যতা। তার পরে ঘরের দোরে এসে দাঁড়াবে সুনন্দা চ্যাটার্জি। দামি সুবাসে ঘরের বাতাস হবে আমোদিত, রূপের জৌলুসে ঘর হয়ে উঠবে উজ্জ্বল স্বপ্নময়, মধুর নীল আলোয় স্নিগ্ধ-ছায়ায় তার কাছে এসে আবির্ভূত হবে সুচন্দ্রা চ্যাটার্জি। দু'একটা কৃত্রিম সৌজন্যভরা বাক্যালাপের পর বলে উঠবে ইংরেজীর বাঁকাসুরে—আমাকে আজ একটু তাড়াতাড়ি ছুটি দিতে হবে রুণুবাবু, বাড়ীতে লোকজন এসেছে—আসবেন, আরেকদিন আসবেন, নিমন্ত্রণ রইল।

বড়লোকের প্রাণহীন মোলায়েম ভদ্রতা, যে ভদ্রতা অতি সূক্ষ্ম সূচিবিদ্ধ করে বুঝিয়ে দেয়—যাও, আর বিরক্ত করো না, অবাঞ্ছিত অপাংক্তেয় জন।

—রুণুদা, সুমিষ্ট সুরের ডাকে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল রণেনের চিন্তাজাল। সচকিত হয়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়েও রণেন ইচ্ছে করেই বসে রইল। একটু কায়দামাফিক সিগারেটটি আঙুলের ডগায় চেপে ঠোঁটের কোণে হেসে বললে, চিনতে পারলে!

প্রজাপতির মতো হাওয়ায় উড়ে এসে তার পাশের চেয়ারে বসে পড়ল সুনন্দা। হাসিভরা মুখে বললে, লোকটিকে ভুলতে পারি, হাতের লেখাটিকে নয়। খাতার পাতায় লেখা আছে যে!

রণেনও একটু হাসলে— "কোন্ ক্ষণে,—তুমি এলে মোর জীবনে।"

দু'জনের সম্মিলিত হাসি ফুলের মতো ঝরে পড়ল। ঈষৎ আরক্তিম হ'ল সুনন্দার মুখ। বললে, জানতাম তুমি নিশ্চয় আসবে, একদিন না একদিন আসবেই আমার রেকর্ড শুনে। উনিও সেদিন জিজ্ঞেস করছিলেন—তোমার রুণুদা তো এলেন না দেখা করতে;—তিন মাস হয়ে গেল রেকর্ড করেছ। ভয় হয়েছিল—বেঁচে আছ কি না। নয় তো তুমি রেকর্ড শুনে নিশ্চয়ই ছুটে আসতে।

মনে মনে অত্যন্ত অপ্রতিভ হ'ল রণেন। লজ্জিত হ'ল। কেমন করে সে স্বীকার করবে আজই প্রথম সুনন্দার গান শুনে ছুটে এসেছে তার খোঁজে, একটু ঘুরিয়ে বললে, ঠিকানা কি তুমি দিয়েছ?

—ঠিকানা পাওয়ার অভাব হয় রুণুদা। ইচ্ছে থাকলে জোগাড় হয়ে যায় বৈ কি! আজ কি করে এলে?

রণেন হেসে বললে, সুচন্দ্রা চ্যাটার্জির সুর টেনে এনেছে।

—উঁহু, সুনন্দা সোমের বেসুরো সুরও তার মধ্যে বাজছে যে, নয় তো সুচন্দ্রার খোঁজে রণেন রায় আসে না।

মুখ টিপে একটু হাসলে, চোখ হ'ল একটু উচ্ছলিত। সেই সুনন্দা, দুরন্ত চঞ্চলা নয়, অভিমানী হৃদয়-সম্রাজ্ঞী নয়, সুচতুর তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্না মিসেস চ্যাটার্জি। অভিভূত হ'ল রণেন। ওর কতখানি আন্তরিক আর কতখানিই বা কৃত্রিম—কি হবে তার যাচাই ক'রে? এ অবিস্মরণীয় অবিশ্বাস্য মুহূর্তে যা পাওয়া যায় তাই চোখ মন ভ'রে গ্রহণ করেই যে পরম আনন্দ!

সুনন্দা তাকে নিয়ে গেল ভিতরের ঘরে। পরিচয় করিয়ে দিলে ডাঃ চ্যাটার্জির সঙ্গে, তাদের বন্ধু ব্যারিষ্টার বোস এবং তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে। সুনন্দার সঙ্গীত-শিক্ষক প্রখ্যাত গায়ক রাধানাথ গোস্বামীও উপস্থিত ছিলেন। উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন তিনি রণেনের কবিতার। বার বার বললেন, গান লিখুন, আমি সুর দেব। সুচন্দ্রা দেবী গাইবেন। নাম হয়ে গেলে সিনেমায় গান দিলে

অর্থ যশ আপসে এসে যাবে। এ যে দুর্লভ ক্ষমতা! ব্যরিষ্টারের স্ত্রী মিহি গলায় বললেন, ও, আপনিই কবি রণেন রায়—কোন্-এক মাসিকের পৃষ্ঠাসংখ্যায় আপনার লেখা দেখেছি মনে হচ্ছে। এই তো সেদিন আমার মেয়েরা আধুনিক বাংলা কবিতা নিয়ে আলোচনা করছিল, তাতে আপনার কবিতারও আলোচনা হচ্ছিল—রণেন রায় না মিত্র···আমি আবার ও সব পড়ি নে। আধুনিক কবিতা ঠিক বুঝতেও পারি নে।

সুনন্দার চোখ উজল হয়ে উঠল—লেখা তবে এখনো ছাড়ো নি রুনুদা? বই-টই বেরিয়েছে? আমি আরো ভাবছি তুমি ও-সব পাট চুকিয়ে দিয়েছ। আমাকে পাঠিয়ে দেবে তোমার লেখা।

—আমাদেরও পড়তে দেবেন মিঃ রায়—ব্যারিষ্টার গিন্নী কৃত্রিম কচিস্বরে বললেন, মিসেস চ্যাটার্জি একাই কেবল আপনার সাহিত্যপ্রসাদ লাভ করবেন? এ তো ন্যায়সঙ্গত কথা নয়।

ওদের কথার উত্তর ওরা নিজেরাই দিলে। রণেন মৃদু মৃদু হাসিতে সিগারেট খেতে লাগল। একটু শুধু হাসি—অনেক কিছু অর্থ সে প্রকাশ করে, কিছুটা মর্যাদা আর ঈষৎ নির্লিপ্ত অবজ্ঞা। চা-কফি এলো, এলো দেশী-বিদেশী নানা রকম খাবার। সুনন্দা গান গাইলে—সুনন্দার মেয়ে নাচলে। কি অপূর্ব হয়েছে মেয়েটি। কন্‌ভেণ্টে পড়ে। আট-নয় বছরে কত কি-ই না শিখেছে। ওই একটি সন্তান। রাধানাথ গোস্বামীও গাইলেন। ব্যারিষ্টার-গিন্নী নাকি এককালে ভালো নাচ জানতেন, প্রশংসাযোগ্য আবৃত্তি করতেন। স্কুল-কলেজে এক সময় কত মেডেল পেয়েছেন তার ফিরিস্তি শোনালেন। অনেক হাসি-গল্প হ'ল। ঘণ্টাখানেকের জন্য ভুল করে কোন্ দেবদূত তাকে নিয়ে এলো স্বর্গের নন্দনপ্রাসাদে। যে সম্মান এবং সমাদরের স্বপ্ন সে এক সময় দেখেছিল, যা সে জীবনে পেতে পারত, কিন্তু পেল না, আর বোধ হয় পাবেও না কোনো দিন—তাই সে লাভ করলে সুনন্দার ড্রয়িং-রুমে। সম-মর্যাদায় হাসি-গল্পের অধিকারী হ'ল নামকরা ডাঃ এইচ. চ্যাটার্জি এবং ব্যারিষ্টার বোসের সঙ্গে।

সুনন্দার বাড়ী থেকে বিদায় নিয়ে বাসে উঠেও রণেনের আবেশ আর কাটতে চায় না। সুনন্দা গেট পর্যন্ত এসে বিদায় দিয়ে গেছে। হেসে বলেছিল, আঠারো-কুড়ি বছর পরে দেখা, আবার আঠারো বছর পার হলে কেউ কাউকে আর চিনতেই পারব না।

—না, আসব মাঝে মাঝে।

—ভুলো না কিন্তু, তোমার কবিতার বই পাঠিয়ে দেবে আমাকে আর মাসিক পত্রিকাগুলি। মনে আছে তো আমার দাবি ছিল সবার আগে। এখনও হার মানতে রাজী নই।

মুচকে হাসলে। হাসলে রণেনও। সুনন্দা ভ্রূভঙ্গি করে বললে, হাসলে যে বড়! ভেবেছ কি দাবি ছাড়ব? বেসুরো সুনন্দা যে সুরলোকে স্থান পেয়েছে, এবার গানের পর গান দাবি করব, আমাকে অগ্রাহ্য করতে পারবে?

—কোনকালেই কি পেরেছি?

—পেরেছ বৈ কি! ঋণী রয়ে গেছ না,—একখাতা কবিতা?

—ভোলো নি দেখছি!

—নাঃ। তুমি হঠাৎ ডুব দিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যেতে পার, কিন্তু সবাই তোমার মতো নির্মম নয়।

মধুর গম্ভীর তিরস্কার। রণেন একটু হাসলে। কিছুতেই না বলে পারলে না—এমন নিষ্ঠুর না হলে কি তোমার বেসুর আজ এমন মনভুলানো সুর হতো, না, আমার লেখাই আজ লোকের কাছে গান হয়ে বিতরিত হ'ত? সু, মধুকর বাইরে থেকেই মধু সংগ্রহ করে, মধু-ভাণ্ডে পড়লে তার মধু যায় ফুরিয়ে।

সুনন্দা যেন বহুদূর থেকে স্মিত-কোমল চোখে তাকিয়ে রইল—মেঘলা দিনের চকিত আলোর ঝলকানি স্তব্ধ-অতল কালো জলের গহন রহস্য কি ভেদ করতে পারে! ক্ষণিক মায়াজাল যদি ছড়িয়ে যায় প্রাণে প্রাণে—কি বা তাতে ক্ষতি, কি বা তার মূল্য! দু'জনের প্রাণের কথা কোনোদিন মুখে উচ্চারিত হয় নি, অজানাও ছিল কি এতটুকু? প্রথম যৌবনের স্বপ্ন—আজ শুধু সেটা সুখস্মৃতি মাত্র, হাসির মাধুর্যে অনুপম!

ফের সুনন্দা বললে, মনে থাকে যেন—একখাতা! ঋণ স্বীকার করতেই হবে!

হেসে রণেন গেটের বাইরে চলে এলো। আবেশ-জড়িত মনে মত্ত-মাতালের মতোই হাসির উচ্ছ্বাস উদ্বেল হয়ে উঠতে চাইল। কোন্ দেবতার হঠাৎ এমন খেয়াল চাপল, তাকে নিয়ে কৌতুক করে নিলে একটু? এক ঘণ্টার রাজা করে দিলে! সুনন্দার বাড়ীতে সে বেশ অভিনয় করে এলো—গালভরা নাম বলেছে চাকরির। পাঁচশ' টাকা গ্রেডের যে পদ তার আকাঙ্ক্ষিত সে নামটিই করেছে। চালাকি ক'রে বাসার ঠিকানা বলে নি, টুরিং অফিসার, বাইরে-বাইরে ঘুরতে হয়। নিজেই আসবে দেখা করতে, পাঠিয়ে দেবে গান-কবিতা। গান-কবিতা—সুনন্দার সঙ্গে সঙ্গে কবে সে চাপা পড়ে গেছে। তবু

কি না সে পরোক্ষে স্বীকার করে এলো একখাতা কবিতার ঋণ? হা হা করে হাসতে ইচ্ছে হ'ল তার। গানের পরে গান লিখবে সে। গাইবে সুনন্দা। রেকর্ডে-দেওয়া তার গানটাই সুনন্দা সেদিন প্রথম গেয়েছিল। রাধানাথ গোস্বামী আগে কবিতাটাতে কি সুর দিয়েছিলেন, পরে আবার কেন বদল করলেন শুনিয়েছিল তা-ও। বাসের ঘর্ঘরধ্বনি ছাপিয়ে কান ভরে বেজে উঠল সুনন্দার সুর। সুনন্দার পুলকিত গভীর দৃষ্টি, তার দেহের কোমল সুরভি —সব কিছু তাকে আকুল করে সুতীব্র বেদনায় নূতন আবেগে জাগিয়ে দিলে। কেমন ব্যাকুল হয়ে উঠল রণেন। একটুক্ষণের জন্য যে সাধারণ এক তুচ্ছ কেরাণীকে করে তুললে এমন মহীয়ান, মূল্যহীনকে দিলে সম্রাটতুল্য মূল্য, তার দাবি কি সে পূরণ করতে পারে না? এমনি নিঃশেষ হয়ে গেছে সে? দিনের পর দিন যে অপেক্ষা করে থাকবে সুনন্দা—একটি খাতা পাবার আশায়! যদি পায় মুখখানি তার সেদিনের মতোই সদ্যফোটা স্থলপদ্মের রক্তিমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে নাকি? সহসা নিগূঢ় এক অত্যুগ্র উন্মাদনার পুলক শিহরণে রণেনের সমস্ত অন্তর মঞ্জুরিত হ'ল। বসন্তের গুঞ্জরণে গানের পর গানের ভাঙাভাঙা ছিন্নভিন্ন অপূর্ব কলিগুলি ভাসতে লাগল। সুতীব্র উত্তেজনায় সে নেবে পড়ল মাঝপথেই। সামনের দোকান থেকে খুঁজে খুঁজে একখানা পছন্দসই খাতা কিনে ফেললে। কালো মলাটে ঢাকা সাদা পাতার খাতাটি—উজ্জ্বল কালোর ভিতরে ঢাকা ভবিষ্যতের কত গোপন আশা, অভাবনীয় সম্মান, অপরিমেয় আনন্দ। জলের মধ্যে আলোক-কম্পনের ন্যায় হৃদয়তন্ত্রীর সূক্ষ্ম তারগুলি অনুভূতির আবেগে কেঁপে উঠল। পারবে, সে নিশ্চয় পারবে, একটা মাত্র খাতা সে নিশ্চয় ভরিয়ে তুলতে পারবে গানে গানে। সুনন্দা যে দাবী জানিয়েছে রণেনের কাছে—কোথায় তলিয়ে গেছে সেখানে অফিসের বড়বাবুর অন্যায়-অবিচার, গা-বউয়ের তুচ্ছ সাংসারিক কোলাহল, তুচ্ছ যত দাবী-দাওয়া। খাতাখানি সে পরম স্নেহে বুকের কাছে চেপে ধরে হাঁটতে সুরু করলে—যেমনভাবে একখানা খাতা নিয়ে হাঁটত কলেজ-জীবনে। পৃথিবীর সুর ছন্দ এখনো নিঃশেষ হয়ে যায় নি।

দু'চার পা হেঁটে একটা দোকানের পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে সে থমকে গেল। দোকানে এক ভদ্রমহিলা উল কিনছেন। মনে পড়ে গেল—বিকেলে উর্বসী তার কাছে উল কেনার কথা বলেছিল। এখন থেকে না বুনলে মেয়েটার শীতের জামা আর বোনা হয়ে উঠবে না। চার-পাঁচ বছর আগে যে জামাটা বুনেছিল সেটা ওর ছোট হয়ে গেছে, পরের মেয়েটা পরবে। গত রাত্রেই কথাটা সে বলেছিল। রণেন সম্মতি জানিয়ে বলেছিল—মাসের প্রথমে বলো, এখন নয়। কিন্তু নীচের তলার যে মেয়েটির কাছ থেকে নূতন ডিজাইনের ফ্রক তৈরী করে নেবার ইচ্ছে, সে মাসের প্রথমেই চলে যাবে। তাই উর্বসী আবার বলতে এসেছিল কথাটা। পকেটে টাকা থাকতে পূর্ণ হবে না ওর সাধটা! গাড়ী নয়, বাড়ী নয়, পনেরো কুড়ি টাকা দামের শাড়ি নয়, শুধু ক'আউন্স সস্তাদামের উল! রণেন দোকানে ঢুকে চোদ্দ-পনেরো টাকা দামের আধ পাউণ্ড উল কিনলে। নূতন ডিজাইন দেখলেই উর্বসী অস্থির হয়ে ওঠে। বেশ সৌখিন ছিল সে এক-কালে। লেশ বুনে বালিশের ওয়ার, পেটিকোট, ব্লাউজ তৈরী করত, নূতন এম্ব্রয়ডারি করত টেবিলক্লথে। সব ঘুচেছে, এখন কেবল মেয়েদের সাজাতে যেটুকু কারু-কাজের সখ। তার ত্রিশ বছর হতে না হতেই সে বুড়ি হয়ে গেছে; সন্ধ্যাও এমন বুঝে চলে যে, দিন দিন তারও সাজসজ্জা রসকষশূন্য সাদাসিদে হতে চলেছে। আর সুনন্দা—বত্রিশ-তেত্রিশ বয়সেও পরিপূর্ণ যৌবনারূঢ়া—রঙের সমারোহে চোখে ধাঁধাঁ লাগে। সাজসজ্জায় আগের থেকে অনেক বেশি মনোহারিণী সুনন্দা। ব্যারিষ্টারের স্ত্রীর এখনো ঠোঁটে গালে রঙ। উলের দোকান থেকে বেরুতেই সামনের ফুটপাতে ব্লাউজ-ফ্রকের ডালি সাজিয়ে বসেছে বিক্রেতা। রঙ্-বেরঙের কত রকম ব্লাউজ। লোভ সংবরণ করা দায়। নিলেও হ'ত সন্ধ্যা আর উর্বসীর জন্য দুটো। কতদিন সে নিজের হাতে কিছু সখ করে কিনে দেয় নি ওদের। ওরাই প্রয়োজন-মতো জামাকাপড় সস্তায় কিনে আনে। বিনা প্রয়োজনে সুন্দর দুটো জামা কিনে দেবে সে। পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল ব্লাউজের সামনে। রাশি রাশি ব্লাউজ দেখলে। বিক্রেতার কাছে জিজ্ঞেস করে আধুনিকতম ডিজাইনের যে ব্লাউজ সদ্য বাজারে আমদানী হয়েছে এবং প্রচলিত হচ্ছে তাই দুটো কিনে ফেললে দাম দিয়ে—টকটকে রঙ, চোখে পড়বার মতো। খুশী মনে চলতে গিয়ে মনটাতে খচখচ করতে লাগল—সকলের মুখে হাসি না ফুটলে কি মন ভরে? কিনে ফেললে আবার ক'গজ সার্ট এবং ফ্রকের কাপড়। মার জন্যে নিলে একটা কপি। মার এ-তরকারিটা প্রিয়। অকালের কপি, পেলে খুশীই হবেন। হিসাব করে দেখলে বাকি মাত্র আর ন'টি টাকা। এ টাকাটা মার হাতে দিয়ে দিতে হবে—নীলটুর টিউটর রাখার জন্য। আর দশটি টাকা কোনো

রকমে জুটবেই, নিশ্চয় জুটবে, টাকা তার আসবে, আসবে সম্মান। সমস্ত পোঁটলার উপরে খাতাখানা সযত্নে রেখে বাড়ীর পথ ধরলে রণেন। কবিতার পংক্তিগুলি এখনো যে মধুহীন পুষ্পপাত্রের চারদিকে মধুস্বাদী মধুপের মতো গুণগুণ করে ফিরছে। খাতা ভরে উঠতে কতক্ষণ!

বাড়ীর কড়া নাড়লে। দোতলায় বাচ্চাদের কলকণ্ঠ শোনা যাচ্ছে। সন্ত ওরা এখনো জেগে। হাতঘড়ির দিকে চোখ পড়ল—দশটা বেজে গেছে। মা কার সঙ্গে কথা বলছেন।—শ্যামলীর গলা নয়! আনন্দে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল মনটা। শ্যামলী এসেছে—তিন বছর পরে শ্যামলী এসেছে ভাগলপুর থেকে। খুব কমই আসে তাদের এখানে। তিন-চারটি ছেলেমেয়ে হয়েছে—বড় মেয়েটি তো তার মেজো মেয়ের বয়সী। মনটা কেমন বিগড়ে গেল। বিলাসিতা করে কেন সে বিনা প্রয়োজনে এতগুলি জিনিস কিনে নিয়ে এল? শ্যামলীকে তো কিছুদিন রাখতে হবে, আদর-আপ্যায়ন করতে হবে। মা আর উষসী তার বিবেচনাহীন ব্যয়ে আগুন হয়ে দগ্ধ করবে তাকে। অসাবধানে ধপ্ করে হাত থেকে খাতাটা মাটিতে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি তুলে নিলে সেটা। ধূলো ঝেড়ে মুছে সার্টের ভিতর লুকিয়ে রাখলে। দেড় টাকা দু'টাকা দামের খাতার মূল্য মা-বউ বুঝবে না; যে বুঝবে, যে এর আশায় থাকবে তারই জন্যে গোপন থাক্ এ খাতা।

বাসায় ঢুকতেই হৈ হৈ পড়ে গেল। শ্যামলী, শ্যামলীর বর তার ছেলেমেয়েগুলি সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল। তার পরে উৎসব জেগে উঠল তার আনা জিনিসপত্র দেখে—কপি এনেছ? ওমা, কি সুন্দর রঙের উল! কত টাকা পাউণ্ড? শ্যামলী এসে ধরল ব্লাউজ দুটো—বাঃ এ বুঝি নূতন কাটের ব্লাউজ? বেশ তো দেখতে! রঙটাও চমৎকার!

সন্ধ্যা উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে—তুমি কি পাওয়া পেলে নাকি দাদা? উষসী বললে—কি ব্যাপার, বলো তো? কে দিল এ সব? মা এসে কপিটা তুলে নিলেন—অকালের কপি, ওরা এসেছে, এনেছিস বেশ করেছিস। বেশি দাম নিশ্চয়ই নিয়েছে। হঠাৎ এ সব কেন রে? শ্যামলীর বর হেসে বললে—দাদা গুণতে জানেন নিশ্চয়, আমরা এসেছি কি ক'রে জানলেন?

কোন্ প্রশ্নের উত্তর দেবে রণেন বুঝে উঠতে পারলে না। সে যেন দিগ্বিজয় করে এসেছে। তার অর্থপ্রাপ্তির কথা সে যে রূপকথার চেয়ে চমকপ্রদ—বিস্ময়বিস্ফারিত চোখে শুনলে সবাই। মা প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন। গর্বে উষসীর মুখ ঝলমল করতে লাগল। রাণীর মতো জামাকাপড়গুলি বণ্টন করে দিলে শ্যামলীর ছেলেমেয়েদের মধ্যে। এতদিন পরে মামাবাড়ী এসেছে, মামার দেওয়া জামা পরবে বৈ কি ওরা! সন্ত ওরা তো পুজোর সময়েই পাবে। তার পর সহাস্যে একটি ব্লাউজ তুলে শ্যামলীর হাতে দিয়ে বললে—নাও ঠাকুরঝি। বাংলা দেশে তো থাক না, নূতন কার্টের জামা পুরোনো না হলে পাও না। আমরা এমন কত পরি!

মা পরম খুসী। স্নেহভরা স্বরে বললেন—যাও বৌমা, এবার রান্না ঘরে; সেই কোন্ সকালে দুটো খেয়েছে, পরে ওসব হবে। যা রে জামাকাপড় ছেড়ে হাত-পা ধুয়ে আয়। শ্যামলী আর মানস তোর জন্যেই অপেক্ষা করে আছে।

রণেন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল মা-বউয়ের দিকে। কত দিন ওদের এমন মধুর হাসিখুসী মুখ দেখেনি। উষসীকে দেখে মনে হচ্ছে অন্য কেউ। সাধারণ কেরাণী ঘরের ঘরণী নয়, এ যে কবি রণেন রায়ের সহধর্মিণী—সুনন্দা চ্যাটার্জি আর ব্যারিষ্টার-গিন্নীর সমমর্যাদাপ্রাপ্ত। স্বামী-গর্বে অলঙ্কৃতা, সর্বরিক্তা হয়েও আনন্দিতা। পরিপূর্ণ অন্তঃকরণে ঘরে গেল সে। জামাকাপড় ছাড়বার আগে খাতাখানাকে সাদরে তুলে রাখলে ছোট আলমারির উপরে। বাচ্চাকাচ্চার ঘর, নষ্ট করে না ফেলে। এ খাতা যে অমূল্য—জীবনের সব অপমান-লাঞ্ছনা দূর করে প্রতিষ্ঠিত করবে তার যোগ্যতা। কেবল বড়বাবুর কাছে নয়, অফিসে নয়, জগৎসমক্ষে এনে দেবে তার সব বাঞ্ছিত ধন।

উষসী এসে ঘরে ঢুকল—ওগো শুনছ! মানসবাবুকে তুমি ছুটির ক'দিন এখানেই ধরে রেখো—বেশ কিছুদিন নাকি ছুটি পেয়েছেন। ঠাকুরঝির ইচ্ছে এখানেই এবার থাকেন। মানসবাবুর তো আত্মসম্মান বেশি, শ্বশুরবাড়ি থাকতে লজ্জা, তুমি কিছুতে···ওমা এনেছ বুঝি?

রণেন ফিরে তাকাল—কি গো! খাতা?—বলতে বলতে উষসী ছেলেমানুষের মতো ছুটে গেল আলমারির কাছে। কবে সে রণেনকে বলেছিল একটা ভালো মোটা খাতা আনতে—তার উল ও এমব্রয়ডারীর ডিজাইনগুলি বাজে কাগজে বাজে খাতায় তোলা—কত-বা তার পুরোনো হয়ে ছিঁড়ে গেল, কত বা গেল হারিয়ে। নিজে সে বেশ আঁকতেও পারে। ভালো খাতার দাবী ছিল তার। রণেন তাকেই কিনে নিতে বলেছিল। কিন্তু নিজের জন্য নিতান্ত প্রয়োজন না হলে কিছু কিনতে উষসীর ইচ্ছে করে না। ছেলেমেয়ে ননদ দেওর স্কুল-

কলেজে যায়, তাদের খাতা-বইয়ের দাবীই যে আগে। নিজের খুশীর খাতা আর কেনাই হয় নি। আজ কি টাকা পেয়ে রণেন তার আবদারের কথা ভুলে থাকতে পারে, নিয়ে এসেছে খাতা।

চুপি চুপি বললে—কী সুন্দর! এত দাম দিয়ে আনলে কেন গো? তিরস্কারের মধ্যে প্রগাঢ় খুশী উপচে পড়ল তার চোখে-মুখে, তার কথার স্বরে। রণেন স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল। এত আগ্রহের দাবী সে ব্যর্থ করে দেবে? সূক্ষ্ম একটা বেদনা কুশের মতো মনে বিদ্ধ হ'ল। তারই সংসারের দাবী মেটাতে যে নিজের দাবী ঘুচিয়ে বসে আছে; তার এ সামান্য চাওয়াটুকুও পূর্ণ হবে না? ওকে ক্ষুণ্ণ করে সে আনন্দ দেবে কাকে? ওর আনন্দ কি তার স্বপ্নলোকের প্রেয়সী সুনন্দার আনন্দের চেয়ে কম মূল্যবান্? রণেনের জীবনের খাতা যে ও প্রতিদিন ভরে তুলেছে সুখ-দুঃখ—বিতৃষ্ণা অনুরাগের নানা ডিজাইনে।

উর্মসী রণেনের দিকে তাকিয়ে দমে গেল। তার পরে হাসি টেনে এনে বললে—খাতাটা কার গো? সুনন্দা দেবী নূতন গানের দাবী জানিয়ে দিয়েছে নাকি?

রণেন কাছে এগিয়ে গেল। উর্মসীর ঈষৎ বিষণ্ণ আনন্দ-ঢলঢল মুখখানি তুলে ধরে বললে—না গো না, তোমার জন্য এনেছি, নিজ হাতে দেব বলে লুকিয়ে রেখেছিলাম।

তীর্থ দর্শন

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

তীর্থ কর—বহু তীর্থ ভ্রমণ কর প্রিয়।
সম্পদ যা পাবে তাহা অনির্বচনীয়।
কৃচ্ছ্র সাধন, সে এক তপস্যা—
চুকিয়ে দেবে সকল সমস্যা,
জীবনে তা জানি পরম প্রয়োজনীয়।

২

তীর্থ পথ যে আকাঙ্ক্ষিত অনুরাগের পথ—
তোমার আগেই ছুটবে তোমার ব্যাকুল মনোরথ।
ভগবানের সঙ্গে তাহার যোগ,
প্রতি পদে অমৃত সম্ভোগ,
পুণ্য প্রভায় হেরবে উজল তোমার ভবিষ্যৎ।

৩

পথ চলা নয়—ও তো করা মনের মাঝে হোম।
প্রদক্ষিণ ও পরিক্রমার পুণ্য পরিশ্রম।
ধ্রুবের সাথে যাপন করে রাত
উঠবে যখন বলবে সুপ্রভাত—
অখণ্ড এক পূজা জীবন—নয় কো ব্যতিক্রম।

৪

তীর্থে তীর্থে হয় তো তোমার জাগবে নিতিনিতি,
জন্মান্তরের সৌহার্দ্য ও জন্মান্তরের স্মৃতি।
মনে হবে অচেনা তো নয়—
এ যে অনেক দিনের পরিচয়,
জড়িয়ে আছে সবেই আমার পুরাতন সে প্রীতি।

৫

ভক্ত সাধু মুনি ঋষি হয় তো তুমি ছিলে—
বুঝবে তুমি তুচ্ছ নহ, নও কো এ নিখিলে।
দেখবে যেসে চাহেন তোমার পর,
সে কেউ নহে—ত্রিভুবনেশ্বর,
ছিলে, আছ, থাকবে, তাহার সৃষ্টি সাথে মিলে।

৬

হয় তো সেথা দেখতে পাবে এমন মহাজনে—
এমন অমর মুহূর্তে আর এমন শুভক্ষণে
যাঁহার পদরজের এই স্বভাব—
হবে তোমার নূতন জন্ম লাভ,
দিব্য আঁখি পাবে তাঁহার অমৃত অঞ্জনে।

৭

হয়ে যাবে সন্দেহ ও দ্বন্দ্ব দ্বিধার নাশ—
জাগবে বুকে নিষ্ঠা নিবিড় ভক্তি ও বিশ্বাস।
যখন তখন কারণ অকারণে
আসবে বারি তোমার আঁখি কোণে,
জানিয়ে দেবে তুমি প্রভুর চির দিনের দাস।

৮

ছোট বড় সমান তীর্থ, প্রেম মহিমানয়—
চিন্তামণি মিলবে কোথায়?—নাহি তো নিশ্চয়।
অনেক সময় সাগরে নয় 'বিলে'
সহসা যে বৃহৎ 'রোহিত' গিলে,
ডোবায় মেলে শুক্তি—বৃহৎ মুক্তা যাতে রয়।

পাড়াগাঁয়ের কথা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

হুগলী জেলার আঁটপুর অঞ্চলের কথা বল্‌ছি। আঁটপুর ইউনিয়ন, শ্রীরামপুর মহকুমায় জাঙ্গীপাড়া থানা এলাকায়। এই থানা এলাকার উন্নয়নের জন্য "ডেভেলাপমেণ্ট ব্লক্‌" জাঙ্গীপাড়ায় স্থাপিত হয়েছে; যথাবিহিত, বিভিন্ন বিভাগের জন্য কর্ম্মচারী প্রভৃতি নিযুক্ত করাও হয়েছে। উন্নয়ন ব্লকের রুটিন্‌-মাফিক কাজকর্ম্ম ঠিকই চল্‌ছে। সরকার বাহাদুর, উন্নয়ন ব্লকের কাজ যাহাতে সুচারুভাবে চালান যায়, সেজন্য "জীপ গাড়ীও" দিয়েছেন। একটি আদর্শ থানা কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করা হয়েছে, স্থানীয় কৃষকদের উন্নততর প্রণালীতে কৃষিকার্য্য শিক্ষা দেওয়ার জন্য। কিছু কিছু শিল্পকার্য্যও, যেমন, ছুতারের কাজ, নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং শিক্ষাদান কার্য্য চলছে। সারা থানা অঞ্চলটির সর্ব্ব বিষয়ে উন্নতির কথা ভেবে এই সব "ডেভেলাপমেণ্ট ব্লক" স্থাপিত হয়েছে। এজন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় করা হচ্ছে এবং কর্ম্মচারীদেরও, জীপারোহণে এদিক্‌-ওদিক্‌ পাড়ি দিতে দেখে খুব কর্ম্মতৎপর বলে দেখাচ্ছে। কিন্তু, সত্যিই কি এতে দেশের প্রকৃত উন্নয়ন হচ্ছে? মানুষের মনের হতাশার ভাব কি একটুও প্রশমিত হয়েছে? সত্যি বলতে হলে বলতেই হবে এর সামান্য-মাত্র লক্ষণও আমার চোখে পড়ে নি। বরং প্রত্যক্ষ করছি পল্লীর মানুষ দিনের পর দিন আরও বেশী করে মুষড়ে পড়ছে। কিছুদিন আগে সংবাদপত্রে পড়েছিলাম, আমাদের প্রধান মন্ত্রীও "ডেভেলাপমেণ্ট ব্লকের" কার্য্যকলাপে মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারেন নি।

কিন্তু, কেন? কেন পল্লী ও সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা তেমন সুফলপ্রসূ হচ্ছে না? সরকার বাহাদুর কোটি কোটি টাকা খরচ করেও দেশের উন্নতি করতে পার্চ্ছেন না কেন? কেন পাড়াগাঁয়ের লোকের মনে আশার দীপ জ্বলছে না? উত্তর একটিমাত্র কথা। সরকারের, জনসাধারণের প্রতি কোনও আন্তরিক দরদ নেই; তাদের সঙ্গে কোনও "সম্পর্ক" নেই। শুধু "রুটিন্‌ ওয়ার্ক"; শুধু "প্রেসিডিওর", শুধু লাল ফিতায় বাঁধা "ফাইল"। এই সব ব্লকের কর্ম্মচারীরা যেন মহিমায় সমাসীন্‌। গ্রামের লোকের সঙ্গে মেলামেশা করে, তাদের প্রকৃত সমস্যাগুলি অনুধাবন করবার চেষ্টা ও প্রবৃত্তি নেই। এই বৃথা মর্য্যাদা-বোধ, ব্রিটিশ আমলের চেয়ে বর্ত্তমানে অনেকগুণ বেশী হয়েছে। সরকার জনসাধারণের কাছ থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে গিয়েছেন। বড়দের চেয়ে ক্ষুদেদের দাপট এখন অনেক বেশী। সরকারের কাছে কোনও ব্যাপারে সাহায্য বা উপদেশ চাওয়া মানে, অযথা হয়রাণ হওয়া। সরকার কৃষিঋণ দেন, চাষের বলদ ক্রয়ের জন্য ঋণ দেন, জমিতে সার দিবার জন্য অর্থঋণ দেন, মাছের চাষের জন্য পুষ্করিণী সংস্কারাদি ব্যাপারে ঋণ দেন, আরও কত কি দেন। কিন্তু, যাঁরা প্রত্যক্ষ করছেন, তাঁরা জানেন, ঐসব ঋণ প্রার্থী ও গ্রহীতাদের কি পরিমাণ লাঞ্ছনা ও হয়রাণি সহ্য করতে হয়। সামান্য কিছু পরিমাণ টাকা ঋণ পাবার জন্য।

যাক্‌, ও কথায় আর দরকার নেই। এখন চাষবাসের কথা বল্‌ছি। সময় মত বৃষ্টি না হওয়ায় এবার এ অঞ্চলে পাটের চাষ কিছু কম হয়েছে। ঐ একই কারণে, আউস ধানের চাষও আশানুরূপ হয় নি। আমন ধানের চাষ এখন চলছে; কিন্তু, ঠিক পরিমাণমত বৃষ্টি না হওয়ায় চাষ যেন মন্থর গতিতে চলছে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে প্রয়োজনমত বর্ষণ না হওয়ায়, তরিতরকারির চাষও চাষীরা ভাল-ভাবে করতে পারে নি। ফলে, যেমন কল্‌কাতায়, তেমনি এই অঞ্চলেও তরিতরকারি খুব দুর্ম্মূল্য। কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি। এখন এখানে আলু সাত আনা, পটোল বারো আনা, বেগুন আট আনা, চিচিঙ্গা চার আনা, করোলা আট আনা, মূলা ছয় আনা এবং পেঁয়াজ পাঁচ আনা সের। মাছ নেই বললেই চলে; সামান্য যাহা হাটে-বাজারে পাওয়া যায়, তাহা একেবারে "শিশুমৎস্য।" দাম দু'টাকা থেকে আড়াই টাকা সের। দুধ টাকায় দেড় সের; তাও খাঁটি নয়। আর, খাঁটি কোনও জিনিসই তো দেশে পাওয়া যায় না; এমন কি, মানুষ পর্য্যন্ত। সব ভেজাল্‌, সব ভেজাল্‌!

উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় এই অঞ্চলে খুব কাছা-কাছি চারি পাঁচটি আছে। কিন্তু, কি কলা, কি বিজ্ঞান, কি কৃষি, কি বাণিজ্য—কোন বিভাগেরই জন্য যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক পাওয়া যায় নি। এর জন্য, সরকার-প্রবর্ত্তিত অতি নিম্ন বেতনক্রমই দায়ী। "এক পয়সায় অক্রুর-সংবাদ গান হয় না।" আমাদের অঞ্চলের পুরাতন প্রবাদবাক্য। বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটিকে শিক্ষক নিযুক্ত করতে অক্ষমতার জন্য অভিভাবকদের কটুবাক্য গলাধঃকরণ করতে হচ্ছে। শিক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের পড়শুনার খুবই ব্যাঘাত ঘট্‌ছে, আর বিদ্যালয়ের দায়িত্ব-

শীল শিক্ষকগণকে "নাজেহাল" হতে হচ্ছে। তিনটি শিক্ষাধারা (কোর্স) বিশিষ্ট যে কোনও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে, পূর্ব্বেকার নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য অনুমাদিত ও নিযুক্ত বড়জোর তিনজন শিক্ষক নিয়ে, নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীর প্রত্যেকটিতে তিনটি হিসাবে, মোট নয়টি ক্লাস যুগপৎ চালাতে হবে। এজন্য, "ল্যাবোরেটরী" ঘর ছাড়াও অন্ততঃ নয়খানি ক্লাসরুমের প্রয়োজন এবং ঐ নয়টি ক্লাসের জন্য কমপক্ষে ১২।১৩ জন শিক্ষক আবশ্যক। দুইখানি ঘর ও বড়জোর তিনজন শিক্ষকের সাহায্যে কেমন করিয়া যুগপৎ নয়টি ক্লাসে পাঠনকার্য্য চলতে পারে? যদিও বা কোনও কোনও বিদ্যালয় সরকারী সাহায্যে টাকায় গৃহনির্ম্মাণ কার্য্যটি তাড়াতাড়ি করে ফেলে থাকেন, তথাপি, প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক না থাকায় শিক্ষাদান-কার্য্য যথোপযুক্ত-ভাবে হচ্ছে না। বেতনক্রম বৃদ্ধি না করলে অদূর-ভবিষ্যতেও শিক্ষক মিলবে না, ইহাই এখন আমাদের ধারণা ও বিশ্বাস। সরকার এ বিষয়ে কি ভাবেন, জানি না।

পাড়াগাঁয়েও বেকার-সমস্যা তীব্র হইতে তীব্রতর রূপ ধারণ করছে। কৃষি-মজুরদের তো প্রায় বৎসরের অর্দ্ধেক দিন কর্ম্মহীন থাকতে হয়। আবার, অনাবৃষ্টি এবং বন্যা প্রভৃতি ঘটলে উহারাই সর্ব্বাগ্রে কর্ম্মহীন হয়ে পড়ে। এখন যদিও চাষের মরশুম হিসেবে গত কয়েক সপ্তাহ মজুরদের চাহিদা আছে, কিন্তু ভাদ্রের অর্দ্ধেক অতীত হলেই চাহিদা বেশ কিছু হ্রাস পাবে এবং বেকারত্ব সুরু হবে। অবশ্য তার পর থেকে পাট কাটা, পচানো, পাট কাচা প্রভৃতি কার্য্যে পুরুষ শ্রমিকদের কিছু অংশ কাজ পাবে বটে, কিন্তু স্ত্রী মজুরেরা আমন ধান কাটার কার্য্যের আগে বিশেষ কিছু কাজ পাবে না। দেশের সাধারণ লোক আগের দিনে বাড়ীর নানাবিধ কাজের জন্য মজুর নিয়োগ করতেন, তাতে কিছু কর্ম্মসংস্থান হতো। কিন্তু, এখন দ্রব্যমূল্য গগন স্পর্শ করায় মজুরীর যে হারবৃদ্ধি ঘটেছে, তাতে বর্ত্তমান যুগের তথাকথিত ভদ্রলোক-শ্রেণীর পক্ষে আর "বাড়ীর কাজ" করান সম্ভব নয়। এই হতভাগ্য তথাকথিত ভদ্রলোক-শ্রেণী অর্থনৈতিক চাপে নিজেরাই ধ্বংসের পথে। পুরাতন গ্রাম্য সমাজ-ব্যবস্থার সে রূপ আর নাই। গ্রামগুলি সমগ্র এবং সম্পূর্ণ ভাবেই অবনতির পথে। কলকারখানার মজুরেরা কতকটা ভাগ্যবান্। তাদের একটা নির্দ্দিষ্ট ন্যূনতম আয় আছে। কিন্তু, গ্রাম্য কৃষি-মজুরেরা সম্পূর্ণ ভাবে অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন গুজরান করেন।

আমার অঞ্চলে চাউলের ন্যূনতম মূল্য এগারো আনা থেকে বারো আনা সের। গ্রামাঞ্চলে যে আংশিক রেশন-প্রথার কথা সংবাদপত্রে পড়া যায়, উহা "তামাসা" ছাড়া আর কিছুই নহে। সুতরাং, সাধারণ ভাবে বলতে গেলে "ভাতের দুর্ভিক্ষ" লেগেই আছে।

এখন স্বাস্থ্যের কথা বলি। একথা স্বীকার করতেই হবে, গ্রামাঞ্চল থেকে ম্যালেরিয়া জ্বর একরূপ বিতাড়িত হয়েছে। এতে, সাধারণ ভাবে সকলের স্বাস্থ্যের উন্নতি হওয়ার কথা। কিন্তু, উপযুক্ত পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্য না পাওয়ায়, সে দিক দিয়া কিছু ভাল লক্ষণ দেখা যায় না। ম্যালেরিয়া জ্বর না থাকলেও, তাহার স্থান, টাইফয়েড প্রভৃতি জটিল রোগ অধিকার করেছে। এখন পেটের অসুখের হিড়িক্ চলছে।

এত দুঃখের পরও মানুষের শান্তি নেই। এ অঞ্চলে চুরি-ডাকাতি যেন নিত্য ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধাতু-নির্ম্মিত বিগ্রহ চুরি প্রায়ই হচ্ছে। একটি ক্ষেত্রেও চোর ধরা পড়েনি। ডাকাতি যথেষ্ট হচ্ছে। কিন্তু, সেখানেও কোনও সুরাহা হচ্ছে না। মানুষ বেশ ভয়ে ভয়ে রাত কাটাচ্ছে। থানা-পুলিসের এলাকা ও লোকবলের বিষয় বিবেচনা করলে কিছুই আর বলার থাকে না—ইহা অবশ্যই স্বীকার করতে হয়।

পূর্ব্বেকার তুলনায় দেশের পথ-ঘাটের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। তবে, গ্রামের পথ-ঘাটের উন্নতি হয় নি। এ-গুলির দায়িত্ব ইউনিয়ন বোর্ডের। বোর্ডের আর্থিক সঙ্গতি অতি সীমাবদ্ধ; সুতরাং গ্রামের পথ-ঘাটের অবস্থার পরিবর্ত্তনের আশা নেই। আগেকার দিনে, গ্রামের ধনী ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে নজর দিতেন। এখন তাঁহারা গ্রাম ছেড়েছেন। সুতরাং তাঁদের নিকট প্রত্যাশা করার আর কিছু নাই। পানীয় জল অবশ্য এখন দীঘি ও পুষ্করিণীর পরিবর্ত্তে নলকূপগুলি থেকে অধিকাংশ স্থানে পাওয়া যাচ্ছে। যথেষ্ট সংখ্যক নলকূপের অভাব আছে বটে, তথাপি ইহা স্বীকার করি, পানীয় জল অনেকটা বিশুদ্ধ ভাবে পাওয়া এখন সম্ভব হয়েছে। পুরাতন দীঘি ও পুষ্করিণীগুলিও সংস্কারাভাবে ক্রমশঃ মজে যাচ্ছে। ঐগুলির সংস্কার আর কে করবে?

দামোদর পরিকল্পনায় গ্রামাঞ্চল কৃষিক্ষেত্রে সেচের জলের যে ব্যবস্থা করা আছে, তাহা সকল ক্ষেত্রে এখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ কার্য্যকর না হলেও, এ অঞ্চলে কিছু কিছু ফলপ্রসূ হয়েছে। আশা করা যায়, পরিকল্পনার কার্য্য শেষ হলে অবস্থার আরও উন্নতি হবে।

ঈশ্বর পাড়াগাঁয়ের লোকেদের সহায় হউন্! তাঁহারা ভাষাহীন, দুর্ব্বল ও ভাগ্যহীন!

রামানুজমতে ব্রহ্ম ও জীবজগতের সম্বন্ধ

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

পূর্ব সংখ্যায় রামানুজমতে ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। রামানুজ ত্রিতত্ত্ববাদী এবং তাঁর মতে জীব ও জগৎ বা চিৎ ও অচিৎ দ্বিতীয় ও তৃতীয় তত্ত্ব।

চিৎ

জীবের স্বরূপ, গুণ, পরিমাণ, সংখ্যা ও প্রকারভেদ

এ বিষয়ে, রামানুজ, নিম্বার্ক প্রমুখ একেশ্বরবাদী বৈদান্তিকেরা একমত। রামানুজও বলেছেন যে, জীব জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতা, কর্তা, ভোক্তা, অণুপরিমাণ, বহুসংখ্যক ও বদ্ধ-মুক্ত ভেদে দু'প্রকার। বদ্ধ জীবের জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা ও মরণরূপ অবস্থাপঞ্চক; এবং স্বর্গ, নরক ও অপবর্গরূপ অদৃষ্টত্রয় সম্বন্ধেও মতভেদ নেই।

অচিৎ

রামানুজের মতে, অচিৎ তিন প্রকারের—প্রকৃতি, কাল ও শুদ্ধতত্ত্ব। 'শুদ্ধতত্ত্ব' 'প্রকৃতি'র ন্যায় ত্রিগুণাত্মক নয়, কেবল সত্ত্বগুণাত্মক।

এস্থলে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, বৈষ্ণব বৈদান্তিকদের 'শুদ্ধতত্ত্ব' 'অপ্রাকৃত' প্রমুখ তত্ত্বটিকে 'অচিৎ' তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত করা হলেও, তাকে জড় বলে গ্রহণ করা হয় না, অজড় বস্তুই বলা হয়। রামানুজ-সম্প্রদায়ের মতবাদ-প্রপঞ্চনাকারী 'যতীন্দ্র-মতদীপিকায়' এই বিষয়টি স্পষ্ট ভাবে বলা আছে—

'দ্রব্যং দ্বিবিধম্। জড়মজড়মিতি। জড়ং চ দ্বিধা। প্রকৃতিঃকালশ্চেতি। অজড়ং তু দ্বিবিধম্। পরাক্-প্রত্যগিতি। অজড়ং পরাগপি তথা। নিত্য বিভূতি-ধর্মভূত জ্ঞানং চেতি। প্রত্যগপি দ্বিবিধ : জীবেশ্বর ভেদাৎ।

অর্থাৎ, দ্রব্য দ্বিবিধ : জড় ও অজড়। জড় দ্বিবিধ : প্রকৃতি ও কাল। অজড় দ্বিবিধ : পরাক্ (পরোক্ষ) ও প্রত্যক্ (প্রত্যক্ষ)। পরাক্ অজড় দ্বিবিধ : নিত্য বিভূতি ও ধর্মভূত জ্ঞান। প্রত্যক্ অজড় দ্বিবিধ : জীব ও ঈশ্বর।

'তানি চ দ্রব্যানি ষট্—প্রকৃতি-কাল-শুদ্ধতত্ত্ব-ধর্মভূত জ্ঞান—জীবেশ্বর ভেদাৎ। তত্র জড়াজড়রূপয়োর্বিভক্তয়োর্মধ্যে জড়ত্ব লক্ষণ মুচ্যতে অমিশ্রসত্ত্ব রহিতং জড়ত্বম্। তদ্ দ্বিবিধম্—প্রকৃতি-কাল-ভেদাৎ।'

অর্থৎ, দ্রব্য ছয় প্রকারের—প্রকৃতি, কাল, শুদ্ধতত্ত্ব, ধর্মভূত জ্ঞান, জীব ও ঈশ্বর। এদের মধ্যে প্রকৃতি ও কাল জড়। যা কেবল সত্ত্বগুণাত্মক নয়—তাই জড়।

'কাল নাম গুণত্রয় রহিতো জড়দ্রব্য বিশেষঃ।'

কাল গুণত্রয় রহিত জড়দ্রব্য বিশেষ। কাল নিত্য ও বিভু। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ভেদে কাল ত্রিবিধ। কাল থেকেই 'যুগপৎ', 'ক্ষিপ্র', ও 'অচির'; এবং 'নিমেষ', 'কাষ্ঠা', 'কলা', 'মুহূর্ত', 'দিবস', 'পক্ষ', 'মাস', 'ঋতু', 'অয়ন' ও 'সংবৎসর' প্রমুখ ব্যবহারসিদ্ধি হয়। পনেরো নিমেষে এক কাষ্ঠা, তিরিশ কাষ্ঠায় এক কলা, তিরিশ কলায় এক মুহূর্ত, তিরিশ মুহূর্তে এক দিবস, পনেরো দিবসে এক পক্ষ, দুই পক্ষে এক মাস, দুই মাসে এক ঋতু, তিন ঋতুতে এক অয়ন, দুই অয়নে এক সংবৎসর।

'শুদ্ধসত্ত্ব-ধর্মভূতজ্ঞান-জীবেশ্বর-সাধারণং লক্ষণমজড়ত্বম্। অজড়ত্বং নাম স্বয়ং প্রকাশত্বম্।'

শুদ্ধতত্ত্ব, ধর্মভূতজ্ঞান, জীব ও ঈশ্বর সকলেই অজড়। যা স্বয়ং প্রকাশ, তাই অজড়। তবে শুদ্ধসত্ত্ব ও ধর্মভূত জ্ঞান 'পরাক' অথবা স্বয়ং প্রকাশ হলেও এ দুটি অপরের নিকটই প্রকাশিত হয়, নিজের নিকট নয়। বদ্ধকালে শুদ্ধসত্ত্বের প্রকাশ নেই; সুষুপ্তিকালে ধর্মভূতজ্ঞানের।

'শুদ্ধসত্ত্বং নাম ত্রিগুণ-দ্রব্য-ব্যতিরিক্তত্বে সতি সত্ত্ব বত্ত্বং নিঃশেষাবিদ্যা নিবৃত্তি দেশ বিজাতীয়ত্বম্।'

শুদ্ধসত্ত্ব বা নিত্য বিভূতি শুদ্ধসত্ত্ব গুণসম্পন্ন। অবিদ্যা নিবৃত্তি না হলে শুদ্ধসত্ত্বের প্রকাশ হয় না। সত্ত্বরজোতমগুণাত্মিকা প্রকৃতির মাধ্যমে ঈশ্বরের যে জগৎরূপে প্রকাশ তার নাম 'লীলাবিভূতি'। একই ভাবে, শুদ্ধসত্ত্বের মাধ্যমে ঈশ্বরের যে বৈকুণ্ঠরূপে প্রকাশ, তার নাম 'নিত্য বিভূতি'। এই বিভূতি উর্দ্ধপ্রদেশে অনন্ত, অধঃপ্রদেশে পরিচ্ছিন্ন। শুদ্ধসত্ত্ব বা নিত্যবিভূতি অচেতন হয়েও স্বয়ং প্রকাশ—

"অচেতনা স্বয়ং প্রকাশ্যা চ।" প্রগাঢ় আনন্দময় বলে এ পঞ্চোপনিষদাত্মিকা, অপ্রাকৃত-পঞ্চশক্তিময় বলে এ পঞ্চশক্তিময়। এই শুদ্ধসত্ত্ব বা নিত্যবিভূতি ঈশ্বর, নিত্য-মুক্ত ও বদ্ধমুক্তগণের ভোগ্য বা শরীরাদি; ভোগোপকরণ বা চন্দন, কুসুম, বস্ত্র, ভূষণ, আয়ুধ প্রভৃতি; এবং ভোগস্থান বা গোপুর, পুরপ্রাকার, মণ্ডপ, বিমানোদ্যান

প্রভৃতির উপাদান কারণ। এ সম্বন্ধে আলোচনা "নিম্বার্ক বেদান্তে" দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্মের সঙ্গে জীবজগতের সম্বন্ধ

ব্রহ্মের সঙ্গে জীবজগতের সম্বন্ধ আলোচনা কালে রামানুজ কারণ ও কার্য, অংশী ও অংশ, বিশেষ্য ও বিশেষণ, আত্মা ও দেহ, রাজা ও প্রজা প্রভৃতি নানারূপ উপমা প্রদান করেছেন। এদের মধ্যে, বিশেষ্য ও বিশেষণ, এবং আত্মা ও দেহের উপমা দুটিই তাঁর বিশেষ প্রিয়, এবং এ দুটির বারংবার উল্লেখ তাঁর গ্রন্থে পাওয়া যায়।

উপরের উপমাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ঐ দুটি বস্তুর মধ্যে ভেদ ও অভেদ দুই আছে। যেমন, কার্য কারণেরই রূপান্তর, অংশ সমগ্র অংশীরই অন্যতম একটি বিভাগ, বিশেষণ বিশেষ্যের গুণ, এবং দেহ আত্মার উপর নির্ভরশীল বলে, কার্য ও কারণ, অংশ ও অংশী, বিশেষণ ও বিশেষ্য, দেহ ও আত্মা এক-পক্ষে অভিন্ন। কিন্তু অন্যপক্ষে সেই সঙ্গে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে, এই গুণ ও শক্তি ভিন্ন বলে তারা অভিন্ন হয়েও ভিন্ন। সেজন্য তাদের মধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধই স্বীকার্য।

রামানুজও একই ভাবে ব্রহ্ম ও জীবজগতকে কোনো কোনো স্থলে অভিন্ন, এবং কোনো কোনো স্থলে ভিন্ন বলেছেন। যেমন, "শ্রীভাষ্যের" ২-১-১৫ সূত্রে তিনি কার্য-কারণ উপমার উল্লেখ করে বলছেন :

"তস্মাৎ পরমকারণাদ্ ব্রহ্মণঃ অনন্যত্বং জগতঃ।"

এই একই সূত্রে শরীরী ও শরীর বা আত্মা ও দেহের উপমা প্রদান করেও রামানুজ বলছেন :

"তদেতৎ কার্যাবস্থস্য কারণাবস্থস্য চ চিদচিদ্বস্তুনঃ সকলস্য স্থূলস্য সূক্ষ্মস্য চ পরব্রহ্ম-শরীরত্বম পরস্য চ ব্রহ্মণ আত্মত্বম্ অন্তর্যামি-ব্রাহ্মণাদিষু সিদ্ধং স্মারিতম্। অচি-দ্বস্তুনি সজীবে ব্রহ্মণ্যাস্ম তয়াবস্থিতে নামরূপ-ব্যাকরণ-বচনাৎ চিদচিদ্বস্তু শরীরকং ব্রহ্মৈব জগচ্ছব্দ বাচ্যমিতি।"

(পৃঃ ৭৬)

অর্থাৎ, ব্রহ্ম ও জীবজগৎ অনন্য বা অভিন্ন কারণ, সূক্ষ্ম-চিদচিদ্‌বিশিষ্ট কারণরূপ ব্রহ্মই স্থূল চিদচিদ্‌বিশিষ্ট কার্যরূপ জগৎ—ব্রহ্মই জীবজগতের আত্মা ও অন্তর্যামী। এরূপে জীবজগতের আত্মাস্বরূপ ব্রহ্মই বিভিন্ন নামরূপে নিজেকে প্রকাশিত করেছেন বলে, ব্রহ্মই 'জগৎ' শব্দবাচ্য।

এই ভাবে, কার্য-কারণের "অনন্যত্ব" স্বীকার করলেও, রামানুজ শঙ্কর ও ভাস্কর যে অর্থে এই "অনন্যত্বকে" গ্রহণ করেছেন, সেই অর্থে করেন নি। সেজন্য তিনি বলছেন :

"যে তু কার্য-কারণয়োরনন্যত্বং কার্যস্য মিথ্যাত্বাশ্রয়েণ বর্ণয়ন্তি, ন তেষাং কার্য-কারণয়োরনন্যত্বং সিধ্যতি, সত্য-মিথ্যার্থয়োরৈক্যানুপপত্তেঃ, তথা সতি ব্রহ্মণো মিথ্যাত্বং জগতঃ সত্যত্বং বা স্যাৎ। যে চ কার্যমপি পারমার্থিকমভ্যু-পয়ন্ত এব জীব-ব্রহ্মণোরৌপাধিকমনন্যত্বং স্বাভাবিকং চানন্যত্বম্ অচিদ্ ব্রহ্মণোস্তু দ্বয়মপি, স্বাভাবিকমিতি বদন্তি…" (২-১-১৫, পৃঃ ৭৮।)

অর্থাৎ, অদ্বৈত সম্প্রদায়ের মতে, কারণ ও কার্য অনন্য বা অভিন্ন, যেহেতু কার্য মিথ্যা। কিন্তু সত্য কারণ ও মিথ্যা কার্যের মধ্যে একত্ব ও অভিন্নত্ব সম্ভব কি করে? একই ভাবে, ভাস্কর সম্প্রদায়ের মতে, জীব ও ব্রহ্মের অনন্যত্ব বা ভিন্নত্ব ঔপাধিক, অনন্যত্ব বা অভিন্নত্ব স্বাভাবিক, জগৎ ও ব্রহ্মের ভিন্নত্ব ও অভিন্নত্ব দুই স্বাভাবিক—এই মত অযৌক্তিক।

রামানুজের মতে, দুটি বস্তুর মধ্যে অনন্যত্ব বা অভিন্নত্ব কেবল সেক্ষেত্রেই সম্ভব যে ক্ষেত্রে—সেই দুটি বস্তু একই বস্তুর দুটি বিভিন্ন অবস্থান্তরই মাত্র, যেরূপ ব্রহ্ম ও জীবজগৎ।

দ্বিতীয়তঃ, অন্যপক্ষে, রামানুজ ব্রহ্ম ও জীবজগতের ভেদের কথাও বলেছেন। যেমন "শ্রীভাষ্যে" (২-১-২২) তিনি বলেছেন :

"প্রত্যগাত্মনো হি ভেদেন নির্দিশ্যতে পরং ব্রহ্ম।"

পুনরায়, ২-১-১৪ সূত্রে তিনি বলছেন :

"স্যাদেবঃ বিভাগঃ জীবেশ্বর-স্বভাবয়োঃ।" (পৃঃ ৬৩)

এই সূত্রেই তিনি রাজা ও প্রজার উপমা প্রদান করে বলেছেন :

"লোকবৎ—যথা লোকে রাজশাসনানুবর্তিনাং তদতি-বর্তিনাঞ্চ রাজানুগ্রহ-নিগ্রহ-কৃত সুখ-দুঃখ যোগেঽপি ন সশরীরত্ব মাত্রেণ শাসকে রাজন্যপি শাসনানুবৃত্ত্যতি-বৃত্তি-নিমিত্ত-সুখ-দুঃখয়োর্ভোক্তৃত্ব-প্রসঙ্গঃ" (পৃঃ ৬৪)।

অর্থাৎ, পৃথিবীতে দেখা যায় যে, প্রজাগণ রাজার অনুগ্রহ ও নিগ্রহের পাত্র হয়ে সুখ ও দুঃখ উপভোগ করলে তা রাজাকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করে না।

তৃতীয়তঃ, ২-৩-৪২ সূত্রে রামানুজ জীব যে ব্রহ্মের অংশ, তা প্রমাণ করবার জন্য ব্রহ্ম ও জীবজগতের মধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধের কথাও স্পষ্ট বলেছেন :

"ব্রহ্মাংশ ইতি। কুতঃ? অন্যথা চ একত্বেন ব্যপ-দেশাৎ। উভয়থা হি ব্যপদেশো দৃশ্যতে। নানাত্ব ব্যপ-দেশস্তাবৎ স্রষ্টৃত্ব-সৃজ্যত্ব-নিয়ন্তৃত্ব-নিয়াম্যত্ব-সর্বজ্ঞত্বাজ্ঞত্ব-স্বাধীনত্ব-পরাধীনত্ব-শুদ্ধত্বাশুদ্ধত্ব-কল্যাণগুণাকরত্ব-তদ্বিপরী-তত্ব-পতিত্ব-শেষত্বাভির্দৃশ্যতে। অন্যথা চ—অভেদেন ব্যপদেশোঽপি "তত্ত্বমসি" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদি-

ভিধীয়তে। অপি দাশকিতবাদিত্বং মধীয়তে একে—'ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মেমে কিতবাঃ' ইত্যাথর্বণিকা ব্রহ্মণো দাশ-কিতবাদিত্বমপ্যধীয়তে। ততশ্চ সর্বজীব ব্যাপিত্বে নাভেদো ব্যপদিশ্যত ইত্যর্থঃ। এবমুভয়—ব্যপদেশমুখ্যত্ব-সিদ্ধয়ে জীবোঽয়ং ব্রহ্মণোঽংশ ইত্যভ্যুপগন্তব্যঃ। ন চ ভেদব্যপদেশানাং প্রত্যক্ষাদি-প্রসিদ্ধার্থত্বেন অন্যথাসিদ্ধত্বম, ব্রহ্ম-স্রষ্টৃত্ব-তন্নিয়াম্যত্ব-তচ্ছরীরত্ব-তচ্ছেষত্ব-তদাধারত্ব-তৎ-পাল্যত্ব-তৎসংহার্যত্ব-তদুপাসকত্ব-তৎপ্রসাদ-লভ্য-ধর্মার্থকাম মোক্ষরূপ-পুরুষার্থ-ভাক্ত্বাদয়স্তৎকৃতশ্চ জীব ব্রহ্মণোর্ভেদঃ প্রত্যক্ষাদ্যগোচরত্বে নান্যথাসিদ্ধিঃ।...অত উভয় ব্যপ-দেশোপপত্তয়ে জীবোঽং ব্রহ্মণোঽংশ ইত্যভ্যুপেত্যম্।"

অর্থাৎ, অদ্বৈতবাদিগণের মতের বিরুদ্ধে রামানুজ এ স্থলে প্রমাণ করতে প্রচেষ্টা করছেন যে, জীব ব্রহ্মের অংশ, এবং অংশী ব্রহ্ম থেকে ভিন্নাভিন্ন। সেজন্য শাস্ত্রে ব্রহ্ম ও জীবের ভেদ ও অভেদ উভয়ের কথাই বলা আছে। যেমন, ভেদের দিক থেকে ব্রহ্ম স্রষ্টা, জীব সৃজ্য, ব্রহ্ম নিয়ন্তা, জীব নিয়াম্য, ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ, জীব অজ্ঞ; ব্রহ্ম স্বাধীন, জীব পরাধীন; ব্রহ্ম শুদ্ধ, জীব অশুদ্ধ; ব্রহ্ম কল্যাণ গুণাকর, জীব তদ্বিপরীত; ব্রহ্ম পতি, জীব সেবক; ব্রহ্ম শরীরী, জীব শরীর, ব্রহ্ম অঙ্গী, জীব অঙ্গ; ব্রহ্ম আশ্রয়, জীব আশ্রিত; ব্রহ্ম পালক, জীব পালিত; ব্রহ্ম সংহারক, জীব সংহার্য; ব্রহ্ম উপাস্য, জীব উপাসক; ব্রহ্ম অনুগ্রাহক, জীব অনুগৃহীত (২-৩-৪২) প্রভৃতি। একই ভাবে, অভেদের দিক থেকে, সর্বব্যাপী ব্রহ্ম সমগ্র জীবজগতের আত্মা, এবং সেরূপে জীবজগৎ থেকে অভিন্ন। সুতরাং ব্রহ্ম ও জীবজগতের ভেদ ও অভেদ উভয়ই সত্য। সে কারণে জীবজগৎকে ব্রহ্মের অংশ বলে স্বীকার করতে হয়, কারণ অংশী ও অংশের সম্বন্ধ, যা পূর্বেই বলা হয়েছে, ভেদাভেদ সম্বন্ধ।

শ্রীভাষ্যের ১-১-১ সূত্রেও রামানুজ প্রকৃতপক্ষে এই ভেদাভেদ সম্বন্ধের কথাই বলেছেন—

(১) "অচিদ্ বস্তু ন-শ্চিদ্ বস্তুনঃ পরস্য চ ব্রহ্মণো ভোগ্যত্বেন ভোক্তৃত্বেন চৈশিতৃত্বেন স্বরূপবিবেকমাহুঃ কাশ্চন শ্রুতয়ঃ। (পৃঃ ২৩৪)

"এবং ভোক্তৃ-ভোগ্যরূপেণাবস্থিতয়োঃ সর্বাবস্থাব-স্থিতয়োশ্চিদ চিতোঃ পরম পুরুষ-শরীরতয়া তন্নিয়াম্যত্বেন তদপৃথক্ স্থিতিং পরম পুরুষস্য চাত্মত্বমাহুঃ কাশ্চন শ্রুতয়ঃ।

(২) "এবং সর্বাবস্থাবস্থিত-চিদচিদ্ বস্তু-শরীরতয়া তৎ প্রকার পরমপুরুষ এব কার্যাবস্থ-কারণাবস্থ-জগদ্রূপেণাব-স্থিত ইতীমমর্থং জ্ঞাপয়িতুং কাশ্চন শ্রুতয়ঃ কার্যাবস্থন-কারণাবস্থঞ্চ জগৎ স এবেত্যাহুঃ।" (পৃঃ ২৩৮)

"অত্রাপি শ্রুত্যন্তরসিদ্ধশ্চিদচিতোঃ পরম পুরুষস্য চ স্বরূপবিবেকঃ স্মারিতঃ।"

এরূপে, এ স্থলে রামানুজ দুই প্রকারের শ্রুতিবাক্যের অবতারণা করেছেন। প্রথম প্রকার হ'ল—ভোক্তৃ-ভোগ্য-নিয়ন্তৃ-শ্রুতি। এই প্রকার শ্রুতিবাক্যের মধ্যে কোনো কোনোটি জীবজগৎ ও ব্রহ্মের ভেদ, কোনো কোনোটি পুনরায় অভেদ প্রতিপাদিত করছে। দ্বিতীয় প্রকার হ'ল—সৃজ্য-স্রষ্ট-শ্রুতি। এ স্থলেও ভেদ ও অভেদ বাক্য দুই পাওয়া যায়। সেজন্য শরীরি-শরীর, বিশেষ্য-বিশেষণের মধ্যে যেরূপ ভেদাভেদ সম্বন্ধ, যা পূর্বেই বলা হয়েছে, ব্রহ্ম ও জীবজগতের মধ্যেও সেই একই সম্বন্ধ (১-১-১)।

অনেকে হয়ত আশ্চর্যান্বিত হতে পারেন যে, রামানুজ যে কেবল অভেদবাদ ও ভেদবাদই অযৌক্তিক বলে বর্জন করেছেন, তাই নয়—সেই সঙ্গে ভেদাভেদবাদেরও তীব্র সমালোচনা করেছেন (১-১-১; পৃঃ ২২৮-২৩০)।

যেমন তিনি বলেছেন:

"সদপি কৈশ্চিদুক্তম্—ভেদাভেদয়োর্বিরোধো ন বিদ্যত ইতি, তদযুক্তম্। ন হি শীতোষ্ণ-তমঃ প্রকা...দিবদ্ ভেদা-ভেদাবেকস্মিন্ বস্তুনি সংগচ্ছতে।" (১-১-১; পৃঃ ৩১৮)।

"অতএব জীবস্যাপি ব্রহ্মণো ভিন্নাভিন্নত্বং ন সম্ভবতি" (১-১-১)।

অবশ্য এই ভেদাভেদবাদ অর্থ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাস্করীয় ঔপাধিক-ভেদাভেদবাদ (১-১-১; ২৪৫, ৩০৪, ৩১৮; ২-১-১৫, পৃঃ ৭৮)।

কিন্তু একস্থলে তিনি "স্বাভাবিক-ভেদাভেদ বাদেরও" সমালোচনা করেছেন এই বলে যে, এই মতবাদানুসারে ব্রহ্ম ও জীবের স্বরূপগত ভেদ স্বীকৃত হয় বলে, ব্রহ্ম স্বভাবতঃই শুদ্ধ, জীব স্বভাবতঃই দোষগুণসম্পন্ন—এই স্বীকার করতে হয়। সে স্থলে এই দুজনের মধ্যে পুনরায় স্বরূপগত অভেদ সম্ভবপর কি করে? (১-১-১; পৃঃ ২২৯)।

কিন্তু এই সাধারণ ভেদাভেদবাদ ও রামানুজীয় ভেদাভেদবাদের মধ্যে প্রভেদ এই যে, রামানুজ বলছেন, একমাত্র আত্মা ও দেহ বা বিশেষ্য ও বিশেষণের উপমা গ্রহণ করলে, এই দুরূহ সমস্যা থেকে পরিত্রাণ লাভ সম্ভবপর হতে পারে (১-১-১) এ স্থলে রামানুজ "অপৃথক্-সিদ্ধি" (১-১-১; পৃঃ ২৩৭), এবং "সামানাধি-করণ্য" এই দুটি তত্ত্বের সাহায্য গ্রহণ করেছেন।

নিরক্ষরের ভাষায় সেকালের স্মৃতি

শ্রীভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

সেকালের লোকশিক্ষা

সেকালে বাঙালীর নীতি ধর্ম সংস্কৃতি ও চিত্তবিনোদনের প্রধান উৎস ছিল রামায়ণ, মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত। হাতের লেখা পুঁথির যুগে বই ছিল দুষ্প্রাপ্য। সেই জন্য অক্ষর-জ্ঞানের প্রয়োজন হইত কম। জনগণের বিরাট অংশই থাকিত নিরক্ষর। তাহাদের এই নিরক্ষরতা জনগণের হৃদয়ে হিন্দুর জাতীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠার অথবা সাহিত্যিক রসবোধের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইতে পারে নাই। পাঠের উদ্দেশ্য গ্রন্থের ভাব-গ্রহণ। নিজে পড়িয়া অথবা অপরের পাঠ শুনিয়া লেখকের বক্তব্য বুঝিতে পারা যায়। নীরব পাঠক লাভবান হয় একক। সরব পাঠকের পাঠে একসংগে উপকৃত হয় বহু শ্রোতা। লোকশিক্ষার জন্য এদেশে সর্বসাধারণকে পাঠ শোনাইবার ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। অধিকারী ব্যতীত অপর কেহ গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া তাহাদের মর্ম গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় না। যোগ্য পাঠক মধ্যে মধ্যে ব্যাখ্যা করিয়া দুরূহ বিষয় শ্রোতাদের বোধগম্য করিয়া তুলিতে পারেন। বই-পড়া থাকে শিক্ষিতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ: পাঠ-শোনায় অধিকার সর্বস্তরের আবালবৃদ্ধবনিতার।

প্রতিদিন মন্ত্রী করে পুরাণ শ্রবণ।

*　　*　　*

নগরবাসী যত যায় রাজপুরে।
শুনয়ে পুরাণপাঠ করিয়া যতন।

*　　*　　*

বসিয়া সমাজে শিশু শাস্ত্রকথা শুনে।
ভক্তির উদয় হৈল পুরাণ শ্রবণে॥

পাঠ করিয়া শাস্ত্রগ্রন্থ শুনাইবার রীতির উদ্ভব হইয়াছিল অতি প্রাচীনকালে। নৈমিষারণ্যে যজ্ঞোপলক্ষে সমবেত মুণিগণ প্রথম সূত, পরে সূত-নন্দনের মুখে নানা চিত্র-বিচিত্র পুরাতন কাহিনী এবং বহু শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াছিলেন। রাজা জন্মেজয়কে ভারত-কাহিনী শুনাইয়াছিলেন ব্যাস-শিষ্য শ্রীবৈশম্পায়ন। আকবরের রাজত্বকালে মেদিনীপুরের রাজবাটীতে পুরাণ-পাঠক ও কথকদের মুখে মহাভারতের কাহিনী শুনিয়া পাঠশালার গুরুমশায় কাশীরাম দাস স্বীয় মহাভারত রচনায় প্রবৃত্ত হন। আবার তিনি যখন—

আদি সভা বন বিরাট রচিলেন পাঁচালি।
তাহা শুনি সর্বলোক করে ধন্যি ধন্যি॥

পুঁথি পাঠ দেওয়া, জলাশয় প্রতিষ্ঠা, পথ নির্মাণ, পথিপার্শ্বে ছায়াতরু রোপণ প্রভৃতির ন্যায় একটি পুণ্যকর্ম বলিয়া গণ্য হইত। বিত্তবানেরা পাঠ দিতেন, পাঠ শুনিতে গ্রাম ভাঙ্গিয়া পড়িত। পাঠ শ্রবণে কেবলমাত্র সরস কাহিনীর আনন্দ উপভোগ করা উদ্দেশ্য ছিল না, উহাতে পাপ-ক্ষয় ও পুণ্য-সঞ্চয় হইত। স্বয়ং ব্যাসদেব বলিয়াছেন:

ব্রহ্মবধ আদি পাপ সব হবে ক্ষয়।
অশ্বমেধ ফল পাবে নাহিক সংশয়॥

মহাভারত শ্রবণের ফলের মতই রামায়ণ শ্রবণের ফল।

যেই জন রামায়ণ করিবে শ্রবণ।
পরলোকে সন্তান-স্বর্গে করিবে গমন॥
অপুত্রক শুনে যদি পায় পুত্রফল।
সপ্তকাণ্ড শুনিলে অশ্বমেধের ফল॥

শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের ফলও অনুরূপ। এই তিন গ্রন্থ ছাড়া বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল ও শিবচন্দ্র সেনের সত্যনারায়ণের পাঁচালির বহুল প্রচলন ছিল পূর্ববঙ্গে।

লিপিজ্ঞানহীন নর-নারীর মধ্যে জ্ঞান-প্রচার ও আনন্দ সৃষ্টির এই অভিনব ধারার প্রবাহ চলিয়া আসিয়াছিল বর্তমান শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত। পুস্তক মুদ্রণের পর এই সকল গ্রন্থের পাঠ ও শ্রবণ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের হিসাবে চল্লিশ বৎসর পূর্বে 'প্রতিবৎসর প্রায় এক লক্ষ কাশীদাসী মহাভারত বিক্রীত হইত।' পাঠ ছাড়া যাত্রা, কৃষ্ণলীলা, রামায়ণের পালাগান, ভাসান গান প্রভৃতির মধ্য দিয়া গ্রন্থের বিষয়বস্তু চক্ষের সম্মুখে মূর্ত হইয়া উঠিত। এইরূপে সেকালের বাঙালী বাস করিত রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত ও মনসামঙ্গলের ভাব-পরিবেশে। গ্রন্থসমূহের পাত্র-পাত্রী তাহাদের বন্ধু পরিচিত ও প্রতিবেশীর মতই চেনা হইয়া গিয়াছিল। এই কারণে সাধারণ লোকের মুখের ভাষায়

বহু রূপক ও উপমা আসিয়াছে পৌরাণিক যুগের জীবন হইতে।

চলতি শতকের প্রথম দশকে জাতীয় আন্দোলনের বন্যায় পুরাতনকে ভাসাইয়া দিয়া বাংলা নবজন্ম লাভ করিয়াছে। রামায়ণ-মহাভারত এখন শিশুপাঠ্য বই। বড়দের মনের শূন্যস্থান এখন পূরণ করিতেছে বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা। নিরক্ষরদের শিক্ষার ধারা পশ্চিমবঙ্গের নদীর মত মজিয়া গিয়াছে। তাহাদের অপাংক্তেয় ভাষায় রক্ষিত এই অপস্রিয়মান যুগের কয়েকটি 'ফসিলে'র নিদর্শন তুলিয়া ধরা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

পৌরাণিক যুগের অস্ত্রশস্ত্র

যুদ্ধ-প্রধান পৌরাণিক যুগের অস্ত্রাদির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় বেশী। সেকালে ধাতু-নির্মিত অঙ্গাবরণের নাম ছিল কবচ। শত্রুর অস্ত্র প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে যোদ্ধারা এইরূপ সাঁজোয়া পরিধান করিত।

শত লক্ষ বাণ মারিলেন একেবারে।
ভীষ্মের কবচ ভেদি রক্ত পড়ে ধারে॥

এখন বলা হয়, 'শনির কোপ (আঘাত) এড়াবার জন্য এক কবচ ধারণ করতে হবে।' এই কবচ সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করে না; ইহা মাদলের আকৃতি ক্ষুদ্র মাদুলি মাত্র। কিন্তু বিশ্বাসীর মতে মন্ত্রবলে বলীয়ান বলিয়া ইহা বিরূপ গ্রহের আক্রমণ প্রতিরোধের ক্ষমতা রাখে। 'কুমড়া গাছে ঢাল ঢাল (ঢালের মত বড়) পাতা কিন্তু ফল ধরে না।' 'জামাইর তীরকাঠির মত (সরু) নাক।' অজ্ঞাত কারণে সতেজ গাছ ঢলিয়া পড়িলে অথবা বলিষ্ঠ লোক রক্তবমন করিলে বলা হইয়া থাকে, 'কে যেন বাণ মারিয়াছে।' ক্ষিপ্রহস্ত ধনুর্ধরদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধের সময় বাণে বাণে আকাশ ছাইয়া শরের জাল সৃষ্টি হইত। এখন বৃদ্ধারা বলে, 'বাড়ীতে গিয়া দেখ কি শরজাল (তুমুল ঝগড়া) আরম্ভ হইয়াছে।' কখনও বা বলে, 'এত শরজাল (যন্ত্রণা) আর সইতে পারি না।' 'বৃদ্ধা রোগে ভুগছিল অনেক দিন। অবশেষে একমাত্র ছেলের মরণই হ'ল তার মৃত্যুবাণ।' 'কুইনাইন জ্বরের ব্রহ্মাস্ত্র।' 'তার কথাগুলো তীরের মত গিয়া বুকে বিন্ধে।' 'সে ত ছ'মাস ধরে 'শরশয্যায়' (দীর্ঘস্থায়ী ব্যাধিতে) পড়েছে, এখন সব বোঝা বইতে হয় আমার।' 'লোকটা ত আমার উপর খড়্গহস্ত।' 'দুই ভাইর মধ্যে ঘোর অসিয়তা (অসি চালাচালি, বিরোধ) চলছে।' 'তার এক-একটা কথা বুকে শেলের মত বাজে।' 'ছেলেটির ধনুষ্টংকার হয়েছে।' 'চাঁদা না দিলে ইস্কুলে যাবে না, এই তার ধনুর্ভঙ্গ পণ।' 'এ কথাটা হ'ল সর্বচূর্ণ গদার বাড়ি।' 'তোরা সপ্তরথীর মতো ঘিরে ফেলে বর বেচারাকে কি নাকালটাই না করলি।' 'ওদের বাড়ী কুরুক্ষেত্র বেধেছে।' 'আমি সংসারের নাগপাশে আবদ্ধ, তীর্থে যাওয়া আমার ভাগ্যে নাই।' 'দুই ভাইয়ে শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ হয়ে গেল।' 'ভাই ভাই সারাদিন মহীরাবণের যুদ্ধ চলে।'

পৌরাণিক যুগের নরনারী

আমাদের আলোচ্য গ্রন্থসমূহের বিশাল চিত্রপটে অগণিত নরনারীর আনাগোনা দেখা গেলেও সাধারণ লোকের স্মৃতিপটে বাঁধা পড়িয়াছে তাহাদের মাত্র অল্প কয়েকজন। যাহাদের চরিত্র বা কৃতিত্ব অসাধারণ কেবলমাত্র তাহারাই স্মৃতির ভাণ্ডারে সংরক্ষিত হইয়াছে। জনসাধারণের আটপৌরে ভাষায় আমরা এদের দেখা পাই সদাসর্বদা। মহাপুরুষ ভীষ্ম বাঁচিয়া আছেন তাঁহার প্রজ্ঞা বা শৌর্যের জন্য নহে, তাঁহার প্রতিজ্ঞা ও শরশয্যা তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। মহাভারতের আরও অনেকে প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু পিতার আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য নিজের সুখ চিরতরে বিসর্জন দিয়া তিনি যে মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন তাহা লোকের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছে। তাঁহাকে না ভুলিবার ইহাই প্রধান কারণ। শুনিতে পাই, 'ছেলেটি কিছুতেই খাবে না, ওর ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা।' উত্তরায়ণের প্রতীক্ষায় মৃত্যুকে ঠেকাইয়া রাখিয়া শরশয্যায় কালযাপন এক অভূতপূর্ব ঘটনা। ইহা বিস্মৃত হওয়া অসম্ভব। নারীরা বিরক্ত হইয়া বলে, 'শরশয্যায় পড়েছে আর উঠবে না।'

মহাভারতের শ্রেষ্ঠ বীর কর্ণ অসামান্য দাতা ছিলেন। তিনি—

যেই যাহা চাহে দিতে নাহি করে আন।
প্রাণ কেহ নাহি চায় তেঞি রহে প্রাণ॥

তিনিও বীরত্বের জন্য নহেন, দানের মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছেন। 'তুমি দেখি আজ দাতাকর্ণ হয়ে বসেছ।'

যুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যে পর্দার ফাঁক দিয়া কয়েক বার চক্ষে পড়ে সাধু বিদুরের শান্ত সৌম্য নিরভিমান মূর্তি। মহাসমর বারণের শেষ চেষ্টা করিতে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ হইয়াছেন বিদুরের বাড়ীতে অতিথি। তিনি বলিলেন—

খাদ্যবস্তু আন কিছু জুড়াক অন্তর।

বিদুর গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—

তণ্ডুলের খুদমাত্র আছে অবশেষ।

সংকুচিত চিত্তে—

তাহা আনি দিল পদ্মাবতী।

তখন—

সন্তুষ্ট হইয়া কৃষ্ণ করেন ভক্ষণ।
বিদুর লজ্জিত হয়ে না মেলে নয়ন॥

এই অপূর্ব অতিথি সংকারের কথা অবিস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে লোকের মুখের ভাষায়। কোন বিশিষ্ট অভ্যাগতের আহারের সময় বলা হয়, 'আমার আয়োজন ত বিদুরের খুদ-কুঁড়া ; কোন প্রকারে ক্ষুধার নিবৃত্তি করিবেন।'

ধর্মবরে হ'ল পুত্র এহিত কারণ।
যুধিষ্ঠিরে কহে সবে ধর্মের নন্দন॥

× × ×

সকল ধার্মিক শ্রেষ্ঠ এই স্থতবর।

এখন ব্যঙ্গ করিয়া বলা হয়, 'তুমি ত একজন ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির।'

ভীম দেখিতে ছিলেন—

হেমন্ত পর্বত প্রায় কিবা যূথপতি।

তিনি রহিয়া গিয়াছেন 'ভীমের মত চেহারা'র মধ্যে।

বীরত্ব অপেক্ষা মহত্ত্বকে প্রাচীন ভারতে উচ্চ আসন দেওয়া হইত বলিয়া মহাভারতের একিলিস অর্জুনের সাক্ষাৎ ভাষার মধ্যে কোথাও পাওয়া যায় না।

অসহায় ভীষ্ম মনের খেদে বলিয়াছিলেন—

শিখণ্ডী পশ্চাতে থাকি পার্থ ধনুর্ধর।
আমাকে মারিছে বীর তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শর॥

আজকাল শুনিতে পাওয়া যায়, 'নির্বোধটাকে শিখণ্ডীর মতো সামনে রেখে সে নিজে মামলা চালাচ্ছে ভাইয়ের বিরুদ্ধে।'

'তাকে বলে কি হবে সে তো এক জড়ভরত।' সুখ-দুঃখে নির্বিকার জাতিস্মর ব্রহ্মবিৎ মৌনী জড়ের মত নিষ্ক্রিয় মহারাজ ভরতের নিষ্ক্রিয়তাই তাহাকে অমরতা দান করিয়াছে।

ভ্রাতৃভক্ত বীর লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের আদেশ পালন করিতেন অক্ষরে অক্ষরে, আদেশের অভিপ্রায় বুঝিয়া কাজ করিতেন না। ইহার ফলে বনবাসের চৌদ্দ বৎসর তাহাকে অনাহারে থাকিতে হইয়াছিল। তিনি বলিতে-ছেন—

আমাকে কহিতে, 'ফল ধর রে লক্ষ্মণ।'

আর

আমি ধরে রাখিতাম কুটিরেতে আনি।
খাইতে কখনে বল নাহি রঘুমণি॥
আজ্ঞা বিনা কেমনেতে করিব আহার।
চৌদ্দ বৎসরের ফল আছয়ে আমার॥

উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া আদেশের আক্ষরিক অর্থ অনুসারে যে কাজ করে তাহার সম্বন্ধে বলা হয়—সে তো এক ধর লক্ষ্মণ।

নিদ্রা-বীর কুম্ভকর্ণের নাম শোনা যায় প্রতিদিন সকাল বেলা। ছেলে কাদা হইয়া ঘুমাইতেছে ; মার ডাকে তার চেতনা ফিরে না। ভর্ৎসনা করিয়া মা বলেন, 'কুম্ভ-কর্ণের নিদ্রা আর ভাঙে না।'

সীতা ভ্রমে প্রণতা মন্দোদরীকে 'জন্মায়তি হও' বলিয়া আশীর্বাদ করেন শ্রীরামচন্দ্র। ভুল বুঝিতে পারিয়া মন্দোদরীর অনুযোগের উত্তরে তিনি বলিলেন—

রাবণের চিতা রহিবে সর্বথা।
চিরকাল রবে আয়তে॥

পুত্রশোকাতুরা জননীকে বলিতে শুনা যায়, 'যেদিন রামকে বিদায় দিয়ে এলাম সেদিন থেকে বুকের ভিতর রাবণের চিতা জ্বলছে।

রাবণের মামা কালনেমি হনুমান বধের ভার লইয়া গন্ধমাদন পর্বতে গেল। হনুমানকে বধের পুরস্কার স্বরূপ সে লঙ্কার অর্ধেক পাইবে এই ছিল সর্ত। সে মনে মনে ভাবিতেছিল—

অর্ধ লঙ্কা ভাগ করি লইব সত্বর।
দড়ি ধরে লব ভাগ উত্তর-দক্ষিণে।
পূর্ব দিকে লব আমি না যাব পশ্চিমে॥
পশ্চিম সাগরে যদি বাঁধ ভেঙে যায়।
পশ্চিমে রাবণে দিব ভাগ যত হয়॥
অশ্ব হস্তী সৈন্য রথ ভাণ্ডারের ধন।
সকল অর্ধেক বুঝে লইব এখন॥

অকস্মাৎ হনুমানের আগমনে তার এই দিবা-স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল। তার পর 'বুকে হাঁটু দিয়া হনু কালনেমি মারে।' আর লেজে জড়াইয়া তাহাকে 'লঙ্কাতে ফেলিয়া দিল রাবণের পাশে।' এই কাহিনীর স্মৃতি বহন করিতেছে 'কালনেমির লঙ্কা ভাগ বাক্যাংশ'।

'চৌষট্টি যোজন গিরিবর' গন্ধমাদন মাথায় তুলিয়া বীর হনুমান আকাশপথে 'চলে দক্ষিণ মুখেতে'। মানস-পটের এই দৃশ্য ভুলিবার নহে। বিরাট খড়ের বোঝা মাথায় করিয়া নিতে দেখিলে মুখে আসে, 'গন্ধমাদন নিয়ে চলেছ কোথায়?'

সংসারের যাতনায় ক্লিষ্ট রমণীর মুখে শুনিতে পাই, 'আমি আছি কংসের কারাগারে।'

আর তো ব্রজে যাব না ভাই,
ব্রজে যেতে প্রাণ নাহি চায়।
ব্রজের খেলা ফুরিয়ে গেছে
তাই এসেছি মথুরায়।

অক্রুর আসিয়াছিলেন ব্রজের কানাইকে মথুরায় লইয়া যাইবার দূত হইয়া। এই শোকাবহ ঘটনার হেতু অক্রুর লোকচিত্তে অম্লান রহিয়াছে। লোকে বলে, 'পয়সা দেবে একটি গান শুনতে চাও অক্রুর-সংবাদ।

ভাষায় পৌরাণিক যুগের স্মৃতির নিদর্শন এখানেই শেষ করিয়া আমরা চলিয়া যাইব ঐতিহাসিক যুগে।

ঐতিহাসিক যুগ

বাঙালীকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল যে, তাহার দুঃখের জন্ম দায়ী তাহার পূর্ব জন্মের কর্ম। সুতরাং অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করিয়াও সে প্রতিবাদ করে নাই, কাহারও বিরুদ্ধে নালিশ করে নাই। সে বলিত, আমি ভুগিতেছি আমার কর্মফল, আমার দুঃখ আমারই কর্মদোষে। আফিমের নেশায় বিভোর লোকের মত কর্মফলে বিশ্বাসী বাঙালী পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি সাধারণতঃ থাকিত উদাসীন। কিন্তু তুর্কি ও বর্গীর উৎপাত এমন প্রচণ্ড আঘাত হানিয়াছিল যে, তাহাদের কথা মুখে মুখে ঘুরিয়া বেড়াইত। মাথা নেড়া তুর্কির প্রতি কিরূপ বিদ্বেষ পোষণ করা হইত তাহা এখনও বুঝিতে পারা যায়। দুষ্কৃতকারী মুসলমানকে বিরক্তির সহিত বলা হয় 'নেড়ে তুরুক।'

গতির ক্ষিপ্রতা যুদ্ধ জয়ের জন্ম অপরিহার্য। গজেন্দ্র-গমনে অভ্যস্ত বাংলা ও বিহারের রাজাদের দ্রুত পরাজয় ঘটিয়াছিল বিদ্যুৎগতি তুরুক সওয়ারদের হাতে। তাহাদের গতির ক্ষিপ্রতার কথা রক্ষিত হইয়াছে 'তুর্কি ঘোড়ার মত ছুটে চলেছে'—এই বাক্যে। সে যুগের ধনী ধন লুকাইয়া রাখিত মাটির নীচে, আস্তাকুঁড়ে, আরও কত অস্থানে। প্রাণ নির্ভর করিত আমীরওমরাদের খোশখেয়ালের উপর। সুন্দরীদের মুখে উল্কি পরাইয়া, মুখের উপর ঘোমটা টানিয়া, অন্তঃপুরে আবদ্ধ রাখিয়াও যে তাহাদিগকে রক্ষা করা যাইত না সে সব কাহিনী বর্ণিত আছে ময়মনসিংহ গীতিকায়। বিক্রমপুরে শুনি তাহারই প্রতিধ্বনি—

অতি আহ্লাদের দুলা ঝি,
তুরুকে নিলে করবি কী!

আমাদের পূর্বপুরুষদের অসহায় অবস্থার কি করুণ চিত্র এই ছড়ায় ফুটিয়া উঠিয়াছে!

ভাস্কর পণ্ডিতের বর্গীর দল যে বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার স্মৃতি রক্ষিত হইয়াছে ঘুমপাড়ানি গানে।

ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো
বর্গী এলো দেশে।

তাহার অপকীর্তির জন্ম ঐতিহাসিক অমরতা লাভ করিয়াছে কালাপাহাড়। হিন্দুর ধর্ম ও আচার-বিরোধী তরুণকে বলা হয়,—তুই তো এক কালাপাহাড়।

ব্যঙ্গে—তিনি নবাব সিরাজদ্দৌলা এসেছেন কিনা—যা বলবেন তাই আমাকে মানতে হবে। ছেলেটার কি সাজ—যেন রাজা রাজবল্লভের নাতি।

কোম্পানীর আমলের পূর্বে বাংলা দেশ বস্ত্রশিল্পের জন্ম প্রসিদ্ধ ছিল। চরখার ঘড় ঘড় শুনা যাইত ঘরে ঘরে। নিজের চরখায় তেল দেও—এই উপদেশের মধ্যে পাই তার পরিচয়। লোকটাকে পুলিসে দেয় নাই, তুলা-ধোনা করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। একি তোমার সুতাকাটা পয়সা? ঘাটে বাড়ীতে আর তানা (টানা) হাঁটতে পারি না।

সেকালে ক্রয়-বিক্রয়ে যে কড়ি ব্যবহারের প্রচলন ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় কয়েকটি বাক্যে। তার কাছে ধারে বিক্রী নাই, ফেল কড়ি মাখ তেল। পারের কড়িত যোগাড় করতে হবে। লোকটা এমন যক্ষ যে এক কড়ায় মরে এক কড়ায় বাঁচে। দোকানের দেনা কড়ায়-গণ্ডায় চুকিয়ে দিয়েছি। আমার হাতে একটা কাণা কড়িও নাই। মৃতবৎসা জননী যমকে প্রতারিত করিবার উদ্দেশ্যে কড়ি ধার করিয়া সদ্যোজাত শিশুকে ধাত্রীর নিকট বাঁধা রাখিত। ধারের কড়ির সংখ্যা অনুযায়ী শিশুর নাম হইত পাঁচকড়ি, সাতকড়ি প্রভৃতি। শৈশবের ফাঁড়া কাটিয়া গেলে মায় সুদ ঋণ শোধ করিবার নিয়ম ছিল।

বল্লালী বা কৌলিন্য প্রথা এক কালে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ সমাজে ঘোর দুর্দশা সৃষ্টি করিয়াছিল। গত শতাব্দীর মধ্যভাগে উহার বিষময় ফল এমন প্রবল আকার ধারণ করে যে, বর্ধমানের মহারাজার নেতৃত্বে একুশ হাজার হিন্দু কুলীনের বহুবিবাহ নিবারণের জন্ম আইন প্রণয়নের প্রার্থনা জানাইয়া সরকারের নিকট এক আবেদনপত্র পেশ করে। তাহা হইতে জানা যায় বিবাহ কুলীনের পক্ষে একটি লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছিল। বিবাহে পাওয়া যাইত পণ ও যৌতুক কিন্তু স্ত্রীকে ভরণপোষণের দায় কুলীন বরের ছিল না।

ঘটি না দেই বাটি না দেই
শয্যায় না দেই ঠাঁই।
বিয়া কইর‍্যা ফালাইয়া রাখি
পোষে বাপ ভাই॥

হিন্দুদের আবেদনে বর্ণিত অনাচারের সংক্ষিপ্ত প্রসার এই ছড়াটি বিক্রমপুরে প্রচলিত ছিল। সেকালে বিত্তবানেরা একাধিক পত্নী গ্রহণ করিত। নিঃস্ব কুলীন বহুবিবাহ করিত অর্থলাভের উদ্দেশ্যে। স্ত্রী পুত্র কন্যা পোষণের ভার শ্বশুরের উপর রাখিয়া গোকুলের ষাঁড়ের মত স্বেচ্ছাবিহারী কুলীন যত ইচ্ছা বিবাহ করিয়া যাইতেন।

আইনের জন্য আবেদনে বলা হইয়াছে যে, কোন কোন কুলীনের স্ত্রীর সংখ্যা ছিল আশী। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হিসাবে হুগলি জেলার কোন কোন কুলীনের বিবাহ ছিল শতাধিক। এত শ্বশুর বাড়ীর কথা মনে রাখা এক কঠিন ব্যাপার। এই অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন এক কৌতুকপ্রিয় বহুপত্নীক কুলীন কবি। ইহাও বহুপ্রচলিত।

বিয়া করছি কুড়ি চারি,
চিনি না সব শ্বশুর বাড়ী,
কোন্ পথে যাব গো মা,
বিশ্বনাথ বাড়রীর বাড়ী।

অচেনা স্ত্রীকে মা বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। বিশ্বনাথ বাড়রী সত্যই গায়কের শ্বশুর ছিলেন। গানের রচনাকাল উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ।

'আমি কি ভরার মেয়ে এসেছি?' বিক্ষুব্ধা রমণীর এই প্রশ্নের অন্তরালে কৌলিন্য প্রথার এক কলঙ্কিত অধ্যায়ের ইতিহাস লুক্কায়িত রহিয়াছে। সমাজে নারী-পুরুষ সাধারণতঃ প্রায় সমান থাকে। বিধবা বিবাহের প্রচলন যেখানে নাই সে সমাজে এক পুরুষের এক স্ত্রী গ্রহণ করাই উচিত। কুলীনগণ বহু বিবাহ করিত। কুলীনে কন্যাদান না করিলে অকুলীনদের অসম্মান হইত। কুলীনদের সকল মেয়ে কুলীনগণ বিবাহ করিতই, তদুপরি সমাজে সম্মানিত সকল অকুলীনের মেয়েও তাহারা বিবাহ করিয়া রাখিত। ইহার ফলে অকুলীন পুরুষদের সকলের ভাগ্যে মেয়ে জুটিত না, কুলীনে বিবাহ দিবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিত সেই অকুলীন মেয়েদের দর স্বাভাবিক নিয়মেই বাড়িয়া গেল। ক্রমে মেয়ের বয়সের বৎসর প্রতি একশত টাকা দর উঠিল। সুন্দরীদের পণ ছিল আরও বেশী। হাজার টাকার কমে দশ বৎসর বয়সের মেয়ে পাওয়া যাইত না। সে যুগে টাকা ছিল দুর্লভ। বহু অকুলীন অর্থাভাবে অবিবাহিত থাকিতে বাধ্য হইত। কেহ বা অল্প টাকায় শিশু বিবাহ করিত। এই সব বর-কনের বয়সের বিস্তর প্রভেদ লক্ষ্য করিয়া বলা হইত—যাবৎ বিবি বড় হবে তাবৎ সাহেব গোর পাবে। সমাজের এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ফন্দিবাজেরা মেয়ের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া দিল। তাহারা শ্রীহট্ট ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চল হইতে জাতিধর্ম নির্বিশেষে নিম্ন শ্রেণীর মেয়ে সংগ্রহ করিয়া বড় নৌকায় বিক্রমপুরের ঘাটে ঘাটে নিয়া আসিত। বিবাহলোলুপ দরিদ্র অকুলীন ব্রাহ্মণদের কেহ কেহ এরূপ ভরার (নৌকায়) মেয়ে সস্তা দরে কিনিয়া বিবাহ করিত। এই সকল অজ্ঞাতকুলশীলা সমাজে সম্মান পাইত না। শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণেরা ইহাদের হাতে খাইতেন না। বংশের গোপনীয়তা রক্ষার জন্য ইহারা কখনও পিত্রালয়ে যাইত না। কোন কোন ভরার মেয়ের ভাষা ও আচরণে বংশ-পরিচয় প্রকাশ হইয়া পড়িত। 'ঠাউকরাণ চিরাগটা কই?' প্রশ্ন শুনিয়া শাশুড়ীর বুঝিতে বাকী থাকিত না যে, বৌমা মুসলমানের মেয়ে। কনে প্রশ্ন করিয়াছিল, 'আপনাদের ঘরে টানা সানা নাই কেন?' এই সব প্রশ্নের পর চুপ চুপ বলিয়া সমাজকে শান্ত রাখিবার চেষ্টা চলিত। এইরূপ অজ্ঞাত পরিচয়া পিতৃমাতৃ কুলের সহিত ছিন্ন-সম্পর্কা ভরার মেয়ে ছিল সমাজে নিন্দিতা। আমি কি ভরার মেয়ে?—এই জিজ্ঞাসা সেকালের সমাজের এক কলঙ্কিত অধ্যায়ের সাক্ষী।

বিক্রমপুরে প্রচলিত বাক্য ও বাক্যাংশ অবলম্বন করিয়া এই প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের মৌখিক ভাষা হইতে ইতিহাসের উপকরণ সংগৃহীত হইতে পারে।

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

শ্রীসোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

উনবিংশ শতকের বাংলা তথা ভারতের জাতীয় নবজাগরণের মর্মকেন্দ্র জোড়াসাঁকো। তারই সর্বশেষ সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি সর্বজনশ্রদ্ধেয়া ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী গত ১২ই আগষ্ট (১৯৬০) ইহধাম ত্যাগ করলেন। দেশের একটি গৌরবময় পর্বের শেষ অভিজ্ঞান আমাদের দৃষ্টি-বহির্ভূত হ'ল।

ইন্দিরা দেবী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পৌত্রী, ভারতের প্রথম আই. সি. এস. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর কন্যা। ইংরেজী ১৮৭৩ সনের ২৯শে ডিসেম্বর এঁর জন্ম হয় বোম্বাই প্রদেশের বিজাপুর জেলায়। মাত্র পাঁচ বৎসর বয়সেই ইন্দিরা দেবী মা এবং দাদা সুরেশনাথের সঙ্গে বিলাত যাত্রা করেন। প্রায় দু' বৎসর পর দেশে ফিরে ইনি সিমলায় অকল্যাণ্ড স্কুলে কিছুকাল অধ্যয়ন করেন, ও পরে কলিকাতায় লরেটো হাউস কন্‌ভেণ্টে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। এখান হইতে তিনি এণ্ট্রান্স পাস করেন। ফরাসী ও ইংরেজী ভাষা নিয়ে প্রাইভেট ছাত্রীরূপে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি মহিলা পরীক্ষার্থিণীদের ভিতরে প্রথম স্থান অধিকার করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পদ্মাবতী পদক' লাভ করেন।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের বিশিষ্ট পরিবেশে ইন্দিরা দেবীর কৈশোর অনেকটা কেটেছে। স্বভাবতঃই সেই পরিবেশের গভীর ও ব্যাপক প্রভাব পড়েছে তাঁর চরিত্র ও ব্যক্তিত্বে। সে প্রভাব তাঁর চরিত্রকে সমৃদ্ধ ও বিকশিত করে তুলেছে। জীবনারম্ভের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বিবাহ। ১৮৯৯ সনে তৎকালীন বাংলার বিখ্যাত চৌধুরী পরিবারের সুসন্তান বাংলা সাহিত্যের উজ্জল জ্যোতিষ্ক প্রমথ চৌধুরীর (বীরবল) সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। দুই প্রখ্যাত পরিবারের আত্মীয়তার মধুর সম্পর্ক এ বিবাহে মধুরতর ও গাঢ়তর হয়ে ওঠে। সংক্ষেপে এই হ'ল পারিবারিক পরিচিতি।

ইন্দিরা দেবী সম্বন্ধে চিন্তা করতে গেলেই তাঁর ব্যক্তিত্বের যে দিকটি বিশেষভাবে স্মরণে আসে, তা হ'ল তাঁহার সহজতা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সহজ হবার শক্তি আসে প্রকৃত Culture থেকে। এ কথার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু সেই প্রকৃত শিক্ষিত ও সংস্কৃত মনের পরিচয়লাভ বেশী ঘটে না জীবনে। ইন্দিরা দেবী সেই বিরল উদাহরণের অন্যতম।

কিন্তু শুধুই সহজতা নয়। আরও একটি জিনিস তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করার ছিল। অসাধারণকে অসাধারণরূপেই আমরা সর্বত্র দেখি। যিনি সাধারণ নন; কথাবার্তায়, আচার-ব্যবহারে তাঁর অসাধারণত্বের প্রকাশ ঘটে স্বতঃই। এটা অসঙ্গত বা অস্বাভাবিক নয়; স্বভাবের ধর্মই তাই। কিন্তু কচিৎ এমন দেখা যায় যে, অসাধারণ আবির্ভূত হয় সাধারণের ছদ্মবেশে। যিনি দশের সেরা তিনি দশেরই একজন হয়ে ধরা দেন। অসাধারণত্বের চমক দর্শক-মনকে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে ব্যবধান রচনা করে না। এই মহীয়সী মহিলার একান্ত সাধারণ হবার সেই একান্ত অসাধারণ গুণটি ছিল। শুধু জন্মগত নয় অর্জিতও বটে। তুচ্ছতম ব্যক্তিও তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে অথবা দীর্ঘ সময় আলোচনায় কাটিয়ে কখনও সহজের দূরত্ব অনুভব করে নি। মানুষকে মানুষ হিসাবে অন্তরের অত্যন্ত নিকটে টানবার এক আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তাঁর। তিনি যে বিরাট অভিজাত ধনী পরিবারের কন্যা এবং বধূ; তিনি যে উচ্চশিক্ষিতা অথবা বিদেশ-প্রত্যাগতা তাঁর কথা ও আচরণে কখনও তার প্রকাশ পেত না।

অথচ কত গুণের অধিকারিণীই না তিনি ছিলেন। আজীবন ঠাকুর পরিবারের সাহিত্য ও সঙ্গীতের পরিবেশে বাস করায় এই উভয় সাধনার ক্ষেত্রেই তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। শুধু প্রাচ্য সঙ্গীত নয়, পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতেও তাঁর নৈপুণ্য ছিল অসাধারণ। এই বিদেশী সঙ্গীত-প্রীতি বাল্যজীবনের লরেটো কন্‌ভেণ্টের শিক্ষাজনিত। সেখানে সেণ্টপল্‌স্ ক্যাথিড্রেলের অর্গানিষ্ট মিঃ স্লেটারের কাছে তিনি পিয়ানো এবং মানজাটো নামে এক ইতালীয় বেহালা-শিক্ষকের কাছে বেহালা শিক্ষা করেছিলেন। সেকালে কেম্‌ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজ অব মিউজিক থেকে গানের প্রশ্ন এদেশে আসত। তার মাধ্যমিক পর্ব পর্যন্ত তিনি উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

রবীন্দ্র সঙ্গীতের আদিযুগের গানের ভাণ্ডারী ছিলেন ইন্দিরা দেবী, উত্তরকালে যেমন ছিলেন দিনেন্দ্রনাথ। শুধু আদিযুগ নয়, জীবনের শেষ পর্যায়েও তিনি আবার সেই

রবীন্দ্র সঙ্গীতের সাধন-রাজ্যের সঙ্গে নিজেকে নিবিড়ভাবে যুক্ত করে নিয়েছেলেন শান্তিনিকেতনে। বিশ্বভারতীয় সঙ্গীত ভবনের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয়েছিল। এবং রবীন্দ্র সঙ্গীতের বিশুদ্ধ ধারাটিকে অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত রাখার সাধনায় তিনি আমৃত্যু নিয়োজিত রেখেছিলেন নিজেকে। একদা বাল্যে, জীবনের আদিতে যে সঙ্গীত-রসসাধনার ক্ষেত্রে তাঁর ডাক পড়েছিল, জীবনের উপান্তে আবার তাঁকে তারই আহ্বান ও আমন্ত্রণে সাড়া দিতে হয়েছিল।

শুধু সঙ্গীত-বিদ্যা নয়, অভিনয় ও নৃত্যকলায়ও তাঁর দক্ষতা ছিল যথেষ্ট। জোড়াসাঁকোতে একাধিক নাট্যাভিনয়ে তিনি অভিনয় ও নৃত্যাংশে ছিলেন। বাল্মীকি প্রতিভা প্রভৃতি বহু নাটকে তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। 'রবীন্দ্র সঙ্গীতের ত্রিবেণী সঙ্গম' তাঁর সঙ্গীত আলোচনার গ্রন্থ। ঠিক এমনি একখানি রবীন্দ্র নাট্য-অভিনয়ের ধারা সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনার কথা তিনি অনেকবার ভেবেছেন এবং বার বার লেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সে ইচ্ছা আর পূর্ণ হ'ল না। বাংলা দেশ একখানি মহামূল্য তথ্য ও তত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থসম্পদ থেকে চিরদিনের মত বঞ্চিত হয়ে রইল।

রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং বীরবলের সহধর্মিণী ইন্দিরা দেবী যে সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করবেন এ আর বিচিত্র কি? একদিকে রবীন্দ্রনাথ অন্য দিকে প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব তাঁর রচনায় দেখা যায়। সে প্রভাব তাঁর সৃষ্টিকে সমৃদ্ধ করেছে। একদিকে মাধুর্য ও গাম্ভীর্য, অন্যদিকে বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য, দ্যুতি ও দীপ্তি গুণের এই সার্থক সমন্বয়ে তাঁর রচনা সুন্দর ও সার্থক হয়েছে। কিন্তু একথা বলা প্রয়োজন যে, এই দুই সর্বগ্রাসী প্রভাব তাঁর ব্যক্তিত্বকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি। রচনায় তাঁর একান্ত নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যের সুরটি বেজেছে সর্বত্র। "নারীর উক্তি," "বাংলার স্ত্রী আচার," "পুরাতনী," "রবীন্দ্র-স্মৃতি" প্রভৃতি গ্রন্থে সে পরিচয় সুস্পষ্ট।

তাঁর কলমের ভাষা এবং মুখের ভাষা দুই-ই সমান চিত্তাকর্ষক ছিল। ইন্দিরা দেবীর কথকতার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা একথা ভাল করেই জানেন।

সঙ্গীত, সাহিত্যের বাইরে সাধারণ সমাজসেবার ক্ষেত্রেও এই বিদুষী মহিলার দান উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় নারী-জাগরণের তিনি ছিলেন অন্যতম নেত্রী। নানা সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর শুধু নামের নয়, নিরলস কর্মেরও যোগ ছিল। বহু নারী-প্রতিষ্ঠানের তিনি ছিলেন পরিচালিকা ও সভানেত্রী।

আমাদের পরম তৃপ্তি এই যে, শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরা দেবীর অনন্যসাধারণ প্রতিভাকে আমাদের দেশ অকুণ্ঠ স্বীকৃতি জানিয়ে ধন্য হতে পেরেছে। তিনি যেমন দেশকে ভালবেসেছেন, দেশও তাঁকে ভালবেসেছে, শ্রদ্ধা জানিয়েছে। ১৯৪৪ সনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ভুবন-মোহিনী' পদক প্রদান করেছেন। ১৯৫৩ সনে সমগ্র বাংলা দেশের পক্ষ থেকে তাঁর সংবর্ধনার আয়োজন হয়। ১৯৫৬ সনে বিশ্বভারতীর অস্থায়ী উপাচার্যপদে তিনি বরিত হন। ১৯৫৭ সনের বার্ষিক সমাবর্তনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'দেশিকোত্তমা' উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনে আমরা নিজেদেরই সম্মানিত বোধ করি।

মৃত্যুর অন্ধকার পটভূমিকায় ইন্দিরা দেবীর চরিত্রের অপরিম্লান, ভাস্বর রূপটি আজ আমাদের সম্মুখে আরও উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। সকল সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত, অহঙ্কার থেকে মুক্ত, বিদ্যার জড়ভার থেকে মুক্ত, সর্বপ্রকার অর্থহীন সংস্কার থেকে মুক্ত একটি স্বচ্ছ, সুন্দর আত্মার জ্যোতি মৃত্যুর আকাশে জ্যোতিষ্কের মতই দীপ্ত হয়ে রইল। সেই দীপ্তি আমাদের ভাবীকালের চলার পথকে আলোকিত করুক।

শত্রু

শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

আকাশ যেন নীল পাথর ! দিনরাত তপ্ত বাতাস হু হু শব্দে ঝড়ের মত বহিয়া যাইতেছে। বাতাসের সঙ্গে শুধু ধূলি আর ধূলি। সমস্ত আকাশে-বাতাসে—গাছে-লতায়-পাতায় শুধু ধূলি। ক্ষেত-খামার—শুকনো, হা-হা করিতেছে। দারুণ তীব্র রৌদ্রে, গাছপালা শুকাইয়া পুড়িয়া গিয়াছে—গ্রামের পুষ্করিণীগুলি শুকাইয়া গিয়াছে, কুয়া-ইঁদারাতেও জল নাই। এমন কি গ্রামের নদীটির জলও অনেক কমিয়া গিয়াছে।

এখন শুধু ঝড়ের মত তপ্ত বাতাস—আর তপ্ত ধূলি। গাছপালা, ক্ষেত-খামার বাড়ীঘর, সমস্তই ধূলার একটা গাঢ় কালো প্রলেপের মাঝে অবলুপ্ত হইতে বসিয়াছে।

আশ্চর্য্য, এটি আষাঢ় মাস ! তবুও বৃষ্টির কোনও চিহ্ন নাই। কে বলিবে যে, এটা বর্ষাকাল। সারা আকাশে বিন্দুতম মেঘ নাই। সমস্ত আকাশ পরিষ্কার ঝকঝকে নীল। ভোর হইতেই অগ্নিরথে সূর্য্য দেখা দেন। অগ্নিরথ ক্রমশই অগ্রসর হইতে থাকে। মাটি পুড়িয়া কাল হইয়াছে—সমস্ত মাঠ—সমস্ত পুষ্করিণী ফাটিয়া গিয়াছে—তীব্র রোদ্রের অগ্নিদাহে গাছ-লতা-পাতা শুষ্ক দগ্ধ হইয়া বুঝিবা একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবার জন্য কোনমতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

—না, আবার দুর্ভিক্ষ হবে। গাঁয়ের লোকেরা, চাষীরা শুষ্কমুখে ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা বলে।

—আবার কবে চাষ হবে ! পাট, আউশ তো হ'ল না। এবার আমনও হবে বলে মনে নিচ্ছে না। দুর্ভিক্ষ ঠিকই দেখা দেবে—। লোকে সভয়ে আকাশের দিকে চাহিল। না, সেখানে কোনও করুণার চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। লোকের মুখে মুখে বাতাসে যেন দুর্ভিক্ষের খবর ছড়াইয়া পড়িল। আবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে—সেই পঞ্চাশ সালের মত আবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে, দুর্ভিক্ষ একপ্রকার আরম্ভই হইয়া গিয়াছে। গাছে পাতা নাই—জলাশয়ে জল নাই—ক্ষেতে ফসল নাই—মাঠে ঘাস নাই। খাওয়ার অভাবে হালের বলদ, গাই গরু অনেক মরিতে সুরু করিয়াছে, অনেকে এখানে-ওখানে পালাইতেছে—কেহ বা মরিতেছে। লোকে জমিজমা, গরুবাছুর বিক্রয় করিতে লাগিল, কিন্তু ক্রেতা নাই। মহাজন, ব্যবসায়ী, আর দালালরা এই সুযোগে উচ্চ-মূল্যে জিনিস বিক্রয় করিয়া মোটা লাভ করিতে লাগিল। এইরূপ বিশ্রী অবস্থার মধ্যে, গ্রামের বাজারের মধ্যে একটা নূতন জিনিস আসিল। জিনিসটি আমদানি করিল, ব্যবসায়ী জনার্দ্দন সাহা। এটি একটি যন্ত্র। যন্ত্রের বিকট শব্দে, সমস্ত গ্রাম সচকিত হইয়া উঠিল। ছেলে-বুড়ো সকলে বাজারে ছুটিয়া আসিয়া দোকানঘরে ব্যাকুলভাবে উঁকি দিতে লাগিল।

বিরাট যন্ত্র—দুটি চাকা ঘুরিতেছে। তাহার বিকট-শব্দে কেহ কাহারও কথা শুনিতে পায় না। কানে তালা ধরিয়া যায়। এ উহাকে ফিস্ ফিস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করে—কি এটা ? এ দিয়ে কি হবে ?

কিন্তু কেহই সঠিক উত্তর দিতে পারে না। চামড়ার একটা চওড়া লম্বা ফিতা বন্ বন্ করিয়া পাক খাইতেছে, দুটি চাকা নক্ষত্রবেগে বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতেছে। দেখিতে দেখিতে নেশা লাগিয়া যায়, কানে তালা ধরিয়া যায়। কিন্তু কি এটা ?

শেষে জনার্দ্দন সাহা মীমাংসা করিয়া দিল—এটা হচ্ছে কল। এতে ধান ভানা—চিড়ে কোটা—গম ভাঙ্গা—সব কাজ হবে। সস্তায় সব কাজ করে দেব। ঢেঁকিতে দু'দিন ধরে পার দিয়ে—গতর জল করে আর চাল-চিড়ে করতে হবে না। চাল বল—চিড়ে বল সবই নিমিষের মধ্যে এতে হয়ে যাবে। আর আমার রেটও বেশী নয়। এক মণ চালে মজুরী মাত্র এক টাকা। গম ভাঙ্গাতে সেরে নেব তিন পয়সা করে। ঐ দেখ না, কেমন আটা বেরুচ্ছে। লোকে অবাক হইয়া দেখিল, সত্যই তাই। যন্ত্রের মাথার ওপর দিয়া গম ফেলিবামাত্র উহার সরু মুখ দিয়া ঝুর্ ঝুর্ করিয়া আটা পড়িতে লাগিল। বাঃ, বাঃ, ভারী মজা তো !

—হাঁ মজা বৈকি ! তবে আমরা কি করব ? আমরা—। একে দেশে ধান নেই—ফসল নেই—চাষ নেই। আকাশে মেঘ নেই যে জমিতে আমন ধান হবে—কোনও ভরসা নেই। আমরা অনাথা, বিধবা মেয়েমানুষ, চিরকাল লোকের ধান ভেনে, চিড়ে কুটে সংসার চালাচ্ছি। আর এই কল নিয়ে এসে তুমি আমাদের মুখের গেরাস কেড়ে নিলে সা মশাই—সব্যনাশ করলে আমাদের। পিছনে সারবন্দী, কাল চিট কাপড় পরা,

গ্রাম্য বিধবা স্ত্রীলোকগুলি ঝেঁঝিয়ে এই প্রশ্ন করিল।
—তুমি সব্যনাশ করলে আমাদের।

জনার্দ্দন সা অবাক হইয়া বলিল, আমি সর্ব্বনাশ করলাম তোদের? সর্ব্বনাশ যদি কেউ করে থাকে তবে সে ভগবান। হাঁ ভগবানই। দেখছিস্ নে—এটা বর্ষাকাল, তবুও পোড়া আকাশে এক ফোঁটা মেঘ নেই। বৃষ্টির অভাবে গাছপালা শুকিয়ে গেল—ঘাস পর্য্যন্ত পুড়ে গেল। আরে সাধে কি আর এ যন্ত্রটা নিয়ে এলাম! একজনের কাছে টাকা পেতাম। নগদ টাকা দিতে পারল না—ছিল এই মেসিন। এই মেসিন দিয়ে দেনা শোধ করল। যদি দেশে ফসল না হয়—ধান-পান না হয়—তবে এই মেসিন নিয়ে আমি কি ধুয়ে জল খাবো? না আমার লোকসানের কপাল! লোকসান যা হবার হয়েছে। এখন যদি ফসল হয়—তবেই কল চলবে। যদি না চলে তবে বিক্রী করব—এ ছাড়া আর পথ কি?

চাষী মেয়েরা এ উহার মুখ চাহিল। শুষ্ক জিহ্বা দিয়া, ঠোঁট চাটিয়া তাহারা তৃষ্ণা নিবারণ করিতে চায়। আকাশ তেমনি নির্ম্মেঘ—নীল পাথরের মত আকাশের বুকে সূর্য্য যেন জলন্ত অগ্নি-গোলার মত দপ দপ করিয়া জ্বলিতেছে—আর গলিত অগ্নিস্রোত আসিয়া পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুকে জ্বালাইয়া পোড়াইয়া দিতেছে।

আর কি বৃষ্টি হইবে না? আকাশ হইতে সুধার মত, অমৃতের মত নরম শীতল বৃষ্টি ঝর্ ঝর্ করিয়া আসিয়া পড়িবে না? বরষা মেঘের রসের বরিষণে, আবার কি পৃথিবীর মাটি শস্যশ্যামা উর্ব্বরা হইয়া উঠিবে না? গাছে গাছে ফল ফুল—মাটিতে নরম কোমল মখমলের মত কচি কচি দুর্ব্বা ঘাস—ক্ষেতে সোনার ধান আর কি ভরিয়া যাইবে না?

হে ঈশ্বর বৃষ্টি দাও—বৃষ্টি দাও—

—কিন্তু সা মশাই, এখন যাও বা এর-ওর কাছ থেকে দুটো ধান নিয়ে ভেঙে দু'মুঠো যোগাড় হচ্ছে—কিন্তু তুমি কল চালিয়ে সে পথও বন্ধ করলে সা মশাই। সব্যনাশ যেমন ভগবান করছে—তেমনি তুমিও করতে বসেছ যে সা মশাই—

জনার্দ্দন সা কি বলিল· বোঝা গেল না। মেসিনের কর্কশ শব্দের মাঝে সমস্ত কথাই ডুবিয়া গেল। দরিদ্র অনাথিনী মেয়েলোকগুলি যন্ত্রের দিকে চাহিয়া আক্রোশে ফুলিতে থাকে। উহাদের স্তিমিত চোখগুলি উগ্র হিংস্র হইয়া উঠিয়াছে। মনে হইতেছে বুঝি বা চোখের আগুন দিয়া এখনই এই মুহূর্ত্তে ধান-ভাঙা কলটিকে দগ্ধ করিয়া দিবে। উহাদের চোখগুলি জ্বলিতেছে—শীর্ণ পাংশু ঠোঁটগুলি শক্ত হইয়া উঠিয়াছে—শীর্ণ দেহগুলি রাগে কাঁপিতে থাকে।

মেয়েলোকগুলি বলাবলি করে,—লোকে আর কি আমাদের ধান দেবে, না—আর দেবে না।

—সবাই এখন কলে ধান ভানবে। চাল-আটা-চিড়ে সব যখন চোখের পলক ফেলবার মধ্যে হয়ে যাবে, তখন কি আর দু'চারদিন দেরী সইবে?

—হাঁ, এবার আমাদের মরতে হবে। উপোষ দিয়ে মরতে হবে—ওটা রাক্ষস, ওটা সাক্ষাৎ যম। আমাদের মারতে এসেছে। আমাদের মুখের ভাত কেড়ে নিতে এসেছে—

ঘট্ ঘট্ শব্দ করিয়া মেসিন তখন কাজ করিয়া যাইতেছে। যন্ত্রের মুখ দিয়া ঝুর্ ঝুর্ করিয়া নরম সাদা আটা পড়িতেছে। সকলে অবাক বিস্ময়ে তাকাইয়া রহিল।

ইহার পর সুরু হইল সত্যিকারের যুদ্ধ। একদিকে যন্ত্র—অন্যদিকে অসহায়া দরিদ্র স্ত্রীলোকদের মিথ্যা আস্ফালন। উহাদের ঢেঁকিগুলি আর শব্দ করে না—লোকে ধান দেয় না। জনার্দ্দন সা'র কলেই এখন চাল-চিড়ে-আটা করিয়া লইতেছে। অসহায়া স্ত্রীলোকগুলি কেমন যেন দুর্ব্বল আর বোকা হইয়া গিয়াছে। উহারা ঢেঁকিঘরে যাইয়া দুর্ব্বল চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে ঢেঁকিগুলির গায়ে হাত বুলাইতে থাকে।

তাহাদের যন্ত্রগুলি নিস্তব্ধ। ভোররাত্রে নিস্তব্ধ, দুপুরে আর দুমদাম্ শব্দ হয় না—সব স্তব্ধ—স্থির, মৃত্যুর মত শীতল। উহারা শেষচেষ্টা হিসাবে গ্রামের লোকদের বুঝাইতে চেষ্টা করে। কিন্তু গ্রামের মানুষ উহাদের যুক্তি মানিতে চায় না—উহারা ঝগড়া করে, গালাগালি করে, ঈশ্বরের কাছে নালিশ করে। কিন্তু কেহই আর ধান-ভানানীদের কথা শুনিতে চায় না।

সবাই বলে, আমাদের কলই ভাল গো। তোমাদের পায়ে আর তেল দিতে হবে না—আজ দিচ্ছি, কাল দিচ্ছি করে, আজ রোদ হয় নি, কাল বৃষ্টি—এই সব নানান্ অজুহাতে হয়রাণ হয়েছি কত আমরা। এখন বাপু আধ-ঘণ্টার মধ্যে চাল-চিড়ে-আটা সবই পেয়ে যাচ্ছি। কেন বাপু আর তোমাদের পায়ে তেল দেব? তোমরা তো আর মিনি পয়সায় ধান ভানতে না—

ভানিয়ে-মেয়েলোকগুলি চীৎকার করিয়া বলে, তবে তোমরা বলতে চাও আমরা না খেয়ে মরে যাই। এত-কাল তোমাদের কাজ করে এলাম, আজ কল এসেছে

বলে তোমরাই মারতে চাও। তোমরা না আমার গাঁয়ের লোক—

গ্রামবাসীরা বলে, কি করব বল? এটাই এখন আমাদের সুবিধে। তাই বলছি, এখন তোমরা অন্য ব্যবসা ধর—

নিঃসহায়া ভানিয়ে-মেয়েলোকগুলি বলে, আমরা অন্য ব্যবসার কি জানি গো? মাঠে লাঙ্গল দিতেও পারব না, লোকের বাড়ী জনমজুরও খাটতে পারব না। চিরকাল ঢেঁকির কাজ করে এসেছি—জনমভোর চিড়ে, চাল তৈরি করেছি। আর আজ কোন্ ব্যবসা করতে বলছ তোমরা?

কোনদিকে কিছু মীমাংসা হয় না। লোকগুলি কথার উত্তর না দিয়া এদিক-সেদিক ছিটকাইয়া পড়ে। নিঃসহায়া ধান-ভানানীরা নিষ্পলক চোখে সম্মুখের দিকে তাকাইয়া ধান কলের গর্জ্জন শোনে—

ওরা ফিস্‌ফিসিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলে,—না। এবার ঠিক ভিক্ষে করতে হবে। কিন্তু কেই বা ভিক্ষে দেবে? লোকের বাড়ীতে কি ধান আছে—

শিবুর মা বলে, চিরকাল ঢেঁকিতে কাজ করে সংসার চালাচ্ছি। মা-মরা দুটি নাতি নিয়ে এখন কার দুয়োরে যাব—

শুধু চুপ করিয়া থাকে যোগীর মা। যোগীর মা বলে, মরতে যখন বসেছি তখন দেখে নেব একবার। ডুবতে যখন বসেছি তখন পাতাল কতদূর তাও দেখব। চুপ করে থাক্ তোরা। জনার্দ্দন সা আমাদের মুখের ভাত কেড়ে নেবে—এ আমরা সইব না। যদি মরি, তবে ওকে নিয়েই মরব।

উহারা ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা বলিয়া এক সময় চলিয়া যায়।

যোগীর মা একদিন সন্ধ্যাবেলায় শম্ভুর কাছে হাজির হইল। শম্ভু বিয়ে-থা করে নাই—দিনরাত ড্যাং ড্যাং করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। মাঝে মাঝে গরুর গাড়ী লইয়া বাহির হয়—ভাড়া খাটে। কখনও বা ক্ষেতে-খামারে কাজ করে, আর কবি বা যাত্রাগান শুনিয়া বেড়ায়। চেহারাখানি দৈত্যের মতন। চওড়া বুকের ছাতি—হাত-পা লম্বা লম্বা আর ইস্পাতের মতন কঠিন। বড় বড় চোখ দুটি দিন-রাত লাল হইয়া রহিয়াছে আর মাথাভর্ত্তি তেল-চুকচুকে বাবড়ি চুল ঘাড় অবধি নামিয়া আসিয়াছে।

যোগীর মা বলিল, শম্ভু, হারে তোরা থাকতে আমরা না খেয়ে মরব। শম্ভু তখন এক ছিলিম গাঁজা খাইয়া নেশায় বুঁদ হইয়া রহিয়াছে। দুই লাল চোখ কোন মতে মেলিয়া বলিল, ওঃ, খুড়ী যে। কি মনে করে—

—এই তো বললাম ড্যাক্‌রা। দিনরাত নেশা করে থাকবি তো কথা শুনবি কখন? বলি, গাঁয়ে ধান-ভাঙ্গা কল এসেছে দেখেছিস—

—হুঁ, তা আর দেখি নি? শালার কলের ঘটর্ ঘটর্ শব্দে কানে তালা ধরে গেল। তা কল এসেছে তো হয়েছে কি—

—হয়েছে কি বলছিস্? এদিকে আমাদের যে সব্যনাশ করে দিল। লোকে আর আমাদের ধান ভানতে দিচ্ছে না। চিরকাল ধান ভেনে এলাম, চিড়ে কুটে এলাম, ঐ ঢেঁকির দৌলতেই প্রাণটা বেঁচে আছে। এখন এই দশ দিন হয়ে গেল কেউ আর ধান দিচ্ছে না। সবাই কলে ধান নিয়ে গিয়ে চাল, চিড়ে করে আনছে। বলি, তোরা থাকতে এবার না খেয়ে মরব—

শম্ভু এতক্ষণ ব্যাপারটা বুঝিয়া বলিল, ওঃ এই কথা। তা আমাদের বারণ শুনে কি জনার্দ্দন সা কল বন্ধ করবে? তা করবে না, শালা মেলা টাকা দিয়ে কল এনেছে, এখন দু'হাতে টাকা লুটবে তবে তো—

যোগীর মা শম্ভুর কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, তাই তো তোর কাছে এলাম বাবা। ও কলকে বন্ধ করতে হবে। তোকে মদের টাকা দেব। কলঘরে আগুন লাগিয়ে দে—ভেঙে দে—

—অ্যাঁঃ, আগুন দেব। তা যুক্তিটা মন্দ নয়। শালা জনার্দ্দন সা একবার আমাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়ে সব টাকা দেয় নি। কিন্তু এক বোতল মদের দাম দিলে হবে না। চার বোতল মদের দাম দিতে হবে। মানে ওরা সব আছে তো—

—তাই হবে—তাই হবে। এখন এই নে পাঁচটা টাকা। আরও পাঁচটা টাকা কাল দেব। কিন্তু খুব সাবধান বাবা, কেউ যেন জানতে না পারে। শেষে ধরা পরে, থানা-পুলিস না হয়।

হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া শম্ভু বলিল, থানা-পুলিস! হাঃ হাঃ, এই শালা শম্ভুকে ধরবে কোন্ বেটা পুলিস। শালা শম্ভু সব কাজ করতে পারে! তুই ভাবিসনে খুড়ী। যা এখন বাড়ী যা। শালা জনার্দ্দন সা'র কলে লাল ঘোড়া ছুটিয়ে দেব—কল ভেঙে গঙ্গার জলে ডুবিয়ে দেব। ঠিকই তো, শালা জনার্দ্দন সা কল এনে গাঁ শুদ্ধ ধান-ভানিয়েদের মুখের ভাত কেড়ে নেবে—না, এটি হচ্ছে না। ও একাই পয়সা লুটবে—আর অন্যেরা না খেয়ে মরবে? উঁহুঃ, তা হতে দেব না। আর তা ছাড়া তুই আমার আপনজন খুড়ী। যা এখন—আজ রাতেই কাম কিলিয়ার করে দেব—

তখন অনেক রাত !

গ্রাম হইতে অল্প দূরে, মাঠের মধ্যে একটা গাছতলায় দশ-বার জন লোক গোল হইয়া বসিয়া মদ আর ছোলা পোড়া খাইতেছে। মাঝে মাঝে গাঁজার কলিকা, এক হাত হইতে অন্য হাতে চালান হইতেছে।

শম্ভু বলিল, চলরে, আর দেরী করা নয়। শালার কাজটা সেরে আসি। কিন্তু শিবে তোর যে পা টলছে—

শিবে বলিল, টলছে টলুক। চ—শালার কাজ শেষ করে আসি।

ভোর রাত্রে গাঁয়ের লোক ঘুম হইতে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া অবাক বিস্ময়ে দেখিল, জনার্দ্দন সা'র কলঘর দাউ দাউ করিয়া জলিতেছে। বাঁশের খুঁটিগুলি শব্দ করিয়া ফাটিতেছে—ঘরের টিনগুলি বাঁকিয়া, তোবড়াইয়া ঝন্ ঝন্ শব্দে ছিটকাইয়া পড়িতেছে। আটা, গম, চাল, ধান পুড়িয়া দুর্গন্ধ ছড়াইতেছে। জনার্দ্দন সা হায় হায় করিতে করিতে পাগলের মত চুল ছিঁড়িতেছে, বুক চাপড়াইতেছে।

দূর হইতে আকাশের গায়ে আগুনের লেলিহান শিখা দেখিয়া ধান-ভানানীরা কিন্তু আনন্দে ফাটিয়া পড়িতে লাগিল। যোগীর মা তাহার উঠানে দাঁড়াইয়া দাঁতে দাঁত দিয়া হিংস্রকণ্ঠে বিড় বিড় করিয়া বলিতে লাগিল, শত্রু শেষ—শত্রু শেষ।

রাজা রামমোহন রায় ও ফ্রান্স

শ্রীগোলকেন্দু ঘোষ

রাজা রামমোহন রায় ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি রঙপুর হইতে কলিকাতায় আসিয়া স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। ইহার পর বৎসর উদারপন্থী মধ্যবিত্ত ও বিত্তশালীদের লইয়া 'আত্মীয় সভা' প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই সভায় ধর্ম, সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-বিচার প্রভৃতি নানা বিষয়ে আলোচনা হইত। এই বৎসরেই বাঙলায় তাঁহার 'বেদান্ত-গ্রন্থ' প্রকাশিত হইল এবং পর বৎসর ১৮১৬ সনে ইংরেজীতে তাঁহার তিনখানি গ্রন্থ (১) Translation of Abridgment of the Vedant, (২) Translation of Cena (Kena) Upanishad এবং (৩) Translation of Ishopanishad প্রকাশিত হয়।

কিন্তু ভারতবর্ষের নবজাগরণের জনক হইবার জন্য যাঁহার জীবন, স্বভাবতই তাঁহার কর্মৈষণা শুধু ধর্মালোচনা এবং গ্রন্থ রচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই। সমাজের দিকে দৃষ্টি ফিরাইতে প্রথমে তাঁহার নজরে পড়িল—নির্মম সতীপ্রথা। এইরূপ একটি অমানুষিক প্রথার উচ্ছেদ ভিন্ন কোন প্রকারেই সমাজের উন্নতি সম্ভব নয়। ধর্মীয় অন্ধত্ব হইতে যে ইহার মূল শক্তি আহৃত হইতেছে—ইহা বুঝিয়াই তিনি সতীপ্রথা উচ্ছেদের জন্য ধর্মীয় অন্ধত্বের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিলেন। ১৮১৮ সনে 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের প্রথম সংবাদ' এবং ১৮১৯ সনে উক্ত দ্বিতীয় সংবাদ ও ইহার ইংরেজী অনুবাদও প্রকাশিত হইল। ফলে দেশে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি হয়। আলোড়নের ঢেউ ফ্রান্সেও গিয়া পৌঁছিল।

১৮১৮ সনেই ফ্রান্স রামমোহনের পরিচয় পাইয়াছে। 'ক্যালকাটা টাইমস্', এর সম্পাদক ডি. এ্যকষ্টা মহোদয় ফ্রান্সের ব্লুইস শহরের বিশপ আবে গ্রেগরীকে রামমোহনের গ্রন্থাদি পাঠান এবং রামমোহন সম্পর্কে তথ্যাদিও লিখিয়া পাঠান। আবে গ্রেগরী রামমোহনকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন।

এই পুস্তিকায় তিনি লেখেন :

"The moderation with which he repels the attacks on his writings, the force of his arguments, and his profound knowledge of the sacred books of the Hindoos, are proofs of his fitness for the work he has undertaken and the pecuniary sacrifices he has made, show a disinterestedness which cannot be encouraged or admired too warmly."

তিনি আরও লেখেন :

"Every six months, he publishes a little tract in Bengali and in English developing his system of theism; and he is always ready to answer the public at Calcutta or Madras in opposition to him . . . He takes pleasure in controversy; but

দিনে
দিনে
দিনে
দি...
রেক্সোনা সাবানে 'ক্যাডল'
বলে একটি বিশেষ ধরনের তেল
মেশানো হয়, যাতে ত্বক আরও
কোমল, আরও সুন্দর, আরও
লাবণ্যময়ী হয়···! সুবাস ভরা রেক্সোনার
পরশ সারাদিন আপনাকে সজীব আর
সতেজ রাখে। সৌন্দর্য্য সাধনায় সর্বদা
রেক্সোনা ব্যবহার করুন।
Rexona
BLENDED WITH CADYL

although far from deficient in philosophy or in knowledge, he distinguishes himself more by his logical mode of reasoning than by his general views."*

রামমোহনকে চিনিতে ইংলণ্ডের ঢের সময় লাগিয়াছিল, কিন্তু ফ্রান্সের আদৌ সময় লাগে নাই। ১৮২৪ সনে ফ্রান্স হইতে প্রকাশিত 'Revue Encyclopedique গ্রন্থে সতীপ্রথা সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া রামমোহন সম্পর্কে নিম্ন মর্মে মন্তব্য করা হয়:

"A glorious reform has, however, begun to spread among the Hindoos. A Brahmins whom those who know India agree in representing as one of the most virtuous and enlightened of men, Rammohun Roy is exerting himself to restore his countrymen to the worship of true God and to the union of morality and religion. His flock is small, but increases continually. He communicates to the Hindoos all the progress and thought that has made among Europeans."*

* * *

ফ্রান্সের বিদ্বৎসভা 'প্যারিসের সোসাইটি এসিয়াটিক' ১৮২৪ সনেই রামমোহনকে ডিপ্লোমা পাঠাইয়া অনারারি সদস্য করিয়া লন। বিদেশের সংস্কৃতিমূলক সংস্থাগুলির এইটিই প্রথম রামমোহনকে সম্মানিত করিলেন।

আধুনিক সভ্যতার পীঠস্থল পশ্চিমের সুসভ্য দেশগুলি পরিক্রমা করিবার বাসনা রামমোহন কলিকাতায় আসিয়া বসবাস শুরু করিবার সময় হইতেই পোষণ করিতেছিলেন। তাঁহার সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনীতে* লিখিতেছেন,

"I now felt a strong wish to visit Europe, and obtain, by personal observation, a more thorough insight into its manners, customs, religion and political institutions. I refrained however, from carrying this intention into effect until the friends who coincided in my sentiments should be increased in number and strength. My expectation having been at length realised, in November, 1830, I embarked in England...."

অবশেষে ১৮৩০ সনের ১৫ই নভেম্বর এলবিয়ন জাহাজে চড়িয়া ইংলণ্ডের উদ্দেশ্যে তিনি যাত্রা করিলেন। তখন সুয়েজখালের পথ খোলা হয় নাই, পথ খোলা হয়েছে ১৮৬৯ সনে। কাজেই রামমোহনের জাহাজ চলিল উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া।

ফ্রান্সের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রতি রামমোহন প্রথম হইতেই ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। তাই আচার্য ব্রজেন্দ্র শীল তাঁহাকে বিশ্বজনীন মানবরূপে আখ্যা দিয়াছেন। ফ্রান্সে তখন ১৮৩০ সনের জুলাই গণবিপ্লব জয়লাভ করিয়াছে। রামমোহনের মনীষার পক্ষে মানবমুক্তির প্রগতিশীল পদক্ষেপরূপে এই বিপ্লবের তাৎপর্য বুঝিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হয় নাই। জাহাজ যখন কেপটাউন বন্দরের নিকটবর্তী তখন ফরাসী বিপ্লবের পতাকাবাহী অপর একটি জাহাজ তাঁহার গোচরীভূত হয়। তিনি নূতন ভারতের চিন্তানায়করূপে এই বিপ্লবকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিলেন। মানবমুক্তির সপক্ষে এ স্বাক্ষর তাঁহাকে রাখিতেই হইবে। আগ্রহাতিশয্যের ফলে তাঁহার 'এলবিয়ন' জাহাজটিকে ফরাসী জাহাজের

---

* **Ram Mohun Roy, The Man and his work** (শতবার্ষিকী প্রকাশনা) হইতে উদ্ধৃত।

* ফ্রান্স যাত্রার প্রাক্কালে বন্ধু Mr. Gordon-কে কলিকাতায় এই পত্রটি লিখিত হয়। রামমোহনের মৃত্যুর পর লণ্ডনের Athenoeum পত্রিকায় ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়।

নিকটবর্তী করা হইল। তিনি ফরাসী জাহাজে উঠিয়া ত্রিবর্ণরঞ্জিত স্বাধীনতার পতাকাকে অভিবাদন করিলেন। ভারতের মুক্তিসাধনার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় অধ্যায় রচিত হইল।

১৮৩১, ৮ই এপ্রিল তিনি লিভারপুলে পৌঁছিলেন। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অন্যতম পীঠস্থান ব্রিটেন স্বচক্ষে দেখিবার সুযোগ এইবার তাঁহার হইল বা খ্রীষ্টান মিশনারীগণ তাঁহাকে লণ্ডনের প্রকাশ্য সভায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিলেন। সেই সভায় আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট ডক্টর কর্কল্যান্দ, রেভারেণ্ড ফক্স প্রভৃতি সুধীবৃন্দ রামমোহনকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া বক্তৃতা দেন। সম্রাট চতুর্থ উইলয়মের রাজ্যাভিষেক দরবারে ইউরোপের মুকুট পরিহিত রাজাদের সারিতে রাজা রামমোহনের আসন নির্দিষ্ট হইল। লণ্ডন-ব্রিজ উন্মোচন অনুষ্ঠানের ভোজে সম্রাট তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চেয়ারম্যান তাঁহার সম্মানার্থে ভোজসভার আয়োজন করেন। রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির আমন্ত্রণে বার্ষিক সভায় বক্তৃতা করিলেন। ইংলণ্ড তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান দিল।

বিলাত ত তাঁহার দেখা হইল। কিন্তু সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার উদ্গাতা ফ্রান্স না দেখিলে পাশ্চাত্ত্যে আসা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। ১৮৩১ সনের শেষ দিকে রামমোহন ফ্রান্সে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু জানিতে পারিলেন যে, তিনি বিদেশী বলিয়া লণ্ডনস্থ ফরাসী রাজদূতের নিকট হইতে নিজের সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী পেশ করিয়া ভিসা লইতে হইবে। ইহা স্বাধীনচেতা রামমোহনের মর্যাদায় লাগিল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সের পররাষ্ট্র দপ্তরে একখানি প্রতিবাদ-পত্র পাঠাইলেন। এই পত্রখানি কি বলিষ্ঠ প্রতিবাদে, কি রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিতে একটি ঐতিহাসিক দলীল হইয়া রহিয়াছে। এই পত্রেই তিনি তাঁহার বিশ্বজনীন মানবতা সম্পর্কে ধারণা পরিস্ফুট করেন।

প্রায় একশত বৎসর পূর্বেই লীগ্ অব নেশন্স বা রাষ্ট্র-সঙ্ঘের প্রয়োজনীয়তা এই পত্রখানিতে তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। মতবৈষম্যসম্পন্ন রাষ্ট্রের সমন্বয় সাধনের জন্যই তিনি এই প্রস্তাব উত্থাপিত করেন। পত্রখানি অংশত এই :

"But on general grounds I beg to observe that it appears to me the ends of constitutional Governments might be better attained by submitting every matter of political difference between two countries to a congress composed of an equal number from the parliament of each; the decision of the majority to be acquised in by both nations and the Chairman to be chosen by each Nation alternatively, for one year, and the place of meeting to be one year within the limits of one country and next within those of other; such as at Dover and Calais for England and France."

প্রগতিশীল চিন্তাধারার ইতিহাসে এই প্রস্তাবের মূল্য অপরিসীম।

বলা বাহুল্য, ফরাসী পররাষ্ট্র বিভাগ এই পত্রের পর রামমোহনকে ভিসা দিতে দ্বিধা করেন নাই। রামমোহন ১৮৩২ সনের মাঝামাঝি ফ্রান্সে আসিলেন। ফ্রান্সের সুধীমহল ও রাজনৈতিকমহল তাঁহাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলেন। রাজা লুই ফিলিপ একাধিকবার তাঁহাকে ভোজে আপ্যায়ন করেন। ফ্রান্স তাঁহাকে যথোপযুক্ত সম্মান করিল। ১৮৩৩ সনের জানুয়ারী মাসে তিনি ইংলণ্ড ফিরিয়া আসিলেন।

বিপ্লবীর জীবন-দর্শন

প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী

১৭

ষ্টীমার ও রেলওয়ে ষ্টেশনে যাত্রী দেখার প্রবল কৌতূহল ছিল। কত অপরাহ্ণ এবং সন্ধ্যা জেঠির সঙ্গে বাঁধা পনটুনগুলির উপরে বসে মুগ্ধ নয়নে কাটিয়ে দিয়েছি তার ঠিক নেই। দেখতাম কত নৌকোর যাতায়াত—নদীর ওপারের মনোরম দৃশ্য। ষ্টীমার আর লঞ্চ এসে নদীর বুকে ঢেউ তুলে চলে যেত। পনটুনগুলি দুলতে থাকত।

মাঝে মাঝে নদীতে বড় বড় স্লুপ (sloop) আসত। খোলটা জল থেকে অনেক উঁচুতে। ডেকের উপরে নানা কোণে খাটানো পালের হাওয়ায় চলত ওগুলি। দেখতে আগের দিনের পাল-তোলা জাহাজের মত। দূরবর্তী মেঘনা ও ধলেশ্বরী নদীর বুকে ছুটে চলত ষ্টীমার সন্ধানী-আলো ফেলে। বহুদূরে দিক্‌চক্রবালে রাতের অন্ধকারে মনে হতো যেন ধূমকেতুর পুচ্ছ।

কলকাতার যাত্রী আসত গোয়ালন্দ ষ্টীমারে। বরিশাল, ভৈরব, চাঁদপুর, লক্ষ্যা, সুন্দরবন, কাছাড় এবং আরও কত ষ্টীমার—যাত্রী বোঝাই হয়ে নারায়ণগঞ্জ আসত এবং এখান থেকে আবার বোঝাই হয়ে চলে যেত। দৈনিক যাত্রীবাহী নৌকোর সংখ্যাও কম ছিল না। আমাদের দেশে ওগুলির নাম ছিল 'গহনার নৌকো'। ভাড়া ষ্টীমার বা রেলের চাইতে অনেক কম। একজন লোক দাঁড়াত হাল ধরে আর চার-ছ'জন সামনে থেকে দাঁড় টেনে বিদ্যুতগতিতে ছুটিয়ে নিয়ে যেত। দশ-পনেরো থেকে সত্তর-আশী জন পর্যন্ত যাত্রীবাহী বিভিন্ন সাইজের গহনার নৌকো ছিল। হিন্দু-মুসলমান, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য নির্বিশেষে ঠসাঠাসি হয়ে বসে অনায়াসে এরা রাত কাটিয়ে দিত।

যাত্রী দেখার মোহ যেন আমাকে পেয়ে বসত। অজানা দেশের কত অচেনা লোক এই পথে জোয়ার-ভাটার স্রোতের মত যাতায়াত করত তার ঠিক নেই। শত সহস্র লোক যেমন ষ্টীমার কিংবা নৌকো থেকে রেলে উঠত আবার তেমনি রেল থেকে ষ্টীমার কিংবা নৌকোয় গিয়ে উঠত। ভীষণ একটা তাড়াহুড়া আর ছুটোছুটির হিড়িক লেগে থাকত।

কত বিচিত্র ধরনের মানুষ আর পোশাক! কেউ পরিধান করেছে ভাল কোট, সার্ট, জুতো, কারুর পরিধানে বা ছিন্ন-মলিন বস্ত্র। কারুর সঙ্গে কত বিচিত্র রঙের ট্রাঙ্ক বা সুটকেশ, কেউ বা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ময়লা সতরঞ্চি বা কাঁথায় মোড়া বোঝা বেঁধে। দেখতাম কত বরযাত্রীর দল, কত ফুটবল টিমের সদর্প গতাগাত। কত ঘোমটা-টানা কনে বউ আর ক্ষীণদেহ মানুষেরা ভয়ে ভয়ে যাচ্ছে; কখনও বা জুতো পায়ে, মুখে পাইপ গুঁজে গ্যাটম্যাট করে চলেছে সাহেব। নেটিভরা সভয়ে সরে গিয়ে পথ করে দিচ্ছে। ষ্টেশনে দেখেছি যাত্রীর সঙ্গে কুলির অন্তহীন বচসা। সাহেবদের ত কথাই নেই, বাঙালী ভদ্রলোকের লাথি ঘুঁসি এদেরকে সহ্য করতে হতো। আজকাল অবশ্য দিন পালটে গেছে।

যাত্রীসাধারণ—বিশেষ করে তৃতীয় শ্রেণীর, ষ্টেশনের বাবুদের পুলিস-দারোগার মতই ভয় করত। এদের শত প্রকার লাঞ্ছনা এবং উচ্চশ্রেণীর যাত্রীর সদর্প ব্যবহার আজও লুপ্ত হয় নি। টিকিট কাটতে পুলিসের হাতে গলাধাক্কা, রুলের গুঁতা, গেট-কিপারদের ধমক, বাবুদের রূঢ় ব্যবহার, স্বল্পপরিসর নোংরা জায়গা দখলের জন্য মারামারি-ঠেলাঠেলি, তৃষ্ণা নিবারণের জন্য জলের অভাব—এ ছিল তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর নিত্য পাওনা।

তৃতীয় শ্রেণীর প্লাটফরমে বা ষ্টীমারের ডেকের উপর হট্টগোল লেগেই থাকত। নিজেদের কাপড় বা সতরঞ্চিই হ'ত যাত্রীদের বসবার আসন। তামাক খাওয়া, ছেলে-পিলে সামলানো, দখলী জায়গা নিয়ে ঝগড়া লেগেই থাকত। কখনও বা পুলিস ও ষ্টেশনের কর্মচারী বাবুরা এসে চীৎকার করত—'ইধার সে হটো', 'উধার যাও'। আর অমনি সকলে পোটলা পুটলি, বাক্স-বিছানা নিয়ে ছুটছে। সেকালে চা-পানের তেমন রেওয়াজ না থাকায় চিড়ে-মুড়ি বা ফলই ছিল যাত্রীসাধারণের খাদ্য।

একটা ব্যাপার কিন্তু সে বয়সেও লক্ষ্য করেছি। কি নিরীহ, সহিষ্ণু, প্রতিকারবিমুখ মানুষ এরা। দিনগত পাপক্ষয়ই যেন লক্ষ্য। মুখের প্রতিবাদটুকুও শুনতে পেতাম না। স্কুলে মাষ্টারমশায়দের কাছে শুনতাম দেশ-বিদেশের কত শৌর্য-বীর্যের কাহিনী। রামায়ণ-

মহাভারতের চন্দ্র ও সূর্য বংশের ক্ষত্রিয়দের বীরত্বগাথা। রাজপুত, শিখ আর মারাঠাদের যে চিত্র মনে ফুটে উঠেছিল তার সঙ্গে এই ষ্টেশনভর্তি লোকগুলির কোন মিল খুঁজে পেতাম না। এদের দেখে মনে হ'ত বক্তিয়ার খিলজির সপ্তদশ অশ্বারোহী নিয়ে বঙ্গ-বিজয় বুঝি অলীক কাহিনী নয়।

মাঝে মাঝে দেখতাম ষ্টেশন হিন্দীভাষী কুলিতে ভর্তি হয়ে গেছে। পরণে ময়লা কাপড়। বহু নারী-পুরুষ চলেছে চা-বাগানে কুলিগিরি করতে। হাসিমুখে কলরব করতে করতেই যেত। জিজ্ঞেস করলে সগর্বে বলত—'কাছাড় যায়েঙ্গে'। দীনদরিদ্র মানুষগুলি উপার্জনের আশায়, অন্ন-বস্ত্রের ভরসায় পুরুষ-রমণীরা সানন্দে চলে এসেছে বাসভূমি পরিত্যাগ করে। সামান্যই সম্বল, ছেঁড়া ন্যাকড়ায় জড়ানো, আর শিশু-সন্তান কোলে-কাঁখে। চা-বাগানে যে ক্রীতদাসের জীবন তাদের জন্য অপেক্ষা করছে তার কিছুই তখন পর্যন্ত জানতে পারত না! উল্টোটাই বরং তাদের বোঝান হ'ত। আসামের চা-বাগানে কুলির উপর অত্যাচারের কাহিনী সেই বয়সেই খবরের কগেজে পড়েছিলাম। নামটা যদিও আজ আর মনে নেই তথাপি একটা নাটকের কথা আজও মনে আছে। এই সব কুলিদের মধ্যে অনেকে যখন আবার কালাজ্বরে জীর্ণ হয়ে পেটে পিলে নিয়ে পঙ্গু হয়ে ফিরে যেত এই পথ দিয়ে, তখন তাদের কেউ জিজ্ঞেস করলে ক্ষীণকণ্ঠে টেনে টেনে বলত—'বাবুজি, কাছাড়সে আয়া'।

অবশ্য ইচ্ছা করলেই যে সব কুলি চা-বাগান থেকে ফিরে আসতে পারত তা নয়। যে দলিলে দস্তখত করে এরা কুলি হয়ে নিযুক্ত হ'ত তাই হতো চা-কর সাহেবদের যদৃচ্ছ ব্যবহারের রাজদণ্ড। ইচ্ছে করলেই কেউ চাকরি ছেড়ে আসতে পারত না। প্রকৃতপক্ষে এরা ক্রীতদাস হয়ে পড়ত। কেউ পালিয়ে গেলে প্ল্যাণ্টার (Planter) সাহেবরাই গ্রেপ্তার করে আনতে পারত। তৎকালীন সরকারী আইনই তাদেরকে এ ক্ষমতা দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, কাজ করতে অস্বীকার করলে কারাদণ্ড বা বন্দী করবার অধিকারও তাদের ছিল। এই আইনসম্মত জবরদস্তির সঙ্গে বেত্রাঘাত প্রভৃতি বহু বে-আইনী অত্যাচার সাহেবরা নির্বিবাদে চালিয়ে যেত। কিন্তু স্বাস্থ্য যেদিন চিরতরে মানুষগুলিকে কাজ-কর্মে অক্ষম করে দিত তখন কিন্তু সাহেবরা এদেরকে একবস্ত্রে তাড়িয়ে দিতে কুণ্ঠিত হ'ত না।

ইংরেজ সরকারের উপর এসব সাহেব প্ল্যাণ্টারদের প্রভাব-প্রতিপত্তির ফলেই দূরদেশে লোকালয়ের বাইরে চা-বাগানের সীমানার মধ্যে এই নিরীহ মানুষগুলিকে সাহেবরা যদৃচ্ছ ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হ'ত না।

একবার একটি কুলি-বালক অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য পালিয়ে আসে। একদিন তাকে চাঁদপুরের রাস্তায় দেখা যায় একরকম মৃতপ্রায় অবস্থায় পড়ে থাকতে। আমার মাতুল অপর্ণানাথ ঠাকুর তাকে কুড়িয়ে এনে আশ্রয় দেন। সে আর কোনদিন দেশে ফিরে যায় নি। আমার মামারা তাকে জায়গা-জমি দিয়ে এক বাঙালী মেয়ের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিয়ে দিয়েছিলেন। চিরকালই সে আমাদের কাছে কৃতজ্ঞ ছিল। আমাদের সুখ-দুঃখের সমভাগী হয়ে বাড়ীর এক-প্রকার আপনজনের মত দীর্ঘজীবন কাটিয়ে দেয়। নিজের পিতামাতা, বাড়ীঘর এসবের স্মৃতি তার কাছে অস্পষ্ট হয়ে যায়।

যা হোক্, যে কথা বলতে যাচ্ছিলাম। এই সমস্ত কুলি ও যাত্রী সমাগম দেখতাম অবাক বিস্ময়ে। এদের সভয় চাউনি ও অসহায় ভাব দেখে মন ব্যথিত হ'ত। ইংরেজরা না হয় রাজার জাত। তাদের স্পর্দ্ধার কারণ অনুমান করতে পারি। কিন্তু পুরো ছ'ফিট লম্বা, প্রশস্ত বদন, বিচিত্র বস্ত্রবহুল পোশাক সজ্জিত কাবুলিওয়ালা যখন প্রকাণ্ড লাঠি নিয়ে ভিড় ঠেলে চলে যেত তখন তাদের ভয়ে ভীত হয়ে জনতা রাস্তা ছেড়ে দিত! এই কাবুলিওয়ালা-ভীতি আমাদের দেশে অনেক দিন পর্যন্ত ছিল। এদের অত্যাচারও মানুষরা নীরবে সহ্য করত! দেশের লোকের দুর্বলতা দেখে মনটা ব্যথিত হ'ত। রাজনীতি না বুঝলেও, প্রতিকারের পথ না দেখতে পেলেও, প্রতিকার যে চাই তা বুঝতে অসুবিধে হ'ত না। কোন মানুষেরই উপর অপর কারুর অত্যাচার করবার অধিকার নেই। মানুষকে দুঃখ দেওয়া অন্যায়। সকল মানুষই সমান এবং সকলেই ভগবানের সন্তান—পিতৃদেবের এই শিক্ষা স্মরণ করতাম।

পিতৃদেব দরিদ্র নিঃসহায় মানুষকে ঘৃণা করতে নিষেধ করতেন। তিনি বর্ণনা করতেন তাঁর বাল্যজীবনের দুরবস্থার কথা। আমার ঠাকুর্দা যখন মারা যান তখন বাবার বয়স ষোল কি সতেরো। বাক্স খুলে পাওয়া গেল মাত্র ষোলটি মুদ্রা। থেকে গেল ঠাকুরমা, দুই কাকা, চারজন পিসী, এবং আরও দু'একজন আশ্রিত আত্মীয়। সকলের ভার পড়ল পিতার উপর, কেননা তিনিই জ্যেষ্ঠ পুত্র। অদৃষ্টের পরিহাসে কয়েকদিনের মধ্যেই বসত-বাটীটি পর্যন্ত আগুনে ভস্মীভুত হয়ে গেল। বাবা শহরে গেলেন লেখা-পড়া শিখতে। এক শিক্ষকের আশ্রয়ে

থেকে লেখাপড়া করতে লাগলেন। তাঁকে রান্নাও করতে হ'ত। স্কুল থেকে ফিরে রোজ জল-খাওয়া হ'ত না। কখনও পয়সায় আট-নয়টা পেয়ারা পাওয়া যেত। তারই একটা করে দৈনিক খেতেন। ক্রমে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে জলপানি পান। সে টাকা পাঠাতেন বাড়ীতে। পড়া ছেড়ে শিক্ষকের কাজ হাতে নিয়ে সংসার চালাতে লাগলেন। এ অবস্থাতেই ওকালতি পাস করে আইন ব্যবসা সুরু করে সহস্র সহস্র অর্থ উপার্জনই করেন নি—কত আত্মীয়-অনাত্মীয়কে প্রতি-পালন করলেন, আমাদের লক্ষ টাকার মালিক করে দেহত্যাগ করেন।

জীবনে তিনি দরিদ্রকে ঘৃণা করতেন না। শ্রমের মর্যাদা ছিল তার নিত্য সাথী। গৃহস্থালীর কোন কাজই তাঁর অজানা ছিল না। নারায়ণগঞ্জের একদড় উকিল, মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান, স্কুলের সেক্রেটারী, শহরের অতি গণ্যমান লোক এবং লক্ষপতি হয়েও বাজার করে মাছের চুপরি এবং তরিতরকারির বোঝা হাতে নিয়ে আসতে কুণ্ঠিত হতেন না। এবং তাঁর দৃষ্টি সবদা সতর্ক থাকত যাতে আমরা নিজেদের ধনী বলে না ভাবি এবং দরিদ্র নিম্নশ্রেণীর লোককে ছোট এবং তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের চোখে না দেখি। এ কারণেই তার সঞ্চয় সম্পর্কে কোন আভাসই আমাদের দিতেন না। শুধু যে বিলাসিতাই তিনি ঘৃণা করতেন তা নয়, আমাদের সকলের সঙ্গেই ভদ্র ও বিনয় ব্যবহারই ছিল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। লক্ষ্য রাখতেন যাতে আমরা তার ব্যতিক্রম না হই।

যাক্, ষ্টীমার ঘাটের কথায় ফিরে যাই। কত বিচিত্র জলযানই যে দেখেছি তার অন্ত নেই। টিনের গুদামের মত বড় বড় পাট-বোঝাই নৌকো দশ-বারটা একসঙ্গে টেনে নিয়ে যেতে দেখতাম লঞ্চগুলিকে। আর মাল-বোঝাই ফ্ল্যাট বয়ে নিয়ে যেত বড় বড় ষ্টীমার। আবার প্রত্যেক ফ্ল্যাটের সঙ্গে থাকত ছোট ছোট জালি বোট। নদী-তীরের সঙ্গে যোগাযোগ হ'ত এগুলির সাহায্যেই। এগুলিতে চেপে সান্ধ্য-ভ্রমণ ছিল আমাদের প্রিয়। নিজেরাই বেয়ে নিয়ে যেতাম শীতল-লক্ষার বুকের উপর দিয়ে। নদীর দু'ধারে পাটের আপিস, গুদাম ও কারখানার চিমনী। প্রত্যেকটা আপিসের জন্য আলাদা আলাদা জেঠি দিয়ে মাল ওঠা-নামা করছে। নদীর ধারে ধারে ফুলের বাগান সাহেবদের, তাদেরই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ী আলোতে ঝল্‌মল্ করছে। মনে উদিত হ'ত এই একান্ত অনাত্মীয় বিদেশীরাই কোটি কোটি টাকার ব্যবসা করছে। এরা আমাদের নেটিভ বলে ঘৃণা করে, লাথির চোটে পেটের পিলে ফাটায় এবং বিচার হলে যারা মুক্তি পায় কিংবা বড়জোড় পাঁচ-দশ টাকার জরিমানায় বিচার-প্রহসন শেষ হয়। এদেরই হাতে ভারতীয় বিশিষ্ট লোকেরাও ট্রেনে-ষ্টীমারে লাঞ্ছিত হয়। মনটা ব্যথায় টনটন করে উঠত।

সাহেবরা যে আমাদের দেশ থেকে কোটি কোটি টাকা ব্যবসা করে নিয়ে যাচ্ছে এ জ্ঞানটা জন্মায় যখন আমার কাকা একটা স্বদেশী কাপড়ের দোকান খোলেন। আমার পিসতুত ভাই শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উৎসাহে আমার কাকা স্বদেশী আন্দোলনের কয়েক বৎসর পূর্বেই বোম্বাই মিলের কাপড় এনে দেশী কাপড়ের দোকান খোলেন। স্বদেশী শিল্পের উন্নতির জন্যই যে দেশী কাপড় কেনা উচিত এ বিষয়ে বিজ্ঞাপন বিলি করেন।

বাল্যকাল থেকেই পিতাকে খবরের কাগজ পড়ে শোনাতে হ'ত। এই সব খবরের কাগজ মারফত সাহেবদের পিলে ফাটানোর সংবাদ এবং বিচার-বৈষম্য মনের মধ্যে আস্তে আস্তে কিন্তু নিশ্চিতরূপে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করতে লাগল।

১৮

সেকালের নারায়ণগঞ্জ সমৃদ্ধশালী হলেও দালান-কোঠা খুব কম ছিল। অর্থাভাব এর কারণ নয়। কারণ বুঝতে গিয়ে দেখি যে, শহরের প্রায় সমস্ত জায়গাই কয়েক-জন জমিদারের সম্পত্তি ছিল। তারা হয় নিজেরাই বাড়ী ঘর করে ভাড়া খাটাত, নয়ত যারা জায়গা কিনে বাড়ি করে থাকত তারাও পাকাবাড়ী করবার চিন্তা করত না, তার কারণ ছিল যে, জায়গা-জমির উপর দখলিস্বত্ব তাদের জন্মাত না। জমিদার ইচ্ছা করলেই এদেরকে উৎখাত করতে পারত। অবশ্য আমি যখন ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য তখন একটা অস্থায়ী আইন পাশ করিয়ে এ অবস্থার পরিবর্তন হয়। তার পর, তখনকার দিনের মানুষ এতটা শহরমুখী হয়ে ওঠেনি। কেবল একটা আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল মাত্র। সুতরাং শহরে পাকাবাড়ী তৈরি করে স্থায়ী ভাবে বসবাস করবার বাসনা বর্তমানের ন্যায় এত প্রবল ছিল না।

তখন পর্যন্ত অধিকাংশেরই গ্রামে কিছু কিছু জমি-জমা এবং বাড়ী থাকত। গ্রামের বাড়ীই হতো আসল "সাকিন", আর শহরের বাড়ী হ'ত "হাল সাকিন"। শহর বাস্তবিকপক্ষে ছিল প্রবাস বা বিদেশ। গ্রামেই থাকত আমাদের সমাজ। সুতরাং আমার উপনয়ন,

বোনের বিয়ে সবই গ্রামে হয়েছিল। গত পঁয়তাল্লিশ বছরের উপর গ্রামে যাই নি। পাকিস্থান হওয়ার ফলে দেশ ত আজ বিদেশ। তবুও কেউ যদি জিজ্ঞেস করে —বাড়ী কোথায়, তবে এখনও না বলে পারি না—ঢাকা জেলার চুড়াইন গ্রামে।

তবুও যে মানুষ শহরের দিকে ঝুঁকতে আরম্ভ করেছিল তার প্রধান তাগিদ অর্থনৈতিক। কৃষির উপর নির্ভর করে আর সংসার চলে না। চাকরি করতে হলে ইংরেজী লেখাপড়াও যেমন প্রয়োজন তেমন শহর ভিন্ন চাকরি মিলবেই বা আর কোথায়? কাজেই কিছুকালের মধ্যেই শহর দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেতে লাগল। গ্রামগুলি হতে লাগল অস্বাস্থ্যকর, সুচিকিৎসার অভাব সেখানে। বিশুদ্ধ পানীয় জল পাওয়া যায় না, গুণ্ডা-বদমায়েস অত্যন্ত প্রবল। সর্বোপরি শহরে হাওয়ায় জীবন-যাপনের মানের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় গ্রামে মন আর টিঁকতে চাইল না। অবশ্য পূর্ববঙ্গে পদ্মা-মেঘনার ভাঙনে অনেক মানুষকে শহরমুখী করতে বাধ্য করেছে।

পাকাবাড়ীর অভাবে নারায়ণগঞ্জে প্রতি বৎসরই ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হতো। অগ্নিকাণ্ডের সেই ভয়াবহ দৃশ্য আজও ভুলতে পারি নি। শীতের গভীর রাতেই বেশীর ভাগ আগুন লাগত। খুব বেশী দূর না হলে আমরাও ছুটে যেতাম সাহায্যের জন্য। অগ্নিকাণ্ডে সর্বহারা মানুষগুলির হায়, হায়, গেল গেল, বিলাপ; নিজের যা-কিছু রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা; আর অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে ঘনবসতি একটা গোটা পল্লী ভস্মীভূত হওয়ার দৃশ্য আজও মনকে কেমন যেন বিষাদগ্রস্ত করে দেয়।

পাটের গুদামগুলিতেও প্রায় প্রতি বছর ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হ'ত। এর মধ্যে আবার ইচ্ছাকৃত ব্যাপারও ছিল। গুদামগুলি প্রায়ই ইন্‌সিওর করা থাকত। কোম্পানীকে ঠকাবার জন্য অল্প মালসহ গুদাম পুড়িয়ে দিয়ে বহু টাকা আদায়ের চেষ্টা করা হ'ত। এমনি একটা চাঞ্চল্যকর ঘটনার কথা উল্লেখ না করে পারছি না।

সেভেজ (Mr. Savage) নামে এক সাহেব পাটের গুদাম খুলে বসে। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তার ঐশ্বর্যের ঝলমলানিতে মানুষের চোখে ধাঁধা লাগল। সব সাহেবরাই বাবুগিরি করত, কিন্তু তারা সেভেজ সাহেবের কাছে একেবারে নগণ্য। হঠাৎ একদিন রাত্রিতে তারই গুদামে ভীষণ ভাবে আগুন লেগে গেল। সবটা পুড়তে বেশ কয়েক দিন লাগল। চার দিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল যে, বহু লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছে। যথারীতি ইনসিওর কোম্পানীর লোক অনুসন্ধান করতে এল। কয়েকদিন পরেই আশ্চর্য হয়ে শুনতে পেলাম যে, পাটের আপিসের বড়বাবু এবং আর একজন কর্মচারীসহ সেভেজ সাহেব স্বয়ং পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন।

সেভেজ সাহেবের পিতা ছিলেন তখন ঢাকা বিভাগের কমিশনার। এতবড় জাঁদরেল ইংরেজ রাজকর্মচারীর ছেলে গ্রেপ্তার হওয়ায় ঢাকা নারায়ণগঞ্জে হুলস্থূল পড়ে গেল। সাহেব গ্রেপ্তার হয়, বিশেষ করে কমিশনারের পুত্র! একটা প্রায় অভূতপূর্ব ব্যাপার! সাহেব গরীব কিংবা চুরি করতে পারে এ কথা তখনকার দিনে এক রকম অবিশ্বাস্য ছিল। ইংরেজ বলে নয়, যে কোন শ্বেতাঙ্গই আমাদের কাছে শ্রেষ্ঠ!! অবশ্য সেভেজ সাহেবের পিতার প্রতিপত্তিতে ইনসিওর কোম্পানীর সঙ্গে একটা রফা হয় এবং সেভেজ সাহেবও ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করে বোধহয় অষ্ট্রেলিয়ায় চলে যায়। যাই হোক, চুরির অপরাধে সেভেজ সাহেবের গ্রেপ্তার ইউরোপীয়দের মর্যাদা অনেকটা নীচে টেনে আনল।

সাহেবদের সম্বন্ধে কেন যে এমনি উচ্চ ধারণা হয়েছিল তার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখতে পাই যে, প্রধানতঃ, দু'রকমের সাহেব সেকালে আসত। রাজকর্মচারীর মধ্যে জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট আর পুলিস সাহেব। কলকাতায় অবশ্য পুলিস সার্জেণ্টও দেখেছি। এ সব ছোট পুলিস সাহেবদেরও কম প্রতাপ ছিল না। আর এক জাত-ব্যবসায়ী—পাটের কিংবা চা-প্ল্যাণ্টার। ব্যবসায়ী সাহেবরা প্রচণ্ড বড়লোক। এদের ত কথাই নেই—রাজকর্মচারীদেরও জীবন-যাত্রার মান ছিল চোখ-ঝলসানো।

পাটের আপিসে নবাগত অনভিজ্ঞ ছোকরা সাহেবও বাঙালী বড়বাবুর উপরিওয়ালা হ'ত। প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ বড়বাবুকেও ছোকরা সাহেবকে দাঁড়িয়ে সেলাম করতে বাধ্য করা হ'ত। সাহেবরাও কর্মচারীদের নিছক নাম ধরে ডাকত, তাও আবার তুমি বলে! বড়বাবুরা নিম্নপদস্থ কর্মচারীর উপর যতই লম্ফঝম্প করুক না কেন, সাহেব উপরওয়ালার সামনে কাঁপতে থাকত। এদের এক কথায় চাকরি যেত। তার আর কোন আপীল চলত না।

তাছাড়া সাহেবরা রেলে, ষ্টীমারে প্রধানতঃ প্রথম শ্রেণীতেই যাতায়াত করত। বড় জোর দ্বিতীয় শ্রেণীতে। সুতরাং সাহেবেরা গরীব হতে পারে একথা বড় কেউ বিশ্বাস করতে চাইত না। অবশ্য বৃদ্ধদের মধ্যে কেউ কেউ প্রথমাগত দু'একজন সাহেবের দুরবস্থা দেখেছিলেন, কিন্তু তাদের কথা বড় কেউ বিশ্বাস করত

না। ডেভিড কোম্পানী ছিল সেকালে নারায়ণগঞ্জের শ্রেষ্ঠ পাট-কোম্পানী। তার প্রতিষ্ঠাতা এম. ডেভিড সাহেব এত দরিদ্র ছিলেন যে, তিনি এক অতি সাধারণ দরিদ্রের কুটীরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। আর সানকিতে করে ভাত খেতেন। এক বৃদ্ধ মুসলমানকে আমার বাবার সামনে এ গল্প করতে আমি শুনেছি। কিন্তু পরে ডেভিড কোম্পানীর যে ঐশ্বর্য মানুষের চোখে পড়েছে তাতে এ গল্প কেউ বড় একটা বিশ্বাস করতে চাইত না! সাহেবদের মর্যাদা ছিল এতই অসাধারণ! রাজার জাত কি না! ক্রমশঃ

বাদলের অবসরে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

দুলায়ে দুলায়ে কামনার তরী প্রাণের স্পর্শে মম
দেহতটে তুমি এসে তরঙ্গ সম।
ঘুম-ঘুম চোখে কুমকুম মেখে দুঃসহ ভঙ্গীতে
কেটে গেছে কত রাত!
সাঙ্গ করেছ সঙ্গিনী হয়ে আলাপনে সঙ্গীতে
সঙ্গীহীনের নিদারুণ অবসাদ।

দিনগুলি গেছে প্রেম হ'য়ে রাঙা! যৌবন মোহালসে,
হৃদয়পাত্র ভরেছ প্রেমের রসে।
মনোবাতায়নে দীপ জ্বেলে জ্বেলে সোহাগে আলিঙ্গনে
বিরাম বাসরে শেষে
মোর হাতখানি নিয়েছিলে বুকে ভুলে-যাওয়া কোন্ ক্ষণে
বিজন-নিভৃতে মুকুল ফোটাতে এসে।

শুনেছি তোমার কণ্ঠ-কাকলী রৌদ্রখচিত কূলে,
মোর পানে চেয়ে নবনীত মুখ তুলে,
মৃগ-নয়নের কটাক্ষলতা বিছায়ে দিয়েছ তুমি
পথচলা সঞ্চারে;
তব অধরের মৃদু শিহরণ দেখেছি কপোল চুমি
প্রতি নিমেষের সম্প্রীতি-সম্ভারে।

তোমার রূপের উৎস ধারায় সেদিন সিনান করি
মদমুকুলিত যাপিয়াছি বিভাবরী।
দুধালি রঙেতে আঁকা ছিল রাকা সীমাহীন নীলনভে;
আমরা পরস্পর
স্রোতের মত কি উদ্দাম হয়ে অনুলেহ-উৎসবে
ফুলেরি ছায়ায় সঁপেছিনু অন্তর?
আজিকে আবার মিলেছি দুজনে দীর্ঘদিবস পরে
অভিসার তিথি এনেছ কি তুমি বাদলের অবসরে?

সুধীরকুমার সেন

(১৮৮৮-১৯৫৯)

স্বাধীন ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাঙালীর প্রথম প্রতিভা দ্বারকানাথ ঠাকুর। এই ধারায় দ্বিতীয় প্রতিভা স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের নামও শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখযোগ্য; স্বাধীনভাবে এবং বাঙালীর মূলধনে রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনের দৃষ্টান্ত তিনিই এদেশে সর্ব্বপ্রথম স্থাপন করেন। প্রফুল্লচন্দ্রের সেই প্রয়াস শিক্ষিত বাঙালী যুবকের সম্মুখে সেদিন একটি নূতন সম্ভাবনার পথ খুলে দিয়েছিল। তার পর এই শতাব্দীর প্রথম-ভাগে স্বাধীন ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অসামান্য প্রতিভা নিয়ে যিনি আবির্ভূত হলেন তাঁর নাম সুধীরকুমার সেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী তাঁর জন্ম। স্বনামধন্য পিতার তিনি স্বনামধন্য পুত্র। 'টমকাকার কুটীর'-এর অবিস্মরণীয় লেখক,* স্বদেশপ্রাণ চণ্ডীচরণ সেনের তিনি সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র। বাংলা সাহিত্যের খ্যাতনামা মহিলা কবি কামিনী রায় সুধীরকুমারের জ্যেষ্ঠা ভগিনী। সুধীরকুমারের জন্ম উনিশ শতকে, কিন্তু তাঁর জীবন বিংশ শতকের দীর্ঘকাল অধিকার করেছে, এমন কি তাঁর কীর্ত্তির চরম বিকাশ বিংশ শতকে; তৎসত্ত্বেও বললে অন্যায় হয় না যে, তিনি উনবিংশ শতকের মানুষ। সেই শতকের সামাজিক আবহাওয়া ও মানসিকতায় তাঁর মন ও ধ্যান-ধারণা গঠিত। উনিশ শতকীয় মানসিকতার বৈশিষ্ট্য, এক কথায় বলতে হলে বলতে হয়—জীবনের প্রতি একটি সুগভীর দৃষ্টি—ম্যাথু আর্ণল্ড বলেছেন—High seriousness. নানা কারণে বাংলা দেশে উনবিংশ শতক নিষ্ঠায়, আদর্শে এবং প্রেরণায় অত্যন্ত গম্ভীর; বাস্তবকর্ম্মে ও সাহিত্যে তাঁর এ পরিচয় অত্যন্ত স্পষ্ট। সে সময়ের প্রত্যেকটি বরণীয় বাঙালী সন্তানের পায়ের তলাকার মাটি ছিল যেমন সুদৃঢ়, তেমনি অটল। ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাব, ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব, নব উদ্বোধনজাত আত্মশক্তিতে বিশ্বাস এবং সংস্কার প্রয়াসী কর্ম্মোদ্যম প্রভৃতি মিলিত হয়ে উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত বাঙালীর মন বিশেষ একটা ধরনে গড়ে উঠেছিল। তারই ফলে জীবনের প্রতি তাঁদের ছিল high seriousness বা সুগভীর দৃষ্টি।

সুধীরকুমার সেন

এই উত্তরাধিকার নিয়েই তাঁর নিজস্ব কর্ম্মক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন সুধীরকুমার সেন। প্রতিবেশ-প্রভাব তাঁর জীবনে অত্যন্ত সুস্পষ্ট। যাঁরা কর্ম্মের দ্বারা দেশের ও জাতির ইতিহাসকে যথেষ্ট উপাদান দিয়ে যান, তাঁরাই সার্থক-জীবন। মনুষ্যত্বের সত্য বিকাশ—এরিষ্টটল যাকে বলেছেন: Truthful transmission of personality—আমরা একমাত্র সেই জীবনেই লক্ষ্য করি। চরিত্র এবং কীর্ত্তি—এরই নিরিখে মনুষ্যত্বের যাচাই করা, ইতিহাসের একটি চিরাচরিত নীতি। যে

* মূল গ্রন্থের নাম UNCLE TOM'S CABIN; লেখিকা: মিসেস বিচার স্টো। বাংলা ভাষায় এই বইখানির সর্ব্বপ্রথম অনুবাদ করেন চণ্ডীচরণ সেন। এ ছাড়া, 'দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ', 'অযোধ্যার বেগম' প্রভৃতি বহু-ঐতিহাসিক উপন্যাসের রচয়িতা হিসাবে চণ্ডীচরণের খ্যাতি সুবিদিত।

সর্বত্র গৃহিণীরা বলাবলি করছেন

- সার্ফে কাচলে বোঝা যায়

সাদা জামাকাপড় কতখানি ফরসা হতে পারে!

সার্ফে কাচলেই বুঝতে পারবেন যে সার্ফ জামাকাপড়কে শুধু "পরিষ্কার" করে না, ধবধবে ফরসা করে। সার্ফে কাচারও কোন ঝামেলা নেই। সহজেই সার্ফের দেদার ফেনা কাপড়ের ময়লা টেনে বার করে, কাপড় আছড়াবার কোন দরকার নেই। আর সার্ফে কাপড় যা পরিষ্কার হয় তা, না দেখলে বিশ্বাস করবেন না। এর কারণ সার্ফের অদ্ভুত কাপড় কাচার শক্তি! দেখবেন সার্ফে রঙ্গীন কাপড়ও কেমন ঝলমলে হবে! সার্ফে সবচেয়ে সহজে আর সবচেয়ে চমৎকার কাপড় কাচা যায়। ধুতি, শাড়ী, ফ্রক, জামা, তোয়ালে, ঝাড়ন এক কথায় বাড়ীর সব জামা কাপড় সার্ফে কাচুন—দেখবেন ধবধবে ফরসা করে কাচতে সার্ফের জুড়ী নেই!
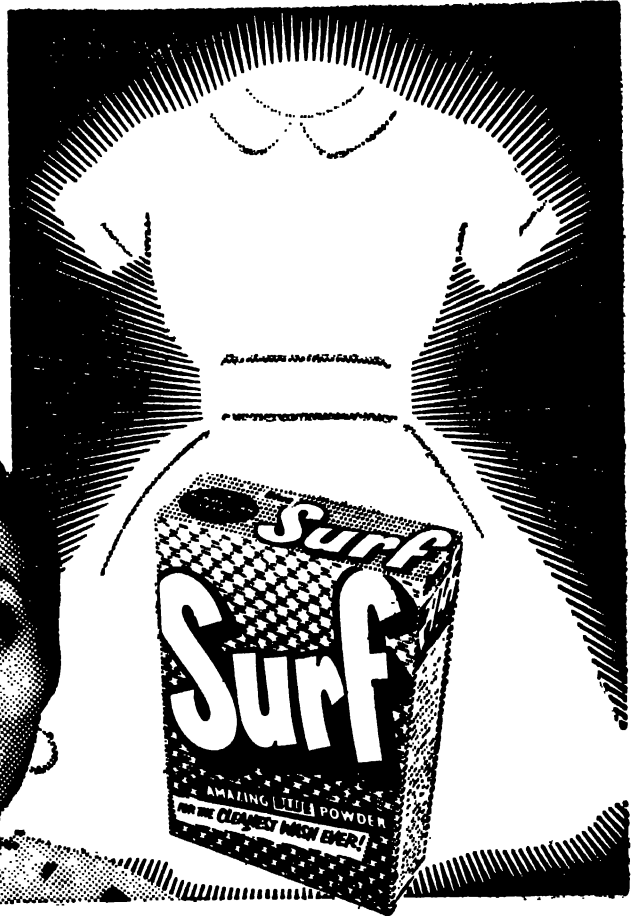
সার্ফ দিয়ে বাড়ীতে কাচুন, কাপড় **সবচেয়ে ফরসা** হবে

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

SU. 12-X52 BG

চরিত্রে বিশিষ্টতা নেই, যা সমাজের ওপর একটা ছাপ দিয়ে যেতে না পারে, উত্তরপুরুষ কখনো তার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয় না। যাঁর চরিত্র ও কীর্ত্তি সমাজের সর্ব্বস্তরে আলোড়ন এনে দিতে পারে, যাঁর প্রভাব বহুজনের উপর ব্যাপ্ত যে জীবন আপন বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর এবং আপন মহত্ত্বে উজ্জ্বল, তাই-ই অনুশীলনযোগ্য। সুধীরকুমারের সুদীর্ঘ কর্ম্মজীবনের সঙ্গে যাঁদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, যাঁরা তাঁর নিকটতম সান্নিধ্যে আসবার সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁরা স্বীকার করবেন যে, তিনি এমনই জীবনের অধিকারী ছিলেন; অথচ এর জন্য তাঁর না ছিল অহঙ্কারবোধ, না ছিল বিন্দুমাত্র আত্মপরিতৃপ্তি। কবি কামিনী রায়ের একটি কবিতায় আছে:

পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও;
তার মত সুখ কোথাও কি আছে?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।

সুধীরকুমারের জীবনের প্রতিস্তরে এই আদর্শের একটি নিখুঁত প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে এই কলকাতা শহরে ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে সুধীরকুমার অতি সামান্য মূলধন নিয়ে তাঁর "সেন য়্যাণ্ড পণ্ডিত" প্রতিষ্ঠানের পত্তন করেন। তার চার বছর আগে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করেছেন। কলেজে তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে অন্যতম হলেন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ। সুধীরকুমার একজন ইন্‌ডেন্‌টিং এজেন্ট (Indenting Agent) হিসাবেই তাঁর কর্ম্মজীবন শুরু করেন এবং প্রথম প্রথম বহুবিধ জিনিসের আমদানি করলেও, এদেশে বাই-সাইকেল আমদানীকারক হিসাবেই তাঁর খ্যাতি সর্ব্বাধিক। এই ব্যবসায়ে বস্তুতঃ তিনি ছিলেন অপ্রতিরথ এবং তাঁকে যে "Father of the Indian bicycle trade and industry" বলা হয়, তার মধ্যে এতটুকু অতিশয়োক্তি নেই। এই ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভা যে অসাধ্য-সাধন করেছে, যে যুগান্তর এনে দিয়েছে তার আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস যেদিন লিপিবদ্ধ হবে, সেদিন বাঙালী জানতে পারবে তাঁর প্রকৃত মূল্য কোথায়। পরবর্ত্তী জীবনে আমরা আর এক সুধীরকুমারকে পাই—তিনি শিল্পপতি সুধীরকুমার। তিনি তাঁর প্রথম জীবনে যখন বিদেশ থেকে সাইকেল এনে এদেশের বাজারে বেচতেন, তখন থেকেই সুধীরকুমার স্বপ্ন দেখেছিলেন, ভারতবর্ষে তিনি আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞান সম্মত বাইসাইকেল তৈরীর একটি কারখানা স্থাপন করবেন। ১৯৪৯-এ যখন তাঁর আজীবনের সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হোল, তখন ভারতবর্ষে শিল্পোদ্যমের ক্ষেত্রে আরেকটি নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি হোতে দেখা গেল। সে-ইতিহাসও জানবার মতন। পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্ববৃহৎ সাইকেল তৈরী প্রতিষ্ঠান —নটিংহামের বিখ্যাত র‍্যালে ইন্‌ডাষ্ট্রীজের সংযোগিতায় ভারতবর্ষে 'সেন-র‍্যালে ইন্‌ডাষ্ট্রীজে'র প্রতিষ্ঠা নিঃসন্দেহে এক বাঙালী সন্তানের একটি অনন্যসাধারণ কর্ম্মকীর্ত্তি হিসাবে পরিগণিত হবে।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে সুধীরকুমার 'সেন য়্যাণ্ড পণ্ডিত' প্রতিষ্ঠানের পত্তন করলেন। তার পর বিগত পঞ্চাশ বৎসর কালের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠান সাইকেল ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে শুধু আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতিই অর্জ্জন করে নি, ভারত-বর্ষে এই ব্যবসায়ে এক অভাবনীয় যুগান্তর এনে দিয়েছে। 'সেন য়্যাণ্ড পণ্ডিতে'র ইতিহাস এক শিক্ষিত বাঙালী যুবকের সংগ্রামের ইতিহাস, তাঁর কর্ম্মকুশলতার ইতিহাস এবং বহু বাধাবিপত্তি জয়ের ইতিহাস। সে-ইতিহাস সত্যই জানবার মতন। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে জামসেদজী টাটার যে গৌরব, ভারতবর্ষে সাইকেল ব্যবসায় ও সাইকেল তৈরীর ইতিহাসে সুধীরকুমার সেই একই গৌরবের দাবী করতে পারেন। ভারতবর্ষে সাইকেল আমদানী হোতে শুরু হোল উনিশ শতকের শেষ ভাগে (১৮৮৯ খ্রী:) এবং বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের মধ্যে সাইকেল জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। বিলাতে কভেন্ট্রি ও বার্মিংহামে সাইকেল তৈরী হোত; ইংরেজ ব্যবসায়ীরা তা এদেশে আমদানি করতেন এবং দেশীয় ডিলার্স (dealers) মারফত এখানকার বাজারে এর কেনাবেচা চলতো। সাইকেল ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্রই ছিল তখন কলকাতা এবং স্থানীয় ডিলার্সদের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন বাঙালী। প্রথমে হ্যারিসন রোড এবং পরবর্ত্তী-কালে ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট ও বেন্টিক ষ্ট্রীট ছিল সাইকেল বিক্রীর প্রধান স্থান। লাভের মোটা অংশটা বিদেশী ব্যবসায়ীদের হাতেই চলে যেত। জি. য়্যাবারডীন, ষ্ট্যানলিওকস্‌, ই. লেভিটাস প্রভৃতি বিলাতি ফার্ম্মগুলি তখন ইংলণ্ডের নামকরা সাইকেলগুলি আমদানি করতেন; কাজেই ব্যবসায়ের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ বা monopoly এঁদের হাতেই থাকতো। র‍্যালে সাইকেল আমদানি করতেন ওয়াল্টার লক্‌ নামে আর একটি প্রতিষ্ঠান। সুধীরকুমার এই ব্যবসায়ে অবতীর্ণ হয়ে (শুরুতেই তাঁর সঙ্গে লেভিটাসের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং এই যোগাযোগের ফল তাঁর কর্ম্মজীবনে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল) দেখলেন যে, দেশীয় ডিলার্সদের অবস্থা শোচনীয়। বিলাতি প্রতিষ্ঠান-

গুলির ওপর তাঁদের শুধু নির্ভর করতেই হোত না; দেশীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এঁরা ভালো ব্যবহার পর্য্যন্ত করতেন না। এর ফলে ব্যবসায়ীদের অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হোত। সুধীরকুমার এই অবস্থার প্রতিকার করতে চাইলেন। প্রতিকারের একটি মাত্র রাস্তাই ছিল —নিজে সাইকেল আমদানি করা। লেভিটাসের সহযোগিতায় তাঁর পথকিছুটা সুগম হোল।
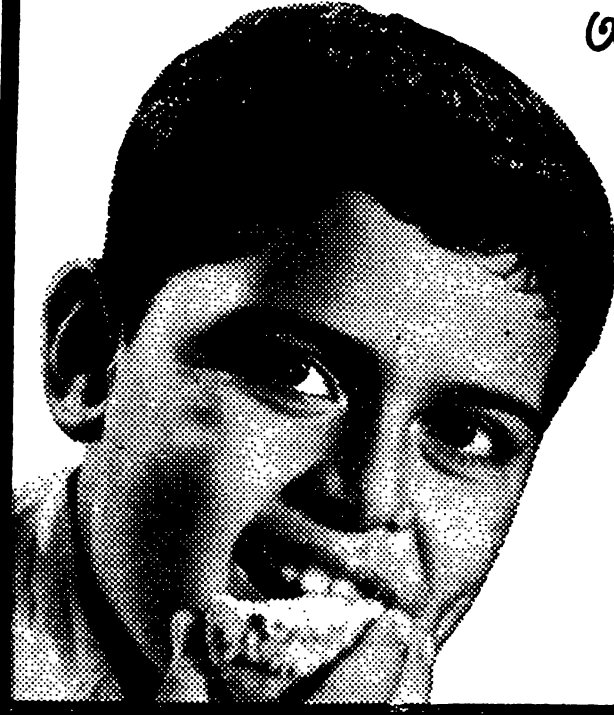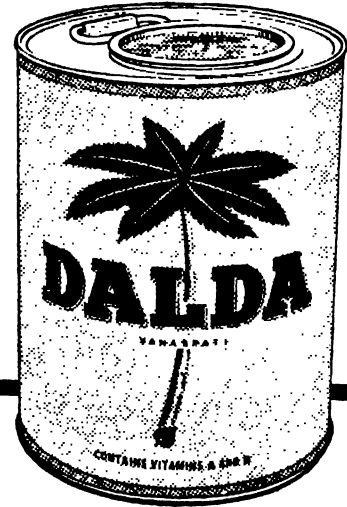
১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে সুধীরকুমার সর্ব্বপ্রথম বিলাত যান। তারপর প্রতি বছরই (কেবলমাত্র ছুইটি মহাযুদ্ধের অন্তর্ব্বর্ত্তীকাল বাদে) তিনি য়ুরোপে যেতেন ও সেখানে পাঁচ-ছয় মাস কাল ধরে অবস্থান করতেন এবং ওদেশে সাইকেল জগতের সকল খবর আগ্রহের সঙ্গে সংগ্রহ করতেন ও সেখানকার সাইকেল-শিল্পের অগ্রগতি লক্ষ্য করতেন—এই পর্য্যবেক্ষণই ছিল তাঁর সফলতার মূল। প্রথমবার বিলাতে গিয়ে সেখানে ভারতীয় সাইকেল ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি হিসাবে ইংলণ্ডের তৎকালীন প্রসিদ্ধ সাইকেল নির্ম্মাণকারীদের এক সভায় যোগদান করেন। সেই সভায় সুধীরকুমার এমন নিপুণ যুক্তির সঙ্গে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করলেন যে, সকলেই মুগ্ধ হন এবং তিনি যে একজন কার্য্যকুশল ব্যক্তি, সকলেরই সেই ধারণা হোল। বিলাতের সকল সাইকেল নির্ম্মাণকারী প্রতিষ্ঠান তাঁকে তাঁদের প্রতিনিধি হিসাবে পাইতে চাইল, কারণ তাঁরা বুঝেছিলেন ভারতবর্ষে সাইকেল রপ্তানি বৃদ্ধি করতে হোলে এই রকম একজন লোকই দরকার। অতঃপর বিলাতের প্রসিদ্ধ সাইকেল নির্ম্মাতাদের সঙ্গে সেন য়্যাণ্ড পণ্ডিতের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হোল এবং কালক্রমে সুধীরকুমার লণ্ডন ও জার্ম্মানিতে ছুইটি স্বতন্ত্র আপিস খুললেন। ভারতবর্ষে, মাদ্রাজ ও বোম্বাই এবং রেঙ্গুনে পর্য্যন্ত তাঁর শাখা আপিস ছিল। বর্ত্তমানে রেঙ্গুন ব্র্যাঞ্চ উঠে গিয়েছে; দিল্লী, বোম্বাই ও মাদ্রাজে তিনটি শাখা আপিস ও লণ্ডনে স্বতন্ত্র আপিস রয়েছে। সেন য়্যাণ্ড পণ্ডিতের খ্যাতি আজ বলতে গেলে সারা পৃথিবীতে। এমন সময় গিয়েছে যখন সুধীরকুমার বিলাতের তিনটি নাম-করা সাইকেল কোম্পানীর যুগপৎ প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং তখন সেন য়্যাণ্ড পণ্ডিতের এলাকা সমগ্র ভারতবর্ষ, সিংহল ও ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

সেন য়্যাণ্ড পণ্ডিতের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সঙ্গে এদেশীয় সাইকেল ব্যবসায়ীদের অবস্থারও উন্নতি হতে থাকে। ডিলারদের স্বার্থকেই সুধীরকুমার সব সময় বড়ো করে দেখতেন, তাদের নানারকম সুযোগ দিতেন এবং এরই ফলে তিনি তাদের বিশ্বাসভাজন হতে পেরেছিলেন। তাঁর সংগঠনী প্রতিভা ছিল অসাধারণ, ব্যবসায়গত সাধুতা ছিল আরো অসাধারণ। নিজে বড়ো হবেন, সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে বড়ো করবেন—এই-ই ছিল তাঁর আদর্শ এবং এরই জন্য সেন য়্যাণ্ড পণ্ডিতের অগ্রগতি হয়েছিল বিস্ময়কর। "The service which Mr. Sen had rendered to the trade is immeasurable"—কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের বহু প্রবীণ সাইকেল ব্যবসায়ী আমাকে এই কথা বলেছেন। এই প্রসঙ্গে নটিংহ্যামের র‍্যালে ইন্‌ডাষ্ট্রিজ-এর বর্ত্তমান চেয়ারম্যান মিঃ জর্জ্জ উইলসনের একটি উক্তি স্মরণীয়। সুধীরকুমারের মৃত্যুর পর (১৯৫৯-এর ২৮শে আগষ্ট জার্ম্মানির ডর্টমুণ্ড শহরে তাঁর মৃত্যু হয়) তিনি লিখেছিলেন: "His passing away leaves the bicycle industry, and the Indian cycle trade in particular, the poorer, He was widely acknowledged to be the fouuder of the Indian cycle iudustry, and was greatly loved and respected in all business circles, particularly by the many dealers in the cycle trade to whom Mr. S. K. Sen was a good friend and in whom they had the greatest confidcrce."

সুধীরকুমারের কর্ম্মের ক্ষেত্র কেবলমাত্র একটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ ছিল না। স্যর নীলরতন সরকারের অন্যতম কর্ম্মকীর্তি ন্যাশনাল টানারীর পুনর্গঠনে সুধীরকুমারের প্রয়াস বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। সুধীরকুমার স্যর নীলরতনের অন্যতম জামাতা ছিলেন। সুধীরকুমারের চরিত্রে বহু সদ্‌গুণের সমাবেশ ছিল। তাঁর কর্ম্মকীর্তি তিনটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে—চরিত্র, প্রতিভা এবং কর্ম্মকুশলতা। তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা ছিল অসাধারণ এবং এরই বলে তিনি সর্ব্বত্র সমানভাবে মাথা উঁচু করে কাজ করে গিয়েছেন, কোথাও তিনি মেরুদণ্ড অবনমিত করেন নি। রবীন্দ্রনাথের একটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে: "মনুষ্যত্ব আমাদের পরম দুঃখের ধন, তাহা বীর্য্য দ্বারা লভ্য।" সুধীরকুমারের জীবনেতিহাসের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে পরে দেখা যাবে যে, তাঁর চরিত্রে ও কর্ম্মে এবং চিন্তায় সব সময়েই প্রাধান্য পেয়েছে এই মনুষ্যত্ব। এ জিনিস তিনি লাভ করেছিলেন উনিশ শতকীয় ভাবধারার উত্তরাধিকারসূত্রে। স্বল্পভাষী, প্রচারবিমুখ এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠ এই মানুষটির জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদই ছিল মনুষ্যত্ব এবং যে কেউ তাঁর জীবনের পরিধির মধ্যে একবার এসেছে তিনিই তা উপলব্ধি করেছেন। ভারত-

বর্ষের সাইকেল ব্যবসায়ী সমাজে সুধীরকুমার আপন স্নিগ্ধ সহৃদয়তাগুণে সকলের হৃদয় জয় করেছিলেন। বুদ্ধির স্বাভাবিক তীক্ষ্ণতা, চিন্তার গভীরতা, চিত্তের একাগ্রতা এবং সকলের ওপর দূরদর্শিতা—এইগুলি একত্রিত হয়ে তাঁর কর্ম্মজগতের সকল প্রচেষ্টাকে ফলবতী করতো। সুধীরকুমারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীঅমলহোম আমাকে বলেছেন: "সুধীরদা কারো নিন্দা করতেন না। অতি অমায়িক সজ্জন ও মধুরালাপী মানুষ ছিলেন তিনি। যে কেউ তাঁর সংস্পর্শে এলে পরে তাঁর সহৃদয়তার উত্তাপ অনুভব না করে পারত না।" সুধীরকুমার কেবলমাত্র ব্যবসায়ী ছিলেন না। তিনি একজন সংস্কৃতিবান্ মানুষ ছিলেন। কর্ম্মব্যস্তজীবনের অবসরে তাঁর একটিমাত্র বিলাস ছিল—তা হোল বই পড়া। নানা রকমের বই তিনি পড়তেন এবং অপরকে পড়াতে ভালবাসতেন। তাঁর জীবনের চারদিকে ঘিরে থাকত একটি পরিচ্ছন্ন সুরুচিবোধ এবং সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা। আতিথেয়তা তাঁর চরিত্রের আর একটি গুণ। কি ইংরেজ, কি স্বদেশীয়, সুধীরকুমারের উদার আতিথ্যে মুগ্ধ হন নি, এমন লোক খুব কম। উনিশ শতকের জীবনাদর্শকে সহজভাবে নেওয়া ও তাকে তেমনি সহজভাবে কর্ম্মজীবন, পারিবারিক জীবন ও সামাজিক জীবনের সকল স্তরে অনায়াসে ফুটিয়ে তোলার মধ্যেই আমরা দেখতে পাই সুধীরকুমার সেনের কৃতিত্ব। আজকের দিনে এমন মানুষের দৃষ্টান্ত বিরল বললেই চলে।
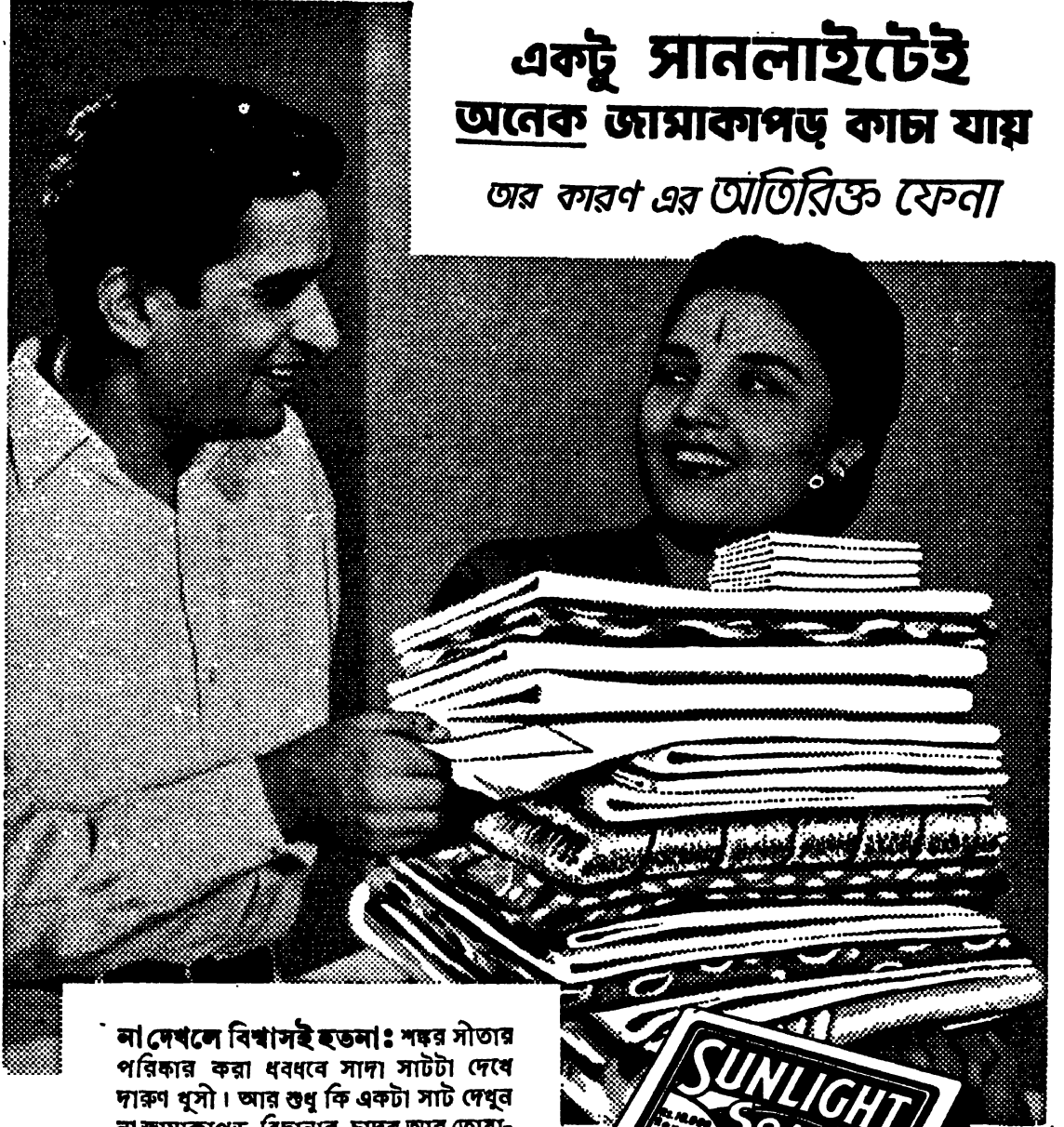
দেশ-বিদেশের কথা

আশুতোষ চক্ষু-চিকিৎসা সমিতি

ছানিতোলা কার্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সন ১৩৬৬ সাল (১৯৫৯-৬০)

১৯৩৪ সনে সুদূর পল্লী অঞ্চলে দুঃস্থ ছানিগ্রস্ত লোকেদের ছানি তুলিয়া দিবার এই প্রচেষ্টা আরম্ভ করেন পল্লী বাংলার অন্যতম কংগ্রেস-নেতা মহাপ্রাণ ডাক্তার আশুতোষ দাস মহাশয়। তদবধি বহু পল্লীতে এই ছানি-তোলার কাজ সম্পন্ন হইয়াছে।

বর্তমান বর্ষে বিভিন্ন সময়ে সমিতি ৮টি বিভিন্ন কেন্দ্রে এই চক্ষু-চিকিৎসা কার্যের অনুষ্ঠান করেন। কেন্দ্রগুলিতে মোট ২০২ জন নরনারীর চোখের ছানি তুলিয়া দেওয়া হয়। রোগিগণ সকলেই দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইয়া ঘরে গিয়াছেন। ঘরে গিয়া তাঁহারা কি ভাবে থাকিবেন ও কি নিয়ম পালন করিবেন সে সম্বন্ধে তাঁহাদের উপদেশ দেওয়া হয়।

আশুতোষের সহকর্মী কলিকাতার অভিজ্ঞ চক্ষু-চিকিৎসক সদাশয় শ্রীঅনাদিচরণ ভট্টাচার্য এম্. বি. মহাশয় বিনা পারিশ্রমিকে বিভিন্ন কেন্দ্রে রোগিগণের চোখের ছানি তুলিয়া দেন। ছানি কাটিয়া দিবার সময় গ্রামের

এই সকল সাময়িক চক্ষু-চিকিৎসা কেন্দ্রে রোগিগণকে ১০ দিন রাখা হয়। নির্দিষ্ট ব্যবস্থামত স্থানীয় ডাক্তার ও কর্মিগণ ঐ সময়ে তাঁহাদের চিকিৎসা, শুশ্রূষা ও পথ্যের বন্দোবস্ত করেন।

ইণ্ডিয়ান রেড ক্রশ সোসাইটির পশ্চিমবঙ্গ শাখা গত কয় বৎসর ধরিয়া রোগিগণের জন্য ঔষধাদি সরবরাহ করিতেছেন। অন্যান্য ব্যয়নির্বাহার্থ সাধারণতঃ বিভিন্ন গ্রাম-কেন্দ্রে উৎসাহী কর্মিগণ চাঁদা তুলিয়া অর্থাদি সংগ্রহ করেন।

প্রত্যেক কেন্দ্রে অগ্রে রোগিগণের চক্ষু পরীক্ষা করা হয় এবং ছানিতোলার যোগ্য রোগী নির্বাচন করা হয়।

এই সকল রোগী সুদূর পল্লীর অধিবাসী। লোকবল ও অর্থবল ইহাদের নাই। কলিকাতায় গিয়া ছানি কাটাইবার কথা ইহাদের কল্পনার অতীত।

আন্দাজে ধরা যায় যে, প্রত্যেক ইউনিয়নে অন্ততঃ শতাধিক লোকের চোখে ছানি আছে। কিন্তু ইহা আন্দাজমাত্র। গবর্ণমেণ্টের জনস্বাস্থ্য বিভাগ উদ্যোগী হইয়া তথ্যসংগ্রহ করিলে দেশে চোখে ছানিপড়া লোকের সংখ্যা কত তাহার সঠিক নির্ণয় হইতে পারে এবং ছানি-তোলার ব্যাপারে গবর্ণমেণ্ট সচেতন হইতে পারেন।

এই সেবাকার্যে বিভিন্ন কেন্দ্রের কেন্দ্রকর্তা ও সেবকগণ, কংগ্রেসকর্মী ও অপর অনেকে অকুণ্ঠভাবে সহায়তা করিয়া থাকেন। হরিপালের সুদক্ষ কর্মী শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মল্লিক কয়টি কেন্দ্রে সেবাকার্যে অশেষ সহায়তা করিয়াছেন।

আমরা ভালই জানি, আমাদের এই প্রচেষ্টা কত সীমাবদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গের কয়েক লক্ষ লোকের চোখের ছানির কথা ভাবিলে এই চেষ্টা নগণ্য, সমুদ্রে জলবিন্দুবৎ বলিয়া মনে হইবে। তথাপি এই চেষ্টায় পথের নির্দেশ রহিয়াছে—এই ক্ষুদ্র বিবরণী প্রকাশের ইহাই একমাত্র কারণ।

শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়
সভাপতি

বিভিন্ন কেন্দ্রে ছানিতোলার হিসাব

গ্রামকেন্দ্র	তারিখ	সংখ্যা পুং	স্ত্রী	মোট
। হরিপাল (১৩শ বর্ষ)				
থানা হরিপাল (হুগলী)	২৯-৭-৫৯	৪	×	৪
২। সুভাষ পল্লী, হেঁড়্যা (৩য় বর্ষ)	৬-১২-৫৯			
থানা খেজুরী (মেদিনীপুর)	৭-১২-৫৯	১৮	১০	২৮
৩। জগদীশপুর (৮ম বর্ষ)				
থানা বালি (হাওড়া)	২০-১২-৫৯	১৬	১৬	৩২
৪। কলানবগ্রাম (৩য় বর্ষ)	৫-১-৬০			
থানা মেমারি (বর্ধমান)	৬-১-৬০	১৪	১৯	৩৩
৫। আঁইয়া (৬ষ্ঠ বর্ষ)	২৩-১-৬০			
থানা চণ্ডীতলা (হুগলী)	২৪-১-৬০	২২	২২	৪৪
৬। রামনগর সাহোড়া (১ম বর্ষ)				
থানা বড়ঞা (মুর্শিদাবাদ)	১৬-২-৬০	৯	৯	১৮
৭। রাধানগর (৩য় বর্ষ)				
থানা খানাকুল (হুগলী)	৮-৩-৬০	১৪	১২	২৬
৮। শ্যামবাজার (৩য় বর্ষ)				
থানা গোঘাট (হুগলী)	১০-৩-৬০	৫	১২	১৭
		১০২	১০০	২০২

বিগত চারি বৎসরের ছানিতোলা কার্যের তুলনামূলক ছক

রোগীর বয়স	সংখ্যা ১৩৬৩ (১৯৫৬-৫৭)	সংখ্যা ১৩৬৪ (১৯৫৭-৫৮)	সংখ্যা ১৩৬৫ (১৯৫৮-৫৯)	সংখ্যা ১৩৬৬ (১৯৫৯-৬০)
১ হইতে ৯ বৎসর	×	২	×	২
১০ " ১৯ "	×	১	১	১
২০ " ২৯ "	×	×	×	২
৩০ " ৩৯ "	৫	৩	৫	২
৪০ " ৪৯ "	১৮	১৩	১২	২২
৫০ " ৫৯ "	২৯	২২	৬২	৫০
৬০ " ৬৯ "	২৩	৫৫	৬৩	৭৭
৭০ " ৭৯ "	৮	২৯	১৮	৪২
৮০ " ৮৯ "	২	৫	২	৪
৯০ " ১০০ "	×	২	×	×
বয়স লেখা হয় নাই	×	১	১	×
মোট	৮৫	১৩৩	১৬৪	২০২
পুরুষ	৪০	৬০	৮১	১০২
স্ত্রী	৪৫	৭৩	৮৩	১০০

LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY SOAP

স্মৃতিতীর্থ—শ্রদ্ধেয়া সরলাদেবীর ও শ্রদ্ধেয় বেণীমাধব দাসের পুণ্যস্মৃতি। প্রকাশিকা বীণা ভৌমিক। মূল্য ২৷০ টাকা।

স্বর্গত বেণীমাধব দাস, শিক্ষক, সাধক ও দিব্যজ্ঞানপূর্ণ গুরু ও বন্ধুরূপে তাঁহার ছাত্রছাত্রী, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের চিত্তে ও হৃদয়ে যে শ্রদ্ধামণ্ডিত মধুর স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছেন এই পুস্তক তাহারই পরিচয়। তাঁহার দেবোপম চরিত্র এবং নিষ্কলুষ প্রেমপূর্ণ চিত্ত, তাঁহার সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য যাঁহাদের ঘটিয়াছিল, তাঁহাদের কতদূর মুগ্ধ ও অনুপ্রেরিত করিয়াছিল, এই পুস্তকে তাহার উজ্জ্বল সাক্ষ্য অনেক কিছুতেই পাওয়া যায়। একটি উদাহরণ দিই। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার সোদরপ্রতিম বন্ধু ছিলেন, এ কথা বেণীমাধববাবুর মৃত্যুর এক বৎসর পরে লিখিত পত্রে পাই। ঐ পত্রের শেষে আছে—

"তাঁহার পরলোক গমনের পর এক বৎসর হইয়া গেল, তাঁহার বিজয়া দশমীর পত্র পাইলাম না। তাঁহার স্থান অপূর্ণ রহিয়া গেল। তিনি ঈশ্বরকে মাতৃরূপে দেখিতেন। তাঁহার এই মাতৃভক্তি পরকে আপন করিতে শিখাইয়াছিল।

"তিনি চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সৌম্য প্রিয়দর্শন মূর্তি বালকসুলভ কৌতূহল-দৃষ্টি এবং মুখের স্মিতহাস্য চক্ষের সম্মুখে ভাসিতেছে।"

তাঁহার ছাত্রদের শ্রদ্ধাঞ্জলি, যাহা এই পুস্তকে আছে তাহাতে শুধু এই কথাই মনে হয় যে আজিকার দিনে এই আদর্শ শিক্ষক ও গুরুর একটি সম্পূর্ণ জীবনী আমাদের দেশের শিক্ষকদের অবশ্যপাঠ্য পুস্তকরূপে নির্দ্ধারিত হইলে হয়তো দেশের ছাত্র সঙ্কট ও শিক্ষা-সমস্যার একটা সমাধানের পথ পাওয়া যাইত।

এই পুস্তকেই বেণীমাধব দাস মহাশয়ের পত্নী স্বর্গতা সরলা দেবীরও স্মৃতিতর্পণ করা হইয়াছে। সহধর্মিণী বলিতে যাহা বুঝায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায় ইহার যে স্মারক বিবরণ ও পত্র এই পুস্তকের শেষে দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে।

পরবর্ত্তী জীবন—শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস। প্রকাশক শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস ১০-২ কেয়াতলা লেন : কলিকাতা—২৯। মূল্য ১৲ টাকা।

এই ক্ষুদ্র পুস্তক (ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ১০৩ পৃষ্ঠা) পরবর্ত্তী জীবন সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারার সংক্ষিপ্ত সার। এই সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অতীত অতি সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয়ের আলোচনায় লেখক শুধু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের সাহায্য লইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বহু চিন্তাশীল মনীষীর ধারণা ও বিশ্বাসের বিচারও করিয়াছেন। লেখকের এই তত্ত্বজিজ্ঞাসার মূল্য নিরূপণ সহজ নহে কেননা তিনি এই বিষয়টির বিভিন্ন অঙ্গের প্রত্যেকটি সমস্যার পূরণ সংক্ষিপ্তসারের রূপে উপস্থিত করিয়াছেন, যাহার অনেক কিছুই সাধারণ পাঠকের নিকট যুক্তিসঙ্গত ও সন্তোষজনক মনে হইতে পারে কিন্তু যাঁহারা সংশয়বাদী তাঁহাদের নিকট উহা সম্পূর্ণ সন্তোষজনক না হইতে পারে। লেখক নিজে জন্মান্তরে আস্থাবান সেইজন্য যেখানে ঐরূপ কোনও প্রশ্নের পূর্ণ নিরসন না হইয়াছে সেখানে তিনি সেই প্রশ্ন বিশ্বাসের উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন।

"পরবর্ত্তী জীবন" কি? ইহার উত্তরে তিনি পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সোক্রেটিসের বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন : "আমি তোমাদিগকে সত্য অবধারণ করিতে বলিতেছি, আমার কথা অবধারিত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে বলিতেছি না ; আমি সত্য বলিতেছি—এরূপ মনে হইলেই আমার সহিত একমত হইও।" এই উদ্ধৃতি দিবার পরেই লেখক বলিতেছেন : "যিনিই পরলোক প্রসঙ্গে যে কোনও বিবৃতি দিন না, তৎসম্পর্কে লেখক ও পাঠকের এইরূপ মনোভাব থাকা বাঞ্ছনীয়।"
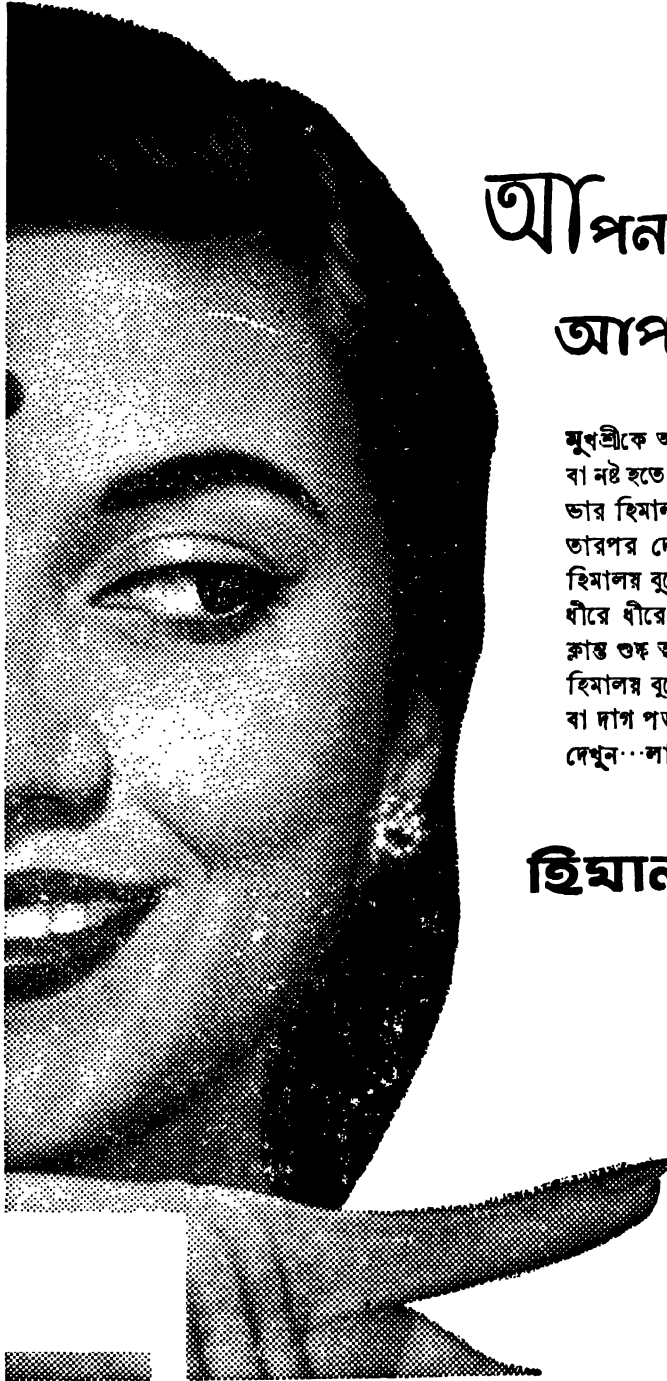
আপনার রূপ লাবন্য
আপনারই হাতে !
মুখশ্রীকে অকারণ রোদে—ধূলোয় কালো
বা নষ্ট হতে দেন কেন? চেহারার লাবণ্যতা রক্ষার
ভার হিমালয় বুকে স্নোর ওপরই ছেড়ে দিন—
তারপর দেখুন চেহারার চমক। একটু খানি
হিমালয় বুকে স্নো ঘষে দেখুন, হারানো কান্তি
ধীরে ধীরে আবার কেমন ফিরে আসছে !
ক্লান্ত শুষ্ক ত্বক সজীব হয়ে উঠছে !
হিমালয় বুকে স্নো আপনার মুখে কখনও ব্রণ
বা দাগ পড়তে দেবে না। নিজের চেহারায়
দেখুন···লাবণ্যতা এনে ধরেছে···
হিমালয় বুকে স্নো !
HIMALAYA
BOUQUET
SNOW
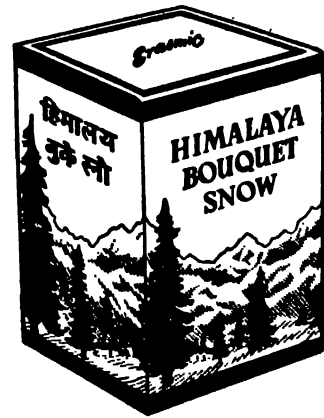
এই প্রারম্ভিক ভিত্তির উপর তিনি পরবর্তী জীবন সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ না হইলেও, সম্যক বিচার করিয়াছেন। যে ভাবে তিনি তথ্যের ও তত্ত্বের স্থাপনা করিয়াছেন তাতে বিচার্য্য বিষয়ের সকল দিকই প্রদর্শিত হইয়াছে। পুনর্জ্জন্মবাদের বিষয়ে সব দিক আলোচনা করিয়া, তিনি শেষ করিয়াছেন এই বলিয়া :

"উদ্ধৃত বাক্যগুলি হইতে পুনর্জ্জন্মবাদ ও অন্যান্য মত আপেক্ষিক সত্য ইহাই বুঝা যায়। অপূর্ণ মানবের জ্ঞানে আপেক্ষিক সত্য ভিন্ন অভ্রান্ত সত্য প্রতিভাত হইতে পারে না। যাঁহার নিকট যে মত অবলম্বনীয় বলিয়া বিশ্বাস হইবে, আপেক্ষিক হইলেও তিনি তাহাই আশ্রয় করিয়া সংসারপথে চলিবেন; যেহেতু চরমসত্য শুধু সেই এক।"

লেখক জ্ঞানী ও সুলেখক সেইজন্য পুস্তকটি সরল ও মনোগ্রাহী হইয়াছে। সেইজন্য জিজ্ঞাসু পাঠক মাত্রেই ইহাতে সন্তুষ্ট হইবেন। তথ্যের তুলনায় মূল্যও অতি সুলভ হইয়াছে।

কেশবচন্দ্র—মণি বাগচি। জিজ্ঞাসা। মূল্য চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ—মণি বাগচি। জিজ্ঞাসা। মূল্য চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

বিগত উনবিংশ শতকে বাংলা ও বাঙালীর ধর্ম্ম ও সামাজিক জীবনে জ্ঞান ও মনীষার আলোকপাত করিয়া যাঁহারা বাঙালীকে নূতন জীবনের ও নূতন চেতনের পথ দেখাইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম দুই জনের জীবন পরিচিতি, এই দুইখানি বইয়ে দেওয়া হইয়াছে।

লেখক সাধারণ ভাবে জীবনকাহিনী বা জীবনবৃত্তান্ত না লিখিয়া, এই দুইজন মহামানবের কর্ম্মময় জীবনের নানা কার্য্যের, নানা ঘটনার, নানা লিখিত ও কথিত মতামত ও বচনের সঙ্গে তাঁহাদের জীবনের ও সমাজের সমসাময়িক ঘটনা উল্লেখ করিয়া এবং ইহাদের জীবনচরিত ও তৎসংশ্লিষ্ট বিচার, নানা পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া, ইহাদের জীবনদর্শনের ও ব্যক্তিত্বের প্রকৃত মূল্য ও অর্থ নির্ণয় করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন। এইরূপে লিখিত বই বাংলায় একেবারে অভিনব না হইলেও সাধারণ ধারা হইতে পৃথক। ইহাতে সাধারণ জীবনীর চিরাচরিত প্রথায় পুঞ্জীকৃত ঘটনাবলী ধারাবাহিক ভাবে সাজাইয়া দেওয়া হয় নাই। বরঞ্চ সাধারণ সাংসারিক বা বৈষয়িক ব্যাপারে অবান্তরের পর্য্যায়ে ফেলিয়া শুধু তাহাই দেখান হইয়াছে বা উদ্ধৃত হইয়াছে, যাহা ইঁহাদের আদর্শবাদের, চিন্তাধারার ও কার্য্যপন্থার উপর আলোকপাত করিয়া ইহাদের জীবনের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে সহায়তা করে।

লেখক এই কাজে—যাহাকে তিনি "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের" মুখবন্ধে "জীবনের ব্যাখ্যা" বলিয়াছেন—অনেকদূর সাফল্য লাভ করিয়াছেন। বস্তুতঃ পক্ষে এই দুই মহাপুরুষের বৃহত্তর জীবনীর সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় নাই তাঁহারা ইঁহাদের জীবনের সংক্ষিপ্ত কিন্তু তথ্যপূর্ণ পরিচিতি এই দুই বইয়ে পাইবেন।

এইভাবে জীবনী বিচারের বা লিখনের মধ্যে ভ্রমপ্রমাদের একটি বিশেষ সম্ভাবনা থাকে যখন আলোচ্য জীবনে অন্তর্মুখী সত্তার আধিক্য থাকে এবং তাহার বহিঃপ্রকাশ অতি সংক্ষিপ্ত হয়, যেমন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনে। সেই কারণে এই দুইখানি বই, যাহা প্রায় এক সময়েই প্রকাশিত হয়েছে, একসঙ্গে পড়িলে অনেক অসঙ্গতি দেখা দেয়, যথা যেখানে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের মতান্তরের বিষয় লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও এই বই দুইখানি শিক্ষিত বাঙালীর কাছে সমাদর পাইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

অচিরা—প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। শান্তি লাইব্রেরী। মূল্য চারি টাকা।

কবিতার কি বয়স আছে? এই বইখানির আরম্ভে কবির নিবেদনে সেই প্রশ্নের উত্তর অন্যভাবে দেওয়া হয়েছে। "যে-সব সাময়িক ঘটনাকে উপলক্ষ ক'রে এর অধিকাংশ কবিতা রচিত, সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে উপলক্ষ্যের ঔজ্জ্বল্য লোকস্মৃতিতে ম্লান হয়ে যাওয়ায় সেগুলির লৌকিক আবেদন কমে গেছে, তাতে তাদের কাব্য মূল্য নির্ণয় আজ সহজ হয়েছে মনে হয়।" এই কথাগুলির সহজ অর্থ এই যে, সে কবিতার আবেদন একান্তভাবে তার নিজের মধ্যেই নিহিত নয়, সাময়িক বা পারিপার্শ্বিক ঘটনার আবেদনে যার আশ্রয় সে কবিতার কোনই মূল্য নাই।

কবিতার মূল্য নিরূপণ কি ভাবে হওয়া উচিত, কবিতা এবং রসোত্তীর্ণ হয় কিসে, এই দুই প্রশ্ন আজ বহু কাব্য-মহারথীর জটিল ও পরস্পর-বিরোধী বিচারে, অতি কঠিন সমস্যায় দাঁড়িয়েছে। কিন্তু যদি কবিমানসের আবেগ বা অনুভূতি তাঁর কবিতা পাঠে পাঠকের মনে সমতানের ঝঙ্কার তুলে একটি বেদনা বা চেতনা এনে দিলেই কবিতা সার্থক হয়, তবে বলিব অচিরার অনেক কবিতাই সে পরীক্ষায় সার্থক।

ক. চ.

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এবং তাঁহার স্বভাবনিষ্ঠ যোগ—উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় প্রণীত। নববিধান পাবলিকেশন কমিটি, 'ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির,' ৯৫ নং কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য—দুই টাকা।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের নির্দ্দেশে তাঁহার কয়েকজন বিশিষ্ট অনুগামী বিভিন্ন ধর্ম্মের শাস্ত্রগ্রন্থ অনুশীলন করিয়া সমন্বয়ের দৃষ্টিতে তাঁহাদের মর্ম্মার্থ বিশ্লেষণে ব্রতী হন। উপাধ্যায় বা উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থব্যাখ্যায় নিযুক্ত হইয়া সংস্কৃতে ও বাংলায় অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। ভগবদ্‌গীতা সমন্বয়ভাষ্য ও বেদান্ত সমন্বয় সংস্কৃত (১৮২১ ও ১৮২৮ শকাব্দ) ও বাংলা (১৮৩৬ ও ১৮৩৪ শক) উভয় ভাষাতেই প্রকাশিত হয়। আধুনিক যুগে সংস্কৃতে লিখিত এই জাতীয় গ্রন্থ বিরল বলা চলে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কি বাংলা কি সংস্কৃত কোন ভাষাতেই তাঁহার লিখিত এই সকল গ্রন্থ বা অপর কোন গ্রন্থ পণ্ডিত মহলেও বিশেষ পরিচিত নহে। নববিধান পাবলিকেশন কমিটি পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে প্রথম প্রকাশিত বর্ত্তমান গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিয়া গৌরগোবিন্দের কীর্ত্তিকলাপ সাধারণের নিকট প্রচার করিতে উদ্‌যোগী হইলেন ইহা খুবই আনন্দের কথা। গ্রন্থকারের জীবন-কাহিনী ও গ্রন্থাবলীর বিস্তৃত পরিচয় ভূমিকা বা পরিশিষ্টরূপে সন্নিবেশিত হইলে পাঠকগণ খুবই উপকৃত হইতেন। উহার পরিবর্ত্তে গ্রন্থশেষে প্রদত্ত উপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলীর তালিকাটি হইতে তাঁহার কৃত বিপুল কার্য্যের কথঞ্চিত আভাস পাওয়া যাইবে। আলোচ্য গ্রন্থে 'গ্রন্থকার নববিধানের দৃষ্টিতে সমন্বয়ের আলোকে গৌরাঙ্গ বিধানের দুর্ব্বোধ্য গূঢ়তত্ত্ব সকল আলোচিত করিয়াছেন।' এজন্য গ্রন্থকার বহু গ্রন্থ হইতে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা করিয়াছেন। আলোচনা পাণ্ডিত্যপূর্ণ। অনুসন্ধিৎসু পাঠক গ্রন্থখানি পড়িয়া আনন্দিত ও উপকৃত হইবেন।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ—অধ্যাপক শ্রীশ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়, গ্রন্থভবন, ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য—ছয় টাকা।

বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য আজ যে স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, মানোন্নয়নের দিক দিয়া তাহা পৃথিবীর যে-কোনো ভাষার সহিত তুলনীয়। যদিও বাংলাভাষার উদ্ভবকাল নির্ণয় করা শক্ত, তবে তাহার উন্নতির ক্রমটা আমাদের চোখে পড়ে। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে সেই ক্রম-পরিণতিকেই গ্রন্থকার বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন।

এখন দেখা যাক, গ্রন্থকার কি ভাবে আলোচনা সুরু করিয়াছেন। গ্রন্থকার বলিতেছেন, "ক্রমাগত আত্মবিকাশ ও অগ্রগমনের প্রয়াসে নতুনের সঙ্গে পুরোনোর সংঘর্ষ ও সমন্বয় সাধন করা হয়, আর এই ক্রমবিবর্ত্তন ক্রিয়ায় ভাষা ও সাহিত্য পরস্পরের দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়, সেই জন্যেই বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ বুঝতে হলে তার ভাষাগত ও সাহিত্যিক, দু'রকম আলোচনাই অপরিহার্য্য।" সেইজন্য তিনি তাঁহার আলোচনাকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। (১) বাংলা ভাষা তথা বাংলা গদ্য ভাষার প্রথম উদ্ভবকাল; ঐ ভাষার আনুমানিক প্রাথমিক রূপ; ঐ ভাষার আদি ও মৌলিক উপাদানসমূহ। (২) বাংলা গদ্য ভাষার প্রথম ব্যবহার, ব্যবহার ক্ষেত্র, আনুমানিক প্রয়োগকাল ও প্রয়োজকগণ। (৩) বাংলা গদ্য ভাষার উপর বহিরাগত প্রভাব সমূহের কাল নির্ণয় ও স্তর বিশ্লেষণ করার উদ্দেশ্যে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ঐতিহাসিক পর্য্যানুক্রমিক আলোচনা তথা গদ্যসাহিত্যের ক্রমবিকাশ বর্ণনা। (৪) বাংলা গদ্যের মূলধারা নির্ণয়। (৫) বাংলা গদ্যের বর্ত্তমান প্রবণতা ও ভাবী সম্ভাব্যতা। (৬) বাংলা গদ্যের বরণীয় পথ।

আলোচনা পর্ব্বটি দীর্ঘ। কিন্তু দীর্ঘ হইলেও তথ্যবহুল। তিনি দেখাইয়াছেন বাংলা ভাষা বহুদিন হইতেই প্রচলিত। নানা কারণে লেখা ভাষায় চলন না থাকিলেও, বাংলা ভাষায় কথায় চলন বহু পূর্ব্ব হইতেই ছিল। অবশ্য নানা প্রভাবে পড়িয়া তাহা বিকৃত

আকার লইয়াছিল। সংস্কৃত, মাগধী প্রাকৃত হইতে ইহার প্রকৃত জন্ম। কালধর্মে ফার্সী প্রভাব পড়িয়া আরও বিকৃত আকার ধারণ করে। এই প্রভাব এড়াইবার চেষ্টা অনেক কাল ধরিয়া চলে। দুর্বলতা আমাদের মধ্যেও ছিল। যে কারণে, তাঁহারা গদ্য না লিখিয়া পদ্য লেখা সুরু করেন। গদ্য ছিল তখন মৌখিক ভাষা ও চিঠিপত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। লেখক বলিতেছেন, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের আগে বাংলা ভাষায় গদ্য রচনা থাকিলেও, গদ্য সাহিত্য বলিতে কিছুই ছিল না। তার অন্যতম প্রধান কারণ অবশ্য ছাপাখানার অভাব।

বাংলা ভাষার সমৃদ্ধির মূলে আমরা যে যে কারণ দেখিতে পাই তাহার প্রধান কারণ আঞ্চলিক শব্দ-সম্পদ। জগতে কোনো ভাষাই আঞ্চলিক ভাষা ব্যতিরেকে সমৃদ্ধ হইতে পারে নাই। এই কারণেই, বাংলা ভাষায় দশম-একাদশ শতাব্দীর মধ্যে অমন জোয়ালো প্রাণপূর্ণ গীতিকা-সাহিত্য গড়িয়া ওঠা সম্ভবপর হইয়াছিল। গ্রন্থকার বলিতেছেন, "বাংলা ভাষায় আজও অন্য সমস্ত আধুনিক ভারতীয় ভাষার তুলনায় তৎসম শব্দের ব্যবহারের পরিমাণ অনেক বেশি। এই তৎসম-প্রাচুর্য্য বাংলা ভাষার ধ্বনি-গাম্ভীর্য্য বিশেষভাবে বৃদ্ধি করেছে।"

লেখক বলিতেছেন, "যে ভাষা আজ সাধু ভাষা নামে পরিচিত, তার চূড়ান্ত ব্যাকরণগত রূপ বিদ্যাসাগর গঠন করেন। ১৮৬৫ সন থেকে বাংলা গদ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ সুরু হয় বলা যেতে পারে। কিন্তু ১৮৭৮ সন থেকেই সাধু ভাষার পাশাপাশি বাংলা গদ্যের নতুন ধারার জন্ম হওয়ায় ঐ সময় বাংলা গদ্যের বিবর্তনের ইতিহাসে আর একটি নতুন যুগ আরম্ভ হ'ল ধরা যায়।"

মোট কথা, একটা শতাব্দী ধরিয়া যে এক্সপেরিমেণ্ট চলিয়াছিল তাহাই বাংলা-সাহিত্যকে বহু দূর পর্য্যন্ত ঠেলিয়া দিয়াছিল। যে এক্সপেরিমেণ্টের পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আসিলেন বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভাধর। 'যার ফলে দীর্ঘ চারশো বছরের অক্লান্ত সাধনায় বাংলা গদ্য এখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গদ্য ভাষাগুলির সমপর্য্যায়ে উঠে আসতে পেরেছে।'

এই গ্রন্থ রচনায় গ্রন্থকারকে বহু তথ্যাবলী সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। তবে তাঁহার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে। এরূপ তথ্যাদিবহুল প্রামাণ্য-গ্রন্থ বাঙালী মাত্রেরই গর্ব্বের বস্তু। একটা বিষয় লক্ষ্য করা গেল, যাঁহারা এই তথ্যপূর্ণ গ্রন্থাদি রচনা করেন, তাহাদের প্রায় অধিকাংশই তথ্যভারে ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে—সাহিত্য হিসাবে তাহাদের মূল্য সামান্য। কিন্তু শ্যামলকুমারের এই আলোচ্য গ্রন্থখানি সাহিত্যের মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। তিনি ভাষাকে খেলাইতে জানেন।

গ্রন্থ শেষের অনুচ্ছেদটি অনাবশ্যক আসিয়া পড়িয়াছে। অকারণ উপদেশ দিবার এই গ্রন্থে অবকাশ কোথায়? দ্বিতীয় মুদ্রণ কালে গ্রন্থকার এবিষয়ে বিবেচনা করিলে ভাল হয়।

শ্রীগৌতম সেন

রবীন্দ্র স্মৃতি—শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ২, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য—দুই টাকা।

(ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী গত ১২ই আগষ্ট (১৯৬০) ৮৭ বৎসর বয়সে শান্তিনিকেতনে পরলোক গমন করিয়াছেন) ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে এই পুস্তকখানি প্রকাশিত (২৫ বৈশাখ, ১৩৬৭)। কাজেই প্রায় শতাব্দীব্যাপী জীবনের বহুলাংশে তিনি রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসিয়াছেন ঘনিষ্ঠভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। তাহারই কিঞ্চিৎ এই স্বল্প-পরিসর পুস্তকখানিতে পরিবেশন করিয়াছেন। অধ্যায়গুলির নাম হইতেই ইহার আভাস পাওয়া যাইবে, যথা—সঙ্গীত স্মৃতি, নাট্য স্মৃতি, সাহিত্য স্মৃতি, ভ্রমণ স্মৃতি, পারিবারিক স্মৃতি। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে স্মৃতির পাতা উল্টাইতে গিয়া স্বভাবতঃই জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর মনীষাসম্পন্ন বহু নারী ও পুরুষের কথা ইহাতে আসিয়া পড়িয়াছে। আবার শুধু জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীই নয়, এখানকার বিভিন্ন ব্যক্তিদের সঙ্গে যাঁহারা অন্তরঙ্গভাবে মিশিতেন, যেমন অক্ষয় চৌধুরী ও তদীয় পত্নী কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার পরিবার প্রভৃতি বিষয়ও লেখিকার সুনিপুণ তুলিকায় বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। সবুজপত্র যুগের কথা ইহার সম্পাদক তাঁহার স্বামী প্রমথ চৌধুরী ('বীরবল'), বড়ঠাকুর আশুতোষ চৌধুরী, তদীয় পত্নী প্রতিভা চৌধুরী, সরলা দিদি (সরলা দেবী চৌধুরাণী) সম্পর্কেও তিনি অতি নিষ্ঠার সঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন। এক কথায় জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের সেই মহনীয় পরিবেশটি সম্বন্ধে আমরা পুস্তকখানির ভিতর হইতে অনেক তথ্য আহরণ করিতে পারি। এ কারণ গত যুগের কথা আলোচনা করিতে গেলে পুস্তকখানির প্রয়োজনীয়তা পাঠক মাত্রেরই নিকট প্রতিপন্ন হইবে। ইহার বহুল প্রচার হইবে নিশ্চয়।

পুস্তকখানিতে সন্নিবেশিত বাল্মীকির বেশে রবীন্দ্রনাথ চিত্রখানি ইহার সৌষ্ঠব বাড়াইয়া দিয়াছে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

প্রাসাদ অন্তঃপুরে

চিত্রাধিকারী শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

:: ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬০শ ভাগ
২য় খণ্ড } অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭ { ২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয় পাঁচসালা যোজনা

২৮শে কার্ত্তিকের দৈনিক সংবাদপত্রে দেখিলাম যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছেন কেন্দ্রের প্রাপ্য ঋণ পরিশোধের কিস্তিবন্দী ব্যবস্থায় কিছুদিনের জন্য বিরতি দেওয়া হউক। এই অনুরোধের কারণ তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের অর্থের টানাটানি। এই বিরতি কতকালের জন্য না চিরকালের জন্য প্রয়োজন, সেকথা কোথাও প্রকাশিত হয় নাই, শুধুমাত্র জানান হইয়াছে যে, ঋণ শোধ না দিতে হইলে ঐ কিস্তি ইত্যাদিতে যে ৫৪ কোটি টাকা লাগিত সেই মত উপরি অর্থের সংস্থান হইবে, কিন্তু তাহা হইলেও আরও বহু কোটি টাকার ঘাটতি রহিয়া যাইবে। কেননা এই রাজ্যের তৃতীয় পাঁচসালা যোজনায় ৩৪১ কোটি টাকার প্রয়োজন। ইহার জন্য পরিকল্পনা কমিশন ১৬০ কোটি টাকা দিতে সম্মত আছেন, এই রাজ্যে জোগাড় হইবে ৯২.৮১ কোটি—ব্যবধান ৮৮ কোটি। সুতরাং "ধারের কড়ি" না দিতে হইলেও আরও ৩৪ কোটি টাকার জোগাড় চাই এবং সেইজন্য দ্বিতীয় দফায় আবেদন জানান হইয়াছে সাহায্যের পরিমাণ বাড়াইবার।

যে "স্মারকলিপি" তৃতীয় পাঁচসালা যোজনা সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার এই শীতকালীন অধিবেশনে আলোচনার জন্য দেওয়া হইয়াছে তাহাতে এই তথ্যগুলি আছে। আরও আছে, এই আশার কথা যে, গত দুইটি পাঁচসালা যোজনায় "রাজ্য সরকারের কৃতিত্বের পটভূমিকায়" নাকি রাজ্যের ভিতরে "অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ করা তেমন কঠিন হইবে না"।

এই আশা দুরাশা কিনা তাহা আমাদের জানা নাই। সত্য কথা এই যে, ঐ আশার ভিত্তি যে কৃতিত্বের উপর স্থাপিত সেই কৃতিত্বের রূপ ও পরিমাণ সম্বন্ধে আমরা কোনও বাস্তব নির্ণয়ের কথা কখনও শুনি নাই। যাহা শুনিয়াছি ও পড়িয়াছি সে সবকিছুই ভবিষ্যদ্বাণী এবং সেই ভাবীকালের রঙীন ছবি কালের গতির সঙ্গে ক্রমে মরুতৃষ্ণিকার ন্যায় দূর হইতে দূরেই সরিয়া যাইতেছে। কি-বা দেশের শ্রীবৃদ্ধিতে, কি-বা দেশের সন্তান-সন্ততির অবস্থায় আমাদের এই চর্ম্মচক্ষুতে বা সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনায় আমরা উন্নতি বা প্রগতির কোনও চিহ্ন দেখিতে পাই না।

দেশের কথা বলিতে আমাদের কর্ত্তৃপক্ষ এতদিন বুঝিতেন শুধু কলিকাতা, এখন তাহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে উত্তর-বর্দ্ধমান অঞ্চল—দুর্গাপুর হইতে আসানসোল পর্য্যন্ত। কলিকাতার অবস্থা এই প্রথম ও দ্বিতীয় পাঁচসালা যোজনার ফলে কি হইয়াছে তাহা ত এখন জগৎ-বিখ্যাত। কিন্তু তাহা শ্রীবৃদ্ধির কারণে নহে। আর দুর্গাপুর—"দুর্গা" "দুর্গা" বলিলে মনের গ্লানি যায় না, "রাম" "রাম" বলিতে হয়।

দেশের সন্তানদিগের অবস্থা অতি সোজা ভাষায় বলা যায়, প্রথম পাঁচসালা যোজনার পর "জঘন্য", দ্বিতীয় পাঁচসালা শেষ মহড়ায় "জঘন্যতর"—জানিনা তৃতীয় পাঁচসালার পরে "অপরা কিম্ বা ভবিষ্যতি!"

তবুও কেন্দ্রীয় তহবিল হইতে আরও ৮৮ কোটি টাকা আদায়ের চেষ্টাকে আমরা বাহবা দিব। কেন্দ্রীয় তহবিল হইতে টাকা যেভাবেই বরাদ্দ করা হউক তাহার মোটা

অংশ যাইবে তক্ষক গোষ্ঠীর কবলে। যদি তাহার একটা অংশ আমাদের স্থানীয় বঞ্চকদিগের হস্তগত হয় তবে কৃতিত্বের প্রশ্ন কিছুটা সমাধান হইবেই। তবে এই কৃতিত্বের ফলে বেকার সমস্যা বা বাংলার সন্তান-সন্ততির অভাব-অনটনের কোনও সুরাহা হইবে কিনা সন্দেহ।

শোনা যায় ঐ স্মারকলিপিতে একদিকে বলা হইয়াছে যে, পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয় পাঁচসালা যোজনার প্রধান দুইটি লক্ষ্য "কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা" এবং "ইস্পাত, জ্বালানী ও শক্তি উৎপাদন, জাতীয় মৌল শিল্পগুলির সম্প্রসারণ।" অন্যদিকে বেকারসমস্যা সমাধানের জন্য ছোট, বড় ও মাঝারী শিল্পের সম্প্রসারণও একান্ত দরকার সেকথাও বলা হইয়াছে। কিন্তু ঐ "ছোট বড় ও মাঝারী শিল্প" চালনা করিবে কে বা কাহারা এই হইল আমাদের প্রশ্ন। মৌল শিল্পগুলিতে ত. শ্রমিক হিসাবে সংস্থান ভিন্নপ্রদেশীয়েরই হইয়াছে এতদিন। ভবিষ্যতে যে অন্য কিছু হইবে মনে হয় না। কেননা সেরূপ ব্যবস্থার প্রস্তুতি অনেক কিছু করা প্রয়োজন নচেৎ বাঙালী সে কাজ হয় পাইবে না, নচেৎ পাইয়াও অযোগ্যতার কারণে রাখিতে পারিবে না। ছোট বড় শিল্প ইত্যাদিও ত একে একে বাঙালীর হাত থেকে চলিয়া যাইতেছে, সে বিষয়েও আমাদের সরকারের কোনও হুঁস হইয়াছে, মনে হয় না। সুতরাং কৃতিত্বের প্রশ্নও ঐ পূর্ব্বের নির্দ্দেশ অনুযায়ী পথেই হইবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন

বিগত ৯ই নবেম্বরের নির্ব্বাচনে ডেমোক্রাটিক দলের মনোনীত প্রার্থী মিঃ জন ফিট্স্‌জেরাল্ড কেনেডি তাঁহার রিপাবলিকান প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টের আসন পাইয়াছেন। অবশ্য সেই আসন তাঁহার অধিকারে আসিবে আগামী ২০শে জানুয়ারী।

ইঁহার বয়স মাত্র ৪৩ বৎসর এবং যুক্তরাষ্ট্রে ইতিপূর্ব্বে রোমান ক্যাথলিক কেহ প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হয় নাই, ইনিই প্রথম। সেই কারণে ইঁহার বিরুদ্ধে কিছু প্রচারও চলিয়াছিল, যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান ধর্ম্মনিরপেক্ষ।

ইঁহার মতামত সম্পর্কে যাহা প্রচারিত হইয়াছে তাহা ভারতের পক্ষে আশাপ্রদ। কার্য্যতঃ কি দাঁড়ায় সেকথা পরে দেখা যাইবে। কেননা যুক্তরাষ্ট্রের পার্টিতন্ত্র সম্পূর্ণ অন্য প্রকার, সেখানে দলগত অধিকারী বা দলগত স্বার্থের দাপট বিশেষ কিছুই নাই। এমনকি নির্ব্বাচনেও নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার রিপাবলিকান দলের প্রতিনিধি, কিন্তু ১৯৫৬ সনের নির্ব্বাচনে তিনি বহু লক্ষ ডেমোক্রাটেরও ভোট পাইয়াছিলেন। মার্কিন জাত বাঙালীর মত পার্টির নামে বুদ্ধি বিবেচনা বিসর্জ্জন দেয় না।

দেশাত্মবোধ ও দলগত স্বার্থ

কিছুদিন যাবৎ আচার্য্য কৃপালনী প্রজা-সোস্যালিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব ছাড়িতে চাহিতেছিলেন। সম্প্রতি তিনি উহা ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং তাঁহার স্থলে শ্রীঅশোক মেটা লোকসভায় প্রজা-সোস্যালিষ্ট দলের নায়ক হইয়াছেন। যে কারণে আচার্য্য কৃপালনী এই নেতৃত্বের আসন ছাড়িয়াছেন তাহা সকল স্বাধীনচেতা ব্যক্তিরই চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেটি আর কিছু নয়, পার্টির স্বার্থে সকল বিবেক-বিচারবুদ্ধি সর্ব্বপ্রকার ন্যায়-অন্যায়ের ভেদজ্ঞান—এক কথায় সত্যাসত্য ও ন্যায় ধর্ম্মজ্ঞান—বিসর্জ্জন দেওয়ার প্রশ্ন। আমাদের দেশে আজ যে এই অপরূপ চিত্তবিকারের উদাহরণ সকল ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়—যে চিত্তবিকারের ফলে দেশে শাসনতন্ত্রে, বিধানসভায়, লোকসভায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য স্বার্থসর্ব্বস্ব লোকের অধিকার দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়া যাইতেছে—আমাদের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সেই বিকারের কারণ আর কিছু নয়, শুধু এই ভুয়া পার্টিসকলের উপর আমাদের অন্ধবিশ্বাস। আমরা আজকাল সকল বিষয়ে, সকল কাজে ঐরূপ অন্ধবিশ্বাসে চলি এবং ইহারই ফলে সারা ভারতের এরূপ সর্ব্বাঙ্গীণ অবনতি ঘটিতেছে।

আমাদের বাংলা দেশে আবার ভাবের আবেশ কথায় কথায় হয়। কেহ-বা বামপন্থী দেখিলেই ভাবে গদগদ হইয়া সেই মহাশয় ব্যক্তির বাক্যসুধা অমৃতজ্ঞানে আকণ্ঠ পান করিতে থাকেন, কেহ বা কংগ্রেসী দেখিলেই তাহাকে সাক্ষাৎ মহাত্মা গান্ধীর দোসর জ্ঞানে তাঁহার কথায়—বুদ্ধি-বিচার বিসর্জ্জন দিয়া—উঠেন বসেন। ইহারই পরিণামে আজকার বাঙ্গালী "গতগৌরব হৃত-আসন নত মস্তক লাজে"। এই অবস্থার দায়িত্ব আমাদের নিজেদের সকলের, কেননা আমাদের ভগবৎদত্ত বুদ্ধিবিচার আমরা শঠের কথায় এবং মূর্খের মন্ত্রণায় জলাঞ্জলি দিয়া, ভাবের স্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছি এবং সেই কারণেই আমাদের মুখপাত্র বলিতেও কেহ নাই, রক্ষক বা সহায়কও কেহই নাই।

শুধু তাই নয়। যদি কোনও চিন্তাশীল ব্যক্তি আমাদের এই বন্ধুহীন, সহায়হীন, অসমর্থ ও হেয় অবস্থার প্রকৃত বিচারের চেষ্টা প্রকাশ্যে করেন তবে তৎক্ষণাৎ আমাদের আত্মসম্মান জ্ঞানকে খোঁচা দিয়া চাগাইয়া তোলা হয়।

সে খোঁচাও আসে ঐরূপ বুদ্ধিমানের মারফৎ, যিনি সত্যাসত্য, জ্ঞানবুদ্ধি বহুদিন পার্টি দেবতার সম্মুখে বলি দিয়াছেন। সেই খোঁচার প্রতিক্রিয়ায় আমরা উত্তেজিত হইয়া কাণ্ডজ্ঞান খোয়াইয়া বসি। অবশ্য যদি কোনও অবাঙালী আমাদের অপমান বা অপকারের চূড়ান্তও করে, আমরা শুধু গালিগালাজ দিয়াই ক্ষান্ত হই, কেননা শক্তিহীনের প্রতিক্রিয়া শুধু কান্না ও কুকথা—যেখানে প্রতিপক্ষ প্রবল। ল্যাটিন প্রবাদ আছে, দেবতারা যাহাদের নাশ করিতে চাহেন, তাহাদের বুদ্ধিবিচার বিকারগ্রস্ত হয় দেবতার কোপে। আমাদের বর্ত্তমান অভিশপ্ত অবস্থার কারণও সেই মত, শুধু যা আমরা নিজেরাই এই অভিশাপ আহ্বান করিয়া আনিয়াছি ঐ পার্টি ও শ্লোগানের বশে।

আচার্য্য কৃপালনী দীর্ঘদিন কংগ্রেসের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কংগ্রেসের চক্রীদের সহিত মতান্তরের ফলে তিনি সেই দল ছাড়িয়া প্রথমে নিজের দল স্থাপন করেন এবং তাহারও পরে, সোস্থালিষ্ট দল ও কৃষকপ্রজা-দল যুক্ত হইয়া প্রজা-সোস্থালিষ্ট দল গঠিত হইলে তিনি তাহার নেতৃত্বপদ গ্রহণ করিয়া দীর্ঘদিন চালাইয়াছেন। সুতরাং ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে ইঁহার অভিজ্ঞতা প্রশস্ত ও দীর্ঘকালের। সেই কারণে বিগত ৮ই নবেম্বর নয়াদিল্লীতে, দিওয়ান চাঁদ ইণ্ডিয়ান ইনফরমেশন সেণ্টারে এক বক্তৃতায় তিনি "ভাষা সমস্যা ও ভারতীয়ের একতা" সম্পর্কে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য।

তাঁহার বক্তব্যের মূল কথা এই যে, ভোটের দায়ে ভারতের প্রায় প্রত্যেকটি দলের সকল ঐতিহ্য সকল মূলনীতি বিকাইয়া গিয়াছে। এবং এই কারণে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে, ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনে বা রাজ্য চালনায়, ভাষার প্রতিষ্ঠায় যে অন্ধগোঁড়ামি ও বর্ব্বরতা প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার প্রতিকারে অসমর্থ ও অশক্ত মনোভাব দেখাইয়াছেন। আচার্য্য কৃপালনী বলেন যে, এই ভাষাভিত্তিক আন্দোলনের পিছনে সাধারণজনের কোনই সমর্থন নাই। তিনি বলেন যে, দেশের প্রায় শতকরা ৮০ জনের কোনও শিক্ষারই বালাই নাই সুতরাং এই আন্দোলনের মূলে অল্পসংখ্যক রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ ও শিক্ষিত ভাগ্যান্বেষীর ক্রিয়াকলাপ আছে, যাহারা নিজ স্বার্থে বা দলগত স্বার্থে—অর্থাৎ নিজের বা আত্মীয়ের উচ্চ রাজপদ লাভের লোভে কিংবা রাজ্যে নিজদলের প্রাধান্যের চেষ্টায়—এই ভাষার ধোঁয়াজাল উড়াইয়া নিজ কার্য্যসিদ্ধির ছিদ্র অন্বেষণ করিতেছেন। তিনি বলেন, আসামে, পঞ্জাবে ও অন্য প্রান্তে "আমাদেরই মত মুষ্টিমেয় অল্প কিছু লোকে, নিজের দলের বা সমাজ-স্তরের লোকের স্বার্থের খাতিরে জাতীয় স্বার্থকে সরাইয়া দিয়া এই ভাষা-আন্দোলন চালাইতেছি। এই প্রকার আন্দোলনের বাস্তব বা সংবিধানগত কোনও ভিত্তি নাই।"

তিনি শুধু কংগ্রেসকে দোষ দিয়া ক্ষান্ত হন নাই। তিনি বলেন, প্রজা সোস্যালিষ্ট পার্টি ও ভারতীয় কম্যুনিষ্ট দল, এই দুইটিও আসাম, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে এই চক্রান্তে আত্মনিয়োগ করে।

তিনি বলেন, এমনকি পণ্ডিত নেহেরুও এইরূপ চাপে মাথা নোয়াইয়াছেন। তিনি জোর গলায় বলিয়াছিলেন যে, যদি আসামে মাৎস্যন্যায় চলে তবে সেখানে "পিটুনি ট্যাক্স" বসানো হইবে। আসামীরা বলে যে, ঐ ট্যাক্স বসাইলে কংগ্রেস মরিবে। পণ্ডিত নেহেরুকে নিজের কথাই তখন গিলিতে হয়।

আমাদের দাবী

রাস্তা দিয়া কোথাও যাইতে হইলে প্রায়ই দেখা যায় অল্পসংখ্যক লোকে যতদূর সম্ভব ছড়াইয়া ও বিস্তৃতভাবে দলবদ্ধ হইয়া পতাকা প্রভৃতি হস্তে শোভাযাত্রা গঠন করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহাদের উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত ধ্বনিতে জনপথ মুখর হইয়া উঠে এবং তাঁহাদের অসংযত গতিভঙ্গীতে অযথা অপর পথিক ও যানবাহনের সহজ-গমন অসম্ভব হইয়া উঠে। "আমাদের দাবী মানতে হবে। কিম্বা কোন একটা কিছু "চলবে না, চলবে না।" জনমত বা কোনও কাহারও মত প্রকাশের এই যে প্রকট-ভঙ্গী ইহার মূলে আছে রাষ্ট্রীয় দলগুলি। তাঁহাদের প্রত্যেকের একটি করিয়া "লেবার ফ্রণ্ট" অথবা শ্রমজীবী অঙ্গ আছে। এই অঙ্গের কার্য্য শ্রমজীবী মহলে বিক্ষোভ সৃষ্টি করিয়া এবং তাহাদিগকে মালিকদিগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে শিক্ষা দিয়া ও সাহায্য করিয়া নিজেদের প্রভাব ও দল বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা করা।

আমাদের দেশে যতপ্রকার অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার ইত্যাদি সচরাচর লক্ষ্য করা যায়, তাহার মধ্যে শ্রমজীবী অথবা চাকুরীজীবীদের বেতন, বোনাস, নিয়োগ, ছাঁটাই সম্পর্কে যে সকল অভিযোগ সেইগুলির বিজ্ঞাপন ও প্রচারই খুব সতেজে চালানি হইয়া থাকে। ইহার মূলে আছে রাষ্ট্রীয় দল বা পার্টিগুলির কর্ম্মপদ্ধতি এবং "পলিসি"। ইহার কারণ রাষ্ট্রীয় দলগুলির নিজেদের দোষ ঢাকিয়া জনসাধারণের দৃষ্টি অপরের উপর পাতিত করাইবার চেষ্টা। শ্রমজীবী ও চাকুরীজীবীদের অভিযোগ যথেষ্টই আছে এবং তাঁহাদিগের প্রতি বহু অন্যায়ই করা হয়। কিন্তু ভারতের সর্ব্বজনের যত অভিযোগ আছে তাহার মধ্যে বেতন বা বোনাস সংক্রান্ত অভিযোগগুলিই

সর্ব্বপ্রধান, এই ধারণা পোষণ করিবার কোন যথার্থ কারণ নাই। আমরা সর্ব্বসাধারণে মিলিত হইয়া অনায়াসেই পূর্ণ সত্যকে আশ্রয় করিয়া চীৎকার করিতে পারি "চুরি-ডাকাতি বন্ধ কর, অন্যায় রাজকর বন্ধ কর, মূল্যবৃদ্ধি বন্ধ কর, রাজস্ব অপব্যয় বন্ধ কর, বেকার সমস্যা দূর কর, গৃহের অভাব দূর কর"—অথবা "খাবাবে ভেজাল, দুধে জল, চাউলে কঙ্কর চলবে না চলবে না"···কিম্বা "মাছের সের এক টাকা আট আনা, দুধের সের চার আনা, চিনির সের আট আনা করতে হবে, করতে হবে।" রাষ্ট্রীয় দলের পক্ষে এই সকল কথা বলা চলিবে না, কারণ বলিলে "পার্টি" ভাঙিয়া যাইবে।

"আসামে বাঙালীর প্রতি অন্যায় অত্যাচার, চীনের ভারত-প্রবেশ ও জোর করিয়া ভূমি দখল, পাকিস্থানের কাশ্মীর-দখল অথবা কম্যুনিষ্ট পার্টির কিম্বা কংগ্রেসের বিদেশীর পদলেহন, চলবে না, চলবে না!" বলিলে পার্টিবাজিও "চলবে না"। সুতরাং ঐ সকল অপ্রিয় সত্যের অবতারণা সম্ভব হইবে না। মোসাহেব অথবা চাটুকারদিগের সহায়তা, লাইসেন্স, পারমিট, কন্‌ট্রাক্ট, চাকুরী প্রভৃতি লোক বুঝিয়া বণ্টন—আরও কত অন্যায়, মিথ্যা ও অবিচার রাষ্ট্রীয় দলগুলি জীয়াইয়া রাখিয়াছেন তাহার পূর্ণ বিবরণ দেওয়া সম্ভব হইবে না। বড় বড় মিথ্যা "সত্যমেব জয়তে" বলিয়া সংরক্ষণ করা হইতেছে। "পৃথিবীর সকল কর্ম্মী একত্র হও" বলিয়া অগণ্য নিষ্কর্ম্মার আত্মপ্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা···এই জাতীয় সকল অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার দূর করা হউক, এই আমাদের দাবী।

অ

মুক্তি

আমরা যে সময় পরাধীন ছিলাম; অর্থাৎ ব্রিটিশ জাতি যে সময় আমাদের শিক্ষা, কর্ম্ম, জীবিকা, রাজনীতি প্রভৃতি আমাদের অভিভাবক অথবা প্রভু হিসাবে নিজেদের আয়ত্তে রাখিয়া আমাদের দেশ ও জাতিকে পরিচালিত রাখিয়া নিজেদের সুবিধার আয়োজন করিয়া লইতেন; সেই সময় মুক্তি কথাটা প্রায়ই ব্যবহৃত হইত। "মুক্তি কোন পথে?" প্রভৃতি পুস্তক সেই সময়ে ব্রিটিশ শাসকদিগের আদেশে বাজেয়াপ্ত হইত, এবং মুক্তির কথা বলা নিষেধ ছিল। মুক্তি কথাটার ইংরেজী Liberation. এই কথাটি অধুনা কম্যুনিষ্টগণ প্রায়ই ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহারা যখনই অপর দেশ বা জাতির স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করেন ও তাহাদিগকে কম্যুনিষ্ট নীতি অবলম্বন করিতে বাধ্য করেন, তখনই সেই দেশ বা জাতিকে তাঁহারা Liberate করিলেন বা মুক্তি লাভ করাইলেন বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন। এইরূপে তাঁহাদের সাহায্যে অনেক দেশ মুক্তিলাভ করিয়াছে বলিয়া কম্যুনিষ্ট-মহলে প্রচার। হাঙ্গেরীর, তিব্বতের ও অপরাপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির "মুক্তি" লাভ করিয়ত এত অধিক রক্তপাত হইয়াছিল যে, বহু লোকে মুক্তি বা Liberation-এর কম্যুনিষ্ট অর্থ পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। নিজ জাতির লোকেদের রক্তপাত করিয়া সংখ্যালঘু দল যদি কোন দেশে রাজশক্তি নিজেদের আয়ত্তে আনিতে পারেন, সেই প্রকারে শক্তি আহরণ ততটা অন্যায় নহে, যতটা অন্যায় বাহিরের অপর জাতীয়দিগের সামরিক সহায়তা লইয়া নিজ জাতির সকল লোকের উপর ক্ষুদ্র দলগত প্রভুত্ব স্থাপন। কারণ প্রথমটা হইল শুধু গায়ের জোরে স্বজাতীয় অধিকাংশ লোকের উপর রাজত্ব করা, কিন্তু তাহাতে বাহিরের লোকের সাহায্য লইয়া বাহিরের লোকের হস্তে সাক্ষাৎ অথবা পরোক্ষভাবে রাজশক্তি তুলিয়া দেওয়া হয় না। শুধু নিজ জাতির অধিকাংশ লোককে দাসত্বে আবদ্ধ করা হয়। যে ক্ষেত্রে বাহিরের শক্তিমান রাষ্ট্রের সামরিক সাহায্য লইয়া এই কার্য্য সাধন করা হয়, সে ক্ষেত্রে নিজ জাতির বিরুদ্ধে অপরাধ বাড়িয়া উঠে; কারণ ইহার ফল নিশ্চয়ই পর-দাসত্ব হইয়া দাঁড়ায়। রাশিয়া বলিতে পারেন যে, হাঙ্গেরীর কম্যুনিষ্টদিগকে তাঁহারা মুক্তিদান করিয়াছেন, অথবা চীন বলিতে পারেন যে, তিব্বতীদিগকে তাঁহারা মুক্তিদান করিয়াছেন; কিন্তু এই জাতীয় কথা যে মিথ্যা তাহা বুঝিতে অধিক বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। দুই ক্ষেত্রেই রাশিয়া চীনদেশীয় শক্তির নিকট হাঙ্গেরী ও তিব্বতের জনসাধারণ দাসত্বে আবদ্ধ হইয়াছেন এবং কূটতর্ক করিয়া উল্টা প্রমাণের চেষ্টা করিলেও কম্যুনিষ্টদিগের সে চেষ্টার বুদ্ধিমান লোকের কাছে কোন মূল্য নাই। অ

আসাম কংগ্রেস তথা মন্ত্রিসভা

অবশেষে পন্থ-ফরমূলাকে কাটিয়া, এক কথায় কেন্দ্রীয় নির্দ্দেশ অমান্য করিয়া আসম-প্রদেশ-কংগ্রেস-কমিটি অসমীয়াকে রাজ্যের একমাত্র সরকারী ভাষা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এই ঘোষণা আসাম মন্ত্রিসভাকেও মানিয়া লইতে হইয়াছে। পন্থ-ফরমূলা অবশ্য আসামের বাংলাভাষী এবং পার্ব্বত্য উপজাতীয় বাসিন্দারাও ন্যায্য এবং গ্রহণযোগ্য মনে করে নাই। চালিহাও ইহা সমর্থন-যোগ্য নয় বলিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, বিলটির মূল বিষয়বস্তু ও কাঠামো সম্পর্কে পুনরালোচনার কোন প্রশ্নই উঠে না। বিলটি পড়িলেই দেখা যাইবে যে, উহাতে অসমীয়া ভাষা কাহারও উপর চাপাইয়া দিবার

কোন চেষ্টাই করা হয় নাই। কিন্তু কথা হইল আসাম-প্রদেশ-কংগ্রেস-কমিটি পন্থজীর ফরমূলা বাতিল করিয়া একমাত্র অসমীয়াকে রাজ্যের সরকারী ভাষা গণ্য করিবার সিদ্ধান্ত লইবার পর কংগ্রেস সংগঠনে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সার্থকতা রহিল কতটুকু? আসাম রাজ্যভাষা সম্পর্কে অসমীয়া কংগ্রেসীদের দাবি মানিয়া লইতে অগ্রসর হইয়া কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতারা যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতেছেন তাহা কেবল নীতির দিক দিয়া অন্যায় ও ক্ষতিকর নয়, দেশের সর্ব্বপ্রধান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং ক্ষমতাধিকারী দল হিসাবে ইহা কংগ্রেসের আভ্যন্তর দুর্ব্বলতা ও আদর্শ ভ্রষ্টতার পরিচায়ক। দেশ স্বাধীন হইবার পূর্ব্বকালে কংগ্রেসের নীতি এবং বিস্তারিত কার্য্যক্রম স্থির করা ব্যাপারে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বই ছিল সর্ব্বশক্তিমান। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দ্দেশ সরাসরি অমান্য অথবা উপেক্ষা করার সাধ্য কোনও প্রদেশ-কংগ্রস-কমিটির ছিল না। তবে আজ কেন হয়? কারণের কথা না তুলিয়া শুধু এইটুকুই বলিব, ইহার পরিণাম ভাল হইবে না। কারণ, অসমীয়া একমাত্র রাজ্যভাষা হইলে পার্ব্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরা স্বতন্ত্র অঙ্গরাজ্যের দাবি লইয়া প্রবল আন্দোলন করিবেই। আবার অপরদিকে আসামের বাংলাভাষী অঞ্চলগুলিও নিশ্চয়ই একচ্ছত্র অসমীয়া আধিপত্য হইতে মুক্ত হইতে চাহিবে। অতঃ কিম্?

আমরা সরাসরি কয়েকটি প্রশ্ন করিতে চাই, যেমন—রাজ্য হিসাবে আসাম কি ভারতরাষ্ট্রের অন্তর্গত এবং ভারতীয় সংবিধান কি আসাম মানিতে বাধ্য? পার্টি হিসাবে আসামের কংগ্রেস কি সর্ব্বভারতীয় কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত এবং নিখিল ভারতীয় পার্টি-শাসন অনুসরণ করিতে সে কি বাধ্য? একটি বহুভাষিক রাজ্য কি সর্ব্বপ্রকার ন্যায় বিধান উপেক্ষা করিয়া একটি মাত্র রাজ্যভাষা বাকী সকলের উপর চাপাইয়া দিতে এবং মাইনরিটিদের অধিকার হরণ করিতে পারে?

এই প্রশ্নগুলির উত্তর পাওয়া আবশ্যক। কারণ এগুলির উপর ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীক ও সাংস্কৃতিক ঐক্য নির্ভর করিতেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য হইয়াছে বলিয়া প্রধানমন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু প্রতীকারের জন্য কোনরূপ কঠোরতা অবলম্বন করেন নাই। অথচ সূক্ষ্মভাবে ও গভীরভাবে বিচার করিলে বলিতে হয়, আসামের ইহা এক ধরনের বিদ্রোহ এবং এই বিদ্রোহের দণ্ড লাভ করিয়াছে প্রায় লক্ষাধিক নিরীহ বাঙালী। কোন স্বাধীন বৈদেশিক রাষ্ট্র ছাড়া মাইনরিটিকে আইনসঙ্গত নাগরিককে এভাবে কেহ ভিটেমাটি ছাড়া করে না। স্বদেশী গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক উদ্বাস্তু সৃষ্টি ইহা ইতিহাসে অভিনব এবং এই অভিনব কার্য্যই করিয়াছে আসাম। এখানে প্রশ্ন এই, আসাম যদি সর্ব্বভারতীয় কংগ্রেসের পার্টি-ডিসিপ্লিনের অন্তর্গত হইয়া থাকে, তবে আসাম-কংগ্রেস কি ভাবে কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের কর্তৃত্ব অস্বীকার করিতে পারেন? কার্য্যতঃ আসামের কংগ্রেস ও মন্ত্রীসভা সর্ব্বভারতীয় শাসন, শৃঙ্খলা, নীতি এবং সংগঠনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে।

যদি কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট এবং কেন্দ্রীয় কংগ্রেস গোড়া হইতে সতর্ক, দৃঢ় ও কঠোর হইতেন তবে আসামে এই উচ্ছৃঙ্খলতা এবং ন্যায় ও নীতি-বিরোধী মনোভাব দেখা দিত না। ইহা তাঁহাদেরই সৃষ্টি। তাঁহারা আসাম সম্পর্কে কোনদিনই কঠোর হইতে পারেন নাই। এই কঠোরতার দাবীই পশ্চিমবঙ্গ হইতে বার বার উত্থাপন করা হইয়াছিল এবং কেন্দ্রীয় কর্ত্তাদের দুর্ব্বলতার তীব্র প্রতিবাদ করা হইয়াছিল।

তবে আশার কথা, আবার আলোচনা সুরু হইয়াছে, নূতন করিয়া বৈঠকও বসিতেছে। এমনি এক বৈঠকে ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই বলিয়াই সকলকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন, কোন রাজ্য কর্ত্তৃক জনগণের উপর কোন ভাষা চাপাইয়া দেওয়া চলিবে না। রাষ্ট্রপতির এই ভাষণে তবু কিছু আলোর আভাস দেখা যাইতেছে।

গ

আসামের লোক-গণনা

আসামের লোক-গণনা কার্য্য সুরু হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার আছে। আদমসুমারী বা লোক-গণনার কার্য্য যদিও মূলতঃ কেন্দ্রীয় সেন্সাস কমিশনারের অধীন, তথাপি গণনাকার্য্যে যে বিরাট লোকবল প্রয়োজন হয় এবং সাময়িক চাকরিতে যে, 'এন্যুমারেটর' বা গণনাকারীরা যোগ দেন, তাঁহারা প্রধানতঃ রাজ্য সরকারের দ্বারাই সংগৃহীত বা নিয়মিত হন। তা ছাড়া, আদমসুমারীর প্রশ্নাবলী প্রণয়নের ব্যাপারেও রাজ্যসরকারের সূক্ষ্ম হস্তক্ষেপের অবকাশ আছে। তাঁহারা ইতিপূর্ব্বে দুই-একটি প্রশ্ন সংযোজনের অধিকারী ছিলেন এবং প্রশ্নগুলিকে সরকারী নোটিশের দ্বারা 'ব্যাখ্যা' করার নজীরও কোন কোন ক্ষেত্রে স্থাপন করা হইয়াছে। কিন্তু রাজ্য-সরকারের এই 'সূক্ষ্ম হস্তক্ষেপই' আসামে আনুমানিক ১০ লক্ষ বঙ্গভাষীকে বেমালুম লোপাট করিয়া দিয়াছে। ভারতবর্ষে মুসলিম লীগের আমলে লোক-গণনা-কারসাজি অবিদিত নয়, কিন্তু আসামে কংগ্রেসী গবর্ণমেন্টের আমলেই ১৯৫১ সনে যে কাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে

মুসলীম লীগের রেকর্ডও ম্লান হইয়া গিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, দাঙ্গা, নরহত্যা বা নির্য্যাতনের দ্বারা 'বঙ্গাল খেদা'র যেটুকু পরিকল্পনা সিদ্ধ হইয়াছে, লোক-গণনার কর্ম্মচারীরা এবং গবর্ণমেণ্ট ও রাজনৈতিক দল নীরবে ১৯৫১ সনের আদমসুমারীতেই তাহা অপেক্ষা বৃহৎ 'বঙ্গাল বিলোপ' ঘটাইয়া দিয়াছেন।

ঐ সনের রিপোর্টটি 'অভূতপূর্ব্ব', কারণ সরকারী দলিলে মিথ্যাচার ও কারসাজির নিদর্শন হিসাবে ইহার কোন জুড়ি পাওয়া যাইবে না। বঙ্গভাষীদের অসমীয়া ভাষী বলিয়া তালিকায় লিপিবদ্ধ করার জন্য আসাম সরকার একটি প্রশ্ন যোগ করিয়াছিলেন, যাহাতে জিজ্ঞাসা করা হইতেছে—আপনি কি আসামের খাঁটি অধিবাসী? তাহার প্রমাণ কি? আপনি কি অসমীয়া ভাষায় কথা বলেন? যদি কোন বঙ্গভাষী লেখেন যে, তিনি অসমীয়া ভাষায় কথা বলেন না তাহা হইলে তাঁহাকে আসামের 'খাঁটি অধিবাসী' বলিয়া গণ্য করা হইবে না। ইহার ফলে লক্ষ লক্ষ বঙ্গভাষীই নিজেকে খাঁটি অসমীয়া বলিয়া প্রমাণ করার জন্য অসমীয়া ভাষী হিসাবে লোক-গণনার খাতায় নাম তুলিতেও বাধ্য হইয়াছেন। এ ছাড়াও ভীতিপ্রদর্শন এবং তথ্যবিকৃতির সাহায্য বহুক্ষেত্রে লওয়া হইয়াছে। ফলে আসামের লোক-গণনায় বাঙালী-বিলোপের কার্য্য এমন বিরাট আকারে সাধিত হইয়াছে এবং শেষ পর্য্যন্ত এমন একটি দলিল প্রস্তুত হইয়াছে যাহা দেখিয়া স্বয়ং সেন্সাস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টই তাজ্জব বনিয়া গিয়াছেন।

কার্য্যতঃ এই রিপোর্টের উপরে আসামকে একমাত্র অসমীয়াদেরই রাজ্য এবং তাঁহাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বলিয়া দেখান হইতেছে। ইহারই ভিত্তিতে তাঁহারা ভাষার প্রশ্ন, রাজনৈতিক অধিকারের প্রশ্ন—এমন কি মাতৃভূমির দাবীও প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছেন এবং বঙ্গভাষীদের 'বহিরাগত' বলিয়া বর্ণনা করা হইতেছে। কাজেই আসামের দাঙ্গার পর দীর্ঘমেয়াদী সমাধান সম্বন্ধে যাঁহারা মাথা ঘামাইতেছেন এবং বঙ্গভাষীদের পুনর্ব্বাসন বা নিরাপত্তা দিবার প্রশ্ন যাঁহারা চিন্তা করিতেছেন সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের এই লোক-গণনার প্রশ্নটিকে গুরুত্ব দিতে হইবে। যাহাতে ঐ সব এন্যুমারেটার বা গণনাকারী আর দ্বিতীয় সর্ব্বনাশ না করিতে পারে এবং সময় থাকিতে ইহার প্রতিরোধ করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের নেতৃবৃন্দকেই আগাইয়া আসিতে হইবে।

আয়ুবশাহী দাপট

সংবাদপত্রে দেখিতেছি, পাকিস্থানে প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁ ভারতের উদ্দেশে আর এক দফা হুঙ্কার ছাড়িয়াছেন। এবারের উপলক্ষ্য কাশ্মীর। এই রাষ্ট্রনায়কের মতে কাশ্মীর একটি সাংঘাতিক 'টাইম্‌-বম্‌ব'। দীর্ঘ বারো বৎসর ধরিয়া তাহা অটুট আছে বলিয়া যে সে কখনও ফাটিবে না, এ ধারণা ভুল। তিনি তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন, যদি ভারতবর্ষ ও পাকিস্থান সর্ব্বাত্মক ধ্বংসের হাত হইতে বাঁচিতে চায়, তাহা হইলে কাশ্মীর-রূপ বিলম্বিত বোমাটির অস্তিত্ব লোপ করিতে হইবে। অবশ্য আয়ুব খাঁ বিচলিত হইয়াছেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নির্লিপ্ত মনোভাব দেখিয়া। আয়ুব চাহিতেছেন, ছলে বলে কৌশলে কার্য্যোদ্ধার করিতে। তবে তিনি যে জালই পাতুন, ভারতবর্ষ আবার আপনার সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিবে এমন সম্ভাবনা নাই। খালের জল বাহিয়া কুমীরকে ঘরে আসিতে ভারতবর্ষ কিছুতেই দিবে না।

এখন প্রশ্ন এই, পাকিস্থানের আসল রূপটি কি? শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যা সমাধান, না ভারতের বিরুদ্ধে হিংসা বিদ্বেষ জীয়াইয়া রাখিয়া ক্রমাগত যুদ্ধের হুমকি দেওয়া? ইহা বলিবার প্রধান কারণ এই যে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যা সমাধানের জন্য পাকিস্থান যতবার যে বিষয়ে অগ্রসর হইয়াছেন, ভারতবাসীর আপত্তি ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও আমাদের প্রধানমন্ত্রী পাকিস্থানকে বরাবরই তোষণ করিয়া আসিতেছেন। পাকিস্থান যেখানে যতটা আপত্তি বা বাধা সৃষ্টি করিয়াছে, সেই খানেই সমস্যা বা বিরোধ অমীমাংসিত রহিয়াছে। খালের জলের মীমাংসা-চুক্তি স্বাক্ষরের পরে আবার কাশ্মীর লইয়া রণ-হুঙ্কার কি সদিচ্ছা বা শান্তির পরিচায়ক? খাল-চুক্তির অব্যবহিত পরেই তিনি এক ফতোয়া জারি করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন, ভারত ও পাকিস্থান—এই দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে অবাধ যাতায়াতের যে অধিকার ছিল তাহা সঙ্কুচিত করিয়া তাহাদের বৎসরে মাত্র একবার পাকিস্থানে যাইতে দেওয়া হইবে।

যে সকল হিন্দু-পরিবার বহু বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও আজও পাকিস্থানে বাস করিতেছে, তাহারা ঐ 'বি' ও 'সি' ভিসার জোরেই থাকিতে পারিয়াছে। আজ যদি সেই ভিসা তাহাদের কাড়িয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে চির-দিনের জন্য পাকিস্থান ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে চলিয়া আসিতে হইবে।

হয়ত পাকিস্থান তাহাই চাহে। পশ্চিম-পাকিস্থান

হইতে হিন্দু-সম্প্রদায় বিদায় লইয়াছে বহুদিন পূর্ব্বেই। তাহাতে পাকিস্থানের কোনো ক্ষতি যে হয় নাই এমন নয়, কিন্তু আজ যদি সেই ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি হয় পূর্ব্ব-পাকিস্থানে, তাহাতেই বা তাহাদের কি লাভ হইবে? কাজটা শুধু যে মানবিকতার দিক দিয়া অন্যায় তাহা নয়। আইনের দিক দিয়া বিচার করিলেও দেখা যাইবে, ইহা অত্যন্ত অসঙ্গত। দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যখন কোনো চুক্তি-সম্পাদিত হয় তখন তাহাকে একতরফা কেহ ভাঙ্গিতে পারে না। ভাঙ্গিলে, প্রচলিত আন্তর্জ্জাতিক বিধি লঙ্ঘন করা হইবে। ভিসা সম্বন্ধে দুই দেশ যে নিয়ম মানিয়া লইয়াছিল তাহা খুশিমত বদলাইয়া পাকিস্থান শুধু যে দুই প্রতিবেশীর মৈত্রীর মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে এমন নয়, আন্তর্জ্জাতিক বিধিও জলাঞ্জলি দিয়াছে।

প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের কূটকৌশলের উদ্দেশ্য বুঝিতে কষ্ট হয় না। বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না, পাকিস্থানের সহিত বুঝাপড়া ব্যাপারে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নেহরুর অদ্ভুত অবাস্তব মনোভাব। নেহরু-লিয়াকত চুক্তির সময় হইতে বার বার ঠকিয়া এবং ঠেকিয়া শ্রীনেহরু স্বেচ্ছায় পাকিস্থানী কূটনীতির ফাঁদে ভারতকে অনবরত জড়াইয়া ফেলিতেছেন। বৃহৎ শক্তিদের মধ্যে বিরোধ-নিষ্পত্তির জন্য আমাদের প্রধানমন্ত্রীর ভাবনার অন্ত দেখি না। আমেরিকা এবং রাশিয়ার কি করা উচিত অথবা উচিত নয় সে সকল বিষয়ে শ্রীনেহরুর মতামত প্রকাশে উৎসাহের সীমা নাই। অথচ ঘরের পাশে প্রতিবেশী-রাষ্ট্রের প্রবল শত্রুতাচরণ গত বারো বৎসর ধরিয়া যে ভারতবর্ষের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ এবং মর্য্যাদা নষ্ট করিতেছে, তাহার প্রতিকারের জন্য শ্রীনেহরুর বিশেষ উদ্যোগ দেখা যায় না। মনে হয় পাকিস্থানী কর্ত্তারা শ্রীনেহরুর মনোভাবকে খুব ভালো করিয়াই বুঝিয়াছেন। তাই কখনো চোখ রাঙ্গাইয়া, কখনো বা মিষ্ট কথা বলিয়া তাঁহারা কাজ গুছাইয়া লইতেছেন। আমাদের প্রধানমন্ত্রীর এক কথা—পাকিস্থানের সঙ্গে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, ভারতবর্ষের তরফ হইতে অনেক কিছু ছাড়িতে হইবেই। কিন্তু আর কত ছাড়িতে হইবে শ্রীনেহরু স্পষ্ট করিয়া বলিবেন কি? গ

রায়পুরে কংগ্রেস অধিবেশন

কংগ্রেসের রায়পুর অধিবেশন শেষ হইয়া গেল। কিন্তু অধিবেশনের প্রয়োজনীয়তা কি ছিল ঠিক বোধগম্য হইল না! যে দুর্য্যোগ ভারতের আকাশে ঘনাইয়া উঠিয়াছে, আশা করা গিয়াছিল, এই অধিবেশনে তাহার কিছু আলোচনা হইবে। আসাম হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্জাব পর্য্যন্ত এবং উড়িষ্যা হইতে কেরল পর্য্যন্ত সমস্তায় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। বহু কংগ্রেস-কর্ম্মী প্রাদেশিক এবং সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির ফলে দিশাহারা হইয়াছেন এবং বহুক্ষেত্রে কংগ্রেসের আভ্যন্তর শৃঙ্খলা শোচনীয়ভাবে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। ইহার কোন প্রতিকারের কথাই রায়পুর কংগ্রেসে উচ্চারিত হয় নাই।

এতদিন আসামে যা ঘটিয়াছে, তাহা কংগ্রেসের এবং ভারতীয় সংবিধানের আদর্শ-বিরুদ্ধ। কিন্তু এখন যাহা ঘটিতেছে তাহা আরও মারাত্মক। প্রকাশ্য ভাবেই আসাম কেন্দ্রীয়-নির্দ্দেশ লঙ্ঘন করিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। অথচ এ সম্বন্ধে কোন উদ্বেগই রায়পুর কংগ্রেসে প্রকাশ পাইল না।

রায়পুর কংগ্রেস হইতে আমরা পাইলাম, নেহরুজীর নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা আর উপদেশ। কিন্তু ইহার জন্য রায়পুরে ঘটা করিয়া অধিবেশন ডাকিবার প্রয়োজন কি ছিল? কিছু যে না ছিল এমন নয়—এই অধিবেশনে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনয়ন সম্পর্কে কিছু পরিবর্ত্তন সাধন করা হইয়াছে। এতদিন কংগ্রেস সভাপতিই ওয়ার্কিং কমিটির সকল সদস্য মনোনয়ন করিতেন। কিন্তু এখন স্থির হইয়াছে, মোট একুশজন সদস্যের মধ্যে কংগ্রেস সভাপতি তাঁহার নিজেকে ছাড়া আরও তেরোজন সদস্য মনোনয়ন করিবেন এবং সাতজন সদস্য নির্ব্বাচিত হইবেন। পুণায় এই প্রস্তাবই একদিন অগ্রাহ্য করা হইয়াছিল।

ওয়ার্কিং কমিটিতে নির্ব্বাচিত সদস্য না হয় লওয়া হইল, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক কি? এক সম্পর্ক দেখিতেছি ইলেকশন। এই ইলেকসন-রোগটাই কংগ্রেসকে জর্জ্জর করিয়া ফেলিয়াছে—যেন দেশের জন্য দল নয়, দলের জন্য দেশ। রায়পুরের অধিবেশনে এই আসন্ন-নির্ব্বাচনই একটা বড় জায়গা জুড়িয়া ছিল। নির্ব্বাচন লইয়া এত মাতামাতি ক্ষমতার জন্য। ক্ষমতার এই লোভটাকে আজও তাঁহারা ত্যাগ করিতে পারিলেন না। স্বাধীনতার একমাত্র লক্ষ্য যেন কর্ত্তৃত্ব আর ক্ষমতা। আর তাঁহারা কি করিলেন? ক্ষমতা হাতে পাইয়াও দেশবাসীর সম্মুখে কোন আদর্শই তাঁহারা রাখিয়া যাইতে পারিলেন না! তাঁহাদের নিকট হইতে দেশবাসী শুধু এই শিক্ষাই পাইল, ক্ষমতার জন্যই ক্ষমতা, কাজের জন্য নহে। গ

অনাথ শিশু সম্বন্ধে নেহরুজীর মন্তব্য

নয়া দিল্লীতে অনাথ শিশুদের উদ্দেশ্যে ভারতের প্রধান মন্ত্রী এক বক্তৃতা দিয়া ফেলিয়াছেন। বক্তৃতায়

তিনি বলিয়াছেন, শিশুদের জন্য অনাথ আশ্রম অথবা অসহায় শিশু নিকেতন ইত্যাদি নামের কোন প্রতিষ্ঠান এদেশে থাকা উচিত নয়। কারণ কোনো শিশুই তো একেবারে অনাথ নয়। অন্ততঃ ভারতমাতা যে সকল শিশুর মা একথা মনে রাখা দরকার।

বক্তৃতায় একথাগুলি শোনায় ভাল—বিশেষ করিয়া শ্রীনেহরুর মুখে। কারণ বাগ্মী বলিয়া তাঁহার একটা খ্যাতি আছে। কিন্তু বাগ্মীতার দ্বারা ত অপ্রিয় সত্যকে চাপা দেওয়া যায় না! যদিও তিনি সেই চেষ্টাই বরাবর করিয়া আসিয়াছেন! ভারতের যে হাজার হাজার অসহায় পিতৃমাতৃহীন বালক-বালিকা ভারতের বড় বড় শহরের রাস্তায় রাস্তায় ক্ষুধার অন্ন ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, মাথা গুঁজিবার স্থানের অভাবে ফুটপাতে, পার্কের খোলা জায়গায় অথবা বড় বড় অট্টালিকার পাদদেশে গড়াগড়ি দেয়, সেই ছিন্নবসন ক্ষুধার্ত্ত জীর্ণ-শীর্ণ শিশুরা কি কেবল 'ভারতমাতা'র কথা শুনিয়াই সান্ত্বনা পাইবে?

শ্রীনেহরু কি জানেন, এখনও পর্য্যন্ত পৃথিবীর বহু উন্নত দেশের মত ভারতে প্রকৃত অনাথ শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং ভরণ-পোষণের ভার লইবার ব্যবস্থা রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে করা হয় নাই? করা হইলে অবশ্য 'ভারতমাতা' প্রকৃতই তাহাদের মাতা হইতে পারিতেন।

গ

'নন্দাঘুন্টি হিমালয়' জয়ে বাংলার তরুণদল

'নন্দাঘুন্টি' অবশেষে তরুণ বাংলার দুঃসাহসের কাছে পরাজয় মানিয়াছে। ভারতীয় হিমালয়-অভিযানের ইতিহাসে যুগান্তকারী এই আনন্দ সংবাদ। এই শৃঙ্গটি ২০,৭০০ ফুট উচ্চ। শুধু শৃঙ্গ-বিজয় নয়, অভিযাত্রীদল নন্দাঘুন্টির চিরাচরিত সহজগম্য দক্ষিণাপথ ছাড়িয়া উত্তরের এক অজানাপথে পাড়ি দিয়া এক নূতন পথ-আবিষ্কারের গৌরবেও ভূষিত হইলেন। বাঙালী অভিযাত্রীদলের হিমালয় অভিযান এই প্রথম।

গত ২৫শে সেপ্টেম্বর শ্রীসুকুমার রায়ের নেতৃত্বে ছয় জন অসমসাহসী বাঙালী তরুণ লইয়া গঠিত এই অভিযাত্রীদল হাওড়া ষ্টেশন হইতে বিজয়-যাত্রার পথে রওনা হন। সঙ্গে ছিলেন থাণ্ড শেরিঙের নেতৃত্বে এক উৎসাহী শেরপাদল।

নন্দাঘুন্টি অবশ্য বিদেশীর কাছে অজেয় ছিল না। অতীতে তিনটি অভিযান হইয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে ১৯৪৭ সনে এক সুইসদল দক্ষিণপথেই ঐ পর্ব্বত-চূড়ায় আরোহণ করেন। অন্যতম অভিযাত্রী আন্দ্রে রচ। ইহা ছাড়া ১৯৪৪ সনে আর একটি নন্দাঘুন্টি অভিযান হয়। এই দল রণ্টি হিমবাহ পর্য্যন্ত উঠিয়া আর অগ্রসর হইতে না পারায় অভিযান ব্যর্থ হয়। ১৯৪৫ সনে পি. এল. উডের নেতৃত্বে আর একটি অভিযাত্রীদলও গুরুতর পরিশ্রম এবং হিংস্র আবহাওয়ার আক্রমণে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন। উঁহারা সকলেই দক্ষিণাপথে যাত্রা করেন। উত্তরপথে গমন এই প্রথম।

যাই হোক, অভিযাত্রীদলের অধ্যবসায় ও নিষ্ঠায় গিরিপথের তুষার-বাধা শেষ পর্য্যন্ত গলিয়াছে। সেই তুষার-গলা পথে অগ্রসর হইয়া যাঁহারা আজ সাফল্য অর্জ্জন করিলেন এবং অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিলেন, আমাদের গর্ব্ব তাঁহারা বাঙালী।

গ

সরকার হইতে কর্ম্মী নিয়োগের নূতন ব্যবস্থা

পশ্চিম বাংলা সরকার এবার নাকি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, নূতন লোক নিয়োগের সময় অনধিক ৩৫০ টাকা পর্য্যন্ত মাসিক বেতনের পদগুলি কেবলমাত্র বাঙালী দ্বারা পূরণ করিবেন। এবং ৩৫০ টাকা হইতে অনধিক ৬৫০ টাকা পর্য্যন্ত মাসিক বেতনের শূন্য পদগুলি পূরণের জন্য সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে আবেদনপত্র আহ্বান করা হইবে, তবে অন্য সব দিক দিয়া যোগ্যতা সমান থাকিলে বাঙালী প্রার্থীদিগের আবেদন অগ্রগণ্য বিবেচিত হইবে। আর তদপেক্ষা উচ্চতর বেতনের পদগুলি এখনকার মতো সর্ব্বভারতীয় প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে পূরণের ব্যবস্থা ভবিষ্যতেও বলবৎ থাকিবে। কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁহাদের অধীনস্থ সংস্থায় লোক নিয়োগ সম্পর্কে পূর্ব্বরীতি নাকি সম্প্রতি সংশোধন করিয়াছেন। স্থানীয় প্রার্থীদিগের আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া বহিরাগত প্রার্থীদিগকে চাকরি দেওয়ায় বহু অসন্তোষের কারণ ঘটিতেছে। ইহার প্রতিকারার্থে তাঁহারা নাকি নির্দ্দেশ দিয়াছেন—ন্যূনতর বেতনের পদে স্থানীয় প্রার্থীদিগকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। শুনা যাইতেছে, এই নির্দ্দেশ জানিবার পরেই পশ্চিম বাংলা সরকার এই রাজ্যে লোক-নিয়োগ সম্পর্কে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহারা নাকি আরও স্থির করিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে ক্রমশঃ এই নীতি প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিবেন।

এই নীতি প্রবর্ত্তন হইলে, রুজি-রোজগারের ক্ষেত্রে বাংলায় স্থানীয় অধিবাসীদিগের ন্যায্য দাবী স্বীকৃত হইবে। যে কারণেই হোক, রাষ্ট্র এই দাবী কোনদিনই পূরণ করেন নাই—যাহার ফলে বেকারের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে। আর একটি কথা এখানে বলিবার

আছে। শিল্পে এবং ব্যবসায়ে অনগ্রসরতার জন্য রাষ্ট্র এখন পর্য্যন্ত কোন দায়িত্ব পালন করিতে পারে নাই। এদিক দিয়াও বাঙালী কর্ম্ম-প্রার্থীদের প্রতি অবিচার করা হইতেছে। অতীতে এই রাজ্যের প্রধান প্রধান শিল্পে শ্রমিক মনোনয়নের ক্ষমতা কার্য্যতঃ 'সর্দ্দার' শ্রেণীর উপর ন্যস্ত ছিল। তাহারা সকলেই বহিরাগত। তাহারা নিজ নিজ অঞ্চল হইতে লোক আমদানি করিয়াই শূন্য-পদগুলি পূরণ করিত। ফলে চট, চা, কাপড়কল প্রভৃতি বড় বড় শিল্পে অধিকাংশ শ্রমিকই অবাঙালী। জাহাজ-ঘাটায়, রেলপথে, অন্যান্য যানবাহন চালাইবার কাজেও বাঙালীর সংখ্যা অতি নগণ্য। এসব ক্ষেত্রে শূন্যপদ পূরণের সময় আজও স্থানীয় প্রার্থীদের প্রতি বৈষম্য এবং বহিরাগতদিগের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শিত হইতেছে। আপিসে ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া-জানা কর্মচারী নিয়োগের সময়ও বাঙালী প্রার্থীর পরিবর্ত্তে বহিরাগত প্রার্থীরা কাজ পাইতেছে। ফলে এই রাজ্যে শিক্ষিত বেকারের সমস্যাও অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অনেক বেশী ভয়াবহ। এখানে উল্লেখযোগ্য, শিক্ষিত, অশিক্ষিত মিলাইয়া প্রায় ২০ লক্ষ বাঙালী বেকার অবস্থাগ্রস্ত।

এরূপ অবস্থা কেবল যে শান্তি ও প্রগতির পরিপন্থী তাহা নহে, শিল্প ব্যবসা প্রসারের প্রতিবন্ধকও বটে। সুতরাং জাতীয় উন্নয়নের তাগিদেই ইহার অবসান অত্যাবশ্যক। গ

ঝড়ে পূর্ব্ব-পাকিস্থান বিধ্বস্ত

পূর্ব্ব-পাকিস্থানের উপকূলবর্ত্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের নিকট গত ৩১শে অক্টোবরের সন্ধ্যা যে ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন বহন করিয়া আনে, তাহার কথা কেহ কোনদিনই বিস্মৃত হইতে পারিবে না। তিন সপ্তাহের মধ্যে প্রকৃতির এই দ্বিতীয় ক্রুদ্ধ আক্রমণে উপকূল অঞ্চল আজ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত।

প্রথম আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, সন্দীপ, ভোলা ও বরিশাল। দ্বিতীয় আক্রমণেও এই অঞ্চলগুলিই সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়াছে। এরূপ সাঙ্ঘাতিক ঝড় পূর্ব্ববঙ্গের ইতিহাসে আর দেখা যায় নাই। এই প্রচণ্ড ঝড়ের বেগে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রতরঙ্গ উত্তাল হইয়া উপকূলবর্ত্তী অঞ্চলগুলি ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। এখন পর্য্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির ও হতাহতের বিবরণ যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা অতীব ভয়াবহ।

মোট কথা দুইবারের আঘাতে পূর্ব্ব-পাকিস্থানে একটি খণ্ড প্রলয় হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের দরিদ্র মানুষেরাই যে বেশী মার খাইয়াছে ইহা বলাই বাহুল্য। যদিও বাংলা দেশ খণ্ডিত এবং পূর্ব্ববঙ্গের নাম বদলাইয়া পূর্ব্ব-পাকিস্থান করা হইয়াছে, তথাপি সেই দেশের সঙ্গে আজও আমাদের নাড়ীর টান ও মাটির টান রহিয়াছে। তাহাদের এই অবর্ণনীয় দুর্গতিতে আমরা গভীর বেদনা বোধ করিতেছি এবং আশা করিতেছি যে, দ্রুত আর্ত্তত্রাণ কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

গ

চারিজন শিক্ষকের তিনজন নাই

বড়বৈনান ইউনিয়ানের ধামনারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা বর্ত্তমানে ১৪০ জন। ইহাতে ৪ জন শিক্ষক ছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় গত এক বৎসর হইতে ৩ জন শিক্ষক অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন। এখন মাত্র ১টি শিক্ষক বিদ্যালয় চালাইতেছেন। স্কুল বোর্ডকে বহু জানাইয়াও কোন ফল হয় নাই।

'দামোদর' পত্রিকার এই সংবাদে আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। চালাইতে না পারিলে বন্ধ করিয়াই দেওয়া উচিত। স্কুলের ঠাট বজায় রাখিবার প্রয়োজন কি?

গ

বাড়া ভাতে ছাই

'ভারতী' পত্রিকা লিখিতেছেন:

এ বৎসর বাঘা-ঘোড়শালার পশ্চিমের বিলের প্রায় দেড় হাজার বিঘা জমির বোরো ধান মিরেরগ্রাম ও পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের গোয়ালারা অন্যায়ভাবে জবরদস্তি চড়াইয়া দেওয়ার ফলে এতদঞ্চলের চাষীর প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। ইহা ছাড়া উক্ত বিলের চৈতালি ফসলও তাহারা গো-মহিষ দ্বারা চড়াইয়া দেয়। স্থানীয় কৃষক ও জমির মালিকেরা বড় অসহায় ও বিপন্ন বোধ করিতেছে।

গোয়ালাদের এইরূপ কার্য্যকলাপ ইহাই নূতন নহে। প্রতি বৎসরই তাহারা দেশবাসীর উপর জোরজুলুম ও উপদ্রব করিয়া আসিতেছে, ফলে হাজার হাজার বিঘা জমির ফসল অভুক্ত মানুষের পরিবর্ত্তে গো-মহিষের পেটে চলিয়া যাইতেছে ও তাহাদের এইরূপ অত্যাচার দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে।

সরকারের তরফ হইতে এই অত্যাচারের প্রতিকার করার জন্য কোন প্রচেষ্টা হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না।

'বাড়া ভাতে ছাই' দিবার কথাই আমরা জানি। জমির ফসল এই ভাবে যাহারা নষ্ট করে তাহারা পশুর সামিল। স্থানীয় পুলিসের কর্ত্তব্য, কঠোর হস্তে ইহাদের দমন করা।

গ

সুব্রত মুখার্জ্জী

বিদেশে এক অভাবনীয় পরিস্থিতিতে ভারতীয় বিমান বাহিনীর সর্ব্বাধ্যক্ষ এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখার্জ্জী গত ৮ই নবেম্বর পরলোকগমন করিয়াছেন। শুনা যাইতেছে, আহারকালে একখণ্ড মাংস শ্বাসনালীতে প্রবেশ করায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৪৯ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার অশীতিপর বৃদ্ধ পিতামাতা এখনও বর্ত্তমান। মাত্র কয়েক মাস আগে এয়ার মার্শাল মুখার্জ্জির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাংলার অন্যতম কৃতীসন্তান পি. সি. মুখার্জ্জি মারা যান।

সুব্রত মুখার্জ্জি ১৯১১ সনের ৫ই মার্চ কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৯ সনে তিনি চিকিৎসা-বিদ্যা অধ্যয়ন করিবার জন্য ইংলণ্ডে গমন করেন। কিন্তু সুযোগ পাইয়া তিনি বিমান-বাহিনীতে ভর্ত্তি হ'ন। ১৯৩২ সনে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া, বিমানবাহিনীতে পাইলট হিসাবে যোগ দেন। প্রায় এক বৎসর তিনি ইংলণ্ডে রাজকীয় বিমানবহরে কাজ করেন। ১৯৩৩ সনের ১লা এপ্রিল ভারতীয় বিমানবাহিনী গঠিত হয়। মুখার্জ্জি ঐদিন হইতেই ইহার সহিত যুক্ত হন।

তার পর এয়ার মার্শাল বিভিন্ন পদে কার্য্য করেন। ভারত স্বাধীনতা লাভের পরে বিমানবাহিনী একটি পৃথক অংশরূপে পরিগণিত হয়। সেই সময় তিনি বিমান-বাহিনীর সদর দপ্তরে ডেপুটি চীফ অফ দি এয়ার ষ্টাফ নিযুক্ত হন। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম এই পদ লাভ করেন। ১৯৪৮ সনে হায়দ্রাবাদে রাজাকর আন্দোলনের সময় ভারতীয় বিমানবহর পরিচালনা ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। ইহার কিছুদিন পরেই তিনি এয়ার ভাইস মার্শাল পদে উন্নীত হন। ১৯৫৩ সনে মুখার্জ্জি ব্রিটেনে ইম্পিরিয়াল ডিফেন্স কলেজে যোগদান করিয়া শিক্ষালাভ করেন। দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পর ১৯৫৪ সনের ১লা এপ্রিল সুব্রত মুখার্জ্জিকে ভারতীয় বিমানবাহিনীর অধিনায়ক রূপে নিযুক্ত করা হয়। ১৯৫৬ সনের জুলাই মাসে সোভিয়েট রাশিয়ার আমন্ত্রণক্রমে তিনি রুশ বিমানবাহিনীর কৌশলাদি পর্য্যবেক্ষণের জন্য মস্কো গিয়াছিলেন।

আপন কৃতিত্বের বলে তিনি যে পদে উন্নীত হইয়াছিলেন তাহা সচরাচর প্রায় কাহারও ভাগ্যে হয় না। বাঙালী মাত্রেরই ইহা গর্ব্ব করিবার কথা। তাঁহার মৃত্যুতে যে অপূরণীয় ক্ষতি হইয়া গেল তাহা আর পূরণ হইবার নহে।

গ

ডঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নির্ভীক জাতীয়তাবাদী ও খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ্ ডঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গত ৫ই নবেম্বর পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮১ বৎসর হইয়াছিল।

প্রমথনাথ ১৮৭৯ খ্রীঃ উত্তর-প্রদেশের মীর্জ্জাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার শিক্ষাস্থল পাটনা এবং কলিকাতা। তিনি ন্যাশনালিষ্ট পার্টির নেতা হিসাবে ১৯৩৫ সন হইতে ১৯৪৬ সন পর্য্যন্ত তৎকালীন কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য ছিলেন এবং অবিভক্ত বাংলার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন ১৯২৩-১৯৩০ সন পর্য্যন্ত। তিনি রামমোহন মেমোরিয়াল ও লাইব্রেরীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

ডঃ ব্যানার্জ্জি দীর্ঘকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের মিণ্টো অধ্যাপক, সেনেট ও সিণ্ডিকেটের সদস্য, পোষ্ট গ্রাজুয়েট কাউন্সিল অব আর্টসের সভাপতি ছিলেন। তাঁহার রচিত বিখ্যাত গ্রন্থাবলীর মধ্যে আছে ষ্টাডি অব ইণ্ডিয়ান ইকনমিক্‌স, পাবলিক ফিনান্স ইন ইণ্ডিয়া, হিষ্ট্রী অব ইণ্ডিয়ান ট্যাক্‌সেশন, পাবলিক্ এডমিনিষ্ট্রেশন ইন এনসিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া প্রভৃতি।

তাঁহার এই লোকান্তর প্রাপ্তির ফলে বাংলার আর এক বরেণ্য সন্তানের স্থান শূন্য হইয়া গেল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ও কৃতবিদ্য অধ্যাপকরূপে যেমন অগ্রগণ্য, দেশসেবী ও চিন্তানায়করূপে তেমনি। তিনি তাঁহার অসামান্যতার স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই।

গ

ডাঃ দেবব্রত চাটার্জ্জি গুলীতে নিহত

গত ২৪শে সেপ্টেম্বর শিবপুরের ভারতীয় বোটানিক্যাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাঃ দেবব্রত চাটার্জ্জির গুলীতে নিহত হইবার সংবাদটি যেমন মর্ম্মন্তুদ তেমনি শোচনীয়, আততায়ী হিসাবে বর্ণিত চিত্রশিল্পী রমেন সরকার নিজেও নিজেকে গুলী করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন।

ডাঃ চাটার্জ্জির ন্যায় জ্ঞানী-গুণী ও উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী প্রত্যেক দেশেরই অমূল্যসম্পদ। বহু গবেষণার দ্বারা তিনি আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার অমায়িকতা ও মধুর ব্যবহারে সকলেই আকৃষ্ট হইতেন। বিজ্ঞানের যে সাধনা আমাদের দেশে একান্ত প্রয়োজন,

বোটানিক্যাল গার্ডেনের অভ্যন্তরে তিনি সেই সাধনাতেই ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার যে শত্রু থাকিতে পারে ইহা কেহই ভাবিতে পারে নাই। বাগানের সংশ্লিষ্ট যে কর্ম্মচারীর বন্দুকের গুলীতে তিনি নিহত হইয়াছেন ডাঃ চাটার্জ্জি আপিসের মধ্যেই তাঁহার উন্নতির জন্য কি ব্যবস্থা করা যায় তাহা ভাবিবার জন্য আপিসের লোককে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। তথাপি ভারত সরকারের যে উচ্চতর পদের জন্য আততায়ী বর্ণিত ব্যক্তি আবেদন করিতে চাহিয়াছিল ডাঃ চাটার্জ্জির মতে উহাতে আবেদনের উপযুক্ত যোগ্যতা তাহার ছিল না, এইরূপ সন্দেহেই যদি তাঁহার মাথায় খুন চাপিয়া থাকে তাহাও শোচনীয়।

ছয় মাস কঠিন রোগ ভোগের পরে আততায়ী কিছু-কাল পূর্ব্বে কাজে যোগ দিয়াছিলেন। সে অবস্থাতেও এরূপ সঙ্কল্প সাংঘাতিক।

এই প্রসঙ্গে সামান্য মানুষের হিংসা-প্রবৃত্তি যে ক্রমশঃ কত হিংস্র হইয়া উঠিতেছে, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। বালিগঞ্জের রাস্তায় রাজনৈতিক নেতা পূর্ণ দাসের হত্যার কথা অনেকেই ভুলেন নাই। লেকের নিকটস্থ সরকারী ফ্ল্যাটে জনৈক কর্ম্মচারীর স্ত্রীকে বাথরুমে হত্যাকাণ্ডটিও খুব বেশী পুরাতন হয় নাই। যাদবপুর সন্নিহিত টালিগঞ্জ গল্‌ফ ক্লাবে জনৈকা বিবাহিতা নারীর মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহার কোনো কিনারা হয় নাই। বেলে-ঘাটায় হাসপাতালের লেডি ডাক্তারের হত্যা, ডালহৌসী স্কোয়ারের সন্নিহিত মিসন রো-তে ষ্টেট ট্রান্সপোর্টের বি. সি. গাঙ্গুলীর হত্যা, দমদম বাগুইআটিতে মীরা চাটার্জ্জির হত্যা, বেহালায় ইন্‌কাম ট্যাক্‌স-অফিসার মুক্তি সেনের হত্যা কোনোটিই ভুলিবার নহে। যে যাহাকে পারিবে হত্যা করিয়া প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপরাধী ধরা পড়িবে না বা তাহাদের উপযুক্ত শাস্তি হইবে না, ইহাই যদি সমাজের অবস্থা হয়, তাহা হইলে স্বভাবতঃই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় যে, আমরা আছি কোথায়? সভ্য-সমাজ কি আরণ্যক হিংস্রতার আগারে পরিণত হইল?

একদিকে সমাজের অবনতি, অপর দিকে পুলিসের নিষ্ক্রিয়তা আমাদিগকে অতিমাত্রায় চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছে। মানুষের ধর্ম্মাধর্ম্ম বা নীতি বলিয়া আজ কোন বালাই নাই। সুতরাং দোষ দিব আজ কাহার?

প

হেমচন্দ্র নস্কর

গত ১২ই নবেম্বর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বন ও মৎস্যমন্ত্রী হেমচন্দ্র নস্কর পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৭১ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

অমায়িক মিষ্টভাষী, সর্ব্বব্যাপারে নির্ব্বিরোধী এরূপ লোক আজকালকার দিনে দেখা যায় না। স্বাধীনতার পূর্ব্বে ও পরে বহু বৎসর একাধিক্রমে তিনি আইন সভার সদস্য ছিলেন। মন্ত্রিত্বের রদ-বদল হইলেও, তাঁহার মন্ত্রিত্বের কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। তাঁহার নির্ব্বাচক-মণ্ডলীও তাঁহাকে অকুণ্ঠভাবেই বিভিন্ন সময়ের নির্ব্বাচনে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া আসিয়াছেন। রাজনৈতিক দলের প্রতি তাঁহার আনুগত্য থাকিলেও, দলাদলি বা দ্বন্দ্ব-কলহের মধ্যে তাঁহাকে থাকিতে দেখা যাইত না। নিজের দল বা বিরোধী দলের সকলেই তাঁহাকে নির্ব্বিচারে ভালবাসিতেন এবং শ্রদ্ধা করিতেন। অজাত-শত্রু বলিতে যাহা বুঝায়, কার্য্যতঃ তিনি ছিলেন তাহাই।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অনুপ্রেরণায় তিনি রাজ-নীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার কথা উঠিলেই শ্রদ্ধাভরে তিনি মাথা নত করিতেন। ১৯২৪ সনে তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হন। মুসলীম লীগের আমলে তিনি কলি-কাতার মেয়র হইয়াছিলেন। তাঁহার কর্ম্মজীবন বা রাজনৈতিক জীবনে বরাবরই দেখা গিয়াছে, যে-কোন দলই ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হউক, সেই দলের পক্ষ হইতে হেমচন্দ্র নস্করের নিকট সহযোগিতার আহ্বান আসিয়াছে। মুসলীম লীগ, কৃষক প্রজা, কংগ্রেস কেহই তাঁহাকে বাদ দিয়া চলিবার কথা ভাবিতে পারেন নাই।

সমাজ-দরদী ব্যক্তি হিসাবেও তাঁহার প্রতিষ্ঠা ছিল অসাধারণ। বেলেঘাটার বহু শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনহিতকর অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। সুদীর্ঘকাল বিভিন্ন কর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া, সকলের সঙ্গে সদ্ভাব ও প্রীতি রক্ষা করিয়া হেমচন্দ্র নস্কর মহাশয় ইহলোক হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে দেশবাসী যথার্থ বন্ধু হারাইল।

প

আমাদের শিক্ষা কোন্ পথে ?

শ্রীগৌতম সেন

রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় ছিল এমন একটি বিদ্যালয়—যার কাঠামোটা হবে, ভারতের আত্মিক-চেতনায় সম্পূর্ণ। সে বিদ্যালয় শুধু ভারতের জন্মেই নয়—জগতের মানুষকে আসতে হবে সেই একই বিদ্যাপীঠের মহা-অঙ্গনে। 'বিশ্বভারতী' সেই প্রাণরসে সমৃদ্ধ।

শিক্ষা সম্বন্ধে বিবেকানন্দ বলেছেন : "আজকালকার শিক্ষা-পদ্ধতি মনুষ্যত্ব গড়িয়া তুলে না, কেবল উহা গড়া জিনিস ভাঙিয়া দিতে জানে। এইরূপ অবস্থামূলক বা অস্থিরতা-বিধায়ক শিক্ষা কিংবা যে শিক্ষা কেবল 'নেতি' ভাবই প্রবর্তিত করায় সে শিক্ষা মৃত্যু অপেক্ষাও ভয়ংকর।"

কিন্তু পরাধীন জাতির পক্ষে সে ধারার অনুবর্তন সম্ভব হয়নি। তাই বিশ্ববিদ্যালয় আজ শুধু কেরাণী তৈরীর কারখানা।

হয়ত তার প্রয়োজন একদিন হয়েছিল, কিন্তু আজ সে প্রয়োজন ফুরিয়েছে, তাই ফাঁকিটা বড় বেশি চোখে পড়ছে। আজ কেরাণীর প্রয়োজন যত কমে আসছে, অন্ন-সমস্যাও ঠিক সেই পরিমাণে বাড়ছে। জগতের আর কোথাও ঠিক এইভাবে অন্নের অভাব দেখা দেয়নি। কারণ তারা শুধু কেরাণী নয়—তারা ঐসঙ্গে কি ক'রে বাঁচতে হয় তা জানে। এই বাঁচার কথা ভাবার মধ্যেই আছে আমাদের জাতীয় শিক্ষার ভিত।

অবশ্য একথাও সত্য, বর্তমান শিক্ষা-প্রণালীর মধ্যে থেকেও কেউ কেউ আপন প্রতিভা-বলে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। এঁরা হলেন স্বয়ম্ভু। কিন্তু সে শক্তি কয়জনের মধ্যে থাকে? কাজেই শিক্ষার ফলাফল আমাদের সাধারণের মাপকাঠি দেখেই বিচার করতে হবে। তারা লেখাপড়া শিখেছেন বিদ্যাশিক্ষার জন্মে নয়, মনুষ্যত্ব অর্জন করবার জন্মে নয়, নিজেকে প্রকাশ করবার জন্মে নয়—তাঁরা শিখেছেন, শুধু ভাল একটা চাকরির জন্মে।

কিন্তু শিক্ষার উদ্দেশ্য ত তা নয়! শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল আত্ম-বিকাশ। এ আত্ম-বিকাশের কোন সীমা-রেখা নেই। কিন্তু সাধারণ মানুষ অতদূরে পৌঁছতে পারে না। সে তার স্বল্প ক্ষমতাকে যথোচিত পরিপুষ্ট ক'রে একদিকে যেমন সুষ্ঠু জীবিকার ব্যবস্থা ক'রে নেয়, আবার অন্যদিকে সেই জীবিকার মাধ্যমেই আত্মবিকাশের শক্তিও অর্জন করে। ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করাটাই বড় কথা নয়—বড় কথা হ'ল কাজ শেখা। আমাদের ভাবতে হবে ঐদিক দিয়েই। শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই সাধারণ মানুষ তার বিকাশের পথ খুঁজে নেবে। মানুষের জীবন তার চারপাশের কাল ও সমাজের কাঠামোতে বাঁধা। এই পারিপার্শ্বিককে কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। কিন্তু অতিক্রম করতে পারেন। সাধারণ মানুষ তার চারপাশের সমাজের মধ্যে কি কি কাজ করতে পারে এবং কে কতটা ভালভাবে করতে পারে, শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্য দিয়ে সেই ব্যবস্থা করাই হ'ল আসল কাজ।

হাওয়া অবশ্য বদলেছে। কিন্তু সে সম্পূর্ণ বিপরীত হাওয়া। তাঁরা চাচ্ছেন, হাতে-কলমে শিক্ষা নয়, হাতে-হেতেরে শিক্ষা। অর্থাৎ দেশটাকে রাতারাতি কেজো মানুষের দেশ ক'রে তুলবেন। তাতেই যেন সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। অর্থাৎ মানুষের কাজ থাক আর নাই থাক, কাজের মানুষ থাক।

গলদ ঐখানেই। হাতিয়ার ধরতে শিখলেই কি জীবিকা সহজ হয়ে যাবে? তা যাবে না। যার যা কাজ তাকে তাই দিতে হবে। আসল কথা, শিক্ষাকে জীবনের ক্ষেত্রে আমাদের প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কিন্তু যে-পথ ধরেই আমরা শিক্ষার পথ প্রশস্ত করি না কেন, চরিত্র গঠনই হ'ল শিক্ষার প্রথম সোপান। চরিত্র না থাকলে কেউ কোনদিন বড় হয় না। শিক্ষার সঙ্গে চরিত্রের এই সম্পর্কটাই আমরা ভুলেছি। আজ বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাই এই ভেবে, এই ক'টা বছরের মধ্যেই ভোজবাজীর মতো মানুষগুলো কি ক'রে বদলে গেল! ঘরে-বাইরের ছেলে-মেয়েরা তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত! জানি না, কোন বিষাক্ত হাওয়ায় তাদের নৈতিক মেরুদণ্ড আজ ভেঙে গেল! গুরু-শিষ্যের মধুর সম্পর্ককে তারা আজ এত নীচে টেনে নামিয়েছে, যা আগে ছিল না। আজ গুরু চেনেন না শিষ্যকে, শিষ্য জানে না তার শিক্ষাদাতাকে! কিন্তু এই কিছুদিন আগেও দেখেছি, তাঁরা ছিলেন জাত-মাষ্টার। তাঁদের জগতই ছিল আলাদা। এককালে গুরুগৃহে থেকে ছেলেরা অধ্যয়ন করত। কোন প্রত্যাশা

ছিল না, আদান-প্রদানের কোন চুক্তি ছিল না—এমনই ছিল সম্পর্ক। এও সৃষ্টি। চরিত্র-সৃষ্টির গৌরবে তাঁরা ছিলেন আত্মসমাহিত।

সেই ধারাই চলে আসছিল। তাঁদের এ বিদ্যাদান নয়, জীবনদান। এই জীবন-দেওয়ার ব্রত উদ্‌যাপন ক'রেই তাঁরা ছিলেন কৃতার্থ। তবেই ত হ'ত শিক্ষা সম্পূর্ণ। সে শিক্ষায় ছেলেরা শুধু বিদ্যাই অর্জ্জন করত না, মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করত। এ ঋণ—গুরুর কাছে ছাত্রের ঋণ। এ তারা স্বীকার ক'রে নিত। জীবন দিয়ে সে ঋণ পরিশোধ করবার চেষ্টার মধ্যেই ছিল সম্পর্কের মাধুর্য্য।

এখন দেখতে হবে, বর্ত্তমানে বিদ্যাশিক্ষার যে ব্যবস্থা আছে তার মধ্যে কোন্ কোন্ ভাবের অভাব আছে, কি ছিল আর কি নাই—যার ফলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হচ্ছে না।

ইউরোপের যে-যুগকে অন্ধকার যুগ বলা হয়, বর্ব্বরের আক্রমণে যখন রোম-সভ্যতার ধ্বংস হ'ল তখন একমাত্র আয়র্লণ্ডই ছিল বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্র। সারা ইউরোপ থেকে তখন ছুটে এসেছে ছেলে-মেয়েরা এই বিদ্যাকেন্দ্রে। তারা আহারের সঙ্গে পেয়েছে বাসস্থান আর পড়বার বই। অনেকটা আমাদের সেকেলে টোলের মতো। আইরিশ ভাষাই ছিল তাদের মাতৃভাষা—তাই ভাষার দৈন্যও তাদের ছিল না। কিন্তু ইংরেজ-আক্রমণের সঙ্গে তাদের সব গেল। তার শিক্ষা গেল, সংস্কৃতি গেল—ইংরেজ আগুন জ্বালিয়ে তার ধ্বংসসাধন করল।

তার পরের আইরিশ ইংরেজী-ছাঁচে-ঢালা আইরিশ। তারা সব ছাড়ল, কিন্তু মাতৃভাষা ছাড়তে চাইল না। এই মাতৃভাষা ছাড়াবার জন্যে ইংরেজ তাদের কী কঠিন নির্য্যাতনই না করেছে সে সময়! আজ তারা বিদেশের ইতিহাস পড়ে—নিজের দেশকে জানে না।

আজ ভারতবর্ষের অবস্থা যা হয়েছে। সেই একই সমস্যা। নিজে চিন্তা করবে, নিজে সন্ধান করবে, নিজে কাজ করবে, এমনতর মানুষ তৈরি করবার প্রণালী এক, আর পরের হুকুম মেনে চলবে, পরের মতের প্রতিবাদ করবে না ও পরের কাজের জোগানদার হয়ে থাকবে সে আর এক।

চাকরির অধিকার নয়, মনুষ্যত্বের অধিকারের যোগ্য হবার প্রতি যদি লক্ষ্য রাখি তবেই আমরা যথার্থ শিক্ষা দিতে পারব।

যখন আমরা দেখি, আমরা যেভাবে জীবন-নির্ব্বাহ করতে চাই, আমাদের শিক্ষা সেভাবে হয়নি, আমরা যে-গৃহে বাস করব তার উন্নত চিত্র আমাদের পাঠ্যপুস্তকে নেই, যে-সমাজের মধ্যে আমরা থাকব, সে-সমাজের কোন উচ্চ আদর্শ নেই—আমাদের পিতা-মাতা, আত্মীয়-বন্ধু, ভাই-ভগ্নিদের তার মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখি না, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের কোন কথাই তার মধ্যে নেই—আমাদের আকাশ, আমাদের পৃথিবী—আমাদের পরিপূর্ণ শস্যক্ষেত্র, নদ-নদীর কোন সঙ্গীত-ধ্বনি সেখানে শুনতে পাই না, তখন বুঝতে পারি, আমাদের শিক্ষার সঙ্গে জীবনের কোন যোগই নেই।

আজকাল প্রয়োজনের নিয়মে শিক্ষকের গরজ ছাত্রের কাছে আসা, কিন্তু স্বভাবের নিয়মে শিষ্যের গরজ গুরুকে লাভ করা। এই বিপরীতধর্ম্মী আচরণই মানুষকে বিপথে নিয়ে যাচ্ছে।

তবু এই প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে থেকেও অনেক শিক্ষক দেনা-পাওনার সম্বন্ধ ছাড়িয়ে ওঠেন—সে তাঁদের একটি বিশেষ গুণ। শিক্ষককে বুঝতে হবে, তিনি গুরুর আসনে বসেছেন—তাঁর জীবনের দ্বারাই ছাত্রের জীবন সঞ্চার হবে, তাঁর জ্ঞানের দ্বারাই অপরজনের জ্ঞান আলোকিত হবে, তাঁর স্নেহের দ্বারাই কনীয়ানের কল্যাণ-সাধন হবে। এ দান। এ দানের তুলনা নেই। এ দান পণ্যমূল্যে পাওয়া যায় না: সে মূল্যের অতীত। ভক্তি-গ্রহণ—সে কি মুখের কথা! তাকে পেতে হয় ধর্ম্মের বিধানে, ভাবের নিয়মে, সে ভক্তি আপনিই আসে।

ছাত্রকেই দিতে হবে আপন আপন দায়িত্বের ভার। জোয়াল কাঁধে নিলেই গোরু সোজা হয়ে চলে। অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত ছাত্রেরা নিজেরা পালন করবে। তাদের নিয়মে তারাই চলবে। যেমন সেকালে ছিল। কেউ তাদের বাধ্য করত না।

শাস্তি যখন পরের কাছ থেকে আসে, তখন সেটা হয় প্রতিফল—প্রায়শ্চিত্ত হ'ল নিজের দ্বারা অপরাধের সংশোধন। দণ্ড স্বীকার করা যে নিজেরই কর্ত্তব্য এবং না করলে যে গ্লানি মোচন হয় না, এ শিক্ষা তারা বাল্য-কাল থেকেই পেত।

তাই বলে একথা বলব না, দু-চার হাজার বছর আগের শিক্ষা আমাদের দিতে হবে। সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ত নিত্য ঘটছে—কেউ তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না, অথচ ব্যবস্থাকে সনাতন করে, পাকা করে রাখলে মানুষের দুর্গতিই হয়। মানুষ করে তুলবার পক্ষে সকলের চেয়ে যে বড় বিদ্যালয় সেটা আমাদের বন্ধ।

একদিন আমাদের ইতিহাসের একটা বিশেষ অবস্থায় আমাদের সমাজ মানুষের কাউকে ব্রাহ্মণ, কাউকে ক্ষত্রিয়, কাউকে বৈশ্য বা শূদ্র হতে বলেছিল। এটা কালের

দাবি। সেই দাবির প্রতি লক্ষ্য রেখেই শিক্ষার ব্যবস্থাও ছিল বিচিত্র।

কিন্তু আজ কালের পরিবর্তন হয়েছে, সমাজের পরিবর্তন হয় নি—সে এখনো বলছে, ব্রাহ্মণ হও, শূদ্র হও। কোন সঙ্কীর্ণতার মধ্যে দিয়েই শিক্ষা অগ্রসর হতে পারে না। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ চরম কথা বলেছেন: "সমস্ত পৃথিবীকে বাদ দিয়া যাহারা ভারতকে একান্ত করিয়া দেখে তাহারা ভারতকে সত্য করিয়া দেখে না। তেমনি যাহারা ভারতের কেবল এক অংশকেই ভারতের সমগ্রতা হইতে খণ্ডিত করিয়া দেখে তাহারাও ভারত-চিত্তকে নিজের চিত্তের মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারে না। এই কারণবশতঃই পোলিটিক্যাল ঐক্যের অপেক্ষা গভীরতর উচ্চতর মহত্তর যে ঐক্য আছে তার কথা আমরা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে পারি না। পৃথিবীর সকল ঐক্যের যাহা শাশ্বত ভিত্তি তাহাই সত্য ঐক্য। সে ঐক্য চিত্তের ঐক্য, আত্মার ঐক্য। ভারতে সেই চিত্তের ঐক্যকে পোলিটিক্যাল ঐক্যের চেয়ে বড় বলিয়া জানিতে হইবে। কারণ, ঐক্যে সমস্ত পৃথিবীকে ভারতবর্ষ আপন অঙ্গনে আহ্বান করিতে পারে। অথচ দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের বর্তমান শিক্ষা এমন যে, সেই শিক্ষার গুণেই ভারতীয় চিত্তকে আমরা তাহার স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেছি না।"

আজকালকার পঠন-পাঠনের ধারার কথা বলতে গেলেই প্রথমেই মনে পড়ে পাঠ্য-তালিকার কথা। এই তালিকা প্রস্তুত যাঁরা করেন, তাঁরা নিয়তই ভাবছেন কত সহজ উপায়ে পাঠ্যবিষয়গুলি ছেলে-মেয়েদের গিলিয়ে দেওয়া যায়। অর্থাৎ ফাঁকির বিদ্যাটা ছেলে-মেয়েরা এখান থেকেই আয়ত্ত করছে। কর্তৃপক্ষের এই নিত্য-নূতন পরীক্ষায় পাঠ্য-পুস্তকের পরিবর্তন একদিকে যেমন হচ্ছে, দরিদ্র অভিভাবকের পক্ষে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা-দানও তেমনি দুরূহ হয়ে উঠছে।

কিছুদিন আগেও দেখেছি, দাদার বই ভাই পড়েছে, আবার সেই বই পাড়া-প্রতিবেশীরও কাজে লেগেছে। অঙ্ক, জ্যামিতি, ভূগোল, ইতিহাস, ব্যাকরণ—এর আর তখন পরিবর্তন ছিল না। আজ পরিবর্তন বাড়ছে, বিদ্যা বাড়ছে না।

পাঠশালার শিক্ষা-পদ্ধতি আমাদের দেশ থেকে প্রায় উঠেই গেল। এই পাঠশালায় ছেলে-মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা যে প্রণালীতে হ'ত, তা তখন যেমন সহজ ছিল তেমনি সম্পূর্ণও ছিল।

এই ক্রম-পরিবর্তনের ফল কোথাও ভাল হয়নি, এটাও আমরা বুঝতে পারছি। তা ছাড়া আরও একটা কথা আছে। ছেলেরা আপন আপন প্রকৃতি নিয়ে জন্ম-গ্রহণ করে—সকলের প্রকৃতি সমান নয়। এই প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা আমাদের দেশে মোটেই নেই—যেটার মূল্য জগতে আজ সবাই দিচ্ছে। যে ছেলেটা ছবি আঁকতে ভালবাসে, তাকে দিয়ে তারা ছবিই আঁকায়—আমাদের মত জোর করে তারা অঙ্কের বোঝা তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয় না।

ঠিক অনুরূপ কথা বিবেকানন্দও বলেছেন, "বিদ্যাশিক্ষা কাকে বলি? বই পড়া? না। নানাবিধ জ্ঞানার্জন? তাও নয়। যে শিক্ষার দ্বারা ইচ্ছাশক্তির বেগ ও স্ফূর্তি নিজের আয়ত্তাধীন ও সফলকাম হয়, তাহাই শিক্ষা।"

আমাদের অক্ষমতা ও অজ্ঞানতাবশতঃ জ্ঞান-শিক্ষাকে আমরা এতদিনেও আনন্দজনক করে তুলতে পারলাম না, এই আশ্চর্য্য! রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "শিক্ষা হচ্ছে সমাজগত। আমাদের দুর্গতিটা এসেছে সেইদিক থেকেই। সমাজকে ছেঁটে বাদ দিয়ে শিক্ষার ধারা প্রবর্তন আমরা করেছি।

আবার একথাও সত্য, কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সমাজেরও হচ্ছে বদল। এ বদল নিয়তই হচ্ছে। অথচ আমরা সেই প্রাচীন সমাজের রীতিনীতিকেই আঁকড়ে ধরে আছি। এতে মনের প্রসার হয় না, মানুষেরও হয় দুর্গতি। নদী সরে গিয়েছে কিন্তু বাঁধাঘাট ঠিক এক জায়গাতেই আছে।"

পরিবর্তনকে স্বীকার করে নিতে হবে, তবেই এগুনো যাবে। সৃষ্টির নিয়মই তাই।

আমাদের দেশে এই ইউনিভার্সিটির পত্তন হয়েছে বাইরের দানের থেকে। ভারতীয় বিদ্যা বলে কোন একটা পদার্থ যে কোথাও আছে তা এই বিদ্যালয়ে গোড়া থেকে অস্বীকার করা হয়েছে। জগতের আর কোথাও এরূপ হয় নি। এর দানের বিভাগ অবরুদ্ধ, কেবল খোলা আছে গ্রহণের বিভাগ। এতে গ্রহণের কাজও বাধা পায়। কারণ যেখানে দেওয়া-নেওয়ার চলাচল নেই সেখানে পাওয়াটাও অসম্পূর্ণ থাকে। অন্য স্বাধীন দেশের সঙ্গে আমাদের একটা মস্ত প্রভেদ আছে। সেখানে শিক্ষার পূর্ণতার জন্যে, যারা দরকার বোঝে তারা বিদেশী ভাষা শেখে। কিন্তু বিদ্যার জন্যে যেটুকু আবশ্যক তার বেশি তাদের না শিখলেও চলে। কেননা তাদের দেশের সমস্ত কাজই নিজের ভাষায় হয়।

এই পঙ্গুতা থেকে তাকে মুক্তি দিতে হবে। নিজের ভাষার ভিতর দিয়ে তাকে গ্রহণ করতে হবে, তাকে প্রয়োগ করতে হবে।

আমরা মুখে ভারত-ধর্ম, ভারতীয়তার গর্ব্ব করি, কিন্তু কার্য্যতঃ তাকে অস্বীকার করি। আমরা মুখে বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথের জয়গান গাই কিন্তু কার্য্যতঃ আমাদের জীবনের ক্ষেত্র থেকে, আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে তাঁদের সসম্মানে দূরে সরিয়ে রাখি। যদি এইভাবে তাঁদের আজ দূরে সরিয়ে না রাখতাম তা হলে আজ দেশের চেহারা বদলে যেতো। তাঁরা আমাদের জীবন ও সাধনার প্রত্যেক ক্ষেত্রের সমস্ত মূল সমস্যাগুলিকে সমাধান করবার পথ নির্দ্দিষ্ট করে গিয়েছেন। ধর্ম আর শিক্ষা সম্বন্ধে আজ যে ভ্রান্ত অর্দ্ধ-সত্য আর অর্দ্ধ-মিথ্যায় আমরা নিজেদের প্রতারিত করে চলেছি—বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ—যাঁরা ভারত-পথিক তাঁরা তন্ন তন্ন করে তার অনুশীলন করে গিয়েছেন। শিশুকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষতম স্তর পর্য্যন্ত এই সব মহা-মনীষীদের বিশাল বিপুল রচনাকে নির্দ্দিষ্ট পাঠক্রমে যদি আমরা নিয়মিত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারি, তাহলে এক যুগের মধ্যে আমাদের জাতীয় জীবনের চেহারা বদলে যাবে।

বদলে যাবে জাতির নৈতিক চরিত্র। ঐ পথেই আছে ভারতবর্ষ, মানুষ-গড়ার ইতিহাস। ভারত-ধর্ম্ম হলো দেবত্ব-প্রয়াসী মানুষের অসংখ্য বাস্তব জীবন-পরীক্ষার পরিণামফল, ভারত-ধর্ম্ম হলো মানুষের পরম উপলব্ধির চরম প্রকাশ।

তাই শিক্ষার চরম কথা হলো, এই ভারত-ধর্ম্মকেই গ্রহণ। চাই প্রস্তুতি। গুরু তিনিই হবেন, যিনি মনে-প্রাণে ভারত-ধর্ম্মী। শিক্ষা নয়, প্রাণ-শক্তি—জাতির বীজ-মন্ত্র।

একদিন ইংরাজ সরকার তার রাজ-কাজ চালাবার জন্যে—এক কথায়, কেরাণী তৈরি করবার জন্যে এই ইউনিভার্সিটি গড়েছিলো। তার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। আজ ইংরাজ না থাকলেও, ইংরাজের বানানো ঐ মহা-বিদ্যালয় আছে। আজো আমরা সেই বিদ্যালয়কেই আদর্শ করে ছেলেদের চরিত্র গঠনে মন দিয়েছি। এক কথায় চরিত্র যে শিক্ষার প্রধান অঙ্গ, সে কথা ভুলেই গিয়েছি। অবশ্য তার কারণও আছে। দু'শো বছর ধরে একটু একটু করে ইংরেজ আমাদের নূতন পড়া পড়িয়েছে, যার ফলে জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে আমাদের পরিবর্ত্তন এনেছে। আমাদের সমাজ বদলেছে, আচার-ব্যবহার বদলেছে, ধর্ম্মাধর্ম্ম, বিশ্বাস-অবিশ্বাস—নিজেকে এমন ভাবে বদলে নিয়েছি; আমরা পূর্ব্বে কি ছিলাম আজ চেষ্টা করেও মনে আনতে পারি না। ঐ জৌলুস—হঠাৎ চমক-লাগার জৌলুস! মন আর ফিরে যেতে চায় না এমনি দৃষ্টি-বিভ্রম!

একদিন সাহেব-সাজার রেওয়াজ ছিল, কিন্তু আজও আমরা সে পোশাক ফেলে দিতে পারি নি। আমরা ঘরে-বাইরে বিলিতি-কায়দাকে সযত্নে লালন করছি। ভুলে গিয়েছি, ধুতি-চাদর আর চটি-জুতার মহিমা। খণ্ড খণ্ড দেশ তার খণ্ড খণ্ড জাতি। আপন আপন মাটির জল-বাতাসে সে বর্দ্ধিত। এই মাটির কথা পৃথিবীর কোনো জাতিই ভোলে নি, যেমন করে ভুলেছে ভারতের মানুষ।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই মাটিকে ভুলালে কে? আমাদের মতো পৃথিবীর অনেক জাতই এককালে পরাধীন ছিলো, কিন্তু তারা আর যাই করুক, আমাদের মতো মাটিকে এমন করে বিস্মৃত হয় নি। পরাধীনতাকে তারা সাময়িক উপদ্রব বলে মনে রাখে, জানে, একদিন তাদের জাতি হিসেবেই বড় হতে হবে। বড় হয়ও তারা। জাতির প্রতি এই সহজাত দরদ না থাকলে কোনো কিছুই গঠন করা যায় না। আমাদের গড়বার প্রবৃত্তিও গিয়েছে নষ্ট হয়ে, আর সে শক্তিও নেই।

আজ রাশিয়া যে পরিবর্ত্তন এনেছে, তার মূলে আছে এই গড়ার ইতিহাস। একটু একটু করে সে নূতন করে রাশিয়াকে গড়ে তুলেছে।

আজ পরিবর্ত্তন আনতে হলে, আমাদের সেই প্রাচীন যুগে ফিরে যেতে হবে। খুঁজে দেখতে হবে, কোথায় কি ছিল আমাদের নিজস্ব সম্পদ, ঐশ্বর্য্যের মতো আহরণ করে আনতে হবে সে-যুগের বহু মূল্য গ্রন্থরাজি। কি সম্পদ যে সেখানে ছড়িয়ে আছে, আজ এতদিন পরে—যত দেখছি, বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ছি! জ্ঞান নয়, জ্ঞানের আকর!

এই সংস্কৃত ভাষাকে যারা আমাদের 'ডেড্ ল্যাংগুয়েজ' বলতে শেখালো, তারা কিন্তু এই শাস্ত্রকে এমন করে অবহেলা করে নি—তারা সযত্নে আহরণ করে নিয়ে গিয়েছে নিজের দেশে যেখানে যত রত্ন আছে। আমরা জাত-হিসাবে না মরলে এ কোনো দিনই সম্ভব হতো না। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই জাতীয়তাকে বাঁচাবার কি চেষ্টাই না করে গিয়েছেন! বিদেশী পোশাক পরে ঢুকতে হবে বলে, তিনি কোনো দিনই লাট-সাহেবের দরজা মাড়ান নি। কিন্তু আমাদের চৈতন্য হয় নি। একজন ইংরেজও জানে, সে আগে ইংরাজ, পরে মানুষ। আমরা সে কথা কোনো দিনই জোর করে বলতে পারলাম না। আর পারলাম না বলেই স্বাধীনতাকে পেয়েও আমরা স্বাধীন হলাম না। বিবেকানন্দও এই

দেশকে চেনাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দেশ আমাদের কাছে শুধু মাটিই হয়ে রইলো।

ইংরেজ যতদিন ছিলো, তারা শুধু রাজ্য-শাসনই করে নি, শাসন করেছে মানুষের মনকে। তাদেরই বেঁধে-দেওয়া ছকে আমরা চোখ বুঁজে চলেছি। এমনি অন্ধ আমরা, তারা যা শিখিয়েছে—বিচার না করে, তাই শিখে গিয়েছি। অবশ্য ভালো যে তারা কিছু করে নি এমন কথা বলবো না। অকৃপণ মনে তারা আমাদের শিক্ষা দিয়েছে, জ্ঞান দিয়েছে—সে দেওয়ার মধ্যে এতটুকু ফাঁকি ছিল না। তাদের দেওয়া শিক্ষার মধ্য দিয়েই আমরা স্বাধীনতার চিন্তাধারা লাভ করেছি।

ভাল তারা করেছে। কিন্তু সেই ভালই আমাদের কাল হলো। সেদিনকার সেই চোখ-ধাঁধাঁনো জৌলুসে আমরা ক্ষতির দিকটা দেখতে পাইনি, আজ যা প্রত্যক্ষ করছি।

তাই আজ বুঝতে পারছি, জাতি হিসাবে আমাদের বাঁচতে হলে আমাদের ঐ শিক্ষার ধারা বদলানো দরকার। কিন্তু এই দরকারের কথাই সকলে মিলে বলছি—পথের কথা কেউ বলছি না। চীন কি করেছে, রাশিয়া কোন্ পথে যাচ্ছে, আমরা সেই দিক দিয়েই চিন্তা করেছি। আমাদের নিজস্ব চিন্তা বলে কোনো কিছুই নেই। চিন্তা করতেও ভুলে গিয়েছি। জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে আমরা অপরের 'কোটেসন' ব্যবহার করে করে চলেছি। কিন্তু চীন যা ভাবে, রাশিয়া যা ভাবে তা নিজের মত করেই ভাবে।

দু'শো বছর ধরে বিদেশী শাসক যে-জিনিসের যে-মূল্য দিয়ে গেল, আজ দেখা যাচ্ছে তার বিশেষ কোনো মূল্যই নেই। একদিন যে-জিনিসকে মূল্যহীন মনে করে আবর্জ্জনার স্তূপে ফেলে দিয়েছি, আজ দেখছি তার অভাবে জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে উঠেছে হাহাকার। অমূল্য মনে করে যে-জিনিসকে এত দিন ধরে সঞ্চয় করে রেখেছি, আজ প্রয়োজনের দিনে তাকে ভাঙাতে গিয়ে দেখি, তার কোনো বাজারদর নেই। এই মূল্যের অরাজকতার মধ্যে মানুষ আজ বিভ্রান্ত। মানুষ আজ ভাবতেও পারছে না, কোন্ পথ ধরলে সে ঠিক লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে?

আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের দেশের পরিচয় পেতে হয়েছিল একদিন ইংরেজের কাছ থেকে। আজ আমরা ভুলে গিয়েছি আমাদের পূর্ব্ব-পরিচয়।

আমাদের ঠিক পেছনে যে দু'শো বছর পড়ে রয়েছে—পেছনে পড়ে আছে বলে যদিও তাকে বলব অতীত, কিন্তু আসলে এই দু'শো বছরের অতীতই হ'ল আমাদের বর্ত্তমান জীবনের ভিত্তি, আশ্রয়, অবলম্বন। তার আগের অতীত আমাদের স্মৃতি থেকে মুছে গিয়েছে, তাই আমরা জানিও না পূর্ব্বে কি ছিলাম, কি ছিল আমাদের ঐতিহাসিক পরিচয়। কিন্তু যে দেখেছে সে জানে, শুধু দু'শো বছর পেছনে নয়, আমাদের এই জীবন-জাহ্নবী অবিচ্ছেদ ধারায় প্রবাহিত হয়ে আসছে বহু দূর থেকে—বহু যুগ ধরে—বহু শতাব্দীর প্রান্তর পেরিয়ে। আজ সময় এসেছে সেই প্রবাহিত উৎস-ধারার মূল অনুসন্ধান করবার। অনুসন্ধান করতে হবে ভারত-ধর্ম্মের স্বরূপ, আবিষ্কার করতে হবে সেই হারিয়ে-যাওয়া ভারতবর্ষকে। কিন্তু কে করবে এই অসাধ্যসাধন?

বিলেতের মাটিতে বসে ভারতবর্ষকে দেখা যায় না। ভারতবর্ষকে চিনতে হলে, তার ধর্ম্মকে, তার দর্শনকে আগে জানতে হবে। তার ধর্ম্ম হ'ল তার ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য, তার মনস্বিতার চরম ফল। বহু যুগের, বহু সাধকের, বহু মনীষীর সাধনা ও সমন্বয়ের ফলে এই ধর্ম্ম বিশ্ব-মানবের পক্ষে গ্রহণীয় এক অপূর্ব্ব আত্মিক ঐশ্বর্য্য গড়ে তুলেছে। ভারতবর্ষের ধর্ম্মের মধ্যে আছে জাতিহীন, সম্প্রদায়হীন মানব-মনের সেই পূর্ণ অভিব্যক্তির সংবাদ। হিন্দুধর্ম্ম কোনোদিনই নিজের চারদিকে অচলায়তন তৈরি করে নি। প্রত্যেক শতাব্দীর প্রত্যেক সভ্যতার, প্রত্যেক প্রাণ-আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যকে সে প্রয়োজন অনুসারে নিজের মধ্যে আত্মস্থ করে নিয়েছে বলেই সে এমন একটা ধর্ম্মীয় ব্যবস্থার উদ্ভাবন করেছে, যেখানে বিশ্ব-মানবকে সে আহ্বান করতে পারে এবং এই পথ ধরেই সে চিরকাল জগতের লোককে আহ্বান করে এসেছে। জগতের লোক ছুটে এসেছে এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

আজ দু'শো বছর ধরে শিক্ষার নামে যে চরিত্রহীন ভিত্তিহীন ধর্ম্মহীন জাতির মৃত্তিকাস্পর্শহীন পল্লবগ্রাহী শিক্ষা, শুধু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার লোভে আমরা অনুসরণ করে এসেছি, বিষবৃক্ষের মতন তাকে আমূল উৎপাটন করে ফেলে দিতে হবে এবং তার জায়গায় একেবারে নিম্নতম শ্রেণী থেকে সুরু করতে হবে সম্পূর্ণ নতুন এক শিক্ষাপদ্ধতি, সম্পূর্ণ নতুন এক পাঠক্রম—যে শিক্ষা এই সুদীর্ঘজীবী জাতির প্রাণশক্তিরূপে ওতঃপ্রোত হয়ে আছে তার ইতিহাসে, যে শিক্ষার বিজ্ঞান বহু শত বর্ষের সজাগ সাধনার ফলে আমাদের দেশের ঋষিকল্প জ্ঞানীরা সৃজন করেছিলেন, যে-শিক্ষা বিদেশী শাসকের ইচ্ছাকৃত উদাসীনতার শত অত্যাচার সত্ত্বেও বিলুপ্ত হয়নি আজো আমাদের চেতনা থেকে, আমাদের সেই জাতীয় শিক্ষার বিজ্ঞানকে বলিষ্ঠ বিশ্বাসে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে করে তুলতে হবে সত্য।

রবীন্দ্রসাহিত্যে ইব্‌সেনিজ্‌ম্

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

আত্মকেন্দ্রিক পুরুষকে ভালোবাসে—এমন মেয়ে পৃথিবীতে নেই বললেও চলে। অথচ রবিঠাকুরের 'যোগাযোগ' উপন্যাসে চাটুজ্জে বাড়ীর মেয়ে কুমু যার কণ্ঠে বরমাল্য দিলো সেই মধুসূদন ঘোষাল বাস করে আয়নার ঘরে। নিজেকে ছাড়া আর কাউকে সে দেখতেই পায় না : নিজের কথা ছাড়া আর কারও কথা ভাববার অবসর নেই তার। এমন মানুষকে তো কুমু পতিত্বে বরণ করতে চায় নি। "যখন কুমারসম্ভব পড়লে তখন থেকে শিব-পূজায় সে শিবকে দেখতে পেলে, সেই মহাতপস্বী যিনি মহাতপস্বিনী উমার পরম তপস্যার ধন। কুমারীর ধ্যানে তা'র ভাবী পতি পবিত্রতার দৈবজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে দেখা দিলো।" কিন্তু এ কী হোলো! শেয়ালকুলিতে ঘোষাল দীঘির ধারে বিবাহের পূর্ব্বেই যার তাঁবু পড়লো সেই ভাবী বরের ধনের বড়াই দেখে কুমুর মন বিষাদে ভরে উঠলো। এই কি তার ধ্যানলোকের শিব? কার কণ্ঠে কুমু বরণমাল্য দিতে চলেছে?

কুমারীর স্বপ্নলোকের পতির সঙ্গে মধুসূদনের একটুও যদি মিল থাকতো! দলবল নিয়ে বিয়ে করতে এলো বরপক্ষকে কোন খবর না দিয়েই। খবর না-দেওয়ার উচিত জবাব হচ্ছে খবর না-নেওয়া। কিন্তু বরের অভ্যর্থনায় ত্রুটি হলে পিতৃমাতৃহীনা ছোট বোন হয়তো মনে দুঃখ পাবে। বিপ্রদাস তাই কাউকে না-জানিয়ে ঘোড়ায় চড়ে গেল ষ্টেশনে। ভাবী বধূর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে মধুসূদন নমস্কার করলো। শুষ্ক সংক্ষিপ্ত সেই নমস্কার। ক্রমশঃই মধুসূদনের আসল পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে। ভাবী পতির সঙ্গে শুভদৃষ্টি হবার আগেই কুমুর মর্ম্মমুকুরে মধুসূদনের ছায়া পড়েছে। একেবারে 'ফিলিষ্টাইন্'। টাকার কুমীর কিন্তু সৌজন্যের কোন বালাই নেই। নিজেকে গৌরব দান করতেই অনবরত ব্যস্ত। কুমুর সর্ব্বশরীর কাঁপছে বিবাহ-আসরে যাবার আগে। এমন পতির ছবি তার কল্পলোকের ত্রিসীমানাতেও ছিল না।

কোথায় মহাতপস্বী শিব যিনি ছিলেন কুমুদিনীর ধ্যানে আর কোথায় মধুসূদন যার কণ্ঠে কুমু বরমাল্য দিতে উদ্যত! মধুসূদন "বেঁটে, মাথায় প্রায় কুমুদিনীর সমান। হাত দুটো রোমশ ও দেহের তুলনায় খাটো। সবসুদ্ধ মনে হয় মানুষটা একেবারে নীরেট। মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই কী যেন একটা প্রতিজ্ঞা গুলি পাকিয়ে আছে। যেন ভাগ্যদেবতার কামান থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে একাগ্র ভাবে চলেছে একটা একগুঁয়ে গোলা। দেখলেই বোঝা যায় বাজে কথা, বাজে বিষয়, বাজে মানুষের প্রতি মন দেবার ওর একটুও অবকাশ নেই।" আসলে মানুষটা ভদ্রলোকের পর্য্যায়ে পড়ে না। ভদ্র তো সে-ই, যে সর্ব্ব সময়ের জন্যে আর আর মানুষগুলির সুবিধা-অসুবিধা, সুখ-দুঃখ সম্পর্কে সচেতন। নিজের গৃহিণী যার অতি আদরের সহোদরা সেই বিপ্রদাস রোগশয্যায়। বিপ্রদাস মনে করেছিলো মধুসূদন এই কয়দিনের মধ্যে একবার এসে দেখা করে যাবে। তা সে করলো না। বিপ্রদাসের ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ন্যুমোনিয়ায় গিয়ে পৌঁছাতে পারে। কুমুর মনে উদ্বেগের সীমা নেই। লজ্জা কাটিয়ে কম্পিতকণ্ঠে বিবাহরাতে সে স্বামীর কাছে প্রার্থনা করলো, আর দুটো দিন যেন তাকে বাপের বাড়ীতে থাকতে দেওয়া হয়, দাদাকে যেন একটু ভালো দেখে সে যেতে পারে। মধুসূদন সে প্রার্থনা মঞ্জুর করলো না। তার কাছে কুমুর ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন মূল্য নেই। মধুসূদন সত্যই নীরেট যাকে বলে philistine অর্থাৎ dull and unimaginative. কুমু বিছানার প্রান্তে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে রইলো।

হায় রে কুমু! তার জীবন নিয়ে নিয়তির এ কী নিষ্ঠুর খেলা! যে-বাপের সে ছিলো আদরিণী কন্যা তাঁর ব্যবহারে ত্রুটি এবং চরিত্রে খুঁত ছিলো ঠিকই। তবু সেই চরিত্র ছিল "ঔদাস্যে বৃহৎ, পৌরুষে দৃঢ়, তার মধ্যে হীনতা কপটতা লেশমাত্র ছিলো না, যে-একটা মর্য্যাদাবোধ ছিলো সে যেন দূরকালের পৌরাণিক আদর্শের। তাঁর জীবনের মধ্যে প্রতিদিন এইটেই প্রমাণ হয়েছে—যে, প্রাণের চেয়ে মান বড়ো, অর্থের চেয়ে ঐশ্বর্য্য।" এই ত গেল বাপের চরিত্র। আর মা-টি কেমন ছিলেন? স্বামী নারীর আদর্শরূপে কুমু আপন মাকেই জান্‌তো। কী স্নিগ্ধ শান্ত কমনীয়তা, কতো ধৈর্য্য, কতো দুঃখ, কতো দেবপূজা, মঙ্গলাচরণ, অক্লান্ত সেবা।"

মনীষীরা বলে থাকেন, পরিবেশ আর রক্ত—এই দুটোর প্রভাবই নাকি মানুষের চরিত্রে কাজ করে। The

blood tells. দুটোই কুমুদিনীর অনুকূলে ছিলো। যৌবনারম্ভের পূর্ব্বে থেকেই সে থেকেছে দাদার নির্ম্মল স্নেহের আবেষ্টনে। সংস্কৃত সাহিত্যে দাদার বড়ো অনুরাগ। দাদার কাছ থেকে কুমু ব্যাকরণ শিখে কুমারসম্ভব পড়েছে। বিপ্রদাসের ফটোগ্রাফ তোলার সখ, কুমুও তাই শিখে নিয়েছে। কুমু এসরাজও বাজায়; দাদাকে কানাড়া মালকোষের আলাপ শোনায়। আর ঘর-সংসার গুছিয়ে রাখতে কুমুর জুড়ি নেই। "কাপড়-চোপড়, দিন-খরচের টাকাকড়ি, বইয়ের আলমারি, ঘোড়ার দানা, বন্দুকের সম্মার্জ্জন, কুকুরের সেবা, ক্যামেরার রক্ষণ, সঙ্গীতযন্ত্রের পর্য্যবেক্ষণ, শোবার-বসবার ঘরের পারিপাট্যসাধন—সমস্ত কুমুর হাতে।" দাবা খেলাতেও কুমুর হাত আছে। কুমু কামানের 'একগুঁয়ে গোলা' নয়, বিচিত্র বিষয়ে তার interest—যাকে বলে accomplished.

আর দাদার চরিত্রটি স্বামীর চরিত্রের ঠিক উল্টো। "যস্মাং মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যা"—যে রাস্তায় চল্‌তে গিয়ে বহু মানুষের সর্ব্বনাশ ঘটে সেই অর্থ সঞ্চয়ের রাস্তায় পা দিতে বিপ্রদাসের কোনই উৎসাহ নেই। ঘটক একদা বিপ্রদাসকে একটা মোটা পণের আশা দেখিয়েছিল। তাতে ফল হয়েছিল উল্টো। কম্পিতহস্তে হুঁকোটা দেয়ালের গায়ে ঠেকিয়ে সেদিন অত্যন্ত দ্রুতপদেই ঘটককে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল। উদারচেতা বিপ্রদাসের চরিত্রে আত্মকেন্দ্রিকতার লেশমাত্র নেই। যাকে বলে perfect gentleman বিপ্রদাস তাই। আর will Durant ঠিকই বলেছেন, A gentleman is a person who is continually considerate.

এমন একটা সুদুর্লভ পুরুষের লোভনীয় সান্নিধ্যে মানুষ হয়ে উঠলো যে মেয়ে, সে পড়লো কার হাতে? যার মনকে জুড়ে আছে টাকার দম্ভ, সঙ্গীতে সাহিত্যে যার কোনই অনুরাগ নেই, সে একান্তভাবে আত্ম-কেন্দ্রিক। পতির গৃহ এমনই একটি বাড়ী সে বাড়ীতে এস্‌রাজ বাজাতে কুমুর লজ্জা করে। স্বামীকে কুমু যে ভালোবাসতে পারলো না—এতে বিস্মিত হবার কি আছে? যে মানুষের গানে অনুরাগ নেই সে নাকি খুন করতে পারে।

আর্ট তো জীবনেরই criticism চারিদিকের জীবন থেকে, নিজের ব্যক্তিগত জীবন এবং পারিবারিক জীবন থেকেও লেখক যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা আহরণ করেছিলেন তাদেরই অপূর্ব্ব প্রকাশ 'যোগাযোগ' উপন্যাসে। শুধু কল্পনাকে আশ্রয় করে বিপ্রদাসের চরিত্র আঁকা যেতো না, মধুসূদন ঘোষালের অমন নিখুঁত বর্ণনা দেওয়া সম্ভব হোতো না। "Imagination is a poor substitute for experience." অতীত জীবনের অভিজ্ঞতাগুলিকে সাজিয়ে গুজিয়ে আর্টিষ্ট প্রকাশ করবার জন্যে উৎসুক। চন্দনদহের বিলে মধুসূদনের নিমন্ত্রিত সাহেবেরা দু'শো কাদাখোঁচা পাখী মেরেছে শুনে বিপ্রদাস স্তম্ভিত হয়ে রইলো। এ বিপ্রদাসের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নিজেরই ছবি। বিপ্রদাস বিয়ে করেনি, রবীন্দ্রনাথ বিপত্নীক ছিলেন। তা হোক, এসব পার্থক্য ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। এহ বাহ্য। ঔপন্যাসিক কিছু কিছু কাল্পনিক ঘটনা সৃষ্টি করে থাকেন। সেই ঘটনাগুলির ফ্রেমের মধ্যে নিজের অভিজ্ঞতাগুলিকে কৌশলের সঙ্গে তিনি সন্নিবেশিত করেন। ঔপন্যাসিকের আর্টের মধ্যে বাস্তব জীবনের সত্যগুলি এমন জলজ্যান্ত হয়ে যে ফুটে ওঠে তার কারণ—সেই সত্যগুলির মধ্যে লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতারই সৌন্দর্য্যময় প্রকাশ! কুমুর চরিত্র নিছক কল্পনায় তৈরী হতে পারে না। কিন্তু সত্যই কি এমন বুদ্ধিমতী মেয়ে জেনেশুনে অমন একজন vulgar আত্মকেন্দ্রিক পুরুষের কণ্ঠে স্বেচ্ছায় মালা দিতে পারে? যুগে যুগে দেশে দেশে অহরহই তো এমন ঘটনা ঘটে চলেছে। বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, পরমজ্ঞানী সোক্রাতেস্ (Socrates) কোন্ দুঃখে জ্যান্‌থিপীর গলায় মালা দিতে গেলেন? কলহপরায়না জাঁদ্‌রেল সেই গৃহিণী যার কাঁটা তারের মতো রসনার ভয়ে দার্শনিক প্রবর ঘরে যেতে সাহস করতেন না? আর এব্রাহাম লিঙ্কনের মতো অমন একজন ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন প্রতিভাবান ব্যক্তিই বা মেরীর মতো ঈর্ষাপরায়ণা কোপন-স্বভাবা উড়োনচণ্ডী মহিলাকে ঘরের বধূ করলেন কেন? এর কোন সদুত্তর নেই। জীবন ঠিক লজিকের হাত ধরে চলে না। মানবচক্ষুর অন্তরালে কোন্ রহস্যময়ী নিয়তি কার ভাগ্যের সঙ্গে ভাগ্যকে গেঁথে দিচ্ছে! বিয়েতেও বুঝি সেই নিয়তিরই হাত। তার নিষ্ঠুর হাতের আচম্‌কা ধাক্কায় চাটুজ্যেদের এস্‌রাজ বাজানো, কুমারসম্ভব-পড়া মেয়ে ছিট্‌কে গিয়ে পড়লো ঘোষাল বাড়ীতে একটা প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে। যে-পতির মধ্যে কুমু দেখতে চেয়ে-ছিল রজতগিরিনিভ শিবের প্রতিচ্ছবি সে, তাকে করে রাখতে চাইলে বাঁদী, তার জীবনকে কোন মর্য্যাদাই সে দিলো না। দৈনিক গার্হস্থ্যের তুচ্ছতায় ছায়াচ্ছন্ন হয়ে প্রাচীরের আড়ালে কর্ত্তাদের কটাক্ষচালিত মেয়েলী জীবনযাত্রায় কুমু সন্তুষ্ট থাকবে—এর বেশী মধুসূদন কিছু ভাবতেই পারেনি। নারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার মূল্য কি? "স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহার করবারও যে একটা কলা-নৈপুণ্য আছে, তার

মধ্যেও যে পাওয়া বা হারাবার একটা কঠিন সমস্যা থাকতে পারে, একথা ঘোষালনন্দনের হিসাবদক্ষ সতর্ক মস্তিষ্কের এককোণেও স্থান পায়নি; বনস্পতির নিজের পক্ষে প্রজাপতি যেমন বাহুল্য, অথচ, প্রজাপতি সংসর্গ যেমন তাকে মেনে নিতে হয় ভাবী স্ত্রীকেও মধুসূদন তেমনি করে ভেবে ছিলো।" মধুসূদনের চরিত্র আঁকতে গিয়ে ঔপন্যাসিক দু'একটা এমন আঁচড় কেটেছেন যার থেকে বুঝতে বিলম্ব হয় না, মানুষটার সবটাই 'আমি'তে ঠাসা। মধুসূদনের বাড়ীর দ্বারে খোদা হয়েছে "মধুপ্রাসাদ"। শোবার ঘরে পালঙ্কের শিয়রের দিকে মধুসূদনের নিজের অয়েলপেন্টিং, তাতে তার কাশ্মীরী সালের কারুকার্য্যটাই সব চেয়ে প্রকাশমান। বাচ্চা-ছেলে হাবলুকে কুমু কাঁচের কাগজ-চাপা দিয়েছে। সেই কাঁচা ছেলেকে চোর বলে মারতে মধুসূদনের কোথাও বাধল না। কুমু যখন বললে, সে-ই বালককে কাগজ-চাপাটা দিয়েছে, মধুসূদন জবাব দিলো, "আমার হুকুম ছাড়া জিনিসপত্র কাউকে দেওয়া চলবে না।" অথচ কুমুর অনুমতি না নিয়েই তার নীলার আংটিটি বেমালুম সরিয়ে ফেলতে মধুসূদনের কোন কুণ্ঠাই গেলো না। ওটা কুমুর হলেও নিজের কাছে কুমু রাখতে পারবে না—কারণ সেটা যে কর্ত্তার ইচ্ছা নয়। বাইবেলের মধ্যে যীশুখ্রীষ্টের একটা মোক্ষম কথা আছে: Do unto others as you would that they should do unto you. মধুসূদন ইচ্ছা করে, তার জিনিস তাকে না বলে কেউ নেবে না। খ্রীষ্টীয় নীতিতে তারও উচিত ছিলো কুমুর আংটি এমন করে না নেওয়া। কিন্তু মধুসূদন এক-দমই খাজা। কুমুর মুখের উপরে দিব্যি বলে দিলো, "এ-বাড়ীতে তোমার স্বতন্ত্র জিনিস বলে কিছু নেই।" পারিবারিক জীবনের ক্ষেত্রে মধুসূদন ঘোষাল একটি ছোটো-খাটো হিটলার।

সে অর্থের জৌলুস দিয়ে কুমুর মন জয় করবে! ভুলে গেছে কুমু দাদারই বোন যে-দাদার মনে টাকার প্রতি কোন আসক্তিই নেই। অনমনীয় আত্মমর্য্যাদার সহজ প্রকাশ কুমুর মনের মধ্যে। তার ব্যবহারে কোথাও কিছুমাত্র অশোভন প্রগলভতা নেই। মধুসূদন শুধু একটা বিষয়ে কুমুর সঙ্গে টেক্কা দিতে পারে। সে তার ধনে। বিত্ত দিয়ে চাটুজ্জেদের ঘরের মেয়েকে এবারে সে অভিভূত করে দেবে। দেখা যাবে আত্মমর্য্যাদার দৌড় কতদূর! জহরী ডাকিয়ে তিনটে আংটি নিয়েছে মধুসূদন। একটা চুনি, একটা পান্না, একটা হীরের আংটি। মধুসূদন মনে মনে একটি দৃশ্য কল্পনাযোগে দেখতে পাচ্ছে। হীরেটাই কুমু পছন্দ করলে। কুমুর লুব্ধতার ক্ষীণ সাহস দেখে মধুসূদন তিনটে আংটিই তার তিন আঙুলে পরিয়ে দিলো। বাস্, কেল্লা ফতে! চাটুজ্জেদের ঘরের মেয়ে হীরের ধাক্কায় একেবারে কাৎ! কিন্তু স্বল্পভাষিনী মেয়েটাকে তো জয় করতে পারা গেলো না। আংটি পরার কোন আগ্রহই দেখা গেল না ওর মধ্যে। নির্ব্বিকার কুমুর অতলস্পর্শী ঔদাসীন্যের কঠিন বর্ম্ম মধুসূদনের নিক্ষিপ্ত অমন ব্রহ্মাস্ত্রকে ব্যর্থ করে দিলো। দাদার দেওয়া নীলার আংটিতে কুমুর দরকার ছিলো। সেই আংটিই যখন মধুসূদন তাকে পরতে দিলো না তখন আর কোন আংটিতে তার দরকার নেই। মধুসূদন ধমক দিয়ে বলল, "যাও চলে।" চরিত্রের গরিমা দিয়ে কুমু মধুসূদনকে বুঝিয়ে দিলে, 'বিপুল ধনের অধিপতি হলেও কুমুর চেয়ে সে বড়ো নয়।'

'যোগাযোগ' পড়তে পড়তে আমার বারে বারে মনে হয়েছে ইবসেনের A Doll's House এর কথা। ঐ নাটকের নায়িকা 'নোরা'র দাম্পত্যজীবন স্বামীর আত্মকেন্দ্রিকতার পাহাড়ে লেগে চুরমার হয়ে গেল। নোরার স্বামী হেলমার আসলে নিজেকেই ভালোবাসে, স্ত্রীকে নয়। নোরার ব্যক্তিত্বের কোন মূল্য নেই তার স্বামীর কাছে। সে সংসারে সাজানো-গোছানো যেন পুতুল! আছে হাসি দিয়ে নাচ দিয়ে, গান দিয়ে তার স্বামীর চিত্তবিনোদনের জন্যে। হেলমারের কাছে নোরা মূল্যবান খেলনার অতিরিক্ত আর কিছুই নয়। স্বামীর সংসার ত্যাগ করে যাওয়ার মুখে নোরা বলছে হেলমারকে: In all these eight years—longer than that—from the beginning of our acquaintance, we have never exchanged a word on any serious subject. আট বছর বিয়ে হয়েছে দু'জনের। এই আট বছরের মধ্যে নোরার সঙ্গে কোন গুরুতর বিষয় নিয়ে আলোচনার কথা হেলমারের মনে জাগে নি। সে ত ব্যক্তিকে ঘরে আনে নি, এনেছে বস্তুকে। হেলমারের নীড় ভাঙবার আগে পর্য্যন্ত সে বুঝতে পারছে না, স্ত্রীর প্রতি কত বড় অন্যায় করেছে সে। বলছে, No, No; only ban on me; I will advise and direct you. নারীজন্ম যেন পুরুষের ইচ্ছায় পরিচালিত হবার জন্যে। পুরুষ উপদেষ্টার আসন থেকে উপদেশ দেবে আর নারী সেই উপদেশ নিঃশব্দে শিরোধার্য্য করে চলবে। হেলমার নোরাকে কখনও বুঝল না। তাই বড় দুঃখেই নোরার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এসেছে: I have been greatly wronged, Trovald—first by papa and then by you. স্বামী বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে

জিজ্ঞাসা করল: 'বলছো কি! আমাদের দু'জনের মত এমন ক'রে আর কে ভালোবেসেছে তোমাকে?' মাথা নেড়ে নোরা উত্তর দিল: 'ভালোবাসে নি। বাপের বাড়ী যখন ছিলাম বাবা সকল বিষয়ে তাঁর অভিমত আমাকে শোনাতেন। আমার নিজের মত ব'লে আর কিছু রইল না। কোন বিষয়ে সায় দিতে না পারলে ব্যাপারটা তাঁর কাছ থেকে লুকোতাম। তাঁর থেকে স্বতন্ত্র কোন মত আমি পোষণ করি এটা তিনি পছন্দ করতেন না। আমাকে তিনি ডাকতেন তাঁর আদরের পুতুল বলে। আমি যেমন আমার পুতুলগুলি নিয়ে খেলা করতাম ঠিক তেমনি আমিও ছিলাম তাঁর খেলনা। এলাম তোমার ঘরে। বাবার হাত থেকে পড়লাম তোমার হাতে। তুমি নিজের রুচি অনুসারে সব কিছুরই ব্যবস্থা করতে। তোমার রুচি তাই আমার রুচি হয়ে দাঁড়াল। অথবা আমি তার ভান করতাম। ঠিক বুঝতে পারছিনে, কোন্‌টা ঠিক। এতদিন যে বাঁচলাম সে তোমাদের শুধু আমোদ দেবার জন্যে। তুমি আর বাবা আমার বিরুদ্ধে বিরাট অপরাধ করেছ। দয়া তুমি করেছ যথেষ্ট। But our home has been nothing but a play-room. I have been your doll-wife, just as at home I was Papa's doll-child; and here the children have been my dolls.

খেলাঘর ভেঙে দিয়ে নোরা যখন পথে পা বাড়াতে যাচ্ছে তখন সন্ত্রস্ত স্বামী প্রশ্ন করছে: "কিন্তু সর্ব্বাগ্রে তুমি কি স্ত্রী নও, মা নও?" মোক্ষম উত্তর দিয়েছে বিদ্রোহিনী স্ত্রী: 'আমি আর ওতে বিশ্বাস করি নে। আমি বিশ্বাস করি, সর্ব্বাগ্রে আমি একজন মানুষ যার বিচারবুদ্ধি আছে···যেমন তুমি একজন মানুষ।

হেল্‌মার নোরাকে যদি ভালোবাসত তাদের আট বছরের বিবাহিত জীবন এমন করে ভেঙে যেত না। যাকে ভালোবাসি তার ব্যক্তিত্বের মূল্যকে আমরা সানন্দে স্বীকার করি। তাকে দয়া করি নে, সম্মান করি; উপর থেকে করুণার হস্ত প্রসারিত করে তাকে অনুগৃহীত করি নে, তাকে দেবীর মর্য্যাদা দিই, মানুষ মানুষের কাছ থেকে মর্য্যাদাই তো চায়। যেখানে সেই মর্য্যাদা নেই, আছে শুধু অনুগ্রহ সেখানে আত্মা স্বভাবতঃই বলে, দরকার নেই তোমার ঐ ঔদার্য্যে; যেমন বলেছে ইবসেনের Pillars of Society-তে সেই মেয়েটি যাকে ইস্কুলমাষ্টার Rorlund বিয়ে করে অনুগৃহীত করতে চেয়েছিল: I am sick and tired of all this goodness!

যোগাযোগের মধুসূদন যেমন কুমুর ব্যক্তিত্বকে কোন মূল্য দেয় নি তেমনি ইব্‌সেনের A Doll's House-এর হেল্‌মারের কাছে নোরার ব্যক্তিত্বের কোন মর্য্যাদা নেই। দু'জনেই আপন আপন স্ত্রীকে খেলাঘরের পুতুল বানিয়ে রাখতে চেয়েছে। ফলে দু'জনেই বিদ্রোহ করেছে। হীরের আংটি দিয়ে কখন কুমুর মত নারীর মন চাওয়া যায়? সে মন পাওয়ার জন্যে সাধনা করতে হয়, নারীর ব্যক্তিত্বকে মর্য্যাদা দিতে হয়। আত্মকেন্দ্রিক মধুসূদন জানে শুধু নিজেরই মাথায় ফুল চড়াতে।

হেল্‌মার যদি সত্য সত্যই ভালবাসত নোরাকে তবে তার অপরাধ যত বড়ই হোক—স্ত্রীর সেই অপরাধকে সে ক্ষমা করত। এ কথা ঠিক যে নোরাকে বাপের নাম জাল করে টাকা সংগ্রহ করতে হয়েছিল। বাপ তখন মৃত্যুশয্যায়; স্বামীর স্বাস্থ্যের অবস্থাও খুবই শোচনীয়। ডাক্তারে পরামর্শ দিল স্বামীকে নিয়ে ইটালিতে চেঞ্জে যেতে। বায়ু-পরিবর্ত্তন ছাড়া স্বামীকে বাঁচান কঠিন। বাপের স্বাক্ষর জাল করে সে যত অপরাধই করে থাকুক —সে অপরাধের মূলে ছিল স্বামীর জীবনরক্ষার আগ্রহ। অপরাধের কথা যখন ফাঁস হয়ে গেল তখন স্ত্রীর প্রতি হেলমারের এত যে ভালবাসা সব নিমেষে উবে গেল। যে স্ত্রী তার সংসারকে এতদিন জুড়ে ছিল, যাকে সে আদর করে কত প্রিয় নামে ডাকত তাকে hypocrite, liar, criminal বলতে স্বামীর রসনায় একটুও বাধল না। এমন কি, এ কথাও স্ত্রীকে শুনতে হ'ল, নিজের ছেলে-মেয়েকে মানুষ করবার দায়িত্ব তার হাতে থাকবে না। সে কেবল বাড়ীতে থাকবে, মাত্র পরিবারের একজন হয়ে। নোরা আশা করেছিল, স্বামী আগিয়ে এসে স্ত্রীর কলঙ্কের বোঝা নিজের স্কন্ধে তুলে নেবে। বলবে, 'তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার গলায় পরিতে সুখ!'

এমন একজন আত্মকেন্দ্রিক মানুষকে ভালবাসা নোরার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই হেল্‌মারকে স্পষ্টই বলল: 'আমি আর তোমাকে ভালবাসিনে এবং ভালবাসা নেই বলেই এখানে আর থাকতেও পারি নে।' স্বামী বলল, 'নোরা, নোরা এখন নয়। কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর।' কিন্তু সে কথা নোরা কানে নিল না। বলল, I cannot spend the night in a strange man's room. যাকে ভালবাসিনে সে ত অপরিচিতেরই সামিল আর অপরিচিত পুরুষের ঘরে কোন মর্য্যাদাবোধ-সম্পন্ন ভদ্রমহিলা রাত্রিবাস করতে পারে? হেলমার যখন বলল, দরকারের সময়ে সে যেন সাহায্য করবার সুযোগ পায়, নোরা কঠিন হয়ে জবাব দিয়েছে, No. I

can receive nothing from a stranger. অপরিচিতের কাছ থেকে একজন মহিলা ত কিছু গ্রহণ করতে পারে না। স্বামী-স্ত্রীর এই কথোপকথনের মধ্যে শেষের দিকটায় নোরা দাঁড়িয়ে উঠেছে চলে যাবার জন্যে। সেই নাটকীয় মুহূর্তটিতে নোরার অন্তরের পুঞ্জিত ক্ষোভ এবং আত্মগ্লানি কি মোক্ষম ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে! নোরার মুখে ইবসেন যে কথাগুলি বসিয়েছেন তাদের বিপ্লবাত্মক গুরুত্ব নারী-পুরুষের সম্পর্কের নতুন বনিয়াদ রচনা করল। Trovald—it was then it downed me that for eight years I had been living here with a strange man, and had borne him three children—Oh, I can't bear to think of it! I could tear myself into little bits. আট বছর ধরে নোরা কার সঙ্গে বাস করে এসেছে? স্বামী বলে যার শয্যার অংশ গ্রহণ করেছে সে, যাকে সে উপহার দিয়েছে একে একে তিনটি সন্তান, যার জীবনরক্ষার জন্যে পিতার সই জাল করতে সে একটুও কুণ্ঠিত হয় নি সেই স্বামী ত কোন দিন তাকে ভালবাসে নি। নোরা স্বামীকে বলছে: You have never loved me, you have only thought it pleasant to be in love with me. 'তোমরা ত আমাকে কখনও ভালবাসো নি। শুধু মনে করেছ, আমাকে ভালবাসায় মজা আছে। যে ভালবাসে নি, তাকে দুরূহ কাজের কোন অংশ দেয় নি, কখনও কোন গুরুতর বিষয় নিয়ে তার সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হয়নি, স্ত্রীকে কখন বুঝবার চেষ্টা করেনি, তাকে নিয়ে শুধু পুতুল খেলা খেলেছে তার সঙ্গে দীর্ঘ আট বছর ধরে যে সংসার করলো! তার সন্তান গর্ভে ধারণ করতে কোথাও তার বাধলো না! ছিঃ, ছিঃ, নোরা কি করে পাঁকের মধ্যে এতদিন ধরে আকণ্ঠ ডুবে থেকেছে। তার আত্মাকে দিনে দিনে পঙ্কস্নান করিয়েছে। ভাবতেও পারা যায় না! নোরা যদি এই মুহূর্তে নিজেকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে পারতো!

কুমুর সঙ্গে মধুসূদনের সম্পর্ক বিবাহ-আসর থেকেই আড়ষ্ট! "বিবাহের সমস্তক্ষণ কুমুর দু'চোখ দিয়ে কেবল জল পড়েছে।" শুভদৃষ্টির সময় সে কি স্বামীর মুখ দেখেছে? হয়ত দেখেনি। মধুসূদনের সন্তান কুমুর গর্ভে এসেছে নারীজীবনের এত বড় একটা ব্যাপার কুমুকে কোন আনন্দই দিতে পারলো না। "মধুসূদনের সঙ্গে ওর রক্তমাংসের বন্ধন অবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, তার বীভৎসতা ওকে বিষম পীড়া দিলো।" যে-মেয়ের মনের মধ্যে সুতীব্র আত্মমর্য্যাদাবোধ আছে, শিক্ষা ও সংস্কৃতি যার বৌদ্ধিক জীবনকে উজ্জ্বল করে তুলেছে সে কখনও এমন একটা ইতর স্বামীকে ভালবাসতে পারে? কুমুর দেওয়া বরমাল্য কণ্ঠে পরেও মধুসূদন তাই আপন স্ত্রীর কাছে Strange man. নোরা আত্মকেন্দ্রিক স্বামীর সংসারে থাকতে অস্বীকার করেছে। কুমুই বা কোন লজ্জায় মধুসূদনের ঘরণী হতে রাজী হবে? "মধুসূদনের মধ্যে এমন কিছু আছে যা কুমুকে কেবল যে আঘাত করেছে তা নয়, ওকে গভীর লজ্জা দিয়েছে। ওর মনে হয়েছে সেটা অশ্লীল।" তাই কুমুকে নিতে এসে মধুসূদন যখন বলল, 'শূন্য ঘর কি ভাল লাগে?" তখন দৃঢ়তার সঙ্গে কুমু জবাব দিয়েছে: "আমি যাব না।" বিপ্রদাস বলছে কুমুকে: "তুই যদি অন্য মেয়ের মত হতিস্ তা হলে কোথাও তোর ঠেকত না। আজ যেখানে তোর স্বাতন্ত্র্যকে কেউ বুঝবে না, সম্মান করবে না, সেখানে সে তোর নরক।" 'ভালগার' মধুসূদনের বাড়ীতে কুমু স্বেচ্ছায় নরকবাস করতে যাবে কোন দুঃখে? স্বাধীনতা যেখানে নেই সেখানেই ত নরক। জগতটা তৈরী হয়েছে সব রকমের মানুষ দিয়ে। প্রত্যেকেই আপন আপন স্বাতন্ত্র্যে অনুপম। প্রত্যেকেই যদি নিজের নিজের সুরে ঠিকমত বাজে তবেই না Grand chorus সম্ভব! বৈচিত্র্য না থাকলে পৃথিবীতে জীবন বলে কিছু থাকত? সব একঘেয়ে! এক-রঙা! একই প্যাটার্ণের! ভাবতেও ভয়ে মনের ভিতরটা শির শির করে ওঠে। তাই ত কুমু দাদাকে বলেছে: "মিথ্যে হয়ে মিথ্যের মধ্যে থাকতে পারব না। আমি ওদের বড় বৌ, তার কি কোন মানে আছে যদি আমি কুমু না হই?" তুমি—তুমি, আমি চিরকাল ধরে আমি। তুমি কখনও আমি হবে না; আমিও তুমি হব না। মানুষে মানুষে এই যে মৌলিক পার্থক্য—শুধু মুখের চেহারেতে নয়, মনের চেহারেতেও—এই পার্থক্যকে অবলুপ্ত করে দিয়ে যখনই স্ত্রী স্বামীর মনের মত করে নিজেকে বানাবার চেষ্টা করে তখনই সেই অনুকরণের দ্বারা সে আত্মঘাতিনী হয়। অনুকরণই আত্মহত্যা। এমার্সন কি সাধে ঈর্ষাকে অজ্ঞতা এবং পরানুকরণকে আত্মহত্যা বলেছেন?

নোরা আর কুমু-দু'জনেই দাম্পত্য জীবনের খেলাঘরে স্বামীর পুতুল হয়ে থাকতে অস্বীকার করেছে। অস্বীকার করেছে কর্ত্তব্যের মুখোস-পরা দাসত্বের কাছে স্বাতন্ত্র্যকে বলি দিতে। হেলমার স্ত্রীকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করেছে তার পারিবারিক কর্ত্তব্যের কথা মনে করিয়ে দিয়ে। উত্তর পেয়েছে: I have other duties as sacred.

সর্ব্বপ্রকার মিথ্যার এবং কপটতার প্রতি ইবসেনের

ঘৃণা কি নিদারুণ! কি অপরিমেয় তাঁর সত্যানুরাগ! স্বাধীনতাকে এমন করে আর কয়জন ভালবাসতে পেরেছে? কার লেখনী-মুখে এমন করে স্বর্গের আগুন জ্বলে উঠেছে? হেভলক্ এলিসের একটা সুন্দর প্রবন্ধ আছে ইবসেনের উপরে। ঐ প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন: His work throughout is the expresion of a great soul crushed by the weight of an antagonistic Social environment into utterance that has caused him to be regarded as the most revolutionary of modern writers. একটা বিরাট প্রাণ নিয়ে ইবসেন এসেছিলেন। সামাজিক পরিবেশের মধ্যে দেখেছিলেন মিথ্যার পুঞ্জীভূত আবর্জ্জনা। আনতে চাইলেন অন্ধকূপের মধ্যে নববসন্তের হিল্লোল; যুগান্তরের নবারুণজ্যোতিঃ। Pillars of Society নাটকে নাগরিকেরা যখন বার্ণিককে অভিনন্দিত করল, বার্ণিক জবাবে বলল: 'তোমারা বলেছ যে, আমরা আজ রাত্রে একটা নূতন যুগের তোরণদ্বারে এসে দাঁড়িয়েছি। আমি আশা করব, এ যেন সত্য হয়। কিন্তু সেই যুগান্তরকে সত্য করে তুলতে হলে we must lay fast hold of Truth—truth which, till to-night has been altogether and in all circumstances a stranger to this community of ours. নূতন যুগের স্বপ্নকে ফলবান করতে চাও? বলছ সে নবযুগের দরজায় পৌঁছে গেছ? না, না; সত্যকে জোরের সঙ্গে আঁকড়ে ধরতে হবে। সেই সত্য আমাদের সমাজে আজও অপরিচিত আগন্তুক।"

ইবসেনের রসনায় সত্যবাক্য খর খড়্গের মতই জ্বলে উঠেছে। একটা পুরাতন যুগের সমস্ত কপটতাকে, সমস্ত ভীরুতাকে এবং সাধুত্বের সমস্ত ভানকে তিনি যাদুঘরের সামগ্রী করে রাখতে চেয়েছেন। প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিকূল সামাজিক আবেষ্টনীর জগদ্দল পাথরের নির্মম চাপে একটা সংবেদনশীল বিশাল আত্মা গর্জ্জন করে উঠেছে, ইবসেনের সাহিত্যে ক্ষুব্ধ মানবাত্মার সেই গর্জ্জন। Before all else I am a reasonable human being—এই ধরনের উক্তি তাঁকে দিয়েছে আধুনিক বিপ্লবী লেখকদের দলপতির সম্মান। ইবসেনের মত রবীন্দ্রনাথেও বিপ্লবের তূর্য্যধ্বনি। যোগাযোগে বিপ্রদাসের মুখে, স্ত্রীর পত্রে, মেজ বৌ মৃণালের কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ যে-সকল কথা বসিয়েছেন তার মধ্যে বারুদের গন্ধ, বিদ্যুতের ঝলকানি, তরবারির ঝনঝনা। রবীন্দ্রসাহিত্যে ইবসেনের ছায়া পড়েছে যথেষ্ট, এ কথা বললে কি তাঁকে ছোট করা হয়? নাটক লেখায় বার্ণার্ড শ ইবসেনের অনুকরণ করেছেন—এতে শ'য়ের অগৌরব কোথায়?

জলতরঙ্গ

ডক্টর শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায়

তেইশ বছর পর আবার দেখা হ'ল আমাদের।

দেখা হ'ল বাংলা দেশের বাইরে, এলাহাবাদে।

ছেলেবেলার বন্ধু হরিশ। দু'হাতে জড়িয়ে ধরে একগাল হেসে বলল, বেঁচে থাকলে দেখা হয় সত্যি?

হেসে জবাব দি, হয় বই কি। নিশ্চয়ই হয়। বেঁচে থাকলে অনেক অকল্পনীয় দেখাও হয়ে যায়।

—ছেলেবেলার কথা যখনই মনে পড়ে তখনই ভাবি হয়ত আর দেখা হ'ল না আমাদের।

বলি, তুমি আমি ভাববার কেউ নই ভাই। যিনি ভাববার তিনিই ভাবছেন। এলাহাবাদে তুমি যে আছ এ আমি শুনেছিলাম। কিন্তু এখানে আসবার আগে সে কথা ভুলে গিয়েছিলাম। এ একেবারে অভাবিত।

দেখা হয়েছিল পথে কিন্তু হরিশ আমায় টেনে নিয়ে এল একটি পার্কের ভিতর। শুনলাম পার্কটির নাম খসরু বাগ। সাহাজাদা খসরুর সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ আছে কি না জানি না। কিন্তু পার্কটি নয়নাভিরাম। ভারি শান্ত পরিবেশ!

হরিশ বলল, এমনটির দেখা বড় একটা কোথাও মিলবে না ভাই। এলাহাবাদে যখন এসেছ তখন দেখে যাও।

চারিদিকে দৃষ্টি মেলে মুগ্ধ হয়ে বলি, তুমি মিথ্যে ব'ল নি হরিশ; এমন অপরূপ পরিবেশ আমি জীবনে দেখি নি বড় বেশী। যা দেখেছি তার মধ্যে মনে হয়, এইটাই সংশয়াতীত ভাবে শ্রেষ্ঠ!

খসরু বাগকে সত্যই ভারী ভাল লাগল আমার। মনে হ'ল ওস্তাদ শিল্পীর চিত্র একখানি কে যেন চোখের সামনে তুলে ধরেছে। সাজানো ফুলের গাছগুলিতে কত যে বিচিত্র বর্ণের ফুলের বাহার, তা বলে শেষ করা যায় না। সযত্ন-রক্ষিত বাগান, নয়নানন্দ-দায়ক।

ভিড় নাই। যেটুকু আছে তা এ দেশীয় লোকেরই। আমাদের মত দর্শকের সংখ্যা নগণ্য। এদেরই মাঝে অপেক্ষাকৃত নিরিবিলি স্থানে স্থান করে নিলাম আমরা।

বাল্যকালের বন্ধু হরিশ, তাই বাল্য প্রসঙ্গই তুলল সে। তারই জের যখন কৈশোরকেঅতিক্রম করে যৌবনে এসে পৌছল, তখন যৌবনের মোহ যাকে ঘিরে, তার কথাও বাদ পড়ল না। প্রশ্ন করল হরিশ, এবার তোমার সখি-সংবাদ বল।

বিস্ময়ের ভান করে বলি, সে অবার কি?

—যিনি একাধারে ত্রয়ী—কখনও গৃহিণী, কখন সচিব, কখন মিথ, তাঁর খবরটা কি, বল?

নিশ্বাস ভেলে বলি, ত্রয়ী নয় ভাই, ব'ল, ত্র্যহস্পর্শ। এনাদের খবর কখনও মন্দ হয় না জেন।

হরিশ বলে, এ তোমার রাগের কথা ভাই। ভদ্রকন্যে ত্র্যহস্পর্শই বা হ'তে যাবেন কেন আর মন্দই বা হবেন কেন? বলি, হ'ল ক'বছর?

—শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আসাঢ়ে পেরুবে তেইশ।

হরিশ বিস্মিত হয়ে বলে, বল কি হে, তেইশ বছর? তেইশ বছর দেশছাড়া আমি?

—তা ত জানি না ভাই তোমার দেশছাড়ার তারিখ।

—তুমি জান না, আমি জানি। তোমার বিয়ের নেমন্তন্ন খেয়ে সেই যে দেশছাড়া হয়েছি, আজও ফিরে যেতে পারি নি সেখানে। আচ্ছা বলত, একটা কি গণ্ডগোল শুনে এসেছিলাম তোমার বিয়েতে। কনে নাকি বদল হয়ে গিয়েছিল শেষ পর্যন্ত।

বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠে। নিজেকে সামলে নিয়ে বলি, তেইশ বছরের পুরোন কাসুন্দি ঘেঁটে কি লাভ আছে ভাই?

—লাভ অনেক। পুরোন কাসুন্দি মজে ভাল। তার স্বাদই আলাদা। লজ্জা ক'র না। তুমি নিঃসঙ্কোচে বল, আমি শুনি।

বললাম, তোমার শোনার মধ্যে গলদ কিছু নেই হরিশ। কনে বদল হয় নি বটে, তবে সম্বন্ধটাই বাতিল হয়ে গিয়েছিল শেষ পর্যন্ত।

বল কি! একেবারে মুলেহাবাত। পছন্দ হয় নি বুঝি?

—এর চেয়ে বড় পছন্দ আর কখনও আমার হয় নি হরিশ।

—তবে?

একটু ম্লান হেসে বলি, অদৃষ্ট! ভোগৈশ্বর্যের মাধুর্য

সকলের ভাগ্যে জোটে না। আমার ভাগ্যেও জোটে নি। তাপসীকে পেলে হয়ত আমি ভোগী হতে পারতাম, কিন্তু হ'ল না।

হরিশ ঠাট্টা করতে যায়, তাপসীরা ভোগের ইন্ধন জোগায় না ভাই, তারা যোগায় ত্যাগের ইন্ধন।

—তাতেও সুখী হতাম আমি। তাপসীর সঙ্গে বনবাস সুখের ছিল। তার সৌন্দর্য যতখানি আমায় মুগ্ধ না করুক, তার মাধুর্য আমায় মুগ্ধ করেছিল অনেক বেশী; এমন চিত্তজয়ী আলাপচারী মেয়ে আমি দেখি নি।

—এত আলাপ হ'ল কি করে? প্রেম করেছিলে না কি?

—না। আলাপ আমাদের দু'দিনের। তাও টুকিটাকি আলাপ। তাইতেই সে চিত্ত জয় করে নিয়েছিল, শুধু আমারই নয়, বাড়ীর সকলের। বাপ-মা মরা মেয়ে নবদ্বীপে বাড়ী। বড় ভাই সুজয় ভট্টাচার্য যত্ন করে লেখাপড়া শিখিয়ে আই-এ পাস করিয়েছিল বোনকে। তখনকার দিনে আই-এ পাস মেয়ে দুষ্প্রাপ্য না হলেও সহজ প্রাপ্য ছিল না। তবুও ভাই তাকে নিয়ে এসেছিল আমাদের বাড়ী, নবদ্বীপে আমাদের যাওয়া অসুবিধে হবে বলে।

হরিশ বলে, একে ত দুষ্প্রাপ্য বলব না ভাই, বলব এ সহজপ্রাপ্য। বাড়ী বসেই তুমি তাকে পেয়েছিলে।

—পেয়েছিলাম সত্যি। তবে বড় স্বল্পস্থায়ী এ পাওয়া। কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী এর স্মৃতি। সেদিন খবর পেয়েছিলাম তাঁরা আসছেন। তাই আপিস থেকে বাড়ী ফিরলাম সকাল সকাল। জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে পর্দার ফাঁক দিয়ে প্রথম দেখলাম তাপসীকে। রেডিও-র পাশে বসেছিল—বাঁ হাতের ওপর ভর রেখে পা দুটিকে পিছন দিকে মুড়ে। বৈদ্যুতিক আলো পুরোপুরি ভাবে এসেছিল তার মুখের ওপর। ভারী মিষ্টি লাগল মেয়েটিকে।

—প্রথম দৃষ্টিপাতেই প্রেম?

—প্রেম ত বলি নি। বলেছি, ভাল লেগেছিল। তাপসীর মুখে মৃদু হাসি। রেডিও-র রেগুলেটরটিকে সে মাঝে মাঝে ঘোরাচ্ছিল ডান হাত দিয়ে। সামনে বসেছিল বৌদিদি। বুঝলাম, গল্প হচ্ছে দু'জনার। বৌদিদি বলছিল, তোমাকে ত ভাই গানভক্ত দেখছি খুব! তখন থেকে বসে আছ ঠায় রেডিও খুলে। ঠাকুরপো জানতে পেরেছিলেন বলেই তোমার জন্যে রেডিওটি কিনে আনলেন তাড়াতাড়ি। বলি, বিদ্যের সঙ্গে এ-চর্চাও চলে নাকি?

তাপসী হাসি মুখে বলে, সঙ্গীতও বিদ্যে দিদি।

বৌদিদি বলে, মুখ্য-সুখ্য মানুষ, অত সব জানি না ভাই। তবে তোমাদের দুটিতে মানাবে ভাল। ঠাকুরপোকে বলব, কলাবতী রাজকন্যে পেতে হ'লে নিরস কেমিষ্টের চাকরি, তোমায় ছাড়তে হবে। নইলে বনিবনাতি হ'বে না কলাবতীর সঙ্গে। অন্য চাকরির চেষ্টা দেখ এবার।

তাপসী নতমুখে বলে, কেমিষ্টের চাকরি ত খারাপ নয় দিদি। কেরাণীর চাকরির চেয়ে অনেক ভাল। সবাই এ চাকরি পায় না।

বৌদিদি বলে, কিন্তু কেমিষ্টের গায়ে যে বোঁটকা গন্ধ ভাই। সইতে পারবে ত? নাকে কাপড় চাপা দেবে না?

তাপসী বলে, আমাদের কলেজে ল্যাবরেটরী আছে। অনেকবার সে ঘরে ঢুকেছি। আমার ত তেমন কিছু খারাপ লাগে নি দিদি।

বৌদিদি উচ্চ কণ্ঠে হেসে ওঠে। বলে, এই রে, এবার রং ধরেছে মনে। কেমিষ্টকে চোখে না দেখেই মেয়ে মজেছে। এর পর দেখলে ত আর রক্ষে থাকবে না! একেবারে তলিয়ে যাবে।

ঠিক এই সময়েই ঘরের মধ্যে এসে ঢুকি। বৌদিদি বলে, এই যে গন্ধমাদন। গন্ধে গন্ধে এসে গেছ ঠিক! এখন নিজেরটিকে দেখে-শুনে বাজিয়ে নাও। আমাদের সেকেলের লোকদের কথা ত আর বিশ্বাস করবে না তুমি!

হাসি মুখে বলি, ওটি তোমার রাগের কথা বৌদি।

—রাগের কথাই ত। বাস্‌রে বাস্‌। আজকালকার ছেলেমেয়েরা হ'ল কি? বলে কি না, কেমিষ্টই আমার ভাল। আমি চাই না কেরাণী। গায়ের বোঁটকা গন্ধ এসেন্স দিয়ে ধুইয়ে নেব। শোন কথা মেয়ের।

বলি, এ সব অগ্রজাদের পদাঙ্ক অনুসরণ, বৌদি। আমার পূজ্যপাদ অগ্রজের সম্বন্ধে তোমারও নাকি ঐ রকম একটা ঐতিহাসিক উক্তি আছে শুনতে পাই।

বৌদিদি তৎক্ষণাৎ বীরদর্পে বলে, আছেই ত! জান ভাই বলেছিলাম, গোঁয়ার-গোবিন্দ আর মুর্খের ঘরে রাজ-রাণী সেজে বসে থাকার চাইতে বিদ্বানের ঘরে দাসীবাঁদী হয়ে থাকাও ভাল। কিছু অন্যায় বলেছিলাম কি? বৌদিদির মুখখানা গর্বে জল জল করে উঠে।

কিন্তু তাপসী লজ্জায় জড়োসড়ো মেয়ে যায়। বৌদিদি

তার মুখখানা দু হাতে তুলে ধরে বলে, উহুঁ, ওসব চলবে না এখানে। মুখ্যু মানুষ হলেও ও চালাকি আমরা বুঝি। তখন থেকে বসে আছ যার প্রতীক্ষায় ইনি সেই কেমিষ্ট মানুষ, সশরীরে উপস্থিত সম্মুখে তোমার। এবার তোমাদের বিশ্রম্ভালাভ সুরু হক। ঠাকুরপোর জন্যে আমি চা নিয়ে আসি ততক্ষণ।

বলি, এই জন্যেই তোমার নাম রেখেছি প্রিয়ম্বদা, বৌদি।

বৌদিদি যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে বলে, প্রিয়ম্বদা কি অনসূয়া সে বিচার করব পরে। এখন লতাকুঞ্জের অভাবে রেডিও-পার্শ্ববর্তিনী তাপসী শকুন্তলার প্রতি একটু দৃষ্টিপাত কর। প্রিয়তোষের দীর্ঘ অদর্শনে বেচারী ম্লান হয়ে উঠেছে এতক্ষণে।

প্রিয়ম্বদা বৌদিদি দরজার বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে ঘরের মধ্যে দক্ষিণা বাতাসকে আবাহন জানিয়ে গেলেন। তাই সঙ্কোচের জাড্যতা কাটিয়ে তাপসীকে সহজ ভাবেই বলতে পারলাম, ভারী ভাল মেয়ে বৌদিদিটি আমার। এমন দেখা যায় না সচরাচর।

এতক্ষণকার রুদ্ধ উচ্ছ্বাস তাপসীর যেন ফেটে পড়ে। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে, চমৎকার লোক। কত গল্পই না এতক্ষণ করছিলেন আমার সঙ্গে! যেন কত পরিচিত জন আমি তাঁর! এমন দিদি পাওয়াও ভাগ্য! আচম্বিতে কথাটা বলে ফেলেই তাপসী লজ্জায় মুখ নত করে।

বলি, সত্যিই তাই। কারোর দিদি হতে ওনার বাধে না। আপনার বেলায়ও বাধবে না দেখবেন। দু' দিনেই আপনার অন্তর জয় করে নেবেন।

তাপসী হয়ত তখনও সবটুকু সঙ্কোচে কাটিয়ে উঠতে পারে নি। তাই একটু চুপ করে থেকে নত কণ্ঠে উত্তর দেয়, আশ্চর্য নয়! এ পরাজয়ে আনন্দ আছে। তবে এ আনন্দ উপভোগ করবারও যোগ্যতা থাকা চাই। জিহ্বার ওপর সংযম হারিয়ে ফেলি। ফস্ করে বলি, এ আপনার আছে। দিদির ছোট বোন হবার পূর্ণ যোগ্যতাই আপনার আছে।

আমার উক্তিতে তাপসী আরক্তিম হয়ে উঠল কি শুধুই রক্তিম হয়ে উঠল, আলোর অপ্রাচুর্যে সঠিক বোঝা গেল না, তবে সে বেশ চঞ্চল হয়ে উঠল। প্রসঙ্গটাকে ঘোরাবার জন্যই বোধ হয় বলল, দাদা গেছেন অনেকক্ষণ। এখনও ত ফিরলেন না তিনি। রাত হয়ে যাচ্ছে অনেক।

তার ভ্রম সংশোধন করবার জন্য বলি, রাত অনেক হয় নি। ঘরের অন্ধকারের মধ্যে বাইরের আলোর খবর সঠিক এসে পৌঁছয় নি বলেই ভুল হয়েছে। আপনার এখন সবে ত্রি-সন্ধ্যে উত্তীর্ণ হয়ে রাতের আগমন সুরু হয়েছে। এখনও বেশী এগুতে পারে নি। আপনার যদি এখানে খুব বেশী অসুবিধে হয়ত আশে-পাশে তাঁর একবার খোঁজ-খবর করে দেখতে পারি।

তাপসী চকিতে মুখ তুলে বলে, না, না অসুবিধে হবে কেন? এখানে দিদি আছেন। তাঁর কাছে অসুবিধে কিছু নেই।

খুশি হয়ে বলি, দিদিকে চিনেছেন তাহলে। তাঁর কাছে সত্যিই কোন অসুবিধে হবে না আপনার।

বৌদিদি চায়ের ট্রে নিয়ে ঘরে ঢোকে। বলে, গুণিনীকে কি মৎলব দেওয়া হচ্ছিল গুণীর? কি হবে না শুনি?

ভাল মানুষ সেজে বলি, বলছিলাম যে, বৌদিটি আমার লোক ভাল নয়। খালি ঝগড়া নিয়েই ব্যস্ত। তার সঙ্গে বনিবনাতি হবে না আপনার।

তাপসী মুখে আঁচল চাপা দিয়ে লুটিয়ে পড়ে।

বৌদিদি বলে, হুঁ, এখন থেকেই ফুসমন্তর দেওয়া সুরু হয়ে গেল কানে কানে। রতনে রতন চিনেছে দেখছি। বিশ্রম্ভালাপে বাধা দিলাম, না? এখন পছন্দ হয় রত্নটিকে?

বৌদিদির শেষের প্রশ্নটিকে এড়িয়ে যাই। শুধু বলি, বিশ্রম্ভালাপ হল না বৌদি। বাদ সাধলেন দাদা।

বৌদি চকিত হয়ে বলে, তোমার দাদা এসেছেন নাকি?

অতি বিনয় প্রকাশ করে বলি, আমার নয়, ওনার। দাদার ভাবনাতেই অস্থির। বলেন, দাদা ফিরলেন না এখনও। বাড়ী যাবেন কি করে।

বৌদি বলে, কেন ভাই, জলে ত আর পড় নি এসে! এও ত তোমারই ঘর-কন্না। দু'দিন পরে না নিয়ে, দু'দিন আগেই না হয় বুঝে নাও না। আমি একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

তাপসী আরক্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু সহজ ভাবেই বলে, জলে পড়ব কেন দিদি? দিদির বাড়ীতে ছোট বোনের স্থান সব সময় ডাঙ্গাতে। কিন্তু দিদির নিন্দে করব, এত বড় নিন্দুক আমি নই। বলছিলাম, দাদা গেছেন অনেকক্ষণ, এখনও ফিরলেন না কেন তিনি।

বৌদিদি আমার মুখের দিকে তাকায়।

সপ্রতিভ মুখেই বলি, বিজ্ঞানী মানুষ বৌদি। চোখে

আমাদের এক্স্-রে দৃষ্টি। তাই অন্তরের হক্ কথাটা ধরতে পেরেছি।

বৌদিদি বলে, কি ভাই তাপসী, বিজ্ঞানীর না সুখ্যাতি তোমার পঞ্চমুখে। বলছিলে কেরাণীর চেয়ে বিজ্ঞানী ভাল। কেমন ভাল, এবার বোঝো হক্ কথাটা কেমন বলেছে বিজ্ঞানী।

তাপসী চট্ করে একবার আমাকে দেখে নেয়। তার পর মুখ টিপে বলে, সব বিজ্ঞানীই খারাপ নয় দিদি। মরুভূমির বুকেও মরুস্থান থাকে।

বৌদিদি প্রাণখোলা হাসি হেসে ওঠে। বলে, তুমি এক দণ্ডেই গোল্লায় গেছ তাপসী। মিথ্যুককে আবার সমর্থন করছ। ও হল মরুভূমির বুকে মরুস্থান?

একটু থামি। হরিশ তাগাদা দেয়, থামলে কেন? শেষটা কি হ'ল, বল, শুনি?

দম নিয়ে বলি, বলছি। মাত্র দু'দিন দেখা হয়েছিল আমাদের। তাইতেই বুঝেছিলাম, তাপসী যেমনি বুদ্ধিমতী, তেমনি শ্রীমতী।

—দু'দিনেই মজে গিয়েছিলে দাদা?

—মজবার মত জিনিস বটে ভাই! এমনটি আর দেখলুম না এ জীবনে।

হরিশ প্রশ্ন করে, এক দিনের কথা না হয় শুনলাম। আর একদিন দেখা হ'ল কি করে? সে দিনের কথাটা বল?

—সে দিন দেখা হ'ল দিদির করুণায়। নিমন্ত্রণ জানালেন তাপসীকে—নিজের ভাবী ভ্রাতৃবধূকে স্বচক্ষে একবার দেখবার জন্যে। এ নিমন্ত্রণ রেখেছিল তাপসী। আমার বৌদি-দূতী খবরটা পৌঁছে দিল আগেভাগেই। আপিস পালালাম সকাল সকাল। বাড়ী এসে তাপসীকে দেখতে পেলাম সেই রেডিও-র পাশটিতে, বসে আছে অনুরূপ ভঙ্গিমায়। বাইরে থেকেই দিদির স্বর কানে গেল, কি ভাই, ঘর বর পছন্দ হয়েছে ত?

তাপসী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, আপনাদের সব ঘরই বড় দিদি। অপছন্দ হবার কিছু নেই।

—আর বর?

এর উত্তর দিল বৌদিদি। বলল, ঘরের আগেই বর পছন্দ হয়ে গেছে ঠাকুরঝি। বলে, সাহারার বুকে ওয়েসিস্। মরুভূমিতে মরুস্থান।

দিদি বলে, বেশ বলেছ ভাই। ও যদি মরুদ্যান হয়, তা হলে আমিও বলি, তুমি হবে মরুদ্যানের বুকে ঝরণা। আমি আশীর্বাদ করি, ঝরণা হয়েই যেন চিরদিন বিরাজ করতে পার।

একটু নির্জনতার সুযোগ খুঁজছিলাম। পাবামাত্র তাপসীকে চুপি চুপি বললাম, ঝরঝরে ঝরণা আমি চাই না! আমি চাই ঝিরঝিরে ঝরণা।

হরিশ প্রশ্ন করে, এর উত্তর দিয়েছিল তাপসী? কি বলল সে?

—চোখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে সলজ্জে হেসে বলেছিল, তথাস্তু। ঝিরঝিরে ঝরণাই পাবেন। তার পরই বৌদিদিকে দূর থেকে আসতে দেখে চট্ করে সরে গেল এক পাশে।

ঝিরঝিরে ঝরণার প্রতীক্ষা করে দিন গুণছিলাম। বিবাহের আগের দিন—মনে মনে বলছিলাম, অদ্য শেষ রজনী। কাল এ প্রতীক্ষার সমাধি হবে। এমনি সময়ে সাধে বাদ সাধল।

—বাদ সাধল মানে? হরিশ প্রশ্ন করে বিস্মিত হয়ে।

—বলছি। প্রতুলকে ত তুমি জান? একটু পাগলাটে চেহারাটা। হাত দেখা একটা বাতিক ছিল তার। এক দিন আমার হাত দেখে বলেছিল, 'বিবাহ স্থানটা তোমার খুব শুভ দেখাচ্ছে না হে। তেমন সুখের হবে বলে ত মনে হয় না।' এত দিন পর একটু মুচকি হেসে মনে মনেই বললাম, এর চেয়ে বড় সুখ আর কি আমি আশা করতে পারি বন্ধুবর? কিন্তু মুখের হাসি আমার মুখেই মিলিয়ে গেল যখন দেখলাম এ রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেছেন স্বয়ং আমার মামা। অভাবী লোক। বিস্তর ঋণ করেছেন বন্ধুর কাছে। আর সেই ঋণ পরিশোধ করলেন তাঁর খঞ্জন নয়না মেয়েটিকে ভাগ্নের স্কন্ধে চাপিয়ে।

হরিশ বলে, কিন্তু ভাগ্নে রাজি হ'ল কেন?

উত্তর দি, না হয়ে উপায় ছিল না। অভাবী লোক যদি বিষয়ী হ'লে, তার বুদ্ধির শ্রীবৃদ্ধি হয়। মামা সব দিক আট-ঘাট বেঁধেই কাজ করেছেন। আমাদের অজ্ঞাতে নবদ্বীপে গিয়ে তিনি বিয়েটি ভণ্ডুল করে দিয়ে এসেছেন। তাপসীর বাবা অজয় ভট্টাচার্জিকে তিনি নাকি আগে থেকেই চিনতেন। লোকটা যেমনি ফন্দীবাজ, তেমনি ধড়িবাজ। লোক ঠকানই ছিল তাঁর একমাত্র ব্যবসা। তাঁরই ছেলেমেয়ে যে কখনও সৎ হতে পারে না এইটাই তাঁদের মুখের ওপর বলে বিয়ে বন্ধ করে এসেছেন। আর আমা হেন রত্নের বিবাহ স্থির করে এসেছেন তাঁর বন্ধু-কন্যা রত্নার সঙ্গে। তারা দেবে-থোবে ভাল আর জামাইয়েরও আদর-আপ্যায়নও হবে ভাল। অতএব—

—অতএব তুমি ঝুপ করে ঝুলে পড়লে ভাল ছেলেটির মত?

—নেহাত ভাল ছেলেটির মত নয় ভাই। হাত-পা একটু ছোঁড়বার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ব্যর্থ হ'ল সবই।

হরিশ অধৈর্য হয়ে বলে, কিন্তু ব্যর্থ করল কে?

—রূপেয়া। রূপেয়া শুধু রূপজয়ী নয়, চিত্তজয়ী, বিত্ত-জয়ী সব। চিত্ত জয় করল সকলের। তবে পারল না আমার আর বৌদিদির। বৌদিদি ছল ছল চোখে এসে বলে, মেয়েটা মনে ভারী আঘাত পাবে ভাই ঠাকুরপো! ঘর বর সবই মনের মত হয়েছিল তার। সে নিজে থেকেই আসতে চেয়েছিল আমাদের ঘরে। কিন্তু দেখছি তার আসা হ'ল না। এ সবই মামাবাবুর কারসাজি। বন্ধুর মেয়েটিকে পার করতে গিয়ে আর একটি মেয়ের সর্বনাশ করে বসলেন তিনি।

বৌদিদি মামাবাবুকে চিনেছিল ঠিকই। কাতর কণ্ঠে বললাম, এ সম্বন্ধ ভেঙে দাও বৌদি। বিয়ে আমি করব না।

কিন্তু আমার ক্ষীণ কণ্ঠের 'না' মামাবাবুদের প্রবল কণ্ঠের হাঁয়ের তলায় কোথায় যে তলিয়ে গেল নাগাল পেলাম না। তাই শেষ পর্যন্ত মামাবাবুরই মনোনীত পাত্রীটিকে বিয়ে করে সকলকে নিশ্চিন্ত করলাম।

—ষ্টুপিড! কচি খোকা! নাগাল পেলাম না। লজ্জা করছে না তোমার বলতে? একটা মেয়েকে পথে বসিয়ে উনি নিশ্চিন্ত করলেন সকলকে। কিন্তু মেয়েটার যে কি হ'ল তার খবর নিয়েছিলে একবার?

—রাধে মাধব! এর পর আর মুখ দেখাতে পারি তাদের কাছে। তবে অমন মেয়ের বিয়ে যে আটকায় নি এ আমি বলতে পারি জোর করে। তার পর একটি একটি করে তেইশটা বছর কেটে গেল, কিন্তু আজও তাকে ভুলতে পারি নি আমি। সেই স্নিগ্ধ মনোরম শ্যামল মূর্তিখানি এখনও উকিঝুঁকি মারে মনের মধ্যে। এখনও তার সেই মুখ টিপে অপরূপ ভঙ্গিমায় বলার স্বরটি কানে বাজে, মরুভূমির মধ্যেও মরুদ্যান থাকে দিদি। সত্যি বলছি হরিশ, এই তেইশটা বছর বিবাহিত জীবনে যে সুখটুকু আমি না পেয়েছি, তার চেয়ে অনেক—অনেক গুণ বেশী সুখ আমি পেয়েছি তার ঐ একটিমাত্র কথার মধ্যে।

পিছন থেকে মাঝে মাঝে একটা গুঞ্জন কানে ভেসে আসছিল। অস্পষ্ট রূপ বর্জন করে ক্রমশঃই সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। তাকিয়ে চিনতে পারি ছোট একটি বাঙালী পরিবার। মা ও গুটিকয়েক ছেলেমেয়ে ভ্রমণ-সুখ উপভোগ করছে ঠিক আমাদেরই পিছনটিতে বসে। মহিলাটি বর্ষিয়সী। মা জগদম্বারই দ্বিতীয় সংস্করণ। মেদভারে নিপীড়িতা এবং সেই জন্যই হয় ত হাঁপাচ্ছিলেন এতক্ষণ। দূর থেকে কর্তাটির আভাস পেয়ে ছেলেমেয়ে-দের হাঁক দিয়ে উঠে দাঁড়ান। হরিশ চিনল ভদ্রলোককে। বলল, মনোরঞ্জনবাবু। অনেক বছর ধরে এ সহরে আছেন। এখানকার বাঙালী সমাজের মামা বললেই চলে। এস, পরিচয় করিয়ে দিই তোমার সঙ্গে। পরিচয় হয়। ভারী অমায়িক ভদ্রলোক। পঞ্চাশোর্ধ বয়স। কিন্তু অন্তরে ছোট ছেলের মতই সরল। আলাপ করে খুশি হয়ে বাসায় ফিরে এলাম।

কিন্তু অতটুকু সামান্য আলাপে খুশি হতে পারলেন না মনোরঞ্জনবাবু। পরদিন সকাল বেলায় বাড়ী বয়ে এসে হাজির। বললেন, হরিশবাবুর মুখে শুনলাম কৃতি পুরুষ আপনি। আলাপ হওয়াতে ভারী আনন্দ পেলাম। এত দূর আমাদের মধ্যে যখন এসে পড়েছেন দয়া করে, তখন ছাড়ছি না। অন্ততঃ একটা দিনের তরেও সঙ্গসুখ পেতে চাই।

সঙ্গসুখ দিতে রাজি হই এবং সেই দিনই সন্ধ্যার পর এসে হাজির হই মনোরঞ্জনবাবুর বাড়ীতে। ভদ্রলোক বাড়ী ছিলেন না। খবর পেলুম, দিল্লী থেকে 'তার' এসেছে দুপুর বেলা। ভাগ্নে-ভাগ্নীর দল ছুটির অবকাশে দিল্লী থেকে ফিরছে কলকাতায়। এই সুযোগে মামার বাড়ীতে হৈ-চৈ করে যাবে ক'টা দিন। তাই মামাকে 'তার' পাঠিয়ে ষ্টেশনে থাকতে অনুরোধ জানিয়েছে আগে ভাগে।

মনোরঞ্জনবাবু ষ্টেশনে গেলেন বটে, কিন্তু এদিকের পাকা ব্যবস্থাই করে গেছেন তিনি। সুনিপুণা গৃহিণীর উপর ভার দিয়ে গেছেন অতিথিসেবার। খবরটা পাই ছোট ছেলের মুখে। সেই জানাল দিল্লী মেল আসবার সময় হয়ে এসেছে। বাবা ফিরবেন এক্ষুণি। মা বলে পাঠালেন আপনি বসুন, তিনি আসছেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই গৃহস্বামিনীর দর্শন পাই। দৃষ্টি-পাতেই চিনতে পারি গতকালের সেই মূর্তি। জগদম্বার সাক্ষাৎ সহোদরা। মেদ-ক্লিষ্ট বপু নিয়ে স্মিতাননে এগিয়ে আসেন মন্থর গতিতে। তার পর জোড় হাতে ছোট একটি নমস্কার সেরে দেহভারে সম্মুখস্থ নির্জীব চেয়ারখানিকে সজীব করে বলেন, খুব অসুবিধে হচ্ছে আপনার, তা একটু হবে। বিদেশে সব সুখ পাওয়া যায় না এক সঙ্গে। তবে যাবার সময় বার বার বলে দিয়েছি, পথে অনর্থক দেরী যেন না করেন। আপনি আসবেন, সুতরাং তাড়াতাড়ি যেন বাড়ী ফিরে আসেন।

বিনীত ভাবে বলি, অসুবিধের কথা ভাবছি না।

গৃহস্বামী নেই, স্বামিনী আছেন। সে দিক থেকে অনুষ্ঠানের ত্রুটি হবে না জানি, তবে গৃহস্বামীর দেখা পেলে খুসীই হব।

—হবেন। গৃহস্বামীর দেখাও পাবেন, খুসীও হবেন। তিনি এই এলেন বলে। না আসা পর্যন্ত অতিথির সব দায়িত্ব আমার। সুষ্ঠুভাবে এ দায়িত্ব পালিত না হলে নিন্দে হবে আমারই। গৃহস্বামিনী একটুখানি মিষ্টি হাসি হাসেন।

অপ্রতিভ ভাব দেখিয়ে বলি, দেখুন, আমার জন্যে কতখানিই না দুর্ভোগ আপনার। কাজের মানুষ, এ ভাবে আটকে থাকলে চলবে কেন ?

গৃহস্বামিনী স্মিতাননে বলেন, তা হক। অতিথি সেবাও কাজের একটা অঙ্গ।

হেসে বলি, আপনারা 'পরবাঁধা' পাখী। মুক্তি দিলেও নেবেন না।

গৃহস্বামিনীও হাসেন, নেব না কেন জানেন ?

ঘাড় নাড়ি। নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করি।

তিনি বলেন, ঐখানেই বোধ হয় আমাদের সত্যিকারের সুখ। আর ঐ বন্ধনের মধ্যেই হয় ত আমাদের যত কিছু জোর।

শুনে অবাক হয়ে যাই। বলি, মেয়েলী মনস্তত্ব মেয়েরাই বোঝে ভাল। এখানে পুরুষদের অনুপ্রবেশ শুধু অনধিকার চর্চাই নয়, বে-আইনী। কোথায় আপনাদের সুখ আর কোনখানে জোর এ পরম জ্ঞান আপনাদেরই থাক, ওর ভাগীদার হতে চাই না।

গৃহস্বামিনী এবার অমায়িক হাসি হাসেন। বলেন, আমরাও ভাগীদার খুঁজি না। ও আমাদের নিজস্ব জিনিস, আপনারা বুঝবেন না।

এইখানেই বুঝতে পারি গৃহস্বামিনীর আকৃতি এবং প্রকৃতির মধ্যে মিল নাই। আকৃতিটা শাঁসেজলে যতখানি পুষ্ট, প্রকৃতিটা সরলতায় ততখানি শিষ্ট। ভদ্রমহিলার কথার বাঁধুনী আছে। বুদ্ধিমত্তার পরিচয় আছে। মনে হয় এ রকম অতিথি সৎকার এই তার প্রথম নয়। নিত্যনৈমিত্তিকের ব্যাপার না হলেও এতে তিনি সবিশেষ অভ্যস্ত। মনোরঞ্জনবাবু এখানকার বাঙালী সমাজের একজন উচুদরের চাঁই। সুতরাং এ হাঙ্গামা যে তাঁকে মাঝে মাঝে পোহাতে হয় এ ব্যবহারেই বোঝা যায়।

কথার মাঝখানে বাধা পড়ে। মনোরঞ্জনবাবুর বছর দশেকের ছোট ছেলে অরুণ 'মা মণি' বলে ডেকে মায়ের কোল ঘেঁসে এসে দাঁড়ায়। তার পর মায়ের মাথাটিকে মুখের কাছে টেনে এনে ফিস্ ফিস্ করে কি কথা ব'লে কোন দিকে না তাকিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে যায় এক ছুটে।

স্নেহময়ী মা হাসেন। বলেন, পাগল ছেলে, ওর লজ্জার জ্বালায় আর বাঁচি না। মেয়েদের মত লজ্জা। খবর দিয়ে গেল, ষ্টেশন থেকে আমাদের ভুলো চাকর ফিরে এসেছে। দিল্লী মেল লেট আছে। উনি খবর পাঠিয়েছেন, যেন ওনার অনুপস্থিতিতে অতিথি-সৎকারের কোন ত্রুটি না হয়।

ব্যস্ত হয়ে বলি, তা হলে—?

গৃহস্বামিনী বলেন, এ বরং ভালই হ'ল। এক ঝাঁক লোক এসে পড়লে অতিথি-সৎকারে বিঘ্নই হ'ত। অতিথি-সৎকার হয়ে গেলে, এক ঝাঁক কেন, দু' তিন, চার ঝাঁক এলেও কোন ক্ষতি নেই।

চমৎকৃত হই ! এ মন্দ কথা নয়। অতিথি পর অথচ তার সেবাতে এঁর যতখানি আগ্রহ, নিকট আত্মীয়ের আগমনে ততখানি নয়। আত্মীয় হ'ল ঝাঁক, আর অনাত্মীয় আমি ? জানি না এ কোন ভাগ্যের খেলা !

অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা মন্দ হ'ল না। যাকে বলে ভুরি-ভোজন, এ তাই। বাংলা দেশের বাইরে এলে এত রকম সুরসাল খাদ্য, এ সত্যই দুর্লভ ! তাই মৌখিক অনিচ্ছাকে আশ্রয় করে, আর অন্তরের ইচ্ছাকে গোপনে প্রশ্রয় দিয়ে যখন ডিসের পর ডিসগুলিকে একের পর এক নিঃশেষিত করতে লাগলাম, তখন অতিথি পরায়ণা গৃহস্বামিনীও হয় ত মনে মনে চমৎকৃত হলেন আমার খাওয়ার বহর দেখে।

সুখাদ্যের ঘন ঘন অনুপ্রবেশে মুখবিবর নিশ্ছিদ্রভাবে পূর্ণ। সেখান দিয়ে নিরাকার শব্দ ব্রহ্মেরও বহির্গমনের পথ ছিল না। তাই গৃহস্বামিনীই এতক্ষণ আসর মাতিয়ে রেখেছিলেন একাই। এক সময়ে তিনি একটু ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন, বাঙালীর মেয়ে, বাংলা দেশ ছেড়ে সেই যে চলে এসেছি কবে, মনে পড়ে না। আবার যে কবে মুখ দেখব দেশের তাও জানি না। এমনি পোড়া চাকরি জুটেছে।

এ ক্লিষ্ট অন্তরের একটুখানি সহানুভূতি কামনা করা। সুতরাং নিশ্চুপ থাকা ভদ্রতা বিগর্হিত। তাই পরিপূর্ণ বিবরে কোন মতে একটা ছিদ্র করে নিয়ে বলি, কিন্তু এলাহাবাদ ত বাংলা দেশেরই মত। বাঙালীর অভাব ত এখানে কিছু নেই।

—তা নেই। উনিও সেই কথাই বলেন। কিন্তু বললে কি হবে, মায়ের সাধ কি সৎমায়ে মেটে, না, দুধের সাধ মেটে ঘোলে ? উনি ক্লাব, মিটিং, আর ফাংসন

নিয়েই মেতে আছেন। কিন্তু আমি থাকি কি নিয়ে। তাই মাঝে মাঝে বড় বিরক্ত ধরে যায় মনে।

বুঝতে পারি সব। প্রবাসী বাঙালীর অন্তরের ব্যথা, মা-হারা সন্তানের মতই মর্মন্তুদ। তাই চুপ করে থাকি।

গৃহস্বামিনী বলতে থাকেন, এক এক সময় মনে হয়, এ সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে দেশ থেকে ঘুরে আসি দিন কতক। কিন্তু যা সব আত্মীয়স্বজনের দল! ভুলেও খোঁজখবর নেয় না কেউ। আপনারা কিন্তু আছেন ভাল।

মুখে বলি, তা আছি। কিন্তু অন্তরে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠি। আত্মীয়স্বজনের ধার ধারি না বিশেষ। কিন্তু যিনি আত্মীয়েরও আত্মীয়, পরমাত্মীয়, তাঁর কথা স্মরণেই অন্তরে কাঁপন জাগে। হয় ত ভালই থাকতাম আর নির্বিবাদেই হাসিতে খুশিতে দিনগুলি কাটিয়ে দিতে পারতাম এই মনোরঞ্জনবাবুরই মত, কিন্তু ভাল থাকতে দিল না আমার এই পরমাত্মীয়টি। বিবাহের পর থেকে সুমধুরভাষিণীর সেই যে সুমধুর ভাষণ সুরু হয়েছে তাতে পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিতে পারলাম না আজও। চেরাপুঞ্জীর বৃষ্টির মত এ ভাষণ ঝরে পড়ছে যখন তখন। নির্মল আকাশ, মেঘের নামগন্ধ নাই। হাসিতে খুশিতে চারিদিক ঝলমল। এমন সময় সামান্য একটা কথায়, অথবা একটা ইঙ্গিতে, কোথা থেকে মেঘ উড়ে এল, আর সঙ্গে সঙ্গে এক পশলা বর্ষণ হয়ে গেল। পরমাত্মীয়াটি আমার সম্মুখোপবিষ্ট অনাত্মীয়াটির একেবারে বিপরীত ধর্মী। আকৃতিতে মন্দোদরী কিন্তু প্রকৃতিতে কম্বুকণ্ঠি। সরল কথাকে নীরস করবার মত বাহাদুরী তার মত আর কারো নেই।

ঠিক এই স্থানটিতেই ঘা দিলেন মনোরঞ্জন-গৃহিণী। বললেন, গৃহকর্ত্রীর সর্বাঙ্গীন কুশল ত?

বলি, শুধু কুশলই নয়। কুশলেরও বড় যদি কিছু থাকে তাই। একেবারে মহাকুশল।

—মানে?

—মানে, কাছে থাকলেই যত গণ্ডগোল, তা না হলেই কুশল। এখন শুধু গৃহ ছাড়া নই, দেশ ছাড়াও। সুতরাং মহাকুশল।

মনোরঞ্জন-গৃহিণী প্রাণ-খোলা হাসি হেসে ওঠেন। ভারী, সরল হাসিটি। মনে হ'ল, এ হাসি একেই মানায়। হরিশের মুখে শুনেছি, এদের ছোট সংসার। বেশ সুখের এবং শান্তির সংসার। এখানে সুখের যা কিছু আয়োজন, শান্তির যা কিছু প্রয়োজন সবই অনুষ্ঠিত হয় গৃহস্বামিনীর কর্তৃত্বে। মনোরঞ্জনবাবুর কৃতিত্ব ক্লাবে, মিটিংয়ে। গৃহ-গত ব্যাপারে স্ত্রীর উপর নির্ভরশীল। স্ত্রীও স্নেহশীলা জায়া, স্নেহশীলা মাতা। স্বচক্ষেই ত দেখলাম ছেলে আর মায়ের মধ্যে গভীর অপত্য-স্নেহটুকু। 'মা মণি' বলে ডেকে ছেলে এসে নিঃসঙ্কোচে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল মায়ের মাথাটিকে, তার পর টেনে আনল নিজের মুখের কাছটিতে। ভারী আনন্দদায়ক মনোরম দৃশ্য। এমনটি যে পরিবারে ঘটে, সে পরিবার শান্তির পরিবার, আনন্দের পরিবার।

গৃহস্বামিনীর প্রাণখোলা হাসিতে একটু যেন বেসামাল হয়ে পড়ি। ঈষদুত্তেজিত কণ্ঠে বলি, আপনি হাসছেন? সত্যি বলছি, জীবনটা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। এখন মর্মে মর্মে বুঝি বিয়ে করাটাই ঝকমারি হয়েছে। সে রাতে অমন তাড়াহুড়ো করে যদি না···মাঝপথে সম্বিত ফিরে পেয়ে থেমে যাই।

স্মিতমুখী গৃহস্বামিনী মুচ্‌কি হেসে বলেন, বিয়ের পর সব পুরুষের ঐ এক কথা। ঝকমারি হয়েছে বিয়ে করাটা। কেন করতে গেলাম এ কাজ! অথচ না করেও থাকতে পারেন না কিছুতেই।

ঘাড় নেড়ে বলি, সব পুরুষে এ কথা বলেন না। মনোরঞ্জনবাবু নিশ্চয়ই বলবেন না। ভারী লোভ হয় এমন সুন্দর সংসারটি দেখে। আর আমার? যেন চোর-দায়ে ধরা পড়ে গেছি আমি। যা কিছু দোষ সব আমার। সংসারে ছেলের চেয়ে মেয়ের আধিক্য বেশী, অতএব দোষ আমার। ছেলেমেয়েরা দজ্জাল, দোষ আমার। মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, দোষ আমার, অথচ কোন চেষ্টারই ত্রুটি নেই আমার দিক থেকে।

গৃহস্বামিনী প্রশ্ন করেন, মেয়ের বয়স হ'ল কত?

—আই-এ, পরীক্ষা দিয়েছে এবার। তাইতেই মহাভারত অশুদ্ধ। মেয়ের মুখের দিকে আর চাওয়া যায় না। আরে, আজকালকার দিনে এ কথা কি আর সাজে। ছিল আমাদের যুগে, যখন আই-এ পাশ করা মেয়ের কদরই ছিল আলাদা। অমন মেয়ে পেলে লুফে নিত সকলেই।

গৃহস্বামিনী ছোট একটি নিশ্বাসে আমার যুক্তিকে যেন খণ্ডন করেই বলেন, মেয়েদের অবস্থা সব যুগেই সমান। তখন আর এখনে কোন প্রভেদই নেই।

প্রতিবাদ করি জোর গলায়, কক্ষণও না। আমাদের যুগে অমন বৌ পেলে ছেলেরা ধন্য হ'ত। আর এখন আই-এ পাশ মেয়ে ছড়াছড়ি যাচ্ছে ঘরে ঘরে। ভাল পাত্র পাওয়াই দায়। তবু ত চেষ্টাচরিত্তির করে একটা সুপাত্র যোগার করেছি আমি। কথাবার্তা এক রকম পাস। এখন দু'হাত এক হ'লেই হয়।

গৃহস্বামিনী বলেন, মেয়ের বিয়ের যত দুর্ভাবনা ঐ

খানেই। শুভ কাজ যতক্ষণ না নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হচ্ছে ততক্ষণ স্বস্তি নেই। আমি জানি, আশীর্বাদ হয়ে গিয়েও অমন কত বিয়ে ভেঙে গেছে। আমাদেরই যুগের একটা মেয়ের কথা বলি। আই-এ পাস মেয়ে—তখনকার দিনে যাকে ছেলেরা লুফে নিত বলছিলেন—তারই বিয়ে ভেঙে গেল আশীর্বাদের পর। পাত্রপাত্রী সব পছন্দ। কথাবার্তা একদম পাকা। এমন সময় হঠাৎ—আচ্ছা, শুনেছি আপনি কলকাতার হালদার পাড়ার লোক। সেখানকার অবিনাশ হালদারের নাম শুনেছেন?

নাম শুনে বুকের ভিতরটা ধক্ করে উঠে। পিতাঠাকুরের সুপ্রসিদ্ধ নাম। অবশ্য তিনি গত হয়েছেন বছর তিরিশ পূর্বে কিন্তু অদ্যাপি হালদার পাড়ায় তাঁর নাম জানেন না এমন কেউ নেই। তাই গৃহস্বামিনীর প্রশ্নে বিশেষ কৌতূহল অনুভব করি। তবে আসল কথা প্রকাশ না করে পাল্টা প্রশ্ন করি, বিলক্ষণ! স্বনামধন্য পুরুষ তিনি। কিন্তু কেন বলুন ত?

—এ তাঁরই বংশের কেলেঙ্কারী। এমন অভদ্র-বংশ আমি দেখি নি।

আকর্ণ নাসাগ্র পর্যন্ত লাল হয়ে উঠে। আমারই বংশের অসম্মান আমারই মুখের উপর? কিন্তু আসল ব্যাপার না জেনে প্রতিবাদ করতে পারি না। তাই তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে।

মনোরঞ্জন-গৃহিণী বলে চলেন, তেইশ বছর আগেকার কথা। হালদার পাড়ার অবিনাশ হালদারের ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির হয়েছিল নবদ্বীপের অজয় ভট্টাচার্যের মেয়ে তাপসীর। বাপ-মা মরা মেয়ে। আই. এ. পাস করেছে সেই বছর। বড় ভাই সুজয় ভট্টাচার্য অনেক কষ্টে মানুষ করেছেন স্নেহের এই বোনটিকে। ভাল ঘরে, ভাল বরে বিবাহ দিয়ে বোনটিকে সুখী করতে চান তিনি। পাত্রের সন্ধান পেলেন কলকাতায় হালদার পাড়ায় স্বর্গীয় অবিনাশ হালদারের ছেলের।

দম বন্ধ হয়ে এসেছিল আমার। মনে হ'ল কে যেন গলা টিপে ধরেছে প্রাণপণে। কথা বলতে পারি না বটে কিন্তু কান সজাগ হয়ে শোনে গৃহস্বামিনীর কথা—সুপাত্র, সুতরাং তাপসীর দাদাই তৎপর হয়ে উঠলেন এ বিষয়ে। নবদ্বীপ থেকে বোনকে ঘাড়ে করে হালদার পাড়ায় নিয়ে এলেন দেখাতে। একদিন নয়, দু'দিন। পাত্রপাত্রী পছন্দ হ'ল দু'পক্ষেরই।

থাকতে না পেরে রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করি, পাত্রীর পছন্দ হয়েছিল পাত্রকে?

মনোরঞ্জন-গৃহিণী একটু হাসেন। বলেন, জানি না। তবে না হবার কিছু ছিল না। কেরাণী বর নয়, কেমিষ্ট বর, সম্মানের চাকরি। যেমনটি সে চেয়েছিল মনে মনে ঠিক তেমনিটি। ঘরও পছন্দ হয়েছিল তার। তবে সব চেয়ে পছন্দ হয়েছিল যাঁদের তাঁরা পাত্রের দিদি আর বৌদিদি। এমন স্বভাব-সুন্দর মানুষ তাপসী দেখে নি জীবনে। তাই এমন স্বজন পাবে বলে সে অসংখ্যবার মাথা ঠেকাল তার ঠাকুরের কাছে। আর খুশিতে ডগমগ হয়ে মনের গোপন কথাটি জানিয়ে এল তার ভাবী জায়ের কাছে।

—তার পর? গৃহস্বামিনীকে থামতে দেখে প্রশ্ন করি।

—কথাবার্তা সব ঠিক। আশীর্বাদও হয়ে গেল নির্দিষ্ট দিনে। তাপসী রোমাঞ্চিত কলেবরে তাকিয়ে রইল হালদার পাড়ার সেই ঘরখানির দিকে, যাকে সে পেতে চেয়েছে আপন করে। কিন্তু সাধে বাদ পড়ল বিয়ের আগের দিন দুপুর বেলায়।

—কারণ? কারণ আমার অজানা নয়। তবুও প্রশ্ন করি জোর করে।

—পাত্রের মামা। একেবারে শকুনি মামা, আকৃতি এবং প্রকৃতিতে। বলে, অজয় ভট্টাচার্যকে আমি চিনি। তারা তিন পুরুষে ডাকাত। চুরি আর জোচ্চুরি তাদের ব্যবস্থা। তারা দেবে ত্রিশ ভরি সোনা আর নগদ আড়াই হাজার টাকা। খাট, বিছানা, ড্রেসিং টেবিল! এ বিশ্বাস করব আমি! সব জোচ্চুরি। গিল্টি করা গয়না দিয়ে মেয়েটিকে পার করতে চাও তোমরা! দাগী-বংশের মেয়ে বেদাগী হতে পারে না কখনও। আমি পুলিশ ডাকব। হাতে দড়ি দিয়ে তবে ছাড়ব। অমন সোনার চাঁদ ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে চাও এই কাল-পেঁচা মেয়ের! বামন হয়ে চাঁদে হাত!

গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। তবুও কোন মতে বলি, অসভ্য কোথাকার! সেকেলে বর্বরতা। আমার কি মনে হয় জানেন, পাত্র স্বয়ং এত কথা জানত না নিশ্চয়ই। জানলে তার শিক্ষিত মন এতখানি ইতরতার প্রশ্রয় দিত না কখনই। কিন্তু এর পর কি করলেন তাপসীরা?

—তাপসীর দাদা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। তাকে ডেকে বলেন ও ঘরে তোর বিয়ে দেব না, তাপসী। এতে তোর বিয়ে হউক আর নাই হউক। মাতুল বংশের পরিচয় যাদের এই সে বংশ কখনও ভদ্র বংশ হতে পারে না। আমি বিয়ে ভেঙে দেব এখুনি।

তাপসীর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। অসহায় কণ্ঠে ডাকে, দাদা!

দাদা বলেন, না বোন তুই ভাবিস না। আমার সর্বস্বের বিনিময়েও আমি তোর ভাল বিয়ে দেব। কিন্তু ওখানে নয়। অভদ্রতার বদলে অভদ্রতা প্রকাশের শিক্ষা বাবা আমাদের দেন নি। তবে শকুনি মামাকে বাইরে যাবার পথটা দেখিয়ে দিয়ে আসছি এখুনি।

বিয়ে ভেঙে গেল। কিন্তু তবুও তাপসী অপেক্ষা করে বসেছিল তিন দিন। ভেবেছিল শেষ পর্যন্ত একটা কিছু অচিন্তনীয় ঘটে যাবে নিশ্চয়ই। হয়ত ছুটে আসবে পাত্র স্বয়ং অথবা তার দিদি বৌদিদি এঁরা সব। তার পর ভুল ভাঙা-ভাঙির পালার পর একটা অনাবিল আনন্দ-স্রোতের মধ্য দিয়ে নাটকের পরিসমাপ্তি হবে মিলনান্তে।

সব কিছু আমার কাছে বিস্বাদ হয়ে গেল। ভোজ্য বস্তুগুলি উৎকট তিক্ত রসে সিক্ত হয়ে উঠল। কণ্ঠনালী কখন যে রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল বুঝতে পারি নি। শত চেষ্টা করেও একটা স্বর ফুটিয়ে তুলতে পারলাম না সেখানে। এমন কি একটু ঢোঁক গিলেও সেটাকে পরিষ্কার করে নিতে সক্ষম হলাম না কোনমতে। তাই অসহায়ের মত তাকিয়ে রইলাম গৃহস্বামিনীর মুখের দিকে।

মনোরঞ্জন-গৃহিণী হয়ত আমার মনস্তত্ত্ব বুঝতে পারেন নি, তাই তিনি বলে চললেন, কিন্তু হ'ল না কিছুই। তাপসীর বুকভরা আশা নিরাশায় পর্যবসিত হ'ল। হতাশায়, অপমানে সে গিয়ে খিল দিল দোরে। গৃহস্বামিনী থামেন। তার পর সরাসরি আমাকে প্রশ্ন করেন, আচ্ছা বলুন ত, তাপসীর কি অন্যায় হয়েছিল এটুকু প্রত্যাশা করা? ছেলে ত জেনেছিল মেয়ের মনোভাব! তবে এ বিষয়ে কি কোন কর্তব্যই ছিল না তার? জীবনের যা শ্রেষ্ঠ ঘটনা, সে কি শুধু তামাসা? এই যে জীবনের এত বড় অপচয়, এর কি প্রতিষেধক ছিল না কিছু? একটু সমবেদনার্থ অন্তর, একটু অনুসন্ধিৎসু-প্রবণ মন হলেই হয়ত মিটে যেত সব। এই প্রশ্নটাই সেদিন তাপসীর অন্তরে জেগেছিল বার বার। গিল্টির গয়না দিয়ে দাদা করবেন স্নেহের বোনকে প্রতারণা? এত নীচ, এত অনুদার তিনি ছিলেন না। আর অজয় ভট্টাচার্যকে নবদ্বীপে কে না চেনেন? তাঁর বংশ-মর্যাদা প্রায় ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। এ খবরটাও নিতে কার্পণ্য করল তারা শুধু কতগুলো টাকার লোভে। এত বড় স্বার্থপর, জঘন্য মনোবৃত্তিসম্পন্ন ঐ হালদার বংশের লোকেরা। তাই ত বলছিলাম, মেয়ের ঝামেলা অনেক। কথাবার্তা পাকা হলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না।

আমার মাথার উপর এক সঙ্গে শত শত দুরমুষের সুরু হয়ে গেল। বুকের উপর তিন টনী ভারী রোলার চেপে বসল কয়েক মুহূর্ত মধ্যেই। নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে এল। আমারই বিগত জীবনের বিচিত্র কাহিনী শুনলাম বিদেশে এক অপরিচিতা মহিলার মুখ থেকে। এত দিন এ ইতিহাসের একটা দিকই আমার জানা ছিল। এখন দুটো দিকই উন্মুক্ত হয়ে গেল। তেইশ বছর আগেকার বৌদিদির অশ্রুপূর্ণ কণ্ঠস্বর আবার শুনতে পেলাম, এ সবই মামাবাবুর কারসাজি। বন্ধুর মেয়েটিকে 'পার' করতে গিয়ে আর একটি মেয়ের সর্বনাশ করে বসলেন তিনি। বৌদিদি মানুষ চিনতে ভুল করেন নি।

হরিশকে কাল যে ইতিহাস শুনিয়েছিলাম, সেটা ছিল আমার। আজ যা শুনলাম সেটা তাপসীর। এতদিন যে সংশয় মনের কোণকে অধিকার করে বসেছিল আজ তা নিঃসংশয় হয়ে গেল। আজ সর্বপ্রথম মনে হ'ল, ভুল, মহাভুল করেছি আমি। তাপসীদের কথা তাদের মুখ থেকে না শুনে কোন সুনির্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করা উচিত হয় নি আমার। সেদিন যদি সকল সঙ্কোচের বেড়া ডিঙিয়ে একবার ছুটে যেতাম তাদের কাছে, হয়ত আজ জীবনের ধারাটাই যেত পাল্টে। কিন্তু নিয়তি অমোঘ, অদৃষ্ট অপরাজেয়।

খাবারের পিণ্ড আর কণ্ঠনালী ভেদ করে নামবার পথ খুঁজে পায় না। জিহ্বা আর তালু অসহযোগিতা সুরু করে দেয়। সুতরাং ভোজ্যবস্তু অস্পৃশ্য পড়ে থাকে।

মনোরঞ্জন-গৃহিণী ব্যস্ত হয়ে পড়েন। বলেন, বাঃ, বেশ লোক ত আমি! শুধু গল্প করেই চলেছি। এ দিকে অতিথি যে কিছু খাচ্ছেন না সেদিকে লক্ষ্য নেই আমার!

বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতখানাকে আড়াল করে বলি, মাপ করবেন। সাধ্য যা, করেছি। অসাধ্য সাধনে অনুরোধ করবেন না। পেটের ওপর অবিচার সয়, কিন্তু অত্যাচার সয় না।

মনোরঞ্জন-জায়া নিরস্ত হ'ল। বলেন, তবে থাক। অত্যাচারের পক্ষপাতী আমিও নই। আপনি ততক্ষণ হাতমুখ ধুয়ে নিন, আমি পান নিয়ে আসি বরং। আচমন পর্ব সমাপ্ত করে অস্থির হয়ে পড়ি। এখান থেকে পালাবার ফিকির খুঁজি। চঞ্চল চোখে এদিক ওদিক তাকাতে গিয়ে বাঁদিকের দেওয়ালে টাঙান একখানা

সুদৃশ্য ছবির উপর চোখ থমকে দাঁড়ায়। দৃষ্টি আপনা থেকেই কুঞ্চিত হয়ে উঠে। বুকের ভিতর সঘন নিশ্বাসকে আটক রাখা যায় না। মনে হয় হাপরও বুঝি এর কাছে নিষ্প্রাণ। তাড়াতাড়ি নিজেকে ছবিখানির ঘন সান্নিধ্যে টেনে এনে তার উপর হুমড়ি খেয়ে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে দেখি। এ আমার কল্পনা বা দৃষ্টি বিভ্রম নয়। এ তাপসীর ছবি। বিহ্বল হয়ে পড়ি। আজ চারিদিক থেকে তাপসী আমায় ঘিরে ধরেছে। এখানেও দেখি তাপসী, দাঁড়িয়ে আছে অনুপম ভঙ্গিতে। হাতে এক-রাশ ফুল। মাথায় ফুলের গুচ্ছ। মুখে উপচীয়মান পরিতৃপ্তির হাসি। পাশে দাঁড়িয়ে আছেন আমারই দিদি। মনে পড়ে যায়, তেইশ বছর আগে এ আমারই তোলা ছবি। দিদিকে পাশে রেখে সেদিন তাপসীর ছবি তুলেছিলাম অনেক কৌশল করে। ফুলের তোড়া কিনে এনেছিলাম আপিস থেকে ফেরবার পথে। তারই কয়েকটি গুচ্ছ বৌদিদি পরিয়ে দিয়েনিলেন তাপসীর মাথায়। তাকিয়ে তাকিয়ে অবাক হয়ে যাই। মনে হয়, তেইশ বছর আগেকার সেই অপরূপ বৈকালটি আবার যেন ফিরে এসেছে আমার কাছে। সেই রিণরিণে কণ্ঠস্বর, দিদিকে লুকিয়ে সেই ছোট ছোট চোরা চাহনী, কারণে অকারণে সেই উপচে পড়া মিষ্টি হাসিটি, সব যেন ভেসে উঠল চোখের সামনে।

অকস্মাৎ এক কাণ্ড করে বসি। ছবিখানাকে ছু'হাতে তুলে ধরতে যাই। ঠিক সেই সময়ে গৃহস্বামিনী ঘরে এসে ঢোকেন। হাত সরিয়ে নিই বটে, কিন্তু ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রশ্নভরা চোখ মেলে তার মুখের দিকে তাকাই। এ দৃষ্টির ভিতর দিয়ে কি প্রশ্ন মূর্ত হয়ে উঠেছিল জানি না, কিন্তু উত্তর দিলেন গৃহস্বামিনী, বিশ্বাস করবেন না নিশ্চয়ই, কারণ কেউ-ই সহজে এ কথা বিশ্বাস করতে চায় না। কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন, ও ছবি আমার। তেইশ বছর আগে আমার বিয়ের কিছু দিন পূর্বে ও ছবি তুলেছিলাম আমার এক পাতান দিদির সঙ্গে। তার পর তেইশ বছর ধরে এই কাঠখোট্টার দেশে বাস করে আর বসে বসে খেয়ে খেয়ে এমনিই মুটিয়ে উঠেছি যে, কেউ-ই বিশ্বাস করতে চায় না যে, একদিন ঐ রকম চেহারার অধিকারিণী ছিলাম আমি। বলতে বলতে গৃহস্বামিনীর গলাটা যেন একটু ভারী হয়ে আসে এবং মনে হয় তার চোখের কোল দুটিও যেন মুহূর্ত তরে চকচকিয়ে উঠে। কিন্তু চকিতে মুখখানিকে ফিরিয়ে নিয়েই তিনি বলে উঠেন, ঐ যাঃ, পান নিয়ে এলাম বটে, কিন্তু চুণ আনতে ভুলেছি। একটুখানি অপেক্ষা করুন, এই এলাম বলে।

কিন্তু এর পর অপেক্ষা করবার মত মনের সাহস বা ধৈর্য কোনটাই আমার রইল না। ছবিখানিকে আর একবার দেখে নিয়ে মনোরঞ্জনবাবুর ছেলেকে ডেকে বললাম, তোমার মাকে বল খোকা : বড় জরুরী কাজে আমায় চলে যেতে হ'ল এক্ষুণি, কিছু যেন মনে না করেন তিনি।

উর্দ্ধশ্বাসে বেরিয়ে এলাম এবং সেই রাত্রেই তল্পী গুটিয়ে পাড়ি দিলাম ষ্টেশনের উদ্দেশ্যে। দিল্লী মেল হয়ত এতক্ষণে চলে গেছে। কিন্তু তার পরই আছে বম্বে মেল, তার পর তুফান মেল।

আধুনিক আরবী সাহিত্য

রেজাউল করীম

দুটো ইউরোপীয় মহাসমর সমগ্র আরব-জগতকে প্রচণ্ড ভাবে আলোড়িত করে তুলেছিল। প্রথম মহাসমর তাকে মুক্ত করল চারশ' বছরের তুর্কিশাসন থেকে, আর দ্বিতীয় মহাসমর তাকে মুক্ত করল পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে। রাজনৈতিক মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে আরব-জগতের উপর বইতে লাগল নূতন যুগের হাওয়া। পর পর কয়েকটি বিপর্য্যয়ের ধাক্কায় সে-দেশ প্রবল ভাবে কেঁপে উঠল। মধ্যযুগীয়, জড়তা, ধর্ম্মান্ধতা, রক্ষণশীলতা—এসব অপসারিত হতে লাগল। সর্ব্বক্ষেত্রে পরিবর্ত্তনের আভাস পাওয়া গেল। এই পরিবর্ত্তন কেবল রাজনীতি ক্ষেত্রেই নয়—সর্ব্ব ক্ষেত্রে—শিল্পে সাহিত্যে ও চিন্তাধারায় একটা বিপুল পরিবর্ত্তন অনুভূত হতে লাগল। আরবী-সাহিত্যের প্রাচীন রীতি-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন সাধিত হ'ল। এবং শিল্পী, লেখক ও সমালোচকগণ অসীম সাহসের সহিত নূতন যুগকে অভিনন্দন জানালেন। তাঁরা আর সে মান্ধাতার আমলের চিরাচরিত পথে চলতে সম্মত হলেন না। তাঁরা যুগের প্রয়োজনের সঙ্গে নিজেদের শিল্প-কৌশলেরও পরিবর্ত্তন করে ফেললেন। অবশ্য সাহিত্যের গতি পরিবর্ত্তন দু'একদিনে হ'ল না। একশ বছর ধরে আরবী-সাহিত্যের শিল্পী ও লেখকগণ পশ্চিম দেশের ভাবধারার সংস্পর্শে এসেছিলেন। তখন থেকেই আরবী-সাহিত্য পশ্চিমী সাহিত্য-রীতির দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিল। মহাসমরের পর আরবী-সাহিত্য রক্ষণশীলতা পরিত্যাগ করে চাঙ্গা হয়ে উঠল। কি ভাবে ও কেমন করে, আরবী-সাহিত্য আধুনিক রূপ পেল, তার কিঞ্চিৎ আভাস দিবার চেষ্টা করব, এই প্রবন্ধে। ডাঃ এ. কে. জুলিয়াস জেরগেনাস আরবী-ভাষায় সুপণ্ডিত। তাঁর একটি প্রবন্ধ থেকে এই আলোচনায় প্রচুর সাহায্য নিয়েছি। সেজন্য তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ।

আধুনিক আরবী-সাহিত্যের রূপান্তর আরম্ভ হয়েছিল, নেপোলিয়নের মিশর আক্রমণের যুগ থেকে। এই দিগ্বিজয়ী বীর যখন কিছুদিন মিশরে ছিলেন, তখন তিনি সঙ্গে করে এনেছিলেন কয়েকজন প্রাচ্যভাষাবিদ্ ফরাসী পণ্ডিতকে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, এঁদের সাহায্যে মিশর-বাসীকে শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করে তুলা। একথা সত্য যে, মধ্য যুগে মুসলীম পণ্ডিতগণ তাঁদের চিন্তাধারা ইউরোপকে দিয়েছিলেন এবং তার ফলে ইউরোপ মহা-দেশের বহু লোকের মনে স্বাধীন অনুসন্ধানের আগ্রহ জাগ্রত হয়েছিল। কিন্তু তার পরে মুসলীম-সমাজে এল এক জড়তা। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি তাদের আগ্রহ কমে এল। আর অপর দিকে ইউরোপে জেগে উঠল নূতন জীবন। পশ্চিমদেশ মধ্যযুগের পর বহু বিষয়ে বহু প্রকার উন্নতিলাভ করল। আরব-জগতের বুকে নেমে এল অজ্ঞানের অন্ধকার। এই অবস্থায় পশ্চিমদেশ আরব দেশে আনতে লাগল তার নবলব্ধ জ্ঞান-গরিমা। এই ভাবে পশ্চিমদেশ আরবদের নিকট তার ঋণ পরিশোধ করল। পশ্চিম আরবকে দিল নবযুগের জ্ঞান। ফলতঃ, ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে অদ্যাবধি পশ্চিমদেশ পূর্ব্বাঞ্চলকে নানা ভাবে জ্ঞানদান করে আসছে।

নেপোলিয়ন বেশীদিন মিশরে থাকতে পারলেন না। তাঁর মিশর পরিত্যাগের পরেও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ব্যবস্থা বন্ধ হ'ল না। তার ফলে মিশরে একটা নূতন ধরনের আরবী-সাহিত্য গড়ে উঠতে লাগল। সে আরবী-রচনার ষ্টাইল একেবারে নূতন, তার বিষয়বস্তু নূতন এবং জীবন সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গিও নূতন। পশ্চিমদেশের সহিত নিকটতর সম্পর্ক স্থাপনের ফলে এটা সম্ভব হয়েছিল।

সাধারণতঃ, আরবা কবিতা—কাসিদা এবং গজল—এই দু'প্রকার রীতিতে লিখিত হয়। কাসিদা হচ্ছে শোকগাথা আর সাধারণ কবিতার রীতির নাম গজল। ইউরোপীয় প্রভাবের পরেও কাসিদা ও গজল রীতিই অক্ষুণ্ণ থাকল। কিন্তু তাদের বিষয়বস্তু আধুনিক হয়ে পড়ল। কঠিন, কঠিন, বাছাই বাছাই শব্দসমন্বিত আড়ম্বরপূর্ণ ভাষা বর্জ্জিত হতে লাগল। লেখকগণ অধিক-তর আগ্রহের সঙ্গে অনুভূতি (sentiment) ও আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। জাতীয় চেতনা, স্বাধীনতার প্রতি আগ্রহ আরব কবিদেরকে উদ্বুদ্ধ করে তুলল। বিগত যুগের গৌরবময় ঐতিহ্যের স্মৃতি কবিদের মনে ব্যক্তিগত ও জাতীয় স্বাধীনতার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করল। ইতিমধ্যে শিল্প-বিদ্রোহ ক্রমে ক্রমে সমাজের রূপান্তর ঘটাতে লাগল। আর তারির ফলে

একটা নূতন ধরনের গল্পরীতি আত্মপ্রকাশ করল। ছোট গল্প, উপন্যাস ও নাটকের অস্তিত্ব প্রাচীন আরবী-সাহিত্যে একেবারেই ছিল না, তা নয়, কিন্তু পশ্চিমদেশের প্রভাবের অধীনে আসার ফলে সাহিত্যের এই তিনটি শাখাই বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে বিকশিত হয়ে উঠল। আরবী-সাহিত্যে গল্প উপন্যাস নূতন জিনিস নয়। আরব্য উপন্যাস আরবী-সাহিত্যের একটা গৌরবের বস্তু। এই বহুজন প্রশংসিত আরব্য উপন্যাস ইতালী ভাষা ও ফরাসী ভাষাকে গল্প রচনার মূল প্রেরণা ও আদর্শ দিয়েছিল। "আনতার ইবনে শাদ্দাদ" আর একটি রোমাণ্টিক অভিযানের কাহিনী। ইউরোপের কয়েকটি ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছিল। কিন্তু সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে উপন্যাস রচনার রীতি পশ্চিম থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে। ছোট গল্প রচনার প্রেরণা আরব-সাহিত্যিকগণ ইউরোপ থেকেই পেয়েছেন। বর্ত্তমান পশ্চিমদেশীয় উপন্যাসে একটা নূতন সামাজিক পরিবেশের চিত্র অঙ্কিত থাকে। এই ধরনের উপন্যাস আরবী-ভাষায় আরম্ভ হ'ল ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। তুর্কি ভাষায়ও উপন্যাস লেখা আরম্ভ হ'ল। তার কিছুদিন পরে আরবী-ভাষাও আধুনিক রীতিতে উপন্যাস রচিত ও প্রকাশিত হ'ল। এই সব উপন্যাস একেবারে আধুনিক। এর বিকল্প জিনিস প্রাচীন আরবী-সাহিত্যে নাই। আধুনিক আরবী উপন্যাসগুলি এত সুন্দর ও সার্থক যে দু'একটা ইউরোপীয় ভাষায় তার অনুবাদ হয়েছে। কয়েকজন উপন্যাস-লেখক ইউরোপে পরিচিত—যথা, মহম্মদ, তাইমুর, তাওফিকুল হাকিম, তাহা হোসেন, তাহের লাশিন, আমিন হাম্বুনা, হোসেন হায়কল, ইব্রাহীম মাসরী, আবদুল কাদের-মাজিনি, নাজিব মহফুজ, আবদুল হামিদ জুদা সাহাব, আবদুল হালিম, আবদুল্লাহ্-আলি আহমদ বাকাসির, আমিন ইউসুফ গুরমে, মাহমুদ আল বাদাগ্নি এবং নাজিব আল আকিকি। এঁদের উপন্যাসগুলি আরব জাতি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, শিল্প-বিপ্লব সমস্ত আরব-জগতের সাহিত্যের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করেছে। সেখানে এমন একদল সাহিত্যিক-গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়েছে, যারা নানা বিষয়ে নূতন নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। আরবী-সাহিত্যের এই নূতন প্রগতিশীল অগ্রদূতদের মধ্যে কয়েকজন খুব খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন: মহম্মদ নাজি, সাহারাতি, সান্নারাফি, ওয়াদিফিলিসতিন, রিজুয়ান ইব্রাহিম, আবদুল্লাহ আবদুল জাব্বার, জাকারিয়া আল্-আনসারী, আবদুল মুনেম খাফাজী, হাসিম মিসরী।

এই সাহিত্যিক-গোষ্ঠীর আধ্যাত্মিক গুরু হচ্ছেন ডাক্তার জাকি আবু শাদি। তিনি নিজে একজন বহু গ্রন্থের লেখক। প্রবন্ধ, সমালোচনা, নাটক এবং কবিতা, এসব বিষয়ে তিনি সিদ্ধহস্ত। তিনি একটি সাময়িক পত্রের সম্পাদক। সে পত্রিকার নাম এপোলো (Apollo)। পত্রিকার নাম থেকেই বুঝা যায় ডাঃ জাকি আবু শাদি কত আধুনিক ভাবাপন্ন। এপোলো হচ্ছেন গ্রীক-দেবতা। তিনি গ্রীক-সভ্যতার প্রতি অনুরক্ত। তাই গ্রীক-দেবতার নাম অনুসারে তাঁর পত্রিকার নামকরণ করেছেন। তিনি মনে করেন যে, গ্রীক-সভ্যতা থেকে তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণ বহু অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন।

সু-সাহিত্যিক আবদুল মুনেম খাফাজি, আল্-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত। যদিও আল্-আজহারের পরিবেশের মধ্যে একটা সার্ব্বজনীন ভাব বিদ্যমান আছে, তবুও এই মহা-বিদ্যা-আয়তনটির মূলে বদ্ধমূল হয়ে আছে একটি মিশরীয় স্পিরিট। আর কবি-শিল্পী আবদুল মুনেম খাফাজি তাঁর সমগ্র রচনার মধ্যে এই মিশরীয় ভাবটিকে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি কাইরোর প্রভাবের ঊর্দ্ধে উঠতে পারেন নি। কাইরোর চারিদিকে ছড়িয়ে আছে প্রচুর প্রাচীন ঐতিহ্য—মেমলুক বংশ, ফাতেমাইদ বংশ, তুরস্কের ওসমানীয় শাসন, বর্ত্তমান যুগের পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা-প্রভাবিত জীবন—এ সবই কাইরোর জীবনের উপর অবিচ্ছেদ্য প্রভাব বিস্তার করেছে। তিনি প্রচুর পড়াশুনা করেছেন, সুতরাং খাফাজির বিবিধ রচনার মধ্যে দেখতে পাই কাইরোর বিচিত্র ট্রাডিশনের প্রতিচ্ছবি। খাফাজির একটি সমালোচনা-পুস্তকের নাম "মাহাজিবুল আদব"। এই সমালোচনা-গ্রন্থে তিনি বলেছেন যে, আধুনিক কবিতার উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের সেবা করা। সুতরাং তাঁর মতে আধুনিক কবিতা হবে বাস্তবধর্ম্মী। আধুনিক কবিতা সুখ-দুঃখ পূর্ণ সমাজের অনুভূতিকে (Sentiment) প্রকাশ করবে। সুতরাং সামাজিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে কবিতা সৌন্দর্য্য ও সত্যকে প্রকাশ করবে। কবি অলঙ্কারপূর্ণ শব্দ রচনায় নিজের জীবনকে ব্যয় করবে না। বরং কবিতা দুঃখ-দারিদ্র্য পীড়িত গণমানবের সংগ্রামশীল স্পিরিটকে ফুটিয়ে তুলবে। খাফাজির মতে, ফিকৃরী, মাজিনি এবং আক্কাদ—এই তিনজন কবি তাঁর কাব্যাদর্শ মেনে চলেন। এই তিনজনের উপরই ইংরাজী-সাহিত্যের প্রভাব পড়েছে এবং তাঁরা ইংরাজী-সাহিত্য অনুসারে নূতন ধরনের কবিতা লিখতে আরম্ভ করেছেন।

ইউরোপীয় সাহিত্যে বিশেষ করে ইংরাজী-সাহিত্যে

free-verse বা গদ্য-কবিতা প্রচলিত হয়েছে। এ ধরনের কবিতা আঙ্গিকের দিক দিয়ে গদ্য। কিন্তু এতে আছে পদ্যের ছন্দ ও পদ-লালিত্য। অধুনা বাঙ্গালা ভাষায়ও এর প্রচলন হয়েছে। পূর্ব্বে এ ধরনের রচনা আরবী-ভাষায় প্রচলন ছিল না। কিন্তু পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলে আরবী-ভাষায়ও এ ধরনের কবিতা-রীতি আরম্ভ হয়েছে। তবে বহু কবি এ রীতি পছন্দ করেন না। এর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মিশরের সমালোচকদের মধ্যে বিতর্ক হয়ে গেছে। "আর রিসালা" নামক পত্রিকায় মহম্মদ আওয়াদ একটি প্রবন্ধে এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। তিনি বলেছেন, আরবী-ভাষায় এ ধরনের কবিতা চলবে না। তিনি একে স্বীকার করতে সম্মত নন। আবার অপর পক্ষে জাফি আবু শাদি এর একটা সমুচিত উত্তর দিয়ে বলেছেন যে, এ ধরনের পদ্ধতিকে পরীক্ষা করে দেখতে কোন দোষ নাই। এই প্রকার কবিতার ভবিষ্যৎ কি হতে পারে, তা পরবর্ত্তী যুগের উপর ছেড়ে দিতে হবে। তাঁর মতে গদ্য-কবিতা নাট্য-সাহিত্যে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হতে পারে। এই প্রকার সমালোচনা ও প্রতি-সমালোচনা এই প্রমাণ করে যে, অত্যন্ত গভীরভাবে আরবী-সাহিত্য পশ্চিমদেশের স্পিরিট দ্বারা দিন দিন অনুরঞ্জিত ও প্রভাবিত হয়ে উঠছে। তাদের ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য মিশর ও লেবাননের অর্থনৈতিক জীবন পশ্চিমদেশের প্রভাব অনুভব করছে। আর সেই জন্য এই দুই দেশের সাহিত্য প্রাচীনতার মোহ বর্জ্জন করে আরও স্বাধীন ও বাধাবন্ধহীন ভাবে বিকশিত হয়ে উঠছে।

সাম্প্রতিক যুগে মিশরে একটি "সাহিত্যচক্র" গঠিত হয়েছে। এর সদস্যগণ বিবিধপ্রকার কাব্য-রীতিকে নানাভাবে উৎসাহ দিয়ে থাকেন। কবি খালেদ আল-জরনুমি (khalid al Jarnumi) এই সাহিত্যচক্রের একজন প্রভাবশীল সদস্য। এর মধ্যে কয়েকজন মহিলা-কবিও আছেন। মিশরে নারী-প্রগতির এঁরা নেতৃত্ব করেন। এই সাহিত্যচক্রের দু'জন মহিলা সদস্যার নাম জালিনা রিদা। তিনি "আল্‌লাহান আলবাকি" (কান্নার গান) এই গ্রন্থের লেখিকা। অপর মহিলা সদস্যের নাম জয়নব হোসেন। এ ছাড়া আরও বহু কবি ও শিল্পী এই চক্রের সক্রিয় সদস্য। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য: (১) খলিল জারজিস খলিল, (২) ইব্রাহীম ইশা, (৩) রাশদি মাহির, (৪) ম্যাজর মহম্মদ আলি আহম্মদ। এ ছাড়া "আরব-ভ্রাতৃত্বমণ্ডলী" নামে আর একটা সাহিত্যচক্র গঠিত হয়েছে। তার প্রধান নেতা হচ্ছেন, মহিলা-কবি জামিলিয়াল্‌ লাইলি। এই মহিলা-কবি "আল-হাদাক" (লক্ষ্য) এই পত্রিকার সম্পাদিকা। তিনি "এলা ইবনাতি" (আমার কন্যার প্রতি) এবং "মিন ওয়াহিরাতুল ফাজর" (সূর্য্যোদয়ের অনুপ্রেরণা) এই দু'টি কাব্য-গ্রন্থ লিখে বিশেষ যশঃ অর্জ্জন করেছেন। এ ছাড়া মিশরে আর একটি সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান আছে—"মুসলিম যুব-সমিতি"—এখানেও কয়েকজন কবি একত্র হয়ে কাব্যচর্চ্চা করেন। এই সমিতির নেতা হচ্ছেন মহম্মদ জাবর। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, মিশরের সাহিত্যিকগণ নবভাবে উদ্দীপিত হয়ে নূতন নূতন সাহিত্য সৃষ্টি করতে উৎসুক হয়ে উঠেছেন।

মিশরই সমগ্র আরব জগতকে নেতৃত্ব দান করছে। আর মিশরে পড়ে গেছে প্রগতির ধুম। মিশরের ও আরব-জগতের সমসাময়িক আরবী-কবিতার প্রধান প্রবণতা হচ্ছে তাদের জাতীয়তাবোধ ও স্বাধীনতাপ্রীতি। সমগ্র আরব-জগত আজ জাতীয়তা ও স্বাধীনতার জন্য উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। কবি ও শিল্পীদের প্রেরণার পট-ভূমি হয়ে পড়েছে রাজনৈতিক জীবন। কবি-শিল্পী আবু শাদির কথা ধরা যাক—তিনি সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রে সুদক্ষ ও কুশলী শিল্পী। তিনিও স্বাধীনতার আদর্শের মাদকতা বর্জ্জন করতে পারেন নি। স্বাধীনতার কবি হিসাবেই তিনি অধিকতর খ্যাতিসম্পন্ন। সেইরূপ খালিদ জারনুসী। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ "হাদাসা ফি আসরারে রসিদ" (এটা রশিদের রাজত্বকালে ঘটেছিল)। তাঁর এই গ্রন্থ অতীত যুগের মুসলিম গৌরবের কাহিনীতে পূর্ণ একটা বিরাট এপিক কাব্য। সমাজ যে কেবলমাত্র প্রাচীন যুগের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে, তিনি এই গ্রন্থে সেই মনোভাবের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। অতীতের মিথ্যা গৌরব অজ্ঞতার নামমাত্র। এই সব অন্ধ অতীত পূজা মানুষের উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করে। খালিদ জারনুসী উক্ত গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে আধুনিক যুগে অতীত পূজার দ্বারা কোন ফললাভ হবে না। এইরূপ মনোভাবই খলিল জিরজি তাঁর কাব্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর সে কাব্যগ্রন্থের নাম "সারাল ফিদাইয়ন" (মুক্তি দাতার প্রতিশোধ)। অপর একজন লেখক মহম্মদ ফাউজিল আনতিল। তার "আগানিয়াতাল হুরুরিয়াৎ" (স্বাধীনতার গান) গ্রন্থে যুগের গতি ও প্রবণতার কথাই বলা হয়েছে।

আধুনিক আরবী-কবিতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, "প্রকৃতির দিকে প্রত্যাবর্ত্তন।" অবশ্য অতীত যুগের আরবী-কবিতায় প্রকৃতি বর্ণনার অভাব নাই।

কিন্তু প্রকৃতি সম্বন্ধে আধুনিক যুগের ধারণা পূর্ব্ব যুগ থেকে বহুলাংশে পৃথক। আধুনিক যুগের কবি বন-উপবন-নদী-সূর্য্যাস্ত-সূর্য্যোদয়, প্রভৃতি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনার সময় নিজেকে প্রকৃতির সঙ্গে এক করে তুলেন। কতকটা ইংরাজী-সাহিত্যের রোমান্টিক যুগের কবির মত। যাঁরা প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিয়ে এবং প্রকৃতির মাঝে নিজেদের সত্তা বিলিয়ে দিয়ে কবিতা লিখেছেন, তাঁদের অগ্রদূত হচ্ছেন ইব্‌নে রুমি। কবি মাহমুদ হাসান ইসমাইলের কাব্যগ্রন্থ "আয়নাল মাফার" (কোথায় আশ্রয়।) এতে আছে প্রকৃতি বর্ণনার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই গ্রন্থে তাঁর কয়েকটি উচ্চাঙ্গের কবিতা আছে; যথা—"নীলনদের কথা", "ঘাসের প্রার্থনা", "শুকিয়ে-যাওয়া ফুল"। সাহারতি আর একজন কবি—তাঁর কাব্য-গ্রন্থের নাম "আজহাক্ জিকরা" (স্মৃতির ফুল)। এতে প্রকৃতির বিচিত্র অভিজ্ঞতার বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। এর কয়েকটি কবিতা উল্লেখযোগ্য:—"প্রকৃতির পুত্রগণ", "প্রজাপতি", "ছোট্ট নদী", "ছায়াময়-তরু যার পাশ দিয়ে একটি ঝরণা বয়ে যাচ্ছে।" তাঁর মতে প্রকৃতি হচ্ছে সৃষ্টির দেবালয় বা আশ্রয়স্থান। কবি আলি শাহাতার কাব্য-গ্রন্থের নাম "জুম ওয়ারুজুম" (তারা ও চুম্বক) এতে তিনি গ্রাম্য-জীবনের চিত্র এঁকেছেন। মিশরের গ্রাম্য-জীবন বহু কবিকে মুগ্ধ করেছে। তাঁরা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গ্রামের মহিমা গান গেয়েছেন। মহম্মদ হাসান ইসমাইল তাঁর কাব্য-গ্রন্থ "হাকাজা উগানি"তে "জলের কল", "বলদ", "শস্যের পাকা শীষ", "ধান-ঝাড়া যন্ত্র"—এই সব নিয়ে বহু কবিতা রচনা করেছেন।

মিশরবাসীর জীবনের উপর তীব্র ভাবে পড়েছে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার চাপ। তারির ফলে মিশরের কবি ও শিল্পীগণ ধীরে ধীরে সাহিত্য-রীতির প্রাচীন ধারা পরিহার করে নূতন ধরনের সাহিত্য সৃষ্টি করতে লাগলেন—বহু আরব আমেরিকাবাসী হয়ে গেছেন। তাঁদের কবিতা পাশ্চাত্ত্য ভাবে পূর্ণ। ইসমাইল আহমদ আদহম আমেরিকা প্রবাসী আরব-কবিদের সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন যে, এগুলি নামেই আরবী-কবিতা। তাঁর মতে এসব কবিতা পশ্চিমদেশের স্পিরিট দ্বারা অনুরঞ্জিত! সুলেখক আবুশাবাকা তাঁর "রাওয়াবিশ্চল ফিকরা ওয়ার রুহ" (মানসিক ও আধ্যাত্মিক বন্ধন) গ্রন্থে বলেছেন যে, ফরাসী-সাহিত্যে যে ধরনের লেখা প্রকাশিত হউক না কেন, তার অনুকরণে আরবী-ভাষায় কিছু না কিছু লেখা হবেই। ফরাসী প্রভাব ব্যতীত পশ্চিমদেশের অন্যান্য অঞ্চলের প্রভাবও কম নয়। বিশেষ করে ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাব। পশ্চিমদেশের ক্লাসিকাল ও আধুনিক গ্রন্থের অনুবাদ আরব-সাহিত্যের একটা প্রধান ঘটনা। এমন অনেক কবি আছেন যাঁরা ব্যক্তিগত ভাবে পশ্চিম-দেশের প্রভাবের বিরোধী। কিন্তু তবুও সে সব সাহিত্যিক তাঁদের রচনায় পশ্চিমদেশের প্রভাব পরিহার করতে পারেন নি।

পাশ্চাত্ত্য ভাব দ্বারা প্রভাবিত মিশরের নব্য কবিদের মধ্যে ডাঃ ইব্রাহীম নাজী অন্যতম। দ্বিতীয় মহাসমরের পর তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তিনি আধুনিক আরবী-কবিতার অরুণোদয় স্বরূপ। তিনি তাঁর প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতাকে গানের ভাষায় প্রকাশ করেছেন। পাঠক ও শ্রোতৃবর্গকে তাঁর কবিতা মুগ্ধ করেছে! সেন্টিমেন্ট (অনুভূতি)। ভালবাসার ব্যথা-বেদনা, সৃষ্টির আনন্দ—এই সবই তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু। কবিতার আদর্শ সম্বন্ধে তিনি যে কবিতা লিখেছেন, তার মর্ম্মার্থ :—

"কবিতা হচ্ছে একটি বীণা, যা মানুষের গান করে,
কবিতা-রূপ বীণার তারে আশা ভীড় করে আসে, এবং
সতত স্পন্দিত হয়!
কবিতা জীবনের স্রোত এবং গানের প্রাচুর্য্য!
কবিতা কবির দীর্ঘশ্বাস—সেই কবির;
সে প্রেম ও বিরহের অনুভূতির সংবাদ রাখে।"

"লয়ালিল কাহিরা" (কায়রোর জননী) গ্রন্থের ভূমিকায় ইব্রাহীম নাজী বলেছেন, "আমার নিকট কবিতা একটি জানালার মত। এই জানালা থেকে আমি জীবনকে দেখি, সেখান থেকে আমি অনন্তকেও দেখি—এবং তার পর যা দৃষ্টিপথে আসে তাও দেখি। কবিতা আমার নিকট বায়ু; আমি তার নিঃশ্বাস লই; কবিতার সুগন্ধ-নির্য্যাস দিয়ে আমি আমার ক্ষত স্থানকে নিরাময় করি, যখন দুঃখ এসে আমার আত্মাকে অভিভূত করে।"

ইব্রাহীম নাজী বহু লিরিক কবিতা লিখেছেন। তাঁর লিরিক কবিতাগুলি প্রেম-ধর্ম্মী। "একজন প্রেমিকাকে" তাঁর একটি বিখ্যাত লিরিক কবিতা! এই কবিতায় তিনি তাঁর অদৃশ্য দয়িতাকে উদ্দেশ্য করে বলছেন :—

"হায়, সে ত তখন ঘুমিয়ে ছিল, যখন সূর্য্যদেব
তার গৃহে দীপ্ত মুখ নিয়ে চক্রবালের ধারে
উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিল—
তখন একটি পথক্লান্ত যুবক দ্বারে করল মৃদু করাঘাত,
—সে অনেক দূর থেকে এসেছে, তার পদদ্বয় কাঁপছে—
সে তোমার দুয়ারে হাজার আশার বন্যা রেখে দিল,
আর তোমার ভালবাসার, মন্দিরে তোমার ছড়িটা রেখে
দিল।"

এই কবিতাটি এই ধরনের মর্ম্মস্পর্শী ভাবে পূর্ণ। এতে আমরা অনুভব করছি যে, ইব্রাহীম নাজী যেন আমাদের চোখের সামনে একটি সুন্দর ছবি এঁকে দিয়েছেন। তাঁর ব্যবহৃত শব্দগুলি কেবল অর্থই দেয় না, সেই সঙ্গে একটি মনোমুগ্ধকর ছবি এঁকে দেয়। সে ছবি অত্যন্ত সুনিশ্চিত! ইব্রাহীম নাজি হচ্ছেন ছবি ও কল্পনার কবি। উপমা, প্রসঙ্গ ও অলঙ্কারকে আশ্রয় নিয়ে তিনি যে কল্পনাকে ফুটিয়ে তুলেন, তা নয়। বরং তিনি বাস্তব জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকেই অভিনব মূর্ত্তিতে সৃষ্টি করেন।

এবার আরবী-ভাষার নাট্য-সাহিত্য সম্বন্ধে কিঞ্চিত আলোচনা করব। বস্তুতঃ, আরব-জগতে নাট্য-সাহিত্য কতকটা নূতন জিনিস। স্বাধীনতার উন্মাদনা থেকেই নাট্য-সাহিত্য জন্মলাভ করল। জাতীয় অনুভূতি এবং পূর্ব্বপুরুষদের, গৌরবপূর্ণ কাহিনী নিয়ে বিবিধ প্রকার নাটক আত্মপ্রকাশ করল! নাট্যমঞ্চের উপর মিত্রাক্ষর বক্তৃতা দেওয়ার অসুবিধা ও সম্ভাবনা নিয়ে বিবিধ প্রকার মতভেদ প্রচলিত আছে। কিছুদিন পূর্ব্বে ল্যাসেল এবের কুম্যের একটি প্রবন্ধ পড়েছিলাম—প্রবন্ধের নাম "The function of poetry in the drama." আরবী ভাষায় বর্ত্তমানে যে ধরনের নাটক রচিত হচ্ছে, তাতে উক্ত সমালোচকের মানদণ্ড এখানে প্রযুক্ত হতে পারেনি। তবুও যে নাটক রচিত হচ্ছে এবং নাটক সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে, এইটাই যথেষ্ট; মিশরের বিখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক, ডাঃ তাহা হোসেন বলেন যে, নাট্য-কবিতা (Poetic drama) এখনও শৈশব-অবস্থা অতিক্রম করতে পারে নি। তাঁর মতে এই ধরনের নাটক ছন্দ ও মিলের উপর অত্যাচার করে। মঞ্চোপরি গদ্য-নাটকই অধিকতর বাঞ্ছনীয়। অপর পক্ষে আজিজ আবাজা বলেন যে, নাট্য কবিতা আরবী ভাষায় খুব চলবে। জনসাধারণ এ-ধরনের নাটক দেখে মোটেই বিরক্ত হয় না। নাট্য-কবিতা পশ্চিমদেশের মঞ্চে যখন সাফল্য অর্জ্জন করেছে, তখন এখানে তা ব্যর্থ হবার কোন কারণ নাই। বোধ হয় আহমদ শাওকীই প্রথম শিল্পী যিনি, নাট্য কবিতা আরবী ভাষায় প্রবর্ত্তন করেন। তিনি ইউরোপীয় মডেল অনুসরণ করেই নাটক রচনা করেছেন। তবে, সব ক্ষেত্রে অন্ধের মত অনুকরণ করেন নি। আহমদ শাওকী ছিলেন প্রতিভাবান লেখক। তিনি অতীত যুগের আরবী কবিতার ঐতিহ্যের দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু তবুও পশ্চিম দেশের পদ্ধতি অনুসরণ করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। অতীত যুগের কাহিনীকে কেন্দ্র করেই তিনি নাট্য-কবিতা রচনা করেছেন। তবে আহমদ শাওকীর পর আর কোন লেখক কবিতার মাধ্যমে নাটক লিখে সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। অন্যান্য লেখকগণ গদ্যের মাধ্যমেই নাটক লেখার চর্চ্চা করেছেন। নাট্য-সাহিত্য প্রথম মহাসমরের পর হু হু করে বাড়তে লাগল। এতদিন আহমদ শাওকী রাজা মহারাজাদের জন্য নাটক লিখতেন। এখন থেকে তিনি সর্ব্বসাধারণের জন্য নাটক রচনায় হাত দিলেন। দরবারের কবি হয়ে পড়লেন জনসাধারণের কবি। আহমদ শাওকী নবযুগের প্রয়োজন ও দাবী অনুভব করলেন। কিন্তু দেশে ছিল না, মডেল বা নমুনা। সেইজন্য তিনি ফ্রান্সের বিখ্যাত নাট্যকার কর্ণেলি, রেসিন, ভিক্টোর হিউগোর আদর্শ সামনে রেখে নাটক রচনা করতে বাধ্য হলেন। শাওকী সর্ব্বাগ্রে কবি, তার পরে নাট্যকার। সেইজন্য তাঁর নাটকগুলি লিরিকধর্ম্মী হয়ে উঠেছে।

আরব জগতের অর্থনৈতিক পরিমণ্ডল থেকে বহু দূরে অবস্থিত বলে, ইরাক প্রদেশ এখনও প্রাচীনতার মোহ কাটাতে পারে নি। সেইজন্য ইরাক অধিকতর কঠোরতার সঙ্গে প্রাচীন ঐতিহ্য রক্ষা করে চলছে। ইরাকের কবি ও সাহিত্যিকের সংখ্যা নগণ্য নয়। তবে সকলেই প্রসিদ্ধিলাভ করেন নি। ইরাকের আধুনিক কবিদের মধ্যে জামিল সিদ্দিকি জাহাবি সুবিখ্যাত। তিনি একাধারে কবি ও দার্শনিক। তিনি নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখেছেন এবং বিভিন্ন বিষয়ের উপর যে সব চিন্তাকর্ষক কবিতা লিখেছেন, তা সারা আরব দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। কল্পনা ও চিন্তার সঙ্গে তিনি প্রকৃত কাজের প্রতিও মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি প্রকৃতির পূজারী। এই দিক দিয়ে তাঁর বহু কবিতা প্রকৃতির কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের মত। মানব-জীবনের সমস্যা তাঁকে আকুল করে তুলেছে। তাঁর সেই আকুল মনের ব্যথা-বেদনাকে তিনি অপূর্ব্ব ছন্দে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর একটি কবিতার কিঞ্চিৎ নমুনা দেওয়া যাক। Evolution বা ক্রমবিকাশ (তাতাওয়ার) সম্বন্ধে তিনি যে সুন্দর বৈজ্ঞানিক কবিতাটি লিখেছেন, তার প্রথম কয়েক পঙক্তির ইংরাজী পদ্যানুবাদ দেওয়া গেল:

"The ape long ages in the forest passed,
Before he found the ascending way at last,
The ape begot, a million years ago,
Man, who set forth upon his progress slow.
What sudden change upon the ape has come?
His offspring leaves his tribe and forest home,
Weak should he be, without intelligence,

And dull his life, like words that makes no sense.
When for long years on four legs he had crept,
He stood upright, on two legs proudly stepped.
He took the stone and carved it, weapons made.
For his defence against the least that preyed.
But his best weapon in intelligence,—
The sense that outstrips every other sense.
Oh, what a mighty change from ape to man,
Whose imagination on the whole world span."

এই কবিতাটিতে ইমোশন নাই বললেই চলে। মোতাজালা সম্প্রদায়ের লেখকদের মত তাঁর কবিতায় আছে ইতিহাস, বিজ্ঞান আর যুক্তি। এই দীর্ঘ কবিতাটি তিনি এই ভাবে শেষ করেন :

"My whole belief is, that all life on earth.
From chemical reactions came to birth,
And this phenomenon can nothing be,
But the effect of electricity.
Before the land or sea were formed, this force,
Became of all terrestrial life the source ;
And countless ages did the change effect
Of best to man, who stood and walked erect;
Heredity does by fixed law decree,
That as the fathers were, their sons shall be."

এ-কবি তাঁর যুক্তিধারা পেয়েছেন প্রাচ্য-দেশের সংস্কৃতি থেকে, আর তাঁর অন্তরের প্রত্যক্ষ অনুভূতি থেকে। কখনও কখনও সন্দেহবাদ তাঁর নিকট প্রবল হয়ে উঠে। তখন তিনি আবেগ ভরে বলে উঠেন :

"জীবনের রহস্য সম্বন্ধে আমার মনে জাগে বিস্ময়। এই বিস্ময় আমাকে বাধা দিয়েছে জীবনের সুখকে অবলম্বন করতে। আর এই বিস্ময় আমাকে নির্দেশ দিয়েছে যে, এই পৃথিবীতে সন্দেহ ও কল্পনার গোলক-ধাঁধার মধ্যে আমাকে দীর্ঘদিন থাকতে হবে!" জামিল সিদ্দিকি জাহায়ি যে সন্দেহবাদী কবি, তা তাঁর আর একটা কবিতা থেকে বুঝা যাবে। এই কবিতাটি অপর একজন সন্দেহবাদী কবি আবুল আলা আল মারুরিকে লক্ষ্য করে বলছেন :

"সবার উপর এই কথাটি আমাকে ভাল লেগেছে যে,
তুমি বিদ্রোহ করেছ, ট্র্যাডিশনকে অগ্রাহ্য করেছ,
লোকে বলে তুমি নাস্তিক, অবিশ্বাসী, এবং তোমার
মাথার উপর নিন্দাবর্ষণ করে,
যদিও তোমার দেহের হাড়গুলি বহুদিন হ'ল
ধূলিসাৎ হয়ে গেছে।
আমার গৃহে আমিই তোমার ছাত্র—এবং
তোমার উপরে যে অন্যায় নিন্দার আক্রমণ হয়েছে
আর, কেউ তার প্রতিবাদ করে নি—সে সব নিন্দা
আমার উপরই পড়েছে।"

গোঁড়া রক্ষণশীল মানুষ এ ধরনের কবিকে ও তাঁর কবিতাকে বরদাস্ত করবে না, তা খুবই স্বাভাবিক। সুতরাং বাগদাদের রক্ষণশীল ব্যক্তিগণ তাঁকে আক্রমণ করতে ছাড়েন নি। কিন্তু জমিলও সহজ পাত্র নন। তিনিও এই সব আক্রমণের প্রতি উত্তর দিয়েছেন সমুচিত দৃঢ়তার সহিত। তাঁর লিখিত "কিতাবুল ফাজর্ আস সাদিকক" (সত্য-প্রভাতের পুস্তক)—এই বইটি ১৯০৫ সালে প্রকাশিত হয়।

জামিল সিদ্দিকি জাহায়ি বহু লিরিক কবিতাও লিখেছেন। এই ধরনের কবিতা তাঁর অন্তরের অনুভূতির গভীরতা প্রকাশ করে। তিনি তাঁর কাল্পনিক প্রেমিকাকে লক্ষ্য করে বলছেন :

"আমি সারারাত স্বগৃহে একাকী ছিলাম, এবং তোমার কল্পিত মুখের প্রতি আমার অভিযোগগুলি বর্ষণ করছিলাম। তোমার সে মুখে মৃদু হাসি লেগে ছিল—সে মুখ প'রে ছিল একটা প্রতারণাকারী মুখোস, কিন্তু তারপর আমার কি হ'ল, সে কথা জিজ্ঞাসা কর না। তোমার সৌন্দর্য্যের উপযোগী আবেগকে, পোষণ ও আদর করতে আমি ক্ষান্ত থাকি নি। আমার সমগ্র জীবনকে এক ঘণ্টার জন্য বিক্রয় করতে প্রস্তুত আছি, যদি আমি সেই সময়টা তোমার সান্নিধ্যে থাকতে পারি। হে লায়লা, তোমার প্রতি আমার ভালবাসা এরূপ যে আমি তোমার জন্য স্বেচ্ছায় মরণ বরণ করব। আমি যখন মরে যাব তখন কি আমি সেই মূর্ত্তি ধরে তোমার কাছে আবির্ভূত হব, যা তোমার স্মৃতিতে প্রিয় হয়ে আছে।" বস্তুতঃ জামিল জাহায়ির অনুভূতি এত আন্তরিক ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত যে তাঁর ষ্টাইল জনসমাজে প্রবাদ-বচনের মত হয়ে উঠেছে।

মিশরের আর একজন কবির নাম এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না—জাকি আবু শাদি। তিনি ইউরোপীয় মহিলাকে বিবাহ করেছেন এবং নিজে একজন চিকিৎসক। কিন্তু তৎসত্ত্বেও জাকি আবু শাদি কায়রোতে একটি সাহিত্য-জগৎ গড়ে তুলেছেন। তিনি ইংরাজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত এবং সেক্ষপীয়রের কয়েকটি নাটকের আরবী অনুবাদ করেছেন। ইংরাজী কবিতার বীর্য্য ও স্বাধীনতার আদর্শকে আরবী ভাষায় প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করেছেন। তিনি কঠোর নিয়মাবদ্ধ আরবী কবিতাকে শক্তিশালী জীবন-দান করেছেন এবং সহজ গতিও দিয়েছেন। সেজন্য তাঁকে বহু বাধা-বিঘ্ন সহ্য করতে হয়েছে। কবি জাকি

আবু শাদি সমাজের উন্নয়ন ও কৃষ্টি-সংস্কারের জন্য বহু কাজ করেছেন। তিনি করেছেন দুর্নীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ। সেজন্য তাঁকে বহু নির্য্যাতনও সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু তিনি কিছুতেই আদর্শ ত্যাগ করেন নি। অবশেষে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর আমেরিকা চলে যান। এবং সেইখানে তাঁর মৃত্যু হয়। জীবিত অবস্থায় তিনি যে সব সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেন, তাঁর মৃত্যুর পরও সেই সব সমস্যা নিয়ে দেশে আলোড়ন হতে থাকবে।

জাফি আবু শাদির কন্যা সাফিয়াও একজন বিশিষ্ট মহিলা কবি। পিতার প্রভাবে এবং আমেরিকার স্বাধীন পরিবেশে সাফিয়া কবিতা চর্চ্চা করেন—তিনি সাধারণতঃ free-verse বা গদ্য-কবিতা লেখেন। ১৯৫৪ সনে তাঁর "দিওয়ান" কাইরোতে প্রথম প্রকাশিত হয়। তাঁর এই কাব্যগ্রন্থ তাঁর কল্পনা শক্তি ও স্বাধীন স্পিরিট পরিচয় দেয়। তাঁর কাসিদা বা শোকগাথার মধ্যে পাশ্চাত্য ও প্রতীচ্যের ভাব-সমন্বয় দেখা যায়। তাঁর কোন কোন কবিতা মিত্রাক্ষর গদ্যে (Rhymed prose) লিখিত। এই ধরনের কবিতার পরীক্ষা ইতিমধ্যে আরবী ভাষায় হয়েছে। আরবী কবিতার সমালোচকগণ এই ধরনের মিত্রাক্ষরপূর্ণ গদ্যকে সুনজরে দেখেন না। কিন্তু তবুও বহু কবি এই রীতি অবলম্বন করেছেন।

মিশরের কোন কোন লেখক একই সঙ্গে কবি ও সমালোচক। মহম্মদ আবদুল গণি হাসান—একজন উচ্চাঙ্গের সমালোচক। তিনি নামকরা কবিও বটে। ১৯২৮ থেকে ১৯৫৪ সনের মধ্যে তিনি যে সব কবিতা রচনা করেছেন, সেগুলি সম্প্রতি "মাদিমিনাল উমর" (অতীত জীবন) নাম দিয়ে প্রকাশ করেছেন। এই কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতার কয়েকটি পংক্তির ভাবানুবাদ দেওয়া গেল—তাঁর কবিতাটিতে আছে একটা রণহুঙ্কার :

"বল, কে চুপ করে আছে? আর শান্তির কথা নয়,
কে পশ্চাতে পড়ে আছে?
এখন সাহসের সঙ্গে অগ্রসর হও!
কেউ তোমার সম্মতির অপেক্ষা করে না,
কিন্তু তোমার সমস্ত ব্যাপার তোমার জন্য নির্দ্ধারিত,
তুমি কি তাতে সন্তুষ্ট থাকবে?
তুমি শুনছ, তোমায় মাথার উপর
তীরগুলি কথা বলছে,
আর তোমার চার পাশে যুদ্ধের সমস্ত
ভেরী-নিনাদ ছড়িয়ে পড়ছে,
শিকার ধরবার জন্য দস্যুদের লোভাতুর হাত
তোমার কাছে উপস্থিত!
তারা মাল লুণ্ঠন করে চলে গেছে,
মহম্মদ আলির পর লুণ্ঠনকারীরা জেগে উঠেছে,
যেখানে ইচ্ছা সেইখানে তারা
লুঠের মাল নিয়ে যাচ্ছে।"

গানি হাসান একজন বিপ্লবী কবি। মিশরের বর্ত্তমান ধীরমন্থর গতি দেখে তিনি অসন্তুষ্ট। তিনি সাহসের সঙ্গে অধিকতর স্বাধীনতার আওয়াজ তুলে গাইছেন :

"হে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামশীল বীরগণ,
তোমার পদক্ষেপে অনন্ত শক্তিশালী শব্দ ধ্বনিত হচ্ছে।
যারা বীরত্বের সঙ্গে সত্যের জন্য
মৃত্যুর যন্ত্রণার মধ্যে যুদ্ধ করে,
ঐ দেখ, তাদের ধ্বনি শুনা যাচ্ছে।
স্বাধীন মানুষ অভিন্ন হৃদয়ে,
অগ্রসর হচ্ছে মহান লক্ষ্যের দিকে,
যারা পুরাতন জীর্ণ শৃঙ্খল মুক্ত করার জন্য
সংগ্রাম করছে,
তাদের ধ্বনি ঐ শুনা যাচ্ছে।"

গানি হাসান কবিতা ব্যতীত কয়েকটি নাটকও রচনা করেছেন—সেগুলির মধ্যে "ইবনে জায়েদুন", "ইমরুল কায়েস" এবং "ক্লিওপেট্রা" বিখ্যাত। তাঁর আর এক-খানা নাটক "মিন নাফিজাতুত তারিখ" (ইতিহাসের জানালা থেকে)—একটি বিরাট পরিকল্পনা নিয়ে রচিত। এর প্রকাশ-কাল ১৯৫২ সন। এই বিরাট গ্রন্থে মানব-সমাজের ইতিহাসকে নাটকের আকাশে রূপ দিয়েছেন। হাঙ্গেরিয়ার কবি ইমরে মাদাক রচিত "ট্রাজেডি অব ম্যান" এর প্রভাব তাঁর উপর যথেষ্ট পড়েছে। এর থেকে বুঝা যাবে যে আরব-জগতের শিল্পীগণ পশ্চিম দেশের ভাবধারা গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত নন।

আরব-জগতের অপরিহার্য্য অঙ্গ হচ্ছে হেজাজ। কয়েক বছর পূর্ব্বে নাম করবার মত কোন কবিতা বা গ্রন্থ আধুনিক হেজাজে ছিল না। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসায়-বাণিজ্যের ফলে হেজাজেও নুতন যুগের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। বহু দিনের বদ্ধ দুয়ার খুলে গেল। ফলে নুতন নুতন লেখক জেগে উঠল। তাঁরা সাহসের সঙ্গে বর্ত্তমান যুগের সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হলেন। এবং লেখনীর সাহায্যে পশ্চাদ্পদ জাতির উন্নতির জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। নুতন লেখক-গোষ্ঠীর মধ্যে আবদুল্লাহ জাব্বার, ইব্রাহীম হাশিম আলফিলালি, সঈদ আল্ আমুদী এবং মহম্মদ হাসান আওয়াদ সমধিক প্রসিদ্ধ। উপরোক্ত আবদুল্লাহ আবদুল জাব্বার কয়েকটি নাটক রচনা করেছেন। তিনি আধুনিক

আদর্শের সমর্থক। "উম্মি" (আমার মা) এবং "আল-আম্মো-শাহতুত" তাঁর এই দু'টি নাটক থেকে বুঝা যাবে, তিনি কত আধুনিক। আওয়াদের সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক-একাঙ্ক নাটক "আশশায়াতিহুল খুরম্" (নির্ব্বাক শয়তান) একটা বাস্তবধর্ম্মী শিল্পকর্ম্ম। উপদেশ দেওয়াই এর উদ্দেশ্য। তাঁর বর্ণিত প্রত্যেকটি চরিত্র এক একটি ব্যক্তিগত টাইপ বিশেষ। এই নাটক আরম্ভ হয়েছে একটি বিলাসপূর্ণ হলের মধ্যে। সেখানে পরস্পর বিরোধী চিন্তা-বিশিষ্ট লোকগুলি পরস্পরের মধ্যে ভয়ানক কলহ করছে। তাদের কেউ কেউ রক্ষণশীলদলের প্রতীক। আর কতকগুলি প্রগতিশীলের। একটি চরিত্র হচ্ছে আধুনিক বুর্জ্জোওয়া সমাজের। সে "শাজ"-ছন্দে অর্থাৎ গদ্য-পদ্যে কথা বলছে। অপর চরিত্রগুলি কেবলই তার কথা শুনে যাচ্ছে তাদের মাথা দুলিয়ে। এই হ'ল নাটিকার প্লট। কিন্তু এই নাটিকাটি আধুনিক সমাজের পরস্পর বিরোধী চিন্তাগুলিকে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছে। মহম্মদ হাসান আওয়াদ ১৯৫৪ সনে তাঁর দিওয়ান প্রকাশ করেন—তার নাম দেন "আলবারায়েম"—ফুলের ঝুঁড়ি। তিনি হেজাজী কবিতায় রোমান্টিক আদর্শের প্রবর্ত্তক। তাঁর কবিতায় পাঠক-সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তা দেখে মনে হয় যে তাঁর কাব্যের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। তাঁর একটি কবিতার নাম "মাতা" (কখন?) কয়েকটি পঙক্তির মর্ম্মানুবাদ দেওয়া গেল—

"কখন আবার আমরা অমর গৌরবের চূড়ায় উঠবো?
এবং পুরাতন কাহিনীর পাতায় লিখব আমাদের
সাহায্যকারী গর্ব্বের কথা?
কখন আমাদের মহান জাতি পরিপূর্ণ
মর্য্যাদা ফিরে পাবে?
কখন আমাদের সুপরিচালিত তীর
উপরের দিকে নিক্ষিপ্ত হবে?
আহা! প্রগল্ভ ভ্রান্তি কি শীর্ষদেশে উঠতে পারে?
নিদ্রামগ্ন অবস্থায় আমরা কি জাতির গৌরবের জন্য
চেষ্টা করতে পারি?
বিনা চেষ্টায়, সুখের মধ্যে, বিশ্রামের মধ্যে
আমরা সে সম্মান কখনও ফিরে পাব না।"

আজ আরবের মরুভূমি সেইসব ঐহিক স্বপ্ন দেখছে, যা পশ্চিমদেশ ভোগ করছে। কবি মহম্মদ হাসান আওয়াদের নূতন দেওয়ানের নাম "নাহনো কিয়ান জাদিদ" (আমরা নূতন যুগের মানুষ)। এঁর নামই গ্রন্থখানির বক্তব্যকে পরিস্ফুট করছে।

হেজাজের আর একজন কবির নাম সঈদুল আল আমুদি। তিনি "মুজাদ্‌খাতাল হাজ" পত্রিকার সম্পাদক। কবি সঈদ আরও কয়েকটি কবিতা লিখেছেন। তাঁর কতিপয় কবিতা "জিকরা" (স্মৃতি) পুস্তকে সন্নিবেশিত হয়েছে। এর প্রকাশ-কাল ১৯৫৪ সাল।

হেজাজের নিকট ক্ষুদ্র "কুয়েৎ" প্রদেশও কাব্যালোচনার দিকে পদযাত্রা আরম্ভ করেছে। এ অঞ্চলের প্রধান কবির নাম শাওকী আল-আইউবী এবং আহমদ জয়নাশ শাফ্‌ফাক। ওমান প্রদেশের কবি আমীর সাফরাল কাসেমী একটি নূতন কাব্য রচনা করেছেন। এই কাব্য-গ্রন্থের একটি কবিতার নাম কোবালা (চুম্বন)। তারির কিয়দংশ তুলে দেওয়া হল:

"যদিও সে-মেয়েটি রাগ করেছিল, তবুও তার গণ্ডে
দিলাম একটি চুম্বন—
আমার বুকে যে ব্যথার ছায়া পড়েছিল
তাই তাকে দিবার জন্য।
আমার মনের অগ্নি-শিখা তার মুখে ফুটে উঠল;
আমার আত্মা যাকে লুকিয়ে রেখেছিল,
তাই তার গণ্ডে
দীপ্যমান হয়ে উঠল।
সে পালিয়ে গেল,—কিন্তু আমরা উভয়ে বুঝলাম—
আমাদের উভয়ের বুকে আগুন জ্বলে উঠল,
এবং অশ্রু রাজি আমাদের উভয়কে অভিভূত করল।"

এই ধরনের কবিতা দিয়ে বর্ত্তমান ওমানের কবিরা দুঃসাহসিক যাত্রা আরম্ভ করেছেন। অতীত যুগে ১২৫১ সালে ইবনে সাহালান্ আন্দালুসি যে ধরনের কবিতা রচনা করতেন ওমানের এই কবির কবিতা তাঁকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

এবার প্যালেষ্টাইনের সাহিত্য সম্বন্ধে দু-চারটি কথা বলে এই প্রসঙ্গ শেষ করব। প্যালেষ্টাইনের দু'জন মহিলা কবি বিশেষ নাম করেছেন—ফাদোওয়া এবং নাজিক। পুরুষ কবিদের মধ্যে ইব্রাহীম আদ্দাব্বা বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। কিছুদিন হ'ল তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর পর তাঁর রচনা ১৯৫৪ সনে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর সে-গ্রন্থের নাম "ফি জালালুল হুররিয়াৎ" (স্বাধীনতার ছায়াতলে)। ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সামাজিক বিষয় নিয়ে লেখক আলোচনা করেছেন এই গ্রন্থে। আদ্দাব্বাগ ছিলেন একজন বৈপ্লবিক কবি। প্যালেষ্টাইনের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হওয়ার পর তিনি স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে বহু কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর বহু শোকগাথার বিষয়বস্তু প্যালেষ্টাইন ও তার স্বাধীনতা সংগ্রাম। "ফিলিস্তিন আলজারিহা" (আহত
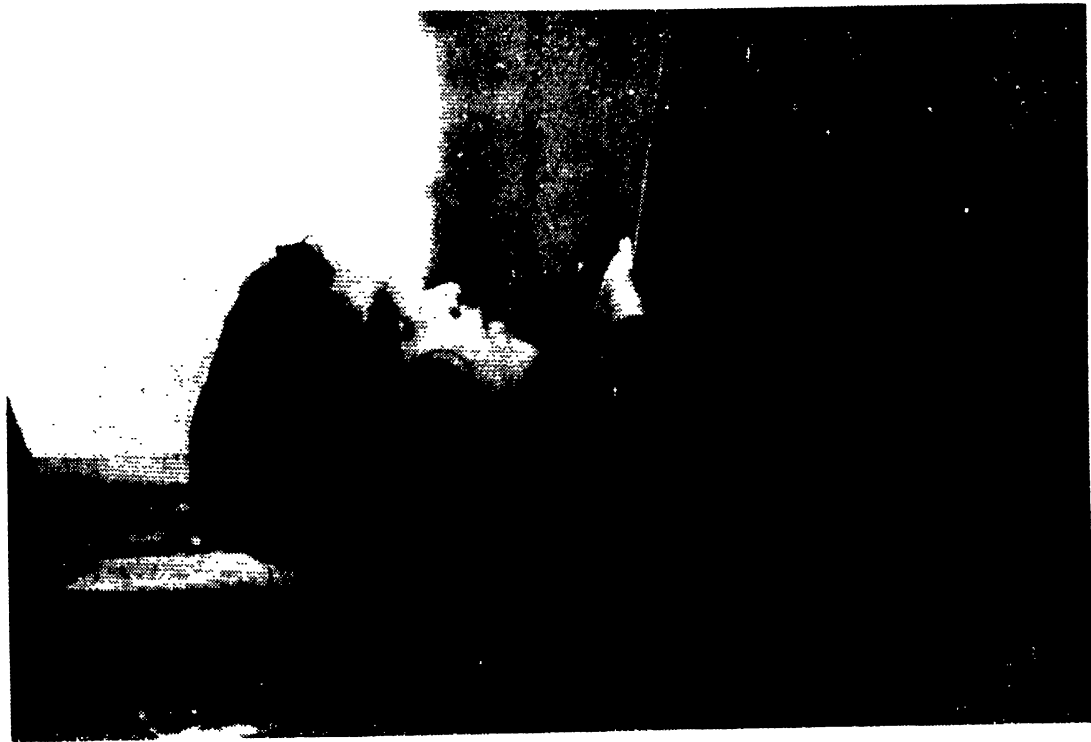
ইরাণী

বাতায়নে

ফটো : শ্রীশান্তনুকুমার মুখোপাধ্যা

বাষ্প-শক্তি   ফটো : শ্রীতপনকুমার বর্মণ

অজানা বন্দর   ফটো : শ্রীতপনকুমার বর্মণ

প্যালেষ্টাইন), "ওয়াতানিল্ আওয়াল" (আমার প্রথম জন্মভূমি), "আলামাশ শারদ" (প্রাচ্যদেশের প্রস্তর), "আলামাল্ ওয়াদি" (উপত্যকার-প্রস্তর), "দাম্মাশ্ শাহিদ" (শহীদের রক্ত) তাঁর এই ধরনের বহু শোক-গাথা আছে, যা সর্ব্বত্র খ্যাতি অর্জ্জন করেছে। প্রথম জীবনে আদ্দাব্বাগ ছিলেন, আল-আজহার-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। কিন্তু পরে স্বাধীনভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন এবং দেশপ্রেমকেই প্রধান ধর্ম্ম বলে গ্রহণ করেন। তিনি কয়েকটি সমালোচনার গ্রন্থও রচনা করেছেন।

মোটের উপর বর্ত্তমান আরবী-সাহিত্য প্রগতির পথে যাত্রা করেছে। আরব কবি ও লেখকগণ সাহসের সঙ্গে নূতন পথে অগ্রসর হচ্ছেন। তাঁরা বিশ্ব-সাহিত্য-ভাণ্ডারে যথেষ্ট দান করে যাচ্ছেন। প্রগতির পথে তাঁদের এযাত্রা বন্ধ হবে বলে মনে হবে না।

কবির বয়স

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

Grow old along with me,—
The best is yet to be—R. Browning

দিন ফুরালো সন্ধ্যা হ'ল বলছে ডেকে সাধু সন্ত
মুচকি হেসে বলছে কবি তাহার আয়ু অফুরন্ত।
চুল পাকিলে দাঁত পড়িলে বলি পলিত খালিত্যেও
ইন্দ্রলুপ্তে দশেন্দ্রিয়ের শক্তি অধিক না থাকিলেও,
কবির বয়স হয় যবীয়স হয় না বয়স বয়স হলেই
সবার সাথে এক বয়সী জানে সবাই বন্ধু বলেই।

বন্ধু কবি বান্ধবী তার কুৎসিতা কি সুন্দরীও
গৌরী কিম্বা শ্যামোজ্জ্বলা না হয় প্রৌঢ়া জরতীও।
সবার সাথে এক বয়সী জরায় দেহ জারেও যদি
স্নেহের সুধা উৎসেধে তার জোয়ারে হয় দ্বিগুণ নদী।
শুষ্ক কাঠে পুষ্প ফোটে পাষাণ ফেটে বটের চারা
জরাজীর্ণ হলেও কবি হয় না গোবি বা সাহারা।

জীবনেরি জয়গানে সে 'জয়মা' বলে জমায় পাড়ি
গায় সে গানে সবার সনে সারিগানের ভাটিয়ারি।
যৌবনে তার নেইকো ভাঁটা শৈশবেরো বিরাম নাহি
তিন ফাগুনের খোকার মত কান্না হাসি যতই চাহি।
রৌদ্র হলে বৃষ্টি হলে শিব ঠাকুরের বিয়ের মত
এক চোখে তার অশ্রু ঝরে আর এক চক্ষু হাস্যে রত।

আয়ুষ্কালের কাল ফুরালে
ফুলের মত শুকিয়ে যাবে—
শুকিয়ে যাওয়া ফুলের মত
সুরভি তার পরেও পাবে।

সবার উপরে

শ্রীসীতা দেবী

১৫

গৌরাঙ্গিনী গিন্নীবান্নী মানুষ, কোন্ অবস্থায় কিরূপ ব্যবহার করতে হয় সে বিষয়ে তাঁর খুব কাটা-ছাঁটা মতামত আছে। সেই ভাবেই নিজে চলেন, এবং অন্যদেরও চালাবার চেষ্টা করেন। স্বামী আসছেন বেশ কিছুদিন বাইরে কাটিয়ে। তা আনন্দ অবশ্য গৌরাঙ্গিনীর হচ্ছে, কিন্তু তাই বলে ত আর ছেলেপিলের সামনে ধেই ধেই করে নাচতে পারেন না?

ট্রেন এসে গেছে এতক্ষণ। ছেলেমেয়ে, নাতী-নাতনী সব সদর দরজার কাছে গিয়ে ভিড় করেছে, চেঁচামেচি করছে। গৌরাঙ্গিনীও গিয়েছেন, তবে সদর দরজার অনেকখানি ভিতরে দাঁড়িয়ে আছেন, মুখখানা গম্ভীরই করে রেখেছেন।

গাড়ী ট্যাক্সি সব এসে গেল। ছেলেমেয়েরা কলরব ক'রে দৌড়ে গেল। গৃহিণী আরও একটুখানি বেরিয়ে দাঁড়ালেন। কর্ত্তা নামলেন, চেহারা দেখে ত মনে হচ্ছে বেশ ভালই ছিলেন। ছোট বৌমা, হিতেন এদেরও ত চেহারা ভালই দেখাচ্ছে। মনুটার মুখ শুকনো, পথে কষ্ট গেছে বোধ হয়। যতই পয়সা খরচ কর, বাড়ীর মত আরাম আর কি কোথাও পাওয়া যায়? বাড়ীর ঝি ত আহ্লাদে ডগমগ। আঃ মর, রকম দেখ না!

সবাই ভিতরে ঢুকে এল। গৌরাঙ্গিনী ছেলেমেয়ে বৌ সবাইকার প্রণাম নিয়ে বললেন "ছিলে কেমন সব?"

স্বামী আর ছেলে বললেন, "ভালই।" উষা ত এখন কথা বলতে পারে না? সে বিনীতভাবে উপরে চলে গেল।

সুমনা বলল, "যেমন এখানে থাকি, তাই ছিলাম।" মনে মনে বলল, "কত মিথ্যে কথাই যে এ জগতে বলতে হয়!"

সবাই উপরে উঠে এল। গৃহিণী বললেন, "নেয়ে-খেয়ে সব শুয়ে পড়। পথের কষ্ট বড় কষ্ট যতই ফার্ষ্ট ক্লাশে এসো না কেন।"

সুমনার আপত্তি ছিল না, শুয়ে পড়বার একটা সুযোগই সে খুঁজছিল। কথাবার্ত্তা বলতে ভাল লাগছিল না। ধরা পড়ার ভয় যে বড় ভয়, না হলে বুকের ভিতর তার যে অশ্রুর সাগর ফুলে ফুলে উঠছে, কেঁদে একটু সেটাকে হাল্‌কা করে নিত। কিন্তু রাত্রি ছাড়া সে সুযোগ কোথায়? সুচিত্রার বিয়ে হয়ে যাবার পর সে এখন ঘরে একলাই শোয়, বাড়ীর ঝি অবশ্য দরজার কাছে বিছানা ক'রে শুয়ে থাকে, শীতকালে ঘরের ভিতরে এসেও শোয়। মায়ের ঘর ত পাশেই, কাজেই এ ব্যবস্থায় কারও আপত্তি হয় নি।

যা হোক, খেয়েই শোওয়া গেল না। গীতা এল গল্প করতে, উষাও এসে জুটল। হিতেন ত নাক ডাকিয়ে ঘুমচ্ছে, সুতরাং সে আর ঘরে বসে থেকে কি করবে?

সে এসেই সুরু করল, "কি সুন্দর জায়গা ভাই বোম্বাইটা। তুমি যে ছেলেপিলে নিয়ে জড়িয়ে পড়েছ, না হলে কেমন বেড়িয়ে আসতে পারতে।"

গীতা বলল, "যেমন কপাল আমার। গোড়া থেকেই ত হাতে-পায়ে শেকল পড়েছে। কোথাও কি একটু যেতে পেরেছি? বড় ঠাকুরঝি আর আমি হচ্ছি জুড়ী। তুই কেমন ঘুরে এলি, সুচিত্রাও ত শুনলাম পশ্চিম বেড়াতে গেছে। তা, তোরা খুব বেড়িয়েছিস ওখানে?"

উষাই সব কথার জবাব দিচ্ছে, সুমনাকে কিছুই বলতে হচ্ছে না। সে বলল, "খুব বেড়িয়েছি ভাই দিদি। বিজয়বাবু কি ছাড়েন? রোজ টেনে বার করেছেন। কত সব সুন্দর সুন্দর বাগান দেখলাম, যাদুঘর দেখলাম। আবার সমুদ্রের জানোয়ারের চিড়িয়াখানা দেখলাম।"

সুমনা বলল, সমুদ্রের জানোয়াররা কি চিড়িয়া নাকি?"

উষা বলল, "ঐ হ'ল, আবার কি বলব? ছবি যে কত দেখেছি তার ঠিকানা নেই। সত্যি, বিজয়বাবু লোকটা কি ভাল ভাই। পুরুষ মানুষে যে পরের জন্যে এত ক'রে তা কোনোদিন দেখিনি। বিয়েতে কোনো প্রেসেণ্ট দেন নি বলে এতদিন পরে একটা প্রেসেণ্টও দিয়ে দিলেন।"

গীতা বলল, "ওমা, তাই নাকি? কই, দেখি কি প্রেসেণ্ট?"

উষার নেক্‌লেশ আবার বেরল, এবং তাই নিয়ে খুব "আহা উহু" চলতে লাগল। সুমনা চুপ করে ব'সে ব'সে

সব দেখতে লাগল। গৌরাঙ্গিনী পাশের ঘর থেকে এসে জিজ্ঞাসা করলেন কি হয়েছে। নেক্‌লেশ দেখে বললেন, "ওমা, এতদিন পরে আবার উপহারও দিয়েছে? খুব আত্মীয়তা করেছে দেখছি।" কথাটা এমন সুরে বললেন, যেন আত্মীয়তা করাটা বিজয়ের অনধিকার-চর্চ্চাই হয়েছে।

যাহোক, এই সময় গীতার ছেলে উঠে চেঁচাতে সুরু করায়, তাকে চ'লে যেতে হ'ল। উমা উঠে গেল একটু পরে। সুমনা শুয়ে পড়ে কি যে ভাবতে লাগল সে-ই জানে। পাশ ফিরে দু'চারবার চোখ মুছে ফেলল। দরজা বন্ধ ক'রে একবার স্যুটকেস্‌ থেকে বিজয়ের দেওয়া চুড়ি জোড়া বার করল। সেটাকে হাতে ক'রে ভাবল, "এতে তোমার স্পর্শ লেগে রয়েছে এখনও।"

নিজেকে সে এখন চিনে নিয়েছে। কিন্তু তাতে তার দুঃখ বেড়েছে বই কমে নি। সারাক্ষণের চিন্তা তার, কি ক'রে নিজেকে সে গোপন করবে। তার হয়ত মৃত স্বামী কি এখনও তার হৃদয়কে দখল ক'রে আছে? সে জানে, কথাটা মিথ্যা, নির্ম্মলের সে রকম অধিকার কোনো দিন জন্মায়ই নি, তা এখন থাকবে কি? কিন্তু লোক-সমাজে সে বিবাহিতা নারী ব'লে পরিচিত, আর কাউকে ভালবাসতে গেলে তার পাপ হয়।

আর বিজয়? সেও কি সুমনাকে ভালবাসে না? সুমনার সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। সে ওখানে জোর ক'রে তাকে কথা বলতে দেয় নি, কিন্তু সব জায়গায় কথায়ই কি দরকার হয়? আর কথাও কি সে বলে নি, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে? গানের দুটো লাইন খালি তার মনে ঘুরতে লাগল, "গোপনে প্রেম রয়না ঘরে, আলোর মত ছড়িয়ে পড়ে।" সুমনার প্রেমও কি বিজয়ের চোখে ধরা পড়েছে? সুমনা ঠিক জানে না।

দিনটা কেটে গেল। সুমনা একবার খোঁজ করল বোম্বাইয়ে কোনো টেলিগ্রাম করা হয়েছে কি না। হিতেন বলল, সে খবর দিয়ে দিয়েছে।

সুমনা আগে আগেও বিজয়ের চিঠি পেত, তবে মাসে তিন চারখানার বেশী নয়। এবারে ব্যগ্র আর আকুল হয়ে রইল কতদিনে চিঠি আসে। অমৃতের পাত্রকে সে মুখের সামনে থেকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে এসেছে কিন্তু তৃষ্ণায় যে তার বুক জ'লে যাচ্ছে? সত্যি কি পাপ হ'ত? লোভের চোখে হ'তই বোধ হয়। কিন্তু তার নিজেরও মনে কি এ সন্দেহ আছে? সুমনার মন সাড়া দেয় না, এ প্রশ্নের উত্তর সে যেন জানে না।"

চিঠি এলই শেষে, তিন চার দিন পরে। বিজয় এবারে তাকে কল্যাণীয়াসু বলে সম্বোধন করে নি। সোজাসুজিই লিখেছে,

"সুমনা,

এতদিনে আবার কলকাতার অভ্যস্ত জীবনের মধ্যে জায়গা ক'রে নিয়েছ বোধ হয়। কোথাও কি বাধছে না? বোম্বাইকে একটুও মনে আছে না ভুলে গেছ? আমার বাড়ীটা তোমরা যাবার পর বড় বেশী খালি হয়ে গেছে, এবং ছোট বৌদি আর তুমি না থাকায় বড় বেশী অগোছালও হয়ে উঠেছে। যাহোক, আমার বন্ধুটি আর দিন কয়েক পরে ফিরে আসছেন, কাজেই গোলমালের অভাব অতঃপর আর হবে না, তবে তাতে কোনো শান্তি পাব কি না জানি না।

পরীক্ষার খবর পেলেই জানিও। আগের মত ফল অত ভাল না হলেও বেশী ক্ষুব্ধ হোয়ো না। ইউনি-ভার্সিটির পরীক্ষা জীবনের কতখানিই বা? দু'দিনে ভুলে যাবে। আমিও অনেকগুলো পরীক্ষায় ফার্ষ্ট হয়েছিলাম, কিন্তু এখন সেটা আমায় কিছুই সান্ত্বনা দেয় না। অন্য পরীক্ষায় যে হেরে যেতে বসেছি, সেই দুঃখটাই বড় হয়ে উঠেছে।

শরীর ভাল রেখো। এখান থেকে তুমি একটুও সেরে যেতে পারলে না, এটাও আমার একটা দুঃখ। হয়ত এর মধ্যেও আমার দোষ ছিল। তুমি একটু সুস্থ হয়েছ জানতে পারলে সুখী হব। বাড়ীর আর সকলে কেমন আছেন? প্রণম্যদের প্রণাম দিও ও ছোটদের স্নেহ জানিও।

ইতি

বিজয়"

সুমনা তার পরদিনই চিঠির উত্তর দিল। কিন্তু বিজয়ের মত সুন্দর ক'রে লিখতে পারল না। মন যাই বলুক, হাত আড়ষ্ট হয়ে আসে। ছোট-খাট একটা চিঠি কোনোমতে রচনা ক'রে পাঠিয়ে দিল।

দিন কাটতে লাগল একটা একটা ক'রে। মন তার আগের মতই জলতে লাগল, কিন্তু মুখের মুখোসটা ক্রমে এঁটে বসে যেতে লাগল। সে যেন বড় তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যাচ্ছে, ছেলেমানুষের দলে আর তাকে ফেলা যায় না। রোগাই ছিল, আরো যেন রোগা হয়ে যেতে লাগল।

গৌরাঙ্গিনী এবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। স্বামীকে বললেন, "খুব ত মেয়েকে বেড়িয়ে নিয়ে এলে, তার এ রকম দশা হ'ল কেন?"

রাসবিহারী মনে মনে মেয়ের জন্তে উদ্বিগ্ন ছিলেন, কিন্তু সেটা ত স্ত্রীকে কিছুতেই জানতে দেওয়া যায় না? কাজেই অত্যন্ত উদাসীন মুখ করে বললেন, "কি দশা হ'ল আবার?"

গৌরাঙ্গিনী বললেন, "আমি না হয় তোমাদের মত অত ইংরিজি বই পড়িনি, তাই বলে কি আমি মুখ্যু না কাণা? মেয়ে খায়দায় না, ঘুমোয় না, আধখানা হয়ে গেছে শরীর, কিছু একটা ঘটেছে ওখানে।"

রাসবিহারী বললেন,"ঘটবে আবার কি? কিছু ঘটেনি —আমরা ত আর মরে ছিলাম না?"

স্ত্রী বললেন, "তা ত ছিলে না, কিন্তু মেয়ের দিকে চোখ রেখেছিলে একটুও? না টো টো করে ঘুরতে ছেড়ে দিয়ে ছিলে, বিজয়ের সঙ্গে?"

রাসবিহারী বিরক্ত হয়ে বললেন, "বিজয়ের সঙ্গে একলা সে কোনোদিন যায় নি, হিতেন আর বৌমা সব সময় সঙ্গে থাকত।"

গৌরাঙ্গিনী বললেন, "আবার চিঠি লেখালেখিও করে দেখছি।"

রাসবিহারী বললেন, "সেটা কি তুমি আজ আবিষ্কার করলে? সে ত যখন স্কুলে পড়ত, তখন থেকেই লেখে।"

গৌরাঙ্গিনী বললেন, "কি জানি বাপু, ভাল কিছু বুঝি না। মেয়ে আমারও ত বটে, তা আমার ত কোনো কথাই চলে না" বলে তিনি নিজের কাজে চলে গেলেন।

এইবার একদিন সুমনার পরীক্ষার খবর এসে গেল। ভালভাবেই পাস করেছে, তবে গতবারের মত অত ভাল নয়। এ নিয়ে আর টেলিগ্রাম করবে কি? চিঠি লিখেই খবরটা বিজয়কে জানিয়ে দিল।

বিজয় উত্তরে লিখল,

"সুমনা,

চিঠি পেলাম। অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং পরের বারে যেন আবার খুব ভাল কর, এই আশীর্ব্বাদ। এতে আশা করি ভয় পাবে না। বি. এ.-তে কি কি পড়বে সেটা একটু ভেবেচিন্তে ঠিক কোরো। সম্ভব হয় ত ভাল কোনো কলেজে যেও।

আমাদের দিন কাটছে এক রকম। তোমারও কলেজ খুলে গেলে দিন ভালই কাটবে—কাজের মত ওষুধ আর নেই। দেহের অসুখও সারে, মনের অসুখও সারে। তবে কাজটা অবশ্য কিছুটা মনের মত হওয়া চাই। ক্রীত-দাসের কাজ করে কোনো সুখ হয় না।

পূজার সময় কলকাতায় যাবই ঠিক করে রেখেছি। আজ এই পর্য্যন্ত। বিজয়"

পূজোর সময় হতে ত এখনও আড়াই মাস দেরি। কিন্তু উপায় বা কি? নিজের কলেজে ভর্ত্তি হওয়া, বই কেনা, এই সব নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত করে রাখল সুমনা। চিঠিপত্র যেমন লিখত তেমন লিখতেই লাগল। কিন্তু ক্রমে তার মনে একটা ভয় জেগে উঠতে লাগল যে,বিজয় বোধ হয় তাকে ভুলে যেতে আরম্ভ করেছে। তার চিঠির সুর বদলেছে, ক্রমেই যেন হাল্কা হয়ে আসছে। হতে পারে, সুমনা ত তাকে কিছুই জানাতে পারে নি, কোনো আশ্বাসই দিতে পারে নি। কোনো প্রতিদান না পেলে, ক'জন মানুষ চিরকাল একতরফা ভালবেসে যেতে পারে? পুরুষ মানুষে বোধ হয় পারেই না। কিন্তু সুমনা যদি দুঃখ পেয়ে এতে মরেও যায়, তবু সহ্য করে থাকা ছাড়া আর তার কি করবার আছে? বাবা বলেছিলেন বটে যে, সাত বছর নির্ম্মলের কোনো খোঁজ না পেলে সে বিয়ে করতে পারে, কিন্তু সাত বছর হতেও ত চার বছর প্রায় দেরি আছে। তত দিন বিজয় কি তার পথ চেয়ে বসে থাকবে?

যাক্ পূজোর ছুটিটা অবশেষে এসেই পড়ল এবং সুমনা খবর পেল যে, বিজয় কলকাতায় আসছে। হিতেনকেও সে একটা চিঠি লিখে জানিয়েছে। রাসবিহারী সেখানে অবশ্য বিজয়কে নিমন্ত্রণ করে এসেছিলেন তাঁদের বাড়ী উঠতে, কিন্তু সেটা অনেকটা না ভেবেই বলে ছিলেন। গৃহিণীর যে রকম বিরূপতা বিজয় সম্বন্ধে, তাতে সে এখানে থাকতে এলে কোনো আরামই পাবে না, বিরক্ত হয়ে যেতেও পারে। কিন্তু অতদিন ধরে তার বাড়ীতে থেকে এসে এখন নিজেরা একেবারে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলে কি করে? তিনি হিতেনকে তাড়া লাগালেন, "কই রে, তোর গাড়ী কেনার কি হ'ল?"

হিতেন বলল, "এই যে, সামনের হপ্তার মধ্যে হয়ে যাবে।"

হ'লও তাই, পরের সপ্তাহে ঝকঝকে নূতন গাড়ী এসে দাঁড়াল। ছোটরা ত সকলে আনন্দে অস্থির! নূতন গাড়ী চড়ার ছুতোয় তারা রোজই লম্বা লম্বা চক্র দিয়ে আসতে লাগল।

বিজয় কবে আসবে সেটা ঠিক করে লেখেনি। হঠাৎ একদিন সকাল বেলা এসে হাজির হ'ল। রাসবিহারী বললেন, "কই, কবে আসবে, কখন আসবে কিছুই ত জানালে না? হিতেন ঠিক করেছিল তার নূতন গাড়ী করে তোমায় এখানে নিয়ে আসবে।"

বিজয় বলল, "নূতন গাড়ীর সদ্ব্যবহার আরো অনেক রকমে করা যাবে। অনেক জায়গায় বেড়ানোর প্রস্তাব

ছিল না? সেই দিকে মন দেওয়া যাক্। কোথায় কোথায় যাবেন কিছু ঠিক করেছেন?"

এই নিয়ে আলোচনা চলতে লাগল। সুমনার সঙ্গে কথাবার্ত্তা সে আগের মতই বলে গেল, কিন্তু সুমনার মনের ভয় দূর হ'ল না। বিজয়কে চোখে দেখতে পাচ্ছে, এ একটা খুব বড় জিনিস তার কাছে, কিন্তু এই সংশয়ের খোঁচাটা যদি না থাকত।

যাক্ কথা ত বলতে হবে, চুপ করে বসে শুধু বিজয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না ত? জিজ্ঞাসা করল, "আপনাদের সেই চাকরটাই আছে?"

বিজয় বলল, "আছে এখনও, তবে বেশী দিন থাকবে না। আমার বন্ধু বিয়ে করে অন্য বাড়ীতে উঠে যাচ্ছেন, কাজেই অত দামী চাকরের আর আমার দরকার হবে না। আমি অন্য একটা লোক রেখে দেব।"

উষা বলল, "ঐ অতবড় ফ্ল্যাটে একলা থাকবেন? ভয় করবে না?"

বিজয় বলল, "সম্প্রতি ত থাকছি, তার পর যদি ভয় করে তখন অন্য জায়গায় উঠে যাব।"

হিতেন বলল, "ফ্ল্যাটটা ভারী চমৎকার ছিল কিন্তু। সঙ্গে থাকবার লোক পাকাপাকি জুটিয়ে নিন্ না একজন, তা হলে আর বাড়ী ছাড়তে হয় না।"

বিজয় বলল, "ও রকম লোক কি সহজে পাওয়া যায়? বাড়ী পাওয়া বরং তার চেয়ে সোজা।"

সুমনার ইচ্ছে করল উঠে ঘর থেকে চলে যায়, কিন্তু সেটা নিশ্চয়ই অন্যরা লক্ষ্য করবে ভেবে সে বসেই রইল।

রাসবিহারী বিজয়কে পরদিন খেতে নিমন্ত্রণ করলেন দুপুরে। ঠিক করলেন, গৌরাঙ্গিনী যদি কিছু গোলমাল করেন তা হলে তাঁকে আচ্ছা করে বকে দেবেন। গৌরাঙ্গিনী যতই জাঁহাবাজ গিন্নী হোন্ না কেন, স্বামীর বকুনিকে এখনও ভয় করে চলতেন।

যাহোক্, বকুনি এড়াবার জন্যই বোধহয় গৃহিণী কোন ওজর-আপত্তি করলেন না। রান্নাবান্নাও ভাল করে করলেন। বিজয় এসে অনেকক্ষণ ধরে বসবার ঘরে বসে সকলের সঙ্গে গল্প করল। খাবার ডাক যখন পড়ল, তখন দেখা গেল যে, টেবিলে খাওয়ার জায়গা করা হয়েছে শুধু চারজনের জন্য। বৌ দু'জন ও সুমনা অবশ্য উপস্থিত আছে।

গৌরাঙ্গিনীকে বিজয়ের সামনে আসতেই হ'ল, যদিও ইচ্ছা ছিল না, তার প্রণামও নিতে হ'ল। বিজয় দেখতে এত ভাল কেন ভেবে তাঁর মেজাজ আরো খারাপ হয়ে গেল। তাঁর জামাই নির্ম্মল দেখতে ভাল ছিল না এবং সেই জন্যে মেয়ের তাকে মনে ধরে নি, এই তাঁর ধারণা ছিল। এ কোন্ শয়তান এমন মনোহর রূপ ধ'রে এসে সুমনাকে ভোলাচ্ছে।

যাক্, খাওয়া ত কোনো মতে শেষ হ'ল। কর্ত্তা, হিতেন, জিতেন, সবাই অনেক গল্প করলেন, মেয়েরাও মাঝে মাঝে যোগ দিল। হিতেন বলল, "পরশু ত রবিবার, চলুন ডায়মণ্ড হারবার ঘুরে আসি। সকালে যাব, সারাটা দিন থাকব, সন্ধ্যা বেলা ফিরে আসব।"

বিজয় বলল, "আমার আর কি আপত্তি? আমি ত বেড়াতেই এসেছি।"

গৃহিণী বললেন, খাওয়া-দাওয়ার কি হবে?

জিতেন বলল, "ভাল ডাকবাংলা আছে। রঘুকে নিয়ে যাব, সে রান্না করে দেবে। তা হলে বাবাও যেতে পারবেন।" কর্ত্তা না গেলে যে গৌরাঙ্গিনী সুমনাকে আটকাতে চেষ্টা করবেন সেটা জিতেন ধরেই নিয়েছিল।

রাসবিহারী বললেন, "কে কে যাচ্ছ?"

হিতেন বলল, "সকলেই ত যেতে পারে, দুটো গাড়ী রয়েছে যখন।"

স্থির হ'ল বিজয়, হিতেন, জিতেন, সুমনা ও উষা ত যাবেই। রাসবিহারীও ভেবেচিন্তে যাওয়াই ঠিক করলেন। গীতা আগেই নেপথ্যে অনেক কান্নাকাটি করে ঠিক ক'রে রেখেছিল যে, এবার সে নিশ্চয়ই যাবে। রাণু ত ঠাকুরমার কাছেই থাকে, তার মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। কাতীকে অনেক বখশিসের লোভ দেখিয়ে গীতা স্থির করেছে যে, খোকনকে সে সারাদিন রাখবে। একটা দিন সে দিবা-নিদ্রা দেবে না। গৌরাঙ্গিনীর এতে কোনো আপত্তি ছিল না। নাতী-নাতনীর উপর তাঁর অধিকার যে গীতার চেয়ে বেশী এইটেই তিনি ভাবতে ভালবাসতেন।

সকালে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে সবাই যাত্রা করল। হিতেনের নিজের গাড়ীতে সে আর উষা, সুমনা ও বিজয়। পিছনের পুরনো গাড়ীতে গীতা, জিতেন, রাসবিহারী আর রঘু।

জিতেন বলল, "আরও সকালে বেরুতে পারলে ভাল হ'ত। রোদটা বড় কড়া হয়ে যাচ্ছে। ওখানে আবার ছাতা মাথায় দেওয়া সুবিধা নয়, বড় জোর হাওয়া।"

গীতা বলল, "হোক্ গে, ছোটগুলো ত সঙ্গে নেই।"

সামনের গাড়ীতে হিতেন ড্রাইভ করছে, বিজয় তার পাশে বসে আছে। উষার ইচ্ছা ছিল হিতেনের পাশে বসে যায়, কিন্তু শ্বশুর শাশুড়ীর সামনে সে ভাবে বসা ত গেল না? বিজয়কে আর সুমনাকে পাশাপাশি বসতে

দেওয়াও চলে না, বাবা যদি তাতে রাগ করেন। কাজেই নিতান্ত গম্ভময় ভাবেই তাদের গাড়ী চলল।

ডাক বাংলায় পৌঁছতে লাগল বেশ খানিকক্ষণ। থেমেই রাসবিহারী বললেন, "তোমরা খানিকটা বেড়িয়ে এস, আর আধ ঘণ্টা পরে বাইরের দিকে তাকানোই যাবে না। রঘু বাজারে যাক, আমি এখানে ব'সে একটু বিশ্রাম করি।"

বুড়ো ড্রাইভার আর রঘু মিলে অল্পস্বল্প জিনিসপত্র যা সঙ্গে এসেছিল, তা ডাকবাংলার ঘরে তুলল। বিছানা ইত্যাদি পরিষ্কার করে পাতা আছে, এবং ঘর ও চেয়ার প্রভৃতিও ঝাড়ামোছা করা আছে দেখে রঘু বাজারে চলে গেল। রাসবিহারী বারান্দায় একটা আরাম কেদারায় ব'সে ঝিমতে লাগলেন এবং বুড়ো ড্রাইভার এদিক ওদিক ঘুরতে লাগল।

বাইরে বেরিয়েই দুই বৌ মাথার কাপড় খুলে দিল, বলল, "এমন সুন্দর হাওয়া, মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হোক্।"

উষার অবশ্য ভাসুরের সামনে মাথার কাপড় খুলতে একটু লজ্জা করল, কিন্তু জিতেন নিজের স্ত্রীকে নিয়ে খানিকটা অগ্রসর হয়ে যাওয়ায় তার সে অসুবিধাও বেশীক্ষণ রইল না।

উষা বলল, "ঠিক মনে হচ্ছে আবার যেন বোম্বাই ফিরে গিয়েছি। মানুষও সেই চার জন, আর সামনে সমুদ্র।"

বিজয় বলল, "বোম্বাইটা আপনার খুব ভাল লেগেছিল, না?"

উষা বলল, "খুব। দেশ বেড়ান ত আমার হয়ই নি প্রায়। অতদূরে এই প্রথম গেলাম।"

দলে দলে ছোট ছোট ছেলে ঘুরছে। বেতের টুপি আর সাজি আর পাখা, এই তাদের পণ্য, তাই নিয়ে সকলকে তারা অস্থির করে তুলেছে। সামনে গঙ্গার উদার বিস্তার, ওপারে যেন কাজলে আঁকা তটভূমি। হু হু করে হাওয়া বইছে। যারা বেড়াতে এসেছে তারা এগুলি উপভোগ করবে, না, বেতের টুপি কিনবে? কিন্তু ছেলেগুলো কিছুতেই ছাড়ে না যে?

বিজয় শেষে একটা টুপি কিনে হিতেনের মাথায় পরিয়ে দিল, "নিন্ মশায়, আপনিই পরুন। টোপর পরা একটু অভ্যাস আছে ত?"

হিতেন বলল, "আপনার জন্যেও একটা কিনি। বয়স ত ঢের হ'ল, একটু অভ্যাস করতে আরম্ভ করুন।"

উষা বলল, "সত্যি, বৌ যদি একটি নিয়ে যান, তা হলে বোম্বাইয়ের ফ্ল্যাটে একলা থাকার সমস্যা চিরদিনের মত মিটে যায়।"

বিজয় বলল, "কথাটা মন্দ বলেন নি, ভেবে দেখতে হচ্ছে।"

সুমনা বলল, "ছোড়দা, আমার মাথাটা কিন্তু রোদে ধরে উঠেছে, আমি ফিরে যাব?"

হিতেন বলল, "যাঃ, মেয়ে যেন ননীর পুতুল। আচ্ছা, এই ঝাউ গাছের ছায়ায় বসে থাক একটু, আমরা আরও পাঁচ দশ মিনিট ঘুরে আসি।"

বিজয় বলল, "একটা ক্যামেরা ত রয়েছে সঙ্গে, একটু জিতেনবাবুদের ডেকে আনুন না, একটা গ্রুপ ফোটো তোলা যাক।"

"আচ্ছা, আনছি," বলে হিতেনরা চ'লে গেল এগিয়ে। বিজয় সুমনার দিকে ফিরে বলল, "মাথা ধরল কেন আবার?"

সুমনা বলল, "বড় রোদ, সত্যি আরও আগে আসা উচিত ছিল।"

বিজয় বলল, "ওদের ত আসতে বেশ খানিকক্ষণ লাগবে, অনেক দূরে গিয়ে পড়েছে। তোমারই একটা ছবি তুলি; আপত্তি আছে?"

সুমনা বলল, "আপত্তি কিছু নেই। তবে রোদে ঘুরে আর ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটা খেয়ে ভূতের মত চেহারা হয়ে গেছে। এর আর কি ভাল ছবি হবে?"

বিজয় বলল, "ভূত এত ভাল দেখতে হয় না। বেশ ত কপালকুণ্ডলার মত দেখাচ্ছে।"

সুমনার মুখে অত্যন্ত মৃদু একটা হাসির ছায়া যেন একবার প'ড়ে মিলিয়ে গেল। বলল, "আপনি কি লুকিয়ে লুকিয়ে সাহিত্যচর্চ্চা করেন? কথাবার্ত্তা শুনে সেই রকম মনে হয়।"

বিজয় বলল, "সাহিত্য পড়াকে যদি সাহিত্যচর্চ্চা বল তাহলে করি। লেখা-টেখার অভ্যাস নেই।"

সুমনা বলল, "এ জায়গাটা কিন্তু অনেকটা কপালকুণ্ডলার আবির্ভাবের জায়গার মত। সেই বিশাল নদী, সেই বালিয়াড়ি—"

বিজয় তাকে বাধা দিয়ে বলল, "আর একজন পথহারা পথিক, কিন্তু কপালকুণ্ডলা তাকে পথ দেখাতে চাইছেন না।"

সুমনা বলল, "ডাকবাংলা অবধি পথ দেখাতে পারি, তার বেশী পথ দেখাবার ক্ষমতা আমার নেই।"

বিজয় বলল, "কেন?"

"আমি নিজেই যে পথ দেখতে পাই না? সামনে খালি অন্ধকার আছে মনে হয়।"

বিজয় বলল, "একটু আলো এতদিনেও দেখলে না? দেখা উচিত ছিল।"

সুমনা বলল, "দেখি মাঝে মাঝে, তবে হয়ত সেটা আলেয়ার আলো।"

ইতিমধ্যে হিতেন জিতেনরা এসে পড়ায়, ছবি তোলার পর্ব্ব সুরু হ'ল। যতক্ষণ ফিল্ম রইল, ততক্ষণ ছবি তুলে তবে তারা ডাকবাংলায় ফিরল। রান্না হতে একটু দেরি ছিল, ততক্ষণ ব'সে ব'সে গল্পই হ'ল। এখানকার ঘোলা জলে স্নান করতে কারও ইচ্ছা করল না।

খাওয়া দাওয়া সারা হতে বেলা গড়িয়ে গেল। গীতা এইবার যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল। সারাদিন ছেলেপিলের ধকল সামলে গৌরাঙ্গিনী পাছে চ'টে যান এই তার ভয়। ঘণ্টাখানিক পরে তারা বেরিয়েই পড়ল।

এর পর আর যে ক'দিন বিজয় রইল, বেড়ান অনেক বারই তাদের হয়ে গেল। তার পর চলে যাবার দিন এগিয়ে এল, বিদায় নিয়ে সে চ'লেও গেল।

সুমনা নিজের মনের দিকে তাকিয়ে দেখল। তার বুকের ভিতরটা যেন ক্রমে মরুভূমি হয়ে আসছে। আর কতদিন সে এ বোঝা বয়ে হাঁটতে পারবে? তার আর ত পা চলে না।

১৬

সুখে-দুঃখে মানুষের দিন কেটেই যায়। এ বাড়ীর দিনগুলোও কাটছে। সুচিত্রা বাপের বাড়ী এসেছে কয়েকদিনের জন্যে, সারাদিন স্বামীর গল্প করে সুমনার মনে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। বৌদিরা সুচিত্রাকে নিয়ে খুব ঠাট্টা-তামাসা করে।

রাসবিহারীর শরীরটা ক্রমে ক্রমে আরো যেন অথর্ব্ব হয়ে পড়ছে। গৌরাঙ্গিনী সারাক্ষণই উদ্বিগ্ন, মেজাজ তাঁর আগের চেয়েও খারাপ হয়ে গেছে। তাঁর সংসারের জন্য তত ভাবনা অবশ্য কিছু নেই, চামেলী ছাড়া আর সকলেরই ব্যবস্থা হয়ে গেছে, কিন্তু সুমনার ব্যবস্থা যে হয়েও হ'ল না? তার তপঃক্লিষ্টা উমার মত চেহারা দেখে গৌরাঙ্গিনীর মনের ভিতর জ্বলতে থাকে। কিন্তু কি করবেন তিনি?

গ্রীষ্মের ছুটির সময় রাসবিহারী গৃহিণীকে নিয়ে একবার বাইরে যাবেন ভাবছিলেন। তীর্থস্থান হলে তিনি হয়ত আপত্তি করবেন না। সুমনার শরীরেরও উন্নতি হতে পারে। সে ত খালি রোগাই হচ্ছে। ডাক্তার দেখানও হয় মাঝে মাঝে, ওষুধও কেনা হয়, কিন্তু উপকার কিছু পাওয়া যায় না।

হঠাৎ আষাঢ় মাসের প্রথম দিকে গৌরাঙ্গিনীর বাপের বাড়ী থেকে একটা দুঃসংবাদ এসে পৌঁছাল। তাঁর বৃদ্ধা মা এখনও বেঁচে ছিলেন, মাঝে মাঝে তাঁর খবর নিতেন গৌরাঙ্গিনী, তবে দেখতে যাওয়া বহু বৎসর হয় নি। তিনি হঠাৎ দারুণ পীড়িতা হয়ে পড়েছেন, মেয়েকে জামাইকে শেষ দেখা দেখতে চাইছেন। কবে চলে যান তার ঠিকানা নেই।

যেতেই হবে। বেশী দিন থাকতে না হলেই মঙ্গল, কিন্তু যদি থাকতে হয় তবে যতটা কম অসুবিধা ভোগ করতে হয় ততই ভাল। জিতেন গিয়ে মা-বাবাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে, সঙ্গে পুরোনা চাকর যাবে। খাবার জিনিস যা সেখানে পাওয়া যায় না, সব সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। আয়োজন সব তাড়াতাড়ি শেষ করতে হ'ল, কারণ বৃদ্ধা রোগিণীর অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছে।

রাসবিহারী সুমনাকে বললেন, "তোমাকে রেখে যেতে আমার মন সরছে না মা, তোমার শরীরটা বড় খারাপ হয়ে যাচ্ছে। যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরে আসব। তুমি খুব সাবধানে থেকো।"

সুমনা বলল, "সাবধানেই ত থাকি বাবা, কিন্তু কোনো কিছুতেই যেন আমার উপকার হয় না।"

পরদিন তাঁরা স্বামী-স্ত্রীতে রওনা হয়ে গেলেন। সুমনা আরও যেন আন্মনা হয়ে গেল। বাড়ীটা এমন খালি লাগে। সুচিত্রা চলে গেল, উষাও সুবিধা পেয়ে কিছু দিনের মত বাপের বাড়ী চলে গেল। দুই ভাই অফিস চলে যায়, গীতা শাশুড়ীর অভাবে সারাদিন মেয়ে-ছেলে সামলিয়ে একেবারে হয়রান হয়ে যায়। কাকীমাদের দিকে তিনি দরজায় খিল দিয়ে ঘুমান। সুমনা পড়তে চেষ্টা করে, পারে না। বিজয়ের পুরোন চিঠিগুলি নিয়ে বার বার করে প'ড়ে। ক্রমেই যেন সে দূরে সরে যাচ্ছে, তার মনে হয়।

হঠাৎ সকাল বেলা রাধা ঝি এসে খবর দিল, "মেজ-দিদিমণি, সেই বোম্বাইয়ের মাষ্টারমশায় এসেছেন।"

সুমনার বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ করে উঠল। বলল, "বসবার ঘরে বসতে বল, যাচ্ছি। দাদারা কোথায়?"

রাধা বলল, "দু'জনেই চায়ের ঘরে ঢুকেছেন। বৌদি খাবার ঠিক করছে।"

সুমনা নেমে গেল। বিজয় উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "এবার আর খবর দিতে পারিনি। বাবাকে দেখে এলাম একবার —বাড়ীটা এমন চুপচাপ লাগছে কেন?"

সুমনা বলল, "বাড়ীতে আছেই বা কে? মা তাঁর মাকে দেখতে দেশে গেছেন, বাবা গেছেন তাঁর সঙ্গে। ছোট বৌদি বাপের বাড়ী গেছে। আছি আমি, দাদারা, বড় বৌদি আর বাচ্চারা।"

বিজয় বলল, "ও, তোমার বাবা নেই বুঝি এখানে? একবার দেখা হলে ভাল হ'ত। কলকাতায় এসেছি আমি, একটু বিশেষ প্রয়োজনে। হয়ত কিছু দিনের জন্যে আমাকে বিদেশে যেতে হবে। তার আগে তোমাকে কিছু বলবার ছিল আমার।"

সুমনার মুখটা একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেল। গলাটাও বুজে যাচ্ছে, কোন মতে বলল, "বিদেশে? কোথায় যাবেন? কত দিনের জন্তে?"

বিজয় বলল, "বলব সবই। বলবার জন্তেই আসা এবার।"

এমন সময় জিতেন এবং হিতেন এসে ঘরে ঢুকল। জিতেন জিজ্ঞাসা করল, "হঠাৎ এ সময়ে যে? আসবার কথা ত কিছু শুনি নি?"

বিজয় বলল, "হঠাৎ এসেছি, বিশেষ প্রয়োজনে। কাল-পরশুর মধ্যে ফিরে যাচ্ছি।"

জিতেন বলল, "রেল কোম্পানীর কাছে আপনার ঋণ ছিল আর জন্মের। কম পয়সা দিচ্ছেন না তাদের।"

বিজয় বলল, "আর জন্মের নানা রকম ঋণই এখন শোধ করতে হচ্ছে।"

জিতেনদের খাবার দেওয়া হয়েছিল, তারা খেতে চলে গেল। বিজয় উঠে পড়ে সুমনাকে বলল, "দেখ, তোমার সঙ্গে কথা বলতেই আসলে আমার আসা। কিন্তু কথা যে বলব কোথায় তা ত বুঝতে পারছি না। এখানে অসম্ভব, আমি নিজে হোটেলে উঠেছি, সেখানেও অসম্ভব —যাক্, আজ সন্ধ্যার মধ্যে খবর দেব তোমায়, কোথায় meet করতে পারি।"

বিজয় চলে যাবার পরে সুমনা নিজের ঘরে গিয়ে খানিকক্ষণ অভিভূতের মত বসে রইল। এরই মধ্যে জগৎ-সংসার তার কাছে কালো হয়ে আসছে। এবার তা হলে কি বাঁধন ছিঁড়ল পাকাপাকি? বিদেশে যাচ্ছে, কোথায়, কতদিনের জন্তে? আর কি সে ফিরে আসবে সুমনার জীবনে? এর পর সুমনার জীবনে আমরণ তুষানলে জলা ছাড়া বাকি থাকবে কি? কিন্তু যাবার আগে কিই বা সে সুমনাকে বলে যেতে চাইছে? সুমনা কি ধরা পড়ে গেছে তার কাছে? অর্থহীন সান্ত্বনার কথাই কি বলে যেতে চায়?

সন্ধ্যার সময় হরিবাবুর স্ত্রী তাদের বাড়ী বেড়াতে এলেন। বললেন, "কাল আমাদের এখানে সন্ধ্যায় তোমার নিমন্ত্রণ রইল মা। সুকু পাস করে অবধি সবাই খাওয়ার জন্তে ধরেছিল। তা বিজয়কে ওরা বড় ভাল বাসে, সে এসেছে বলে এখনই করছি। যেয়ো কিন্তু নিশ্চয়।"

গীতা বলল, "নিশ্চয় যাবে।"

সুমনা বলল, "যাব বৈকি? ক'টার সময়?"

হরিবাবুর স্ত্রী বললেন, "ওর আর সময় অসময় কি? সাড়ে ছ'টা, সাতটা, যখন হয় যেও। তোমার দিদিমা কেমন আছেন?"

সুমনা বলল, "ভাল আর কই? ভাল আর হবেন না।"

হরিবাবুর স্ত্রী আর দু'চারটে কথা বলে চলে গেলেন। সুমনা নিমন্ত্রণ পেয়ে একটু অবাক হ'ল। এঁদের টানা-টানির সংসার, নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ বড় একটা করেন না; তা ছাড়া তার মনে হ'ল, সে যেন কিছুদিন আগে শুনেছে যে, হরিবাবু তাঁর বড় ছেলেকে নিয়ে কোথায় হাওয়া বদ্‌লাতে গেছেন। এটা কি বিজয়ই করিয়েছে?

পরদিন সকালে আবার বিজয়ের সঙ্গে দেখা হ'ল। সুমনা বলল, "নিমন্ত্রণটা আপনিই করছেন না?"

বিজয় বলল, "যদি বলি হ্যাঁ, তাহলে কি তুমি আসবে না?"

সুমনা বলল, "যাব ত নিশ্চয়ই, কিন্তু একটু অবাক হচ্ছি।"

বিজয় বলল, "মাঝে মাঝে অবাক্ হওয়া ভাল। এক-ঘেয়ে জীবনযাত্রার মধ্যে এগুলো একটু কমা, সেমি-কোলনের কাজ করে।"

বাড়ীর আর সবাই এসে পড়ায়, অন্য কথা উঠল।

বিকেলে স্নানাদি সেরে সুমনা যাবার জন্তে তৈরী হ'ল। গীতা বলল, "অমন ভূত সেজে যাচ্ছ কেন? নিমন্ত্রণ একটা আনন্দের ব্যাপার, শ্রাদ্ধ ত নয়?"

মনে মনে সুমনা বলল, "শ্রাদ্ধই হয়ত আমার, মুখে বলল, "কি এমন বিয়ে বৌভাতে যাচ্ছি?"

বাড়ীর গাড়ী তাকে পৌঁছে দিয়ে গেল। ন'টার সময় আবার এসে তাকে নিয়ে যাবে। হরিবাবুর বাড়ীর সবাই এসে তাকে অভ্যর্থনা করে নিল। সুকু আছে, তার ছোড়দা আছে, বাড়ীর গৃহিণী আছেন। হরিবাবু আর তাঁর বড় ছেলে নেই। সুমনা ছাড়া আর কোনো

নিমন্ত্রিতও নেই। বুঝল ব্যাপারটা একান্ত তারই সঙ্গে দেখা করার জন্যে।

খাওয়া-দাওয়া সকাল সকাল হয়ে গেল। তার পর গৃহিণী উপরে চলে গেলেন কি একটা কার্য্য উপলক্ষ্যে। ছেলেমেয়ে দু'জন খানিক এধার-ওধার করে কখন এক সময় অদৃশ্য হয়ে গেল। শোনা গেল তারা কোথায় থিয়েটার দেখতে যাচ্ছে। ঘরে বাকি রইল শুধু সুমনা আর বিজয়।

একেবারে চুপ ক'রে ব'সে থাকতে সুমনার ভাল লাগছিল না। কিন্তু কথা বলার খাতিরে কথা বলার মত মন তখন তার ছিল না। বিজয় চুপ ক'রে আছে কেন? যা বলার তা বলা হয়েই যাক্।

ঘরের কোণের ছোট সোফাটাতে সুমনা বসেছিল। একটা চেয়ার টেনে তার পাশে ব'সে বিজয় বলল, "কথাটা আরম্ভ করছি। বেশী upset হোয়ো না কিন্তু।"

সুমনার মনে হ'ল, কে যেন তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে যাচ্ছে। একবার বিজয়ের দিকে তাকিয়েই চোখটা নামিয়ে নিল, বলল, "বলুন।"

বিজয় বলল, "তখন জানতে চাইছিলে আমি সত্যই যাচ্ছি কি না বিদেশে, আর গেলে কতদিনের জন্যে যাচ্ছি। বাইরে যাবার সুবিধা একটা হয়েছে। যাব কি না এখনও স্থির করি নি। তবে যাই যদি, বছর দুইয়ের জন্যে আপাততঃ যাব। এমন অবস্থা হতে পারে যে, আর ফিরেই আসব না। এখন সবই নির্ভর করছে আমার কথার কি উত্তর তুমি দাও তার উপরে।"

সুমনার তখন চোখের সামনে জগৎ-সংসার যেন ভেঙে উল্টো-পাল্টা হয়ে যাচ্ছে। তবু একবার জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে বিজয়ের মুখের দিকে তাকাল।

বিজয় বলল, "সুমনা, তোমার সঙ্গে পরিচয় আমার প্রায় সাড়ে চার বছর হতে চলল। এসেছিলাম তোমার মাষ্টার রূপে। কিন্তু তার পরও যে ক্রমাগত তোমার চার পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছি এতদিন ধরে, সেটা কেন তা কি তোমার একবারও জানতে ইচ্ছা করে নি?"

সুমনা উত্তর দিল না।

বিজয় বলল, "উত্তর দাও একটা। আমার মনে হয় না তুমি কিছুই বোঝ নি। তাহলে আমার ওখানে ছিলে, তখন আমাকে কাছে আসতে দিতে অত ভয় পেতে কেন? আমি যে নিজের ভালবাসাটাই জানাতে চাইছি, তা কি বোঝ নি? তোমার ভয় দেখে মুখের কথায় আমি তোমায় কিছুই বলি নি, কিন্তু আমার সমস্ত প্রাণটাই যে তোমাকে চাইছে, তা একেবারেই জানতে পার নি? নিজের মনটাকে কি চিনে ছিলে? আমাকে ভালবাস নি তুমি? এটা আমি বিশ্বাস করি না সুমনা।"

বিজয়ের মুখের দিকে চাইবার ক্ষমতাও যেন সুমনার চ'লে গিয়েছিল। গলাটাও যেন কে টিপে ধরেছে, তবু কোনোমতে বলল, "আমি যে কিছুতেই বলতে পারছি না।"

বিজয় বলল, "কেন পারছ না? এটা ত ছেলেখেলা নয়? আমার সমস্ত ভবিষ্যৎটা নির্ভর করছে এর উপরে। তুমিও কোন্ পথে যাবে, জীবনটাকে নিয়ে কি করবে, তাও ত বুঝবার সময় এসেছে। তোমাকে পাবার কোনো আশা যদি আমার না থাকে, আমাকেও যদি তোমার কোনো প্রয়োজন না থাকে, তাহলে ভিক্ষুকের মত তোমার দরজায় ব'সে থেকে আমার কি লাভ? তুমি আজ আমায় ফিরিয়ে দিলেই যে আমি তোমাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারব তা নয়, কিন্তু জীবনটা ত তখনই আমার শেষ হয়ে যাবে না? সেটাকে নিয়ে অন্য কিছু আমায় করতে হবে। বিদেশে যাবার সুযোগ আছে একটা এখন। বছর দু' তিন ওখানে থাকতে হতে পারে। ভাল কাজ সেখানে পাওয়া শক্ত নয়, ফিরে আসার দরকারও আর না হতে পারে।"

পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর মত অসহায় ভাবে সুমনা একবার তাকাল বিজয়ের দিকে, তার পর নীচু গলায় বলল, "আর একটু সময় দিন আমাকে।"

"বিজয় বলল, "সুমনা, চার পাঁচ বছরেও যদি আমার প্রশ্নের উত্তর না জেনে থাক, তাহলে আর একটু সময়ে কি পারবে জানতে?"

সুমনা কথা বলল না। তার মুখের দিকে তাকিয়ে বিজয়ের মনে হ'ল সুমনা আর একটুক্ষণ এ ভাবে ব'সে থাকলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়বে। চেয়ার ছেড়ে উঠে প'ড়ে সে বলল, "তোমাকে আমি অকারণেই বড় কষ্ট দিলাম সুমনা। তোমার উত্তর যে কি তা আমি বুঝতেই পারছি। তোমার উপর এ উৎপাতটা না করতে হ'লেই ভাল ছিল। কিন্তু সত্যি একটা আশা নিয়েই আমি এসেছিলাম। সবটাই আমার ভুল হয়ত। চল, ট্যাক্সি ক'রে তোমায় রেখে আসি, বাড়ীর গাড়ী আসতে এখনও অনেক দেরি হবে।

দরজার দিকে সে এক পা এগোতেই সুমনা হঠাৎ তার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল। দু'হাতে তাকে জড়িয়ে ধ'রে কেঁদে উঠল, "যেয়ো না, আমাকে ফেলে যেয়ো না।

তুমি ছাড়া আমার জীবনে আর কোনো অবলম্বন নেই। আমি আর একদিনও বাঁচব না, আজ যদি তুমি আমায় ফেলে যাও। জগতে আমার আর আশ্রয় কোথায়?"

বিজয় তাড়াতাড়ি তাকে টেনে তুলে বুকে চেপে ধরল। সুমনার সমস্ত শরীর ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছে, মুখ কাগজের মত শাদা, দুই চোখ দিয়ে ঝর ঝর ক'রে জল পড়ছে। বিজয়ের মনে একটা অনুশোচনার শেল যেন আঘাত করল। এই ভীরু পাখীর মত বালিকা, এত কষ্ট তাকে সে কেন দিতে গেল?

বলল, "সুমনা, একটু শান্ত হও, নিজেকে সাম্‌লাবার চেষ্টা কর, না হলে অজ্ঞান হয়ে পড়বে। আমিই যদি তোমার একমাত্র আশ্রয় আর অবলম্বন হই তা হলে এস তুমি আমারই কাছে। সমস্ত জীবনের সঞ্চিত ভালবাসা আর আগ্রহ নিয়ে তোমাকে নিতেই আমি এসেছিলাম আজ, কিন্তু সহজে ত তোমার মনের দরজা খুলল না। তাই এতো জোরে আঘাত করতে হ'ল। আমার অপরাধ ক্ষমা কর তুমি।"

বিজয়ের বুক থেকে মাথাটা তুলে সুমনা কি যেন বলতে চাইল। কিন্তু তার গলা দিয়ে কোনো স্বরই বেরুল না। বিজয় তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে সোফাটায় বসিয়ে নিজে পাশে ব'সে তাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে রাখল। অন্য হাতে তার মাথায় আর মুখে হাত বুলতে বুলতে বলল, "আমাকে ভালবাসা এমনই কি মহাপাপ সুমনা যে ম'রে যেতে বসেছিলে তবু স্বীকার করতে পার নি। কিন্তু লুকতেই বা পারলে কৈ? আমি ত ভুল বুঝি নি!"

এতক্ষণে সুমনা মাথা তুলে একবার বিজয়ের মুখের দিকে তাকাল। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, "কি ক'রে যাব আমি তোমার কাছে? আমার জীবনের উপর যে রাহুর ছায়া পড়েছে?"

বিজয় বলল, "রাহুর ছায়া হলেও সেটা ছায়া ছাড়া আর কিছু নয়? তোমার হৃদয়ের মধ্যে কোথাও সে ছায়া পড়ে নি। তুমি ত ফুলের মতনই পবিত্র নিষ্কলঙ্ক আছ দেহে আর মনে। তুমি ভালবাসতে পারবে না কেন? ভালবাসার অধিকার কোন্ মানুষের বা নেই? বাধা পেলে যে প্রেম ফিরে যায় সে ত নামের অযোগ্য। মৃত্যুতেও যাকে হার মানায় না, তুচ্ছ মানুষের সৃষ্টি বাধাতে সে পালাবে?

সুমনা বলল, কেন তোমাকে কিছু বলতে পারি নি মরতে ব'সেও,' এই ভেবে তুমি অবাক হচ্ছ? সমস্ত প্রাণটাই তোমায় দিয়ে ব'সে আছি, সে যে কবে থেকে তা মনে আনতে পারি না। আমার জীবনের সবটাই তুমি জুড়ে ব'সে নেই এমন দিন কবে ছিল তা ভুলে গেছি। কিন্তু কি ভয় আমায় পেয়ে বসেছে তা কি বুঝতে পার? কোনো আশা কি কোথাও পেয়েছি? কি ক'রে নিজেকে দেব আমি তোমার পায়ে? দেশাচার সংসার, সমাজ সবই ত সামনে পাহাড়ের মত বাধা সৃষ্টি ক'রে দাঁড়িয়ে আছে।"

বিজয় বলল, "দেখ সুমনা, এ দিক্‌টা ভাবি নি যে তা নয়। কিন্তু আসল যে বাধার ভয় ছিল আমার, সে বাধা যখন নেই, তখন আর কোনো বাধা মানব না। আর কোনো কিছুর শাসন আমি অন্ততঃ গ্রাহ্য করব না। এমন কোন শক্তি আছে যা এখন তোমাকে আমার হাত থেকে কেড়ে নিতে পারে? মৃত্যু পারে এক, দেহের বিচ্ছেদ সে ঘটাতে পারে ঠিকই। কিন্তু মানুষের প্রেমকে সেও ধ্বংস করতে পারে না। সাবিত্রীর মত মরণেও সে প্রিয়কে ছাড়ে না। দেশাচার, সমাজবিধি, শাস্ত্র, এ সবই মানুষের গড়া জিনিস, এদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কেউ তার শাসন না মানলে এরা শাস্তি দিতে চায়। সে শাস্তি যে নিতে ভয় পায় না, তাকে কে ঠেকাবে? দুঃখ সহ্য করতে আমি প্রস্তুত আছি। গোড়ার থেকেই প্রস্তুত ছিলাম।"

সুমনা বলল, "বাবার আশীর্ব্বাদ আমি পাব, জানি না অন্যরা কি বলবে।"

বিজয় বলল, "অন্যদের এখনি কি জানাবার দরকার? আমাদের সামনে মস্ত প্রতীক্ষার কাল প'ড়ে আছে, তার পর যাকে যা বলবার বলা যাবে। তবে তোমার বাবাকে আমি এখনই জানাতে চাই। গোড়ার থেকে মনে হ'ত আমার যে, তিনি চানই যে আমার আর তোমার মধ্যে একটা বন্ধন গড়ে উঠুক। এই ইচ্ছা না থাকলে তিনি কখনই আমাকে তোমার এত কাছে আসতে দিতেন না।"

সুমনা বলল, "বাবা আমার জীবনের ট্র্যাজিডিটাকে না স্বীকার করতেই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠছেন ক্রমে। গোড়াতেই মায়ের কথাটা যদি না শুনতেন।"

বিজয় বলল, "অবস্থাচক্রে পড়ে ভুল সব মানুষেই করে কোনো না কোনো সময়। কিন্তু ঐ ভুলের রাস্তা ধরেই আমি আসতে পারলাম, তোমার জীবনের মধ্যে।"

সুমনা দু'হাতে তার একখানা হাত ধরে বলল, "এলে ত, কিন্তু আবার ত ফেলে দিয়ে চলে যাবে?"

বিজয় বলল, "না গিয়ে উপায় কি বল? চাকরি করছি যখন, তখন সেখানে ত উপস্থিত থাকতে হবে?"

সুমনা বলল, "আমার ভাগ্যে খালি 'অশ্রুনদীর সুদূর পারে'র দিকে তাকিয়ে থাকা। কি ক'রে তোমাকে ছেড়ে এখন আমি থাকতে পারব, তা একবারও ভাব ?"

বিজয় বলল, "পারবে, মনে সাহস কর। আগে যতটা খারাপ লেগেছে, এখন তা আর লাগবে না। বিচ্ছেদের দুঃখটা থাকবে অবশ্য। কিন্তু সংশয় ত কিছু থাকবে না ? ভয়ও থাকবে না। ভালবাসার প্রতিদান না পাওয়ার যে দুঃখ, তা বড় ভীষণ সুমনা। শত্রুর জন্যেও সে শাস্তি আমি কামনা করি না। এ দুঃখটা আমাদের অকারণ ভোগ করতে হ'ল। তুমি নিজের উপর নির্দ্দয় ত ছিলেই, যদি আমার উপরেও একটু দয়া করতে। মুখের কথায় নিজে কিছু বলতে পার নি, তোমার আজন্মের সংস্কারে বাধছিল, কিন্তু এতখানি যাকে চাইছিলে, কি ক'রে পারতে তাকে অত দূরে ঠেলে রাখতে ?"

সুমনা বলল, "বুকে ত সারাক্ষণ তুষানল জ্বলত, অথচ সামনেই ছিল অমৃতের সাগর। কিন্তু ভয়ে সেদিকে তাকাতে পারি নি।"

বিজয় তাকে আরো কাছে টেনে নিয়ে বলল, "সুমনা পৃথিবীতে এই প্রেম জিনিসটিরই দাম সব চেয়ে বেশী, আর সে দাম শোধ করতে হয় দুঃখের কড়ি দিয়ে। আমাদের অনেকটা দেওয়া হ'ল,কিন্তু এখনও বাকি ঢের। ভয় পেলে আমাদের চলবে না। এক সঙ্গে যদি থাকতে পেতাম, তাহলে কোনো ভয়ই কাছে আসত না, কিন্তু অবস্থাচক্রে সেটা এখনই হতে পারবে না, মন শক্ত কর তুমি। পড়াশুনোর মধ্যেই মনটা বেশী করে দিতে চেষ্টা কর।

সুমনা বলল, "মন আমার আছে কোথায় যে, পড়াশুনোর মধ্যে তাকে দেব ? তোমার সেই marine drive-এর বাড়ীতে, তোমার চারপাশে সে ঘুরতে থাকবে, আর বইয়ের পাতায় অক্ষরের বদলে দেখব তোমার মুখ। ঘরে বসে বসেই কতদিন চমকে উঠেছি, ঠিক যেন তোমার গলায় কে আমাকে 'সুমনা' বলে ডাকছে।"

বিজয় একটু হাসবার চেষ্টা করল, বলল, "ডাকটা শুনতে পেতে তা হলে ? এরপর আরো বেশী শুনবে। কিন্তু যতটা পার মনকে শান্ত রেখো। না হলে শরীরও যে ভেঙে যাবে। আমার চিঠি রোজই পাবে। বলত trunk call-ও করতে পারি একটা করে, না হয় কিছু টাকা খরচ হবে, তা হোক্। যতবার পারব তোমাকে দেখে যাব এখানে এসে। তুমিও ত তোমার বাবাকে সঙ্গে করে আমার এখানে ঘুরে যেতে পারবে। ফ্ল্যাটটা ভাগ্যে আমি ছাড়ি নি। কেমন যেন একটা বিশ্বাস ছিল যে, হৃদয়লক্ষ্মী আবার গৃহলক্ষ্মী হয়ে দেখা দেবেন, তাই ঐখানেই থেকে গেলাম। যে ঘরে তুমি ছিলে, সেই ঘরেই এখন আমি আছি। এখনও সেখানে বিগতদিনের সৌরভ ভেসে বেড়াচ্ছে।"

সুমনা বলল, "তোমার কথা ত শুনছি, কিন্তু মন আশ্বাস পাচ্ছে না।"

বিজয় বলল, "আমাদের পথ খুব সোজা হবে না সুমনা, মনকে শক্ত করতে হবে, সাহস রাখতে হবে। এ ব্যবস্থা ছাড়া আর কোন্ ব্যবস্থা এখন হতে পারে বল ? অনেক মানুষকে এ সহ্য করতে হয়েছে,আমাদেরও হবে।"

সুমনা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, "কবে যাচ্ছ তুমি ?"

বিজয় বলল, "তোমার বাবা দু'চারদিনের মধ্যে আসেন যদি, তাহলে তাঁর সঙ্গে দেখা করেই যাব। আর এখন যদি না ফেরেন, তাহলে দু'দিন পরে যাব।"

দূরে একটা গাড়ীর হর্ণ শোনা গেল। সুমনা বলল, "আমার গাড়ীটা এল বোধ হয়। যাবে আমার সঙ্গে ?"

বিজয় বলল, "কাল সকালে গিয়ে দেখা করব, আজ থাক। আমাকে নিয়ে গেলে আজই তুমি সকলের কাছে ধরা পড়ে যাবে।"

সুমনা বলল, "কেন ?"

বিজয় বলল, "মনে হচ্ছে, বুকের ভিতর তোমার কে সোনার প্রদীপ জ্বেলে দিয়েছে, চোখ-মুখ দিয়ে তার জ্যোতি ফুটে বেরচ্ছে।"

সুমনা হেসে বলল, "যাই তবে একলাই। ধরা পড়তে এখনি চাই না।"

এতক্ষণ বিজয়ের বাহুবন্ধনের মধ্যেই বসেছিল সে। এবার তার হাত ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। অবনত হয়ে বিজয়কে প্রণাম করে বলল, "বহুদিনের সাধ ছিল, আজ পূর্ণ হ'ল।"

বিজয় দু'হাতে তার মুখটা তুলে ধরে চুম্বন করে বলল, "আশীর্ব্বাদ করা উচিত আমার। যে আনন্দ তোমার জীবনে আজ এল, তা যেন চিরদিন অক্ষয় থাকে। কিন্তু সুমনা, আমি কি আজও তোমার সেই গুরুই থেকে গেছি ? তার চেয়ে কাছে যেতে পারি নি ?"

সুমনা বলল, "পেরেছ বৈকি ? আজ ত বুকের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছ।"

"তাহলে এ ধরনের অভিবাদন কেন ?"

সুমনা বলল, "ওকি আর আমি গুরুকে প্রমাণ করলাম?"

"তাহলে কাকে?"

"আমার প্রিয়তমের মধ্যে যে দেবতা আছেন তাঁকেই প্রণাম করলাম। আমার কাছে দু'জনেই এক যে!"

বিজয় হেসে তার গালটা টিপে দিল। বলল, "সার্থক রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলে তুমি সুমনা। যাক্, প্রিয়তম বলে যে স্বীকার করে নিলে এতেই আমি ধন্য।"

সুমনাকে নিয়ে গাড়ী চলে গেল।

ক্রমশঃ

বিদায় বেলা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

সকল বাঁধন ছিঁড়তে হবে, সময় নাহি বাকি রে—
যাবার আমার সময় হল—শঙ্খ জানায় ডাকি রে।
ডাক শুনেছি, শুনেছি ডাক, যেতে হবে জল্‌দি হে—
ও ভিজে পথ ভিজাবনা তবু নয়ন-জল দিয়ে।
দেবযানে যে যাবে চলে তাহার আবার ভয় কি সে?
যাহার মা আনন্দময়ী নিরানন্দ রয় কি সে?
কাটলো জীবন সুখে দুখে নয়কো নেহাৎ মন্দ,
পান করেছি সহস্রদল পদ্ম মকরন্দ।
পেয়েছিনু মায়ের কৃপায় অমৃতময় দৃষ্টি—
দেখেছিলাম অভেদ আমি স্রষ্টা এবং সৃষ্টি।
বেদন ব্যথা ঢের পেয়েছি কাউকে নাহি দুষবো—
ফুটলো কাঁটার বৃন্তে আমার পারিজাতের পুষ্প।

২

এ নয় তো রোগ শয্যা শুধু—দর্ভ আসন দিব্য—
দেবারতির মাটির প্রদীপ আনন্দেতে নিভবো।
এও তো এক তপস্যা মোর—বেশ পেরেছি জান্তে-
দিবস নিশি জননীকে ডেকেছি একান্তে।
বিরাম-বিহীন-ব্যাকুল স্বরে জপিয়াছি নাম গো—
যজ্ঞ আমার সাঙ্গ হবে—এবার আমি থাম্‌বো!
রইলো সুখ ও শান্তি ভবন—পরিজনে ভর্ত্তি
সেবক তারা—রইলে মাগো তুমিই গৃহকর্ত্রী।
কি পুণ্যেতে স্বর্গে যাব—আমি যে জীববন্ধ—
আকাঙ্ক্ষা মোর হতে শুধু তোমার পূজার পদ্ম।
যুগের যুগের শরৎ জুড়ে ফুটবো প্রেমানন্দে—
আগমনী গানের সুরে—রূপে এবং গন্ধে।

৩

গ্রামটি মোদের গ্রাস করোনা—অটুট রেখো ভাই রে
যাবার সময় বন্ধু 'অজয়' এ ভিক্ষাটি চাইরে।
প্রণাম করি লোচনদেবে, নমি সজল চক্ষে—
গত এবং আগত ও অনাগত লোককে।
মহাষ্টমীর সন্ধি পূজায় 'মা' 'মা' বলে কাঁদবো—
প্রথম আশীর্ব্বাদের কুসুম চেলাঞ্চলে বাঁধবো।
মাধবীতে অযুত স্তবক—ফুটবে মধু মঞ্জরী—
কোকিল হয়ে ডাকবো যাবো ভ্রমর হয়ে গুঞ্জরি।
প্রণাম করি বিশাল ভারত, বঙ্গভূমি ধন্য—
স্বাধীন দেশের তনয় হয়ে ধরাও হয় পুণ্য।
'ক্ষপয়তু পুনর্জন্ম'—হে নীল লোহিত কান্ত—
যাত্রা পথটি কর আমার সুন্দর, শিব, শান্ত।

কৃষ্ণগিরি

শ্রীদীপক সেন

পাহাড় কেটে স্থাপত্য সৃষ্টির চেষ্টা হয় ত পৃথিবীর অনেক জায়গায় হয়েছে, তবে ভারতবর্ষে পাহাড় কেটে গুহা রচনা করে তার গায়ে যে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অমর স্বাক্ষর আমাদের পূর্ব পুরুষেরা রেখে গেছেন তার জুড়ি পৃথিবীর কোথাও মিলবে কি না সন্দেহ, ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন এই তিন প্রধান ভারতীয় ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেই গুহামন্দির রচনার প্রচলন ছিল। সারা ভারতবর্ষব্যাপী তার অসংখ্য নিদর্শন বিদ্যমান। তার অনেকের মতে বৌদ্ধদের রচিত গুহামন্দিরগুলি স্থাপত্য, ভাস্কর্যের বিচারে উৎকর্ষের চরম সীমায় পৌঁছেছিল।

দক্ষিণ পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বিশেষতঃ বর্তমান মহারাষ্ট্রে গিরিকন্দরে বৌদ্ধদের রচিত গুহা-মন্দিরগুলি আজও অতীত ইতিহাসের অমর স্মৃতি বহন করছে। এই গুহা-স্থাপত্য নিদর্শন দেশ পর্যটকদের বিরাট বিস্ময়, প্রত্নতাত্ত্বিকদের গবেষণার বিষয়বস্তু। বর্তমান নিবন্ধের আলোচ্য কৃষ্ণগিরির বৌদ্ধ সংস্থা এই গোষ্ঠীর অন্যতম।

বোম্বাই মহানগরীর থেকে কৃষ্ণগিরি অনুমান পঁচিশ মাইল দূরে, শহরতলী এলাকার মধ্যে বোরীভেলী ন্যাশনাল পার্ক যাবার রাস্তা দিয়ে পূবমুখো মাইল দুয়েক যাবার পরই কৃষ্ণগিরির কৃষ্ণধূসর পর্বত চোখে পড়বে। কৃষ্ণগিরির নামের সার্থকতা বুঝতে আদৌ দেরী হবে না কারও। ঘন কালো গ্র্যানাইট। কৃষ্ণ-গিরির গুহামন্দিরগুলো সমস্ত পাহাড় জুড়েই বিস্তৃত।

বোম্বাই ও বেসিন এই দু জায়গা থেকেই অতি সহজে পৌঁছানো যায় বলেই বোধ করি ষোড়শ শতকের থেকে পর্তুগীজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় নাবিক, বণিক, দেশপর্যটক-দের দৃষ্টি এড়ায় নি কৃষ্ণগিরির বৌদ্ধ নিদর্শন। এ প্রসঙ্গে ফ্রায়ার, আঁকেতিল, দু'পেরন প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইংরেজ আমলের গোড়া থেকেই প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানীর কাছে কৃষ্ণগিরি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। জেমস বার্গেস ও জেমস ফার্গুসন নামে দুজন বিশ্ববিশ্রুত প্রত্নতাত্ত্বিক কৃষ্ণগিরির ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্য নিরূপণ করে গেছেন।

প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানীরা যে পথে কৃষ্ণগিরির গুহামন্দিরে গেছেন তা ছিল অসম বন্ধুর পর্বতশিলা সঙ্কুল পথ। আজ সেই পথই সুসজ্জিত হয়েছে টারম্যাকাডমে। কৃষ্ণগিরি গুহারাজির পাদদেশ পর্যন্ত মোটরগাড়ীতে পৌঁছতে বোম্বাই গেটওয়ে অব ইণ্ডিয়ার থেকে ঘণ্টা দেড়েকের কাছাকাছি সময় লেগেছিল।

ভগবান বুদ্ধ (কৃষ্ণগিরি গুহা)

কৃষ্ণগিরির বৌদ্ধ গুহার সংখ্যা মোট ১০৯টি। খুঁটি-নাটি দেখার মত প্রচুর সময় হাতে ছিল না। কারণ সেইদিনই আমাদের বোম্বাই ছেড়ে পুণার পথে রওনা

হবার কথা। কার্লা, ভাজা, জুন্নারের বৌদ্ধগুহা ও স্থাপত্যের নিদর্শন দেখবার জন্য রওনা দেবার আগে কৃষ্ণগিরি দেখে নিতেই হবে এই ছিল আমাদের নির্দ্ধারিত ভ্রমণ সূচী। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের কৃতী ছাত্র বন্ধুবর শ্রীব্রতীন্দ্রনাথের প্রিন্স অব ওয়েলস মিউজিয়ামে বিশেষ প্রয়োজন ছিল। সেই উপলক্ষ্যে বোম্বাই ও তার আশে পাশের এবং মহারাষ্ট্রের প্রাচীন ইতিহাসখ্যাত দর্শনযোগ্য স্থানগুলি দেখাই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য।

বৌদ্ধ ধর্মযাজক ও ভিক্ষুদের আবাসিক এককগুলিকে বলা হ'ত সঙ্ঘারাম। একজন ধর্মগুরু বা প্রধানের নেতৃত্বে এই সঙ্ঘারামগুলি পরিচালিত হ'ত। উন্মুক্ত প্রকৃতির পরিবেশে কালাতিপাত করার নির্দেশই ভগবান বুদ্ধ দিয়েছিলেন বৌদ্ধ ভিক্ষু ও সন্ন্যাসীদের। কিন্তু কালক্রমে দুরন্ত বর্ষাকালে উন্মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে থাকা ক্রমেই দুরূহ হয়ে উঠল। তখনই একে একে বর্ষাবাস হিসাবে এক একটি আশ্রম গড়ে উঠল, বিশেষ করে দক্ষিণ পশ্চিম ভারত উপকূলে যেখানে বর্ষার প্রকোপ বেশী সেখানে বর্ষাবাস প্রয়োজন হয়ে পড়ে। গুহাগুলির সূচনাও বোধ করি এই কারণবশতঃ। এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলে নেওয়া ভাল। ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের একশ বছর পরে বৈশালীর দ্বিতীয় বৌদ্ধ-মহাসম্মেলনে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিভেদ ক্রমশঃই বেড়ে গেল দেখে দুটি প্রধান শাখার উৎপত্তি হয়, যাঁরা প্রাচীনপন্থী তাঁরা হীনযান আর যাঁরা উদারপন্থী তাঁরা মহাযান নামে পরিচিত হলেন। হীনযান মতাবলম্বীরা ভগবান বুদ্ধের কোনও মূর্তি পূজা করার বিরোধী কিন্তু মহাযান মতাবলম্বীরা ভগবান বুদ্ধের মূর্তি কল্পনা করে পূজা করেছেন। শুধু তাই নয় মহাযান মতাবলম্বীরা যে সমস্ত স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যের নিদর্শন রেখে গেছেন তার থেকে বোঝা যায় যে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মত তাঁরাও বহু দেবদেবীর কল্পনা করেছেন। কৃষ্ণগিরির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য নিদর্শন দেখলেও বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় যে এখানে প্রথমে হীনযান এবং পরবর্তীকালে মহাযান মতাবলম্বী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা বাস করতেন।

কৃষ্ণগিরির গুহাগুলির যেখানে শুরু প্রায়ই তারই গা ঘেঁষে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয় পাহাড়ে। অর্থাৎ কি না সিঁড়ি যেখানে শেষ, গুহা সেখানে শুরু। গুহাগুলির সর্বপ্রাচীন ১নং গুহা। স্থাপত্য বা ভাস্কর্য কারুকার্যে কোনও বৈশিষ্ট্য চোখে পড়বার মত নয়। নেহাৎই সাদামাটা রচনাশৈলী। গুহাভ্যন্তর সমচতুর্ভুজ। বাইরে বারান্দা, দুদিকে পাথরের বৃহদায়তন দুটি স্তম্ভ, গুহাকক্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশের পথ সর্বসমেত তিনটি এবং এর মধ্যে মাঝেরটাই সবচাইতে বড়।

দ্বিতীয় গুহাটিও বহু প্রাচীনকালের। বৈচিত্র্যহীন রচনা শৈলী। তবে এই গুহাটির সামনে একটি জলাধার আছে যার গায়ে ব্রাহ্মী লিপিতে খোদাই করা আছে সাতবাহন নৃপতি বশিষ্ঠপুত্র সাতকর্ণির রাজমহিষী-মহাক্ষত্রপ রুদ্র'র কন্যার দানের কথা। ইতিহাসের নজীর হিসাবে এর দাম অপরিমেয়।

কৃষ্ণগিরির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্ভার তৃতীয় গুহা। গুহার ভেতর পৌঁছাতে হলে প্রথমেই চোখ পড়বে ভাস্করের কারুকার্যবহুল রেলিং। রেলিং-এর ডানপাশের একটি প্যানেলে একটি যক্ষমূর্তি। ভেতরের বারান্দার বাইরের দিকে দুটি প্রান্তে দুটি সুউচ্চ স্তম্ভ। বারান্দায় এসে পৌঁছানোর আগেই প্রধান প্রবেশপথের দু পাশে অর্থাৎ গুহাভ্যন্তর কক্ষের দেয়ালের বাইরের দিকে বেশ কয়েকটি যুগলমূর্তি। অনেকের মতে এই মূর্তিগুলি হচ্ছে দাতাদম্পতির প্রতিকৃতি। কার্লার বিখ্যাত বৌদ্ধগুহাতেও দাতাদম্পতির এই ধরনের প্রতিকৃতি আছে। এই মূর্তিগুলি বিরাটাকার প্যানেলের মধ্যে দু'পাশে দুই স্তম্ভের মধ্যে বসান। এই স্তম্ভগুলিরও বৈচিত্র্য আছে। দেয়ালের সমতল পশ্চাদপট থেকে কেটে কেটে বার করা হয়েছে এগুলোকে। এতে করে স্তম্ভটির বাইরের তিন দিক বেরিয়ে এসেছে এবং চতুর্থদিক দেয়ালে মিশে আছে। ইংরাজীতে pillar-এর পরিবর্তে pillaster বলা হয় এগুলোকে।

যুগলমূর্তিগুলোর উপরে ছোট ছোট অসংখ্য বুদ্ধ-প্রতিকৃতি খোদাই করে বের করা হয়েছে দেয়ালের গা থেকে। এই মূর্তিগুলোর এক একটিতে এক একটি মুদ্রার ব্যবহার হয়েছে। কোনটি ধ্যানব্যাখ্যান, কোনটি অভয়, কোনটি বরদ। বারন্দার দুই পাশের খাঁজে দুটি বৃহদায়তন অতিকায় বুদ্ধমূর্তি আছে। উচ্চতায় প্রায় তেইশ ফুট এই মূর্তি দুটি অনিন্দ্যসুন্দর। গন্ধার শিল্পীদের সৃষ্ট মূর্তিগুলির সঙ্গে এর সাদৃশ্য দেখা যায়। অর্দ্ধবৃত্তাকার চৈত্য-খিলান (chaitya-arch) বা চন্দ্রশালা ছাতার মত আড়াল করে আছে এই অতিকায় দুই বুদ্ধমূর্তির উপর। বস্তুতঃ বারন্দার বাইরের ও গুহাভ্যন্তরের ভেতরের দিককার দুই দেয়ালের সংযোগ রক্ষা করেছে যে প্রস্তরখণ্ড তারই উপরে ভগবান বুদ্ধের দুই বৃহদাকার মূর্তি সৃষ্ট হয়েছে। বার্গেস প্রমুখ প্রত্নতাত্ত্বিকেরা মনে করেন যে সভাকক্ষ তৈরী হওয়ার বহু পরে বুদ্ধমূর্তি দুটি নির্মিত হয়েছে।

তৃতীয় গুহাভ্যন্তরের চেহারা দেখলে মনে হয় যে এটি বিশেষভাবে ধর্ম-সম্মেলনের জন্যেই তৈরী হয়েছিল। এই কক্ষেই ধাতুগর্ভ বা চৈত্য আছে। গুহার ভেতরের চেহারা চৈত্য অনেকটা কার্লার বৌদ্ধ-চৈত্যগৃহের অনুরূপ। এই গুহাটি দেখবার জন্য সর্বাধিক দর্শক সমাগম হয়। আমরা যখন ছিলাম তখনও তার ব্যতিক্রম হয় নি।

গুহাভ্যন্তরের সভাকক্ষে মোট তিরিশটি স্তম্ভ আছে। স্তম্ভগুলির মধ্যে বামে ১১টি ও দক্ষিণে ৬টি কারুকার্য বহুল। অর্থাৎ এর অঙ্গসজ্জা বা decoration সম্পূর্ণ। বাকি তেরটির কারুকার্য আদৌ চোখে পড়ে না। তবে এটুকু বোঝা যায় যে কোনও বিশেষ বাধার জন্যেই এই-গুলো স্থপতি ও ভাস্করের কৃপা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

বেশ মনে পড়ছে যে এই কারুকার্য-মণ্ডিত একটি স্তম্ভ-শীর্ষে চৈত্যস্তূপের ক্ষুদ্রায়তন প্রতিকৃতির উপরে দুটি হস্তী বারিসিঞ্চন করছে এই অবস্থাটির সজীব রূপায়ণ দেখে-ছিলাম। গুহাভ্যন্তরের সমাপ্ত ও অসমাপ্ত স্তম্ভ যেখানে পাশাপাশি সেখানে একটি photograph-ও নিয়েছিলাম, কিন্তু সেটা কয়েকটি পাঞ্জাবী কিশোর কিশোরীর লুকো-চুরি খেলার দাপাদাপিতে খুবই তাড়াতাড়িতে তুলতে হয়েছিল। এ্যাপারচারের গোলমাল করে ফেলেছিলাম বলে নষ্ট হয়ে গেছে সেখানি।

এই গুহার উত্তরপূর্ব দিকে দরবার গুহা নামে পরিচিত যে গুহাটি আছে সেটির বৈশিষ্ট্যও দেখবার মত। একটি গিরিকন্দরে সম্পূর্ণভাবে পৃথক একটি একক বলে এটি আরও বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এর আশেপাশে একাধিক ছোট ছোট বিহার আছে। বিহারগুলি ধর্ম-যাজক, অতিথি, বণিক বা শ্রেষ্ঠী-সম্প্রদায়ের বিশ্রামাগার হিসাবেই বোধ করি ব্যবহৃত হ'ত। সংঘারামের স্থায়ী আবাসিকেরাও যে অনেকেই এই বিহারগুলিতে বাস করতেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। দরবার কক্ষের অভ্যন্তরে সিংহাসনে উপবিষ্ট ভগবান বুদ্ধের একটি মূর্তি আছে। ভগবান বুদ্ধের আদেশের প্রতীক্ষায় আছে পদ্মপাণি ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ। দরবারকক্ষের ভিতরে চার-পাঁচ'শ লোকের আসন হবার মত জায়গা আছে। এর ভিতরে দুটি লেখা (inscription) আছে। অবশ্য তাতে করে ইতিহাসের কালনির্ণয়ের সুরাহা হয় না কিছু।

এ ছাড়া আরও অসংখ্য ছোট বড় গুহা আছে কৃষ্ণ-গিরিতে। বেশীর ভাগই ব্যবহৃত হোতো সঙ্ঘারামের সভ্য, অতিথি এবং ভ্রাম্যমাণ শ্রেষ্ঠীদের বসবাসের জন্যে। এ প্রসঙ্গে পরে আরো কিছু আলোচনা করা যাবে।

আবাসিক গুহাগুলির মধ্যে ছোট একটি গুহাকক্ষ—সামনে বারান্দা—পাহাড়ের গায়ে গায়ে উঠে গেছে গুহাকক্ষে যাবার সোপান শ্রেণী। বৃহদায়তন কক্ষ সমন্বিত অপর গুহাটিও দর্শনীয়। এই গুহার ভেতরে একটি উপপ্রকোষ্ঠ বা antechamber আছে। এই antechamber-এর চার দেয়ালে দণ্ডায়মান চারিটি বুদ্ধমূর্তি আছে। এ ছাড়া আর কিছু বিশেষ নজরে পড়ে নি —তবে আর কিছু ছিল কি না—কোনও পুণ্যবেদী বা shrine তা বলতে পারি না। এই গুহার আর একটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ল। আবাসিকদের বিশ্রামের জন্য দুই পার্শ্বে দুটি বসবার জায়গা বা বেদী আছে এই গুহায়। এই বেদীগুলি পাথর কেটে তৈরী। তাতেই বোধ করি আধুনিক আমলের পার্ক বা সাধারণের ব্যবহারের যে কোনও জায়গার বসার আসনের চেয়ে মজবুত।

আর একটি গুহাতে পদ্মপাণি এবং অপর গুহায় ধর্মচক্র-প্রবর্তন মুদ্রার বিস্তারিত প্রকাশ আছে।

মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিশ্বাস এই যে, ধ্যানী-বুদ্ধের এক একটি পৃথক শক্তি আছে। পদ্মহস্ত ধ্যানীবুদ্ধ অমিতাভের বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণি নামে পরিচিত।

আর একটি গুহায় অবলোকিতেশ্বর এবং তাঁর আজ্ঞাবহদের মূর্তি আছে। এই গুহাভ্যন্তর দেখবার মত। অতি সুন্দর রূপ দিয়েছেন স্থপতি ও ভাস্কর। বুদ্ধ দেবকুলের অতি সম্মানজনক আসনের অধিকারী বোধি-সত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর, ইনি করুণার অবতার। মহাযান সম্প্রদায়ের বিশ্বাস এই যে জগতের শোক ও দুঃখে এতই অভিভূত যে অবলোকিতেশ্বর নিজের মোক্ষলাভের যোগ্যতা অর্জন করা সত্ত্বেও বিশ্বের কল্যাণে তা তিনি গ্রহণ করেন নি।

দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে গুহাস্থাপত্যের অতীত নিদর্শন যা আমরা পাই তার থেকে বৌদ্ধধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির উত্থান-পতনের পর্যায় নিরূপণ করেছেন বিভিন্ন ঐতি-হাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক।

বৌদ্ধ গুহামন্দিরগুলোর যা যা বৈশিষ্ট্য থাকে কৃষ্ণ-গিরিতে তার কোনটিরই অভাব নেই। সঙ্ঘারামের সদস্যেরা পাহাড়ের গা থেকে কেটে বার করা ছোট বড় নানা আকারের গুহায় বাস করতেন। অনেকগুলি ছোট বড় আবাসিক গুহার মাঝখানে ভগবান বুদ্ধের পূতাস্থির ধারক স্তূপ বা ধাতুগর্ভ বিশিষ্ট সভাকক্ষ—যেখানে ধর্ম-সঙ্ঘের নেতার নেতৃত্বে বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীরা মিলিত হতেন প্রার্থনার সময়ে। স্তূপ-গৃহই ছিল কেন্দ্র আর তারই

চারপাশে আবাসিকদের বাসস্থান রচিত হ'ত। শ্রেষ্ঠী ও পর্যটকদের অস্থায়ী আস্তানা হিসাবেও কতক কতক গুহা ব্যবহৃত হয়েছে। অগাধ বিত্তশালী বৌদ্ধ-শ্রেষ্ঠীদের অর্থ-সাহায্যে এবং পৃষ্ঠপোষকতায় পুষ্ট হ'ত সঙ্ঘারামের ভাণ্ডার। রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবও কখন বিশেষ হয় নি। বহু বৌদ্ধ-সঙ্ঘারামের জন্যে একাধিক রাজা ভূ-দান এবং অর্থানুকুল্য করেছেন। ঐতিহাসিক নজীরের অভাব হয় না একথা প্রমাণের জন্যে।

কৃষ্ণগিরির গুহা-নির্মাতারা স্থান নির্বাচনে বিচক্ষণ দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। বর্তমান বিংশ শতকের বৈজ্ঞানিক ভাবধারা ও ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত বহু ব্যয়সাধ্য ও পরিকল্পনা প্রসূত প্রয়াসের অসাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে আমাদের পূর্ব-পুরুষদের কৃতিত্বের পরিমাণ নির্ধারণ করা অনধিকার চর্চা। যাই হোক তবু দু'চার কথা এ প্রসঙ্গে না বলে পারছি না।

পর্বত ও কঠিন মৃত্তিকাবহুল কৃষ্ণগিরির পরিবেশ, অথচ এই গুহারাজির প্রত্যেকটি গুহাবিহারের সামনে পানীয় জলের ছোট বড় নানা আকৃতির জলাধার আছে। এমনই স্থান নির্বাচন করা হয়েছিল যাতে করে পানীয় জলের অভাব না হয় এবং বিহারবাসীদের বার বার পানীয় জল সংগ্রহের জন্যে পাহাড় থেকে নেমে আসতে না হয়। এখনও এসব জলাধারে পানীয় জল আছে যার থেকে আশে-পাশের গ্রামবাসীরা এবং দর্শকেরা পানীয় সংগ্রহ করেন। বলাবাহুল্য এই পানীয় জল সুশীতল এবং সুপেয়।

কৃষ্ণগিরির পাশ দিয়ে পার্বত্য কোনও নির্ঝরিণী প্রবাহিত ছিল বলে মনে হয়। একটি নদীর খাত দেখেছি বলে মনে পড়ছে অবশ্য তাতে জল ছিল না একেবারেই।

প্রাচীন ভারতের বাণিজ্যপথ ও বাণিজ্যের বিষয়ে সামান্য আলোচনা করা প্রয়োজন। দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম উপকূলে একাধিক সুবিখ্যাত নগরী ও বন্দর ছিল তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এই সব নগরী ও বন্দর থেকে পশ্চিম পৃথিবীর সঙ্গে ভারতবর্ষের বাণিজ্য সামগ্রী রপ্তানী হোতো। কৃষ্ণগিরির খুবই কাছাকাছি যে সব বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল তার মধ্যে সূর্পারক (গ্রীক্ সুপ্পর) অধুনা সোপারা (বোম্বাই এর পাঁচ মাইল উত্তরে), চেমুল্লা (গ্রীক্ সেমিল্লা), অধুনা ট্রম্বে, কল্যাণ (গ্রীক ক্যালিয়েণা) এবং শ্রীস্থানক অধুনা থানা সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় প্রথম শতক বা তথাকথিত বৌদ্ধযুগে এবং পরবর্তী কয়েকটি খ্রীষ্টাব্দে এবং গুপ্ত রাজন্যদের আমলেও পশ্চিমমুখী বাণিজ্যকেন্দ্রগুলির উপর বিভিন্ন রাজশক্তির বিশেষ আকর্ষণ ছিল। ভারতবর্ষে বৈদেশিক মুদ্রার আমদানী হোতো ঐ পথেই। পেরিপ্লাস অব দি ইরিথ্রিয়ান সী ও ক্লডিয়াস টলমীর বিবরণ এবং একাধিক দেশী ও বিদেশী নথিপত্র থেকে এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে রোমক পৃথিবীর বহু জিনিসের চাহিদা মিটিয়েছে ভারতীয় শ্রেষ্ঠীকুল—দেশে অর্থাগম হয়েছে প্রচুর।

প্রতিষ্ঠানপুর, অধুনা পৈঠান (ঔরঙ্গাবাদ জেলা) ছিল দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যকেন্দ্র। গোদাবরীর তীরে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানপুরের একটি বিশেষ স্থান আছে বিভিন্ন বৌদ্ধ জাতকে। বৌদ্ধজাতক ও পেরিপ্লাসের বর্ণনায় আছে যে প্রতিষ্ঠানপুর বয়ন শিল্পের সুবিখ্যাত কেন্দ্র ছিল। টলেমীর বর্ণনায় ইতিহাস-শ্রুত সাতবাহন সম্রাট দ্বিতীয় পুলমায়ীর রাজধানী ছিল প্রতিষ্ঠানপুর (Baethan)। প্রতিষ্ঠানপুরের অধিকার নিয়ে বিভিন্ন রাজশক্তির শক্তি পরীক্ষা হয়েছে। সম্রাট অশোকের শিলালিপি, গুপ্তরাজ-দুহিতা, বাকাটক মহিষী প্রভাবতীর তাম্রশাসনে দক্ষিণা-পথের এই সর্বপ্রাচীন নগরীর উল্লেখ আছে।

ভারতবর্ষের উত্তর এবং পূর্বপ্রান্ত থেকে বাণিজ্যপণ্য নিয়ে শ্রেষ্ঠীরা সমাগত হতেন প্রতিষ্ঠানপুরে। তারপর সেখান থেকে পণ্যসম্ভার যেত পশ্চিম উপকূলবর্তী বাণিজ্য বন্দরসমূহে। শ্রেষ্ঠী সম্প্রদায়ের পথিমধ্যে বিশ্রামের জন্যে অন্যান্য ব্যবস্থা যেমন ছিল, সেই সঙ্গে ছিল এই বৌদ্ধ-বিহারগুহাগুলি। বহু শ্রেষ্ঠী ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। বোধকরি সেই কারণেই পশ্চিমঘাট পর্বতমালা ও মহারাষ্ট্র অঞ্চলব্যাপী বাণিজ্যপথের উপরে ঔরঙ্গাবাদ, জুন্নার নাসিক, কার্লা, ভাজা, কোন্দানের এই গুহাগুলি শ্রেষ্ঠী ও রাজশক্তির অর্থানুকুল্যে ও পূর্বপোষকতায় সমৃদ্ধিলাভ করেছিল।

কৃষ্ণগিরিতে যে কয়েকটি শিলালিপি বা গুহার গায়ে খোদাই করা লিপি পাওয়া গেছে তাতে কালক্রম নির্ণয়ের দিক থেকে বিশেষ কোনও সুবিধা হয় না। তবে গোড়ার দিককার সময় ঠিক করবার ব্যাপারে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য নিদর্শন এবং সাতবাহন লেখ বিশেষ সহায়ক।

প্রাক্ খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয়, প্রথম শতকে এবং খ্রীষ্টীয় প্রথম, দ্বিতীয় শতকে সাতবাহন এবং শকক্ষত্রপ বংশীয় রাজন্যবর্গ দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের উপকূলভাগের আধিপত্য নিয়ে বহুবার শক্তিপরীক্ষা করেছেন। শক রাজন্যদের যে সব প্রাদেশিক শাসনকর্তারা পরবর্তীকালে সার্বভৌমত্ব অর্জন

করেন তাদের মধ্যে কর্দমক ও ক্ষহরাত বংশীয়েরা সমধিক প্রসিদ্ধ। এই শক্তিপরীক্ষার মূলকারণগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল পশ্চিমমুখী বাণিজ্যকেন্দ্রসমূহ হস্তগত করা অর্থাৎ কিনা বৈদেশিক মুদ্রায় রাজকোষের সমৃদ্ধি।

কৃষ্ণগিরির গুহাবিহার দেখা শেষ করে যখন চলে আসছি তখন একে একে পুঁথিগত বিদ্যার যৎকিঞ্চিৎ যা এখনও মাঝে মাঝে বিস্মৃতির আড়াল থেকে উঁকি মারে সেগুলি মনে পড়তে লাগল। মনে পড়ল শক-ক্ষত্রপ ও সাতবাহনদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা। গৌতমীপুত্র সাতকর্ণির গৌরবদৃপ্ত ঘোষণা—'খখরাত বস নিরবসেস করস'। অবশ্য ইতিহাসের পটপরিবর্তন হতে দেরী হয় নি। গৌতমীপুত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষহরাত নহপানের বংশধরেরা বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যান। উজ্জয়িনীর শক-ক্ষত্রপ কর্দমক বংশীয়েরা প্রাধান্য লাভ করেন। সাতবাহন নরপতিরা যে সব অঞ্চল খখরাতদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিলেন সে সব অঞ্চলসহ আরও বিস্তীর্ণ এলাকা অধিকার করলেন কর্দমক মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামন। জুনাগড় শিলালিপিতে (১৩০-৫০ খ্রীষ্টাব্দ) রুদ্রদামন বলেছেন যে নিকট সম্বন্ধের খাতিরে দুবার সাতবাহন নরপতিকে পরাজিত করা সত্ত্বেও নির্মূল করেন নি বিজিতকে।

ঐতিহাসিকদের অনেকের মতে এই সাতবাহন নরপতিই সম্ভবতঃ বাশিষ্ঠীপুত্র যাঁর মহিষী (রু'···র কন্যা)র দানের কথা উৎকীর্ণ করা আছে দ্বিতীয় গুহাটির জলাধারের গায়ে।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসতে আসতে কানে এল পরিষ্কার হিন্দীতে একজন self-made গাইড এক শ্বেতাঙ্গ দম্পতিকে বুঝিয়ে দিচ্ছে—'এহি তো কানহেরী, কৃষণ্ গিরি আউর কানহেরী এহি লেণা (গুহা)।' বর্তমানে কৃষ্ণগিরির ঐ নামই বটে।

বন্ধুবরের সঙ্গে ইতিহাসের পটভূমিকার আলাপ-আলোচনা করতে করতে এ্যাপোলো বন্দরে আমাদের অস্থায়ী আস্তানায় যখন এসে পৌছলাম তখন দ্বিপ্রাহরিক আহারের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

সম্মোহন

(প্রবাসীর—প্রতিযোগিতায় ৩য় পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প)

শ্রীবিমলাংশুপ্রকাশ রায়

১

যে পথে প্রতিদিন গ্রাম থেকে শহরের দিকে রাশি রাশি আনাজ চালান হয়, সেই পথে একটা দীঘির ধারে বট-তলায় মাধববৈরাগী একদিন তার ঝুলিটি পাশে রেখে এক-তারা বাজিয়ে গান গেয়েছিল এক যুগ আগে। জায়গাটা তার বড়ই মনোরম লাগলো। সেই থেকে রয়ে গেল ঐ গাঁয়ে। গলাটা বড়ই মিঠে। চোখেমুখে যেন ভক্তি-রসের ধারা ঝরছে—ভাবে ঢলঢল। দীর্ঘদেহ, উজ্জ্বল বর্ণ। প্রশস্ত ললাটে আর উন্নত নাশায় রসকলি আঁকা। ভোরের বেলায় স্নান করে কাঠের কাঁকই দিয়ে চুল আঁচড়ে নামাবলী গায়ে যখন সে গান ধরে তখন গাঁয়ের বৌ-ঝিরা দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে গান না শুনে যায় না। পথিকরাও দু'দশ মিনিট দাঁড়িয়ে গান শুনে বাহবা দেয়। তার গানের আর ভাবের টানে গাঁয়ের দু'চারটে যুবক ছোকরা অলক্ষ্যে ভিড়ে দোহারের ফাঁক পূরণ করতে আর খোল-কর্ত্তাল বাজাতে লেগে গেছে। তাদের মধ্যে কেতন আর রসিক মাধববৈরাগীর একান্ত অনুগত হয়ে পড়েছে। গেঁজেল হলে কি হয়, কেতনমণির মতো এমন খোলের হাত ওদিকে কারো নেই। তার প্রাণের বন্ধু রসিকও গাঁজার আড্ডা ছেড়ে পুরানো কর্ত্তালজোড়া মেজেঘষে জুটে পড়েছে দলে। দুই বন্ধুই গুণীলোক। মাধবও বুঝেছে, ওরা গাঁজা খায় বটে কিন্তু দুটি রত্ন। তাই কীর্ত্তনের টান গাঁজার টানকে টপকে বাউল করে তুলেছে তাদের।

যতদিন গাঁজার আড্ডায় বোম্‌ভোলা হয়েছিল, ততদিনে রসিকের কর্ত্তালে কলঙ্ক আর কেতনের খোলে লেগেছিল কীট। তাই অমন পাকা হাতেও খোলের বোল খুলতো না আর মাধবের ভাব যেত ছুটে—গাওনা জমতো না। একদিন কীর্ত্তনের পর মাধব বলে, "কেতনা! তোর খোলটা বদলা দিকিনি।" কেতনও বোঝে, এ খোলে চলছে না, বরং সে-ই বেশী দুঃখের সঙ্গেই বোঝে। কিন্তু ভাল খোল একটা পায় কোথা!

২

দেখতে দেখতে দশটা বছর কেটে গেছে। বন্যার প্লাবনে যেমন করে বদ্ধজলের জমাট পানার দাম দিগ্বিদিক বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, স্বাধীনতার প্লাবনে পূর্ব্ব বাংলার উদ্বাস্তুরা তেমনি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পশ্চিমপানে এসে কে কোথায় ছিটকে পড়েছে। অনেকে দলবদ্ধভাবেই ছড়িয়েছে, কেউ কেউ আবার দলছাড়া হয়েও পড়েছে—একেবারে নিঃসঙ্গ একাকী। এই রকম দলছাড়া হয়েছিল দশটা বছর আগে কান্ত। তখন ছিল কিশোরী আজ পরিপূর্ণা যৌবনা। শরতের পদ্মদীঘির মতো রূপ তার ঢলঢল। এই ক' বছর তার যে কি ভাবে কেটেছে, কত জায়গায় এবং কত বিচিত্র লোকের সঙ্গে যে ঘুরতে হয়েছে তা বলতে গেলে আর একটা মহাভারত রচনা হয়ে যায়।

এই এক টুকরো বিচ্ছিন্ন পানার উপর দিয়ে কত প্রলয় বয়ে গেছে। কিন্তু পানার পাতার মসৃণতায় কিছুতেই দাগ পড়ে নি—চিক্কণতা ম্লান হয় নি। কিছুকেই সে ধরে রাখে নি এবং কিছুতেই ধরা দেয় নি; তবুও, একরত্তি ভাসমান পানারও থাকে আকাঙ্ক্ষার শিকড়, তা যেন কিছুকে আঁকড়ে ধরতে চায়! নানা স্থান ঘুরতে ঘুরতে কান্ত এখন যেখানে এসে পৌঁছেছে সেটা হ'ল ঐ মাধব-বৈরাগীর এলাকা। এই পরিবেশটা মন্দ লাগে নি তার, মাধবের গাওনা মনোরম, রসিকের মিঠে কড়া কর্ত্তালের ঝঙ্কারও মনমাতানো। আর ভাল লাগে কেতনমণির মৃদঙ্গের উদ্দাম উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তার ঝাঁকড়া-চুল মাথাটার পাগলপারা নৃত্য!

গানের আসরের পাশেই কান্তর পানের আসর। গানের পালা শেষ হলে অনেকেই পান খেতে আসে কান্তর দোকানে। কেতনের ঝাঁকড়া মাথার দিকে নিজের খদির-রঞ্জিত অঙ্গুলি সঞ্চালন করে কান্ত বলে, "আহা। মাথাটা অত ঝাঁকতে থাক কেন গা? মাথা যে ছিঁড়ে পড়বে?"

বলে হাসতে থাকে। সেই হাসির যে কি মোহ তা কেতন বুঝতে পারে না, অথবা গভীর ভাবেই বোঝে। গুন গুন করে শোনায় "অধরের তাম্বুল নয়নে লেগেছে, ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি।"

কান্ত নিজেকে সামলে নেয়, হাল্কা হতে দেয় না,

বলে, "নেও, এখন হাকরা রাখ, পানে দোক্তা দেব, না সাদা ?"

কেতন বুঝতে পারে যে কান্ত সহজে ধরা দেবার মেয়ে নয়। তবু একটু সোহাগ করে মৃদু হেসে বলে, "আহা! খয়েরের জলে আঙুল সব লাল টুকটুকে করে ফেলছ যে ? বেশ দেখতে হয়েছে কিন্তুক, মাইরি !" কান্ত চুপ মেরে থাকে।

৩

হঠাৎ ক'দিন কেতনের আর দেখা নেই, তার পর একদিন এসে বললে, "মাধবদা ? খুব ভাল একটা খোলের হদিস্ পেয়েছি।"

"বলিস্ কি রে! কোথা পেলি ?"

"গেছলাম ওপাড়ার বেপনার সঙ্গে তার ভাগ্নার বে'তে বরযাত্তির হয়ে শঙ্খগ্রামে। খুব বর্দ্ধিষ্ণু গাঁ, সাঁঝের লগ্নে বে' হয়ে গেল। তার পর বরকনেকে আর সেই সঙ্গে সব্বাইকে নে' গেল জমিদার বাড়ীর ঠাকুরদালানে, সেখানে তখন গোপালের আরতি চলেছে, সেখানে দেখলাম, শিকেয় তোলা রয়েছে একটি খোল, আহা-হা! দেখলে চক্ষু জুড়ায়! কিন্তুক, খোঁজ নিয়ে জানলাম ও খোল অমনিই স্বগগে তোলা থাকেন বারটি মাস, কেউ কোনদিন আর বাজায় না তেনারে, যদ্দপি উনি পুজো পেয়ে থাকেন পেরত্যহই পুষ্পচন্দনে। জমিদারের ঠাকুর-দার গুরুদেব ছিলেন সনাতন শিরোমণি, মস্ত কেত্তন গাইয়ে, তেনারই ছিল ঐ খোল, নাম রেখেছিলেন 'শ্রীখোল।'

এই পর্য্যন্ত গল্প বলার কায়দায় বলে, হঠাৎ গলাটা বকের মত বাড়িয়ে মাধবের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বললে, "আনব চুপি চুপি ? পড়েই ত আছে—এখানে বরং বোষ্টমের সেবায় লাগবে, কি বল মাধবদা ?"

মাধব হেসে বললে, "আজ ত তোর ঐ গাঁজার খোলেই ঠেকা দে!" সেদিন মাধব ছেপ্‌কা তালে বাউল ধরল—

"দয়াল তোমার নামের বলে
অন্ধ দেখে খঞ্জ চলে
মূকের মুখে ভাষা খোলে
সেই আশায় আমি এসেছি দুয়ার।
আমার কর ভবে পার।"

গানটা শেষ না করে, এই পর্য্যন্ত গেয়েই হঠাৎ থেমে গিয়ে মাধব বললে, "মূকের মুখে ভাষা ফোটাতে হবে রে কেৎনা! শ্রীহরি আজ কেত্তনের আবেশের মধ্যে দিয়ে আদেশ দিলেন, ঐ শ্রীখোলকে আর বোবার মত সেখানে থাকতে দেওয়া নয়!"

কেতন উৎসাহে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল! মাধব বললে, "উতলা হয়ে যাস্ নে, কেৎনা ? নাম জপ করতে করতে যা, খুব সাবধান!"

গানের আসর ভাঙবার পর কান্ত আড়ালে কেতনকে ডেকে বললে, "দেখ, অমন কাজও করো না কিন্তু!"

"কি কাজ ?"

"ঐ যে, চুরি করে খোল আনবে পরামর্শ হ'ল তোমাদের!"

কেতন একটু লজ্জিত ভাবে হেসে বললে, "তুমি পরামর্শের কথা জানলে কি করে ?"

"আমার সব জানা হয়ে যায়।"

কেতন একটা ঢোক গিলে বলে, "কিন্তুক, ও ত চুরি নয়। মাধবদা যে বললে, হরিনাম গানের জন্যে যে খোলের ছিষ্টি, তারে বোবা করে তালে ঝুলিয়ে রাখা পাপ! কেত্তনের মধ্যে শ্রীহরি তেনাকে আদেশ করলেন যে!"

কান্ত ব্যস্ত হয়ে বলে, "না, না, মণিভাই! (কান্ত আড়ালে কেতনমণিকে ঐ বলেই ডাকত) ওসব কথায় কান দিও না। চুরি চুরিই! শ্রীহরির আদেশ-টাদেশ ঐ মাধবের মাথায় থাক। আমার কথা শোন মণিভাই! ও সবের মধ্যে তুমি যেও না।"

"আচ্ছা, তুমি যখন বলছ তখন যাব না।"

"ঠিক ত ?"

"হ্যাঁ ঠিক। তোমার কথা কি অবহেলা করতে পারি কান্তমণি!" গলার স্বরটা একটু গদগদ হয়ে পড়ে। কান্ত চুপ করে থাকে। কেতনকে সে বুঝে নিয়েছে। আবার মাধবের পাল্লায় পড়লে মন হয়ত যাবে বদলে। তাই ওর মুখের কথায় যেন ঠিক বিশ্বাস হয় না। আদরের ডাকে মনটা আবার নরমও হয়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে—চিন্তাজড়িত তৃপ্তি!

মাধববৈরাগীর সুমধুর পদ-কীর্ত্তনে কান্তর ছন্নছাড়া-জীবন যেন একটা রসের আশ্রয় পেয়েছে। সেই জন্তে মাধবের উপর ভক্তিও জাগে, মনে ভাবে, হ্যাঁ, লোকটা ভক্ত বটে, ক্ষমতাও আছে। কিন্তু তাই বলে কেতনকে দিয়ে যে সে যা খুশী করিয়ে নেবে, তার উপর যে নিজের চেয়ে বেশী আধিপত্য বিস্তার করবে, এ কান্তর পছন্দ নয়। তাই কেতনকে নিয়ে মাধবের সঙ্গে চলে মনে মনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা—মনের রাজ্যেই হয় কোনো দিন জয়, কোনো দিন পরাজয়। আজ কান্তর জয় হলো কি না তা

সে ঠিক ধরতে পারছে না। তাই সে-রাতে নিদ্রা তার সুস্বপ্নে ও দুঃস্বপ্নে ভরে রইল। কেতনেরও ঘুম ছিল না সে-রাতে। বাসায় ফিরিবার পর বিছানায় শুয়ে যেন বিছে কামড়াতে লেগেছে তাকে। ভাবছে, কিন্তুক, অমন খোল! ওটা কি হাতছাড়া করা যায়? এদিকে আবার ক্ষান্তমণি বেজার হবে। হয় হবে, এ ত ঠিক চুরি নয়, তাকে ত বোঝালাম, না বুঝলে কি করবো?

ক্ষান্তর যত সব—। এই সব সাত-পাঁচ চিন্তার দংশন খেতে থাকে।

পরদিন শ্রীখোলকে ঠিক নিয়ে এসে হাজির হলো কেতনমণি। শেষ পর্য্যন্ত ক্ষান্তর পরাজয়ই হ'ল। খোলের যেমন রূপ তেমনি গুণ। বোল যেন মেঘমন্দ্র! মাধব সেদিন বাউল গানটার অবশিষ্ট কলি গাইল একটু যেন শঙ্কামুক্ত হবারই আশায়—

"দীনহীনের এই বাসনা—
পাপে যেন আর ডুবি না।
সাধু-মুখে শুনি আমি
পতিতের বন্ধু তুমি
কত পাপী করিলে উদ্ধার,
দয়াল আমায় কর ভবে পার।"

সেদিনের কীর্ত্তন জমলো অভাবনীয়—আশ্চর্য্য!

৪

মাধব বললে, "এইবার চল্ কেৎনা, শহরে যাই। তুই কি বলিস্ রসিকচন্দর?"

খুলি করতালী দু'জনেই সাগ্রহে সায় দেয়। শহরে উপার্জ্জনও হবে খ্যাতিও হবে। আর শ্রীখোল চুরির সন্ধান করতে অত দূর কেউ পৌঁছবে না গিয়ে। জন-সাগরে কে কার সন্ধান রাখে!

চলে গেল শহরে। এখানেও ক্ষান্তর হ'ল আর এক দফা পরাজয়। কারণ সে পই পই করে কেতনকে মানা করেছিল—"শহরে যেও না"। আগেকার অভিজ্ঞতায় তার একটা শহরভীতি ছিল। আর এবারও কেতন ক্ষান্তর কাছে কথা দিয়েছিল যাবে না বলে। কিন্তু মাধবের সান্নিধ্য যেন সম্মোহিত করে ফেলে কেতনকে। মাধবের মূর্ত্তিই যেন কীর্ত্তনের প্রতিমূর্ত্তি! তাকে দেখলেই কেতনের সর্ব্বাঙ্গে যেন তালের মহড়া চলতে থাকে। কোথায় থাকে তখন ক্ষান্ত, আর কোথায় তার কাছে প্রতিশ্রুতি!

কিন্তু ঐখানটাতে তাদের চালে হ'ল ভুল। শহরে এসে খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীখোলের প্রকাশ সহজ হয়ে পড়ল। একদিন কোত্থেকে কোটাল এসে হাজির। কেতনমণিকে নিয়ে গেল পাকড়াও করে। লঘু পাপে হ'ল গুরু দণ্ড।

রসিকের সঙ্গে কেতনের ছেলেবেলা থেকেই বন্ধুত্ব। এক সঙ্গে ড্যাং-গুলি খেলেছে, এক সঙ্গে গাঁজায় দম দিতে শিখেছে, এক সঙ্গে আখড়ায় গিয়ে খোল-কর্ত্তালের সঙ্গত করেছে। তার পর না মাধববৈরাগীর আগমন! কেতনের কারা'র আদেশের সঙ্গে সঙ্গে 'ধুত্তর' বলে রসিক মাধবের কীর্ত্তনের দল দিলে ছেড়ে। যা টাকা জমিয়েছিল তা দিয়ে একটা তেলে-ভাজা দোকান দিলে কেতনের জেলের গেটের প্রায় সামনেই। আর ক্ষান্ত তার দোকান তুলে এনে বসালে তারই পাশে। দু'জনেই কেতনের দরদী।

৫

"দু' পয়সার প্যাঁজী দেও ত।"

"আমায় দেও চার পয়সার বেগুনী।"

কিন্তু দোকানদার প্যাঁজীও দেয় না, বেগুনীও না। দু' দুটো খদ্দেরকে দাঁড় করিয়ে রেখে যেন একটা গানের তালে তালে মাথা নাড়তে থাকে, আর সঙ্গে সঙ্গে দুটো হাত মুঠো করে যেন এক জোড়া অদৃশ্য কর্ত্তাল বাজাচ্ছে এই ঢং-এ তালে তালে হাত আর মুখের ভঙ্গি করতে থাকে। দৃষ্টিটা উদাস—কোন্ রাজ্যে যেন!

খদ্দেররা অবাক হয়ে তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে 'পাগলা' বলে হেসে চলে যায়। এই দেখে পাশের দোকান থেকে ক্ষান্ত ছুটে এসে বললে, "তোমার হ'ল কি রসিকদা? হাতে কর্ত্তাল কৈ যে বাজাচ্ছ?"

রসিক তার উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিটা ক্ষান্তর দিকে এনে বললে, "আ-হা-হা! কি কেত্তনই শোনালো মাইরি?"

"সে ত আমিও শুনলাম। কিছু বুঝলে?"

"বুঝলাম—কেত্তনের ছিনিমিনি খেলে গেল। গাড়ী হাঁকিয়ে কেত্তন গেয়ে যাওয়া, এ কোন্ রীতি?"

"কিন্তু গলাটা চিনলে?"

"ওঃ হোঃ, তাই ত! ও যে মাধবদার গলা?"

"সেই কথাই ত বলছি। ও ঠিক মাধববৈরাগী।"

৬

ওদিকে মাধবের খ্যাতি খুবই বাড়তে লাগল। অন্য খুলি ও কর্ত্তালী সে যোগাড় করে নিয়েছে। কিন্তু রসিক-

কেতনের অভাবে মনটা খাঁ খাঁ করে। বিশেষ করে কেতনের জন্যে। তাকে স্মরণ করে গানও বেঁধেছে। সেই গানকে কীর্ত্তনের ছাঁচে ঢেলে যখন গাহিতে থাকে তখন শ্রোতাদের মনে হয়—কানাই ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে, তারই বিরহের ক্রন্দন-কীর্ত্তন। শুনতে শুনতে অশ্রু ঝরে পড়তে থাকে। মাধবের খ্যাতিও এমনি করে বাড়তে থাকে।

ক্রমে তার খ্যাতি এমনি বেড়ে গেল যে, রাজ্যপাল-ভবন থেকে তার ডাক আসতে লাগল কীর্ত্তন গাইবার জন্যে।

বৃদ্ধ রাজ্যপাল ধার্ম্মিক মানুষ। মাধববৈরাগী তাঁকে একেবারে মুগ্ধ করে ফেলেছে।

গানের আসর একদিন ভাঙ্গতেই মাধব রাজ্যপালের সামনে গিয়ে করজোড়ে নিবেদন করল—"হুজুর! আমার এ গান আমারই মত পাপী-তাপীদের উদ্ধারের তরে। আপনকারদের মত সজ্জন ব্যক্তিদের 'ঠেঁ' কি আমার মত অধমের কীর্ত্তন করা শোভা পায়? এ শুধু আপন্কারদের আদেশ করা। একটা নিবেদন করতে চাই, হুজুর। জেলখানার হতভাগ্যদের কর্ণে একদিন হরিনাম সুধাবর্ষণ করে আসি এই পারার্থণা, হুজুর! পাপীদের কর্ণে হরিনাম যদি দান করতে পাই, তবে না আমার কীর্ত্তন সার্থক হয়! পাপ শোধনের জন্যি বেত্রাঘাত বা প্রস্তরচূর্ণ করানো ত ঔষধ নয়, প্রাণ-জুড়ানো হরিনামই এর মহৌষধি।" এই পর্য্যন্ত বলে সুর করে তান ধরলো—

"হরি নাম মহৌষধি
পান কর রে নিরবধি
ভব-ব্যাধি রবে না রবে না।"

৭

মাধবের আর্জ্জি অবশেষে মঞ্জুর হয়েছে। এখানেও বোধ হয় তার সম্মোহনশক্তি কাজ করেছে। জেলের মধ্যে গিয়ে কীর্ত্তন গাইবার অনুমতি সে পেয়েছে। একটা বাসও পেয়েছে কীর্ত্তন-দলের যাতায়াতের জন্যে। সেই বাসে চড়ে গাইতে গাইতে যাবার সময়ই গানের ছোঁয়া দিয়ে গেছে রসিক ও কান্তর দেহমনে।

রাজ্যপালের আদেশে জেলের মধ্যে কীর্ত্তনের আসর। মহা উৎসাহের তরঙ্গ উঠেছে কয়েদীদের মধ্যে। আজ ঘানি-টানা নেই, পাথর-ভাঙ্গা নেই। শুধু "প্রাণ ভরে আজ গান কর ভবে ত্রাণ পাবে আর নাহি ভয়।" এমন আশার বাণী তাদের কেউ ত কোন দিন শোনায় নি! যে প্রাঙ্গণের প্রান্ত থেকে মৃত্যুর পরোয়ানা এসেছে, দুরন্ত অপরাধীর চূড়ান্ত সাজা, সেই মঞ্চ থেকে এল আজ অমৃতের আহ্বান পাপীদের জন্যে। চোখ দিয়ে তাদের বিগলিত হতে লাগল আনন্দাশ্রু শুনতে শুনতে 'হরিনাম বল রে ভাই, পাপের জ্বালা আর রবে না।'

আসরের মাঝে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে মাধব কীর্ত্তনের পদ গায় আর ঘুরেফিরে তাকায়—ভাবে কেতনটা রইল কোথায়? হঠাৎ দেখতে পায়—কে রে, ঐ কোণে বসে মাথা ঝাঁকছে আর একটা বেঁটে কয়েদীর পিঠে তাল ঠুকছে চোখ বুঁজে? হ্যাঁ ত! কেতনই ত! ওর সেই ঝাঁকড়া দীর্ঘ চুল আর নেই, ছোট করে ছাঁটা এখন, আর কয়েদীর পোশাকে ওকে চিনতে দেরী হ'ল। মাধব ওকে দেখেই গাইতে গাইতে সোজা এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধরল। সবাই অবাক; জেলার ছুটে আসেন—কি কি! ব্যাপার কি?

*　　*　　*　　*

শ্রীখোল তখনও পুলিসের হেপাজতেই ছিল। অপরাধীর শাস্তি পেতে দেরী হয় না। কিন্তু অপহৃত পদার্থ আদিম স্থানে গিয়ে পৌঁছিতে দেরী হয় বিস্তর। মাধবের আব্দারে জেলারের হুকুমে শ্রীখোল এসে কেতনের করতলগত হ'ল। তার করাঘাতে খোলের বোল আবার জেগে উঠল। এবার কীর্ত্তন জমে উঠল পুরোদস্তর। শুনতে শুনতে কয়েদীদের কারু চোখে অনুতাপাশ্রু, কারু বা আনন্দাশ্রু। কেহ বা শৃঙ্খলিত পদেই নৃত্য শুরু করে দিলে নূপুর-পরা নর্ত্তকের মত।

৮

কিছুদিন পরে ক'দিন ধরে মাধব মাতলো একটা দরবার নিয়ে। তখন কেতনের কারামুক্তির দিন এগিয়ে এসেছে। ঘন ঘন যাতায়াত চলছে মন্ত্রীমহলে। খবরের কাগজে প্রায়ই দেখা যেতে লাগলো রাজ্যপাল-ভবনে সমাগতদের নামের তালিকার মধ্যে মাধব কীর্ত্তনিয়ার নাম। দেশী সরকারকে সে এই ব'লে বোঝায় যে, জমির মালিক জমিদার, এ সাবেকী কথা ত নতুন যুগে বাতিল হয়ে গেছে; জমি হ'ল এখন চাষীর, যে জমি চাষ করছে তার। এ যেমন নবযুগে অবধারিত বাক্য, তেমনি যে শ্রীখোলের মালিক শ্রীখোলকে সিঁকায় তুলে রেখেছে তার কোনো দাবী নেই শ্রীখোলের উপর। যে তা বাজাতে পারে তারই দাবী। আর কেতনের তুল্য কে বাজাতে পারবে শ্রীখোল? এই সব বক্তব্য তার গদ্য বক্তৃতার দ্বারা ও মাঝে মাঝে পয়ার ছন্দে গেঁথে

কীর্ত্তনের সুরে গেয়ে যুক্তির সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতের সম্মোহন-শক্তি সংযোগ করে দিতে লাগল। আর কীর্ত্তন শুনতে গেলে মস্তিষ্ক সঞ্চালন ত রেওয়াজ। রাজ্যপাল, মন্ত্রী উভয়েরই মস্তক সঞ্চালিত হতে থাকে, সেই সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গেই সম্মতির সঞ্চালন এসে পড়ল।

তার পর কেতনের কারামুক্তির দিন। ভোর হতেই মাধব সদলবলে গিয়েছে দেউড়ীর কাছে। কেতন বেরিয়ে আসতেই চন্দনে পুষ্পমাল্যে ভূষিত হ'ল পরক্ষণেই শ্রীখোলেও ভূষিত হ'ল। তার পর পথচলার সঙ্গে সঙ্গে কীর্ত্তন চলতে লাগল। মাধবের মুখে গানের বোল, কেতনের করের শ্রীখোলের বোল কম্পিত করে দিতে লাগল দিগ্বিদিক। কেতন বললে, "মাধবদা! মনে হচ্ছে আমার যেন এ গঙ্গাযাত্রা।"

"দূর, পাগলা! গঙ্গাযাত্রা করতে নিজেই বুঝি খোল পিটিয়ে চলে?"

"ভাল কথা, মাধবদা! খোল ত পিটুছি, কিন্তক রসিক ছোঁড়ার কর্ত্তালের অভাবে সব যেন ঠিক খুলছে না। চল দাদা ঐ পথটা দিয়ে। আমি জানি, ঐ মোড়ের মাথায় তেলে-ভাজার দোকান দিয়েছে কম্‌বক্তাটা। পাকড়াও করে নিয়ে যাব। তবে আবার সেই পাকা দলটা গড়ে উঠবে।"

"বলিস কি রে! রসিক এইখানে? চল্, চল্, চল্।"

রসিকের কথাই কেতন পাড়লো। কিন্তু রসিকের অভাবের চেয়েও আর এক জনেন অভাব যে বেশী বোধ করছিল সে ত বলা চলে না। হ্যাঁ, রসিকের সন্ধানে গেলে তারও দর্শন মিলবে। সে ত জানতই জেলের সেই হিতৈষী পেটুক প্রহরীর কাছে যে,তাদের পাশাপাশি দোকান। তাদের কাছ থেকে সেই প্রহরীটিরই মারফৎ কতই না চর্ব্বচোষ্য পেয়েছে এই কারাবাসকালে! অবিশ্যি প্রহরীরও থাকতো আধাআধি ভাগ। রসিককে আবিষ্কার করা হ'ল। কেতন আড়-নয়নে অনেক দিন পরে ক্ষান্তর মুখখানি পান করে নিল। তার পর সত্যিই আবার এতদিন পরে মরা-গাঙে গান-বাজনার বান ডাকলো। আর কেতনের সংবর্দ্ধনার অন্ত নেই। তা দেখে ক্ষান্তর অন্তর আনন্দে ভরে উঠলো। কিন্তু সেই সঙ্গে একটা আতঙ্কেরও উদ্রেক হতে থাকে। প্রেমের সংকীর্ণ স্বরূপ যেন বহু হতে প্রেমাস্পদকে একের আওতায় আনতে চায়। যেন তার মন বলতে থাকে—'তুমি আমার আপন হবে কবে?'

৯

কিছুদিন পরেই মাধব বললে, "চল:কেৎনা,এবার লম্বা পাড়ি দি—একেবারে শ্রীবৃন্দাবন, তার পর মথুরা। শ্রীকৃষ্ণের আদি লীলাভূমি। কীর্ত্তন সেখানে জমবে ভাল।"

* * *

কেতনকে মাধব বড়ই স্নেহের চোখে দেখেছে। তার গুণেও মুগ্ধ সে। কিন্তু কেতনের উপর ক্ষান্তর প্রভাবটা মাধবের অবিদিত ছিল না এবং সেই জন্যই তার চিন্তারও অবধি ছিল না। মাধব চায় কেতনকে মায়াবিনীর কবল থেকে মুক্তি দিতে। যার হাতের মৃদঙ্গ নামকীর্ত্তনে এমন মেতে ওঠে তাকে মলিন মায়াজাল থেকে মুক্ত করতে যদি না পারল, তবে তার সব কীর্ত্তনই ব্যর্থ। তাই তাকে উদ্ধারের সুযোগ খুজতে থাকে, তাই চায় শ্রীবৃন্দাচলে নিয়ে গিয়ে কায়েমী কীর্ত্তনিয়া করে ফেলতে। নিয়ে যাবারও সুযোগ চিন্তা করতে থাকে।

ওদিকে ক্ষান্ত খবর পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে। কেতনের দুই হাত ধরে বলে, "মণি ভাই! কতবার তুমি আমার কথা না শুনে কত বিপদ ডেকে এনেছ। এবার আমার কথাটা রাখতেই হবে। আমার মাথার দিব্যি, কিছুতেই তুমি যেতে পাবে না।"

কেতনের মুস্কিল এই যে, ক্ষান্তর মুখের দিকে চাইলে সব ভুলে যায়। তার ভালবাসার টানে কত আশার জাল বুনতে থাকে—তাকে নিয়ে ঘর বাঁধবে। আবার মাধবের কীর্ত্তন তার দেহেমনে এমনি তীব্র মত্ততা জাগায় যে, ঘর বাঁধার কথা, ক্ষান্তর কথা কিছুই তার মনে থাকে না।

এখন ক্ষান্তমণির কথাগুলো শুনে তার বুকের মধ্যে দোলা দিয়ে উঠ্‌লো। বললে, "না, মণি! তোমায় ছেড়ে কি যেতে পারি? উড়ুনচণ্ডীপানা আর ভাল লাগে না। এইবার একটা ঘর বাঁধার যোগাড় করি।" একটু থেমে, একটু ভেবে আবার বলে, "চল, আমরা দু'জনে এখান থেকে পালিয়ে যাই।"

শুনে লজ্জায় আনন্দে ক্ষান্তর চোখে জল এসে পড়লো। অল্পক্ষণ মাথা নিচু করে থেকে কেতনের হাত ছেড়ে দিয়ে তার বড় বড় কাজল-সজল চোখ কেতনের দিকে তাকিয়ে বললে, "এত সুখ কি আমার কপালে হবে? কিন্তু পালানো চলে না।"

"কেন?"

"আগে বিয়ে না হলে তোমার সঙ্গে কি যাওয়া চলে?"

"বিয়ে? কে দেবে আমাদের বিয়ে?"

"মন্দিরের পুরুৎ মহিমঠাকুরের কাছে চল। আমি

তাঁকে বলে রেখেছি। কিছু টাকা দিলেই কাজ হবে। বেশী না, পঁচিশটা। চল, এখুনি যাই, রাত বেশী হয় নি।"

কেতন বললে, "টাকা ত আমার নেই।"

"আমার আছে, চল যাই।"

যা কথা তাই কাজ। সে রাতেই বিয়ে হয়ে গেল। এখন আর কোনো গোল নেই। কান্ত নিশ্চিন্ত। এইবার ঘর বাঁধবে। সে এখানেই হোক বা যেখানেই হোক। সে পরে ঠিক করা যাবে।

১০

কিন্তু সে-রাতে মাধবের শুতে যেতে অনেক দেরী হলো। বিবিধ চিন্তার আলোড়ন নিয়েই সে তার ভারাক্রান্ত মাথাটা সন্তর্পণে বালিসে রেখে শুয়ে পড়লো।

শেষ রাতে স্বপ্ন দেখছে—গুন গুন করে কে যেন কানের কাছে কীর্ত্তনের একটা কলি গাইছে, আর সেই সঙ্গে ঠুং ঠুং করে কর্ত্তালের মিঠে সঙ্গত! শুনতে শুনতে ঘুম ভেঙ্গে যায়। তখন বোঝে—স্বপ্ন ত নয়, সত্যিই তার দোরগোড়ায় অতি মৃদু স্বরে কে গাইছে—

"শ্যামের বাঁশরী বাজিল যমুনায়,
তোরা কে কে যাবি আয়।"

দোর খুলেই দেখে মাধব গাইছে অতি চাপা গলায় আর রসিকও খুব আলগোছে, খুব আস্তে কর্ত্তালে টোকা দিচ্ছে।

"আরে? তোমরা এত ভোরে?

"এই ভোর রাতেই যেতে হবে—ডাক এসেছে যাবার তরে রে, কেৎনা!" জবাব দেয় মাধব।

"কোথা যাবে?"

"বাঃ রে! শ্রীবৃন্দাবন। শ্যামের ডাক এসেছে, আমি ভক্তিভরে কানখাড়া করে শুনতে পেলাম গভীর রাতে। চল্, চল্, তোর কিছুই নিতে হবে না, আমরা সব নিয়েছি। তুই শুধু তোর শ্রীখোলটা চট করে নে'চল।" বলেই আবার চাপা গলায় গানের কলি গাইতে লেগে যায়। রসিকও কর্ত্তালে হাল্কা টোকা দেয়।

কেতন তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে মৃদঙ্গটা তুলে নিয়ে উৎসাহে জোর চাঁটি দেয়।

মাধব অমনি মহা ব্যস্ত হয়ে চাপা গলায়ই চেঁচিয়ে ওঠে—"না, না, না! অত জোরে বাজাস্ নে।" বলেই কিছুক্ষণ কান্তর আস্তানার দিকে তাকিয়ে থাকে। সেটা খুব বেশী দূর না সেখান থেকে। তার পর আবার বলে, "খুব মৃদু করে ঠেকা দিয়ে সঙ্গত করতে করতে চলে আয়। শুভযাত্রার লগ্ন বয়ে যায়! চুপি চুপি নিঃশব্দে তোকে তুলে নিয়ে যাব ভেবেছিলাম কিন্তু গুরুতে নাম গান করতে করতে না গেলে যাত্রা শুভ হয় না।"

তখন তিন জনেই খুব মৃদু সঙ্গত করতে করতে বেরিয়ে পড়লো। দু' পা এগিয়েই হঠাৎ কেতন থমকে থেমে গিয়ে এক হাতে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলে, "কিন্তুক—"

মাধব এক ধমক দিয়ে বলে, "আর কিন্তুক কিন্তুক না। ঝট করে চল। শুভলগ্ন বয়ে যায়—বলছি যে!"

তখন তিন জনে এগিয়ে চলে গেল। বেচারি 'কিন্তুক' রইল পিছনে প'ড়ে!

১১

যাত্রা করে যদিও বেরুলো সাত সকালে, ধরলো কিন্তু গিয়ে সেই সন্ধ্যের ট্রেন। গাড়ীতে উঠে কেতন একটা পৃথক আসন নিয়ে বসলো। বৃন্দাবন-বিলাসের অনিবার্য্য আকর্ষণে মুক্তকামী কেতনমণি। ট্রেনখানা ছুটে চলেছে জ্যোৎস্না-প্লাবিত মাঠের মধ্য দিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে তীর্থমুখে। কেতন তার শ্রান্ত মাথাটা জানালায় ঠেকিয়ে বাতাসে মেলে দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখছে আর ভাবছে কত কি! গাড়ী চলেছে অবিরাম গতিতে ঘুম-পাড়ানিয়া তালে। কখন এক সময় বসে বসেই তন্দ্রায় জড়িয়ে গেছে কেতনের চোখ। আর ঐটুকু তন্দ্রাকেই আশ্রয় করে স্বপ্ন দেখতে লেগেগেছে। স্বপ্ন কিন্তু বৃন্দাবনের বা মোক্ষলাভের নয়। সামনে যা পাবে বা যেখানে যাবে তার নয়, পশ্চাতে যা ফেলে এসেছে তারই স্বপ্ন সব। তার গ্রামখানিকে, তার মাকে, যে মাকে হারিয়েছে বহুকাল হলো, বন্ধুবান্ধবকে এবং সবচেয়ে স্পষ্ট ভাবে দেখে কান্তকে। হঠাৎ কান্ত কোথায় মিলিয়ে গেল এবং সেই সঙ্গেই কাতর কণ্ঠের ডাক শোনে "মণি ভাই!" শঙ্কাজড়িত সে ডাক।

ডাক শুনেই কেতনের ঘুম ভেঙে যায়। ভাবতে লাগলো, ইশ! কি স্বপ্নই দেখলাম কান্ত কেন অমন করে ডাকলো? তার মন কান্তর জন্যে ভীষণ খারাপ হয়ে পড়লো। সে কি কোনো বিপদে পড়েছে? হয়ত আমাকে দেখতে না পেয়ে খুঁজতে বেরিয়েছে? হয়ত বনের মধ্যে কোনো জন্তুর মুখে পড়েছে? অথবা তার চেয়েও ভয়ানক—কোনো দুর্বৃত্ত লোকের খপ্পরে প'ড়ে থাকবে! বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখে গাড়ীখানা ছুটেছে সামনের দিকে নিষ্ঠুর দানবের গতিতে, কিন্তু টেলিগ্রাফের পোষ্ট-গুলো উল্টো দিকে চলেছে—বোধ হয় কান্তর কি হ'ল তাই দেখতে ছুটেছে দরদীর দল। হঠাৎ তার মনে

হলো—পাগল হয়ে যাবে নাকি সে? মহা ব্যস্ত হয়ে মাধবকে এক ধাক্কায় জাগিয়ে তুলে বললে, "ব্রেন্দাবন আর কত দূর মাধবদা?"

"দূর পাগলা? বৃন্দাবন এখনই কি রে? তুই শুয়ে ঘুম লাগা ত।"

ধমক খেয়ে শুয়ে পড়লো। কিছু পরে একটা ষ্টেশনে গাড়ী থামলো। ফিরিওয়ালার হাঁকে, আরোহীদের কোলাহলে ব্যস্ত হয়ে উঠে বসলো। ভাবলো এটা ত খুব বড় ষ্টেশন তবে—আবার বলে উঠলো, "মাধবদা! এটা ব্রেন্দাবন?"

"নাঃ! তোকে নিয়ে ত পারলাম না! বৃন্দাবন কি এতই কাছে রে, কেৎনা? চুপটি করে শুয়ে থাক্। আর একটি কথা না।"

গাড়ী ছাড়তে কেতন হতাশ হয়ে শুয়ে পড়ে। ভাবতে থাকে—কে জানত ব্রেন্দাবন এত দূর! তা জানলে কি আর ক্ষান্তকে অমন করে ফেলে আসে সে? সে জানত, দু'চার দিন তীর্থ ক'রে ফিরে গিয়ে ক্ষান্তকে পাবে। এখন এত দূর গিয়ে পড়ছে—শীগ্‌গির কি আর ফিরতে পারবে? অনুশোচনায় দুর্ভাবনায় তার অন্তর ভরে যায়। ভাবতে থাকে, বেবাহিত পরিবারকে পরিত্যাগ ক'রে এলাম! ফিরে যেতে ইচ্ছা হতে লাগলো। মাধবের উপর, রসিকের উপরও মনটা বিষিয়ে গেল। ঠিক করলো, এইবার যেই গাড়ী থামবে যে ইষ্টিশনেই হোক—সে নেমে পড়বে, তার পর একটা ফিরতি গাড়ী চড়ে ফিরে যাবে একেবারে ক্ষান্তর কাছে। কিন্তু যদি গিয়ে ক্ষান্তকে না পায়? নাঃ! আর ভাবতে পারে না। মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করতে থাকে। তার পর কখন যে আবার ঘুমিয়ে পড়েছে টের পায় নি। আবার স্বপ্ন দেখলো যে, সত্যিই ফিরে গেছে দেশে—সেই তার পরিচিত পরম প্রিয় স্থান। ছুটলো ক্ষান্তর আস্তানা পানে। কিন্তু কোথায় ক্ষান্ত? ঘর শূন্য তার! অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময় দেখে গোলক গয়লা গরু-বাছুর নিয়ে চলেছে। কেতনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে বললে, "এখানে দাঁড়িয়ে ভাবছ ক্ষান্ত কোথায় গেছে? সে এমন জায়গায় গেছে যেখান থেকে আর কোনো মনিষ্যি ফেরে না। তোমরা যেই চলে গেলে অমনি সে করলো কি, শুকনো কাঠ টেনে টেনে এনে একটা চিতা সাজালো, তার পর তাইতে আগুন ধরিয়ে না—চট, করে চিতার উপর উঠে পড়েই সটান শুয়ে পড়লো! ঐ দেখ না ঐ হোথা খালের ধারে আগুনটুকুর সবটা এখনও নেবে নি।"

কেতন আঁৎকে উঠে এক চীৎকার দিতেই ঘুম গেল ছুটে। রসিক শুধোল, "কি রে, কেৎনা চেঁচিয়ে উঠলি যে?"

কেতন কোনো জবাব না দিয়ে উঠে ব'সে জানলার দিকে তাকিয়ে দেখে ভোর হয়ে এসেছে, পুব আকাশে শুকতারাটা জ্বল্ জ্বল্ করছে। ভাবতে লাগলো, ভাগ্যিস্ স্বপ্ন সত্য না। কিন্তু ভোরের স্বপ্ন নাকি সত্য হয়! কি সর্ব্বনাশ! যদি সত্যিই হয়? নাঃ! আজই ফিরে যেতে হবে। গুম্ হয়ে ব'সে রইল। কারু সঙ্গে আর কথা কয় না।

মোগলসরাই ষ্টেশনে ট্রেন আসতেই ভীষণ গোল-মালের সৃষ্টি হলো। নামবার যাত্রী ও উঠবার যাত্রীদের মধ্যে লেগে গেল ঠেলাঠেলির কসরৎ। কে কাকে ঠেলে হারাতে পারে। এই গোলযোগের সুযোগে মাধবদের অলক্ষ্যে কেতন টুপ করে নেবে গেল। নেবেই দিলে এক ছুট। ছুটতে ছুটতে দেখে আর একটা প্ল্যাটফর্ম্মে আর একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ নিজেও দাঁড়িয়ে গেল এবং ভাবতে লাগলো—ঐটে কি কলকাতায় যাবে? কাকে জিজ্ঞাসা করে ভাবছে এমন সময় পিছন থেকে ডাক শুনলো—"মণি ভাই?" একেবারে চমকে উঠে ফিরে তাকিয়ে দেখে—ক্ষান্ত! এবার ত স্বপ্ন নয়, সত্যই ক্ষান্ত যে!

"আরে! ক্ষান্তমণি যে? এখানে কি ক'রে এলে?"

মুচকি হেসে ক্ষান্ত বলে, "তোমরা যা করে এলে। আমি যে একেবারে তোমাদের পাশের কামরায় আছি। যেই তুমি নামলে এখানে, আমিও নেমে পড়লাম। তার পর তোমার পিছন পিছন ছুটতে ছুটতে আসছি। তা অত ছুটছো কেন গা? কোথা যাবে ভাবছিলে?"

"ভাবছিলাম দেশেই ফিরে যাই।"

"কেন? তোমার ব্রেন্দাবন কি হলো?"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কেতন জবাব দেয়, "আর ব্রেন্দাবন। তোমার জন্যি মনটা বড় ইয়ে—"

"ঈস?"

"সত্যি মণি! বিশ্বাস কর। অনুতাপে আমার চিত্ত—। ভাবছিলাম কি, গাড়ীটা যদি হাওড়ায় যায়, উঠে পড়ব। তোমাকে ছেড়ে এসে—"

আবার দীর্ঘশ্বাস। কথা শেষ করতে পারে না। ক্ষান্ত একটু ভেবে নিয়ে বলে, "দেখ, ঐ গাড়ী হাওড়া যাবে না—যাবে কাশী। আমি খবর নিয়ে জেনেছি। চল আমরা কাশীবাসী হই গে।"

কেতন হঠাৎ দু'হাত জোড় করে তুলে কপালে

ঠেকায়। বলে, "জয় বিশ্বনাথ! তোমারি কেরপায় কান্তকে ফিরে পেলাম। দেও তবে আমাদের তোমার চরণেই আশ্রয়!"

কান্ত বলে, "তবে এসো, আর একবার ছুট দি। গাড়ী ছাড়তে বোধ হয় বেশী দেরী নেই।"

১২

কাশীর গাড়ী চলেছে প্রাতে পরম আশ্রয়স্থানে। শিবের ত্রিশূল যে স্থানের সকল শঙ্কা বিতাড়ন করে। সদ্য ঝঞ্ঝামুক্ত কপোত কপোতী দুটি নিশ্চিন্তে একটি ছোট্ট কামরায় পাশাপাশি বসেছে। গাড়ীতে ভিড় নেই। খুব ফাঁকা। বিগত শত আতঙ্কমুক্ত আজ। কেতন বললে, "আচ্ছা, একটা কথা জিগ্যেস করি—আমরা যে আসছি, তা জানলে কি ক'রে তুমি?"

কান্ত তার ভুবনভোলানো মুচকি হাসির সঙ্গে ঘাড়টা একটু কাৎ করে, আড় নয়নে কেতনের দিকে চেয়ে বললে, "ঐ ত! তোমার কান্তমণি যে কি চীজ, তা ত আজও বুঝলে না! জান? সেদিন শেষ রাতে—না ভোরই হয়েছে তখন প্রায়—হঠাৎ তোমার খোলের চাঁটির আওয়াজ শুনে জেগে উঠলাম। কিন্তু একটু পরেই একেবারে নিঝুম্! অবাক হয়ে রইলাম কান পেতে, কিন্তু আর কোন শব্দ নেই। ভাবলাম হলো কি? ছুটলাম তোমার ঘর পানে। তারপর তোমার ঘরের কোণের সেই শেওড়া গাছটার আড়ালে থেকে স-ব দেখলাম, আর ফিস্ ফিস্ করে তোমাদের কথাবার্তা স-ব শুনলাম। তার পর তোমরা বেরিয়ে পড়লে, আমিও গোয়েন্দার মত পেছু নিলাম। ট্যাঁকে গোঁজা ছিল টাকা। আমার সব টাকাই সব সময় থাকে অমনি।"

কেতন একেবারে অবাক হয়ে বললে, "আচ্ছা ডানপিটে মেয়ে ত তুমি!"

কান্ত আবার সেই মুচকি হেসে বললে, "হুঁ, তাইত বলছি—তোমার কান্তকে তুমি এখনও চেন নি। এইবার চিনবে।"

কান্তর একখানি হাত কেতন নিজের দুই হাতের মুঠোয় মুড়ে নিয়ে বললে, "জান মণি! কি দুঃস্বপ্নই দেখেছি কাল রাতে!"

"কি?"

"তা বলতে পারা যায় না। কিন্তুক বলে ফেলাই ভাল। তবে ব'লে ফেললে স্বপ্ন মিথ্যা হয়।"

দুই চোখ মুদ্রিত করে কেতন ঢোক গিলতে গিলতে বলতে থাকে, "স্বপ্ন দেখলাম, দেশে ফিরে গেছি, এক ছুটে তোমার ঘরে গিয়ে হাজির, কিন্তু হায় তুমি নেই! তুমি—তুমি—" আর বলতে পারে না, ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে মাথাটা কান্তর কাঁধের উপর লুটিয়ে দিল। কান্ত দুই হাতে কেতনকে জড়িয়ে ধরলো নিবিড় ভাবে। প্রেমসম্মোহন।

রবীন্দ্রনাথের "ডাকঘর"

অধ্যাপক শ্রীবিমলচন্দ্র কুণ্ডু

ডাকঘর তিনটি দৃশ্যে বিভক্ত একাঙ্ক নাটক। রুগ্ন অমলকে কেন্দ্র করে এই নাটকটির ক্ষীণ প্লট গড়ে উঠেছে: তাই দৃশ্য পরিবর্তন হলেও স্থান পরিবর্তন হয় নি। তিনটি দৃশ্যের স্থানই মাধব দত্তের গৃহ। প্রত্যেকটি দৃশ্যে অমলকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন চরিত্রগুলিকে দেখান হয়েছে।

নাটকের মূল সুর অমলের মর্মবেদনা। সেই মূল সুরকে ধরে কয়েকটি বিভিন্ন সুরের মূর্চ্ছনা—কোনটি কোমল, কোনটি কর্কশ, কোনটি বা সংবেদনশীল। অমলের পরিপ্রেক্ষিতে যে কয়েকটি চরিত্রের সন্নিবেশ হয়েছে, তাদের কাউকেই সজীব বলে মনে হয় না। যদিও শিশুনায়ক সমস্ত নাটকটি জুড়ে রয়েছে, তবুও অনেক সময় মনে হয় অমল যেন একটি বিশেষ ভাবের প্রতীক।

নাটকটির সময়—সকাল হতে সন্ধ্যা। সকালবেলাটি আবার শরৎকালের। কবিরাজের কথায় এই সময়টার ইঙ্গিত রয়েছে—এই শরৎকালের রৌদ্র আর বায়ুই দুই-বালকের পক্ষে বিষবৎ। "শরততপনে প্রভাতস্বপনে" যখন পরাণ আনন্দবিহ্বল হয়ে কি চায় জানতে পারে না, সেই সময়েই কবিরাজ নিষেধাজ্ঞা জারী করেন অমলের উপর। শরতের রৌদ্র আর বাতাস থেকে তাকে সরে থাকতে হবে বাঁচবার জন্য। কবিরাজের মতে প্রকৃতির সঙ্গে বিচ্ছেদ অমলের পক্ষে মঙ্গল।

ক্রমশ: বেলা বাড়ে। পিসিমা জাঁতা দিয়ে ডাল ভাঙেন, দইওয়ালা হাঁক ছোড়ে—দই—দই—ভাল দই। বেলা বয়ে যায়—সুধার দাঁড়াবার জো নেই, ছেলেরা খেলতে চলেছে। অনেকক্ষণ বসে থেকে অমলের পিঠ ব্যথা করছে, তার ভারি ঘুম পাচ্ছে। এখন বেলা এক-প্রহর। ছেলেদের মুখে শুনতে পাই:

এখন যে সবে একপ্রহর বেলা—এখনি তোমার ঘুম পায় কেন। ঐ শোন একপ্রহরের ঘণ্টা বাজছে।

তৃতীয় দৃশ্যে অমলের কথার মধ্যে নাটকটির আরম্ভের সময়-এর কথা স্পষ্ট:

দেখ, ফকির, আজ সকালবেলা থেকে আমার চোখের উপরে থেকে থেকে অন্ধকার হয়ে আসছে···।

বেলা ক্রমশ: বেড়ে সূর্যাস্তে পৌঁছয়: কবিরাজ বলেন—ঐ যে জানলা দিয়ে সূর্যাস্তের আভাটা আসছে, ওটাও বন্ধ করে দাও···

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরদার সঙ্গে অমলের কথায় জানতে পারি—এতক্ষণে চার প্রহর হয়ে গেছে বোধহয়। ঐ যে ঢং ঢং ঢং—ঢং ঢং ঢং। সন্ধ্যাতারা কি উঠেছে ফকির? আমি কেন দেখতে পাচ্ছি না।

রাজ-কবিরাজমশায় যখন সব বন্ধ দরজা-জানলা খুলে দেন, অমল বলে: আ:, সব খুলে দিয়েছ—সব তারা-গুলি দেখতে পাচ্ছি—অন্ধকারের ওপারকার সব তারা।

এইবার ক্লান্ত অমলের চোখে ঘুম নামছে। রাজ-কবিরাজ বলেন, প্রদীপের আলো নিবিয়ে দাও—এখন আকাশের তারাটি থেকে আলো আসুক। এ ধারে সুধার ফেরার সময় হয়েছে। রাজ-কবিরাজের হাতে সে তার ফুল তুলে দেয় অমলকে দেবার জন্য।

অমলের ঘুমিয়ে পরার কিছুক্ষণ পরেই নাটকের যবনিকা।

অমলের প্রশ্নের উত্তরে রাজদূত জানায় যে, মহারাজ আসবেন রাত্রি দুই প্রহরে। সুতরাং যদি কেউ মনে করেন যে, রাত্রি দুই প্রহর পর্যন্ত নাটকের বিস্তৃতি, তা হলে অবশ্যই একটু বোঝার ভুল হবে। আকুল প্রতীক্ষায় অমল যখন ঘুমিয়ে পড়ল, তখন স্বপ্নের ইন্দ্রজাল কয়েক মুহূর্তেই তার সেই চির আকাঙ্ক্ষিত মুহূর্তটির কাছে এনে দেয়।

নাটকের স্থান—মাধব দত্তের গৃহ।

কাল—শরতের সূর্যোদয় হতে সন্ধ্যাতারা ওঠা পর্যন্ত।

পাত্রগণ—মাধবদত্ত, কবিরাজ, ঠাকুরদা, অমল, দই-ওয়ালা, প্রহরী, মোড়ল, বালিকা সুধা, ছেলের দল, রাজদূত, রাজ-কবিরাজ।

২

নাটকের কাহিনী বৈচিত্র্যহীন। গ্রাম্য পটভূমিকায় রূপায়িত। পরিবেশ অত্যন্ত সাধারণ। সেক্সপীয়রের নাটকের মত বৈচিত্র্যময় ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এই নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটে নাই; তার কারণ, ডাকঘরের নায়কের চরিত্রে জগতের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি, সন্দেহ,

রাজ্যলিপ্সা, প্রণয়ের আকাঙ্ক্ষা বা প্রেমের ব্যর্থতার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। বস্তুতঃ, শিশুর জগৎ পরিণত বা পরিপক্ক মানুষের জগৎ হতে স্বতন্ত্র। নাটকটির বিষয়-বস্তু সাধারণ নাটকের পার্থিব জটিলতা হতে মুক্ত। কিন্তু নায়কের চরিত্রে সংঘাতের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে—সে সংঘাত অন্তর্দ্বন্দ্ব। সেই সংঘাত এক করুণ বেদনায় আত্মপ্রকাশ করে। শিশু মন দিয়ে যা ভালবাসে, বাইরের জগৎ দু'হাত দিয়ে তা সরিয়ে নেয়। মাধব দত্ত বা কবিরাজ সেই শিশুর আত্মাকে যতই বাঁধতে চায়, সে আত্মা ততই চঞ্চল হয়ে সুদূরের দিকে যায়। শিশুর দেহটাকে সবের মধ্যে বন্দী করে রাখলে কি হবে, তার মনটা পড়ে থাকে ঘরের বাইরে। ঘরের বাইরে নির্বন্ধ যে মন সেই মনটাই নাটকের আসল নায়ক।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ode to immortality-তে বলেছেন: Heaven lies about us in our infancy! পৃথিবীর শতসহস্র আচার-বিচার আর প্রলোভন থেকে শিশু দূরে থাকে বলেই ভগবান তার সান্নিধ্যে। ঠিক এই রকম এক নিষ্কলুষ পবিত্র মনকে ঘিরেই ডাকঘর নাটক। অনতিদীর্ঘ নাটকের নায়ক এক মানবকে।

ডাকঘরে হাজার হাজার চিঠি আসে। সে সব চিঠির অধিকাংশই বৈষয়িক; কিন্তু অমলের জন্য রাজার চিঠি এক অপার্থিব আনন্দের উৎস হয়ে দেখা দেয়। এই চিঠিখানির জন্যই ডাকঘরের সৃষ্টি, অথচ এই চিঠিখানিকে গৌণ করে ডাকঘর মুখ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু চিঠি ত আকাশ হতে উড়ে আসে না, তাই ডাকঘরের সৃষ্টি। সাধারণ লোকের কাছে সাধারণ চিঠি আসে, অমল আর পাঁচজন শিশুর মত সাধারণ নয় বলেই, তার চিঠি সঙ্কেতে অসাধারণ।

অমলের প্রথম (ও শেষ) চিঠি আসবে রাজার কাছ থেকে। কে এই রাজা? আর এই রাজার চিঠিই বা কি? এ সেই রাজা যে ঘরের চাবি ভেঙে, সব পার্থিব জঞ্জাল হতে মানুষের পীড়িত আত্মাকে মুক্তির মহানন্দ-যজ্ঞে নিমন্ত্রণ জানায়, কাছ থেকে দূরে নিয়ে যায়, দূরদৃষ্টি দেয়। এ সেই চিরন্তন বিশ্বরাজ, যিনি প্রকৃতিতে পত্র-পুষ্পে পল্লবিত মধুভাণ্ড, যিনি তৃষিত মানবাত্মাকে অমৃত-বারি সিঞ্চিত করে স্নিগ্ধ করেন। শয্যাশায়ী অমলের ব্যথা তিনি ছাড়া আর কে আছে বোঝবার? সর্বব্যথা-হারী যিনি, তিনি সকলকে বিস্মিত করে অমলের কাছে কি না এসে পারেন? তিনি যে করুণাঘন!

যিনি বিশ্বরাজ, তাঁর চিঠিখানি অব্যক্ত অক্ষরে চির-রহস্যময়। সমগ্র শাস্ত্র যুগ যুগ ধরে যাকে ব্যক্ত করতে পারে নি, তিনি আজও অব্যক্ত। মোড়লের অক্ষরশূন্য কাগজখানাই অমলের কাছে গভীর সত্যে পরিপূর্ণ। নিরক্ষর হলেও নিরর্থক নয়। যিনি সীমাহীন, তাঁর প্রকাশ হ-জ-ব-র-ল-এর মধ্যে নয়। তাঁর চিঠি সাদার সঙ্কেত মাত্র। হয়ত কালির অক্ষরে কালিমার স্পর্শ লাগে, তাই যিনি শ্বেতশুভ্র তাঁর পত্রখানি বরং সাদা হলেই মানায় ভাল। রবীন্দ্রনাথ যিনি কালোর কালো হরিণ চোখ দেখেছিলেন, তিনি কি সাদার শ্বেতপদ্মের মধ্যে বাণী-মূর্তিকে দেখেন নি? অব্যক্ত সাদা শুধু সুদূরের সঙ্কেত!

বিশ্বরাজের চিঠির আভাস এক রসঘন নবলোকের সন্ধান আনে। চিঠি বাস্তবের চাক্ষুষ-পরিচয়কে হার মানায়, যে কল্পনা বাস্তবে নেই, চিঠিতে সেই আলোছায়ার কল্পলোক। যিনি কল্পতরু, তাঁর পত্র অমৃতবাহী। মুক্তিস্পর্শী। মানুষের ভাবটুকু ভাষা দিয়ে বদ্ধ চারিধারে। রাজার চিঠি কিন্তু ভাষার বন্ধনে বদ্ধ নয়। সেই চিঠি-খানির ঘোষণাই অমলের কাছে এক অনাবিল, অচিন্ত্য ভাবের আনন্দরাজ্যে যাবার আমন্ত্রণ-প্রতীক।

নাটকটির বিষয়বস্তু ব্যক্তের মধ্যে রূপায়িত হয় নি। অব্যক্ত ও অদৃশ্যের আকর্ষণেই নাটকটির চরম গৌরব। যে রাজা চিঠি পাঠান তাঁকে দেখা যায় না। তিনি যে চিঠি পাঠান, তাও চোখে পড়া যায় না। ফকির ঠাকুরদা সত্যদ্রষ্টা বলে তাঁর কাছে চিঠিখানি যেমন সত্য, রাজ-কবিরাজের সঙ্গে রাজার আগমনবার্তাও তেমনি সত্য। সবকিছু সঙ্কেতময় হলেও নাট্যকারের ইঙ্গিতগুলি সার্থকতা লাভ করেছে।

৩

ডাকঘরকে পুরোপুরি ভাবে নাটক আখ্যা দেওয়ার চেয়ে বরং কোন সুনিপুণ শিল্পীর একটি সুন্দর ছবির সঙ্গে তুলনা করা চলে। শিল্পী যেমন কয়েকটি মাত্র রেখায় বিরাট দিগন্তকে ধরে, রবীন্দ্রনাথ তেমনি মাত্র কয়েকটি পাতার মধ্যে একটি অপূর্ব ভাবকে প্রকাশ করেছেন। সেই ভাবটি নাটকের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছে। নিরর্থক ভাষা লাগিয়ে নাটকের কলেবর বৃদ্ধি না করে, রবীন্দ্রনাথ সেই ভাবটিকে চরম লক্ষ্যে নিয়ে গেছেন। সেইজন্য নাটকের action অত্যন্ত দ্রুত গতিতে চলেছে। মাধব দত্তের গৃহে রুগ্ন অমলের ছটফটানি, তার পর মোড়লের চিঠি এবং রাজ-কবিরাজের আগমন—এই সব ঘটনাগুলি যেন একটি বিজলীর তারে কয়েকটি বালবে-এর মত, একটা না নিভতেই অপরটি জ্বলে। নাটকের ঘটনার গতিকে ভাবের গতি বলা চলে। একটি মাত্র ভাবকে

কেন্দ্র করে নাটকটি লেখা হলেও এটিকে একটি গদ্যে লেখা লিরিকের মত হৃদয়স্পর্শী বলে মনে হয়; যার সুরটি কারণে অকারণে হৃদয়ের মণিকোঠায় অনুরণিত হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

কোথাও যাবার ডাক ও মৃত্যুর কথা উভয় মিলে, খুব একটা আবেগে সেই চঞ্চলতাকে ভাষাতে 'ডাকঘরে' কলম চালিয়ে প্রকাশ করলুম। মনের আবেগকে একটা বাণীতে বলার দ্বারা প্রকাশ করতে হ'ল। মনের মধ্যে যা অব্যক্ত অথচ চঞ্চল তাকে কোন রূপ দিতে পারলে শান্তি আসে। ভিতরের প্রেরণায় লিখলুম। এর মধ্যে গল্প নেই। এ গদ্য লিরিক। আলংকারিকদের মতানুযায়ী নাটক নয়, আখ্যায়িকা। এটা বস্তুত: কি? এটা সেই সময়ে আমার মনের ভিতর যে অকারণ চাঞ্চল্য দূরের দিকে হাত বাড়াচ্ছিল, দূরের যাত্রায় যিনি দূর থেকে ডাকছিলেন, তাঁকে দৌড়ে গিয়ে ধরবার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা···১

সুদূরের জন্য ব্যাকুলতা কবিকে উন্মনা ও উদাসী করে তোলে :

দিন চলে যায়, আমি আনমনে
তারি আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে

কবিচিত্তের সেই সুদূর, সেই বিপুল সুদূরের পরশ পাবার প্রয়াস যেন অমলের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত :

কত বাঁকা বাঁকা ঝরণার জলে আমি পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে পার হতে হতে চলে যাব—দুপুরবেলায় সবাই যখন ঘরে দরজা বন্ধ করে শুয়ে আছে, তখন আমি কোথায়, কতদূরে কেবল কাজ খুঁজে খুঁজে বেড়াতে বেড়াতে চলে যাব।

কাব্যের "তারি আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে" অমলের জানলার ধারে বসে থাকার মধ্যে প্রাণবন্ত হয়েছে—

রাজার কাছ থেকে রোজ একটা করে চিঠি যদি পাই তা হলে বেশ হয়—এই জানলার কাছে বসে পড়ি··· (অমলের স্বগতোক্তি)

নাটকের রাজা সেই সুদূর, বিপুল সুদূর; তাঁর চিঠি "ব্যাকুল বাঁশরি"।

৪

প্রসিদ্ধ আইরিশ কবি W. B. Yeats-এর উক্তি হতে আমরা জানতে পারি যে, মুক্তির আকাঙ্ক্ষা কি ভাবে এবং কখন কবির মনে জেগেছিল :

The deliverance sought and won by the dying child is the same deliverance which rose before his imagination, Mr. Tagore has said, when once in the early dawn he heard amid the noise of a crowd returning from some festival, this line out of an old village song. "Ferrymen, take me to the other shore of the river."

[রবীন্দ্রনাথ নিজে বলেছেন যে, মুমূর্ষু শিশুর মুক্তির আকাঙ্ক্ষা সেই রকম মুক্তি, যা তাঁর কল্পনায় জেগেছিল একদিন যখন তিনি খুব সকালে কোন উৎসব হতে প্রত্যাগত জনতার গোলমালের মধ্যে একটি পুরাতন গানের "মাঝি, আমাকে নদীর অপর পারে নিয়ে চল"—এই লাইনটি শুনেছিলেন।]

কবির এই অপর তীরে যাবার আকাঙ্ক্ষার জাগরণ লালাবাবুর আকাঙ্ক্ষার মতই সহসা জেগেছিল। এই প্রসঙ্গে ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের কয়েকটি কথা তুলে দিচ্ছি :

সাঙ্কেতিক নাটকের একটি মূলনীতি আছে। ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে গুহাহিতকে রূপ দেওয়া। কাজেই এই নাটকে বাহ্য ঘটনার বাহুল্য থাকে না। সরব কর্ম্ম ও বাক্য অপেক্ষা নীরব সঙ্কেতই ইহার প্রধান বাহন। এই সম্পর্কে মেটারলিঙ্কের একটি কথা খুব প্রচার লাভ করিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি বিশ্বাস করেন যে একজন বৃদ্ধ তাহার আরাম-কেদারায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া নিজের অজ্ঞাতসারে বহু চরম সত্যের সন্ধান পাইতে পারে এবং যে সেনাপতি যুদ্ধ জয় করে ও যে স্বামী তাহার আহত সম্মানের প্রতিহিংসা গ্রহণ করে তাহাদের জীবনে এই সকল চরম সত্য উপলব্ধির সম্ভাবনা বিরল। তাই সাঙ্কেতিক রচনায় শব্দের মূল্য কম এবং অনেক সময় দেখা যায় যে, যে সকল শব্দ আপাত:দৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা অপ্রয়োজনীয় মনে হয়, তাহারাই সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যবান।···২

একথা সর্বস্বীকার্য যে, মাথা খুঁড়ে যে সত্যের সন্ধান আমরা পাই না, হঠাৎ কোন এক বিশেষ মুহূর্তে সেই সত্য অত্যন্ত নগণ্য এবং সাধারণ জিনিসের মধ্যেও আত্মপ্রকাশ করতে পারে। ম্যাথুউ আরনল্ড-এর Scholar Gipsy এইরূপ একটি পরম মুহূর্তের অপেক্ষায় ছিল—

And waiting for the spark from heaven to fall.

শিল্পী বহুলাংশে মানবের রূপকপ্রতীক্। ব্রাউনিং-এর প্যারাসেলসাস্-এর কথা শিল্পীর ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য :

১। রবীন্দ্র-সংগীত— শ্রীশান্তিদেব ঘোষ, ২২৩ পৃষ্ঠা।

There is an inmost centre in us all
Where truth abides in fulness
. . . .
This perfect clear perception—which is truth.

দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় মানুষের ক্রিয়াকলাপ তার বিচার-বুদ্ধির পরিচয় দেয়, আর শিল্পীর সৃষ্টি তার অন্তরের উপলব্ধির সন্ধান দেয়।

এই প্রসঙ্গে W.T. Young তাঁর Rovert Browning—A Selection of Poems (1835-1864)-এর সম্পাদনার ভূমিকাতে কয়েকটি কথা বলেছেন, তার থেকে কিছু উদ্ধৃত করছি—

To both of them there comes at times those visitings from infirmity, moments of contact with the transcendent and the eternal, which secure by their flash of illumination some further step of progress. . . ৩

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন—

আমার নিজের প্রথম জীবনে আমি যেমন একদিন আমার অন্তরের একটা অনির্দেশ্যতাময় অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাহিরের সহজ অধিকারটি হারাইয়া বসিয়াছিলাম, অবশেষে সেই বাহির হইতেই একটি মনোহর আলোক হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে প্রকৃতির সঙ্গে পরিপূর্ণ করিয়া মিলাইয়া দিল···আমার সমস্ত কাব্যরচনার ইহা একটি ভূমিকা। আমার তো মনে হয় আমার কাব্যরচনার এই একটি মাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে "সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা"।

নাটকের মধ্যে যে সুরটি সব কিছু ছাপিয়ে উঠেছে—সেটা হলো অমলের অনায়ত্তকে আয়ত্ত করার, অদৃষ্টকে দেখার ব্যাকুল আগ্রহ ও অধীরতা। বিভিন্ন কথোপকথনের মধ্য দিয়ে অমলের ব্যাকুলতা এক অপূর্ব করুণ রসের সৃষ্টি করে। সেই সুরটি যেন শেলীর, "I fall upon the thorns of life ! I bleed !"—এর মতই শোনায়। অমলের অসুখ ততটা দেহের নয়, যতটা মনের। সেই মুক্তিপ্রয়াসী মনের বলাকা ডানা মেলে দিগন্তের রামধনুকে ছুঁতে চায়, ছায়াঘন মেঘলোকের পরপারে পরম রহস্যের মধ্যে বিলীন হতে চায়। মাধব দত্ত অমলকে শুধু বাঁচিয়ে রেখে পুত্রের শূন্যস্থান পূর্ণ করতে চায়, কিন্তু কবিরাজের পাঁচনে অমলের মুখের তিক্ততা যত বাড়ে, মনের তিক্ততাও ততো বাড়ে। কবিরাজের ব্যবস্থায় আছে অসত্যের রুদ্ধ দ্বার, সে ব্যবস্থায় মাধব দত্তের মতো বৈষয়িক লোকের কাছে গুরুত্ব থাকতে পারে; কিন্তু অমলের কাছে সে ব্যবস্থা অনর্থসূচক। কবিরাজের ঔষধে তার ঘুম আসে না, সে শুধু চোখ বুজে থাকে। সুপ্তির ভান করে পারিপার্শ্বিক অবস্থা হতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়। মাধব দত্ত মনে করে, অমল ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু মাধব দত্ত ও কবিরাজের প্রস্থানের পর ঠাকুরদা যেই আসেন অমল বলে, না ফকির, তুমি ভাবছ আমি ঘুমোচ্ছি। আমি ঘুমোই নি। আমি সব শুনছি। আমি যেন অনেক দূরের কথাও শুনতে পাচ্ছি। আমার মনে হচ্ছে, আমার মা, আমার বাবা যেন শিয়রের কাছে কথা বলছেন।

এই কথাগুলির মধ্যে অমলের homesickness ধরা পড়ে: Wordsworth-এর দুটি লাইন মনে পড়ে এই প্রসঙ্গে—

But trailing clouds of glory do we come
From God, who is our home.

রবীন্দ্রনাথের কথায়, "হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনখানে"—সে অনেক দূরের কথা! অনেক দূরের কথা—এই কথা কয়টি এক রহস্যময় আনন্দলোকের সৃষ্টি করে, যেখানে প্রিয়জনের সঙ্গে বিচ্ছেদ নেই; এবং সেই চিরমিলনের শান্তি এনে দিতে পারে। বাস্তিক জীবনের বন্ধন মুক্ত হয়ে যেতে হয় সেই অমৃতলোকে। কিন্তু কে দেবে সেই অযুত আলোকে ঝল্‌সানো নীল আকাশের সন্ধান, কে দেবে "অকুল শান্তি, সেথায় বিপুল বিরতি?" দিতে পারে সেই রাজা, যার পৃথিবীর ডাকঘর অজস্র লিপির হাসিকান্নায়, মিলন-বিরহে, সংশয়-আশংকায় চির আন্দোলিত।

ডাকঘরের মূল সুরটির ব্যাখ্যা ভাষায় মেলে না, গানের সুরের মতই একে অনুভব করতে হয়। এটি introspective lyric-এর মতো প্রাণে এক অপার্থিব অনুভূতির দোলা দেয়। সুদূরের আহ্বানে পলাতক মনের একটি করুণ রাগিনীর মতই মনকে রাঙিয়ে দেয়। নাটকটি চোখের সামনে যে ছবিটি তুলে ধরে সেটি tragic নয়, beautiful and sublime (সুন্দর এবং মহান)।

৫

অমলের মৃত্যু সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, "ডাকঘরের অমল মরেছে বলে যারা সন্দেহ করে তারা অবিশ্বাসী—রাজবৈদ্যের হাতে কেউ মরে না; কবিরাজটা

২। রবীন্দ্রনাথ শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, ২২০ পৃষ্ঠা।

৩। Robert Browning. Edited by W. T. Young. Introduction, Page XXVI.

ওকে মারতে বসেছিল বটে। ১০-২-৩৯।"১ রাত্রির শান্ত পরিবেশে তারার আলোয় রাজবৈদ্যের পাশে রাজার অপেক্ষায় অমলের ঘুমিয়ে পড়া সাঙ্কেতিক। মাধব দত্ত পুরোপুরি সাংসারিক, তার কাছে 'অন্ধকার ঘর,' 'প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে সব জানলা খুলে দেওয়া'—এ সবের কোন তাৎপর্য নেই। সেই জন্য ঠাকুরদা তাকে ধমকানি দেন—চুপ করো অবিশ্বাসী! কথা কোয়ো না। পরম সত্যে যার বিশ্বাস নেই, সে অবিশ্বাসী, অথবা সত্য যার কাছে জ্ঞানাঞ্জন শলাকার কাজ করে না, সেও অবিশ্বাসী; আর অবিশ্বাসী সেই যার মোহমুক্তি হয় নি। পাটোয়ারি বুদ্ধি নিয়ে সংসার করা যায়—কিন্তু সত্যদর্শন সম্ভব হয় না।

অমলের শান্তিপারাবারে যাত্রা টেনিসনের Crossing the Bar-এর—

> Sunset and evening star
> And one clear call for me

মতই শোনায়। টেনিসনের কবিতায় বার্দ্ধক্যের বন্ধন-মুক্তি, আর রবীন্দ্রনাথের ডাকঘরে শিশুর অনন্তের উদ্দেশ্যে যাত্রা—কিন্তু উভয় যাত্রায় পারিপার্শ্বিক অবস্থা শান্ত। শিশু এখানে সমগ্র মানবাত্মার প্রতীক। যেমন কথায় বলে তুলসীপত্রে ছোট বড়ো নেই, সেই রকম আত্মার রহস্য ও তত্ত্ববিচারে শিশু বৃদ্ধ নেই। 'রবি বেন এজরা' কবিতায় ব্রাউনিং বার্ধক্যের কোঠায় দাঁড়িয়ে ফেলে-আসা জীবনের শৈশব ও যৌবনকে দেখেছেন, রবীন্দ্রনাথ শৈশবের রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের বিভিন্ন চরিত্রকে দেখেছেন। দৃশ্যগুলির মধ্যে মাধব দত্তের ভোগাসক্তি, মোড়লের অন্তরশূন্যতা ও সংসারের কুটীল আবর্তে নিমজ্জমানতা, কবিরাজের চিকিৎসায় আত্মকেন্দ্রিক অজ্ঞতা, ঠাকুরদা ও রাজ-কবিরাজের মুক্তিসন্ধানী দৃষ্টি, দইওয়ালা, পাহারাওয়ালা ও বালকগণের প্রীতিপূর্ণ আচরণ, সুধার ভালোবাসা—সব কিছুই শিশু অমলের মনের আয়নায় ছায়া ফেলে নিজেদের এক একটি বিশেষ ভাবের প্রতীক হিসাবে পরিচয় দেয়।

৫

প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিক ও সমালোচক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী মহাশয় অমলের মৃত্যু প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলেছেন, তার উদ্ধৃতি এখানে অবান্তর হবে না:

"এখন আর একটা প্রধান প্রশ্ন এই যে, রাজ-কবিরাজের আগমনে অমলের ঘুমাইয়া পড়াটা কি? মৃত্যু? না কোনো রকমের প্রতীক-নিদ্রা? রাজা আসিয়া ডাকিলেই অমল জাগিয়া উঠিবে এই সূত্র ধরিয়া কেহ কেহ ইহাকে খ্রীষ্টীয় Resurrection জাতীয় কিছু মনে করিয়াছেন।

ইহা যে মৃত্যু নয় তাহা নিশ্চিত করে বলা যায়। কারণ মৃত্যুকে জীবনের চূড়ান্ত অবসান হিসাবে কোনো তত্ত্বনাট্যে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেন নাই; এ রকম মতবাদ তাঁহার তত্ত্বের বিরোধী। বিশেষ অমল তো মরে নাই; স্পষ্টই উল্লিখিত আছে রাজার ডাকের অপেক্ষায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে মাত্র।

ইহাকে মৃত্যু বলিয়া মনে করার চেয়ে এক রকমের প্রতীক-নিদ্রা মনে করা অধিকতর সঙ্গত। কারণ কবির কাব্যে বহু স্থানে এই নিদ্রা-প্রতীকের ব্যবহার আছে। আকাঙ্ক্ষিতের জন্য যখন রাত্রি জাগিয়া বিরহিনী ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, সেই নিদ্রাকে সার্থক করিয়া আকাঙ্ক্ষিত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে—এরূপ ভাব রবীন্দ্রকাব্যে অবিরল।২

অমলের জাগরণের ও রাজার আগমনের ইঙ্গিত নাটকটিকে সীমার বন্ধন হতে মুক্তি দিয়ে এক পরমানন্দময় আনন্ত্যের দিকে নিয়ে যায়। অমলের সুপ্তি নবজাগরণের সম্ভাবনায় অর্থপূর্ণ: অমলের প্রতীক্ষা রাজাকে ধন্য করেছে, কারণ রাজা যে প্রেমের কাঙাল। অমল মরেছে—এ কথা মনে করলে নাটকটির শুধু তত্ত্বগৌরব ক্ষুণ্ণ হবে না, আসল উদ্দেশ্যটিও ব্যর্থ হবে। কবিরাজের চিকিৎসায় তার দৈহিক ব্যাধির উত্তরোত্তর অবনতি ঘটেছে। দীর্ঘকাল রোগভোগের পর মৃত্যু স্বাভাবিক পরিণতি, একথা ঠিক; কিন্তু রাজবৈদ্যের হাতে অমল পুনরায় সঞ্জীবিত হয়েছে নূতন জীবনের সম্ভাবনায়। অমলের সুপ্তি মৃত্যুর চেয়ে বড়ো।

৬

নাটকটির তিনটি দৃশ্যের মধ্যে ঠাকুরদাকে প্রথম ও তৃতীয় দৃশ্যে দেখা যায়। প্রথম দৃশ্যে বিভিন্ন চরিত্র সমাবেশ ও অমলের বাইরে যাবার আকাঙ্ক্ষা দেখানো হয়েছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে অমলের সেই আকাঙ্ক্ষাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এবং তার জন্য যারা বাইরের হাওয়ায় বেড়িয়ে বেড়ায় তাদের আনা হয়েছে। তৃতীয় দৃশ্যে পরিণতি। নাটকটির প্রারম্ভে এবং পরিণতিতে ঠাকুরদাকে দেখা যায়। মাধব দত্তের কথায় ঠাকুরদা ছেলে খেপাবার সদ্দার। ছেলেগুলোকে ঘরের বার

১। রবীন্দ্র-নাট্য প্রবাহ—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী (২য় খণ্ড), ১১৪ পৃষ্ঠা

২। রবীন্দ্র-নাট্য প্রবাহ—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। পৃষ্ঠা ১০৮ (২য় খণ্ড)

করাই তাঁর বুড়ো বয়সের খেলা। মাধব দত্ত তাই ঠাকুরদাকে ভয় করেন। ইতিমধ্যে অমলের সঙ্গে ঠাকুরদার পরিচয় হয়েছে। অমলের কাছে তিনি এসেছেন ফকিরবেশে। তিনি রোজ অমলের কাছে এসে নানা দেশ-বিদেশের কথা বলে যান। অমলের ভারি ভালো লাগে সে সব কথা শুনতে। মাধব দত্ত জানে না যে ঠাকুরদা অমলের ফকির, অমলের জানা নেই যে ফকির আসলে ঠাকুরদা। ফকিরবেশে ঠাকুরদাকে দেখে মাধব-দত্ত যখন বিস্মিত হয়ে পড়েন, ঠাকুরদা চোখ ঠেরে পরিচয় দেন—আমি ফকির। এই লুকোচুরির মাধ্যমে বৃদ্ধের সঙ্গে শিশুর আত্মার বিনিময়। তুমি যে কি নও তা তো ভেবে পাই না—মাধব দত্তের এই ক'টি কথার মধ্যে বিস্ময়টুকু বাদ দিয়ে বাকীটুকু সত্য বলে ধরে নিলে অন্যায় হবে বলে মনে হয় না।

ঠাকুরদা রবীন্দ্রনাট্য সাহিত্যে এক বিশিষ্ট স্থান পেয়েছেন। রাজা নাটকে একমাত্র তিনিই রাজার আসল রূপের সন্ধান জানেন, রূপের গণ্ডি পেড়িয়ে যে অরূপরতন—তিনি সেই অরূপদ্রষ্টা। তাই তিনি সত্যদ্রষ্টা। ডাকঘর নাটকে মুক্তিপ্রয়াসী শিশুর চোখের সামনে তিনি তুলে ধরেন ক্রৌঞ্চদ্বীপের মায়ালোক—সে পাখীদের দেশ—সমুদ্রের ধারে নীল পাহাড়ে তাদের বাসা। সেখানে আকাশের রঙ, পাখীর রঙ সব মিশে একাকার হয়ে ওঠে—আর তার সঙ্গে মিশে যায় অমলের মনের রঙ। সেখানে ঝরণাটি সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে। সেই মহানন্দলোকে কোনো কবিরাজের বাবার সাধ্য নেই তাকে একদণ্ড কোথাও আটকে রাখে। ঝরণাটি সমুদ্রের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, এবং সেখানে কোনো বিধিনিষেধ নেই, এই কথাগুলি অমলের ঝরণার মত মনটিকে মুক্তিস্বরূপ সমুদ্রের মধ্যে বিলীন করে দেয়; সেই মুক্তিস্রোতে কবিরাজ তলিয়ে যায় আর রাজ-কবিরাজ হন কর্ণধার। অমলের যখন ঘুম আসে রাজ-কবিরাজ তার শিয়রের কাছে বসেন আর ঠাকুরদা মূর্তিটির মতো হাত জোড় করে নীরব হয়ে যান। ঠাকুরদার নীরবতা সম্বোধির সমাধি। নিঃসঙ্গ অমলের তিনিই একমাত্র শান্তি; তাই শুভ মুহূর্তটির আগমনে তাঁর নীরবতা গভীর অর্থসূচক।

প্রান্তরের গান

শ্রীবিভা সরকার

শ্রান্তদিন স্তব্ধ এ প্রান্তর
কুয়াশা ভরা বকুল ঝরঝর।
তবুও মনের সঙ্গোপনে আশা
সময় সাগর পেরোয় ভালবাসা
জানি তুমি ধরবে রথের রসি
ঝরবে বকুল বাতাসে নিঃশ্বসি—
শূন্য পথ দূর গহন-অন্ধকার
ডুবুরি মন অন্ধকারে দেয় সাঁতার।
ভ্রান্তি ভুল মিথ্যা কিছু নয়—
প্রান্তরের করুণ গান নয়ত শূন্যময়!
ভোরের রবি নতুন ছবি আঁকে
বিধুর বাতাস বকুল ঝরায় শাখে।

কামনা

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

চাই, চাই, আরো চাই তোমাকে আমার
হৃদয়ের হাহাকারে দাও গো মমতা।
বিরহের বর্ষা যাক, মেঘের সম্ভার
মুছে যাক। শরতের আসুক বারতা।

তোমার সান্নিধ্য-মধু কত যে মধুর!
হারাণো দিনের সে যে দেয় পরিচয়।
অতীতে ফিরিয়া যাই। বাসন্তিকা সুর
গুঞ্জরি গুঞ্জরি ফিরে সারা মনোময়।

কিছু নয়, শুধু বসে থাকা কাছাকাছি।
মৃদু-মধু দু'টো কথা, একটুকু চাওয়া,
এই চাই শুধু, যত দিন বেঁচে আছি।
দিনের উপান্তে এসে পরিপূর্ণ পাওয়া।

রূপ শেষে রসে মন করে টলমল,
তুমি সে অনন্ত রসে লীলা শতদল।

তিন সাগর

শ্রীব্রজমাধব ভট্টাচার্য

১৫

মস্তবড় একখানা ঘরের তিন দিকেই দেয়াল। সিলিংটা উঁচু হবে প্রায় চব্বিশ ফুট। চতুর্থ দিকের পুরোটাই কাঁচের দেয়াল, পথের দিকে খোলা। কাজেই তিনদিক চাপা সত্ত্বেও ঘরখানা আলোয় ঝলমল্ করছে। একটা ধারে দেয়াল বেয়ে একটু সিঁড়ি উঠে একটা ঝোলা বারান্দা মতো। রোমান ছাঁদের খিলানের তলায় একটু জায়গা হয়েছে, আট ফুট চওড়া। লম্বায় অন্তত পনেরো ফুট। সেইখানে একখানা খাট পাতা—গের্ঁার শোবার ব্যবস্থা। সেই বারান্দা মতো জায়গাটার নীচে একটু রান্নার জায়গা ; মানে একটা সিঙ্ক-ওয়াশ-বেসিন, একটা ষ্টোভ, একটা রেফ্রিজারেটার আর একটা মীট-সেফ্। ছোট্ট একটা আলমারিতে কিছু উৎকৃষ্ট চায়না আর রূপোর বাসন। গের্ঁা সৌখীন।

বাকী ঘরটা রইলো পনেরো ফুট চওড়া আর বাইশ ফুট লম্বা। আর এক কোণে ৬ ফুট × ৬ ফুট × ১০ ফুট একটা জাল দেওয়া ঘরে পাঁচ-ছ'টি ওরিওল জাতীয় পাখী। তাদের বাসা, নাইবার জায়গা, দোলনা, টবে লাগানো পাতা-বাহারের গাছ। এরা গের্ঁার বন্ধু। "ভোর-বেলা ওদের ডাকের বিশ্রাম নেই। ডাকে উঠে পড়ি। বা বিছানায় শুয়ে শুয়ে শীস দিই। শোবার আগে ওদের জালের দরজা খুলে দিই, সারা ঘরে উড়ে বেড়ায়। আলো পেলে আমার বিছানার কাছে এসে ডাকে। উঠে ওদের খেতে দিই কি না।"

"ঘর নোংরা করে না?"

"করে না আবার! খুব করে।" আমি সশঙ্ক চোখে মেঝে-ভর্তি ভারতীয় আর পারসীক কার্পেট দেখি। গের্ঁা বুঝতে পারে।

"ইলেকট্রিক একটা ঝাড়ু কিনেছি, এ সব পরিষ্কার হয়ে যায়। দাড়ি কামাই, রুটি টোষ্ট করি, জল গরম করি, শ্যাম্পেন ঠাণ্ডা করি, সব ইলেকট্রিকে। একটু T. V. set রেখেছি। বন্ধুর কাজও করছে ইলেকট্রিকে। কাজেই পাখীরা আমায় নোংরামীতে জব্দ করতে পারে না।"

কথা বলছে আর, টেবিলের ওপর একগাদা বই ছিলো, সরিয়ে জায়গা করছে। তিনটে টেবিল, একটা দীভান্, মেঝে—সব বইয়ে ভর্তি। (পরে আবিষ্কার করেছিলাম দীভানটা দীভান নয়। লম্বা একটা বাক্সে-রাখা বইয়ের ওপর একটা স্প্রীংয়ের ম্যাট্রাস্ পাতা—আপহোলষ্টরিটা খুব ভালো, তার ওপর একটা কাশ্মীরী গাব্বা।) ঘরের অন্যান্য দিকে কোথাও বুদ্ধ, কোথাও গান্ধী, কোথাও ইজিপশিয়ান্ পুতুল, বা রেকাবী, কোথাও কর্সিকান তীর ধনুক, কোথাও মালাবার বাঁশের কাজ, জাপানের ছবি, বোর্নিওর বুমেরাঙ্গ এমন কি দিল্লীর হনুমানজীর মেলায় কেনা দাড়ি-গোঁফ সবই সাজানো।

কোনো রকমে জায়গা হোলো টেবিলে। টোষ্ট, মাখন, জ্যাম, সেদ্ধ ডিম, চীজ্ আর বাদাম ভাজা এই সব দিয়ে অনাড়ম্বর এবং নির্ভেজাল প্রাতরাশ সেরে তার পর পাড়া গেলো ডক্টর ক্রনেলের কথা।

হেসে বাঁচে না গের্ঁা, "তাই নাকি? বললে? বুঝতে পেরেছে তা হলে যে, আমি ওর সঙ্গ পরিহার করার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলাম, বললে যে ঠিকানা জানে না? আমি জু?" বলছে আর ঠোঁট টিপে টিপে চোখের কোণ দিয়ে হাসছে। মাঝে মাঝে প্রশস্ত মুখের মধ্যে দু-একটি দাঁত দেখা যাচ্ছে টুকটুকে লাল পাৎলা ঠোঁটের ফাঁকে।

"আমার প্রেসে ও সেদিনও ছাপার কাজে এসেছে; বাড়ীর ঠিকানাও ওর কাছে থাকা উচিত। বললে আমি পাগল হয়ে গেছি?" আরও হাসে। টুক্রো টুক্রো রুটি মুখে দেয়। কুড়মুড় করে চিবোয়, আর হাসে।

"হয়েছি তো পাগল। ও ভারতবর্ষের নামে ডাকা মিটিংগুলোয় যায়, বক্তৃতা দেয়, অথচ হাড়ে হাড়ে এতো হেয় মনে করে ভারতকে যে আমিও ওকে আড়ালে ঠুক্তে ছাড়ি না। পরে ও প্রচার আরম্ভ করলো আমি একটা ভুঁইফোড়। আমি তো সত্যই তাই, কলেজের ডিগ্রী তো নেই। কাজেই ওর বুদ্ধির তারিফ করেছিলাম ওর সুন্দরী স্ত্রীর কাছে। সুযোগ পেলাম। আমার পরিচিত এক সিলিয়নের সৌখীন ব্যবসায়ীর সঙ্গে এক নামকরা ডান্সিং-হলে বসে খানা খাচ্ছিলো। সে সুযোগ ছাড়তে পারি নি।" বলে আর হাসে, হাসে।

"ডেকেছে তোমায়? যোগবাশিষ্ট বলে দেবে? বেশ বেশ, দাও, দাও। আমরা তো ভুঁইফোঁড়; ও সব বুঝিও না। তবে আজ নয়। বলে দাও কাল সকালে নটায়।" চোখের কোণের হাসি আর যায় না।

"বিদেশে যাচ্ছে বললো? তা হোক্। তোমার কাজ
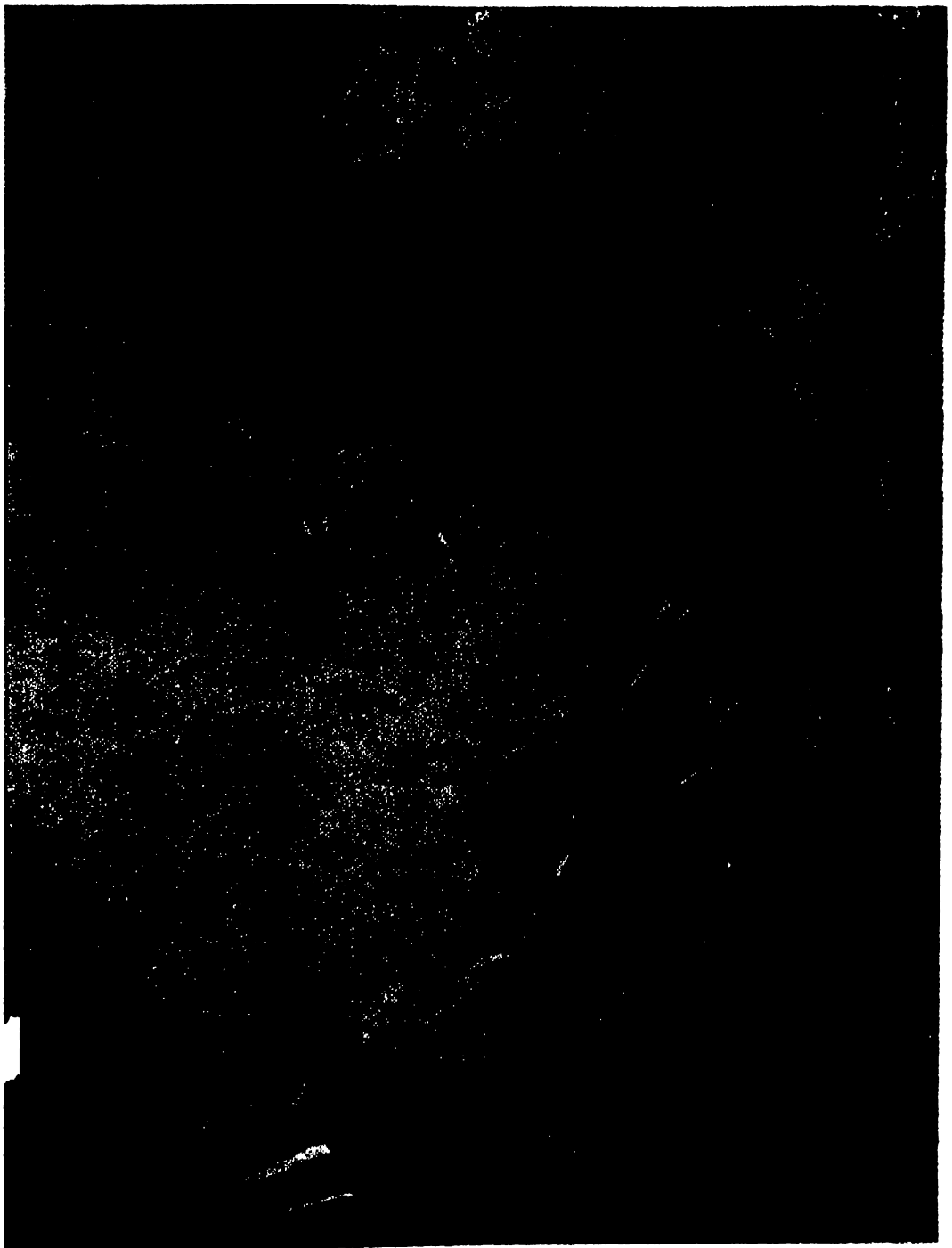
রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার পত্নী মৃণালিনী দেবী

তুমি করবে। ফোন করবে। আর প্রথমেই চলো মার্থা হোটেলে, জিনিসগুলো এনে ফেলা যাক। মঁসিয়ে পুলঁ, কি করবে তুমি আজ? চলো না বন্ধুকে নিয়ে ঘোরা যাক!"

হোটেল মার্থার আমার ঘরে গিয়ে নিজে হাতে বাক্সে জিনিস ভরে, নিজেই বাক্স নিয়ে লিফ্‌টে চাপলো। ছোট্টো লিফ্‌ট। একজনই ধরে। তাতে গেরঁার মতো একজন আর আমার বাক্স। আমায় বললে নেমে এসো সিঁড়ি দিয়ে। নামার পরে দেখি বাক্স গাড়ীতে, গেরঁা কাউণ্টারে আমার অপেক্ষা করছে।

আমি পার্স বার করে একখানা নোট নামিয়ে দিলাম। মহিলাটিও হাসছে, গেরঁাও হাসছে। গেরঁা ঐ কারণে আগে ভাগে নেমে এসেছিলো। একটু অপ্রতিভ হলাম।

"আমায় প্যারীতে পাও নি বলে হোটেলে ছিলে বেশ। কিন্তু পাবার পরের খরচ যদি তুমি করো আমি কিন্তু রেগে যাবো। এই নাও আমার পার্স আর চেক বই। তোমার পার্স আমায় দাও। প্যারীতে তোমার সব খরচ আমার। যা কিনবে, পরবে, খাবে, দেখবে, যা খরচ হবে সব, সব। তোমায় আমি একটি পয়সা খরচ করতে দেবো না।" গেরঁার চোখে হাসি নেই; থাকলেও ভিজে।

কথায় বলে না, মলিনত্বং ন মুঞ্চতি? আমার তাই। এতো সব কাণ্ড-কারখানার মধ্যেও ক্রনেলের সঙ্গে রগড় করার ইচ্ছেটা যায় নি। একটা টেলিফোন ধরে ওকে তো ডেকে তুললাম।

"ওহ্‌ মাই গুড্‌নেস্—মঁসিয়ে বাতাশারিয়া এতো ভোরে?"

"ঘুমুচ্ছিলে নাকি?"

"জানই, পারী আর রবিবারের ভোর।"

"কিন্তু তোমার তো এখন চার্চে থাকার কথা।"

"কিন্তু রোববার সকালে দুনিয়ার তাবৎ চার্চ পারি-সিয়ানের মগজে। ভগবান তোমার মতো নির্মম নালায়েক নন্!"

"একটা সুখবর ছিলো তাই তোমায় বিরক্ত করলাম।"

"কি? কি?"

"কাল বেলা নটায় তোমার কাছে আমি আসতে পারবো। হোটেল মার্থা বদলাচ্ছি। ভালো জায়গায় যাচ্ছি। এটা বড়ো ছোটো।"

"প্যারিসের হোটেলে সব খবর না জেনে যেও না বাতাশারিয়া। কালতু চার্জ দিতে দিতে ফতুর হয়ে যাবে।"

"না তা হবে না। ম্যানেজার আমার পরিচিত। যদিও বন্ধু, আমায় খাতির ক'রে কন্সেশন্ করে দিয়েছে।"

"কোথায় হোটেল?"

"এলেসিয়া!"

"ও বাবা:, সে তো একেবারে ঐ তল্লাটে! তবে পাড়া ভালোই।"

"তা বটে! তোমার পাড়ার মতো নয় তা ব'লে।"

বনেদী হাসির দমক ওপার থেকে ভেসে আসে।

"গেরঁার খোঁজ পেলে?"

"হ্যাঁ পেয়েছি।"

"কি করে পেলে?"

"রাধার যেমন করে শ্যাম মিলেছিলো। সাইমনের যেমন করে এনাইষ্ট মিলেছিলো।"

"তবু? শুনিই না!"

"পারীর পুলিস সাহায্য করলো। দেখলাম পল গেরঁাকে যতো অপরিচিত ও অবাঞ্ছনীয় বলে মনে করেছিলাম ততো অবাঞ্ছনীয় নয় ও।"

"না-না। অবাঞ্ছনীয় কেন হবে? রুচির কথা।"

"যা বলেছো ভাই! আমার রুচিই ঐ ধরনের।"

"না, না, ও কথা বললে শুনবো না। তুমি ব্রাহ্মণ, দার্শনিক, শিক্ষক। তোমায় আমি জু-র রুচির বলতে পারবো না।"

"তবে আইনষ্টাইনকে কি বলো তুমি?"

"ও অনেক সাধারণ কথা বললে তুমি। পারীতে আমরা অরিজিনাল ছাড়া কথা বলি না।"

"তা যদি জানতাম, আগেই তোমার মতের তাৎপর্য বুঝতে পারতাম। গেরঁা সম্বন্ধে তোমার মত অতীব অরিজিনাল, সন্দেহ নেই।"

"আচ্ছা, আসছো তো কাল! তখন কথা হবে। এখন থাক্।"

"আচ্ছা কালই হবে। আজ সকালের ঘুমটা মাটি করলাম। মাদামের কাছে ক্ষমা চাইছি। জানিয়ে দিও।"

হাসে ক্রনেল। "তোমার ঠিকানা কি?"

"দিলাম।"

"কিন্তু হোটেলের নাম বা ঘরের নম্বর তো দিলে না।"

"নেই তার দেবো কি?"

"হোটেলের নাম নেই?"

"না।"

"কেন?"

"কারণ সেটা হোটেল নয়।"

"তবে কি?"

"এক ভদ্রলোকের বাড়ী।"

"কে ভদ্রলোক? ভারতীয়?"

"না, পারিসিয়ান্। তবে জু।"

"ব্যাপার কি! গের্ঁার বাড়ী?"

"হ্যাঁ ভাই।"

থতমতো খেয়ে যায় ব্রুনেল। বলে, "হ্যাঁ, অরিজিনাল; মানতেই হবে অরিজিনাল। কোনও সন্দেহ নেই। নিশ্চয় অরিজিনাল। আচ্ছা, আচ্ছা; কাল দেখা হবে, কাল, কাল। আঁ রিভোয়া মঁসিয়ে, আঁ রিভোয়া।"

হাসি আর ধরে না গের্ঁার। চোখমুখ লাল হয়ে গেছে। পুলঁা বুঝতে না পেরে ফ্যালফেলিয়ে চেয়ে থাকে। গের্ঁা সব ঘটনা ওকে বলতে থাকে। শুনে পুলঁাও একচোট খুব হেসে নিলো।

বেলা হয়েছে। একটু একটু করে গাড়ী চলতে চলতে এখন শহর যেন শহর শহর বোধ হচ্ছে। বাড়ী এখন যেতে হবে না। পুলঁা দেখাতে লাগলো পারী শহর। গের্ঁা বললো, "তাই ভালো পুলঁা, তুমি ওর গাইড্ আর আমি ওর হোটেল।"

তখন আমরা সাইনের ধারে ধারে পথ দিয়ে প্লাস দলা কঁকর্দ-এ এসে পড়েছি। বিস্তীর্ণ একটা এসপ্লানেড। বহু পথ এসে মিশেছে। মাঝখানে মিশরীর ওবেলিস্ক; চারধারে চারটি ফোয়ারা। য়োরোপের বিখ্যাত চারটি নদী—দান্যুব, রোন্, রাইন আর সাইন এদের নামে চারটি ফোয়ারা। একধারে ল্যুভরের চমৎকার বাগান আরম্ভ হয়েছে খানিক উঁচু জমির ওপর। আসল ল্যুভরে প্রাসাদ প্রায় এক মাইল দূরে তখনও। সাইনের ধারে বিশাল বিশাল প্লো-ড্রপের গাছের সার। আর হলদে পাতার একরকম গাছ, নাম জানি না। পথটা চমৎকার। এক ধারে গাড়ী রেখে একটা সেতুর ওপর দাঁড়ালাম। সাইনের রূপ দেখছি। দূরে একটা সুইমিং পুল, সুসজ্জিত। বড় বড় সাজানো ষ্টীমারের ডেকে চেয়ার-টেবিল পাতা। নানা দেশের পর্যটকেরা জুনের মরশুমে পারী বেড়াতে এসেছে। দলা কঁকর্দ সেতুর এপার থেকে ওপারে পালাস্ বুর্ঁো দেখছি। এখানেই প্রথম রিপাব্লিকের চুক্তি স্বাক্ষর হয়, তার নানান ধারা রচিত হয়। সম্পূর্ণ গ্রীসীয় মডেলে তৈরী প্রাসাদ দেখে এথেন্সের পাঁথিয়নের কথা মনে পড়ে গেলো। ওবেলিস্কের একধারে সাইন, তার পরপারে বুর্ঁো পালেস, আবার ওবেলিস্কের অন্য ধারে ফরাসী সরকারের দপ্তর। এককালে একজনার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিলো এই দীর্ঘ প্রাসাদ। এখন সরকারী।

রোম যেমন মৃত ও প্রাচীন, পারী তেমনি জীবন্ত ও চিরযৌবনা। যৌবন যদি ক্ষণস্থায়ী হয় তবেই যেন মানায়। যে যৌবনের শেষ নেই সেও তো জরার সামিল। কালই তো জরার; স্মৃতিই তো বিস্মরণ আনে। ধূলো পড়ে যাতে তাই তো মলিন হয়। পারীর যৌবনের ক্ষয় না থাকলেও এতো দীর্ঘ এর স্মৃতি যে, জরাহীন এর বৃদ্ধত্ব একে বহু পতিভোগ্যা করে রেখেছে। এর রমণীয়তায় এর কমনীয়তা কমে গেছে, বারনারীত্বে এর পৌরনারীত্বে ব্যাঘাত এনেছে।

তাই পারীতে যতো ইমারত দেখি সবই জীবন্ত। এমন কি এর পাঁথিয়নও রোমের পাঁথিয়নের মতো একেবারে মরে যায় নি। পারীর পাঁথিয়ন তৈরিই করেন লুই পঞ্চদশ। সেন্ট জেনেভীভের একটি গির্জা ছিলো অতি প্রাচীন কালে। সে গির্জা কালক্রমে ধ্বংস হয়ে যাবার পর পঞ্চদশ লুই সেখানে জাতীয় গৌরবের মন্দির করে তুলতে চান। ১৭৫৮-য় আরম্ভ হয়ে ১৭৮৯-তে এর নির্মাণ শেষ হয়। সেই গ্রীসীয় ছাঁদই, রোম হয়ে পারীতে এসেছে একালে। পর পর ছটি থামের মাথায় একটি তিম্পেনাম। তার ত্রিকোণ জমিতে ভাস্কর্যের বিচিত্র নমুনা। তার ওপরে গোল থামের সার—প্রায় ত্রিশটি থাম আছে, তারও ওপরে গম্বুজ, সবশুদ্ধ ৮৫ মীটর খাড়াই। যদিও প্রথমটায় এটা চার্চই ছিলো এখন এখানে ফ্রান্সের যশস্বী ও সম্মানিত সন্তানদের দেহাবশেষ রক্ষিত হয়। লেখা আছে দোরে—"ফ্রান্সের সুসন্তানের স্মৃতিতে দেশের অর্ঘ্য।"

দলা কঁকর্দের এপার ওপার বাঁধা সেতু। এক ধারে এক সার সিঁড়ি উঠে গেছে। চমৎকার রেলিং ঘেরা বারান্দা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি। শত শত মোটর-গাড়ী চারধার থেকে আসছে যাচ্ছে। নানা পোশাকে জনতা চমৎকার রোদে বেড়াতে বেড়িয়েছে। দু'ধারে দুটো ঝর্ণার মাঝে মিশরীয় ওবেলিস্ক। সেতুর মুখের অপর পারে প্রশস্ত পথ Rue Royal গিয়ে মিশছে Place de la Madeline এই পথ দিয়ে গাড়ী এগুতে লাগলো। পর পর কয়েকটি বিখ্যাত দর্শনীয় ইমারৎ। পারীর ইতিহাস তো খুব প্রাচীন নয়। এর নামকরণই হয়েছিলো সীজার যখন গল্ জয় করেন সেই সময়ে। কখন হবে

সময়টা? মনে হয় যীশুখৃষ্ট জন্মাবার ষাট বছর আগে হবে। সেই সময়ে Parisii নামে একটা উট্‌কো জাত সাইনের দুই তীরে বাস করতো। সীজার এই জাতটার মধ্যে নানারকম চাতুরি ও কৌশল লক্ষ্য করে এদের সাজানো শহরে একটা আড্ডা গড়ে তোলেন। সেই রোম্যান আড্ডা আজ পারী। এ দেশের ইমারৎ সবই প্রায় সেদিনের। চতুর্দশ লুইয়ের আগেকার ইমারৎ পারীতে প্রায় নেই। আজ যা নিয়ে পারীর গর্ব সবই ১৬৪০ থেকে আরম্ভ, এবং তার পরে নেপোলিয়নের কাল। নাগরীকে নগরীর মতো সাজানোর কায়দা এই পারী থেকে সারা য়োরোপে ছড়ায়। এটাই য়োরোপে পারীর সবচেয়ে বড়ো ঠেকার।

এবং এ ঠেকার করার মতো দেহ-সৌষ্ঠব আছে পারীর। প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ লোক বাস করছে পারী আর তার সহরতলিতে। অথচ নোংরামী নেই। এককালের দেয়াল ঘেরা শহর, আজ যেন বাগানে, গাছে, চওড়া পথে, রংয়ে, আলোয় ঝলমলে। জেনেভা তো যেন বুঝলাম পাহাড়ের শহর, হ্রদ আছে, উপত্যকার শ্যামলিমা আছে। কিন্তু পারীতে একটি গাছকে বড়ো করার পেছনে অনেক সংযম, ধৈর্য, আয়োজনের দরকার। সেই পারীতে এমন সব পথঘাট গড়ে উঠেছে মাত্র চারশো বছরের মধ্যে।

বেশীর ভাগ ইমারতও এই চারশো বছরের। তা ছাড়া গ্রীস, রোম, মস্কৌয়ের মতো ইমারতের কুলীনপনা নিয়ে পারীর অহঙ্কার ছিলো না, নেইও; বাইজান্টাইন্, করিন্থিয়ান্, রোমানেস্ক্, এথেনিয়ান, স্পার্টান, রোম্যান্ যে কোনো রকম ভাস্কর্য বা স্থাপত্যের যতটুকু যা যেখানে ভালো তার সাহায্যে, রুচি আর মৌলিকতা দিয়ে সাজানো ফরাসী স্থাপত্য। শিল্পের দরবারে যে সবটাই দেওয়ান-ঈ-আম্, রুচির দুনিয়ায় যে একছত্র ছত্রাকার এই সত্যটাই পারী ও পারীর নবশিল্প প্রথম জানিয়ে দিলো সারা পাশ্চাত্য জগতকে। এক পারীতেই গড়া হ'ল পশ্চিম য়োরোপের সেরা মসজিদ। পারীর নানা দ্রষ্টব্যের মধ্যে এটাও একটি দ্রষ্টব্য। পারীতেই প্রথম এল মিশরীয় ওবেলিস্ক, আরাবিয়ান পোষাক, মোগলাই রান্না কাশ্মীরী শাল; পারীর বিদ্বদ্‌গোষ্ঠী মন প্রাণ ঢেলে দিল প্রাচ্য ইতিহাস আর প্রত্নতত্ত্বের সাধনায়। সভ্যজগতে যতো হিসাব নিকাশ, গবেষণা ও গণনা ফরাসী আর জার্মানরা করে গেলো তার সঠিক খবর ইংরাজ-ঢাক-নিনাদিত-ভূখণ্ডে বসে আমরা পাই না।

লা মাদেলীনের আট থাম আর তিম্পেনামের কাজটা রোমের পাঁথিয়নের ত্রিম্পেনামের চেয়ে ভালো লাগলো এর ধাপ ধাপ সিঁড়ির জন্ম। সিনেট হল কলকাতার। থামও আছে; সিঁড়িও আছে; নেই অবকাশ। যে দূরত্ব ও অবকাশ থেকে দেখলে এই সিঁড়ি আর থামের পূর্ণরূপ পার্সপেক্‌টিভে ধরা পড়ে শ্রীমান্ কলেজ ষ্ট্রীট প্রসাদাৎ সেই অবশ্য প্রয়োজনীয় অবকাশটুকু নেই। বেঘোরে ঐ ইমারতের সৌন্দর্যের বারোটা বেজে গেছে। লা মাদেলীন দেখা যায় সাইনের পুল থেকে। দু'সার বিল্ডিংয়ের মাঝ থেকে পথ, তার মাথায় লা মাদেলীন সমস্তটা নিয়ে একটি অপরূপ ছন্দ।

লা মাদেলীনের পাশে, খানিক দূরে এ্যভিন্যু Champs Elysees-এর ধারে Elysee-র বিখ্যাত তোরণ রয়েছে। এমন তোরণ চারটে আছে পারীতে। আরম্ভ হয় ১৭৬৪তে, শেষ করে Vignon ১৮৪২; আর নেপোলিয়ন তাঁর Grand Armeeর প্রতিষ্ঠা ও যশের নামে মন্দির বলে এই বিখ্যাত ও পরিপাটী সৌধটী উৎসর্গ করেন। পারীতে এতো নামকরা সমৃদ্ধ গির্জাঘর আর নেই। চার ধারে এই থামের সার। ভালো ভালো ভাস্কর্যের কাজের মধ্যে Lemaire-এর Last Judgment, Pradier-এর The Marriage of the Virgin আর Rude-এর Baptism of Cloves.

গেঁরা ঘুরে ঘুরে কঁকর্দ বার বার দেখাতে লাগলো। "দেখছো শত শত মোটর চলেছে একটি হর্ণ নেই! ভাবো দিল্লী।" অন্য কেউ বললে হয় তো দুঃখ হোতো। অপমান বোধ করতাম। কিন্তু আমি জানতাম ও কতো ভালবাসে ভারতবর্ষকে। ও বললে ততো লাগে না। বললাম, "আমি বিশ্বাস করি হর্ণ না থাকলে এক্সিডেন্ট কম হয়।"

"জানো বাতাশারিয়া আজ এখানে এমন সভ্য ভীড় দেখছো, এখানেই গিলোটিন টাঙিয়ে বিদ্রোহের দিনে কাতারে কাতারে লোক এসেছে রোজ রোজ নতুন নতুন বলি দেখতে। মেরী আঁতিয়োনেত্‌কে এখানেই বলি দেওয়া হয়। ঐ দূরে দেখ চেম্বার অব ডেপুটিজ দেখছো। পারীর এটা যেন হার্ট। এক দিকে চেম্বার অব ডেপুটিজ অন্য দিকে নেভীর হেডকোয়ার্টার্স, মাঝ দিয়ে পথ। এটা দেখছো বড় হোটেল একটি। আটটি ষ্ট্যাচু দেখছো—ফ্রান্সের আটটি প্রদেশের প্রতীক। তৃতীয় নেপোলিয়নের সঙ্গে সৌখ্যের নিদর্শন হিসেবে মিশরের আমীর মহোমেত আলীর দেওয়া এই স্তম্ভ, গোটাটা একখানা পাথরের তৈরি। সেকালে মিশরীরা এটা দেখে সময় ঠিক করত। এ জায়গায় এলে খানিকক্ষণ খুশীতে ভরে থাকবে না

এমন ফরাসী নেই। ফ্রান্সের ইতিহাস মানে এই কঁকর্দ সার্কাসের ইতিহাস।"

এধারে ওধারে দেয়ালে দেয়ালে গাঁথা ছোট শ্বেত পাথরের টুকরো দেখি, কি লেখা। মাঝে মাঝে তার ধারে দু'একটা ফুল।

পথে যেতে যেতে এমনি একটা তাকে একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোককে ফুল দিতে দেখি।

গের্ঁাকে জিজ্ঞাসা করলাম।

গের্ঁা গাড়ীতে এসে বসলো। অপেরার দিকে গাড়ী চলতে লাগল, অপেরায় যাবো। গের্ঁা বলল, "গত যুদ্ধে জর্মান অকুপেশনের সময়েও ফ্রান্সে যোদ্ধা থেকে গিয়েছিল, যেমন ইংরেজদের অকুপেশনের পর ' তোমাদের দেশেও মানুষ দু'চার জন ছিল।"

অবাক হয়ে চেয়ে থাকি ওর মুখের দিকে।

"সত্যি বাতাশারিয়া আমি যখন ফরাসীদের লেখা ইতিহাস পড়ি, দেখি যে ভারতবর্ষ তো পুরো জয় ইংরেজেরা করে নি। ১৭৫৭-তে পলাশী, আর ১৮৫৭তে ওদের নতুন ধরনের ডিপ্লোমাসীর চেহারা ভারতবর্ষের চোখে বেইমানী বলে বোধ হ'ল। ভারতবর্ষে ডিপ্লোমাসীতে কপটতা ও ধূর্ততার চেয়ে রক্তাক্ততা আর শঠতাটি ছিল বেশী, মারামারি, কাটাকাটি করে বলীর হাতে শাসন চলে যেত। ১৮৫৭-তে প্রায় হাত ছাড়া হয়েছিল ভারতবর্ষ। দেশীয় রাজারা বাঁচাল তাদের পায়ের শেকল, কতো খেতাব পেলো। ভিক্টোরিয়া তাড়াতাড়ি সালিসী করে তখনকার মত সবটি ধামাচাপা দিলেও এমন বছর রইল না যখন গ্রেপ্তার, ফাঁসী, লাঠিচার্জ হলো না। ১৯৫৭ আর এল না। দুশো বছর যেতে না যেতে ইংরেজ মানে মানে সরে পড়ল। বিশ্বাস করি আমি যে ভারতবর্ষের আণ্ডার গ্রাউণ্ড এক্টিভিটি অতিষ্ঠ করে তুলেছিল ইংরেজের শাসন।"

"কিন্তু গের্ঁা ক'বছর আগে এ কথা তুমি বলতে পারতে? এখনই বা আলজিরিয়ায়, টুনিশিয়ায় কি চলছে?"

"আমি পলিটিশান্ নই। গুছিয়ে সব বলতে পারি না, কিন্তু ফরাসীর লেখা ইতিহাস ইংরেজ কেন বন্ধ করতে পারবে? ইংরেজের লেখা নেপোলিয়নের জীবনী পড়েছো? মিলিয়ে পড় ত ফরাসীর লেখা, ফরাসীদের সরকার বড়ই বেসরকারী, এখানে জনমত শাসন করে, শাসন জনমত গড়ে না। তাই এখানকার সরকার ওঠে, পড়ে—ভাঙে না। ফরাসী জাতটা বড় সজাগ জাত। আলজিরিয়া আর ট্যুনিশিয়ার ব্যাপার বলছো? যদি দেখতে দেশ দুটো। ভারতবর্ষের জনতা, ইতিহাস, সভ্যতা জার্ণালিশম্—এমন কি নিরক্ষর ভারতবর্ষেরও নাড়ীর শিক্ষা—এ সর্বের সঙ্গে তুমি আলজিরিয়া ট্যুনিশিয়ার তুলনা কোরো না, তুলনা হয় না।"

আলজিরিয়া আর ট্যুনিসিয়া যেন ফরাসী জাতের সেরিব্রাল্ টুমার। পাকা হাতে মোক্ষম অপারেশন ছাড়া বাঁচবার আর অন্য উপায় নেই জানা সত্ত্বেও অপারেশন করছে না, কারণ অপারেশন করলেও বাঁচার আশা কম।

জেনেভায় জ্যাকি ক্ষেপে গিয়েছিলো এই প্রস্তাবের উল্লেখে। ওরও বক্তব্য—"ভারতবর্ষের জনতা, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সুস্থতা ও ভদ্রতার মাপকাঠিতে এই সব ব্যাপার বিচার করছো। ওরা এখনও স্বাধীনতার যোগ্য নয়।"

জ্যাকী, গের্ঁা এরা ইম্পীরিয়ালিষ্ট নয়; রিয়ালিষ্ট। কিন্তু শ্রেফ রিয়ালিজমের গুনাহ্ এই যে ওতে আইডিয়ালিজম্ থাকে না। আর তার ফলে ধরা মানুষের প্রাণের দাবিকে দেহের প্রয়োজনের ওপরে স্থান দিতে পারে না। আমি জানতাম ওরা ভুল করছে। কিন্তু আমি একদিনে আর সে ভুল ভাঙ্গবো কি করে।

গের্ঁা চতুর। মনের শিল্পী। "খুশী হলে না জবাবে? দরকার নেই ও কথা ভেবে। গত জর্মান অকুপেশনের সময়ে আণ্ডারগ্রাউণ্ড ফরাসীরা যেখানে যেখানে মারা গেছে জর্মানদের হাতে, যেখান থেকেই ফরাসী পুলিস সে মৃতদেহ কুড়িয়েছে, সেইখানটাকে তারা তীর্থ করে রেখেছে এই সব পাথরের ফলক গেঁথে রেখে। রোজ জনতা এদের ফুল দেয়।"

অপেরার সুদৃশ্য অট্টালিকা এসে গেলো। নামি নি। দূর থেকেই দেখলাম। শিল্পী স্থপতি গার্ণিয়ের বারো বছরে এই সৌধ নির্মাণ করেন। এভিন্যু ড-লা অপেরার সামনে বিস্তীর্ণ সাজানো মাঠ। তার মাথায় মুকুটের মতো এই অট্টালিকা। প্যারীর গৌরব। এই অপেরার ভেতরের লাউঞ্জ আর সিঁড়ি পৃথিবীর এক বিস্ময়। এর ভেতরে, সামনে অসংখ্য ভাস্কর্য এর প্রতি নিমেষকে ছন্দে বন্দনায় মুখর করে রেখেছে। আর্টের, সঙ্গীতের, নৃত্যকলার ম্যুজিয়াম-এর ভেতরে; এর ভেতরে ম্যুজিক এ্যাকাডেমী—সেই ফরাসী ম্যুজিক এ্যাকাডেমী যার যশস্বী ও প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রীর তাবৎ দুনিয়ার দিকে দিকে ফরাসী সঙ্গীত ও নৃত্য চর্চার কারিগরী দেখাতে ছুটেছে। বিস্তীর্ণ এভেন্যু দ্য-লা অপেরার ছায়াঘন পথ ছেড়ে ডান

ধারে আমরা চলে গেলাম পারী-র ক্লাইভ স্ট্রীটে—Bourse-এর বিল্ডিং—পারীর ষ্টক-এক্সচেঞ্জে।

"নিশ্চয় তোমার গা নেই এখানে নামার।"

"পকেট নেই বলো।"

"গা থাকলেই পকেট জোটে!"

বুলেভার্দ মর্মার্ত দিয়ে বেরিয়েছে লম্বা পথ—নানা নাম। যেমন কর্ণওয়ালিস ষ্টীট হচ্ছে কলেজ স্ট্রীট, কলেজ স্ট্রীট হচ্ছে বৌবাজার তেমনি। বুলেভার্দ বন্, বুলেভার্দ সেণ্ট ডেনিস—বুলেভার্দ সেণ্ট মার্টিন।

'সেণ্ট মার্টিন' দেখেই প্রায় লাফিয়ে উঠেছি। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই—এমনি একটা দিন নবেম্বর মাস ১৯১৭-১৯১৭ লেনিন, মস্কো, আর ১৭৮৯ রোবেস্‌পীয়ে—পারী! ফরাসী বিদ্রোহ, ব্যাসটাইলের কারাগার ভাঙ্গলো। সেই বিশাল জনসমুদ্র তো সেণ্ট মার্টিনের পথে এগিয়ে এসেছিলো। এই এলাকাটাই সেণ্ট মার্টিনের সেই এলাকা যেখানে আজ বড়ো বড়ো পথ। সেদিন এই বুলেভার্দ ভলুটেয়ার ছিলো না, বুলেভার্দ টেম্পল ছিলো না, বুলেভার্দ মেজেসী ছিলো অখ্যাত নামে। আজ এই বুলেভার্দ সেণ্ট মার্টিন মিলছে গিয়ে ষ্ট্যাচ্যু অব লিবার্টির কাছে। সেখান থেকে place de la Bastilee পর্যন্ত বুলেভার্দ টেম্পল, বুলেভার্দ ক্যালভাইরে, বুলেভার্দ বোমাঁরে ও পর পর একই পথের নানা খণ্ড, নানা নাম। এই place de la Bastilee-এ খাড়া আছে জুলাই কলাম, সেদিনের সেই অদ্ভুত বিদ্রোহের স্মারক। য়োরোপের ইতিহাসে যে তিনটি যুগান্তকারী বিক্ষোভ এসেছে তার একটা ১৪৫৩-তে মুসলমানদের কনস্তান্তিনোপল্‌স্ অধিকার এবং রেনেসাঁর সূচনা, একটা ফরাসী বিদ্রোহ, একটা রুশের নবেম্বর বিদ্রোহ। সীজার নয়, নেপোলিয়ঁ নয়, হিটলার নয়। সভ্যতার ইতিহাসে, মাহুষের জন্ত মাহুষের লড়াই আর জয়ের ইতিহাসে এ তিনটে ঘটনা রক্তে লেখা আছে।

আজ পা রেখেছি সেই বেস্‌টাইলের কারাগারের মাটিতে। আমি জানি আমার গা কেঁপে ওঠে। আমি এও জানি অনেকের কাঁপে না। দেবতা-মন্দির জানি না। দেখে ভালো লাগে; আধ্যাত্মিক চিন্তা খানিকটা আচ্ছন্ন করে। কিন্তু মাহুষের ইতিহাসের পর্বে পর্বে এই যে কাপালিক সাধনা এ যেন জীবন্ত করে তোলে ঝিমিয়ে পড়া স্নায়ুকুণ্ডলী।

১৩৭০—সে কি আজকের কথা? ভারতবর্ষে তখন কে রাজত্ব করছেন? ফিরোজ শা তুঘলক্! ১৩৯৮-তে তৈমুরের হত্যাকাণ্ড! সেই সময়ে এখানে একটা কারাগার তৈরি হয়। যেন লণ্ডনের টাওয়ার। দিন দিন কারাগারের কলেবর বৃদ্ধি হয়, যেমন যেমন ফ্রান্সে রাজাদের পাপের পসরা বাড়তে থাকে। বড় প্রাচীর হোলো, প্রাচীরের বাইরে খাঁড়ি হোলো। যারা ওর ভেতরে যেতো তারা আর বেরুতো না। বিচার যাদের হোতো তো হোতো, অনেকেরই ও প্রহসনের বালাই থাকতো না। বাসটেল্ তখন অত্যাচার আর অবিচারের প্রতিশব্দ হোলো যেন। মাহুষ চুপ করে চিরদিন মার খায় না। ইতিহাস চিরকাল প্রতিহনন করে এসেছে। ১৩৭০ থেকে বেঁচে বেঁচে জরাজীর্ণ রাসৃটীল্ মুখ থুবড়ে পড়লো ১৭৮৯ প্রায় ৪২০ বছর বয়সে। গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে পড়ে যাবার পক্ষে যথেষ্ট বয়স বৈকি! বাসটিল নেই, তার চিহ্নও নেই। আছে স্বাধীনতার দেবীমূর্তি আর আছে জুলাইয়ের স্মারক স্তম্ভ।

গাড়ী ছুটেছে। ভিক্তরহ্যুগো ম্যুজিয়ম, ন্যাশনাল আর্কাইভস্, কার্নিভ্যাল হল, Place de vosges, Hotel de sens, সর্বশেষ পারীর নগরপালিকা, ম্যুনিসিপ্যালিটি দপ্তর—Hotel de ville বিশাল প্রাসাদ। Tour St Jaeques একটা বড়ো টাওয়ার। কিন্তু মন পড়ে আছে নতার্দেমের গির্জা। গির্জায় যেতে পথে পড়লো বিখ্যাত প্যালে জাষ্টিস—Pont Arcole-এর মনোহর পুল ধরে সাইনের মাঝে একটা বড়ো দ্বীপে এলাম। এই দ্বীপের এক কোণে নতার্দাম গির্জা, অন্ত ধারে প্যালে জাষ্টিস এবং কঁসের্জেয়র।

অনেকেই জানেন না যে, পারী "শহরের" শীলের চিহ্ন একটা জাহাজ কেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নবম লুঈ সাইনের নাবিকসঙ্ঘকে ডেকে নগরী চালনার ভার দেন। কিন্তু বর্তমান চমৎকার এই হলটি তৈরি হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে। ১৮৭১ একবার আগুন দিয়ে বিদ্রোহীরা পুড়িয়ে দেয় এটাকে কিন্তু ১৮৭৮ এটা পুনরায় গড়া হবার পর থেকে যুগে যুগে নানা ভাস্কর্যে এই প্রসিদ্ধ Town Hall এখন পর্যটকদের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। এর Hall of Festivites, Hall of Banguet, মার্বেলের মাঝে, মার্বেলের সিঁড়ি দেখতে অনেক যাত্রীর ভিড় হয়। লা-সেণ্ট শ্যাপেল আর কঁসের্জেয়র দেখতে গিয়ে পুরোনো দিন মনে পড়ে যায়।

নবম লুইয়ের নাম ফ্রান্সে তো বটেই, ক্যাথলিকদের মধ্যেই খুব প্রসিদ্ধ। পোপ এই ধর্মপ্রাণ রাজর্ষির সাত্ত্বিকতায় মুগ্ধ হয়ে এঁকে 'সন্ত'-দের অন্যতম বলে গণনা করেন। লোকে খ্যাত হয় 'সেণ্ট লুই'। এই সাত্ত্বিক রাজার খাতিরের কারণ সপ্তম ক্রুজেড-এর সময়ে ইনি

অধিনায়ক ছিলেন, এবং প্যালেষ্টাইনে পৌঁছে যান। প্যালেষ্টাইন থেকে আসার সময়ে স্বয়ং যীশাসের ব্যবহৃত ও অন্যান্য পূত-পবিত্র স্মারক সংগ্রহ করে আনেন। সেই সংগ্রহ রাখার জন্য সীনের তীরে এই শ্যাপেল নির্মাণ করান। সে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিক। পারীতে খ্যাতি, এই গির্জার জানালার রঙীন কাঁচের চেয়ে পুরোণো কাঁচ পারীতে আর নেই।

গির্জায় গির্জায় রঙীন কাঁচের নানা কারু নিয়ে য়োরোপে বড়ো অহঙ্কার। যেখানে যেখানে গেছি সকলেই এই কাঁচের বড়াই করেছে। এর spire-এর দৈর্ঘ্য ৭৫ মীটর। একটা পুরোণো ঘড়ি-ঘর আছে, প্যারীর প্রাচীনতম ঘড়ি-ঘর।

কিন্তু পুরোণো কথা মনে তুলেছিলো এই গির্জা বা ঘণ্টা-ঘরের জন্য নয়, ঠিক পাশের—কঁসের্জেয়র দেখে। সেই সাংঘাতিক বিদ্রোহের দিনে এখানে বন্দী ছিলেন রাজ্ঞী মেরী আঁতিয়োনেৎ, দার্শনিক বৈজ্ঞানিক লাভোয়েশি-এ, হ'শে—। তাদের কথা মনে করে এই জায়গায় খানিক দাঁড়ালাম।

"এবার চলো নতার্দেম্—"

"ঘড়িতে কটা ?"

"এখনও দু' ঘণ্টা সময় আছে। ঐ তো গির্জা !"

"ও এক রকম দেখাই। ভিক্তর হ্যুগো, বালজাক্, ডুমা—এদের কৃপায় নতার্দেমের প্রতি অংশ মানুষের জানা।"

কি ভিড় নতার্দেমের গির্জায়।

ক্রমশঃ

—•—

ঘাট

শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী

এ পারে নদী বালির চরে শীর্ণ তোয়া ; এখানে
বাবলা নিমে বিজন পথ ছায়ায় ঢাকা, ঘাটে
চিতার ধোঁয়া, পিঠুলি কাঠে ধোঁয়ার জালা ছড়ায় ;
সবুজ জল, ঘাটের কোলে বাঁশের মাচা—কে জানে,
কাদের ঘরে সন্ধ্যে নামে !—শেয়ালে পথ হাঁটে,
শ্যাওলা ভরা পাথরে আর কাঁটায় যে পা জড়ায়।

স্তব্ধ রাতে এপারে নীল শেয়াল চোখ জাগে।
আলেয়া ঘোরে। বাতাসে নিভু চিতার আলো দেখে
পথিক তারা স্বপ্ন আঁকে নদীর হৃদি ধারায়,
দূরের পথে শব্দ নেই, শব্দ তবু লাগে ;
মাটির কূলে ঘাটের কোলে চোখেতে আলো মেখে
ছায়ার শাড়ী জড়িয়ে গায়ে কঙ্কালিনী দাঁড়ায়।

ওপারে সাদা বালির চরে হাঁসেরা হাঁটে, বন
কুড়িয়ে কাঠ মাথায় বাঁধে ধাঙর মেয়ে দু'টি।
ওপারে ভাঙা নৌকা বাঁধা, মাঝির খোঁজ নেই।
ব্যাঙের ডাকে সন্ধ্যে নামে, ঘাট কি নির্জন !
চিতায় ছাই, আধপোড়া এক শবের দেহ খুঁটি
কুকুরে টানে ; এপার পথে আঁধার নিমেষেই।

ওপার চরে নিশুতি রাত, এপার চেয়ে দেখে
শ্মশান বন নদীর পারে আঁধারে পথ হারায়।

কঙ্গো

শ্রীপ্রেমকুমার চক্রবর্ত্তী

অজ্ঞাত অন্ধকার আফ্রিকা মহাদেশ আবিষ্কারের একটি সংক্ষিপ্ত আভাস পূর্ব্বে (প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৬৬) "কেনিয়া" প্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে। খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারক ডাঃ ডেভিড লিভিংষ্টোনের চমকপ্রদ ভ্রমণ কাহিনী (১৮৪০-৭৩) বিশ্ববাসীর মনে প্রবল কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা জাগরিত করে। ১৮৭১ খ্রীঃ অব্দে ইংরেজ বংশোদ্ভূত, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হেন্‌রী এম্‌, ষ্ট্যানলী নিউইয়র্ক হেরল্ড পত্রিকার বিশেষ সংবাদ-দাতা হিসাবে প্রেরিত হইয়া লিভিংষ্টোনের অন্বেষণে আফ্রিকায় প্রবেশ করেন। ১৮৭১ খ্রীঃ অব্দের ১০ই নভেম্বর, মধ্য আফ্রিকার কঙ্গোরাজ্য প্রান্তরে টাঙ্গাইনিকা সীমান্তে ইঁহাদের ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার ঘটে। তাঁহারা সেইদিন জানিতেন না আফ্রিকার ভবিষ্যৎ ইতিহাসে তাঁহারা দুইটি বিপরীত আদর্শ ও ভাবধারার বাহক বলিয়া পরিচিত হইবেন। ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দে লিভিংষ্টোনের মৃত্যুর পর ষ্ট্যান্‌লী তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আফ্রিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন,—সাংবাদিকের কৌতূহল লইয়া এবং অপর পক্ষে "খনি" ও "মণি"র সন্ধানে। লিভিংষ্টোনের ন্যায় মানব-কল্যাণ ও ঈশ্বরের বাণী বহন করা তাঁহার ব্রত বা অভিপ্রায় ছিল না। আফ্রিকা হইতে প্রেরিত সংবাদ ও বিবরণী প্রভৃতি পাঠ করিয়া বেলজিয়াম-রাজ লিওপোল্ড, ১৮৭৬ খ্রীঃ অব্দে ব্রুসেল্‌স নগরীতে বিশিষ্ট ভূতাত্ত্বিক-গণকে আমন্ত্রণ করিয়া একটি সম্মেলন আহ্বান করিলেন। এই সম্মেলনের একটি প্রস্তাবে "আন্তর্জাতিক আফ্রিকা অনুসন্ধান ও সভ্যতা বিস্তারক সমিতি" নামক একটি সংস্থার প্রতিষ্ঠা করেন। আফ্রিকা হইতে ষ্ট্যানলীর প্রত্যাবর্ত্তনের পর বেলজিয়াম-রাজ লিওপোল্ড সমাদরে তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়া এই "আন্তর্জাতিক" (?) সভার কার্য্যে পুনরায় আফ্রিকায় প্রেরণ করিলেন। লিওপোল্ড তাঁহার ব্যক্তিগত অর্থভাণ্ডার হইতে তাঁহার সমুদয় ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব লইলেন। বুদ্ধিমান ষ্ট্যান্‌লী এই "আন্তর্জাতিক" নামধারী সভার উদ্দেশ্য বুঝিয়া লইলেন। ষ্ট্যান্‌লী জানিতেন লিওপোল্ড তাঁহার প্রদত্ত বিবরণী হইতে কঙ্গোরাজ্যের খনি অঞ্চলগুলির অস্তিত্বের সন্ধান পাইয়াছেন। ষ্ট্যান্‌লী আফ্রিকা মহাদেশে ফিরিয়াই মধ্য-আফ্রিকায় অবস্থিত কঙ্গো ও কাসাই নদী উপত্যকার বিশাল ভূভাগ দখল করিলেন। সেই কালে এই "দখল কার্য্য" বর্ত্তমান কালের ন্যায় কঠিন ছিল না। পূর্ব্ব হইতেই সাবধানী রাজা লিওপোল্ড মঁসিয়ে ব্রাজা (M. de Brazza) নামধেয় জনৈক ফরাসীর সাহায্যে একটি দলিলে কঙ্গোরাজ্যের জনৈক আফ্রিকান দলপতির স্বাক্ষর সংগ্রহ করিয়াছিলেন।* আফ্রিকা বিভাগের সময় বার্লিন সম্মেলনে এই দলিলটি রাজ্য হস্তান্তরের একটি চুক্তিপত্র বলিয়া প্রদর্শন করা ও কঙ্গোরাজ্য বেলজিয়ামের এলাকাধীন বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়। ১৮৯৭ সনে রাজা লিওপোল্ড একটি উইল সম্পাদন করিয়া কঙ্গোরাজ্য শাসন বেলজিয়াম রাষ্ট্রের হস্তে অর্পণ করেন। তৎপর হইতে এই রাজ্যটি "বেলজিয়াম কঙ্গো" নামে পরিচিত।

মধ্য আফ্রিকায় এই রাজ্যটি বিষুব-রেখার উপরে অবস্থিত। এই স্থানের জলবায়ু উষ্ণ এবং প্রচুর বারিপাত হইয়া থাকে। রাজ্যটির মধ্য দিয়া পৃথিবীর বৃহত্তম নদীগুলির অন্যতম কঙ্গোনদী (আফ্রিকান "কঙ্গোয়া") প্রবাহিত; ইহারই নামানুসারে এই রাজ্যের নাম কঙ্গোরাজ্য। কঙ্গোরাজ্যের উত্তরে সুদান ও ফরাসী অধিকৃত নিরক্ষবৃত্তে অবস্থিত মধ্য-আফ্রিকার রাজ্য, দক্ষিণে রোডেসিয়া, পূর্ব্বে টাঙ্গাইনিকা ও উগাণ্ডারাজ্য, এবং পশ্চিম প্রান্তে পর্ত্তুগাল অধিকৃত অ্যাঙ্গোলা ও ফরাসী মধ্য আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে অবস্থিত। সমগ্র রাজ্যটি কঙ্গো ও কাসাই নদী উপত্যকায় অবস্থিত এবং রাজ্যের অর্দ্ধাধিক স্থান নিবিড় বনানীতে পরিপূর্ণ। এই বনভূমি পৃথিবীতে দৃষ্ট প্রায় সকলপ্রকার জীবজন্তুর আবাসস্থল। দুর্দ্দান্ত গরিলা উহাদের অন্যতম। রাজ্যের পূর্ব্ব-প্রান্তে অনেকগুলি বৃহদাকার হ্রদ আছে। উহাদের মধ্যে টাঙ্গাইনিকা সীমান্তের টাঙ্গাইনিকা হ্রদ সর্ব্ববৃহৎ। মধ্য-আফ্রিকার অভ্যন্তরে অবস্থিত রাজ্যটির বহির্জগতে গমনাগমনের পথ অতলান্তিক মহাসাগর তীরে কঙ্গোনদীর মোহানা পর্য্যন্ত বিস্তৃত সঙ্কীর্ণ ভূভাগ। কঙ্গো নদীটি এই রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমানার নিকট হইতে প্রথমে উত্তরা-

* "Accross the Dark Continent" by H. M. Stanley (Published in London, 1878)

ভিমুখে ও ক্রমশঃ পশ্চিম ও দক্ষিণাভিমুখী হইয়া একটি অর্দ্ধবৃত্তাকারে অবশেষে পশ্চিম প্রান্তে অতলান্তিক মহাসাগরে পতিত হইয়াছে।

কঙ্গোরাজ্যের আয়তন প্রায় নয় লক্ষ বর্গমাইল অর্থাৎ প্রায় ভারতবর্ষের সমতুল, অপর দিকে ইহার জনসংখ্যা মাত্র ন্যূনাধিক এক কোটি চল্লিশ লক্ষ। ইহাদের মধ্যে ইউরোপীয়ের সংখ্যা (স্বাধীনতা ঘোষণার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত) এক লক্ষাধিক। ইউরোপীয়গণের শতকরা পঁচাত্তর জন বেলজিয়াম দেশীয় এবং অবশিষ্ট আমেরিকান, ফরাসী, ইংরেজ প্রভৃতি। বেলজিয়াম দেশীয়গণের মধ্যে রাজকর্ম্মচারী, সেনাবাহিনীর কর্ম্মচারীবৃন্দ, ব্যবসায়ী, খনিকর্ম্মচারী, যন্ত্রশিল্পী, ধর্ম্মযাজক প্রভৃতি। অপরাপর ইউরোপীয় ও আমেরিকানগণের মধ্যে ব্যবসায়ী, শিল্প ও যন্ত্র-বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ প্রভৃতির সংখ্যাই অধিক। ইহা ভিন্ন খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারক ও তাঁহাদের শিক্ষাকেন্দ্রসমূহের শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যাও যথেষ্ট। কঙ্গোরাজ্যের অবশিষ্ট অধিকাংশ অধিবাসী (ন্যূনাধিক ১ কোটি ৩৯ লক্ষ) কৃষ্ণকায় আফ্রিকান যাহারা সাধারণ ভাবে নিগ্রো নামে অভিহিত হয়। ইহাদের মধ্যে বহু শ্রেণী ও শাখাপ্রশাখা আছে এবং প্রকৃতপক্ষেই ইহাদের সকলে মূল নিগ্রো-জাতির বংশোদ্ভূত নহে। কঙ্গোরাজ্যে বাণ্টুজাতির প্রাধান্যই সর্ব্বাধিক। ইহা ভিন্ন মূল নিগ্রো, কিকিয়ু, ওয়ানিয়ামওয়াদি, কাফ্রী প্রভৃতি অনেক জাতি উপজাতি আছে। ইহাদের প্রত্যেকের বিভিন্ন ভাষা থাকিলেও সোয়াহিলি ভাষার প্রচলন প্রায় সর্ব্বত্রই আছে। এই ভাষায় ব্যবহৃত প্রাচীন আরবীয় ও মিশরীয়, সেমেটিক ও হেমাটিক শব্দের বহু অপভ্রংশের ব্যবহার উত্তর আফ্রিকার বারবারি ও ফেলাহি এবং অতি প্রাচীন আসিরিয় ও বাবিলনীয় ভাষাবর্গের সহিত যোগস্থাপন করে। তবে ইহার কোনও প্রাচীন লিপি বা নিদর্শন নাই; সহস্রাধিক বৎসরের নিরক্ষরতাই সম্ভবতঃ এই বিলুপ্তির কারণ। বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঐ সকল জাতিবর্গের সহিত আফ্রিকাবাসীর যোগসূত্র অনুমান করা অযৌক্তিক নহে। আফ্রিকার এই সকল আদি অধিবাসী ব্যতীত কিছুসংখ্যক আরবীয় পূর্ব্ব-সীমান্তে স্থায়ীভাবে বসবাস করে। দক্ষিণাঞ্চলের কাটাঙ্গা প্রদেশে ও খনি অঞ্চলে অল্পসংখ্যক ভারতীয় ব্যবসায়ী স্থায়ীভাবে সপরিবারে বাস করে। ইহাদের প্রায় সকলেই গুজরাটী ও পাঞ্জাবী। কঙ্গোরাজ্যের পশ্চিম অংশে রাজধানী লিওপোল্ডভিলে ও সন্নিহিত দুই-একটি নগরীতে কতিপয় দক্ষিণ-ভারতীয় ও বাঙালী ঔষধবিক্রেতা ও চিকিৎসকের বাস আছে। অধুনা আফ্রিকা মহাদেশে কিছু সংখ্যায় জাপানীয়, ভ্রাম্যমান পণ্যদ্রব্য বিক্রেতা ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসাবে আবির্ভাব দেখা দিয়াছে। ইহাদের মধ্যে দুই-চারিজন যে পণ্যসম্ভার সাজাইয়া সুবিধাজনক কোনও এক স্থানে বসিয়া পড়িতে চেষ্টা করিতেছে না এমন নহে। রাজ্যের বিশৃঙ্খলতা ও যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যেও ইহারা পরম নিশ্চিন্ত ও বোধহয় পণ্যের বিনিময়ে খনিসমূহের লভ্যাংশ গ্রহণে দৃঢ়সংকল্প।

কঙ্গোরাজ্য সর্ব্ববিষয়ে অনুন্নত হইলেও দরিদ্র বলা চলে না। প্রাকৃতিক সম্পদে পৃথিবীর বহু দেশ হইতে কঙ্গো অধিকতর ঐশ্বর্য্যশালী। সমগ্র পৃথিবীতে শিল্পে-ব্যবহৃত হীরকের শতকরা সত্তর ভাগ কঙ্গোরাজ্য হইতে রপ্তানি হয়। এতদিন পর্য্যন্ত ইহা বেলজিয়াম রাজ্যের "হীরক বাজারে"র মাধ্যমে বিক্রয় হইত। ইউরেনিয়াম ও রেডিয়াম সহ বহুবিধ খনিজ-সম্পদ এই রাজ্যে সঞ্চিত আছে। রাজ্যের দক্ষিণাংশে কাটাঙ্গা প্রদেশে বিশাল তাম্রখনি আছে। ইহা ভিন্ন গজদন্ত রপ্তানি এই রাজ্যের একটি লাভজনক ব্যবসায়। মেহগনি, আবলুস প্রভৃতি বনজ-সম্পদও প্রচুর জন্মায়। বর্ত্তমানে কফি, কোকো, তামাক প্রভৃতিও যথেষ্ট জন্মায়। ইহা সত্ত্বেও কঙ্গোরাজ্যের আদি অধিবাসীর অধিকাংশই দীন-দরিদ্র ও পর্ণ-কুটীরবাসী। নগর ও শিল্পাঞ্চলের জীবনধারণের মান ও রাজ্যের অভ্যন্তরভাগের জীবনধারণের মানের কোনও প্রকার সাদৃশ্য নাই। পঁচাত্তর বৎসরের বেলজিয়াম দেশীয় শাসন সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা বিস্তার ও প্রসার ঠেকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে। ইহা ছিল তাহাদের রাষ্ট্রীয় নীতি। উহাদের ধারণা ছিল, ইহা দ্বারা উহারা অজ্ঞ আফ্রিকানদিগের উপর শাসন চিরস্থায়ী রাখিতে পারিবে। কিন্তু বিধাতা ছিলেন বিরূপ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, দুইটি বিপরীত আদর্শের বাহক, ডেভিড লিভিংষ্টোন ও ষ্ট্যান্‌লীর সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল এই কঙ্গোরাজ্য সীমান্তে। দুই জনেই উন্নত চরিত্র ছিলেন। অথচ একজন আনিয়াছিলেন রাজ্যে দেবতার বাণী ও আশীর্ব্বাদ, লিভিংষ্টোন চাহিয়াছিলেন খ্রীষ্টীয় আদর্শে দেশবাসীর উন্নয়ন ও শিক্ষার-বিস্তার। অপর পক্ষে ষ্ট্যান্‌লী যাহাদের প্রতিনিধি হইয়া দ্বিতীয় বার আফ্রিকায় আসিলেন, তাহারা আনিয়াছে রাজ্যলিপ্সা, লোভ, স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা, শিক্ষা-বিমুখীনতা, দানবের অবদান। বেলজিয়াম শাসনের পঁচাত্তর বৎসরের ইতিহাস এই দুই আদর্শের সঙ্ঘর্ষে অব্যক্ত ইতিহাস। বেলজিয়াম শাসনের প্রথম আফ্রিকাবাসীর রক্তরঞ্জিত। বেলজিয়াম রা-

আফ্রিকানগণকে উচ্চশিক্ষা,—এমনকি কারিগরি শিক্ষাদান পর্য্যন্ত বিপজ্জনক মনে করিত। অথচ তাহারা দক্ষিণ-আফ্রিকার ন্যায় আফ্রিকাবাসী কৃষ্ণকায়গণের পৃথকীকরণ নীতি আদৌ গ্রহণ করে নাই। তাহারা ক্রমে ক্রমে নগরাঞ্চলের ও খনি-অঞ্চলের আফ্রিকানগণকে, বিশেষ ভাবে অধীনস্থ কর্ম্মচারীবৃন্দকে, পোশাকে ভূষণে ইয়োরোপীয় করিয়া তুলিয়াছে। বহু বেলজিয়ামবাসী কৃষ্ণকায় আফ্রিকানগণের সহিত অবাধে মিশিয়াছে, তাহাদিগকে নৃত্যোৎসবে নিমন্ত্রণ করিয়া একত্রে নৃত্য করিয়াছে, মদ্যপান শিখাইয়াছে, নৈতিক পতনের পথ উন্মুক্ত রাখিয়াছে। অপর দিকে লিভিংষ্টোনের পদানুসরণে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ স্থানে স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে, কেবল মাত্র খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা ব্যতীত নিঃস্বার্থ ভাবে তাঁহাদের অনেকে আফ্রিকাবাসীর মনে উচ্চ শিক্ষালাভের স্পৃহা ও মনুষ্যত্ববোধ জাগরিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই সকল ধর্ম্মপ্রচারকগণের অনেকের উৎসর্গীকৃত জীবন আমৃত্যু আফ্রিকার গভীর বনানী মধ্যে অতিবাহিত হইয়াছে। রাষ্ট্রশক্তি জ্ঞানবিস্তার ও মনুষ্যত্ববোধকে দাবাইয়া রাখিতে পারিল না।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ-শাসিত দক্ষিণ-আফ্রিকা পূর্ণ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করিল ; কিন্তু সে স্বাধীনতা কেবলমাত্র আফ্রিকাবাসী ইয়োরোপীয় ওলন্দাজ ইংরেজ প্রভৃতির জন্য,—কৃষ্ণকায় আফ্রিকাবাসীর জন্য নহে। প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানে (১৯১৯) ভার্সাই সম্মেলনে আফ্রিকার কৃষ্ণকায় অধিবাসীগণের স্বাধীনতার কথা সর্ব্বপ্রথম শোনা যায়। তৎপর ১৯২০ সনে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে জনৈক জামাইকাবাসী, এম. এ. গার্ভে, "আফ্রিকা আফ্রিকাবাসীর জন্য" আন্দোলনের প্রবর্ত্তন করেন। গার্ভের সমসাময়িক ডাঃ ডুবয়েস গার্ভের উগ্র মত সমর্থন না করিলেও কৃষ্ণকায় আফ্রিকার যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সমর্থন করেন। তৎপরবর্ত্তীকালে ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স প্রভৃতি রাজ্যে বহুবার আফ্রিকার স্বাধীনতার সমর্থনে সম্মেলন আহূত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত ও সার্থক স্বাধীনতা আন্দোলন আসিয়াছে শিক্ষিত আফ্রিকাবাসীর মধ্য হইতে। বেলজিয়াম রাষ্ট্র যখন কঙ্গোরাজ্যে শিক্ষা-বিরোধী নীতি গ্রহণ করে সেই সময় পাশ্চাত্ত্য বিভিন্ন দেশীয় খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার প্রতিষ্ঠানগুলি কৃষ্ণকায় আফ্রিকাবাসীকে উচ্চতর শিক্ষাদান করিতে দ্বিধা করে নাই।

কঙ্গোরাজ্যটি এতাবৎ বেলজিয়াম রাষ্ট্রের অনুরূপ [illegible]র গঠিত শাসনতন্ত্র পরিচালিত ছিল। বেলজিয়াম [illegible] প্রতিনিধি গবর্ণর-জেনারেলের প্রধান কার্য্যালয় স্থাপিত ছিল রাজধানী লিওপোল্ডভিলে। সমগ্র রাজ্যটি কতিপয় প্রদেশে বিভক্ত। রাজধানী লিওপোল্ডভিলে ভিন্ন রাজ্যের অন্যান্য প্রধান নগরী—ষ্ট্যামলীভিলে, নিউ-এণ্টোয়ার্প, লুলুয়াবুর্গ, লুসাম্বো, এলিজাবেথভিলে, বাকওয়াঙ্গা ও ডেকোভু প্রভৃতি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধান্তে উত্তর-আফ্রিকার অনেকগুলি রাজ্য স্বাধীনতা লাভ করে। এই স্বাধীনতা আন্দোলনের তরঙ্গ আফ্রিকার সর্ব্বস্থানে প্রসারিত হয়। স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করিবার পর ১৯৫৮ সনে ঘানার পরিষদ ভবনে আহূত একটি আফ্রিকা রাজ্য সম্মেলনে ইথিওপিয়ার প্রতিনিধি প্রিন্স ষেইলা সেলিসি বলেন, "এত দিনে আফ্রিকাবাসী নূতন ভাবে আফ্রিকা মহাদেশ আবিষ্কার করিয়াছেন,—তাহারা জানিতে পারিয়াছে আফ্রিকায় মনুষ্যের বসবাস আছে এবং তাহাদের দেশে ভোগ্যবস্তু প্রস্তুতের উপাদানের ও খনিজ সম্পদের অভাব নাই।" তিনি আরও বলেন, "আফ্রিকাবাসী তাহাদের বক্তব্য ব্যক্ত করিয়াছে, পৃথিবীর বিভিন্ন শক্তিবর্গকে তিনি উহার জবাব দিবার জন্য আহ্বান জানান। কঙ্গোরাজ্যেও স্বাধীনতা আন্দোলন ঘনীভূত হইতেছিল। স্থানে স্থানে সভা-সমিতির অধিবেশন চলিতেছিল। যোশেফ কাসাভুর নেতৃত্বে আবাকোদল ও জিন বল্লিকঙ্গোর নেতৃত্বে পুনাদল শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিল। ইঁহাদের সঙ্গে আসিয়া যোগ দিলেন নবীন যুবক প্যাট্রিস্ লুমুম্বা তাঁহার নব গঠিত দল "কঙ্গো জাতীয় আন্দোলন দল" লইয়া। ১৯৫৯ সনের ৪ঠা জানুয়ারী লিওপোল্ডভিলায় স্বাধীনতা ঘোষণার দাবি জানাইয়া একটি সভা আহ্বান করা হয়। সভাটি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। উহার ফলে ক্ষিপ্ত জনতার সহিত পুলিস ও ইয়োরোপীয়ানগণের (বেলজিয়ান) মধ্যে প্রচণ্ড দাঙ্গার সূত্রপাত হইল। পরদিবস হইতে সান্ধ্য-আইন জারী করা হয়। আবাকো দলের নেতা কাসাভুভুকে গ্রেপ্তার করিয়া কারারুদ্ধ করা হইল এবং আবাকো দল বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা করা হইল। দুইজন কঙ্গোদেশীয় জেলা-মেয়র লিওপোল্ডভিলের অপর সাতজন মেয়রের স্বাক্ষর সংগ্রহ করিয়া কাসাভুভুর মুক্তির দাবিতে একটি ইস্তাহার প্রকাশ করেন। এই মাত্র অপরাধে ১২ই জানুয়ারী তারিখে ইঁহাদের গ্রেপ্তার করা হইল। তাহার ফলে অবস্থা পুনরায় আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায়। সহস্রাধিক কঙ্গোবাসী আফ্রিকান রাজ্যের প্রধান বন্দর মাতাদি আক্রমণ করে ও কিছুকালের জন্য শাসন-ব্যবস্থা প্রায় অচল হইয়া পড়ে। বেলজিয়াম সরকার রাজধানী ব্রুসেল্স্ হইতে সহসা ঘোষণা করিল

"কঙ্গো রাজ্যে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা স্থাপনই আমাদের লক্ষ্য।"

অকস্মাৎ বর্ত্তমান বৎসরের (১৯৬০) জুন মাসে বেলজিয়াম সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিলেন। ইহার মূলে যুবক নেতা প্যাট্রিস লুমুম্বার প্রচেষ্টা অনেকখানি ছিল। সুদূর এক পল্লীর অতি দীন-পর্ণ-কুটীরে ১৯২৫ সনে লুমুম্বার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা-মাতা রোমান ক্যাথলিক মতাবলম্বী খ্রীষ্টান ছিলেন। উদার মতালম্বী প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম প্রচারকগণের নিকট তিনি শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পান। তাঁহার উদার-চেতা শিক্ষক দর্শন ও কাব্য হইতে কার্লমার্ক্স পর্য্যন্ত পাঠ দোষণীয় মনে করিতেন না। তাঁহার শিক্ষকের মতে জ্ঞান-লাভের জন্য সকল প্রকার মতবাদ জানার প্রয়োজনীয়তা আছে। ধর্ম্ম বিষয়ে লুমুম্বা স্বাধীন মতাবলম্বী। রোমান ক্যাথলিক পরিবারে পালিত হইয়াও তাহাদের সম্বন্ধে তিনি কিছুটা বিরূপ মত পোষণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি রাজস্ব বিভাগে কেরাণীর পদ গ্রহণ করেন ও পরে সহকারী পোষ্টমাষ্টারের পদে নিযুক্ত হন। ষ্ট্যানলীভিলে অবস্থানকালে তিনি কর্ম্মচারী সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ইহাই তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের সূচনা করে। তাঁহার যুক্তি ও বাগ্মীতায় কঙ্গোবাসী উৎসাহিত হইয়া দলবদ্ধ হইতে শিক্ষালাভ করে। বলা বাহুল্য তদানীন্তন সরকার ইহা প্রীতির চক্ষে দেখে নাই। ১৯৫৭ সনে লুমুম্বা চাকুরি পরিত্যাগ করিয়া লিওপোল্ডভিলে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। এই স্থানে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি "কঙ্গো জাতীয় আন্দোলন দল" গঠন করেন। তৎপরে তিনি পূর্ণ সময় স্বাধীনতা আন্দোলনে আত্ম-নিয়োগ করিবার জন্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের চাকুরিও পরিত্যাগ করিলেন। সেই সময় হইতে তিনি আবাকো ও পুনা দলের সহিত সহযোগিতা করিয়া আন্দোলন চালাইতে লাগিলেন। ১৯৫৯ সনের জানুয়ারী মাসের ঘটনায় কাসাভুভু প্রমুখ নেতৃবর্গ কারারুদ্ধ হইলে তাঁহার নেতৃত্বে আন্দোলন চলিতে লাগিল। বেলজিয়াম সরকারের স্বাধীনতা দানের প্রতিশ্রুতির সূত্র ধরিয়া তিনি কথাবার্ত্তা চালাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

বর্ত্তমান বৎসরের ৩০শে জুন বেলজিয়াম সরকার কঙ্গোরাজ্যকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। প্যাট্রিস লুমুম্বা প্রধান মন্ত্রী ও যোশেফ কাসাভুভু রাষ্ট্রপতি পদে নির্ব্বাচিত হইলেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের পরেই বেলজিয়াম বাহিনীর অনেকাংশ কঙ্গোরাজ্য হইতে অপসারিত হইল। বেলজিয়ান কর্ম্মচারীগণও বহুলাংশে কঙ্গো রাজ্য ত্যাগ করিল। কিন্তু ঘটনা স্রোত এইখানেই শেষ হইল না।

লুমুম্বার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভায় তাঁহারই কঙ্গো জাতীয় আন্দোলন দলের এলবার্ট কিলোঞ্জিকে গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় নাই; ইহাতে কিলোঞ্জি তাঁহার উপর সন্তুষ্ট ছিল না। কিলোঞ্জি দক্ষিণ-কাসাইর হীরক-প্রদেশের সভাপতি (কঙ্গো রাজ্যে রাজ্যপালের পদ নাই)। দক্ষিণ-কঙ্গোর কাটাঙ্গা-প্রদেশের "আত্ম-ঘোষিত" সভাপতি মোইসে শোম্বে প্রথমে আবাকো দলের নেতা কাসাভুভুর সমর্থক ছিলেন এবং তিনি প্রদেশগুলির স্বকর্তৃত্ব ও স্বাতন্ত্র রক্ষা করিয়া একটি কঙ্গো যুক্তরাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। তিনি এই সম্পর্কে একটি পরিকল্পনাও কাসাভুভুর নিকট অর্পণ করিয়াছিলেন। অপরপক্ষে "হীরক-প্রদেশে" ও কাটাঙ্গার খনি অঞ্চলে বেলজিয়াম দেশীয় সহ বহু ইয়োরোপীয় শিল্পী, কারিগর ইত্যাদি নিযুক্ত ছিল। ইহাতে বেলজিয়ামবাসী ও অন্যান্য বিদেশীয় স্বার্থও অনেকখানি জড়িত। তদুপরি দক্ষিণ-আফ্রিকার শ্বেতকায় অধিবাসীবৃন্দ সংবাদপত্রগুলির মাধ্যমে কঙ্গোরাজ্যের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য চালাইতেছিল। তাহারা কাটাঙ্গার তাম্রখনি অঞ্চল ও হীরকখনিগুলি কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকানগণের হস্তে না যায় সেই চেষ্টাও করিয়াছে। সর্ব্বদিকের পরিস্থিতি যখন এই-রূপ জটিল সেই সময় একটি ঘটনা আর একটি বিপাকের সৃষ্টি করিল।

ক্ষমতা হস্তান্তরের চার দিন পরে বেলজিয়াম সরকার তাহাদের সৈন্যবাহিনী পুনরায় ফিরাইয়া আনার একটি সুযোগ পাইল। আইসভিলে একটি আফ্রিকান জনতা একটি বিশেষ ঘটনায় উত্তেজিত হইয়া ইউরোপীয় অধ্যুষিত অঞ্চল আক্রমণ করে ও প্রায় সকলপ্রকার টেলিফোন, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি যোগাযোগ-ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। এই ঘটনার সুযোগ পাইয়া বেলজিয়াম সরকার দ্রুততার সহিত সৈন্যবাহিনী কঙ্গোরাজ্যে পাঠাইয়া দেয়। ঘটনাটি যে তেমন গুরুতর নহে—বেলজিয়াম সংবাদ-প্রতিষ্ঠান বেলগার এই সংবাদগুলি হইতেই স্পষ্ট বোঝা যাইবে, "দুইশত ইউরোপীয় নিরাপদে লিওপোল্ড ভিলে পৌঁছিয়াছে", তেরশত বেলজিয়ামবাসী অক্ষত অবস্থায় ব্রাজাভিলায় চলিয়া গিয়াছে," ও "কেহ হতাহত হয় নাই" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। জনৈক আমেরিকান সংবাদ-দাতার মতে বেলজিয়ামবাসীগণের লিওপোল্ডভিল ত্যাগের কালে "অপরাধীর মনোবৃত্তি" দেখা গিয়াছে। কোনও কঙ্গোলীয় কোনও বেলজিয়ান মহিলার মর্য্যাদা-

হানি করে নাই, অপরপক্ষে বেলজিয়ামবাসীগণ বিশেষ ভাবে সেনাবাহিনী কর্মচারিবৃন্দ কঙ্গোদেশীয় রমণীবৃন্দকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে নৃত্য-পানোৎসবে আনয়ন করিয়াছিল। সংবাদে আরও জানা যায়, যে সময় বেলজিয়ামবাসীগণের উপর আক্রমণ ও অত্যাচারের কাহিনী বিদেশে প্রচারিত হইতেছিল, সেই সময় লিওপোল্ডভিলের ধনী বেলজিয়াম-বাসীগণের আবাস "রেজিনা হোটেলে" রাত্রিব্যাপী নৃত্য ও পানোৎসবের কোনও ব্যাঘাত ঘটে নাই। এই সকল ঘটনায় বেলজিয়াম সৈন্যবাহিনী পুনরায়নের ফলে কঙ্গো-রাজ্যে প্রবলবহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। প্রধানমন্ত্রী লুমুম্বা বেলজিয়াম সরকারকে অবিলম্বে সেনাবাহিনী সরাইয়া লইবার অনুরোধ করিলেন। তিনি রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিকট আবেদন জানাইয়া বলেন যে, যদি রাষ্ট্রসঙ্ঘ তাঁহাকে অবিলম্বে এই সম্পর্কে সাহায্য না করে তাহা হইলে তিনি সোভিয়েট রাশিয়ার সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন। এই উত্তেজনা ক্রমশঃ প্রবলতর হইয়া ১৫ই জুলাই অতি ভয়াবহ রূপ গ্রহণ করে। সেই দিবস রাত্রিতে দুইজন ইউরোপীয়ের নিহত হইবার সংবাদ পাওয়া যায়। বেলগা সংবাদ-দাতার মতে বেলজিয়ান সৈন্যবাস হইতে ঐ দিন কঙ্গো-দেশীয় সৈন্যগণ অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি অপহরণ করে। লুমুম্বা সরকারের মুখপাত্র বলেন, দুইজন কঙ্গো-দেশীয় সৈনিক ও পুলিসরক্ষীকে বেলজিয়ান সৈনিকগণ হত্যা করিয়াছিল এবং শান্তিরক্ষার জন্যই অস্ত্রশস্ত্র অপসারণ আবশ্যক ছিল।

১৬ই জুলাই যুক্তরাষ্ট্র বাহিনীর প্রথম দল কঙ্গো সরকার বাহিনীর সাহায্যার্থে লিওপোল্ডভিলে উপনীত হয়। সুইডেনের জেনারেল কার্লভ্যান হর্ণ এই বাহিনীর অধ্যক্ষরূপে আগমন করেন। সেই দিনই সোভিয়েট রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভ কঙ্গোর নূতন রাষ্ট্রকে প্রয়োজন হইলে সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে কাটাঙ্গার (আত্ম-ঘোষিত) সভাপতি মোইসে শোম্বে কঙ্গোরাজ্যের প্রদেশগুলির স্বাতন্ত্র্য ও স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা রাষ্ট্রপতি কাসাভুভুর নিকট অর্পণ করিয়াছিলেন। অপরপক্ষে লুমুম্বা কেন্দ্রশাসিত গণতান্ত্রিক রাজ্যগঠনের পক্ষপাতি। লুমুম্বা মনে করেন, কেন্দ্রের শাসন-ক্ষমতা বৃদ্ধি না করিলে রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন কঠিন হইবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতিগুলি পরস্পর বিবদমান এবং প্রায়ই যুদ্ধাবস্থা বর্ত্তমান থাকে। আরব রাজ্যের দাঙ্গা ও আফ্রিকান উপজাতিগুলির যুদ্ধ একই জাতীয়। লুমুম্বার আদর্শ কঙ্গোরাজ্যকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া "সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে" শাসন ও সমাজ ব্যবসার পুনর্গঠন করা। শোম্বের পরিকল্পনা লুমুম্বা মন্ত্রীসভা গ্রহণ না করায়, কিলোঞ্জির সমর্থনে ও সহায়তায় শোম্বে কাটাঙ্গাকে পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করিলেন। দক্ষিণ-কাসাইর "হীরক-প্রদেশ" কিলোঞ্জির নেতৃত্বে স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। লুমুম্বার সম্মুখে কঙ্গো রাজ্যের সমস্যা জটিলতর হইয়া উঠিতে লাগিল। একদিকে বেলজিয়াম সরকারের সহিত বিরোধ, অপর দিকে কাটাঙ্গা ও দক্ষিণ-কাসাই প্রদেশের বিদ্রোহ ঘোষণা। কঙ্গোরাজ্যের সেনাবাহিনীতে উপযুক্ত সেনাপতি ও পরিচালকের অত্যন্ত অভাব। তদুপরি রাজ্যে উচ্চশিক্ষিত মানুষের অভাব; শিল্পী, যন্ত্র-বিজ্ঞানবিদ এবং বৈজ্ঞানিক এমন একজনও নাই। যাহারা বিদেশী ইউরোপীয়গণের স্থান পূরণ করিতে পারে। নগরাঞ্চলের একটি বৃহৎ অংশ পোশাকে-পরিচ্ছদে ইউরোপীয়গণের অনুকরণ করিতে শিখিয়াছে, কিন্তু বিদ্যা অর্জ্জন করিবার বেশী সুযোগ তাহারা পায় নাই। কাসাই ও কাটাঙ্গার খনি অঞ্চলেও সেই এক অবস্থা। জনসাধারণের অধিকাংশ নিরক্ষর ও অশিক্ষিত। অথচ আর্থিক স্বচ্ছলতায় ইহারা আফ্রিকার অন্যান্য রাজ্যগুলির তুলনায় অনেক উন্নত। লুমুম্বা হৃদয়ঙ্গম করিলেন ইউরোপীয় কতিপয় রাষ্ট্র প্রকাশ্যে কাসাই ও কাটাঙ্গার সমর্থন না করিতে পারিলেও কেহ কেহ এই বিচ্ছেদ সমর্থন করিতে পারে। তদুপরি রাষ্ট্রসঙ্ঘ বাহিনীর সাহায্যদান-পদ্ধতির অসংখ্য প্রশ্ন-সমস্যা কঠিনতর করিয়া তুলিল।

কাসাই ও কাটাঙ্গার বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য লুমুম্বা প্রেরিত কঙ্গো সরকার বাহিনী কাসাই রাজধানী বাক-ওয়াঙ্গার চতুষ্পার্শ্বে তুমুল রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর বাকওয়াঙ্গা অধিকার করিল। কিলোঞ্জি কাটাঙ্গার রাজ-ধানী এলিজাবেথভিলে পলায়ন করিলেন। কঙ্গো সরকারী বাহিনীর সেনাপতি কর্ণেল যোশেফ মেম্বোটো ঘোষণা করিলেন, অবস্থা অনেকটা আয়ত্তে আনা গিয়াছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রতিনিধি ডাঃ রালফ বাঞ্চ ভারতের রাজেশ্বর দয়ালের নিকট রাষ্ট্রসঙ্ঘ বাহিনীর কার্য্যভার হস্তান্তর করিবার কালে প্রসঙ্গক্রমে বলেন, "বিপজ্জনক অবস্থার অনেকখানি কাটিয়া গিয়াছে।" কিন্তু বাস্তবপক্ষে বাত্যা-আন্দোলিত ভাগ্য-দোলক স্থির হইতে পারিল না।

৫ই সেপ্টেম্বর অকস্মাৎ রাষ্ট্রপতি কাসাভুভু ঘোষণা করিলেন, তিনি লুমুম্বাকে অপসারিত করিয়া তাঁহার স্থলে পরিষদ সভাপতি যোশেফ ইলিওকে প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ

করিয়াছেন। পরবর্ত্তী দিবসেই লুমুম্বা ঘোষণা করিলেন যে, তিনি আইনানুসারে ও শাসনতান্ত্রিক নিয়মানুসারে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং সেই ক্ষমতা বলে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা ও দেশদ্রোহীতার জন্য কাসাভুভুকে রাষ্ট্রপতির পদ হইতে অপসারিত করিলেন ; পরিষদের অধিবেশনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঐ পদ শূন্য থাকিবে। কিন্তু কাসাভুভুও স্থির থাকিলেন না ; তিনি তাঁহার ঘোষণাগুলি গুপ্তভাবে ব্রাজাভিলের ফরাসী কেন্দ্রে পাঠাইয়া দিলেন। কাসাভুভু তাঁহার ঘোষণায় বলিলেন, লুমুম্বা কঙ্গোরাজ্যকে কম্যুনিজমএর পথে চালিত করিয়া দেশবাসীকে বঞ্চনা করিতেছেন। কাটাঙ্গা হইতে একটি ঘোষণায় শোম্বে কাসাভুভুর সমর্থন করিলেন। অপরপক্ষে লুমুম্বা আফ্রিকার অন্যান্য স্বাধীন রাজ্যগুলির নিকট সৈন্যবাহিনীর সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন। কঙ্গোরাজ্যে খাদ্য সাহায্য পাঠাইবার জন্য সোভিয়েট সরকার কতিপয় বিমান ও মোটরলরী পাঠাইয়া দেন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি সোভিয়েট সরকারকে সাবধান করিয়া বলিলেন (৭ই সেপ্টেম্বর) এই যানগুলি সেনাবাহিনীর কর্ম্মচারী পরিচালিত হওয়া আপত্তিজনক। এইরূপ অবস্থায় ডাঃ রাল্‌ফ বাঞ্চের স্থলাভিষিক্ত শ্রীরাজেশ্বর দয়াল লিওপোল্ডভিলে আসিয়া পৌঁছিলেন। কঙ্গোরাজ্যের ভবিষ্যৎ এখনও অনিশ্চিত, কেবলমাত্র আশা করা যায়, যে দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়া স্বাধীনতার পথ, সেই সংগ্রামের পথেই আলোক তুলিয়া ধরিবে।

এখন প্রশ্ন আফ্রিকাবাসী কোনও বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদের সমর্থক কি না ? প্রথমেই যাহা বাস্তবঃ দেখা যায় আফ্রিকাবাসী জনগণ পাশ্চাত্ত্য শ্বেতাঙ্গ জগতের প্রচারিত কোনও রাজনৈতিক মতবাদকেই নিঃস্বার্থ নিরভিসন্ধিমূলক বলিয়া মনে করে না। সম্ভবতঃ তাহারা সকল মতবাদকেই পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির রাজ্য-বিস্তারের কৌশল বলিয়া মনে করে। ইহার মূলে রহিয়াছে আফ্রিকাবাসীর উপর পাশ্চাত্ত্য জাতিসমূহের বহুকালের নির্যাতনের ইতিহাস—রহিয়াছে দাস ব্যবসায় ও ক্রীতদাস নিপীড়নের ইতিহাস। পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাসে দেখা যায়, অতীতকালে দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও অনাবৃষ্টি প্রভৃতি হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্যই বহুবিধ বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। কিন্তু আফ্রিকার বিগত একশত বৎসরের ইতিহাসে দেখা যায়, আফ্রিকা দেশ হইতে শ্বেতজাতিসমূহের অপসারণের জন্য কৃষ্ণকায় আফ্রিকানগণ যে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন তাহাতে গবাদি, মেষ প্রভৃতি যে-সংখ্যা উৎসর্গীকৃত হয় তাহাতে আফ্রিকার এক অংশ হইতে এই সকল প্রাণী কিছু কালের জন্য সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। অবশ্য যজ্ঞের ফলে শ্বেতজাতির অপসারণ ঘটে নাই। কিন্তু ইহার দ্বারা আফ্রিকাবাসীর নির্যাতন ও নিপীড়নের গভীরতা অনুভব করা যায় (Dr. W. E. B. Du Bois)।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রতিনিধি ডাঃ বাঞ্চ বলেন, স্বাধীনতা ঘোষণার পরে বেলজিয়াম বাহিনী কঙ্গোরাজ্যে ফিরাইয়া আনাই বর্ত্তমান সঙ্কটজনক পরিস্থিতির মূল কারণ। পৃথিবীর অগ্রগতি কোনও শক্তি রোধ করিতে পারে নাই ও পারিবে না। দেবতার বাণী আনিয়াছে মুক্তি, জোগাইয়াছে শক্তি, মানুষকে করিয়াছে নির্ভয় ; মানুষের ছদ্মবেশে দানব আনিয়াছে দ্বেষ হিংসা ভ্রান্তি—আনিয়াছে বন্ধন, ভয়। কিন্তু বিশ্বে চলিতেছে দেব ও দানবের সংগ্রাম।

চিরন্তনী

শ্রীপুষ্প দেবী

সত্যিই চমৎকার! একবোঁটায় দুটি ফুলের মত সুন্দর সরল শিশুর মত মন নিয়ে তারা দু'জনে সংসার আরম্ভ করল। কিষাণ সত্যি সত্যিই ভাল স্কলার। আই-সি-এস পাস করেছে সে। মা-ভায়ের সে কী আনন্দ! অনেক দুঃখ-ঝঞ্ঝার পর যেন আবার সংসারে নতুন সূর্য্যের আলো দেখা দিল। বাপ গেছেন শিশু অবস্থায় কিষাণকে রেখে। সামান্য বিষয়টুকু বজায় রেখে অনেক কষ্টে বড় ভাই সংসার চালালেও কিষাণের পড়ার খরচ তাঁর দেবার সামর্থ্য ছিল না। এ সময় সাহায্য করলেন ভগ্নিপতি। নিজে থেকে বললেন—পড়া তুমি ছেড় না কিষাণ; যা লাগবে আমি দেব, আমিও তো তোমার দাদাই। আজও সেকথা ভাবতে গেলে কিষাণের চোখে জল ভরে আসে। পরে শুনেছিল ঐ পড়ার খরচ জোগাতে প্রৌঢ় ভদ্রলোক গোপনে টিউশানি নিয়েছিলেন। সব সার্থক করে কিষাণ সত্যি সত্যিই কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করেছিল। ক্লাস ওয়ান ইনকামট্যাক্স অফিসার হয়ে গ্রাজুয়েট সুন্দরী গৌরীকে বিয়ে করে প্রথম সংসারী হয়ে সে এল কোলকাতায়।

গৌরী, সত্যি সত্যিই গৌরী! ধনীকন্যা হয়েও সে স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণ করে নিল স্বামীর সহধর্ম্মিণী হয়ে। কোলকাতার বিলাস মাঝে মাঝে দু'জনকে প্রলুব্ধ করে। যতই হোক তাদের কতই বা বয়েস? কিন্তু আত্মীয় পরিজনের প্রতি কর্ত্তব্য স্মরণ করে তারা সে সব মোহ থেকে দূরেই ছিল। একদিন দু'জনের সাধ হ'ল, তারা 'নীরায়' চা খাবে। দু'জনে কত কল্পনা, কত জল্পনা। তাদের সংসারে এ খবরটুকু কম নয়! কাজেই তার মূল্য তাদের কাছে প্রচুর। কি রংএর শাড়ী পরবে গৌরী, ঠিক করে দিল কিষাণ। আর গৌরী বলে দিল কি রকম স্যুট পরতে হবে কিষাণকে।

একই বাড়ীর ফ্ল্যাটে আমরা থাকি। সম্পূর্ণ ভিন্ন-দেশীয় হলেও তারা আমায় শুধু 'মা' বলেই ডাকত না, ভালোও বাসত মায়ের মতই। তারা পাঞ্জাবী, আমি বাঙালী। তবু ভাষার অভাব আমাদের আলাপে ব্যবধান আনতে পারে নি। শুধু গল্প নয় মায় রবীন্দ্রনাথের কবিতাও গৌরীকে কতদিন বুঝিয়েছি। মেয়েটি সত্যি সত্যিই বুদ্ধিমতী। দেখেছি কবিতার রস ও মর্ম্মার্থ সে ঠিকই গ্রহণ করতে পারত। তার এই বুদ্ধিমত্তার প্রশংসায় সবচেয়ে খুশী হ'ত কিষাণ। আমি যখন তাকে বলতাম—গৌরী খুব ইন্টেলিজেন্ট মেয়ে। কিষাণের সুগৌর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠত। সে ভারি খুশী হয়ে বলত—ঠিক বাত, আমি ত বুদ্ধু আছি।

সেদিন যে ওদের 'নীরা'য় চা খাবার কথা, তা আমার মনে ছিল না। দুপুরে বসার-ঘরে বসে আমি বই পড়ছি, হঠাৎ পায়ের আওয়াজে চেয়ে দেখি গৌরী খুব সেজে নামছে সিঁড়ি দিয়ে। আমি একটু হেসে আবার বইয়ে মন দিলাম। সন্ধ্যে বেলা হঠাৎ কিষাণের আবির্ভাব। মাতাজী, গৌরী কাঁহা? আমি বললাম—সে ত অনেকক্ষণ বেরিয়ে গেছে। কিষাণ ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেল। তার প্রায় আধ ঘন্টা বাদেই এল গৌরী, বললে—মাতাজী, কিষাণ আয়া? আমি বললাম—সে ত একটু আগেই তোমায় খুঁজছিল। আবার চলে গেল।

শেষে যা বুঝলাম বিভ্রাট বাধিয়েছে গৌরীর ঘড়ি। গৌরীর রিষ্ট-ওয়াচ্‌টি ছিল ভারি খামখেয়ালী। যখন-তখন সে যেত বন্ধ হয়ে। সেই ঘড়ি দেখে গৌরী যখন 'নীরায়' গিয়েছিল, তখন চারটে বেজে গিয়েছিল অনেকক্ষণ। পথের ঘড়ি দেখেও গৌরীর মনে দ্বিধা জাগে নি যে, সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। নিজের সেই ঘড়ির উপর নির্ভর করে সে যখন পৌঁছল 'নীরা'য় তখন বসে বসে অধৈর্য্য হয়ে কিষাণ বাড়ী ফিরেছে গৌরীরই সন্ধানে। এমনিভাবে দুটি কিশোর-কিশোরী কোলকাতার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত বাসে-ট্রামে ঘোরাঘুরি করে যত বা ক্লান্ত হয়েছে, পরস্পরের অভিমানও জমেছে ঠিক ততই গভীর হয়ে। কিষাণের পাশের ফ্ল্যাটেই থাকত তারই এক সতীর্থ ও সহকর্ম্মী প্রশান্ত। সে অবিবাহিত—কাজেই একই চাকরি হলেও তার অর্থের কিছুটা প্রাচুর্য্য ছিল। সে সব শুনে দেখল বিপদ।

বুঝল, আবার 'নীরা'য় যাওয়া ওদের পক্ষে সম্ভব নয়। এ ধারে অত বড় সাধে বাধা পড়ায় দু'জনের মনে যে মেঘের সঞ্চার হয়েছে তাও সহজে যাবার নয়। অনেক ভেবেচিন্তে সে এসে আমায় বললে—চলুন মাসীমা, কাল

সবাই মিলে কোন হোটেলে যাওয়া যাক, ওদের নিষ্পত্তি হয়ে যাবে ব্যাপারটার। আমি বললাম—তোরা যা বাবা, আমার ওসব হৈ-চৈ পোষায় না এ বয়সে।

হবি কি হ, সেই দিনই দুপুরে আমার ধরল 'কলিক'। প্রশান্তকে ডেকে বললাম—আজ আর তোরা হোটেলে যাস নি চা খেতে। উনি কোর্টে, আমার শরীরটা তত ভাল লাগছে না। প্রশান্ত ত ব্যস্ত হয়ে ওষুধ-ডাক্তারের ব্যবস্থা করল। তার পর বললে—আমি একটু ওপর থেকে ঘুরে আসছি। আমি ভাবলাম চা-টা খেতে গেল হয়ত! ফিরতে জিগ্যেস করলাম—কোথা গিয়েছিলি? প্রশান্ত বললে—গৌরীজীকে পাঠিয়ে দিলাম বির্জ্জুকে দিয়ে। আমি বললাম—কোথায়? ও বলল—আজ আমাদের 'গ্লীভায়' যাবার কথা ছিল না?

কথা ছিল কিষাণ অফিস থেকে সোজা যাবে, আর আমি এখান থেকে গৌরীজীকে নিয়ে যাব। তা কিষাণ বেচারা আশা করে বসে থাকবে? তাই বির্জ্জুকে দিয়ে ওকে ট্যাক্সী করে পাঠিয়ে দিলাম। আমিই ত ওদের নেমন্তন্ন করেছিলাম। আমি বললাম—কিষাণ যে ওধার দিয়ে যাবে তা আমায় বললি না কেন? তা হলে তোদের যেতে আমি বারণ করতাম না, আবার না বিভ্রাট বাধে।

সন্ধ্যে হব হব, এমন সময় কিষাণ এসে ধপ করে আমার খাটের উপর বসে পড়ল। বেচারা তখন এত উত্তেজিত যে, ওষুধ—হটু-ওয়াটার ব্যাগ কিছুই তার লক্ষ্য হ'ল না। খুব রেগে বলল—কেয়া তাজ্জব কা বাত প্রশান্ত—হাম ত বৈঠকে বৈঠকে হক গিয়া—তোমলোককা যানে কো বাত নেহি 'গ্লীভা'মে? প্রশান্ত বলল—গৌরীজী নেহি গিয়া? কিষাণ যা বলল তার মর্ম্মার্থ এই যে, সে বেচারা বসে কাপের পর কাপ চা অর্ডার করেছে, এ ধারে এদের দেখা নেই। সে বলল—আমি যে কি খাচ্ছি তা নিজেই বুঝতে পারছি না, আমার চোখ শুধু গৌরীকে খুঁজছে।" অনেক করে আমার অসুখের ব্যাপার বলে প্রশান্ত ত তাকে ঠাণ্ডা করে। এধারে বির্জ্জু একা ফিরে এল, সে বলে গৌরীজী তার মামার সঙ্গে কোথায় বেড়াতে গেছে। ব্যাপার আরও গুরুতর হয়ে উঠল—দ্বিগুণ অন্ধকার ঘনিয়ে এল কিষাণের মনে।

গৌরী যখন ফিরল, তখন গৌরীর মুখ ভ্রূকুটী-কুটীল—অনেক কষ্টে যা বুঝলাম তাতে গৌরী 'গ্লীভা'য় গিয়ে বির্জ্জুকে বললে কিষাণকে খোঁজ করতে। বির্জ্জু বেচারা কানা—একটা চোখে সে আর কত ভাল দেখতে পারে? তা ছাড়া ভাল বাঁবুর্চি বলেই তাকে রেখেছে প্রশান্ত, ভাল দেখতে পায় বলে নয়। আর বুদ্ধিটাও তার দেহের অনুপাতে কম। সে দেশ-বিদেশে ঘুরেছে হাকিম সাহেবের সঙ্গে। তার জ্ঞান নেই যে, কোলকাতাটা চাটগাঁ বা মালদহ নয়। প্রকাণ্ড হোটেলে সে গিয়ে কাকে জিজ্ঞেস করেছে—কিষাণ সাব হ্যায়? বয়ও নির্ব্বিবাদে বলেছে—নেহি হ্যায়। সেও সেই খবর জানিয়েছে গৌরীজীকে। এমন সময় সেখানে গৌরীর এক মামার সঙ্গে দেখা। গৌরী তাকে বলেছে, ভেতরে কিষাণকে খুঁজে দেখতে। মামা বেচারা ভাগ্নী-জামাইকে প্রায় চেনেই না। দীর্ঘ দু'বছর আগে বিয়ের রাতে একবার দেখেছিল। সে ঘুরে এসে বলল—না, দেখতে পেলাম না ত? এই কথা শুনে গৌরী ফিরে এসেছিল, মামাই তাকে তাঁর নিজের বাসায় নিয়ে গিয়ে চা খাইয়ে পৌঁছে দিয়েছেন।

পর দিন সকালে উঠে শুনি, বিভ্রাট—গৌরী ধানবাদে চলে যাচ্ছে তার বোনের কাছে, সাত দিনের জন্য। আর কিষাণ ছুটির দরখাস্ত করেছে, সে বলেছে—কাজ ত করতেই পারব না, শুধু শুধু অফিস যাওয়া কেন? আমি বললাম—তবে তুমিও কেন যাও না ধানবাদে? কিষাণ নিরুত্তর রইল, বুঝলাম এটা গৌরীর প্রতি অভিমান।

তখন শ্রাবণ মাস চলছে—বৃষ্টির বিরাম নেই। প্রশান্ত ছুটি নিয়েছিল তার একটা পরীক্ষার জন্যে। এধারে বিপদ হ'ল কিষাণকে নিয়ে। সে নিজেও কিছু করতে পারছে না—আর অপরকেও কিছু করতে দেবে না। ভিন্ন-দেশীয় বলেই হোক, বা অত্যধিক সরল বলেই হোক—কুণ্ঠা সঙ্কোচ তার একটু কম। কখনও এসে বলছে,—মাতাজী, গৌরীকা প্রেম বলবৎ নেহি হ্যায়, হাম ত কভি উসিকো ছোড়নে নেহি সেকৃতা, ইত্যাদি। দেখলাম শ্রাবণের আকাশের মতই বর্ষণোন্মুখ হয়ে রয়েছে কিষাণের মন—মনে পড়ল নিজেদের ছোটবেলার কথা—কত তুচ্ছ ঘটনা কি বড় হয়েই না দেখা দিত তখন—কিন্তু সত্যি কি তুচ্ছ? কে জানে?

চিন্তাসূত্র ছিন্ন করে দিল—কে যেন কড়া নাড়ছে, দেখি,মেয়ের শ্বশুরবাড়ী থেকে পাঠিয়েছে গঙ্গার ইলিশ—। বিকালে মনে হ'ল প্রশান্ত আর কিষাণকে বলি খেতে। তা ছাড়া কিষাণের যা মনের অবস্থা নেহাৎ নেমন্তন্ন বলেই যদি খেতে বসে। খেতে বসে এক বিভ্রাট। গৃহকর্ত্তা ও প্রশান্ত মনের আনন্দে বর্ষায় খিচুড়ী সহযোগে ইলিশ মাছ খেয়ে চলেছে। এদিকে কিষাণের অবস্থা কাঁদ কাঁদ। তবু মাছ দেখে দুঃখু ততটা হ'ল না। কারণ গৌরী মাছ খায় না। কিন্তু তার পর যখন শেষ-পাতে সন্দেশ দিলাম, বলি, বড়ি বহিন পাঠিয়েছে, তখন তার সত্যি সত্যি চোখে

জল। আমার বড় মেয়েকে গৌরী বড়ি বহিন বলত। ভালোওবাসত ঠিক বোনের মতই। সেই বড়ি বহিন সন্দেশ পাঠাল, আর গৌরী কিনা খেতে পেল না। ক্ষুব্ধ হয়ে কিষাণ বলে উঠল—সন্দেশটাও যদি বড়ি বহিন সকালে পাঠাত গৌরী খেতে পেত। পরিহাস-তরল কণ্ঠে প্রশান্ত বললে—চাই কি মন-মেজাজ ভাল হলে ধানবাদ যাওয়াও বন্ধ হতে পারত।

কিষাণ কিন্তু ঠাট্টা বুঝল না। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—হোনে ভি সেকতা। এর পর সে-সন্দেশ মুখে তোলার সামর্থ কিষাণের হ'ল না—সন্দেশ পাতেই পড়ে রইল।

পর দিন সত্যি সত্যিই জ্বর হ'ল কিষাণের। চার—পাঁচ দিন ধরে জ্বর। অথচ ডাক্তারও দেখায় না, ওষুধও খায় না, চুপচাপ শুয়ে থাকে। একদিন বিকেলে তার কুশল জানতে গিয়ে দেখি, সে চিঠি লিখছে গৌরীকে। আমায় দেখে ভারী খুসী হয়ে বসতে বলে বললে,—আচ্ছা মাইজী, আমার অসুখ শুনে আর কি গৌরী থাকতে পারবে? এ চিঠির উত্তরে সে নিজেই চলে আসবে নিশ্চয়। তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে আমিও বললাম—নিশ্চয়, তাতে কি কিছু সন্দেহ আছে? আনন্দের আতিশয্যে কিষাণ উঠে বসল খাটের উপর। বললে—যদিও আমি তাকে আসতে বলি নি, দু'দিনের জন্য আনন্দ করতে গেছে করুক না - লিখেছি সামান্য অসুখ তুমি ব্যস্ত হয়ো না। কিন্তু মা, আপনি জানেন না ওর কিরকম নরম মন, আমার একবার জ্বর হয়েছিল, ও ভাবনায় সারারাত ঘুমোয় নি।

কিন্তু এমনি কিষাণের দুরদৃষ্ট, গৌরী ঠিক দিনেও ফিরল না। তার বদলে চিঠি এল যে, এখানকার লেকে মঙ্গলবার বাঁচ খেলা আছে, আমি দেখে তবে ফিরব।

এ চিঠির পর ধৈর্য্য ধরা কিষাণের পক্ষে সত্যি সত্যি শক্ত। সে বলল—আমিও লিখব—এখানেও লেক আছে তবে বাঁচ খেলা দেখবার জন্যে নয়, আমার ডুবে মরার জন্যে। মহা বিপদে পড়লাম আমরা, কি করে এ পাগলকে সামলাই—প্রশান্ত বিব্রত হয়ে অনবরত কিষাণকে গীতার নিষ্কাম প্রেম, দান্তের ও প্লেটোনিক লাভ বুঝাতে লাগল—পরীক্ষা তার মাথায় উঠল। কিষাণ কিন্তু সব শুনে মাথা নেড়ে বলল—চুপ কর, তোমার বাজে বকুবকানি—ওরকম হয় না, যা বোঝ না তা নিয়ে কথা বল না। আমরা দিনে দিনে কিষাণের সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম—আর সত্যি কথা বলতে কি, মনে মনে গৌরীর ওপর রাগ হচ্ছিল, সে হতভাগা মেয়ে কী বলে স্বামীর অসুখ শুনে চুপ করে বাঁচ খেলা দেখতে বসে রইল?

তাই সেদিন কিষাণ যখন বলল—আচ্ছা,মাইজী বলুক কার কসুর আছে? আমি অকপটে গৌরীর দোষই স্বীকার করলাম, কিন্তু আশ্চর্য্য কাণ্ড,কিষাণ যেন আন্তরিক ভাবে আমায় সমর্থন করল না বরং প্রশান্তর নিষ্কাম প্রেম সম্বন্ধেই সে যেন বেশী আগ্রহান্বিত মনে হ'ল!

সেদিন সন্ধ্যেবেলা আমি রান্নাঘর থেকে ফিরে দেখি উনি কোর্ট থেকে ফিরেছেন আর কিষাণ ওঁর পাশে বসে ওঁকে বোঝাচ্ছে—আমরা যেন ওদের জন্যে বেশী না ভাবি, খুব সহজেই এটা মিটে যাবে, প্রথমে একটু রাগারাগি কান্নাকাটি হয়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। কারণ একি সম্ভব যে, কিষাণ রাগ করে থাকবে গৌরীর ওপর? না গৌরী পারবে কিষাণের ওপর রাগ করে থাকতে?

বাঙালী কি লেড়কী

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

ইতিহাসের নাকি পুনরাবৃত্তি হয় লোকে বলেন। হয়ত হয়। এবারেও অনেকটা হয়েছে যেন দেখছি। সেই হস্তিনাপুর—সেই রাজধানী ভীষ্ম দ্রোণ কুরুকুলপতি অন্ধ রাজা ধার্ম্মিক রথী-মহারথী পণ্ডিত ভরা রাজসভায় দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা হয়েছিল। জালায়ন নেপথ্যবর্ত্তিনী অন্তঃপুর-নারীদের দৃষ্টির সামনেই।

কত হাজার বছর আগের ঘটনা—কিন্তু যেন মনের ওপর দাগ কেটে রেখে গেছে। আজও কি তারই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে? সেই ভারতবর্ষ সেই এক ধর্ম, এক রাজ্যশাসক, 'ঐক্যে'র 'বাক্যে' মুখরিত ধার্মিকই (অন্ধ) শাসকবর্গ, সেই দেশেরই একপ্রান্তে এক জাতি, এক-ধর্মীয় নারীদের লাঞ্ছনা আর শিশু-হত্যা সুরু হয়ে গেছে। চলছে এখনো। পুরুষদের হত্যার কথা তো ছেড়েই দিই, তাঁরা আত্মরক্ষা করলেও করতে পারেন, না পারলে মরেই যান। কিন্তু নারীর লাঞ্ছনা, চরম অপমান শক্তিশালী দলবদ্ধ পুরুষের হাতে—তাকে কি বলব? এবং নিষ্ক্রিয় রাজশক্তি, শাসকশক্তি বড় বড় কথা নিয়ে বিশ্রম্ভালাপ, লঘু পরিহাস, তিক্ত মন্তব্য, মৌখিক আশ্বাস—তাকে কি বলব?

শুধু মনে পড়ে যায় ভারত ইতিহাসের সেই সাল-তারিখহীন একটি দিনের কথা। রাজকুলবধূর লাঞ্ছনা অপমানের জলন্ত একটি চিত্র। যে কথা ভারতবর্ষের শিক্ষিত-অশিক্ষিত ধনী-নির্ধন সব নরনারীর চল্লিশ কোটি আবালবৃদ্ধবনিতার জানা। এবং তার পরিণাম কি হয়েছিল তাও তাদের জানা। মনকে জিজ্ঞাসা করি ইতিহাসের কি পুনরাবৃত্তি হবে?

এখন একটি পুরাতন ঘটনার কথা বলি। তখন ব্রিটিশ আমল। পঞ্জাববাসিনী একটি ইংরেজ কন্যা, নামটা (যুগান্তর সম্পাদক মহাশয়ের বক্তৃতায় জানলাম মিস্ এলিস্) মনে ছিল না। তাঁকে অপহরণ করে নিয়ে যায় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দেশবাসী উপজাতীয় কোনও দল।

দেশে-বিদেশে বিলেতের তাঁর স্বদেশবাসী—তাঁর বন্ধু-বান্ধব রাগে ক্ষোভে আকুল হয়ে উঠলেন। এদেশ-বাসীরাও বিচলিত হলেন। নারীর অবমাননার কথা ভেবে। একেবারে গবর্ণমেণ্ট থেকে উচ্চ নিম্ন পদস্থ সৈন্য থেকে সাধারণ সকলেই তাঁর উদ্ধারের চেষ্টায় নিযুক্ত হ'ল। আন্দোলন করতে লাগল। মাস খানেকের মধ্যেই সেই ইংরেজ-কন্যা বা রাজজাতির কন্যাকে উদ্ধার করে আনা হ'ল। সম্পূর্ণ সুস্থ শরীর মনে তাঁকে ফিরে পাওয়া গেল।

তার পরে মনে হয় কিছুদিনের মধ্যেই বোম্বাইয়ের কোনও প্রদেশে অনুরূপ একটি ঘটনা হয় (ঠিক আমার সব কথা মনে নেই)। রবীন্দ্রনাথ সেই সময়ে ঐ প্রসঙ্গে সেই প্রদেশবাসীদের জিজ্ঞাসা করেন, এই ঘটনায় তাঁরা কি কিছু উদ্ধারের বা সাহায্যের ব্যবস্থা করেছেন?

তাঁরা আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। সেই মেয়েটার জন্য? তাঁদের কি ভাবনা? সহজ নির্বিকার মনে বললেন, 'উয়ো তো বানিয়া কী লেড়কী থী'। অর্থাৎ আরে, সে তো বেনেদের ঘরের মেয়ে! তাঁদের কি তাতে? তাঁদের আত্মীয়া আপনজন কুটুম্বিনী স্নেহাস্পদা বান্ধবী তো সে নয়। তার জন্য তাঁরা কিছু কেন করবেন? কি অদ্ভুত কথাই যে কবি বললেন!

তাঁদের আশ্চর্য্য হওয়ায় কবিও আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন, বলা বাহুল্য। কবির লেখা ঐ প্রসঙ্গটী 'প্রবাসী'তে পড়েছিলাম। বছর ত্রিশ কি আরো আগে, ঠিক মনে নেই।

আজকে হস্তিনাপুরবাসী 'ঐক্য'বাণী 'বাক্য'বিলাসী শাসকবর্গও ঐরকমই আশ্চর্য হয়ে গেছেন মনে হচ্ছে। মনে মনে হয়ত বলছেন, 'আরে উয়ো তো বাঙালী কি লেড়কীয়োঁ-জানানীয়াঁ হায়···মেরা কৌন্ হায়।' (ওরা তো বাঙালীর মেয়ে···। আমাদের কে ওরা?···")

লোকক্ষয়? প্রজাক্ষয়? তা কিছু ক্ষয় হয়েছে তো হোক। 'পরিবার পরিকল্পনা'য়, 'খাদ্যসমস্যায়' 'গৃহসমস্যায়' সাহায্য হবে খানিকটা।

কারণ সেটাতে তো তাঁদের প্রদেশের কিছু ক্ষয়-ক্ষতি হয় নি।

বিপ্লবীর জীবন-দর্শন

প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী

২০

বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড ভিন্ন চলতে পারে না, একথাটা আমাদের দেশের বাদশা-আমীররা বুঝতে পারেন নি। তা নইলে যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাহেবরা বাদশাহের দরবারে কুর্ণিশ করে প্রবেশ করতে পায়, আর আমীর ওমরাহদের খোসামোদ করে কুঠি করে ব্যবসা শুরু করতে বাধ্য হয়, তাদেরকে কিছুতেই আভ্যন্তরিণ আত্মকলহের অংশ গ্রহণ করতে দিতে পারতেন না। ইংরেজরা কিন্তু কথাটা ভাল করেই জানত। সুতরাং তারা নির্ভুলভাবে ঘুটি চালিয়ে কাঁটা দিয়ে কাঁটা অপসারণ করে নিজেরা নিষ্কণ্টক হলেন।

কোম্পানীর শ্রীবৃদ্ধি দিন দিন শশীকলার মত বাড়তে লাগল। যে সব ইংরেজ এদেশে এসে লুঠের অংশে ভাগ নিতে পারল না তারা কিন্তু ব্যাপারটা সহজে ছেড়ে দিতে চাইল না। সুতরাং আলোচনা ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট ভবনে প্রবেশ করল। ১৭৭৩ খ্রী: রেগুলেটিং এক্ট নামে যে আইন পাস হলো তার বলে রাজার মন্ত্রীসভা কোম্পানীর ডাইরেক্টরদের কাগজপত্র পরীক্ষা করবার ক্ষমতা লাভ করল। তারা কোম্পানীর আভ্যন্তরিণ অবস্থা জানবার সুযোগ পেল। আরও ঠিক হলো যে, গবর্ণর জেনারেলের সঙ্গে চারজন পরামর্শদাতা ও কর্মকর্তা থাকবে। এরা কাউন্সিলার নামে অভিহিত হত। গবর্ণর জেনারেলের সঙ্গে এই পরামর্শদাতাগণের কলহের অন্ত ছিল না। ওয়ারেন হেষ্টিংস ও ফ্রান্সিস প্রভৃতির সঙ্গে কলহ ইতিহাস প্রসিদ্ধ। পার্লামেণ্টেরই নির্দেশে বিচার-কার্য পরিচালনার জন্ত সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হলো।

১৭৮৪ খ্রী: বিলাতের প্রধানমন্ত্রী পিট সাহেব আর একটি আইন পাস করিয়ে কোম্পানীর কাজ পরিচালনার জন্ত বোর্ড অফ কণ্ট্রোল গঠিত করলেন। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ছ'জন কমিশনারের দ্বারা গঠিত হলো এই নূতন বোর্ড। সরকার-নিযুক্ত এই নূতন বোর্ড এবং কোম্পানীর বোর্ড অফ ডাইরেক্টর এই দুই বোর্ডই ভারত শাসন করতে থাকে এবং এ দ্বৈত শাসন ১৮৫৮ সন পর্যন্ত থাকে।

১৮৫৮ সনে সিপাহী বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ সরকার কোম্পানীর রাজত্ব তুলে দিয়ে নিজেদের হস্তে শাসনভার গ্রহণ করলেন। 'ভারত সুশাসন আইন' (Act for the better Government of India) পাস হলো! পূর্বোক্ত দ্বৈত শাসন তুলে দিয়ে একজন ভারত সচিব (Secretary of State for India) নিযুক্ত হলেন ১৫ জন পরামর্শদাতা (Councillor) সহ। আর ভারতবর্ষে এলেন গবর্ণর জেনারেল রাজ-প্রতিনিধি হয়ে।

ভারতের জনসাধারণ কিন্তু জানতে পারল মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারত সাম্রাজ্ঞী হয়েছেন এবং নিজ হস্তে ভারত শাসন গ্রহণ করেছেন। ১৮৫৮ সনেই এক ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘোষণায় শপথ করলেন—ভারতবর্ষে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে সমান সুবিধা ও অধিকার ভোগ করবে, কাহারও ধর্মে হস্তক্ষেপ করা হবে না।

শুধু যে সাধারণ লোকই এই ঘোষণায় আস্থা স্থাপন করে আশান্বিত হয়ে উঠল তাই নয়, রাজনীতিকরা পর্যন্ত তারপর পঞ্চাশ বৎসর এই ঘোষণার দোহাই দিয়ে নিজেদের দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলন এবং আবেদন-নিবেদন চালিয়ে গেলেন! এই ঘোষণার অসারতা বুঝতে পঞ্চাশ বছর লেগে গেল! প্রকৃত অবস্থা সাধারণ লোকের হৃদয়ঙ্গম হয় ১৯০৫ সনের স্বদেশী আন্দোলনের সময়। একেই বলা যায় সত্যিকারের নিদ্রাভঙ্গ। অবশ্য একদল লোকের আবেদন নিবেদনে অচলা ভক্তি-বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত বজায় ছিল। যাই হোক এই ক্রম বিবর্তনের কথা পরে যথা স্থানে আলোচনা করবো।

ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট নিজহস্তে শাসনভার গ্রহণ করার পূর্বের ভারতবর্ষের চিত্র অতি অন্ধকারময়। শুধু ঘোরতর অরাজকতা বিরাজ করছিল বললে কিছুই বলা হয় না। অত্যাচার, অবিচার, লুণ্ঠতরাজ, বাংলাদেশে বর্গীর হাঙ্গামা—লোকের ধন-প্রাণ এমনকি অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপর্যস্ত! সর্বোপরি দেশীয় রাজাদের মধ্যে অন্তহীন কলহ, ইংরেজ-ফরাসীর ভারতবর্ষের জমিদারী দখলের দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধ—সব মিলে জনসাধারণ এমনি আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল যে সামান্তমাত্র শান্তির ইঙ্গিতে তারা

অনেকটা আশ্বস্ত বোধ করল। তদুপরি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অত্যাচারও তখন পর্যন্ত লোকের স্মৃতিপট মসিলিপ্ত করা। তারা দেশীয় সব ব্যবসা শুধু নিজেদের করতলগত করল না, বস্ত্র ও অন্যান্য শিল্প নিষ্ঠুরভাবে ধ্বংস করল। চাষীর স্বাধীনতা রইল না জমি চাষের। কোন জমিতে কি চাষ করবে, নীলচাষের জমির পরিমাণ কত হবে তা সবই তাদের নির্দেশে হবে। এমনি পরিবেশের মধ্যে মহারাণীর ঘোষণায় লোক মনে করল সত্যই বুঝি মহারাণী প্রজাসাধারণের মঙ্গল চিন্তায় চিন্তান্বিত।

কূটনীতিজ্ঞ ইংরেজের প্রচারে সবাই বুঝল মুসলমান রাজা-বাদশারা ছিল ঘোর অত্যাচারী। একমাত্র নবাব সিরাজদ্দৌলার অত্যাচারের কত গল্প প্রচলিত ছিল! গল্প শুনতাম যে,নবাব-বাদশাহদের পৈশাচিক সখ প্রবৃত্ত করার জন্য গর্ভবতী স্ত্রীলোকের পেট চিড়ে সন্তানের অবস্থান দেখানো হত! যাত্রীসহ নৌকো মাঝ-নদীতে ডুবিয়ে দিয়ে লোকগুলির অসহায় দুরবস্থা নাকি তাদের কাছে আনন্দ-দায়ক হতো! এজন্য তারা লোকের ঘরবাড়ীতে আগুন দিতেও নাকি দ্বিধা-বোধ করতেন না। সুন্দরী স্ত্রী ঘরে রাখা নাকি একেবারে সাধ্যাতীত ব্যাপার ছিল। এবং তার ফলেই নাকি পর্দা বা ঘোমটার প্রবর্তন হয়। এমনিতর অকথ্য অত্যাচার নাকি বেশীর ভাগ হিন্দুদের উপরই হতো। শুনেছি যে, সর্বজনমান্য নিষ্ঠাবান হিন্দু জমিদারদের ধরে "বৈকুণ্ঠ বাস" অর্থাৎ বিষ্ঠাপূর্ণ গর্তে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করে রাখা হতো।

মুসলমানদের অত্যাচারের কাহিনী যে আদপে মিথ্যা ছিল তা নয়। তবে ইংরেজরা নিজেদেরকে ভাল প্রতিপন্ন করতে আমীর-নবাবদের অত্যাচারের কথা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে রং লাগিয়ে প্রচার করার জন্য অনেক কাল্পনিক গল্প জুড়ে দিত। ইংরেজ আমলে অনেক নারকীয় অত্যাচারই আর তেমন ছিল না; কিন্তু তাদের অত্যাচার নতুন পথে প্রবাহিত হলো। নিজের দেশের শিল্প বিপ্লব (Industial Revolutiron) সফল করবার জন্য শাসনের লৌহচক্রের নীচে এত বড় একটা জাতির সমস্ত রক্ত শোষণ করবার পাকাপাকি ব্যবস্থা হলো।

ইংরেজরা 'মগের মুল্লুকের' অবসান করলো, রদ করলো মগ দস্যু এবং "কাজির বিচার"। সুতরাং জনসাধারণ অনায়াসে ইংরেজের বিচারে আস্থাবান হলো। প্রাক ব্রিটিশ যুগে বিচার করত মুসলমান কাজিরা। কাজি কথার অর্থই হচ্ছে বিচারক। লোক আশা করতো যে, তারা বিচারের জন্য নির্ভর করবেন ন্যায় ও ধর্মের উপর। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের বিচার একটা খামখেয়ালীর প্রহসন ভিন্ন আর কিছুই ছিল না অধিকাংশ ক্ষেত্রে। একে ত কোন লিপিবদ্ধ আইন ছিল না, তদুপরি গোড়া ধর্ম-প্রণেতা মুসলমানই হতো বিচারক। তারা নাকি ঘোরতর হিন্দু-বিদ্বেষী হতো এবং ন্যায়-অন্যায়ের ধার ধারত না। এখনও লোকে খামখেয়ালী বিচারকে "কাজির বিচার" বলে ব্যঙ্গ করে!

তখনকার দিনে আদালতের ভাষা ছিল ফার্সী। হিন্দু ভদ্রলোকেরাও তখন এ ভাষা লিখতে শিক্ষা করতো। ইংরেজ আমল আরম্ভ হওয়ার পরও অনেক দিন পর্যন্ত এই ফার্সী ভাষা আদালতে ব্যবহার হতো। যতদূর মনে পড়ে ১৮৩৩ খ্রীঃ ফার্সীর বদলে ইংরেজী ও বাংলা আদালতের ভাষারূপে স্বীকৃত হয়। এখন পর্যন্তও অনেক ফার্সী শব্দ আদালতে ব্যবহৃত হয় এবং কোর্টের নোটিশ ও দলিলপত্রাদি ফার্সী শব্দ পূর্ণ থাকে এবং ফার্সী রীতি অনুসারেই লিখিত হয়।

সে যাই হোক, 'কাজির বিচার' থেকে রেহাই পেল এই ধারণা মানুষের মনে স্থান পেল। আইনের চোখে সকলেই নাকি সমান—জমিদার-প্রজা, ধনী-দরিদ্র কোন ভেদ নেই, এই বিশ্বাসই মানুষের মনে ঠাঁই পেলো প্রচারের দ্বারা। এই প্রত্যয় ক্রমে এমন দৃঢ় হলো যে, ইংরেজ শাসনের শেষ দিন পর্যন্তও অনেকের মন থেকে ইংরেজের সুবিচার এবং ন্যায় নিষ্ঠার উপর অগাধ আস্থা ছিল। ভাবতে কৌতুক বোধ হয় যে আদালত ব্যয়-বহুল স্থান এবং দরিদ্র এ ভার বহনে অক্ষম এ জেনেও লোক ইংরেজের আইন-আদালতে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল! বোধ হয় 'কাজির বিচারের' প্রহসন থেকে রক্ষা পেয়েই তাদের এমনি ধারণা জন্মেছিল।

তবে শ্বেতাঙ্গের হাতে ভারতীয়দের লাঞ্ছনার কথা এবং অত্যাচারীর বেকসুর খালাসের কথা যে মাঝে মাঝে প্রচারিত হতো না তা নয়। কিন্তু লেখাপড়া জানত না বলে জনসাধারণ এ সব কথা বেশী হৃদয়ঙ্গম করতে পারত না। তারা দেখতে পেলো এবং জানত যে, ইংরেজ 'মগের মুল্লুকের' অবসান করেছে, স্থাপিত হয়েছে শান্তি, সুন্দরী স্ত্রী ঘরে রাখতে আজ আর কোন বাধা নেই এবং রাস্তায় চলাফেরার বিপদও কেটে গেছে, উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ বিদূরিত—অস্পৃশ্যও লেখাপড়া শিখলে উচ্চ পদ পেতে তার কোনই বাধা নেই। হাইকোর্টের ন্যায়-বিচারে চিরকালই মানুষের গভীর বিশ্বাস ছিল।

দুর্ভিক্ষ বলতে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যা বোঝায় তা পূর্ববঙ্গে বোধহয় ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর আর হয়নি। সারা বাংলা দেশ সম্বন্ধেই বোধ হয় একথা খাটে। অন্ত

প্রদেশে যখন লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করেছে তখনও বাংলা দেশে কেউ না খেয়ে মরে নি। পাট চাষ প্রচলনের ফলেই লোকের হাতে কাঁচা টাকা আসায় সচ্ছলতার মুখ দেখতে পেলো। কিন্তু আসল সমস্যা সম্পর্কে তারা রইল একেবারেই অজ্ঞ। দেশের শাসন-শোষণ জমিদারী প্রথার সঙ্গে বিশ্ব-বাণিজ্যের দরবারে সবটুকু ঝোল ইংরেজের কোলে টানবার প্রয়াসের ফলে জনসাধারণের অবস্থা যে নিম্নগামী হলো একথা তারা বুঝতে পারল না। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি বা অজন্মা হলে তারা অদৃষ্টের দোহাই দিত। মনে করত পূর্বজন্মের কৃত-কর্মের ফল। দেশের সরকারেরও যে এ ব্যাপারে কোন কর্তব্য থাকতে পারে এ ধারণা কৃষক বা জনগণের মনে একেবারেই ঠাঁই পায় নি।

মধ্যবৃত্ত শ্রেণী এদেশে সৃষ্টি করে ইংরেজরাই। ইংরেজী লেখাপড়া শিখে রাজ-সরকারে চাকরি করে, কিংবা কোম্পানীগুলিতে কেরাণীর কলম চালিয়ে অথবা জমিদারী প্রথায় মধ্যস্বত্ত ভোগ করে এই মধ্যবৃত্ত শ্রেণী জন্মলাভ করে। বাংলা দেশে ইংরেজ রাজত্বের স্থাপনের সময় থেকে ও পরে সারা ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্ব প্রসারে সহায়তা করে সরকারের আস্থাভাজন হয়। এরাও ইংরেজের Pax Britanica বা শান্তি রাজ্যে বর্দ্ধিত হচ্ছিল। লেখাপড়া শিখলে বেকার বড় কেউ থাকত না। তবে তাতেই যে সকলের দারিদ্র্যদশা ঘুচত তা নয়। কিন্তু অদৃষ্টই হতো এমনি হীন অবস্থার জন্য দায়ী। সরকারের কোন দোষই এরা দেখতে পেত না।

সাধারণভাবে লোক জানতে পারল যে, তারা মহারাণীর রাজত্বে বেশ সুখেই আছে। সুতরাং দীর্ঘকাল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকার পর ভিক্টোরিয়া যখন ১৯০১ সনে দেহত্যাগ করলেন তখন ভারতবাসী সত্যই আন্তরিক দুঃখিত হ'ল। সভা, শোকযাত্রা করে সকলেই দুঃখ প্রকাশে অংশ গ্রহণ করল। সকলের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, ব্রিটিশ শান্তি-রাজ্যের প্রতীক মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুতে ভারতবাসী নিজেদেরকে মাতৃহারা মনে করল। কেন না তখন পর্যন্ত পরাধীনতার বেদনা ও অবমাননা লোকের মনকে বিক্ষুব্ধ করতে শুরু করে নি।

সুতরাং সপ্তম এডওয়ার্ডের সিংহাসন আরোহণে ভারতবাসী উল্লসিত হ'ল। আমার মনে আছে যে আমরা—আমি অবশ্য তখন শিশু মাত্র, শহরের একটা বড় শোভাযাত্রার সঙ্গে যোগ দিয়ে 'এডওয়ার্ডের জয়' গান গেয়ে শহর পরিভ্রমণ করলাম। চাঁদা তুলে বাজি পোড়ান হ'ল, খেলা-ধুলা-উৎসব আরও কত কি! রাজা বিদেশী, আমাদের কেউ নয় তথাপি সে যে আমাদের পরাধীনতার প্রতীক এ কথা সেদিন কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। হয়ত দু একজন স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু জন-সাধারণের মনে তার ছোঁয়াচ লাগে নি। সেদিন তাই দেশের অবস্থা বা আবহাওয়া দেখে কেউ ভাবতেও পারে নি যে চার পাঁচ বছরের মধ্যেই এ দেশে বিপ্লব আন্দোলন শুরু হয়ে যাবে কিংবা বিপ্লবী দল গড়ে উঠবে। অথচ এমনি আন্দোলন বা দল গঠন কখনই আকস্মিক ঘটনা নয় বা হতে পারে না। দেশের আভ্যন্তরীণ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার ক্রমবিবর্তনের মধ্যেই এর বীজ লুকিয়ে থাকে। যথাস্থানে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করব।

মহারাণীর মৃত্যুর মাত্র দু বছর আগে অর্থাৎ ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জন ভারতবর্ষের ভাইসরয় হয়ে আসেন। এবং ১৯০৫ সন পর্যন্ত তিনি ভারত শাসন করেন। এই সময়টা ভারত ইতিহাসে নানা কারণে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষের নবজাগরণের ইতিহাসে কার্জনের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। কেউ কেউ তাকে উনিশ শতকের মধ্যভাগে ভারতের বড়লাট লর্ড ডালহৌসীর সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। ডালহৌসীর কঠোর শাসনে সারা উত্তর ভারতে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে—ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যা ১৮৫৭ সনের সিপাহী-বিদ্রোহ নামে খ্যাত। আর কার্জনের জবরদস্ত শাসনে ভারতবাসীর নিদ্রাভঙ্গ হয়।

বহুকাল পরাধীন থেকেও কোন কোন জাতির চিত্তে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয় না যতক্ষণ না কেউ তীব্র কষাঘাতে পরাধীনতার জ্বালা অনুভব করিয়ে দেয়। শাসক তার নির্যাতনে জাতির মনকে শুষ্ক বারুদে পরিণত না করলে দেশ-প্রেমিক নেতার শত জ্বালাময়ী বক্তৃতাও নিষ্ফল হয়ে যায়। দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিপিনচন্দ্র পালের বজ্রনির্ঘোষ দেশের লোকের মর্ম স্পর্শ করতে পারত কিনা সন্দেহ যদি না বড়লাট কার্জন এবং পূর্ববঙ্গের ছোটলাট ফুলার সাহেবের দাম্ভিকতা লোককে অপমান ক্ষুব্ধ না করে তুলত।

অবশ্য জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে নানা ঘটনা এবং ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে। যে অসন্তোষ বহুকাল ধরে মানুষের মনে জমতে থাকে তাই একদিন অনুকূল পরিবেশে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে বিদ্রোহের রূপ নিয়ে। কিন্তু জাতির জাগরণে যদি কোন ব্যক্তি-বিশেষের হাত থেকে থাকে তবে তা দেশ-প্রেমিক নেতা ও অত্যাচারী শাসক উভয়েরই প্রাপ্য।

মহারাণী যুগের অবিচ্ছিন্ন শান্তিতে বাস করে মানুষ-

গুলি যেন নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়েছিল। আকাল মহামারীতে লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ হারিয়েছে, কিন্তু সরকারের প্রতি (মহারাণী) তাদের বিশ্বাস টলে নি। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দীর্ঘ প্রচেষ্টা, ১৮৮৫ সন থেকে কংগ্রেসের নিয়মতান্ত্রিক সবিনয় আবেদন নিবেদনের আন্দোলন যা করতে সমর্থ হয় নি তা লর্ড কার্জনের ও ফুলার সাহেবের জবরদস্তি অতি অল্পদিনেই সাফল্য দান করল। বিদেশীর আসল রূপ মানুষের কাছে প্রকট হয়ে উঠল। সুতরাং মনে হয় শুভক্ষণে লর্ড কার্জন ভারত-শাসনের অধিকর্তা হয়ে এলেন।

লর্ড কার্জন বিদ্যায় ছিলেন অগাধ পণ্ডিত এবং তার কর্মশক্তির ফোয়ারা ছিল অফুরন্ত। ইংলণ্ডে ছিলেন তিনি প্রথম শ্রেণীর খানদানী এবং নামজাদা রাজনীতিজ্ঞ। এমনি জাঁদরেল সাম্রাজ্যবাদী শাসক লর্ড ডালহৌসীর পর বোধ হয় আর কেউ আসে নি! এমন যথেচ্ছাচারী প্রতিবাদ-অসহিষ্ণু শাসক জারের সিংহাসনে শোভা পেত! বেতনভোগী হওয়া তার পক্ষে অদৃষ্টের পরিহাস মাত্র! সৈন্য-বিভাগের সর্বময় কর্তৃত্ব নিয়ে যখন তার সঙ্গে লর্ড কিচ্‌নারের মত-বিরোধ হয় তখন অনেকেই কানাকানি করেছিল যে হয়ত কার্জন নিজেকে ভারত সম্রাট বলেই ঘোষণা করবে। তার পর যখন বিলেত সরকার লর্ড কিচ্‌নারকেই সমর্থন করল তখন লোকের মনে এই ধারণাই হ'ল যে কার্জনের হাতে সৈন্যভার দেওয়া বিপজ্জনক বলেই তাকে সমর্থন করে নি।

ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করেই তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সুরক্ষিত করার কাজে মন দিলেন। এ কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য নর্থ ওয়েষ্টার্ণ প্রভিন্স নামে একটি নতুন প্রদেশ গঠন করলেন। এবং ব্রিটিশ সৈন্য সীমান্তের শেষ প্রান্ত থেকে সরিয়ে এনে সুরক্ষিত জায়গায় সন্নিবেশিত করলেন। তদুপরি দুর্দ্ধর্ষ উপজাতীয়-গুলির মধ্য থেকে লোক নিয়েই এক নতুন রক্ষীদল নিয়োগ করে সীমান্তবাসীর একাংশের আনুগত্যের বীজ বপন করলেন। আফগানিস্থানের আমীর হবিবুল্লার সঙ্গে বন্ধুত্ব দৃঢ় করবার জন্য তাকে স্বাধীন রাজা বলে স্বীকার করলেন এবং বৃত্তির পরিমাণ বাড়িয়ে দিলেন।

কার্জনের রুশ আতঙ্ক ছিল অত্যন্ত প্রবল। তাই আফগানিস্থানের সঙ্গে সঙ্গে পারস্যের ব্যাপারেও হাত বাড়ালেন। তখন পারস্যের উপর অনেক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির লোলুপ দৃষ্টি। রুশরা যদি পারস্য উপসাগর পর্যন্ত অগ্রসর হতে সমর্থ হয় তবে ভারতবর্ষ বিপন্ন হবে। সুতরাং কার্জনের চেষ্টায় পারস্যদেশ বিশেষ করে তার দক্ষিণাংশ বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত করতে সমর্থ হলেন।

কেবল কি পারস্য বা আফগানিস্থান, সুদূর তিব্বতের উপরও কার্জন সাহেব দেখতে পেলেন রুশের উদ্যত মুষ্টি। তা ছাড়া তিব্বতে আপন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে সেখানকার বাণিজ্য-সম্পদ করতলগত করা যায় না। সুতরাং তিনি তিব্বত অভিযানে মন দিলেন।

এ ব্যাপারে ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলা দেশে বিশেষ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। কেন না বাংলা দেশের উত্তরাঞ্চল দিয়েই অভিযান পরিচালিত হয়। সংবাদপত্র মারফৎ এ কাহিনী পাঠ করতাম। এ প্রসঙ্গে এক বাঙালী রায়বাহাদুর শরৎচন্দ্র দাসের নাম খুব শুনতে পেতাম। তিনি তিব্বত অভিযানের অনেক আগেই পায়ে হেঁটে তিব্বত গিয়েছিলেন। সভ্যজগতের অজ্ঞাত দেশ তিব্বত। দুর্গম-বিপদসঙ্কুল তার পার্বত্যপথ। এহেন দেশে গিয়ে তিনি বাঙালীর বিশেষ গৌরবের পাত্র বলে পরিগণিত হয়েছিলেন। এই শরৎচন্দ্রই নাকি পরে তিব্বত অভিযানের পথপ্রদর্শক হয়েছিলেন। এবং তিব্বত সম্বন্ধে অনেক তথ্য ইংরেজকে সরবরাহ করে-ছিলেন।

অনেকে এ বিষয় নিয়ে গৌরব বোধ করত। কিন্তু রাত্রিতে যখন পিতৃদেবকে খবরের কাগজ পড়ে শুনাতাম তখন তিনি তার বন্ধুদের সঙ্গে যে আলোচনা করতেন তাতে মনে প্রত্যয় জন্মাল যে শরৎচন্দ্র কাজটা ভাল করে নি। তিনি নিজে পরাধীন দেশের লোক। আর তিনিই কি না অপর দেশকে শৃঙ্খল পরাবার কাজের সহায়তা করতে গেলেন! হাজার বছর আগে এই বাংলা দেশের বিক্রমপুরের দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বত গিয়েছিলেন সভ্যতার আলোক-বর্তিকা বহন করে। প্রাতঃস্মরণীয় রাজা রামমোহন রায় গিয়েছিলেন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভের পবিত্র সঙ্কল্প নিয়ে। আর শরৎচন্দ্র দাস গেলেন কি না পরাধীনতার শৃঙ্খল হাতে করে! কারুর মতে অবশ্য শরৎচন্দ্রের প্রথমবার তিব্বত যাওয়াও ব্রিটিশের গুপ্তচর-বৃত্তির জন্যই।

তিব্বতীরা কিন্তু কোনদিনই বিদেশীকে বরদাস্ত করতে অভ্যস্ত নয়। ইংরেজের বাণিজ্য আকাঙ্ক্ষা তারা পছন্দ করল না। তারা বুঝতে পেরেছিল যে প্রবাদ বাক্যের গাধার মতই একদিন এই ইংরেজ তাদের স্বাধীনসত্তা বিলোপ করে দিয়ে, রক্ত শোষণের 'পবিত্র দায়িত্ব' গ্রহণ করবে। ইংরেজরা যতবারই বাণিজ্য-মিশন পাঠিয়েছে ততবারই তারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

এমন কি তিব্বতীরা এ বিষয়ে চীনাদের আদেশও অগ্রাহ্য করতে দ্বিধা করে নি। যদিও তখন তিব্বতের উপর চীনের সার্বভৌম অধিকার বর্তমান ছিল।

লর্ড কার্জনের আমলেই তিব্বতে নতুন আর এক পরিস্থিতির উদ্ভব হ'ল। তিব্বত তখন পর্যন্ত চীনের অধীন একটা প্রদেশ হলেও তিব্বতীরা ছিল ভিন্ন জাতের লোক। চীনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের মনে জেগে উঠল স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। তারা চীনের কর্তৃত্ব অস্বীকার করে রুশের সাহায্য চাইল। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে যদিও রাজশক্তির অধিকারী ছিলেন দালাই লামা, কিন্তু রাজ্যের অভিজাত সম্প্রদায়ের কর্তৃত্ব ছিল অত্যন্ত সুদৃঢ়। কাজেই তিব্বতবাসীরা যখন চীনের অধীনতা থেকে মুক্ত হতে রাশিয়ার সাহায্যপ্রার্থী হ'ল তখন দালাইলামা প্রচেষ্ট হলেন অভিজাতদের ক্ষমতা নষ্ট করতে।

এমনি পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে কার্জন একটা নগণ্য ছুঁতায় অভিযোগ খাড়া করে ১৯০৩ সনে এক মিশন পাঠান। প্রকৃতপক্ষে তারা ছিল অভিযাত্রী। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েই গিয়েছিল। সুতরাং তারা তিব্বত-সরকারের বিনা অনুমতিতেই রাজ্যে প্রবেশ করল। তিব্বতীরা তাদের দেশ ত্যাগ করতে অনুরোধ করল এবং এ কথাও জানিয়ে দিল যে যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা সীমান্ত ত্যাগ করে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সঙ্গে কোন কথা বা সাক্ষাৎ হবে না। তারা শুধু অনুরোধ করেই ক্ষান্ত থাকে নি। সৈন্য-সমাবেশও শুরু করল। ইংরেজ গিয়েছিল ভিন্ন মতলবে। সুতরাং সামান্য যুদ্ধও হ'ল। কিন্তু তিব্বতীরা পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হ'ল।

ইংরেজরা ছিল তখনকার দিনে লভ্য সমস্ত অস্ত্র সজ্জায় সজ্জিত। আর তিব্বতীরা! তিব্বতীরা নাকি নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষায় তীর ধনুক দিয়েও লড়াই করেছিল। এজন্য এ দেশের বা অপর দেশেরও অনেকে তাদের ব্যঙ্গ করেছিল। আমার পিতৃদেবের বৈঠক-খানায়ও শুনেছি প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশ সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করার পাগলামীর কথা! কিন্তু পিতৃদেবের একটা কথা আমার মনে চিরতরে গ্রথিত হয়ে রইল। তিনি বলতেন, "তবুও তিব্বতীরা স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তীর ধনুকই হোক বা তাদের যা কিছু আছে সব দিয়েই হোক বিদেশীকে বাধা দেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমাদের মত সপ্তদশ অশ্বারোহীর বঙ্গ-বিজয়ের গল্প সৃষ্টির সুযোগ দেয় নি।"

আক্রমণকারীকে সর্বশক্তি দিয়ে বাধা দেওয়াই যে পবিত্র দায়িত্ব একথা অধিকাংশ লোক ভুলে যায়। সুতরাং আফ্রিকার সোমালিল্যাণ্ডের মোল্লা যখন ব্রিটিশ আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য সচেষ্ট হলেন তখন ইংরেজরাই যে তাকে "পাগলা মোল্লা" বলত তা নয়, অনেক ভারতবাসীও তাকে এ নামে বিদ্রূপ করতে কসুর করে নি।

যাই হোক, অভিযানকারী দল তিব্বতের রাজধানী লাসায় প্রবেশ করলে দালাই লামা পলায়ন করলেন। ১৯০৪ সনে সন্ধি স্থাপিত হ'ল। বাণিজ্যের সুবিধে ত বটেই, তাছাড়া তিব্বতীদের ঘাড়ে ৭৫ লক্ষ টাকার খেসারত চাপানো হ'ল। উপরন্তু পররাষ্ট্রনীতি নিজেদের করতলগত করে চাম্বি উপত্যকা ব্রিটিশ অধিকারে এসে গেল।

কিন্তু রুশদের চাপে পড়ে সন্ধির ঐসব সর্তগুলি আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হয়ে গেল। কার্যতঃ লর্ড কার্জনের অভিযান ব্যর্থ হ'ল। ইউরোপের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি অবশ্য এজন্য অনেকাংশে দায়ী। জার্মানরা তখন ব্রিটিশের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায়। জার্মানীর ভয়ে রুশের সঙ্গে মিত্রতা তখন ইংরেজের বিশেষ প্রয়োজন। সুতরাং রুশের অসম্মতি, তিব্বত সন্ধির ব্যাপারে, ইংরেজরা অস্বীকার করতে পারল না। ইংরেজরা তিব্বতে অধিকার বিস্তার করতে সমর্থ হ'ল না সত্য, কিন্তু তিব্বতীদের স্বাধীনতা আন্দোলন বিশেষভাবে ব্যাহত হ'ল! চীনারা তিব্বতের উপর অধিকার অধিকতর সুদৃঢ় করার সুযোগ পেল।

লর্ড কার্জনের ক্ষুধা ছিল সর্বগ্রাসী। তিনি দেশীয় রাজ্যগুলির উপরও হস্তক্ষেপ সুরু করে দিলেন। নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত বেরার প্রদেশ ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত করায় সমস্ত দেশীয় রাজারাই শঙ্কিত হয়ে উঠল। এখানেই এসে তিনি ক্ষান্ত হলেন না। দেশীয় রাজ্যগুলি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্যদল গঠন করে ও তাঁর সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতে বাধ্য করলেন। এইসব সৈন্য-দলের নাম দেওয়া হ'ল ইম্পিরিয়েল সার্ভিস ট্রুপস্। প্রয়োজন বোধে পৃথিবীর যে কোনও স্থানে এদের নেওয়া চলবে এবং এরা সম্পূর্ণরূপে ব্রিটিশ কর্তৃত্বাধীনে থাকবে।

এমনিতেই ভারত সাম্রাজ্যের আয়ের প্রায় অর্দ্ধেক ব্যয় হ'ত সৈন্যদল প্রতিপালনে—অবশ্য বেশী অংশ পড়ত শ্বেতাঙ্গ সৈনিকের ভাগে। তাই কার্জন ভাবলেন যে, সাম্রাজ্য সুরক্ষিত রাখতে এবং বাড়াবার জন্য যদি অন্যের খরচায় আরও কিছু সৈন্য রাখা যায় তবে ক্ষতি কি! তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, এ সৈন্যদল নিয়ে দেশীয় রাজারা

কোনমতেই বিদ্রোহ করবার সুযোগ পাবে না। সেই অবস্থাই এদের নেই। প্রতি দেশীয় রাজ্যে যে ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট থাকত প্রকৃত ক্ষমতা ছিল তারই হাতে। কোন রাজা অবাধ্য হলে তাকে গদিচ্যুত হতে হ'ত। রাজ্যের সমস্ত আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রিত হ'ত ব্রিটিশ সরকারের সুপারিশে নিযুক্ত রাজস্বসচিব দ্বারা। কাজেই কোনমতে ব্রিটিশ স্বার্থ বিরোধী কোন কাজ দেশীয় রাজ্য থেকে হওয়া অসম্ভব ছিল।

নিজেদের স্বার্থরক্ষাই ছিল ব্রিটিশ কর্তৃত্বের আসলরূপ। সুতরাং রাজারা প্রজার মঙ্গল করত কিনা তাতে তাদের ভ্রূক্ষেপ ছিল না। লোকে আইন মেনে চলছে জানলেই তারা খুসী।

শুধুমাত্র বর্তমান নিয়েই ইংরেজরা খুসী হয় নি। রাজার ছেলেরা অল্প বয়স থেকেই ইংরেজ-শিক্ষকের কাছে লেখাপড়া শিখত—তা দেশেই হোক বা বিদেশেই থাকুক। এমনি অবস্থায় তারা পাশ্চাত্ত্য আদপ-কায়দায় কেতাদুরস্ত হয়ে উঠত। সাজে-পোশাকে, কথাবার্তায়, মেলামেশায় তারা ব্রিটিশের অধীন হ'ত। কেবলমাত্র মদ, ব্যভিচার, পরদার আর বিলাসিতায় ছিল রাজা এবং রাজপুত্রদের অবাধ অধিকার। সুতরাং একমাত্র নারী ও সুরা ছাড়া রাজা ও তাদের পুত্ররা ইংরেজের নজরবন্দী হয়ে থাকত।

কার্জন আরও এক চাল চাললেন। রাজার ছেলেদের যুদ্ধবিদ্যা শেখাবার জন্য গঠন করলেন ইম্পিরিয়েল কেডেট কোর। এরাও প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষারই অপর এক বাহন হ'ল। বাল্যাবধি ইংরেজের তত্ত্বাবধানে থেকে রাজপুত্ররা এমনি ভাবে মানুষ হয়ে উঠত যে, যুদ্ধ-বিদ্যা শিখেও ব্রিটিশ-বিরোধী কাজে প্রভাবান্বিত হওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না।

আমাদের দেশে তখনও বুর্জোয়া গণতন্ত্র গড়ে ওঠে নি। আগাগোড়া সমাজ সামন্ততান্ত্রিক। সম্রাট, দেশীয় রাজা, জমিদার, তালুকদার পর্যায়ক্রমে এরাই সমাজের মাথা। ভূম্যাধিকারের উপর যে আভিজাত্য গড়ে ওঠে তাকেই ভিত্তি করেছিল তখনকার সমাজের প্রতিষ্ঠা। পারিবারিক ক্ষেত্রেও পিতাই প্রধান সর্বেসর্বা। এ ব্যবস্থা কায়েম রাখাই ছিল ব্রিটিশের স্বার্থ। এ সমাজই যে ভারতবাসীর পক্ষে মর্যাদার এ প্রচারই তারা সযত্নে করে যেত। ভারতবাসী শিল্প-বাণিজ্যের দিকে নজর দিক এটা তাদের একেবারেই ইচ্ছা ছিল না। কেননা তার ফলে যে শিল্প-বিপ্লব ঘটবে তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ব্রিটেনের শিল্পপতি এবং পুঁজিবাদীরা। এক কথায় ইংরেজের শিল্প-বিপ্লব হয়ে যাবে নসাৎ। এ কারণেই ব্রিটিশ সরকার সদাসর্বদা ভূম্যাধিকারীর মর্যাদা প্রতিপত্তি রাখতে সচেষ্ট থাকত এবং শেষ পর্যন্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কায়েম রেখেছিল। এমন কি ফ্লাউট কমিশনের রিপোর্টও জমিদারদের ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে নি।

সপ্তম এডোয়ার্ডের সিংহাসন আরোহণের উৎসব উপলক্ষ করে লর্ড কার্জন দিল্লীতে ইতিহাস প্রসিদ্ধ "দিল্লী দরবারের" আয়োজন করলেন। তিনি মনে করলেন যে, রাজাদের প্রকাশ্য দরবারে ইংরেজের বশ্যতা স্বীকার করিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া সম্রাট থাকেন সুদূর বিলেতে। এদেশে আসেন না। আসবার সম্ভাবনাও নেই। সুতরাং তার প্রতিনিধি ভাইসরয়কে যাতে দেশীয় রাজারা সম্রাটযোগ্য সম্মান দেয় তা শেখাবার জন্যই এ আয়োজন।

যদিও কলকাতাই ছিল তখন পর্যন্ত ভারতবর্ষের রাজধানী, কিন্তু তিনি দরবারের আয়োজন করলেন দিল্লীতে। তার পেছনেও একটা মতলব ছিল। শত শত বছর ধরে দিল্লীই ভারত-সাম্রাজ্যের রাজধানী। ইংরেজ আমলেই এর ব্যতিক্রম হ'ল। ভারতবাসীরা দিল্লীকেই ভারতের রাজধানী এবং দিল্লীশ্বরকেই ভারত-সম্রাট বলে মানতে অভ্যস্ত। কার্জন জানতেন ভারতবাসীর কাছে দিল্লীশ্বর জগদীশ্বরের রূপান্তর মাত্র—"দিল্লীশ্বরওবা জগদীশ্বরওবা"। সামন্ত রাজারাও দিল্লীশ্বরের বশ্যতা স্বীকারে অভ্যস্ত। কলিকাতার কোন গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস নেই যা দিল্লীর আছে। সুতানটি ও কলিকাতা নামক গ্রামে কুঠি নির্মাণ করে বাণিজ্য করতে করতে একদিন কলকাতা রাজধানী হয়ে উঠল। এমনকি ১৮৩৩ সন পর্যন্ত সমস্ত উত্তর ভারত বাংলা নামেই পরিচিত হ'ত। আর বড়লাটের উপাধী ছিল গবর্ণর জেনারেল অফ বেঙ্গল। কাজেই দিল্লী হ'ল গিয়ে ইম্পিরিয়েল আর কলকাতা কমার্শিয়াল! সুতরাং কলকাতা দরবার করলে ইংরেজের বণিকত্ব ঘুচবে না। তাই দিল্লীতে হ'ল দরবার।

খুব জাঁকজমক হ'ল। সমস্ত দেশীয় রাজারা সেখানে গিয়ে অনেক টাকা খরচ করলেন। লর্ড কার্জন রাজ-প্রতিনিধি হিসেবে সিংহাসনে আরোহণ করলেন। এবং দেশীয় রাজারা তাঁর কাছে হাঁটুগেড়ে বসে কুর্ণিশ করে বশ্যতা স্বীকার করলেন। কুর্ণিশ করতে করতে পিছু হঠে আসতে হ'ল। কিন্তু বরোদার গাইকোয়ার নাকি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে ফিরেছিলেন। বড়লাটের অমর্যাদা হ'ল বলে নাকি মহা হুলুস্থুল পড়ে গিয়েছিল। এবং শুনতে পাই এ ত্রুটির জন্য গায়কোয়ারকে পরে অনেক

কিছুই করতে হয়েছিল। দেশের লোকের কাছে কিন্তু তার মর্যাদা বৃদ্ধি পেল। জনসাধারণের কাছে এ ক্রটি স্বাধীনচিত্ততার রূপ নিয়ে দেখা দিল। সুশাসন ও ন্যায়-পরায়ণতার জন্য গায়কোয়ারের সুনাম ছিল। এর পর তাঁর মর্যাদা এতটা বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, কোন কোন স্বপ্ন-বিলাসী দেশপ্রেমিক স্বাধীন ভারতে গাইকোয়ারকে প্রথম সম্রাট বলে কল্পনা করতেন!

জাঁকজমকে এই দরবার মোগল-বাদশাহদের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে হ'ল। ইংরেজ ঐশ্বর্য প্রকাশের জন্য রাজস্বের প্রচুর অর্থ খরচ করা হ'ল। মাত্র দু-তিন বছর আগে আমাদের দেশ দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে নিপতিত হয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে অনাহারে। বহু জনপদ সম্পূর্ণরূপে জনহীন হয়েছিল। যারা মরতে পারল না তারাও কঙ্কালসার দেহে কোন রকমে ধুঁকছিল। দেশের এমনি পরিস্থিতির মধ্যে ক্ষুধিতের মুখে অন্নের ব্যবস্থা না করে উৎসবের জাঁকজমক ও বিলাসিতায় ব্যয় করাতে দেশের অনেক শিক্ষিত লোকই অসন্তোষ প্রকাশ করল। অবশ্য তখন পর্যন্ত প্রকাশভঙ্গি মৃদুই ছিল। জনচিত্তের তাপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে আরম্ভ করল—যদিও ধীরে ধীরে।

বয়স তখন অল্প হলেও পত্রিকা এবং আমাদের বাড়ীতে আলোচনার ফলে এ দরবারের অনেক কথাই শুনতে পেলাম। দিল্লীর উত্তেজনার ঢেউ সুদূর বাংলা দেশকে উদ্বেলিত করেছিল। ইংরেজ কিন্তু অবিচলিত। বরং এই জাঁকজমকের বহু ছবি তারা দেশ-বিদেশে প্রচার করল।

এ দরবারই তাঁর 'কীর্তির' শেষ নয়। তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী সাম্রাজ্যবাদী। একথা ভালভাবেই জানতেন যে,একটা জাতির উপর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা চিরস্থায়ী করতে হলে শুধু মাত্র পুলিস ও সৈন্যবল যথেষ্ট নয়। দেশের কৃষ্টি ও সভ্যতার উপর পুরোপুরি প্রভাব বিস্তার করা প্রয়োজন। তার জন্য সর্বপ্রথমই প্রয়োজন শিক্ষা-ব্যবস্থাকে আয়ত্তে আনা। অজ্ঞান-অন্ধকারে রাখতে পারলেই যদৃচ্ছ শাসনকার্য চালিয়ে যাওয়া সহজ হয়। জ্ঞানের আলোকই জাতীয়-জীবনের রবির কর। আত্মসম্বিৎ ফিরে পাওয়ার যাদুকাঠি। বিশেষ করে ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশ যে আপন কৃষ্টি ও ঐতিহ্যে গরীয়ান তাকে অবিদ্যার যাদুতে সম্মোহিত করে না রাখতে পারলে কেবলমাত্র অস্ত্রবলে মুষ্টিমেয় বিদেশী ইংরেজ বেশীদিন টিকে থাকতে পারবে না। সুতরাং কার্জন সাহেব ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ব্রিটিশ-সরকারের কর্তৃত্বাধীনে আনবার জন্য ১৯০৪ সনে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ করালেন।

এ আইনের বলে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালক পরিষদ্ নতুনভাবে গঠিত করার ব্যবস্থা হ'ল। কলেজগুলিকে সরকারীভাবে পরীক্ষা করার অধিকার দেওয়া হ'ল এবং কলেজগুলির স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতির পূর্ণ ক্ষমতা রইল সরকারের হাতে।

এ ব্যবস্থায় শিক্ষিত সম্প্রদায় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। চারদিকে উঠল প্রতিবাদধ্বনি। বাঙালীর শিক্ষাগুরু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণস্বরূপ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রতিবাদ জ্ঞাপন করলেন। দেশের সর্বত্র প্রতিবাদ সভা হ'ল। উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, শিক্ষক—এককথায় সমগ্র শিক্ষিত সমাজ এই আইনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করল। দাম্ভিক কার্জন জনমত পদ-দলিত করে আইনের ধারাগুলি কার্যে পরিণত করলেন।

দেশের লোকের চোখ প্রায় খুলে গেল। নিজেদের অসহায় অবস্থার শোচনীয় রূপ দেখতে পেয়ে শিক্ষিত জন-সমাজের অন্তঃকরণ নিষ্ফল ক্রোধে জ্বলতে লাগল। জাতীয় অপমানবোধ যা এতদিন লুপ্ত হয়েছিল তা যেন আবার ভেসে উঠল। ইতিহাসের ইঙ্গিত বুঝতে পারলেন না লর্ড কার্জন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে চ্যান্সেলারের আসন থেকে তিনি ভারতবাসীকে এবং তাদের পূর্ব-পুরুষদের মিথ্যাবাদী আখ্যায় ভূষিত করলেন। শুধু সভাস্থ সকলেই ক্ষুণ্ণ হ'ল না, সমস্ত দেশের জনমন অপমানের জ্বালায় দগ্ধ হতে লাগল।

১৮৩৩ কিংবা তার নিকটবর্তী কালে লর্ড ম্যাকলে ভারতের আইনসচিব হয়ে আসেন। তিনি এদেশের নিমকে পুষ্ট হয়ে বাঙালীকে মিথ্যাবাদী আখ্যায় ভূষিত করে 'নিমকের' মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন। তখন রাজ-নৈতিক চেতনা এতটা জাগ্রত হয় নি, কিন্তু বাঙালী সেদিনের জাতীয় অপমান ভুলতে পারে নি। সুতরাং দাম্ভিক লর্ড কার্জনের এই অপমানোক্তি বাঙালী নীরবে সহ্য করে নি। ধীরে ধীরে দেশের জনগণের অন্তরে যে আগুন সঞ্চিত হয়ে চলছিল, তাই লর্ড কার্জনের পরবর্তী কার্যের ফলে অগ্নিস্রোতে প্রকাশ্যে প্রবাহিত হ'ল। বঙ্গ-ভঙ্গের ফলে দেশব্যাপী যে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হয়েছিল, বিশ্ববিদ্যালয় আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তার প্রস্তুতি বলে আখ্যা দেওয়া যায়।

সকলকেই তাদের প্রাপ্য দেওয়ার বিধি আছে। এ হেন অবস্থায় লর্ড কার্জনের দু-একটি ভাল কাজের উল্লেখ না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। দরিদ্র

জনসাধারণকে খানিকটা আর্থিক সুবিধে করে দিয়েছিলেন লবণের উপর ট্যাক্স অর্দ্ধেক করে দিয়ে। আয়-করের পরিমাণও কিছু কমিয়ে দিয়ে সাধারণ উপার্জনশীল লোকের বোঝা কিছুটা হাল্কা করেছিলেন। তখন পঞ্জাবে ঋণের দায়ে কৃষককে উচ্ছেদ করা যেত। লর্ড কার্জন 'পঞ্জাব ল্যাণ্ড এলিয়েনেশন এক্ট' পাশ করিয়ে চাষীর জমি হস্তান্তরের সম্ভাবনা কমিয়ে দিলেন। কুশিদ-জীবির হাত থেকে চাষীদের মুক্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে ১৯০৪ সনে কৃষি ব্যাঙ্ক ও সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেছিলেন।

ভারতবর্ষে লর্ড কার্জনের সর্ববাদিসম্মত প্রধান কীর্তি অবশ্য 'প্রাচীন কীর্তি' সংরক্ষণের ব্যবস্থা। এতদুদ্দেশ্যে তিনি 'এনসেণ্ট মনুমেণ্ট এক্ট' পাস করান। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে (Archeological Department) খুলে সমগ্র ভারতবর্ষের প্রাচীন কীর্তির অনুসন্ধান ও সংরক্ষণের সুব্যবস্থা করেছিলেন।

এতসব করেও কিন্তু লর্ড কার্জন ভারতবাসীর কাছে জনপ্রিয় হতে পারলেন না। যে চরম অপমানের কশাঘাতে ভারতবাসীর জ্ঞানচক্ষু খুলে দিলেন তারই সাহায্যে তারা দেখল বুঝতে লাগল—তার ভাল কাজ শুধু জোড়াতালি; গাছের গোড়া কেটে জল ঢেলে তাকে বাঁচাবার অপ-প্রয়াস মাত্র। যত অস্পষ্টই হোক না কেন, এ বোধ তখন মানুষের মনকে উদ্বেলিত করতে শুরু করেছে যে বিদেশীর শাসন-শোষণের অবসান না করতে পারলে কেবলমাত্র সংস্কারের দ্বারা জাতীয় ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা যায় না।

তামস-তপস্যা

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

অরণ্যের অন্ধকারে পেতেছি আসন;
তামস-তপস্যা তরে আমার এ আত্মনির্ব্বাসন
স্বেচ্ছায় নিয়েছি আমি।
হেথায় এসেছে নামি
নৈশব্দ্যের অবগাঢ় ধ্যান-সুগম্ভীর
সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপ্তি; দুর্ভেদ্য প্রাচীর
গড়িয়া উঠেছে হেথা পর্ব্বতে পর্ব্বতে
ভূর্জ্জ বৃক্ষ, বটে অশ্বথে।
আলোর প্রবেশ-পথ অবরুদ্ধ, প্রত্যাহত বায়ু
পরাস্ত বিক্রম তার ছিন্নভিন্ন স্নায়ু,—
ফুৎকারে ছড়ায়ে দেয় আগ্নেয় নিঃশ্বাস।
প্রাণ-ধর্ম্মে পশুর বিশ্বাস
উৰ্দ্ধশ্বাস জীবনের তটপ্রান্তে সদা কম্পমান;
দুর্নিরীক্ষ দুর্ভাগ্যের মৃগয়া-সন্ধান
এ অগম্য পথে যদি কোন দিন তোলে কোলাহল
অন্তরাত্মা সেই দিন বিদ্রোহে চঞ্চল
এ তামস-তপস্যার ব্যাহৃতি করিয়া উচ্চারণ
অন্ধকার গিরিগর্ভে তিলে তিলে লভিবে মরণ।

তবু, তবু এই মোর ভালো
ছায়াচ্ছন্ন এ আঁধারে জ্বালিতে চাহিনা আমি আলো।
সমস্ত জীবন ব্যাপি আলোকের নিত্য প্রবঞ্চনা
বিনিদ্র রাত্রির শেষে প্রভাতের সে রূঢ় গঞ্জনা
সহিয়াছি আজীবন যন্ত্রণা তাহার
নিঃশেষে যাইনি মুছে; শ্রাবণের ঘন অন্ধকার
জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিদ্যুতের চকিত আলোকে
আলোকের তৃষ্ণা মোর রেখে গেছে কঠিন নির্ম্মোকে,
নয়নে তৃষ্ণার জ্বালা, অন্তরে তৃষ্ণার কাতরতা
আজন্ম বহিয়া চলি—নাহি তার কোন সার্থকতা।

তাই আজ এ নিরন্ধ্র অন্ধকারে বসি'
অনুভবি' আলোকের স্বর্ণপক্ষ একে একে পড়িতেছে খসি
স্খলিত পাণ্ডুর পত্রে, বিশীর্ণ বিশুষ্ক লতাজালে।
আলোকের পরাজয়—আকাশের ভালে
লেখা থাক মসিকৃষ্ণ অক্ষরে অক্ষরে।
আমার অন্তরে
এ তামস-তপস্যার অন্ধকার আরও গাঢ় হোক
আমার সমস্ত সত্তা হোক আজি বিরিক্ত আলোক।
তমোঘ্ন সূর্য্যের অভিশাপ
স্পর্শিবে না কভু মোরে, বীতশোক আমি নিরুত্তাপ।

চট্টগ্রামের কয়েকজন মুসলমান কবি

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

মহাকবি নবীনচন্দ্র সেনের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বহু মুসলমান কবি চট্টগ্রামের আধ্যাত্মিক ভাবসম্পদ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উল্লসিত বিজয়গাথা রচনা করে গেছেন। সর্বযুগের সর্ব সম্প্রদায়ের লোকেরা সে রস পান করে চিরকাল ধন্য হবে। এখানে যে সকল মুসলমান কবির বিষয়ে লিখছি—তাঁরা সকলেই মুসলমান। আরো বহু মুসলমান কবি আছেন, যাঁদের সম্বন্ধে আরো অত্যন্ত বিস্তৃত করেছি এবং ভবিষ্যতে আরো করবো। এই প্রবন্ধোক্ত কবিরা দৌলৎ খাঁ এবং আলাওলের উত্তর সাধক।

সমসের আলি ও আছ্‌লম

সমসের আলী "রেজওয়াল সাহা" নামক রোমান্টিক কাব্য সমাপ্ত করে যেতে পারেন নি। আছ্‌লম তা পূর্ণ করেছিলেন। এবং সেই গ্রন্থ ছেদমত আলী প্রকাশিত করেছিলেন। ছেদমত আলীর বাড়ী ছিল জোয়ারগঞ্জ থানার অন্তর্গত সাহেবপুর গ্রামে। তারই মামাত ভাই আছলম। আছলম ছেদমত আলীর প্রশংসা করে বলেছেন:

> "সর্ব গুণে গুণী পুনঃ রূপে পঞ্চবাণ।
> সঙ্গীত পুরাণ বেদ আগম নিদান।
> অমর পিঙ্গল নট কাব্য রস রতি।
> করিলাম আদি অন্তে মাঝে যত ইতি॥"

এই গ্রন্থের তালিকা থেকে তখনকার দিনের মুসলমানদিগের কোন্ বিদ্যায় রতি ও খ্যাতি ছিল, তা সহজেই বুঝতে পারি। উল্লিখিত সব কয়টি গ্রন্থই সংস্কৃত গ্রন্থ। অর্থাৎ ইংরেজেরা স্বল্প দেড়শত বৎসরের মধ্যে যেমন আমাদের অস্থি মজ্জা মেরুদণ্ড ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে গেছে, মুসলমানেরা অতি সুদীর্ঘকাল চট্টগ্রামে থেকেও কেবল দেশের প্রেমেই বিভোর হয়ে, দেশের সাহিত্য, কলা, শিল্প সেগুলিরই অনুশীলন করেছে—পরাশ্রয়ী হয়ে দেশের সভ্যতাকে বিকলাঙ্গ করে নি। এ ক্ষেত্রে এটি স্মর্তব্য যে চট্টগ্রামে যখন ঋষি রায়জিৎ বস্তাসী আসেন—যিনি সূফী দর্শনের একজন পারংগত পণ্ডিত এবং ধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রচারক—তখন ভারতবর্ষের অন্যত্র মুসলমান উপনিবেশ স্থাপিত হয় নি। সমুদ্র পথে মুসলমানেরা এক হাজার বৎসর আগে চট্টগ্রামে এবং মাদ্রাজে এসে পৌঁছিয়েছিলেন। এক হাজার বৎসর মুসলমান ধর্ম ও দর্শনের সঙ্গে সুসংপৃক্ত হয়েও চট্টগ্রামের মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ দেশের শিক্ষাদীক্ষার প্রতি এতটুকু অশ্রদ্ধা বা ঔদাসীন্য দেখায় নি। এমন কি, নিজেদের রাজত্ব সময়েও। এটি আজ গবেষণাক্রমে স্থির সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, সেরসাহ, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, দারা, খানখানান প্রভৃতি রাজা, রাজপুত্র এবং প্রধান রাজপুরুষেরা সংস্কৃত সাহিত্যের পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। খানখানানের তিনটি সংস্কৃত গ্রন্থ এবং দারাশুকোর "সমুদ্রসঙ্গম" নামক সংস্কৃত গ্রন্থ সম্প্রতি ইংরাজী অনুবাদ সহ প্রাচ্যবাণী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। মুসলমানদের রাজত্ব সময়ে সংস্কৃত শিক্ষার অনুশীলনে কোনও ব্যাঘাত ঘটে নি। চট্টগ্রামের মুসলমানদের বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় এটি স্বভাবতঃই চোখে পড়ে। এবং এটি নিছক সত্য বলেই এত গৌরবের।

লায়লি-মজনুর রচয়িতা বহরাম চট্টগ্রামের প্রাচীন কবিদের মধ্যে একজন শীর্ষস্থানীয় কবি। এই কবি স্বীয় পিতার নাম চট্টগ্রামের নৃপতি নেজামশাহ সুরের "দৌলৎ উজির" ছিলেন। পণ্ডিত কাইমদ্দিনের "চমন বাহার" অন্যতম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। চাঁটিগাঁ নালুপুর গ্রামনিবাসী আজগর আলি পণ্ডিতের "চিল লেম্পতি" নামক গ্রন্থ ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ বা কাছাকাছি সময়ে বিরচিত হয়েছিল।

সৈয়দ সুলতান, জৈনুদ্দিন ও শেখচাঁদ

চট্টগ্রামের মুসলমান কবিরা খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে বঙ্গভাষায় আর একটি সাহিত্যের গোড়াপত্তন করেন—সেটি হচ্ছে "নবীবংশ" এবং "জঙ্গনামা" সাহিত্য। বাঙালী হিন্দুর পুরাণ-পদ্ধতির প্রভাব থেকে এগুলি মুক্ত নয়; —তা হলেও ধর্মের আস্বাদ-পরিপূর্ণ এই সাহিত্য পুনরায় এক নব জাগরণের সৃষ্টি করে। সৃষ্টির কৌশলে অগ্রণী চট্টগ্রামের মুসলমান কবিগণ প্রগাঢ় হৃদয়াবেগে হজরত মহম্মদের জীবনচরিত, ধর্মসাধনা প্রভৃতি বিষয়ে সরস ভাবপ্রধান গ্রন্থ রচনা করলেন। এতদ্ব্যতীত হজরত মহম্মদের পরবর্তী খলিফাদের বিজয়কাহিনী এবং গৃহবিবাদের বর্ণনাও এঁরা "জঙ্গনামায়" (বা যুদ্ধকথায়)

প্রচার করতে সুরু করেন। চট্টগ্রামের মুসলমানেরা ষোড়শ শতাব্দীর অনেক আগের থেকেই মনেপ্রাণে বাঙালী হয়ে গিয়েছিলেন এবং বাঙালী চিন্তার ধারাই এতে অবিরত গতিতে প্রবাহিত হয়েছে।

চট্টগ্রামের সৈয়দ সুলতান, জৈনুদ্দীন এবং শেখ চাঁদ নবীবংশ রসুলবিজয় পাঁচালী-সাহিত্যে সর্বাগ্রগণ্য। ১৬১৪ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দ সুলতান তাঁর "নবীবংশ" সমাপ্ত করেছিলেন; এই সুফী সাধক অন্যদিকে আবার "যোগ-তত্ত্বনিবন্ধ" এবং ভাল ভাল পদাবলীও রচনা করেছিলেন।

জৈনুদ্দীনের কাব্য লেখা হয়েছিল ইউসুফ খানের অনুরোধে।

জঙ্গনামা লেখকের মধ্যে সর্ব প্রাচীন বংশপরম্পরায় চট্টগ্রামের অধিবাসী কবি মোহম্মদ খান। তাঁর রচিত মুক্তাল হোসেন ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। তাঁর গুণগ্রাহী জালাল খানের গুণ-বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বলেছেন:

"প্রণমি তাঁহার পদ রচিব পাঁচালী পদ
তান পুত্র বলে হলধর।
চাটিগ্রাম দেশকান্ত পৃথ্বী জিনি ধৈর্যবন্ত
গাণ্ডীবে অর্জুন সমসর ॥
শান্ত দান্ত গুণবন্ত মর্যাদার নাহি অন্ত
হৃদন্তে একান্ত কোপ গণি।
ক্ষোভন্ত করন্ত বল নাশন্ত রিপুর দিল
জ্বলন্ত আনন হেন জানি।

* * *

কেহ বোলে দিনকর কেহ বোলে বিদ্যাধর
কেহ বোলে না হয় সফল।
এই সে জালাল খান সুরপতি পঞ্চবাণ
রূপে জিনিয়াছে মহীতল ॥"

পাঁচালীর আকারে গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য কি—কবি এই বলতে গিয়ে বলেছেন:

"হিন্দুস্থানে সব লোকে না বুঝে কিতাব।
না বুঝিয়া না শুনিয়া নিত্য করে পাপ ॥
তে-কাজে সংক্ষিপ্ত করি পাঞ্চালি রঁচিলুঁ।
ভাল মতে পাপপুণ্য কিছু না জানিলুঁ ॥

* * *

কিতাব আল্লার আজ্ঞা শুনিবেন্ত যবে।
দানকর্ম পুণ্যকর্ম করিবেন্ত তবে ॥
অবশ্য মোহরে সবে দিব আশীর্বাদ।
মহাজন আশীর্বাদে খণ্ডিব প্রমাদ ॥"

সৈয়দ সুলতান জঙ্গনামার শেষে বলেছেন:

"রসুলের পদযুগে করিয়া প্রণাম।
রচিলেকে সুলতানে পাঁচালি অনুপাম ॥
কহে সৈদ সুলতান সভানের তরে।
সবে মেহেরাজনামা রহিল অতঃপরে ॥"
(ব্রিটিশ মিউজিয়ামের পুঁথি, পত্রসংখ্যা ৫৮)।

জঙ্গনামার কবি রসরুল্লা খানও অষ্টাদশ শতাব্দীতে চট্টগ্রামে শাস্ত্রজ্ঞান প্রচার করেছেন। এঁর গুরু ছিলেন পীর হামিদুদ্দীন।

চট্টগ্রামের মুসলমান কবিরা "ভেলুয়ার প্রণয়" কথা নিয়েও সুন্দর কাব্য রচনা করে গেছেন।

দৌলৎ উজির বহরাম

বাংলায় "লালা-মজনু"র যত অনুবাদ আছে, তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বপ্রথম অনুবাদ চাটিগাঁর দৌলৎ উজীর বহরাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই গ্রন্থ এখনও ছাপানো হয় নি। কবির গুরু ছিলেন আছাওদ্দীন শাহা। তাঁর পিতা মোবারক ও চাটিগ্রাম-অধিপতি নিজাম শাহা সুবের দৌলৎ উজির ॥

মোহম্মদ রাজা

মোহম্মদ রাজা "তমিম গোলাল চতুর্ণছিল্লান" নামক গ্রন্থ রচনা করেন এবং তা' প্রকাশ করেন চাঁটি-গা নিবাসী মহাম্মদ কাজেমের পুত্র হামিদুল্লা।

মহম্মদ আলি, বদিউদ্দীন, প্রভৃতি

চট্টগ্রামনিবাসী মহম্মদ আলী "কিফায়েতোন সোহল্লিন" ইছুপ হাফিজের অনুরোধে রচনা করেন।

চট্টগ্রামের খিতপ্পচর গ্রামের অধিবাসী গুরু চাম্পা গাজীর শিষ্য জাভিদীতা তার গ্রন্থ "চিপ্ত ইমানে"র শেষে এই পরিচয় দিয়েছেন—

"আর গুরু চাম্পাগাজী নয়নের জুতি।
খিতাপার শুভগ্রাম তাহাতে বসতি ॥"

এতদ্ব্যতীত চট্টগ্রামের সৈয়দ নুরুদ্দীন "দাফায়েতাম হাফায়েৎ", মহম্মদ কাছিম "সুলতান জমজমার পুঁথি", মহম্মদ হকির "নুরফন্দিল", আবদুল করিম "নুর ফরাসিস নামা", শাহা রজ্জাকের তনয় আবদুল হাকিমের "নূরনামা" এবং অন্যান্য মুসলমান সুধীরা শাস্ত্রবিষয়ক আলোচনা করে গেছেন।

শাড়ি, জারি, নাট-গীতির মধ্যে কত গান চট্টগ্রামের অধিবাসিগণের দান, তা নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয়। তা হলেও এই সব গানে চট্টগ্রামের যে বহুল দান আছে, সন্দেহ নেই।

যে সকল মুসলমান কবিরা বিশেষ ভাবে বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন ছিলেন, তন্মধ্যে অলিরাজা অন্যতম—তিনি একটি পাদ বলছেন—

"যে শুনে তোমার বংশী সে বড় দেবের অংশী
প্রচারি কহিতে বাসি ভয়।
গৃহবাসে কিবা সাধ বংশী মোর প্রাণনাথ
গুরু পদে অলিরাজা কয়॥"

অন্যান্য মুসলমান ভক্ত বৈষ্ণবদের মধ্যে কে কে চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন—তা অনুসন্ধেয়।

কবিগান প্রভৃতিতেও মুসলমান কবিরা অংশ গ্রহণ করতেন। তাঁদের দানও বাংলা সাহিত্যে কম নয়।

চট্টগ্রামের ভাষা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এ দেশের ভাষার উপর নিখিল বিশ্বের যেন প্রভাব রয়েছে। আরবী ফরাসী, পর্তুগীজ প্রভৃতি ভাষা তো আছেই—চট্টগ্রামে বৌদ্ধগণের স্থায়ী বাসের ফলে পালি ভাষার অনেক কিছুই চট্টগ্রামের লোকেরা ভাষায় গ্রহণ করেছেন। যেমন 'ঋজু'র পালিরূপ হচ্ছে—"উজু : চট্টগ্রামের লোকেরা "উজু" কথাই ব্যবহার করেন 'সরল' অর্থ। লোকটির মনে কোনও কপটতা নেই খুব বেশী সরল, এই ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে চট্টগ্রামের লোকেরা বলেন—মানুসটি "উজ্জা-উজ্জি" যা উজু শব্দটির দ্বিত্বাকার মাত্র। ফারসী-উর্দ্দু ভাষাকে চট্টগ্রাম আপনার করে নিয়েছিল—কারণ স্বতঃপ্রকাশ। ইসলামীয় ধর্মগ্রন্থের বহুল প্রচার ও প্রকাশ চট্টগ্রামেই প্রভূত পরিমাণে হয়। চট্টগ্রামের ভাষার উপরেও তার প্রভাব যথেষ্ট। বঙ্গদেশের অধিবাসিগণের মধ্যে একমাত্র চট্টগ্রামের এবং আশে-পাশের অধিবাসীরাই জলকে দৈনন্দিন ভাষায় "পানি" বলে। চিরকাল বহু দেশ বিদেশের সভ্যতার সঙ্গমস্থল চট্টগ্রাম কাকেও উপেক্ষা করে নি—যতদূর সম্ভব—সকলকেই চট্টলজননী কোল দিয়েছেন। সকল ভাল'র অনেক ভালই তিনি গ্রহণ করেছেন। যে স্থানে অধিবাসের গৌরব করে শিবশম্ভু মহাদেব একদিন বলেছিলেন,—

"বিশেষতঃ কলিযুগের বসামি চন্দ্রশেখরে"—সেই স্থানেরই অদূরে কত শত শত বৎসর ধরে রায়জিৎ গোস্বামির আখেরা পূর্ণ গৌরবে বিরাজ করছে। এমন কোনও হিন্দু নেই—যিনি পরম ভক্তি ভরে সাধক ভক্ত রায়জিৎ গোস্বামীর চরণে প্রণতি নিবেদন করেন না। আবার সেখানেই অজস্র অজস্র বৌদ্ধমন্দির প্রভৃতিতে "মহামুনি" ভগবান্ বুদ্ধের পূজা চলছে। "মহামুনি"র বাৎসরিক মেলায় লক্ষ লক্ষ হিন্দু প্রাণের অকৃত্রিম ভক্তার্ঘ্য নিবেদন করে। এই সব কারণেই দেখা যায়, চট্টগ্রামের মুসলমান কবিরা যোগতত্ত্ব বিশ্লেষণ করেন ইস্‌লামীয় তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়েও—যেমন এক মুসলমান কবি বলছেন—

"জলে চরে হংসাহংসী করে হাসি-রসি।
হংসা যাএ নিজ ঘর জল কেনে দুখী।"

চট্টগ্রামের ফকীর পীর গাজীদের কাছে হিন্দুরা এবং হিন্দু সাধু সন্ন্যাসীদের মুসলমানেরা অতি অকপটে নিজেদের সাধন রহস্য প্রকট করেছেন। উভয়ে উভয়ের ভাব পরিগ্রহ করেছেন, কোথাও কোনও বৈষম্য দেখা দেয় নি। এই কিছুদিন আগে যে মহান্ সাহিত্যসাধক সুপণ্ডিত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ চট্টগ্রামেই আপন বাস ভবনে দেহরক্ষা করলেন, তাঁর সঙ্গে হিন্দুদের মেলামেশা যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন—তাঁরা এক মুখের বিনিময়ে শত শত মুখে বলবেন—চট্টগ্রামের হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে ভেদবুদ্ধির অপসারক তাঁর মত মহাত্মা ব্যক্তিরাই। সেই মনোভাব চট্টগ্রামে এখনও সার্বজনীন। চট্টগ্রাম জননীর সন্তানেরা সর্বধর্ম নির্বিশেষে, ধনী-দরিদ্র উচ্চ-নীচ সকলে একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত।

বিশালাক্ষী দেবী

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

গত সন ১৩৬৪ সালের চৈত্র মাসের "প্রবাসী"তে বিশালাক্ষী দেবীর ভৌগোলিক বিস্তার সম্বন্ধে কিছু লিখিয়াছিলাম। তৎপরে আরও কিছু তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে—এইগুলি যাঁহারা এ বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা করেন তাঁহাদের কাজে আসিতে পারে মনে করিয়া দিলাম। বিশালাক্ষী দেবী স্থান বিশেষে অন্যান্য নামেও পরিচিত—এজন্য স্থানীয় নামও দিলাম। এমন হইতে পারে যে, এই স্থানীয় নাম বিশালাক্ষী দেবী ব্যতীত অন্য দেবীর নাম। যাহা হউক তথ্যগুলি নিম্নে দিলাম। যথা:

জেলা মেদিনীপুর

	স্থানীয় নাম	গ্রাম	থানা
১।	বিশালাক্ষী	শ্যামসুন্দরপুর	মহিষাদল
২।	ঐ	গোপালপুর	চন্দ্রকোনা
৩।	বাসুলী	চাঁদাবিলা	মেদিনীপুর
৪।	ঐ	আম্‌দাবাদ	নন্দীগ্রাম
৫।	ঐ	সের খাঁ চক্‌	খেজরী
৬।	ঐ	জনকা	খেজরী
৭।	ঐ	হাঁসুভুঞা	নন্দীগ্রাম
৮।	ঐ	শ্যামহরিবাড়	এগরা

২৪ পরগণা

	স্থানীয় নাম	গ্রাম	থানা
১।	বিশালাক্ষী	ফল্‌তা	ফল্‌তা
২।	ঐ	বারুইপুর	বারুইপুর

বারুইপুরের বিশালাক্ষী দেবী বহুদিনের ও খুব প্রখ্যাত। কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল কাব্যে এই বিশালাক্ষী দেবীর উল্লেখ আছে। যথা:

"সাধুঘাটা পাছে করি সূর্য্যপুর মাহিনগরী
চাপাইল বারুইপুরে আসি।
বিশেষ মহিমা বুঝি বিশালাক্ষী দেবী পুজি
বাহে তরী সাধুগুণরাজি॥
মালঞ্চ রহিল দূর বাহিল কল্যাণপুর
কল্যাণমাধব প্রণমিল।
বাহিলেক যত গ্রাম কি কাজ করিয়া নাম
খড়দহ ঘাটে উত্তরিল॥"

কেহ কেহ বলেন যে, কৃষ্ণরাম দাস নহেন তাঁহার প্রকৃত নাম কৃষ্ণরাম বসু। সে যাহা হউক রায়মঙ্গল কাব্য ১৬০৮ শকে বা ইং ১৬৮৮ সনে লিখিত হয়। এ মতে বর্ত্তমান কাল হইতে পৌণে তিনশত বৎসর আগে ইহা লিখিত। তখনকার কালে এই দেবীর

"বিশেষ মহিমা বুঝি বিশালাক্ষী দেবী পুজি"

আরও দক্ষিণে সাধু নৌ-যাত্রা করিলেন। কৃষ্ণরামের নিবাস নিমিতা গ্রামে। এই নিমিতা বা নিমতা গ্রাম কলিকাতা হইতে ৭।৮ মাইল উত্তরে; আর বারুইপুর ১৫।১৬ মাইল দক্ষিণে। এই বিশালাক্ষী দেবীর মাহাত্ম্য ২৪।২৫ মাইল দূরেও ব্যাপ্ত হইয়াছিল।

বিপ্রদাস চাঁদ সদাগরের যাত্রা বিবরণে বারুইপুরের উল্লেখ করিলেও এই দেবীর উল্লেখ করেন নাই। বিপ্রদাস ১৪৯৫ খৃঃ অঃ মনসামঙ্গল লিখিয়াছিলেন। মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ বারুইপুর বা এই দেবীর কোনও নাম করেন নাই। মুকুন্দরামের কাল লইয়া মতভেদ আছে। ইহা ইং ১৫৪৪ সনের আগে বা ইং ১৫৯৪ সনের পরে ইহা রচিত হয় নাই। এজন্য মনে হয় এই বিশালাক্ষী দেবী কৃষ্ণরামের সময় যেরূপ প্রখ্যাত হইয়াছিলেন পূর্ব্বে সেইরূপ হয়েন নাই। এমনও হইতে পারে যে, কৃষ্ণরাম বিশালাক্ষীর ভক্ত ছিলেন বলিয়া বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।
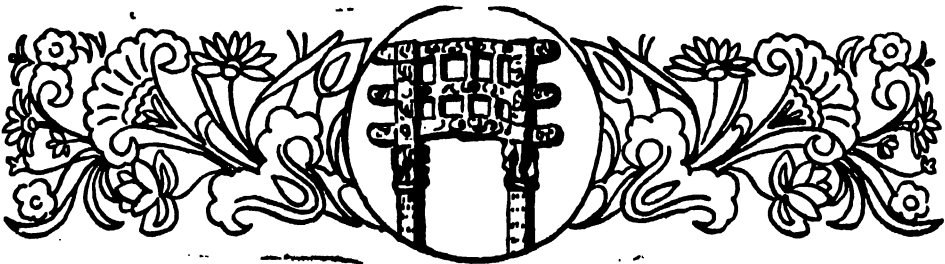
দীপারতি

শ্রীবিমলকুমার চট্টোপাধ্যায়

তোমার দু'টি নীলার চোখে রাতের মায়াজাল বোনা,
গর্বী তনুর চিত্ররেখায় স্বপ্ন-রঙের আল্‌পনা।
শিল্পী মনের বিবশ মাতাল চুণীর মদে বিভোরপ্রায়,
পেশোয়াজের জাফ্‌রানেতে জরদ্‌-রোদের কল্পনা!

রক্তাধরে বিজ্‌লী হাসি গোলাপ-মেঘের চমকানি,
অস্ত-রবির ক্লান্ত-মায়ায় সোনার শিখার ঝলকানি।
চিত্ত আমার উধাও হ'য়ে তেপান্তরেই পথ হারায়,—
'জ্যোৎস্না-রাতের পান্না-কুহক'—আমি কি তার ছল জানি!

বিশ্ব যখন ঘুমিয়ে রবে নিশীথিনীর আঁচল ছায়,
চাঁদের হুরী মুখ লুকোবে রাজার পুরীর থামের গায়।
আসবে তুমি আমার কাছে বিস্মরণের পথ ধরে,
দিগন্তে ওই ঘুমের প্রদীপ এক নাগাড়ে জ্বলবে ঠায়!

উষা-পরী গোলাপ-বনে ঢালবে যখন শিশিরজল,
চিত্ত-হ্রদে মেলবে আঁখি চুম্বনেতেই রূপ-কমল।
মসজিদের ওই আজান সাথে বাজবে যখন বিশ্ববীণ,—
চাওয়া-পাওয়ার অতল-নীরে যাচব প্রেমের মুক্তাফল!

সোনার আঁচল এলিয়ে দিয়ে আস্‌বে মায়া-দ্বিপ্রহর,
মরুর সাগর থম্‌কে গিয়ে জাগবে হঠাৎ সবুজ চর।
দোয়েল-শ্যামা তোমার পথে ফিরবে কেবল শিস্‌ দিয়ে,
তোমার তরে আমার নেশা আনবে আবার যুগান্তর!

কুঞ্জ ছায়ায় রঙীন বিকেল পদ্মরাগের ইঙ্গিতে,
সবুজ শিখা জ্বলবে তখন যৌবনেরই দীপটিতে।
ঊষর-তটে জাগ্‌বে প্রীতি মরকতের মখমলে,—
তোমার অধর দ্রাক্ষা সুরার নেশায় বিভোর দিনটিতে!

শীত-কুহেলির ঘোমটা দিয়ে নামবে প্রেমের সাঁঝ বিহান,
রক্ত-গোলাপ শুকিয়ে যাবে, স্তব্ধ হবে পাখীর গান।
কাড়বে তখন মৃত্যু দূতী আজকে জমা তৃপ্তি গো,
ভূর্জ তরু করবে তবু শেষের মত কিরণ-স্নান!

কাটল আবার আরেক জনম্‌ রূপ-সায়রে ডুব দিয়ে,
'চাঁদ-মুকুরে' মেঘের ছায়া জাগছে অমোঘ রূপ নিয়ে।
অসার দেহের ছিন্ন পুঁথি দূর করে তাই দিই ফেলে,—
অন্ধকারের তামস মোহে মণিদীপের দীপ্তি-এ!

বিদায় ক্ষণে চিরন্তনের ব্রত ভাঙার পথ ধরে,
সংস্কারেরই মলিন মেঘে শম্পা-পরীর রূপ ঝরে।
দেহ-নেশার জীর্ণ খাঁচা কালের অসি ভাঙবে গো,
তরুণ মনের 'আরতি-দীপ' জ্বলবে অটুট মন্তরে!

মস্‌লিনেরই ওড়নাখানি আজকে আবার দাও টানি,
তপ্ত মরুর ললাট তটে রাখ কোমল করখানি।
ব্যথার বীণায় বাজিয়ে গীতি মরীচিকায় ফোটাও ফুল,—
কুহক-মায়ার অন্তরালে নির্ঝরিণীর সুর হানি!

মাধ্যমিক শিক্ষার নব রূপান্তর

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ

প্রাথমিক শিক্ষাকে যদি শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি বলা যায়, মাধ্যমিক শিক্ষা তবে শিক্ষা কাঠামোর স্তম্ভ যার ওপরে গড়ে তোলা হয় কারুকার্যশোভিত নানা কক্ষ, আকাশ-চুম্বী সৌধ শিখর। সকল সভ্য দেশেই জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশ মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে জীবিকা অর্জনের বিভিন্ন পন্থা গ্রহণ করে, অল্প সংখ্যক ব্যক্তি শিক্ষাসৌধের শীর্ষের দিকে অগ্রসর হয়। মানুষের জীবন ও কর্মক্ষেত্র যেমন বিচিত্র, এর জন্য প্রস্তুতিও তেমনি বিচিত্র রূপ পরিগ্রহ করে। শিক্ষার অন্য নাম সুস্থ সমৃদ্ধ সুন্দর জীবন যাপনের জন্য প্রস্তুতি, শিক্ষা ব্যবস্থার ভিতর তাই দেখি সমাজ-জীবনের প্রতিফলন, বর্তমানের সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা, ভবিষ্যতের পূর্বাভাস। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার ও পুনর্গঠনের প্রয়োজন অনুভূত হয় উনবিংশ শতকের শেষ দিকে, মানসিক আলোড়ন ক্রমে দানা বেঁধে ওঠে, শিক্ষাবিদ মনীষীদের কমিশন গঠিত হয়, সুচিন্তিত অভিমত পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়ে মনস্বিতার আলোক বিকিরণ করে, কিন্তু বিদেশী শাসকমহলের অচলায়তনে তা কর্মের উদ্দীপনা জাগাতে পারে নি। স্বাধীনতালাভের পর বহুদিনের রুদ্ধ আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের ও বাস্তব রূপায়ণের সুযোগ এসেছে কিন্তু সেই সঙ্গে এসেছে নূতন নূতন সমস্যা, পরিবর্তিত জগতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নবভারত গঠনের বিরাট দায়িত্ব। বর্তমানে চলেছে শিক্ষাবিদগণের অগ্নি-পরীক্ষার যুগ, তাঁদের দূরদৃষ্টি মানসিক বলিষ্ঠতা ও জগৎ-চেতনা বাস্তবের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেবার যুগ।

পরিবর্তনের পটভূমি

মাধ্যমিক শিক্ষার দুর্বলতা ও অসম্পূর্ণতার বীজ নিহিত ছিল এর আদিতেই। ১৮৩৫ সনে মেকলে সাহেবের প্রস্তাব অনুসারে ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হ'ল এবং এর উদ্দেশ্য হ'ল সরকারী চাকুরিতে প্রবেশার্থীর যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করা। ১৮৪৪ সনে লর্ড হার্ডিঞ্জ যখন সরকারী ঘোষণাপত্রে গবর্ণমেণ্টের নীতি ঘোষণা করলেন যে, ইংরেজী স্কুল শিক্ষিত তরুণদের সরকারী চাকুরির ক্ষেত্রে অন্যের চেয়ে বেশী সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে তখন থেকেই সমাজের মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের লোকদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি অনুরাগ বাড়তে লাগল। সে সময়কার হাই স্কুলগুলি তৎকালীন প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখেই শিক্ষা-ক্রম প্রবর্তন করেছিল, এর মধ্যে জীবনের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুতির আয়োজন ছিল না, আবশ্যকও ছিল না। সে যুগে চাকুরিই ছিল শিক্ষিত মানুষের কাম্য বৃত্তি বর্তমানের মত মানুষের কর্মধারা বিস্তারের এমন প্রশস্ত অঙ্গন সে যুগে রচিত হয় নি। শিল্প-বিপ্লবের আলোড়ন থেকে তখন এ দেশ ছিল অনেক দূরে, কুটিরশিল্প দেশে যা প্রচলিত ছিল তাতে শিক্ষালাভের জন্য স্কুল কলেজের প্রয়োজন ছিল না, বংশানুক্রমিক পন্থায় এই সকল শিল্প কাজ পিতা থেকে পুত্রে পৌত্রে সঞ্চারিত হ'ত। তাঁতী কামার কুমার ছুতার মালাকার পটুয়া প্রভৃতি নিজেদের ব্যবসাগত কাজ নিজেরাই শিক্ষা করত, আপনজনকে বাস্তব কর্মশালায় শিক্ষা দিত; জীবিকার্জনের পন্থা সুনির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল, এর মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্য ছিল, দ্বন্দ্ব ছিল না। তেমনি দেশের মানুষের যে বৃহৎ অংশ শস্য উৎপাদনে ব্রতী ছিল তাদের কাছেও চাষ আবাদের কাজ জানার জন্য বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজন অনুভূত হত না। বরং পুঁথিগত বিদ্যা অর্জন করলে ছেলেরা কৃষির প্রতি বীতরাগ হয়ে উঠে এই ছিল প্রচলিত ধারণা। সমাজের এইরূপ পটভূমিকায় বৃত্তি-শিক্ষার প্রয়োজন ছিল কেবল এক শ্রেণীর লোকের যারা চিরাচরিত জীবনযাত্রার উপায় কোনটিই গ্রহণ করে নি বা করতে ইচ্ছুক ছিল না। ইংরেজী হাই স্কুল কলেজ নূতন বৃত্তির পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল; শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় সমাজে এই নব পেশা হয়েছিল সম্মান ও প্রতিষ্ঠার সোপান। সে যুগের লোকে বলত: যেনতেন সরকারী চাকুরি, দুধভাত। শিল্প বিপ্লব—বিবিধ দ্রব্য উৎপাদনের ব্যাপারে বৃহৎ যন্ত্রের ব্যবহার—আমাদের সমাজেও এনেছিল এমন বিরাট পরিবর্তন যার ফলে ধীরে ধীরে অথচ অমোঘভাবে পূর্বেকার জীবনযাত্রার ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়ে গেল। মৌচাক ভেঙে ফেললে মৌমাছির দল নূতন গৃহ রচনা না করা পর্যন্ত যেমন বিশৃঙ্খল ভাবে অস্বস্তিকর জীবন যাপন করে, বিশ শতকের প্রথম দিক থেকে আমাদের সমাজ-জীবনের অবস্থা এইরূপ

বিপর্যস্ত হয়ে উঠতে থাকে: পুরাতন জীবনধারা বিকল হয়ে গেছে, নূতন সচল হয় নি। গভীরভাবে এর কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের নীরব অথচ বিপুল পরিবর্তনের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক নিবিড়। নূতন জীবনের সঙ্গে তাল রেখে চলতে, নূতন যুগের বিচিত্র কর্ম সম্পাদনের যোগ্যতা অর্জন করতে যে শিক্ষা সহায়তা করবে তার প্রবর্তন শিক্ষিত চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দাবির বিষয় হয়ে উঠল।

সে যুগ আর এ যুগ

বিগত একশত বৎসরে আমাদের দেশের চেহারায় ও জীবন যাত্রায় যেমন পরিবর্তন এসেছে এর আগের এক হাজার বৎসরেও তেমন আসে নি, তার কারণ পূর্বের সমাজে গতিবেগ ছিল নিতান্ত শ্লথ, জীবনের উপকরণে নিত্য নূতন বৈচিত্র্য ঘটে নি: হিন্দু যুগের শেষ দিকে দেশের সামগ্রিক রূপ যেমন ছিল মুঘল আমলের শেষেও তা ছিল প্রায় অপরিবর্তিত। কিন্তু ইংরাজ-শাসনের আমলে ইউরোপের বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং বৃহৎ যন্ত্র-শিল্পের প্রসার আমাদের দেশের মানুষের জীবনে পরিবর্তনের ঘূর্ণিহাওয়া সব ওলটপালট করে দিল। রেড়ির তেলে বাতি জালানো পল্লীগ্রামে প্রবেশ করল কেরোসিন তেলের হ্যারিকেন লণ্ঠন, হাতে চালানো মাকুর পরিবর্তে তাঁতীর গৃহ তাঁতের খটাখট শব্দে মুখরিত হ'ল, লণ্ঠনের পরে এল পেট্রোম্যাক্স লাইট, নদীপথে চলল লঞ্চ স্টীমার, লৌহপথে চলল রেলগাড়ী, শহর গড়ে উঠল, কারখানার বাঁশি আর দীর্ঘ চোঙা-নিসৃত ধূম্রকুণ্ডলী-যন্ত্রদানবের নবযুগের আবির্ভাব ঘোষণা করল। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপকরণ বাড়তে লাগল। রেল-স্টীমার, মোটর গাড়ী, তার টেলিফোন, ছাপাখানা, মিল কল-কারখানা আমাদের জীবনে নিয়ে এল নূতন সম্ভাবনা এবং নূতন নূতন সমস্যা। ইউরোপীয় সভ্যতা ও তার উপকরণ দেওয়াল ভেঙ্গে যেন আমাদের ঘরে প্রবেশ করল, শুধু ভারতবর্ষে নয়, এশিয়ার অন্যান্য দেশেও এমনি পুরাতন যুগের অবসান এবং নূতন যুগের আবির্ভাব সূচিত হ'ল! এই নবযুগের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করে সমাজে এবং জীবনযাত্রায় পরিবর্তন সাধন করা হ'ল বিরাট সমস্যা। এতদিন পর্যন্ত শিক্ষা ছিল পোষাকী, উচ্চ মধ্যবিত্তের কাছে যে একটি মাত্র উপার্জনের পথ খোলা ছিল সেই চাকুরির যোগ্যতা দান করা ছিল ইংরেজী শিক্ষার উদ্দেশ্য। দেশে মানুষের কর্মক্ষেত্র যখন নানা দিকে বিস্তৃত হ'ল, শিল্পকাজেও বিজ্ঞানের জ্ঞান ও কৌশল প্রয়োগ আবশ্যক হয়ে পড়ল। তখন শিক্ষার বিষয়বস্তুতেও নূতনত্ব আমদানি করা একান্ত প্রয়োজন বলে বোঝা গেল। চৌবাচ্চায়-রাখা রুই মাছের পোনা যদি বাড়তে বাড়তে সবখানি জায়গা ভরে ফেলে তবে হয় চৌবাচ্চা বড় করতে হয়, নতুবা মাছ ছেড়ে দিতে হয় পুকুরে। প্রয়োজনের তাগিদেই আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

পরিবর্তনের স্বরূপ

পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভূত হয়ে কর্মের দ্যোতন সৃষ্টি করল; শিক্ষাবিদ্‌গণকে নিয়ে কমিশন গঠিত হতে লাগল: কোন পন্থা গ্রহণ করলে শিক্ষা মানুষকে সমাজের উপযোগী করে তুলতে পারে? প্রচলিত কাঠামোর কোন অংশ বাতিল করতে হবে? নূতন অংশ যা যোজনা করা হবে কী তার স্বরূপ, কী তার সম্ভাবনা? মণীষীদের চিন্তার আলোক-বর্তিকা ভবিষ্যৎ অন্ধকারের বুক চিরে চিরে পথের রেখা ঠিক করতে লাগল। ১৯৩৪ সনে উত্তর-প্রদেশ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত সপ্রু কমিটি মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করেছিলেন বর্তমানে মূলতঃ তাই গৃহীত হয়েছে। বলা হয়েছিল: 'আসল প্রতিকার হ'ল—মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বিভিন্ন পাঠ্য বিষয় প্রবর্তন, এই স্তরটিকে অধিকতর বস্তুনিষ্ঠ ও স্বয়ং সম্পূর্ণ করা এবং শিক্ষার্থীর প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন বৃত্তি বা পেশা শিখানোর ব্যবস্থা করা।' শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে আমাদের বাস্তব জীবনের সমস্যার প্রতিফলন এবং জীবিকার্জনের প্রস্তুতি যে স্থান পায় নি এ সত্য ক্রমশঃ বড় হয়ে দেখা দিতে লাগল। শিক্ষা যদি মানুষকে অর্থোপার্জন করে সৎভাবে জীবনযাপন করার পথ খুলে না দেয় তবে তার মূল্য কোথায়? বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে তাত্ত্বিক জ্ঞানের সঙ্গে বাস্তব প্রয়োগ কৌশল অবগত না হলে কোন শিল্প ও উৎপাদনমূলক কাজেই সাফল্যলাভ করা যায় না। কল-কারখানায়, যন্ত্র-পরিচর্যায়, রাস্তাঘাট নির্মাণে, পরিবহন বিভাগের কাজে—সর্বত্রই যেমন বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন, কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি করতেও চাই আধুনিক মৃত্তিকা বিজ্ঞান উদ্ভিদ বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানদৃষ্টি। আদিকাল থেকে চলে আসলেও ফসল ফলানো মানুষের সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান শিল্প। মাটিতে বিছন ছিটিয়ে দিয়ে তার বহু গুণ শস্য আদায় করে নেওয়ায় একদিকে যেমন সৃষ্টির আনন্দ, অন্যদিকে তেমনি শিল্পীর প্রতিভার বিকাশ। যে দেশে শস্য উৎপাদন একটি শিল্প হিসাবে সমাদৃত নয়, সে দেশের প্রতি লক্ষ্মী বিরূপ; অন্নের কাঙাল হয়ে তাকে বিদেশের দ্বারে হাত পাততে হয়। ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে যে শিক্ষা আমাদের

দেশে প্রসার লাভ করেছিল তাতে কৃষি-শিল্প ব্যবসা বাণিজ্যের কোনটিই পাংক্তেয় হয় নি, ফলে আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি ও প্রবণতা কেবল একদিকেই বৃদ্ধির সুযোগ পেয়েছিল, শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে পরিপূর্ণতা লাভ করার পরিবেশ পায় নি। বর্তমান শিক্ষা-সংস্কারের উদ্দেশ্য শিক্ষার ডালপালা প্রসারের ব্যবস্থা করে মানুষের বর্তমান প্রয়োজনের উপযোগী বিবিধ বিষয় পাঠনার সুযোগ করে দেওয়া যাতে কিশোর-কিশোরী বহুধা বিচিত্র কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুতি লাভ করতে পারে।

নব রূপায়ণ

১৯৫৩ সনে প্রকাশিত মুদালিয়র কমিশন রিপোর্ট মাধ্যমিক শিক্ষার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিচিহ্ন। গত একশত বৎসরের মধ্যে দেশে যে সামাজিক অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান কালোপযোগী শিক্ষাধারা নূতন করে গড়ে তোলার জন্য যেমন আন্তরিকতা বাস্তব দৃষ্টি-ভঙ্গি ও সর্বদিক চিন্তিত পরিকল্পনা এতে প্রকাশ পেয়েছে তেমন আগের কোন রিপোর্টে দেখা যায় নি। মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য আলোচনা প্রসঙ্গে কমিশন তিনটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন যথা—গণতান্ত্রিক সমাজে বাসের যোগ্য মানসিক ও চারিত্রিক জ্ঞানের বিকাশ, দেশের আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধির যোগ্যতা সম্পাদন এবং শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ সঞ্চার। সদাচরণ ও চারিত্রিক গুণ পাঠ্যবিষয় অধিগত করেই লাভ করা যায় না, যোগ্য পরিবেশে গড়ে ওঠে সৎ মানসিক গড়ন এবং তা থেকেই কর্তব্য ও দায়িত্ববোধের উদ্ভব ও পরিপুষ্টি। ফুলের সুবাসের মত মাধ্যমিক শিক্ষার এই লক্ষ্য অলক্ষ্যে সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে করবে কমিশন এই আশা করেন। দেশের আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধি ও সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ সঞ্চার করার উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ে বহুবিধ বিষয় পাঠনার ব্যবস্থা করা হয়েছে যার ভিতর দিয়ে ছাত্রদের শুধু নূতন নূতন বিষয়েই জ্ঞানলাভ হবে না, কর্মজীবনের নূতন নূতন পথের সন্ধান মিলবে। পূর্বেকার মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল একমুখী—কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে তার দরজা ছিল খোলা; বর্তমানের নব রূপায়িত স্কুল বহুমুখী—বিস্তান-ধৃত সমাজজীবনের নানা দিকের পথ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে বিদ্যার্থীর কাছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এখন ৭টি মুখ, এর যে কোনটি অনুসরণ করে কিশোর তার সামর্থ্যের স্ফুরণ ঘটাতে পারে, অর্থোপার্জনের দক্ষতা লাভ করতে পারে। সাতটি জ্ঞানপন্থা (কোর্স) হ'ল (১) হিম্যানিটিজ বা সাহিত্য (২) বিজ্ঞান (৩) কারিগরি (৪) বাণিজ্য (৫) কৃষি (৬) গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ও (৭) ললিতকলা।

বহুশাখ বৃক্ষ

বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণী থেকে ছাত্রকে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হয়; বহুশাখ বৃক্ষের কোন শাখা অবলম্বন করে সে এগিয়ে যাবে তারই উপর নির্ভর করে তার ভবিষ্যৎ কর্মজীবন। কর্মজীবনের জন্য প্রস্তুতির আয়োজন আছে, তাকে রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী পথ নির্ধারণ করে নিতে হবে। মাতৃভাষা ও অন্য একটি ভাষা শিক্ষা সকলের পক্ষেই আবশ্যিক; এর সঙ্গে আছে আবশ্যিক হাতের কাজ শিক্ষার ব্যবস্থা। ইণ্টারমিডিয়েট স্তর থেকে এক বৎসর স্কুলের সঙ্গে যোগ করে দিয়ে বিদ্যালয়ে পাঠকাল এক বৎসর বাড়ানো হয়েছে, অন্য এক বৎসর ডিগ্রী কোর্সের সঙ্গে যোগ করে দিয়ে দুই বৎসরের স্থানে তা করা হয়েছে তিন বৎসরের। মাধ্যমিক শিক্ষাকে যথাসম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ করার চেষ্টা হয়েছে; এর মান হবে উন্নত এবং দেশের প্রয়োজন এর মধ্যে হবে প্রতিফলিত। বহুমুখী বিদ্যালয় স্থাপনের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতি ছাত্রের হাতে-কলমে কিছু কাজ শিক্ষা করার বাধ্য-বাধকতা। দৈহিক পরিশ্রমের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে শুধু তাত্ত্বিক শিক্ষায় শিক্ষিত উন্নাসিক সম্প্রদায় গড়ে তুলে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রভূত অকল্যাণের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বর্তমান জগৎ বিশ্বকর্মার প্রভাবাধীন; শ্রমকে বিদ্যাতীর্থে মর্যাদার আসন দিয়ে আমরা যদি কর্মের প্রতি অনুরাগী পরিশ্রমী হয়ে উঠতে পারি তবেই দেশের সম্পদ বৃদ্ধি সম্ভবপর। এতদিন এক দরজাবিশিষ্ট বিদ্যাকক্ষে বাস করছিলাম; তার দেওয়াল ভেঙে সাতটি দরজা স্থাপন করা হয়েছে, দৃষ্টিপথ প্রসারিত হয়েছে নানাদিকে। এই ব্যাপক পরিবর্তনের সময় কিছুটা অনিশ্চয়তা এবং সংগঠনগত বিশৃঙ্খলার সাময়িক প্রকাশ অস্বাভাবিক নয়। একটি পুরাতন জীর্ণ গৃহের স্থানে নূতন গৃহ নির্মাণের সময় যে অসুবিধা দেখা দেয়; প্রসন্নচিত্তে ভবিষ্যতের দিকে চেয়েই আমরা তাকে মেনে নিই। এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ মনোভাব বাঞ্ছনীয়।

কর্মের নূতন ক্ষেত্র চাই

পৃথিবীর কোন উন্নত দেশেই খুব বেশিসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী উচ্চতম শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে না; শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, পশুপালন, নৌবিদ্যা, সমর-বাহিনী প্রভৃতির ভিতর যে বাস্তব জীবন স্পন্দিত তার মধ্যে প্রবেশ করে অধিকাংশ কিশোর কিশোরী, সমাজ

সমৃদ্ধির রথচক্র ঠেলে নিয়ে চলে সম্মুখের দিকে। অল্প-সংখ্যক মেধাবী তরুণ আত্মনিয়োগ করে বৈজ্ঞানিক গবেষণায়, আইন দর্শন সাহিত্য চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতির উচ্চ জ্ঞানরাজ্যে। ইউরোপের সমৃদ্ধ দেশগুলিতে দেখি মাধ্যমিক শিক্ষার পরের স্তরে কর্মের জন্য প্রস্তুতির বহুবিধ আয়োজন—কৃষি বিদ্যালয় সেখানে শুধু তাত্ত্বিক নয়,বাস্তব শিক্ষা দিয়ে তরুণদের শস্য উৎপাদনের মহান শিল্পকাজের যোগ্য করে তোলা হয়; শিক্ষাবিস্তার বিভিন্ন পর্যায়ের স্কুল, পলিটেকনিক, বাণিজ্যবিদ্যা শিক্ষার বিদ্যালয় যেখানে বাণিজ্যের বাস্তব সমস্যার সঙ্গে কর্মীদের পরিচিত করানো হয়। পশুপালন শিক্ষালয় যেখানে হাঁস মুরগীপালন, গোপালন প্রভৃতির উপায় পদ্ধতি সংক্রান্ত শিক্ষার ব্যবস্থা বর্তমান। আমাদের বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষায় নূতন পথ খুলে দেওয়া হয়েছে কিন্তু সেই পথ ধরে অগ্রসর হলে যাতে উপযুক্ত জ্ঞান ও বাস্তবতা মিশ্রিত শিক্ষার সুযোগ পাওয়া যায় এবং সর্বশেষে তা প্রয়োগ করে জীবনকে সুন্দর ও সমৃদ্ধ করা যায় তার ব্যাপক বন্দোবস্ত চাই। মাধ্যমিক শিক্ষার সুষ্ঠু বিন্যাসের ওপর উচ্চতর শিক্ষা এবং দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিত্তি নির্ভর করছে। সেই দৃষ্টি-ভঙ্গি থেকে বিচার করলে বোঝা যাবে মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার রূপান্তর আমাদের শত বৎসরের বিবর্তনের ফল এবং নূতন এক যুগের দিকে প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

আমার বাংলা

শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী

খণ্ডিত দেহ ব্যথাজর্জর, ক্ষুধার্ত আত্মার
আর্তনাদের ভাষা নেই। নীল কুয়াশাঢাকা আকাশ
আঁধার সামনে, হৃদয়ে আঁধার; দুর্বহ হতাশার
রিক্ততা চোখে। নিভে গেছে বুকে সূর্য্যের প্রতিভাস।

সূর্য যে নেই। তুষারের হিমহৃদয়ে বেঁধেছি ঘর।
অন্ধকারের গভীরে প্রাণের চেতনা নিরুত্তর।
জীবনে অলস লঘু স্বপ্নের জাল বুনে বুনে থাকি;
বাক্য লেখার বাতিক না হলে কেরাণীর মসী মাখি।
চায়ের টেবিলে তাস ভাঁজি জোরে, ফাঁকে ফাঁকে আলোচনা,
—"আরবসাগরে ঝড় উঠেছিলো, ডুবেছে দু'চারজনা।
চায়নায় চাল সস্তা; আয়ুব বেয়াদব জোরদার,
আসামে চলেছে পাকিস্তানের মতই অত্যাচার।"

ঘরে চাল নেই। গিন্নী গেছেন শূন্য বটুয়া হাতে
শাড়ীর দোকানে। মেয়েটা নিত্য ফিরছে অনেক রাতে;
ইস্কুল ছেড়ে বিগড়েছে—সিনেমার বড় নেশা;
নাকে কানে তেল—দশটা পাঁচটা কলম পেষার পেশা।
মুখে আছে তবু ঐতিহ্যের, গরিমার ভণ্ডামি,
ভিক্ষান্নের করুণা কুড়োতে হয়েছি তীর্থকামী।

কোথায় দাঁড়াই অর্দ্ধেক দেশ বিদেশের পদতলে,
আমার পুণ্য স্বাদের মাটি ডুবে আছে বেনোজলে।
ঘর ভেঙ্গে গেছে, বালির চরাতে ঠাঁই নেই দাঁড়াবার,
আমরা বাঙ্গালী এ পরিচয়কে ঢাকুবো কোথায় আর!

ঘরে ঘরে কাঁদে নিরন্নপ্রাণ, পদে পদে লাঞ্ছনা,
ক্ষুধিত মুখের আর্তিতে, ভারু জীবনের প্রতারণা;
আসাম দেশের চোখ জুড়ে শুধু বিছিয়ে দিয়েছে কালি
বুকের রক্তে ভ্রাতৃপ্রেমের সমিধ রেখেছো জ্বালি।
পিশাচের হাতে আমার নারীর কঠিন লাঞ্ছনাতে
ধিক্কার নেই; যুধিষ্ঠিরের চরণের সাথে সাথে
কোটিতে কোটিতে সারমেয় যত চলেছি স্বর্গজয়ে,—
জায়াজননীর সতীত্ব তবে দাঁড়াবে কার আশ্রয়ে?

ওরে ঘুম তোর ভাঙ্গবেনা আজও? দুয়োরে দিয়েছে হানা
মৃত্যুর দূত; কুয়াশার নীল অশরীরী হাতছানি;
ক্রীতদাসত্বে আজও বাঁধা রবি? পরিচয় দিতে মানা;
স্থবির দেহের গিঁঠে গিঁঠে যত বীজাণুর আমদানি।
পদলেহনের ধূলিলেপ মুখে অদৃশ্য কৌতুকে
ভায়ের মায়ের নিপীড়ন আজ বাজেনা আমার বুকে
দুর্ভাগ্যের লজ্জায় শুধু ব'য়ে যাই নতশিরে,
দাসত্ব, হীন চাটুবৃত্তির ঘৃণায় রেখেছে ঘিরে।

চেয়ে দেখ আজ—ঘরে ঘরে শুধু অসহায় রিক্ততা,
প্রবঞ্চনায় সারাজীবনের শূন্য হয়েছে কথা।
ক্ষুধায় জীর্ণ দীন দেহখানি ঢেকে রাখা নির্মোকে
শীর্ণ মনের চকিত চেতনা কাঁদে লজ্জিত চোখে।
চেতনারিক্ত আত্মলোপের মৃত্যুর গ্লানি থেকে—
কে জাগাবে আজ সারাবাংলার কালঘুম ডেকে ডেকে?
সূর্য কোথায়, শক্তি কোথায়, আশ্বাস কোন্‌খানে?
এ আঁধার থেকে মুক্তি কোথায়, অগ্নি কোথায় প্রাণে?

কালিদাস সাহিত্যে 'সর্প'

শ্রীরঘুনাথ মল্লিক

সাপ দেখলে ভয় পায় না এমন লোক এক বেদে ছাড়া অপর কেউ আছে কিনা সন্দেহ, কিন্তু সেই ক্রুর স্বভাব সাপকেও মহাকবি কালিদাস তাঁর রচনাবলীর মাঝে মাঝে এমন সুন্দর ভাবে উপমান করেছেন যে, তাতে তাঁর লেখনীর মর্যাদা বৃদ্ধিই পেয়েছে, কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি।

প্রথমে শ্রীরামচন্দ্রের মুখ থেকে সাপের উপমা নিয়ে আলোচনা করা যাক্। সীতাকে সচ্চরিত্রা জেনেও, তিনি যে পতিব্রতা নারীদের শীর্ষস্থানীয়া সে বিষয়ে পূর্ণ বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও রাম কেবল নিজের স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে প্রজারা যে বিরূপ সমালোচনা করে বেড়াবে, ইহা অসহ্য মনে করে সীতাকে চিরতরে বনে নির্বাসিতা করে দেবেন স্থির করে ফেলে তাঁর এ সঙ্কল্প ভায়েদেরকে জানিয়ে দেওয়ার সময় বলছেন "ভেবো না তাহলে আমার রাবণ-বধ নিষ্ফল হয়েছে, কারণ"অমর্ষণঃ শোণিতাকাঙ্ক্ষয়া কিং। পদা স্পৃশন্তং দশতি দ্বিজিহ্বঃ।" (রঘু—১৪ ৪১)—'পায়ের দ্বারা দলিত হলে ক্রুর স্বভাব সাপ যে কামড়ায়, সে কি রক্ত পানের লোভে কামড়ায়!'

রাম বলতে চাইছেন যে, তিনি লঙ্কায় গিয়েছিলেন, রাবণের রাজ্য কেড়ে নিয়ে ভোগ করার লোভে নয়, রাবণ তাঁর স্ত্রীকে হরণ করে নিয়ে যে অপমান তাঁকে করেছিল, কেবল সে অপমানের প্রতিশোধ লওয়ার জন্য তিনি রাক্ষসদের দেশে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন।

পরশুরামের মুখেও সাপের উপমা। নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপার সমর্থন করার জন্য পরশুরাম যে সাপের উপমাটি ব্যবহার করেছেন, নিম্নে তাহা দেওয়া গেল—

'হরধনু' ভঙ্গ করার পর রাম সীতাকে বিবাহ করে দশরথের সঙ্গে মিথিলা থেকে অযোধ্যায় ফিরে চলেছেন, পথের মাঝে ক্ষত্রিয়দের মহাশত্রু পরশুরাম পথ আগুলিয়ে রামের রথের সামনে দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধস্বরে বলছেন, 'আমার পিতাকে একজন ক্ষত্রিয় বধ করেছিল বলে ক্ষত্রিয় জাতটাই আমার শত্রু, বহুবার তাদেরকে ধ্বংস করে ক্রোধ শান্ত করেছি, এখন—'সুপ্ত-সর্প-ইব দণ্ডঘট্টনাদ্রোষিতোঽস্মি তব বিক্রমশ্রবাৎ'। (রঘু—১১।৭১)—'তোমার পরাক্রম (হরধনু ভঙ্গ করার বীরত্ব) শুনে ঘুমন্ত সাপকে লাঠির খোঁচা দিলে সে যে ভাবে জেগে উঠে আমিও ঠিক সেই ভাবে রেগে গিয়েছি।'

পরশুরামের কেবল কথা বলার সময় নয়, তাঁর আকৃতির বর্ণনা দেওয়ার সময়ও মহাকবি সাপের উপমা ব্যবহার করেছেন।

পরশুরাম ছিলেন সেকালের নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের সন্তান, সুতরাং তাঁর আকৃতিতে একটা মনোহারিত্ব থাকা স্বাভাবিক, অথচ ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করতেন বলে তাঁর দেহে একটা ভীষণতার ছাপও রয়ে গিয়েছিল। পরশু-রামের দেহের এই ভীষণ ও মনোহর ভাবের সমন্বয় বর্ণনা করবার সময় মহাকবি বলেন,'দেহে ছিল তাঁর পিতৃবংশের যজ্ঞোপবীত, আর হাতে ছিল তাঁর মাতৃবংশের উজ্জ্বলধনু তাঁকে দেখাচ্ছিল যেন, 'স-দ্বিজিহ্ব ইব চন্দনতরুঃ!' (রঘু—১১।৬৪)—'যেন সর্প-বেষ্টিত চন্দন বৃক্ষ'।

চন্দন বৃক্ষ দেখতে মনোরম, কিন্তু সেই চন্দন বৃক্ষে যখন সাপ জড়িয়ে থাকে, তার মনোহারিত্বে একটা ভীষণতার ছাপ রয়ে যায় না কি?

সাপেরা যে চন্দন বৃক্ষে জড়িয়ে থাকতে ভালবাসে, বিশেষত গ্রীষ্মকালে—এই তথ্যটি জানিয়ে দিতে গিয়ে মহাকবি আবার একবার সাপ ও চন্দন তরুর উপমা দিয়ে বক্তব্যটি বেশ হৃদয়গ্রাহী করেছেন।

রাবণরাজার ভগিনী সূর্পণখা বনের মাঝে সহসা তরুণ ও সুপুরুষ রামকে দেখে কামার্তা হয়ে নিজের মনোভাব জানাবার জন্য যখন তাঁর কাছে যেতেছিল, তার সে গমন-ভঙ্গিকে মহাকবি গ্রীষ্মার্তা সর্পীর চন্দন বৃক্ষে গমন করার উপমা দিয়ে বর্ণনা করেছেন—

'অভিপেদে নিদাঘার্তা ব্যালীব মলয়দ্রুমম্' (রঘু—১২।৩২)—গ্রীষ্মের তাপে আর্ত হয়ে সর্পী যে ভাবে চন্দন বৃক্ষের নিকট গমন করে।

কিন্তু সাপেদের বা সর্পিণীদের চন্দন তরুকে জড়িয়ে থাকতে ভাল লাগলেও, চন্দন বৃক্ষের যে সাপের স্পর্শ ভাল লাগে না, কেবল নিরুপায় হয়ে তাকে তাদের সকল অত্যাচার সহ্য করে থাকতে বাধ্য হতে হয়, সে কথাও মহাকবি 'রঘুবংশের' দশম সর্গে—জানিয়ে দিতে ভুলেন নাই।

সেখানে তিনি বলেছেন যে, রাক্ষসরাজ রাবণের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দেবতারা যখন সকলে মিলে শ্রীবিষ্ণুর নিকটে গিয়ে নিজেদের দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী

নিবেদন করেছিলেন, শ্রীবিষ্ণু তাঁদেরকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, "ব্রহ্মা তাকে বর দিয়েছিলেন বলে আমি 'অত্যারূঢ়ং রিপোঃ সোঢ়ং চন্দনেব ভোগিনঃ' (রঘু—১০।৪২)—'শত্রুর অতিবৃদ্ধি সহ্য করে এসেছি, যেমন চন্দন বৃক্ষ সাপের অত্যাচার সহ্য করে থাকে'।"

সর্পরাজ বাসুকী আর শ্রীবিষ্ণুর সমুদ্র-শয়নের প্রিয়-শয্যা শেষনাগকেও মহাকবি উপমান রূপে ব্যবহার করেছেন।

'রঘুবংশের' একাদশ সর্গে—'হরধনু ভঙ্গের' দৃশ্য বর্ণনা করার সময় মহাকবি লিখছেন, রাজর্ষি-জনকের লোকজনেরা যখন রামচন্দ্রকে দেখবার জন্য হরধনুটি বহে নিয়ে এসে সভার মধ্যে রেখে দিল, তখন সে ধনুটিকে দেখে মনে হ'ল, 'প্রসুপ্তভুজগেন্দ্রভীষণং' (রঘু—১১।৪৪), —'নিদ্রিত সর্পরাজের মত ভয়ঙ্কর'—যেন ধনু নয়ত, ঘুমন্ত বাসুকী সাপ!

শেষনাগের উপমাটি সুন্দর। শ্রীরামচন্দ্রের বানর সৈন্যদল লঙ্কায় যাওয়ার জন্য দক্ষিণ মহাসমুদ্রের উপর গাছ ও পাথর দিয়ে যে সেতু নির্মাণ করে ফেলল, সেটি দেখতে কেমন হ'ল?

মহাকবি তার বর্ণনা দিয়েছেন, 'রসাতলাদিবোন্মগ্নং শেষং স্বপ্নায় শার্ঙ্গিনঃ' (রঘু—১২।৭০)—'দেখাল যেন, শেষনাগ নারায়ণ নিদ্রা যাবেন বলে পাতাল থেকে উঠে সমুদ্রের উপর তাঁর শয্যা হয়ে রয়েছে।

মহাকবির যুগেও মন্ত্র ও ওষধী দ্বারা বিষধর সর্পদের বীর্য রুদ্ধ করে ফেলা যেত, সে কথা তাঁর 'রঘুবংশের' দিলীপ-রাজার কাহিনী পড়লে বুঝা যায়।

এক সিংহকে মারবার জন্য যেমন রাজা তূণীর থেকে তীর বার করতে গেলেন, রুদ্রের প্রভাবে তাঁর হাতটি তূণীরে আটকে রইল। সম্মুখে শত্রু, অথচ তাকে মারবার উপায় নাই—নিষ্ফল রোষে রাজা গজরাতে লাগলেন।

তেজস্বী-পুরুষের নিষ্ফল ক্রোধে দগ্ধ হয়ে গজরানর দৃশ্যটি মহাকবি মন্ত্র ও ওষধী দ্বারা রুদ্ধবীর্য সাপের উপমা দিয়ে বর্ণনা করেছেন। কবির কল্পনানেত্রে দিলীপ-রাজাকে তখন দেখাচ্ছিল, 'ভোগীব মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্যঃ' (রঘু—২।৩২)—যেন মন্ত্র ও ওষধী দ্বারা রুদ্ধবীর্য সাপ।

'রঘুবংশে' যেমন রুদ্ধবীর্য সাপের নিষ্ফল আক্রোশে দগ্ধ হওয়ার—উপমা, 'কুমারসম্ভবে' তেমনি মন্ত্র দ্বারা হতবীর্য সাপের হীন মুহ্যমান্ অবস্থার উপমা পাওয়া যায়।

তারকাসুরের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে দেবতারা গেলেন ব্রহ্মাকে নিজেদের দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী নিবেদন করতে। দেবতারা কিছু বলবার পূর্বেই ব্রহ্মা তাঁদের দীন মলিন মুখগুলি দেখে উৎকণ্ঠার সহিত অন্যান্য দেবতাদের মত, বরুণকে বললেন, "এই কি বরুণের হাতের সেই 'পাশ-অস্ত্র?' 'মন্ত্রেণ হতবীর্যস্য ফণিনো দৈন্যমাশ্রিতঃ' (কু—২।২১)—'এ যে মন্ত্রের দ্বারা হতবীর্য ফণির মত দীন-ভাবাপন্ন হয়ে গেছে'।

সাপেরা যে খোলস পরিত্যাগ করলে দ্বিতীয়বার সেটি গ্রহণ করে না, এই তথ্যটিকেও মহাকবি অতি সুন্দর ভাবে উপমান করেছেন, 'রঘুবংশের' অষ্টম সর্গে।

মহারাজ রঘু হয়েছেন বৃদ্ধ, কুলপ্রথামত উপযুক্ত পুত্র অজকে সিংহাসনে বসিয়ে শেষজীবন ভগবচ্চিন্তায় কাটিয়ে দেবেন স্থির করে ফেললেন। তারপর যখন গৃহ ছেড়ে, সংসার ছেড়ে বনে চলে যাওয়ার সমস্ত বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ করা হ'ল, অজ আর স্থির থাকতে পারলেন না, পিতার চরণে মস্তক রেখে অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলতে লাগলেন, "আমাদের ছেড়ে বনে যাবেন না।"

তখন? পুত্রবৎসল রঘু পুত্রের অশ্রুপূর্ণ-মুখ দেখে বিচলিত হয়ে পুত্রের ইচ্ছা পূরণ করলেন। বনে যাওয়া তাঁর হ'ল না বটে, কিন্তু—

'নতু সর্পইব ত্বচং পুনঃ
প্রতিপেদে ব্যপবর্জিতাং শ্রিয়ম্॥'
(রঘু—৮।১৩)।

সর্প যেমন একবার খোলস ত্যাগ করলে পুনরায় তা গ্রহণ করে না, তিনিও তেমনি পরিত্যক্ত রাজ্য-সম্পদ গ্রহণ করলেন না।

তখনকার দিনে লোকের বিশ্বাস ছিল, সাপেদের মাথায় অত্যুজ্জ্বল মণি থাকে। কালিদাসের একাধিক কাব্যনাটকে তার উল্লেখ পাওয়া যায়।

'রঘুর ত্রয়োদশে' মহাসমুদ্রের বর্ণনায় মহাকবি অনেক সুন্দর সুন্দর দৃশ্যের অবতারণা করেছেন, তার মধ্যে একটিতে বলেছেন, 'মহাসমুদ্রের এক জায়গায় সাপেরা বেলাভূমির বায়ু সেবন করবার জন্য জলের ভিতর থেকে উপরে উঠে আসাতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ-এর সঙ্গে তারা মিশিয়ে গিয়েছে, কেবল 'সূর্য্যাংশু-সম্পর্কসমৃদ্ধরাগৈর্ব্যজ্যন্ত এতে মণিভিঃ ফণস্থৈঃ' (রঘু—১৩।১২)—তাদের ফণার উপরের মণিগুলির দীপ্তি সূর্যের কিরণ লেগে বৃদ্ধি পাওয়াতে তাদেরকে সাপ বলে বুঝতে পারা যেতেছে।

মহাসমুদ্রের জলের রং কালচেটে নীল, সাপগুলির দেহের বর্ণও সেইরূপ—কালচেটে নীল, তাই যখন তারা জলের ভিতর থেকে হাওয়া খাওয়ার জন্য উপরে উঠে তরঙ্গের সঙ্গে ভেসে চলে, তাদের রং আর জলের রং এক রকম বলে তারা জলের সঙ্গে মিশিয়ে যায়। সা

দিনে
দিনে
দিনে
দি...
রেক্সোনা সাবানে 'ক্যাডল' বলে
একটি বিশেষ ধরণের তেল মেশানো হয়,
যাতে ত্বক আরও কোমল, আরও
সুন্দর, আরও লাবণ্যময়ী হয়...! সুবাস
ভরা রেক্সোনার পরশ সারাদিন
আপনাকে সজীব আর সতেজ রাখে।
সৌন্দর্য্য সাধনায় সর্ব্বদা
রেক্সোনা ব্যবহার করুন !
Rexona
BLENDED WITH CADYL

বলে চিনবার উপায় থাকে না। তবে তাদের ফণার উপর যে মণিগুলি থাকে সূর্যের কিরণ লেগে সেগুলি যখন ঝকমক করতে থাকে তখনই কেবল বুঝা যায় ওগুলা ঢেউ নয়, সাপ—জলের উপর কতকগুলি সাপ ভেসে বেড়াচ্ছে।

সাপের মাথার মণির উল্লেখ 'কুমার-সম্ভবেও' পাওয়া যায়।

তপস্যারতা গৌরীর ভক্তি-পরীক্ষা করবার জন্য শিব এসেছেন ব্রহ্মচারীর ছদ্মবেশে। কেন যে গৌরী এ নবীন যৌবনে আভরণগুলি খুলে ফেলে দিয়ে বৃদ্ধকে যা শোভা পায় সেই বল্কল পরে কঠোর তপস্যায় রত হয়েছেন জানতে চেয়ে তিনি বলছেন, "পরাভিমর্শো ন তবাস্তি কঃ করং। প্রসারয়েৎ পন্নগরত্নসূচয়ে' (কু—৫।৪৩)—কেহ যে তোমার উপর অত্যাচার করতে পারে এ কথা ভাবা যায় না, কারণ এমন কে আছে যে সাপে মাথার মণি লওয়ার লোভে হাত বাড়ায়?

'রঘুবংশেরও' এক জায়গায় মহাকবি ঠিক এই ভাবটিরই যেন পুনরাবৃত্তি করে বলেছেন—'সর্পস্যেব শিরোরত্নং নাস্যশক্তিত্রয়ং পরঃ' (রঘু—১৭।৬৩)—সাপের মাথার মণি যেমন কেহ নিতে পারে না, তাঁরও রাজশক্তি কোনও শত্রু আকর্ষণ করে নিতে পারত না।

শিবের বর্ণনা দিতে দিতে মহাকবি 'কুমারসম্ভবের' এক শ্লোকে বলেছেন, 'কপর্দমুদ্বদ্ধমহীনমূর্দ্ধরত্নাংশুভির্ভাস্বরমুল্লসদ্ভিঃ' (কু—১২।৯)।

শিবের মাথায় জটা—কয়েকটা সাপকে দড়ির মত ব্যবহার করে এ জটা তিনি বদ্ধ করে রাখতেন, তাই নিজে মাথায় রত্ন ধারণ না করলেও দড়ির মত জড়ান সাপেদের মাথার মণিগুলির দীপ্তিতে তাঁর মস্তকটি রত্ন-শোভিত বলে মনে হ'ত।

সাপেদের ফণায় মণি থাকে মহাকবি শুধু একথা বলেই ক্ষান্ত হন নাই, খ্যাতনামা সাপেদের মণিগুলির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও কিছু না কিছু বর্ণনা দিয়েছেন।

সর্পরাজ বাসুকীর ফণায় যে মণিটি থাকে, সে মণির বৈশিষ্ট্য এই যে, তার প্রভায় একটা শয়ন-ঘর আলোকিত করে রাখা যেতে পারে—একথা তিনি 'কুমারসম্ভবে' জানাতে চেয়েছেন।

অসুররাজ তারক যখন দেবতাদেরকে যুদ্ধে পরাজিত করে স্বর্গরাজ্য দখল করে বসলেন, মহাকবি বলেন, তখন 'জলন্মণিশিখাশ্চৈনং বাসুকিপ্রমুখা নিশি' (কু—২।৩৮)—রাত্রিতে তাঁর শয়ন গৃহটি বাসুকি প্রভৃতি সাপেদেরকে তাদের মণির দীপ্তিতে আলোকিত করে রাখতে হ'ত। সে গৃহে আর অন্য কোনও আলো জ্বালান হত না।

এ বর্ণনা পড়লে মনে হয় বাসুকির ফণার মণিটি উজ্জল হলেও অসাধারণ নয়, যেন সাধারণ ধরণের একটি অত্যুজ্জল মণি, কিন্তু কালিয় নাগের ফণার-মণির যে বিবরণ 'রঘুবংশে' দিয়েছেন মহাকবি, তা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ত্রিভুবনে এ মণির তুলনা ছিল না।

মথুরার রাজা সুষেণের পরিচয় দিতে দিতে কালিদাস লিখছেন, 'যমুনাবাসী কালিয়নাগ যখন গড়ুরের ভয়ে অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েন, তখন রাজা সুষেণ তাঁকে অভয় দিয়েছিলেন বলে কালিয় নাগ তাঁকে যে মণিটি উপহার দেন, সে মণিটি—'বক্ষঃস্থলব্যাপিরুচংদধানঃ। সকৌস্তুভং হ্রেপয়তীব কৃষ্ণম্'। (রঘু—৬।৪৯)—তাঁর সারা বক্ষঃস্থলে যখন সে মণির দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ে শ্রীকৃষ্ণের 'কৌস্তুভ-মণি'ও তার কাছে যেন হীন বলে মনে হয়।

স্বয়ং নারায়ণের বক্ষের মণি—সে মণিও যার কাছে কিছুই নয় সে মণি যে কি অসাধারণ মণি, তার বর্ণনা দেওয়া সম্ভব কি!

শেষনাগ—যাকে সাধারণত অনন্তনাগ বলা হয়, তার ফণার মণিরও কিছু বর্ণনা পাওয়া যায় 'রঘুবংশে'।

শ্রীবিষ্ণুর বর্ণনা প্রসঙ্গে মহাকবি বলেন, 'শ্রীবিষ্ণু তখন বসেছিলেন শেষনাগের দেহের উপর, যার মাথার মণির প্রভায় তাঁর সারা অঙ্গ উদ্ভাসিত হতেছিল (রঘু—১০।৭)।

পরমপুরুষের জ্যোতির্ময় দেহকেও যে মণি উদ্ভাসিত করতে পারে সে মণি কি যে-সে মণি?

এতক্ষণ যে সমস্ত সাপের কথা বলা হ'ল তারা সাধারণ সাপ, অসাধারণ অর্থাৎ পক্ষযুক্ত সাপের উপমাও মহাকবির সাহিত্যে পাওয়া যায়।

স্বর্গের রাজা ইন্দ্র ও মর্ত্তের রাজা দিলীপের পুত্র রঘুর যুদ্ধের বর্ণনা দিতে গিয়ে মহাকবি বলেছেন, 'গরুত্মদাশীবিষভীমদর্শনৈঃ'। (রঘু—৩।৫৭)—পক্ষযুক্ত-সর্পের মত দেখতে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর বাণ (উভয়ে উভয়ের প্রতি নিক্ষেপ করতে লাগলেন)।

বিষহীন, নিবীর্য ঢোঁড়া সাপেরও উল্লেখ তাঁর সাহিত্যে পাওয়া যায়।

মহামুনি বিশ্বামিত্রের নির্দেশে রাম তাঁহাদের আশ্রমের যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে অন্য সকলকে ছেড়ে কেন যে তাদের দলপতি মারীচ ও সুবাহুকে আক্রমণ করলেন তার কারণ জানাবার জন্য মহাকবি লিখছেন, 'কিং মহোরগ বিসর্পিবিক্রমো-রাজিলেষু গড়ুরঃ প্রবর্ত্ততে।'—গড়ুর কি কখনও মহা-সর্পকে ছেড়ে ঢোঁড়া সাপকে আক্রমণ করে।

'রঘুবংশের' প্রথম সর্গে পাওয়া যায়, জলাধিপতি

বরুণ পাতালে যে বিরাট যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন, সে যজ্ঞগৃহের দ্বার-রক্ষার ভার দেওয়া ছিল সাপেদের উপর, তারা প্রহরীর মত পাহারা দিত ('ভুজঙ্গপিহিতদ্বারং পাতালম্—রঘু-১।৮০)।

'রঘুবংশে' রাম-রাবণের যুদ্ধের বর্ণনা তিনি এমন ভাবে দিয়াছেন যে, একটা শ্লোক পড়লে মনে হয় যেন বাস্তবিকই মহাকবির বিশ্বাস ছিল যে পাতালে বহু সাপ বাস করে। তিনি লিখেছেন :

'রাবণস্তাপি রামাস্তো ভিত্বা হৃদয়মাশুগঃ
বিবেশ ভুবমাখ্যাতুমরগেভ্য ইব প্রিয়ম্।"(রঘু-১২।৯১)

রামের ক্ষিপ্রগতি-অস্ত্র রাবণের হৃদয় ভেদ করে যেন সাপেদেরকে এ প্রিয় সংবাদ দেওয়ার জন্য ভূমির ভিতর চলে গেল।

নবম সর্গে 'মুক্তবিষভুজঙ্গের' উপমা পাওয়া যায়।

রাজা দশরথ অন্ধমুনির পুত্রকে দূর থেকে ভুল করে হাতী ভেবে 'শব্দপাতী' বাণ দ্বারা বধ করায় অন্ধমুনি তাঁকে অভিসম্পাত দেন। অভিসম্পাত দেওয়ার পর মুনি যখন সুস্থ হলেন, ক্রোধ শান্ত হ'ল, মহাকবি তাঁর তখনকার সে শান্ত অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন—'আক্রান্তপূর্ব্বমিব মুক্তবিষং ভুজঙ্গম্' (রঘু-৯।৭৯)—আক্রান্ত হলে আক্রমণকারীকে দংশন ও বিষ উৎসেক করার পর সাপ যেমন সুস্থ ও শান্ত হয়।

'কুমারসম্ভব' কাব্যে তিনি দেবতা ও অসুরদের যুদ্ধ-বর্ণনার পূর্বে তারকাসুরের যুদ্ধ যাত্রার বর্ণনা এমন ভাবে দিয়েছেন যে তা থেকে বুঝা যায় তিনি সর্প দর্শন, দুর্লক্ষণ বলে বিশ্বাস করতেন।

অসুররাজ তারক যখন যুদ্ধে বার হ'ল, চারিদিকে দুর্লক্ষণ দেখা যেতে লাগল, সে দুর্লক্ষণগুলির মধ্যে সর্প দর্শনেরও বর্ণনা আছে—'লোক ভয়চকিত চিত্তে দেখল অসুররাজের রথের ধ্বজার উপর যেন সাপ উঠেছে, আর তার মুখ থেকে বিষ ঝরে পড়ছে—(কু-১৫।১০)।

মহাকবি সাহিত্যে এক নাগকন্যার বিবরণ পাওয়া যায়, এখানে সেটি দেওয়া গেল।

শ্রীরামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র অবিবাহিত কুশের জল-বিহার বর্ণনা। মহাকবি বলেন যে, স্নানের পর গা মুছার সময় কুশ দেখলেন তাঁর দক্ষিণ বাহুতে 'জয়শীল' কবচটি নাই, নদীর জলে কখন পড়ে গিয়েছে তিনি জানতে পারেন নি। তাঁর আদেশে 'ডুবরি' ও 'জালিকেরা' জলে নেমে অনেক খোঁজাখুঁজির পরও যখন কবচটি উদ্ধার করতে পারল না, তারা জানাল যে, জলের মধ্যে যে কুমুদ নামক নাগ থাকে নিশ্চয় সে-ই সেটি পেয়ে নিজের কাছে রেখে দিয়েছে।

কুমুদ নাগকে জব্দ করার জন্য কুশ ধনুকে গড়ুর-বাণ যোগ করে জলের দিকে লক্ষ্য করতে লাগলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে জলের মধ্যে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হ'ল। কুমুদনাগ ভয় পেয়ে তাঁর কনিষ্ঠা ভগিনী কুমুদ্বতীকে সঙ্গে নিয়ে জলের উপর উঠে এলেন, আর অনেক মিনতি করে ক্ষমা চেয়ে কুশকে তাঁর হারাণ কবচটি ফিরে দিলেন। শেষে বললেন যে, তাঁর ভগিনী কুমুদ্বতীর একান্ত ইচ্ছা যে, তাদের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সে তার সারা জীবন কুশের সেবা করে কাটিয়ে দেয়। কুশ তাঁর কথায় সম্মত হয়ে কুমুদ্বতীকে বিবাহ করলেন, মানুষের সঙ্গে নাগকন্যার বিয়ে হয়ে গেল।

মহাকবি কুমুদনাগকে এক জায়গায় বলেছেন, 'ভুজঙ্গ-রাজ' (রঘু-১৬।৭৯), আর এক জায়গায় বলেছেন, 'তক্ষকের পঞ্চম পুত্র' (রঘু—১৬।৮৮), মল্লিনাথ তার পূর্বে কুমুদনাগকে বলেছেন 'পন্নগ।'

তা ছাড়া এই বিয়ের ফলে, মহাকবি বলেন কুমুদ নাগকে বন্ধুরূপে পেয়ে কুশের রাজত্বে আর সর্পভয় রইল না।

তবু একটা 'কিন্তু' থেকে যায়। কুমুদ্বতী যদি সত্যই সাপ হতেন তাহলে মানুষের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হ'ল কিরূপে, যথাসময়ে তাঁদের পুত্রও হ'ল। তার পর কুশ যখন দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে নিহত হলেন, কুমুদ্বতী তাঁর চিতায় শয়ন করে 'সহমৃতা' হলেন।

তা ছাড়া কুশের পুত্র অতিথির জীবন বৃত্তান্ত মহাকবি 'রঘুবংশের' বহু শ্লোকে—পুরা একটা সর্গে লিখে গেছেন, তার মধ্যে সর্পবংশের কোনও গুণ বা দোষের তিলমাত্র আভাস কোথাও নাই, পুরাপুরি মানুষের বর্ণনা—বহুমুখী প্রতিভার ও কর্মকুশলতার আনুপূর্বিক বিবরণ। তাই মনে হয় 'নাগকন্যারা' যে সাপ ছিলেন তা নয়, তাঁরা ছিলেন হয়ত কোন উপদেবতা বা অপদেবতা, হয়ত কোনও জলজ প্রাণী—যাদের আকৃতি, প্রকৃতি, আচার-ব্যবহার মানুষের মতই ছিল।

সামনের বাড়ীর মেয়ে

পি. কৃষ্ণমূর্তি

অনুবাদ : বোম্মানা বিশ্বনাথম্

ইণ্টারভিউ-এর চিঠি পাওয়ার পর থেকে রমনামূর্তির আনন্দের আর সীমা নেই। বি, এ পাশ করে বহু আপিসে চাকরির চেষ্টা করে বিফল হয়েছে সে। দেখতে দেখতে দেড় বছর কেটে গেল। বেকার জীবন অসহ্য! কিন্তু সে কি বা করতে পারে। চেষ্টার তো কোন ত্রুটি ছিল না! ফল যদি কিছু না পায় কি করবে। শেষ পর্যন্ত নিজের দুর্ভাগ্যের উপর দোষ চাপাল সে।

পরশুদিন তার এক বন্ধু রামম্ চাকরির একটা খবর দিল। তার আপিসে সেই দিনই একজন মারা গেছে। তার স্থান পূরণ করতে লোক নেবে নিশ্চয়ই। সুতরাং আর কারোর দরখাস্ত পড়ার আগেই রমনাকে দরখাস্ত করে রাখতে বলে। ঐ চাকরি যাতে রমনা পায় তার জন্য নিজেও সাহেবকে বলে কয়ে দেখবে। যা দিন কাল সামান্য ব্যাকিং না থাকলে কিছু হবার নয়।

রামন্-এর উপদেশ মত রমনা একটা দরখাস্ত তৎক্ষণাৎ লিখে জমা দিয়ে এল। দিন তিনেকের মধ্যেই ইণ্টারভিউ চিঠি পেল। আগামী সোমবার সকাল দশটায় যেতে হবে।

সোমবার। সকাল নটার মধ্যেই রমনা প্রস্তুত হয়ে গেল। রমনামূর্তির মা বিশালাক্ষী আম্মার ইচ্ছা ছেলে শুভ মুহূর্তে যাত্রা করুক। তাই ছেলেকে ঘরে বসতে বলে তিনি বাইরে বেরিয়ে পথের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। শুধু মুহূর্তই নয় যাত্রার লক্ষণও ভাল হওয়া চাই।

দশ মিনিট কেটে গেল। মা আর ডাকছে না দেখে অধৈর্য এবং উদ্বিগ্ন হয়ে রমনা চিৎকার করে বলে, 'মা, দেরি হয়ে যাচ্ছে যে!'

'একটু থাম বাবা!' রাস্তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করেই বলেন বিশালাক্ষী আম্মা। ইতিমধ্যে সামনের বাড়ীর তরুণী সেজেগুজে ভ্যানেটি ব্যাগ নিয়ে বেরুলো। তৎক্ষণাৎ তিনি বললেন, এখন তুই বেরুতে পারিস বাবা। সামনের বাড়ীর মেয়েটি কোথায় যেন বেরুচ্ছে। এখন যাত্রা শুভ। মার কথা কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক লাফে ঘর থেকে বেরিয়ে পথে নামে রামনামূর্তি। পাশাপাশি তারা পথ চলে। দেখেও না দেখার ভাণ করছে পরস্পরকে। কিছুক্ষণ এ ভাবে পথ চলে তারা চুপচাপ। হঠাৎ সামনের বাড়ীর ঐ তরুণী একটি রিক্সা ডেকে উঠে বসল তাতে। রামণ বাস ষ্টাণ্ডের দিকে এগিয়ে গেল।

বাস থেকে নির্দিষ্ট আপিসের সামনে দাঁড়িয়ে একবার ঘড়ির দিকে তাকায় রামণ। দশটা বাজতে এখনও আট মিনিট বাকি। সময় মত পৌঁছাতে পেরে স্বস্তি পেল সে। সিঁড়ি বেয়ে উঠল উপরে। উদ্বিগ্ন প্রতীক্ষারত রামম্ বলে, যাক ঠিক সময়ে এসে গেছিস। দেরি করবি আশঙ্কা করছিলাম। এখনও অফিসার আসেন নি। চল, আমার কাছে বসবি ততক্ষণ। তাই করল রামন। দশ মিনিট কেটে গেল।

পিয়ন এসে ডাক দিল রমনামূর্তিকে। সাহেব ডাকছেন ইণ্টারভিউ নিতে। wish your goodluck বলে রামম্ পিঠ চাপড়ে এগিয়ে দেয় রামনকে। মিনিট পাঁচেক পরে রামন অফিসারের ঘর থেকে বাইরে এসেই থমকে গেল। তার সামনে দাঁড়িয়ে সামনের বাড়ীর ঐ তরুণী।

আপনি···আপনি···এখানে। কি যেন বলতে গেল রামন। পারলো না।

আজ্ঞে হাঁ, আজ আমার এখানে ইণ্টারভিউ আছে। kindly একটু পথ ছাড়ুন তো।

চমক ভাঙলো রামনের। সরে দাঁড়ালো সে। তরুণী ঢুকে গেল অফিসারের ঘরে। তার যাওয়ার দিকে তাকিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে রামন। অদূরে দাঁড়িয়ে রামম্ দেখছিল এ সব। অর্থহীন ঠেকছে তার কাছে। দ্রুত এগিয়ে এলো রামনের কাছে। কাঁধে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করে, কিরে রমেন? কি হলো তোর? মেয়েটি কে রে? কি কথা হচ্ছিল তার সাথে? আচ্ছা, যাক সে কথা। এখন বল দিকি, অফিসার কি প্রশ্ন করলেন তোকে। এক নিঃশ্বেসে বলে গেল রামম্।

আঃ। থাম তুই। শুভক্ষণ দেখে বেরিয়েছিলাম। ধ্যেৎ শালার চাকরির নিকুচি করেছে! বিরক্তি বোধ করে রামন।

কিরে? কি বক বক করছিস। শুভক্ষণ, চাকরির নিকুচি করেছে—কি সব বলছিস বুঝতে পারছি না

একটু খুলে বল দিকি। তার পর রামম তাকে নিজের সীটের কাছে নিয়ে গেল। রামন ঘর থেকে বেরুনো থেকে শুরু করে পথের সব খুঁটিনাটির বর্ণনা দিয়ে গেল। এখন তুই বল দিকি অমন সুন্দর যুবতীর ইণ্টারভিউ নিয়ে কোন অফিসার আমাকে পছন্দ করবে? ধ্যেৎ শালার কপালে নেইকো ঘি ঠক্ ঠকালে হবে কি। যাক্ তোকে ধন্যবাদ! তোর সাধ্যমত চেষ্টা করেছিস। আমার দুর্ভাগ্য আমি চাকরি পাব না। এই কথা বলে রামন টলতে টলতে বেরিয়ে গেল ঘরের দিকে। খুব বিরক্তি-বোধ করছে রামনামূর্তি। ঐ চাকরিটা যে সেই পাবে সে বিষয়ে তার মনে একটা দৃঢ়বদ্ধ ধারণা ছিল। শেষে কি না অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল সেই তরুণী। যার মুখ দেখে বেরুলে মার মতে যাত্রা শুভ হয়। শুভক্ষণের উপর যে সামান্যতম বিশ্বাস ছিল তা উবে গেল। তবু এখনও ধারণা চাকরিটা রামনামমূর্তিই পাবে। অসহ্য মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করে রামন।

পরের দিন। প্রায় এগারোটা বাজে। রামনামূর্তি গম্ভীর চিন্তামগ্ন হয়ে বসে আছে নিজের ঘরে।

বাড়ীতে কে আছেন?

আগন্তুক একটি চিঠি দিয়ে গেল তার হাতে। খাম ছিঁড়ে চিঠিটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রামনার মুখে আনন্দের আভাস দেখা দেয়। ঠোঁটের কোণে চাপা হাসি। চোখে অদ্ভুত এক ঔজ্জ্বল্য। 'মা' বলে চীৎকার করে ছুটে যায় রান্নাঘরের দিকে।

মা তোমার কথাই ফললো। চাকরিটা ওরা আমাকেই দিয়েছে। এই যে এপয়েণ্টমেণ্ট লেটার। বলে সে প্রণাম করল মাকে। বিশালাক্ষী আম্মার চোখ আনন্দে ছলছল করে উঠে।

বলছিলাম না হবে; তোকেই ওরা পছন্দ করবে।

মা! যাই ছুটে গিয়ে রামমকে জানিয়ে আসি, এ শুভ খবর। সে বেচারা আমার জন্য কি না করেছে।

যা, ঘুরে আয়।

রামনামূর্তিকে দেখেই রামম্ সাদরে কাছে টেনে বসায়। রামম্, যাই বল, আমি কিন্তু হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম। কোন আশা ছিল না আমার এ চাকরি পাওয়ার। কি করে যে শেষ পর্যন্ত আমিই পেলাম ভেবে পাচ্ছি না। নিশ্চয়ই তুই কোন স্পেশাল চেষ্টা করেছিস। বলে রামনামূর্তি রামমের হাত জড়িয়ে ধরে।

দেখ রামন, তোর ধন্যবাদ পাওয়ার পাত্র আমি নই। তোর সামনের বাড়ীর মেয়েকে জানাগে যা ধন্যবাদ বলে হাত ছাড়িয়ে নেয়।

ঐ ইন্দিরাকে? কেন বলত? প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমার মোকাবিলা করেছে বলে, রামনের স্বরে বিদ্রূপ।

না, তার জন্য নয়। ইন্দিরা যে ত্যাগ স্বীকার করেছে তার স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য।

ত্যাগ? কিসের ত্যাগ শুনি? আমি কিছু বুঝতে পারছি না। একটু খুলে বল।

তাহলে বলি। তুই তো জানিস প্রাথমিক পরীক্ষাগুলো উত্তীর্ণ হয়ে শেষ পর্যন্ত টিকেছিলি তোরা দুজন।

হ্যাঁ, তা তো জানি।

তোর ইণ্টারভিউয়ের পরেই ইন্দিরা অফিসারের চেম্বারে ঢুকেছিল। সেটাও তুই দেখেছিস। কিন্তু তার পর কি ঘটল তা কি তুই জানিস?

—কি ঘটল?

ইন্দিরাকে অফিসার কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। প্রত্যেকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তরই দেয় ইন্দিরা। কিন্তু অফিসার অবাক হয়ে গেল ইণ্টারভিউ হয়ে যাওয়ার পর তার কথা শুনে।

স্যার দয়া করে এই চাকরিটা আমার আগে যিনি ইণ্টারভিউ দিয়েছেন অর্থাৎ রামনামূর্তিকে দেবেন। চাকরিটা আমার চেয়ে তারই বেশী প্রয়োজন। দয়া করে আমার এই আবেদন রক্ষা করবেন। বলে বেরিয়ে যায় ইন্দিরা।

তার চলে যাওয়ার পর ঘটনাটি জানতে পারলাম। এখন তুই বল দিকি, ধন্যবাদ কার প্রাপ্য? বলে রামনামূর্তির মুখের দিকে তাকাল রামম্। সে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে।

এই রামনা! তোর জন্য যে মেয়েটি এত কিছু করল, প্রতিদানে তুই কিছু করবি না? এই ধর যাকে বলে প্রত্যুপোকার।

আমিও তাই ভাবছি।

তাহলে দিনক্ষণ দেখে তাকে বিয়ে করে ফেল।

বলে রামনামূর্তির মুখের দিকে তাকাল রামম। রামনামূর্তির মুখ দেখলে বেশ বোঝা যায় যে বিয়ের কথা শুনলে শুধু মেয়েরাই নয়, ছেলেরাও লজ্জা পায়!

আধুনিক সংস্কৃত নাটক

ডক্টর শ্রীঅমরেশ্বর ঠাকুর

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের বিরুদ্ধে অষ্টনাগপাশ বন্ধন যতই কঠোর হইয়া উঠিতেছে, সংস্কৃত সাহিত্যের অভূতপূর্ব উজ্জীবনীশক্তি ততই আত্মপ্রকাশ করিতেছে। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে, অল ইণ্ডিয়া রেডিওর মাধ্যমে—বার্ষিক অধিবেশনাদি উপলক্ষ্যে এবং ধর্মসঙ্ঘ প্রভৃতির মাধ্যমে সংস্কৃত নাট্যাভিনয় জনসাধারণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। উদাহরণক্রমে বলা যায় যে, ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী ও ডক্টর রমা চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত প্রাচ্যবাণী মন্দিরের সংস্কৃত অভিনেতৃবৃন্দ নিখিল ভারতের বহুলাংশে সংস্কৃত নাট্যাভিনয়পূর্বক বিশেষ কীর্তি অর্জন করিয়াছেন। ভারত সরকারের নাটকসঙ্গীত বিভাগও ইঁহাদের সমাদরপূর্বক দিল্লীতে অভিনয় করিবার জন্য গত বৎসর লইয়া গিয়াছেন। ইঁহারা সেইখানে ডক্টর চৌধুরীর "মহিমময় ভারতম্" ও ভাসের "প্রতিমা" নাটক অভিনয় করিয়া আসিয়াছেন সগৌরবে। প্রাচ্যবাণী সংস্কৃত নাট্যাভিনয় পুরীতে তিনটি সংস্কৃত নাটক উপর্যুপরি তিন রাত অভিনয় করিয়া নিখিল ভারতের সংস্কৃত সাহিত্যরসিক শ্রোতৃবৃন্দের বিশেষ মনোরঞ্জন করিয়াছেন ১৯৫৮ সনের জুন মাসে। এই ভাবে ইহারা যখন যেই স্থানে গিয়াছেন, সেইখানেই অত্যুচ্চ সম্মান ও ভালবাসা-প্রীতি অর্জন করিয়া আসিয়াছেন, সংবাদপত্রের মারফতে বঙ্গবাসী সুধীমাত্রেই এই সংবাদ জানেন। নিখিল ভারত লেখকসঙ্ঘ, নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন প্রভৃতি বিশিষ্ট বিশিষ্ট সংস্থানের তত্ত্বাবধানে অতি গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে সেই সেই কর্তৃপক্ষ প্রাচ্যবাণীর সংস্কৃত নাট্যাভিনয় সঙ্ঘকে কেন বারংবার আহ্বান করিতেছেন, সে সম্বন্ধে কিছু মতামত এখানে লিপিবদ্ধ করিব।
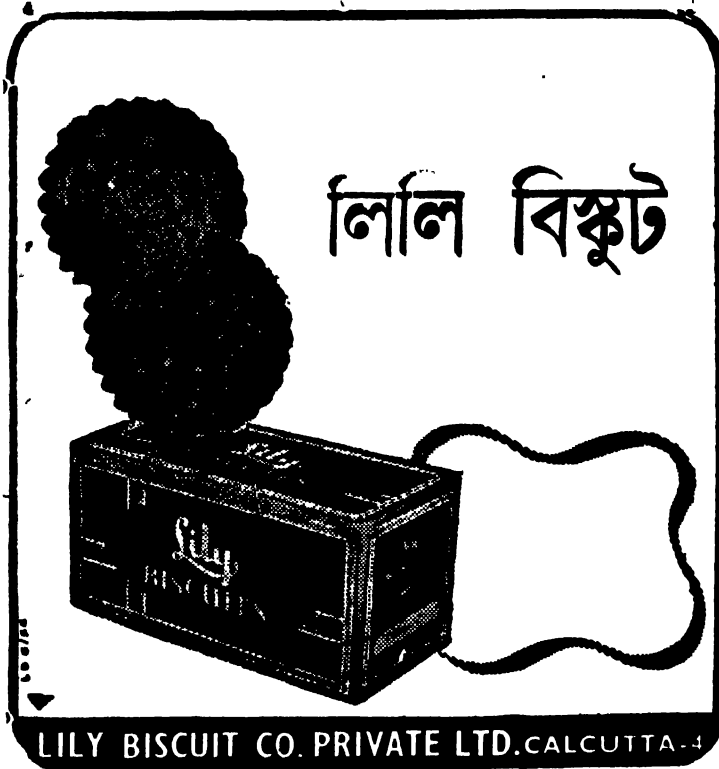
(১) অভিনয় কৌশল

ইহা অবশ্যস্বীকার্য যে, ডক্টর চৌধুরী সংস্কৃত নাট্যসঙ্ঘ প্রায় ২০ বৎসর যাবত বহুস্থানে বহু সংস্কৃত নাটক অভিনয় করিয়া প্রভূত ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন। অভিনেতৃবৃন্দের মধ্যে অনেকেই অল্প বয়স থেকেই ডঃ চৌধুরীর সঙ্গে অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে, রঙ্গমঞ্চে অথবা অন্যত্র নিপুণ অভিনয় করিয়া আসিতেছেন। ইঁহাদের অভিনেত্রীরা প্রায় সকলেই লেডী বেরোর্ণ কলেজের মেধাবিনী ছাত্রী এবং উচ্চারণে সুনিপুণা, সংস্কৃতবিদ্যায় বিশেষ অনুরাগশালিনী।

ইহা ব্যতীতও আরও কতিপয় কারণ উল্লেখযোগ্য।

(২) প্রথমতঃ, ইঁহারা ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর যেই সকল আধুনিক সংস্কৃত নাটক অভিনয় করেন— সেইগুলির বিষয়বস্তু ও রচনাপ্রণালী বর্তমান যুগের একান্ত উপযোগী।

বিষয়বস্তু

ডক্টর চৌধুরী মাতৃ-তত্ত্বের বিশেষ উপাসক। ফলে, তিনি ত্রেতাযুগের জননী সীতা, দ্বাপরের জননী রাধিকা, কলিযুগের বুদ্ধলীলাসঙ্গিনীটি যশোধরা, মহাপ্রভুর লীলাসঙ্গিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া এবং বর্তমান যুগপাবনী জননী সারদামণির পূর্ব ও উত্তর জীবন অবলম্বনে পৃথক পৃথক সংস্কৃত নাটক রচনা করিয়া মাতৃমহিমা অতুলনীয় ভাবে ঘোষণা করিয়া নিজেও ধন্য হয়েছেন এবং দেশকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। তাঁহার প্রখর গবেষণা দৃষ্টির সম্মুখে ভগবল্লীলাসঙ্গিনী মহাজননীরা তাঁহাদের লুক্কায়িত জীবনের বহু কাহিনী সুপ্রকট করিয়াছেন। শ্রীরাধা, শ্রীযশোধরা, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া বিষয়ক গ্রন্থকয়েকটি ইঁহার চূড়ান্ত নিদর্শন। ইহা ব্যতীত অন্যান্য সকল গ্রন্থে ডক্টর চৌধুরীর একটি অতি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি দেখিতে পাওয়া যায়। মাতৃজীবনের এই অপূর্ব মহিমবর্ণন অন্যত্র কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। এই সমস্ত মাতৃজীবন ভারতীয় শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র বেদপুরাণের পূর্ণ দ্যোতক। নাটকের মারফতে মাতৃজীবনের শ্রেষ্ঠ রূপায়ণ।

মহাপ্রভু-হরিদাসম্, দীনদাস-রঘুনাথম্, প্রভৃতি ডক্টর চৌধুরী শ্রেষ্ঠ ভক্তগণের জীবনচরিত অবলম্বনে রচিত গ্রন্থসমূহও প্রোজ্জ্বল ভক্তিভাবের পূর্ণ প্রোদ্দীপক। স্ব স্ব ক্ষেত্রে এই সকল গ্রন্থ অতুলনীয়। ফলতঃ, হরিদাস ও রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর এত সুন্দর চরিত্র-চিত্রণ কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। রঘুনাথদাস প্রভুজীর সম্বন্ধে অন্য কোনও নাটক এ পর্যন্ত রচিত হয় নাই।

(৩) নাট্য রচনা কৌশল

ডঃ চৌধুরীর নাটকসমূহের অভিনয় যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা সকলেই ডঃ চৌধুরীর নাটকীয় বস্তু খ্যাপনের উচ্চ প্রশংসা করেন। যথাযথভাবে গরিষ্ঠ বিষয়ের স্থাপন এবং লঘু বিষয়ের প্রত্যাখান তো বটেই—প্রয়োজন অনুসারে এমন অনবদ্য ভাবে যশোধরা প্রভৃতির জীবনের ঘটনা ডঃ চৌধুরী পরিবেশন করেন—যাতে মধ্যস্থলের কোনও অংশে কিছুই অসম্পূর্ণতা পরিদৃষ্ট হয় না। বীজ স্থাপনা থেকে উপসংহার পর্যন্ত সর্বত্রই একটি নিরন্তর ফলাভিমুখী কর্মপ্রবাহ পরিদৃষ্ট হয়।

(৪) চতুর্থতঃ ডঃ চৌধুরী গবেষণায় সিদ্ধহস্ত ও প্রখ্যাত। কাব্য-নাটক প্রভৃতি রচনায় তাঁর পারদর্শিতা তাঁর সেই গৌরবকে আরো প্রকটিত করছে, কারণ গবেষণার বস্তু নিয়েই তিনি সংস্কৃত নাটক ও কাব্য রচনা করছেন। এই নাটকগ্রন্থসমূহের মধ্যে পুনরায় ডক্টর চৌধুরী হাস্যরসপরিবেশনে অত্যন্ত প্রশংসনীয়। নাট্যবিষয়ের অঙ্গীভূত বিষয়বিশেষ অবলম্বনে এমন সরস সুন্দর ভাবে হাস্যরস পরিবেশন সচরাচর দৃষ্ট হয় না।

(৫) পঞ্চমতঃ ডঃ চৌধুরীর সঙ্গীতসমূহ বিশেষতঃ স্তোত্র—সংস্কৃত সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদরূপে পরিগণিত হইতে পারে। ভাবে ও ভাষায় প্রত্যেকটি সঙ্গীত বিশেষতঃ, স্তোত্রসমূহ অপূর্ব, সন্দেহ নাই। সদ্যোরচিত "আনন্দপঠম্" গ্রন্থের সরসললিত অনুপ্রাসবহুল সঙ্গীত ও স্তোত্রসমূহ পাঠে আমি একান্ত বিমুগ্ধ হয়েছি।

বঙ্গদেশের পণ্ডিতসমাজ কায়মনোবাক্যে ডক্টর চৌধুরীর সুদীর্ঘ জীবন ও যশঃ প্রার্থনা করেন। ভগবৎসকাশে প্রার্থনা করি ডঃ চৌধুরী আরো বহু পাণ্ডিত্যমূলক এবং কবিত্বসংবলিত গ্রন্থ প্রকাশিত করে সংস্কৃত জননীর গৌরব বর্ধিত করুন।

"ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী"

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

আমরা যতদূর জানিতে পারি, যাঁহারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুসন্ধানকার্যে গত শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে রত হইয়াছেন, তাঁহাদের ভিতরে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই প্রথম এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন। আমরা তাঁহাকে শুধু কবি বলিয়াই জানি, কিন্তু সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদকরূপে দীর্ঘকাল পদ্য গদ্য উভয় রচনায়ই তিনি নিরত ছিলেন। তাঁহার সাহিত্য বিষয়ক প্রযত্ন দ্বারা পরবর্তী কালের বহু কবি ও মনীষী অনুপ্রাণীত হইয়াছিলেন। এ কথা আজ সর্বজনবিদিত। তিনি বহুবৎসর যাবৎ বাংলার কবি এবং কবিওয়ালাদের জীবনী ও সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে থাকেন। এই অনুসন্ধানের ফল হইল কয়েকজন খ্যাত-অখ্যাত কবি ও কবিওয়ালাদের জীবন-কথা। এই সকল জীবন-কথা তদীয় সংবাদ প্রভাকরেই ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। পরবর্তী কালে যাঁহারা সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দী এবং কতকাংশে উনবিংশ শতাব্দীরও বাংলা ভাষা-সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় লিপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা কেহ কেহ কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র বিরচিত এই সকল জীবন-কথার উপর বিশেষ ভাবে নির্ভর করিয়াছেন। আমরা প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন বর্ষের সংবাদ প্রভাকর যখন দেখিয়াছিলাম তখনই এই সকল জীবনীর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ঐ সময় এই কথাই বিশেষ করিয়া মনে হইয়াছিল, এতাদৃশ অমূল্য তথ্যসম্ভার কেহ পুস্তক আকারে প্রকাশিত করিলে বড়ই উপকার হয়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভবতোষ দত্ত এই কার্যটি সুসম্পন্ন করিয়া সাধারণভাবে বাঙালী জাতির এবং বিশেষভাবে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-গবেষকদের যে কতখানি হিতসাধন করিয়াছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

সম্পাদক ভবতোষবাবু এই গ্রন্থখানিতে* কবিবর রচিত কবি এবং কবিওয়ালাদের জীবনী সঙ্কলিত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; তিনি তাঁহাদের সময় ও কাল সম্বন্ধেও বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি পুস্তকখানিতে এই কয়টি মূল বিষয় সন্নিবেশিত করিয়াছেন: (১) অবতারণা (২) কবি (৩) কবিওয়ালা (৪) পরিশিষ্ট (৫) আনুষঙ্গিক তথ্য (৬) কবি-জীবনীতে উল্লিখিত কবি-ওয়ালাদের শিষ্যপরম্পরা প্রভৃতি। 'অবতারণায়' তিনি নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের আলোচনা করিয়াছেন: (ক) কবি-জীবনী রচনার প্রেরণা (খ) অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও ভারতচন্দ্র (গ) অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ ও রামনিধি (ঘ) আখড়াই ও কবিগান (ঙ) কবিগান ও ঈশ্বর গুপ্তের যুগ। গ্রন্থের এই অংশটিতে সম্পাদক বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনায় যে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার কোন কোনটিতে হয়ত মতান্তর থাকিবে, যেমন ডক্টর সুশীলকুমার দে গ্রন্থের ভূমিকায় এ বিষয়টির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। কিন্তু অনুচ্ছেদ-গুলিতে সম্পাদক অনুসন্ধিৎসা এবং গবেষণা-পদ্ধতির যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। বাংলা সাহিত্যে গবেষকগণ এই অংশ পাঠে অনেক নূতন বিষয়ের সন্ধান ও নির্দেশ পাইবেন।

পুস্তকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্রের রচনাবলী সংবাদ প্রভাকরের পৃষ্ঠা হইতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে মাত্র 'কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন-বৃত্তান্ত' পুস্তক আকারে ঈশ্বরচন্দ্র জীবিত কালেই প্রকাশ করিয়া যান। কবি এবং কবিওয়ালা এই দুইটি অধ্যায়ই গ্রন্থখানির মূল অংশ (পৃষ্ঠা ৪৭-৩২৪)। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দী এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিককার কবি ও কবিওয়ালাদের জীবন-কথা এবং সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে ধারাবাহিক ভাবে যে সব প্রবন্ধ সংবাদ প্রভাকরে লিপিবদ্ধ করেন তাহাই এই অংশে হুবহু উদ্ধৃত হইয়াছে। 'কবি' অধ্যায়ে আছেন—কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন (১, ২, ৩) এবং রামনিধি গুপ্ত। কবিওয়ালাদের মধ্যে পাইতেছি এই ক'জন—রাসু নৃসিংহ, হরু ঠাকুর, নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী (১, ২), রাম বসু (১, ২, ৩, ৪) এবং লক্ষীকান্ত বিশ্বাস। এই সকল কবি ও কবিওয়ালাদের জন্ম অষ্টাদশ শতাব্দীতে সেই মাৎস্যন্যায়ের যুগে। কেহ কেহ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদ পর্যন্ত জীবনের জের টানিয়াছেন এই

* ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বিরচিত কবিজীবনী— শ্রীভবতোষ দত্ত সম্পাদিত। ক্যালকাটা বুক হাউস। ১।১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। পৃঃ ৸৵+৪৮৯; মূল্য ১২৲ টাকা।

পর্যন্ত। তখনকার দিনে জীবন-চরিত রচনা এবং পদ-কর্তাদের পদ বা কবিতা সংগ্রহ করা খুবই কষ্টসাধ্য ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন, এই সকল জীবন-কথা রচনায় তাঁহাকে বহুক্ষেত্রে কিংবদন্তির উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। তবে তিনি নিজে কবি, বিভিন্ন পদকর্তার পদ বা কবিতা সংগ্রহে তিনি একদিকে যেমন বিপুল শ্রম স্বীকার করিয়াছেন, অন্যদিকে তেমনি নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। এদিক হইতে তিনি আধুনিক কালের নিষ্ঠাবান গবেষকদের পথপ্রদর্শক বলিয়া সম্মানের যোগ্য। এ কারণে তাঁহার রচনাবলী সাহিত্য-বিষয়ক আকরেরও দাবী রাখে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে আধুনিক কালেও যাঁহারা আলোচনা ও গবেষণা করিবেন তাঁহাদের পক্ষে এই রচনাগুলি একান্তই অপরিহার্য।

সম্পাদক ভবতোষবাবু পরিশিষ্ট অংশে কবিবর ঈশ্বর-চন্দ্রের কবি-জীবনী সংগ্রহ-সম্পর্কীয় কয়েকটি বিজ্ঞপ্তি এবং বিভিন্ন কবির জীবনী প্রকাশ কালে তদ্রচিত সংক্ষিপ্ত ভূমিকা সংবাদ প্রভাকর হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। প্রথমোক্ত বিজ্ঞপ্তিতে কবি-জীবনী এবং তাঁহাদের পদ ও কবিতা সংগ্রহ বিষয়ে তাঁহার আকুতি পরিষ্কাররূপে প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি এই বিজ্ঞপ্তিটিতে পুরাতন গ্রন্থকর্তা, সংকীর্তন ও ঢপ এবং কালীয়দমন যাত্রার সৃষ্টিকর্তা, কবিওয়ালা পর্যন্ত বহু বঙ্গ সাহিত্য-সেবকের নামোল্লেখ করিয়াছেন। এই নামের ফিরিস্তি পাঠে বুঝা যায়, তিনি কত ব্যাপকভাবে ইহাদের জীবন সাহিত্যকর্ম অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি ইহার সামান্যমাত্রই সমাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কবিবর অশেষ শ্রম স্বীকার করিতে কখনও কুণ্ঠিত হন নাই। এই অংশে দুইখানি প্রেরিত পত্রে সমসময়ে হাফ্ আখড়াই গান সম্বন্ধে আমরা একটি স্পষ্ট ধারণা করিতে পারি। এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখ করিতে চাই। ঈশ্বরচন্দ্র জীবনের শেষ ক'বৎসর কবি-জীবনী অনুসন্ধান-কল্পে এবং নিজের স্বাস্থ্যোন্নতির নিমিত্তও জলপথে এবং স্থলপথে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই ভ্রমণবৃত্তান্তও ঐ সময়কার সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। বিভিন্নস্থলে শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতিমূলক প্রযত্নগুলির কথা এই সব বিবরণে বিধৃত রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতে পারি, তিনি নদীপথে নৌকাযোগে রাড়ুলি কাঠিপাড়ায় গিয়া হরিশ্চন্দ্র রায়চৌধুরীর শিক্ষা-সংস্কৃতিমূলক কার্যাবলী দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং যথাসময়ে সংবাদ প্রভাকরে ইহা প্রকটিত করেন। এই হরিশ্চন্দ্র আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের পিতৃদেব। এই রকম বর্ধমান অঞ্চলের কথাও ভ্রমণকাহিনী হইতে কিছু কিছু পাওয়া যায়। বর্তমান গ্রন্থে ইহা সন্নিবেশিত হওয়ার কথা নয়। তবে কোন অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি যদি এগুলি সংকলন করিয়া পুস্তক আকারে গ্রথিত করেন তাহা হইলে বড়ই ভাল হয়।

'আনুষঙ্গিক তথ্য' অংশে সম্পাদক কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এবং তদ্রচিত কবি ও কবিওয়ালাদের জীবনী-সংক্রান্ত বিস্তর আনুষঙ্গিক তথ্য সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এ বিষয়ে বিশেষ কিছু বলার প্রয়োজন নাই। পাঠক-মাত্রেই বুঝিবেন, সম্পাদক এ সমুদয় সংকলনে কতখানি কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। এই সকল তথ্য উদ্ঘাটনে শুধু কবিদের নয়, সমসাময়িক অবস্থা ও ঘটনাবলীর উপরও বিশেষ আলোকপাত করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া পাঠক-পাঠিকার কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য সম্পাদক প্রসঙ্গতঃ বহু তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। পুস্তকখানির নির্দেশিকা ইহার গুরুত্ব অবশ্যই প্রতিপাদন করিবে। আর একটি কথাও এখানে বলা দরকার। ঈশ্বরচন্দ্র বিরচিত এই সকল গদ্যরচনা পাঠে আজিকার দিনে অনেকেরই হয়ত ক্লেশ হইবে. কিন্তু বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাস যাঁহারা আলোচনা করিবেন তাঁহাদের পক্ষে ইহা বিশেষভাবে কার্যকরী হইবে। ঈশ্বরচন্দ্রের গদ্য রচনা-বলীর এইরূপ একটি সুসম্পাদিত সুষ্ঠু সংস্করণের বিশেষ প্রয়োজন আমরা বরাবর অনুভব করিয়াছি। শ্রীযুক্ত ভবতোষ দত্ত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া যে ইহার সম্পাদন কার্য এমন সুন্দরভাবে সম্পন্ন করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

—*—

রাজপথ জনপথ—শ্রীচাণক্য সেন। নবভারতী। ৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য—ছ' টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

যাঁরা বাংলা উপন্যাস পড়তে ভালবাসেন, তাঁদের প্রায়ই একটি ক্লান্তিকর কর্তব্য করতে হয়। মাসে মাসে যত উপন্যাস প্রকাশ পায় সেগুলি পড়তে হয়। সেই পাঠ, বলা বাহুল্য, প্রায়ই পরিণামে মনস্তাপ আনে। সাম্প্রতিক আশু-প্রকাশ্য উপন্যাসগুলি সম্পর্কে এক শোচনীয় নিরাসক্তি এবং ভবিষ্যতের বাংলা উপন্যাস সম্বন্ধে অনাস্থা এসে পড়ে। কিন্তু এর ব্যতিক্রমও আছে। একটা ছুটো স্মরণীয় উপন্যাস মনের ক্লান্তি দূর ক'রে নবোৎসাহে উদ্দীপিত করে। চাণক্য সেনের 'রাজপথ জনপথ' সাম্প্রতিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে এমনি এক ক্লান্তিহর ভূমিকা নিয়ে এসেছে।

এ-উপন্যাসের কাহিনীভাগে স্বাধীনতা-উত্তর নবজাগ্রত ভারতের ভৌগোলিক বিস্তার। একদিকে রাজপথ, আর একদিকে জনপথ। আবার উভয়ের যুগল সম্মিলনের পূর্ণ মূর্ত্তি। ভারতবর্ষের বিস্তারিত জীবন-চিন্তায় অতীতের ঐতিহ্য, স্বাধীনতার জন্ম সহিংস ও অহিংস সংগ্রাম-স্মৃতি, অনেক শহীদের স্মরণীয় আত্মত্যাগের মৃত্যুঞ্জয়ী মহিমা। সঙ্গে সঙ্গে সমকালীন আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে নবপ্রবেশী ভারত, ভারতের শিল্পায়ন এবং অনুন্নত নিপীড়িত বিদেশী জাতির বান্ধব ভারত। এই বিশদ পটভূমিকায় যাঁদের আসা-যাওয়া তাঁদের কারোর নিছক ভারত-কুতূহল, কেউ এসেছেন ভারতের আত্মার সন্ধানে, কারোর চোখে পড়ছে শিক্ষিত ভারতে মৃত গান্ধীবাদের স্মৃতিবীজ। সাংবাদিকের ছদ্মবেশে লম্পট জীবনোৎসাহী, আমেরিকান জন মিলার; নিগ্রো-নিপীড়ক খাঁটি ইংরেজ-মহিমা-সচেতন আর্নেষ্ট লংফেলো; 'জন্মে ইংরেজ, জীবনে ফরাসী' মহিলা সাংবাদিক সিল্ভিয়া ওয়ার্ড; আফ্রিকান যুবক সলোমন কুচিরো এবং সর্বোপরি নিগ্রোনেতা পিটার কাবাকু। ভারতীয় চরিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আই-সি-এস শুকদেব শর্ম্মা ও তাঁর স্ত্রী সুলোচনা; জীবনপ্রেমিক বাঙালী বিবেক সোম ও সোমজায়া সুষমা। পাঞ্জাবী মেয়ে পার্ব্বতী দত্ত, পণ্যনারী মিসেস গোয়েল, নিরাশাকংোজ্জল রতন খান্না। এত সব বিভিন্ন-বিচিত্র জাতি-ধর্ম্মের সমবায়ী সমারোহ চাণক্য সেন খুব দক্ষ হাতে রূপায়িত করেছেন।

কাহিনীর পটভূমিকায় বৃহত্তর ভারতের নবীন জীবনধারায় প্রধান ভূমিকা থাকলেও তার সংলগ্ন নিগূঢ় পরিপ্রেক্ষিত হিসাবে লেখক গ্রহণ করেছেন দিল্লীর আডমিনিস্ট্রেটরদের আশ্চর্য্য পরিবেশ, দিল্লীর নিকটবর্তী প্রাযোজেগ পরিকল্পনার অন্তর্গত ভীমগড় গ্রাম। এরই সমান্তরালে এই উপন্যাসের নায়ক পিটার কাবাকু-র মাতৃভূমি আফ্রিকায় পিকুয়ু সমাজ একটি প্রকৃষ্ট ভূমিকা নিয়েছে। আফ্রিকান উপজাতিদের আলেখ্যসদৃশ আরণ্য জীবন, হীন জন্মযন্ত্রণা, উন্নত হবার প্রবল বাসনা, বিদেশী স্বৈরাচার, আর নিগ্রো কাবাকু-র মোহ-ভালবাসা-মুমূর্ষা-নির্ব্বেদের করুণ-রঙীন কাহিনী উপন্যাসের প্রাণ।

এ উপন্যাস যাঁরাই পড়বেন, তাঁদেরই মনে হবে লেখক কি অনায়াসে আন্তর্জাতিক মানসে বিশেষতঃ অন্ধকার দেশ আফ্রিকার জটিল জীবনের কেন্দ্রে উপস্থিত হয়েছেন। সে সমাজের রীতিনীতি, অসংস্কার, আরণ্য উল্লাস এমন প্রত্যক্ষদর্শীর ভঙ্গিতে লিখেছেন যা রীতিমত তথ্য-নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা। এ ব্যাপারে তাঁর অনায়াস সিদ্ধির প্রধান কারণ, আমার মতে, বিষয়বস্তু সম্পর্কে লেখকের ধারণার গভীরতা এবং মমতাময় লেখনী। লেখক লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাংবাদিক কিন্তু উপন্যাসের সীমানা-সচেতন। সেই জন্যই তথ্য কখনই বস্তুপুঞ্জ হয়ে কষ্ট দেয় না বরং পাঠককে কৌশলে জ্ঞানী করে। বস্তুতঃ আন্তর্জ্জাতিক চিন্তাধারায় ভারতের স্বরূপের এমন অনাবরণ উন্মোচন আগে কোন লেখকের হাতেই ঘটে নি।

আজকাল বেশীর ভাগ বাংলা উপন্যাসই কলকাতা কিংবা শহরতলীকে কেন্দ্র ক'রে লেখা হয়। এ ছাড়া ভারতের আদিম উপজাতি, দক্ষিণ ভারতের সমুদ্র-সৌরভ কিংবা মুখর লণ্ডনের পট-ভূমিকা অণুমাত্র থাকলেই দৈনিকে রব শোনা যায়, বাংলা সাহিত্যের ভূগোল বাড়ছে। সাহিত্যকে যাঁরা ভৌগোলিক বিস্তারের সঙ্গে যুক্ত করেন, তাঁদের সঙ্গে আমি একমত নই। পটভূমিকায় ভৌগোলিক আয়োজন কখনই উপন্যাসে গভীরতা দেয় না। উপন্যাসের গভীরতা মানসিক প্রসারে। রাজপথ জনপথ সেদিক্ থেকে শ্রদ্ধের সেতুবন্ধ। আফ্রিকার পিটার কাবাকু যে জীবনযন্ত্রণায় ও শুভ্র মানবিকতায় যে কোন ভারতীয়ের নিকটবান্ধব, এ কথা কত সহজেই অনর্গলিত। নবীন ভারত গঠনের চড়াই-উতরাইয়ের সঙ্গে নবজাগ্রত আফ্রিকার পতন-অভ্যুদয় কি নিগূঢ় বন্ধনে অনন্ত। এ সব কথা ভাবতে এবং অনুভব করতে রাজপথ জনপথ যে কোন বিবেকী পাঠককে উদ্‌বুদ্ধ করে। সমগ্র উপন্যাসটির অসংখ্য উপ-কাহিনীর অন্তর্লীন যে গভীর গোপন আধুনিক চিন্তা আমাকে অভিভূত করেছে তা বঙ্কিমচন্দ্রের তত্ত্বমূলক উপন্যাসগুলির মতই লক্ষ্যভেদী।

বাংলাদেশে যাঁরা উপন্যাসের নামে গল্প বানান, তাঁরা রাজপথ জনপথ প'ড়ে উপন্যাসের প্রকৃত পথনির্দেশ পেতে পারেন। যে-দেশে দাঙ্গা-দুর্ভিক্ষ—দেশভাগের নাটকীয় অভিজ্ঞতা নিয়ে ওয়ার এ্যাণ্ড পিসের মত দু'তিনখানি মহৎ উপন্যাস লেখার সম্ভাবনা নীরবে অবসিত হয়েছে, সে দেশে রাজপথ জনপথের বৃহৎ এবং

সময়োচিত প্রসঙ্গ রীতিমত বিস্ময়কর সৎসাহসের পরিচয়। এই সৎসাহসকে স্বাগত জানাই।

এই সৎসাহস উপন্যাসের পরিবেশ রচনা ও চরিত্রায়ণে বারবার পাওয়া যায়। পিটার কাবাকু ও মিসেস গোয়েলের আনন্দ-দৃশ্য (২০৬ পৃ), পার্ব্বতী ও রতন খান্নার নিরাশাঘন প্রেম (২৩১ পৃ), সুলোচনা শর্মার প্রেমের খেলা (৫৫ পৃ) এবং বিদায়ী যৌবনের খেদ কারুণ্যের (১৫২ পৃ) পরিবেশ রচনায় বলিষ্ঠতা যে কোন বাংলা উপন্যাসে দুর্লভ। লীলা শর্মা সম্পর্কে সলোমান কুচিয়োর অন্তরে প্রেমোদ্বোধনের আনন্দ-অনুভূতি অবিস্মরণীয় নৈপুণ্যে বিশ্লেষিত। লেখকের রচনাসৌকর্য আগাগোড়া বর্ণোজ্জ্বল।

রাজপথ জনপথের লিখনরীতি প্রসঙ্গে কিছু আপত্তি উঠতে পারে। সমস্ত উপন্যাসের কাহিনী এবং খণ্ড কাহিনীগুলি যেমন অসংখ্য ঘটনার মধ্যে দিয়ে সহজপ্রাণ পেয়েছে, সে তুলনায় প্রথম পরিচ্ছেদের জন মিলার-কাহিনী একটু বেশিমাত্রায় বিবৃতিধর্মী। অথচ পিকুয়ু সমাজের খুঁটিনাটি বর্ণনা, যা সহজেই ডকুমেণ্টারি হয়ে যেতে পারত, কী নিপুণ প্রাণময়। ভারতের বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতের ব্যবহারে লেখক অতিমাত্রায় স্বাধীনতা নিয়েছেন। যেমন ১৮৮ পৃষ্ঠায় পার্ব্বতী দত্তের সঙ্গে পণ্ডিত নেহরুর কাল্পনিক সংলাপ। তাছাড়া বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে লেখক গান্ধীবাদ বনাম শিল্পায়নের যে সাম্প্রতিক ভারতীয় সমস্যার প্রতি বারবার ইঙ্গিত করেছেন তার মৌল লক্ষ্য, সন্দেহ করি, সাংবাদিক।

এসব সামান্য ত্রুটি বাদ দিলে রাজপথ জনপথ গত পাঁচ বছরের বাংলা সাহিত্যের আসরে স্মরণীয়তম গ্রন্থ। এর বিষয়বস্তু, ভাষা-ব্যবহার (লক্ষণীয়, লেখকের বিশেষণ ব্যবহার), বিশ্লেষণের প্রাঞ্জল মৌলিকতা, নিগ্রোজীবনের আর্তনাদ ও ঈপ্সা সবকিছুই মর্মভেদী, সংযত এবং মধুরেখা। উজ্জ্বল একটি আধুনিক কালোপযোগী উপন্যাস রচনার জন্য পাঠকমাত্রই চাণক্য সেনকে ধন্যবাদ দেবেন।

শ্রীসুধীর চক্রবর্ত্তী

তাও-তে চিং—লাও-ৎস কথিত জীবনবাদ। ভূমিকা—ওয়াং ওয়েং-হুং। অনুবাদ—অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রকাশক: সাহিত্য আকাদেমী, নিউ দিল্লী। পরিবেশক: ত্রিবেণী প্রকাশন, ২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য দুই টাকা।

'তাও-তে-চিং' প্রায় ২,৩০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাচীন চীনাভাষায় লিখিত তাও-দর্শনের আদি গ্রন্থ। চীন দেশে ইহা বিশেষ সমাদৃত ও প্রসিদ্ধ। চীনের বাহিরেও ইহা সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে এবং নানা ভাষায় ইহা অনূদিত ও আলোচিত হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে সংস্কৃত ভাষায় ইহার অনুবাদের সূচনা হইয়াছিল। সাহিত্য আকাদেমীর প্রযোজনায় আধুনিক ভারতীয় ভাষায় ইহার প্রামাণিক অনুবাদ প্রকাশের উদ্যোগ অভিনন্দনযোগ্য। শ্রীঅমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বাংলা ভাষায় মূল চীনা হইতে ইহার যে অনুবাদ করিয়াছেন তাহা পড়িয়া পাঠক আনন্দলাভ করিবেন। উপনিষদের ঋষি বা বাউলদের মত সহজ সরল—অথচ অনেক ক্ষেত্রে রহস্যময়-ভাষায় এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় যে মহনীয় তত্ত্বসমূহ পরিবেশিত হইয়াছে আধুনিক ভাষার মধ্য দিয়াও তাহাদের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা যায়। দুই-একটি নমুনা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

> নিষেধ আর প্রতিবন্ধ জগতে যতই বাড়বে,
> মানুষ ততই হবে দরিদ্র।
> মানুষের হাতে ধারালো অস্ত্র যতই জমবে,
> দেশে গোলমাল ততই বাড়বে। (পৃঃ ৩৪)
> দুর্ভাগ্যের উপর সৌভাগ্য নির্ভর করে,
> সৌভাগ্যের মধ্যেই দুর্ভাগ্য থাকে লুকিয়ে। (পৃঃ ৩৫)
> এটা সত্যি যে যা কঠিন, শক্ত,
> তা হচ্ছে মৃত্যুর সাথী,
> যা নরম, দুর্ব্বল,
> তা হচ্ছে প্রাণের সঙ্গী। (পৃঃ ৪৬)

শ্রী ওয়াং ওয়েং-হুং-এর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকায় গ্রন্থের রচয়িতা, রচনাকাল ও প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হইয়াছে সাধারণ পাঠকের নিকট তাহার কোন কোন অংশ প্রয়োজনাতিরিক্ত ও দুরূহ বলিয়া মনে হইবে। 'অনুবাদকের ভূমিকা'য় বা অন্যত্র এই ভূমিকা ও ইহার লেখক সম্বন্ধে কিছু পরিচয় দেওয়া হইলে ভাল হইত। অনুবাদক মহাশয় তাঁহার ভূমিকায় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কৃত 'তাও-তে-চিং'-এর আংশিক বঙ্গানুবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে 'প্রবাসী' পত্রিকায় ইতিপূর্ব্বে সমালোচিত (বৈশাখ, ১৩৫৪) স্বামী জগদীশ্বরানন্দ সঙ্কলিত 'চৈনিক ঋষি লাউৎসে' নামক অনুবাদ গ্রন্থেরও উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাতে অনুবাদ ছাড়া, লাউৎসে ও তাঁহার ভাষ্যকার চুয়াংজুর জীবনী ও উপদেশের সারমর্ম বিবৃত হইয়াছে এবং চৈনিক সাধনার বৈশিষ্ট্য ও চৈনিক যোগ বা জেন সম্বন্ধে নাতিবিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

শুদ্ধিপত্র

(প্রবাসী, কার্ত্তিক, ১৩৬৭, রবীন্দ্র-তর্পণ, শ্রীদিলীপকুমার রায়)

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৮	২	২	স্বর্গসম ভুল	স্বর্গসম ভুল।
২০	১	২	সায় দিতে যেন অঙ্গীকার	যেন অঙ্গীকার।
২১	১	২৯	শরবৎ	শরব্য।

মিঠে কড়া—দীপাঙ্কর। "বৈরায়ন"। ৪।২, মহেশ চৌধুরী লেন। ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫। মূল্য ২'৫ নঃ পঃ।

গল্পগ্রন্থ। থিয়েটার, কপাল, জি. এ. পি. সি., উপাধি ও দশ আনা ছ' আনার ইতিহাস—এই পাঁচটি গল্প পুস্তকখানিতে স্থান লাভ করিয়াছে।

বর্ত্তমান যুগের সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দিকের প্রতি (ভাল ও মন্দ) লেখক আলোকপাত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং সে চেষ্টা তাঁহার বহুল পরিমাণে সফল হইয়াছে।

গল্পগুলি মিঠাও কড়াও। পুস্তকখানি আশা করি আদৃত হইবে।

নীতি বিচার—মিলোভান জিলাস। অনুবাদক শ্রীবিকাশ মজুমদার। ওয়ার্কার্স পাবলিকেশন হাউস প্রাঃ লিমিটেড। ২০ নেতাজী সুভাস রোড, কলিকাতা। মূল্য ১.৭৫।

তেরটি রাজনৈতিক প্রবন্ধ। প্রবন্ধ ক'টি সুচিন্তিত এবং সুলিখিত। যদিও যুগোস্লোভিয়ার রাজনৈতিক পটভূমিকায় লিখিত, কিন্তু আজিকার পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই এই একই সমস্যা বিদ্যমান—রাজনীতির কুটিল ও জটিল ঘূর্ণাবর্ত্তে আবর্ত্তিত প্রত্যেকটি দেশেই একই সমস্যা। মিলোভান জিলাস এই সমস্যাগুলির সমাধানের পথ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রবন্ধগুলি মূল্যবান।

অনুবাদে মাঝে মাঝে আড়ষ্টতা পরিলক্ষিত হইল।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

সামাজিক নিরাপত্তা বীমা—মৃত্যুঞ্জয় নন্দী। ওয়ার্কার্স পাবলিকেশন হাউস প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা। মূল্য ১৲ টাকা। পৃষ্ঠা—৫২।

চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, রুমানীয়া প্রভৃতি সাম্যবাদী বা কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের সামাজিক নিরাপত্তা বীমা সম্বন্ধে বিভিন্ন পাশ্চাত্য লেখকের লেখার অনুবাদ এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। সাম্যবাদী দেশগুলি নিজেদের দেশের এই সকল বীমার জন্য খুবই গর্ব্ববোধ করে এবং তৎসম্বন্ধে পৃথিবীর নানা দেশে বিশেষতঃ অকম্যুনিষ্ট দেশে প্রচার করিয়া বেড়ায়। কিন্তু কার্য্যতঃ কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে সামাজিক নিরাপত্তা বীমা পরিকল্পনা শিল্পে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এই তথ্যমূলক পুস্তক পাঠ করিলে এ দেশের শ্রমিক ও পাঠক বুঝিতে পারিবে যে তথাকথিত কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের সামাজিক নিরাপত্তা বীমার গলদ কোথায়। প্রসিদ্ধ শ্রমিক নেতা শ্রীশিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

সর্ব্বোদয় ও শাসনমুক্ত সমাজ—শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, গান্ধী স্মারক নিধি, ২১, গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা-১৯। মূল্য ২.৫০ নয়া পয়সা।

সর্ব্বোদয়কে বুঝিতে হইলে, রাষ্ট্র ও তাহার শাসন-ব্যবস্থা কি এবং সমাজ-জীবন কি তাহা বুঝিতে হইবে। গ্রন্থকার এই জন্যই এই গ্রন্থে সম্পূর্ণ গোড়া হইতেই আলোচনা সুরু করিয়াছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কোন্ কোন্ প্রথায় নেতারা মানবগোষ্ঠীকে সংহত করিতে চাহিয়াছেন ইহা উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন। কোনো বিধানই মানুষকে স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারে নাই। এই বিশ্লেষণের ফলে বিভিন্ন মতবাদগুলির ত্রুটি-বিচ্যুতি বড় বেশী করিয়া চোখে পড়ে। মানুষের মুক্তিযাত্রায় সমাজবাদের বিচার, ধারা ও কর্ম্মসূচী যে এক বলিষ্ঠ ও সুপরিণত ধাপ ইহা গ্রন্থকারও স্বীকার করিয়াছেন। সমাজ ব্যতীত মানুষের জীবনধারণ অসম্ভব। এই সমাজ কিরূপ হইবে ইহা লইয়াই তো তর্ক! কেহ বলিতেছেন, এইরূপ হওয়া উচিত, আবার কেহ বলিতেছেন, না ঐরূপ হইলেই

মানুষের সকল সমস্যার সমাধান হইবে। অন্যান্য মনীষীদের মতো গান্ধীজীও এক দিক দিয়া চিন্তা করিয়া গিয়াছেন। অবশ্য অপর মনীষীদের মতো দেশ এবং কালের প্রভাব গান্ধীজীর উপরও পড়িয়াছে। বিশেষ করিয়া টলষ্টয়ের জীবনাদর্শ-গান্ধীজীকে গভীর ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। 'সর্ব্বোদয়' সেই আদর্শ হইতেই উদ্ভুত। গান্ধীজী বলিয়াছিলেন, "রাষ্ট্রের ক্ষমতাবৃদ্ধির প্রতিটি প্রচেষ্টা আমি অত্যন্ত শঙ্কিতচিত্তে দেখে থাকি। কারণ বাইরে থেকে এ প্রচেষ্টার পরিণাম শোষণের নিরাকরণ বলে মনে হলেও মানব-প্রগতির মূলাধার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের বিনাশসাধন করে ব'লে রাষ্ট্রের ক্ষমতাবৃদ্ধি প্রকৃত মানব-সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কল্যাণকারী। রাষ্ট্র হচ্ছে ঘনীভূত এবং সুসংগঠিত হিংসার প্রতিনিধি। ব্যক্তি-মানবের আত্মা আছে, কিন্তু রাষ্ট্র-আত্মার অস্তিত্ব-বিহীন এক যন্ত্র ব'লে এর অস্তিত্বের জীবনকাঠি হিংসার প্রভাব থেকে একে মুক্ত করা কদাচ সম্ভব নয়। দণ্ডশক্তি-আধারিত প্রতিষ্ঠান আমি চাই না, রাষ্ট্র এই জাতীয় একটি প্রতিষ্ঠান। তবে সমাজে স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতার আধারে গঠিত প্রতিষ্ঠানাবলী তো থাকবেই।"

গান্ধীজী চাহিয়াছিলেন গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে গঠনমূলক কাজ। তিনি বলিয়াছিলেন, "গঠনমূলক কর্ম্মপদ্ধতি হচ্ছে সত্য ও অহিংসার পথে পূর্ণ স্বরাজ অর্জ্জনের সাধন। এর পরিপূর্ণ রূপায়ণই পূর্ণ স্বাধীনতা।"

শাসনবিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে প্রথমে সমাজ হইতে শাসনের প্রয়োজনীয়তা দূর করিতে হইবে। ইহা গান্ধীজীও বলিয়াছিলেন।

এ সম্বন্ধে গ্রন্থকার একটি চমৎকার কথা বলিয়াছেন: "আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থাতেও শাসন থাকবে। তবে তা হবে মাতার শাসন এবং এরই অপর নাম প্রেমশক্তি বা সত্যাগ্রহ। শাসন-মুক্ত সমাজে তাই সত্যাগ্রহ শক্তি অপরিহার্য্য।"

গ্রন্থকার আরও বলিয়াছেন: "শাসনমুক্ত সমাজ অর্থ যে উচ্ছৃঙ্খল সমাজ বা সংহতিবিহীন সমাজ নয় এ কথা নিশ্চয় বলে দিতে হবে না। অরাজকতা কারও কাম্য হতে পারে না। সর্ব্বোদয়ের আদর্শে চূড়ান্ত সংহতি ও শৃঙ্খলা থাকবে। তবে এ শৃঙ্খলা বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া নিষ্প্রাণ কোন ব্যবস্থা হবে না, এ হবে নৈতিক শৃঙ্খলা।"

যে উদ্দেশ্য লইয়া এই বইখানি লেখা হইয়াছে তাহা সার্থক হইয়াছে। এই বোধ মানুষের মনে জাগ্রত হইলে, আদর্শ সমাজ আপনা হইতেই গড়িয়া উঠিবে ইহা আমরা বিশ্বাস করি।

এই গ্রন্থ রচনার পশ্চাতে লেখকের যে বিপুল পরিশ্রম রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। তবে তাঁহার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে।

বহুরূপে—শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ৫৭, ইন্দ্রবিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭। মূল্য—সাড়ে ছয় টাকা।

'বহুরূপে' গ্রন্থখানি ইতিপূর্বে 'প্রবাসী' মাসিক পত্রিকায় 'জটার জালে' নামে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই সময়েই ইহা পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভ্রমণ-কাহিনী অনেকেই লিখিয়াছেন, পথের দৃশ্য দেখেনও অনেকে, কিন্তু দেখিবার চোখ কয়জনের থাকে? আর তাহাকে সুন্দর করিয়া বলিবার ক্ষমতাই বা কয়জনের? হিমালয়ের পথে বদরিনারায়ণ—একই পথ, দুঃখের পথ—কেউ দুঃখকেই বড় করিয়া দেখিয়াছেন, কেউ বা দুঃখের মাঝেই আনন্দের লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। যিনি কবি, যিনি ভাবুক তিনিই অপরূপের সন্ধান পান। সেই অপরূপের সন্ধানই দিয়াছেন মণীন্দ্রনারায়ণ বাবু। পথ যেখানে শুধু পথ, সেখানে 'গাইডে'র প্রয়োজন হয়, কিন্তু পথও যে কথা বলে তাহা শুনিতে পান কবি।

এই একই কাহিনী লইয়া বহুদিন পূর্বে প্রবোধ সান্যাল মহাশয় 'মহাপ্রস্থানের পথে' লিখিয়াছিলেন। তিনি ঔপন্যাসিক, তাই বোধ হয় উপন্যাস করিবার লোভ শেষ পর্যন্ত সম্বরণ করিতে পারেন নাই। তথাপি বইখানি ভ্রমণ-কাহিনী হইয়াও সুখপাঠ্য হইয়াছে। কিন্তু কোনো রোমান্স না করিয়াও, পাঠক আকৃষ্ট করিবার শক্তি মণীন্দ্রনারায়ণ বাবুর অসাধারণত্বেরই পরিচয় দেয়। ইহাতে গল্প যে নাই এমন নয়, কিন্তু তাহা আপনি আসিয়া পড়িয়াছে—আসিয়া পড়িয়াছে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে, 'আপনাতে আপনি বিকশি।' যেন ওখানে গল্প না-আসাটাই হইত অস্বাভাবিক।

বহুরূপের সহিত লেখক আমাদের পরিচয় করাইয়াছেন। কত রকম মানুষ তিনি দেখিলেন এবং আমাদের দেখাইলেন। এও এক আবিষ্কারের আনন্দ. তীর্থ-মাহাত্ম্য তো সেইখানেই—যেখানে বৈচিত্র্যের সমারোহ। শুধু প্রকৃতির রূপ-পরিবর্তনই নয়, পথের বৈচিত্র্য, বিচিত্র মানুষের আনাগোনা। যাহাদের পূর্ব পরিবেশে এমন করিয়া চেনা যায় না—তাহারা যেন উলঙ্গ হইয়া ধরা দিল মুক্ত আকাশের তলে। যেমন আসিয়াছে, শকুন্তী, সীতা, আসিয়াছে গঙ্গোত্রী ও তাহার মা। তার পর পাই আমরা বাহাদুরকে। এমন কর্তব্যনিষ্ঠ নেপালী সচরাচর দেখা যায় না। এই বাহাদুরই একদিন আহত হইয়া অচল হইয়া পড়িল। এই অচল অবস্থার জন্যই গ্রন্থকারকে অদূরে যাইয়াও ফিরিতে হইয়াছে। গ্রন্থকার নিজেই বলিতেছেন: "ফিরে চললাম। নিজেরই আমার বিশ্বাস হয় না, ঘর-বাড়ী ছেড়ে প্রায় দেড় হাজার মাইল দূরে চলে এসেছি। প্রায় তিন সপ্তাহ হয়ে গেল—কেবল চলছি আর চলছি। দিন পনর কেটেছে এই হিমালয়ের গিরিকন্দরে আর আদিম অরণ্যে। শিখরের পর শিখর, উপত্যকার পর উপত্যকা পার হয়ে এসেছি। দুর্গম পথে পায়ে হেঁটেই তো চলেছি প্রায় শ'খানেক মাইল। লক্ষ্য বদরীনাথ। খুব কাছাকাছিই এসেছিলাম সেই লক্ষ্যের—সামনে মাইল পঁচিশ মোটে পথ। তবুও আর এগিয়ে না গিয়ে ফিরেই চলেছি।"

কত বাধা! একজন কুলীর জন্য বদরীনাথকে ছাড়িয়া কেবে নাকি কোনো ধর্মপ্রাণ যাত্রী?

উত্তরে লেখক বলিলেন, "বরং বদরীনাথজীই তো ছাড়লেন আমাকে—তাঁর দোরগোড়া থেকে ফিরিয়ে দিলেন।

এই ফিরিয়া আসার জন্য কোনো ক্ষোভ নাই গ্রন্থকারের মনে। বরং বলিয়াছেন, "মন্দির পর্যন্ত যেতে পারলেও আমার ছোট ছোট দুটি চশমা-পরা চোখ দিয়ে আর বেশী কি দেখতাম?...খুব কাছে থেকেও হিমালয়ের যে অপরিমেয় ও অতুলনীয় শোভা দেখলাম দিনের পর দিন, তা কি ছিল কেবলই পাহাড়, মাটি, পাথর?"

যাত্রা তাঁহার এইখানেই সার্থক হইয়াছে।

মণীন্দ্রবাবুর সহজ করিয়া বলিবার ভঙ্গিটি চমৎকার। অকারণ কোথাও টানেন নাই। গতিবেগে পাঠক-মনকেও টানিয়া লইয়া গিয়াছেন। সার্থক তাঁহার কলম।

নিউ দিল্লীর নেপথ্যে—অমিয়া সেন, প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম পাঁচসিকা মাত্র।

বইখানির পরিচয় তাহার নামেই। দিল্লীকে আমরা বাহির হইতেই জানি, কিন্তু এই গ্রন্থে লেখিকা তাহার যে নেপথ্য-চিত্রটি আমাদের চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন তাহাতে প্রত্যেক মানুষই বর্তমান স্বাধীনতার সমগ্র রূপটি প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন। স্বাধীনতা আর যাঁহারাই পাইয়া থাকুন, আমরা যে পাই নাই, ইহা নয়া দিল্লী না দেখিলে বুঝা যাইবে না। অথচ ইহারাই একদিন সদম্ভে ঘোষণা করিয়াছিলেন, আমাদের এই স্বাধীন দেশে সকলের সমান অধিকার থাকিবে—গান্ধীজীর হরিজনকে গদ গদ হইয়া আমাদের নেতারা আলিঙ্গনও করিতেছেন দেখিতে পাই। কিন্তু ভুল তখনই ভাঙে যখন তাঁহাদের এই বাহিরের রূপের অন্তরালে আর একটি চিত্র উদ্ঘাটিত দেখি। সেকালের জাতিভেদ —ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতির সঙ্কীর্ণতাকে ইহারা ঘৃণা করিতে বলিলেন, কিন্তু নয়া দিল্লীর নূতন জাতিভেদকে তাঁহারাই করিলেন রচনা। এ জাতিভেদ অর্থ-কৌলিন্যের ভিত্তিতে গঠিত। দু' হাজারী, এক হাজারী, পাঁচশতীরা, একশতীরা। এক অপরের কাছে অচ্ছুৎ। কি আপিসে, কি বাড়ীতে, কি রাস্তাঘাটে। স্বতন্ত্র ব্যবস্থা, স্বতন্ত্র পল্লী। সেকালের জাতিভেদে ব্রাহ্মণ সন্তানরাও নীচ-জাতীয়া কোনো স্ত্রীলোককে মা-মাসী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে, কিন্তু একালের নয়া দিল্লীর দু-হাজারী, এক-হাজারীর ছায়া মাড়াইতেও ঘৃণা বোধ করেন। পরস্পরের সহিত পরস্পরের কোনো সংযোগই ইহাদের মধ্যে নাই। ইহাই আমাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, আর ইহারাই আমাদের জাতীয় নেতা।

ভূমিকায় লেখিকা সত্য কথাই বলিয়াছেন, 'দিল্লী কেবলই ইতিহাস। এর ঐতিহাসিকতার সিংহদ্বারে বর্তমানের প্রগতি দাঁড়িয়ে আছে কুণ্ঠিত হয়ে।' লেখিকার, বলিবার শক্তি আছে, চাবুক মারিবার কৌশলটিও তাঁহার জানা আছে। কিন্তু যাঁহাদের উদ্দেশে এই চাবুক, ইহাতে তাঁহাদের চৈতন্য হবে কি?

শ্রীগৌতম সেন

দেশ-বিদেশের কথা

কলিকাতায় আন্তর্জ্জাতিক বধির দিবস

গত ২৫শে সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় মূক-বধির সঙ্ঘের উদ্যোগে কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আন্তর্জ্জাতিক বধির দিবস উদ্‌যাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীমৃগাঙ্কমোহন সুর এম. পি মহোদয়। সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক শ্রীদিলীপকুমার নন্দী উপস্থিত ব্যক্তিদের সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া বলেন, এই দিবস পালনের মধ্য দিয়া

অধ্যক্ষ রাধেশচন্দ্র সেন বক্তৃতা করিতেছেন ও নলিনী মজুমদার দোভাষীর কাজ করিতেছেন

বধিরগণের সমস্যাবলী ও উহার সম্ভাব্য প্রতিকারের দাবী জনসাধারণ ও সরকারকে সম্যকরূপে অবহিত করানই এই আন্তর্জ্জাতিক বধির দিবস পালনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীরাধেশচন্দ্র সেন বধিরদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ছবিতে তাঁহাকে বক্তৃতারত অবস্থায় দেখা যাইতেছে। দোভাষী হিসাবে শ্রীনলিনীমোহন মজুমদার উপস্থিত সমবেত বধিরদের সভার সারাংশ বুঝাইয়া দিতেছেন। ছবিতে আর যাঁহাকে দেখা যাইতেছে তিনি বঙ্গীয় মূক-বধির সঙ্ঘের কার্য্যকরী চেয়ারম্যান শ্রীজিতেন্দ্রলাল চৌধুরী।

শ্রীজয়কৃষ্ণের জন্মোৎসব উদ্‌যাপন

গত ৬ই কার্ত্তিক রবিবার সন্ধ্যায় ২ নং কে, সি, বোস রোডস্থ বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী ভবনে সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যালের জন্মোৎসব সম্পন্ন হয়। শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ পৌরোহিত্যের আসন গ্রহণ করেন এবং শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীঅখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো) যথাক্রমে প্রধান অতিথি ও উদ্বোধকের আসন অলঙ্কৃত করেন। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে স্বপনবুড়ো রচিত "সুর ব্রহ্মের মৃদু কম্পনে" এই গানটি কুমারী রেবা ভট্টাচার্য্য, গীতা ভট্টাচার্য্য, অর্চ্চনা রায় ও অরুণা ঘোষ কর্ত্তৃক গীত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধকরূপে সাহিত্যিক শ্রীঅখিল নিয়োগী বলেন, শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যালের জন্মদিনে আজ বার বার এই কথাই মনে হচ্ছে যে, একমাত্র শিল্পীরাই দেশকালের ও দ্বেষ-দ্বন্দ্বের উর্দ্ধে উঠে মহাত্মা ও রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষের প্রকৃত রূপদান করিতে পারে। ইহার পর প্রধান অতিথি মহাশয় বলেন, ধ্রুপদ গান ভারতীয় সঙ্গীতের আদি ও মূল রূপ। ধ্রুপদ শিক্ষা ও সাধনা না করলে

কোন সঙ্গীতই উত্তমরূপ আয়ত্তে আসে না। ধ্রুপদের যাঁরা সাধক ও বাহক তাঁহারা দেশের শ্রদ্ধার পাত্র। জয়কৃষ্ণবাবু ধ্রুপদের সেবা করে চলেছেন একনিষ্ঠ ভাবে, সেজন্য তিনি সঙ্গীত সমাজের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করেছেন। ভবানীপুর সঙ্গীত সম্মেলনের তরফ হইতে জয়কৃষ্ণকে পুষ্পমাল্য প্রদান করা হয় এবং "প্রজ্ঞা মন্দিরে"র সম্পাদক একটি মানপত্র প্রদান করেন।

সত্যকিঙ্কর সাহানা

বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস থানায় শুঁড়ি পুষ্করিণী গ্রামে জানৌ (উপবীতি) উগ্রক্ষত্রিয় কুলে বাংলা ১২৮১ সালের ২১শে আশ্বিন বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন সত্যকিঙ্করের জন্ম হয়। পিতা প্রাণকৃষ্ণ সাহানা ধনবান ব্যক্তি ছিলেন। বাল্যকালে গৃহ-শিক্ষকের নিকটেই সত্যকিঙ্করের প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয়। ইন্দাস অঞ্চলে তখন ম্যালেরিয়া ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছিল। সত্যকিঙ্কর ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইলে প্রাণকৃষ্ণ পত্নী ও পুত্রকে লইয়া রাণীগঞ্জে গমন করেন। পরে তাঁহারা গিরিডিতে যান। সেখানে প্রথম দুই বৎসর সত্যকিঙ্করের লেখাপড়ার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। কিন্তু জননীর প্রেরণায় ৬।৭ বৎসর বয়সেই কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত পাঠে তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ জন্মে। পরে গিরিডিতে এণ্ট্রান্স স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইলে সত্যকিঙ্কর সেখানেই অধ্যয়ন করেন এবং পরীক্ষাকালে অসুস্থতা সত্ত্বেও ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে কৃতিত্বের সহিত এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি কলিকাতায় জেনারেল এসেম্বলিজ ইনষ্টিট্যুশনে ভর্ত্তি হন এবং ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হন। কিন্তু ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ায় অধ্যয়নে বিশেষ বিঘ্ন জন্মে। পুনরায় জেনারেল এসেম্বলিজ ইনষ্টিট্যুশনে ভর্ত্তি হইয়া তিনি ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তার পর ঐ কলেজেই তিনি ইংরেজীতে এম. এ. এবং রিপন কলেজে আইন অধ্যয়ন করিতে থাকেন; কিন্তু নানা কারণে ঐ দুই পরীক্ষা দিতে পারেন নাই।

ছাত্রজীবন অতিক্রান্ত হইলে তিনি পিতা ও পিতৃব্যের নিকট তাঁহাদের অভ্র ও কয়লার খনি ব্যবসায়ে এবং জমিদারী ব্যবসায়ে শিক্ষালাভ করেন। ঐ সময় তিনি বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্য পাঠ করিয়া অধিক সময় অতিবাহিত করিতেন। অশ্বারোহণে ও মৃগয়ায় তাঁহার বিশেষ প্রীতি ছিল। এই সময় সহসা পিতৃহীন হইয়া সত্যকিঙ্কর সংসারের মূর্ত্তি বড়ই রুক্ষ দেখিলেন। তথাপি বিষয়কর্ম্ম দেখার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-চর্চ্চাও সমান তালে চালাইতে লাগিলেন। বহু স্মৃতি-বিজড়িত পল্লীভবনটি যদিও তাঁহার অতি প্রিয় ছিল তথাপি সেখান হইতে মানভূম জেলার কয়লার খনি ও হাজারীবাগ জেলার অভ্রখনির কার্য্য পরিচালনা সহজসাধ্য ছিল না বলিয়া বাঁকুড়া নগরের উপকণ্ঠে কেন্দুয়া ডিহিতে প্রায় ৯০ বিঘা জমি ক্রয় করিয়া সেখানে উদ্যান ও বাটীসহ "আনন্দকুটির" নামক প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন এবং ১৩২৪ সালের শ্রাবণ মাস হইতে সেখানে সপরিবারে বাস করিতে থাকেন।

বাঁকুড়ায় আসিবার পর কর্ম্মশক্তি ও চরিত্রগুণে তিনি জনসাধারণের এবং সরকারী কর্ম্মচারীগণের শ্রদ্ধা ও সম্মানলাভে সমর্থ হ'ন। জনমঙ্গলকর বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার সংযোগ স্থাপিত হয়। তিনি বাঁকুড়া ওয়েশলিয়ান কলেজের ও জেলা স্কুলের গভর্ণিং বডির মেম্বার, মিউনিসিপালিটির সদস্য, কো-অপারেটিভ ইউনিয়নের অন্যতম ডিরেক্টর, বোরষ্টাল ইনষ্টিট্যুশন এবং বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর সব-জেলের পরিদর্শক ছিলেন। তিনি একজন অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের বিষ্ণুপুর হইতে নির্ব্বাচিত সদস্য ছিলেন। বহু জনহিতকর কার্য্যের জন্য ১৯৩৪ সনে ভারত-সরকার তাঁহাকে 'রায়বাহাদুর' উপাধি দান করেন। বাঁকুড়া সারস্বত সমাজের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতৃগণের মধ্যে সত্যকিঙ্কর ছিলেন অন্যতম।

বাঙালীদের মধ্যে সত্যকিঙ্করই সর্ব্বপ্রথম বাঁকুড়ায় 'শ্রীধর রাইস মিল্'স্ নামে ধান-কল স্থাপন করিয়া বহু বাঙালী বণিকের পথিকৃৎ রূপে গণ্য হইয়াছেন। বাঁকুড়া-রাণীগঞ্জ রাস্তার ধারে কাঞ্চনপুরে কয়েক শত বিঘা জঙ্গলভূমি সংগ্রহ করিয়া তিনি তাহাতে একটি আদর্শ কৃষিশালা স্থাপন করেন।

তিনি কিছুকাল বাঁকুড়া হিন্দু মহাসভার সভাপতি এবং নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সদস্য ছিলেন। কিন্তু শেষ জীবনে রাজনীতি ও বিষয়কর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণরূপে অবসর গ্রহণ করিয়া একান্ত মনে শাস্ত্র-চর্চ্চা, ভগবচ্চিন্তা ও আত্মচিন্তায় কালাতিপাত করিতেছিলেন।

গত ২১শে আশ্বিন ১৩৬৭ তারিখে তিনি পরলোক-গমন করেন।

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

আশ্রমে কয়েক ঘণ্টা

শ্রীগৌতম সেন

তীর্থময় ভারত। ইহার প্রতিটি ধূলিকণা মহাপুরুষদের চরণ-স্পর্শে পবিত্র হইয়া আছে। ইহার আকাশে-বাতাসে নিয়ত ধ্বনিত হইতেছে জগতের আদি শব্দ ওঁঙ্কার ধ্বনি। ইহার মাটি পবিত্র, জল পবিত্র, বাতাস পবিত্র। এই মাটিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বুদ্ধ, চৈতন্য, শঙ্কর। তাঁহারা আসিয়াছিলেন মানুষেরই প্রয়োজনে। জীব-জগতে একমাত্র মানুষই শুধু প্রাণধারণ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে

গোপালজীর মন্দিরসংলগ্ন স্বামীজীর শয়নঘর

পারে নাই। সে আপনাকে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছে, বিকশিত করিতে চাহিয়াছে। এই চেষ্টার ফলেই, সাধনার ফলেই সে সৃষ্টি করিয়াছে শিল্প, সাহিত্য বিজ্ঞান। কিন্তু জ্ঞান-পিপাসা তাহার এইখানেই মেটে নাই। সে প্রশ্ন করিয়াছে, অতঃ কিম? এই জিজ্ঞাসার ফলেই, তাহার সাধনা চলিয়াছে যুগ-যুগান্তর ধরিয়া। একমাত্র মানুষই ঈশ্বরকে জানিতে চাহিয়াছে, সৃষ্টি-তত্ত্বের মূল রহস্যকে উদ্‌ঘাটিত করিবার চেষ্টাকরিয়াছে। এই চেষ্টা যাঁহারা করেন তাঁহারা অতিমানব। তাঁহারা নিজের, মুক্তি চাহেন না, চাহেন জগতের কল্যাণ। ইহাই তাঁহাদের ধর্ম। এই ধর্মাচরণ করিবার জন্যই তাঁহারা আসেন। জন্ম হইতে জন্মান্তরে তাঁহাদের পরিক্রমণ। অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করিতে তাঁহাদের নিয়ত আগমন। ইহাও তপস্যা। যে তপস্যা চলে কঠোর সংযমের মধ্য দিয়া। এই সাধন-ক্ষেত্রের অপর নাম আশ্রম। তপোবনের সৌন্দর্য্যের মধ্যে একটি গম্ভীর পরিবেশ আছে। যা মনকে অভিনিবিষ্ট করে, কেন্দ্রীভূত করে। ভারত-আত্মাকে খুঁজিতে হইলে, মানুষকে এই দিক দিয়াই অনুসন্ধান করিতে হইবে। তাই ত আশ্রম মানুষকে আজও আকৃষ্ট করে।

কলিকাতার অতি সন্নিকটে হুগলী জেলায় ডুমুরদহের নাম কে জানিত? সম্পূর্ণ উপেক্ষিত এই পল্লী। কিন্তু সেই পল্লীর নাম আজ লোকের মুখে মুখে। বহুদিন হইতেই 'উত্তমাশ্রমে'র নাম শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু দেখিবার সৌভাগ্য হয় নাই। বন্ধুবর মণিবাবু একরূপ জোর করিয়াই ধরিয়া লইয়া গেলেন। আসাঢ় মাস, বর্ষা সুরু হইয়াছে। পাড়াগাঁয়ের কাদা ভাঙিয়া আশ্রম-দ্বারে উপস্থিত হইলাম। শকুন্তলায় বর্ণিত কণ্বমুনির আশ্রম মনে পড়িয়া গেল।

প্রথমেই নজরে পড়িল, আশ্রমবাসী কয়েকজন টিউবওয়েল-পাড়ে বসিয়া আপন আপন পরিধেয় কাপড় কাচিতেছে, বাসন মাজিতেছে। সর্ব্বত্রই দেখিলাম বালখিল্য মুনি-বালকের মত এই ব্রহ্মচারীর দল আপন

স্বামী ধ্রুবানন্দের সমাধি-মন্দির

হোম কুণ্ড

আপন কাজ করিয়া যাইতেছে। কাহার নির্দ্দেশে এই কর্ম্মগুলি সম্পন্ন হইতেছে—কে করাইতেছে জানিবার উপায় নাই। এমনি নিষ্ঠা। কিছু দূরে আসিয়া একটি প্রাচীন অশ্বত্থগাছের তলায় আসিলাম। ইহা কতদিনের কেহ বলিতে পারে না। এই গাছ সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী আছে। শুনিলাম, এই অশ্বত্থগাছের তলায় আসিয়া স্বামী উত্তমানন্দ চীৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন, পাইয়াছি। ইহাই আমার স্বপ্নে-দেখা স্থান—এইখানেই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিব।

গভীর অরণ্যের ভিতর দিয়া পায়ে-হাঁটা পথ চলিয়া গিয়াছে এদিকে-ওদিকে। স্তব্ধ পরিবেশ। নিজেদেরই পদশব্দে লজ্জিত হইতেছি। স্থানে স্থানে কয়েকটি মন্দিরের মত দেখিলাম। মণিবাবু জানাইলেন, ঐগুলি পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্বামীজীদের সমাধি-মন্দির। উত্তমানন্দের সমাধিটি দেখিবার মত। আর এক জায়গায় দেখিলাম, একটি চত্বরের মত স্থান—চারিধার রেলিং দিয়া ঘেরা। শুনিলাম ওটি হোমকুণ্ড। যজ্ঞকুণ্ড হইতে তখনও অল্প অল্প ধূম নির্গত হইতেছে।

মণিবাবুকে বলিলাম, এসব পরে হবে—আগে চলুন স্বামিজীকে দর্শন করে আসি। স্বামীজী সন্নিধানে আসিয়া দেখি, সেখানে বহুলোকের সমাবেশ হইয়াছে। কোন পর্ব্ব নাই, উপলক্ষ্য নাই তবু এইরূপ লোকসমাগম হইতে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। শুনিলাম, প্রত্যহই এইরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারাই আসুন, তাঁহাদের না খাইয়া যাইবার উপায় নাই। কোথা হইতে কি করিয়া ইহা সম্পন্ন হইয়া যাইতেছে ইহা ভাবিতেও বিস্ময় লাগে। পরে শুনিয়াছি, অতিথ-অভ্যাগতের সংখ্যা সময় বিশেষে তিন-চারিশতও হইয়া থাকে।

আরও একটি জিনিস বিস্মিত হইয়া লক্ষ্য করিলাম, এত ভিড়ের মাঝেও আমাদের আগমন স্বামীজীর দৃষ্টি এড়ায় নাই। আগাইয়া গিয়া প্রণাম করিলাম। সমাদর করিয়া বসাইয়া কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। পরিচিতের মতই মধুর সম্ভাষণ। বসুধৈব কুটুম্বকম্ এইখানেই প্রত্যক্ষ করিলাম। মণিবাবুকে বলিলেন, আগে বিশ্রাম কর পরে কথাবার্ত্তা হইবে। একজন আসিয়া আমাদের নির্দ্দিষ্ট ঘরে লইয়া গেলেন। বারান্দা-সংলগ্ন বাংলো-প্যাটার্ণের ঘর। সম্মুখের দৃশ্য আরও চমৎকার। দূর-প্রসারী বিস্তীর্ণ প্রান্তর। আমরা কলিকাতার লোক। নিয়ত দৃষ্টি ব্যাহত হয়। মুক্তির আনন্দে দুই চোখ ভরিয়া দেখিলাম। দৃষ্টি যেন চলিয়াছে সীমা ছাড়িয়া অসীমের উদ্দেশ্যে। এই চোখে যে এতদূর দেখা যায় পূর্ব্বে জানা ছিল না। দূরে গঙ্গা দেখা যাইতেছে। শুনিলাম, গঙ্গা পূর্ব্বে এই আশ্রমেরই কোল ঘেঁষিয়া প্রবাহিত ছিল, এখন দূরে সরিয়া গিয়াছে। আরও সুন্দর দেখাইতেছে অরণ্য-বেষ্টিত আশ্রমগৃহগুলিকে। যেন একখানা ছবি!

স্নান করিয়াই গিয়াছিলাম। সুতরাং স্নানের বালাই ছিল না। একটু পরেই খাবার ডাক আসিল। একটু দূরেই রন্ধনশালা। প্রকাণ্ড বারান্দাসংলগ্ন খাবার-ঘর, সারি সারি পাতা পড়িয়াছে। সাধারণ ব্যবস্থা, কোন আড়ম্বর নাই—একটি ডাল একটি তরকারী। কিন্তু তৃপ্তির সহিত খাইলাম। আহার শেষ করিবার মুখে পাচক আসিয়া প্রতিটি পাতে দুটি করিয়া আম পরিবেশন করিয়া গেলেন। বলিলেন, আমের সময় শেষ করে আপনারা এলেন—ক'দিন আগে এলে পেট ভরে আম খাওয়াতে পারতাম। আমগুলি ভাল। হিমসাগর বলিয়াই মনে হইল। আম নাই, কিন্তু কাঁঠাল হইয়াছে প্রচুর।

রন্ধনশালা

করুণাময়ী দেবী

উত্তমানন্দের সমাধি-মন্দির

একটু বিশ্রাম করিয়া আশ্রম-পরিদর্শনে বাহির হইলাম। প্রথমে গেলাম শ্রীশ্রীঠাকুর মন্দিরে। এই ঠাকুর ঘরের উত্তরে সাধারণের থাকিবার ঘর। সাধারণ ঘরের পশ্চাতে পায়রার অসংখ্য খোপ এবং তৎসংলগ্ন মহিমানন্দ গ্রন্থাগার। ইহার কিছু দূরে গোয়ালঘর। মন্দির-সংলগ্ন বৃহৎ চত্বর। এখানে নিয়মিত নাম-কীর্ত্তনাদি হইয়া থাকে। যাত্রিনিবাসটিও চমৎকার। যাঁহারা আসেন তাঁহাদের আরামের বিবিধ ব্যবস্থা আছে। দেওয়ালে টাঙানো কয়েকটি ফটোর প্রতি দৃষ্টি পড়িল। শুনিলাম, ইঁহারা আশ্রমের পূর্ব্ব আচার্য্য। একটি নারী-মূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টি পড়িল। মণিবাবু বলিলেন, ইনি করুণাময়ী। এই মহীয়সী মহিলা ছিলেন উত্তমাশ্রমের বর্ত্তমান মঠাধ্যক্ষ বিজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারীর জননী সরোজিনী দেবীর ভগ্নী। ইনি উত্তরকালে করুণাময়ী দেবীর সহচরীরূপে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। করুণাময়ীর পূর্ব্ব নাম পঙ্কজিনী দেবী। শুনিয়াছি, ভাবসমাধিকালে তাঁহার মুখ হইতে অনর্গল প্রাকৃত ভাষায় চণ্ডীর শ্লোক বাহির হইত। অথচ তিনি নিরক্ষরা ছিলেন। আরও শুনিলাম, সিদ্ধঘটের আবির্ভাব কালে স্বয়ং পার্ব্বতী বালিকা মূর্ত্তিতে নাকি তাঁহাকে দর্শন দেন। সেই সিদ্ধঘট উত্তমানন্দজীউর সমাধিমন্দিরে আজও রক্ষিত আছে। 'অঘটন আজও ঘটে' ইহা বিশ্বাস না করিয়া উপায় নাই। করুণাময়ী ছিলেন উত্তমাশ্রমের প্রাণস্বরূপা। মগরায় ছিল তাঁহার সাধনক্ষেত্র। সেখানেই তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। মগরার এই সাধন-ক্ষেত্রটি আজও সযত্নে রক্ষা করা হইতেছে। করুণাময়ীর দেহরক্ষার পর ডুমুরদহে ম্যালেরিয়া দেখা দিল। এই ম্যালেরিয়ায় গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হইয়া যায়। আশ্রমের কর্ম্মীরা সকল কাজ ফেলিয়া সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করে। কিন্তু তাহাদেরও শরীর ভাঙিয়া পড়ে। তখন স্বাস্থ্যকর স্থানে আশ্রমের শাখা স্থাপন করিবার প্রয়োজন অনুভূত হয়। এবং ১৩২৯ সালে বাঁকুড়া জেলায় কঁড়ো-পাহাড়ে উত্তমাশ্রমের শাখা আশ্রম স্থাপিত হয়। কঁড়ো-পাহাড়ে শাখা আশ্রমটি স্থাপিত হইবার পর ১৩৩৫ সালে পুরীধামে স্বামী মহিমানন্দ মহারাজ দেহত্যাগ করেন। এই আশ্রমেই করুণাময়ীর স্বপ্ন-দৃষ্ট শ্বেত-পাথরের অষ্টভুজা পার্ব্বতী দেবীর মন্দির স্থাপিত হইয়াছে। স্বামী পূর্ণানন্দজীর অক্লান্ত পরিশ্রমে

সমাধি-মন্দিরের অপর এক অংশ
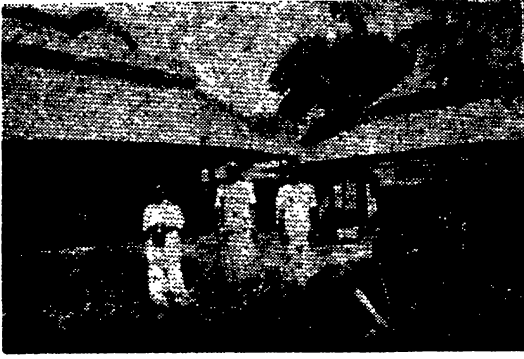
ক্ষীরপাই আশ্রম

মন্দির এবং উপস্থিত তপোবন পাহাড়ের যাবতীয় উন্নতি মূর্ত্তরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এই কঁড়ো-পাহাড় একদা দুরধিগম্য ছিল, আজ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মানুষের যাওয়া-আসার পথ সুগম হইয়াছে, আজ এই তপোবন বেদান্ত-তন্ত্র-পুরাণের জ্ঞান বিতরণের একটি প্রধান কেন্দ্র রূপে পরিচিত। স্বামী ধ্রুবানন্দের জন্মভূমি ক্ষীরপাই গ্রামে ইঁহারা আরও একটি আশ্রম করিয়াছেন। বিভিন্ন আশ্রমের শিষ্যসংখ্যা আজ কম নয়। কাজ যেমন বাড়িতেছে, কর্ম্মক্ষেত্রও তদনুপাতে বাড়িতেছে। যিনি এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহার বিদেহী আত্মাই যে অলক্ষ্যে থাকিয়া সকল কাজ করিয়া যাইতেছেন, ইহাতে সন্দেহ নাই, নহিলে এমন অসম্ভব কোনো দিনই সম্ভব হইতে পারিত না। ইহা আশ্রমের অধিবাসীরাও স্বীকার করেন।

স্বামী উত্তমানন্দ ছিলেন কোটালপুরের প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার নীলকান্ত সিংহ রায়। জাতিতে ক্ষত্রিয়। তাই ক্ষত্রিয়-জনোচিত তেজ ও জিদ ছিল তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। সত্যাশ্রয়ী সাধক উত্তরকালে তাঁহার সেই তেজকে ভিন্ন মুখে পরিচালিত করেন। কখন কাহার কি ভাবে পরিবর্ত্তন আসে, তাহা বলা কঠিন। আমরা পরিবর্ত্তিত রূপটাই দেখিতে পাই। কিন্তু মনের অন্তরালে যে ভাঙা-গড়ার কাজ চলে তাহার হিসাব জানিবার উপায় নাই। যাহা প্রত্যক্ষানুভূত তাহাতে দেখিতে পাই, তিনি স্বামী শান্তানন্দ গিরির নিকট দীক্ষা লইয়া সাধনার জন্য গুরুদেবের সহিত বর্দ্ধমান জেলায় কালনার এক গভীর অরণ্যে চলিয়া যান। এই শান্তানন্দ গিরি ছিলেন, বর্দ্ধমানের উকিল রামগোপাল মুখোপাধ্যায়। একটি দীপ সহস্র দীপকে প্রজ্জ্বলিত করিতেছে। আবার এই শান্তানন্দ রামগিরির নিকট দীক্ষিত হন। রামগিরি ছিলেন কাশীর ধ্রুবেশ্বর মঠের উমেদগিরির শিষ্য। ইঁহারা শঙ্করাচার্য্য সম্প্রদায়ভুক্ত।

এই আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৩১৮ সালে ৩রা কার্ত্তিক। আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর বহু বৎসর কাটিয়া গিয়াছে—কর্ম্মক্ষেত্রের সম্প্রসারণও আজ হইয়াছে। কিন্তু আশ্রমের অরণ্য-সম্পদ তাহার পূর্ব্ব পরিচয়কেই ঘোষণা করিতেছে। শুনিয়াছি, ইহা নাকি ব্যাঘ্রসঙ্কুল অরণ্য ছিল। বর্ত্তমানে এই আশ্রমটি ৬৫ বিঘার উপর স্থাপিত।

মনে প্রশ্ন আসে, কেন স্বামীজী এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলেন। নির্জ্জনে তপস্যার জন্য ঘটা করিয়া আশ্রম বানাইবার প্রয়োজন কি? মনে পড়িয়া গেল, রবীন্দ্রনাথের একটি কথা—"মানুষ অশ্রান্ত যাত্রা করেছে অন্নবস্ত্রের জন্য নয়, আপনার সমস্ত শক্তি দিয়ে মানবলোকে মহামানবের প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে, আপনার জটিল বাধার থেকে আপনার অন্তরতম সত্যকে উদ্ধার করবার জন্যে।" মহাপ্রাণ যাঁহারা তাঁহারা নিজের মুক্তি চাহেন না, সকলের মুক্তি তাঁহাদের কাম্য। সকলকে প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহাও তো সাধনা। ছাত্র-জীবনে স্বামীজী দেখিয়াছিলেন, বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি কেরাণী তৈরির কারখানা। ইহাতে চরিত্র গঠিত হয় না। কেরাণী নয়, শিক্ষার দ্বারা মানুষ তৈয়ারি করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথও তাই চাহিয়াছিলেন। 'বিশ্বভারতী' প্রতিষ্ঠার ইহাই একমাত্র কারণ। ডুমুরদহে আসিয়া উত্তমানন্দ তাই প্রথমেই নজর দিলেন, বিদ্যালয়গুলির সংস্কারকার্য্যে। নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা
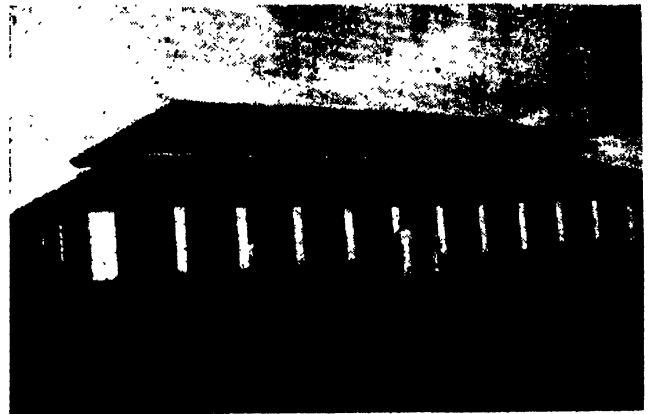
ধ্রুবানন্দ প্রাইমারী স্কুল

তখন সম্ভব ছিল না। পরে অবশ্য অনেকগুলি স্কুল, পাঠশালা স্বামী ধ্রুবানন্দের চেষ্টায় গড়িয়া উঠিয়াছে। আদর্শ বিদ্যালয় যদিও তাঁহারা গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই, তবু তাহার মধ্য দিয়াই তাঁহাদের সংস্কার-কার্য্য চালাইয়া গিয়াছেন। সংস্কার অনেক দিক দিয়াই হইয়াছে। আগে রাস্তা ছিল না, রাস্তা হইয়াছে—ষ্টেশন ছিল না, ষ্টেশন হইয়াছে এবং ডাকঘরও হইয়াছে। যাহা কিছুই হইয়াছে আশ্রমের চেষ্টাতেই হইয়াছে। উত্তমানন্দ ছিলেন মন্ত্রদাতা—পথ-প্রদর্শক। তিনি বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছেন, আজ তাহা মহীরুহে পরিণত হইয়াছে।

ধ্রুবানন্দ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়

বৈকালের দিকে স্বামীজী আমাদের আহ্বান করিলেন। আমরা গিয়া লাইব্রেরী-ঘরে বসিলাম। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই বৃষ্টি সুরু হইল। দেখি, সেই বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতেই স্বামীজী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অল্পক্ষণ পরেই আমাদের জন্য চা জলখাবার আসিল।

মনের ভিতর অনেক প্রশ্ন জমা হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের কথা বলিবার পূর্ব্বেই স্বামীজী বলিলেন, আমাদের লাইব্রেরীটি দেখেছেন?

বলিলাম, না তো।

তার পর যাহা দেখিলাম তাহাতে বিস্ময়ের অবধি রহিল না। বিভিন্ন প্রাচীন ও নবীন গ্রন্থের এরূপ একত্র সমাবেশ তাঁহারা করিয়াছেন—যাহাতে তাঁহাদের রুচি ও রসবোধের প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। রবীন্দ্র-রচনাবলীর সমগ্র সেট এইখানেই দেখিবার সৌভাগ্য হইল। গ্রন্থাগার নয়—গবেষণা-মন্দির। ইহা সচরাচর দুর্লভ। দেখিলাম, বর্ত্তমান স্বামীজী বিজ্ঞানানন্দ জ্ঞান-সমুদ্র মন্থন করিয়া বসিয়া আছেন। গীতার মূর্ত্ত প্রতীক। জিজ্ঞাসা করিলাম, এত বড় প্রতিষ্ঠান চলে কিসে?

চালান শিষ্য ও অনুগত ভক্তেরা। তবে আশ্রমের নিজস্ব আয়ও কিছু আছে। জমি থেকে যা ধান হয়, তাতে সংবৎসরের খোরাক প্রায় চলে যায়। তরি-তরকারীও জমি থেকে ওঠে। আর আম-কাঁঠালের বাগানও তো দেখছেন। গরু আছে—দুধ পাই। অভাব বড় একটা হয় না। আর অভাব তো মনের। ওটা তো আমরাই সৃষ্টি করি।

স্কুলগুলিও চলে কি আশ্রমের তহবিল থেকে?

ঐ তো বললাম, কে কোথা থেকে চালাচ্ছে আমরাও ঠিক জানি না—তবে চলছে দেখতে পাচ্ছি।

একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ও আছে দেখলাম!

হাঁ, রোগীও সেখানে কম হয় না।

সবই কি চালান আশ্রমের কর্মীরা?

স্বামীজী হাসিলেন। কর্ম্ম ছাড়া মানুষের গতি কি?

ক্ষীরপাই আশ্রমের তোরণদ্বার (মেদিনীপুর)

স্বামী ধ্রুবানন্দ

অষ্টভুজা পার্ব্বতী দেবী (বাঁকুড়া)

কর্ম্মের মধ্য দিয়েই তো এগুতে হবে। 'জীবে দয়া করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।' জীবই তো ভগবান।

তবে সাধন-ভজনের প্রয়োজন কি?

কিছু না। না করলেও চলে। তবে মনকে তৈরি করতে হলে ওগুলোর দরকার। নইলে কর্মে নিষ্ঠা আসে না। কর্ম্মকে সহজ করতে হবে তো।

একটা জিনিস লক্ষ্য ক'রে দেখছি—এত যে কাজ করছে এরা, কোন ক্লান্তি নাই।

স্বামীজী হাসিয়া বলিলেন, আনন্দই তো সব। আনন্দ যেখানে, ভগবান সেখানে।

স্বামীজীর বড় ইচ্ছা একবার বাঁকুড়ায় যাই। বলিলেন, গেলে আনন্দ পাবেন। পাহাড়টা ছোট—তিন-চার শো বিঘা জুড়ে আছে। এখানে আছে উত্তমানন্দজীর স্মৃতি-মন্দির, একটা যাত্রিনিবাস, সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীদের চার চালা, মাঠকোঠা এই সব। আর আছে অষ্টভুজা পার্ব্বতী দেবীর মন্দির।

উত্তমানন্দই কি ধ্রুবানন্দকে প্রতিষ্ঠিত করে যান?

হাঁ। তাঁর নির্বাচনে ভুল হয় নি। আশ্রমের অনেক কাজ তিনি করেছেন। উত্তমানন্দজীর স্বপ্নকে তিনি রূপায়িত করেছেন। এই ধ্রুবানন্দ ছিলেন শিয়ালদহ মিশনারী স্কুলের হেডমাষ্টার। কিন্তু পরিবর্ত্তন কোথা দিয়া আসিল ইহা নিরূপণ করা বড় শক্ত। যখন আসে তখন তাহাকে ঠেকাইয়া রাখে কাহার সাধ্য। এমনি ভাবেই একদা তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ভাইকে দিয়া ঘর ছাড়িয়াছিলেন এবং পরে মহিমানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই আশ্রম-প্রতিষ্ঠার বিষয়ে তাঁহার সহিত আলাপ-আলোচনা হয়। মহিমানন্দ মহারাজ তখন বলিলেন, টাকার তো দরকার! তাহাতে ধ্রুবানন্দ বলিলেন, আপাততঃ দুই শত টাকা আমি সংগ্রহ করিয়া দিতেছি, এই লইয়াই আপনি চালকরূপে অগ্রসর হউন। এবং উভয়েই উত্তমানন্দজীর সংস্পর্শে আসেন।

এই ধ্রুবানন্দই কি আপনার গুরু?

হাঁ। তাঁর অসমাপ্ত কাজ আমাকেই এখন সম্পূর্ণ করতে হচ্ছে। তাই তো হয়। কর্ম্মপ্রবাহ চলে জন্ম থেকে জন্মান্তরে।

ব্রহ্মচারী যাঁরা এখানে আছেন, সেবা ছাড়া তাঁদের আর কি করতে হয়?

তাদের জীবনকে গড়ে তুলবার জন্যে বিবিধ শাস্ত্র-পাঠের ব্যবস্থা আছে। নিত্য গীতা-পাঠ, উপাসনা—আলাপ-আলোচনার মধ্যে দিয়ে সংশয় নিরসন। এক কথায় বলতে গেলে, তারাই তো আশ্রমের পরিচালক!

ইহার পর স্বামীজী যাহা বলিলেন, তাহা এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিলেন, আমরা যাহা-কিছুই করিয়া থাকি তাহা সম্পূর্ণ করা কোনদিনই সম্ভব ছিল না, যদি না সাধারণের সমর্থন ও সহানুভূতি ইহার পিছনে থাকিত। তাঁহাদের মধ্যে কেহই আজ জীবিত নাই সত্য, তবু রাজেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভজগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিনী বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, তরণী মালা ও রজনী ঘোষের নাম আশ্রমবাসী চিরদিন স্মরণে রাখিবে। কিন্তু এখনও অনেক কিছু করিবার

আশ্রমাচার্য্য স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

মহিমানন্দ মহারাজ

আছে। স্বামীজীর কল্পনায় আছে, চাষবাসের সুবিধার জন্য একটি শক্তিশালী পাম্প, ইঞ্জিন এবং ৪ ইঞ্চি ব্যাসের টিউবওয়েল প্রতিষ্ঠা। আর তাঁহার ইচ্ছা 'মহিমানন্দ পাঠাগার'টিকে সংস্কার করা। ক্ষীরপাই আশ্রমে ধ্রুবানন্দ মহারাজের একটি স্মৃতি-মন্দির নির্মাণ করিবার ইচ্ছাও তাঁহার প্রবল দেখিলাম। সেই সঙ্গে তিনি মগরার সিদ্ধাশ্রমে মায়ের একটি মন্দির নির্মাণ করিতে চান। বাঁকুড়ায় তপোবন পাহাড়ে ১০৮টি শিবমন্দির নির্মাণ করিবার পরিকল্পনা বহুদিন হইতেই ছিল—অর্থাভাবে তাহা সম্পূর্ণ করা এতদিন সম্ভব হয় নাই! ধ্রুবানন্দ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের নিজস্ব বাড়ী আজও নাই—ইহার প্রয়োজনও অত্যাবশ্যক।

কিন্তু অর্থাভাবে এই অত্যাবশ্যক কাজগুলি পড়িয়া আছে। আশ্রমকে বাঁচাইয়া রাখার দায়িত্ব সর্ব্বসাধারণের। তাঁহাদেরই কল্যাণ ইহাতে সাধিত হইতেছে। তাঁহারা আজ আগাইয়া আসুন এবং মুক্তহস্তে দান করুন ইহাই আমার বিনীত প্রার্থনা। মনে রাখিবেন, আপনার একার দানই সহস্র হইয়া পড়িবে। যাহা কিছু পাঠাইবেন ডুমুরদহ আশ্রমে স্বামীজীর নামেই পাঠাইবেন। প্রসঙ্গ ছাড়িয়া অন্য কথায় আসিয়া পড়িয়াছি।

স্বামীজীকে প্রশ্ন করিয়া আর বিরক্ত করিতে ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তিনি বলিতে বলিতে তদ্‌গত হইয়া গিয়াছেন। বলিলেন, তপোবন-পাহাড়ে অষ্টভুজা পার্ব্বতী দেবীর মূর্ত্তি তখনও স্থাপিত হয় নি। কিন্তু যে নিজে ধরা দেবে, তাকে না এনে উপায় কি? সেই পাগলী মেয়ে আমাকেও কি পাহাড়ে পাহাড়ে কম ছুটিয়েছে নাকি! কেউ বিশ্বাস করবে না, কিন্তু করুণাময়ীর মত আমিও দেখেছি সেই দামাল মেয়েকে। বলে, আমার এখানে জায়গা করে দে। স্বপ্নে দেখা। কিন্তু স্বপ্ন যে মিথ্যা নয়, আজ বুঝতে পারছি। দেবী এলেন এবং দেবীর ইচ্ছাতেই মুড়ি-মুড়কি, বাতাসা, কড়াই ভাজা, চানার লাড়ু, ভোগের ব্যবস্থা হ'ল। সেই প্রথা আজও চলে আসছে।

বৃষ্টি সমানেই পড়িতেছিল। সেইদিকে চাহিয়া স্বামীজী বলিলেন, এ ট্রেনে না গেলেই কি চলে না?

উত্তরে জানাইলাম, না, এই ট্রেনেই আমাদের যাইতে হইবে। আর একটা নিমন্ত্রণ জানিয়ে রাখি—আগামী ১৩৬৮ সালে আশ্রমের ৫০ বৎসর পূর্ণ হবে। ফাল্গুন মাসে হবে তার উৎসব। সেই উৎসবের সময় আপনাদের আসা চাই-ই। তবে সবই তো অর্থ-সাপেক্ষ!

আপনারা জনসাধারণের কাছে আবেদন জানান না কেন?

নেহাৎ ব্যবসাদারী হয় না কি?

জন-কল্যাণ তো আর ব্যবসা নয়! আপনারা তাদের কল্যাণেই আবেদন জানাচ্ছেন।

হাসিতে হাসিতেই কথার শেষ হইল বটে, কিন্তু কথাটা ভুলিতে পারিলাম না।

আশ্রমের সঙ্গে কয় ঘণ্টারই বা আমাদের পরিচয়।

স্বামী উত্তমানন্দ

সিদ্ধাশ্রম (মগরা)

যাত্রী নিবাস
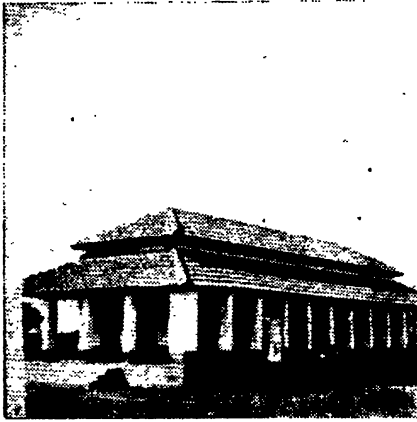
কিন্তু মনে হইল, ইঁহারা যেন কত আপন! ঘণ্টার বিচারে আত্ম-পরের মূল্য নিরূপণ করা যায় না। স্বামীজী বলিলেন, আম তো খাওয়াতে পারলাম না, আপনারা একটা ক'রে কাঁঠাল নিয়ে যান। কোনো অসুবিধাই হবে না—এরা ষ্টেশনে পৌঁছে দেবে।

আশ্রমের ইতিহাস লিখিতে বসি নাই। কয়েক ঘণ্টার সান্নিধ্যে আশ্রমবাসীদের অন্তরের যেটুকু পরিচয় পাইয়াছি তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম।

পথে আসিতে আসিতে স্বামীজীর পূর্ব্বকথা কিছু কিছু শুনিলাম মণিবাবুর মুখে। বিজ্ঞানানন্দ ছিলেন করুণাময়ীর মানসপুত্র। পূর্ব্বনাম হৃষিকেশ। এই হৃষিকেশকে বিজ্ঞানানন্দ করিবার মূলে ছিলেন তিন গুরুভাই ও গুরুভগ্নী। তাই তো উত্তরকালে স্বামী ধ্রুবানন্দ তাঁহার উপর ন্যস্ত করিতে পারিয়াছিলেন আশ্রম-পরিচালনার গুরুভার। স্বামী ধ্রুবানন্দ জানিতেন যে, মায়ের আসন প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে এই বিজ্ঞানানন্দকেই। বিজ্ঞানানন্দও জানিতেন মগরায় সিদ্ধাসন রক্ষা ও বাঁকুড়ায় মাকে প্রতিষ্ঠা তাঁহাকেই করিতে হইবে। আজ এই বিজ্ঞানানন্দকেই লইতে হইয়াছে তিনটি আশ্রম পরিচালনার সকল দায়িত্ব। স্বামীজী বলেন, আমার সাধ্য কি—যাঁর বোঝা তিনিই বহেন।

মণিবাবুর কথায় বিস্মিত হই নাই। এমন করিয়া 'অহং'কে বিসর্জ্জন দিতে ইঁহারাই তো পারিবেন!

আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া, মণিবাবু বলিলেন, কি, চুপ করে গেলেন যে! কেমন দেখলেন বলুন।

দেখলাম? সমগ্র গীতাখানি প্রত্যক্ষ করে এলাম।
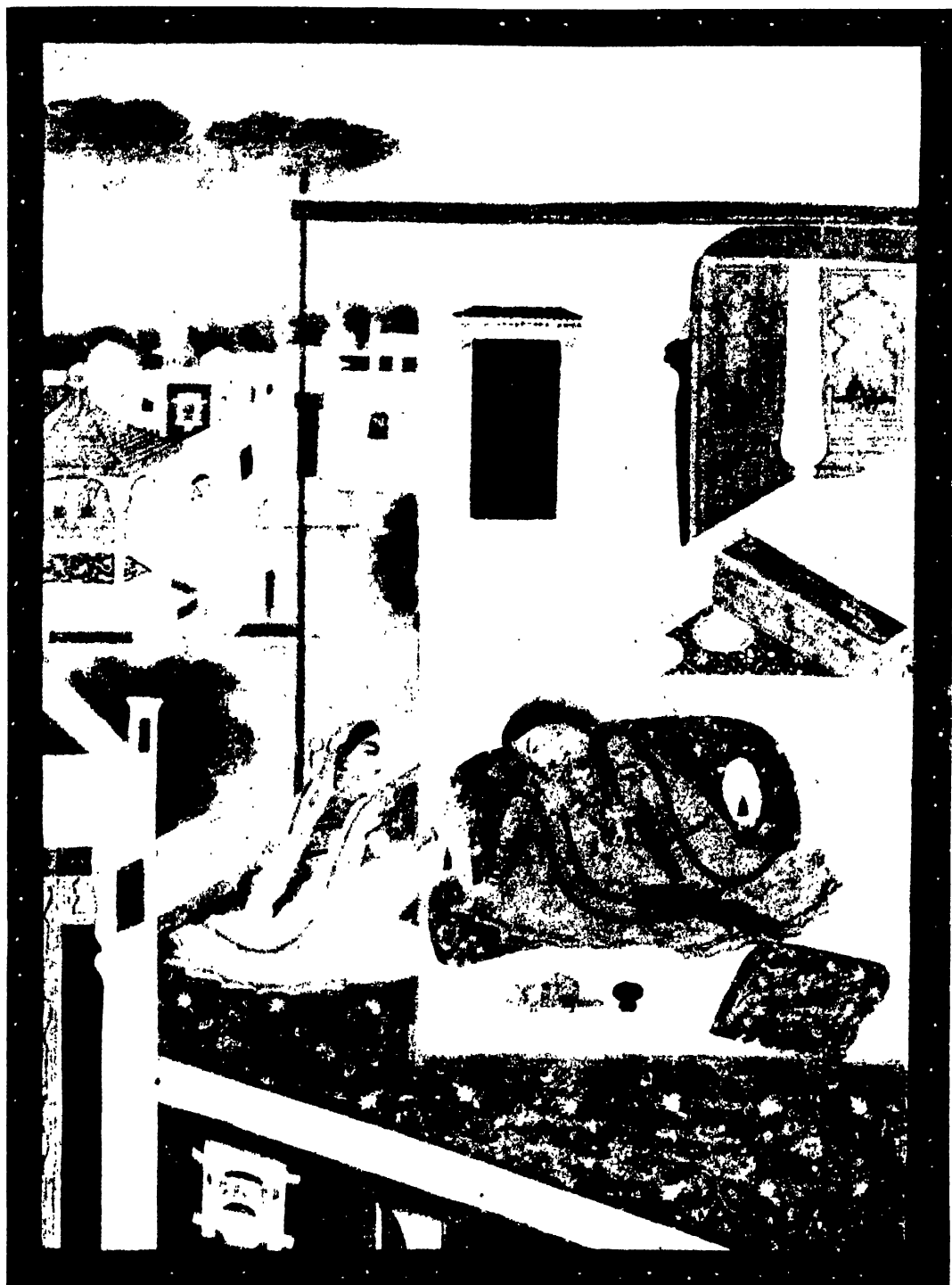
প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

সান্ত্বনা

(প্রাচীন চিত্র হইতে)

স্বত্বাধিকারী শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

:: ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬০শ ভাগ
২য় খণ্ড

পৌষ, ১৩৬৭

৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

রাষ্ট্রপতির অধিকার ও ক্ষমতা

রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ অল্পদিন পূর্ব্বে এক প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন যে, ভারতীয় সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতির দায়িত্বই বা কী এবং তাঁহার ক্ষমতাই বা কী? রাষ্ট্রপতি কি রাষ্ট্রের প্রতীক মাত্র এবং রাষ্ট্র চালনায়, তত্ত্বাবধানে ও শাসনতন্ত্র নিয়ন্ত্রণে, তিনি মন্ত্রীসভার নির্দ্দেশ ও পরামর্শ ব্যতীত কোন কিছুতে হস্তক্ষেপ করিতে অক্ষম, না তাঁহার নিজস্ব ক্ষমতা কিছু আছে যাহা সংবিধান প্রদত্ত এবং যাহার বলে তিনি রাষ্ট্র সম্পর্কিত কোন ব্যাপারে তিনি নিজের বিচার-বিবেচনা অনুযায়ী সক্রিয় হইয়া দায়িত্ব পালন করিতে পারেন?

শোনা গিয়াছিল যে, যে ন্যায়বিশারদগণ আমাদের সংবিধান রচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের অধিকাংশ ব্রিটিশ পার্লামেন্টারী প্রথার নির্দ্দেশই প্রধানতঃ অনুসরণ করিয়াছিলেন কিন্তু কিছু কিছু বিষয়ে তাঁহাদের ব্রিটিশ ছাঁদ ছাড়িয়া সুইস মার্কিণ ইত্যাদি অন্যদেশীয় সংবিধানের পথও লইতে হইয়াছিল। তাঁহারা যে সংবিধান আমাদের মাথায় চাপাইয়া দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে অনেক কিছুই আছে যাহার উদ্দেশ্য মহান কিন্তু কার্য্যতঃ যাহাতে সজ্জনের অধিকার সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে এবং দুর্জ্জন ও দুষ্টের দুরাচারের পথ পরিষ্কৃত হইতেছে। এইরূপ অবস্থার ফলে দেশের প্রগতি ব্যাহত এবং রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে সংবিধান মতে এখন অন্যায়ই পরাক্রান্ত হইয়াছে এবং সম্প্রতি আসামে মাৎস্যন্যায় স্বীকৃতি পাইয়া গিয়াছে।

এই প্রসঙ্গ লিখিবার সময় সংবাদ দেখা গেল যে আসাম সরকার গোরেশ্বরের তদন্ত বিষয়ে এক নোটে স্বীকার করিয়াছেন যে ঐ এলাকায় উপদ্রবের সময় ৪০১৯টি কুটির ও ৫৮টি কাঁচা পাকা বাড়ী বিধ্বস্ত হয় যাহার ফলে ১৪০৩টি বাঙালী পরিবার বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেই সঙ্গেই উক্ত সরকার বলেন যে লুটতরাজ ও পুড়াইয়া দেওয়ায় যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার পরিমাণ ৭ লক্ষ টাকা। সেই সঙ্গে স্বীকার করা হইয়াছে যে ৪ জন বাঙালীকে গুলী করিয়া খুন করা হয় এবং শতাধিক জখম হয়। সেই সঙ্গে আসাম সরকার কিছু সাফাইও গাহিয়াছেন এবং জানাইতে চাহিয়াছেন যে ঐ হাঙ্গামা, হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি আকস্মিক ঘটনা, পূর্ব্বকল্পিত নহে!

ঘটনা যাহা ঘটিয়াছে তাহাতে আসাম সরকারের স্বীকৃতি যেটুকু তাহাই যদি সত্য বলিয়া ধরা যায় তাহা হইলেও উহা চরম বর্ব্বরত্বের পরিচায়ক। এখন প্রশ্ন এই যে এইরূপ ঘটনার প্রতিকার ও প্রতিরোধ করার দায়িত্ব কাহার এবং করিবে কে? যে মহাশয় ব্যক্তিগণ সংবিধান গঠন করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা ত এ বিষয়ে বিরাট ফাঁক রাখিয়া গিয়াছেন দেখিতেছি কেন না প্রতিকার ও প্রতিরোধ ব্যাবস্থায় কেহই অগ্রসর হইতেছেন না। পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থায় ইহার প্রতিকারের পথ কি আছে জানি না—কেন না এখন পর্য্যন্ত তাহা আমাদের চক্ষু কর্ণের গোচর হয় নাই—কিন্তু প্রতিরোধের যে কিছুই ব্যবস্থা নাই তাহা ত নানা স্থলের একাধিক ছোট বড় হাঙ্গামায় প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে—বিশেষ যেখানে রাজ্য সরকার হাঙ্গামা দমনে অনিচ্ছুক বা অপারগ ছিলেন।

বহির্জ্জগতের দুইটি সাধারণতন্ত্র চালিত দেশে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা অন্যরূপ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট যুক্তরাষ্ট্রের চিফ একজিকিউটিভ অর্থাৎ শাসনতন্ত্রের

চালনায় সম্যক ক্ষমতা যুক্ত—অবশ্য মার্কিন সংবিধান অনুসারে। সেইজন্য এরূপ অবস্থায় শাসনতন্ত্রের চালনা পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থা অপেক্ষা বহুগুণ দ্রুত এবং তাহার কর্ম্মপন্থাও সুনির্দ্দিষ্ট ও সুনিশ্চিত, কেননা দলগত স্বার্থ বা দলীয় চাপে তাহা লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম।

ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট আগে প্রতীক মাত্র ছিলেন এবং প্রত্যক্ষ সাধারণ নির্ব্বাচনের যে দল, বা দলসমষ্টি, সংখ্যাগরিষ্ঠ হইত সেই শাসনতন্ত্রের পূর্ণ অধিকারী থাকিত। সেখানে ক্রমাগত মন্ত্রীসভা পতনের ফলে দেশের রাষ্ট্রচালনার ব্যাপার প্রায় অচল হইয়া আসে এবং জগতে ফ্রান্সের আসন স্থানচ্যুত হইবার উপক্রম হয়। বর্ত্তমানে নূতন রাষ্ট্রে ও পরিবর্ত্তিত সংবিধানে প্রেসিডেণ্টের ক্ষমতা প্রায় একাধিপত্যে দাঁড়াইয়াছে। এলজিরিয়ার ব্যাপারে কি হয় এখনও জানা নাই কিন্তু যেভাবে প্রেসিডেণ্ট সাক্ষাৎ ভাবে জনসমর্থনের দাবী করিয়াছেন তাহা যদি সফল হয় তবে ইহা প্রায় নিশ্চিত যে এলজিরিয়ারও সমস্যা পূরণের নূতন পথ দেখা যাইবে।

মার্কিন দেশে দাঙ্গা হাঙ্গামায়—যথা দীর্ঘদিন পূর্ব্বের "হিরন লেকস" (Heron Lakes) অঞ্চলে ব্যাপক ও নৃশংস ভাবে নিগ্রো-হত্যার এবং সম্প্রতি নিগ্রোদিগকে শ্বেতাঙ্গদিগের স্কুলে ভর্ত্তি করার ব্যাপারে দাঙ্গায়—প্রেসিডেণ্ট সরাসরি হস্তক্ষেপ করিতে পারেন ও করেন। দুর্নীতির ও দুরাচারের বন্যা বহিলে—যেরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বহিয়াছিল—তাহার প্রতিকারের ও দুষ্কৃতি দমনের জন্য ঘুষখোর ও রাষ্ট্রনৈতিক দলবিশেষের হস্তগত পুলিসকে অতিক্রম করিয়া ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেষ্টিগেশন (F. B. I.) গঠন করার নির্দ্দেশ দিতে পারিয়াছিলেন মার্কিন প্রেসিডেণ্ট, যেহেতু তিনি কোনোও দলের অনুগ্রহপ্রার্থী ছিলেন না।

আইনবিশারদ যাঁহারা, রাষ্ট্রনীতি বিজ্ঞানের অধিকারি যাঁহারা, তাঁহারা বর্ত্তমান সংবিধানে রাষ্ট্রপতির কি ক্ষমতা বা দায়িত্ব আছে তাহার বিচার করুন। আমাদের সম্মুখে প্রশ্ন এই যে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন, দুর্ব্বলের রক্ষণ ও প্রবলকে শাসন এ কি এই পার্লামেণ্টারী শাসন ব্যবস্থায় হইতেছে? যদি না হয় তবে এই সংবিধানের মূল্য কি?

আরও এক প্রশ্ন এই যে প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীদল যদি বিভ্রান্ত, দুর্ব্বল বা ক্ষমতালোভী হইয়া পড়েন তবে তাঁহাদের সামলাইবে কে? ইহা নিশ্চিত যে দলভারী হওয়ার ফলে তাঁহাদের অনেকে জনসাধারণের বহু অপকার অতীতে করিয়াছেন এবং এখনও করিতে পারেন। এই ক্ষমতা কিছু খর্ব্ব হওয়া নিতান্তই প্রয়োজন।

এই যে সকল সমস্যা, পার্লামেণ্টারী প্রথায় শাসনতন্ত্রের গঠন, নিয়ন্ত্রণ ও চালনে দেখা যায়, তাহার মূল রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে দলবদ্ধভাবে প্রতিযোগিতা করার জন্য সঙ্ঘ গঠন, যাহার নাম "পার্টি সিস্টেম"। এই পার্টি সিস্টেমই যত নষ্টের মূল, যত অনর্থ ও অনাচারের উৎস। দলের লোকের খাঁই, অনুযোগ-অনুরোধ না মিটাইলে দল ভাঙ্গিয়া যায় এবং সেই সব পার্টিগত অন্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে আসে দুর্নীতি এবং শাসনতন্ত্রের অবনতি—যাহার বিষময় ফল আমরা সম্প্রতি দেখিলাম আসামের ব্যাপারে।

আসামে ন্যায়ধর্ম্ম অনুসারে অত্যাচারী দুর্বৃত্তদিগকে দমন করিলে এবং যথাযথভাবে এই ব্যাপারের তদন্ত করিয়া এই বর্ব্বরতার আরম্ভ কাহাদের প্ররোচনায়, তাহা নির্ণয় করিয়া তাহাদের শাস্তি দিলে, আসামের কংগ্রেস আগামী নির্ব্বাচনে হারিয়া যাইবে এই ভয়ে পণ্ডিত নেহেরুর মতো ব্যক্তিকেও ন্যায়নীতি বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য করা হইয়াছে, ইহাই পার্টি সিস্টেমের প্রকৃত পরিচয়।

এখন দুইটি প্রশ্ন আছে আমাদের সম্মুখে। প্রথম হইল রাষ্ট্রপতিকে মার্কিন প্রেসিডেণ্টের মতো ক্ষমতাপন্ন করিলে এবং সেই ক্ষমতার প্রভাবে রাজ্যপালদিগের বিশেষ ক্ষমতা দিলে তাহার ফলাফল কি হইবে—বিশেষতঃ পার্লামেণ্টারী আদর্শে গঠিত মন্ত্রীসভার অবস্থার কি পরিবর্ত্তন হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবেন আইন ও রাজনীতিবিশারদগণ এবং আংশিকভাবে দিতে পারে তাহারা যাহারা শাসনতন্ত্রের অবনতিতে এই ভাবে চরম দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। সেই দিক দিয়া এই প্রশ্ন মানবত্বের, আইনের নহে, রাষ্ট্রনীতির নহে, কূটনীতির বা সংবিধানের নহে। মনুষ্যত্বের যদি কোনই মূল্য না থাকে তবে সে সংবিধানেরই বা কি মূল্য ও গণতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্রেরই বা কি মূল্য? প্রধানমন্ত্রী মানবত্বের মূলে যে ন্যায়নীতি আছে তাহা বিসর্জ্জন যদি দিতে প্রস্তুত থাকেন তবে তাঁহাকে চেতনা দিবার ক্ষমতা কাহার!

দ্বিতীয় প্রশ্ন আজ আমাদের—অর্থাৎ অভাগা বঙ্গজননীর বিভ্রান্ত সন্তানদিগের সম্মুখে আসিয়াছে। আমাদের দেখা উচিত, বুঝা উচিত, চিন্তা করা উচিত, কি কারণে আমরা সমগ্র ভারতের কাছে এরূপ হেয়, এ প্রকার অবহেলার পাত্র হইয়াছি ও হইতেছি। পার্টি সিষ্টেম, দলাদলি, পৌরসভায়, বিধানসভায়, বিধান-পরিষদে লম্ফঝম্প, সোরগোল, মারপিট, হরতালে বিক্ষোভে আমরা অন্য প্রদেশের লোকের নিকট শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতেছি, না হাস্যাস্পদ হইয়া অবজ্ঞা অর্জ্জন করিতেছি?

কলিকাতার পার্শ্বে উপনগর

কিছুদিন পূর্ব্বে বিশ্ব ব্যাঙ্ক মিশন, তাঁহাদের তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার আলোচনায় মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, ভারতের এই পাঁচসালা পরিকল্পনাগুলিতে দেশের জনসাধারণের সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাস্থ্যের বিষয়ে কোনও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই। উদাহরণ-স্বরূপে তাঁহারা বলিয়াছেন যে, তৃতীয় পাঁচসালা পরি-কল্পনায় সমাজ-কল্যাণ বাবদ খরচ, সারা ভারতে, সর্ব্বশুদ্ধ, গড়ে প্রতি বৎসর ১৩০ কোটি টাকা মাত্র ধরা হইয়াছে। ইহা জাতীয় আয়ের (নেট উৎপাদন) শতকরা ০.৯ অংশ মাত্র—যাহা বিশ্ব ব্যাঙ্কের মতে জগতের অধিকাংশ দেশের তুলনায় অত্যন্ত কম। এই মন্তব্যের গোড়ায় কলিকাতা রক্ষার প্রসঙ্গ ছিল।

আর একটি বিশ্বজাগতিক প্রতিষ্ঠান, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই জাতীয় সমাজ-কল্যাণ সম্পর্কে নানা মন্তব্য করিয়াছেন—বিশেষ কলিকাতা শহরের দুরবস্থা ও তাহার প্রতিকারের বিষয়ে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্প্রতি এক নূতন পরিকল্পনা সম্পর্কিত একটি পুস্তিকা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা সদস্যদিগের মধ্যে বিলি করিয়াছেন। বিধানসভায় জনৈক কংগ্রেস সদস্যের এক বিশেষ প্রস্তাবে কলিকাতার নানা সমস্যা সমাধানের জন্য একটি নূতন পরিকল্পনা বিধানসভায় আলোচিত হইবে। ঐ পুস্তিকায় সেই পরিকল্পনার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাতে কলিকাতার উপকণ্ঠে একটি নূতন নগরের পত্তন এবং বর্ত্তমান কলি-কাতার উন্নয়ন সম্পর্কে নানা প্রস্তাবের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। সেই সঙ্গে বিশ্ব ব্যাঙ্ক মিশনের মন্তব্য ও সুপারিশগুলিও সংক্ষেপে দেওয়া হইয়াছে।

এই সকলের বিবরণ কলিকাতার সকল সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং আমরা অতি সংক্ষেপে ঐ নগর-পত্তন প্রস্তাবের মূল বিষয়বস্তু নীচে দিলাম, যাহা "আনন্দবাজার পত্রিকা" দিয়াছেন :

স্থান—কলিকাতার দক্ষিণে ডায়মণ্ডহারবার রোডের দুই পাশে ৮ নং মাইল পোস্ট হইতে ১৮ নং মাইল পোস্ট।

মোট এলাকা—৫৫ হাজার একর।

বসবাস—১৪ লক্ষ লোকের।

মোট ব্যয়—২২০ কোটি টাকা।

আবাসিক এলাকা—১৫ হাজার একর।

শিল্প এলাকা—২,৫০০ একর।

খেলার মাঠ ইত্যাদি—৩ হাজার একর।

সড়ক—৮ হাজার একর।

উদ্বাস্তু ও গৃহহারাদের জন্য—দেড় লক্ষ বাড়ী ও ফ্লাট।

মধ্য আয়ের লোকের জন্য বাড়ী—৪৫ হাজার।

নিম্ন আয়ের লোকের জন্য বাড়ী—৪৫ হাজার।

জমি বিভাগ তপশীল

		আয়তন
(১) আবাসিক অঞ্চল		১৫ হাজার একর
(২) শিল্পাঞ্চল		২৫ শত একর
(৩) নাগরিক সুখ-সুবিধার জন্য মধ্যাঞ্চলে সংরক্ষিত		১৫ শত একর
(৪) সরকারী ও ব্যবসায় অঞ্চল		২ হাজার একর
(৫) বহির্বেষ্টনী		
(ক) খনন-অঞ্চল		৯ হাজার একর
(খ) সবুজ মাঠ		১০ হাজার একর
(গ) বনভূমি	২ হাজার একর	১৪ হাজার একর
(ঘ) কৃষি খামার	২ হাজার একর	
(৬) খেলার মাঠ প্রভৃতি		৩ হাজার একর
(৭) রাস্তা		৮ হাজার একর
মোট		৫৫ হাজার একর

বিশ্ব ব্যাঙ্ক মিশনের যে রিপোর্টের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই কলিকাতা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের পরি-কল্পনা গঠিত হইয়াছে তাহাতে কলিকাতার সমস্যাবলীর এক বিবরণ দিয়া বলা হইয়াছে যে, ভারতের যে অঞ্চলে কল-কারখানা ও শিল্প উদ্যোগ সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুত গতিতে গঠিত হইতেছে, সেখানে তাহার প্রসার ও প্রতিষ্ঠার প্রধান অন্তরায় দাঁড়াইয়াছে কলিকাতার নিজস্ব সমস্যা-বলীর সমাধানে সরকারী অবহেলা। অন্ততঃ উক্ত মিশনের ধারণা তাই। মিশন বলেন, বৃহত্তর কলিকাতার জনসংখ্যা কমপক্ষে ষাট লক্ষ—যেখানে ১৯৪৮ সনে ছিল ৩৫ লক্ষ। বর্ত্তমানে প্রায় ৮ লক্ষ উদ্বাস্তু এই অঞ্চলে আছে। ভারতের নানা অঞ্চল হইতে শ্রমিকের দল কলিকাতায় আসে এবং এখানের অসংখ্য প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম্মের অনেকাংশই পশ্চিমবঙ্গের বাহির হইতে আগত শ্রমিক ও কর্ম্মীরা পাইয়াছে। শিল্প পরিবহন ইত্যাদি সকল ব্যাপারেই ঐ অবস্থা। উদাহরণস্বরূপে মিশন বলেন, কলিকাতা বন্দরের ডক অঞ্চলের শ্রমিক-দিগের মধ্যে ছয় ভাগের এক ভাগ মাত্র বাঙ্গালী। কলিকাতার ছাত্রগণ, সারা ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সংখ্যায় অধিক এবং নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য কুখ্যাত। শিক্ষিত বেকারের সংখ্যায়ও কলিকাতা নিশ্চয়ই অন্য সকল শহরকে দূরে ছাড়াইয়া গিয়াছে।

অত্যধিক ঘনবসতি, ঘরবাড়ীর দুরবস্থা ও অভাব, স্বাস্থ্যরক্ষায় নানা প্রতিবন্ধক এবং অন্য বহু কারণে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠানের সাধ্য নাই যে, উহা এই অসংখ্য ও অতি বৃহৎ সমস্যার প্রতিবিধান করে। উহার আয় মাত্র সাড়ে আট কোটি টাকায় সীমাবদ্ধ। বোম্বাই নগর হিসাবে কলিকাতা অপেক্ষা যদিও ছোট কিন্তু তাহার আয় অনেক অধিক।

মিশনের মতে ঐ সকল দুর্ব্বহ সমস্যার প্রতিকারের জন্য সরকারকে ব্যাপকভাবে নূতন ক্ষমতা ও অধিকার গ্রহণ করিতে হইবে যাহাতে আইনকানুনের কার্য্যগতি দ্রুত হয় এবং ব্যক্তিগত স্বত্ব-উপস্বত্বের দৃঢ়বদ্ধ প্রাকার ভেদ করিয়া এই সকল সমস্যার সমাধান সহজ হয়। বস্তী পরিষ্কার ও বাসগৃহের নির্ম্মাণ ও প্রসার, মিশনের মতে এখনই আরম্ভ করা যাইতে পারে, কেননা সাড়ে তিন বর্গমাইল নোনাজলা অঞ্চল বাসোপযোগী করার পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই করা হইয়াছে, যেখানে ৫০,০০০ হইতে ১,০০,০০০ পরিবারের বসতি গঠিত হইতে পারে।

কলিকাতার গঙ্গা ক্রমে মজিয়া যাওয়ায় এদেশে যে বিষম সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে এবং যেভাবে কলিকাতা বন্দরের দ্রুত অবনতি চলিতেছে তাহার বিশদ আলোচনার পর মিশন ভারত সরকারের জনকল্যাণ বিষয়ে খরচের কার্পণ্যের কথা বলেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও কলিকাতার স্বাস্থ্য-সমস্যার বিষয় আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, কলিকাতার জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও প্রসার এখন চলিবে এবং কলিকাতায় বাহির হইতে আগতের সংখ্যাও বাড়িয়াই চলিবে।

এই সকল আলোচনার ফলেই এই নূতন উপনগর গঠনের প্রস্তাব আসিয়াছে। এবং আশা করা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় এই পরিকল্পনাটি সম্যক্‌ভাবে আলোচিত হইবে। পশ্চিমবঙ্গের এই বর্ত্তমান দুর্দ্দশা ও অবনতির প্রধান কারণ এই যে, প্রত্যেকটি বিষয় প্রত্যেকটি সমস্যার বিচারে ও আলোচনায়, কি বিধানসভায় ও পরিষদে, কি সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়, কেবলমাত্র দলীয়-স্বার্থের দৃষ্টিকোণেই সবকিছু দেখা হয়। এক্ষেত্রেও তাহাই হইলে ঐ ২২০ কোটি টাকা—অন্ততঃ ৭৫ কোটি টাকা—জনসাধারণের অর্থাৎ দেশের ও দশের কোনোও উপকারে লাগিবে না।

প্রথমে দেখা যাউক কাহাদের জন্য এই পরিকল্পনা, তাহাদের প্রয়োজনই বা কি এবং সে প্রয়োজন মিটাইবার জন্য তাহাদের ক্ষমতা অনুযায়ী ব্যবস্থাই বা কি প্রয়োজন।

বিশ্ব ব্যাঙ্ক মিশন যাহা বলিয়াছেন তাহার সহিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মন্তব্য যুক্ত করিলে বুঝা যায় যে, কলিকাতার ঘনবসতি অঞ্চলের দরিদ্র, নিম্ন আয়ের লোক ও মধ্যবিত্তের জন্য স্বল্প খরচের ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে স্থিত বাসগৃহের ব্যবস্থাই সর্ব্বপ্রথমে প্রার্থনীয় এবং সেই সঙ্গে প্রয়োজন নূতন উপনগরের ১৪ লক্ষ লোকের জীবনযাত্রার পথ সুগম করার জন্য উন্নত মানের ব্যবস্থা, অর্থাৎ কিনা শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা, যানবাহন, জল-বিদ্যুৎ, হাসপাতাল, খেলা-ধূলার জন্য প্রশস্ত ক্রীড়াভূমি, জল ও ময়লা নিকাশ ইত্যাদির জন্য, আধুনিক নগর গঠনের নিয়ম আনুযায়িক ব্যবস্থা। উপরোক্ত দুই সংস্থার মতে ষাট লক্ষ লোকের বসবাসের জন্য বাসগৃহ, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ যানবাহনের ব্যবস্থা ইত্যাদি বৃহত্তর কলিকাতায় যাহা আছে তাহা অতি জঘন্য এবং এই কারণেই এখানের বাসিন্দাদিগের মধ্যে এত বিক্ষোভ ও দুরবস্থা। নূতন উপনগরে যদি যথাযথ ব্যবস্থা হয় তবে সেখানে বেশ কিছু লোক চলিয়া যাইবে এবং কলিকাতায় ভীড় কমিয়া যাইলে এখানেরও পরিবেশ স্বাস্থ্যকর ও সন্তোষজনক করা যাইতে পারে।

কিন্তু যাহারা নিকৃষ্ট বাসগৃহে বা বস্তিতে ভীড় করিয়া থাকে তাহাদের আয় ও সংস্থানে কুলাইলে তবে তো তাহারা দূরে চলিয়া যাইবে। বাঙালী মধ্যবিত্ত, নিম্ন-আয়ের গৃহস্থ ও বস্তি অঞ্চলের বাসিন্দা ইহারা বাড়ী ভাড়া দিয়া ও ট্রেন বা বাস ভাড়া দিয়া ঐ উপনগর হইতে কলিকাতার কর্ম্মস্থলে তখনি আসিতে পারিবে যদি তাহাদের আয়-ব্যয়ের অনুপাত বর্ত্তমানের তুলনায় ঐ সময়ে অন্ততঃপক্ষে সমানই থাকে, অধিক দাঁড়ায় না। নিম্ন-আয়ের বা মধ্যবিত্ত অবস্থার গৃহস্থের নিজস্ব গৃহনির্ম্মাণ তখনই সম্ভব হইবে যখন তাহাদের সংস্থান আনুযায়িক কিস্তিবন্দী ব্যবস্থায় গৃহনির্ম্মাণের যথাযথ ব্যবস্থা—যেরূপ বিদেশে হয়—করা হইবে। না হইলে এই পরিকল্পনায় বাঙালী অল্প আয়ের বা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে আকাশ-কুসুমেই পরিণতি প্রাপ্ত হইবে।

বাঙালী অবস্থাপন্ন গৃহস্থ দ্রুত মধ্যবিত্তে পরিণত হইতেছে এবং মধ্যবিত্তের তো উচ্ছেদই হইয়া চলিতেছে। ইহার প্রধান কারণ বাঙালীর ঘরের শত্রু সগোষ্ঠী বিভীষণ এবং বিদেশী সরকার। বিদেশী সরকার বলিতেছি এই কারণে যে, নয়াদিল্লীয় সরকার যদি বাঙালীর কাছে বিদেশী নহেন, তবে বিদেশী কি পদার্থ তাহা বাঙালী জানে না।

সর্ব্বশেষে বলি পৌর-প্রতিষ্ঠানের কথা। কলিকাতার উপনগরের পৌর-প্রতিষ্ঠানও কি এখানের ছাঁচেই ঢালাই

করা সামগ্রী হইবেন? যদি তাই হয় তবে যে সেই উপনগরও অল্প দিনের মধ্যে নরককুণ্ডে পরিণত হইবে সে বিষয়ে কি সন্দেহ আছে?

উপনগরে কি হইবে জানি না, কিন্তু কলিকাতায় পৌর-প্রতিষ্ঠানের কার্য্যপ্রকরণ যে ভাবে চলে তাহাতে সরকারী দপ্তর ও বিধান-সভা ও পরিষদ সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন, কিন্তু সাধারণ নাগরিকদিগের দুর্দ্দশার অন্ত নাই। কলিকাতার উন্নয়নের জন্য সর্ব্বপ্রথমে দৃষ্টি দেওয়া উচিত এই দিকে।

রেলপথে পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানের যোগাযোগ

ভারতবর্ষের মধ্য দিয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানের রেলপথের যোগাযোগের ব্যবস্থা বোধ হয় পাকা হইতে চলিয়াছে। কারণ, পাকিস্থানের রেলওয়ে মন্ত্রী মিঃ এফ. এম. খান করাচীতে সাংবাদিকদের নিকট বলিয়াছেন যে, আগামী ১লা এপ্রিল হইতে পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানের মধ্যে ভারতবর্ষের ভিতর দিয়া সরাসরি রেলপথে যাতায়াত করা যাইবে। এই সমস্ত 'থ্রু সার্ভিস' ট্রেনের বিস্তৃত বিষয় সম্পর্কে শীঘ্রই সরকারী ঘোষণা বাহির হইবে। ঢাকা-করাচী রেলপথের সরাসরি যোগাযোগ বিষয়ে ভারতীয় লোকসভায়ও প্রশ্ন উঠিয়াছিল এবং তখন আমাদের সরকারপক্ষও স্বীকার করিয়াছিলেন যে, পারস্পরিক যাতায়াতের সুবিধার ভিত্তিতে একটি চুক্তি হইয়াছে। তবে এখনও বিস্তৃত খুঁটিনাটি সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত মীমাংসা হয় নাই। কিন্তু করাচীর সংবাদ দেখিয়া মনে হইতেছে যে, পূর্ব্ব পাকিস্থানের মধ্য দিয়া পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের সরাসরি রেল-সংযোগের বিনিময়ে ঢাকা-করাচী রেল যোগাযোগের চুক্তি সম্পন্ন হইয়াছে।

অনেক দিন পূর্ব্বে জিন্না এই করিডোর চাহিয়াছিলেন, দেখিতেছি সেই করিডোরই ইহারা ধীরে ধীরে আদায় করিয়া লইতেছে। যদিও নেহরু আশ্বাস দিয়াছেন, এখানে করিডোরের কোন প্রশ্ন নাই। কিন্তু পাক-ভারত সম্পর্কের জটিলতার দিকে তাকাইয়া এই প্রকার সরাসরি রেলওয়ে যোগাযোগের চুক্তিটা কল্যাণকর এবং আশঙ্কার উর্দ্ধে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহই থাকিয়া যাইতেছে।

আন্দামানে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আন্দামান একটি স্মরণীয় নাম। সেই মহান ইতিহাসের স্মৃতি-বিজড়িত বলিয়া ইহার নূতন নামকরণ হইয়াছে 'সুভাষ দ্বীপ'। এই সুভাষ দ্বীপেই এ বৎসর হইল বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন। গত ১৮ই নবেম্বর হইতে ২৩শে নবেম্বর পর্য্যন্ত ছয়দিন সুভাষ দ্বীপের বিভিন্ন স্থানে রবীন্দ্র জন্ম শত-বার্ষিকী উৎসব ও বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন সম্পর্কে কয়েকটি অনুষ্ঠান বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে সম্পন্ন হইয়াছে।

এই উপলক্ষ্যে বহু কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, চিত্রকর ও সাহিত্যানুরাগীর সমাগম হয়। ১৯শে অপরাহ্নে অতুল স্মৃতিভবনে স্থানীয় চীফ কমিশনারের পত্নী শ্রীমতী রাঙ্গওয়াড়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে সম্মেলনের পতাকা উত্তোলন করেন। রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উৎসবের স্মারক হিসাবে কলিকাতা হইতে আনা হইয়াছিল বট ও ছাতিম গাছের দুটি চারা। প্রখ্যাতা কবি শ্রীমতী রাধারাণী দেবী ঐ ভবনের প্রাঙ্গণে চারা দুটি রোপণ করেন। রাধারাণী বৃক্ষ রোপণের তাৎপর্য্য ও রবীন্দ্রনাথের আদর্শ ব্যাখ্যা করিয়া একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের স্থায়ী সভাপতি ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি এবং বিভিন্ন ভাষার সহিত তাহার যোগসূত্র বিশ্লেষণ করিয়া ইংরাজীতে একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা করেন।

ইঁহাদের আগমনে এই ক্ষুদ্র দ্বীপটি কয়েকদিনের জন্য উৎসব-মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। আন্দামানের ইতিহাসে এক নবজীবনের সূচনা বলিয়া স্থানীয় অধিবাসীরা মত প্রকাশ করেন। এই দিক দিয়া, সাহিত্য সম্মেলনের কর্তৃপক্ষের স্থান নির্ব্বাচন যে সার্থক হইয়াছে ইহা বলা চলে।

শিশুরক্ষার ব্যবস্থা

দেখিতেছি, দেশের কয়েকটি অঞ্চলে শিশুদের সম্পর্কে সরকার এতদিনে এক প্রকারের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। শুধু কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলগুলিতে অবহেলিত ও অপরাধপ্রবণ বালক-বালিকাদিগের শিক্ষা, রক্ষা, ভরণপোষণ ও পুনর্ব্বাসনের জন্য ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়নের উদ্যোগ অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে। যুক্তকমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী 'শিশুরক্ষা বিল' রাজ্যসভায় অনুমোদিত হইয়াছে। শিক্ষামন্ত্রী ডঃ শ্রীমালি বলিয়াছেন যে, বিলে যে-সকল ব্যবস্থা ও কর্ত্তব্য বিহিত করা হইয়াছে সেগুলি শিক্ষামূলক, শাস্তিমূলক নহে। তথাপি সেগুলি বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার ব্যাপারে নানা অসুবিধা দেখা দিতে পারে বলিয়া তিনি মনে করেন। এই ধারণার ভিত্তি আছে বলিয়া আমরাও মনে করি। এমন

হইতে পারে যে, প্রশাসনের আচরণের ভুলে শিশুরক্ষা নামক মানবতার কর্ত্তব্যটিও জনসাধারণের পারিবারিক জীবনে হস্তক্ষেপের ব্যাপারের মতো হইয়া উঠিতে পারে। এ বিষয়ে প্রশাসনের পক্ষে বিশেষ সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইবার প্রয়োজন দেখা দিবে।

শিশু হইল রাষ্ট্রের সম্পদ, এই আদর্শোচিত নীতির অর্থ ইহা নহে যে, শিশুর মালিকও রাষ্ট্র। প্রশাসনকে এক্ষেত্রে প্রধানতঃ শিক্ষা ও সেবার সংস্থা হিসাবে কাজ করিতে হইবে। বিলটিতে বস্তুতঃ প্রথম পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টার ব্যাপার বলিয়া মনে করা উচিত। কারণ শিশু-রক্ষা সম্বন্ধে সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের ইহাই প্রথম প্রচেষ্টা। এবং কার্য্যক্ষেত্রে কিছুকালের অভিজ্ঞতা লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত ব্যবস্থার ভাল-মন্দ সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা লাভ করা সম্ভব হইবে না। প্রশাসনের পক্ষেও ইহা অভিনব প্রকারের কর্ত্তব্যের ব্যাপার বলিয়া বোধ হইবে। সুতরাং সেক্ষেত্রেই বেশী ভুল ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। মনে হয় ইহার জন্য প্রশাসনেও একটি বিশেষ বিভাগ স্থাপন করা প্রয়োজন, যাহা ট্রেনিংপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা গঠিত হইবে।

নেহেরুর কথার মূল্য

৫ই ডিসেম্বর তারিখে লোকসভায় পণ্ডিত নেহেরু যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, সে সকল কথাই তিনি খুব নিরপেক্ষতা ও বাধ্য হইয়া অপ্রিয় কার্য্য করার ভাব দেখাইয়া উচ্চারণ করেন। "আমি চাই না যে, এই সসাগরা বসুন্ধরাতে কেউ বলিতে পারে যে, আমরা ভারতীয়েরা নিজেদের কথা রাখি না। আমাদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতেই হইবে।" "বেরুবাড়ীর ৬,০০০ হাজার লোকের প্রতি আমাদের প্রচণ্ড সহানুভূতি আছে। এদের মধ্যে প্রায় ৪,০০০ লোক একবার উদ্বাস্তু হইয়া ঐখানে আসিয়া ঘর পাতিয়াছেন; কিন্তু তাঁরা হয় ত পুনর্ব্বার উদ্বাস্তু হইবেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের প্রয়োজন হইলে পূর্ণ সাহায্যদান করিবেন।" তিনি আরও বলেন, যে "চীফ সেক্রেটারী ও তাঁহার অন্যান্য সাহায্যকারীগণ আমার (নূনের সহিত) কথাবার্ত্তার সময় বরাবর উপস্থিত ছিলেন এবং আমাদের কথায় অনুচ্চারিত (?) সম্মতিদান করিয়াছিলেন। এমনকি বলা যায় যে, এই বন্দোবস্ত তাঁহাদের সহায়তা লইয়াই করা হইয়াছিল।" "পরে যে সকল পত্রাদি পশ্চিম বাংলা গবর্ণমেণ্টের সহিত বিনিময় হয় তাহাতেও দেখা যায় যে, আমাদের বেরুবাড়ী সংক্রান্ত ব্যবস্থাতে তাঁহাদিগের বিশেষ কোন আপত্তি ছিল না।" "আমরা জানি পশ্চিম বাংলার জনসাধারণ এই অদল-বদল চান না; পশ্চিম বাংলা গবর্ণমেণ্ট এই ব্যবস্থা পছন্দ করেন না; লোকসভায় পশ্চিম বাংলার সভ্যরাও এ ব্যবস্থা চান না। আমরা এ সব কথা পূর্ণ-রূপে উপলব্ধি করিয়াছি। কিন্তু এই জাতীয় ব্যবস্থা করিতে হইলে অনেক কিছু অপ্রিয় ব্যাপার মানিয়া লইতে হয়।"

উদ্ধৃত কথাগুলি হইতে এই কয়টি বিষয় পরিষ্কার বুঝা যায়:

১। পণ্ডিত নেহেরু, তাঁহার পার্টি ও গবর্ণমেণ্ট কথার ও অঙ্গীকারের স্থান সবকিছুর উপরে ধার্য্য করেন। অর্থাৎ তাঁহারা কদাপি কথার খেলাপ করেন না।

২। তাঁহাদের বেরুবাড়ীর গরীব উদ্বাস্তু ও হবু-উদ্বাস্তুদের প্রতি প্রচণ্ড সহানুভূতি আছে।

৩। তাঁহার কথাবার্ত্তা ও বিলিব্যবস্থার সময় বাংলার চীফ সেক্রেটারী ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা সর্ব্বক্ষণ উপস্থিত ছিলেন এবং সকল কথায় সায় দিয়াছিলেন।

৪। তিনি বাংলার জনসাধারণের এ বিষয়ে কি মত ও কি মনোভাব তাহা পূর্ণরূপেই জানেন; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই কার্য্য তাঁহাকে প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য করিতে বাধ্য হইতে হইতেছে।

প্রথম কথাটি সত্য কিনা দেখা যাউক। পণ্ডিত নেহেরু ও কংগ্রেস বাংলা দেশ সম্বন্ধে চিরকালই কথার খেলাপ করিয়া থাকেন। বাংলার যে সকল জেলা বিহার ও অপরাপর প্রদেশের সহিত ব্রিটিশ রাজারা যুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন সেই সকল জেলা বাংলাতে পুনঃ সংযুক্ত করার জন্য কংগ্রেস ব্রিটিশ আমলে বহুবার মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সকল পূর্ব্বেকার বাংলা দেশের অংশগুলি ছিনাইয়া লইয়া সেখানকার বাসিন্দা-দিগকে জোর করিয়া হিন্দি শিক্ষা করিতে বাধ্য করা ও তাহাদের জমি-জমাতে ভোজপুরীদিগকে আমদানি করিয়া বসান যে অন্যায়, সে কথা পণ্ডিত নেহেরু ও তাঁহার অপরাপর হিন্দিভাষী বন্ধুরা উত্তমরূপে জানেন। তাহা সত্ত্বেও ঐ সকল জেলা এখনও বাংলায় সংযুক্ত হয় নাই এবং পণ্ডিত নেহেরু বহু সুবিধা থাকিলেও শুধু স্বদেশের জমি অপর দেশকে দান করিয়া বা অপরকে জোর করিয়া দখল করিতে দিয়া এবং দেশের ভিতরে সত্যমিথ্যা অগ্রাহ্য করিয়া "হিন্দি-ভারতের" পরিমাপ বৃদ্ধির চেষ্টা করা ব্যতীত অপর কোনোভাবে প্রতিজ্ঞা, ন্যায় বা সত্যরক্ষা করিবার কোনো চেষ্টা কখনও করেন নাই। কংগ্রেস ও পণ্ডিত নেহেরুর প্রতিজ্ঞা রক্ষার কথা

শুধু বিদেশীদের বেলাতে উঠে। দেশের ভিতরে তাহার কোনো পরিচয় কেহ পায় না। তিনি যেভাবে চীনকে আমাদের দেশ দখল করিতে দিয়াছেন ও তৎপরে চীনের সহিত "প্রতিজ্ঞা ও কথা" রক্ষার খাতিরে নিজ দেশ পুনরাধিকার করিতে (ভীতভাবে) অনিচ্ছা দেখাইয়াছেন, তাহাতে প্রমাণ হয় যে, তাঁহার সত্যমিথ্যা অঙ্গীকার, প্রতিজ্ঞা রক্ষা ইত্যাদি শুধু লোভ ও ভয়ের দ্বারাই নির্দ্ধারিত হয়। "হিন্দি-ভারত" গড়িবার লোভে তিনি অপর সকল দেশ ও ভাষার অবমাননাতে কোনো শোক অনুভব করেন না। এমনকি মতলব করিয়া আসামে বাঙ্গালী ও বাংলাকে খর্ব্ব করিয়া নিজের দলের চক্রান্তের সহায়তা করেন। সুতরাং বেরুবাড়ী লইয়া তাঁহার যে প্রতিজ্ঞা পালনের প্রেরণা; তাহা সম্পূর্ণ পাকিস্থানকে খুশী রাখার চেষ্টা মাত্র। যে প্রতিজ্ঞা করিবার তাঁহার কোনো ন্যায়তঃ অধিকার ছিল না। সে প্রতিজ্ঞা পালন করারও তাঁহার কোনো কথা উঠে না। নেহেরু ও নুন উভয়েই জানিতেন যে, তাঁহাদের পরস্পরের দেশ ভাগ-বাটোয়ারা করিবার কোনো অধিকার আইনতঃ ছিল না। সে ক্ষেত্রে তাঁহাদের কথাবার্ত্তা বেআইনী ছিল, সুরু হইতেই। এবং সে জল্পনা-কল্পনা বিলিব্যবস্থা সম্পূর্ণই নাকচ করিয়া দেওয়া আইনসাপেক্ষ ও সাধারণতন্ত্রের সংরক্ষণের দিক হইতে অবশ্য প্রয়োজন।

দ্বিতীয় কথাটি অর্থাৎ তাঁহার বেরুবাড়ীর লোকেদের সম্বন্ধে সহানুভূতি পুরাপুরি অভিনয়। তাঁহার বাংলা বা বাঙ্গালীর প্রতি কোনো সহানুভূতি কোনোদিন ছিল না এবং এখনও নাই। তিনি রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিয়া স্বদেশে ও বিদেশে নিজের সুবিধা করিয়া লইবার চেষ্টা করেন মাত্র। "হিন্দি-ভারতে" যদি শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, গুরু নানক, ছত্রপতি শিবাজী, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, রামন, তিলক, গোখলে, সুরেন্দ্রনাথ, লাজপত রায়, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে পণ্ডিত নেহেরুর কোনো বাঙ্গালী বা মহারাষ্ট্রীয়ের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিতে হইত না।

তৃতীয় ও চতুর্থ পর্য্যায়ের কথাগুলি তাঁহার বিলি-ব্যবস্থা আইনত গ্রাহ্য প্রমাণ করে না; বরং তিনি যে জনমত উপেক্ষা করিয়া গায়ের জোরে নিজের মত চালাইয়া থাকেন সেই কথাই প্রমাণ হয়। বেরুবাড়ী অথবা অপরাপর দেশ বিনিময়ের ব্যবস্থা সবই বে-আইনী। এবং পণ্ডিত নেহেরুর প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইলেও বে-আইনী কাজ আইনত শুদ্ধ হইয়া যাইবে না। অ

মিথ্যার জয়

আসামের মন্ত্রী ফখরুদ্দিনের নির্লজ্জ মিথ্যার সাহায্যে আসামের "রাষ্ট্রীয়" চোর, ডাকাত, খুনে, লুঠেড়া, নারী-ধর্ষক প্রভৃতির পরোক্ষভাবে সাফাই গাহিবার চেষ্টাতে আমাদের মনে হইল, জগতবাসী অথবা নিজেদের আত্ম-প্রবঞ্চনার জন্য কংগ্রেস দলের "সত্যমেব জয়তে" ও অশোকের ধর্ম্মচক্রের ব্যবহারের কথা। এই "সত্য" ও "ধর্ম্ম" নিষ্ঠার ইতিহাসের আরম্ভ হইল মুসলিম লীগের সহিত মিলিত হইয়া কংগ্রেসের ভারত খণ্ডন-বণ্টনের সময় হইতে। সেই সময় কংগ্রেস ভারতের জনসাধারণের প্রতিনিধি সাজিয়া ব্রিটিশের নিকট হইতে খণ্ডিত ভারত শাসনের ভার গ্রহণ করিয়াছিল রাজত্ব করিবার আগ্রহে। সত্য প্রতিনিধি ভারতের জনসাধারণের কেহই ছিল না। মুসলিম লীগ কিছুসংখ্যক গুণ্ডা ও ব্রিটিশের গুপ্তচর দিয়া গঠিত ছিল এবং কংগ্রেস ছিল, দেশভক্ত দুই চার ব্যক্তির চতুর্দ্দিকে যে সকল চাটুকার, নিকর্ম্মা অনুচর ও অপর নেতৃত্ব অভিলাষী ব্যক্তি ঘুরিত, তাহাদের দ্বারা গঠিত। অবশ্য ব্রিটিশ রাজত্বের সময় ভারতের জনসাধারণের কোনো মত বা অধিকার গ্রাহ্য ছিল না এবং সেই দিক হইতে দেখিলে যে কংগ্রেস-রাজ ভারতে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্ত্তিত হইল, তাহা জনমতে নির্ভরতার দিক হইতে ব্রিটিশ-রাজ অপেক্ষা নিকৃষ্ট না হইতেও পারিত, যদি না কংগ্রেস রাজত্ব করার আগ্রহে ভারত খণ্ডনে মত দিতেন ও পরে ভারতের সর্ব্বত্র ভিন্ন ভিন্ন "রাজ্যের" সৃষ্টি করিয়া তত্রস্থ ধর্ম্মজ্ঞানহীন অর্দ্ধশিক্ষিত লোকেদের রাষ্ট্রীয় নির্ব্বা-চনের অভিনয় করিয়া সেই সেই দেশের হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতা করিয়া রাজ্য শাসনের সিংহাসনে বসাইয়া দিতেন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে যে সকল মিথ্যা প্রচার করিয়া মুসলিম লীগ নিজের ভিন্ন রাজ্য দাবী করে। সেগুলির মধ্যে মুসলিম ও হিন্দু এই দুই জাতি কথাটা সর্ব্বাপেক্ষা বড় মিথ্যা ছিল। ভাষা, সভ্যতা, খাদ্য, বস্ত্র, আচার-ব্যবহার সকল দিক হইতে হিন্দু মুসলমান ভারতের এক এক অঞ্চলে প্রায়ই একই সমাজের অঙ্গ হিসাবে বাস করিত। ভারতের সর্ব্বদেশের মুসলমান এক জাতির অন্তর্গত এ কথাটা পুরাপুরি মিথ্যা ছিল ও এখনও মিথ্যাই আছে। ভারতের সকল মুসলমানের এক জাতীয় ভাষা উর্দ্দু এ কথাটাও মিথ্যাই ছিল ও এখন তাহা পাকিস্থানের আইনে প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। কারণ এখন পাকিস্থান মানিয়া লইয়াছে যে, বাংলা ও উর্দ্দু এই দুই ভাষা পাকিস্থানের জাতীয় ভাষা। কংগ্রেসী ভারতের অধিকাংশ লোকই কংগ্রেসের সভ্য কখনও ছিল

না, এখনও নাই। কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধীর নাম ভাঙ্গাইয়া ভারতে একটা প্রতিপত্তি গড়িয়া তুলিয়াছে, যে প্রতিপত্তির বর্ত্তমানের কোন অর্থ নাই। কারণ গান্ধীর আদর্শে কংগ্রেস চলিতেছে না। কংগ্রেসের অধিকাংশ সভ্য ও অনুচরগণ বিভিন্ন অন্যায় ও অধর্ম্মের সাহায্যে ঐশ্বর্য্যশালী হইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। কোনো সত্য আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া কংগ্রেস চলে না। নিজেদের সুবিধার জন্য কংগ্রেস দলের লোকেরা সর্ব্বপ্রকার মিথ্যা অবাধে প্রচার করিয়া থাকে। যথা আসামের ভাষা ও বিভিন্ন ভাষাভাষী জনসংখ্যা লইয়া আসাম কংগ্রেসের লোকেরা অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া মিথ্যা বলার একটা নূতন ঊর্দ্ধ-সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছে। বিহার কংগ্রেস হিন্দীকে বিহারের মাতৃভাষা নির্দ্ধারিত করিয়া বিহারের মৈথিলি, মাগধি, অর্দ্ধমাগধি ও ভোজপুরি ভাষাগুলির সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। আদিবাসী ও বাঙালীরা বিহারে কি অবস্থায় আছে সে কথার আলোচনা করিলে বিহার কংগ্রেসের মিথ্যার আশ্রয়ে স্বার্থসিদ্ধির কথা আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝা যায়। বর্ত্তমানে অপরাপর প্রদেশের কংগ্রেস নেতাগণ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অকাতরে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন। চাকরি, ব্যবসা, অনধিকার-চর্চ্চা, সুপারিশ, চাঁদা আদায়, দেশসেবার অভিনয় ইত্যাদি বহু ক্ষেত্রে সেই মিথ্যা বিভিন্নরূপে দেখা দেয়। দেশের রাষ্ট্র ও সমাজে মিথ্যার প্রভাব খুবই জোরাল। শুধু সত্যের জয় হইবে, ইহা বলাও কংগ্রেসের একটা মিথ্যার অভিনয় মাত্র। অ

কর্দ্দম-চিকিৎসা

কয়েক ধরনের গ্রন্থির ও পেশীর ব্যাধি সারাইবার জন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কতকগুলি বিশেষ স্থানের কাদার প্রলেপ লাগানোর রীতি সকল দেশেই দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। এই সব বিশেষ বিশেষ স্থানের কাদার সহিত যেসব বিশেষ ধরনের খনিজ ও জৈব-রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত থাকে, সেগুলিই ঐ সব রোগ নিরাময়ে সহায়তা করে। এই কর্দ্দম-চিকিৎসা ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই দেখা যায়।

ক্রিমিয়ায় কৃষ্ণসাগরের পশ্চিম উপকূলে ইওপাতোরিয়া শহরটি হইতে মাইল দুই দূরে মৈনাক নামে যে হ্রদটি আছে, সেই হ্রদের কাদার রোগ-নিরাময়গুণের খ্যাতি সুদূরপ্রসারী। এই হ্রদ এক সময়ে সমুদ্রেরই অঙ্গ ছিল। কালক্রমে এই ক্ষুদ্র উপসাগরের প্রণালী-পথটা বুজিয়া গিয়া এই হ্রদের সৃষ্টি হয়। এই মৈনাক হ্রদের জল সমুদ্রের জল অপেক্ষা অনেক বেশী ঘন। এত ঘন যে, সাঁতার না কাটিয়াও অনায়াসেই জলের উপর ভাসিয়া থাকা যায়। এই হ্রদের জলে এবং কাদায় মিশানো আছে প্রচুর পরিমাণে বিবিধ খনিজ-লবণ। প্রধানতঃ সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং পটেশিয়াম ও ম্যাগনেশিয়ামের ব্রোমেট ও সালফেট, সোডিয়াম আইওডেট ইত্যাদি। কয়েক ধরনের জৈব রাসায়নিক পদার্থও এই হ্রদের জলে ও কাদায় প্রচুর পরিমাণে আছে। অগভীর জলের নীচে নীলাভ-কালো রঙের কাদা তৈলাক্ত আর চটচটে, হাইড্রোজেন সাল-ফেটের কড়া গন্ধ পাওয়া যায়। বিশেষ করিয়া পুরাতন বাতরোগ সারাইবার পক্ষে এই কাদা খুব উপকারী।

সম্প্রতি সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট এইসব রোগীর সুবিধার জন্য কয়েক লক্ষ রুবল খরচ করিয়া এখানে এক বিরাট স্বাস্থ্যনিবাস তৈয়ারি করিয়াছেন। এই স্বাস্থ্যনিবাসে এখন দৈনিক তিন হাজার লোকের কর্দ্দম-চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। এই হ্রদের ধারে ৩৬টি স্নানাগারও প্রস্তুত করা হইয়াছে। যাহাদের পক্ষে হ্রদের ধারে যাওয়া সম্ভব নয়, তাহারা এই স্বাস্থ্যনিবাসেই বসিয়া কর্দ্দম-স্নানের সুযোগ পাইতে পারে। হ্রদের তীর হইতে স্বাস্থ্যনিবাস পর্য্যন্ত ছোট একটা রেললাইন পাতা হইয়াছে কাদা আনিবার জন্য। ৫০টি বৈদ্যুতিক চুল্লীতে প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর এক টন কাদা গরম করা হয়। সেই উষ্ণ কাদার প্রলেপ দিবার জন্য প্রায় চারিশত পুরুষ ও নারী নার্স নিযুক্ত আছে।

সেই সঙ্গে মৈনাক হ্রদের জল ও কাদা লইয়া ব্যাপক রাসায়নিক ও চিকিৎসার গবেষণার কাজ চলিতেছে। দেখা গিয়াছে, এই কাদার অ্যাণ্টিবায়োটিক গুণও বড় কম নয়। ইহার মধ্যে নানারকম তেজস্ক্রিয় ও হর্ম্মোনপুষ্টিকর পদার্থ মিশ্রিত আছে। ফলে এই কাদা দেহের বিপাক-ক্রিয়ার সহায়তা করে, স্নায়ুর ক্রিয়াকে সুসম করে তোলে এবং গ্রন্থিগুলিতে সঞ্চিত লবণকে বিশ্লিষ্ট করিতে সাহায্য করে। ইহার ফলে নানারকম পেশীর রোগ, স্নায়বিক রোগ এবং নারীরোগের নিরাময়ে এই কাদা অত্যন্ত ফলপ্রসূ।

বর্দ্ধমান হাসপাতালের দুরবস্থা

'বর্দ্ধমান বাণী' নিম্নের এই সংবাদটি দিতেছেন :

বর্দ্ধমান হাসপাতালের বহির্বিভাগ প্রায় অচল অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। যে কোন দিন সকালের দিকে হাসপাতালের বহির্বিভাগ ঘুরিয়া আসিলে বুঝিতে পারা যাইবে কি চরম অব্যবস্থা এখানে চলিতেছে। অসংখ্য রোগীর ভিড়। সামলাইবার মত উপযুক্ত সংখ্যক ডাক্তার নাই। যদি বা ডাক্তারের সাক্ষাৎ এবং চিকিৎসাপত্র

মিলিল, দেখা গেল ঔষধ নাই। এ অবস্থা প্রতিকারের জন্য অর্থাৎ ডাক্তারের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং প্রয়োজনমত ঔষধ সরবরাহের জন্য হাসপাতাল সুপারিনটেনডেণ্ট উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট বার বার আবেদন জানাইয়াও কোন ফল পান নাই। স্বাস্থ্য-দপ্তর যেন এ বিষয়ের উপর কোন গুরুত্ব দিতে রাজী নন।

আমরা এখানে হাসপাতালের শয্যাবৃদ্ধির কথা বলিতেছি না। যদিও শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধি একান্ত আবশ্যক এবং সংখ্যা বৃদ্ধি না হইলে অধিকতর অসুবিধা দেখা দিবে তথাপি আপাততঃ আমরা বহির্বিভাগের সুব্যবস্থার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

প্রত্যহ হাসপাতালের বহির্বিভাগে যে সমস্ত রোগী আসে তাহারা সকলেই দরিদ্র। অন্য ডাক্তারের নিকট চিকিৎসিত হইবার সামর্থ্য না থাকায় বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে বিনামূল্যে চিকিৎসার আশ্রয় লইতে হয়। কিন্তু তাহারা প্রত্যহ হাসপাতালে ধর্ণা দিয়া যদি ব্যর্থকাম হয় তাহা হইলে সরকারের বিশেষ করিয়া স্বাস্থ্য-বিভাগের নিশ্চয়ই সুনাম বৃদ্ধি পায় না। সরকার যখন বহির্বিভাগে বিনামূল্যে ঔষধ দিবার প্রথা চালু করিয়াছেন তখন উহা যথাযথভাবে চালু রাখার দিকে লক্ষ্য রাখাই সমীচীন, অন্যথায় এই বিভাগ তুলিয়া দেওয়াই ভাল।

কলিকাতায় নেতাজী কন্যা শ্রীমতী অনীতা

আনন্দ ও বেদনার পরিবেশের মধ্যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর কন্যা শ্রীমতী অনীতা গত ১১ই ডিসেম্বর এই প্রথম ভারতের মাটিতে তাঁহার আত্মীয়স্বজনবর্গের সহিত মিলিত হন। দমদম বিমানঘাঁটিতে অনীতাকে তাঁহার জ্ঞাতি ভ্রাতা, ভগ্নী ও অন্যান্য আত্মীয়দের সহিত পরিচয় করাইয়া দিবার কালে সকলের চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠে এবং অনেকেই চোখের জল মুছিতে থাকেন। সুভাষচন্দ্রের মামা শ্রীসত্যেন্দ্র দত্তকে অনীতা পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলে বৃদ্ধ তাঁহাকে বুকে জড়াইয়া কাঁদিয়া ফেলেন। এই সময় অনীতার চক্ষুও আর্দ্র হইয়া উঠে।

সুভাষচন্দ্রের বৃহৎ পরিবারের বহু লোকজন তাঁহাকে তাঁহাদের গৃহে সমাদরে গ্রহণ করিয়া নেতাজীর বাসস্থান ও তাঁহার স্মৃতিঃপূত জিনিসপত্রগুলি দেখান। ভারতবর্ষের সহিত পূর্ব্বপরিচয় না থাকিলেও তিনি বাঙালীর বেশে শাড়ী পরিধান করিয়া বিমান হইতে অবতরণ করেন এবং বাঙালীর প্রথা মতোই নমস্কারাদি বিনিময় করেন।

শ্রীমতী অনীতা বর্ত্তমানে আঠার বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহার বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ হইয়াছে। শ্রীমতী অনীতা তিনমাস কাল এদেশে অবস্থান করিয়া ভারতের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করিবেন। পরিণতবুদ্ধি বা বৈষয়িক বুদ্ধির বয়স তাঁহার হয় নাই। কিন্তু মায়া-মমতার বশে তিনি তাঁহার অচেনা অজানা পরিবেশকে প্রথম আগমনেই আপন করিয়া লইয়াছেন।

শ্রীমতী অনীতাকে লইয়া আর একটি ঘটনা যাহা ঘটিয়াছে তাহা যেমনই হৃদয়বিদারক তেমনই মর্ম্মস্পর্শী। অনীতা বাসন্তী দেবীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলে, তিনি "এ যে বোস বাড়ীর মেয়ে, ঠিক ছোটবেলার 'বুয়ী'র মত" —অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে এই কয়টি কথা বলিয়া তাঁহার দুইখানা শীর্ণহাতে অনীতার মুখ তুলিয়া ধরেন। তার পর তিনি সুভাষের কন্যাকে বুকে চাপিয়া অঝোরে কাঁদিতে থাকেন। চোখের জল চোখের জলকে টানিয়া আনে। অনীতা ছোট্ট শিশুর মত কাঁদিতে কাঁদিতে বলে, আমি জানি আমার বাবা আপনার কাছে কতখানি ছিলেন।

অনেক কথা, অনেক স্মৃতি, অনেক ইতিহাস বলা হইয়া গেলেও, অনীতা উঠিতে চাহে না। শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীর গলা জড়াইয়া তাঁহার বুকে মাথা রাখিয়া ভেজা চোখ বুঁজিয়া থাকেন।

শ্রীমতী অনিতাও যেমন পিতৃভূমি দেখিয়া উল্লসিত হইয়াছেন, তেমনি নেতাজীর স্মৃতির সহিত যাহা কিছু বা যত কিছু জড়িত, তাহার প্রতি ভারতবাসীর মোহ অসাধারণ হইবে ইহা বলাই বাহুল্য।

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ

বহু প্রতীক্ষিত 'আয়ুর্বেদ বিল' এবার পশ্চিমবঙ্গ আইন পরিষদে উপস্থাপিত হইয়াছে। আমরা পূর্বাহ্ণেই সরকার, জনসাধারণ ও সংবাদপত্রের কর্ত্তৃপক্ষ, সর্বোপরি কবিরাজ-মণ্ডলীকে এজন্য অভিনন্দন জানাইতেছি। এ অভিনন্দন তাদের প্রাপ্য—তার চেয়েও বাংলার জাগ্রত মনীষা, অপ্রতিহত অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি ও মরণবিজয়ী দুঃখদৈন্যাপহারী সঞ্জীবনী শক্তিকে অভিনন্দন জানাইতেছি। বিলম্বিত হইলেও হাজার হাজার বৎসর পরে ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান আয়ুর্বেদের—চরক, সুশ্রুত ও বাগ্‌ভটের স্বীকৃতি ও সম্মানিত হওয়া বড়ই আনন্দের ও গৌরবের কথা।

ভারতের জলবায়ুর সহিত তার প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট—জড় ও চেতন তারই অভিব্যক্তি। আয়ুর্বেদের মৌলিকতত্ত্ব ইহার সহিত জড়িত—তার ত্রিদোষনীতি, দ্রব্যবিজ্ঞান, ঔষধনির্মাণ, দেহবিশ্লেষণ ও ক্রিয়াকলাপ, ধ্যানধারণা, গুণাগুণ বিচার, রসৌষধি, এমনকি, অষ্টাঙ্গ একই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এই সামগ্রিক চিকিৎসাপদ্ধতি প্রাচীন শাস্ত্রের অনুসন্ধানের মধ্য দিয়া নূতনের বনিয়াদ রচনা করিবে।

চারুচন্দ্র বিশ্বাস

গত ১০ই ডিসেম্বর ভারত সরকারের ভূতপূর্ব্ব আইন-মন্ত্রী চারুচন্দ্র বিশ্বাস পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭২ বৎসর হইয়াছিল।

১৮৮৮ সনে কলিকাতায় চারুচন্দ্রের জন্ম হয়। পিতা আশুতোষ বিশ্বাস ছিলেন ২৪ পরগণার পাবলিক প্রসিকিউটর। হিন্দু স্কুল, প্রেসিডেন্সী কলেজ ও রিপণ কলেজে তিনি শিক্ষালাভ করেন। মেধাবী চারুচন্দ্র এণ্ট্রান্স ও এফ, এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন ১৯০৭ সনে তিনি বি-এ পরীক্ষায় ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম এবং দর্শনশাস্ত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এম, এ ও ল-ক্লাসে ভর্ত্তি হন। ১৯০৮ সনে তিনি এম, এ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন এবং ১৯১০ সনে বি, এল পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত পাস করেন। এই দুই ক্ষেত্রেই তাঁহার স্থান প্রথম। বস্তুত পরীক্ষায় প্রথমেতর তাঁহার জন্য ছিল না।

কলিকাতা হাইকোর্টে তাঁহার আইন-জীবনের সুরু ১৯১০ সনে। ১৯২৪ সনে তিনি হাইকোর্টের এডভোকেট হন। ১৯৩৭ সনে চারুচন্দ্র কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৯৪৯ হইতে ১৯৫০ সন পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলররূপে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাজ করিয়া গিয়াছেন। তিনি র‍্যাডক্লিফ কমিশনের অন্যতম সদস্য ছিলেন।

চারুচন্দ্রের পরিচয় তাঁহার মেধা এবং কর্ম্মদক্ষতায়। ইহা ছাড়া আরও একটি পরিচয় তাঁহার ছিল—সেটি মানবিক পরিচয়। যেমন আলাপী তেমনি সহৃদয় এবং নিরহঙ্কার। আসলে তাঁহার প্রতিভা ছিল বহুমুখী। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেই প্রতিভার স্পর্শ পড়িয়াছে। এবং সর্ব্বত্রই যে তাহা সুফলপ্রসূ হইয়াছে তাহা সকলেই জানেন। বিচক্ষণ এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি এই মানুষটির মৃত্যুতে আজ যে শূন্যতার সৃষ্টি হইল, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে।

সুপ্রভা দেবী

বিগত ২৭শে নভেম্বর রাত্রে স্বর্গত সুকুমার রায়ের স্ত্রী এবং প্রসিদ্ধ চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের মাতা পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার বয়স ৬৮ বৎসর হইয়াছিল।

সুপ্রভা দেবী আমাদের কাছে নিকট-আত্মীয়ার মতই পরিচিত ছিলেন নানা কারণে। তাহার মধ্যে তাঁহার নিজ গুণাবলী ছিল অন্যতম। বস্তুতঃ স্বামী হারাইবার পর এবং শ্বশুর-বাড়ীর সংসার ভাঙিবার পর যেভাবে তিনি জীবন-যাত্রার অতি দুরূহ পথ অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন, জীবিত থাকিলে হয়ত সে কাহিনীর বর্ণনা করিতে পারিতেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জন্মিয়াছিলেন সুখের ও স্বাচ্ছন্দ্যের সংসারে, বিবাহ হইয়াছিল বিত্তশালী পরিবারে যেখানে তাঁহার বিবাহিত জীবনের প্রথম আট-নয় বৎসর সুখময় ছিল। শ্বশুর উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ছিলেন জ্ঞানী, ঋষিকল্প মহাশয় ব্যক্তি, বৈজ্ঞানিক, সুলেখক, সঙ্গীতজ্ঞ—তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ মুরারীবাবুর প্রিয়শিষ্য-হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। সুপ্রভা স্বামী পাইয়াছিলেন সুকুমার রায়কে, যাঁহার স্মৃতি আজও তাঁহার বন্ধুমণ্ডলীর অবশিষ্ট যাঁহারা, তাঁহারা সকলেই অতি যত্নে, অপরিসীম শ্রদ্ধার ও অনুরাগের সহিত অন্তরে রক্ষা করেন। বস্তুতঃই সুকুমার রায়ের অসাধারণ গুণাবলীর তুলনা ছিল না। সুরসিক, চিত্রাঙ্কনে অদ্ভুত রসের পরিবেশনে অতুলনীয়, দেবোপম চরিত্র, মধুর সদালাপি স্বভাব, এ সবের এরূপ অপূর্ব্ব সমাবেশ আর তো কোথাও আমরা দেখি নাই।

সব কিছুই পাইয়াছিলেন সুপ্রভা এবং যখন ১৯২১ সনের ডিসেম্বরে সত্যজিৎ জন্মগ্রহণ করে, তখন সে কি আনন্দের উৎসব। কিন্তু ঝড় যখন আসিল তখন এই সুখের সংসারের উপর যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। প্রথমে স্বামী তাঁহাদের জমিদারি তদারকে যাইয়া দুরারোগ্য কালাজ্বরে আক্রান্ত হইলেন এবং বহু চিকিৎসা সত্ত্বেও ১৯২৩ সনে পরলোকগমন করিলেন। তাহার পরেই আসিল সাংসারিক বিপর্য্যয়, যাহাতে শ্বশুরকুলের সর্ব্বস্ব গেল। কেবলমাত্র পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া এই সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে লালিতা মহিলা জীবন-সংগ্রামের দুর্গম পথে নামিলেন।

তাঁহার সেই পথে চলার কথা সহজে বলা যায় না, শুধু এইমাত্র বলা যায় যে পথের মাঝে যাহাদের সঙ্গে তাঁহার মেলামেশা করিতে হইয়াছে, যাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে, সকলেরই তিনি প্রীতি, শ্রদ্ধা ও স্নেহ লাভ করিয়াছেন। সন্তানের জন্য বাঙালীর মা যে কি ভাবে অসাধ্য সাধন করিতে পারেন, সে বিষয়ে আমরা শুনিয়াছি অনেক কিছু কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়াছি সুপ্রভা দেবীর কঠোর ব্রত সাধনে। তাঁহার কীর্ত্তিতে পিতৃমাতৃকুল ও ও শ্বশুরকুলকে তিনি আলোকিত করিয়া গিয়াছেন।

জন কেনেডি

শ্রীগৌতম সেন

মিঃ জন ফিটজেরাল্ড কেনেডি মাত্র ৪৩ বৎসর বয়সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো রাষ্ট্রে সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা ও সম্মানের পদে আসীন হইলেন। রিপাবলিকান প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের আট বৎসর শাসনকাল শেষ হইয়া গেল এবং আমেরিকার জনগণ রিপাবলিকানের বদলে একজন তরুণ ডেমোক্রাটকেই পছন্দ করিলেন। কেবল তাহাই নহে, আমেরিকার ইতিহাসে এই সর্ব্বপ্রথম রোম্যান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত কোনোও ব্যক্তি প্রেসিডেণ্টের পদে বসিলেন। ইহাও অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা।

কেন এই পরিবর্ত্তন? ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, মার্কিন জনগণ রিপাবলিকান আইসেনহাওয়ারের একটানা আট বৎসরের শাসনের পরিবর্ত্তন চাহিয়াছিলেন। বিশেষ করিয়া কেনেডির যৌবনোচিত উৎসাহ ও উদ্যম মার্কিন নর-নারীদের উপর গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। অবশ্য আরও একটি কারণ ছিল, বর্ত্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'প্রেষ্টিজ' বা মর্য্যাদা অনেকখানি নামিয়া গিয়াছিল—সোভিয়েট রাশিয়া ও দূরপ্রাচ্য বা জাপানের ঘটনাবলীতে। বিশেষ করিয়া জাপ-মার্কিন নিরাপত্তা চুক্তির বিরুদ্ধে টোকিওতে যে গণ-অভ্যুত্থান ঘটিয়াছিল, উহার ফলেও আইসেনহাওয়ার যথেষ্ট গ্লানি ভোগ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ ইঁহার পূর্ব্বে আর কোন মার্কিন প্রেসিডেণ্ট সরকারীভাবে আমন্ত্রিত হইবার পর এইভাবে প্রত্যাখ্যাত হন নাই। রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদার দিক হইতে ইহাও তাঁহাদের অসহ্য হইয়াছিল।

নানা বক্তৃতায় এই তরুণ কেনেডি মার্কিন জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, ঘরে ও বাহিরে তিনি মার্কিন শক্তি ও সম্ভ্রমের পুনরুজ্জীবন ঘটাইবেন। চারিদিকে যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, সেই গণ্ডি ভাঙিয়া ফেলিয়া তিনি আমেরিকাকে আবার গতিশীল করিবেন। তাঁর এই সমস্ত উদ্দীপনাময় বক্তৃতা আমেরিকার জনগণের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে।

শ্রম-শিল্পের উৎপাদনে, আর্থিক শক্তিতে এবং ডলার মুদ্রার স্থায়িত্ব রক্ষায় কেনেডি যে ভরসা দিয়াছেন, মার্কিন ভোটারগণ তাহাও আপাততঃ মানিয়া লইয়াছেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের পঞ্চদশ অধিবেশনের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী যেমন, সোভিয়েট নায়ক ক্রুশ্চেভ ও কিউবার প্রধানমন্ত্রী ডঃ ক্যাষ্ট্রোর প্রতি অশোভন আচরণ, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরু কর্ত্তৃক উত্থাপিত পঞ্চরাষ্ট্রের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ কারচুপি—এই ঘটনাগুলিও মার্কিন সমাজের চিন্তাশীল অংশকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে—যে অংশ যুদ্ধ চাহে না, শান্তি ও সৌভ্রাতৃত্বই চাহে। মিঃ কেনেডির এই ঐতিহাসিক জয়ের পিছনে এই সমস্ত কারণ রহিয়াছে।

যদিও মূলগতভাবে রিপাবলিকান ও ডেমোক্রাট পার্টির পররাষ্ট্র-নীতিতে কিংবা কমিউনিষ্ট বিরোধিতায় কোন বড় রকমের তফাৎ নাই, তথাপি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক হইতে এই নীতির প্রয়োগে ও প্রতিফলনে সময় সময় যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। এই পার্থক্য নির্ভর করে ব্যক্তিত্বের উপর। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট এই দিক দিয়া উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—যিনি ১৯৩৩ সনে সোভিয়েট রাশিয়াকে আমেরিকার পক্ষ হইতে প্রথম কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিয়াছিলেন এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রাশিয়া ও ষ্ট্যালিনের সঙ্গে সখ্যতার সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারই উত্তরাধিকারী প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ডেমোক্রাট হওয়া সত্ত্বেও কোরিয়াতে এবং অন্যত্র বিষম গোলমালের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সুতরাং একদিকে যেমন পার্টির মতবাদের গুরুত্ব আছে, অন্যদিকে তেমনি প্রেসিডেণ্টের নিজস্ব প্রতিভা, দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যক্তিত্বেরও যথেষ্ট গুরুত্ব আছে।

পনের বৎসর পূর্ব্বে যেদিন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের আকস্মিক মৃত্যু ঘটে এবং অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁহার স্থান অধিকার করেন মিঃ ট্রুম্যান, সেইদিনই মার্কিন রাজনীতি হইতে উদার প্রগতিশীলতার অবসান হয়। ইহার পরই দেখা যায় বিশ্বব্যাপী সমরায়োজন। এই যুদ্ধের প্রধান কথাই হইল 'পজিসন অব ষ্ট্রেংথ'। এই 'ষ্ট্রেংথ' বৃদ্ধির জন্য যাহাকে প্রয়োজন হইয়াছে, তাহাকেই আমেরিকা দলে টানিয়াছে। আমেরিকার এই সমরায়োজনে যে সহযোগিতা করিতে চাহে নাই, তাহাকেই সে সন্দেহের চোখে দেখিয়াছে। সে ভারতকেও বিশ্বাস করিতে পারে নাই, বরং প্রশ্রয় দিয়াছে পাকি-

ষানকে। এক কথায় আমেরিকার সমর্থন ও সাহায্য বণ্টিত হইয়াছে সামরিক প্রয়োজনের তৌলদণ্ডে। অবশ্য একথা স্বীকার করিতে বাধা নাই, কমিউনিষ্ট আক্রমণ প্রতিরোধের জন্ম এই সমর-প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কমিউনিষ্ট প্রভাব বিস্তৃতির অন্যান্য কৌশল ও নীতির প্রতি উদাসীন থাকিয়া একমাত্র যুদ্ধের দিকে ঝুঁকিয়া পড়া একগুঁয়েমিরই পরিচয়। এই একগুঁয়েমির ফলেই তাহার একনায়কত্ব ও সাম্রাজ্যবাদের দিকটাই প্রকট হইয়া পড়ে। যাহার ফলে কমিউনিষ্ট-শিবির তাহাদের পাশ্চাত্ত্য শিবির-বিরোধী প্রচারের নূতন উপকরণ লাভ করে। এই অদূরদর্শী নীতির বিরুদ্ধে তখন হইতেই আমেরিকার জনমত ভিন্ন রূপপরিগ্রহ করে। কেনেডির সাফল্যের ইহাও অন্যতম কারণ।

১৯১৭ সনে সোভিয়েট বিপ্লবের নিদারুণ বৎসরে যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলের মাসাচুসেটস রাজ্যে জন এফ. কেনেডি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা জোসেফ পি. কেনেডি একজন ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। ব্রিটেনে মার্কিন রাষ্ট্রদূতরূপেও তিনি কিছুদিন নিযুক্ত ছিলেন।

হাইস্কুল হইতে গ্রাজুয়েট ডিগ্রী লাভের পর মিঃ কেনেডি 'লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স'-এ অধ্যয়ন করেন। সেখানে প্রখ্যাত সমাজতন্ত্রী অধ্যাপক হারল্ড জে. লাস্কির ছাত্ররূপে পাঠ গ্রহণ করেন। ইহার পর যুক্তরাষ্ট্রে ফিরিয়া আসিয়া হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন এবং সেখান হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। যুদ্ধ-পূর্ব্বকালে ইংলণ্ডে থাকিবার সময় তাঁহার অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করিয়া যে 'থীসিস' তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করেন তাহা পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। বইখানির নাম 'Why England Slept'.

১৯৪৩ সনের আগষ্ট মাসে সলোমোন দ্বীপপুঞ্জের কাছাকাছি প্রহরারত এক টর্পেডো-বোটের অধিনায়ক-রূপে লেঃ কেনেডি যখন নিযুক্ত ছিলেন তখন জাপানী ডেষ্ট্রয়ারের আক্রমণে টর্পেডো-বোটটি ভাঙিয়া যায়। কেনেডি তাহাতে আহত হন। সেই আহত অবস্থাতেই তিনি সাঁতার কাটিয়া তাঁহার সঙ্গীদের ভাসমান বোটের টুকরোর কাছে লইয়া আসেন এবং পরে সকলে মিলিয়া সাঁতার কাটিয়া নিকটবর্ত্তী এক দ্বীপে গিয়া উঠেন। সেখানকার আদিবাসীরা তাঁহাদের আশ্রয় দান করে। এই সাহস ও বীরত্বের জন্ম তাঁহাকে মার্কিন নৌবাহিনীর সম্মানজনক পদক দেওয়া হয়।

১৯৪৫ সনে সামরিকবাহিনীর কাজ ছাড়িয়া দিবার পর মিঃ কেনেডি সাংবাদিক-জীবনে প্রবেশ করেন। 'ইণ্টার-ন্যাশনাল নিউজ সার্ভিস' নামক সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের সংবাদদাতারূপে তিনি সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনে উপস্থিত থাকিয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার সংবাদ পরিবেশন করেন। বৃটেনের নির্ব্বাচন এবং ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পটসডাম বৈঠকের বিবরণও তিনি বেশ কৃতিত্বের সঙ্গেই সরবরাহ করেন।

ইহার পরই তাঁহার জীবনের মোড় ঘোরে। তিনি রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। ইহাও আকস্মিক। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, দাদার অকালমৃত্যু না হইলে কোনোদিনই হয় ত তাঁহাকে রাজনীতির আসরে নামিতে হইত না। সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের প্রতিই তাঁহার প্রবল ঝোঁক। দাদার ছিল অসাধারণ প্রতিভা। তাঁহার দীপ্তিতেই তখন ঝলমল করিত সারা পরিবার। তিনি ছিলেন সাধারণগোছের মানুষ। কিন্তু মহাযুদ্ধ এবং দাদার মৃত্যু তাঁহার জীবনটাকে একেবারে স্বতন্ত্রপথে ঘুরাইয়া দিয়াছে।

অর্থের অভাব ছিল না। পিতা তাঁহাদের প্রত্যেককে চল্লিশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি দিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেন, শুধু বেঁচে থাকার জন্যই জীবন নয়। যাহার যে ভাবে ইচ্ছা সেই ভাবেই জীবনকে চালিত করুক।

মিঃ কেনেডির জীবনে তাই আমরা অসংখ্য ঘাত-প্রতিঘাত দেখিতে পাই। প্রতিনিধি-পরিষদে যোগদানের উদ্দেশ্যে ১৯৪৬ সনে তিনি প্রবলভাবে প্রচার-অভিযান চালাইয়া মাত্র ২৯ বৎসর বয়সে যখন মার্কিন কংগ্রেসের সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন তখন সকলেই বিস্মিত হইয়াছিল। রাজনীতি ক্ষেত্রে এই তাঁহার প্রথম প্রবেশ। তাহার পর ১৯৪৮ এবং ১৯৫০ সনে তিনি প্রতিনিধি পরিষদে পুনরায় নির্ব্বাচিত হন। কিন্তু মন সন্তুষ্ট হয় না। ইহার পর তিনি সেনেটের সদস্যপদ লাভের সঙ্কল্প করেন এবং ১৯৫২ সনে মাসাচুসেটস-এর প্রতিনিধি সেনেটর হেনরি ক্যাবট লজকে পরাজিত করিয়া সেনেটে নির্ব্বাচিত হন।

এই সময় মিঃ কেনেডিকে কিছুকাল হাসপাতালে থাকিতে হইয়াছিল। কারণ যুদ্ধে আহত হইবার ফলে তাঁহার মেরুদণ্ডে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়। রোগ-শয্যায় থাকিয়া তিনি যে বই লিখিয়াছিলেন তাহার নাম 'Profiles in courage'. আটজন দুঃসাহসী সেনেটরের জীবন-কাহিনী লইয়া এই গ্রন্থখানি রচিত। দলগত স্বার্থের নিকট নিজেদের নীতিগত আদর্শকে বিসর্জন না দিয়া তাঁহাদের কর্ম্মজীবনের প্রতিষ্ঠাকে বিপন্ন অথবা

বিসর্জ্জন করিতেই ইহারা প্রস্তুত ছিলেন। এই বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই লেখককে পুলিৎসার প্রাইজ দেওয়া হয়।

নিজস্ব চিন্তাধারা এবং নিজস্ব সিদ্ধান্তের জন্য কেনেডি আজও সকলের নিকট শ্রদ্ধাভাজন। আইন-রচয়িতা হিসাবেও তাঁহার নাম কম নয়। বিশেষতঃ সামাজিক আইন ও বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ে তাঁহাকে দুইটি আইন-সভাতেই সর্ব্বদা কর্ম্মব্যস্ত থাকিতে হয়। সাধারণ মানুষের মতই তাঁহার অনাড়ম্বর জীবন। জীবনের এই খুঁটিনাটি চিত্র হইতেই তো মানুষের চরিত্র অধ্যয়ন করা যায়।

কেনেডির এই অসাধারণ সাফল্য জগতকে বিস্মিত করিয়াছে। বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য, আগামী জানুয়ারীতে সেনেটর জন কেনেডি যখন প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ গ্রহণ করিবেন তখন আমেরিকার ইতিহাসে তিনটি 'প্রথম' রেকর্ড সৃষ্টি হইবে। তিনিই হইবেন প্রথম প্রেসিডেন্ট যিনি বিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। হোয়াইট হাউসে তিনিই হইবেন প্রথম রোম্যান ক্যাথলিক। তিনিই হইবেন প্রথম প্রেসিডেন্ট যিনি মার্কিন নৌ বিভাগে কাজ করিয়াছেন।

ইতিহাসের পটভূমিকায় বর্ত্তমান চিন্তাধারা

আমাদের পরম সৌভাগ্য, আমরা এমন এক শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, যখন পৃথিবীর ইতিহাসে বিস্ময়কর সব পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। এত প্রয়োজনীয় এবং এত বিস্ময়কর ঘটনা, এত কাছাকাছি এমন একসঙ্গে আর কোনো শতাব্দীতে ঘটে নাই। সেই জন্য বিংশ শতাব্দী জগতের ইতিহাসে সবচেয়ে বিস্ময়কর শতাব্দীরূপে পরিগণিত হইবে। আমাদের সৌভাগ্য, আমরা সেই শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। সেই শতাব্দীর বিস্ময়কর সব ঘটনা আর আবিষ্কার আর চিন্তার ধারা আমাদের জীবনে সাক্ষাৎভাবে প্রভাব বিস্তার করিতেছে, তাহারই মধ্যে আমরা মানুষ হইয়া উঠিতেছি। সেই সৌভাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দায়িত্বও বাড়িয়া উঠিয়াছে। এই যে সব নূতন ঘটনা আর নূতন চিন্তাধারা আমাদের জীবনে আসিয়া পড়িতেছে, আমাদের জীবনের ধারাকে আলোড়িত ও পরিবর্ত্তিত করিতেছে, আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য হইল, সেইসব ঘটনা এবং সেইসব চিন্তাধারার সহিত সম্যক্‌ভাবে পরিচিত হওয়া। যে আবহাওয়ার মধ্যে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি, যে আবহাওয়ার মধ্যে আমরা জীবনধারণ করিতেছি এবং যে আবহাওয়ার মধ্যে আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নত জীবনের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে, তাহাকে সম্যক্‌রূপে জানা, উপলব্ধি করা, তাহাই হইল আমাদের শিক্ষার প্রধানতম বিষয়। সুতরাং আজিকার যুগের উপযুক্ত নাগরিক যাহাকে হইতে হইবে, তাহাকে আজিকার যুগের এইসব বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে বিশেষ ভাবে পরিচিত হইতে হইবে।

এই শতাব্দীর জীবনে সর্ব্বপ্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল বিশ্ব-যুদ্ধ। ইতিমধ্যেই দুইটি বিশ্ব-যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের আশঙ্কায় পৃথিবী দিন গুণিতেছে। এই বিশ্ব-যুদ্ধের দরুণ আমাদের শতাব্দীর জীবন ও চিন্তাধারা অন্যান্য শতাব্দী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছে।

পৃথিবীতে আগে যে যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটিত না, তাহা নহে। মানুষ সভ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ নানা কারণে নানা উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করিয়া আসিতেছে। পৃথিবীতে এইরূপ শত শত যুদ্ধ ঘটিয়া গিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান শতাব্দীর বিশ্ব-যুদ্ধের সঙ্গে সেইসব প্রাচীন যুদ্ধের কোনো তুলনা হয় না। প্রাচীন জগতে যে-সব যুদ্ধ হইত, তাহাতে দুইটি দেশ বা দুটি দল কিংবা তিনটি কি চারিটি প্রতিবেশী দেশ বা জাতি সংযুক্ত থাকিত। বিশ্বের অপর অংশের সহিত তাহার কোনো যোগ থাকিত না বা সেইসব যুদ্ধের ফলাফল বিশ্বের অন্য দেশের উপর ছড়াইয়া পড়িত না। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে যে বিশ্ব-যুদ্ধ হইল, তাহাতে জগতের প্রায় প্রত্যেক প্রধান দেশ বা জাতি জড়াইয়া পড়িল। যুদ্ধক্ষেত্র যেখানেই হউক না কেন, তাহার ফলাফল বিশ্বের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে যে যুদ্ধ ঘটিতে লাগিল, তাহার ফলাফল বাংলার সুদূর গ্রামে আসিয়া তরঙ্গ তুলিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই বিশ্বব্যাপী প্রভাব আরও গভীর ভাবে সর্ব্বত্র অনুভূত হইল। প্রতিদিনের জীবনযাত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র এই বিশ্ব-যুদ্ধের দরুণ প্রভাবান্বিত হইয়াছে দেখিতে পাই। এই বিশ্ব-যুদ্ধ আসিয়া মানুষের চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল যে, আজ কোনো দেশই বিচ্ছিন্ন নয়, কোনো দেশই নিজের ইচ্ছা-অনুসারে যাহা খুসী তাহা করিয়া যাইতে পারে না, প্রত্যেক দেশের ভাল-মন্দের সহিত, উত্থান-পতনের সহিত বিশ্বের অপরাপর দেশ বা জাতির ভালমন্দ বা উত্থান-পতন নির্ভর করিতেছে। এবং এই নূতন জ্ঞান বা

অভিজ্ঞতার ফলে জগতে দুইটি নূতন চিন্তাধারা প্রবলতম হইয়া উঠিল।

একটি হইল, কোনো জাতি নিজের বিশেষ সামরিক-শক্তি বা বৈজ্ঞানিক শ্রেষ্ঠতার দরুণ অপর কোনো জাতিকে পরাধীন বা ক্রীতদাস করিয়া রাখিতে পারে না।

দ্বিতীয় হইল, এমন এক নূতন রাজনৈতিক আদর্শ আবিষ্কার করিতে হইবে, যাহার দ্বারা কোনো একটি বিশেষ জাতি বা দেশ নয়, সমগ্র বিশ্ব-জগৎ শান্তিতে থাকিতে পারে এবং এই লোকক্ষয়-কারক যুদ্ধ পৃথিবী হইতে অদৃশ্য হইতে পারে।

প্রথম চিন্তাধারার ফলে, জগতের সর্ব্বত্র লাঞ্ছিত, পরাধীন জাতিরা স্বাধিকার লাভের জন্য আন্দোলন সুরু করিল। দুর্ব্বল পরাধীন দেশে দেশে এক প্রবল জাতীয় আন্দোলনের সূত্রপাত হইল। অতীতের অত্যাচার হইতে, অতীতের ভুল হইতে, অতীতের অন্যায় হইতে, নিজের নিজের অসহায় দুর্ব্বল জাতিকে জগতে আবার উন্নত স্বাধীন করিয়া তুলিবার জন্য, সেই সব দেশে এক নূতন ধরনের কর্ম্মী, এক নূতন ধরনের নেতা জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের অনন্যসাধারণ বীরত্বের কাহিনীতে তাঁহাদের নব-পৌরুষের মহিমায় সমগ্র পৃথিবী যেন নব-প্রাণে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। রাশিয়ায় লেনিন, মিশরে জগলুল পাশা, তুরস্কে কামাল আতাতুর্ক, আয়ারল্যাণ্ডে ডি. ভ্যালেরা, চীনে সান-ইয়াৎ-সেন, ইতালীতে মুসোলিনী, পারস্যে রেজা শাহ্ পাহ্‌লবী, আরবে ইবনে সউদ, ভারতবর্ষে মহাত্মা গান্ধী, প্রত্যেকেই এক নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া স্ব স্ব দেশকে অতীতের পঙ্ক হইতে টানিয়া তুলিলেন।

এইসব সদ্যজাগ্রত নূতন জাতিদের দাবীর সহিত পুরাতন জগতের শক্তিশালী জাতিদের দাবীর সংঘর্ষ বাধিতে লাগিল। তখন একদল লোক চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি করিয়া সমগ্র বিশ্ব-জুড়িয়া শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা যায়, কি করিয়া এই লোকক্ষয়কর হত্যার প্রতিযোগিতা বন্ধ করা যায়। দুর্ব্বল জাতিরা উন্নত শক্তিশালী হইল বটে কিন্তু তাহাতে মানুষের কি লাভ হইল? মানুষ তো আরও দুর্ভাবনার মধ্যে, আরও গভীর আশঙ্কার মধ্যে ডুবিয়া যাইতেছে। ইহার হাত হইতে কি মুক্তির উপায় নাই? মানুষ কি বন্যপশুর মতন হত্যার মধ্য দিয়াই তাহার সব সমস্যার মীমাংসা করিবে? হত্যার মধ্য দিয়াই কি তাহার মীমাংসা হইবে?

এই সমস্যার সমাধানের জন্য জগৎ চিন্তিত হইয়া উঠিল। আজ পর্য্যন্ত এই সমস্যা সমাধানের যতগুলি ব্যবস্থা উদ্ভাবন করিয়াছে, তাহাদের প্রধানতঃ চার ভাগে ভাগ করা যায়:

প্রথম, একদল লোক বলিল, প্রত্যেক দেশে যাহারা শ্রমিক এবং মজুর যাহারা শ্রম করিয়া অর্থ উৎপাদন করে, রাজ্যের শাসনের ভার তাহাদের হাতে দিতে হইবে। প্রত্যেক দেশের শ্রমিকরা এই ভাবে সম্মিলিত হইয়া বিশ্ব-জোড়া একটা শ্রমিক-শাসক-তন্ত্র গড়িয়া তুলিবে। প্রত্যেক দেশের শ্রমিকেরা এক আদর্শে সঙ্ঘবদ্ধ হইবে; তাহা হইলে জগতে শান্তি আসিবে, জগতে আর কেহ যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারিবে না। কারণ যুদ্ধের অস্ত্র তৈরি করা বা কারখানা চালানো বা যান-বাহন চালানো—যাহা না হইলে যুদ্ধ চলিবে না, তাহা সমস্তই শ্রমিকের আয়ত্তে থাকিবে। তাহারা যদি সম্মিলিত থাকে, তাহারা যদি যুদ্ধের সাহায্য করিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে আর যুদ্ধ কখনই সম্ভব হইতে পারে না। এই আদর্শ অনুসরণ করিয়া যাহারা চলে, তাহাদের মূল উৎস হইল, রুষ-কম্যুনিজম্। সুতরাং বর্ত্তমান জগতের একটি প্রধান চিন্তাধারা হইল, এই রুষ-কম্যুনিজমের। সোভিয়েট রাশিয়া হইল, এই চিন্তা-ধারার প্রবর্ত্তক ও প্রচারক।

দ্বিতীয় হইল, এক দল লোক মনে করেন, প্রত্যেক জাতির প্রতিনিধি লইয়া একটা শক্তিশালী আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানে সকল জাতীয় সমস্যার মীমাংসা হইবে। এবং এই আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠান যে বিধান দিবে, সেই বিধানই বিবাদমান জাতিদের মানিয়া লইতে হইবে। যে তাহা মানিতে না চাহিবে, অন্য সকলে মিলিয়া তখন তাহাকে শাসন করিবে। বিশ্বের সকলের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে একজন আর বিদ্রোহ করিতে সাহস পাইবে না। এই ভাবে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই দ্বিতীয় ভাগে যাহাদের চেষ্টা পড়ে, তাহাদের প্রধান প্রতিষ্ঠান হইল, বর্ত্তমানে U. N. E. S. C. O. বিশ্ব-রাষ্ট্র-সম্মেলন।

কিন্তু এই রাষ্ট্রসঙ্ঘ জগতে কোনো শান্তিই আনিতে পারে নাই। কাশ্মীর লইয়া যে পরিস্থিতি আজও জটিল হইয়া আছে, তাহার কোনো সমাধানই হইল না। চীন-ভারতের বিরোধও একই জায়গায় রহিয়া গেল। কঙ্গোর ভয়াবহ পরিণামও তাঁহারা ঠেকাইতে পারিলেন না। লুমুম্বা শুধু প্রধানমন্ত্রীই নন, সেখানকার একমাত্র আইন-সঙ্গত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান পার্লামেণ্টের তিনি আস্থা-ভাজন। যে পার্লামেণ্টের সমর্থনে কাশাভুবু কঙ্গোর প্রেসিডেণ্ট, লুমুম্বাও সেই পার্লামেণ্টের সমর্থিত। রাজনীতি

ক্ষেত্রে বিস্ময়ের যদি কিছু থাকে, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা অধিক বিস্ময়ের কথা, এই কাশাভুবু ও তাঁহার সঙ্গীদল গণতন্ত্রাভিমানী পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রগুলির পরোক্ষ সমর্থনেই লুমুম্বাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে এবং তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিতেছে। দেশের সামরিক শক্তির আকস্মিক অভ্যুত্থানে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা বিপন্ন হইবার এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্ব্বাচিত রাষ্ট্রনায়কদের জীবনান্ত ঘটিবার দৃষ্টান্ত জগতে আছে। কিন্তু নাই, এই ধরনের রাজনৈতিক বিপর্য্যয়ের পশ্চাতে গণতন্ত্রের ধ্বজাবাহীদের সমর্থনের ভয়াবহ দৃষ্টান্ত। 'ভয়াবহ' এই কারণে যে, গণতন্ত্রের নামে রাজনৈতিক ভণ্ডামি যদি এমন সীমাহীন হয়, তাহা হইলে শুধু কঙ্গোয় নয়, পৃথিবীর কোথাও স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র নিরাপদ নয়। এই কঙ্গোর স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের ভার লইয়াছেন রাষ্ট্রসঙ্ঘ। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থান্বেষী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির চক্রান্তে রাষ্ট্রসঙ্ঘ এখানে সম্পূর্ণ পঙ্গু ও ক্ষমতাহীন প্রতিপন্ন হইয়াছে।

তবে কি অশান্তির আগুন নিভিবে না? যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই—এরূপ কথা বহু হইয়াছে। ইহার পর এই পরিপ্রেক্ষিতে নূতন বাণী শুনাইতে আসিলেন, সোভিয়েট রাশিয়ার সর্ব্বাধিনায়ক শ্রী ক্রুশ্চেভ। তাঁহার প্রথম কথাই হইল, ক্ষেপণাস্ত্র, অ্যাটম্-বোমা, হাইড্রোজেন বোমা সমস্ত পৃথিবী হইতে ঝাঁটাইয়া বিদায় করিতে হইবে। কামান, বন্দুক, অস্ত্রশস্ত্র, সৈন্যসামন্ত কিছুই থাকিতে পারিবে না—এমনকি প্রতিরক্ষামন্ত্রণালয়গুলির পর্য্যন্ত দরজা বন্ধ করিতে হইবে। চার বৎসরের মধ্যে প্রত্যেকটি রাষ্ট্র এইভাবে নিরায়ুধ, বর্ম্ম-চর্ম্ম-কবচ-কুণ্ডলহীন যদি হয় তবেই জগতে নির্ব্বিঘ্নে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

যুদ্ধ-বিগ্রহের সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করিবার জন্য শ্রী ক্রুশ্চেভ যে চূড়ান্ত নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা যদিও সম্পূর্ণ নূতন নয়। একবার লিটভিনফ লীগ অফ নেশনে এই কথাই বলিয়াছিলেন। বলিয়াছেন আরও অনেকে। যুগে যুগে বহু জ্ঞানীগুণী-মনীষী হিংসায়-উন্মত্ত এই পৃথিবীকে অস্ত্র ত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। আশা করিয়াছেন, এমন দিন আসিবে, যখন অস্ত্রের ঝনৎকার স্তব্ধ হইবে, তরবারি ভাঙিয়া গড়া হইবে লাঙলের ফলক। শান্তিবাদীদের যাহা কল্পনামাত্র, মহাপরাক্রান্ত সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী আজ তাহাই বাস্তবে রূপ দিতে চাহিতেছেন।

এখন কথা হইতেছে—কে, কতটা, কি ভাবে ইহাকে গ্রহণ করিতে পারিবে। কারণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান কাল হইতে এ পর্য্যন্ত নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাব লইয়া আলোচনা কম হয় নাই। বৈঠকের পর বৈঠক ব্যর্থ হইয়াছে, পরমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধ করার প্রস্তাবটিতে পর্য্যন্ত বৃহৎ-শক্তিরা একমত হইতে পারেন নাই। ইহার কারণও সুস্পষ্ট। কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। পরস্পর অবিশ্বাস যখন প্রচণ্ড এবং তাহার বাস্তব কারণগুলিও উপেক্ষাযোগ্য নয়, তখন উভয়পক্ষে শান্তি-কামনা আন্তরিক হইলেও, অস্ত্রশস্ত্র, যুদ্ধ-সম্ভার সমুদ্রে বিসর্জ্জন দিয়া চূড়ান্ত নিরস্ত্রীকরণের ঝুঁকি লইতে সাহসী হইবে কে? আর যদি কেহ অগ্রসরও হয়, তবে তাহার সর্ব্বদাই সন্দেহ থাকিবে, আমাকে ফাঁকি দিয়া উহারা ভিতরে ভিতরে অস্ত্র শানাইতেছে না তো? তাহাদের দুর্ম্মতি হইলে, যে কারখানায় ট্রাক্টর তৈয়ারী হয়, সেখানে ট্যাঙ্ক, যেখানে পরমাণবিক শক্তি উৎপন্ন হয়, সেখানে পরমাণবিক বোমা তৈয়ারী করিতে বাধা কোথায়? কোথায়, কোন্ রাষ্ট্রে, কোন্ বৈজ্ঞানিক গোপনে কি বানাইতেছেন তাহার সন্ধান রাখিবে কে? সুতরাং এই অবিশ্বাসী মনই ক্রুশ্চেভের এই প্রস্তাবকে সমর্থন করিতে চাহিবে না। তিনিও কি অপরকে মনে-প্রাণে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিবেন?

অবশ্য যুক্তি দিয়া বিচার করিতে হইলে, ক্রুশ্চেভ যে-সব কথা বলিয়াছেন তাহা অযৌক্তিক নহে। তিনি বলিয়াছেন, পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি বৎসরে সামরিক-খাতে প্রায় একশত লক্ষ-কোটি ডলার খরচ করেন। গত দশ বৎসরে সামরিক-খাতে যে ব্যয় হইয়াছে, তাহাতে পনের কোটি বাসভবন প্রস্তুত হইতে পারিত। বৃহৎ শক্তিগুলি সামরিক-খাতে অর্থব্যয় বন্ধ করিলে তাহার একটি অংশমাত্র দ্বারা এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ-আমেরিকার অনুন্নত অঞ্চলে নূতন জীবনের গোড়াপত্তন করা যায়।

এ বাণী ভারতের পক্ষে নূতন নয়। ইহা ভারতেরই নীতি। আমরা শুধু বিস্মিত হইয়াছি, ক্রুশ্চেভের মধ্যে সেই নীতি সংক্রামিত হইতে দেখিয়া। যাহা হউক, আজ যদি ক্রুশ্চেভের প্রস্তাব অনুযায়ী অস্ত্রের প্রতিযোগিতা ও অস্ত্রের নির্ম্মাণ এবং উৎপাদন বন্ধ হইয়া যায় তবে অবিলম্বেই আমরা পৃথিবীতে এক নূতন অর্থনৈতিক যুগের দিকে যাত্রা করিতে পারি। জানি না, কার্য্যতঃ ইহা কতদূর অগ্রসর হইবে—কারণ, ইহা হইতেছে মহৎ-আদর্শের কথা। কিন্তু আদর্শ লইয়াই ব্যক্তি বা জাতি বাঁচিয়া থাকে। আমরাও বাঁচিয়া থাকিব। কারণ, জানি মানব-মহত্ত্বের গতি স্তব্ধ হইবে না। মানুষ একদিন যুদ্ধ ও হিংসার ঊর্দ্ধে উঠিবেই,—ক্রুশ্চেভের কথা আজ

ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে উড়াইয়া দিলেও সেদিন ইহার মূল্য নিরূপিত হইবে।

প্যারিস-বৈঠকে সেই কথাই ক্রুশ্চেভ আমেরিকাকে শুনাইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু প্যারিস-বৈঠক ব্যর্থ হইল। ইহার কারণও আছে। অনেকেই মনে করেন, মুখে শান্তি ও গণতন্ত্রের কথা বলা হইতেছে বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ মার্কিন সামরিক-বিভাগই এই পররাষ্ট্র নীতিকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র সামরিক ঘাঁটি, সর্ব্বত্র সৈন্য মোতায়েন, সোভিয়েট রাশিয়া ও চীনের বিরুদ্ধে চারিদিকে বেষ্টনী সৃষ্টি, যুদ্ধাস্ত্র তৈয়ার ও সামরিক সাহায্যদান, নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাবে দ্বিধা এবং পরমাণু অস্ত্রাদির নিষিদ্ধকরণে অনিচ্ছা ইত্যাদি সব কিছুই একত্র বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, বর্ত্তমান মার্কিন সরকারের গণতন্ত্র ও শান্তি যেন গোলা-বারুদ এবং এটম ও হাইড্রোজেন বোমার উপর বসিয়া আছে। ফলে, কোনো সুস্থ, জীবন্ত এবং বলিষ্ঠ নীতি অর্থাৎ যে-নীতির ফলে পৃথিবীর মানুষ নিঃশঙ্কবোধ করিতে পারে, তেমন নীতির সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।

একথা কেহই অস্বীকার করিবেন না, যুদ্ধ মানব-সভ্যতার এক কলঙ্কস্বরূপ। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, শিক্ষায়-শিল্পে-সংস্কৃতিতে মানব-জাতি গত পাঁচ হাজার বৎসরের সভ্যতায় সমৃদ্ধি বড় কম সঞ্চয় করে নাই। আদিকালের কৃষি ও কুটীর-শিল্প দিয়া যাত্রা সুরু করিয়া মানুষ আজ জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে তাহার অসীম শক্তির পরিচয় দিয়াছে। যাহা প্রথম যুগে. মধ্যযুগে মানুষের কল্পনার বিষয় ছিল, আজ তাহাও একে একে বাস্তবমূর্ত্তি ধরিতেছে। এমন দিনেও মানুষের সেই আদিম প্রবৃত্তি! যাহার ফলে, তাহারই সৃষ্ট নগর, জনপদ, বন্দর, শিল্পশালা সব কিছুই ধ্বংস হইবে। তাই তো যুগে যুগে মনস্বী, চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে বুদ্ধির আবেদন শুনাইয়াছেন। রামায়ণ-মহাভারত যুগেও বলিয়াছেন, আজও বলিতেছেন। এই সেদিনও রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, রলাঁ, রাসেল বলিয়া গিয়াছেন, 'যুদ্ধ সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিবে'। প্রথম মহাযুদ্ধের পর এই. অস্ত্র-পরিহারের কথা একবার উঠিয়াছিল, কিন্তু তাহা অঙ্কুরেই শেষ হয়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধই মানুষকে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছে ইহার ভয়ঙ্কর রূপ! আজ মানুষ বুঝিতে পারিতেছে, ধ্বংসের পথে কল্যাণ নাই।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ সনদে মানুষের যে চতুর্বর্গ স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছে, তাহার প্রধানতম অঙ্গ হইল, ভয়মুক্ত জীবন। এই ভয়মুক্ত, সহজ ও স্বচ্ছন্দ জীবন পৃথিবীতে ততদিন আসিবে না,যতদিন যুদ্ধ-ত্রাস মানুষের সম্মুখে অন্ধ নিয়তির মতো দোদুল্যমান থাকিবে। দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে অবিশ্বাস,ঈর্ষা ও বৈরিতার অবসানও হইবে না।

আরও একটা কথা চিন্তা করিবার আছে। মানুষ যুদ্ধ করে কেন? যুদ্ধ বন্ধ করিলেই শুধু হইবে না, যে জন্য যুদ্ধ করে সেই সঙ্গে তাহারও মৌলিক পরিবর্ত্তন ঘটাইতে হইবে। পরদেশ কবলিত করিয়া স্বদেশের ভৌমিক সীমানা বৃদ্ধি করা, অন্য দেশকে দমিত ও পদানত করিয়া তাহার লুণ্ঠিত বিত্তে নিজ দেশের তহবিল স্ফীত করা, অন্যকে ঘাড়ে ধরিয়া আপন মতের অনুবর্ত্তী করা, অন্য দেশকে অনগ্রসর রাখিয়া, তাহার বাজারে বাণিজ্যিক একাধিকার ভোগ করা, এইগুলিই হইল যুদ্ধের সুবিদিত কারণ। মারণাস্ত্রগুলির মতো এই মূলগত কারণগুলিরও সর্ব্বাঙ্গীণ অপসারণ প্রয়োজন এবং সে জন্য সমগ্র বিশ্ব-ব্যবস্থাই ঢালিয়া সাজা দরকার।

কিন্তু এই ঢালিয়া সাজিবার পাঠ লইতে হইলে বিশ্বের মানুষকে আসিতে হইবে 'এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে'। কারণ সে আদর্শ আছে কোনো দেশের মধ্যে নয়, কোনো রাষ্ট্রের মধ্যে নয়—আছে একজন মানুষের মধ্যে, তাঁহার নাম মহাত্মা গান্ধী। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস-সত্যাগ্রহ যদিও আজ ভারতবর্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ, কিন্তু তাঁহার আদর্শের মধ্যে যে মহাসত্য আছে, একদিন বিশ্বের চিন্তাধারাকে তাহা প্রভাবান্বিত করিবেই। তিনি কল্পনা করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়া অহিংসা-নীতির উপর নির্ভর করিয়া এমন একরাষ্ট্র-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবে, যাহার শক্তির প্রভাবে জগতের যুদ্ধমান জাতিরা পরাজয় স্বীকার করিবে। জগতের শক্তির দলাদলিতে ভারতবর্ষ তাহার যুদ্ধ-বিরোধী আদর্শ লইয়া এমন এক শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করিবে যে, সেই আদর্শের কাছে জগৎকে নতি স্বীকার করিতে হইবে। জগতের প্রত্যেক শিক্ষিত লোককে মনে-প্রাণে এই অহিংসার আদর্শকে গ্রহণ করিতে হইবে। অহিংস-সত্যাগ্রহীর যে আদর্শ তিনি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, সেই আদর্শ অবলম্বন করিয়া যে কোনো মুষ্টিমেয় লোক যে কোনো জাতির অন্তরে ভাব-বিপ্লব আনয়ন করিতে পারে। একান্ত মুষ্টিমেয় একদল সন্ন্যাসী, একদিন বিপুল শক্তিশালী য়ুরোপব্যাপী রোমকরাজ্যে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিতে পারিয়াছিলেন এবং যুদ্ধাস্ত্র না থাকিলেও, তাঁহারা কম শক্তিশালী হইয়া উঠেন নাই।

মোটামুটিভাবে বর্ত্তমান শতাব্দীর চিন্তাধারার ইহাই হইল সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

রামানুজ-মতে ব্রহ্ম ও জীবজগতের সম্বন্ধ

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

২

কার্তিক (১৩৬৭) সংখ্যায় রামানুজ-মতে, ব্রহ্ম ও জীবজগতের কি সম্বন্ধ, সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করা হয়েছে।

রামানুজ এই ভাবে কোনো ক্ষেত্রে ব্রহ্ম ও জীবজগতের ভেদ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁদের অভেদ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁদের ভেদাভেদের কথাই বিশেষ জোরের সঙ্গে বলেছেন ; পুনরায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভেদাভেদবাদকে অযৌক্তিক বলে তা গ্রহণও করেন নি। সেজন্য ধারণা হওয়া আশ্চর্য নয় যে, ব্রহ্ম ও জীবজগতের সম্বন্ধ বিষয়ে রামানুজীয় মতবাদ বিরোধদোষদুষ্ট। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, বিশেষ সাবধানতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করলে এই সম্বন্ধে রামানুজের মতবাদ নিম্নলিখিতরূপ বলে গ্রহণ করা যেতে পারে :

ত্রিতত্ত্ববাদী রামানুজের মতে, অচিৎ, চিৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে ভোগ্য, ভোক্তা ও নিয়ন্তা সম্বন্ধ। প্রথমতঃ, অচিৎ ভোগ্য, চিৎ ভোক্তা। জ্ঞানস্বরূপ জীবের কর্মফলভোগের ক্ষেত্র এই জগৎ—সকাম কর্মের ফল পুনর্জন্ম, নিষ্কাম কর্মের ফল মোক্ষ।

দ্বিতীয়তঃ, অচিৎ ও চিৎ নিয়ন্তা ব্রহ্মকর্তৃক নিয়ত নিয়ন্ত্রিত। সেদিক্ থেকে জীবজগৎ ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন। জীব অণুমাত্র, ব্রহ্ম বিভু ; জগৎ জড়, ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ। কিন্তু ভিন্ন হলেও তারা ব্রহ্ম থেকে অভিন্নও। ব্রহ্ম কারণ, অংশী, বিশেষ্য, আত্মা ; জীবজগৎ যথাক্রমে কার্য, অংশ, বিশেষণ ও দেহ। এবং কারণ ও কার্য, অংশী ও অংশ, বিশেষ্য ও বিশেষণ, আত্মা ও দেহ, ভিন্ন হয়েও অভিন্ন, কারণ তারা অঙ্গাঙ্গী ভাবে সংশ্লিষ্ট। দুটি ভিন্ন বস্তুর মধ্যে যদি এরূপ সম্বন্ধ থাকে যে, একটি ব্যতীত অপরটির অস্তিত্বই সম্ভবপর নয়, তা হলে সেই সম্বন্ধকে "অপৃথক্-সিদ্ধি" বা "অপৃথক্-স্থিতি" বলা হয়। যেমন, অংশহীন অংশী ও অংশিহীন অংশ সম্ভবপর নয় ; গুণহীন দ্রব্য ও দ্রব্যগুণও অসম্ভব ; দেহহীন আত্মা ও আত্মাহীন দেহও দেখা যায় না। সেজন্য অংশী ও অংশ, দ্রব্য বা বিশেষ্য ও গুণ বা বিশেষণ, আত্মা বা দেহ পরস্পর ভিন্ন হয়েও অপৃথক্ সিদ্ধ বা অপৃথক্স্থিত রূপে অভিন্ন বা এক। একই ভাবে, জীবজগৎ ও ব্রহ্মের অংশ, বিশেষণ ও দেহরূপে ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন হয়েও অপৃথক্সিদ্ধরূপে ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন। এস্থলে "অভিন্নত্ব" শব্দের অর্থ 'Identity নয়, 'Inseparability' বা 'Organic Relation', অর্থাৎ, পরস্পরাশ্রয়িত্ব। ব্রহ্ম ও জীবজগৎ একটি 'Organic, Synthetic, Concrete Whole'। অবশ্য ব্রহ্মের দিক্ থেকে, তাঁর জীবজগতে প্রকাশ বা পরিণতি সাধারণ প্রয়োজন বা অভাবমূলক নয়, তাঁর স্বভাব বা আনন্দমূলক ; এবং জীবের দিক্ থেকে, কর্মবাদানুসারে ন্যায়ধর্মানুসারী। তা সত্ত্বেও, জীবজগৎ যেমন সম্পূর্ণরূপেই ব্রহ্মের উপর নির্ভরশীল, ব্রহ্ম তেমনি সেই একই অর্থে জীবজগতের উপর নির্ভরশীল না হলেও, জীবজগৎ ও ব্রহ্ম ঘনিষ্ঠতম, অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে আবদ্ধ—এই অর্থেই ব্রহ্ম জীবজগৎ সমবায়ে একটি পরিপূর্ণ, অখণ্ড সত্তা ; এবং সেই দিক্ থেকেই ব্রহ্ম ও জীবজগৎ অভিন্ন। জীব যে ব্রহ্মের অংশ, এবং তদ্রূপে ব্রহ্ম থেকে ভিন্নাভিন্ন, তা প্রমাণ কালে (২-৩-৪২), রামানুজ এ বিষয়ে সুস্পষ্ট উল্লেখ করেছেন :

"প্রকাশাদিবৎ জীবঃ পরমাত্মনোঽংশঃ, যথা অগ্ন্যাদিত্যাদির্ভাস্বতো ভারূপঃ প্রকাশোঽংশো ভবতি, যথা গবাশ্ব-শুক্লকৃষ্ণাদীনাং গোত্বাদিবিশিষ্টানাং বস্তূনাং গোত্বাদীনি বিশেষণান্যংশাঃ, যথা বা দেহিনো দেবমনুষ্যাদির্দেহোঽংশঃ তদ্বৎ। একবস্ত্বেকদেশত্বং হ্যংশত্বম্, বিশিষ্টস্যৈকস্য বস্তুনো বিশেষণমংশ এব। তথা চ বিবেচকাঃ বিশিষ্টে বস্তুনি বিশেষণাংশোঽয়ম্, বিশেষ্যাংশোঽয়মিতি ব্যপদিশন্তি। বিশেষণ-বিশেষ্যয়োরংশাংশিত্বেঽপি স্বভাববৈলক্ষণ্যং দৃশ্যতে। এবং জীবপরয়োর্বিশেষণ-বিশেষ্যয়োরংশাংশিত্বং স্বভাবভেদশ্চোপপদ্যতে।........যথাভূতো জীবঃ, ন তথাভূতঃ পরঃ। যথৈব হি প্রভায়াঃ প্রভাবান্ অন্যথাভূতঃ, তথা প্রভাস্থানীয়াৎ স্বাংশাজ্জীবাৎ অংশী পরোঽপ্যর্থান্তরভূত ইত্যর্থঃ। এবং জীবপরয়োর্বিশেষণ বিশেষ্যত্বকৃতং স্বভাববৈলক্ষণ্যমাশ্রিত্য ভেদনির্দেশাঃ প্রবর্তন্তে। অভেদনির্দেশাস্তু পৃথক্সিদ্ধ্যনর্হবিশেষণানাং বিশেষ্যপর্যন্তত্বমাশ্রিত্য মুখ্যত্বেনোপপদ্যন্তে।"

অর্থাৎ, প্রভারূপ প্রকাশ যেরূপ অগ্নি, সূর্য প্রভৃতির

অংশ, গোত্ব যেরূপ গোর অংশ, দেহ যেরূপ দেহীর অংশ, সেরূপ জীবও ব্রহ্মের অংশ। সুতরাং বিশেষণও বিশেষ্যের অংশবিশেষই মাত্র। কিন্তু বিশেষণ ও বিশেষ্যের মধ্যে এরূপ অংশ-অংশী সম্বন্ধ থাকলেও, তাদের মধ্যে স্বভাবগত ভেদ আছে। একই ভাবে, জীব ও ব্রহ্মের মধ্যেও একপক্ষে স্বভাবভেদ নিশ্চয়ই আছে—জীব যে প্রকার, পরমাত্মা ঠিক সেই প্রকার নয়; যেমন প্রভা প্রভাবান্ বস্তু থেকে ভিন্ন, তেমনি জীবও ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন। অন্যপক্ষে, জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে অপৃথক্‌সিদ্ধিরূপ সম্বন্ধ আছে বলে, সেই অর্থে উভয়ে অভিন্ন। অর্থাৎ বিশেষণরূপ জীবের পক্ষে বিশেষ্যরূপ ব্রহ্ম থেকে পৃথক্ বা স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান অসম্ভব। সেজন্য জীব ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন।

কিন্তু এরূপে কেবল "অপৃথক্‌সিদ্ধি"রূপ তত্ত্বের উপর জোর দিলে এস্থলে ভ্রান্ত ধারণার উদ্রেক হতে পারে। যেমন আত্মা ও দেহের উপমার কথাই ধরা যাক্। প্রকৃতপক্ষে আত্মা ও দেহ স্বরূপতঃ ও ধর্মতঃ সম্পূর্ণ ভিন্ন, কেবল পরস্পরাশ্রয়ী রূপে অপৃথক্ মাত্র। সেজন্য যদি বলা হয় যে, ব্রহ্ম ও জীবজগৎ কেবল অপৃথক্‌সিদ্ধরূপেই অভিন্ন, তা হলে হয়ত মনে হতে পারে যে, ব্রহ্ম ও জীবজগৎ স্বরূপতঃ ও ধর্মতঃ ভিন্ন, কিন্তু জীবজগৎ ব্রহ্মাশ্রিত ও ব্রহ্মশাসিত বলে ব্রহ্ম থেকে অপৃথক্ ও সেই অর্থেই কেবল অভিন্ন। কিন্তু রামানুজের মতে, জীবজগৎ স্বরূপতঃও ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন, কেবল অপৃথক্‌সিদ্ধরূপে নয়।

এস্থলে রামানুজ "সামানাধিকরণ্য"রূপ তত্ত্বের উল্লেখ করেছেন (১-১-১), এবং ছান্দোগ্যোপনিষদের সুপ্রসিদ্ধ "তত্ত্বমসি" (৬-৮-৭ ইত্যাদি) বাক্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ব্রহ্ম ও জীবজগতের স্বরূপতঃ অভিন্নতা ও ধর্মতঃ ভিন্নতার বিষয় স্পষ্ট করে বলেছেন। "সামানাধিকরণ্যের" অর্থ হ'ল এই যে, দুটি আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্ন বস্তুর অভিন্নতা একটি বাক্যে প্রতিপাদিত হলে বুঝতে হবে যে, তারা একই অধিকরণে ন্যস্ত, নয়ত বাক্যটি বিরোধদোষদুষ্ট হয়ে পড়ে। যেমন একটি বাক্য আছে: "দণ্ডী কুণ্ডলী" (শ্রীভাষ্য—১-১-১)। এক্ষেত্রে দণ্ডধারী ব্যক্তি ও কুণ্ডলপরিহিত ব্যক্তিকে বিভিন্ন বলে মনে হলেও, তাঁরা একই অভিন্ন ব্যক্তির দুটি ভিন্নরূপ বিশেষণই মাত্র। অর্থাৎ, দণ্ডিত্বগুণবিশিষ্ট ব্যক্তি ও কুণ্ডলিত্বগুণবিশিষ্ট ব্যক্তি একই ব্যক্তি—অথবা উভয় ব্যক্তিই গুণতঃ ভিন্ন হলেও, স্বরূপতঃ অভিন্ন।

সেজন্য রামানুজ বলছেন:

"তত্ত্বমস্যাদিবাক্যেষু সামানাধিকরণ্যং ন নির্বিশেষবস্ত্বৈক্যপরম্ 'তৎ' 'ত্বম্'-পদয়োঃ সবিশেষ-ব্রহ্মাভিধায়িত্বাৎ। 'তৎ'-পদং হি সর্বজ্ঞং সত্যসংকল্পং জগৎকারণং ব্রহ্ম পরামৃশতি। 'তৎ' সমানাধিকরণং 'ত্বং'-পদঞ্চ অচিদ্‌বিশিষ্ট-জীবশরীরকং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়তি।" (১-১-১)।

রামানুজ "তত্ত্বমসি" (ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৬-৮-৭) বাক্যের অর্থও একই ভাবে করেছেন। শঙ্করের মতে, "তৎ ত্বম্ অসি" বা "তিনিই (ব্রহ্মই) তুমি (জীব)" এই মন্ত্রটির অর্থ এই যে, ব্রহ্মই জীব, অর্থাৎ ব্রহ্ম ও জীব অভিন্ন। এস্থলে "তৎ" ও "ত্বম্" এই দুটি শব্দের মুখ্য অর্থ: "ব্রহ্ম" ও "জীব" গ্রহণ করলে চলবে না, কারণ "ব্রহ্ম" ও "জীব" ভিন্নস্বভাব বলে তাঁদের ঐক্য বা অভিন্নতা অসম্ভব। যেমন, আমরা অনায়াসে বলতে পারি: 'ক'ই 'ক'। কিন্তু যদি আমরা বলি: 'ক'ই 'খ', তবে বাক্যটি বিরোধদোষদুষ্ট হয়ে পড়বে—কারণ 'ক' কেবল 'ক'ই হতে পারে, এক ভিন্ন বস্তু 'ক' অন্য ভিন্ন বস্তু 'খ' হতে পারে কি করে? 'ক' ও 'কয়ের' মধ্যেই কেবল অভিন্নতা সম্ভব, দুই ভিন্ন বস্তু 'ক'ও 'খয়ের' মধ্যে কোনোদিনও নয়। যেমন, আমরা বল্‌তে পারি "পদ্মই পদ্ম", কিন্তু "পদ্মই প্রস্তর" বলা বাতুলতাই মাত্র। একই ভাবে, "ব্রহ্মই জীব" বলাও স্ববিরোধী উক্তিই মাত্র। আমাদের বলা উচিত: "ব্রহ্মই ব্রহ্ম", অথবা "সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মই উপাধিরহিত ব্রহ্ম"। এরূপে শঙ্করের মতে, প্রত্যেক 'Judgment' বা বাক্যই Analytic ও Identity-Judgment, বা 'Subject-Predicate, বা উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের একার্থবিধায়ক। সুতরাং এস্থলে "তৎ"-র শব্দের অর্থ নিরুপাধিক ও সর্ববিশেষণরহিত ব্রহ্ম বা পরব্রহ্ম, "ত্বম্" শব্দের অর্থও নিরুপাধিক ও সর্ববিশেষণরহিত ব্রহ্ম বা পরব্রহ্ম। এই অর্থেই কেবল বিরোধদোষের কবলগ্রস্ত না হয়ে, আমরা অনায়াসে বলতে পারি: "তত্ত্বমসি" "তিনিই তুমি" "পরব্রহ্মই পরব্রহ্ম"।

এরূপে, শঙ্করের মতে যদি একটি বাক্যে দুটি আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন বস্তুর অভিন্নত্ব প্রতিপাদন করা হয়, তা হলে এই অর্থই বুঝতে হবে যে, ঐ দুটি বস্তু স্বরূপতঃ সত্যই অভিন্ন, কিন্তু দেশ-কাল-ধর্ম প্রমুখ উপাধিযোগে আপাততঃ ভিন্ন বলে প্রতীত হচ্ছে মাত্র। সেজন্য এই সকল উপাধি বর্জন করে কেবলমাত্র বস্তুস্বরূপ বা সত্তাকেই এস্থলে গ্রহণ করতে হবে।

কিন্তু রামানুজের মতে, শঙ্করানুযায়ী অর্থ স্বীকার করলে পুনরুক্তি দোষের উদ্ভব হয়। 'ক' যে 'ক', অন্য কিছুই নয়, তা ত সর্বজনবিদিত সত্য—সে কথা পুনরায় অনর্থক বলার প্রয়োজন কি? 'পদ্মই পদ্ম', 'রামই রাম'—

এরূপ বলাই বাতুলতামাত্র। সেজন্য দুটি আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন বস্তুর মধ্যে অভেদস্থাপনকারী বাক্যের এরূপ শাঙ্করীয় অর্থ গ্রহণ করা সম্পূর্ণ অনুচিত। বরং বলা উচিত "লোহিত পদ্ম", "রঘুপতিই সীতাপতি"। অর্থাৎ, লোহিতগুণবিশিষ্ট পুষ্পই পদ্মগুণবিশিষ্ট পুষ্প, রঘুপতি রামই সীতাপতি রাম অথবা রঘুপতিত্ব গুণবিশিষ্ট রাম ও সীতাপতিত্ব গুণবিশিষ্ট রাম এক ও অভিন্ন, অথবা উভয় রামই ধর্মত: ভিন্ন হলেও স্বরূপত: অভিন্ন। এস্থলে "রঘুপতিত্ব" ও "সীতাপতিত্ব" এই দুটি গুণ কিন্তু বর্জন করলে চলবে না, কারণ তা হলে সমগ্র বাক্যটি কেবলমাত্র অর্থশূন্য পুনরুক্তিতেই পর্যবসিত হবে। সেজন্য দুই ভিন্ন গুণবিশিষ্ট বস্তুর স্বরূপত: অভিন্নতাই এরূপ বাক্যের প্রকৃত অর্থ। সুতরাং রামানুজের মতে, বাক্য বা 'Judgments', Analytic, Indentity-Judgement নয়; Synthetic Identity-in-difference Judgment. অর্থাৎ, এরূপ বাক্যে একই বস্তুর দুটি বিভিন্ন গুণের কথা বলা হয়। সেজন্য "তত্ত্বমসি" বাক্যের প্রকৃত অর্থ এই যে, "তৎ" বা পরমাত্মাই "ত্বম্" বা জীবাত্মা। অর্থাৎ, সর্বজ্ঞত্ব প্রমুখ-গুণবিশিষ্ট ব্রহ্ম ও জীবত্বগুণবিশিষ্ট ব্রহ্ম এক ও অভিন্ন।

সেজন্য, রামানুজ, "সামানাধিকরণ্যের" সংজ্ঞা প্রদান করে বলছেন :

"প্রকার-দ্বয়াবস্থিতৈকবস্তুপরত্বাৎ সামানাধিকরণ্যস্য"।
(১-১-১)।

অর্থাৎ, একই বস্তুর দুই প্রকার অবস্থার মধ্যে যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধই হ'ল "সামানাধিকরণ্যম্।" অতএব জীব ব্রহ্ম থেকে ধর্মত: ভিন্ন হলেও স্বরূপত: অভিন্ন।

এরূপে, রামানুজের নানা আপাতবিরুদ্ধ উক্তির প্রকৃত সারার্থ সংগ্রহ করলে বলা চলে যে, তাঁর মতে :

(১) জীবজগৎ ব্রহ্ম থেকে ধর্মত: ভিন্ন। (২) কিন্তু ব্রহ্ম আধার বা আশ্রয়; জীবজগৎ আধেয় বা আশ্রিত; ব্রহ্ম অংশী বা সমগ্র সত্তা, জীবজগৎ অংশ মাত্র; ব্রহ্ম দ্রব্য বা বিশেষ্য, জীবজগৎ গুণ বা বিশেষণ; ব্রহ্ম আত্মা বা শরীরী, জীবজগৎ দেহ বা শরীর। সেজন্য জীবজগৎ ধর্মত: ভিন্ন হয়েও সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মাশ্রয়ী ও পৃথক্‌সত্তাহীন, এবং এই অর্থে ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন বা অপৃথক্‌সিদ্ধ। (৩) পুনরায়, জীবজগৎ ব্রহ্ম থেকে স্বরূপত:ও অভিন্ন।

রামানুজ এইভাবে বিভিন্ন দিক্‌ থেকে ব্রহ্ম ও জীবজগতের মধ্যে ভেদ, অভেদ ও ভেদাভেদ সবই বলেছেন : জীবের ক্ষুদ্র জীবধর্মের দিক্‌ থেকে, সে ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন; কিন্তু তার অন্তর্নিহিত ব্রহ্মস্বরূপের দিক্‌ থেকে, সে ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন; এবং পরিশেষে, এই ভাবে, সে ব্রহ্ম থেকে ভিন্নাভিন্ন।

প্রখ্যাত পণ্ডিত মাধবাচার্য তাঁর সুপ্রসিদ্ধ "সর্বদর্শন-সংগ্রহে" এই কথাই বলেছেন :

"কিমত্র তত্ত্বং ভেদ:, অভেদ:, উভয়াত্মকং বা। সর্বং তত্ত্বম্। তত্র সর্বশরীরতয়া সর্বপ্রকারং ব্রহ্মৈবাবস্থিতমিত্যভেদোঽভ্যুপেয়তে; একমেব ব্রহ্ম নানাভূতচিদচিৎপ্রকারং নানাত্বেনাবস্থিতমিতি ভেদাভেদৌ; চিদচিদীশ্বরাণাং স্বরূপ-স্বভাব-বৈলক্ষণ্যাদসংকরাচ্চ ভেদ:।"

(পৃ: ৪৫-৬, জীবানন্দবিদ্যাসাগর সংস্করণ)

অর্থাৎ, রামানুজ মতে, ব্রহ্ম ও জীবজগতের মধ্যে ভেদ, অভেদ ও ভেদাভেদ সবই আছে। প্রথমত:, সর্বপ্রকার বস্তুই ব্রহ্মের শরীররূপে অবস্থিত বলে, সর্বপ্রকার বস্তুই ব্রহ্মরূপে অবস্থিত; এবং এইভাবে, জীবজগৎ ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন। দ্বিতীয়ত:, একই ব্রহ্ম নানাবিধ—চিৎ ও অচিৎরূপে অবস্থিত বলে নানাভাবে অবস্থিত; এবং এই ভাবে, জীবজগৎ ব্রহ্ম থেকে ভিন্নাভিন্ন। তৃতীয়ত:, ব্রহ্ম ও জীবজগতের স্বরূপ ও স্বভাবের বৈলক্ষণ্য আছে ও ব্রহ্ম ও জীবজগৎ পরস্পর অমিশ্রিত এবং এই ভাবে, জীবজগৎ ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন।

স্বয়ং রামানুজ "শ্রীভাষ্যে" দু' একস্থলে (২-১-১৪) এবং মাধবাচার্য "সর্বদর্শন-সংগ্রহে" জীবেশ্বরের স্বভাব ও স্বরূপভেদের কথা বললেও, রামানুজ অন্যান্য স্থলে ব্রহ্ম ও জীবজগতের মধ্যে "অভেদ", "অনন্যত্ব", "তাদাত্ম্য" প্রভৃতির কথা বলেছেন। বিশেষ করে, "তত্ত্বমসি" বাক্যের অর্থ-প্রপঞ্চনা কালে তিনি স্পষ্টতম ভাবে বলেছেন যে, "তৎ" ও "ত্বম্" : ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে "সামানাধিকরণ্য" সম্বন্ধ, এবং এই সম্বন্ধের সংজ্ঞাদান করে, তিনি বলেছেন যে, একই বস্তুর দুটি ভিন্ন অবস্থা, বা দুটি বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট অবস্থার মধ্যে ঐক্য-সম্বন্ধই হ'ল সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধ। সেজন্য জীবজগৎ ঈশ্বরস্বরূপেরই রূপান্তর বা অবস্থান্তরই মাত্র বলে "তত্ত্বমসি" বাক্যে ঈশ্বর ও জীবজগতের অভেদ প্রতিপন্ন করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে, ঈশ্বর ও জীবজগতের মধ্যে স্বরূপ বা স্বভাবগত ভেদ অসম্ভব। সেজন্য রামানুজের মতে যে, ব্রহ্ম ও জীবজগৎ স্বরূপত: অভিন্ন, কিন্তু ধর্মত: ভিন্ন—এই মতই সমীচীন।

বস্তুত:, শাঙ্করীয় অভেদবাদ খণ্ডনের উৎসাহে রামানুজ অনেক ক্ষেত্রেই, স্বীয় বিশ্বাসের প্রতিকূলে, ভেদের উপর অন্যায় জোর দিয়েছেন, নি:সন্দেহ। কিন্তু সেজন্যই যে, তিনি ভেদবাদী বা জীবেশ্বরের স্বরূপভেদ অনুমোদন করেন—তা বলা অযৌক্তিক। উপরন্তু, অভেদবাদিগণের

বিরুদ্ধে উত্থাপিত সমস্ত আপত্তির পরও যে তিনি ভেদ অপেক্ষা অভেদের উপরই জোর দিয়েছেন, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর মতবাদের "বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ" নামটিতে। এই নামে "ভেদ" "দ্বৈত" শব্দের উল্লেখমাত্র নেই। এই বিষয়ে রামানুজ ও নিম্বার্ক মতবাদের মধ্যে প্রভেদ আছে।

যা হোক, রামানুজের মতে, "অপৃথক্‌সিদ্ধি" রূপ সম্বন্ধের দিক্ থেকে, জীবজগৎ ব্রহ্মের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ বলে ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন। কিন্তু "সামানাধিকরণ্য" রূপ সম্বন্ধের দিক্ থেকে, জীবজগৎ ব্রহ্ম থেকে স্বরূপতঃ অভিন্ন বলেই ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন। সুতরাং, এও বলা চলে যে, প্রথম সম্বন্ধটি দ্বিতীয় সম্বন্ধেরই ফলস্বরূপ। অর্থাৎ, জীবজগৎ ব্রহ্ম থেকে ধর্মতঃ ভিন্ন হয়েও স্বরূপতঃ অভিন্ন; এবং সেজন্যই ব্রহ্ম ও জীবজগৎ অপৃথক্‌সিদ্ধ বা অচ্ছেদ্য বন্ধনে চিরাবদ্ধ।

এরূপে রামানুজের মতে, ভেদের দিক্ থেকে তত্ত্ব তিনটি: ব্রহ্ম, চিৎ ও অচিৎ। কিন্তু চিৎ ও অচিৎ ব্রহ্মাত্মক বলে, অভেদের দিক্ থেকে তত্ত্ব মাত্র একটি: চিদচিদ্‌বিশিষ্ট ব্রহ্ম। যেমন, ব্যষ্টির দিক্ থেকে মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র ও পুষ্প—এই পাঁচটি তত্ত্ব। কিন্তু সমষ্টির দিক্ থেকে মূল-কাণ্ড-শাখা-পত্র-পুষ্প-বিশিষ্ট বৃক্ষ—এই একটি মাত্র তত্ত্ব।

সেজন্য রামানুজের মতবাদকে "বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ" বলা হয়। অর্থাৎ, "বিশিষ্ট" (বা ধর্মতঃ ভিন্ন) বস্তুর (স্বরূপতঃ) "অদ্বৈত" বা অভিন্নত্ব। অথবা, (নানাত্ব বা জীবজগৎ) "বিশিষ্ট" "অদ্বৈত" (বা এক ব্রহ্মই) চরম সত্য।

বিশ্ববিরহ

শ্রীকালিদাস রায়

বিশ্বনাথ, তব বিশ্বে তুমি বুঝি শাশ্বত বিরহী!
কত যুগ রবে তুমি এ বিরহ সহি?
ষড়ৈশ্বর্য অধিগত, এত তব প্রচণ্ড প্রতাপ
বহিতেছ কার অভিশাপ?
বুঝিবা প্রেমের রাজ্যে বিচিত্র বিধান,
সেথা তুমি অসহায় মোদেরি সমান!
জাগে অহরহ
গগনে গহনে মেঘে গিরিশৃঙ্গে তোমার বিরহ।
শুষ্কপত্র মর্মরিয়া বেণুবনে বহিছে বাতাস
সে ত তব মর্মভেদী তাপিত নিশ্বাস!
তোমার বিরহলিপি তারার অক্ষরে
নিশি নিশি ছল ছল জল জল করে।
তব অশ্রুজল
প্রপাত ধারায় নামে গিরিগাত্র ভেদি অবিরল।
তুমি যদি বিরহী না হবে
মানবজীবনে কেন এত আর্তি তবে?
তোমার মাথুর
করিতেছে সর্ব জীবেরে আতুর।

প্রিয়া কি তোমার অভিমানে
দূরে রহি তব মর্মে শল্য শেল হানে?
মানভঞ্জনের তব সব আবেদন
দূতীমুখে ব্যর্থ হয়, হয় না সে প্রিয়ার তোষণ।
কবি তুমি, গাহিতেছ বিরহের গান
নদীনদে তাই বুঝি গদগদ সকরুণ তান?
বরষায় মেঘদূত, হংসদূত রচিছ শরতে,
নিদাঘে পবনদূত অলিদূত বাসন্ত জগতে।
সেই গীতি অবিরত কর্ণে পশে আসি
অকারণে করিতেছে তাই বুঝি কবিরে উদাসী?
প্রিয়া যবে কণ্ঠলগ্না বক্ষ যবে তার দুরু দুরু,
তখনো তাহার মন তাই বুঝি করে উড়ু উড়ু।
এ বিরহ কবে হবে শেষ?
রহিবে না এ ভুবনে বিষাদের লেশ?
আনন্দময়ীর সাথে কবে তব হইবে মিলন?
শূন্যে নয়, করিবে হলাদিনী হ্রদে বিশ্ব সন্তরণ!

শিল্প সম্ভবা

(প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প)

শ্রীসুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বাড়ীটার সামনের মাঠটুকুতে একটা ছোট নিমগাছ, তার নীচে দাঁড় করিয়ে রেখে বাড়ী ঢুকেছে বীরেন। বৌ দেখাবে। অপরাধীর মত এধার-ওধার তাকাচ্ছি, খস্ খস্ একটা শব্দ হ'ল। দেখি বীরেন ডাকছে, এই দেখরে, তোর বৌমণি!

কোল-পাঁজা করে নিয়ে এসেছে বৌকে। একটা কাগজের নৌকোর মত করে মাটির ওপর তুলে ধরেছে। দু'হাত দিয়ে বেচারা তখন শাড়ি টানছে মহা অপ্রস্তুতের ভারে। সামলে নিয়ে প্রকৃতিস্থ হয়ে দাঁড়াল, বলল, ছি ছি!

—ভালো মানুষটি হয়ে এলে না কেন? বাবা থাকলেই বা। অপরাধ তো করছ না কিছু—

আরো কি সব বকুনি আওড়ে যাচ্ছিল বীরেন, হকচকিয়ে প্রায় স্তম্ভিত আমি। শিল্পীর হাতে-গড়া লক্ষী আর সরস্বতীর মূর্তি দেখেছি, কিন্তু মানুষের দেহে সে-রূপও আসতে পারে! একটা যেন সজীব আদর্শ প্রাণছন্দে লীলায়িত। দেবীমূর্তির মতোই গঠনবিন্যাস, মুখের ওপর তেমনি নির্মল, পবিত্র একটা ভাব। পানের মতো মুখে আমীলিত ঢলঢলে দুটি চোখ, বৃন্তাকার দুটি ভ্রূ সঙ্কোচে ঈষৎ আকুঞ্চিত। নারী-লাবণ্যের সে এক বিস্ময়কর স্থির-বিজুরী! বলতে লজ্জা নেই, সে চোখের দৃষ্টি মানুষকে মুহূর্তেই মোহিত করে।

—কি রে অমল, কথা বল! এর নাম সুমনা—তাকিয়ে থাকবি শুধু?

চমকে উঠলাম বীরেনের গলায়। সুমনা হাত তুলে নমস্কার করল। বললাম, আজ থেকে তা হলে বৌমণি।

বৌমণি বলল, কেমন বে-আক্কেলের হাতে পড়েছি দেখছেন? হঠাৎ কিছু একটা অনাছিষ্টি করা চাই। ভালো মানুষের মতো ডেকে নিয়ে এসে—আপনার কথা বলা নেই, কওয়া নেই—

তোমায় আসতে বলি নি?

মোটেও না। ইসারা করেছিলে শুধু, তাও আবার বাবা রয়েছেন পাশে।

হাসতে হাসতে মন্তব্য করলাম, ও এমনি বরাবর। কথা বলে কম, হঠাৎ কাজ করে বসে।

সুমনাও মিষ্টি হাসির বাতাস ছড়াল, এই ক'দিনেই তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি।

আচ্ছা, আপনাকে কি বলে ডাকব বলুন তো? কবি ঠাকুরপো?

বীরেন আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে, বললাম, সব পরিচয়ই তা হলে জেনে ফেলেছেন?

—সব! ডান হাতটা মুখের কাছে উলটে ধরে সুমনা অভিজ্ঞ সুরে বলল, বিশেষ করে আপনার কথা। দেখেই চিনেছিলাম।

স্ত্রীর বিনুনিটায় টান মেরে বীরেন টিপ্পনী কাটল, এত শাই, জানিস অমল! উল্টোডিঙ্গির সেই ন্যারো একটা লেনে থাকত তো! মনটা তেমনি একদম পুরনো, কিছুতে বের হবে না। কেবল কাজ, কাজ।

বারে! মেয়েমানুষের কাজ থাকবে না? দেখুন কবি-ঠাকুরপো, বন্ধুর বুদ্ধির দৌড় দেখুন। কিন্তু তার পরই ঘাড়টা পাশ ফিরিয়ে কি যেন দেখল সুমনা। ত্রস্ত-ভাবে বলে উঠল, বাবার বেড়াতে যাবার সময় হল বোধ হয়। এমন চুরি করে নয়, ভেতরে আসুন না। একটু চা খেয়ে যান অন্ততঃ।

অনুনয়টা সেদিন রাখতে পারি নি, কাজের পথে পাকড়াও করেছিল বীরেন। বিয়ের সময় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম, যেতে পারি নি। তার পর এই হঠাৎ দেখা হয়ে গেল তাদের শহরতলীর বাসার কাছে। একদম টেনে নিয়ে এল।

গিয়েছিলাম দিন কয়েক পর। সন্ধ্যা হয় হয়, ভেতর থেকে শাঁখ বাজার শব্দ পেয়ে দরজার কাছটায় দাঁড়িয়ে পড়লাম। একটু পরে এলেই ভাল হত। পরক্ষণেই সুমনার কথা শোনা গেল। বাবা, আপনার ছড়ি চাদর এনে দি। বেড়াতে যাবেন তো?

কিন্তু আজ যে মাস-কাবারী বাজার করার কথা মা!

বুঝতে পারলাম, নগেনবাবুর গলা। অনেকবার এসেছি এ বাড়ীতে, বারান্দায় বসে বোধ হয় অলসভাবে গড়গড়া টানছেন তিনি। সুমনা বলে উঠল, তা হোক বাবা। আগে একটু বেড়িয়ে আসুন, বাজার নয় কাল বিকেলবেলা হবে।

স্বচ্ছল সংসার, দেশে বাড়ী জমি আছে, এখানেও ভাল চাকরি করেন। বার তিনেক ছেলে ফেল করবার পর কিছুদিন হ'ল নিজেদের আপিসে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। ঐ একটিমাত্র ছেলে, সংসারে আর কেউ নেই। শুনেছিলাম কয়েক বছর ধরে ছেলের বউ খুঁজছিলেন, সুন্দরী মেয়ে চাই। দালালদের যাতায়াতে বীরেন একদিন অতিষ্ঠ হয়ে বলেছিল, তোর বাড়ীতে আমাকে পেয়িং-গেষ্ট করবি?

অর্থাৎ

ঘরে আর টেঁকা যায় না। কেবল বিয়ে, বিয়ে, বিয়ে। বিয়ে আবার মানুষে করে?

দাঁড়া না। বড়লোক বাপের এক ছেলে, টু' পাইস্ পাবি তো!

বীরেন হাতটা ধরে ফেলে বলেছিল, না ভাই, কিছু না। বাবার বাতিক, স্রেফ একটি ছবির মতো মেয়ে চাই। তা গরীব ঘরের হলেও চলবে। দরকার হলে খরচ করবে বরং।

শেষে তাই হয়েছিল। কপাল জোর সুমনার, নিম্ন-মধ্যবিত্তের উৎকণ্ঠা দূর করে এখানে প্রতিষ্ঠিত হ'ল। হাঁ, প্রতিষ্ঠিত হওয়াই, শুনেছি এরই মধ্যে সুনাম অর্জন করেছে সুমনা। মিষ্টি ব্যবহার, সুন্দর সংসার চালানো, শ্বশুরের প্রতি শ্রদ্ধা—এসব টুকরো কথা ইতিমধ্যেই আমার কানে এসেছে।

ছড়ি এবং জুতোর শব্দ পেলাম। আর দাঁড়িয়ে থাকা চলে না, ডেকে ফেললাম, বীরেন!

দু' পা এগিয়ে এসেছি নগেনবাবুর সঙ্গে মুখোমুখী। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই বললেন, অমল! এসো, তোমার শরীর খারাপ শুনেছিলাম, ভালো আছ তো?

—আজ্ঞে হাঁ।

—সুমনা, ও সুমনা অমলকে নিয়ে যেয়ে বসাও তো মা!

চলে গেলেন তিনি। কেমন অস্বস্তি বোধ করলাম, বাড়ীতে আর কেউ নেই নাকি? কিন্তু না, শুনতে পেলাম, বৌমণি ডাকছে বীরেনকে, এই, ওঠ না। কী আশ্চর্য, ভর-সন্ধ্যের সময় ঘুম। বাইরে কবি-ঠাকুরপো দাঁড়িয়ে যে—শুনছ?

দু' হাতে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বীরেন বের হয়ে এল, তুই এসেছিস তা হলে! রবিবারের বিকেলটাও যখন পেরিয়ে গেল, ভাবলাম ভুলে গেছিস।

পেছনে এল বৌমণি। স্মিতহাস্তে উজ্জ্বল মুখটি। সাদা-মাটা সাজ, একটু কৃত্রিমতা নেই কোথাও। বীরেনের কথাটা আবৃত্তি করে বলল, ভাবলাম ভুলে গেছিস! কেমন মানুষ দেখেছেন? চেয়ার দেখাল সুমনা, হাসতে হাসতে বসলাম।

আরেকটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বীরেন বলল, জীবনটা কিস্-সু এখনো বোঝে না রে ও। কেবল খাটে। কুক্-টাকে পর্যন্ত ছাড়িয়ে দিয়েছে, টিঁকে আছে মাত্র একটা ঠিকে ঝি।

টানা টানা চোখের সামনে ডান হাতটা তেমনি তুলে ধরে সুমনা বলল, দেখুন তো! তিনটি মানুষের সংসার, এ আবার খাটুনি! নোংরা একটা ঠাকুরের হাতে পোড়া-সেদ্ধ না খেলে যেন বাঁচে না মানুষ! রান্নাঘরের দিকে চলে গেল সুমনা কথা বলতে বলতে।

বীরেন জের টেনে গলাটা একটু চড়িয়ে বলে চলল, কিস্-সু বোঝে না জীবনটা কি। লাইফ ইজ্ বাট এ ড্রীম। এমন জীবনে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে, বসে বসে খাবার মতো সৌভাগ্য চাই, বুঝলে?

ও-ঘর থেকে কলকণ্ঠে উত্তর এল, ঘুম-সিদ্ধ মহাপুরুষ, ঘুমোও তুমি!

সাধে কি বলে মেয়েমানুষ! বীরেন উন্নাসিকভাবে মাথাটা দোলাল, ওদিকে ইঙ্গিত করে বলল, জানিস অমল, আমার বদ্ধ ধারণা হয়েছে, বুদ্ধি নামে বস্তুটার মেয়েদের মগজে সত্যিই বড় অভাব।

ও-পক্ষ থেকে আর কোন উত্তর এল না, কেবল চামচ-প্লেটের শব্দ পাওয়া গেল।

বললাম, বড় পণ্ডিত হয়ে উঠেছিস তো!

—ঠিক বলছি। জীবন ওদের ফাঁকি দিচ্ছে, আর সেই ফাঁকিটাই কিনা ওরা লাক্সারি মনে করে নিয়ে পরম আনন্দে খেটে মরছে। বড় পিটি ফিল করি, বুঝলি?

বুঝলাম, বীরেন সুখী হয়েছে। অনেক ভাগ্যের জোরে এমন বৌ পেয়েছে, ছন্নছাড়া বীরেন এতদিন পরে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে, জীবন-বেদ পর্যন্ত একটা খাড়া করে ফেলেছে। সুখী হয়ে বাঁচার জীবন-বেদ। খুব আনন্দ হ'ল ওর এমন ভালোবাসা পাবার সৌভাগ্যে। অচেনা এক গৃহের অবজ্ঞাত একটি মেয়ে আর একটি সংসারের ওপর অমৃত-পরশ বুলিয়ে দিয়েছে; মোহ নেই, কুয়াশা নেই, শুধু স্নিগ্ধ, শান্ত ভোরের বাতাসের আমেজ বীরেনের ছোট সংসারে। বার থেকে ভেতরে ঢুকলে সহজেই চোখে পড়ে একটা ছড়ানো স্নিগ্ধতা।

বীরেনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে অমনোযোগী হয়ে পড়েছিলাম, ভাবছিলাম এসব। সুমনা চা নিয়ে এল,

প্লেটে ভাজা কচুরি আর ছানার সন্দেশ। হাতে তুলে বললাম, এসব বাড়ীতেই করা বোধ হয়?

—বোধ হয় কি রে? উচ্চৈস্বরে হেসে উঠল বীরেন। সুমনার হাতটা খপ্ করে ধরে ফেলে বলল, শুঁকে দেখতে পারিস এখনো।

এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিল হাতটা বৌমণি, চোখ পাকিয়ে শাসিয়ে উঠল, কোন কাণ্ডজ্ঞানই কি নেই তোমার?

বীরেন কিন্তু দমল না, দুষ্টুমি-ভরা চোখে জবাব দিল, অমলের কাছে ভদ্রতা? কতদিন এক বিছানায় ও আর আমি শুয়ে কাটিয়েছি জান? এখন না হয়—

আমি বীরেনকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, সত্যি বৌমণি, ওর কোন পরিবর্তন হ'ল না। বড় একরোখা। মনে আছে বীরেন, তোর সেই দৌলতপুরের পুকুরটায় পঞ্চাশ বার এপার-ওপার করে সাঁতার দেওয়ার কথাটা? সেই মাঘ মাসের হি হি শীতে?

চায়ে চুমুক দিয়ে হাসল বীরেন, বলল, একটু একটু।

বৌমণি বসে পড়ে বলল, বলুন না ব্যাপারটা! বে-আক্কেলের ইতিহাস তো?

—না, সরলতারও। জীবনভোর বিশ্বাস করে এসেছে সকলকে, আর কথা রাখে প্রাণ দিয়ে। একাগ্রভাবে তাকিয়ে রইল সুমনা। বললাম, তখন আমরা নতুন কলেজে ঢুকেছি, থাকি একটা প্রাইভেট মেসে। শীতের রাতে বিছনায় লেপ জড়িয়ে সবাই মিলে আড্ডা হচ্ছে। রমেন বলে একটি ফাজিল ছেলে বলে উঠল, না থেমে এখন ঐ পুকুরটায় কেউ পঞ্চাশ বার এপার-ওপার করতে পারিস?

বীরেন বলে উঠল, বাজি?

—পঞ্চাশটা সিঙ্গাড়া।

ব্যস, চলল বীরেন। কথা মানেই পাকা কথা। আমরাও গেলাম পেছনে পেছনে মজা দেখতে। কিন্তু বার কয়েক পারাপার করতেই ব্যাপারটা সুবিধের ঠেকল না। বীরেন ওপারের দিকে মুখ করতেই কাঁপতে কাঁপতে আমরা পালিয়ে এলাম চুপিসারে। ঘণ্টাখানেক চলে গেছে, কি তারও বেশী। ভাবলাম, বীরেন পালিয়ে বেঁচেছে, আমাদিকেও বাঁচিয়েছে। ও হরি, দমাদম ধাক্কা দরজায়! শব্দের ভয়ে খুলতে হ'ল খিলটা।

—সিঙ্গারা দাও, বলল বীরেন। তখনো ভিজে কাপড় গায়ে লেগে আছে।

রমেন ভয়ে ভয়ে বলল, এখন কোথায় পাব সিঙ্গাড়া, এই রাত দুপুরে?

আলবাত দিতে হবে, এখনই। বলেই বীরেন টান-মেরে ওঠাল রমেনকে। বেচারা কাঁপতে কাঁপতে গেল দোকানীর কাছে। সঙ্গে আমরা দর্শক। ঝাঁপ নামিয়ে শুয়ে পড়েছে সব। ওঠালাম ডাকাডাকি করে। তার পর ভাজানো হ'ল পঞ্চাশটি সিঙ্গাড়া।

এতক্ষণ যেন একনিঃশ্বাসে শুনে গেল গল্পটা সুমনা। একটা ঢোক গিলে শুষ্ক গলায় বলল, সব কটাই—

—ওই পেল। মেসের ঘরে বসে বসে।

বীরেনের দীর্ঘ দেহটির দিকে একবার চোখ বুলিয়ে দাঁড়াল সুমনা। বলল, তা বুঝতে পারছি এতদিনে।

তার পর?

একটি কুঁজো জল। তার পর স্বচ্ছন্দ নিদ্রা।

বীরেন এবার মুখ ফেরাল। বলল, নিন্দে করছিস বউয়ের কাছে?

বাইরের উঠোনটুকুতে আবছা অন্ধকার। ঘরে ঘরে আলোর দেয়ালি, সেই আলো-অন্ধকারের মাঝে বৌমণি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ চোখ তুললে মনে হয়, পেছনের আবছা অন্ধকারের পটভূমির মধ্যে একটি জ্যোতির্ময় দেবীমূর্তি ঈষৎ আভঙ্গঠামে বিরাজ করছেন মৃণাল-দণ্ডের ওপর প্রফুল্ল একটি পদ্মের মত। একটা হাত বীরেনের চেয়ারে হেলানো, বঙ্কিম দেহবল্লরী বিশেষ একটা ভাবে স্থির হয়ে আছে। অগ্নিকণার মতো উজ্জ্বল কিন্তু দেবীর মতোই শান্ত, কোমল! ভাগ্যবান্ বীরেন যে এমন নারীরত্ন ঘরণীরূপে লাভ করেছে! কোন ফাঁক নেই, শুভ্র শিশিরকণার কমনীয়তা নিয়ে সুমনা প্রতিষ্ঠা করেছে তার ঘরে প্রেম আর শান্তি। চোখ নামিয়ে নিলাম। বৌমণি লক্ষ্য করল বোধ হয়, হাসল একটু মুখটিপে। সংক্ষেপে বলল, পুরুষদের বিশ্বাস নেই, ওরা সব করতে পারে।

প্রশ্ন করলাম, তার মানে?

বীরেন বলল, দেখ কেমন বে-আক্কেলে বৌ নিয়ে ঘর করি!

সকলেই হেসে উঠলাম। বীরেন ওর কথাই এমন সময় বুঝে ফিরিয়ে দিয়েছে!

সভা ভাঙল সেদিন। দরজার কাছে এগিয়ে দিয়ে বৌমণি বলল, মাঝে মাঝে আসবেন কবি-ঠাকুরপো। দেখলেন তো কেমন লোককে নিয়ে—

এবার বৌমণিই হাসল সবার আগে।

বেশ কয়েক মাস দেখা নেই এর পর বীরেনের সঙ্গে। নানা কাজে জড়িয়ে পড়েছি, সময়ও হয় নি যেতে। আপিস ফেরতা কলেজ স্কোয়ার হয়ে আসছি, দেখি, এক-

রাশ সওদা নিয়ে বীরেন চলেছে। নেমে পড়লাম বাস থেকে। পশলা পশলা প্রশ্ন ছড়াল বীরেনই: কোথায় ছিলাম এ্যাদ্দিন, কেন যাই নি, বৌমণি রাত-দিনই বলে আমার কথা, ইত্যাদি। তার পর একটু কন্‌ফিডেন্‌সিয়াল হবার চেষ্টা করে বলল, একদম ছেড়ে দেয় না ভাই। ঐ একটুকু যে আপিস যাওয়ার ছুটি। তাতে কিন্তু রেহাই নেই। আপিস যেতেই হবে, কামাই করা চলবে না। এমন ভীষণ সংসারী হয়ে পড়েছে, কি হয়ে উঠেছে ভাই—যাবি একদিন? তার পর গলার স্বরটা খুব নামিয়ে বলল, দেখাব তোকে আইডিয়াল প্রেয়সী কাকে বলে!

যাব, কিন্তু এ-সব কি কিনেছিস?

দেখবি? আয়, চা খাই একটু। এগুলো কিনবার জন্যেই আজ একবেলা ছুটি নিয়েছি আপিস থেকে।

একটা কাফের একটেরে বসলাম দুই বন্ধু। পাঞ্জাবী, ধুতি, চাদর—এ-সব খুলে দেখাল বীরেন। বলল, ওর কে একজন হেমন্তদার জন্মদিন, তাই উপহার কিনতে বলেছে। না হলে কি এতক্ষণ বাইরে থাকতে পারতাম!

হেমন্তদা?

ওঃ, জানিস না তুই! মাঝে মাঝে চিঠি দিতেন সুমনাকে। এখন বদলি হয়ে এসেছেন কলকাতায়। বাসাও পেয়ে গেছেন একটা আমাদের পাড়াতেই। বেশ সুন্দর শান্ত লোকটি। আলাপ করিয়ে দেব তোর সঙ্গে। চায়ে একটা চুমুক দিয়ে ছোট একটি প্যাকেট খুলতে লাগল বীরেন, বের করল খানকয়েক বাংলা ইংরেজী বই। বড়লোকের ছেলে, আর যাই হোক, বীরেনের বই কেনার বদ অভ্যাস ছিল না কোন কালে। বিস্মিত-ভাবে তাকাতেই ও লজ্জিত হ'ল। বলল, আর্ট সম্বন্ধে ক'টা বই কিনলাম। ঐ সাবজেক্টটা একটু ষ্টাডি করব ভাবছি। বাড়ীতে ঈজেল চড়িয়েছি একটা, ছবি আঁকব। অবিশ্যি তুই জানিস দু'দিন আর্ট-স্কুলে ঘুরেছি একদিন। মাঝেমাঝে সুমনা এমন একটা ভঙ্গি করে দাঁড়ায় কিছুতে সেটা তুলিতে ধরতে পারছি না। তুই হয়ত হাসছিস অমল, কিন্তু—

—হঠাৎ এত বছর পরে আবার এসব ধরলি?

ধরলাম মানে—একটু সঙ্কোচে দম নিল বীরেন। বলল কুণ্ঠিতভাবে, হেমন্তবাবু খুব শিল্প-রসিক, তারই দেখে সখ গেল আর কি! আর সুমনার যে এমন একটা আর্ট-এর সেন্স আছে জানতাম না ভাই। দুই ভাই-বোনের আলোচনা যদি একদিন দেখতিস, তোরও ইচ্ছে হ'ত অমল এ সম্বন্ধে কিছু পড়াশুনা করতে এখন মনে হচ্ছে আর্ট-স্কুলটা ছেড়ে দিয়ে ঠিক ভাল করি নি। এর পরই ডুবে বীরেন সুমনার বন্দনা-গানে। এমন মেয়ে, কি আশ্চর্য গোছ-গাছ সংসারের! এত কাজের মধ্যেও কি অদ্ভুত হাসে আজকাল, কিরকম একটা পোজ নিয়ে দাঁড়ায়, তুই যদি দেখতিস! চল না? বাবাকে আবার আজকাল পাটনায় প্রায়ই যেতে হচ্ছে কাজে, এখন বাড়ী ফাঁকা, যাবি?

হঠাৎ সুরটা কেটে গেল কি জানি কেন, হঠাৎ একটা অশ্বস্তি লাগল মনে। বীরেনের সংসারে তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব বোধ হয় সহ্য হ'ল না। হয়ত আমার এ মনোভাব উচিত ছিল না। কিন্তু উচিত অনুচিতের আকাঙ্ক্ষিত রাজপথেই তো মনের বিচিত্র ধারা সব সময় চলে না। একটু ভেবে নিয়ে এমনি বলে ফেললাম, এক কাজ কর বীরেন। তুই একটু বিরহ-যন্ত্রণা ভোগ কর। তোদের প্রেম আরো গভীর হবে, পরস্পরকে আরো ভাল-বাসতে পারবি।

হো হো করে হেসে ফেলল বীরেন এই এত লোকের মাঝেই। অনেকেই অবাক হয়ে তাকাল আমাদের দিকে চায়ের পেয়ালা নামিয়ে। অপ্রতিভ বীরেন ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলল, ঠাকুরটাকে কেন ছাড়িয়েছে জানিস্? বাড়ীটাকে একটু লোন্‌লি করবার জন্যে। আরো ভালবাসা?

—তা হোক, বৌমণিকে কিছুদিনের জন্যে একটু সরিয়ে দে না!

এর পর তা হলে বাড়ীতেই ফসিল বনে গিয়ে পড়ে থাকতে বলিস?

দোষ কি?

কিন্তু তা হবে না ভাই। ও আমাকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারে না। একটা দিনের জন্যেও না। কতবার নিতে এসেছে ওর বাপের বাড়ী থেকে—

যায় নি?

অসম্ভব। একটু চুপ করে বীরেন গর্বভরে বলল, তোর বৌমণি কি একটা যাদু জানে ভাই। বাবা পর্যন্ত ছাড়তে চান না। কলকাতায় যখন থাকেন, আপিস যাবার সময় একবার ডাকবেন মেয়ের মত করে, কাছে এলে পর বের হবেন। ওর মুখ খুব পয়মন্তর। আমরা, মানে বাবা আর আমি দু'জনেই একটা প্রমোশন পেয়ে গেলাম বিয়ের তো মাসখানেক মধ্যেই।

বললাম, বেশ তো। কিন্তু বিয়ের পর যদি দু'চার ডজন চিঠি বৌকে না লিখলি, তবে আর প্রেম হ'ল কোথায়! তোদের ভালবাসা একেবারে একঘেয়ে, নিরামিষ!

কিন্তু ওকে বলব কি করে বল দিকি ?

পারবি না ?

চুপ করে রইল বীরেন। বুঝতে পারলাম শুধু প্রেম নয়, স্নেহ দিয়ে সুমনা জয় করেছে সকলের হৃদয়। হেমন্তবাবুর আবির্ভাব এবং বীরেনের সংসারে তার নাটকীয় প্রভাব, এই সব কারণে মনে প্রথমটা খট্‌কা লেগেছিল, কিন্তু ভুলের কুয়াশা উড়ে গেল ক্রমশঃ। অনুতপ্ত হলাম, কিন্তু আশ্বস্ত হবার আনন্দ সব ছাড়িয়ে উঠল। সহজ সরল মানুষ বীরেন, নীলাভ এক টুক্‌রো নির্মল আকাশ ওর পৃথিবী ঢেকে রাখুক, চির-বসন্ত বিরাজ করুক ওর ঘরে, ওর ঘরণীর আয়ত আঁখি-পল্লবে।

কিন্তু এ পৃথিবীর জীবন আমাদের আশার মাপে গড়ে ওঠে না। চলতি গাড়ী কখন কতকটা কাদাজল ছিটিয়ে দেয় পরিষ্কার জামা-কাপড়ের ওপর, নষ্ট হয়ে যায় যাত্রা-পথের সবটুকু আনন্দ। বৌমণির পরবর্তী কাহিনী লিখতে যেয়ে এই কথা মনে হচ্ছে বার বার। বীরেনের সঙ্গে আর জীবনে দেখা না হলেই বোধ হয় ভাল হ'ত, কিংবা পৃথিবীর অন্য কোন প্রান্তে যেয়ে বাস করতাম! ধুলোর আস্তরণ, কাদা-জলের ছাট, এ-সব দেখে দুঃখ পেতে হ'ত না।

কিন্তু নিয়তিকে খণ্ডান যায় না, ভাগ্যকে ঠেকাবে কে!

ছিলাম বেশ কিছুদিন চুপচাপ নিজের মধ্যে। কি একটা কাজে ওদিকের শহরতলীতে গেছি, সেদিনও রবিবার। চললাম ঘুরতে ঘুরতে সেইখানেই। বৌমণি-দের বাড়ীর দরজায় কড়া নাড়লাম। চাকর দরজা খুলে দিল। ভাবলাম বীরেন তা হলে সুমনাকে শান্ত করেছে কাজের চাপ থেকে, একটা চাকর বহাল করেছে যা হোক! প্রশ্ন করলাম, বীরেন আছে? বৌমণি?

লোকটা হাঁ করে রইল খানিক। বলল, মেয়েলোক তো নেই এখানে, এক বাবু আছে। ডাকব?

দরজায় যেন হোঁচট খেলাম। কথা বের হ'ল না মুখ দিয়ে, সরাসরি ভেতরে এলাম। একটা আঙুল দিয়ে সে দেখাল ঘরটা, ঐ দাদাবাবু, বলে, রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

জুতোর শব্দ করে উঠে এলাম। পাশের শোবার ঘরে বীরেন ছবি আঁকছে। ঈজেলের সামনে একটা চেয়ারে তুলি হাতে বসে তন্ময় হয়ে। পড়ন্ত বেলাতেই একটা ল্যাম্প-ষ্ট্যাণ্ড বোর্ডের ওপর লালচে আলো ফেলে তেমনি নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে। ঘরময় কাগজ ছড়ানো, নানা শিল্পকলার ছবি-সমন্বিত বই খোলা পড়ে। ঘরে

ঢুকতে পর বীরেনের জ্ঞান হ'ল। তুলি-হাতে ঘাড় ফেরাল, বলল, অমল! আয়।

বৌমণি?

সে তো নেই!

নেই?

আমার কথায় গুরুস্বরে হেসে ফেলল বীরেন, নেই মানে মরে নি রে, বাপের বাড়ী গেছে। তুই একদিন পাঠাতে বলেছিলি, বিরহের কাব্য লেখবার জন্যে। সে নিজে থেকেই গেল ভাই। কবিতা তো আসে না, তাই ছবি আঁকছি। তুলিটা ধরে বসে বীরেন। একটু থেমে বলল, একটা কবিতা লিখে দিবি?

বসে পড়েছিলাম অগোছালো ঘরের মধ্যে, কিছু বলতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হ'ল, কেন গেল বৌমণি। যে একদম বাড়ী থেকে নড়তে চাইত না, তার যাওয়া একটু হেঁয়ালি বই কি! তবু সাহস হ'ল না জিজ্ঞাসা করতে। তাই অন্য প্রসঙ্গে চলে গিয়ে প্রশ্ন করলাম, কাকাবাবু কোথায়?

বাবা তো পাটনায়। ওখানের আপিসটা নতুন কিনা, বাবাকেই তাই পাঠিয়েছে ইন্‌-চার্জ করে। আসেন মাঝে মাঝে—তার পর কি ভেবে নিয়ে বীরেনই বলে ফেলল, আচ্ছা, মেয়েদের বাক্সে কি থাকে জানিস?

কেন বল ত?

—সেদিন ওর শরীরটা খারাপ। আপিস যাবার সময় দেখি শুয়ে পড়েছে। ভাবলাম, নিজেই জামা-কাপড়টা বের করে নি, ওকে আর কষ্ট দেব না। কিন্তু বাক্সের ডালা খোলার শব্দে ও এমনি চেঁচিয়ে উঠল, কি কি করে, আমি থ' হয়ে গেলাম। টলতে টলতে উঠে গিয়ে বের করে দিল জামা-কাপড়। কিন্তু কোন কথা যেন বলতে পারল না।

কবে গেল?

সেই দিনই। বিকেলে এসে দেখি ও তৈরী একে-বারে। সহজ ভাবে হাসল কিন্তু, সেই আগেকার মত। বলল, একবার বাপের বাড়ী থেকে ঘুরে আসি।

আমার দিকে না তাকিয়েই বীরেন কথা বলে যাচ্ছিল। কি একটা ভাবতে ভাবতে বলল, বাচ্চা-টাচ্চা হবে নাকি যেন। তাই আমিও ভাবলাম, একটু চেঞ্জ দরকার। কি বলিস?

কি বলব আমি! কেন গেল সুমনা এমন হঠাৎ! নিজেকেই প্রশ্ন করতে লাগলাম।

বীরেন কিন্তু বোধ হয় ভুলে গেল এসব। ছবিটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলল, আচ্ছা, দেখ ত, তোরা তো

কবি, সুমনার দাঁড়াবার সেই পোজটা ছবিতে ধরতে পেরেছি নাকি? বিশেষ করে সেই লাভিং ভাবটা।

বিমূঢ়ভাবে তাকিয়ে রইলাম। ঈজেলের ওপর ক্যানভাসটার কয়েকটা রঙবেরঙের আঁকিবুঁকি, হলদে আর গোলাপী তুলির আঁচড়ই বেশী। এ কোন্ ধরনের ছবি এঁকেছে বীরেন! রেখা আছে, রঙ তো আছেই, রসানুভূতিও নিশ্চয় রয়েছে, কিন্তু রূপ নেই এক কণাও। শিল্পী নেহাৎ অপটু, সৃষ্টি-কৌশল এবং শিল্প-বিজ্ঞান কিছুই আয়ত্তে আনতে পারে নি। কিংবা হয়ত সে ঠিক এখনো মনের মধ্যে পায় নি তার শিল্পের বিষয়বস্তুকে। ফলে সে অন্ধকার পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে; দূরে তার নাগালের অনেক বাইরে জলছে আলোক বর্তিকা, তার সুমনা। ঠারে ঠারে তাকে ব্যঞ্জনা দিতে গিয়ে ক্যানভাসময় ঠোক্কর খেয়েছে শুধু। ব্যঞ্জক আর ছান্দসিক ছবির একটা বিকৃত মিশ্রণ ঘটিয়ে সাফল্য বলে বোধ হয় কিছুটা তৃপ্তিলাভ করেছে। ওকে সান্ত্বনা দেবার জন্তে বললাম, বেশ হয়েছে তো!

বাঁ-হাত দিয়ে ছবিটা আরো একটু খাড়া করে দিল বীরেন। অভিজ্ঞ চারু-শিল্পীর মতো মুখের ভাব করে বলল, না, বোধ হয় ঠিক পারি নি। সেই কেমন একটা বেশ বাঁকা হয়ে ডান-হাতটা উল্টে তুলে ধরে হাসত অদ্ভুতভাবে, ঠিক তেমনটি বোধ হয় পারলাম না।

—তোর তো বেশ আর্টের সেন্স হয়েছে দেখছি। পড়াশুনাও তো যথেষ্ট করছিস্। তুই ঠিক পারবি।

বীরেন এতক্ষণ পর একটু হাসল; কিন্তু আগেকার সে ভরাট উচ্ছল হাসি নয়, এ হাসি কেমন ফাঁকা, প্রাণহীন। মুখস্থ বলার মতো করে দুর্বল গলায় যেন স্বগতোক্তির মতো বলে চলল, শিল্প হ'ল একটা ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা; রঙে রেখায় ইঙ্গিতে একটা বিশেষ ভাবের অনুষঙ্গ জাগিয়ে তোলাই হ'ল শিল্প-সৃষ্টির মূল কাজ। কিন্তু ভাই, কাজে প্রাণ পাচ্ছি না, তাই ছবিতে প্রাণ দিতেও পারছি না।

বীরেনের ভঙ্গি দেখে হেসে ফেললাম। বললাম, বৌমণিকে নিয়ে আয়, আর কেন!

—সত্যি বলেছিস অমল, আমার মনের কথা। লাইফটা বড় ভেকেণ্ট মনে হচ্ছে, একদম ফাঁকা। চিঠি-চিঠি অবিশ্যি ঠিক দেয় রেগুলার। কি খাব, কেমন থাকব, সবই লিখে জানায়। কিন্তু সুমনা কাছে না থাকলে বড় ফাঁকা মনে হয়।

দার্শনিকের মতো মুখের চেহারা করে বলল বীরেন, বড় কষ্ট হ'ল বেচারার বিরহ যন্ত্রণায়। বললাম, দেখ, কেমন ভালবেসে অন্তরটি চুরি করে নিয়ে গেছে।

অন্যমনস্ক হয়ে গেছে বীরেন রীতিমত, আমার কথাটা বোধ হয় কানে গেল না। বলল, যাবার পর থেকেই একটা কথা এবার বেশ ভাবছি। মনে কর, এমন তো হতে পারে, ও হঠাৎ মরে গেল। এমন তো হামেশাই ঘটে!

দূর, ও-সব কি ভাবছিস আজকাল! কথাটা লঘু করবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু বীরেন যেন এক নতুন সুরে কথা বলতে শিখেছে। বলল, তাই ওর একটা ছবি ভাল করে আঁকব ভাবছি। ও থাকবার সময় আর্টটা লাইট্‌লি নিয়েছিলাম। কিন্তু এখন ভাবছি একটু সিরিয়াসলি ষ্টাডি করি। তুই ঠিক বুঝছিস না অমল, বোধ হয় মনে মনে হাসছিস। কিন্তু মানুষের আয়ুর মূল্য কি বল? ওকে কাছে থেকে ঠিক দেখিস নি। দেখলে বুঝতিস, একবিন্দু শিশিরের মতো শুকিয়ে উড়ে যেতে কতক্ষণ! শাজাহান তাজমহল কেন গড়েছিল, এখন পরিষ্কার বুঝতে পারছি।

বললাম, মমতাজ মরে যেতে পর না হয় শাজাহান তাজমহল গড়েছিলেন, তুই যে এখনই মক্‌স করছিস বীরেন!

লাইফ ইজ বাট এ ড্রীম, অমল।

সময় রথচক্র চালিয়ে নিয়মিত চলে গেছে এর পর কয়েক মাস। কাজের চাপে বীরেনকে প্রায় ভুলে গেছি। ভাবনা আনন্দ আশঙ্কা সব ধুয়ে-মুছে গেছে মন থেকে। ভালই হয়েছে। তার প্রেমঘন জীবনকে ভারাক্রান্ত করে তুলতাম হয়ত বে-ফাঁস কিছু বলে ফেলে। তাছাড়া আমার আপিসে গোলমাল চলেছে একটানা, কাজ আর 'বস' নিয়ে হয়রাণ হয়ে উঠেছি আমি নিজেই। ছুটির কাছাকাছি সময়ে সেদিন এমনি একটা গোলযোগের মধ্যে একরাশ ফাইল নিয়ে বড় সাহেবের ভ্রূভঙ্গি শান্ত করতে ব্যস্ত। চাপরাসী কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করে বলে গেল, এক বাবুসাব বাইরে জোর তলব করছেন। সাহেবের কাছে এক মিনিটের ছুটি নিয়ে আসতেই হ'ল, বাড়ীতে কোন দুর্ঘটনা নাকি, কে জানে। কিন্তু পর্দা সরিয়ে এসেই অবাক্! উদভ্রান্ত বেশে বীরেন। এলোমেলো চুল, জামার বোতাম খোলা। বললাম, কি রে?

—আমার সঙ্গে এখনই আয় একবার।

ব্যাপার কি?

তুই আয়।

চা খাবি?

না, তুই আয় এখনই।

তাকে হাত ধরে টেনে এনে সাহেবের কাছে হাজির করে বললাম, আমার ভাই, খুব বিপদ বাড়ীতে, ডাকতে এসেছে তাই আমাকে। যদি স্তর আজকের মতো ছুটি দেন—

সাহেব দেখলেন বীরেনকে একবার, ভদ্রলোকের মত বললেন, গো।

বাইরে এসে বীরেনের হাতটা টেনে নিলাম। ও ছেলেমানুষের মতো কেঁদে ফেলল। যেন দমটা আটকে যাবে, এমনি একটানা চাপা আর্তনাদ। মাথায় হাত দিয়ে থামাবার চেষ্টা করে বললাম, কাকাবাবুর কি কিছু হয়েছে?

—বাবা তো সেই পাটনায়।

তবে?

ও চলে গেল।

কি বললি?

হেমন্তর সঙ্গে!

অশ্রু আর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে যে কাহিনী বলে গেল বীরেন, তার সূক্ষ্ম নিষ্ঠুরতায় স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। বাচ্চাটা নষ্ট হয়ে যাবার পর বীরেন সুমনাকে নিয়ে আসে। সেখানেও বুঝি হেমন্ত যেত, এখানেও আসত প্রায়ই। সুমনা প্রফুল্ল থাকত দেখে বীরেন খুশীই হ'ত, কিন্তু পাড়ায় নানা কথা উঠল। সুশোভন বলে একটি ছোক্‌রা তাকে বলল, বীরেন আপিস গেলে পরই নাকি হেমন্ত আবার আসে। বীরেন বিশ্বাস করে নি ও-সব কথা। কিন্তু শেষে সুশোভনই জোর করে দেখাল এই আজ। আপিস যাবার নামে সুশোভনের নির্দেশ মত কাছেই এক জায়গায় লুকিয়ে রইল। হেমন্ত ঢুকল একটু পরেই। বীরেন গিয়ে দেখল, দরজা বন্ধ। ধাক্কা দিয়ে ডাকতেই বাইরের দরজা খুলে আগে বেরিয়ে এল সুমনা, পেছনে হেমন্ত; ওর সামনে দিয়ে তারা চলে গেল।

আমরা যখন পৌঁছলাম হাট হয়ে দরজা খোলা। উৎসুক পড়্‌শীরা তখনো উঁকি দিয়ে এখান-ওখানে দাঁড়িয়ে। সেই নিমগাছটা পার হয়ে ঘরে এলাম। কাকাবাবুর এতদিনের গড়া সংসারটা যেন সর্বহারার মালিন্য নিয়ে স্তব্ধ হয়ে আছে। বীরেন নির্জীব, নিস্পন্দ হয়ে বোধ হয় তাই দেখছে। বললাম, চাকরটা কোথায়?

—তাকে এসেই বিদেয় করেছিল। কেন, এখন বুঝতে পারছি। বাক্সটার ওপর চোখ পড়তেই কটমট করে তাকাল। বলল, খুলব ওটা?

—খোল।

সুমনার খানকয়েক শাড়ি-ব্লাউজ, বীরেনের ধুতি-জামা আর নীচে চিঠির স্তূপ। বীরেন উলটে-পালটে বলল, এ তো আমাদের নয়! ও, আমি বাক্স খুলতে গিয়েছিলাম একদিন, তাই এমন চম্‌কে চেঁচিয়ে উঠেছিল।

দেখা গেল সত্যিই তাই। সব চিঠিই প্রায় হেমন্তর। সেই কোন্ কালের কয়েকটা, যখন হেমন্ত থাকত ওদের পাড়াতেই। যত্ন করে সাজানো, অনেক সতর্কতার সঙ্গে রক্ষা করা আগাছা আর আবর্জনা, স্বৈরিণীর অভিসারিকা-জীবনের পচা ইতিহাস। স্নেহ-ভক্তি-প্রেম দিয়ে সকলকে জয় করে রেখেছিল শুধু একটা মুখোস? কোন এক অসংযমের উন্মত্তক্ষণে হঠাৎ মুখোসটা খোলা অবস্থায় পড়েছিল, রূপকথার দেবকন্যার আসল পরিচয় ধরা পড়ে গেল? বেচারা সুমনা! কত ছল, কত ছলনায় ক্ষত-বিক্ষত করেছে নিজেকে এতগুলি বছর ধরে। দোটানা থেকে মুক্তি পেল; গেল অবশেষে সততার শ্বেতপদ্মের ওপর নির্মমভাবে কাদা পা ফেলে। দরজার দিকে তাকালাম। ছবির মতো সুমনা গেছে হেমন্তর হাত ধরে এই পথে, বীরেনের সমস্ত বিশ্বাস মিথ্যে করে দিয়ে।

গভীর ভাবে তলিয়ে দেখবার শক্তিটুকু পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে বীরেন কিংবা হয়ত সুমনাকে অবিশ্বাস করতে পারে না এখনো। বলল, সেই হেমন্ত ডেভিলের এই সব কাজ।

—তা হবে।

থানায় খবর দিয়ে ওকে ধরা যায় না?

এর ফলাফল ভেবে দেখেনি বীরেন। নিরস্ত করে বললাম, সে এখন পরে হবে। দরজা বন্ধ কর, চল বাইরে যাই। কাকাবাবুকে আগে আসতে টেলিগ্রাম করা দরকার।

কাকাবাবু এসে কেমন গম্ভীর হয়ে গেলেন, ফিরিয়ে আনার চেষ্টার ধারে-কাছেও গেলেন না। সে সব ক্রমশঃ পুরনো কাহিনী হয়ে গেল আমার কাছে। ডিউটির ঘানি টানতে টানতে অনেক বছর কেটে গেছে তার পর, কিন্তু ভুলতে পারি নি সুমনা বৌমণিকে। পথে যেতে যেতে কোন একটি বিশেষ রকমের মেয়েকে একটি বিশিষ্ট ভঙ্গিতে দেখলে আর একটি ছবি ভেসে ওঠে চোখের সামনে। বৌমণি কি বেঁচে আছে? আবার কার ঘর করছে? হেমন্তদার? প্রাণছন্দে লীলায়িত সজীব একটি কল্পনা! রক্তমাংসের মানুষ তো নয়, আলোকোজ্জ্বল একবিন্দু শিশির। কাছে না থাকলে একদম ভেকেন্ট মনে হয় রে, বীরেন বলেছিল। ফাঁকা লাগে তার সংসার তার অন্তর। এমন গোছ-গাছ সংসারের কাজের মধ্যেও এমন সুন্দর হাসে সুমনা। তার গুণগানে বীরেন পঞ্চমুখ

হয়ে উঠত সে সময়। সবচেয়ে তার সরল বিশ্বাস: ও কিস্-সু বোঝে না রে! বড় পিটি ফিল্ করি, বুঝলি? আদর্শ প্রেম খুঁজে পেয়েছিল সে তার সুমনার মধ্যে। যখন সব শেষ হয়ে গেছে, সর্বস্বান্ত হয়েছে তখনো বলেছে, নিশ্চয়ই ও ইচ্ছে করে যায় নি, ওর মতো মেয়ে যেতে পারে না। থানা-কোর্ট করে সুমনাকে উদ্ধার করতে চেয়েছিল বীরেন, আমরাই বাধা দিয়েছিলাম। জানি না অন্যায় করেছি কিনা। অনেক সময় ভাবি, হয়ত বা বীরেনের কথাই ঠিক: সুমনা কিছুই জানে না সংসারের, একটা সর্বগ্রাসী রাহু গ্রাস করে ফেলল ওকে। হাত ধরে দুঃখের পথে টেনে নিয়ে গেছে—পেছনে ফেলে স্বামী, শ্বশুর, সংসার—স্নেহ, প্রীতি আর ভালবাসা। বীরেন বলেছিল কোন এক স্মরণীয় ক্ষণে: লাইফ ইজ বাট এ ড্রীম। ক্ষণস্থায়ী এ জীবন। মিথ্যা, ফাঁকা। আবার তো সে বিয়ে করেছে? কিন্তু এখনো কি সে ছবি আঁকে, তার বৌ সুমনার ছবি? অদৃষ্ট তার হাতে তুলি ধরিয়েছিল, তারও দোষ নেই। কিন্তু এখনো কি সে ছবি আঁকছে?

সেই ঘটনার পরই কানপুর আপিসে বদলী হয়ে গেলাম আমি। প্রায় আট-ন' বছর বীরেনের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি। নিজেই এত বিপদগ্রস্ত হয়ে আছি ক্রমাগত যে, কারো খোঁজ নেবার সময়ও পাই না, শক্তিও যেন হারিয়ে ফেলেছি। তা ছাড়া সময় সময় আত্মবিশ্লেষণ করে দেখেছি, বীরেনের কাছে যাবার একটা আকর্ষণ ছিল, সে বৌমণি। যেদিন প্রথম সন্দেহ-কীট আমার অন্তরে জ্বালা ছড়াল, সে কীট ঈর্ষার। আর একজন আমারই সামনে বৌমণির প্রীতির পাত্র হবে একথা ভাবতেই আমার অন্তর ঈর্ষায় ভরে উঠেছিল, অসহ্য লেগেছিল তাই হেমন্তবাবুকে। কিন্তু সে গেছে, বীরেনের ঘরের সম্পদ আর গৌরব গেছে সেই দিনই। কি হবে সে একটা বিষণ্ণ, অভিশপ্ত বাড়ীর নিরানন্দময় আবহাওয়ায় কিছুক্ষণ মনের বিরুদ্ধে কাটিয়ে! খাবার দিয়ে ঈষৎ বঙ্কিম আভঙ্গঠামে ডান হাতটা সামনে ধরে লক্ষ্মী-প্রতিমার মতো কেউ তো আর দাঁড়িয়ে থাকবে না! সে অসহ্য!

কাজের প্রয়োজনে যখন কলকাতা এলাম, আরো কিছুদিন কেটে গেছে। দেখলাম, বীরেনদের প্রতি দুর্বলতা একটুও কমে নি, যেতে হ'ল ও-পাড়াতে। কিন্তু সে বাড়ীটার চেহারা গেছে পাল্টে। নিমগাছটা নেই, অন্য সব লোকজন বাস করছে সেখানে। বীরেনের ঠিকানা তো দূরের কথা, তাকে কেউ চিনতেই পারল না। রোখ চেপে গেল, বীরেনকে খুঁজে বের করতেই হবে। হঠাৎ রাস্তায় পোষ্ট-আপিসের পিয়নের দেখা মিলে গেল। নাম বলে জিজ্ঞাসা করতেই বলল, এক বুড়ো ভদ্রলোক তো?

—বুড়ো না, একটু ছোকরা মতন—

বীরেন চৌধুরী বলে ছোকরা এ-পড়ায় কেউ নেই।

চলে যাচ্ছিল পিয়ন, কি ভেবে ফেরালাম, আচ্ছা, সে ভদ্রলোক কোথায় থাকেন?

—ঐ ছোট গলিটার মধ্যে খোঁজ করুন, দেখবেন টাকমাথা মোটা মতো এক বুড়ো ভদ্রলোক—

মাথায় একটা ঝাঁকুনি লাগল। চিন্তিত মনে গেলাম নির্দিষ্ট পথে। আর একজন যে বাড়ীটা দেখাল তার দরজা খোলা। অন্দর পর্যন্ত দেখা যায় গলিতে দাঁড়িয়েই। গোটা দুই-তিন কুচো ছেলেমেয়ে সপ্তমে গলা চড়িয়ে কাঁদছে, আর একটার চুল টেনে ধরে মোটা মতো এক ভদ্রলোক হাত উঠিয়েছেন মারবার জন্যে। মোক্ষম হাত ওঠানো। আমাকে দেখে যা হোক বন্ধ হয়ে গেল শেষ অঙ্কটা, মেয়েটা রক্ষা পেয়ে গেল এ যাত্রা। নীল লুঙ্গির ওপর ঊর্ধ্বাঙ্গ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত, ভদ্রলোক মুখটা বিকৃত করে বললেন, কাকে চাই?

—বীরেন থাকে এখানে, বীরেন চৌধুরী?

কাছে এলেন ভদ্রলোক, তার পর অমায়িক হাসিতে ভরে গেল তাঁর মুখ, তুই? অমল?

—বীরেন! স্তম্ভিত হয়ে বলে ফেললাম। বীরেন তখনো হাসছে হাঁ করে শব্দহীন হাসি। ইতস্ততঃ চার-পাঁচটা দাঁত পড়ে গেছে, চাপা বয়সের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর সমস্ত চেহারায়। পিয়ন বলেছিল, বুড়ো ভদ্রলোক। আমার সেই কল্পনার বৌমণির বীরেন যে কোনদিন বুড়ো হবে, একথা ভাবা সম্ভব ছিল না। কিন্তু বাস্তব আর কল্পনা মিলে না কখনো।

বীরেন আমাকে হাত ধরে ভেতরে নিয়ে গেল। একটি মাত্র ঘর। একটা চেয়ার টেনে দিল বসতে। বাইরে বারান্দা থেকে আর একটা নড়বড়ে চেয়ার এনে নিজে বসল। ভারিক্কি চালে বলল, তার পর অমলের খবর কি?

—এ বাড়ীতে কতদিন এলি?

যেন প্রশ্নটা অবান্তর, তেমনি ভাবে বীরেন জবাব দিল, সে তো অনে—ক দিন। পাকিস্থান থেকে যা পাচ্ছিলাম সে তো সব গেছে। তার ওপর বাবা মারা যাবার পর আয়টাও গেল কমে—

—কাকাবাবু?

সে তো অনে—ক দিন।

পরিষ্কার বোঝা যায় বীরেনের অনুভূতি ক্ষীণ হয়ে গেছে। কোন ঘটনা বা দুর্ঘটনা মোটেই আর ছাপ রাখে না মনে। বললাম, তুই এত পাল্টে গেছিস বীরেন, প্রথমটা চিনতেই পারি নি!

খুশী খুশী ভাবে দেহটাতে হাত বুলোতে বুলোতে বীরেন বলল, একটু মোটা হয়ে গেছি, নয়?

আশ্চর্য! শুধু শরীরটা একটু মোটা হয়ে গেছে, এইটুকু সম্বন্ধেই সচেতন। সমস্ত অবয়বই কেমন বিকৃত, কিম্ভূত-কিমাকার হয়ে উঠেছে, তা বুঝতেই পারে নি। মুখের থুত্‌নি ঝুলে পড়েছে, গাল দুটো ভাঙা ভাঙা, ছোপধরা দাঁতগুলো যেন ভেংচি কাটছে মুখটাকে। কয়েক-পোঁচ কালো রঙ ধরেছে চামড়ায়, পৃথুল শরীর সেই পরিমাণে বেঁটে-খাটো দেখাচ্ছে। তার ওপর মাথাটায় অর্দ্ধ-চন্দ্রাকারে একটা টাক; পরিষ্কার ঠিক নয়, কিছু চুলও মাকড়সার জালের মতো উড়ে বেড়াচ্ছে সেখানে। মনে হয় যেন কোন একটা বিষাক্ত গ্যাস পেটের মধ্যে ঢুকে তাকে এমনি বিকৃত করে ফেলেছে।

ছেলেমেয়েগুলো কান্না-কাজিয়া ভুলে ঘরের ভেতরে বাইরে দাঁড়িয়েছে ভিড় করে। বুঝতে পারলাম সবই। তবু প্রশ্ন করতে হ'ল, তোরই ছেলেমেয়ে?

—ও, জানিস না বুঝি? কি করেই বা জানবি, একদম তো দেশ ছেড়ে দিয়েছিস। ওগো শুনছ? এই ডাকত ট্যারা, তোর মাকে—

ডাকতে হ'ল না। তিনিও বোধ হয় পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, মাথায় কাপড় দিয়ে এলেন হাসিমুখে। দৈর্ঘ-প্রস্থে বীরেনের সমধর্মী, বোধ হয় কিঞ্চিৎ খর্বকায়া; ঠোঁট দুটি একটু মোটা, চোখ দুটি সাদা এবং গোল, নাকটি মুখের সঙ্গে মানানসই। আমি ব্যস্ত হয়ে উঠে পায়ের ধুলো নিতে যাচ্ছিলাম। দু' পা সরে গিয়ে বললেন, এই এই বোধ হয় কবি-ঠাকুরপো?

বীরেনের দিকে চাইলাম, ও হাসল: সব জানে রে মনোরমা। তবে মোটেই ইন্‌টেলিজেণ্ট নয়, বড় ভাল্।

ফোক্‌লা দাঁত বের করে বীরেন হাসতে লাগল। ওদের দু'জনের দিকে তাকাতে তাকাতে মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা বেদনা অনুভব করলাম। সেই কবেকার একটি দৃশ্য, পটে-লিখা একটি ছবি, বোধ করি বা কাব্য জগতের একটি কল্পনা আমার চোখের সামনে আজ আবার ভেসে উঠল।

বীরেন কিন্তু আমার মুখ দেখে সে সব কথা বুঝতে পারল না। বৌদির দিকে একবার তাকিয়ে বলল, পাকা হিসেবী রে! আমার একার আয়, এতগুলির সংসার, বেশ চালিয়ে যাচ্ছে—

হিসেবের কথাটায় পুরনো সেই ঘটনাটা মনে পড়ে গেল। দেওয়ালের দিকে একটা বেঞ্চে অগোছালো কয়েকটি বাক্স, তার দিকে হাত দেখিয়ে বীরেনকে বললাম, ওখানে কি সব জমাচ্ছেন, বাক্সগুলো দেখেছিস তো ভাল করে?

—সব শুনেছি, সব বুঝেছি। ভারী ভারী গলায় বলে উঠলেন বৌদি, দেখুন না, সব খুঁজে দেখুন—

হেসে উঠলাম আমিও। বললাম, আপনি সত্যিই খোলামেলা মানুষ বৌদি। আপনাকে দেখেই বোঝা যায় আপনার লুকনো কোন জিনিস নেই।

নেই কেন? মোটা কালো ডান হাতটি মুখের কাছে তুলে ধরলেন বৌদি, নেই কেন? আছে বই কি। ঐ ওটাতে আছে ওনার সেই কোন্ যুগের খানকয়েক ম্যান-ম্যানে চিঠি। ওটাতে আছে চুলোর ছাই ওনার ছবি আঁকার তুলি, রঙ—আর ওটাতে—

বারান্দায় গোটা দুই ছেলে মারামারি আরম্ভ করেছে, বৌদি মুখ বিকৃত করে একবার তাকালেন সেদিকে। বললেন, আস্‌ছি ঠাকুরপো, একটু চা করি।

—ছবি-টবি তা হলে আর আঁকিস না? বৌদি চলে যেতে বীরেনকে ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলাম।

গভীর দীর্ঘশ্বাস একটা বের হয়ে এল বীরেনের বুক থেকে। হতাশার সুরে বলল, তার পর কিছুদিন পর্যন্ত আঁকতাম। কিন্তু মানুষ আঁকা ছেড়ে দিয়েছিলাম ভাই, ফুলের ছবি চেষ্টা করছিলাম। মনে হয় মানুষের ছবির চেয়ে ফুলে বেশ একটা ন্যাচারেল ব্যঞ্জনা আছে। পাঁচটার সংসার, বুঝতেই তো পারছিস, সব নষ্ট হয়ে গেছে ঈজেলটি পর্যন্ত। এই একটা কোন রকমে বাঁধিয়ে বেড-রুমে রেখেছি। দেখ দেখি তোর কেমন লাগে—

চেয়ারে ওঠে অনেক সাবধানে ঝুলকালি মাখা একটি ছবি দেওয়াল থেকে নামিয়ে নিয়ে এল বীরেন। তুলে ধরতেই দেখলাম অপরিষ্কার কাঁচের মধ্যে বীরেনের শিল্পকলা: মৃণালদণ্ডের ওপর আধ-ফোটা একটি পদ্ম ফুলের মধ্যে মধু পান করছে একটি মৌমাছি। আমার হাল্‌কা ভাবটা মিলিয়ে গেল পরমুহূর্তে। একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহে আপাদমস্তক চমকে উঠল। পরিষ্কার দেখতে পেলাম ছবির মধ্যে আভঙ্গঠামে একটি নারী-রূপের ছান্দসিক সঙ্কেত। এর রঙে রঙে, রেখায় রেখায় ফুটে উঠেছে প্রশান্তি, পরম পরিতৃপ্তি!

সুমনা বৌমণি মরে নি। বীরেনের শিল্পপ্রয়াস কাল-জয়ী হয়েছে তার প্রিয়তমার যৌবনের প্রেমঘন রূপটিকে ফুলের প্রতীকের মাধ্যমে অমরত্ব দান করে।

ছবিটা ধরে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বীরেন আমার দিকে। আমারও ভেতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। সে যে কি বলতে চায়, তার মুখ-চোখের ভাব দেখে পরিষ্কার বুঝতে পারলাম।

—এই ট্যারা, এই কাপটা নিয়ে চল দিকি।

বৌদি আসছেন বোধ হয়। চকিত হয়ে বীরেন ছবিটা টাঙাতে চেয়ারটায় উঠে পড়ল।

ইসলামের ইতিহাসের ধারা

(প্রাচীন ও মধ্যযুগ)

অ'্যাপক শ্রীশঙ্কর দত্ত

আরব দেশ ইসলামের মাতৃভূমি। হজরত মহম্মদ ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা। মহম্মদ-পূর্ব্ব আরবদেশ ছিল বেদুইন অধ্যুষিত। বেদুইনদের যাযাবর-জীবনে উট ছিল স্থায়ী সঙ্গী, খেজুর ছিল প্রতিদিনের আহার, মরু-ভূমির রুক্ষতা ছিল প্রতিদিনের পরিবেশ। বেদুইন-সমাজে সভ্যতার সুউচ্চ আঙ্গিকের পরিচিতি না মিললেও বেদুইনদের প্রতিবেশী সভ্যতা ও সংস্কৃতির সার গ্রহণ করার ক্ষমতা আধুনিক ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করেছেন। ঐতিহাসিক Hitti বলেন :

"Ability to assimilate other cultures when the opportunity presents itself is well marked among the children of the desert. With this other known quality of adaptibility there were other faculties among them which did remain dormant for ages and which did seem to awake suddenly under the proper stimuli and develop into dynamic powers."[1]

বেদুইনদের গ্রহণ করার এই অন্তর্নিহিত ক্ষমতার মধ্যে নিহিত সম্ভাবনাময় প্রতিশ্রুতিকে বাস্তবে প্রকাশ করেন হজরত মহম্মদ।

৫৭১ খ্রীষ্টাব্দে হজরত মহম্মদের জন্ম, ব্যক্তিত্বের প্রকাশ, সাধনার বিকাশ ও ভগবৎ-আদেশ-প্রাপ্তির কথা সুপরিচিত। যে ধর্ম্মপ্রচারের মধ্য দিয়ে তিনি ছিন্ন, খণ্ড, বিক্ষিপ্ত বেদুইন-জীবনে ঐক্যের সঞ্চার করেছিলেন তার প্রধান অঙ্গ ছিল ইমান (ধর্ম্মবিশ্বাস), ইসাম (ধর্ম্মো-পাসনা), ইবাদৎ (ন্যায়কর্ম্ম), উপবাস এবং তীর্থদর্শন। উপরোক্ত পাঁচটির মধ্যে ইসলাম-সংগঠনের প্রথম দিকে ইমানের প্রভাবই সমধিক পরিলক্ষিত হয়। জনৈক ইতিহাসবিদ্ বলেছেন :

"The first, the greatest and the most essential article of faith in Islam is the belief in the unity of Godhead; *la ilah illa Allah Muhammad al Rasul al Allah.* (There is no God but Allah and Muhammad is his messenger)."[2]

আল্লার এই একক অস্তিত্বে স্বীকৃতি, আল্লার ওপর এই অখণ্ড আস্থার প্রতিশ্রুতি এবং সমগ্র মুসলমান-জগতের অবিভাজ্য ঐক্যে অখণ্ড বিশ্বাসের মধ্যেই জন্ম-গ্রহণ করে ইসলামের প্রাথমিক ঐক্য। মহম্মদের প্রচার অবশ্য প্রতিবাদ-বিহীন ছিল না। কিন্তু মহম্মদের ব্যক্তিত্ব ও সংগঠনী প্রতিভা ধীরে ধীরে এই প্রতিরোধের প্রতি-কূলতাকে জয় করে ধর্ম্মীয় চেতনার ভিত্তিতে ইসলামের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলামের এই প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ছাড়াও সংস্কারের এক ব্যাপক কার্য্যসূচীকে বাস্তবে রূপায়নের কৃতিত্বও মহম্মদের। মহম্মদের সংস্কার রাজ-নৈতিক জীবনে উপদলীয় স্বার্থসংঘাতের পরিবর্ত্তে বৃহত্তর ঐক্যের সূচনা করে, ধর্ম্মজীবনে অস্পষ্ট পৌত্তলিকতার পরিবর্ত্তে স্বচ্ছ বিশ্বাসের ভিত্তিতে পবিত্রতার সূচনা করে, সমাজ-জীবনে সংযম আনে এবং আচার-অনুষ্ঠানে উন্নতির সূচনা করে।

৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদের মৃত্যু হয়। মহম্মদ নির্দ্দিষ্ট ইসলামের ধর্ম্মীয় রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌম ক্ষমতা ও ঐক্যের প্রতীক, আল্লা এবং সেই আল্লার প্রত্যক্ষ দূত মহম্মদের মধ্য দিয়ে ইসলামের ধর্ম্মীয় রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌম ক্ষমতা ও ঐক্যের প্রথম প্রকাশ। মহম্মদের মৃত্যুর পর যথাক্রমে আবুবকর (৬৩২-৩৪), ওমর (৬৩৪-৪৪), ওসমান (৬৪৪-৫৬) এবং আলি (৬৫৬-৬১)—এই খলিফা-চতুষ্টয়ের হাতে মহম্মদ-সৃষ্ট ঐক্যের সূত্রটিকে অক্ষুণ্ণ রাখার

গুরুদায়িত্ব এসে পড়ে। আবুবকর থেকে আলি পর্য্যন্ত (৬৩২-৫৬) প্রায় ত্রিশ বছরের এই অধ্যায় ইসলামের ইতিহাসে একটি বিশেষ যুগ—"the period of the Orthodox Caliphate" বলে পরিচিত। এ যুগের ইসলামের ইতিহাসের বৈশিষ্ট্যসমূহ পর্য্যালোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় রাজ্যবিস্তৃতির কথা। কথিত আছে, মহম্মদ মৃত্যুশয্যায় ইসলামের অখণ্ড আধিপত্য-প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলেন।(৩) মহম্মদের এই নির্দ্দেশকে সফল করে তুলতে এ-যুগের খলিফারা, বিশেষ করে আবুবকর, ওমর এবং ওসমান আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, পারস্য, মিশর প্রভৃতি দেশে ইসলামের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা ইসলামের এই যুগের কৃতিত্ব। ইসলামের এই রাজ্য-বিস্তৃতির পিছনে শুধু মহম্মদের নির্দ্দেশপুষ্ট ধর্মীয় উন্মাদনা ছিল—একথা মনে করলে ভুল করা হবে। অর্থনৈতিক প্রয়োজনেও ইসলামের রাজ্যবিস্তৃতি—একথা আধুনিক ইতিহাসে স্বীকৃত। ঐতিহাসিক Hitti বলেছেন:

"It was not fanaticism but economic necessity which drove the Beduin hordes beyond the confines of their abode to the fair lands of the north."[4]

রুক্ষ আরবে উত্তোরত্তর বর্দ্ধিত জনসংখ্যার সংস্থান ক্রমশঃই অসম্ভব হয়ে পড়ছিল। প্রতিবেশী অপেক্ষাকৃত সভ্য এবং সমৃদ্ধ রাজ্যে আধিপত্য বিস্তারই ছিল সমাধানের একমাত্র পথ। ইসলামের এই যুগের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল আভ্যন্তরীণ সংগঠন। যে সংগঠনের সূচনা মহম্মদের হাতে, তা পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করে এই খলিফা-চতুষ্টয়ের যুগে। এই প্রসঙ্গে খলিফা ওমরের কৃতিত্বের কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। এ যুগের পরবর্ত্তী প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল ইসলামে আভ্যন্তরীণ গৃহযুদ্ধের সূচনা। ওমরের আভ্যন্তরীণ সংগঠন প্রশংসনীয় হলেও ইসলামকে গৃহযুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা করেতে পারে নি। ওমরের পরবর্ত্তী খলিফা ওসমান ছিলেন অত্যাচারী। তাঁর নিষ্ঠুর শাসন তাঁকে জনসাধারণের কাছে বিশেষ অপ্রিয় করে তুলেছিল। কেন্দ্রীয় শক্তির এই অপ্রিয়তার সুযোগ নিয়ে রাষ্ট্রের মধ্যে অন্তর্ঘাতী শক্তিগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে। ওসমানের মৃত্যুর পর আলি খলিফা হলেও, খলিফাসন নিয়ে এক ত্রি-পক্ষীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব ক্রমশঃ প্রকাশ্য হয়। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে আলি নিহত হন এবং ৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে সিরিয়ার সুযোগ্য শাসক মহাবিয়া (যিনি উপরোক্ত অন্তর্দ্বন্দ্বে এক বিশিষ্ট পক্ষ ছিলেন) নিজেকে খলিফা বলে ঘোষণা করেন।

৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে মহাবিয়ার খলিফাসন গ্রহণ ইসলামের ইতিহাসে অপর একটি যুগের সূচনা। এই যুগ উমমায়াদ যুগ বলে পরিচিত। একাধিক কারণে ইসলামের ইতিহাসে এই উমমায়াদ যুগ স্মরণীয়। এ যুগের প্রথম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ'ল খলিফাসন নির্দ্ধারণের মাধ্যম পরিবর্ত্তন। এতদিন পর্য্যন্ত ইসলামে খলিফাসনের অধিকারী নির্দ্দিষ্ট হতেন নির্ব্বাচনের মাধ্যমে। উমমায়াদ যুগের প্রথম শাসক মহাবিয়া নির্ব্বাচনের পরিবর্ত্তে মনোনয়ন প্রথার প্রচলন করেন। দ্বিতীয়তঃ, এই যুগ ইসলামের ইতিহাসে কেন্দ্রীকরণের যুগ। মহাবিয়া, প্রথম আবদুল মালিক, প্রথম ওয়ালিদ প্রমুখ খলিফাদের নাম এই কেন্দ্রীকরণ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনে মদিনা কুফা থেকে দামস্কাসে রাজধানী স্থানান্তরকরণের কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তৃতীয়তঃ, এই যুগ ছিল রাজ্যসংরক্ষণের যুগ। পরবর্ত্তী যুগে অধিকৃত রাজ্যে আঞ্চলিক বিদ্রোহের পুনরাবৃত্তির নিবৃত্তির দিকে এ যুগের শাসকদের দৃষ্টি নির্দ্দিষ্ট করতে হয়েছিল। চতুর্থতঃ, এই যুগ ছিল ইসলামের ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব এক সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের যুগ। সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন দিকে ইসলামের সংস্কৃতির স্বতস্ফূর্ত্ত স্ফুরণ এ যুগের এক বিশিষ্ট ঐশ্বর্য্য।

৬৬১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৭২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আংশিক এবং ক্ষেত্রবিশেষে আঞ্চলিক বিরোধিতা সত্ত্বেও উমমায়াদ শাসনের ভিত্তি সাধারণভাবে দৃঢ় থাকে। ৭২০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে অর্থাৎ দ্বিতীয় ইয়াজিদের শাসনকালের সূচনা থেকে উমমায়াদ শাসনের ভিত্তি শিথিল হতে থাকে। যে সমস্ত কারণ এই শৈথিল্যের জন্য দায়ী তার মধ্যে তিনটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, দ্বিতীয় ইয়াজিদের কুশাসন, দ্বিতীয়তঃ, অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ব্যক্তিত্বের হাতে শাসন এবং তৃতীয়তঃ, আব্বাসাইদ সমর্থকদের প্রচার।

তৃতীয় কারণটির বিশেষ বিশ্লেষণ প্রয়োজন। আলির মৃত্যুর পর মহম্মদের খুল্লতাত আব্বাসের বংশধরেরাই খলিফাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী এবং উমমায়াদরা আব্বাসের বংশধরদের এই ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার অভিযোগে অভিযোগী—এই তথ্যে যাঁরা বিশ্বাস করতেন তাঁরাই "আব্বাসাইদ" বলে পরিচিত। দ্বিতীয় ইয়াজিদের কুশাসন এবং পরবর্ত্তী দুর্ব্বল উত্তরাধিকারীদের ততোধিক দুর্ব্বল শাসনের সুযোগ নিয়ে উক্ত আব্বাসাইদেরা তাদের দাবীকে প্রকাশ্য করে তোলে এবং

তাঁদের সমর্থকদের উমমায়াদদের বিরুদ্ধে সংগঠিত ভাবে উত্তেজিত করে তুলতে থাকেন। খোরাসানে এই বিরোধী আন্দোলনের সূচনা হয় এবং বিরোধীরা উমমায়াদ-বিরোধী অপরাপর সম্প্রদায়কে কেন্দ্রীভূত করে আন্দোলনের তীব্রতা উত্তোরত্তর বাড়িয়ে তোলেন। এই ব্যাপক বিরোধিতার মধ্যে ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে উমমায়াদ বংশের পতন এবং উমমায়াদ শাসনের অবসান ঘোষিত হয়।

ইসলামের ইতিহাসে ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ শুধু উমমায়াদ শাসনের অবসান নয়—আব্বাসাইদ শাসনের সূচনা-হিসাবেও স্বীকৃত। ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই আব্বাসাইদ শাসনের স্থায়িত্ব। এই যুগের প্রথম দিকেই ইসলামের ইতিহাসে বিখ্যাত খলিফ্ হারুন-অল্-রসিদ্, আল্ মামুন, আল্ মুতোয়াকিল প্রমুখ আবির্ভূত হন। বিভিন্ন সুশাসকের আবির্ভাব সত্ত্বেও এই যুগেই ইসলামের খলিফা-কেন্দ্রিক ঐক্য শিথিল হয়ে পড়ে। আব্বাসাইদ খলিফারা দামাস্কাস থেকে বাগদাদে রাজধানী স্থানান্তর করেন। কিন্তু স্থানান্তরিত এই নতুন রাজধানী বাগদাদ ইসলামের অপ্রতিদ্বন্দ্বী কেন্দ্রস্থলে পরিণত করতে পারে নি। মিশরে প্রতিদ্বন্দ্বী ফতিমিদ্ খলিফাদের (৯০৯-১১৭১) এবং স্পেনে প্রতিদ্বন্দ্বী উমমায়াদ খলিফাদের (৭৫০-১০৩১) উত্থান এবং পৃথক স্বীকৃতিলাভ এই যুগেরই ঘটনা। দ্বিতীয়তঃ উমমায়াদ যুগকে যদি আরব-প্রাধান্যের যুগ বলা যায়, আব্বাসাইদ যুগ ছিল পারসিক প্রাধান্যের যুগ। পারসিক আচার-অনুষ্ঠান, পারসিক রাষ্ট্রীয় আঙ্গিকের প্রভাব এই যুগে বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়। তৃতীয়তঃ, উমমায়াদ যুগের মত এ যুগও ছিল সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের যুগ। প্রকৃতপক্ষে এ যুগের সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ উমমায়াদ যুগের উৎকর্ষকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। রাজ্যজয় এবং অধিকৃত বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান, বিশেষ করে অমর পারসিক সংস্কৃতির সঙ্গে ইসলামের সংযোগ, ইসলামের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। চতুর্থতঃ, এই যুগে আরব জনজীবনেও এক গভীর পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়। বিস্তীর্ণ রাজ্যজয় এবং আহরিত সম্পদের প্রাচুর্য্যের প্রভাব ইসলামের জনজীবনকে বিলাসী ও উজ্জ্বল করে তোলে। ইসলামের প্রথম দিকে কঠোর, পরিশ্রমী জনজীবনের প্রতিচ্ছবি এযুগে পাওয়া যায় না।

আব্বাসাইদ শাসনের ক্ষেত্রেও ইতিহাসের অনিবার্য্য নিয়ম উত্থান-পতনের ব্যতিক্রম হয় নি। আব্বাসাইদ যুগের শেষের দিকের শাসকেরা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ছিলেন। প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠানের অনুপস্থিতিতে দুর্ব্বল শাসকদের হাতে কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল। তা ছাড়া বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য সংরক্ষণের সমস্যাও যথেষ্ট জটিল হয়ে পড়েছিল। সাম্রাজ্যের বিস্তীর্ণ প্রান্তসীমায় আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যবাদীদের সক্রিয় ক্রিয়াকলাপ সাম্রাজ্যের সংহতিকে ক্রমশঃই বিপন্ন করে তুলছিল। এই পরিস্থিতিতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১২৫৮ আনুমানিক) মোঙ্গল-তাতার প্রমুখ উপজাতি আক্রমণের মাধ্যমে আব্বাসাইদ শাসনের পতন অনিবার্য্য হয়ে ওঠে। Ibu-ul-Athir এই প্রসঙ্গে যে উক্তি করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন :

"The invasion of the tartars was one of the greatest of calamities and the most terrible of visitations which fell upon the world in general and the Moslems in particular, the like of which succeeding ages have failed to bring forth . . . .[5]

যথার্থ মোঙ্গল-তাতারদের এই আক্রমণে বহু-যুগ-সৃষ্ট ইসলামের ইতিহাসকে এক অদৃষ্টপূর্ব্ব বিপর্য্যয়ের সামনে এনে উপস্থিত করে। বিপর্য্যয়ের এই যুগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে গিয়ে Juwani বলেছেন :

"The men of learning have become the victims of the sword. This is a period of famine for science and virtue."[6]

সৌভাগ্যের কথা, এই বিপর্য্যয় ইসলামকে বিপন্ন করলেও বিধ্বস্ত করতে পারে নি। বিপর্য্যয়ের অন্ধকারান্তে নতুন চেতনার আলো ইসলামের আধুনিক যুগের সূচনাকে ধীরে ধীরে স্পষ্ট করে তোলে।

---

1. Hitti : *History of the Arabs.*
2. Hitti : *History of the Arabs.*
3. "Throughout the land there shall be no second crud"—Muhammad. (From Hitti's *History of the Arabs*)
4. Hitti : *History of the Arabs.*
5. Quoted by Ameer Ali : *History of the Saracens.*
6. Quoted by Ameer Ali : *History of the Saracens.*

অভীরভীঃ

ত্রি-অঙ্ক নাটক

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

পাত্র-পাত্রী

শশাঙ্কশেখর	পীড়িত প্রৌঢ় ভদ্রলোক।
সুমিত্রা	শশাঙ্কশেখরের কন্যা।
রাজেন্দ্র	শশাঙ্কশেখরের জামাতা।
বিভা	রাজেন্দ্রের অবিবাহিতা ভগিনী
নিখিল	রাজেন্দ্রের প্রতিবেশী যুবক।
রণধীর	জাপানীদের হাতে পড়বার ভয়ে রেঙ্গুন থেকে পালিয়ে-আসা রাজেন্দ্রের পরিচিত ভদ্রলোক।

ডাক্তার, নার্স দুজন, চাকর বঙ্কু, ড্রাইভার, দু'জন ষ্ট্রেচার-বেয়ারার।

স্থান: কলিকাতা, হাটখোলায় রাজেন্দ্রের বাড়ী।

সময়: ১৯৪২, ডিসেম্বর।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(রাজেন্দ্রের বাড়ীর দু'তলায় শশাঙ্কশেখরের ঘর। শনিবার সকাল। বাঁদিক ঘেঁসে নানা-রঙা বেড-কভারে ঢাকা একটি বিছানা। পেছন দিকে জানালার একপাশে টেবিলের ওপর কয়েকটা শিশি-বোতল, মেজার গ্লাস, ফিডিং কাপ, জলের ফ্লাস্ক, সবুজ শেড-দেওয়া একটা আলো, একটা টাইম-পিস্। বিছানাটার একটু এদিকে গদি-মোড়া চেয়ারে ব'সে শশাঙ্কশেখর বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছেন। তাঁর ঠিক পাশেই একটা ছোট টিপয়, একটু দূরে, কিন্তু তাঁর হাতের নাগালের মধ্যে, ছোট শেল্‌ফে গুটি ছয়-সাত বই। গোটা দুই সাধারণ চেয়ার এবং চামড়া-বাঁধানো দুটি মোড়াও রয়েছে ঘরের আসবাবের মধ্যে। শশাঙ্কর মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, গোঁপদাড়ি কামানো, বয়স ষাটের কাছাকাছি হবে। মুখ দেখলে অসুস্থ ব'লে বোঝবার উপায় নেই, যদিও কথার সুর আর বসবার শিথিল ভঙ্গিতে সেটা কতকটা ধরা পড়ে।

পেছনের খোলা জানালায় সকালের আলোর লাল আভা ক্রমে ফিকে হয়ে আসছে, শাদা আলো উজ্জলতর হচ্ছে।

বাইরে যাওয়া-আসার একমাত্র দরজা ডান-দিকে। খাবারের ট্রে নিয়ে সেইদিক থেকে সুমিত্রা ঢুকল। সুমিত্রার গায়ের রঙ উজ্জল শ্যাম, সে তন্বী এবং সুন্দরী। চোখে-মুখে একটা সতেজ দৃঢ়তার ভাব। বয়স বাইশ-তেইশের বেশী নয়। সুমিত্রার পরণে বাসন্তী রঙের আটপৌরে কাপড়, চুলের রাশ এলো খোঁপা ক'রে বাঁধা।

দুধের পেয়ালা থেকে ধোঁয়া উঠছে, এগ-কাপে ডিম, যথাযোগ্য বাসনে মাখন, চিনি, বিস্কিট। পাশের টিপয়ের উপর ট্রে নামিয়ে রেখে)

সুমিত্রা। এবারে খেয়ে নাও, বাবা। বইটা দাও দেখি, তুলে রাখছি।

(বইটা নিয়ে শেল্‌ফে রাখল।)

শশাঙ্ক। তুমি কেন এত কষ্ট করতে গেলে মা? আর একটু দেরি করলেই ত নার্স এসে পড়ত!

সুমিত্রা। নার্স আসে নি ব'লে তোমার দেরি ক'রে খেতে হবে? আমরা তাহলে রয়েছি কি করতে?

(শশাঙ্ক খেতে লাগলেন। সুমিত্রা বেড-কভারটাকে আরও একটু সটান ক'রে পেতে টেবিলের কাছে গিয়ে টাইমপিস্‌টাতে দম দিল। তার পর জানালার পরদা আরও ভাল ক'রে দু'পাশে সরিয়ে দিয়ে বাপের কাছে ফিরে এসে তাঁর দুধে চিনি মেশাচ্ছে।)

শশাঙ্ক। তোমাদের চা খাওয়া হয়ে গিয়েছে মা?

সুমিত্রা। এই এখুনি হবে।

শশাঙ্ক। (খাওয়া বন্ধ ক'রে হাত তুলে) তাহলে তুমি যাও মা। আমার জন্যে তোমাদের সকলের চা খাওয়া—

সুমিত্রা। তুমি যে কি বল বাবা! একটু দেরি ক'রে চা খেলে আমরা ম'রে যাব? তোমার খাওয়া হোক, তার পর এই ওষুধটা তোমাকে খাইয়ে দিয়েই আমি যাচ্ছি।

(শশাঙ্ক আবার খেতে লাগলেন।)

ও কি রকম খাওয়া হচ্ছে? এত তাড়াতাড়ি কেন করছ? কোনো কিছুতেই তাড়াতাড়ি করা তোমার একেবারে বারণ।

শশাঙ্ক। তাড়াতাড়ি করছি না, মা।

(হুঁঃ, ব'লে একটু হেসে সুমিত্রা মেজার গ্লাসে ক'রে একদাগ ওষুধ আর কাচের ফ্লাস্ক্ থেকে খাবার জল নিয়ে এল। এমন সময় ডানদিক থেকেই নার্স এসে ঢুকল। মাঝবয়সী বাঙালী মেয়ে, বেশ শক্ত-সমর্থ দেখতে। হাতের 'আটাসে' কেস্‌টা টেবিলে রেখে, শাদা শাড়ীর আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে এগিয়ে এসে)

নার্স। এই যে, আমায় দিন।

সুমিত্রা। আমিই দিচ্ছি খাইয়ে।

নার্স। ভবানীপুর থেকে আসতে হয়, সব দিন ঠিক সময় বাস্ ধরতে পারি না, তাই দেরি হয়ে যায়।

সুমিত্রা। (ওষুধ খাইয়ে শশাঙ্ককে জল খেতে দিয়ে) আপনার এমন বেশী ত কিছু দেরি হয় নি! (ট্রেতে পাট-করা তোয়ালে ছিল, সুমিত্রা সেটার পাট খুলছে শশাঙ্কর মুখ মুছিয়ে দেবে ব'লে।)

নার্স। (হাত বাড়িয়ে) আমায় দিন।

সুমিত্রা। এই ত হয়ে গেল, আমিই দিচ্ছি মুছিয়ে।

(ট্রেটাও সুমিত্রাই তুলে নিচ্ছিল)

নার্স। না, না, ওটা আমি নিয়ে যাচ্ছি। (ব'লে প্রায় জোর করেই সেটা কেড়ে নিয়ে চলে গেল। শশাঙ্কর যে বইটা সুমিত্রা তুলে রেখেছিল, সেটা তাঁকে সে ফিরে এনে দিল।)

শশাঙ্ক। সব কাজ যদি তুমি নিজেই করবে, তাহলে নার্সটিকে কি করতে রেখেছ মা?

সুমিত্রা। সব করা কি আর আমার সাধ্যে আছে? যতটা পারি করি। করতে পেলেই আমার ভাল লাগে বাবা।

শশাঙ্ক। তা জানি। কিন্তু তোমার যে অনেক কাজ মা! তোমাকে খাটিয়ে মারছি ভাবতে আমার যে ভাল লাগে না।

(নার্স ফিরে এল। টাইমপিস্‌টার দিকে একবার তাকিয়ে নিজের হাতঘড়িটা দেখল, তার পর চার্টটি নিয়ে খাবার সময়টা লিখে রাখছে।)

এইবার তুমি চা খেতে যাও মা।

সুমিত্রা। এই যাচ্ছি।

(বেরুতে যাচ্ছিল, ডাক্তার ব্যানার্জি এসে ঢুকলেন। সুতরাং সুমিত্রাকেও ফিরে আসতে হ'ল। ডাক্তার প্রায় শশাঙ্কর সমবয়সী, মুখে একটা হাসিখুশী ভাব।)

শশাঙ্ক। নমস্কার, আসুন, আসুন। বসুন।

ডাক্তার। নমস্কার। কেমন আছেন আজ?

শশাঙ্ক। সে ত আপনারই কাছে শুনব। তা, আজ এত সকাল সকাল?

(নার্স ডাক্তারের হাত থেকে তাঁর ব্যাগটা নিয়ে টিপয়ের ওপর রাখল। ডাক্তার একটা চেয়ার শশাঙ্কর পাশে টেনে নিয়ে তাঁর কাছ-ঘেঁসে বসলেন।)

ডাক্তার। এ পাড়ায় একটা জরুরী কল্ ছিল, মেনিঞ্জাইটিসের কেস্। সেটা সেরে ভাবলাম, এতটা কাছেই যখন এসে পড়েছি তখন আপনাকেও একবারটি দেখেই যাই। (নার্সের দিকে ফিরে) চার্ট দেখি।... আজকাল পেট্রল যা পাই, একটু দূরের কল্ হ'লে ত নিতেই পারি না। শুনছি নাকি এর পর এও আর দেবে না। তখন যে ডাক্তারগুলোর কি গতি হবে!

(নার্স চার্ট এনে দিলে সেটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে নাড়ী দেখছেন।)

শশাঙ্ক। গতিটা রুগীগুলোর কি হবে, সেইটে হচ্ছে আসল ভাববার কথা। সবাই কি বিনা চিকিৎসায় মরব?

ডাক্তার। রুগীরা যে বাঁচে, সেটা ডাক্তারদের চিকিৎসার গুণে, এরকম একটা ধারণা আপনার মনে এখনো রয়েছে তাহলে?

(ব্লাড-প্রেসার ইন্‌স্ট্রুমেন্ট খুলছেন।)

শশাঙ্ক। আপনার কি ধারণা, রুগীরা যে আপনাদের ডেকে পাঠায়, তা ঐ আপনাদের-দেওয়া ওষুধগুলো খাবার লোভে?

ডাক্তার। (শশাঙ্কর হাতে ইন্‌স্ট্রুমেন্টের কাপড় জড়াতে জড়াতে) ওষুধগুলো সুস্বাদু নয়, না?

শশাঙ্ক। খেয়ে দেখবেন একটু?

ডাক্তার। রক্ষে করুন!

(দুজনেই হাসলেন।)

ডাক্তার। (ইন্‌স্ট্রুমেন্টের হাওয়া পাম্প করতে করতে) তা, যে রেটে লোক পালাচ্ছে, শহর ত খালি হয়ে গেল মশাই। আমরা ওষুধগুলো নিয়ে এর পর করব কি? সেগুলো খাবে কে?

(ব্লাড-প্রেসার দেখছেন।)

শশাঙ্ক। আপনি কি সেইজন্যে আমায় কলকাতায় ধ'রে রেখেছেন, কিছুতেই বাইরে যেতে দিতে চাইছেন না?

সুমিত্রা। তুমি বা তোমার মত আর ক'টি রুগী যারা কলকাতা ছেড়ে পালাতে পারছে না তারা ওঁর কত ওষুধই বা খেতে পারবে বাবা? ডাক্তারদের পসার যদি বজায় রাখতে হয় ত এমন ওষুধ এখন বের করতে হয়, যা খেলে বোমার ভয় সারে। সে রকম ওষুধ কিছু আছে নাকি ডাক্তার ব্যানার্জি?

(সুমিত্রাদের চাকর বঙ্কু ঢুকল।)

বঙ্কু। চা দেওয়া হয়েছে মা।

সুমিত্রা। আমি একটু পরে যাচ্ছি।

(বঙ্কুর প্রস্থান।)

শশাঙ্ক। তুমি যাও মা, যাও, যাও।

সুমিত্রা। এই যাচ্ছি। (ডাক্তারকে) কেমন দেখলেন ?

ডাক্তার। (চার্টে ব্লাড্-প্রেসার লিখে রাখতে রাখতে) তা মন্দ কি ? একটু ভালোর দিকেই বলা যেতে পারে। সেই ইন্‌জেক্‌শনটা এঁকে আজ আর দেব না, ক'টা দিন এখন একটু ফাঁক দিয়ে দেখতে চাই, উনি কি রকম থাকেন।

সুমিত্রা। উনি আশা করি ভালই থাকবেন, কিন্তু বোমার ভয় সারে এমন একটা ওষুধ বা ইন্‌জেক্‌শন সত্যিই আপনারা এইবার ভেবে বের করুন। শহরের লোকগুলোর কাণ্ডকারখানা দে'খে ত হাড়-জ্বালাতন হয়ে যাচ্ছি !

ডাক্তার। ওষুধ কষ্ট ক'রে আমাদের বের করতে হবে না, মা। শহর ছেড়ে যারা পালাচ্ছে তারা বাইরে গিয়েও যে বেশীদিন টিকবে তা মনে ক'রো না। যেমন হুড়মুড় ক'রে সব যাচ্ছে, তেমনি ফেরবার জন্তেও ক'দিন পরেই আবার হুড়োহুড়ি বেধে যাবে। অত লোক ধরবে কোথায় ? দু'শো লোক যেখানে ধরে না, সেখানে দু' হাজার গিয়ে জুটছে। বসতে ঠাঁই নেই, শুতে ঠাঁই নেই, খেতে পাচ্ছে না, তার ওপর কলেরা, টাইফয়েড, এসব ত আছেই। সংসার চালাবার দায় যাদের ঘাড়ে তারা থাকবে কলকাতায় আর বাড়ীর অন্তরা থাকবে বাইরে, এতে দু'দিক্ সামলাতে কত লোক সর্বস্বান্ত হয়ে যাচ্ছে ?

(বঙ্কু ফিরে এল।)

বঙ্কু। আচ্ছা মা, এক কাজ করলে হয় না ?

সুমিত্রা। কি, বল ?

বঙ্কু। আপনার চা-টা এইখানে নিয়ে এলে হয় না ?

শশাঙ্ক। মা তুমি, এইবারে তুমি যাও। ওরা নিশ্চয় তোমার জন্তে অপেক্ষা ক'রে বসে আছে, কি যে ভাবছে !

ডাক্তার। আমিই একে আটকে রেখেছি, নয় ? তা আমার ত হয়ে গেল, এইবারে উঠি ?

(উঠে দাঁড়ালেন।)

সুমিত্রা। বাবার খাওয়া-দাওয়া বিষয়ে কয়েকটা কথা আমার জেনে নেবার ছিল।

ডাক্তার। তা বেশ ত মা, চল, নীচে ব'সেই কথা হবে এখন ? এক পেয়ালা চাও জুটে যাবে সেই সূত্রে।

(প্রথমে সুমিত্রা, তার পর ডাক্তার, তার পর বঙ্কু, এই ভাবে তিন জনের নিষ্ক্রমণ।)

শশাঙ্ক। নার্স !

নার্স (এগিয়ে এসে) কি বলছেন ?

শশাঙ্ক। না, এমন কিছু কথা নয়, এই এমনি একটু জানতে চাইছি, কলকাতা ছেড়ে সবাই কি চ'লে যাচ্ছে ?

নার্স। সবাই না হোক, অনেকেই যাচ্ছে ত ?

শশাঙ্ক। অবিশ্যি ভয়ের কারণ একেবারেই যে নেই তা ত নয় ? তবে কি না, কোনো জিনিস নিয়েই বাড়াবাড়ি করাটা ভাল নয়। তা তোমরা যাচ্ছ না ?

নার্স। যাবার জো কি বলুন ! কলকাতা ছেড়ে গেলে যে শুকিয়ে মরতে হবে ! যেখানে যাব সেখানে কি আমাদের বসিয়ে খেতে দেবে ?

শশাঙ্ক। এদের অবশ্য সে ভাবনা নেই। এক হাটখোলাতেই সাতখানা বাড়ী, মাস গেলে দু'হাজার টাকার বেশী ভাড়া আসে। কিন্তু এরা আমাকে নিয়েই মুশ্‌কিলে পড়েছে। নিয়ে যেতেও পারছে না, ফেলে যাওয়াও শক্ত হচ্ছে।

নার্স। ফেলে যাওয়া কি যায় ? আপনি তাড়াতাড়ি সেরে উঠুন, তার পর সবাই একসঙ্গে যাবেন এখন।

শশাঙ্ক। (হেসে) আর সেরে উঠেছি !

(দরজাটাকে ঠেলে খুলে নিখিল ঢুকল। লম্বা ছিপছিপে চেহারা, ফর্‌সা রঙ, একমাথা কালো চুল, ঠোঁটের ওপর সরু একটি গোঁপের রেখা। পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর বয়স হবে। বেশ চটপটে সপ্রতিভ ধরনধারণ। হাতে কয়েকটা প্যাকেট ও একটা ওষুধের শিশি।)

নিখিল। আজ আপনাকে বেশ ভাল দেখাচ্ছে মেসোমশায়।

শশাঙ্ক। (আগের হাসিটিরই জের টেনে) যদি কোনোদিন সারি, ত তোমার মুখে ঐ কথাটা ক্রমাগত শুনে শুনেই বোধ হয় আমি সারব নিখিল।

নিখিল। (দুই হাত জোড়া প্যাকেট ও শিশি টেবিলে রেখে) কেবল আমার মুখে শুনতে হবে কেন ? ডাক্তার ব্যানার্জ্জি ত একটু আগেই আপনাকে দে'খে গেলেন, তিনি কি বললেন ?

শশাঙ্ক। তিনি কি বলেছেন সে খবর নীচে থেকে সংগ্রহ না ক'রে তুমি আসনি, আমি জানি।

নিখিল। না, না, সত্যিই আপনাকে দে'খেই মনে হ'ল আপনি আজ ভাল আছেন।

(শশাঙ্কের পিঠের কুশনটা ঠিক ক'রে দিল।)

শশাঙ্ক। অমন ভাল থেকে কি লাভ বল ?

নিখিল। তার মানে ?

শশাঙ্ক। ঐ চেয়ারটা টেনে নিয়ে বস' দেখি, তার পর মানে কি তা বলছি।

(নিখিল একটা মোড়া এনে শশাঙ্কর পা-দুটো তার ওপর রাখল, তার পর আর একটা মোড়া টেনে নিয়ে তাঁর পায়ের কাছে বসল। নিখিলের আনা জিনিসগুলোকে সাজিয়ে রেখে নার্স জানালার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।)

দেখ, এমনিতে একটু ভাল বোধ করছি তা ঠিক। ক'দিন আগে অবধি একটানা এতক্ষণ চেয়ারে ব'সে থাকতেও কষ্ট হ'ত। কিন্তু ভাল আছি ব'লে যত সার্টিফিকেটই তোমরা আমায় দাও, এই ঘরটা ছেড়ে নড়তে ত আমায় দেবে না ?

নিখিল। কেন, এই ঘরটা কি দোষ করল মেসোমশায় ? বেশ ত ঘর !

শশাঙ্ক। (হেসে) ঘরটা বেশ ভালই, কিন্তু ধর, যদি ঠিক এর ছাতের ওপর জাপানী বোমা হঠাৎ একটা পড়ে ?

নিখিল। Incendiary না, explosive ?

শশাঙ্ক। ধর, যদি সেটা explosive-ই হয় ?

নিখিল। বোমাটার ওজন কত ধরব ? পাঁচ পাউণ্ড না পঁচিশ পাউণ্ড, না পাঁচশো পাউণ্ড ?

শশাঙ্ক। তুমি কথাটাকে হাল্‌কা ক'রে উড়িয়ে দিতে চাইছ, কিন্তু কথাটা ভাববার মত কি নয় ?

নিখিল। (উঠে গিয়ে চার্টটা নিয়ে এল) আপনি খুব কি ভাবছেন মেসোমশায় ?

শশাঙ্ক। নিজের জন্যে একেবারেই ভাবছি না। আমার যা জীবন, এ কোনোরকম ক'রে শেষ হয়ে গেলেই এখন বাঁচি। কিন্তু আমাকে নিয়ে অন্যদের কি বিপদ্ হয়েছে দেখ দিকি। দেওঘরে বাড়ী ঠিক হয়ে আছে, দু'মাস ধ'রে তার ভাড়া গুনছে, যেতে পারছে না।

নিখিল। (চার্টটাকে যথাস্থানে রেখে এসে) তা, যেতে পারলেও ত ভাড়া গুনতেই হ'ত।

শশাঙ্ক। আবার তুমি কথাটাকে হাল্‌কা ক'রে দেবার চেষ্টা করছ !

নিখিল। হাল্‌কা না ক'রে কি করি বলুন ? তবে চেষ্টা ক'রে সেটা করছি না। যদি সত্যিই ভয়ের কিছু আছে ব'লে ভাবতাম তাহলে চেষ্টার দরকার হ'ত।

শশাঙ্ক। তুমি বলতে চাও ভয়ের কিছু নেই ?

নিখিল। যে রকম দিগ্বিদিক্ জ্ঞান হারিয়ে সবাই ছুটছে, সে রকম ভয়ের কিছু ঘটতে পারে ব'লে আমি সত্যিই মনে করি না। সেদিন হাওড়ার পুলের ওপর অবাঙালীদের ঠেলাঠেলি মারামারি দে'খে এসে অবধি জীবনটারই প্রতি আমার কেমন একটা বিতৃষ্ণা এসে গেছে। বাঁচতে কে না চায় ? কিন্তু এই রকম ক'রে বাঁচতে হবে ?

শশাঙ্ক। এরা কি ঠিক প্রাণের ভয়ে পালাচ্ছে তুমি ভাবো ?

নিখিল। বীরদর্পে পালাচ্ছে, আপনি ভাবছেন ?

শশাঙ্ক। ভয় পেয়েই পালাচ্ছে, কিন্তু ভয়টা ঠিক মৃত্যুর নয়। ভয়টা বেশী আসলে, যা দেখেনি কোনোদিন এমন জিনিসের। (নার্স ফিরে দাঁড়িয়ে শুনছে।) ইউরোপের লোক বোমাকে এত ভয় পায় না, কারণ জিনিসটা ওদের চেনা ; কিন্তু কোথাও কারু বসন্ত হয়েছে শুনলে এরকমই ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়তে থাকে। আবার এদের বেলায় দেখ, বাড়ীর চার-পাশে দু'বেলা বসন্তে লোক মরছে, তার মধ্যে দিব্যি নির্ব্বিকারচিত্তে ব'সে থাকবে। আমাদের দেশের লোক স্বভাবতঃই অন্য দেশের লোকদের চেয়ে বেশী ভীতু এটা আমি মনে করি না।

নিখিল। নিজের দেশের লোকগুলির জন্যে আপনার যে কি দরদ তা আমি জানি।

শশাঙ্ক। আমার সত্যিই মনে হয়, এদের এই ভয়টা ভেঙে যেতে খুব বেশীদিন লাগবে না। তার পর হয়ত অন্য দেশের লোকদের চেয়েও বেশী সাহসেরই পরিচয় এরা দেবে। কিন্তু তা হলেও, ভয় ভাঙাবার জন্যে, মেয়েদের, শিশুদের কলকাতায় ধ'রে রাখবার আমি পক্ষপাতী নই। তুমি, বিভা, এদের আমিই এক রকম জোর ক'রে এখানে ধ'রে রেখেছি। আর যাদের ভয় পাওয়া হয়ত উচিত নয়, অথচ পাচ্ছে, তাদেরই বা এখানে আটকে রাখবার কি অধিকার আছে আমার ?

নিখিল। সব অবস্থায় প্রতিকারের উপায় ত মানুষের হাতে থাকে না মেসোমশায় !

শশাঙ্ক। (দীর্ঘনিঃশ্বাস সহকারে) কি জানি !

(রাজেনকে সঙ্গে ক'রে তুমি আবার এসে ঢুকল। রাজেনের মাথায় ছোট একটি টাক, তবে চেহারা মোটের ওপর ভাল। বয়স ত্রিশের কোঠায়। আজন্ম সহজ জীবনযাপন ক'রে এসেছে, চেহারায় ও ধরনধারণে সেটা বোঝা যায়। পরণে কোঁচানো

সরুপাড় তাঁতের ধুতি, গিলে-করা পাঞ্জাবি, পায়ে রেশমের ফুল-তোলা শাদা কটকী চটিজুতো।)

এই যে রাজেন! এসো বাবা, এসো। তোমাদের চা খাওয়া হয়ে গেল মা?

সুমিত্রা। হাঁ, বাবা।

(সুমি নার্সকে কি একটা বলল, নার্স ঘাড়টাকে অল্প একটু হেলিয়ে সম্মতি জানিয়ে বেরিয়ে গেল। নিখিল উঠে গিয়ে জানালার পাশে টেবিলটার এক কোণে শরীরের ভর রেখে দাঁড়াল। নিখিলের আনা জিনিসগুলোকে সুমি নেড়েচেড়ে দেখছে। নিখিল সুমিকে দেখছে।)

শশাঙ্ক। বাবা, রাজেন, আমি কাল রাত্রে বড্ড চেঁচামেচি করেছি, না বাবা? তোমাদের ঘুমের বড় ব্যাঘাত হয়েছে।

রাজেন। (চার্ট দেখছিল, সেটাকে রেখে দিয়ে) না, না। ঘুম আমাদের এমনিতেও আজকাল বড় একটা ত হয় না! সারাক্ষণ একটা উদ্বেগ মনে নিয়ে মানুষ ঘুমোতে পারে না।

শশাঙ্ক। সেদিন চাটগাঁয়ে বোমা পড়েছে শুনেছিলাম, তার খবর আর কিছু কি বেরিয়েছে?

রাজেন। হ্যাঁ, বেরিয়েছে বৈ কি? আজকের কাগজ ত প্রায় তাইতেই ভরতি। বেশ কয়েকশো লোক মারা গিয়েছে।

(সুমি পেছনের জানালাটার কাছে গিয়ে বাইরে কি একটা যেন দেখছে। নিখিলও তার পাশে গিয়ে জুটেছে।)

শশাঙ্ক। বল কি বাবা? আমাদের দিশী লোক?

রাজেন। দিশী লোকই ত বেশীর ভাগ।

শশাঙ্ক। আহা হা! আমাদের দেশের নিরীহ সব লোক, কারুর ভালতেও নেই, মন্দতেও নেই তারা!

রাজেন। (নিখিলের ছেড়ে-যাওয়া মোড়াটাতে ব'সে) সে কথা কে আর শুনছে?

(সুমি একদৃষ্টে বাইরেটাকে দেখছে, নিখিল বেশী সময়টা সুমিকে দেখছে। মাঝে মাঝে একটা-দুটো কথাও হচ্ছে দু'জনে।)

শশাঙ্ক। তোমরা খুব সাবধানে থেকো বাবা। এ অবস্থায় যা যা করা দরকার, সব ক'রো।

রাজেন। করবার কি-ই বা আছে? চাটগাঁ এতটুকু শহর, তাই বলেই কয়েকশো মরেছে; কলকাতাতে বোমা পড়লে হাজারে হাজারে লোক মরবে।

(সুমি এসে শশাঙ্কর পেছনে দাঁড়াল। নিখিল ঝুঁকে প'ড়ে বাইরেটাকে দেখছে।)

একটা ভাল shelter পর্য্যন্ত শহরে আজ অবধি তৈরি হ'ল না। কতগুলি খানা খুঁড়ে রেখেছে; যারা মরবে তাদের চটপট্ সেগুলিতে গোর দেওয়া চলবে।

শশাঙ্ক। (ঘাড় ফিরিয়ে সুমিকে দে'খে নিয়ে) কলকাতা ছেড়ে এখন সবাইকার চ'লে যাওয়াই বোধ হয় উচিত।

রাজেন। তাই ত সবাই বলছে। আমি নিজের জন্যে তত ভাবছি না, কিন্তু সুমিকে, বিভাকে আর একদিনও—

শশাঙ্ক। না, না, কেবল সুমি আর বিভা কেন, তোমাদের সবাইকারই এখন কলকাতা ছেড়ে চ'লে যাওয়া উচিত।

সুমিত্রা। যঃ পলায়তি স জীবতি।

শশাঙ্ক। (সুমির দিকে মুখটাকে একটু ফিরিয়ে) তা মা, অকারণ নিজেকে বিপন্ন করার মধ্যে বাহাদুরি ত কিছু নেই! কলকাতা ছেড়ে যদি যাওয়া সম্ভব হয় ত কেন যাবে না মা?

সুমিত্রা। ছেড়ে যেতে যারা পারে তারা যাক না!

শশাঙ্ক। আমার সামনে এসো দেখি মা: (মোড়া থেকে পা নামিয়ে সোজা হয়ে ব'সে) বসো। (সুমিত্রা মোড়াটায় বসলে তার পিঠে হাত রেখে) শোন মা, আমাকে ছেড়ে যেতে তোমার ভাল লাগবে না তা জানি, কিন্তু কর্ত্তব্যের খাতিরে অনেক অপ্রিয় কাজই মানুষকে করতে হয়। আমাকে তোমরা হাসপাতালে পাঠিয়ে দাও, সেখানে আমার কোনো অসুবিধা হবে না, আমি ভালই থাকব। ডাক্তার ব্যানার্জ্জিকে ব'লে যেও, তিনি রোজ তোমাদের খবর দেবেন। নিখিল যদি কলকাতাতে থাকে, সেও তোমাদের খবর দিতে পারবে। তার পর ধর, বাড়াবাড়িই যদি কিছু হয়, দেওঘর এমন কিছু দূরের রাস্তা নয়, টেলিগ্রামে তোমাদের খবর দিলে তোমরা চট্ ক'রেই এসে পড়তে পারবে।

রাজেন। এ ত খুব ন্যায্য কথাই উনি বলছেন, সুমি।

সুমিত্রা। যে-কাজ আমাকে কেটে ফেললেও আমার দ্বারা হবে না তোমরা জানো, কেন বৃথা তা আমাকে করতে বলছ?

রাজেন। দেখছেন ত? এরকম জেদের কিছু মানে আছে কিনা আপনিই বলুন?

সুমিত্রা। তুমি চুপ কর দেখি। যা বুঝতে পার না, তা নিয়ে কেন কথা বলতে এসো?

রাজেন। তোমার ধারণা, বুঝবার শক্তিটা ভগবান্ একমাত্র তোমাকেই দিয়েছেন। থাকো কলকাতায়, নিজেই ভুগবে, আমার কি?

(বন্ধুর প্রবেশ।)

বন্ধু। রেঙ্গুন-পালানো সেই বাবুটা আপনাকে ডাকছেন।

রাজেন। রেঙ্গুন-পালানো বাবু কি রে বাঁদর ?

বন্ধু। আজ্ঞে, রেঙ্গুন-পালানো সাহেবটা।

রাজেন। চুপ, লক্ষ্মীছাড়া ইডিয়ট। রেঙ্গুন-পালানো কি রে ? আর কোনোদিন ঐরকম ক'রে বলবি ত দেখবি মজা !

(উঠে চ'লে গেল, পেছন পেছন বন্ধুর প্রস্থান। নিখিল এসে শেল্ফ থেকে একটা বই নিয়ে আবার জানালার কাছে গিয়ে সেটা পড়ছে।)

সুমিত্রা। সাধে একলা ওঁকে তোমার কাছে আসতে দিতে আমার ভরসা হয় না ? কখন কি তোমাকে বোঝাবেন কে জানে ?

শশাঙ্ক। না মা, ওকে কেন বোঝাতে হবে ? নিজের মন দিয়েই কি আমি বুঝছি না ? কলকাতা ছেড়ে তোমার চ'লে যাওয়াই উচিত।...তুমি যখন ছোট এতটুকুন ছিলে, তোমার মা...(একটু থেমে,গলার স্বর বদ্‌লে) তোমায় কোলে ক'রে তাঁর সামনে গিয়ে আমার দাঁড়াতে হ'ল। বললেন, 'ও'কে নিয়ে আমায় ভুলবে, আর আমার অভাব ওকেও ভুলিয়ে দেবে।' তখন থেকে চেষ্টার ত্রুটি করিনি। তা যদি নাও হ'ত, তোমার মা যদি আজ থাকতেন, তোমার মূল্য আমার কাছে কিছুই কম হ'ত না। কোনো বিপদের একটু আঁচও তোমার গায়ে লাগছে এ চিন্তাও যে আমার পক্ষে কত কষ্টের তা তোমাকে কেমন ক'রে বোঝাব ? আমি নিতান্ত নিজেরই গরজে বলছি মা, আমাকে ভাল একটা হাসপাতালে রেখে তোমরা চ'লে যাও।

(নিখিল আবার জানালায় ঝুঁকে প'ড়ে বাইরেটাকে দেখছে।)

সুমিত্রা। বাবা, আমার সেই এতটুকু বয়স থেকে যত কিছু তুমি আমার জন্যে করেছ, তার প্রতিদান কি এইরকম ক'রে আমাকে দিতে বলছ ?

শশাঙ্ক। আমার জন্যে বেশ ভাল ব্যবস্থা যতরকম হওয়া সম্ভব সব ক'রে রেখে যদি চ'লে যাও, তোমার কিছু অন্যায় হবে না মা, আর আমি যে কিছুই মনে করব না তা ত জানোই।

সুমিত্রা। তুমি কিছু মনে করবে না, কিন্তু আমারও মন ব'লে একটা জিনিস আছে ত বাবা ? আমার কথাটাও তাহলে শোন। মাকে মনে নেই ; জ্ঞান হয়ে অবধি তোমাকেই কেবল জেনেছিলাম ! যা পেয়েছিলাম, তার চেয়ে বেশী কোনো মানুষের জীবনে ধরতে পারে তাই কোনোদিন মনে হয়নি। চিরটা জীবন বিরূপ ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই ক'রে তোমার কেটেছে ; আজ এই শেষ বয়সে ক'টা দিন আমার কাছে একটু জুড়োতে এসেছ। তাও আসতে না, যদি তোমার শরীরটা না ভেঙে পড়ত। আজ তোমার এই অবস্থায় সেই বিরূপ ভাগ্যেরই হাতে তোমাকে আবার তুলে দিয়ে নিজের প্রাণটা নিয়ে আমি যে পালাব, সে শক্তি আমি পাব কোথা থেকে ? কেন তাহলে আমাকে মানুষ ক'রে গড়বার জন্যে এমন প্রাণ পণ করেছিলে, এমন ক'রে ভালই বা কেন বেসেছিলে ? (কথা জড়িয়ে এল।)

শশাঙ্ক। (একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে) হুঁ, বুঝতে পেরেছি মা, সমস্যা সত্যিই জটিল। তবে সব সমস্যারই সমাধান আছে ; ভগবান্ যদি দয়া ক'রে একটু তাড়াতাড়ি আমাকে এখন নেন, একমাত্র তাহলেই সবদিক্ রক্ষা হয়।

সুমিত্রা। (উঠে দাঁড়িয়ে, বাপের মুখে হাতচাপা দিয়ে) না, বলবে না, না, বলবে না অমন কথা ! কেন বললে, কেন বললে ? কেন এমন বিচ্ছিরি কথা মুখে আনলে ?

(সুমির কথার সুরের উত্তেজনায় নিখিল ত্রস্ত হয়ে ফিরে দাঁড়িয়েছে।)

শশাঙ্ক। (সস্নেহে কন্যার হাতটিকে সরিয়ে এনে নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে, একটু হেসে) আচ্ছা মা,—আর বলব না।

সুমিত্রা। ভাববেও না কোনদিন।

শশাঙ্ক। (আবার একটু হেসে) ভাবনার ওপর কি আর মানুষের হাত আছে রে পাগলী ?

(গদি-মোড়া চেয়ারটাতে শরীরটাকে যতটা এলিয়ে দেওয়া যায় দিয়ে শশাঙ্ক নিজ হাতে নিজের নাড়ী দেখছেন।)

নিখিল। (ছুটে এগিয়ে এসে) আপনার কি ব'সে থাকতে কষ্ট হচ্ছে মেসোমশায় ? শরীর খারাপ করছে ? এইবার একটু শোবেন ?

শশাঙ্ক। তা একটু শুতে পেলে মন্দ হয় না।

(সুমিত্রা ক্ষিপ্রহস্তে বেড্-কভারটা তুলে ফেলে বিছানা ঠিক করছে। নিখিল শশাঙ্কর হাত ধ'রে বিছানায় নিয়ে যাচ্ছে।)

দৃশ্যান্তর

দ্বিতীয় দৃশ্য

(সময় সন্ধ্যা, রবিবার। রাজেন্দ্রের বাড়ীর একতলায় সিঁড়ির নীচেকার হল। ডানদিকের দরজার পাশেই সিঁড়ির একটা অংশ এবং তার মিড্-ল্যাণ্ডিং-টা দেখা যাচ্ছে। ল্যাণ্ডিং-এর ঠিক নীচেই ছোট একটি টেবিলের ওপর টেলিফোন; পাশে হাতাবিহীন ছোট একটি চেয়ার। হলের মাঝামাঝি জায়গায় সোফা-সেট্ এবং বৈঠকখানার উপযোগী অন্য আসবাব। সিঁড়ির উল্টোদিকের, অর্থাৎ বাঁ দিকের দেয়াল ঘেঁষে একটি বড় টেবিল হারমোনিয়ম। তার থেকে বেশ খানিকটা দূরে, সামনের দিকে এক কোণে ছোট একটা কার্ড-টেবিল, আর তার চারদিকে চারটি হাতবিহীন চেয়ার। একটা hood দেওয়া আলোর নীচে ব'সে এক প্যাক তাস নিয়ে রাজেন অত্যন্ত নিবিষ্ট-মনে Solitaire খেলছে।

টেলিফোন বাজল। টেলিফোন বেজেই চলেছে; রাজেন উঠে দাঁড়িয়েও হাতের তাসগুলিকে তাড়াতাড়ি মিলিয়ে মিলিয়ে নীচে রাখছে, এরই মধ্যে ডানদিক্ থেকে স্নুমি ঢুকল একটা সেলাই হাতে ক'রে। সেলাইটা হাতে ক'রেই স্নুমি টেলিফোন ধরল।)

স্নুমি। হেলো…কে?…ও!…আচ্ছা…আচ্ছা, তা বেশ ত।…না, দরকার নেই…বলছি ত দরকার নেই। …আচ্ছা…আচ্ছা…আচ্ছা।…ছাড়ছি।

(চুলগুলোকে এলো খোঁপা ক'রে জড়াতে জড়াতে বিভা ঢুকল ডানদিক্ থেকেই। উনিশ-কুড়ির মত বয়স, পরিপাটি সজ্জা। গায়ের রঙ, নাক মুখ চোখ, শরীরের গড়ন, সবই সুন্দর। কিন্তু দৃষ্টিতে, ভ্রূভঙ্গিতে এমন কঠোর কিছু একটা আছে, যা মানুষকে প্রতিহত করে।)

বিভা। টেলিফোন কে করছিল বৌদি?

স্নুমি। (টেলিফোনের কাছ থেকে স'রে এসে) নিখিলবাবু।

বিভা। দু'বেলা ত স্বয়ং আসছেন, আবার টেলিফোন কেন?

স্নুমি। বাবার কিছু দরকার আছে কি না, সন্ধ্যায় তাঁকে দেখতে আসবেন, আমরা তখন বাড়ী থাকব কি না, এই সব জানতে চাইছিলেন।

বিভা। দেখতে আসবেন ওঁকে, জানতে চাইছেন তোমরা বাড়ী থাকবে কিনা,—মানেটা ঠিক বোঝা গেল না।

স্নুমি। খুব গভীর মানে কিছু না থাকাই সম্ভব।

বিভা। কি জানি!

(চ'লে গেল। স্নুমিও সেলাই হাতে ক'রে সিঁড়িটার দিকে যাচ্ছিল, রাজেন ডাকল।)

রাজেন। স্নুমি!

স্নুমি। (ফিরে দাঁড়িয়ে) কি বলছ?

রাজেন। (তাসগুলিকে পাট ক'রে এক পাশে রেখে দিয়ে) আরে, বসোই না এসে একটু। তুমি ত বোমাকেও ভয় কর না, না হয় আমার কাছেও খানিকক্ষণ ব'সে একটু সাহসের পরিচয় দিয়ে যাও।

স্নুমি। আচ্ছা!

(যেখানে দাঁড়িয়েছিল তার সব-চেয়ে কাছের, রাজেনের কাছ থেকে অল্প একটু দূরে একটা গদি-মোড়া চেয়ারে বসল।)

রাজেন। এর চেয়ে আর বেশী কাছে আসতে ভরসা হ'ল না?

স্নুমি। রসিকতা জিনিসটা তোমার এখনও আসে, দেখছি। তোমার অবস্থা তাহলে ততটা মারাত্মক এখনো হয় নি।

রাজেন। আমার অবস্থাটা খারাপ কোন্‌দিকে দেখছ?

স্নুমি। (সেলাইয়ের কোঁড় তুলতে তুলতে) বালাই ষাট, খুব ভাল দেখছি! বুদ্ধিসুদ্ধি যেটুকু বা ছিল, বোমার ভয়ে তাও লোপ পেয়ে যাবার জোগাড়।

রাজেন। আচ্ছা, বুদ্ধি তোমার না-হয় খুব বেশী, কিন্তু এই যে জাপানী রেডিও-তে রোজ সবাইকে বড় শহরগুলি ছেড়ে চ'লে যেতে বলছে, সেটার তাহলে কিছুই মানে নেই বল? কাল সাইগন রেডিও-তে সুভাষ বসুও ঠিক ঐ কথাই বলছিলেন। অন্যদের কথা না-হয় উড়িয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু তাঁর কথার ত একটা মূল্য আছে?

স্নুমি। (সেলাই থেকে চোখ না তুলেই) তুমি সুভাষ বসুর খুব একজন বড় চেলা, নয়? যে কাজগুলো উনি করতে বলছেন, তার মধ্যে কেবল পালানোটাই তোমার পছন্দ, সেইটেই করতে চাইছ। তা দেখ, তর্ক ক'রে জেতা যায়, কিন্তু তর্ক ক'রে একটা মানুষকে ভয় পাওয়ানো যায় না, যদি ভয় পাওয়া তার স্বভাবে না থাকে।

রাজেন। ভয় পাওয়া স্বভাবে আছে কিনা, সময় হলেই সেটা বুঝতে পারব।

স্নুমি। তুমি কি ক'রে সেটা বুঝবে? তুমি তখন কাছাকাছি কোথাও থাকবে ব'লে ত ভরসা হচ্ছে না!

রাজেন। (আর এক পালা Solitaire-এর জন্যে তাস সাজাতে সাজাতে) তোমাকে নিয়ে মুশকিল কোথায় হয়েছে জানো? ভগবান্ কল্পনাশক্তি ব'লে জিনিসটা তোমাকে একেবারে দেন নি।

সুমি। (একটু হেসে) তোমাকে সেটা খুব বেশী দিয়েছেন ব'লেই বলছি, আমাকে যে একেবারে দেন নি সেটাও তোমার কল্পনা নয় ত?

রাজেন। (জোর গলায়) না। যদি একটু দিতেন ত ভাল করতেন, তোমাকে নিয়ে আজ তাহলে এই বিপদে আমাদের পড়তে হ'ত না।

সুমি। (সেলাইয়ে চোখ রেখে) আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব? ভয়ের কল্পনাটাই কেবল কি কল্পনা, ভয় পাবার মত কিছু নাও যে ঘটতে পারে সে কল্পনাটা কল্পনা নয়?

রাজেন। (তাসগুলিকে গুটিয়ে নিয়ে সজোরে ভাঁজতে ভাঁজতে) কলকাতায় বোমা পড়ছে, এটা কিছুমাত্র কষ্ট-কল্পনা নয়, আর পড়লে খুব একটা মজা হবে মনে ক'রো না।

সুমি। বোমা না পড়তেই তোমরা যা সুরু করেছ, সেটাকেও এমন কিছু মজার ব্যাপার ব'লে আমার মনে হচ্ছে না।

রাজেন। (তাসগুলিকে একদিকে ঠেলে সরিয়ে রেখে) তোমার সঙ্গে তর্কে কে পারবে।

সুমি। ভগবান্ ত কল্পনাশক্তি দিয়েছেন,—কল্পনা ক'রে নাও না যে পেরেছ, তর্কে জিতেছ।

(বাঁদিক্ থেকে বন্ধুর প্রবেশ।)

বন্ধু। রেঙ্গুনের সেই যে সাহেবটা কলকাতা বেড়াতে এসেছিল, তিনি আপনাকে ডাকছেন।

রাজেন। তাঁকে আসতে বল।

সুমি। আমি এবারে পালাই, কলকাতার বোমাকে ভয় করি না সত্যিই, কিন্তু রেঙ্গুনের বোমাকে আমার ভীষণ ভয়।

(উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু বাঁদিক্ থেকে রণধীর ঢুকে পড়াতে আবার বসল।)

রাজেন। (উঠে দাঁড়িয়ে) এই যে রণধীরবাবু, আসুন। নমস্কার।

রণধীর। নমস্কার, নমস্কার।

(রণধীর কিঞ্চিৎ স্থূলকায়, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, পঞ্চাশের কোটায় বয়স। পরিপাটি শক্ত, ছাঁটা গোঁপ এবং একটু ছুঁচলো দাড়ি মুখে। পরণে খাকী হাফপ্যাণ্ট আর খাকী শার্ট।)

রাজেন। বসুন।

(রণধীর বসলে, নিজেও তাঁর পাশে একটা গদি-মোড়া চেয়ারে এসে বসল।)

রণধীর। আপনাদের মধুর বিশ্রম্ভালাপে বাধা দিলুম।

রাজেন। বিশ্রম্ভালাপ জাপানী বোমা নিয়ে আমাদের বেশ মধুর হয়েই জমে এসেছিল।

রণধীর। বাধা দিলুম।

সুমি। সে জন্যে দুঃখ করবেন না; জাপানী বোমা ত আর পালিয়ে যাচ্ছে না?

রণধীর। না, পালাচ্ছে আর কোথায়? বেশ ভাল ক'রে তেড়ে আসছে। পালাব ত আমরা। আমি বলি, আর একদিনও দেরি না ক'রে কলকাতা ছেড়ে সবাই চ'লে যান। আমরা ত আসছে শনিবারেই যাচ্ছি; যদি ইচ্ছে করেন, এক সঙ্গেই সবাই যাওয়া যেতে পারে।

সুমি। এই ত সেদিন রেঙ্গুন ছেড়ে পালিয়ে এলেন, এরই মধ্যে আবার কলকাতা ছেড়ে পালাবেন?

রণধীর। পালানোটা ত ভুরিভোজনের মত ব্যাপার নয় যে, মাঝখানে যথেষ্ট ফাঁক না দিয়ে দু'বার করা যায় না?

(রাজেন একটু অকারণ বেশী শব্দ ক'রে হেসে উঠল।)

সুমি। বর্ম্মা থেকে আসতে পথে আপনাদের খুব কষ্ট হয়েছে শুনেছি, তাই বলছি।

রণধীর। সেই কষ্টের মান রাখবার জন্যেই ত আবার পালাতে হচ্ছে। তাছাড়া তখন যদি মরতুম, লোকে একটু আহা-উহুও ত অন্ততঃ করত। এত কাণ্ড করবার পর সেই জাপানী বোমাতেই যদি মরি, তাহলে মরব আর সেই সঙ্গে লোকও হাসাব। সেবারে শুধু ছিল বোমার ভয়, এবারে তার সঙ্গে লোক হাসাবার ভয়।

রাজেন। (সুমির দিকে বক্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে) বোমার আবার ভয়! পড়ছে দেখলে স'রে দাঁড়ালেই হ'ল।

রণধীর। স'রে দাঁড়াবেন কি মশাই? এক-একটা বোমায় পাড়াকে পাড়া উড়ে যায়, স'রে কোথায় যাবেন?

রাজেন। কেন, অন্য পাড়ায়?

রণধীর। ও! আপনারা ভাবছেন এ বেশ একটা হাসি-তামাসার জিনিস? তাহলে শুনুন—

রাজেন। না, না, থাক। ও শুনে আর হবে কি? কলকাতা ছেড়ে নড়তে যখন পারবই না তখন আর
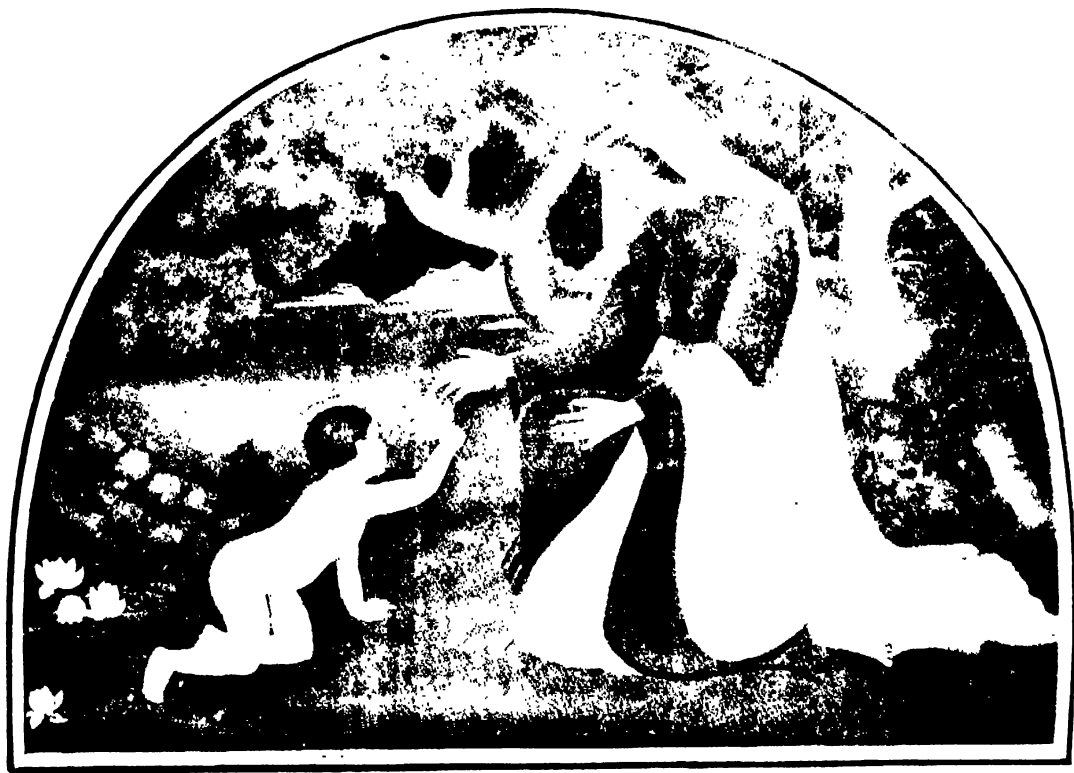
সানফ্রানসিস্কো-অভিমুখে এশিয়ার ছাত্র-ছাত্রী দল

(সুমিত্রাকে দেখিয়ে) এঁকে মিছিমিছি কেন ভয় পাওয়ানো?

সুমি। ভয়? আমাকে? হুঁ!

রণধীর। আমার স্ত্রীও মশাই, ঠিক ঐরকম বলতেন। তার পর যেদিন চোখের সামনে—

(ছোট ছেলেদের ভয়ের গল্প শোনাবার সময় লোকে যেরকম গলার স্বর আর মুখভঙ্গি করে, রণধীরও তাই করছেন।)

রাজেন। রণধীরবাবু, থাক, দরকার নেই।

রণধীর। মনে প'ড়েই বুকটা টিপ্‌টিপ্‌ করছে। একদিনকার কথা কেবল শুনুন—

সুমি। কতগুলি লোক মারা গেছে, এই ত? সে ত সব জায়গায় সব সময় মরছে।

রণধীর। কিন্তু কি রকম ক'রে তারা মরছে, সেটা দেখতে হবে না?

সুমি। যেরকম ক'রেই মরুক, মরার বাড়া ত আর গাল নেই? আর কতক লোক যেমন মরবে, কতক লোক বেঁচেও ত যাবে? আমরা এই শেষের দলে পড়ব ভাবতে বাধা কি আছে?

রণধীর। পড়ব না ভাবতেও বাধা কিছু নেই। একদিনকার কথা কেবল শুনুন—

রাজেন। না থাক, ঢের হয়েছে। উনি এখন ভয় পাচ্ছেন না, কিন্তু শুনলে হয়ত ভয় পাবেন।

সুমি। ভয় আমি পাব না, সে তুমি বেশ ভাল ক'রেই জান।

(বিভা ডানদিক দিয়ে ঢুকে সিঁড়ির ধার দিয়ে পিছন দিক্‌কার কোন একটা ঘরে যাচ্ছে। রণধীর উঠে দাঁড়ালেন।)

রণধীর। নমস্কার! কেমন আছেন?

(বিভা চ'লে যাচ্ছে।)

(গলার সুর চড়িয়ে) নমস্কার!

(বিভা চ'লে গেল।) উনি মনে হ'ল যেন শুনতে পান নি।

সুমি। শুনতে ঠিকই পেয়েছে, বোধহয় ওকেই যে বলছিলেন সেটা বুঝতে পারে নি। আমি ওকে ডেকে আনছি।

(সেলাই রেখে উঠে গেল।)

রণধীর। (ব'সে) বড়ই মুশ্‌কিলে পড়েছেন, নয়?

রাজেন। সে আর বলতে?

রণধীর। আমার স্ত্রীও মশাই, ঠিক এইরকম করতেন।

রাজেন। আমারটি ঠিক আপনারটির মত নয়।

রণধীর। কি ক'রে সেটা জানলেন? আমারটিকে ত দু-তিন বারের বেশী দেখেনও নি আপনি!

রাজেন। নিজেরটিকে দু-তিন বারের অনেক বেশী দেখেছি কিনা, তাই অনুমান করছি। এমনটি আর দ্বিতীয় নেই। থাকতে পারে না।

রণধীর। নিজেরটির সম্বন্ধে সবাইকারই মশাই, ঐ ধারণা। আপনি আমার কথা শুনুন ত। একটু শক্ত হন। আমি যা বলছি তা করুন।

রাজেন। কি করতে হবে?

রণধীর। আমি নিজে যা করেছিলাম। ভয় পাইয়ে চাকরগুলোকে আগে তাড়ান। গিন্নী একদম টিট্ হয়ে যাবেন।

রাজেন। সে আমার দ্বারা হবে না। একজন স্ত্রীজাতীয়াকেই ভয় পাওয়াতে পারলাম না, ওরা ত পুরুষ!

(বিভাকে নিয়ে সুমি ফিরে এল।)

রণধীর। (উঠে দাঁড়িয়ে) নমস্কার।

বিভা। নমস্কার। বসুন।

(সকলের উপবেশন।)

রণধীর। রেঙ্গুনের সেই এয়ার-রেডের গল্পটার বাকীটুকু আপনাকে একদিন শোনাব বলেছিলাম।

বিভা। কি হবে শুনে? গোড়ারটুকু যে এতদিনে ভুলে গিয়েছি!

সুমি। ওঁদের প্রাণের মায়া ছেড়ে তাল ঠুকে সেই বর্ম্মা থেকে পালিয়ে আসা, সে যে কি আশ্চর্য্য গল্প, তুমি জানো না বিভা!

রাজেন। আঃ, সুমি!

রণধীর। বলতে দিন, বলতে দিন, আমি কিছুই মনে করছি না। নিজেরা ও জিনিস একবার চোখে না দেখলে বুঝতে সত্যিই পারবেন না, কেন আমরা পালিয়ে এসেছিলাম। আমাদের মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন, যাঁদের বীরত্ব, আত্মত্যাগ, মনে করে রাখবার মত।

সুমি। আচ্ছা রণধীরবাবু, সবই মানলাম। আমার একটা কথার উত্তর দেবেন?

রণধীর। নিশ্চয় দেব। কি কথা বলুন?

সুমি। লড়াই থামলে আবার বর্ম্মায় ফিরে যাবেন?

রণধীর। (বেশ একটু ভাবাবেগ দেখিয়ে) নিশ্চয় যাব; ওটাই ত বলতে গেলে আমার দেশ। ওখানে আমার বাড়ীঘর, চালের কল—

সুমি। কোন্ মুখে ফিরে যাবেন?

রাজেন। সুমি!

রণধীর। বলতে দিন, বলতে দিন।

সুমি। যে-দেশের বুকে ব'সে এতদিন সবাই মিলে খেয়েছেন, তার বিপদের দিনে একবারটি মনে হ'ল না, থেকে যাই? নিজের বুক দিয়ে প'ড়ে এই বিপদ্ থেকে তাকে বাঁচাই? প্রাণটা একটু কাঁদল না তার জন্তে? প্রমাণ ক'রে দিয়ে এলেন সে-দেশটার আপনারা কেউ নন, তার সম্বন্ধে কোনো দরদ, এমন কি কোনো দয়াও আপনাদের মনে নেই, আবার বলছেন, ওটাই আপনার দেশ!

রাজেন। বিভা, তুই একটা গান কর্ দেখি। এসব আর ভাল লাগছে না।

সুমি। দেশটার না হয় মন ব'লে কোনো জিনিস নেই, দেশের মানুষগুলোর ত আছে? আপনাদের এই পরিচয়টা এতদিন তাদের জানা ছিল না, এবারে জানবার পর আর দেবে তারা আপনাদের ফিরে যেতে?

রাজেন। কই, বিভা?

(রণধীর দুলে দুলে হাসছেন।)

বিভা। কি গাইব? (টেবিল হারমোনিয়মের কাছে গিয়ে বসল।)

রাজেন। যা তোর মন চায়।

(সুমি সেলাই নিয়ে উঠে যাচ্ছিল।)

গানটা না হয় শুনেই যাও না?

(সুমিত্রা ব'সে সেলাইয়ের কৌড়গুলো একটু বেশী জোরে জোরে তুলছে।)

বিভা। (গান)

এক পৃথিবীর কোলে ছিলাম একটি কোনো শুভক্ষণে,
একই সুখে গলেছিলাম মিলিয়ে হাসি হাসির সনে।
হাতটি নিতে দাও নি হাতে,
তবু কত আঁধার রাতে
একসাথে পথ চলেছিলাম, সেকথা কি থাকবে মনে?
রইনু কি যে বুকে পুষে,
শুধাবে না কেউ কভু সে;
কত কথাই বলেছিলাম বিনা কাজের আলাপনে।
একটু পেলে হাসির আলো
সারাটা দিন কাটত ভালো,
আপনারে যে ছলেছিলাম কতই মতে অকারণে।

(গানের এইখানটায় নিখিল এসে রণধীরকে নমস্কার ক'রে চুপচাপ একটি কোণে গিয়ে বসল। সেখান থেকে সুমিকে দেখবার তার সুবিধা সবচেয়ে বেশী, অন্যদের তাকে দেখতে পাবার সুবিধা সবচেয়ে কম।)

হয়ত চেয়ে চোখদুটিতে
পেরেছিলে বুঝে নিতে
কোন্ জ্বালাতে জ্বলেছিলাম আপন মনে সঙ্গোপনে॥

রণধীর। চমৎকার! তবে ঐ আঁধার রাতে পথ-চলা, আর জ্বালা-জ্বলুনির কথা শুনলে কেমন যেন ব্ল্যাক-আউট আর এয়ার-রেডের কথা মনে পড়তে থাকে।

(সকলের হাসি।)

সুমি। নিখিলবাবুর সব উল্টো। আর একটু আগে আসতে কি হয়েছিল?

নিখিল। গানটা মিস্ করেছি, নয়? আসতে আসতে শুনতে পাচ্ছিলাম,—বেশ গান।

রণধীর। তা একটি মিস্ করেছেন, করেছেন; এ ত আর রেডিও-তে গান হচ্ছে না? আর একটি হোক।

বিভা। (হারমোনিয়ম ছেড়ে উঠে এসে) না, আর নয়। অল্ ক্লিয়ারের মত শোনায় এমন কোনো গান মনে আসছে না। (একবার নিখিলের দিকে তাকিয়ে) মাথাটা বড্ড ধরেছে। আপনারা বসুন, আমি বাইরে বাগানে একটু ঘুরব। নমস্কার।

রণধীর। (উঠে দাঁড়িয়ে) নমস্কার। আমিও তাহলে এখন—

(বিভা বেরিয়ে গেল, বাঁদিক্ দিয়ে।)

রাজেন। ওপরে শ্বশুর-মশায়কে একবার দে'খে যাবেন না?

রণধীর। হ্যাঁ, তা,—আচ্ছা দেখুন, যদি কেবল চোখে দেখা ছাড়া আর-কিছু করবার না থাকে তাহলে কারুর রোগ হলেই তাকে দেখতে যেতে হবে এটা মনে করা একটা কুসংস্কার। এতে রোগীর কোনো লাভ নেই, বরং সে যে রোগী এটা তাকে মনে করিয়ে দেওয়া হয় ব'লে ভয় পেয়ে তার ক্ষতিই হয়। আর দেখতে যে যায় তার ছোঁয়াচ লাগবার ভয় থাকে। তবে অবশ্য শশাঙ্ক-বাবুর রোগটা ছোঁয়াচে ধরনের কিছু নয় ব'লেই জানি।

রাজেন। থাক, দরকার নেই তাহলে। আচ্ছা, নমস্কার।

রণধীর। নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার!

(পিছনের সিঁড়ি দিয়ে রাজেন্দ্র উপরে উঠে গেল, রণধীর বাঁদিক্ দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। নিখিল উঠে এসে একটা চেয়ার সুমির পাশে টেনে নিয়ে বসল।)

সুমি। (মুখ টিপে হেসে) আপনার মাথা ধরেনি?

নিখিল। না।

সুমি। ভারি অন্যায়। বাইরে বাগানে একটু খোলা হাওয়ায় ঘুরলে কেমন সেরে যেত!

নিখিল। কিছু মনে করবেন না, কিন্তু ঐ একটা রসিকতা আমার সঙ্গে না করলেই কি নয়?

সুমি। বোমা বোমা ক'রেও ক্ষেপে যাবার জোগাড়, প্রাণের দায়ে একটু রসিকতা করি, তাতেও আপনার রাগ?

নিখিল। কিন্তু আমিও যদি সুরু করি, শেষ সামলাতে পারবেন?

সুমি। কি হবে? রসিকতার চাপে মারা পড়ব?

নিখিল। (নিজের চেয়ারটাকে আরও একটু সুমির কাছে টেনে এনে) যদি বলি, মাথাটা ক্রমেই ধ'রে উঠছে কিন্তু বাইরে বাগানে বেড়িয়ে সেটা সারবে না, সারবে যদি এইখানে ঠিক এমনিভাবে কিছুক্ষণ—

সুমি। হয়েছে। চুপ করুন এবারে।

নিখিল। বলেছিলাম না?

(সাইরেন বাজছে। নিখিল ছুটে গিয়ে বাইরের দরজায় মুখ বাড়িয়ে বিভাকে ডাকছে।)

শুনুন···শুনছেন···শীগ্‌গির ভিতরে চ'লে আসুন।

(তার পর পাশের জানালাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে এল। সিঁড়ি বেয়ে রাজেন নামছে ছুটতে ছুটতে, নার্স নামছে তার পেছন পেছন।)

রাজেন। এই, এই, দরজা-জানালা সব বন্ধ কর, গাড়ী-বারান্দার আলো নিবিয়ে দাও, শীগগির, শীগগির··· এই, এই, বঙ্কু, উমাপদ, ড্রাইভার···

(বিভা সহজ শান্তভাবে ঢুকে একটা চেয়ারে গিয়ে বসল।)

রাজেন। সিঁড়ির নীচে চ'লে আয়, সিঁড়ির নীচে চ'লে আয়!

(নিজে সিঁড়ির নীচে টেলিফোন্‌টার পাশে চেয়ার নিয়ে বসল। এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে রণধীরের প্রবেশ।)

রণধীর। ভাগ্যিস বেশীদূর যাই নি, কি বিপদেই যে পড়েছিলাম! উঃ, উঃ!

রাজেন। সিঁড়ির নীচে চ'লে আসুন, সিঁড়ির নীচে চ'লে আসুন!

(রণধীর রাজেনের পাশে মেজের উপর উবু হয়ে বসলেন। বিভা মুখে হাত-চাপা দিয়ে হাসছে। সুমি অস্তপদে ওপরে উঠে যাচ্ছে।)

রাজেন। ও কি বোকামি করছ? কোথায় চলেছ? শীগ্‌গির নেমে এস, নেমে এস শীগ্‌গির!

সুমি। (সিঁড়ি উঠতে উঠতে) বাবা ভয় পাবেন না জানি, কিন্তু তাঁর কাছে একজনও কেউ না থাকাটা কি ভাল দেখাবে?

নিখিল। আমি যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি, আপনি থাকুন।

(সুমি ছুটতে ছুটতে উঠে গেল। একমুহূর্ত ইতস্তত: ক'রে নিখিলও সিঁড়ি উঠছে। বিভার দৃষ্টি তার প্রত্যেকটি পদক্ষেপকে অনুসরণ করছে। তার মুখে এখন আর হাসি নেই।)

রাজেন। নার্স, নার্স, আলোটা ত নিবোনো হ'ল না, আলোটা নিবিয়ে দিন, আলোটা নিবিয়ে দিন···

(নার্স আলো নিবিয়ে দিল। অন্ধকারে সব চুপচাপ। একটু পরেই অল্ ক্লিয়ার।)

রাজেন। কি হ'ল আবার?

রণধীর। অল ক্লিয়ার, অল ক্লিয়ার! ভুল ক'রে সাইরেন দিয়েছিল আর কি! হাঃ, হাঃ, হাঃ!

(নার্স আলো জেলে দিল। রণধীর চ'লে এলেন সিঁড়ির নীচে থেকে, রাজেন রইল ব'সে সেখানেই। বঙ্কু এবং উমাপদ হাস্তনিকশিত-মুখে এসে ঢুকল।)

বঙ্কু। (উমাপদর মাথায় একটা চাঁটি মেরে) ব্যাটা বুদ্ধির ঢেঁকি। বললুম, অল কিলার দিচ্ছে, শুনবে না। বলে অল কিলার কাকে বলছ? এ যে আরো বিটকেল আওয়াজ রে বাবা!

(দরজা-জানালা খুলছে।)

রাজেন। আরে, না, না, এখুনি নয়, এখুনি নয়। থাক আরো খানিকক্ষণ। তোদের এত তাড়াটা কিসের, শুনি? ভুল ক'রে সাইরেন যদি দিয়ে থাকতে পারে ত ভুল ক'রেই অল ক্লিয়ারও যে দিচ্ছে না, তাই বা কে বলবে? নিবিয়ে দিন আলোটা, নার্স, নার্স, আলোটা নিবিয়ে দিন।

(নাস আবার আলো নিবিয়ে দিল, আবার সব অন্ধকার, দূরে একটানা অল ক্লিয়ার বেজে চলেছে।)

দৃশ্যান্তর।

•

তৃতীয় দৃশ্য

(বেলা আন্দাজ দশটা। সোমবার। রাজেনের বাড়ীর একতলায় লাইব্রেরী। পিছনের দিক্‌কার দেয়াল ঘেঁষে গোটা চারেক বইয়ের আলমারি, মাঝখানে একটা দরজা, তাতে একটা ভারি পর্দা ঝুলছে। বাঁদিকে আরও একটা বুক-কেস। ডান

দিক্‌কার দেয়াল ঘেঁষে একটা সুন্দর লিখবার টেবিল, তার সঙ্গে match করা চেয়ার। একপাশে জানালা। সামনের দিকে গদি-মোড়া প্রকাণ্ড দুটো আরাম-কেদারা, দুটো টিপয়, মস্ত বড় শেড্‌-দেওয়া একটা আলোর ষ্ট্যাণ্ড। লিখবার টেবিলের ঠিক উপরকার দেয়ালে রবীন্দ্রনাথের একটি ছবি। পিছন দিক্‌কার দরজার পর্দ্দা সরিয়ে বিভা এসে ঢুকল। আলমারি-গুলোতে কি একটা বই খুঁজছে। বইটা বার ক'রে এনে একটা চেয়ারে বসল। একটু পরে বইটাকে কোলের ওপর মুড়ে রেখে উৎকর্ণ হয়ে কি যেন শুনছে। এমন সময় বাঁদিক্ থেকে রাজেন এসে ঢুকল।)

রাজেন। কি রে বিভা, তুই এখানে একলা রয়েছিস?

বিভা। দোকলা কোথা পাব?

রাজেন। তোর বৌদি কোথায় গেল?

বিভা। সে ত আমার চেয়ে তোমারই বেশী জানবার কথা।

রাজেন। ওপরে নিখিলের গলা পাচ্ছিলাম, বোধ হয় ও সেখানেই রয়েছে।

বিভা। জানোই যদি ত জিজ্ঞেস কেন করছ?

রাজেন। (ব'সে) তা শ্বশুর-মশায় অসুস্থ হয়ে আমাদের কাছে রয়েছেন, তাঁর কাছে একটু বেশী থাকতে ইচ্ছে হওয়াটা ত ওর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক।

বিভা। তা বেশ ত, থাকুন না, কে ওঁকে বারণ করছে? কিন্তু রুগীর ঘরে পাড়ার লোক ডেকে এনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আসর জমালে রুগীর তাতে কিছু সুবিধা হয় না, অন্ততঃ আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে ত এইরকম বুঝি।

রাজেন। গল্পগুজবে উনি একটু ভাল থাকেন কিনা!

বিভা। আচ্ছা বেশ, তোমারও ত ভাল থাকাটা একটু দরকার! তুমিও ত একটা মানুষ বাড়ীতে রয়েছ? সারাক্ষণ একলাটি এমন মুখ ক'রে বেড়াও, যে, দেখলে মায়া হয়।

রাজেন। দু' বছর আগে পর্য্যন্ত ত একলাই ছিলাম রে! একলা থাকতে আমি বেশ পারি। কিন্তু কথাটা আসলে কি তা জানিস? তোর কাছে লুকোব না। কলকাতায় আমার আর একটুও মন টি কছে না।

বিভা। তা ত জানিই।

রাজেন। কিন্তু কি করতে পারি বল? ও যে কিছুতেই কলকাতা ছেড়ে নড়বে না ঠিক করেছে!

বিভা। তুমি কেন জোর কর না?

রাজেন। কি রকম ক'রে করব?

বিভা। যে রকম ক'রে লোকে করে! আগে দেখতে হবে তোমার জোরটা আসলে কোথায়, তার পর সেখানে দাঁড়িয়ে হুকুম করবে।

রাজেন। (একটু ভেবে) তোরা আজকালকার মেয়েরা বড্ড বেশী হেঁয়ালিতে কথা বলিস। আর একটু স্পষ্ট ক'রেই না হয় বল্ কথাটা।

বিভা। উনি যে কলকাতায় থাকবেন বলছেন, কিসের জোরে থাকবেন?

রাজেন। (একটু ভেবে) তুই বলতে চাস্ আমারই দেওয়া টাকার জোরে, এই ত?

বিভা। তাছাড়া আবার কি?

রাজেন। তা সেটা সোজাসুজি বলতে বাধছে কেন তোর?

বিভা। তুমি ওঁকে একবার বল দেখি, বেশ, থাকো তুমি, আমরা চললাম। কিন্তু তোমার কোনো দায়-ঝুঁকি আমি ঘাড়ে করতে পারব না। চালিও যেমন ক'রে পার।

রাজেন। (উঠে গিয়ে বিভার হাত থেকে বইটা নিয়ে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে পাতা ওল্টাচ্ছে।) ও কি করবে জানিস?

বিভা। কি করবে তুমি ভাবছ?

রাজেন। (হেসে) সোনার দাম জানিস?

বিভা। গয়না বেচবে?

রাজেন। ধর্ যদি বেচেই, কিম্বা বাঁধা দেয়? বেশ কয়েক হাজার টাকার গয়না ওর আছে।

বিভা। তোমার কি বুদ্ধি! সেগুলো কি তুমি কলকাতায় রেখে যাবে ঠিক করেছ না কি? সবাই ত সঙ্গে নিয়েই পালাচ্ছে?

রাজেন। ওর জিনিস, ও যদি নিয়ে যেতে না দেয়?

বিভা। তাহলে ত তুমি ফ্যাসাদেই পড়েছ বলতে হবে?

রাজেন। ফ্যাসাদ ব'লে ফ্যাসাদ!...

(ডানদিকের দরজায় টোকার শব্দ।)

কে?

(নেপথ্যে: আমি নিখিল।)

ও, নিখিল! এসো, এসো!

(নিখিলের প্রবেশ।)

বসো।

(বিভা আগেই উঠে গিয়ে আলমারির বই দেখতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তারই পরিত্যক্ত

চেয়ারটাতে নিখিল এসে বসল।) বিভা জানতে চাইছে, আর একপালা চা হবে কি না?

বিভা। (ঘুরে দাঁড়িয়ে) কই, আমি ত সে রকম কিছু বলি নি!

রাজেন। না যদি ব'লেই থাকিস্‌, চা আসতে ত বাধা নেই! কি বল নিখিল, হবে না এক পেয়ালা? আমার অবস্থা ত জানোই, গলাটা সারাক্ষণ শুকিয়েই থাকে!

নিখিল। হ্যাঁ, চা এক পেয়ালা হলে মন্দ হয় না!

(বিভা বাঁদিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।)

রাজেন। ভাই নিখিল, একটা কথা আছে, এই ফাঁকে সেটা ব'লে নিই।

(লিখবার টেবিলের পাশের হাল্‌কা চেয়ারটা টেনে নিয়ে নিখিলের কাছ ঘেঁসে ব'সে।)

দেখ নিখিল, সুমি তোমার কথা খুব শোনে, আমি লক্ষ্য করেছি। তুমি ওকে একটু বুঝিয়ে বল না, যেন আর দেরি না ক'রে—

নিখিল। কলকাতা ছেড়ে চ'লে যেতে? সে উনি কিছুতেই—

রাজেন। অসুস্থ বাপকে ফেলে ও কিছুতেই যেতে রাজি হবে না, এই ত? সে কথা ত রোজ উঠতে বসতে হাজারবার শুনছি। কিন্তু একটা কথা তুমি জানো না, সুমিকেও বলি নি। (নিখিলের আরও একটু কাছ-ঘেঁষে) সুমি আশা ক'রে আছে, শ্বশুরমশায় একটু সামলে উঠলে তার পর যাহোক কিছু করবে, যেতে হয় ত তাঁকে সঙ্গে নিয়েই যাবে। হলে খুবই ভাল হ'ত, হবে না। ডাক্তার ব্যানার্জ্জি আজই আমায় আড়ালে ডেকে নিয়ে ব'লে গেলেন, সামলে ওঠা ওঁর অদৃষ্টে আর নেই।

নিখিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, ওঁকে দেখলে, ওঁর সঙ্গে কথা বললে একেবারেই মনে হয় না যে, সিরিয়াস্‌ কিছু ওঁর হয়েছে। ডাক্তার কি কোনো ভরসাই আর দিচ্ছেন না?

রাজেন। এমন নয় যে এখন তখন, কিন্তু তাঁকে কলকাতার বাইরে কোথাও নিয়ে যাওয়া যায়, এতটা সুস্থ আর কোনোদিন তিনি হবেন না।

নিখিল। মেসোমশায়ের অবস্থা এতটা খারাপ জানলে উনি ত আরোই তাঁকে ছেড়ে কোথাও যেতে চাইবেন না!

রাজেন। আরে রাম! এত কথা সুমিকে কখনো বলা যায়? এখনি তাহলে কেঁদেকেটে হাট বসাবে। তবে উপায় একটা আছে।

নিখিল। কি?

রাজেন। (লিখবার টেবিলটার এক কোণে শরীরের ভার রেখে দাঁড়াল।) কপালক্রমে খুবই ভাল একটা নার্সিং-হোমের সন্ধান পেয়ে গিয়েছি। খুব বড় লোকেরাই সেখানে যায়, অনেকে সখ ক'রেও যায়, জায়গাটা এতই ভাল সবদিকে। ডাক্তারটিও খুব ভাল লোক, ডাক্তার ব্যানার্জ্জির বিশেষ পরিচিত এক ভদ্রলোকের বড় ভাই। ঠিক লেকের ধারেই বাড়ীটা—

নিখিল। শুনে আমারই লোভ হচ্ছে, কিন্তু উনি কিছুতেই রাজি হবেন না।

রাজেন। কার কথা বলছ, সুমির? তা ত জানিই, তা না হলে আর তোমাকে বলছি কি জন্যে?

(ফিরে এসে চেয়ারটাতে বসল। নিখিল বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছে।)

নিখিল। মেসোমশায়ের ত্রিসংসারে আর ত কেউ নেই! শেষ বয়সে অসুস্থ অক্ষম হয়ে মেয়ের আশ্রয়ে তিনি আজ এসে পড়েছেন, তাঁকে এ অবস্থায় একলা ফেলে তাঁর মেয়ের পক্ষে চ'লে যাওয়া কি সম্ভব?

(বাঁদিক্‌ থেকে চাকর চা নিয়ে এল। বিভাও এসেছে সেই সঙ্গে। সে চা ঢালছে। চাকর চ'লে গেল।)

রাজেন। একলা ফেলে যাওয়া বলতে যা বোঝায়, ঠিক তা ত করা হচ্ছে না? নার্সিং-হোমে বাড়ীরই মত যত্ন হবে, আর তুমি ত ওঁর ছেলেরই মতন, তুমিও ওঁর দেখাশোনা করতে পারবে।

বিভা। (চায়ের পেয়ালা দুটো দু'জনের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে) তোমরা সবাই চ'লে যাবে, আর তোমাদের ভার বইবার জন্যে নিখিলবাবু এখানে একলা থাকবেন? কেন থাকবেন?

নিখিল। (চামচ দিয়ে চায়ের চিনি নাড়তে নাড়তে) থাকব, অন্ততঃ এই জন্যে, যে, কলকাতা ছেড়ে নড়বার বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় আমার নেই।...আচ্ছা, দেওঘর যাওয়া যদি আপনাদের না-ই হয় এখন, এঁকে কেন আপনি আর কোথাও পাঠিয়ে দিচ্ছেন না?

রাজেন। পাঠাতে ত পারি, কিন্তু নিয়ে যায় কে? আমি একা আছি, কিন্তু আমার ত যাবার জো নেই। নয়ত শান্তিনিকেতনে আমার মেজো মাসীমা রয়েছেন, তাঁদের বাড়ীতে স্বচ্ছন্দে ওর জায়গা হয়ে যেতে পারত।

(বন্ধুর প্রবেশ।)

বন্ধু। বাবু, টেলিফোনে আপনাকে ডাকছে।

রাজেন। আচ্ছা, যা, যাচ্ছি।

(বন্ধু চ'লে গেল।)

তুমি কথাটা একবার তুমিকে ব'লে দেখো নিখিল। তোমার কথায় হয়ত কাজ হবে।

(চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে চা-টা নিঃশেষ ক'রে বাঁদিকের দরজা ঠেলে বেরিয়ে গেল।)

বিভা। (গদি-মোড়া আর একটা চেয়ারে ব'সে) আপনি চলুন না, আমায় শান্তিনিকেতনে পৌঁছে দিয়ে আসবেন ?

নিখিল। আমি ?

বিভা। এমন আঁৎকে উঠলেন যে ? আমি আরও ভাবলাম, আপনি ভীষণ ব্যস্ত হয়েছেন আমাকে কলকাতার বাইরে কোথাও পাঠাতে।

নিখিল। আপনি শান্তিনিকেতনে যেতে চান, সঙ্গী হয়ত খুব সহজেই আপনাকে আমি জুটিয়ে দিতে পারব।

বিভা। (খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে) আপনার কি ধারণা, আমার এমনি দুরবস্থাই হয়েছে, যে, ইচ্ছে করলে কয়েক ঘণ্টার জন্যে একটা সঙ্গীও জুটোতে পারব না ?

নিখিল। না, না, তা বলছি না।

বিভা। দাদা বেশ ভাল ক'রেই জানেন, শান্তিনিকেতনে স্বচ্ছন্দেই আমি একলা যেতে পারি, তবু সঙ্গীর ভাবনা ভাবছেন, নিজে সঙ্গী হতে চান ব'লে। আর আপনি সেই একই ভাবনা ভাবছেন, নিজে সঙ্গে যেতে চান না ব'লে। আপনি কি রেলভাড়া বাঁচাতে চাইছেন ?

নিখিল। একটা কিছু বাঁচাতেই চাইছি।

বিভা। সেটা কি ? জবাবদিহির দায় ?

নিখিল। কতকটা সেই রকমই।

বিভা। আপনি বীরপুরুষ তা মানতেই হবে।

(সাইরেণ বাজল। দু'জনে ক্ষিপ্রহস্তে জানালাগুলো বন্ধ ক'রে দিল।)

বিভা। আজকে এই দিনদুপুরে ?

নিখিল। তাই ত দেখছি !

(নিখিল বেরিয়ে যাচ্ছে।)

বিভা। পালাবার সত্যি কি কিছু দরকার আছে ?

নিখিল। উপরে মেসোমশায় একলা রয়েছেন, তাঁর একটু খোঁজ নিতে হচ্ছে।

বিভা। একলা মোটেই নেই, বৌদি এতক্ষণ নিশ্চয় তাঁর কাছে গিয়ে পড়েছেন।

নিখিল। দেখতে হচ্ছে।

(চ'লে গেল। বিভার জ্বালাময় দৃষ্টি তাকে অনুসরণ ক'রে ফিরে এল। রাজেন পড়ি-কি-মরি ক'রে ছুটে এল।)

রাজেন। নিখিল কোথা গেল ?

বিভা। শুনতে তোমার ভাল লাগে যদি ত বলছি, —ওপরে বৌদির কাছে।

রাজেন। হলের সিঁড়ির নীচেটা সবচেয়ে ভাল জায়গা, যাবি সেখানে ?

বিভা। ওখানে তোমাকে আর, রণধীরবাবুকেই সবচেয়ে ভাল মানায়।

রাজেন। (একটু ইতস্ততঃ ক'রে বিভার পাশের চেয়ারটাতেই বসল। একটু উঠি উঠি ভাব বসার মধ্যে।) আমার এসব মোটেই আর ভাল লাগছে না।

বিভা। আমিও যে খুব এন্‌জয় করছি তা বলতে পারি না।

রাজেন। (খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে) আজ ত বেশ অনেকক্ষণ হয়ে গেল ; আজকেরটা আর ভুল ক'রে দেওয়া নয় তাহলে ?

(আরও খানিকক্ষণ চুপ ক'রে কাটল।)

সময়টা দেখে রেখেছিলি ?

বিভা। না।

রাজেন। অল্ ক্লিয়ার দিতে কতক্ষণ লাগছে রে বাবা ! ওদের হয়ত সে খেয়ালই নেই ; নিজেরা নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে, ভাবছে, ধীরে-সুস্থে দিলেই হবে,—এদিকে আমাদের যে প্রাণ যায় !···হে ভগবান্ !···তোর বৌদির একগুঁয়েমির জন্যেই আজ সবাইকার এই দুর্দশা, জানিস ত ! নয়ত আজ দেওঘরে কি মজাসে দিন কাটত বল্ দেখি !

বিভা। তোমার আর মজাসে দিন কেটেছে ! অন্ধের কি-বা রাত্রি কি-বা দিন ! চোখ থাকতেও যে দেখতে পায় না—

রাজেন। কি দেখতে পাই নি ? কি বলছিস্ তুই ? তুই কি হেঁয়ালীতে ছাড়া কথা বলবি না ঠিকই ক'রে নিয়েছিস্ ?

বিভা। উনি যে কলকাতা ছেড়ে নড়বেন না ঠিক করেছেন, তুমি কি ভাবছ সেটা কেবল তাঁর গয়নাগুলোর ভরসায় ?

রাজেন। আবার নতুন কি ব্যাখ্যা তোর মাথায় এল ? তুই বড্ড জ্বালাতে পারিস্ মানুষকে।

বিভা। গয়না না-হয় বেচবেন বা বাঁধা দেবেন। সে-সব ব্যবস্থা করবে কে শুনি ? দিনরাত খবরদারি করতে, কাই-করমাস খাটতে, ওষুধপত্র জুটিয়ে এনে

দিতে, গল্পগুজবে আসর জমাতে কে সারাক্ষণ হাজির থাকবে?

রাজেন। এ ত সোজা কথা। নিখিলই বরাবর এ সব করছে, পারেও করতে, তখনও নিখিল ছাড়া আর কে করবে?

বিভা। আর কেউ করবে না, নিখিলই করবে। কিন্তু কেন করবে? কেন করছে? বৌদি কে ওর? ছেলেবেলায় জানাশোনা ছিল; তা, ছেলেবেলায় অমন কত লোকের সঙ্গেই ত মানুষের জানাশোনা থাকে; কই, আর ত কেউ করতে আসছে না? ও কেন আসে দু'বেলা? আমাদেরও ত কত লোকের সঙ্গে জানা-শোনা ছিল ছেলেবেলায়! আমাদের জন্যে ত করতে আসে না কেউ?

রাজেন। আঃ, চুপ কর্। কি বাজে বকৃছিস? শ্বশুর-মশায়কে ও কি রকম ভক্তি করে জানিস্?

বিভা। ওগো মশায়, ভক্তিটা তোমার শ্বশুরকে করে না, করে বৌদির বাবাকে; এই সহজ কথাটা যদি না বুঝতে পেরে থাক এতদিনে ত তোমার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা।

রাজেন। তুই বড্ড যা-তা কথা বলিস্। নিখিল ত আমার মতে বেশ ভাল ছেলে।

বিভা। যতটা ভাল ছেলে হ'লে বৌদির বেশ মনে ধরে, ততটা ভাল হবার চেষ্টার তার কিছু ত্রুটি নেই।

রাজেন। আচ্ছা, আচ্ছা, ঢের হয়েছে, এবারে চুপ কর্ দেখি, এখন আর এসব ভাল লাগছে না।...ওটা কিসের শব্দ?

(দূরে অল্ ক্লিয়ার বাজছে।)

বিভা। অল্ ক্লিয়ার দিচ্ছে।

রাজেন। না রে, বোধ হয় যেন আবার সাইরেণই দিচ্ছে।

বিভা। (উঠে গিয়ে জানালা খুলে বাইরে তাকিয়ে) তুমি এক আচ্ছা পাগল! প্রায় উমাপদর মতই কথা বলছ। ঐ ত গাড়ী-ঘোড়া, লোকজন আবার চলছে, ট্রাম চলতে সুরু করেছে, শব্দও কি শুনতে পাচ্ছ না?

(দরজায় টোকার শব্দ। নেপথ্যে নিখিল: আসতে পারি?)

রাজেন। এসো।

(নিখিল ঢুকল।)

নিখিল। যাক, আজকেরটাও মনে হচ্ছে উতরে গেল ভালয় ভালয়।

রাজেন। উতরে গেল বলছ কি ক'রে এখুনি? আবার হঠাৎ সুরু হতে ত বাধা নেই?

নিখিল। তা অবশ্য নেই।

(একটা চেয়ারে বসল। বিভা বেরিয়ে গেল একটু বেশী গম্ভীর মুখ ক'রে। এতটাই গম্ভীর যে, রাজেন ও নিখিল দু'জনই সেটা লক্ষ্য করেছে বোঝা গেল। রাজেন কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইল, কপালের দু'দিকের রগ ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠ এবং অনামিকায় চেপে ধ'রে।)

রাজেন। (গলার সুর বদ্‌লে) কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

নিখিল। কেন, ওপরে!

রাজেন। সবাই নীচে, তুমি ওপরে কেন?

নিখিল। (হেসে) এটাও কি একটা প্রশ্ন হ'ল? আমি যদি জানতে চাই, সবাই ওপরে আপনি নীচে কেন?

রাজেন। (রুক্ষস্বরে) সবাই মোটেই ওপরে ছিল না।

নিখিল। (হাসতে হাসতেই) তা, সবাই নীচেও ত ছিল না!

রাজেন। দেখ নিখিল, ঠাট্টা নয়। কথাটা উঠে পড়েছে, ভালই হয়েছে। অনেকদিন ধরেই তোমাকে বলব বলব ভাবছিলাম। তোমার মৎলবটা আসলে কি, আমায় বল দেখি?

নিখিল। কোন্ বিষয়ে কথা হচ্ছে জানলে বলতে পারি।

রাজেন। এই আমাদের সম্বন্ধে তোমার মৎলবটা জানতে চাইছি।

নিখিল। আপনারা আমার হিতার্থী বন্ধু, সেই বন্ধুত্বের ঋণ যতটা পারি শোধ করবার চেষ্টা করি। আপনাদের সম্বন্ধে আমার মৎলব কিছু থাকতে হবে কেন?

রাজেন। না থাকলেই ভাল; কারণ, আমি চাই না তুমি ক'খনো এমন কিছু কর যাতে মনে হতে পারে, তোমার এই আত্মীয়তাটা লোক-দেখানো।

নিখিল। কথাটা উঠেছে ব'লে জানতে চাইছি, আমি কি সে রকম কিছু করেছি?

রাজেন। (উঠে গিয়ে পিছনের খোলা দরজাটা ভেজিয়ে দিচ্ছে) না, ঠিক তা যদিও নয়, কিন্তু শ্বশুর-মশায় সম্বন্ধে তোমার মনোযোগের একটু বাড়াবাড়ি সকলে লক্ষ্য করছে।

নিখিল। (বিভার পরিত্যক্ত বইটা নেড়েচেড়ে

দেখছিল,—সেটাকে সোফার দূরপ্রান্তে প্রায় ছুঁড়ে দিয়ে) সে কি কথা? মেসোমশায় অসুস্থ অসহায় মানুষ, আমার যেটুকু সাধ্যে আছে তাও আমি সব সময় করতে পারি না ওঁর জন্যে। বাড়াবাড়ি মানে?

রাজেন। আহা, তা ত জানিই। তুমি যা কর তাঁর জন্যে তা আর কারুর দ্বারা সম্ভব হ'ত না, আমার দ্বারা ত নয়ই। আমি খুবই কৃতজ্ঞ তোমার কাছে সেইজন্যে। তবে নানা জনে নানা কথা বলছে, তাই বললাম।... আচ্ছা, তুমি এক কাজ কর না? ওঁর সমস্ত ভার নিয়ে থাকো না এই বাড়ীতে? আমি তাহলে সুমি আর বিভাকে দেওঘরে নিয়ে গিয়ে তাদের দেখাশোনা করতে পারি। হাসপাতালেও ওঁকে তাহলে যেতে হয় না, নার্সিং-হোমেও না,—তুমি ত বাড়ীরই ছেলের মত, বাড়ীতেই ওঁকে নিয়ে থাকবে, এ ব্যবস্থায় ত কারুর আপত্তি হওয়া উচিত নয়!

নিখিল। আমি খুব খুশী হয়েই রাজী হচ্ছি, কিন্তু—

রাজেন। সুমি রাজী হবে না, এই ত? তা, রাজী তাকে করতে হবে, আর সে ভার তোমার!

নিখিল। চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি।

রাজেন। হ্যাঁ, চেষ্টা একটু কর ভাই, তুমি চেষ্টা করলেই হবে।

(পিছনের দরজা খুলে বিভা মুখ বাড়াল।)

বিভা। দাদা, excuse me, ঐ বইটা একটু নেব।

রাজেন। নিয়ে যা না।

(অত্যন্ত গম্ভীর মুখে বিভা ঢুকল এবং বইটি তুলে নিয়ে বক্রদৃষ্টিতে প্রথমে রাজেন ও পরে নিখিলের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর মুখেই বেরিয়ে গেল।)

তবে চেষ্টাটা একটু ভাল ক'রে করো। কারণ, একথাও ব'লে রাখছি, সুমি যদি এ ব্যবস্থাতেও রাজী না হয়, তাহলে বুঝব, এর ভেতর তোমাদের মৎলব সত্যিই কোথাও কিছু একটা আছে।

নিখিল। এবার আর শুধু আমার মৎলব নয়, আমাদের মৎলব। এবং গৌরবে বহুবচন এটা নয় নিশ্চয়ই।

(পিছনের দরজাটা বিভা ভেজিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, সেটাকে ঠেলে সুমিত্রা ঢুকল। নিখিল উঠে দাঁড়িয়েছে।)

সুমি। দরজা এঁটে কি ষড়যন্ত্র হচ্ছে দু'জনে?

রাজেন। সুমি শোন, নিখিল কি বলছে! সে বলছে, তুমি যদি দেওঘর যেতে রাজী হও ত শ্বশুর-মশায়ের সমস্ত ভার নিয়ে সে এ বাড়ীতেই থাকবে।

সুমি। এই কুযুক্তি দু'জনে মিলে এতক্ষণ করছিলে বুঝি? তা বাবার ভার অনেকটা এখনই ত উনি নিয়ে রয়েছেন, বাকীটুকু না হয় আমারই ওপর থাক, যতদিন না মরি।

রাজেন। মরবার ব্যবস্থাই ত করছ। কিন্তু তোমার সঙ্গে বাড়ীশুদ্ধকে কেন মরতে হবে?

সুমি। বাড়ীশুদ্ধুরা যাক না চ'লে, কে তাদের ধরে রাখছে?

রাজেন। যেতে যে পারি না তা মনে ক'রো না, কিন্তু তোমাকে ফে'লে গেলে তোমার বন্ধুরাই যে আমাকে সাধুবাদ দেবে না, সেইটে কেবল ভাবি।

সুমি। আর বাবাকে এখানে এ অবস্থায় ফে'লে রেখে আমি যদি চ'লে যাই, তাহলে পৃথিবীতে এমন কেউ আছে, এক তুমি ছাড়া, যে আমাকে সাধুবাদ দেবে?

রাজেন। তর্ক করতেই একমাত্র শিখেছ, সবকিছু নিয়ে তর্ক তুমি করবেই।

(সুমি আর রাজেন দু'জনেরই গলা এক পর্দা ক'রে বেশ একটু উঁচুতেই উঠে যাচ্ছিল। বিভা কৌতূহলী হয়ে পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকে ইতিমধ্যে একপাশে এসে দাঁড়িয়েছে। গুরুগম্ভীর ভাব।)

তুমি বেশ জানো, সাধারণ অবস্থায় ওঁকে ফেলে যেতে কেউ তোমাকে বলত না। কিন্তু সবদিক্ ভেবে দেখলে—

সুমি। ভয় পেয়ে ভাববার ক্ষমতা তোমার লোপ পেয়ে গেছে, তার আর হবে কি?...আমার কি ইচ্ছে হচ্ছে, জানো? ইচ্ছে হচ্ছে, তোমার ঠিক এই সময় খুব শক্ত অসুখ-বিসুখ কিছু একটা করুক, আর রণধীরবাবুকে ডেকে তোমার সব ভার নিয়ে এ বাড়ীতে থাকতে ব'লে আমি আর সবাইকে নিয়ে দেওঘরে পালিয়ে গিয়ে দেখি, সেটা তোমার কেমন লাগে!

বিভা। ছিঃ বৌদি, অমন অলক্ষুণে কথা স্ত্রী হয়ে কি ক'রে তুমি মুখে আনলে?

সুমি। নিজে স্ত্রী হও আগে, তার পর এই প্রশ্নটা আমায় ক'রো।

(ডানদিক দিয়ে চ'লে গেল। নিখিলও সেই দিকে যাচ্ছিল।)

রাজেন। (কর্কশ কণ্ঠে) নিখিল

নিখিল। (ফিরে দাঁড়িয়ে) কি?

রাজেন। কোথায় যাচ্ছিলে?

নিখিল। বাড়ী।

রাজেন। এদিকে তোমার বাড়ী যাবার রাস্তা নয়!

নিখিল। যাবার আগে মেসোমশায়ের সঙ্গে দেখা ক'রে যাব কথা দিয়েছিলাম, তাই ওপরে যাচ্ছিলাম।

রাজেন। (বিভার গম্ভীর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে) থাক,—ওপরে তোমাকে আর যেতে হবে না।

নিখিল। কি করতে হবে ব'লে দিন, আমি—

রাজেন। এ বাড়ী থেকে তুমি চ'লে যাও, এখখুনি যাও, আর এসো না।

নিখিল। তথাস্তু। বাড়ীটা আপনার, আমাকে আসতে না দেবার ষোলআনা অধিকার আপনার আছে।

(রাজেন একথার কোন জবাব না দিয়ে পিছনের দরজাটাকে অকারণ জোর দিয়ে ঠেলে বেরিয়ে গেল। নিখিল বাঁদিক্ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, বিভা পথরোধ করল।)

নিখিল। আমি যাচ্ছি, আমায় যেতে দিন।

বিভা। একটা কথা শুনে যান।

নিখিল। কি কথা বলুন, কিন্তু আমি আর দেরি করতে পারছি না।

বিভা। জবাবদিহির ভয় করছিলেন, কিন্তু তার খুব সহজ সমাধান একটা আছে।

নিখিল। আপনি এখনো সেই পুরনো কথাই ভাবছেন ?

বিভা। হ্যাঁ, ভাবছি। না ভেবে আমার উপায় নেই ব'লে। সমাধান সহজেই হতে পারে। আপনি আমাকে পৌঁছোতে যাচ্ছেন কেউ সেটা জানবে না। আপনি দৈবক্রমে আমার সঙ্গী হবেন।

নিখিল। সঙ্গীর প্রয়োজন ত আপনার নেই, আপনি নিজেই বলেছেন।

বিভা। (একটু চুপ ক'রে থেকে) তার মানে, কোন অবস্থাতেই আমার সঙ্গে যেতে আপনি চান না ?

(নিখিল অধোবদনে চুপ ক'রে রইল।)

জবাবদিহির কথাটা তাহলে কেন বলেছিলেন ?

নিখিল। (করজোড়ে) আমার অপরাধ হয়েছে, ক্ষমা চাইছি।

(নিখিল নমস্কার ক'রে চ'লে যাচ্ছিল)

বিভা। যাবেন না. দাঁড়ান। একটা সত্যি কথা ব'লে যান। বলুন, আমি ক্ষমা করি বা না করি তাতে আপনার কিছু যায় আসে না।

নিখিল। আপনি কেন এত রাগ করছেন ?

বিভা। (বাঁদিকের দরজাটা টেনে বন্ধ ক'রে সেটাকে আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ে) ব'লে যেতে হবে।···

নিখিল। আমি সত্যি কথাই বলছি, আপনি আমার উপরে রাগ করুন এটা একেবারেই আমি চাই না।

বিভা। বাস্, ঐটুকু ?

নিখিল। আপনাদের আমি বন্ধু ব'লে জানি ; বন্ধুর মতই ব্যবহার এতকাল আপনাদের কাছে পেয়েও এসেছি, অন্যদের থেকে অবিশ্যি আপনারা আলাদা।

বিভা। আপনাদের, আপনারা ! আমিও ত একটা মানুষ ? আমার আলাদা মূল্য কিছু একটু থাকতে নেই ?

নিখিল। সে-মূল্য আলাদা ক'রে প্রত্যেক মানুষেরই কোথাও না কোথাও আছে। সবাইকার সব মূল্য একলা দিতে পারে এমন সাধ্য কোনো মানুষেরই থাকে না, আমারও নেই।

বিভা। ও !···আচ্ছা, যান। যান, চ'লে যান আপনি।

(নিখিলের প্রস্থানোদ্যম।)

শুনুন !

(নিখিল ফিরে দাঁড়ালে গলার সুর বদ্‌লে)

আমার একটি কথা কেবল রাখুন,—আমি আর কিছু চাইব না। আপনি কলকাতা ছেড়ে চ'লে যান।

নিখিল। কেন একথা বলছেন ?

বিভা। সে আপনি বুঝতে পারবেন না।

নিখিল। বুঝিয়ে দিন।

বিভা। আপনি কেন জানতে চাইছিলেন, দাদা কেন আমাকে কলকাতার বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছেন না ?

নিখিল। এই কথা ? আপনি বিশ্বাস করুন, কলকাতা ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

বিভা। বিশ্বাস করতে হবে না, আমি সেটা জানিই। এমন কি, কেন অসম্ভব সেটাও আমি জানি। আচ্ছা, যান, আপনার দেরি হয়ে যাচ্ছে। নমস্কার।

নিখিল। নমস্কার।

(নিখিল বেরিয়ে গেলে লিখবার টেবিলটায় মাথা গুঁজে বিভা কিছুক্ষণ ব'সে রইল। পিছনের দরজা ঠেলে রাজেন আবার এসে ঢুকল।)

রাজেন। কি কথা হচ্ছিল ঐ গোভূতটার সঙ্গে ?

বিভা। সত্যিই গোভূত। ভাবছে ভারি বীরত্ব দেখাচ্ছে, কলকাতায় থেকে মরবে !

রাজেন। (একটা বই পেড়ে নিয়ে ব'সে পাতা উল্টোতে উল্টোতে) কিন্তু ওকে এতগুলো শক্ত কথা এক সঙ্গে না শোনালে হয়ত ছিল ভাল। ও যে বড্ডই কাজের মানুষ। ও না থাকলে এতদিনে আমার যে কি দশা

হ'ত জানি না। তাছাড়া, ও ত সত্যিই অন্যায় কিছু করে নি?

(হঠাৎ সাইরেনের শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠতে গিয়ে রাজেন টিপয়টাকে উল্টে দিল, সেটার একটা পাশ তার পায়ের ওপর পড়ল ব'লে লাগলও তার একটু। হিঃ হিঃ হাসির শব্দ, পরমুহূর্তেই মুখে সাইরেনের মত শব্দ করতে করতে পাড়ার ন'দশ বছরের একটি ছেলে এসে ঢুকল ঘরে। আবার সে হিঃ হিঃ ক'রে হাসছে।

রাজেন। (চেয়ার ছেড়ে প্রায় লাফিয়ে ছুটে গিয়ে) এই লক্ষীছাড়া বাঁদর! চুপ কর্, চুপ! (ছেলেটার কান ধ'রে খুব জোরে একটা চড় কষিয়ে দিল তার গালে। কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে যাচ্ছিল ছেলেটা, সুমিত্রা একটু আগেই দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল, প্রায় ছুটে এসে এক হাতে তাকে আগলে বসল মেঝের ওপর।)

সুমি। লক্ষীটি, কাঁদে না। দেখি, কোথায় লেগেছে? এইখানে?...এইখানে?...এইখানে?...না, না, না, লক্ষীটি! (হাত বুলিয়ে দিতে দিতে, রাজেনের দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে) একে মারলে কেন?

রাজেন। বেশ করেছি মেরেছি। উঃ, ডান পা'টায় যা লেগেছে!

সুমি। ও ইচ্ছে ক'রে তোমার পায়ে লাগিয়ে দিয়েছে?

রাজেন। দেখ, তুমি সবকিছু নিয়ে তর্ক করতে এসো না।

সুমি। এইটুকুন একটা বাচ্চা ছেলে তোমাকে ভয় পাওয়াতে পারে, তোমার লজ্জা করে না?

(এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল। ছেলেটা ছাড়া পেয়ে চোখ মুছতে মুছতে চ'লে যাচ্ছে।)

রাজেন। তোমাদের সবাইকার হঠাৎ খুব বীরত্ব বাড়ছে দেখছি যে!

সুমি। ভয়ে বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ না পেয়ে গেলেই সেটা বীরত্ব হয় না।

রাজেন। বুদ্ধি আমার ঠিকই আছে, বুঝলে? অর্থাৎ তোমার চেয়ে একটু বেশীই আছে। তুমিই অত্যন্ত নির্বোধের মত ব্যবহার ক'রে চলেছ এই ক'দিন ধ'রে!

সুমি। কেন? কি করেছি আমি? বৃদ্ধ, অসুস্থ, অসহায় একটা মানুষকে একলা এখানে মরতে ফেলে রেখে নিজের প্রাণটা, বা প্রাণের ভয়টা নিয়ে তোমাদের সঙ্গে পালাতে চাইছি না, এই ত?

রাজেন। (কথার সুর যথাসাধ্য নরম ক'রে) দেখ, টাকায় কি না হয়? দিনের নার্স, রাত্তিরের নার্স, দু'বেলা দেখাশোনা করবার জন্যে ডাক্তার, নার্সিং হোমের দক্ষিণ দিক্‌কার সবচেয়ে ভাল ঘর, এ সমস্তেরই ব্যবস্থা আমি ক'রে দেব। আর যদি নার্সিং হোমে তোমার খুব বেশী আপত্তি থাকে, বেশ ত একজন পাস-করা ডাক্তার আর দিনরাতের নার্স আমি বাড়ীতেই ওঁর জন্যে রেখে দিয়ে যাব। তাছাড়া, নিখিল থাকবে—

(বিভা হেসে উঠল।)

সুমি। (ফিরে দাঁড়িয়ে) তোমার এত হাসি পেল কেন অকস্মাৎ?

বিভা। বা রে! আমার হাসি যদি পায়, একটু হাসতেও পাব না নিজের বাড়ীতে ব'সে?

সুমি। বেশ, হেসে নাও যত পার। আমি চললাম।

(বেরিয়ে যাচ্ছিল)

বিভা। শোন! ওঁর ভার দিয়ে নিখিলবাবুকে রেখে যেতে ত পারছ না; নিখিলবাবু যদি আমাদের সঙ্গে যান ত যাবে?

সুমি। (বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত টান হয়ে দাঁড়িয়ে) তার মানে?

বিভা। মানেটা যে কি, তা তুমি বেশ ভাল ক'রেই জান—

সুমি। না, জানি না, সত্যিই মানেটা জানি না আমি।

রাজেন। আঃ বিভা, যা তুই এখান থেকে!

(বাঁকা হাসিতে মুখ ভ'রে বিভা চ'লে গেল।)

সুমি। (এগিয়ে রাজেনের কাছে গিয়ে) বিভার কথাতে খুব বিশ্রীরকমের ইঙ্গিত ছিল একটা।

রাজেন। তা আমাকে কেন বলছ, আমি কি জানি? তোমাদের এ সমস্ত কথার মধ্যে থাকতেও আমি চাই না।

সুমি। (লিখবার টেবিলটার পাশে ব'সে) আমার কি ইচ্ছে করছে জানো? ইচ্ছে করছে, বাবাকে নিয়ে এই মুহূর্তে তোমাদের সংসার ছেড়ে আমি চ'লে যাই।

রাজেন। (কথার সুর নরম ক'রে) 'তোমাদের' সংসার মানে? এটা কি তোমার সংসার নয়?

সুমি। (ক্রন্দন-জড়িত স্বরে) আজ সত্যিই মনে হচ্ছে, নয়। নিজের সংসার মানুষের হাত-পা ছড়াবার জায়গা, এ বাড়ীর দেয়ালগুলো শুধু যেন সারাক্ষণ আমার জন্যে খোঁচা উঁচিয়ে আছে। কিন্তু ছেড়ে যাই বললেই ত ছেড়ে যাওয়া যায় না? কোথায় যাব, কি খাব, কে আছে আমার? (টেবিলে মাথা গুঁজল।)

পটক্ষেপ

ক্রমশঃ

সহজ জীবনের সাধনা

শ্রীরথীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য

সহজভাবেই যদি জীবনটা কাটিয়ে দেব, স্রোতের কুটোর মতন যদি সহজেই ভেসে চলে যাব, বিনাযুদ্ধে আর বিনা প্রতিবাদে পারিপার্শ্বিকতার যত সামাজিক আর নৈতিক ঘাত-প্রতিঘাত সেগুলো মাথা নীচু করে নির্বিচারে হজম করেই যদি একদিন পক্ককেশ ন্যুব্জ দেহ আর লোলচর্ম হয়ে বিদায় নেব, তবে তার জন্যে আবার সাধনা কেন? জীবনযুদ্ধে যে কোন পুরুষসিংহের মনে স্বভাবতই এই প্রশ্নটা প্রথমে উঠবে। কিন্তু সত্যই কি সহজ জীবন এতই সহজ যে, স্রোতে ভেসে-যাওয়া কুটোর সঙ্গে তার তুলনা চলে? জীবনযুদ্ধ আর জীবনযুদ্ধ! আধুনিক মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শুধু এই কথাটা শুনে শুনে আর এই কাল্পনিক যুদ্ধে মেতে উঠে একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করে যে, নিতান্ত একটা ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করে সে ক্লান্ত ক্ষতবিক্ষত আর নিঃশেষিত হয়ে পড়েছে। কিন্তু অনেক দেরী হয়ে যায় তখন, ভুল সংশোধন করার সময় হাতে আর বড় থাকে না; আর থাকলেও সে উদ্যম থাকে না।

যদি বলা যায় যে, 'জীবনযুদ্ধ' একটা ভ্রান্ত শ্লোগান-মাত্র, যার সৃষ্টি হয়েছে জীবনকে বিপথে পরিচালনা করার এক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপচেষ্টা থেকে—তাহলেই একটা প্রতিবাদের সোরগোল উঠবে চারিদিক থেকে। বক্তাকে অতি নির্বোধ জ্ঞানে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে বর্তমান দুর্মূল্য বাজারের সমস্যা, বেকার সমস্যা, বাস্তুহারা সমস্যা ইত্যাদি সহস্র সমস্যাকণ্টকিত সমাজ-জীবনের দিকে। আর তাতেও যদি বক্তার জ্ঞানোদয় না হয় তাহলে তাকে নিতান্ত একজন পরগাছা বুর্জোয়া শ্রেণীর জীব হিসেবে অভিযুক্ত করা হবে।

জীবনে সমস্যা আছে, একথা সত্য—নিদারুণভাবে দৈনন্দিন জীবনে জীবন দিয়ে অনুভব করার মত সত্য। কিন্তু অসত্য যা তা হচ্ছে এই সত্যগুলিকে ক্রমাগত আঙুল দিয়ে সত্য হিসেবে দেখিয়ে দেবার একদল লোকের উদ্দেশ্যমূলক অপচেষ্টা। আর এই অপচেষ্টার ফলেই আজ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে মানুষের জীবনে কতগুলো খণ্ড খণ্ড প্রবল প্রতাপশালী ব্যবহারিক সত্য জীবনের সর্বাঙ্গীণ সত্যকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে, মতবাদের ঝড়ে মানুষের সুস্থ শুভবুদ্ধির সমাধি রচনা করতে চলেছে, জীবনের সামগ্রিক উপলব্ধির মৌলিক অধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করতে চলেছে আর জীবনযুদ্ধের নামে জীবনের মূল সুরটিকেই হারাতে বসেছে। তাই তত্ত্বের নাগপাশে আর তথ্যের আক্রমণে চতুর্দিকে শুধু একটা আত্মধ্বংসী বিভ্রান্তি। তাই সমাজ-তত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব আর নীতিতত্ত্বের ছদ্মবেশে বিভিন্ন মতবাদের জয়ডঙ্কা বুদ্ধিজীবী মানুষের একটি পরম সম্পদ যে বুদ্ধি তারই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা সম্পন্ন করে এনেছে।

বস্তুতপক্ষে, জীবজগতের মধ্যে মানুষই একমাত্র জীব যার জীবনের অভিধানে 'যুদ্ধ' বলে কোন শব্দ থাকা সঙ্গত নয়। নিম্নতর জীবের পক্ষে শারীরিকভাবে বেঁচে থাকাটাই একটা বড় প্রশ্ন হতে পারে কিন্তু মানুষের পক্ষে তা নয়। কেন নয়, তার জবাব, জীবজগতে একমাত্র মানুষই সহজ জীবনের সম্পদ নিয়ে জন্মেছে, আর জীবনের বিনিময়েও এ সম্পদ সে রক্ষা করে যাবে এই তার নিয়তি। সহজ জীবনের যোগ্যতা অর্জন করাটা কিন্তু বড় সহজ নয়। এই জীবনবেদে যিনি বিশ্বাসী তাঁর সাধনার প্রথম ধাপ হবে একটা স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসের শক্তি যা দৈনন্দিন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো তাঁর সমগ্র চরিত্রকে করবে নিয়ন্ত্রিত, যার থেকে নিরন্তর তাঁর দেহ প্রাণ মন বুদ্ধি আত্মা সর্বাঙ্গীণ পুষ্টিলাভ করবে।

দার্শনিক জটিলতার মধ্যে না গিয়ে সহজভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে, জড় আর চৈতন্য পরস্পরকে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে—যেমন করে অন্ধকার জড়িয়ে থাকে আলোকে। অন্ধকার যেমন আলোর অভাব সূচনা করে, তেমনি চৈতন্যের অভাবেই জড়ের অস্তিত্ব। আসলে অন্ধকার এবং জড় এই দুটি পদার্থের অস্তিত্বই নেই। সকাল-সন্ধ্যার আলো-আঁধারির সঙ্গম-ক্ষণদুটি যেন জড়বস্তুতে প্রাণের সঞ্চার! প্রাণের পাসপোর্ট ছাড়া চৈতন্যের রাজত্বে পৌঁছানো অসম্ভব, তাই প্রাণী-জগতে প্রাণরক্ষার এত তাগিদ! কি সে পরম বস্তু যা পেলে জীবনের সমস্ত চাওয়া আর পাওয়ার জটিল হিসেব থেকে মুক্ত হয়ে একটা সরল স্বচ্ছন্দ জীবনের অধিকারী হওয়া যায়? এই জিজ্ঞাসাই জড়ের বুকে অর্ধসুপ্ত চৈতন্যের প্রথম আকুলতা। দেহ প্রাণ ও মনের হাজার দাবী, লক্ষ ক্ষুধা আর হাহাকার ভরা জীবনের বেলা-

ভূমিতে চৈতন্যের সাগর থেকে যেমনি এক-একটি তরঙ্গ এসে পৌঁছুতে থাকে তখনই ঐ একটি জিজ্ঞাসার আলোড়নে উদ্বেল হয়ে ওঠে জীবন। সেই তরঙ্গের আবর্তে গতানুগতিক ধারণা সংস্কার আর যাবতীয় মূল্য-বোধ ধসে গলে মিলিয়ে যায়। চৈতন্যের সাগরে অবগাহন করে জড়ের নবরূপায়ণ ঘটে। মানবসভ্যতার ইতিহাসে দেশে দেশে যুগে যুগে সকল সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার নিগূঢ় উৎসের সন্ধান এখানেই পাওয়া যাবে। সাহিত্যে সঙ্গীতে শিল্পকলায়, ধর্ম দর্শন বিজ্ঞানে, ব্যবসায় বাণিজ্যে কৃষিকর্মে, রাজনীতি কূটনীতি আর অর্থনীতিতে, এক-কথায় জীবনের সর্বক্ষেত্রে যখনই কোন আলোড়ন চলমান সভ্যতার গতিকে বেগ দিয়েছে, তখুনি দেখা যাবে তার উৎস, ঐ একটি জায়গায়। জীবনের যত আপাতঃবিরোধ, হানাহানি আর ভুল বোঝাবুঝি সব কিছুরই মূলে ঐ মূল শিকড়টি থেকে জীবনের আত্মচ্যুতি।

সহজ জীবনের সাধনার প্রথম ধাপ তাই ঐ শিকড়টিকে আপন বলে আঁকড়ে থাকা, শ্রদ্ধা দিয়ে, বিশ্বাস দিয়ে, প্রেম দিয়ে, স্বাভাবিক উপলব্ধিতে যা কিছু মহৎ মনে হয়, সুন্দর মনে হয়, সৎ মনে হয় সে সব কিছু দিয়ে। ঐ আপন বলে ধরে থাকার কাজটি নিরন্তর অনলস চেষ্টায় যখন অভ্যাসে পরিণত হয়ে আসবে তখনি সহজ জীবনের প্রথম পাঠ সমাপ্ত হয়ে দ্বিতীয় পাঠের সুরু। দ্বিতীয় পাঠের সময়টায় সহজ জীবনের ছাত্রের জীবন সত্যি অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে, কারণ আত্ম-ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হবার একটা ক্রমাগত আশঙ্কা থেকে সে মুক্তি পেয়েছে। ব্যবহারিক জীবনের টুকরো টুকরো সত্যগুলি তার দৈনন্দিন আচরণবিধির মধ্যে যথাযোগ্য সামঞ্জস্য পেয়েছে এবং সমস্ত জীবনজুড়ে দাপাদাপি করার স্পর্ধা ছেড়ে দিয়ে তারা আত্মস্থ ছাত্রটির নবলব্ধ চেতনার আলোতে নিজেদের মহিমান্বিত মনে করছে।

আগেই বলেছি, জড় আর চৈতন্যের আকর্ষণ-বিকর্ষণ নিয়ে সমগ্র জগৎ জুড়ে চলেছে একটা আলো-আঁধারির ছায়াছবি—মানুষের বিরাট কর্মপ্রবাহ যার একটা অতি ক্ষুদ্রতম অংশমাত্র। এই ছায়াছবির বিশেষত্ব হচ্ছে, এতে দর্শক কেউ নেই, সবাই অভিনেতা। এটির যেমন সুরু ছিল না, তেমনি বর্তমান নেই, ভবিষ্যৎও নেই। এটির কারণ নেই, ফলাফল নেই—বুদ্ধি দিয়ে অনুভব করার মতো কোনো যুক্তিও নেই। বিশ্বজোড়া এ শুধু এক বিরাট খামখেয়ালীর খেলা—অনাদি অনন্তকাল ধরে এই বিপুল ব্রহ্মাণ্ডে অযুতকোটি আলোকবর্ষের বিশাল অসীমের স্রোতে বয়ে চলেছে এই অপরূপ রসের খেলা। ক্ষয়হীন লয়হীন এই চলমান রসস্রোতরূপে রসে গন্ধে স্পর্শে জীবনের মাটিকে উর্বর করে ফল পত্র আর পুষ্পের সম্ভারে নিরন্তর সমৃদ্ধ করে চলেছে। সহজ জীবনের ছাত্র প্রথম পাঠ শেষ করে দ্বিতীয় পাঠের সুরুতে এই রসস্রোতে সাঁতার কাটার দক্ষতা অর্জন করে—তীরে দাঁড়িয়ে এই স্রোতের লীলা দূর থেকে শুধু দেখে আর সে তৃপ্তি পায় না। ক্ষয় ক্ষতি লাঞ্ছনা, নৈরাশ্য ভীতি যন্ত্রণা আর ব্যাধি জরা মৃত্যুর ভ্রূকুটিগুলিকে প্রথম পাঠের শেষেই সে আয়ত্ত করে এনেছে; তাই এই নেতিবাচক সংস্কারের বাধাগুলি তার এই নূতন পাঠে আর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। প্রবহমান চৈতন্যের উচ্ছল স্রোতে জড়ের এই বিকারগুলো প্রাকৃতিক নিয়মেই নিঃশেষে মিলিয়ে যায়, জীবনের নূতন উপলব্ধি উদ্দামগতির বেগে নিজের পথের পাথেয় নিজেই সংগ্রহ করে নিতে থাকে।

সহজ জীবনের দ্বিতীয় পাঠে ছাত্র তাই সৃষ্টির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। না হয়ে সে পাবে না। অনেক দ্বিধা সংশয়ের প্রাচীর পেরিয়ে জীবনের মূল সুরটিকে সে এতদিনে খুঁজে বের করেছে; আনন্দ আর রসের স্রোতে অবগাহন করে দেহে প্রাণে মনে সে সঞ্জীবিত হয়েছে। শতকোটি সৌরজগৎ আর নীহারিকাপুঞ্জের মহাপথের পথিক সে—সংসারের ছোট ছোট চাওয়া আর পাওয়ার পথ ধরে যে বিষাক্ত কীটগুলো সাধারণ জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে দুরারোগ্য ক্ষতের সৃষ্টি করে, সেগুলোর আর সে তোয়াক্কা করে না। প্রাণধারণের দৈনন্দিন প্রয়োজনগুলো সরল সংক্ষিপ্ত হয়ে আসাতে 'জীবনযুদ্ধে'র কোলাহলের অনেক উপরে উঠে এসেছে সে। শুধু তাই নয়, তার দেহ প্রাণ মনের অনাড়ম্বর প্রস্তুতি, বস্তুজগতের প্রতি তার স্বাভাবিক অনাসক্তি এক বিচিত্র প্রাকৃতিক নিয়মে প্রকৃতির যত লোভনীয় ঐশ্বর্য বিনাযুদ্ধেই তার পায়ের কাছে এনে ফেলতে সুরু করেছে। সে লুব্ধ নয় বলেই যেন লোভের উপকরণগুলি তার প্রসাদ পেয়ে ধন্য হতে চায়; সে মুগ্ধ নয় বলেই যেন প্রকৃতির রূপ রস গন্ধ স্পর্শ নিরন্তর তাকে ঘিরে মোহজাল বিস্তার করে আছে। প্রকৃতি যেন এক ছলনাময়ী নারী—সহজে যা পাওয়া যায় তাতে তার আসক্তি নেই। সহজ জীবনের ছাত্র এত সহজে তাকে অবজ্ঞা করবে এটা সে কেমন করে সহ্য করবে? আর, দ্বিতীয় পাঠের মাঝামাঝি এসে ছাত্রটিও ততক্ষণে জেনে ফেলেছে যে, এই ক্ষুব্ধ, চপল, অভিমানী, ছলনাময়ী নারীটিকে একান্ত করে পেতে গেলেই হারাতে হবে, বুঝে ফেলেছে এটিকে ঠিকমতন খেলিয়ে যাওয়াই তার বর্তমান পাঠের সব চাইতে সরস

অধ্যায় আর এই অধ্যায়টিকে পুরোপুরি উপভোগ করার সামর্থ্য সে অর্জন করেছে। এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রটির জীবনে আধ্যাত্মিক ব্রহ্মচর্যের কৃচ্ছ্রসাধনের সমাপ্তি এবং প্রকৃতির এই লীলাসঙ্গিনীকে সহচরী করে তার গার্হস্থ্য আশ্রমের সুরু। সভ্যতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে—যেখানে যা কিছু সৃজনী প্রতিভা—ঐ অনাসক্ত কামনা থেকেই তার উন্মেষ। চৈতন্যের ঔরসে জন্ম নিয়ে প্রকৃতির স্তন্যপুষ্ট হয়ে সে বেড়ে ওঠে—সমাজ-সভ্যতাকে বিভিন্নমুখী কর্মের বন্যায় প্লাবিত করে, সার্থকতামণ্ডিত করে। উত্তাল আনন্দঘন চৈতন্যসাগর মন্থন করে সার্থক এই কর্মস্রোত ব্যক্তিত্বের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের গণ্ডি ধরে বয়ে চলে। কর্ম যেখানে শুধু আনন্দেরই প্রকাশ, সেখানে সে আপন সত্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ। বস্তুগত বিচারের ভালমন্দের সবরকম প্রশ্নই সেখানে অবান্তর। সমাজ-সংসারের প্রয়োজনের মাপকাঠিতে এই কর্মের গুণাগুণ বিচার করা তখন আর চলে না। কারণ, সমাজ-সংসারের ভাল বা মন্দ করার কোন মহৎ বা ইতর উদ্দেশ্যের প্রেরণা নেই এই কর্মের পেছনে। সহজ জীবনের ছাত্রের আধ্যাত্মিক গার্হস্থ্য জীবনের সবটাই শুধু কর্মময়—শুধু সৃষ্টির উল্লাসে সে কর্ম করে যায়, না করে সে পারে না তাই করে। ছলনাময়ী ঐ নারী যাকে সে স্বেচ্ছায় জীবনসঙ্গিনী করেছে তার নিরন্তর আকর্ষণে দেহের অণুতে পরমাণুতে সে অনুভব করে বাঁধভাঙা সৃষ্টির উচ্ছ্বাস। এমনিতরো উন্মাদনার মধ্য দিয়ে কখন তার দ্বিতীয় পাঠের সমাপ্তি ঘটেছে, সে টেরও পায় না।

তৃতীয় পাঠের সুরুতে হঠাৎ একদিন ছাত্রটি আবিষ্কার করে, যে কর্মের বন্যায় নিজের সত্তাকে মিলিয়ে দিয়ে জীবন-নাট্যে সে অমরত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চলেছিল তাতে হঠাৎ ভাটার টান লেগেছে। বিস্মিত ক্ষুব্ধ এবং প্রতিহত হয়ে সে অনুভব করে যে, তার সামর্থ্য এবং প্রেরণা এতদিন যা একটা একমুখীন সহযোগিতার খাতে এগিয়ে যাচ্ছিল, তা হঠাৎ বিপরীত খাতে বইতে সুরু করেছে। প্রথমটার এই হঠাৎ-দেখা-দেওয়া সমস্যাটা তাকে নিতান্ত অসহায় এবং দিশেহারা করে ফেলে। নিদারুণ অপমানিত এবং লজ্জিত হয়ে সে দেখতে থাকে তার ক্ষয়িষ্ণু দেহ এবং মনের অবাধ্য ক্রমাবনতি। কালের আক্রমণে তার বড় সাধের দেহটাকে যতই অপ্রতিরোধ্য জরা এবং আধিব্যাধিরূপী তার সাঙ্গোপাঙ্গের দল এসে কুঁড়ে কুঁড়ে খেতে থাকে ততই একটা অসহায় পরাজয়ের গ্লানিতে অভিভূত হয়ে পড়তে থাকে সে। আতঙ্কিত হয়ে সে দেখতে থাকে, দেহের যে পরিপূর্ণতা এতকাল চৈতন্যের রসস্রোতের পথকে অবারিত করে রেখেছিল এবার তাতে ফাটল ধরেছে। প্রকৃতির ঐ ছলনাময়ী নারী, যাকে সে স্বেচ্ছায় জীবনসঙ্গিনী করেছিল, অবশেষে তারই হাতে কি নিষ্ঠুরভাবেই না তাকে পরাজয় বরণ করতে হ'ল! নারীটি নিশ্চয়ই শাণিত বিদ্রূপে তার মোহমদির চোখ দুটি দিয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ন্যুব্জ শীর্ণ ক্লান্ত সহজ জীবনের ছাত্র তার জীবনের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে নিদারুণ হতাশায় একবার চোখ মেলে তাকায়। কিন্তু, এ কি! চিরচপলা হৃদয়হীনা ঐ নারীর ছলোছলো অশ্রুভারাক্রান্ত চোখ দুটিতে অপার সমবেদনা আর করুণ মিনতি! সে যেন বলতে চায়, ভুল বুঝো না তুমি আমায়, অনাদি অনন্তকাল ধরে চৈতন্যের যে রসস্রোত প্রবাহিত হচ্ছে তারই একপাশে আমিও বয়ে চলেছি চিরযৌবনা প্রকৃতি। জীবধাত্রী বসুন্ধরার কোলে চৈতন্যের আশীর্বাদ-পুষ্ট বিধাতার সেরা সৃষ্টি তোমরা—মানুষ। তোমরা আস যাও, আমি চেয়ে থাকি। আমি তোমাদের চিরন্তন খেলার সঙ্গিনী—শ্রান্তিহীন ক্লান্তিহীন এই খেলায় শুধু খেলার রসদ জুগিয়েই যাব, এই আমার নিয়তি। সুখ দুঃখ, হাসি কান্না, ভয় ভাবনা এই আমার খেলার উপকরণ। আমি অন্ধ প্রকৃতি—আমার মুক্তি নেই। খেলার মর্ম না বুঝে শুধু তার অমোঘ নির্দেশে খেলেই যাই। তোমরা জীবনের স্ফুলিঙ্গ, প্রাণের আধার, জ্ঞানের অধিকারী। তোমাদের মধ্যে যারা সার্থক জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ কর তারা প্রায়ই আমাকে মূর্তিমতী বিঘ্নজ্ঞানে দূরে সরিয়ে রাখ অবজ্ঞায়—বিশ্বনিয়ন্তার খেলার বিধানে আমাকে বাধ্য হয়ে তার চরম প্রতি-শোধও নিতে হয় কখনো কখনো। তাই বলে তুমি অন্তত আমাকে নিষ্ঠুর ভেবো না। আকাশে বাতাসে যে ঐশ্বর্য আমি ছড়িয়ে রেখেছি, হাসি কান্না মায়া মমতা ভরা যে জগৎ আমি নিরন্তর সৃজন করে চলেছি—তা যে নিতান্তই অবজ্ঞার বস্তু নয়, তা আর কেউ না বোঝে না বুঝুক, সহজ জীবনের মরমী সন্ধানী তুমি তা বুঝো! এবারকার মতো তোমার সাথে আমার খেলার পালা সাঙ্গ হতে চলেছে—তোমার জীবনের অস্তসূর্যের শেষ বর্ণছটার স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের পায়ে তোমার এ-জন্মের লীলাসহচরী অভাগিনী প্রকৃতির—যাকে তুমি সন্ধান দিয়েছ, অবজ্ঞা কর নি, তার প্রণাম রইল।'

কেশবচন্দ্র সেন

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষে আমরা এখানে সমবেত। তাঁর আশীর্ব্বাদ আমাদের উপরে বর্ষিত হোক। আপনারা ছাত্রী এবং শিক্ষাব্রতী—সকলেই আমার সতীর্থ। আমি এখনও, দৃষ্টিশক্তি লোপ পাওয়া সত্ত্বেও অন্যের সাহায্যে দৈনিক অন্ততঃ ঘণ্টাখানেক অধ্যয়ন-অনুধ্যানে লিপ্ত থাকি। উপস্থিত ছাত্রীগণ একারণ সত্যসত্যই আমার সতীর্থ। আবার শিক্ষাব্রতী যাঁরা আছেন তাঁদেরও সতীর্থ হবার যোগ্যতা হয়ত এতদিনে কিছু অর্জ্জন করেছি। তবে তাঁদের সঙ্গে আমার প্রভেদ এই, তাঁরা প্রাচীরের ভিতরে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক লোককে পড়ান, আমি প্রাচীরের বাইরে অসংখ্য জনসমষ্টির উদ্দেশ্যে আমার কথা নিবেদন করি। আবার যাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের নিমিত্ত আমরা এখানে এসেছি তিনিও এক হিসাবে আমাদের 'সতীর্থ'। তিনি বিদ্যালয়ের ছাত্রই শুধু ছিলেন না, বিশ্বজননীর বিদ্যালয় থেকে আমৃত্যু অহরহ জ্ঞান আহরণ করে গিয়েছেন। এমন একজন মহামনা ভক্তপ্রধান সতীর্থের জন্মদিনে তাঁর কথা আলোচনার সুযোগ পেয়ে আমরা ধন্য!

ছাত্রের তপস্যা

আমাদের নিকট আজকাল 'ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ' কথাটি কেমন যেন বেসুরো হয়ে উঠছে। অথচ ছাত্রজীবনে অধ্যয়ন-অনুধ্যানকে তপস্যা করে না নিলে সমগ্র জীবনই যে ব্যর্থ হয়ে যাবার উপক্রম হয়। কেশবচন্দ্র কৈশোরে সত্যসত্যই একজন আদর্শ ছাত্র ছিলেন। ধনী-পরিবারে লালিতপালিত হয়েও সেযুগে কেমন করে অনন্যতুল্য অধ্যয়ন-প্রবণ ছাত্র হয়ে উঠেছিলেন তা আজকের দিনে ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। তিনি সাহিত্যে—বাংলা, ইংরেজিতে অল্পবয়সেই বেশ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। বাংলায় পারগতাহেতু তিনি শিক্ষা-বিভাগের সার্টিফিকেট বা প্রশংসাপত্র পেয়েছিলেন। আমি ঐ সময়কার শিক্ষাসমাজের বার্ষিক বিবরণে 'হিন্দু কলেজ' শীর্ষক নিবন্ধে তা দেখেছি।

কৈশোরেই নিজগুণে কেশবচন্দ্র সতীর্থদের শ্রদ্ধাপ্রীতি লাভ করেন। তিনি তাঁদের নেতা হয়েও তাঁদের থেকে কেমন যেন আলাদা ছিলেন। একটু সময়ও তাঁকে নষ্ট করতে দেখা যেত না। কলেজের পড়া বাদে যতটুকু সময় পেতেন, কলেজ লাইব্রেরীতে পুস্তকপাঠে নিরত থাকতেন। হিন্দু কলেজের (তখন এটি জুনিয়র ও সিনিয়র এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল) অধ্যাপকদের নিকট থেকেও তিনি অপূর্ব্ব জ্ঞানার্জ্জন-স্পৃহার জন্য কতই না প্রশংসা পেতেন! একদিন কলুটোলা সেন-ভবনে মহা সোরগোল উপস্থিত—কিশোর কেশবচন্দ্রকে পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক রাত্রি, বাড়ীর নানা জায়গায় খুঁজে পরে দেখা গেল চিলেকুঠুরীতে কেশবচন্দ্র ঘুমিয়ে পড়েছেন, বুকে তাঁর একখানি বই।

কলেজের বাইরেও, যখনই সুযোগ পেতেন, কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরীতে গিয়ে সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম্মতত্ত্ব, বিজ্ঞান, ইংরেজি কতরকমেরই না বই পড়তেন কেশবচন্দ্র। একটি কথা এখানে আরও বলি—কেশবচন্দ্র কিছুকাল হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজে সুবিখ্যাত ক্যাপ্টেন রিচার্ডসনের নিকটে সেক্সপীয়রের পাঠ নিয়েছিলেন। তখন তাঁর বয়স অল্প। কিন্তু এমনভাবে নাটকের রস তিনি পেয়েছিলেন যার জন্যে পরবর্ত্তীকালে নব নব ভাব প্রচারে নাটক-অভিনয়ের সাহায্য নিতে তাঁকে আমরা দেখি। এক কথায়, ছাত্রাবস্থায় কেশবচন্দ্র অধ্যয়নকেই তপস্যা বা মন্ত্র করে নিয়েছিলেন।

পরোপকার না আত্ম-কল্যাণ?

কেশব-জীবনের আরও কয়েকটি কথা, হোক না তা ছোটখাট, এখানে কিছু বলা যাক। আমরা "পরোপকার"কে 'ধর্ম্ম' বলে মানি। এ কথাটির মধ্যে আর একটি কিন্তু বিসদৃশ ভাবও রয়েছে। পরোপকার মানে পরের উপকার—অর্থাৎ অপরকে আমি উপকার করছি, এর ভিতরে যেমন অহমিকা আছে, তেমনি অপরকে অনাত্মীয় ভাববারও অবকাশ রয়েছে। আবার অপরকে আমি দয়া করি বা কৃপা করি, এরকম একটি ভাবও মনে আসতে পারে। কেশবচন্দ্র যখনই সেবা ধর্ম্মে দীক্ষিত হলেন, সেই থেকেই এই কথাটির উপর তাঁর বিরূপতা লক্ষ্য করি। প্রথমতঃ, 'পর কে?' এ জগতে পর বলে তো কেউ নেই! পরিবার বল, সমাজ বল, দেশ বল

নরনারী সকলেই তো আমার এক পিতার সন্তান। এবং একটি প্রীতিপূর্ণ ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে আবদ্ধ। কাজেই পরোপকার কথাটির সার্থকতা একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে যায়। কিন্তু পরকে যদি আমার আত্মীয় মনে করি, এবং এই ভাবনা থেকেই তাঁর হিত-সাধনে রত হই, তা হলে এই ভাবনাটি স্বতঃই মনে আসবে যে, আমি অপরের হিতসাধন করতে গিয়ে নিজেরই কর্ত্তব্য পালন করছি। এই কর্ত্তব্যবোধই হ'ল আসলকথা। দেশের প্রতি, দশের প্রতি এই কর্ত্তব্যবোধ থেকেই হিতসাধন-স্পৃহা জাগ্রত হলে তবেই মানুষের সার্থক কল্যাণ-সাধিত হতে পারে। এখানে অহমিকা নেই, দয়া নেই আছে শুধু কর্ত্তব্যবোধ। এর ফলে আমার ভিতরকার মনুষ্যত্ব উদ্বুদ্ধ হবে, আত্মিক উন্নতি সম্ভব হয়ে উঠবে। এখন আমরা বুঝলাম, 'পরোপকার' কথাটির উপরে কেন কেশবচন্দ্র এত চটা ছিলেন। তবে 'পরোপকার' শব্দটি ত অভিধান থেকে বাদ দেওয়া যাবে না! পরোপকারকে কেশবচন্দ্রের ভাবনার দ্বারা পরিশ্রুত করে আত্ম-কল্যাণ রূপেই আমাদের গ্রহণ করতে হবে।

কেশবচন্দ্র সেন

ধর্ম্ম ও জীবন

ধর্ম্ম এবং জীবনের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ, এ কথার সারবত্তা আমরা কখনও উপলব্ধি করি না। এ দুটি যেমন একটি টাকা বা পদকের এপিট-ওপিট, একটিকে বাদ দিলে অন্যটির অস্তিত্ব কল্পনা করাও কঠিন। ভক্তপ্রধান কেশব-চন্দ্র ধর্ম্ম ও জীবনকে এইভাবেই দেখেছিলেন এবং মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর আয়ুষ্কালের মধ্যে জীবনের মহান ব্রত উদ্‌যাপনে সমর্থ হয়েছিলেন। আমরা গীর্জ্জায়, মন্দিরে বা মসজিদে যাই, বিগ্রহ দেখে চিত্ত শুদ্ধ করতে চেষ্টা করি। আবার ধর্ম্মকথা শুনেও কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হয়। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই যে এই পর্য্যন্ত! আমরা নীতি-ধর্ম্মের অমৃতবাণী হৃদয়ে গ্রথিত করে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করি না, তাই এত দুঃখ, বিপদ, লাঞ্ছনা।

কেশবচন্দ্র জীবনের পরতে পরতে নীতিধর্ম্মকে আশ্রয় করে নিয়েছিলেন; তাই ত তাঁর এত শক্তি! জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দৈনন্দিন আচার-ব্যবহারে, কার্য্যকলাপে, বিষয়কর্ম্মে সর্ব্বত্রই নীতিধর্ম্ম মেনে নিয়েছিলেন বলেই কেশবচন্দ্র এত বড়। এ কথা কখনও ভুললে চলবে না যে, তিনি আমাদের মতই একজন মানুষ ছিলেন। কিন্তু ধর্ম্ম ও জীবনকে একাধারে স্থিতি করেছিলেন বলেই তাঁর এত মহত্ত্ব। কেশবচন্দ্রের "জীবন-বেদ" নামে একখানি বই রয়েছে? জীবন-বেদ নামটি কত মধুর! বাংলা-সাহিত্যে এখানি অপূর্ব্ব আত্ম-জীবনী। জীবনের বিভিন্ন স্তরে তিনি যে-সব বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করে-ছিলেন, তারই উপলব্ধি জারক-রসে সিঞ্চিত করে নিজের জীবনকে অত উন্নত স্তরে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন।

জীবন-বেদ তাঁর ধর্ম্ম ও জীবনের অঙ্গাঙ্গী করণের একটি প্রকৃষ্ট পরিচিতি।

বিলাত-প্রবাস

যাতায়াতের সময় ধরে মোট সাত মাস কাল কেশবচন্দ্র বিলাতে ছিলেন। তিনি ধর্ম্মনেতা। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁর বক্তৃতা বিদগ্ধ ও সুধী-সমাজকেও চমৎকৃত করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু ধর্ম্মনেতা ছাড়া তিনি আরও কিছু ছিলেন, এবং এ জন্যই কি বিলাতে, কি ভারতবর্ষে সরকারী ও বেসরকারী ইউরোপীয় মহলে এত চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল। কোন কোন বক্তৃতায় তিনি ভারতে ব্রিটিশ শাসনে অনাচার ও দুর্নীতির কথা বিশেষভাবে ব্যক্ত করেন। এ দেশে ইউরোপীয় সমাজের মুখপত্র 'ইংলিশ-ম্যান', 'ইণ্ডিয়ান ডেইলী নিউজ' প্রভৃতি পত্রিকায় তার উক্তিগুলির খুবই সমালোচনা হয়েছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, কলকাতার 'হিন্দু পেট্রিয়ট', 'সোমপ্রকাশ' প্রভৃতি দেশীয়দের পরিচালিত পত্রিকাগুলি কেশবচন্দ্রের বক্তৃতার গুরুত্ব অনুধাবন না করে বরং ইউরোপীয় কাগজগুলির সঙ্গেই সুর মেলায়। তখন ঢাকাস্থ 'ঢাকাপ্রকাশ' এবং যশোহরের অমৃতবাজার গ্রামস্থ 'অমৃতবাজার পত্রিকা' (তখন ইংরেজী ও বাংলা) কেশবচন্দ্রের বক্তৃতার গুরুত্ব সম্পর্কে স্বদেশবাসীদের সবিশেষ অবহিত করান। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ঐ সময় এ কথাও লিখেছিলেন যে, কোন পেশাদার রাজনৈতিক নেতার বক্তৃতায় বিলাতে এরূপ চাঞ্চল্যের উদ্রেক হ'ত না ও কখনও সম্ভবপর ছিল না। কেশবচন্দ্র ধর্ম্মনেতা, রাজনৈতিক বিষয়ে তাঁর উক্তির অকাট্যতা সম্বন্ধে ইংরেজ জনসাধারণের স্বতঃই বিশ্বাস জন্মে। কেশবচন্দ্র ছিলেন সত্যিকার দেশপ্রেমিক। বিলাত পর্য্যটনে ভারতবর্ষের গৌরব ও মর্য্যাদা তখন আশাতীত বেড়ে যায়।

শিল্প বা কারিগরী বিদ্যালয়

কেশবচন্দ্র স্বদেশে ফিরে আর অপেক্ষা করলেন না। বিলাতে যে সকল দেশোন্নতিমূলক ব্যাপারের সঙ্গে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন তারই নিরীখে সাধ্যানুরূপ আয়োজন করতে লেগে গেলেন। ভারত-সংস্কার সভা প্রতিষ্ঠা বিলাত-প্রবাসলব্ধ অভিজ্ঞতার ফল। কয়েকটি বিভাগের মাধ্যমেই ভারত-সংস্কার সভা কার্য্যারম্ভ করেন। শিক্ষা-বিভাগের অন্তর্গত শিল্প বা কারিগরী বিদ্যালয় সম্বন্ধে এখানে কিছু বলি। একবার ভেবে দেখা যাক, বহু বিষয়ে আমরা কত অসহায়। চেয়ারের একটি পায়া ভেঙ্গে গেল, অমনি আমরা ছুতার মিস্ত্রীকে ডাকি। তালায় চাবি লাগে না, ডাকো চাবিওয়ালাকে। ছাতির শিক বা তার স্থানচ্যুত হলে বা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গেলে, অমনি ডাকি 'ছাতা-সারাবে'-কে। ঘড়ির কাঁটা চলে না, অমনিই ছুটি ঘড়ি-মেরামতী দোকানে। আরও কত দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়! জলের কল বিকল হ'ল, উড়িষ্যাবাসী না হলে তা চালু হবে না। এই রকম আরও কত কি!

কেশবচন্দ্র দেখলেন, বিলাতের প্রত্যেকটি পরিবারে এই সব তথাকথিত তুচ্ছ বা সামান্য কাজ পরিবারের লোকেরাই—কি নারী, কি পুরুষ—করে থাকেন। এতে তাঁদের পারিবারিক সাশ্রয় খুবই হয়। অর্থ-বণ্টন তো হবেই, আমরা যে সব জিনিস কিনি, তার মাধ্যমেই তো অর্থ-বণ্টন হয়ে থাকে। কিন্তু আর্থনীতিক সচ্ছলতা এ সব পরিবারের হয়ে থাকে, দৈনন্দিন এই সকল তুচ্ছ বা সামান্য কাজ তারা নিজেরা করে বলে। পরিবারের এই যে অর্থ-সংরক্ষণ, এর দ্বারা সমবায়ের মাধ্যমে কতই না স্বদেশের উন্নতি করছে ইংরেজরা! এই সেদিন তো নিখিল-ভারত-সমবায় দিবস হয়ে গেল, প্রত্যেক পরিবারের যদি অর্থ-স্বাচ্ছল্য না থাকে তা'হলে সমবায়-প্রথা সাফল্যমণ্ডিত হবে কিরূপে?

কেশবচন্দ্র কারিগরী বিদ্যালয়ের মাধ্যমে স্বল্পবিত্ত পরিবারের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ঘটাবারই উপায় করে দিয়েছিলেন। সকালে ও বিকালে বিদ্যালয় বসত। বয়স্ক লোকেরা যারা দুপুরে অন্য কাজে ব্যস্ত থাকতো—এখানে বসে তাদের বিবিধ বিষয়ে হাতে-কলমে কাজ শেখাবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। আজ দেশে শিল্প-কারখানার অভাব নেই।

কিন্তু কেশবচন্দ্র প্রত্যেকটি স্বল্পবিত্ত পরিবারের আর্থনীতিক সচ্ছলতার যে উপায় করে দিয়েছিলেন তার বহুল প্রচলন হ'ল কৈ? স্বদেশের আর্থনীতিক উন্নতি না হলে সব বিষয়েই অনাদৃত হয়ে পিছনে পড়ে থাকে। প্রত্যেকটি পরিবারের ধন-সংরক্ষণ—এখানে পুঁজি করার কথা বলছি না—না হলে সাধারণ মানুষের আর্থনীতিক উন্নতি হবে কিরূপে? কেশবচন্দ্রের এই উপায় পারিবারিক অর্থ সঞ্চয়েরই নির্দ্দেশ দেয়। কিন্তু স্বল্পবিত্ত আমরা এতই পরমুখাপেক্ষী যে, সঞ্চয় তো দূরের কথা, মাসের শেষে একেবারে অনেকেই ঋণজালে জড়িয়ে যান। অর্থের কিছু আশ্রয় হলে তো তবে সমাজে সমবায় চালু হতে পারে? আজ যে বাঙালীদের ভিতরে সমবায় মনোভাবের এত অসদ্‌ভাব দৃষ্ট হয়, তার মূলে রয়েছে বাঙালীর পারিবারিক অসচ্ছলতা। কেশবচন্দ্র শিল্প বা কারিগরী বিদ্যালয় স্থাপন করে স্বদেশের একটি মৌলিক অভাব

বিদূরণে প্রয়াসী হয়েছিলেন। এই বিস্তালয়টি বেশী দিন টেঁকে নি বটে, কিন্তু এ থেকে আমরা যে নির্দ্দেশ পাই, তা এখনও কার্য্যকরী হলে আমাদের অনেক দুর্গতি ঘুচে যাবে।

স্ত্রী-শিক্ষা : শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়

কেশবচন্দ্র স্ত্রী-শিক্ষা তথা স্ত্রীজাতির উন্নতির বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, সে সম্বন্ধে এখন আর বিশেষ কিছু বলার আবশ্যক করে না। ভারত-সংস্কার সভার তো একটি বিভাগই ছিল—'স্ত্রী-জাতির উন্নতি বিভাগ'। তখন বালিকা-বিস্তালয় সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে যায়। যে সব মনীষী মিস্ মেরী কার্পেণ্টার-কে কলকাতায় একটি শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় স্থাপনে সহায়তা করেন তাঁদের মধ্যে কেশবচন্দ্র সেন ছিলেন অন্যতম। মিস্ কার্পেণ্টারের প্রস্তাব গ্রহণ ক'রে বাংলা সরকার বেথুন স্কুলের সঙ্গে একটি শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় খুলেন। সরকার কিন্তু তিন বৎসর যেতে না যেতেই ছাত্রীর অভাবে এটি বন্ধ করতে বাধ্য হন। তৎকালীন ছোট লাট সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল বিদ্যালয় বন্ধ করার বিষয়টি বিজ্ঞপ্তি করার সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলেছিলেন যে, যদি দেশীয়দের দ্বারা এরূপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আয়োজন হয়, তাহ'লে তারা একে অর্থ সাহায্য করবেন। কেশবচন্দ্র স্ত্রী-জাতির উন্নতি-বিভাগের অধীন এইরূপ একটি শিক্ষয়িত্রী বিস্তালয় অনতিবিলম্বে স্থাপন করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অল্পবয়স্কা বালিকাদের নিয়ে একটি পাঠশালাও খোলা হ'ল। প্রতিষ্ঠার পরে সরকার থেকে অর্থ-সাহায্যও পাওয়া গেল।

কিন্তু একটি বিষয়ে কেশবচন্দ্রের দূরদর্শিতার তারিফ করতে আমরা বাধ্য। আগেকার শিক্ষয়িত্রী বিস্তালয়টি তো বয়স্কা ছাত্রী অভাবে তুলে দেওয়া হয়েছিল। কেশবচন্দ্র ছাত্রীর অভাব নিরাকৃত করলেন একটি অভিনব উপায়ে। কেশব প্রতিষ্ঠিত ভারত-আশ্রমের কথা এখানে কিছু বলা দরকার। ভারত-সংস্কার সভার কার্য্যাবলী সুপরিচালনার জন্য একদল ত্যাগী নিষ্ঠাবান সেবাপরায়ণ কর্ম্মী চাই। কেশবচন্দ্র তাঁর অনুবর্ত্তীদের ভিতরে এইরূপ কর্ম্মীদল পেয়েছিলেন। তখন সামাজিক কারণে কোন কোন ব্রাহ্ম পরিবার নির্য্যাতিতও হতে থাকেন। তাঁদেরকেও আশ্রয়দান আবশ্যক হয়ে পড়ল। এই সকল কারণ থেকে উদ্ভব হ'ল—ভারত-আশ্রমের। এখানে বহু ব্রাহ্ম সপরিবারে এসে জুটলেন। এই সকল পরিবারে বয়স্কা মহিলারাও ছিলেন অনেক। তাঁদের পুত্র-কন্যাদের শিক্ষার জন্য যেমন আশ্রম-মধ্যে পাঠশালা স্থাপিত হ'ল, তেমনি শিক্ষয়িত্রী বিস্তালয়ে বয়স্কা মহিলাদেরও ছাত্রীরূপে গ্রহণ করা হ'ল। তখন উদ্দেশ্য ছিল, মহিলাদের ইংরেজি, বাংলা, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, বিজ্ঞান, বিশেষতঃ মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি যাবতীয় শিক্ষণীয় বিষয় শিখিয়ে তাদেরকে যেমন শিক্ষিত করে তোলা, তেমনি বালিকা-বিস্তালয়গুলির জন্য তাদের শিক্ষয়িত্রী হবার উপযুক্ত করা। যে কারণে সরকারী বিস্তালয়টি উঠে গিয়েছিল, কেশবচন্দ্র এইরূপে সেই কারণটি নিরাকৃত করেন।

ভারত-আশ্রম

ভারত-আশ্রমের উল্লেখ তো আমরা এইমাত্র পেলাম। এ একটি অভিনব যৌথ-পরিবার। আজকাল আমরা, 'কমিউনিটি প্রজেক্ট' 'কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট' ইত্যাদি কত কথাই না শুনি, কিন্তু কিরূপে এই সমাজ-উন্নয়ন কার্য্য সুসম্পন্ন হতে পারে তা কি আমরা ভেবে দেখেছি? কেশবচন্দ্র ভারত-আশ্রমের মাধ্যমে এই সমাজ-উন্নয়ন কার্য্য সুরু করে দিয়েছিলেন। পূর্ব্বেই বলেছি ভারত-আশ্রম গঠিত হয়েছিল কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুবর্ত্তী কয়েকটি ব্রাহ্ম পরিবারকে নিয়ে। পরে অবশ্য আরও অনেকে নিজ নিজ স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাগণকে এখানে বসবাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। কোন কোন বিধবা ছেলেমেয়েদের নিয়েও এখানে আশ্রয় পান। ভারত-আশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহ হ'ত একটি সুন্দর উপায়ে। প্রত্যেকটি পরিবারের কর্ত্তাকে —নিজ নিজ মাসিক বা সাময়িক যা কিছু আয়—সবই আশ্রমের ভাণ্ডারে জমা দিতে হতো। এই ভাণ্ডার থেকে তাঁদের আহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, পুস্তকাদি ক্রয়, সন্তানদের লালন-পালন ও বিস্তাশিক্ষা সবরকম ব্যয়ই সঙ্কুলানের ব্যবস্থা হয়। আশ্রমবাসী পুরুষেরা এরূপে পরিবার-প্রতিপালনের ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্ত হয়ে ভারত-সংস্কার সভার বিবিধ সমাজ-হিতকর উন্নয়ন কার্য্যে আত্মনিয়োগ করবার সুযোগ এবং অবসর যথেষ্টই পেতেন। এইরূপ সমবণ্টন-নীতির ভিত্তিতে একটি সমাজ গড়ে তোলার অগ্রদূত হিসাবে ভারত-আশ্রমকে আমরা স্মরণ না করে পারি না। গাত্রোত্থান থেকে শয্যাগ্রহণ পর্য্যন্ত দিবারাত্র সমস্ত সময়টুকুই আশ্রমের নরনারী শিশু সকলকে একটি নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে থেকে দৈনন্দিন কার্য্য সম্পন্ন করতে হতো। এ যুগে সাম্যবাদ তথা সম-অর্থবণ্টন-প্রথার কথা তো অনেক শুনি, একে কার্য্যকর রূপ দেওয়ার চেষ্টা চলছে কোন কোন দেশে। কেশবচন্দ্রই দিব্যদৃষ্টিতে দেশ ও সমাজের কল্যাণকর এই সমবণ্টন-নীতিকে একটি

আশ্রমের ভিতর দিয়ে রূপদানে যত্নপর হয়েছিলেন। তাঁকে আমরা বাররার নমস্কার করি।

স্ত্রী-শিক্ষা কোন পথে?

একটু আগে কেশব-প্রতিষ্ঠিত শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় ও বালিকাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার কথা তোমাদের বলেছি। শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় পাঁচ বৎসর বেশ ভাল ভাবেই চলেছিল কিন্তু পরে এটি উঠে যায়। কেন উঠে গেল, তার কারণ বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন নেই। শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ে বয়স্থা ছাত্রীগণ বামাহিতৈষিণী সভা নামে একটি সভা স্থাপন করেছিলেন। আশ্রম-বাসিনী এবং আশ্রমের বাইরের বহু মহিলা এই সভার অধিবেশনে এসে যোগ দিতেন। কেশবচন্দ্র ছিলেন সভার সভাপতি। মধ্যে মধ্যে ছাত্রীদের প্রবন্ধপাঠ হতো। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং আরও অনেকে এখানে বক্তৃতা দিতেন। কেশবচন্দ্রের ভাষণ আমরা কিছু কিছু উদ্ধার করেছি। তাতে স্ত্রী-শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর কতকগুলি মৌলিক মতামত বিধৃত রয়েছে। তিনি মনে করতেন, নারী ও পুরুষের প্রকৃতিগত ভেদ-বৈষম্যের প্রতি দৃষ্টি রেখেই স্ত্রী-শিক্ষার নিমিত্ত কতকটা স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। পরিবারের 'সম্রাজ্ঞী' নারীরা। পরিবার ও সমাজ-সংরক্ষণ তথা পারিবারিক ও সামাজিক সংযম, শৃঙ্খলারক্ষার ভার নারীদেরই উপর। কেশবচন্দ্র প্রকৃতি-ভেদে শিক্ষাব্যবস্থার স্বতন্ত্র আয়োজন করতে গিয়ে এই কথাগুলির উপর বিশেষভাবে জোর দিয়ে-ছিলেন। একটি ভাষণে তিনি বলেন যে, নারীদের সুকন্যা, সুগৃহিণী এবং সুমাতা হ'বার সবরকম আয়োজনই থাকবে স্ত্রী-শিক্ষার মধ্যে। বর্ত্তমানে ভারতরাষ্ট্রের সংবিধানে পুরুষের মত নারীরও সমান অধিকার স্বীকৃত হয়েছে, কাজেই আমি এখানে সুকন্যা, সুগৃহিণী এবং সুমাতার সঙ্গে 'সুনাগরিক' কথাটিও যোগ করে দিচ্ছি। স্ত্রী-শিক্ষা এইভাবে যুগোপযোগী করে নিলেই কেশবচন্দ্রের মৌলিক প্রযত্নগুলির প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা জানান হবে।

বেথুন স্কুলের ছাত্রীগণ যখন পুরুষের মতই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার অধিকারী হলেন তখন কেশবচন্দ্রের মতানুবর্ত্তীরা এর প্রতিবাদ না করে পারেন নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় কি পরীক্ষা ব্যবস্থায়, নারী ও পুরুষের প্রকৃতিগত ভেদ-বৈষম্যের প্রতি কখন লক্ষ্য রাখা হয় নি। এর জন্য স্ত্রী-শিক্ষা সমাজের যথোচিত উপকারে আসবে না এই ছিল কেশব-পন্থীদের অভিমত। কেশবচন্দ্র পূর্ব্বাপর স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে নিরতিশয় যত্নবান ছিলেন। তিনি শিক্ষার এবম্বিধ সমীকরণে সমাজের অকল্যাণ সম্ভাবনা লক্ষ্য করে ভিক্টোরিয়া কলেজ নামক একটি নূতন ধরনের উচ্চ শিক্ষায়তনের পরিকল্পনা করেছিলেন। এ কলেজের শিক্ষাদান-পদ্ধতি সম্বন্ধে এখানে বিশেষ আলোচনার অবকাশ নেই। নানারূপ চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে এই অভিনব শিক্ষায়তনটি বর্ত্তমান ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশনের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

কেশবচন্দ্রের জীবন স্বল্পকাল স্থায়ী হলেও বিবিধ এবং বিচিত্র ঘটনার সমাবেশে পূর্ণ। এ সব কথা লিপিবদ্ধ করলে এক বিরাট 'মহাভারত' হতে পারে। "মহা-ভারতের কথা অমৃত সমান"—কেশবচন্দ্রের জীবন-কথাও অমৃত তুল্য। যাঁরা তাঁর কথা শোনেন তাঁরা পুণ্যবান নিঃসন্দেহ। কিন্তু আজকার দিনে সে কাশীরাম দাস কোথায়? যিনি সুললিত ছন্দে এই 'মহাভারত' কাহিনী গৌড়জনকে পরিবেশন করবেন!*

*বিগত ১৮ই নবেম্বর, ১৯৬০ তারিখে ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশনে অনুষ্ঠিত কেশবচন্দ্রের জন্মোৎসব সভায় প্রদত্ত ভাষণের মর্ম্ম।

হায়েনা
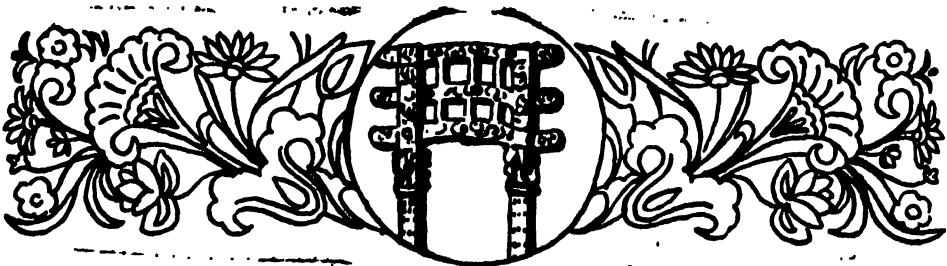
শ্রীসন্ধ্যা রায়

ঘরের চারদিকটা ভাল করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন ভবশঙ্কর। কেমন যেন নতুন দৃষ্টিতে। তিরিশ বছর একটানা এ বাসাতে আছেন ভবশঙ্কর। এ বাসা থেকেই বিয়ে হয়েছে তাঁর। এই পালঙ্কেই ফুলশয্যা রচিত হয়েছিলো ওভারম্যান-ইন্‌চার্জ্জ ভবশঙ্কর রায়ের। খাদের ছোট সাহেব ভবশঙ্কর। কলিয়ারীর হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা ভবশঙ্কর। লেবারেরা বলতো মালিকবাবু। বেশ শুনতে লাগতো কথাগুলো। ছোট সাহেব! মালিকবাবু! মনে মনে কথাগুলো আওড়ান ভবশঙ্কর। কথাগুলোর মধ্যে একটা যেন কেমন নেশার আমেজ। বড় সাহেব ভালবাসতেন ভবশঙ্করকে। কাজ-পাগলা ভবকে।

একবার তিনি সখ করে ডিস্টেম্পার লাগিয়েছিলেন এই ঘরটায়। ক্রিম-কলার ডিস্টেম্পার। চমৎকার মানিয়েছিলো ঘরটা। ছেলেমেয়েরা দেখে খুব খুশী হয়েছিলো। সাবিত্রীও বলেছিলো: 'সুন্দর মানিয়েছে কিন্তু'। সেটাও আজ প্রায় সাত বছর আগের কথা। তখন শক্তসমর্থ মানুষ ভবশঙ্কর। শালগাছের মতো দীর্ঘ ঋজু আর মজবুত তাঁর দেহ। এক্সিডেণ্ট হয় নি তখনও। এমন ভাবে শয্যা নেননি ভবশঙ্কর।

একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস বেরিয়ে আসে ভবশঙ্করের বুক চিরে। তাঁর কল্পনা, তাঁর সুখস্বপ্ন সব রঙিন গ্যাস-ভরা বেলুনের মতো উবে গেলো ফুস্ করে। এক্সিডেণ্টে কেবল ভবশঙ্করই বিকল হলেন না—বিকল হয়ে গেলো ছেলেমেয়ে, স্ত্রী সব ক'জনই। জমে বরফ হয়ে গেলো সারাটা সংসার। আচম্‌কা মূক হয়ে গেলো যেন মালিকবাবুর কোয়ার্টার। নাটক শেষ হবার পর ফাঁকা আসরের মতো একটা যেন বিরাট্ শূন্যতা।

দেওয়ালের ডিস্টেম্পার ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। নীচের চুণের সাদা পচোরা উঁকি মারছে এখানে সেখানে। দাঁত বের করে করে ভেংচি কাটছে যেন এক্স-ছোট সাহেব ভবশঙ্করকে। ডিস্টেম্পার দিয়ে চুণকে ঢাকা দেওয়ার মতো সাবিত্রীর যেন সভ্যতার মুখোশে ঢাকতে চাইছে সংসারের ত্রুটি-বিচ্যুতি—পতন। কিন্তু হায়!

উপরের আচ্চাঁঙের দিকে তাকান ভবশঙ্কর। গোল ভাবে ঢালাই করা ছাদ। ভেন্টিলেটারের মধ্যের লাল ইঁটগুলো দেখা যাচ্ছে। চুণের পচোরা পড়েনি ওখানটায়। খাঁটি ইঁট। কোনো আচ্ছাদন নেই, কোনো পচোরা নেই, নেই কোনো কৃত্রিমতা। কৃত্রিম প্রলেপে নিজের নগ্নরূপ ঢাকবার প্রয়াস নেই তার বর্ত্তমান হুজুকে সভ্য সমাজের মতো। মধ্যবিত্তের পাকা গৃহিণীর মতো।

ভেন্টিলেটারের মধ্যে একটা টিকটিকির লেজের শেষ-প্রান্ত দেখা যাচ্ছে। সুতার মতো সরু লেজ। লেজটা নড়ছে একটু একটু। দেওয়ালে বার্মাশেলের একটা পুরানো ক্যালেণ্ডার ঝুলছে। কিরাতার্জ্জুনের ফটো। দু'টো তীর-বিদ্ধ একটা কালো জানোয়ার পড়ে আছে, কিরাতরূপী মহাদেব আর অর্জ্জুনের মাঝে। মৃত বন্য বরাহ। লাল রঙের ধারা নেমেছে জন্তুটার ক্ষতস্থান থেকে। সাদা সাদা দাঁত দু'টো চিক্‌চিক্ করছে বিজলী বাতিতে। মৃদুমন্দ বাতাসে কাঁপছে ছবিটা। অর্জ্জুনের হাতের ধনুকটাও যেন।

গীতা পাঠ করতেন ভবশঙ্কর। গীতার এক একটা শ্লোক আওড়ে যেতেন মুখে মুখে আর তার তর্জ্জমা করে শোনাতেন ছেলেমেয়েদের। স্ত্রীকেও। স্ত্রী সাবিত্রী ভালবাসতো গীতা শুনতে। অকৃত্রিম সত্যিকার ভালবাসা।

আদিনাথ, সিদ্ধার্থশঙ্কর, বিজয়া এরাও শুনতো। বাধ্য হয়েই যেন শুনতো ওরা সব। জড়-পদার্থের মতো বসে থাকতো সব মুখ গুম্‌ড়ে। ভবশঙ্কর ছোট মেয়ের নাম রেখেছিলেন গীতা। তিনি মনে মনে স্বপ্নের ক্ষীণজাল বুনেছিলেন। গীতাকে গড়ে তুলবেন নতুন ভাবে। ধর্ম্মে বাঙালী, কর্ম্মে বাঙালী, শিক্ষা-দীক্ষায়, শৌর্য্যে, বীর্য্যে বাঙালী। হেঁ, লোকে বলবে ভবশঙ্কর রায়ের মেয়ে। মেয়ের মতো মেয়ে। আদিনাথ, সিদ্ধার্থশঙ্কর, বিজয়া ওগুলো সব বুড়ো পাখী। পোষ মানবে না আর। বুলীও শিখবে না। শিব গড়তে বানর হয়েছে ওগুলো। ওদের কথা ভাবতে গিয়ে দুঃখ হয় ভবশঙ্করের। কোথায় কল্পনা আর কোথায় বাস্তব? রূঢ় বাস্তব!

গীতা পড়ছিলেন ভবশঙ্কর। পাশে বসে শুনছিলো গীতা আর সাবিত্রী। তের বছরের মেয়ে গীতা।

"ন চ শক্লোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব।

অর্জ্জুন বলছেন হে কৃষ্ণ, হে পতিত পাবন, হে কেশব, আমি আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারছি না। আমার মন ভীষণ চঞ্চল আর আমি যেন অমঙ্গলের সব চিহ্ন দেখছি।"

আচম্‌কা চম্‌কে উঠলেন ভবশঙ্কর। গাঁ গাঁ একটানা বেজে চলেছে সাইরেন। বিপদ-সঙ্কেত। কোনো অঘটন ঘটেছে খাদে। তিন নম্বর পিটের সাইরেন।

গীতা পাঠ অসমাপ্ত রেখেই উঠে পড়তে হোলো ভবশঙ্করকে। তিন-চার শ' লোক সেকেণ্ড শিফটে কাজ করছে খাদে। তা'দের 'জান' তাদের সেফটি ভবশঙ্করের হাতে। গ্যাস-খাদ।

এক্সপ্লোশান হয়েছে তিন নম্বর পিটে। বড সাহেব আগেই নেমে পড়েছে খাদে। লেবার অনেক উঠে পড়েছে আগেভাগেই। কিছু লোকের পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না এখনও। ভিড় জমেছে চাণকের মুখে। জুটেছে সবাই আপনজনের সন্ধানে। উদাস দৃষ্টি! থমথমে আবহাওয়া। গাঙ্গিয়ে-গাঙ্গিয়ে সাইরেনের একটানা চীৎকার থেমে গেছে।

কেজে গিয়ে ঢুকলেন ভবশঙ্কর। ব্যাঙ্কস্‌ম্যান সেলাম ঠুকলে মিলিটারী কায়দায়। খাদের কানুন-মাফিক তিনটা ঘণ্টি বাজালে। অনসেটারের জবাব এলো খাদ থেকে ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং। তিন-ঘণ্টির জবাব। ব্যাঙ্কস্‌ম্যান আবার একটা ঘণ্টি বাজায় ক্রিং। আবার জবাব আসে অন্‌-সেটারের ক্রিং। কেজের ফেলসিং ঠিক করে দেয় ব্যাঙ্কস্‌-ম্যান। ওয়াইণ্ডার খালাসীর রুমে বেজে ওঠে ঘণ্টি ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং। ঘটাং-ঘটাং-ঘট। বিরাট একটা আওয়াজ করে চালু হলো ঘাট-ঘোড়া ওয়াইণ্ডার-ইঞ্জিন। ডুলি সোজা নামতে লাগলো নীচে। সাতশ' বিশ ফুট নীচে।

আবার একটা এক্সপ্লোশান হলো। থরথরিয়ে কেঁপে উঠলো সারাটা খাদ। তার পর···তার পর আর কি হলো কিছুই জানেন না ভবশঙ্কর। যখন জ্ঞান ফিরলো তখন তিনি হাসপাতালের বেডে। কোমরে আর পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা। কোমরে যেন কেউ পাহাড় চাপিয়ে দিয়েছে একটা। নড়বার-চড়বার ক্ষমতা নেই কোনো। কোমর পা সব সাদা প্লাষ্টারে মোড়া।

হাসপাতালের ভিজিটিং আওয়ার সম্ভবতঃ। প্রত্যেকটি বেডের পাশেই প্রায় লোক। ভিজিটার্স সব। ভব-শঙ্করেরও অনেক লোক। সাবিত্রী, ছেলেমেয়েরা, কলিয়ারীর লেবার, ষ্টাফ। সবারই মুখ কেমন থমথমে। কেমন যেন ফ্যাকাশে। রক্তহীন। নার্সদের এ্যপ্রনের মতো সাদা।

ভবশঙ্করের মাথায়-কপালে হাত বুলিয়ে দেয় সাবিত্রী। চোখের অবাধ্য জল গোপন করে হেসে সান্ত্বনা দেয় ভবশঙ্করকে। বলে: 'ভাল হয়ে যাবে ভাবনা কি?' ডাক্তারের কাছে জানতে পারেন ভবশঙ্কর, কেসটা কমপ্রেশান মাইলাইটিস উইল এ ফ্রাকচার অফ দি লেগস। স্পাইন্যেল কর্ডটা ছিঁড়ে গেছে। জটিল কেস। তবু ভবশঙ্করকে এনকারেজ করেন ডাক্তার। তাঁদের ধর্ম্মই এনকারেজ করা। ডিসকারেজ তাঁরা বড় একটা করেন না। মৃত্যুপথযাত্রীকেও তাঁরা শোনান আশার বাণী। 'ভয় কি ভাল হবেন।'

এক বছর পরে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন ভবশঙ্কর। পঙ্গু পক্ষাঘাতগ্রস্ত ভবশঙ্কর। যাঁরা একদিন এনকারেজ করেছিলেন তাঁরাই বললেন, এ রোগ ভাল হবার নয়। ট্রেচার আর এম্বুলেন্সে করে আবার বাসায় ফিরে এলেন ভবশঙ্কর। কলিয়ারীর ছোট সাহেব ভবশঙ্কর। সেই থেকেই বিছানা নিয়েছেন তিনি। অসাড় হয়ে গেছে কোমর আর পা দুটো। সম্পূর্ণ পঙ্গু। মাজা-ভাঙা একটা জানোয়ারের মতো বিছানায় পড়ে আছেন তিনি।

খাদের সে এক্সিডেন্টে ক'জনের জীবন্ত-সমাধি হয়ে-ছিলো। খাদের মুখ সিমেণ্ট দিয়ে সিল্ড করেছিলো কোম্পানী খাদকে বাঁচাতে। আর ভবশঙ্করেরও জীবন্ত-সমাধি হোলো সেই এক্সিডেন্টে। বেঁচে থেকেও আজ মৃত ভবশঙ্কর। সাইক্লোনে মূলোৎপাটিত একটা বিরাট মহীরুহের মতো তিনি পড়ে আছেন। গাছেও বরং কাজ হয়, আসবাব হয়, জ্বালানি হয়, কিন্তু তিনি তো সম্পূর্ণ অকেজো। পায়া-ভাঙা পুরানো ফার্নিচারের মতো অকেজো—বিকল।

অন্ধকার হয়ে এসেছে ঘরটা। উপরের ভেন্টিলেটারটা আর ভাল দেখা যাচ্ছে না। টিকটিকির লেজটাও না। বাইরের পেয়ারা গাছের ডগার পাতাগুলো একটু একটু কাঁপছে। অশ্বত্থের পাতাগুলো সব ঝরে পড়েছে একে একে। রুক্ষ আর কুৎসিত মূর্ত্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গাছটা—সাবিত্রীর মতোই। রুক্ষ আর কুৎসিত অশ্বত্থ ক'দিন পরেই আবার কচি পাতায় ভরে উঠবে, আবার সাজবে অভিসারিকার সাজে। কিন্তু তার সাবিত্রী?

বাইরের একফালি কালো আকাশ দেখা যাচ্ছে। মিশমিশে কালো। ভবশঙ্করের ভবিষ্যতের মতোই কালো আর অন্ধকার।

ঘরে ঢুকে সুইচ অন করে দেয় সাবিত্রী। টিক করে একটা আওয়াজ উঠে সুইচে। ঘরের মধ্যের বড়

পাওয়ারের বাতিটা জ্বলে উঠে। ঘরের জমাট-বাঁধা অন্ধকার যেন খোলা জানালাটা দিয়ে পালিয়ে যায় ভয়ে —কিংবা মুখ লুকায় স্থবির ভবশঙ্করের পালঙ্কের নীচে— যেমন ভাবে লুকিয়ে ছিলেন রাঙা বৌদি আর বিজুর মা তাদের ফুলশয্যার দিন। ওঃ, কি দুষ্টু ছিলেন রাঙা বৌদি।

সেই ফুলশয্যার সাবিত্রী আর আজকের এই সাবিত্রী? সাবিত্রীর অস্থি-সার শরীরের দিকে আজ ভাল করে তাকাতেও পারেন না ভবশঙ্কর। কষ্ট হয়। বেচারী!

বাতি জ্বালিয়ে ধীরে ধীরে বাইরে যায় সাবিত্রী। ভবশঙ্কর এবার তাকান দেওয়ালের মেন সুইচটার দিকে। পাঁচ-সাতটা লাইনের তার এসে জমেছে মেন সুইচটার পাশে। কোনো সামঞ্জস্য নেই, কোনো শৃঙ্খলা নেই, ওগুলোর মধ্যে যেন। কেমন এবড়ো-খেবড়ো সব। বিশৃঙ্খল ভাব একটা। নাড়িভুঁড়ির মতো স্তূপীকৃত। এতদিন এখানে বাস করেও এ জিনিসটা লক্ষ্যই করেননি তিনি। আজ হঠাৎই যেন আবিষ্কার করলেন এটা।

কেবল বিজলীর তার নয় সংসারের সবকিছু বিশৃঙ্খলাই যেন মিছিল করে তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে আজ। সবাই যেন স্লোগান দিচ্ছে হাত উঁচিয়ে আর ফেষ্টুন দেখিয়ে। খাদের মুন্সী আদিনাথ এক্সেস রেজিং দিতে গিয়ে ধরা পড়েছে হাতে নাতে। চার্জ্জশীট হয়েছে তাই। সাসপেণ্ডও হবে হয়তো। সিদ্ধার্থশঙ্কর বার দুয়েক স্কুল ফাইনেল দিয়ে ফেল করে এখন বেকার বসে আছে। কলিয়ারীর বখাটে ছেলেগুলোর সঙ্গে আড্ডা দেয় আর বিড়ি ফুঁকে বিড়ি টেনে টেনে ঠোঁট দুটো কালো করেছে। বিজয়া ক্রেচে কাজ নিয়েছে কি একটা পাস করে যেন। নানান লোকে নানান কথা বলে ওকে নিয়ে। গায়ে পাঁক মেখেছে মেয়েটা। ও পাঁক থেকে বাইরে আসবার সাধ্যি ওর নেই। ইচ্ছাও নেই হয়তো। গীতাও গেছে। বয়ে গেছে। কুড়ি বছরের কুমারী মেয়ে অবাঙ্গালী সেবার অফিসারের বাংলোয় আড্ডা দেয়—রাত কাটায়। চোখের কোলে কালি পড়েছে তার। ভবশঙ্করের চোখের সামনে আসতে ভয় পায় ছেলেমেয়েরা। ইঞ্জিনের সার্চ্চ লাইটের পাওয়ার ভবশঙ্করের চোখে। শরীরের অংশ মৃত বলেই কি অন্য অংশ এত জাগ্রত?

স্থবির ভবশঙ্করের কাছে অভিযোগ করে সাবিত্রী। কাঁদে। বোবা কান্না।

টিকটিকিটা নেমে এসেছে ভেন্টিলেটার থেকে। দেওয়ালের উপর ঘুরছে। বাতিটার কাছে দেওয়ালে একটা কালো পোকা এসে বসেছে। টিকটিকিটা দূর থেকে একদৃষ্টে দেখছে পোকাটাকে। বিজলী বাতির আলোতে টিকটিকির কালো কালো চোখের গোলক দুটো জ্বলছে চিকচিক করে। এগুচ্ছে টিকটিকিটা। বুকের উপর ভর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে পোকাটার দিকে। পোকাটা কিন্তু একটুও নড়ছে না। যেন জমে গেছে পোকাটা। আর একটা বুকডন টানলে টিকটিকিটা। পোকাটা এবারে প্রায় আয়ত্তের মধ্যেই এসে পড়েছে। আর এক কদম। পোকাটা কি ভবশঙ্করের মতো পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়েছে না কি? কমপ্রেশান মাইলাইটিস?

ঘেমে প্রায় নেয়ে উঠেছেন ভবশঙ্কর। বেশ জোরে শ্বাস টানছেন তিনি। তাড়াতাড়ি। বুকের হাড়ের ফ্রেমটা উঠছে নামছে কামারের বুড়ো হাপরের মতো। বুকে যেন একটা কেমন ব্যথা। আলোর কাছে আসায় টিকটিকির চোখ দুটো আরও বেশী জ্বলছে। গায়ের কালো কালো ছাপ-ছোপগুলোও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। জ্বলছে ছাপ-ছোপগুলোও। হায়েনার মতো। নিজের সমস্ত সত্তা ক্রমশঃই যেন একটু একটু করে হারিয়ে ফেলেন ভবশঙ্কর। পক্ষাঘাতগ্রস্ত কালো পোকাটা যেন ভবশঙ্কর আর টিকটিকিটা একটা হিংস্র হায়েনা। ছোট জিভটা বের করে কালো পোকাটাকে টেনে নিলে টিকটিকিটা। তার পর মুখের এ পাশ ও পাশ করলে একবার। আঃ! চীৎকার করে উঠল ভবশঙ্কর! তার পর···

তার পর স্বামীর চীৎকার শুনে ছুটে আসে সাবিত্রী। কিন্তু তার আগেই বিছানায় এলিয়ে পড়েছেন ভবশঙ্কর।

"শেষের কবিতা"র নামকরণ

অধ্যাপক শ্রীশ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

অমিত লাবণ্যকে জানিয়েছিল তার শেষ কথা, রাস্তার শেষে এসে, যাত্রা শেষ করে, একটি শেষ মুহূর্তকে অবলম্বন করে কবিতা রচনার পর :—

"আর-কোনো কথার ভার সইবে না। হতভাগা নিবারণ চক্রবর্তীটা যেদিন ধরা পড়েছে সেই দিন মরেছে, অতি সৌখিন জলচর মাছের মতো, তাই উপায় না দেখে তোমারই কবির উপর ভার দিলুম আমার শেষ কথাটা তোমাকে জানাবার জন্যে।"

অমিত-র কবিতার উত্তরে লাবণ্য একটি কবিতা লিখে পাঠাল। এই কবিতাটি দিয়ে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি সাধন করা হয়েছে। সেই দিক থেকে এই কবিতাটিকে উপন্যাসটির শেষের কবিতা বলা যেতে পারে। কিন্তু এ হ'ল নিতান্ত বাইরের কথা।

লাবণ্য আর অমিত-র মধ্যে অনেক দিন থেকে অনেক কবিতার আদান-প্রদান চলেছে। সেই কবিতারাশির মধ্যে লাবণ্যের এই কবিতাটিই শেষ কবিতা; এই কবিতাই সম্ভবত উভয়ের মিলিত কাব্যচর্চার শেষ নিদর্শন। এর পর লাবণ্য শোভনলালের গৃহিণীপদে অধিষ্ঠিতা হয়ে আপনাকে বলি দিতে চায় বলেই অমিত-র মতো রোমান্সের পরমহংসের সঙ্গে কাব্য-বিলাস রচনা করা তার পক্ষে আর সম্ভবপর না হতে পারে। প্রেমিক-যুগলের শেষ কবিতা বলেই শেষের কবিতা নামটি গৃহীত হয়ে থাকতেও পারে। কিন্তু এই ব্যাখ্যাও "মনে নাহি লয়"।

উপন্যাসটি সতেরটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত; শেষ পরিচ্ছেদের শিরোনামা, "শেষের কবিতা"। এই পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ অমিত-র নিজের মুখে তার রোমান্স-লোভী চঞ্চল প্রকৃতির স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। এ হেন ব্যক্তিকে লাবণ্য যে কতখানি চিনতে পেরেছিল এবং চিনতে পেরেছিল বলেই তাকে স্বামীরূপে গ্রহণ করতে কুণ্ঠা অনুভব করে শোভনলালকে জীবনসঙ্গী হিসেবে বরণ করল, সেই কথা জানাবার জন্যে রবীন্দ্রনাথ লাবণ্য-বিরচিত কবিতাটির সাহায্য গ্রহণ করেছেন। এই কবিতাটিতে দেখা যাচ্ছে, লাবণ্য অমিতকে যতটা বুঝতে পেরেছে, ততটা হয় ত অমিত নিজেও পারে নি, অমিতর-স্বরূপ ঠিক ভাবে বোঝার পর সে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তা এক দিক থেকে যেমন নারীসুলভ প্রখর ও তীব্র বাস্তববোধসম্পন্ন, অন্য দিকে তেমনি রোমান্সের পরমহংস অমিত-র যতিশঙ্করের কাছে প্রদত্ত আত্মবিশ্লেষণের সঙ্গে সুসমঞ্জস, যার ফলে অমিত নিজেও লাবণ্যের সিদ্ধান্তে যুক্তির দিক থেকে কোনও আপত্তি করতে পারবে না। এই ভাবে, এই কবিতাটির দ্বারা লাবণ্য-অমিত সম্পর্কের মর্মকথা চূড়ান্ত ভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ এদের সম্বন্ধে যা বলতে চেয়েছেন সেই রোমান্স ও বাস্তবের সমন্বয়তত্ত্বটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এক কথায় এর পর আর কিছু বলার থাকে না। সুতরাং এই কবিতাটি শেষের কবিতা ত বটেই; তা ছাড়া, বইটির পরিণতি এর মধ্যেই সমাপ্তি লাভ করেছে বলে উপন্যাসের নামকরণ এর নামে হওয়া সঙ্গত হয়েছে।

কোন কোন সমালোচক এর চেয়ে ভালো নাম কল্পনা করেছেন: "শেষের কবিতার নাম হওয়া উচিত ছিল ক্ষণিকা" (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—আচার্য সুকুমার সেন)। কিন্তু মনে হয়, শেষের কবিতার চেয়ে সার্থক-নাম আর কিছু হতে পারে কি না, সন্দেহ। যে কবিতা বইটির শেষে রয়েছে, যা দিয়ে কাহিনীর শেষ করা হয়েছে, যা নায়ক-নায়িকার কাব্য-বিনিময়ের শেষ নিদর্শন এবং যাতে উভয়ের প্রণয়-রহস্যের মর্মকথা বিশ্লেষণ করে উভয়ের সম্বন্ধের চরম পরিণতি দেখান হয়েছে, গ্রন্থের নামকরণ তার নামে হওয়া একান্ত যুক্তিযুক্ত।

এই নামটির প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে হলে কবিতাটি বিশ্লেষণ করে তার রসাস্বাদ করতে হবে এবং অমিত-র যে শেষ কথার জবাবে এটি লেখা, তার পটভূমিকা অমিত-র আত্মবিশ্লেষণও পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

অমিত-র মতে, "কেতকীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভালো-বাসারই, কিন্তু সে যেন ঘড়ায় তোলা জল, প্রতিদিন তুলব, প্রতিদিন ব্যবহার করব। আর লাবণ্যের সঙ্গে আমার যে ভালোবাসা, সে রইল দীঘি, সে ঘরে আনবার নয়, আমার মন তাতে সাঁতার দেবে।" সুতরাং দেখা যাচ্ছে, অমিত দু'রকম ভালোবাসার অস্তিত্ব ঘোষণা করছে —একটি নিত্য ব্যবহারের সামগ্রী, সেটি লাবণ্যের ভালোবাসা নয়, কেতকীর; অপরটি আকাশের ফাঁকা রাস্তায় উপভোগের বিষয়, সেটি লাবণ্যের প্রতি

রোমান্সের পরমহংসের বিমান-বিহার। লাবণ্যের কবিতায় দেখা যায়, সে অমিতকে চিনতে পেরে অমিতের দৃষ্টিভঙ্গির সার্থক প্রয়োগ করেছে অমিত-রই প্রতি। তার বক্তব্য, অমিত-র ভালোবাসা যখন নিত্যব্যবহারের সামগ্রী নয়, তখন অমিত-র সঙ্গে তার সম্বন্ধটি হবে ভাব-বিভোর, স্মৃতিবিহ্বল, প্রতি নিমিষের সান্নিধ্য থেকে দূরে অবস্থিত :

কোনোদিন কর্মহীন পূর্ণ অবকাশে,
বসন্ত বাতাসে
অতীতের তীর হতে যে-রাত্রে বহিবে দীর্ঘশ্বাস,
ঝরা বকুলের কান্না ব্যথিবে আকাশ,
সেই ক্ষণে খুঁজে দেখো ; কিছু মোর পিছে রহিল সে
তোমার প্রাণের প্রান্তে ; বিস্মৃত প্রদোষে
হয় তো দিবে সে জ্যোতি,
হয় তো ধরিবে কভু নামহারা স্বপ্নের মূরতি।

আর শোভনলালের সঙ্গে তার সম্বন্ধ হবে প্রতিদিনের সুখ-দুঃখে ভালো-মন্দয় মেশা, আটপৌরে সহজ নিঃসঙ্কোচ ভাবের সম্বন্ধ : কারণ, শোভনলাল হচ্ছে সেই লোক :

যে আমারে দেখিবারে পায়
অসীম ক্ষমায়
ভালোমন্দ মিলায়ে সকলি।

সুতরাং এই শেষ কবিতায় অমিত ও লাবণ্যর ভাবধারার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়েছে : অমিত যা চেয়েছিল লাবণ্যর কাছে, লাবণ্য তাকে তাই দিতে চেয়েছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবজীবনের অবলম্বনরূপে খুঁজে নিয়েছে আর এক জন "পৃথিবীর মানুষ"কে :

তোমারে যা দিয়েছিনু তার
পেয়েছ নিঃশেষ অধিকার,
হেথা মোর তিলে তিলে দান,
করুণ মুহূর্তগুলি গণ্ডুষ ভরিয়া করে পান
হৃদয়-অঞ্জলি হতে মম।

এমনি করে এই কবিতায় দেখানো হয়েছে নারীর পক্ষেও পরস্পরবিরোধহীনভাবে এক সঙ্গে দুই পুরুষকে ভালোবাসা সম্ভবপর, অবশ্য দুই স্বতন্ত্র ভাবে। এই আধুনিক যুগোপযোগী মনোধর্ম রসায়িতরূপে প্রদর্শন করাই উপন্যাসখানির উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য চরম পরিণতি লাভ করেছে এই কবিতায়। অতএব এই কবিতাটিকে এবং কবিতাটির গুরুত্ব বিবেচনায় বইটিকে "শেষের কবিতা" বলা সঙ্গত হয়েছে। এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের কবিধর্ম প্রবলভাবে আর একবার আত্মপ্রকাশ করেছে। তাতে তাঁর ঔপন্যাসিকধর্ম প্রভাবিত হলেও ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি। একটি কবিতাকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভাব-ব্যঞ্জনার কাজে ব্যবহার করে তিনি উপন্যাসের নাম-করণেও কবিতার প্রভাব প্রকটিত করেছেন। অমিত যেখানে শেষ কথা বলার ভার কবির উপর ছেড়ে দিয়েছে, সেখানে ঔপন্যাসিকের তুলনায় কবির আধিপত্য প্রবলতর। ঐ শেষ কথা বলার জন্যেই লাবণ্যর কবিতার নাম হল "শেষের কবিতা"।

অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশি মহাশয়ের মতে, শেষের কবিতা-র আর একটি ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে, বই-এর ঐ নামকরণের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ বয়সের কবিতা-গুলির পক্ষ সমর্থনের এক অভিমানভরা চেষ্টা প্রকাশ করেছেন। তাঁর শেষের কবিতাগুলি যে একেবারেই কিছু নয়, সমসাময়িক যুগের কয়েক জন অর্বাচীন ও সমালোচকের এই রকম মনোভাবের একটা উত্তর দেবার প্রয়াস যেন বইটির রচনাপদ্ধতির মধ্যে দেখা যায়। যে-অমিত রবীন্দ্রনাথকে একেবারে বাতিল বলে ঘোষণা করেছিল, সেই অমিত-র পক্ষেও যে রবীন্দ্রনাথের কবিতার কিছু উপযোগিতা ছিল, এই উপন্যাসে তা প্রমাণিত হয়েছে। ঐ ব্যাপারটা দেখিয়ে রবীন্দ্রনাথ যেন বলতে চেয়েছেন, আধুনিক মনের ভাষাও তাঁর কবিতায় যখন অভিব্যক্ত হতে পারে, তখন তাঁর শেষের কবিতাগুলি একেবারে ব্যর্থ নয়। এই কবিতাসমষ্টির সম্বন্ধে একটা আহত অভিমানবোধও গ্রন্থে ঐ নাম আরোপের অন্যতম কারণ। শেষের কবিতা নামকরণের সম্ভবত এটাই শেষ তাৎপর্য।

বাসা-বদল

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

বহুদিন হ'ল আছি
এই গলি, লেনে।
ধূসর আবছা স্মৃতি—ঊর্ণজাল টেনে
একটা আভাস—ছবি মনে আসে: কৈশোর তখন—
একটেরে উঠলাম, এ-প্রান্তের মন
করেছিল দুর্নিবার দৃঢ় আকর্ষণ।
চারদিকে বস্তি মাঠ
পুরোপুরি তখনও শহর
গজায়নি, ছিল শুধু এখানে-ওখানে কাঁচা ঘর।
ট্যাক্সি-ট্রাম
আজকালকার মত উদ্দাম।

যে-ঘরটায় থাকি—তার
চারধার
শুধুই আকাশঘেরা নীল
নক্সাকাটা প্রজাপতি—
পাখার মতই ঝিলমিল।
খুঁজে পাই আমি
নানা স্বপ্ন হরিৎ-বাদামী,
পরিষ্কার হাওয়া
পরিবেশ একান্ত ঘরোয়া।

এ-বাড়ির প্রতি ঘরে ঘরে
আমারই ইচ্ছারা নড়ে চড়ে,
দেয়ালে-প্রাকারে
দীপশিখা জ্বালে চুপিসাড়ে,
নিঃসীম আকাশে
অজস্র নক্ষত্র নিয়ে আসে।
হৃদয়ের অফুরন্ত নিয়ে পাখ্‌সাট
মনে হয় এ-ভুবনে আমিই সম্রাট্‌।

তবু, হৃত রাজ্যপাট
সম্রাটের মত
আমারও অন্তিম দিন জানায় স্বাগত।

মাথার উপরে
দীর্ঘ পরোয়ানা
ঝুলছে ক্রমাগত,
কে জানত আগে
এ-বাড়ি ছাড়ার মায়া কত!

বড়দিন

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

"Hold thow thy cross before my closing eyes
Shine through the gloom,—
and point me to the skies."

আজি বড়দিন বৃহৎ বিশ্বে ঈশের পুত্র ঈশা
প্রেরিত হইল প্রসূত হইল প্রভাত হইল নিশা।
শোনো অবহিত শ্রবণে রে ভাই!
দ্বেষ হিংসার লেশ তাঁর নাই
নিখিল মানব মনের হিংসা আপন বক্ষ-শোণিত-ধারে
মানব জাতির গুণাহগারির ক্ষমার ভিক্ষা মিলিল তাঁরে।

শশি-সূর্যের জ্যোতি নীহারিকা বিশ্ব আঁধার তবু
মহাকাশ পথে ছায়া পথ বাহি এলে তুমি তাই প্রভু,—
স্নিগ্ধ তারকা অচপল ভাতি—
তমসার পারে জ্বলে ক্ষীণ বাতি
সেই তারকার ধ্রুব দুর্বার প্রভার রশ্মি নয়নে নিয়া
আসিলে গোপাল এই মেষপাল পাছে ঘুরে মরে
বিপথে গিয়া।

আজি বড়দিন রজনী দীর্ঘ সরণি দীর্ঘ লাগে—
ওগো মোর প্রিয়! আঁখির অমিয়! দাঁড়াও আঁখির আগে।
হোমানল জ্বলে তোমার হিয়ায়
আলোক সুরভি সুষমা বিলায়
বিশ্বনাথের সান্ত্বনা বাণী শোনায় বিশ্ববাসীর কানে
নিবিড় নিগূঢ় হরষ জাগায়—অমরাবতীর বারতা আনে।

আজি বড়দিন বড় শুভদিনে মহান্‌! তোমারে বরি
এই ধরণীর গর্বিত শির ধুলায় মিলায়ে ধরি।
তোমার বুকের দুঃখের দান
বক্ষ নিঙাড়ি ভরি দিল প্রাণ
তৃষাতুর তুমি, ক্ষুধাতুর তুমি, তোমারেই করি প্রবঞ্চনা
কৃপণের মত সঞ্চয় করি স্বর্ণ ত্যজিয়া ভস্মকণা।

আজি বড়দিন অঞ্জলি বাঁধি ঊর্দ্ধনয়নে চাহ
তব করপুট পূর্ণ করিবে করুণার বারিবাহ।
কেন হানাহানি মিছে কর ভাই
যিশুর মলিন মুখ পানে চাই
নিকীট করি বক্ষকুসুম তাঁহার চরণে ধরিবি নাকি?
মহামানবের মহা বলিদান সে-মহাযজ্ঞে পড়িবি ফাঁকি?

তিন সাগর

শ্রীব্রজমাধব ভট্টাচার্য

১৩

অনেক সময়ে মনে হয় দেশে দেশে ঘুরে ঘুরে খ্যাত-অখ্যাত ইমারতের গায়ে চোখ-বোলানো এক ধরনের পাগলামী। এই যে রোম দেখলাম, কাপ্রী দেখলাম, মনের জাঁক ছাড়া জানলাম বুঝলাম কতোটুকু? দেশকে জানা মাথা দিয়ে; ভালোবাসা হৃদয় দিয়ে। গঙ্গা বলতে যে ভাব মনে জাগে, তাজমহল বা রামায়ণ বা কন্যাকুমারী বা বেলুড়, কি শান্তিনিকেতন বলতে যে সব ধারণা রসের সঙ্গে মিশে আছে, সবরমতী, ওয়ার্ধা, বুড়ি বালাম, পলাশী বলতে যে ধরনের ছটফটানী মনকে ব্যাকুল করে, সেটা দেশ 'দেখা'র নয়, দেশ 'জানা'র; দেশ জানারও নয়—দেশের "মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু, মম চিত্তমনুচিত্তং তেহস্তু" না হলে তা হয় না। ওয়াটারলু, মার্ণ বা সোম্, কি বাসটীল বলতে ফরাসীর রক্তে যে দাপাদাপি সুরু হবে; স্ট্রাটফোর্ড এ্যভন্, লেক ডিষ্ট্রিক্টস্, লণ্ডন টাওয়ার কি বিগবেন্ বলতে ইংরেজের মন যেমন ছল-ছলিয়ে উঠবে, আমার তা হবে কেন? তবে কেন এ সব দেখতে যাওয়া? আমরা ক'জন ঐতিহাসিকের জ্ঞান নিয়ে বিদেশ যাই; প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে দেখি, ভাস্করের, স্থপতির শিল্পীর অনুরাগে বন্দনা আঁকি? কেবল নেশা, নেশা, নেশা, পাগলামী; টাকার ব্যয়, সময়ের ব্যয় আর ফিরে এসে নিজের দেশে সামাজিক বনেদিয়ানায় রাশভারি হবার চেষ্টা। এ ছাড়া দেশ বেড়ানোর মধ্যে যে শিক্ষা, অনুরাগ, রুচি সত্যিই আছে সে মন কৈ, সে সময় কৈ, সে আয়োজন বা প্রস্তুতি কৈ?

নতার্দেমে এসে ভিড় দেখেই মন গেলো বেঁকে। সে যে কী ভিড়! যেন ভাগাড়ে শকুনের কিলবিলি।

এমন সুন্দর একটা প্রাণবন্ত সকাল! সীনের জল চক চক করছে। দূরে ব্রীজের ওপর দীর্ঘ একটি স্থাপত্য-শিল্প মনকে মুগ্ধ করে দেয়; পারীর কেন ফ্রান্সের জাতীয় দেবী—সেণ্ট জেনেভীভের দীর্ঘ প্রস্তর মূর্তির সুঠাম সরল দীর্ঘ-কান্তি ছন্দ। ইংলণ্ডে যেমন সেণ্ট জর্জ, ফ্রান্সে তেমনি সেণ্ট জেনেভীভ। চকচকে গাছের পাতায় রোদ ঝলমল করছে। পোষা পায়রার দল ঝাঁকে ঝাঁকে রোদে সাঁতরাচ্ছে। দু' দল ছেলে পথের পাড় থেকে অন্য পাড়ে দৌড়ে দৌড়ে কি খেলা খেলছে। তাদের নিষ্কলঙ্ক কণ্ঠস্বরের প্রগলভতা রক্তের মধ্যে একটা উচ্ছৃঙ্খল আনন্দ এনে দিচ্ছে। গির্জার বাইরে শহীদ-পাথরের গায়ে দুটি মেয়ে ফুল রাখছে। এ সব দেখতে দেখতে সকালটা যেমন রমণীয় বোধ হতে লাগলো, তেমনি ঐ ভিড়ের দিকে চেয়ে মন বিগড়ে যেতে লাগলো।

দার্শনিকতা বেয়াড়া মনের জাঁতিকল। চেষ্টা করি দার্শনিকতার ধোঁয়ায় অস্পষ্ট অন্ধকারটাকে স্পষ্ট অন্ধকার করে তুলি। আমিও তো ঐ ভিড়েরই একজন। আমি এমন কে এমন ধনুকেষ্টোর বেটা লবকেষ্ট যে আমি নতার্দেম গির্জা রোববার সকালে, জুন মাসের সকালে ফাঁকা পাবো। দুর্গাষ্টমীর দিনে কালীঘাটের মন্দিরে ফাঁকা খুঁজতে যাই কেন? এ যাওয়ারই বা দরকার কি, এবং এতোশতো ধানাই-পানাইয়েরই বা দরকার কি?

"কি হলো, ভেতরে যাবে না?" গের্ঁা হাসতে হাসতে কাঁধ ছোঁয়। "বেড়ে লাগে তোমার এই হঠাৎ চিন্তায় ডুবে যাওয়া।"

আশ্চর্য রকম লজ্জিত হয়ে বলি—"কি করে বুঝলে?"

হাসে সেই মনোরম হাসি গের্ঁা যা এক গের্ঁার চোখেই খিল খিল করে। ওর সাদা সাদা চুলের বাহার রোদে খুলেছে ভালো। হাল্কা গ্রে টুইডের কোটটা পরেছে, দরকার ছিলো না—তবু পরেছে, জানে ওটাতে ওকে দেখায় ভালো।

"বুঝবো না? তোমায় দেখে কতো মেয়ে যে কতো-বার ঘাড় ফেরালো যদি দেখতে, অন্তত মানুষের বুকে না হোক কাঁধে স্প্রেন্ হবার আতঙ্কেও এখান থেকে সরতে।...ঐ দেখোনা মেয়ে দুটি তোমায় পার করে ওপারের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে তোমায় দেখছে।"

"কি এতো দেখছে হে তোমার পারীর হ্যাংলা মেয়েরা?"

"সকলেই পারীর নয় অবশ্য। কতো আমেরিকানও তোমায় দেখলো। ও মেয়ে দুটি অবশ্য পারীর। জানো না তো বরাবরই পারীতে ভারতীয় কতো কারণে কতো রকমে পপুলার। সকলেই যে বেদান্তভক্ত তা তো নয়। অবশ্য এ-কথা বলবো তোমার রূপ দেখে যে কেউ আকৃষ্ট হবে না এটা তুমি বুঝতেই পারো।"

"আশ্চর্য গুণবেদিনী তোমাদের পারিসিনী বলতে হবে গের্ঁা। চোখে দেখেই চোখে দেখার বাইরের গুণ টের পায়।"

"বাতাশারিয়া, বাতাশারিয়া। তুমি সত্যিই নিরেটই রয়ে গেলে। মাষ্টারদের কাছে বুদ্ধি আর কে কবে আশা করে। তা নয়। কিন্তু চিনিয়ে, পাকা জহুরী, জমি দেখেই হীরের কথা টের পায়। খোঁড়ার পর বিফল হলে হীরের কারবার করতে হয় না।"

হাসি আর হাসি।

সেই তালে ও আমায় নিয়ে ঢুকল নতার্দেমের সুপ্রসিদ্ধ গির্জায়, ঐতিহাসিক গির্জায়, সাহিত্যিক গির্জায়। রোববারে বিশেষ একটা কি সারমন ছিল সে দিন। বাইরেটার একটি সাময়িক জুলপিট করেছিল। ফুলে, লতায়-পাতায়, নানারকম টবের গাছ দিয়ে, লাল কাপড়, সোনার কাজ-করা ঝালর, বড় বড় বাতিদান—সব দিয়ে, সব জড়িয়ে যত সুন্দর হয়েছিল তার চেয়ে ঢের ঢের বেশী সুন্দর হয়েছিল দু'ধারে সার সার কচি কচি কিশোরী, তরুণী নান্‌দের দৌলতে। ওরা সবে ওদের সমবেত গান থামিয়েছে, আর আমরাও পৌঁছেছি। ওদের কাছাকাছি যখন গেছি ওরা তখন সেই মণ্ডপ ভেঙে ফুল গাছগুলো বহন করে নিয়ে যাচ্ছে ভেতরে।

গের্ঁা দেখাচ্ছে কাঁচের জালির কাজ। বোঝাচ্ছে যে এই কাঁচের নীল এখন আর হয় না। এই নীল কাঁচ করার শিল্প এখন নিবে গেছে। কে শুনছে ও সব! আমেরিকানদের কিলবিলে ভিড়ে দেখার চোখে বিরক্তির ধুলো উড়ছে। ও বলছে যে, সাদার্ণ টাওয়ারের ডেরোটনী ঘণ্টাটা সম্বন্ধে—ভিক্তর হুগোর কোয়াসিমোদো ঐ বেল্‌টাই নেড়েছিল কিন্তু মনে লাগছে না কথা। ভাবছি কখন বেরুব। ১১৬৩তে সপ্তম লুই আরম্ভ করে এর নির্মাণ, সেন্টলুই শেষ করে। ৯,০০০ লোক ধরে, ৮০ মীটরের স্পায়ার—ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক গুণগান। কিন্তু মন তখন নারাজ এ সব তত্ত্বকথা শোনায়। আইল্যাণ্ড দ লা সিটির সীমানা পার করে চললাম এবার পারীর বিখ্যাত লাতিন কোয়ার্টারে।

"নামবনা বিশেষ কোথাও, কিন্তু পারীর বিদ্যা, বুদ্ধি, গবেষণা, সবই এই লাতিন কোয়াটার। পারীর সমাজ, আভিজাত্য, রাজবংশ, বিদ্রোহ, রাজনীতি সব নদীর উত্তর পাড়। লাতিন কোয়াটারে দারিদ্র্য দেখবে, কৈশোর দেখবে, তারুণ্য দেখবে, তোমাদের পণ্ডিতদের আড্ডা দেখবে।"

পূর্বে অষ্টারলিজ ব্রীজ, পশ্চিমে আর্টস্ ব্রীজ, এর মধ্যে সীনের ধারে ধারে বরাবর পথ গেছে। এই পথ উত্তর-দক্ষিণে জুড়েছে বড় বড় দুটা পথ, বুলেভার্দ রাস্‌পেয়ল্ আর বুলেভার্দ মঁ পার্নেস্। উত্তর-দক্ষিণে পথ পশ্চিমে বুলেভার্দ সাঁ মীকেল, পূর্বে বুলেভার্দ সাঁ-মার্সে আর বুলেভার্দ দ হস্পিতেল্। এই ঘেরাও জায়গাটার মধ্যে কোয়ার্টার লাতিন্। এর ভেতরে বোটানিকেল গার্ডেন, ম্যুজিয়ম্, পারীর প্রসিদ্ধ মসজিদ, পাঁথিয়ন, পারীর বিশ্ববিদ্যালয় সরবোন্, সরবোন্ শাপেল্, হোটেল দ ক্লুনী—অর্থাৎ মধ্যযুগীয় শিল্প ও জীবনের ম্যুজিয়াম। পথ-ঘাটগুলি সরু সরু ঘিঞ্জি। ভিড় আছে। রবিবার তবু যথেষ্ট ভিড়। নীগাড়ে হাল্কা বয়সী ভিড়, হাল্কা বয়সী উচ্ছৃঙ্খলতা। মসজিদ বাইরে থেকে দেখে সোজা গেলাম পাঁথিয়ন। তার পর সেখান থেকে আমি কার্ডিন্যাল রিশেল্যুর গৌরব সরবোন শ্যাপেলে। কার্ডিন্যাল রিশেল্যু জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই শ্যাপেলে তার সমাধিতে তাঁর দেহের প্রতিকৃতিটি বেশ। "ধর্ম" কোলে করে আছে রিশেল্যুকে, আর "বিজ্ঞান" পায়ের কাছে বসে কাঁদছে। এর ভেতরে অন্যান্য ষ্ট্যাচুগুলোও মনীষীদের স্মারক। টমাস্ একুইনাস্, বুসে গারসঁ, পিয়েরে লম্বার্ট—আর বাগানে অগস্ত কোঁৎ এদের প্রতিমা দেখার জন্য এ গির্জায় নেমেছিলাম। নৈলে এর ঠিক উত্তরে পারীর প্রাচীনতম সৌধে এখন মধ্যযুগীয় মুজিয়ম হয়েছে। এ মুজিয়ম দেখার জন্য আর অপেক্ষা করিনি। বাড়ী ফিরে গেছি ততক্ষণ। মঁসিয়ে পুলাঁকে খুশী করে দিল গের্ঁা সেই আস্ত এক বোতল শ্যাম্পেন দিয়ে। আমরা হাঁটতে হাঁটতে চলতে লাগলাম অবজারভেটারির দিকে।

"সে কি হে অবজারভেটরিতে কি খানা মিলবে নাকি?"

"বল কি? এখানে পৃথিবীর মধ্যে সেরা যন্ত্রপাতির অনেক কলই আছে। সূর্যের গায়ের ফোস্কা দেখেও এনার্জি সংগ্রহ করতে পারবে না? মিথ্যা মায়াময় খাদ্য আর রূপে ঠাসা খাদ্যের তল্লাস করছ? সত্যিই ব্রাহ্মণ তুমি।"

আমি জানি না গের্ঁা আমার খাবার ব্যবস্থা করেছে একটি ফরাসী পরিবারে। আমার কথা ম সিয়ে বেস্‌দেভঁা আগে থেকেই জানতেন। পারীতে গের্ঁার সব চেয়ে বড় বন্ধু মঁসিয়ে বেস্‌দেভঁা। হাগের অন্যতম বিচারপতি বেস্‌দেভঁার ছেলে ইনি। যুদ্ধের সময়ে একটি চোখ যায়। সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রির দপ্তরে সেক্রেটারি। আমি আসছি শুনেই গের্ঁাকে বলে রেখেছিলেন যে, লাঞ্চের নেমন্তন্ন ওখানে খেতে হবে। গের্ঁাও সকালে মাদাম

বেস্‌দেভাকে জানিয়ে দিয়েছিল, আমায় বলে নি। ভালই লাগল যে খাঁটি ফরাসী পরিবারের সঙ্গে আলাপ হবে।

ফরাসীরা জবর ক্যাথলিক, কিন্তু পোপের বৈরাগ্য সম্বন্ধে ওরা ভারী বৈরাগী এবং রাগী ; ফরাসীরা যীশুখ্রীষ্ট ভক্ত, কিন্তু গত একশ' বছরে ওরা দশটি লড়াই লড়েছে ; ফরাসীরা মূর্তি পূজা করে না, কিন্তু ওদের চার্চে, অপেরায়, বাগানে, ঘরে ঘরে মূর্তিতে মূর্তিতে ছয়লাপ। চানের চেয়ে চানের আড়ম্বর বেশী, খাবারের চেয়ে খাওয়ার জাঁক বেশী, নাচের চেয়ে ঘুরপাক বেশী, পোশাকের চেয়ে উলঙ্গতা বেশী, কথা বলার চেয়ে না বলা বেশী, হাসি বার করার চেয়ে না বার করায় ওদের কদর বেশী। ফায়দা-হীন কায়দা, ফাইনহীন আইন, পর্দাহীন আব্রু, লাগাম-হীন গতি ওদের দেশকে য়ুরোপের মধ্যে সবচেয়ে কাম্য দেশ করে রেখেছে। ফরাসী সৈন্য হেরে যায় জিততে জিততে ; আর ইংরেজ সৈন্য জিতে যায় হারতে হারতে ; তবু ফরাসী সৈন্যের মান ইংরেজ সৈন্যের জানের চেয়ে বড়। তবু এ কথা পরম সত্য যে ফ্রান্সে, বিশেষ করে পারীতে, একবার যে গেছে আর একবার যাবার ইচ্ছে বুকে নিয়েই সে বেরুবে। কলকাতায় ঢুকলেই বেরুতে ইচ্ছে করে, লণ্ডনে ঢুকলে আর বেরুতে ইচ্ছে করে না, পারী থেকে বেরুলে ঢোকার ইচ্ছে নিয়েই বেরুতে হয়।

ইংরেজ জেনে জেনে দিল্‌-কলেজায় চড়া পড়ে গেছে ; দাঁতের ফাঁকে বালি ঢুকেছে ; ফরাসী পরিবার জানার ইচ্ছে ছিল ; গেরঁা নিয়ে এল সেই বাড়ী!

মঁসিয়ে বেস্‌দেভাঁর বাড়ীটি সুন্দর, খুব বিশাল নয়, খুব ছোট নয় ; বড় একখানা বসার ঘরের দু'পাশে দু'খানা বড় বড় শোবার ঘর ; একধারে বারান্দা পার হয়ে নাইবার ঘর, রান্না ঘর, আর বেশ সাজান একটা খাবার ঘর।

মাদাম বেস্‌দেভাঁ যে গেরঁাকে খুব প্রীতির চক্ষে দেখেন তা বোঝা যায়। এর কারণটি বড়ই সজল।

১৭

ফরাসী আর ইংরেজদের মধ্যে কারা "ভালো" এ নিয়ে অনেক রকম কথাবার্তা চালু আছে। সাধারণত, ভারতীয়েরা ভাবে ফরাসী জাতটি অনেক সভ্য। যে কোনো জাতকেই ভালো ভাবাটাই ভালো। তাই তাদের বলে রাখি যেন ফরাসীদের ইতিহাস পড়তে গিয়ে ফ্রান্সের বাইরে তাঁরা পা না বাড়ান। ইংলণ্ডে ইংরেজ বাচ্চা বেজায় রকম মাইডীয়ার মাল। ও জাতের বসুধৈব কুটুম্বিতার জুড়ি হয় না। যেই ইংরেজ বেড়াল সুয়েজ পেরুলো, সে হোলো মার্জার, আর ভারতে, ব্রহ্মে, মালায়াতে কি বোর্ণিওতে যেই সে পা রাখলো অমনি সে রয়াল বেঙ্গল টাইগার। আহা-হা, রিটায়রমেন্টের পর এই টাইগার যখন বেগার হন তাঁদের সে ঢলঢলে চামড়া দেখে মায়া হয়।

ফ্রান্সের ফ্রেঞ্চ চাচার যা কিছু বদচরিত্তির সব সৎ বনে যায় অক্ষরেখা পেরুতে না পেরুতে। ভলতের, রুশো, কোঁৎ, বার্গসঁ, রলঁ্যার ফ্রান্স, বেকন, সেকস্‌পীয়র, মিলটন্‌, হিউম, কার্লাইল, রাস্কিন, শ', ওয়েল্‌স, রাসেলের ইংলণ্ড যেন। অমন লক্ষী ছেলেটি আর হয় না। কালো-পাহাড় বইবার অমন সাদা খচ্চর আর পাবেন না। কিন্তু তা বলে পড়বেন না যেন নেদারল্যাণ্ডস-এর ইতিহাস, ইন্দোচায়নার ইতিহাস, আলজিরিয়া মরক্কোর ইতিহাস, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ জয় করায় ফ্রেঞ্চ বুকানীয়ারদের ইতিহাস ; এমনকি শ্রীমান নেপেলিয়ঁর কীর্তি ওয়েষ্ট-ইণ্ডিজ, হিস্পানিওলা-হাইতির ইতিহাস! এ গুলো না পড়ে কেবল যদি ফরাসী সাহিত্য, গান, শিল্প, পারীর অপেরা, লুক্সেমবুর্গ, ল্যুভর্‌, নানা ম্যুজিয়ম দেখা যায়, সত্যি ফরাসী দেশের মতো দোস্‌রা দেশ নেই,—ভারি বেপরোয়া, খুব মদ পাওয়া যায় ; ফরাসী জেনানার মতো জেনানা নেই, খুব সমঝদার আর উদার ; ফরাসী আদমীর মতো আদমী নেই, যেমন চোখ চাইতে জানে, তেমনি চোখ বুঁজতেও জানে ; যেমন গান শুনতে কান খাড়া করতে জানে, তেমনি মান খোয়ানোর ব্যাপারে কাণে তালা লাগাতেও একেবারে যাদুগর হুডিনী।

যুদ্ধের আগে গেরঁারা চার ভাই আর মা যে বাড়ীটায় থাকতো সে বাড়ীটি সমেত সমগ্র পরিবার এক বোমায় মাটির তলায় ঢুকে যায়। পারীর একটু বাইরে ঘটনাটি যখন ঘটে গেরঁা তখন কর্সিকায় দেশের প্রচার-বিভাগের কাজে গেছে। ওর বড়ো ভাইয়ের বিয়ে হয় যখন পারী জর্মানদের হাতে চলে যায়। মা এবং দুই ভাই বোমার পর লা-পতা হয়ে যায়।

খবর পেয়ে গেরঁা আর পারীতে ফেরে না। মাকে গেরঁা প্রাণের চেয়ে বেশী করে চাইতো। আমার সঙ্গে দেখা হবার পরেও মার কথা বলতে গিয়ে ওর চোখে বার বার জল এসেছে। ওর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে ওকে ইন্দোচায়নায় বদলি করা হয় ; সেখান থেকে ও ভারতে আসে। তার পর আমার সঙ্গে দেখা।

কর্সিকা থেকে পারী কেন গেলো না তা নয় বুঝলাম। কিন্তু ভারতবর্ষ ছেড়ে দেশে যেতে চায় না কেন জানতাম

না। গরমে ভারতবর্ষে গের্ঁার কষ্ট দেখেছি। ওর মতো উদার অন্তঃকরণের লোকের ভারতবর্ষে অর্থাভাব হওয়া খুবই সম্ভব কথা। হোতোও। অথচ পারীর ছাপাখানার কারবার তখনও ওর জবর। টাকা• আনানোর উপায় নেই।

একদিন জিজ্ঞাসাই করে ফেলি—বাড়ী তুমি যাচ্ছ না কেন গের্ঁা? ভারতবর্ষে তোমার কষ্ট হচ্চে আমি বেশ বুঝছি।"

সেদিন জানলাম আর এক করুণ কাহিনী।

"কোথায় যাবো য়োরোপে? যে য়োরোপ পর পর দু'দুটো সর্বনেশে যুদ্ধ একই শতাব্দীর পঞ্চাশ বছরের মধ্যে করলো? আর বিশ্বাস করি কি করে এই য়োরোপকে? মা নেই, ভাই নেই। চিরদিনের পরিচিত সেই বাড়ী নেই। তবু ভাবতাম যাবো দেশে। এক-জনকে ভালোবেসেছি চোদ্দ বছর ধরে। বিয়ে করছি—করবো করে করে দেরী হয়ে গেলো। যুদ্ধ এসে গেলো। তার পর পারী থেকে তাকে চুরি করে নিয়ে গেলো। কন্‌সেন্‌ট্রেশন ক্যাম্পে গেলো। খোদ বার্লিনের কাছে জর্মান কন্‌সেন্‌ট্রেশন ক্যাম্প। আশা ছিলো, তার রূপই তাকে বাঁচিয়ে রাখবে; আমার প্রেম তাকে বাঁচিয়ে রাখবে। হয় নি। যুদ্ধ শেষ হবার পর কতো খোঁজ করেছি তার। আর কোনো খবর পাইনি।"

একদিন দু'দিন নয়, গের্ঁার কাছে এ কাহিনী অনেক বার অনেকভাবে অনেক রসে শুনেছি। প্রতিবারেই সেদিনের মতো ওর মন খারাপ হয়েছে; সেদিনের মতো মদে মদে ও চুর হয়ে থেকেছে, সেদিনের মতো ও মানুষ সমাজের বাইরে চলে গেছে।

কিন্তু ও যেদিন য়োরোপ এলো সেদিন আমি হিমালয়ের এক নিভৃত কোণে। ফিরে এসে শুনি ও চলে গেছে। কেন গেলো, কিভাবে গেলো খোঁজ নিয়ে জানতে পারি যে, শেষ পর্যন্ত ও প্রেয়সীর খোঁজ নিজে করতে গেছে। পাগলের মতো যথাসর্বস্ব খরচ করে ও য়োরোপের শহরে শহরে ঘুরেছে।

শেষ অবধি এই বেস্‌দেভ্‌ঁার সঙ্গে ওর পরিচয় হয়। মাদাম বেস্‌দেভ্‌ঁা তাঁর যত্নে, মমতায় এই উদাসীন, ভৈরব, শঙ্করকে ধীরে ধীরে সুস্থ করে তোলেন।

গের্ঁা আর আগের গের্ঁা নেই। অনেক বেশী আত্মভোলা অনেক বেশী উদাসীন। ছাপাখানার সব লোক সরিয়ে দিয়ে সব কাজ একা একা করে। বলে, "লোক রেখে খাটিয়ে কাজ নেওয়া তো বানিয়াদের মনোবৃত্তি। এতোদিন তোমার সঙ্গ করে কি বৈশ্য হয়ে মরবো বলতে চাও? ব্রাহ্মণ হয়ে মরতে চাই। সাধু, বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ। নিজের পেটের মতো ধান্দা নিজেই করতে পারি। এই যথেষ্ট। আর দরকার হয় না। তা ছাড়া, মনটা বড়ো ভালো থাকে।"

কাজেই মাদাম বেস্‌দেভ্‌ঁা গের্ঁাকে প্রীতির চোখেই দেখতেন। বড়ো ছেলে কলেজে পড়ছে। মেজ ছেলে আর বড়ো মেয়ে স্কুলে পড়ছে। একেবারে ছোটো ছেলে দুটোর মধ্যে বিলকুল ছোট্টটি বছর সাত হবে। প্রাইমারী স্কুলে সবে যাচ্ছে। নাম লুলু—যেতে না যেতে ভাব করে নিলো।

মাদাম বেস্‌দেভ্‌ঁা এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে আমায় ঘরের মধ্যে নিয়ে এলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝে নিলাম যে, এ বাড়ীতে আমি অতিথির চেয়েও বেশী কিছু।

মঁসিয়ে বেস্‌দেভ্‌ঁা লম্বা সুপুরুষ। তীক্ষ্ণ নাক, মাথা-জোড়া টাক। একটি চোখ কাচের। এসেই আমায় এগিয়ে এসে ঝাঁকিয়ে দিলেন। পরক্ষণেই লুলুকে নিয়ে আদর করলেন। তার পরেই বার করলেন ভয়েস্‌ রেকর্ডার।

"ও একটা হ-বী! আমি অটোগ্রাফ নিই না। কেবল স্বর সংগ্রহ করি।"

শুনলাম অনেকের কণ্ঠস্বর। গেরা আর লুলুর ঝগড়া। মাদাম বেস্‌দেভ্‌ঁা মেয়েকে বকছেন। মঁসিয়ে বেস্‌দেভ্‌ঁা কলঘরে গান গাইছেন। সে যে কি চমৎকার সময় কেটেছিলো। চল্লিশ মিনিট সময় যেন পাখায় ভর করে কেটে গেলো।

মসিয়ে তখন সে সব বন্ধ করে. বললেন, "গল্প করা যাক্‌। জেনেভা কেমন লাগলো?"

"আপনি গিয়েছিলেন জেনেভায়?"

গের্ঁা বললো, "কনসেন্‌ট্রেশন ক্যাম্প এবং কবরের তলা ছাড়া য়োরোপের কোনও জায়গা নেই এই পারপে-চুয়াল লাট্টুটি ঘোরেন নি।"

হাসি। আমি জেনেভার গল্প করতে করতে কখন রবীন্দ্রনাথ আর গান্ধীতে এসে পড়ে প্রচুর উত্তেজনা সহকারে কথা বলে চলেছি।

হঠাৎ মাদাম এসে বললেন, "উঠুন খেতে হবে।"

মাদাম, ছেলেমেয়েরা সকলের মুখে-চোখে অদম্য হাসির বেগ।

খাবার বেশ ঝরঝরে। গের্ঁা জানতো মাশ্‌রুম সুপ আমি ভালোবাসি। সেই সুপ। তার পরে মাছভাজা—আস্ত মাছভাজার ওপর আলাদা গ্রেভী মাখিয়ে আলু আর লেটুশ দিয়ে। তার পর একটু মাংস সেদ্ধ আর

চমৎকার একটি সস্ দিয়ে বাঁধাকপি দিয়ে। শেষ একটা লেটুশ-সাসাদ-টম্যাটো-শশার ওপর জলপাই তেল আর মাষ্টার্ড দিয়ে টেবিলেই নেড়েচেড়ে দিলেন মাদাম। চমৎকার লেগেছিলো খেতে।

"বোঝো, এতো ভালো ভালো রান্না থাকতে কাল রাতে বামুনের পো পিণ্ডি পড়ে মারা গেসলাম আর কি! ভাগ্যিস্ কালোবাবুকে পেয়ে গিয়েছিলাম!"

গের্ঁাকে গল্প বলেছিলাম। সে গল্প ও শোনায় সকলকে। সবাই হেসে হেসে কাহিল।

মাদাম আনারস আর রাস্পবেরীর সঙ্গে জবরদস্ত এক এক পাত্র ক্রীম এনে দিলেন। সেটা শেষ করতে করতেই শুনি—

ও ঘরে আমি আর গের্ঁা মহা কলরবে জেনেভা নিয়ে আলোচনা করছি !!!

সে যে কি এক অনুভূতি! আমারই গলা, আমারই অসতর্ক মুহূর্তে বলা ভাষা, বাচনভঙ্গি, গলার খ্যাক্ খ্যাক্ শব্দ, বাঙখাঁই থেকে ন্যাকামী পর্যন্ত সব পর্দা আবার শুনতে পাচ্ছি।

সত্যিই পরম উপভোগ্য হয়েছিলো এ রসিকতা।

বেস্‌দেভঁা বললো, "ছেলেমেয়েদের সংসারে রেকর্ডিং মেশিন থাকায় নানা সময়ে নানা কৌতুক হয়। আমাদের এ যেন একটি বন্ধু হয়ে গেছে।"

গের্ঁা বললো, "এবার সত্যি সত্যি রেকর্ডিং করা যাক। বলো তো আমার প্রিয় সেই শ্লোকটা নৃণাং একো গম্যঃ—"

ইতস্ততঃ না করেই মহিম্ন থেকে গের্ঁার অতি প্রিয় সেই চারটি পংক্তি আবৃত্তি করলাম। ওরা তার ইংরেজী অনুবাদটাও করিয়ে ছাড়লো।

তার পর গান।

মাদাম বেস্‌দেভঁার দু'খানা গান শুনলাম। একখানায় এতো ছায়ানটের ছোঁয়া পেলাম যে, আমিও মেতে উঠলাম। ছায়ানটের মৌতাতে গেয়ে উঠি "আমারে তুমি অশেষ করেছো"। গীতাঞ্জলি থেকে গের্ঁা এটা মুখস্থ করেছিলো। ইংরেজী গীতাঞ্জলির প্রথম গানই এটা। ও ইংরেজীটা আবৃত্তি করলো।

দুপুর গড়িয়ে আসছে।

বেস্‌দেভঁা বাচ্চাদের নিয়ে তার বিরাট্ গাড়ী বার করেছে "চলো ল্যুভরে চলি—" প্রস্তাব করলো গের্ঁা।

বেস্‌দেভঁা সপরিবার আমাদের সঙ্গে লুভরে চললেন।

পথে কেবল রবিবার মধ্যাহ্নের পারীর ফুটপাথ-কামড়ানো জনতা। বুলেভার্দ রাস্‌পাইল, বুলেভার্দ সাঁজারমাঁ দুটোরই ফুটপাথে নানা রঙের ঝালর ঝুলছে, মাঝে মাঝে ছাত' লাগানো আছে রঙীন। অপরিণত বয়সীদের মধ্যে গোঁফ ও দাড়ির বৈচিত্র্য বেশ উপভোগ্য; তেমনি মেয়েদের চুল কাটা ও চুল বাঁধার বাহারের সঙ্গে বেশভূষার মধ্যে অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলাও লক্ষ্যণীয়।

ল্যুভর বলতে যে প্রাসাদ আসলে তার জ্যামিতিক আরম্ভ আর্ক-দ্য-এ্যয়স্ফ থেকে। নয়া দিল্লীর রাষ্ট্রপতি ভবনের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা জানেন রাষ্ট্রপতি ভবনের সৌন্দর্য ইণ্ডিয়া গেট থেকে আরম্ভ হয়। ইণ্ডিয়া গেট, তার দু'ধারের ফোয়ারা, সেণ্ট্রাল ভিস্তার বিরাট্ মাঠ, গ্রাণ্ডপ্লেস আর সেণ্ট্রাল ভিস্তার মধ্যেকার সংযোগ, লম্বা সরল পথটা সবুজ চিরে গেছে, তার পর গ্রাণ্ডপ্লেস, ফোয়ারার দল, গ্রাণ্ডপ্লেসের চড়াই, সেক্রেটরিয়ট বিল্ডিংয়ের দুই ভুজ, ব্রিটিশ কমনওয়েল্‌থ কলামের সার, সব জড়িয়ে রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে ইণ্ডিয়া গেট পর্যন্ত যেন একটা সুনীট। তেমনি আর্ক-দ্য-কঁকর্দ থেকে ল্যুভরের প্রাসাদ পর্যন্ত যেন একটা সুনীট্। Avenue Des Champs Elysee-এর প্রায় দেড় মাইলব্যাপী পথ মিশরীয় ওবেলিস্কের কাছে প্লেস-দ্য-লা কঁকর্দে মিশছে। সেই সরল রেখাতেই পড়ছে আর্ক-দ্য-কারুজাল। এই আর্ক আর প্লেস-দ্য-কঁকর্দের মধ্যে ল্যুভরের বিচিত্র উদ্যান। এ উদ্যানের মধ্যে থিয়েটার, সিনেমা, সবই রাত্রে আকাশের তলায় হয়। একটা ফোয়ারার চার পাশে রাশি রাশি গোলা পায়রা। সৌখীন-দয়ালুরা পায়রাদের দানা খাওয়াচ্ছে। বাগানের পথে যেখানে সেখানে মর্মরের ষ্ট্যাচু। সাজাতে জানে এরা। সজ্জা আর সাজ শিখতে পারীতে যেতে হয়।

"কাল তো তুমি আর্ক-দ্য-এ্যয়স্ফে ঘুরে এসেছো; আজ যাবে নাকি?"

"না। আগে দেখে নি এ সব। ল্যুভরে আগে চলো।"

"চলো। কেমন লাগলো আর্ক। ইণ্ডিয়া গেটের মতো?"

হাসি আমি।

"আজ অতো বলিগারি। লুই ফিফটীন্থের সময় পর্যন্ত ওখানটায় একটা টিবি ছিলো। বিশ্রী হয়ে থাকতো জায়গাটা। মাঝে রাজার ষ্ট্যাচু ছিলো বলে কেউ ওই নোংরা জায়গাটা সরাবার কথা তুলতে সাহস করতো না।"

"তার পরে প্লেস রয়্যাল থেকে একদিন রাজা নিজেই লক্ষ্য করে বলেন যে, সোজা পথের ওপর এমনি একটা টিবি প্লেস রয়্যালের তরিবত নষ্ট করছে।"

"প্লেস রয়্যাল কোনটা ?"

"এখনকার প্লেস-দ্য-লা কঁকর্দই তখনকার প্লেস রয়্যাল। তোমাদের দেশেও তো হাট, ঘাট, মাঠের নাম বদ্লানোর হিড়িক এসেছে। প্লেস-দ্য-লা মদলেন্ আর ইজিপ্শিয়ান্ ওবেলিস্কের মাপের পথটুকুর নাম এখনও রু-রয়্যাল্।"

"যাক্ রাজার ইচ্ছে ঢিবি সরুক তো ঢিবি সরুক। সরানো সোজা নয়। ঠিক করা হোলো ঢিবিটাকে কেটে-একটা অতিকায় হাতীর রূপ দেওয়া হবে।"

বলে উঠি, "ভাগ্যি হয় নি !"

"যা বলেছো। সরিয়েই ফেলা হলো। বিশাল এভেন্যু গ্র াদ্দামী তৈরি করা হলো। পরিষ্কার জায়গায় এতোটা অবকাশ পাওয়া গেলো যে, মাঝখানটায় একটা কিছু গড়ার প্রস্তাব হলো। অনেক প্রস্তাব হলো। এমন কি বিগবেনের মতো ঘড়ি-ঘর করার কথাও হলো। কিন্তু নেপলিয়ঁ শিল্পী শাগ্রেঁকে দিয়ে নব্বই লক্ষ ফ্রাঙ্ক খরচ করে এই আর্ক তৈরি করান। ১৮৫৮-তে এই আর্ককে কেন্দ্র করে বিখ্যাত বিখ্যাত পথ বার করে পারীকে সুন্দর করে তোলেন শিল্পী হস্‌মান্।"

"পারী তবে নেপোলিয়ঁর কাছে ঋণী বলো।"

"নিশ্চয়। আজ পারীতে যা দেখছো সুন্দর, এই নগরের প্রতি গলি, পথ, ব্যবসায় কেন্দ্র, বিলাস কেন্দ্র, শিক্ষা কেন্দ্র কোনোটা নেপলিয়ঁর তীক্ষ্নদৃষ্টি এড়ায় নি। যদি এক মাত্র উপায়টাকে শোধরাতে পারতেন, নেপলিয়ঁ তাঁর মণীষা আর কর্মক্ষমতা দিয়ে জগতকে ঋণী করে যেতে পারতেন। য়ুনাইটেড য়োরোপের স্বপ্ন নেপোলিয়ঁ দেখে-ছিলেন। কিন্তু সে মৈত্রী বন্ধন তলোয়ার দিয়ে করতে গিয়েই খারাপ হয়ে গেলো।"

আমি বলি,—"নেপলিয়ঁর আর একটা দোষ ছিলো যে জন্য সে স্বপ্ন সার্থক হতে পারে নি।"

"কি ?"

"য়ুনাইটেড য়োরোপের শিল্পী পারী কে ভালো-বাসতেন বড় বেশী। বিশ্বপ্রেম করতে গেলে ব্যক্তিপ্রেম বাদ দিতে হয়। নেপলিয়ঁ বড় বেশী ফরাসী ছিলেন। হেরেও ফ্রান্স ভোলেন নি।"

"হারলেন কবে ?"

হাসি আমি।

"হার মানে হার স্বীকার, বশ্যতা স্বীকার।"

"হ্যাঁ, বশ্যতা স্বীকার করেছেন ফ্রান্সের দরবারের কাছে। ওয়াটারলুকে পরাজয় বলে না কোনো বিচক্ষণ ঐতিহাসিক। ওয়াটারলু'র মতো রিট্রীট্, সে রকম একটা রেয়ারগার্ড একশন্ বিশ্বের ইতিহাসে দুর্লভ। ফিরে পারীঁ জনসভায় কয়েকদিনের জন্য একছত্র অধিকার চেয়ে যখন পান নি তখন পারীর পার্লামেন্টের কাছে নতি স্বীকার করেছেন। ইতিহাস বলে ওয়াটারলু হার। ওয়াটারলু হার নয়।"

বেস্‌দেভঁা বলেন,—"ল্যুভর দেখবেন না ইতিহাস আওড়াবেন ?"

আমি বলি, "গেরঁাকে নেপোলিয়নের ভূত একবার ধরলে হয়। ওর আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না।"

ল্যুভর প্রাসাদ এত বৃহৎ যে, একমাত্র আগ্রা ফোর্ট ছাড়া অতোবড়ো প্রাসাদ আমি দেখি নি। ভাতিকান যদি বিশ্বের সেরা প্রাসাদ হয়, ল্যুভর বিশ্বের চমৎকারতম না হলেও আশ্চর্যতম প্রাসাদ।

এ প্রাসাদের প্রবেশ পথে নেপোলিয়ঁর বিজয়-তোরণ ল-ক্যারাউজেল্—১৮০৫-এর জিনিস। শ্বেতপাথরের বড় বড় আটটি থাম। প্রতিটি থামের মাথায় ফরাসী-বাহিনীর আটটি শাখার আটটি সৈনিক পূর্ণ পরিচ্ছদে দাঁড়িয়ে আছে। ছাদের ওপর ফরাসী রেষ্টোরশন বর্ণনা করা এক সার খোদাই-কাজ। আগাগোড়া খিলানের মাথায় নেপলিয়ঁর নানা সমর-কীর্তির ছবি।

এটা পার হলেই ল্যুভরের প্রাসাদের বিশালতা। ধাপ ধাপ সিঁড়ি, সার সার খিলানের পর খিলান, যতদূর দেখা যায় চতুর্দশ লুই-প্রবর্তিত স্থাপত্যের নিপুণতা। তাই বলে সাইনের ধারের এ প্রাসাদ চতুর্দশ লুইর তৈরী নয়। যদি চ নেপোলিয়ঁই এই প্রাসাদের বর্তমান তেজস্বীতা, মনস্বীতা ও যশস্বীতা এনে দিয়েছেন, আসলে এটা ১৫৩০-এর কাছ বরাবর ফ্রান্সিস ফার্স্ট আরম্ভ করেন। সে সময়ের কিছু পরের ল্যুভরের একখানা ছবিতে কাঠের আঁকা বাঁকা এক ল্যাকপেকে সেতুর জায়গায় আজ কারুজেল ব্রীজের মনোহর শোভা। নেপোলিয়ঁ এই বিরাট প্রাসাদকে জাতীয় ম্যুজিয়ম হিসেবে গড়ে তোলেন। সারা ইউরোপ তখন নেপোলিয়নের তাঁবেতে থর থর। সেরা সেরা যাদুঘর থেকে তুলে এনে সেরা সেরা শিল্পকলার নিদর্শন জড়ো করেছিলেন পারীতে ল্যুভরে। অবশ্য নেপোলিয়নের লুঠের মালে আরও যোগ করেন তৃতীয় নেপোলিয়ন, ল্যুভরের পরিণতি তৃতীয় নেপোলিয়নের হাতে।

সে লুঠের সেরা মাল দুটি। রাজা-রাজড়ার নানা মণি-মাণিক্য দেখলাম এখানে। সে যেন চোখে ধাঁধা। কিন্তু চোখে যা কাজল, চোখে যা স্বপ্ন, চোখে যা পরমা-নন্দের বিলাস হয়ে লেগে রইল এ জীবনটার বাকী

সময়ের জন্ম তা দুটি। একটি ভীনাস-ডি-মেলো; অন্যটি দা-ভিঞ্চির জিয়াকোণ্ডা অর্থাৎ মোনা লিসার ছবি।

একদিনে ল্যুভর দেখা বাতুলতা। দশ দিনেও দেখা যায় না। পর পর ঘরগুলো মেপে লম্বালম্বি রাখলে তিন মাইল পথ। আর তার প্রতি ঘরের চার দেয়াল একবার করে চোখ বোলালে এগারো মাইল চোখ বোলাতে হয়। আর প্রতি দেয়ালে যদি একাধিক সার থাকে তবে বোধ করি পঁচিশ মাইলেও পার পাওয়া যায় না। মাইলের হিসাবে তো মনোহরণের সমস্ত মাপা যায় না; থার্মোমীটর দিয়ে কে কবে ভালোবাসা মেপেছে! এক-একটা আচমকা ছবি বা ভাস্কর্যের সামনে থ' মেরে দাঁড়িয়ে আছি তো আছিই।

বিশাল বিশাল জানালা দিয়ে আলো আসছে, তবু সারা ঘরের ছাদে ছাদে এক্লোরেসেণ্ট আলোর সার। সিলিং ভরতি সেকালের পঙ্কের কাজ। মেঝেগুলো পাৎলা পাৎলা কাঠের ফালিতে ঠাস করে ছাওয়া। মোক্ষম পালিশকরা কাঠের ওপর দিয়ে চলতে চলতে একটু অসতর্ক হলেই পদস্খলন ও পতন। পারীতে পদস্খলনের মর্যাদা তাতে না থাকলেও গা-গতরে ব্যথা ও লোক হাসাবার পক্ষে যথেষ্ট।

পরের দিনও ল্যুভরে যেতে হয়েছিলো। পারী মানে আজও ল্যুভরই মনে হয়। তবু তারও মধ্যে মনে হয় ভীনাস-ডি-মেলোর অদ্ভুত সেই মূর্তি! রোমে সাইরীণের ভীনাস, মূর্তি ল্যুভরে ডায়ানা, ভীনাস-ডি-মেলো আর আফ্রদিতে সীনাইডী তিনটি মূর্তিই যখন পাশাপাশি রেখে বিচার করি, মনে হয় সর্বকালীন ভাস্কর্যের আশ্চর্য সমাধান ভীনাসা-ডি-মেলোয় নারী, এ্যাপোলো বেলেভেডিয়রে যুবার, ডেভিডে কেশোরের আর মোজেজে বৃদ্ধের। এদের তুলনা নেই।

তখনই মনে পড়ে কোনারক, বেলুর, হালেবীদ্, মহাবল্লিপুরম্, খাজুরাহো, ভুবনেশ্বরম্, কৈলাস-ইলোরা! সে সব মূর্তির উৎকর্ষ কোথায়? এর জবাব দেবার জায়গা এ নয় তবু মনে ভেসে গেছে এ সব কথা ল্যুভরের গ্যালারিতে ঘুরতে ঘুরতে। সুন্দরী ভীনাসের প্রতিমা আদর্শের প্রতীক নয়; মানুষের, বাস্তবের, চরিতার্থতা: সে যেন সুদেহিনী মূর্তির আদর্শ; আর আমাদের দেশের ভাস্কর্যের যেন শ্রেষ্ঠ আদর্শের মূর্তি। মানুষে প্রতীক থামে; প্রতীক আদর্শ চিরন্তনতা পায়। ভীনাস-ডি-মেলোর সঙ্গে প্রেমে পড়া যায়; মামল্লপুরমের মহিষ-মর্দিণীর ধারণায় গোটা চেতনাটা যেন অতীন্দ্রিয় পাক খেয়ে ওঠে। বোঝাতে পারবো না এ প্রভেদ। মাটি আর আকাশের প্রভেদ; তোষামোদ আর স্তবের প্রভেদ; ছাই আর ভস্মের প্রভেদ। এমনি মূর্তি আরও দেখলাম ব্যুনোয়োওরীর "স্লেভ" আর আর পিপালের 'মার্কারি' কিন্তু আদর্শ যন্ত্রণার বিকৃত চিৎকারের নিদারুণ বীভৎস অভিব্যক্তি দেখেছি প্রমিথিয়ুসের নির্যাতনের ভাস্কর্যে। যে অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্যে আর্তনাদ ও বীভৎসতা প্রাণের মধ্যে মমতারও করুণার উৎস খুলে দেয়, এ যেন সেই লোকোত্তর শিল্পকর্মের স্বাক্ষর।

মনে আছে ছোটো একটি ভাস্কর্য। একটি আতরদান তিনটি নারীমূর্তির মাথায়। মূর্তিকটি পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে। মাথায় আতরদান। খুবই অপ্রাকৃতিক আর বেমানান আইডিয়া। কিন্তু ভাস্কর্য চমৎকার। Germain Pilon-র থ্রি গ্রেসেজ।

অবাক হয়েছিলাম রুবেন্সের কাণ্ডকারখানা দেখে। শিল্পের ইতিহাসে বোধ হয় এতো রং খরচ করনেওয়ালা একটি মানুষ আর নেই। তাও তো বেশীর ভাগই কাপড়-চোপড় আঁকেন নি রুবেন্স, কেবল মানুষগুলোই এঁকেছেন। মেরিয়া মেডিসীর নামে যে সীরিজটি এঁকেছেন সে ঘরটায় ঢুকে হকচকিয়ে গেলাম যেন। ১৬৪০-এ রুবেন্স মারা যান ৬৩ বছর বয়সে। য়োরোপের প্রত্যেক প্রখ্যাত চিত্রশালায় এই ফ্লেমিশ কীর্তিমানের কাজের নমুনা রাখা আছে। পুরোনো কালের কাজের মধ্যে রটিচেনির আত্মচিত্র, টিশিয়ানের ফ্রান্সিস ফার্ষ্ট, সেলারিওর 'ভার্জিন উইথ এ গ্রীনকুশান' খুব সুন্দর লাগলো। পুঁসার রেপ্ অব সেবাইন্ আর ভেগ্‌নেসের Les Noces de Cana এই দুটি গ্রুপ চিত্র এখনও মনে আছে। ল্যাণ্ডস্কোপের মধ্যে হবেমা-র 'ওয়াটার মিল' খুব সুন্দর লাগলেও টার্ণারের সরলতা ভি-লা-তুর প্রখ্যাত আর্টিষ্ট নয় জানি। মাঝামাঝি। কিন্তু ক্রাইষ্টের কয়েকটি ছবির দৌলতে এ শিল্পীকে আমার মনে থাকবে। বিরাগ হয়েছিলো এ কে গ্রেকোর ওপর। রাজা আর মন্ত্রীর সঙ্গে খৃষ্টের ছবি এঁকে অত সুন্দর ছবিটির মর্যাদা চুর চুর করেছেন। টাকার জন্ম বুভুক্ষিত শিল্পীদের কী না করতে হয়েছে। মনে পড়ে যায় টলষ্টয়ের উক্তি "Literature as a living? It is prostitution!"

ইন্‌গ্রেসের 'বে-এদর' মনে আছে চামড়ার উজ্জ্বলতার মধ্যে সোনালী চমকের জন্ম। নেলে হ্যাডস্ তো অনেক দেখেছি। মডার্ণসের আঁকা ছবির রাশি দেখেছি। আমার মনে হয় মডার্ণসে আমার মেজাজ চাঙ্গা হয়, মন খুশী হয় না। চড়া মেজাজের যৌবনবিগত হবার পর, চিরদিনের শান্ত, শুদ্ধ শিল্প আবার দুনিয়ার মনকে খুশীতে ভরে দেবে। ক্রমশঃ

বিদ্যাবিনোদ সত্যকিঙ্কর

শ্রীসুখময় সরকার

বাঁকুড়া জেলার জনসাধারণের নিকট রায় বাহাদুর সত্যকিঙ্কর সাহানা বিদ্যাবিনোদের নাম সুবিদিত। তবে সাধারণ লোকে তাঁহাকে কেবল ধনী ও মানী বলিয়াই জানে, আমি কিন্তু তাঁহাকে জ্ঞানী বলিয়া জানি। এই প্রবন্ধে আমি তাঁহার ধন ও মানের কথা পরিত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞানের কথা আলোচনা করিব।

ইং ১৯৪৫ সন, মার্চ মাস। বাঁকুড়া-নূতনগঞ্জের ধর্মশালায় একটি ছাত্রসভার আয়োজন হইয়াছে। স্কুল-কলেজের বহু ছাত্র সমাগত; কয়েকজন শিক্ষক, অধ্যাপক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় উপস্থিত। সাহানা মহাশয় সভাপতির আসনে উপবিষ্ট। হাতে ছড়ি। বয়স সত্তর বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে; কিন্তু সুন্দর সুগঠিত দেহ; আ-গৌর উজ্জ্বল শ্মশ্রুল মুখকান্তি। দৃষ্টিতে সকৌতুক প্রতিভার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি। দুইজন ছাত্রনেতা বর্তমান পরিস্থিতিতে ছাত্রদের কর্তব্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করিলেন এবং সমাগত ভদ্র-মহোদয়গণের মধ্যে কেহ কেহ ঐ বিষয় লইয়া বক্তৃতা করিলেন। পরে আমি একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করিলাম। সভাপতির ভাষণে সাহানা মহাশয় সভায় পঠিত কবিতা ও প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, একবার শুনিয়াই আমার কবিতার দুই ছত্র স্মৃতি হইতে পুনরুদ্ধার করিয়া বলিলেন, "এই অংশ অতি সুচিন্তিত, সুশ্রাব্য, রসোত্তীর্ণ ও সারগর্ভ।" সেই দিন সাহানা মহাশয়ের সহিত আমার প্রত্যক্ষ-পরিচয়ের সৌভাগ্য হইল।

ইহার মাসখানেক পরে বাঁকুড়া-দোলতলায় ভারত-সেবাশ্রম-সঙ্ঘের উদ্যোগে এক বিরাট্ ধর্ম-সম্মেলন আহূত হয়। সাহানা মহাশয় এই সম্মেলনের প্রথম দিন সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সেদিন হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁহার মুখে যে জ্ঞানগর্ভ ও তথ্য-ভূয়িষ্ঠ ভাষণ শুনিয়াছিলাম, তাহাতে স্বধর্ম ও স্বজাতীয় সংস্কৃতির প্রতি আমার সুপ্তপ্রীতি জাগরিত হইয়াছিল। সেইদিন তাঁহার সহিত আমার দ্বিতীয়বার পরিচয় হইল। তিনি আমায় সস্নেহে বলিলেন, "মাঝে মাঝে আমার ওখানে যেয়ো।"

অল্পদিনের মধ্যে কেন্দুয়াডিহিতে ভারত-সেবাশ্রম-সঙ্ঘের আশ্রম ও ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আমি সেখানে থাকিবার সুযোগ লাভ করি। সাহানা মহাশয়ের গৃহ অতি নিকটে। তাঁহার সহিত আমার পরিচয় নিবিড়তর হইতে থাকে। কভু কদাচিৎ তিনি আমায় ডাকিয়া নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লেখাইতেন। তখন আমার বয়স এত অল্প ছিল যে, সে সকল প্রবন্ধের বিষয়বস্তু আমার বোধগম্য হইত না; সেইজন্য ঠিক স্মরণ হইতেছে না। একদা কী একটা পত্রিকায় তাঁহার "ন্যায় তো শারী ভিজগয়ী" নামে একটি সরস অথচ তত্ত্বসমৃদ্ধ আলোচনা পাঠ করিলাম। মনে পড়ে, সেইদিন সাহানা মহাশয়ের চিন্তার গতি ও প্রকৃতি অনেকটা ধরিতে পারিয়াছিলাম। এক বসন্তোৎসবের দিনে কে একজন পিচকারী মারিয়া এক কন্যার বস্ত্র ভিজাইয়া দিয়াছিল; বালিকা হা-হুতাশ করিতে লাগিল, "ওগো, কে আমায় পিচকারী মারিলে—আমি যে সব ভিজিয়া গেলাম।" বালিকা তো সত্যই ভিজে নাই, রঞ্জিত জলে তাহার বস্ত্র ভিজিয়াছে মাত্র; বস্ত্রটি ধৌত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলেই তো ফুরাইয়া যায়; তাহার জন্য 'হা-হতোস্মি' করিবার কী আছে? আখ্যায়িকার অন্তর্নিহিত কথাটাও তিনি সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। কৌতূহলী পাঠক তাঁহার "শুক্ত" নামক গ্রন্থে ইহা সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাইবেন।

মাঝে মাঝে তিনি আমায় কৌতুক করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, "হাঁ গো, মহাভারত ব'লে আমাদের একটা বই আছে না? তা 'মহাভারত' নাম কেন হ'ল, বলতে পারো?"

নিরুত্তর থাকি। কী উত্তর চা'ন, কে জানে? তখন নিজেই প্রশ্ন করেন, "মহাভারত, Greater India?"

আমি বলি, "না।"

"কেন? এই তো সে-বার এক বিখ্যাত ঐতিহাসিক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, তাঁর মুখেও শুনলাম, মহাভারত—A History of Greater India."

আমি সসঙ্কোচে বলি, "ভরতবংশের ইতিহাস, এই অর্থ হ'তে পারে।"

তিনি বলেন, "তা বলতে পারো। কিন্তু মহাভারতেই

তো রয়েছে—যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ, মহাভারতমুচ্যতে। আজও বলতে পারি, Mahabharata is the biggest book in the world." এই বলিয়া তাঁহার নিজস্ব অপূর্ব ভঙ্গি সহকারে গণেশের সাহায্যে বেদব্যাসের মহাভারত লিখনের কাহিনীটি বিবৃত করেন। শুনিতে শুনিতে শ্রোতার হর্ষ ও কৌতুকের সীমা থাকে না। বর্ণনা শেষ করিয়া তিনি বলেন, "এটা অবশ্য গল্প। আসল কথা, নারী-শূদ্র-দ্বিজবন্ধুরা তো বেদ-উপনিষদ্ বুঝতে পারে না, তাদের জন্য কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন মহাভারত রচনা করেছেন। মহাভারত পঞ্চমবেদ নামে বিখ্যাত হয়েছে।"

কখনও জিজ্ঞাসা করিতেন, "মহাভারতে আদর্শ-চরিত্র কোন্‌টি, বল দেখি?"

নিজ বিচারশক্তি ও আদর্শ অনুযায়ী বলিতাম, "ভীষ্ম।"

"ভীষ্ম চরিত্র অতি মহান্, সন্দেহ নাই। কবি তাঁর ব্যক্তিত্বকে সুবিশাল হিমালয়ের মত বিরাট্ আর তাঁর চরিত্রকে হিমালয়ের উচ্চ চূড়ায়-লগ্ন তুষারের মতই নিষ্কলঙ্ক ক'রে অঙ্কিত করেছেন। কিন্তু কথাটা কি জান? ভীষ্ম চরিত্রটি খণ্ডিত। আমরণ তিনি ছিলেন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী; তিনি দার-পরিগ্রহ করেন নি, তাঁর সন্তান হয় নি। এই কারণে তাঁর হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তিগুলির তেমন অনুশীলন হয় নি। দ্রৌপদী পাশাখেলায় বাস্তবিক পণজিতা হয়েছেন কি না, এই প্রশ্ন তুলতে ভীষ্ম তাঁকে যে উত্তর দিয়েছিলেন, তাতে যথেষ্ট পারুষ্য, কার্কশ্য আর হৃদয়হীনতা প্রকাশ পেয়েছিল। অর্জুনই মহাভারতের শ্রেষ্ঠ চরিত্র। মানুষের দুটো হাতের কর্ম-ক্ষমতায় যে স্বাভাবিক পার্থক্য, কবি তাও সহ্য করতে না পেরে অর্জুনকে সব্যসাচী করেছেন। সকল গুণের এমন সর্বতোমুখী অনুশীলন অর্জুন ছাড়া আর কোন চরিত্রে দেখতে পাওয়া যায় না।"

কতবার কত রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সভা-সমিতিতে বিদ্যাবিনোদ সত্যকিঙ্করকে দেখিয়াছি; বিবিধ বিষয়ে তাঁহার ভাষণ শুনিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছি। অপূর্ব তাঁহার বাচন-ভঙ্গি, অকাট্য তাঁহার যুক্তি-পরম্পরা। ইং ১৯৪৭ সনে আচার্য যোগেশচন্দ্রের সম্বর্ধনা-সভায় তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাষণ হইতেই আচার্যদেবকে প্রথম চিনিতে পারিয়াছিলাম। চণ্ডীদাস-সমস্যার সমাধানে সত্যকিঙ্কর অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন এবং বড়ু-চণ্ডীদাস যে ছাতনার অধিবাসী ছিলেন, এই সত্য পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আচার্য যোগেশচন্দ্রকে তিনি তথ্য সংগ্রহ-বিষয়ে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। একথা আচার্যদেবের মুখেই বহুবার শুনিয়াছিলাম। আচার্য যোগেশচন্দ্রের প্রতি সত্যকিঙ্করের ভক্তি ও প্রীতি ছিল অগ্রজ-তুল্য।

বাংলা ১৩৬০ সালের ২৩শে কার্তিক, বাঁকুড়া টাউন-হলে স্বর্গত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্‌বল্লভ মহাশয়ের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী স্মৃতি-সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার অনুরোধ লইয়া উক্ত অনুষ্ঠানের দিন-দুই পূর্বে আমি তাঁহার সমীপস্থ হইয়াছিলাম। সেদিন তাঁহার ব্যবহারে যে স্নেহসিক্ত হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছিলাম, তাহার তুলনা হয় না। একথা-সেকথার পর তিনি আমায় বলিলেন, "তুমি তো বাংলাভাষা-সাহিত্য নিয়ে চর্চা কর; আমার 'মহাভারতে অনুশীলন তত্ত্ব' বইখানা নিয়ে যাও, And read it with the insight of a critic. বইখানার দ্বিতীয় সংস্করণ করার ইচ্ছা আছে।"

পুস্তকখানি লইয়া আসিয়া পড়িলাম। মহাভারতের প্রধান প্রধান চরিত্র অবলম্বনে তিনি যে সুন্দর, সুখপাঠ্য, প্রাঞ্জল অথচ পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন, বাস্তবিক, বাংলা-সাহিত্যে তাহা এক অমূল্যসম্পদ এবং অনুশীলনার্থী ও তত্ত্বজিজ্ঞাসুর নিকটও তাহার মূল্য অসামান্য।

সেদিন বিদ্বদ্‌বল্লভ-স্মৃতিসভার সভাপতিরূপে তিনি বড়ু-চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন' এবং 'চণ্ডীদাস-সমস্যা' সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা করিলেন। সে আলোচনা হইতে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল যে, বড়ু-চণ্ডীদাস ছাতনায় বাস করিতেন। এ বিষয়ে অধিকতর কৌতূহলী হইয়া একদা আমি সাহানা মহাশয়ের বাসভবনে উপস্থিত হইলাম। মৃগচর্মে বসিয়া একখানি উপনিষদ্ পাঠ করিতেছিলেন। আমি জিজ্ঞাসু হইলে তিনি বাসলী, বড়ু, নাহুর, নিত্যা প্রভৃতি লইয়া অনর্গল প্রায় এক ঘণ্টা বলিয়া গেলেন। প্রসঙ্গক্রমে বৈষ্ণব রসতত্ত্ব ও দর্শনের কথা উঠিল। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সরস ভাষায় তিনি বলিলেন, "বিন্দে গয়লানী বলছে, ঠাকুর, আমি তোমার ঐ ত্রিভঙ্গ মূর্তি দেখতে বড় ভালবাসি। ভালবাসারই কথা। ত্রিভঙ্গ, তিনটি তরঙ্গ—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়। অনন্তকাল ধ'রে এই লীলা চলেছে। কোন্ ভক্ত সে লীলারস আস্বাদন করতে না ভালবাসে?"

কিয়ৎকাল কী চিন্তা করিয়া, বলিলেন, "আচ্ছা, বল দেখি, বৈষ্ণব কবিতায় 'গোপী' কাকে বলা হয়েছে?"

আমি বলিলাম, "যিনি গোপনে সাধনা করেন, তিনিই গোপী।"

"কাছাকাছি এসেছ। কিন্তু গোপী তো আমরা সবাই। যেহেতু আমরা সবাই গোপনে আছি। এই দেহ-মনো-বুদ্ধির অন্তরালে যে নিত্য, শাশ্বত, অবিনাশী সত্তা—তিনি গুপ্তভাবে আছেন। সেই সত্তাই তো আমি। গোপী

শব্দটা উভয় লিঙ্গ। আজকাল আবার 'গোপিনী' শব্দ দেখতে পাই, যার কোন মানে নেই।"

আমি তন্ময় হইয়া তাঁহার কথা শুনিতেছি; তিনিও ভাব-বিহ্বল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "শোন শোন, বৈষ্ণব কবির গান শোন। 'আমি পড়েছি পীরিতের দায়ে, আমায় যেতেই যে হবে গো।' আচ্ছা, এ গানের মানে কি? কবি কার প্রীতিতে আবদ্ধ হয়েছেন? আত্ম-প্রীতিতে। নিজেকে তিনি চিনেছেন, নিজেকে ভাল-বেসেছেন। আর সেই প্রীতির বশেই তাঁকে যেতে হবে আত্মারামের অভিসারে।"

কথায় কথায় মূর্তিপূজা ও মূর্তি-কল্পনার কথা উঠিল। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বলিলেন, "আহা! হিন্দুকে অহিন্দুরা পৌত্তলিক বলে। আমার হাসি পায়! যাদের জ্ঞানের পরিধি নিতান্ত সঙ্কীর্ণ, তারাই হিন্দুকে পুতুল-পূজক মনে করবে। হিন্দু-দার্শনিক বলছেন, 'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা'। যারা হিন্দুকে পৌত্তলিক বলে, তারা সভ্য হবার হাজার হাজার বছর আগে ভারতের ঋষি 'অবাঙ্‌মনসগোচরম্ একমেবাদ্বিতীয়ম্' ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি ক'রে অসংখ্য শাস্ত্র রচনা ক'রে গেছেন; তাঁরাই আবার অধিকারীভেদে উপাসনার ক্রম-নির্দেশ করেছেন। প্রতিমা ধ্যানের আশ্রয়। প্রতিমা-পূজা তো নয়, প্রতীক-পূজা। কালী-প্রতিমায় কোন্ তত্ত্ব নিহিত আছে? কালী শক্তি, পদতলে তাঁর ভূতনাথ, ভূতসমষ্টি। ভূত ও শক্তি, এই দুইয়ের সম্মিলনেই সৃষ্টি। সৃষ্টির আদি নাই, অন্ত নাই। মা আমার তাই কৃষ্ণবর্ণা। সৃষ্টিতে চলেছে নিরন্তর সংগ্রাম, মা তাই খর্পরধারিণী, মুণ্ড-মালিনী। কিন্তু পা দু'টি দেখেছ? লাল টুকটুকে, আর সোনার নূপুর পরানো। সৃষ্টির গতি যে মঙ্গলের দিকে, তারই দ্যোতনা। ত্রিভঙ্গ মুরলীধর কৃষ্ণমূর্তিতেও সেই তত্ত্ব। ত্রিভঙ্গ—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়, বংশীধ্বনিতে মাধুর্যের অভিব্যক্তি। তাঁরও চরণদ্বয় অরুণবর্ণ, নূপুর-পরানো—শুভের দিকে গতি নির্দেশ করছে। অনন্তশায়ী নারায়ণ-মূর্তিতেও সেই কথা। অনন্তনাগ অনন্তের দ্যোতক। নারায়ণের চার হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম। পদ্মটি সৃষ্টির প্রতীক; চক্র, কালচক্র। শঙ্খ দ্বারা শব্দ সূচিত হচ্ছে; আকাশ শব্দ বহন করে। আকাশই হচ্ছে স্থান (space) স্থান ও কাল ব্যতিরেকে সৃষ্টি হয় না। গদা প্রলয়ের প্রতীক। সৃষ্টিকে তিনি আবার গদা দিয়ে চূর্ণ করছেন।"

এইরূপে একটির পর একটি তিনি কত মূর্তির অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলেন; সব মনে পড়িতেছে না। সেদিন যে সম্পদে হৃদয় ভরিয়া আনিলাম, সারা-জীবন তাহা অন্তরে অমৃত সিঞ্চন করিবে।

বাল্যকাল হইতেই সত্যকিঙ্কর কবিতা রচনায় সিদ্ধ-হস্ত। তাঁহার বহু কবিতা 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'হিতবাদী', 'সাহিত্য' ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে এবং পরবর্তীকালে সেগুলি 'যূথিকা', 'কলিকা', 'মালিকা' ও 'আর্যাশতক'—এই চারিটি গ্রন্থে গ্রথিত হইয়াছে। 'মালিকা'র শেষদিকে ভারতীয় কয়েকজন লোকোত্তর পুরুষের সম্বন্ধে রচিত সনেটগুলি কেবল তাঁহার বীরপূজার নিদর্শন নহে, সনেট-রচনায় তাঁহার দক্ষতারও সাক্ষ্য বহন করিতেছে। তাঁহার অধিকাংশ কবিতাই উচ্চাঙ্গের। এক একটি কবিতা ভাষায়, ভাবে, সৌন্দর্যে ও মাধুর্যে এক একটি প্রস্ফুটিত কুসুম। মাতৃভূমির বন্ধন-মুক্তির জন্ত তাঁহার অন্তরবেদনা 'গরুর' কবিতায় রস-রূপ লাভ করিয়াছে। 'স্বপ্ন ও চিন্তা' কবিতায় তিনি এক ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছেন: ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিনে তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন, পশ্চিমাকাশ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে; পূর্বগগন রক্তিম আভায় আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। এই কবিতার আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, "দেখ, ২৭ বৎসর বয়সে আমি এই স্বপ্নটা দেখেছিলাম। আমি নিশ্চিত বলতে পারি, আগামী ৪৭ বৎসরের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে, ভারত-গৌরব-রবি পুনরায় উদিত হবেন পূর্বাচলে।" ইহা ইং ১৯৫৩ সনের কথা।

'গুরু' পুস্তকের প্রবন্ধাবলীতে দেখিয়াছি, সত্য-কিঙ্করের প্রিয় কবি ছিলেন হেমচন্দ্র। এই পুস্তকের 'মধু-হেম' প্রবন্ধটি সাহিত্যানুরাগীর নিকট অতিশয় মূল্য-বান্।

"ভুলিতে হবে আপন, ভুলিতে হবে স্বপন,
ত্যজিতে হবে জীবন, তবে সে পারিবে।"

হেমচন্দ্রের দেশসেবার এই আত্মমেধী আদর্শ সত্য-কিঙ্করের হৃদয়ে প্রেরণা সঞ্চার করিত। যে সময়ে তিনি এই সকল প্রবন্ধ রচনা করেন, তখন রবীন্দ্রনাথের কবিতা-সম্বন্ধে যে সাধারণ অনুযোগ ছিল, সত্যকিঙ্করও সেই অনুযোগ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, রবীন্দ্রনাথের ভাব অতি সুন্দর ও উচ্চ, কিন্তু ভাষায় ইংরেজীর প্রভাব কিছু অধিক থাকায় সাধারণের নিকট তাহা অনেক স্থলে দুর্বোধ্য এবং কোন কোন স্থলে বঙ্গভাষার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। কাব্য-বিষয়ে সত্যকিঙ্কর ছিলেন পুরাতন মতাবলম্বী। কাব্যের "কান্তা সম্মিততয়া উপদেশ যুজে" আদর্শের তিনি সমর্থক ও প্রচারক ছিলেন। তিনি মনে করিতেন,

চিত্তোৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে যে কাব্য বিত্তশুদ্ধি সম্পাদনেও সহায়তা করে, তাহাই উৎকৃষ্ট কাব্য।

সাহানা মহাশয়ের সহিত আমার বয়সের ব্যবধান ছিল প্রায় ৫৫ বৎসর। আমি তাঁহাকে 'দাদু' বলিয়া ডাকিতাম, তিনিও আমাকে তাঁহার 'নাতি' বলিয়াই জানিতেন এবং তদনুরূপ রসিকতা করিতেন। রসিকতা তাঁহার চরিত্রের অন্যতম অলঙ্কার ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার সহিত আলাপ শুরু করিলে সহজে কেহ উঠিতে পারিত না। আমি বাঁকুড়া ছাড়িয়া আসিবার কিছুকাল পরে এক পত্রে তিনি লিখিলেন—

"বহুদিন তোমাকে দেখি নাই। কবে দেখা হইবে জানি না। তবে দেখা যে একদিন হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। বাঁকুড়ায় না আসিয়া তুমি থাকিতে পারিবে না, কারণ বাঁকুড়া তোমার নিকট হরের হিমালয় এবং হরির মহোদধি।" (২৮।৩।৫৫)

রসিকতাটা বুঝিতে পারিয়াও উত্তরে লিখিলাম, "বাঁকুড়ার প্রতি আমার যে আকর্ষণ, সে শুধু বিদ্যানিধি আর বিদ্যাবিনোদের জন্য। তাঁহারাই আমার নিকট হরি ও হর।"

প্রত্যুত্তরে তিনি লিখিলেন, "নাতির সহিত রঙ্গ করিবার জন্য, একটা উদ্ভট শ্লোক স্মরণ করিয়া কথাটা লিখিয়াছিলাম; কিন্তু তুমি সরল অথচ চতুর; তাই কথাটা ঘুরাইয়া দিয়াছ। শ্লোকটা জান তো—

অসারে খলু সংসারে সারং শ্বশুর-মন্দিরম্।
হিমালয়ে হরঃ শেতে হরিঃ শেতে মহোদধৌ॥"
(১৬।৪।৫৫)

গত বৎসর এক পত্রে লিখিয়াছিলেন (২৪।৩।৫৯);

"আমি শুধু স্থবির নই, পা দুটির অক্ষমতায় স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি।"

১৭।১০।৫৯ তারিখের পত্রে লিখিলেন—"বোধহয় যাবার দিন ঘনাইয়া আসিল। শমনও অনেক দিন হইতেই পাইতেছি। এখন একদিন হয় ত গেরেপ্তারি পরোয়ানা (arrest warrant) জারি হইবে।"

নিজেকে লইয়া এইরূপ রসিকতার দৃষ্টান্ত বিরল নয় কি?

সত্যকিঙ্কর ছিলেন মনে-প্রাণে ভগবদ্ বিশ্বাসী। সর্বনিয়ন্তার বিধানেই যে বিশ্ব-প্রপঞ্চ পরিচালিত হইতেছে, শেষ বয়সে তাঁহার অন্তরে এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল হইয়া গিয়াছিল। কয়েকটি পত্রের উদ্ধৃতি হইতে তাঁহার মনোভাব স্পষ্ট হইবে।

"বিশ্বকার্য বিশ্বনিয়ন্তার খেলা, মানুষের বোধগম্য

বিদ্যাবিনোদ সত্যকিঙ্কর

নয়। মানুষ তাঁহার খেলার পুতুল, মায়ার দ্বারা যন্ত্রারূঢ় হইয়া ঘুরিয়া মরে।" (৪।১০।৫৯)

"এই বিশ্বজগৎ বিশ্বনিয়ন্তার খেলাঘর, আর আমরা তাঁহার খেলার পুতুল। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে।" (১৬।১০।৫৯)

"বিশ্বনিয়ন্তার খেলা চলিতেছে; তিনি যাহা করিবেন তাহাই হইবে, মানুষের চিন্তা বৃথা।" (৮।১।৬০)

তাঁহার 'আর্যাশতকে'র কয়েকটি আর্যায় এই ভাবটি ছন্দিত হইয়া উঠিয়াছে:

"বিশ্ব পঞ্চালিকা নাচে
স্মত্রধরের স্মতার টানে;
স্মত্রধর যে কোথায় আছে,
দেখতে কেমন, কে বা জানে!
রাজা সেজে, বাদশা সেজে
স্মতার টানে নেচে চলি;
আমিই নাচি, আমিই কর্তা,—
এই কথা সবারে বলি।"
(৮০ নং আর্যা)

ভগবদ্গীতার "অহংকার বিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে" স্মরণ করাইয়া দেয়। সত্যকিঙ্করের 'আর্যাশতক' বাংলা সাহিত্যের একটি মূল্যবান্ সম্পদ। ইহার এক একটি

সমায়তন আর্যা ভাষার সারল্যে, ভাবের গৌরবে এবং ব্যঞ্জনাশক্তির প্রাচুর্যে অতুলনীয়। এখানে মাত্র দুইটি আর্যা উদ্ধৃত করিতেছি :

"ভূতের বেগার খেটে মরি,
দেখা নাই ভূতনাথের সনে ;
পদে পদে ঠক্‌ছি তবু,
নিজকে চতুর ভাবি মনে।
ভূতের সাথেই মিলি মিশি,
ভূতের সাথেই করি খেলা ;
ভূতনাথেরে চাই না আমি,
বনেছি পাঁচ ভূতের চেলা ॥"
(৭৯ নং আর্যা)

"হিসাব করে বলব কথা ভাবি,
বে-হিসাবটা হিসাবে দেয় নাড়া ;
হিসাব তখন মূর্চ্ছা খেয়ে পড়ে,
বে-হিসাবটা জোরে বাজায় কাড়া।
হিসাব-বেহিসাবের দ্বন্দ্বে প'ড়ে
আকুল পরাণ ফুটির মত ফাটে ;
বে-হিসাবেই আঁকড়ে চলি ধরে
গেলাম তোমার হিসাবের ঐ ঠাটে ॥"
(২৭ নং আর্যা)

'মহাভারতে অনুশীলন তত্ত্ব' ও 'শকুন্তলা-রহস্য' সত্যকিঙ্করকে অমর করিয়া রাখিবে। 'মহাভারতে অনুশীলন তত্ত্ব' গ্রন্থ রচনার জন্যই কলিকাতার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-সমাজ তাঁহাকে ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে সম্বর্ধিত করেন এবং বিদ্যাবিনোদ' উপাধিতে বিভূষিত করেন। সাধারণ পাঠক যদি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' পড়িয়া রসগ্রহণে ইচ্ছুক হ'ন তৎপূর্বে তিনি সত্যকিঙ্করের 'শকুন্তলা-রহস্য' পাঠ করিলে সবিশেষ উপকৃত হইবেন, একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে 'কালিদাসের ফুল' প্রবন্ধটি যেমন তাঁহার অনুসন্ধিৎসা ও সৌন্দর্যবোধের পরিচায়ক, তেমনই কৌতূহলী পাঠকের নিকট প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্যে পুষ্প-পরিচয়ের সহায়ক হইয়াছে।

বাঁকুড়ার 'শিখা' পত্রিকায় সত্যকিঙ্করের "হিন্দুর পৌত্তলিকতা" ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতেছিল। প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া তাঁহার জ্ঞানের গভীরতায় বিস্মিত হইয়াছি। সংস্কারমুক্ত মন লইয়া তিনি যেমন হিন্দুধর্মের বিশ্লেষণে প্রয়াসী হইয়াছেন, অপর দিকে তেমন নাস্তিকদিগকে তিনি যুক্তিপূর্ণ তীক্ষ্ণ ভাষায় তিরস্কার করিয়াছেন।

'প্রবাসী'তে প্রকাশিত আমার পূজাপার্বণ-বিষয়ক প্রবন্ধগুলি তিনি আগ্রহসহকারে পাঠ করিতেন এবং আমাকে উৎসাহিত করিবার জন্য আনন্দ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিতেন। একখানি পত্রে তিনি লিখিলেন (১৮।২।৫৯)—

"হিন্দুর ধর্মাচরণের এই দুর্দিনে তুমি যাহা করিতেছ তাহা সত্যই একটা কাজের মত কাজ হইতেছে। বিশ্বনিয়ন্তার কৃপায় তোমার কার্য সাফল্যমণ্ডিত হউক, ইহাই কামনা করি।"

আর একখানি পত্রে লিখিলেন (৬।৩।৫৯)—

"পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ সম্বন্ধে তুমি 'প্রবাসী'তে যাহা লিখিতেছ, তাহা যে কাজের মত কাজ হইতেছে, কেন লিখিয়াছিলাম ? নানারূপ ভুল-ভ্রান্তিতে সব নষ্ট হইতে বসিয়াছে। শিবলিঙ্গ মানে জ্যোতির্লিঙ্গ ; সাধকের যখন সিদ্ধিলাভ হয়, তখন তিনি ব্রহ্মজ্যোতিঃ দর্শন করেন। তখন গ্যাসের আলো, বিদ্যুতের আলো ছিল না, প্রদীপই জ্যোতির প্রতীক ছিল, শিবলিঙ্গ বা সিদ্ধিলাভের 'মঙ্গলচিহ্ন' কাজেই নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখা। এখন দুর্ভাগ্যক্রমে উহা লিঙ্গপূজা বা স্ত্রী ও পুং-জননেন্দ্রিয়ের একত্র সমাবেশরূপে গৃহীত হইতেছে। * * * বাঁকুড়া অদ্ভুত জেলা। এখানেই শূন্যপুরাণ-প্রণেতা রামাই পণ্ডিত এবং শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন-প্রণেতা বড়ু চণ্ডীদাস জন্মিয়াছিলেন। এখানে ধর্মপূজা এবং হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী পূজা মিশিয়া গিয়াছে—তাহাদের সহাবস্থান ঘটিয়াছে। তুমি পণ্ডিত লোক, পূজাপার্বণগুলির মূল উৎসের সন্ধান নিশ্চয়ই করিবে।"

গত বৎসর (১৩৬৬ বঙ্গাব্দ) বুদ্ধপূর্ণিমার দিনকয়েক পূর্বে বাঁকুড়া-সারস্বত-সমাজের সম্পাদক মহাশয়ের নিকট হইতে একখানা পত্র পাইলাম ; বুদ্ধপূর্ণিমায় সাহানা মহাশয়ের সম্বর্ধনা-সভায় উপস্থিত থাকিবার জন্য আমন্ত্রণ। কবি সত্যকিঙ্করকে আমিও সম্বর্ধনা জানাইব, এই বাসনায় তাড়াতাড়ি একটা কবিতা লিখিয়া ফেলিলাম। তার পর উহা ছবির মত করিয়া বাঁধাইয়া লইলাম। বাঁকুড়ায় চণ্ডীদাস-চিত্র-মন্দিরের সভায় উপস্থিত হইয়া দূর হইতে দেখি, জেলা-শাসক মহাশয় সভাপতি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর ইউ. এন. ঘোষাল প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর জে. এল. ব্যানার্জিও সভায় উপস্থিত। 'যুগবাণী' সম্পাদক শ্রীদেবজ্যোতি বর্মন, সাহিত্যিক শ্রীমণি বাগচী, শ্রীনারায়ণ চৌধুরী ইত্যাদি খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের সমাবেশ হইয়াছে। স্থানীয় বিদ্বদ্‌মণ্ডলী এবং নেতৃবৃন্দ প্রায় সকলেই সমাগত। সমবেত বিদ্বদ্‌মণ্ডলী সত্যকিঙ্করের কীর্তিকথা সবিস্তারে বর্ণন

করিয়া ভাষণ দিলেন। সারস্বত-সমাজের পক্ষ হইতে তাঁহাকে মানপত্র দেওয়া হইল।

পঁচাশি বৎসরের বৃদ্ধ সত্যকিঙ্কর সম্বর্ধনার উত্তরে ভাষণ দিতে আরম্ভ করিলেন: "কলকাতার লোকেরা বলেন—খাঁকুড়োখারী বাঁকড়োবাসী, মুড়ি খায় রাশি রাশি। তা বাঁকুড়াবাসী খাঁকুড়োই থকুক আর রাশি রাশি মুড়িই খাক, তারা যে সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কারও থেকে পশ্চাদপদ নয়, আজ আমার সামান্য জ্ঞান দিয়ে আপনাদের কাছে তাই প্রতিপন্ন করব,"—এইরূপ ভূমিকা করিয়া তিনি বড়ু চণ্ডীদাস হইতে আরম্ভ করিয়া রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত বাঁকুড়া জেলার প্রায় ছয় শত বৎসরের গৌরবময় ইতিহাস বিশ্লেষণ করিলেন। এক ঘণ্টা ধরিয়া অক্লেশে বলিয়া গেলেন; কণ্ঠের ওজস্বিতা স্বল্পমাত্রও শিথিল হইল না!

সভা ভঙ্গ হইলে প্রায় সকলেই যখন চলিয়া গেলেন এবং সাহানা মহাশয় গাড়ীর অপেক্ষায় বসিয়া ছিলেন তখন আমি গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কবিতাটি তাঁহার হাতে দিলাম।

বিস্মিত হই। তিনি বলিলেন, "তুমি! এতক্ষণ কোথায় ছিলে? আমি যে তোমাকেই খুঁজছিলাম!!"

"আমি বসেছিলাম সকলের পিছনে।"

"তোমাকে আর পারিনে, দাদু। আজ সন্ধ্যেবেলায় আমার বাড়ীতে যেও। কবিতাটা নিজে পড়িয়ে শুনিয়ো।"

সন্ধ্যায় গিয়া দেখি, তখনও কলিকাতা হইতে আগত বিদ্বদ্গণের সহিত তাঁহার নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হইতেছে। আমার সহিত তিনি তাঁহাদের পরিচয় করাইয়া দিলেন। তাঁহারা বিদায় গ্রহণ করিলে পর সাহানা মহাশয় তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে সাত-খানির প্রত্যেকটিতে উপহার-সূচক বাক্য লিখিয়া এবং স্বাক্ষর করিয়া আমায় উপহার দিলেন। তার পর বলিলেন, "কই, তোমার কবিতা পড়।" বাঁধানো কবিতাটা পাশেই দেওয়ালে ঝুলিতেছিল। পড়িলাম—

"ভোগেরে বাজায়ে নিত্য ত্যাগের বীণায়,
ধনেরে বাঁধিয়া সদা জ্ঞানের শৃঙ্খলে,
ঐশ্বর্যেরে সিক্ত করি' মাধুর্য-কণায়
সত্যেরে সেবিছ তুমি, স্বদেশ-মঙ্গলে।
কাব্যলোকে কভু তব স্বচ্ছন্দ বিহার,
শাস্ত্রের সমুদ্র কভু করিছ মন্থন,
দৃপ্ত কণ্ঠে তব রাষ্ট্রনীতির বিচার
ছিন্ন করে মূঢ়তার দুশ্ছেদ্য বন্ধন।
ভারতীর বরপুত্র ইন্দিরার ক্রোড়ে
সযত্নে লালিত পঞ্চ-অশীতি বৎসর;
সিদ্ধকাম হে রাজর্ষি, প্রণিপাত করে
প্রজ্ঞামুগ্ধ ভক্ত তব, সভক্তি-অন্তর;
জ্ঞানযোগী যোগেশের বিয়োগের পরে
তুমি আছ, সত্যসন্ধ, হে সত্যকিঙ্কর!!

কবিতা শুনিবার পর পাশে বসাইয়া আমার কাঁধে হাত রাখিয়া জীবনের অনেক কথা বলিয়া গেলেন। রাত্রি গভীর হইতেছিল, প্রণাম করিয়া বিদায় লইলাম। তখন ভাবি নাই, এই শেষ বিদায়!

ইহার পরেও তাঁহার বহু পত্র পাইয়াছি—প্রত্যেক পত্র জ্ঞানগর্ভ উপদেশে পরিপূর্ণ। কিন্তু আর সঙ্গলাভের সৌভাগ্য হয় নাই। এ বৎসর বিজয়ার প্রণাম জানাইয়া পত্র লিখিয়া উত্তরের অপেক্ষা করিতেছিলাম; সহসা একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁহার পুত্রগণের এক পত্র তাঁহার মহাপ্রয়াণের দুঃসহ সংবাদ বহন করিয়া আনিল। সদানন্দময় পুরুষ তাঁহার মর্তধামের 'আনন্দকুটির' পরিত্যাগ করিয়া চিরানন্দধামে প্রয়াণ করিলেন। আজ বেদনাহত চিত্তে কেবল ভাবিতেছি, বাঁকুড়ার মনীষা-গগন যে প্রায় জ্যোতিষ্কহীন হইয়া গেল!!

রূপজ
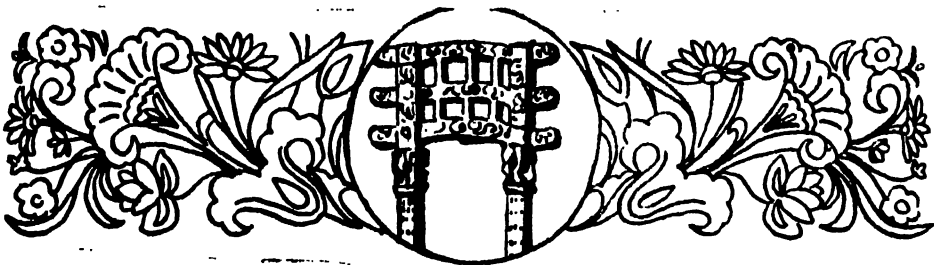
(পুরস্কার-প্রাপ্ত গল্প)

শ্রীহেনা হালদার

ওরা বেড়াতে বেরিয়েছে পশ্চিমে। সুগতা আর মল্লিনাথ। নতুন বিয়ে হয়েছে ওদের। কলকাতার কোলাহল আর সংসারের কলরবকে পেছনে ফেলে এসেছে ওরা জব্বলপুরে, মল্লিনাথের মাসতুতো বৌদি এলার কাছে। দিনগুলো একটার পর একটা রঙীন স্বপ্নের মত কেটে যাচ্ছে। সুগতার রূপ সম্বন্ধে বিধাতার বাড়াবাড়িটাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে মল্লিনাথের শিল্পী-মানস। বর্ণে আর বর্ণনায়। মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে ওঠে সুগতা, হয়ে ওঠে বিব্রত লজ্জিত। সকলের মাঝে বসেই মল্লিনাথ পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে সুগতার রূপের ব্যাখ্যায়। উপমা আর উক্তির মুক্তা আহরণ করে বৈষ্ণব-কাব্য মন্থন করে। লাল হয়ে ওঠে সুগতা, কখনও রাগে কখনও লজ্জায়। সুখ যে একেবারেই পায় না তা নয়। তবু ওর মনে হয় বড্ড বাড়াবাড়ি করছে মল্লিনাথ।

এলা বৌদি ওদের কাণ্ড দেখে হাসতে থাকেন। ঠাট্টা-তামাসাও করেন মাঝে মাঝে। কখনও বা গম্ভীর হয়ে ওঠেন। মল্লিনাথের মাসতুতো দাদা জব্বলপুরের গান ক্যারেজ ফ্যাক্টরীতে এ্যাসিস্টাণ্ট ফোরম্যান। ওদের দুটি ছেলেমেয়ে রঞ্জু আর মঞ্জু ক্রাইষ্ট চার্চ্চ স্কুলে পড়ে। এলা বৌদি দেখতে সাধারণ। ওর স্বামী দিবানাথ সুপুরুষ। ছেলে রঞ্জু হয়েছে বাপের মত সুদর্শন। মঞ্জু কালো। দেখতেও মায়ের মতন।

মল্লিনাথ এলা বৌদিকে হাসতে হাসতে বলে, 'বৌদি তোমার মেয়েটি যদি ছেলে হ'ত আর ছেলেটি হ'ত মেয়ে তবে কিন্তু অনেক ভালো হ'ত।'

এলা বৌদি বলেন, 'না ভাই যা হয়েছে তাই সবচেয়ে ভালো। মেয়েদের বেশী রূপ থাকা ভালো নয়, বড় দুঃখ পায় তাতে।'

মল্লিনাথ হেসে ওঠে সশব্দে। বলে, 'তুমি কি সত্যিই একথা বিশ্বাস কর বৌদি না নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছ এই সব বলে? অদ্ভুত থিয়োরী ত তোমার!'

এলা বৌদি বলেন, 'না ভাই, এ আমার বিশ্বাস। আর এর একাধিক প্রমাণ ছড়ান রয়েছে রামায়ণে, মহাভারতে, পুরাণে, ইতিহাসে। সীতা, দময়ন্তী, উর্ম্মিলা থেকে নিয়ে দ্রৌপদী, অহল্যা, তারা, মন্দোদরী সকলেই রূপের সর্ব্বনাশে জ্বলেছেন। ইতিহাসেও পদ্মিনীর, কৃষ্ণকুমারীর ট্র্যাজিডির জলন্ত নিদর্শন। আর শুধু ভারতবর্ষেই নয় পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আছে কত সে প্রমাণ তা তুমিও স্বীকার করবে।'

—'কিন্তু এ সব ত সবই মানুষের কল্পনা হতে পারে বৌদি, প্রত্যেকটি দুর্ঘটনার অন্য কারণ থাকাও সম্ভব নয় কি?' বললে মল্লিনাথ।

—'না ভাই শুধু কবিকথন নয়। কুন্দনন্দিনী-বিনোদিনী-কিরণময়ীদের দুঃখের ইতিহাসই নয়, আমার নিজের চোখে দেখা এক অপরূপ রূপসী মেয়ের মর্ম্মন্তুদ দুঃখের কাহিনীও আছে। ললিতা প্রিয়দর্শিনীর গল্প শুনলে তোমাকে স্বীকার করতেই হবে আমার থিয়োরী ভুল নয়।'

—'তবে শোনাও সেই অলৌকিক কাহিনী।' হাসতে হাসতে বলে মল্লিনাথ। সুগতাও এসে বসে গল্প শোনার লোভে।

এলা বৌদি বলতে আরম্ভ করেন। আর বলতে বলতে তন্ময় হয়ে ডুবে যান স্মৃতির রোমন্থনে:

—তখন অহল্যার মত সদ্যঃ ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে মধ্যপ্রদেশের এই পাহাড়ী শহর। তার ধমনীতে রক্তস্রোত চঞ্চল হয়ে উঠেছে বিচিত্র স্পন্দনে। শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য নিয়ে আশ্রম-বালিকার মত যে পড়েছিল লোকচক্ষুর অন্তরালে, হঠাৎ যেন তার মুখে পড়েছে স্পট-লাইটের ফোকাস্। অনেকগুলো সরকারী-বেসরকারী কলেজ, স্কুল, হাসপাতাল আর সিনেমার মনোরম রূপসজ্জায় রূপসী সেজে এসেছে সে। তার শ্যামল দেহ ঘিরে চড়েছে গ্ল্যামরের সোনার জল। বিরাট পরিকল্পনা নিয়ে উদ্বাটিত হয়েছে মধ্যপ্রদেশের একমাত্র মেডিকেল কলেজ, নবনির্ম্মিত ত্রিতল সৌধ।

এই কলেজ আর হাসপাতাল এ শহরের নবতম বিস্ময় আর গৌরব। আর সেই বিস্ময়বোধকেও ম্লান ক'রে দিয়ে এল এখানকার ফিমেল ওয়ার্ডের নার্স ললিতা প্রিয়দর্শিনী। নাম যেন তার রূপের অভিধা। ছায়াচিত্রের নায়িকা হবার মত রূপ নিয়ে কিনা হ'ল সে হাসপাতালের নার্স। অল্প সময়ের মধ্যে সারা শহরে ছড়িয়ে

পড়লো ওর রূপের খ্যাতি আগুনের মত। আর আগুন ধরিয়ে দিলে অনেকের বুকে।

ললিতা প্রিয়দর্শিনীর বাবা ছিলেন দক্ষিণ-ভারতীয়, মা ইহুদী। ললিতা হয়েছিল তার মায়ের মতই সুন্দরী। ওর জন্মের মাত্র পাঁচ বছর পরেই ওর বাবা আর মা মারা যান বাড়ীতে আগুন লেগে। ললিতাকে বাঁচিয়ে নেন এক ক্রিশ্চান পাদ্রী। মাদ্রাজে এক মিশনারী অর্ফানেজে মানুষ হ'ল সে। আর বড় হয়ে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করলে সে খ্রীষ্টান ধর্ম্মমত। মিশনারীদের সাহায্যে সে ম্যাট্রিক পাস করেছিল আর নার্সিংয়ের ট্রেনিংও নিয়েছিল। তার পর তাঁদেরই চেষ্টায় কেমন করে যেন এসে পড়েছিল এই সুদূর মধ্যপ্রদেশের হাসপাতালে হেড নার্স হয়ে। এখানকার মাইনে ছিল কিছু বেশী, তা ছাড়া কোয়ার্টার ও খাওয়া ফ্রি।

বছরখানেক এই হাসপাতালে ভালই কাটলো ললিতার। ডাক্তারেরা সকলেই ওর কাজের প্রশংসা করতেন। কয়েকজন তরুণ ডাক্তারের দৃষ্টিও যে ওর ওপর পড়েনি তা নয়। তা ছাড়া মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা ত ছিলই। ও কাউকে আমল দিত না। সে বছরই আমার রঞ্জু হ'ল। সিজারিয়ন-কেস বলে মেডিকেল কলেজের হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হ'ল আমাকে। বিলেত ফেরত ধাত্রীবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ ডাক্তার চিত্রেশ নাটেকরের হাতেই ছিলাম। ডাক্তার নাটেকর নাগপুর থেকে বদলী হয়ে এসেছেন। মেডিকেল কলেজেও ক্লাশ নেন। লম্বা-চওড়া সুদর্শন পুরুষ। জাতে মহারাষ্ট্রীয়। পুণার কোন বিখ্যাত পরিবারে জন্ম। শিবাজীর বংশধারার সঙ্গে যাদের নাম যুক্ত। আভিজাত্যের অহঙ্কার ওদের জন্মগত। চিত্রেশ নাটেকরের বাবা দামোদর বালকৃষ্ণ নাটেকরের পুণা-আহেমেদাবাদে বিরাট বস্ত্র ব্যবসায়। একটা মিলেরও মালিক। চিত্রেশ ওঁর একমাত্র সন্তান। ছেলেবেলা থেকেই ছেলের মধ্যে ললিতকলানুরাগ ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল তাঁর মনে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও চিত্রকলায় পারদর্শী হওয়া সত্ত্বেও তাই দামোদর ছেলেকে জোর করে ডাক্তারী পড়িয়েছিলেন বোম্বাইয়ের মেডিকেল কলেজে। তার পর বিলাত ঘুরিয়ে এনে তাকে চাকরিতে প্রতিষ্ঠিত করে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। ছেলের উড়ু উড়ু ভাব দেখে অল্প বয়সেই বিয়ে দিয়েছিলেন মনের মত মেয়ের সঙ্গে। অভিজাত বংশেরই মেয়ে ছিল অনসূয়া। রূপের চেয়ে বড় ছিল যার বংশপরিচয়, লাবণ্যের চেয়ে বড় ছিল যার স্বাস্থ্য। কিন্তু সাদা জলে পিপাসা মেটেনি শিল্পী চিত্রেশের, নেশা ধরেনি রক্তে। তাই নাগপুর থেকে বদলী হয়ে এখানকার হাসপাতালে এসে ললিতাকে দেখে অভিভূত হয়ে গেল তার শিল্প-চেতনা। ছাই-চাপা আগুন জ্বলে উঠল লেলিহান শিখায়! দোলা লাগল তার পৃথিবীতে, আর তারই ধাক্কায় ধ্বসে গেল দামোদরের এত দিনকার বহু সাবধানে, বহু যত্নে গড়ে-তোলা সোনার সংসার। শিল্পী চিত্রেশের দুই চোখের সমস্ত বিস্ময়কে সীমাহীন করে কামনাকে আকুল করে তুললে ললিতা প্রিয়দর্শিনীর আশ্চর্য্য রূপ।

পদে পদে মনে মনে তুলনা করতে লাগল সে অনসূয়ার সাদামাটা চেহারা আর লাবণ্যলীলাহীন ব্যবহারের সঙ্গে ললিতা প্রিয়দর্শিনীর মোহময় ব্যঞ্জনার। আর দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষায় দুর্বোধ্য অসন্তোষে ভরে উঠতে লাগল ওর দিন-রজনীর অবসর।

হাসপাতালের একই বিভাগে ছিল ওদের কাজ। তাই অনবরতই মুখোমুখি পড়তে হ'ত দু'জনকে। কখনও বা রাত কাটাতে হ'ত কোন রোগীর রোগশয্যার পাশে পাশাপাশি। তখন একজনের চোখে জ্বলত উজ্জ্বল কামনা, অন্য জনের মুখে ছড়াত লজ্জার আবির।

একান্ত ঘরোয়া মেয়ে অনসূয়ার মধ্যে চিত্রেশ না পেয়েছিল রস, না রহস্য। রূপের রূপোর কাঠি ছুঁইয়ে ঘুম ভাঙাতে পারেনি তার বত্রিশ বছরের যৌবনের। তাই ললিতা প্রিয়দর্শিনীর অপরূপ মুখ আর অজন্তার মত দেহশ্রী উদ্‌ভ্রান্ত করে তুললে চিত্রেশের সংযম-সাধনা। আর সেই মত্ততার ঢেউয়ে অনসূয়া গেল হেরে, গেল হারিয়ে।

ওদের প্রেম বেশী দিন চাপা রইল না। হাসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষ এই তরুণ চিকিৎসককে কিছুই বললেন না, কিন্তু তুচ্ছ পতঙ্গের অগ্নিতৃষ্ণাকে করতে পারলেন না ক্ষমা। চাকরি গেল ললিতার। আর সেই সুযোগে শহরের কতকগুলো বাজে ছেলে ভীষণ উত্যক্ত করতে লাগল ওকে। নতুন সহরের নতুন পরিবেশে বিপদজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে যেন দিশেহারা হয়ে পড়ল মেয়েটা। আমার সঙ্গে তখন বেশ হৃদ্যতা গড়ে উঠেছে ললিতার। একমাত্র আমার কাছেই সে সহজে আসত আর অসঙ্কোচে বলত সব কথা। তোমার দাদার অমত থাকা সত্ত্বেও সে সময়ে আমিই ওকে আশ্রয় দিলাম আমাদের বাড়ীতে। আশেপাশের সব বাড়ীগুলোর গৃহিণীরা এ নিয়ে আমার ওপর খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে উঠলেন, আমি গ্রাহ্য করলাম না। কিন্তু চিত্রেশই এ সময় এক অভাবনীয় কাণ্ড করে বসল। চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে সে ললিতাকে বিয়ে করার জন্তে উৎসাহিত হয়ে উঠল, সমস্ত

নিন্দা, কলঙ্ক, জনমতকে অগ্রাহ্য ক'রে। পুণায় সে অনসূয়ার কাছে ডাইভোর্সের প্রস্তাব নিয়ে চিঠি লিখলে। সারা শহর এই মুখরোচক রোমান্সের কাহিনী নিয়ে তোলপাড় করে উঠল। অনসূয়া ডাইভোর্স দিতে স্বীকৃত হ'ল না। উপরন্তু দামোদর নাটেকর অগ্নিমূর্ত্তিতে এসে উপস্থিত হলেন হঠাৎ। ভালোকথায় বুঝিয়ে, চোখের জলে মিনতি ক'রে, বংশগৌরবের দুরপনেয় কলঙ্কের ভয় দেখিয়ে, সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার প্রতিজ্ঞা করেও তিনি টলাতে পারলেন না চিত্রেশকে। অনেক অভিশাপ বর্ষণ ক'রে তিনি ফিরে গেলেন পুণায়। আর তার কয়েকদিন পরেই ললিতাকে নিয়ে চিত্রেশ এ শহর ছেড়ে, কে জানে কোথায়, চলে গেল।

এতটা শোনবার পর মল্লিনাথ সকৌতুকে বলে উঠল, 'যতই কৌতূহলোদ্দীপক ক'রে বলুন না কেন বৌদি, কাহিনীতে নতুনত্ব নেই। ভালবাসার গৌরবে চিত্রেশ নাটকের ডিউক অব উইণ্ডসর হতে পারে, কিন্তু ললিতা প্রিয়দর্শিনীর রূপই তার সুখের কারণ বৌদি, দুঃখের নয়।'

এলা বৌদি বিষণ্ণ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন। বললেন, 'নতুনত্ব আছে বৈ কি ভাই, আগে সবটা শোনো।'—ললিতা আর চিত্রেশ এ শহর ছেড়ে জগদল্-পুরে চলে গেল। চিত্রেশ সেখানের হাসপাতালে চাকরি পেয়েছিল এক বন্ধুর সৌজন্যে। বিয়ে ওদের কোন্ মতানুসারে হয়েছিল বলতে পারব না। তবে জগদলপুরে ওরা অত্যন্ত মিশুকে, আলাপী ও জনপ্রিয় দম্পতি বলে অভিহিত হ'ল।

সেই সময় ললিতা প্রিয়দর্শিনী তার ছোট্ট সংসারকে ঘিরে রূপে রসে বর্ণে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। তার রূপ যেন ভাদ্রের ভরানদীর অত্যন্ত পুরোনো উপমাকেই মনে পড়িয়ে দিত। আর শিল্পী চিত্রেশ সেই রূপ-সাগরে ডুব দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে অরূপ-রতন আবিষ্কার ক'রে মুগ্ধ হয়ে যেত। ইচ্ছা নিয়ে তৃষ্ণা নিয়ে, আবেগে আর আবেশে বিহ্বল হয়ে পান করত সে ললিতার মাধুরী-মদিরা।

মাঝে মাঝে ললিতা তাকে বলত, 'তুমি আমার রূপটাকে বড় বেশী বাড়াও চিত্রেশ, ওর বাইরে আমার অস্তিত্বকেও যেন স্বীকার কর না তুমি। আমার ভয় হয় চিত্রেশ, যেদিন রূপে আমার ভাঁটা পড়বে সেদিন তোমার ভালোবাসারও নৌকাডুবি হবে।'

ললিতার লতান গোলাপের মত মঞ্জুদেহলতাকে বুকে জড়িয়ে চিত্রেশ বলত, 'তুমি আর তোমার রূপ কি আলাদা ললিতা, যে, তুমি নিজেই নিজের সৌন্দর্য্যকে ঈর্ষা করছ?'

ললিতাও হাসত। বলত, 'বহিরঙ্গের জৌলুষ যেখানে অন্তরঙ্গের বাধা রচনা করে সেখানে ঈর্ষা ত' হবেই। শেষ পর্য্যন্ত এই রূপ-ই আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হবে না ত'?'

চিত্রেশ ওকে আদরে আদরে বিভ্রান্ত করে বলত, 'সীমার মাঝেই বাজে অসীমের সুর! রূপের মধ্যেই পাই অপরূপকে! দেহের মধ্যেই পেয়েছি তোমার বৈদেহী আত্মাকে! রূপকে অবহেলা ক'র না ললিতা। রূপ তুচ্ছ করার জিনিস নয়।'

ললিতা হাসতে হাসতে বলত, 'রূপ হারালে হয় ত' তোমাকেও হারাব, কাজেই ওটাকে অবহেলা করার সাধ্য আমার নেই।'

এই সব কথা আমি অনেক পরে শুনেছি, ললিতারই মুখ থেকে। কিন্তু মধুরের সাধনায় হ'ল না ওদের প্রহর শেষ, একদিন মধুরের ঘটল অবসান। সে এক অকল্পনীয় দুর্ঘটনা।

ওদের বিয়ের চতুর্থ বছরের শেষের দিকে, ললিতা তখন অন্তঃসত্ত্বা, হঠাৎ ললিতার হাত পা মুখ ফুলতে আরম্ভ করল। এ রকম অনেক গর্ভিণী মেয়েরই হয়ে থাকে ভেবে গ্রাহ্য করলে না ওরা। তারপর ললিতার একটি আশ্চর্য্য সুন্দর মেয়ে হ'ল। কিন্তু মেয়ে হবার পর থেকেই ললিতার দেহের স্ফীতি আশ্চর্য্য দ্রুত গতিতে বেড়ে যেতে লাগল। প্রথম প্রথম চিত্রেশ এটাকে মেয়েদের স্বাভাবিক স্থূলতা মনে করে ঠাট্টা করে বলত, 'ওগো ললিতা, খাওয়া না কমালে বেশী দিন আর প্রিয়-দর্শিনী থাকবে না, তুমি সাবধান হও, সাবধান হও।'

ললিতাও পাল্টা জবাব দিত, 'আমি আর প্রিয়দর্শিনী নই ত' এখন আমি মিসেস নাটেকর।'

কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল, ললিতার দেহ ততই বিশাল আকার ধারণ করতে লাগল। শরীরের সমস্ত কাঠামোটাই যেন চার-পাঁচ গুণ বড় হয়ে উঠলো। তা ছাড়া তার মসৃণ কোমল ত্বক্ বিশ্রী লোমশ ও কণ্ঠস্বর মোটা ও খসখসে হয়ে গেল।

এবার ভয় পেলে চিত্রেশ। নিজে সে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে অজ্ঞ নয়, তাই মেডিকেল জার্ণাল ঘেঁটে রোগ নির্ণয় না করতে পেরে যতই তার ভয় বাড়ল ততই দুশ্চিন্তা। যত উদ্বেগ তত অশান্তি। শহরের বিশিষ্ট চিকিৎসকদের পরামর্শ নিলে সে। রক্ত পরীক্ষা, এক্স-রে কোন কিছুরই ত্রুটি করলে না। তার পর সুরু হ'ল ছুটোছুটি। ছোট ডাক্তার থেকে মাঝারি, মাঝারি থেকে বড়। বিশিষ্ট থেকে বিশেষজ্ঞ। লম্বা ছুটি নিয়ে দিল্লী,
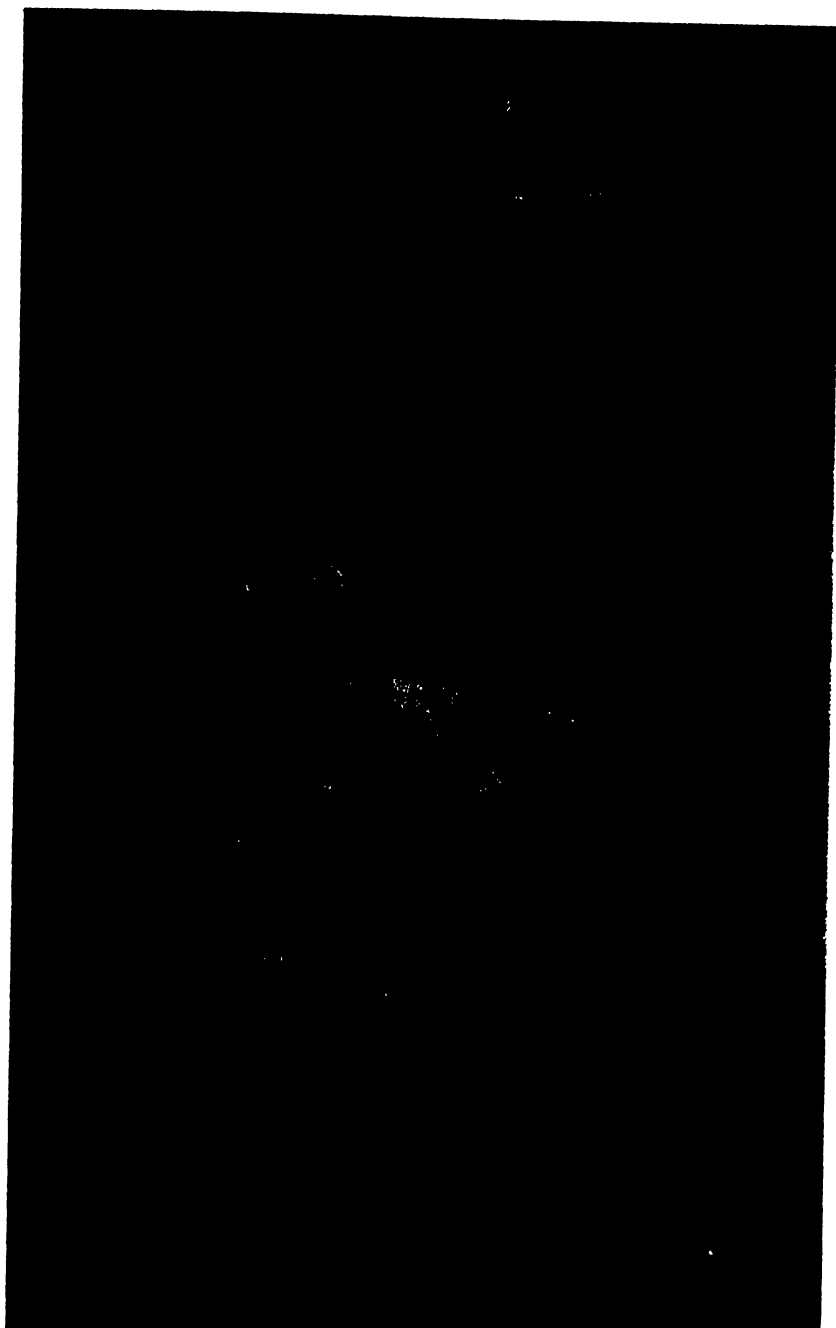
থার্ডক্লাস বন্দী

থার্ডক্লাস বন্দী

শ্রীকানু দেশাই

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

(প্রবাসী [illegible], পৌষ সংখ্যা হইতে পুনর্মুদ্রিত)

নবদ্বীপ বঙ্গবাণীর শ্রীঅরবিন্দের স্মৃতিমন্দির

ঝিকিমিকি

ফটো : শ্রীবিমলকুমার সরকার

বোম্বাই, কলকাতার অক্লান্ত পরিক্রমা। কিন্তু সবই ব্যর্থ। ললিতা প্রিয়দর্শিনী তত দিনে এক বীভৎস স্থূল মাংসের স্তূপে পরিণত হয়েছে। আর লম্বায়-চওড়ায় তার বিরাট্ দেহ যে কোন পালোয়ান পুরুষকেও বোধ হয় লজ্জা দিতে পারে। ললিতা প্রিয়দর্শিনী নাম বিধাতার এক উচ্চাঙ্গের পরিহাসের নমুনায় পর্য্যবসিত হয়েছে।

লজ্জায় মুখ খুলতে পারে না ললিতা। পারে না চোখ তুলতে। সব শঙ্কা আর সংশয়ের সীমান্তে পৌঁছেছে সে। এখন শুধু নিশ্ছিদ্র অন্ধকার আর নিরবচ্ছিন্ন হতাশায় ভরে উঠেছে ওর দিগন্ত, ওর অন্তর, ওর জগৎ আর জীবন। চিকিৎসকেরা একমত হয়ে রায় দিয়েছেন রোগের নাম এ্যাক্রোমেগালি। পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ডের অতিরিক্ত ক্ষরণই এ রোগের অন্যতম কারণ। তবে সুনির্দ্দিষ্ট কারণ বা চিকিৎসা-পদ্ধতি এখন পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি চিকিৎসা-বিজ্ঞানে। ইহুদীরাই নাকি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আক্রান্ত হয় এই রোগে। আর পুরুষের চেয়ে মেয়েরাই বেশী। এ্যাক্রোমেগালি বংশানুক্রমিক ভাবে সংক্রামক কি না এ বিষয়েও তাঁরা নিঃসন্দেহ হতে পারেন নি, তবে হেরেডিটারী হওয়াও আশ্চর্য্য নয়। রোগমুক্তির ক্ষীণ আশা নিয়ে একজন বিশেষজ্ঞ অস্ত্রোপচারও করলেন। কিন্তু মেয়েটার এমন অদৃষ্ট যে, কোনই ফল হ'ল না।

চিত্রেশ তখনো যেন আশা ছাড়েনি। তার নিষ্ঠা, তার অক্লান্ত সেবা আর যত্ন দেখে বন্ধু-বান্ধব সকলেই ধন্যধন্য করতে লাগলো। কিন্তু ললিতার আর বুঝতে বাকী রইল না যে, তার কপাল ভেঙেছে। তখন তার শরীর থেকে নিঃশেষে রূপ অন্তর্হিত—রূপান্তরিত। হাতীর দাঁতের মত গায়ের রং লোমে ঢেকেছে, অমন ক্ল্যাসিক্ মুখাবয়ব বীভৎস স্থূল, আর নিখুঁৎ অজন্তা-টাইলের তনুশ্রী হারিয়ে গেছে বিশাল এলিফেণ্টা কেভ্‌সের ধ্বংসস্তূপে।

ললিতা বুঝতে পারে যে, কবি শিল্পী প্রেমিক চিত্রেশ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তার দিক থেকে। এখন শুধু পড়ে আছে স্বামী চিত্রেশের কর্ত্তব্যবোধ আর বিবেক। ডাক্তার নাটেকরের অধ্যবসায় আর অনুসন্ধিৎসা। ডাক্তার চিত্রেশ পাগলের মত চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অন্ধিসন্ধি হাঁৎড়ে বেড়াচ্ছে এ রোগের বিশল্যকরণীর সন্ধানে। সকলের চোখে তার ঐকান্তিক সাধনা সম্ভ্রম জাগায়। শুধু ললিতার মনে জাগে বিপুল বিতৃষ্ণা বিরূপ সমালোচনা।

রূপের স্বর্গ থেকে বিদায় নিয়েছে শিল্পী, এখন শুধু রোগের উপসর্গ নিয়ে গবেষণার পালা চিকিৎসকের। এক সীমাহীন যন্ত্রণায় ছট্‌ফটিয়ে ওঠে ললিতা প্রিয়দর্শিনী। ফেটে পড়ে অকারণ কঠিন ভর্ৎসনায়, প্রবল প্রতিবাদে, দুর্ব্বোধ্য রূঢ়তায়।

প্রেম তার কাছে আজ সুন্দর মরীচিকা, জীবন অনন্ত বিভীষিকা। বৃথাই খোঁজে সে চিত্রেশের চোখে দেহজ-কামনার অধীরতা, রূপজ-মোহের মদিরতা! আকাঙ্ক্ষার আলো সেখানে চিরদিনের মত নিভে গেছে। কোথায় গেল সেই দুরন্ত কামনা? সেই অফুরন্ত পিপাসা? ভালবাসার কবরের তলায় শুধু পাণ্ডুর শীতলতা—শুধু পুরোণো স্মৃতির কঙ্কাল। মৃত্যুময় তিমিরাচ্ছন্ন ভবিষ্যৎ শুধু ভয়ের ছবি এঁকে যায় জীবনের আর্টপ্লেটে। রক্তের গভীর স্রোতে তীব্র সুখ, তীব্র ব্যথার আরোহ অবরোহে বাজে না। শুধু গভীর হতাশা—অপার শূন্যতা!

ললিতা বার বার বলে, হে ঈশ্বর ও কেন আমায় ঘৃণা করে না, বাক্য যন্ত্রণায় ছিন্ন-ভিন্ন ক'রে দেয় না। সে-ও ভাল, সে-ও ঢের ভাল। কিন্তু ওর চোখের ঐ অনির্ব্বাণ অনুসন্ধিৎসা আমি আর সহ্য করতে পারি না। আমি ওর প্রেম নই, প্রিয়া নই, নই ওর স্ত্রী। আমি যেন শুধু ওর এক্সপেরিমেণ্ট-এর অবজেক্ট—ওর ল্যাবরেটরীর ইঁদুর কি গিনিপিগ্! থীসিসের উপকরণ। ওর চোখে কই সমবেদনা? মমতা কই সেখানে? সেখানে শুধু জ্বলে ওঠে ঔৎসুক্য। শব-সাধনার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা! ওর স্পর্শে ঘৃণায় শিটিয়ে ওঠে ললিতার দেহ। ও কি পাগল হয়ে যাবে? এর চেয়ে ওকে বিষ দিচ্ছে না কেন চিত্রেশ? বীভৎস দেহের লজ্জা দিয়ে দিনরাত্রির অসহ্য যন্ত্রণাকে মুড়ে, কত দিন আর সে প্রতীক্ষা করে থাকবে এ নাটকের শেষ দৃশ্যের জন্যে?

দিনে দিনে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হয় তার। যেখানে ছিল নির্ভয়তা, নির্ভরতা সেখানে জমতে থাকে সংশয়ের গ্লানি। ভালবাসার মধুর দিনগুলি সন্দেহে বিধুর হয়ে ওঠে।

রূপের পূজারী চিত্রেশ সে রূপতৃষ্ণা অন্য কোথাও মিটিয়ে নিচ্ছে এই বিশ্বাস নিয়ে নিরন্তর ছট্‌ফট্ করে সে। আর সামান্যতম সুযোগ পেলেই তাই নিয়ে খিটিমিটি বাধিয়ে উত্ত্যক্ত করে তোলে চিত্রেশকে। সে বেচারার হাসপাতালের কাজে নার্সদের সঙ্গে কথা বলা কিংবা অল্প-বয়সী রোগিণীদের বাড়ী যাওয়া দুর্ঘট হয়ে উঠলো ক্রমে। যে কোন মেয়ের দিকে তাকালে, কি কথা বললে, আর রক্ষা থাকে না। নিয়তির মত কুটিল চক্রান্ত নিয়ে নিয়ত ওকে অনুসরণ করে ফেরে একদা-পাগলকরা দুটি চোখের নির্ম্মম দৃষ্টি। তবু ওকে ছাড়তে পারে না চিত্রেশ। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল একদিন। স্পষ্ট হয়ে উঠল ললিতার মস্তিষ্ক-বিকৃতির নিদর্শন। ওকে জোর করে

পাঠাতে হ'ল নাগপুরের মেণ্টাল হোমে। তার পর হঠাৎ কোথায় যে চলে গেল চিত্রেশ নাটেকর, আজ পর্য্যন্ত তার কোন খবর পাইনি। মেয়েটিকে সে সঙ্গে নিয়ে যায় নি। ললিতার মেয়ে ললিতার মতই আশ্চর্য্য রূপ নিয়ে একটা অর্ফানেজে মানুষ হচ্ছে। তার কপালে আবার কী আছে কে জানে।'

এলা বৌদি চুপ করলেন। ললিতা প্রিয়দর্শিনীর জন্ত ব্যথায় সকলের মন ভারী হয়ে উঠেছে। তর্কপ্রিয় মল্লিনাথও আর কোন প্রশ্ন না তুলে দূরদিগন্তের দিকে তাকিয়ে রইল।

সন্ধ্যা আসন্ন।

ভুলের ফুলে পূজা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

জানি আমি আমার গানে
ছোট বড় ভুল আছে ঢের,
ভেবেছিলাম বদলে দেবো,—
রেখে দিলাম যা ছিল ফের।
বামা ক্ষেপা ও গান শুনে,
কি আনন্দ পেলেন মনে!
ঝরে ছিল গণ্ড বেয়ে—
অশ্রু তাহার দু নয়নের।

২

শালুক ফুলেই পূজা দিলাম—
এখন কোথা পদ্ম পাবো?
আদর করে হাতেই নিলেন
হেসেই তাহা পদ্মনাভ।
আমার পূজা পূর্ণ হলো।
ত্রুটি আবার কি রহিল?
ভুলের ফুলেই তুষ্ট প্রভু—
সে ফুল অবার কি বদলাবো?

৩

আমি 'পোড়ের ভাতের' লাগি—
জেলেছিলাম 'ঘুটে'র উতো,
প্রাণের হোমের দেবতা মোর
তাতেই হলেন আবিভূর্ত।
এতই কৃপা আমার প্রতি,
স্বয়ং দিলেন পূর্ণাহুতি
হ'ল আমার পর্ণ কুটীর
মণিকোঠা পুণ্যপূত।

৪

কথার ভুলে কি আসে যায়?
দেব দেবীরা ভাবগ্রাহী।
ভক্তি কোথায়? সজল চোখে
ব্যাকুল প্রাণে কেবল চাহি।
কাতর, ডাকি আমার মাকে,
হেরি যে মা বজলাকে
তাঁহার কনক আঁচল দিয়ে
অশ্রু মুছান জগন্মায়ি।

রবীন্দ্রসাহিত্যে ইব্‌সেনিজ্‌ম্‌

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

২

"ভালো মানুষ নইরে, মোরা ভালো মানুষ নই।" রবীন্দ্র-সাহিত্যের নায়ক-নায়িকারা কেউ নিছক ভালো মানুষ নয়। তাদের ভালোমানুষির মধ্যে একটা তেজ আছে। তারা শুধু ক্রোধকে জয় ক'রে শান্ত থাকে নি, ভয়কেও তারা পদানত করেছে। তারা শুধু অহিংস নয়, সত্যানুরাগীও বটে। অহিংসা পরম ধর্ম—এতে কোনো সন্দেহই নেই। কিন্তু যে-অহিংসার মধ্যে বীর্য্যের আগুন নেই, যার মধ্যে নেই পাপের নিবারণের চেষ্টা, তাকে ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতি খুব মূল্য দেয় নি। বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রে বারম্বার যে সত্যকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তা হোলো: 'যে ধর্ম্মরক্ষণে ও পাপের দমনে সক্ষম হইয়াও তাহা না করে, যে সেই পাপের সহকারী।' কৃষ্ণকে বঙ্কিম আদর্শ মানুষ বলেছেন। বলেছেন, Christian Ideal অপেক্ষা Hindu Ideal শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণচরিত্রে বঙ্কিম লিখেছেন: "পুনশ্চ, মনে কর, যদি ইহুদীরা রোমকের অত্যাচারপীড়িত হইয়া স্বাধীনতার জন্য উত্থিত হইয়া, যিশুকে সেনাপতিত্বে বরণ করিত, যিশু কি করিতেন? 'কাইসরের পাওনা কাইসরকে দাও' বলিয়া তিনি প্রস্থান করিতেন। কৃষ্ণও যুদ্ধে প্রবৃত্তিশূন্য—কিন্তু ধর্ম্মার্থ যুদ্ধও আছে। ধর্ম্মার্থ যুদ্ধ উপস্থিত হইলে অগত্যা প্রবৃত্ত হইতেন।" কিন্তু ধর্ম্ম কি? কৃষ্ণকৃত ধর্ম্মের লক্ষণ নির্দ্দেশ—"যদ্দারা প্রাণিগণের রক্ষা হয়, তাহাই ধর্ম্ম।" সত্য কি? যা ধর্ম্মানুমোদিত তাই সত্য। কৃষ্ণ লোকের হিতার্থে অর্জ্জুনকে গাণ্ডীব ধরালেন। জরাসন্ধবধও একই উদ্দেশ্যে। বঙ্কিমের ভাষায়, "জরাসন্ধ সম্রাট, কিন্তু তিমুরলঙ্গ বা প্রথম নেপোলিয়ানের ন্যায় অত্যাচারকারী সম্রাট্। পৃথিবী তাহার অত্যাচারে প্রপীড়িত।" জরাসন্ধবধের জন্য কৃষ্ণের যে পরামর্শদান, তার উদ্দেশ্য—"অত্যাচারপ্রপীড়িত ভারতবর্ষের হিত—সাধারণ লোকের হিত।" যাতে লোকহিত সাধিত হয় সে পরামর্শ দিতে কৃষ্ণ ধর্ম্মতঃ বাধ্য। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বত্রই আদর্শ ধার্ম্মিক।

রবিঠাকুর ভারতীয় সংস্কৃতিতে বঙ্কিমচন্দ্রের মতোই বিশ্বাসী। সুতরাং অহিংসার আদর্শে বিশ্বাসী হলেও তাঁর সে অহিংসা নিছক ন্যাদাটে ভালোমানুষী নয়। 'আমি তো কোন পাপ করছিনে, পরে করছে, আমার তাতে দোষ কি?' অনেক সাধু আছেন যাঁরা এই ভেবে দারুণ অন্যায়ের সামনেও নীরব থাকেন, নিশ্চিন্ত এবং নিষ্ক্রিয় থাকেন। বলাবাহুল্য, এই নীরব ঔদাসীন্যকে বঙ্কিমচন্দ্র যেমন ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখতে পারেন নি, তেমনি রবীন্দ্রনাথও নয়। সাধ্যমতো পাপনিবারণের চেষ্টা না করা যে অধর্ম্ম! এই তো ভারতবর্ষের আদর্শ মানুষ কৃষ্ণের কথা। এই কথাই তো 'কৃষ্ণচরিত্র' লিখে বঙ্কিম ঘায়ে ঘায়ে নব্যভারতের মর্ম্মের মধ্যে বসিয়ে দেবার চেষ্টা ক'রে গেছেন! আর রবিঠাকুরের লেখার মধ্যেও কি অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার এই পাঞ্চজন্য বেজে ওঠেনি? অত্যাচারকে, নর-দেবতার অসম্মানকে কোথাও কি তিনি ক্ষমা করেছেন? 'ক্ষমা সেথা ক্ষীণ দুর্ব্বলতা, হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা তোমার আদেশে'—এই তো রবিঠাকুরের কথা। রবিঠাকুরের সাহিত্যে নায়ক-নায়িকা যারা তারা তো শুধু ভালো মানুষ নয়—তারা শক্ত মানুষও। তারা নির্লোভ, তারা নির্ভীক, তারা সত্যের জন্যে, স্বাধীনতার জন্যে মরীয়া। তাদের কথা যোগাযোগের বিপ্রদাসের সেই কথা: "সর্ব্বনাশকে আমরা কোনো কালে ভয় করিনে, ভয় করি অসম্মানকে।"

সত্যের এবং স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামের যে বলিষ্ঠ সুর রবীন্দ্রনাথে, ইব্‌সেনেও তাই। ইব্‌সেনের নায়ক-নায়িকারা সত্যের এবং স্বাধীনতার জন্যে মরীয়া হতে জানে। তাদের সাধুত্বের ধার আছে অর্থাৎ তারা কেউ ভোঁতা ভালো মানুষ নয়। Pillars of Societyতে বার্ণিক (Bernick) বলছে লোনাকে (Lona):

"It is you women that are the Pillars of Society."

বুদ্ধিমতী নারী তৎক্ষণাৎ বার্ণিকের ভুল ভেঙে দিয়ে বলেছে:

You have learnt a poor sort of wisdom, then, brother-in-law. No, my friend; the spirit of truth and the spirit of freedom—they are the Pillars of Society.

. আদর্শ সমাজের স্তম্ভ হবে সত্য আর স্বাধীনতা। পুরাতন যুগের প্রেতাত্মার উপদ্রবকে ইবসেন্ আদৌ সহ্য করতে পারেন নি। জনতা যখন বার্ণিকের কাছে অর্ঘ্য নিবেদন করতে এলো তখন সেই উল্লসিত জনতাকে সম্বোধন ক'রে বার্ণিক বলছে :

The old era—with its affectation, its hypocrisy and its emptiness, its pretence of virtue and its miserable fear of public opinion—shall be for us like a museum, open for purposes of instruction.

যে-যুগ গত হয়ে গেছে, যে-যুগ পুরাতনের পর্য্যায়ে—তাকে আমরা দেখবো সেই চোখে যে-চোখে আমরা এখন যাদুঘর দেখি। আমাদের দৃষ্টিতে মৃত অতীত তার কপটতার এবং ভীরুতার কঙ্কালরাশি নিয়ে হয়ে থাকবে একটা যাদুঘরের সামিল। সেই মিউজিয়ামে আমরা রেখে দেবো আমাদের মত মর্চ্চে-ধরা শ্যাওলা-ঢাকা ছাতা-পড়া রীতি-নীতিগুলিকে।

Pillars of Societyতে বার্ণিকের যে-চরিত্র এঁকেছেন, ইব্সেন্—বিশ্বসাহিত্যে সেই চরিত্রের জুড়ি মেলা ভার। বার্ণিক অভিজাত-বংশের ছেলে। বিদেশের মুক্ত জগতের আবহাওয়ায় অনেক দিন সে কাটিয়েছে। দেশে ফিরে এসে দেখে মা রোগশয্যায়। যার উপর ছিল বিষয় দেখবার ভার। ব্যবসা প্রায় শিকেয় উঠেছে। তিন পুরুষ ধরে যে-বংশের এত হাঁক-ডাক সেই বংশ-গৌরব সর্ব্বনাশের মধ্যে ডুবে যাওয়ার মুখে। এমনি একটা পরিস্থিতির মধ্যে পরিবারের মর্য্যাদাকে যেন তেন-প্রকারেণ বাঁচানোর চিন্তা বার্ণিকের মনকে জুড়ে বসলো। টাকা হোয়ে দাঁড়ালো তার দিবসের চিন্তা, রাত্রির ধ্যান। আর কাঞ্চনের মোহ একবার কোনো মানুষকে পেয়ে বসলে তার ডুবতে কতক্ষণ? অর্থসঞ্চয়ের রাস্তা হোলো সেই রাস্তা, উপনিষদে যাকে বলা হয়েছে, 'যস্তাং মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ।' অর্থের মোহে বার্ণিকেরও নৈতিক-জীবনের সমাধি হোলো। মিথ্যায় মিথ্যায় আপনাকে সে কলঙ্কিত করেছে। সত্যভঙ্গের প্রথম অপরাধ করলো লোনার কাছে। বিদেশ থেকে লোনাকে-লেখা চিঠি-গুলিতে বার্ণিক প্রেমিকের ভাষায় তার অকুণ্ঠ ভালোবাসা নিবেদন করেছে। লোনা প্রতীক্ষায় ছিল, বার্ণিক ফিরে এসে তার পাণিগ্রহণ করবে। প্রেমাস্পদ ফিরে এলো কিন্তু মাল্যদান করলো লোনার ভগ্নী 'বেটি'র কণ্ঠে। বেটি ভাগ্যের জোরে তখন বহু অর্থের মালিক। এক নিকট আত্মীয়া তাকেই সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী ক'রে গেছে। বার্ণিকেরও টাকার তখন একান্ত প্রয়োজন। নইলে বংশের মানমর্য্যাদা সব যায়। লোনাকে বলি দিয়ে, সত্যকে জবাই ক'রে বার্ণিক বনেদীবংশের জয়ধ্বজাকে খাড়া রাখলো।

কিন্তু বেটিকে তো বার্ণিক ভালোবাসেনি; ভালো-বেসেছিল তার টাকাকে। লোনার প্রশ্নের জবাবে একথা সে স্বীকার করেছে। স্বীকারোক্তির ভাষা হচ্ছে :

I did not love Betty then; I did not break off my engagement with you because of any new attachment. It was entirely for the sake of the money. I needed it; I had to make sure of it.

বার্ণিকের অর্থলালসার যুপকাষ্ঠে দ্বিতীয় নারীবলি বেটি। বেটি যাকে ভালোবাসা মনে ক'রে বার্ণিককে হৃদয়ে বরণ ক'রে নিলো সে আসলে প্রেম নয়, প্রেমের ভানমাত্র। বংশের প্রতিপত্তির জন্যে বার্ণিক সত্যকে বলি দিতে দ্বিধা করলো না।

বার্ণিকের তৃতীয় বলি জোহান (Johan) জোহান লোনার এবং শ্রীমতী বার্ণিকের বৈমাত্রেয় ভাই। বাপ-মা কেউ নেই। সে কাজ করতো বার্ণিকের মায়ের আপিসে। তার একঘেয়ে জীবনে হঠাৎ আবির্ভূত হোলো বার্ণিক। বার্ণিক সদ্য ফিরে এসেছে লণ্ডন প্যারিস্ সব ঘুরে। তার চারদিকে আভিজাত্যের ছটা। সে যেন দিগ্বিজয়ী কোনো পুরুষ-সিংহ। বার্ণিক বেটির টাকাটা ঘরে আনবার জন্যে তার কাছে তখন প্রেম নিবেদন করছে। প্রণয়িনীর ভ্রাতা জোহানকে হাতে রাখা তখন নিতান্ত দরকার। জোহান বার্ণিকের চেয়ে বয়সে চার বছরের ছোট। তা হোক; বার্ণিক তাকে বেছে নিলো বন্ধু ব'লে। জোহান আনন্দে ডগমগ। কী তার ভাগ্য! এমন একজন বন্ধুর জন্যে কী না ত্যাগ করতে পারা যায়! বন্ধুত্বের এই অভিনয় যখন চলেছে তখন শহরে এক থিয়েটার পার্টি এসে হাজির। ঐ থিয়েটার কোম্পানীর এক অভিনেতার স্ত্রীর সঙ্গে বার্ণিকের মাখামাখিটা একটু বেশীদূর গড়িয়ে গেল। একদিন হঠাৎ এসে স্বামী দেখে স্ত্রীর ঘর ভিতর থেকে বন্ধ। হৈ-চৈ হতেই বাতায়ন-পথে বার্ণিকের পলায়ন। বার্ণিক আর জোহান উভয়ের মধ্যে একজনকে কলঙ্কের বোঝা নিতে হোতোই। বন্ধুর হয়ে নিরপরাধ জোহান নিজের ঘাড়ে তুলে নিলো সেই বোঝা। পিতৃমাতৃহীন জোহানের তেমন কোনো দায় ছিল না। কিন্তু বার্ণিকের বুড়ী মা বেঁচে। তদুপরি বেটির সঙ্গে তার বিয়ের সব ঠিকঠাক। জোহান বার্ণিককে

বাঁচিয়ে দিলো। নিজের ঘাড়ে বদ্‌নামের বোঝা নিয়ে জোহান চলে গেল আমেরিকায়। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো বার্ণিক। আপদ বিদায় হোলো। জোহানের নিন্দা মুখে মুখে। বার্ণিক প্রতিবাদ তো করলোই না, বরং মনে মনে খুশীই হোলো। এমনকি, জোহান বুড়ী বার্ণিকের ক্যাশবাক্স ভেঙেছে, শূন্য হাতে আমেরিকায় পাড়ি দেয় নি—এই মিথ্যা বদ্‌নামের বোঝাও জোহানের উপরে চাপলো। মিথ্যাকে আশ্রয় ক'রে, জোহানের বিরুদ্ধে নানা গুজবের চূড়ান্ত সুযোগ নিয়ে বার্ণিক ধাপে ধাপে সাফল্যের চূড়ায় গিয়ে উঠলো। সত্য ফাঁস হয়ে গেলে বার্ণিকের ভবিষ্যৎ কোন্ অতলে তলিয়ে যেতো! রক্ষণশীল সমাজ যৌবনের পদস্খলনকে কিছুতেই ক্ষমা করতো না। জোহানের বিরুদ্ধে মিথ্যা গুজব ছড়ানোর ব্যাপারে বার্ণিকের উস্কানি ছিল—একথা বার্ণিক লোনার কাছে শেষ পর্য্যন্ত স্বীকারই করেছে। এতে বার্ণিকের স্বার্থ ছিল। লোনার কাছে বার্ণিকের স্বীকারোক্তিতে আছে:

Yes, Lona, that rumour saved our house and made me the man I now am.

লোনা তার উত্তরে বলেছে:

That is to say, a lie has made you the man you are.

একজন নিরীহ নিরপরাধ মানুষকে অপরাধীর পর্য্যায়ে ফেলে দিয়ে বার্ণিক সমাজের শিরোমণি হয়ে বসলো। শহরে তার প্রতিপত্তি অতুলনীয়। তার সুখ্যাতি ঘরে ঘরে। কাকে বলি দিয়ে বার্ণিক এই ধনসম্মানের অধিকারী হয়েছে, যে স্বেচ্ছায় বন্ধুর কলঙ্কের বোঝা নিজের মাথায় তুলে নিয়েছে।

লোনা চেষ্টা করেছে বার্ণিকের শুভবুদ্ধিকে জাগ্রত করবার জন্যে। তার বিবেককে দিয়েছে সে নাড়া। স্বেচ্ছায় যাতে সে সত্যকে প্রকাশ করে, ভিতরের তাগিদে যাতে সে নিজেকে মিথ্যার জাল থেকে মুক্ত ক'রে ফেলে। কিন্তু পারিবারিক সুখের এবং লোকমান্য হওয়ার মোহ তখন বার্ণিককে গ্রাস করেছে। তাই লোনা যখন জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কি নিজের ভিতরে কোনো প্রেরণাই অনুভব করো না এই মিথ্যা থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্যে, তখন বার্ণিক জবাবে বলেছে: 'তুমি কি মনে করো স্বেচ্ছায় আমি বিসর্জ্জন দেবো আমার পারিবারিক শান্তিকে এবং পদমর্য্যাদাকে?'

কিন্তু প্রেমের কি অদ্ভুত ক্ষমতা! তার সোনার কাঠির স্পর্শে বার্ণিকের জীবনে এলো রূপান্তর। জোহানের কাছে বার্ণিকের লেখা দু'খানা চিঠি ছিলো আর সেই দু'খানা চিঠিতে তার অপরাধের স্বীকৃতিও ছিল। আমেরিকায় যাওয়ার আগে জোহান সেই চিঠি দুইখানি দিয়ে গেল লোনার হাতে। লোনা যখন বার্ণিককে বললো, এই দেখ, চিঠি দুটো আমার হাতে আছে, তখন বার্ণিকের মনে সঙ্গে সঙ্গে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিলো তা হোলো ভয়, উদ্বেগ। জনতা যখন শোভাযাত্রা সহকারে আসবে তাকে অভিনন্দিত করতে ঐদিন সন্ধ্যায় তখন লোনা নিশ্চয়ই সব ফাঁস ক'রে দেবে তাকে ডুবোবার জন্যে। বার্ণিকের মানসিক উদ্বেগ দেখে তার সন্দেহ নিরসনের জন্যে লোনা যা বললো তাতে বার্ণিক বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল। লোনা বললো, "আমি এখানে ফিরে আসিনি তোমার অপরাধের কথা লোকের কাছে ফাঁস ক'রে দেবার জন্যে। আমি এসেছিলাম তোমার বিবেককে নাড়া দিতে যাতে তুমি স্বেচ্ছায় সব কথা প্রকাশ করো। আমি তাতে সফলকাম হই নি; সুতরাং তুমি যে তিমিরে ছিলে সেই তিমিরেই থাকো মিথ্যায় প্রতিষ্ঠিত তোমার ঐ জীবন নিয়ে। এই দেখো তোমার চিঠিদুটো আমি টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলছি। এখন আর তোমার বিরুদ্ধে প্রমাণ নেই কোনো। এখন তুমি নিরাপদ; যদি পারো তো সুখী হও।"

এর পরে জনসাধারণের পক্ষ থেকে এক অভিনন্দন দেওয়া হোলো বার্ণিককে। জনতার সামনে অভিনন্দনের উত্তরে বার্ণিক যা বললো তাতে সবাই একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল। এ কি ভয়ানক স্বীকারোক্তি! বার্ণিক দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে কৌতূহলী জনতার সামনে বলতে লাগলো, "বন্ধুগণ, মিথ্যার বেসাতি আমি আর করবো না। আমার সত্তার প্রতিটি অণু-পরমাণুকে বিষিয়ে দিয়েছে এই মিথ্যা। তোমাদের কাছ থেকে কিছুই গোপন রাখবো না। পনেরো বছর আগে অপরাধ করেছিল যে-মানুষটা—সে হ'চ্ছে আমি।" ঐ স্বীকারোক্তি শুনে জনতা হতবাক্। বলে কি বার্ণিক! এমন অসম্ভব কাণ্ডও হ'তে পারে? বার্ণিক আবার ব'লে চললো, "হাঁ, বন্ধুগণ; আমিই সেই অপরাধী, এবং সে চলে গেল সুদূরে। এই পনেরো বছর ধ'রে আমি সুফলতার ধাপে ধাপে আরোহণ করেছি ঐ সব মিথ্যা গুজবকে সহায় ক'রে। আর তোমরা যে বলছো আমি নিঃস্বার্থ; তবে শোনো, যদিও আমি সব সময় আর্থিক লাভের দিকে চেয়ে কাজ করি নি তবুও এখন আমি বুঝতে পারছি আমার অধিকাংশ কাজের মূলে ছিল ক্ষমতার জন্য লালসা, প্রতিপত্তির এবং পদমর্য্যাদার মোহ।"

বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতোই এই বক্তৃতা জনতাকে একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ক'রে দিলো। সমাজের আর আর ধুরন্ধরেরা বুঝলো, বার্ণিকের ভাষণে তাদেরও মুখোস খ'সে পড়েছে, তাদেরও পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গিয়েছে। রেগে তারা কাঁই। কিন্তু স্বামীর এই সত্য-ভাষণে খুশী হোলো তার ঘরণী শ্রীমতী বার্ণিক। সব চেয়ে খুশী হোলো লোনা যার হৃদয়ে বার্ণিকের জন্ত ভালো-বাসার আগুন নিবে যায় নি। জোহানের মুখে লোনা যখনই শুনেছে মিথ্যায় ভর ক'রে তার যৌবনের প্রেমাস্পদ সমাজের শিখরে উঠেছে তখনই সে পণ করেছে, বার্ণিককে সে মুক্ত করবেই মিথ্যার কালিমা থেকে, তাকে প্রতিষ্ঠিত করবেই সত্যে। আর সে-প্রতিজ্ঞা সে রেখেছে।

ইব্‌সেন দেখেছিলেন সমাজ দাঁড়িয়ে আছে একটা কপটতার উপরে মিথ্যাকে আশ্রয় ক'রে। অন্তঃসারশূন্য এই সমাজে সাধুতার নামে সাধুত্বের অভিনয় চলেছে। লোকে কি বলবে—এই ভয়ে সবাই জড়সড়ো। মুখ ফুটে মনের কথা খুলে বলতে কেউ সাহস পায় না। ইব্‌সেন চাইলেন পুরানো যুগের তমসাচ্ছন্ন দিগন্তে নূতন যুগের অরুণোদয় আনতে। কিন্তু সত্যহীন স্বার্থপরায়ণ লোকদের দিয়ে নূতন সমাজ গড়া তো সম্ভব নয়। গণ-তন্ত্রকে সত্য ক'রে তুলতে হ'লে দেশের মানুষগুলির জীবন হওয়া চাই মহৎ। তাই 'Rosmersholm' নাটকে যখন Rosmer বল্‌লো, আমি চাই গণতন্ত্রকে তার ব্রত-পালনে উদ্বুদ্ধ করতে, তখন Rector Kroll জিজ্ঞাসা করলো, কি সেই ব্রত? Rosmer উত্তর দিয়েছে: That of making all the people of this Country noble. কেমন করে? By freeing their minds and purifying their wills. জনসাধারণের মনকে মুক্তি দিতে হবে যাতে তারা উদার এবং স্বাধীন চিত্ত নিয়ে সাহসের সঙ্গে ভাবতে পারে, তাদের সংকল্পের মধ্যে কোন মলিনতা না থাকে। সত্য হবে তাদের জীবনের ধ্রুবতারা, আর তাদের মনে থাকবে নিজেদের ব্যক্তিত্বের মূল্য সম্পর্কে যেমন একটি শ্রদ্ধা, অন্তদের ব্যক্তিত্বের মূল্য সম্পর্কেও তেমনি একটি অবিচলিত শ্রদ্ধার ভাব। তাই তো বার্ণিক অভিনন্দনের উত্তরে বললো, তোমাদের প্রতিনিধি তাঁর ভাষণে বলেছেন আমরা নবযুগের দ্বারে উপনীত। সে আশা পূর্ণ হোক্। কিন্তু আমরা যদি সত্যকে আঁকড়ে ধরি তবেই সেই যুগান্তর আসবে,—সেই নবযুগের আবির্ভাব সত্য ঘটনায় পরিণত হবার পূর্ব্বে আমাদের হতে হবে সত্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত—'But before that can come to pass, we must lay fast hold of Truth.'

জীবনের মহান আদর্শগুলির প্রতি অনুরাগকে সুদৃঢ় ক'রে তুলবার কাজে সাহিত্যের বুঝি জুড়ি নেই। হাক্সলি Ends and Means-এ ঠিকই মন্তব্য করেছেন, The chief educative virtue of literature consists in its power to provide its readers with examples which they can follow. শিক্ষার দিক দিয়ে সাহিত্যের প্রধান সার্থকতা হচ্ছে—সাহিত্য পাঠক-পাঠিকাদের পরিবেশন করে এমন সব আদর্শ যাদের তারা অনুসরণ করতে পারে। কিন্তু যাকে বলে non-attached human being, যে মানুষের মনে আছে অপরের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে শ্রদ্ধা, যে মানুষ সহানুভূতিসম্পন্ন এবং সেই সঙ্গে সত্যনিষ্ঠ—এমন পুরুষের এবং নারীর ভালো ছবি বিশ্বসাহিত্যে সত্যসত্যই বিরল। সাহিত্যে সাধু লোকের ছবির অভাব নেই—কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তারা সাধু। তাদের সামাজিক পরিবেশের মধ্যে যে গলদ রয়েছে, মিথ্যা রয়েছে তার নিবারণের জন্তে কোন প্রেরণা তারা অনুভব করে না অন্তরের মধ্যে। হাক্স্‌লি ঠিকই বলেছেন, The good people in plays and novels are rarely complete, fully adult personages. এই সব সাধুসজ্জনেরা ব্যক্তিগত ভাবে ভালোই কিন্তু তারা ভালো একটা দুষ্কারজনক পরিবেশের মধ্যে। Virtuous হওয়াই তাই যথেষ্ট নয়; হাক্সলির ভাষায় 'intelligently virtuous' হওয়া দরকার। শুধু যৌনসংযম ও দানশীলতা থাকলেই কি আদর্শ মানুষ হওয়া যায়? এদিকে ব্যক্তিগত জীবনে দয়া-দাক্ষিণ্যের অভাব নেই, ওদিকে কিন্তু ঘোরতর সাম্রাজ্যবাদী। এই সাধুত্বের দাম কি?

ইব্‌সেনের বার্ণিক শেষ পর্য্যন্ত সত্যনিষ্ঠ, প্রেমিক, অনাসক্ত মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে। পারিবারিক সুখের মোহে এবং সমাজের শিরোমণি হ'য়ে লোকের বাহবা পাওয়ার প্রবল আগ্রহেই তো বার্ণিক নিজেকে মিথ্যা থেকে এতকাল মুক্ত করতে পারছিল না। কিন্তু লোনার পরম প্রেমে তার আত্মায় এলো নববসন্তের পুষ্পসম্ভার। কোথায় চলে গেল তার আত্মকেন্দ্রিকতা। যাক্ অর্থ, যাক মান, যাক পারিবারিক সুখ ধূলায় বিলুপ্ত হ'য়ে! আসুক কলঙ্ক, আসুক অপমানের বোঝা। বার্ণিকের কোন কিছুতেই আজ ভয় নেই। তার জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার সমাধিভূমির উপরে উড্ডীন হোক

সত্যের বিজয়ধ্বজা! যে জোহান্ একদা অসীম প্রেমে তার সমস্ত অপরাধের বোঝা নিজের মাথায় তুলে নিয়ে পাড়ি দিয়েছিলো। সমুদ্রবক্ষে তাকে নিষ্কৃতি দিতেই হবে সমস্ত কলঙ্ক থেকে, যে-কলঙ্ক একমাত্র তারই প্রাপ্য, তাকে এড়িয়ে গেলে চলবে না।

আর সত্যের প্রতি এই যে নিবিড় অনুরাগ—এ তো শুধু ব্যক্তিগত জীবনের কল্যাণের জন্তে নয়; পুরাতন পঙ্কিল সমাজকে নূতনতর পথে পরিচালিত করবার জন্তেও মিথ্যা থেকে বার্ণিকের মুক্ত হবার প্রয়োজন ছিল। বার্ণিক বলছে, যুগান্তর আনতে হোলে সত্যে প্রবল নিষ্ঠা দরকার—সেই সত্যে যা আমাদের সমাজে আজও অপরিচিত হয়ে আছে। সমাজকে গড়ে তুলতে হবে সত্যের এবং এবং স্বাধীনতার স্তম্ভের উপরে। Rosmer-এর সেই যে-আদর্শ—making all the people of this country noble, দেশের প্রত্যেকটি মানুষের জীবনকে মহৎ করবার আদর্শ—এ আদর্শ তো একটা নোংরা সামাজিক পরিবেশের মধ্যে, একটা প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রীয় শাসনপদ্ধতির মধ্যে ফলবান হওয়া সম্ভব নয়। কারণ উইলিয়াম জেমসের ভাষায়:

The community stagnates without the impulse of the individual. The impulse dies away without the sympathy of the community.

ব্যক্তির কাছ থেকে প্রেরণা না এলে সমাজ হয়ে যায় নিশ্চল। কিন্তু সমষ্টির সহানুভূতি ব্যতীত ব্যক্তির প্রেরণাও কি জীবন্ত থাকতে পারে! ইবসেন বার্ণিকের চেতনাকে সমাজের দিকে খোলা রেখেছেন। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনকে মিথ্যার জালে জড়িয়ে রাখলে সমাজকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে কেমন ক'রে? তাই জনতা বার্ণিকের মাথায় যে-প্রশংসার পুষ্পবৃষ্টি করেছে সেই মিথ্যা স্তুতিতে বার্ণিক আদৌ খুশী হ'তে পারল না; মুক্তকণ্ঠে জনতার কাছে স্বীকার করলো:

Even though I may not always have aimed at pecuniary profit, I at all events recognise now that craving for power, influence and position has been the moving spirit of most of my actions.

সত্যের প্রতি এই যে ঐকান্তিক অনুরাগ—যে-অনুরাগে বার্ণিক নিজের সর্বস্ব খোয়াতে প্রস্তুত হয়েছে, এ-অনুরাগ গান্ধীর সেই চিরস্মরণীয় কথাগুলি মনে করিয়ে দেয়, Let hundreds like me perish, but let truth prevail. আমার মতো শত শত গান্ধীর ধ্বংস হোক—কিন্তু সত্যের হোক জয়!

স্বাধীনতাকেও শেষ পর্য্যন্ত বার্ণিক কী ভালোই না বেসেছে! একমাত্র পুত্র ওলাফকে বার্ণিক বলছে: "আমি জীবনে যা' গড়ে তুলেছি তার উত্তরাধিকারী হিসাবে তোমাকে মানুষ করা হবে না; তোমার সম্মুখে নিজের জীবনের কাজের ক্ষেত্র রয়েছে প'ড়ে। তারই জন্তে তোমাকে তৈরি করা হবে।" ছেলে যখন বললো, "বাবা, আমি সমাজের স্তম্ভ হবো না" বাবা অম্লানবদনে জবাব দিলো, You shall be yourself, Olaf. ওলাফ, তুমি যা তাই হবে তুমি।

ইব্‌সেনের 'An Enemy of the People' নাটকের ডক্টর স্টক্‌ম্যান যেমন ভদ্র তেমনি তেজস্বী। ডক্টর স্টক্‌ম্যান শহরের স্নানাগারগুলির (Baths) মেডিকেল ডিরেক্টর। দূরদূরান্তর থেকে ব্যাধিগ্রস্ত নরনারীরা ঐ স্নানাগার-গুলিতে আসে জলের গুণে ভালো হবার জন্তে। এর জন্তে তাদের দক্ষিণা দিতে হয় প্রচুর। ডক্টর ইতিমধ্যে আবিষ্কার করলো, বাথের জল বিষাক্ত হ'য়ে গেছে আর রুগ্নদের পক্ষে তার ফল বিষময়। ডক্টর মনস্থ করলেন, ব্যাপারটা এখনই সকলের গোচরে আনা দরকার এবং এর একটা প্রতিকার হওয়া উচিত। কিন্তু কথাটা জানাজানি হ'য়ে গেলে শহরে রুগ্নব্যক্তিরা আর আসবে না এবং তাতে শহরের শ্রীবৃদ্ধির পথে পড়বে কাঁটা। ডক্টরের মতিগতি দেখে প্রবীণেরা প্রমাদ গুণ্‌লো। তাকে নিরস্ত করবার জন্তে উপরোধ-অনুরোধ, তর্জ্জন-গর্জ্জন, ভীতিপ্রদর্শন—কোন অস্ত্রপ্রয়োগই বাকী রইলো না। ডক্টর কিন্তু সংকল্পে অটল! তার একই কথা:

The whole of our flourishing municipal life derives its sustenance from a lie!

আমাদের শহরের এই যত কিছু সমৃদ্ধি—এর মূলে রস যোগাচ্ছে একটা মিথ্যা! এই মিথ্যাকে বরদাস্ত করা কিছুতেই উচিত নয়। নাটকের চতুর্থ অঙ্কে ডক্টর এক জনসভা আহ্বান করেছে। নিজের আবিষ্কারকে সকলের গোচরীভূত করার জন্তে তার কাছে আর কোন পথ খোলা ছিল না। সভায় যখন Hovestad বললো, 'ডক্টর স্টক্‌ম্যান বুঝি শহরটাকে জাহান্নামে দিতে চায়' তখন ডক্টরের মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে:

Yes, my native town is so dear to me that I would rather ruin it than see it flourishing upon a lie.

হাঁ, যে-শহরে আমি জন্মেছি তা আমার এতই

প্রিয় যে মিথ্যার উপরে তাকে সমৃদ্ধিসম্পন্ন দেখবার আগে আমি তাকে ধ্বংস করতে চাই। Hovestad আবার যখন বললো, A man must be a public enemy to wish to ruin a whole community! তখন স্টকম্যান আবার জবাব দিলো, What does the destruction of a community matter, if it lives on lies! মিথ্যাকে আশ্রয় ক'রে কোন সমাজ যদি বাঁচে তবে তার ধ্বংসে কি এমন এসে যায়!

ডক্টর স্টকম্যানের ভাই পর্য্যন্ত ভায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। শ্রীমতী স্টকম্যান যখন বললো, "ভায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে?" স্বামী জবাব দিলো, In God's name, what else do you suppose I should do but take my stand on right and truth? "যা সত্য, যা ন্যায় তার উপরে দাঁড়ানো ছাড়া আমি আর কি করতে পারি ব'লে তুমি মনে করো?" "কিন্তু চাকরি গেলে স্ত্রীপুত্রের কি অবস্থা হবে? তুমি তো আমাদের কথা কিছুই ভাবছো না!" স্ত্রীর এ-কথার জবাবে স্বামী উত্তর দিয়েছে, "ক্যাথারিন! তোমার মাথাটা কি খারাপ হ'য়ে গেল?" Because a man has a wife and children, is he not to be allowed to proclaim the truth—is he not to be allowed to be an active useful citizen—is he not to be allowed to do a service to his native town! "যেহেতু একজনের স্ত্রীপুত্র আছে সেই হেতু সে সত্য প্রচার করতে পারবে না? তাকে শহরের মঙ্গলের জন্তে কাজ করতে দেওয়া হবে না? সে বঞ্চিত হয়ে থাকবে তার নিজের শহরের সেবাকার্য্য থেকে?"

শেষ পর্য্যন্ত জনসভায় স্টকম্যান্‌কে জনতার হস্তে লাঞ্ছিত হ'তে হয়েছে। তারা ডক্টরের জানালা ভেঙেছে, ট্রাউজার ছিঁড়ে দিয়েছে। স্ত্রী যখন সেই ছিন্ন ট্রাউজারের অবস্থা দেখে বললো, "হায়, হায়, আর যে ভালো ট্রাউজার তোমার নেই!" তখন ডক্টর মন্তব্য করেছে, You should never wear your best trousers when you go out to fight for truth and freedom. "সত্যের এবং স্বাধীনতার জন্তে যখন লড়াই করতে বেরোবে কখন নতুন পোশাক প'রে বেরিও না।" স্টকম্যানের ভাই যখন বললো, নিজের ভুল স্বীকার ক'রে দু'চার লাইন লিখলেই তো সব ল্যাঠা চুকে যায়! স্ত্রী-পুত্রকে পথে বসানোর কী অধিকার আছে তোমার?" স্টকম্যান জবাবে বলেছে, "এই পৃথিবীতে একজন স্বাধীন মানুষের কেবল একটি জিনিসে অধিকার নেই। A free man has no right to soil himself with filth; he has no right to behave in a way that would justify his spitting in his own face. "একজন স্বাধীন মানুষেব কোন অধিকার নেই নিজেকে মিথ্যার পঙ্কে কলঙ্কিত করবার; তার কোন অধিকার নেই এমন ব্যবহার করবার যাতে মনে হয় সে নিজের মুখে নিজেই থুথু দিচ্ছে।"

নাটকের উপসংহারে ডক্টরের পাশে কেউ নেই নিজের কন্যা ছাড়া। ডক্টর আকাশের প্রভাতী তারার মতোই একাকী। নিঃসঙ্গ বীরের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এসেছে, "দেখ ক্যাথারিন, আমি একটা বিরাট্ সত্য আবিষ্কার করেছি।" স্ত্রী পরিহাসের সুরে বললো, "আরও একটা আবিষ্কার?" ডক্টর জবাব দিলো, Yes. It is this, let me tell you—that the strongest man in the world is he who stands most alone. "হাঁ, তা হ'লে শোনো; আমার আবিষ্কারটা হচ্ছে, পৃথিবীতে যে-মানুষ সব চেয়ে একা সে-ই হচ্ছে সকলের চেয়ে শক্তিমান।" অবিশ্বাসের হাসি হেসে স্ত্রী মাথা নেড়েছে। সেই পরম নিঃসঙ্গতার অন্ধকারে শুধু কন্যা এসে ডক্টরের হাত ধরেছে আর উৎসাহ দিয়ে বলেছে, "বাবা!" এখানেই যবনিকাপাত।

ইব্‌সেনের নাটকগুলি পড়ে মনে হয়েছে, ডঃ স্টকম্যান, বার্ণিক—এরা যেন সত্যনিষ্ঠার দিক দিয়ে এক একটি গান্ধী। এই ধরনের চরিত্র বিশ্বসাহিত্যে দুর্লভ। চারিত্রিক এই আভিজাত্য ফুটে উঠেছে রবীন্দ্রনাথেরও নাটকে, উপন্যাসে, গল্পে। 'রামকানাইয়ের নির্ব্বুদ্ধিতা' গল্পে রামকানাইয়ের পুত্র নবদ্বীপ মায়ের সঙ্গে চক্রান্ত করে জ্যেঠামশায়ের উইল জাল করেছে। মায়ে-পোয়ে আশা করেছিল অপুত্রক গুরুচরণ বিষয় ভ্রাতুষ্পুত্র নবদ্বীপকেই দিয়ে যাবে। সম্পত্তি ভাইপো'র পরিবর্ত্তে যখন স্ত্রী বরদাসুন্দরী পেলো, আকাশ ভেঙে পড়লো মায়ের এবং ছেলের মাথায়। 'যস্যাং মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ' বহু মানুষ তো সেই কাঞ্চনের রাস্তায় গিয়ে ডোবে। নবদ্বীপও ডুবলো। উইল সে জাল করলো। তার পর বরদাসুন্দরী ও নবদ্বীপচন্দ্র—উভয়ের মধ্যে সুরু হলো উইল-জালের মামলা। মামলায় সাক্ষ্য দেবার জন্তে ডাক পড়লো রামকানাইয়ের। সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে জজের দিকে ফিরে রামকানাই জোড়হস্তে বললো, "হুজুর, আমি বৃদ্ধ, অত্যন্ত দুর্ব্বল। অধিক কথা কহিবার সামর্থ্য নাই। আমার যা বলিবার সংক্ষেপে বলিয়া যাই। আমার দাদা স্বর্গীয় গুরুচরণ চক্রবর্ত্তী মৃত্যুকালে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি

তাঁহার পত্নী শ্রীমতী বরদাসুন্দরীকে উইল করিয়া দিয়া যান। সে উইল আমি নিজহস্তে লিখিয়াছিল এবং দাদা নিজহস্তে স্বাক্ষর করিয়াছেন। আমার পুত্র নবদ্বীপচন্দ্র যে উইল দাখিল করিয়াছে তাহা মিথ্যা।"

এই 'Moral nihilism'-এর যুগে যখন যেন-তেন প্রকারেণ অর্থসঞ্চয় বহু মানুষের জীবনের আকাশে ধ্রুবতারা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে তখন আপন পরিবারে রামকানাই 'নিতান্ত অনাবশ্যক নির্ব্বোধ কর্ম্মনাশা বাবা' ব'লে উপেক্ষিত হবে—এটাই স্বাভাবিক। নবদ্বীপের বুদ্ধিমান বন্ধুদের কাছেও রামকানাই 'আস্ত নির্ব্বোধ'। কিন্তু প্রতিভার কাজ আমাদের সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গিমায় একটা বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন ঘটানো। রবীন্দ্রনাথ তাই করেছেন। 'সর্ব্বকর্ম্মপণ্ডকারী নবদ্বীপের অনাবশ্যক বাপ' যেখানে সকলের উপেক্ষা পেয়েছে সেখানে রবীন্দ্রনাথ তার কণ্ঠে দুলিয়ে দিয়েছেন বীরের বরমাল্য, তাকে অভিনন্দিত করেছেন সুদুর্লভ পুরুষ-সিংহ ব'লে।

'সমস্যাপূরণ' গল্পটিতেও ঝিঁকড়াকোটার জমিদার কৃষ্ণগোপাল সরকারের চরিত্রে একই সত্যানুরাগের গভীরতা। পুত্র বিপিনবিহারীর হাতে জমিদারীর ভার দিয়ে কৃষ্ণগোপাল কাশীবাসী হয়েছেন। বিপিনবিহারী পিতার অন্ন দানই বাহাল রাখলেন। উদারচেতা পিতার আমলে দান-খয়রাতের পথে ঘর থেকে যা বাইরে গিয়েছিল বিপিনের কড়াকড়িতে তা ঘরে ফিরতে লাগলো। অনেক প্রজাই ভয়ক্রমে বশ্যতা স্বীকার করলো। কেবল মির্জ্জাবিবির পুত্র অছিমদ্দি কিছুতেই বাগ মানলো না। কর্ত্তার আমল থেকেই মির্জ্জাবিবি বহু জমি নিষ্কর ও স্বল্প করে উপভোগ ক'রে আসছে। বিপিনবিহারীর কাছে মনে হলো এ অনুগ্রহ নিতান্ত অপাত্রে। অছিমদ্দিও ছাড়বার ছেলে নয়। ফলে উভয় পক্ষে মোকদ্দমা। অবশেষে অছিমদ্দির যথাসর্ব্বস্ব যখন নিলাম হবার মুখে তখন সর্ব্বস্বান্ত সে হাটের মধ্যে বিপিনকে করলো আক্রমণ। লোকে তাকে ধরে ফেললো। বিপিন বেঁচে গেল, হাজতে গেল অছিমদ্দি। মির্জ্জাবিবির অন্নহীন পুত্রহীন গৃহে মৃত্যুর অন্ধকার এলো ঘনিয়ে।

আদালতে মোকদ্দমা উঠতে বিলম্ব নেই। জমিদার বিপিনবিহারী আসামী অছিমদ্দির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে এসেছে। এমন সময় স্নিগ্ধজ্যোতির্ম্ময়, কৃশ শরীরটি নিয়ে কাশী থেকে বৃদ্ধ কৃষ্ণগোপাল আদালত-প্রাঙ্গণে এসে হাজির। হরিনামের মালা। ললাট থেকে একটি শান্ত করুণা বিশ্বে বিকীর্ণ হচ্ছে। বিপিন প্রণাম ক'রে উঠতেই কৃষ্ণগোপাল পুত্রকে বললেন, "অছিম যাতে খালাস পায় সে চেষ্টা করো এবং তার যে-সম্পত্তি কেড়ে নিয়েছো সেই সম্পত্তি তাকে ফেরৎ দাও। অছিমদ্দিন তোমার ভাই, আমার পুত্র।" চমকিত বিপিন যখন বললে, "যবনীর গর্ভে?" কৃষ্ণগোপাল উত্তর দিলেন, "হাঁ বাপু।"

কৃষ্ণগোপাল সরকারের এবং রামকানাই চক্রবর্ত্তীর দেবদুর্লভ চরিত্র যে-সাহিত্যে এমন অবর্ণনীয় মহিমায় ফুটে উঠেছে সেই রবীন্দ্র-সাহিত্যে এই আদর্শভ্রষ্ট যুগের অত্যন্ত প্রয়োজন আছে। আলডুস্ হাক্সলি ঠিকই বলেছেন, Literary example is a powerful instrument for the moulding of character. চরিত্রগঠনের জন্তে সাহিত্যিক আদর্শ একটা মস্তো বড়ো সহায়। হাক্সলির ভাষায় আবার বলি, There is a great need for literary artists as the educators of a new type of human being. নূতন প্যাটার্ণের মানুষের দরকার। এর জন্তে প্রয়োজন আছে—আর সে প্রয়োজন বিশাল—সাহিত্যস্রষ্টা শিল্পীদের যারা শিক্ষাব্রতী হিসাবে এই নূতন ধরনের মানুষ গড়ে তুলবে। রামকানাই চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণগোপাল সরকার, কারস্টেন বার্ণিক্ (Karsten Bernick) ডক্টর স্টক্ম্যান এই নূতন টাইপের সত্যনিষ্ঠ মানুষ যারা গান্ধীর মতোই বলেছে, 'Let hundreds like me perish, but let truth prevail.

সবার উপরে

শ্রীসীতা দেবী

১৭

শ্বশুরবাড়ীর গ্রামে এসে রাসবিহারী বড় বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। এখানে না আছে খাওয়া-শোওয়ার সুখ, না আছে মানুষজনের সঙ্গে গল্পগাছা করার সুখ। দু' একজন বুড়ো-বুড়ী ছাড়া বাড়ীতে কেউ থাকেও না। গৌরাঙ্গিনীও সেই যে এসে মায়ের রোগশয্যার পাশে বসেছেন, সেখান থেকে নড়তেই চান না।

বৃদ্ধাও সহজ লোক নন। তিনি যে সারবেন একথা কেউই বলে না। অথচ চ'লে যাবার লক্ষণও দেখান না। একইভাবে দিনের পর দিন কেটে চলেছে।

শেষে দিন দশ-বারো পরে ভাবতে আরম্ভ করলেন তিনি, কলকাতায় ফিরেই যাবেন। গৌরাঙ্গিনী না হয় থাকুনই এখানে কিছুদিন। তাঁকে দেখলে ত মনে হয় না যে, তাঁর বিশেষ কিছু অসুবিধা হচ্ছে। আবার না হয় জিতেন এসে তাঁকে নিয়ে যাবে। ছেলেপিলেদের ছেড়ে এসে রাসবিহারীর মন এখানে একেবারে টিঁকছিল না, বিশেষ ক'রে সুমনাকে ছেড়ে এসে। এই মেয়েটিকে তিনি ভালও বাসতেন সবচেয়ে বেশী, এর জন্য ভয় আর উদ্বেগও তাঁর ছিল সবচেয়ে বেশী।

প্রথম যৌবনে যখন রাসবিহারী প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়তেন, তখন তাঁর ক্লাশে একটি খ্রীষ্টান মেয়ে পড়ত। নাম তার মালতী, বাঙালী পিতা আর ইংরেজ মাতার সন্তান। ভারী সুন্দরী, বড় বড় কালো চোখ, ফর্সা রং। রাসবিহারী একেবারে দারুণ রকম প্রেমে প'ড়ে গেলেন। তবে সাহস ক'রে কোনোদিন তাকে জানাতে পারেন নি। কথাবার্ত্তা কইতেন বটে, তার মধ্যে দিয়েই মেয়েটি তাঁর মনের ভাব কিছু বুঝেছিল কিনা কে জানে? রাসবিহারী গোঁড়া হিন্দুঘরের ছেলে, এখানে যে তাঁর বিয়ে হতে পারে না তা তাঁর জানাই ছিল। অত অল্প বয়সে সে সাহস তাঁর ছিল না যে, বাপ-মার অমতে এত বড় একটা ব্যাপার তিনি করতে পারেন। মেয়েটি কিছুদিন পরে কলেজ ছেড়ে দিল, এবং রাসবিহারীর জীবনপথে তার পায়ের চিহ্ন আর পড়ল না।

রাসবিহারী মর্ম্মান্তিক আঘাত পেলেন। কিন্তু যে কারণে তাকে কিছু বলতে পারেন নি, সে কারণেই এখনও তার কোনো অনুসন্ধান করতে পারলেন না। মন-মরা অবস্থায় পড়াশুনো নিয়ে দিন কাটাতে লাগলেন। পাস করলেন, চাকুরিতে ঢুকলেন। কিন্তু বাপ-মায়ের আদেশ অমান্য ক'রে, বেশ কিছুদিন কুমার থেকে গেলেন।

তার পর অবশ্য বিয়েও করলেন, পুরোপুরি সংসারী হলেন, ছেলেপিলেও কয়েকটি হ'ল। গৌরাঙ্গিনী অল্প বয়সে দেখতে ভালই ছিলেন, এবং বয়সে বেশ কিছু বড়, স্বামীর মন জুগিয়ে চলতেই চেষ্টা করতেন। কাজেই রাসবিহারীর দাম্পত্যজীবনটা একেবারেই যে অসুখী হয়েছিল তা নয়।

ছেলেমেয়েরা মোটামুটি দেখতে সব ক'জনই ভাল হয়েছিল, কারণ কর্ত্তা ও গৃহিণী দু'জনেই দেখতে ভালই ছিলেন। কিন্তু সুমনা হ'ল সবচেয়ে সুন্দরী, এবং আশ্চর্য্যের বিষয়, সে বাবা বা মা, কারো মতোই হ'ল না। এর মুখে রাসবিহারী কেন জানি না তাঁর প্রথম যৌবনের হারানো-প্রিয়ার ছায়া দেখতে লাগলেন। ঠিক সেইরকম বড় বড় চোখ আর পাতলা ঠোঁট। কপাল, রং সবই যেন তার মতন! একে ভগবান্ কি তাঁর সান্ত্বনার জন্যে পাঠিয়েছেন? মালতী বেঁচে আছে কি ম'রে গেছে, কিছুই তিনি জানেন না, কিন্তু তাঁর কেবলই মনে হতে লাগল, সে-ই শিশুকন্যারূপে আবার ফিরে এসেছে।

ছোট থেকেই সুমনা তাঁর নয়নের মণি হয়ে বেড়ে উঠেছিল। একে নিয়ে ক্রমাগতই স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর খিটি-মিটি বাধত। তিনি অন্য ছেলেমেয়েদের খানিকটা গৌরাঙ্গিনীর হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু সুমনার বেলা নিজের মত সর্ব্বদাই বজায় রাখতেন।

কি কুক্ষণে একবার তিনি স্ত্রীর কথায় সায় দিয়ে ফেলেছিলেন। সুমনার বিবাহের নিদারুণ পরিণামে তাঁর বুক প্রায় ভেঙে গিয়েছিল। যখন কোনোমতে সামলে উঠলেন তখন স্থির করলেন, এ বিয়ে অস্বীকার করতে হবে। তাঁর মেয়ের বিয়েই হয়নি তা সে বিধবা কি ক'রে হবে? তিনি আবার ওর বিয়ে দেবেন, এমন সৎচরিত্র বুদ্ধিমান্ কৃতী ছেলের সঙ্গে দেবেন যে, জীবনে যেন মেয়েকে দুঃখ পেতে না হয়। দেশাচার যাই

হোক, পরিবার-পরিজন যাই বলুক, তিনি গ্রাহ্য করবেন না।

বিজয় যখন তাঁর দৃষ্টিপথে পড়ল, তখন থেকেই তিনি এই ছেলেটির প্রতি লক্ষ্য রাখলেন। সবদিক্‌ দিয়ে তাঁর মনের মতো। আরো খুশী হলেন দে'খে যে ছেলেটি অবিলম্বে তাঁর মেয়ের প্রতি বেশ খানিকটা আকৃষ্ট হয়ে পড়ল। মেয়ের রকম দে'খে অবশ্য প্রথমেই বিশেষ কিছু বুঝলেন না।

কিন্তু তার পর দিন ত কাটল ঢের। এদের ভিতর সম্পর্কটা যে কি দাঁড়িয়েছে সেটা জানতে ইচ্ছা করত। বোম্বাই গিয়ে যা দেখলেন তাতে, ভুক্তভোগী মানুষ তিনি, সহজেই বুঝলেন যে বুকে দু'জনেরই আগুন জলছে। কিন্তু এরা কিছু বলে না কেন? মেয়ে না হয় বলতে পারে না, কিন্তু বিজয় পুরুষমানুষ, সে কেন বলতে পারবে না? তবে কি তার দিক্‌ থেকেও কোনো বাধা আছে? মেয়ের চেহারা দে'খে তাঁর মনটা ক্রমেই খারাপ হয়ে যেতে লাগল।

প্রায় ঠিক ক'রে ফেলেছিলেন যে, এবার গিয়ে তিনি নিজেই বিজয়ের সঙ্গে কথা বলবেন, এমন সময় এই উৎপাত! দু'চার দিনে যে চুকবে, তাও ত মনে হয় না।

ভেবেচিন্তে রাত্রে কথাটা গৌরাঙ্গিনীর কাছে ব'লেই ফেললেন, "ভাবছি কাল একবার কলকাতা যাব।"

গৌরাঙ্গিনী বললেন, "সে কি হয়? মায়ের এই অবস্থা, তাঁকে ফে'লে যাই কি ক'রে?"

রাসবিহারী বললেন, "তুমি থাক না আর কিছুদিন, জিতেন এসে নিয়ে যাবে কিছুদিন পরে। ততদিনে মা ভাল হয়ে যাবেন।"

গৌরাঙ্গিনী বললেন, "আর ভাল হয়েছেন। কেন যেতে চাচ্ছ তুমি? শরীর কিছু খারাপ হয়েছে?"

কর্ত্তা বললেন, "হুঁ।"

এইটি ছিল রাসবিহারীর মোক্ষম অস্ত্র। তাঁর শরীর খারাপ হচ্ছে শুনলেই গৃহিণী একেবারে ভয়ে কুঁকড়ে যেতেন। বললেন, "তা হলে ত যাওয়াই ভাল। পাড়াগাঁ জায়গা, এখানে অসুখ করলে ত ভাল ডাক্তার-বদ্যিও পাওয়া যায় না। কালই রওনা হও তাহলে। বাড়ীঘরের যে কি দশা হচ্ছে কে জানে? খোকা-খুকী দু'টোই বা কেমন আছে! ওদের মা ত ছেলেপিলের যত্ন জানে না।"

পরদিন জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে রাসবিহারী যাত্রা করলেন। বৃদ্ধা মায়ের উপর বেশ কিছু বিরক্ত হয়ে গৌরাঙ্গিনী পিছনেই থেকে গেলেন।

কলকাতায় ফিরে এসে রাসবিহারী যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। আজন্ম শহরবাসী মানুষ তিনি, ওসব পাড়াগাঁ-টা তাঁর সহ্য হয় না। আর ছেলেপিলে ছেড়ে কতদিন মানুষ থাকতে পারে? নাতী আর নাতনীকে একসঙ্গে কোলে নিয়ে খানিকক্ষণ ব'সে রইলেন।

সুমনা স্নান করতে ঢুকেছিল, বেরিয়ে এসে বাবাকে প্রণাম করল।

রাসবিহারী জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন আছ মনুমা?"

সুমনা বলল, "বেশ ভাল আছি বাবা।"

তার গলার স্বরটা যেন কেমন নূতন ঠেকল রাস-বিহারীর কানে। ভাল ক'রে মেয়ের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, সত্যিই বোধ হয় সে ভাল আছে আগের চেয়ে। মুখের সেই কালিমাড়া অথচ বিবর্ণ চেহারাটা আর নেই। চোখ দুটিও কেমন তারার মতো জলজ্বল্‌ করছে। বেশভূষাও বদ্‌লে গেছে, অনেক পারিপাট্য এসেছে।

সুমনা বলল, "তুমি এত তাড়াতাড়ি চ'লে এলে যে বাবা? দিদিমা কেমন আছেন?"

রাসবিহারী বললেন, "ভাল আর কই? ওসব বুড়ো রুগী অনেকদিন ধরে ভোগে। আমার ওখানে বড় অসুবিধা হতে লাগল, তাই চ'লে এলাম।"

সুমনা একটু ইতঃস্তত ক'রে বলল, "বাবা, বিজয়বাবু এসেছেন এখানে ক'দিন হ'ল। তুমি এলেই খবর দিতে বলেছিলেন।

রাসবিহারী একটু আশান্বিত ভাবে মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "তা দারোয়ানকে ব'লে দাও, খবর দিয়ে আসবে। বিকেলে এখানেই চা খাবে এখন।"

বিজয় বিকেল বেলা এসে ঠিক সময়ই উপস্থিত হ'ল। গৌরাঙ্গিনী উপস্থিত থাকলে সে অন্দরমহলে একেবারেই যেত না, বসবার ঘরেই ব'সে সবাইকার সঙ্গে গল্প করত আজ রাসবিহারী তাকে সোজা উপরের ঘরে ডেকে পাঠালেন।

বিজয় উপরে উঠে দেখল রাসবিহারী খাটের উপর রাণুকে নিয়ে ব'সে আছেন, আর সুমনা দাঁড়িয়ে চায়ের সরঞ্জাম সাজাচ্ছে একটা ছোট টেবিলে। বসবার জন্যে গুটি তিন চেয়ার খাবার ঘর থেকে নিয়ে আসা হয়েছে।

বিজয়কে দে'খে বললেন, "শরীর তত ভাল নেই, তাই গ্রাম থেকে চলে এলাম। তুমি বেশ ভাল আছ ত বাবা? ক'দিন আছ আর এখানে?"

বিজয় বলল, "ভালই আছি। নেই এখানে আর বেশীদিন। কালই যাব বোধ হয়।" একবার অপাঙ্গে

সুমনার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল তার মুখটা ক্রমেই গোলাপী হয়ে আসছে। যাই হোক্, যা বলা দরকার তা বলতেই হবে।

গলাটাকে একটু নামিয়ে বলল,"আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল।"

রাসবিহারী নাতনীকে কোল থেকে নামিয়ে দিলেন, সে ছুটে বাইরে চলে গেল। সুমনাও হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। রাসবিহারী বললেন, "বল কি বলবে।"

বিজয় বলল, "কথাটা সুমনার সম্বন্ধে। অনেক দিন আপনাদের বাড়ীতে আমি আস্‌ছি-যাচ্ছি। ছেলের মত আদরেই আপনি আমায় গ্রহণ করেছেন। এই সম্বন্ধটা চিরদিন আমি রাখতে চাই। সুমনার প্রথম স্বামী মৃত ব'লে যেদিন আইনতঃ স্বীকৃত হবে, তখন আমি ওকে বিবাহ করতে চাই।" কথাটা আরো খানিকটা সাজিয়ে-গুজিয়ে বললে হয়ত ভাল শোনাত, কিন্তু তখন আর বিজয়ের মুখে কোনো কথা জোগাল না।

রাসবিহারী নিজের মাথায় হাত বুলতে লাগলেন, তার পর বললেন, "দেখ বাবা, তোমাদের পরস্পরের উপর টানটা আমার চোখে পড়েনি তা নয়। এতে আমার আপত্তি কিছু নেই, আশীর্ব্বাদই আছে। আমার মেয়েকে ত তুমি এতদিন ধ'রে দেখছ, ও যে কি রকম তা আমায় কিছু ব'লে দিতে হবে না। কিন্তু ও রূপে-গুণে যতই অতুলনীয় হোক, ওর প্রথম জীবনের উপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেছে। সমাজের চোখে ও বিবাহিতা যদিও, আমার মতে ও কুমারী। তুমি ওকে ভালবেসে গ্রহণ করতে চাচ্ছ, এতে আমি কত যে আনন্দবোধ করছি তা বলতে পারি না। কিন্তু আমাদের সংসার-সমাজ ত জান, যদি এই বিয়ে নিয়ে কোনোদিন নিন্দা বা অপযশ ভোগ করতে হয়, তাতে তোমার মন বিরূপ হবে না ত? মনুর মন একেবারে ফুলের মত কোমল, বেশী আঘাত সে সহ্য করতে পারবে না।"

বিজয় দৃঢ়কণ্ঠে বলল, "কোনোদিনই তেমন কিছু হবে না। সুমনার সুখ আর শান্তি অক্ষুণ্ণই থাকবে, যতদিন আমি বেঁচে থাকব।"

রাসবিহারী বললেন, "তা হলে আমার আর কিছু বলবার নেই। আমি জানি আমার মনুকে যে পাবে, সে চিরদিন নিজেকে ভাগ্যবান্ ভাববে। মনুরও সৌভাগ্য যে, তোমার মত ছেলে তাকে আগ্রহ করে নিতে চাচ্ছে। তোমার হাতে আমি ওকে নির্ভয়ে দিতে পারবো। আমার বড় দুর্ভাবনা থেকে তুমি আমায় বাঁচালে। আমি মরলে যে এ মেয়ের কি হবে, তাই ভেবে আমার আহার-নিদ্রা ঘুচে গিয়েছিল।

বিজয় বলল, "কিন্তু এখনও ত বছর আড়াই দেরি আছে। এর মধ্যে কথাটা কি প্রকাশ করা হবে, না এখন যেমন আমরা তিন জন শুধু এটা জানলাম, এই ভাবেই চলবে?"

রাসবিহারী বললেন, "ভেবে দেখি। বাড়ীর বাইরে কাউকে জানান ত হবেই না। তবে মনুর মা আর ভাইদের বল্‌ব কি না ভাবছি। ছেলেদের বল্‌তে কিছু বাধা নেই, তারা খুশীই হবে, তবে মনুর মা বড় গোঁড়া, প্রাচীন পন্থী মানুষ, তিনি যে কি ভাববেন বা কি বলবেন, সেটা ঠিক বুঝতে পারছি না। যাক, যাই ভাবুন, তাতে কিছু এসে যাবে না শেষ পর্য্যন্ত।"

বিজয় বলল, "আমি যাওয়া-আসা ত করব, তাতে আপনার অনুমতি আছে ত?"

রাসবিহারী বললেন, "অবশ্য আসবে যাবে, যখন তোমার খুশী। আমিও মাঝে মাঝে যাব ভাবছি মনুকে নিয়ে। ও তা না হ'লে বড় মুষড়ে পড়বে। এতদিন ওর জীবনে সুখ-শান্তি কিছুই ছিল না, এখন ভগবান যদি অত বড় আনন্দ ওকে দিলেন, তা চারিদিকের নির্ব্বোধ মানুষ মিলে সেটাকে নষ্ট না করে সেটা দেখতে হবে।"

বিজয় ভাবল, 'বৃদ্ধ ভদ্রলোক এত সব জানলেন কি করে? মেয়েটি মূর্ত্তিমতী কবিতারূপিণী বটে, কিন্তু তাঁর মা ত একেবারে গদ্য। তাঁকে নিয়ে কোনোদিন প্রেমের খেলা হয়েছিল বলে মনে হয় না ত।

রাসবিহারীর এতক্ষণে হুঁস হ'ল যে, বিজয়কে চা খেতে বলা হয়েছে, কিন্তু চায়ের কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। দুষ্টু মেয়েটাই বা কোথায় পালাল? চাকরকে ডেকে তিনি চা আন্‌তে বললেন এবং সুমনাকেও ডেকে আনতে বললেন।

সুমনা একটুক্ষণ পরে আরক্ত মুখে ঘরে এসে ঢুকল। খাবার দাবার চা সবই একসঙ্গে উপরে পৌঁছে গেল। বিজয়ের দিকে তাকিয়ে দেখল সুমনা, মুখে তার ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা যাচ্ছে। বুঝল বাবাকে কথাটা জানান হয়েছে এবং তিনি খুশী হয়েছেন।

রাসবিহারী হেসে বললেন, "চা না দিয়ে পালিয়ে গেলে কেন? ভাল ক'রে খেতে-টেতে দাও।

সুমনা কোনোমতে চা জলখাবার দেওয়া শেষ করল, তার পর রাসবিহারীর কোল-ঘেঁষে ব'সে পড়ল। তিনি তার পিঠে হাত বুলতে বুলতে বললেন, "বিজয়ের কাছে সব শুনলাম মা। চিরসুখী হও, আশীর্ব্বাদ করি।

আমাদের ভুলে প্রথম জীবনে তোমাকে যা ঝড়-ঝাপটা সইতে হ'ল সব কিছুর ক্ষতিপূরণ তোমার হোক্।"

সুমনা বাপের কাঁধে মুখ গুঁজে চুপ করে ব'সে রইল। রাসবিহারী একটুক্ষণ পরে বললেন, "গাড়ীটা ত ব'সেই আছে, যাও তোমরা, গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে এস।"

সুমনা তৈরি হ'তে গেল। রাসবিহারী বললেন, "ছেলেদের কাছে খানিকটা বলতেই হবে। নইলে বাধা ঘটবে নানারকম। বৌমারাও জানবেন কথাটা তা হ'লে, তবে আর যেন কথাটা না ছড়ায় সে বিষয়ে হিতেন এবং জিতেনকে সাবধান করে দিতে হবে।"

সুমনা তৈরী হয়ে আসতেই বিজয় বলল, "আমি কাল রাত্রেই ফিরছি। কাল সকালের দিকে আসব কি একবার? জিতেনবাবুরা কি বলেন, সেটা জানতে একটু আগ্রহ হচ্ছে।"

রাসবিহারী বললেন, "তা এস। জিতেন খুব খুশী হবে আমি জানি। হিতেনের কথাটা ঠিক জানি না, ও আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা খুব বেশী বলে না।"

বিজয় সুমনাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। বাড়ীতে এখন লোকজন এতই কম যে, তাদের একসঙ্গে বেরোনটাও বিশেষ কারো চোখে পড়ল না।

বিজয় বলল, "কোথায় যাবে বল? গঙ্গার ধার বা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল যেখানেই যাবে সেখানেই বেজায় ভিড় কিন্তু।"

সুমনা বলল, "গড়ের মাঠেই নামি। জনসমুদ্রে ওখানে মাঝে মাঝে নির্জ্জনতার দ্বীপ দু' একটা আছে।"

একটু ফাঁকা জায়গা দেখেই তারা নেমে বেড়াতে আরম্ভ করল। বিজয় হঠাৎ বলল, "আচ্ছা দেখ, তোমার মা কি তোমার বাবার দ্বিতীয় স্ত্রী? বয়সের অনেক তফাৎ, না?"

সুমনা বলল, "বয়সে বাবা অনেকটাই বড় বটে, তবে মা প্রথম স্ত্রী-ই। বাবা বহুকাল বিয়ে করেন নি, শেষে ঠাকুরমার কান্নাকাটিতে অস্থির হয়ে, বয়সে অনেক ছোট মেয়েই বিয়ে করে বসলেন। কিন্তু তুমি কেন জানতে চাইছ?"

বিজয় বলল, "আজ ওঁর কথাবার্ত্তা শুনে মনে হ'ল ওঁর জীবনের একটা দুঃখময় স্মৃতি কিছু আছে। আমাদের ব্যাপারে যতটা সহানুভূতি দেখালেন, তা ওঁর বয়সের মানুষরা আমাদের দেশে দেখায় না। বিবাহের আগে ভালোবাসা যে থাকতে পারে তাই ত তারা স্বীকার করতে চায় না।"

সুমনা বলল, "একটা কিছু আছে, সেটা আমি অনেক দিন থেকে জানি, কিন্তু কাউকে কখনও বলি নি। আর কেউ জানেও না। আমি যখন খুব ছোট্ট, ঐ রাণুটার মত, তখন বাবা প্রায়ই ছাদে বেড়াতেন আমাকে কোলে করে। যদি বেশী গম্ভীর মুখ করে তাঁর দিকে তাকাতাম, তা হ'লে তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, 'তুমি কি মালতী?' মালতী যে কে, বাবার সঙ্গে কি তাঁর সম্বন্ধ কিছুই জানি না।"

বিজয় বললে, "ছিলেন বোধ হয় কেউ তাঁর প্রথম জীবনে। অনেকেরই থাকে, তার পর অতীতের গহ্বরে মিলিয়ে যায়।"

সুমনা বলল, "তোমারও কেউ আছে নাকি?"

বিজয় বলল, "কেউ নেই, কেউ কোনদিন ছিলও না। তোমার জন্যে গোড়ার থেকেই canvasটা খালি করে রেখে দিয়েছি।"

সুমনা বলল, "সবটা ভরতে পারলে হয়। মানুষটা আমি ছোটখাট ত?"

বিজয় বলল, "ছোটখাট বটে, কিন্তু বিশ্ব জুড়ে ত বসে আছ!"

সুমনা বলল, "আচ্ছা, যে কথাগুলো আমি ভাবি কিন্তু কিছুতেই বলতে পারি না, সেগুলো এমন সুন্দর করে তোমার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে কি করে?"

বিজয় বলল, "আমি তোমায় বলেছিলাম না যে, আমি পুরুষমানুষ, আমার সাহস বেশী?"

সুমনা বলল, "আর আমি ঠিক তার উল্টো। একটা কথাও কি বলতে পারলাম! সেদিন অমন মৃত্যুবাণ হেনে যদি কথাটা আমার মুখ থেকে বার করে না নিতে, তা হলে আজও ঘরের কোণে বসে তিল তিল করে পুড়ে ছাই হতাম।"

বিজয় বলল, "একেবারে মৃত্যুবাণ?"

সুমনা বলল, "তা ছাড়া আর কি বল? যেই চলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালে, আমার মনে হ'ল বুক ফেটে এখনি প্রাণটা বেরিয়ে যাবে। নইলে আমার মত ভীরু মেয়ে কিছুতেই পারত না ও রকম করে তোমাকে জড়িয়ে ধরতে।"

বিজয় বলল, "চল, ঐ দিকটায় একটু বসি, আর ঘুরতে ভাল লাগছে না।"

একটুখানি নিরিবিলি দেখে তারা ঘাসের উপর বসে পড়ল। সুমনার হাতটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে বিজয় বললে, "এতটা কঠোর হ'বার ইচ্ছা ছিল না আমার, সুমনা। কিন্তু তখন কেমন যেন রাগ হ'ল। চোখে

দেখছি যে, মেয়েটা আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসছে, অথচ কিছুতেই স্বীকার করবে না!"

সুমনা বিজয়ের হাতের উপর হাত বুলতে বুলতে বলল, "একি চোখে দেখা যায়?"

বিজয় বলল, "দেখা আবার যায় না? তুমি দেখতে পেতে কি করে? একটা কথা বলতে গেলেই যে দশ হাত দূরে সরিয়ে দিতে, সেটা কি করে সম্ভব হ'ত? মুখ দেখেই ত বুঝতে যে, মানুষটা কাছে আসতে চায়?"

সুমনা বলল, "সেও ত ভয়ের জন্যেই। খালি ভয় হ'ত এইবার বুঝি ধরা পড়ে যাব!"

বিজয় বলল, "পড়তেই যদি, তা হলেই বা কি ক্ষতিটা হ'ত? আর ধরা কি দাও নি? ঐ রকম চোখে মানুষের দিকে তাকালে অতি বোকা মানুষও বোঝে। অবশ্য বোম্বাই-এ তোমরা আসার জন্যই ব্যাপারটা আরও তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল, না হলে আমাকেও হয়ত একটু দেরি করতে হ'ত, নিজের মন বোঝার জন্যে। কিন্তু বাবার চেয়ারের পিছনে বসে যখন গান সুরু করলে, তখনই আমার পরাজয়টা সম্পূর্ণ হয়ে গেল। তবে এটাও বুঝলাম যে, "যে কাঁদনে হিয়া কাঁদিছে, সে কাঁদনে সেও কাঁদিল।'

আলো জলে উঠল চারদিকে, সন্ধ্যা ক্রমে রাত্রির দিকে এগোচ্ছে। সুমনারা বাড়ী যাবার জন্যে উঠে পড়ল। বিজয় বলল, "তোমার বাবার স্নেহের অপব্যবহার করব না। নইলে এখনই যেতাম না। লোকের ভিড় হলেও বসে বসে কথা ত বলা যায়?"

সুমনা বলল, "ইস্, কাল চলে যাচ্ছ ভেবে ভয়ানক মন কেমন করছে আমার। কতদিন পরে আবার তোমাকে দেখতে পাব?"

বিজয় বলল, "খুব বেশী দিন না এসে আমিই কি থাকতে পারব? যাকৃগে, ও সব ভেব না এখন। মনটা যতটা পার হালকা রাখতে চেষ্টা কর। কিছু দিন দুর্ভোগ ত আমাদের সামনে রয়েইছে, সয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় কি?"

বাড়ী এসে শোনা গেল যে, সুমনার দিদিমার মৃত্যু-সংবাদ বহন করে টেলিগ্রাম এসে উপস্থিত হয়েছে। জিতেন অবিলম্বে যাচ্ছে গৌরাঙ্গিণীকে ফিরিয়ে আনতে। কাজেই ছেলেদের কাছে সুমনার বাগ্‌দানের কথা বলা তখনি হয়ে উঠল না। পরদিন সুমনাকে অনেক আশ্বাস দিয়ে, বিজয়ও বোম্বাই ফিরে চলে গেল।

১৮

গৌরাঙ্গিনী ফিরে আসতেই রাসবিহারী তখনই কথাটা ভাঙলেন না। গৃহিণীকে সান্ত্বনা দিতে দু'একদিন গেল, তার পর চতুর্থীর শ্রাদ্ধশান্তি ব্যাপার চুকতেও সময় গেল কিছু। গৌরাঙ্গিনীর নিজের দিক্ থেকেও মন এবং চোখ খুব বেশী সজাগ ছিল না তখন, বাড়ীর আবহাওয়ার কিছু যে পরিবর্তন হয়েছে, সেটা প্রথমেই তাঁর চোখে পড়ল না।

কিন্তু তিনি ছিলেন অতি সংসারী মানুষ, শ্মশান-বৈরাগ্য অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর কেটে গেল। আর মাকে তিনি প্রায় বাল্যকালেই ছেড়ে এসেছিলেন, যোগসূত্র অনেক দিনই ছিঁড়ে গিয়েছিল। এখন পরিষ্কার চোখে সংসারটার দিকে তাকিয়ে দেখলেন, কোথায় যেন কি একটা সুরের পরিবর্তন ঘটেছে। কর্তাকে অকারণে অত খুশী দেখাচ্ছে কেন? ছেলে-বৌরা একই রকম আছে, বাচ্চা দুটোও কিছু বদ্‌লেছে বলে মনে হ'ল না। আর সুমনা? মেয়ের কি হ'ল এই ক'দিনের মধ্যে? এ যেন নূতন সোনার গহনার মত ঝক্‌ঝক্ করছে। চোখে-মুখে এত খুশী কেন?

গৌরাঙ্গিনী নারী, এবং নিজের ক্ষমতামতো স্বামীকে ভালও বাসতেন। ভালবাসা কথাটার মানে সব মানুষের কাছে এক নয়। যার স্বভাবে যতখানি ধরে। নিজের মন দিয়ে বুঝলেন যে, মেয়ের পরিবর্তনের কারণ হৃদয়-ঘটিত, এবং ঐ বিজয় মানুষটিও আছে এর মধ্যে।

একদিন দুপুরে সুমনা যখন কলেজে চ'লে গেছে তখন তিনি রাসবিহারীর কাছে এসে বললেন, "মনু এখন বেশ ভাল আছে, না?"

রাসবিহারী ন'ড়ে চ'ড়ে ব'সে বললেন, "ভালই ত মনে হয়।"

গৃহিণী বললেন, "বিজয় এসেছিল নাকি এখানে, মাঝে?"

কর্তা বললেন, "হুঁ।"

গৌরাঙ্গিনী বললেন, "তুমি ঐ ছেলেটিকে বড় বেশী প্রশ্রয় দিচ্ছ। দেখতে শুনতে ভাল কথাবার্তাও কয় খুব ভাল। মনু ছেলেমানুষ ত? যদি মন বেশী প'ড়ে যায় ঐ ছেলের দিকে, তখন উপায় হবে কি?"

রাসবিহারী বললেন, "উপায় আর কি হবে? ও ত এবার মনুকে বিয়ে করার প্রস্তাব করেছে, আমি মতও দিয়েছি।"

গৃহিণী ধপ্ করে খাটের উপর ব'সে পড়লেন। গালে হাত দিয়ে বললেন, "ওমা, কি সর্বনাশের কথা বলছ!"

রাসবিহারী এইবার চটতে আরম্ভ করলেন, "সর্ব-নাশটা যাতে না হয়, তারই জন্যে এই ব্যবস্থা করলাম।"

গৃহিণী বললেন, "মেয়েমানুষের ক'বার বিয়ে হয় ?"

রাসবিহারী বললেন, "আমাদের দেশে একবারই হয় সাধারণতঃ, অন্য দেশে যতবার ইচ্ছা হতে পারে। তবে যে মেয়ের বিয়েই হয় নি ধরতে হবে, তার আর একবার বিয়েতে ক্ষতিটা কি আমি ত বুঝি না। ওকে নিয়ে আমরা বোকামী ক'রে একটা পুতুলখেলার বিয়ে দিলাম, তাতেই ওর বিয়ে হয়ে গেল ?"

গৌরাঙ্গিনী বললেন, "তা আমরা কি খ্রীষ্টান না ব্রাহ্ম, আমাদের বিয়ে ত ঐরকম ক'রেই হয়, আর ঐ বয়সেই হয়, অনেক সময় ওর চেয়ে ছোটতেও হয়।"

রাসবিহারী বললেন, "তা হয় বটে। কিন্তু তার পর তারা একসঙ্গে থাকে, চেনা-পরিচয় হয়, দেহ-মনের যোগ হয় সন্তান-সন্ততি হয়, একটা ভালবাসার বন্ধন হয়। এদের কোন্‌টা হয়েছে ? একটা টোপরপরা মুখ একবার দেখলেই চিরদিনের মতো তার হয়ে যাওয়া যায় ?"

গৌরাঙ্গিনী বললেন, "অগ্নি, শালগ্রাম সাক্ষী ক'রে, মন্ত্র প'ড়ে বিয়ে হয়েছে, সেটা কিছু নয় ?"

কর্ত্তা বললেন, "অগ্নি আর শালগ্রাম কিসের সাক্ষী ছিলেন তা আমি জানি না। মন্ত্র ত ভুল সংস্কৃতে অন্য লোক পড়েছে, তার এক অক্ষরও আমার মেয়ের মুখ দিয়ে বেরোয় নি। তাকে কলের পুতুলের মতো ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তোমরা ত তার বিয়ে শেষ করলে কিন্তু এতে ওর বিয়ে করা হ'ল কোথায় ? তার পর বিয়ের রাত থেকে ত ওর অসুখ, একটা রাতও সে জামাইয়ের সঙ্গে কাটায় নি।"

গৌরাঙ্গিনী বললেন, "মেয়েকে তুমি ত সম্প্রদান করেছিলে ঐ ছেলের হাতে।"

রাসবিহারী বললেন, "তা না হয় করেছিলাম। যদি সে বেঁচে থাকত তাহলে মেয়ে তারই ঘর করত। বেঁচেই যখন নেই, তখন অত সাত-সতেরো ভেবে কি হবে ? মেয়ে যাতে সুখী হয়, তার জন্যে যেন একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারি, এই ভেবে বিয়ে আবার দিচ্ছি আমি। ছেলে অত্যন্ত সৎপাত্র, অত ভাল ছেলে চারপাশে তাকিয়ে কোথাও আমি দেখতে পাই না।"

গৌরাঙ্গিনী আর কি বলবেন ভেবেই পেলেন না। রাসবিহারীকে যে রকম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখাচ্ছে, তাতে যত কথাই তাকে বলা হোক্, কিছুই তিনি শুনবেন না। চিরকালই এমন ব্যবহার করে এসেছেন যেন সুমনা তাঁরই মেয়ে শুধু, গৌরাঙ্গিনীর কেউ নয়। আর মেয়েও হয়েছে তেমনি বাপ-সোহাগী, মায়ের কোন কথা কানেই নেয় না। অন্য মেয়ে হলে তাকে তিনি ব'কেই ঢিট্ ক'রে দিতেন।

তবু শেষ চেষ্টা ক'রে বললেন, "লোকের কাছে মুখ দেখাব কি ক'রে ? আত্মীয়-স্বজন কি বলবে ?"

রাসবিহারী বললেন,"যা খুশি বলুক, কারো খাইও না আমি, কারো আটচালায় বাসও করি না। মুখ দেখাতে তোমার ইচ্ছা না হয় তুমি দেখিও না। আমার কোনো অসুবিধে হবে না।"

গৌরাঙ্গিনী দুম্ দুম্ ক'রে পা ফে'লে নীচে নেমে গেলেন। কর্ত্তা পাখাটা আর একটু বাড়িয়ে দিয়ে ঘুমবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

গৌরাঙ্গিনী নীচে নেমে এসে একটু সংশয়ে পড়লেন। এখন কি করবেন তিনি ? ইচ্ছে করছে বটে খুব সোরগোল তুলে কান্নাকাটি করতে, কিন্তু ভরসা হচ্ছে না। কর্ত্তা ভীষণ চ'টে যাবেন, এবং তাঁর রক্তের চাপ বেড়ে যাবে। এইটিকে ভয়ানক ভয় গৌরাঙ্গিনীর। দ্বিতীয়তঃ, এখন বেশী লোক জানাজানি করতেও ইচ্ছা করছে না, যদিই কর্ত্তার বা মেয়ের মতিগতি বদ্‌লায়। কিন্তু সে কি আর হবে ? হতভাগী মেয়ে যে লক্ষ্মীপ্রতিমার মতো সুন্দর! যে ছেলে একবার তার মন অধিকার করেছে, সে কোনোদিনই আর দখল ছাড়বে না। আর ছেলেটাও বেশ সুন্দর দেখতে। গৌরাঙ্গিনী শুনেছেন, সে খুব বিদ্বান্ আর খুব ভাল কাজ করে। সুমনার মন তার দিক্ থেকে কেউই ফেরাতে পারবে না।

ছেলেদের বলবেন কিনা গৌরাঙ্গিনী ভাবতে লাগলেন। জিতেনের কথাবার্ত্তা বেশী শোনেন, তাকে দিয়ে বলালে হয়। কিন্তু সেও ত বাপের মত কালাপাহাড়, কিছুই মানে না। হিতেন বাপের থেকে একটু দূরে দূরে থাকে, সে হয় ত বলতে সাহসই পাবে না। জ্যোৎস্নাও ভয় পাবে।

নিজের মনে ব'সে গজ গজ্ করতে লাগলেন। অনর্থক রাধাকে ব'কে দিলেন খানিকটা। সে পুরোনো ঝি, মুখে মুখে উত্তর দিল, এবং দু'জনে রীতিমত কলহ বেধে গেল। তাতে আর কিছু লাভ হোক বা নাই হোক, সময় বেশ কেটে গেল খানিকটা।

বেলা গড়িয়ে এল, ছেলেমেয়ে সব অফিস ও কলেজ থেকে বাড়ী ফিরতে লাগল। কপালক্রমে সুমনাই পড়ল তাঁর চোখে সবার আগে। অত্যন্ত জলন্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে তিনি সেখান থেকে চ'লে গেলেন।

সুমনা বুঝল ব্যাপারটা। বাবা বলেছেন মাকে। একজনের কাছে সে প্রাণঢালা আশীর্ব্বাদ পেয়েছে, আর একজন তাকে চোখের দৃষ্টিতে ভস্ম করতে চাইছেন। ভাল, যার যেমন ইচ্ছা!

সুমনার দিন ভাল কাটছে না। বিজয় তাকে যেন অকূল সাগরের মধ্যে ফে'লে দিয়ে গিয়েছে। এই মন-জানাজানি হবার আগেও কি তার কষ্ট ছিল না? কিন্তু সে দুঃখ সে সহ্য করত ফাঁসির আসামী যেমন ক'রে মৃত্যু-দণ্ডের আদেশ সহ্য করে। সহ্য না ক'রে উপায় কিছু ছিল না। কিন্তু এখনকার কষ্টটা অন্যরকম। সকালে উঠে তার চোখ চাইতে ইচ্ছা করে না। বাউলের গান তার মনে গুন্ গুন্ ক'রে বাজে, 'আমি মেলব না নয়ন যদি না দেখি তার প্রথম চাওনে।' কার গলার স্বর শুনবার জন্যে তার মন উন্মুখ হয়ে ওঠে, কিন্তু হায় সেই অমৃতস্রাবী কণ্ঠ! সে ত শোনে না একবারও। যার স্পর্শে তার তরুণ দেহ-মন ফুল্ল-কুসুমের মতো ফুটে উঠেছিল, সে স্পর্শও পায় না। খালি ভাবে, ভগবান্ কেন এমন নিষ্ঠুর? জলের মধ্যে থেকেও আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে সে মরছে কেন?

বিজয়ের চিঠি খুব ঘনঘনই পায়, উত্তরও দেয় সে তাড়াতাড়ি। এটা দাদারা লক্ষ্য করছে সে বুঝতে পারছিল। বাবা তাহলে এখনও তাদের বলেন নি? তবে মা যখন এসে গেছেন এবং রণমূর্ত্তিও ধরেছেন, তখন কারো আর জানতে বাকি থাকবে না। তবে রাসবিহারীর স্নেহ যে তাকে সব সংঘাত থেকে আড়াল ক'রে রাখবে তাও সে বুঝত।

সেদিন সকালেই চিঠি পেয়ে গেল একটা। কলেজের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবার সময় প্রায় হয়ে এল, তবু কোনো চিঠিই দু'তিন বার না পড়লে তার তৃপ্তি হ'ত না। বিজয় লিখেছে:

"সুমনা,

আমার সঙ্গে যে ভদ্রলোক আগে থাকতেন তিনি হঠাৎ এসে আব্দার ধরেছেন যে, তাঁকে আবার থাকতে দিতে হবে। নূতন জায়গায় বাড়ীওয়ালার সঙ্গে তাঁর কিছুতেই বনছে না। একলা থাকতে চাইলে হয় ত আপত্তি করতাম না, কিন্তু সস্ত্রীক থাকতে দিতে মনের মধ্যে বড় আপত্তি অনুভব করছি। তাঁর বৌটি দেখতে একেবারেই তোমার মতো নয়, অর্থাৎ বেশ মোটা এবং কালো, এবং গলার স্বরটা অত্যন্ত কর্কশ। শুনলাম, শ্রীমান্ এঁকে টাকার লোভে বিয়ে করেছেন। একটি অপরূপ সুন্দরীর ছায়া এখানে সারাক্ষণ আমার দৃষ্টিপথে ভেসে বেড়ায়, মাঝে মাঝে সে কানের কাছে গুঞ্জন করে যায়, 'দাঁড়াও যেখানে বিরহী এ হিয়া, তোমারি লাগিয়া একেলা জাগে।' জানি আমার বন্ধুপত্নী যদি এসে এখানে ঘুঁটেওয়ালির সঙ্গে ঝগড়া আরম্ভ করেন, তাহলে ঐ গানের সুর আমার কানে আর বাজবে না। কি করে ঠেকাব বুঝতে পারছি না।

একবার পুজোর ছুটিতে এসেছিলে, আর একবার এস না তোমার বাবাকে নিয়ে? একসঙ্গে দুটো কাজ উদ্ধার হয়ে যাবে তাহলে। ছায়ার বদলে কায়াকে পেলে নানা-দিকে সুবিধা তা ত জানই। এবং এই যে লোকগুলো উৎপাত করছে, এসে তাদেরও অক্লেশে ঠেকিয়ে রাখা যায়। এসে পড়লে সবদিক্ দিয়ে ভাল।

তবে নাও যদি কোনো কারণে আসতে পার, তবু পুজোর ছুটির সময় আমাদের দেখা হবেই। আমিই যাব তাহলে। কিন্তু বাড়ীটার কি ব্যবস্থা করব সেটা ভেবে পাচ্ছি না।

পড়াশুনো করছ ত? আমাদের বিয়ের আগে এম্.এ.টা পাস ক'রে ফেল্‌তে হবে কিন্তু। তখন যদি মাষ্টারের দরকার হয়, তাহলে আমিই যাব মাস দু'ইয়ের ছুটি নিয়ে। বইয়ের পাতায় তাহলে আর আমার মুখ দেখতে হবে না। তবে পড়াটা কতখানি হবে তা বলতে পারি না। আজ আর সময় নেই, অফিস যেতে হবে। চিঠিতে অনেকে ভালবাসা জানায়, আমি সেটা পারি না। অক্ষম কতগুলো কথা, আমার ভালবাসা বহন ক'রে নিয়ে যাবার তাদের ক্ষমতা কোথায়?

ইতি
তোমার বিজয়।"

চিঠি পড়া শেষ ক'রে মুখ তুলতেই সুমনা দেখল যে, তার বড়দা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে আছে। সুমনাকে তার দিকে তাকাতে দে'খে বলল, "কার চিঠি অত মন দিয়ে পড়ছিস্?"

সুমনা সংক্ষেপে বলল, "বিজয়বাবুর।"

জিতেন বলল, "দেখি চিঠিটা?"

সুমনা মুখ লাল ক'রে বলল, "থাক! বাবার সঙ্গে বরং এই নিয়ে একটু কথা বলো।"

জিতেন চ'লে গেল, মুখে তার একটু বিস্ময়ের ভাব। তবে তারও অফিসের তাড়া ছিল, সমস্যার সমাধান করতে তখনই বাবার কাছে যাওয়া গেল না।

সন্ধ্যাবেলায় ফিরে এসে সে রাসবিহারীর ঘরে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। গৌরাঙ্গিনী তখন নীচে ঝি-চাকর শাসন করছেন। জিতেন বলল, "বাবা, সুমনা সম্বন্ধে বিজয় তোমার কাছে কিছু বলেছে নাকি?"

রাসবিহারী বললেন, "হ্যাঁ, কথাটা তোমাদের দু' ভাইয়ের কাছেই বলব ভেবেছিলাম, তবে নানা কারণে দেরি হয়ে গেল। বিজয় ত বিয়ের প্রস্তাব করেছে, সুমনার সঙ্গে। আমি মতও দিয়েছি, তবে আইনতঃ

এখনও বিয়ে হতে পারে না, দেরি করতে হবে কিছু। নির্ম্মলের সেই দুর্ঘটনার পর সাত বছর কেটে গেলে তবে সুমনার বিয়ে হতে পারে।"

জিতেন বলল, "আমি খুব খুশী হলাম বাবা। আমরা সব ক'জন ভাই-বোন বিয়ে ক'রে ঘর-সংসার করব, আর ঐ ছেলেমানুষ মেয়ে একলা ব'সে বৈধব্য পালন করবে, ভাবতেই আমার কেমন লাগ্‌ত! আর পাত্র হিসাবে বিজয় ত একেবারে নিখুঁৎ! ওর চেয়ে ভাল ছেলে কোথাও পাওয়া যেত না। কিন্তু মাকে বলেছ নাকি? তিনি কি বলছেন?"

রাসবিহারী বললেন, "তিনি বলছেন ত অনেক কিছু, কিন্তু তাঁর কথা শুনে চললে ত এক্ষেত্রে চলবে না। তাঁর মতে হিন্দু মেয়ের বিয়ে শুধু একবারই হয়। তবে যে মেয়ের বিয়েই হয় নি ধরতে হবে, তার যে কেন আর বিয়ে হবে না, তা ত বোঝা যায় না! আমাদের দেশে মেয়েদের আসল শিক্ষা কিছু হোক্ বা নাই হোক্, এ সব গোঁড়ামিগুলো মনে খুব বদ্ধমূল ক'রে বসিয়ে দেওয়া হয়।"

নিজের ছেলেবেলার অনেক ঘটনা স্মরণ ক'রে জিতেনের হাসি পেল। বলল, "আর এর ফল ভোগ করে ছেলেমেয়েরা। যাক্ গে, ভেবোনা তুমি। বিয়েটা একবার হয়ে গেলে মা তখন সেটাকে গ্রাহ্য না ক'রে পারবেন না। তবে কথাটা এখন বাইরে প্রচার না হওয়াই ভাল। নানা রকম মন্তব্য সব হ'তে থাকবে, মনু শুনলে তার মন খারাপ হয়ে যাবে।"

রাসবিহারী বললেন, "না, আমি আর কাউকে বলছি না। তুমি হিতেনকে ব'লে দিও, আর তোমরা যদি বৌমাদের কাছে বলতে চাও, তাহলে তাঁদের একটু সাবধান ক'রে দিও, কথাটা যেন না ছড়ায়। আর তোমার মায়ের সামনে এ বিষয়ে কোনো কথা না তোলাই ভাল, তিনি এই নিয়ে এখনও খুব চ'টে আছেন। সবে মা মারা গেছেন তাঁর, যত কম অশান্তি তাঁর পেতে হয় ততই ভাল।"

হিতেন এবং বৌমারা অবশ্য অবিলম্বেই শুনলেন। হিতেন খুসীই হ'ল, তবে তার স্ত্রী ত আনন্দের আতিশয্যে প্রায় ক্ষেপে যাবারই জোগাড় করল। সে আবার বিজয়ের ভীষণ ভক্ত। ক্রমাগত আধ ঘণ্টা ধ'রে তার বক্তৃতা শুনে হিতেন শেষে বলল, "আমি ত দেখছি মনুর চেয়েও তুমি খুসী হয়েছ বেশী। বঙ্কিমবাবু কি আর সাধে বলেছিলেন, 'সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্র'? তোমার সঙ্গে বিজয়ের বিয়ে হলেই ভাল হ'ত।"

ঊষা তার গায়ে পাখার বাড়ি এক ঘা মেরে বলল, "কি ছাই-ভস্ম বকৃছ? আমার সঙ্গে আবার বিয়ে হবে কি ক'রে? বিজয়বাবু না হয় সুন্দর বেশ আছেন, তুমিই কি কিছু মন্দ নাকি?"

হিতেন বলল, "তা কে জানে? আমার সঙ্গে যখন বিয়ে হয়, তখন এর অর্দ্ধেক খুশীও তোমায় দেখায় নি।"

কলেজ থেকে বাড়ী ফিরতেই বাড়ীর মধ্যে কেমন যেন একটা চাপা উত্তেজনার ভাব সুমনা লক্ষ্য করল। মা অবশ্য অতি সংক্ষেপে তাকিয়ে চা-জলখাবার তার দিকে এগিয়ে দিয়ে ঘর থেকে চ'লে গেলেন। আজকাল পারতপক্ষে তিনি সুমনার সঙ্গে কথা বলেন না। কিন্তু দুই বৌদির মুখ দে'খে মনে হ'ল তারা যেন এখনই ফেটে পড়বে। ঊষা বলল, "চলত একবার উপরে, তোমাকে দেখাচ্ছি মজা!"

বড়বৌদি বলল, "সবাই বলে, মেজঠাকুরঝি বড্ড ভাল মেয়ে। কেমন ডুবে ডুবে জল খেতে জানে দেখ!"

সুমনা বলল, "কি, হয়েছে কি?"

নীচে কথা বলা যায় না, গিন্নীদের রাজত্ব এখানে। তিনজনে মিলে উপরে উঠে গেল। ঊষা সুমনাকে জড়িয়ে ধ'রে খানিক নেচেই নিল। বলল, "বেশ তলে তলে বর ঠিক ক'রে রেখেছ, আর আমরা কিছুই জানি না? না-খেয়ে শুকিয়ে, আর বৈরাগিনীর বেশ ধ'রে এরই তপস্যা হচ্ছিল বুঝি? কবে ঠিক হ'ল, এখানে না বোম্বাইয়ে?"

সুমনা নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, "এখানেই।"

গীতা বলল, "মায়ের পছন্দ হয় নি বুঝি? সেকেলে লোকরা সব ঐ রকমই! তোমার দাদা কিন্তু ভাই বেজায় খুশী। বলেন, এতদিন তাঁর নিজের বৌকে আদর করতে সুদ্ধ লজ্জা করত, বোন এই রকম অবস্থায় রয়েছে ব'লে। তা কবে ভাই বিয়ে হবে তোমাদের?"

সুমনা বলল, "বছর দুই দেরি আছে বোধ হয়।"

ঊষা বলল, "আচ্ছা, বড়ঠাকুরঝি, কি সুচিত্রা এদের খবর দেওয়া হবে না?"

সুমনা বলল, "বাবা ত এখন কাউকেই বলছেন না। বাড়ীর ক'জনই জানল শুধু। তবে ওরা যদি এসে পড়ে তবে জানতে পারবেই মনে হয়। মা বড়দিকে ত ব'লেই দেবেন। এ বাড়ীতে নিজের দলে কাউকে ত পাচ্ছেন না, যদিই বড়দি ওঁর দলে যায়।"

গীতা বলল, "বড়ঠাকুরঝির অত গোঁড়ামি নেই, সে বোধ হয় খুশীই হবে। আমাদের ঠাকুরজামাইও লোক মন্দ নয়। তবে ওদের কর্ত্তা-গিন্নীরা সব বড় সেকেলে। ঠিক মায়ের মত। ঠাকুরঝিকে হয় ত কথা শোনাবে কিছু।"

সুমনা বলল, "কি জালাতন রে বাবা! মানুষ কি চিড়িয়াখানার জানোয়ার নাকি? তাদের অন্তর বাহির সব কিছুই সমালোচনার জিনিস? তার নিজস্ব কিছু নেই, গোপন কিছু নেই?"

ঊষা বলল, "আমাদের দেশ ঐ রকমই ভাই। মানুষকে তারা মানুষ ভাবে না ত, খেলার পুতুল ভাবে।"

আরো দু'চারটে কথাবার্ত্তার পর সুমনা নিজের ঘরে চ'লে গেল। পড়তে বসল, তবে আজকাল পড়তে বসা মাত্র হয়, পড়াটা আর হয় না। বাবার কাছে বোম্বাই যাবার কথাটা পাড়বে কিনা ভাবতে লাগল। রাসবিহারীর শরীরটা তত ভাল যাচ্ছে না, যেতে কি পারবেন? মা কি তাঁকে যেতে দেবেন? নিজেও হয় ত সঙ্গে যেতে চাইবেন। কিন্তু সেটাও আর সম্ভব নয়!

গৌরাঙ্গিনী যেদিন শুনেছিলেন যে, রাসবিহারী সুমনার আবার বিবাহ দেওয়া ঠিক করেছেন, সেইদিন থেকে কথাবার্ত্তা ভয়ানক কমিয়ে দিয়েছেন স্বামীর সঙ্গে। কর্ত্তার যে অবশ্য তাতে কিছু এসে-যাবে না তা তিনি জানতেনই, কিন্তু এইটুকু রাগ না দেখিয়ে পারছিলেন না। তাঁর রাগটা যতই অগ্রাহ্য করছিলেন স্বামী, ততই রাগ তাঁর বাড়ছিল। মনের খেদে এমন কথাও তাঁর এক-আধবার মনে হ'তে লাগল যে, ধ'রে-বেঁধে বাল্যকালে তাঁদের একজনের ঘাড়ে গছিয়ে দেওয়া হয়েছে ব'লে স্বামীদের কাছে তাঁদের কোনো আদর হয় নি। এ কালের মেয়েগুলো সে দিক দিয়ে ভাল আছে। মান-মর্য্যাদা পায়। নিজের মেয়েরই কথা দেখ না। অমন ছেলে বিজয়, ওকে ত মাথায় ক'রে নেবার জন্যে সাধা-সাধি করছে, সমাজে নিন্দা হবে জেনেও।

রাসবিহারীকে একদিন তিনি জিজ্ঞাসা করে বসলেন, "খুব ত মেয়ের বিয়ে ঠিক ক'রে বসলে, একটা কথা কোনো দিন ভেবে দেখেছ?"

রাসবিহারী বললে, "কি?"

"ওর না হয় বিয়ে দিলে বিজয়ের সঙ্গে, তার পর দৈবের কথা বলা যায় না ত? যদি নির্ম্মল ফিরে আসে?"

রাসবিহারী বললেন, "সম্ভব নয়। বিদেশে যায় নি, এই দেশে ঘটল সে ঘটনা, আর সাত বছরের মধ্যে কিছু খোঁজ পাওয়া গেল না। সে শিশু ছিল না, প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষিত পুরুষ, খবর দিত না বেঁচে থাকলে? এত খোঁজ করা হ'ল, কোনো খোঁজ কেউ দিতে পারল না!"

গৌরাঙ্গিনী চুপ করে গেলেন। কিন্তু রাসবিহারীর মনে কথাটা অনেকক্ষণ খচ্‌খচ্‌ করতে লাগল।

পূজার সময়টা এসেই গেল শেষ পর্য্যন্ত। কিন্তু রাস-বিহারী এবারে বেরতে পারলেন না। তাঁর শরীর ভাল থাকছিল না। এখন বাইরে কোথাও যেতে হ'লে গৌরাঙ্গিনীকে নিয়েই যেতে হবে, না হ'লে তিনি মহা চেঁচামেচি বাধাবেন। তাঁকে নিয়ে ত বিজয়ের বাড়ীতে যাওয়া সম্ভব নয়?

সুমনা বিজয়কেই আসতে লিখল। বাবা ত যেতে পারবেন না। বোম্বাইয়ের ফ্ল্যাটের কি ব্যবস্থা হ'ল, তাও জানতে চাইল। ঐ বাড়ীটার উপর তার একটা টান জন্মে গিয়েছিল। আবার সেখানে ফিরে গিয়ে কি ভাবে সেখানে থাকবে, তার খুব উজ্জ্বল চিত্র সে কল্পনায় দেখত।

বিজয় লিখল, ফ্ল্যাটের একটা ব্যবস্থা সে কোনোমতে করেছে। তার দূর-সম্পর্কের এক বোন আর ভগ্নীপতিকে আসতে লিখে দিয়েছে, তাঁরা এখন মাসখানেক এসে থেকে যাবেন। ততদিন বন্ধুবর ত বৌ নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে পারবেন না, তাঁকে থাকবার জায়গা একটা খুঁজে নিতে হবেই।

ক্রমশঃ

বিপ্লবীর জীবন-দর্শন

প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী

১৯০৫ সন ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটা যুগসন্ধিক্ষণ। ভারতবর্ষের পূর্বভালে বাংলা দেশের আকাশে উষার আলো উদিত হ'ল যুগযুগান্তব্যাপী তিমির রাত্রির পর। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের কোলাহলে জাতির নিদ্রাভঙ্গ হ'ল।

তখন কেবল বাংলা বা ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র পৃথিবীর রাজনৈতিক পরিস্থিতিই বুঝি বিপ্লব-মুখী হয়েছিল। নির্যাতিত জাতিগুলির অন্তরে জেগে উঠেছিল বিদ্রোহের আকাঙ্ক্ষা। একদিকে যেমন রাশিয়ায় জারের বিরুদ্ধে বিপ্লবান্দোলন পরিণতির দিকে এগিয়ে চলছিল, তেমনি অপরদিকে রুশ-জাপান যুদ্ধে রাশিয়াকে পর্যুদস্ত করে 'অসভ্য' জাপান হ'ল 'সভ্য'। প্রতীচ্যের সাম্রাজ্য-লোভী শক্তিগুলির হ'ল ভীতির কারণ। তুর্কী অধিকৃত দেশগুলি একটার পর একটা স্বাধীনতা ঘোষণা করতে লাগল। দেশের অভ্যন্তরে অভ্যুদয় হ'ল নব্য বিপ্লবী দলের। সামাজিক কুসংস্কার, সুলতানের কুশাসন সবকিছুর বিরুদ্ধেই এরা বিদ্রোহী হ'ল। পারস্যে আত্ম-প্রকাশ করল গণবিক্ষোভ। চীনদেশে সান-ইয়াত-সেনের নেতৃত্বে স্বাধীনতার বিপ্লব প্রচেষ্টা সফলতার দিকে অগ্রগামী। এমনকি সাম্রাজ্যবাদী শিবিরেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা যুদ্ধের লক্ষণ আত্মপ্রকাশ করবার মত রূপ পরিগ্রহ করল।

ভারতবর্ষের কথায় ফিরে এসে দেখতে পাই, ১৯০৫ সনে লর্ড কার্জন বঙ্গ-বিভাগ ঘোষণা করলেন। কিন্তু কোন্ প্রয়োজনে এই বঙ্গ-বিভাগ এবং কেনই বা তার বিরুদ্ধে এত বড় আন্দোলন হ'ল,তার কারণ খোঁজ করতে গিয়ে ব্রিটিশ রাজত্ব স্থাপনের পূর্বাবস্থা এবং ১৯০৫ সন পর্যন্ত তার ক্রমবিকাশের দিকে স্বতই দৃষ্টি নিপতিত হয়। সুতরাং অপ্রাসঙ্গিক নয় বলেই এ আলোচনা করছি।

মুসলমান রাজশক্তি কখনই সমস্ত ভারতবর্ষকে এক রাজ্যপাশে বাঁধতে পারে নি। যোগাযোগ তথা যান-বাহন এবং সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থাই ছিল এত বড় একটা দেশব্যাপী সুশৃঙ্খল রাজত্ব গড়ে উঠবার পরিপন্থী। তদুপরি ছিল মোগল-বাদশাহ পরিবারে অন্তর্দাহ। শান্তির পথে মসনদ্ যেমন প্রায় কারুর ভাগ্যে জোটে নি, তেমনি শান্তিতে তা ভোগও কেউ করতে পারে নি।

প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের বেলায়ও দেখি একই ইতিহাস। তাদের আনুগত্য নানা কারণে ক্ষণস্থায়ী হয়ে পড়ত। অধিকাংশ বাদশাহজাদাই পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। আর তার গদীতে বসেই পিতার আমলের সমস্ত কর্মচারীদের বরখাস্ত করতেন। কখন্ কার পক্ষে যোগ দিলে যে তাদের কর্তৃত্ব থাকবে তার কোনই নিশ্চয়তা ছিল না—যতই রাজভক্ত হোক না তারা। সুতরাং তারাও সুযোগ-সুবিধে পেলে বিদ্রোহ করে নিজেদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করত।

এত গেল রাজায় রাজায়। প্রজার সঙ্গে সম্বন্ধের কথায় এসে দেখছি বাদশাহ দেশ শাসন করতেন না। প্রজার সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ কোন যোগাযোগ ছিল না। প্রদেশগুলি থেকে নিয়মিত খাজনা পেলেই তিনি খুশী। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের বেলাতেও একই কথা প্রযোজ্য, এমনকি জমিদারও নিয়মিত খাজনা পাঠিয়ে অন্যান্য সব বিষয়ে প্রায় স্বাধীন থাকতে পারতেন। অবশ্য সকলেরই যার যার উপরওয়ালার খেয়াল খুশি চরিতার্থ করাও একটা কর্তব্য ছিল।

দেশের সভ্যতার ভিত্তি ছিল গ্রাম্যজীবন। তখনকার দিনে মানুষের প্রয়োজনের তালিকার প্রায় সবই পাওয়া যেত গ্রামে। সুতরাং গ্রামগুলি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ অন্য-নিরপেক্ষ। তা ছাড়া রাজার সঙ্গে গ্রামের লোকের সম্পর্ক খুব কম থাকায় রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রাতের মধ্যে যে পরিবর্তনই আসুক না কেন গ্রাম্যজীবন প্রায় অব্যাহত গতিতেই চলত। হবুচন্দ্রের মত রাজা ও গবুচন্দ্রের মত মন্ত্রীও এদেশে রাজত্ব করতে পারিত। অবশ্য এরা গল্পের রাজা ও মন্ত্রী। কিন্তু এই গল্পের সমর্থন বঙ্কিমচন্দ্রতেই পাই। তিনি এক জায়গায় লিখেছেন যে, একটা বট বৃক্ষকে রাজা করে দিলেও এদেশের রাজত্ব চলত।

কিছু কিছু অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন ছাড়া আমাদের সমাজ সেই প্রাচীনকাল থেকে ব্রিটিশ বণিকের রাজ্য স্থাপন পর্যন্ত মূলত প্রায় একই ধরনের অচল ও অপরিবর্তিত অবস্থায় ছিল। এমনি অবস্থায় বাস করে

মহম্মদ ঘোরী বা সুলতান মামুদের আক্রমণ সারা ভারত-ব্যাপী কোন বিপদের সঙ্কেত বহন করে আনে নি। পরবর্তীকালে ইংরেজ যখন বাংলা, মাদ্রাজ বা বোম্বাইয়ের ক্ষুদ্র জায়গায় রাজ্য স্থাপন করতে অগ্রসর হয় তখন অপর অংশের ভারতবাসীরা তা নিজেদের বিপদ বলে ভাবতেও পারে নি। তা ছাড়া এ সবের বেশীর ভাগ খবরই গ্রামের লোকের কাছে বড় একটা পৌঁছত না। খবর নেওয়ার প্রয়োজনও তারা বড় একটা বোধ করত না।

ইউরোপের সামন্ত-প্রথা ভিন্নপ্রকৃতির ছিল বলে জড়ত্ব শুরু হওয়ামাত্র তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিল। ইউরোপীয় রাজা ছিলেন সবকিছুর মালিক। ভূ-সম্পত্তি, কৃষক, কারিগর সকলের উপরই ছিল তার সর্বময় কর্তৃত্ব। নির্দিষ্ট কাজ করেই কর্মচারীরা রেহাই পেত না। তারা রাজার দাসের মতই ছিল। ইউরোপে নানা স্তরের স্বত্বাধিকারীর মধ্যে যুদ্ধ হয়েছে স্বত্ব নিয়ে, কোন্ স্বত্বাধিকার কোন্ তন্ত্র-প্রথানুযায়ী চলবে তাই নিয়ে। তার ফলে জীবনধারার উপরই আঘাত এসে গেল এবং সামন্ততন্ত্র প্রথার বিরুদ্ধে বিরাট বিপ্লব ঘটে গিয়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হ'ল।

অবশ্য প্রাক্ ব্রিটিশ যুগ পর্যন্ত যে মানুষগুলি মোটা ভাত, মোটা কাপড় নিয়েও নিরঙ্কুশ সুখী জীবনযাপন করছিল, তা নয়। দুঃখ-দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ-মহামারী, বন্যা বা রাজার কিংবা উচ্চশ্রেণীর অত্যাচারের মধ্যে দেশ বিক্ষুব্ধ হ'ত। কিন্তু গ্রাম্যসমাজের কাঠামো ভেঙ্গে পড়ত না। নিদ্রার সাময়িক ব্যাঘাতের ফলে একটু নড়ে-চড়ে পুনরায় ঘুমিয়ে পড়ত।

নগর ও নাগরিক জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখি, সেখানেও প্রাচীর-ঘেরা স্থিতিশীল জীবন। কারিগরি, কারুশিল্প বংশগত। শুধু কি কামার, কুমার, জোলা, তাঁতি, সুতার আর খোদাইকার, চিত্র নির্মাণে হ'ল পটুয়ারা আর সঙ্গীতে 'ঘরানা', এরা সকলেই কম বেশী সূক্ষ্ম কারুকার্য, দক্ষতা ও অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে কিন্তু তার ফলে যন্ত্রপাতির উন্নতি ঘটে নি এবং উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় নি।

তার ওপর পাঠান-মোগলরা এল পরধর্ম নিয়ে। মন্দির ধ্বংস, হিন্দুদের উপর অত্যাচার ও বৈষম্যমূলক আচরণের ফলে তারা কোনদিনই হিন্দুর আপনজন হতে পারল না। আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা কোনদিনই সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয় নি। সুতরাং প্রবল-প্রতাপান্বিত স্বৈরাচারী ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোগল সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ল জীর্ণ গৃহের মত। যতটুকু ন্যায়নীতি, আইন-কানুন, শৃঙ্খলা ছিল সবই দূর হয়ে গেল। চারিদিকে দুর্নীতি, অনাচার, নৈরাশ্য ও দুর্বলতা দেখা দিল। কোথাও কোথাও, যেমন মারাঠা, রাজপুত আর শিখরা নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অভ্যুত্থান ঘটাল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিষ্ঠিত হ'ল নতুন নতুন রাজবংশ; সামন্ত রাজা। অনতিবিলম্বেই দেখা দিল আত্মকলহ হীনস্বার্থের দ্বন্দ্ব। সুতরাং পুরাতন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো অটুটই রয়ে গেল।

ভারতীয় সমাজ যখন এমনি শিলীভূত অবস্থায়, তখন ইউরোপে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লব শুরু হয়ে গিয়েছে। নতুন উৎপাদন পদ্ধতির গোড়াপত্তন হয়েছে। সুতরাং নব-যৌবনে উদ্দীপ্ত হয়ে ইউরোপীয়রা নতুন জয়-যাত্রায় বেরিয়ে পড়ল কাঁচামাল সংগ্রহ করতে এবং তা কারখানায় তৈরী হলে পর তার বিক্রয়ের বাজার স্থাপিত করতে। ভারতীয় ধনরত্ন আহ্বান করল পর্তুগীজ, ডাচ্, ফরাসী ও ইংরেজ।

আমাদের দুর্বলতা এবং কূটনৈতিক চালের ফলে ভারতবর্ষে ইংরেজরাই সাফল্যমণ্ডিত হ'ল। সাফল্য নিয়ে এল অত্যাচার ও শোষণ। উইলিয়াম বোল্টস্ লিখেছেন, "এই অত্যাচার সর্বক্ষেত্রেই। বেনিয়ান্ ও গোমস্তাদের সহায়তায় ইংরেজরা নিজেদের ইচ্ছামত দামে যে কোনও ব্যবসায়ীকে জিনিস বিক্রয় করতে বাধ্য করত। তাঁতিদের যে সমস্ত সর্তে আবদ্ধ করা হ'ত তাতে তাঁতিদের সম্মতি লওয়ার কোন প্রয়োজন ইংরেজরা বোধ করত না। সর্ত পালনে অক্ষম হলে মালপত্র দখল করে যে কোনও দরে বিক্রয় করে দাদনের টাকা আদায় করত। অত্যাচার এড়াবার জন্য তাঁতিরা আঙুল কেটে নিজেদের অক্ষম করে ফেলত···।" ওদের অত্যাচার সহ্য করার চাইতে বিকলাঙ্গ হওয়াও শ্রেয় মনে হয়েছিল !!

আর একজন ঐতিহাসিক লিখেছেন, "ইংরেজ কর্মচারীরা দেশের লোকের উপরও অত্যাচার করতই, নবাব কর্মচারীরা বে-আইনী কার্যে বাধা দিতে আসলে তারাও রেহাই পেত না। এরই ফলে মীরকাশিমের সঙ্গে যুদ্ধ হয়।" নবাবী পাওয়ার সময় ইংরেজেরা প্রত্যেক নবাবকে প্রচুর টাকা দিতে বাধ্য করত। দ্বিতীয় বার নবাব হওয়ার সময় মীরজাফর দেয় ২,৩০,৩৫৬ পাউণ্ড। পরে আট বছরের মধ্যে নানাখাতে আরও ৫৯,৪০,৪৯৮ পাউণ্ড। পলাশী যুদ্ধের পর ইংরেজ বণিক ও কর্মচারীরা মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করে অপরিমেয় ধনরত্ন লুণ্ঠন করে। ১৭৬৫ সনে লর্ড ক্লাইভ দিল্লীর বাদশাহের কাছ থেকে দেওয়ানী সনন্দ আদায় করবার ফলেও সমস্ত

খরচ বাদ দিয়ে ১৬,৫০,১০০ পাউণ্ড ষ্টার্লিং মুনাফা করল।

এর পরে ত বাংলা দেশে ইংরেজ অত্যাচারের বন্যা বয়ে গেল। অত্যাচার, শোষণ ও উৎপীড়নে সমস্ত দেশ ছারখার হয়ে যেতে লাগল। ১৭৭০-৭১ সনে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হ'ল যা ইতিহাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বলে কুখ্যাত। আনন্দমঠে সেই ভয়াবহতার বর্ণনা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। এই মন্বন্তরের মধ্যেও কিন্তু রাজস্ব আদায় পুরোদমে চলেছিল। ১৭৭২ সনে ওয়ারেন হেষ্টিংস্ বোর্ড অফ ডাইরেক্টরকে লিখেছিলেন—"যদিও এ দেশে এক-তৃতীয়াংশ লোক মরে গেছে এবং তার ফলে চাষের অবনতি ঘটেছে, তথাপি ১৭৭১ সনের নিট আদায় ১৭৬৮ সনের চাইতে বেশী। কড়া তাগিদের ফলেই এ সম্ভব হয়েছে।"

ইংরেজ কোম্পানীর আমলে ভারতবর্ষের সামন্ত-তান্ত্রিক শিল্প-বাণিজ্য ও কৃষি ধ্বংস হ'ল ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির দ্বারা। পুরাতনের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে নতুনের আবির্ভাব হ'ল না সামগ্রিক ভাবে। যা কিছু হ'ল তারও গতি অতি মন্থর। এক কথায় বলতে গেলে এদেশে শিল্প-বিপ্লব ঘটল না।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই ইংরেজের ব্যবসা-বাণিজ্যের সহায়তা করতে গিয়ে ব্রিটিশের প্রতিকূলতা সত্বেও কিছু কিছু কলকারখানা, বিশেষ করে কাপড়ের কলকারখানা স্থাপিত হতে লাগল। ব্রিটিশের সঙ্গে ভারতীয় বণিকের অর্থনৈতিক বিরোধ বৃদ্ধি পেতে লাগল। এ সংঘাতের মধ্য দিয়েই আমাদের দেশে শিল্প-বিস্তারে নবযুগের আবির্ভাব হ'ল। দেশের পুরনো আর্থিক কাঠামো ভেঙে গিয়ে নতুন ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল। সৃষ্টি হ'ল বুর্জোয়াশ্রেণীর। ক্রমে গ্রাম্যসমাজ ভেঙে গিয়ে দেশের নেতৃত্ব বুর্জোয়াদের হাতে চলে যেতে লাগল। এ প্রসঙ্গে সেকালের একটা গানের পদ মনে পড়ল, "তাঁতি, কর্মকার করে হাহাকার; মাকু, খাতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার।"

সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীব্যাপী দুর্ভিক্ষ হয় ভারতবর্ষের নানা জায়গায়। শুধু উনবিংশ শতাব্দী কেন, ইংরেজ রাজত্বের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষ কোনও দিনই দুর্ভিক্ষের হাত থেকে রেহাই পায় নি। সেই সময়ে সরকার একটা কমিশন গঠন করে দুর্ভিক্ষের কারণ নির্ণয়ে মনোনিবেশ করেছিল। এই প্রসঙ্গেই রমেশ দত্ত তাঁর দুই প্রামাণিক গ্রন্থ রচনা করেন ইকনমিক হিস্ট্রি অব ব্রিটিশ রুল ও ভিক্টোরিয়ান এজ। ডিগবি সাহেব লেখেন প্রস্পারাস ইণ্ডিয়া। ব্রিটিশের আর্থিক শোষণের নিষ্ঠুর ইতিহাস আমরা জানতে পারলাম। সবাই জানতে পারল, ভারতবর্ষের কৃষকেরা এক বেলাও পেট ভরে খেতে পায় না। ভারতবর্ষের অর্দ্ধেক লোকের দু'বেলা খাওয়া জোটে না। ভারত-সচিব (Secretary of States), বড়লাট (Viceroy) প্রভৃতি নানা উপলক্ষে স্পষ্টভাষায় মত প্রকাশ করেছেন যে, শাসন ও শোষণ একসঙ্গেই চলবে। শোষণ বন্ধ করার কথাই ওঠে না। India must be bled. আর যেখানেই রক্ত বেশী তাই হবে আঘাতের সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান।

সুতরাং বাংলা দেশ হ'ল তাদের লক্ষ্যস্থল। বাংলার জমি সুজলা সুফলা। ধনদৌলত অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অনেক বেশী। এই প্রসঙ্গে উইলিয়াম হাণ্টারের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, "প্রথম থেকেই বাংলা দেশ ভারতবর্ষের কামধেনু ছিল। বাংলাদেশকেই সকলে শোষণ করত।" ইংরেজ নিজের স্বার্থেই প্রতিষ্ঠা করে-ছিল রেলওয়ে, কয়লার খনি আর পাটশিল্প। কিন্তু এর ফলে যে সংঘাতের সৃষ্টি হ'ল তা বাংলা দেশের সামন্ত-তান্ত্রিক প্রথার ধ্বংস ক'রে শিল্প-বাণিজ্যের নবযুগের গোড়াপত্তন করে।

উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই ভারতবর্ষে যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বা ভদ্রলোকশ্রেণী গড়ে উঠছিল তারা, দ্বিতীয়ার্দ্ধ থেকেই আগ্রহের সঙ্গে লেখাপড়া শিখতে আরম্ভ করল। পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান আগ্রহের সঙ্গে জানতে ও বুঝতে চাইল। এ বিষয়ে বাংলা দেশ হ'ল সকলের অগ্রণী। কেন না, বাংলা দেশ ইংরেজের সংস্পর্শে প্রথম আসে। রাজত্ব স্থাপনে বাঙ্গালীই হয় প্রধান সহায়। এক-একটা রাজ্যজয়ের সময় বাঙ্গালী কেরাণীবাবু ও অন্যান্য কর্মচারীরা ব্রিটিশের অনুগমন করত। তারা ছিল সাহেব-দের পরই ছোট সাহেব। বাংলা দেশের বাইরে বাঙ্গালীর উপনিবেশ এভাবেই গড়ে উঠেছিল বিদেশী বিজেতার সাহায্য করে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা, সভ্যতা, জ্ঞান, বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করে বাঙ্গালীর চোখ খুলে গেল। নিজেদের মনে করল বিদেশীর সমকক্ষ। বিদেশীর সঙ্গে সমান অধি-কারের দাবীর প্রশ্ন মনে উদিত হ'ল।

ভারতবর্ষের ঘুমন্ত শক্তি জাগ্রত হ'ল। ইহাই রেনেসাঁস। আর তার প্রধান পুরুষ হলেন রাজা রাম-মোহন রায়। চৈতন্যদেবের সময়ও একবার বাংলায় রেনেসাঁস হয়েছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ পরিধিতে। কিন্তু ব্রিটিশ যুগে সমগ্র ভারতবর্ষে বিশেষত বাংলা দেশে জাতীয়

জীবনের সকল ক্ষেত্রে এত বড় জাগরণ, এতগুলি মনীষীর জন্ম জগতের ইতিহাসেও বোধ হয় অভূতপূর্ব।

রাজা রামমোহন রায় জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রাণসঞ্চার করলেন। সর্বপ্রকার সামাজিক ও ধর্মনৈতিক কুসংস্কারকে আঘাত করে তিনি ভূমিসাৎ করলেন। সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন এমনি বর্বর প্রথা যে আমাদের দেশে ছিল, আজ তা বিশ্বাস করাও কঠিন। উপনিষদে একেশ্বরবাদ প্রচার করে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন ব্রাহ্ম সমাজ। যদিও ব্রাহ্মধর্ম খুব বেশী লোক গ্রহণ করে নি কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজের নীতিগত, ধর্মগত ও সমাজগত প্রভাব এবং আদর্শ শিক্ষিত বাঙ্গালী হিন্দু সমাজকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে।

সাহিত্যের দিক দিয়াও তাহার দান অপরিসীম। তিনিই বাংলা গদ্যের জনক। জনগণের চলতি ভাষা সমৃদ্ধ না হলে জ্ঞান-বিজ্ঞান শুধু উচ্চশিক্ষিত জন কয়েকের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, এ কথাটা তিনি ভাল করেই বুঝেছিলেন। মানুষের মনের দাসত্ব ঘোচানই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তিনিই ভারতবর্ষের প্রথম বিপ্লবী।

পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সাধনাও পরানুকরণ মোহ ত্যাগ করে দেশের ধর্ম ও সভ্যতার দিকে শিক্ষিত লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। তিনি ছিলেন ভারতীয় ধর্মের জীবন্ত বিগ্রহ। নিজের জীবনে সত্য উপলব্ধি করে দেশের শিক্ষিত লোকের আত্মপ্রত্যয় জাগিয়ে তুলেছিলেন। মনের দাসত্ব ঘুচিয়ে বিপ্লবের জন্য যারা দেশকে প্রস্তুত করছিলেন পরমহংসদেব ছিলেন তাদের অন্যতম।

উনবিংশ শতাব্দীর আর একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এত বড় তেজস্বী নির্ভীক দয়ার্দ্রচিত্ত বিদ্বান ব্যক্তি সমগ্র শতাব্দীতে খুব কম জন্মেছে। বিদেশী শাসকদের কাছে কোন অবস্থাতেই মাথা নত করেন নি। হিন্দু সমাজের মহাপাপ মেয়েদের বৈধব্যদশা ও বহু-বিবাহ প্রথা বর্জনের জন্য ঘোরতর সংগ্রাম করেন। তিনি ছিলেন বাংলা-সাহিত্য স্রষ্টাদের পুরোভাগে। তিনি শুধু নিজের শিরই উন্নত রাখেন নি, নিজের আচরণ দ্বারা দেশকে শির উন্নত করতে শিখিয়েছিলেন। বাল্যজীবনের কথা বলতে গিয়ে পূর্বেই উল্লেখ করেছি কিভাবে তার আদর্শ সমাজকে বিপ্লবী জীবনের দিকে এগিয়ে যেতে প্রভাবান্বিত করেছে।

বাংলা দেশের মত এত ব্যাপক না হলেও অন্যান্য প্রদেশেও কিছু কিছু সংস্কার আন্দোলন দেখা দিয়েছিল। উত্তর ভারতে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর আর্যসমাজ-আন্দোলন ছিল সর্বপ্রধান। বিদেশী শাসনের প্রতি ছিল আর্যসমাজীদের তীব্র ঘৃণা। তার ফলে জাতীয়তা বোধ জাগিয়ে তুলতে অনেক সহায়ক হয়েছে।

আমার মনে হয় সমস্ত উনবিংশ শতাব্দীটাই বিপ্লবের জন্য প্রস্তুতির যুগ, যার পরিণতি ঘটে ১৯০৫ সনে। জাতির সর্বাঙ্গ তখন প্রাণপ্রাচুর্যে টলমল। এ সময়কার সাহিত্যের মধ্যেও দেখতে পাই এর প্রতিফলন। কবি ঈশ্বর গুপ্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীন সেন, রবীন্দ্রনাথ, গোবিন্দ দাস ও ডি, এল, রায় অক্ষয় দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, জ্যোতিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীনবন্ধু মিত্র, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, চণ্ডীচরণ সেন, স্বর্ণকুমারী দেবী, রজনী সেন, ক্ষিরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, কামিনী রায়, গিরিশ ঘোষ, অমৃতলাল বসু, রজনীকান্ত গুপ্ত প্রভৃতি কবি, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার, নাট্যকার, সকলেই সামাজিক, ধর্মনৈতিক, রাজনৈতিক—এক কথায় সর্বতোমুখী জাতি-গঠনের কাজ সাহিত্যের মধ্য দিয়ে করেছেন। এদেশের জাগরণের ইতিহাসে, বৈপ্লবিক শক্তির উদ্বোধনে স্বামী বিবেকানন্দের দানের তুলনা নেই।

১৭৫৭ সনের জুন মাসে পলাশীতে যে যুদ্ধের প্রহসন হয়, তার ফলে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু গোটা ভারতবর্ষ দখল করতে ব্রিটিশের এক শত বৎসর লেগে গেল। জয় সম্পূর্ণ হয় ১৮৫৭ সনে মে-জুন মাসের সিপাহী যুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে। কিন্তু ব্রিটিশের শিল্প-বাণিজ্য এবং রেলওয়ে স্থাপনের মাধ্যমে সর্বভারতীয় জাতীয়তাবোধের সূত্র গ্রথিত হ'ল।

সিপাহী বিদ্রোহের বিশ বৎসরের মধ্যেই ভারতবর্ষে প্রধানত বাংলা দেশে রাজনৈতিক সংগঠন-প্রচেষ্টা সুরু হয়। এই যুগেই নীল-চাষীরা বিদ্রোহ করে নীলকর ইংরেজের অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে। বাংলার নীল-চাষীদের সংগ্রাম এক অভূতপূর্ব ব্যাপার। তারা ইংরেজ নীলকরদের কাছ থেকে দাদন নিতে অস্বীকার করল। ভীষণ অত্যাচারেও তাদের সংকল্প ভেঙ্গে পড়ল না। দেশের সংবাদপত্র ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় চাষীদের দাবী ন্যায্য বলে স্বীকার করল। দীনবন্ধু মিত্রের "নীল দর্পণ" নাটক দেশে একটা প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি করে।

এই সমস্ত নানা কারণে তখন শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-বোধ, স্বাধীন চিন্তাশীলতা, সকল দিক থেকে উন্নত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হচ্ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক চেতনা তখনও আসে নি বা তার আশা-

আকাঙ্ক্ষার কোন বিশেষ প্রকাশ ছিল না—যা ছিল তারও কোন সংঘবদ্ধ রূপ দেখতে পাই না।

এমনি সময়ে রাজনৈতিক আকাশে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আবির্ভূত হলেন। তাঁর আবির্ভাব একটা বিস্ময়কর ঘটনা। ভারতবাসীর রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা তার বজ্রকণ্ঠে ধ্বনিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা নতুন যুগের প্রবর্তন হ'ল। সারা দেশব্যাপী রাজনৈতিক চেতনা ও তার সংঘবদ্ধ রূপ দিতে তিনিই প্রথমে আনন্দমোহন বসু ও অন্যান্য সহকর্মীদের সাহায্যে অগ্রসর হলেন।

আই-সি-এস-এর মত তখনকার দিনের উচ্চতম পদাধিকারী হয়েও আদালতে ইংরেজ জজ সাহেব হিন্দুর দেবতাকে অপমান করায় সুরেন্দ্রনাথ প্রতিবাদ জানান এবং দেশে প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি করেন। এজন্য তিনি চাকুরি থেকে বরখাস্ত ত হলেনই এমনকি তার কারাদণ্ডও হ'ল। জেলে যাওয়ার কথা যখন কেউ ভাবতেও পারে নি তখন সেই সুদূর অতীতে দেশের সম্মানরক্ষার জন্য কারাবরণ করলেন।

ভারতবর্ষের পরম লাভ হ'ল। ইংরেজ রাজত্ব স্থাপিত হওয়ার পর এই প্রথম ভারতের জনগণ একজন রাজনৈতিক নেতা পেল। সুরেন্দ্রনাথ বাস্তবিক রাষ্ট্রগুরু। দেশে রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারের জন্য তিনি আনন্দমোহন বসুর সাহচর্যে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন (ভারত সভা) নামে এক সমিতি গঠন করলেন। অন্যান্য প্রদেশেও এর শাখা প্রতিষ্ঠিত হ'ল। কোথাও কোথাও আবার সুরেন্দ্রনাথের উৎসাহেই অন্য নামে সমিতি গঠিত হয়েছিল। বাংলা দেশেরই শহরে শহরে, যেমন ঢাকায়, পিপলস্ এসোসিয়েসন স্থাপিত হয়। সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করে তিনি অগ্নিবর্ষী বক্তৃতা দিতে লাগলেন। শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে প্রাণস্পন্দন অনুভূত হ'ল। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও নবোদ্ভূত ধনিক ও বণিক শ্রেণীর মধ্যে যে অসন্তোষ এত দিন সঞ্চিত হচ্ছিল তা যেন বহিঃপ্রকাশের একটা পথ খুঁজে পেল।

ব্রিটিশ সরকার ও তাদের সাম্রাজ্যবাদী সমর্থকগণ প্রমাদ গণলেন এবং শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তাঁরা সিপাহী বিদ্রোহের আঘাত ভুলতে পারেন নি। সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁর সহকর্মীদের কার্যকলাপ দেখে তাঁরা চারদিকে বিভীষিকা দেখতে লাগলেন। একদিকে যেমন মুদ্রাযন্ত্র-স্বাধীনতা হরণ করতে উদ্যত হলেন তেমনি অপর কি উপায়ে রাজনৈতিক কার্যকলাপ বন্ধ করা যায় ভাবতে লাগলেন। তখন এলেন অক্টোভিয়ান হিউম নামে এক আই. সি. এস.। ভারতবর্ষে কংগ্রেস গঠনের পরামর্শ দিলেন। তিনি ছিলেন খুব দূরদর্শী ব্যক্তি। তিনি জানতেন যে, একটা জাগ্রত জাতির রাজনৈতিক চেতনার বহিঃপ্রকাশের পথ থাকা দরকার। নিয়মতান্ত্রিক ও আইনসম্মত পথে তাদের অভাব-অভিযোগ আলোচনা ও প্রকাশের ক্ষমতা না দিলে ত ভয়ঙ্কর পথ অবলম্বন করবে। এক রকম তাকেই কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়। সুরেন্দ্রনাথকে তিনি কংগ্রেসে আকর্ষণ করলেন। দেশের সর্বত্র সমিতি গঠনের কাজে মনোনিবেশ করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ এবং প্রকৃত শক্তিকেন্দ্র গঠন তার ফলেই হ'ত। কিন্তু বৎসরে একবার একত্রিত হয়ে দিন-তিনেক খুব বক্তৃতা আলোচনা ও প্রস্তাব পাশ করেই কর্তব্য শেষ ও উৎসাহ উদ্যম অবসানের সুবন্দোবস্ত হ'ল এই বাৎসরিক কংগ্রেসে। শক্তি সংহত হলেই বিপদ, তাকে বাইরে উবে যেতে দিলেই সাম্রাজ্যের পক্ষে মঙ্গল, এ কথাটা ইংরেজ ভাল করেই বুঝল।

তার পর অনেক বৎসর ধরে কংগ্রেস বৎসরে একবার শুধু বক্তৃতা, আলোচনা, প্রস্তাব গ্রহণ ও আবেদন নিবেদন করেই কর্তব্য সম্পাদন করত। প্রার্থনার মধ্যে ছিল এই কয়টি—সরকারী চাকুরিতে ভারতবাসীর নিয়োগ, আই. সি. এস. পরীক্ষায় ইংরেজ ও ভারতবাসীর সমান সুযোগলাভ, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইংরেজ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সমান সুবিধা। বিদেশী বণিকের বিশেষ সুবিধা লোপ। যদিও ক্রমে কংগ্রেসে বেশীসংখ্যক লোক যোগ দিতে থাকে কিন্তু ক্রমে কংগ্রেসের কোন সংস্থা (organisation) গড়ে ওঠে নি। তবুও ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের উপর অসন্তুষ্ট হ'ল। রাজকর্মচারীদের কংগ্রেসে যোগদান নিষিদ্ধ হয়ে গেল। অথচ কংগ্রেসের প্রথম দুই একটা অধিবেশনে বড়লাট উপস্থিত হয়েছিলেন। রাজভক্তিসূচক একটা প্রস্তাব পাশ হওয়া বহুদিন পর্যন্ত রীতি ছিল।

কংগ্রেসে যোগদান করেই সুরেন্দ্রনাথ নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। এই সেদিন পশ্চিমবঙ্গের গভর্ণর শ্রীচক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী মহাশয় সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতিসভায় বলেছিলেন যে, তাঁদের বাল্যকালে তাঁরা কংগ্রেস বলতে সুরেন্দ্রনাথকেই বুঝতেন।

কংগ্রেস আন্দোলনে বোম্বাই প্রদেশও খুব অগ্রসর হয়ে এল। তাদের উদীয়মান ধনিকশ্রেণী ধনতান্ত্রিক ইংরেজের সর্ববিষয়ে সুবিধাভোগে অসন্তুষ্ট হয়ে উঠছিল। এরাই কংগ্রেসে বেশী করে যোগ দিতে লাগল। বোম্বাইয়ের পার্শীরা বিদ্যায় ধনে ভারতবর্ষের অগ্রগণ্য

তাদের মধ্যে দাদাভাই নৌরজী, ফিরোজ শা মেটা, দিন শা ইছুলচী ওয়াচারের মত লোক জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

মহারাষ্ট্র রাজ্যেও তখন নবজাগরণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়েছিল। সাহিত্য, ইতিহাস চর্চায় এরা বাঙালীর পরই অগ্রসর হয়ে এসেছিল। নেতৃস্থানীয়-দের মধ্যে মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ে, ভাণ্ডারকর, গোখলে, তিলকের নাম চিরস্মরণীয়।

বালগঙ্গাধর তিলক ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নেতাদের অন্যতম ছিলেন। ১৯২০ সনে গান্ধীজীর দেশের নেতৃত্বভার গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত, অর্থাৎ তিলকের মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনিই ছিলেন ভারতবর্ষের সর্বজনমান্য শ্রেষ্ঠ নেতা। এমন সংগ্রামপন্থী, সর্বত্যাগী নির্ভীক নেতা তাঁর আগে দেশে জন্মগ্রহণ করে নি। তিনি ছিলেন চরমপন্থী বিপ্লবী। প্রথম থেকেই পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল তার আকাঙ্খার বস্তু। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তিনিই একাধিকবার রাজদ্রোহের অপরাধে কারাদণ্ড ভোগ করেন। মহারাষ্ট্রেই প্রথম বিপ্লবী সমিতি গঠিত হয়। লোকমান্য তিলক ছিলেন বিপ্লবীদের অগ্রজ।

১৮৯৮ সনে ভারতবর্ষে প্রথম প্লেগের আবির্ভাব হয়। পুণাতে প্লেগ নিবারণ করতে গিয়ে ব্রিটিশ মিলিটারী অফিসার ও সৈন্যগণ ভারতীয় নারীদের উপর পর্যন্ত অকথ্য অত্যাচার ও অপমান করে। র‍্যাণ্ড ও এমৃহার্ষ্ট ছিল এই বিষয়ে সবচেয়ে বেশী অপরাধী। বিপ্লবীরা এদেরকে গুলি করে মৃত্যুদণ্ড দেয়। তার ফলে চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের ফাঁসী হয় এবং নাটু ভ্রাতৃদ্বয় নির্বাসিত হন এবং তিলককেও অনেক নির্যাতন ভোগ করতে হয়।

তখনকার দিনের অবস্থা পর্যালোচনা করে লর্ড কার্জন দেখলেন যে, বাংলাই ভারতের সর্বাগ্রগণ্য প্রদেশ এবং সর্বভারতের নেতৃত্ব করছে। তৎকালীন বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে ইংরেজের সর্বাধিক টাকা খাটত পাট, চা, কয়লা ও অন্যান্য খনিজ দ্রব্যে। তার মধ্যে বাংলাই সর্বপ্রধান। ক্রয়-ক্ষমতা তখনও বাঙালীরই বেশী; সুতরাং, বিলিতী মাল বিক্রীর বাজারেও বাংলাই প্রথম। কলকাতাই ছিল সর্বপ্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ও সামুদ্রিক বন্দর। সুতরাং এই জাগ্রত বাঙালীকে দুর্বল না করতে পারলে ভারতবর্ষের শাসন ও শোষণে বাধা পড়বে। গোটা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেরই বিপদ ঘটবে। ধর্মগত বিভেদের উপর প্রদেশ গঠন করে জনগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি সৃষ্টি করতে পারলে সামান্ততান্ত্রিক প্রাচীনতার মধ্যে ডুবিয়ে রাখা সম্ভব হবে। এই সমস্ত কারণেই লর্ড কার্জন বঙ্গ-বিভাগ শেষ করে ফেললেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে বাঙালী সমাজকে হীনভাবে গালি দিয়ে সমস্ত বাঙালীকেই ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত করে তুলেছিলেন। তার উপর বঙ্গবিভাগের আদেশ দিয়ে একটা জাতির অন্তর্নিহিত শক্তি বিস্ফোরণের পথ করে দিলেন।

ক্রমশঃ
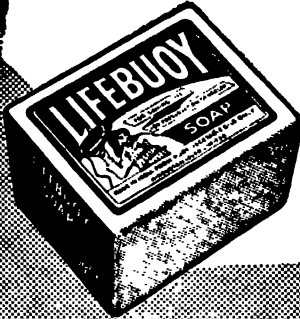
আর্টে সংযম

শ্রীতপতী চট্টোপাধ্যায়

মানুষের বিশিষ্ট অন্তর্লীলার বহিঃপ্রকাশই শিল্প। যিনি প্রকাশ করেন তিনিই কবি, স্রষ্টা, শিল্পী। প্রকাশের কথা বলিতে যাইলে মনে হয়, ব্যাপ্তির সৌন্দর্য্য তথা বাহ্যিক ব্যঞ্জনা রূপলীলাই শিল্পের বড় কথা। সৌন্দর্য্যের আনন্দ অনস্বীকার্য্য। জীবনে যে সত্য সাধারণরূপে আমাদের সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াও দৃষ্টিলাভ করে না—এই সৌন্দর্য্যই তা আমাদের দৃষ্টিকে তাহার দিকে আকৃষ্ট করে। কিন্তু এ সৌন্দর্য্য তখনই সার্থক হইয়া উঠে যখন তাহার মধ্যে ফুটিয়া ওঠে গভীরতার ব্যঞ্জনা। এই গভীরতার মাধুর্য্য-শিল্পসৃষ্টিকে বিশ্বের সকল মানবের অন্তরে স্থান-কাল-অতীত এক স্থায়ী আসন দেয়। সেই সর্ব্বকালের রসবস্তু হইয়া উঠাই শিল্পের উৎকর্ষতার স্বাক্ষর। এই গভীরতা ও বিচিত্র বহিঃপ্রকাশের কথা রবীন্দ্রনাথ কবি সুইন্‌বার্ণের কাব্য প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "ধ্বনি প্রতিধ্বনি নানাবিধ রঙিন সুতায় তিনি চিত্র বিচিত্র করিয়া ঘোরতর টকটকে রঙের ছবি আঁকিয়াছেন। সে সমস্ত আশ্চর্য্য কীর্ত্তি কিন্তু বিশ্বের ওপর তার প্রশস্ত প্রতিষ্ঠা নহে। শিল্পের উদ্দেশ্য, জীবনের সত্যকে সুর ও রসের সিঞ্চনে নূতন সৌন্দর্য্য সঞ্চারিত করিয়া সেই সৌন্দর্য্যের মাধুর্য্যে আমাদের দৃষ্টি তাহার দিকে ফিরাইয়া মনকে তত্ত্বের দিকে লইয়া যাওয়া আনন্দময় পথে। সুর ও রসের প্রয়োজন পরে, আগে চাই চিরন্তন সত্যের প্রতি গভীর দৃষ্টি লইয়া চাওয়া ও তাহাকে জানা।

শিল্পীর শিল্পসৃষ্টিকালে অনুভব বা উপলব্ধির ক্ষেত্রে সংযমের প্রয়োজন ভারতীয়ের কাছে নূতন নহে, প্রাচীন কালে ঋষিগণ পঞ্চ ইন্দ্রিয় তথা বাহ্যিক চাঞ্চল্যের দ্বার রুদ্ধ করিয়া সত্য উপলব্ধিতে হইতেন প্রবৃত্ত। সেই ত্যাগ ও সংযমের মধ্য হইতেই আসে সত্যোপলব্ধির আনন্দ। এই আনন্দের অন্তর্লীলার সুর ও রসে সম্পৃক্ত বহিঃপ্রকাশই শিল্প। শুধু ভাব চয়ান নহে প্রকাশকালেও সংযমের প্রয়োজন বড় কম নহে। শিল্পরস আস্বাদনকারীগণের দৃষ্টি যাহাতে অবাঞ্ছনীয় প্রাচুর্য্যের অবস্থিতিতে স্থির লক্ষ্য হইতে দূরে চলিয়া না যায় তাহার জন্য; শিল্পী তাহার সৃষ্টিতে একটি আঁচড় কাটিতে পারেন না যাহা অপ্রয়োজনীয়। এমনকি, শিল্পী তাহার অন্তর্লীলার উৎস হইতে প্রকাশিত ছিন্ন তানটিকে আপন আবেগের পূর্ণতা দিয়া ভরাইয়া দিতেও পারেন না, শিল্প বা সাধকের কল্পনার জন্য কিছুটা স্থান রাখিতে হয় তাহার মাঝে। শিল্পীর সৃষ্টি যখন মনকে রূপ-অতীত এক সৌন্দর্য্য মহাদেশের তটভূমির প্রান্তে লইয়া যাইবে তখনই শিল্প ইহার সার্থক। এই সার্থকতার শুধু সম্ভাবনা থাকিবে, শিল্পের মধ্যে সার্থক হইবে যে তাহাকে গ্রহণ করিবে তাহার মনে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

> "একাকী গায়কের নহে তো গান,
> গাহিতে হবে দুই জন
> গাহিবে একজন খুলিয়া গলা
> আরেক জন গাবে মনে।"

এই গ্রহণের মনের প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর, তবে এই গ্রহণের সুযোগ দিবার জন্য স্রষ্টার সংযমের প্রয়োজন। ভাষা ও ভাবের গতির রাশ কঠোর হাতে ধরিয়া বাহুল্যের চপলতাকে কঠিন সংযমের বাঁধনে বাঁধিয়া তবে শুরু হয় সৃষ্টির বিকাশ। এই সৃষ্টির প্রতি কথা, প্রতি আঁচড়ে আছে এক গভীর ব্যঞ্জনার ব্যাপ্তি। সেই সংযত শ্রীর মাধুর্য্য মনকে লইয়া যায় জীবনের অন্তর্লোকের সৌন্দর্য্যের রাজ্যে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ দিবস
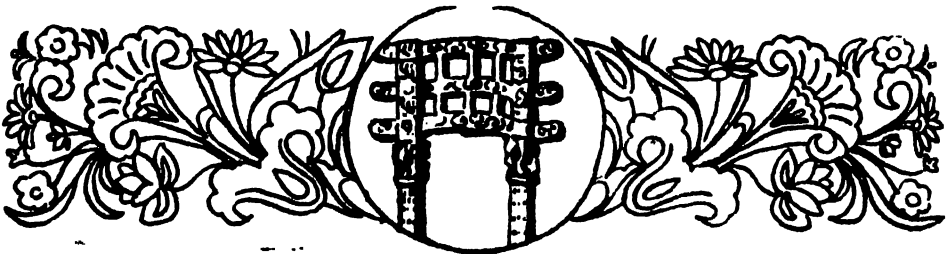
শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

আজ ২৪শে অক্টোবর, ১৯৬০ রাষ্ট্রসঙ্ঘ ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করল। পনর বৎসর পূর্ব্বে ১৯৪৫ সনে এই দিন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের স্যানফ্রানসিসকো শহরে পৃথিবীর ৫১টি স্বাধীন শান্তিকামী রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ সমবেত হ'য়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেদিন তাঁরা রাষ্ট্রসঙ্ঘের চার্টার বা সনদের ভূমিকায় ঘোষণা করেছিলেন :

"আমরা দৃঢ়সঙ্কল্প গ্রহণ করলাম, আমাদের জীবিতকালে দুই মহাযুদ্ধ যে সকল অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে এসেছে, সে সর্ব্বনাশা মহাযুদ্ধের কবল থেকে আমরা আমাদের অনাগত ভবিষ্যৎ-বংশীয়দের রক্ষা করব; মানুষের মৌলিক অধিকার তথা প্রত্যেক জাতির নরনারীর সম-অধিকার প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করব; জাগিয়ে তুলব সকলের মনে ন্যায়ের প্রতি নিষ্ঠা, উদ্বুদ্ধ করব চুক্তির বাধ্যবাধকতায় প্রত্যেক মানুষের শ্রদ্ধা। আন্তর্জ্জাতিক বিধানকে অক্ষুণ্ণ রাখার দায়িত্ব-পালনে আমরা দৃঢ়সঙ্কল্প। বৃহত্তর স্বাধীনতার মধ্যে জনগণের জীবনধারণের মান উন্নয়ন এবং সামাজিক সফল সাধনের কাজকে জীবনের মহাব্রতরূপে গ্রহণ করব। এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমরা হ'ব পরমতসহিষ্ণু, বসবাস করব সকল প্রতিবেশীর সঙ্গে সুখে ও শান্তিতে। আন্তর্জ্জাতিক নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য এবং বিশ্বশান্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং শক্তিশালী করার জন্য আমরা আমাদের সকল শক্তি সংহত ও ঐক্যবদ্ধ করব। এই মহান্ আদর্শের সাধন উদ্দেশ্য ব্যতীত কখনো অস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করব না এবং আন্তর্জ্জাতিক সংস্থার সাহায্যে বিশ্বের সকল জাতির অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করব। আমরা এই মহান্ আদর্শের রূপায়ণের জন্য ঐক্যবদ্ধ হ'তে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।"

এই পবিত্র ঐতিহাসিক দিনে আমাদের এক বিশেষ কর্ত্তব্য হচ্ছে, একবার অতীত ১৫ বৎসরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা এবং জাতিসমূহ রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠায় যে আদর্শ ও উহার রূপায়ণে যে দৃঢ়সঙ্কল্প ঘোষণা করেছিলেন তার কতটা সফল হয়েছে তা' যাচাই করা। রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রথম ও প্রধান আদর্শ যুদ্ধ নিবারণ, আলাপ-আলোচনা, তথ্য-সংগ্রহ, সালিশী-বিচার, পরস্পর বোঝাপড়া ও অন্যান্য নানা উপায়ে নানা জাতির মধ্যে যাতে যুদ্ধ না বাধে সেরূপ চেষ্টা করা এবং বিশ্বে শান্তি বজায় রাখা। আজ বিজ্ঞানের চরম উন্নতির দিনেও সভ্য মানুষ যে বিশ্ববিধ্বংসী মারণাস্ত্রের আবিষ্কার করেছে, আর একটি মহাযুদ্ধ হ'লে মানব-সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য্য। সুতরাং পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে অতি ক্ষুদ্র আকারেও সংঘর্ষের কারণ বা সম্ভাবনা দেখা দিলে রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাজ হ'ল তা' রোধ করা।

এ বিষয়ে আজ পর্য্যন্ত রাষ্ট্রসঙ্ঘ যা' করতে পেরেছে তা'তে বিরূপ হওয়ার কিছু নেই। রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কিছু পরেই ইরাণের আজারবাইজান অঞ্চলে সোভিয়েট বাহিনী থাকায় শান্তিভঙ্গের সূচনা দেখা দিলে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের চেষ্টায় সোভিয়েট-সৈন্য সরিয়ে নেওয়া হয়। রাষ্ট্রসঙ্ঘের চেষ্টায় ১৯৪৯ সনে আরব রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ইস্রাইলের যুদ্ধ নিবারিত হয়। ১৯৪৮ এবং ১৯৪৯ সনে ডাচ্ ও ইন্দোনেশীয়ার মধ্যে বিবাদ চলে, তা'ও রাষ্ট্রসঙ্ঘের 'শুভাকাঙ্ক্ষী' দলের চেষ্টায় নিবারিত হয় এবং ফলে ইন্দোনেশিয়া ১৯৫০ সনে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। সেদিন নীলনদের দেশে বিরোধের আগুন জ্বলে উঠল, সুয়েজ প্রণালীতে যাতায়াত বন্ধ হ'ল, সেখানেও শান্তির বাণী নিয়ে উপস্থিত হ'য়েছিল রাষ্ট্রসঙ্ঘ—মিশর দেশের সুয়েজ খাল এলাকা থেকে ইংরেজ ও ফরাসী এবং গাজা ও আকাবা উপসাগর থেকে ইস্রাইলের সৈন্য অপসারণের পর সুয়েজ প্রণালী পুনরায় উন্মুক্ত হয়েছে। এই অঞ্চলে শান্তিরক্ষার জন্য এখনও রাষ্ট্রসঙ্ঘের জরুরী বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। কাশ্মীরের যুদ্ধবিরতিও রাষ্ট্রসঙ্ঘের মধ্যস্থতায় হয়েছে। কিন্তু উত্তর-কোরিয়ার আক্রমণ থেকে দক্ষিণ-কোরিয়াকে রক্ষা করতে এবং আক্রমণকারীকে বিতাড়িত করতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের যুদ্ধ করতে হয়েছিল। গত বৎসর থাইল্যাণ্ড ও কাম্বোডিয়ার মধ্যে বিরোধ আরম্ভ হ'তেই রাষ্ট্রসঙ্ঘের চেষ্টায় মীমাংসা হয়। অতীতে দেখা গেছে যে, ছোট ছোট বিবাদ ও সংঘর্ষের পরিণতি হয়েছে মহাযুদ্ধে। কিন্তু রাষ্ট্রসঙ্ঘের স্থাপনের পর থেকে এই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠান বিশ্বধ্বংসী মহাযুদ্ধের অঙ্কুরকে আরম্ভেই বিনাশ করতে সক্ষম হয়েছে।

বিশ্বশান্তির একটা উপায় হচ্ছে, বড় বড় রাষ্ট্র কর্ত্তৃক যুদ্ধের আয়োজন পরিবর্জ্জন, অস্ত্র নির্মাণ সঙ্কোচন, আণবিক অস্ত্রাদির বিলোপসাধন। এই বিষয়ে ১৯৪৭ থেকে অবিরাম চেষ্টা চলেছে এবং বর্ত্তমান বৎসরের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনেও প্রধান প্রধান জাতিসমূহের মধ্যে সম্পূর্ণ মতৈক্য প্রতিষ্ঠা না হ'লেও একথা

সকলেই স্বীকার করছে যে যুদ্ধের আয়োজনের বিরতি না হ'লে মানবজাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার এবং মানব-সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য্য। বিশ্বের মঙ্গল সকলেই চাইছেন অথচ পন্থা নিয়ে এই ঝগড়ার কারণ হচ্ছে দুইটি আদর্শের দ্বন্দ্ব, মুখ্যতঃ সোভিয়েট ও আমেরিকার বিরোধ। পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস এর পশ্চাতে রয়েছে। একদল দেখছেন ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে বড় করে আর একদল ভাবছেন বাধাহীন রাষ্ট্রকর্তৃত্বই মানবের চরম মঙ্গলের হেতু। সকল ব্যক্তি তথা রাষ্ট্র একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'বে। সকলে একই কর্ম্মপন্থায় বিশ্বাসী হ'বে এরূপ মনে করা বা এ বিষয়ে অনমনীয় মনোভাব পোষণ করা বাস্তবতার পরিপন্থী। বিভিন্ন আদর্শের রাষ্ট্র ও মানুষকে সহনশীল হ'য়ে পৃথিবীতে বসবাস করতে হবে,এই মূলনীতি যতদিন না মানুষ অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি কচ্ছে ততদিনই বিশ্বশান্তির পরিণতিতে মানুষের সন্দেহ থেকে যাবে।

বিশ্বশান্তি কেবল যুদ্ধ-নিবারণ থেকেই আসবে না। আজও পৃথিবীর অর্দ্ধেকের বেশী লোক দৈন্য, অভাব, ক্ষুধায় প্রপীড়িত, অশিক্ষা ও অজ্ঞানতায় নিমজ্জিত, বহু দেশ আজও অনুন্নত, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ আজও অব্যাহত। পৃথিবীর নানা দেশের অনুন্নত অবস্থা ও অর্থনৈতিক শোষণ যতদিন না দূর হচ্ছে ততদিন বিশ্ব-শান্তি একটা কথার কথা থেকে যাবে। তাই রাষ্ট্রসংঘ এদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেছে এবং বিভিন্ন আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সকল প্রকারের জনকল্যাণ কাজে রত হ'য়েছে। এক দিকে বিশ্বমানবের মনে সে আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগাচ্ছে, অন্য দিকে শিক্ষা, সংস্কৃতি, জ্ঞান, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প প্রভৃতির উন্নতির এবং শিশু ও নারী-কল্যাণ তথা সকল প্রকার মানব-কল্যাণের কাজে হাত দিয়েছে।

রাষ্ট্রসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ কয়েকটি সহযোগী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজকল্যাণ, মানব-অধিকার প্রতিষ্ঠা, মাদক ঔষধাদির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ যা'তে না হয় এবং নারীর মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ইউরোপ, লাটিন-আমেরিকা, এসিয়া ও দূর-প্রাচ্য এবং আফ্রিকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য চারিটি কমিশন কাজে ব্যস্ত রয়েছে। আন্তর্জ্জাতিক শিশুকল্যাণ তহবিল সৃষ্টি করে অনুন্নত দেশের মাতৃমঙ্গল ও শিশুগণের প্রাণরক্ষার ও চিকিৎসার কাজ চলেছে। লক্ষ লক্ষ শিশু ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, ট্রাকোমা এবং 'ইয়' রোগের আক্রমণ থেকে আজ রক্ষা পাচ্ছে। বিশ্বস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের চেষ্টায় নানা মহামারীর বিরুদ্ধে পৃথিবীব্যাপী সকল অভিযান চলেছে। বিশ্ব-খাদ্য ও কৃষি-প্রতিষ্ঠান পৃথিবীর ক্ষুধিত মানবের খাদ্য সংস্থান ও কৃষির জন্য গবেষণা, খাদ্য উৎপাদন ও বণ্টন, নূতন খাদ্যের সন্ধানে ব্যাপৃত রয়েছে। অনুন্নত দেশসমূহের আর্থিক পুনর্গঠনের জন্য বিরাট্ ভাবে কারিগরি সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। বিশ্বব্যাঙ্ক, আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা-তহবিল, আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক সংস্থা এবং আন্তর্জ্জাতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান বিশ্বের সকল দেশের সকল প্রকার অর্থনৈতিক উন্নয়নে হাত দিয়েছে। দুনিয়ার মজুরের হিতের জন্য কর্ম্মরত রয়েছে আন্তর্জ্জাতিক শ্রম-প্রতিষ্ঠান। বিশ্বের চিঠিপত্রের যোগাযোগ রক্ষা করছে আন্তর্জ্জাতিক ডাক-ইউনিয়ন।

পরাধীন দেশগুলি যা'তে স্বাধীনতা পায় রাষ্ট্রসংঘ সেজন্য নানাভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে। রাষ্ট্রসংঘের চেষ্টায় ব্রিটিশ টোগোল্যাণ্ড গোল্ডকোষ্টের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে স্বাধীন ঘানায় পরিণত ও রাষ্ট্রসংঘের সদস্য হয়েছে। ফরাসী ক্যামারুন্‌স্, টোগোল্যাণ্ডও স্বাধীনতা পেয়েছে। অন্যান্য দেশও দ্রুত স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হচ্ছে। সম্প্রতি আফ্রিকার ১৬টি দেশ এবং প্রাক্তন ব্রিটিশ উপনিবেশ সাইপ্রাস্ স্বাধীনতা লাভ করে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য নির্ব্বাচিত হয়েছে।

বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের সমবেত চেষ্টায়ই রাষ্ট্রসঙ্ঘের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল চেষ্টা সম্ভব হচ্ছে। যদি এই চেষ্টায় ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে, যদি বিরাট আদর্শ আজও বাস্তবে রূপায়িত না হ'য়ে থাকে তা'র কারণ খুঁজতে হ'বে বিশ্ব-মানবের শক্তি। বুদ্ধি ও উহার প্রয়োগের ত্রুটির মধ্যে এবং উহার প্রতিকারের বিষয় চিন্তা করতে হবে। মানুষের মুক্তি একমাত্র সমবেত চেষ্টাতেই সম্ভব এবং এই সমবেত চেষ্টার বৃহত্তম এবং সার্থকতম সমাবেশ হয়েছে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মধ্যে। ভবিষ্যৎ মানবের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক্ রাষ্ট্রসঙ্ঘের জন্মদিনে, আমরা তা'র মহান্ আদর্শের সফলতা এবং প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘজীবন কামনা করছি।*

---

* অল ইণ্ডিয়া রেডিওর কলিকাতা কেন্দ্রে কথিত এবং অল ইণ্ডিয়া রেডিওর সৌজন্যে প্রকাশিত।

সেকালের ছাত্রজীবন

ডক্টর বিনয়কুমার সরকার

১৯০৩ সনের জুন মাসের শেষাশেষি। ইডেন হিন্দু হষ্টেলের নয়া বাড়ীর দোতলায় সিঁড়ির সামনে বারান্দা। বনোয়ারী খাবারওয়ালার চাঙারীতে লুচি, তরকারী, মাংস, সন্দেশ, রসগোল্লা ইত্যাদি মাল সাজানো। সম্মুখে খেলার মাঠ। জিতেন বাগচীর সঙ্গে এক ছোকরা রসগোল্লা খাইতেছে। পাশের ঘর হইতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি রে, তুই আবার কে?" বলিল, "সুকুমার চ্যাটার্জ্জী" কোথ থেকে, "মেদিনীপুর" তুই কে? "বিনয় সরকার" কোথ্ থেকে, "মালদা" ব্যস এই সুরু। জিতেন অঙ্ক কসে। অঙ্ক-কসিয়েদের দলে ছিল ময়মনসিংহের নরেশ ঘোষ। সে অবশ্য হষ্টেলে থাকিত না। আর একজন সারদা মাইতি, বাড়ী বীরভূম। ওর ঘর ছিল পুরোনো বাড়ীর দোতলায়। সুকুমার ইত্যাদির সঙ্গে তার দহরম-মহরম ছিল বেশ। একালে নরেশ ছিল প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক, সারদা পাটনার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। জিতেনও অঙ্কের প্রফেসার। অল্প বয়সে মারা যায়। আমাদের এই আড্ডার খুড়ো ছিল মনোরঞ্জন মৈত্র। নয়া বাড়ীর নীচের তলায় নাইবার কলের কাছে ছিল তার ঘর। কাজেই তেল মাখবার সময় গুলতান জমিত তার ঘরে দস্তুরমতন। ফরিদপুরের ছোঁড়া। একটু বাঙ্গাল-বাঙ্গাল আওয়াজ। তবে নরেশের মতন নয়। নরেশের "চ"টা আর "জ"টা কোনোদিনই মেরামত হইল না। মনোরঞ্জন ছিল সংস্কৃতয় পণ্ডিত। যখন তখন সুকুমার আসিয়া বলিত, "চ খুড়োর ঘরে গিয়ে সংস্কৃত শ্লোক শুনে আসি।" নরেশ আর সারদাও অনেক সময় হাজির থাকিত। রীতিমত পণ্ডিতী পাঠ। লোক জুটিত ঢের। কিরাতার্জ্জুনীয় শিশুপাল বধ ইত্যাদি বইয়ের কথা মনে পড়িতেছে। কিছুদিন প্রফেসারী করার পর মনোরঞ্জন ডেপুটি হইয়াছিল।

রংপুরের অতুল গুপ্ত হষ্টেলে থাকিত না। প্রেসিডেন্সী কলেজের বারান্দায় সে ছিল এই আড্ডারই ধুরন্ধর অন্যতম। সুকুমারের ফাঁকে ফাঁকে অতুলের তর্কাতর্কিও শুনিবার মতো ছিল। অতুলের কথার ঢঙ ছিল টানা টানা। এখনো প্রায় সেই রকমই আছে। হাইকোর্টের আওয়াজ শুনি নাই। ঘরোয়া বৈঠকের বলা-কওয়ার টানই বলিতেছি। হষ্টেলে তার বড় বেশী আনাগোনা ছিল না। গম্ভীর দার্শনিক গোছের। একালেও প্রায় তাই। প্রমথ চৌধুরীর (বীরবলের) সঙ্গে গা-ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া কিঞ্চিৎ সামাজিক মানুষ হইয়াছে। সুকুমারের সহিতই ঘনিষ্ঠতাটা দেখিবার মতো। হষ্টেলের বাসিন্দা ছিল নলিনী চক্রবর্ত্তী পুরোনো বাড়ীর দোতলায়। দর্শন পড়ুয়া। আড্ডাধারী ছিল মন্দ নয়। সুকুমারের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে চর্চ্চা চালাইত। দেশ তার বগুড়ায়। একালে উকীল। সুকুমার একদিন নলিনকে বলিল, "বিনয়টা বাংলা সাহিত্যে আনাড়ী, দে তো একবার রবিবাবুর কিছু শুনিয়ে!" মোহিত সেনের সম্পাদিত একটি বই হইতে সুকুমারই পড়িতে সুরু করিল সন্ন্যাসী উপগুপ্ত ইত্যাদি—যতই পড়িতেছে ততই আমি মাত্ হইতেছি। মুখে আর রা বাহির হইতেছে না। যাকে বলে অবাক। শেষ পর্য্যন্ত শুনিলাম, "আজি রজনীতে হয়েছে সময় এসেছি বাসবদত্তা।" যেই থামিল আমি ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলাম আনন্দে আর বিস্ময়ে। ভাবিলাম, বোধ হয় আরো আছে। দেখিলাম আর নাই। আমি তো হতভম্ব! আমার ভ্যাবাচাকা অবস্থা দেখিয়া নলিন ও সুকুমার এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল, "কী রে? বাংলা সাহিত্য কিছুই নয়? না?" জবাব দিলাম, "হাঁ কবিতা বটে! আর্ট বটে! ঐ রকম ভাবে হঠাৎ এসে থেমে গেল? উঃ, কী বাহাদুরী!" তখন সুকুমারের সঙ্গে আমরা তৃতীয় বার্ষিকে-(১৯০৩-০৪) এর পরের কথা। হষ্টেলের ফটকের সামনে দাঁড়াইয়া সুকুমার, নলিন ও মনোরঞ্জন আর অন্যান্য সকলকে লম্বা গলায় বলিতেছে, "সারদা মাইতি কি বলেছে শুনেছিস?" শোন, বলছে—"ভাই বিবেকানন্দ হষ্টেলে বিবেকের আনন্দ হ'ল কি না জানি না, কিন্তু উদরানন্দ তো হয় নি। তাই আবার অধম হিন্দু হষ্টেলেই পুনর্মূষিকো ভব।" সেই সময় মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে আর আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোড়ে একটা ছাত্রাবাস কায়েম হয় বিবেকানন্দের নামে। বিবেকানন্দের মৃত্যু ১৯০২ সনে। জলপাইগুড়ির শান্তিনিধান রায় একদিন সুকুমারের সঙ্গে হাত-পা নাড়িয়া বক্তৃতা করিতেছে বকাবকির মুদ্রা—"বোলপুরের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম।" সুকুমার বলিতেছে, "চল একবার দেখে আসি,

রবি ঠাকুরের সঙ্গেও দেখা হয়ে যাবে, আশ্রমও দেখে আসব।" শান্তি বলিল, "সমাজে গেলে আমি বেশ কিছু ইন্স্পেটাস (উদ্দীপনা) পাই।" দর্শন পড়ুয়া মনোমোহন বসুর সঙ্গে একদিন সুকুমার বকাবকি করিতেছে প্রেসিডেন্সী কলেজের বারন্দায়, সেখানে হাজির ছিল রাখাল ব্যানার্জ্জী (একালের মহেঞ্জোদাড়োর উদ্ধার কর্ত্তা) আর বিজয় বসু (পরে মেয়র), সকলেই বলিল, "আরে বিনয় আমাদের একদিন তোর ডন্ সোসাইটির তীর্থে নিয়ে চল, শুনে আসি সতীশ মুখার্জ্জীর বক্তৃতা। দেখি কার পাল্লায় পড়েছিস"। পরের দিন হষ্টেলের কলকতায় বিশ-পঁচিশ জনের হৈ হৈ, রৈ রৈ-র ভেতর সুকুমার সকলকে বলিতেছে, "জানিস ডন্ সোসাইটিতে বিনয় কী পড়তে যায়? সুখও কিছু নয়, দুঃখও কিছু নয়। বাঃ! মানুষগুলো গাছ-পাথর নাকি রে?" সুকুমার ও রাজেন্দ্র-প্রসাদ পণ্ডিত নীলকণ্ঠ গোস্বামীর গীতা-ব্যাখ্যা শুনিয়া আসিয়াছিল। ছাপড়ার রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মনোমোহন ইত্যাদি অনেকেই ছিল। রাজেন্দ্র আমাদের এক ক্লাস নীচে পড়িত। হষ্টেলে থাকিত নম্বা বাড়ীর নীচের তলায়। রাধাকুমুদের তদ্বিরে সে ডন্ সোসাইটিতে আমাদের গুরু-ভাই। আজকাল রাজেন্দ্রপ্রসাদ ডমিনিয়ান ভারতের খাদ্যসচিব। রাধাকুমুদ আমাদের অনেক বড় বয়সের। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভা হইতে একদিন সুকুমার, মনোরঞ্জন, অতুল, নরেশ, সবাই এক সঙ্গে ফিরিতেছি। সন্ধ্যার পর, শীতকাল। ১৯০৩ কিম্বা ১৯০৪ সন। আপার সারকুলার রোডে তেল কল, সুরকির কল, ময়দার কল ইত্যাদি কলের আবহাওয়া। ধোঁয়ায় আর ধুলায় সকলেরই চোখ কটকট করিতেছে। অস্থির হইয়া "সুকুমার বলিল, এই জন্যই ত গবর্ণমেণ্ট প্রেসিডেন্সী কলেজটাকে কলিকাতা হইতে সরাইতে চায়। খুব ভাল প্রস্তাব নয় কি? ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র কলিকাতা, রাজনৈতিক আন্দোলনের কেন্দ্র কলিকাতা। এইখানে কি লেখাপড়ার কেন্দ্র রাখা উচিত? লেখাপড়ার জন্য চাই রাচি, কি কোন স্বাস্থ্যকর নির্জ্জন জায়গা।"

আমি বলিলাম, "উল্টা। হট্টগোলের আর ধুলা-ময়লার ভিতরই ব্যবস্থা করা উচিত লেখাপড়ার জন্য। পোশাকী আবহাওয়ায় মানুষ তৈয়ারী হয় না। মানুষ গড়িবার জন্য বনেজঙ্গলে বা লোকজনের বাহিরে যাওয়া ঠিক নয়।"

তখনকার দিনে দেশের ভিতর চলিতেছিল বিশ্ব-বিদ্যালয় কমিশনের তদন্ত-সংক্রান্ত তর্কাতর্কি। সতীশ মুখার্জ্জী, গুরুদাস ব্যানার্জ্জী, সুরেন ব্যানার্জ্জী (বেঙ্গলী), মতি ঘোষ (অমৃতবাজার পত্রিকা) ইত্যাদি সকলেই কমিশনের বিরুদ্ধে। রবিবাবু স্বদেশী-সমাজ পড়িলেন দু'দু'বার। কলিকাতার ছেলে-ছোকরা মহলে হুলুস্থুল! জিতেন, অতুল, সুকুমার, রাজেন্দ্র ইত্যাদি সকলেই বহুমুখে তারিফ করিতেছে। সুকুমার জিজ্ঞেস করিল, "কিরে বিনয় তুই কিছু বলছিস না যে?" "ভাই, দুটোর কোনটাতেই যাই নি।" "কেন ডন সোসাইটির বারণ নাকি রে?" তা কেন হবে? সতীশবাবু নিজেই তো হাজির ছিলেন দু'বারই। হারাণ, চাকলাদার, রাধাকুমুদ, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, রাজেন্দ্র ইত্যাদি ডন্"সোসাইটির অনেকেই দু' দু'বার শুনে এসেছে।

১৯০৪ সনের বর্ষাকালে চৌরঙ্গীর মাঠ থেকে ফিরে সুকুমার বলিতেছে, "ধর্ম্মতলার খবরের কাগজের আপিসের দেওয়ালে কি ছাপা দেখলাম জানিস? ওয়ার ইমিনেণ্ট, লড়াই বাধো-বাধো।" "সে আবার কি?" মনোরঞ্জনকে সুকুমার বলিল, "বিনয়টা আদার বেপারী, জাহাজের খবর রাখে না।" খুব গল্প-গুজব চলিল। ১৯০৪ সনের কথা রুশ-ভাল্লুক জাপানী-ছাগলকে গিলিতে আসিতেছে। বাংলা দেশকে দু'টুকরো করবে ইংরেজ-জাত, বাংলা বাচ্চা তা শুনবে কেন? টাউনহলে বিলাতী মাল বয়কটের জন্য সভা হইল। ১৯০৫ সনের ৭ই আগষ্ট স্বদেশী আন্দোলনের জন্য বঙ্গ-বিপ্লবের সূত্রপাত। ঠিক যেন লড়াই! পরের দিন কলেজে সুকুমার, নরেশ, বিনয় সেন ইত্যাদি সকলে জিজ্ঞাসা করিল, তোকে তো টাউন-হলে দেখলাম না? তুই আবার বিলাতী মালের ভক্ত কবে থেকে হ'লি? ডন্ সোসাইটিতে তো সতীশবাবু স্বদেশী জিনিসেরও দোকান খুলেছেন। সেখানে তোরা কেনা-বেচার কারবারও তো শিখেছিস?" আমি তখন হিন্দু হোষ্টেল ছাড়িয়া দিয়াছি। সতীশবাবু, রবি ঘোষ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় আর পণ্ডিত মোক্ষদা সামাধ্যায়ীর সঙ্গে থাকি কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের উপরকার একটা মাঠ-ওয়ালা বাড়ীতে। মাঠটা পান্তের মাঠ নামে পরিচিত। বাড়ীটার নীচের তলায় ফিল্ড' অ্যাণ্ড আকাডেমী ক্লাব। সেই ক্লাব ছিল বিপিন পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ, বিজয় চ্যাটার্জ্জী (ব্যারিষ্টার), রজত রায় (ব্যারিষ্টার), সুবোধ মল্লিক (জমিদার) ইত্যাদি জননায়কের আড্ডা। দোতলায় ছিল সতীশ ব্রহ্মবান্ধবের "মেস"। সুকুমার, অতুল, মনোমোহন, বিজয় ইত্যাদি আমাদের মেসে ঢু মারিয়া গিয়াছিল। আমার হোষ্টেল ছাড়াটা সুকুমার, মনোরঞ্জন ইত্যাদির পছন্দসই ছিল না। বলিয়াছিল, হোষ্টেলে থেকে গেলেই ভালো করতিস।" যাহা হউক

সতীশবাবুর "বাগানে" ব্রজেন শীল, বিপিন পাল, রবি ঠাকুর, হীরেন দত্ত, গুরুদাস ব্যানার্জী, আশু চৌধুরী (ব্যারিষ্টার), মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (জমিদার) ইত্যাদি সেকালের ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, যমের আসা-যাওয়া ছিল। এই অধমের চৌকিতেও অনেকেই বসিয়া গিয়াছেন।

কলেজ-স্কোয়ারে ছেলেদের স্বদেশী সভা। বক্তৃতা করিল সুকুমার। জিজ্ঞাসা করিলাম "কি বললি?" সুকুমারের জবাব: "কাল কলেজে অতুল বলছিল দেবাটা বড় হয়ে গেছে। যেখানেই যাই সকলেই কিছু না কিছু নূতন কথা বলে, আমার পক্ষে বিশেষ কিছু বলবার দরকার হয় না। ঠিক সেই সুরেই আমিও গেয়ে এলাম।" প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ষ্টুডেণ্টস ম্যাগাজিন বাহির হইল (১৯০৫)। সুকুমার বিনয়কে, অতুলকে, নলিনকে ও আমাকে—যাকে পায় তাকে ডাকিয়া বলিতেছে, "আরে তোদের কাছে ষ্টুডেণ্টস ম্যাগাজিন আছে? থাকে তো দে, বড্ড জরুরী। না থাকে তো, এই একটা দিচ্ছি নিয়ে যা। ঘরে বসে এটাকে দুমড়ে মুচড়ে কালী-পেন্সিলের দাগ লাগিয়ে কালই ফেরৎ দিবি।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কাণ্ড কি রে সুকুমার? কী হয়েছে?" "আরে ভাই, পুলিস নাকি প্রেসিডেন্সী কলেজের উপর চটেছে এই কাগজ প্রিন্সিপাল আর বের করতে দেবে না।" "তাহলে কাগজটাকে দুমড়ে মুচড়ে ফেরৎ দিতে বলছিস্ কেন?" প্রিন্সিপালকে শ' দেড়-দুই কপি ফেরৎ দিতে হবে। দেখাবো যে, আমরা কাগজটা এখনো বেশী বিলি করি নি। যেগুলো বিলি হয়েছিল সে সবই ফেরৎ নিয়েছি। তাহলে প্রিন্সিপাল সাহেব পুলিসের কর্ত্তাদের ঠাণ্ডা রাখতে পারবে। এই সংখ্যাতে সরকারী শাসন সম্বন্ধে নরেশ সেনগুপ্তর কড়া সমালোচনা ছিল এক প্রবন্ধে।" নরেশ সেনগুপ্ত আমাদের চেয়ে বয়সে ও ক্লাশে বেশ বড়। একালে উকিল ও গাল্পিক। সেই বৎসরই পূজার ছুটির পর বিশ্ববিদ্যালয় বয়কটের ধুম। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্ কায়েম হইতেছে। বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজের জন্ম তোড়জোড় চলিতেছে। পার্সিভাল সাহেব এম এ ক্লাসে ইংরেজী পড়াইতে পড়াইতে কালো মুখ লাল করিয়া দেশের লোকগুলাকে বেশ কসে দু'ঘা জুতো লাগাইলেন। আমরা পার্সিভালের গালগুলা খুবই ভালোবাসিতাম। এই গালাগালিগুলিও বেশ লাগিল। ক্লাসের পর সুকুমার বলিতেছে, "দেখলি, তোর দিকে তাকানি আর চোখ রাঙানি! প্রেসিডেন্সী বয়কট করতে চাস্? তার মানে পার্সিভাল বয়কট? পার্সিভাল সাহেবের চেয়ে বড় মাষ্টার পেয়েছিস কাউকে? একি পার্সিভালের সহ্য হয়? দেশের লীডারগুলা ছেলেগুলাকে প্রেসিডেন্সী থেকে ভাগিয়ে নিয়ে পরকাল নষ্ট করতে চায়, কাজেই পার্সিভালের জুতা।"

হোষ্টেলের সুপারিণ্টেডেণ্ট ছিলেন সংস্কৃতের অধ্যাপক কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, ডন্ সোসাইটিতেও সতীশবাবু তাঁকে ডাকিয়া লইয়া বক্তৃতা দেখাইয়াছিলেন। একদিন পণ্ডিত মশাই ডাকিয়া পাঠাইলেন তাঁহার ঘরে। মনোরঞ্জন আর সুকুমার সঙ্গে গেল। ঘরে গিয়া দেখিলাম শীতলা গাঙ্গুলী (একালের ডেপুটি) ও বিনয় সেনকে (অধ্যাপক) একটা সরকারী চিঠি আমার হাতে দিয়া তিনি বলিলেন, "এই নেও ষ্টেট স্কলারশিপের পরোয়ানা, আই হোপ ইউ উইল্ কাম্‌ব্যাক্ অ্যাজ সিবিলিয়ান্"। সুকুমার বলিল, বিনয় ষ্টেট স্কলারশিপ নেবে না ঠিক করেছে।" পণ্ডিত মশাই বলিলেন, "এ আবার কি কথা? কে এমন পরামর্শ দিলো?" সুকুমার বলিল ও কারুর পরামর্শই শোনে না। এমনকি ল' কলেজ পর্য্যন্ত ছেড়ে দিয়েছে। আমরা ওকে কতবার বলেছি অন্ততঃ ল পরীক্ষাটা পাশ করে রাখ, তোর নিজের খেয়ালই হয় ত কখন বদলে যাবে। উকিলি তো স্বাধীন ব্যবসা!" সুকুমার আমায় আইন পাস করিবার জন্য অনেক উস্‌কাইয়াছে। বলিত, "পরে পস্তাবি।" বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলা বয়কট করার প্রস্তাব জননায়কগণের সভায় মঞ্জুর হইল না। গুরুদাসবাবু ছোকরাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "বিশ্ববিদ্যালয় বয়কটের দরকার নাই, আমরা একটা নয়া বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্ গড়িয়া তুলিতেছি।" সুকুমার বলিল, "দেখলি, গুরুদাসবাবুর মাথা? সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ও ছাড়িবেন না। অথচ জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্‌ও খাড়া করিবেন। তোদের ডন্ সোসাইটির প্রেসিডেণ্টই তো তিনি। সতীশ বাবুর মেজাজ এখন কোন দিকে রে? তোদের চালগুলো ভেস্তে যাচ্ছে দেখছি!"

হোষ্টেলে সুকুমারের ঘরে মহা হট্টগোল। কোঁদলের বিষয় ন্যাশনাল কলেজ। বলিতেছে—ন্যাশনাল কলেজ-ন্যাশনাল কলেজ শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। তোদের ঐ কলেজে কে পড়তে যাবে? ইতিহাসও পড়াবে অরবিন্দ ঘোষ। ইংরেজিও পড়াবে অরবিন্দ ঘোষ। এক অরবিন্দর নামে কলেজ ক'দিন চলবে রে গাধা? ব্রজেন শীলও মাষ্টার হচ্ছেন না। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীও মাষ্টার হচ্ছেন না। মোহিত সেনও মাষ্টার হচ্ছেন না। প্রফুল্ল রায় বা জগদীশ বোসও মাষ্টার হচ্ছেন না। কলেজের নাম হবে কিসে? মোক্ষদা সামাধ্যায়ীকেই

বা ক'জন চেনে ? রাধাকুমুদ আর রবি ঘোষ তো ছোকরা মাত্র। ঝালে ঝোলে অম্বলে সবেধন নীলমণি অরবিন্দ ঘোষ।

১৯০৬ সনে হোষ্টেলের পুরোনো বাড়ীর নীচের তলায় থাকে বঙ্গেন্দু। বাড়ী কৃষ্ণনগর। তাকে আমরা ডাকিতাম বাংলার চাঁদ বলিয়া। তখন আমাদের এম, এ, ক্লাস চলিতেছে। সুকুমার মনোরঞ্জনকে বলিল, "মজার খবর শুনেছিস ? বাংলার চাঁদের কাণ্ড ? সেদিন টিপিং সাহেব এসেছিল (প্রেসিডেন্সীর অধ্যাপক) হোষ্টেল দেখতে। যেই বঙ্গেন্দুর ঘরে ঢোকা আর যাবে কোথায় ? অমনি বঙ্গেন্দু জলের কুঁজোটা হাতে করে তুলে নিয়ে বারান্দায় গিয়ে খেলার মাঠের ভেতর ধুপ করে ফেলে দিলে। টিপিং তো অবাক! ব্যাপার কি ? খ্রীষ্টিয়ান ঢুকবে হিন্দুর ঘরে ? যে ঘরে খাবার জল থাকে ? খুড়োর ঘর তখন ছিল আড্ডাধারীতে ভরপুর। হো হো হাসিতে গুলজার হইল।"

সুকুমার, বঙ্গেন্দু খুড়ো আর আমি সুকুমারের ঘরে গুলতান করিতে করিতে একসঙ্গে পড়া মুখস্থ করিতাম। কার্লাইলের 'সার্টার রেসার্টাস' শেক্সপীয়রের 'সিম্বালিন' অথবা পোপের 'এশে অন ম্যান' ইত্যাদি মাল পেটে ঢুকিত। পাড়ার লোকেরা আমাদের চেঁচামেচি আর হাতাহাতিতে অস্থির। ১৯০৬ সন। ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়িতেছে। বলাবলি করিতেছে—সুকুমারটাকে এই ঘর ছাড়াতে হবে। সুকুমার কী করে ? বাধ্য হইয়া বলিতেছে, "ভাখ, তোর দার্শনিক ব্যাখ্যা-ট্যাখ্যা আর চলবে না। দে ওসব বাদ। দেখবি আর গণ্ডগোল হবে না। তুই যেখানে সেখানে ফিলজফি ঢুকাবি। এইজন্যই ত হাতাহাতি, ওসব আমারও বরদাস্ত হবে না, বঙ্গেন্দুর বরদাস্ত হবে না। তোকে ডন্ সোসাইটি বড় পেয়ে বসেছে। একদিন অতুলকে সুকুমার বলিতেছে, "বিনয়ের বাতিক্ দেখেছিস ? পার্সিভালের কমার্সের ক্লাসে গিয়ে ভর্ত্তি হ'ল। যেখানে পার্সিভাল সেখানে বিনয়। যায় ফিলজফির ক্লাসেও যায় পার্সিভালের প্লেটো পড়ানো শুনতে।" সুকুমার অতুলও পার্সিভাল-ভক্ত। পার্সিভালের নামে আমাদের জিভে জল আসিত। তবে হাসি-ঠাট্টার সামগ্রী ছিল এই অধম। ১৯০৭ সনের মাঝামাঝি বন্ধুরা কেহ গেল উকিলির দিকে, কেহ মাষ্টার, কেহ হাকিম, কেহবা কলেজেই। সুকুমারকে পাকড়াও করিলাম। বলিলাম, "ভাই একটা ছোকরাকে পড়ার সাহায্য করিতে হইবে। দেখি তোর পকেটে কি আছে। যাহা ছিল ভালই। লইয়া বলিলাম এইটাই হউক মাসিক। উচ্চবাচ্য না করিয়া সুকুমার বলিল, "তাই হবে"। ও তখন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। এই অধম ন্যাশনাল কলেজে ঢুকিয়াছে মামুলি সেবক খালি পা, খালি গা! বিলকুল কপর্দ্দকহীন।

[স্বর্গীয় ডঃ বিনয়কুমার সরকারের পত্র হইতে]

—•—

ধূসর গোধূলি
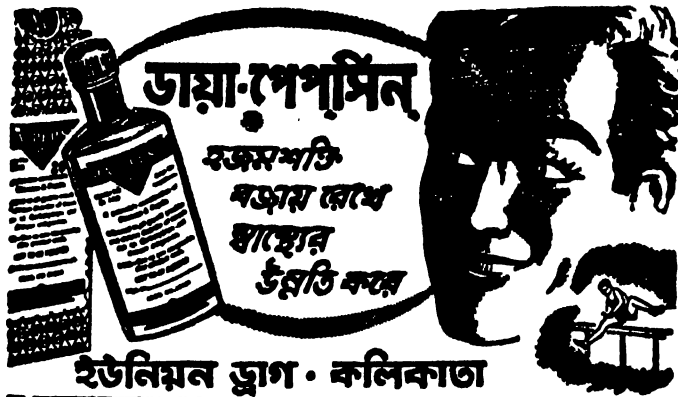
শ্রীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী

"আমি পারব না, পারব না, পারব না। এই আমার শেষ কথা—" তীক্ষ্ণ স্বরে বলে প্রবল উত্তেজনায় হাঁপাতে থাকে বিমলা। আগুনের শিখার মত টকটকে লাল মুখ, চোখ দুটোর মধ্যে যেন হীরকের তীব্র দ্যুতি কেন্দ্রীভূত হয়েছে।

গুম্ হয়ে নড়বড়ে চেয়ারটায় বসে ছিল সুগত। দাঁত দিয়ে ওপরের ঠোঁট কামড়াতে থাকে সে। ছাঁটা গোঁফে টান লাগার মৃদু বেদনাটুকু অনুভবও করতে পারে না।

কলকারখানা প্রধান এই অঞ্চলে ওরা এসেছে অল্প দিন। ঢালাই লোহার এই বিরাট ফ্যাক্টরীতে টাইপিষ্ট-এর কাজ পেয়েছে সুগত। মাইনে যা পায়—বাড়ী ভাড়া, জল আর চাল, ডাল, তেল, মসলাতেই কাবার। মাসের শেষে চিরকালের টানাটানিটা থেকেই যায়। তবু বাঁচোয়া যে, ছেলেপুলে হয় নি এখনও।

এ কারখানার উঁচুদরের চাকুরেদের নাকটা একটু বেশী রকমে উঁচু। ভালো মাইনে, ভালো কোম্পানীর বাড়ী আর নিজেদের উচু পদমর্য্যাদা সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন তাঁরা। কারখানার বাইরে নিম্নস্তরের কর্ম্মচারী-দের সঙ্গে কথাই বলেন না—অভ্রভেদী মর্য্যাদাটা ধূল্যব-লুণ্ঠিত হবার আশঙ্কায়। তাঁদের ক্লাব আলাদা, পাড়া আলাদা, ছেলেমেয়েদের স্কুলও আলাদা।

এখানে এসে হাঁপিয়ে উঠেছে বিমলা। কৃত্রিমতা ভরা এখানকার জীবনযাত্রার চাপে দম আটকে আসে তার। কলকাতার উদার আবহাওয়ায় বড় হয়েছে সে। স্কুল-কলেজে কত বড়লোকের মেয়ে ছেলের সঙ্গে পড়েছে। মিশেছে ধনবৈভবে প্রচণ্ড-নামাদের ছেলে মেয়ের সঙ্গে। কিন্তু এখানে এসে অবধি দেখেছে অফিসার গিন্নীদের বাঁকা দৃষ্টি আর বাঁকা সানুনাসিক কথা। সর্ব্বাঙ্গে জ্বালা ধরে যায় তার।

তাই বাড়ী থেকে বেরোয় না বড় একটা। মেশে না কারুর সঙ্গে।

স্কটিশ চার্চ্চ থেকে বি. এ. পাশ করেছে বিমলা। এখানকার বহু অফিসার গিন্নীর চেয়ে শিক্ষা আর সংস্কৃতিতে উঁচু সে আর অমার্জ্জনীয় এই অপরাধের জন্যই বুঝি তাঁদের সমবেত ঈর্ষার তাপ তার দিকেই বইতে থাকে।

বাপ মার পঞ্চম মেয়ে, তাই গ্র্যাজুয়েট টাইপিষ্ট-এর চেয়ে বড় কিছু জুটল না তার কপালে। তবু অখুশী নয় বিমলা। স্বামী সুগতর হৃদয়ের ঐশ্বর্য্য অফুরান।

কিন্তু এই নিষ্কাশনপুর মন টেকে না কিছুতেই।

বিপর্য্যয়টি ঘটে গেল স্বল্পতোয়া বরাকর নদীর বালুময় তীর দিয়ে বেড়াবার সময়ে।

সূর্য্য-ডোবা অন্ধকারে মুমূর্ষুর দেহে ক্ষীণ প্রাণস্পন্দনের মত তির তির করে বয়ে চলেছে বরাকরের জল। দূর দক্ষিণে—পঞ্চকোটের বিরাট পাহাড় যেদিককার আকাশকে সম্পূর্ণ আবৃত করে মহাকায় দৈত্যের মত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আর ক্ষীণ শরীর বরাকর নদী বন্দিনী সুন্দরীর মত লুটিয়ে পড়েছে তার পদপ্রান্তে। অন্য দিকে মাইথন বাঁধের বিদ্যুৎ-বাতীর মালা। অদূরের কলিয়ারী চিম্নীটা সারাদিন ধরে ধূম উদ্গীরণ করে করে যেন ক্লান্ত হয়ে করুণ চোখে আসন্ন রাত্রির নিঃশব্দ আগমন লক্ষ্য করছে। অল্প একটু পরেই সবার চোখেই নামবে ঘুম, কিন্তু ঘুমুবার উপায় নেই তার। সারারাত ধরে কলিয়ারীর ফুসফুস থেকে বিষাক্ত নিঃশ্বাস টেনে টেনে ছড়িয়ে দিতে হবে বাইরের স্থির নিষ্কলঙ্ক নৈশ বাতাসের গায়ে।

সুগত আর বিমলা আস্তে আস্তে হেঁটে বেড়াচ্ছিল নরম ভিজে বালির ওপর দিয়ে। এখানে ওখানে গ্রাম্য-বধূদের বালি খুঁড়ে জল নেবার অজস্র চিহ্ন ছড়িয়ে আছে।

বিপরীত দিক থেকে আসছিল একটি সাহেবী পোশাক পরা লোক। পাশে পাশে চেনে বাঁধা একটি প্রকাণ্ড এ্যাল্‌সেশিয়ান। কাছাকাছি হতেই তাকে চিনতে পারল সুগত। ওয়ার্কস্ ম্যানেজারের পার্শ্ব-সচিব মিষ্টার এন্, এল্, বরাট। তার বিনীত নমস্কারটাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেই পেরিয়ে যাচ্ছিলেন বরাট সাহেব, হঠাৎ বাঁকা চোখটা বিমলার পাণ্ডুর মুখে আটকে গেল।

দাঁড়িয়ে পড়লেন বরাট সাহেব, মুহূর্ত্তের দ্বিধাকে ঝেড়ে ফেলে বলে উঠলেন—"এক্সকিউজ মি, আমার মনে হচ্ছে আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি আমি—"

থেমে গেল সুগত আর সঙ্গে সঙ্গে বিমলা। মুখোমুখি দাঁড়ালো ওরা। নদীর ওপারে চিরকুণ্ডায় আলোর মালা জ্বলে উঠেছে, তারই ক্ষীণ আলোয় দেখা গেল পরিচয়ের দীপ্তিতে জ্বলে উঠেছে বরাট সাহেবের চোখ। পলকের জন্য যেন মিথ্যা আভিজাত্যের মুখোশ খসে পড়ল, মসৃণ মধুক্ষরা স্বরে বলে উঠলেন তিনি—"আরে, এ যে দেখছি বিমল, তুমি এখানে?"

তার পর সুগতর নরম আপ্যায়িত মুখের দিকে চোখ পড়ামাত্র ঘাড় নেড়ে বললেন—"I see. বুঝেছি।"

অস্পষ্ট গলায় বিমলা কি যেন বলল বোঝা গেল না, কিন্তু সুগতর বিগলিত কণ্ঠস্বর স্তব্ধ অন্ধকারের বুক চিরে ছড়িয়ে পড়ল চার পাশে—

"ইনি আমার স্ত্রী বিমলা স্যার।"

"So I guess—" সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে ওদের দু'জনার দিকে তাকালেন বরাট সাহেব। বিমলার শরীর থেকে একটা অদৃশ্য আকর্ষণ শক্তি বেরিয়ে যেন বেঁধে ফেলেছে তাঁর পা দুটো, চলে যেতে চাইলেও যেতে পারছেন না।

অনেক দিন আগের স্মৃতির দাগ কাটা মনের রেকর্ড যেন কথা কয়ে উঠল। সাত বছর আগের আবেগচঞ্চল দিনগুলি মনে পড়ল।

স্কটিশচার্চ কলেজের ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র তখন তিনি। নীরস পাঠ্য বইয়ের পাতা থেকে সহপাঠিনীদের সরস সজীব আকর্ষণই ছিল অনেক বেশী প্রবল। আবার অনেক মুখের প্রদর্শনীর মাঝে বিশেষ একটি মুখই মুগ্ধ করেছিল তাঁকে—সে মুখখানা বিমলার। আজকের এই গম্ভীর স্থৈর্য্যে বালুচরের ওপর দাঁড়ান বিমলার সঙ্গে সে মুখের মিল থেকে অমিলই যেন বেশী। প্রাণ-চাঞ্চল্যে ভরপুর সেই শ্যামাঙ্গী মেয়েটি তাঁর এবং আরও অনেক যুবক-চিত্তই প্রলুব্ধ করেছিল তখন। কলেজের কমনরুমে যাবার পথে অথবা কলেজের সামাজিক অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে আলাপ করার চেষ্টা করেছেন অনেকবার। কিন্তু কেমন যেন নীরব ঔদাসীন্যের বর্মে ঠেকে ভেঙে যেত তাঁর সকল চেষ্টা। তার কারণ আবিষ্কার করতেও বেশী সময় লাগে নি তাঁর। সায়েন্স ষ্টুডেন্ট অমিয় রায়ের সঙ্গেই যেন বেশী মাখামাখি বিমলার। তার সঙ্গে বিমলাকে দু চারদিন সিনেমা বা রেষ্টুরেন্টেও দেখতে পেলেন তিনি। কি একটা উন্মাদনায় ভরপুর হয়ে নিজের পড়ার বা কাজের বহু ক্ষতি করেও অলক্ষ্যে ওদের দুজনকে অনুসরণ করেছেন সেদিনের ঈর্ষ্যাকাতর নন্দলাল। তাঁর গায়ে-পড়া ঘনিষ্ঠতাকেই যতই এড়াতে চায় বিমলা ততই তাকে পাবার জন্য ক্ষেপে উঠলেন।

প্রথম যৌবনের উষ্ণ তাজা রক্ত টগবগিয়ে ফুটতো শুধু অনুরাগে নয় রাগেও।

তার পর এলো সেদিন, যেদিন জয় হিন্দ রেষ্টুরেন্টের একটি নিভৃত কেবিনে বসে অমিয়র জন্য অপেক্ষা করছিল বিমলা। প্রসাধনের সামান্য হেরফেরে রূপে যেন আগুন জ্বালছিল সে।

চুপি চুপি চোরের মত পা টিপে টিপে কাটা কাঠের দরজার ফাঁক দিয়ে ভেতরে উঁকি দেন নন্দলাল। জনপূর্ণ রেষ্টুরেন্টে কেউ লক্ষ্য করল না তাঁকে।

চুপ করে কনুই দুটি টেবিলে ঠেকিয়ে দু'হাতের তালুর বাটিতে থুঁৎনী ডুবিয়ে ভুমিলগ্ন চোখে বসে আছে বিমলা। অশোক বনের সীতার ছবির মতো বিমলার মুখখানা দেখে বুকের ভেতরটা হু হু করতে থাকে তাঁর। চক্ষের পলকে প্রলয় ঘটে গেল, কি করছেন আর কি বলছেন হুঁশ রইল না তাঁর।

হুঁশ হ'ল তখন যখন বিমলার ডান হাতের চারটি আঙুলই তাঁর বাঁ গালে রক্তাভ স্পষ্টতা নিয়ে ফুটে উঠল। সুমুখের ভয়ঙ্করী মূর্ত্তিই কি বিমলা? লেলিহান অগ্নির আভা তাঁর সারা মুখে পরিব্যাপ্ত, বিদ্যুৎ-প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে দুই চোখ দিয়ে। দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরছে বারে বারে। মাথার চুলগুলোও যেন ফুলে ফেঁপে উঠেছে, তেমনি ফুলে ফুলে উঠছে ওর বুক।

তার পর হৈ হৈ, চীৎকার, অনেক লোকের ভিড় আর ব্যঙ্গ বিদ্রূপ; এরই মাঝে কোথা থেকে ভীড় ঠেলে এগিয়ে আসে অমিয়। থর থর কাঁপা অপমানের বিষে জর্জ্জর বিমলাকে নিয়ে চলে যায় তাঁর সবল ব্যক্তিত্বের জোরে।

সেদিনকার ছায়াছবির মতো দৃশ্যের সবগুলি মনেও পড়ে না বরাট সাহেবের।

আবার বদলায় দৃশ্যপট। বি এ পাস করে বাপের পয়সায় বিলেতে চলে যান বরাট সাহেব। সেখান থেকে রপ্ত হয়ে আসেন সাহেবিয়ানায়। মুরুব্বির জোরে আর নিজের চেষ্টায় আজ তিনি এই নিষ্কাশনপুরের ঢালাই লোহার কারখানার একজন হোমরা-চোমরা অফিসার।

কার কাছে যেন শুনেছিলেন ছেচল্লিশের দাঙ্গায় খুন হয়েছে রিসার্চ স্কলার অমিয় রায়।

সূর্য্যাস্তের পর যে তরল স্বচ্ছতাটুকু আকাশের বুক থেকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে তা মিলিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। অন্ধকারের ঘন কালো আস্তরণ ক্রমে ক্রমে

আজ ...
লক্ষ পরিবারের
আদরের বস্তু
ডালডা বিশুদ্ধতার গুণে!
আপনার পরিবারই বা বঞ্চিত হবে কেন?
★ ডালডা বনস্পতিতে রাঁধুন!
ডালডা খুবই খাঁটি জিনিষ! আর সব সময়ই বায়ু সমূত সীল করা টিনে পাচ্ছেন।
★ ডালডা বনস্পতিতে রাঁধুন! তবেই খাবারের আসল স্বাদটি পাবেন। বাড়ীর সব রান্না, ডাল-তরকারী, শাকসব্জী, মাছ-মাংস সব কিছুই ডালডা বনস্পতি দিয়ে রাঁধুন।
★ ডালডা বনস্পতিতে রাঁধুন দেহের অধিকতর পুষ্টি সাধনের জন্য এর প্রতি আউন্সে (২৮.২৫ গ্রাঃ) ৭০০ ইন্টার ন্যাশনাল ইউনিট ভিটামিন 'এ' এবং ৫৬ ইন্টার ন্যাশনাল ইউনিট ভিটামিন 'ডি' যোগ করা হয়।
আজ রাতেও লক্ষ গৃহিনী যাঁরা ডালডায় রাঁধবেন সকলের হয়ত এ তথ্য জানা নেই। হয়ত ভাল জিনিস ব্যবহার করার অভ্যেসের ফলেই তাঁরা ডালডায় রাঁধছেন। আজ আপনিই বা তবে পেছনে পড়ে থাকবেন কেন?
ডালডা
বনস্পতি
DALDA
DL. 55-X52 BG
হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

ঢেকে দিচ্ছে চারদিক। মিলিয়ে গেছে ধূম উদগীরণরত কালো চিমনীটা, মিলিয়ে গেছে আকাশের পটে আঁকা পঞ্চকোট পাহাড়ের বিশাল দেহ।

কিন্তু বহু দূরের ফেলে আসা দিনগুলির স্মৃতি মিলিয়ে যাওয়া দূরে থাক, ক্রমেই যেন ভাস্বর হয়ে জ্বল জ্বল করে উঠছে মিষ্টার বরাটের মনে। সেদিনের সেই প্রত্যাখ্যান আর অপমানের বেদনার তীব্রতা আর অগ্নিজ্বালা যেন নতুন ভাবে অনুভব করতে লাগলেন তিনি।

নিজের অজান্তেই এক পা এগিয়ে গেলেন বিমলার দিকে। শিউরে উঠে এক পা পিছিয়ে গেল বিমলা। অন্ধকারে তার মুখখানি দেখা না গেলেও স্পষ্ট অনুভব করলেন বরাট সাহেব সে মুখখানি যেন ছাই ছাই হয়ে গেছে।

প্রথম যৌবনের পরিণামহীন আবেগ বিহ্বলতা আর নেই। কঠোর সংযম আপনা থেকেই বাস্তব জগতে ফিরিয়ে আনে বরাট সাহেবকে।

সুমুখে দাঁড়িয়ে একজন অতি নগণ্য কর্ম্মচারীর স্ত্রী —যে কর্ম্মচারীকে ইচ্ছে করলে নিমেষের মধ্যে একটা পিঁপড়ের মতো আঙ্গুলে পিষে মারতে পারেন তিনি।

একটা বিচিত্র হাসি খেলে গেল তাঁর মুখে।

আর একটিও কথা না বলে চট করে ঘুরে গিয়ে সুদৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যান বরাট সাহেব। দামী সিগারেটের গন্ধ ক্রমে ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে আসে।

এতক্ষণে যেন জীবন ফিরে পায় সুগত। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে ওঠে—"বরাট সাহেবকে তুমি চিনতে নাকি বিমল? কই এ্যাদ্দিন এখানে এসেছি, এ কথাটা বল নি তো কোনোদিন!"

ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল বিমলা। ক্লান্ত স্বরে বলল, "চল বাড়ী ফিরি এবার, রাত হয়ে গেল অনেক।"

নিঃশব্দ গতি বরাকরের স্তব্ধ বাতাসে তার কণ্ঠের কাঁপা করুণ সুরটি মিলিয়ে যায় নিঃসীম অন্ধকারে।

"বরাৎ খুলে যাবে আমার, বুঝলে বিমল," অদূরবর্ত্তী জি. টি. রোডের দিকে এগুতে এগুতে দ্রুত ছন্দে বলতে থাকে সুগত, "বরাট সাহেবের নজরে পড়লে আর কিছু না হোক অফিস এ্যাসিস্ট্যান্টের পোষ্টটা তো একেবারে বাঁধা। হুঁ, হুঁ, চারশো টাকার গ্রেড—"

এর পর দুই-তিন দিন গুম হয়ে রইল বিমলা। সুগতর বারম্বার আগ্রহব্যাকুল প্রশ্নের উত্তরে শুধু এই টুকুই বলল যে, কলেজে এক সঙ্গে পড়েছে নন্দলাল বরাটের সঙ্গে।

আর এটুকু সম্বল করেই আকাশে তাসের প্রাসাদ তৈরি করতে থাকে সুগত। এক একখানা তাস বসায় আর বিমলাকে ডেকে এনে দেখায়, বোঝায় তার গঠন-নৈপুণ্য, তার সুন্দর ভাস্কর্য্য।

কিন্তু কিছুই বলে না বিমলা। মুখখানা শুধু ম্লান হয়ে আসে তার।

সাত দিন মাত্র। আট দিনের দিন চীফের ঘরে ডাক পড়ল সুগতর। রাগে অগ্নিবর্ণ চীফ-এর মুখের দিকে তাকিয়ে গুড় গুড় করে উঠলো তার বুক। ছুঁচলো পেন্সিলের মাথা দিয়ে সুগতর সদ্য টাইপ করা কাগজটার এক অংশ এফোঁড়-ওফোঁড় করে চীৎকার করে উঠলেন তিনি, "What's this bloody nonsence!"

অপমানে চোখে জল এসে যায় সুগতর, তবু প্রাণপণে আত্মসংবরণ করে ঝুঁকে পড়ে কাগজখানা দেখে সে। সামান্য ভুল, যা টাইপিষ্ট মাত্রই করে। এর জন্যই সানকিতে বজ্রাঘাত!

বিমূঢ় ভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে এক মিনিট।

খাঁটি স্কচম্যান তার চীফ। সিগারের প্রান্ত কামড়াতে কামড়াতে সুগতর আপাদমস্তক লক্ষ্য করছিলেন তিনি। এবার বোমার মতো ফেটে পড়লেন, "Get out, get out you idiot. Any more of such mistako and you will get a sack.

স্বপ্নের ঘোরে নিজের চেয়ারে এসে বসে সুগত। অন্য কেরাণীরা আঙ্গুল দিয়ে তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে ফিস্‌-ফিসানি জুড়ে দেয় নিজেদের মধ্যে। অনেকেই খুশী হয়েছে সুগতর এই অপমানে—অনেক ম্যাট্রিক-ফেল করা কেরাণীরা, যারা সুগতর গ্র্যাজুয়েট হওয়াটাকে একটা অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলে মনে করে।

বিপর্য্যস্ত মনটাকে আসলে গুছিয়ে নিতে অনেকটা সময় যায় সুগতর। টাইপরাইটার মেশিনটা সুমুখে রেখে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে সে। ভেবেই পায় না তাদের প্রোডাক্‌শন ম্যানেজার মিষ্টার ম্যাক্‌ডোনাল্ড সহসা এত গরম হয়ে উঠলেন কেন। এ ভুলটা তো অতি সাধারণ, ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়।

এর পর যত দিন যেতে লাগলো ততই এ কথাটা স্পষ্ট হয় যে, সুগতর ধর্ত্তব্যের মধ্যে না থাকা ভুলগুলো ধরবার জন্যই ম্যাকডোনাল্ড যেন হঠাৎ সহস্র-চক্ষু হয়ে গেছেন। সুগতর সম্পূর্ণ ত্রুটিশূন্য দিনগুলোই মনে মনে অপছন্দ করেন বরং।

টাইপিষ্ট-এর পোষ্টটা অদূর ভবিষ্যতেই খালি হবে এই আশায় কয়েকজন অত্যুৎসাহী সামান্য টাইপ-জানা ছোকরা

আধুনিক গৃহিণীদের মতে

সার্ফে কাচা কাপড় সবচেয়ে ফরসা হয়

খুব সহজে !

হাজার হাজার গৃহিণীরা আজ সার্ফ ব্যবহার করে জেনেছেন যে সার্ফের মতো এত ফরসা করে কাপড় আর কোন কিছুতেই কাচা যায় না।

সার্ফের কাপড় কাচার শক্তি অতুলনীয়। কাপড়ের ভেতরের সব ময়লা, এমনকি লুকোনো ময়লাও টেনে বের করে—তাই সার্ফে কাপড় সবচেয়ে ফরসা হয়।

আধুনিক এই কাপড় কাচার পাউডারটিতে কাচারও কোন ঝামেলা নেই। তাই সার্ফই আজকের দিনে কাপড় কাচার সবচেয়ে সহজ উপায়।

ধুতি, শাড়ি, ব্লাউজ-জামা, ফ্রক, সার্ট, তোয়ালে, ঝাড়ন, বালিশের ওয়াড়, বিছানার চাদর, এক কথায় আপনি বাড়ীর সব কাপড় চোপড়ই সার্ফে কাচুন—দেখবেন রঙীন কাপড় ঝলমলে আর সাদা কাপড় ধব্‌ধবে ফরসা করে তুলতে সার্ফের জুড়ী নেই।
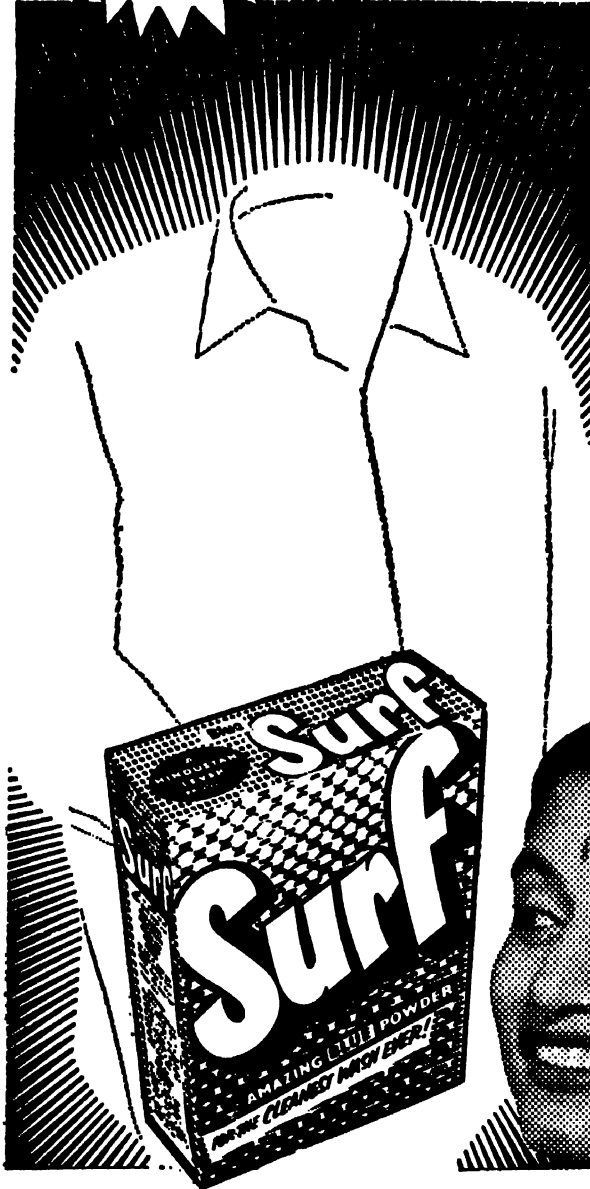
Surf

Surf

AMAZING BLUE POWDER

FOR THE CLEANEST WASH EVER!

সার্ফ দিয়ে বাড়ীতে কাচুন, কাপড় **সবচেয়ে ফরসা** হবে

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেডের তৈরী

কেরাণীরা দরখাস্ত করে বসল ঐ পোষ্টের জন্য। খেজুর রং-এর গোঁফের আড়ালে মৃদু হাসলেন, ম্যাক্‌ডোনাল্ড সে সব দরখাস্ত পেয়ে ব্রিটিশ ইম্পিরিয়ালিজমের উগ্র সুরা সেবন করতে করতে প্রৌঢ়ত্বে পা দিয়েছেন তিনি। স্বাধীন ভারতের হীনবীর্য্য নাগরিকদের গালি-গালাজ করে আর সাজা দিয়ে একটা অদ্ভুত প্রতিশোধ-স্পৃহার চরিতার্থতা খোঁজেন তিনি।

কথাটা কিন্তু গোপনে রইল না বেশী দিন। সুগতর শুভানুধ্যায়ীরা আভাসে-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল যে, চাঁদের যেমন নিজস্ব আলো নেই, তেমনি ম্যাক্‌ডোনাল্ডের এই হাঁক-ডাক, তর্জ্জন-গর্জ্জন সব কিছুই আসলে আসছে—মিষ্টার বরাটের কাছ থেকে।

এই আকস্মিক বিপর্যয়ে দিশেহারা হয়ে মিষ্টার বরাটের কথা ভুলেই গিয়েছিল সুগত। এবারে মনে পড়ল সেই প্রদোষ অন্ধকারে তাদের সাক্ষাতের কথা।

অদৃষ্টের পরিহাসে অমৃত গরলে পরিণত হয়েছে।

পূর্ব্ব পরিচয়ের সূত্র ধরে বরাট সাহেবের বাংলো না যাবার এই ফল।

তাই বিমলার কাছে বরাট সাহেবের বাংলোতে বেড়াতে যাবার প্রস্তাব করে সুগত। যদি কোনো কারণে ক্ষুব্ধও হয়ে থাকেন তবে তার কারণটাও জানা যেতে পারে।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য, একেবারে বেঁকে বসে বিমলা। শক্ত আরক্ত মুখে সুগতর সব অনুনয় আর যুক্তি শোনে সে, কিন্তু ঐ ছোট্ট 'না' শব্দটি ছাড়া আর কোনো কথা বেরয় না ওর মুখ থেকে।

অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করে সুগত। এর মধ্যে দোষাবহ কিছু দেখতে পায় না সে। বিমলার মতো শিক্ষিতা নারীও যে কেন এ রকম অবুঝপনা করে! শেষটায় তিক্ত কণ্ঠে বলে, "তা হ'লে কাজে জবাব হয়ে যাক আমার—তোমারও বোধ হয় এই-ই ইচ্ছে?"

"জবাব হবে কেন? কাজ ছেড়ে দাও তুমি—" এতক্ষণ পরে শান্তস্বরে বলে বিমলা, "তুমি পুরুষ মানুষ, লেখাপড়া শিখেছ, অন্য একটা কাজ যোগাড় করে নিতে পারবে না?"

চটে ওঠে সুগত, বলে, "বলাটা খুবই সহজ, চট করে কাজ পাওয়াটা মুখের কথা নয়। তা ছাড়া এতদিন এখানে কাজ করে সিনিয়ার হয়েছি আমি, আর একটা লিফ্‌ট পাওনা হবে দু' মাস পরে, ক'বছর পরে পাওনা হবে গ্র্যাচুইটি। নতুন জায়গায় তো সিঁড়ির শেষ ধাপ থেকে শুরু করতে হবে আবার!" ভাবতেও শিউরে ওঠে সুগত। প্রাক্‌-চাকরিজীবনের বেকারত্বের ছবিটা জল জল করে ভেসে ওঠে ওর চোখের সামনে। দরজায় দরজায় ধরণা দেবার দুঃস্বপ্নের মতো রুক্ষ কঠিন দিনগুলির কথা মনে পড়ে।

"কেন মিছে ভাবছ?" পাশে বসে সুগতর বিরাগ-ভরা মুখখানা দু' হাতে ধরে নিজের দিকে ফেরায় বিমলা, বলে, "আমিও তো আছি, একটা স্কুল-মিষ্ট্রেসের কাজ পাওয়াটা বোধ হয় কঠিন হবে না।"

বিমলার স্পর্শ আর কোমল সুরের ছোঁয়ায় শীতল হয়ে আসে সুগতর তপ্ত মন। নিঃশ্বাস ফেলে বলে, "বি.টি. না হলে স্কুল-মিষ্ট্রেস হওয়াও কঠিন আজকাল।"

"বি.টি.-টা না হয় দিয়েই দেব বাবার ওখানে থেকে" —অল্প হেসে উঠে দাঁড়ায় বিমলা, বলে, "চল, খেতে দি তোমাকে। রাত বড়ো কম হয় নি। ঘুম পেয়েছে আমার।"

কিন্তু খাবার পর বিছানায় শুয়ে ঘুম পাবার কোনো লক্ষণই দেখায় না বিমলা। অনেক রাত পর্য্যন্ত জেগে থেকে নতুন চাকরি পাবার পরিকল্পনা করে দু'জনে।

কিন্তু তপ্ত নিশায়, প্রেয়সীর সঙ্গ-সুখের নেশা-ঢুলুঢুলু মনের সব কল্পনাই দিনের রূঢ় কঠিন আলোকের ঘায়ে ভেঙে মিলিয়ে যায় মহাশূন্যে। চাকরি ছাড়ার পথে দেখা দেয় বহু দুস্তর আর দুরতিক্রম বাধা।

ম্যাকডোনাল্ডের নির্য্যাতন অব্যাহত থাকে।

তীব্র অপমানের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে এক-একদিন আপিস থেকে বাড়ী ফিরে বিমলাকে শক্ত শক্ত কথা শোনায় সুগত। কখনো অনুনয়ের, কখনো বা বিনয়ের সুরে লুব্ধ করতে চায় তাকে, বলে, "অচেনা তো আর নন, এক সঙ্গে পড়েছ কলেজে, একটিবার গেলেই যদি কাজ হয় তবে তোমার এই না-যাবার অহেতুক জেদের মানে তো আমি বুঝি না বিমলা। চলো, আজ যেতেই হবে তোমাকে।

"না, না, ওগো তোমার পায়ে পড়ি, জোর করো না তুমি"—আর্ত্তস্বরে বলে ওঠে বিমলা, দু' হাতে মুখ ঢাকে। অবরুদ্ধ ক্রন্দনের বেগে কাঁপতে থাকে ওর পিঠ, আর সে দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে যায় সুগত। দু' হাতে জোর করে তুলে ধরে বিমলার অশ্রু-কলঙ্কিত মুখ। কোঁচার খুঁট দিয়ে মুছে দেয় তার চোখের জল, তার পর গভীর প্রেমে চুম্বন এঁকে দেয় তার থর্‌থর্‌-কাঁপা ঠোঁটে।

অবস্থা চরমে উঠলো। কাজে ক্রমাগত অন্যমনস্কতার জন্য একদিন চার্জ্জসীট পেল সুগত।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ী ফিরে টাইপ-করা

কাগজটা বিমলার মুখের উপর ছুঁড়ে দিয়ে গভীর ঘৃণায় বলল, "এই নাও তোমার অসঙ্গত জেদের পুরস্কার। মনস্কামনা পূর্ণ হ'ল বোধ করি—"

কাগজখানা তুলে নিয়ে তার ওপরে চোখ বুলালো বিমলা। মুখখানা প্রথমে রক্তহীন ফ্যাকাসে হয়ে গেল, তার পরে হঠাৎ প্রবল রক্তোচ্ছ্বাসে টকটকে লাল হয়ে গেল।

চার্জ্জসীটের নীচে সহি করেছেন মিষ্টার এন্. এল. বরাট। আঁকা-বাঁকা সেই সহিটার দিকে তাকিয়ে বিমলার চক্ষু দু'টি শান-দেওয়া ছুরির মতো ঝক্ ঝক্ করতে লাগলো। সারা মুখে নেমে এলো একটা অবিচল সঙ্কল্পের দৃঢ়তা। একটা ক্রুর প্রতিহিংসার ছায়া যেন ঝিলিক দিয়ে ওঠে।

নন্দলালের অবিমৃশ্যকারিতার জন্যই বিমলাকে হারাতে হয়েছে প্রথম যৌবনের প্রেমাস্পদকে। তারই অকারণ শত্রুতার জন্য বিমলাকে হারাতে হবে স্বামী আর সংসার। পাকে পাকে নাগপাশের মত বেঁধে ফেলতে চায় তাকে নন্দলাল।

কিন্তু কেন? কিসের এত দর্প তার? কিসের এই তেজ? কোন্ প্রলোভনে এতো নীচে নেমে যাচ্ছে এই নন্দলাল বরাট?

মাথার ভেতর আগুন জলতে থাকে বিমলার।

দীর্ঘ দিন পরে প্রসাধনে বসলো বিমলা। রক্তলাল-শাড়ীর সঙ্গে ম্যাচ করে গায়ে দিল ঘোর রঙের কটকী কাজ করা ব্লাউজ। পায়ে গলালো বাটার লাল জুতো। অল্প রুজের ছোঁয়ায় গাল দুটি থেকে রক্ত যেন ফেটে পড়ছে। কবরী বন্ধ খুলে পিঠে ছড়িয়ে দিল কৃষ্ণ সর্পিল বেণী। তার পর হতোদ্যম সুগতর কাছে এসে বলল— "নাও চল—"

অগ্নিস্পৃষ্টের মত উঠে দাঁড়াল সুগত, বলল, "যাবে?"

কালবিলম্ব না করে ফর্সা ধুতী-পাঞ্জাবী পরে বিমলার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে পথে।

পশ্চিম-আকাশে মেঘের গা থেকে সন্ধ্যার শেষ সিন্দুরটুকু অবলুপ্ত হয় নি তখনও। বাগানের গেট খুলে ভেতরে ঢুকল বিমলা আর সুগত। বারান্দার খুঁটিতে চেনে বাঁধা এ্যালসেশিয়ানটা গর্জ্জন করে ওঠে। সে চীৎকার শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন বরাট সাহেব। বাগানের দিকে চোখ পড়তেই দ্রুতপদে এগিয়ে আসেন।

"আঃ, কি সৌভাগ্য আমার—রাণী এসেছেন দরিদ্রের পর্ণ কুটিরে—" নিষ্ঠুর ব্যঙ্গে বিভক্ত ওষ্ঠাধরে বলে ওঠেন তিনি।

কথাটা গায়ে না মেখে স্মিত সুন্দর হাসল বিমলা। মুক্তার মত সাদা দাঁতগুলো ঝক ঝক করে উঠল, বলল— "চল, চল ঘরে চল, রাস্তায় দাঁড়িয়ে আর রসিকতা করতে হবে না।"

মুখ থেকে আধ-পোড়া সিগারেটটা বারান্দার ফুলের টবে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন বরাট সাহেব। ব্যস্ত পায়ে এগোতে এগোতে বললেন—"এস, এস—আসুন—কি নাম আপনার? ওঃ সুগত, হ্যাঁ, সুগতবাবু—"

বারান্দায় উঠল তিন জন। তিনটি বেতের চেয়ার নিয়ে কাছাকাছি বসল তারা। প্রভুকে দেখে এ্যালসেশিয়ানটা বসে বসে চোখ পিট পিট করে।

"কাউকে দেখছি না যে—তোমার স্ত্রী কোথায়?" একটু ঝুঁকে বসে বলল বিমলা—

"স্ত্রী! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—" হাসি আর থামে না বরাট সাহেবের—"কোনো খবরই রাখ না আমার তুমি। বিয়ে আর করলাম কবে? একটি বাবুর্চ্চি আর একটি চাকর এই নিয়ে আমার সংসার। ওরা গেছে আবার সিনেমায়। একটু যে চা করে খাওয়াব—"

অন্য দিকে তাকিয়ে ক্ষণকালের জন্য বিমনা হয়ে গিয়ে ছিল বিমলা। চায়ের কথা শুনে চোখ তুলে তাকাল বরাটের মুখের দিকে। আধো অন্ধকারে দুটি রাক্ষসী-লুব্ধদৃষ্টি তার জন্য অপেক্ষা করছিল সেখানে।

চমকে উঠল না বিমলা। এটুকু দেখবার অপেক্ষাতেই যেন ছিল সে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে অসহিষ্ণু ভাবে বলল—"চা-টা না হয় আমিই করে খাওয়াচ্ছি। চল, রান্নাঘরটা কোন দিকে দেখাবে চল—"

চট করে উঠে দাঁড়ালেন বরাট। আকাঙ্ক্ষিত অভিপ্রায় যে এত সহজে হাতের মুঠায় এসে পড়বে এ তিনি কল্পনাও করেন নি।

"সুগতবাবু, একটু বসুন তাহলে—এই ফিল্ম স্কোয়ারটা দেখুন ততক্ষণ—" পাশের বেতের টেবিলে রাখা পত্রিকাটি উড়ন্ত পাখার মত ঝপ করে সুগতর কোলে এসে পড়ল।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, বস তুমি—চা নিয়ে আসছি আমি" বলে কেমন যেন অস্থির পায়ে বরাটের পিছনে পিছনে ঘরে ঢুকে গেল বিমলা। ঝুলন্ত পর্দ্দাটা বার কয়েক আন্দোলিত হয়ে থেমে এল।

একা একা চুপ করে বারান্দায় বসে থাকতে থাকতে পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরে গেল সুগতর। কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হ'ল বিমলার ব্যবহার। এ যেন অন্য জগতের বিমলা, তার চেনা-জানা বিমলার ধ্বংসাবশিষ্টও যেন এর

মধ্যে নেই। আর এতক্ষণ ধরে ঘরের ভেতর ওরা করছেই বা কি। চা করতে ত এত দেরী হবার কথা নয়।

কোম্পানীর এই বাংলোটি লোকালয়ের শেষপ্রান্তে। কাছাকাছি না আছে অন্য কোন বাংলো, না আছে অন্য কারও বাড়ী ঘর। দু'ধারের ধানক্ষেত চিরে বন্ধুর জি. টি. রোড পূর্ব্ব-পশ্চিমে নিজের অজগর দেহ বিছিয়ে দিয়েছে। অনেক পরে পরে দু'একটা ট্রাক বা কার ছাড়া সে পথও জনহীন।

উঁঠি উঁঠি করছে সুগত। ভেতরে যাবার মতলব ভাঁজে মনে মনে। কিন্তু সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারে না। রাত্রির অন্ধকারে চারদিক লেপামোছা। কাছেই বাগানের গাছের পাতাগুলো দেখা যাচ্ছে না। স্তব্ধ নিঝুম চার দিক।

এমন সময়ে সেই স্তব্ধ বাতাসের বুক চিরে একটা মৃত্যু শীতল আর্ত্তনাদ শুনে হিম হয়ে যায় সুগতর সর্ব্বশরীর। পরমুহূর্ত্তেই এক লাফে দৌড়ে চলে গেল ভেতরে। একটা দরজার কাছে বিপরীত দিক থেকে ছুটে-আসা বিমলার সঙ্গে ধাক্কা লাগল তার। দু'জনেই ছিটকে পড়ল মেঝের ওপর।

দরজার ওপাশে নজর যেতেই হৃৎস্পন্দন স্তব্ধ হয়ে গেল সুগতর।

মসৃণ মেঝের ওপর পড়ে হাত-পা ছুঁড়ছেন বরাট সাহেব। এ কান থেকে ও কান পর্য্যন্ত কাটা মস্ত হাঁয়ের মুখ দিয়ে রক্তস্রোত নেমে এসে ভাসিয়ে দিচ্ছে সব।

দিশেহারা হ'ল না সুগত। এগিয়ে গিয়ে মূর্চ্ছিতা বিমলার হাত থেকে তীক্ষ্ণধার রক্তাক্ত ক্ষুরটা খুলে নিয়ে ঘরের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল। এক দৌড়ে কোন থেকে একটা কুঁজো এনে গব গব শব্দে জল ঢেলে ধুয়ে দিল বিমলার রক্ত-মাখা হাত।

তার পর গভীর অনুরাগে বিমলার অচেতন দেহ পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে দৃঢ়পদে বেরিয়ে পড়ল জনমানবহীন পথে।

এ্যালসেশিয়ানটা শুধু কি মনে করে করুণ সুরে ককিয়ে উঠল একবার।

ভারতীয় পরিকল্পনার হিসাব-নিকাশ

শ্রীঅণিমা রায়

১৯৬১ সনে ভারতীয় যোজনার প্রথম দশক শেষ হবে। এই দশ বছরে সরকারী ও বেসরকারী বিভাগে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে এবং জাতীয় পরিকল্পনা দুটিকে সফল করবার জন্ম সারা দেশব্যাপী নানাবিধ প্রচেষ্টা চলেছে যাতে আমাদের অনগ্রসর দেশটি সর্ববিষয়ে উন্নত হয়ে পৃথিবীর অন্যান্য অগ্রসর দেশগুলির সমকক্ষ হয়ে উঠে। কৃষি, শিল্প, জনস্বাস্থ্য, সমাজকল্যাণ, বেকার-সমস্যার সমাধান, জাতীয় ও মাথাপিছু আয়বৃদ্ধি করা, রাস্তাঘাট নির্মাণ প্রভৃতি কল্যাণমূলক কাজের কর্মসূচী এই দশ বছরে রূপায়িত হচ্ছে। এত টাকা ব্যয় ক'রে এবং এত লোকে মাথা ঘামিয়ে ও খেটে এই সব বিষয়ে কতটা সাফল্যলাভ করেছে তার একটি মোটামুটি হিসাব-নিকাশ করবার সময় এসেছে। এই প্রবন্ধে সাধারণের সামনে আমাদের সাফল্যের ও ত্রুটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রথম পরিকল্পনায় সরকারী বিভাগে ১,৯৬০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৪,৬০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। অর্থাৎ জাতীয় পরিকল্পনার প্রথম দশকে প্রায় ৬,৫৬০ কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। এই খরচের মধ্যে প্রথম পরিকল্পনায় ১,৫৬০ কোটি টাকা এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৩,৬৫০ কোটি অর্থাৎ প্রথম দশকে মোট ৫,২১০ কোটি টাকা দেশে গঠনমূলক ও আয়কর কাজে খাটান হয়েছে ও হচ্ছে। এই সময়ের মধ্যে বেসরকারী বিভাগে প্রথম পরিকল্পনায় ১,৮০০ কোটি টাকা ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৩,১০০ কোটি টাকা খাটান হয়েছে ও হচ্ছে। সরকারী ও বেসরকারী বিভাগে জাতীয় পরিকল্পনার প্রথম দশকে গঠনমূলক ও আয়কর কাজে প্রায় ১০,১১০ কোটি টাকা খাটান হয়েছে ও হচ্ছে। এই টাকার অনেকাংশই আমাদের ঋণ করতে হয়েছে এবং এত টাকা খাটানর ফলে দশ বছরে দেশে কিভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিচে দেওয়া হ'ল:

কৃষি: প্রথমে কৃষি ও কৃষিফলনের কথা ভাবা উচিত—কেন না ভারতের জনসংখ্যার প্রায় ৭৫ শতাংশের জীবনযাত্রা নির্ভর করে কৃষি ও তৎসংক্রান্ত কাজের উপর। ১৯৫০-৫১ সনে ভারতে সেচযুক্ত জমির আয়তন ছিল ৫ কোটি ১৫ লক্ষ একর। বছরের পর বছর নতুন সেচব্যবস্থা করে ১৯৬০-৬১ সনে দেশে সেচযুক্ত জমির আয়তন হবে ৭ কোটি একর। দেশে প্রায় ৪ হাজার উন্নত জাতের শস্তবীজের জোত স্থাপন করা হয়েছে। এইগুলি থেকে উন্নত জাতের শস্তবীজ বিভিন্ন খামারে সরবরাহ করা হচ্ছে। যবক্ষারজাতীয় রাসায়নিক সার প্রয়োগের পরিমাণ ১৯৫০-৫১ সনে ছিল ৫৫ হাজার টন; দশ বছরে এই সার প্রয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৬০-৬১ সনে ৩৬০,০০০ টন দাঁড়িয়েছে। এই দশ বছরে প্রায় ৪০ লক্ষ একর পতিত জমি উদ্ধার ক'রে সেখানে চাষ হচ্ছে। ২ কোটি ২০ লক্ষ একর জমিতে পাতাপচা সার প্রয়োগ করা হচ্ছে এবং ২৭ লক্ষ একর জমির মৃত্তিকাক্ষয় রোধ করা হয়েছে। এই দশ বছরে প্রাথমিক কৃষি-সমবায় সমিতির সংখ্যা ১০৫,০০০ থেকে ১৮৫,০০০তে দাঁড়িয়েছে।

এই সব প্রচেষ্টার ফলে কৃষিজাত ফসলের ফলন দশ বছরে কিভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তা নিম্নলিখিত সারণী থেকে বোঝা যায়। মাপকাঠি (Index) হিসাবে ১৯৪৯-৫০ সনের কৃষিফলন = ১০০ ধরা হয়েছে।

	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৫৮-৫৯	১৯৬০-৬১ (প্রত্যাশিত)
খাদ্যফসল	৯০'৫	১১৫'৩	১৩০'০	১৩১'০
অন্যান্য ফসল	১০৫'৯	১২০'১	১৩৮'০	১৪৩'০

প্রথম দশকে মাঝে মাঝে অনাবৃষ্টি, বন্যা, ঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয় হওয়া সত্ত্বেও কৃষিফলন উৎপাদন শতকরা ৪০ ভাগ বেড়েছে।

বড় শিল্প: বড় শিল্পের বিভাগে গত দশ বছরে লৌহ, ইস্পাত, সিমেন্ট, সালফিউরিক অ্যাসিড প্রভৃতি বড় শিল্পের বুনিয়াদি উপকরণ এবং নানাবিধ ছোট-বড় যন্ত্রপাতি ও ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের উপর ঝোঁক দেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনার সুরুতে ১৯৫১-৫২ সনে দেশে ১০ লক্ষ টন ইস্পাত তৈরী হ'ত; নতুন তিনটি ইস্পাত-কল তৈরী হওয়াতে ভারতে ইস্পাত উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াবে ৪৫ লক্ষ টন। শিল্পের জন্য অত্যাবশ্যক উপাদান, যেমন কয়লা, সিমেন্ট, এলমিনিয়াম প্রভৃতি দ্রব্যের উৎ-

পাদনও এই দশ বছরে বেশ বেড়েছে। নানাবিধ বড় শিল্পের উপযোগী যন্ত্রপাতিও এদেশে তৈরী হচ্ছে,—১৯৫১ সনে মাত্র ১১ কোটি টাকা মূল্যের এইসব যন্ত্রপাতি তৈরী হ'ত, ১৯৫৮ সনের শেষে ভারতে উৎপন্ন বড় শিল্পের যন্ত্রপাতির মূল্য দাঁড়ায় ৭৯ কোটি টাকা। রেলপথের জন্য যেসব সরঞ্জাম দরকার হয় তার অধিকাংশ এখন আমাদের দেশে তৈরী করা হচ্ছে।

বিদ্যুৎ তৈরীর সরঞ্জাম ও কলকব্জা তৈরি করার কাজও ভারতে সুরু করা হয়েছে। নানাবিধ ছোট ও বড় রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধ এবং রাসায়নিক সার উৎপাদনের মাত্রাও বেশ বেড়েছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় চটকল ও কাপড়ের কলগুলিতে আধুনিক কলাকৌশল ও যন্ত্রপাতি নিয়োগ করা হচ্ছে। এই সব কাজের দ্বারা আমদানী দ্রব্যের মাত্রা কমিয়ে ফেলে বিদেশী মুদ্রা বাঁচান সম্ভব হচ্ছে।

নিচে প্রদত্ত সারণী থেকে বোঝা যায় যে, গত দশ বছরে নিত্যব্যবহার্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন কিভাবে বেড়েছে ঃ

	ইউনিট	১৯৫০-৫১	১৯৬০-৬১ (প্রত্যাশিত)
ইস্পাতের তৈরি জিনিসপত্তর	মিলিয়ন টন	১·০	২·৬
এলমিনিয়াম	হাজার টন	৩·৭	১৭
ডিজেল এঞ্জিন	হাজার	৫·৫	৩৩
ইলেকট্রিক কেবল ও কনডাকটার	টন	১,৬৭৪	১৮,০০০
রেলওয়ে এঞ্জিন	সংখ্যা	৩	২৯৫
যবক্ষারজানীয় রাসায়নিক সার (যবক্ষারজান)	হাজার টন	৯	২১০
সালফিউরিক এসিড	হাজার টন	৯৯	৪০০
সিমেণ্ট	মিলিয়ন টন	২·৭	৮·৮
কয়লা	মিলিয়ন টন	৩২	৫৩
লৌহ প্রস্তর	মিলিয়ন টন	৩	১২

ভারতীয় শিল্পজাত এইসব দ্রব্যের উৎপাদন গত দশ বছরে শতকরা ১২০ ভাগ বেড়েছে।

সুতিবস্ত্র, চিনি, সাইকেল, মোটর গাড়ী প্রভৃতির

উৎপাদন গত দশ বছরে বেশ বেড়েছে। তা ছাড়া বয়লার, মিলিং মেসিন, নানাবিধ যন্ত্রপাতি, সালফা ও এন্টিবায়টিক ঔষধ, ডি.ডি.টি., শিল্পের জন্য বিস্ফোরক দ্রব্য, ছাপার কাগজ প্রভৃতি ভারতে এখন তৈরি হতে সুরু হয়েছে।

কুটিরশিল্প ও ছোট শিল্প : বড় শিল্প মূলধন ভিত্তিক, শ্রমিক ভিত্তিক নয়। বড় শিল্প প্রতিষ্ঠার দ্বারা দেশের বেকার-সমস্যা বিশেষ কিছু কমান যায় নি। কিন্তু কুটির-শিল্প ও ছোট শিল্প শ্রমিক ভিত্তিক এবং সেগুলি বেকার-সমস্যা কতক পরিমাণে সমাধান করতে পারে। সেইজন্য জাতীয় পরিকল্পনাগুলিতে কুটিরশিল্পের ও ছোট শিল্পের প্রসার ও শ্রীবৃদ্ধির উপর ঝোঁক দেওয়া হয়েছে। আমাদের দেশে তাঁতশিল্প সবচেয়ে বড় কুটিরশিল্প। গত দশ বছরে তাঁতে প্রস্তুত সুতিবস্ত্রের উৎপাদন ৭৪'২ কোটি গজ থেকে ২১২'৫ কোটি গজে ও খদ্দরের উৎপাদন ৭০ লক্ষ গজ থেকে ৮ কোটি গজে দাঁড়িয়েছে। এই সময়ের মধ্যে রেশম উৎপাদনের পরিমাণ ২০ লক্ষ পাউণ্ড থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৭ লক্ষ পাউণ্ড হয়েছে। ছোট শিল্পের বিভাগে সাইকেল, সেলাইয়ের কল, ইলেকট্রিক পাখা প্রভৃতির উৎপাদন প্রচুর বেড়েছে।

বিদ্যুৎ : ১৯৫০-৫১ সনে ২'৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট বিদ্যুৎ ভারতে উৎপন্ন হ'ত। ১৯৬০-৬১ সনে বিদ্যুৎ-উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ৫'৮ কিলোওয়াটে দাঁড়িয়েছে। ১৯৫০-৫১ সনে ৩,৬৮৭টি গ্রাম ও শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হ'ত। ১৯৬০-৬১ সনে ১৯ হাজার গ্রাম ও শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

পরিবহন : দেশবিভাগের ফলে রেলপথগুলি বিশেষ-ভাবে অব্যবস্থিত হয়ে পড়েছিল। প্রথম পরিকল্পনায় সেগুলিকে ঠিক করার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অনেক নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সেগুলির সুবিধার জন্য ১,২০০ মাইল নতুন রেলপথ তৈরি হচ্ছে ও ৮৮০ মাইল রেলপথ বৈদ্যুতিকরণ করা হচ্ছে।

১৯৫০-৫১ সনে ৯ কোটি ১০ লক্ষ টন মাল রেলপথে রপ্তানী করা হয়। ১৯৬০-৬১ সনে ১৬ কোটি ২০ লক্ষ টন মাল রেলপথে চালান দেওয়া হচ্ছে। গত দশ বছরে রেল-এঞ্জিনের সংখ্যা ৮,২০০ থেকে ১০,৬০০ হয়েছে। মালগাড়ীর সংখ্যা ১৯৯,১০০ থেকে ৩৫৪, ০০ হয়েছে।

গত দশ বছরে ভারতে পাকারাস্তা ৯৭,৫০০ মাইল থেকে ১৪৪,৩০০ মাইলে দাঁড়িয়েছে। জাহাজে মালবহনের ক্ষমতা ৩৯০,০০০ জি. আর. টি থেকে ৯০০,৩০০ জি. আর. টিতে দাঁড়াচ্ছে।

শিক্ষা ব্যবস্থা : গত দশ বছরে বুনিয়াদি, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাও বাড়ান হয়েছে যাতে দেশের ছাত্র-ছাত্রীরা উচ্চশিক্ষালাভের সুযোগ পায়।

১৯৫০-৫১ সনে দেশের ছয় থেকে এগার বছরের ছেলেমেয়েদের শতকরা ৪৩ জন বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করত। ১৯৬০-৬১ সনে তাদের ৬০ শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছে। গত দশ বছরে বিদ্যালয়গুলির ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা শতকরা ৭৫ ভাগ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা শতকরা ১৪০ ভাগ বেড়েছে।

১৯৫০-৫১ সনে ভারতে শিল্পবিজ্ঞান, এঞ্জিনীয়ারিং ও কারিগরী বিদ্যালয়গুলিতে প্রায় দশ হাজার ছাত্রছাত্রীর স্থান ছিল। ১৯৬০-৬১ সনে এই সব বিদ্যালয়ে সংখ্যা এমন ভাবে বেড়েছে যে, ৩৭,৫০০ ছাত্র-ছাত্রী সেগুলিতে শিক্ষালাভ করে। বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ ক'রে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে ডাক্তারী, এঞ্জিনিয়ারীং প্রভৃতি বৃত্তিমূলক শিক্ষালাভ করতে পারে তার জন্য বহুসংখ্যক এগার শ্রেণী সমন্বিত নানার্থসাধক বিদ্যালয় ও উচ্চ একাডেমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। এগুলিতে মহা-বিদ্যালয়ের প্রাথমিক পাঠ শিক্ষা দেওয়া হয়।

চিকিৎসা ব্যবস্থা : ১৯৫০-৫১ সনে বা তার পূর্বে ভারতের গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসার বিশেষ কোন ব্যবস্থা ছিল না। গত দশ বছরে সারা ভারতের গ্রামাঞ্চলে বহুসংখ্যক স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এগুলিতে শুধু রোগ চিকিৎসা করা হয় না, গ্রামবাসীদের রোগনিরোধের উপায়ও বুঝিয়ে দেওয়া হয়। কলেরা বসন্ত প্রভৃতির টিকা দিয়ে রোগনিরোধ করা হয়।

১৯৫০-৫১ সনে ভারতের হাসপাতাল, ডিসপেন্সারী প্রভৃতির সংখ্যা ছিল ৮,৬০০; ১৯৬০-৬১ সনে সেগুলির সংখ্যা হয়েছে ১২,৬০০। গত দশ বছরে দেশে মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ৩০ থেকে ৫৫ হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে পাস-করা ডাক্তারের সংখ্যা ৫০ হাজার থেকে ৮৪ হাজারে দাঁড়িয়েছে। ১৯৫০-৫১ সনে প্রতি ৬,০০০ অধিবাসীর জন্য একজন ডাক্তার ছিল। এখন প্রতি ৫,০০০ অধিবাসীর জন্য একজন ডাক্তার আছে।

সমাজসেবা : সমষ্টি উন্নয়ন ব্লক—সমস্ত দেশটির বিভিন্ন গ্রামে গ্রামবাসীদের আত্মনির্ভর করে তোলবার জন্য সমষ্টি উন্নয়ন ব্লক ও জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লক স্থাপন করা হয়েছে। গ্রামগুলির পুনর্গঠনের প্রাথমিক ও সাধারণ

কাজগুলি গ্রামবাসীরা সরকারের কাছে অর্থ ও বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে নিজেরাই সম্পন্ন করছেন। তাঁরা নিজেদের অর্থ, পরিশ্রম এবং সাধারণ যন্ত্রপাতি এই গঠনমূলক কাজে নিয়োগ করছেন। এই অংশটি ভারতের জাতীয় পরিকল্পনার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। তৃতীয় যোজনার শেষে ভারতের সমস্ত গ্রামই কোন না কোন ব্লকের অন্তর্ভুক্ত হবে বলে আশা করা যায়। এই কাজে সাহায্য করবার জন্ত গত দশ বছরে গ্রামগুলিতে ৩১ হাজার শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মী এবং ২৮,০০০ শিক্ষাপ্রাপ্ত সম্প্রসারণ আধিকারিক ব্লকগুলিতে নিযুক্ত হয়েছেন।

পঞ্চায়েত : আমাদের দেশে সাধারণ শাসন বিকেন্দ্রীভূত করা দরকার বলে পরিকল্পনাগুলিতে একটি কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে যাতে গ্রামবাসীরা গ্রামে বসে সুবিচার পান। সেইজন্ত পঞ্চায়েত-শাসন পুনরায় প্রবর্তিত করা হচ্ছে এবং বিভিন্ন রাজ্যে পঞ্চায়েত আইন পাস করা হয়েছে।

লোকসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ : ভারতের লোকসংখ্যা বিস্ফোরণের মত বছরে বছরে বেড়ে চলেছে। এইরূপ পরিস্থিতিতে কোন পরিকল্পনাই কার্যকরী হতে পারে না। কাজেই গ্রামবাসী ও শহরবাসীর সমস্ত অধিবাসীদেরকে পরিবার-নিয়ন্ত্রণপদ্ধতি শিক্ষা দেবার জন্ত সারা দেশব্যাপী পরিবার-নিয়ন্ত্রণ ক্লিনিক খোলা হচ্ছে এবং ১৯৬০ সন পর্যন্ত ১,৮০০ ক্লিনিক খোলা হয়েছে।

জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় : কৃষি ফসল বৃদ্ধির জন্ত প্রথম পরিকল্পনার মেয়াদে জাতীয় আয় শতকরা আঠার ভাগ বেড়েছিল। দ্বিতীয় যোজনার মেয়াদে ১৯৬০-৬১ সনের মধ্যে জাতীয় আয় শতকরা আরও কুড়ি ভাগ বেড়েছে বলে অনুমান করা হয়। কাজেই গত দশ বছরে জাতীয় আয় প্রায় শতকরা বিয়াল্লিশ ভাগ বেড়েছে। এই সময়ের মধ্যে মাথাপিছু আয় শতকরা কুড়িভাগ বেড়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু ভোগ করবার শক্তি মাথাপিছু শতকরা ষোল ভাগ বেড়েছে।

এই পর্যন্ত ভারতীয় যোজনার কতকগুলি বিষয়ে সাফল্যের কথা বলা হ'ল এবার কতকগুলি বিষয়ে ব্যর্থতার সম্বন্ধে কিছু বলা হচ্ছে।

গৃহনির্মাণ : জনসাধারণের বাসোপযোগী গৃহের ব্যবস্থা পরিকল্পনামত হয় নি। এখনও কাজ অনেক বাকী আছে। আজও ভারতের শহরগুলিতে লক্ষ লক্ষ নরনারীকে ফুটপাতে রাত্রিযাপন করতে হয়। শিল্পশ্রমিকদের অধিকাংশকে যেসব ঘরে বাস করতে হয় সেগুলি মানুষের বাসের অযোগ্য। গ্রামবাসীদের কুটির দেখলে মনে হবে না যে আমরা বিংশ শতাব্দীতে বাস করছি। অবশ্য "নিজেদের গৃহ নিজেরা তৈরি কর" এই পরিকল্পনার মাধ্যমে পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় গ্রামবাসীদের বাসোপযোগী গৃহনির্মাণের কাজে বিশেষ নজর দিয়েছেন।

নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্য : খাদ্য, কাপড় ও অন্যান্ত অত্যাবশ্যক নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অবশ্য ক্রমোন্নয়মান এই অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু তা সুনিয়ন্ত্রিত ও সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। শিল্পশ্রমিকদের অবাস্তব মজুরিবৃদ্ধি উপরোক্ত মূল্যবৃদ্ধির একটা কারণ। মাপকাঠি হিসাবে ১৯৫২-৫৩ সনের পাইকারী মূল্যগুলিকে ১০০ ধরলে ১৯৫৯-৬০ সনের শেষে পাইকারী মূল্য ১১৮.৬ দাঁড়িয়েছে।

বেকার-সমস্যা : নানাভাবে চেষ্টা করা সত্ত্বেও দেশে বেকারের সংখ্যা ক্রমশঃই বেড়ে যাচ্ছে। বেকার-সমস্যা সমাধানের কোন লক্ষণই আজ পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। এর মূল কারণ হ'ল অসম্ভব হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি। প্রথম পরিকল্পনার শেষে দেশে বেকারের সংখ্যা ছিল প্রায় ৫৩ লক্ষ। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ১৯৬০-৬১ সনে দেশে বেকারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৭৩ লক্ষ। অবশ্য তৃতীয় পরিকল্পনার খসড়া থেকে জানা যায় যে, এই পরিকল্পনার শেষে বেকারের সংখ্যা বাড়বে না, কিন্তু বেকারের সংখ্যা কমবেও না। অবশ্য এ সমস্যা দু'চারটি পরিকল্পনার দ্বারা সমাধান করা সম্ভব নয়। পুরামাত্রায় সমাধান করতে গেলে অন্ততঃ পঞ্চাশ বছর লাগবে। তা হ'লেও যথাসাধ্য চেষ্টা করে বেকারের সংখ্যা দিনদিন কমিয়ে ফেলতে হবে—এইটি আমাদের পরিকল্পনার বিশেষ লক্ষ্য হওয়া উচিত।

যা হোক আমাদের পরিকল্পনার বিভিন্ন বিভাগ রূপায়ণে কয়েক স্থানে ব্যর্থতা থাকলেও অধিকাংশ স্থলেই সাফল্যের মাত্রা অত্যন্ত বেশি। অভিজ্ঞতার অভাব, অর্থের অনটন, দেশে নানাদলের বিরোধীতা প্রভৃতি উৎপাত থাকা সত্ত্বেও আমরা যে সারা দেশটিকে অগ্রগতির পথে এতটা এগিয়ে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছি তা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। সারা বিশ্ব আজ আমাদের সাফল্যের প্রতি বিস্মিতনেত্রে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিচ্ছে।

এই প্রবন্ধের অঙ্কগুলির জন্ত আমি ষ্টেটস্ম্যান পত্রিকার দিল্লী সংবাদদাতার নিকট কৃতজ্ঞ।

ভারতে জাতীয় আন্দোলন—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক, গ্রন্থন। ২২১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। কলিকাতা-৬। মূল্য—১০'৭৫ নয়া পয়সা

প্রত্যেক দেশেরই অতীতকালের রাজনৈতিক ইতিহাস আছে এবং এই ইতিহাস বর্তমান ও ভবিষ্যতের রাজনীতিকগণকে পথ দেখাইতে এবং নতুন পথের সন্ধান দিতে সহায়তা করে।

সমালোচ্য পুস্তকখানিতে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত কাল হইতে আরম্ভ করিয়া তাহা বিভিন্ন সময়ে নানা পরিস্থিতির ভিতর দিয়া কি ভাবে চলিয়া আসিয়াছে, এই আন্দোলনের কোন শাখা বিপথে গিয়া ব্যর্থ হইয়াছে এবং এই ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা আবার কেমন করিয়া উহাকে পুনরায় প্রবল ও বেগবান করিয়া তুলিয়াছে এই সকল তথ্য শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় পুস্তকখানিতে সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

গ্রন্থখানি রচনা করিতে মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে বিভিন্ন সময়ের বহু তথ্য ও সংবাদ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। এই তথ্য ও সংবাদগুলি তিনি ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামায় আলাদা আলাদা ভাবে পরিবেশন করিয়াছেন।

আলোচ্য বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নাই কিন্তু প্রভাতবাবু প্রচুর শ্রম সহকারে জাতীয় আন্দোলনের বিবর্তন ও পরিবর্তনের মূল সূত্রগুলি ধারাবাহিক ভাবে পর পর এমন সুষ্ঠুভাবে সাজাইয়া দিয়াছেন যে বিষয়টি শুধু বুঝিতেই সহায়তা করে নাই বরং আরও জানিবার আগ্রহকে বৃদ্ধি করিয়াছে।

তথ্যবহুল এই গ্রন্থটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রাজনৈতিক মতামতগুলিকে একত্রে সন্নিবেশিত করিয়া পুস্তকখানির মূল্য ও গৌরব বৃদ্ধি করা হইয়াছে বলিয়া শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মুখবন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা অনস্বীকার্য। তিনি যথার্থই বলিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথ পেশাদার রাজনৈতিক ছিলেন না। রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁহার উক্তিগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, রাজনীতিবিদেরা ইহার সম্পর্কে খুব বেশী আলোচনা করেন নাই। সুতরাং এই উক্তিগুলির সহিত সাধারণের বিশেষ পরিচয় নাই। আজিকার দিনে এই উক্তিগুলি পাঠ করিলে রাজনীতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যাইবে এবং ভবিষ্যতের পথ নির্দেশেও ইহা অনেক সহায়তা করিবে।

গ্রন্থখানির প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল লেখকের নিজস্ব চিন্তাধারার বলিষ্ঠ প্রকাশ।

বর্তমান কালে বহু দল, নানা মত ও অসংখ্য বাঁকা বাঁকা পথে চলিতে গিয়া দৃষ্টি পদে পদে ব্যাহত হয়, বুদ্ধি আচ্ছন্ন হইয়া যায়। প্রতিনিয়ত নানা রকমের স্লোগান শুনিয়া শুনিয়া উহাকেই শ্রেণী বিশেষ বেদবাক্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া মানসিক জড়তার পরিচয় দিতেছে। নানা পন্থির নানা মত কিন্তু শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় এই সব মত ও পথ হইতে দূরে থাকিয়া সাহসের সহিত নিজে যেরূপ বুঝিয়াছেন তাহাই বলিয়াছেন। তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা অভ্রান্ত এমন কথা বলা শক্ত হইলেও তিনি যে যুক্তি দেখাইয়াছেন তাহা এক কথায় উড়াইয়া দেওয়াও শক্ত।

ভারতের জাতীয় আন্দোলন সম্বন্ধে যাঁহারা আগ্রহশীল পুস্তকখানি পাঠ করিয়া তাঁহারা যে শুধু উপকৃত হইবেন তাহা নহে যথেষ্ট আনন্দ পাইবেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

সুন্দর প্রচ্ছদ—বহু বর্ণে ছাপা।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

দেশ-বিদেশের কথা

ঝাড়গ্রামে ধন্বন্তরি উৎসব

গত ১লা নবেম্বর ঝাড়গ্রামে দেববৈদ্য ধন্বন্তরির আবির্ভাব-তিথি স্মরণে সেবায়তন গ্রামীণে ডাঃ দেবব্রত পাল প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসাকেন্দ্র ও ডাঃ কালিদাস পাল মেমোরিয়াল মেডিকেল পাঠাগার ভবনে এক মনোজ্ঞ

অনুষ্ঠান হয়। পূর্বাহ্নে সুসজ্জিত পূজামণ্ডপে পূজা, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠানের পর অপরাহ্নে আচার্য স্বামী সত্যানন্দ গিরি মহারাজের পৌরোহিত্যে সাধারণ সভায় ধন্বন্তরিদেবের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করা হয় এবং পরে ভারতীয় চিকিৎসা সংঘ (I. M. A.) ঝাড়গ্রাম শাখার উদ্যোগে কলিকাতার ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক ডাঃ এন্. সান্যাল এম্. আর. সি. পি. মহাশয় সভাপতিত্বে চিকিৎসা বিজ্ঞান বিশেষতঃ কুষ্ঠ ব্যাধির বিবরণ ও প্রতিকার সম্বন্ধে সর্বশ্রী মণীন্দ্রনাথ হালদার, ডাঃ কানাইলাল দে, ডাঃ শচীন্দ্রনাথ সেন, ডাঃ বিকাশ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ মন্মথ শিকদার ও ডাঃ অনুকূল গুহ প্রভৃতি স্থানীয় চিকিৎসকগণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে আলোচনা করেন। কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে আয়ুর্বেদিক, হোমিওপ্যাথিক এবং এলোপ্যাথিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশদ সহজবোধ্য পক্ষপাতহীন আলোচনা পল্লীঅঞ্চলে এই প্রথম এবং উদ্যোক্তাগণের এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। কুষ্ঠরোগ আজ এই দরিদ্র অনগ্রসর মহকুমার অন্যতম ভয়াবহ সমস্যা, যাহার আশু প্রতিকার করা না হইলে অচিরেই দেশ শ্মশানে পরিণত হইবে। সভাপতি মহাশয়ের সময়োচিত ভাষণ, শিল্পীগণের ভজন, ডাঃ পালের আতিথেয়তা, ডাঃ বেণী গাঙ্গুলী ও কলিকাতা হইতে আগত শ্রীনলিনীমোহন মজুমদার প্রভৃতি কর্মিগণের উৎসাহ কর্মকুশলতা উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করে।

ব্রেবোর্ণ কলেজের ঈশান-বৃত্তি লাভ

শ্রীশুক্লা মজুমদার

বোম্বাই-র আমদানী-রপ্তানী বিভাগের কণ্ট্রোলার শ্রী এন্. এন্. মজুমদারের কন্যা ও অধ্যাপক মণি সেনের দৌহিত্রী লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজের ছাত্রী শ্রীশুক্লা মজুমদার এই বৎসর সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম এবং সমস্ত বিষয়ের অনার্সের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ঈশান-বৃত্তি লাভ করিয়াছেন। তিনি ১৯৫৮ সনে এই কলেজ হইতেই আই-এ পরীক্ষায় ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। ইতঃপূর্বে কোনো মহিলা কলেজ ঈশান-বৃত্তি লাভ করেন নাই।

এ বৎসর ব্রেবোর্ণ কলেজের ছাত্রীরা ভূগোল, পার্সী ও ফিজিওলজি অনার্সেও প্রথম শ্রেণীর প্রথম হন, এবং বি-এ ও বি-এস্-সিতে যথাক্রমে শতকরা পঁচানব্বই ও একশত জন উত্তীর্ণ হন।

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

রাজ-অন্তঃপুরিকা

(প্রাচীন চিত্র হইতে)

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

:: ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬০শ ভাগ
২য় খণ্ড } মাঘ, ১৩৬৭ { ৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

সরদারনগরে কংগ্রেসের অধিবেশন

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৬৬তম অধিবেশন সম্প্রতি ভবনগরের নিকটে 'সরদারনগর' নামক ছাউনিতে হইয়া গিয়াছে। ঐখানকার অধিবেশনে যাহা ঘটিয়াছে তাহার পূর্ণ বিবরণ এই 'বিবিধ প্রসঙ্গে' দেওয়ার কোনও বিশেষ সার্থকতা নাই, কেন না বিগত দশ বৎসরে এই 'জাতীয় কংগ্রেস' ক্রমে ক্রমে একটি প্রহসন এবং তামাসায় পরিণত হইয়াছে। বিগত দশ বৎসরের অধিবেশন আমাদের জাতীয় জীবনধারায় বা রাষ্ট্রনৈতিক পটভূমিতে কোনোও ক্ষণস্থায়ী চিহ্নমাত্রও রাখিতে পারে নাই। মহাত্মাজী মৃত্যুর পূর্ব্বে এইরূপ অবনতির আশঙ্কা করিয়াই "হরিজন" পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, কংগ্রেস সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ স্বাধীনতালাভ যখন হইয়া গিয়াছে তখন উহাকে শ্রদ্ধার সহিত বিসর্জ্জন দেওয়াই শ্রেয়ঃ। আমাদের নেতৃবর্গ ভারতের জনগণের সম্মুখে কি খেলা খেলিবার জন্য এই নির্জ্জীব জাতীয় প্রতিষ্ঠানের ধ্বংসাবশেষকে প্রতি বৎসর সাজগোজ করাইয়া দেশের বিভিন্ন স্থানে উপস্থিত করেন, তাহা তাঁহারা ও তাঁহাদের চাটুকারবর্গই জানেন!

এইবারের অধিবেশনে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বিষয় হইল কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনীলম সঞ্জীব রেড্ডীর অভিভাষণ। তিনি নানা বিষয়ের আলোচনার মধ্যে কংগ্রেসীদিগের ক্ষমতা-লালসার কথা উল্লেখ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, ক্ষমতাদখলের চেষ্টা স্বাভাবিক যেহেতু সরকারী ক্ষমতার অধিকার সকল রাজনৈতিক প্রচেষ্টারই লক্ষ্য। কিন্তু স্বার্থসিদ্ধির জন্য বা ক্ষমতা রক্ষার জন্য চক্রান্ত করা বা অপকৌশল গ্রহণ করাই অন্যায়। এই চক্রান্তের বিষয়ে তিনি বলেন যে, শুধু কর্ম্মীদের দোষ দিলেই চলে না, কেন না বর্ত্তমানে যাঁহারা ক্ষমতার অধিকারী তাঁহাদেরও এ বিষয়ে দোষ আছে, কেন না তাঁহাদের অনেকেই একবার ক্ষমতা পাইলে তাহা আঁকড়াইয়া বসিয়া থাকেন। কংগ্রেসকে উন্নতির পথে লইতে হইলে যাঁহারা দশ বৎসর যাবৎ ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছেন তাঁহাদের উচিত পদত্যাগ করিয়া সংগঠনমূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করা। প্রধানমন্ত্রীর অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সাহায্য আমরা সর্ব্বদাই পাইয়া থাকি, সুতরাং তাঁহার কথা আলাদা। কিন্তু অন্যান্য সকলের সম্পর্কে এই কথা বলা চলে না।

শ্রীযুক্ত সঞ্জীব রেড্ডীর মতে কংগ্রেসকর্ম্মীদের এই ক্ষমতাদখলের লালসাই বিভেদপ্রবণতার মূল এবং ঐ সমস্যা-সমাধানের উপরই জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। তাঁহার মতে, দুর্নীতি দমনের সমস্যা অপেক্ষাও এই বিভেদকারী সমস্যা আরও ভয়ানক।

এই ক্ষমতালোলুপতার ফলে জাতির অবনতি কিভাবে হইতে পারে তাহার নিদারুণ দৃষ্টান্ত আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গ! এখানে শুধু কংগ্রেস নহে, প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল ও উপদল, দেশ এবং দশের মঙ্গলচিন্তা বিসর্জ্জন দিয়া কেবলমাত্র দলগত স্বার্থচিন্তায় ও নিজ ক্ষমতাপ্রাপ্তির বা রক্ষণের চেষ্টায় ব্যস্ত। প্রকৃতপক্ষে বাঙালীর সকল দৈন্য, সকল দুর্দ্দশার মূল কারণ এই ক্ষমতালোলুপতা। আজ যে দেশ অনাচার ও দুর্নীতিতে ডুবিয়া যাইতেছে এবং বাঙালী সারা ভারতে ঘৃণা ও অবহেলার পাত্র হইয়া দাঁড়াইতেছে, তাহার প্রধানতম কারণ আমাদের নেতৃবর্গের এই নীচ রাজনৈতিক জুয়া খেলার প্রবৃত্তি। ইহার ফলে কোনোও রাজনৈতিক দলে

সৎ বা সত্যনিষ্ঠ লোকের স্থান নাই—যদি-না তিনি মূক-বধিরের পর্য্যায়ে পড়েন। এবং এই কারণেই ভিন্ন প্রান্তের লোকে নির্ভয়ে বাঙালীর সর্ব্বনাশের ব্যবস্থা করিতে সাহস পায়, কেন না আমরা নিজেদের মধ্যে খাওয়াখাওয়ি এবং পরস্পরকে অপদস্থ করিতে এতই ব্যস্ত থাকি যে, তাহার ফলে নিজেদের ক্ষতি যে কতটা হইতেছে তাহাও বুঝিতে আমরা অসমর্থ। এই নীচ মনোভাব এখন এতই ব্যাপ্ত হইয়াছে যে, কোনোও মহাপুরুষের গুণকীর্ত্তনেও আমরা অন্য প্রথিতনামা বাঙালী মহামানবের স্মৃতিতে মসীলেপনই প্রধান কর্ত্তব্য মনে করি।

এই ৬৬তম কংগ্রেস অধিবেশনে প্রায় দুই শত প্রতিনিধি পশ্চিমবঙ্গ হইতে গিয়াছিলেন। কংগ্রেসের অধিবেশনের সংবাদগুলি অতি সূক্ষ্মভাবে দেখিলেও তাঁহাদের অস্তিত্বের কোনোও বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় নাই। মনে হয় এই মূক-বধিরের দল ওখানে গিয়াছিলেন কেবলমাত্র আসন্ন নির্ব্বাচনে কংগ্রেসী টিকিটে দাঁড়াইবার অধিকার অর্জ্জনের জন্য। তাঁহাদের যূথপতি নির্ব্বাচন কমিটিতে ঠাঁই করিয়া লইয়াছেন। সুতরাং আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনেও কংগ্রেসদলের মনোনীত প্রার্থীদের মধ্যে সক্রিয় সৎলোক খুঁজিয়া পাওয়া দুরূহ ব্যাপার হইবে।

বহির্জ্জগত

সর্দ্দারনগরে কংগ্রেসের ৬৬তম অধিবেশনের সমাপ্তির দিনে পণ্ডিত নেহরু তাঁহার সন্ধ্যাকালীন বক্তৃতায় বৈদেশিক পরিস্থিতি নানাদিক লইয়া আলোচনা করেন। তিনি লাওসের পরিস্থিতি সম্পর্কে বলেন যে, উহা খুবই বিপজ্জনক এবং উহা হইতে বড় রকমের যুদ্ধ ঘটিবার আশঙ্কা আছে। ভারত সীমান্তে চীনের আক্রমণের বিষয়ে তিনি বলেন যে, ভারতের শক্তিবৃদ্ধি হইয়াছে এবং ইহাও বলেন যে আমরা যদি ভুলক্রমে কিছু করিয়া বসি তবে ঐ অর্জ্জিত শক্তির অপচয় হইবে। সেই সঙ্গে তিনি বলিতে ভুলেন নাই যে, আমাদের এরূপে ঐক্যবদ্ধ ও সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে যাহাতে আমাদের কেহ আক্রমণ করিতে সাহস না পায় এবং তাহা সত্ত্বেও যদি কেহ আক্রমণ করিয়া বসে তবে যেন আমরা সে আক্রমণ প্রতিহত করিতে পারি।

আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কিত প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাই বলেন যে, ভারত ক্রমেই শক্তিশালী হইতেছে এবং চীন যদি ভারত আক্রমণ করে তবে সে যথাযথ ভাবে প্রতিহত হইবে। শ্রীদেশাই গোয়ার কথা তুলিয়া বলেন যে, গোয়ার মুক্তি শীঘ্রই হইবে।

কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেনন একেবারে মুখ খোলেন নাই এবং সেই কারণে সাধারণ দর্শক ও শ্রোতা-দিগের মধ্যে বিস্ময় ও কৌতূহল জাগ্রত হয়। এমন কি যে কঙ্গো লইয়া তিনি রাষ্ট্রসঙ্ঘে বিশ্বজাতির সম্মেলনে, নানা উদ্ভট মন্তব্য করিয়া জগতবাসীকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধেও তিনি একটা কথাও বলেন নাই। শ্রীমোরারজী দেশাই তাঁহার হিসাবের খতিয়ান ছাড়িয়া আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে যখন নানা কথা বলিতে বলিতে কঙ্গোর বিষয়ে বলেন যে, সে দেশের স্বাধীনতা ও সংহতি স্বীকার করিয়া লইলে ওখানের পরিস্থিতির উন্নতি হইতে পারে, তখনও শ্রীমেনন আলোচনায় যোগদান করেন নাই। শ্রীদেশাই লাওস, কঙ্গো ও আলজিরিয়া লইয়া নানা মন্তব্য করিয়া ঐ প্রস্তাব উপস্থিত করেন।

প্রকৃত পক্ষে, ঐ তিনটি দেশ—লাওস, কঙ্গো এবং আলজিরিয়া—বর্ত্তমানে যে অবস্থায় আছে সে বিষয়ে কোনোও আলোচনা, কোনোও মন্তব্য, আমাদের এই জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে উপস্থিত করাই অবান্তর। যে কংগ্রেস স্বদেশ ও স্বজাতির উন্নতি ও প্রগতি কল্পে শুধু ভুয়া কথার জাল বুনিতে পারে, যাহার বর্ত্তমানে একমাত্র সার্থকতা দেশের শাসনতন্ত্রের অধিকারীবর্গের কার্য্যক্রমের অনুমোদন, তাহার পক্ষে বিশ্বজগতের পরিস্থিতির আলোচনা বৃথা। যদি তাহা না হইত তবে ঐ অধিবেশনে শ্রীমেননকে প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে সওয়াল জবাবের সম্মুখীন হইতে হইত এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘে কঙ্গো লইয়া তিনি যে সম্পূর্ণ দায়িত্ববিহীন ভাবে মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহারও জবাবদিহি তাঁহাকে করিতে হইত।

বস্তুতঃপক্ষে, শ্রীমেননের কার্য্যাবলী সম্পর্কে এখন পার্লামেণ্টে শুধু অসন্তোষ নহে, নানাপ্রকার অস্বস্তিজনক গুজবও শোনা যাইতেছে। ঐ সকল কথার সত্যাসত্য নির্ণয় এখনই প্রয়োজন, কেন না দেশের প্রতিরক্ষা এমনই সাংঘাতিক দায়িত্বপূর্ণ বিষয় যে, তাহা যাঁহার হস্তে সমর্পিত তাঁহার কার্য্যকলাপ সন্দেহের অতীত হওয়া প্রয়োজন। শ্রীনেহরু তাঁহাকে বিশ্বাস করেন এবং শ্রীনেহরুর ব্যক্তিত্ব সকল সন্দেহের অতীত ইহা নিশ্চয়। কিন্তু শ্রীনেহরুর বিশ্বাস যাহাদের উপর ন্যস্ত হয় তাহাদের অনেকেই সেই বিশ্বাসের অপব্যবহার করিয়াছে এবং করিবে—কেন না পণ্ডিত নেহরু নিজে নির্ম্মলহৃদয়, কিন্তু তিনি লোকচরিত্র-বিচারে সম্পূর্ণ অক্ষম।

লাওসের বর্ত্তমান পরিস্থিতি কি তাহা বলা কঠিন,

কেন না ওখানের কর্ত্তৃপক্ষ নিষ্ক্রিয় এবং প্রতিরক্ষা ব্যাপারে অনভিজ্ঞ ও কার্য্যবিমুখ। উপরন্তু তাঁহারা কথামালার মেষপালকের ন্যায় একবার অকারণে "বাঘ-বাঘ" বলিয়া চীৎকার করিয়াছেন যে, ওখানের প্রকৃত অবস্থা কি তাহা বিচার করা অসম্ভব। পণ্ডিত নেহরু অবশ্য আমাদের অপেক্ষা অনেক অধিক খবর পাইতে পারেন, কিন্তু যে দেশ ১৯৫৮ সনে স্বেচ্ছায় অসময়ে আন্তর্জাতিক কণ্ট্রোল কমিশনকে (I. C. C.) বিদায় দিয়া এই আভ্যন্তরীণ গোলযোগের পথ খুলিয়াছিল তাহাদের খাতস্থ করা সহজ নয়। তবে বর্ত্তমানে এক সম্মেলনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, যাহাতে চৌদ্দটি জাতিকে যোগ দিতে আহ্বান করা হইয়াছে। এবং রুশ-প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভও তাহাতে রাজী হইয়াছেন, সুতরাং সেখানের আকাশে ঝড়ের মেঘ কিছু পাতলা হইয়াছে মনে হয়।

কঙ্গোর অবস্থা এখনও সঙ্গীন এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘে শ্রীমেননের ব্যবস্থা চলিলে সেখানে অতি বৃহৎ লাওস সৃষ্ট হইত। এখন পর্য্যন্ত যাহা দেখা যায় তাহাতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের হস্তে আরও শক্তি ও ক্ষমতা দেওয়া ভিন্ন অন্য উপায় নাই। কঙ্গোর অধিবাসীদিগের মধ্যে আদিম অজ্ঞতার অন্ধকার এখনও সর্ব্বব্যাপী, উপরন্তু বেলজিয়ামের স্বার্থরক্ষার চক্রান্ত এখনও সেখানে পূর্ণমাত্রায় চলিতেছে। এমত অবস্থায় রাষ্ট্রসঙ্ঘ সেখান হইতে প্রস্থান করিলে ঐ দেশ অন্তর্বিরোধের আগুনে জ্বলিয়া যাইবে।

আলজিরিয়ার সমস্যা এখন একদিকে প্রেসিডেণ্ট দ্য গল ও অন্যদিকে আলজিরিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের যোদ্ধবর্গের (F. L. N.) হাতে। প্রেসিডেণ্ট দ্য গল ত ফ্রান্সের ও আলজিরিয়ার অধিবাসীগণের সম্মতি লাভ করিয়াছেন, এখন তিনি কি ভাবে এই অত্যন্ত জটিল প্রশ্নের সমাধান করিতে অগ্রসর হইবেন, তাহাই দেখিতে সারা জগৎ উন্মুখ হইয়া আছে।

চীন-ভারত সমস্যা এখনও অত্যন্তই জটিল এবং শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের অভয়বাক্যে দেশের লোক যেন সম্পূর্ণ আস্থা না দেয়। আমাদের ভয়, এই দেশের আভ্যন্তরীণ শত্রুর পক্ষ হইতে এবং সেই মনোভাব হইতে যাহা "পঞ্চশীল", "অহিংসা", "আণবিকঅস্ত্র-বিরোধ" ইত্যাদি স্তোকবাক্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। ঐরূপ মনোভাবের বশেই আমরা চীনকে প্রশ্রয় দিয়া "খাল কাটিয়া কুমীর আনয়ন" করিয়াছি। এবং শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা-ব্যাপারে এখনও যে নানা প্রকার ব্যাঘাত ও বিপত্তি চলিতেছে তাহার পিছনে আছে নীচস্বার্থ, পঞ্চম-বাহিনীর চক্রান্ত এবং সামরিক-বাহিনীর কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে বিবাদ-বিরোধ।

নেপালের ঘটনাবলী এখনও সম্পূর্ণ পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায় না। নেপালের জনমত এখনও অশিক্ষিত এবং ওখানের চলাচল-ব্যবস্থাও অতি সীমাবদ্ধ, সুতরাং সেখানের সংবাদের উপরও আস্থা স্থাপন করা সহজ নহে। নেপাল মহারাজ কি মনে করিয়া কাজ করিতেছেন, তাহা এখন প্রকাশ পায় নাই। এ বিষয়ে কংগ্রেস অধিবেশনে যে বিশেষ আলোচনা হয় নাই তাহা ভালই।

শেষ পর্য্যন্ত এই বলিয়াই এ প্রসঙ্গ শেষ করি যে, আমাদের ঘরের সমস্যা এখন এতই প্রখর যে, সেই দিকে পূর্ণ মনোযোগ দিয়া পরে অন্যদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করা উচিত। পণ্ডিত নেহরুর এই বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

পঞ্চায়েতী রাজ

কংগ্রেস অধিবেশনে প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল চারিটি। সর্ব্বপ্রথম ছিল অবশ্য "নির্ব্বাচনী ইস্তাহার" কেন না উহার উপরই আগামী ১৯৬২ সনে কংগ্রেসের ভাগ্যপরীক্ষার ফলাফল নির্ভর করে। ঐ ভাগ্যপরীক্ষায় জয়লাভ হইলে, পরে পাঁচ বৎসরের মত নিশ্চিন্তভাব থাকিবে। পরের নির্ব্বাচনেও আবার দেশের লোকের চোখে ধাঁধা লাগাইবার নূতন ব্যবস্থা চিন্তা করা হইবে, কিন্তু মাঝের কয় বৎসর ত দেশের লোক নাচার!

অন্য তিনটি বিষয় ছিল পঞ্চায়েতী রাজ, জাতীয় সংহতি এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। ইহার মধ্যে পঞ্চায়েতী রাজ সম্বন্ধে উৎসাহ দেখান হইয়াছে নানা প্রকারে, পণ্ডিত নেহরু দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, আমাদের এ কথা ভাবিলে চলিবে না যে, সদা-সর্ব্বদা পরামর্শ না দিলে পঞ্চ ও সরপঞ্চগণ কার্য্য পরিচালনা করিতে পারিবেন না, উহাদের হাতে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া প্রয়োজন। তাঁহার বক্তৃতার সারাংশের কিছু আমরা "আনন্দবাজার পত্রিকা" হইতে উদ্ধৃত করিয়া পরে আমাদের মন্তব্য দিব।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ঐ দিনে পঞ্চায়েতী রাজ সংক্রান্ত প্রস্তাব সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, পঞ্চায়েতী রাজ ভারতের সমগ্র পল্লীজীবনের ক্ষেত্রে বিপ্লবের সূচনা করিবে। লক্ষ লক্ষ লোক আত্ম-নির্ভরশীল হইয়া উঠিবে এবং তাহারা নিজেরাই প্রশাসনিক ও অন্যান্য কার্য্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করিবে। নানা অভাব-অভিযোগের প্রতিকার-প্রার্থনা জানাইয়া দরখাস্ত হস্তে যে যুগে পল্লীর ও অন্যান্য অঞ্চলের জনগণকে কর্ম-

চারিগণ ও অন্যান্য কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে ছুটিতে হইত, ইহার ফলে সে যুগের অবসান ঘটিবে। এখন তাহারা নিজেরাই এই সমস্ত জিনিস করিবার সুযোগ লাভ করিবে।

শ্রীনেহরু বলেন, পঞ্চায়েতগুলিকে তাহাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে ছিটেফোঁটা ক্ষমতা নহে, পরন্তু পূর্ণ ক্ষমতা দান করা উচিত। এই ক্ষমতার যথোচিত সদ্ব্যবহার করা হইবে না বলিয়া যে ভয়, তাহা অর্থহীন। এমন কি পঞ্চ ও সরপঞ্চগণ যদি কোনো কোনো সময় পরস্পরের মাথাও ভাঙ্গেন, তাহা হইলেও তাঁহারা তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ও ভুল হইতে শিক্ষালাভ করিবেন।

"শ্রীনেহরু বলেন, সর্ব্বদা পরামর্শ না দিলে পঞ্চ ও সরপঞ্চগণ কার্য্য পরিচালনা করিতে পারিবেন না বলিয়া যে আশঙ্কা প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহাতে যে সব পিতামাতা সর্দ্দি লাগিবার ভয়ে ছেলেমেয়েদের আগলাইয়া রাখেন, তাঁহাদের অত্যুৎসাহের কথা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। 'অনেক সময় দেখিতে পাই, কোনো কোনো পিতামাতা তাঁহাদের ছেলেমেয়েদের যদি সর্দ্দি লাগে, সেই ভয়ে তাহাদের গলায় তিন-চারটা মাফলার জড়াইয়া দেন। এই মনোভাব ছেলেমেয়েদের পক্ষে ক্ষতিকর। যে শিশুকে এই ভাবে সর্ব্বদাই আগলাইয়া রাখা হয়, বাকি জীবনে তাহাদের সহজেই সর্দ্দি লাগে।'

"শ্রীনেহরু বলেন, সুইজারল্যাণ্ডের মতো দেশগুলিতে তুষার লইয়া খেলা করিবার জন্য শীতকালে শিশুদের খোলা জায়গায় লইয়া যাইতে আমি দেখিয়াছি। শিশুগণকে ভয়মুক্ত করিতে এবং তাহাদিগকে মজবুত করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্যই ইহা করা হয়। তুষারের উপর স্কেটিং করায় অথবা তুষারাবৃত পর্ব্বত হইতে গড়াইয়া পড়ায় আহত হইবার বিপদের আশঙ্কা আছে। কিন্তু ছেলেমেয়েদের মধ্যে যাহাতে নির্ভীকতার ও সাহসের সহিত বিপদের সম্মুখীন হইবার মনোভাব গড়িয়া ওঠে, তদুদ্দেশ্যে অন্যান্য দেশে পিতামাতারাই এই সব বিষয়ে উৎসাহ দেন।

"সুতরাং আমি আপনাদের বলিতে চাই যে, যদি পঞ্চায়েতগুলিকে তাহাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে একযোগে সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহারা যথোপযুক্তরূপে কাজ করিতে পারিবে না, এই আশঙ্কা করা আমাদের পক্ষে উচিত নহে। আমি পুনরায় বলিতেছি, আপনারা পঞ্চায়েতগুলিকে তাহাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে যে পরিমাণে ক্ষমতা দিবেন, সেই পরিমাণে পঞ্চায়েতী রাজ সাফল্যলাভ করিবে।

"শ্রীনেহরু বলেন যে, সাধারণ লোককে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইবার কাজে সমর্থ করাই গণতন্ত্রের প্রকৃত অর্থ। প্রত্যেকে সমান নয়। কিন্তু প্রত্যেকের জন্য সমান সুযোগ থাকিবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, জনসাধারণ যাহাতে নিজেদের কাজ নিজেরা করিতে পারে, পঞ্চায়েত রাজ সেই সুযোগ দিবে। একজন কালেক্টর কি একজন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ভাল কাজ করিতে পারেন, কিন্তু তাহার ফল সুদূরপ্রসারী হইবে না। জনসাধারণকে নিজেদের দায়িত্ব নিজেদের বহন করিতে হইবে। পঞ্চায়েত রাজ সফল হইবে। ইহার ব্যর্থ হইবার আশঙ্কা নাই। কোনো চতুর সরকারী কর্ম্মচারী জনসাধারণকে প্রভাবিত করিয়া তাঁহার স্বমতে আনিতে পারেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত জনগণ নিজেরাই নিজেদের কাজ করিবে।

"শ্রীনেহরু বলেন যে, কয়েকটি স্থানে পঞ্চায়েত রাজ প্রশংসনীয় কাজ করিয়াছে। কৃষকগণ যখন তাহাদের অভ্যাসবশে কোনো-না-কোনো বিষয়ের জন্য সরকারী কর্ম্মচারীর নিকট ছুটিত, ঐ সব কাজ তাহাদের নিজেদের করিতে বলা হইত। গ্রামে হরিজনদের বাসগৃহের সমস্যা বহুকালের। এতদিন এই সমস্যার সমাধান হয় নাই। কিন্তু পঞ্চায়েত রাজ এই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া তাহাদের বাসগৃহ তুলিয়া দিয়াছে। শুধু হরিজনরাই নয়, তহবিলে অর্থ থাকায় অন্যান্য ব্যক্তিদেরও ঘর উঠিয়াছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, ভিত্তি দৃঢ় হইলে বিরাট কাঠামো কিছুটা কমজোরদার হইতেও পারে। কিন্তু ভিত্তিমূল শিথিল হইলে সমগ্র কাঠামোই ধসিয়া পড়িবে। পঞ্চায়েত তাই গণতন্ত্রের শক্ত ঘাঁটি। ভবিষ্যতে কাহাকেও লোকসভা অথবা বিধানসভায় নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইতে হইলে পঞ্চায়েতকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না, বরং উহার সঙ্গে তাঁহাকে কাজ করিতে হইবে। আর একটি শুভ লক্ষণ এই যে, বহু গ্রামের লোক আবার গ্রামেই ফিরিয়া যাইতেছেন; তাঁহারা জানিতে পারিয়াছেন যে, পঞ্চায়েত প্রশাসনিক ক্ষমতা পাইবে।

অতঃপর তিনি বলেন যে, যেখানে গণতন্ত্রের কোনো শক্ত ভিত নাই, সেখানে যে কোনো প্রশাসনিক কাঠামো 'প্রাসাদ' বিপ্লবের ফলে গঠিত হয়। ভারতে এখন কোনো প্রাসাদ নাই; উহাদের স্থানে সংস্কৃতি ও সংগ্রহশালার প্রাসাদ গড়িয়া উঠিয়াছে।

"শ্রীনেহরু বলেন যে, অদলীয় ভিত্তিতে পঞ্চায়েতের নির্ব্বাচন হওয়া উচিত। কিন্তু যদি অন্যান্য দলের লোক দলীয় ভিত্তিতে উহাতে নির্ব্বাচনপ্রার্থী হন তাহা হইলে অবস্থা ভিন্নরূপ দাঁড়াইবে। তবে সূচনায় লক্ষণ শুভ;

পঞ্জাব ও রাজস্থানের বহু স্থানে অদলীয় ভিত্তিতে পঞ্চায়েতের নির্ব্বাচন হইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে পঞ্চ ও সরপঞ্চদিগকে কোনো স্কুল কলেজে হাতেখড়ি দেওয়া যায় না। অভিজ্ঞতা হইতে তাঁহাদিগকে শিখিতে হইবে। তবে সমবায়-সংস্থা চালাইতে গেলে কিছুটা ব্যবহারিকজ্ঞান প্রয়োজন।"

পণ্ডিত নেহরুর তাঁহার স্বভাবসুলভ উৎসাহে পঞ্চায়েতী রাজের এক রঙীন ছবি আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। তিনি নিজে মানবচরিত্রের জন্মগত গুণাবলীর বিশ্বাসী এবং সেই বিশ্বাসের বলে তিনি এদেশের জনসাধারণের প্রিয়জন হইতে পারিয়াছেন। কিন্তু মানুষের প্রবৃত্তি বলিয়া যে জন্মগত কতগুলি দোষগুণ মিশ্রিত প্রেরণা আছে, যাহার বশে সুশিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই চালিত হয় শ্রীনেহরু তাঁহার উৎসাহের মধ্যে সেগুলির কথা ভুলিয়া গিয়া অনেক অনর্থের পথ খুলিয়া দিয়া থাকেন। মানুষ যেখানে অনভিজ্ঞ ও অশিক্ষিত সেখানে ধূর্ত্তের ও প্রবঞ্চকের পরামর্শে অনেক অন্যায় ও অনর্থের সৃষ্টি হয়।

আমাদের দেশে এখন যে অনাচার ও দুর্নীতির স্রোত বহিতেছে তাহার প্রসার এখন বহুদূরে হইয়াছে। যাঁহাদের ক্ষমতা আছে তাঁহাদের অধিকাংশই—কি সরকারী কর্ম্মচারী, কি রাজনৈতিক দলের দালাল বা নেতা, কি ইউনিয়ন বোর্ডের বা জেলাবোর্ড ও মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের সদস্য—সে ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত, বিশেষ যেখানে নিজস্ব বা নিজ দলীয় স্বার্থের নীচ আকাঙ্ক্ষা জড়িত থাকে। এইরূপ অবস্থায় বিনা ওজরে গ্রাম পঞ্চায়েতের হস্তে পূর্ণ ক্ষমতা দান কতটা বিবেচনায় গ্রাহ্য হইবে সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। আমরা জানি বর্ত্তমানে কালোবাজার, চোরাইমাল চালান ও বিক্রয়—বিশেষ পাকিস্থানের সীমান্তে—ব্যাপারে গ্রামস্থ ও নগরস্থ বহু রাজনৈতিক দালাল এখন সক্রিয়ভাবে লিপ্ত। পঞ্চায়েত রাজের হস্তে পূর্ণ ক্ষমতা আসিলে তাহাদের পথের সকল কাঁটা দূর হইবে এবং তাহারা পঞ্চায়েত অতি সহজে ও অল্প অর্থের ব্যয়ে দখল করিয়া নিজের দুষ্কর্ম্ম ও অনাচার চতুর্গুণ উৎসাহে চালাইবে। প্রতি গ্রামে ও গ্রামাঞ্চলে কিছু না কিছু দুর্বৃত্ত আছে, একথা বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন সকলেই জানে। তাহারা এখন এই সকল অপকর্ম্ম পুলিসকে ঘুস দিয়া বা রাজনৈতিক ক্ষমতাপ্রসূত শক্তির অপব্যবহার করিয়া চালাইতেছে। পঞ্চায়েত দখল করা তাহাদের কাছে ছেলেখেলা হইয়া দাঁড়াইবে। তখন পঞ্চায়েতীরাজের এই সুখের স্বপ্ন যাইবে কোথায় মিলাইয়া?

আমাদের এই সব কথা মনগড়া নহে। অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে দাদা ধর্ম্মাধিকারির মত উৎসাহী সজ্জন উত্তর-প্রদেশের পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার সম্পর্কে "গুণ্ডারাজের" অভিযোগ আনিয়া এক বিস্তারিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমরা অন্য কয়েকজন বিশ্বস্ত লোকের মুখে একই কথা শুনিয়াছি সুতরাং আমরা পণ্ডিত নেহরুর বিবৃতিতে কোনো উদ্দীপনা অনুভব করিতেছি না।

আসলে এই পঞ্চায়েত রাজ প্রচারের অর্থ রাজনৈতিক দালালদিগকে ক্ষমতার—যাহার বর্ত্তমান অর্থ ঘুসের বা চুরির টাকা লাভের উপায়—লোভ দেখাইয়া গ্রামাঞ্চলে পাঠানো। পণ্ডিত নেহরু তাঁহার ভাষণের শেষে নিজেই বলিয়াছেন যে, পূর্ণ পঞ্চায়েত রাজ প্রতিষ্ঠিত এই খবর শুনিয়াই বহু লোকে গ্রামে ফিরিয়া যাইতেছে। তাহারা কি প্রকৃতির লোক এবং কিসের আশায় গ্রামে ফিরিয়া চলিয়াছে সে বিষয়ে তিনি কি কোনোও খোঁজ করিয়াছেন?

কংগ্রেসের নির্ব্বাচনী ইস্তাহার

এবারের কংগ্রেস অধিবেশনের মূল বিষয় ছিল ১৯৬২ সনের সাধারণ নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের জয়ের ব্যবস্থা করা। দেশের লোকের চোখে ধূলা দিতে হইলে কি ভাবে তাহাতে হাত সাফাই করিতে হইবে এবং কি কথা বলিয়া তাহাদের মন বর্ত্তমানের অন্যায়, দুর্নীতি ও অনাচারের চিন্তা হইতে হটাইতে পারা যায় এই ছিল মুখ্য প্রশ্ন। তাহার সমাধানে পঞ্চায়েতী রাজ, জাতীয় সংহতি ও তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা এই তিনটি "দিল্লী কি লাড্ডু" জনসাধারণের সম্মুখে রাখিয়া, ঠকাইয়া ভোট সংগ্রহের ব্যবস্থার চেষ্টা হইয়াছে। নীচে উদ্ধৃত সংবাদে ঐ খসড়া নির্ব্বাচনী ইস্তাহারের রূপ ও রকম দেওয়া আছে।

"১৯৬২ সনের সাধারণ নির্ব্বাচনের জন্য রচিত কংগ্রেসের নির্ব্বাচনী ইস্তাহারের খসড়ায় বলা হইয়াছে যে, ভারতের অখণ্ডতা যে কোনো ভাবেই হউক রক্ষা করিতে হইবে। ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, চীন ভারতের যে সব অঞ্চল দখল করিয়াছে, সেগুলি পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা চালাইয়া যাইতে হইবে; গোয়াকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

"কংগ্রেসের ভবনগর অধিবেশনে যে সব প্রস্তাব গৃহীত হইবে, তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই নির্ব্বাচনী ইস্তাহার রচিত হইবে। ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবে

নির্ব্বাচনী ইস্তাহারে ২২টি বিষয়ের উপর জোর দিতে বলা হইয়াছে।

"খসড়া নির্ব্বাচনী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, সরকারী পরিচালনাধীন শিল্পের ক্ষেত্র ক্রমশঃ সম্প্রসারিত হইবে এবং সরকারী শিল্পপ্রচেষ্টার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বেসরকারী শিল্পপ্রচেষ্টা অগ্রসর হইবে।

"সরকারী পরিচালনাধীন শিল্পের সুপরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক পরিবর্ত্তন সাধন করার কথাও খসড়া নির্ব্বাচনী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে।

"ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, এইরূপ ভাবে কর ধার্য্য করা উচিত যাহাতে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে আয়ের পার্থক্য হ্রাস পায় এবং দেশের সম্পদ বৃদ্ধি পায়।

"অত্যাবশ্যক দ্রব্যমূল্যের স্থিতিকরণ এবং প্রয়োজন হইলে সরকারী পরিচালনাধীনে বাণিজ্যের জন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিলাস দ্রব্য এবং অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদনে উৎসাহ দান করা উচিত হইবে না। ভারতের সকল রাজ্যে কংগ্রেসের ভূমি-সংস্কার সংক্রান্ত নীতি বলবৎ করিতে হইবে। যেখানে সম্ভব, স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতে সমবায় কৃষির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কৃষির ক্ষেত্রে আধুনিকপদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে।

"খসড়া ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, কংগ্রেস শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সাহায্যে দেশে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানের জন্য চেষ্টা করিবে। ইস্তাহারে আরও বলা হইয়াছে যে, পরিকল্পনার মাধ্যমে ঐ লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব।

"নির্ব্বাচনী ইস্তাহারে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

"ইস্তাহারে সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে বলা হইয়াছে।

"উহাতে বলা হইয়াছে যে, নূতন সমাজ-ব্যবস্থায় ব্যক্তির মর্য্যাদা রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

"ঐ সমাজ-ব্যবস্থায় ঐক্য, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সংহতির মনোভাব সৃষ্টি হইবে।

"ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ভাষা সম্পর্কে কংগ্রেসের নীতি স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

"অনগ্রসর সম্প্রদায়সমূহের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। ইস্তাহারে মাদক দ্রব্য নিষিদ্ধ করার নীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।"

ঐ খসড়া ইস্তাহারের প্রত্যেকটি দফার বিশদ আলোচনা করিতে হইলে বিগত দশ বৎসরের কংগ্রেসী শাসনের প্রতিটি ভুল ভ্রান্তি ও অন্যায়-অনাচারের ইতিহাস লিখিতে হয়। সে কাজের অবকাশ আমাদের নাই, স্থানও নাই, সেই জন্য আমরা পাঠকমাত্রকেই বলিব যে, এই সকল প্রস্তাবিত সাধু-সংকল্পের সহিত অতীতের প্রতিশ্রুতি এবং পরে কার্য্যতঃ তাহার ব্যতিক্রমের কথা যেন প্রত্যেকেই চিন্তা করিয়া দেখেন। এখানে আমরা কয়েকটি মাত্র দফার আলোচনা করিব।

চীন কর্ত্তৃক অধিকৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধারের চেষ্টা ততদিনই ব্যর্থ হইবে যতদিন বর্ত্তমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা চলিবে। এই প্রতিরক্ষা বিভাগের শীর্ষে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর অদ্যাবধি একজনও যোগ্য ও সক্ষম ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হয় নাই। এখনও প্রতিরক্ষা ব্যাপারে অশেষ গোলযোগ ও দুর্নীতির কথা শোনা যাইতেছে। গোয়ার ভারত অন্তর্ভুক্তি কোনও চেষ্টার চিহ্নমাত্র নাই যেখানে সেখানে সেকথার অবতারণা শুধু ধাপ্পাবাজী। তবে যদি রাষ্ট্রসঙ্ঘের ঝড়ে পোর্ত্তুগীজ কাক মরে তবে ফকির নেহরু এবং খেলোয়াড় সাকরেদ মেননের কেরামৎ বাড়িতে পারে।

ব্যক্তি মর্য্যাদার কথা এই ইস্তাহারে কি করিয়া স্থান পায় তাহাই আমরা বুঝি না। যেখানে আমলাতন্ত্র ও সরকারী অধিকারিবর্গের ক্ষমতার অপব্যবহার বাড়িয়াই চলিতেছে, মন্ত্রীসভাতেও যেখানে ভদ্রলোকের ভদ্রত্ব রক্ষা প্রায় অসম্ভব করা হইতেছে, উপরন্তু ভোটের লোভে দেশকে "পঞ্চায়েতী রাজের" নামে দুর্বৃত্তদের হাতে তুলিয়া দেওয়া হইতেছে সেখানে "ব্যক্তিমর্য্যাদা" উল্লেখ করাই পরিহাস মাত্র।

"ভাষা সম্বন্ধে কংগ্রেসের নীতি স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইবে—কবে?

পরিশেষে আমরা একটি ইংরেজী প্রবাদ বাক্য দিয়া শেষ করি—"

When the Devil is ill, the Devil a monk
would be
When the Devil is well, Devil a monk
is he!

"যখন শয়তান অসুস্থ হয় তখন সে সাধুসন্ত হইতে চায়, কিন্তু নীরোগ হইবার পর শয়তান,—যে শয়তান সেই শয়তানই হয়!

দেশের লোকের সামনে ১৯৬২ সনে সত্যই এক ভাগ্যপরীক্ষা আসিতেছে। কংগ্রেসে মূকবধির ছাড়া সজ্জনের স্থান নাই, এতই মেকী ঢুকিয়াছে। আর অন্য দুই দলের একটি দু'নৌকায় পা দিয়া অচল অবস্থায়

পৌঁছিয়াছে আর অন্যটির কাছে ভারত স্বদেশ নহে, দেশপ্রেম বা দেশসেবার কোনো অর্থও তাঁহাদের কাছে সমীচীন নহে।

"জাতীয় সংহতি"

"জাতীয় সংহতি" হইল নির্ব্বাচন ব্যাপারের অন্যতম সমস্যা। এই অধিবেশনে বিভিন্ন বক্তা বলেন যে, দেশে দলাদলী ও বিভেদবিচ্ছেদ যে ভাবে চলিয়াছে তাহাতে উহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা না করিলে এবং আগামী বৎসরের নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে কর্ম্মীদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন না করিতে পারিলে নির্ব্বাচনে সাফল্যলাভ দুরাশা মাত্র। অবশ্য সাফল্য লাভ করিলে পরে পরের চার বৎসর মনের আনন্দে বিভেদবিচ্ছেদ, সাম্প্রদায়িকতা ঘুষের অংশ লইয়া মন্ত্রীসভা বা দলগোষ্ঠীর সঙ্গে বিরোধ ইত্যাদি করা চলিবে, একথা কেহই খোলসা করিয়া বলেন নাই। প্রস্তাব উত্থাপন করেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং "আনন্দবাজার পত্রিকা" তাহার সারাংশ যাহা দিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া আমাদের মন্তব্য দিব।

জাতীয় সংহতির প্রস্তাব উত্থাপন করেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। তিনি বলেন যে, সংখ্যালঘুদের মন হইতে যে কোনো অভিযোগ দূর করার দায়িত্ব কংগ্রেস-সেবীদের উপর বর্ত্তিয়াছে। যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় সংখ্যালঘুদের আস্থা অর্জ্জনে সফল হয় তাহা হইলেই জাতীয় সংহতির কাজ সহজতর হইবে। কিন্তু প্রতি-ক্রিয়াশীল ব্যক্তিরা জনসাধারণের মধ্যে বিভেদসৃষ্টির জন্য সংখ্যালঘুদের অভাব-অভিযোগকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কাজে লাগাইতেছে। কাজেই কংগ্রেস ও গবর্ণ-মেণ্টকে উহার প্রতিকারের উপায় খুঁজিতে হইবে, এমনকি প্রযোজনমত সুবিধাদাননীতি অনুসরণ করিয়া তাহাদিগকে কাজ দিতে হইবে।

"তিনি বলেন যে, ভারতে বিভিন্ন ভাষা, সম্প্রদায় ও ধর্ম্ম আছে। এই বিচিত্রতাই ভারতবাসীর ঐক্য ও শক্তির উৎস। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অধুনা এই বৈচিত্র্য হইতেই ভাঙনের সূচনা দেখা যাইতেছে। যদি এই প্রবণতাকে আরও বাড়িতে দেওয়া হয় তাহা হইলে সাম্প্রদায়িকতা ও ভাষাগত কূপমণ্ডুকতা বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়াইবে। তিনি বলেন যে, সাধারণ লোককে হিন্দী শিখিতে উৎসাহ দিতে হইবে এবং জাতীয় ভাষার প্রসার হইলে ঐক্যবোধ দৃঢ়তর হইবে।

"শ্রীমতী গান্ধী ভাষাগত সংখ্যালঘু ও অনগ্রসর শ্রেণীর লোকজনকে শিক্ষালাভের সুবিধা দিবার জন্য কংগ্রেস ও সরকারের নিকট অনুরোধ জানান। তিনি বলেন যে, প্রস্তাবটি যেন পুঁথিগত ব্যাপার হইয়া না থাকে; উহাকে যেন রূপায়িত করা হয়।

"জাতীয় সংহতির বিষয়ে শ্রীমতী গান্ধী যাহা বলিয়াছেন মূলতঃ তাহা খুবই সত্য, কিন্তু তাঁহার প্রস্তাবে এমনকিছু নাই যাহাকে আমরা সদিচ্ছা ছাড়া অন্য কোনোও সংজ্ঞা দিতে পারি। জাতীয় সংহতির বিরুদ্ধে যাহারা প্রতিক্রিয়াশীল তাহারা কি সকলেই সংখ্যালঘু-দিগের অন্তর্ভুক্ত? বোম্বাই দখলের জন্য দাঙ্গায় যাহারা হতাহত, ধর্ষিতা ও লুণ্ঠিত হইয়াছিল তাহারা সংখ্যাগুরু ছিল না, অত্যাচারীর দল সংখ্যাগুরু ছিল? আসামে এই ছয় মাস পূর্ব্বে যাহারা পশুর ন্যায় অত্যাচার করিল তাহারা কি সংখ্যালঘু ছিল, না অত্যাচারক্লিষ্টগণ সংখ্যা-লঘু ছিল? শুধুমাত্র মুসলমান, দলিত বা উদ্বাস্তুদের কথা ভাবিয়া আসল বিষয়কে উপেক্ষা করা কিছু যুক্তিসিদ্ধ নয়। অবশ্য যদি এই সকল গান ভোট চাওয়ার পালার অংশ হয় তবে আমাদের কিছুই বলিবার নাই।

একদিকে ভাষা সম্প্রদায় ও ধর্ম্মের বৈচিত্র্যের গুণ গাহিয়া অন্য দিকে হিন্দি শিক্ষায় উৎসাহ দিবার কথা বলায় কি রকম যেন গানে বেসুরা বেতালা ভাব আসিয়াছে। যদি সত্যই বৈচিত্র্য প্রশংসনীয় তবে উৎসাহ-দান সর্ব্বমুখীন হওয়া প্রয়োজন। হিন্দীতে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, কিন্তু হিন্দীওয়ালাদিগের শিক্ষা দেওয়া হইতেছে কি? তাহাদের অধিকাংশই যে মাতৃভাষাকে স্বার্থসিদ্ধির অস্ত্ররূপে আবাহন করিতেছেন, তাহার উপায় কি? বিশেষ হিন্দী বলিতে কোন হিন্দী বুঝায় সে বিষয়ে কোন মীমাংসাই এখনও হয় নাই।"

জাতীয় সংহতি" এত সহজে লভ্য নয়।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্ত্তন

বিগত ৮ই জানুয়ারী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে স্নাতকদিগকে সম্ভাষণ করিয়া রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা বাংলার ছেলেবুড়া সকলেরই প্রণিধান-যোগ্য। ছেলেমেয়েরা আজ ভুলিয়া গিয়াছে যে, তাহারা উত্তরাধিকারসূত্রে কাহাদের কীর্ত্তিযশ ও ঐতিহ্যের অধিকারি এবং সেই মহামানবগণ কি দায়িত্বজ্ঞান, মানবত্ব ও জ্ঞানতৃষ্ণার বশে বঙ্গে ও সারা ভারতে তাঁহাদের অক্ষয়কীর্ত্তির নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। সেই মহাজন-গণের পন্থা ছাড়িয়া কেবলমাত্র সাময়িক উত্তেজনা ও ভাবোচ্ছ্বাসের বশে চলিয়া, বাংলার ভবিষ্যতের অধিকারি যাহারা, তাহারা কি ভুল করিতেছে এবং সেই ভুলের কি বিষময় ফল সে বিষয়ে চেতনা তাহাদের হওয়া উচিত।

ছেলেমেয়েদের এই ভুল পথে চলার প্রধান কারণ যাঁহারা বয়স্ক তাঁহাদের এ বিষয়ে অমনোযোগ। নিজের স্বার্থ চিন্তায়, নিজের গুণকীর্ত্তন বা অন্যের যশখ্যাতির উপর মসীলেপন চেষ্টায় আমরা এতই ব্যস্ত যে, যাহাদের জ্ঞানবুদ্ধি বিবেচনা এখনও সম্পূর্ণ বিকশিত হয় নাই তাহাদের নিকট পূর্ব্বসূরীগণের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের কীর্ত্তিযশগান শুনাইয়া আমরা পথপ্রদর্শন করি না। উপরন্তু যদি কোনও গুরু বা মহাপুরুষের গুণকীর্ত্তন আমরা করি ত সেই সঙ্গে অন্য মহামানবের সম্বন্ধে মিথ্যার প্রচার করিয়া তাঁহাদের খর্ব্ব করিবার চেষ্টা করি। এইরূপ জঘন্য মনোবৃত্তির ফলে আমরা ছেলেমেয়েদের আদর্শ বিচ্যুত ও বিভ্রান্ত করিয়া ফেলিয়াছি।

এইরূপ অবস্থায় শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর অভিভাষণ অতিশয় সময়োচিত ও যথাযথ হইয়াছে। আমরা জানি অনেক বিজ্ঞব্যক্তি একটু হাসিয়া বলিবেন, "এ ত স্তোকবাক্যের চর্ব্বিত চর্ব্বণ মাত্র"। আমরা সেই সকল বিদগ্ধ চূড়ামণিগণকে ক্ষান্ত থাকিতে বলিয়া শ্রীমতী নাইডুকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

শ্রীমতী নাইডুর ভাষণের সারাংশ "যুগান্তর পত্রিকা" যাহা দিয়াছেন তাহা নীচে উদ্ধৃত হইল :

শ্রীমতী নাইডু তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, সিপাহী বিদ্রোহের এক শত বৎসরের মধ্যে বাংলাদেশের দীপ্ত প্রতিভা ও প্রচণ্ড গতিশীল ব্যক্তিসম্পন্ন এত মানুষ এক সঙ্গে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং কেবল বাংলাদেশে নহে, সারা ভারতবর্ষের চিন্তা ও কর্ম্মকে আকার দিয়াছেন। কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে যে সকল জ্ঞানী ব্যক্তি সেই সময়ে জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রতি আমাদের ঋণ রহিয়া গিয়াছে। তাঁহাদের ঐতিহ্য অমলিন রাখার জন্য একনিষ্ঠ ও ঐক্যবদ্ধ চেষ্টা করা ছাড়া আমরা অন্য কোনো উপায়ে সেই ঋণ শোধ করিতে পারিব না। জলন্ত দেশপ্রেমসম্পন্ন এই সকল মহাপুরুষ একথা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, অনাগত ভবিষ্যৎ কালের জন্য তাঁহারা যদি তাঁহাদের উত্তরাধিকার রাখিয়া যান তাহা হইলে ভবিষ্যৎ বংশধরগণ বিপন্ন হইবেন। তাঁহারা দূর ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, দেশের নিজস্ব প্রতিভার প্রতিকূল কোনো শিক্ষাপদ্ধতি বজায় থাকিলে পরিণাম খারাপ হইবে।

তিনি বলেন যে, ব্যবহারিক জ্ঞানের সহজ ও দ্রুত ফললাভের লোভের দ্বারা যেন আমরা নিজেদিগকে প্রলুব্ধ হইতে না দিই। জ্ঞানের সহিত নীতিবোধকে যুক্ত করার যত প্রয়োজন আজ দেখা দিয়াছে, পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনও তত দেখা দেয় নাই। আমরা পরিবর্ত্তনশীল ও অস্থির পৃথিবীতে বাস করিতেছি। সেখানে নীতির মানদণ্ড পরিবর্ত্তিত হইতেছে, সমস্ত মূল্যবোধ কম্পমান এবং সর্ব্বপ্রকার জাতীয় ও আন্তর্জ্জাতিক আচরণবিধি দোদুল্যমান।

শিক্ষাপদ্ধতি সংক্রান্ত যে সকল প্রশ্ন সারা দেশে আলোচিত হইতেছে সেগুলি উল্লেখ করিয়া শ্রীমতী নাইডু বলেন যে, শিক্ষাপদ্ধতির খুঁটিনাটি যে পরিবর্ত্তনই করা হউক না কেন দায়িত্বের প্রধান বোঝা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির এবং যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করেন তাঁহাদের উপরেই আসিয়া পড়ে। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে অবশ্যই মানবিকতা, সহিষ্ণুতা, যুক্তি, নূতন চিন্তার অন্বেষণ ও সত্যানুসন্ধানের সেই চিরপুরাতন অথচ চিরনবীন আদর্শের প্রতীক হইতে হইবে, মানুষ যে ক্রমাগত উচ্চ হইতে উচ্চতর লক্ষ্যের অভিমুখে ধাবিত হইতেছে সেই অভিযাত্রা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে প্রতিফলিত হইতে হইবে।

শ্রীমতী নাইডু বলেন যে, চিন্তার গোঁড়ামির কোনোরূপ প্রশ্রয় না দিয়া কোনো ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য নিজের মধ্যে লালিত না করিয়াই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এই মহান দায়িত্ব পালন করিতে পারে।

স্নাতকদের উদ্দেশ্যে অভিনন্দন ও শুভকামনা জানাইয়া তিনি বলেন যে, অন্যত্র বাংলা দেশের তরুণরা পাস করিবার পর জীবিকাহীনতার যে দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হয় সেই হতাশ হইতে এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা মুক্ত থাকিবে, ইহা সুখের কথা। যাহাদের ইঞ্জিনীয়ার ও কারিগরি জ্ঞান আছে তাহাদের জন্য ভারতের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের কাজে যথেষ্ট কর্ম্মের অবকাশ রহিয়াছে। কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যেন কেবল মাত্র জীবিকার্জ্জনের সুযোগ লাভ করিয়াই সন্তুষ্ট না থাকে। প্রত্যেককেই নিজ নিজ পথে ভারতের সেবা করিতে হইবে। মহাত্মা গান্ধী ভারতের সকল মানুষের দুঃখ দূর করিতে চাহিয়াছিলেন। সকল চক্ষুর অশ্রু মোচন করিতে চাহিয়াছিলেন। যতক্ষণ দুঃখ আছে, যতক্ষণ অশ্রু আছে, ততক্ষণ আমাদের মধ্যে কেহই হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না।

ভারত ও নেপাল

নেপালের মহারাজা নিজ রাজত্বে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

করিয়া দেখিলেন যে, কংগ্রেসী ঢং-এর সাধারণতন্ত্রের অর্থ ঠিক সাধারণের দ্বারা চালিত ও সাধারণের সুবিধা ও উন্নতির জন্য প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র নহে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল ও গণ্ডি নিজ নিজ সুবিধা ও লাভের জন্য সাধারণের উপর প্রভুত্ব করিলে তাহাকে ঠিক সাধারণতন্ত্র বলা চলে না। পক্ষান্তরে, যদি এই সকল ক্ষুদ্র দল ও গণ্ডির স্বার্থে বাধা লাগে তাহা হইলে তাহারা অনায়াসেই নিজেদের সুবিধার জন্য দেশের মঙ্গল ভুলিয়া যাইতে পারেন। এমন কি এ সন্দেহ অসঙ্গত হইবে না, যে নিজেদের ক্ষুদ্র লাভের খাতিরে এই সকল দল ও গণ্ডি দেশকে ভাগ-বাঁট করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্যের সৃষ্টি করিয়া যে-কোনো মহাদেশকে শীঘ্রই পরস্পরবিরোধী প্রদেশসমষ্টিতে পর্য্যবসিত করিবে। ইহার কারণ, অল্পবুদ্ধি লোকের দৃষ্টির প্রসার সীমাবদ্ধ এবং তাহারা কখনও নিজেদের অধিকার বা প্রভাবের কল্পনা বিস্তৃতভাবে সুদূরে প্রক্ষেপ করিতে সক্ষম হয় না। এই কারণে ক্ষুদ্রচেতা ও ক্ষুদ্রবুদ্ধি লোকে সততই নিজ নিজ প্রভাব অল্পপরিসর স্থানে নিবদ্ধ রাখিতে ইচ্ছা করে। এবং এই জাতীয় জননেতা সর্ব্বত্রই অধিক সংখ্যায় পাওয়া যায় এবং সেই কারণে স্থানীয় নেতাদিগের নেতৃত্ব রক্ষার জন্য ও তাহাদিগের অল্পবিস্তৃত প্রভাব বিস্তারের আনুকূল্য হেতু সর্ব্বত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রীয় কেন্দ্র সৃষ্ট হয়। ফলে যে-কোনো দেশ এইপ্রকার নকল সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ফলে ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা হইয়া যায় এবং সেই দেশের তথাকথিত কেন্দ্রীয় শাসনকর্ত্তাগণ পক্ষপাতিত্ব-দোষে দুষ্ট হইয়া ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন প্রিয়জনগঠিত গণ্ডির সহায়তা করিয়া আরও পূর্ণরূপে সেই ভাঙ্গিয়া-যাওয়া সম্পন্ন করিতে সাহায্য করেন। কোথাও কোথাও দেখা যায় যে, দল বা গণ্ডির সাহায্যের জন্য দলপতিগণ গোপনে বিদেশী শত্রুদিগের সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়া বন্ধুত্ব করিবার অছিলায় তাহাদের নিকট সাহায্যলাভের ব্যবস্থা করিতেছেন এবং নিজ দেশেও সমাজদ্রোহী গুণ্ডা, ডাকাইত প্রভৃতিকে দলে টানিয়া ও প্রশ্রয় দিয়া সমাজের বিশেষ ক্ষতি করিতেছেন। দেশে যে সকল বিরুদ্ধদল গঠিত হয় তাহার নেতাগণও রাজত্ব-অধিকারী দলগুলির অনুকরণে বিদেশীদিগের সহিত যোগাযোগ করিয়া দেশের সর্ব্বনাশ-সাধনের পথ বাহিরের শত্রুর জন্য ক্রমশঃ সুগম করিয়া দিয়া থাকেন। নেপালে ঠিক কি ঘটিয়াছিল তাহা আমাদিগের পূর্ণভাবে জ্ঞাত করান হয় নাই; কিন্তু আমরা একথা বুঝিয়াছি যে, দেশের অবস্থা বিচার করিয়া নেপালের মহারাজা নিজ রাজ্য ও স্বদেশের রক্ষার জন্য, নেপালের তথাকথিত স্বাধীনতা-প্রয়াসী দলগুলিকে দমন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। শ্রীকয়রালা সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বে লিখিযাছিলাম যে, তাঁহার চীনদেশ গমন ও চীনের সহিত নেপালকে প্রেমের বন্ধনে বাঁধিবার চেষ্টা তাঁহার দেশের পক্ষে অকল্যাণকর হইবে। কয়রালা ভারতের সহিত কোনো আলোচনা না করিয়া ভারতশত্রু চীনের সহিত সখ্যস্থাপন করিয়া নেপাল ও ভারতের মধ্যে বিদ্বেষের সৃষ্টি করেন। সেই বিদ্বেষ আজও নেপালে প্রচারিত হইতেছে। ইহা হইতে একথা অনুমান করা যাইতে পারে যে, নেপালের রাষ্ট্রীয় দলগুলি ভারত-বিদ্বেষী এবং সেই বিদ্বেষের কারণ দলপতিদিগের চীনের সহিত গোপন প্রেম ও খোলাখুলি মৈত্রীর প্রচেষ্টা। এই দলগুলি চীনের নিকট হইতে অর্থসাহায্য পাইতেন কি না তাহা জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে।

আমাদের রাষ্ট্রনেতা পণ্ডিত নেহরু সাহেব নেপালের মহারাজা নিজ দেশের দল ও গণ্ডিগত সাধারণতন্ত্র দমন করিবামাত্র তাঁহার সেই কার্য্যের সমালোচনা করিয়া নিজ মত প্রকাশ করিয়া নেপালীদিগের ভারত-বিদ্বেষ আরও সর্ব্বত্র প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার মতে নেপালের এই ঘটনা সাধারণতন্ত্রের ক্ষতিকর এবং ইহা দ্বারা জগতের সকল সাধারণতন্ত্রে অনিষ্ট হইয়াছে। আমাদের মনে হয় পণ্ডিতপ্রবরের সকল তথাকথিত সাধারণতন্ত্রকে একত্র স্থাপন ন্যায়শাস্ত্রবিরুদ্ধ কারণ যে সকল রাষ্ট্র নিজেকে সাধারণতন্ত্র অন্তর্গত বলিয়া প্রচার করে এবং উপর উপর সাধারণতন্ত্রের কিছু কিছু রীতিনীতি পদ্ধতির অনুকরণও করে সে সকল রাষ্ট্রই ভিতরের অবস্থানির্ব্বিচারে এক জাতীয় নহে। যথা, যে সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্রটিকে আমরা অতি ঘনিষ্ঠভাবে ও অন্তরে অন্তরে চিনি ও জানি; অর্থাৎ পণ্ডিত নেহরুর দল ও গণ্ডি দ্বারা চালিত ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক রাষ্ট্রগোষ্ঠী, সেই সাধারণতন্ত্র ও আমেরিকা, ইংলণ্ড, সুইডেন বা সুইজারল্যাণ্ডের সাধারণ-তন্ত্রগুলি কোনোপ্রকারেই তুলনীয় নহে। ভারত ও ভারতের প্রাদেশিক শাসন-প্রণালীর শুধু অর্থব্যয় পদ্ধতি বিচার করিলেই দেখা যাইবে যে, পণ্ডিত নেহরু সাধারণ-তন্ত্র বলিতে বুঝেন রাষ্ট্রীয়দলের একাধিপত্য ও যথেচ্ছ অর্থ রাজকর, মাশুল ইত্যাদিতে আদায়ের ও রাষ্ট্রীয়দলের তথাকথিত "আদর্শ" প্রচার ও বিস্তারের জন্য দরিদ্রের নিকট আদায়কৃত অর্থ অপব্যয় করিবার নির্ব্বাধ অধিকার। সুইডেন অথবা সুইজারল্যাণ্ডে কোনো রাষ্ট্রীয় দল কখনও রাষ্ট্রীয় অর্থ খদ্দর প্রচার, গ্রাম সংগঠনের নামে দলের লোক পোষণ ইত্যাদিতে ব্যয় করিতে পারেন না। আমেরিকায় রাষ্ট্রীয় প্রচারের নামে কোনো রাষ্ট্রীয় দলের

"আদর্শ" প্রচার ও গুণগান চলিতে পারে না। রাষ্ট্রীয় দলগুলি সভ্যজগতে সর্ব্বত্র নিজ আদর্শ প্রচার ও দল-সংরক্ষণের খরচ নিজ অর্থে চালাইয়া থাকেন। রাষ্ট্রীয় অর্থ শুধু সর্ব্বসাধারণের সুবিধা, সংরক্ষণ, উন্নতি ও লাভের জন্যই ব্যয় করা যাইতে পারে। সভ্যজগতে রাস্তায় ভিখারী চরাইয়া, কোটি কোটি লোককে অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে রাখিয়া, জাতির অর্দ্ধেক অধিক লোককে বেকার রাখিয়া, চিকিৎসার, শিক্ষার ও অপরাপর সমাজের সুবিধাসাপেক্ষ ও অবশ্যপ্রয়োজনীয় বিষয় অবহেলা করিয়া পৃথিবীর লোককে তাক লাগাইবার জন্য শত শত কোটি মুদ্রা কদাপি ব্যয় করিতে কেহ পারে না। ভারতে বেকার, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, অসহায়, অনাথ, পীড়াক্রান্ত লোকের সংখ্যা অগণ্য এবং গ্রামে গ্রামে রাজপথ, পাঠশালা, চিকিৎসাগার প্রভৃতি নাই বলিলেই চলে। অথচ প্রতি বৎসর বহু সহস্র কোটি মুদ্রা পণ্ডিত নেহরু ও তাঁহার রাষ্ট্রীয় দলের লোকেরা নানানভাবে ব্যয় করিয়া থাকেন। এই অবস্থায় ভারতকে সাধারণতন্ত্রের আদর্শাবদ্ধ বলা অতি বড় মিথ্যা। এইপ্রকার অবস্থায় পণ্ডিত নেহরুর নেপাল সম্বন্ধে সমালোচনা পূর্ণ মতপ্রকাশ চালুনির পক্ষে সূচির ছিদ্রান্বেষণের মতোই হইয়াছে। তিনি নিজে বহু সহস্র ব্যক্তিকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন, যখন প্রয়োজন মনে করিয়াছেন। তিনি ইচ্ছামত ইহাকে তুলিয়া, উহাকে নামাইয়া রাজ্য শাসন করিয়া থাকেন; তিনি প্রদেশে প্রদেশে কলহ হইলে পক্ষপাত করিয়া সকল নীতির ধ্বংস সাধন করিয়া থাকেন ও মৌনভাবে হাত গুটাইয়া থাকিয়া সকল অত্যাচার, অনাচার ও অরাজকতার সহায়তা করিয়া থাকেন। এবং সর্ব্বত্র নিজ দলের লোকের সকল দুষ্কর্ম বিনা বাধায় করিতে দিয়া নিজ দলের ও দেশের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া থাকেন। এ অবস্থায় তাঁহার পক্ষে কোনো লোকের কোনোও কার্য্যের সমালোচনা করা শোভন হয় না। নেপালের মহারাজা নেপালের অধীশ্বর ছিলেন বলিয়া চীনের গুপ্তচর ও অপরাপর দেশ-শত্রুদের তিনি দমন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ভারতের অধীশ্বর, সাধারণতন্ত্রের নীতি অনুসারে ভারতের জনসাধারণ; কিন্তু পণ্ডিত নেহরুর দল ও অপরাপর রাষ্ট্রীয় দলগুলি ভারতের জনসাধারণকে সর্ব্বদাই "প্রজা" করিয়া রাখিতে ইচ্ছুক। জনসাধারণের জ্ঞান ও শক্তি থাকিলে তাঁহারা নেপালেশ্বরের অনুকরণে ভারতের রাষ্ট্রীয় দলগুলিকে নিশ্চয়ই দমন এবং উচ্ছেদ করিতেন। ভবিষ্যতে হয়ত তাহা ঘটিতেও পারে।

অ

জাল-ভেজালের জালে বৈজ্ঞানিক

জাল-ভেজালের কারবারীদের ষড়যন্ত্রজাল যে কি ভাবে ছড়ান তাহা জানিলে বিস্মিত হইতে হয়। ভেজাল-মিশানর কাজে যে, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিও খাটিতেছে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয়! মানুষের মাথা কিনিয়া মানুষ-মারার অভিসন্ধি হাসিল করার ব্যবস্থা এই প্রথম নহে, নানা মারণাস্ত্রের উদ্ভাবনাই তাহার প্রমাণ—ভেজালের ব্যাপারে তাহারই রকমফের মাত্র। বড় জোর বলা চলে, অর্জ্জিতজ্ঞানও এ কালে পরিশুদ্ধ নহে, তাহাতেও কালগুণে ভেজাল ঢুকিয়াছে। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি আসলে যন্ত্রমাত্র, যে যন্ত্রীর আঙুল তাহাকে বাজায়, আমাদের প্রশ্ন সেই ভেজাল-শিল্পপতিদের সম্পর্কে; কেন না, ভেজাল যে আছে তাহা লইয়া অনুমাত্র সন্দেহ ত নাই; কি উপায়ে তাহা মেশান হয়, তাহাও একমাত্র কথা নয়। কথা, তাহার পাট্টা এমন মৌরসী এবং অবাধ থাকে কি করিয়া?

কর্পোরেশনের ষ্ট্যাণ্ডিং হেল্‌থ কমিটির চেয়ারম্যান, ডাঃ বি. সি. বসু যাহা জানাইয়াছেন, তাহাতে স্তম্ভিত না হইয়া পারি না। সাংবাদিক-বৈঠকে উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, বহু শিক্ষিত বৈজ্ঞানিক এইসব ভেজাল-চক্রের সঙ্গে যুক্ত আছেন। কিসের সঙ্গে কি ভেজাল দেওয়া যায়, ল্যাবরেটারিতে বসিয়া নাকি সে সম্পর্কে ইহারা দিনরাত গবেষণা চালাইয়া যান এবং বহু হোমরা-চোমরা ব্যবসায়ী হাজার হাজার টাকা বেতনে এই সকল বৈজ্ঞানিককে পুষিয়া থাকেন।

সংবাদটি আতঙ্ককর! দেখা যাইতেছে, মানুষের কল্যাণসাধনই যাঁহাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল, এমন কিছু কিছু বিজ্ঞানী আজ অর্থের নেশায়, অবিমিশ্র অকল্যাণের সাধনায় মাতিয়াছেন। তাহার জন্য মস্তিষ্ক এবং মনুষ্যত্ব বিক্রয় করিতে ইঁহাদের বাধে নাই। মনুষ্যত্ব বিক্রয় করিয়া ইহারা অমানুষ হইয়াছেন। এবং আপন দেশের মানুষের মুখে সেই ভেজাল-খাদ্য তুলিয়া দিবার ষড়যন্ত্রকেই ইঁহারা সফল করিয়া তুলিতেছেন—খাদ্য না বলিয়া যাহাকে বিষ বলিলেও কিছু অত্যুক্তি করা হয় না। বলা বাহুল্য, যাঁহারা সত্যকারের বিজ্ঞানসাধক, জনকল্যাণকেই যাঁহারা বিজ্ঞানসাধনার লক্ষ্য বলিয়া জানিয়াছেন, তাঁহারাই এই সংবাদে সর্ব্বাধিক মর্ম্মাহত হইবেন। সে যাহা হউক, অসাধু-ব্যবসায়ী এবং অসাধু-বিজ্ঞানীর এই সর্ব্বনাশা আঁতাতকে এখন যে করিয়াই হউক ছিন্ন করা দরকার। সরকার জানিয়া-শুনিয়া ইহাকে প্রশ্রয় **দিতেছেন বিশ্বাস করা কঠিন!**

জাল-ভেজাল সব এই শহরেই তৈরী হয় না—বাহির হইতেও আসে। কিন্তু রেলে যে মাল আসে, তাহা ষ্টেশনেই পরীক্ষা করিয়া দেখার এক্তিয়ার পৌর-কর্মচারীদের নাই। ভেজালের গুদামগুলিও সব খাস শহর এলাকায় নহে—অনেকগুলিই শহরতলী এলাকায় অথবা আরও দূরে, অন্য মিউনিসিপ্যালিটির চৌহদ্দিতে। সেখানেও হাত দিবার অধিকার পৌরসভার নাই। মজা এই, কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, রেল-পুলিস, গণ্ডা-গণ্ডা পৌরসভা—কোনোকিছুরই অভাব নাই, সবগুলিই ক্ষমতার প্রতীক, তথাপি দুর্নীতি বাড়িতেছে। আইনের বেড়ে ভেজালদারদের ধরিবার জো নাই—যদি বা ধরা পড়ে, সাজা দিবার উপায় নাই, সাজা যদি বা হয়, তবে নামমাত্র। অর্থাৎ সঙ্কল্পের আঁটুনিটাই বজ্র, প্রয়োগের গেরোটা একেবারে ফস্‌কা রাখিয়া কর্তৃপক্ষ ভেজাল-নিবারণ অভিযান চালাইতেছেন!

ব্রিটিশ সংবাদপত্রগুলির অবস্থা

'লণ্ডনের দুটি বিখ্যাত দৈনিক সংবাদপত্র 'নিউজ ক্রনিকল' ও তাহার সান্ধ্য সহচর 'ষ্টার'-এর মৃত্যু হইয়াছে। তাহাদের উদারনৈতিক আত্মা আসিয়া মিশিয়াছে 'ডেইলী মেল' ও 'ইভনিং নিউজ' এর রক্ষণশীল আত্মার সঙ্গে।

এই মিশ্রণ আশ্চর্যের হইতে পারে কিন্তু অচিন্তনীয় নয়। উদারনৈতিক ও রক্ষণশীল ধ্যানধারণা ইহার পূর্ব্বেও বহুবার বিটিশ রাজনৈতিক ও সমাজ জীবনে আসিয়া মিশিয়াছে এবং পরস্পরের ধ্যানধারণাকে ফলবতী করিয়াছে। আজকের এই মিশ্রণও বৃথা যাইবে বলিয়া মনে হয় না।

সংবাদপত্রের অর্থনীতি একটা জটিল বিষয়। ব্রিটেনে কোন সংবাদপত্রকে—একমাত্র কম্যুনিষ্ট 'ডেইলী ওয়াকার' ছাড়া, রাজনৈতিক অর্থ সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে হয় না। পাঠকরা যে মূল্য দেয় তা ব্যয় নির্ব্বাহের পক্ষে একেবারেই যথেষ্ট নয়, সেই জন্য বিজ্ঞাপন হইতে যে আয় হয় তাহা দিয়া আয়-ব্যয়ের এই ফাঁক পূরণ করিতে হয়। বিজ্ঞাপনদাতারা মনে করিতে পারেন—তাঁহারা যদি কাগজে কি থাকিবে বা না থাকিবে সে সম্পর্কে নির্দ্দেশ দিতে পারিতেন তাহা হইলে তাঁহারা কাগজটাকে আকর্ষণীয় করার সুযোগ সাংবাদিকদের তুলনায় অনেক বেশি দিতে পারিতেন। অবশ্য তাঁহারা এরূপ মনে করেন না।

যাই হোক, যে কোন সংবাদপত্রকে উৎপাদন ব্যয় মিটাইবার জন্য কেবল পাঠকদের উপর নয়, বিজ্ঞাপন-দাতাদের উপরও নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। এদিক দিয়া কোন পত্রিকার ব্যর্থতার কারণ তাহার চেষ্টা বা বুদ্ধির অভাব নয়, পাঠকগোষ্ঠী সৃষ্টি বা তাহাদের সন্তুষ্ট রাখার ক্ষমতার অভাব। ইহার অর্থ হইল, পাঠকগোষ্ঠী—এখন হইতে যাহাদের সহিত বিজ্ঞাপনদাতারা নিকট পরিচয় স্থাপন করিতে চায়। ইহার এক অর্থ হইল, সংবাদপত্রগুলির নিজেদের সম্বন্ধে যেমন একটা দায়িত্ব আছে তেমনই দায়িত্ব আছে তাহাদের সম্বন্ধে যাহাদের অর্থ সে চাহিতেছে। সেই জন্য তাহাকে একটা পাঠক-গোষ্ঠী বরাবরের মত ঠিক রাখিতেই হইবে।

'টাইমস' পত্রিকার কথা এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যাইতে পারে। পত্রিকার বাহিরের কোনো অর্থ সাহায্য নাই, তাহা একমাত্র চলিতেছে আড়াই লক্ষ পাঠকের সমর্থনের উপর। প্রসঙ্গত প্রাদেশিক সংবাদপত্রগুলির কথা উল্লেখ না করিয়া উপায় নাই। ব্রিটেনের জাতীয় পত্রিকাগুলিকে অনেক সময় এই সব পত্রিকার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হয়। কারণ তাহাদের প্রচার-সংখ্যা অভাবিত।

এই সব পত্রিকার বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, তাহারা যে কেবল নিজেদের অঞ্চলের সংবাদসমূহের প্রাধান্য দিয়া থাকে তাহা নয়; তাহারা অ-শাহরিক দৃষ্টিকোণ হইতে জাতীয় প্রশ্নগুলিও বিচার করিয়া দেখে। উপরন্তু প্রাদেশিক সংবাদপত্রের সম্পাদক—যিনি অনেক সময় পত্রিকার মালিকও হন, তিনি নিজেকে পাঠকবর্গ হইতে দূরে সরাইয়া রাখিতে পারেন না—যেমন পারেন জাতীয় পত্রিকাগুলির সম্পাদকরা। কারণ, তাঁহাকে তাঁহার সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গের সহিত প্রাত্যহিক জীবনে মেলা-মেশা করিতে হয় এবং কথাবার্ত্তার সময় তাঁহার সংবাদ-পত্রের মনোভাব সম্বন্ধে সর্ব্বদাই সজাগ থাকিতে হয়।

বেরুবাড়ী

শ্রীগৌতম সেন

বেরুবাড়ী হস্তান্তর প্রসঙ্গে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহাকে সামান্য বলিয়া বিচার করিতে গেলে ভুল করা হইবে। সত্য বটে, বেরুবাড়ী জলপাইগুড়ির সামান্য একটি অংশ এবং পূর্ব্বে বিরল বসতিই ছিল। সুতরাং স্থান হিসাবে পূর্ব্বে ইহার কোনো গুরুত্বই ছিল না। কিন্তু গত দাঙ্গায় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনকল্পে সরকারই তাহাদের বেরুবাড়ীতে পাঠাইয়াছিলেন। দীর্ঘ আট-নয় বৎসরে বাড়ীঘর বানাইয়া জায়গা-জমি করিয়া, জীবিকার সকল প্রকার ব্যবস্থা করিয়া তাহারা কায়েম হইয়া বসিয়াছে। বর্ত্তমানে ১২ হাজার মানুষের বসবাস এই দক্ষিণ বেরুবাড়ীর ৮-৭৫ বর্গ মাইল এলাকায়। এখানকার প্রধান শস্য ধান, পাট ও তামাক। বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ দেড় লক্ষ মণ ধান, সওয়া লক্ষ মণ পাট এবং বিলাতি ও জাতি তামাক মিশাইয়া হাজার মণ তামাক। সুতরাং বর্ত্তমানে অভাব কাহাকে বলে তাহারা জানে না। ইহা তাহাদের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলেই সম্ভব হইয়াছে। সরকারও সেখানে প্রভূত অর্থ ঢালিয়া চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল, শিক্ষার জন্য কয়েকটি স্কুল এবং অনেকগুলি রাস্তাও নির্মাণ করিয়াছেন। এক কথায় তাহারা এখন স্থিতিশীল সম্পন্ন গৃহস্থ। অত্যন্ত আকস্মিকভাবে আজ আবার তাহাদিগকে ঘরবাড়ী জমি-জিরেত ছাড়িয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইতে হইতেছে।

প্রশ্ন হইতেছে, নেহেরু-নূন চুক্তি যখন নয় বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছে তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার বেরুবাড়ীতেই তাহাদের স্থানান্তরিত করিলেন কেন? পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি এই চুক্তির কথা জানিতেন না? অথবা ভারতের প্রধানমন্ত্রী—যিনি এই চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিলেন, তিনি পশ্চিম বাংলা-সরকারকে এরূপ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করেন নাই কেন? জানিয়া-শুনিয়া এতগুলি অর্থের অপচয়ই বা করিতে দিলেন কেন?

১৯৪৭ সনে যখন অখণ্ড ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করিয়া স্বতন্ত্র স্বাধীন পাকিস্তানের সৃষ্টি করা হইয়াছিল, তখন আমরা ভাবিয়াছিলাম যে, হিন্দু-মুস্লিম প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া গেল। এখন হইতে ভারতবর্ষ পরিপূর্ণ শান্তিতে থাকিতে পারিবে। কিন্তু তাহা হইল না—গত তের বৎসরের মধ্যেও পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের হৃদ্যতা, সদ্ভাব ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হইল না। কাশ্মীরের মত বৃহৎ প্রশ্ন ছাড়াও পাকিস্তানের ও ভারতের মধ্যে কয়েক হাজার মাইল দীর্ঘ সীমান্তের সামঞ্জস্য-বিধানের প্রশ্ন ছিল। পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব্ব পাকিস্তানের সীমানা পুনর্বিন্যাসের দাবী হইতেই বেরুবাড়ী লইয়া এই বিভ্রাটের সৃষ্টি এবং এই বিভ্রাটের জন্য আইনের দিক হইতে দায়ী নয়াদিল্লীর কেন্দ্রীয় কর্ত্তৃপক্ষ—যাঁহারা তাড়াহুড়া করিয়া নেহেরু-নূন চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। আর নৈতিকতার দিক হইতে অন্ততঃ পরোক্ষভাবে দায়ী পশ্চিমবঙ্গের শাসন-কর্ত্তৃপক্ষ, যাঁহারা চুক্তি স্বাক্ষরের অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে কার্য্যতঃ বাধা দেন নাই।

ইহার পরের ঘটনা হইতেছে, ভুল যাহারই হউক, ভারতের প্রধানমন্ত্রী যখন অন্য রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছেন তখন তাহা কোন কারণেই ভঙ্গ করা যাইবে না। কারণ, সত্যভঙ্গের অপরাধে তাহা হইলে ভারতকে জগতের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের জনমত এই সরকারী সিদ্ধান্ত সন্তুষ্টচিত্তে মানিয়া লয় নাই। কারণ, সুপ্রীম কোর্টের অভিমত অনুসারে বেরুবাড়ী সীমানা পুনর্বিন্যাসের অন্তর্গত নহে, এবং বর্ত্তমান সংবিধান অনুযায়ী ভারতবর্ষের কোন অংশ অপর কোন রাষ্ট্রকে অর্পণ করা যায় না—যদি অর্পণ করিতে হয়, তবে সংবিধানের সংশোধন আবশ্যক। এখন দেখা যাক, এই সংবিধান পাল্টাইতে পারা যায় কি না। সংবিধান সংশোধনের দ্বারা আইনের জোর খাটান হয়ত কঠিন নয়, কিন্তু একমাত্র আইনের জোরে জনচিত্ত যেমন জয় করা যায় না, তেমনি কোন ভ্রান্ত ধারণা ও ভ্রান্ত কার্য্যকে ভোটের জোরে সংশোধনের মুখোস পরাইয়া লইলেও গণতন্ত্রের নৈতিক ভিত্তি তৈয়ার হয় না। নিঃসন্দেহে কেন্দ্রীয় সরকার একটি কু-দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলেন। এখানে আর একটি প্রশ্ন ওঠে—প্রধানমন্ত্রী কি সংবিধানের অতিরিক্ত ক্ষমতার অধিকারী? তিনি নিজের ক্ষমতার বাইরে যে চুক্তি

স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাহা আন্তর্জ্জাতিক আইনের দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না। কেন না আন্তর্জ্জাতিক আইনের প্রামাণ্য ভাষায় বলা হইয়াছে, আইনতঃ যে ক্ষমতা আছে, তার অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া আন্তর্জ্জাতিকক্ষেত্রে কোন চুক্তি করা হইলে তাহা মানিয়া চলিতে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র বাধ্য থাকিবে না। তারপর ভুল ধারণার ভিত্তিতে কোন চুক্তি হইলে, সে চুক্তিও টিকে না। কেন্দ্রীয় সরকার এই হস্তান্তর ও সংযোজনকে কার্য্যকরী করিবার জন্য দুইটি পৃথক বিল রচনা করিয়াছেন—তাহা আইনের দিক দিয়া শুদ্ধ নহে।

প্রধানমন্ত্রীর যে একটি বিশেষ মর্য্যাদা আছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিবে না। কিন্তু রাষ্ট্রের অখণ্ডতা রক্ষা করা কি প্রধানমন্ত্রীর কর্ত্তব্য নয়? ভারত রাষ্ট্রের ভৌমিক অখণ্ডতা ও মর্য্যাদা কি তাঁহার পদের সঙ্গে জড়িত নহে? তিনি ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া দেশের কোন অংশ এভাবে 'বে-আইনী চুক্তি' স্বাক্ষরের দ্বারা পাকিস্থানের হাতে কি তুলিয়া দিতে পারেন? ইতিহাসের সুপণ্ডিত শ্রীনেহেরুকে কি একথা স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে যে, মিউনিক-চুক্তির দ্বারা সুদেতেনল্যাণ্ড চেকোশ্লোভাকিয়ার অঙ্গ কাটিয়া জার্ম্মানীর হিটলারের হাতে তুলিয়া দেওয়ার ফলে শেষ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ঘটিয়াছিল? সেদিনের চেম্বারলেন ও ফরাসী প্রধানমন্ত্রী দালাদিয়ের নাৎসী জার্ম্মানীকে খুশী করিতে গিয়া এবং যুদ্ধ নিবারণের 'সরল উদ্দেশ্য' লইয়া এমন কলঙ্কিত চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। আজও তেমনি অঙ্ক কাটিয়া পাকিস্থানকে ভারতবর্ষের অঙ্গ কাটিয়া বেরুবাড়ী অর্পণ করা হইতেছে প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব সম্মান ও সীমান্তে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু এই কার্য্যের দ্বারা জাতির মেরুদণ্ডকে যে ভাবে ভাঙিয়া দেওয়া হইতেছে, তাহা কি কেন্দ্রীয় কর্ত্তারা অনুধাবন করিতেছেন? প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন, "পৃথিবীর লোক জানুক যে, আমরা কথা দিলে কথা রক্ষা করিতেও জানি।" কিন্তু ইহার উত্তরে যদি আমরা পাল্টা ঘোষণা করি—"পৃথিবীর লোক জানুক যে, আমরা দেশের মাটি রক্ষা করিতে জানি।" তাহা হইলে খুবই কি অন্যায় বলা হইবে? দেশের মাতৃভূমি হইতে বঞ্চিত করার কোন অধিকার কোন প্রধানমন্ত্রীর আছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। ১৯৩৮ সনে মিউনিক চুক্তির দ্বারা চেম্বারলেন-দালাদিয়ের পরের দেশ চেকোশ্লোভাকিয়া ভাগ করিবার বাহাদুরি দেখাইয়াছিলেন, ব্রিটেন বা ফ্রান্সের এক ইঞ্চি জমিও তার সঙ্গে জড়িত ছিল না। আর আমাদের প্রধানমন্ত্রী আমাদেরই দেশ ভাগ করিয়া নেহরু-নূন চুক্তির নূতন মিউনিক সংস্করণ ঘটাইয়াছেন। ইহা লজ্জার এবং অগৌরবের। কারণ, বর্ত্তমান শাসকবর্গ আমাদিগকে রাষ্ট্রিক মর্য্যাদার বদলে ক্রমাগত অসম্মান ও আত্মসমর্পণের দিকে লইয়া যাইতেছেন। মিউনিক-চুক্তি যেমন ইউরোপে শান্তি আনে নাই, এই নেহরু-নূন কিংবা বেরুবাড়ী চুক্তিও পাকিস্থান ও ভারতবর্ষের মধ্যে মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করিবে না।

চুক্তি দ্বারা অপরপক্ষকে তুষ্ট করিলেই সমস্ত বিরোধ-বিদ্বেষের বাষ্প উবিয়া যায় না, বহুদর্শী রাষ্ট্রনেতামাত্রেই তাহা জানেন। অপরপক্ষে যাহার সহিত চুক্তি করা হইতেছে তাহার মনোভাব কি, তাহার আচরণে কি কি লক্ষণ সুস্পষ্ট সেগুলির কঠোর বাস্তবনিষ্ঠ বিচার না করিয়া চুক্তির গুণগান করা রাষ্ট্রনেতার পক্ষে মারাত্মক হঠকারিতা। গত তের বৎসর রাষ্ট্রনীতি পরিচালনায় প্রধানমন্ত্রী নেহরু এইরূপ মারাত্মক হঠকারিতার পরিচয় দিয়াছেন বহুবার। নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি হইতে নেহরু নূন চুক্তি পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি পর্য্যায়ে পাকিস্থানকে তোষণের জন্য দেশের বৃহত্তর স্বার্থের ক্ষতি করিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। দেশের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ বোঝাপড়া করা ভাল, ইহা রাষ্ট্রনীতির সাধারণ সূত্র হিসাবে মানিয়া লইতে কেহ আপত্তি করিবেন না। কিন্তু শ্রীনেহরুকে ইহাও বার বার স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, বন্ধুত্ব একতরফা নয়, পরস্পর বোঝাপড়ার অর্থ কেবলই অপরপক্ষের তুষ্টিবিধান হইতে পারে না। সীমান্তে শান্তি-স্থাপনের জন্য অপরপক্ষের সঙ্গে বোঝাপড়া প্রয়োজন, কিন্তু সে জন্য কি অপরপক্ষকে তাহার সীমান্ত প্রসারিত করিয়া স্বদেশের এক অংশের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে দিতে হইবে?

বেরুবাড়ী ভেট দিয়া শ্রীনেহরু সীমান্তে শান্তি-স্থাপনের আশা করিতেছেন—খালের জল এবং তাহার সহিত কয়েক কোটি টাকা পাকিস্থানকে উপহার দিয়াছেন সেই একই আশার ছলনায়। ফল কি হইয়াছে? অপরপক্ষের ক্ষুধাই কেবল বাড়িয়া চলিয়াছে।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও সংবিধানকে ক্ষুণ্ণ করিয়া বেরুবাড়ী যে ভাবে পাকিস্থানকে দিবার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী তথা ভারত সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং পশ্চিমবঙ্গের মতামত উপেক্ষা ও অগ্রাহ্য করিয়াই লোকসভায় সংবিধান সংশোধন করাইয়াছেন তাহা শুধু আপত্তিকর নহে, উহার অশুভ পরিণামও সুদূরপ্রসারী। যুক্তি অপেক্ষা জিদ যেখানে প্রবল হইয়া উঠে এবং রাষ্ট্র-প্রধানের ভুলকেই শুদ্ধ করিবার জন্য সংবিধান সংশোধন করিতে

হয়, সেখানে শাসনতন্ত্র বা সংশোধনের মর্য্যাদাই ক্ষুণ্ণ করা হয়। আমাদের পরম এবং চরম দুর্ভাগ্য এই যে, ক্ষমতাবানেরা যখন ক্ষমতার অপব্যবহার করেন, তখন তাহার প্রতিকার হয় না। ভারত-বিভাগ হইতে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ, রাজ্যপুনর্গঠনে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি অবিচার, কমিশনের সুপারিশ অগ্রাহ্য করিয়া এই রাজ্যের অংশকে অন্য রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া, আসামে বাংলা-ভাষার দাবী-দলন, ভারতবাসীর অজ্ঞাতে এবং একান্ত অতর্কিতে নেহরু-নূন চুক্তিতে বাংলার অংশ বেরুবাড়ী পাকিস্থানকে দানের সঙ্কল্প—একটানা অন্যায় অবিচারের বহু আলোচিত সুদীর্ঘ কাহিনী।

পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ হইতে প্রত্যেকটি ব্যাপারে তুমুল আন্দোলন হইয়াছে, প্রতিকারের দাবীও করা হইয়াছে, কিন্তু কোন অবিচারই প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় নাই। কারণ ক্ষমতাবানেরা যখন অন্যায় অবিচার করেন, তখন একটিমাত্র উপায় ছাড়া তাহার প্রতিকারের পথ থাকে না। যাহারা সে রক্তক্ষয়ের পথে বুঝাপড়া করিতে চাহেন না, তাহাদের পক্ষে প্রতিবাদ জানানই বিক্ষোভ-প্রকাশের ভদ্র উপায়।

এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে, বেরুবাড়ীর প্রশ্ন সর্ব্ব-ভারতীয় প্রশ্ন, ইহা শুধু পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা নহে। ভারতীয় সংবিধান উপেক্ষা করিয়া যদি ভারতের কোনো অংশ অন্য দেশকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে সমগ্র ভারতের অবস্থা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলের হাতে কোথায় গিয়া পৌঁছিতে পারে, তাহা সকলকেই শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে।

সুপ্রীম কোর্ট তাঁহাদের রায়ে পরিষ্কার বলিয়াছেন যে, র‍্যাডক্লিফ বাঁটোয়ারা কিংবা বাগে ট্রাইব্যুনালের বাঁটোয়ারার সঙ্গে উহার সম্পর্ক নাই। ১৯৫২ সন পর্য্যন্ত পাকিস্থান বেরুবাড়ীর কোনো প্রশ্নই তোলে নাই। সুতরাং নেহরুজী বর্ণিত চুক্তির ভিত্তিটা বিকৃত, কিংবা তিনি নিজে বিভ্রান্ত। তিনি বলিয়াছেন, ভারতবর্ষ ও পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণ এবং স্বার্থেই ইহা সম্পাদিত হইয়াছে। ইহার প্রমাণ কি? একমাত্র সীমান্তের বিরোধ নিষ্পত্তি ও শান্তি? কিন্তু গত তের বছরে পাকিস্থানের সঙ্গে কি আমাদের কোনো মৈত্রী ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে? এমন কি ভারতবর্ষের গঙ্গার জল এবং কোটি কোটি টাকা সরবরাহের পরেও? এখনও পাকিস্থানের সঙ্গে আসল প্রশ্নের মীমাংসা বাকি রহিয়াছে এবং তাহা কাশ্মীর। সুতরাং বেরুবাড়ী অর্পণ করিলেই পাকিস্থানের সঙ্গে শান্তি-প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহা অবাস্তব।

তার পর বেরুবাড়ী ও কোচবিহারের ছিটমহলগুলি হস্তান্তরের ফলে আমরা মোট প্রায় ১৫ বর্গমাইল জমি ও প্রায় ১৮ হাজার লোক হারাইতেছি। অর্থাৎ পশ্চিম-বঙ্গের ভাগ্যে লোকসান ও নতুন উদ্বাস্তুর দায়িত্ব ছাড়া আর কোনো লাভের দিক নাই। বিশেষতঃ দীর্ঘসীমান্তে বেরুবাড়ী-হস্তান্তরের পরেও, পাকিস্থানের তরফ হইতে হানাদারী ও গুণ্ডামি চলিতে পারে।

নেহরুজী আরও একটি কথা বলিয়াছেন, কোনো অঞ্চল বিদেশী রাষ্ট্রকে হস্তান্তরের জন্য কোনো রেফা-রেণ্ডামের দরকার নাই। কারণ, পার্লামেণ্টই সার্ব্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। মূলগতভাবে আইনের এই দিকটা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু পার্টিশান ও ভূমি-হস্তান্তরের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জনগণের মতামতের কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতা নাই, এই দাবি সত্য নহে। কারণ, ভারতবর্ষের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া নতুন পাকিস্থানের জন্মদানের জন্য নিঃসন্দেহে ভারতীয় এবং সংশ্লিষ্ট জনগণের মতামত গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। পঞ্জাব, অবিভক্ত বাংলা দেশ ও আসামের জনমত ও আইনসভার সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ গ্রহণের প্রয়োজন হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে সেদিনের কংগ্রেসের পিছনে জনমতের অধিকাংশই পার্টিশানের পক্ষে ছিল বলিয়া ভারত-রাষ্ট্রের অঙ্গচ্ছেদ সম্ভব হইয়াছিল। সুতরাং রেফারেণ্ডামের প্রয়োজন হইয়াছিল বই কি! সংবিধানের আইনগত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও রেফারেণ্ডাম বা গণভোটের প্রয়োজন হইয়া থাকে। উনবিংশ ও বিংশ শতকের ইউরোপে ইহা বার বার ঘটিয়াছে। এখনও ফ্রান্সের আলজিরিয়ার প্রশ্নে রেফারেণ্ডামের প্রস্তাব শুনা যাইতেছে। অথচ ফরাসী-পার্লামেণ্টেরও সার্ব্বভৌম অধিকার আছে। ভারত-বিচ্ছেদের সময় যদি জনমতের অভিব্যক্তির প্রয়োজন হইয়া থাকে, তবে বেরুবাড়ীর অর্দ্ধেক কাটিয়া পাকি-স্থানের হাতে অর্পণ করিবার জন্যই বা জনসমর্থনের প্রয়োজন হইবে না কেন? এ ক্ষেত্রেও ত পশ্চিমবঙ্গের আইনসভা বিরোধিতা করিয়াছে এবং সেই বিরোধিতা পশ্চিমবঙ্গের সরকারীস্তরেও প্রতিফলিত হইয়াছে। সুতরাং সরকারী ও বে-সরকারী জনমত যেখানে ঐক্যবদ্ধ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, সেখানে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে বেরুবাড়ী-হস্তান্তরের নৈতিক যুক্তিটা কোথায়? পার্লা-মেণ্টের আইনগত অধিকার সত্ত্বেও যদি তিনি গণভোট গ্রহণ করিতেন, তবে বেরুবাড়ী সম্পর্কে নৈতিকতা ও গণতন্ত্রের দাবি পরিপূর্ণ ভাবে পালিত হইত। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী সেই দিক দিয়া যান নাই।

কিন্তু নেহরুজী সান্ত্বনা দিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, বেরুবাড়ী-হস্তান্তর ও ছিটমহল-বিনিময়ের ফলে যাঁহারা আবার উদ্বাস্তু হইবেন, তাঁহাদের অতি দ্রুত পুনর্ব্বাসন করা হইবে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গের ৫০ লক্ষ উদ্বাস্তু, আসামের ২৬ হাজার ক্যাম্প-উদ্বাস্তু লইয়া সরকারী কর্ত্তারা যে-খেলা দেখাইতেছেন, তাহাতে বেরুবাড়ী ও ছিটমহলের আরও ১৮ হাজার উদ্বাস্তুর উদ্দেশ্যে সান্ত্বনার এই স্তোকবাক্য নিশ্চয়ই নিষ্ঠুর পরিহাসের মত শুনাইবে।

এই প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হয় —আসামে বাঙালীর বিরুদ্ধে বর্ব্বরতা অনুষ্ঠানের সময় প্রধানমন্ত্রীর এই দৃঢ়তা, এই কঠোরতা এবং এই যুক্তির বহর দেখা যায় নাই কেন? সম্পত্তি ধ্বংস, লুণ্ঠন, গৃহদাহ, হত্যাকাণ্ড, আক্রমণ ও নারীর সতীত্ব-নাশ—এই সমস্ত জঘন্য ও পৈশাচিক অপরাধ করিয়া যে গুণ্ডারা গণতন্ত্র ও সংবিধানকে হত্যা করিল, তখন নেহরুজী ও পন্থজী ত সেই অত্যাচার দমন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য বজ্র-কঠোর সংকল্প লইয়া অগ্রসর হন নাই! সেদিন প্রধান-মন্ত্রীর ও ভারত-রাষ্ট্রের মর্য্যাদা বুঝি বিপন্ন হয় নাই? তবে কি বুঝিতে হইবে সেদিন নিহত হইয়াছে বাঙালী পুরুষ এবং ধর্ষিতা হইয়াছে বাঙালী নারী—এই কারণেই তিনি নীরব ছিলেন?

কিন্তু ইহাও আমরা জানি, ইতিহাসের অমোঘ দণ্ড একদিন তাহাদেরও জবাই করিবে। সুতরাং বেরুবাড়ীর জবাই কেবল গণতন্ত্রের কারসাজি, সংবিধানের ধোঁকা-বাজি এবং নৈতিকতার ডিগবাজিই নহে, ইহা ইহাতেই ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অপদার্থ শাসকবর্গের আত্মপ্রবঞ্চনা ও হীনবীর্য্যতার ফল।

ইঁহারা যে গণতন্ত্রের কথা বলিয়া থাকেন, আসলে তাহা কি বস্তু দেখা যাক্। গণতন্ত্র-সংবিধান যাহা তৈয়ারি হইয়াছে তাহা আমাদের দেশজ নহে। সেখানেও গলদ্ রহিয়াছে। অনুকরণবিলাসী আমরা —সে সংবিধান আমেরিকার ছাঁচে ঢালাই করিয়াছি। কিন্তু যে কঠোরতা তাহাদের ছাঁচে রহিয়াছে, তাহা আমরা সর্ব্বত্র গ্রহণ করি নাই। সেখানে প্রধান ব্যক্তিরা ইচ্ছামত পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়াছেন। দেখা যাক্, উহাদের সংবিধানের প্রধান কথাগুলি কি? সংবিধানের মূলনীতি হইতেছে তিনটি—(১) জনসাধারণের পূর্ণ সার্ব্বভৌম অধিকার, (২) নাগরিকদের সম্পূর্ণ সাম্য, (৩) সরকারী কর্ম্মচারীদের ক্ষমতার অপব্যবহার হইতে জনসাধারণকে রক্ষা। ইহার পর আরও দেখা যায়, শাসকেরা যাহাতে ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে না পারে তার ব্যবস্থা কেন্দ্রে এবং প্রদেশে এইভাবে করা হইয়াছে—(১) আইনসভা দুই কক্ষবিশিষ্ট হইবে, (২) আইনসভা যাহাতে খুসীমত আইন পাস করিতে না পারে তাহার জন্য প্রদেশে গবর্ণর এবং কেন্দ্রে প্রেসিডেণ্টের হাতে ভিটো-ক্ষমতা থাকিবে। কিন্তু দুই-তৃতীয়াংশ মেজরিটিতে আইনসভা প্রেসিডেণ্ট এবং গবর্ণরের ভিটো বাতিল করিতে পারিবে। ইহাতে আইন প্রণয়নের চূড়ান্ত ক্ষমতা আইনসভার হাতেই রহিল, অথচ ফাঁকতালে খুসীমত আইন পাস করাইয়া লওয়ার আশঙ্কার উপর ব্রেক কষিয়া রাখা হইল। শাসন-কর্ত্তৃপক্ষকে কতকগুলি নিয়োগের ক্ষমতা দেওয়া হইল বটে, কিন্তু তাহাদিগকে আইনসভার ছোট কক্ষের অনুমতি লইতে বাধ্য রাখা হইল। (৩) আইনসভা এবং শাসন-কর্ত্তৃপক্ষকে সংবিধানের অধীন করা হইল। খুসীমত সংবিধান-পরিবর্ত্তনের ক্ষমতা তাহাদের হাতে দেওয়া হইল না। আদালতের প্রাধান্য এইভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হইল। আইন বা শাসকের আদেশ সংবিধানবিরোধী হইতেছে মনে হইলে আদালত তাহা বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবেন এবং আইন ও শাসন-কর্ত্তৃপক্ষ উভয়কেই তাহা মানিতে হইবে। (৪) জনসাধারণের সার্ব্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের একটি প্রধান উপায় ঘন ঘন নির্ব্বাচন। প্রেসিডেণ্টের কার্য্যকাল চার বৎসর কিন্তু পার্লামেণ্টের দুই বৎসর। (৫) আইন, শাসন ও বিচার-বিভাগ একে অপরের উপর ব্রেক হিসাবে কাজ করিতেছে—ইহাকেই বলা হয়, আমেরিকান গণতন্ত্রের Check and balance পদ্ধতি।

আমাদের এই পদ্ধতি নাই। নাই বলিয়াই, আমাদের দেশে গণতন্ত্রের মুখোসে অতিশয় নিকৃষ্ট ধরনের ডিক্টেটরী চলে। যাহার ফলে দেশের লোক অসহায় হইয়া পড়িতেছে। আমেরিকান সংবিধানে জনসাধারণের সার্ব্ব-ভৌম অধিকারের মূলনীতি কার্য্যে প্রয়োগ করা হইয়াছে। যাহা আমাদের দেশে আজও সম্ভব হইল না। কথা হইল, সন্ধি ও চুক্তি সম্পাদন ব্যাপারে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার যেমন নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী, অন্য কোনও গণতন্ত্রী রাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্ট তেমন সর্ব্বময় ক্ষমতা ভোগ করেন না। ব্রিটেনে সন্ধি ও চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা গবর্ণমেণ্টের, কিন্তু আর্থিক দায়যুক্ত চুক্তি কিংবা রাষ্ট্রের সীমানাভুক্ত কোনও অঞ্চল হস্তান্তরসংক্রান্ত সন্ধি পার্লামেণ্টের অনুমোদন ছাড়া কখনও কার্য্যকর হইতে পারে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান এ বিষয়ে আরও কঠোর। সেনেটের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের অনু-মোদন ছাড়া মার্কিন প্রেসিডেণ্ট বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত

কোনোরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে পারেন না। ভারতীয় সংবিধানে এ-বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারই সর্ব্বেসর্ব্বা। কেন্দ্রীয় সরকার সম্পাদিত চুক্তি পার্লামেণ্টের অনুমোদনের ধার ধারে না—প্রথমতঃ ইহাই অগণতান্ত্রিক। ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এভাবে সংসদকে ডিঙ্গাইয়া চুক্তি কার্য্যকর হয় না।

ভারতীয় ইউনিয়নের অখণ্ডতাকে যদি এভাবে খণ্ডিত ও ক্ষুণ্ণ করা যায়, তাহা হইলে 'সার্ব্বভৌমত্বে'র সংজ্ঞা ও মর্য্যাদা কি তাহা আমরা বুঝিতেছি না। যে গবর্ণমেণ্ট পাক-অধিকৃত কাশ্মীর উদ্ধার করিতে অক্ষম, যাঁরা গোয়ার মুক্তিবিধান করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন, যাঁরা পাকিস্থানকে খুসী করিবার জন্য ভারতীয় নদীপথের বারো আনা জল এবং সেই সঙ্গে ৮৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা আয়ুবশাহীকে উপহার দিতে বাধ্য হইয়াছেন, যাঁহাদের রাজত্বে লক্ষ লক্ষ নারী সর্ব্বস্বান্ত ও উদ্বাস্তু, যাঁদের শাসনদণ্ড দেশবাসীকে এক রাজ্য হইতে অন্য রাজ্যে খেদাইয়া মনুষ্যত্বের চরম লাঞ্ছনা ডাকিয়া আনে, তাঁরাই আবার পশ্চিম বাংলার একটি অংশ বন্ধু পাকিস্তানকে উপঢৌকন দিতেছেন! দেশের মাটি যাহারা পররাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া দেয়, অভিধানে ইহাদিগকেই দেশদ্রোহী বলিয়া থাকে—কেন্দ্র ইহার যে অর্থই করিয়া থাকুক।

সংবিধান শুধু দেশের শাসন-ব্যবস্থার রূপরেখা নয়, সংবিধান রাষ্ট্রীয় চেতনার দর্পণ। জাতির রাজনৈতিক মানসের প্রতিবিম্ব তাহাতে ফুটিয়া উঠে। সংবিধান তাই কখনও একটা বিধি বা আইনমাত্র বলিয়া গণ্য হয় না।

ভারতীয় সংবিধান রূপায়ণের দিক হইতে মার্কিন সংবিধানের সগোত্র হইলেও, আমেরিকায় সংশোধন ব্যবস্থার যে জটিলতা ও দুরূহতা আছে তাহা এ দেশের শাসনতন্ত্রে স্থান পায় নাই। সাধারণ আইন ও সংবিধানের বিধির মধ্যে একটা প্রভেদ অবশ্য আছে, কিন্তু সেটা নিতান্তই নিয়ম রক্ষামাত্র। সে অনুশাসনের গণ্ডি পার হওয়া পার্লামেণ্টে সংখ্যাগরিষ্ঠদলের পক্ষে যে অত্যন্ত সহজ তাহার প্রমাণ ত বেরুবাড়ী বলিদানের প্রস্তুতি পর্ব্বে দেখা গিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের ভূখণ্ড পাকিস্থানকে খয়রাত করা হইবে অথচ পশ্চিমবঙ্গের মতামত পর্য্যন্ত জানা হইবে না,ইহাই বর্ত্তমান সংবিধানের বিচিত্র বিধান। এদেশে সংবিধান সংশোধনের একচেটিয়া অধিকার পার্লামেণ্টের—কেবল কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট বিষয় ছাড়া। তখন অবশ্য ব্যাপারটা রাজ্যগুলির কাছে পাঠান হইবে তাহাদের মত প্রকাশ করিবার জন্য, আর সেক্ষেত্রে অন্ততঃ অর্দ্ধেক রাজ্য প্রস্তাবিত সংশোধনের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করিলে তবেই তাহা গৃহীত হইয়া সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

সংবিধানের এই বিধির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন পশ্চিমবঙ্গ আইনজীবী সম্মেলনের সভাপতি শ্রীপ্রমথনাথ মিত্র। যে সংবিধান দেশের চল্লিশ কোটি লোকের স্বার্থ ও স্বাধীনতার রক্ষাকবচ তাহার ঘন ঘন পরিবর্ত্তন কখনই কল্যাণকর হইতে পারে না। তাহাতে সংবিধানের মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হয় ও শেষ পর্য্যন্ত তাহার ধারাগুলি দলীয় রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত্তে ঘুরপাক খাইতে থাকে। ইহাতে সংবিধানের বাঁধন ক্রমশঃ শিথিল হইয়া পড়ে। আর তাহাই হইতেছে ভারতবর্ষে। এদেশের শাসনতন্ত্র রচিত হইয়াছে দশ বৎসর পূর্ব্বে, অথচ ইহারই মধ্যে এবার লইয়া নয় বার সংবিধানের সংশোধন হইয়াছে। তাহার কারণ রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতির দ্বন্দ্ব। যখনই রাজনৈতিক নেতারা ঠেকিয়াছেন তখনই তাঁহারা সংবিধানের সংশোধন করিয়া আপনাদের জিদ বজায় রাখিয়াছেন। সংবিধানের প্রাধান্য মানিয়া লইয়া নিজেদের পথ বদলান নাই।

সংবিধানের গুরুত্ব ইহাতে যেমন লোকচক্ষে হ্রাস পাইয়াছে তেমনই সুপ্রীম কোর্টের মর্য্যাদাও সরকারের অবিমৃষ্যকারিতার ফলে ধূলায় লুটাইতেছে। যে কাজটাই সুপ্রীম কোর্ট সংবিধান-বিরোধী হেতু অসঙ্গত বলিয়াছেন, সে কাজটাই কেন্দ্রীয় সরকার জোর করিয়া করিয়াছেন—তবে ইতিমধ্যে সংবিধান-সংশোধন কাজটা ভোটের জোরে সারিয়া লইয়াছেন। অর্থাৎ সংবিধান অনুসরণ করিয়া চলিবার কোন প্রয়োজন শ্রীনেহরুর নাই। তিনি যাহা খুসী তাহাই করিবেন, তাহা সুপ্রীম কোর্ট অনুমোদন করুক আর নাই করুক—সংবিধানসম্মত হউক আর নাই হউক।

পশ্চিমবঙ্গীয় আইনজীবী সম্মেলনের সভাপতির মতে আজ সংবিধানের মর্য্যাদা ও তাহার সঙ্গে নাগরিকদের মৌল অধিকার রক্ষা করিতে গেলে সংবিধানের এই অবমাননা রোধ করিতে হইবে। তাহার জন্য সংবিধান সংশোধনের যে সুগম ও সহজ উপায় আছে তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া সংশোধন-প্রণালী কঠিন ও কষ্টসাধ্য করিতে হইবে। সংবিধানের ৩৬৮ ধারার সংশোধন সাধন করিতে হইবে যদি তাহার গৌরব ফিরাইয়া আনিতে হয়। কেমন করিয়া তাহা করিতে হইবে তাহার নজির রহিয়াছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে। অন্ততঃ এটুকু ব্যবস্থা হওয়া উচিত যে প্রত্যেকটি সংশোধনী প্রস্তাব বিবেচনা করিবার অধিকার প্রত্যেকটি রাজ্য যেন পায়।

শঙ্কর-দর্শনে "সমন্বয়বাদ"

ডঃ অণিমা সেনগুপ্তা

প্রায় এক হাজার একশ সত্তর বৎসর পূর্ব্বে দক্ষিণ ভারতের কালাডি নামক স্থানে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন এক লোকোত্তর মহাপুরুষ—যাঁর পদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করে কেবল তাঁর জন্মভূমিই ধন্য হয় নাই, ধন্য হয়েছে সমস্ত ভারতবর্ষ। জ্ঞান ও ভক্তিরসসিক্ত ভারতভূমিতে অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব অবশ্য অচিন্ত্য বা বিস্ময়কর ঘটনা নয়। বৈদিক ঋষিগণের যুগ থেকে আরম্ভ করে বর্ত্তমান শতাব্দী পর্য্যন্ত বহু যুগাবতার বার বার এই দেশের মাটিতে আবির্ভূত হয়ে বিশ্বমানবকে শুনিয়ে গিয়েছেন মুক্তির বার্ত্তা, দেখিয়ে গিয়েছেন জ্যোতির্ম্ময় আলোকের পথ এবং পরবর্ত্তী মনুষ্যসমাজের জন্য সঞ্চিত করে রেখে গিয়েছেন দিব্য ও জ্ঞানগর্ভ আশার বাণী।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেছিলেন ৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং তিনি দেহরক্ষা করেছিলেন ৮২০ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর বত্রিশ বর্ষব্যাপী জীবন সীমাহীন কালস্রোতের তুলনায় অতি অপরিসর ও সঙ্কীর্ণ বলে মনে হলেও জ্ঞানসম্পদ, ভক্তিনিষ্ঠা ও আধ্যাত্মিক প্রতিভার গতিশীলতায় তা আজও অতুলনীয় ও চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। তিনি যে যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে যুগে ভারতের ধর্ম্মাকাশ ছিল দ্বন্দ্ব ও কলহের ধূলিজালে আচ্ছন্ন ও মলিন। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সবল প্রভাব সেই সময় অনেকখানি ম্রিয়মান হলেও সম্পূর্ণ দুর্ব্বল হয় নাই।

দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দ হতে আরম্ভ করে নবম খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্ম এক সক্রিয় ধর্ম্মরূপেই এ দেশে বিদ্যমান ছিল। সেজন্য এ সময়ে বৌদ্ধ-দর্শন ও ধর্ম্মকে আমরা পেয়ে থাকি সকল বৈদিক-দর্শনের এক প্রবল পূর্ব্বপক্ষরূপে।

বৌদ্ধধর্ম্মের সর্ব্বোত্তম বিকাশ হয়েছিল মাধ্যমিক শূন্যবাদ ও যোগাচার বিজ্ঞানবাদের ভিতর দিয়ে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে অবশ্য মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ যোগাচার বিজ্ঞানবাদের পূর্ব্ববর্ত্তীরূপেই স্বীকৃত হয়েছে; কিন্তু দার্শনিক চিন্তাধারার ক্রমিক বিকাশের দিক থেকে বিচার করলে 'সর্ব্বশূন্যত্ব' 'বিজ্ঞপ্তিমাত্র সত্যত্বে'র পরবর্ত্তী প্রকাশ বলেই প্রতিভাত হয়।

যোগাচার বিজ্ঞানবাদের মত অনুসারে জগতের সমস্ত বস্তুই জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। জগতের বাহ্যত্ব বাস্তবিক নয়, কাল্পনিক এবং বাহ্যজগৎ সৎ বা অস্তিত্বশীল নয়, পরন্তু অসৎ, অবাস্তবিক ও সম্পূর্ণ সত্তাহীন। ব্যক্তিমানসের ধারণাই বাহ্যবস্তুরূপে কল্পিত হয়ে থাকে। জ্ঞাননিরপেক্ষ বস্তুসত্তার অস্তিত্ব তাঁরা মানেন নাই। যখন আমরা নীল রং দেখি, তখন নীল রং ও তার ধারণাটিকে এক সঙ্গেই উপলব্ধি করে থাকি। (সহোপলম্ভ নিয়মাৎ অভেদঃ নীলতদ্ধিয়ঃ) বস্তু ও তার ধারণার মধ্যে লেশমাত্র পার্থক্য নাই, আছে অভেদ ও তাদাত্ম্য। বিজ্ঞানই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় রূপে দ্বিধা বিভক্ত হয়। জ্ঞেয় বস্তুর কোনো স্বতন্ত্র সত্তা বা অস্তিত্ব নাই। বিশ্বকে যে রূপে দেখি, যে ভাবে অনুভব করি, তার যে বর্ণবৈচিত্র্যে আকৃষ্ট হয়ে তাকে আমরা ভালবেসে থাকি—সে সকলই বিজ্ঞানসৃষ্ট। বাস্তবিক-পক্ষে এই বৈচিত্র্যপূর্ণ জগতের কোনো স্থায়ী মূল্য বা সত্তা নাই। এ সংসার আমাদের অন্তরে অবস্থিত, বাইরে নয়, এবং এর বাস্তবিক রূপ জ্ঞানময়, চৈতন্যময়। একমাত্র বিজ্ঞান বা চৈতন্যই সত্যবস্তু আর সমস্তই অসৎ বা অস্তিত্ব-হীন। মরুমরীচিকায় জল না থাকলেও যেমন জল দর্শন হয়, তেমনি বিজ্ঞানসৃষ্ট জগতের বাহ্যত্ব না থাকলেও ভ্রম-বশে বাহ্যজগৎ বলে গ্রাহ্য হয়ে থাকে। বৃক্ষ, লতা, নদী, পর্ব্বত ইত্যাদি যা কিছু প্রাকৃতিক বস্তু আমরা সাধারণতঃ দর্শন করি—সে সকলই আমাদের মানসিক ধারণা। ভ্রম-বশে তাদের আমরা বাইরের বস্তু বলে গ্রহণ করি। বস্তুকে যখন আমরা জানি, তখন তা জ্ঞাত বস্তুরূপেই আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়। জ্ঞাত না হয়ে যখন কোনো বস্তুই সত্তাবান বলে প্রকাশিত হয় না, তখন আমাদের মেনে নিতেই হবে যে, জ্ঞান ও বস্তু অভিন্ন। জ্ঞানে যে আকার প্রকাশ পায়, তা বস্তুকৃত নয়, জ্ঞানকৃত। পূর্ব্ব জ্ঞান উত্তর জ্ঞানের আকারের কারণ হয়ে থাকে। অন্তরের বিজ্ঞানধারাই বাসনা-উৎপাদন দ্বারা কার্য্য-কারণ ভাব, জ্ঞান-জ্ঞেয় ভাব, অথবা বস্তু ও বস্তু গ্রাহক চৈতন্য ভাব প্রাপ্ত হয়ে ব্যবহারিক জগতের সকল কার্য্য সম্পন্ন করছে। নীলজ্ঞানও বিজ্ঞান, নীলবস্তুও বিজ্ঞান। বিজ্ঞান ভিন্ন পৃথক বিজ্ঞেয় এদের মতে স্বীকৃত হয় না।

মাধ্যমিকগণ বিজ্ঞানবাদ অপেক্ষাও জগৎ সম্বন্ধে অধিক অসৎবাদী ছিলেন। তাঁদের মতে বিজ্ঞানও সত্যবস্তু বলে গণ্য হতে পারে না। ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক—উভয় প্রকার জগৎকেই তাঁরা বর্ণনা করেছিলেন শূন্যরূপে। তাঁদের বীজমন্ত্র ছিল "সর্ব্বং শূন্যং।" সে যুগে বৈদিক

দার্শনিকগণ শূন্য শব্দের অর্থ করতেন অসৎ এবং সেজন্য মাধ্যমিক বৌদ্ধগণও জগদসৎবাদীরূপেই আখ্যাত হতেন।

বস্তুবাদী দর্শন থেকে সম্পূর্ণ বিরোধী দৃষ্টি নিয়েই মাধ্যমিকগণ সে যুগে বিশ্বকে নিরীক্ষণ করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের চক্ষে ভৌতিক বস্তু, জ্ঞান, এমনকি আত্মাও পরিবর্ত্তনশীল, সাপেক্ষ ও নিঃসত্তারূপে প্রতিভাত হয়েছিল। ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক সমান সত্তাহীন, সমান অবাস্তবিক ও সমান নাস্ত্যর্থবাচক। জ্ঞানকে ভৌতিক পদার্থ থেকে পৃথক করে অস্তিত্বশীল মানার কোনোই সঙ্গত কারণ নাই। ভৌতিক পদার্থের মতো আধ্যাত্মিকেরও উদ্ভব হেতু প্রত্যয় দ্বারাই হয়ে থাকে এবং এই কারণে উভয়ক্ষেত্রেই অস্তি শব্দের প্রয়োগ সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। হেতু দ্বারা যার উদ্ভব হয় এবং প্রত্যয় দ্বারা যার স্থিতি ও প্রত্যয়ের অভাবে যার বিনাশ, তার স্বতন্ত্র সত্তা বা অস্তিত্ব স্বীকার করা কখনই সম্ভবপর নয়। স্বপ্নজগৎ ও মায়াজগতের মতোই বিবিধ সামগ্রী দ্বারা সজ্জিত, দৈনন্দিন জীবনে অনভূত আমাদের এই জগৎ নিঃসত্তা, কল্পনাপ্রসূত, অর্থহীন ও শূন্য।

অবৈদিক অসৎবাদী বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে সেই যুগে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ছিল বস্তুবাদী সাংখ্যযোগ এবং ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন। গৌতমের "ন্যায়-সূত্র" নামক গ্রন্থে "শূন্যবাদ নিরাস" শীর্ষক একটি দীর্ঘ অধ্যায়ই রচিত হয়েছে। বস্তুবাদী দার্শনিকের পক্ষে বস্তুজগৎ অস্তিত্বহীন—এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা একেবারেই অসম্ভব। সেজন্য সাংখ্যযোগ ও ন্যায়-বৈশেষিকাচার্য্যগণ অসৎবাদী জগদ্দর্শনকে খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন অতি নির্ভীক ও স্পষ্ট যুক্তির ছুরিকাঘাতে।

বিজ্ঞানবাদের ভ্রান্ততা প্রদর্শন করার মানসে বাহ্য-সৎবাদী যোগসূত্রকার বলেছেন "বস্তুসাম্যে চিত্তভেদাৎ তয়োঃ বিভক্ত পন্থাঃ"। অর্থাৎ কিনা বস্তু এক হলেও যখন তার ধারণা বিভিন্ন ব্যক্তিমনে বিভিন্নরূপে উদিত হয়, তখন এদের পরস্পর অত্যন্ত বিভিন্ন বলে গ্রহণ করাই আমাদের কর্ত্তব্য। জ্ঞান যখন বস্তু অবলম্বন না করে উৎপন্ন হয় না, বিজ্ঞেয় না হলে যখন বিজ্ঞানের অস্তিত্ব অসম্ভব হয়ে পড়ে, তখন আমরা কেমন করে বলতে পারি, বাহ্যবস্তু নাই, বাহ্যজগৎ অসৎ এবং বিজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই সত্য নয়? বিজ্ঞেয় বাহ্যবস্তু অবশ্যই স্বতন্ত্র, অস্তিত্বশীল ও জ্ঞান হতে ভিন্ন।

বস্তুবাদী ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন ও প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে যে, এই বিজ্ঞেয় বস্তুজগৎ সৎ এবং অস্তিত্বশীল। প্রতি মুহূর্ত্তে বহির্বিশ্বের বস্তুধারা আমাদের বুদ্ধি ও চৈতন্য তীব্রভাবে প্রভাবান্বিত হচ্ছে। সকল দেশে ও সকল কালে বাহ্যবস্তু বিভিন্ন মানবের বিচিত্র চিন্তাধারার বিষয় হচ্ছে। শশশৃঙ্গের মতো অলীক বা কল্পিত বস্তু কখনও আমাদের অনুভব বা বুদ্ধিবিচারের বিষয় হয় না। এক বস্তু যখন বিভিন্ন মানুষের মনে বিচিত্র প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন করতে সক্ষম হয়, তখন বস্তু অবশ্যই জ্ঞান হতে ভিন্ন এবং জ্ঞাননিরপেক্ষ। অপর পক্ষে যখনই কোন বস্তুর জ্ঞান আমাদের হয়, তখনই আমাদের অতি স্পষ্টভাবে অনুভব হয় যে, বস্তু জ্ঞান হতে ভিন্ন। বস্তু যদি অসৎ হয় তবে জ্ঞানও অস্তিত্বহীন হবে, কারণ বস্তুবিহীন জ্ঞান কখনও সম্ভবপর হয় না।

জগৎ সম্বন্ধে এই দুই পরস্পরবিরোধী মতবাদ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের জন্ম সময়ে ভারতের উর্ব্বর-ভূমিতে সমান ভাবেই পরিপুষ্ট হচ্ছিল। ফলে দর্শনের ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছিল তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা, মানসিক বিহ্বলতা এবং বাদ-প্রতিবাদের তুমুল আন্দোলন। এমন এক সঙ্কটের মুহূর্ত্তে ভগবৎ প্রেরিত দেবদূতের মতোই শ্রীশঙ্করাচার্য্য ভারত-ভূমিতে অবতীর্ণ হয়ে ভারতবাসীকে শুনালেন সমন্বয়ের পবিত্র মন্ত্র—যার প্রভাবে দর্শন ও ধর্ম্মক্ষেত্রে জেগে উঠল শান্তশ্রী, পবিত্র মাধুরী ও অদ্বৈতবাদের উদার প্রসন্নতা।

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের জগৎ মিথ্যাত্ববাদকে আমি জগৎ সৎবাদ ও অসৎবাদের সমন্বয় বলেই মনে করি। যুক্তি ও অগাধ পাণ্ডিত্যের সাহায্যে এই অলোকসামান্য মহাপুরুষ প্রমাণ করে গেলেন যে, জগৎ সৎও নয়, অসৎও নয়। সদসৎ বিলক্ষণ জগৎকে তিনি বর্ণনা করলেন মিথ্যা রূপে। পরিদৃশ্যমান জগৎ সম্পূর্ণ সৎ এবং সম্পূর্ণ অসতের মধ্যবর্ত্তী এক অনির্ব্বচনীয় প্রকাশ। কেবল সৎ শব্দ কিম্বা কেবল অসৎ শব্দ দ্বারা জগতের প্রকৃতি বর্ণিত হতে পারে না এবং অসৎ শব্দকে যদি ইন্দ্রজাল বা আকাশকুসুমের মতো অলীক অর্থে ব্যবহার করি, তবে জগৎকে কখনও অসৎ আখ্যা দিতে পারা যায় না। জগৎকে যখন অসৎ বলা হয়, তখন অসৎ শব্দের ব্যবহার হয়ে থাকে বাধিত (Contradicted) অর্থে, অলীক অর্থে নয়। সৎবাদী ও অসৎবাদীর জগৎ বর্ণনা অন্ধ ব্যক্তিদের হস্তীবর্ণনার মতোই অসম্পূর্ণ ও ভ্রমাত্মক। জগৎ ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সত্য এবং পারমার্থিক দৃষ্টিতে বাধিত হয় বলেই অসত্য। এমন কি স্বপ্ন জগৎ অপেক্ষাও জাগ্রত অবস্থায় অনুভূত এই পরিদৃশ্যমান জগৎ অধিক সত্য। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের দৈনন্দিন অনুভূতির বিষয় আকাশাদি প্রপঞ্চ যথাবস্থিত রূপে থাকে। স্বপ্নজগৎ কিন্তু প্রতিদিনই বাধিত হয়। (প্রাকৃ

চ ব্রহ্মাত্মদর্শনাৎ বিয়দাদি প্রপঞ্চো ব্যবস্থিতরূপো ভবতি, সন্ধ্যাশ্রয়স্তু প্রপঞ্চঃ প্রতিদিনং বাধ্যতে ইতি বৈশেষিকমিদং সন্ধ্যস্ত মায়ামাত্রত্বমুদিতম্) স্বপ্ন জাগ্রৎ বাসনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয় ; সেইজন্য স্বপ্নকে জাগ্রত্তুল্য বলা হয়েছে।

উপনিষদে বলা হয়েছে যে জগতের অধিষ্ঠান সৎস্বরূপ ব্রহ্ম। ব্রহ্ম হতে জগতের উৎপত্তি এবং ব্রহ্মেই জগৎ লীন হয়। আমরা তবে কেমন করে স্বীকার করি যে, পরম সদধিষ্ঠানের উপর আশ্রিত আমাদের এই অনুভূতির জগৎ আকাশকুসুমের মতোই অলীক? শ্বেত উপনিষদে বলা হয়েছে—

মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্ মায়িনং তু মহেশ্বরম্
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ।

এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্য্য বলেছেন যে, মায়াবশাৎ ব্রহ্মই ভূ, বায়ু, শরীর, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি অবয়বযুক্ত পরিদৃশ্যমান জগৎরূপে প্রকাশিত হচ্ছেন। জগৎ যদি ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নয়, তবে সংসার সম্পূর্ণ অসৎ, এমন সিদ্ধান্তকে আমরা অনায়াসেই অপসিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু জগৎ অনুভূতির বিষয়রূপে এবং ব্রহ্মের প্রকাশরূপে সৎ হলেও পারমার্থিক দৃষ্টিতে সৎ বা অস্তিত্বশীল নয়। অখণ্ড, অপরিবর্ত্তনশীল ব্রহ্মের জগদাকারে প্রকাশ অবিদ্যা বা অধ্যাসমূলক, যাকে আমরা সাধারণ ভাষায় ভ্রম বলে বর্ণনা করে থাকি। এক পদার্থের অন্য পদার্থরূপে কিংবা তার মধ্যে যে গুণ বা ধর্ম্ম নাই, সে গুণ বা ধর্ম্মের কল্পনা করাকেই বলা হয় অধ্যাস। এক চৈতন্যস্বরূপ, অপরিণামী-পরমসত্তায় যখন আমরা জড়ত্ব, বহুত্ব, খণ্ডত্ব এবং আমিত্ব দর্শন করি, তখনই আমাদের ভ্রম বা অবিদ্যার বশীভূত হতে হয় এবং এ ভাবেই অদ্বৈতব্রহ্ম আমাদের সম্মুখে বিবিধাকারে প্রকাশিত হয়। আমরা সংসারে যত কিছু কাজ করি—ইহলৌকিক বা পারলৌকিক—সমস্তের মূলে রয়েছে অধ্যাস বা অবিদ্যা। অতএব বিশ্বের যে পরিণামী, চঞ্চল ও বৈচিত্র্যময় রূপ আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে ভেসে ওঠে, তা ব্যবহারিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় ও অস্তিত্বশীল বলে গণ্য হলেও পারমার্থিক ক্ষেত্রে বাধিত ও নাস্ত্যর্থবাচক। জগৎ কেবল সৎও নয়, কেবল অসৎও নয়, উভয় প্রকারও নয়। জগৎ মিথ্যা বা অনির্ব্বচনীয়। সর্ব্ব কালে ও সর্ব্ব অবস্থায় জগতের অনুভব হয় না বলে "বাধিত" অর্থে জগতকে অসৎ বলা যায়। অবিদ্যার পাশমুক্ত ব্রহ্মবিদ্ পুরুষ জগদাকার সত্যরূপে দর্শন করেন না। তিনি অনুভূতিতে প্রাপ্ত হন একমাত্র সৎ, অদ্বিতীয়, অখণ্ড পরমব্রহ্মকে। জগৎ সৎ, কারণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞানের আলোয় জীবের অজ্ঞান দূরীভূত না হয়, ততক্ষণ প্রতি পলে, প্রতি দণ্ডে তার জগতের অনুভূতি হয়। এইজন্য ব্রহ্মসূত্রে বলা হয়েছে "না ভাব উপলব্ধেঃ"। উপলব্ধির বিষয়ভূত জগত কখনও আকাশকুসুমের মতো অলীক নয়। সাংসারিক জীবনে, লোকব্যবহার, লোকযাত্রা ও লোকস্থিতি, জগতের অস্তিত্ব মেনে না নিলে, কোনো মতেই চলতে পারে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জগদাকার কোনো পুরুষের অনুভবের বিষয় হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এর অপেক্ষা অধিক সত্য, অন্য কোনো বস্তু উপলব্ধি করা তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ে।

জগতের ব্যবহারিক সত্যত্ব ও সাংসারিক জীবনে তার মূল্য শ্রীশঙ্করাচার্য্য বার বার উল্লেখ করে গিয়েছেন। সাধারণ জীবনে জগতের মূল্য প্রত্যেক মানুষকেই স্বীকার করে নিতে হবে। ভোজনকালে ভোজ্যবস্তুর অস্তিত্ব ও ভুক্তবস্তুর স্বাদ, গন্ধ যেমন আমরা অস্বীকার করতে পারি না, তেমনি নিরন্তর অনুভূত এই জগতের ব্যবহারিক অস্তিত্ব ও সাংসারিক জীবনে অস্বীকার করা আমাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। অতএব জগৎ সৎবাদী ও জগদসৎবাদীর কলহ সম্পূর্ণই ভিত্তিহীন এবং অপ্রয়োজনীয়। সংসার সম্পূর্ণ সত্য নয়, সম্পূর্ণ অসত্যও নয়, পরন্তু মিথ্যা বা অনির্ব্বচনীয়।

দর্শনের ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন করে শ্রীশঙ্করাচার্য্য ধর্ম্মক্ষেত্রেও সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর জীবিতকালে দক্ষিণ ভারতে শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমাগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও রেষারেষি চলত।

আপন অদ্বৈত দর্শনের আলো জ্বেলে শঙ্করাচার্য্য স্পষ্ট ভাবে প্রমাণ করলেন যে, ধর্ম্মের ক্ষেত্রেও সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে মহামিলন ঘটানো যেতে পারে। এক অদ্বিতীয়পরমব্রহ্ম উপাধি ভেদে শিব, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, সরস্বতী ইত্যাদি রূপে প্রকাশিত হচ্ছেন। অতএব ব্রহ্মের যে কোনো অবতারের পূজা সেই পরম সত্তারই পূজা বা আরাধনা। এই দৃষ্টি নিয়ে যদি আমরা ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হই, তবে সম্প্রদায়গত কলহ একেবারেই অর্থহীন ও অনাবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়।

বাস্তবিক পক্ষে অদ্বৈতবাদী দর্শন সর্ব্বক্ষেত্রে সমন্বয় সাধনেরই সহায়ক হয়। এক অখণ্ড ঐক্যের মধ্যে নানাত্বের পরিসমাপ্তি স্বীকার করে নিলে কোনো ভেদভাব, বৈষম্য তজ্জনিত কলহ বা বাদ-প্রতিবাদের কোনোরূপ প্রয়োজনই আর থাকে না। অদ্বৈতবাদের মন্ত্র সমন্বয়ের মন্ত্র এবং শ্রীশঙ্করাচার্য্য অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই মন্ত্র উচ্চারণ করে বৈদিক ও বৌদ্ধ (অবৈদিক) দর্শনের মধ্যে সমন্বয় সাধনেরই চেষ্টা করেছিলেন।

সমাবর্ত্তন

শ্রীঅমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

শীতের অপরাহ্ন। পরন্ত বেলার সোনালী রোদ ম্লান হ'য়ে এসেছে। প্রকটতা আছে, কিন্তু তাপ নেই। কেমন যেন নিষ্প্রভ। ঠিক মরা কাকের চোখের চাউনির মতো। সারাদিনের উত্তাপেও জড়তা কাটে নি। দিনের শেষে অপরাহ্নের বাতাসে বিষাদের সুর।—কেমন যেন ঝিম্‌ঝিমে, অলস,—মন্থর। শীতের দিনগুলো বড় ছোট।

ভবতোষবাবু অফিস থেকে ফিরে এলেন। রোজই ফেরেন এই সময়ে, কিন্তু আজ ফেরার বিশেষত্ব আছে। কাল থেকে আর ফিরবেন না অফিস থেকে ক্লান্ত দেহের বোঝা ব'য়ে। ছুটি,—একদম ছুটি হয়ে গেলো তাঁর। দীর্ঘদিন এক নিয়মে চলার পর আজ অবসান হোলো তার কর্ম্ম-জীবনের। শুভানুধ্যায়ী সহকর্মীরা আজ তাঁকে বিদায় অভিনন্দন দিলো। গালভরা বক্তৃতায় জানালো তাদের মনের আবেগ। সরকারের পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। এতদিন তাঁর ছিলো কত কাজ, কত দায়িত্ব! সমস্ত staff চেয়ে থাকতো এই অচঞ্চল অনলস লোকটির দিকে। আজ থেকে সব ফুরোল, ঘরে ব'সে যে টাকা তিনি পাবেন—তা' খুব কম নয়। কিন্তু ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলার প্রয়োজন তাঁর আর নেই।

রোজকার মতো আজ আর ভিতরে ঢুকলেন না ভবতোষবাবু, বাইরের ঘরেই বসলেন। সমস্ত বাড়ীটা নিস্তব্ধ। ভবতোষবাবুর সংসার বলতে অবশ্য স্ত্রী মনোরমা ও চাকর দু'জন—রঘুনাথ আর কপিল। একমাত্র মেয়ে সুলতার অনেক দিন বিয়ে হয়ে গেছে। কোলকাতাতেই শ্বশুরবাড়ী—টালিগঞ্জে। জমাট সংসার পেতে বসেছে সে। মাঝে মাঝে আসে। কয়েকদিন কাটিয়ে যায়—কাজেই বাড়ীতে হৈ চৈ থাকবে কি ক'রে। নিজের মনেই হাসলেন ভবতোষবাবু। কবেই বা হৈ চৈ থাকে? তবু আজ যেন বড্ড বেশী ফাঁকা ঠেকছে। এ বোধ হয় নিজের মনেরই শূন্যতা।

"এ কি এখানে ব'সে আছ যে? এলেই বা কখন?—আচ্ছা মানুষ তো!" মনোরমার কণ্ঠে একরাশ উৎকণ্ঠা আর বিরক্তি ফুটে ওঠে।

ম্লান হাসলেন ভবতোষবাবু। বললেন, "বেশ লাগছে এখানে বসতে। তাছাড়া বাঁধা নিয়মের জীবনটাই যখন শেষ হয়ে গেলো তখন এই সামান্য নিয়মটুকুই বা থাকে কেন?"

অফিস থেকে এসে আগে এক কাপ কফি খাওয়ার অভ্যাস ভবতোষবাবুর বরাবর। তার পর অন্য যা হোক কিছু—সেই নিয়মের কথাই বলছিলেন।

"থাক, আর আদিখ্যেতায় দরকার নেই। রিটায়ার আর কেউ করে না। তুমি একাই করেছো। এখন এসো, যা খাবে খেয়ে আমাকে উদ্ধার করো"—

মনোরমার কথাই এমনি হুল ফোটানো। এর জন্যে এখন আর কিছু মনে করেন না ভবতোষবাবু। আগে অবশ্য খুব অসহ্য লাগতো। কথার পিঠে দু'একটা কথা ব'লেও ফেলতেন। তার পরই সুরু হতো কুরুক্ষেত্র। দিন কয়েক চলতো স্বামী-স্ত্রীর অসহযোগ। পরে অবশ্য মিটে যেতো। কিন্তু প্রাথমিক পর্ব্ব এতো তীব্র আকার ধারণ করতো যে, তার জের সামলাতে বেশ ভুগতে হতো। তাই এখন আর প্রতিবাদ করেন না ভবতোষবাবু স্ত্রীর কথায়।—বললেন, "হ্যাঁ চলো। রঘু, কপিল ওরা কোথায়?"—সহজ হবার চেষ্টা করেন ভবতোষবাবু।

—"ওদের একটু কাজে পাঠিয়েছি। তুমি এসো তাড়াতাড়ি। আমি একটু বেরোবো। দাদার ওখানে যেতে হবে একবার।"

মনোরমার পিছু পিছু ভবতোষবাবু ভিতরে ঢুকলেন। কাপড় ছাড়তে হবে, হাত-মুখ ধুতে হবে—এসব দিকে মনোরমার অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। পান থেকে চুণ খসবার জো নেই।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গতে একটু বেলাই হোলো ভবতোষবাবুর। হাত-মুখ ধুয়ে এসে বসলেন। কপিল চা দিয়ে গেলো। চা-এর কাপটা হাতে নিয়ে ঘড়ির দিকে তাকাতেই চমকে উঠলেন—এ কি! ন'টা বাজে! পরক্ষণেই ওঁর মনে পড়লো, আজ আর অফিস নেই। এক্ষুনি তেল-গামছা নিয়ে ছুটতে হবে না। স্বস্তি পেলেন। যাক, চা-টা বেশ আরাম ক'রেই খাওয়া যাবে আজ। কিন্তু কোথায় যেন একটা অদৃশ্য কাঁটা খচ-খচ করতে লাগলো। হঠাৎ খেয়াল হোলো, ঘরে যেন বেশ ঝুল জমেছে। চাকরগুলো কি? এ সব লক্ষ্য করে না?

রঘুকে ডাকতে গিয়েও থেমে গেলেন। এ সময় রঘু মনোরমাকে সাহায্য করে রান্নাঘরে। কপিলও বাড়ী নেই। বাজারে গেছে। কি যেন ভেবে বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন উনি। যাক, একটা কাজ পাওয়া গেছে। এ কাজটা তিনি নিজেই করবেন। বাকি চা-টুকু শেষ ক'রে লে গ গেলেন কাজে। ঠিক কপিলের মতো মাথায় একটা গামছা বেঁধেছেন, কোমরেও জড়িয়েছেন একটা। কিছুক্ষণ পরেই বুঝলেন, এ কাজ তাঁর জন্য নয়। তা' হোক। চুপচাপ বসে থাকার চেয়ে অনেক ভালো।—মহা উৎসাহে ঝুল ঝাড়তে লাগলেন ভবতোষবাবু। হঠাৎ—ঝন্-ন্-ন্...। দেওয়ালের গা' থেকে একটা ফটো বাঁশটার ধাক্কা লেগে প'ড়ে গেছে।

ঝাড়টা রেখে দিয়ে ফটোটা তুলে নিলেন। ইস্! কাঁচটা একদম ভেঙ্গে গেছে। কাটা কাঁচের ঘায়ে কেটে গেছে ফটোটা একটুখানি। তাঁদের তিন বন্ধুর ফটো। তিনি মাঝখানে, ডানদিকে হিমাংশু, বাঁ-দিকে শমিতা। কনভোকেশনের সময় তোলা। এতদিন ধরে কত যত্নে রেখেছিলেন ফটোটা। আর আজ তাঁর হাতেই ভাঙ্গলো। অনুশোচনায় যেন জল এসে পড়ছে চোখে।—হিমাংশু, ভবতোষ, শমিতা। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। তিন জনেরই পরিধানে কনভোকেশনের জন্য নির্দিষ্ট পোশাক। কি সুন্দর মানিয়েছে তাঁদের। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন ভবতোষবাবু।—মনে পড়ে তাঁর সেই দিনটির কথা, যে দিন এই ফটো তোলা হয়। আরও কত মিষ্টি-মধুর স্মৃতি একে একে ভেসে ওঠে ভবতোষবাবুর মনের পর্দ্দায়। কতদিন হ'য়ে গেছে। তবু এখনও যেন দেখতে পাচ্ছেন, সে দিনগুলো। একেবারে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন উনি চোখের সামনে। একেবারে স্পষ্ট!—

শমিতা...। শমিতার কথাটাই ঘুরে-ফিরে আগে মনে পড়ছে।—যেদিন শমিতার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়—সেদিন। সেদিন ছিল কি একটা ছুটির দিন। B. S. C. ক্লাসে পড়েন তখন। Pretest-এর দিনকয়েক আগের কথা। ছুটির দিন পড়াটা খুব ভালো করেও হয় না। ভালো লাগেও না। তাঁরও লাগছিলো না। সারা দুপুর ধরে চেষ্টা করেও "এ্যানিলিন" মাথায় ঢুকলো না। 'লাইট'-এর 'ফিজিকাল অপটিক্স্'টা অন্ধকারে থেকে গেলো। 'ডিফারেনসিয়াল ইক্যুয়েশনের' পাতাটা মনে হোলো দুর্ব্বোধ্য। তার পর 'ধ্যেৎ' ব'লে উঠে পড়েছিলেন—আজকের এই প্রৌঢ় ভবতোষ নয়, সে দিনের এক চঞ্চল তরুণ। নিজের মস্তিষ্কের সার পদার্থ যে জমাট বেঁধে গেছে—এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হোলো এবং জমাট পদার্থ শুধু একটা সিনেমা দেখলেই তরল হয়ে যাবে—তাতেও নিঃসন্দেহ হোলো। কিন্তু সিনেমা কি একা ভালো লাগে? কাকে সঙ্গে নেওয়া যায়? চিন্তিত হোলো ভবতোষ। সামনেই পরীক্ষা। কে যাবে এই সময় তার সঙ্গে সিনেমায়? তাছাড়া আরও একটা কথা। তার মাথাই না হয় জমাট বেঁধেছে, তাই ব'লে আর সকলের মাথাও যে সেই সঙ্গে জমাট বাঁধবে—তার কোনো মানে নেই। অনেক ভেবে হিমাংশুর বাড়ী যাওয়াই ঠিক করলো ভবতোষ। চুপি চুপিই বেরিয়ে যাচ্ছিলো। মার সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেলো সিঁড়ির মুখে।

"কোথায় যাচ্ছিস্ খোকা? বইটই নিয়ে বসলে তো পারতিস?"

মিথ্যে কথা বলতে পারে না ভবতোষ মার কাছে। সত্যি কথাই বললো, "বসেছিলুম মা। কিন্তু মন লাগছে না। একটু হিমাংশুদের বাড়ী যাচ্ছি।"

"তাড়াতাড়ি আসিস কিন্তু।"

"একটু সিনেমায় যাবো মা?"

"সামনেই পরীক্ষা, আর এখন সিনেমা?"

"না হোলে যে পড়ায় মন লাগছে না। তুমি একটু বাবাকে ব'লে দিও।"

"সিনেমা দেখলেই পড়ায় মন লেগে যাবে"? হেসে ফেললেন করুণাময়ী। বললেন, "তা' তুই-ই ওঁকে ব'লে যা না।"

"না মা, তুমিই ব'লে দিও।"

"আচ্ছা যা, ছবি শেষ হোলেই চলে আসিস।"

ভবতোষ ততক্ষণে দরজার বাইরে চলে গেছে। ভাবতে ভাবতে চলেছে—সত্যিই তো, বাবাকে কেন বলতে পারে না ও? বাবা কি বারণ ক'রতেন? মোটেই না। তবু যেন কোথায় বাধে। এই বোধ হয় মনের রহস্য। মাকে যতখানি কাছের ব'লে মনে হয়, বাবাকে ঠিক ততখানি হয় না। মাকে সবকিছুই বলা যায়। বাবাকে যায় কি? ভবতোষের মন ব'লে উঠলো, না না, তাই কি যায়?

ট্রাম ষ্টপেজে গিয়ে দাঁড়ালো ভবতোষ। ট্রামের চিহ্নও নেই। রাস্তাটা কি অসম্ভব ফাঁকা। সেই মির্জ্জাপুরে যেতে হবে। ছটফট করতে থাকে ভবতোষ মনে মনে।—মিনিটগুলো যেন এক-একটা ঘণ্টা। একটা ট্রাম আসছে, তাই না? আঃ, আসছে—ট্রাম আসছে এতক্ষণ পরে—ট্রামটা আসতেই এক লাফে উঠে পড়লো ভবতোষ। থামা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করার মতো ধৈর্য্য আর নেই।

মির্জাপুর ষ্ট্রীটের একটা গলিতে হিমাংশুদের বাড়ীটা। অনেকবার এসেছে ভবতোষ এ বাড়ীতে। হিমাংশুর মা, বাবা, ভাই-বোন সবার সঙ্গেই গড়ে উঠেছে তার একটা সহজ সম্পর্ক। এ বাড়ীর সে অপরিচিত তো নয়ই, অনাত্মীয়ও যেন নয়। বরং ঘনিষ্ঠ আত্মীয়র মতো হ'য়ে গেছে সে। হিমাংশুর বাবা হৃষিকেশবাবু সত্যিই স্নেহ করেন ভবতোষকে। হিমাংশুর বোন রেখা, আর ছোট ভাই বাবলু ভবতোষদা এসেছে শুনলেই লাফাতে লাফাতে আসে। বিশেষ ক'রে বাবুল। তার কাছে ভবতোষ যেন এক অবাক্ বিস্ময়। কি সুন্দর গল্প বলে ভবতোষদা। কত রকম পাখী, আর কুকুর, বিড়াল—এই সব ডাকতে পারে। কি সুন্দর, কি আশ্চর্য্য! আর মাসীমা—মানে হিমাংশুর মা, তিনি সব সময় অনুযোগ করেন, ভবতোষ মোটেই আসে না তাঁদের বাড়ী। ভবতোষ যদি রোজ আসে তা' হোলেও নয়।

সিঁড়ি দিয়ে সোজা উপরে উঠে গেলো ভবতোষ। ছাদের একধারে চিলে-কোঠাটাই হিমাংশুর ঘর। পড়া, থাকা দু'টোই চলে।

ভবতোষ ঢুকেই বললো, "হিমু একটা···।"

মুখের কথা মুখেই র'য়ে গেলো, বলা হোলো না। না, রেখা নয়। একজন অচেনা মেয়ে বসে রয়েছে হিমাংশুর সামনের চেয়ারে। একে তো কোনো দিন দেখে নি ভবতোষ। চিন্তা করতে চেষ্টা করলো, কখনও দেখেছে কি না—নাঃ, মনের পর্দ্দায় কোথাও স্বাক্ষর নেই এই মেয়েটির।

"কি রে?—ওরকম বুদ্ধুর মতো দাঁড়িয়ে রইলি কেন? বোস্।"

বসতে গেলে ওই মেয়েটির পাশের চেয়ারটাতেই বসতে হয়। হিমাংশু তাই বলছে, কিন্তু ভবতোষ বসে কেমন করে? দাঁড়িয়েই রইলো।

হিমাংশু হেসে ফেললো, "ও, শমিতাকে দেখে লজ্জা করছিস? বোস-বোস, আলাপ করিয়ে দি।"

বসলো ভবতোষ, কেমন যেন অসহায় ভাবেই ব'সে পড়লো। এ যেন ভবতোষ নয়, আর কেউ।

হিমাংশু পরিচয় করিয়ে দিলো—"এই হোলো আমার সব চেয়ে প্রিয় বন্ধু, ভবতোষ চৌধুরী। আর এ হচ্ছে শমিতা গাঙ্গুলী, সম্পর্কে আমার মাসী কি পিসী ওই রকম একটা কিছু হবে। কিন্তু সেটা কিছু নয়। আসলে বন্ধু। এও এবারে B. Sc. দিচ্ছে আমাদের সঙ্গে।"

হিমাংশুর বলার ভঙ্গিতে হেসে ফেললো ভবতোষ আর শমিতা—দু'জনেই। তার পরেই হাত তুলে নমস্কার করলো পরস্পর পরস্পরকে।

শমিতাই কথা বললো প্রথমে।

"কি হোলো? আপনি কি যেন বলছিলেন হিমুকে।"

"না। ও···মানে···।" বলতে পারলো না ভবতোষ। এখনও ও সহজ হ'তে পারে নি।

"বল না, কি বলছিলি।" হিমাংশু হাসতে হাসতেই বললো, "শমিতাকে তুই এখনও লজ্জা করছিস?"

"থাকগে। আমি চলি, তোরা পড়। আমি বরং কাল···।"

"কাল নয়, বোস," ভবতোষকে মাঝপথেই থামিয়ে দিলো হিমাংশু। বললো, "দেখ তো, এই অঙ্কগুলো পারিস কি না?"

"আমরা কিছুতেই পারলুম না।" অক্ষমতা স্বীকার ক'রে নিলো শমিতা, বললো, "দেখুন, আপনি যদি পারেন।"

"কি অঙ্ক?" প্রশ্ন ক'রেই লজ্জিত হোলো ভবতোষ। তার সামনেই খুলে দেওয়া হয়েছে 'ডিফারেনসিয়াল ইক্যুয়েশন'-এর সেই পাতাটা—যেটা একটু আগেই বাড়ীতে তার কাছে দুর্ব্বোধ্য ঠেকছিলো—তবু টেনে নিলো খাতাটা—কি আশ্চর্য্য! যে অঙ্কগুলো বাড়ীতে মনে হচ্ছিল সাধ্যের বাইরে—সেগুলোই হ'য়ে যাচ্ছে একটার পর একটা। অঙ্কগুলো প্রায় এক নিঃশ্বাসে ক'রে খাতাটা এগিয়ে দিলো ভবতোষ।

"জিত্‌তা রহো!" টেবিলের উপর একটা প্রবল ঘুঁষি মেরে চেঁচিয়ে উঠলো হিমাংশু। বললো, "তুই এতো শিগ্‌গির ক'রে ফেললি। আর আমরা সেই কখন থেকে···।" কথাটা শেষই করলো না হিমাংশু। উত্তেজনায় না আনন্দে কে জানে?

আর শমিতা! শমিতার দিকে একবারও তাকায় নি ভবতোষ। তাকালে দেখতে পেতো শমিতার চোখে বিস্ময় আর অবাক শ্রদ্ধা। সে চোখের ভাষা মুখর নয়, মূক।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। ঘরের মধ্যে একটা আবছা অন্ধকার। যেন পাতলা মসলিনের একটা কালো পর্দ্দা হাওয়ায় দুলছে।—হিমাংশু লাইটটা জ্বালিয়ে দিলো।

"এ কি, ভবতোষ কখন এলে?" হিমাংশুর মা কি জন্যে যেন ছাদে এসেছিলেন। ভবতোষকে দেখেই এ ঘরে এলেন।

"বেশ কিছুক্ষণ হোলো মাসীমা। এবার উঠবো।—হিমু চললাম।"

"না, না,—বসো আর একটু। গল্পটল্প করো। শমিও এবার তোমাদের সঙ্গে পরীক্ষা দেবে শুনেছো তো ?"

ঘাড় কাত করলো ভবতোষ।

"তবে আর কি ? পড়াটড়া নিয়ে আলোচনা করো। এক্ষুণি যাবে কি ? আমি চা নিয়ে আসছি।"

চা এলো, সেই সঙ্গে এলো গরম নিম্‌কি। রেখার নিজের হাতে ভাজা। খেতে খেতে চললো গল্প। হিমাংশুর মাও যোগ দিলেন।

হঠাৎ খেয়াল হোলো, আটটা বেজে গেছে। ভবতোষ উঠে দাঁড়ালো যাবার জন্যে।

হিমাংশুর মা বললেন, "ভবতোষ, শমিতাকে তুমি একটু পৌঁছে দিতে পারবে ? তোমার অসুবিধা হবে না তো ?"

ভবতোষ কিছু বলার আগেই হিমাংশু বললো, "কেন, অসুবিধে হবে কেন ? ওর পথেই তো পড়বে—শমিতাকে ওর বাড়ী পৌঁছে দিয়ে তুই আবার ট্রাম ধরবি।"

আপত্তি জানাবার সময় পেলো না ভবতোষ। শমি তাই উঠে দাঁড়ালো, বললো, সেই ভাল। চলুন. রাত হয়ে যাচ্ছে"।

* * *

"ও-মা, মা! আমি যাব কোথায় ? তুমি এই সং সেজে এখানে বসে আছ ?" মনোরমার স্বভাবসিদ্ধ কণ্ঠস্বরের তীক্ষ্ণতায় ভবতোষবাবুর অতীতের স্মৃতি ঝাপ্‌সা হয়ে আসে। অপরাধীর চাউনি ফুটে ওঠে চোখে। বললেন, "ঘরটায় বড্ড ঝুল জমেছে কি না।"

—"ও···, আর তুমি বুঝি ঝুল ঝাড়তে লেগে গেলে সঙ্গে সঙ্গে। কেন রঘু, কপিল ওরা আছে কি জন্যে ?" একটু থামলেন মনোরমা, তার পরই জুড়ে দিলেন, "ঝুল ঝাড়াই হচ্ছে বটে। কোমরে, মাথায় গামছা বেঁধে সং সেজে একটা ফটো হাতে নিয়ে ব'সে থাকলেই ঝুল ঝাড়া হয়ে যায়।"

প্রত্যেকটি কথাই ছুরির ধার। যেন কেটে কেটে ব'সে যায়। কিন্তু ভবতোষবাবু জানেন যে, প্রতিবাদ করা বৃথা। কপিল বাজারে গিয়েছিলো, রঘু মনোরমাকে সাহায্য করছিলো, অথবা তাঁর নিজেরই চুপচাপ ব'সে থাকতে ভালো লাগছিলো না—এ সব বোঝাতে গেলে হিতে বিপরীতই হবে তাই সবকিছু উড়িয়ে দিয়ে সহজ হবার চেষ্টা করলেন ভবতোষবাবু। বললেন, "না গো তা নয়। ফটোটা ভেঙ্গে গেলো কি না, তাই দেখছিলুম।"

"কোন্ ফটোটা ? ভেঙ্গেছ তো ? বেশ করেছ। তুমি কি কোনও কাজের ? আমার সব শেষ করবে তুমি —দেখি, কোন্ ফটোটা ?"

কি কথা থেকে কি কথায় চ'লে গেলো। সত্যি, এক এক সময় এতো খারাপ লাগে, কিন্তু মুখ দেখে কিছু বোঝা যায় না তার—নিঃশব্দে এগিয়ে দিলেন ফটোটা মনোরমার দিকে।

"ও···, এই ফটোটা ? আমি ভাবলুম কি না কি ?"

সহজেই বোঝা যায়, ফটোটা ভাঙ্গাতে বিশেষ কিছু এসে যায় নি মনোরমার। এটার উপর ওঁর রাগ অনেক দিনের। স্বামীর কোনো মেয়ে বন্ধু থাকতে পারে, এ কথা ভাবতেই যেন কেমন লাগে তাঁর। সবচেয়ে খারাপ লাগে এই ভেবে যে, সেই মেয়েটির আর তাঁর স্বামীর ফটো তাঁরই ঘরে টাঙানো।—ফটোটা ভেঙ্গে যাওয়াতে মনে মনে তিনি খুশীই হয়েছেন। কারণ এই ফটোটা নিয়েই তাঁর বিয়ের দিনকয়েক পরেই একটা অপ্রিয় ব্যাপার ঘটে গিয়েছিলো, কিন্তু সে সব তাঁর মুখে বা চোখে ফুটে উঠলো না। যেন কিছুই হয় নি এমন ভাবে বললেন, "ওঠো ওঠো, নাইতে যাও, কত বেলা হয়েছে, সেটা খেয়াল আছে ? নিজেও ভুগবে, আমাকেও ভোগাবে।"

গজগজ ক'রতে ক'রতে চলে গেলেন মনোরমা।—ঘড়ির দিকে তাকাতেই আফশোষ হলো ভবতোষবাবুর। ইস্‌! পৌনে বারোটা—? সত্যি বড্ড বেলা হ'য়ে গেছে। মনোরমার দোষ নেই। অন্য দিন এতক্ষণ খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করে। আর আজ তাঁরই জন্যে বেচারা কত কষ্ট পাবে। নাঃ, সত্যিই অন্যায় হয়েছে তাঁর। ফটোটা তাড়াতাড়ি গুছিয়ে রাখলেন ড্রয়ারে। তার পর তেল-গামছার সন্ধানে অন্দরের দিকে পা বাড়ালেন।

* * *

মনোরমা আর একটু ঝোল দিয়ে বললেন, "অনুপমের চাকরিটার কি ক'রলে ? তেলকলের কাজ কি ওকে মানায় ?"

অনুপম মনোরমার দাদার ছেলে। কোন একটা অয়েল মিলে হিসাব-রক্ষকের চাকরি করে। মনোরমার ইচ্ছে, তাঁর ভাই-পো তাঁর স্বামীর আপিসেই কাজ করুক। এ কথা মনোরমা স্বামীকে বলেছেন। ভবতোষও সম্মতি জানিয়ে বলেছেন যে, তাঁদের অফিসে একটা ছোটখাট কেরাণীগিরির চাকরি খালি আছে। সেটাতে ঢুকিয়ে দেবেন অনুপমকে। মনোরমা সেই কথারই পুনরাবৃত্তি ক'রলেন।

"হবে হবে। এই সপ্তাহের মধ্যেই হ'য়ে যাবে।"

ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে তুলতে উত্তর দিলেন ভবতোষবাবু।

"হ'লেই বাঁচি। তুমি যে টিমে তালে চলো—আর দুটো ভাত দেবো?"

"না না। আমার হয়ে গেছে।"

* * *

খেয়ে উঠেই কপিলকে ডেকে পাঠালেন ভবতোষবাবু। কপিল খেতে বসেছিলো, খাওয়া শেষ করে এলো—বললেন, "যাতো মোড়ের দোকান থেকে দু'টো পান একটা দেশলাই আর গোটা চারেক সিগারেট নিয়ে আয়।" একটা আধুলি ব্যাগ থেকে বের ক'রে দিলেন।

কপিল একটু বিস্মিত হোলো, বললো, "কি সিগারেট বাবু?"

তাই তো! মুস্কিলে পড়লেন ভবতোষবাবু। পান, সিগারেট এ সব তো তিনি কোনোও দিনই খান নি। নাম জানবেন কি ক'রে? বললেন, "নিয়ে আয় যা হয়। একেবারে খেলো আনিস না তা ব'লে। আর শোন্ পানে দোক্তা না জর্দ্দা কি যেন বলে, ওসব যেন না থায়।"

কপিল ঘাড় নেড়ে চ'লে যায়। ভাবে বাবুর হোলো কি?

ভাবছেন ভবতোষবাবু, কি করা যায় এখন? একটু শোবেন? কিন্তু অভ্যেস নেই যে। পরক্ষণেই ভাবেন, পান সিগারেট খাওয়াই কি অভ্যেস আছে নাকি? অভ্যেস-টভ্যেস ও সব কিছু না। দু'দিন করলেই ঠিক হ'য়ে যাবে। শুয়ে শুয়ে সিগারেট খাওয়া সে বেশ চমৎকার হবে। না ঘুমুলেই হোলো। শুয়ে পড়লেন ভবতোষবাবু। বাঃ, বেশ লাগছে তো। র‍্যাপারটা টেনে নিলেন গায়ের উপর। শীত শীত ক'রছে। খেয়ে উঠলে বেশ শীত লাগে। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে দুপুরে শোয়া এই প্রথম। রবিবারটা থাকতোই, তাছাড়া আরও যে সব ছুটি পেতেন, তার একদিনও দুপুরে শুয়েছেন ব'লে তো মনে পড়ে না। নাঃ, একদিনও নয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মাত্র একদিন। তাও আবার বাধ্য হ'য়ে। সেই যেবার সুলতার মেয়ে পাপড়ির জর হলো—সেইবার। পাপড়ি খুব কেঁদেছিলো, "দাদুভাই, আমার কাছে শোওনা দাদুভাই"। সে কি কান্না. সেই একদিন শুয়েছিলেন। শুয়ে শুয়ে পাপড়ির মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন। পাপড়ি ঘুমিয়ে পড়তেই উঠে পড়েছিলেন। সেই পাপড়ি এখন কত বড় হয়েছে। স্কুল ফাইন্যাল দেবে এবার। অনেক দিন ওদের খবর নেওয়া হয় না। সুলতাও আসে না আগের মতো যখন-তখন, ওর অবশ্য দোষ নেই। শাশুড়ী মারা যাবার পর সংসারের দায়িত্ব সবটুকুই ওর ঘাড়ে পড়েছে। তাঁরই উচিত ছিলো মেয়ের খোঁজ নেওয়া। আজই যাবেন একবার টালিগঞ্জে।

"কেপেষ্টান আনছি বাবু," কপিল ব'লতে ব'লতে ঢোকে, "পানেও মিষ্টি দিছে। আর এক আনা ফেরৎ আসছে বাবু।" পান, দেশলাই, সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিল কপিল ভবতোষবাবুর দিকে।

"ওটা তুই নে, পানটান কিনিস।"

কপিল চ'লে যাচ্ছিলো। আবার ডাকলেন, "শোন, শোন, কি বললি? পানে মিষ্টি কি রে?"

"মুগ বিলেস দিছে বাবু।" কপিল হাসে বাবুর অজ্ঞতায়, বলে, "দিলে বেশ বাস্ আর সোয়াদ হয়। আমি যাই বাবু?"

"আচ্ছা যা, দরজাটা ভেজিয়ে দিস।"

পান দু'টো এক সঙ্গে মুখে পুরে দিয়ে একটা সিগারেট ধরালেন।

কপিল দরজা পর্য্যন্ত গিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো, "উইখানে যে ফটোকটা ছিল সেটা কুথা গেলো বাবু?"

ধ্বক্ ক'রে উঠলো ভবতোষবাবুর বুকটা। আবার সেই প্রসঙ্গ? সেই শমিতা! নাঃ, ও কথা আর ভাববেন না। নিজেকে সংবরণ ক'রে নিলেন ভবতোষবাবু। এক মুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, "সেটা আজ ভেঙ্গে গেছে।"

"ক্যাম্‌নেগো বাবু?"

"প'ড়ে গেলো হঠাৎ। তুই যা এখন। বিরক্ত করিস নে। একটু বিশ্রাম করি।"

কপিল কি যেন জিজ্ঞেস করতে গিয়েও করলো না। চ'লে গেলো। ওর মনে একটা খট্‌কা লাগলো। নিশ্চয়ই বাবুর কি হয়েছে। বেশীক্ষণ ওকথা ভাববার সময় নেই কপিলের। মৌতাতের সময় নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে ওর—অবশ্য দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে গেলো ও।

কিন্তু ভাবতে না চাইলেও ভাবতে হয় যে। যে কথা ভুলতেই চান, সেই কথাগুলোই যে সার বেঁধে ভিড় জমাতে চায় মনের ভেতর। ঘুরে-ফিরে শমিতার কথাটাই মনে আসে। কপিলই খুঁচিয়ে দিয়ে গেল ক্ষতটা। আর একটা সিগারেট ধরালেন। কোনো দিন খান নি, তবু খাচ্ছেন, লাভ হ'চ্ছে কি? কিছুই না, ক্ষতি?—তাও না। তার চেয়ে বরং ঘুমোতে পারলে হোতো। কিছুক্ষণ স্মৃতির কপাটটা বন্ধ থাকতো। কিন্তু ঘুম কি আসবে? মনে হয় না। সে চেষ্টাও বিফল হবে। যেমন সেদিন হয়েছিল। সেই যেদিন শমিতাকে তার বাড়ী পৌঁছে দিতে গিয়ে-

ছিলেন। বিডন ষ্ট্রীট থেকে হেঁটেই ফিরেছিলেন সেদিন রাত্রে। শমিতার কথাগুলো রোমন্থন করেছিলেন সমস্ত পথটা। বাড়ী পর্য্যন্তই পৌঁছে দিয়েছিলেন শমিতাকে। ভেতরে ঢোকেন নি। শমিতা বসতে বলেছিলো অনেক ক'রে, কিন্তু তিনি বসেন নি। কথা দিয়েছিলেন পরদিন সন্ধ্যাবেলা যাবেন।

ফিরতে অনেক দেরী হ'য়ে গিয়েছিলো। বাড়ী এসে কি কৈফিয়ৎ দিয়েছিলেন সে দিন আজ আর তা মনে নেই। তবে সেদিন রাতে চোখের পাতা দু'টো একটুও ভারী হয় নি। সারা রাত কেটেছিলো শুধু না ঘুমিয়ে, আর শমিতাকে নিয়ে কল্পনার জাল বুনে। একথা আজও মনে পড়ে। সে এক বিচিত্র অনুভূতি। যেন নিজেকে নতুন ক'রে আবিষ্কার করার আনন্দ। আজ আর কালের অভ্যস্ত জীবনের পরে যেন পরশু দিনের জীবনের আলোকসম্পাত। পৃথিবীকে যেন নতুন ক'রে জানা, নতুন ক'রে চেনা। সে যে কি অদ্ভুত তা বলা যায় না, বোঝানোও যায় না।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা গিয়েছিলেন শমিতাদের বাড়ী। চা খেয়েছিলেন, গল্প করেছিলেন। বেশ কেটেছিলো সন্ধ্যেটা। তার পরদিনও যেতে বলেছিলো শমিতা।—গিয়েছিলেন। তার পরদিনও। ধীরে ধীরে সহজ হয়ে এসেছিলো শমিতা। একসঙ্গে পড়তেন। একসঙ্গে বেড়াতেন। হিমাংশুও সঙ্গী হোতো মাঝে মাঝে।—কোনোদিন গঙ্গার ঘাট, কোনোদিন পার্ক, কোনোদিন বা গড়ের মাঠ।

এইভাবেই চলছিলো। কিন্তু একদিন আকস্মিকভাবে ছেদ পড়ে গেলো। ফাইন্যাল পরীক্ষা আরম্ভ হয়ে গেলো। —শেষও হয়ে গেলো একদিন। হিমাংশুর, ভবতোষের, শমিতার,—সবারই। পরীক্ষার পর অফুরন্ত অবসর।—শমিতার মামা থাকেন পাটনায়, কি একটা কাজে এসেছিলেন কোলকাতায়। যাবার সময় শমিতাকে নিয়ে গেলেন। শমিতার অবশ্য খুব একটা ইচ্ছে ছিলো না, কিন্তু ওর মা-ই জোর করে পাঠালেন ওকে। অবকাশটা কাটবে ভালো, তাছাড়া বায়ু পরিবর্ত্তনও হবে। যা চেহারা হচ্ছে দিন দিন মেয়ের।—শমিতা চলে গেলো।

হিমাংশুও হঠাৎ একটা বৃটিশ ফার্মে চাকরি পেয়ে চলে গেলো বোম্বাই। রইলো শুধু ভবতোষ। কোনোও প্রবাসী আত্মীয়ের কাছ থেকে এল না আমন্ত্রণ, পেলো না কোনোও চাকরির সন্ধান দূর অথবা নিকট বিদেশ থেকে।

একা,—একেবারে একা ভবতোষ। ভাল লাগে না কোলকাতার একঘেয়ে রাস্তাঘাট, মাঠ, পার্ক, কিছুই। তবু একা একাই গিয়ে বসে গঙ্গার ঘাটে। পালতোলা নৌকাগুলোর দিকে তাকিয়ে উদাস হয়ে যায় মন।—ওরা কোথায় যায়, কতদূরে যায়?—হয়তো শমিতার মামার বাড়ীর দেশেও যায়।—অন্ধকার ঘন হয়ে আসে। উঠে পড়ে ভবতোষ। ভাবে, কতদিন হোলো গিয়েছে শমিতা, এবার ফিরে এলেই তো পারে, Result out হওয়ার দিন তো এগিয়ে এলো।

পরদিন এলো একটা চিঠি। শমিতার চিঠি। লিখেছে, জ্বর হয়েছিলো, স্বাস্থ্য খুব খারাপ হয়ে গেছে। আর ভালো লাগছে না বাইরে থাকতে। কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্যে ফিরতে দেরী হবে হয়তো। ভবতোষ কেমন আছে? হিমাংশু কোথায়? ভবতোষ যেন চিঠি দেয়। হিমাংশুর ঠিকানাটাও চেয়েছে শমিতা। সবশেষে প্রীতি জানিয়ে ইতি টেনে দিয়েছে।

* * * *

বেশ কিছুদিন কেটে গেছে।—পরীক্ষার ফল বেরিয়ে গেল। হিমাংশু, ভবতোষ, শমিতা—তিন জনেই পাস করেছে, ভবতোষ পেয়েছে ডিষ্টিংশন,—কিন্তু শমিতা এলো না তার মামার বাড়ী থেকে। চিঠিও এলো না আর। হিমাংশুর কাছ থেকে তার এলো—'কনগ্রাচুলেসন'। কিন্তু শমিতা,...?—তবে কি শমিতার স্বাস্থ্য এখনও ভালো হয় নি। একখানা চিঠিও তো লিখতে পারতো, সেই দিনই খোঁজ নিলো ভবতোষ শমিতাদের বাড়ী।—না, কিছু খারাপ খবর নয়, ভালই আছে শমিতা, আর দিনকয়েক পরে ফিরবে।

দিনকয়েক পরে নয়। ফিরলো একেবারে কনভোকেশনের দু'দিন আগে। হিমাংশুও এলো সেইদিনই বোম্বাই থেকে। আবার দেখা হোলো তিন জনে, শমিতাদের বাড়ীতেই সেদিন মজলিস বসলো। শমিতার মা চা পরিবেশন করলেন।—সেদিন হিমাংশু আর শমিতা বক্তা, ভবতোষ শুধু শ্রোতা। সে তো দেখে নি নতুন জায়গায়, নতুন আকাশে কেমন করে সূর্য্য ওঠে, অস্ত যায়, কেমন করে চাঁদনীরাতে ঝলমল করে রাত্রির নীরবতা। কেমন করে মিট-মিটিয়ে চায় আর হাতছানি দেয় তারার দল। সে তো শোনে নি, সেই নতুন জায়গার নতুন মাটির ভাষা, বাতাসের কানাকানি।—সে শুধু শুনে গেলো, আর অবাক হয়ে দেখলো শমিতাকে। এও যেন নতুন শমিতা। আগের চেয়ে আরও উজ্জ্বল, আরও উচ্ছল,—প্রাণপ্রাচুর্য্যে আরও—ভরপুর।

কিন্তু কিছুই কি ভবতোষের বলার নেই? এতদিন যে সে গুমরে গুমরে কাটিয়েছে শমিতার খবরের জন্ত,

কত উৎকণ্ঠায় কেটেছে তার দিন—সেগুলো কি বলা যায় না? বলা হয়তো যায়, কিন্তু সে বড়ো ছেলেমানুষি হয়ে যায়, না না, ভবতোষ তা পারবে না।—তাদের গল্প শুনে আর উৎসাহ দিয়ে সে পরিবেশটা হাল্কা করে রাখলো। তার পর এক সময় শেষ হোলো। উঠে পড়লো ওরা।

কনভোকেশনের দিন।—

হিমাংশু, ভবতোষ, শমিতা,—তিন জনেই পেয়ে গেল সার্টিফিকেট। হিমাংশু বললো—"চলো, সবাই ফটো তোলা যাক।"

"খুব ভালো হবে, তাই চলো।" শমিতা সানন্দে সম্মতি দিল।

ভবতোষও উৎফুল্ল হয়ে উঠলো, বললো—"চলো চৌরঙ্গীতে আমার একটা চেনা দোকান আছে। সেখানেই যাওয়া যাক্।"

হিমাংশু আপত্তি করলো না, শমিতাও না। সবাই সোৎসাহে ট্রাম ধরতে এগিয়ে চললো।

হিমাংশুই তুললো প্রস্তাবটা।—প্রত্যেকের একটা করে সিঙ্গল ফটো আর তিন জনের একসঙ্গে একটা গ্রুপ ফটো তোলা হবে।

"বেশ তো তাই হোক।" শমিতা, ভবতোষ দু'জনেই সম্মতি দিল।

তাই হোলো। একটা করে সিঙ্গল ফটো, আর গ্রুপ ফটো একটা। গ্রুপ ফটোটাতে ভবতোষ মাঝখানে, দু'পাশে হিমাংশু, শমিতা। ভবতোষ ডিষ্টিংশনে পাস করেছে বলেই নাকি ওকে মাঝখানে দেওয়া হয়েছে মধ্যমণির মতো।—কি ছেলেমানুষি। ভাবলে হাসি পায় এখন।

ঠিক হোলো, প্রত্যেক ফটোর তিনখানা করে কপি করা হবে। একটা করে কপি হিমাংশুকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, ও কালই ফিরে যাবে আপ্‌-বোম্বে মেলে। কাজেই নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না।

দোকান থেকে বেরিয়ে হিমাংশু বললো—"ভবতোষ, তোরা যা। আমার একটু এখানকার ডিপার্টমেন্টাল অফিসারের কাছে যেতে হবে।"

"সে কি রে? এক্ষুণি যাবি কি? চল্, আগে চা খাই।" ভবতোষ হাত ধরলো হিমাংশুর।

"হ্যাঁ, আগে চলো, চা খেয়ে নিই, তার পর না হয় যেও। শমিতাও আপত্তি জানালো।

"না, ভাই। সম্ভব হবে না, তোমরা কিছু মনে কোরো না। দেরী করলে ওকে হয়তো ধরতে পারবো না। তখন কৈফিয়ৎ দিয়ে মরতে হবে।—আচ্ছা চলি।"

একটা চল্‌তি ট্রামেই উঠে পড়লো হিমাংশু। ভবতোষ আর শমিতা হাঁ করে তাকিয়ে রইলো অপস্রিয়মান ট্রামটার দিকে।

"চলো।" শমিতা নীরবতা ভাঙলো—"চলো একটু বসি কোথাও।"

"চলো।" ভবতোষ পায়ে পায়ে চলতে থাকে। বলে, "চলো, গঙ্গার ঘাটেই যাই।"

"তাই চলো।"

গঙ্গার ঘাট।—

ঘোলা জল তর তর করে এগিয়ে চলেছে।—কোথায়, কত—দূরে?

অকূল সাগরের মোহানার ডাক শুনেছে। তাই এতো চঞ্চল?—তাই কি এতো উচ্ছল? পাল-তোলা নৌকা-গুলো চলেছে মন্থর গতিতে। জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে দু'একটা। সেখান থেকে ভেসে আসছে না কোনোও কোলাহল। একটা শান্ত সমাহিত পরিবেশ।

ভবতোষ আর শমিতা এসে বসলো। অনেকদিন ওরা এসেছে এই ঘাটে, কিন্তু আজ যেন একটা নতুন কিছু হয়েছে। সবই কেমন যেন নতুন ঠেকছে। ওদের অনুভূতিতে ধরা দিচ্ছে একটা গম্ভীরীগম্ভীর ব্যঞ্জনা। ওরা অনুভব করছে, কিন্তু বুঝতে পারছে না।

"ভবতোষ?"—শমিতাই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলো।

"বলো।"

"কি ভাবছো?"

"কিছু না তো।" হাসলো ভবতোষ, সহজ হওয়ার চেষ্টা করলো।

"না, তুমি নিশ্চয়ই কিছু ভাবছো।—আমাকে বলবে না?"

"কি হবে ব'লে শমিতা? দু'দিন পরে কে কোথায় চলে যাব্। তখন তো থাকবে না এই সম্বন্ধটুকু। কাজেই, এই মধুর দিনগুলোকে টেনে বড়ো করে কি হবে?"

"কেন ভবতোষ? একথা ভাবছো কেন?"

"কেনই বা ভাববো না? চোখের আড়াল হোলেই যেখানে মনের আড়াল হয়, সে বন্ধুত্ব কি স্থায়ী হয়?"

শমিতা বুঝলো, ভবতোষের অভিমান হয়েছে। সে মামার বাড়ী গিয়ে মাত্র একখানা চিঠি দিয়েছে,—সেই কথাই বলতে চাইছে ভবতোষ। ভবতোষের হাতখানা টেনে নিল শমিতা নিজের হাতের মধ্যে। বললো, "চোখের আড়াল যাতে না করতে হয় সেই চেষ্টাই কর না।"

"তার মানে?" একটানে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে

সোজা হয়ে বসলো ভবতোষ। ফিরে তাকালো শমিতার দিকে।

"জানি না যাও।" শমিতা তাকিয়ে রইলো নীচের দিকে। যত সহজে সুরু করা গিয়েছিলো তত সহজে শেষ করা যায় না যে। হাজার হাজার লজ্জা এসে চেপে ধরে শমিতাকে। না দেখতে পেলেও বুঝতে পারছে শমিতা, তার কপোল, কর্ণমূল সব আরক্ত হয়ে গেছে। ছি ছি, এ কি করলো সে?—

ভবতোষ অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে শমিতার দিকে। কি বললো শমিতা? কি অর্থ হয় ও-কথার? শমিতাই বা ওরকম হয়ে গেল কেন,—কেন?—তবে কি—? নিশ্চয়ই তাই।—সে কি বোকা—কি বোকা! এক টানে শমিতাকে দাঁড় করিয়ে দিলো ভবতোষ। বললে, "বুঝেছি শমিতা, তোমার কথার মানে বুঝেছি। —চলো, এক্ষুণি চলো, তোমার বাবাকে গিয়ে বলবো।"

শমিতাকে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে চললো ভবতোষ। বিদ্যুতাবিষ্টের মতো থর থর করে কাঁপছে ওর সমস্ত শরীর।

শেষ হয়ে যাওয়া সিগারেটের আগুন থেকে আরেকটা ধরালেন ভবতোষবাবু। তিনটে বাজে। সন্ধ্যেবেলা গেলেই হবে সুলতার ওখানে। আরও একটু শুয়ে থাকা যাক।

সেদিন অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরেছিলেন ভবতোষবাবু। বেশ মনে পড়ছে, সেদিন বাড়ী ফিরে প্রথমে বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো। তাঁর চোখে-মুখে সেদিন কি দেখেছিলেন বাবা,—কে জানে? কিন্তু আশ্চর্য্য, কিছুই জিজ্ঞাসা করেন নি। বলেছিলেন, "খোকা, তোমার শরীরটা ভাল নেই মনে হচ্ছে। যাও, খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়োগে। তোমার মা বসে আছেন।"

"আমি খেয়ে এসেছি বাবা।"

"ও, আচ্ছা, যাও তাহলে তোমার মাকে বলে শুয়ে পড়ো।"

মাথা নীচু করে চলে গিয়েছিলেন ভবতোষবাবু। সেদিন রাতেও ঘুম আসে নি, অনেকক্ষণ কেঁদেছিলেন,—হ্যাঁ, কেঁদেছিলেন তিনি। জীবনের প্রথম চাওয়া, প্রথম কামনা সুরুতেই শেষ হোলো।—এই দুঃখ, এই আঘাত তিনি সইতে পারেন নি। কাউকে সব খুলে বলতে পারলেও মনটা হাল্কা হোতো। কিন্তু হিমাংশু বহুদূরে। বাড়ীতেও কেউ নেই শুনবার মতো।

ভবতোষ ভাবতে পারে নি, শমিতার বাবা তাকে এভাবে প্রত্যাখ্যান করবেন। শমিতার সঙ্গে তার বিয়ে হোতে পারে না, কারণ ভবতোষ অব্রাহ্মণ। শুধু সামাজিক বৈষম্যটাই বড়ো হোলো উমাপ্রসন্নর কাছে? মনের দিক থেকে তাদের কতো মিল সেটা তিনি চেয়েও দেখলেন না? এতোই যদি কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন, তবে কেনই বা দিয়েছিলেন কলেজে? কেনই বা দিয়েছিলেন পুরুষ-বন্ধুদের সঙ্গে সহজভাবে মিশবার অবাধ স্বাধীনতা? আর শমিতাই বা কেমন? বাবার অমতে কি কিছু করা যায় না?—অভিমানে, দুঃখে, আশাহত বেদনায় নিজেকে সামলাতে পারেনি ভবতোষ, অনেকক্ষণ কেঁদেছিল সেদিন। বেশ মনে পড়ে, কেঁদেছিলো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। তার পর কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলো। ছেলেমাহুষি, সত্যিই ছেলেমাহুষি। এখন হাসিই পাচ্ছে সে সব কথা মনে ক'রে।

উমাপ্রসন্নবাবু সত্যিই মত দিতে পারেন নি এই অসামাজিক বিবাহে। শমিতাকে কলেজে দিয়েছিলেন, পুরুষ-বন্ধুদের সঙ্গে দিয়েছিলেন মিশবার অধিকার। তখন আধুনিকতার হাওয়া বইতে সুরু করেছে। তিনিও পারেন নি সে হাওয়ার মোহ থেকে দূরে থাকতে। কিন্তু মেয়ের অসামাজিক বিয়েতে মত দেবার মতো উগ্র আধুনিক তিনি হোতে পারেন নি। সেই জন্যেই বাধা দিয়েছিলেন কঠোরভাবে এবং শমিতাও সে বাধানিষেধ না মেনে পারে নি।

পরদিন বিকেলবেলা অফিস থেকে ফিরে ছেলেকে ডেকে পাঠালেন মনোময়বাবু। ভবতোষ যেতেই বললেন, "ব'সো, কথা আছে।"

ব'সলো ভবতোষ। ভেবেই পেলো না, কি এমন কথা থাকতে পারে?

"তুমি শমিতাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলে?"

থতমত খেয়ে গেলো ভবতোষ, বাবা জানলেন কি ক'রে? কিন্তু উত্তর দিতেই হবে। বাবা অপেক্ষা করছেন। কেশে গলা পরিষ্কার ক'রে নিলো ভবতোষ। বললো, "হ্যাঁ, কিন্তু···।"

"আমি জানি। শমিতার কাকা আজ আমাদের অফিসে এসেছিলেন।" বাধা দিলেন মনোময়বাবু। "অবশ্য আমি খুসী হয়েই মত দিতাম যদি এ বিয়ে সম্ভব হতো। কিন্তু হলো না যখন···," একটু থামলেন। পরে বললেন, "তুমি কি এ ব্যাপারে আঘাত পেয়েছো?"

"না···, মানে···" বুঝতে পারে না ভবতোষ কি উত্তর দেবে এ প্রশ্নের।

"পাওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু খোকা, জীবনের পথটা বড় উঁচু-নীচু। অনেক আঘাত আসে চলার পথে, আসবেও।

প্রথম থেকেই যদি মুষড়ে পড়ো, কি ক'রে চলবে বাকি পথটা? মনটাকে শক্ত করতে শেখো।"

"না বাবা। আপনি যা ভাবছেন তা নয়। আমি বেশ শক্তই আছি।" এই প্রথম সহজভাবে কথা বললো ভবতোষ।

"বেশ।" একটু চুপ করে থেকে বললেন মনোময়বাবু, "আমাদের অফিসে একজন স্টোর-কীপার নেওয়া হবে। আমি বলি কি, তুমিই ঢুকে পড়ো এইটাতে।"

"আপনি যদি ভালো মনে করেন,…।"

"হ্যাঁ, এটাতে প্রস্‌পেক্ট আছে। এই ফর্মটা নাও। ঠিকমতো ফিল্‌-আপ ক'রে একটা সই ক'রে দিও। কালই দিয়ে দোবো।"

ফর্মটা হাত বাড়িয়ে নিলো ভবতোষ।

চাকরি হয়ে গেলো। সেদিন স্টোর-কীপার হয়ে ঢুকেছিলেন। তার পর দিন মাস বছর গড়িয়ে গেছে। তিনিও উঠেছেন ধাপে ধাপে। স্টোর-কীপারে সুরু, সুপারিন্টেণ্ডেণ্টে শেষ। অন্তর্বর্ত্তীকালীন অধ্যায়গুলো যেমন গতানুগতিক, তেমনি সংক্ষিপ্তও। তবু তারই মধ্যে কিছু কিছু বৈচিত্র্য ছিলো বৈকি?

চাকরি পাওয়ার কিছুদিন পরেই প্রজাপতি-মার্কা চিঠি এলো শমিতাদের বাড়ী থেকে। সেই সঙ্গে এলো একখানা খাম—শমিতার চিঠি। ক্ষমা চেয়েছে শমিতা। বাবার অমতে কিছু করবার উপায় নাকি ছিলো না। ভবতোষ যেন তার এ ভীরুতা ক্ষমা করে।—অনুযোগ করে জানিয়েছে, কেন ভবতোষ সেদিনের পর একবারও দেখা করলো না। তার পর অনেক ক'রে মিনতি করেছে, ভবতোষ যেন বিয়ের দিনে নিশ্চয়ই যায়।

আশ্চর্য্য! চিঠির ভাষাগুলো এখনো মনে করতে পারেন ভবতোষবাবু। আর একটা সিগারেট ধরালেন। সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছেন তিনি। কতদিনের কথা। তবু মনে আছে প্রায় সবই। খাপছাড়া ভাবে নয়, পর পর যা হয়েছিলো, সবই মনে আছে। আরও আশ্চর্য্য,—শমিতার সঙ্গেও মাঝে মাঝে দেখা হয়। তাঁদের বাড়ীতেও আসে, কিন্তু কোনোও রকম ভাবান্তর তারও দেখা যায় নি, শমিতারও না।

শমিতার বিয়ের দিন কিন্তু তিনি যেতে পারেন নি। যাবেন ব'লে বেরিয়েও শেষ পর্য্যন্ত যাওয়া হোলো না। গঙ্গার ঘাটে গিয়ে সেই জায়গায় বসেছিলেন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত। শমিতা এ নিয়ে পরে অনুযোগ করেছিলো, কাপুরুষও বলেছিলো তাঁকে। তিনি বলেছিলেন, "কাপুরুষ নয় শমিতা। আমি মনের কাছ থেকে পালিয়ে যেতে চেয়েছিলুম, কিন্তু পারলুম না। সেই মনের কাছেই আমায় হার মানতে হোলো।"

শমিতা অবাক হয়ে বলেছিলো, "তার মানে?"

"তার মানে আমি আজও জানি না। কে যেন আমাকে জোর ক'রে নিয়ে গেলো সেই গঙ্গার ঘাটে। কিছুতেই উঠে আসতে দিলে না।"

"তুমিও বিয়ে ক'র ভবতোষ।"

"বিয়ে? হ্যাঁ, তা করতে হবে বৈকি?" এমন বিষণ্ণ ভাবে হেসেছিলেন ভবতোষবাবু যে, শমিতা সেখানে আর দাঁড়ায় নি।

আর একদিন। যেদিন মনোরমা এলেন, সেদিনও মনের মধ্যে উঠেছিলো নতুন ক'রে আলোড়ন। দিন কয়েক কেটেছিল খুব হৈ চৈ ক'রে। তার পর মনোরমার চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় ঘটতেই মনের আলোড়ন মনেই মিলিয়ে গেলো।

ফুলশয্যার দিন-চারেক পরের ঘটনা। ভবতোষবাবু একটা বই পড়ছিলেন শুয়ে শুয়ে। মনোরমা এসে কাছে দাঁড়ালেন—"একটু চা খাবে?"

"হ্যাঁ!" চমকে উঠলেন ভবতোষবাবু। তার পর মনোরমাকে দেখে বললেন, "ও, তুমি কি বলছো?"

"চা খাবে একটু।"

"নিশ্চই, নিশ্চই, নিয়ে এসো। ও আবার জিজ্ঞাসা করতে হয় নাকি?" মনোরমার উপর খুব খুশী হোলেন ভবতোষবাবু। এক কাপ চায়ের প্রত্যাশাই তিনি করছিলেন।

মনোরমা চলে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন, "ওটা কার ফটো?"

"কোন্‌টা?" ফিরে তাকালেন ভবতোষবাবু।

"ওই যে!" আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন মনোরমা দরজার মাথার উপর।

শমিতা আর হিমাংশুর সঙ্গে কনভোকেশনের দিন তোলা গ্রুপ ফটোটা। শুধু ওইখানাই তিনি টাঙিয়ে-ছিলেন বাঁধিয়ে। বাকিগুলো আছে এ্যালবামে।

ভবতোষবাবু মনোরমার কৌতূহলের কারণ বুঝতে পারলেন। বললেন, "ও আমার বন্ধুদের ছবি। বি-এস্‌সি পাস করার পর তুলেছিলুম।"

"বন্ধু!" যেন আকাশ থেকে পড়লেন মনোরমা। "কিন্তু মেয়েটা…?"

"হ্যাঁ ও-ও বন্ধু। কেন, দেখোনি ওকে? বৌভাতের দিন এসেছিলো। তোমাকে খুব সাজালো। ওই তো শমিতা।"

"কিন্তু ও ফটো এ ঘরে থাকা চলবে না।"

"কেন?" বিস্মিত হোলেন ভবতোষবাবু। বিরক্তও হোলেন একটু।

"না, এ ঘর আমার। তুমিও···," একটু দ্বিধা করলেন মনোরমা। তার পর বললেন, "হ্যাঁ, তুমিও আমার। আমার ঘরে বা তোমার মনে অন্য কোনোও মেয়ের ছবি থাকতে পারবে না।"

"মনোরমা!" চাপা গম্ভীর স্বরে বললেন ভবতোষবাবু, "এ ঘর তোমার স্বীকার করছি, ফটোটা তাই সরিয়ে ফেলতেও পারো। কিন্তু, মনটা আমার। সেখানে তোমার জোর চলবে কি?"

কোনোও কথা বলেন নি মনোরমা,চলে গিয়েছিলেন। ফটো সম্বন্ধে কোনোও কথাই তার পর থেকে তোলেন নি কোনোও দিন। শমিতার সঙ্গেও সৌহার্দ্দ স্থাপন করেছিলেন, কিন্তু তবু কোথায় যেন একটা ফাঁক ছিলো।

ভবতোষবাবু কিন্তু সেইদিন থেকেই চিনেছিলেন মনোরমাকে।

এর পর অনেকদিন চলে গেছে। অনেক পরিবর্ত্তনও এনে দিয়েছে। ভবতোষবাবু প্রথমে হারিয়েছেন মাকে, তার পর বাবাকে। চাকরির হয়েছে ক্রত উন্নতি। তাঁদের সংসারে এসেছে নতুন আগন্তুক,—স্থলতা। স্থলতা বড়ো হোলো। তার বিয়ে হোলো। নিজের সংসারে চলে গেলো। আবার সেই নির্জ্জনতা। সেই সকালে চা, খবর কাগজ, দুপুরে অফিস, সন্ধ্যায় পার্ক, আর মাঝে মাঝে মনোরমার বাক্যবাণ। একঘেয়ে লাগে। তবু এর মধ্যেই কতকগুলো দিন বেশ কাটে। যেদিন স্থলতা আসে, আর যে ক'টা দিন সে থাকে।

শমিতারও অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। বিয়ের বছর-দুই পরেই স্বামী নিরুদ্দেশ। ছেলে বিকাশের মুখের দিকে তাকিয়ে, আর আশার জাল বুনে তার দিন কাটে। ছেলেকে নিয়ে দেওরের সংসারেই থাকে। নিজে মাস্টারী করে কোন একটা স্কুলে। ছেলের বিয়ে দেয় নি শমিতা। বিকাশও খুব বাধ্য। মা যাতে ব্যথা পান, এমন কাজ ও কিছুতেই করে না। নিজের মত বলতে ওর কিছুই নেই। থাকলেও প্রকাশ করে না। বাবা যে বেদনার বোঝা চাপিয়ে গেছেন মায়ের বুকে, তার উপর অতিরিক্ত কোনোও দুঃখ ও দিতে চায় না মাকে। বোধ হয় মায়ের মনে যে ব্যথা পুঞ্জীভূত হয়ে আছে, সেটা দূর করতে পারে না বলেই।

I. A. পাস করেই একটা সওদাগরি অফিসে ঢুকে গেছে। মাইনে সামান্য, কিন্তু মা আর ছেলে যা আয় করে ওদের তাই-ই যথেষ্ট।

কপিল এসে বৈকালিক চা দিয়ে গেলো। বারান্দা থেকে রোদ চলে গেছে। কার্নিসের কাছে থির থির করে কাঁপছে ম্লান সোনালীটুকু। বেলা শেষ হয়ে গেছে।

চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে কপিলকে বললেন, "তোর মাকে একটু পাঠিয়ে দিস তো।"

কপিল ঘাড় নেড়ে চলে গেল।

চা খাচ্ছেন ভবতোষবাবু, আর ভাবছেন।

ভাবছেন, এত দিন পরে গেলে স্থলতা কি বলবে? পাপড়ি, বিল্টু—ওরাই বা কি বলবে? কিছু খাবার-টাবার নিয়ে যেতে হবে।

"কি ব্যাপার? ডাকলে যে?" মনোরমা ঘরের ভেতর এসে দাঁড়ালেন।

"আজ ভাবছি খুকীর ওখান থেকে একটু ঘুরে আসবো."

"তাই নাকি? তা বেশ তো।" মনোরমা খুব খুশী হোলেন। তার পর হঠাৎ ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তা হঠাৎ যে?"

বিব্রত বোধ করলেন ভবতোষবাবু। বললেন, "না, ··অনেক দিন যাওয়া হয় নি কিনা?"

"ও,— আমি ভাবলাম কি না কি? তা বেন হলো। খুকীকে আসতে বল কিন্তু। অসীমকে নিয়ে যেন এই রবিবার আসে।"

"আচ্ছা বলবখন। তোমার জামাই আবার সময় পেলে হয়।"

"ওমা! কেন? রবিবার আবার কাজ কি?"

"অসীমের রবিবার সোমবার সব সমান। সোমবার অফিস। রবিবারে আড্ডা।"

"থাম, থাম।" স্বামীকে ধমক দিলেন মনোরমা—"সব তোমার মতো কিনা?"

মেয়ের কথায় এতো খুশী হয়েছেন মনোরমা যে ভুলেই গেছেন ভবতোষবাবুর কোনোও অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই। আড্ডা কাকে বলে তিনি জানেনই না।

ভবতোষবাবুও অবাক হন মনে মনে। তার মতো? তিনি কি আড্ডা দেন? কিন্তু আপত্তি করা নিষ্ফল জেনেই সে চেষ্টা করলেন না। বললেন, "আচ্ছা তাই বলবো।" পাছে বেশী কথার উৎপত্তি হয় এই ভয়ে তিনি পাশের ঘরে কাপড় ছাড়তে চলে গেলেন।

বেরবার সময় কপিল মনিব্যাগটা দিয়ে গেলো। বালিশের নীচে ছিলো। ইস্, কি ভুল! এই ব্যাগটা না

নিয়ে তিনি ট্রামে চাপতেন। কিছুক্ষণ পরে কণ্ডাক্টর পয়সা চাইলে কি করতেন? কি আর করতেন? অত লোকের মাঝখানে বেকুব বনে যেতেন। পরের ষ্টপেজে নেমে পড়তে হোতো। তার পর বেশ কিছু পথ হেঁটে বাড়ী ফিরতে হোতো।

এসপ্ল্যানেডে এসে টালিগঞ্জের ট্রামে উঠলেন ভবতোষ বাবু। ট্রাম ছাড়ার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে গাড়ীতে যে উঠলো—তাকে দেখে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন তিনি।

শমিতাও অবাক হয়ে ছিলেন ওঁকে দেখে। ওই-ই এগিয়ে এসে বসলো ভবতোষবাবুর পাশে। বলল, "খুব অবাক হয়ে গেছ না?"

ভবতোষবাবু সামলে নিয়ে ছিলেন, বললেন, "হ্যাঁ, কিন্তু তুমি এদিকে কোথায়?"

"আমার খুড়তুত বোন বাণীকে চেন ত? ওর শ্বশুর বাড়ী বকুল বাগান, ওদের ওখানেই যাচ্ছি—তা তুমি কোন দিকে?"

"খুকীর ওখানে যাবো একবার, অনেক দিন যাওয়া হয় না।"

তার পর সুরু হোলো খোঁজ-খবর। ভবতোষবাবু বললেন, তাঁর অবসর গ্রহণের কথা। শমিতা বললো তার স্কুল মাষ্টারীর কথা। একথা সেকথার পরে হঠাৎ শমিতা বললো, "তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালোই হলো ভবতোষ, না গেলে আমিই যেতাম।"

"কেন?" ভবতোষবাবু বেশ অবাক হোলেন।

"বিকাশের একটা কাজের জন্যে, ওর চাকরিটা হঠাৎ চলে গেলো কিনা—আমাকেও বোধ হয় এবার অবসর নিতে হবে।"

ভবতোষবাবু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন শমিতার দিকে, এখনোও যেন তিনি সঠিক উপলব্ধি করতে পারেন নি কথাটার মর্ম্ম।

"তার পর," শমিতা বললো, "আমাদের আর ওখানে থাকা চলে না। আইনের আশ্রয় নিয়ে ঠাকুরপো আমাকে আর বিকাশকে তাড়াতে চায়। প্রতিবেশীরা মামলা করতে বলেন, কিন্তু আমি তা চাই না—আর মামলা যে করব, তার টাকা কৈ।" একটু চুপ করে থেকে শমিতা আবার বললো, "তুমি যদি একটা চাকরী ওকে জুটিয়ে দিতে পার, আমরা একটা ছোট্ট বাসা করে থাকব।"

"কত দিন চাকরি গেছে বিকাশের?" এতক্ষণ পরে কথা বললেন, ভবতোষবাবু।

"তা প্রায় মাস দুয়েক।"

"তুমি এতো দিন জানাও নি কেন?"

চুপ করে রইল শমিতা।

"বুঝেছি, তুমি অভাব জানাতে চাওনি—কিন্তু আমাকে কি তুমি বন্ধু মনে কর না?"

এবারও শমিতা উত্তর দিল না।

ভবতোষবাবু বললেন, "তুমি না করলেও আমি কিন্তু করি। আচ্ছা, তুমি কাল গোটা-নয়েকের সময় পাঠিয়ে দিও বিকাশকে। দেখি কি করতে পারি।"

এতক্ষণ পরে মুখ খুলল শমিতা। বললো, "তুমি বুঝতে পারবে না কি হচ্ছে আমার মনের মধ্যে। তোমাকে বন্ধু বলে জানি বলেই ত সব বলতে পারলাম তোমাকে।"

"তুমি তা হলে ওকে পাঠিয়ে দিও ঠিক সময়ে।"

"হ্যাঁ দেব। ঠিক নয়টায় তোমাদের বাড়ী যাবে ও, তোমাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেব?" বলতে বলতে উঠে পড়ল শমিতা। এখানেই নামবে ও।

"না না ধন্যবাদের প্রয়োজন নেই, চাকরীটা হয়ে যাবার পর ওটা দিও।"

ম্লান একটু হেসে নেমে গেল শমিতা।

যে চাকরিটা মনোরমার ভাইপোকে দেবেন ভেবে ছিলেন, সেইটাই বিকাশকে দেবেন। মনোরমার দাদার ছেলের চাকরি না হলেও চলবে, কিন্তু বিকাশের না হলে চলবে না। একথা যখন মনোরমা শুনবেন তখন—তখন যা হয় হবে। সেই তো কথার হুল। ওতে আর ভয় পান না ভবতোষবাবু। ও অভ্যেস হয়ে গেছে।

শমিতা রাস্তা পার হয়ে বকুলবাগানে ঢুকল। ট্রাম চলতে সুরু করেছে এখনও দেখা যাচ্ছে ওকে। ট্রাম এগিয়ে চলল, পথের বাঁকে হারিয়ে গেল শমিতা—

(পুরস্কার প্রাপ্ত গল্প)

কবি ও কাব্য

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশ ও অপ্রকাশের খেলা

কাব্য-সৃষ্টির মূলে থাকে প্রেরণা—তাতে করেই কবি-মানস অনুপ্রাণিত হয়; বাইরের প্রাকৃতিক দৃশ্য, জগৎ-সংসারের ঘটনা, শ্রবণ, স্পর্শন, আস্বাদন, আঘ্রাণ প্রভৃতির উপলব্ধি মনের উপর রেখাপাত করে। মনস্তাত্ত্বিক যে নামই ব্যবহার করুন আমরা কাব্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাকে বলব উদ্দীপনা বা প্রেরণা। প্রতিনিয়ত তার রূপ বদলায়, আকারে প্রকারে, ভাবে ভঙ্গিতে, আবেদনে ও প্রতিফলনে তার যে বিচিত্র খেলা, সে খেলায় প্রেরণা জাগে সংবেদনশীল কবি-মানসে। রূপে রসে, শব্দে গন্ধে ও স্পর্শে তার বিভিন্ন ভাবান্তর ঘটে, কবি-মানসের উপলব্ধি থেকেই ছন্দের লাবণ্যে ও রসের মাধুর্যে কাব্যরূপ ফুটে ওঠে :

> হাজার হাজার বছর কেটেছে, কেহ ত কহেনি কথা
> ভ্রমর ফিরিছে মাধবীকুঞ্জ তরুরে ঘিরেছে লতা ;
> চাঁদেরে চাহিয়া চকোরী উড়েছে, তড়িৎ খেলেছে মেঘে
> সাগর কোথায় খুঁজিয়া খুঁজিয়া তটিনী ছুটেছে বেগে।
> ভোরের গগনে অরুণ উঠিতে কমল মেলেছে আঁখি,
> নবীন আষাঢ় যেমনি এসেছে চাতক উঠেছে ডাকি ;
> এত যে গোপন মনের মিলন ভুবনে ভুবনে আছে
> সে কথা কেমনে হইল প্রকাশ প্রথম কাহার কাছে।"
>
> (রবীন্দ্রনাথ)

বিচিত্র রূপিণী প্রকৃতির এই লীলাখেলা রহস্য-সন্ধানী কবির কাছেই প্রথম প্রকাশ পায়—সেই কবির নিভৃত মনে যে গুঞ্জনধ্বনি ওঠে—কবি জানতে পারেন এ "নিখিল ভবে কতকাল ধরে কি যে রহস্য ঘটিছে"—তিনি প্রকাশ করেন সে রহস্য—তাই শুনে প্রকৃতি 'সাবধানী' হয়ে যায়। তপন অস্তে নেমে যায়; চন্দ্রবনের আড়ালে থমকে দাঁড়ায়; কমল সরোবরে নয়ন মুদ্রিত করে; দখিন বাতাস বয়ে যায় "সকলি পড়েছে ধরা"। কিন্তু হায়, ধরা পড়েও অনেক কিছুই ধরা পড়ে না। প্রকাশ ও অপ্রকাশের আনন্দ ও আকুলতা নিয়েই কবির ভাবের হাটে বেচা-কেনা; ভবের হাটে কবি নিত্যকালের হাটুরিয়া। অ-ধরার আকর্ষণ, না-পাওয়ার আকুলতা কবিকে এক রহস্য থেকে আর এক রহস্যে টেনে নিয়ে যায়—কবি বলেন—

> "শুধু গুঞ্জনে কূজনে গন্ধে সন্দেহ হয় মনে
> লুকানো কথার হাওয়া বহে যায় বন হতে উপবনে।
> মনেহয় যেন আলোতে ছায়াতে রয়েছে কি ভাবভরা"

কিন্তু সে ভাব ধরা যায় না, আবার তাই কবি সেই রহস্যের সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, জগতের সঙ্গে চলে তাঁর দিবসরাত্রি ভাবের আদান প্রদান। তিনি "লতাপাতা চাঁদ মেঘের সঙ্গে "এক হয়ে মিশে" থাকেন, "মনের আড়ালে ফুলের মতন মৌন" থাকেন, কখনও বা "মেঘের মতন আপনার মাঝে আপন ছায়া" বিস্তার করে "একা বসে বসে ঘন গম্ভীর মায়া" রচনা করেন। সেই ত কাব্য —ভাবরসে সমৃদ্ধ গীতিকবিতার গভীর আবেদন ত এই খানেই।

এই ভাবে চলে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত কবি-মানসের যোগসাধন। বহির্জগতের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সংস্পর্শলাভ। সেই উদ্দীপনায় কবি-মানসের ভাব-তরঙ্গে দোলা লাগে,—দোলা লাগে কবির চিন্তা, মনন ও অনুভূতিতে। কবির ভাব-তন্ময়তার মধ্যেই এই ভাবে কাব্যের জন্মলাভ ঘটে। সৌন্দর্যে, মাধুর্যে, সুখদুঃখ হাসিকান্নায়, আশা নিরাশার আবেগ-স্পন্দনে ছন্দে ছন্দে কাব্য রূপায়িত হয়ে ওঠে, হৃদয়-বীণার তারে তারে অনুরণিত মূর্চ্ছনা পাঠকের শ্রুতিমূলে ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে—অনাস্বাদিত রসের তৃপ্তি আনন্দলোকের সন্ধান দেয়। এখানেই কবির কাব্য সফল ও পাঠকের রসগ্রাহিতা সার্থক হয়।

মননশীলতা ও উপলব্ধি শক্তি

কাব্য-সৃষ্টির প্রেরণা কোনোও 'ভ্যাকুয়াম' বা শূন্যগর্ভ উৎস থেকে আসে না—উপলব্ধিই তার আশ্রয়, কোনোও না কোনোও সত্যের উপর তা প্রতিষ্ঠিত। কবির কাছে বাস্তব বা কাল্পনিক উপাদানের তারতম্য থাকে না বলেই কাব্য বস্তুনিরপেক্ষ নয়, ভাবনিরপেক্ষও নয়।

আমাদের এই বিশাল পৃথিবীর মানুষ অনেক বদলে গেছে; কারণ, তার পরিবেশ বদলেছে; তার সহজাত ধর্মবোধ, তার আদর্শ ও তত্ত্বজ্ঞানের সীমারেখা ও দৃষ্টির

পরিধি সম্প্রসারিত হয়েছে, সে আজ পরিবর্তনের পথে নূতনের সন্ধানে অগ্রসর হয়ে চলেছে। সে আজকার চোখে আগামী কালের রূপদর্শনে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। অবশ্য বস্তুমূল্যে আজ যা সত্য বলে প্রতিভাত হচ্ছে—হয়ত বা প্রাণমূল্যে আগামী কালের বিচারে তা অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হবে। এ প্রশ্ন সাধারণ মানুষের কিন্তু কবির কাছে কল্পনাও সত্য বাস্তবতাও সত্য—যা কিছু অনুভূতি-সাপেক্ষ তাই নিয়েই কবির কারবার। কিন্তু তার মধ্যে গভীর জীবনবোধ থাকে বলেই কবি-কৃতি কয়েকটি অনন্য-সাধারণ বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। "শুধু মননক্রিয়া বা বুদ্ধির মারপ্যাঁচে কাব্য হয় না। মননক্রিয়া বা বুদ্ধি থাকা চাই কিন্তু তার মধ্যে পুরুষশক্তির আবির্ভাব থাকা চাই। মেধাবীর মালভূমি হ'ল এই প্রকার কিন্তু মেধাবী কেবল সেই জিনিস উপলব্ধি করবেন অথচ প্রকাশ করবেন না। তিনি ঋষি হতে পারেন কিন্তু কবি নন। যে মেধাবী কূজন করেন তিনিই কবি। এ হতে বোঝা যাচ্ছে যে, কবি-কৃতির মধ্যে মননশীলতা বা বুদ্ধি থাকা চাই কিন্তু তাতে স্বয়ম্ভু পুরুষশক্তির অভিব্যক্তি না হলে কিছু হয় না। সেই সঙ্গে প্রকাশও হওয়া চাই। এই হ'ল কবিকৃতির মূল কথা।" প্রথম "বাইরের সমাজ—এর থেকেই কবি তাঁর অভিজ্ঞতা আহরণ করেন, তাই হচ্ছে কাব্যের মালমসলা। দ্বিতীয়, কবি নিজে, তার হাতে ঐ সকল মালমসলা বা উপাদানে কাব্য রূপ পরিগ্রহ করে। তৃতীয় হ'ল—কাব্য। অর্থাৎ বাইরের উপকরণ এই ভাবে কবি-কৃতির মাধ্যমে কাব্যে রূপান্তরিত হয়।*

তা হলেই দেখা গেল—কাব্য-সৃষ্টির কাজে মনন-শীলতা যেমন বাঞ্ছনীয় তেমনি আশঙ্কাজনকও বটে। এক সময়ে আমরা দেখি যে, লেখক বহুদিন যাবৎ কষ্ট স্বীকার করে চিন্তা করছেন বলে অনেক রচনায় তার হাত খুলল—আবার আর এক সময় দেখি যে, অধিক চিন্তায় তিনি লেখার শক্তি একেবারে হারিয়ে বসেছেন। উপাদান বা কার্যকারণ সম্পর্কে সূক্ষ্ম ও সঠিক চিন্তায় রচনার উৎকর্ষ সাধন করা যায় কিন্তু যদি অতিরিক্ত মননের দ্বারা সেই উৎকর্ষের সৌকর্ষ সাধন করা হয় তা হলে রচনা প্রাণহীন ও নীরস হয়ে পড়তে বাধ্য। কবির অন্তরে আছে একটি নিগূঢ় ভাব-চেতনা, আছে যুক্তি, আছে সংস্কার—আছে সূর্যালোকিত প্রভাত ও মধ্যাহ্ন-দিবসের সখন্ধে রচিত স্মরণীয় মুহূর্ত, আছে প্রশ্বায়িনী সন্ধ্যার অবগাঢ় মায়া, আছে রহস্যময়ী রাত্রির গভীর উপলব্ধি, আছে নীরবতা, আছে মুখরতা, আছে জীবনের কৃষ্ণপক্ষ শুক্লপক্ষ, আছে সমাহিত চিত্তের অনুধ্যান, আছে শ্রম, আছে বিশ্রাম, আছে রোগ শোক দুঃখ জরা ও মৃত্যুর প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, আছে অতীন্দ্রিয়ের ধ্যান ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুজগতের ধারণা;—এই সবের মধ্যেই আছে রচনাত্মক মুহূর্তের অবকাশ ও কাব্য-সৃষ্টির প্রেরণা।

একজন গ্রীক সমালোচক বলেছেন, "It is not in the light but rather in darkness that lucidity is born" অর্থাৎ, আলোকে নয়—অন্ধকারেই রসের উদ্ভব হয়ে থাকে। যা হোক কবি এই অবিরাম আলো,-অন্ধকারের খেলার মধ্যে, আনন্দ-বেদনার উদ্ভব বিলয়ের মধ্যে নিজেকে নিমগ্ন রেখে সমস্ত দ্বন্দ্ব ও বিরোধের অবসান ঘটান, একটি পরিপূর্ণ ভাব-সঙ্গতি ও উপাদান সামঞ্জস্য বিধান করে'। কি চিন্তা কি উপলব্ধি কি প্রেরণা কি ভাবস্মৃতি সব কিছু পরিপক্বতা বা পূর্ণতা লাভ না করলে এটা সম্ভব হয় না।

কাব্যের ভাষা

এর পরের কথা, কাব্য-রচনার ভাষা সম্পর্কে। দর্শন বা বিজ্ঞানের ভাষা কাব্যের নয়। যুক্তিতর্কের সমন্বয়-বিধানে, তথ্য-উদ্‌ঘাটনের বিন্যাস-কৌশলে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়ে থাকে—তা' ভাবপ্রবণতাবর্জ্জিত—কাব্য-সাহিত্যে তার স্থান নেই। সেজন্য কাব্য-স্রষ্টার ভাব-প্রকাশ ও তদনুযায়ী ভাষা ব্যবহারের মধ্যে একটা অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক আছে। ভাষার জটিলতায় প্রকাশ পায় চিন্তার অসংলগ্নতা, ভাষার স্পষ্টতায় প্রকাশ পায় চিন্তা ও উপলব্ধির স্পষ্টতা। অবশ্য কাব্য-রচনার ক্ষেত্রে ভাষার একথা সব সময় খাটে না;—কাব্য-সাহিত্যে ভাষার অস্পষ্টতা অনেক স্থলে তাৎপর্যপূর্ণ—অনিবার্যও বটে। এমনও হতে পারে যে মনের অনুভূতি কোনোও পদ বা বাক্যাংশে প্রতিধ্বনিত হ'ল, কিন্তু তার যুক্তিযুক্ত অর্থ হৃদয়ঙ্গম হ'ল না। এমন পদ বা বাক্য চিন্তা করে ব্যবহার করা যায় না; হঠাৎ উপযুক্ত বাক্য বা পদ বিদ্যুতের মতো মনে চমক দিয়ে যায়, তার দ্বারা তখন প্রকাশিত হয় সেই আসল অর্থটি—অজ্ঞাতের অপ্রমেয়তায় কবির মন অনেক সময় আচ্ছন্ন থাকলেও বস্তু-বিষয়ের যে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানাতীত বিষয়ের যে উপলব্ধি সেটা কবির কাছে সত্য হয়েই দেখা দেয়, তাই আলোছায়ার প্রচ্ছন্নতায় ভাষাও মাঝে মাঝে অস্পষ্ট হয়ে ওঠে, কিন্তু তাতে মর্মার্থ গ্রহণে কোনোও বাধার সৃষ্টি হয় না।

প্রকাশ-ভঙ্গির মধ্যে এমন একটি শক্তি দেখা যায় যা' কাব্য-রচনার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করে। জানা-অজানার যুগল-মিলনে উদ্ভূত কাব্যই শ্রেষ্ঠ কাব্য। এই

* সাহিত্য ও সংস্কৃতি—শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

মিলনের আনুষ্ঠানিক রীতিপদ্ধতি প্রয়োজনের উপর প্রতিষ্ঠিত—যাকে বলা হয়, "Conventions of literature" সর্ব্বপ্রথম স্বেচ্ছাকৃত মনোনয়ন, তার পর আসে সৃষ্টির প্রয়োজনবোধ ও আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ। তার সঙ্গে সঙ্গে উপজাত হয় অনুরাগ ও আবেগ। এই মানসিক ভাব ও বাহ্য প্রক্রিয়ার পরিপূর্ণতার মধ্যেই হয় সার্থক কাব্য-সৃষ্টি। তা হলে দেখা গেল যে, কাব্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে আছে চিন্তার ক্রিয়া ও তৎপ্রণোদিত মানসিক প্রতিক্রিয়া। পাঠকের দিক থেকে কাব্যরস সম্ভোগের মধ্যেও তাই চিন্তা, তা মননশীলতা এবং অনুভূতির স্থান আছে, কবি ও পাঠক পরস্পর নির্ভরশীল ; কারণ,

"একাকী গায়কের নহে ত গান,
মিলিতে হবে দুইজনে ;
গাহিবে একজন খুলিয়া গলা,
আরেকজন গাবে মনে।"

কাব্য ও মহৎ চিন্তা

কাব্য থেকে মহৎ চিন্তাকে পৃথক করা যায় না, কারণ চিন্তা, অনুভবশক্তিকে সুবিন্যস্ত করে—তাতে কাব্য সুন্দর হয়, কালজয়ী হয়। সমগ্রভাবে কাব্যকে একটি পরিপূর্ণ সৌন্দর্যরূপে উপলব্ধি করতে হবে। কাব্যে ভাবাবেগ থাকলেই শুধু চলে না, "স্বয়ম্ভু পুরুষশক্তি"র কতটা অভিব্যক্তি হয়েছে—সেটা অবশ্যই বিচার্য। যে ভাব সার্বজনীন তার আবেদনও নিঃসংশয়ে সার্বজনীন তবে কাব্যে স্বকীয় ভাবকে পৃথক করে দেখতে গেলে কাব্যের প্রকৃত বিচার হয় না। কাব্যের নিজস্ব প্রকৃতি আছে সেটা উপেক্ষিত হলে বিচার-বিভ্রান্তি ঘটবার আশঙ্কা থাকে।

কাব্যের সত্য জীবনের সত্য থেকে কদাচ পৃথক নয়। পাছে সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে নীতিবোধের বিরোধ ঘটে—মান বা আদর্শের গোলমাল হয়ে যায়, সেজন্য এই দুটি সত্যকে দুইদিক থেকে দেখা যেতে পারে অর্থাৎ, কাব্যে-নিহিত বক্তব্যের সঙ্গে কবির জীবনের মিল আছে কিনা সেটার বিচার করা যায়। দুটি সত্যের মিলনে বক্তব্য যে জোরাল হয় একথা ঠিক, কিন্তু কাব্য-বিষয়ের সঙ্গে প্রকৃত-বিষয়ের সম্পর্ক কতখানি সেটা দেখার অর্থই হচ্ছে কাব্যের সত্য ও জীবনের সত্যকে পৃথক করে দেখা—এ দেখা কাব্য-রস উপভোগের সহায়ক নয়।

যদি কেউ প্রত্যক্ষভাবে জীবনকে না দেখে, না জেনে বুদ্ধির দ্বারা, মনের দ্বারা জানতে চান অথবা প্রত্যক্ষভাবে জেনেও তিনি অধিকতর জ্ঞানের সহায়করূপে অধিক কিছু পেতে চান, তা হলে কাব্য অপেক্ষা জীবনীর শিক্ষা অধিকতর কার্যকরী হওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু মনের উপর প্রভাব বিস্তারে উৎকৃষ্ট কাব্যের যে শক্তি আছে জীবনীর তা থাকা সম্ভব নয়, তবে রসোত্তীর্ণ কাব্য না পড়ে যদি কেহ জীবন-জিজ্ঞাসার উপাদানে রচিত জীবনী পড়ে জীবনকে জানতে চান সে কথা স্বতন্ত্র।

কাব্য ও জীবন

কাব্যে কল্পনা বিস্তারের স্বাধীনতা আছে, কিন্তু তা অন্যান্য চারুকলা বা সুকুমার শিল্পের মতোই নিয়মানুগতা ; কিন্তু জীবনীর মতো সুনির্দিষ্ট ঘটনা বা প্রমাণিত তথ্যের দ্বারা কাব্যের গতি-প্রকৃতি সীমাবদ্ধ নয়। এটা আমরা বিবেচনা করে দেখি না বলে কাব্যের সঙ্গে জীবনের গরমিল দেখি। কাব্যের উপলব্ধ সত্যকে বস্তুজগতে দেখতে পাই না বলে অনেক সময় ভুল বুঝে থাকি। কাব্যের বলিষ্ঠ আবেদন রস-পিপাসু মানুষের জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। "অস্কার ওয়াইল্ড" সেজন্য বলেছেন, জীবন আর্ট বা শিল্পের অনুকরণ করে। কাব্য-অনুশীলনে এ সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এই ভাব কাব্যের অনুশীলন না করে যদি কেউ কেবল কাব্যে প্রকাশিত চিন্তাধারা বা মননশীলতার দিকে জোর দেন তা' হলে কাব্য থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে তিনি ভাবাদর্শ ও ব্যবহারিক রীতির বিষয়েই শুধু চিন্তা করে চলবেন, তাতে বিভ্রান্তি ঘটতে পারে। যে কোনোও শ্রেষ্ঠ কাব্য-রচনার মধ্যে বহু কাব্য বিন্যাস আছে, বহু চিন্তার সমাবেশ আছে, বিষয়-অনুভূতি ও রসমাধুর্য উপলব্ধির বহু অভিব্যক্তি আছে, সে সকলের সংমিশ্রণে যে ভাবময় রূপময় রসময় বস্তুর সৃষ্টি হয়—আমরা তাকেই বলি কাব্য। স্বভাবগত সৌন্দর্যবোধের সাহায্যে গ্রহণশীল মনের প্রসারতার দ্বারা সেই কাব্যকে আমরা আমাদের আদর্শগত সংস্কারগত এবং অধ্যাত্মদৃষ্টিগত প্রয়োজনের তাগিদেই গ্রহণ করে থাকি। তার মধ্যে সক্রিয় থাকে আমাদের চিন্তন মনন ও রসাস্বাদনের সংস্কৃতিগত আকাঙ্ক্ষা।

কাব্য-সৃষ্টির প্রয়োজনবোধ

উপরোক্ত আলোচনার পর এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, কাব্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে উপকরণ-সম্ভার প্রেরণা জোগায় কিন্তু কোনোও একটি ভাব-ধারণার সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকলেও কবি-কর্মের উৎস শুধু চিন্তা বা মনন নয়। বার্ণাড শ'-এর মতে প্রচারধর্মী-মন নিয়ে প্রয়োজনবোধে ইচ্ছা থাকলে নাটক রচনা করা যায় ; কোনোও একটি বিশেষ ঢঙে, বিশেষ একটি কাঠামোতে (আঙ্গিকে) তার

রূপায়ণ চলতে পারে এবং তার গঠন-পারিপাট্য কলা-সম্মত নাও হতে পারে কিন্তু শুধু ক্ষেত্রবিশেষেই সে প্রকার রচনা সম্ভবপর হয়। কিন্তু কাব্য-সৃষ্টির শক্তি নির্ভর করে কোনোও একটি বিশেষ অবস্থার উপর—এবং সে অবস্থার উদ্ভব হয় স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছা ও স্বকীয় বুদ্ধিবৃত্তির উপর। বিভিন্ন শক্তির ক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায় কবিকৃতির মধ্যে; প্রতি পদক্ষেপেই সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে কবির সংস্পর্শ ঘটে—সেই সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত আছে কাব্য-সৃষ্টির ঐতিহ্য। সেই সমস্তের নিবিড় পরিণতি আমরা দেখতে পাই ঐকান্তিক নিষ্ঠায় রচিত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কাব্যে। শুধু চিন্তার দ্বারা সেরূপ কাব্যের সৃষ্টি হতে পারে না। রচনার ক্ষমতা থাকা চাই, সুযোগ ঘটা চাই, প্রত্যেকের সঙ্গে পরোক্ষের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সঙ্গে, আঘাতে সংঘাতে, দুঃখ-বেদনার গভীর অনুভূতি মনকে আবিষ্ট করা চাই, আনন্দের উচ্ছল আনন্দে অন্তর অভিভূত হওয়া চাই—তবেই হয় সত্যকার কাব্য-সৃষ্টি।

চিন্তাশীলতা ও বুদ্ধিবৃত্তি

চিন্তাশীলতার গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা অবহিত নই এ কথা মনে করবার কোনোও কারণ নেই—যথাস্থানে তার যথাযোগ্য প্রয়োজন কতটা তা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। কাব্য-সৃষ্টিকে একান্ত করে দেখার একটা দিক আছে, কিন্তু তার পশ্চাতে যে অদৃশ্য শক্তি কাজ করছে তাকেও স্বীকার করে নিতে হয়—শুধু প্রতিভাই এক্ষেত্রে একমাত্র কথা নয়—কবি-কর্ম কঠোর শ্রমসাপেক্ষ; তার কাজ চলে ভিতরে ও বাইরে। যে কবি কিছুটা পরিপক্কতা লাভ করেছেন তিনিই জানেন শুনবার মতো কান থাকলে সেখানেই বাঁশী বাজে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে রাখা দরকার যে, শুধু কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের বিনিময়ে কবি-খ্যাতি লাভ সম্ভব নয়। তবে সর্বদা জাগ্রত না থাকলে, শ্রমবিমুখ হলে অনেক প্রেরণা বিফল হয়ে যায় —অনেক আহ্বান দুয়ার থেকেই উপেক্ষিত হয়ে ফিরে যায়। কবি-মানসে প্রেরণা উপস্থিত হলে কখনও কখনও তৎক্ষণাৎ তা ভাষায় প্রকাশিত হয়ে পড়ে—অথবা ধীরে ধীরে পরিপক্ক ভাব-সংহতিতে পর্যবসিত হলে তবে তা ভাষায় রূপ পরিগ্রহ করে। কবি, কথাশিল্পী, চিত্রশিল্পী প্রভৃতির জীবনে এ অভিজ্ঞতা সর্বদাই ঘটে থাকে। কবির প্রকৃতিগত এই গুণেই কাব্য-সৃষ্টি হয়ে থাকে—সে গুণ তার মৌলিক সত্তায় বর্তমান। চিন্তা ও মননশীলতায় এ গুণের উৎকর্ষ সাধিত হয়। কবি-কৃতির মধ্যে চিন্তার কাজ হচ্ছে বিষয়বস্তু বা ভাব-ধারণাকে বুঝে নেওয়া, তার অস্পষ্টতা দূর করা এবং কাব্য উপকরণকে পরিমার্জিত করা। মননশীলতা ও বুদ্ধিবৃত্তি, সৃজনীশক্তির হন্তারক নয় বরং সক্রিয় ভাবে সহায়ক।

অবশ্য কোনও কোনও সাহিত্য-সমালোচক এরূপ যুক্তির বিরোধী। এই প্রসঙ্গে ইংরাজি সাহিত্যে কার্লাইলের কথা স্বভাবতই মনে পড়ে। তিনি বলেছেন, "If called to define Shakespear's facaulty, I should say superiority of intellect and I think I had included all under it." তিনি তাঁর "The Hero as Poet" নামক প্রবন্ধে বলেছেন যে, আমাদের তথাকথিত প্রতিভা বা বুদ্ধিবৃত্তি পৃথক পৃথক বস্তু কিন্তু "Man's spiritual nature, the vital force which dwels in him is essentially one and indivisible." অর্থাৎ মানুষের মধ্যেকার অধ্যাত্ম প্রকৃতি, প্রাণশক্তি মূলতঃ এক এবং অবিচ্ছিন্ন। সেক্সপীয়র একজন প্রকাণ্ড বুদ্ধিমান ব্যক্তি, একথা শুনলে আপাতভাবে শ্রুতিকটু মনে হবে, কারণ এ কথা আমরা বলতে পারি বেকন ও জনসন সম্পর্কে। মোট কথা এই যে, শক্তি আপাত-বিরোধের সামঞ্জস্য বিধান করে সেই শক্তিই রচনাকে ভাবসম্পদে ঋদ্ধ করে, বিন্যাস-কুশলতায় মনোজ্ঞ, পরিমার্জিত ও বলিষ্ঠ করে তোলে।

প্রকৃষ্ট বুদ্ধি, তীক্ষ্ণ মেধা, প্রবল ইচ্ছাশক্তির অধিকারী হয়েও একজন কবি শ্রেষ্ঠ কবি বলে স্বীকৃতি নাও পেতে পারেন। তিনি হয়ত অন্য কবি অপেক্ষা উচ্চতর স্থান অধিকার করলেন। হয়ত তিনি তাঁর চিন্তা, মনন ও উপলব্ধি শক্তির সদ্ব্যবহার করে কাব্য-রচনায় কৃতিত্ব দেখালেন। আবার এমনও হতে পারে যে, তাঁর উদ্দাম ভাবপ্রবণতা তাঁকে কাব্য-রচনায় বাধ্য করে বলে তা তাঁর কাছে অনিবার্য প্রয়োজন হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু প্রকৃষ্টতর বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী বলে তাঁকে অভিহিত করলে তার কবিত্বশক্তির যথাযথ পরিচয় দেওয়া হবে না। এমন হওয়াও অসম্ভব নয় যে তিনি যে সংবেদনশীলতার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল সেটা অন্য অপেক্ষা হয় উৎকটতর নয় নিকৃষ্টতর; তাঁর অপেক্ষা বস্তুতঃ কম সংবেদনশীল হয়েও আর একজনের কাব্য সৃষ্টি খুব উচ্চাঙ্গের বলে স্বীকৃতি লাভ করল এবং অমর হওয়ার কোনও আকাঙ্ক্ষা না রেখেও তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে অমর হয়ে গেলেন। কিন্তু অপরের পক্ষে তা সম্ভব হল না।

অমরত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা

আমাদের বলবার কথা এই যে, মানুষের প্রকৃতির

মধ্যে সৃষ্টি করবার আদিম প্রেরণা থাকে ; সেই প্রেরণা কোনও কোনও ব্যক্তিকে সাহিত্য বা কাব্য সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করে সে সৃষ্টি সার্থক ও সফল হয় চিকীর্ষা মননক্রিয়া বুদ্ধি ও বোধশক্তির সমন্বয়ে। এ সকলের সুপ্রয়োগে কবি কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। বর্তমানে কবি-কৃতির এ সকল মৌল-নীতি অনেক ক্ষেত্রেই উপেক্ষিত হতে দেখা যায়। পার্থিব সম্পদের প্রাচুর্য কবির পক্ষে কাম্য নাও হতে পারে, কিন্তু তার কাব্যে অপার্থিব অথচ সাধনাসিদ্ধ অমরত্বের দাবী থাকবে না, বা জীবনের পূর্ণতায় আনন্দলাভের আকাঙ্ক্ষা থাকবে না এটা হতে পারে না। সৃষ্টির প্রেরণার সঙ্গে কাব্য-সাধনার যে নিগূঢ় সম্পর্ক তার মধ্যে অমরত্ব লাভের আশাও অনুপস্থিত নয়। ভ্যালেরি তাঁর "Reflection on the Modern World" পুস্তকে বলেছেন, "Thought of posterity or immortality was for the artist, an unparalleled source of energy." অর্থাৎ ভবিষ্যৎ-বংশধরদের কাছে নিজের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ অমরত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা শিল্পীর পক্ষে উৎসাহ উদ্দীপনার অতুলনীয় উৎস। কবিকীর্তি বা কাব্যের অমরত্বলাভ সৃষ্টি প্রয়াসের ক্ষেত্রে একেবারেই গৌণ নয়। কাব্য ব্রহ্মস্বাদের তুল্য বলেই তা অমৃত—অতএব কালজয়ী প্রতিষ্ঠায় তা অমর। তার আকর্ষণ কবিকর্মকে অনুপ্রাণিত করে একটি নিবিষ্ট ও গভীর ভাব-তন্ময়তার সাধন-পর্যায়ে উন্নীত করে। অতএব ভাববস্তু রসবস্তুর প্রেরণা কাব্য-সৃষ্টির মূলে থাকলেও অমরত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা যদি সেই সঙ্গে কাব্য সাধনায় কবিকে উদ্বুদ্ধ করে তাতে জীবন চেতনার সুলক্ষণই প্রকাশিত হয়।

ইন্দ্রিয়-মন-কাব্য

কাব্য-সৃষ্টির মূলগত প্রেরণার আর একটি দিক আছে। যদি বলা যায় যে, কাব্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সম্ভোগ-সুখের বিভিন্ন অনুভূতি থেকে উদ্ভূত, তা হলে নীতি-বাগীশরা হয় ত চোখ রাঙিয়ে উঠবেন। আমাদের সমাজে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সত্ত্বেও তথাকথিত লোকাচার ও আচরণনীতির দিক থেকে ইন্দ্রিয় শব্দটির এমনি একটি অর্থ দাঁড়িয়েছে যে, ঐ কথাটির উল্লেখমাত্রই আমরা সচকিত হয়ে উঠি। আমরা দৈহিক লালসা বা জৈব উত্তেজনার আকররূপেই ইন্দ্রিয়কে বিচার করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। আমাদের কামনা ইন্দ্রিয়-আশ্রয়ী ; কামনা অগ্নি, তার ইন্ধন আহৃত হয় আমাদের চারিদিকের পরিবেশ থেকে—যেখানে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য, অনুরাগ ও আকর্ষণ থরে থরে সাজান আছে, সক্রিয় মন তার সন্ধানে সর্বদাই ব্যস্ত। একদিক থেকে এ যুক্তির সারবত্তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু আমরা কি শুধু দেহ-ধর্মের দিক থেকেই এর বিচার করব?

ইন্দ্রিয় শব্দের আভিধানিক অর্থ, জ্ঞানসাধনের যন্ত্র ; যার দ্বারা পদার্থের জ্ঞান জন্মে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় : বাক, পানি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় : মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, এই চারটি অন্তরেন্দ্রিয়, আর মন হচ্ছে সকল ইন্দ্রিয়ের নিয়ামক। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, কবির অন্তর এবং বাইরের উপলব্ধি ইন্দ্রিয়-সাপেক্ষ অর্থাৎ জ্ঞানসাধন ও কাব্য-সাধনা ইন্দ্রিয়-অনুভূতির বাইরে হয় না। কি জ্ঞানেন্দ্রিয়, কি কর্মেন্দ্রিয়, কি অন্তরেন্দ্রিয় সকলকেই চালনা করে মন আর সেই মনের লীলাখেলাতেই কবি কাব্য রচনা করেন। কিন্তু এমনি আমাদের বিভ্রান্ত বিচার-বুদ্ধি যে, ইন্দ্রিয় বলতে তার কামজ-লালসা ও তার আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকলাপ ছাড়া আমরা আর কিছুই বুঝতে চাই না।

কবি কাব্য-রচনার পূর্বে ইন্দ্রিয়গ্রামের সাহায্যে তাঁর লক্ষ্য বস্তুটিকে অন্তরের সঙ্গে উপলব্ধি করতে চান, সে উপলব্ধি শক্তির গভীরতা ও প্রখরতা আছে বলেই কাব্যের বিচিত্ররূপে আমরা সমগ্র বস্তুটিকে প্রতিফলিত হতে দেখি। যা আমাদের চির চেনা ছিল, হয় ত বা মনের অন্তরালে, আমাদের অজ্ঞাতসারে হারিয়ে গিয়ে ছিল, তাকে আবার চোখে দেখি, অন্তরে অনুভব করে আনন্দ পাই ; এ আনন্দকেও আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই অনুভব করি ; কবির ইন্দ্রিয়লব্ধ কাব্য-সাধনার অপরূপ মূর্তিটি ভাব, ভাষা ও ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়েই আবির্ভূত হয়।

"Poetry is sensuality of the mind—because poetry is in relation with the forms, and images of ideas—forms, images, sensations, impressions, emotions, attached to ideas are the sensual or, if you prefer to call it the sensuous side of things"—কথাটা একটু পরিষ্কার করে বলা যাক। মনের যে ধারণা বা ভাব এবং চিন্তা—কাব্যের সঙ্গে তার নিকট সম্পর্ক ; সে সম্পর্ক ইন্দ্রিয়লব্ধ অনুভূতি থেকে গড়ে ওঠে। বহু বিচিত্র ভাবের ঘরে কাব্যের বসতি ; ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান, অনুভূতি ও কর্মের দ্বার দিয়েই তার প্রবেশলাভ ঘটে। বহির্বিশ্বের সংস্পর্শে এসে দেহের ভিতর যে ভাবান্তর ঘটে, মনের মধ্যে যে অনুভূতি সঞ্জাত হয়, তার রূপায়ণই দেখি কাব্যে, সুতরাং

কাব্য হচ্ছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের ছন্দালঙ্কৃত ভাষার ভাবময় রূপ। যিনি দার্শনিক তিনি বস্তু ও ভাবধারণার মধ্যে প্রবেশ করে তত্ত্বের সন্ধান করেন—কিন্তু কবির কাজ তা নয়—তিনি ইন্দ্রিয়গ্রামের সাহায্যে সত্য, সুন্দর ও শিব অর্থাৎ মঙ্গলের সাধনা করেন, কবিদৃষ্টিতে প্রতিভাত বিস্ময়কে তিনি একটি আঙ্গিকের সাহায্যে প্রকাশ করেন তত্ত্ব যেখানে গৌণ কবির লক্ষ্যও সেদিকে নয়, তবে কবিমানসের সহজাত ও স্বাভাবিক অভিব্যক্তির উচ্চগ্রামে যদি কোথাও কোনও গভীর তত্ত্ব আপনা থেকেই প্রকাশ পায় তার জন্য কবিকে কেউ তাত্ত্বিক বলবে না, বরং বলবে তত্ত্বজ্ঞানী-কবি। কবির কাছে কবিখ্যাতি অবশ্যই কাম্য, কিন্তু তাত্ত্বিকখ্যাতিও অবাঞ্ছনীয় নয়। যিনি কেবল দৈহিক জীবনের ভোগ-লালসার মধ্যে দিন যাপন করেন—তাকে আমরা বলি ইন্দ্রিয়পরবশ, বস্তুজগতের যে পথে এবং যে প্রকারে ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করা যায় তিনি সেই পথে চলেন এবং সেই প্রকার জীবনই একমাত্র কাম্য বলে গ্রহণ করেন। কিন্তু কবির অন্তরেন্দ্রিয়ের প্রেরণাশক্তি একই ভাবে মন বুদ্ধি অহঙ্কারকে আচ্ছন্ন করে তা দৈহিক ভোগসুখের প্রেরণার শক্তি নয়। বস্তুজগতের রক্তমাংসের দেহকে বর্জন করে নয়, তার কাছে আত্মসমর্পণ করেও নয়, তাকে স্বাভাবিক ভাবে স্বীকার করে তার বিচিত্র অভিব্যক্তিকে অনুধাবন করে—জীবনধর্মে তাকে প্রতিষ্ঠিত করে কবি কাব্য রচনা করেন। কবিমানসের ক্রিয়া ইন্দ্রিয়ানুগ হয়েও ইন্দ্রিয়পরবশ নয়। তবে একথাও অসঙ্কোচে বলা প্রয়োজন যে, ইন্দ্রিয়সুখের কামনা ভোগায়তনে পূর্ণ হলে যে কাব্যের সৃষ্টি হয় তা রসোত্তীর্ণ শ্রেষ্ঠ কাব্য বলে সকল কাব্য-সাহিত্যেই প্রশংসিত হয়ে থাকে, কিন্তু সেখানে রসোত্তীর্ণতাই বড় কথা—শ্লীলতা অশ্লীলতার প্রশ্ন সেখানে অবান্তর, যদি রসাভাস না ঘটে থাকে, রুচিবিগর্হিত প্রকাশভঙ্গিতে আর্টের ধর্ম লজ্জিত না হয়ে থাকে। কাব্যকলা সুরুচিসম্মত ও সূক্ষ্ম রসবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। সাহিত্যে বা কাব্যে Crudity বা স্থূল হস্তাবলেপ ঘৃণার যোগ্য নয়। কবি Psycho-analist নন—তিনি রসবেত্তা ও রসস্রষ্টা। মহাকবি কালিদাস-রচিত "উত্তরমেঘে"র সম্ভোগ বর্ণনা এ বিষয়ের একটি প্রাসঙ্গিক উদাহরণ।

ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই কবি সত্যের সন্ধান পান—সে সত্য একমাত্র দেহবাদের লালসা-সংপৃক্ত অভিজ্ঞতা নয়, তা চিরন্তন এবং বিশুদ্ধ আত্মিকজ্ঞানে সমৃদ্ধ।

কবি স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা থেকেই সৃষ্টি করেন, বস্তুজগতের সঙ্গে তার সংস্রব নেই এটা অর্বাচীনের উক্তি। যদি কেউ বলেন, কবি চিন্তাকে পরিহার করে চিত্তকে শ্লথ, মনকে বিকল এবং দেহকে গতিহীন করে এমন একটি ঊর্দ্ধলোকে বিচরণ করেন যেখানে তিনি পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কাব্য-রচনার সুযোগ পান তা হলে সে উক্তিও অগ্রাহ্য। অবশ্য ভোগ-বিরাগী-যোগীর পক্ষে এমন একটি তুরীয়ভাবে অবস্থান করা সম্ভব, কিন্তু যদি আত্মসমাহিত যোগীর সঙ্গে কবির তুলনা করা হয়, তাহলে এই কথাই বলতে হয় যে যোগীর আত্মসমাহিত অবস্থার সঙ্গে কবির আত্মসমাহিত অবস্থার তুলনা যুক্তিসিদ্ধ নয়, কারণ, কবি সৃষ্টি করেন আত্মস্থ হয়ে ভাবসমাহিত মুহূর্তে তিনি যোগী হলেও তিনি জগৎ-সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন নন। কাব্যের উপাদান আহৃত হয় বস্তুজগৎ থেকে, সেটা কবিমানসে ভাবস্মৃতি হয়ে ক্রমশঃ প্রকাশের ভাষা খুঁজতে থাকে। এটা বৈজ্ঞানিক সত্য, এ বিষয়ের বিশদ আলোচনা আমরা অন্যত্র করেছি। কবি একাধারে দ্রষ্টা ও স্রষ্টা—ভাবুক ও বক্তা, ভোক্তা ও ত্যাগী, ধ্যানে তন্ময়, জ্ঞানে আত্মসচেতন। চিত্তের সংক্রমণ যেমন এই পৃথিবীতে থেকে বহু ঊর্দ্ধে তেমনি তাঁর বিচরণক্ষেত্রও সেই পৃথিবীরই ধূলামাটির পথে পথে। পঙ্কের পদ্ম যেমন কবির কাছে মনোলোভা, তেমনি পঙ্কের তিলকও কবির ললাটে তাঁর কাব্যকৃতির জয় ঘোষণা করতে পারে কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করবে কবির কবি-কীর্তির নিঃসংশয় স্বীকৃতির উপর।

আবার একথাও সত্য যে, সাধারণ মানুষ থেকে কবি সম্পূর্ণ পৃথক, যখন তিনি কাব্য রচনা করেন তখন তাঁর জীব-সত্তা উচ্চস্তরে অবস্থিত। এই জীব-সত্তা বা কবি-সত্তা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উজ্জীবিত হয়; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুজগতের অণুপরমাণুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন অথচ সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি সাধারণ মানুষ থেকে পৃথক—পৃথিবীতে থেকেও তিনি একাকীত্বের নিঃসঙ্গতায় আত্মসমাহিত। বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরঙ্গে ও বহিরঙ্গে কবির লীলাখেলা। ইন্দ্রিয়গ্রাম সেই প্রকৃতির চির-রহস্যময় প্রাসাদপুর প্রবেশের বিভিন্ন দ্বারদেশ মাত্র।

দ্রাবিড় সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু মাদুরা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

রাত পৌনে দশটায় মাদুরা পৌঁছলাম। অজানা দেশ, নিরাপদ আশ্রয়লাভের চিন্তা অবশ্যই ছিল—সেই সঙ্গে আশাও করেছিলাম, মাদ্রাজের পর যে শহরের এত নামডাক সেখানে নিরাশ্রয়ে রাত কাটবে না। হোটেল ধর্ম্মশালায় স্থানাভাব হলেও রেলওয়ে রেষ্টরুম ত আছে।

পৌঁছে দেখি, রাত দশটা এই শহরের পক্ষে কিছুই নয়। দিনের মতোই লোকজনের ভিড় আর আলোর রোশনাই : জমজমাট শহর !

মজুর মোট মাথায় নিয়ে বলল, গাড়ীর দরকার হবে না—পাঁচ মিনিট হাঁটলেই ধর্ম্মশালা। কোন্‌খানে যাবেন—ছত্রমে, না ধর্ম্মশালায় ?

চলতি কথায় বলে—যার নাম ভাজা চাল তারই নাম মুড়ি। ধর্ম্মশালা আর ছত্রমের তফাৎটা প্রায় ওই রকমই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রভেদ একটু আছে। যেমন তাঞ্জোরের রাজছত্রমে তিন শ্রেণীর ঘরের জন্য তিন রকম ভাড়ার ব্যবস্থা। কাঞ্চীপুরমে অথবা পক্ষী-তীর্থেও ছত্রমের ভাড়া গুণতে হয়। ধর্ম্মশালা সর্ব্বত্রই নিষ্কর।

মাদুরার ছত্রম্‌টি খুবই কাছে, ষ্টেশনের নাক-বরাবর সোজা। নাম মঙ্গাম্মল ছত্রম্‌। নায়ক বংশের একজন রাণী স্বনামে এটির প্রতিষ্ঠা করেন। এরই তিন-চারখানা বাড়ীর পরে গুজরাট ধর্ম্মশালা। ধর্ম্মশালাতেই আশ্রয় নিলাম। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ত্রিশ বছর আগেকার স্মৃতি-ভারে মনটা ভারী হয়ে উঠল। ১৯২৮ সনে ধর্ম্মশালাটি সবে তৈরী হচ্ছিল আমরা আশ্রয় নিয়েছিলাম এখানে। খান তিন-চার ঘর মাত্র তৈরী হয়েছিল, রন্ধনশালা, শৌচাগার, জলের কল কিছুই ছিল না তবু বিদেশে এটি পরম নির্ভরযোগ্য আশ্রয় বলে মনে হয়েছিল। সেদিন যাঁরা আমাদের সঙ্গে দক্ষিণতীর্থ-পরিক্রমায় এসে এই ধর্ম্মশালায় উঠেছিলেন, তাঁদের বেশীর ভাগ মানুষই পৃথিবীর ধর্ম্মশালা ছেড়ে নিজ বাসভবনে চলে গেছেন—বর্ত্তমান ধর্ম্মশালায় নূতন অবয়বে পুরাতনের চিহ্নমাত্র নাই। চিহ্ন বুঝি এমনি করেই মুছে যায়, কিন্তু স্মৃতি বড় অকরুণ ! ধর্ম্মশালায় পা দিতেই পুরাতন স্মৃতি অতীতের অন্ধকারে ক'টি অগ্নি-অক্ষর জ্বালিয়ে দিলে। মনে হ'ল, নিরবধি কালের খেলাঘরে পাতা রয়েছে একটি বিরাট পাশার ছক। অসংখ্য ঘুঁটির মতো আমরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছি সেই ভুবনজোড়া ছকে। এক অদৃশ্য লীলাধর—তিনি পুরুষ নন—নারীও নন—দিব্যশক্তির এক ঘনীভূত সত্তা। জগতের যাবতীয় প্রাণীর সুখ-দুঃখে নির্লিপ্ত অথচ প্রসন্ন উজ্জ্বলকায় ঘুঁটিগুলিকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছেন কোন্ লক্ষ্যস্থানে, কেউ জানে না। অথচ তাঁর লীলাকৌতুকে :

'চলিতেছে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি প্রাণী।
চলিতে চলিতে থামে, পণ্যভার দিয়ে যায় কাকে,
পশ্চাতে যে রহে নিতে—ক্ষণ পরে সে-ও নাহি থাকে।'

বিদ্যুৎ-উদ্ভাসে সেই চলমান রূপহীন বিরাটকে আমি অনুভব করলাম। জানি, ইনি ক্ষণে ক্ষণে নাই, মহাক্ষণের পলকপাতের মুহূর্ত্তে এঁর স্থিতি। এঁরই খেলায় আনন্দে সুখ-দুঃখের ভার বহন করেও ধরণী প্রতিনিয়ত পরিপূর্ণ।

পরের দিন সকালবেলায় দেখি ধর্ম্মশালা লোকে লোকারণ্য ; তিল ধারণের স্থান নাই। শ্রীরঙ্গম ধামে দেখা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সেই বড় দলটি এই ধর্ম্মশালায় উঠেছেন। মঠাধীশ শ্রীভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ আসছেন পরের ট্রেনে—বেলা দশটা নাগাদ তিনি মাদুরায় পৌঁছবেন। তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবেন মাদুরা-বাসী—সেই আয়োজনে সর্ব্বত্র সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। ধর্ম্মশালার সামনে দেখলাম, বিরাটকায় একটি হাতীর পিঠে সুসজ্জিত হাওদা, ছত্র ও চামরের ব্যবস্থাও রয়েছে। এসেছেন শহরের মান্যগণ্য মহাজনেরা—পৌরপ্রধান, আরক্ষাধ্যক্ষ, বিচারপতি, উকিল-ব্যারিস্টার, বণিক এবং প্রধান নাগরিকরা। এঁদের সঙ্গে গৌড়-দেশাগত শতসংখ্যক যাত্রী ত যোগদান করবেনই। বিরাট সে দলটি নামকীর্ত্তন করতে করতে শহরের কিছু অংশ প্রদক্ষিণ করে এক শ্রেষ্ঠীভবনে গিয়ে থামবে। সেখানে স্বামীজীকে অভ্যর্থনা-অভিনন্দন দেওয়া হবে। সেইখানেই অপরাহ্নে বসবে সভা—স্বামীজী শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মমত ব্যাখ্যা করবেন। সভাশেষে শতসংখ্যক গৌড়-দেশজ অতিথিকে ওঁরা ভূরিভোজে সৎকৃত করবেন শুনতে শুনতে আমাদের বুকও গৌরবে ফুলে উঠল কোথায় বাংলা আর কোথায় মাদুরা। হাজার হাজা

মাইলকে প্রেমধর্ম্মের ডুরি দিয়ে কি মধুর বন্ধনেই না বেঁধে রেখে গেছেন গৌরাঙ্গসুন্দর। সাড়ে চারশো বছরের কালস্রোত সে বাঁধনকে একটুও শিথিল করতে পারে নি ত! এই মাদুরাতেই ভক্ত রামদাসের সংশয় ভঞ্জন করেছিলেন চৈতন্যদেব সে কথা পূর্ব্বেই বলেছি। এই স্থানকে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলছেন—দক্ষিণ মথুরা। আর্য্যেরা দ্রাবিড়দেশে এসেও তাঁদের অতি প্রিয়ভূমি মথুরাকে ভুলতে পারেন নি, নামের সঙ্গে ইতিহাসের এই সম্পর্কটুকুই তা প্রমাণ করছে। সম্প্রতি ষ্টেশনের নাম হয়েছে মধুরাই। আমরা চলতি নাম মাদুরা বলব।

পাশ্চাত্ত্য ভ্রমণকারীরা মাদুরাকে এথেন্সের সঙ্গে তুলনা করেন। মাদুরা কিন্তু মন্দিরময় শহর নয়—একটিমাত্র মন্দির নিয়েই তার গৌরব। এই একটি মন্দির শুধু দক্ষিণ ভারতে নয়—সারা ভারতে অদ্বিতীয়। যদিও রামেশ্বর মন্দিরের বিরাট দালানের চিহ্ন এখানে নাই, কিংবা শ্রীরঙ্গমের সপ্তগোপুর বিশিষ্ট অসংখ্য মণ্ডপ-শোভিত বিরাট পরিধিতে স্ফীতকায় নয়, তবু দ্রাবিড়-শিল্পরীতির বিন্যাসে এ মন্দিরের তুলনা নাই। এই মন্দিরে প্রতিটি মণ্ডপের স্তম্ভ, অলিন্দ, দেওয়াল, কুলুঙ্গি প্রভৃতিতে শিল্পীদলের স্বাক্ষর রয়েছে। এলোমেলো স্বাক্ষর নয়—যেমন তেমন করে একটা ছবি আঁকা নয়—পুরাণের মহাভারতের এক-একটি কাহিনী আগুন্ত উৎকীর্ণ রয়েছে কোনো কোনো মণ্ডপে। শুধু পুরাণ-মহাভারত নয়—ইতিহাসও রয়েছে কিছু কিছু; আর রয়েছে নাট্য শাস্ত্রোল্লিখিত নৃত্যভঙ্গিমার দৃষ্টান্তগুলি। যত কাহিনী শিল্পকর্ম্মও তত। শোনা যায় তেত্রিশ লক্ষেরও বেশী ছবি মীনাক্ষী-সুন্দরেশ্বর মন্দিরগাত্রে আর মণ্ডপে উৎকীর্ণ রয়েছে। একশো কুড়ি বছর ধরে চলেছিল এই বিপুল শিল্পসৃষ্টির কাজ। মন্দিরের গায়ে কালের হস্তক্ষেপ এখনও রূঢ় হয়ে ওঠে নি কেন না এ মন্দির বহু পুরাতন হলেও বাধা বদল করেছে মাঝে মাঝে। মালিক কাফুরের দাক্ষিণাত্য অভিযানের সময়ে ধনখ্যাতির দায়ে এটি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। লুণ্ঠনকারীদের মধ্যে মতভেদ ঘটায় শুধু সুন্দরেশ্বর-মীনাক্ষীর বিমানদুটি রক্ষা পেয়েছিল।

প্রাচীনকালে পাণ্ড্য রাজবংশের সময়ে এই মন্দির তৈরী হয়। তাঁরা নাকি অনেকগুলি গোপুরম তৈরি করেছিলেন যার একটিও আজ নাই। তাঁদের সময়কার স্তম্ভ-মণ্ডপ-সিংদ্বার কিছুই নাই। সে সময়ের শিল্পকলাকে চিহ্নিত করাও দুষ্কর। পাণ্ড্য বংশ দীর্ঘকাল রাজত্ব করার পর চোলরা তাদের হাত থেকে কেড়ে নেয় মাদুরা। চোলরা আধিপত্য করেছিল প্রায় দু'শো বছর ধরে—দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত। তার পরে আবার পাণ্ড্যদের হাতে ফিরে আসে মাদুরা। অতঃপর মালিক কাফুরের অভিযান। মুসলমান আধিপত্যের স্থিতিকাল মাত্র আটচল্লিশ বৎসর। এর পর বিজয়নগর এসে মুসলমানদের তাড়িয়ে পাণ্ড্য বংশকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে এই রাজ্যে। দুঃস্বপ্নের শেষ হ'ল, মাদুরায় পাণ্ড্য বংশ প্রতিষ্ঠিত হ'ল, কিন্তু পাণ্ড্যরা তখন হৃতবল। বিজয়নগরের মুখ চেয়েই তাঁরা রাজ্য চালনা করতে লাগলেন। সুযোগ বুঝে তাঞ্জোর থেকে চোলরা আবার হানা দিয়ে দখল করে নিল মাদুরা। খবর পৌঁছল বিজয়নগরের রাজসভায়। বিজয়নগর তাঁর এক সুদক্ষ সেনাপতি নাগমা নায়ককে পাঠালেন এই বিদ্রোহ দমন করতে। চোলেরা পরাজিত হ'ল, কিন্তু পাণ্ড্যরা আর ফিরে এল না মাদুরায়। নাগমা নায়ক সেখানে সর্ব্বে-সর্ব্বা হয়ে বসলেন।

সংবাদ পেয়ে বিজয়নগর ক্রুদ্ধ হয়ে সমরসভা আহ্বান করলেন। জানালেন, সেনানায়কদের জীবিত বা মৃত বিদ্রোহী নায়ককে এই সভায় নিয়ে এলে প্রচুর বকশিস দেওয়া হবে। এই ঘোষণায় সভা হ'ল নিস্তব্ধ! শত যুদ্ধজয়ী রণকৌশলী বীর নাগমাকে এভাবে হাজির করার সাধ্য কোন্ যোদ্ধার বা আছে!

অবশেষে এক দীর্ঘকায় যোদ্ধা উঠে দাঁড়ালেন। তরবারি ছুঁয়ে শপথ করলেন জীবিত বা মৃত সেই বিদ্রোহীকে বিজয়নগরের সিংহাসনতলে এনে হাজির করবেন। সভা দ্বিতীয়বার নিস্তব্ধ হ'ল এমন অঘটনও কি ঘটে! এই দীর্ঘদেহী যোদ্ধা আর কেউ নন—বিদ্রোহী নায়কের পুত্র বিশ্বনাথ নায়ক!

রাজা ত হতবাক! বিদ্রোহীর পুত্রকে বিশ্বাস করে প্রচুর সৈন্যসামন্ত দিয়ে কি বিপদ ডেকে আনবেন! অথচ যুবকের শৌর্য্য বীর্য্য ও সততায় তাঁর বিশ্বাস ছিল। এই বীর মুসলমানদের বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধ-পরিচালনা করেছে, বহু যুদ্ধ জয় করেছে। এর সাহস ও বিশ্বাসের তুলনা হয় না। অবশেষে যুবকের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তাঁকে সম্পূর্ণ মত দিতে হ'ল।

যুদ্ধ হ'ল পিতাপুত্রে। পিতা পরাস্ত ও বন্দী হ'ল। বিশ্বনাথ বিজয়নগরের রাজসভায় এসে পিতার হয়ে ক্ষমা চেয়ে নিল। রাজা ক্ষমা করলেন বিদ্রোহীকে এবং বিশ্বনাথ নায়কের হাতেই তুলে দিলেন মাদুরার শাসন কর্ত্তৃত্বভার। পাণ্ড্যরা অবশ্য নামে মাত্র রাজা রইল।

বিশ্বনাথ নায়কের সময় থেকে আরম্ভ হ'ল মাদুরার স্বর্ণযুগ। মাদুরাকে গড়ে তুলবার কাজে আর একজন দক্ষ রাজনীতিজ্ঞের সাহায্য পেয়েছিলেন বিশ্বনাথ। এঁর নাম আদিনাথ মুদালি। ইনি ছিলেন নায়ক রাজার প্রধান মন্ত্রী এবং প্রধান সেনাপতিও। বিশ্বনাথের বীর্য্য ও আদিনাথের বুদ্ধি দুইয়ের সম্মেলনে মাদুরা দ্রুত উন্নতির পথে উঠতে লাগল। শহরকে নূতন রূপ দিলেন বিশ্বনাথ। পাণ্ড্যরাজকৃত পুরাতন দুর্গ-পরিখা ভেঙ্গে ফেললেন—দু'দফা প্রাচীর-বেষ্টনী দিয়ে নগরীকে করলেন সুদৃঢ়। এই প্রাচীরের ভগ্নাংশ আজও সরকারী হাসপাতালের কাছে দেখতে পাওয়া যায়। সুদৃঢ় প্রাচীরের মধ্যে নগরীকে শিল্পশাস্ত্রসম্মতভাবে গড়ে তুললেন। মীনাক্ষী মন্দিরকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে চওড়া চওড়া রাজপথগুলিকে উদ্যানের আকারে নিয়ন্ত্রিত করলেন। এর সাক্ষ্যস্বরূপ চিত্রাই, অবনী, মাসি নামের পুরাতন পথগুলি আজও উত্তর, দক্ষিণ এবং পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রসারিত রয়েছে। জীর্ণ মন্দির সুসংস্কৃত হ'ল। ব্রাহ্মণদের জন্য নির্ম্মিত হ'ল আবাসগৃহ। মাঠে জলসেচের ব্যবস্থা, পথে দস্যুভয় নিবারণ এবং বন কাটিয়ে শহরের পরিধি-বিস্তার—এক কথায়, এই বিশ্বনাথ নায়কের শাসনকালে বহুদিনের অরাজকতা ও অত্যাচার থেকে মুক্তিলাভ করল মাদুরা। আরও একটি বড় কাজ করেছিলেন বিশ্বনাথ। পাণ্ড্যবংশীয়রা তিনেভেলির কাছে সমবেত হয়ে মাদুরা আক্রমণের ষড়যন্ত্র করছিল—অপূর্ব্ব কৌশলে সে বিদ্রোহের মূলোচ্ছেদ করলেন তিনি। নিজ রাজ্যকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করার জন্য বিশ্বনাথ সামন্তপ্রথার প্রবর্ত্তন করলেন। এই সামন্ত-সর্দ্দাররা নিজ নিজ ভূমিখণ্ডে শাসনদণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন—রাজস্ব আদায় ও ভোগ করতে পারবেন—নামমাত্র মাদুরার অধীন থাকবেন। শুধু মাদুরা আক্রান্ত হলে বা কোনও বিদ্রোহ ঘটলে নিজ নিজ সৈন্যসামন্ত নিয়ে নায়ক রাজার পতাকা তলে সমবেত হতে হবে। এইটুকু মাত্র বাধ্য-বাধকতা। পরে দক্ষিণ দেশের অন্যান্য রাজ্যও এই নীতি গ্রহণ করেছিল।

নায়ক বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বনাথ ছিলেন শ্রেষ্ঠতম রাজা, কিন্তু থিরুমল নায়কের খ্যাতি ছিল আরও বিস্তৃত। অনেকের মতে ক্ষমতায়, ঐশ্বর্য্যে, ধনজন সমৃদ্ধিতে মাদুরা শীর্ষস্থানে উঠেছিল তাঁরই রাজত্বকালে। ইনি ৩৬ বছর রাজত্ব করেছিলেন। ছোটখাট বহু মন্দির, টেপ্পাকুলম (সরোবর), গোপুরম্ ছাড়াও বিশাল এক প্রাসাদ তৈরি করিয়ে ছিলেন থিরুমল। সে প্রাসাদের অপরূপ ভাস্কর্য্য-শিল্প আজও অগণিত দর্শককে বিস্ময়বিমুগ্ধ করে। মাদুরা মন্দিরের সবচেয়ে বড় গোপুরম—রায় গোপুরম (সম্ভবতঃ এটি বিজয়নগরের বিখ্যাত রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের স্মরণে উৎসর্গীকৃত) অসম্পূর্ণ ছিল। থিরুমল চেষ্টা করেছিলেন এটিকে সম্পূর্ণ করতে, কৃতকার্য্য হন নি। আর একটি গোপুরম্ সম্পূর্ণ করতে পারেন নি বলে তার নামই রয়ে গিয়েছিল মোট্টা গোপুরম্। 'মোট্টা'র অর্থ হ'ল টাক—অর্থাৎ কেশহীন অসম্পূর্ণ শির। এই মোট্টা গোপুরমের কাছে আশ্চর্য্য সঙ্গীত স্তম্ভ আছে পাঁচটি। প্রতিটি স্তম্ভ অখণ্ড এক গ্রানাইট পাথর কেটে তৈরী হয়েছে। বাইশটি সরু সরু থামের সমন্বয়ে এক একটি স্তম্ভ। এই সরু থামগুলিতে অল্প আঘাত করলে যে শব্দ বার হয়—তা সুরের পোত্রজ। ষড়জ, রেখাব, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম প্রভৃতি সপ্ত সুরের বৈচিত্র্য এই ধ্বনি-তরঙ্গে ধরা পড়ে। এমনি ধারা সুরস্রাবী স্তম্ভ আর এক জায়গায় আমাদের চক্ষু ও শ্রোত্রকে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ করেছিল—সে হ'ল কন্যাকুমারী থেকে আট মাইল আগে শুচিন্দ্রম দেউলে।

থিরুমল ছিলেন ক্ষমতাদর্পী উচ্চাভিলাষী রাজা। মন্দির, প্রাসাদ প্রভৃতিতে শিল্পবিন্যাস করিয়ে নিজেকে খ্যাতিবান করার অভিলাষ ছিল তাঁর। এ সব করতে তাঁকে প্রচুর স্বর্ণ ব্যয় করতে হ'ত। মীনাক্ষী মন্দিরের আয়ের উপরও হস্তক্ষেপ করতেন মাঝে মাঝে—এজন্য পূজারী ব্রাহ্মণরা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না। থিরুমলের সহসা অন্তর্দ্ধান হওয়ার কাহিনীর সঙ্গে অনেককিছু জড়িয়ে আছে—ব্রাহ্মণদের রোষ তার মধ্যে অন্যতম। কথিত আছে—অসন্তুষ্ট ব্রাহ্মণেরা রাজাকে ধনলোভ দেখিয়ে মীনাক্ষী মন্দির-প্রাঙ্গণস্থিত একটি গুপ্ত সুড়ঙ্গগর্ভে নামিয়ে দেয়। রাজা সুড়ঙ্গে প্রবেশ করলে একখানা পাথর উঠিয়ে ঢেকে দেয় তার মুখ। তার পর বাইরের পৃথিবীতে কোনদিন দেখা যায় নি থিরুমলকে। মতান্তরে থিরুমলের খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রীতিই ওর পতনের কারণ।

থিরুমলের পরে নায়ক বংশে যাঁর খ্যাতি ছিল বিস্তৃত—তিনি হলেন রাণী মঙ্গাম্মল। এই বিধবা রাণী নিজ পৌত্রের নামে ১৫ বছর ধরে রাজ্য শাসন করেন। নরসাপ্পিয়া নামে একজন সুদক্ষ মন্ত্রী ও সেনাপতির সাহায্য নিয়ে ইনি দুরূহ শাসনকার্য্য পরিচালনা করতে পেরেছিলেন। এঁর সময়ে রাস্তাঘাটের উন্নতি হয়, পান্থশালা নির্ম্মিত হয়। ষ্টেশনের সামনে মঙ্গাম্মল ছত্রমূটি আজও এর সাক্ষ্য বহন করছে। রাজ্য সুশাসনে রেখেও রাণীকে কিন্তু লোকাপবাদ সহ্য করতে হয়েছিল। এঁর

শেষ জীবন কেটে ছিল কারাগারে। চরম নিষ্ঠুরতার মধ্য দিয়েই ওঁর বন্দীজীবনের অবসান হয়।

এর পরে নায়ক বংশে কোনো উল্লেখযোগ্য রাজার নাম পাওয়া যায় না। প্রায় দু'শো বছর শাসনদণ্ড পরিচালনা করে নায়ক বংশ মাদুরার রঙ্গমঞ্চ থেকে অপসৃত হয়। এর পর অল্প কিছুদিনের জন্য মাদুরার রাজস্ব আদায় করেছিলেন কর্ণাটের মুহম্মদ আলি। ইনি ছিলেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আশ্রিতজন। ১৮৪০ সনে মাদুরা পুরোপুরি ইংরেজ অধীনে থাকে। ওই সময়ে কালেক্টর ব্ল্যাকবর্ণ মাদুরার রক্ষণা-প্রাচীর ভূমিসাৎ করে শহরটিকে বাড়াবার সুযোগ করে দেন। প্রাচীর-বেষ্টনী মুক্ত হয়ে মাদুরার কলেবর আজ বেড়েই চলেছে। কৃতজ্ঞ মাদুরাবাসীরা একটি আলোকস্তম্ভে ব্ল্যাকবর্ণের স্মৃতিকে উজ্জ্বল করে রেখেছেন।

এ হ'ল মাদুরার রাজনৈতিক আকাশে কতকগুলি নক্ষত্রের জন্ম-মৃত্যুর সংক্ষিপ্ত কাহিনী। এরা চন্দ্রমণ্ডলকে কিঞ্চিৎ প্রভাবিত করলেও মাদুরার অন্য আকাশকে তমসাচ্ছন্ন করে নি কোনোদিন। এক অত্যল্পকাল স্থায়ী মুসলমান শাসন ছাড়া কোনো বিজয়ী রাজাই মীনাক্ষী সুন্দরেশ্বরকে অসম্মান করেন নি। এমনকি বিদেশী ইংরেজ বণিকও ১০৮ গিনির স্বর্ণহার তৈরি করে দেবীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে। কালেক্টার রাউস পীটার বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে দেবীকে উপহার দিয়েছেন—ঘোড়ার স্বর্ণ-পাদান। তিরুমলের মণিমুক্তাখচিত মুকুট কিংবা প্রাচীন পাণ্ড্য বংশের পেণ্ডাণ্ট অথবা ত্রিবাঙ্কুর, মহীশূর, নেপাল প্রভৃতি নরপতিবৃন্দের উপঢৌকন এই সত্যই কি প্রমাণিত করছে না—দেবী মীনাক্ষীর আসন রাজনৈতিক আবর্ত্তের ঊর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত!

দেবী মীনাক্ষীর কাহিনী কিন্তু ঐতিহাসিক ভিত্তিতে সুদৃঢ় নয়। দেবদেবীর কাহিনীতে অলৌকিক ঘটনা ও দেব-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন-কথা সহজলভ্য। নানা পুরাণ থেকে আহৃত এইগুলি। দেবী মীনাক্ষীর কাহিনীও পুরাণ অনুসৃত, যা মন্দির গাত্রে শিল্পনৈপুণ্যে প্রকাশিত। কিছু ইতিহাসের প্রলেপও রয়েছে তার মধ্যে। বই না পড়েও সুদক্ষ গাইডের মুখে ছবিগুলির পরিচয় নিলে আধ ঘণ্টার মধ্যেই গল্পটা জানা যায়। এই ছবিগুলি উৎকীর্ণ রয়েছে অষ্টশক্তি মণ্ডপে। মণ্ডপের আটটি স্তম্ভে শক্তিরূপিণী দেবীর প্রতিমূর্ত্তি, আর ছাদের অসংখ্য কুলুঙ্গীতে মীনাক্ষী-সুন্দরেশ্বরের বিভিন্ন ঘটনাশ্রয়ী মূর্ত্তি। মীনাক্ষীর জন্মকাল থেকে, যৌবনপ্রাপ্তি, রাজ্যশাসন, যুদ্ধজয়, পরিণয় প্রভৃতি আদ্যন্ত বিবরণে পরিপূর্ণ এই মণ্ডপ।

পুরাকালে পাণ্ড্য বংশে মলয়ধ্বজ নামে এক রাজা ছিলেন। পুত্রকামনায় রাজা পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন। যজ্ঞের হোমকুণ্ড থেকে আবির্ভূতা হন দেবী মীনাক্ষী (দ্রৌপদীর জন্মবৃত্তান্ত স্মরণীয়)। পুত্রপ্রাপ্তি না ঘটলেও রাজা মনোক্ষুণ্ণ হন নি, তাঁর মনঃক্ষোভের কারণ ছিল স্বতন্ত্র। তিনটি স্তন নিয়ে জন্মেছে কন্যা। এই কন্যার গতি কি হবে?

কিন্তু রাজাকে আশ্বস্ত করে দৈববাণী হ'ল, ভাবী স্বামীকে দর্শন করা মাত্রই কন্যার তৃতীয় স্তনটি লুপ্ত হয়ে যাবে। মীনের মত অক্ষি বলে কন্যার নাম হ'ল মীনাক্ষী। রাজার মৃত্যুর পর মীনাক্ষী বসলেন সিংহাসনে। তাঁর অপরূপ রূপলাবণ্যের কথা ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। পাণিপ্রার্থী রাজাদের দল আসতে লাগল রাজসভায়। মীনাক্ষী কিন্তু প্রতিজ্ঞা করলেন, যে বীরপুরুষ তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করতে পারবেন, তাঁরই গলায় তিনি অর্পণ করবেন বরমাল্য। এই সূত্র ধরে আরম্ভ হ'ল মীনাক্ষীর রাজ্যজয়ের পালা। একে একে বহু রাজা পরাজয় স্বীকার করলেন। অবশেষে এলেন রাজপুত্ররূপী সুন্দরেশ্বর। দুজনের সাক্ষাৎকার হল রণক্ষেত্রে। আশ্চর্য্যের কথা, সুন্দরেশ্বরকে দেখে দেবীর বদন ব্রীড়াভারে অবনত হ'ল, আর বক্ষমধ্যস্থ তৃতীয় স্তনটিও সেই সঙ্গে হ'ল লুপ্ত। অতঃপর যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দেবী সুন্দরেশ্বরকে পতিত্বে বরণ করলেন।

মীনাক্ষী-সুন্দরেশ্বরের বিগ্রহ দুটি পাশাপাশি মন্দিরে অবস্থিত। সুন্দরেশ্বরের মন্দিরটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। দেখে মনে হয় এইটিই প্রধান মন্দির। যা কিছু শিল্প-সমাবেশ সুন্দরেশ্বর মন্দিরকে ঘিরেই পূর্ণতা লাভ করেছে। পুরাণে মাদুরা কদম্ববনক্ষেত্র বলে উল্লিখিত হয়েছে; তারই চিহ্নস্বরূপ একটি শুষ্ক কদম্ববৃক্ষ সুন্দরেশ্বর দেউলের একধারে রক্ষিত আছে। এটিকে অবশ্য কদম গাছ বলে চেনা দুষ্করই। দিব্য বাঁধান বেদীর উপর স্বর্ণমূর্ত্তি ঘেরা একটি থামের তলায় ভক্ত নরনারীর পূজা-উপচার জমছে প্রতিদিন। সুন্দরেশ্বর মন্দিরের সম্মুখে রয়েছে বিখ্যাত কামবাটাদি মণ্ডপ, যার শিল্পঐশ্বর্য্যের তুলনা নাই দক্ষিণের আর কোনো মন্দিরে।

সুন্দরেশ্বর আর মীনাক্ষীকে নিয়ে এই দুটি মন্দিরে দেবসংসার পেতেছেন পুরোহিতদল। সকাল থেকে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত মীনাক্ষী আর সুন্দরেশ্বরকে নিয়ে নানা আচার অনুষ্ঠানের পালা—স্নান পূজা, ভোগ, আরতি, বেশ পরিবর্ত্তন, শয়ন প্রভৃতি যথা-নিয়মে সুসম্পন্ন হয়। এই দেব-পরিবারের আরও

সুভাষচন্দ্র বসু

জাপানের রাজকুমার ও রাজকুমারীকে সম্মান প্রদর্শনার্থে নিউ দিল্লীতে ছাত্র-সমাবেশের একাংশ

অনেকে পূজা পেয়ে থাকেন, তার মধ্যে ষড়ানন ও দ্বাদশ হস্তধারী সুব্রহ্মণ্য (কার্তিক) ও গজমুণ্ডধারী গণপতি প্রধান। গণপতির খাতির দেখলাম সবচেয়ে বেশী। একটি পৌরাণিক প্রবাদ প্রচলিত আছে ওঁর সম্বন্ধে। এক সময়ে হর-পার্ব্বতীর সাধ হয়েছিল গণপতিকে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করেন। তার উত্তরে গণপতি জানিয়েছিলেন, তিনি বিবাহ করবেন সেই কন্যাকে যে রূপে, গুণে, বুদ্ধিতে ও পরাক্রমে তাঁর জননী পার্ব্বতীর তুল্যা হবে। ত্রিভুবন অনুসন্ধান করে তেমন কন্যা নাকি মেলে নি। কুমার গণপতি তাই মীনাক্ষী-নায়কম্‌ মণ্ডপের প্রবেশ পথে অনুসন্ধিৎসু-দৃষ্টি মেলে আজও অন্বেষণ করছেন তেমনই রূপ, গুণ, শক্তিময়ী ভাবী বধূকে। এমন সজীব মূর্ত্তি এই মন্দিরেও কম আছে।

বেশীর ভাগ মানুষই মাদুরায় একটি বেলা কাটান—বড় জোর পুরো একটি দিন। মীনাক্ষী-সুন্দরেশ্বর দর্শন হলে তীর্থকামীর কাজ সারা হয়। অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠা যাদের কৌতূহল নিবৃত্তি করে তাঁরা স্তম্ভ আর প্রাচীরগাত্রে চোখ বুলিয়ে নেন। দেখেন গোপুরম, স্বর্ণকমল সরোবর, টেপ্পাকুলম, থিরুমল নায়কের প্রাসাদ, সহস্রস্তম্ভের দালান, অষ্টশক্তি, কামবাটাদি, ওমিস্রা কিলিক্কাটু, মীনাক্ষী-নায়কম্‌ প্রভৃতি মণ্ডপগুলি। অজস্র শিল্প-সৌন্দর্য্য ও কাহিনীকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার অবসর বা ধৈর্য্যও থাকে না সকলের। বিশেষ করে ভাল প্রদর্শক না মিললে পুরাণ বা ইতিহাসের কথাগুলি বোধগম্য হওয়াও কঠিন। আবার ঘুরতে ঘুরতে দেহ আর দৃষ্টি দুই-ই ক্লান্ত হয়ে ওঠে—স্মৃতির ভাণ্ডারে এত জিনিসকে ধরে রাখাও যায় না।

তবু ওরই মধ্যে মীন অক্ষি বিশিষ্ট দেবীকে এবং তাঁর স্বর্ণহীরক, মণিমুক্তাখচিত অলঙ্কারগুলিকে কিছুক্ষণের জন্য দেখতেই হয়। ভক্তিতে দু'চোখ বন্ধ করে মনের মাঝে একটি রূপের পদ্ম ফুটিয়ে তন্ময় হয়ে যাওয়া সহজ ; ভক্তের দর্শন এই ভাবেই সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু বাইরের ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্য কম কৌতূহল সঞ্চার করে না অধিকাংশ যাত্রীর মনে। তাই দেবীদর্শনের পর দৃষ্টি পড়ে মণ্ডপগুলির উপরে। মণ্ডপের কয়েকটি অত্যুজ্জ্বল চিত্রের নিকটে এসে চোখ বুলিয়ে চলে যাওয়া চলে না—দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে দেখতেই হয়।

যেমন কামবাত্তাদি মণ্ডপে মীনাক্ষী-সম্প্রদানের চিত্রটি। এই অপরূপ চিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে কে না বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে লক্ষ্য করেন পাথরের মূর্ত্তিতে জীবনের প্রকাশ! বরবেশী সুন্দরেশ্বর ও বধূবেশী মীনাক্ষীর দু'টি হাত মিলিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সম্প্রদান-কর্ত্তা চতুর্ভুজ বিষ্ণু। মুখে তাঁর রহস্যময় হাসি, দেবীর সলজ্জ ভঙ্গী ও ব্রীড়ানম্র ঈষৎ হাস্যময় আনন আর সুন্দরেশ্বরের আনন্দ-উদ্বেল প্রশান্ত মুখমণ্ডল! এই ছবি নিতান্ত অরসিক-চিত্তকেও শিল্পবোধের সামান্য স্পর্শ দিয়ে সচকিত করে তুলবেই।

শিবেরই আরও কয়েকটি ভঙ্গি—ধ্যানী শিব, নৃত্যরত শিব, যোদ্ধা শিব, দৈত্যমর্দ্দন শিব প্রভৃতি মনে রাখবার মতো। কৈলাস পর্ব্বতে পার্ব্বতীর সঙ্গে সমাসীন শিব-মূর্ত্তিটিও দৃষ্টি আকর্ষণ করে—বিশেষ করে দণ্ডায়মান বৃষ-রাজের ঘাড় ফিরিয়ে অবাক হয়ে সেই যুগল রূপ দেখার

শুচিন্দ্রম মন্দির

অপরূপ ভঙ্গিটি। নাট্যশাস্ত্র-বর্ণিত শিবের ললাট-তিলক নৃত্যভঙ্গিটিও অবিস্মরণীয়। এই দুরূহ নৃত্যভঙ্গিতে ছন্দ-পতন না ঘটিয়ে পদাঙ্গুলি ললাটে ঠেকিয়ে তিলক আঁকার অভিনয় করতে হয়। আর কৈলাস পর্ব্বত উত্তোলনের দৃশ্য—শিবের অঙ্গুলির চাপে পর্ব্বত ভারক্লিষ্ট রাবণের স্তুতিনতি ও বীণাবাদন। অপূর্ব্ব চিত্র এটি! সুন্দরেশ্বর দেউলের অতিকায় দ্বারপাল দু'টিকে কে উপেক্ষা করতে পারবেন? কিংবা সুব্রহ্মণ্য, সরস্বতী, রতি প্রভৃতিকে? আর একটি স্তম্ভে ক্ষোদিত বিষ্ণুর মোহিনীমূর্ত্তি—যাঁর কটাক্ষপাতে ত্রিভুবন যৌবন-চঞ্চল। এই মূর্ত্তির সম্মোহন শক্তি দু'টি তপোভ্রষ্ট ঋষিকে আনন্দ-উন্মত্ত করে তুলেছে—পাশাপাশি তিনটি স্তম্ভে এই মূর্ত্তিগুলিও কম লোভনীয় নয়। তারই পাশে অপাপবিদ্ধা সতী অনসূয়া রয়েছেন। মোহিনীর প্রতি অঙ্গে পুরুষচিত্তকে আকৃষ্ট করার উদ্দীপ্তি, আর অনসূয়ার নির্ম্মল শুচিস্নিগ্ধ লাবণ্যে প্রশান্তির প্রলেপ। পুরাণের এই দু'টি কাহিনী সর্ব্বজনবিদিত,

সুতরাং মূর্ত্তির পিছনে শিল্পীর রসবোধকে উপলব্ধি করা কঠিন নয়।

পুরাণ কাহিনী ছাড়াও কয়েকটি ঐতিহাসিক মূর্ত্তি দৃষ্টিকে টানে। যেমন হস্তীপৃষ্ঠে যোদ্ধবেশে পাণ্ড্য রাজার মূর্ত্তি, বিশ্বনাথ নায়ক, সস্ত্রীক থিরুমল নায়ক কিংবা মুথুরাম আয়ার ও তাঁর পত্নী।

অসংখ্য মূর্ত্তি দৃষ্টির সামনে মিছিল সাজিয়ে অন্তহীন শোভাযাত্রায় প্রদক্ষিণ করছে দেবী মীনাক্ষীকে—দেব দেব সুন্দরেশ্বরকে। বৃহৎ মিছিলের মাঝখান থেকে মানুষের যেমন পরিচয়ের আঙ্গুল ছুঁইয়ে পৃথক করে রাখা যায় না, তেমনি দু'একটি দিনে মীনাক্ষী মন্দিরের অসংখ্য ছবিকে মনে আশ্রয় দেওয়া কঠিন। এই মন্দিরে শুধু ইতিহাসের টুকরো ঘটনা ছড়িয়ে নেই, শুধু পুরাণের দেবদেবী ও কাহিনীকে শিল্প-মহিমায় উত্তীর্ণ করে দেওয়ার প্রয়াস

বিবেকানন্দ শৈল
কন্যাকুমারী দূরে

নাই—নাট্যশাস্ত্রানুমোদিত নৃত্যভঙ্গির দৃষ্টান্তগুলি—মুদ্রা, অলঙ্কার, ছন্দ সহযোগে ব্যক্ত করা হয়েছে। নৃত্য শিক্ষার্থী বা শিল্পীর পক্ষে এই মন্দির মহাতীর্থ।

এসব ত গেল মন্দিরের ভিতরের ব্যাপার, মন্দিরের বহির্ভাগে অর্থাৎ, প্রবেশ পথেও যাত্রীকে থমকে দাঁড়াতে হয়। এমন গগনস্পর্শী গোপুরম্ দক্ষিণতীর্থ ছাড়া ভারতবর্ষের কোন্ তীর্থেই-বা আছে! একটি দু'টি নয়—এক রাজার আমলেও তৈরী নয়। সেকালে দেব-মন্দিরের দুয়ার তৈরী যেন পুণ্যকৃত্যের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল। শ্রীরঙ্গমে দেখি সাতটি গোপুরম্—বিভিন্ন নরপতির সময়ে তৈরী হয়েছে। আর এক একটি গোপুরম্ তৈরীর সঙ্গে সঙ্গে মন্দির সীমানা বেড়ে গেছে।

মীনাক্ষী মন্দিরের চার দিকে চারটি বড় গোপুরম্, তার মধ্যে দু'টি আবার অসম্পূর্ণ। কিন্তু মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বে এখানে নাকি ছোট-বড় চৌদ্দটি গোপুরম ছিল। বর্ত্তমান গোপুরমগুলি নায়ক রাজাদের সময়ে তৈরী হয়েছে। পূর্ব্বে রায়া গোপুরম্ আর উত্তরে মোট্টা গোপুরম অসম্পূর্ণ। দক্ষিণের গোপুরমটি সবচেয়ে বড় আর সুদৃশ্যও। তবে গোপুরমে উৎকীর্ণ মূর্ত্তিগুলি শিল্প-সৌন্দর্য্যের প্রকৃষ্ট নিদর্শন নয়—সুসংবদ্ধ ত নয়ই। বহু বিদেশী পর্য্যটক বলেছেন, এগুলি সামঞ্জস্যহীন ও এলোমেলো ভাবে ছড়ান রয়েছে। তাঁদের অনুযোগ মেনে নিলেও এগুলি উদ্দেশ্যহীন ভাবে গোপুর-গাত্রে সন্নিবিষ্ট হয় নি। কারও কারও মতে একদা মন্দির অভ্যন্তরভাগে যাদের প্রবেশাধিকার ছিল না এগুলি সেই অচ্ছুৎদের জন্য। মন্দিরের মধ্যে কোন্ কোন্ দেবদেবী রয়েছেন তারই আভাস দেওয়ার চেষ্টা। যেমন শ্রীক্ষেত্রের পূর্ব্ব দুয়ারে পতিতপাবন মূর্ত্তি। যাই হোক্ পাণ্ড্য রাজবংশের সময় থেকে মন্দির-অভ্যন্তর ভাগের কারুকার্য্যের চেয়ে বাইরের শিল্পসৃষ্টিতে মনোযোগ দেওয়া হ'ত, ফলে গগনস্পর্শী গোপুরমের সৃষ্টি।

আরও একটি অনুযোগ অতিরিক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-বিশিষ্ট দেবদেবীর মূর্ত্তিগঠনে শিল্পদলের বাস্তববোধের অভাব লক্ষিত হয়। এই অনুযোগেরও কোনো ভিত্তি আছে বলে মনে হয় না। শিল্পীদল দেবদেবীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেছেন বিশুদ্ধ শাস্ত্রাচার মতে। দেবদেবীর মূর্ত্তিতে অলৌকিক সত্তা আরোপের জন্যই বহু পদ, বহু হস্ত, বহু আনন, অতিরিক্ত নেত্র প্রভৃতির সমাবেশ করতে হয়েছে। দেবশক্তির উৎকর্ষ জ্ঞাপনের জন্য এটি প্রয়োজনীয় ছিল সেকালে। নতুবা শিল্পীদল যে বস্তুজ্ঞানে অপারদর্শী নন, এ প্রমাণ দ্বারপাল, নর্ত্তকী, বাদ্যকর প্রভৃতির মূর্ত্তিতে মিলবে।

পূর্ব্বদিকের গোপুরম্ দিয়ে মন্দির প্রবেশ ও দেবদর্শন প্রশস্ত। মাদুরা মন্দিরে পূর্ব্ব গোপুরমটি কিন্তু পরিত্যক্ত। বেশীর ভাগ যাত্রী আসে পশ্চিম আর দক্ষিণ গোপুরম্ দিয়ে। এর একমাত্র কারণ পূর্ব্ব গোপুরমটি অসম্পূর্ণ বলে নয়। এই গোপুরমে অনেকদিন আগে একটি দুর্ঘটনা ঘটে। এক সময়ে মন্দির-কর্ত্তৃপক্ষ মন্দিরের সেবকদের উপর কর ধার্য্য করেন। তারই প্রতিবাদে একজন পরিচায়ক উচ্চ গোপুর থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে—ফলে অশুচিজ্ঞানে পূর্ব্ব গোপুরম্ পরিত্যক্ত হয়েছে। তবে যাত্রীকে এদিকে আসতে হয় পূজার উপকরণ সংগ্রহ করতে। এই গোপুরমে দোকান-পসার অনেক—যার

জন্য দেবমন্দিরের পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্য ব্যাহত হয়েছে বলে মনে হয়।

মন্দিরের মধ্যে রয়েছে একটি সুন্দর সরোবর—নাম স্বর্ণকমল সরোবর। এই সরোবরে স্নান করে দেবীদর্শন প্রশস্ত। এরও একটি কাহিনী আছে। একদা এক বক এই সরোবরে স্নান সেরে মন্দির-বিমান প্রদক্ষিণ করতে থাকে। ক্রমে তার ক্ষুধাবোধ হওয়াতে সরোবরের জল থেকে একটি মাছ তুলে নেয়। সঙ্গে সঙ্গে মনে ধিক্কার আসে, কেন এমন পাপকার্য্যে তার রুচি হ'ল! অনুতপ্ত বক জীবন বিসর্জ্জন দিয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করল এবং মৃত্যুকালে দেবতার কাছে প্রার্থনা করে গেল—অচিরে এই সরোবর মৎস্য-শূন্য হোক—ভবিষ্যতে আর কোনো অবোধ যেন প্রলুব্ধ না হতে পারে। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই সরোবরে আজ পর্য্যন্ত কোনো মাছ বা ব্যাঙ কারও নজরে পড়ে না।

মীনাক্ষী মন্দিরের পিছনে কত যুগযুগান্তরের শিল্প-সাধনা ও সংস্কৃতির প্রবাহধারা রয়েছে—কে করবে তার হিসাব! তবে অতি প্রাচীনকাল থেকে মাদুরা যে দক্ষিণ ভারতের সংস্কৃতির কেন্দ্রপীঠ হয়েছে, তা তামিল-সঙ্গমের অস্তিত্বের দ্বারা প্রমাণিত। বাংলার যেমন ছিল নবদ্বীপের খ্যাতি—সেখানকার উপাধি লাভ করতে না পারলে বুধমণ্ডলীতে সম্মানের আসন মিলত না—তেমনি মাদুরার তামিল-সঙ্গমের প্রশংসাপত্র না পাওয়া পর্য্যন্ত লেখকের সাহিত্য-কর্ম্ম স্বীকৃতি লাভ করে না। আর স্বীকৃতিলাভও বড় সহজসাধ্য নয়। সেকালে আটচল্লিশ জন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন এর বিচারক। কেমন ছিল তাঁদের বিচারপদ্ধতি সে কাহিনী পৌরাণিক। এই পৌরাণিক কাহিনীটুকু ভারি সুন্দর। একদা বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকে অবজ্ঞা করার অপরাধে ব্রহ্মা অভিশাপ দেন—তাঁকে আটচল্লিশবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতে হবে। আটচল্লিশবার জন্ম-গ্রহণ—সে ত দু'এক শতাব্দীর ব্যাপার নয়। দেবী শাপমোচনের জন্য বহু কাকুতি-মিনতি করেন। অবশেষে ব্রহ্মা সদয় হয়ে মর্ত্ত্যবাসের স্থিতিকাল একটি অভিনব উপায়ে সংক্ষিপ্ত করে দেন; দেবী একই সঙ্গে আটচল্লিশ-জন পণ্ডিতের দেহ-অংশে নিজ আত্মাকে সংযোজিত করতে পারবেন। তারই ফলে ওই আটচল্লিশজন কোবিদ সেই কালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী-পণ্ডিত বলে খ্যাতি লাভ করেন। এঁরাই পাণ্ড্য বংশের কাছে সর্ব্বোচ্চ সম্মান লাভ করে তামিল সঙ্গম গঠন করেন। তাতে কিন্তু একটি বিপদ দেখা দেয়। আরও বহু কবিযশপ্রার্থী পাণ্ডিত্যাভি-মানী ওই সম্মানের দাবী জানান, এবং তামিল-সঙ্গমে স্থান লাভের জন্য অবাঞ্ছিত অবস্থার উদ্ভব হয়। অবশেষে দেবাদিদেব মহাদেব এর মীমাংসা করে দেন। তিনি একটি স্বর্ণাসন দিয়ে বলেন, এই আসনে আটচল্লিশজন প্রকৃত বিদ্বানেরই স্থানসঙ্কুলান হবে আর গুণহীন অবাঞ্ছিত কেউ বসতে গেলেই আসনটি সঙ্কুচিত হবে। আবার সাহিত্য বিচার কালেও মাত্র আটচল্লিশজন গুণীই এসে বসতে পারবেন। প্রবাদ, একদা বিখ্যাত তামিল গ্রন্থ 'কুরুল' এর সাহিত্যমান যাচাই করতে তিরুবল্লুবর এই সঙ্গমের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। প্রথমে তিনি ব্যর্থকাম হন। পরে 'কুরুল' গ্রন্থকে ওই আসনের এক প্রান্তে স্থান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে। রচনার সারবত্তাকে প্রমাণিত করার জন্য আসনটি ক্রমশঃ প্রসারিত হতে থাকে—আর সেই সঙ্গে গ্রন্থটির কলেবর বৃদ্ধি হয়ে আটচল্লিশজন কোবিদের স্থানটি একাই দখল করে নেয়। অতঃপর তিরুবল্লুবরকে স্বীকৃতি না দিয়ে উপায় কি। যাই হোক, পৌরাণিক আখ্যায়িকার সঙ্গে সংযুক্ত হলেও ১৯০১ সনে এই 'সঙ্গম' নব ভাবে গঠিত হয়েছে আর তামিল-সংস্কৃতি মণ্ডলে এর প্রভাবও অপরিসীম। সাহিত্য-কর্ম্মের মাননির্ণয়ে আজও এ সক্রিয়। এই রাজ্যের সংস্কৃতির ধারা যে অতি প্রাচীন-কাল থেকে প্রবাহিত সে কথা পণ্ডিতজন স্বীকার করেছেন। অতি প্রাচীনযুগে ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের মতো এখানেও প্রচলিত ছিল ব্রাহ্মীলিপি। তার পর প্রাকৃতের প্রভাব চলে চতুর্থ শতক পর্য্যন্ত। এর পরে তিনশো বছর ধরে কদম্ব,গঙ্গা ও পল্লব বংশের রাজত্বকালে সংস্কৃত ভাষাই এ রাজ্যের সংস্কৃতি-মণ্ডলকে অধিকার করেছিল। অতঃপর সংস্কৃতের প্রভাব কিছু হ্রাস পায়; তামিল, তেলেগু, কানাড়া প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষাগুলিতে দলিল-দস্তাবেজ, সার্কুলার, উপহার, মন্দির-সীমা নির্দ্ধারণ বা ব্রহ্মোত্তর প্রভৃতি দানপত্র লিখিত হতে থাকে। আনুমানিক দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত এই সব চলেছিল। অবশ্য তখনও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দেবভাষা স্বীয় মর্য্যাদায় সমাসীন ছিল।

উচ্চ-শিক্ষালাভের ক্ষেত্রেও সংস্কৃত ছিল অপরিহার্য্য। বৃত্তিদানের দ্বারা সংস্কৃত শিক্ষার্থীকে উৎসাহ দেওয়া হত। চার থেকে আঠারোটি ছিল শিক্ষণীয় বিষয়। প্রধান চারটি বিষয় হ'ল (১) দর্শন, (২) বেদ, (৩) অর্থবিদ্যা ও (৪) রাজনীতি। চতুর্দ্দশ বিদ্যার মধ্যে চারবেদ, ব্যাকরণ, তর্কশাস্ত্র, মীমাংসা, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র, জ্যোতিষ, রাজবিধি, ছন্দশাস্ত্র, স্বরশাস্ত্র ও শব্দশাস্ত্র। এর সঙ্গে যোগ হত—আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ ও গন্ধর্ব্ববেদ (সঙ্গীত)। ব্রাহ্মণ-

পরিচালিত উচ্চ-শিক্ষালয়গুলির নাম ছিল ব্রহ্মপুরী ও ঘাটিকা। বৈষ্ণবরা শিক্ষাদান করতেন মঠে। এ ছাড়া প্রতিটি মন্দিরে সাংস্কৃতিক চর্চ্চা ও গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। মন্দির গাত্রে শিল্প-কর্ম্ম উৎকীর্ণ করিয়ে শিল্পীদের পোষণ করার ব্যবস্থা ছিল। এতে শিল্পীদলের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জ্জনের অবকাশও ছিল। চতুর্দ্দশ শতকের প্রথম ভাগে ইবনবাতুতা একটি মাত্র জায়গায় তেরটি বালিকা-বিদ্যালয় ও তেইশটি বালকদের শিক্ষালয় দেখেছিলেন। এক ইতালীয় ভ্রমণকারী পিয়াত্রে দেল্লা ভাল্লে সতেরো শতকের প্রথম ভাগে বহু বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান-প্রসঙ্গে জানিয়েছেন—তখনকার দিনে মেঝেতে বালি ছড়িয়ে লেখান ও মুখে মুখে পাঠ অভ্যাস করান হ'ত। ওই সময়কার আর একজন ভ্রমণকারী (Robert De Nobite) তাঁর পত্রে মাদুরাতে দশ হাজার ছাত্রকে ব্রহ্ম-বিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্র পড়ানোর কথা উল্লেখ করেছেন। এর পর খ্রীশ্চান মিশনারীরা এখানে স্কুল ও হাসপাতাল খোলেন।

শিক্ষার ক্ষেত্রে রাজপরিবারস্থ মেয়েরাও পশ্চাদ্‌গামী ছিলেন না। এঁরা উচ্চ-শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতেন, কলাবিদ্যাতেও ছিলেন সুনিপুণা, কেউ কেউ বা রাজ্য শাসননীতি ও যুদ্ধবিদ্যা জানতেন। দু' একটি দৃষ্টান্ত দিলে আশা করি তা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। চালুক্য-রাজ দ্বিতীয় জয়সিংহের ভগ্নী আক্কাদেবী রীতিমত একটি প্রদেশ শাসন করতেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে স্বয়ং সৈন্য পরিচালনাও করেছেন। হয়শালার প্রথম বল্লালের রাণী সঙ্গীত ও নৃত্য-নিপুণা ছিলেন। কালচুরির শোভিদেবের রাণী শোভনা দেবী ভিন্ন দেশীয় সম্ভ্রান্ত, বিদ্বান ও যশস্বী শিল্পীর সমক্ষে ওই সমস্ত বিদ্যার পরিচয় দিতেন। তাঞ্জোরের নায়ক রাজা রঘুনাথের সময়ে বহু শিক্ষিতা মহিলা-কবি ছিলেন—যাঁরা বিভিন্ন ভাষার মাধ্যমে-সাহিত্য সেবা করতেন। উঁচু মহলে শিক্ষিতা মহিলাদের সম্মান ছিল—এঁরা ছিলেন সংস্কৃতি-চর্চ্চার অপরিহার্য্য অঙ্গ।

সংস্কৃতির আর একটি শাখা—ক্রীড়া-কৌতুক বা প্রমোদ-আনন্দেও দক্ষিণ দেশের খ্যাতি ছিল। বরাহ ও বন্যজন্তু শিকার, ঘোড়ায় চড়ে বল খেলা (পোলো খেলার মতো), মল্লক্রীড়া, পশুযুদ্ধ, ঘোড়দৌড়, সাপ খেলান, শরীর-চর্চ্চা, চডুইভাতি, লোকনৃত্য, কোনটাই প্রমোদসূচী থেকে বাদ পড়ত না। যে গজেন্দ্র-গমন নিয়ে কবিরা কাব্যে এত রস সঞ্চার করেছেন—প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তাকে গতিবান করার চেষ্টাও চলত। মাদুরার হাতীর দৌড় ছিল ঘোড়দৌড়ের মতই জনপ্রিয়। পিয়াত্রে দেল্লা ভাল্লে আর একটি প্রমোদ-কৌতুকের কথা উল্লেখ করেছেন; একদিন সন্ধ্যাকালে তিনি দেখলেন, রঙীন ঢাকের কাঠি নিয়ে একদল তরুণী গানের সঙ্গে পরস্পরের কাঠিতে ঘা দিতে দিতে চলেছে। তাদের নিম্নাঙ্গে ঝলমলে রেশমী পোশাক (ঘাঘরা), কাঁধে রুমাল বাঁধা, ঊর্দ্ধাঙ্গ অনাবৃত, মাথায় সাদা ও হলুদ রঙের ফুল দিয়ে সাজান।

মাদুরার একটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে, সে হ'ল হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম্ম-সম্প্রীতি। মালিক কাফুরের দুঃস্মৃতি এর বাতাসে স্থায়ী হতে পারে নি—তার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত তিরুপুরকুলরামের পর্ব্বত শিখরে মুসলমান ফকির সিকান্দারের সমাধি—আর তারই পাশে বিখ্যাত সুব্রহ্মনিয়ার মন্দির। এত কাছাকাছি পাশাপাশি দু'টি বিপরীত-ধর্ম্মের অর্চ্চনার স্থান, আশ্চর্য্য লাগে বৈকি! কোন দিন সংঘর্ষ ত দূরের কথা, সামান্য মনোমালিন্য পর্য্যন্ত হয় নি। বহু হিন্দুযাত্রী পীরের সমাধিতে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে থাকেন আবার মুসলমানরাও হিন্দু-দেবমন্দিরে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

সবচেয়ে আশ্চর্য্য লাগে এই নগরীর প্রাণ-চাঞ্চল্য দেখে। বহু পুরাতন তীর্থনগরী হয়েও মাদুরা জরাগ্রস্ত হয় নি। এ শুধু প্রাচীনকালকে সযত্নে লালন করে তীর্থকামীদের ভক্তি ও ভ্রমণকারীদের বিস্ময় কুড়িয়ে কাল-সমুদ্রের তীরে ছায়া ফেলে নিশ্চল হয়ে নেই, প্রাচীন যুগের সঙ্গে আধুনিক জীবনের যোগসূত্র স্থাপন করে প্রাণ-চাপল্যে আজও আনন্দমুখর। দিনে দিনে এর পরিসর ও শ্রী সৌন্দর্য্য শিল্প খ্যাতি বেড়েই চলেছে। পাঠাগার, সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ, বিদ্যালয়, বস্ত্রশিল্প, চারুকলা, ব্যবসা-বাণিজ্য সবদিক দিয়ে এর অগ্রগমন অপ্রতিহত, এ শহর আজ তামিল-নাদের মুকুটমণি বললে অত্যুক্তি হয় না।

অভীরভীঃ

ত্রি-অঙ্ক নাটক

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(রাজেন্দ্রের বাড়ীর একতলায় সিঁড়ির নীচেকার হল্। মঙ্গলবার, সন্ধ্যা। রাজেন সলিটেয়ার খেলছে। বিভা টেবিল-হারমোনিয়মে একটা গানের গৎ বাজাচ্ছে। একটু পরে হারমোনিয়মের ডালা বন্ধ ক'রে উঠে এসে রাজেনের কাছেই আর একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।)

রাজেন। উঠে এলি কেন? আমি ভেবেছিলাম গানটা গাইবি।

বিভা। গান গাইবার মতোই অবস্থা বটে!

রাজেন। কেন, তোর আবার কি হ'ল? (তাস ভাঁজছে।)

বিভা। হবে আবার কি? বাড়ীটাকে বাড়ী ব'লেই আর মনে হচ্ছে না।

রাজেন। কি মনে হচ্ছে? (তাস সাজাচ্ছে।)

বিভা। কখনো মনে হচ্ছে হাসপাতাল, আর কখনো মনে হচ্ছে পাগলা-গারদ। এর মধ্যে গান আসে মানুষের?

রাজেন। (তাস থেকে চোখ না তুলে) তুই অন্ততঃ মাথাটাকে একটু ঠিক রাখ্ দেখি! সবাই মিলে পাগল হয়ে গিয়ে ত লাভ নেই কিছু?

বিভা। কথাটা বলা যত সহজ, কাজে সেটা করা তত সহজ নয়।

রাজেন। (চোখ তুলে) নতুন কিছু ঘটেছে নাকি?

বিভা। নতুন কি পুরনো তা জানি না।

রাজেন। (হাতের তাস-ক'টাকে সশব্দে টেবিলে রেখে) আঃ, কথাটা কি বল্ না?

বিভা। একজনকে ত বাড়ীতে ঢুকতে বারণ ক'রে দিয়েছ। কিন্তু বাড়ী ছেড়ে বেরোনো আটকাচ্ছ কি রকম ক'রে?

রাজেন। এই আবার তুই হেঁয়ালিতে কথা বলতে সুরু করেছিস্! তোরা আজকালকার মেয়েরা সব কি হয়েছিস্? কথাগুলিকে সোজাসুজি বলতে কি হয়?

বিভা। (উঠে দাঁড়িয়ে) আর কত সোজা ক'রে বলতে হবে? বানান ক'রে ক'রে বলব? তোমার দুটো ত চোখ আছে, নিজে কিছুই দেখতে পাও না নাকি? (ঘরের মধ্যেই এক পাক ঘুরে এল।)

রাজেন। (বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ এবং তর্জ্জনীতে কপালটাকে টিপে ধ'রে একটু ভেবে) তোর বৌদি এই ক'দিন একটু বেশী বাইরে বেরুচ্ছে, এই ত?

বিভা। (চলতে চলতে দাঁড়িয়ে) ক'দিন মানে? যেদিন থেকে নিখিলবাবুর আসা বন্ধ হয়েছে, তার ঠিক পরদিন থেকেই।

রাজেন। অকারণে লোককে তুই বড় বেশী সন্দেহ করিস্। নিখিল দশটা সাদা-কালো বাজার ঘুরে দরকারী ওষুধ-বিষুধ এনে দিত, আমি ত ওসব বিষয়ে একেবারেই আনাড়ী আর বাড়ীতে দ্বিতীয় লোক কেউ নেই এ কাজগুলো করে, তাই বাধ্য হয়ে সুমিকেই বেরুতে হচ্ছে।

বিভা। (হাতঘড়িটা দে'খে) তিনটেয় বেরিয়েছে, সাতটা বাজতে যাচ্ছে।

রাজেন। তোর বক্তব্যটা আসলে কি তা বল্ দেখি? তুই কি বলতে চাইছিস্, ও একটা ছুতো ক'রে বেরিয়ে যায় আর তারপর নিখিল ওর সঙ্গে গিয়ে জোটে?

বিভা। জোটে না যে তা জানব কি রকম ক'রে?

রাজেন। (মাথা চুলকে) কিন্তু সুমি ও ধরনের মেয়ে নয়ই মোটে, সে তুই যাই বলিস্।

বিভা। সেটা অবিশ্যি আমার চেয়ে তোমারই বেশী জানবার কথা। তবে এটা ঠিক যে নিখিলবাবুকে না হ'লে তাঁর এক দণ্ডও চলে না।

রাজেন। (উঠে একটু পায়চারি ক'রে বিভার সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে) তুই আমাকে কি করতে বলিস্?

বিভা। কি আর করবে? নিখিলবাবুকে আবার বাড়ীতেই ডাকো। এখানে তবু দু'জনেই চোখের ওপর থাকবে ত?

রাজেন। তুই বলিস কি? ওকে আসতে বারণ ক'রে দিয়ে এত শীগগির আবার ফিরে ডাকব?

বিভা। তা যদি না পার, তাহলে বাজার-ঘোরাঘুরির কাজটা তুমি নিজেই কর কষ্ট ক'রে।

রাজেন। (হেসে) হ্যাঁ, তা যা বলেছিস্! কখন সাইরেন দেবে, কি হবে, শেষটা পথে প'ড়ে মরি আর কি!

বিভা। তাহলে কি আর হবে? যেমন চলছে চলুক। আমার কর্ত্তব্য করা হ'ল, যা বলবার ছিল বললাম।

রাজেন। (তাসের টেবিলে ফিরে এসে ব'সে তাস-গুলোকে নিয়ে একটু নাড়াচাড়া ক'রে) দেখ্ বিভা, সুমিকে তুই অকারণে সন্দেহ করছিস্।

বিভা। সে হলেই খুব সুখের কথা।

(রাজেন আবার পায়চারি করছে। বিভা একটা চেয়ারে বসল। তার ঠিক সামনে এসে আবার হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়িয়ে)

রাজেন। কি তাহলে তুই আমাকে করতে বলিস্?

বিভা। বিশেষ কিছু যে তুমি ক'রে উঠতে পারবে সে ভরসা আমার নেই। তবে, সন্দেহটা সত্যি কি মিথ্যে সেটা পরীক্ষা ক'রে অন্ততঃ দেখতে পার।

রাজেন। কি রকম ক'রে সেটা করব?

বিভা। নিখিলবাবুদের বাড়ীতে একবার ফোন ক'রে দেখতে পার।

রাজেন। সুমি সেখানে আছে কিনা জিজ্ঞাসা করব?

বিভা। বাড়ীতে বাপের অসুখ; যদি থাকেন ওখানে, তুমি ফোন করছ শুনলে ভয়েই নিজে থেকে সাড়া দেবেন। আর যদি না থাকেন, ত সম্ভবতঃ নিখিল-বাবুকেও ওখানে পাবে না। কোথায় গেছেন সেটা জেনে নেবার চেষ্টা ক'রো তাহলে মনে ক'রে।

(রাজেন একটু ইতস্ততঃ ক'রে গিয়ে টেলি-ফোনে নম্বর চাইল।)

রাজেন। হেলো, হেলো!...কে? নিখিল?...আরে নিখিল, আমি রাজেন কথা কইছি...রাজেন...হ্যাঁ, হ্যাঁ!

(দু'তলার সিঁড়ির মিড্‌ল্যাণ্ডিং-এ নেমে দাঁড়িয়ে ঠিক এই সময় সুমি ডাকল)

সুমি। বঙ্কু! বঙ্কু!

(নেপথ্যে: যাই মা! সুমি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল।)

রাজেন। (টেলিফোনে) না, এমনি।...এই আর কি, অর্থাৎ...(মাউথপিস্‌টা হাত দিয়ে চেপে) এই বিভা, বোকা মেয়ে! দেখ্ দিকি কি কাণ্ড বাধিয়েছিস্! আমি কি বলি এখন নিখিলকে? (মাউথপিস্ থেকে হাত সরিয়ে) না, কেটে দেয় নি...কি জানি হয়ত কেটেই দিয়েছিল...কি বলছ?...না, কিছুই ঠিক করি নি, যেতেই চাইছি, কিন্তু কেবল চাইলেই কি আর হয়?...কি বলছ? ...ওষুধের দোকানের ঠিকানা একটা সুমিকে দেব?...কত নম্বর বললে?...৪৮ নম্বর শিবদত্ত রোড...সেটা কোথায়? ...ও!...ও! আচ্ছা, আচ্ছা।...ঐ একই রকম।...হ্যাঁ, আচ্ছা, নিশ্চয়।...বাই বাই।

(ফিরে এসে পরিত্যক্ত চেয়ারটাতে ব'সে রুমালে মুখ আর ঘাড় মুছছে। পিছনদিক্ থেকে ঢুকে বঙ্কু ছুটতে ছুটতে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল।)

বিভা। এটা আবার কোন্ দেশী বুদ্ধি হ'ল? এত কথাই যদি বলতে পারলে ত আসতে বলতে কি হয়েছিল?

রাজেন। তুই আর কথা বলিস্ নি। কি কাণ্ডটা করলি বল্ দিকি।

বিভা। বৌদি কখন ফিরেছে আমি দেখি নি। ছ'টা অবধি ফেরে নি নিশ্চয়। তা না-হয় টেলিফোনই ওঁকে একটু করেছ—

রাজেন। ঢের হয়েছে, চুপ্ কর্।

বিভা। বাপ্-রে-বাপ্, তোমার মেজাজখানা যা হয়েছে আজকাল, একেবারে বাঁধিয়ে রাখবার মতো!

রাজেন। মেজাজের বড় অপরাধ কি না? সবাই মিলে যা তোরা সুরু করেছিস্!

বিভা। তা যদি ক'রেই থাকি, তুমি এত বড় জমিদার বংশের ছেলে, নিজে এত বড় একটা জমিদারীর মালিক, তুমি কেন পার না সবাইকে নিজের মতে চালিয়ে নিতে? তোমার ভাব দেখে মনে হয়, যেন তুমিই সবাইকার খাচ্ছ-পরছ। তোমার এ দুর্দ্দশা হবে না ত কার হবে?

("রাজেন, রাজেন ওখানে রয়েছ? আসতে পারি?" বলে ডাক্তারের প্রবেশ। বিভা চ'লে গেল।)

রাজেন। (উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় ক'রে) এই যে, আসুন।

ডাক্তার। কি খবর তোমাদের?

রাজেন। বসুন, ভাল খবর কি ক'রে আর থাকতে পারে?

ডাক্তার। কেন? তোমরা আজকালকার ছেলেরা একটুকুতেই এমন মুষড়ে যাও কেন সব? কি এমন হয়েছে?

রাজেন। হয় নি, কিন্তু হ'তে কতক্ষণ বলুন! সে

যাক, আপনি কি করবেন ভাবছেন? কলকাতাতেই কি থাকছেন?

ডাক্তার। কেবল থাকছি? একশ' দশটা নতুন বেড পড়ছে হাসপাতালে, তার সব ব্যবস্থা করবার ভার নিয়েছি। (বসলেন।)

রাজেন। (ব'সে) এত নতুন বেড?

ডাক্তার। এত বেড মানে? সব ক'টা হাসপাতালের air raid casualty ward-গুলোকে এক সঙ্গে করলে যা বেড হচ্ছে, এক দিনের raid-এর পক্ষেও তা যথেষ্ট না হ'তে পারে। General ward-গুলোর রোগীদের তাই নোটিশ দিয়ে রাখা হয়েছে, দরকার হলেই বেড খালি ক'রে দিয়ে তারা চ'লে যাবে।

রাজেন। এয়ার রেড হবে ব'লেই তাহলে সবাই ধ'রে নিয়েছে?

ডাক্তার। ধ'রে নিতে দোষ কি? তা উনি আছেন কি রকম?

রাজেন। সে আর আমরা কি বুঝব? তবে এ বাড়ীতে আপনার patient একটি বাড়ছে, তার কথা বলতে পারি।

ডাক্তার। সেটি কে?

রাজেন। আমি নিজে।

ডাক্তার। তোমার কি হ'ল হে আবার?

রাজেন। সেইটেই ঠিক বুঝতে পারছি না। একটু কোথাও চেঞ্জে গেলে বোধ হয় ভাল হয়।

ডাক্তার। চেঞ্জে শুধু গেলেই ত হ'ল না, দার্জ্জিলিং যাবে না পুরী, রাজগির না শিমুলতলা, রোগ বুঝে তার ব্যবস্থা করতে হয়। তা তোমার trouble-টা কি? জ্বর হয়? মাথা ধরে? হজমের গোলমাল?

রাজেন। না, সে রকম কিছু নয়। এই আর কি, ঘুম হয় না রাত্তিরে, আহারেও রুচি নেই তেমন, কোনো কিছুতেই মনও দিতে পারি না ভাল ক'রে—দেওঘরে গেলেই হয়ত এগুলো সেরে যায়।

ডাক্তার। (রাজেনকে একবার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে) দেখি হাত।

(নাড়ী দেখলেন।) হু!

(রাজেনের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে)

খুবই বুঝি খারাপ বোধ করছ?

রাজেন। খুব!

ডাক্তার। তা শশাঙ্কবাবুকে ত বাইরে নিয়ে যাওয়া চলবে না?

রাজেন। তা ত জানি।

ডাক্তার। সুমি বেচারি বড়ই বিপদে পড়বে যে? কোন্‌দিক্ সামলাবে?

রাজেন। ওকেও এখানে রেখেই যদি যাই। আমার এমন ত কিছু হয় নি যে, আমার সঙ্গে সুমিকে যেতেই হবে? বিভা সঙ্গে থাকবে, আমার কোনো অসুবিধাই হবে না। আপনি সুমিকে একটু বুঝিয়ে বলুন না?

ডাক্তার। তোমার কি অসুখ সেটা ঠিক ধরা যাচ্ছে না, অথচ চেঞ্জে তোমার যাওয়া দরকার, আর জায়গাটা দেওঘর হলেই ভাল হয়—এ কথাগুলো তুমিই সুমিকে খোলাখুলি বল না?

রাজেন। আমি বললে কি ও শুনবে?

ডাক্তার। যদি একান্তই পতিপরায়ণা হয়, শুনবে। আর যদি বুদ্ধিসুদ্ধি কিছু থাকে, তাহলে ঠিক ঐ রকম ক'রে কথাটাকে আমি বললেও শুনবে না। যদি জানতে চায় তোমার কি হয়েছে, কি তাকে বলব?

রাজেন। (বুকের বাঁদিক্‌টা দেখিয়ে) এইখানটায় আমার কেমন যেন ব্যথা-ব্যথা করছে আজ ক'দিন ধ'রে। বলবেন না হয় যে, হার্টের দোষ হয়েছে একটু।

ডাক্তার। হার্ট কি বলছ হে? তোমাকে যে বাড়ী ছেড়ে নড়তেই দেবে না তাহলে একেবারে!

রাজেন। না, না, হার্ট নয়, হার্ট নয়, আর কিছু একটা বলবেন। সত্যি বলতে কি, ব্যথাটা ঠিক যে কোথায় তা ঠিক বুঝতে পারছি না।

ডাক্তার। (হেসে) বুকের বাঁদিকটাতে যে নয় সেইটে এখন কেবল বুঝতে পারছ! (উঠে দাঁড়িয়ে) আচ্ছা, সুমিকে বুঝিয়ে বলতে আমি চেষ্টা করব।

রাজেন। ভুল না বোঝে!

ডাক্তার। (উচ্চকণ্ঠে হেসে) চেষ্টা করলেও ওকে ভুল বোঝানো যাবে না, এই ভয়ই ত করছি।

(দু'তলার সিঁড়ি বেয়ে সুমি কয়েক ধাপ নেমে এল।)

সুমি। সেই কখন থেকে আপনার গলা পাচ্ছি আর ক্রমাগতই ভাবছি এইবার আপনি আসবেন!

ডাক্তার। এই যে মা, চল যাচ্ছি।

(সুমির পেছন পেছন সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলেন।)

রাজেন। (নেপথ্যের কাছে গিয়ে) বিভা! ও বিভা। বিভা ওখানে রয়েছিস্?

(বিভা ঢুকল।)

বিভা। কেন ডাকছ?

রাজেন। (হেসে) ওরে বিভা, শোন্, আজ ডাক্তারকে দেখবামাত্র আমার কেমন বুদ্ধি খুলে গেল।

বিভা। আশ্চর্য্য বলতে হবে! ওষুধ-বিষুধ কিছু খেয়ে?

রাজেন। ঠাট্টা নয়। দু'জনে মিলে কি ঠিক করলাম জানিস্? আমার শরীর ভাল নয়, হাওয়া বদ্‌লাতে দেওঘর যাওয়া দরকার, তোর বৌদিকে ডাক্তার বুঝিয়ে বলবেন।

বিভা। আর বৌদি অমনি লক্ষ্মীমেয়ের মতো তোমার সঙ্গে যেতে রাজী হয়ে যাবেন—এত বোকা ওঁকে পাও নি।

রাজেন। আরে, না, না, ওকে কে সঙ্গে যেতে বলছে? ও এখানেই থাকবে। আমি অসুখ ক'রে চেঞ্জে যাচ্ছি, এতে আমার কোনো দোষ ত আর কেউ ধরতে পারবে না? বলতে ত পারবে না যে, ভয় পেয়ে পালাচ্ছি?

বিভা। (পাশের একটা চেয়ারের হাতার উপর শরীরের ভর রেখে) এমন বিচিত্র ব্যবস্থাটি তুমি না ক'রে যদি নিখিলবাবু করতেন ত তার একটা মানে বোঝা যেত।

রাজেন। আবার হেঁয়ালি সুরু করেছিস্?

বিভা। আচ্ছা, জিজ্ঞেস্ করি, ওদের দু'জনকে এখানে রেখে গিয়ে দেওঘরে তুমি টিকতে পারবে?

রাজেন। সুমি আর নিখিলকে? কেন? কি করবে ওরা?

বিভা। ধর, কিছুই করবে না, কিন্তু তুমি টিকতে পারবে?

(রাজেন উঠে পায়চারি করছে। একবার থেমে বিভার দিকে ফিরে তাকাল। আবার কিছুক্ষণ পায়চারি ক'রে জানলার কাছে ফিরে দাঁড়িয়ে)

রাজেন। তা, তুই যদি সারাক্ষণ কানের কাছে এ রকম মন্ত্র ঝাড়িস্ ত হয়ত পারব না। (এগিয়ে এসে) তুই থেকে থেকে মানুষকে বড্ড বিপদে ফেলিস্। ভুলে যাচ্ছিস্, কলকাতাতে আমি আরোই বেশী টিকতে পারছি না। নিজের জন্যে তত ভাবছি না, কিন্তু তোকে আর একটা দিনও এখানে থাকতে দিতে আমার ইচ্ছে করছে না।

বিভা। তুমি একলাই যাও দাদা, আমি কলকাতাতেই থাকব। (চেয়ারটায় বসল।)

রাজেন। (আর একটা চেয়ারে ধপ্ ক'রে ব'সে) সে কি রে? তুইও শেষকালে যাবি না বলছিস্?

বিভা। তা তোমাদের সকলের এক-একটা মতামত থাকতে পারে, আমার থাকতে নেই?

(উপরে ডাক্তারের গলা শোনা গেল: "আচ্ছা, আসি তাহলে। নমস্কার।")

রাজেন। আমার কথাটা তুই একেবারে ভাবছিস্ না।

(বিভা হেসে উঠল। ডাক্তার, সুমি আর নার্স সিঁড়ি বেয়ে নামলেন।)

সুমি। কি রকম দেখলেন?

ডাক্তার। ঐ একই রকম। ওষুধ কিছু আর বদলাব না, পথ্যের মধ্যে বিস্কিট আর হর্লিক্স্ চলবে, গরুর দুধটা বন্ধ থাকবে। তরকারির সুপটা দিনে দু'বার দিও। গ্লুকোজ যতবার ইচ্ছে খেতে পারেন। হ্যাঁ, আর একটা কথা, ক'টা দিন আমি ওঁকে বিছানা ছেড়ে একেবারেই উঠতে দিতে চাই না, পুরোপুরি বিশ্রাম দিয়ে একবার দেখতে চাই।

সুমি। সে-ব্যবস্থা সহজেই হ'তে পারবে। কিন্তু হর্লিক্স্, গ্লুকোজ, এ সমস্ত কে এখন আমাকে এনে দেয়।

বিভা। বাড়ীতে লোকের কিছু কি অভাব আছে? তাছাড়া নার্সকে খানিকটা সময় ছেড়ে দিলে তিনিই ত এ সমস্ত জুটিয়ে এনে দিতে পারবেন।

নার্স। তা হয়ত পারব।...স্ট্রীকৃনিন্‌টাও ফুরিয়ে গেছে। আনতে হবে।

সুমি। সে কি? এই ত সেদিন কেনা হ'ল! আরো ত অনেক দিন চলবার কথা। শিশি ভরতি স্ট্রীকৃনিন্ ফুরিয়ে গেল কি রকম?

নার্স। আমি এসে ত শিশিটা ভরাই দেখেছিলাম। আজ দেখছি, গোটা তিন-চার ট্যাব্‌লেট খালি নীচেয় প'ড়ে আছে।

ডাক্তার। শিশির মধ্যে থেকে ট্যাব্‌লেট যায় কি ক'রে? বের করতে গিয়ে প'ড়ে যায় নি?

নার্স। আজ্ঞে না।

ডাক্তার। টফি কিংবা লজেঞ্জ ত নয়, ও যে বিষম বিষ। কি সাঙ্ঘাতিক কথা!

(সুমিত্রা একটু ইতস্তত: ক'রে ত্রস্তপদে উপরে উঠে গেল, নার্সও গেল তার পেছন পেছন।)

রাজেন। কি ব্যাপার?

বিভা। ব্যাপার আর কি? কালোবাজারে বেচেছে।

ডাক্তার। তা ঠিক জানলে ত নিশ্চিন্ত হ'তে পারতাম। আচ্ছা; আমি থেকে ত এর কিছু কিনারা করতে পারব না, চলি তাহলে।

রাজেন। সুমিকে কি বলেছিলেন কথাটা?

ডাক্তার। ও, হ্যাঁ। তবে বিশেষ কিছু বলতে হয় নি, কলকাতায় থাকলে তোমার স্বাস্থ্য ভাল থাকবে না সুমি নিজেই আমাকে বলছিল। আমি যেতে পারি তাহলে?

রাজেন। ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ। আচ্ছা, নমস্কার।

ডাক্তার। নমস্কার।

(চ'লে গেলেন।)

বিভা। বিশেষ কিছু বলতে হয় নি···সুমি নিজেই বলছিল···তা ত বলবেই। ঠিক যা ভেবেছি তাই!

রাজেন। দেখ্ বিভা, হেঁয়ালি করতে চাস্ কর্, কিন্তু এত কষ্ট ক'রে সব ব্যবস্থা করছি, বাগড়া দিস্‌নে যেন মাঝখান থেকে।

বিভা। তুমি কি যাবেই ঠিক করেছ?

রাজেন। পাল্টে আমিই তোকে জিজ্ঞেস করছি, তুই কি যাবি না ঠিক করেছিস্?

বিভা। ওদের দু'জনের একজনও যদি সঙ্গে যায় ত যাব। তোমার মতো এত দিলদরিয়া আমি হ'তে পারব না।

রাজেন। সুমি ত কিছুতেই যাবে না জানিস্।

বিভা। বেশ ত, নিখিলবাবু চলুন।

রাজেন। আমি বললেই সে যাবে?

বিভা। কি রকম ক'রে কথাটা ব'ল তার ওপর সেটা নির্ভর করছে।

রাজেন। বাবাঃ! তুই যে থেকে থেকে কি বিপদে মানুষকে ফেলিস্!

বিভা। বিপদে ফেলছি, না বিপদ্ কাটাবার চেষ্টা করছি, ঘটে আর একটু বুদ্ধি থাকলে সেটা বুঝতে।

(হঠাৎ উঠে টেলিফোনে গিয়ে রাজেন নিখিলের নম্বর চাইল। বিভা চেয়ারটাকে ঘুরিয়ে সেই দিকে মুখ ক'রে বসল।)

রাজেন। (মাউথপিস্‌টা বাঁহাতে চাপা দিয়ে) দেখ্, সুমিকে বা নিখিলকে আমি কিন্তু একটুও সন্দেহ করছি না, কেবল তোর কথাতেই—(মাউথপিস্ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে) হেলো···কে, নিখিল?···হ্যাঁ, আমিই আবার ফোন করছি। ভাই নিখিল, সেদিন বড্ড যা তা ব্যবহার করেছি তোমার সঙ্গে···না, না, সত্যিই বড় অন্যায় হয়ে গিয়েছে। জান ত, বিপদ্-আপদের মুখে মানুষের মন-মেজাজ ঠিক থাকে না। কিছু মনে ক'রো না।...তা ত জানিই, তা ত জানিই। আর শোন, সন্ধ্যাবেলা একলাটি বাড়ী ব'সে কি করছ? চ'লে এসো না এদিকে?···কখন আসছ?···হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমরা আর যাব কোন্ চুলোয়?

(ফিরে এসে বিভার পাশের চেয়ারটাতে ব'সে)

ও ত এখুনি এসে পড়বে। কি যে তাকে বলব ভেবে পাচ্ছি না।

বিভা। কিছু না ভেবেই তাকে ডেকে ব'সে আছ?

রাজেন। ভাববার আর আছে কি, কেবল কি রকম ক'রে কথাটা সুরু করব ঠিক করতে পারছি না।

বিভা। (হেসে) কোন্ কথাটা?

রাজেন। এই আর কি, তুই যা বল্লি।

বিভা। তোমার দ্বারা কিছু হবে না। আমি জানতামই; তোমাকে কি আর আমার চিনতে বাকি আছে? তা বেশ, তুমি এক কাজ কর দেখি—যা তুমি পারবে। উপরে গিয়ে বৌদির বাবার কাছে একটু বস দেখি; আর বৌদিকে একটু নীচে আসতে বল, ব'লো খুব জরুরী একটা কথা আছে আমার, তার সঙ্গে।

রাজেন। আচ্ছা, যাচ্ছি। কিন্তু তুই ওকে···

বিভা। তোমার কোনো ভাবনা নেই, তুমি যাও।

(রাজেন সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল। বিভা উঠে গিয়ে টেবিল-হারমোনিয়মের ডালা খুলে একটুক্ষণ সুর বাজিয়ে গান ধরল।)

আমারে বলিতে দাও শুধু গো,
আমি আর কিছু চাব না।
জানি জীবনের পথ ফুরাবে,
তোমারে যে কাছে পাব না।
শুনিতে চাও না তুমি, জানি গো,
বৃথা এই ব্যাকুলতা, মানি গো বন্ধু!
তবু না শোনায়ে দিয়ে তোমারে
এ পৃথিবী ছেড়ে যাব না।
আমারে বলিতে দাও শুধু গো,
কিছু যে হ'ল না মোর বলা;
মরণ-আঁধার আসে ঘনায়ে,
কখন্ ফুরাবে পথচলা।
আমি শেষ হয়ে যাব, জানি গো,
আমার এ ভালবাসাখানি গো, বন্ধু!
কোথাও র'বে না কারও মনে যে,
আজ শুধু সেই ভাবনা।
আমারে বলিতে দাও শুধু গো,
ভালবাসি, এই কথাটিরে
নিয়ে যেতে কোথা পাব পাথের
সাথে ক'রে মরণের তীরে?

কোন্ সে জনমে, নাহি জানি গো,
ভালবেসে বুকে ল'বে টানি' গো, বন্ধু!
সে দিন হয় ত র'ব নীরবে,
হয় ত বা গান গাব না।

(সুমি একটা সেলাই হাতে ক'রে গানের মাঝখানে পেছনে এসে বসেছে। গান শেষ ক'রে তাকে দেখবামাত্র বিভা উঠে এল।)

অনেকক্ষণ এসেছ বৌদি?

সুমি। না। তুমি আমাকে কিছু বলবে?

বিভা। হ্যাঁ। বস।

(সুমির পাশের চেয়ারটা একটু আরও তার কাছে টেনে নিয়ে বসল।)

শোনো বৌদি। যা বলতে চাইছি, তাড়াতাড়ি ব'লে শেষ ক'রে নিই। নিখিলবাবু এখুনি এসে পড়বেন।

সুমি। নিখিলবাবু? তাঁর না এ-বাড়ীতে আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল?

বিভা। দাদা নিজেই ওঁকে আবার ডেকেছেন। সে-দিনকার রাগারাগির ব্যাপারটার আসল যে কি মানে, সেটা হয়ত তুমি জান না। এই ফাঁকে সেটা তোমাকে ব'লে নিই। নিখিলবাবু যে এ-বাড়ীতে সারাক্ষণ তোমার আঁচল-ধরা হয়ে ঘুরে বেড়ান, দাদার সেটা পছন্দ নয়।

সুমি। (সেলাইয়ে চোখ রেখে) তা জানি।

বিভা। তা যদি জান, ত সেটা হ'তে দাও কেন?

সুমি। না দেবার ব্যবস্থা তোমরাই ত করেছিলে, তার বেশী আমি আর কি করতে পারতাম?

বিভা। তা যেন হ'ল, কিন্তু তুমি যে ভাবছ, তাঁর সন্দেহটা কেবল নিখিলকেই, সেটা কিন্তু ঠিক নয়।

সুমি। (সেলাই রেখে সোজা হয়ে ব'সে) আমাকেও সন্দেহ করবার কিছু কি কারণ ঘটেছে?

বিভা। জানি না, কিন্তু তুমি যতক্ষণ বাড়ীর বাইরে থাক, দাদা এত বেশী ছটফট করে যে দেখলে মায়া হয়। তুমি কি ভাব জানি না, কিন্তু ও যে সত্যিই তোমাকে খুব ভালবাসে সেটা ত ঠিক?

সুমি। তোমার বলবার কথাটা কি তাই বল। তোমার দাদা আমাকে ভালবাসেন কি না এবং বাসলে কতটা ভালবাসেন সেটা না-হয় আমি তাঁর কাছ থেকেই শুনব।

বিভা। ডাক্তার বলছিলেন, কলকাতায় থাকলে দাদার শরীর ভাল থাকবে না, এটা তুমিও বোঝ।

সুমি। তা বুঝি ব'লেই ত আমি চাই যে উনি চ'লে যান।

বিভা। চ'লে যান বললেই আর সে যেতে পারছে কই? মুশ্‌কিল ত সেইখানেই। সে ভাবছে, সে চ'লে গেলে নিখিলবাবুর একেবারে পোয়াবারো হবে এ বাড়ীতে।

সুমি। (সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে) তার আমি কি করতে পারি? ওঁকে ত তোমরাই তাড়িয়েছিলে, ফিরে আবার ডাকলে কেন তা হ'লে? ও এমন ছেলে, তোমরা যদি না ডাকতে, কিছুতেই আর এ বাড়ীর ছায়া মাড়াত না।

বিভা। এই জন্যে ডাকলাম, যে, তুমি তাকে কলকাতা ছেড়ে চ'লে যেতে বলবে। তোমার কথা সে শুনবে। দাদা তা হ'লে বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে আমাকে নিয়ে দেওঘর যেতে পারে। আরও ভাল হয়, যদি ব'লে-কয়ে ওকে তুমি দেওঘরেই পাঠাতে পার। চোখের ওপর সে সারাক্ষণ থাকলে দাদার মনটা—

সুমি। নিখিলবাবুকে এসব কথা আমি কেন বলতে যাব? অনধিকার-চর্চ্চা জিনিসটা একেবারেই আমার ধাতে নেই।

বিভা। (উঠে দাঁড়িয়ে) অনধিকার-চর্চ্চা তুমি কাকে বল জানি না, কিন্তু এই যে ছেলেটা, সম্পর্কে তোমার কেউ নয়, তবু এত করছে তোমার জন্যে, এত তোমাকে ভালবাসছে, তারও ভালমন্দের ভাবনা একটু ত তোমার ভাবা উচিত? হ'তে ত পারে যে, তোমারই জন্যে সেও কলকাতা ছেড়ে যেতে পারছে না? শহর ছেড়ে সবাই চ'লে যাচ্ছে, ওকে কেন তুমি ধ'রে রাখছ? ও ত নিজে মুখ ফুটে কখনো বলবে না, আমায় ছেড়ে দিন! তোমারই উচিত তাকে জোর ক'রে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া। স্নেহ-মমতার কথা না-হয় না-ই তুললাম, কৃতজ্ঞতা ব'লেও ত একটা জিনিস আছে পৃথিবীতে? আশ্চর্য্য, যে এই কথাগুলো তোমাকে আমার বলতে হচ্ছে!

সুমি। কথাটাকে ঠিক এই দিক্ দিয়ে সত্যিই আমি ভাবি নি; আচ্ছা, ভেবে দেখব। যেতে পারি এখন?

বিভা। যাও।

(সুমি সিঁড়ি উঠছে, বিভা একটু বাঁকা হাসি মুখে নিয়ে তাকিয়ে আছে সেদিকে।)

দৃশ্যান্তর

দ্বিতীয় দৃশ্য

(দু'তলায় শশাঙ্কের ঘরের পাশে সুমিত্রার বসবার ঘর। পর্দার রঙ, কার্পেটের রঙে হাল্কা নীলের প্রাধান্য। চেয়ারগুলোর কভারের রঙেও তাই। কুশনগুলির রঙ মভ্। ফুলদানীতে বেগুনী রঙের ফুল। হাল্কা ধরনের এবং ছোট আকারের সব আসবাব। একপাশে একটা রকিং চেয়ার। পিছনে পর্দা-ঢাকা জানালা। বুধবার, সন্ধ্যা। বাঁদিক্ থেকে নিখিলকে সঙ্গে ক'রে রাজেন ঢুকল।)

রাজেন। এস, এইখানেই বসা যাক। নীচে নিরিবিলি কথা হবার ত জো নেই? সেই কখন থেকে রণধীরবাবু এসে জাঁকিয়ে ব'সে আছেন, রেঙ্গুনের এয়ার রেড়ের গল্প আজ চাকরদের না শুনিয়ে উঠবেন না।··· কেমন আছ? (দু'জনে বসল)।

নিখিল। এই যেরকম থাকি।

রাজেন। আর এদিকে আমার অবস্থা দে'খে ডাক্তার ত আজ এক্কেবারে হাঁ!

নিখিল। আপনার কোনো অসুখ আছে তা ত কখনো মনে হয় নি!

রাজেন। মনে কি আর আমারই হয়েছিল? পরীক্ষা করতে গিয়ে ধরা পড়ল। বাধ্য হয়েই আমাকে এখন কিছুদিনের জন্যে চেঞ্জে যেতে হচ্ছে।

নিখিল। উনিও কি যাচ্ছেন?

রাজেন। কে, সুমি? না, না, তার যাওয়া কি ক'রে চলতে পারে? অসুস্থ বুড়ো বাবাকে একলা এখানে ফেলে সে যেতে পারে কখনো? তাকে রেখেই আমায় যেতে হবে। তা, তুমি কি করবে ঠিক করেছ? কলকাতা ছেড়ে নড়বে না?

নিখিল। আমার ডাক্তার ত আমাকে চেঞ্জে যেতে বলেন নি?

রাজেন। দেখ নিখিল, ঠাট্টা নয়! এই কথাটা জিজ্ঞেস করব ব'লেই তোমাকে আজ আমি ডেকেছি। তুমি কলকাতায় থাকলে সুমির অনেক সাহায্য হয় সেটা ঠিক, কিন্তু সেইসঙ্গে তার থেকে কতগুলি সমস্যারও যে সৃষ্টি হবে সেটা কি একবারও ভেবে দেখেছ? সে এখানে একলা থাকবে, বিভাও থাকবে না বাড়ীতে। তুমি যদি তখন আগের মতোই ঘন ঘন আসা-যাওয়া কর, ত নিশ্চয়ই লোকে সেটাকে ভাল চোখে দেখবে না।

নিখিল। এ ছাড়া আর কোনো সমস্যার কথা যদি আপনাদের মনে এসে থাকে ত বলুন, কারণ এটা কোনো সমস্যাই নয়। আমাকে ফিরে না ডাকলে এ বাড়ীতে আমি আজ আসতাম না, আবার আপনারা চাইলেই আর আসব না।

রাজেন। এ বাড়ীটাতেই যে আসতে হবে তারই বা কি মানে আছে? কলকাতায় বাড়ীর অভাব নেই। তা ছাড়া রাস্তাঘাট, দোকানবাজার···

নিখিল। আশ্চর্য্য! (উঠে দাঁড়িয়ে) তা আমাকে কি করতে হবে? রাস্তায় বেরোব না, দোকানবাজার যাব না, নিজের ঘরে হুড়্কো এঁটে ব'সে থাকব, কথা দিতে হবে? তাই না-হয় দিচ্ছি।

রাজেন। আহা, রাগ ক'রো না। তাই কি আমি বলছি? কথা কি জানো, বিভার খুব ইচ্ছে, আমারও ইচ্ছে, তুমি আমাদের সঙ্গে যাও।

নিখিল। আপনাদের সঙ্গে? দেওঘরে? সে কি?

রাজেন। অমন আঁৎকে উঠবার মতো কথা কিছু আমি বলি নি। দেওঘরটা কিছু এমন খারাপ জায়গা নয়, আর আমাদের সঙ্গে যেতে বলছি এইজন্যে, যে, সেখানে সুমি শ্বশুরমশায়কে সঙ্গে নিয়ে যাবে মনে ক'রে বিরাট্ একটা বাড়ী নিয়েছি আমরা; ওরা ত যাচ্ছে না, তাই কতগুলো ঘর খালিই প'ড়ে থাকবে। তুমি যদি যাও, তার দু'একটা কাজে লাগে।

নিখিল। ঘরগুলোকে নিয়ে আপনি খুব বিপদে পড়েছেন মনে হচ্ছে। আমার পরামর্শ নিন, ওগুলোকে sublet ক'রে দিন, ভাড়াটের অভাব হবে না।

রাজেন। (ক্রুদ্ধস্বরে) তোমার পরামর্শ আমি চাই নি।

(নার্সের কাঁধে ভর দিয়ে পা দুটোকে টেনে টেনে ডানদিক্ থেকে শশাঙ্কর প্রবেশ।)

শশাঙ্ক। বাবা নিখিল, তুমি এসেছ?

(নার্স রকিং চেয়ারটাতে তাঁকে বসিয়ে দিয়ে গেল। কিছুক্ষণ তাঁর দম নিতে গেল।)

রাজেন। আচ্ছা, বস তোমরা।

(চ'লে গেল।)

নিখিল। (রকিং চেয়ারের হাতায় হাত রেখে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে) আপনি উঠে কেন এলেন?

শশাঙ্ক। তোমার গলা শুনছিলাম খানিকক্ষণ ধ'রে, কিছুতেই আর লোভ সামলাতে পারলাম না।

(বাঁদিক্ থেকে ত্রস্তভাবে সুমির প্রবেশ।)

সুমি। ও কি বাবা? তুমি উঠে কেন এসেছ? ডাক্তার এত ক'রে বারণ ক'রে গেলেন।···নার্স?

শশাঙ্ক। নার্সের কোনো দোষ নেই মা। আমিই

চ'লে আসছিলাম, ও দেখতে পেয়ে দরজার কাছে এসে আমাকে ধরল। তা অন্যায়টা ক'রেই ফেলেছি যখন, খানিকক্ষণ এখানে ব'সে যাই। এইটুকু এসেই কেমন যেন হাঁপিয়ে গিয়েছি, একটু না জিরিয়ে ফিরে যেতেও ত পারব না?…আজ ক'দিন নিখিল আসে নি, আমার গল্প করা বন্ধ আছে।

সুমি। (হেসে) আমার সঙ্গে গল্প ক'রে বাবার সুখ হয় না।

(শশাঙ্কর কাছে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।)

শশাঙ্ক। সুখ খুব হয় না, কিন্তু তোমাকে বেশীক্ষণ ধ'রে রাখতে ভরসা হয় না, তোমার ওপর অন্যদের দাবী আছে কিনা? নিখিলের ত ঝাড়া হাত-পা, তাকে স্বচ্ছন্দে যতক্ষণ খুশি জ্বালাতে পারি।

সুমি। (নিখিলের দিকে একটু আড়চোখে চেয়ে, হাসতে হাসতে) ওঁর যে ঝাড়া হাত-পা সেটা তুমি কিরকম ক'রে জানলে?

শশাঙ্ক। যতটা সবাই জানে, তার চেয়ে বেশী আর আমি কিরকম ক'রে জানব? (হেসে) গোকুলে কেউ বাড়ছেন নাকি?

নিখিল। কেউ যদি বাড়ছেনই ত গোকুলে আর কেন, আশা করা যাক মনুষ্যকুলেই বাড়ছেন।

শশাঙ্ক। তা তাঁর ঠিকানা পেলে ত কুলের বিচারটা করতে পারি।

নিখিল। আপনাকে দিয়ে কুলের বিচার না করিয়ে আমি এক পা এগোব না, আপনি ভাববেন না।

সুমি। তা আপনার যদি এতই ঝাড়া হাত-পা, ত কলকাতা ছেড়ে কেন বাইরে কোথাও চ'লে যান না? এত লোক শহর ছেড়ে চ'লে যাচ্ছে—

নিখিল। কথাটা, এই খানিকক্ষণ হ'ল, আমি ভাবতে সুরু করেছি, তবে বোমার ভয়ে নয়, ভাবছি একেবারে অন্য কারণে।

সুমি। যে কারণেই ভাবুন, চ'লে যদি যান ত আর একটা মানুষ সম্বন্ধে আমাদের দুর্ভাবনা কমে!

নিখিল। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। আপনি যেমন এঁকে নিয়ে আট্‌কা পড়েছেন, আমিও তেমনি একজন মানুষকে নিয়েই আট্‌কা পড়েছি। আসলে আমারও ঝাড়া হাত-পা বিশেষ নয়।

(সুমি উঠে গিয়ে ডানদিকের দরজাটাকে ভেজিয়ে দিচ্ছে।)

শশাঙ্ক। সে-মানুষটি আমিই নয় ত বাবা?

নিখিল। (হেসে উঠে) না, না, আপনি নন, আপনি নন; কি যে বলেন!

(সুমি একটা কুশন নিয়ে সেটাকে চাপড়ে চাপড়ে ঠিক করছে।)

শশাঙ্ক। তুমি আমাকে ভোলাতে চেষ্টা ক'রো না বাবা! আমি একলা একজন মানুষ, এতগুলো মানুষের জীবনে এত বড় একটা সমস্যাস্বরূপ হয়ে উঠেছি, আমাকে নিয়ে এতদিকে এত অশান্তি!

নিখিল। এমন-সব অদ্ভুত কথা কেন আপনার মনে হচ্ছে?

শশাঙ্ক। কেন যে মনে হচ্ছে তা কেবল আমিই জানি।

(নিজের হাতে নিজের নাড়ী দেখছেন।)

সুমি। (ছুটে এসে) তোমার শরীর খারাপ করছে বাবা? চল, তোমাকে শুইয়ে দিয়ে আসি। নার্স, নার্স—। নিখিলবাবু যাবেন না, একটু বসুন।

(নার্স এলে সে ও সুমিত্রা মিলে শশাঙ্ককে ধরাধরি ক'রে ডানদিক্ দিয়ে নিয়ে চ'লে গেল। নিখিল দরজা অবধি এগিয়ে গিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তার পর ফিরে এসে, সুমি যে-চেয়ারটাতে বসেছিল সেটাকে নিজের একটু কাছে টেনে এনে রাখল। সুমি এসে বসল সেই চেয়ারটাতে।)

নিখিল। আমি যাঁকে ফেলে কলকাতা ছেড়ে যেতে পারছি না, সে-মানুষটি যে কে—আশা করি তা আপনি জানেন।

সুমি। (উঠে দাঁড়িয়ে) চা খাবেন?

নিখিল। মনে হচ্ছে খাওয়াটা খুবই জরুরী দরকার, সুতরাং খাব।

(সুমি বাঁদিক্ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে একটু পরেই ফিরে এল)

সুমি। বিভাকে কাছেই পেলাম, তাকেই বললাম, একটু চা ক'রে আনতে।

নিখিল। চা-টা আকস্মিক, কিন্তু বিভাদেবীর এত নিকট-সান্নিধ্যটাকে ঠিক ততটাই আকস্মিক ব'লে ত মনে হচ্ছে না?

(সুমি হাসল একটু।)

ভেবেছিলাম, আপনার কাছে একটুক্ষণ বসতে পাব, কিন্তু আমার যেমন কপাল!

সুমি। ব'সে ত আছেনই!

নিখিল। ভেবেছিলাম, একটু নিরিবিলি বসতে

পাব, আর কেউ সেখানে থাকবে না, বিভা দেবী ত নয়ই।

সুমি। ওরকম ক'রে কথাটাকে বলবেন না।

নিখিল। যেরকম ক'রেই বলি, কথাটা যে কি তা ত আর আপনার অজানা নেই?

সুমি। অজানা থাকলেই ছিল ভাল।

নিখিল। (চেয়ারটাকে সুমির দিকে ঘুরিয়ে ব'সে) কেন, কেন আপনি একথা বলছেন?

সুমি। আপনি এখনো ছেলেমানুষ আছেন, বুঝতে পারবেন না।

নিখিল। আপনি দুঃখ পান?

সুমি। (একটু চুপ ক'রে থেকে) সুখ কিছুই পাই না।

নিখিল। আমি কি কেবল দুঃখই বয়ে এনেছি আপনার জীবনে? কোনোদিকে, কোনোদিন এতটুকুও—

সুমি। (উঠে দাঁড়িয়ে) এ আলোচনাটা আর চলবে না।

নিখিল। (দাঁড়িয়ে) আচ্ছা, চুপ করলাম। আপনার হাত থেকে মৃত্যুদণ্ডও যদি আমায় নিতে হয়, ভগবান্ করুন, হাসিমুখেই যেন আমি সেটা নিতে পারি।

সুমি। এই বুঝি আপনার চুপ করার নমুনা?

নিখিল। আচ্ছা যাক, আর বলব না।

(দু'জনেই বসল।)

ঐ যে, চা আসছে।

(বাঁদিক্ থেকে চাকর চায়ের ট্রে নিয়ে এল, বিভাও এসেছে সেইসঙ্গে। অতি গুরু-গম্ভীর মুখের ভাব।)

সুমি। জল গরম হয়ে গেল এরই মধ্যে?

বিভা। হয়েছে কিনা দে'খে নাও;—না হয়ে থাকে ত আবার গরমে বসাচ্ছি।

নিখিল। না, না, বেশ গরম হয়েছে, ঐ ত ভাপ বেরোচ্ছে।

(সুমি উঠে গিয়ে চায়ের পটে চা মেপে দিয়ে চামচ দিয়ে নাড়ছে।)

নিখিল। (বিভাকে) বসুন।

(বিভা বসল। রাজেন এসে ঢুকল ঠিক সেই সময়। একটা চেয়ারে ধপ্ ক'রে ব'সে)

রাজেন। আমাকেও দিও এক পেয়ালা। রেঙ্গুনের এয়ার রেডের গল্প শুনে গলাটা শুকিয়ে উঠেছে। কি কষ্টে যে ভদ্রলোকের হাত থেকে রেহাই পেয়েছি তা জানো না।

সুমি। গলা যদি শুকিয়ে ওঠে ত অমন গল্প শোন কেন?

রাজেন। সাধ ক'রে কি আর শুনি? তেড়ে এসে শোনায়। তোমরা ত দিব্যি পালিয়ে চ'লে এস, কিন্তু আমার বাড়ী, ভদ্রলোক অভ্যাগত, আমার ত পালাবার জো নেই?

নিখিল। রাজেনবাবু, দেওঘরে যাবেন না।

রাজেন। কেন? দেওঘর কি দোষ করল?

নিখিল। কলকাতার এয়ার রেড সেখানে এড়াতে পারবেন, কিন্তু রেঙ্গুনের এয়ার রেড এড়াবেন কি ক'রে? রণধীরবাবুও ত দেওঘরে যাচ্ছেন?

সুমি। বন্ধু কাল সোজাসুজিই বলল, মাইনেটা কিছু বেইড়ে দিন্ মা। বললাম, কেন রে? না, কাজ কত বেড়ে গিয়েছে। কি কাজ বাড়ল? না, ঐ রেঙ্গুনী গল্প ব'সে ব'সে শুনতি হয়। আর প্রাণডা কেমন করতি থাকে।

(সুমি দু-পেয়ালা চা রাজেন আর নিখিলের দিকে এগিয়ে দিয়ে আর দুটো পেয়ালায় চা ঢালছে এমন সময় সাইরেন বাজল। নিখিল ও বিভা ছুটে গিয়ে জানালা বন্ধ করছে। সুমি চ'লে গেল শশাঙ্কর কাছে পাশের ঘরে। নিখিল ফিরে এসে চা খাচ্ছে, বিভা নিজের পেয়ালাটার চা-য়ে চিনি দুধ মেশাচ্ছে, রাজেন তার পেয়ালাটাকে ঠেলে সরিয়ে রাখল।)

রাজেন। (সাইরেন থামলে চেয়ারের দুটো হাতার ওপর ভর দিয়ে উঠি উঠি করছে) নীচে চ'লে গেলে হ'ত না?

বিভা। তুমি নীচেই যাও দাদা।

রাজেন। আমি নিজের জন্যে ভাবছি না—

বিভা। যার জন্যেই ভাবো, নীচে না গেলে ভাল ক'রে ভাবতে পারবে না।

(ওপরে এরোপ্লেনের শব্দ। দূরে অ্যান্টি এয়ারক্রাফ্ট্। ডানদিক্ থেকে ত্রস্তভাবে নার্স ঢুকল। নীচে থেকে রণধীরের গলা শোনা গেল, "রাজেনবাবু, ওঁদের নিয়ে নীচে চ'লে আসুন, নীচে চ'লে আসুন!")

নার্স। উনি আপনাকে একটু ওঘরে আসতে বললেন।

রাজেন। গিয়ে বলুন, একটু পরে যাচ্ছি।

(ছুটে উল্টোদিক্ দিয়ে বেরিয়ে গেল। নার্স চ'লে গেলে বিভা ও নিখিল চা খাওয়া শেষ ক'রে ছাতের কড়িকাঠ গুনছে। একটুক্ষণ ঐ ভাবে কাটলে, একটু ন'ড়ে ব'সে।)

নিখিল। আপনি নীচে গেলেন না?

বিভা। গেলে আপনার কিছু সুবিধা হ'ত?

নিখিল। আমি কোনো কথা বললেই আপনি চ'টে যান কেন?

বিভা। আপনিও ত নীচে যান নি, কই, আমি ত জানতে চাই নি কেন যান নি? আমাকে কেন আপনি জিজ্ঞেস করছেন?

নিখিল। অন্যায় হয়েছে, ক্ষমা চাইছি।

বিভা। ক্ষমা চাইছি! ঐ একটি কথাই কেবল শিখেছেন! (আর একটুক্ষণ চুপ ক'রে কাটলে)

আর এক পেয়ালা চা দেব?

নিখিল। তাই দিন বরং, সন্ধি স্থাপিত হয়ে যাক।

(বিভা চা ঢেলে দুধ চিনি মেশাচ্ছে এমন সময় ডানদিক্ থেকে সুমি ঢুকল খুব উত্তেজিত ভাবে।)

সুমি। উনি কি নীচে চ'লে গেলেন?

নিখিল। (উঠে দাঁড়িয়ে) কেন, কি হয়েছে?

সুমি। বাবা হঠাৎ কি রকম ক'রে উঠলেন। এত ভড়কেছিলাম! তা ওঁকে ডাকতে পাঠানোই আমার ভুল হয়েছিল।

নিখিল। কি হ'ল ওঁর আবার, চলুন দেখছি।

সুমি। না থাক, সামলে গেছেন। নার্স ওঁকে এখন একটু ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করছে।

নিখিল। আপনার মুখটা কি রকম ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে; আপনি বসুন দেখি একটু। (একটা চেয়ার এগিয়ে দিল।)

সুমি। (চেয়ারটাকে ঠেলে দিয়ে) না, বসব না। বসতে ভাল লাগছে না।...বাবা! ভয় পেতে অনেককে দেখেছি, কিন্তু এ রকম কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলতে যে কেউ পারে সেটা জানা ছিল না। নার্স টা যে কি ভাবল! আর বাবাই বা কি মনে করলেন!

বিভা। ভীরু মানুষকে ক্রমাগত ভয় পেতে দিয়ে তোমাদেরই বা কি পরমার্থ লাভ হচ্ছে আমাকে বলতে পারো? ওকে দাও না ছেড়ে, ও চ'লে যাক।

সুমি। (ক্ষিপ্রবেগে বিভার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে) কে ওঁকে ধ'রে রেখেছে?

বিভা। (উঠে দাঁড়িয়ে) তোমরা, তোমরা!

সুমি। তোমরা মানে?

বিভা। তোমরা মানে তোমরা। তুমি আর নিখিল-বাবু। যেন কিছু জান না, যেন কিছুই বুঝতে পারছ না, ভয়ে আধমরা হয়ে গিয়েও কেন ও কলকাতা ছেড়ে যেতে ভরসা পাচ্ছে না।

সুমি। আচ্ছা, বেশ! নিখিলবাবু!

নিখিল। বলুন।

সুমি। আমার একটা কথা রাখবেন?

নিখিল। (সাধারণ ভাবে) বলুন, কি কথা?

সুমি। আগে বলুন, রাখবেন কি না।

নিখিল। যদি আগাম কথা দেবার দরকার আছে আপনি মনে করেন, তবে কথা দিচ্ছি, রাখব।

সুমি। আপনি দেওঘর যাবেন?

নিখিল। (একটুক্ষণ মাথা নীচু ক'রে থেকে) যাওয়াটা দরকার,—নয়?

সুমি। খুব।

নিখিল। (সুমির মুখের দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে, তারপর চকিতে বিভাকে একবার দেখে নিয়ে) তথাস্তু! কবে যেতে হবে?

সুমি। আজকেই, রাত্রের ট্রেনে।

বিভা। আজকেই কেন? (কেউ দেখল না তার দিকে।)

নিখিল। কতদিনের জন্যে এই নির্ব্বাসন?

সুমি। জানি না। (ঠোঁট কামড়ে একটা চেয়ারের হাতা চেপে ধরেছে। মনে হচ্ছে, কাঁপছে।)

নিখিল। (আবার একটুক্ষণ সুমির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে) বেশ, তাই হবে। (হাতঘড়িটা দেখল) আমাকে তাহলে এখনই বেরুতে হচ্ছে। এদিক্-ওদিক্ একটু-আধটু কাজ যা বাকী আছে সেরে নিতে হবে। আচ্ছা, চললাম। নমস্কার! নমস্কার!

সুমি। এখনি যাবেন না, অল্-ক্লিয়ার দিক আগে।

বিভা। অল্ ক্লিয়ার অবধি ব'সে যান, অল্ ক্লিয়ার অবধি ব'সে যান!

নিখিল। (বেরিয়ে যেতে যেতে) ব'সে যাবার উপায় নেই, ট্রেন ধরতে হবে।

দৃশ্যান্তর।

তৃতীয় দৃশ্য

(দু'তলায় শশাঙ্কর ঘর। বৃহস্পতিবার, সকাল আটটা। জড়ো করা কয়েকটা বালিশ আর কুশনে হেলান দিয়ে শশাঙ্ক ব'সে আছেন বিছানায়। রাজেন সেগুলির কোনোটাকে একটু টেনে, কোনোটাকে বা একটু ঠেলে, উঠিয়ে নামিয়ে ঠিক ক'রে দিচ্ছে।)

রাজেন। আর দুটো কুশন এনে দেব?

শশাঙ্ক। না, এই ঠিক আছে।

(রাজেন একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।)

রাজেন। হতভাগা চাকরগুলোর জন্তে আপনাকে বাড়ীতে রাখবার ব্যবস্থা করতে পারলাম না। আমাদের রান্নার চাকর ভজহরি কাল সকালে বাজার করতে বেরিয়ে বাজারের টাকাটা নিয়েই উধাও হয়েছে। উমাপদ অনেক চেঁচামেচি ক'রে ঘুঁষি-টুসি বাগিয়ে তাকে ধ'রে আনতে গেল, ত সে গেলই। বঙ্কু কেবল বাকি আছে, কিন্তু তার ছুটি পাওনা; আমরা সবাই যখন দেওঘর যাব তখন সেও কিছুদিনের জন্তে দেশে যাবে কথা ছিল; জানি না এখন সে কি করবে।

শশাঙ্ক। নার্সিং হোমে আমার ত কোনো অসুবিধাই হবার কথা নয়? ও বেচারারা ভয় পাচ্ছে, ওদের ধ'রে না রাখাই উচিত।

রাজেন। বাড়ীতে চাকর একটাও না থাকলে আমরাই বা কলকাতায় কি ক'রে থাকতাম?

শশাঙ্ক। সে ত সত্যি কথা। চ'লে যাবে ঠিক ক'রে তুমি খুব বুদ্ধিমানের মতই কাজ করেছ। কেবল সুমিকেও যদি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারতে তাহলেই আর কোনো কথা ছিল না।

রাজেন। সে জন্যে চেষ্টার কিছু ত্রুটি করি নি, তা ত আপনি জানেন।

শশাঙ্ক। ওকে ব'লে আর কোনো লাভ নেই, নয়?

রাজেন। কোনো লাভ নেই।

শশাঙ্ক। রণধীরবাবুরাও ত চ'লে যাচ্ছেন?

রাজেন। যাবার তাড়া ওঁদেরই ত বেশী। এয়ার রেড বলতে কি যে বোঝায় সেটা ওঁদের জানা আছে কিনা? দেওঘরের বাড়ীটা ওঁরাই ত ঠিক করেছেন। এক তলায় ওঁরা থাকবেন, দু'তলায় আমরা। চাকর-বাকর বেশী ত নেওয়া যাচ্ছে না সঙ্গে, রান্না-খাওয়াও তাই একসঙ্গেই হবে ঠিক হয়েছে। একসঙ্গেই আমরা বেরুচ্ছি।

শশাঙ্ক। বেশ, বেশ, এ খুব ভাল ব্যবস্থাই হয়েছে। বিদেশে বন্ধুবান্ধব কাছাকাছি থাকলে সবদিক্ দিয়েই সুবিধা। কিন্তু সুমি বড্ড ভুল করছে, তারও উচিত ছিল তোমাদের সঙ্গে চ'লে যাওয়া।

(একটা ট্রেতে ধূমায়মান পরিজের প্লেট আর দুধের পাত্র নিয়ে সুমির প্রবেশ। বিছানার পাশে টিপয়ের ওপর ট্রেটা নামিয়ে রেখে একটা ন্যাপকিন নিয়ে শশাঙ্কের গলায় জড়িয়ে দিল। তার পর পরিজের প্লেটে দুধ ঢালছে, চিনি মেশাচ্ছে।)

ডাক্তার আজ পরিজ খেতে দিয়েছেন, তার মানে আমি অনেকটাই ভাল আছি। মা সুমি, রাজেন বলছিলেন, তাঁর এক বন্ধুর নার্সিং হোমে আমার থাকবার খুব ভাল ব্যবস্থা তিনি করেছেন। আমি আবারও বলছি মা, তুমি নিশ্চিন্ত মনে দেওঘর চ'লে যাও।

সুমি। (চামচে করে শশাঙ্কর মুখে খাবার দিতে দিতে) আমি বেশ নিশ্চিন্ত মনেই কলকাতাতে থাকব বাবা। দেওঘরে আমি যাব না। নার্সিং হোমে পাশাপাশি দুটো বেশ ভাল ঘর পাওয়া গেছে, তার একটাতে তুমি থাকবে, আর একটাতে আমি। আমাদের ডাক্তারবাবুর বাড়ীর খুব কাছেই সেই নার্সিং হোম, দিনে যতবার ইচ্ছে তাঁকে ডাকা যাবে। আমার খাওয়া-দাওয়ারও খুব ভাল ব্যবস্থাই হবে সেখানে। দু'জনে বেশ থাকব আমরা।

শশাঙ্ক। কিন্তু মা,—

সুমি। বাবা, আমি জানি তুমি কি বলবে। তুমি আমার জন্তে ভয় পেও না। তুমি দেখো কিছুই হবে না; আমার মন বলছে, আমাদের কোনো বিপদ্ হবে না।

শশাঙ্ক। ভগবান্ করুন, তোমার মন যা বলছে তাই যেন ঠিক হয় মা, কিন্তু আমি যে স্থির হতে পারছি না।

(শশাঙ্ককে খাওয়ানো শেষ ক'রে জল খাইয়ে সুমি ন্যাপকিন্‌টাতে তাঁর মুখ মুছিয়ে দিচ্ছে।)

রাজেন। দেখ সুমি, তোমাকে আমাদের সঙ্গে যেতে আমি বলছি না। তবে কোনো ভুল ধারণা নিয়ে তুমি এখানে থাকো তাও আমি চাই না। বোমার ভয় তোমার নেই, খুব ভাল কথা। কিন্তু মনে রেখো, সেইটেই একমাত্র ভয় নয়। জাপানীরা যেসব জায়গা দখল করেছে, কি অকথ্য অত্যাচার করেছে সেসব জায়গায় তা ত জানো না? কাগজে কিছুটা বেরিয়েছে, অনেক কথাই বেরোয় নি। বিশেষ ক'রে মেয়েদের ভয় ত সবচেয়ে বেশী। রেঙ্গুনে—

সুমি। চুপ কর! অসুস্থ মানুষের সামনে কি যা তা বলছ? চ'লে যাও এখান থেকে!

রাজেন। আচ্ছা বেশ, যাচ্ছি। আর ত দুদিন, তার পর আর কোনো কথাই বলতে আসব না।

(চ'লে গেল।)

শশাঙ্ক। মা সুমি, রাজেন রাগ ক'রে চ'লে গেল! যা দিনকাল পড়েছে, কে কখন কি অবস্থায় আমরা থাকব কে জানে? তুমি যাও, ওকে ডেকে নিয়ে এস।

সুমি। উনি যদি রাগ করেন তার আমি কি করতে পারি? আমি কিছু কি অন্যায় বলেছি?

শশাঙ্ক। মা, ও ভয় পাচ্ছে; নিজের জন্তেও পাচ্ছে, তোমার জন্তেও পাচ্ছে। তর্ক ক'রে বা তিরস্কার ক'রে মানুষের ভয় দূর করা যায় না। ওটা একটা ব্যাধি।

তোমাকে মনে রাখতে হবে এখন থেকে, যে, তোমার ওপর দুটি রুগীর দেখাশোনার ভার রয়েছে। তার একটি আমি, আর একটি রাজেন। যাও মা, ওকে ডেকে আনো।

(সুমির প্রস্থান, ও একটু পরে পুনঃপ্রবেশ।)

সুমি। উনি রণধীরবাবুর সঙ্গে একটু বাইরে গেছেন।

শশাঙ্ক। আচ্ছা, ফিরে আসুক, তখন কথা হবে। মা সুমি, তার আগে একটা কথা তোমাকে ব'লে রাখছি। আমার জন্যে যে ব্যবস্থাই তোমরা কর, তার ফলে তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি···মা, সুমি, আমার প্রতি কর্ত্তব্যই ত তোমার একমাত্র কর্ত্তব্য নয়!

(একটু রোদ এসে শশাঙ্কর মুখে পড়ছিল, সুমি উঠে গিয়ে জানালার পর্দ্দাটাকে টেনে দিয়ে এল।)

সুমি। বাবা, ওঁকে লজ্জা দিয়ে হোক, দুঃখ দিয়ে হোক, ওঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা চ'লে যাচ্ছে এই আর একটা ভয় ওঁর মনে ধরিয়ে দিয়ে হোক, ওঁর এই বোমার ভয়টা আমি যদি একটু কমিয়ে দিতে পারি ত স্বামীর প্রতি একটা খুব বড় কর্ত্তব্য আমার করা হবে ব'লে আমি মনে করি।

শশাঙ্ক। মা, তুমি ছেলেমানুষ, না বুঝে অত্যন্ত বড় risk একটা নিচ্ছ। ধর, যদি ভয় না কাটে, কিন্তু অন্য জিনিষগুলি মনে দাগ কেটে ব'সে যায়, কিংবা ভয় কেটে গিয়েই সেটা হয়?

সুমি। তখন সেই দাগগুলো মুছে ফেলবার চেষ্টা করা স্ত্রী হিসেবে আমার কর্ত্তব্য হবে।

শশাঙ্ক। বড় কঠিন সমস্যা! বড় কঠিন সমস্যা।··· মা, এই কুশনগুলো সরিয়ে নাও, একটু শোব।

(সুমি কুশন সরিয়ে নিয়ে বালিসদুটো ঠিক ক'রে দিলে শশাঙ্ক শুলেন।)

নটা প্রায় বাজতে যাচ্ছে, আজ নার্স কেন এখনও এল না?

সুমি। সে নার্স আর আসবে না বাবা। কালকেই ত আমরা নার্সিং হোমে যাচ্ছি, এই একটা দিন আমিই চালিয়ে নেব।

শশাঙ্ক। কলকাতা ছেড়ে যাবে না বলেছিল, চ'লে গেছে বুঝি?

সুমি। না, তা নয় বাবা। অনেকগুলো ষ্ট্রীকৃনিন্ খোয়া গিয়েছিল, তা নিয়ে বিভা তাকে কি বলেছিলেন জানি না; বললে, চুরির অপবাদ নিয়ে এ বাড়ীতে সে কাজ করতে পারবে না। মাইনেপত্র বুঝে নিয়ে কাল রাত্রেই সে চ'লে গেছে।

শশাঙ্ক। (দুই কনুইয়ে ভর দিয়ে মাথা উঁচু ক'রে) চুরি? চুরির অপবাদ? কখনো সে চুরি করে নি, করতে পারে না। হে ভগবান্! আমি কি করি এখন? (শুলেন)

সুমি। একটা নার্স গেছে, দরকার হলেই আর একটা আসবে, এ নিয়ে তুমি এত বেশী অস্থির হচ্ছ কেন?

শশাঙ্ক। তুমি জানো না মা, চুরির অপবাদ বড় বিশ্রী অপবাদ। একেবারে নিঃসন্দেহ না হয়ে কাউকে সে-অপবাদ দিতে নেই। সন্দেহও প্রকাশ করতে নেই। চুরি যে করে নি, তাকে চোর সাব্যস্ত ক'রে কথা বলার মত এত বড় মহাপাতক বোধ হয় আর পৃথিবীতে নেই।

সুমি। বাবা, সে মহাপাতক আমি ত করিনি?

শশাঙ্ক। যেই ক'রে থাকুক, তার প্রায়শ্চিত্ত আমাদেরই করতে হবে। সেই নার্সটিকে তুমি ডেকে পাঠাও মা, আমি ওকে বুঝিয়ে বলব। বড় ভালমানুষ লোকটি, আমার এত যত্ন করত!

সুমি। সে জন্যে তুমি ভেব না বাবা, যত্ন করাই ওদের কাজ, সব নার্সই তা করবে।···তোমার বিছানার চাদরটা বদ্‌লে দিই বাবা?

শশাঙ্ক। না, না, কি দরকার? ঠিকই ত আছে?

সুমি। মোটেই ঠিক নেই, বড্ড থামসে গিয়েছে।

(শশাঙ্ককে বেশী নড়তে না দিয়ে দক্ষ নার্সের মত তাঁর চাদর পাল্‌টে দিচ্ছে)।

শশাঙ্ক। ওকে তুমি ডেকে পাঠাও মা। আমি তোমায় বলছি, চুরি সে করতে পারে না, চুরি সে করেনি, —ওকে অকারণে তোমরা সন্দেহ করছ।

(সুমি যখন তাঁর বালিসের তলার চাদর সরাচ্ছে তখন শশাঙ্ক কাগজের পুঁটলির মত কি একটা জিনিষ সেখান থেকে নিয়ে হাতের মুঠোয় লুকোলেন।)

সুমি। (সাধারণ ভাবে) ওটা কি?

শশাঙ্ক। (একটু হেসে) ও কিছু না মা।

(সুমি বাপের দিকে এক মুহূর্ত্ত আড়চোখে তাকিয়ে কি যেন ভাবল। চাদর বদ্‌লান শেষ হয়ে গেলে শশাঙ্ক দুটো হাত মাথার পেছন দিকে বালিশের নীচে রেখে শুলেন।)

শশাঙ্ক। নিখিলও এই দুদিন আসেনি, নয় মা? আজকেও তার আসার সময় উৎরে গেল।

সুমি। (শশাঙ্কর বিছানায় তাঁর শিয়রের কাছে

ব'সে) তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছি বাবা, নিখিলবাবু কলকাতায় নেই।

শশাঙ্ক। (টান হয়ে ব'সে) নিখিল কলকাতায় নেই? সে কি? সে ত বোমার ভয়ে পালাবার ছেলে নয়? জরুরী কোনো কাজে বাইরে গিয়েছি বুঝি? কবে ফিরবে?

সুমি। কবে যে ফিরবে তার ত কিছু ঠিক নেই।

শশাঙ্ক। তুমি যে আমাকে অবাক্ ক'রে দিচ্ছ মা। আমাকে নিয়ে এরপর যে একেবারে একলা পড়বে। কি ক'রে আমাদের চলবে?

সুমি। (হেসে) আমি কি রকম কাজের মেয়ে তা ত তুমি জানই বাবা। দেখো, ঠিক চালিয়ে নেব।

শশাঙ্ক। নিখিলও তা হলে আমাদের ছেড়ে চ'লে গেল? মা সুমি, শেষ পর্য্যন্ত নিখিল অন্ততঃ আমাদের কাছে থাকবে, এই আশা বরাবর আমার মনে ছিল।

সুমি। আমাদের খুব প্রয়োজনের সময় না এসে কি পারবেন?

শশাঙ্ক। জানি না, ভাবতেও পারছি না আর। (মুঠো বাঁধা ডান হাতটা বালিশের তলায় ঢুকিয়ে রেখে) মনে হচ্ছে, সে আসবে না আর। খুব সামান্য কারণে কলকাতা ছেড়ে সে যায় নি।

সুমি। (শশাঙ্কর বিছানার মাঝামাঝি জায়গায় পা ঝুলিয়ে বসে) হাতটা দাও বাবা। (শশাঙ্ক ডান হাতটা বালিশের নীচ থেকে বার ক'রে তার হাতে দিলে, সেটাতে হাত বুলোতে বুলোতে) তুমি ভেব না বাবা। কালই ত নার্সিং হোমে চ'লে যাচ্ছি; আর নার্সিং হোমগুলো ঠিক হাসপাতালের মত ত নয়? অনেকটাই বাড়ীর মত। দেখাশোনা করবার অনেক লোক থাকবে সেখানে। তা ছাড়া ওখানে আমার আর ত কোনো কাজ থাকবে না? সারাক্ষণই তোমার কাছে থাকতে পারব। ঐ হাতটা দাও এবারে।

(শশাঙ্ক সুমির দিকে পাশ ফিরে শুয়ে অন্য হাতটা তার হাতে দিলেন, এমন সময় "আসতে পারি?" ব'লে ডাক্তারের প্রবেশ)

ডাক্তার। নমস্কার। কেমন আছেন আজ সকালে?

শশাঙ্ক। এই যে, আসুন, নমস্কার! এমনিতে ত মোটের ওপর ভালই আছি, কিন্তু মনটা হঠাৎ বড় বেশী অবসন্ন হয়ে পড়েছে। নিখিল আমাদের ত্যাগ ক'রে গেছেন, আর শুনছি সেই নার্সটিও আর আসবে না।

ডাক্তার। তা ত জানি। ভাল কথা, সেই স্ট্রীকৃনিন্ গুলোর কিছু হদিশ মিলল?

সুমি। না।

ডাক্তার। তা হলে একটু সন্দেহ তার ওপর ত মানুষের হতেই পারে। ওগুলো সত্যিই যে দামী জিনিষ, বিশেষতঃ এই যুদ্ধের বাজারে, চাকরবাকরদের ত সেটা জানবার কথা নয়। (একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন।)

শশাঙ্ক। তা নয়, এ আপনি ঠিকই বলেছেন, কিন্তু সে নার্সটি সম্পূর্ণ নির্দোষ, এও আমি আপনাদের ব'লে দিচ্ছি। (উত্তেজিত ভাবে) এত ভালমানুষ লোকটি, ওর ওপরে এই মিথ্যে সন্দেহ, অন্যায় সন্দেহ কেন যে আপনাদের হচ্ছে!

সুমি। বাবা, তুমি এই একটা সামান্য কথা নিয়ে—

শশাঙ্ক। (উত্তেজিত ভাবে) কথাটা সামান্য নয় মা।

(সুমি শশাঙ্কর মুখের দিকে একটুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে কি ভাবল।)

সুমি। তোমার বালিশদুটোকে একটু ঠিক ক'রে দিই বাবা।

(উঠে শশাঙ্কর শিয়রের কাছে গিয়ে বালিশে হাত দিতে যাচ্ছিল, শশাঙ্ক দুর্ব্বল হাতেও বেশ একটু জোরেই তার হাতটাকে ঠেলে সরিয়ে দিলেন।)

শশাঙ্ক। বালিশ ঠিক আছে মা, তা ছাড়া আমার বড় ক্লান্ত বোধ হচ্ছে, আমাকে আর এখন নাড়ানাড়ি বেশী ক'রো না।

(ডাক্তার শশাঙ্কর নাড়ী দেখছেন, হাতঘড়িটা সামনে ধ'রে। সেটা হয়ে গেলে)

সুমি। কেমন দেখলেন?

ডাক্তার। ভালই ত মোটের ওপর।

সুমি। আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আগে কখনো আপনাকে বলিনি, আজ বলছি, যদি সম্ভব হয়, বাবাকে কলকাতার বাইরে নিয়ে যেতেই আমি চাই। আমার আজ, কেন জানি না, মনে হচ্ছে, কলকাতায় উনি কিছুতেই ভাল থাকবেন না। এ সঙ্কট থেকে পারেন ত আপনি আমাদের উদ্ধার করুন।

ডাক্তার। আমার যথাসাধ্য আমি ত করছি মা।

সুমি। যতরকমের precautions নিতে বলবেন, সব নেব, নার্স একজন বা দুজন্ সঙ্গে যাবে, যদি বলেন ত নতুন পাশকরা ডাক্তার একজন কাউকে সঙ্গে নিয়ে যাব। আপনি ভাল ক'রে আজ আর একবার ওঁকে দেখুন।

ডাক্তার। (কিছুমাত্র উৎসাহ না দেখিয়ে) আচ্ছা, তাই না হয় দেখছি।

(বন্ধুর প্রবেশ।)

বন্ধু। মা, দাদুর জন্যে ছানা করবেন্ বলেছিলেন, দুধ ফুটছে, একবার আসবেন?

সুমি। চল যাচ্ছি।

(বন্ধুর সঙ্গে সুমি বেরিয়ে গেল, ব্লাডপ্রেসার মাপবার যন্ত্র খুলে তার সব সরঞ্জাম ঠিক করতে করতে)

ডাক্তার। সেই মেনিঞ্জাইটিসের কেস্‌টা সেরে উঠল মশাই এতদিনে।

শশাঙ্ক। সেরে উঠেছে? আহা, বেশ, বেশ!

ডাক্তার। (ইনস্ট্রুমেণ্টের কাপড়টা শশাঙ্কর হাতে জড়াতে জড়াতে) টুকটুকে বৌটি, এই সেদিন মাত্র বিয়ে হয়েছে, যেতে বসেছিল আর কি! (হাওয়া পাম্প করতে করতে) কিন্তু হলে কি হবে? শনির প্রকোপ কাটেনি। অবিশ্রান্ত এতদিন বৌয়ের সেবা ক'রে স্বামীটি যখন ভাবছে এবারে ক'দিন একটু হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করবে, তখন নিজেই সারা গায়ে বসন্ত বা'র ক'রে শুয়ে পড়েছে।

শশাঙ্ক। আসল বসন্ত?

ডাক্তার। না, পানবসন্ত, কিন্তু ভোগ ত আছে কপালে এখন আরও কিছুদিন? (প্রেশার মাপা শেষ হ'ল।)

শশাঙ্ক। কেমন দেখছেন?

ডাক্তার। একটু ভালর দিকেই ত মনে হচ্ছে।

শশাঙ্ক। (উঠে ব'সে) আমিও বেশ ভালই বোধ করছি এই দু'দিন। আমার মনে হয়, আপনি এখন স্বচ্ছন্দে আমাকে এদের সঙ্গে দেওঘর যাবার অনুমতি দিতে পারেন।

(ডাক্তার নীরবে মাথা নেড়ে জানাচ্ছেন, না, না, না।)

দেখুন, আমার জন্যে সুমির যাওয়া হচ্ছে না। রাজেন একটু বেশী ভয় পাচ্ছে, কিন্তু বোমার ভয়টা যে আছেই সেটা ত অস্বীকার করা যায় না? তার ওপর আবার শহরে বসন্ত হতে সুরু হয়েছে। বাপ হয়ে নিজের সন্তান, নিজের একমাত্র সন্তানের জীবন আমি বিপন্ন করছি।

ডাক্তার। আপনি ইচ্ছে ক'রে ত আর করছেন না?

শশাঙ্ক। অনিচ্ছাতেই বা করব কেন? আপনি অনুমতি করুন, আমি যাই।

ডাক্তার। কলকাতা ছেড়ে সবাই ত আর যাচ্ছে না? এই ত দেখুন না, আমি যাচ্ছি না।

শশাঙ্ক। কি হয় যদি যাই? পথেই কি ম'রে যাব?

ডাক্তার। আপনাকে ভয় দেখানো আমার উচিত নয়, কিন্তু আপনার এখনকার শরীরের অবস্থায় দেওঘর যাওয়া কিছুতেই চলতে পারে না।

শশাঙ্ক। নাও ত মরতে পারি!

ডাক্তার। রাখে কেষ্ট মারে কে? ভগবানের ইচ্ছেয় এই পৃথিবীতে এখনও দু-একটা miracle না যে ঘটে এমন ত নয়? কিন্তু সে-সম্ভাবনার উপর নির্ভর ক'রে এত বড় একটা risk ডাক্তার হয়ে কি ক'রে আপনাকে আমি নিতে দেব?

শশাঙ্ক। বেশ, অন্যদিকের risk-এর কথাটাও তাহলে একটু ভাবুন। সুমির নিজের বিপদাপদের কথাটা না-হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু, ওর যদি যাওয়া না হয় তাহলে তাই নিয়ে ওদের স্বামী-স্ত্রীতে চিরকালের মতো একটা মন-কষাকষির সূত্রপাত হয়ে থাকবে, এই ক'দিন ধ'রে আমি সেটা খুব বেশীই অনুভব করছি। আমি মাঝখানে এসে পড়াতে এরা দু'জন দু'জনের কাছ থেকে ক্রমেই যেন দূরে চ'লে যাচ্ছে। রাজেন সেটা বুঝছে না, সুমি খানিকটা হয়ত বুঝছে কিন্তু জিনিষটার শেষ পরিণতি যে কি হতে পারে সেটা তলিয়ে ভাবছে না। কিন্তু আমি ত না ভেবে পারি না? আমি আর ক'দিন, কিন্তু ওদের সারা জীবনটাই যে সামনে প'ড়ে আছে।

(একটু দম নেবার জন্যে শশাঙ্ক আবার বালিশে মাথা রেখে শুলেন। ডাক্তার নিজের ডান হাতটাকে মেলে ধ'রে যেন রেখাগুলোকে দেখছেন। শশাঙ্ক আবার উঠে বসলেন।)

ধরুন যদি এমন হয়,—এ বাড়ীতে বোমা প'ড়ে আগুন লাগে, আমাকে না সরিয়ে নিলে আমার পুড়ে মরাটা নিশ্চিত, আর সরিয়ে নিলে তার risk যতটা আপনি বলছেন তা আছে;—সে অবস্থায় আমাকে পুড়ে মরতে দেবার পরামর্শই কি সকলকে আপনি দেবেন?

ডাক্তার। ঠিক এ ধরনের অবস্থায় কখনো ত পড়িনি, তাই ঠিক বলতে পারছি না; তবে আমার মনে হয়, riskটা যে কি, ডাক্তার হিসেবে সেটুকু ব'লেই ক্ষান্ত হব, কোনো পরামর্শই দেব না।

শশাঙ্ক। বেশ, মনে করুন পরামর্শ নেবার কেউ নেই, আমার ভালমন্দের সমস্ত দায়িত্ব একলা আপনার। আমাকে সরিয়ে নেবার risk আপনি কি নেবেন, না আমায় পুড়ে মরতে দেবেন?

(ডাক্তার এবার নিজের বাঁ হাতের তেলোটা চোখের খুব কাছে এনে দেখছেন।)

কলকাতা থেকে আমাকে সরিয়ে নেবার অনুমতি আপনি দিন। আপনাকে এ পরিবারের, এবং আমার, খুব বড় বন্ধু ব'লে আমি জানি, এইটুকু বন্ধুকৃত্য আপনি করুন, সবদিকে সকলেরই তাতে ভাল হবে। আমি

সত্যি বলছি, কলকাতাতে আমি বেড়া আগুনের মধ্যে রয়েছি, অকারণে আরও কয়েকটা মানুষকে এই বেড়া আগুনের মধ্যে আমি এনে ফেলেছি, এর থেকে সকলকার মুক্তির উপায় আপনি ক'রে দিন। একমাত্র আপনিই সেটা করতে পারবেন।

ডাক্তার। (দুটি হাতেরই তেলো চোখের কাছে নিয়ে গেলে ধ'রে) আপনি বড় কঠিন সমস্যায় আমাকে ফেলেছেন। আমি কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না, কি ক'রে আপনার অনুরোধ আমি রাখব।

শশাঙ্ক। (বালিশে মাথা রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে, চাদরটাকে ভাল ক'রে গায়ে জড়িয়ে) আমার শেষ কথা যা বলবার, তাও আপনাকে তাহলে বলি। বলব না ভেবেছিলাম, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি উপায় নেই! শুনুন, (আবার হঠাৎ উঠে ব'সে) আমাকে দেওঘর যাবার অনুমতি না দিতে পারেন, কিন্তু আরও অনেক কাছে আর একটা দেওঘর আছে জানেন, যার পথ আমার মতো অসহায় অক্ষম মানুষের জন্যেও নিয়তই খোলা রয়েছে?

(ডাক্তার উঠে দাঁড়িয়ে যেন হাত তোলার ভঙ্গিতে ওঁকে থামিয়ে দিতে চাইলেন।)

কারুর অনুমতি না নিয়েই সে পথে পা বাড়াতে আমি পারি, দম না নিয়ে কয়েক ধাপ সিঁড়ি একটু তাড়াতাড়ি উঠে গেলেই ত সেখানে পৌঁছে যেতে পারি। আজকেই পারি, যে-কোনো মুহূর্তে,···কিন্তু সে বড় বিশ্রী হবে, নিতান্ত নিরুপায় না হলে সে রকম কিছু করতে আমি চাই না।

ডাক্তার। (পিছনের খোলা জানালাটার কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে বাইরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, তার পর ফিরে দাঁড়িয়ে সেইখান থেকেই) আপনি কি বলতে চাইছেন, আমি বুঝতে পারছি। আচ্ছা, আমাকে একটু সময় দিন, আমি ভেবে দেখব, কথা দিচ্ছি।

শশাঙ্ক। (আবার শুলেন) না, ভাববার সময় আর একেবারে নেই। যা বলবার, এখুনি বলুন।

ডাক্তার। (এগিয়ে এসে ব্যাগটা তুলে নিয়ে) আচ্ছা, অনুমতি দিচ্ছি, আপনি যান। ভগবান্ করুন, আপনার কোনো বিপদ্ যেন না হয়। যদি হয়, সমস্ত জীবনে কোনোদিন আর আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না।

শশাঙ্ক। (ডাক্তারের দিকে একটা হাত বাড়িয়ে) পরকাল ব'লে যদি কিছু থাকে, (ডাক্তার তাঁর হাতটিকে নিজের হাতে নিলেন) আছে ব'লেই বিশ্বাস করি, ত আপনার এ বন্ধুঋণ ওপারে গিয়েও আমি ভুলব না।

ডাক্তার। আচ্ছা, নমস্কার!

শশাঙ্ক। নমস্কার! আপনি যাবার সময় কথাটা দয়া ক'রে ওদের ব'লে যাবেন। Risk-এর কথাটা সুমিকে বলবার দরকার নেই, রাজেনকে বলতে পারেন, যদি তার দরকার মনে হয়, সে-ই সুমিকে বুঝিয়ে বলবে এখন।

ডাক্তার। রাজেন বোধ হয় পাশের ঘরেই রয়েছেন, তাঁর গলা পাচ্ছিলাম।

(নেপথ্যের দিকে ফিরে)

রাজেন!

("এই যে, যাচ্ছি" ব'লে রাজেনের প্রবেশ।)

রাজেন। আমাকে ডাকছিলেন, ডাক্তার ব্যানার্জ্জি?

শশাঙ্ক। (হেসে) ডাকছিলাম আসলে আমি। বাবা, শোন! ডাক্তার ব্যানার্জ্জি বলছেন, risk একটু যদিও আছে, তবু শনিবারে তোমাদের সঙ্গে আমিও দেওঘর যেতে পারি।

(শশাঙ্কর দিকে ফিরে নীরবে দু-হাত কপালে ঠেকিয়ে ডাক্তারের প্রস্থান।)

রাজেন। (উত্তেজিত ভাবে) পারেন? পারেন? যেতে পারেন আপনি আমাদের সঙ্গে? সুমি কোথা গেল? সুমি! সুমি!···বিভা, ও বিভা! (ছুটে বেরিয়ে গেল।)

(একটু পরেই সুমির প্রবেশ।)

শশাঙ্ক। রাজেন তোমাকে খুঁজছিলেন।

সুমি। (শশাঙ্কর মাথার নীচেকার বালিশ দুটোকে ঠিক করতে গেলে শশাঙ্ক নিজেই সে দুটোকে ঠিক ক'রে নিচ্ছেন।) ওঁর ডাক শুনেই ত এলাম। (বসল।)

ছানাটা এখন খাবে বাবা, আনতে বলব?

শশাঙ্ক। এখন থাক, একটু পরে আনতে ব'লো। (ডান হাতে কপাল টিপছেন।)

সুমি। তোমার মাথা ধরেছে বাবা? টিপে দেব?

শশাঙ্ক। না, না, মাথা ধরে নি। একটু কি রকম করছিল মাথাটা, তা এখন সেরে গেছে।

(উত্তেজিত ভাবে রাজেনের প্রবেশ।)

রাজেন। সুমি, তুমি এইখানে রয়েছ? আমি ওঁর আর তোমার টিকিট করতে পাঠিয়ে এলাম।

সুমি। তার মানে?

রাজেন। কেন, তুমি জানো না? ডাক্তার ব্যানার্জ্জি যে আজ ওঁকে দেওঘর যাবার অনুমতি দিয়ে গিয়েছেন?

সুমি। জানি না।

রাজেন। (রেগে উঠে) জানতে না; এখন ত জানো?

সুমি। না!

শশাঙ্ক। মা, রাজেন ঠিক কথাই বলছে। দেওঘর যাবার অনুমতি আজ আমি পেয়েছি।

সুমি। ও!

রাজেন। ও! 'ও' মানে কি? তোমার আসল মনের কথাটা কি বল ত শুনি? উনি ভাল আছেন, ওঁকে নিয়ে সকলে মিলে আমরা আনন্দ ক'রে দেওঘর যাব, এ আর তোমার প্রাণে সইছে না, না?

সুমি। হ্যাঁ, আনন্দ করবারই মত অবস্থা বটে।

রাজেন। অবস্থাটা খারাপ কিসে শুনি?

সুমি। আচ্ছা, ডাক্তারের কাছ থেকে কথাটা তুমি জোর ক'রে আদায় কর নি?

শশাঙ্ক। মা, সুমি—

রাজেন। দেখ সুমি, যা তা বলবে না।

সুমি। আমার কেবলই কেমন সন্দেহ হচ্ছে। কাল পর্য্যন্ত যে-মানুষটার বিছানা ছেড়ে ওঠা বারণ ছিল, আজই হঠাৎ এই নিদারুণ ভিড়ে সে একেবারে দেওঘর যাবার অনুমতি পেয়ে গেল, এর ভেতরে কিছু একটা রহস্য আছে যা আমি জানি না।

শশাঙ্ক। মা সুমি, রাজেনকে তুমি অকারণ—

রাজেন। তোমার পছন্দমত কথা না হলেই সেটাকে তোমার রহস্য মনে হয়, আর তুমি কোমর বেঁধে তর্ক করতে লেগে যাও। পছন্দ নয়ই যে কেন তাও একমাত্র তুমিই জানো। (প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল।)

শশাঙ্ক। (দুই কনুয়ের ওপর শরীরের ভর রেখে একটু উঠে বসার চেষ্টা ক'রে) মা সুমি, রাজেন রাগ ক'রে চ'লে গেলেন!

সুমি। (তাঁকে আবার শুইয়ে দিয়ে) না হয় করলেনই একটু রাগ। ভয় ছাড়া আরও দু-একটা মনো-বৃত্তি ওঁর মধ্যে এখনো কাজ করছে, জানতে পেলেও যে আমি বর্ত্তে যাই।

শশাঙ্ক। হে ভগবান্!

সুমি। বাবা, তোমার মনটার এখন প্রচুর বিশ্রাম দরকার। তার ঠিক উল্টো ব্যবস্থাটাই আমরা সকলে সারাক্ষণ করছি। (তাঁর বিছানায় তাঁর শিয়রের পাশে ব'সে তাঁর চুলের মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করতে করতে হঠাৎ সুমিত্রা বালিশের নীচে থেকে একটা ছোট কাগজের পুঁটুলি বের ক'রে নিল। শশাঙ্ক অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠলেন, সুমির হাত থেকে জিনিষটাকে নিতে গিয়ে পারলেন না। হতাশ ভাবে হাত গুটিয়ে নিলেন।)

শশাঙ্ক। ওটা তুমি নিও না মা, ওটা আমায় দাও! (আলোর কাছে পুঁটুলিটাকে নিয়ে গিয়ে খুলে দে'খে সুমি প্রায় ছুটে ফিরে এল শশাঙ্কর কাছে। তাঁর মুখের কাছে ঝুঁকে চাপা গলায়)

সুমি। বাবা! ষ্ট্রীকৃনিন্! এ ত ষ্ট্রীকৃনিন্! কি করতে এতগুলো বিষের বড়ি তোমার বালিশের নীচে?

শশাঙ্ক। (হাসবার চেষ্টা ক'রে) আমি বলি নি কি মা, যে, নার্স টির কোনো দোষ নেই? এই···মানে কি জানো? সব সময় নার্স কে বলতে ভাল লাগে না। আর ···মানে, সব সময় নার্স থাকেও না ত কাছে? ওটা খেলে গায়ে একটু বল পাই, ভাল লাগে, তাই নিয়ে রেখেছিলাম আর কি!

(সুমিত্রা একদৃষ্টে চেয়ে আছে বাপের দিকে, শশাঙ্ক শুয়ে থেকেই অস্বস্তিতে একটু ছট্‌ফট্ করছেন, বেশ বোঝা যাচ্ছে। পা-দুটিকে একবার গুটিয়ে নিলেন, একটু পরেই আবার মেলে শুলেন। দুটো হাতকে নিয়ে কি করবেন, যেন ঠিক ক'রে উঠতে পারছেন না।)

সুমি। (হঠাৎ আর্ত্তকণ্ঠে) বাবা!

শশাঙ্ক। (দুই কনুয়ের ওপর ভর রেখে মাথা তুলে) মা, মা!

সুমি। বাবা, এই রকম ক'রে তুমি আমাদের সমস্যাটাকে মেটাবে মনে করেছিলে?

শশাঙ্ক। না মা, না! মানে···হঠাৎ কি খেয়াল হ'ল, ওগুলিকে সরিয়ে রেখেছিলাম। হয়ত কোনো কাজেই লাগত না এগুলো শেষ পর্য্যন্ত।

সুমি। বাবা! বাবা!

শশাঙ্ক। মা!

(সুমিত্রা কেঁদে গড়িয়ে পড়ল শশাঙ্কর পাশে তাঁর বিছানার ওপর। মেয়ের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে অন্য হাতে শশাঙ্কও চোখের জল মুছলেন। সুমিত্রা হঠাৎ উঠে গিয়ে ষ্ট্রীকৃনিনের পুঁটুলিটা লোহার আলমারিতে তুলে রাখল। তার পর টেবিলটার কাছে গিয়ে তিন-চারটে শিশি-বোতল বেছে নিয়ে আলমারিতে রেখে চাবি বন্ধ ক'রে, পাল্লাদুটোকে টেনে দে'খে বাবার কাছে ফিরে এল। শশাঙ্ক বাহু-মূলে দুচোখ আবৃত ক'রে শুয়ে আছেন।)

সুমি। বাবা, সমস্যাটার আমিই সৃষ্টি করেছিলাম, কাজেই ঠিক করলাম, আমিই সেটার সমাধানও করব।

আমি ওদের সঙ্গে দেওঘরেই যাব শনিবারে। তুমি যাও নার্সিং হোমে, ভগবান্ তোমাকে দেখবেন।

শশাঙ্ক। মা, একমাত্র এ হলেই সবদিক্ রক্ষা হয়, আমিও বেঁচে যাই।

সুমি। আমি যাব।

(নেপথ্যে ডাক্তার, "আসতে পারি ?")

শশাঙ্ক। আসুন, আসুন ডাক্তারবাবু।

(ডাক্তারের প্রবেশ।)

ডাক্তার। এই যে সুমিও এখানে রয়েছ!

শশাঙ্ক। বসুন।

ডাক্তার। বাড়ীর পথের অর্দ্ধেকটা গিয়ে ফিরে এলাম, শশাঙ্কবাবু। ভেবে দেখলাম, এবাড়ীতে ডাক্তার হিসাবেই আমি ঢুকেছি যখন, ডাক্তার ব'লেই এখানে আমার পরিচয়, তখন আর কোনোদিক্ ভেবে কোনো কিছুর বিচার করবার অধিকার আমার নেই। আমি এই কথাটাই আপনাকে বলতে ফিরে এলাম, যে, আপনাকে দেওঘর যাবার অনুমতি দেওয়াটা আমার ভুল হয়েছে, অন্যায় হয়েছে। দেওঘর যাওয়া আপনার চলবে না।

সুমি। এইমাত্র স্থির হয়েছে, বাবা নার্সিং হোমে যাবেন, আর আমি দেওঘরে যাব এই শনিবারে অন্যদের সঙ্গে।

ডাক্তার। এ হলে ত আর কোনো কথাই থাকে না, সুমি।

সুমি। আমি যাই, ওদের বলি গে।

(প্রস্থানোদ্যত)।

শশাঙ্ক। একটা কথা মা, দেওঘর যাবার অনুমতি ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে আমিই জোর ক'রে আদায় করেছিলাম, রাজেন করেনি।

সুমি। (ম্লান হেসে) জানি বাবা। (প্রস্থান।)

পটক্ষেপ।

ক্রমশঃ

কুলায়ে

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

ফলে ফুলে তোর পুলক উঠিছে উচ্ছলি',
গৃহ, ওরে মোর গৃহ!
ভু'লে কোনোদিন দেখি নাই তুই চোখ তুলি'—
কত তুই রমণীয়!
কনকচাঁপার 'কাঞ্জিভরম্' শাড়ী
জড়ায়ে অঙ্গে মন নিলি আজ কাড়ি';
খোঁপায় করবী ;—অঞ্চলে গরবিণী,
সফেদ কুন্দ কিও?

ফাগুয়ার ফাগে প্রাঙ্গণ তোর দেয় ভরি'
রঙ্গন রহি' রহি',
অঙ্গে বীজন করিছে পবন সঞ্চরি'—
চামেলীর ঘ্রাণ বহি'।
কাঁচা রোদমাখা নারিকেলতরুশিরে
পাখীর গানের জল্‌সা ব'সেছে কিরে?
রূপে গুল্‌জার করিছে গোলাপ তোরে—
কাঁটার বেদনা সহি'!

পাতাবাহারের বাহারে আহা কি উল্লাসে
প'ড়েছিস্ যেন গলি,'
ফুটায়ে পলাশ র'য়েছিস কার তল্লাসে,—
হইয়া উদঞ্জলি?
ভোরে-ফোটা ঐ ছোটো জুঁই ফুলগুলি
কখন কর্ণে প'রেছিস্ তুই তুলি!
রক্তজবায় লাল হ'য়ে তোর আজ
কপোল উঠিছে ঝলি'!

পল্লীর গৃহ, তুষিলিরে প্রীতিচন্দনে
নগর-পীড়িত মোরে,
এমন স্বস্তি, শান্তি মেলে কি নন্দনে
বল্ আদরিণী ওরে?
এ মাটিতে তোর ছড়ানো স্বর্ণমুঠি,—
তাই ফেলি' হায়, বৃথা করি ছোটাছুটি!
বনের কুলায়, ক্লান্ত বিহগে আজ
বাঁধিলিরে মায়াডোরে!

ফা-হিয়েনের ভ্রমণ বৃত্তান্তের একাংশ

অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী

[কী-চা হইতে উত্তর-ভারত]

কী-চা (লাডক) হইতে পর্য্যটকেরা পশ্চিমমুখী হইয়া উত্তর-ভারত অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এক মাস ধরিয়া চলিতে চলিতে তাঁহারা পলাণ্ডু (onion)১ পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন। এই পর্ব্বতমালায় শীত, গ্রীষ্ম সকল সময়েই তুষার জমিয়া থাকে, এখানকার বিষধর নাগেরা২ উত্তেজিত হইলে নিঃশ্বাসের দ্বারা বিষাক্ত ঝড়ের সৃষ্টি করে। তাহারা কখনও তুষারবৃষ্টি, কখনও বা প্রস্তর ও বালুকা বৃষ্টি করিতে থাকে। এইরূপ বিপদ্‌সঙ্কুল স্থানে প্রবেশ করিয়া দশ সহস্র লোকের মধ্যে একজনও প্রাণ লইয়া ফিরিতে পারে না। দেশীয় লোকেরা এই পর্ব্বতমালার নাম দিয়াছে 'তুষার পর্ব্বত'। এই পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিয়া ভ্রমণকারীরা উত্তর-ভারতের সীমান্তস্থিত তো-লেই (দরদ) রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। এই রাজ্যেও হীনযানপন্থী বহুসংখ্যক শ্রমণ বাস করিতেন।

পূর্ব্বে এইদেশে একজন অর্হৎ বিদ্যমান ছিলেন। তিনি অলৌকিক শক্তিবলে তুষিত-নামক স্বর্গে আরোহণ করতঃ মৈত্রেয়-বোধিসত্ত্বের উচ্চতা, বর্ণ এবং আকৃতি অবলোকন পূর্ব্বক পুনরায় প্রত্যাগমন করিয়া উল্লিখিত মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের একটি কাষ্ঠপ্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন৩। তিনি এই উদ্দেশ্যে তিনবার স্বর্গে গমনাগমন করিবার পর মূর্ত্তিটির নির্ম্মাণকার্য্য পূর্ণতা লাভ করে। এই মূর্ত্তির উচ্চতা ৮০ হাত এবং জানুযুগলের ব্যবধান ৮ হাত। উপবাসের দিনগুলিতে এই মূর্ত্তি হইতে দিব্য জ্যোতিঃ নির্গত হয়৪। নিকটবর্ত্তী রাজ্যগুলির নৃপতিরা সকলেই ইহাকে নানাবিধ উপহার প্রদান করিয়া থাকেন। প্রাচীনকালের ন্যায় এখনও সকলেই এই মূর্ত্তি দর্শন করিতে পারে।

পর্য্যটকগণ পর্ব্বতমালার পাদদেশ দিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ১৫ দিন ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। এই রাস্তা অতিশয় বন্ধুর ও দুর্গম ছিল। একপ্রান্তে একটি বিপজ্জনক নদী এবং অপরপ্রান্তে ১০ হাজার ফুট উচ্চ পর্ব্বতের প্রাচীর। একস্থানে নদী ও পর্ব্বত এত পাশাপাশি চলিয়াছে যে, পথিকের দৃষ্টি ভীতিবিহ্বল হইয়া উঠে। তিনি সম্মুখদিকে পা রাখিবার স্থান পান না, এবং নীচের খরস্রোতা সিন্ধুনদ যেন তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে থাকে।

প্রাচীনকালের লোকেরা পর্ব্বত কাটিয়া রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছিল। এই রাস্তা হইতে নীচদিকে মোট ৭০০টি সিঁড়ি কাটিয়া নামিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাহার নীচে যেখানে নদীর বিস্তার মাত্র ৮০ পদ, তথায় একটি দড়ির পুল নির্ম্মিত আছে। এই পুল দিয়া তাঁহারা সিন্ধুনদ অতিক্রম করিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী নয়জন ভ্রমণকারীর পুস্তকে এই স্থানের বর্ণনা আছে বটে; কিন্তু 'চেং-কীন' অথবা 'কেন্-ইং' কেহই এই স্থানটিতে পৌঁছিতে পারেন নাই৫।

১। James Legge প্রভৃতি মনীষীরা বলেন, ইহা কারাকোরাম পর্ব্বতমালার প্রাচীন নাম।

২। চীনা ভাষায় মূলগ্রন্থে নাগবাচক শব্দই রহিয়াছে। ইউরোপীয় অনুবাদকেরা ইংরাজী করিয়াছেন 'ড্রাগন'। আমার মতে উক্ত পার্ব্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরা সাপের মতো খলস্বভাব ছিল বলিয়াই সমতলভূমির অধিবাসীরা তাহাদিগকে নাগ (সাপ) নামে অভিহিত করিতেন। ফা-হিয়েনও এই কারণেই তাহাদিগকে নাগ আখ্যা দিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহারা ড্রাগন নামে পরিচিত পাখাবিশিষ্ট কাল্পনিক অজগর সাপ ছিল না। এখানকার বর্ণনা হইতেই বুঝা যায়, ইহারা দলবদ্ধ হইয়া পথিকদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক তাহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত; এবং এইরূপ নৃশংস আক্রমণের সময় পথিকদের বৃহৎ বৃহৎ দলগুলি পর্য্যন্ত একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইত। পর্ব্বতে সঞ্চিত বৃহৎ তুষারখণ্ডসমূহ এবং প্রস্তররাশি বর্ষণ করিয়া এই দস্যুরা ধনবাহী পথিকদিগকে নির্ম্মূল করিয়া ফেলিত। ইহাদের এইরূপ মারাত্মক অনিষ্টকারিতার জন্যই সম্ভবতঃ ইহাদের সঙ্গে বিষধর বিশেষণটি যুক্ত হইয়াছে।

৩। অর্হতের স্বর্গে গমনাগমন সম্পর্কীয় গল্পটি নিশ্চয়ই ভক্তগণের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য রচিত। অন্যান্য ধর্ম্মের গ্রন্থগুলিতেও এইরূপ অলৌকিক ব্যাপারের বর্ণনা আছে।

৪। উপবাসের দিনগুলিতে মৈত্রেয়-বোধিসত্ত্বের এই মূর্ত্তিটিকে ঘৃত ইত্যাদি মাখাইয়া স্নান করান হইত; এবং ফলে ইহার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পাইত।

৫। ইতিহাস পাঠে জানা যায় খ্রীঃ পূঃ ১১৫ অব্দে হানবংশীয় নৃপতি 'উ-'এর রাজত্বকালে 'চেং-কীন' নামক ভ্রমণকারী সর্ব্বপ্রথম এই অঞ্চলে প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং ঐ সময় হইতে উক্ত অঞ্চলের ৩৬টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের সহিত চীন-সাম্রাজ্যের যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। 'কেন্-ইং' আসিয়াছিলেন ৮৮ খ্রীষ্টাব্দে; কিন্তু তাঁহার ভ্রমণের বিশেষ বিবরণ জানা যায় না। ফা-হিয়েনের উল্লিখিত অপর ৭ জন ভ্রমণকারীর পরিচয় আমরা জানিতে পারি নাই। তবে এ কথা এক প্রকার নিঃসংশয়েই বলা যাইতে পারে যে, ফা-হিয়েনের পূর্ব্বে আর কোনো চৈনিক পর্য্যটকই ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত আসেন নাই।

শ্রমণেরা ফা-হিয়েনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোন্ সময় হইতে পূর্ব্বদেশে (চীনে ?) বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা কি জানা যায় ?" ফা-হিয়েন উত্তর করিলেন—"আমি যখন ঐ সকল দেশের লোকদিগকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তখন তাঁহারা সকলেই বলিলেন—মৈত্রেয়-বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠার পর হইতেই পূর্ব্বদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ হয়। তাঁহারা সকলেই নিজ নিজ পূর্ব্বাধিকারীর নিকট হইতে এই তথ্য অবগত হইয়াছেন। মৈত্রেয়-বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল বুদ্ধের নির্ব্বাণলাভের প্রায় ৩০০ বৎসর পরে। এই সময়ে চৌ বংশের পিং নামক রাজা চীনদেশে রাজত্ব করিতেন। সুতরাং আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, শাক্যমুনির বংশধর, তিনটি মূলতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা, বিখ্যাত ধর্ম্মপ্রচারক মৈত্রেয়-বোধিসত্ত্ব নিজে যদি পূর্ব্ব-দেশে ধর্ম্মপ্রচার নাও করিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহার নির্ব্বাণলাভের এবং মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পর হইতেই ঐ সকল দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ হয়। প্রসিদ্ধি আছে যে, এইরূপ ধর্ম্মপ্রচারের আরম্ভ মনুষ্যকৃত নহে, এর হানবংশীয় সম্রাট সিং-এর স্বপ্নদর্শনই পূর্ব্বদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারারম্ভের মূল হেতু।"

নদী অতিক্রম করিয়া অবিলম্বে তাঁহারা 'উ-চেং' বা উদ্যানরাজ্যে প্রবেশ করিলেন। বস্তুতঃ এই রাজ্যটি উত্তর-ভারতেরই একটি অংশ। এখানকার অধিবাসীরা সকলেই মধ্যভারতের ভাষা ব্যবহার করে। মধ্যভারতকে অতঃপর মধ্যরাজ্য বলা হইবে। এখানকার লোকদের খাদ্য এবং পানীয়ও মধ্যভারতেরই অনুরূপ। এখানে বৌদ্ধধর্ম্ম বহুল-প্রচারিত এবং উন্নত ধরনের। শ্রমণদের স্থায়ী বাসস্থানগুলিকে এই রাজ্যে সঙ্ঘারাম বলা হয়। সমগ্র রাজ্যে মোট ৫০০টি সঙ্ঘারাম আছে। শ্রমণেরা সকলেই হীনযানমতাবলম্বী। কোনো বিদেশী ভিক্ষু আসিলে তিন দিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে বা তাঁহাদিগকে এইরূপ সঙ্ঘারামসমূহে আহার্য্য ও আশ্রয় দেওয়া হয়; এবং অতঃপর অন্যত্র যাইবার জন্য বলা হইয়া থাকে।

এইরূপ প্রবাদ আছে যে, উত্তর ভারত পর্য্যটনকালে বুদ্ধদেব এই রাজ্যে আসিয়াছিলেন এবং এখানে একটি পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। দর্শকেরা নিজেদের কল্পনানু-সারে এই পদচিহ্নটিকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার দেখিয়াছেন। সত্য কথা এই যে, পদচিহ্নটি যথার্থই আছে, এবং এখনও তাহাকে দেখা যায়।

বুদ্ধ যে প্রস্তরে কাপড় শুকাইয়াছিলেন, এই রাজ্যে এখনও সেই পাষাণটি দৃষ্টিগোচর হয়। তিনি যে স্থানে একটি দুর্দ্দান্ত নাগকে[৬] বশীভূত করিয়াছিলেন, সেই স্থানটিও অদ্যাপি চিহ্নিত আছে। পাষাণটির উচ্চতা ১৪ হাত এবং বিস্তার ২০ হাতেরও অধিক। ইহার একটি প্রান্ত অতিশয় মসৃণ।

হাই-কিং, হাই-তা এবং তাও-চিং পূর্ব্বাভিমুখে নাগরদেশের দিকে রওয়ানা হইলেন। ঐ দেশে বুদ্ধের প্রতিবিম্ব বিদ্যমান আছে। ফা-হিয়েন এবং অন্যান্য পর্য্যটকেরা উ-চেং রাজ্যেই গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করিলেন। গ্রীষ্মাবসানে তাঁহারা দক্ষিণদিকে সমতল দেশের অভিমুখে অবতরণ করিয়া সু-হো-তো দেশে উপস্থিত হইলেন। এই দেশেও বৌদ্ধধর্ম্ম পূর্ণগৌরবে বিরাজিত। পূর্ব্বকালে দেবরাজ শক্র শ্যেনরূপ ধারণ করিয়া বোধিসত্ত্বকে পরীক্ষা করিতে আসিলে যে স্থানে বোধিসত্ত্ব পারাবতের উদ্ধারের জন্য নিজ দেহ হইতে মাংস কাটিয়া দিয়াছিলেন, সেই পবিত্র স্থানটি এই দেশেই অবস্থিত। বুদ্ধত্বলাভের পর শাক্যমুনি তাঁহার শিষ্যগণসহ এই দেশে ভ্রমণ করিতে আসিয়া শিষ্যদের নিকট বলিয়া-ছিলেন যে, পূর্ব্ববর্ত্তী এক জন্মে এখানেই তিনি পারাবতের মুক্তির জন্য স্বকীয় দেহ-মাংস কাটিয়া দিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে এখানকার অধিবাসীরা উল্লিখিত সত্য সংবাদটি জানিতে পারে এবং উক্ত পবিত্র স্থানের উপর একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া সোনা ও রূপার পাতদ্বারা তাহাকে মণ্ডিত করিয়া রাখে।

এই স্থান হইতে পূর্ব্বদিকে অবতরণ করিয়া ভ্রমণ-কারীরা পাঁচ দিনে গান্ধারদেশে উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বকালে এই দেশে সম্রাট অশোকের পুত্র ধর্ম্ম-বিবর্দ্ধন রাজত্ব করিতেন। এই দেশেই বুদ্ধদেব বোধিসত্ত্বরূপে অন্য একজন লোকের জন্য নিজের চক্ষু দান করিয়া-ছিলেন। এই পবিত্র স্থানটির উপরও একটি বৃহৎ স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে সোনা ও রূপার পাত দ্বারা

৬। ইউরোপীয় অনুবাদকেরা এই নাগ শব্দের অনুবাদ করিয়াছেন 'ড্রাগন'। বস্তুতঃ দুর্দ্দান্ত নাগ বলিতে লেখক নাগবংশীয় কোন দুর্দ্দান্ত নরপতি বা সর্দ্দারকেই বুঝাইতে চাহিয়াছেন। প্রাচীনকালে নাগবংশীয় নৃপতিরা যে ভারতের বিভিন্ন অংশে রাজত্ব করিতেন, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন নাগকন্যা উলুপীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। উলুপীর পিতার রাজ্য ছিল সমুদ্রের উপকূলে। এই নাগেরা আর্য্য কি অনার্য্য ছিলেন নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে মহাভারতে উলুপীর রূপ ও বর্ণের যে বর্ণনা আছে, তাহা দেখিয়া মনে হয়, নাগেরা আর্য্যবংশসম্ভূতই ছিলেন। সম্ভবতঃ ইঁহারা প্রধানতঃ নাগ (সর্প) বা বিষহরির পূজা করিতেন বলিয়া এই নামে অভিহিত হইয়াছেন।

মণ্ডিত করা হইয়াছে। এই দেশের অধিকাংশ লোকই হীনযান-মতাবলম্বী।

এখান হইতে পূর্ব্বাভিমুখে সাত দিন চলিয়া তাঁহারা তক্ষশিলা রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। তক্ষশিলা শব্দের অর্থ 'ছিন্নমুণ্ড'৭। কথিত আছে যে, বোধিসত্ত্ব এই স্থানে একজন লোককে নিজ মস্তক দান করিয়াছিলেন; এবং উল্লিখিত ঘটনার স্মৃতিরক্ষার জন্য তখন হইতে এই স্থানটি তক্ষশিলা নামে অভিহিত হইতেছে।

আরও দুইদিন পূর্ব্বাভিমুখে চলিয়া তাঁহারা আর একটি পবিত্র স্থানে উপস্থিত হইলেন। এখানে বোধিসত্ত্ব একটি ব্যাঘ্রীর ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য নিজ দেহ দান করিয়াছিলেন। উক্ত দুইটি স্থানেই বৃহৎ স্তূপ নির্ম্মাণপূর্ব্বক বহুমূল্য রত্নাদি দ্বারা তাহাদিগকে বিভূষিত করিয়া রাখা হইয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যগুলির রাজা, মন্ত্রী ও জনসাধারণ সকলেই এই স্তূপ দুইটিতে উপহার প্রদান করিয়া থাকেন। এখানে পুষ্প ও প্রদীপ দানের জন্য গমনাগমনকারী যাত্রীদের স্রোত কখনও বন্ধ হয় না। পূর্ব্বের উল্লিখিত দুইটিসহ এই দুইটি স্তূপকে জনসাধারণ 'স্তূপ-চতুষ্টয়' নামে অভিহিত করিয়া থাকে।

গান্ধার হইতে দক্ষিণাভিমুখে চারি দিন চলিয়া তাঁহারা পুরুষপুর (বর্ত্তমান পেশোয়ার) রাজ্যে পৌঁছিলেন। প্রাচীনকালে নিজ শিষ্যগণের সহিত এই রাজ্যে ভ্রমণ করিবার কালে বুদ্ধ আনন্দকে বলিয়াছিলেন—"আমার পরিনির্ব্বাণের পর এখানে কনিষ্ক নামে এক ব্যক্তি রাজা হইয়া একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করিবে।" পরবর্ত্তীকালে কনিষ্ক জন্মিয়াছিলেন এবং তিনি রাজ্যলাভও করিয়াছিলেন। একদা ভ্রমণে নির্গত হইয়া কনিষ্ক দেখিতে পান—একটি অল্পবয়স্ক রাখাল বালক তাঁহার রাস্তার ডানদিকে একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করিতেছে। দেবরাজ ইন্দ্রই বালকরূপে এই কার্য্যটি করিতেছিলেন। কনিষ্কের প্রশ্নের উত্তরে বালক বলিল—"আমি বুদ্ধের জন্য একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করিতেছি। রাজা রাখাল বালককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া তাহার স্তূপের দক্ষিণদিকে আর একটি বিশাল অত্যুচ্চ স্তূপ নির্ম্মাণ করাইলেন।

এই স্তূপটি চারি শত হস্তেরও অধিক উচ্চ ছিল এবং সর্ব্বপ্রকার মূল্যবান্ পদার্থ দ্বারা ইহাকে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। পরিব্রাজকেরা যতগুলি স্তূপ ও মন্দির দর্শন করিয়াছিলেন, সৌন্দর্য্য ও গৌরবে তাহাদের কোনটিই এই স্তূপের সমকক্ষ নহে। জনসাধারণ বলিত যে, সমগ্র জম্বুদ্বীপের মধ্যে ইহাই সর্ব্বোত্তম স্তূপ। রাজার নির্ম্মিত এই মহাস্তূপের পার্শ্বেই রাখাল বালকের স্তূপটি সুরক্ষিত ছিল। ইহা উচ্চতায় তিন হাতের চেয়ে কিছু বেশী।

বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্রটি এই দেশেই রক্ষিত আছে। পূর্ব্বকালে 'য়ু-শে' (yiieh-she) দেশের কোনো রাজা৮ উক্ত ভিক্ষাপাত্রটি লইয়া যাইবার জন্য একটি বিশাল বাহিনীসহ এই দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি এই রাজ্য দখল করিলেন বটে; কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মে বিশ্বাস থাকার ফলে ভিক্ষাপাত্র লইয়া যাইবার পূর্ব্বে তিনি ও তাঁহার অমাত্যেরা বিরাট রকমের এক পূজা দিলেন। অতঃপর তিনি একটি সুসজ্জিত হস্তীর পৃষ্ঠে ভিক্ষাপাত্রটি তুলিয়া দিয়া তাহাকে চালনা করিলেন। কিন্তু হস্তীটি হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল; কারণ ভিক্ষাপাত্রটি বহন করিবার সামর্থ্য তাহার ছিল না।

৭। তক্ষশিলা রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। Eitel বলেন, ইহা Lat. 35 48′ N Lon. 72 44′ E. এর মধ্যে অবস্থিত। ক্যানিংহাম তাঁহার "Ancient Geography of India" (pp 103, 109) গ্রন্থে লিখিয়াছেন—ইহা পাঞ্জাবের উত্তরাংশে (Upper Punjab) সিন্ধু ও ঝেলাম নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে অবস্থিত। কিন্তু ফা-হিয়েনের বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, ইহা সিন্ধুনদের পশ্চিমতীরে অবস্থিত ছিল (কারণ ইহার পরে তিনি পুনরায় সিন্ধু অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে আসিবেন)। James Legge-ও এই মতই পোষণ করিয়াছেন।

রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থেও তক্ষশীলা নগরীর বর্ণনা আছে। রামায়ণে ইহাকে সিন্ধুনদের উত্তরতীরবর্ত্তী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। রামায়ণের মতে, প্রাচীনকালে এখানে গন্ধর্ব্বদের রাজধানী ছিল। কেকয়ভূপতি যুধাজিৎ এই রাজ্য জয় করিবার জন্য রামচন্দ্রকে অনুরোধ করিলে, রামের আদেশে ভরত এই রাজ্য অধিকার করিয়া নিজ পুত্র তক্ষকে এখানকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। রামায়ণের মতে এই তক্ষের নাম হইতেই উক্ত রাজ্য ও নগরীর নাম তক্ষশিলা হইয়াছে। মহাভারতে এই স্থানটিকে গান্ধারের অন্তর্গত বলিয়াও বর্ণনা করা হইয়াছে (আদিপর্ব্ব ৩।২২)। মহাভারতের স্বর্গারোহণ পর্ব্ব (৫ম অধ্যায়) হইতে জানা যায়, জনমেজয় এখানে সর্পযজ্ঞ করিয়াছিলেন।

কেহ কেহ বলেন, প্রাচীনকালে তক্ষবংশীয় নৃপতিগণ এই দেশ শাসন করিতেন এবং তাঁহাদের বংশের নামানুসারেই রাজ্য ও নগরীর নাম তক্ষশিলা হইয়াছিল। তক্ষশিলা শব্দটি ইহারই সংস্কৃত রূপ। বস্তুতঃ এই মতটি প্রমাণসিদ্ধ নহে। ফা-হিয়েন যদিও ছিন্নমুণ্ড অর্থে তক্ষশিলা শব্দটিকে গ্রহণ করিয়াছেন; তথাপি তক্ষশিলা নামের উৎপত্তি এই কারণেই হইয়াছিল বলিয়াও মনে হয় না। তক্ষশিলা নামের হেতু সম্বন্ধে শেষোক্ত মত দুইটির যে কোনোটি সত্য হইলে রামায়ণ প্রভৃতি সুপ্রাচীন গ্রন্থে তাহার উল্লেখ থাকিত।

৮। Eitel, Legge প্রভৃতির মতে কনিষ্ক নিজেই এই রাজা। ফা-হিয়েনের 'য়ুয়ে শে' শব্দ জাঠদেশ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। Eitel-এর মতে ইহার বর্ত্তমান নাম তুখারা (Tukhara)।

অতঃপর রাজা একটি চারি-চাকার গাড়ী আনিয়া তাহার সাহায্যে ভিক্ষা পাত্রটি লইয়া যাইতে চাহিলেন। ৮টি হস্তী সর্ব্ব শক্তি নিয়োগ করিয়া সেই গাড়ীখানা টানিতে লাগিল; কিন্তু তাহারা গাড়ীখানাকে নড়াইতেই পারিল না৯। রাজা বুঝিলেন, ভিক্ষাপাত্রটি তাঁহার কাছে লইয়া যাওয়ার সময় এখনও আসে নাই। তিনি অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং লজ্জা বোধ করিতে লাগিলেন। তখন রাজা সেই স্থানে একটি স্তূপ এবং একটি বিহার নির্ম্মাণ করিয়া ভিক্ষাপাত্রটিকে তন্মধ্যে স্থাপন করিলেন। অতঃপর ঐগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একদল প্রহরী নিয়োগ পূর্ব্বক প্রচুর অর্থ দান করিয়া স্বরাজ্যে চলিয়া গেলেন।

এই বিহারে সাত শতেরও অধিক শ্রমণ অবস্থান করিতেন। মধ্যাহ্ন-সমাগমে ভিক্ষাপাত্রটি বাহিরে আনিয়া সম্মিলিত জনগণসহ তাঁহারা উহার অর্চ্চনা করিতেন এবং তাহার পরই মধ্যাহ্ন ভোজনে যাইতেন। সন্ধ্যাকালে আরতি করিবার জন্য পুনরায় ভিক্ষাপাত্রটি বাহিরে আনয়ন করা হইত। এই পাত্রে ২ পেক১০ এর চেয়েও বেশী খাদ্য ধরিত এবং ইহার বিবিধ বর্ণের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণেরই আধিক্য ছিল। ইহার চারিটি বিভিন্ন অংশ সেলাই করা ছিল। এই ভিক্ষাপাত্রের ঘনত্ব ছিল প্রায় ½ ইঞ্চি এবং ইহা হইতে উজ্জ্বল রমণীয় দ্যুতি নির্গত হইত। দরিদ্র লোকেরা কয়েকটি মাত্র পুষ্প প্রদান করিলেই পাত্র পূর্ণ হইয়া যাইত; কিন্তু ধনী লোকেরা শত-সহস্র পুষ্পাদি দ্রব্য নিক্ষেপ করিয়াও ইহাকে পূর্ণ করিতে পারিতেন না১১।

পাও-যুন এবং সাংকিং ভিক্ষাপাত্রের অর্চ্চনা সমাপনান্তে প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্কল্প করিলেন। হাই-কিং, হাই-তা এবং তাও-চিং অন্যান্য পরিব্রাজকদের পুরোভাগে থাকিয়া বুদ্ধদেবের প্রতিবিম্ব, দন্ত, অস্থি ও কপালের অর্চ্চনা করিবার জন্য অগ্রগামী হইলেন। এই সময়ে হাই-কিং অসুস্থ হইয়া পড়িলে তাও-চিং তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত রহিলেন।

হাই-তা একাকী পুরুষপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অন্যান্য পরিব্রাজকদের সহিত মিলিত হইলেন। তিনি পাও-যুন এবং সাং-কিং এর সহিত চীনদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। যে বিহারে বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্র ছিল, তাহাতেই হাই-সিং দেহত্যাগ করিলেন। অতঃপর ফা-হিয়েন একাকী বুদ্ধের অস্থি ও কপালের অর্চ্চনা করিবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইয়া চলিলেন।

পশ্চিমাভিমুখে ষোল যোজন পথ অতিক্রম করিয়া ফা-হিয়েন নগারদেশের সীমান্তবর্ত্তী হেলো নগরীতে১২ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে একটি বিহারে বুদ্ধের অস্থি সুরক্ষিত ছিল। এই অস্থিটি সোনার পাত দ্বারা আবৃত এবং সাতটি মহামূল্য রত্ন দ্বারা ভূষিত ছিল। এই দেশের রাজা উল্লিখিত অস্থিটির প্রতি অত্যন্ত ভক্তিমান্ ছিলেন এবং কেহ যাহাতে ইহা চুরি করিয়া লইয়া যাইতে না পারে, তৎপ্রতি সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখিতেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি দেশের বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত পরিবারের ৮ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রত্যেককে এক-একটি নামমুদ্রা দিয়া উক্ত অস্থির রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

প্রত্যহ প্রভাতে উল্লিখিত ৮ জন লোক আসিয়া নিজ নিজ মুদ্রা ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন এবং এই পরীক্ষাকার্য্য সমাপ্ত হইলে পর তখনই দ্বার খোলা হইত। অতঃপর তাঁহারা সুগন্ধি জল দ্বারা হস্ত প্রক্ষালন করিয়া অস্থিটি আনয়ন পূর্ব্বক বিহারের বহির্দ্দেশে উচ্চ বেদীর উপর উহা স্থাপন করিতেন। এই সময়ে একটি গোলাকার সপ্তধাতু নির্ম্মিত আধারের উপর অস্থিটিকে স্থাপন করিয়া মূল্যবান্ হীরক-খচিত কার্পেটের দ্বারা তাহাকে আচ্ছাদন করা হইত।

এই অস্থির বর্ণ ছিল কিঞ্চিৎ হরিদ্রাভ। ইহা আকারে প্রায় গোল এবং ১২ ইঞ্চি পরিমাণ দীর্ঘ। প্রত্যহ অস্থিটিকে আনিবার সময় বিহার-রক্ষকগণ উচ্চ অলিন্দে (গ্যালারীতে) উঠিয়া বৃহৎ বৃহৎ ঢাক, শঙ্খ এবং তাম্র-করতাল বাজাইত। এই বাদ্যধ্বনি শুনিয়া রাজা স্বয়ং বিহারে যাইতেন এবং পুষ্পধূপাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিতেন। এইরূপ করা হইলে রাজা ও পরিষদ্‌গণ একে একে

৯। বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্রের মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে নিশ্চয়ই এই গল্পটি পরবর্ত্তীকালের শ্রমণগণ কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে। আসল কথা সম্ভবতঃ এই যে, রাজা পর পর দুইবার ভিক্ষাপাত্রটি স্থানান্তরিত করিবার বা রাজধানীতে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং দুইবারই ইহার ফলে জনমত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলে, বিক্ষুব্ধ জনমতকে শান্ত করিবার জন্য রাজা নিজ সঙ্কল্প পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

১০। ১ পেক=২ গ্যালন।

১১। গয়াধামে যেমন পাণ্ডারা হিন্দু তীর্থযাত্রীদের নিকট হইতে সকল আদায় করেন, এখানেও তেমনি বৌদ্ধ যাজকেরা তীর্থযাত্রীদের নিকট হইতে সকল আদায় করিতেন বলিয়া মনে হয়। যাহার যেমন সামর্থ্য, তাহার নিকট হইতে ইঁহারা সেই পরিমাণে অল্পাধিক মূল্যবান্ দ্রব্য সকলরূপে গ্রহণ করিতেন। এইভাবে যাজকদিগকে তুষ্ট করিতে না পারিলে তীর্থদর্শন সফল হয় নাই বলিয়া পুণ্যার্থীরা মনে করিতেন।

১২। জেম্‌স্ লেগের মতে ইহা বর্ত্তমান 'হিদ্দা'। এই শহরটি পেশোয়ার হইতে পশ্চিমদিকে এবং জেলালাবাদ হইতে ৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

অস্থিটিকে মাথায় লাগাইতেন। প্রবেশ করিবার সময় তাঁহারা পূর্ব্বদ্বার দিয়া আসিতেন; কিন্তু অস্থি অর্চ্চনার পর পশ্চিমদ্বার দিয়া বাহির হইয়া যাইতেন। প্রত্যহ প্রভাতে এইরূপ পূজা দেওয়ার পর তবেই রাজা রাজকার্য্য সম্পাদনের জন্য রাজসভায় যাইতেন। বৈশ্য পরিবারের লোকেরা ও অন্যান্য কর্ত্তব্য সম্পাদনের পূর্ব্বে অস্থির পূজা দিতেন। প্রত্যহ এইরূপ করা হইত। কদাপি এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইত না। সকলের পূজা সমাপ্ত হইলে অস্থিটিকে পুনরায় বিহারের অভ্যন্তরে বিমোক্ষ-স্তূপের উপর স্থাপন করা হইত।

এই বিমোক্ষ-স্তূপটি সপ্তধাতু নির্ম্মিত এবং প্রায় পাঁচ হাত উচ্চ ছিল, ইহা কখনও বন্ধ থাকিত: কখনও বা অস্থি রাখিবার জন্য খোলা হইত। বিহারের দ্বারপ্রান্তে পুষ্প, ধূপ প্রভৃতির বহু দোকান ছিল। ভক্তেরা এই সকল দোকান হইতে পূজোপকরণ ক্রয় করিতেন। বিভিন্ন দেশের রাজারাও বিবিধ উপহারসহ সর্ব্বদাই দূত পাঠাতেন। বিহারটি দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের প্রত্যেক দিকে ৩০ পদ পরিমিত ভূমির উপর দণ্ডায়মান ছিল এবং স্বর্গ-মর্ত্ত্যের বিপর্য্যয় ঘটিলেও ইহা কখনও একটুমাত্রও কম্পিত হইত না১৩।

এখান হইতে উত্তরাভিমুখে এক যোজন পথ অতিক্রম করিয়া ফা-হিয়েন নাগর রাজ্যের রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানেই এক সময়ে বোধিসত্ত্ব দীপঙ্কর বুদ্ধের অর্চ্চনার নিমিত্ত পাঁচটি পুষ্পস্তবক ক্রয় করিয়া ছিলেন। নগরীর মধ্যস্থলে একটি স্তূপে বুদ্ধের দন্ত রক্ষিত ছিল। পূতাস্থিতে যে নিয়মে অর্চ্চনাদি করা হইত, এখানকার অর্চ্চনা-পদ্ধতিও ছিল ঠিক সেই রকম।

এই নগরীর ঈশান কোণে এক যোজন মাত্র দূরে একটি উপত্যকার প্রবেশপথে ফা-হিয়েন বুদ্ধের পবিত্র যষ্টিটি দর্শন করিয়াছিলেন। এখানেও একটি বিহার নির্ম্মাণ করিয়া তথায় যথারীতি অর্চ্চনা করা হইত। যষ্টিটি গোশীর্ষচন্দনকাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মিত এবং ১৬।১৭ হাত লম্বা ছিল। ইহা একটি কাষ্ঠাধারে রক্ষিত ছিল এবং শত-সহস্র লোক চেষ্টা করিলেও ইহাকে উত্তোলন করিতে পারিত না১৪।

উপত্যকায় প্রবেশ পূর্ব্বক পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া তিনি বুদ্ধের সংঘালি অবলোকন করিলেন। এখানেও একটি বিহার নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং তাহাতেও যথারীতি পূজা দেওয়া হইত।

এখানকার প্রথা অনুসারে দেশের লোকেরা দীর্ঘ অনাবৃষ্টির সময়ে দলে দলে মিলিত হইয়া এই সংঘালিতে পূজা দিত এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বর্ষণ আরম্ভ হইত।

নগরীর দক্ষিণদিকে অর্দ্ধযোজন দূরে একটি গিরিগুহা আছে। ইহার মুখ দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। এই গুহাতেই বুদ্ধ তাঁহার প্রতিবিম্ব রাখিয়া গিয়াছেন। দশ পদের অধিক দূর হইতে দৃষ্টিপাত করিলে মনে হইবে যে, বিবিধ-লক্ষণবিশিষ্ট বুদ্ধের স্বর্ণবর্ণ দেহটি যেন যথার্থই দাঁড়াইয়া আছে। যতই নিকটে যাইবেন, ততই এই আকৃতিটি ম্লান হইতে থাকিবে এবং একেবারে কাছে গেলে ইহা সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইয়া যাইবে। নিকটবর্ত্তী দেশের নৃপতি-গণ এই গুহার অনুরূপ অন্য গুহা নির্ম্মাণের জন্য পুনঃ পুনঃ বহু শিল্পী পাঠাইয়াছেন; কিন্তু কেহই ইহার অনুকরণ করিতে পারে নাই১৫। জনসাধারণকে বলিতে শোনা যায়—সহস্র বুদ্ধের প্রত্যেকেই এখানে নিজ প্রতিবিম্ব রাখিয়া যাইবেন।

উক্ত প্রতিবিম্বের পশ্চিমদিকে চারি শতাধিক পদ দূরে বসিয়া বুদ্ধ তাঁহার কেশ ও নখ কর্ত্তন করিয়াছিলেন। ইহার উপর ৭০।৮০ হাত উচ্চ একটি স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই স্তূপটিই ছিল সকল স্তূপের আদর্শ। ফা-হিয়েন এই স্তূপটিকে পূর্ণ গৌরবে বিদ্যমান দেখিয়াছিলেন। এই স্তূপের নিকটে একটি বিহারে প্রায় ৭০০ ভিক্ষু অবস্থান করিতেন। এই দেশে বিভিন্ন অর্হৎ ও প্রত্যেক বুদ্ধদের সমাধির উপর রচিত প্রায় এক হাজার স্তূপ ফা-হিয়েনের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল।

১৩। আসামের রাজধানী শিলং সহরে প্রায়ই ভূমিকম্প হয়, কিন্তু এখানকার গৃহগুলি কাঠের কাঠামোর উপর নির্ম্মিত হওয়ায় ভূমিকম্পে তাহাদের কোন ক্ষতি হয় না। উল্লিখিত বিমোক্ষ স্তূপটির নির্ম্মাণেও সম্ভবতঃ এইরূপ কোনো বিশেষ কৌশল অবলম্বন করা হইয়াছিল, এবং ইহারই ফলে প্রবল ভূমিকম্পের সময়েও তাহার কোনো ক্ষতি হইত না।

১৪। সম্ভবতঃ যষ্টি ও তাহার আধারটি দৃঢ়ভাবে ভূমিতে প্রোথিত থাকার ফলেই ইহা উত্তোলন করা সম্ভব হইত না।

১৫। এই প্রতিবিম্ব দর্শন কি যথার্থই বুদ্ধের অলৌকিক ক্ষমতার ফল, না ইহা শিল্পীর রচনা-কৌশল? আমাদের মনে হয় শিল্পচাতুর্য্যের ফলেই এইরূপ প্রতিবিম্ব-দর্শন সম্ভব হইয়াছিল। ঘরের মধ্যে দেওয়ালের উপর দর্পণ রাখিলে সেই দর্পণের উপর বাহিরের লোকের ছায়া পড়ে এবং তাহা দেখিয়া ঘরের মেয়েরা সতর্ক হইয়া থাকেন এইরূপ ঘটনা আমরা সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। আয়নার একেবারে নীচে আসিলে তখন আর তাহার মধ্যস্থিত প্রতিবিম্ব দৃষ্টিগোচর হয় না। উল্লিখিত গুহামধ্যেও সম্ভবতঃ একটি স্বচ্ছ প্রস্তর বসাইয়া তাহার সম্মুখদিকের এক পার্শ্বে কোনো গোপনস্থানে বুদ্ধের একটি লক্ষণাক্রান্ত মূর্ত্তি স্থাপন করা হইয়াছিল। দূর হইতে তাকাইলে দর্শনার্থীরা উল্লিখিত প্রস্তরের উপর বুদ্ধের সেই লক্ষণাক্রান্ত মূর্ত্তিটির প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইত। প্রস্তরের বর্ণের জন্যই প্রতিবিম্বটিকে স্বর্ণবর্ণ দেখাইত। দর্পণের স্থলবর্ত্তী সেই প্রস্তরটির নিকটে আসিলে তখন আর বুদ্ধমূর্ত্তির প্রতিবিম্ব তাহাতে দেখা যাইত না।

শীতকালের তৃতীয় মাস পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করতঃ, ফা-হিয়েন সঙ্গীদ্বয়সহ দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইয়া তুষার-পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিলেন। এই পর্ব্বতমালায় কি শীত কি গ্রীষ্ম সকল সময়েই তুষাররাশি জমিয়া থাকিত। এই পর্ব্বতমালার উত্তরপ্রান্ত দিয়া চলিবার সময় হঠাৎ এক তুষারশীতল বায়ুপ্রবাহ বহিতে আরম্ভ হইল। কন্‌কনে শীতে তাঁহারা কাঁপিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হইল। হাই-কিং আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না, তাঁহার মুখ দিয়া সাদা ফেন বাহির হইতে লাগিল। তিনি ফা-হিয়েনকে বলিলেন—"আমি আর বাঁচব না, তোমরা শীঘ্র চলিয়া যাও; নতুবা আমাদের সকলেরই মৃত্যু ঘটিবে।" এই কথাগুলি বলিতে বলিতেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

ফা-হিয়েন শবের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া করুণস্বরে বিলাপ করিতে করিতে বলিলেন—"আমাদের আসল পরিকল্পনাই মাটি হইল. ইহাই অদৃষ্ট! আমরা আর কি করিতে পারি?" অবশেষে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া তাঁহারা পর্ব্বতমালার দক্ষিণপ্রান্তে পৌঁছিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তথায় তাঁহারা লো-এ[১৬] নামক রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। এই রাজ্যে মহাযান ও হীনযান উভয় মতাবলম্বী প্রায় তিন হাজার ভিক্ষু বাস করিতেন।

গ্রীষ্মকাল শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা এই রাজ্যেই অবস্থান করিলেন এবং গ্রীষ্মাবসানে দক্ষিণাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। দশ দিন চলিবার পর তাঁহারা পো-না[১৭] রাজ্যে প্রবেশ করিলেন, এই রাজ্যেও হীনযানপন্থী তিন সহস্রাধিক ভিক্ষু ছিলেন। এই স্থান হইতে যাত্রা করিয়া তিন দিন চলিবার পর তাঁহারা সিন্ধুনদ অতিক্রম করিলেন —এই নদের উভয়তীরবর্ত্তী দেশটি নীচু ও সমতল।

১৬। লো-এ (Lo-i) বা রোহি আফগানিস্থানের একটি প্রাচীন নাম। পর্য্যটকেরা আফগানিস্থানের অংশবিশেষের উপর দিয়া আসিয়াছিলেন।

১৭। চৈনিক পর্য্যটক সম্ভবতঃ পঞ্জাব অর্থে পো-না শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু এই স্থানটির পারিপার্শ্বিক বর্ণনা দেখিয়া মনে হয়, ইহা বর্ত্তমান বান্নু জিলা। ইউরোপীয় সমালোচকেরাও এইরূপই অনুমান করিয়াছেন।

দ্রষ্টব্য- ফা-হিয়েনের মুখে শুনিয়া তাঁহার এক চৈনিক শিষ্য এই পুস্তক (চীনা ভাষায়) প্রণয়ন করিয়াছেন।

আর কত আছে সাগরে ঢেউ

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

আর কত আছে সাগরের ঢেউ,
শুন্‌তে পারো?
আর কত দূর ওপারের কূল,
বল্‌তে পারো?
সেই যে প্রভাতে ডেকেছিল পাখী,
সাঁতার সুরু।
মাঝ দরিয়ায় ঘন মেঘে দেয়া,
ডেকেছে গুরু॥
উথাল পাথাল ফেনিল জলের,
অট্ট হাস।
সাগর বক্ষে লক্ষ লক্ষ,
তিমির ত্রাস॥
দুই হাত দিয়ে কত ঢেউ আর,
সরানো যাবে।
কত নোনা জল দুই চোখ মুখে,
আছাড় খাবে॥
লোলুপ চাহনি হাঙ্গরের দল
শোণিত চায়।
কত না হিংস্র জলের মকর,
লেগেছে গায়॥
কত চাঁদ গেল কত না সূর্য্য,
মাথার পরে।
জোয়ার ভাঁটার তাণ্ডবে নেচে
আকাশ ভরে॥
একটা মানুষ কতটুকু তার
দুঃখ সুখ?
একটা মানুষ কতটুকু তার
খিন্ন মুখ?
অকূল সাগর পাড়ি দিতে হবে
তবুও তার।
তবু দিতে হবে ঢেউ ভেঙে ভেঙে
চুপ-সাঁতার।
আর কত আছে সাগরের ঢেউ,
শুন্‌তে পারো?
আর কত দূর ওপারের কূল
বল্‌তে পারো?

পিঠেপার্ব্বণ

শ্রীসীতা দেবী

১

সকালের দিকে ঘুম ভেঙে যেতেই ব্রজরাণী ধড়মর ক'রে উঠে বসলেন। ওমা, আজও রোদ উঠে গেছে, ছেলের ঘর থেকে খোকনের কলরব শোনা যাচ্ছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তাঁর চোখ কপালে উঠে যাবার জোগাড়। আজও আধঘণ্টা দেরি হয়ে গেছে।

তাড়াতাড়ি খাট ছেড়ে নেমে পড়লেন। চাকরকে ডাকা, চায়ের জোগাড় করা, ভাঁড়ার বার করা সব যেন কলের পুতুলের মত ক'রে যেতে লাগলেন। এগুলো তাঁর মস্তিষ্কের নির্দেশ না পেয়েও হাত যেন নিজের থেকে ক'রে যায়। মনটা খালি খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগল। এ তাঁর হ'ল কি? কিছুতেই আর আগের গতিবেগ বজায় রাখতে পারছেন না কেন? বয়স হচ্ছে বটে, কিন্তু এমনি কি বয়স? তাঁর মা ত বাহাত্তর-তিয়াত্তর বৎসর বয়সেও সংসারের রান্না ক'রে দিতেন, আর ব্রজরাণীর ত মাত্র পঁয়ষট্টি বৎসর। তিনি কি এর পর অথর্ব্ব ঝুড়িচাপা বুড়ী হয়ে পড়বেন নাকি? সংসারের উপর সব কর্ত্রীত্ব তাঁর চ'লে যাবে? তাঁকে কেউ মানবে না? চোখে তাঁর প্রায় জলই এসে গেল। এত পরিশ্রমে নিজের হাতে গড়া সংসার তাঁর। এসব বৌদের হাতে চ'লে যাবে আর ব্রজরাণীকে থাকতে হবে তাদের হাততোলায়?

ছেলে সমর ঘরে ঢুকে বলল, "কই মা, চা কই? আমাকে যে আজ সকাল সকালই বেরতে হবে?"

ব্রজরাণী বললেন, "এই যে এখনই দিচ্ছি বাবা। অ রঘু, হ'ল বাছা চায়ের জল তোমার? আমার উঠতে পাঁচ মিনিট দেরি হয়েছে কি অমনি ছিষ্টি উল্টে গেল। এ বুড়ী মরলে যে সংসারের দশা কি হবে!"

"সে জন্যে দায়ী ত তুমিই মা? কাউকে যদি ধরতে ছুঁতে কিছু না দাও, ত তারা শিখবে কি ক'রে? ক'রে ক'রেই মানুষে কাজ শেখে, তুমিও তাই-ই শিখেছ।"

মায়ে ছেলেতে একটা তর্কাতর্কি এখনই বেধে যেত। তবে এক দরজা দিয়ে কেট্‌লি হস্তে রঘুর প্রবেশ ও অন্য দরজা দিয়ে বৃদ্ধ কর্ত্তা গুরুচরণ রায়ের প্রবেশের ফলে তর্কটা ওখানেই থেমে গেল। কর্ত্তার সামনে হাঁকাহাঁকি ক'রে বকাবকি করতে এখনও তিনি ভয় পান, পুরাকালের এ শিক্ষাটুকু তাঁর এখনও আছে। তা ছাড়া গুরুচরণ বড় রাশভারী মানুষ। পঞ্চাশ বাহান্ন বছর তাঁর সঙ্গে ঘর ক'রেও ব্রজরাণী একটু সমীহ তাঁকে না ক'রে পারেন না। কাজেই ছেলেকে দাবড়ানি দেবার প্রেরণাটা কোনোরকমে মুলতুবী রেখে তিনি তাড়াতাড়ি চা তৈরি ক'রে রুটিতে মাখন লাগিয়ে ছেলে ও স্বামীকে পরিবেশন করতে লেগে গেলেন। মেয়ে শান্তি, দুই পুত্রবধূ প্রমীলা আর তৃপ্তি, ছোট ছেলে প্রবীর, ছোট্ট খোকন, সব এসে একে একে ঘর ভরে ফেলল।

ছেলেমেয়েরা খাবার টেবিলেই ব'সে চা খেতে লাগল, বৌরা নিজেদের চা-জলখাবার তুলে নিয়ে ঘরে চ'লে গেল। বাচ্চাদের খাইয়ে, তাদের খেতে দেরি হয়, ততক্ষণ কে দাঁড়িয়ে তাদের চা আগ্‌লাবে? তারা কাজ-কর্ম্ম সেরে নিজেদের ইচ্ছামত ঠাণ্ডা চা খায়, নয়ত নিজেরা গরম ক'রে নেয়। টেবিলে বসার হাঙ্গামও আছে, বৌদের স্বামী-শ্বশুরের সামনে গব্‌ গব্‌ ক'রে খাওয়া শাশুড়ী পছন্দ করেন না। তাঁদের সামনে বৌরা ছেলেদের সঙ্গে কথা বলে, এটাও চান না। তাঁর কথা অবশ্য তারা জেদ ক'রে না শুনতে পারে, কিন্তু তিলকে তাল ক'রে তুলে ঝগড়া বাধিয়ে কোনো লাভ নেই, তাই তারা এই ব্যবস্থাই ক'রে নিয়েছে।

সমীর চা খেয়ে চ'লে যেতেই গুরুচরণ বললেন, "কি বলছিল তোমার ছেলে?"

ব্রজরাণী বললেন, "ওদের চিরকেলে কথা। সব কাজকর্ম্ম কেন বৌদের হাতে ছেড়ে দিচ্ছি না। ওরা তা হলে শিখবে কি ক'রে?"

কর্ত্তা বললেন, "দিলেও ত পার কিছু কিছু ক'রে। এই এক সংসারের চিন্তায় ত তোমার আহার-নিদ্রা বন্ধ। সারারাত কাৎরাবে, তবু ভোর রাত্রে হুড়মুড় ক'রে উঠে ছুটবে ভাঁড়ার দিতে। কতদিন বা চলবে এইরকম ক'রে? বয়স বাড়ছে না কমছে?"

গিন্নী চটে গেলেন, "বয়স বাড়ছে সে আমি জানি তোমায় মনে করিয়ে দিতে হবে না। কিন্তু ছাড়ব কার হাতে? বৌরা কোনো কিছু গুছিয়ে করতে পারে?

যেটা না দেখব তাতেই ক্ষতি। দশ দিনের জিনিস পাঁচ দিনে শেষ করবে।"

কর্ত্তা বললেন, "ঐ তোমার এক কথা। কাজ ক'রেই মানুষে কাজ শেখে। তুমি যখন প্রথম কাজ হাতে নিলে তখন তোমার কোনো ভুল হয় নি নাকি?"

ব্রজরাণী বললেন, "জো ছিল তার? কেমন কড়া শাশুড়ীর হাতে মানুষ আমরা। সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখতেন, কখনও পানের থেকে চুন খস্‌তে পেয়েছে?"

কর্ত্তা বললেন, "তুমিও রাখলেই পার, তা হলে দিন-কয়েকেই ওরা শিখে নেয়।"

গিন্নী বললেন, "হ্যাঁ, তেমনিই আজকালের মেয়েরা বটে! একবার যদি কোনো কাজ হাতে তুলে দিই, আর তাতে আমার একটা কথা বলার জো থাকবে? তখনই ঠাকরুণদের অপমান হয়ে যাবে না? আমি যেমন ক'রে যা চালাই, তেমন ক'রে চালাতে তাদের আর হয় না। এই ত কাজ করতে করতে দিনে পঁচিশ বার হিসেব মেলাচ্ছি, ভাঁড়ারের জিনিষ মেলাচ্ছি। ওরা করবে এই রকম? পনেরো দিনের জিনিষ দশ দিনে খরচ ক'রে দিয়ে হাত ঝেড়ে বলবে, "এটা ফুরিয়ে গেছে মা।" তখন কি করবি তুই কর্। ভাঁড়ারের চাবি, ডুলির চাবি সব যেখানে-সেখানে ফেলে রাখবে, ঝি-চাকরের মোচ্ছব লেগে যাবে একেবারে।"

কর্ত্তা বললেন, "কল্পনায় কত কিই যে দেখ তুমি। বৌমারা মানুষ বই ভূত ত নয়? তাদেরও বুদ্ধি-শুদ্ধি আছে, পড়াশুনো করেছে, হিসেব-জ্ঞান আছে। একে-বারে কচি খুকীও নয়। হবে কেন অপচয় তাদের হাতে? আর হয় যদি একদিন, ব'লে দেবে, ভুল শুধরে দেবে। সত্যিই তারা কিছু তোমায় কামড়ে খেতে আসবে না? জগতের নিয়মে একদিন তুমি থাকবে না এটা ত ঠিক? যতই তোমার শুনতে খারাপ লাগুক না কেন? তখন ত ওদের হাতে সবই পড়বে? মাঝ থেকে ওরা নাকের জলে চোখের জলে হবে, কোনো কিছুই সময়মত শেখে নি বলে।"

ব্রজরাণী ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, "বেশ, বেশ, তাই দেব কাল থেকে। আমার আর কি? তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, হরিনাম ক'রে বাকি দিনগুলো কেটে যাবে। মাসের শেষে তখন যেন বলতে এসো না, এত টাকা যায় কোথায়? যা ক'রে আমি চালাই তা ভগবান জানেন।"

নাকের কাছে ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্‌খানা খুলে ধ'রে কর্ত্তা বললেন, "বড় বাজে বক তুমি বাপু। কথা শুনলে লোকে ভাববে, তোমার ভিক্ষে ক'রে সংসার চালাতে হচ্ছে চিরটাকাল। কবে খরচের টাকা তুমি যথেষ্ট পাও নি হাতে? যা রোজগার করেছি তার সবটাই তোমার হাতে ধ'রে দিই নি? এখন না হয় পেন্‌শন নিয়েছি, তা দুই ছেলে মিলে পুষিয়ে দিচ্ছে না? কমটা তোমার পড়ছে কিসে?"

কথাগুলো সত্য, কাজেই জবাব আর কি দেওয়া যায়? কর্ত্তা কাজ থেকে অবসর নিয়েছেন বটে, কিন্তু তার জন্য বাড়ীও বদ্‌লাতে হয় নি, চাকরবাকরও ছাড়াতে হয় নি। ছেলেরা প্রতিপক্ষ হলে অনর্থকই আরো খানিকক্ষণ গজর্‌ গজর্‌ করা চলত, তারা কিছু মাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিত না, কিন্তু গুরুচরণ তা স্বচ্ছন্দেই করতে পারেন, স্ত্রীকে ধমক দিতে তাঁর বিন্দুমাত্র আটকাবে না। অতএব নিজের মান নিজে রাখার খাতিরে ব্রজরাণীকে চুপ ক'রে যেতে হ'ল। মুখখানা ভ্রূকুটি-কুটীল ক'রে তিনি নিজের কাজ-কর্ম্ম সারতে লাগলেন। গুরুচরণ খানিকক্ষণ সেইখানে ব'সেই কাগজ পড়লেন, তারপর চশমা ও কাগজ হাতে উঠে নিজের শয়নকক্ষে চ'লে গেলেন।

চাকর রঘু বাজার নিয়ে এল। আবার হিসাব নিতে হ'ল। মাছটা যেন বড় ছোট মনে হচ্ছে, একবার ওজন ক'রে দেখলে হ'ত। তবে দুই ছেলেকেই তাড়াতাড়ি খেয়ে অফিস যেতে হয়, কাজেই এখন মাছ ওজন করতে বসলে আর রান্নার সময় থাকবে না। সুতরাং অনিচ্ছা সত্ত্বেও রঘুকে ছেড়ে দিতে হল।

বড় বৌ প্রমীলা ব'সে ব'সে আধ-ঠাণ্ডা চা খাচ্ছে, এমন সময় নিজের চায়ের পেয়ালা হাতে তৃপ্তি এসে ঘরে ঢুকল। জিজ্ঞেস করল, "বট্‌ঠাকুর বেরিয়ে গেছেন ভাই?"

প্রমীলা বলল, "এই ত গেলেন। মা অত বক্‌বক্‌ করছেন কেন? শ্বশুর মশায়ের সঙ্গে আবার কি নিয়ে লাগল?"

তৃপ্তি বলল, "কারণ কিছু থাকতেই হবে, এমন ত নয়? নূতন কিছু নয়, বাপ-বেটায় মিলে আমাদের হয়ে ওকালতি করছিলেন একটু, তাইতে গিন্নী চটে গেছেন।"

প্রমীলা বলল, "কেন যে ওঁরা বারে বারে ওসব কথা বলতে যান, জানি না। মা কোনোদিন প্রাণ ধ'রে আমাদের হাতে ভাঁড়ারের ভার দিতে পারবেন না, ক্যাশবাক্সের চাবি ত নয়ই।"

তৃপ্তি বলল, "কাজ নেই বাপু। উনি চিরজন্ম ব'সে নিজের চাল ডাল মাপুন আর টাকা-পয়সা গুনুন। অত ঝামেলায় আমার কাজ নেই। আমি আবার ঢিলেঢালা

মায়ের মেয়ে। তাঁর হিসেব কোনোদিনই মিলত না, তাই নিয়ে বাবা কত বকাবকি করতেন। মাসকাবার হতে না হতেই তাঁর চাল ডাল সব ফুরিয়ে যেত, হাজার হিসাব ক'রে আনা হলেও।"

প্রমীলা বলল, "অত ঢিলেঢালা না হলেও, আমার মাও এ বাড়ীর মায়ের মত নয়। অত আধ ছটাক চাল বাড়ল কি কমল, তা দিনে দশবার মাপেন না। জাল আলমারী থেকে একটা চন্দ্রপুলি বা পাটিসাপটা কেউ খেয়ে ফেল্‌লে, তখনি তাঁর চোখ উল্টে যায় না।"

তৃপ্তি বললে, "খাবার জিনিস খেলে অপরাধটা কি শুনি? ওগুলো কি ব্যাঙ্কে রাখবার জন্যে আনা হয়? ঐ যে গেল রবিবারে চন্দ্রপুলি রাখলেন অতগুলো, তা অপরাধের মধ্যে একখানা নিয়ে কে যেন রাত্রে খেয়েছিল। আর আছে কোথায়? মা ত বাড়ীশুদ্ধকে প্রায় খেয়ে ফেলবার জোগাড়। এমন কাণ্ড দেখি নি বাপু। কেন জানি না তাঁর ধারণা হল যে আমি খেয়েছি। খালি ঠেশ দিয়ে দিয়ে কথা বলতে লাগলেন, কারো আর বুঝতে বাকি রইল না যে কাকে সন্দেহ করছেন।"

প্রমীলা বলল, "তার পর শান্তি হল কেমন ক'রে?"

তৃপ্তি বলল, "আমি প্রায় কেঁদে ফেলছি দেখে তোমার দেওর শেষে রক্ষা করলেন। যদিও নিজে খান নি, তবু খাবার ঘরে গিয়ে বললেন, 'অত চেঁচাচ্ছ কেন মা? ও ত আমি খেয়েছি। ভোরবেলা উঠলাম, শুধু মুখে ঘুরতে ভাল লাগছিল না, তাই গিয়ে একটা খেয়ে নিলাম। তা হয়েছে কি? খাবার জন্যেই ত কিনেছিলে?' তবে গিয়ে মা থামেন, ছোট-ছেলে-অন্তপ্রাণ ত?"

প্রমীলা বলল, "তোর স্বামীভাগ্য আছে ভাই ছোট বৌ। আমার ইনি হলে উল্টে আমাকেই দশ কথা শুনিয়ে দিতেন, তাঁর মাকে অমন বিরক্ত করার জন্যে।"

তৃপ্তি বলল, "তা বোলো না দিদি। স্বামী-নিন্দে কোরো না। বকেন ঝকেন বটে মাঝে মাঝে কিন্তু অসুখ বিসুখ হলে কি রকম সেবাটা করেন, ও রকম ক'টা দেখা যায়?

প্রমীলা বলল, "তা করেন বটে, অস্বীকার করছি না। কিন্তু থেকে থেকে বাক্যি যা শোনান, তাতে আর ও করার কিছু মান থাকে না।"

তৃপ্তি বলল, "দোষেগুণে মানুষ ভাই। আগাগোড়াই গুণ কোন মানুষটার বা আছে?" এমন সময় শোবার ঘর থেকে ডাক আসাতে তৃপ্তিকে উঠে যেতে হ'ল।

ব্রজরাণী এবারে মনস্থির ক'রে ফেলেছেন। দিন কতক বৌমাদের হাতে সংসার ছেড়েই দিতে হবে। খুব ভালভাবে নাকানি চোবানি না খেলে, কর্ত্তা আর ছেলেদের আক্কেল হবে না। পুরোপুরি জব্দ হলে তবে যদি তাদের ফুটানি কমে। তখন এসে আবার ব্রজরাণীকেই সাধাসাধি করতে হবে, সংসারের ভার হাতে তুলে নেবার জন্যে।

সন্ধ্যে হতেই ব্রজরাণী দুই বৌকে নিয়ে খাবার ঘরে ঢুকলেন। এই ঘরেই নানা আলমারী ও দেরাজে ভাঁড়ার থাকে, দুধ থাকে, জলখাবার মিষ্টি সব থাকে। প্রমীলাকে বললেন, "দেখ বড় বৌমা, কি রকম ক'রে চাল ডাল দিই, ক'টিন ক'রে, সব দেখে রাখ। পলা দিয়ে মেপে তেল ঘি দিই তাও দেখে রাখ। কাল থেকে তুমিই দেবে। তোমাদেরই হবে সংসার এর পরে, শাশুড়ী ত চিরকাল থাকবে না?"

প্রমীলা কিঞ্চিৎ হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। চাল ডাল দেওয়া তার বহুকাল দেখা আছে, নূতন কিছু দেখবার ছিল না। এ রকম প্রেরণাটা গৃহিণীর কেন এল, তা ঠিক সে বুঝতে পারল না।

তৃপ্তির দিকে ফিরে ব্রজরাণী বললেন, "জলখাবারের ভার তোমার উপর রইল ছোট বৌমা। পাঁউরুটি সকালে আটটুকরো দেবে টোষ্ট করতে। নিয়ে এলে নিজের হাতে মাখন মাখাবে। চিনি বার করবে সকলের জন্যে দুচামচ ক'রে। চা বড় চামচের চার চামচ বার করবে। নিজেদের চা ঢালা হয়ে গেলে, সেই টি-পটে দু চামচ চা দিয়ে চাকরদের দিয়ে দেবে। ওদেরও এক-একজনকে দু চামচ চিনি আর বড় চামচের এক চামচ ক'রে দুধ দেবে। বিকেলে আর ওদের জলখাবার নয়, শুধু নিজেদের। এক পোওয়া ময়দা বার করবে, আর আধ টিন ঘি, ছোট টিনের। মিষ্টি সকলের দুটো ক'রে আনান হয়, সেই আন্দাজে দেবে। কেউ যদি একদিন একটা কম খায় ত সেটা নষ্ট কোরো না, পরের দিনের জন্যে তুলে রেখ।"

তৃপ্তিরও মাথার ভিতরটা ভোঁ ভোঁ করতে লাগল, তবু সেও কথা না ব'লে চুপ ক'রেই রইল।

ব্রজরাণী ব'লে চললেন, "ভাঁড়ার-আলমারীর চাবি ভাঁড়ার দেওয়া হয়ে গেলেই বন্ধ ক'রে দেবে। জাল আলমারীটার চাবি নেই, সেই হয়েছে মুশ্‌কিল। তা আমি ও ঘর ছেড়ে বেরই না, তাই এত কাল অসুবিধে কিছু হয় নি।"

প্রমীলা বলল, "আমরাও ত একজন না একজন থাকিই বাড়ীতে। রাত্রে যশোদা ত বাড়ীই চ'লে যায়,

আর রঘু থাকে উপরে রান্নাঘরে, কে বা জাল আলমারী খুলতে আসবে?"

গৃহিণীকে অবশ্য এখন বাধ্য হয়েই চুপ ক'রে থাকতে হ'ল, বলতে ত পারেন না বৌদের মুখের উপর যে ঝি-চাকর ছাড়াও জাল আলমারী খুলবার লোক থাকতে পারে? এ কি আর পুরাকালের বৌঝি, সাত চড়ে যাদের মুখে রা ছিল না? পরদিন সকাল থেকেই নূতন শাসনপ্রণালী চালু করা হ'ল। প্রমীলা ঠিকমত সব দিয়ে গেল, খালি তেল মাপবার সময় হাত কেঁপে প্রায় আধ পলা তেল মাটিতে পড়ে গেল। স্নান যদিও সে বারোটার আগে করে না শুধু শাশুড়ীর ভয়ে তাড়াতাড়ি তেলটা মাটি থেকে তুলে মুখে আর হাতে ভাল ক'রে মেখে নিল। ব্রজরাণী আজ একটু বেলা ক'রে উঠেছিলেন, তাই তখন অবধি ভাঁড়ার ঘরে এসে উঠতে পারেন নি, এই যা রক্ষা।

তৃপ্তি খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠল, "কি কাণ্ড ভাই দিদি!" বলে হাসতে হাসতে এক চামচ চা ছিটিয়ে ফেলে দিল।

প্রমীলা বলল, "শীগ্‌গির খুঁটে খুঁটে তুলে ফেল ছোট বৌ। ঐ মায়ের পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। খবরদার যেন একটা কণা চাও প'ড়ে না থাকে।"

দুজনে হাত চালিয়ে চা তুলে ফেলল, রঘুও ভাঁড়ার নিয়ে চ'লে গেল। ব্রজরাণী এসে ঘরে ঢুকে চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলেন। কিন্তু বার্দ্ধক্যস্তিমিত চোখে বিশেষ কিছু খুঁৎ দেখতে পেলেন না। কর্ত্তা, ছেলেমেয়েরা সব ক্রমে এসে জুটল, বৌরা ঠিক মতই তাদের চা রুটি পরিবেশন করল। ব্রজরাণী কত বৎসর পরে যে অন্যের করা চা খেলেন, তা মনেই ক'রে উঠতে পারলেন না।

কর্ত্তা মস্করা ক'রে বললেন, "কি গো, চা কেমন হয়েছে?"

গিন্নী বললেন, "ভালই হয়েছে।" কর্ত্তা বুঝলেন ভাল হওয়াটা ব্রজরাণীর ভাল লাগে নি। তিনি আর কথা বাড়ালেন না। খবরের কাগজ নিয়ে শোবার ঘরে চ'লে গেলেন।

রঘুকে ডেকে বাজারের পয়সা গৃহিণী দিয়ে দিলেন। বৌদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এই ভাঙা মাসের ক'টা দিন আমারই হাতে পয়সা-কড়ি রইল। মাসকাবারের পর তোমার হাতে দিয়ে দেব বড় বৌমা। হিসেব-কিতেব রেখো সব। বাজার থেকে যখন যা জিনিষ আনবে, সব ওজন ক'রে নিও।"

প্রমীলা মিহিস্বরে বলল, "থাক্ না মা আপনার হাতেই? ওসব পয়সা-কড়ি রাখা ভারি হাঙ্গাম।"

ব্রজরাণী বললেন, "না বাছা, দিচ্ছি যখন তখন আধখ্যাঁচড়া ক'রে দেব না। সবই শেখা ভাল। বাড়ীর আর সকলে চায়ও তাই।

যদিও কাজের ভার এখন থেকে আইনতঃ বৌদের হাতে গেল, তবু ব্রজরাণী একেবারে মোহত্যাগ করতে পারলেন না। যতক্ষণ না তাঁর নিজের নাওয়া খাওয়া সারা হ'ল, এবং চোখ ঘুমে ঢুলে এল, ততক্ষণ তিনি রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘরে ঘুরে বেড়ালেন। কিন্তু প্রথমদিন বৌরা এতই সতর্ক ও সজাগ হয়ে রইল যে সারাদিনের ভিতর একবারও তিনি খুঁৎ ধরবার সুযোগ পেলেন না।

তৃপ্তি বলল, "দে না ভাই দিদি একটা কিছু উল্টে ফেলে, মা একটু বকাবকি করুন, ওঁর মুখ বুজে থাকতে বড় কষ্ট হচ্ছে।"

প্রমীলা বলল, "থাক, তোমার আর এত অত উদারতা দেখাতে হবে না। আমরা রক্তমাংসের মানুষ ত? ভুল আমাদের এমনি থেকেই হবে, সাধ ক'রে করতে হবে না। তখন মনের সাধে বকবেন এখন।"

প্রবীর সেদিন একটু বেলা ক'রে অফিস থেকে ফিরল। চা খেতে ব'সে নীচু গলায় স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল, "কিগো নূতন রাজ্যপাল, কাজকর্ম কেমন চলছে?"

তৃপ্তি বলল, "ভালই ত চলছে। তবে মায়ের মনে হচ্ছে বড় খারাপ লাগছে।"

"ও দুদিনে সয়ে যাবে এখন," বলে প্রবীর খাওয়া শেষ ক'রে চ'লে গেল।

সন্ধ্যার পরই ঝি যশোদা ডেকে বলল, "ও মা, খাবার-ওয়ালী এসেছে।"

"তা ছোট বৌমাকে বল না," বলতে বলতে কিন্তু ব্রজরাণী নিজেই এগিয়ে এলেন। মিষ্টি তিনি নিজে বড় ভালবাসেন, সুতরাং কি খাবার এসেছে সেটা না দেখে আর পারলেন না।

সেদিন পাটিসাপটা এসেছিল। এ খাবারের ভক্ত বাড়ীর ছেলে-বুড়ো সকলেই, কাজেই অনেকগুলিই কেনা হ'ল।

তৃপ্তিকে ডেকে শাশুড়ী বললেন, "ভাল ক'রে গুনে, ঢাকা দিয়ে জাল আলমারীতে রেখে দাও। সকালে চায়ের সঙ্গে দিও। রুটি টোস্ট কম ক'রে দিও। রাত্রে কেউ মিষ্টি খায় যদি ত শুতে যাবার সময় আবার গুনে রেখ।" তৃপ্তি পরম গম্ভীর ভাবে তাঁর আজ্ঞা পালন করল।

রাত্রে ছোট খোকন মিষ্টি খেল, প্রবীরও খেল। আর কাউকে দেওয়া হ'ল না। গৃহিণী সকলকে বুঝিয়ে বললেন, "পিঠে একটু বাসি না হ'লে খেতে ভাল লাগে না। সবাইকে সকালে দেব।"

নিয়মমত সকলের খাওয়া-দাওয়া চুকে গেল, এবং যে যার ঘরে শুতে চ'লে গেল। বৌরা গৃহিণীর নির্দ্দেশ-মত সকালের কাজের সব ব্যবস্থা করল, ঝিকে চাকরকে বিদায় দিয়ে সদর দরজা বন্ধ ক'রে নিজের নিজের ঘরে ঢুকল। ঘুমোতে অবশ্য তাদের ঢের দেরি। একজনের ছেলে এবং একজনের মেয়েকে ঘুম পাড়াতে বেশ কিছু দেরি হয়। তারপর সারাদিনের মধ্যে ত স্বামীদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয় না? ঝগড়াঝাঁটি প্রেমালাপ সবই তোলা থাকে রাত্রের জন্য।

ব্রজরাণী শুতে যান সকাল সকাল, তবে ঘুম আসতে তাঁর দেরি হয়। কর্ত্তা সহজে আলো নিভোতে দেন না, ব'সে ব'সে বই পড়া তাঁর বাতিক। তারপর ঘুমিয়ে পড়েন দু'জনেই, তবে শেষ রাত্রে ব্রজরাণীর আবার ঘুম ভাঙে। বেশী রাত বাকি থাকলে তিনি আবার ঘুমতে চেষ্টা করেন। গুরুচরণের ঘুম ভাঙলে তিনি সোজা গিয়ে ছাতে বেড়াতে আরম্ভ করেন।

আজও ব্রজরাণীর ঘুম আসতে কিছু দেরি হ'ল। আশেপাশের ঘর থেকে নাতি-নাতনীর কান্নাকাটির শব্দ ক্রমে স্তব্ধ হয়ে গেল।

ঘুম ভাঙল আবার ভোর রাত্রের দিকে। পাড়ায় কাদের বাড়ীতে মোরগ আছে, সে ঠিক প্রহর ডাকে। তাকিয়ে দেখলেন, গুরুচরণও উঠে গেছেন। এখন হিম পড়ে শেষ রাতে। ছাদে উঠেছেন গিয়ে নাকি কে জানে? তার পর কাশি বেড়ে যাক, তখন ভুগতে ত আছেন ব্রজরাণী। বিরক্ত হয়ে উঠে পড়লেন খাট ছেড়ে।

ও মা, খাবার-ঘরে আলো জ্বলছে কেন? সারা রাতই জ্বলেছে নাকি? এমন না হলে ইলেক্‌ট্রিক বিল বাড়বে কেন? এই না বৌরা বড় হিসেবওয়ালী মেয়ে?

হন্ হন্ ক'রে খাবার-ঘরে গিয়ে ঢুকেই হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। জ্বাল আলমারী খোলা। তার সামনে চেয়ার টেনে নিয়ে ব'সে কর্ত্তা পরম তৃপ্তমুখে পাটিসাপটা খাচ্ছেন।

গৃহিণীর বজ্রাহত মুখের দিকে তাকিয়ে বেশ নিশ্চিন্ত ভাবে বললেন, "হ'ল কি তোমার? একেবারে বাক্‌লোপ হয়ে গেল? দুটো পিঠে খেয়েছি বই ত নয়?"

খাবার-ঘরে গোলমাল শুনে তৃপ্তি ততক্ষণে উঠে এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়েছে। তার বিস্মিত মুখের দিকে চেয়ে ব্রজরাণী হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

কর্ত্তা বললেন, "দেখ পাগলের কাণ্ড! হয়েছেটা কি?"

হায়, এই কাণ্ডজ্ঞানহীন বৃদ্ধকে কি ক'রে বোঝাবেন ব্রজরাণী যে কি তাঁর হয়েছে? শুধু দুটো পিঠে কি তাঁর হারাল আজ? বিগত জীবনের সৌধ যে বনিয়াদের উপরে রচিত ছিল, তাই কি আজ ভূমিসাৎ হ'ল না? তাঁর নিজের বাল্যকালের শিক্ষা, সভ্যতা আর সংযম, এই ছিল তাঁর সবচেয়ে গৌরবের জিনিষ। এগুলির প্রতীক ছিলেন তিনি আর গুরুচরণ। এই আদর্শ থেকে বিচ্যুতিকে তিনি চিরকাল অপরাধ ব'লে গণ্য করেছেন এবং পুত্রকন্যা আত্মীয়-স্বজনকে নির্ব্বিচারে শাসন করেছেন। আজ কিনা গুরুচরণ ক'রে বসলেন এমন কাণ্ড! তাও পরের মেয়ে পুত্রবধূর সামনে? আর কোনোদিন ব্রজরাণীর মুখ থাকবে এদের বকাঝকা করতে? ওরা হাসবে না মুখ টিপে?

কর্ত্তা আবার বললেন, "তবু ফোঁপায় দেখ। আরে এতে আমি মরব না তোমার ভাবনা নেই। কতদিনই ত খেয়েছি এমন? হয়েছে তাতে কিছু? ওসব ডাক্তারদের ধাপ্পা, পসার বাড়ান। আমার এমনি কি ডায়েবেটিস্ যে দুটো পিঠে খেলেই ম'রে যাব?"
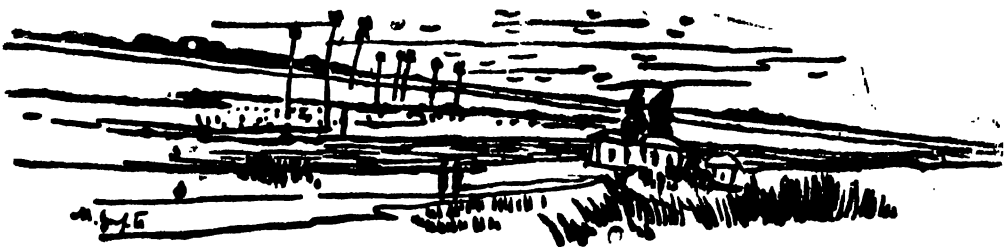
শীতের বৃন্দাবন

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

আগ্রা হতে বাসে দিল্লী যাচ্ছিলাম। হঠাৎ সকাল সাতটায় মথুরাতে নেমে পড়লাম। একদিন বৃন্দাবন বাস করে দিল্লী যাব। প্রোগ্রামে এটা ছিল না, তবু ঘটে গেল।

হাড়-কাঁপানো শীত। হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে টাঙ্গায় চড়লাম। টাঙ্গা তিলকদ্বার অতিক্রম করে ক্রমে মথুরা শহর ছেড়ে চলল। সবে শহর ছাড়িয়েছি, দেখি বৃন্দাবনী পাণ্ডারা রোদে হাত মেলে বসে আছে রাস্তার উভয়পাশে যাত্রী পাকড়াও করার আশায়। এখন ভাল সিজন্। বর্ষান্তে যমুনার জলোচ্ছ্বাস মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীস্রোতেও ভাঁটা পড়েছে। যেটুকু স্রোত ছিল তা রাসযাত্রার পর একেবারে শুকিয়ে গেছে। তাই সকালের শীত উপেক্ষা করে মথুরাপ্রান্তে বৃন্দাবনী পাণ্ডারা যাত্রী শিকারের জন্য ওৎ পেতে বসে আছে। মথুরার ভেতরে তাদের প্রবেশ নিষেধ। যদি তারা ভেতরে প্রবেশ করে যাত্রী ধরতে, তাহলে মাথুর পালা সুরু করবে মথুরাবাসী, হবে বৃন্দাবন বয়কট। অথচ বৃন্দাবনী-দের মথুরা ছাড়া গতি নেই। তাদের বহির্গমনের প্রধান পথই মথুরা। মথুরার পাণ্ডারাও পারতপক্ষে যাত্রী-শিকারে বৃন্দাবন যায় না। একবার মথুরার গণ্ডমার্কা 'কানে নাড়ু সাড়ে সাত ভাই' পাণ্ডারা বৃন্দাবনে ঘাঁটি গাড়ার চেষ্টা করেছিল, সফল হয় নি। তবে এজেণ্ট আছে তাদের বৃন্দাবনে। যেমন বৃন্দাবনবাসীদের এজেণ্ট আছে মথুরায়। প্রচারকার্য্য চলে ওদিকে হাতরাস-আগ্রা পর্য্যন্ত, এদিকে বাঁদিকুই দিল্লীর ধার পর্য্যন্ত। হ্যাণ্ডবিল বিলি করা হয় ট্রেনে এবং বাসেও। কোন্ পাণ্ডা কোম্পানী কত সুবিধা দেবে তাও ছাপানো বিজ্ঞাপনী ইস্তাহারে জানান হয়।

দু'পাশে সাদা মাটির টিলা আর বুনো গাছের কাঁটা ঝোপ দেখতে দেখতে অগ্রসর হয়ে চলি। ময়ূর দু'চারটে ঘাপটি মেরে গাছের মগ ডালে বসে পেখমে মিষ্টি রোদ লাগাচ্ছে। হিমেল হাওয়ায় তাদের ক্যাঁও ক্যাঁও শব্দ থমকে গেছে। শীতকাতুরে টিয়েগুলোও লাল ঠোঁট বাড়িয়ে ডালে ডালে রোদ পোহাচ্ছে।

পথে ছোট্ট একটা ঝরণা আর তার উপরে গড়ে-ওঠা একটা পুল অতিক্রম করলাম। মথুরা থেকে বৃন্দাবন মাত্র ছ' মাইল। পথ ক্রমশঃ অট্টালিকা সমাকীর্ণ হয়ে উঠেছে। অক্রূরের স্মৃতিবাহী গ্রামটির এখন জীর্ণাবস্থা। তবে কৃষ্ণ-বলরামের ব্রাহ্মণপত্নীদের নিকট ভাত ভিক্ষা করার রূপকথাটা যে স্থানটির সঙ্গে বিজড়িত সেখানে এখনও স্মরণী মেলা বসে। জয়সিংহপুরা আর অহল্যাগঞ্জ অতীতের দুটি জনস্থান আজ ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও বিপ্লবী নেতা রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের প্রেম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বিড়লাশেঠের গীতা মন্দির আর ধর্ম্মশালা, টি. বি. হাসপাতাল প্রভৃতি অনেক কিছুই গড়ে উঠে পথের শূন্যতাকে ভরে দিয়েছে। বাস্তুহারারাও বাসা বেঁধেছে স্থানে স্থানে। আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতার জীবনায়ন বৃন্দা-বনের রাখালিয়া প্রীতিকে ইতি করার চেষ্টা করছে।

পথে পুলিসের হামলা, নতুন কাপড় বা মাদক দ্রব্য বৃন্দাবনে নিয়ে যাচ্ছি কিনা, জানতে চাইলে তারা। এখানে চুঙ্গী ট্যাক্স আদায় করা হয়।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে জিনিসপত্র রেখেই বেরিয়ে পড়ি। বেলা ন'টার বেশী হবে না। সেবাশ্রম থেকে সোজা পথে অগ্রসর হয়ে দেখি তড়বড়িয়ে নাকে তিলক-কাটা বুড়ীরা বেরিয়ে আসছে ভজনাশ্রম হতে। এখানে তাদের সকালে পাঁচটা-আটটা এবং বিকেলে তিনটে-ছ'টা ডিউটি। সকাল-বিকেলের ছ' ঘণ্টা হরিনামের বিনিময়ে তারা ছ'আনা পয়সা পায়। ঐ তাদের সম্বল, ওতেই খাওয়া-পরা চলে। শীতের সঙ্গে পাল্লা দিতে ওরা পায়ের পাতার তলা থেকে হাঁটু পর্য্যন্ত মোটা চটের খণ্ডাংশ দিয়ে আবৃত করেছে। গায়ে জড়িয়েছে কম্বল। মাথায় কান-ঢাকা তুলোভরা-লাল রঙের টুপি, হাতেও চটের দিশী দস্তানা।

ভজনাশ্রমের সংখ্যা শুনলাম পাঁচটি এখানে। ভজনা-শ্রমীদের শতকরা নিরানব্বইজনাই বাঙালী সর্ব্বহারা মহিলা এবং অধিকাংশই পাকিস্থানী, পাঞ্জাবী উদ্বাস্তুও আছে বৃন্দাবনে। তারা কাজ করে খায়, ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।

পথের দু'পাশের সব্জীওয়ালা আর ঠেলা গাড়ীর ফল-বিক্রেতারা চুপ করে বসে আছে। বৃন্দাবনী ছাপা শাড়ী, নামাবলী এবং পিতল-কাঁসার বাসন-মূর্ত্তির দোকান-দারেরা পথচারীর উপর করুণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করছে। দুধ-দই-পেঁড়ার দোকানীরা মাছি তাড়াচ্ছে। শীতের বৃন্দাবনে মরুভূমির রুক্ষতা। যাত্রীর ভিড় নেই। পাণ্ডাদের অনেকেই চা-দোকানে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। কোথাও কোন পাণ্ডা সহিষ্ণু শ্রোতাকে কৃষ্ণকথা শোনাচ্ছে। কৃষ্ণকথা আর কৃষ্ণভক্ত এই নিয়েই ত বৃন্দাবন। আর তার সঙ্গে মিশে আছে পাণ্ডাদের যাত্রী-জমিদারীর মৌরসী সত্ব। তবে জমিদারী উচ্ছেদের মত একদিন পাণ্ডাগিরিও এখান থেকে উৎখাত হবে। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের শাখা স্থাপিত হওয়ায় পাণ্ডার দাপট কিছুটা কমেছে। আধুনিক ছেলেরা পাণ্ডাগিরি আর বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে চাইছে না। বসে বসে পরগাছা হয়ে অপরকে লুণ্ঠন করে জীবিকা নির্ব্বাহ করাটা তারা লজ্জার বস্তু মনে করে। মুমুক্ষু দরিদ্রের মিছে স্বর্গের পাসপোর্টের লোভ দেখিয়ে লাল কাপড় মাথায় বেঁধে দিয়ে মোটা টাকা নিয়ে লালযাত্রী করাটাকে এরা ঠিক ধাতস্থ করে উঠতে পারছে না। বোধোদয় হয়েছে বৃন্দাবনী ছেলেদের, এটা আনন্দের কথা। তবে বুড়ো শালিখরা ত আর অন্য নাম শিখবে না! গাঁজা সিদ্ধিতে সিদ্ধ হয়ে তারা বেশ পরস্বাপহরণ করে চলেছে।

মোড় ঘুরে গোবিন্দজীর মন্দিরে যাবার পথ ধরলাম। গোবিন্দজীর মন্দির আর শেঠজীর শ্রীরঙ্গনাথ মন্দির কাছাকাছি। একটু উঁচুতে উঠতে হ'ল গোবিন্দজীর মন্দিরে প্রবেশের জন্য। পথের দু'ধারে ভিখিরীর ভিড়। ছিঁনে জোঁকের মত এরা পিছু নেয়। একজনকে ভিক্ষে দিলে অন্যেরা ছেঁকে ধরে। তখন পলায়ন ছাড়া উপায় নেই। বাঙালীর উপর ভিখিরীদের জুলুমটা যেন বেশী। এখানের ভিক্ষুকদের হরিবোল কথাটাই হরিবল্।

গোবিন্দজীর নূতন পুরাতন উভয় মন্দির পরিক্রমা করে রঙ্গনাথজীর মন্দিরের দিকে পা বাড়ালাম। দেখি, যে রাস্তাটা রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের সামনে দিয়ে যমুনায় গিয়ে পৌঁছেছে, সেই রাস্তার মোড়ে এক ভদ্রমহিলা একবার করে চারিধার দেখে নিচ্ছেন আবার মাটিতে শুয়ে পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছেন। বুঝলাম, তিনি ব্রজরজঃ অঙ্গে মাখছেন। কিন্তু ঘৃণা, লজ্জা, ভয়ের—অন্ততঃ পক্ষে লজ্জাটা তাঁর পরিত্যাগ করা এখনও হয়ে ওঠে নি, তাই পাছে কেউ দেখে ফেলে সেই আশঙ্কায় গড়াগড়ি দিতে দিতে মাঝে মাঝে উঠে দেখছেন, কেউ কোথাও আছে কি না।

রঙ্গনাথজীর দুর্গে প্রবেশ করলাম। দুর্গাধীশ আছেন সাত দেওয়ালের ঘেরাটোপের ভেতর। দক্ষিণী গোপুরমের অনুকরণে তিন তিনটে ফটক অতিক্রম করে অরুণ স্তম্ভের সন্নিকটে পৌঁছলাম। সোনার পাতে মোড়া স্তম্ভ, কেউ বলে সাড়ে সাত মণ সোনা আছে স্তম্ভে, কেউ বলে সাতাশ মণ, সাধারণে একে বলে সোনার তালগাছ।

চলেছি গোপীনাথ বাজারের পথে। বৃন্দাবন ত আজকের নয়! এর উল্লেখ আছে বরাহপুরাণে। বরাহ-রূপী নারায়ণের দন্তলগ্না পৃথিবী এই বৃন্দাবনেই প্রথম আশ্রয় লাভ করে। তখন এখানে বৃন্দা আর লতার কুঞ্জ ছিল, আর ছিল প্রবহমান এক নদী, এ নদীর জল ছিল নীল। গর্গসংহিতাও এই মত সমর্থন করে। বৃন্দা বা তুলসীর বন ছিল বলে স্থানটির নাম হয়েছিল বৃন্দাবন। অবশ্য নাম সম্বন্ধে গাল-গল্পের শেষ নেই। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ বলেন বৃন্দাদেবীর নামানুসারে স্থানটির নাম বৃন্দাবন হয়।

পদ্ম পুরাণে জলন্ধর লক্ষ্মীর নিকট বীজ চাইলেন। লক্ষ্মী বীজ দিলেন, সেই বীজ রোপণ করে তুলসী, মালতী আর ধাত্রী নাম্নী তিন রকম লতা গাছ হ'ল। তুলসীর অপর নাম বৃন্দা। এই বৃন্দাই এখানে দেবীর মর্য্যাদা পেয়েছিলেন। তাই ইতিহাসের বৃন্দাবনে রূপগোস্বামী সেবাকুঞ্জে বৃন্দাদেবীর মন্দির নির্ম্মাণ করেছিলেন। এখন অবশ্য সে মন্দিরের চিহ্নও নেই।

রূপকথার বৃন্দাবন থেকে পুরাণের বৃন্দাবন। শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল বৃন্দাবন, ব্রজমায়ীদের স্নেহের বৃন্দাবন, ব্রজ-বালাদের প্রেমের বৃন্দাবন।

তার পর বৃন্দাবন লুপ্ত হ'ল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আবার প্রকট করলেন ইতিহাসের বৃন্দাবন। রূপ, সনাতন, জীব গোস্বামীর বৃন্দাবনের রজে পা ফেলে অগ্রসর হয়ে চলেছি—রজঃ নেই সর্ব্বত্র, সিমেণ্ট কংক্রিট করা রাস্তাই এখন বেশী। আজকের বৃন্দাবনের বয়স চারশ' বছরের বেশী হবে না। বৃন্দাবনের সব চেয়ে পুরাতন মন্দিরও ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বের নয়। প্রাচীন মন্দির চারটি। গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন আর যুগলকিশোর। ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে এসেছিলেন ফাদার টাইফেনথেলার। তিনি দেখে গেছেন, বৃন্দাবনে একটি মাত্র পথ, আর সে পথের উপরে রয়েছে বিরাট বিরাট মন্দির এবং অট্টালিকা, মুমুক্ষু মানবের ভিড় দেখে গেছেন তিনি। দেখে গেছেন জটা-জুটধারী অসংখ্য সন্ন্যাসী। বানর দেখে সাহেবের নাসিকা কুঞ্চিত হয়েছিল।

১৮২৯-৩০ খ্রীষ্টাব্দে এসেছিলেন ভিক্টর জাকুমণ্ট, তাঁর

বিবরণীতে বৃন্দাবন মথুরা অপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করেছে। গোবিন্দজীর মন্দিরের শিল্পকৃতির প্রশংসা করেছেন তিনি। কাশীর পর বিশাল হিন্দু নগরী বলে আখ্যা দিয়েছেন বৃন্দাবনকে। সমারোহ দেখেছিলেন তিনি বৃন্দাবনে, জমজমাট ভাব দেখে শ্বেতাঙ্গপুঙ্গব অভিভূত হয়েছিলেন।

বৃন্দাবনে ঘর বাড়ী বাড়ছে, কিন্তু জৌলুষ যেন কমছে মনে হ'ল। রাজারা রাজ্যহারা হয়েছেন, জমিদারীর উচ্ছেদ হয়েছে। ফলে ভোগরাগ বন্ধ হয়ে গেছে বহু মন্দিরে। তবু আজও প্রায় হাজার মন্দির রয়েছে এখানে —ঠাকুরের জন্য গেরস্থ গজিয়েছে, না গেরস্থের জন্য ঠাকুর বাড়ী বেড়ে উঠেছে, সে কথা আজ বলা মুস্কিল। যে দিকে তাকাই—ঠাকুর বাড়ী, ছোট, বড়, মাঝারি, কত প্রকারের।

পাঁচ বছর পূর্ব্বের বৃন্দাবনে ডালদার প্রচলন এতো ছিল না, সিনেমা ছিল না, আর আজ স্যাণ্ডেল ও সিনেমার যুগ এসেছে বৃন্দাবনে, বাঙালীর অনুকরণ করছে ব্রজবাসীরা। বাবুগিরির বর্ণপরিচয় পাঠ করতে সুরু করেছে এরা। ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবী এই দারুণ শীতেও দেখতে পেলাম অনেকের অঙ্গে। খোঁজ করলে নস্যির কৌটা এবং সিগারেট কেসও হয়ত পাওয়া যাবে অনেকের পকেটে। কথার মধ্যেও ঢুকেছে শ্লেষ বা বক্রোক্তি, তবে মহিলা-মহলে তেমন পরিবর্ত্তন এখনও আসে নি। ব্রজবধূরা কোমরের চন্দ্রহার নাচিয়ে দধিমন্থন না করলেও এখনও রক্ষণশীলতার চক্রব্যূহ ভেদ করে সভ্যতার রাজপথে প্রগতির ধ্বজা ধারণ করে দাঁড়াতে পারে নি। এখনও তাদের মুখে ঘোমটা, পায়ে খাড়ুমল, হাতে রূপোর হাতপদ্ম। ওরা একটু সেকেলে থেকে গেছে বৈকি!

'রাধে, রাধে'। তাকিয়ে দেখি গোপীনাথ ব্রজবাসী। লোকটি সজ্জন, কংগ্রেসী। পূর্ব্বে দু'বার সে আমাদের সেতোর কাজ করেছিল। বললে, চলুন সেবাকুঞ্জে। বৃন্দাবনের সব চেয়ে সেবা ঠাঁই ওটি। ওখানে নিত্য লীলা।

বললাম, চল।

নিকুঞ্জবনের অপর নাম সেবাকুঞ্জ। স্থানটি দেওয়াল-ঘেরা। নিকুঞ্জবনকে বন কোনো মতেই বলা যায় না। নিকুঞ্জও নয় এটি। শুধু ঝোপ আর ঝুপকো গাছ। লতাই বেশী, গাছ যা আছে তাও নেতিয়ে-পড়া। সবই সখি ভাব আর কি! দেবতারা নাকি এখানে মাথা নত-করা বৃক্ষের ছদ্মবেশে শ্রীকৃষ্ণের লীলারস পান করেছিলেন। কিনতিতে এখানের বৃক্ষ আজও মাটি স্পর্শ করে আছে। আঁকা বাঁকা পথে গা-মাথা বাঁচিয়ে অগ্রসর হই। হাততালির শব্দ পেলাম প্রথমে, পরে গানের। নিকটে গিয়ে দেখি ছোট্ট একটি মন্দিরে মেয়ে-পুরুষে হাততালি দিয়ে ভজন গাইছে। মন্দিরটি রাধা-রাণীর। এখানের প্রবেশ পথে তমালের দর্শন পেয়েছিলাম। গাছটির একটি বিশেষ স্থান নির্দ্দেশ করে গোপীনাথ বললে: মাখন খেয়ে হাত মুছেছিলেন কানহাইয়া ওইখানে। মা যশোদা পাকড়াতে এলে সামনের ওই পিলু ঝোঁপে বড়ি বড়িহা লুকলুক খেলা খেল্‌তা থা। যাইয়ে ঝোঁপকা অন্দর।

পথ গেছে ঝোঁপের মধ্য দিয়ে, কোথাও নুয়ে, কোথাও শুয়ে, কোথাও হামাগুড়ি টেনে লীলাস্থলগুলি দর্শন করতে হ'ল। পিলু ঝোঁপে কোনো মতে প্রবেশ করলাম। দেখি, ভেতরটি আবছায়া ঢাকা হলেও বেশ পরিচ্ছন্ন। একজন মহিলা বসে আছেন ঘোমটা টেনে। বিব্রত বোধ করে কুঞ্জ থেকে পশ্চাদ অপসরণ সবে সুরু করেছি—হঠাৎ গম্ভীরকণ্ঠে মহিলাটি নির্দ্দেশ দিলেন, যাবেন না, বসুন। রাধারাণীর ভোগ দিচ্ছি, প্রসাদ পেয়ে যাবেন।

কণ্ঠস্বরে কুণ্ঠিত হলাম। এমন পৌরুষব্যঞ্জক মহিলা-কণ্ঠ কখনও শুনি নি। গোপীনাথ ভেতরে বসার ইঙ্গিত করলে, বসলাম। যথা সময়ে প্রসাদ পেলাম। মহিলাটি ভোগের পাত্রসমেত কুঞ্জ হতে বহির্গত হলেন। হঠাৎ ঘোমটা খসে গেল মাথা থেকে। দেখি কুন্তলহীন মস্তক। গোঁফের রেখা সুস্পষ্ট। বস্ত্রের আবরণ ভেদ করে বুকের লোমগুলি অস্তিত্ব জাহির করছে। অথচ নাকে মোতি, হাতে কাচের চুড়ি, কানে মাকড়ী। বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম।

গোপীনাথ বললে: উনি ললিতা সখি। অর্থাৎ পুরুষ কিন্তু মেয়ের সাজপোশাকে আরাধনা করেন। বৃন্দাবনে একমাত্র পুরুষ সেই পরম পুরুষ, বাকী সব গোপী। মনে হ'ল মীরাবাঈয়ের কথা। তিনিও গোমা-টিলাতে রূপ গোস্বামীকে ওই কথাই বলেছিলেন যখন রূপ মহিলা বলে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান নি।

বেলা অনেক হয়েছে। তাই সেবাশ্রমের পথ ধরলাম, একটি ছোট্ট দোকানের সম্মুখে লোঁকের কিছু ভিড় জমেছে দেখে থামলাম। সকলের মুখে একটা চাপা হাসি। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক নাটকীয় ভঙ্গিতে বলছেন: অমন কইর‍্যা লিখস ক্যান? পোলাপানেরা কি মানে করব! ভাশ এক্কেরেই বুজরুকিতে ছাইয়া ফ্যালছ।

কাটা পোশাকের দোকান। অবাঙালীর। বাঙালীদের বোঝাবার জন্য বাংলাতে সাইন বোর্ড লিখেছে; এখানে

জামা-ই পাওয়া যায়। কন্যাদায়গ্রস্ত বৃদ্ধটি ভুল বুঝে-ছিলেন। মনে করেছিলেন, ওটি ঘটকের অফিস। তাই এই বচসা।
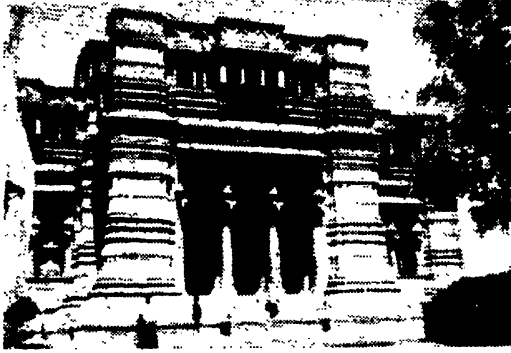
গোবিন্দজীর পুরাতন মন্দির

সেবাশ্রমে আহারান্তে বিশ্রামের পর বেলা দুটোতে আবার রিক্সা করে বেরিয়ে পড়লাম। গেলাম কালীয়-দমন ঘাটে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ কালীনাগকে দমন করে তার কালকূট বিষ থেকে ব্রজমণ্ডলকে রক্ষা করেছিলেন। কালীদহ জলশূন্য। যমুনার স্রোত সরে গিয়ে বহুদূরে বালির বুকে মুখ লুকিয়েছে। কেলিকদমের গাছ একটি এখনও আছে এখানে। হয়ত এই গাছ অথবা এর কোনো পূর্ব্বপুরুষের শাখায় চড়ে শ্রীকৃষ্ণ যমুনায় ঝাঁপ দিতেন।

কালীদহ অতিক্রম করে সোজা পথে চলেছি। সাধুদের ঝুপড়ি দু'চারটি নজরে পড়ছে এবার। যমুনা-কিনারে একজন সন্ন্যাসী বসেছিলেন। ভস্মমাখা জটার বিড়ে মাথায়, বুকের লোমে বয়েসের চিহ্ন। কাছে গেলাম তাঁর। ইঙ্গিতে বসতে বললেন। বসলাম। কাটল কিছুক্ষণ। জিজ্ঞাসা করলাম, কেত্‌না বরষ ভজন করতা? দর্শন মিলা?

পরিষ্কার বাংলা ভাষায় উত্তর এল, সব তাঁর ইচ্ছা। ইচ্ছা হলে দেখা দ্যান, না হলে আর কুথা থেকে হবেক। কবকে আইছ? আছ কুথায়? কুথাকার লোক? ভাষা এবং উচ্চারণ দুই-ই মানভূমের।

নিজের কথা বিনীতভাবে নিবেদন করে প্রশ্ন করলাম; কতদিন রয়েছেন বৃন্দাবনে? বয়স কত হ'ল? বাল্যকাল থেকে বিবাগী, না সংসার-ধর্ম্ম সারা করে সন্ন্যাস নিয়েছেন? বাড়ী কোথায়?

নিজের কথা সবিশেষ বললেন না তিনি। যা বললেন তার থেকে বুঝলাম, চাকরি থেকে অবসর নিয়ে এখানে এসেছিলেন। সে হ'ল ত্রিশ বছর পূর্ব্বের কথা। বৃন্দাবনের নৈতিক অধঃপতন ঘটছে ক্রমশঃ। সেটাই তাঁকে বিশেষ পীড়া দিচ্ছে। বললেন, কোনো সাধুকে যদি নূতন কাপড় বা কম্বল দাও লিবেক নাই। কেনে জান? রাত্রে চোরে এসে মারপিট করে উগুলা কেড়ে লিয়ে যাবেক। আমাদের ছেঁড়া কম্বলই ভাল। উগুলা ত আর বিক্রি হবেক নাই। নতুন হলে তা হবেক। আমাদিকে নতুন কাপড় কম্বল দেওয়া মানে আমাদের প্রাণান্ত ঘটান।

কথাগুলির মধ্যে আবেগ ছিল। বুঝলাম বৃন্দাবনের মর্ম্মকথাই বলেছেন তিনি। আজকের বৃন্দাবন বাটপাড়ের বৃন্দাবন। শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপর যুগে একটি কংসকে ধ্বংস করেছিলেন। এখন বৃন্দাবনের ঘরে ঘরে কংস। ফিরে এলাম কালীদহ হতে।

'রাধেশ্যাম'। দেখি গোপীনাথ উপস্থিত হয়েছে। তার সঙ্গে কালীয়দমন ঘাটেই দ্বিতীয়বার সাক্ষাত করার কথা ছিল। দু'জনে রিক্সায় চেপে বসলাম। তার নিকট জানলাম, ওই সাধুটি জ্ঞানী, বিদ্বান এবং বিলেতফেরৎ। এখন উনি বৃন্দাবনের মধ্যে আর আসেন না। যমুনা পারের গ্রামে মাধুকরীতে যান।

মদনমোহন মন্দির, দ্বাদশাদিত্যটিলা, সনাতনের সমাধি দেখে নিধুবনে এলাম। দেওয়াল-ঘেরা স্থান এটি, মুক্তালতায় ভরা। এলিয়ে-পড়া গাছ, জড়িয়ে-থাকা লতা, আর তার মাঝে মাঝে গোলকধাঁধাঁর মতো পথ। হরিদাস স্বামী ভজন করতেন এখানে। এখানেই বাঁকেবিহারীকে মাটির নিচে পেয়েছিলেন হরিদাস। এখন এই বাঁকেবিহারীই বৃন্দাবনের একমাত্র আসল ঠাকুর, বাকী সব নকল। তানসেনের গুরু হরিদাস' এঁর গান শুনতে আকবর বাদশাহ ছদ্মবেশে এসেছিলেন এই নিধুবনে। হরিদাসের সমাধিটিও রয়েছে এখানে। বাঁকা লাঠি আর তানপুরাটি স্মারণিক হয়ে ঝুলছে ছোট্ট কুটিরে। চুয়াচন্দনের মিষ্টি গন্ধে বাতাস ভরপুর। এখানের গেরিমাটি হয়েছে গোপীচন্দন। একটি কুণ্ড রয়েছে। পাথরে ঘেরা। নাম বিশাখা কুণ্ড।

নিধুবন থেকে বেরিয়ে শুনতে পেলাম হাহাকার ধ্বনি। কৃষ্ণবিরহে রাধার নয়, রাধিকা বাঈয়ের। জননীর নিষেধ সত্ত্বেও নিধুবনের প্রবেশপথের টিনের ঝাঁপ-ফেলা পাদুকা-নিরাপত্তা ভবনে রাধিকা তার নতুন চপ্পল জোড়া রেখে আসে নি। তাই ঝকমকে লালরঙে আকৃষ্ট হয়ে কোন্ লালমুখো মেনি-বানর চপ্পল জোড়া নিয়ে পালিয়েছে। গোপীনাথ বললে, ভয় নেই। ছোলা-

ভাজা ভেট দেনেসে ও মেনি আভবি আয়েগা, চপ্পলভি দে যায়েগা।

এলাম বস্ত্রহরণ ঘাটে। ব্রজবাসীরা বলে, চীর ঘাট। কদম গাছটির শাখা দেখার উপায় নেই। শুধু বস্ত্রখণ্ড। বাসনা জানিয়ে তীর্থযাত্রীরা বস্ত্র বাঁধে। জনশ্রুতি, বাসনা নাকি পূর্ণ হয়। এখানে শ্রীকৃষ্ণ গোপিনীদের লজ্জা কেড়ে নেবার জন্য বস্ত্রহরণ করেছিলেন, বললে গোপীনাথ। ঘৃণা, লজ্জা—এ সব সাধনার অন্তরায়, তাই লজ্জাহারী গোপীদের লজ্জা কেড়ে নিলেন। অধ্যাত্ম কথা যাই হোক, হরণ জিনিসটা আজও চলছে। পাণ্ডারা যাত্রীদের রূপকথা শুনিয়ে বাসনা পূর্ণ হবার লোভ দেখিয়ে অর্থ আর বস্ত্র হরণ করছে। আর জুতো হরণ করছে বানরে। অসতর্ক হলেই জুতো নিয়ে যাবে মেনি-বানরে।

এখনও বৃন্দাবনের আসল ঠাকুর দেখা বাকী। অথচ সন্ধ্যা আসন্নপ্রায়। তাই ত্বরান্বিত হয়ে বাঁকেবিহারীর মন্দিরে এলাম। সম্মুখে পর্দা ঝুলছে। মাঝে মাঝে সে পর্দা সরে যাচ্ছে আর বিহারীজীর ঝাঁকি দর্শন হচ্ছে। কবে নাকি কে বিহারীজীকে দেখে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিল। সেই থেকে এই ঝাঁকিদর্শন, অর্থাৎ ক্ষণিক খোলা, ক্ষণিক ঢাকা—এই ব্যবস্থার প্রচলন হয়েছে। গোপীনাথ বললে, পাছে বিহারীজী মথুরা পালিয়ে যান সেই ভয়ে তাঁকে ঢেকে রাখা হয়।

'অর্ব্বাচীন, অর্ব্বাচীন, যত সব ইয়ে···', দেখি পাশের এক বৈষ্ণব গোপীনাথের কথা শুনে ক্ষেপে উঠেছেন। তিনি যে ব্যাখ্যান দিলেন ঝাঁকিদর্শনের তা হ'ল এই: আনন্দ তৃপ্তিতে নেই। আছে লালসার তীব্রতায়। সেই তীব্রতা বাড়াবার জন্যই এই ঝাঁকিদর্শনের ব্যবস্থা।

নিধুবন—হরিদাস স্বামীর সমাধি

মণি-মাণিক্যের ছড়াছড়ি। রাজবেশ। ফুলের দোলায় দোল খাচ্ছেন বিহারীজী। চোখে দীপ্তি। মনে হ'ল হীরের চোখ। হিরণ্ময় সিংহাসন। আভিজাত্যের চূড়ান্ত। হয়ত এত সোনাদানাকে গোপন রাখার প্রচেষ্টার মধ্যেই ঝাঁকি দর্শনের উদ্ভব। ঠিক ঠাহর হবার পূর্ব্বে পর্দা নেমে এল। আবার সরে গেল। আবার এল। দর্শক ঠাকুরের সবকিছু ভালভাবে দেখতেই পেল না। হীরে-জহরতে লোভ দেবে কি?

মাথায় কুহেলি গুণ্ঠন টেনে নেমে এসেছে সন্ধ্যা। বাতাসে বরফের স্পর্শ। প্রাণশক্তি যেন ঝিমিয়ে আসছে। সম্মুখের নীল যমুনায় মৃত্যুর শীতলতা। সেই নিঃশ্বাসে সর্ব্বাঙ্গ নিঃসাড় হবার উপক্রম। অতএব ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের পথ ধরা ছাড়া আর উপায় কি?

আদর্শ

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

দু'খানা চিঠি একসঙ্গে এল। অদ্ভুত যোগাযোগ। যুক্তি-বাদী মন বলবে, ওটা নেহাতই কাকতালীয়—চান্স কো-ইন্সিডেন্স। কিন্তু যুক্তির বাইরেও মানুষের মনের পরিধি অনেকটা বিস্তৃত, সেখানে মানুষ বিশ্বাসই করতে চায়, কোনো অদৃশ্য হাতের স্পর্শ অনুভব করে। হয় ত হাজার হাজার বছরের সঞ্চিত সংস্কারের প্রভাব সেখানে বদ্ধমূল, কিন্তু বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে তাকে কাটিয়ে ওঠার চেয়ে তাকে বিশ্বাস করে মনের দুর্ব্বলতা এবং সংশয়ের দোলা থেকে অব্যাহতি পেতেই মানুষ ব্যগ্র হয়।

বৃদ্ধ সুশোভনবাবুর জীবনসংগ্রামে বিপর্য্যস্ত মনটাও তাই দু'খানা চিঠি একসঙ্গে আসার মধ্যে এক অদৃশ্য হাতের ইঙ্গিত পেলেন।

অথচ মনের দিক থেকে দুর্ব্বল তিনি নন। দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রামে মাথা নোয়ান নি, আদর্শের জন্য বিবেকের সঙ্গে আপোস করেন নি। কিন্তু আজ একাত্তর বছর বয়সে বাতে পঙ্গু দেহটা যখন সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মপ্রেরণার সামনে মূর্ত্তিমান বিদ্রোহের মতন অবস্থান-ধর্ম্মঘট করে বসে আছে এবং দুই বেলা মাত্র দুটি অন্ন জোটান হিমালয় অতিক্রম করার মতন দুরূহ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন মনে হয়, আজীবন ব্রত সাধনার ফলে তিনি কি পেলেন!

লাঠিতে ভর দিয়ে বারান্দায় ইজিচেয়ারে গিয়ে বসলেন সুশোভনবাবু। স্ত্রী সুভাষিনী দূর থেকে দেখে ছুটে এলেন। বললেন, "একা যেতে পারবে? ধরব কি একটু? কার চিঠি এল গো?"

চিঠি দু'খানাতে সুশোভনবাবু একবার চোখ বুলিয়ে-ছেন। বারান্দায় গিয়ে চশমার কাঁচ মুছে আলোতে আবার মেলে ধরলেন।

লিখেছে রণেন আর সুজিত। হ্যাঁ, রণেনের নামটাই আগে মনে পড়ল; ভোলবার অনেক চেষ্টা করেছেন, তবুও। রণেন লিখেছে—

শ্রীচরণকমলেষু,

বাবা, জানি না আপনি আর কতদিন আমার উপর রাগ করিয়া থাকিবেন। প্রায় এক বৎসর পর চিঠি লিখিতেছি। তার পূর্ব্বে অনেক চিঠি লিখিয়াও উত্তর পাই নাই। বার বার টাকা পাঠাইয়াছি, আপনি ফেরৎ দিয়াছেন। লোক মারফৎ বরাবরই আপনার খবর নিতেছি। সম্প্রতি আপনার যেরূপ স্বাস্থ্যের অবস্থা জানিলাম, তাহাতে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছি। অনুমতি দিলে আপনাকে কিছু টাকা পাঠাই, অথবা এখানে লইয়া আসিতে পারি। চিকিৎসা ও যত্নের কোনরূপ ত্রুটি হইবে না। পত্রোত্তরের আশায় রহিলাম। আপনি ও মা আমার প্রণাম গ্রহণ করিবেন। ইতি।

দ্বিতীয় চিঠিতে সুজিত লিখেছে—

পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু,

মাষ্টার মহাশয়, আমি সম্প্রতি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ফলিত রসায়নে ডি. এস্. সি. ডিগ্রী লইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি। বর্ত্তমানে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে আছি। কয়েকদিনের ছুটি লইয়া শীঘ্রই বাড়ী যাইব, তখন আপনার সঙ্গে দেখা করিব। আপনার শিক্ষাগুণে এবং আশীর্ব্বাদে আমি আজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছি। আপনার ঋণের কথা বলিয়া আর অপরাধ বাড়াইব না। আশীর্ব্বাদ করিবেন, যেন আপনার আদর্শ সামনে রাখিয়া চিরকাল মাথা উঁচু করিয়া চলিতে পারি।

শ্রীচরণে প্রণামান্তে নিবেদন, ইতি।

সুজিতের চিঠি পড়ে সুশোভনবাবু একটু হাসলেন। আদর্শ! সৎশিক্ষা! এ সব কি? স্বদেশী আন্দোলনের সময় বি. সি. এস্-এর চাকুরি ছেড়ে আদর্শের জন্য শিক্ষকতা গ্রহণ করেছিলেন। সুদীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসর শিক্ষকতা এবং তার মধ্যে কুড়ি বৎসর প্রধান শিক্ষকের পদে কাজ করে হাজার হাজার ছাত্রকে আদর্শ এবং সৎ-শিক্ষা দিয়েছেন। অন্যায়, উৎপীড়ন এবং মিথ্যার বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের আদর্শ নিজের জীবনে দেখিয়ে ছাত্রদের উৎসাহিত করেছেন। তাতে কি পেয়েছেন? আজ একাত্তর বৎসর বয়সে রোগজীর্ণ দেহ, উপবাস—আর মূর্খ লক্ষপতি ব্যবসায়ী পুত্র।

কিন্তু আরও পেয়েছেন। কৃতবিদ্য, কৃতজ্ঞ ছাত্র। সুজিত ত বটেই, তা ছাড়াও অনেক। এরাই তাঁর আদর্শের সার্থক রূপায়ণ!

রণেন এবং সুজিত—সুশোভনবাবুর পুত্র এবং মানস-

পুত্র। সুজিত বিদ্বান, মহৎ, আদর্শ-চরিত্রের যুবক। আর আজীবন ব্রতী, ত্যাগী পিতার পুত্র হয়েও রণেন লেখা-পড়ায় অনগ্রসর, আদর্শভ্রষ্ট, নীতিবর্জ্জিত। ম্যাট্রিক ফেল করবার পর লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়ে ও ব্যবসায়ে নামে। যতদিন পর্য্যন্ত সে ক্যানভাসারি, দালালীতে পুরাপুরি দুই বেলা খাবার সংস্থান করতে পারত না, ততদিন সুশোভনবাবুর কিছুটা করুণা পুত্রের জন্য ছিল। তার পর এল যুদ্ধ—রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে বিপুল পরিবর্ত্তন। কোথা দিয়ে কি যেন হয়ে গেল ভোজবাজীর মতন। রণেন দু'হাতে টাকা উপার্জ্জন করতে লাগল। তার নিজস্ব অফিস হ'ল। গাড়ী হল, মস্ত ফ্ল্যাট সে ভাড়া নিল। টাকা যেন বৃষ্টির ধারার মতন তার উপর ঝরে পড়তে লাগল।

সুশোভনবাবু একটু নড়ে চড়ে বসলেন। সন্ধ্যাবেলা একটু চা হ'লে বেশ হত। বহুদিনের অভ্যাস, কিন্তু আজ-কাল ওটি ত্যাগ করেছেন। অর্থাভাবই এর প্রধান কারণ, তবুও দারিদ্র্যের কৃচ্ছ্রসাধনায় আত্মনিগ্রহের মধ্যে এক ধরনের অহঙ্কারের পরিতৃপ্তি আছে, যা বিত্তের পঙ্কিলতায় নেই। তাই দীর্ঘকালের অভ্যাস চা-পানের মধ্যে তৃপ্তি থাকতে পারে, কিন্তু অভ্যাস ত্যাগ করার আত্মপ্রসাদ তাতে নেই।

প্রায় পঁচিশ বৎসর আগেকার কথা মনে পড়ল। স্মৃতির রোমন্থন সব সময় উপাদেয় না হতে পারে, কিন্তু অনিবার্য্য।

সন্ধ্যার পর বাড়ীর মধ্যে পুত্র রণেনের পড়ার আওয়াজ না পেয়ে বাইরের ঘর থেকে হেঁকে ডাকলেন সুশোভনবাবু—"রণু, রণেন—"

উত্তর নেই।

আবার ডাকলেন, "রণেন কি করছিস? বই নিয়ে এদিকে আয়।"

সাড়াশব্দ নেই। মৃদু পদক্ষেপে সুভাষিনী এসে দাঁড়ালেন।

"রণু ঘুমোচ্ছে।"

ক্ষেপে উঠলেন সুশোভনবাবু। "ঘুমোচ্ছে মানে? আটটা বাজে, সবে সন্ধ্যে। ক'মাস পরে ম্যাট্রিক পরীক্ষা, আর এখন সন্ধ্যাবেলা ঘুমোচ্ছে হতছাড়া?"

অতিশয় শান্ত, নিস্পৃহ গলায় সুভাষিনী বললেন—কোত্থেকে ম্যাচ খেলে এসেছে। বলল, খুব পরিশ্রম হয়েছে, সারা গা ব্যথা। শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।"

"ঘুমিয়ে পড়ল? আর তুমি কিছু বললে না?"

"কি বলব, বাপের শাসন-ই যে মানে না।"

ফেটে পড়লেন সুশোভনবাবু।—"অপদার্থ, কুলাঙ্গার, আমার নাম ডোবাল, মুখ হাসাল। ফেল করে করে ক্লাশ-প্রমোশান পায়, লোকের কাছে ছেলে বলে পরিচয় দিতে পারি না। অথচ কি-না করছি ওর জন্য। কত যত্ন, কত আগ্রহ নিয়ে ওকে লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা করছি। কত আশা ছিল—"

সুভাষিনী নিরাসক্ত গলায় বললেন, "আশা না রাখলে আর আশাভঙ্গ হয় না।"

অসহিষ্ণুভাবে সুশোভনবাবু বললেন, "দর্শন শাস্ত্রের কথা আলাদা, আমরা সংসারী জীব।"

সুভাষিনী বললেন, "আদর্শের কথা তোমরাই বল।"

দরজার বাইরে মৃদু আওয়াজ হয়—"স্যার।"

"এস, এস সুজিত।" ব্যগ্র ভাবে আহ্বান জানালেন সুশোভনবাবু। স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন, "দেখ—অতিশয় গরীবের ছেলে, দু'বেলা খেতে পায় না। অথচ কি আগ্রহ লেখাপড়ায়। ও স্কলারশিপ পাবে। আর রণু?"

সুভাষিনী নিঃশব্দে বাড়ীর মধ্যে চলে গেলেন।

একগাদা খাতা নিয়ে এসে সুজিত টেবিলের উপর রাখল। —"স্যার টাস্কগুলো—"

রাত দশটা পর্য্যন্ত তাকে পড়ালেন।

প্রাইভেট ছাত্র নয়। লেখাপড়ায় ভাল এবং আগ্রহ-শীল সব ছাত্রকেই যথাসাধ্য সাহায্য করেন প্রধান শিক্ষক সুশোভনবাবু।

সন্ধ্যার ম্লান আলোতে ভাঙা ইজিচেয়ারে শুয়ে পঙ্গু, বৃদ্ধ, অর্থাভাবে ক্লিষ্ট সুশোভনবাবুর কর্ম্মময় অতীত জীবনের বহু ঘটনা ছায়াছবির মতন মনের উপর ভেসে ওঠে।

জীবন-সঙ্গিনী সুভাষিনী। গরীবের মেয়ে। ইচ্ছা করেই গরীবের মেয়ে বিবাহ করেছিলেন সুশোভনবাবু। পঁয়তাল্লিশ বৎসরের দাম্পত্য জীবনে সুভাষিনী কখনও কিছু চান নি এবং নিতান্ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু পান-ও নি। স্বল্পভাষী, নিরুত্তাপ, বুদ্ধিমতী সুভাষিনী স্বামীর আদর্শনিষ্ঠার সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে মিলিয়ে দিয়েছিলেন।

"বড় বউ"—

কাছে এসে দাঁড়ালেন সুভাষিনী।—"গা-টা কি একটু গরম গরম লাগছে?"

"ও কিছু নয়। ঘাটে বসে ঢেউ দেখে ঘাবড়ালে চলবে কেন। তুমি বস।"

"সুনীলকে একবার খবর দি?"

সুনীল ছাত্র, এখানে ডাক্তারী করে। তার জন্যই সুশোভনবাবুর চিকিৎসার কোন খরচ নাই। প্রকৃতপক্ষে ছাত্রদের সাহায্যেই তাঁর চলছে। যদিও এ সাহায্য নিতে তিনি কুণ্ঠিত, কিন্তু ওদের আগ্রহ তিনি ঠেলতে পারেন না।

যুক্তি হিসাবে এ কথা তাঁর মনে হয়েছে, ছাত্রদের সাহায্য নিলে ছেলে কি দোষ করল? যে সকল ছাত্র তাঁকে সাহায্য করে তারা সকলেই কি তাঁর আদর্শের ধ্বজাধারী?

কিন্তু না, ছেলে আর ছাত্র এক নয়। ছাত্রদের তিনি ভালবাসেন, আলঙ্কারিক ভাষায়, ছেলের মতন। কিন্তু আশাভঙ্গের ব্যথা ত ছাত্রদের সম্পর্কে অনুভব করেন না! অথচ কোন একটি ছাত্রের সার্থকতার সংবাদ সঙ্গে সঙ্গে ছেলের কথা মনে করিয়ে দেয় কেন?

সুভাষিনী বললেন, "আদা দিয়ে একটু চা করে এনে দিই?" গরম গরম খেলে ভাল লাগবে। ঠাণ্ডা লেগেছে হয়ত।"

চমকে তাকালেন সুশোভনবাবু। সুভাষিনী কি তাঁর মনের কথা জানতে পারলেন? হবেও বা। এতদিনকার একাত্মবোধ! সংযম ভুলে গিয়ে সাগ্রহে বললেন, "চা? তা হলে ত বেশ হয়! কিন্তু কোথায় পাবে তুমি?"

কেমন যেন একটা অবসাদ স্তিমিত চেতনাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে। চোখ মেলতে ইচ্ছে করছে না। সারা জীবন যুদ্ধ ক'রে জয়লাভ করেছেন তিনি। সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাস এবং নির্লোভ সেবাপরায়ণ মনোভাবের দ্বারা আদর্শ শিক্ষকের অম্লান যশ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন। না-ই বা থাকল টাকা! অর্থাভাবের মধ্যে মাথা উঁচু রাখবার গৌরবও ত কম নয়!

তবুও কোথায় যেন একটা খটকা থেকে যায়। সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি স্ত্রী সুভাষিনী আজীবন ছায়ার মতো স্বামীর অনুগামিনী। জীবনে কখনও নিজের কোনো ইচ্ছা ব্যক্ত করেন নাই। আদর্শ স্ত্রী! তবুও আজ জীবনসায়াহ্নে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে কেন মনে হয়, কোথায় যেন সূক্ষ্ম একটা গরমিল রয়েছে। হিসাবে ঘাটতি,—সামান্য নয়, কিন্তু ধরা যাচ্ছে না। লোকসান একটা হয়ে গেছে, এখন আর কোনো উপায় নাই।

একমাত্র পুত্রকে হারান এতদিন লোকসানের মধ্যে গণ্য করেন নি। ওটা তাঁর যোদ্ধজীবনের একটা দিক। আদর্শের সঙ্গে স্নেহের সংঘাতে আদর্শের জয়। অথচ কোনো কোনো দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে এ যুক্তি মন মানতে চায় না। অনটনের সংসারেও পুত্রকে যথাসম্ভব সৎশিক্ষা দিতে ত্রুটি করেন নি তিনি। প্রাচুর্য্য সে পায় নি সত্য, কিন্তু যে অভাববোধ থেকে হীনমন্যতা এসে শিশুর দেহ-মনের সুস্থ বিকাশকে ব্যাহত, ছেলেকে তা থেকে দূরে রাখবার যথাসম্ভব চেষ্টা করেছেন। শিক্ষাব্রতী সুশোভনবাবু শিশুমনোবিজ্ঞানের জটিল তত্ত্বগুলির সঙ্গে সুপরিচিত। পুত্রের শিক্ষায় অবৈজ্ঞানিক কোনো পন্থা তিনি অনুসরণ করেন নাই। অথচ রণেনের লেখাপড়া হ'ল না,—হ'ল কঠোর দারিদ্র্যপীড়িত স্বল্পশিক্ষিত পিতামাতার সন্তান, সুজিতের।

সুভাষিনী চা নিয়ে এলেন। আবার গায়ে হাত দিয়ে বললেন, "তাই ত, গা-টা ত বেশ গরম মনে হচ্ছে।"

সুশোভনবাবু বললেন, যেতে দাও। বরং রাত্রে দু'খানা রুটি করে দিও, অবশ্য ঘরে যদি আটা থাকে।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে সুশোভনবাবুর মনে হ'ল, মাথাটা যেন বড্ড ঝিম ঝিম করছে। সারা শরীরে অদ্ভুত ক্লান্তি আর চোখদুটি আপনা থেকেই বুঁজে আসছে। শরীরটা অসুস্থ হয়েছে। স্নায়ী বাতব্যধি নয়—অন্য কিছু। আচ্ছা, এখন যদি তুষারশুভ্র বিছানায় এক হাত পুরু গদির উপর সুশোভনবাবু শুয়ে থাকতেন, আর মাথার কাছে রণেন আর পায়ের কাছে চিন্তাক্লিষ্ট মুখে বৌমাকে বসে থাকতে দেখা যেত তা হলে কেমন হ'ত? এই চিন্তাতেও কি তৃপ্তি! দেহ যতই অশক্ত হয় প্রিয়জনের সঙ্গকামনাতে মন ততই ব্যাকুল হয় কেন? আর্য্য ঋষিরা এই জন্যই বোধ হয় চতুরাশ্রমের তৃতীয় পর্য্যায়ে সংসার ত্যাগের নির্দ্দেশ দিয়েছেন। আদর্শের সংঘাতে যে ছেলের সঙ্গে দীর্ঘকাল আগে নিজেই নিষ্ঠুর হাতে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন, তারই কথা আজ বার বার মনে পড়ছে কেন?

তবু রণেনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা চলবে না। পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, পিতার আদর্শকে পদদলিত করে সে শুধু অর্থের সাধনা করেছে। সে বিদ্রোহী। তার কাজ সমর্থনযোগ্য হোক আর না-ই হোক, তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা চলবে না। আজ সে লক্ষপতি, আর তার পিতা রোগজীর্ণ, কপর্দ্দকহীন অবস্থায় মৃত্যুপথযাত্রী!

"দাদু—"

সুশোভনবাবু চমকে ফিরে তাকালেন। তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "কে রে? দাদু? কখন এলে?"

রণেনের ছেলে পানু, আট বছর বয়স। কয়েকবার তাকে নিয়ে রণেন এখানে এসেছে পিতাকে দেখতে। ফর্সা টুকটুকে ছেলে, স্বাস্থ্যবান, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা,

পহলগাঁও (কাশ্মীর) ফটো : শ্রীপ্রফুল্ল সি
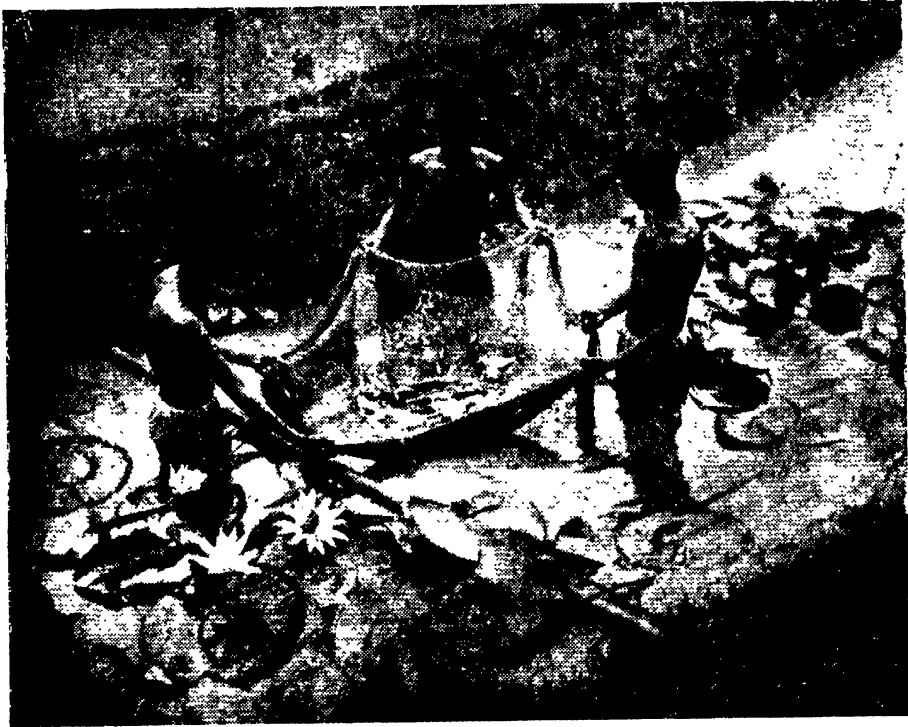
নয়াদিল্লীতে কাঞ্জাওয়ালা সমাজ-উন্নয়ন ব্লকের অন্তর্গত চারিটি গ্রাম-পঞ্চায়েতের সদস্যগণকে সরকারপক্ষে মৎস্য-ছানা উপহার প্রদান

চটপটে। সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়ে। ওকে দেখলে কেমন যেন বুকের মধ্যে হু হু করে ওঠে। কিন্তু সে দুর্ব্বলতাও জয় করেছেন সুশোভনবাবু। বছর দশেক পূর্ব্বে রণেন তার সিনিয়ার পার্টনারের একমাত্র সন্তানকে বিবাহ করে। বছর পাঁচেক পূর্ব্বে পার্টনার মারা যাওয়াতে সমগ্র ব্যবসায়ের মালিক রণেনই হয়েছে। ভাগ্য আর কাকে বলে! বিবাহের পূর্ব্বে রণেন অবশ্য সবিনয়ে পিতার অনুমতি প্রার্থনা করেছিল।

পানু বলল, "দাদু, তুমি কি এখনও আমাদের উপর রাগ করে আছ? আমরা যে এখানে থাকব বলে এসেছি!

পানুকে কাছে টেনে নিয়ে সুশোভনবাবু বললেন, "না, দাদু, রাগ করব কেন। কিন্তু তোমরা ত খবর না দিয়ে হঠাৎ এ রকম আস না। কার সঙ্গে এসেছ?"

পানু বলল, "বাবা এসেছে, ওই যে, ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। তুমি না ডাকলে আসবে না। দাদু, আমাদের এখানে থাকতে দেবে?"

ওকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে সুশোভনবাবু বললেন, "আমার যা কিছু সবই ত তোমাদের, দাদু। আমি থাকতে না দেওয়ার কে? কিন্তু রণু কই? রণু, এদিকে আয়।

রণেন এগিয়ে এসে প্রণাম করল। সুশোভনবাবু তাকিয়ে দেখলেন, রণেনকে কেমন যেন অনেকটা ম্লান দেখাচ্ছে। তার বেশভূষার সে পারিপাট্য, চেহারার সে জৌলুশ আর নেই!

"তোর কি হয়েছে রণু? চেহারা ও রকম দেখাচ্ছে কেন?"

রণেন বলল, "আমার সর্ব্বস্ব গেছে ; বাবা, আমি আজ পথের ভিখারী!"

"তার মানে?" অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন সুশোভনবাবু।

"অনেকদিন ধরে ব্যবসাতে লোকসান যাচ্ছিল, দেনা করে চালাচ্ছিলাম, শেষ পর্য্যন্ত ব্যবসা লিকুইডেশানে গেছে।"

এক বিচিত্র অনুভূতিতে সুশোভনবাবুর মন ভরে গেল। কি সে অনুভূতি? আনন্দ? প্রতিহিংসা? ক্রোধ? অনেক রকম কথাই এই মুহূর্ত্তে ছেলেকে বলা যেত। বলা যেত,—দেখলি, বাপের অবাধ্য হওয়ার ফল? বলা যেত—লেখাপড়া না করে ব্যবসা করতে গেলি, কিন্তু ওটা যে স্টেডি নয়, দেখলি ত? বলা যেত,—বেশী লোভ করলে এই রকমই ফল হয়। কতজনকে ঠকিয়েছিস, পাপের টাকা কি থাকে?

আরও কত কি বলা যেত—কিন্তু কিছুই বললেন না। বরং সস্নেহে কাছে ডেকে বললেন, "রণু, এদিকে আয়। দুঃখ করিস নি বাবা, জীবনে উত্থান-পতন ত আছেই। ভগবানের আশীর্ব্বাদ আর নিজের পুরুষকারের জোরে উন্নতি করেছিলি, এখন লোকসান হয়েছে, আবার সব হবে। ভগবানে বিশ্বাস রেখে আবার নতুন করে আরম্ভ কর।"

—"আমার যে কিছুই নেই, বাবা, সর্ব্বস্ব গেছে।"

—"আছে, আছে। তোর আছে আত্মবিশ্বাস, ব্যবসাবুদ্ধি আর, আর—"

"আর কি, বাবা?" রুদ্ধশ্বাসে রণেন জিজ্ঞাসা করল।

ফিস ফিস করে বললেন সুশোভনবাবু, "আমার কিছু টাকা আছে। এত দুঃখেও খরচ করি নি। তোর যদি দরকার হয় মনে করে রেখে দিয়েছি। তোরা জানতিস না,—আমি বেনামীতে বই লিখতাম। তা ছাড়া গোপনে শেয়ার-কেনা-বেচা করেও কিছু টাকা উপার্জ্জন করেছিলাম। সব আছে।"

"কত টাকা বাবা?" রণেন আনন্দে প্রায় পাগলের মতন।

"তা, লাখ দু'য়েক হবে। সব তোর, সব টাকা তোকে দিলাম। এই টাকা নিয়ে আবার নতুন করে ব্যবসা আরম্ভ কর।"

বাম বাহুতে কি রকম এক তীক্ষ্ণ অনুভূতি ;—সুশোভনবাবু চোখ মেলে চাইলেন। সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেছে।

ইনজেকসানের নীডলটা বের করে নিয়ে হাতটা সন্তর্পণে মেসাজ করে দিতে দিতে মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে সুনীল বলল, "এখন কেমন বোধ করছেন, মাস্টারমশাই?"

সব যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে! চারিদিকে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকালেন সুশোভনবাবু। ঐ ত সুভাষিণী চিন্তিত, ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।—"রণু কই, রণেন? পানু? কোথায় গেল সব?"

বুকের উপর স্টেথস্কোপটা ধরে সুনীল বলল, "ওরা ত কেউ আসে নি, মাস্টারমশাই। হঠাৎ জ্বরের ঘোরে আপনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন, দুর্ব্বল শরীর ত! হাতটা একটু বাড়িয়ে দিন, হয়েছে। ব্লাডপ্রেসারটা একবার দেখি।

সুভাষিণীর দিকে তাকিয়ে সুনীল বলল, "এই এক ধরনের ইনফ্লুয়েঞ্জা আজকাল খুব হচ্ছে, মাসীমা। হঠাৎ জ্বর ওঠে খুব, আর সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান। তবু ভাল যে,

ঠিক সময় খবর দিতে পেরেছিলেন।" গলার স্বর নীচু করে সুনীল আবার বলল, "কিন্তু এভাবে কি করে চলবে, মাসীমা? মাষ্টারমশাই অচল, আপনিও বুড়ো হয়েছেন! বাড়ীতে আর লোক নেই! ধরুন গভীর রাত্রে যদি ডাক্তার দরকার হয়, কে খবর দেবে?"

সুভাষিণী মৃদু স্বরে বললেন, "তোমরা আমার অনেক ছেলে আছ বাবা, আমার ভাবনা কি?"

"মাষ্টারমশাই", সুনীল বলল, "চলুন, ঘরে শুইয়ে দিই। আপনি রণেনের কথা কি বলছিলেন না?"

অদ্ভুত ভাবে বললেন সুশোভনবাবু, "সব বৃথা, সব বৃথা সুনীল, আমি সারা জীবন কোনো আদর্শের পিছনে ছুটি নি, কোনো সংযম, কোনো সাধনা আমার ছিল না। শুধু ভণ্ডামি করেছি। তারই প্রতিফলন দেখছিলাম অজ্ঞান অবস্থায়। দেখছিলাম, আমি দু'লাখ টাকার মালিক, আর রণেন সর্ব্বস্বান্ত!"

সুনীল ডাক্তার, মোটামুটি বুঝে নিল। বলল, "মন বড় জটিল বস্তু, মাষ্টারমশাই, আপনি ত জানেনই। কিন্তু এখন ওসব কথা থাক। বেশ জর রয়েছে, তাই মাথাটাও আপনার দুর্ব্বল আর উত্তপ্ত। আজ ঘুমোন। আমি একটা ঘুমের ওষুধ দিয়ে যাচ্ছি।" সুভাষিণীর দিকে ফিরে বলল, "ওষুধগুলো ঠিক সময়ে খাওয়াবেন, মাসীমা, আর দরকার হলেই আমাকে ডাকবেন। আমি কাল সকালে আবার আসব।"

সুনীল চ'লে গেল।

সুশোভন ধীরে ধীরে ডাকলেন, "বড় বউ—"

সুভাষিণী বললেন, "আমি এখানেই আছি। তুমি এই গরম দুধটুকু খেয়ে নিয়ে ঘুমাও।"

"বড় বউ", সুশোভন বললেন, "বড় দেরীতে বুঝলাম যে, আমার ঘরে আমি নিজ হাতেই আগুন দিয়েছি। তাতে তুমি পুড়ে মরেছ, রণু পালিয়ে বেঁচেছে, আর আমি জলছি। আর নয়। চল, আমরা রণুর কাছে গিয়েই থাকিগে। কালই ওকে লিখে দাও।"

ওঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে সুভাষিণী বললেন, "রণুকে আসতে লিখে দি, অনেকদিন দেখি নি ওকে। কিন্তু আর ওখানে গিয়ে থাকা চলে না। তুমি মনে কোনো ক্ষোভ রেখো না। এখন একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর।"

চমকে স্ত্রীর দিকে তাকালেন সুশোভনবাবু। তার পর ধীরে ধীরে পাশ ফিরে শুয়ে চোখ বুঁজলেন। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মৃদু স্বরে বললেন, "আমায় মাপ কর, বড় বউ।"

—*—

ওগো নির্জন শীত

শ্রীকৃতান্তনাথ বাগচী

শীর্ণ চাঁদের কান্তে যখন শূন্য আকাশ প্রান্তে,
নীল কুয়াশার অবগুণ্ঠনে দূরগিরি এক ডাইনী,
ঘুমের নেশায় পারে নি কো ঝাউ চকিত নিমেষে জানতে
কোন চরণের শিশির শব্দ, তাই সুরে তাকে পায় নি।

ভেবেছি কেবলি হলুদ ঘাসের কপোলে জোনাকী জলবে,
মরণের হিম নিঃশ্বাস এসে কাঁটার রিক্ত কুঞ্জে
রক্তের শেষ লেখা মুছে নিয়ে অশ্রু কৌটায় গলবে,
বিদীর্ণ শোক কীর্ণ করেই করুণ কুন্দ পুঞ্জে।

তবু দেখি একি স্নিগ্ধ গভীর নীরব নিবিড় স্পর্শ
নেমেছে নিঠুর নিয়তির মত কঠিন মাটির মর্মে:
পাকা ফসলের সোনালী কেশের উচ্ছ্বাসে দুর্দ্ধর্ষ
পৌরুষ জাগে উদ্ধত জয়ে পরি রৌদ্রের বর্মে!

মহাপ্রস্থান পথ বেয়ে এলে সন্ন্যাসী পুরোহিত,
মন্দিরে উঠে ঘণ্টার ধ্বনি, দূর হৃদয়ের প্রান্তে,
পানের ফুল কি ছড়ানো শিখায়, ওগো নির্জন শীত!
গিয়েছিলে বুঝি তুষার গুহায়, গোপন মুঠিতে আনতে

জীবনের নদী ফেলেছে খসিয়ে ধূসরের নির্মোক,
তরঙ্গলীলা করেছে শিলায় শিল্প উন্মোচন,
তারায় তারায় উঠেছে জলিয়া ক্ষুধিত বাঘের চোখ,
ডেকে ডেকে ফেউ মেঘলা শ্মশানে ক্রমশঃই নিঃস্বন।

তিন সাগর

শ্রীব্রজমাধব ভট্টাচার্য

আর্টের দেশে যে কত প্রমত্ততা আছে তা দেখলাম মর্মাঁর্তে এসে। মর্মাঁর্ত পারীর প্রখ্যাত একটা গিরিচূড়া। এর ওপর গাঁ-গাঁ ভাবের একরত্তি একটু শহর আছে ঃ সেকেলে পারীর ছায়া বুকে ধরে আছে। এখানকার পুলিশও সেকেলে পুলিসের পোশাক পরে, যখন নিলোটিনে মুণ্ডু কাটা পড়ত ধরাধ্বড়্। এখানে বিখ্যাত একটি গির্জা আছে। লোকে তা দেখতে যায়। এখানে পারীর শিল্প-জগতের একটি জীবন্ত ব্যবচ্ছেদ দেখা যায়।

মর্মাঁর্ত পাহাড়। সারা পারীতে দিল্লীর মত ছোট ছোট পাহাড়ের গা থাকায় সাজাবার ভারী সুবিধা। পাথিয়ন এমনি একটি পাহাড়ের ওপর। বেসদেভাঁর গাড়ী অবলীলাভরে চলতে পারে না এমন ভিড় পথে। পাহাড়ী পথ যেমন সরু হয়, বাড়ী-ঘর-দোরও যেমন ছোটদের রূপকথার বইয়ে যেমন গ্রামের-বাড়ী ঘর-দোর আঁকা থাকে। নীচু নীচু সিলিং, নীচু নীচু দরজা, ঘুপ্চী ঘুপ্চী জানালা। অথচ গোছ-গাছ খুব। প্রাষ্টারও সব সেকেলে। পথে গাড়ী, লোক, হকার, গাইয়ে, নাচিয়ে, হাঁস-মুরগী—সবই মিশ খেয়ে গেছে। তবু গাড়ী চালাচ্ছেন বেসদেভাঁ।

"ইচ্ছে করে প্রাক্তন গ্রামের আবছায়া ধরে রাখা গেছে এখানে।" বলে গেরাঁ।

গেরাঁ হাসে।

"কিন্তু ব্যাপারটা কি বল ত? বুড়ীর এত রাগ কিসের?"

গেরাঁ বোঝাল। কোনো অদৃশ্য লোক (আপাততঃ তাকে এ ভিড়ে চেনা দুষ্কর) এই ভিড়ের মধ্যে ওর মেয়ের হাত ধরে টেনে বিনা পয়সায় কিছু স্ফুর্তির ব্যবস্থায় তৎপর ছিল। মেয়েটা সে রকম ব্যবহারকে অনিপুণ বোধ করার ফলে বুড়ীর কানে তোলে। সুতরাং বুড়ী বোঝাপড়া করার জন্য এখনই উঠে-পড়ে লেগেছে। ওর বক্তব্য যে, ওর সেই নিদারুণ কন্যকা বিনা পণে স্বয়ংবৃতা হবে এমন আশা যেন কোনও শূকরীর সন্তান না করে।

এত কোলাহল। তার পাশেই গির্জা। পারীর সুপ্রসিদ্ধ গির্জা। পারীর যে কোনো জায়গা থেকে এর চূড়া দেখা খুব বিচিত্র নয়। ৯৪ মীটার উঁচু চূড়া। এর বেলফ্রিতে ২৫ টনী টনটনানী-ঘণ্টা সেই প্রসিদ্ধ Savoyarde যা দেখতে বহু লোক আসে। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের সাধারণের চাঁদায় তৈরী এ গির্জার শুভ্রতা আর রেখার সরলতা পারিসিয়ানদের জাঁকের অঙ্গ।

গির্জার সিঁড়ির ওপর বহু ফটোগ্রাফার। টপ্ টপ্ ফটো নিচ্ছে আর বাঁ-হাত পকেটে ঢুকিয়ে একটা ঠিকানা ছাপা কার্ড বার করে দিচ্ছে। "যদি দয়া করে দোকানে হাজিরা দেন, পাবেন ছবি।"—আর যদি না দিই? গেল! শত শত বিদেশী মর্মাঁর্ত দেখতে আসছে। ক'জন কষ্ট করে ছবি সংগ্রহ করতে যাবে? কেন যাবে? যদিই-বা যায়, এতগুলো ফটোগ্রাফারের মধ্যে ক'জন যাবে, ক' ভাগ হবে, কার ভাগ্যে ক'টা খরিদ্দার জুটবে? যে পরিশ্রম আর ফিল্মের অপচয় হবে, তার কত অংশ সঞ্চয় হবে?

এই ভাবি, আর ভাবি গঁগা, ভান্-গক্, মোনে, মানে, দেগাস্, রেনোয়া, পিকারো, সীজানে—কত কত শিল্পী পারীর পথে এমনি করেই ঘুরেছে, দেখেছে, তৎকালীন পর্যটকদের চোখে উপহসিত,ব্যবহারে অবহেলিত হয়েছে। পারীর পথে না ঘুরলে বোঝা যায় না অঘোর-পন্থী বাউণ্ডুলে এই শিল্প-জগতের কালভৈরবদের। ক্ষ্যাপায় পাওয়া, নিশির ডাকে মাতোয়ারা ছেলে আর মেয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত পোশাক পরে পারীর পথে ঘোরে। ওদের চোখে জালাময় শুকনো একটা চাউনি, শরীরে হোম-কাষ্ঠের শুষ্কতা, কিন্তু মনে আগুন, ব্যবহারে স্নিগ্ধতা! পারীর কাফেতে গেরাঁর আনুকূল্যে দু'চার জনার সঙ্গে যা পরিচয় হ'ল তাতে মনে হ'ল, ঘোড়-দৌড়, ফাট্কা, বোতল আর বার-বিলসিনীর • নেশার মত এদের দুনিয়াটাও সামাজিক ব্যবস্থায় একটা নেশাই বলতে হয়। তবু এরা ধন্য! এরা একমাত্র শিল্পের যূপকাষ্ঠে অনেক সাধ-স্বপ্ন, অনেক মান-সম্মান, অনেক সুখ-সুবিধা, অনেক স্বাস্থ্য-আহার-নিদ্রা বলি দিয়েছে। বাইরে থেকে এদের যতই উচ্ছৃঙ্খল বোধ হউক, এ কথা সত্য, রক্তে যাদের নেশা নেই, মদের জ্বালা আর তেতোর ভয়ে সে যেমন ভাঁটিখানায় ঢুকবে না, তেমনি শিল্প যাদের ব্রত নয়,

তপশ্চরণ নয়, তারা শিল্পীর শ্মশানের কাপালিক-আসনে বসবে না। যে কারণে শ্মশান-ভৈরব সাধকরা পঞ্চমকার সত্ত্বেও আমার নমস্য, সেই কারণেই আর্ট-দুনিয়ার এই সব অপগ্রহেরা আমার কাছ থেকে শনি, রাহু,কেতু পূজার আরতি পায়।

ফেরার সময়ে বেসদেভাঁরা আলাদা চলে গেলেন। আমায় নিয়ে গেরাঁ মলঁ্যা-রুজে গেল রাতের জন্য টিকিট করতে। ফলি বার্জার তখন বন্ধ, বাইরে থেকে বোঝা যায় না মলঁ্যা-রুজের ভেতরের জাঁক। মলঁ্যা-রুজে একটা জিনিস প্রমাণিত হয়। উলঙ্গতা যে অসভ্যতা নয়, সেটা যেমন মলঁ্যা-রুজে বোঝা যায় তেমনি কালী-মূর্তিতে বোঝা যায়, কোনারক-খাজুরাহোতেও বোঝা যায়। তাই ফলি বার্জার আর মলঁ্যা-রুজের দেশের লোকেদের চোখেই প্রথম কোনারক, খাজুরাহো, বরভুধর, জাভার সৌন্দর্য ধরা পড়েছে। আপাদমস্তক ঢেকে রাখা ইংলণ্ডবাসীরা সে সব দেখে আঁৎকে উঠেছে। মনে রাখতে হবে ইংলণ্ডের গান, চিত্র, নাচ, মঞ্চের সাড়ে ষোল আনা মলঁ্যা-রুজের দেশের কাছ থেকে ধার। যারা অন্যের মুখে ঝাল খাওয়া শেখে তারা লঙ্কার চাষের মর্ম জানে না। বাইরে থেকে টকুটকানি আর রগরগানিতে তারা বাজী মাৎ করতে যতই ওস্তাদ হউক!

চা-ক্ষিধে পেয়েছে। সন্ধ্যার জাঁক বেড়েছে। রোববারের সন্ধ্যা। একটি কাফেতে ঢুকি। কলকাতায় এ কাফে আশা করা যায় কলেজ ষ্ট্রীটে। গেরাঁ জিজ্ঞাসা করেছিল—"ক্লাস খানাঘর না মাস্ খানাঘর। কোথায় যাবে?"

"তুমি কোথায় যাও?"

"আমার কথা ছেড়ে দাও। না ক্লাস, না মাস। আমি যাই ঘরোয়া খানাঘরে। এখানে অনেক ছোট ছোট পরিবার দোকানেই ঘর করে, ঘরেই দোকান। হয়ত গ্রোসারি, নয়ত বইয়ের দোকান, নয়ত মনোহারী, নয়ত টুকিটাকি উপহার আর স্মৃতিচিহ্নের দোকান। স্বামী-স্ত্রী, দোকান করছে। দোকানেরই পেছন দিকে খেয়ে নিচ্ছে। একটু রান্নার জায়গা আছে। তেমনি একটা জায়গার ব্যবস্থা করে নিয়েছি। খেয়ে নিই। অনেক এমনি দোকান আছে যেখানে আমি রীতিমত গ্রাহক। সেখানে গেলে আমায় পাবে, পারী পাবে না। তোমায় ত পারী দেখাতে চাই।"

"তোমার মত খাসা মন-মাফিক গাইড ইচ্ছে করলে আগা খাঁও পাবেন না। চল, তুমি যেখানে নিয়ে যাবে।"

চল তবে, মাসও নয়, ক্লাসও নয়—চৌরঙ্গীও নয়, ডায়মণ্ডহারবারও নয়, কলেজ-স্কোয়ারে চল—যেখানে কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী, বে-ইস্তজামী, বে-অকল্, বে-অদব্, বে-কার পারীকে পাবে, কিন্তু বে-ইমান্ বে-অকুফ, নয়। যেখানে বুড়োরা গিয়ে বোধ করে যৌবন, আর তরুণ-তরুণী আয়ত্ত করতে চায় বয়স্কদের লা-পরোয়াই।"

সত্যিই তেমনিই খোসবয় বইছে এ রঙ্গমঞ্চের পর্দায় পর্দায়। সুবৃহৎ একটা মুরগী আঁকা কাচে। হলের ভিড় গড়িয়ে পড়েছে ফুটপাতের কানা পর্যন্ত। আলোয় আলোয় ছয়লাপ। সারস পক্ষীর মত ঘাড় উঁচিয়ে নিজের জন্য জায়গা খোঁজে গেরাঁ। কোনও সভ্য-বক বাট্‌লার-স্যুট পরে নোটবুক আর পেন্সিল নিয়ে দাঁড়াচ্ছে না পাশে এসে—বলছে না—"আসুন মঁসিয়ে, বসুন।" ফেরার-দুনিয়া, ফেরার-সময়, ফেরার-জীবনের ছন্দ এটা। খোঁজ পাও। Seek seek and ever seek।

দূরে টেবিল পেয়ে কোন রকমে কনুইবাজী করে পৌঁছান গেল। সুন্দরী দুটি তরুণী কাউণ্টারে চোখে কানে মুখে নাকে কাজ করে যাচ্ছে, অদ্ভুত ক্ষিপ্রকারিতার সঙ্গে। জিনিস দিচ্ছে, পয়সা নিচ্ছে, ভাঙানি ফেরৎ দিচ্ছে। ওরই ফাঁকে ফাঁকে গ্রাহকের মনে ছিটিয়ে দিচ্ছে নিজের অপরিমিত তারুণ্যের বাসন্তী রঙের আমেজ। একটি কোণে বসেছে একটি আধ-বুড়ো মাতাল। তার হাতে ব্যাঞ্জো। আধা-চীনা আধা-য়োরোপের ধাঁচ। হাল্কা একটি মেলডী বাজাচ্ছে অনেকটা পিলু বারোঁয়া। তার কাছাকাছি টেবিল-চেয়ার জড়ো করে একটা গোল মত জায়গায় তিন জোড়া অল্পবয়সী নাচছে। কোনো সময়ে বাজিয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল নীচে। চার ধার থেকে জলপ্রপাতের মত হাসি ঝরে পড়তে লাগল বিশাল কল্লোলধ্বনি তুলে। যেই বাজিয়ে আবার তার উঁচু টুলে আসন নিল, চার ধার থেকে গেলাস উঠল উঁচু উঁচু হাতের মুঠোয়। জয়ধ্বনি করা হ'ল অ-ভঙ্গুর সেই বাজিয়ে বৃদ্ধের নামে। এবার চলল একটি কাটা কাটা কিন্তু করুণ সুর, বিভাস কি রামকেলির সমকালীন ও সমবয়সীও, কেবল লয়টা দ্রুত।

গেরাঁর সঙ্গে চোখে চোখে মিঠে পাখীপনা চলে ভেতরের তৃতীয় মেয়েটির সঙ্গে। সে-ই সামনে একটি সাদা এপ্রন্ বেঁধে ভেতর-বার ছুটাছুটি করছে। কাগজে টুকে নিচ্ছে কি চাই, এঁটো বাসন সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিয়ে গেলাস বোতল রেখে যাচ্ছে। পান্ চলুক, ও আসছে খাবার নিয়ে।

"চেনো নাকি?"

"ওরা তিন বোন—মা ভেতরে বাসন ধুচ্ছে। বাপ রাঁধছে। মেয়েরা বিকিকিনি করছে। অল্প দিন হ'ল একটি মেয়ে বিয়ে করেছে ফায়ার ব্রিগেডের এক অফিসারকে। আজ রবিবার। কাজের ভিড়। মাঝে মাঝে ভিড়ের দিনে এসে সাহায্য করে দেয়। ঐ যে যুবকটিকে দেখছ জিনিসপত্র বেচছে, ওই হ'ল ওর স্বামী।"

"বল কি, অফিসার হোটেলে কাজ করছে।"

"ক্ষতি কি? কাজ না করার চেয়ে ত ঢের সম্মানজনক। তা ছাড়া অফিসার বলে কি দিনরাতই অফিসার? আসল মানুষটি তবে কোথায় যাবে? শুধু কাজ করছে তাই নয়। শ্বশুরের কাজ করছে। শ্বশুর ওকে আধাদিনের মজুরী অবধি গুণে দেবে; মেয়েকেও।"

"বল কি?"

"জান না বাঙালীবাবু, এতে মন কত পরিষ্কার থাকে। টাকাকে তোমরা ময়লা বল, ছাই বল। ঠিকই বল। কেবল ময়লা আর ছাই বলে ফেলে রাখ, বাতিল কর জীবন থেকে। কাজেই আমরা গিয়ে কুড়োতে থাকি। আমরা ঐ ছাই-পাঁশ দিয়ে মন মাজি। ছাই দিয়ে মাজলে বাসন চকচক করে জান ত! পয়সা ব্যবহার করলে মনটি তাজাও থাকে, চকচকেও থাকে। এতে এদের ব্যবসা বাড়ছে, লোকে খুসী হচ্ছে এবং ওরাও খুসীতে আছে। নেহাৎ অসুবিধা না হলে ওরা এই কাজে সাহায্য করতে পেছ-পাও হবে না। জান, প্রেম আরম্ভ হয় উপবাস করে, বাড়ে রান্না ঘরে, মরে প্রসূতি আগারে। তেমনি ভাল সম্পর্ক ব্যবহারে জন্মায়, লেন-দেনের সম্ভ্রমে আর সরলতায় বাড়তে থাকে, আর উদাসীনতায় বা বেশী অন্তরঙ্গতায় ভ্যাবাচাকা খেয়ে ভিরমি যায়। টাকা না চেনো বৈদান্তিক, টাকার ব্যবহারকে চেনো। ইংরিজী জানি না আমি, কিন্তু ইংরেজকে জানি। তেমনি আর কি?"

"লম্বা বক্তৃতা দিয়ে ফেললে। বেশী জ্ঞান নাকি এ মেয়েদের?"

"পারীতে আমরা কোন মেয়েকেই বেশী জানতে চাই না। যে পর্যন্ত জানা থাকলে বেশী জানার পর্যায়ে পড়া যায় না সেই পর্যন্তই জানি। মেয়েদের বেশী জানতে নেই বাতাশারিয়া। মেয়েদের মানুষ বলে বেশী জান আর মেয়ে বলে প্রয়োজন অবধি জান, তার বেশী নয়। মেজ মেয়েটি ভালো। কথা বললে বোঝে। ব্যবস্থা করলে মানে।"

খাবার এসে পড়া উচিত!

"দেরী হচ্ছে না খাবারের, না এমনি দেরী হয়?"

"তোমার খিদে পেয়েছে নাকি? এ সব কাফেতে লোকে বসতেই আসে। খেতে নয়। অনেক কাফে আছে যেখানে সব ব্যাপারটাই এত দ্রুত যে ঢুকলে পর বেরুতে তুমি পথ পাবে না। সেখানে গতিই মূলমন্ত্র। এখানে স্থিতি। লোকে এখানে দেখতে, কথা কইতে—"

"আর ব্যবস্থা করতে আসে।"—আমি যোগ করি।

রাঙা রগরগে হয়ে ওঠে গেরাঁর মুখ। "হ্যাঁ ব্যবস্থা করতেও আসে। করব ব্যবস্থা?"

দু'জনাই হাসি।

"কিন্তু যদি জানতে বাতাশারিয়া, কত লক্ষ্মী এই পরিবারটি! যুদ্ধের সময়ে ওর বাপের একটি পা গেছে, ওর মাকে তিন মাস কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে থাকতে হয়েছে—সেই ভীষণ দিনে এই মেয়েরা পারীর মেট্রোর পাথরে ঘুমিয়েছে। এখন ওরা জীবনের মূল্য অন্য অঙ্ক দিয়ে বোঝে। বুঝবে না, বুঝবে না। যুদ্ধ তোমাদের কাছে ইনফ্লেশন, ঘাটতি আর অব্যবস্থা। আমাদের কাছে যুদ্ধ আতঙ্ক, ভয়, সংসার নাশ, প্রেম, মায়া, মমতা, পরিবার সব ধ্বংস করা এক নিষ্ঠুর ব্যবস্থা।"

"তবু ত তোমরাই ত যুদ্ধ চেয়েছ। পঞ্চাশ বছরে পাঁচবার। ইউরোপে হলেই তোমাদের আপত্তি; কিন্তু আবিসিনিয়া, কোরিয়া, ইন্দোচায়নায় হলে তোমাদের পক্ষে তা ব্যবসা, সমৃদ্ধি।"

"আমাদের নয়। কয়েকটি ফরাসী ইংরেজ আমেরিকান পরিবারের। আমি তুমিই বাতাশারিয়া। এই কাফে দিল্লীর কফি-হাউস, এই মেয়েকটি আর কেউ নয়, মুকুল, মিনতি আর মীরা। দুনিয়ায় যুদ্ধ যারা করে তারা সবাই যেমন এক, যুদ্ধে যারা মরে তারাও তেমনি এক। ডেমোক্রাসী হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধ করনেওয়ালা ব্যুরোক্রাসী আর ফিনান্সিয়র্সরাই সাধারণ মেজরিটির গলাটিপে ধরে আছে। নিষ্কৃতি নেই বাতাশারিয়া। বন্দর থেকে বন্দরে যাবার ফাঁকে লস্কররা যেমন দু'দিনের নিমিত্ত ফুর্তিতে আত্মহত্যা করে, য়োরোপের মানুষগুলোর পাঁজরায় সত্যধর্ম এখন এমন শিথিল হয়ে পড়েছে যে, আমরাও ঐ লস্করী নীতিতে দু'দিনের ফুর্তিতে আত্মহত্যা করছি। বাতাশারিয়া যে ফ্রান্স তোমার স্বপ্নের সে ফ্রান্স মরে গেছে। যা আছে তাই দেখ। হেসো না।"

আমি অভিভূত হয়ে বলি, "সে ফ্রান্স যদি মরত তোমার কণ্ঠে তার আওয়াজ শুনতাম না। ফ্রান্স অমর—আবার জাগবে ফ্রান্স। আমি বিশ্বাস করি।"

"থ্রী চীয়ার্স ফর দি প্রফেটিক্ ঈষ্ট !!"

হঠাৎ জোর চিৎকারে চমকে গেলাম।

পিছনে বসে ছিলো তিন-চারটি ছেলেমেয়েতে। ওর মধ্যে একজন আফ্রিকান মেয়ে ও একটি আফ্রিকান ছেলে। ফরাসীদের একজন ইংরাজী জানতো। সাংবাদিক। আমেরিকান একটি সংবাদ-প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। আমার কথা শুনে স্যাম্পেনের গেলাস তুলে চিৎকার করেছে।

"অনেকক্ষণ ধরে আপনাদের কথা শুনছিলাম। মাপ করবেন। আপনাদের সম্পর্কও ধরতে পেরেছি। সত্যি, আপনি বিশ্বাস করেন ফ্রান্স জাগবে?"

"নিজের মধ্যে ফ্রান্স নিজেকে চেনে। এটাই ফ্রান্সের জীয়নকাঠি। যেই ফ্রান্স ইংরেজদের মতো পরনির্ভর হবে, মরবে।"

"বুঝলাম না।"

"বুঝবেন। ইংলণ্ড যেদিন আমেরিকার কলোনী হবার ঝাঁজ সহ্য করতে না পেরে চাড়া দিয়ে উঠবে বুঝবেন। আজ রুশে যা হচ্ছে যেদিন তার সত্যধর্ম অনুধাবন করে অনুকরণ বাদ দিয়ে অনুরণন তুলবেন, সেদিন বুঝবেন। সত্যে বিশ্বাস করা আর ধার করা মুখোস পরে প্যান্টোমাইনে মেতে থাকা এক নয়।"

গেরাঁ চঞ্চল হয়ে উঠতেই আমি বলি, "কিন্তু খাবার দিতে দেরী কেন হয় ভাই?"

ফরাসীরা কায়দা জানে। সাংবাদিক গেইয়ে—জাক্ গেইয়ে বলে—"আমি আজ বেশী পান করেছি সত্য, তবু বলবো ঈষ্ট, গ্রাণ্ড ঈষ্টের মুখ থেকে যা শুনলাম তা ভুলবো না। নিশ্চয় বলবেন না যে, আমরাও আমেরিকায় ভুগছি।"

"ইংলণ্ডে এসে ফ্রান্স তার দোসরা ভাইকে পায় তাই গলাগলি করে পকেট মারে। ফ্রান্সে এসে আমেরিকা নিজেকে খোঁজে; হারিয়ে ফেলে কিনা তাই খোঁজে। তাই আমেরিকানা ফ্রান্সের পকেটে হাত দিলেও কাঁচি শুদ্ধু দেয় নি। তবু—"

"তবু কি?"

গেরাঁ বলে—'টিকিট কেনা আছে মনে আছে তো। তুমি নেশা করো নি, ওর সঙ্গে কথায় পেরে উঠবে কেন?"

আমার ভালো লাগছিলো। পুরো ফরাসী আব-হাওয়ার মধ্যে প্রেম-সে ডুবে গেছি। কাফে, বার, মেয়ে, নাচ, ব্যাঞ্জো, আড্ডা,—পারী যেন কোলকাতা হয়ে গেছে। বালজাক, সার্ত্র, জীদের পারী; যৌবন, অবিবেকিতা, উচ্ছৃঙ্খলতার আধারে সোম্য, চিন্তঘন, মননশীল পারী।

তবু বলেছিলাম তুনিসিয়া মরক্কো আলজিরিয়ার কথা। জেনেভায় জ্যাকী ক্ষেপে উঠেছিলো তুনিসিয়ানদের মুক্তির কথায়।

ভারতের মুক্তি, ইন্দোনেশিয়ার মুক্তির কথা বলছো। ওদের সারাসেনিক বারবারিজ্‌ম ছিল না। কিন্তু যদি তুমি টুনিশিয়ান্ আলজিরিয়ানদের সভ্য বলতে চাও—"

এ ধরনের কথা শুনলেই মনে জাগে পিজারো, কোর্টেজ, আলবুকার্ক, সেসিলরোড্‌স্ প্রভৃতির কথা। একই বুলি আউরেছে ওরা সিপাহী বিদ্রোহের পরে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ভারত সম্বন্ধে যে সব বক্তৃতা হয়েছে সব, সব মনে পড়ে যায়।

বন্ধুকে চটাতে চাই নি, জ্যাকী ছেলেমানুষ, অল্পবুদ্ধি। ওর মতামতের মূল্যও কম। ওকে ছেড়ে ওর মতামতকে ধরার মতো মন তখন পাই নি।

কিন্তু এ যে গেরাঁ!

গেরাঁও বলে, "বারবারিজম্ লেট লুজ্!"

হাসি!

"হাসলে যে!" চটে যায় গেরাঁ।

"যদি চটে তুমি না গিয়ে থাকতে বুঝতে আমি তো চটিই নি, তোমারও চটার কারণ নেই। ইতিহাস তোমার অজানা নয়। ভারত স্বাধীন করার কথা যতবার উঠেছে ইংলণ্ডে যারা আপত্তি তুলেছে তাদের ভাষা তুমি আজ আওড়াতে পারতে না। বারবারিক দেশে যেওনা বাপু। স্থানত্যাগেন দুর্জ্জন:। ওদিকে কানই দিও না। নাক ঢুকিওনা। হোয়াইট্ ম্যান্—তোমার বার্ডনটা নামালে দেখবে তোমার খাওয়া-পরা সবই ঐ বার্ডনের ঝোলা থেকে বেরুচ্ছে। কিন্তু ঐ দুর্বুদ্ধিই তোমাদের আমেরিকানা।

খাবার এসে গেল। ওদিকে অন্যান্য বন্ধুরাও বিরক্ত হয়ে উঠেছে দেখে গেইয়ে বিদায় নিলো।

"অসভ্য তুনিসিয়া থেকে কি কি সুখাদ্য এসেছে দেখা যাক্—"টিপ্পনী কেটে গেরাঁ ব্যাখ্যা করতে লাগল।

"সুপটা খেয়ে দেখ, সীলারী ক্রীম সুপ গার্ণিশড উইথ স্প্যাঘেত্তী আর নুডল্‌জ্—স্রেফ ভেজিটারিয়ান্। কী যে ফ্যাসাদ ভেজিটারিয়ানদের খাওয়ানো!"

এত ভাল লাগল সুপ আরও চেয়ে নিলাম।

তার পর সামন্-ভেজে এল। ওপরে গ্রেভী ছড়ানো। সঙ্গে বীট আর অনিয়ন সিদ্ধ, টম্যাটোর টুকরো, সালাদের পাতা বেশ রাই আর তেলে মাখান, এক মাত্র ইলিশ মাছের পাতুড়ি বোধ হয় সে রান্নার ওপরে যায়।

পেট প্রায় ভরে এল। গের্আঁ ত একটা বোতল স্যাম্পেন প্রায় একাই শেষ করল।

খেতে খেতে বলি, "তিনকন্যের সরাইখানা আরব্য উপন্যাসে পড়া ছিল। জেনেভার তীরে পেয়েছিলাম—বাপ-মার সঙ্গে জোট হয়ে মাছ ভাজছে আর অতিথি সেবা করছে; এখানেও ভাগ্যে তিনকন্যে, মাছভাজা। ঝড় না ওঠে।"

"কেন, ঝড় কেন ?"

"যেমন বেধরক মিলে যাচ্ছে ট্যুনিশিয়া-আলোচনা বাতাশারিয়ার মুণ্ডপাত, স্যুপ, মাছভাজা, তিনকন্যার সরাইখানা—তাতে মনে হচ্ছে জেনেভার সন্ধ্যাভোজ যেমন ঝড়ে শেষ হয়েছিল, তেমনি এখানেও না ঝড় ওঠে।"

"কিন্তু এক জায়গায় এদের বিশেষত্ব আছে, যে জন্য এখানে এত ভিড় !"

"কি !"

"ঐ যে টুকে নিল তোমার খাদ্য—ফরমাস, তার পরে বাপের কাছে ঐ চিঠি পেশ হয়েছে; তার পর রান্না, তার পর পরিবেশন। প্রতিটি মেনু এরা আলাদা করে রেঁধে রেঁধে দেয়।—"

দেরীর কারণ বোঝা গেল।

আমি চা খাই নি, চা চাইলাম।

"চা ? আবার চা ?"

"কেন ?"

"দেখ না কেন। মাদ্‌মোজেল্ বন্ধুকে চা দিতে পার ?"

"চা ?"—মাদ্‌মোজেলের নয়ন কপালে !

"এখন চা করতে হবে, বড় ভিড় !"

গের্আঁ বললে, "চায়ের দাম এত যে, পারীতে স্যাম্পেন ছেড়ে চা খায় এক নয় ভারতের নবাব, নয় ত পাগল।"

"কফি হবে ?"

"হবে—গুঁড়ো কফি। গোলবার সময় নেই।"

বলি, "বেশ—জল দাও এক গ্লাস।"

সমস্ত ঘরের লোক হো হো করে হেসে উঠল। মাদ্‌মোজেল সবিনয়ে নিবেদন করলেন, "এখানে জল আমরা সার্ভ করি না বলে পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। একটু বিয়ার খান্—কোনো ক্ষতি হবে না।"

হাসির ঠেলায় তেষ্টা মাথায় চড়েছে তখন।

একজন রসিক বললেন কি একটা ফরাসীতে। হাসিতে হাসিতে ঘর ফাটে আর কি ! গের্আঁ আমায় নিয়ে বাইরে এসে বলল, "ফীডিং বোতলে দুধ চাইবার পরেও এই অহিংস ব্যক্তিটি আরও কিছু চাইবেন। সুতরাং ওয়েট নার্স কেউ থাক ত এগোও।"

আমিও হাসতে হাসতে এগিয়ে যাই। সেই মল্যা-রুজে গিয়ে পর পর দু' বোতল ওয়াটার মিনারালে, বা ভিচি ওয়াটার পান করে এক কাপ্ জাঁদরেল আইস্‌ক্রীম্ খেতে খেতে নাচ দেখতে লাগলাম।

সে রাতে আর শুই নি। বিছানায় ঘড়ি দেখি দুটো। উঠতে উঠতে সাতটা। আটটার মধ্যে সব কিছু শেষ করে ন'টায় ব্রুণেলের সঙ্গে দেখা করার জন্য বেরিয়ে পড়লাম।

১৮

অনেক রাতে ঘুমিয়েছি। তবু ঘুম খুব গভীর হয়েছিল। ভোরের দিকে মিষ্টি সুরে ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। জেগে দেখি যদিও গের্আঁ বিছানা ছাড়ে নি, ওপর থেকে শিস দিয়ে দিয়ে তার পাখীদের গানের সাড়া দিচ্ছে। বিশাল ঘরের এক ধারটা পুরো কাঁচে ঢাকা। সিলিং থেকে মেঝে অবধি নাইলনের সাদা পর্দা। আমি সেগুলো ঠেলে দিতেই ভোরের আলোর মাত্রাটা বেড়ে গেল।

হলদে আর ধোঁয়াটে আর সবুজ চড়ুয়ের সাইজের পাখীগুলো, পারিকীৎ, হরিওল্, ছোট্ট হামিং-বার্ড এদের পার্টি ঘরময় উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে আর শিস দিচ্ছে।

বাইরে শেষ রাতে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। ভোরের দিকটা ঠাণ্ডা হওয়া উচিত। কিন্তু বিবাগী বাতাস এ সব বাড়ীতে যাতে না ঢোকে সে ব্যবস্থা এমন নিপুণ যে ভেতরটা গরম।

আমি চান সেরে জামা-কাপড় পরতে পরতে গের্আঁ চা, টোষ্ট, ডিম নিয়ে প্রস্তুত।

আমার যাবার পথ মেট্রোতে ভাল। নিলাম ট্যাক্সি। গের্আঁকে জানালাম না।

ট্যাক্সি নিলাম লুক্সেমবুর্গ প্যালাসের বাগান থেকে। ওটুকু হেঁটে গিয়েছিলাম। লুক্সেমবুর্গ বাগানটা সকালে এক ঝলক দেখে নেব। সবটা দেখা দুঃসাধ্য। পারীর লোকেরাও সবটা ঘোরে না। ক'জন কলকাতাবাসী সারা ঈডেন গার্ডেন বা বট্যানিক্যাল গার্ডেন ঘুরেছেন ? তা ঘুরতে পারেন; আমি ত সারা এ্যালফ্রেড পার্ক একবারও ঘুরি নি যদিচ এলাহাবাদে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দশ বছর সময় কেটেছে।

লুক্সেমবুর্গ প্যালেসই বোধ হয় ফ্রান্সে ইতালীয় স্থাপত্যের সম্পূর্ণতম প্রখ্যাত সৌধ। তার কারণ এই

অট্টালিকাটি মেরী মেডিসীর জন্য তৈরী হয়। যখন তৈরী হয়—১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে দে-ব্রঁ নির্মাণ করে তোলেন এটা—তখনই এটা ফ্লরেন্সের বিখ্যাত প্রাসাদ পালাৎসে পিত্তির অনুকরণে তৈরী হয়। কারণ ফ্লরেন্সের ঐ প্রাসাদেই মেরীয়া মেডিসীর বাল্যকাল কাটে। পরে অবশ্য অনেক সংযোজন ঘটেছে। তবু অট্টালিকাটি 'সুরম্য' বলা উচিত আমার। বলতেই হবে। এ সব অট্টালিকা বাসিন্দাদের সুবিধার জন্য সব সময়ে তৈরী হয় না। যারা বাসিন্দা নয় তাদের হকচকিয়ে দেওয়ার জন্য তৈরী হয়। সেকালের রাজা-রাজড়ারা বিশ্বাস করতেন জাঁক দেখানো প্রজাদের তাঁবেতে রাখার পক্ষে একটা মারণ অস্ত্র। একালে নেহরু বাড়ী বদলে ছোট বাড়ীতে আসেন, গান্ধীজী কুটীরে থাকতে চান, রবীন্দ্রনাথ "শ্যামলী" তৈরি করান!

ট্যাক্সি লুক্সেমবুর্গের ভেতর দিয়ে পাক খেয়ে ঘুরতেই ইন্‌ভালিদসের সমাধি চোখে পড়ল। গাড়ী থামাতে বলি।

হাজার হলেও ফ্রান্সের জাতীয় স্মৃতিমন্দির এটা। কেবল ক্ষত্রিয়দের জন্য—অর্থাৎ রণবীর যে সব যোদ্ধারা ফ্রান্সের গৌরবের জন্য প্রাণ দিয়েছে তাদের জন্যই এ স্মৃতিমন্দির। তৈরী হয়েছিল ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্দশ লুঈর সময়ে। অনেক সময়ে মনে হ'ত ভারতবর্ষে ব্যক্তির কীর্তিস্তম্ভ আছে অনেক, জাতির কীর্তিস্তম্ভ নেই। কারণ ভারতবর্ষ যখন সভ্য ছিল তখন জাতীয়তাবাদের গোঁড়ামি আর বিষ ছড়ায় নি। পরে অ-সভ্যতার দিনে যখন জাতের গণ্ডি কাটা হ'ল, তখন থেকে তলোয়ার আর কোমরবন্ধ ছাড়ে নি, বন্দুক আর কাঁধ থেকে নামে নি। তাই ভারতে ধর্ম ও শীলের প্রচারে শিলালিপি ছড়িয়ে আছে দিকে দিকে, তাজমহল, ইলোরা, কোনারক, শালামার-বাগিচা আছে, কিন্তু পাঁথিয়ন, ইন্‌ভালিডস্ ওয়েষ্টমিনস্টার এ্যব্যে নেই।

থাকলে মন্দ হ'ত না। তাতে তবে আজ তাঁতিয়া তোপী, মোহনলাল, শিবাজী আর টিপুর স্মৃতি পাশাপাশি থাকত; পাশাপাশি থাকত নানক, তুলসীদাস, চণ্ডীদাস, গান্ধী, তিলক, রামমোহন। সমগ্র ভারতের একটি বাঁধা ছবি দেখা যেত। এখনও যে তা করা যায় না আমার বোধ হয় না। কেবল একজন কর্ণধারের কান থেকে প্রাণে প্রবেশ করলেই হয়।

একা একা ঘুরছি। সকালবেলা। দুটি নাতি-নাতনী নিয়ে বৃদ্ধ ঘুরছেন বাগিচায়। লক্ষ্য করে দেখছি ওদের একটা নির্দিষ্ট খেলার জায়গা আছে, নির্দিষ্ট একটা খেলার বিধি আছে। খেলাটায় একটা বল আছে ও কিঞ্চিৎ ছোট আছে। ছবিটা বেশ জোরাল। গত পারীর কাছে আগামী পারী খেলা শিখছে। অন্যধারে পাঁচ-ছ'টা খরগোশ খেলা করে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ থেমে কুড়িয়ে পাওয়া কি একটা ফল দু'হাতে ধরে ল্যাজে ভর করে বসে কুটুস কুটুস করে খাচ্ছে। লক্ষ্য করে দেখি, অনেক দূরের একটা বেঞ্চ থেকে এক তরুণী ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে আখরোটের টুকরো।

ওভাবে খরগোসগুলো এর পোষা। বাড়ীতে জায়গা থাকলেও এখানে ওরা বেশী আরামে থাকবে। রোজ ও এলেই ওরা ওকে ঘিরে খেলার মহোচ্ছব বাধিয়ে দেবে। আমি যে দেখছি, ও বুঝেছে। ইশারায় ডাকল। আমি যেতেই হঠাৎ একটা শব্দ করতেই ছ'টা কি, গোটা বার খরগোশ এসে হাজির। একটা প্লেটে খানিক চিনি রেখে নামিয়ে দিতেই ভদ্র-ব্যবস্থায় ওরা গোল হয়ে বসল। অত বড় কলাইকরা টিনের থালা—সাফ। পরে বসে বসে জেনে নিলাম ওর এই হবি, অবসর-বিনোদনের নেশা। ওর স্বামীর নৌকা চলে সাইনে। কাছেই থাকে।

এতো নাম ডাক ঈফেল টাওয়ায়ের। হাওয়াই বিজ্ঞাপনে ওর মাথা-চাড়া দেওয়া অতো খ্যাতির মানে বুঝি। পারীর তিন-চারটে হাওয়াই আড্ডা থেকে প্লেনের অনবরত নামা-ওঠা ব্যাপারে এই এক কল্কি অবতার শূল উঁচিয়ে রেখেছে। সম্মান না দেখালে খুঁচিয়ে পেড়ে ফেলবে। কিন্তু তাল তাল ইস্পাতের এই আবর্জনার স্তূপকে কেন যে পারী তার সুন্দর বুকে ধরে রেখেছে বুঝতে পারি না। টাওয়ার অব পীসায় এঞ্জিনীয়ারিং ওস্তাদীর সঙ্গে সঙ্গে স্থাপত্যের শিল্পরুচি আছে; কুতব মীনারের রুচি আর কলা খুব উঁচুদরের; কিন্তু একী ব্যাঘাত, মূর্তিমান ব্যতিক্রম! তার ওপরে আমি যখন গেছি সে সময়টায় ওর সারা গায়ে দাদের ছোপের মতো চাবড়া চাবড়া জং, মরচে-পড়া দাগ! এমন সুন্দর সকালটা স্রেফ স্পর্দ্ধার কুশ্রীতায় যেতে যেতে দিলাম না।

Palais de Chaillot-এ গিয়ে গাড়ীটা ছেড়ে দিলাম। পয়সা দিলাম একটা পুলিসের মারফৎ। মনে হয় ঠগতে হয়নি। খ্যাঁকশিয়ালকে দেখি; আসলে ও ভিজেবেড়াল।

Palais de Chaillot-এর জমিতে ছিল বিখ্যাত Trocadero। কিন্তু পারীর সৌন্দর্যবোধ বড় প্রখর। Trocaderoর শিল্প নিয়ে নানা কথার সৃষ্টি হবার ফলে সেই ইমারত ভেঙ্গে তৈরি হোলো ১৯৩৬ এ এই Palais de Chaillot। এর দু'ধারে দুই ভুজ, মাঝখানে প্রশস্ত

দালানের মতো বাঁধানো জায়গার দু'পাশে অতিকায় সব মূর্তি গড়া আছে, প্রত্যেকটা প্রতিকৃতি নয় প্রতীককৃতী। Symboliom-এর নিদর্শন। হঠাৎ এর বলিষ্ঠতা, মৌলিকতা আর পৌরুষ দেখলে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর শিল্পের কথা তো মনে পরে যায়ই, যাঁরা জানেন, মানুষটিও মনে পড়ে যায়। বিশাল চত্বর। ঐ দূরে সাইন বয়ে যাচ্ছে। সকাল ঝলমল করছে। এই চত্বরের তলায় বিশাল এক প্রেক্ষাগৃহ, পারীর বৃহত্তম। তা ছাড়া ম্যুজিয়মে ম্যুজিয়মে ছয়লাপ এই ইমারত। মুজিয়ম অব নেভী, ম্যুজিয়ম অব পাব্লিক মনুমেণ্টস্, কিন্তু সব চেয়ে চমকপ্রদ, সুন্দর ম্যুজিয়ম অব ম্যান্।

ওদিকে সময় হয়ে গেছে শ্রীমান ব্রুণেলের কাছে যাবার। পথটা পার হয়ে একটু চলতেই ব্রুণেলের বাড়ী পেয়ে গেলাম।

আজ মাদাম বড়ো খুশী। "আপনার সঙ্গে উনি engagement করেছেন জানলে আমি বাইরে যাওয়ার programme তখনই বাতিল করে দিতাম। ...তা ছাড়া যোগবাশিষ্ঠের ব্যাপারে আমরাও যে যথেষ্ট......" ইত্যাদি মামুলি আমড়াগাছি।

আজ কফি, কেক সাত সতেরো; আজ ঠোঁটে হাসি, দেহে দোল, চোখে চমক—পুরোপুরি পালিশী আদব-কায়দা যা দেখে আমাদের দেশের খোকারা খুশীতে একেবারে হুরীর দেশের আলাদীন হয়ে ওঠেন।

"পারী কেমন লাগছে?"

"চমৎকার! যা শুনেছিলাম সেটাই অল্প। যা দেখলাম তাও অল্পতর। যা দেখি নি তার গৌরব আর সৌন্দর্যই মনে থাকবে চিরকাল।"

ব্রুণেল বলে—"পারীর ওপর এ বোধ হয় চিরদিনের comment। তোমার পারী দেখা সার্থক কারণ দেখার স্পিরিট আছে তোমার।"

"তাইতো, দেখা না দেখা সমান আমার কাছে। যতো দেখছি সব মনে হচ্ছে যেন চেনা চেনা। কিছুই আমায় অবাক করে দিচ্ছে না। কেবল একটা ব্যাপার ছাড়া।"

মিসেস ব্রুণেল চেরী খেতে খেতে বলেন—"কি?"

"মনে হয় না পারীর ওপর দিয়ে কোনো বিশাল একটি যুদ্ধের ঝড় বয়ে গেছে।"

ব্রুণেলের গলা ভারী হয়ে ওঠে, বলে—"সে ঝড় পারীর মস্তিষ্কে, হৃদয়ে আর আণ্ডারগ্রাউণ্ড বিদ্রোহ। পারীর যুবা শুম্‌খুন হয়েছে; পারীর বিদ্রোহ মাটির তলায় তলায় সুড়ঙ্গ কেটেছে।"

ব্রুণেলের ঘরখানা বড়ো। আগাগোড়া ঘরটায় পণ্ডিতি ঠাসা। বই, টেবিল, খাতাপত্র, নানারকম লেখা-পড়ার সরঞ্জাম মেঝেয়; মেজে, চেয়ারে, আলমারীতে কেবল বই, বই, বই। দ্যালে মুঘল রাজপুত, কাংড়ার ছবি, অজন্তার প্রতিচিত্র, ভুবনেশ্বর, এলোরা, কোনারকের ভাস্কর্যের ছবি। এক কোণে শাদা রংয়ের মূর্তি—বুদ্ধ। তলায় কালো বার্মিজ এবনীর পাত্রে ধূপ পুড়ছে। আশ্চর্য আশ্চর্য সব পুরোনো পুঁথি, পুরোনো ছবি, পুরোনো শাল দেখাল। একখানা শাল দেখাল ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দের; একখানা ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দের। গোল কাঠের রোলারে অতিযত্নে পাকিয়ে রেখেছে। কাশ্মীরী আর মির্জাপুরী কার্পেট হাতীর দাঁতের আর চন্দনের কাজ—মৈসুর এবং জয়পুরের কাশী ও মথুরার পিতলের কাজ—এক এক করে মাদাম এনে এনে দেখালেন।

হঠাৎ ও ছ'ক্লাসের ছেলের মতো লাফ্‌ মেরে উঠে হাতব্যাগটা থপ্‌ করে আঁকড়ে ধরে, অন্যহাতে দোমড়ানো টুপীটা নিয়ে লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে একেবারে দৌড় লাগালো—"আঁ রিভোয়া মঁসিয়ে বাতাশারিয়া, দেরী করে ফেলেছি। ডাক্তারের সঙ্গে এপয়েণ্টমেণ্ট—" খট্‌ করে দরজা খুললো, দুম্‌ করে শব্দ হ'লো। ব্রুণেল হাওয়া।

শ্রীমতী ব্রুণেল হাসতে হাসতে বলেন—" ওর ডেণ্টিষ্টের সঙ্গে এপয়েণ্টমেণ্ট্। অথচ তোমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে দেরী হয়ে গেছে। আবার কখন আসছো?"

'আবার কখন আসছো' মানে "আপাতত যাও।"

আমি বলি—"আবার যখন পারীতে আসবো।"

"কেন যাচ্ছ কবে?"

"যেকোনো সময়ে। আজই হয়তো।"

"সে কি! কেন?"

কেন থাকা চলবে না জানিয়ে ওদের চায়ের জন্য খুব ধন্যবাদ নিবেদন করে ফিরতি পথে আবার ঘুরতে ঘুরতে চলি। সোমবার দিনের বেলা ঝক্‌ঝক্‌ করছে শহর। লোকজনে ভর্তি পথঘাট। শহর, শহর—সেই গতি, বেগ, ক্ষিপ্রতা, তরঙ্গ, কেবল নেই কোলাহল, ধুলা, ধোঁয়া। সেই পথের ধারে ফেরিওলা জুতার পালিশ, বোতাম আর কাঁচি বিক্রী করছে, পালিশ করে দেবে বলে ছোট ছেলের দল বসে আছে। পার্কে অনাবশ্যক বুড়া বেঞ্চে বসে হাঁফাচ্ছে; বালতি ভরে নোংরা নিয়ে শক্ত-দেহ নারী চলেছে ডাষ্টবিনে ফেলতে; দোকানে সাজান টম্যাটো, আলু, ফালি করা কুমড়ো, ঢ্যাড়শ, পেঁয়াজ।

প্রতি ডালার গায়ে পোঁতা কাঠির গায়ের কাগজে দাম লেখা। কিসে কথা কম বলতে হয়, কি হলে বাণিজ্যের রফায় ক্ষিপ্রতা বাড়ে—তারই চেষ্টা।

আমায় তখন পথের নেশায় পেয়েছে, কেবল হাঁটতে ভালো লাগছে। একটা জিনিস চোখে খুব ভালো লাগছে—পারীতে আফ্রিকানদের সংখ্যার আধিক্য। আফ্রিকার অনেকটা যে ফরাসীদের হাতে তা সত্য। কিন্তু অধিকৃত ও শাসিত জাতির সঙ্গে এমন দহরম-মহরম ত ইংরেজ-জর্জরিত ভারতবর্ষে দেখি নি!

ছবি সংগ্রহ করে প্রেসে ফিরে এলাম। গেরাঁ আমার অপেক্ষা করছে।

"মন ভারী কেন?" জিজ্ঞাসা করি।

"কি জানি কেন? আমিও জিজ্ঞাসা করছিলাম।"

"চিনতে পার এটা?" দেরাজ খুলে বার করে ম্লান জ্যোতি একটি রাখী। "তোমার বৌ বেঁধেছিল রাখী-বন্ধনের দিন। ভাই কোঁটায় খাইয়েছিল শুক্ত, চচ্চড়ি, ঘি-ভাত আর পোস্তোর বড়া। একটি রুমাল দিয়েছিল। —আজও আছে। ভারতবর্ষে আবার যেতে ইচ্ছা করে।"

আমার যাবার দিন আজ। গেরাঁকে তাই পেয়েছে বিষাদে। "ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ" বলার শব্দ ভিজে গলা দিয়ে বেরুতে চায় না।

আমি খুব খুসী মনে পারী থেকে এসেছিলাম। যখন গেরাঁ আমায় এয়ারবেসে ছেড়ে দিল তখন ওকে বলেই ফেললাম—"বাসনা নিয়ে গেলাম যাতে আবার আসতে পারি।"

"এস। এবার মিসেস্ বাতাশারিয়াকে নিয়ে এস। আর তপতীকে। কত ছোট দেখে এসেছিলাম।"

ওর বড় বড় চোখ দুটি ছল ছল করে ওঠে।

ও সত্যি আমায় ভালবাসত।

আমি লণ্ডনে প্লেনে চড়েছি তখন।

লণ্ডন পৌঁছাব রাত ন'টায়।

সন্ধ্যার পারী ঝলমল করছে। সমুদ্র টলটল করছে। হস্টেস্ খানা নিয়ে এল। ডিনার। ক্রমশঃ

—*—

অসুখ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

অসুখ বলি যাকে, মনের দেখাকে,
নূতন করে সেই তো গড়ে আমাকে।
অসুখেও দেখছি কিছু সুখ আছে—
সুদূর-স্মৃতির শক্তি আমার বাড়িয়েছে।
ক্লিষ্ট দেহ মনকে করে বলিষ্ঠ—
আপন জনে আরও অধিক ঘনিষ্ঠ।
আবার ঘরায় দেশ বিদেশের বান্ধবে—
ভুলে যাওয়া প্রিয় পরিজন সবে।
মনে পড়ায় এই জীবনের সেই উষা—
স্নেহ মায়া, আদর সোহাগ, শুশ্রূষা।

মনে মনে তীর্থ ভ্রমণ করছি গো—
চলিয়াছি সব দেবতায় অর্ঘি গো।
পাই যে ফিরে পরিক্রমার দিনগুলি—
মনের বনে আবার পূজার ফুল তুলি।
নানান রূপে ভগবানই আসেন যান—
জীবন ধরে পাচ্ছি শুধু তার প্রমাণ।
মাতা পিতা হয়ে করেন পালন রে—
নিত্য নূতন দেব দেবীতে ঘর ভরে।
দুঃখ ও সুখ শত্রু মিত্রে ভেদ তো নাই—
অভিনয় যে করছে চেনা এক জনাই।

রামানুজমতে "মোক্ষ"

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

রামানুজের মতে, মোক্ষ বা মুক্তি জীবের প্রকৃত স্বরূপ বা জীবত্বের বিনাশ নয়, উপরন্তু পূর্ণতম বিকাশ, মুক্তি কেবল জীবের ক্ষুদ্র 'আমিত্ব' বা 'অহং মম' ভাবেরই ধ্বংসসূচক, জীবসত্তার নয়। সেজন্য মোক্ষকালেও জীবন ব্রহ্মের সঙ্গে সম্পূর্ণ অভিন্ন হয় না, ভিন্নাভিন্নই থাকে। বদ্ধাবস্থায় জীবের স্বরূপ ও গুণ পূর্ণ প্রকাশিত হতে পারে না। কারণ, আপাতদৃষ্টিতে দেহমন-সংযুক্ত জীব অজ্ঞানবশতঃ স্বীয় প্রকৃত স্বরূপোপলব্ধিতে অসমর্থ হয়ে, জড় দেহমনের ধর্ম অজড় চিৎস্বরূপ আত্মায় আরোপ করে, এবং ফলে নিজেকে অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তি, এবং দেহমনের ধর্ম : জন্মমৃত্যু, হ্রাসবৃদ্ধি, ক্ষয়-পরিণাম, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, সুখদুঃখ প্রভৃতির অধীন বলে গ্রহণপূর্বক অশেষ দুঃখভাগী হয়। পুনরায়, জীব অজ্ঞানবশতঃ, নিজেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র, এবং ব্রহ্ম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বলে মনে করে ; ক্ষুদ্র 'আমিত্বে'র গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে সকাম-কর্মে প্রবৃত্ত হয়, এবং তারই অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ পুনঃ পুনঃ জন্ম-জন্মান্তরভাগী হয়ে, সংসারচক্রে অনন্তকাল বিঘূর্ণিত হয়। মোক্ষ জীবের এরূপ ক্ষুদ্র 'আমিত্বে'র, বিনাশ, কিন্তু তার প্রকৃত 'জীবত্বে'র বিকাশ।

জীবত্বের বিকাশ অর্থ জীবের প্রকৃত স্বরূপ ও গুণের পূর্ণ, নির্বাধ প্রকাশ ও চরমোৎকর্ষ। স্বরূপের দিক থেকে, জীব প্রকৃতপক্ষে, সচ্চিদানন্দস্বরূপ। কিন্তু বদ্ধাবস্থায় সাংসারিক জীবনকালে, জীব নিজের এই সৎস্বরূপ, নিত্য রূপটি উপলব্ধি না করে, নিজেকে অনিত্য, বা জন্মমৃত্যু-ভাগী মনে করে ; নিজের এই চিৎস্বরূপ উপলব্ধি না করে নিজেকে জড় দেহমনের সঙ্গে একীভূত মনে করে, এবং নিজের এই আনন্দস্বরূপ উপলব্ধি না করে,নিজেকে পার্থিব শোক-ক্লেশাধীন মনে করে। একমাত্র মোক্ষকালেই জীব নিজের প্রকৃত, শাশ্বত, জন্ম-বৃদ্ধি-জরা-মরণ-বিহীন, বিজ্ঞানঘন, আনন্দময় রূপটি পূর্ণ অনুভব করে ধন্য হয়। গুণের দিক্ থেকে, রামানুজমতে, জ্ঞাতৃত্ব, কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, অণুত্ব ও বহুত্ব জীবের স্বাভাবিক ধর্ম বলে', মুক্তিকালেও এই ধর্মগুলি অনুস্যূত থাকে—কেবল তাই নয়, সেই সময়ে, এদের পরিপূর্ণ রূপটিও জীব উপলব্ধি করে। বদ্ধজীবও জ্ঞাতা, কিন্তু অল্পজ্ঞ ; কর্তা, কিন্তু অল্পশক্তি ; ভোক্তা, কিন্তু দুঃখী। একমাত্র মুক্ত জীবই জ্ঞাতা ও সর্বজ্ঞ ; কর্তা ও সর্বশক্তিমান ; ভোক্তা ও পরিপূর্ণ আনন্দময়।

এই ভাবে, আত্মস্বরূপোপলব্ধি করে, জীব ব্রহ্ম-স্বরূপোপলব্ধি করে। 'ব্রহ্মস্বরূপোপলব্ধির', অর্থ, ব্রহ্মসাদৃশ্যোপলব্ধি। স্বীয় স্বরূপ ও গুণের পূর্ণতম, প্রকৃষ্টতম বিকাশ প্রত্যক্ষ অনুভব করে' জীব ব্রহ্মেরই ন্যায় সচ্চিদানন্দস্বরূপ, এবং ব্রহ্মের সমস্ত গুণভাগী রূপটি প্রত্যক্ষোপলব্ধি করে। কেবল দু'টি বিষয়ে সে ব্রহ্ম থেকে ভিন্নই থাকে। প্রথমতঃ, ব্রহ্ম বিভু, মুক্তজীবও অণু। কারণ, পূর্বেই বলা হয়েছে যে, অণুত্ব জীবের স্বাভাবিক ধর্ম বলে, বন্ধ-মুক্তি-নির্বিশেষে জীব সর্বদাই অণুপরিমাণ। দ্বিতীয়তঃ, ব্রহ্ম সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তা, জীব অন্যান্য বিষয়ে ব্রহ্মের ন্যায় সর্বশক্তিমান্ হলেও, এই দিকে সে শক্তিহীন। এই দুই দিক্ ব্যতীত, অন্যান্য সকল দিক্ থেকেই মুক্তজীব ব্রহ্মসদৃশ ও ব্রহ্মতুল্য।

সুতরাং, পূর্বেই যা বলা হয়েছে, মুক্তজীবও ব্রহ্মভিন্ন, ব্রহ্মাশ্রিত ও ব্রহ্মশাসিত। সকল জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দের আকর হয়েও সে ব্রহ্মের চিরদাস ও চিরসেবক।

অদ্বৈতমতের বিরুদ্ধে, রামানুজ বারংবার মুক্তজীবের ব্রহ্মভিন্নতা প্রমাণে প্রয়াসী হয়েছেন। যেমন শ্রীভাষ্যের ১-১-১ সূত্রে তিনি বলছেন—

"মুক্তস্য স্বরূপমাহ। তদ্ভাবঃ ব্রহ্মণো ভাবঃ,
স্বভাবঃ, ন তু স্বরূপৈক্যম্"। (পৃঃ ১৬৬)

অর্থাৎ, মুক্তজীব ব্রহ্মের ভাব বা স্বভাব, অর্থাৎ ব্রহ্মসাদৃশ্য উপলব্ধি করে, ব্রহ্মস্বরূপৈক্য নয়।

এ স্থলে রামানুজ "স্বভাব" ও "স্বরূপ" এই দুটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। সাধারণ অর্থে, এ দুটিকে সমার্থক বলে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি "স্বভাব" অর্থে সাদৃশ্য বা ভিন্নাভিন্নত্ব, এবং "স্বরূপ" অর্থে অভিন্নত্ব গ্রহণ করেছেন ; এবং সেই অর্থেই তিনি বলছেন যে, মুক্তজীব "ব্রহ্মস্বভাব" বা ব্রহ্মসদৃশ, কিন্তু "ব্রহ্মস্বরূপ" বা ব্রহ্মাভিন্ন নয়। সেজন্য এস্থলে একথা বলা হচ্ছে না যে, মুক্তজীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন। কারণ, পূর্বেই বলা হয়েছে যে, রামানুজের মতে, জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন, ধর্মতঃ ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন। সেজন্য মুক্তজীবও ব্রহ্ম

থেকে স্বরূপতঃ অভিন্ন, ধর্মতঃ ভিন্ন—অর্থাৎ সংক্ষেপে, মুক্তজীব ব্রহ্মসদৃশ।

রামানুজ বিদেহমুক্তিবাদী। তাঁর মতে, জীবের সঙ্গে জড় দেহমনের ও জড়জগতের বদ্ধাবস্থাকালীন সম্বন্ধ অজ্ঞানপ্রসূত ও তজ্জন্য সম্পূর্ণ মিথ্যা হলেও, যতদিন পর্যন্ত অন্ততঃ জীব স্বয়ং সেই বন্ধনকে সত্য বলে মনে করে, অর্থাৎ, যতদিন পর্যন্ত জীব আপাতদৃষ্টিতে দেহমন বদ্ধ, সাংসারিক জীবনযাপন করে, ততদিন পর্যন্ত তার স্বরূপ ও গুণের বাধাহীন প্রকাশ ও উপলব্ধি তার পক্ষে সম্ভব নয়। উপরন্তু, সেই অবস্থায়, দেহমনের অবস্থা, ধর্মাদিও সে স্বীয় আত্মায় আরোপ না করে পারে না। যেমন, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, জরা, বেদনাভোগ প্রভৃতি দেহমনেরই অবস্থা ও ধর্ম। সেজন্য দেহধারী জীব এই সব অবস্থা, ধর্মাদি নিজের অবস্থা ও ধর্মাদি বলেই গ্রহণ করে' নিজেকে ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, রোগগ্রস্ত, জরাগ্রস্ত, বেদনাক্লিষ্ট বলে মনে করে। এমন কি, মহাজ্ঞানী সাধকবৃন্দও এই সাংসারিক অবস্থা থেকে নিস্তার লাভ করেন না। যদিও তাঁরা জড়দেহমন ও অজড় আত্মার মধ্যে পার্থক্য অবগত আছেন, তথাপি তাঁরা দেহমনের অবস্থা, ধর্ম প্রভৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্জন করতে সমর্থ হন না, এবং দেহমনের দ্বারা অভিভূতও না হয়ে পারেন না। ফলে, এমনকি তাঁরাও ক্ষুৎপিপাসাক্লিষ্ট হন এবং বেদনাদি অনুভব করেন। সেজন্য মৃত্যুর পরই, পার্থিব দেহশৃঙ্খলমুক্ত জীব মুক্তিলাভ করে, দেহাবিশিষ্ট সংসারী জীব নয়। মুক্তিলাভের উপায় বা সাধনাবলীর যথাযথ পালনের দ্বারা সে মুক্তির অধিকারী হয়, এবং ফলে তার সমস্ত প্রাক্তন, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মের ফল নিঃশেষে বিনষ্ট হয়ে যায়; কেবল প্রারব্ধ কর্মের, বা যে কর্ম ফলপ্রদানে আরম্ভ করেছে সেই কর্মের ফল ধ্বংস হয় না, কারণ, কেবল ভোগদ্বারাই এরূপ কর্মের ফল ক্ষয়প্রাপ্ত হতে পারে। সেজন্য প্রারব্ধ কর্মের ফলস্বরূপ যে বর্তমান দেহ, সেই দেহপাতের পূর্ব পর্যন্ত তাকে সংসারে অবস্থান করতে হয়। দেহপাতের পর সে মুক্তিলাভ করে, অর্থাৎ, তার সূক্ষ্ম দেহও সেই সঙ্গে বিনষ্ট হয়ে যায়, এবং সে জন্ম-জন্মান্তর বা সংসারচক্র থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে। সুতরাং, প্রারব্ধ কর্মের ফলস্বরূপ এই দেহকে "চরমদেহ" বলা হয়। চরমদেহধারী জীবও বদ্ধজীব। অতএব, রামানুজমতে, বিদেহমুক্তিই একমাত্র মুক্তি।

"শ্রীভাষ্যে"র লঘুসিদ্ধান্তে রামানুজ অদ্বৈতবেদান্তসম্মত জীবন্মুক্তিবাদ খণ্ডন করেছেন। তিনি এস্থলে বলছেন যে, অদ্বৈতবেদান্তমতে অদ্বৈতজ্ঞানই মুক্তির সাধন। কিন্তু কার্যতঃ দেখা যায় যে, অদ্বৈতজ্ঞানোদয়ের পরেও জ্ঞানী দ্বৈতদর্শন করেন, অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে মুক্ত হন না। সুতরাং সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে, জীবন্মুক্তি অসম্ভব।

অন্যান্য বৈদান্তিকদের ন্যায়, রামানুজও বলেছেন যে, মুক্তি কেবল দুঃখাভাবই নয়, পরিপূর্ণ আনন্দঘন অবস্থা। ব্রহ্মসদৃশ মুক্তজীব ব্রহ্মেরই ন্যায় আনন্দস্বরূপ ও আনন্দময়। ৮

সবার উপরে

শ্রীসীতা দেবী

১৯

কলকাতার দক্ষিণাঞ্চলে লেক্ আর তার চারদিকের বাগান অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে। বিকাল হতে না হতেই এদিকে মহা ভিড় লেগে যায়। ছোট ছেলে-পিলে ও তাদের আয়ার দল, বৃদ্ধা ও প্রৌঢ়ার দল, যুবক-যুবতীর দল,—কার আগ্রহ যে বেশী তা বোঝা শক্ত। উত্তর দিক্‌টাতেই মানুষ বেশী, দক্ষিণ দিক্‌টাতেও যে কেউ যায় না তা নয়, তবে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে সেদিকের লোকের ভিড় খানিকটা কমে যায়।

দক্ষিণ দিকেই একটা বড় গাছের ছায়ায় বাঁধান বেদীতে বসে দুটি মানুষ কথা বলছিল।

সুমনা বলল, "দেখ, আমার কিন্তু পড়াশুনো কিছু হচ্ছে না। ছেড়ে দেব কিনা ভাবছি। ফেল যদি করি তা হলে বড় একটা লজ্জার বিষয় হবে।"

বিজয় বলল, "ছেড়ে দিয়ে কি করবে? এখন সময় কাটাবার যাও বা একটা অবলম্বন আছে, তখন তাও থাকবে না। একেবারে সারাদিন কিছু না ক'রে মানুষ বেশীদিন থাকতে পারে না, না হলে আমিই ত পারতাম এখানে এসে ব'সে থাকতে কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে।"

সুমনা বলল, "হ্যাঁ, তুমি আবার এসে ব'সে থাকবে। আমি যেরকম কষ্ট পাই দূরে থাকতে, তুমি তার অর্দ্ধেকও পাও না। তোমার চিঠিপত্র পড়েই আমি তা বুঝতে পারি।"

বিজয় বলল, "তোমার অসীম জ্ঞান। কষ্টটা কি ক'রে বোঝাতে হবে? চিঠির কাগজখানা চোখের জলে ভিজিয়ে দিয়ে?"

সুমনা বলল, "কি ক'রে জিনিসটাকে এমন হাল্কা ভাবে নাও, বুঝতেই আমি পারি না। মনে হয়, গোড়ার দিকে ঢের বেশী অস্থির হতে এখনকার চেয়ে।"

বিজয় বলল, "আমি অস্থিরতা যদি বেশী দেখাই তা হলে তুমি কি আর টিকতে পারবে? এমনিতেই ত রোদের তাপে মোমের পুতুলের মতো গ'লে যেতে আরম্ভ করেছ। শেষ অবধি আমার হাতে যখন আসবে, তখন কতটুকু তোমার বাকি থাকবে তাই ভাবি।"

সুমনা হঠাৎ বলল, "নিয়ে যাও না আমাকে? কি হয় নিলে?"

বিজয় একটু হেসে বলল, "হয়ত অনেক কিছু। কিন্তু তোমার বাবা এবং ভাইরা ত এভাবে তোমাকে নিতে দেবে না? বৃদ্ধ ভদ্রলোককে এ রকম শক্ দেবার ইচ্ছাও নেই। দিন ত কেটেই আসছে, আর খুব বেশী বাকি নেই।"

সুমনা বলল, "বড় আস্তে কাটছে। বাড়ীতে আবার একরাশ লোকের আবির্ভাব হয়েছে, একেবারে ভাল লাগে না। সুচিত্রা এসেছে, তাঁর স্বামীটিও এসে জুটেছেন, এই মানুষটিকে আমি একেবারেই দেখতে পারি না।"

বিজয় বলল, "কেন বল দেখি?"

"কিরকম যেন গায়ে-পড়া হ্যাংলা। আমার ওরকম পুরুষমানুষ একেবারে ভাল লাগে না।"

বিজয় বলল, "তোমার ত একরকম একটি পুরুষমানুষ ছাড়া কাউকেই ভাল লাগে না। কিন্তু আমাদের বাঙালী ঘরে ঐরকম ছেলে প্রচুর আছে। শালী এবং বৌদি মহলে তাঁদের দাম কম নয়।"

সুমনা বলল, "তা আছে বটে। সেদিন ঐ ব্যক্তিটি ছোট বৌদির খোঁপা ধরেই নেড়ে দিল। আমি এসব ভালবাসি না, কিন্তু ছোড়দা যখন কিছু বলল না আমিই বা কি বলব? তবে আমার সঙ্গে বেশী ফাজলামি করলে একদিন ঠাস ক'রে চড় লাগিয়ে দেব।"

বিজয় বলল, "ঐ কর্ম্মটি কোরো না। ভদ্রলোক অমন মিষ্টি হাতের চড় খেয়ে একেবারে হন্যে হয়ে যাবেন, এবং ক্রমাগত চড় খাবার ছুতো খুঁজে বেড়াবেন।"

সুমনা বলল, একটু ভদ্রভাবে চললে কি হয়?"

বিজয় বলল, "হবে আর কি? জীবনে রসকষ অনেক ক'মে যায়। এই দেখ না, আমি যে এত ভাল ছেলে, তাও তোমার কাছে ভাল লাগছে না। বিয়ে না ক'রেই আমার সঙ্গে চ'লে যেতে চাইছ। আমি যদি আগে কথাটা বলতাম তা হলে তুমিই উল্টো কথা বলতে।"

সুমনা বলল, "যাক্ গে, নিয়ে যখন যাবে না তখন কথা বাড়িয়ে লাভ কি? তুমিও ত আমাদের বাড়ীর জামাই হতে যাচ্ছ, একদিন সুচিত্রার খোঁপা ধ'রে নেড়ে দিও, দেখব শিশিরকুমার কি করেন?"

বিজয়, "ও সব পরস্ত্রীদের খোঁপা-টোপা ধরায় আমি বিশ্বাস করি না। তবে তোমার চুলের মুঠিটা মাঝে মাঝে

ধরতে ইচ্ছা হয় বটে। একটু প্র্যাক্‌টিশ ক'রে রাখি। আমার এক মাদ্রাজী বন্ধুর স্ত্রী খুব বেশী প্রহার বর্ণনা করতে গেলে বলেন, ঠিক নিজের স্ত্রীর মতো করে মারছে এক-একদেশের এক-একরকম আদর।"

সুমনা বলল, "বাবা রে, ঐ রকম আদর কোরো না যেন। তোমার হাতের একটি চড় খেলেই আমার প্রাণ বেরিয়ে যাবে।"

ইতিমধ্যে একপাল লোক এদিকে এসে পড়ায় তারা কথা বন্ধ ক'রে উঠে পড়ল, এবং বাড়ীর পথ ধরল।

বাড়ীর কাছে এসেই বিজয় বলল, "আমি এখান থেকেই বিদায় হই।"

সুমনা বলল, "কেন? চল না একটু বসবে। বেশী ত রাত হয় নি।"

বিজয় বলল, "ব'সে কিই-বা হবে? যা মানুষের ভিড়, একটা কথাও ত বলা যায় না।"

সুমনা বলল, "চোখে ত দেখতে পাব আরো খানিকক্ষণ।"

বিজয় বলল, "সেটার দাম অবশ্য আমার কাছেই বেশী হওয়া উচিত, কারণ দ্রষ্টব্য হিসাবে তুমি আমার চেয়ে ঢের বেশী উঁচু স্তরের। তোমাকে কয়েকটা কথা বোঝান নিতান্ত দরকার হয়ে পড়েছে। কিন্তু কথা বলবার জায়গাই ত কোথাও দেখি না। ঘরে-বাইরে সর্ব্বত্রই মানুষের ভিড়। দেখছি আবার হরিবাবুর স্ত্রীর শরণাপন্ন হতে হবে।"

সুমনা বলল, "না, না, ভদ্রমহিলা তা হলে আমাদের সং ভাববেন। এমনিতে একদিনও ত তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই না, খালি প্রেম করবার প্রয়োজন হলে তাঁর বাড়ী-চড়াও হয়ে হাজির হলে তিনি বিরক্ত হবেন না?"

বিজয় বলল, "তা হলে চল শিবপুরের বাগানে বেড়াতে যাই। ওখানে দরকার মতো হারিয়ে যাওয়া যায়। তবে তোমাকে খুব ভাল ক'রে সান্ত্বনা দেবার দরকার হলে, সেটা দেবার সুবিধা ওখানে হবে কিনা সন্দেহ।"

"যেখানেই হোক নিয়ে চল, সারাদিন খালি লোকের ঠেলাঠেলি আর আমি সহ্য করতে পারছি না।"

গাড়ী বাড়ীর গেটের কাছে এসে দাঁড়াল। সুমনা নেমে গেল, যেতে যেতে বলল, "কাল সকালেই আমাকে জানিও কিন্তু কোথায় যাবে।"

বিজয় বলল, "নিশ্চয়।" গাড়ীটা ঘুরে আবার রাস্তা ধরল, বিজয়কে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

ঘরে গিয়ে সুমনা দেখল যে, সুচিত্রা তার খাটে ব'সে মহা উৎসাহে উলের মোজা বুনছে।

সুমনার একটু কৌতূহল হ'ল। বলল, "কি রে, এরই মধ্যে মোজা বোনার দরকার হ'ল?"

সুচিত্রা বলল, "এরই মধ্যে আবার কি? সবাই ত এইরকম বাপু, শুধু আমাকে দোষ দিলে কি হবে? নিজের বেলা দেখা যাবে এখন।"

সুমনা তার পিঠে একটা কিল মেরে বলল, "কি যে যা-তা বকিস তার ঠিকানা নেই। তোদের মুখের যদি কোনো আটক আছে!"

সুচিত্রা বলল, "আঃ, কি এমন বললাম? ও ত সবাই সবাইকে বলে। আমাদের ত একদিন আগের দেখা বর, তাইতেই এখনি বাঁধা পড়লাম, আর তুমি এমন ভুবন-মোহিনী রূপসী, তার উপর তিন-চার বছর ধরে কোর্টশিপ চালাচ্ছ—"

সুমনা হাত দিয়ে তার মুখটা চেপে ধরল, বলল, "ফের এই সব কথা বলবি ত তোর গলা টিপে দেব। আর যেন বলবার কিছু কথা নেই জগতে!"

সুচিত্রা হেসে চুপ ক'রে গেল। একটু পরে বলল, "এখনি শুয়ে পড়ছ কেন, যাও না, খেয়ে এস আগে।"

সুমনা বলল, "তুই যা, আমি যাচ্ছি। একটু মুখে-হাতে জল দিয়ে তবে যাব, মাথাটা ধরেছে।"

সুচিত্রা চ'লে যেতেই সে বালিশে মুখ গুঁজে আবার শুয়ে পড়ল। তার বুকের ভিতর এমন যন্ত্রণা হচ্ছে কেন? চোখ দিয়েই বা জল গড়িয়ে পড়ছে কেন?

সকাল বেলাটা কেমন যেন মেঘলা ক'রে রইল। সুমনার ভয় হ'ল, বিজয় হয়ত আজ বাইরে যাবার কোনো ব্যবস্থা করতে রাজী হবে না। একেবারে বাইরে যেতে না পেলে ত সর্ব্বনাশ, বিজয় আবার কালই চ'লে যাবে।

বিজয় একটু পরেই এল। বাড়ীতে এখন যেন মেলা ব'সে গেছে। রাণুর সাহায্যে সুমনাকে নীচে ডাকিয়ে আনল, বলল, "দেখছ ত কেমন মেঘলা, এর ভিতরে ত বাগানে যাওয়া যায় না। আর একটা ব্যবস্থা ত করা যায়, সেটা এতদিন কেন মনে আসে নি জানি না।"

সুমনা বলল, "কি?"

বিজয় বলল, "আমি ত এবার হোটেলে উঠেছি, সে ঘরটা ত রয়েইছে। চল, কোনো একটা সিনেমায় ঢুকে পড়ি গিয়ে তিনটের সময়। তার পর হয় সব ছবিটা দেখে বা খানিকটা দেখে হোটেলে চলে গেলেই হবে। চা-টা খেয়ে গল্প ক'রে-ট'রে সন্ধ্যের পর তোমাকে পৌঁছে দিয়ে যাব। দেখ, ভাল প্ল্যান্ না?"

সুমনা বলল, "ভালই প্ল্যান্, তবে তুমি যাকে মনু-

সংহিতা বল তাতে একটু আটকায়। গৃহলক্ষ্মী হই নি ত এখনও, গৃহে গিয়ে হাজির হলে লোকে কি বলবে?"

"কে বা লোক তোমার অত খবর রাখছে! All is fair in love & war, তোমাদের ঘরে যখন সুবিধা নেই, তখন আমার ঘরেই যেতে হবে। ঠিক সময় তৈরী থেকো, আমি আড়াইটা আন্দাজ আসব। আর বৌদি বা ভগিনী কাউকে আগে বল না, তা হলে তাঁরাও যাবার জন্তে জেদ ধরবেন।"

সুমনা অক্ষরে অক্ষরে তার কথাগুলো পালন ক'রে চলল। পাছে কথাটা ফাঁস হয়ে যায়, এই ভয়ে গীতা, উষা বা সুচিত্রার সঙ্গে কথাই বলল না দুপুর পর্য্যন্ত। রাসবিহারীর ঘরে ব'সে অনেকক্ষণ তাঁর সঙ্গে গল্প ক'রেই কাটিয়ে দিল।

বিকেলে বিজয় যখন তাকে নিতে এল, তখন উষা বলল, "ও মা, এখন কোথায় যাচ্ছেন আপনারা? বিষ্টি পড়ছে যে?"

সুমনা বলল, "যাচ্ছি ত সিনেমায়, বৃষ্টিতে আর কি ক্ষতি হবে?"

উষা গালে হাত দিয়ে বলল, "ও মা, দেখেছ একবার, কি কুটিল মন! পাছে সঙ্গে যেতে চাই, তাই কথাটা এখনও ভাঙে নি। তোমরা বাপু বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা হলেই পারতে, সাধারণ বাঙ্গালী গেরস্ত ঘরে তোমাদের মানায় না।"

বিজয় বলল, "আচ্ছা ছোট বৌদি, এবার একটা ত্রুটি হয়েই গেল। কথা দিচ্ছি,এর পরের বারে এসে আপনাকে নিশ্চয় সিনেমায় নিয়ে যাব। শুধু আপনাকে, সুমনাকেও নেব না।"

উষা বলল, "রক্ষে কর ভাই, অত-ভালবাসা আমার সহ্য হবে না। মেজ ঠাকুরঝি ত তা হলে ফিরে এলেই আমার গলা টিপে দেবে। আর সে নাও যদি দেয় ত আপনার সুমনার দাদা এসেই দেবেন। এমনিতেই খোঁটা খাচ্ছি সারাদিন।"

বিজয় বলল, "কিসের খোঁটা?"

উষা বলল, "তাঁর ধারণা যে, তাঁর চেয়ে আমি আপনাকেই পছন্দ করি বেশী।"

বিজয় বলল, "কি সর্ব্বনাশ! এ রকম 'নষ্টনীড়' হতে চলেছে তা ত জানতাম না? আগে বলেন নি কেন?"

সুমনা বলল, "তোমরা এখন ফাজলামি করবে, না, যাবে? ছবিটা আরম্ভ হয়ে গেলে, ঘরে ঢুকতে ভারি অসুবিধা হয়।"

বিজয় বলল, "না ছোট বৌদি, ভাই-বোন দু'জনেই চটতে আরম্ভ করেছেন, আর এগোন নয়। অতঃপর যাওয়া যাক্।" তারা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল।

পরবর্ত্তী জীবনে জিজ্ঞাসা করলে সুমনা কিছুই বলতে পারত না যে, সে কোন্ সিনেমায় গিয়েছিল এবং কি ছবি দেখেছিল। অন্ধকার ঘরে চুপ করে ব'সে কি যেন ভাবতে লাগল। কানেও সিনেমার গান ঢুকল না, চোখেও সিনেমার ছবির কোনো ছায়া পড়ল না। বিজয় একবার তার হাতখানা ধরে নাড়া দিয়ে বলল, "কি এত ভাবছ আকাশ-পাতাল?

"জানি না কি ভাবছি। মাথার মধ্যে খালি অন্ধকার ঘুরপাক খাচ্ছে। চল, বেরিয়ে যাই।"

বিজয় বলল, "দাঁড়াও, interval-টা আসুক। এখন বেরনোর অসুবিধা আছে।"

আলো জ্বলতেই দু'জনে বেরিয়ে এল। ট্যাক্সি ডেকে হোটেলের দিকে যেতে যেতে বিজয় বলল, "ছবিটা একটুও দেখ নি?"

সুমনা বলল, "না। মাথার অবস্থাটা এখন ছবি দেখবার মতো নয়।"

বিজয় বলল, "এমন মুস্কিল হয়েছে! সব চেয়ে যখন মানুষ একলা থাকতে চায়, সব চেয়ে বেশী মানুষের ভিড় তখন তাকে তাড়া ক'রে বেড়ায়।"

হোটেলে এসে বিজয়ের ঘরে ঢুকে সুমনা বলল, "বেশ দেখতে ঘরটা, গোলমালের মধ্যে থেকেও কেমন নিস্তব্ধ। এখনি চা দিতে বোলো না। খানিক পরে হবে। একটু কথা বল আগে। আমায় কি সান্ত্বনা দেবে ব'লে নিয়ে এসেছ। সান্ত্বনাই দাও।"

একটা চেয়ার এনে তার পাশে বসল বিজয়। বলল, "কোন্ দুঃখের সান্ত্বনা?"

সুমনা বলল, "এই যে দিনের পর দিন যায়, তোমায় দেখতে পাই না। আমার কাছে ত জগৎ-সংসার বিষ হয়ে উঠতে আরম্ভ হয়েছে। খালি মনে হয়, এই বিচ্ছেদের আর শেষ হবে না। যতদিনে এই সব আইনের নাগপাশ বন্ধন খুলবে আমার জীবনের উপর থেকে, ততদিনে একমুঠো ছাই ছাড়া আমার আর কিছু বাকি থাকবে না। তুমি পুরুষ মানুষ, আমার চেয়ে শক্ত মন তোমার, তুমি যেটা সহ্য করতে পারছ আমি সেটা পারছি না।"

বিজয় তার একখানা হাত টেনে নিয়ে তার উপর হাত বুলতে লাগল, বলল, "পুরুষ মানুষ ত বটে, এবং বয়েস তোমার চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু সেজন্যে সুবিধাই কি শুধু আমার? তুমি ছেলে মানুষ এবং

অত্যন্ত কাঁচা তোমার মনের ভিতরটা, নিষ্কলঙ্ক পবিত্র। কত প্রলোভন আসে আমাদের মনে কিছু কি বোঝ? এই যে সুধাসাগর তীরে আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে ব'সে থাকি, সেটা কত শক্ত আমার পক্ষে তাও কি তুমি বোঝ? কিন্তু উপায় যেখানে নেই, সেখানে হাসিমুখে থাকা ছাড়া আর কি করা যায়? এ পথের গোড়াটায় সবটাই প্রায় কাঁটা বিছানো, সেটা কি বোঝ নি যখন এ পথে নেমেছিলে?"

সুমনা বলল, "কিছু কি ভেবে নেমেছিলাম? এইটুকু শুধু জানতাম যে, আমায় যেতে হবে এই পথে, না হলে আমি বাঁচব না।"

বিজয় বলল, "শেষ ত হয়ে এল। এক বছরের একটু বেশী আর বাকি আছে। একটা কিছু কাজের আশ্রয় নাও, তাতে কষ্ট কমবে না, তবে সময়টা তাড়াতাড়ি কাটবে। না হয় ঘর-সংসারের কাজই কর। সেটাও ত তোমার কাজে লাগবে।

সুমনা বলল, "পারতাম সেটা করতে, যদি মা একটু সদয় থাকতেন। ঘর-সংসারটা সবই তাঁর হাতে। আমি তার ভিতর ঢুকতে গেলে ওঁর হয়ত আরও রাগ হবে। আমি যে একটা মহাপাপ করতে যাচ্ছি—এ ধারণা তাঁর কিছুতেই যাচ্ছে না।"

"তোমার নিজের মনে কোনো সন্দেহ নেই ত?"

সুমনা বলল, "এতকাল পরে তোমার এ কথা জানবার দরকার হ'ল? মহাপাপ মনে ত করিই না, আর যদি করতামও তা হলেও এ পথ থেকে ফিরবার ক্ষমতা আমার ছিল না। চারদিকের মানুষগুলোকে যখন দেখি, কেমন তারা খাচ্ছে, পরছে, আমোদ-আহ্লাদ করছে বা ঝগড়াঝাঁটি করছে তখন মাঝে মাঝে হিংসে হয়। মনে হয় আমার জীবনটা অমনি সরল হ'ল না কেন? বুকের ভিতর এমন আগুন ভগবান্ আমার কেন দিলেন? কিন্তু এও বুঝি, ওদের মত হতে আমি পারতাম না। ছোট থেকেই আমি আলাদা, বোনরা জগৎ-সংসারকে যে ভাবে দেখত আমি তা পারতাম না।"

বিজয় বলল, "যে বাঁশ দিয়ে রাখাল গরু তাড়ায়, সেই বাঁশ দিয়ে বাঁশীও হয়। মানুষে মানুষেও ঐ রকম তফাৎ।"

সুমনা বলল, "কেন আমাদের এই যন্ত্রণা বল ত? দেরি আমাদের করতে হচ্ছে, কারণ অবস্থাটা একটু অসাধারণ, কিন্তু সত্যি ভালবেসে অনেকদিন দূরে অনেক মানুষকেই থাকতে হয়। বিয়ের পরেও থাকতে হয়। কিন্তু আর কাউকে এতটা কষ্ট পেতে দেখি না। আমারই কি মন বড় বেশী দুর্ব্বল, সহ্য-শক্তি একেবারে নেই?"

বিজয় বলল, "পৃথিবীর বেশীর ভাগ মানুষই এদিক দিয়ে বড় হতভাগ্য সুমনা। তারা যে সত্যিকার ভালবাসা শুধু কোনোদিন পায় না তা নয়, পায় যে না সেটা জানেও না। ভালবাসা ব'লে আমাদের দেশে যা চলে, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অত্যন্ত ভেজাল দেওয়া জিনিস, খাঁটি কিছুই প্রায় তার মধ্যে থাকে না। কিন্তু বিধাতা কারো কারো বুকে আগুনের পরশমণি ছুঁইয়ে দেন। তাদের ভিতরটা সোনা হয়ে যায় বটে, কিন্তু সে আগুনের জ্বালা কোনোদিন ত যায় না? এদের তুমি আর এক দিক দিয়ে হতভাগ্য বলতে পার, কারণ ঘরের মঙ্গলশঙ্খ, তাদের জন্যে নয়। ধূপের মত তারা পোড়ে কিন্তু সুগন্ধ ছড়ায়, ঘুঁটের আগুন কাজের জিনিস বটে, কিন্তু সে আকাশ-বাতাসকে কোনো ঐশ্বর্য্য দিতে পারে না। কিন্তু না, আর প্রফেসরের মত বক্তৃতা ক'রে তোমাকে জ্বালাব না, তোমার নিশ্চয়ই শুনতে ভাল লাগছে না। এইবার তোমার জন্যে একটু চা আনতে বলি?"

বিজয়কে হাত ধরে টেনে সুমনা আবার বসিয়ে দিল, বলল, "যাবার সময় খেলেই হবে। এখনি ত যাচ্ছি না। তোমার কথা শুনতে ভাল লাগছে না আমার ভাবছ? তোমার স্বভাবে বিনয় বড় বেশী। খুব সান্ত্বনা দেবার মত কিছু বল নি অবশ্য, কিন্তু কিই বা বলতে পারতে? কিন্তু এই যে এতক্ষণ তোমার কাছে ব'সে থাকতে পারলাম, এইতেই মনটা আমার অনেকটা জুড়িয়ে গেল। বাড়ীর আবহাওয়াটা বড় যেন শ্বাসরোধকারী হয়ে উঠেছে আমার কাছে এখন। আর বোন আর বৌদিদিদের রসিকতাগুলিই ক্রমেই যেন বেসুরো হয়ে আসছে। তাদের দোষ নেই বেশী, তারা এই ভাবেই কথা বলে নববিবাহিতা এবং বাগ্‌দত্তাদের সঙ্গে।"

বিজয় বলল, "কিই বা শোন তুমি। আমার সহকর্ম্মীরা যে রকম রসিকতা করেন, শুনলে তুমি মূর্চ্ছা যেতে।"

সুমনা বলল, "শুনতে যেন কোনোদিন না হয়।" কিন্তু সত্যিই সন্ধ্যা হয়ে এল। এর পর যেতে আমাকে হবেই।"

বিজয় সুমনার হাতখানা তুলে নিজের মুখের উপর একটু বুলিয়ে নিল। বলল, "দিনগুলো যাতে শীগ্‌গির কাটে এমন কোনো মন্ত্র জানা থাকলে ভাল হ'ত। কিন্তু সে মন্ত্র আছে কোথায়?"

চা এল এই সময়। খাওয়াও হয়ে গেল দেখতে

দেখতে, কারণ খাওয়ার ইচ্ছাটা কারও ছিল না।

সুমনা বলল, "ট্যাক্সি ডাকতে ব'লে দাও একটা। বর্ষাকালের মত সারাদিন ধ'রে জল ঝরছে। চোখের জলের বর্ষা যাদের জীবন জুড়ে আছে, তাদের এ সময়টা বড় বেদনা দেয়।"

উঠে দাঁড়িয়ে সুমনাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বিজয় বলল, "সন্ধ্যাটা তাহলে বিফলেই গেল সুমনা? কোন সান্ত্বনা তুমি পেলে না?"

সুমনা বলল, "একেবারে বিফল নয়। এটা ত জানলাম যে, যাঁর সামনে ধূপ হয়ে পুড়ছি, তিনি পাথরে গড়া নয়? রক্তমাংসের মানুষই? হয়ত ধূপের ধোঁয়ায় চোখে তাঁর দু'এক ফোঁটা জলও এসে যায়।"

বিজয় বলল, "ঠিকই ধরেছ। কিন্তু দেবতা সেজে থাকতে হয় যে? চোখের জল ফেলবার ত জো নেই! বুকের মধ্যেই সঞ্চিত রাখতে হয়। কোন্ শুভ দিনে তিনি দেবতার বেদী থেকে নেমে তোমার পাশে দাঁড়াতে পারবেন, সেই দিনের অপেক্ষায় তিনিও অপেক্ষা করে আছেন। তাঁর চেয়ে বড় দেবতার কাছে নিশিদিন প্রার্থনাও জানাচ্ছেন।"

সুমনাকে নিয়ে অতঃপর বেরিয়ে পড়তে হ'ল, রাস্তায় আলো জ্বলে উঠেছে। বিজয় জিজ্ঞাসা করল, "বৌদিরা যদি জানতে চান যে, কেমন সিনেমা দেখলে?"

সুমনা বলল, "সত্যি কথাই বলব, যে এত ভাল ছবি আর কোনোদিন দেখি নি।"

২০

অবশেষে কঠিন পথের শেষ দেখা দিল। রাসবিহারী চিঠি লিখলেন বিজয়ের কাছে, তিনি মার্চ্চ মাসেই সুমনার বিয়ে দিতে চান। বিজয় উত্তরে জানাল যে, সে যথাসম্ভব শীঘ্র কিছুদিনের জন্য ছুটি নিয়ে যাচ্ছে।

বাড়ীতে একটা চাপা উত্তেজনার আবহাওয়ার সৃষ্টি হ'ল। সুমনার কোনো জিনিসের অভাব ছিল না। কিন্তু সে জিনিসগুলো দিয়েই রাসবিহারী খুশী হলেন না। তার গহনা কাপড়ে আলমারী ঠাসা হয়ে গেল। এত দূর থেকে আসবাবপত্র বয়ে নিয়ে গিয়ে কি হবে বলে আসবাব তৈরীর টাকাও জোর ক'রে দিয়ে দিলেন। বরকে কি দেওয়া হবে সেটা ঠিক করতে না পেরে বর আসার অপেক্ষা করতে লাগলেন। সব কাজে তাঁর বৌরাই সাহায্য করতে লাগল, গৃহিণী অত্যন্ত বিরস-মুখে চেষ্টা ক'রে তফাৎ হয়ে রইলেন। ভিতরটা তাঁর হয়ে উঠল রুদ্ধমুখ আগ্নেয়গিরির মত। শেষে আর রাগ চাপতে না পেরে বললেন, "আমার ছোট মাসী জগন্নাথ দর্শনে যাচ্ছেন। আমি যাব তাঁর সঙ্গে কিছুদিনের জন্যে। তোমাদের এ সব সাহেবী বিয়েতে ত আমার কোনো দরকার নেই? বৌমারা, মেয়েরাই সামলাতে পারবে। তোমার অমত নেই ত কিছু?"

রাসবিহারী বললেন, "তোমার নিজের যখন মত আছে, তাহলেই হ'ল। অন্যের মতামতের বড়ই তুমি অপেক্ষা রাখ। তাহলে নিজের মেয়ের বিয়ের সময় চ'লে যাওয়ার কথা তোমার মাথায় আসত না।"

"আমার কপাল মন্দ", ব'লে গৃহিণী গম্ভীর ভাবে চ'লে গেলেন এবং পরদিনই বেরিয়ে পড়লেন মাসীমার সঙ্গে। তিনি চ'লে যাওয়ায় মেয়েরা এবং বৌরা হাঁফ ছেড়েই বাঁচল খানিকটা। কাজকর্ম্ম চল্‌তে লাগল। জ্যোৎস্না এবং সুচিত্রা ছাড়া আর কাউকে আসতে ডাকা হ'ল না। তারা দু'জন অবশ্য অবিলম্বে এসে হাজির হ'ল। জামাইরাও যাওয়া-আসা করতে লাগলেন।

বিজয় এসে দেখল যে, বাড়ী একেবারে ভরপুর। তবু তার মধ্যেই সুমনার সঙ্গে দেখা ক'রে বলল, "ব্যাপার কি? এত ঘটা কিসের?"

সুমনা বলল, "তা ত বটে, যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই।"

বিজয় বলল, "বিয়েটা আমার তা ত জানি। কিন্তু অর্দ্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা পাবার ত কথা ছিল না? শুধু রাজকন্যাকে নিয়েই যাব এই ত ছিল আমার ধারণা।"

সুমনা বলল, "বাবা কিছুতেই ছাড়লেন না। তোমাকে কি কি দেওয়া হবে তাই নিয়েও দাদাদের সঙ্গে পরামর্শ করছেন খালি।"

বিজয় বলল, "সর্ব্বনাশ! এ যে আবার বাল্য-বিবাহের ব্যাপার ক'রে তুলছেন। আমাকে আর কিছু দিতে হবে না, যা দিচ্ছেন তাতেই হবে।"

সুচিত্রা এসে বসেছিল, বলল, "তা বললে কি হয় মশায়? জ্যাঠামশায় এই মেয়েটিকে সব চেয়ে ভালবাসেন। তার বর হতে যাচ্ছেন আপনি, আপনাকে তিনি না দিয়ে কিছু ছাড়বেনই না। অন্য জামাইদের বেলা অবশ্য কত কম দিয়ে সারা যায় তার হিসাবও করেছেন।"

সুমনা বলল, "যাঃ, কি বাজে বক্‌ছিস্? তোদের ভিতর কে কি পাস নি বল্ দেখি?"

সুচিত্রার বর শিশিরকুমারও এসে উপস্থিত হলেন।

এঁর সঙ্গে আগে বিজয়ের আলাপ ছিল না। এই প্রথম আলাপ হ'ল। বিজয়কে নমস্কার ক'রে সুচিত্রার স্বামী বললেন, "আপনি ভাগ্যবান পুরুষ মশায়, আপনাকে নমস্কার করি।"

বিজয় বলল, "আপনাকেও ত কিছু কম ভাগ্যবান মনে হচ্ছে না ?"

সুচিত্রা বলল, "দেখলে ত, জহুরীতে মাণিক চেনে।"

সুচিত্রার কথার উত্তরে শিশির বলল, "মাণিক নিয়ে যাদের কারবার তারা মাণিক চিনবেই," ব'লে অন্য ঘরে চ'লে গেল। ভাল ক'রে ঝগড়া করবার জন্যে সুচিত্রাও তার পিছনে ছুটল।

বিজয় বলল, "লোকটি বড় বেশী রসিক দেখছি।"

সুমনা বলল, "অসভ্য কি কম্ নাকি? সারাক্ষণ ঠারে-ঠোরে খালি চিত্রাকে শোনাচ্ছে সে কত উপযুক্ত, আর চিত্রা কত অনুপযুক্ত। কিন্তু সে কথা যাক্, বাবাকে কি বল্‌ব বল্ ?"

ঘরে তখন আর কেউ ছিল না। বিজয় বলল, "আচ্ছা, এ আবার কি কাণ্ড! আমাকে কিছু দিতে হবে কেন? আমি কি জিনিসের লোভে এসেছি?"

সুমনা বলল, "আরে, তা কেন হবে? ভালবেসে ভদ্রলোক একটু কিছু দিতে চাইছেন, তাতে রাগ করছ কেন?"

সুমনা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে দেখে বিজয় বলল, "না, না, রাগ করছি না। আচ্ছা, যা হউক একটা কিছু দিতে বল, একটার বেশী নয়।"

শুধু রেজিষ্ট্রি ক'রে বিয়ে হবে। লোকজন মাত্র কয়েকজন নিমন্ত্রিত হয়েছেন, যাঁরা এঁদেরও বন্ধু অথচ বিজয়কেও জানেন।

সকালবেলাই ব্যাপারটা হয়ে যাবে। লোকজন যাদের আসবার এসেই গেছে প্রায়। ছেলেমেয়েরা কোলাহল ক'রে বেড়াচ্ছে। বিজয়কে আনতে গাড়ী যাচ্ছে। দুই বৌদি মিলে সুমনাকে ধ'রে এনে খাটে বসাল, তাকে ভাল ক'রে সাজাতে হবে।

সুমনা একটু মৃদু আপত্তি করল, "আবার অত সাজ কেন ভাই? কিছু অনুষ্ঠান হচ্ছে না ত?"

গীতা বলল, "তা ব'লে বিয়ের সময় সাজবে না? সাজ কি শুধু অন্য লোকের জন্যে নাকি?"

উষা বলল, "তুমি এত গায়িকা মেয়ে ভাই, ঐ গানটি জান না? 'জীবনে পরম লগন, ক'রো না হেলা হে গরবিনী'?"

গীতা বলল, "বাবাঃ, ছোট বৌ এতও জানে! কে বলবে যে, মেয়ে কলেজে পড়ে নি!"

সোনালী রং-এর বেনারসী সুমনার সোনার অঙ্গকে ঢেকে ঝল্‌কাতে লাগল। গহনাও পরান হ'ল গা সাজিয়ে, তবে তার বেশী নয়। আয়নায় নিজের মূর্ত্তির দিকে একবার তাকিয়ে দেখল সুমনা। সুন্দর দেখাচ্ছে বটে, খুবই সুন্দর! কিন্তু ইচ্ছা করে যেন আরো সুন্দর হতে! রূপ নিয়ে অহঙ্কার করবার জন্যে নয়, যে আসছে তাকে অর্ঘ্য দেবার জন্যে।

বর আসবার পর একবার শাঁখ বেজেই থেমে গেল। বেশী বাজাতে বা উলু দিতে রাসবিহারী বারণ ক'রে দিয়েছিলেন। অতীতের একটা দিনের ছায়া থেকে থেকে তাঁর মনকে পীড়া দিচ্ছিল। রেজিষ্ট্রেসন্ করতে আর কত সময়ই বা লাগবে? কয়েকবার কাগজে সহি করার ব্যাপার; সাক্ষী হিসাবে ভাইরা আর ভগ্নীপতি সহি করলেন।

এর পর ঘরের মধ্যে মেয়েলি অনুষ্ঠান একটু-আধটু হয়ে গেল। বর-কন্যার মালা বদল হ'ল। মিষ্টি খাওয়ান হ'ল। গীতা একটা খুব দামী হীরের আংটি এনে সুমনার হাতে দিয়ে বলল, "তুমি পরিয়ে দাও ভাই ঠাকুর-জামাইকে। বাবা দিলেন।"

বিজয় বলল, "এ সব জিনিসের আগে নোটিশ দিতে হয়, তাহলে প্রস্তুত হয়ে আসা যেত।"

উষা বলল, "কালকের দিনটা অবধি ত আছেন, তার মধ্যে জোগাড় ক'রে আনবেন। এখন চলুন, স্নানাহারের চেষ্টা ত দেখতে হবে? বাসর-ঘরটা ত ফাঁকিই দিলেন, বৌ নিয়ে পালাচ্ছেন হোটেলে, পাছে আমরা আড়ি পাতি। দুপুরেই যতটা পারা যায় আপনাকে জ্বালিয়ে নেব।"

বিজয় বলল, "তা জ্বালান, আপত্তি নেই। দিনে না ঘুমলেও চলে, কিন্তু রাত্রে সেটা পুষিয়ে নেওয়া দরকার হয়।"

উষা বলল, "ইঃ, ঘুমবে যা তা জানা আছে! আমরাই বড় ঘুমতে পেয়েছি তা মেজ-ঠাকুরঝি!"

এই সময় উষাকে কে ডাকাডাকি করাতে সে বেরিয়ে গেল, বিজয় আর সুমনাকে ঘরে রেখে। বিজয় খাটে ব'সে বলল, "আমি সকালে স্নান ক'রেই বেরিয়েছি, আমার আর স্নানের দরকার হবে না। তুমি করতে চাও ত ক'রে নাও। কিন্তু এমন সুন্দর সাজটা খুলে ফেলবে? ভাল ক'রে তোমাকে দেখাও হ'ল না। আমার মনে হয় বিয়ের দিনটা রবিন্‌সন্ ক্রুসোর মত

একটা নির্জ্জন দ্বীপে গিয়ে থাকতে পারলে ভাল হয়। অথচ এই দিনটাতেই ভিড়ের জ্বালায় প্রাণান্ত হবার জোগাড় হয়।"

সুমনা বলল, "আমিও ত সকালে স্নান করেছি। তবে এত সাজসজ্জা ক'রে ত খেতে বসা যাবে না? খুলতেই হবে এগুলো। সন্ধ্যার সময় যখন যাব তখন ত আবার সাজিয়েই দেবে।"

খাওয়ার জায়গা হয়েছে, চামেলী এসে তাদের ডেকে নিয়ে গেল। রাসবিহারী এতক্ষণ খুব বেশী সামনে আসেন নি, একটু দূরে দূরেই ছিলেন। এখন এসে বিজয়ের পাশে বসলেন। বললেন, "কাল রাত্রেই যাচ্ছ তাহলে? রিসার্ভেশন্ হয়ে গেছে?"

বিজয় বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, সে আগের থেকেই করা হয়ে গেছে। ছুটিও আমি এবার বেশী দিনের পাই নি।"

সুচিত্রার মা ঘোমটা দিয়ে এসে দু'চারবার শাশুড়ীর কর্ত্তব্য ক'রে গেলেন। গৌরাঙ্গিনীর অভাবটা তিনি একটু অনুভব করছিলেন, আর কেউ করুক বা না-ই করুক।

খাওয়া শেষ হতে অনেকক্ষণ কেটে গেল, কারণ খাওয়ার চেয়ে গল্প করার দিকেই সকলের নজর বেশী।

উপরে সুমনার ঘরেই খাবার পরে সবাই গিয়ে বসল। এবং তার পর চা খাওয়ার সময় না হওয়া পর্য্যন্ত সমানে গল্পগাছা ও রসিকতা চলতে লাগল। ভাইরাও মাঝে মাঝে এসে ঘুরে গেল, তবে ছোট বোনের সামনে খুব বেশী রসিকতা করতে একটু সঙ্কোচবোধ হওয়ায় বেশীক্ষণ রইল না। ভগ্নীপতিরাও এক-আধবার এসে গল্প জমাবার চেষ্টা করলেন, তবে ভগ্নীরা একটু অসহযোগ করাতে তাঁদেরও খুব সুবিধা হ'ল না।

চা খাওয়াটাও সমান হৈ চৈ ক'রে শেষ হ'ল। সুমনা কাল সকালেই ফিরে আসবে, আজ সন্ধ্যায় গিয়ে। এখান থেকেই একেবারে স্বামীগৃহের উদ্দেশে যাত্রা করবে।

সন্ধ্যা হতেই একবার বাবার কাছে বসল। মেয়েকে আদর ক'রে পিঠে হাত বুলিয়ে রাসবিহারী বললেন, "এইবার বুড়ো ছেলেকে ছেড়ে চললে মা? আশীর্ব্বাদ করি, এ যাওয়া সার্থক হউক। আগেকার দুঃখের স্মৃতিগুলো কখনও যেন তোমাকে আর পীড়া দিতে না আসে। যার হাতে দিলাম, সে অত্যন্ত সচ্চরিত্র ভদ্র ছেলে। কোনো দুঃখ ইচ্ছা ক'রে সে তোমাকে কোনোদিন দেবে না। তুমিও মা তার কোনো কষ্টের কারণ কোনোদিন হ'ও না।"

সুমনা বলল, "তার জন্যে চিরকালই আমি চেষ্টা করব বাবা।"

সন্ধ্যার সময় তার যাবার কথা, তবে অল্প দেরী হয়েই গেল। জিনিসপত্র সামান্য কিছু সঙ্গে নিয়ে, বেশীর ভাগই গুছিয়ে রেখে দিয়ে অবশেষে সুমনারা যখন বেরোল তখন পথে আলো জ্বলে গিয়েছে।

সেই আগেরই ঘরটি। সুসজ্জিতা সুমনাকে সবাই খানিকটা আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে দেখল। বিজয় যে নববধূ নিয়ে আসছে, সেটা র'টেই গিয়েছিল। হোটেলের তরফ থেকে মস্ত একটা ফুলের বাস্কেট তাদের ঘরে শোভা পাচ্ছে দেখা গেল।

বিজয় ঘরে ঢুকে বলল, "এই ঘরটার সম্বন্ধে একটু দুর্ব্বলতা ছিল মনে। ভাগ্যক্রমে এটাই পাওয়া গেল। একটা দিনের মত এইটিই এখন তোমার নীড়।"

সুমনা বলল, "আসল নীড়টা দেখার জন্যে মনটা কেমন উৎসুক হয়ে রয়েছে। সাড়ে তিন বছর চার বছর হতে চলল বাড়ীটা কি ঠিক তেমনই আছে?"

বিজয় বলল, "আছে প্রায় একই রকম। ঘরগুলোর ব্যবস্থার কিছু অদলবদল হয়েছে। তবে যেটি তোমার ঘর ছিল সেইটিই তোমার ঘর হবে ঠিক ক'রে রেখেছি, যদি অবশ্য তুমি অন্য কোনো ঘর বেশী পছন্দ না কর। এই ফ্ল্যাটটা কেন যে আমি কিছুতেই ছাড়ছি না, এই ভেবে আমার বন্ধুর দল ভয়ানক অবাক্ হয়ে যাচ্ছিলেন, শেষে কয়েকজনকে বলতেই হ'ল কারণটা।"

সুমনা বলল, "এঁরাই তোমার সঙ্গে রসিকতা করেন বুঝি?"

বিজয় বলল, "এর পর আরো বেশী করবেন। তোমার বৌদিদের রসিকতার মতো ঠিক নয়।"

সুমনা বলল, "তাঁদেরও সব রসিকতাগুলো খুব রুচি-সঙ্গত নয়, তোমার সামনে মুখ খোলেন না তাই রক্ষা।"

ঘুরে ঘুরে সুমনা ছোটখাট জিনিসগুলো নেড়ে-চেড়ে রাখতে লাগল। বুকের ভিতরটা কেমন যেন কাঁপছে।

বিজয় হঠাৎ এসে তার একটা হাত নিজের হাতে নিয়ে বলল, "হাতটা এত ঠাণ্ডা কেন? ভয় পেয়েছ?"

সুমনা বলল, "ভয় পাব কেন? তুমি ত আমার অনেক দিনের চেনা।"

"যদি আজ রাত্রে একেবারেই অচেনা লাগে ত কিছু মনে ক'রো না। মানুষের ভিতরে শুধু একটা মানুষই ত থাকে না, যাকে একেবারে দেখ নি তেমন কাউকেও আজ হঠাৎ আবিষ্কার করতে পার।"

সুমনা কিছুক্ষণ নিরুত্তরে দাঁড়িয়ে রইল। তার পর

বলল, "এই উৎসবসজ্জা এবার ছেড়ে ফেলি? ক্লান্ত লাগছে।"

টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে গহনাগুলো এক এক ক'রে খুলে ফেলল। একটা লালপেড়ে সূতি শাড়ী নিয়ে স্নানের ঘরে ঢুকে, বেনারসী শাড়ীও ছেড়ে ফেলল। বুকের ভিতরটা ভয়ানক কাঁপছে, কি হ'ল তার? বেরিয়ে এসে দেখল, ঘরের একমাত্র আরাম চৌকিতে ব'সে বিজয় একটা মাসিকপত্রের পাতা উল্‌টাচ্ছে। সুমনা আস্তে আস্তে তার সামনে এসে দাঁড়াল।

তার পর চেয়ারটার সামনে নতজানু হয়ে ব'সে বিজয়ের কোলের উপর নিজের মাথাটা রাখল। দুই হাতে তাকে একবার জড়িয়ে ধরল। মাসিকপত্রটা ঠক ক'রে মাটিতে ফে'লে দিয়ে বিজয় তাকে টেনে নিজের কোলের উপর তুলে নিল। সুমনার মুখখানা নিজের মুখের উপর একবার চেপে ধ'রে বল্‌ল, "এইবার একেবারে আমার ত?"

সুমনা একবার তাকাল বিজয়ের মুখের দিকে। তার পর নিজের মুখ তার মুখের দিকে তুলে ধ'রে বলল, "একেবারেই তোমার।"

অনেক রাতে সুমনার ঘুমটা একবার যেন চমকে ভেঙে গেল। ঘরটা আবছায়া আলোয় কিছু কিছু দেখা যাচ্ছে। পাশে বিজয় ঘুমচ্ছে। বালিশের থেকে মাথা তুলে সুমনা একদৃষ্টে তার স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। এর হাত থেকে আজ জীবনদেবতা সুমনাকে দিলেন তার জীবনের সার্থকতা। দেহমনপ্রাণ আজ সে সম্পূর্ণ ক'রে উৎসর্গ করেছে তার দেবতার কাছে। তার আনন্দ রাখবার জায়গা যেন সে জীবনে খুঁজে পাচ্ছে না, ভরা গাঙেও যেন জোয়ার এসে গিয়েছে! কিন্তু যতটা পেয়েছ ততটা দিতে পেরেছ কি? বিজয় কি তাকে পেয়ে জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়াকে পেয়েছে? ভিখারিণীর মত কি সে শুধু নিয়েছে না রাণীর মত দিতেও পেরেছে? সুমনার মনে একটা প্রার্থনা জেগে উঠল, যা সে পেল আজ তার মূল্য যেন নিঃশেষ করে দিতে পারে। শুধু ভালবাসা দিয়ে যদি না হয়, নিজের প্রাণ দিয়েই যেন দিতে পারে।

আস্তে আস্তে বিজয়ের বুকের উপর মাথাটা রাখল। নিদ্রিত বিজয় একটু যেন ন'ড়ে উঠল। তার পর চোখ না তাকিয়েই তাকে আবার নিজের আলিঙ্গনের মধ্যে টেনে নিল।

সকালে চোখ চেয়ে দেখল বিজয় আগেই বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়েছে। মুখহাত ধুয়ে রাস্তার ধারের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। সুমনাকে তাকাতে দেখে কাছে এসে বলল, "রাত্রে একটুও কি ঘুমোতে পেরেছিলে?"

সুমনা বল্‌ল, "খুব বেশী নয়।"

বিজয় বলল, "আজ আর কাল দুটো রাতই ত কাটবে ট্রেনে। তখনও ঘুমোতে পারবে না। দিনকয়েক তোমার জাগরণে বিভাবরী কাটাতেই হবে এখন।"

সুমনা খাট থেকে নেমে পড়ল। বল্‌ল "ঘুমোতে না পাই তাতে আমার বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই। অনেক বছর ঘুমোবার সময় পেয়েছি। কিন্তু এখনি ছুটতে হবে সেই লোকের ভিড়ে এই ভেবে ভাল লাগছে না। আর রসিকতার এমন বান বইবে আজ যে, তার সামনে দাঁড়ানোই মুস্কিল হবে।

বিজয় বলল, "পাশ্চাত্য জগতে যে বিয়ে ক'রেই পলায়ন করে সেটা খুব ভাল কাজ করে। নিজেদের জন্যে ত এটা একান্ত দরকার। তাছাড়া এই বাজে কৌতূহল মানুষের, সমস্ত জিনিসটার সুর নামিয়ে দেয়। যেন ফুলের স্তবকের উপর নর্দ্দমার জল ঢেলে দেওয়া। আমারও সত্যি আজ এখনই ওখানে যেতে ভাল লাগছে না। একেবারে ও বেলায় গেলে কি ক্ষতি?"

সুমনা বলল, "বাবা দুঃখ করবেন। আর জিনিসপত্র সবই ওখানে পড়ে আছে, সেগুলো গুছিয়ে নিতে হবে। যাব যখন বলেছি আমরা তখন যাবই না হয়, একটু দেরী ক'রে যাব। এখানেই চা খেয়ে নিই।"

বিজয় চায়ের হুকুম দিয়ে দিল। সুমনা তখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে। এক গোছা চুল তুলে নিয়ে বলল, "কি সুন্দর চুল তোমার! কোন্‌টাই বা সুন্দর নয়!"

সুমনা আরক্তমুখে চুপ ক'রে রইল।

চা খাওয়ার পরেই কিন্তু তাদের ঘরে আবার যেন ডাকাত পড়ল। তাদের তখনি যেতে হবে। অগত্যা যাওয়াই স্থির করল তারা। হোটেলের ঘর ছেড়ে দিয়ে সুমনাদের বাড়ীতেই গিয়ে উঠল।

সমস্ত-দিন ধ'রে বাড়ীতে উৎসব কোলাহল চলতে লাগল। গৌরাঙ্গিনীর জন্যে রাসবিহারী মনে মনে একটু দুঃখ অনুভব করতে লাগলেন। অবশ্য এ আনন্দ যদি তাঁর মনকে কোনোখানে স্পর্শই না করত, তাহলে বাড়ীতে থেকেও তাঁর কিছু লাভ হ'ত না। পুরী গিয়ে তিনি চিঠিপত্র মাঝে মাঝে লিখছেন, কিন্তু তাতে সুমনার বিয়ের কোনো উল্লেখ থাকছে না।

বৌদিরা আর বোনরা মিলে নবদম্পতিকে সারাক্ষণ ঘিরে রেখেছে। তাদের কৌতূহলেরও শেষ নেই, রসিকতারও শেষ নেই! সুমনা বেশীর ভাগ চুপ ক'রেই থাকছে, বিজয় মাঝে মাঝে তবু কথা বলছে।

দিন ক্রমে শেষ হয়ে এল। এর পর বিদায়ের পালা। জিনিসপত্র গোছান হ'ল, বেশীর ভাগ আগে চালানও হয়ে গেল ষ্টেশনে। সঙ্গে যাবে যা হাল্কা জিনিস, তাই বাকি রইল। কনেকে আবার সাজান হ'ল, তবে বিবাহের সাজে নয়। বিজয় ট্রেনে যাওয়ার সময় সর্ব্বদা স্যুট্ প'রেই যায়, কাজেই তাকেও বর সাজান গেল না।

রাসবিহারী মেয়েকে কোলে নিয়ে কেঁদেই ফেললেন। কোথায় চলল তাঁর নয়নের তারা, জীবনের আনন্দদায়িনী? তবে নিজেকে সামলে নিলেন তাড়াতাড়ি। মেয়েকে আশীর্ব্বাদ ক'রে বললেন, "মা, এ বুড়ো বাপের বাড়ী তুমি আনন্দ ছাড়া দুঃখ কাউকে কোনোদিন দাও নি, আমার ঘরের তেমনি আনন্দদায়িনীই থেক।" জামাইকে বললেন, "বাবা, তোমাকে উপদেশ দিয়ে আমি অপমান করব না। তবু এইটুকু বলি, তোমার স্নেহ যেন মনুকে সর্ব্বদা আশ্রয় দেয়। জ্ঞানতঃ ও তোমার দুঃখের কারণ কখনও হবে না, কিন্তু যদি নিজের অনিচ্ছাতেও কখনও কিছু অপরাধ ক'রে, তবে কোনোদিন ওর অপরাধ নিও না।"

বিজয় তাঁকে প্রণাম ক'রে বলল, "আপনার আশীর্ব্বাদ সার্থক হবে।"

একেবারে বাচ্চারা এবং বৃদ্ধরা বাদে সকলেই তাদের ট্রেনে তুলে দিতে সঙ্গেই চলল। সুমনা চোখের জল ফেলতে ফেলতে গিয়ে গাড়ীতে উঠল। বিজয়ের মুখখানাও গম্ভীর হয়ে গেল।

ষ্টেশনের ভিড় আর গোলমালের মধ্যে সুমনার মনের স্বাভাবিক অবস্থা খানিকটা ফিরে এল। বৌদিদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সে গিয়ে গাড়ীতে উঠল। এয়ার-কণ্ডিসণ্ড্ গাড়ীর ছোট্ট একটি খুপরি, দু'জনের মতই জায়গা আছে। জিনিসপত্র সামান্যই সঙ্গে, অসুবিধা কিছু হবে না। উষা বলল, "কি মজার গাড়ী ভাই, ঠিক যেন পাখীর বাসা। কপোত-কপোতী যাবে ভাল।"

বিজয় বলল, "আপনি একটা কবিতার বই লিখে ফেলুন ছোট বৌদি, আমি প্রকাশক হতে রাজী আছি।"

হিতেন বলল, "আপনি আর ওকে উৎসাহ দেবেন না। তাহলে হাতা-বেড়ী ফেলে দিয়ে সারাদিন কবিতাই লিখবে। ঠাকুরজামাইয়ের কথা ত ওর কাছে এখন বেদবাক্য হয়ে উঠেছে।"

উষা বলল, "হবেই ত বেদবাক্য, তোমরা কি কখনও আমাকে কোন ভাল বিষয়ে উৎসাহ দিয়েছ? খালি হাতা-বেড়ী নিয়ে বসে থাকলেই আমার স্বর্গলাভ হবে আর কি!"

গাড়ী ছেড়ে দিল অবশেষে। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে যতক্ষণ ভাই-বোনদের দেখা গেল, ততক্ষণ সুমনা তাদের দিকে চেয়ে রইল। বিজয় এসে তার পিছনে দাঁড়াল।

হাওড়ার প্ল্যাটফর্ম যখন চোখের আড়াল হয়ে গেল, তখন তারা ফিরে এল নিজেদের জায়গায়। সুমনার দুই চোখ তখনও জলে ভরে আছে। বিজয় তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, "এখনও খুব মন খারাপ লাগছে?"

সুমনা বলল, "বাবা বড় কষ্ট পাবেন, আমি তাকে সঙ্গ দিতাম বাড়ীতে। অন্যরা ত নিজের নিজের সংসার নিয়েই ব্যস্ত, আর মা ত তাঁর ভাঁড়ার ঘর ছাড়া কিছু দেখতেই পান না।"

বিজয় বলল, "মেয়েসন্তানদের নিয়ে এই ত বিপদ্! তারা নিজের অথচ নিজের নয়। ওঁকে বলে এলে না কেন বছরের ভিতর ছ'মাস আমাদের কাছে এসে থাকতে?"

সুমনা বলল, "সে কি আর তিনি থাকবেন? অন্য ছেলেপিলেরা আছে, মা আছেন। তবে দু'চার দিনের জন্যে আসতে পারেন। আমিই গিয়ে কিছুদিন করে থেকে আসব যদি পারি।"

বিজয় বলল, "ঐ পারাটাই সব চেয়ে শক্ত। তুমিও পারবে না, আমিও পারব না, অন্ততঃ কিছুদিন এখন।"

সুমনা বিজয়ের হাতে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, "তার পরেই পারবে? আর আমাকে ছেড়ে থাকতে কোন কষ্ট হবে না?"

বিজয় বলল, "কষ্ট ত চিরকালই হবে এবং যতদূর নিজেকে বুঝি, এতটাই কষ্ট হবে বলে বোধ হয়। Till death do us part।"

সুমনা তার হাত ধরে চুপ করেই রইল। বলতে ইচ্ছা করে অনেক কথা, কিন্তু মুখের কাছে এসে আটকে যায় কেন? Till death do us part?

মরণের সঙ্গেই শেষ সব? সেও থাকবে না, বিজয়ও থাকবে না, আর এই কুলপ্লাবী জীবনব্যাপী ভালবাসা, এও থাকবে না? এই কি ভগবানের বিধান হতে পারে?

বিজয় তাকে নিজের বুকের কাছে টেনে এনে বলল, "অত দারুণ গম্ভীর হয়ে গেলে কেন? মৃত্যুর নামে মনে এত ভয় এল?"

সুমনা বলল, "না, না, মৃত্যুর নামে নয়। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বিচ্ছেদ হয়ে যায়, এই কি ভাব?"

বিজয় বলল, "থাক এখন ওসব কথা। পরে কোন সময় আলোচনা করা যাবে। বাসর ঘর থেকে বেরিয়েই এখন জন্মমৃত্যু রহস্যের ভাবনা ভাবতে ইচ্ছা করছে না। তার দিন ত আসবেই আজ না হোক কাল। এখন একটু পার্থিব বিষয়ে মন দাও। বাড়ী থেকে যা খেয়ে বেরন গেছে, তাতেই চলবে, না, আর কিছু আনাব? তার পর শোয়ার ব্যবস্থাও একটু করা দরকার। 'হোল্ড অল' একটা এনেছ নাকি?"

সুমনা বলল, এনেছি ত সবই, তবে এখনি ওসব টানাটানি করতে ভাল লাগছে না। আমি খাবও না কিছু আর। খানিকক্ষণ ত বসে গল্প করি, তার পর ঘুম পায় ত শোব।"

বিজয় বলল, "নিদ্রাবতী রাজকন্যার ঘুমটা বড় বেশী ভেঙে গেছে দেখছি।"

সুমনা বলল, "সোনার কাঠির ছোঁওয়ায় যে ঘুম ভাঙে তা সহজে আর ফেরে না।"

কি একটা ষ্টেশনে এসে গাড়ীটা দাঁড়াল। চার দিকে লোকজনের কোলাহল, কিন্তু ঘরের শার্সি শক্ত করে আঁটা কোনও শব্দ তার ভিতর দিয়ে আসছে না। সুমনা বলল, প্রথম বার যখন বোম্বাই যাই তখন এগুলো খুব দেখতে দেখতে গিয়েছিলাম। কিন্তু ফিরবার সময় কিছু আর চোখে দেখি নি!"

বিজয় বলল, "এত কষ্ট হয়েছিল? অথচ প্ল্যাটফর্মে ত একবার আমার দিকে তাকালেও না?"

সুমনা বলল, "আর তাকান! তখন আছড়ে পড়ে কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছিল ত তাকাব কোথায়? গাড়ীতে উঠে সেই যে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লাম, অনেক রাত হবার আগে আর মাথাই তুলি নি। মনে হচ্ছিল, ট্রেনটা যদি আমার বুকের উপর দিয়ে চলে যায় ত ভাল হয়, আর তিলে তিলে মরতে হয় না।"

কথার কোনো উত্তর না দিয়ে বিজয় তাকে নিজের বুকের উপর চেপে ধরে কয়েকবার চুম্বন করল। রাতটা বেড়ে চলল। এ ট্রেন কম জায়গায়ই থামে, তবু যাত্রী ওঠা-নামা অনেক রাত অবধি তাদের চোখে পড়ল। অনেক পরে তবে বিছানা করে দু'জনে শুয়ে পড়ল, কিন্তু সুমনার চোখে ঘুম একেবারেই এল না। ভিতরের আলোটা নেভান, বাইরের আলো এসে মাঝে মাঝে পড়তে লাগল। সুমনা দেখল, বিজয় চোখ বুজেই শুয়ে আছে, ঘুমোচ্ছে কিনা কে জানে? কিন্তু ঘুমোক বা নাই ঘুমোক, তাকে আর কথা বলাতে সুমনার ইচ্ছা করল না। দু'তিন দিন হ'ল, বিশ্রামও তারা একেবারেই পাচ্ছে না।

ভোর হয়ে এল। দিনের আলোর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সুমনার মনটার ভার খানিকটা যেন কমে গেল। আত্মীয়-বিচ্ছেদ বিশেষ করে রাসবিহারীর সঙ্গে বিচ্ছেদটা তার বড়ই আঘাত দিয়েছিল মনে। কিন্তু তিনি বড় নিশ্চিন্ত হয়েছেন, বিজয়ের হাতে তাকে সমর্পণ করে, এই ভেবে নিজের মনে খানিকটা সান্ত্বনা পেল।

সকাল হতেই আবার হাতমুখ ধোওয়া, চা খাওয়া, রাত্রে ব্যবহৃত জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা। স্নান করার এক মহা অসুবিধা, বাথরুমের সামনে মস্ত বড় লাইন দাঁড়িয়ে গেছে। বিজয়ের সাহায্যে কোন মতে স্নানের পর্ব সেরে সুমনা ঘরে পালিয়ে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

বিজয় বলল, "ঐ একটা শাড়ীই বার বার পরছ কেন? সঙ্গে আর জামা-কাপড় আন নি নাকি?"

সুমনা বলল, "এনেছি অনেকগুলোই। তবে এখন বড় কুঁড়েমি লাগছে, আর বাক্স খুলতে ইচ্ছা করছে না।"

বিজয় বলল, "আজকে যা খুসি কর। কিন্তু কাল তোমার পরীক্ষা আসছে একটা। আমার বন্ধুরা দল বেঁধে ষ্টেশনে আসবেন, মুখ্যতঃ বৌ দেখতে এবং গৌণতঃ আমাদের অভ্যর্থনা করতে। খুব ভাল করে সেজে না নামলে চলবে না কিন্তু। সবাই জেনে গিয়েছে যে আমার বৌ অতি রূপবতী! কেউ যেন একটুও disappointed না হয়।"

সুমনা বলল, "আচ্ছা তাই হবে। বিয়ের সময় যে শাড়ীটা পরেছিলাম সেইটাই পরব।" ক্রমশঃ

রাজারাণীর যুগ

শ্রীজ্যোতির্ময়ী দেবী

"সালগিরা"

'সালগিরা' মানে জন্মতিথি। সে সময়ে রাজোয়াড়ায় রাজাদের জন্মতিথি একটা বিশেষ উৎসব ও পার্বণ ছিল। 'সাল' বর্ষ 'গিরা' পড়া (বছর পড়ল)। জন্ম-বর্ষ রাজার। এখন শুনি প্রথাটি আর নেই। তা রাজা-রাণী ত আর নেই। 'রাজ প্রমুখ' হলেও তাঁদের ত আজ প্রজা নেই।

এটা সব রাজারই ভাদ্র মাসের একটা বিশেষ দিন বা তিথিতে হ'ত। ঠিক জন্মদিনে বোধ হয় নয়। বিলাতী রাজাদের মত একটা সুবিধামত তৈরী রাজার জন্মদিন করা হ'ত হয়ত।

রাজ কোষাগার থেকে পুণ্যকারখানার সঞ্চয় বরাদ্দ থেকে একটা বিশেষ বরাদ্দ মত খরচ করা হ'ত। নানা দেবালয়ে পূজা পাঠ উৎসব অর্চনা হ'ত। দীন দরিদ্র ও ব্রাহ্মণদের দান করা হ'ত।

আর রাজমাতাদের (পূর্ব রাজার পাঁচজন মহিষী ছিলেন) 'রসোড়া' (রন্ধনশালা) মহলে নানা খাদ্য তৈরীর বিরাট ধুমধাম সুরু হয়ে যেত পুত্রের জন্ম উৎসবের উপলক্ষে। এবং বিকালে একটি বিরাট দরবার ও ভোজ হ'ত মন্ত্রী অমাত্যদের নিয়ে। প্রধানা রাজমাতাই সব উৎসবের কর্ত্রী থাকতেন।

এখন এই রাজমাতা আর "রসোড়া" বা রান্নাঘরের কাহিনী একটু শুনুন। মাজী সাহেব বা রাণীরা সেই রাজা সওয়াই মাধব সিংহের ("সওয়াই" বা সেবাইত গোবিন্দজীর) নিজের মা কেউই ছিলেন না। রাজা পোষ্যপুত্র। সকলেই বিমাতা। এবং কৌতুক এই সকলেই "মাজী সাহেব রাঠোরজী"। বড় মেজ সেজ ন' ছোট —পাঁচ কন্যাকে এই রাজার পিতা কোন্ সময়ে বিয়ে করে আনেন জানি না। তবে আমাদের এক আত্মীয় কৌতুক করে বলতেন রামসিং রাজা একখানি তলোয়ার (বরের প্রতিনিধি) পাঠিয়েই অথবা একদিনেই পাঁচটি রাঠোর রাজকন্যাকে বিয়ে করে যোধপুর রাজাকে কন্যাদায় উদ্ধার করেছিলেন। (আমাদের দেশের সেকালে কুলীন মেয়েদের মত।)

তা একদিনে করুন বা না করুন, কন্যাদায় রাজপুত ঘরে চিরকালই বড় বিষম দায়। তাতে আবার রাজার ঘরে রাজকন্যাদায়।

রাজকন্যাকে রাজার রাণী ঘরণী করে দেওয়াই নিয়ম। না পারলে রাজ কন্যারও আনন্দ নেই—পিতা বা অভিভাবকদেরও সম্মান কমে যায়। মোগল সম্রাট শাহাজাদীদের মত অনূঢ়া রাখাও নিন্দিত হ'ত। কাজেই হোক সতীনের ঘরে, হোক বয়সে বড় মেয়ে, স্বামীর চেয়ে—

বিয়েটা রাজার মেয়ের রাজার ছেলের সঙ্গেই বাঞ্ছনীয়। ধন দৌলত নয় কোটিপতিত্ব নয় 'নরপতি' বা নৃপতি হওয়া চাই! না হলে অনেক সময়ে মহা অশান্তি হ'ত। (গত মহারাজার মেজ এক রাণী বয়সে বড় ছিলেন এক রাজার মেয়ে। বড় রাণী সমবয়সী ছিলেন।) এক রাজকন্যা রাণী না হওয়ার সত্যি গল্প শুনুন, উদয়পুরের এক রাজকন্যার বিবাহ হয়—পিতার অধীনে খুব এক বড় সামন্ত জমীদার সর্দার-ঘরে। কিন্তু রাজা ত, নন ঠাকুর সাহেব মাত্র! পিতার অধীনস্থ আবার। রাজকন্যা ত রাজ কুলবধূ হলেন না! সম্পত্তি সম্পদ যতই কেন থাক্ না রাণী ত হলেন না!

রাজকন্যা সন্তুষ্ট হন নি বলা বাহুল্য।

একদিন রাত্রে ঠাকুর সাহেব পত্নীকে বলেন, রাণাওয়ৎজী, (রাণাজীর কন্যা) আমাকে একটু খাবার জল দাও ত। (এই রকমই সম্বোধন করা নিয়ম। সেকালের 'দেবী' ইত্যাদির মত।)

রাণাওয়ৎজী ভীষণ আশ্চর্য হয়ে গেলেন ও বললেন, "আমি আমার বাপের ঘরে কোনোদিন কারুর হুকুম শুনি নি এবং কখনো এসব ধরনের কাজ করি নি···। আমি জল এনে দোব তোমাকে? এমন কথা স্বামী বলেন কি করে এই তাঁর ভাব! স্বামী হুকুম করেন কি না রাণাকন্যাকে! যেন স্পর্দ্ধা!

ঠাকুর সাহেবও অবাক! এ কেমন স্ত্রী হ'ল, এক গ্লাস জলও দিতে পারবে না?

পরদিন বাইরের নিজ সভা থেকে খবর পাঠালেন 'ঠাকুরাণী'র জন্য রথ তাঞ্জাম (পাল্কী) হাতী ঘোড়ার

সওয়ারীর (যানবাহন) ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি আজ পিত্রালয়ে যেতে পারেন উদয়পুরে!

এবং শ্বশুরকে একখানি পত্র দিয়ে তাঁর বক্তব্য জানালেন। অর্থাৎ রাজকন্যা 'ঠুকুরাণী' বা 'ঠাকুরাণী' (ঠাকুর সাহেবদের স্ত্রী) হয়ে থাকতে চান না! সে কন্যাকে পত্নীরূপে তিনি কি করে ঘরে রাখবেন? পিত্রালয়ই তাঁর যোগ্য বাসস্থান। ঠাকুরাণী হওয়া তিনি অসম্মান মনে করেন।

ঘোড়সওয়ার গেল চিঠি নিয়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে এদিকে রাণাওয়ৎজীও পিত্রালয়ে এসে পৌঁছলেন যথোচিত সম্মান ও সমারোহ করে। যদিও সেদিনে রাজকন্যাদের পিত্রালয়ে যাওয়ার প্রথা ছিল না।

মহারাণাও সব খবর পেয়ে গেছেন ততক্ষণে। তার পর দিন দরবার বসল। ঠাকুর সাহেব সর্দার জামাতাকে পত্র দিলেন পত্রপাঠ দেখা করতে। রাজকার্য আছে। ঠাকুর সাহেব সর্দারজী এলেন। রাণা সহজ সমাদের তাঁকে তাঁর জায়গায় বসালেন।

সভার কাজ শেষ হ'ল।

ঠাকুর সাহেব জুতা পরতে গিয়ে দেখলেন তাঁর জুতা আগলে দাঁড়িয়ে আছেন রাণাপুত্র যুবরাজ। তিনি দেখিয়ে দিলেন। নত হয়ে বললেন, "সর্দারজী, আপনার জুতো আমাকে আজ আগলাবার জন্য মহারাণার হুকুম হয়েছে।"

সর্দারজী আশ্চর্য ও লজ্জিত। এ রকম ত নিয়ম নয়! মহারাণাপুত্র শ্যালকের কাছে লজ্জিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন এমন হুকুম করেছেন মহারাণাজী? তাঁর কি কোনো অপরাধ হয়েছে···'যে ভাবী রাণা তাঁর জুতো আগলাবেন!

লজ্জিত সর্দার রাণার কাছে ফিরে আসতে—রাণা আর কিছু না বলে বললেন, "এবারে তুমি রাণাওয়ৎজীকে (রাজকন্যাকে) নিয়ে বাড়ী চলে যাও। সে আর তোমাকে অসম্মান করবে না···।"

কাহিনীটি সত্য। ছোট্ট হলেও বেশ বোঝা যায় সিংহের বাচ্চাকে সিংহের ঘরেই দেওয়া হলেই ভাল। না হলেই গণ্ডগোল হতে পারে।

কাজেই রাজা-মহারাজাদের রাজার ঘরেই বিয়ে দিতে চেষ্টা করা হ'ত। প্রায়ই পিসি-ভাইঝিরা সতীন হয়ে বসতেন। বোনের বিয়ে না দিয়ে মেয়ের বিয়ে দেওয়া নিন্দনীয়। একসঙ্গে ছোট বড় সব বোনের কুলীনঘরের মেয়েদের মত একক্ষুরে মাথা মুড়িয়ে দেওয়ার মত করে অনেক সময়েই এক ঘরেই সম্প্রদান করে দেওয়ারও প্রথা ছিল। রাজকন্যাদের রাজার রাণী করে দিতে হবে। স্বামীর চেয়ে অনেক বয়সে বড় হোক সতীন হোক, সব বোনেরা কিন্তু নিচুকুলে বিয়ে দেওয়ার প্রথা নেই। 'ঠুকুরাণী' হওয়া রাজকন্যারা চাইতেন না। দশ-বারো বছরের বড় স্বামীদের চেয়ে—এ রকম বিয়ে রাজস্থানে রাজপুত বড় ঘরে ও রাজার ঘরে প্রচলিত ছিল। সতীন ত হ'তই। সেটা সয়ে নিতেন সবাই।

এখন সালগিরার উৎসবে ফিরে আসি। এই মাজী সাহেবরা পুত্রের জন্য পূজাপাঠ করতেন, আশীর্বাদ নির্মাল্য পাঠানোর ব্যবস্থা করতেন। যিনি বয়োজ্যেষ্ঠা সব প্রধানা মাতা তাঁরই নির্দেশে সব হ'ত। সেকালে অনেক রাজা খুবই মাতৃভক্ত ছিলেন। উদয়পুরের এক মহারাণা প্রতিদিন খাবার আগে জননীকে প্রণাম করে খেতে যেতেন নিজের মহলে। মাজী সাহেবদের প্রতাপও খুব ছিল। জননীর কোনো অনুরোধ উপরোধ রাজারা খুব মেনে চলতেন।

আগেই বলেছি এই দিনের এই উৎসবের ভোজের ব্যয়ের ও ক্রিয়া কাণ্ডের এই সব ব্যয়ও রাজকোষ থেকে বরাদ্দ ছিল।

এই দিনের আর একটা যে বিশিষ্ট প্রথা ছিল, সেটা এখন আর নেই। তার কথাই বলছি। তখন ছিল। সেটা আমাদের ছোটদের কাছে খুবই নিমন্ত্রণ মহোৎসব ছিল।

সেটা ছিল রাজ্যের ছোট বড় সব কর্মচারীদের বাড়ীতে বাড়ীতে খাবার পাঠানো। মিষ্টিমুখ করানোই বলুন খাওয়ানোই বলুন রাজার জন্মতিথি উপলক্ষ্য করে। এই উৎসবের পদানুসারে কারুর বাড়ী দু'খানা থালাতে নানা রকমের ওদেশী খাবার আসত। নিম্নপদস্থের বাড়ী খাবারের পরিমাণ কম, থালাও একটা। আর একটা ঝুড়িভরা চমৎকার বাসমতি চালের (দেরাদুনের চাল) ভাত। ভাতের ওপর ঢালা থাকত খানিকটা মুগসিদ্ধ। একটি বড় ভাঁড়ে পায়েস একটি ভাঁড়ে পোয়াটাক ঘি। এটা হ'ল 'কচ্চি' অর্থাৎ অন্নজাতীয় খাদ্য।

আর থালাগুলিতে থাকত 'পাক্কি' খাদ্য। অর্থাৎ লুচিপুরামিষ্টি। বড় বড় শাল পাতার 'দোনায়' (ঠোঙা) ভরা লুচি কচুরি পাঁপড় মালপোয়া খানচার প্রকাণ্ড ঘিয়ের ক্ষীরের খাবার অনেক রকমের বড় বড় জিলাপি অমৃতি মতিচুর বোঁদে গজা মোহনবাগ ক্ষীরের গজা ইত্যাদি সব ওদেশী মিষ্টি। আর নানা রকম ঝিঙে, কুমড়া, কচু, করোলা, ঢেঁড়স ইত্যাদির পৃথক পৃথক সে দেশী

রান্না তরকারি, দইবড়া ছোট দইবড়া একেবারে সব দোনা ভরা ভরা থাকত। সন্দেশ রসগোল্লা জাতীয় খাবার ওদেশে নেই।

পদানুসারে কর্মচারীদের মিষ্টিমুখের দিন আলাদা। উচ্চ কর্মচারীর যেদিন এল সেদিন নিম্নতনদের জন্য জন্মতিথি বা সালগিরার মিষ্টান্ন আসত না। দু' একদিন পরে আসত। বোধ হয় পদমর্যাদা অনুসারে দিন হিসাবে পাঠাবার বিধি-ব্যবস্থা ছিল। আর ভাতের ঝুড়িও ঐ সঙ্গেই আসত, তবে পৃথক ভাবে।

রাজকীয় রন্ধনশালা 'রসোড়া'তেই এগুলি তৈরি করা হ'ত। তত্ত্বাবধানের কর্মচারীরা সব বাড়ী বাড়ী পাঠাতেন দিন অনুসারে। মিষ্টিগুলি রাজকীয় নিজের দোকানে তৈরি করানো হ'ত। কিন্তু এগুলি একেবারে নিরামিষ। রসোড়ায় বা রাজকীয় রন্ধন-প্রাসাদেও রান্নার তিন-চার রকম বিভাগ ছিল। আমাদের দেশের মতই খাবার জিনিসের আচার-বিচার ওদেশেও আছে। বহু ব্রাহ্মণ বৈশ্য জৈন কর্মচারীরা ভাত বা অন্নজাতীয় খাদ্য সকলের হাতে খেতেন না। পাক্কি বা ভাজা খাবার লুচি কচুরি গজা মালপোয়া তরকারিরও আলাদা বিভাগ এবং মিষ্টান্ন শুধু ক্ষীরের খাবারের বিভাগও পৃথক। সেটাকে বলা হ'ত 'শাকাহারী' খাদ্য। ফলার যেমন 'ফলাহার' নয় তেমনি তরকারি 'শাক' না হলেও ফলমূল-মিষ্টি জাতীয় সে-খাবার। ব্রাহ্মণ বৈশ্য ও জৈনরা সকলের হাতে সব জিনিস ত খেতেনই না, আবার জৈনরা 'সরাওগী'দের সূর্যাস্তের পর খাওয়া প্রায় অবিধেয়। রাত্রে তাঁরা প্রায়ই রান্না জিনিস খান না, কীটপতঙ্গ মারা যাবে ভয়ে। কঠোর অহিংস নিয়মে তাঁদের খাওয়া-দাওয়া বিচরণ বারব্রত পালন ও বেশভূষা। কাজেই এই 'শাগার' বা 'শাকাহার' অথবা ফলমূলমিষ্টি অনাচমনীয় খাদ্য বিষয়ে আমাদের দেশের সেকালের নিষ্ঠাবতী বিধবাদের ও ব্রাহ্মণদের আহার প্রথার মতোই এঁদেরও বৈশ্য ও ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় নিয়ম-কানুন খুবই নিষ্ঠাময় কঠোর এখনও আছে।

এই 'কাঁসা' অবশ্য সব বর্ণের জাতির কর্মচারীদের সব বাড়ীতেই যেত। যাঁরা নিজেরা যেতেন না সেদিন তাঁদের দাসদাসী ভৃত্য সমাজের মহোৎসব।

আমাদের বাড়ীতেও ঐ তিন-চার দিন পদানুসারে কর্তাদের জন্য জন্মতিথির বা 'সালগিরা'র থালা এলে শিশুসমাজে এবং ভৃত্যসমাজে খাবার ভাগের সমারোহ পড়ে যেত। রাশি রাশি ভাত ডাল এবং তরকারী পায়েস লুচি মিষ্টির ভাগ পেত দাসদাসী সকলেই।

এ ছাড়া এই'রসোড়া'তে একটা বিশিষ্ট আমিষ বিভাগও ছিল। সেটা আমিষ রান্নার মহা যজ্ঞশালা ছিল। অতি রাজা ও রাজপুতদের খাদ্য মাংস বরাহ মুর্গী নানারকম পাখী-পক্ষী মৃগয়ালব্ধ ভক্ষ্য যত জন্তু প্রায় সবই রান্না হ'ত। (গো-মহিষ সিংহ-বাঘ হাতী-ঘোড়া বাদে) এবং অনেক সময়ে এই রান্নাঘর থেকে বহু বিশিষ্ট কর্মচারী নিজেদের বাড়ীর আত্মীয়-কুটুম্ব অতিথিদের জন্য ভোজ দিলে রাঁধিয়ে আনিয়ে নিতেন নিজ খরচে। আমাদের বাড়ীতেও এইরকম রান্না জিনিস আসতে দেখেছি। এবং রাঁধতেও কিছু শিখতে হয়েছিল মেয়েদের বধূদের।

এই আমিষ বিভাগের 'রসোড়া'তে সাধারণতঃ রাজস্থানী কোনো ব্রাহ্মণই রান্নায় বা সূপকারেরা কাজ করত না। সে রান্নাঘরের বিশিষ্ট কারিকর রাঁধিয়ে ছিল 'মেহরা' নামে একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায় বা জাত। তারা নানাবিধ আমিষ রান্নায় একেবারে দ্রৌপদী বা নল রাজার (বিনাবাস্তবে অবশ্য নয়!) মতোই সিদ্ধহস্ত সম্প্রদায়।

এখন এই প্রসঙ্গে এই রাজকীয় বা রান্নাঘর বা 'রসোড়া'র নিয়ম-কানুন প্রসঙ্গও একটু শুনুন। এই রান্নাঘরের কর্তৃত্বভার থাকত রাজাদের অতি বিশ্বস্ত এবং আত্মীয় কোনো ঠাকুর সাহেব বা সর্দারের ওপর। তিনি রান্নাঘরের তদারক তদ্বির ত করবেনই তা ছাড়াও রাজভবনে সেই খাদ্যসম্ভার পাঠান হলে তাঁকে রাজার কাছে বসে সেইখানেই (রাজকীয় আহারাদি প্রায়ই অন্তঃপুরে হয় না—বহু ভাইবন্ধু সর্দার সামন্তসহ বাহির-মহলে সে খাওয়া-দাওয়া হ'ত) রাজাদের থালায় পরিবেশনের আগে সামনেই প্রত্যেকটি খাবার চেখে দেখতে হ'ত। চিরকালের কূটনীতি অনুসারে এই চাখা। যদি কেউ খাদ্যে বিষ মিশিয়ে দেয়। এ ত সেকালে হ'তই। এবং এই 'চাখা'র ভার নিকট আত্মীয় অথবা যারা ষড়যন্ত্রকারী হতে পারে তাদের ওপরই দেওয়া হ'ত! অর্থাৎ 'চেখে' দেখারও বিপদ কম নয়। মরতে হয় সেই মরবে! সেকালে বিষাক্ত খাদ্যে মরতও লোকে। এই রাজার সময়ে যাঁর ওপর এই 'রসোড়া'র ব্যবস্থাপনার ভার ও 'চাখা'র দায় ছিল তাঁর নাম ছিল রাজা উদয় সিংহ। মহারাজার পিতার দাসী বা বাদীপুত্র অর্থাৎ একজন লালজী সাহেব। সম্পর্কে রাজার বাঁদীপুত্র ভাই হলেন (মহাভারতের বিদুরের মতো)। রাজা খেতাবও এই মহারাজা তাঁকে দেন। পিতার কাছে (পূর্বরাজার) থেকেও জায়গীর ও বহু খেলাত পেয়েছিলেন। এই জায়গীর লালজী সাহেবরা পেয়ে থাকেন চিরকালই।

রাজার 'রসোড়া'র ভার, খাবার ব্যবস্থা, ভাই বন্ধু পাত্র মিত্র কুটুম্ব আত্মীয়-অভ্যাগত সব নিয়ে এই খাওয়ান সবই রাজা উদয় সিংজীকেই করতে হ'ত। 'মেনু' বা খাদ্য-তালিকাও তাঁর নির্দেশে হ'ত।

রাজপুত সর্দারেরা ঠাকুর লোকেরা (জমিদার) সকলেরই মধ্যে এক থালায় বা 'পাতাপাতি' করে খাবার প্রথা আছে। মনে হয় সেটাও কূটনীতি একটা। মরি ত দু'জনেই মরব। একটি থালায় অসংখ্য বাটিতে সাজিয়ে সব খাবার দেওয়া হ'ত। এবং নিজের নিকট সম্পর্কীয় ভাইয়েরা সগোত্রীয়েরা একটা থালা থেকেই বাটিতে তুলে নিয়ে চামচ বা হাতে করে খেতেন। মুসলমানদের মতোই অনেকটা। এই এক পাতে খাওয়া আরও কিন্তু অনেক জায়গায় দেখেছি। পিতা-পুত্রে মাতা-কন্যায় ভাই-ভাইয়ে। বিহারে এই খাওয়ার প্রথা আছে। পূর্ববঙ্গেও অনেক জায়গায় আছে। পঞ্জাবে উচ্ছিষ্ট বিচার নেই। কিন্তু একপাতে খাওয়াও দেখি নি। ব্রাহ্মণরা কিন্তু কোনোখানেই কারুর সঙ্গে একপাতে খান না। মাদ্রাজে মোটেই পাতাপাতি খাওয়া নেই।

প্রতি বছর এই 'সালগিরা'র দিন সন্ধ্যায় দরবার-সভা বসত। বলা বাহুল্য, কি ব্যাপার কি রকম রাজসভা আমরা জানি না। দেখিনি কখনও।

শুধু দেখতাম, বাড়ীর যত রাজার কর্মচারীরা লাল টকটকে রঙের চোগা-চাপকান পাজামা পাগড়ি সবই লাল (খুনখারাপী রঙের) মোজা অবধি লাল পরে দরবারে যাচ্ছেন। এবং নিজেদের পদানুসারে দেয় নজরের টাকা দিয়ে রাজাকে 'নজর' করবেন। সেই টাকাগুলি কিন্তু সেই দেশী বা 'স্বদেশী' টাকা হওয়া চাই। অর্থাৎ জয়পুরের রাজ্যের টাঁকশালে তৈরী একরকম রাজ সরকারের টাকা ছিল, তাকে 'ঝাড়সাহী' টাকা বলত। (মোহরও 'ঝাড়সাহী' হ'ত) সেই টাকাতেই রাজ্যের আয়-ব্যয় খাজনা-খরচ হিসাব-নিকাশের প্রথা ছিল। কর্মচারীরা সেই টাকা দিয়েই মাহিনা বেতন পেতেন এবং 'নজর'ও সেই টাকাতে করতে হ'ত। বেশ মোটা মোটা কলসীর তলার 'ঢেবুয়া'র মতো সে টাকা দেখতে। যার একদিকে 'ঝাড়ে'র মতো, অন্যদিকে কি উর্দু লেখা থাকত। এই টাকার আবার দাম ছিল বেশী—বিলিতী ভারতের টাকার চেয়ে। দু', তিন, চার আনা অবধিও বেশী 'বাটা' লাগত। ব্রিটিশ ভারতের টাকাকে এদেশে বলত 'কলদার' টাকা অর্থাৎ (কলের তৈরী টাকা)। অর্থাৎ একটি বিলিতী টাকার দাম ৸৴০ বা ৸৶০ আনা 'ঝাড়শাহী' টাকার দাম ১৶০ বা আরও বেশা কম। যেন বিদেশী টাকার উপর 'কর' বসানোর ব্যবস্থা। তামার পয়সাও ঐ গড়নের ছিল।

এই 'দেশীয়' টাকাই রাজাকে যথারীতি কুর্ণিশ করে হাতে ফর্সা রুমালে নিয়ে দু'হাতে করে 'নজর' করতে হ'ত। তাজিমী সর্দাররা ৫৲ হিসাবে নজর দিতেন। আর সকলের ১৲।২৲ এর বেশী নেওয়ার রীতি ছিল না। নির্দিষ্ট পদের দেয় রেট নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে দেওয়া-নেওয়ার প্রথা ছিল। কিন্তু এইসব রাজসভা ত আমরা দেখি নি। পুরানো চিঠিপত্র কুটুম্ব-আত্মীয় কারুর বাড়ীতে লেখা চিঠি থেকে একটু তুলে দিয়ে রাজসভার ও নজরের বিবরণ দিই। আমরা ত সিংহাসন বা সভা দেখি নি কখনই।

"কাল প্রথম রাজসভায় প্যালেসে গিয়েছিলাম। গল্পে যেমন পড়া যায় প্রায় তেমনি। রাজা দরবারে আসিবার সময় চারিদিকে বন্দনা-স্তোত্র পাঠ হয়। সিংহাসনের সামনে খানিক দূরে নর্তকীরা নৃত্য-গীত করে। আর রাজা সিংহাসনে বসিলে সর্দার ঠাকুর লোক (জমিদার) অন্যান্য কর্মচারীরা হাঁটু গেড়ে নিচু হয়ে বসে পদানুযায়ী নজর দিতে আরম্ভ করেন এবং অনুচরেরা রাজাধি-রাজকে 'সলামত' (বন্দনা) সুর করে বলে। নজরের মুদ্রাগুলি রাজা ছুঁয়ে পাশের লোকের হাতে দেন।

"প্রত্যেক ব্যক্তির সভায় বসার জন্য নির্দিষ্ট আসন আছে, কেউ কারুর জায়গায় ইচ্ছামত বসতে পারে না…।" রাজা কিন্তু জামাই-কুটুম্বের 'নজর' শুধু ছুঁয়ে দিতেন, নিতেন না।

এই নজরের টাকা রাজার নিজস্ব কোষে (কবট্‌-দোয়ারা) জমাইত। এর পরে সেদিন রাজসভায় ভোজের নিমন্ত্রণ পদস্থ কর্মচারী ও সর্দারদের থাকত।

এই নিমন্ত্রণটি অবশ্য খাবারই জন্য। ঐ দেশের সেকালের প্রথানুসারে সামনাসামনি দু'খানা পিঁড়ি পাতা হ'ত। একটিতে বসবার আসন পাতা অন্যটি চাদর দিয়ে ঢাকা। চাদর-ঢাকা ('দস্তরখান') পিঁড়িখানিতে সেদিন রূপার কলই-করা অথবা রূপারই থালায় (কাঁসা) করে অসংখ্য রূপার বাটিতে করে নানাবিধ ভোজ্য থাকত। বহু রকমের পোলাও অনেক রকমের মাংস, বহু তরকারী ক্ষীর সোনালী তবক-ঢাকা চালের গুড়ার ক্ষীর মিষ্টান্নাদি থাকত। অনেক রাত্রিতে সে ভোজ শেষ হ'ত। পূর্বে বলেছি পিতামহ নিরামিষাশী বলে তাঁর থালাখানি তাঁর গাড়ীতে বাড়ীর জন্য তুলে দেওয়া হ'ত। বাড়ীর ছোটদের মধ্যে পর দিন ঐ ভোজ্যের ভাগাভাগির সমারোহ পড়ে যেত। সবচেয়ে ঝোঁক পড়ত ঐ সোনালী

বা রূপালী পাত-ঢাকা ক্ষীরটিতে। কিন্তু যেমন চোখ পড়ত একটা প্রকাণ্ড ছাগ মুড়ির বাটিতে, আর সকলেই অস্বস্তিভরে পিছিয়ে হাত গুটিয়ে দাঁড়াত।

এর সঙ্গে থাকত সোনালী-রূপালী তবক-মোড়া 'বিড়া' (পান)। সোনালী-রূপালী করা লবঙ্গ এলাচ বড় এলাচ, রূপার থালা ভরা ঝকমক করা মুখশুদ্ধি। ছোট ছোট এলাচ লবঙ্গগুলিও সব সোনালী-রূপালী পাত-মোড়া।

ঐ 'বিড়া' বা পান রাজা বিশিষ্ট অনেককে হাতে করে কখন কখন দিতেন। সেটি পরম অনুগ্রহ ও প্রীতির চিহ্ন স্বরূপ। রাজস্থানের গল্পে শুনি সেকালে যুদ্ধবিগ্রহের সময়ে আহ্বান করলে ঐ 'বিড়া' যিনি নিতেন প্রথমে তিনি মহা প্রিয়পাত্র হতেন।

আরও এই ধরনের বিশিষ্ট দরবার কয়েকটির কথা বলে এই সালগিরা প্রসঙ্গ শেষ করি।

রাজার জন্মতিথির দরবারে ছোট-বড় সব কর্মচারীরই লাল পোশাক পরে দরবারে উপস্থিতির নিয়ম ছিল।

শ্রাবণ মাসে শুক্লা তৃতীয়াতে একটি খুব বড় মেলা হ'ত, সেটিকে 'তীজ গঙ্গোর' মেলা বলা হ'ত। গণগৌরীর বা গৌরীদেবীর তৃতীয়া (তীজের) দিনের উৎসব-মেলা।

এই দিনটা আবার 'হরিয়ালী'কা 'তীজ'ও বলা হয় অর্থাৎ শ্রাবণের হরিৎ শোভায় গণগৌরীর পূজার মেলা। এর পরেই ঝুলন উৎসবের আরম্ভ মন্দিরে মন্দিরে। আর ঘরে ঘরে বনে বাগানে দোল্‌না টাঙ্গিয়ে ঝুলন মেলার 'কাজরী' সঙ্গীত উৎসব। এই উৎসবকথা সেকালের মেলাপ্রসঙ্গে বলবার চেষ্টা করব।

এই 'হরিয়ালী'কা বা হরিৎ মহোৎসবের 'তীজে'র দিন (তৃতীয়ার) গণগৌরী ('গঙ্গোর') মেলার দিন যে দরবার হয় তার ঐতিহ্য ঠিক কি জানি না। এই দিনে কর্মচারীরা সকলেই সবুজ রঙের চোগা-চাপকান পাজামা পাগড়ি পরে দরবার উৎসবে যেতেন। সেদিনও 'নজর' করতে হ'ত। শহরের সব কর্মচারীরা যাঁরা দরবারে উপস্থিত হতেন, সকলেরই পোশাক সবুজ পরতে হবে।

এর পরের বিশিষ্ট দরবার 'দশেরা'। অর্থাৎ দুর্গাপূজার সময় হ'ত কোজাগরী পূর্ণিমায়। সেটি শরৎ পূর্ণিমার দরবার নামে অভিহিত।

সেদিন আবার সবাই সাদা কাপড় বা সাদা পোশাক পরতেন। ওদেশে শাদা পাগড়ি ত শোকের চিহ্ন, সাধারণতঃ পরার নিয়ম নয়। সেদিন অতি ফিকে গোলাপী কিংবা হলদে রং মতিয়া (হলুদ-গোলাপী) রঙের পাগড়ি পরা হ'ত। সর্দার সামন্ত ঠাকুররা যাঁরা গহনা পরতেন, তাঁরা সেদিন সোনার গহনা না পরে রূপা এবং হীরামুক্তা পরতেন।

এ দরবার বসত সাধারণতঃ অম্বরের পুরানো প্রাসাদে—এ দিনে মহারাণীও দরবার আহ্বান করতেন। তাঁদেরও সকলের এক অতি ফিকে রঙের ঘাগ্‌রা ওড়না পরতে হ'ত—এবং রূপার ও হীরামুক্তার অলঙ্কার।

এ দরবার মহারাণী করতেন অন্তঃপুরে অন্য রাণীদের এবং নানা পদস্থ কর্মচারীর পত্নী ঠাকুরাণী ও শেঠানীদের নিয়ে। নজরও দিতে হ'ত এবং প্রথানুযায়ী প্রায় শাদা কাপড়-চোপড় পরা ও গহনাও শাদা রঙের পরা হ'ত (শাঁখা পরার প্রথা ওদেশে নেই। তা হলে হয়ত শঙ্খ বলয়ই সকলে পরতেন)।

এই সব দরবারেই নজর নেওয়া হ'ত। কিন্তু 'সালগিরা' আর রাধাষ্টমীর উৎসবের দিন রাজকর্মচারীরা খেতাব খেলাত জায়গীর শিরোপা পুরস্কার পেতেন ভাগ্যবান হলে। লোকে আশা দুরাশা করে থাকত।

শিক্ষা ব্যবস্থা

যতদূর মনে আছে সেকালে রাজস্থানে ও জয়পুরে স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা, টোল, চন্দ্রতোরণ বা 'চাঁদপোল' স্কুল সংস্কৃত কলেজ, মহারাজা কলেজ, সর্বত্রই বিদ্যাদান অবৈতনিক ছিল। রাজকীয় শিক্ষাবিভাগের সাহায্যে ও দানে সেগুলি পুষ্ট আর পরিচালিত হ'ত। ক্রিশ্চান স্কুল-কলেজগুলিও মনে হয় তখন সবই অবৈতনিক ছিল অন্ততঃ মেয়েস্কুলগুলি ত বেতন নিত না। বড় বড় স্কুল-কলেজ রাজার শিক্ষাদানভাণ্ডার থেকেই খরচ চালাত। সামান্য কয়েক বছর আগেও মহারাণী গায়ত্রীদেবী গার্লস স্কুলেরও মাহিনা লাগত না। মেয়েদের স্কুলের গাড়ী মনে হয় ছিল না। ঘরের গাড়ীতেই সব মেয়েরা যাতায়াত করত, সঙ্গিনীদেরও নিয়ে নিত। বেতন কিন্তু একেবারেই দিতে হ'ত না। (সেকালে ষ্টেটের পদস্থ কর্মচারীরা গাড়ীর জন্য ভাতা পেতেন। গাড়ী একখানি তাঁদের করিয়ে হয়ত নিতে হ'ত। কিন্তু ঘোড়ার খোরাকি সহিসের মাহিনা বেতনের সঙ্গে পেতেন। কখনও কখনও রাজকীয় সৈন্য বিভাগের গাড়ীও তাঁরা ব্যবহার করতে পেতেন। তবে সে গাড়ী হুকুমের চাকরি করত না আপিস সময় ছাড়া)।

যাই হোক পড়াশোনা অবৈতনিক থাকাতে ব্রাহ্মণ বৈশ্য (বানিয়া) মুসলমান রাজপুত ক্ষত্রিয় সকলেই মোটামুটি টোল মাদ্রাসা স্কুলের শিক্ষা সহজেই নিতে পেতেন। তবু উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে বা কলেজের ছাত্র

খুব বেশী হ'ত না—বিনা বেতনের বিদ্যার সুযোগ পেলেও! মনে হয় অনেকেই জাতব্যবসা নিতেন বৈশ্য সম্প্রদায়। ব্রাহ্মণ সংস্কৃত পাঠশালায় ঢুকে পড়তেন। সেকালের রাজপুত ক্ষত্রিয়দের মধ্যে বিদ্যার্জনের চেয়ে ঝোঁক ছিল জমিদারী জায়গীর দেখা, শিকার করা, গান-বাজনার সখ, ওস্তাদ-বাঈজী মোসাহেব পরিবৃত হয়ে থাকায়। অন্য শ্রেণীরা 'দারোগা' মীনা 'হীর' (আভীর) গোপ জাঠ ভীল জাতীয় নানা সম্প্রদায় জোয়ান মজবুত চেহারা ও দুঃসাহসের জোরে প্রায়ই সামান্য পড়ে বা না পড়েই সেপাইতে ভর্ত্তি হয়ে যেত ও জাত-ব্যবসা করত। আর ইংরাজী শিক্ষার চেয়ে উর্দু ফার্সী শেখার চলনই তখনও খুব ছিল। (আঙুলের টিপসই দিয়েই সই করে নিত সেপাইরা ও সাধারণ সবাই।)

এক কথায় শিক্ষার গুণাগুণ প্রচার তেমন ছিল না। আর সেজন্য শিক্ষার বা আনুসঙ্গিকভাবে কাজের উচ্চাকাঙ্ক্ষাও কারুর মনে বেশী হ'ত না। ঠিক এই ইংরেজী শিক্ষার জন্যেই দেশীয় রাজ্যে সে সময়ে অনেক বাঙালী ও অন্য প্রদেশীয় প্রধান হয়ে উঠেছিলেন। অন্নের বা জীবিকার অভাবও খুব ছিল না মনে হয় সে প্রদেশীয়ের। চাকরির মোহও কম ছিল।

যাই হোক মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষালয় বা স্কুল থাকা সত্ত্বেও আমরা জন্মে স্কুলের মুখ দেখি নি। সেকালের প্রথা মতো। এবং স্কুলগুলিতে 'রইস' বা 'ঘরানা' ঘরের রাজপুত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বাঙালী কারুর মেয়েই পড়তে যেত না। নিন্দার ভয়ে বা লোকাচার অনুসারে যে কারণেই হোক। দেশের অন্য সকলে কি করত জানি না, মনে হয় বেশীর ভাগই নিরক্ষর থেকে যেত। আমরা বাঙালী মেয়েরা ঘরোয়া পণ্ডিতজী ও মাষ্টার মশাইয়ের কাছে সামান্য হিন্দী ও বাংলা খান চার-পাঁচ বইয়ের প্রথম ভাগ থেকে বোধোদয় অবধি 'বিদ্যাসাগরী' প্রথম পাঠের শিক্ষা পেয়েছিলাম পাঁচ বছর থেকে দশ-এগার বছর অবধি। অর্থাৎ বিয়ে না হওয়া অবধি! পাঁচ-ছয়টি বছরেই শিক্ষা সমাপ্ত হ'ত আমাদের মাষ্টারের কাছে।

কাজেই সেকালে মেয়েস্কুলগুলিতে তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণী অবধিই পড়ান হ'ত। কে পড়াত? ঠিক জানি না। খ্রীশ্চান স্কুলে মেম সাহেবরা দেখতেন তবে একজন বাঙালী মেয়ে ছিলেন নাম লক্ষ্মীমণি, খ্রীশ্চান। দেশী খ্রীশ্চানও কম ছিলেন না। তাঁরা পড়াতেনও এবং তাঁদের ছেলেমেয়েরা পড়ত। ধর্মান্তরিতদের মেয়েরা পড়ত এবং নিম্নস্তরই বস্তির শিশু বালিকারা। 'পট্টি' (কাঠের শ্লেট) আর বই হাতে পড়তে যেত।

কিন্তু দেশের লোকের ছেলেমেয়েরা এই সুযোগ পরিপূর্ণ না পেলেও বাইরে থেকে আসা বাঙালীর ছেলেরা ও অনেক ছাত্র এই বিনা ব্যয়ে শিক্ষার সুযোগ পেয়েছেন ও নিয়েছেন। স্বনামধন্য একজনের নাম করি, তিনি দূর বাংলা দেশের বোধ হয় ফরিদপুরের ছেলে। বিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়!

বাংলা দেশ থেকে ইনি তখনকার এন্ট্রেন্স পাস করে এফ. এ. ও বি. এ. জয়পুর মহারাজা কলেজে পড়ে এম.এ. পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে কাশীতে কাজ নিয়ে চলে যান। অদ্ভুত পড়াশুনার ঝোঁক ছিল। ঘরে নানা রকমের বইয়ের সমাবেশ ছিল। নিঃশব্দ নীরব শান্ত একাগ্রমন ছাত্র ছিলেন সে সময়েও। এঁর পরিচয় নতুন করে দেবার দরকার নেই। এখনকার দিনে এত বড় পণ্ডিত ও দার্শনিক ধার্মিক ওঁর মত কমই আছেন শোনা যায়। এঁর নাম জয়পুর মহারাজা কলেজের গৌরব যে কত বাড়িয়েছে সীমা হয় না। ইনি জয়পুরের বাঙালী ছাত্রদের, বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করেছেন।

তখন জয়পুরের কলেজগুলি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। আর লোকে বলত এলাহাবাদের পরীক্ষার আদর্শ কিছু কঠোর। যাই হউক যেদিন শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় সসম্মানে পাস করলেন, সেখানকার বাঙালীদের কি আনন্দ ও গর্ব হয়েছিল বোঝাই যায়!

স্থানীয় বাঙালী ছেলেরা ওখানকার স্কুল-কলেজেই পড়াশুনা করেছেন বেশীর ভাগ। তবে অনেকে কলকাতায় বা অন্যত্রও পড়তে গেছেন। ওদেশের লোক স্বর্গীয় নওরঙ্গা রায়ের ছেলে দেবীপ্রসাদ খৈতান বাংলা দেশে পড়তে আসেন। ঈশান স্কলার হয়েছিলেন। বেশ ভাল বাংলা জানেন। এই খৈতান পরিবার খুব শিক্ষিত।

উর্দু ও ফার্সী পড়ার চলন তখন খুব ছিল। এখনও আছে, কম। লাইব্রেরীর নামটি দেবনাগরী অক্ষরে লেখা 'পুস্তকালয়'। পাশেই কিন্তু উর্দুতে লেখা (লাইব্রেরী?)। দু'চার লাইন উর্দু ছেলেরাও পড়তই। আমরাও একটু ডানদিক থেকে লেখা—আলিফ, বে, তে, পড়বার চেষ্টা করতাম। কিন্তু ঐ 'মিম্' 'নুন' অবধিই। উর্দুতে ত 'একার' 'ওকার' 'আকার' নেই শুধু শব্দগুলি সাজানো হয়। সেকালে ফার্সী ও উর্দু জানাটা ওদেশে ইংরাজীর মতই মার্জ্জিত সভ্যতার পরিচায়ক ছিল। (আগের 'রাজভাষা' বলে?) দোকানে পশারে ত কাজে

লাগতই। দোকানের নাম-ধামও হিন্দীর সঙ্গে উর্দুতে থাকত প্রায়ই। উর্দু অক্ষরটি অবোধ্য হলেও কথ্য ভাষাটি ভারি মিষ্টিও, সহজও, হিন্দীর সঙ্গে সাদৃশ্যও খুব। কথা বলতে বেশী তফাৎ বোঝা যায় না। তবে জয়পুরের কথ্য ভাষাটাকেও (মুদ্রার মতই) বলে 'ঝাড়শাহী'। সেটা কিন্তু প্রায় সমস্ত রাজস্থানী ভাষার সঙ্গে মেলে। সামান্য এদিক-ওদিক তফাৎ হয়। একটু হিন্দী উর্দু আর স্থানীয় ভাষা মিলিয়ে বাঙালী মেয়েরাও লোকজনদের কথা শুনে শিখে ভুল হিন্দীতে বেশ কাজ চালানো কথা শিখে যান। অবশ্য সে বিদ্যেতে বড় বড় ঘরে কিম্বা বিদ্বৎ-সমাজে কথা বলার প্রবেশাধিকার হয় না। তবে 'ঝাড়সাহী' কথার একটা সুবিধা আছে ক্রিয়া কর্ম নিয়ে সূক্ষ্ম লিঙ্গ বিচার নেই। 'লাড্ডু খায়া থা' 'কচৌরী কচুরী খাই থি' 'গাড়ী চল্ দিই', ধরনের। লাড্ডুটা পুং-লিঙ্গ কচুরী স্ত্রী এই হিসাব। তবু বাঙলীর ভুল হয়ে যায়।

মোটামুটি লেখাপড়ার সুযোগ না পেলেও কথ্য ভাষা শেখায় অসুবিধা মেয়েদের ছিল না দাসদাসী ও ছেলেমেয়েদের কল্যাণে।

যাই হোক বৃদ্ধ মহারাজা মাধব সিংহের মৃত্যুর পর নাবালক রাজার রিজেণ্ট আমলে দেখা গেল হঠাৎ শিক্ষা আর অবৈতনিক নেই! কলেজেরও না স্কুলেও না। তা হলে কি ছাত্রছাত্রী বেড়েছিল? মনে হয় না। মনে হয় রাজ্য সরকার কিঞ্চিৎ সভ্য ও হিসেবী হয়ে উঠে-ছিলেন। তাই রাজকোষে বিদ্যাদানের অর্থাভাব ঘটে ছিল।

এখন মেয়ে স্কুল কলেজ ছেলেদের কলেজ সবই ভর-পুর। জায়গা পায় না। মাহিনাও ভাল। শিক্ষিতা হন মেয়েরা। যেদিন বিনা বেতনের বিদ্যা পাবার সুযোগ ছিল সেদিন কিন্তু এই ভীড় জমে নি। বোধ হয় দাম দিতে হলেই মূল্যবোধ মনে জাগে।

সেই সময়ের আরও কত দিন পরে এক সময়ে জয়পুরে গিয়ে দেখলাম ও শুনলাম ইংরাজী স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মাহিনাও অত্যন্ত সভ্য ভাবে বেড়েছে।

সংস্কৃত কলেজ ও টোলের কি ভাবে বেড়েছে খবর ঠিক পাই নি। এবং মাদ্রাসা বা মুসলমান ছাত্রদের ত আলাদা শিক্ষালয় ছিল বলে মনে হয় না। সব স্কুলকেই মাদারসা বা মাদ্রাসা বলত লোকে। সে সব ক্ষেত্রে বিদ্যাদানের ব্যবস্থা উঠে গিয়ে সভ্য ভাবে বিদ্যা কেনার ব্যবস্থা হয়েছে। যদিও তার মাত্র দশ বছর আগে আমাদেরই মেয়েছেলেরা অবৈতনিক ছাত্র হয়েই লেখা-পড়া করেছিল।

সেদিনের—তুমি

হাসিরাশি দেবী

কাল রাতে দেখেছি তোমাকে—:
তারার আলোর ফাঁকে ফাঁকে,
যখন জোনাকি ওর নীল চোখ মেলে আর ঢাকে
সে সময় দেখেছি তোমাকে।
মাঝে মাঝে মিয়ানো হাওয়ায়
পাতার ঝালরগুলো ঝিরি ঝিরি এক সুরেলায়
যখন বলেছে কথা—
আমার ঘরের এই খোলা জানালায়।
ঝিম্ ঝিমে রাতে তাই ঘুম ভাঙ্গা চমকানি নিয়ে—
মনের পাখীটা জেগে উঠেছিল হঠাৎ ককিয়ে।
তার মাঝে শুনেছি আবার—
প্রায় ভুলে থাকা এক—বলেছিলে যে কথা তোমার।

তুমি যেন বলেছিলে—পুকুরের কোন কালো জলে
ভাসিয়েছ ফুল—
আমি যেন একা বসে সীমাহীন আকাশের তলে
ছড়িয়েছি চুল—
সারা পৃথিবীতে—!
তার পর কি এক সঙ্গীতে—
বেজে ওঠে দুটো মনই—বাজে তারগুলো—
বুকের বীণায়। ভাঙ্গা-চোরা খাটে খাটে যত জমা ধুলো
হঠাৎ উড়িয়ে দেয় কোন যাদুকর—!
ঘড়ির কাঁটার মত নড়ে নড়ে সরে গেল রাতের প্রহর-
গুলো—এখানে ওখানে মাথা ঠুকে—।
মনে হ'ল দেখলেম—নতুন কৌতুকে
কালো রাত শাদা হতে চলে—
চাঁদ ওঠে; ফুল ডোবে পুকুরের জলে।

বিপ্লবীর জীবন-দর্শন

প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী

বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে বাংলার জনগণ সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে তীব্র প্রতিবাদ জানাল। তার সঙ্গে ভূপেন্দ্রনাথ বসু—তখন আনন্দমোহন বসুও জীবিত ছিলেন, কৃষ্ণকুমার মিত্র, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, ফরিদপুরের অম্বিকাচরণ মজুমদার, ঢাকার আনন্দচন্দ্র রায়, বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্ত, ময়মনসিংহের অনাথবন্ধু গুহ, চট্টগ্রামের যাত্রামোহন সেন, বহরমপুরের বৈকুণ্ঠনাথ সেন, রাজশাহীর কিশোরীমোহন চৌধুরী, রংপুরের ঈশান চক্রবর্তী প্রভৃতি আরও অনেকে যোগ দিলেন।

কলকাতায় বিরাট সভা হতে লাগল। মফঃস্বলেও প্রতিবাদ তীব্র হয়ে উঠল। আমি তখন নারায়ণগঞ্জে ষষ্ঠশ্রেণীর ছাত্র। মনে আছে, ছুটির পর বাড়ী না গিয়ে ক্লাসেই থেকে যেতাম এবং দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকাতে যা পড়তাম তাই বক্তৃতা করতাম ও আলোচনা হ'ত। মাষ্টারমশাইরাও এ বিষয়ে আমাদের উৎসাহিত করতেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের মাষ্টার রুহিনী দাসের কথা কোনোদিনই ভুলতে পারব না। তিনি রমাকান্ত রায়ের জাপানের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, জাপানীরা তাঁকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিল—"শুনেছি, তোমাদের দেশে নাকি পুরুষ মানুষ নেই? এ কথা কি সত্যি!" রমাকান্তবাবু তখন জবাবে জিজ্ঞেস করলেন যে, তাঁকে দেখেও কি তাই মনে হয় নাকি? তখন ওরা বলেছিল, তাই যদি হয় তবে ত্রিশ কোটি ভারতবাসীকে দু'এক লাখ ইংরেজ কি করে সাত-সমুদ্র পার হয়ে এসে পদানত রাখতে পারে? স্বদেশপ্রেম ছাড়াও নানা সদ্‌গুণ যাতে আমাদের মধ্যে জাগ্রত হয় সে বিষয়ে অনেক উপদেশ দিতেন নানা গল্পচ্ছলে। ভবিষ্যৎ জীবনে-নির্জন কারাকক্ষে বসে যাঁদের কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেছি রুহিনীবাবু তাঁদের অন্যতম।

বাংলা দেশের হিন্দুরা একবাক্যে বঙ্গ-বিভাগের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেও মুসলমানদের মধ্যে একদল নবাব সলিমুল্লার নেতৃত্বে বঙ্গ-বিভাগ সমর্থন করল। মুসলমানদের মধ্যে তখনও তেমন কোন রাজনৈতিক চেতনার লক্ষণ দেখা দেয় নি। তাঁদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি জাগ্রত করে বঙ্গ-বিভাগের সমর্থন পাওয়ার জন্য লর্ড কার্জন স্বয়ং পূর্ববঙ্গ সফরে এলেন। ঢাকা যাওয়ার পথে নারায়ণগঞ্জ ষ্টেশনে সহস্র সহস্র লোক সমবেত হয়েছিল। আমিও গিয়েছিলাম। বড়লাট ছিল তখন ভারতবাসীর কাছে একটা দর্শনযোগ্য অদ্ভুত মানুষ। তিনি এমন একটা সর্বশক্তিমান ভীতিব্যঞ্জক মানুষ ছিলেন যে, পূর্বজন্মার্জিত পুণ্যের ফলে দুই-একজন ভারতবাসী ছাড়া অন্য কোনো ভারতীয় তাঁর কাছে যাওয়ারই কল্পনা করতে পারত না! এখনও বেশ মনে আছে, লর্ড কার্জন কেমন করে একটা পা ঈষৎ টেনে টেনে ষ্টীমার থেকে জেটির উপর দিয়ে হেঁটে রেলওয়ে প্ল্যাটফরমে এসেছিলেন। একদিকে বন্দুকধারী পুলিস ও সৈন্যের সঙ্গিন সূর্যালোকে ঝক্‌ঝক্ করছিল, লাঠিধারী পুলিস জনতাকে হট্ যাও হট্ যাও বলে কারণে অকারণে ধাক্কা দিচ্ছিল, অপরদিকে দেশের সাধারণ লোক বিশেষ করে হিন্দুরা ক্ষুব্ধ চিত্তে দাঁড়িয়েছিল। বৃদ্ধ সর্বজনমান্য নেতৃবর্গ দূরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলছিলেন—Save us from partition, save us from partition (আমাদের বঙ্গ-বিভাগ থেকে বাঁচাও)। ট্রেন যখন শহরের উপর লেভেল-ক্রসিং দিয়ে যাচ্ছিল তখনও বহু বৃদ্ধ নেতা একই উক্তি করেছিলেন, আবেদন জানিয়েছিলেন। সহস্র সহস্র জনতার মধ্যে থেকেও সেদিন নিজেকে বড় নিঃসহায় বোধ করেছিলাম। জনতার কাতরোক্তির দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে, দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়া আর মাননীয় বৃদ্ধ ভদ্রলোকের প্রার্থনা—এই দুটি চিত্র আমাকে বিশেষ ভাবে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল।

লর্ড কার্জন ঢাকা গিয়ে নবাব সলিমুল্লা ও পূর্ববঙ্গের অনেক মুসলমান প্রধানদের সঙ্গে আলাপ করে বঙ্গভঙ্গে মুসলমানের স্বার্থ বুঝিয়ে দিলেন।

নানা জায়গায় সভা করে মুসলমানরা বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করে প্রস্তাব গ্রহণ করল। নারায়ণগঞ্জ জিমখানা গ্রাউণ্ডে এক বিরাট সভার কথা মনে আছে। ওখানে সাধারণত দেশীয় কোন লোক যেতে পারত না। কিন্তু ব্রিটিশ স্বার্থের জন্য ইউরোপীয়ানরা সানন্দে সভা হতে সম্মতি দিল। বোধ-হয় নসরালী চৌধুরীও সভায় উপস্থিত ছিলেন। তখনকার দিনে লাউডস্পীকার ছিল না।

প্রকাণ্ড গ্রাউণ্ডের বিভিন্ন স্থানে এক সময়ে বহু বক্তা চেয়ারে দাঁড়িয়ে বঙ্গ-বিভাগ সমর্থন করে বক্তৃতা দেয়।

অন্যদিকের চিত্র হচ্ছে এই যে, সারা বাংলা থেকে গণ-আবেদন (mass petition) গেল। কিন্তু কোন ফলই হ'ল না। ১৯০৬ সনে বঙ্গ-বিভাগ হয়ে গেল। ঐ বছরই ৭ই আগষ্ট কলকাতা টাউন হলে বিরাট সভায় প্রতিবাদ জানিয়ে বঙ্গভঙ্গ রোধের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করা হ'ল। স্থির করা হ'ল স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ করতে হবে, বিদেশী পণ্য বর্জন করতে হবে।

নেতারা জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে, প্রচারে বেরুলেন, সর্বত্র সভা-শোভাযাত্রা হতে লাগল। এই আন্দোলনকে কেবলমাত্র ব্রিটিশ-পণ্য-বর্জন আন্দোলন বলে মনে করলে ভুল হবে। গোটা দেশ স্বদেশপ্রেমের বন্যায় ভেসে গেল। শুধু কি রাজনৈতিক নেতা, দেশের সর্বশ্রেণীর লোক যথাশক্তি জাতির মুক্তিকামনায় এগিয়ে এল। কবি, সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, শিল্পী এমনকি যাত্রাওয়ালা, কবিওয়ালা, কথকঠাকুররা পর্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিলেন।

৩০শে আশ্বিন রাখী-বন্ধন উৎসব হ'ল। ব্রিটিশ সরকার আমাদের ভাগ করে দিলেও আমরা পরস্পরের সঙ্গে আরও দৃঢ়ভাবে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হলাম। একে অপরের হাতে রাখী বেঁধে দিলাম। সেই দিনটা ছিল অরন্ধনের দিন। সর্বাত্মক হরতাল পালন করা হ'ল। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা লিখলেন। ঠিক ব্রতের কথার ধরনেই সকলের বোধগম্য করে পুস্তকখানা লেখা হয়েছিল, আর তা ঘরে ঘরে সকলে একত্র বসে ভক্তি সহকারে পাঠ করল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনই হ'ল ভারতীয় জাতীয়তাবোধের প্রথম বিস্ফোরণ।

সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতার পর নিষ্ঠুর অত্যাচারের ফলে ভীতি-বিহ্বল অবসাদগ্রস্ত জাতির আবেদন-নিবেদনই প্রধান অস্ত্র ছিল—রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছিলেন —"আবেদন আর নিবেদনের থালা বহি নত শির।" বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেও এ পন্থা নিস্ফল হওয়ায় ব্রিটিশ-পণ্য বর্জন আন্দোলন প্রথম সক্রিয় পন্থা হিসেবে গ্রহণ করা হ'ল। এ বিষয়ে দেশের নেতৃবর্গ আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সুরুতে ব্রিটিশ-পণ্য-বর্জনের নীতি থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। আমেরিকানরা যে ব্রিটিশ-পণ্য বন্দরে নামাতে দেয় নি, জলে নিক্ষেপ করেছে, একথা তাঁরা দেশের লোককে জানাতে লাগলেন। নেপোলিয়ান ইংরেজদের বলতেন, বেনের জাত (A nation of shop-keepers)। সুতরাং ইংরেজকে কাবু করতে হলে "উহাদের পকেটে হাত দিতে হইবে" এই কথা নেতৃবর্গ ঘোষণা করলেন।

যদিও সমস্ত বিলিতি-পণ্য-বর্জনই সিদ্ধান্ত করা হয় কিন্তু আন্দোলনের মধ্যমণি হ'ল বিলিতি কাপড়। বাঙ্গালী তাঁতিদের সর্বনাশ করেই ইংরেজ বিলিতি কাপড়ের বাজার সৃষ্টি করে। বাঙ্গালী সে দুঃখের ইতিহাস ভোলে নি। হাতে-বোনা ঢাকাই মসলিন ছিল জগতের বিস্ময়। বয়কট-আন্দোলনে মৃতপ্রায় তাঁত ও চরকার পুনঃ-প্রচলনে উৎসাহ দেখা দিল।

কংগ্রেসের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল বোম্বাই-র ধনকুবের শিল্পপতিগণ। কংগ্রেসের প্রকৃত নেতৃত্ব বলতে গেলে তাদের হাতেই ছিল। এরা বোম্বে, আমেদাবাদ, নাগপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু ব্রিটিশ শিল্প-ব্যবসায়ী ও ভারত সরকারের প্রতিকূলতায় তা সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারছিল না। তুলা এবং মিহি সুতার উপর আবগারী শুল্ক বসল। রেলের ভাড়া এমন হ'ল যার ফলে ভারতের বিভিন্ন স্থানে মাল চলাচলের যা খরচ পড়ত তা বিলেত থেকে আনার খরচের অনেক বেশী। উপকূলের জাহাজী ব্যবসায় ইংরেজের একচেটিয়া থাকায় সেখানেও কোনো সুবিধে পেত না ভারতীয় ব্যবসায়ীরা। সুতরাং তাদের স্বার্থেও এই বয়কট-আন্দোলন প্রবল হয়েছিল এবং বোম্বের সুতার কল শুধুই বেঁচে রইল না উন্নতিও করল।

এ প্রসঙ্গে কয়েকটি গানের পদ উল্লেখ না করে পারছি না। রজনী সেন লিখলেন—"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই; দীন-দুঃখিনী মা যে মোদের এর বেশী তার সাধ্য নেই।" রবীন্দ্রনাথের —"পরের ঘরে কিনব না আর ভূষণ বলে গলার ফাঁসি।" অশ্বিনী দত্তের—"বিদেশী বাণিজ্যে কর পদাঘাত, আপনার পায়ে দাঁড়ারে ভাই।"

এই বয়কট-আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বাঙ্গালীর আত্মশক্তির উদ্বোধন হ'ল। দেশের জন্য নির্যাতন সহ্য করার প্রথম পাঠ গ্রহণ করল বাঙ্গালী। তাইত যখন বরিশাল কনফারেন্স লাঠির আঘাতে ভেঙ্গে দেওয়া হ'ল তখন বাঙ্গালী গাইল—"আজ বরিশাল, পুণ্যে বিশাল হ'ল লাঠির ঘায়ে।" সর্ববিষয়ে মানুষ হয়ে ওঠার দৃঢ় সঙ্কল্পও জাগে এ সময় থেকেই। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও জগদীশচন্দ্র বসুর শিক্ষকতায় যে বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক-গোষ্ঠী তৈরী হ'ল তার আরম্ভ স্বদেশী যুগেই। আচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুপ্রেরণায় ও শিক্ষায় ভারতীয়

চারুশিল্পে যে নবজাগরণ হয় তাও এই সময়েই। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, যদুনাথ সরকার, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রমাপ্রসাদ চন্দ, ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি যে ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানের স্পৃহা জনগণের মনে জাগিয়ে তুললেন ও জাতির সম্মুখে প্রাচীন ইতিহাস তুলে ধরে আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করলেন তাও এই স্বদেশী যুগে। রবীন্দ্রনাথ জাতির চিন্তাধারায় নতুন প্রাণসঞ্চার করলেন। তাঁর গানে, কবিতায় ও প্রবন্ধে সমস্ত আন্দোলনকে এক নতুন রূপের সন্ধান দিয়ে সমস্ত আন্দোলনকে উচ্চস্তরে তুলে মহীয়ান করলেন। রবীন্দ্রনাথ এবং রজনীকান্ত সেন ছাড়াও কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কামিনী ভট্টাচার্য ও মুকুন্দ দাস প্রভৃতির গানে দেশ মেতে উঠল।

এই স্বদেশী যুগেই ১৯০৭ সনে পঞ্জাবের পূর্তবিভাগের খালের জল প্রভৃতি নিয়ে কৃষকদের মধ্যে প্রবল অসন্তোষ দেখা দেয়। এ আন্দোলন ব্রিটিশের বিশেষ উদ্বেগের কারণ হয়। জনপ্রিয় পঞ্জাব নেতা লালা লাজপত রায় ও সর্দার অজিত সিং ১৮১৮ সনের তিন রেগুলেশনে বন্দী হন। পঞ্জাব ও ভারতের সর্বত্র এর তীব্র প্রতিবাদ হয়। মাস ছয় পর তারা মুক্তিলাভ করেন। সর্দার অজিত সিং গোপনে দেশ ত্যাগ করে বিদেশে অবস্থান করতে থাকেন এবং ভারতবর্ষের বিপ্লবান্দোলন সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য শক্তি সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। ১৯৪৭ সনে ৪০ বৎসর পর অতিবৃদ্ধ ভগ্নস্বাস্থ্য সর্দার দেশে ফিরে আসেন। তখন আমার সঙ্গে দিল্লীতে তাঁর দেখা হয়। ভগত সিংয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের নিয়ে তিনি দিল্লী আসেন। তাঁরাও প্রায় সকলেই রাজনৈতিক কারণে নির্যাতিত হয়েছিলেন। সর্দার অজিত সিং ছিলেন লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা ও এসেমব্লী বম্ব-কেসের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত বিখ্যাত ভগত সিংয়ের জ্যেষ্ঠতাত। সেকালের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা দেশের পরই স্থান ছিল পঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রের। এই দুই স্থানে তখন অনেকগুলি রাজদ্রোহের মামলা হয় এবং অনেকে কারাদণ্ড প্রাপ্ত হন। ব্রিটিশ সরকার এই তিন প্রদেশের তিন প্রধানকে সাংঘাতিক (dangerous) বলে ঘোষণা করে। তারা বলত—লাল (লালা লাজপত রায়), বাল (বাল গঙ্গাধর তিলক), পাল (বিপিনচন্দ্র পাল) এই তিনই সাংঘাতিক। ভীত কণ্ঠেই তারা এঁদের নাম উল্লেখ করত।

নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকায় বড় বড় নেতারা এলেন। সঙ্গে সঙ্গে এল গানের দল। লোকে স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বর্জনের মন্ত্র ও শপথ গ্রহণ করতে লাগল। নারায়ণগঞ্জ স্কুলের হেডমাষ্টার ও অন্যান্য কয়েকজন শিক্ষকের সহায়তায় আমরা বিলিতি দ্রব্যের দোকানে দোকানে পিকেটিং আরম্ভ করলাম। লবণ, চিনি ফেলে দিতে লাগলাম ও বিলিতি কাপড় পোড়ান সুরু হ'ল। এজন্য কোথাও কোথাও কিছু কিছু গণ্ডগোলও হ'ল।

সরকার নানা সার্কুলার জারি করে ছাত্রদের যোগদান নিষিদ্ধ করে দিল। কিন্তু কোনো ফল হ'ল না। কলকাতায় বিনয় সরকার, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের মতো কৃতী ছাত্ররা যখন বিশ্ববিদ্যালয়কে গোলাম তৈরীর কারখানা বলে সম্পর্ক ত্যাগ করলেন তখন দেশব্যাপী ছাত্রদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। বিক্রমপুরের সেরা ছাত্র মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে পারিবারিক অসচ্ছলতা সত্ত্বেও দেশের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়ার ফলেও এদিকের ছাত্ররা উত্তেজিত হয়ে উঠল। অরবিন্দ মস্ত চাকুরি ছেড়ে দিয়ে বরোদা থেকে বাংলা দেশে চলে এলেন এবং দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। এ ঘটনা আমাদের মনে গভীর রেখাপাত করল।

ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচারও একটু একটু করে বৃদ্ধি পেতে লাগল। বরিশাল প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্স লাঠির ঘায়ে ভেঙ্গে দেওয়া হ'ল। বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনি নিষিদ্ধ হ'ল, এবং বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনি করার অপরাধে কোথাও কোথাও ছাত্ররা বেত্রাহত হ'ল। ক্রমে দেশের লোক বুঝতে পারল এবং বিপিনচন্দ্র পাল ও অরবিন্দ প্রমুখ নেতারাও ঘোষণা করলেন যে, কেবলমাত্র-বিলিতি-পণ্য-বর্জনই সব নয়; আমাদের বিলিতি শাসনও বয়কট করতে হবে। আমরা ইংরেজ রাজ্যের অবসান চাই। এঁরাই তখন চরমপন্থী বলে অভিহিত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা লোকের মনে উদিত হ'ল যে, কেবলমাত্র বিধিসঙ্গত আন্দোলনে কোন ফলই হবে না। অন্য পথ আবিষ্কার করতে হবে।

আমি তখন ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। আমাদের একজন শিক্ষক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেন ক্লাসে স্বদেশপ্রেমের নানা কথা ছেলেদের কাছে বলতেন। একদিন তিনি পাঠ্যপুস্তক না পড়িয়ে পুরো এক ঘণ্টা পৃথিবীর নানা দেশের গুপ্ত-সমিতির কথা, বিশেষ করে ইতালী কারবোনারী দল ও রাশিয়ার নিহিলিষ্টদের কথা ছাত্রদের কাছে বললেন। আমার মনের মধ্যে নানা আলোড়নের সৃষ্টি হ'ল। ছুটির পর বাড়ী এসে বেরিয়ে পড়লাম আমার কয়েকজন বিশিষ্ট সহপাঠী বন্ধুর কাছে

গুপ্ত-সমিতি সম্বন্ধে পুস্তকাদির খোঁজ করতে। কোনো খোঁজ-খবর পেলাম না। কয়েক দিনের মধ্যেই যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের ম্যাটসিনির জীবন-চরিত হাতে এল। এ বইতে তিনি কারবোনারী গুপ্ত-সমিতির আদর্শ ও কর্ম সূচীর বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। বইখানা বেশ ভাল করে পড়লাম।

বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ তখন আমার মনকে এক সর্বত্যাগী বিপ্লবী সন্ন্যাসীর প্রতি আকর্ষণ করছিল। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী অন্তরের মধ্যে পরসেবার আত্মোৎসর্গের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম, রাজসিংহ, মৃণালিনী ও অন্যান্য উপন্যাস; কমলাকান্তের দপ্তর ও লোকরহস্য; রমেশচন্দ্র দত্তের মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত ও রাজপুত জীবনসন্ধ্যা এবং স্বদেশী যুগের অসংখ্য গান মনকে নানা ভাবে আলোড়িত করছিল।

এমনি সময়ে, বোধ হয় ১৯০৬ সনের শেষের দিকে, একদিন পিতৃদেব আমায় বললেন, "এই ত এখানেও অনুশীলন সমিতির শাখা স্থাপিত হয়েছে। আজ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে এলাম, ছেলেরা কেমন লাঠি-ছোরা খেলে এবং ড্রিল করে। তুই ওদের সভ্য হয়ে যা। উচ্চ আদর্শ ও নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়েই মনুষ্যত্ব গড়ে উঠবে। বিকেল বেলা ঘরে বসে বসে শুধু বই পড়ার চাইতে ড্রিল, প্যারেড, লাঠি-ছোরা খেলা করলে শরীর মন দুই-ই ভাল থাকবে।"

সমিতির সভ্য হতে প্রথমে আমি রাজী হলাম না। কারণ, প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে সর্বসময়ের জন্য কাহারও আজ্ঞাধীন হওয়াটা আমার মনঃপূত হ'ল না। এ যেন এক রকম বন্দী-জীবন স্বীকার করে লওয়ার মত হবে। নিজেকে কার অধীন করব? সে আমার চাইতে কোন্ বিষয়ে বড়? সত্যিকার এদের উদ্দেশ্য বা আদর্শ কি। কেন এদের আজ্ঞাধীন হব? যদি দেশের মুক্তি-সাধকের দলই গড়ে তুলতে হয় তবে আমি নিজেই বা তা করতে পারব না কেন? বড় হয়ে আমি নিজেই দল গঠন করব।

আরেকটা কথা অত্যন্ত অস্পষ্টভাবে মনে জাগত। সংস্থা মাত্রই মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশে বাধাস্বরূপ হয় কি না এবং তাকে পঙ্গু ও পিষ্ট করে দেয় কি না, পরিণত বয়সে এর উত্তর পেয়েছি। সহযোগিতার মাধ্যমেই শক্তির সম্যক্ বিকাশ সম্ভব। সামাজিক মানুষ ছাড়া অন্য মানুষ পশুর পর্যায়ে থেকে যায়। সমাজের পূর্ণ বিকাশের মধ্যেই ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব। আশৈশব যে মানুষ সমাজ ছেড়ে থাকে তার বিকাশ ত দূরের কথা ব্যক্তিত্ব বলে বস্তুর সন্ধানই তার মধ্যে পাওয়া যাবে না।

এই সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে মাসখানেক কেটে গেল। পিতৃদেব মাঝে মাঝে তাগিদ দিতে লাগলেন। কিছু দিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম যে, প্রবল ব্রিটিশের বিরুদ্ধে একলা কিছু করা যাবে না—দল না থাকলে।

কয়েকদিন পরেই অত্যন্ত শুদ্ধচিত্তে স্বদেশের উদ্ধার-কামনায় আত্মোৎসর্গের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প লয়ে সমিতির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে সভ্য হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। বললাম, প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি। পরিচালক জানালেন আমার বয়স কম—নাবালক, সুতরাং অভিভাবকের অনুমতিপত্র চাই। পিতার নিকট বলতেই তিনি সাগ্রহে অনুমতিপত্র লিখে দিলেন।

নারায়ণগঞ্জ সমিতিতে এই অনুমতিপত্র (নাবালকদের জন্য) সাময়িক ভাবে প্রচলিত হয়েছিল। অন্যান্য শাখা-সমিতিতে এ নিয়ম প্রবর্তিত হয়েছিল কি না বলতে পারি নি। পরে অবশ্য এ নিয়ম উঠে যায়। যতদূর মনে আছে, পুলিনবাবুকে একবার ছেলে-চুরির মোকদ্দমায় ফেলতে চেষ্টা করেছিল। তখনও বিনাবিচারে ধরপাকড় ও দমননীতিমূলক নানা প্রকার আইন ছিল না। কিন্তু প্রচলিত আইনের দ্বারাই পুলিস সমিতি ভেঙে দেওয়ার চেষ্টায় ছিল। কেন্দ্রীয় সমিতির বাড়ী খানাতল্লাস করে পুলিস একবার কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। তার মধ্যে কয়েকটি অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকও ছিল। তাদেরই কোনো অভিভাবকদ্বারা ছেলে-চুরির মোকদ্দমা দায়ের করার চেষ্টা হয়েছিল। বোধ হয় এই কারণেই নাবালকের জন্য অভিভাবকের অনুমতিপত্র লওয়ার নিয়ম সাময়িক ভাবে প্রবর্তিত হয়েছিল।

আঠার বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেদের সমিতির সভ্য করা যাবে না—এ নিয়ম চলতেই পারে না। অল্পবয়সী ছেলেদের বাদ দিয়ে সেকালেও কোনো আন্দোলন গড়ে ওঠে নি, একালেও তা সম্ভব হয় নি। মহাত্মা গান্ধীও তা পারেন নি। তিনি ছাত্রদের আন্দোলনে আহ্বান করেছিলেন। ছাত্রদের অধিকাংশই আঠার বছরের কম। শ্রমিক কৃষক আন্দোলন ছাড়া বুর্জোয়া যে কোনো আন্দোলনে ছেলেদের বাদ দিয়ে চলে না। কৃষক শ্রমিক আন্দোলনেও যুবশক্তির উচ্চস্থান সর্বমান। সে যাই হউক, আদর্শবাদী হওয়া, বিপ্লবীমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করার বয়স পনেরো-ষোল থেকে একুশ-বাইশ পর্যন্ত। অনুশীলন

সমিতির অধিকাংশ সভ্যরই এ বয়স ছিল এবং সকলেই সমিতির প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছে।

পিতৃদেবের অনুমতিপত্র পরিচালকের হাতে দিলাম। যদিও সমিতির ক্যাপ্টেন বা পরিচালক ছিলেন শ্রীশৈলেন্দ্র-কুমার পাল কিন্তু তাঁহার সাময়িক অনুপস্থিতিতে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে কার্য পরিচালনা করেছিলেন শ্রীযামিনী-মোহন দাস। ঐ সময় শ্রীসীতানাথ দাস ও আরও দুই-একজন সভ্য উপস্থিত ছিলেন। প্রাঙ্গণে চলছিল তখন লাঠি ও ছোরা খেলা।

যামিনীবাবু আমার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করলেন। জানালেন সমিতির সভ্য হলে কঠোর নিয়মানুবর্তী হতে হবে। সমিতির আদর্শ সম্বন্ধে বেশী আলোচনা করলেন না। শুধু বললেন যে, দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আমরা সংঘবদ্ধ হচ্ছি। কঠোর নিয়মানুবর্তী, ব্রহ্মচর্যধারী ও যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত প্রকাণ্ড দল দেশব্যাপী গঠন করে আমরা শক্তি পরীক্ষায় জয়ী হব ও লক্ষ্যপথে পৌঁছব। তার পর উপস্থিত নেতৃ-স্থানীয় দু'একজন সভ্যের মত নিয়ে আমাকে জানালেন—"তোমাকে এক সঙ্গেই 'আদ্য' 'অন্ত' প্রতিজ্ঞা দিব। সাধারণতঃ প্রথমে 'আদ্য' প্রতিজ্ঞা গ্রহণের পর কিছুকাল অপেক্ষা করতে হয়। পরে উপযুক্ত মনে হলে 'অন্ত' প্রতিজ্ঞা দেওয়া হয়। তোমাকে এক সঙ্গেই দেব। কিন্তু মনে রেখ 'মন্ত্রগুপ্তি' রক্ষা করতে হবে। সমিতিতে যা কিছু জানবে ও শিখবে তা কাউকেই, বিশেষ ভাবে সমিতির বহির্ভূত কোন লোককে জানাবেও না, শেখাবেও না। তুমি তা পারবে বলে মনে হচ্ছে।"

তার পর তিনি দু'খানা ছাপান কাগজ 'আদ্য' ও 'অন্ত' প্রতিজ্ঞা হাতে দিয়ে কয়েকটা ধারার প্রতি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করে ব্যাখ্যা করলেন। প্রথমে এই পত্র দু'খানা নিজের মনে পাঠ করে কোন আপত্তি থাকলে বা নিজেকে অনুপযুক্ত মনে করলে প্রতিজ্ঞাগ্রহণে বিরত থাকতে বললেন। খুব মনোযোগের সঙ্গে পাঠ সমাপ্ত করে জানালাম আমি প্রস্তুত। তখন তিনি উহা স্পষ্ট উচ্চারণ করে পাঠ করতে বললেন। পাঠ সমাপ্ত হলে বললেন, "তোমার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ সমাপ্ত হ'ল। চাঁদা দেওয়ার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। তোমার দ্বারা যা সম্ভব তা সময় মত দিও।" পরে তাঁর আদেশে বোধ হয় সীতানাথবাবু আমাকে তরবারীর ও ছোরা খেলার প্রথম পাঠ 'তামেচা, বাহেরা, শীর; শীর, তামেচা, বাহেরা' শিক্ষা দিলেন।

এমন সময় হুইসল বেজে উঠল। সবাই সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। নতুনদের আলাদা সারি। পরি-চালক ঐ সারির মধ্য থেকে একজনকে বললেন—'তুমি ড্রিল করাও।' যদিও পরিচালক নিজেই অনেক সময় ড্রিল, প্যারেড করাতেন কিন্তু এমনি আদেশ যাকেই করুন না কেন তাকেই তা বিনা বাক্যব্যয়ে পালন করতে হ'ত —বয়স বা সভ্য হিসেবে জুনিয়র সিনিয়র বলে কোন কথা উঠত না। অর্থাৎ যদি বয়স ও সভ্যরূপে সর্ব-কনিষ্ঠকেও এমনি আদেশ দেওয়া হ'ত তবে আর সবাইকে ঐ সময়ের জন্য তার হুকুম মতই ড্রিল করতে হ'ত। এর দ্বারা শুধু যে অনেক সভ্যের পরিচালনা করায় শিক্ষালাভ হ'ত তা নয়, ফলে সভ্যদের মধ্যে ক্যাপ্টেন বা তা'দ্বারা নিয়োজিত যে কোনো লোকের হুকুম মেনে চলার শিক্ষাও হ'ত।

দোষ-ত্রুটির জন্য শাস্তি পেতে হ'ত। প্যারেডের সময় কথা বললে, লাইন ভাঙলে বা অন্য কোনো নিয়ম-বহির্ভূত কাজ করলে হাতে বা পায়ে লাঠির আঘাত সহ্য করতে হ'ত। লাইনে দাঁড়ান সবাইকে (বিশ থেকে পঞ্চাশ জন) কমাণ্ডার শাস্তি দিলেন একই সঙ্গে—এ আমি নিজেই দেখেছি। আমি নিজেও হাত পেতে শাস্তি গ্রহণ করেছি। একটা জিনিস বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য এই যে, এ শাস্তির জন্য কারুর মনে কোনোরূপ বিরূপ ধারণা জন্মাতে দেখি নি বা তার পরদিন থেকে আর এল না—এমন হ'ত না। কি প্রকাশ্য, কি সম্পূর্ণ গুপ্ত, সকল অবস্থাতেই অনুশীলন সমিতিতে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও কঠিন শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। গুরুতর অপরাধে অপরাধীর প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থাও ছিল। এসব ঘটনা যথা-স্থানে উল্লেখ করব।

রাত্রিতে বাড়ি ফিরে গিয়ে প্রতিজ্ঞাপত্র দু'খানা বার বার মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করলাম। চিন্তা করতে লাগলাম তার পূর্ণ তাৎপর্য। অনুশীলন সমিতির ঢাকা-কেন্দ্রের প্রতিজ্ঞাপত্র রচনা করেছিলেন পুলিনবাবু এবং তা পি. মিত্র মহাশয় অনুমোদন করেছিলেন। এই প্রতিজ্ঞা-পত্রের মারফৎই বোঝা যায় পুলিনবাবু কত বড় প্রতিভা-শালী লোক ছিলেন। বুঝতে পারা যায়, তিনি মানব-চরিত্র সম্বন্ধে কত অভিজ্ঞ এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন। তিনি যখন প্রতিজ্ঞাপত্র রচনা করেন তখন সমিতি প্রকাশ্য ভাবেই কাজ করছে। সমিতি যখন সম্পূর্ণ গুপ্ত হ'ল তখনও সেই প্রতিজ্ঞাপত্রের কোন অদল-বদল আমরা প্রয়োজন মনে করি নি। সংঘ পরিচালনার নিয়ম সময় ও অবস্থা পরিবর্তনে বদলেছে কিন্তু প্রতিজ্ঞাপত্রের পরিবর্তন পরিবর্দ্ধন প্রয়োজন হয় নি।

সেদিন প্রতিজ্ঞাপত্র যে ভাবে মনে দাগ কেটেছিল তারই সামান্য আভাস দেওয়ার চেষ্টা করছি—

(ক) "এই সমিতি হইতে কখনও বিচ্ছিন্ন হইব না।" সুতরাং সমিতির সঙ্গে আমার সম্পর্ক চিরকালের জন্য স্থাপিত হ'ল। এটা এমন একটা মামুলি সমিতি নয় যে, দু'চার দিনের বা বছরের সভ্য হলাম। বিনা সর্তে স্বীকার করে নিলাম যে, সমিতির উদ্দেশ্য সফল না হওয়া পর্যন্ত আজীবন আমি সমিতির সভ্য।

ব্যক্তিগত জীবনে আমি সমিতি থেকে কোন দিনই বিচ্ছিন্ন হই নি বা হওয়ার কথা ভাবতেও পারি না। কল্পনাতেও এমন কথা মনে উদিত হয় না। হৃদয়ের সমস্ত আকর্ষণ, ভালবাসা ও গর্ব যেন এই অনুশীলন সমিতির মধ্যে সমীভূত হয়ে আছে।

(খ) "আমি সর্বদা সমিতির নিয়মাধীন থাকিব।" শুধু সভ্য হলাম তা নয়। সমিতির নিয়মই আমার নিয়ম। কেবলমাত্র সমিতির প্রাঙ্গণে বিকেলবেলার সময়টুকু নয় দিবারাত্রি সর্বক্ষণের জন্যই আমি সমিতির নিয়মাধীন হলাম।

(গ) "যখন যেখানে থাকি না কেন, পরিচালকের আদেশপ্রাপ্তিমাত্র চলিয়া আসিব।" পরিচালকের আদেশ সকলের উপর স্থাপিত হ'ল—পিতামাতা, অভিভাবক, শিক্ষক, বন্ধু-বান্ধব সকলের উপর। বিশ্বাস রাখতে হবে যে, পরিচালক সমিতির মঙ্গলকর কার্য ছাড়া অনর্থক কোন আদেশ করেন না। এ সব সকলের কাছ থেকেই গোপন রাখতে হ'ত যার ফলে অনেক সময় বাড়িতে অনুপস্থিতির সঙ্গত কারণ দেখাতে না পারার জন্য গুরুজনের কাছে অসীম লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে।

(ঘ) "আমি সর্বদা সমিতির মঙ্গলসাধনে ব্যাপৃত থাকিব।" সমিতির উন্নতি ও শক্তিবৃদ্ধিই আমার কাজ। কেবল অবসরসময়ের জন্য নয়, চব্বিশ ঘণ্টার জন্যই সমিতির মঙ্গল আমার সর্বপ্রধান কাজ।

(ঙ) "আমি মন্ত্রগুপ্তি রক্ষা করিব। এই সমিতিতে যাহাকিছু জানিব ও শিখিব তাহা বাইরের লোককে বলিব না বা শিখাইব না।" গুপ্ত-সমিতির যুগে এটাই ছিল সবচেয়ে বড় কথা। এ ভিন্ন কোনো গুপ্ত-সমিতিই রক্ষা পায় না। এমনি ভবিষ্যৎ ভেবেই প্রকাশ্য সমিতির যুগে পুলিনবাবু এই প্রতিজ্ঞা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। প্রকৃত-পক্ষে অনুশীলন সমিতি ছিল একটা নিয়মানুবর্তী সামরিক সংঘ। প্রস্তুতির জন্য মন্ত্রগুপ্তি ছিল অপরিহার্য।

(চ) "আমি নিষ্প্রয়োজনে এই সমস্ত বিষয় (অর্থাৎ সমিতির ভিতরের কথা) আলোচনা করিব না। তর্ক ও বাচালতা পরিত্যাগ করিব।" অনর্থক আলোচনা প্রায়ই মানুষকে বাচাল করে তোলে এবং তার ফলে মন্ত্রগুপ্তি রক্ষা করাই মুস্কিল হয়ে দাঁড়ায়।

(ছ) "আমি সমিতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব জানিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ তৎপ্রতিকারে যত্নবান হইব এবং পরিচালককে জানাইব।" বাইরে ষড়যন্ত্র ও ভিতরে বিশ্বাসঘাতকরা—এ ত হবেই, কাজেই সমিতির সভ্যরা যদি সতর্ক দৃষ্টি রাখে তবে সমিতির বিপদ, বিশেষ করে অন্তর্বিরোধ ও ষড়যন্ত্র, সহসা ঘটতে পারে না।

(জ) "পরিচালকের নিকট সত্য বই মিথ্যা বলিব না, কোন কিছু গোপন করিব না।" একমাত্র শত্রু ভিন্ন মিথ্যাচার ভাল নয়। প্রয়োজনবোধে শত্রুর নিকট মিথ্যা বলাই শ্রেয়। কিন্তু পরিচালকের নিকট গোপনতা বা মিথ্যাচার অসম্ভব। এ না হলে কোনো সমিতিই টি কতে পারে না।

(ঝ) "আমি চরিত্র নির্মল রাখিব; কোন কিছুতেই লোভ করিব না; বিলাসিতা বর্জন করিব।" চরিত্র নির্মল না থাকলে সমিতির কার্যে একাগ্রতা আসিবে না। বিক্ষিপ্ত, অব্যবস্থিত চিত্তকে একমুখী করে কোনো কিছুতেই প্রলুব্ধ না হয়ে একাগ্রচিত্তে সাধনায় ব্যাপৃত থাকব। তবেই ত অপরাজেয় শক্তির অধিকারী হয়ে সাধনায় সিদ্ধি অনিবার্য হবে। যে ব্যক্তি ষড়রিপুর দাস সে দেশের দাসত্ব-বন্ধন দূর করবে কোন শক্তিতে?

(ঞ) "আমি দেশের ক্রমে জগতের মঙ্গলসাধন করিব।" শুধু ইংরেজের কবল থেকে উদ্ধার সাধনাই আমাদের কাম্য ছিল না। এ প্রথম ধাপ মাত্র। পৃথিবীর অন্যান্য পরাধীন জাতির মুক্তি এবং পৃথিবী থেকে অন্যায়-অত্যাচার সমূলে উৎপাটন করাই আমাদের ব্রত। আমাদের এই আদর্শ প্রচারিত হয়েছে ভগবদ্‌গীতায়—

যদাযদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত!
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধুনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

যুগে যুগে দেবতা আবির্ভূত হন শুদ্ধচিত্ত মানুষের মধ্যে মহাশক্তির সঞ্চার করে। তার ফলে ধর্ম সংস্থাপিত হয়। গো-ব্রাহ্মণের হিত-সাধন হয়।

প্রতিজ্ঞাপত্রের আরও অনেকগুলি ধারা ছিল। আদ্য ও অন্ত প্রতিজ্ঞা ছাড়া আর একটা প্রতিজ্ঞা ছিল "বিশেষ প্রতিজ্ঞা।" নিয়ম-মত দেবার্চনা ও হোমানল জ্বেলে যজ্ঞ করার পর সভ্যকে তরবারি ধারণ করে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ

করতে হ'ত। পিতৃ-পিতামহ, ঈশ্বর, দেবগণ, আকাশ, জল-বায়ু, অগ্নি তথা বিশ্ব-প্রকৃতির সকলকে সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা করতে হ'ত—দেশের মুক্তিকামনায় কোন কাজই আমার অকরণীয় থাকবে না। কোন ত্যাগেই আমি পশ্চাৎপদ হব না। প্রয়োজন হলে অতি প্রিয় আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধবকে হত্যা করতেও ইতস্ততঃ করব না। মায়া-মমতা কিছুই আমার মধ্যে স্থান পাবে না।

এই বিশেষ প্রতিজ্ঞার খুব প্রচলন ছিল না। প্রথম অবস্থায় অল্প কয়েকজন এ গ্রহণ করেছিল। পি. মিত্র মহাশয় পুলিনবাবুকে দীক্ষা দিয়েছিলেন এবং পুলিনবাবু অল্পকয়েকজনকে এ ভাবে দীক্ষিত করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সর্বপ্রথমে বিশেষ প্রতিজ্ঞাই ছিল। অমৃত হাজরা (পার্টির নাম শশাঙ্ক) বলেছেন যে, তিনি যখন সমিতির সভ্য হন তখনও আদ্য-অন্ত প্রতিজ্ঞা রচিত হয় নি। সমিতি স্থাপন মাত্রই পুলিনবাবু বিশেষ বিশেষ কয়েকজনকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি প্রথমে রুদ্রাক্ষের মালা গলায় ও হাতে পরিধান করে, কপালে ত্রিশূল চিহ্ন এঁকে, নিজের ও দীক্ষার্থীর কপালে রক্তচন্দনের তিলক অঙ্কন করে যজ্ঞে বসতেন। যজ্ঞস্থলে তামা, তুলসী, গীতা, গঙ্গাজল ও তরবারি রক্ষিত থাকত। দীক্ষার্থী এই সমস্ত স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করত—"অগ্নি, জল-বায়ু, দেবতাগণ সর্বলোক সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, দেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মোৎসর্গ করিব। দেশের বিরুদ্ধে কখনও কিছু করিব না। যদি কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করি তবে সমস্ত দেশের ও দেশভক্তগণের অভিসম্পাত আমার উপর বর্ষিত হইবে। আমি ধ্বংস হইব। আমি দেশের ক্রমে জগতের মঙ্গল করিব।" প্রতিজ্ঞাপাঠের সময় পুলিনবাবু পূর্বোল্লিখিত দ্রব্যগুলি সভ্যের মাথার উপর স্থাপন করে ধরে থাকতেন। প্রথমে পুলিনবাবুর বাড়ীতেই এ ভাবে দীক্ষাদান হ'ত। পরে সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ীতে এ অনুষ্ঠান সম্পাদিত হ'ত।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই পুলিনবাবু বুঝতে পারলেন যে, সমিতিকে সমগ্র দেশে ছড়িয়ে বিরাট শক্তিতে পরিণত করতে হবে, সভ্যসংখ্যা হাজারে হাজারে বাড়াতে হবে, এ ভাবে দীক্ষা দিলে চলবে না। প্রতিজ্ঞার ভাষাও বদলাতে হবে। তাই তিনি আদ্য ও অন্ত প্রতিজ্ঞা রচনা করে ব্যাপক প্রস্তুতির জন্য প্রতিজ্ঞাগ্রহণ পর্বকে সহজ করে ফেললেন। ক্রমশঃ

ফ্রান্সে শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থা

ডক্টর শ্রীনিরঞ্জনপ্রসাদ চৌধুরী

১

"যুগোপযোগী সংস্কার ও পরিকল্পনা সম্বন্ধে আমরা যদি অবহেলা করি, তা হলে আমাদের দেশ বিজ্ঞানে ও শিল্পে অনগ্রসর অন্যান্য দেশসমূহের সমস্তরে নেমে যাবে।"—ফ্রান্সের ন্যাশনাল এসেম্বিলীতে শিক্ষা বাজেটের আলোচনাকালে মঁশিয়ে মেণ্ডেস ফ্রান্সের এই উক্তিকে ঘিরে ফ্রান্সের পত্র-পত্রিকায় আলোচনার যে ঝড় উঠে, তাতে নতুন করে প্রমাণ করে যে সংস্কার ও পরিকল্পনার ক্ষেত্রে পশ্চিমের দেশগুলি কত সজাগ।

ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের মতো তার শিক্ষার ইতিহাসও ঘটনাবহুল। বরং একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, রাষ্ট্রের কাঠামো বদলের সঙ্গে সঙ্গে তার শিক্ষার কাঠামোও বদলিয়েছে। এটা স্বাভাবিক—কারণ মানুষ তার আপন শিক্ষারই সৃষ্টি। বাহির থেকে মানুষে মানুষে যে প্রভেদ, সেটা তাদের শিক্ষায় প্রভেদ—যে শিক্ষা মানুষের সমষ্টিগত সভ্যতার রূপ নির্দ্ধারণ করে। তাই কখনও যখন রাষ্ট্রের ভাবাদর্শের পরিবর্ত্তন ঘটেছে, রাষ্ট্র-নেতারা তখনই শিক্ষা-সংস্কারের উদ্যোগ করেছেন। তা না হ'লে রাষ্ট্রের ভাবাদর্শ কখনও সার্থক বাস্তবরূপ ধারণ করতে পারে না।

ফ্রান্সের রাষ্ট্র ইতিহাসের বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার শিক্ষার ইতিহাসও বিবর্ত্তিত হয়েছে। সেই বিবর্ত্তনের পথে প্রতিকূলতা এসেছে, বাধা এসেছে। এই প্রতিকূলতার সবচেয়ে বড় স্তম্ভ—গীর্জ্জা ও পাদ্রী সমাজ। রুশো ভল্‌তেয়ারের আদর্শে উদ্বুদ্ধ, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার মন্ত্রে অনুপ্রাণিত ফরাসী বিপ্লবের পর রাষ্ট্র আইন করে শিক্ষাকে আপন কর্ত্তৃত্বাধীনে নিয়ে নিলে, শিক্ষার উপর গীর্জ্জার প্রভাব অনেকটা খর্ব্ব হয়। রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে শিক্ষার উপর গীর্জ্জার প্রভাব খর্ব্ব হলেও, গীর্জ্জা কিন্তু হাত গুটিয়ে বসে থাকে নি। তাই এখনও ফ্রান্সের শিক্ষাক্ষেত্রে সরকার-পরিচালিত ধর্ম্মপ্রভাববিমুক্ত ইস্কুল (ecole laique) ও গীর্জ্জা পরিচালিত ধর্ম্মীয় ইস্কুল (ecole religieuse) সমান্তরালভাবে কাজ করে যাচ্ছে। রাষ্ট্রকেও চোখ বুঁজে এই সত্যকে মেনে নিতে হচ্ছে। তার কারণ ফ্রান্সের সমাজ-জীবনের উপর ক্যাথলিক ধর্ম্মের ব্যাপক প্রভাব ও দেশের প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাষ্ট্রের অক্ষমতা।

গীর্জ্জার এই প্রতিকূলতা ছাড়াও, ফ্রান্সের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে আরও একটি বাস্তব বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে। এই বাধাটি হচ্ছে—শিক্ষায় ভাষার মাধ্যম। বাংলা ভাষা সর্ব্বস্তরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাবের বাহন হতে পারে কি না, এই বিষয়ে যাদের মনে সন্দেহ কিংবা দ্বিধা আছে; তাঁরা শুনে চমকে উঠবেন না যদি বলি—একদিন ফ্রান্সেও শিক্ষার মাধ্যম ছিল গ্রীক ও ল্যাটিন। ১৬৫০ সনে গ্রীককে এই গৌরব থেকে বঞ্চিত করা হলেও, ল্যাটিনের সঙ্গে ফরাসী ভাষাকে যুঝতে হয়েছে ১৭৬২ সন পর্য্যন্ত। তার পরেও বহুদিন পর্য্যন্ত ফ্রান্সের পণ্ডিতজনের ভাষা ছিল ল্যাটিন। তাই আজও প্যারিসের যে অঞ্চলে প্যারিস (বা সর্ব্বোন) বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত তাকে ল্যাটিন-পাড়া বলে আখ্যাত করা হয়। শিক্ষা-ব্যবস্থায় ধীরে ধীরে ল্যাটিনের প্রাধান্য যতই কমতে লাগল, সেই স্থান পূর্ণ করা হ'ল ফরাসী ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়নের ব্যবস্থা করে। এতে একদিকে যেমন শিক্ষা-সম্প্রসারণের সুবিধা হ'ল, অন্যদিকে ভাষার খাতে যে সময় বাঁচল তাকে বিজ্ঞান-শিক্ষায় নিযুক্ত করা গেল। ফ্রান্সের শিক্ষা-সংস্কারে এই ঘটনাটি সুদূরপ্রসারী ফল দান করেছে। তাই তার বিশেষ উল্লেখ এখানে প্রয়োজন হ'ল।

ফরাসী বিপ্লব শুধু একটি ঐতিহাসিক রাষ্ট্রবিপ্লব নয়; ইহা সমগ্র ফরাসী জীবনকে নতুন করে ঢেলে সাজিয়েছে। জাতির সেই জীবনের রূপ কি হবে?—এই প্রশ্ন উঠল। সেই রূপ নির্দ্ধারণ করা হ'ল বিপ্লবোত্তর শিক্ষা-পরিকল্পনায়। তাই তারও আগে স্থির করতে হবে: শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? টালিরঁ। নামক একজন রিপাব্লিকানের মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত—"সমাজকে জানা, তাকে রক্ষা করা ও তার উন্নতি বিধান করা।" তিনি দাবী করলেন, প্রাথমিকস্তরে শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হোক্‌। কনডরচে নামক অন্য একজন রিপাব্লিকান আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বললেন—"শিক্ষার উদ্দেশ্য বিশ্বজনীনতা ও সর্ব্বজনীনতা, এই দুই ভাবের দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত।" এবং তিনি সর্ব্বস্তরে ও সকল বয়সের লোকের জন্য শিক্ষাকে অবৈতনিক করার দাবী জানালেন। টালিরঁার প্রস্তাব ছিল ইস্কুলসমূহে শিক্ষা ধর্ম্মকেন্দ্রিক না হয়ে দেশাত্মবোধের দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত। কনডরচের প্রস্তাবে আর্থিক সাহায্য করা ছাড়া শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের উপর রাষ্ট্রের আর কোন ক্ষমতা থাকা উচিত নয়। তাঁহার মতে শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনাভার থাকিবে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ সঙ্ঘের হাতে।

এই সময় আর একবার ফ্রান্সের রাষ্ট্ররূপের পরিবর্তন ঘটল। সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের ভাবাদর্শেরও। নেপোলিয়নের আবির্ভাব, প্রজাতন্ত্রের পতন ও রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার মধ্যে সেই পরিবর্তন রূপ পেল। নেপোলিয়নের বহুমুখী সংস্কার-কার্য্য থেকে শিক্ষাও বাদ পড়ল না। বলতে গেলে আজকে ফ্রান্সে শিক্ষায় যে কাঠামো আমরা দেখি তার অনেকটা নেপোলিয়নের হাতে গড়া। তাঁর কীর্ত্তির সঙ্গে অনন্য হয়ে রয়েছে "লিসে" (Lyce´) নামীয় ইস্কুলগুলি যার তুলনা করা যেতে পারে আমাদের দেশের অধুনাপ্রচলিত হাইয়ার সেকেণ্ডারী ইস্কুলগুলির সহিত। নেপোলিয়নের পর রাজতন্ত্রের অবসান ও রিপাব্লিকের প্রতিষ্ঠা হলে, শিক্ষার উদ্দেশ্যের উপর আবার জোর দেওয়া হ'ল। এই সময় যে শিক্ষা-সংস্কার হ'ল তার মূলনীতি ছিল—"শিক্ষার উদ্দেশ্য এমন হওয়া উচিত যাহা মানুষকে মানুষের কাছে এনে দেয়। এবং এমন হওয়া উচিত নয় যাহা মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে।" এই উদ্দেশ্যের উপর জোর দিতে গিয়ে বিজ্ঞান-শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হ'ল। অন্য আদর্শাদি সম্বন্ধে বলা হ'ল—"বহু শেখানো নয়, ভাল শেখানো।" মেয়েদের ক্ষেত্রে বলা হ'ল—"মেয়েদের শিক্ষা এমন হওয়া উচিত যাহার একমাত্র উদ্দেশ্য শুধু সন্তান-পালন ও গৃহকর্ম্ম-সাধন নয়; আবার এমন হওয়া উচিত নয় যাহার একমাত্র উদ্দেশ্য হবে প্রত্যেকটি মেয়েকে এক-একটি মহাপণ্ডিত করে তোলা। মেয়েদের শিক্ষা এই দু'য়ের মধ্যপথ ধরেই চলা উচিত।" এইভাবে শিক্ষার প্রাধান্য স্বীকৃত হয়ে জাতির মানসে ও দৃষ্টিভঙ্গিতে একপ্রকার "বিশ্লেষণী মনোভাব" গড়ে তোলবার চেষ্টা করা হ'ল। আজ শুধু ফ্রান্সে নয়, ইউরোপের অন্যান্য দেশেও শিক্ষার কাঠামো এ সকল মূলনীতির দ্বারাই নির্দ্ধারিত।

২

প্লেটো তাঁহার ইস্কুলের প্রবেশপথে লিখে রেখেছিলেন —"জ্যামিতি-অজ্ঞরা এখানে প্রবেশ করবেন না।" গ্রীক দার্শনিক মনে করতেন—যে জ্যামিতি জানে না, তাঁহার চরিত্র গঠন সম্পূর্ণ হয় না। চরিত্র কথাটি এখানে "মরাল কেরেক্টর" এর প্রতিশব্দ নয়, ইহা "মেণ্টাল ফ্যাকাল্টি"র দ্যোতক। আধুনিক ফরাসী শিক্ষা-ব্যবস্থাও এই প্রাচীন গ্রীক নীতির উপর ভিত্ত। ফরাসী শিক্ষা-ব্যবস্থায় তাই "ম্যাথমেটিকস্" একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। জাতি হিসাবেও ফরাসিরা ম্যাথমেটিকসের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল। ফরাসীদের দেকার্তের বরপুত্র বলা হয় তার কারণ দেকার্ত্ত প্রবর্ত্তিত "বিশ্লেষণী মন" দেকার্ত্তের যুগকে শুধু প্রভাবিত করে নি, ফ্রান্সের শিক্ষা ও সংস্কারের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাহা ফরাসী চিন্তা, জাতি মানস ও সভ্যতার রূপ নির্দ্ধারণ করছে। পাসকাল, লাপলাস্, লাগ্রাস, গেলোয়া, কোশি, অগুস্‌ৎ কোঁত ও হাঁরি পোঁয়াকারের ফ্রান্সে জন্ম এক একটি খামখেয়ালী আকস্মিক ঘটনা নয়। এরা ফ্রান্সের শিক্ষা-ব্যবস্থারই সৃষ্টি। হাঁরি পোঁয়াকারের জন্মের পর থেকে যদি তাকে আফ্রিকার কোন ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দেওয়া হ'ত; তা হ'লে তিনি আজ যাহা তাহা হতে পারতেন কি না সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তিনি এক বিশেষ সভ্যতা ও শিক্ষাদর্শের সৃষ্টি—যে সভ্যতার পরিপুষ্টি শুধু এক বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেই সম্ভবপর। এইখানেই রামানুজম সম্বন্ধে অধ্যাপক হার্ডির একটি মন্তব্যের উল্লেখ বোধ হয় অবান্তর হবে না—

"...and the damage had been done Ramanujan's genius never had again its chance of full development......He had been carrying an impossible handicap, a poor and solitary Hindu pitting his brains against the accoumulated wisdom of Europe."

এই ভারতভূমিতে একদিন সভ্যতার সেই পরিবেশ ছিল। তাই গণিতশাস্ত্রের ইতিহাস লিখতে হ'লে তার প্রথম কয়েকটি পাতা ভারতের নামে উৎসর্গ করতে হয়। সেইদিন ভারতবাসী জগৎকে দিয়েছিল "শূন্যের ব্যবহার" ও "সংখ্যা লিখন পদ্ধতি"। আমাদের তার পরের ইতিহাস তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। কেমন করে আমাদের এমন অপঘাতমৃত্যু হ'ল? এই প্রশ্নের জবাব কঠিন নয়। যে বিশেষ জাতি-মানস ও শিক্ষা-ব্যবস্থা থেকে পোঁয়াকারেরা জন্ম নেয়, সেই জাতি মানস ও শিক্ষা-ব্যবস্থা আমাদের দেশে আজ আর নেই। ইহা ভেবে দুঃখ হয়, কিন্তু লজ্জা হয় আরও বেশী। যখন দেখি দেশের নেতৃস্থানীয়দের চিন্তা এই বিষয়ে ঘোলাটে। এই ঘোলাটে চিন্তার একটি নমুনা দিই। প্যারিসে ভারতীয় ছাত্রদের এক সভায় ভারত সরকারের একজন গণ্যমান্য মন্ত্রী একজন গবেষক ছাত্রকে বললেন—"বিশুদ্ধ গণিত পড়ছেন? ওতে হবে কি? আমাদের চাই ইঞ্জিনীয়ার।" তখন মন্ত্রীমশাইকে শোনানো হ'ল একটি কাহিনী। একদিন প্লেটোকে অঙ্ক কষতে দেখে সিরাস নামে তৎকালীন গ্রীক-সমাজের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"অঙ্ক কষছেন! ওতে হবে কি?" প্লেটো তক্ষুণি তাঁর চাকরকে ডেকে বললেন—"ওহে, ওঁকে

দু'টি পয়সা দিয়ে দাও।" সিরাস একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন—"পয়সা দুটি কেন?" প্লেটো সঙ্গে সঙ্গে বললেন—"ওতে কিছু হবে। মুড়ি কিনে খাবেন।" এই গল্প শুনে আমাদের মন্ত্রীমশাই অপ্রস্তুত হয়েছিলেন কি না জানি না। কারণ অতঃপর তিনি চুপ করেই ছিলেন।

ম্যাথমেটিকস্ শুধু এক গাদা ফরমুলার স্তূপ নয়। ইহা একটি কঠোর ডিসিপ্লিন—একটি বিশেষ মানসিক গঠন। "Mathematics has a light and wisdom of its own, above any possible application for science, and it will richly reward any intelligent human being for catcha glimpse of what mathematics means for itself. This is not the old doctrine of art for arts sake; it is art for humanitys sake"—(E. T. Bell), অথবা "One should study mathematics because it is only through mathematics that nature can be conceived in harmonius form"—(G. Bizkhoff), এই কথাগুলি মনে রাখলে ফরাসী শিক্ষা-ব্যবস্থায় কেন যে ম্যাথমেটিকসের উপর এত জোর দেওয়া হয়, তা বুঝতে সাহায্য করবে।

ফ্রান্সের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে সংক্ষেপে দু'চার কথা বলে এবার শেষ করব। পাঁচ বছর বয়স থেকে ফরাসী শিশুরা ইস্কুলে যেতে সুরু করে। চৌদ্দ বছর বয়স পর্য্যন্ত এই শিক্ষা সকলের জন্য বাধ্যতামূলক। এই বাধ্যতামূলক শিক্ষার মান আমাদের দেশের ৮ম শ্রেণী পর্য্যন্ত। এই পর্য্যন্ত এসে অধিকাংশ ছেলেমেয়েদের সাধারণ শিক্ষা ছেড়ে দিয়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। যতই উপরের দিকে ওঠা যায় শিক্ষামান ততই কঠিন হয়। ইহাতে একমাত্র সত্যিকারের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের ছাড়া অন্যান্যদের পক্ষে লেখাপড়া-চালান কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে পড়ে।

এর পরে যারা এগোয়, তারা আরও দু'বছর পরে প্রথম "প্রবেশিকা" (baccalauriat) পরীক্ষা দেয়। এই প্রথম প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা রুচি অনুসারে বিজ্ঞান বা দর্শন—এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে দ্বিতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষা দেয়। এই দ্বিতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরাই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার অধিকার পায়। এইখানে উল্লেখযোগ্য যে, সর্ব্বস্তরের পরীক্ষাতেই লিখিত ও মৌখিক—এই দুই ভাবে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা করা হয়।

দ্বিতীয় প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি সাধারণ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা হয়। ইহার গুরুত্ব ফরাসী সমাজ-জীবনে খুব বেশি। এই প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের ব্যয়ভার বহন করে রাষ্ট্র। ইহাদের এক দল যায় "ইকোল পলিটেকনিকে"; আর একদল যায় "ইকোল নর্ম্মাল সুপেরিয়ারে"। প্রথমোক্ত ইস্কুলটি তৈয়ার করে ফ্রান্সের ভাবী ইঞ্জিনিয়ারদের, আর দ্বিতীয়োক্ত ইস্কুলটি ভবিষ্যৎ অধ্যাপকদের। ফরাসী সমাজ-জীবনে এই দুই দলের বিশেষ খাতির। একদল তৈয়ার করে যন্ত্র, অন্য দল যন্ত্রী। পলিটেকনিসিয়ানদের খাতির অনেকটা আমাদের দেশের আই. সি. এস.-দের মত। এদের জন্য ধনবতী, রূপবতী, অনূঢ়া কন্যাদের জননীরা উদ্বিগ্ন প্রতীক্ষায় থাকে। নর্ম্মালিয়ানদের জন্য এই উৎকণ্ঠ প্রতীক্ষা না থাকলেও, তারা পায় দেশজোড়া লোকের শ্রদ্ধা। এদের একদল যদি লক্ষ্মীর বরপুত্র হয়, অন্যদল সরস্বতীর।

বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি পরীক্ষা "প্রপদতিক" ও "লিসান্স"। লিসান্সের মান আমাদের এম. এ. কিম্বা এম. এস-সি সমতুল্য। এই জন্য প্রায় তিন বছর সময় লাগে। তার পরেও আছে—ডিপ্লোম দ্য এতুদ সুপেরিয়ার। এই ডিপ্লোমাগুলি হচ্ছে স্পেশিয়ালিজেশনের প্রথম ধাপ। সাধারণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা এইখানেই শেষ হয়। কিন্তু যাঁরা ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যায়ে অধ্যাপক হবার ইচ্ছা রাখেন, তাঁদের কাজ তখনও অসমাপ্ত। তাঁদের আবশ্যিক ভাবে মৌলিক গবেষণা করতে হয়। এই গবেষণা শেষে ডক্টরেট্। ফ্রান্সে সাধারণতঃ দুই প্রকারের ডক্টরেট্ দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালীয় (Doctorat d'universite') ও ষ্টেট (Doctorat de'tat) ডক্টরেট। বলা বাহুল্য যে ফ্রান্স প্রথমোক্ত ডক্টরেটটি স্বীকার করে না, আর অত্যন্ত মৌলিক ও প্রথম শ্রেণীর কাজ না হলে ষ্টেট ডক্টরেট দেওয়া হয় না।

ফরাসী মন্ত্রীসভায় ঘন ঘন উত্থান-পতনের সঙ্গে ফরাসী ছাত্রজীবনের সম্পর্ক কম। ছাত্রছাত্রীদের উপর রাজনৈতিক দলসমূহের প্রভাব আছে বটে কিন্তু সেই প্রভাব ছাত্রছাত্রীদের "ইন্‌ডিসিপ্লিনের" প্রতি ঠেলে দেয় না। অধ্যাপকদের বক্তৃতা, নোট না নিলে, বাজারের কোনো "হেল্পবুক" পরীক্ষায় কোনো কাজে আসে না। আরও একটি কারণ হচ্ছে—যারা পড়তে যায়, তারা পড়তেই যায়। বিজ্ঞানী হলডনের ভাষায় "ডিগ্রীর কাষ্ট সিষ্টেম" তৈয়ার করতে নয়। তাই যারা পারে না, তারা যায় না। আর যারা যায় তারা মনোযোগের সঙ্গে পড়েও, হয় ত এই জন্যই অধ্যাপকদের হাজিরার বই নিয়ে ক্লাসে ক্লাসে পুলিসী খবরদারী করতে হয় না। ফলে বেশ কিছু মূল্যবান সময় বেঁচে যায়।

রজনীগন্ধা

(পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প)

শ্রীস্নিগ্ধা সান্যাল

রেলিং-এর ধারে রজনীগন্ধা ফুটেছে। গন্ধে তার বাতাস মাতোয়ারা। এ গলির নীচু নীচু বাড়ীগুলোর পাশে যখন নর্দ্দমার পচা গন্ধে প্রাণ যায় যায়, ভাঙাচুরো রেলিংওলা জীর্ণ বাড়ীটা তখন একসার রজনীগন্ধার ঝাড় বুকে নিয়ে আলো হয়ে থাকে, গন্ধ ছড়ায়! নর্দ্দমার পচা দুর্গন্ধ ছাড়িয়ে সে গন্ধ এক-একবার মদির হয়ে ভাসে বাতাসে! নরক যেন স্বর্গের স্বপ্ন দেখে!

নীচুতলার ছোকরা ছুতোর মিস্ত্রী দু'জনের হাতের কাজ তখন থেমে যায়। একটু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে হাসে দু'জনে। চোখ টেপাটেপি করে।

'কে লাগিয়েছে রে? সাহু না ওর বোন? জেনে-শুনেও শুধোয় একজন।

"ওর বোন।" আর একজন বলে একটু মুচকি হেসে।

"আঃ, কি মিঠে গন্ধ মাইরী! প্রাণ ঠাণ্ডা; দু' চোখে বন্ধ করে প্রাণপণে দুজনে একবার মিষ্টি গন্ধে বুক ভরে নেয়। ঐ রজনীগন্ধার ঝাড় প্রাণ-জুড়োন গন্ধ এবং তার মালিক স্বয়ং কম্‌লিকে নিয়ে একটু খোশ গল্পে মেতে ওঠে দু'জন।

তার পর খোশ গল্পও থেমে যায়। কিন্তু গন্ধটা নাকে লেগেই থাকে। মন-মেজাজ খুশি হয়ে থাকে অনেকক্ষণ।

শ্রাবণের কোনো না বৃষ্টি-দুপুরে ছাদে বসে চুল শুকোয় গোলমুখ আর ভারী দেহের মানুষ রাঙা ঠাকরুণ। চোখ পড়ে গিয়ে কম্‌লিদের ছাদের দিকে। না চেয়ে আর পারা যায় না। কি ফুল ফুটেছে! কি গন্ধ তার!

পয়সাকড়িওলা মানুষ বলতে এ পাড়ায় ওই রাঙা ঠাকরুণরাই যা। অথচ বাড়ীতে ফুল গাছ নেই একটিও। এ অভাবটা রাঙা ঠাকরুণ বেশ ভাল করেই বোঝে। কিন্তু নিরুপায়! বাড়ীর কর্ত্তাটি ঠিক তার উল্টো মানুষ। ফুলের ধার ধারে না। কাঠখোট্টা। বলে, "ও সব কি। যেটুকু জায়গা আছে বাড়ীতে শাক লাগাব, খেয়ে বাঁচব। ফুল কি হবে? অ্যাঁ?"

তাই বলে কম্‌লিদের কাছ থেকে একটা ফুলের থোকা চেয়ে নিতে কেমন যেন আত্মসম্মানে বাধে রাঙা ঠাকরুণের। কেন না, এ পাড়ায় তাদের একটা আলাদা মান। তাই রাঙা ঠাকরুণ চায় না। দেখেই খালাস।

ওবাড়ীর পুলিনবিহারীর বৌ কিন্তু নাছোড়। বর ত কাজ করে কোন তেলের কলে। ওদের অবস্থাটা কম্‌লির জানতে বাকি নেই। ঘরে একগণ্ডা ছেলে পুষে বৌটার তবু কি সখের কম্‌তি আছে? রোজ চায়—রোজ। অনেকদিন ধরেই চাইছে। কম্‌লি রেগে কুল করতে পারে না! পারবে কি করে? বৌটা ভারি হাসিমুখ। কিছু বললেও কিছু মনে করে না।

বাধ্য হয়েই কম্‌লি একদিন একটা থোকা ভেঙে দেয় ওর হাতে। "কাওকে বলো না কিন্তু বৌদি! জেনে ফেললে সবাই এসে ছেঁকে ধরবে।"

কিন্তু পুলিনবিহারীর বৌ না বললে কি হবে? এমনিতেই আসে সকলে, ফুল চায়, কম্‌লি ওদের তাড়া দেয়।

নিজেরই ছোট ভাই সিধুকে সেদিন একটা চড়ও মেরেছিল কম্‌লি। ওর চোখে ধুলো দিয়ে ফুল ভাঙতে গিয়েছিল সিধু। কম্‌লি দেখে ফেলেছিল তাই, নইলে গাছগুলোও নষ্ট করে ফেলত হয়ত। বারণ শোনে নি বলে ওর গালে একটা চড় কষে দিয়েছিল কম্‌লি।

তাতে সাহু রেগে বলেছিল, "তুই ওকে মারলি যে বড়? মা-মরা ছেলেকে?"

কম্‌লি মুখে মুখে তর্ক করেছিল, "আদর দিয়ে মাথায় তুলেছ ত ওকে! সমস্ত গাছগুলো নষ্ট করে ফেলত না দেখলে।"

"তুই দেখেছিস ওকে নষ্ট করতে?"

"দেখে ফেলেছি বলেই ত পারে নি।"

"পারে নি!" ওর গলা-ভেংচে সাহু বলেছে, "ফুল নিয়ে তুই ধুয়ে জল খাস। চল সিধু।"

সাহুর ব্যবহারে দ্বিগুণ চটে উঠেছিল কম্‌লি। বিশেষ করে ওর ঐ মুখ ভেংচানিতে। ও ভাবত, পাড়ার বকাটে ছেলেগুলোই পারে এসব। তখনই একটা চিন্তার চমক খেলে গেছে কম্‌লির মনে। সাহুদাও তাহলে বখে গেছে। তা নয়ত কি? বুড়ো বাপ খেটে খেটে মরে, অথচ নিজে একটা চাকরির চেষ্টা করে না। চা-য়ের দোকানে আড্ডা মারে। খাওয়া আর শোওয়ার সময় শুধু বাড়ী আসে। নইলে সব সময় শুধু বাইরে।

সুবিধে পেয়ে সাহুকে অনেক কিছু বলে নেবার জন্যে

কড়া কড়া কথা খোঁজে কম্‌লি। বড় হলেও সাহুর বুদ্ধিটা একটু কম।

কিন্তু বলবে কাকে? সাহু ততক্ষণে বক্তৃতা সুরু করেছে। সবকিছুতেই ওর কথার পাহাড় বানানো-স্বভাব। সাহু বলে "তুই ত আর কিছু জানিস না! ওই ফুল আর ফুল। ফুল গাছ ত আর কারুর বাড়ীতে নেই! কেবল তোরই আছে!"

"আছেই ত!"

"সেদিন শিবের দাদু দুটো ফুল চাইতে এসেছিল, গোপালের পুজোর জন্যে। প্রথমে তুই দিতেই চাস নি। শেষে ধরাধরিতে মাত্র ক'টা ফুল দিয়েছিলি। তাতে শিবের দাদু রেগে কি বলেছিল জানিস?"

"কি বলেছিল?"

"বলেছিল, বাড়ীতে ফুলগাছ লাগিয়ে ছুঁড়িটার ভারী গিদের। একটা ফুল চাইতে গেলে দেয় না। শুনে লজ্জায় আমার মাথা কাটা গিয়েছিল।"

ঠোঁট উল্টে কম্‌লি বলেছে, "বয়ে গেছে আমার।"

"বয়ে গেছে!" চোখ লাল করে রীতিমত তোতলাতে সুরু করেছে সাহু। "আচ্ছা।"

বলেই ওখান থেকে সরে পড়েছে। যেন এসেই একটা কুরুক্ষেত্র বাধাবে, এমনি ভাব।

কিন্তু কম্‌লি জানে সাহুর দৌড় কতদূর, মোড়ের চা-এর দোকানটার কাছে গেলেই ওর সমস্ত রাগ জল হয়ে যাবে।

মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হেসেছে কম্‌লি। হেসে কাজে মন দিয়েছে।

এ ব্যাপার একদিনের নয়, দু'দিনের নয়, নিত্যকার। এপাড়ায় কম্‌লি যেন এক যখ। ওর ধনকড়ি অজস্র ফুল। সে ফুল কম্‌লি কাওকে দেয় না, দিতে চায় না। কতজনে কত কথা বলে, নিন্দে করে। কেউ বলে স্বার্থপর, একলসেরি। কেউ বলে, বড় অহংকারী মেয়ে। কয়েক ঝাড় রজনীগন্ধা ফুল নিয়ে মিছে বড়াই। কেউ বলে, এত ফুল-টুল নিয়ে থাকা ভাল নয়, বোঝ না?

কত জনে কত কি বোঝে!

কিন্তু সাহু হাসে, সাহু ঠাট্টা করে বলে, "তোর বিয়ে হলে করবি কি কম্‌লি। ঝাড়গুলো তুলে নিয়ে যাবি নাকি শ্বশুরবাড়ী?"

এই ঘর, এই খাপছাড়া সংসার, নিত্যকার এই অমসৃণ পরিবেশের মধ্যে কম্‌লি যেন এক নতুন কথা শোনে। অশিক্ষিত, বেকার, বখে-যাওয়া এই সাহুদাটাকে যেন হঠাৎ আশ্চর্য রকমের ভালো লেগে যায় তার। হেসে জবাব দেয়, "তখন তোমাদের জন্যে রেখে যাব সাহুদা। আমার আর দরকার হবে না।"

কথা শুনে একচোট হাসে সাহু।

"ও: বুঝেছি! তুই তা হলে তোর বিয়ের ফুল ফোটাচ্ছিস ওই ফুল দিয়ে! তা এই গলির মধ্যে কে তোর এত আয়োজন দেখতে আসছে বল? আর তুই যা কৃপণ, জেনেশুনে কেউ কি আসবে তোর কাছে ফুল নিতে?"

সাহুর কথায় যেন শিহর লাগে কম্‌লির মনে। আসবে না? কে বললে আসবে না? সে ত আসে, রোজই সে আসে। কে বললে ফুল দেয় না কম্‌লি। দেয় ত, রোজই সে দেয়। সেই একজনকে, শুধু একজনকেই— মনোহরকে।

আকাশের সূর্য্য যখন অনেক পশ্চিমে ঢলে পড়ে, এ গলির পৃথিবীতে যখন মশাডাকা অন্ধকার নামে। উনুনে আঁচ দেওয়া শেষ করে কম্‌লি তখন উঠে পড়ে। কয়লার ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় বাড়ীটাকে আরো অন্ধকার, আরো প্রাগৈতিহাসিক বলে মনে হয়।

সেই আমলের একটা উই-ধরা কাঠের দেরাজের ওপর দুটো টিনের বাক্স, ওপরে নীচে করে সাজানো। সেই বাক্সের ওপর থেকে কম্‌লি ওর রোজকার ভাঁজ-করা চোর-কাঁটা শাড়ীটাকে নামিয়ে আনে। উনিশ বসন্ত পার হয়ে যাওয়া দেহের খাঁজে খাঁজে সেই শাড়ীটাকে কম্‌লি মনের মত করে গুছিয়ে নেয়। এক-গোছা মাথার চুলে আঁটো করে খোঁপা বাঁধে। শুকনো কাপড় দিয়ে অতি সাধারণ মুখখানা ঢাকা-খোলা আয়না দেখে মুছে নেয়।

ঘর থেকে বেরিয়ে আসে কম্‌লি। সেখানে ওর নিজের হাতে মানুষ করা রজনীগন্ধার ঝাড়গুলো আলো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, বাতাসে মাথা দোলায়। গন্ধ ছড়ায় মন মাতিয়ে সেই সময়।

সেই সময় ওর মরশুম। সারাদিনের হাড়-ভাঙ্গা একঘেঁয়েমির শেষে হাতের কাছে পাওয়া কতকগুলি রঙীন নিমেষ।

দুপুরের অবসরে বেঁধে রাখা ফুলের তোড়াটা হাতে নিয়ে কম্‌লি দাঁড়ায় এসে রেলিং-এর ধারে। নড়বড়ে রেলিং-এ সাবধানে বুক চেপে দাঁড়িয়ে থাকে ও। এক-জনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে।

মনোহর ততক্ষণে ফুটপাতে পা ধুয়ে হয়ত ঘরে ফিরেছে। বেকার মনোহর, সারাদিন কাজের ধান্দায় ঘোরে, কাজ জোটে না।

কমলিকে দেখে ও নিজের ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে আসে। কমলিদের ঘরের সামনেই ওর ঘর। কমলিদের মত একটা রেলিংও রয়েছে সামনে।

সেই রেলিং-এর কাছে এসে দাঁড়ায় সে। পরণে একটা হাফ-প্যান্ট, গায়ে বিবর্ণ হাফ-সার্ট। মনোহর হাসে কমলিকে দেখে। পানের ছোপ-লাগা বড় বড় দাঁতগুলি সেই আবছা-অন্ধকারে ঝিকিয়ে ওঠে।

কমলিও হাসে।

তার পর, প্রতিনিয়তের মতো ফুলের তোড়াটা আলতো করে ছুঁড়ে দেয় মনোহরের দিকে। অভ্যস্ত হাতে মনোহর সেটি লুফে নেয়। কৃতার্থ মনোহর।

ওপরে কাঁচ রং আকাশে জুল জুল করে জ্বলে দুটি কি একটি তারা। কমলি ওদিকে চায় একবার, একবার মনোহরের দিকে।

পানের ছোপওলা দাঁত নিয়ে মনোহর ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তোড়াটা নাকের কাছে ধরে গন্ধ নেয় এক একবার।

কমলি শুধোয়, "কেমন হয়েছে আজকের তোড়াটা ?"

মনোহর বলে, "খুব চমৎকার !"

—"গন্ধ ?"

"খুব সুন্দর !"

আত্মপ্রসাদে মন ভরে আসে কমলির।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটে। কেউ কোন কথা বলে না। কি বলবে, আর কি কথা আছে এ-ছাড়া ? কমলির নেই কিন্তু মনোহরের ত থাকতে পারে, কিন্তু মনোহরটা বড় মুখচোরা। ওকে খোঁচা দিয়ে কথা বলাতে ইচ্ছে করে কমলির। জানতে ইচ্ছে করে, সত্যি কোন কাজের খোঁজ করছে কিনা মনোহর। ওর যে বড় কাজের প্রয়োজন। কি করে পেট চলে ওর ? ওকে কি কেউ খেতে দেয় ?

হয়ত দেয়। হয়ত ওর মত একজনকে পুষতে পারে এমন লোক ওর জানা আছে। কিন্তু আর দু'দিন বাদে করবে কি মনোহর ? যখন কমলিকে নিয়ে সে নতুন সংসার পাতবে ?

নেই-নেই করেও অনেক কথা থাকে কমলির। অনেক কথা, কিন্তু বলা হয় না। আজও না, কালও না।

তার পর একসময় খেয়াল হয়, রেলিং-এর এদিকে আর ধোঁয়া আসছে না।

বলে, "চলি, উনুনে আঁচ ধরেছে। রান্না চাপাতে হবে আবার"—

কমলি চলে আসে। মনোহরও ফিরে যায়।

সেদিন দুপুরবেলা ঘর ঝাঁট দিচ্ছিল কমলি। সিধু ছুটে এল, "দিদি, এই দিদি ?"

জড়ো করা ময়লাগুলো বারুণের ওপর তুলতে তুলতে কমলি বলে, "কি ?"

"একথোকা ফুল দে না ?"

"কেন রে ?" সিধুর ব্যস্ত ভাবটা কমলির চোখে পড়বার মত।

"নীচের মিস্তিরিরা চেয়েছে, এনে দিতে পারলে মার্বেল দেবে।"

"কি বলল ?"

কমলি কাজ কমিয়ে কথাটা আবার করে শুধোয়।

"বলল, তোমার দিদির কাছ থেকে একথোকা ফুল নিয়ে এসো ত। এনে দিতে পারলে চার-চারটে মার্বেল দেব। দে না দিদি। মাত্র এক থোকাই ত, তার বদলে ওরা চার-চারটে মার্বেল দেবে। আমার মার্বেল কেনার পয়সা নেই।" সিধুর গলায় মিনতি।

"মার্বেল নিয়ে কাজ নেই"।

"কেন ?"

"কেন আবার, যা বলছি, শোন।"

"তার মানে, তুই ফুলও দিবি না ?"

"দেবই না তো।"

"ভারি দেবে না ! ওর ফুলগাছ' !"

সিধু রেলিং-এর ধারে যায়। ওর স্পর্দ্ধা দেখে ধমকে ওঠে কমলি।

"এই সিধু, হচ্ছে কি ?" সংকুচিত হয়ে যায় সিধু। নরম সুরে বলে, "এক থোকাই ত !"

"যাই হোক ! তুমি ভাঙবে না। আর নীচেও যাবে না এখন। তার পর আসুক না সাহুদা, হচ্ছে।"

"কি হবে ? ঘাবড়ে যায় সিধু।"

"যা হবার হবে, তা শুনে তোমার কাজ কি ?"

বিকেলের দিকে সাহু এলে কথাটা বলে ওকে কমলি। সাহু শুনে হাসে।

"এই কথা, এতে হ'ল কি ?"

"বারে !" কমলি অবাক হয় সাহুর কথায়।

সাহু বলে, ফুল এক থোকা চেয়েছে, তাতে দোষের কি ? তুই কৃপণ তাই বল।'

"না সাহুদা, বাবাকে বলব আমি।"

"দুর, ওটা আজকাল দোষেরই নয়। বাইরে-টাইরে বেরোস নি তাই। আজকাল মেয়েরা—।"

"তোমার বক্তৃতা রাখ।" কমলি বাধা দেয়।

"তবে শোন্। ওদের যে ফুলের থোকাটা দিস্নি,

সেটা আমায় দে দিকি নি। 'বসন্ত কেবিনে' আজ একটা ভাল ফুল-দান দেখে এলাম। ওতে সাজাব।"

কম্‌লি সহসা রুখে ওঠে। কোন্ মুখে চাইছ?"

অবাক হয় সাহু কমলিকে হাঠাৎ রেগে উঠতে দেখে। বলে, "কেন?"

"কেন আবার। তুমি আমার কথা শুনতে চাও না। আমি তোমার কথা রাখব কেন?"

"কি হয়েছে?" সাহু যেন কিছুই জানে না এমনি ভাবে প্রশ্ন করে।

"কেন ছুতোর মিস্ত্রী ছুটো অমন করে সিধুকে দিয়ে ফুল চেয়ে পাঠাবে? আমি বুঝি না? আমাদের একটা মান সম্মান নেই, তুমি ওদের সায়েস্তা করে দিতে পার না?" কম্‌লির গলা ধরে আসে অভিমানে।

"মানসম্মান! আমাদের!" সাহু হাসে, "তা হলে এপাড়াটা এবার পাল্টাতে হয়—কি বলিস?"

কমলি অবজ্ঞা করে, "ওঃ, তাই বল! তুমি এতখানি ভীতু মানুষ তা জানতাম না। ছুটো বকাটে ছোঁড়াকে শায়েস্তা করতে পার না, নইলে পাড়া-বদলানোর কথা বলতে না।" কথাগুলো সাহুর আঁতে ঘা দেয়।

"মুখোমুখি তর্ক করিস্ না কম্‌লি। দিবি দিস্, না দিবি চলে যাব।"

"যাও।"

এবাড়ীতে কখন সন্ধ্যা নামে, কখন যায়। কখন রাত্রি নেমে ঘন-অন্ধকার ক্রমশঃ নিথর নিস্পন্দ রন্ধ্রহীন হয়ে আসে। শ্যাওলা-ঢাকা ভিজে পিচ্ছিল কয়েক-পা-উঠোনে কৃপণ আকাশ একমুঠো তারা ছিটিয়ে অনুকম্পা জানায়। থেকে থেকে কেবল ঐ খোলা আকাশের পথভোলা বাতাস অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে ঝুলপড়া ধোঁয়াটে রান্নাঘরের স্তিমিত প্রদীপটাকে প্রেম বিলিয়ে যায়। শিখাটা কেঁপে ওঠে। হাঘরে হাওয়ার সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে যেতে চায়।

কমলি বিরক্ত হয় মনে মনে। নিমেষে একটি ছোট-খাট সাজানো সংসারের স্বপ্ন তার মনে ভেসে ওঠে। এ ঘরের মত এমন নোংরা, এমন ঘৃণ্য নয়। দম্‌কা বাতাসের ঝাপ্‌টায় প্রদীপ যেখানে নেভে না—আলো যেখানে এর চেয়ে অনেক বেশী উজ্জ্বল—অনেক বেশী, এমন তেলহীন পাংশুটে, আবছায়া ঘেরা নয়।

মনোহরকেই বার বার মনে পড়ে কম্‌লির। এ যেন নির্ব্বাসন, এই নির্ব্বাসন থেকে কবে আসবে সেই মুক্তি, যেদিন মনোহরের হাতে হাত দিয়ে মানুষের মত মানুষের পৃথিবীতে গিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে?

রান্নাঘরে কাজে ব্যস্ত ছিল কম্‌লি। এমন সময় বাইরে থেকে সাহুর গলা পাওয়া গেল।

"কমলি, এই কম্‌লি।"

কম্‌লির কাজ ও ভাবনায় বাধা পড়ল। ও জানত সাহু ফিরবে। যত রাগই করুক না ও, 'বসন্ত-কেবিনে'র গুণে সব রাগ ওর জল হয়ে যায়।

বালি যত তাড়াতাড়ি গরম হয়, ঠাণ্ডাও হয় তেমনি। সাহু যেন তাই। কম্‌লির হাসি পায় ওর কাণ্ড দেখে।

সাহু আবার ডাকে, "এই কম্‌লি শুনছিস্, আয় না বেরিয়ে।"

কম্‌লি বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। "কি হ'ল আবার। কি বলছ?" কপট গাম্ভীর্য্য কমলির কণ্ঠস্বরে।

সাহু কোনো ভূমিকা না করেই বলে, 'মনোহরকে ফুল দিয়েছিস্ তুই? দিস্ নি নিশ্চয়ই।'

কমলির মাথায় যেন বাজ ভেঙ্গে পড়ে। এ কথা জান্‌ল কি করে সাহু! কেউ ত জানে না! পৃথিবীর আর কেউ না। এক মনোহর আর সে ছাড়া। প্রতি সন্ধ্যায় ওদের আশ্চর্য্য সুন্দর কয়েকটা মুহূর্ত্তের কথা কমলি ত কাউকে বলতে চায় নি! তবে? মনোহর তাহলে সেই কথা সকলের কাছে প্রকাশ করেছে। ফুলের তোড়াশুদ্ধ দেখিয়ে দিয়েছে সবাইকে, কম্‌লির দেওয়া তোড়াটা! কিন্তু মনোহর ত জানে না, কমলির এতে কি লজ্জা! কোথায় এ লজ্জা ঢেকে রাখবে কম্‌লি? সামনে সাহু দাঁড়িয়ে। ও কি ভাবছে? ওর সামনে থেকে মাটিতে মিশে যেতে পারলে যেন বাঁচত কম্‌লি? কিন্তু···। ছিঃ ছিঃ! মনোহরটা কি নির্লজ্জ, বেহায়া! ভালবাসে বলেই কি হাজারজনকে বলে বেড়াতে হবে? কম্‌লি ভাবে, মনোহরকে এবার আচ্ছা করে শাসিয়ে দেবে—

সাহুর কথায় হুঁশ হয় কম্‌লির।

"ভাবছিস্ কি? থাক্ না, কালই শায়েস্তা করে দিচ্ছি ওকে। বেটা চোর! আমরা শালা একটা কাজ পাই না ঘুরে ঘুরে। আর ও-বেটা দিব্যি—"

বাধা দিয়ে কম্‌লি শুধোয়, ভীত অস্ফুট স্বরে, "কোথায় দেখলে ওকে?"

"ফুলের দোকানে, বিক্রী করছিল—"

স্বনির্ব্বাচিত গল্প—শ্রীসজনীকান্ত দাস। প্রন্থম। ২২ ১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। কলিকাতা-৬। মূল্য—৫৲।

বর্ত্তমান কালে যে কয়জন নিষ্ঠাবান সাহিত্যিক আছেন সজনীকান্ত দাস তাঁহাদের অন্যতম। দাস মহাশয়ের সৃজনী শক্তির পরিচয় শুধু গল্পে নহে কবিতা, উপন্যাস ব্যঙ্গ রচনা, প্রবন্ধ ও গবেষণামূলক সাহিত্যকর্ম্মেও সমান ভাবে পাওয়া যায়।

সমালোচ্য পুস্তকখানিতে লেখকের বিভিন্ন সময়ের লেখা চব্বিশটি গল্প স্থানলাভ করিয়াছে। গল্পগুলি সমালোচক লেখক নিজেই নির্ব্বাচন করিয়া দিয়াছেন। এই গল্পগুলির মধ্যে বিভিন্ন রসের সমাবেশের সঙ্গে যে চিত্রগুলি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে তাহা মনকে আবিষ্ট করিয়া রাখে।

এই মূল্যবান গল্প সমষ্টি পাঠকসমাজে আদৃত হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

সপ্তপুরা—সুকুমার দত্ত, এ. মুখার্জ্জি অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ২, বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য—২·৫০ ন. প

'সপ্তপুরা' সাতটি গল্পের সমষ্টি। সে হিসাবে গল্পের নামকরণ সুন্দর হইয়াছে। মল্লিকা, অভিশপ্তা, এষা, অগ্নিদাহোত্তরে, সহজিয়া, জগন্নাথের মন্দির, মন্ত্রের উদ্ধকথা—এই সাতটি গল্পই বৌদ্ধযুগের পটভূমিকায় লিখিত। আত:কর গল্প না হইয়াও গল্পগুলি হইয়াছে ক্লাসিক পর্য্যায়ভুক্ত। লেখক নূতন। অসমঞ্জ বাবু ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যাইতেছে তিনিই লেখককে আবিষ্কার করিয়াছেন। নহিলে এই অনাদরে, কোথায় তিনি হারাইয়া যাইতেন—আমরাও এইরূপ অমূল্য সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইতাম। লেখকের কোন লেখাই পূর্ব্বে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না, আবির্ভাবেই তাঁহার পাকা হাতের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইলাম। বইখানি সকলের নিকট নিশ্চয়ই সমাদৃত হইবে।

গৌতম সেন

দেশ-বিদেশের কথা

প্রাচ্যবাণী মন্দির

এবার প্রাচ্যবাণী মন্দিরের অভিনেতৃমণ্ডলী ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী এবং ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরীর ব্রহ্মদেশে গমনপূর্ব্বক পর পর দিন দুটি সংস্কৃত এবং একটি পালি নাটক অভিনয় করিয়া বিগত ১লা জানুয়ারী তারিখে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। এই নাট্যাভিনয়ে ব্রহ্মদেশে সংস্কৃত ও পালি ভাষা ও সাহিত্য এবং ভারতীয় ভাবধারা শিক্ষা বিষয়ে এক নব উদ্দীপনার সৃষ্টি হইয়াছে। বিভিন্ন শিক্ষাস্থানে ডক্টর যতীন্দ্রবিমল ও ডক্টর রমা চৌধুরী ভারতীয় সাহিত্য ও সভ্যতার বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা করেন। প্রত্যাবর্ত্তন দিবসে রেঙ্গুনস্থ বাংলা সাহিত্য সমিতি তাঁহাদিগকে সাদর সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন।

স্মরণে

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

প্রসন্নকুমার আচার্য্য

মহামহোপাধ্যায় ডক্টর প্রসন্নকুমার আচার্য্য বিগত ১লা ডিসেম্বর ৭৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বাঙ্গালীর জীবন-মানের তুলনায় পরিণত বয়সেই ইহধাম ত্যাগ করিলেন, কিন্তু ভারতীয় বিদ্যাক্ষেত্রে তাঁহার মৃত্যুতে যে ছেদ পড়িল তাহা পূরণ হইতে দীর্ঘকাল লাগিবে। এলাহাবাদকেই তিনি কর্ম্ম ও বিদ্যাচর্চ্চার ক্ষেত্র করিয়া লইয়াছিলেন, এইজন্য বাঙ্গালী সাধারণের নিকট তিনি তেমন পরিচিত ছিলেন না। দেখিয়া দুঃখ হয় বাংলার তথাকথিত প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্র সমূহের (অবশ্য দুই-একটি বাদে) পৃষ্ঠায় তাঁহার সুকৃতি ও বিদ্যাবত্তার কথা এখনও প্রকাশ হইল না।

ডক্টর প্রসন্নকুমার কুমিল্লার একটি নিভৃত পল্লীতে ১২৯০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যাবস্থা হইতে পরিশ্রম ও নিষ্ঠা সহকারে বিদ্যাশিক্ষায় মনোযোগী হন। তিনি ক্রমে এণ্ট্রান্স, আই-এ এবং বি-এ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত পাস করেন। সংস্কৃতের প্রতি তাঁহার প্রথম হইতেই ঝোঁক ছিল। বি-এ পরীক্ষায় তিনি সংস্কৃতে অনার্স লইয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পরীক্ষায়ও সংস্কৃত 'আই' বিভাগে (Epigraphy and Ancient Indian History) প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ১৯১৩ সনে উত্তীর্ণ হন। পরবৎসর স্কলারশিপ লাভ করিয়া উচ্চতন সংস্কৃত বিদ্যা অধিগত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি বিলাত গমন করেন। এই বৃত্তিটি নিখিল ভারতীয় প্রতিযোগিদের মধ্যে প্রসন্নকুমার প্রথম হইয়া প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এবারে একাই তিনি উচ্চ শিক্ষালাভার্থ ভারত সরকার কর্ত্তৃক বিলাতে প্রেরিত হন। একাদিক্রমে পাঁচ বৎসর কাল ইউরোপে থাকিয়া সংস্কৃত সাহিত্য-চর্চ্চায় তিনি অভিনিবিষ্ট হন। কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অধ্যাপকের অধীনে এই বিষয়ে অনুশীলন করিতে থাকেন। তখন তিনি প্রাচ্য বিদ্যাবিদ্ ম্যাক্‌ডনেল ও র‍্যাপসনের সংস্পর্শে আসেন। গবেষণার বিষয় নির্দ্ধারণে বাংলার গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের (বর্ত্তমানে কলেজ) প্রাক্তন অধ্যক্ষ ঈ·বি হাভেল তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করেন। তাঁহারই উপদেশে প্রসন্নকুমার প্রাচীন ভারতীয় বাস্তুবিদ্যার উপর গবেষণা করিতে আরম্ভ করেন।

প্রসন্নকুমার আচার্য্য

মহাসমরকালে সংস্কৃত চর্চ্চার সুবিধার জন্য তিনি কিছুকাল হলাণ্ডে অবস্থান করেন এবং সেখানকার লীডেন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পিএইচ-ডি উপাধি লাভে সমর্থ হন। ইহাতেও বৈশিষ্ট্য ছিল। হলাণ্ডের বাহিরের কাহাকেও এই উপাধি দেওয়ার ক্ষমতা তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছিল না। হলাণ্ডের রাণী বিশেষ আইনবলে বিশ্ববিদ্যালয়কে এই উপাধি প্রদানে ক্ষমতা দিয়াছিলেন। তবেই প্রসন্নকুমার এই উপাধি লাভ করিতে পরিয়াছিলেন। তথা হইতে লণ্ডনে ফিরিয়া গিয়া তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও ডি-লিট্ উপাধি পান।

ইহার পর তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসেন এবং প্রথমে কোনো কোনো সরকারী পদে কার্য্য করিয়া শিক্ষকতাকেই

তিনি জীবনের ব্রত করিয়া লন। এলাহাবাদের মুয়ির সেণ্ট্রাল কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হইয়া কার্য্য করিতে থাকেন। ১৯২০ সনে তিনি ইণ্ডিয়ান এডুকেশনাল সার্ভিসভুক্ত হন। তাঁহার বিদ্যাবত্তার কথা ক্রমে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। তিনি পরে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন অব্ দি ফ্যাকাল্‌টি অব্ আর্ট এবং হেড অব দি ওরিয়েণ্টাল ডিপার্টমেণ্ট—তথা প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগের অধ্যক্ষপদে উন্নীত হন। এই পদ হইতে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৪৫ সনে তিনি সরকার কর্তৃক 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে ভূষিত হন।

প্রাচীন ভারতীয় বাস্তুশিল্প তথা স্থাপত্যবিদ্যার উপর প্রসন্নকুমার দীর্ঘকাল যাবৎ গবেষণাকার্য্য পরিচালনা করেন। এই গবেষণার ফলই হইল তাঁহার সাত খণ্ডে প্রকাশিত সুবিখ্যাত "মানসার" গ্রন্থ। এই বিদ্যায় পূর্ব্বে বা সমসময়ে তাঁহার কোনো জুড়িই ছিল না। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে স্বদেশীয় স্থাপত্যবিদ্যা সম্পর্কে প্রসন্নকুমারের বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ "মডার্ণ রিভিয়ু"তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগসাধিত হইয়াছিল। প্রসন্নকুমারের মৃত্যুতে আমরা আত্মীয়-বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করিতেছি।

নৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী

ডক্টর নৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী ২৪ পরগণার অন্তর্গত মধ্যমগ্রাম বসুনগরস্থ নিজ বাসভবনে বিগত ৩০শে নবেম্বর ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ষাট বৎসর হইয়াছিল।

নৃপেন্দ্রনাথ খুলনা জেলার শ্রীফলতলা গ্রামের বিখ্যাত বসুরায়চৌধুরী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় ইংরেজী সাহিত্যে অনার্স সহ উত্তীর্ণ হন। এম-এ পরীক্ষায়ও তিনি ইংরেজী লইয়া কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি অধ্যাপকের কর্ম্ম লইয়া নেপালে যান। এই সময়েই নৃপেন্দ্রনাথ "বাংলার লোকগীতি"র উপর গবেষণা করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি-লিট্ উপাধি লাভ করেন। তিনি বেশীদিন অধ্যাপনাকার্য্যে লিপ্ত থাকেন নাই, রেলবিভাগে কর্ম্ম লইয়া বাংলায় ফিরিয়া আসেন।

তরুণ বয়সেই নৃপেন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনার সূত্রপাত হয়। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অতীব নিষ্ঠার সঙ্গে এই সাহিত্য-সাধনায় তিনি রত রহিয়াছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি কবিতা ও গল্প লেখক হিসাবে সাধারণের নিকট পরিচিত

নৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী

হন। 'দুন্দুভি', 'বাতায়ন', 'গল্পলহরী', 'যুগশক্তি', 'পুষ্প-পাত্র' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁহার বিস্তর গদ্য-পদ্য রচনা প্রকাশিত হয়। তিনি রেলবিভাগে কর্ম্ম করিবার সময় ইষ্টার্ণ রেলওয়ে পরিচালিত বাংলা মাসিকপত্রের সম্পাদনা-

কার্য্যেও লিপ্ত ছিলেন। তাঁহার বহু রচনা ইহাতেও প্রকাশিত হইয়াছিল। রেলবিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত 'বাংলায় ভ্রমণ' নৃপেন্দ্রনাথের লিপিকুশলতার সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসারও পরিচায়ক হইয়া রহিয়াছে।

পরবর্ত্তী জীবনে তিনি হিন্দুদর্শন, বিশেষতঃ বৈষ্ণব-সাহিত্য ও শাস্ত্রচর্চ্চায় মনোযোগী হন। এ সকল বিষয়ে তাঁহার গভীর জ্ঞান বক্তৃতায় ও লেখনীমুখে অহরহ প্রকাশিত হইয়া পড়িত। তাঁহার হিন্দুদর্শন ও বৈষ্ণব-শাস্ত্র বিষয়ক বহু রচনা 'শ্রীগৌরাঙ্গ সেবক', 'সুদর্শন', 'দেবমাল', 'উজ্জীবন', 'জগজ্জ্যোতি', গোরক্ষপুর হইতে প্রকাশিত হিন্দি 'কল্যাণ' প্রভৃতি পত্রিকায় বাহির হয়। তিনি বহু বৎসর 'কায়স্থ পত্রিকা'রও সম্পাদক ছিলেন।

নৃপেন্দ্রনাথের মুখে শুনিয়াছি—তিনি কলিকাতা চালতাবাগানস্থ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর একাদিক্রমে পঁচিশ বৎসর কাল কর্ম্মসচিব বা সেক্রেটারী ছিলেন। এই সম্মিলনীর যে এতটা উন্নতি হইয়াছে তাহার নিমিত্ত নৃপেন্দ্রনাথের অসামান্য নৈপুণ্য ও পরিশ্রম অনস্বীকার্য্য। সীঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীরও তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। তাঁহার মুখে ভাগবত বিষয়ক কথকথা মধুময় হইয়া উঠিত। নৃপেন্দ্রনাথের বক্তৃতা যাঁহারা শুনিয়াছেন তাঁহারা হিন্দুশাস্ত্রের গভীর তত্ত্বকথার সঙ্গে পরিচিত না হইয়াই পারিতেন না। তাঁহার ভাষা এত প্রাঞ্জল ও সরস ছিল যে, তাহা শ্রোতাদের হৃদয়ে গ্রথিত হইয়া যাইত। নৃপেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে বাংলা দেশ একজন নিষ্ঠাবান তত্ত্বদর্শী সাহিত্য-সাধক হারাইল।

নৃপেন্দ্রনাথ অত্যন্ত প্রীতি ও সেবাপরায়ণ মানুষ ছিলেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে প্রত্যেকে মুগ্ধ হইত। আমরা তাঁহার সঙ্গে মিশিয়া তাঁহাও এই সকল গুণও প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

মুরলীধর বসু

সাংবাদিক ও সাহিত্যিকি মুরলীধর বসু মহাশয় বিগত ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৬০ দিবসে তদীয় মধ্যমগ্রামস্থ বাসভবনে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার সংবাদপত্র-সেবা ও সাহিত্যসাধনা জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গভারতী একজন নিষ্ঠাবান সাধক হারাইলেন।

মুরলীধর ১৮৯৭ সনের ৫ই সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু কলিকাতা হাইকোর্টের একজন প্রখ্যাত ব্যবহারাজীব ছিলেন। মুরলীধর বিভিন্ন পরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন তিনি ১৯২১ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইতিহাসে এম-এ পরীক্ষা দিয়া তাহাতেও উত্তীর্ণ হন। ইহার পর

মুরলীধর বসু

১৯২২ সন হইতে ১৯৪৫ সন পর্য্যন্ত একাদিক্রমে চব্বিশ বৎসর কাল ভবানীপুরস্থ মিত্র ইনষ্টিটিউশনে শিক্ষকতাকর্ম্মে রত থাকিয়া শেষোক্ত বৎসরে অবসর গ্রহণ করেন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি নানাভাবে সাহিত্য-সাধনায় রত হইয়া পড়েন। তিনি ক্রমে পত্রিকা পরিচালনা ও সম্পাদনায় অগ্রসর হন এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁহার সুচিন্তিত রচনাও প্রকাশ পাইতে থাকে। 'সংহতি'র অন্যতম সম্পাদকরূপে তিনি মনীষী বিপিনচন্দ্র পালের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসেন। ইহার কিছুকাল পরে 'কালি-কলম' সম্পাদকরূপেই তিনি শিক্ষিতমহলে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অধুনা বিখ্যাত বহু কবি ও কথাশিল্পীর প্রথম দিককার রচনা 'কালি-কলমে' প্রকাশিত করিয়া সম্পাদক মুরলীধর তাঁহাদিগকে একনিষ্ঠ সাহিত্য-সাধনায় প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন।

শিক্ষকতাকর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি কয়েক বৎসর কথাশিল্পী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সহযোগে চলচ্চিত্র পরিচালনায়ও লিপ্ত হন। শেষ বয়সে তিনি "তরুণের স্বপ্ন" মাসিক পত্রের সম্পাদনাকার্য্যে যুক্ত হইয়াছিলেন। মুরলীধরের নিরলস সাহিত্য-সাধনা এবং অমায়িক ব্যবহার আজিকার দিনেও অনেকেরই আদর্শ হইবার যোগ্য। আমরাও তাঁহার ঘনিষ্ট সংস্রবে আসিয়া নিজেদের ধন্যজ্ঞান করিয়াছি।

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
মুদ্রাকরও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

মন্ত্রণা

প্রাচীন রাজপুত (বুঁদি) চিত্রিত পুঁথি হইতে। চিত্রাধিকারী—শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়.

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

:: ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬০শ ভাগ
২য় খণ্ড

ফাল্গুন, ১৩৬৭

৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

দলগত স্বার্থ বনাম দেশাত্মবোধ

আমরা বহু বিদেশী লেখকের কাছে শুনিয়াছি যে, আমাদের দেশে জাতীয়তাবাদ (বা দেশাত্মবোধ) কখনও ছিল না; আজকার দিনে যে দেশসেবার বা দেশপ্রেমের কথা আমরা বলিয়া থাকি, সেটা তাঁহাদের মতে ইংরেজের শিক্ষার ফলে আমরা লাভ করিয়াছি। এই মতের স্বপক্ষে তাঁহারা আমাদের হাজার বৎসরের দাসত্বের ইতিহাসের নানা সাক্ষ্য উপস্থিত করেন। তাঁহারা বলেন, গোষ্ঠীগত বা জাতিবর্ণগত ক্ষুদ্র স্বার্থে দেশের উচ্চতম অধিকারকে—অর্থাৎ স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যকে আমরা হেলায় বিদেশীর হাতে শত শত বার তুলিয়া দিয়াছি।

একথা সত্য কি মিথ্যা তাহার বিচারের অবকাশ বা ক্ষেত্র এখানে নাই। কিন্তু যেভাবে এখন ক্ষুদ্র স্বার্থের লোভে বৃহত্তর স্বার্থকে বিসর্জ্জন দেওয়া হইতেছে তাহাতে আমাদের সকলেরই এ দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। এই কারণেই বোধ হয় রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁহার সাধারণতন্ত্র দিবসের ভাষণে বলিয়াছিলেন:

"বিগত ১১ বৎসর ভারত-ইতিহাসে এক অতি ক্ষুদ্র অংশ; কিন্তু আমাদের নিকটে আজ তাহার গুরুত্ব খুবই বেশী। কারণ আমাদের ইতিহাসে এই সময়ে আমরা সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের এক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের (যাহার আদর্শ হইতেছে মানবিক মর্য্যাদা ও স্বাধীনতা এবং যেখানে দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার কোনোও স্থান নাই) স্থায়ী ও নিরাপদ ভিত্তি স্থাপনে নিযুক্ত ছিলাম। আমরা এমন এক কল্যাণ রাষ্ট্র গঠন করিতে চাই যেখানে প্রত্যেকটি নাগরিক কোনোরূপ বিভেদ বা বৈষম্যের সম্মুখীন না হইয়া সম্মানজনক জীবনধারণের ও পূর্ণ বিকাশের সুযোগ লাভ করিতে পারিবে।"

"এই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়াই আমাদের পরিকল্পনা রচিত হইতেছে। আজ আমরা যে কাজ করিতেছি এবং স্বাধীনতার পর হইতে আমরা যাহা করিয়াছি তাহা দ্বারাই আমাদের ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারিত হইবে। তাই আমাদিগকে বৈষয়িক ও নৈতিক সমস্ত সম্পদ সংগ্রহ করিতে হইবে। আমাদের সকল জাতীয় প্রচেষ্টার মধ্যে ঐক্যের সূত্রবন্ধন না থাকিলে তাহা সাধন করা সম্ভব হইতে পারে না। বিশ্বের বৃহত্তর অংশ যেদিন প্রস্তরযুগে পড়িয়া ছিল, সেই সময়েই আমরা সংস্কৃতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলাম বলিয়া যদি গর্ব্ববোধ করিতে পারি, তাহা হইলে আজ নিজেদিগকে এই কথাই জিজ্ঞাসা করিতে হইবে যে, বহু অনুন্নত জাতি যখন কঠোর শ্রম স্বীকার করিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, তখন আমরা কেন এখানে রহিয়া গিয়াছি। ইতিহাসের শিক্ষাকে বিস্মৃত হওয়া কি বিজ্ঞের কাজ? আমাদের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় কলঙ্ক হইতেছে সেই সময়ের যখন আমরা মাত্রাবোধ ভুলিয়া গিয়া গৌণ ও ক্ষুদ্র জিনিসের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছি; কিন্তু দেশের প্রয়োজন উপেক্ষা করিয়াছি। আমাদের নিজস্ব ইতিহাসের শিক্ষা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই এবং যেসব কারণে এক সময়ে আমাদের পতন ঘটিয়াছিল সেগুলি যেন আজকে আমাদের জাতীয় জীবনে বর্ত্তমান না থাকে এবং ভবিষ্যতেও যাহাতে উহাদের পুনরাগমন না ঘটে তাহা অবশ্যই আমাদের দেখিতে হইবে।

"এই বৎসরে জাতি তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা লইয়া কাজ আরম্ভ করিবে। গত বারো বৎসরে আমরা যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছি সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের লব্ধ স্বাধীনতাকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার রূপদান করিতে হইলে আমাদিগকে আরও দীর্ঘপথ অতিক্রম করিতে হইবে।

"ভারতে আমরা বহুবিধ আভ্যন্তরীণ ও বাহিরের চাপ ও অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছি। ইহাকে আমাদের জাতীয় অস্তিত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জ হিসাবেই গ্রহণ করিতে হইবে। প্রতি বৎসর এই শুভদিনে আমাদিগকে সাধারণ মানুষের স্বার্থে এবং সকল জাতির মধ্যে শান্তি, শুভেচ্ছা ও মৈত্রীর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করিয়া তুলিবার সুপ্রাচীন ভারতীয় প্রচেষ্টার প্রতি আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে।"

ইতিহাসের শিক্ষা যদি কাহারও পুনর্ব্বার পড়া প্রয়োজন হইয়া থাকে তবে সে প্রয়োজন আমাদের। জাতিগত ও ভাষাগত অন্ধ স্বার্থের তাড়নায় যদি কেহ লাঞ্ছিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে তবে সে বাঙালী। বিহারে, উড়িষ্যায় এবং আসামে বাঙালীর উপর স্বার্থ-প্রণোদিত আক্রোশের তাড়না সহ্য করিতে হইয়াছে আমাদের। এখন নিজের দেশে কোণঠাসা হইয়া দুঃস্থ ও ক্লিষ্ট জীবনযাপনের অভিশাপও আমাদের মাথার উপরে ঝুলান রহিয়াছে, তবুও কি বলিব যে, ইতিহাসের পড়া আমাদের মুখস্থ করাব প্রয়োজন নাই?

বাঙালীর মধ্যে প্রাদেশিকতা নাই আমরা মনে করি এবং যদিও তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে—পূর্ণ সত্য হইলে অন্য প্রদেশের লোকের মধ্যে আমাদের এরূপ বন্ধুত্বের বা সখ্যতার অভাব ঘটিত না—তবুও অন্য প্রদেশের তুলনায় এখানে ঐ সঙ্কীর্ণতা কম। বাঙ্গালী দেশাত্মবোধের প্রমাণে, অর্থাৎ দেশের স্বাধীনতা ও প্রগতির জন্য আত্মনিবেদনের নিদর্শনে কোনো প্রদেশের চাইতে কম ছিল না, বরং এই সেইদিন পর্য্যন্ত সে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রসরই ছিল। সর্ব্বভারতের প্রগতির ক্ষেত্রে তাহার অবদান—কি শিক্ষায়, কি শিল্প উন্নয়নে, কি চিকিৎসায়, কি রাজনীতিতে—কাহারও তুলনায় কম নহে। বাঙ্গালী বুদ্ধিমত্তায় ও কার্য্যকুশলেও সেদিন পর্য্যন্ত অগ্রণীই ছিল। তবে তাহার আজ এই নিদারুণ সর্ব্বাঙ্গীন দৈন্য কেন, আজ কেন সে এরূপ অবহেলার ও অবজ্ঞার পাত্র? আমাদের এখন বুঝিবার দিন আসিয়াছে যে, ইহা শুধু ভাগ্যের পরিহাস নহে বা শুধুমাত্র সংখ্যায় লঘু হওয়ার কারণে নহে, ইহার কারণ বাঙ্গালীর আত্মঘাতি অন্তর্কলহ।

গোষ্ঠীগত ও সমাজগত হিংসা, দ্বেষ ও স্বার্থচিন্তা অন্য প্রদেশে খুবই আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এখানে সেটা দিন দিন প্রবল হইতে প্রবলতর হইতেছে। দলগত স্বার্থ-চিন্তা অন্য প্রদেশেও আছে, কিন্তু বাংলার দলগুলির মতো উহা এতটা দেশাত্মবোধশূন্য বোধ হয় এক আসাম ছাড়া আর কোথায়ও হয় নাই। এই দলগত স্বার্থের চিন্তায় আজ বাঙ্গালী নিজেই বাঙ্গালীর সর্ব্বাপেক্ষা ক্রুর ও সাংঘাতিক শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

দলগত স্বার্থের তাড়নায় বাংলার ছোট দলগুলি কিরূপে কাণ্ডজ্ঞান হারাইতেছে তাহার এক উদাহরণ আমরা পাই পৌরসভার নির্ব্বাচনের জন্য জোট বাঁধার ব্যাপারে। ফরওয়ার্ড ব্লক নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত দল এবং ইহার খ্যাতি-প্রতিপত্তি যাহা কিছু আছে তাহা সবই নেতাজী-যশের ভিত্তিতে স্থাপিত। নেতাজী যখন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্যস্ত তখন ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি কিভাবে তাঁহার অপযশকীর্ত্তনে মুখর হইয়াছিল, কিভাবে তাঁহাকে লেখায় ও চিত্রে কদর্য্য বিদ্রূপ করিয়াছিল, তাহা এই অভাগা বাংলার জনসাধারণ ছাড়া আর কেহই ভুলে নাই। অথচ আজ এই দলগত ক্ষুদ্র স্বার্থের তাড়নায় সেই ফরওয়ার্ড ব্লকই কম্যুনিষ্ট পার্টির অনুচররূপে নির্ব্বাচনে নামিবার উদ্যোগ করিয়াছে!

ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের মতামত অনেক ক্ষেত্রে আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। কিন্তু বর্দ্ধমানের সম্মেলনের পর বাংলার কম্যুনিষ্ট পার্টি যে ভূমিকায় নামিয়াছে তাহা দৃষ্টে তিনি যে নিজের দলের সঙ্গে উহার সকল যোগসূত্র ছিন্ন করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প দেখাইয়াছেন তাহার জন্য তাঁহাকে প্রশংসা করিতেই হয়। রাজ্যপালের ভাষণ বর্জ্জনের বিরুদ্ধে তাঁহার অন্য এক কারণও দৈনিক বিশেষে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাও আমরা সম্পূর্ণ সমীচীন মনে করি।' ঐ ব্যাপারে তিনি পার্টি ছাড়িয়া দিতে চাওয়ায় উহার দলের বিভ্রান্ত সদস্যগণের চৈতন্য হইয়াছে দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি।

রাজ্যপালের ভাষণবর্জ্জন উত্তর প্রদেশেও করা হইয়াছে। সেখানে বর্জ্জনকারীদিগের মধ্যে অধিকাংশ ছিল কংগ্রেসেরই এক উপদল। এই স্বার্থান্ধ ভাগ্যান্বেষী-দের ধারণা ছিল যে, ঐরূপে অনাস্থা জানাইলে উত্তর প্রদেশের বর্ত্তমান মন্ত্রীসভার পতন হইবে। বলা বাহুল্য, সেরূপ কিছু হয় নাই, তবে শোনা যায় যে, এই ব্যাপারে কংগ্রেসের "হাই কমাণ্ড" অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছেন এবং এইরূপ অবস্থার প্রতিকার কি ভাবে করা যায় সে জন্য চিন্তিত আছেন। প্রতিকার দুরূহ ব্যাপার, কেন না

কংগ্রেসের সদস্যদিগের মধ্যে দেশাত্মবোধযুক্ত এবং নিঃস্বার্থ লোক এখন অতি সামান্য সংখ্যায় আছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী বোধ হয় সারা ভারতে দুই-চারি জন মাত্র।

তবে বিহারের মন্ত্রীসভা গঠনের পূর্ব্বলক্ষণ ভাল। শ্রীসঞ্জীব রেড্ডীর নির্দ্দেশে সেটা যেভাবে উপযুক্ত লোকের হস্তে অর্পিত হইয়াছে তাহা আশাপ্রদ। অবশ্য মন্ত্রীসভা-গঠনের পরই বহু কায়েমী স্বার্থের টানাটানি আরম্ভ হইবে। তাহাতে অবস্থা কি দাঁড়ায় তাহা অদূর ভবিষ্যতেই দেখা যাইবে। ক্ষমতার আস্বাদ যে একবার পাইয়াছে তাহার পক্ষে অধিকার ত্যাগ করার জন্য বা অধিকার-বিচ্যুত অবস্থায় থাকার জন্য যেরূপ দৃঢ়চিত্ত ও মানসিক সংযমের প্রয়োজন সেইরূপ গুণযুক্ত লোকের সংখ্যা বিহারের পূর্ব্বতন মন্ত্রীসভায় কত জন আছে জানি না। যদি সেখানেও উত্তর প্রদেশের অবস্থাই থাকে তাহা হইলে গোল বাধিবেই।

এইরূপ ক্ষমতালোলুপ লোকের প্রায় শতকরা ৯৯ জনই ক্ষমতা পাইলে, স্বেচ্ছায় বা অনুচরবর্গের পরামর্শে, তাহার অপব্যবহার করিয়া থাকেন। এই যে সারাদেশ দুর্নীতি ও দুরাচারে ভাসিয়া যাইতেছে, তাহার প্রধান কারণ—প্রত্যক্ষ ভাবে বা পরোক্ষভাবে—এই আদর্শভ্রষ্ট ক্ষমতার অধিকারীবর্গ। ইঁহারাই ক্ষমতা পাইবার জন্য এবং ক্ষমতা পাইলে তাহা বজায় রাখিবার জন্য এরূপ লোকের সহায়তা গ্রহণ করেন যাহাদের একমাত্র লক্ষ্য স্বার্থপূরণ, এবং সেই কারণে এহেন নীচ বা নীতিবিরুদ্ধ কাজ নাই যাহাতে উহাদের বাধে। এই সকল সমাজ-দ্রোহী দেশের ও দশের শত্রুদিগের পোষণ করিতেছে কংগ্রেসের নীতিভ্রষ্ট অধিকারীবর্গ এবং এই কারণেই দেশে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছে।

আমাদের মত সাধারণজনের বিপদ এই যে, আমাদের সম্মুখে যাঁহারা নির্ব্বাচনে প্রার্থী হইয়া আসেন তাঁহারা প্রায় সকলেই কোনো না কোনো দলভুক্ত, কেন না দেশের অবস্থা এরূপ যে, এই নির্ব্বাচনে তাঁহারই জয়লাভ সম্ভব যাঁহার দলে ভোট সংগ্রহের "আনুসঙ্গিক উপকরণ", অর্থাৎ অর্থবল ও জনবল, যথেষ্ট পরিমাণে আছে। দেশের লোকের মধ্যে অধিকাংশের এ বিষয়ে কোনোও অভিজ্ঞতা নাই, মুখের বচনে প্রায় আমরা সকলেই ভুলে যাই সব কিছু। যাঁহারা সত্যাসত্য বিচারে সমর্থ তাঁহাদের কথা কেহই শুনে না বা মানে না আজকার দিনে—ইহাই আমাদের অবনতির কারণ।

কংগ্রেসের বিরোধী দল

কংগ্রেসের কলুষিত অবস্থার কথা আমরা ক্রমাগত বলিয়াছি, এবং দেশের যাবতীয় সংবাদপত্রে কংগ্রেসী সরকারের কঠোর সমালোচনা চলিতেছে। সে সমালোচনার ভিত্তিমূলে আছে ক্ষমতার অপব্যবহার এবং দেশব্যাপী দুর্নীতি-প্লাবন-রোধে সরকারী চেষ্টার বা ইচ্ছার অভাব, যাহার বিষময় ফল দেশের লোকে এখন ভোগ করিতেছে। কিন্তু কংগ্রেসের বদলে আমাদের সম্মুখে আর কি বা কে আছে যাহাকে ঐ শাসনতন্ত্র নিশ্চিন্তভাবে সমর্পণ করা যায়?

সংবাদপত্রে দেখিতেছি যে, পশ্চিম বাংলায় আসন্ন নির্ব্বাচনের প্রস্তুতিতে বামপন্থীদের মধ্যে দুইটি জোট বাঁধিবার প্রস্তুতি চলিতেছে। একটি নেতৃত্ব লইবেন কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং সম্ভবতঃ, অন্যটির নেতৃত্ব থাকিবে প্রজা সোস্যালিষ্ট পার্টির হস্তে। এই বিষয় লইয়া বিগত ২২শে জানুয়ারী বর্দ্ধমানে রাজ্য কম্যুনিষ্ট সম্মেলনে বামপন্থী ঐক্য সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহার বিবরণে "আনন্দবাজার পত্রিকা" বলিয়াছেন:

"বলা হয়, যে কোনো দলকে ঐক্যের সর্ত্ত হিসাবে কম্যুনিষ্ট বিরোধিতা ত্যাগ করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের স্থলে অন্য কোনো গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে সে সম্পর্কে এক সর্ব্বনিম্ন কার্য্যসূচী গ্রহণ করিতে হইবে।

"দলীয় সেক্রেটারীয়েটে শ্রীজ্যোতি বসু প্রমুখ প্রবীণগণ সকলেই আছেন। শ্রীবসুকে সমগ্রভাবে পার্লামেণ্টারী কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে বলা হইয়াছে। পার্টি সেক্রেটারীয়েট হইতে একমাত্র ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত এম-পির নাম বাদ পড়িয়াছে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সেক্রেটারী হিসাবে কাজ করাই তাঁহার প্রধান কাজ হইবে। সেক্রেটারীয়েট সমস্ত নীতি নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে। সেক্রেটারীয়েটে ৯জন সদস্য আছেন। একটি আসন খালি আছে।

"সেক্রেটারীয়েট সদস্যদের নাম—শ্রীপ্রমোদ দাসগুপ্ত, শ্রীজ্যোতি বসু, শ্রীমুজাফর আহ্‌মদ, ডাঃ রণেন সেন, শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার, শ্রীনিরঞ্জন সেনগুপ্ত, শ্রীসরোজ মুখার্জ্জি, শ্রীসমর মুখার্জ্জি।

"সেক্রেটারী হিসাবে তাঁহার প্রধান কার্য্য কি হইবে—সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রী দাসগুপ্ত বলেন, 'পল্লীঅঞ্চল দলকে সংগঠিত করা'। তিনি বলেন যে, পার্টি তাহার সদস্যসংখ্যা ১৮,০০০ হইতে বৃদ্ধি করিয়া ইহার দেড়গুণ করার সিদ্ধান্ত করিয়াছে।

"শ্রীজ্যোতি বসু ১৯৫৩ সন হইতে দলের সেক্রেটারী ছিলেন। রাজনৈতিক পর্য্যবেক্ষকগণ মনে করেন যে পরিবর্ত্তনের ফলে উভয় দলের মধ্যে একটা আপোষ-রফা হইয়া গিয়াছে।"

"বামপন্থী ঐক্যের জন্য একটি আবেদন প্রস্তাব করা হইয়াছে। সাধারণ নির্ব্বাচন সংক্রান্ত প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, পি-এস-পি, ফরোয়ার্ড ব্লক এবং আর-এস-পি বিশেষ ভাবে পি-এস-পি কম্যুনিষ্ট বিরোধিতার নীতি গ্রহণ করিয়া এবং কংগ্রেস দলের নীতি অনুসরণ করিয়া গণতান্ত্রিক শক্তির মধ্যে বিভেদ ও বিভ্রান্ত জাগাইতেছে।

"গত সাধারণ নির্ব্বাচনে বামপন্থী ঐক্য সাধারণ সর্ব্বনিম্ন কর্ম্মসূচীর ভিত্তিতে রচিত হইয়াছিল। কিন্তু কম্যুনিষ্টবিরোধী মনোভাবের কথা কিছুই বলা হয় নাই। কিন্তু এবারে কম্যুনিষ্ট মনোভাব কঠিন হইয়াছে।

"কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় পি-এস-পি কে কম্যুনিষ্ট বিরোধিতা প্রত্যাহার করিতে বলা বৃথা। কারণ তাহাদের গণতান্ত্রিক সমাজবাদের মূলে ইহাই। রাজনৈতিক পর্য্যবেক্ষকগণ ভবিষ্যৎবাণী করিতেছেন যে, সাধারণ নির্ব্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে অন্ততঃ দুইটি বামপন্থী ঐক্য গঠিত হইবে—একটি কম্যুনিষ্ট নেতৃত্বে, দ্বিতীয় পি-এস-পি নেতৃত্বে।

"ইহা ব্যতীত কম্যুনিষ্ট পার্টির মতে অদলীয় ব্যক্তিদের সঙ্গেও মৈত্রী হইতে পারে। শ্রীভূপেশ গুপ্ত এম-পি-র কথায় প্রগতিশীল কংগ্রেসী যাঁহারা ধর্ম্মঘট পরিচালনা করিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গেও মৈত্রী হইতে পারে।

"শ্রীজ্যোতি বসু সুস্পষ্ট ভাষায় জানাইয়াছেন—সুবিধাবাদী মৈত্রী আর হইবে না।

"নেতৃবৃন্দ মনে করেন এবং প্রস্তাবেও বলা হইয়াছে যে, রাজ্যের পরিস্থিতি বিকল্প সরকার গঠনের অনুকূলে৭

"প্রস্তাব অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ কম্যুনিষ্টদের বর্ত্তমানে প্রধান কার্য্য :—(১) সাম্রাজ্যবাদী এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতের নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি সমর্থন, (২) জনসাধারণকে জানাইয়া দেওয়া যে, উন্নয়ন ব্যাপারে গবর্ণমেণ্ট পুঁজিবাদী পন্থা অনুসরণ করিতেছে, (৩) বিদেশী অর্থ আমদানী হ্রাসের আন্দোলনও শেষ পর্য্যন্ত উহা সম্পূর্ণ বন্ধ করা, (৪) বৃহত্তর তৃতীয় যোজনার জন্য চেষ্টা করা ও সরকারী উদ্যোগ বৃদ্ধি করা, (৫) করভার হ্রাস আন্দোলন।"

বর্দ্ধমানে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গ কম্যুনিষ্ট পার্টির কার্য্যসূচী যাহা "আনন্দবাজার পত্রিকা" দিয়াছেন তাহার শেষের তিনটি অত্যুত্তম। বিদেশী অর্থ আমদানী বন্ধ এবং করভার হ্রাসের জন্য আন্দোলন করা হইবে অথচ সেই সঙ্গেই বৃহত্তর তৃতীয় যোজনার জন্য চেষ্টা করা হইবে ও সরকারী উদ্যোগ বৃদ্ধি করার চেষ্টা হইবে। অর্থাৎ কিনা তৃতীয় যোজনার জন্য অর্থাগমের তিনটি উৎস যথা : আভ্যন্তরীণ আদায়ের মুখ (করভার) বহিরাগত প্রাপ্তির মুখ (বিদেশী অর্থ) এবং বেসরকারী উদ্যোগের মূলধন রোধ করিয়া "বৃহত্তর" তৃতীয় যোজনার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। বিনা অর্থাগমে কাজ "বৃহত্তর" কি করিয়া হইতে পারে তাহা বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন লোকে বুঝিবার চেষ্টা করিতে পারেন।

অবশ্য বিদেশ বলিতে কি বুঝায় সে প্রশ্ন সাংবাদিকের দল করেন নাই। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেন মস্কৌ ও পাইপিং স্বদেশে না বিদেশে। "আনন্দবাজার পত্রিকা" শুধু এইমাত্র জানাইয়াছেন :

"বর্দ্ধমান, ২২শে জানুয়ারী—কম্যুনিষ্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ শাখার কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি কর্ত্তৃক একজন নূতন সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত হইয়াছে। তাঁহার নাম শ্রীপ্রমোদ দাসগুপ্ত। গত ১০ বৎসর ধরিয়া তিনি প্রাদেশিক পরিষদে আছেন।

"শ্রীদাসগুপ্ত বলেন যে.দলীয় নীতি অধিকতর বামপন্থী হইবে, এই সংবাদ সত্য নয়। প্রকাশ শ্রী দাস কঠোরপন্থী চীন সমর্থক দলভুক্ত। নবম সম্মেলনে দেখা গিয়াছে যে, পশ্চিমবঙ্গে চীন সমর্থকদের সংখ্যাই বেশী। কিন্তু বর্ত্তমানে সম্মেলনের সিদ্ধান্তে কঠোরপন্থী ও নরমপন্থীদের একটা মীমাংসার মনোভাবই বেশী দেখা গিয়াছে।"

কম্যুনিষ্ট পার্টির দলীয় নীতি কোনমুখে যাইতেছে তাহা বুঝিতে আর কি অন্য কোনো তথ্যের প্রয়োজন আছে? প্রজা সোস্যালিষ্ট পার্টির মধ্যে এই নির্ব্বাচন সম্পর্কে কোনোও বিশদ আলোচনা হইয়াছে কি না আমরা জানি না। কিন্তু ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের পার্টি ত্যাগের দৃঢ় ইচ্ছা প্রকাশ এবং পরে পার্টির ভিতরে আলোচনার পর উঁহার পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করায় মনে হয় তাঁহার দল কম্যুনিষ্ট পার্টির আজ্ঞাবহ অনুচর হইতে অনিচ্ছুক।

অন্য দলগুলির কথা বিচার কথা বৃথা। তাঁহারা কি ভাবে কোন্‌দিকে যাইবেন তাহার কোনোই স্থিরতা নাই। দেশের জনসাধারণের মধ্যে একথা এখন প্রচার করা প্রয়োজন যে, দলগত স্বার্থ দেশকে ডুবাইতেছে। বিশ্বস্ত ও সৎলোকের স্থান কোনোও দলে বিশেষ কিছু নাই। তাহার প্রধান কারণ যে, ঐরূপ লোকের দেশাত্মবোধ ও সমাজসেবার প্রবৃত্তি ঐ সকল দলের অসৎ সাঙ্গোপাঙ্গের স্বার্থসিদ্ধির পরিপন্থী। ইহার প্রতিকার না করায় বাংলা

ও বাঙালীর দুর্দ্দশা চরমে নামিয়াছে এবং সারা ভারত এখন এই কারণে বিপদের সম্মুখীন।

কলিকাতা পৌরসভার নির্ব্বাচন

আসন্ন পৌরসভার নির্ব্বাচনে বামপন্থী দলের মধ্যে এক জোটে প্রার্থী নির্ব্বাচন হইবে না, এই সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে। বিগত ৭ই ফেব্রুয়ারী রাত্রে কম্যুনিষ্ট পার্টির কার্য্যালয়ে বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিদের এক বৈঠকে এই বিষয়ে আলোচনা হয়। আলোচনায় কি সিদ্ধান্ত হয় এবং আলোচনার বিষয়বস্তু কি কি ছিল তাহার পূর্ণ বৃত্তান্ত কোনও একটি সংবাদপত্রে বিশদভাবে দেওয়া হয় নাই। তবে ১৯৫২ সনে কম্যুনিষ্ট, পি-এস-পি, ফরোয়ার্ড ব্লক, আর-এস-পি প্রভৃতি বামপন্থী দল যে এক জোটে "ইউনাইটেড সিটিজেন্স কমিটি" (ইউ-সি-সি) নামে দল গঠন করিয়া পৌরসভায় প্রবল বিরোধী পক্ষ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহাতে ভাঙ্গন ধরিয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদগুলিতে দেখা যায় যে, পি-এস-পি-কে বাদ দিয়া অন্য আর একটি জোট বাঁধিবার চেষ্টাই চলিতেছে, এবং এই জোট সম্প্রতি কলিকাতা ও হাওড়ার পৌরসভার নির্ব্বাচনের জন্য গঠিত হইলেও আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনেও ইহা সক্রিয় থাকিবে, এই মতও প্রকাশিত হইয়াছে। একটি বাংলা দৈনিক পত্রিকা জানাইয়াছেন যে, কম্যুনিষ্ট পার্টি, ফরোয়ার্ড ব্লক ও আর-এস-পি একটি জোটে থাকিবে, এবং অন্য আর একটি জোটে বামপন্থী, পি-এস-পি ও আর-সি-পি-আই, দক্ষিণপন্থী জনসঙ্ঘ ও স্বতন্ত্র পার্টির সহযোগে নির্দ্দলীয় ভিত্তিতে বিশিষ্ট নাগরিকদিগকে প্রার্থীরূপে দাঁড় করাইবার চেষ্টা চলিতেছে। কংগ্রেস এ পর্য্যন্ত ৬৮ জন প্রার্থীর নাম প্রকাশ করিয়াছেন, এবং আরও কিছু নাম শীঘ্রই দিবেন শোনা যায়, তবে এ কথাও শোনা যায় যে, কয়েকজন নির্দ্দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে তাঁহারা কোনো প্রার্থী দাঁড় করাইবেন না। এ কথাও প্রকাশিত হইয়াছে যে, আর-এস-পি ও ফরোয়ার্ড ব্লকের কর্ম্মীদের একাংশ কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে এক জোট হইতে এখনও রাজী হয় নাই। আর-এস-পি-র তরফ থেকে এরূপ দাবিও এসেছে জানা যায় যে, দুর্নীতিপরায়ণ কাউন্সিলারদিগকে পুনর্ব্বার মনোনীত যেন না করা হয়। এই সম্পর্কে দুই-একজন কম্যুনিষ্ট কাউন্সিলারের নামও নাকি করা হয় এবং কম্যুনিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষ নাকি আশ্বাস দিয়াছেন যে, এবার সৎলোককেই মনোনয়ন করা হইবে।

অন্যদিকে ৩৮ জন বিশিষ্ট নাগরিক এক আবেদনে জানাইয়াছেন যে, দুর্নীতি, আত্মীয়পোষণ, দলীয় চক্রান্ত ও হাঙ্গামা করার ফলে কলিকাতা পৌরসভা এমন এক জঘন্য অবস্থায় পৌঁছাইয়াছে যে, উহা এখন সারা দেশে ঘৃণা ও বিদ্রূপের পাত্র। বিগত দশ বৎসরে পৌর পিতাগণ এই নগরীর বা নাগরিকগণের উন্নতির বা জরুরী ব্যবস্থা সম্পর্কে কোনোও চিন্তা করেন নাই বা চেষ্টা করেন নাই, ইহা এখন সর্ব্বজনবিদিত, এবং ঐ কারণেই কলিকাতার বর্ত্তমান দুরবস্থা ঘটিয়াছে। ঐ আবেদনে স্বাক্ষরকারীগণ জানাইয়াছেন যে, প্রতিটি ওয়ার্ডের নাগরিকগণ এই বিষয়ে অবহিত হইয়া নিজেদের নির্ব্বাচিত প্রার্থী দাঁড় করাইলে পরে এই অবস্থার অবসান হইতে পারে।

কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠান এখন দুর্নীতি কূটচক্রান্ত এবং দায়িত্বজ্ঞানশূন্যতার প্রতীক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই সঙ্গে ইহা বাঙালীর অক্ষম দুর্ব্বল চিত্তেরও নিদর্শন হইয়াছে। কেন না এই নগরে এত শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন বাঙালী নাগরিক থাকা সত্ত্বেও মুষ্টিমেয় চক্রান্তকারী দলগত ও ব্যক্তিগত স্বার্থে এই পৌর-প্রতিষ্ঠানকে তাহাদের লীলাভূমি করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছে। এই ৩৮ জন বিশিষ্ট নাগরিককে আমরা অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি, তাঁহাদের আবেদন যদি প্রকৃত মানুষের চিত্তে সাড়া দেয় তবে কিছু সুফল ফলিতে বাধ্য। এই সঙ্গে এ কথাও বলি যে, মাত্র একটি দৈনিকে এই আবেদনের সবিশেষ বিবরণ আছে এবং সেইটিই অভারতীয় পরিচালিত।

কম্যুনিষ্ট পার্টির বৈঠকে আর-এস-পি দলের কে বা কাহারা দুর্নীতিপরায়ণ প্রার্থীকে সমর্থন দেওয়ার বিরুদ্ধে মুখ খুলিয়াছিলেন জানি না। কিন্তু তিনি বা তাঁহারা যেই হউন, তাঁহাদেরও আমরা সাধুবাদ দিতেছি। এই সঙ্গে বলি, বিগত সাধারণ নির্ব্বাচনে এক বামপন্থী উদ্যোক্তাকে আমরা তাঁহাদের প্রার্থীদের মধ্যে কিছু সৎলোকের স্থান দিতে অনুরোধ করায় তিনি জোর গলায় বলিয়াছিলেন যে, সৎলোক কখনও কাজের লোক হয় না। আমরা এত দিনে দেখিতেছি যে, সৎলোক ও অসৎলোকের মধ্যে প্রভেদজ্ঞান অন্ততঃপক্ষে এই ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে। অবশ্য জানি না ইহা সুবুদ্ধির উদয় কি না।

কলিকাতার পৌর-পিতাগণের কীর্ত্তিচিহ্ন আজ এই নগরীর চতুর্দ্দিকেই দেখা যায়। যেমন পথ-ঘাটের দুর্দ্দশা তেমনই দুর্দ্দশা সরবরাহ এবং ময়লা নিষ্কাশনের ব্যবস্থার।

নগরবাসীর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করার যে কেহ আছে তাহা বুঝা যায় না। অথচ ব্যবস্থার আয়োজন আছে (নামে মাত্র) সব কিছুরই। আগুন লাগিলে দমকল জল পায় না আগুন নিবাইতে, এদিকে জলের নালি কাটিয়া রাস্তার মাঝে ধ্বসের সৃষ্টি হয়, যেমন হইয়াছে কলেজ ষ্ট্রীটে। সৎলোকে বাড়ী করিতে গিয়া অনুমতি পাইতে অশেষ কষ্ট পায়, অন্যদিকে চতুর লোকে নিয়মবিরুদ্ধ নির্ম্মাণকাজ অনায়াসে করিয়া ফেলে। পথে আলো নাই অনেক স্থলে, কেন না গ্যাসের বাতির তেজ একে কম আবার গাছের পাতার আবরণ অনেক ক্ষেত্রে তাহাও ঢাকিয়া রাখে। আগেকার দিনে একদল মালি ঐ সব ডাল কাটিয়া আলোর পথ পরিষ্কার করিত এখন কেহই করে না। বিজলী বাতি হইলে আলো বাড়ে কিন্তু বিজলী বাতির থাম "পাচার" হইয়া যায় পৌর-পিতাগণের কৃতিত্বের প্রভাবে। কলিকাতা পৌর-সভার বাজার-হাট এককালে দ্রষ্টব্য প্রতিষ্ঠান ছিল। আজকাল মেরামতের অভাবে সেগুলির ভিতরে চলা-ফেরাই কঠিন।

সোজা কথায় কলিকাতার বর্ত্তমান পৌরসভা বাঙালীর কলঙ্ক এবং কলিকাতার নাগরিকবৃন্দের নিষ্ক্রিয় বাক্-সর্ব্বস্বতার নিদারুণ দৃষ্টান্ত। অথচ আমরা বুদ্ধিমান জাতি।

এই অবস্থার প্রতীকার তবেই সম্ভব হবে যখন আমরা সৎলোকের ও নিঃস্বার্থ কর্মীর প্রকৃত মূল্যায়নের সামর্থ্য অর্জ্জন করিতে পারিব। বর্ত্তমানে যে দলগত স্বার্থের চক্রে আমরা আবদ্ধ তাহার কুটিল গতিতে আমরা অধঃপাতে যাইতেছি, যাহার বাস্তব নিদর্শন এই কলিকাতা নগর। এই নগরের (ও সেই সঙ্গে বাঙালী জাতির) সকল দুর্দ্দশা ও কলঙ্কের দায়িত্ব আজ প্রত্যেক দলের প্রত্যেক নেতার উপর। কোনোও দলের কোনোও নেতা সে বিষয়ে নির্দ্দোষ নহেন। এবং আমাদের দুর্ভাগ্য ও দুরবস্থা এতই চরমে গিয়াছে যে, আমরা নিজের বিচার-বুদ্ধি ও বিবেচনা সব কিছুই এই দলগত স্বার্থের আগুনে আহুতি দিয়া ভারবাহী পশুর মতো এই সকল অনর্থের বোঝা নির্ব্বাক ভাবে বহিয়া চলিতেছি।

কলিকাতা উন্নয়নের একমাত্র পথ বাঙালী নাগরিকের সক্রিয় ভাবে নাগরিক দায়িত্ব গ্রহণ করা এবং যাঁহারা পৌর-পিতা বা পৌর-প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীরূপে সেই দায়িত্ব পালনের ভার লইবেন তাঁহাদের সে কাজের যোগ্যতার যাচাই যথাযথ ভাবে করা। যাঁহারা সে যোগ্যতার কোনোও নজীর না দেখাইতে পারিবেন তাঁহাদের বিদায় না দিলে কলিকাতার উন্নয়ন ৮০০ কোটি টাকায় কেন, ৪,০০০ কোটিতেও সম্ভব নয়।

"সামান্য ক্ষতি"

রবীন্দ্রনাথের "কথা ও কাহিনী"তে ঐ নামের এক কবিতায় বৌদ্ধধর্ম্ম উপাখ্যান হইতে গৃহীত এক কাহিনী আছে। কাশীরাজ মহিষী শীতকালে সখীগণের সহিত জলক্রীড়ায় গিয়াছিলেন। পরে শীতার্ত্ত হওয়ায় তিনি এক দরিদ্রের কুটীরে অগ্নিসংযোগ করিয়া নিজের শীত দূর করেন। অন্যদিকে সেই আগুন ছড়াইয়া নিঃসহায় গ্রামবাসী সকলের সর্ব্বস্ব জ্বালাইয়া দেয়। মদগর্ব্বিতা রাজমহিষী দরিদ্রের সর্ব্বনাশের বিষয় চিন্তাও করেন নাই, বরঞ্চ এক সখী ঐরূপে আগুন দেওয়ায় আপত্তি করায় তাহাকে দূর করিয়া দিয়াছিলেন। অসহায় গ্রামবাসীগণ কাশীরাজকে এ বিষয়ে জানাইতে তিনি অন্তঃপুরে রাজমহিষীকে এরূপ কাজের জন্য তিরস্কার করেন। রাজমহিষীর দৃপ্ত উত্তরে প্রকাশ পায় যে, তিনি ঐ ক্ষতিকে অতি সামান্যই জ্ঞান করেন। ক্রুদ্ধ কাশীরাজ তাহাতে রাজ্ঞীকে সকল অলঙ্কার আভরণ খুলিয়া রাজপ্রাসাদ ছাড়িয়া যাইতে আদেশ করেন এবং দণ্ডস্বরূপ তাঁহাকে বলেন যে, ভিক্ষা করিয়া ঐ দরিদ্রদিগের ক্ষতিপূরণ করিয়া বৎসরকাল পরে রাজ-সকাশে আসিতে। এইখানেই রবীন্দ্রনাথের কবিতার সমাপ্তি।

সম্প্রতি ঐ কবিতার উপর রচিত এক নৃত্যনাট্যের প্রথম প্রদর্শন হয় কলিকাতায় মহাজাতি সদনে। নৃত্য-নাট্যের নৃত্যরূপায়ণ করিয়াছেন প্রখ্যাত নৃত্যকলাবিদ্ উদয়শঙ্কর। মঞ্চসজ্জা, যবনিকাবিন্যাস ও নাট্যের আনুষঙ্গিক বেশভূষার ব্যবস্থা করিয়াছেন তাঁহার স্ত্রী অমলাশঙ্কর এবং সমস্ত সঙ্গীতের ব্যবস্থা করেন ভ্রাতা রবিশঙ্কর। অন্য অনেক কুশলী কলাবিদ এই নৃত্যনাট্যকে সফল করিতে সাহায্য করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকী উপলক্ষে রচিত ও প্রযোজিত নানারূপ অনুষ্ঠান এই বৎসরে হইবে। এই নৃত্যনাট্য অতি সাফল্যের সহিত সেই উৎসবের আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। এখানে বিশদ বিবরণ বা সমালোচনার অবকাশ নাই, শুধুমাত্র আমরা বলিব যে, দীর্ঘদিন পরে আমরা রবীন্দ্রনাথের মানসচিত্রকে মূর্ত্ত হইতে দেখিলাম।

পার্টি তন্ত্র

বর্ত্তমানে কম্যুনিষ্ট পার্টির মহাসভার বিগত ১৭ই-২২শে জানুয়ারী যে অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে বাংলার কম্যুনিষ্ট দল এই মতলবই ঠিক করেন যে, এইবার ভোটাভুটির ব্যাপারে

তাঁহারা আর অন্যান্য "বাম"পন্থীদিগের সহিত এক জোট হইয়া কংগ্রেসের সহিত প্রতিযোগিতা করিবেন না। তাঁহারা নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইয়া ভোটযুদ্ধে জয়লাভ করিবার চেষ্টা করিবেন। এই যে মতলব, ইহা নির্দ্ধারণ করিতে কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতাদিগকে বিশেষ মেহন্নত করিতে হয় নাই; কারণ অপরাপর বামপন্থীদলগুলি চীনের ভারত আক্রমণের পর হইতেই,চীন প্রেমিক কম্যুনিষ্টদিগকে অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য করিয়া তাহাদিগের সহিত সহযোগে কোনো কার্য্য করা দেশদ্রোহিতা বলিয়া নিজেদের মধ্যে মানিয়া লইয়াছেন। এই কারণে বিষয়টা ঠিক কম্যুনিষ্টের অপর বামপন্থীদের বর্জ্জনের কথা নহে; বরং বামপন্থী অকম্যুনিষ্ট রাই কম্যুনিষ্টদিগকে বর্জ্জন করিয়া চলিবেন এই কথা জ্ঞাত হওয়াতে, কম্যুনিষ্টরা নিজেদের পথ সরাসরি ঠিক করিয়া লইয়াছেন। বর্ত্তমানে কম্যুনিষ্ট পার্টি ভারত শত্রু চীনের সহিত গোপনে অথবা প্রকাশ্যে সহায়তা করিবেন এই কথাই উক্ত পার্টির অন্তরের কথা। যদিও লোক দেখাইয়া শ্রীজ্যোতি বসু অথবা অপর কেহ দেশপ্রেমের অভিনয় করিতে পারেন তথাপি সে অভিনয়ে কেহ বিশেষ ভুলিবে বলিয়া মনে হয় না। কম্যুনিষ্ট পার্টির চীনের সহিত ভালবাসার কথা প্রায় প্রখর সূর্য্যালোকের মতোই অদৃশ্য লোকচক্ষুর অন্তরালে গুপ্ত আছে। অর্থাৎ কোনো কোনো কম্যুনিষ্ট নেতা উটপাখীর ন্যায় নিজের মাথা বালিতে ঢুকাইয়া ভাবিতেছেন যে বাহিরের জগৎ তাঁহাদিগকে আর দেখিতে পাইতেছে না; কিন্তু বাহিরের জগৎ সকল কিছুই জানিতে ও দেখিতে পাইতেছে। চীনাদিগের বর্ত্তমানে পাকিস্থান, বর্ম্মা, নেপাল, ভুটান ও সিকিমের সহিত মিতালি-চেষ্টা ও ভারতকে পিছন হইতে ছুরি মারিবার পরিকল্পনা সর্ব্বজনজ্ঞাত। এই ক্ষেত্রে ভারতবাসী সাধারণ কেহই (কম্যুনিষ্ট ব্যতীত) চীন ও অপরাপর শত্রুদিগের পরম বন্ধু কম্যুনিষ্ট পার্টিকে সাহায্য করিতে রাজি হইবেন না বলিয়াই আমাদিগের বিশ্বাস। অ

আদমসুমারি

বর্ত্তমান বৎসরে ভারতের জনসংখ্যা গণনা ও সকল লোকের বয়স, বিভিন্ন ধরনের পরিস্থিতি (শিক্ষা, ধর্ম্ম, আয় প্রভৃতি), ভাষা ইত্যাদি লিখিয়া লওয়া হইবে। ভারতে যখন মুসলিম লীগের প্রতিপত্তি ব্রিটিশ শাসকদিগের সাহায্যে খুবই উচ্চে ছিল, তখন হইতেই আদমসুমারির সংখ্যাগুলিকে ইচ্ছামত অদলবদল করিয়া শাসকদিগের মতলব সিদ্ধির ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। যেমন, বাংলায় মুসলমানদিগের সংখ্যা বাড়াইয়া লেখা একটা রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যাহাতে বাংলায় মুসলমান রাজত্ব কায়েম করা সহজ হয়, এই কারণে। বস্তুতঃ ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রবাসীতে দেখান হয় যে, বাংলায় মুসলমানদিগের সংখ্যা গুরুত্ব, আদমসুমারির সংখ্যা লইয়া ভেল্কিবাজি খেলিবার পরেও শুধু ০—৫ বৎসর বয়সের লোকেদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। অর্থাৎ মুসলমানদিগের মধ্যে শিশু অবস্থায় অকালমৃত্যু এত অধিক ছিল যে ৫ বৎসর বয়স হইবার পূর্ব্বেই তাহাদিগের বহু শিশুর মৃত্যু হইয়া ৫ বৎসরের অধিক বয়স্কের জনসংখ্যা তুলনায় অনেক কম হইয়া যাইত। এই সকল সংখ্যার আলোচনা তৎকালে "রাউণ্ড টেবল্ কন্‌ফারেন্সে"ও হইয়াছিল এবং তৎসত্ত্বেও ইহাই ঠিক হয় যে, বাংলা দেশে মুসলমান রাজত্ব হওয়া বিধেয়। আদমসুমারির সংখ্যাগুলি রাষ্ট্রীয় মতলববাজির একটা অস্ত্র। এই সকল সংখ্যা লইয়া ছিনিমিনি খেলিয়া অনেক মিথ্যাকে সত্য বলিয়া চালান হয়। অতি নিকটের কথা আসামে আসামি ভাষাভাষীর সংখ্যা। ১৯৪১ হইতে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দশ বৎসরে দেখা যায় আসামের আসামি ভাষাভাষী হঠাৎ প্রায় দ্বিগুণ হইয়া গিয়াছিল। অর্থাৎ সেই সকল সংখ্যা মতলব সিদ্ধির জন্য মিথ্যা করিয়া বাড়াইয়া লেখা হইয়াছিল। ভারত সরকারের আর একটা অতি প্রিয় মিথ্যা হইল হিন্দি ভাষাভাষীর সংখ্যা। তাঁহারা আজকাল সকল ভাষাকেই হিন্দি বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা দেখাইতে চাহেন যে, ভারতের জনসংখ্যার প্রায় অর্দ্ধেক হিন্দি ভাষাভাষী। বস্তুতঃ ভারতের জনসংখ্যার এক-ষষ্ঠমাংশও হিন্দি ভাষাভাষী নহেন। মৈথিলি, ভোজপুরী, মাগধি প্রভৃতি ভাষার হিন্দির সহিত সাদৃশ্য থাকিলেও সে সকল ভাষার একটা বৈশিষ্ট্য ও নিজত্ব আছে। ঐ সকল ভাষা ও আরও অনেক বিভিন্ন ভাষাকে ভারত সরকার হিন্দি বলিয়া দেখাইয়া থাকেন। বিহারের বাঙালী ও কোল-মুণ্ডা প্রভৃতি জাতির ভাষাও হয়ত এই আদমসুমারিতে হিন্দি বলিয়া দেখাইবার চেষ্টা হইবে। বস্তুতঃ, এখন হইতেই এই বিষয়ে সকল প্রদেশের সংখ্যালঘিষ্ঠদিগের সচেতন হওয়া অবশ্য প্রয়োজন। তাহা না হইলে দেখা যাইবে যে, ভারতের সকল লোকই হিন্দি ভাষাভাষী। পাঞ্জাবী ভাষাও বর্ত্তমানে হিন্দির সহিত সংযুক্তভাবে দেখান হয়; যদিও পাঞ্জাবী ভাষার সহিত হিন্দির সম্বন্ধ নাই বলিলেই চলে। পাঞ্জাবী, গুজরাটি, বাংলা প্রভৃতি ভাষা পরস্পরের অনুরূপ। ভাষা লইয়া খেলা এই আদমসুমারিতে বিহারে, পঞ্জাবে ও অপরাপর

প্রদেশে বিশেষ ভাবে চলিবে। যে সকল জেলা বাংলা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিহারে যুক্ত করা হইয়াছে সেই-গুলিতে সম্ভবতঃ দেখান হইবে যে, বাঙালীরা সংখ্যায় হিন্দি ভাষাভাষী অপেক্ষা কম। এই বিষয়ে সকল বাঙালী ও আদিবাসীদিগের সাবধান হওয়া প্রয়োজন।

সাধারণ ভাবে ভারত সরকারের নিকট যে সকল প্রিয় মিথ্যা ও অপ্রিয় সত্য আছে সেইগুলিকে ইচ্ছামতো বাড়াইয়া-কমাইয়া প্রচারেচ্ছা এই আদমসুমারিতে প্রকাশিত হইবে বলিয়া মনে হয়। এই জন্য সকল লোকেরই কিছু চেষ্টা করিয়া দেখা প্রয়োজন যাহাতে এই-জাতীয় মিথ্যা বিবরণ লিখিত না হয়। ইহা ব্যতীত সকল বিবরণের সত্যতা পরীক্ষা করার ব্যবস্থারও প্রয়োজন আছে। যথা আদমসুমারির গণনা হইয়া যাইলে কোথাও কোথাও বিবরণের সত্যতা যাচাই করিবার জন্য পুনর্গণনা হওয়া এবং তাহা নিরপেক্ষ লোকের দ্বারা করান প্রয়োজন। নিরপেক্ষ কে এবং গণনাকারক নিরপেক্ষ হইলেও তাহার উপরওয়ালা নিরপেক্ষ হইবেন কি না, এ কথার উত্তর কেহ দিতে পারে না। আজকাল অতি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণও নিজ প্রভাব ব্যবহার করিয়া মিথ্যা প্রচার করিয়া থাকেন। আমাদের জাতীয় মন্ত্র 'সত্যমেব জয়তে' যদি সত্য হয় তাহা হইলে এই মিথ্যা প্রচার যাঁহারা করেন তাঁহাদিগের পরাজয় হইবে এই আশা করা যায়। অবশ্য শেষ অবধি পরাজয় হইবেই। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে তাঁহারা দেশের ও দশের কতটা অনিষ্ট করিবেন তাহা কে বলিতে পারে?

অ

বাঙালীর ভবিষ্যৎ

কংগ্রেসের "স্বাধীনতা সংগ্রামে"র ফলে বাঙালী জাতি ধ্বংসের পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে এবং সময়মতো যদি বাঙালী আত্মরক্ষা করিতে না শিখেন এবং করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা না করেন, তাহা হইলে বাঙালীর ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। প্রথমতঃ রাজত্ব হাতে পাইবার জন্য কংগ্রেস ভারত-বিভাগে রাজি হইয়া বাংলার অধিকাংশ পরহস্তে তুলিয়া দিয়াছিলেন; এবং প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ বাঙালী সে কারণে উদ্বাস্তু-অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অপরাংশে আসিয়া পড়াতে সকল বাঙালীরই অবস্থা বিশেষ জটিল ও বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছিল। উদ্বাস্তু বাঙালীরা কেন উদ্বাস্তু পঞ্জাবীদের মতো হাতের কাজ করিয়া এবং দিল্লী সরকারের বিশেষ অনুগ্রহে শীঘ্র শীঘ্র নিজেদের পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা করিয়া লইতে সক্ষম হইলেন না, সে কথার পূর্ণ আলোচনা এ স্থলে সম্ভব নহে। এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, সকল ব্যবস্থার সাফল্য স্থান-কাল-পাত্র নির্ব্বিচারে এক প্রকার না হইতে পারে এবং কোনো ব্যবস্থা কোনো ক্ষেত্রে সফল না হইলে, তাহার জন্য পাত্রগণই দায়ী, এ কথা অভ্রান্ত সত্য বলিয়া না মানিয়া, ব্যবস্থার অথবা ব্যবস্থাকারকদিগের সমালোচনা ন্যায়শাস্ত্র বিরুদ্ধ না হইতে পারে। যে সকল বাঙালী বিভক্ত ভারতে পাকিস্থানী হইয়া রহিয়া গেলেন, তাঁহাদিগের সংখ্যাও বিশেষ অল্প নহে এবং তাঁহাদিগের অবস্থা কি হইয়াছে তাহার আলোচনা বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক; কেন না আমরা তাঁহাদের সাহায্যার্থে কিছু করিতে অক্ষম। তাঁহারা ভবিষ্যতে সকলে বা অধিকাংশ মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন কি না তাহা বলা যায় না। এ কথা জানা গিয়াছে যে, তাঁহাদিগকে জোর করিয়া নিজ মাতৃভাষা ত্যাগ করাইয়া উর্দ্দুকে মাতৃভাষা বলিয়া মানিয়া লইতে বাঙালী মুসলমান শাসকগণ বাধ্য করেন নাই। ইহার কারণ বাঙালী মুসলমানগণ নিজেরাও নিজেদের মাতৃভাষা ত্যাগ করেন নাই এবং বাংলা ভাষাকে পাকিস্থানের জাতীয় ভাষা বলিয়া গ্রাহ্য করাইয়া তাঁহারা পৃথিবীর সকল উন্নত ও সুশিক্ষিত লোকের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। ভারতে বাঙালীদিগের মধ্যে যাঁহারা রহিয়া গেলেন তাঁহাদের সংখ্যা কিঞ্চিৎ অধিক তিন কোটি মাত্র। ইহার মধ্যে কিছু কিছু সংখ্যক বাঙালী বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশের প্রজা হইয়া গেলেন, কেন না কংগ্রেস যদিও বাংলা বিভাগ করিয়া রাজত্ব হাতে পাইলেন, তাহা হইলেও বাংলার যে সকল জেলা অপর প্রদেশে সংযুক্ত করিয়া ইংরেজ প্রভুগণ বাঙালীকে সায়েস্তা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই সকল জেলাগুলি কংগ্রেস বঙ্গদেশের সহিত পুনঃ-সংযুক্ত করিয়া দিলেন না। বহু কষ্টে পুরুলিয়া ও তাহার অতি নিকস্থ কয়েকটি থানা বাংলাকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়, কিন্তু জামসেদপুরে ঘাটশীলা ও সিংভূমের খনিজ-প্রধান এলাকা এবং মানভূমের ঝরিয়া প্রভৃতি কয়লা-বহুল থানাগুলি ফিরাইয়া দিতে হিন্দীভাষী বিহারীগোষ্ঠী ও টাটার পার্সিগণ আপত্তি করায় কেন্দ্রীয় সরকার খুবই আনন্দের সহিত বাংলার ঐ সকল স্থান ইংরেজ আমলের মতোই পরহস্তে রাখিয়া দিলেন। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন যে, জামসেদপুরে "বিহারীদিগের জন্য বিহার" বলিয়া বহু ভোজপুরী, মাগধি ও মৈথিলদিগের চাকুরি ও ব্যবসা জমিয়া উঠিতেছে এবং তাহাতে "হিন্দী রাষ্ট্র" হয়ত সবল হইয়া ক্রমশঃ সারা ভারতকে গ্রাস করিতে সক্ষম হইবে।

বর্ত্তমানে বেরুবাড়ী লইয়া যে আন্দোলন হইয়াছে তাহাতে বাংলার কংগ্রেসীগণ দিল্লীতে পণ্ডিত নেহরুর বেআইনী কার্য্যে সমর্থন করিয়া লোকসভায় ভোট দিয়া আসিয়াছেন। ইহাতে তাঁহারা কংগ্রেসের প্রতি নিজেদের বিশ্বাস রক্ষা করিয়া বাংলা ও বাঙালী জাতি সম্বন্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন বলিয়া বাংলার জনসাধারণের ধারণা। আমরা পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম যে, প্রাদেশিক সীমানা পুনর্গঠন ও অদল-বদল যে সময় পুরুলিয়া বাংলায় সংযুক্ত করা হয় তৎপরে আর কখনও করা হইবে না। কিন্তু আমরা দেখিলাম যে, বোম্বাই বিভাগ ও অপরাপর ক্ষেত্রেও সেই নীতির বিপরীত কার্য্য করা হইয়াছে। তাহার পরে আসিল বেরুবাড়ীর কথা। তখন দেখা গেল যে, পণ্ডিত নেহরু ইচ্ছা করিলে রাষ্ট্রীয় কোনোও নীতি, সর্ত্ত বা স্থিরনিশ্চয় পন্থার কোনো মূল্য থাকে না, এবং প্রাদেশিক সীমানাগুলি তাঁহার ইচ্ছামতো পরিবর্ত্তন করা আইনসঙ্গত হইয়া যায়। এই অবস্থায় আমরা বাঙালী জাতিকে এই কথা বলিতেছি যে, আমরা বাঙালীরা বাংলা ভাষাভাষী এবং ইতিহাস ও সামাজিক নৃতত্ত্বের বিচারে যে সকল স্থান বঙ্গদেশের অন্তর্গত সেই সকল স্থান বাংলার সহিত পুনঃ-সংযুক্ত করাইতে চাই। ভারত সরকার যখন বিদেশীদিগের সহিত মেলামেশা করিয়া বাংলার অঙ্গচ্ছেদ করিতে বীতরাগ নহেন, তখন তাঁহারা নিশ্চয়ই বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া আমাদের নিজেদের জমিজমা, গৃহস্থালী ও খনি, কারখানাদি আমাদিগকে ফিরাইয়া দিবেন। যদি না দিতে চাহেন, তাহা হইলে প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি হওয়া উচিত এবং হইবে। অ

পাকিস্থানের নূতন খেলা

পাকিস্থান অধিনায়ক আয়ুব খাঁ স্পষ্টই বলিয়াছেন, কাশ্মীর সমস্যার মীমাংসা না হইলে, ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে শান্তি ও মৈত্রী সম্ভব নয়। ইহা ত পুরান কথা। কিন্তু সম্প্রতি চীনকে দিয়া কার্য্য উদ্ধারের যে কৌশল পাকিস্থানী কর্ত্তারা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা কুটিল পররাষ্ট্র-নীতির দিক দিয়া ভারতের পক্ষে নিশ্চয়ই দুশ্চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাকিস্থানের পররাষ্ট্র-মন্ত্রী মিঃ মঞ্জুর কাদির সম্প্রতি বলিয়াছেন যে, চীন ও পাকিস্থানের মধ্যবর্ত্তী সীমানা চিহ্নিত করার জন্য পাকিস্থান যে অনুরোধ করিয়াছিল পিকিং তাহা নীতিগতভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। মিঃ মঞ্জুর কাদিরের এই উক্তি ভারত গবর্ণমেন্টের এবং ভারতের জনগণের মনে দুর্ভাবনার সৃষ্টি না করিয়া পারিবে না। এই সঙ্গে প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁর ঘোষণা মনে করিলে, সেই দুর্ভাবনা আরও বর্দ্ধিত হইতে বাধ্য। আয়ুব খাঁ গত ১৯শে জানুয়ারী জার্ম্মাণীর বন্‌ নগরে বলিয়াছিলেন, চীন ও পাকিস্থান এই দুই দেশের সীমানা চিহ্নিত করিবার প্রশ্ন পিকিং গবর্ণমেন্ট বিবেচনা করিতেছেন।

পাকিস্থান এই বিষয়ে যে-কৌশল অবলম্বন করিয়াছে, তাহা বুঝিতে হইলে, প্রথমেই স্মরণ করিতে হইবে যে, বাস্তবিক পক্ষে চীনের সংলগ্ন অথবা সন্নিকটস্থ কোনো সীমারেখা পাকিস্থানের নাই। চীনের সহিত যে সীমানার প্রশ্ন উঠিতে পারে তাহা হইল, গিলগিট ও স্কার্দু এলাকা লইয়া। উহা অবশ্য চীনের গায়ে। কিন্তু এই গিলগিট ও স্কার্দু অঞ্চল কাশ্মীরেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। পাকিস্থানী হামলাকারীরা ১৯৪৭ সনে কাশ্মীরের অন্যান্য কয়েকটি অঞ্চলের সঙ্গে গিলগিট এবং স্কার্দু অঞ্চলও দখল করিয়া লয়। পাকিস্থান জানে যে, এই গিলগিট ও স্কার্দু অঞ্চল আইন অনুসারে এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে পরের অর্থাৎ ভারতের সম্পত্তি এবং উহার উপর কোনো অধিকার তাহার নাই। ইহা জানে বলিয়াই পাকিস্থান চীনকে দিয়া বলপূর্ব্বক অধিকৃত ঐ অঞ্চলের সীমানা নির্দ্ধারণ করিয়া লইতে চায়। কারণ, চীনের মতো একটি পরাক্রমশালী রাষ্ট্র যদি গিলগিট ও স্কার্দু অঞ্চলকে পাকিস্থানের সীমানার অন্তর্গত বলিয়া মানিয়া লয়, তবে পাকিস্থান পরের জমিতে পাকাপোক্ত হইয়া বসিতে পারে, দস্যুতার দ্বারা অপহৃত অন্যের সম্পত্তিকে সে জোর গলায় নিজের বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে।

কিন্তু চীন-পাকিস্থান সীমানা নির্দ্ধারণের ব্যাপার সত্যই যদি চূড়ান্তভাবে সম্পাদিত হয়, তবে পাকিস্থান যে কেবল গিলগিট্-স্কার্দু অঞ্চলেই নিজের অধিকার স্থায়ী করিতে পারিবে তাহা নহে, সমগ্র 'আজাদ-কাশ্মীরে'র উপরই তাহার দাবি স্বীকৃত ও দৃঢ়তর হইবে। কারণ, গিলগিট-স্কার্দু ত আজাদ-কাশ্মীরেরই অংশ এবং ঐ দুই অঞ্চলের সীমানা প্রকৃতপক্ষে আজাদ-কাশ্মীরেরই সীমা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পাকিস্থান এই ব্যাপারে এক চমৎকার চাতুর্য্যপূর্ণ দাবার চাল চালিয়াছে।

১৯৫৫ সনে ভারত-পরিদর্শনকালে মিঃ ক্রুশ্চেভ শ্রীনগরের এক সভায় দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, সমগ্র জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের উপর ভারতের দাবিই ন্যায্য ও সর্ব্বোপরি স্বীকার্য্য। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, চীন ভারতে দাবি সমর্থন করিয়া এ পর্য্যন্ত

কোনো উক্তি করে নাই। অবশ্য ভারতের বিরোধিতা করিয়াও চীন এ পর্য্যন্ত কোনো কথা বলে নাই। ভারতের প্রধানমন্ত্রী আর একটি ব্যাপারের প্রতিও সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। অর্থাৎ কিছুকাল পূর্ব্বে রেঙ্গুনে সীমানা সম্বন্ধীয় আলোচনাকালে চীনের প্রতিনিধিরা কারাকোরাম পর্ব্বতশ্রেণীর পশ্চিমস্থ চীন-ভারত সীমানা লইয়া আলোচনা করিতে আগ্রহ দেখায় নাই। চীন-কাশ্মীর সীমানা সম্বন্ধে কোনো পক্ষের সমর্থনে কোনো কথা না বলায় এখন যে-কোনো পক্ষের দাবি মানিয়া লওয়ার ব্যাপারে সে স্বাধীন। অবশ্য, ইহার মধ্যে এই মর্ম্মে একটি খবর প্রকাশিত হইয়াছিল যে, চীন-পাকিস্থান সীমানার ব্যাপারে চীন এমন কোনো স্থানের কথা আলোচনা করিবে না, যাহা লইয়া কোনো বিবাদ আছে। কিন্তু তাহাই যদি হয়, তবে চীন-পাকিস্থান সীমানা নির্দ্ধারণের প্রশ্ন প্রায় উঠিতেই পারে না। কারণ, যে গিলগিট-স্কার্দু অঞ্চলের সীমানা চিহ্নিত করার কথা পাকিস্থান তুলিয়াছে, তাহা লইয়াই ত ভারতের সঙ্গে পাকিস্থানের বিবাদ রহিয়াছে।

আরও দেখিবার বিষয়, লাডাক লইয়া চীনের সঙ্গে মত-বিরোধের সুযোগে পাকিস্থান চীনের সাহায্যে নিজের কার্য্য সিদ্ধির চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। যাহা হউক, পাকিস্থানের এই নূতন খেলা ভারতের পক্ষে বিশেষ আশঙ্কার কথা। গ

বোম্বাইয়ে বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন

বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনে রবীন্দ্র-জন্ম শতবার্ষিকার উৎসব বস্তুতঃ আন্তর্জ্জাতিক উৎসবের রূপ গ্রহণ করিয়া এবং বিপুল শ্রদ্ধা, উৎসাহ ও বৈচিত্র্যে মণ্ডিত হইয়া একটি সার্থক অনুষ্ঠানে পরিণত হইবার গৌরব লাভ করিয়াছে। বহু বিশিষ্ট বৈদেশিক গুণী, শিল্পী, কবি ও লেখকের উপস্থিতি এবং সর্ব্বভারতীয় জনজীবনের রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে সুখ্যাত ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি এই উৎসবকেও বিশেষ একটি সাংস্কৃতিক গুরুত্ব এবং মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছে। বিশ্বমানবতার প্রবক্তা কবি যে বিশ্ব-মানবেরই কাছে চিরবন্দনীয় হইয়াছেন এবং ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে চিরন্তন হইয়াছেন, তাহা নববর্ষের প্রথম দিনে বোম্বাইয়ের এই স্মরণোৎসবে নূতন করিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। দেশ ও বিদেশের মনস্বীদিগের একটি ধারণার কথা প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করিতে হইতেছে। তাঁহাদিগের ধারণা, ভারতের দুই ক্লাসিক মহাকাব্য, রামায়ণ এবং মহাভারতকে না জানিলে ভারতকে জানিতে ও চিনিতে পারা যায় না। রবীন্দ্রনাথের বাণী, চিন্তা ও সাহিত্যও নব ভারতের মহান্ ক্লাসিক সৃষ্টি, যাহাকে না বুঝিলে ও না জানিলে ভারতকে বুঝিতে ও চিনিতে পারা যাইবে না। এবং রবীন্দ্র-প্রতিভার অতিরিক্ত গৌরব এই যে, ভারতীয় মর্ম্মবাণীর চিরায়ত প্রকাশ হইয়াও তাহার বাণী নিখিল মানবের আত্মা ও অন্তরের সাযুজ্য লাভ করিয়াছে। তিনি সকলকার পূজ্য, তিনি নিখিলজনের অন্তরের সুহৃদ। মানবজাতির চিন্তার ইতিহাস প্রভাবিত করিয়াছেন, তিনি সেই ঐতিহাসিক মনস্বিতার নায়ক। রবীন্দ্র-স্মরণোৎসবের মধ্যে বস্তুতঃ বিশ্বমানবেরই ঐতি-হাসিক কৃতজ্ঞতা অভিব্যক্ত হইতেছে।

প্রসঙ্গতঃ একটি কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি, এতবড় একটা বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন হইয়া গেল, কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে কেহ কিছু বলিলেনও না, সে রকম চেষ্টাও করিলেন না। তার পর দূর দেশ হইতে যাঁহারা গিয়াছেন তাঁহাদের জন্য শুধু থাকিবার ব্যবস্থাই নাকি ছিল, আহারের কোনো আয়োজনই ছিল না। অনেককেই দোকানে খাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে হইয়াছে। প্রায় সর্ব্বত্রই এই নিন্দার কথা শুনা যাইতেছে। কিছু সত্য না থাকিলে একথাই বা উঠিবে কেন? আমাদের বলিবার কথা, যেখানে ব্যবস্থা করিবার লোক নাই বা চেষ্টা নাই, সেখানে এরূপ ঘটা করিয়া অনুষ্ঠান করিবারই বা প্রয়োজন কি? শুধু বিদেশী লোকদের তাক্ লাগাই-বার জন্যই কি? গ

ক্ষুধার জ্বালা

কলিকাতা শহরের ফুটপাতে একজন বেকার ও ক্ষুধার্ত্ত শ্রমিক তাহার শিশুসন্তানকে ঠ্যাং ধরিয়া আছড়াইয়া মারিয়াছে। এইরূপ একটি সংবাদ সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছে। অপরাধের এই বর্ব্বরতা ক্ষুধার বর্ব্বরতাকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। কিন্তু যে বর্ব্বর সমাজ-ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক অবিচারের জন্য এই নরহত্যা-বৃত্তি দেখা দিতেছে তাহার প্রতিকার হইতেছে কই? সেদিন কলিকাতা হাইকোর্টের এক বিচারপতি এই ভয়ঙ্কর অপমৃত্যুর জন্য পরোক্ষে সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে দায়ী করিয়া একটি চাঞ্চল্যকর রায় দিয়াছিলেন এবং খুনী পিতার জন্য প্রভূত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিচারপতির সেই রায়ের কালি শুকাইতে না শুকাইতে আর একটি ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড ও আত্ম-

হত্যার ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে। এবং তাহাও এই কলিকাতাতেই।

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী উত্তর কলিকাতার জোড়াসাঁকো থানা এলাকায় প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের এক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক তাঁহার ত্রিশ বৎসরের স্ত্রী এবং আট বৎসরের কনিষ্ঠ পুত্র নাইট্রিক এসিড খাইয়া প্রায় এক সঙ্গে আত্মহত্যা করিয়াছে। অনুপম রায় নামেমাত্র হোমিও-প্যাথ চিকিৎসক ছিলেন, কিন্তু আসলে তাঁহার কোনো উপার্জ্জন ছিল না। চারিটি সন্তান সহ ছয় জন প্রাণীর আহার জোগান তাঁহার পক্ষে অসম্ভবই ছিল। তাহার উপর পাওনাদারের তাগাদা। সুতরাং অনুপম রায় হতভাগিনী স্ত্রীর সঙ্গে বিষপানে আত্মহত্যার চুক্তি করিলেন। একমাত্র সর্ত্ত এই ছিল যে, আগে স্ত্রী মরিবে, তার পর সন্তান। কারণ মায়ের সামনে সন্তান হত্যার দৃশ্য বোধহয় সহ্য করা সম্ভব ছিল না। কেহ কেহ বলিয়াছেন, ছেলেটিকে গলা টিপিয়া হত্যা করা হইয়াছে। বিষ খাওয়াইয়াই হউক, আর গলা টিপিয়াই হউক—মোট-কথা নিষ্ঠুরভাবে জীবনের অবসান ঘটিয়াছে। সন্তানকে শেষ করিবার পর স্বামী-স্ত্রী আত্মহত্যা করিয়াছেন। অপর ছেলে তিনটি পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে দরজায় খিল দিয়া ঘুমাইতে-ছিল। বোধহয় এই কারণেই তাহারা বাঁচিয়া গিয়াছে। নতুবা তাহাদেরও ঐ একই পরিণতি ঘটিত।

সারা ভারতবর্ষে এমন হত্যা ও আত্মহত্যা বহু ঘটিয়া থাকে। ক্ষুধার্ত্ত সন্তান বক্ষে গভীর কূপে ঝাঁপাইয়া পড়া, গলায় ফাঁসি দিয়া মৃত্যুবরণ করা—এসব ঘটনা ত আমাদের সমাজে নিত্যই ঘটিতেছে। আমরা খবরের কাগজে পাঠ করিয়া হা-হুতাশ করি, সমাজকে গাল দি, নতুবা সরকারের উদ্দেশে কটূক্তি করি। কিন্তু ইহা সাময়িক। সমাজ-মন দীর্ঘ অজগরের মতো আবার ঝিমাইয়া পড়ে। ফুটপাতে সন্তানহননকারী রামদাস না হয় শ্রমিক ছিল। কিন্তু অনুপম রায় এবং তাঁহার স্ত্রী-পুত্র? তাঁহারা আমাদের মতোই ভদ্র পরিবারের লোক। আর এই দরিদ্র ভদ্র পরিবারগুলি আজ নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে। তাহারা ভিক্ষা করিতে পারে না, লোকের বাড়ীতে ঝি-চাকরের কাজও লইতে পারে না, অথচ কোনো উপার্জ্জনও তাহাদের নাই। তাহার উপর আছে ছেলের লেখাপড়া, মেয়ের বিবাহ প্রভৃতি। সুতরাং তাহাদের সম্মুখে মাত্র দুইটি রাস্তা খোলা আছে—এক, বিষপানে আত্মহত্যা বা হত্যা; দুই, নিজের নৈতিক চরিত্রকে কলুষিত করিয়া উপার্জ্জনের ব্যবস্থা। অর্থাৎ চুরি-ডাকাতি-গুণ্ডামি প্রভৃতি।

যখন আমরা সমাজতন্ত্রের কথা বলি, সামাজিক সাম্য ও আর্থিক ন্যায়-বিচারের কথা বলি, তখন মোটা উপার্জ্জনশীল ব্যক্তিরাই 'হাঁ হাঁ' করিয়া ছুটিয়া আসেন—ধর্মের দেশে, পবিত্র ভারতভূমিতে বিজ্ঞান ও সমাজতন্ত্র?

তবে ইঁহারা যাইবে কোথায়? মৃত্যুই কি তাহাদের একমাত্র পথ? প

পরিবহনের অভাবে অর্থনৈতিক দুরবস্থা

দিনাজপুরের 'আত্রেয়ী' সংবাদ দিতেছেন—

পশ্চিম দিনাজপুর মুখ্যতঃ কৃষি প্রধান জেলা। সুতরাং এই জেলার অর্থনীতি কৃষি-নির্ভর। কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি ব্যতীত কৃষিনির্ভর জেলার অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত হইতে পারে না। এই জেলার কৃষিকার্য্য এখনও প্রকৃতি নির্ভর। অতএব প্রকৃতি নির্ভর কৃষিকার্য্যের মাধ্যমে অর্থ নৈতিক উন্নয়ন অসম্ভব।

দেশ স্বাধীন হইয়াছে। দেশের বিভিন্ন অংশে নিত্য নূতন শিল্প-বাণিজ্য গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু একমাত্র রেলপথের অভাবে এই জেলায় কোনরূপ শিল্প-বাণিজ্য গড়িয়া উঠিতে পারে নাই; পরন্তু পূর্ব্বে বাণিজ্যের যে-সব সুযোগ সুবিধা ছিল, দেশ বিভাগের ফলে তাহাও বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

দেশ বিভাগের ফলে নবগঠিত জেলার সদর মহকুমার বালুঘাট অঞ্চলের অধিবাসীরা অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। কারণ এই অঞ্চলে পূর্ব্বে রেলপথ ও জলপথে ব্যবসায় বাণিজ্যের যে সুযোগ-সুবিধা ছিল তাহা সম্পূর্ণ-ভাবে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে মাত্র ৯ ঘণ্টায় বালুর-ঘাট হইতে হিলি রেলপথে কলিকাতায় যাওয়া যাইত, কিন্তু আজ বাস, ষ্টিমার ও বিহার রাজ্যভুক্ত রাজমহল পথে কলিকাতায় যাইতে ১৯।২০ ঘণ্টা আর মণিহারী ঘাট পথে ২৪ ঘণ্টা সময় লাগে। এই দুরূহ যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে এই স্থানের ব্যবসায় বাণিজ্যক্ষেত্রে মধ্য-যুগীয় অবস্থা বর্ত্তমান।

এই জেলার পরিবহন ক্ষেত্রে এইরূপ মধ্যযুগীয় অবস্থা চালু থাকায় কোনরূপ শিল্প বাণিজ্য গড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না। নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য অন্যান্য স্থানের তুলনায় অস্বাভাবিকরূপে বেশী। এই অস্বাভাবিক অবস্থার ফলে এই অঞ্চলের উন্নয়ন ব্যবস্থাও আশাতীত-রূপে পশ্চাতে পড়িয়া আছে।

দেশ বিভাগের ফলে বালুরঘাট শহর ও পার্শ্ববর্ত্তী এলাকায় প্রায় এক লক্ষ উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন লইয়াছে। উদ্বাস্তুগণ ভাবিয়াছিলেন যে, বালুরঘাট জেলা সদর শহর হওয়ায় ভবিষ্যতে ইহার প্রভূত উন্নতি সংসাধিত

হইবে এবং অবিলম্বে রেলপথ দ্বারা কলিকাতার সহিত যুক্ত হইবে। ফলে এই অঞ্চলে নিত্য নূতন শিল্প বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে এবং দেশবিভাগের ফলে তাঁহারা সম্বলহীন অবস্থায় উপনীত হইলেও শ্রমের দ্বারা ও নিত্য-নূতন সুযোগ সুবিধার মাধ্যমে অর্থনৈতিক অবস্থার পুনর্গঠন করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু ১৯৪৮ সন হইতে জেলার এই অঞ্চলে রেলপথ স্থাপনের তোড়জোড় চলিতেছে কিন্তু অদ্যাবধি উহা বাস্তব রূপ গ্রহণ করে নাই।

ভারতে এইরূপ জেলা শহর বোধ হয় একটিও নাই যাহার সহিত সরাসরি রেল সংযোগ নাই। চূড়ান্ত জরীপকার্য্য হওয়া সত্ত্বেও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যেও এই নূতন রেলপথ পরিকল্পনাটি গ্রহণ করা হয় নাই। অথচ তৃতীয় পরিকল্পনা কালে ভারতে প্রায় ১২ শত মাইল নূতন রেলপথ নির্ম্মিত হইতেছে।

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, একমাত্র রেলপথের অভাবে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক বনিয়াদ ভাঙিয়া পড়িয়াছে। নবভারতের একটি কৃষি প্রধান অঞ্চলের অধিবাসীরা উত্তরোত্তর অনশনের সম্মুখীন হইতেছেন। ইহা লজ্জার বিষয়। গ

শ্রীকৃষ্ণ সিংহ

গত ৩১শে জানুয়ারী বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহ পরলোক গমন করিয়াছেন। কিছু দিন আগে পূর্ব্বাঞ্চলীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করিতে তিনি কলিকাতায় আসেন এবং এখানেই গুরুতর পীড়ায় শয্যাগত হইয়া পড়েন। অবস্থার সামান্য উন্নতি হইলে, তিনি পাটনায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অনেকে আশা করিয়াছিলেন, বিপদ বুঝি কাটিয়া গেল। কিন্তু হঠাৎ তাঁহার অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় এবং সেই পরিবর্ত্তনই তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইল।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে সিংহ মহাশয়ের জন্ম এবং মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭৪ বৎসর। স্বর্গীয় শ্রীকৃষ্ণ সিংহ বিহারের তথা ভারতবর্ষের রাজনীতিতে যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাহাতে কেহই না বলিয়া পারিবেন না যে, তাঁহার জীবন আরও বহু দিনের জন্য বিহারী-অবিহারী সকলেই কামনা করিতেন। স্বাধীন ভারতে আজ একদিকে যখন সংগঠন ও উন্নয়নের কাজ সুরু হইয়াছে, অন্যদিকে ঠিক তখনি প্রাদেশিক অন্তর্দ্বন্দ্ব, ভাষা বিরোধ, সাম্প্রদায়িক বিরোধ, বেকার সমস্যা, শিক্ষা সমস্যা, নানা বিপাক একসঙ্গে শত বাহু বাড়াইয়া আগাইয়া আসিয়াছে এবং জাতীয় সংহতি ও স্বস্তির আদর্শকে ভাঙিয়া চুরমার করিতে উদ্যত হইয়াছে। এমন দিনে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে সংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত করা এবং সংগঠনের পথে জাতিকে দ্রুত আগাইয়া লইয়া যাওয়াই হইল প্রধান কাজ। এই কাজে যে কয়জন প্রবীণ ও সর্ব্বজনমান্য কংগ্রেস-নেতা আজিও আমাদের মধ্যে রহিয়াছেন, ডঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহ শুধু তাঁহাদের অন্যতম নন, অনেক হিসাবে তিনি অগ্রগণ্য।

শ্রীকৃষ্ণ সিংহ গোড়ায় আইন ব্যবসায় সুরু করেন। ১৯২০ সনে গান্ধীজীর আহ্বানে ব্যবসা ছাড়িয়া রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করেন। পরাধীন দেশে দেশসেবার পুরস্কাররূপে লাঞ্ছনা, নির্য্যাতন ও কারাবরণের গৌরবেও তিনি কাহারও পিছনে নন। কিন্তু এই সুবিদিত নেতৃ-জীবনের আড়ালে তাঁহার ছিল আর একটি ঘরোয়া জীবন, যেখানে তিনি ছিলেন সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের বন্ধু। সমৃদ্ধ পরিবারের সন্তান, বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জল রত্ন এবং বিশিষ্ট কর্ম্মী ও দেশনায়ক হইয়াও তিনি দরিদ্র কৃষক এবং শ্রমকারী সাধারণ মানুষকে চিরদিন ভালবাসিয়াছেন। চিরদিন তাঁহার দুয়ার তাহাদের জন্য খোলা থাকিয়াছে। দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা প্রপীড়িত এই দেশের শাসক ও নায়ক হইতে হইলে যে গুণটি সর্ব্বাগ্রে থাকা দরকার, শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ও মমতা সবই তাঁহার ছিল পূর্ণমাত্রায়। গান্ধীজীর নিষ্ঠাবান অনুগামীরূপে প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার অন্ধ তমসা হইতে তিনি অবিবেকীদের বরাবরই সংযত করিয়াছেন। তাঁহারই সুযোগ্য নেতৃত্বের গুণে বিহার রাজ্যে অবস্থিত অপরাপর রাজ্যের অধিবাসীরা তাঁহাদের ন্যায়সঙ্গত নাগরিক অধিকারসমূহ পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিয়াছেন এবং সাম্প্রদায়িক কারণেও কোনোদিন কাহাকেও দুর্ভোগ ভুগিতে হয় নাই। বিহারের বাঙালীদের মাতৃভাষার পঠন-পাঠনের অধিকার তিনি সযত্নে রক্ষা করিয়াছেন। আসামের লজ্জাজনক ঘটনাবলীর পর একমাত্র তাঁহার কণ্ঠেই স্পষ্ট ভাষায় এই কার্য্যের তীব্র নিন্দা ধ্বনিত হয়। এ সবই তাঁহার তেজস্বিতা, সত্যনিষ্ঠা, দেশপ্রেম ও উচ্চ মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। আজ প্রবীণ জননেতা তাঁহার জীবনের কাজ সমাধা করিয়া বিদায় লইলেন। আশা করি তাঁহার হাতের আলোক-বর্ত্তিকা এখন যাঁহারা বহন করিবেন, তাঁহারা তাঁহার মহান আদর্শ ও কর্ম্মনীতির ধারা আশ্রয় করিয়াই উন্নততর ও সুন্দরতর ভারত গঠনে অগ্রণী হইবেন। গ

দুগ্ধ-সমস্যা

শ্রীগৌতম সেন

অন্ন সমস্যার মতোই দুগ্ধ একটি বড় সমস্যা। অন্ন মানুষের প্রধান খাদ্য, কিন্তু দুধ হচ্ছে জীবন। সদ্যজাত শিশুর দুধ একমাত্র খাদ্য। সন্তান সম্ভাবনার পূর্ব্ব হইতেই ভগবান মাতৃ-স্তনে দুগ্ধ সঞ্চিত করিয়া রাখেন। দুধ শুধু শরীর গঠনই করে না, দুধ দেহের ক্ষয় পূরণ করিয়া থাকে। এইজন্য রুগ্ন ও বৃদ্ধের পরম বন্ধু এই দুধ। এই জন্যই গো-পালনকে আমরা ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। গরুকে দেবতা বানাইবার উদ্দেশ্যই হইল এই। শাস্ত্রকারগণ এই ধর্ম্মের মধ্য দিয়াই সকল কর্ম্মের নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্ম ছিল বলিয়াই কর্ম্ম ছিল। আজ ধর্ম্মও নাই, কর্ম্মও নাই। গোটা ভারতবর্ষ এই ধর্ম্মের অনুশাসনেই চলিয়াছে। তাই নিত্যকর্ম্মের মধ্যে বিবিধ অনুষ্ঠানের প্রচলন আজও কিছু কিছু দেখা যায়। প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরে আগে গরু ছিল। গোয়ালভরা গরু, গোলাভরা ধান আর পুকুরভরা মাছ—ইহাই ছিল সম্পন্ন গৃহস্থের আদর্শ। আজ আদর্শচ্যুত গৃহস্থ সকল দিক দিয়াই ভ্রষ্ট। সভ্যতার বিষ-বাষ্পে আমরা না-ঘরকা না-পরকা হইয়া পড়িয়াছি। আমরা হারাইয়াছি পল্লী-জীবনের বৈশিষ্ট্য, হারাইয়াছি জাতীয়তা। এই অপরিচয়ের কালিমা জগতের চোখে আমাদের হেয় করিয়া তুলিয়াছে।

আগে ঘরের মেয়েরা গরুর সেবা করিত, গো-পরিচর্য্যার যাবতীয় কাজ তাহাদের উপরই ন্যস্ত থাকিত। দুগ্ধ-দোহনের ভারও তাহাদের উপর ছিল। এইজন্যই তাহাদের আর এক নাম দুহিতা। আজ নামটাই আছে, নামের ব্যবহার নাই। কারণ গো-পালনকে বিলাসী মেয়েরা সযত্নে পরিহার করিয়া চলিয়াছে। শুধু শহরেই নয়, গ্রামেও ইহার প্রভাব পড়িয়াছে। জাত-গয়লারা আগে দুধের ব্যবসা করিত। আজ গয়লারা গরু ছাড়িয়া অন্য ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছে। পল্লীগ্রামে গয়লা-পাড়া আজও আছে, কিন্তু গরুর নাম-গন্ধ তাহাতে নাই। কেন এমন হইল? যুদ্ধ-পূর্ব্বকালেও গরুর এতটা অভাব দেখা যায় নাই। শুনা যায়, সৈনিকদের খাবার প্রয়োজনেই এই ভাবে গরু নিশ্চিহ্ন করা হইয়াছে। যদি তাহাই সত্য হয় তবে এতদিনেও কি কারণে সে ক্ষতি পূরণ করা হইল না? কারণ হিসাবে উহা আংশিক সত্য হইলেও সবটুকু সত্য যে নয়, পরবর্ত্তী মানুষের মতিগতি দেখিয়া বুঝা যায়। আসল কথা, জাত-ব্যবসাকে বাঁচাইয়া রাখিবার প্রচেষ্টা আজ কাহারও মধ্যে নাই। তাহারা অতি লাভের প্রত্যাশায় অন্যত্র ছুটিয়াছে এবং গৃহস্থরাও গো-পালনকে অপাংক্তেয় করিয়া রাখিয়াছে। যাহার ফলে সুযোগ বুঝিয়া যুদ্ধের সময় হইতে বিদেশী ব্যবসায়ীরা আমাদের গুঁড়া দুধ খাওয়াইতেছেন। এইরূপ অনায়াস-লভ্য দুধ হাতের কাছে পাওয়ায় আর কেহই গরু পুষিবার ঝামেলা লইতে চাহিতেছে না। গরুর দুধ এবং শিশির দুধের পার্থক্য সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ সচেতন হইয়াও উহা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

পূর্ব্বে মানুষের স্বাস্থ্য ছিল, দীর্ঘকাল বাঁচিতও। ইহার কারণ, প্রতি ঘরে দুধ ছিল অপরিয্যাপ্ত। সেই দুধ হইতে তাহারা ইচ্ছামত ছানা মাখন দই ঘি বানাইয়া লইত। যাহা মানুষের আয়ু বৃদ্ধিকারক। শ্রীকৃষ্ণকে গো-পালক করিয়া শাস্ত্রকারগণ সেই ইঙ্গিতই করিয়াছেন। বালক কৃষ্ণ মাখন চুরি করিয়া খাইতেছেন, এই জন্যই তাঁহার অপর নাম ননীচোরা। কিন্তু শুধু ননী চুরিই করেন নাই তিনি, নিজে গরুর পরিচর্য্যা করিয়াছেন, মাঠে গরু লইয়া গিয়াছেন—'আপনি আচরি ধর্ম্ম' এই শিক্ষাই তিনি আমাদের জন্য দিয়াছেন। বিজ্ঞানী যাহাই বলুন, দুধের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ডাক্তারেরা বলেন, দুধে যা খাদ্যপ্রাণ আছে, ডিমের মধ্যেও তাহা সমপরিমাণে আছে। দুধ এবং ডিমের ভিতর যে যে উপাদান সঞ্চিত আছে তাহা এইভাবে তাঁহারা ভাগ করিয়াছেন—

	ঘনত্ব	জৈবপদার্থ	এ্যালবুমিন	প্রোটিন	চর্বি	কার্ব্বো-হাইড্রেট	খনিজ দ্রব্য	প্রতি পাউণ্ডে ক্যালোরি
গো-দুগ্ধ	১২·৮%	৩·০%	০·৫%	৩·৫%	৩·৭%	৪·৯%	০·৭%	৩১৩
মুর্গীর ডিম				১১·৯%	৯·৩%		০·৯%	৬৩৫

ইহার মধ্যে লক্ষ্য করিবার বিষয়, দুধে যে-উপাদানগুলি আছে তাহার অনেক উপাদানই ডিমের মধ্যে নাই। বিশেষ করিয়া কার্ব্বো-হাইড্রেট একেবারেই নাই। অবশ্য কতকগুলি উপাদান দুধ অপেক্ষা ডিমেই বেশী।

কিন্তু এই বিশ্লেষণের বাইরেও আমরা দুগ্ধ-শক্তির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি। যাহাকে আয়ুর্ব্বেদ 'প্রভাব' বলিয়াছেন। এই প্রভাবকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যে-প্রভাব আমরা মধুর মধ্যে দেখিতে পাই।

বিজ্ঞান এইখানে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। এখন দেখা যাক, দুধ সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ কি বলিতেছেন। দুধের-গুণ-বর্ণনায় আয়ুর্ব্বেদে আছে, ইহা স্নিগ্ধ, শীতবীর্য্য, পোষক, ক্ষয়-পূরক, আয়ুর্বৃদ্ধিকারক, কান্তিবর্দ্ধক, বর্ণপ্রসাদক, অস্থি-সংগঠক, বীর্য্যবর্দ্ধক, সপ্তধাতুপোষক, দৃষ্টিবর্দ্ধক, বুদ্ধিকারক এবং অনুত্তেজক। ডিমে ইহার প্রায় সকল গুণ থাকিলেও, উহা উষ্ণবীর্য্য এবং উত্তেজক। এইজন্য ডিম সকলে সহ্য করিতে পারে না। কিন্তু দুধ পারে। দু'সের দুধও অনায়াসে হজম করা যায়—যদি তাহা এক বল্কা হয়। ঘন এবং ঠাণ্ডা দুধ খাওয়া উচিত নয়।

এইবার অন্য খাদ্যের বিচারে আসা যাক। আমরা সাধারণত যেসব খাদ্য গ্রহণ করি, তাহা দুইভাগে বিভক্ত। এক, ক্ষারধর্ম্মী, দুই, অম্লধর্ম্মী। যাবতীয় শাকসব্জী এবং উদ্ভিদ্-জাত দ্রব্যই ক্ষারধর্ম্মী। অবশ্য ডাল উদ্ভিদ-জাত হইয়াও অম্লধর্ম্মী। এবং আমিষ-পদার্থ মাত্রই অম্লধর্ম্মী। আমাদের দেহের উপযোগী খাদ্যই হইল ক্ষারধর্ম্মী। অম্লধর্ম্মী খাদ্য অপকারক। অম্লধর্ম্মী খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা অতি সামান্যই। এইজন্যই উহা যত কম পরিমাণে গ্রহণ করা যায় ততই ভাল। ডিমে অষ্টগুণ থাকিয়াও অম্লধর্ম্মী। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, ডিম যাহা করিতে পারে নাই, দুধ তাহা করিয়াছে। আমি এমন অনেক পরিবারের কথা জানি, যাহারা অতি ছোট হইতেই দুধ খাইয়া আসিতেছে। একথা বলিতেছি এই জন্যই, অনেকে দুধ খান না। তাঁহারা উহাতেই অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু দুধ যাঁহাদের সাস্থ্য, তাঁহারা কোনো কারণে দুধ বন্ধ করিলে, ক্ষতিটা উৎকটরূপে চোখে পড়ে। আমার বড় মেয়েকে দেখিয়াছি, শ্বশুরবাড়ী গেলেই তাহার রং কালো হইয়া যায়। আবার কয়েকদিন দুধ পেটে পড়িলেই তাহার স্বাভাবিক বর্ণ ফিরিয়া আসে। ইহা প্রত্যক্ষ সত্য, অবিশ্বাস করিবার উপায় নাই। বুঝিলাম, এই কারণেই আয়ুর্ব্বেদ দুধকে বর্ণ-প্রসাদক বলিয়াছেন। আর একটি ঘটনা হইতে দুধের জীবনীশক্তি কিরূপ তাহা প্রমাণিত হইবে। রকফেলার পৃথিবী-বিখ্যাত ধনী। তিনি যৌবন-কালেই বৃদ্ধের মতো অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন। বিপুল অর্থ তাঁহার ব্যবসায়ে খাটিতেছে—পূর্ব্বে তিনি নিজেই এগুলির দেখাশুনা করিতেন, এখন দেহ অক্ষম হওয়ায়, তিনি সকল কাজ হইতেই অবসর লইয়াছেন। ডাক্তারেরা আসিয়া ইহার কারণ নিরূপণ করিতে পারেন না। রোগ নাই, অথচ শরীর শুকাইয়া যাইতেছে, কোনো কাজেই নাই উৎসাহ, ক্রমশই কুঁজা হইয়া পড়িতেছেন—অকাল-বার্দ্ধক্যের সমস্ত লক্ষণ সুপরিস্ফুট। অর্থের অভাব নাই—নানা দিক দিয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতে লাগিল—কি ঔষধ, কি খাদ্যাদি বিষয়ে। কিন্তু কোনো উন্নতিই দেখা গেল না। জীবনে তিনি হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। সেই সময় তিনি বড় আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, পৃথিবীতে ধনই একমাত্র সম্পদ নয়। অবশেষে চিন্তা আসিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিল। এই বিপুল অর্থ কি তবে এই ভাবেই নষ্ট হইয়া যাইবে? নষ্ট হইতেও বসিয়াছিল। এমন সময় এক বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক নির্দ্দেশ দিলেন, তুমি জীবনে বহু খাইয়াছ, এবার সকল প্রকার খাদ্য বন্ধ কর দেখি। রকফেলার বলিলেন, না খাইয়া বাঁচিব কিরূপে?

—হাঁ, খাইবে, কেবলমাত্র দুধ খাইবে—প্রচুর খাইবে, যখনি ক্ষুধা পাইবে তখনি খাইবে।

—কতদিন খাইতে হইবে?

—যতদিন বাঁচিবে। অন্য খাদ্যে লোভ করিও না। দুধই তোমার একমাত্র খাদ্য।

বৈজ্ঞানিকের নির্দ্দেশমত রকফেলার দুধ খাইতে আরম্ভ করিলেন। পনের দিনের মধ্যে তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখা গেল। ক্রমে কুব্জ দেহ তাঁহার সোজা হইল—পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য ও যৌবন লইয়া আবার তিনি কাজ-কর্ম্ম দেখিতে লাগিলেন। রকফেলার ৯০ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, কিন্তু কোনদিন দুধ ছাড়া আর কোনো খাদ্য গ্রহণ করেন নাই।

জানি না কোন্ শক্তি দুধের মধ্যে নিহিত আছে, কিন্তু যে-শক্তিই থাকুক, দুধই যে আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খাদ্য একথা অস্বীকার করিবার আর উপায় নাই।

কিন্তু 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ' সেই দুধ হইতেই আমরা বঞ্চিত!

এখন দেখা যাক, কি ভাবে আমরা এই দুধ হইতে বঞ্চিত হইতেছি। পূর্ব্বের সংখ্যানুপাতে এখন বাংলা দেশে প্রায় আট গুণ লোক বর্দ্ধিত হইয়াছে। সুতরাং চাহিদানুরূপ দুধ সরবরাহ করা একরূপ কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

অভাবে স্বভাব নষ্ট। ব্যবসায়ীরা দুধে জল মিশাইতে সুরু করিল। যাহাকে এককালে গয়লারা পাপ বলিয়া মনে করিত। তখন অনেক গয়লাকে এমন বলিতে শুনিয়াছি, জানেন বাবু, দুধে জল দিলে গরুর বাঁটে ঘা হয়। হায় রে সেদিন! আজ ধর্ম্মাধর্ম্ম সব বিসর্জ্জন দিয়া তাহারা হেন কর্ম্ম নাই যে করিতেছে না!

প্রসঙ্গতঃ আর একটি কথা মনে পড়িতেছে। অনেক

আগের কথা। এক বাঙালী যুবক উচ্চশিক্ষার্থে জাপান যায়। সেখানে এক বাড়ীতে 'পেয়িং-গেষ্ট' হইয়া থাকে। বাড়ীর মালিক এক দুগ্ধ-ব্যবসায়ী বৃদ্ধ। ঋষিতুল্য সদানন্দ পুরুষ। একটিমাত্র ছেলে—তাহারই সমবয়সী। সুন্দর পরিবেশে ছেলেটির মন ভরিয়া উঠিল। বৃদ্ধও ছেলেটিকে নিজের ছেলের মতই দেখিত। অবসর সময় গল্প করিত, বাংলা দেশের কথা শুনিত। ছেলেটিও ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাদের খামার-বাড়ী দেখিত। এক জায়গায় এত গরু আর কখনও সে দেখে নাই। তা ছাড়া গোয়াল-বাড়ী যে এত পরিষ্কার রাখা যায়, ইহাও সে নূতন দেখিল। গরুগুলির যেমন স্বাস্থ্য, তেমনি তাদের আহারের ব্যবস্থা।

বেশ কাটিতেছিল। হঠাৎ কয়েকদিন হইতে ছেলেটি লক্ষ্য করিতেছিল, বৃদ্ধের সে হাসি-খুশি ভাব নাই—সেই সদানন্দ পুরুষটি যেন রাতারাতি বদলাইয়া গিয়াছে। কাহারও সহিত কথা নাই—সদাই অন্যমনস্ক। ছেলেটি তাহার বন্ধুকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। বন্ধু বলিল, তুমি ত জান, আমাদের দুধের কারবার। বাবাকে প্রত্যহ আড়াই মণ করিয়া দুধ যোগান দিতে হয়। কয়েকটি গরু হঠাৎ মারা যাওয়ায়, দুধের পরিমাণ পনের সের কমিয়া গিয়াছে। কি করিয়া এই দুধ সরবরাহ করিবেন তাহাই চিন্তা করিতেছেন।

ছেলেটি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, এই জন্য অত চিন্তা কেন? ইহার ত সহজ উপায় রহিয়াছে। আড়াই মণ দুধের জায়গায় মাত্র পনের সের কম পড়িতেছে। এই পনের সের দুধের পরিবর্তে ঐ পরিমাণ জল মিশাইয়া লইলে সমস্যার সমাধানও হইবে—কেহ বুঝিতেও পারিবে না।

বন্ধুও বুঝিল, ইহা ত খুব সহজ উপায়—অথচ তাহাদের মাথায় আসে নাই! ছুটিতে ছুটিতে সে তাহার বাবাকে গিয়া বলিল। বৃদ্ধ শুনিয়া গম্ভীর হইয়া গেল। বলিল, এ বুদ্ধি তোমাকে নিশ্চয় ঐ বাঙালীবাবুটি দিয়াছে?

ছেলেটি উত্তরে জানাইল 'হাঁ'।

শুনিয়া বৃদ্ধ অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিল। তার পর তাহাকে ডাকিয়া বলিল, তুমি অন্যত্র থাকিবার চেষ্টা দেখ। আমি তোমাকে এখানে আর জায়গা দিতে পারিব না। তোমাদের দেশে কি হয় জানি না, আমরা ইহা কল্পনাও করিতে পারি না। জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে যেসব সন্তানদের উপর, তাহাদের দুধকে আমরা ঐ ভাবে নষ্ট করিতে পারি না। তুমি যত শীঘ্র পার এখান হইতে চলিয়া যাও। নচেৎ তোমার সংসর্গে আমার পুত্র নষ্ট হইয়া যাইবে।

গল্পের মতো শুনাইলেও, ইহা সত্য ঘটনা। এক ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর সর্বত্রই খাদ্য সম্বন্ধে সচেতন। তাহারা আর যাহাই করুক খাদ্যে এবং ঔষধে ভেজাল দেয় না। আমি আমার দেশের খাদ্যের উপর নির্ভর করিতে পারি না, কিন্তু বিদেশী 'ফুড'—যাহা শিশি বা কৌটা করিয়া আসে, তাহা চোখ বুজিয়া খাইতে পারি। অথচ এমন দুর্নীতি আমাদের দেশে চিরকাল ছিল না। গত যুদ্ধের আগেও আমরা দেখিয়াছি—টাটকা দুধ, ঘি, মাখন। আজ কাহিনী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিজ্ঞান আমাদের এক দিকে উপকার করিয়াছে যেমন, অপকার করিয়াছেও তেমনি। তাহারাই শিখাইল, কৃত্রিম দুধ তৈরীর কৌশল। তাহারাই শিখাইল ঘৃত না হইয়াও ঘৃত বানাইবার প্রক্রিয়া। সেই উপকরণ জোগাইল বিদেশী বণিকেরা। যুদ্ধোত্তরকালে সেই উপকরণগুলিই আজ বাজার ছাইয়া আছে। আজ চেষ্টা করিয়াও খাঁটি জিনিস পাইবার উপায় নাই। কারণ, আমাদের দেশের ব্যবসায়ীরা অতি সহজে বাজার মাৎ করিবার কৌশল পাইয়া গিয়াছে। সামান্য খরচে প্রচুর লাভ!

এই লোভই আমাদের জাতির সর্বনাশ করিয়াছে। এই লোভের জন্য মানুষ আজ এত নীচে নামিয়া গিয়াছে, যাহার ফলে কোনো কুকার্য্য করিতেও তাহাদের বাধে না। নচেৎ খাদ্যে বিষ মিশাইয়া মানুষ মারিতে তাহাদের বিবেকে বাধিত। আজ বিবেক বলিয়া মানুষের কোনো পদার্থ নাই। অর্থই একমাত্র তাহাদের ঐশ্বর্য্য। ইহার জন্য পাপ, পুণ্য, ধর্ম্ম, অধর্ম্মকে তাহারা বিসর্জ্জন দিয়াছে। অবাঙালী ব্যবসায়ী যাহারা, তাহারা যে-হাতে খাদ্যে বিষ মিশাইতেছে, সেই হাতেই পিপীলিকাকে চিনি খাওয়াইতেছে। পাপ-পুণ্যের ভারসাম্য ঠিক রাখিয়া তাহারা একটা জাতির সর্বনাশ করিয়া যাইতেছে।

অথচ গরু যাহাদের খাদ্য—দেবতার আসনেও যাহারা গরুকে বসায় নাই, সেই আমেরিকানরা কত যত্নে গরু পালন করিতেছে শুনিলে অবাক হইতে হয়। সাংবাদিক শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের গো-শালার কথা বলিতে বলিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠেন। তাঁহার কয়েকটি কথা এখনও আমার মনে আছে। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমরাও অত সুন্দর গৃহে বাস করি না। গোয়ালঘর যে দুর্গন্ধ এবং ময়লা-শূন্য হইতে পারে ইহা আমার

কল্পনারও বাহিরে ছিল। যেমন ঝকঝকে সুন্দর তেমনি কোথাও গোময় বা গোমূত্রের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। কি করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে পরিষ্কার হইয়া যাইতেছে, তাহাও দেখিবার বিষয়। যেন ম্যাজিক! গরুও যেমন অসংখ্য, তাহাদের পরিচর্য্যার জন্য লোকও সেইরূপ নিযুক্ত আছে। গরুগুলির যেমন স্বাস্থ্য তেমনি সুপরিস্কৃত।"

ইহারা জাতির প্রয়োজনে গো-রক্ষা করিতেছে, দেবতার আসনে বসাইয়া গরুর প্রতি অবিচার করে নাই।

খাঁটি দুধ-ঘির জন্য পল্লীগ্রামের আগে সুনাম ছিল। আজ পল্লীও এ বিষে দুষ্ট। কারণ তাহারা একই মেসিনে 'মানুষ' হইয়া উঠিতেছে।

কিছুদিন আগে কলিকাতাতেও অনেকগুলি খাটাল থাকায় খাঁটি দুধ পাওয়া যাইত। আজ শহরের স্বাস্থ্য-রক্ষার্থে খাটালগুলি ধ্বংস করা হইয়াছে। এখন একমাত্র দুগ্ধপ্রাপ্তির স্থান হরিণঘাটা, তাও তাঁহাদের বহু বিজ্ঞাপিত 'টোন্‌ড' দুগ্ধ। সুতরাং 'বাঁটে দোয়া' খাঁটি দুগ্ধের অভাব রহিয়াই গেল।

স্বাস্থ্যরক্ষার্থে পল্লী-সংস্কার, শহরের আবর্জ্জনা দূর, হেল্‌থ সেণ্টার প্রভৃতি বিবিধ ব্যবস্থা আজ সরকার করিতেছেন। কিন্তু যাহা খাইয়া মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্য অটুট থাকে, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিতেছেন কৈ? আজ ভেজাল খাদ্যে দেশ ভরিয়া গেল। জানিয়া শুনিয়া এই অপকর্ম্মকে সরকার একরূপ প্রশ্রয়ই দিতেছেন। নহিলে এই দুর্নীতি কবে দূর হইতে পারিত। ভাব দেখিয়া মনে হয়, সরকার এইসব ধনী ব্যবসায়ীর হাতে ক্রীড়নক মাত্র। আইন এমনভাবে রচিত, যাহাতে অপরাধীদের বিচার ত দূরের কথা, তাহাদের সন্দেহ করিবার পর্য্যন্ত অধিকার নাই! এখন যাহা দেখা যাইতেছে, জাতি ধ্বংস হইয়া গেলেও সংবিধান পাল্টাইবে না। সুযোগ বুঝিয়া, বৈজ্ঞানিকদের কেহ কেহ ইহার সহযোগিতা করিতেছেন। কোন্ দ্রব্যের সংমিশ্রণে অপরূপ খাদ্য বানানো যাইবে তাহারই গবেষণায় এই সব বৈজ্ঞানিকরা নিযুক্ত আছেন। কর্পোরেশনের ষ্ট্যাণ্ডিং হেল্‌থ কমিটির চেয়ারম্যান ডাঃ বি. সি. বসু এই কথা বলিয়াছেন।

সকলেই জানেন, খাদ্যে যাহারা ভেজাল দেয় বা রোগীর ঔষধে যাহারা বিষ মিশ্রিত করে, তাহারা দেশের শত্রু। ইহাদের জন্য কঠোর শাস্তির আবশ্যকতাও সর্ব্বসম্মত। তথাপি ইহাদের সম্বন্ধে কঠোর আইন প্রণীত বা প্রবর্ত্তিত হইতেছে না। অথচ ইহাদের মুখেই দেশপ্রেমের, সমাজ-রক্ষার কত বড় বড় কথাই না শোনা যায়! হায় দুর্ভাগা দেশ! কারাগারের কয়েদীদের সুখ-সুবিধার জন্য ইহাদের প্রাণ কাঁদে, দেশের পতিতাদের উদ্ধারের জন্য যাঁহারা আগ বাড়াইয়া যাইতেছেন, তাঁহারা জাল ও ভেজাল দমনে কঠোর দণ্ড বিধানের ব্যবস্থা করিতে এত কুণ্ঠিত বা উদাসীন কেন? খাদ্যে ভেজাল দিয়া যাহারা প্রাণহানি ঘটাইতেছে, আর যাহারা আইনের অজুহাত দেখাইয়া প্রাণ লইয়া এরূপ ছিনিমিনি খেলিতেছেন তাঁহারা সমান অপরাধী। একথা যেন তাঁহারা না ভোলেন।

দ্রব্যে ভেজাল আজ নূতন নহে। যুদ্ধের আগেও ছিল, পরেও আসিয়াছে। বিশেষতঃ দেশবিভাগের পরে, মূল্যবৃদ্ধি ও পণ্যাভাবের সুযোগে ইহার প্রসার বাড়িয়াছে। খাদ্যে যাহারা খাদ মিশায়, পথ্য ও ঔষধ জাল করে, তাহারা কেবল লোককে প্রতারণাই করে না—প্রাণেও মারে এবং তাহারা একজন বা দুইজন নহে, সঙ্ঘবদ্ধভাবে মানুষের প্রাণনাশ করে। চাউলে যাহারা কাঁকর মিশায় তাহারা মাত্রাহীন লাভের লোভে সাধারণ মানুষকে ঠকায় ওজনে। তেল, ঘি এবং ঔষধে জালিয়াতি যাহাদের ব্যবসায়, তাহারা ধর্ম্মে সহস্রমারী—অসহায় রোগীরও তাহাদের হাতে রেহাই নাই। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিকেও এই শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী মারণযজ্ঞে কাজে লাগায়, ইহারা সামান্য নহে। তাই ঘৃতে পাই বনজ-তৈল আর জান্তব চর্ব্বি। সরিষার তৈলের প্রধান উপাদান বাদাম-তৈল ইহা ত সকলেই জানেন। কিন্তু রং আর এসেন্সের এমনই মহিমা কিছু ধরিবার উপায় নাই। আজকাল ডালেও রং মিশানো হইতেছে—উহা ত গরল এবং সে গরল কোনোদিনই অমৃত হইয়া উঠে না। দাম দিয়া যে মধু কেনা হয় তাহা গুড়ের সহিত জাল-দেওয়া শূন্য মৌচাকের রস মাত্র। রসায়ন-বিদ্যায় এই পারদর্শিতার জুড়ি নাই। তালিকা বাড়াইয়া লাভ নাই—পানের সহিত যে খয়ের পাই, তাহা অনেক সময়েই রক্তাভ খড়িমাটির ডেলামাত্র। আর জিরা বলিয়া যাহা বাজারে বিক্রয় হয়, তাহা অতি নিপুণভাবে কাটা খড়কুটা। সুতরাং ভেজাল নাই কোথায়?

মানবেতর জীবগুলির মধ্যে শত্রুতার ব্যাপারে একটা আপোষ-রফা আছে, সাপের শত্রু বেজী, বিড়াল ইঁদুরের যম, কিন্তু মানুষ? মানুষের শত্রু মানুষ! সভ্যতার শিখরে উঠিয়াও আমরা সেই আদিম প্রবৃত্তিগুলিকে জীয়াইয়া রাখিয়াছি।

কালাপানি

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিকালে, অন্ততঃ পঞ্চান্ন বছর আগে নাম মারফৎ বর্ত্তমানের সুভাস দ্বীপের সঙ্গে সামান্য পরিচয় ঘটেছিল। পল্লীগ্রামের পাড়ার "দাদারা" তখন "স্বর্ণলতা"র নাট্যরূপ "সরলা"র অভিনয় করতে রঙ্গ-মঞ্চে অবতীর্ণ হচ্ছেন। সখের দল; অধিকাংশই সওদাগরী আপিসের কেরাণী, কতক বেকার, বাড়ীর কাজ অনেকেই করবার সময় পান না, তাস, পাশা, দাবা খেলা নিয়ে ব্যস্ত; প্রতিবেশী, পল্লীবাসীর অভাব-অভিযোগ দূর করা, রোগের সেবা, প্রভৃতি ছোট বড় কাজ নিয়েই বিব্রত। এঁরা বাড়ীতে নাম পেয়েছিলেন, "mankind gooder" জগদ্ধিতায়, কিন্তু বাড়ীর বেলায় একেবারে "হাওয়া" ফুরসুৎ নাই মোটে। নেশার মধ্যে নস্য, গুড়ুক তামাক, তখনও বিড়ির তেমন চলন হয় নি। ৺বিজয়া উপলক্ষ্যে (এবং অপরাপর সময়েও) সিদ্ধি, "নীরা" তালের অভাবে "fermented" খেজুর রস (বা তাড়ি) এবং কচিৎ কোনোও ক্ষেত্রে "বড় তামাক" চলছে।

এই "সরলা" অভিনয় সাহায্যে "পুলিপোলাও"র নাম প্রচারিত হয়। "গদাধড় চন্দড়" গুরু অপরাধে গেলেন দীর্ঘ মেয়াদী সাজা পেয়ে; তখনও ঠিক প্রকাশ পেল না সে কোন্ স্থান। কিন্তু শশীভূষণ যখন যোগ্য শ্যালকের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে বাধ্য হচ্ছেন, তখন প্রমদার মাতাঠাকুরাণী, শশীভূষণের শ্বশ্রূমাতা, একটা সান্ত্বনালাভ করলেন, যাক্ "পুলিপোলাও" অর্থাৎ "কালাপাণি"তে তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র একটা সঙ্গী পাবেন।

"পুলিপোলাও" নাম সেই দূরপাল্লার জায়গায় হঠাৎ হ'ল কেন, তার জবাব দিতে তাঁরা পারেন, যাঁরা চলতি কথার "মূল" অর্থ অপরিণত বয়স্ক ছাত্রদের বোঝাবার জন্যে মোটা মোটা ব্যাকরণ লেখেন, তাদের বিদ্যাদিগ্ গজ করে ছাড়েন। সাধারণ অর্থে বাঙ্গালীর দুটি লোভনীয় মুখরোচক বস্তু, অর্থাৎ পুলি (পিঠে) আর পোলাও, যার কোনোটাই ঐ দ্বীপের সাতশ' বা হাজার মাইলের মধ্যে আসে নি, তাকেই কৌতুক ক'রে হয়ত ঐ চমৎকার নাম দেওয়া হয়ে থাকবে।

দেখলে দিস্তে কতক কাগজ লিখে বোঝানো যাবে না; অন্ততঃ আমার সে শক্তি নেই। কখন নীল জল কালো হ'তে আরম্ভ হ'ল, এবং ক্রমে মসীবর্ণ হ'ল, সেই মিলন ক্ষেত্র কলকাতা, মাদ্রাজের, ব্রহ্মদেশের ডাঙ্গা হ'তে কতদূর তা আমার পক্ষে বলা কঠিন; তবে শ'পাঁচেক মাইল ধরে যে কেউ যেন কালির দোয়াত উপুড় করে দিয়েছে, সে কথা বলতে ভয় নেই; মনে হয় পরণের কাপড়খানা ঐ জলে কাচলে নীলাম্বরী নয়, আলকাতরা-মসী হয়ে যে উঠবে! জাহাজের প্রোপেলার (চাকা) খানা শ্রান্তিহীন ভাবে জলকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে সাদা ফেনা ভাসিয়ে না দিলে সংশয় জেগে থাকত মনে, যে এই অসীম অতল কালো তরল পদার্থটি অপর যাই-ই হউক, অন্ততঃ জল নয়, তারল্য ছাড়া জলের সাদৃশ্য তার আর কোথাও নেই। বুঝলাম দ্বীপ (পুঞ্জ) "কালাপানি" কেন হলেন —ইংরেজীর "transferred epithet" অলঙ্কারের একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

মালয় না-কি একটা এশিয়ার দক্ষিণী-পশ্চিমী দেশের ভাষায় "হাণ্ডুমান" কথা আছে, বিশাল বারিধি পার হয়ে সেই ভাষাভাষী কোনোও ব্যক্তি সেখানে গিয়েই হউক, আর কথাটা ছুড়ে দিয়েই হউক, ওটাকে "আন্দামান" নাম করে দিয়েছে। এ ব্যাপারটা নিতান্ত ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দের এলাকা; আমার শ্রদ্ধেয় "গুরু" শ্রীসুনীতি চট্টোপাধ্যায় মশাই বিধান-পরিষদ থেকে দু'চার মিনিট বাঁচিয়ে নিজ কার্য্যে মন দিলে ঐ "পুলিপোলাও" আর "আন্দামান" দুটি শব্দেরই মূল উদ্ধার করে নিশ্চয়ই আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করতে পারবেন।

যেটা বুঝতে কষ্ট হয় না, একবার শুনলেই কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশিয়া প্রাণ আকুল করে, সেই নামটি "সুভাষ দ্বীপ"। নেতাজী নিজে "স্বরাজ" আর "শহীদ" দ্বীপ নাম দিতে চেয়েছিলেন, তথাকার অধিবাসী কৃতজ্ঞ-চিত্তে তাঁর নিজের নামেই দ্বীপের পরিচয় দিয়ে গর্ব্ব অনুভব করেন; প্রত্যেক দেশভক্তের প্রাণের তারে তারে তাঁর সাড়া জাগে, জাগে নি খালি মদগর্ব্বিত, আত্মসর্ব্বস্ব, পরশ্রীকাতর কয়েকটি শক্তিমান দিল্লীর রাজপুরুষের

পরিবর্ত্তিত হয়ে যাচ্ছে, তাঁদের নাম অটুট অক্ষুণ্ণ চিরস্থায়ী করে রাখার চেষ্টাই চলছে।

এখন নাম নিয়ে লড়াই দু'পক্ষে—তথাকার বর্ত্তমান অধিবাসী আর দিল্লী রাজশক্তির মধ্যে। লোকের মনে প্রাণে মুখে মুখে সেটা "সুভাস দ্বীপ"; আর প্রচারসর্ব্বস্ব প্রাণহীন সরকারী কাগজপত্রে সেটা ইংরেজের দেওয়া নাম "আন্দামান"ই চলছে ও চলবে।

বহুকাল হতে আন্দামানের পরিচয় আছে, প্রায় সমস্ত দ্বীপই পর্ব্বত থাকায় অসমতল। এই পাহাড়ে পাথর অপেক্ষা মাটির ভাগ বেশী; উপরের স্তর সবটাই মাটি থাকায় গাছপালা প্রচুর জন্মায়। সমুদ্র, পাহাড় ও বনের সম্মিলিত শোভা নিয়ে আন্দামান অতুল সম্পদের অধিকারী। সূর্য্যোদয়, সূর্য্যাস্ত যে কোনোও স্থান থেকে দেখতে পাওয়া যায়। আর এখানেই যেন নবীনচন্দ্রের কবিতার রূপ সর্ব্বত্র বিদ্যমান:

"আনন্দের সচঞ্চল লীলা রত্নাকর।
আনন্দের অচঞ্চল লীলা নীলাম্বর॥
নীলিমায় নীলিমায়, মহিমায় মহিমায়
মিশাইয়া পরস্পরে মহা আলিঙ্গন॥

জাহাজ থেকে আরম্ভ করে আন্দামানে আমার জীবনে এই দৃশ্যের পূর্ণ উপলব্ধি ঘটে এবং যে আনন্দ হয় তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

প্রকৃতির রূপ মনকে বিভোর করে রাখে। কতগুলি বিশেষ সুযোগ দ্বীপপুঞ্জকে সমৃদ্ধ করেছে। ব্রহ্ম হতে মালয় পর্য্যন্ত বিশাল সমুদ্রের মধ্যে আন্দামান নিকোবর অবস্থিত, সুতরাং বাণিজ্যের দিক ছাড়াও সামরিক প্রয়োজনীয়তা দ্বীপগুলির খুব বেশী। বঙ্গোপসাগরের প্রবল ঝঞ্ঝা আন্দামানের কুলকে আলোড়িত করে না, পোতাশ্রয় হিসাবে এ একটা বড় সুযোগ। শীত-গ্রীষ্ম লোককে উত্যক্ত করে না, আছে কেবল বর্ষা আর বসন্ত। প্রচুর বৃষ্টি হওয়ায় আধার সৃষ্টি করে নিতে পারলে জল-কষ্ট দূর করা সম্ভব।

ভূতত্ত্ববিদ্‌দের মতে আন্দামান নিকোবর "পাহাড়" মাত্র। ব্রহ্মে আরাকান ইয়োমার নেগ্রাইস্ অন্তরীপ হতে সুমাত্রার আচিন্ হেড পর্য্যন্ত যে ৭০০ মাইল লম্বা সমুদ্রতলবর্ত্তী পর্ব্বতমালা আছে, তাদেরই কেউ কেউ সমুদ্রের ওপর মাথা ঠেলে উঠেছে। যেন জলের ভিতর থেকে শ্বাস নিবার জন্যে উপরে উঠবার পর ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। যে পাহাড় সবচেয়ে বেশী ঠেলে উঠেছে সেটা উত্তর আন্দামানের স্যাড্‌ল্ পিক্ (Saddle Peak, 2,400 ft.), নিতান্ত অবহেলার পাত্র নয়। আরও কয়েকটি ছোট-খাটো ভায়েরা আছে, যথা, (Mt. Diavolo) ডিয়াভোলো (১,৬৭৮'), (Mt. Koiob) কোইয়ব্ (১,৫০৫'),(Mt. Harriet) হ্যারিয়েট (১,১৯৩') (Fords Peak) ফোর্ডস্ পিক্ (১,৪২২')।

পাহাড়ের ঢালুদেশ খুব সহজ সরল; খালি জায়গা-গুলি সবুজ ঘাসে মোড়া। বড় পাহাড়গুলি সবই সমুদ্রের দিকে ঢলে পড়েছে, তাই তার শোভা এত বেশী। বড়র সঙ্গে ছোটর তুলনা করে বলা যায়, এ যেন দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্ব ও পশ্চিম "ঘাট"। এই পাহাড়ের ওপর প্রধানতঃ কাঠের বাড়ীগুলি দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন পটে-আঁকা স্বপনপুরীর মানুষ থাকবার ক্ষুদে ক্ষুদে খোপ।

আন্দামানের তীরভাগ কেবল যে সমুদ্রতরঙ্গের লীলাভূমি তা নয়; কোথাও বিশ মাইল পর্য্যন্ত (coral reefs) প্রবাল প্রাচীর দিয়ে সজ্জিত। কত রঙের, কত রূপের প্রবাল যে এখানে তার হিসাব-নিকাশ করা কঠিন। কোথাও শামুকের গায়ে নয়নাভিরাম মনো-মোহিনী মুক্তার দ্যুতি। সমুদ্রতীর মাত্রেই শাঁক-শামুকের নানা নিদর্শন পাওয়া যায়, কিন্তু আন্দামানে আছে তার ওপর আরও অনেক কিছু।

আন্দামান ২০৪টি দ্বীপের সমষ্টি; নিকোবর ছোট-বড় ১৯টির। আন্দামান বলতে উত্তর আন্দামান, মধ্য আন্দামান, দক্ষিণ আন্দামান, বড়টাং ও র‍্যাটল্যাণ্ড এই পাঁচটি সর্ব্বপ্রধান অংশ; আর সব "ছুট্‌কো-ছাট্‌কা"। সমস্ত আন্দামানের দৈর্ঘ্য ২৯০ মাইল আর প্রস্থ ৩২ মাইল মাত্র। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। আন্দামানের আয়তন ২,৫০০ বর্গমাইল। আর নিকোবর যোগ দিলে ৩,২১৫ বর্গমাইল।

পোর্টব্লেয়ার প্রধান বন্দর। লেঃ আর্চিবল্ড ব্লেয়ার ১৭৮৯-৯০ সনে এই দ্বীপপুঞ্জের জরীপ পরিদর্শনের ভার নিয়ে ঐ অঞ্চলে গিয়েছিলেন এবং তথ্যবহুল রিপোর্ট দ্বারা তদানীন্তন গবর্ণমেন্টের মনোযোগ উৎপাদনে সমর্থ হয়ে-ছিলেন। আজ পোর্ট ব্লেয়ার তাঁর নাম স্মরণ করে আছে। আর কয়টি মায়া বন্দর, পোর্ট কর্ণওয়ালিশ ও পোর্ট এলফিন্‌ষ্টোন। পোর্ট ক্যাম্পবেলও নিতান্ত উপেক্ষার নয়। রস্ দ্বীপের উত্তর ও দক্ষিণ জাহাজের আশ্রয়রূপে ব্যবহার করবার সুযোগ আছে।

উপেক্ষিত দ্বীপমালা, বিপন্ন বিপর্য্যস্ত জাহাজের আশ্রয়স্থল। সুভাষ দ্বীপ সম্বন্ধে খুব বেশী সাহিত্য জানা নেই, তবে যখন একে "The chain of islands looking like beads in the bluest of the blue seas" বলা হয়, তখন সত্যের সঙ্গে কবিত্বের আমেজ

মনকে স্পর্শ করে। দূর থেকে আমার মনে হ'ল যেন কে চিরহরিৎ পত্রের ছোটবড় সাজি নীল আস্তরণের ওপর সাজিয়ে রেখেছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যলোলুপ মানুষ আন্দামান একবার দেখলে জীবনে তার রূপ বিস্মৃত হতে পারবে না।

রেয়ারের পরিদর্শনের পর সেখানে সরকারী কর্ম-তৎপরতার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৭৮৯ সনে বাঙ্গলা সরকার অভিযুক্ত আসামীদের উপনিবেশ স্থাপন করে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য ১৭৯৬ সনে পাততাড়ি গুটিয়ে চলে আসতে হয়। এর পর প্রায় পঞ্চাশ বৎসর নরখাদক আদিম মানবের দেশ বলে সরকারী নথিপত্রে এর পরিচয় জীইয়ে রেখে দেয়। ১৮৫৭ সনে সিপাহী যুদ্ধের কয়েদী রাখার তাগিদে আবার যাতায়াত সুরু হয়। ওখানে ১৮৬৮ সনে আবহবিভাগ আর ১৮৮৩ সনে বন-বিভাগ স্থাপিত হয়।

বিভিন্ন উদ্দেশ্যে, বিভিন্ন কাজের তাগিদে, কম সংখ্যায় হলেও নানা স্থানের লোক সেখানে হাজির হয়েছে ও বাসও করছে বহুকাল। এখন আসলে যাদের দেশ, তাদের একটু পরিচয় দেওয়া দরকার বলে মনে করি।

এখানে যারা আছে তারা আদিম মানুষ, সভ্যজগতের স্পর্শ তারা বাঁচিয়ে চলেছে। নৃতত্ত্বান্বেষীদের কাছে আজও তারা বিস্ময়ের বস্তু। আদিম মানুষের জীবন-যাত্রা, সামাজিক রীতিনীতির সংবাদ পেতে হলে আন্দামান এখনও উপযুক্ত গবেষণাক্ষেত্র বলা যেতে পারে।

মূলতঃ আট-দশ শ্রেণীতে বিভক্ত থাকলেও এখনও নিকোবরী ও আন্দামানী বাদ দিলে আর মাত্র চারটি "জাতি" দেখতে পাওয়া যায়। অঙ্গি, জারওয়া, সোম-পেন্স আর সেন্টিনেলী। এরা স্বতন্ত্র বিভাগ বলে মনে হয়; সেন্টিনেল দ্বীপে বাস হেতু নূতন আখ্যা পেয়েছে। প্রকৃতির সন্তান হলেও এরা প্রায় লোপ পেতে বসেছে, বিশেষতঃ জারওয়ারা। এখনও এরা হিংস্র জীবন যাপন করে; এবং তার পরিচয়ও মাঝে মাঝে পাওয়া যায়।

গত বৎসরে দু'জন চৌকীদার শ্রেণী লোক ভুলক্রমে জারওয়া এলাকায় গিয়ে পড়েছিল, আর ফিরে আসে নি। উদ্বাস্তুদের মধ্যেও একজন সম্পূর্ণ নিখোঁজ হয়ে গেছে।

এক হতে অপর শ্রেণী সম্পূর্ণ বিভিন্ন এলাকায় বাস করে; জীবনযাত্রায় বিভিন্নতার ছাপ আছে। ভাষা ও নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যধারায় যথেষ্ট গরমিল দেখা যায়। ছোট ছোট দলে, এক মোড়লের আওতায় বাস করা এদের রীতি। মানুষগুলি নাতিদীর্ঘ; পুরুষ চার ফুট দশ সাড়ে দশ ইঞ্চি, নারী গড়ে সাড়ে চার ফুট। পুরুষ যৌবনপ্রাপ্ত হয় আন্দাজ ১৫ বৎসরে; বিবাহাদি হয় ২২ থেকে ২৪; স্ত্রী সাধারণতঃ ১৩ বৎসর বা তারও পূর্ব্বে সন্তান ধারণ করে। গায়ের রং প্রায় চকচকে মিশ কালো; কোথাও বা কটা ফিকে দেখা যায়। মাথার চুল কোঁকড়ানো গোলাকৃতি গুচ্ছ, যেন কে কালো তারের অজস্র আংটি দিয়ে মাথাটা ঢেকে দিয়েছে।

বন্যপশু ও মাছ, গাছের ফলপাকড় দিয়ে এরা জীবন-ধারণ করে; আগুনের ব্যবহার একেবারে অজানা নয়। আগুন সৃষ্টি করার উপায় এখনও শেখা হয় নি, সুতরাং তাকে বাঁচিয়ে রাখা একটা বড় কাজ। ব্যক্তিগত অধিকার ভূমিতে নাই; সেটা প্রয়োজন হয়ে পড়ে যখন ভূমিতে ফসল উৎপন্ন হয়। সকল শ্রেণীর মধ্যে অতি নিম্নস্তরের সভ্যতার চিহ্ন দেখা যায়। বনের ও সমুদ্রের ঠাকুর, প্রেত, রোগ ও মৃত পূর্ব্ব-পুরুষ এরাই তাদের "দেবতা" এবং ধর্মের ভিত্তি। এই কয়টির অপ্রীতিকর কাজ তারা করতে নারাজ। সম্মানিত ব্যক্তির মৃতদেহ কোনও রকমে আচ্ছাদিত করে গাছে তুলে রাখা হয়। ("মরিলে তুলিয়ে রেখ তমালের ডালে" লাইনটি মনে পড়ে)। দেবতার পূজা বা তুষ্টির চেষ্টা নেই, আর নেই কোনোও যাচ্ঞা বা প্রার্থনা। সভ্যজগৎ থেকে এরা এ বিষয়ে অনেক এগিয়ে আছে।

তীর ধনুক আর বর্শা এদের আক্রমণ ও আত্মরক্ষার অস্ত্রশস্ত্র। পশু ও মৎস্য শিকার এদের সাহায্যেই হয়ে থাকে। শক্ত কাঠের পাতলা "ছুরি" সাহায্যে করোয়া কাটা-চাঁচা কাজ সম্পাদিত হয়। এই ছুরির সাহায্যে তারা মাথায় সিঁথির স্থান প্রায় সিকি ইঞ্চি চওড়া চেঁচে পরিষ্কার করে রাখে। এটা দেহসজ্জার একটা অঙ্গ-বিশেষ।

গাছের ছাল হতে দড়ি রশি তৈরী হয়। ছাল পাতা বা তৃণগুচ্ছ লজ্জা নিবারণের একমাত্র আচ্ছাদন। কোথাও গভীর বনের মধ্যে উলঙ্গ মানুষের কথাও শোনা গেল। মাদুর, চাটাই, ঝুড়ি প্রভৃতি তৈরি করার বিদ্যা আয়ত্তে আছে।

অঙ্গি, আন্দামানী, নিকোবরী প্রভৃতি যারা অপর (সভ্য) মানুষের সংস্পর্শে এসেছে, তাদের সঙ্গে কোনোও সামাজিক বিবাহাদি বা অপর বন্ধন স্থাপন করে নি। নিজেদের আলাদা আলাদা জাতের মধ্যেও আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে নি। বনচরের জীবনই চলেছে। উপার্জ্জনের জন্য সমাজ ছেড়ে কেউ আসে না, আদিবাসী কেউ মজুর দেয় না।

চুরি করবার বিশেষ কিছু নেই, করেও না। ঝোড়া-ঝুড়ি, কাঠের যন্ত্র প্রভৃতি তাদের শিল্পজাত দ্রব্য। এই রকম কিছু নিতান্ত প্রয়োজনে "হাতসাফাই" করে। ধরা পড়লে লাঞ্ছিত হতে হয়।

বিভিন্ন শ্রেণীর বাসের এলাকা যে পৃথক, তা পূর্ব্বে বলা হয়েছে। অনুমান, মোট হাজার চৌদ্দ আদিবাসী আছে, তার মধ্যে এক নিকোবরীর সংখ্যাই সাড়ে তের হাজার। এরা সাধারণতঃ নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে বাস করে, আন্দামান দ্বীপ ও আন্দামানীদের সঙ্গে এরা বিশেষ মেলা-মেশা করে না। আন্দামানী প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে; সভ্য জগতের মানুষের সঙ্গে সংস্পর্শ হওয়ায় এরূপ ঘটে থাকবে। এখন যে অবস্থায় পৌঁছেছে তাতে এদের সংখ্যাবৃদ্ধির সম্ভাবনা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। এই জাতি মধ্য ও উত্তর আন্দামানের তটভূমি আশ্রয় করে আছে।

"অঙ্গিদের" সংখ্যা এখনও একটু বেশী; আন্দাজ শ'দেড়েক হবে। মোটামুটি তারা লিটল্ (ক্ষুদ্র) আন্দামানে বাস করে। সাউথ বা দক্ষিণ আন্দামানেও একটা অংশ দেখতে পাওয়া যায়।

জারওয়ার সংখ্যা গোটা পঞ্চাশেক মাত্র হবে, মধ্য ও দক্ষিণ আন্দামানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত। হিংস্রতায় সেন্টিনেলিরা প্রায় এদের সমান। উত্তর সেন্টিনেল দ্বীপে তাদের অবস্থান।

আন্দামানীদের প্রকৃতি সম্বন্ধে বলা হয় যে, তারা সঙ্গীহিসাবে বেশ খোসমেজাজী, শিকারকার্য্যে অত্যুৎসাহী আর বিরক্ত হলে বা রেগে গেলে নিষ্ঠুর, সন্দেহশীল বিশ্বাসঘাতক; মাঝে মাঝে প্রতিহিংসা নেবার চেষ্টাও দেখা যায়। ভাব রাখতে পারলে খুবই ভাল, আর বিগড়ে গেলেই হাঙ্গামা।

সাজা-শাস্তিপ্রাপ্ত আসামী আর এখন তাদের বংশধররা একটা বড় সংখ্যা। গুরু অপরাধে যাদের ফাঁসি দেওয়া হয় নি, তারা মুক্ত কয়েদী—বিবাহ করে বা দেশ থেকে স্ত্রী, স্বামী আত্মীয় এনে ওখানে বসবাস করছে। বর্ত্তমানে তারাই দ্বীপরাজ্যের প্রধান অধিবাসী। আদিবাসীরা পশ্চাতে স্থান গ্রহণ করেছে।

অতীত কাহিনী স্মরণপথ থেকে সরে যাচ্ছে; যারা নতুন গড়ে উঠছে তাদের জন্মভূমি—আদিম দেশ। হঠাৎ উত্তেজনাবশে একটা অপরাধ করার ফলে হয়ত যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়েছিল। মুক্ত হয়ে শান্তভাবে বাস করেছে অনেকেই। নিতান্ত অপরাধপ্রবণ না হলে, দ্বিতীয় বার গুরু অপরাধের সংবাদ খুব কমই আছে।

একটি গল্প হলেও সত্য কাহিনী। বিষণ সিং (?) একদিন হঠাৎ বাড়ী ফিরে পত্নীকে এক প্রণয়ীর সঙ্গে ভারতীয় পঞ্চশীল নীতির সহাবস্থান দৃশ্য দেখে রাগ সামলাতে পারে নি। হয়ত প্রাণ নেবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু লগুড়ের এক আঘাতেই প্রণয়ীকে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হ'ল। বিষণ দোষ স্বীকার করলে, ক্রুদ্ধ হবার কারণ ছিল বলে নরহত্যা করলেও তার প্রাণদণ্ড হয় নি। তাকে দ্বীপান্তরে পাঠিয়ে বিচার নিজ মহিমা রক্ষা করতে পারলে। বিষণ মুক্ত হয়ে আর বাড়ী ফেরে নি; কোথায় বা যায়? যার স্ত্রীর ব্যভিচারে এত সাজা সেখানে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না। আন্দামানেই এক বড় রাজপুরুষের গৃহরক্ষকের কাজ নেয়। সকলেরই সে অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠেছিল। পরিণত বয়সে এক বন্ধুর স্ত্রী ও ছেলে পালনের ভার ঘাড়ে এসে পড়ে। বন্ধু ঐ রকম অভিযুক্ত; পরে দেশ থেকে স্ত্রীকে এনে সংসার পাতে। কিন্তু বেশী দিন তাঁর এ সুখভোগ করতে হয় নি। সে বিষণকে তাদের ভার দিয়ে গিয়েছিল। সবাই বলে, বিষণ স্ব-আরোপিত কর্ত্তব্যচ্যুত হয় নি। মৃত বন্ধুর স্মৃতির সম্ভ্রম রক্ষা করে আন্দামানের মাটিতে মিশিয়ে গেছে। এই বিষণ সিং, জগদেও আহির, মহম্মদ আলি, রমণ পাণ্টলু, মহব্বৎ খাঁ প্রভৃতির সন্তানসন্ততিরা একটা বড় এবং প্রতিপত্তিশালী দল। মজুরি, চাকরি, দোকান-পসার, ব্যবসা প্রভৃতি নিয়ে এরা আছে। দু'জনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় হ'ল। পরিষ্কার নিভুল ইংরেজীতে বক্তৃতা দেওয়ার ক্ষমতা আছে। এই শিক্ষালাভের জন্য তারা মূল ভূখণ্ডে এসেছিল।

এদের সঙ্গে আছে নাটাল, মরিসস ফেরত চুক্তিবদ্ধ কুলির দল। ভারতে ফিরে এসে তারা স্থান পায় নি। এ শ্রেণীর মধ্যে নানা রাজ্যের লোকই আছে। ধর্ম্ম, ভাষা, সামাজিক ব্যবহার প্রভৃতি এদের মেলামেশায় খুব বড় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে নি। ধর্ম্ম তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার, এ নিয়ে মাথা ফাটাফাটি হয় না।

তার পরেই আসছে যাঁরা নতুন ঘর পত্তন করছেন। এঁদের অধিকাংশই পূর্ব্ববঙ্গের বাস্তুহারা—বাঙ্গালী। এরা আসায় বাঙ্গালীরা ওজনে অর্থাৎ সংখ্যায় ভারি হয়ে উঠেছে। সুভাষ দ্বীপের সংস্কৃতিতে একটা ছাপ পড়েছে। নূতন পত্তন-করা গ্রামের নাম থেকে এটা বেশ বোঝা যায়।

এবারডীন, সাউথ পয়েণ্ট, হ্যাডো, মঙ্গলুটান, ওয়ান্দুর, গারাচেরামা, ওগরাব্রাজ, রাইটমায়ো প্রভৃতির পাশে গজিয়ে উঠছে শ্যামকুণ্ড, লক্ষ্মণপুর, উর্ম্মিলাপুর, রামকৃষ্ণ-গ্রাম, সুভাষ গ্রাম, বিদ্যাসাগর পল্লী, ক্ষুদিরামপুর, রবীন্দ্র পল্লী, দুর্গাপুর, উত্তরা, শান্তনু, পঞ্চবটি, প্রভৃতি।

ঔপনিবেশিকবাসের মধ্যে ব্রহ্মদেশীয় লোক বিশেষতঃ কারেণ আছে। আরও আছে মালয়ী, ভারতের মাদ্রাজী ত্রিবাঙ্কুর কোচিনে মারাঠী প্রভৃতি।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও সরকারী কাজকর্ম্মসূত্রে যাঁরা বাস করেন, সংখ্যার তুলনায় তাঁদের প্রভাবপ্রতিপত্তি একটু বেশী। এটা হওয়া স্বাভাবিক কারণ, শিক্ষা-দীক্ষা, অর্থ-সঙ্গতি, জীবনধারণের ধারা সব মিলিয়ে তাঁরা অপেক্ষাকৃত "উচ্চস্তরের" এবং সরকারী দয়াদাক্ষিণ্য বিতরণকার্য্যে তাঁদের হাতই বেশী।

সুভাষ দ্বীপের বনসম্পদ প্রচুর—শত বৎসরাধিক কালের পুরাতন বনস্পতি আজও আকাশ চুম্বনের জন্যে মাথা উপরে তুলেই চলেছে। আশেপাশে আছে জ্ঞাতি-গোষ্ঠী নানা বয়সের নানা মাপের। সুন্দর অর্কিড জঙ্গলের শোভা করে রেখেছে। বড় বড় গাছের ডাল থেকে দীর্ঘ লতা ঝুলছে, চেয়ে দেখি তার মধ্যে পানগাছও আছে! শুনলাম পাতাগুলো একটু মোটা। বেত রয়েছে প্রচুর। মোট ৩,২১৫ বর্গমাইল আয়তনের মধ্যে প্রায় ২,৫০০ বর্গমাইল এখনও ঘন জঙ্গল দিয়ে ঢাকা। গর্জ্জন, বাদাম, পাদাউক, শ্বেত ধূপ, পাপিতা, শ্বেত চুগলাম, কোকো, চুই প্রভৃতি নানা জঙ্গলী কাঠের অফুরন্ত সমাবেশ। বনই আন্দামানের মূল আয়। ১৯৬০-৬১ সনে ১·৫৯ কোটি টাকা আয়ের মধ্যে বনবিভাগ ১·১৬ কোটি টাকা যোগাবে বলে হিসাব ধরা আছে। মোট আয়-ব্যয়ের হিসাবে (১৯৬০-৬১) ১·৩৮ কোটি টাকা ঘাটতি হবার কথা; কেন্দ্র থেকে এনে সে অভাব দূর হবে।

সারি সারি নারকেলগাছ আন্দামান, বিশেষতঃ নিকোবরের পরম সৌন্দর্য্যসম্পদ। শুষ্ক নারকেল শাঁস, ছোবড়া কিছু কিছু বাইরে রপ্তানি হয়। তা ছাড়া রবার, কফি, চা, আনারস, জন্মাবার পরিচয় রয়েছে: রস্ দ্বীপে এবং অন্যান্য স্থানে চা গাছের ঝোপ ছড়িয়ে আছে।

ফলপাকড়ের মধ্যে কলা ও পেঁপে, পেয়ারা প্রচুর। লাউ, কুমড়া, বেগুন, বরবটি, শশা, বীট, মুলো প্রভৃতি বেশ জন্মায়; লোকের অভাব এতেই মিটে যায়। সরবতী লেবু গাছের সংখ্যা অনেক। আমগাছ থাকায় এবং যথা সময়ে ফলের পরিমাণ বেশী হওয়ায়, লোকের এক পরম উপাদেয় সুস্বাদু ফলের জন্য দুঃখ নাই। কাঁঠাল দেখি নি।

যা হতে পারে, এবং কম-বেশী পাওয়া যায় তা হচ্ছে: পাট, কাজু বাদাম, সয়াবীন, রাঙ্গাআলু, ট্যাপিওকা প্রভৃতি। তেঁতুল আর সুপারি যত্রতত্র দেখা যায়। সুপারির ফলন নারকেলের তুলনায় অনেক কম। সাধারণ বাঙ্গালী দু'জনে একটা ডাবের জল পান করলে পরিতৃপ্তি লাভ করে।

নিকোবর দ্বীপে নারকেল প্রধান। তা ছাড়া আন্দামানের ফল-পাকড় ত হয়ই। ইক্ষু, রেড়ী, লঙ্কা, এলাচ এবং তুলা উৎপাদন চেষ্টা বিফল হয় নি। সুতরাং এ সকলের ভবিষ্যৎ বেশ আশাপ্রদ।

ধান চাষ হচ্ছে এবং আরও হবে। ১৯৫৯-৬০ সনে ধানের ক্ষেতগুলি ১৪,৬৯২ একর; এর মধ্যে ৭৭৫ একর জমিতে জাপানী প্রথায় ধান চাষ হচ্ছে।

জন্তুর পরিচয় বলতে বন্য শূকর, প্রচুর "ধাড়ী" ইঁদুর, বাদুড় প্রভৃতি উনিশ রকম স্তন্যপায়ী আছে। হরিণ ছিল না, আমদানি করতে হয়েছিল, পরে তাদের এত বংশবৃদ্ধি হয়েছে যে, এখন কেউ শিকার করলে পুরস্কার পাবার কথা। এদের সংখ্যা আয়ত্তে রাখবার জন্যে দুটো স্ত্রী-চিতাবাঘ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। পুরুষ-বাঘ থাকলে তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি পেয়ে নূতন সমস্যার আশঙ্কায় কেবল ব্যাঘ্রী দেওয়া হয় পরীক্ষামূলকভাবে। স্থানীয় লোকে ঠাট্টা করে বলে, সম্ভবতঃ খুব বেশী খেতে পেয়ে বাঘদুটো গরহজমে মারা পড়েছে, আর না হয় হরিণে গুঁতিয়ে তাদের শেষ করেছে; কারণ বাঘিনীদের অস্তিত্বের কোনোও পরিচয় আর পাওয়া যায় না।

পাখী খুব বেশী রকম নেই। টিয়ার ঝাঁক যত্রতত্র আকাশপথের শোভাবৃদ্ধি করছে। শালিখ প্রায়ই দেখা যায়; কোকিলের ডাক শুনেছি বলে মনে পড়ছে। ছাতারে, বুলবুলি, ঈগল প্রভৃতি কয়েকটি পাখী দেখা যায়। মুরগী ও হাঁস পালিত হয়, কারণ খাবার সম্বন্ধে এরা নিতান্ত বেপরোয়া এবং শিয়াল, ভাম, খটাশ প্রভৃতির উপদ্রব না থাকায় এদের পালনের বিশেষ অসুবিধা হয় না। "মিঠেন" জল না থাকায় হাঁস পালন তত সহজ নয়। পাহাড়ের গা দিয়ে জল গড়িয়ে নীচে চলে যায় বলে নালি-নর্দ্দমা নেই যে ব্রহ্মার বাহন মহা আনন্দে তাতে বিচরণ করবে আর আহার সংগ্রহ করবে।

বলতে ভুলছি, স্তন্যপায়ীদের মধ্যে এখন গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি পালিত পশু হিসাবে গিয়ে পড়েছে এবং সবল সুস্থভাবেই আছে; (১৯৫৬) এদের সংখ্যা ২৯,০০০ মাত্র।

হাতী দেখা যায়; সম্পূর্ণ আমদানি করা। গভীর বনের মধ্যে থেকে বড় বড় গুঁড়ি টেনে সদর রাস্তায় আনবার জন্য হাতীর সাহায্য বিনা চলে না। বড় উঁচু-নীচু, গভীর বন, তার মধ্যে লরী ক্রেণ নিয়ে যাবার উপায় নেই। এইখানে হাতী কত বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে

মানুষের কাজ করছে, তাই দেখবার উদ্দেশ্যে ভ্রমণকারীর দল ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে।

তীরে তীরে মাছের ছড়াছড়ি বললে অত্যুক্তি হয় না। নানা জাতের মাছ, বাংলার ভেট্‌কী, পারশে, কই প্রভৃতির মতো দেখতে ; সুস্বাদু মাছ। গত বছর একটা "কই" ছিপে করে ধরা হয়েছিল, মাত্র ২০।২২ সের ; ঘণ্টা দুই-আড়াই লড়াই করবার পর তবে মাছটাকে কাবু করতে পারা গিয়েছিল। আদিবাসীরা বর্শা-তীর সাহায্যে মাছ শিকার করে ; সে এক অদ্ভুত লক্ষ্যভেদ শক্তি। বাঙ্গালীদের মাছের অসুবিধা হয় না। দ্বীপগুলির তীর-ভূমি প্রায় ১,২০০ মাইল। সেই হিসাবে (অঙ্ক বুঝি না, "যৎ দৃষ্টং") মাছের "ক্ষেত" ১৮,০০০ বর্গমাইল ধরা হয়। ১৯৫৯ সনে ১০৫ টন মাছ ধরা পড়ে ; মূল্য ১,৩৬,০০০ টাকা।

নানা জাতীয় সাপ আছে ঢের, কিন্তু তাদের উপদ্রব খুবই কম। জঙ্গলের আকার দেখলে মনে হয় "পাহাড়ে" ময়াল সাপ বুঝি কিলবিল করে বেড়াচ্ছে ; কিন্তু সে সব মোটেই নয়নগোচর হয় না।

সমুদ্র থেকে শামুক উঠে ডাঙ্গার চাষ নষ্ট করে ভীষণ। তাই যারা শামুক মেরে সংখ্যার হার ভর্ত্তি করে, তারা মিউনিসিপ্যালিটি হতে পুরস্কার পেয়ে থাকে। শামুক-পোড়া চূণ হওয়ার সম্ভাবনা খুব, কিন্তু হয় কি না জানতে পারি নি।

এতদঞ্চলে এক জাতের পাখী আছে, যাদের বাসা চীনা প্রভৃতি এশিয়ার পূর্ব্বাঞ্চলের লোকের পরম উপাদেয় খাদ্য। বেশ দরে বিকোয়। তা ছাড়া পক্ষী-বিষ্ঠা এবং তাদের মরা হাড়-গোড়, পালক প্রভৃতি মিলে যে সার (guano) হয় তা ভারতের মধ্যে আন্দামানেই আছে। এইখানে আবার আন্দামানের বিশেষত্ব দেখা যায়। এই সার লাভ করবার জন্য এক শ্রেণীর কারবারী ওখানে যাতায়াত করে।

আন্দামান-নিকোবর আগ্নেয় পর্ব্বতের নির্ব্বাপিত নিদর্শন বলে ওখানে একটা ধারণা আছে যে, শিল্প-বাণিজ্যের উপযুক্ত খনিজ পাওয়া যেতে পারে। স্থানীয় অনুসন্ধিৎসু অধিবাসীদের মধ্যে দু'একটি খনিজ সংগ্রহ করে রেখেছেন দেখতে পাওয়া গেল। ভূতত্ত্ববিভাগ ধীর বা জোর অনুসন্ধান চালাচ্ছে, শেষ পর্য্যন্ত "বকাণ্ড প্রত্যাশা" হবে কি না কেউ জোর করে বলতে পারে না।

আন্দামানের সঙ্গে সারা ভারতের এক বিশিষ্ট সম্পর্ক রয়ে গেছে। তার আভাস পূর্ব্বেই দিয়েছি। স্বাধীনতা যুদ্ধের দুর্দ্ধর্ষ দলপতি আর সৈনিকদের আশ্রয়স্থল হয়ে কত আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যথা-বেদনা, নির্য্যাতন-নিপীড়ন-দীর্ঘশ্বাস মিশিয়ে দ্বীপটিকে ঘিরে ছিল তার ইয়ত্তা নেই। কত মাতা ভগ্নী পত্নী কন্যার আকুল চিন্তা, চোখে একবার দেখবার উদগ্র বাসনা, একটা সংবাদ পাবার জন্য বুক-ফাটা উৎকণ্ঠা, বন্দীর অমঙ্গল আশঙ্কায় অশান্ত মন, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ঝড়ের তাণ্ডবে সমুদ্র অপেক্ষা বিক্ষুব্ধ হিয়া উদ্বেলিত হয়ে থাকত, তৃণ অপেক্ষা সংখ্যাতিরিক্ত কত যে চিন্তা দ্বীপটিকে ঘিরে থাকত, তার হিসাব করা ত সম্ভব নয়। অনাগত অমঙ্গল-আশঙ্কা-মথিত নিঃশ্বাস সুদূর দ্বীপের বাতাস ভারি করে রাখত। প্রাচীর-ঘেরা ক্ষুদ্র কক্ষের সুদৃঢ় লোহার গরাদ দেওয়া দরজার পিছনে বৎসরের পর বৎসর আপনার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের চিন্তা ছেড়ে, ভয়লেশহীন সন্তানদল ভারতের মুক্তির কথা ভেবে নিজেদের সকল যন্ত্রণা ভুলে কালযাপন করেছে। কবে মুক্তিলাভ করে (আর তা সম্ভব কি না), আবার জীবনমরণ যুদ্ধে লিপ্ত হবে, মায়ের শৃঙ্খল মোচন করা সম্ভব হবে, তারই কথা প্রতি নিশ্বাস-প্রশ্বাসে ধ্বনিত হ'ত ; কুখ্যাত সেলুলার জেলের আকাশ-বাতাস ছেয়ে রাখত।

নির্ভীক বীরের দল আন্দামানে জীবন নিয়ে ছেলেখেলা খেলেছে। জেলের দরজায় পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে বিরাট পরীক্ষা সুরু হয়ে যেত। শৃঙ্খলাবদ্ধ হস্তপদ, ঝম্ ঝম্ শব্দে মুখরিত করে বন্দুক-বেয়নেটধারী প্রহরী বেষ্টিত হয়ে এসে হাজির হওয়া মাত্র দুই বিরাট বিপরীত শক্তির সংঘাত বেধে উঠত। কর্ত্তৃপক্ষ ব্যারি-মরের (Barry ও Murray) দল চাইছে এই বন্দীদের সকল মানসিক তেজ ও শারীরিক বল ভেঙ্গে চুরমার করে কাদার তাল বানিয়ে শৃঙ্খলা, ডিসিপ্লিন শেখাবে ; আর এক শক্তি তাকে সম্পূর্ণ প্রতিরোধ করতে বদ্ধপরিকর। তখন দুই পক্ষের মনের জগতে—

"বর্ম্মে বর্ম্মে কোলাকুলি হয়,
খড়্গে খড়্গে ভীম পরিচয়,
ভ্রুকুটীর সনে গর্জ্জন মিশে, রক্ত রক্ত সনে।"

বেত্রাঘাত, লগুড়াঘাত জর্জ্জরিত দেহ থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে, আর ডাণ্ডা-বেড়ি পরিহিত হাত-পা দিয়ে প্রহরী বা "সুপার", ডেপুটি-সুপারকে আঘাত করে নাক-মুখ থেকে রক্তমোক্ষণ করে ছাড়ছে। প্রতিটি অন্যায় আদেশ, অপমানকর ব্যবস্থার রক্তাক্ত প্রতিবাদ চলেছে। "সেথা গিয়াছেন তিনি সমরে আনিতে জয়গৌরব জিনি। সেথা গিয়াছেন তিনি মহা আহ্বানে, মানের চরণে প্রাণ বলি-দানে, মথিতে অমর-মরণ-সিন্ধু, সেথা গিয়াছেন তিনি।"

শত শত মাইল দূর-দুরান্তের আত্মীয়-আত্মীয়া ভাবছেন "গিয়াছেন তিনি সে মহা আহবে জুড়াইতে সব জ্বালা ; হয় ত ফিরিবে জিনিয়া সমর, হয় ত মরিয়া হইবে অমর" আর সেই মহিমামণ্ডিত হয়ে ভারতের প্রত্যেকটি মানুষ গর্ব্বে ফেটে পড়বে।

সত্যিই সেই মরণবিজয়ী বীরের দল এই খেলা দেখিয়ে গেছে। এসেছে তারা মহারাষ্ট্র, পঞ্জাব, বাংলা দেশ থেকে দলে দলে। এক মন্ত্রে দীক্ষিত তারা ; উন্নত তাদের শির। জেলের অনাহার, অর্দ্ধাশন, নির্জ্জন কারাবাস, মাসের পর মাস, হাত-পায়ে জড়ানো ডাণ্ডা-বেড়ি দেয়ালের গায়ে নিবদ্ধ হয়ে আছে, শোবার বসবার উপায় নেই, কল্পনাতীত বাধ্যতামূলক শ্রম তারা সহ্য করেছে। দেহ শীর্ণ-ক্ষীণ হয়েছে, মন তাদের ভাঙ্গে নি।

এই অনির্দ্দেশ যাত্রার পথে কত ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব পথে পথে প্রাণ দিয়েছে ; আজ তাদের কথা স্মরণ করলে গৌরবে প্রাণ ভরে ওঠে। তার আগে একবার নাম করি পৃথ্বী সিংকে, যিনি কয়েদ বাসকালে মোট ১৫৫ দিন অনশন করেছেন এবং সবটা যোগ দিলে দেখা যাবে কুড়ি মাস নির্জ্জন কক্ষে কাটিয়েছেন। জোয়ালা সিংকে প্রায় সমস্ত সময়টা স্বতন্ত্র লোহার খাঁচায় আবদ্ধ রাখতে হয়েছে। নিত্য জেল আইন ভঙ্গের অপরাধী গুরুমুখ সিং প্রতিনিয়ত অত্যাচারেও এক বিন্দু টলে নি।

অত্যাচারের হাত এড়াবার জন্যে প্রাণ দিলেন আলিপুর বোমার মামলার ইন্দুভূষণ রায়। (ঠিক বলা কঠিন, তবে এটা ১৯১২-১৩ সনে হওয়া সম্ভব)।

মৃত্যু-ভয়কে টিট্‌কারি দিয়ে এলেন পঞ্জাবের সন্তানগণ (১৯১৫) ১০ই ডিসেম্বর মহারাজা জাহাজে আন্দামানে। ডাণ্ডা-বেড়ি পরিহিত সিংহযূথ পাশাপাশি দুইজন হিসাবে সারিবদ্ধ হয়ে দীর্ঘ লাইন দিয়ে জেলের ফটক পার হলেন। উপরের এক ফালি আকাশ ছাড়া বাইরের পৃথিবী তাঁদের কাছে অবলুপ্ত হয়ে গেল। অকথ্য পরিশ্রম, অসহনীয় অত্যাচার তরঙ্গের ওপর তরঙ্গের মত এসে তাঁদের ওপর আছাড় খেয়ে পড়তে লাগল। বীর বিক্রমে তাঁরা সেই অত্যাচারের সঙ্গে লড়াই করতে লাগলেন। শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে প্রাণ দিলেন ১৯১৫ থেকে ১৯২১ সনের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ী বাবা ভান সিং, বুধা সিং, রামরক্ষা, রুলিয়া সিং, নন্দ সিং, কেহর (বা কেশর) সিং, নাথা সিং ও রোড়া সিং।

১৯৩২ সনে ফিরে আসার কালে ডাণ্ডার আঘাতে প্রাণ দিলেন বীর রতন সিং।

সমুদ্র তরঙ্গের ওপর দিয়ে ভেসে এল সেই অপূর্ব্ব জীবনদানের কাহিনী ; সরকারী কাগজপত্রের নিরন্ধ্র খাসা রিপোর্টের ওপরও একটা অপ্রকাশ্য মর্ম্মন্তুদ নিপীড়নের আভাস ফুটে উঠতে লাগল। সভ্যজগতে আন্দামান জেলকর্ত্তৃপক্ষের কুকীর্ত্তি কলঙ্ক রেখাপাত করতে লাগল। তাই ১৯২১, জুলাই মাস থেকে ফিরতি যাত্রা সুরু হ'ল। ১৯২৩ সনে আন্দামানে রাজনৈতিক বন্দী পাঠান প্রায় বন্ধ হয়ে গেল।

স্তিমিত হলেও আলো সম্পূর্ণ নিভে যায় নি। ১৯৩০ সনে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠন ও অপরাপর রাজনৈতিক উপদ্রব দমন করবার জন্যে ১৯৩২ সনের গোড়াতেই আবার সেলুলার জেলের রাজনৈতিক বিপ্লবীর জন্য দরজা খোলা হ'ল। তখন পুরাতন আচরণের পুনরাবৃত্তি সুরু হয়ে গেল। সুরু হয়ে গেল, সেই পুরাতন পদ্ধতিতে প্রতিবাদ প্রতিরোধ। ১৯৩৩ সনে রাজবন্দীরা অনশন সুরু করলেন। তাঁদের মানুষের মত বাঁচার দাবী জানিয়েছিলেন। যথারীতি প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় এই আত্মনির্য্যাতন। নল সাহায্যে জবরদস্তি অন্ননালীর পথে দুধ প্রেরণের চেষ্টায় উৎকট পীড়িত হলেন তিনজন। প্রথমে মহাবীর সিং জীবনোৎসর্গ করলেন ১৯৩৩ সনের ১৭ই মে ; মোহনকুমার নমদাশ ২৬শে মে ; আর মোহিত মৈত্র ২৮শে মে।

মৃত্যুবরণ করে এঁরা বেঁচে গিয়েছেন। জীবন্মৃত হয়ে বৎসরের পর বৎসর যাঁরা কাটিয়েছেন, তাঁদের যন্ত্রণা আরও শত-সহস্র গুণ বেশী। এ কাহিনী মহাকাব্যের বিষয়ীভূত বস্তু। দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে, অস্থি চূর্ণ হয়ে আন্দামানের মাটি উর্ব্বর করেছে। তাদের মন দমে নি, এ বীরত্ব তেজের কাহিনীর তুলনা মেলা ভার।

যেখানে জীবন-মরণের এই খেলা চলেছিল তার একটু পরিচয় দেওয়া যাক। কেন্দ্রে বৃত্তাকার watch tower-চৌকীঘর ; আর তার থেকে (radius) ব্যাসার্দ্ধ রূপে বেরিয়েছে লম্বা সাতটা তেতলা বাড়ী। সমস্ত জেল বৃত্তাকারে তৈরী তার মধ্যে তিনটেতে প্রতি তলায় ৫০ কুঠুরী, সম্ভবতঃ ৮ ফুট লম্বা-চওড়া চৌকোঘর ; তারই তিনতলা মোট ৪৫০টি। আর, চারটিতে প্রতি তলায় ৩৫টি সমমাপের ঘর অর্থাৎ প্রতি ব্লকে ১০৫টি। একুনে ৮৭০ ; এত বড় পরিমাপের কয়েদখানা খুব কমই দেখা যায়। কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে চৌকী দিলে যে কোনোও উইং (wing) থেকে লোক পালাবার চেষ্টা করলে দেখতে পাওয়া যায়—এ ব্যবস্থা করা আছে।

প্রতিটি ব্লক অপরটি থেকে জেল-পাঁচিল (বিবরণ নিষ্প্রয়োজন) থেকে পৃথক করা আছে। প্রত্যেকটির

মধ্যেই "কারখানা" অর্থাৎ কয়েদী খাটাবার জন্তে ঘানি, নারিকেল ছোবড়া পেটা ও ছাড়ানোর ব্যবস্থা, বেতের কাজ, নামমাত্র বয়নের ব্যবস্থা, পাটই বোনা হ'ত বেশী, কামারের কাজ, ইত্যাদি। ঘানির দণ্ড লোহার তৈরী, অতি সবল লোক না হলে তাকে ঘোরানো অসম্ভব। অতীতের নিদর্শন হলেও সেটি এখনও বর্ত্তমান। পাশেই whipping rack, অর্থাৎ হাত-পা বদ্ধ, "জম্পেস্" করে আটকে দিয়ে অনাবৃত পাছা ও পিঠের ওপর বেত্রাঘাত করা হ'ত। সেটিও আছে, স্পর্শ করবার লোভ সম্বরণ করতে পারি নি। কথা বলার শক্তি নেই, মূক-ভাষায় কত কথাই সে বলতে লাগল। কতজনে এই অমানুষিক সাজা নীরবে সহ্য করেছে, চক্ষের জল পড়ে নি, যন্ত্রণার শব্দ ফুটে বেরোয় নি; ক্ষমা প্রার্থনা করে নি, বেত্রধারী তাতে আরও চটেছে, অবিশ্রান্ত বেত মেরেই চলেছে। রক্তের ধারা বয়েছে, মাটি ভিজে গেছে, আর তারা বলেছে "বেত মেরে কি মা ভুলাবি. আমরা কি মার সেই ছেলে?" সব হয়েছে, কিন্তু পারে নি তাদের মনকে দমাতে।

ফাঁসির ঘর একটা আছে, সেখানে রাজনৈতিক কোনোও বন্দীর ফাঁসির খবর পেলাম না। তিনজনকে সারি দিয়ে ফাঁসি দেওয়া যেত। ওখানে সেসন কোর্ট আছে, গুরু অপরাধের বিশেষতঃ জেল বিদ্রোহে ফাঁসি দেওয়া হ'ত। মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞার আপীল বাতিল করার জন্য হাইকোর্টের জজ একজন যাওয়ার রীতি সম্ভবতঃ ছিল।

দেশবিশ্রুত সেলুলার জেল আজ ভগ্নদশায় পড়েছে, একটা বড় আর ছুটা ছোট (wing) উইং যুদ্ধকালে ভেঙ্গে গিয়েছে। স্থানীয় লোকে বলেন, ১৯৪৫ সনে (অক্টোবর নাগাদ) যখন ইংরেজ জাপানীদের তাড়িয়ে আন্দামানের দখল নিতে আসে, তখন তাদের কামানের গোলায় ওগুলো ভেঙ্গেছে। জাপানীরা এসেছিল ১৯৪২ এবং সেখানে ছিল ১৯৪৫ পর্য্যন্ত। জেলের ইট-পাট্‌কেল নিয়ে খোয়ার কাজ চলছে; যে দিকটা ভেঙ্গেছে সমুদ্রের তীর সেদিকটা। সেখানে প্রকাণ্ড হাসপাতাল হচ্ছে। যখন শোনা যায় ১৮৫৭ সনেই জেল তৈরী শেষ হয়েছে, কারণ ১৮৫৮ সন থেকেই ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের যোদ্ধাদের দলে দলে ওখানে বদ্ধ রাখা হয়েছিল, তখন সহজেই বুঝতে হয় লোহালক্কড় দরজা প্রভৃতি মূল ভূখণ্ড থেকেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে, আর ঐ অজস্র ইঁট ওখানেই কাঠের পাঁজায় পোড়ানো হয়ে থাকবে।

শতবর্ষাধিককালের পুরাতন ইমারত বে-মেরামতে থাকলে আপনিই ভেঙ্গে পড়বে। সরকারী রদ্দি উদ্বৃত্ত মালের গুদাম হিসাবে কয়েকটি কুঠুরী ব্যবহৃত হচ্ছে, আর আছে বাস্তুহারা যাঁরা সুভাষ দ্বীপে গিয়ে মাটির সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে নি, তাদের সামান্য কয়টি পরিবার।

সেলুলার জেলে সেদিন এমন লোকও আমাদের দলে ছিল যার সরকারী খরচে ওখানে যাওয়া-থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই ছিল; কপালের ফেরে নিজেদের খরচে যেতে হয়েছে। তাতে সুখ এই, দেশ-সেবার "কৌলিন্য" গর্ব্ব মেলে নি বটে, কিন্তু ইচ্ছামত খাওয়া-থাকা-ঘুরে বেড়ানো, চলে আসা সম্ভব হয়েছে। জেল ঘুরে দেখলে সত্যিই বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে থাকতে হয়।

আর কারও সম্বন্ধে সন্দেহ থাকতে পারে, কিন্তু সুভাষ-চন্দ্র সম্বন্ধে তার কোনোও অবকাশ নেই। তবে ইংরেজের সহিত যুদ্ধে রত শত্রু হিসাবে ১৯৪৩ সনের ২৯শে ডিসেম্বর সুভাষচন্দ্র আন্দামান পৌঁছে তে-রঙ্গা ঝাণ্ডা উঠিয়েছিল। ভারতের বক্ষে প্রথম সেই স্বাধীনতার পতাকা প্রোথিত হয়েছিল। যোগ্য হাতেই পতাকা সম্মানলাভ করেছে, ভারতমাতা যে বক্ষে নির্য্যাতিত সন্তানদের ধারণ করে-ছিলেন, সেইখানেই স্বাধীন পতাকার দণ্ড ধারণ করে হর্ষে উৎফুল্ল হয়েছিলেন। সে স্পন্দন অন্তর দিয়ে অনুভব করতে হয়। এ কাজ পারে সেই যে শৃঙ্খলিতা মায়ের মুখপানে চেয়ে নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করেছে, স্বাধীনতার যুদ্ধে গোপনে প্রকাশ্যে সহায়তা করেছে, পরাধীনতার গ্লানি যাকে ক্লেশ দিয়েছে, যে সকল বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে আপনাকে মায়ের চরণে উৎসর্গ করে দিয়েছে।

সুভাষচন্দ্র সেলুলার জেলে গিয়ে তন্ন তন্ন করে সব দেখেছেন। স্থানে স্থানে বিশেষতঃ রস্ (Ross) দ্বীপে, যেখানে প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা বাদশাহী আমলের বিলাসের মধ্যে বাস করতেন, সেখানেও বক্তৃতা দিয়েছেন, লোকের মনে আশ্বাস দান করেছেন। আর করেছেন জাপানীদের অত্যাচারের হাত হতে রক্ষা। সুভাষ ওখানে পৌঁছুবার আগে পর্য্যন্ত গুপ্তচর সন্দেহে জাপানীরা জনসাধারণের ওপর নিদারুণ কঠোর হয়ে উঠেছিল। সুভাষ তাদের রক্ষা করেছেন; তাই আজ তারা সুভাষ দ্বীপ বলতে আনন্দ পাচ্ছে।

সুভাষ দ্বীপ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে অনেক উন্নতির আশা পোষণ করা যায়; তবে বর্ত্তমানে একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লাভের যে সুযোগ সোদর প্রতিম শ্রীসুরেন নিয়োগী ও শ্রীসন্তোষ রায় বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের এক অধিবেশনের উপলক্ষ্যে

করে দিয়েছিলেন তার জন্যে সাহিত্যিক, আধা-সাহিত্যিক, সাহিত্যানুরাগী, আর যাঁরা দলের মধ্যে প্রবেশ করে আন্দামান দেখার নামে সাহিত্যিক হয়েছিলেন, সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র। যাঁরা সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, সেই অতুল স্মৃতি সমিতি এবং "রাজার হালে" থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন যাঁরা, শ্রীমিহিরকুমার সাণ্ডেল ও তদীয় পত্নী শ্রীমতী স্মৃতিকণা, ষ্টেট ব্যাঙ্কের এজেণ্ট শ্রীনৃসিংহ গুপ্ত ও তাঁর পত্নী চিন্ময়ী ও আমার পুত্রপ্রতিম স্নেহাস্পদ শ্রীদেবব্রত ঘোষকে কৃতজ্ঞতা জানালেই তাঁদের ঋণ শোধ হয় না। রায়বাহাদুর সত্যেন মুখার্জ্জি আমাদের যাওয়ার ব্যাপারে বহু উৎসাহ দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে পত্রে অতুল স্মৃতি সমিতির আলাপ চললেও শ্রীমুখার্জ্জি কলিকাতার সুরেনবাবু ও 'সম্মিলনে'র সুযোগ্য সভাপতি ঋষিকল্প ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্তের সহিত সাক্ষাতে যাবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং তাতেই ইচ্ছাটা তাড়াতাড়ি রূপ গ্রহণ করে।

যাঁরা আন্দামান গিয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই জ্ঞান ও উপহাররূপে প্রদত্ত ও স্বলব্ধ বহু নিদর্শন সংগ্রহ করে এসেছেন, আর এনেছেন অভিজ্ঞতালব্ধ প্রচুর জ্ঞান আর পেয়েছেন অফুরন্ত আনন্দ। বর্ত্তমান আন্দামানের কথা একটু উল্লেখ করা প্রয়োজন। স্থানীয় সংখ্যাতত্ত্ব বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তা শ্রীমান্ দেবব্রত ঘোষ প্রদত্ত সংবাদাদি আমার প্রধান সহায়। সুভাষ দ্বীপে খুব জবর বিচার বিভাগ আছে, সেসন্স জজ, অতিরিক্ত আরও একজন এবং চারজন সাব্-জজ রয়েছেন। লোকসংখ্যা ৫০,০০০-ও নয়, তারই জন্যে এই বিচারব্যবস্থা। প্রতি বর্গমাইলে মাত্র ১৫·৬ লোকের বাস। পানীয় জলের সুব্যবস্থা হলে এখনও বহু লোক সেখানে বসবাস করতে পারবে। মোট বাসা বা বাড়ীর সংখ্যা ৫,৩০০। সকলের অন্ন উৎপাদন করা সম্ভব হয় নি, যদিও ১৪,৬৯২ একর (১৯৫৯-৬০) জমিতে ধান চাষ হয়েছিল, একরপ্রতি গড়ে ফলন ১৪·৩ মণ। খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়েছে (১৯৫৯) ২,৩২৫ টন। বিদ্যালয় সংখ্যা (১৯৫৯-৬০) ১৭৯; ছাত্রসংখ্যা ৪,১৭৯; তার মধ্যে ছাত্র ২,৬৪৪, ছাত্রী ১,৫৩৫। শিক্ষক ১৬৫ জন। শিক্ষার জন্য ব্যয় হয় ৫·২২ লক্ষ টাকা।

স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিশেষ ব্যবস্থা আছে। বিভিন্ন হাসপাতালে একসঙ্গে ৪১৮ জন রোগী রাখা যায়। তাছা ছাড়া ২৯টি ডাক্তারখানা নানাস্থানে ছড়িয়ে আছে। পোষ্টঅফিস সংখ্যা ১৫; ষ্টেট ব্যাঙ্কের এক শাখা পোর্ট ব্লেয়ারে কাজ করছে। সরকারী নিযুক্ত লোক (১৯৬০) ১২,২৪২ সুতরাং মোট আনুমানিক ৫০,০০০ জনসংখ্যার মধ্যে একক হিসাবে একটা বড় দল।

বাস্তুহারা আশ্রয় লাভ করতে গিয়েছেন ১৯৫৩ থেকে ১৯৬০ (জুন) পর্য্যন্ত ২,১৬৪ পরিবার পূর্ব্ববঙ্গের ও ৩৭৯ অপর অঞ্চলের, এতে মোট লোক বেড়েছে ১০,১৭৪ জন।

শিক্ষা সংস্কৃতিসম্পন্ন লোক সেখানে অলস বসে নেই। সাণ্ডেল দম্পতি পরিচালিত অতুল স্মৃতি সমিতির লাইব্রেরী ও কৃষ্টিকেন্দ্র আর শ্রীসত্যেন মুখার্জি মহাশয়ের সুভাষ দ্বীপ হল রুচিসম্পন্ন, সাহিত্যসেবী, সমাজসেবকদের মিলনক্ষেত্র হয়ে আছে। দক্ষিণ-আন্দামানেই দু'টি দুর্গাপূজা হয়—তাতে একটি অভিজাত সম্প্রদায় ও অপরটি "জনতা"র প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে বলে মনে হ'ল। দূরত্ব এবং দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য এ দুইটি কারণও উদ্যোক্তাদের এ কার্য্যে উদ্বুদ্ধ করে থাকবে। মাঝে মাঝে যে নৃত্য, অভিনয়, সভা প্রভৃতি হয় তা অতুল স্মৃতি ও সুভাষ দ্বীপ হলের রঙ্গমঞ্চ দেখলেই বেশ বোঝা যায়। আমরা দুই দিন (১৯ ও ২১ নভেম্বর) তার পরিচয় পেয়েছি। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষে যাঁরা সমুদ্র পারের আসল আর মেকি সাহিত্যিক ডেকে প্রচুর অর্থ, সময় ও শ্রম ব্যয় বা অপব্যয় করেছেন, তাঁদের মনের উদারতা ও রুচি বুঝতে কষ্ট হয় না। যাঁরা সেবা-পরিচর্য্যার দ্বারা অন্ততঃ ষাট জন বিভিন্ন রুচি ও (বরযাত্রী) মেজাজী লোকের তুষ্টি বিধানে সমর্থ হয়েছিলেন তাঁদের কর্ম্মকুশলতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনই করতেই হয়।

শিল্প যে কয়টি আছে তন্মধ্যে দিয়াশলাইয়ের কাঠি ও বাক্সের কাঠ তৈয়ারীর কারখানা; কাঠ চেরাই ও সাইজ করার মিলই বড়। নারিকেল তেল, নারিকেল দড়ি, চা বাক্সের কাঠ তৈয়ারীর কারখানা চালু হয়েছে। শ্রীসত্যেন মুখার্জ্জি কেবল যে ছোট-বড় শিল্প-উদ্যোগ চেষ্টা করছেন তা নয়, যাতে লোক সুভাষ দ্বীপে গিয়ে উপযুক্ত বাস ও আহার পান, তার জন্য হোটেল স্থাপনের সাধু চেষ্টা করছেন। সরকারী খবরাখবর দেবার জন্য এক ফালি 'সংবাদপত্র' নিত্য প্রকাশিত হয়। সরকারী কাগজপত্র তৈয়ারি করবার জন্য একটি ছাপাখানা আছে। জাহাজ মেরামতের কারখানা একটি দ্রষ্টব্য বস্তু।

খোলা জায়গা, বিশেষতঃ "মেরিণ ড্রাইভ" প্রভৃতির রাস্তা, প্রকাণ্ড খেলার মাঠ, গান্ধীজী ও নেতাজীর মূর্ত্তি,

১৮৫৭ সনের যোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে স্মৃতিস্তম্ভ, নানা দেবদেবীর মন্দির, মসজিদ, এ্যাবারডীন বাজার বা চৌক, মিউনিসিপ্যালিটি আর হল, প্রশস্ত রাস্তা, সরকারী বাস এবং ধনীর প্রয়োজনে ট্যাক্সি, বাড়ীতে ইলেক্ট্রিক, কলের জল ইত্যাদি, ইত্যাদি সুভাষ দ্বীপকে পৃথিবীর যে কোনোও সভ্য দেশ ও শহরকে ক্ষুদ্রাকারে প্রতিবিম্বিত করছে। তবে এই মনোমুগ্ধকর প্রকৃতির রূপসজ্জা খুব বেশী জায়গায় পাওয়া যায় না। সে বিষয়ে সুভাষ দ্বীপ অনেককে পরাস্ত করবে। আর আন্দামান সেলুলার জেলের ঘটনা ইতিবৃত্ত মহিমাজড়িত স্মৃতি, শত শত বৎসরের পর পদলাঞ্ছিত দেশের প্রথম স্বাধীনতার পতাকা বহন করবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করায় সুভাষ দ্বীপের প্রতিদ্বন্দী নেই। যাতায়াতের পথ সুগম হলে কেবল দর্শনার্থীর সংখ্যাই বহু গুণ বৃদ্ধি পাবে।

অভিনয় চিরন্তন

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

অফুরন্ত এক অভিনয় চলছে আগের মতই রে,—
তবু তাতে কি মাধুরী, বিচিত্রতা কতই রে।
সেই কাহিনী, সেই কোলাহল,—
শুধু পাত্র পাত্রী বদল,
তবু যে তার নবীনতা অবাক করে স্বতঃই রে।

২

বিয়োগান্ত এক নাটকই,—একই ভঙ্গী, একই ঢং,—
আকর্ষণের তীব্রতাতে সদাই আসর সরগরম।
সমাবেশ যে সব রসেরি
বিস্ময়েতে মুগ্ধ হেরি,
দৃশ্যপট ও রঙ্গমঞ্চ নট-নটীরা রঙ-বেরঙ।

৩

চলেছে ও চলছে লীলা—চলবে ধারা আনন্দে—
সেই পুরাণো অশ্রু হাসি সেই গীতি ও সে গন্ধে।
সেই মানুষই অনুরাগে,—
পিছন থেকে আসছে আগে,
তেমনি হরির পাঞ্জা আঁকা অভিনয়ের সনন্দে।

৪

আনে এবং নিয়েও যায়—গতায়তি বারম্বার,
পার্থিব ও অপার্থিব-ভাবের রূপের এ কারবার।
এমন সূক্ষ্ম-রহস্যময়—
এ অভিনয় সামান্য নয়,
প্রকাণ্ড এই কাণ্ড চলে ইঙ্গিতে হায় একজনার।

সাবিত্রী আবির্ভাব

পুষ্পদেবী

কম্পিত হ'ল বায়ুতরঙ্গ কম্পিত অম্বর
মহা শূন্যেতে শুধু শোনা যায় গুরু গম্ভীর স্বর,
তপ তপস্যা শুধু এই কথা
জানালো কাহার আদেশ বারতা
চারিধার শুধু প্রলয় গম্ভীর শুধু কালো শুধু কালো
কল্পারম্ভে ব্রহ্মার চোখে জ্বলিছে আশার আলো।
প্রলয় চিহ্ন হয়নি লুপ্ত গর্জ্জে সাগর জল
উনপঞ্চাশ বায়ুর বেগেতে চারিদিক উচ্ছল,
ব্রহ্মা প্রথম সৃষ্টি করিতে
মোহের তামস নামিল চকিতে
আহত ব্রহ্মা আপন সৃজনে টুটিল অহঙ্কার
রুদ্র মূর্ত্তি ক্রোধ এল ধেয়ে ভোগেতে জন্ম যার।

পদ্মগর্ভ সভয়ে আকায় রুদ্র ভয়ঙ্করে
সাগরের জল অতলান্তিক মৃত্যুর রূপ ধরে,
হেরিয়া করাল মুরতি তাহার
স্বয়ম্ভু হেরে সকলি আঁধার
লক্ষ লক্ষ নাগিনী ফুসিছে পবনে অট্টহাস,
ধ্যানের আসনে চঞ্চল হ'ল সৃষ্টি করার আশ।
করুণ কণ্ঠে করে প্রার্থনা জুড়িয়া কমল পানি
অন্ধকারেতে কে শোনাল মোরে এই প্রার্থনা বাণী,
উত্তর এল অনন্ত আমি
বিরাট অসীম ত্রিলোকের স্বামী
সৃষ্টির বীজ আমারি মধ্যে অনাদি ও মহাকাল,
আমি তবে কেবা ব্রহ্মা কহিছে কুঞ্চিত করি ভাল।

ধর্ম

শ্রীসুভাষ সমাজদার

গঙ্গারামপুর চার্চের কম্পাউণ্ড থেকে সকলের অলক্ষ্যে বেরিয়ে এল মংলু।

বুক সমান উঁচু বনতুলসীর ঝোপের ভেতর দিয়ে সরু মেঠো পথ ধরে বানগড়ের ধ্বংসস্তূপের ওপরে নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে এসে দাঁড়াল মংলু। এই অরণ্য তাকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে নিশিদিন। বনতুলসীর উগ্র ঝাঁঝালো গন্ধ তার রক্তের ভেতরে নেশা ধরিয়ে দেয়। কিন্তু, না, আর কোনদিন তার এখানে আসা হবে না। চার্চের বড় ফাদার ম্যাকনিল সাহেব যদি একবার দেখে সে এই বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাহলে তাকে ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দেবে।

—মংলু, শেষপর্যন্ত তুইও খ্রীষ্টান হয়ে গেলি? একটা আক্ষেপের কণ্ঠস্বর বেজে উঠল মংলুর কানের কাছে।

বৃদ্ধ বুধুয়া সরেণ নিঃশব্দে তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। বুধুয়ার অজস্র রেখাঙ্কিত মুখখানা কঠোর হয়ে উঠেছে।

—কি করবো সর্দার। তুমি তো সব জান!

—হ্যাঁ জানি। দাঁতে দাঁত চেপে ধরে বলল বুধুয়া—কারণ যাই হোক, তুই ধর্ম ছাড়লি কোন্ আক্কেলে?

মংলুর করুণ অসহায় মুখখানার দিকে তাকিয়ে হয়ত মায়া হ'ল বুধুয়ার। বলল—চল, আয়, ঐ ঢিপিটার ওপরে বসি—

একটা বিড়ি ধরিয়ে বলল বুধুয়া—দেখ, আমাদের জাতভাইরা একবারও ভাবে না, আমরা আদিবাসী হলেও হিন্দু। আমাদের বোঙাবাবার পাথর-পূজা, মুর্গীবলি, নাচগান, হাঁড়িয়া খাওয়াকে হিন্দুদের কখনো ঘেন্না করতে দেখেছিস?

—না।

—সবই তো বুঝিস। জানিস। সব ভুলে কোথাকার কোন্ যীশুর পায়ে মাথা ঠুকতে গেলি কোন আক্কেলে?

আক্রোশে জল জল করতে লাগল বুধুয়ার কোঁচ্‌কান চোখদুটো। একটু থেমে বলল—তুই আর কোনদিন আমার সঙ্গে দেখা করিস না। তোর সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই। বুধুয়া চলে গেল।

মংলুর চোখের সামনে ভেসে উঠল একটা ছবি। একদিন শিববাটির হাটে ম্যাকনিল বুধুয়ার হাত ধরে বলেছিল—তোমার খ্রীষ্টান হতে বাধা কি বুধুয়া? অত্যন্ত অবাক হয়ে সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল বুধুয়া। চিবিয়ে চিবিয়ে বলেছিল—আমার রক্তে বিষ আছে সাহেব। আমাকে ঘাঁটাতে এস না—বিষ! প-য়-জন! ভয়ে দু-পা পিছিয়ে গিয়েছিল ম্যাকনিল।

—হ্যাঁ সাহেব। তিনকুড়ি আর দশ বছর আগে আমার জাতের এক লেখাপড়া-জানা ছোকরা ভাগ্‌রিথ, হাঁড়িয়া খাওয়া আর মুর্গীবলি বন্ধ করার জন্ত উঠে-পড়ে লেগেছিল। তার ভদ্দরনোক হওয়ার চেষ্টাকে দমিয়ে দিয়েছিল আমার বাবা টুডু সরেণ। আমার ঠাকুদ্দাও জীতু সাঁওতালের সঙ্গে হাত মিলিয়ে উঁচু জাতের হিন্দুদের বিরুদ্ধে লড়েছিল আদিনাথে। তুমি আমাকে বলছ ভিনদেশী একটা ধর্ম নিতে? বুধুয়ার দু'চোখে আগুন ঝরছিল। সেই দিন থেকে গঙ্গারামপুর ক্যাথলিক চার্চের বড় পাদ্রী ফাদার ম্যাকনিল আর কিছু বলে নি বুধুয়াকে।

কিন্তু গ্রামকে গ্রাম সব আদিবাসীরা খ্রীষ্টান হয়ে যাচ্ছে বলে বুড়ো বুধুয়া সরেণকে সে রীতিমত কাঁদতে দেখেছে কতদিন। তার মনে হ'ত, না, দুঃখে নয়! অত্যন্ত কঠিন কোন রোগের আক্রমণে যেন দেহ জলে-পুড়ে যাচ্ছে বলেই বুড়ো যন্ত্রণায় কাঁদছে।

কু-উ-উ; কোকিল ডেকে উঠল শিমুল গাছের আড়াল থেকে, সাঁ করে তীর-ধনুক নিয়ে উঠে দাঁড়াল মংলু।

—কি রে, আমাকে মারবি না কি মংলু? ভাঙা একটা দরগার ভেতর থেকে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল সোনা। বুধুয়া সরেণের একমাত্র মেয়ে।

—এ কী রে, তুই? ভীত বিবর্ণ গলায় বলল মংলু।

—কেন, খ্রীষ্টান হয়েছিস বলে কি মানুষটাকে চিনতে পারছিস না?

—তুই আমার কাছে এসেছিস কেন রে! তোর

বাবা তোকে আমার সঙ্গে দেখলে একেবারে ক্ষেপে যাবে, হাঁসুয়া নিয়ে তোকে কাটতে আসবে।

কোন কথা বলল না সোনা। শুধু দূর-দিগন্তে কালো বনরেখার দিকে তাকিয়ে রইল অপলক চোখে। একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দের সঙ্গে মিশিয়ে বলল—সব ভুলে তুই খ্রীষ্টান হয়ে গেলি মংলু!

—কি করব, তুই ত জানিস না কেন এই কাজ করেছি! তীক্ষ্ণ যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটল মংলুর মুখে। মাথা নীচু করে কয়েক মুহূর্ত কি যেন ভাবল। অস্ফুটস্বরে বিড় বিড় করে বলল—আমি যাই সোনা। এখুনি চার্চের ঘণ্টা বেজে উঠবে। লাইন করে জেলখানার কয়েদীদের মত দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করতে হবে।

নিবিড় জঙ্গলের ভেতর দিয়ে মংলুর অপস্রিয়মান দেহরেখার দিকে তাকিয়ে একটা পাথুড়ে মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে রইল সোনা। চোখের জলে ঝাপসা হয়ে এল চারিদিকের দিক-বিকীর্ণ সবুজ অরণ্য!

চার্চের কম্পাউণ্ডে পা দেওয়া মাত্র বড় ফাদার ম্যাকনিল বললেন—মংলু এদিকে এস। তার লালচে মুখখানা আগুনের মত জলছে।

—তুমি আমাদের চার্চের ডিসিপ্লিন মানবে কি না?

—সবই তো মানি স্যার।

—সকালে আমাকে না বলে কোথায় গিয়েছিলে?

—বানগড়ে।

—বানগড় ফরেষ্টে? তুমি কি আবার স্যাভিজ নেটিভস্-দের মত পাখী-শিকার করে বেড়াচ্ছো। হাউ হরিবল্! ফাদার ম্যাকনিলের গর্জনে থর থর করে কাঁপতে লাগল নিস্তব্ধ মিশন-বাড়ীটা।

ম্যাকনিলের অত্যন্ত অনুগত মংলুর স্বজাতি নেটিভ খ্রীষ্টান মাইকেল বলল, স্যার, মেঘ-বৃষ্টি দেখলেই ওর ওপর ইভিল স্পিরিট ভর করে।

—হোয়াট, তুমি কি বলিতে চাচ্ছো?

—সেদিন গঙ্গারামপুর, নয়া বাজার হাটে প্রিচিং এবং বাইবেল বিলি করার প্রোগ্রাম ছিল না স্যার?

—ইয়াস!

হাটে যাওয়ার পথে বৃষ্টি নামল। মেঘ ডাকতে লাগল। মংলু রাস্তার ধারে নয়নজলির ভেতরে জীওল মাছ ধরতে নেমে পড়ল। হাউ হরিবল্! ডার্টি প্যাগান-গুলোর সঙ্গে মিশে মাছ ধরেছে। আমার প্রেসটিজ, চার্চের প্রেসটিজ সব—সব ও ডুবিয়ে দেবে মাইকেল। কান্নার মত করুণ শোনাল ফাদারের গলার স্বর।

—এই রাস্কেল, যাও লাইনে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা কর। মাইকেল ধমকে বলল মংলুকে।

ফাদার ম্যাকনিলের গায়ের কাছে ঘন হয়ে দাঁড়াল মাইকেল। চাপা ফিস ফিস গলায় বলল—স্যার, সেই ডেভিল বুধুয়া সরেণের সঙ্গে ওর যোগাযোগ আছে। বুধুয়ার মেয়ের সঙ্গেও—

—তুমি তোমার কাজে যাও মাইকেল।

—ইয়াস স্যার—যাচ্ছি স্যার—হাতদুটো কচলে বলল মাইকেল—বুধুয়ার জন্যই এসব হচ্ছে স্যার।

মাইকেল চলে গেল।

চার্চের হোষ্টেলের দেওয়ালে টাঙানো যীশুর 'লাষ্ট সাপার' ছবিটির দিকে স্থিরচোখে তাকিয়ে ভাবতে লাগলেন ফাদার ম্যাকনিল: মেঘ-বৃষ্টি দেখলেই—ঐ নেটিভটার ওপর ইভিল স্পিরিট ভর করে? তাহলে তো মংলুর মনের ভেতরে থরে থরে যে প্যাগান ইম্পিউ-রিটি জমে আছে 'ব্যাপ্টাইজ' হওয়া সত্ত্বেও তা এতটুকু কমে নি। আশ্চর্য্য! অথচ তার স্পষ্ট মনে আছে মংলুকে 'ব্যাপ্টাইজ' করা হয়েছিল পূর্ণিমার পরের রবিবারে। ইষ্টার ইভের পুণ্য দিনে। এই দিনে স্বয়ং যীশুকে দীক্ষা দিয়েছিল ব্যাপ্টিষ্ট জন। পিউরিফ্যাক্টরী অয়েল ওর গায়ে ভাল করে মাখিয়ে চার্চের পুকুরে স্নান করানও হয়েছিল। পর পর তিনটে ডুব দিয়ে তিনবার চীৎকার করে মংলু বলেছিল—আমি শয়তানের আত্মাকে পরিত্যাগ করিতেছি। পিতা যীশুর নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, আদিবাসীদের অসভ্য আচার-ব্যবহার সব বর্জ্জন করিব—

সেই মংলু কি না ঝমঝম বৃষ্টি পড়লেই নালায় নেমে জল-কাদা গায়ে মেখে মাছ ধরে বেড়াচ্ছে! দুর্বিঃসহ একটা যন্ত্রণায় জলে যেতে লাগল ফাদারের মাথার ভেতরটা।

এক বছর নয়, দুই বছর নয়—ত্রিশ বছর ধরে সে আদিবাসীদের ভেতরে ধর্মপ্রচারের কাজ করছে। তবুও ওদের হালচাল সে বুঝতে পারে না এতটুকু। চড়কের নামে মোটা বঁড়শীতে পিঠ ফুটিয়ে নিয়ে উঁচু বাঁশের ডগায় ঝুলতে পারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। দেবতার ভর হলে ঝাড়া একঘণ্টা মাটিতে মাথা ঠুকে ঠুকে রক্তা-রক্তি করে এরা। ষ্ট্রেঞ্জ! ওদের ভেতরে সবচেয়ে ডেঞ্জারাস ঐ বুধুয়া সরেণ। তার মনে হয় বুধুয়া যেন একটা যখ। আদিবাসী জীবনের সেই সুদূর অতীত-কালের সব সংস্কার, বিশ্বাস আর আচার-আচরণকে যেন সতর্ক প্রহরায় আগলে রয়েছে। তার এই 'জিদ্দে'

একমাত্র শত্রু ঐ বুধুয়া সারেণ! ক্রিশ্চিয়ানিটির সবচেয়ে বড় এনিমি! কোন উপায়ে ওকে—

অসহ্য অস্থিরতায় তার হাতদুটো নিস্‌পিস্‌ করতে লাগল।

তিনি মন স্থির করলেন, ষ্টিফান টুডুকে ডাকতে হবে। টুডু না পারে এমন কাজ নেই!

চার্চের হোষ্টেলের বিছানায় শুয়ে ঘুম এল না মংলুর। বারে বারে সোনার কান্নার আভাসে করুণ মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। ধর্ম কথাটার মানে কি? খ্রীষ্টান হয়েছে বলে সে সোনাকে পাবে না! সে বহু চিন্তা করেও বুঝতে পারে না, তার ভালবাসার সঙ্গে ধর্মের যোগ কোথায়? উত্তেজনায় দপ দপ করতে লাগল কানের পাশের রগ দুটো।

দরজা খুলে বাইরে এল মংলু। দূরে বানগড়ের ধ্বংসস্তূপের ওপরে ঘন জঙ্গলের গায়ে লেগেছে তামাটে জ্যোৎস্নার আভা। চাঁদ ডুবছে পুনর্ভবার ওপারে।

সে আচ্ছন্নের মতো হাঁটতে লাগল বানগড়ের দিকে। খ্রীষ্টান হওয়ার পর থেকে তার যেন কি হয়েছে বুঝতে পারে না. নিশিদিন বানগড়ের ঐ জঙ্গল যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে। ঐ বনতুলসীর ঝোপ, মনসাকাঁটায়-ভরা ভাঙ্গা দরগাতে স্বর্ণলতায়-ছাওয়া লাটাবনের ভেতরে এলেই তার রক্তে রক্তে যেন গান গেয়ে ওঠে উচ্ছ্বসিত আনন্দে-ভরা পুরানো দিনগুলো। ভুলে যায় যে, সে স্বজাতি স্বজন স্বধর্ম পরিত্যাগ করে একটা ভিনদেশী ধর্মের অনুশাসনে নিজেকে বন্দী করেছে!

দরগার সামনে এসে দাঁড়াল মংলু। এখানে কত নির্জন দুপুরে, গোধূলির ছায়াভরা সন্ধ্যায় সে আর সোনা এসেছে। সে বাজাত বাঁশী। সোনা ধরত গান। তার মনের ভেতরে সোনার প্রিয় গান গুন গুন করে উঠল:

বাপা, মুঁত গোড়কু ফাসি হাতর শাঙ্কুলি।
বেকর মালি ত মু হোইথিলি হো বাপা॥
এবে গোড়র ফাসি হাতর শাঙ্কুলি।
বেকর মালি খোলি নিশ্চিন্ত হব ত॥

একদিন সে জিজ্ঞাসা করেছিল—এ গান তুই কেন করিস সোনা?

—কেন করি, বুঝতে পারিস না! বাবা যে আমার বিয়ে বিয়ে করে একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছে! তাই বাবাকে বলছি, আমি তোমার পায়ের বেড়ী হয়েছি। আমার জন্য তোমার চোখে নিন্দ নাই। আমার বিয়ে হলেই ত তুমি নিশ্চিন্ত হও! ভাল করে তুমি ঘুমাতে পার।—বলেই খিল খিল করে হেসে উঠেছিল সোনা। হাসির দমক কমলে বলেছিল, বাবা ত জানে না, তার মেয়ের জামাই কবে থেকেই ঠিক হয়ে আছে!

সরু সরু ইট-ছড়ান যে টিপিটার ওপর সোনা বসত, হাঁটু গেড়ে সেখানকার মাটিতে বসে বদ্ধ একটা উন্মাদের মতো হাত বুলোতে লাগল মংলু। মনে হ'ল সোনার বুকের উত্তাপ লাগছে তার গায়ে; উষ্ণ নিশ্বাসের ভাপ লাগছে তার চোখে-মুখে। তীব্র উত্তেজনায় তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠল।

তার মনে হ'ল, মেঘভাঙ্গা জ্যোৎস্নার ম্লান আলোয় আচ্ছন্ন এই আদিম অরণ্যেই তাদের আনন্দোচ্ছল অজস্র দিনের সব হাসিগান যেন স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। এখুনি যদি সোনা এসে পড়ে তা হলে ভাঙা দরগার চারিদিকের এই ভয়াল অরণ্যই তার বাঁশীর সুরে গান গেয়ে উঠবে।

না। সোনা আর কোনোদিন আসবে না! সে হতাশ হয়ে শেষরাতের শিশিরে-ভেজা ঐ টিবির ওপরে বসে পড়ল। আর একবার—আর একবার শুধু বুড়ো বুধুয়া সরেণকে সে অনুরোধ করবে!

পরের দিন সকালেই মংলুর ডাক পড়ল ফাদার ম্যাকনিলের ঘরে। তুমি রাত্রে বাইরে গিয়েছিলে?

—হ্যাঁ, বড় গরম লাগছিল তাই।

—চার্চের ডিসিপ্লিন তুমি ভঙ্গ করিতেছ। তোমাকে বহুত ওয়ার্ণিং দিয়েছি। দরজার দিকে তাকিয়ে হাঁক দিল—মাইকেল—

এই ডাকটিরই অপেক্ষায় উৎকর্ণ হয়ে সে দাঁড়িয়েছিল দরজার বাইরে। নিঃশব্দ, মাইকেল এল।

—মংলুর ওল্ড পেরেণ্টসদের কয়জোড়া কাপড় দেওয়া হয়েছে?

—তিন মাসে তিন জোড়া স্যার।

—আর হুইট?

—দশ সের। চাল দেওয়া হয়েছে পাঁচ সের।

—ওদের কোটা স্টপ করে দেবে। আমাদের চার্চের কোনো ফেবার আর যেন ওর ফ্যামিলি না পায়।

—না, না—ফাদার, গম-কাপড় দেওয়া বন্ধ করবেন না। আপনি যা বলবেন সব শুনব। ব্যাকুল গলায় বলল মংলু—চার্চের গম পাচ্ছে বলে বাপ-মা খেয়ে বাঁচছে!

—ওয়েল! তোমার এই প্রমিস্‌ মনে থাকে যেন! জুতোয় মস মস শব্দ তুলে চলে গেলেন ফাদার ম্যাকনিল।

—স্যার, ঐ ডেভিল বুধুয়ার উস্কানিতে এ সব হচ্ছে। ওকে সায়েস্তা করুন আগে, চেঁচিয়ে বলল মাইকেল।

নির্জন ঘরে ঘাড় গুঁজে বসে রইল মংলু। তার মনে হ'ল যেন দুই দিক থেকে দুটো তীর এসে বিঁধেছে তার পাঁজরে। একদিকে এই হিংস্র নির্মম দারিদ্র্য, আরেক-দিকে সোনা! তীক্ষ্ণ একটা যন্ত্রণা যেন শতমুখ দিয়ে বিদীর্ণ করতে লাগল। জনমজুরী করেও রোজগার করা সহজ নয়। অন্য কোনো কাজ করে বুড় বাপ-মাকে খাওয়াতে পারে না বলেই ত এদের সহস্র নিয়মের বন্ধনে জীবন পঙ্গু হয়ে গেছে! তার চোখের কোণায় কোণায় জল এসে পড়ল। না। আর না, আজই এখানে শেষ দিন। নিজের জাতভাইদের মাটি কোপাবে সে। রোজগার করবে। নাচেগানে-ভরা সহজ-সরল আদি-বাসীদের সমাজে আবার ফিরে যাবে সে।

কয়েক দিন পর। বরিন্দের ধু ধু মাঠ খর রোদে দাউ দাউ করে জলছে! মোষ দুটোকে ঘাস খাইয়ে বাড়ীতে ফিরছিল বুধুয়া সরেণ। দূরে নীল আকাশের গায়ে কালো কলঙ্কচিহ্নের মতো চার্চের চূড়াটার দিকে একবার রক্তজলন্ত চোখে তাকাল। প্রত্যেক দিনই তাকায়। আর তার মনে হয় ঐ গীর্জার চূড়াটা যেন বিষ-মাখান তীরের মতো বিঁধে রয়েছে এ অঞ্চলের সমস্ত আদিবাসী-দের মনে। তাদের অভাবের সুযোগ নিয়ে ওরা ধর্ম পাল্টে দিচ্ছে। আদিবাসী সমাজের শত্রু বড় ফাদার ম্যাকনিল নয়, এ গীর্জা নয়, সবচেয়ে বড় শত্রু—দারিদ্র্য!

—সদ্দার—হো—থাম না—একটা চিৎকার মাঠের ওপর দিয়ে শোঁ শোঁ বাতাসে ভেসে এল। টুডু ছুটতে ছুটতে এল।

—সদ্দার—তুমি শীগগীর বেটীকে নিয়ে পালাও!

—কেন?

—গীর্জার সাহেবরা তোমার ওপর মারমুখী হইছে। তুমি নাকি লোতুন খ্রীষ্টান মংলুকে উস্কানী দিচ্ছ। তোমার মেয়েকে মংলুর পেছনে লেলিয়ে দিয়েছ।

—মুখ সামলে কথা বলিস টুডু। তোর একটা কথা আমি বিশ্বাস করি না। তুই পাদ্রী সাহেবদের গম নিস, কাপড় নিস আবার বোঙাবাবার থানে মুর্গীও বলি দিস। তুই সব পারিস।

—আমি যা করি তা করি। তোমার ভালর জন্যই বলছিলাম, বেটীকে সরাও—

—এক পা সরাব না। যা তোর সাহেবদের বল! আমার তিনপুরুষের ভিটে থেকে ওদের ভয়ে আমি জীবন থাকতে যাব না। বুধুয়ার শীর্ণ মুখখানা কঠিন হয়ে উঠল।

রোদে পুড়ে ক্লান্ত হয়ে মাথায় গুরুভার চিন্তার বোঝা নিয়ে বুধুয়া বাড়ীতে এল।

—সোনা, এদিকে আয়। গামছা দিয়ে বাতাস করতে করতে উঠোনের এক কোণে বসে পড়ল বুধুয়া।

—এ কী বাবা, তুমি এত হাঁপাচ্ছ কেন?

—বয়স হয়েছে রে—বুড়ো ত হয়েছি। শোন, সোনা, আমি আজ আছি কাল নেই, আমি ভাবছি, নয়া বাজারের হাপুনের সাথে তোর বিয়ে দেব।

—না, বাবা, হাপুনকে আমি বিয়ে করতে পারব না। আমার যাকে পছন্দ তার সঙ্গে যদি বিয়ে দাও তা হলে—

—কে সে?

কোনো কথা বলল না সোনা। কিন্তু বিচিত্র একটা লজ্জায় রূপবতী হয়ে উঠল। অস্পষ্ট গলায় বিড় বিড় করে বলল—ধর্ম পাল্টালে মানুষটাও কি পাল্টে যায়?

—ও, তুই কি মংলুর কথা বলছিস? বুধুয়ার চোখ দুটো জলে উঠল।

কয়েক মুহূর্ত কি যেন ভাবল। ধীরে ধীরে মন্ত্রোচ্চারণের মতো করে বলল, পায়ের তলায় মাটি আছে বলেই আমরা দাঁড়িয়ে আছি, ধর্মও ঠিক তেমনি আমাদের ধরে রাখে। ধর্ম না থাকলে তো আমরা পশুর মতো যখন যা খুশি করতাম।

কোনো কথা বলল না সোনা। মনে হ'ল, বুধুয়ার মুখের কথাগুলোই যেন বুঝবার চেষ্টা করছে।

শিববাটির চারিদিকে রাত্রি নেমেছে ঘন হয়ে। বুধুয়ার চোখে কিছুতেই ঘুম আসছে না। কিসের যেন একটা অজানা ভয়ে দুরু দুরু কাঁপছে তার বুকের ভেতরটা। মংলুর ওপর সোনার টান সে বুঝতে পেরেছে। সোনা জানে না—মংলু জানে না—চার্চের সাহেবরা জানে না—তার ধর্ম তার মেয়ের চেয়েও বড়! সোনা যদি পালিয়ে—না। আর সে ভাবতে পারে না—

রাত বাড়ল। হঠাৎ গোয়ালঘর থেকে একটা মোষ তারস্বরে চীৎকার করে উঠল। ঘুম ভেঙে গেল বুধুয়ার। এ অঞ্চলে এ সময়ে প্রায়ই মোষ চুরি হয়ে যায়। গোয়ালঘর দেখতে উঠতে যেতেই সোনার বিছানার দিকে তাকিয়ে হিম হয়ে গেল তার বুকের রক্ত। এ কি! সোনার বিছানাটা খালি কেন? শিববাবুর তালপুকুরে তাল কুড়াতে যায় নি তো! না! এখন তো তালের সময় নয়! তার নজরে পড়ল, দড়িতে টাঙান সোনার সবচেয়ে প্রিয় লাল ডুরে শাড়ীটা নেই। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতচমকের মতো মনে পড়ল মংলুর মুখখানা। মাথার ভেতরে আগুন জলে উঠল। ঘরের এক কোণে

ঝুলান হাঁসুয়াটা নিয়ে পাগলের মত ছুটতে লাগল চার্চের দিকে। দুটোকে একসঙ্গে কেটে আজ পুনর্ভবার জলে ভাসিয়ে দেবে। ঐ অপদার্থ খ্রীষ্টানটা, যে নিজে খেটে বাপ-মাকে খাওয়াতে পারে না, পাদ্রীদের দানের ভরসা করে বেঁচে থাকে—তার গলায় মালা দেবে সোনা!

চার্চের লোহার গেটের সম্মুখে থমকে দাঁড়াল বুধুয়া। গেট বন্ধ। হাঁফাতে হাঁফাতে সে বসে পড়ল। চোখ ফেটে জল এল তার। কিছুক্ষণ পর শান্তমনে ভাববার চেষ্টা করল, সে কাঁদছে কেন? তার আদিবাসী ধর্মের জন্য বহু ক্ষয়-ক্ষতিকে স্বীকার করেছে; কোনো মোহ তাকে টলাতে পারে নি। আর মেয়ের প্রতি তুচ্ছ মায়ার টানে সে চুপ করে বসে থাকবে? তাহলে সব সাঁওতাল খ্রীষ্টানরা তার গায়ে থুথু দেবে যে!

পুবের আকাশ ফরসা হয়ে আসছে। বুধুয়া উঠে দাঁড়াল। হয়ত সোনাকে নিয়ে মংলু চলে গেছে দূর কোনো গ্রামে। যাক। মংলুকে নিয়ে ঘর বাঁধুক। কোন আপত্তি নেই। কিন্তু ওর জন্য সোনা খ্রীষ্টান হয়ে যাবে! বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল।

বাড়ীতে না যেয়ে বোঙাবাবার থানের দিকে হাঁটতে লাগল বুধুয়া। কোনো মানসিক অশান্তি হলেই বরাবরই সে আদি দেবতা বোঙাবাবার থানে যায়।

এ কি! থর থর করে কেঁপে উঠল বুধুয়া। বোঙা-বাবার থানের কাছে বিড়াল আঁচড়ার ঝোপের ভেতরে কাদের কথা শোনা যাচ্ছে!

—তোর বুকে ঝুলান রুপার আড়কাঠিটা খুলে ফেল, ভোরের আকাশের দিকে তাকিয়ে আচ্ছন্নের মতো বলল সোনা।

মংলু ক্রশটা খুলে পুনর্ভবা নদীর জলে ছুঁড়ে দিল।

ঠিক তিন মাস আগে ফাদার ম্যাকনিল যেমন করে মংলুকে দিয়ে শপথ করিয়ে নিয়েছিল, তেমনি করে সোনা বলল—বল এবার, দু'বেলা খেটে খাব, বুড়ো বাপ-মাকে খাওয়াব, খ্রীষ্টানদের দয়ার দান নেব না।

মাথা নীচু করে স্পষ্টগলায় সোনার কথাগুলো আবৃত্তি করল মংলু।

—এবার বল, আমার একমাত্র পরিচয় আদিবাসী, শিমুল গাছের আড়াল থেকে চীৎকার করে বলতে চাইল বুধুয়া।

কিন্তু বলল না। সে জানে, গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে বললেও ধর্মগ্রহণের ব্যাপারে কোনো ফল হয় না। তার চেতনার ভেতরে ছায়া ছায়া কুয়াশার মতো কতগুলো চিন্তার রেশ ভেসে উঠল। একদিন মংলু কাপড় আর গমের লোভে খ্রীষ্টান হয়েছিল, আজ সোনার টানে আবার আদিবাসী হ'ল। কোন লোভ বা আকর্ষণ ছাড়া পৃথিবীতে কখনও কি কোনো ধর্ম বিস্তার লাভ করতে পেরেছে!

ওদের অলক্ষ্যে যেমন এসেছিল তেমনি শাল-শিমুলের অরণ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল বুধুয়া সরেণ।

সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে মনুসংহিতা

শ্রীশৈলজানন্দ রায়

আধুনিক প্রগতিশীল সমাজতাত্ত্বিকগণ মনুসংহিতা পাঠ ক'রে দার্শনিক মনু ও তাঁর সমাজদর্শনকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে থাকেন। যখন তাঁরা মনুসংহিতায় পড়েন :

"নৈতা রূপং পরীক্ষন্তে নাসাং বয়সি সংস্থিতি
সুরূপম্বা বিরূপম্বা পুমানিত্যেব ভুঞ্জতে।"

এই শ্লোক পাঠ করেই তাঁরা উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠেন, মনু অত্যন্ত নারী-বিদ্বেষী ছিলেন। কিন্তু ব্যবহারিকদিগের কথা ওঁরা বোধ হয় গভীর ভাবে চিন্তা করেন না। তবে শুনুন, দার্শনিক কবি কোলরিজ কি বলেছেন :

'It appears to me that in all cases of real love, it at one moment that it takes place. That moment may have been prepared by esteem, admiration or even affection,—yet love seems to require a momentary act of volition, by which a tacit bond of devotion is imposed, a bond not to be there after broken without violating what should be sacred in our nature'.

(Coleridge : Lectures on Shakespeare)

এখানে যৌন আবেগপ্রবণতার প্রশ্ন নেই। যা স্বাভাবিক ভাবে ঘটে থাকে কোলরিজ সেই কথাই বলেছেন। এর কারণ দেবা ন জানন্তি কুতো মানবা? বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণেও মতান্তর আছে। সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বলবে এর কারণ Associative—সে অনেক কথা। তা হলে শুনুন ইংরেজ কবি টেনিসন কী বলছেন :

'How should love
Whom the cross lightnings four chance
Met eyes
Flash into fiery life from nothing follow
Such dear familiarities of the dawn?
Seldom, but when he does master of all'.
—Aylmer's field.

মনু বাস্তব দিকটা ঘোষণা করেছেন মাত্র। শুনুন তবে As you like it নাটকে Shakespeare-এর ভাষায় :

"There was never any thing so sudden but the fight of two rams and caesar's thasonical brag of I came, saw and over came : for your brother and my sister no sooner met but they looked, no sooner looked but they loved, no sooner loved but they sighed, no sooner sighed but they asked one another the reason, no sooner knew the reason but they sought the remedy."

মনু উপরোক্ত শ্লোকে নারীর যৌন আবেদন প্রসংগে কোনো কিছু উল্লেখ করেন নি। তিনি যদি তা করতেন তবে বলা যেত নারীজাতিকে ছোট করা হচ্ছে। কিন্তু ঠিক তা নয়। মনু যে সমাজনীতির সূচনা করে-ছিলেন তা কেবল সমাজকে সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করবার জন্য। তাঁর Social Codes-গুলিকে ঠিক সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে। নতুবা আমরা ভুল করব। নারীই হচ্ছে সমাজের কেন্দ্র। মনুসংহিতাতে আছে :

'দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষোৎ ভবৎ
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ।'

যেখানে দাম্পত্যজীবনে সত্যকার প্রেমের বন্ধন রয়েছে সেখানে অন্য প্রশ্ন অবান্তর। কারণ, কবি ব্রাউনিংয়ের কথায় : 'Love conquers all. Love is best.'

ভিক্টর হুগো তাঁর Notre Dame গ্রন্থে বলেছেন :

"Oh love! that is to be two and yet one —a man and a woman mingled into an angle; It is heaven!"

মনুসংহিতাতে বিবাহিত-জীবনের যে আদর্শ রূপায়িত হয়েছে তার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় দার্শনিক কবি Coleridge-এর বক্তব্যে :

'Love is a desire of the whole being to be united to some being, felt necessary to it's completeness.'

'মনুসংহিতা'তে সমাজজীবনে নারীর কর্তব্য নির্দেশ করা হয়েছে :

"বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকস্মৃতঃ
পতিসেবা গুরৌবাসো গৃহার্থোঽগ্নি পরিক্রমা।"

সমাজে সমাজ-বিরোধী লোকের সংখ্যা কম নয়। তাই সর্বত্রই Don Juan-দের দেখা পাওয়া মোটেও বিরল নয়। তাই ইংরেজ কবি বায়রণের ভাষায় :

"Romances paint at full length peopl's woonings.
But only give a bust of marriages.
For no one cares for matrimonial coonings.
—Don Juan.

এই সব সম্ভাবনার কথা ভেবে যদি মনু সাবধানতা অবলম্বন করে থাকেন তা হলে তাঁকে নারী-বিদ্বেষী বলি কী করে? মনু বলেছেন:

"বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে
পুত্রাণাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম্।"

Coleridge বলছেন:

'Long and deep affections suddenly, in one moment, flash transmuted into love.'

Shakespeare-এর 'রোমিও জুলিয়েট' নাটকে দেখতে পাই:

"O, she doth teach the torches to burn bright!
Beauty too rich for use, for earth too dear!
Did my heart love till now? For swear it, sight!
For I ne'er saw true beauty till this night!"

টেনিসন চোখের পলকে প্রেমের কথা বলছেন:

"Love at First sight
May seem—with goodly rhyme and reason for it
Possible—at first glimpse, and for a face
Gone in a moment—strange.
| The Sisters.

Shakespeare-এর Cymbeline নাটকে Imogen তার পিতাকে বলছে:

"It is your fault that I have loved Posthumus; You bred him as my play fellow.

তাই যখন মনু বলেন:

"মাত্রা স্বস্রা দুহিতা বা ন বিবিক্তাসানা ভবেৎ
বলবানিন্দ্রিয় গ্রামো বিদ্বাং সমপি কর্ষতে।"

এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। দেখুন, Coleridge বলছেন:

"Long and deep affections suddenly in one moment, flash transmuted into love."

সেই জন্যই মনু পূর্বাহ্ণে সতর্ক করে দিয়েছেন; আর স্ত্রীজাতির স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেন নাই। তাই তিনি বলেছেন:

"পিতা রক্ষতি কৌমারে, ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।"

আপাতঃদৃষ্টিতে মনুসংহিতায় নারীকে সমাজে যে স্থান দেওয়া হয়েছে তা অনেকের কাছে অবিচারমূলক মনে হলেও গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখলে দেখা যাবে সংসারে নারীর প্রাধান্য অনস্বীকার্য এবং পারিবারিক জীবনে নারী মোটেও অবহেলিতা নয়। সেইজন্যই মনু নিজেই বলেছেন:

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

জীব-বিজ্ঞানের দিক থেকে দেখতে গেলে নারীর যত বেশী সহ্যশক্তি পুরুষের তত নয়। সেই জন্য হিন্দু-শাস্ত্রে নারীকে শক্তির আধার কল্পনা করা হয়েছে। তাই নারী যত আত্মত্যাগ করতে পারে পুরুষ তা পারে না। প্রকৃত প্রেমের বন্ধন ব্যতীত বিবাহবন্ধন মিথ্যা হয়। অথচ সর্বক্ষেত্রে বিবাহবন্ধনে যে দম্পতি সুখী হয় সে কথা সব সময়ে বলা চলে না। তবুও সেক্ষেত্রে Adjustment-এর প্রয়োজন। আধুনিক ও সমাজ-বিজ্ঞান সেই কথাই বলে। যদি তা একান্তই সম্ভব না হয় তা হলে বিবাহ-বিচ্ছেদেই শান্তি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতীয় সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদ স্বীকৃত হয়েছিল। পরাশর সংহিতায় আছে—

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ
পঞ্চ স্বাপৎসু নারীণাং পতিরণ্যো বিধীয়তে।"

কিন্তু সবচেয়ে উপরে স্থান দিতে হবে দাম্পত্য-জীবনে পরস্পরের বুঝাপড়ার মাধ্যমে মিলনের সেতুনির্মাণ প্রচেষ্টাকে। সোভিয়েট য়ুনিয়নে গণ-আদালতে বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন এলে আদালত সর্বপ্রথমে চেষ্টা করেন দাম্পত্য-জীবনের এই ভাঙনের সম্ভাবনাকে পরস্পরের বুঝাপড়ার ভিতর দিয়ে অঙ্কুরেই বিনাশ করতে। এই জন্য আদালত অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা করে থাকেন। অনেক সময় বিলম্বে ক্ষত শুকিয়ে যায়। এই ভাবে সোভিয়েট য়ুনিয়নে বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা ক্রমশঃই কমে আসছে। সেখানে আদর্শ দম্পতির সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এই প্রসংগে মনে পড়ছে শ্রীজহরলাল নেহরু পার্লিয়া-মেণ্টে হিন্দু কোড বিলের বিরোধীপক্ষের উদ্দেশ্যে বলে-ছিলেন, মনু দুই হাজার বৎসর পূর্বে যা লিখে গিয়েছেন আজকের সমাজ-জীবনে তা অচল।

শ্রী নেহরুর এই মন্তব্যের উত্তর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কবিতার দুটি পংক্তি উদ্ধৃত করে দেওয়া চলে:

"তবু দেখ সেই কটাক্ষ আঁখির কোণে দিচ্ছে সাক্ষ্য
যেমন ঠিক দেখা যেত কালিদাসের কালে।"

সকল কাজে, সর্ব ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমকক্ষ নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দৈহিক গঠনের দিক থেকেই নারীকে পুরুষের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হতে হয়। যেমন পুরুষকে প্রকৃতগত কারণেই কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীর উপর নির্ভরশীল হতে হয়। পুরুষ ও নারীর এই অসম্পূর্ণতা অগৌরবের নয়। এতে হীনমন্যতার কোনো কারণ নেই। পুরুষ ও নারীর এই অসম্পূর্ণতার জন্যই পরস্পরের সাহচর্য প্রয়োজন এবং উভয়ের সাহচর্য ও সহযোগিতার ভিত্তিতেই তারা একটি সম্পূর্ণ সত্তা অনুভব করতে পারে। সেই একক সত্তার অনুভূতি পরস্পরের আত্মত্যাগের মাধ্যমেই সম্ভব হয়। তাই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন :

"চিত্তের যে অবস্থায় অন্যের সুখের জন্য আমরা আত্ম-বিসর্জন করিতে স্বতঃ প্রস্তুত হই, তাহাকে প্রকৃত ভালবাসা বলা যায়।"

["বিষবৃক্ষ"—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

সুতরাং পুরুষ ও নারীর উগ্র স্বাতন্ত্র্যবোধ বর্তমান থাকলে দাম্পত্য-জীবনে শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখা কঠিন। পুরুষ কর্মময় জগতে অগ্রগামী, তাই স্বাভাবিক কারণেই নারীকে পুরুষের বশ্যতা মেনে নিতে হয়। এই বশ্যতা স্বীকার অন্তরের তাগিদেই সম্ভব। এখানে স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্ন অবান্তর। প্রেমিক কবি চণ্ডীদাসের ভাষায় :

পিরীতি লাগিয়া আপনা ভুলিয়া
পরেতে মিশিতে পারে
পরকে আপন করিতে পারিলে
পিরীতি মিলয়ে তারে।

—০—

প্রেমের কবিতা

শ্রীকালিদাস রায়

বলিলেন মিতা
"যৌবন ফুরালে কেন লেখ আর প্রেমের কবিতা ?
যতদিন সে যৌবন, প্রেম ততদিনই
তার পর প্রিয়া হ'ন সংসারে গৃহিণী।"
বলিলাম—"ভায়া,
যৌবন ফুরালে প্রিয়া আর ন'ন জায়া,
তখনি প্রেয়সী হ'ন। খাঁটি কথা বলিব তোমায়
আসল প্রেমের-গীতি যৌবনান্ত হলে লেখা যায়।
আবেগে যৌবন হয় ফেনিল উচ্ছ্বাস
শান্ত হলে বেগ তার, তাই হয় রসের বিলাস।
কামনার কালিদহে যত পঙ্ক জমে
পঙ্কজ হইয়া ফুটে তাহাইত ভোগের প্রশমে।
ভুঞ্জনে গুঞ্জন কোথা ? ভুঞ্জনের পরিতৃপ্ত স্মৃতি
অলিকণ্ঠে হয় প্রেম-গীতি।
প্রেম গঙ্গাজল বটে, বর্ষায় আবিল,
শরতে সে 'জল' হয় স্বচ্ছ শুচি নির্মল 'সলিল'।
জলে নয়, সে সলিলে হয় স্পষ্ট বিম্বিতহৃদয়
সে বিম্বে আসল প্রেম-কবিতার হয় উপচয়।"

"মামেকং শরণং ব্রজ"

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

পরম আনন্দঘন মূরতি ঈশ্বর,
অর্জ্জুনের রথে তব কম্বুকণ্ঠস্বর
আজও শুনি, 'সর্ব্বধর্ম্ম এসো তেয়াগিয়া
অঙ্কে মোর। অহোরাত্র রয়েছি জাগিয়া
সংসার-সমুদ্রে তব চরম আশ্রয়।
যে মোর শরণাগত—কোথা তার ভয় ?
সর্ব্ব পাপ হ'তে আমি উদ্ধারিব তারে।'
সে বাণী স্মরিয়া, প্রভু, এসেছি দুয়ারে
কৃতার্থ করিবে বলি চরণচ্ছায়ায়
করুণাপ্লাবনে যাহা অজস্র ধারায়
ঝরে নিত্য আকাশের আলোর মতন।
জানি, চিত্ত ধ্যানে তব যদি অনুক্ষণ
রহে মগ্ন,—মুক্তি পাবো একলহমায়
মৃত্যুকূপ হ'তে তব অমৃত-গঙ্গায়।

অভীরভীঃ

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(রাজেন্দ্রের হাটখোলার বাড়ীর একতলায় হলঘর। শুক্রবার, সকাল দশটা। গোটাদুই লোহার ট্রাঙ্ক, গোটাতিনেক সুটকেস্, দুটো হোল্ডল এবং আরও কিছু কিছু জিনিস বাঁধা-ছাঁদা হয়ে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। বাঁদিক থেকে বিভা, ও তার পেছন পেছন গুটিকয়েক প্যাকেট হাতে ক'রে রণধীর ঢুকলেন।)

বিভা। (মুখ ফিরিয়ে রণধীরের দিকে তাকিয়ে) দেখবেন, হোঁচট খাবেন না। কলকাতা ছেড়ে যাবার নামে দাদার উৎসাহে একেবারে বান ডেকেছে। (গায়ের কোটটা খুলতে খুলতে) জিনিস কত নিচ্ছে দেখুন না!

(রণধীর এগিয়ে গিয়ে একটা টেবিলের ওপর প্যাকেটগুলিকে রেখে ফিরে আসছেন।)

কাল বিকেল থেকে গোছানো সুরু হয়েছে, প্রায় সারা রাত ধ'রে গুছিয়েছে। (কোট কোলে ক'রে একটা গদিমোড়া চেয়ারে বসল।) তার ফলে আজ সকালে উঠে মুখ মুছবার তোয়ালে পাওয়া গেল না, বাজারের হিসেব নেবার সময় বৌদি তাঁর কলম পেলেন না খুঁজে—সে এক কাণ্ড! বসুন না?

রণধীর। (ব'সে) তা, যাচ্ছেনই যখন, উৎসাহ ক'রে যাওয়াই ত ভাল!

বিভা। উৎসাহটা আরও বেশী হয়েছে এই জন্যে যে, বৌদিকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারছে।

রণধীর। সেইটাই ত স্বাভাবিক। বেশীদিন ত হয় নি বিয়ে হয়েছে!

বিভা। কারণটা যদিও একমাত্র তা নয়—বৌদিকে না হলে তার একেবারেই চলে না যে! সবদিক দিয়ে এমন অসহায় মানুষ বোধহয় আর পৃথিবীতে দুটি নেই।

(বাঁদিক্ থেকেই রাজেনের প্রবেশ।)

রাজেন। (ব্যস্তভাবে) বিভা, তুমি কোথা?

বিভা। নিশ্চয় ওপরেই আছেন কোথাও।

রাজেন। নার্সিং হোমের পাকাপাকি ব্যবস্থা সব ক'রে এলাম, (হেসে) অর্থাৎ ডাক্তার ব্যানার্জ্জি ক'রে দিলেন।...যাই, তুমিকে ব'লে আসিগে।...এই যে, রণধীরবাবু! নমস্কার!

রণধীর। (উঠে দাঁড়িয়ে) নমস্কার।

রাজেন। আমাদের গোছগাছ ত প্রায় হয়ে গেছে। আপনাদের?

রণধীর। একটা দিন ত হাতে আছে এখনো? আর আমাদের গোছগাছ হয়েই থাকে সারাক্ষণ। এয়ার রেড্ যে কি জিনিস সেটা চাক্ষুষ করবার পর থেকে সব-কিছু গুছিয়ে নিয়ে স'রে পড়বার জন্যে তিন মিনিটের বেশী সময় আমরা হাতে রাখি না।

রাজেন। শুনলি ত বিভা? আর আমি তাড়া দিচ্ছিলাম ব'লে কি ঝগড়াটাই না কাল আমার সঙ্গে তুই করলি।

রণধীর। উনি ঝগড়া করেছেন বুঝি? তবে এটা বলব, আমরা যা জিনিস গোছাই তা ঐ তিন মিনিটে গুছিয়ে নেবারই মত। আপনি ত দেখতে পাচ্ছি একটা গোটা সংসারই ঘাড়ে ক'রে চলেছেন!

বিভা। উনি ভাবছেন, সংসারটা উনি নিয়ে যাবেন, কিন্তু ঘাড়ে করাটা বৌদি আর আমি মিলে করব।

রাজেন। এই আবার সুরু হ'ল তোর! আমি চললাম। আচ্ছা, রণধীরবাবু, আপনি বসুন।

(সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল।)

বিভা। বসুন! (রণধীর বসলে) আচ্ছা, রণধীর-বাবু! বোমা আর বসন্ত, এ-দুটোর মধ্যে কোন্‌টাকে আপনার বেশী ভয়?

রণধীর। (সন্দিগ্ধভাবে) হঠাৎ ও কথা কেন?

বিভা। বৌদির বাবা বলেন কিনা যে, আমাদের দেশের লোকরা ভীতু নয় তার প্রমাণ, তারা বসন্তকে ভয় পায় না।

রণধীর। পায় না আবার! শীতলা পূজার ধুম লেগে গেছে শহরে। ভক্তির বালাই বিশেষ নেই সে-পূজোয়।

বিভা। আপনি শীতলার পূজো দিয়েছেন?

রণধীর। ঐ একটা পূজোয় ফি-বছর চাঁদা দিই। সরস্বতী পূজোওয়ালাদের চেয়ে ওদের খাঁইও কম।

বিভা। কোন্‌টাকে আপনার বেশী ভয়, বোমাকে না বসন্তকে?

রণধীর। হঠাৎ ওকথা কেন?

বিভা। আহা, বলুনই না?

রণধীর। তা বোধহয় বসন্তকেই।

বিভা। পানবসন্তকেও কি খুব ভয় পান?

রণধীর। ওখানটায় জাত-বিচার না করতে যাওয়াই ভাল। খুব বড় পণ্ডিতদেরও ভুল হয়ে যায় অনেক সময়। ওনারা আবার মাঝে মাঝে গলাগলি ক'রে আসেন কিনা!

বিভা। হুঁ! তা দেওঘরে গিয়ে যদি দেখেন, আমার ওপর মায়ের কৃপা হয়েছে, তখন না হয় মধুপুর, জেসিদি, বা আর কোথাও চলে যাবেন! আপনাদের জিনিসপত্র ত গোছানই থাকে সারাক্ষণ?

রণধীর। (উঠি উঠি ভাব) হঠাৎ ওকথা কেন, এত কথা থাকতে? আপনার কি শরীর ভাল বোধ হচ্ছে না? জ্বরজ্বর লাগছে?

বিভা। (একটু ভেবে) না, না, আমার কিছু হয় নি। এমনি বলেছিলাম কথাটা! আপনি ভয় পাবেন না, বসুন।

(সিঁড়ি বেয়ে রাজেন ও সুমি নেমে এল।)

রণধীর। (উঠে দাঁড়িয়ে সুমিকে নমস্কার ক'রে) আমি যাব ব'লে উঠছিলাম।

রাজেন। একটু চা না খেয়ে কি ক'রে যেতে পারেন? বসুন।

(সুমি ডানদিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল)

সুমি! তুমিও একটু ব'সে চা এক পেয়ালা খেয়ে যাও। কাল দুপুর থেকে ত কিছু না খেয়ে আছ. তার ওপর কাল সারারাত জেগে বসেছিলে শ্বশুরমশায়ের কাছে। এরকম করলে যাবার মুখে তুমিও একটা অসুখে পড়বে, আর তা হলেই ত চিত্তির!

সুমি। (ফিরে এসে বসলে রণধীর বসলেন, রাজেনও বসল।) তা, তুমি ত থাকবে সঙ্গে, দেখবে।

বিভা। দেখবার লোকের অভাব হবে না দেওঘরে।

সুমি। মনে ত হচ্ছে, দেখাশোনার প্রয়োজনটা তোমারই ঢের বেশী হবে সেখানে বিভা।...ওর মুখটা কিরকম টকটকে লাল দেখাচ্ছে, দেখ! আমাকে নিয়ে অনর্থক মাথা না ঘামিয়ে ওর দিকে তোমরা একটু দৃষ্টি দাও দিকি?

বিভা। বৌদি! তুমি কুডাক ডেকো না ত!

রণধীর। (উঠে দাঁড়িয়ে বিভার দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে) সত্যি কিন্তু, মুখটা বেশ লাল দেখাচ্ছে। ওটা eruptive fever-এর লক্ষণ নয় ত?

বিভা। এতক্ষণ আপনার সঙ্গে রোদে রোদে ঘুরে জিনিসপত্র কেনাকাটা করলাম, মুখটা একটু লাল দেখাবে না? আপনারও মুখটা লাল দেখাচ্ছে, আয়নায় দেখুন গিয়ে।

রণধীর। আচ্ছা, আমি তাহলে উঠি এখন। ডাক্তার ব্যানার্জি আজ এলে এঁকে একবারটি দেখিয়ে নিতে ভুলবেন না কিন্তু। দেখিয়ে নিতে ত দোষ নেই কিছু?

(চায়ের ট্রে নিয়ে ডানদিক থেকে বঙ্কুর প্রবেশ।)

রাজেন। আচ্ছা, সে হবে এখন। আপনি চাটা ত খেয়ে যান!

(রণধীর বিমর্ষমুখে আবার বসলেন।)

সুমি। (উঠে গিয়ে চা ঢালতে ঢালতে) এম্বুলেন্স কখন আসছে?

রাজেন। এগারোটার মধ্যেই এসে পড়বার কথা।

সুমি। তাহলে সময়ও আর বেশী নেই! (বঙ্কুকে) বাবা কি করছেন, দেখে এসো ত চট্ ক'রে। যদি দেখ ঘুমোচ্ছেন, শব্দ করবে না একটুও।

(পা টিপে টিপে বঙ্কু সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল উপরে।)

এম্বুলেন্সের গাড়ীতে আমিও ওঁর সঙ্গে যাব।

(সকলকে চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দিল।)

রাজেন। তা বেশ ত, যেও। আমিও ত যাচ্ছি এম্বুলেন্সের সঙ্গে সঙ্গে, ওঁর জিনিসপত্র নিয়ে বাড়ীর গাড়ীতে। ওঁর সব ব্যবস্থা ঠিক ঠিক হ'ল কি না দেখে আসতে হবে ত?...ডাক্তার ব্যানার্জিও থাকবেন সেখানে।

রণধীর। (তাড়াতাড়ি শেষ করবার জন্যে চা-টা পিরীচে ঢেলে ঢেলে খাচ্ছিলেন।) ডাক্তার ব্যানার্জি তাহলে ত আর আসছেন না এদিকে আজ! এঁকে ডাক্তার দেখাবার কি হবে তাহলে? আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে একজন ডাক্তার পাঠিয়ে দেব কি? (উঠলেন।)

সুমি। দেখিয়ে নেওয়া ত ভাল।

বিভা। বৌদি! তোমার নিজের একটা চরকা আছে না? আমারটাতে তেল দিতে এত উৎসাহ কেন?

রাজেন। আপনাকে কষ্ট করতে হবে না, রণধীর-বাবু। দরকার মনে হলে ডাক্তার ব্যানার্জিকেই ডেকে এনে আমরা দেখাব।

রণধীর। বেশ, তাই দেখাবেন। আমি তাহলে এখন চলি। নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার!

(বাঁদিক্ দিয়ে প্রস্থান। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্কু নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে।)

বঙ্কু। দাদু জেগে আছেন মা। আপনাকে খুঁজ-ছিলেন।

সুমি। আচ্ছা যাও, আমি যাচ্ছি।

(ডানদিক্ দিয়ে বন্ধু বেরিয়ে গেল, সুমি উঠে গেল উপরে।)

রাজেন। চা থাকে ত আর-এক পেয়ালা দে না রে!

(বিভা উঠে গিয়ে রাজেনের শূন্য পেয়ালাটা ভরছে।)

তোকে সত্যিই কিন্তু ভাল দেখাচ্ছে না একেবারেই। যাবার মুখে অসুখ-বিসুখ একটা বাধাবি না ত?

বিভা। (চা-য়ে দুধ চিনি মিশিয়ে রাজেনের হাতে পেয়ালাটা দিয়ে) তুমি তাই বলছ, কিন্তু আমি যদি অসুখে পড়ি আর আমার দেওঘর যাওয়া না হয়, ত তাতে খুশী হবে এমন লোকের অভাব নেই পৃথিবীতে।

রাজেন। এই আবার হেঁয়ালিতে কথা বলতে সুরু করেছিস্ তুই!

বিভা। হেঁয়ালি কেন হতে যাবে? এই দেখ না, —যেমন রণধীরবাবু!

রাজেন। Say, this is not fair! কলকাতা ছেড়ে যাতে তুই চ'লে যাস্ তার জন্যে কি না করেছেন ভদ্রলোক! কত গল্প ব'সে ব'সে হয়ত-বা বানিয়েছেনই রেঙ্গুনের, যাতে তুই ভাল ক'রে ভয় পাস্। আর তুই এখন—

বিভা। আমাকে ভয় না পাওয়ালে আমি কলকাতা ছেড়ে যাব না, আমি না গেলে তুমি যাবে না, আর তুমি না গেলে দেওঘরে তোমার খরচে এক রান্নায় স্বামী-স্ত্রী-ছেলেমেয়ে মিলে মজাসে খাওয়া চলবে না, তাই আমাকে ভয় পাওয়াচ্ছিলেন আর কি, কিন্তু মুশ্‌কিল হয়েছে, এবার নিজেই ভয় পাচ্ছেন।

রাজেন। (একটু ভেবে নিয়ে) তোর মাথায় কত কি যে আসে! তুই মানুষটা বড্ড বেশী সন্দেহাতুর। তোর ধারণা নিখিল, সুমি, রণধীরবাবু, এঁরা সবাই একটা-না-একটা মৎলব নিয়ে সব কিছু করছেন। (উঠে পায়চারি করতে করতে হঠাৎ বিভার কাছে এসে দাঁড়িয়ে) তোর হয়ত ধারণা, আমি যা-কিছু করছি তাও একটা মৎলব নিয়ে করছি। (হেসে উঠে) না রে?

বিভা। হুঁ! তা কথাটা খুব মিথ্যে বল নি।

রাজেন। (বিভার পাশের চেয়ারটাতে ব'সে প'ড়ে) মিথ্যে বলি নি? বলিস্ কি তুই? মানে? তুই বলতে চাস আমারও—

বিভা। (হেসে) হ্যাঁ, তোমারও মৎলব একটা থাকে বৈকি তোমার প্রায় সব কথা আর কাজেরই মধ্যে।

রাজেন। সেটা কি শুনি?

বিভা। সেটা হচ্ছে এই যে, তুমি নির্ঝঞ্ঝাট হয়ে যেতে চাও, অন্যের ওপর তোমার সমস্ত কিছুর ভার দিয়ে; এমন কি তোমার স্ত্রীর ভারও।

রাজেন। (রেগে) দেখ্ বিভা, তুই বড্ড বেশী কথা বলিস। মানে, বড্ড বেশী বাজে কথা বলিস। (একটু ভেবে) তুই জানিস, তোরও একটা মৎলব থাকে তোর সব কাজ আর কথার মধ্যে?

বিভা। তাই নাকি? জানতাম না ত। সেটা কি?

রাজেন। (ক্রুদ্ধ স্বরে) সেটা হচ্ছে, মানুষকে খোঁচানো, খোঁচানো, অকারণে খোঁচানো। (উঠে দাঁড়াল।)

(সুমি নেমে এসে দাঁড়িয়েছে মিড্‌ল্যাণ্ডিং-এ।

সুমি। বিভা, দুপুরে তুমি কি খাবে?

বিভা। বৌদি! যা বলবে, নীচে এসে বল।

(সুমি নেমে এল।)

আমার জন্যে দুপুরে বিশেষ রকম খাবারের কিছু ব্যবস্থা হওয়া দরকার, এ কথাটা কেন তোমার মাথায় এল?

রাজেন। আঃ, বিভা!

সুমি। তুমি অকারণ রাগ করছ বিভা। তোমার মুখটা খুব লাল দেখাচ্ছিল, আর সকালে উঠেই অন্য দিন চান কর, আজ দেখলাম তাও করলে না, তাই ভাবলাম হয়ত তোমার শরীর—

বিভা। আমার শরীরের ভাবনা এত বেশী ত আগে কোনো দিন ভাবতে দেখি নি তোমাকে?…একটা সত্যি কথা বলব? তুমি চাও না যে, আমি দেওঘর যাই।

সুমি। (একটু অবাক্ হয়ে বিভার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে) সে কি? তা কেন চাইব না?

বিভা। নিশ্চয় চাও না, আর তাই জন্যে খালি প্রমাণ করতে চেষ্টা করছ, আমি অসুস্থ, যাতে আমি কলকাতা ছেড়ে না যেতে পারি।

সুমি। তাতে আমার লাভ?

বিভা। হয়ত আছে লাভ!

রাজেন। আঃ, বিভা! ঠিক যাবার মুখে একটা গোলমাল বাধিয়ে সব ভণ্ডুল করবার মৎলব নাকি তোর?

বিভা। (উঠে দাঁড়িয়ে) আর একটা সত্যি কথা বলব?

সুমি। ঐ একই রকমের সত্যি কথা ত? (হেসে) বলই না হয়, শোনা যাক। (বসল।)

বিভা। তুমি যে দেওঘর যাবে, এটা অনেক দিন থেকেই মনে মনে ঠিক ক'রে রেখেছিলে।

সুমি। এ কথাটাও সত্যি নয়।

বিভা। অন্ততঃ নিখিলবাবুকে যেদিন দেওঘরে পাঠিয়েছিলে, সেই দিন থেকে।

রাজেন। আঃ, বিভা! চুপ কর্ দেখি!

সুমি। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা।

বিভা। তা ত তুমি বলবেই। কিন্তু আমি বলছি, নিজে যাবে ঠিক ক'রেই দেওঘরে তাকে তুমি পাঠিয়েছিলে, প্ল্যান ক'রে। নয়ত পাঠাতে না। তোমাদের আমি খুব চিনি।

(ডানদিক্ দিয়ে বেরিয়ে গেল।)

সুমি। আমাকে এ রকম ক'রে অপমান করবে তোমার বোন, আর তুমি চুপ ক'রে ব'সে তাই শুনবে, এ খুব ভাল ব্যবস্থা!

রাজেন। চুপ ক'রে মোটেই শুনি নি।

সুমি। তা সত্যি। আঃ বিভা, ওঃ বিভা—করেছ দু'একবার। তুমিও বিশ্বাস কর নাকি ঐ কথাগুলো?

রাজেন। সে রকম ভাব কিছু কি দেখিয়েছি?

সুমি। তা দেখাও নি, কিন্তু তোমার মনে কি আছে জানি না ত? তাই বলছি, দেওঘরে যাব, কাল সেটা স্থির হবামাত্রই নিখিলবাবুকে টেলিগ্রাম করেছি কলকাতায় ফিরে আসতে।

রাজেন। (সুমির দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে রইল কিছুক্ষণ।) নিখিল ওখানে থাকলে আমাদের কত সুবিধে হ'ত!

সুমি। ওঁর কাজকর্ম্ম আছে ত কলকাতায়? না হয় চাকরি করেন না, তবু ওঁকে ক'রে খেতে ত হয়? তাছাড়া উনি এসে বাবার সব ভার না নিলে আমি কিসের ভরসায় ওখানে থাকব? ভয়েই ত ম'রে যাব!

রাজেন। তা নিখিল যদি কলকাতায় চ'লেই আসছে ত বিভাকে সে কথাটা বলতে কি হয়েছিল? ওর বিশ্রী মন্তব্যগুলো তাহলেই ত আর তোমাকে শুনতে হ'ত না!

সুমি। বলি নি ইচ্ছে ক'রেই, আর তোমাকে অনুরোধ করছি, তুমিও বলো না।

রাজেন। কি হবে বললে?

সুমি। ওর দেওঘর যাবার সমস্ত উৎসাহ উবে যাবে। যে অসুখটাকে এখন আমল দিচ্ছে না, সেটাই তখন খুব বড় হয়ে উঠবে। তুমি তখন ওকে রেখে যেতেও পারবে না, নিয়ে যেতেও পারবে না, সব জড়িয়ে খুব বেশী অসুবিধার মধ্যে পড়বে।

রাজেন। তা বেশ, বলব না। (হঠাৎ হাতঘড়িটা দেখে দাঁড়িয়ে উঠে) কিন্তু এম্বুলেন্সটার কি হ'ল বলতে পার? এতক্ষণ ত আসা উচিত ছিল! একটু দেখতে হচ্ছে। (সিঁড়ির নীচে গিয়ে টেলিফোনে একটা নম্বর ব'লে) হেলো, হেলো, আমি হাটখোলা থেকে রাজেন রায় কথা কইছি। কই, আমাদের এম্বুলেন্স?···চ'লে গেছে?···কতক্ষণ হ'ল?···ও, আচ্ছা, আচ্ছা ধন্যবাদ! (রিসিভারটা রেখে সুমির কাছে ফিরে আসতে আসতে) এম্বুলেন্স এখনই এসে পড়বে সুমি। তুমি ওপরে যাও, দেখ, উনি জেগে আছেন না ঘুমুচ্ছেন। বঙ্কুরা ওঁকে চেয়ারে বসিয়ে নামাবে, তাদের নিয়ে আমি যাচ্ছি একটু পরেই।

(সুমি উপরে উঠে গেলে ডানদিকের নেপথ্যের কাছে গিয়ে) বঙ্কু! বঙ্কু!

(যাই বাবু ব'লে একটু পরে বঙ্কুর প্রবেশ।)

ওরে স্তাখ্, তুই একলা পারবি না। ড্রাইভারকেও ডাক্ দেখি! দু'জনে ধরাধরি ক'রে দাদুর সুটকেস দুটো আমার গাড়ীর পেছনে নিয়ে তোল্। আর চামড়ার ছোট হাত-বাক্সটাতে শিশি-বোতল কতগুলি আছে, সেটাকে খুব সাবধানে সোজা ক'রে ধ'রে নামাবি, বুঝলি?

বঙ্কু। হ্যাঁ বাবু!

(বাঁ দিক্ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। রাজেন সিঁড়ি বেয়ে উঠছিল, বাইরে ডানদিকের দরজার কাছে মোটরের হর্ণ শুনে নেমে এল ছুটে। ডানদিকের নেপথ্যের কাছে গিয়ে বাইরের দিকে একটু ঝুঁকে দেখে ছুটে সিঁড়ির কাছে ফিরে গিয়ে)

সুমি, সুমি! এম্বুলেন্স এসে গেছে। (সুমি তখন নামছিল সিঁড়ি বেয়ে।) এম্বুলেন্স এসে গেছে সুমি।

(বঙ্কু ও ড্রাইভার ঢুকে দাঁড়াল বাঁদিক্‌কার নেপথ্যের এক পাশে।—ড্রাইভার রাজেন ও সুমিকে সেলাম করল। ডানদিক্ থেকে বিভাও এসে ঢুকল হলঘরে। ড্রাইভার তাকেও সেলাম করল।)

বঙ্কু, সুটকেস এখন থাক্, সে-সব পরে নিলেও চলবে। তুই আপাততঃ আর একটা লোক জোগাড় ক'রে আন্ দেখি। যে লোকটা গাড়ী ধোয় সে কোথায় আছে দেখ্। তাকে যদি না পাস ত রাস্তার থেকে একটা মুটে বা রিক্সওয়ালা ধ'রে আন। দু'জন নীচে ধরবি, দু'জন উপরে, দাদুকে চেয়ারে বসিয়ে নামাতে হবে।

বঙ্কু। আচ্ছা বাবু!

(ড্রাইভারকে নিয়ে বেরিয়ে গেল বাঁদিক্ দিয়ে।)

রাজেন। আমারই দোষ; আর একটা লোক

আগে থেকেই ঠিক ক'রে রাখা উচিত ছিল আমার। মাথাটার মধ্যে কিছু কি আর আছে ছাই?

বিভা। খুব কিছু ছিলও না কোনোদিন।

(একটা ষ্ট্রেচার নিয়ে এম্বুলেন্সের দু'জন উর্দ্দিপরা লোক ঢুকল। তারা ষ্ট্রেচারটা নামিয়ে রেখে স'রে দাঁড়াল একপাশে।)

রাজেন। আরে, এরা ষ্ট্রেচারই একটা নিয়ে এসেছে দেখছি যে!

বিভা। তাই আসাটাই নিয়ম।

রাজেন। এম্বুলেন্সের সঙ্গে কারবার ত করি নি আগে কখনো, তাই সেটা জানা ছিল না। (বিভাকে একটু ঠেলে দিয়ে) তুই সর্, দেখি একটু।...এসো তোমরা।...এই যে, এদিকে।

(ষ্ট্রেচার-বেয়ারারা ষ্ট্রেচারটা তুলে নিয়ে রাজেনের পেছন-পেছন সিঁড়ির দিকে যাচ্ছে, সুমি যাচ্ছে তাদের পেছনে, এমন সময় দেখা গেল, শশাঙ্ক টলতে টলতে মিড্‌ল্যাণ্ডিং-এ নেমে এসে দাঁড়িয়েছেন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই একটু টলছেন। "বাবা! ওকি?" ব'লে সুমি ছুটে গিয়ে তাঁকে ধ'রে ফেলল, রাজেনও ছুটে গিয়ে আর একদিক থেকে তাঁকে ধরল। ষ্ট্রেচার-বেয়ারারা ষ্ট্রেচার নিয়ে দাঁড়িয়েই ইতস্ততঃ করছে। বিভা সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ উঠে দাঁড়িয়ে আছে।)

সুমি। বাবা! তুমি নেমে এলে কেন? তুমি কেন নেমে এসেছ?

রাজেন। তাই ত, আপনি নেমে এলেন কেন? আপনার যে বিছানাতে উঠে বসাও এখন বারণ।

শশাঙ্ক। এরা যে ষ্ট্রেচার নিয়ে আসবে তা ত জানতাম না বাবা! ভাবলাম, বন্ধুরা আনাড়ী লোক, চেয়ারে ক'রে নামাতে গিয়ে ফেলে দেবে, না কি করবে!

সুমি। তুমি ব'সে পড় বাবা, এইখানেই সিঁড়ির এই ধাপটাতে ব'সে পড়। একটুও আর দাঁড়িয়ে থেক না।

শশাঙ্ক। আচ্ছা, তাই বসছি মা!

(বসতে গিয়ে কাঁপতে লাগলেন। হঠাৎ বড় করুণ ভাবে জড়িয়ে ধরলেন সুমিত্রাকে।)

সুমি। (আর্ত্তস্বরে) কি হ'ল, কি হ'ল, কি হ'ল বাবা?

রাজেন। কি বিপদ্!

(বিভা উঠল সিঁড়ির আরও দু'ধাপ, মিড্-ল্যাণ্ডিংএর খুব কাছেই সে এখন। ষ্ট্রেচার-বেয়ারারা ষ্ট্রেচারটা নামিয়ে রেখে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, যেন, দরকার হলেই অবিলম্বে সেটাকে আবার তুলে নিতে পারে।)

শশাঙ্ক। (কথা জড়িয়ে যাচ্ছে) না মা, এ কিছু না, কিছু না, হঠাৎ মাথাটা কেমন যেন ক'রে উঠল।...এই যে, বসছি...এখানেই বসছি...বসছি...

(রাজেন ও সুমি তাঁকে ধ'রে বসিয়ে দিচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ তাঁর দেহ এলিয়ে গেল অসাড় হয়ে। ঝুলে প'ড়ে যাচ্ছিলেন, দু'জনে মিলে ল্যাণ্ডিং-এই তাঁকে শুইয়ে দিল। তাঁর মাথাটা কোলে নিয়ে ব'সে প'ড়ে সুমি, "বাবা! বাবা! বাবা গো!" ব'লে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। রাজেন "কি বিপদ্ রে বাবা।" বলে নেমে এল দু'ধাপ সিঁড়ি।)

রাজেন। বিভা, বিভা! কি করা যায় বল্ দিকি।

বিভা। আমি জল নিয়ে আসছি, মুখে-চোখে জল দিয়ে দেখতে পার।

(ছুটে বেরিয়ে গেল ডানদিক দিয়ে। বন্ধু, ড্রাইভার, ষ্ট্রেচার-বেয়ারা এরা সিঁড়ির একপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। রাজেন নেমে এসে ষ্ট্রেচার-বেয়ারাদের বলছে)

রাজেন। ওঁকে এখুনি এই অবস্থায় এম্বুলেন্সে তোলা ত যাবে না। তোমাদের অপেক্ষা করতে হবে খানিকক্ষণ।

একজন ষ্ট্রেচার-বেয়ারা। তা আমরা অপেক্ষা করব সার। ষ্ট্রেচারটা এখানে থাক, আমরা গাড়ীতেই বসি গে যাই।

(বিভা একটা কাচের পাত্রে ক'রে জল নিয়ে এসে শশাঙ্কর মুখে-চোখে দিচ্ছে। শশাঙ্কর কানের কাছে মুখ নিয়ে সুমি ডাকছে, "বাবা, বাবা, কি কষ্ট হচ্ছে বাবা? বাবা গো!" রাজেনের দিকে ফিরে, "শীগগির ডাক্তার ব্যানার্জ্জিকে খবর দাও, একটুও দেরি না ক'রে চ'লে আসতে বল।")

অপর ষ্ট্রেচার-বেয়ারা। ওখানে সিঁড়িতে ওঁর কষ্ট হচ্ছে, আমরা বরং ষ্ট্রেচারে ক'রে ওঁকে ওঁর শোবার ঘরে নিয়ে যাই।

রাজেন। তাই যাও, তাই যাও। কি গেরো রে বাবা! আর তাও ঠিক এই যাবার মুখে। (টেলিফোনে গিয়ে নম্বর চাইল।)

(সুমি নাড়ী দেখছে শশাঙ্কর; কখনো চুলে অঙ্গুলি-চালনা করছে, কখনো হাতে হাত বুলচ্ছে। মাঝে মাঝে ডাকছে, "বাবা, বাবা!" বিভা নেমে

এসে রাজেনের পাশে দাঁড়াল। ষ্ট্রেচার-বেয়ারারা সিঁড়ি উঠছে ষ্ট্রেচার নিয়ে।)

হেলো! কে, কে, ডাক্তার ব্যানার্জ্জি?···ডাক্তার ব্যানার্জ্জি, আমি রাজেন কথা কইছি।···শ্বশুরমশায় সিঁড়ি নামতে গিয়ে হঠাৎ প'ড়ে গেলেন।···আজ্ঞে না।··· আজ্ঞে না, আমরা জানতেই পারি নি।···মনে হচ্ছে জ্ঞান নেই। আপনি শীগগির চ'লে আসুন।

(রিসিভারটা রেখে)

কি গেরো, কি গেরো! কি গেরোরে বাবা!!

দৃশ্যান্তর।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(দু'তলায় সুমির বসবার ঘর। শনিবার সন্ধ্যা। ডানদিকের দরজা ঠেলে সুমি ঢুকল, তার পেছন-পেছন ডাক্তার ব্যানার্জ্জি। ডাক্তার ব্যানার্জ্জিকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে সুমি দরজাটাকে ভেজিয়ে দিয়ে এল।)

সুমি। (অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সুরে) কেমন দেখলেন এ বেলায়?

ডাক্তার। মনে ত হচ্ছে এবারকার মতো সামলে গেলেন। কিন্তু কোনোরকম নাড়ানাড়ি করা ওঁকে বেশ কিছুদিন এখন চলবে না।

সুমি। আমার এখন আবার এই আর-এক ভাবনা জুটল। আমার কলকাতা ছেড়ে যাওয়া হ'ল না দেখে বাবা আবার না আগের মতো গোলমাল সুরু করেন!

ডাক্তার। এটা অবিশ্যি দুঃখেরই কথা, তবে গোলমাল করবার মতো অবস্থায় উনি এখন নেই, থাকবেনও না কিছুদিন।···আচ্ছা চলি। (সুমির পিঠে হাত রেখে) কিচ্ছু ভয় পেও না মা। ভয়ের কিছু নেই আর এখন। দরকার হলেই ফোন ক'রো।

(বাঁদিক্ দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। উল্টোদিক্ দিয়ে রাজেনের প্রবেশ।)

রাজেন। ডাক্তার ব্যানার্জ্জি চ'লে গেলেন? কি ব'লে গেলেন?

সুমি। ফাঁড়াটা বোধ হয় কেটে গেছে, তবে খুব সাবধানে রাখতে হবে কিছুদিন ওঁকে।

রাজেন। তোমার তা হলে ত আর যাওয়া হতে পারে না?

সুমি। সে ত এখন একেবারেই অসম্ভব, আর তুমি নিজেই সেটা বেশ জান।

রাজেন। (একটা চেয়ার টেনে ব'সে) আচ্ছা, বিশুটার কি হয়েছে বলতে পার?

সুমি। ডাক্তার ব্যানার্জ্জিকে দেখিয়ে নিলেই ত পারতে? কিছু একটা ওর হয়েছে তা ঠিক।

রাজেন। ডাক্তার সে কিছুতেই দেখাবে না, বলতে গেলে তেড়ে মারতে আসে। কিন্তু আমি সেকথা বলছিলাম না। হঠাৎ কোথাও কিছু নেই, সব গোছগাছ হয়ে যাবার পর ট্রাঙ্ক-সুটকেস সব খুলে কাপড়-চোপড় টেনে বের করছে আর বিছানাময় ছড়াচ্ছে। ব্যাপার কি জানতে চাইলাম, ত তাও প্রথমটা প্রায় তেড়ে মারতে এল, তার পর বলল, ফুল হাতের জামা পরবে, তাই খুঁজছে।

সুমি। যদি খুঁজে না পায় ত আমাকে বলুক, আমার ফুলহাতের জামা একটা ওকে দিচ্ছি। আমার জামা ত হয় ওর গায়ে।

রাজেন। যাক গে, ওকে আর ঘাঁটাব না, নিজে যা পারে করুক। যত সব বাজে খেয়াল, আর তাও এই যাবার মুখে। ট্রেণটা না মিস্ করিয়ে দেয় তা হলেই বাঁচি।···আমি পারি না এ সব বরদাস্ত করতে, ধাতে নেই। এতটা পথ সব-কিছু সামলে নিয়ে যেতে হবে ভাবতেই আমার গা-হাত-পা কেমন যেন হিম হয়ে আসছে। তুমি সঙ্গে থাকলে কোনো ভাবনা ছিল না, কিন্তু ভগবান্ তা হতে দিলেন কই?

(একটুক্ষণ চুপ ক'রে কাটল।)

তোমাকে একলা ফেলে যাচ্ছি সুমি, ভাল লাগছে না। তবে জানই ত, আমি কিরকম নিদারুণ নিষ্কর্ম্মা মানুষ! আমি এখানে থেকেও কিছু ত করতে পারতাম না তোমাদের জন্যে!

সুমি। ও সব ভেবে আর এখন লাভ কি বল? (উঠে দাঁড়িয়ে খোঁপা ঠিক করছে।)

রাজেন। (উঠে) যাচ্ছ?

সুমি। যাই, দেখি, বাবা কি করছেন।

রাজেন। সেই পুরনো নার্সটিই ত আবার এসেছে দেখলাম। শ্বশুরমশায় খুব পছন্দ করেন ওকে। রাতের নার্সটিকেও ত বেশ ভালই মনে হ'ল। তবে আসল কথা হ'ল, নিখিল আজকালের মধ্যেই এসে পড়বে। ও একাই একশ'। ও এসে পড়লে আর কোনো ভাবনাই থাকবে না।

রাণী এলিজাবেথ স্বামী-পুত্র-কন্যা সহ ছুটি উপভোগ করিতেছেন

আধুনিক মিশরের একটি বাড়ী

দূরের পথে
ফটো : শ্রীশান্তনু মুখোপাধ্যায়

(স্নমি এক পা দু' পা করে ডানদিকের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। রাজেনও এসে দাঁড়িয়েছে তার পেছনেই।)

স্নমি। তুমি নির্ভাবনায় চ'লে যাও।

রাজেন। একটা কথা ব'লে যাই স্নমি। সত্যি সত্যিই খুব সন্দেহ নিখিলকে কোনোদিনই আমি করি নি। একটুও যে করেছিলাম লোকের কথা শুনে, এখন বুঝতে পেরেছি সেটা আমার অন্যায়ই হয়েছিল। ওকে আমার হয়ে তুমি বলো, ওর এ বাড়ীতে আসতে থাকতে আমার দিক্ থেকে কোনো বাধা নেই।

(ডানদিকের দরজা দিয়েই বিভা ঢুকল। তিন-জনেই তারা এখন দরজাটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।)

বিভা। কার কথা বলছ, দাদা?

রাজেন। এই, শ্বশুরমশায়ের কথা হচ্ছিল আর কি!

বিভা। কিন্তু এ বাড়ীতে আসতে থাকতে বাধা নেই বলছিলে, সেটা কার কথা?

রাজেন। বলছিলাম যে, বাড়ীতে পুরুষমানুষ ত কেউ রইল না। মাইনে-করা গোমস্তা জাতীয় একটা লোক যদি পাওয়া যায়, একটু বুড়ো-সুড়ো গোছের, ত তার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা এ বাড়ীতেই হতে পারে।

বিভা। হ্যাঁ, সে হলে ত খুব ভালই হয়।

রাজেন। ফুল হাতের জামা ত একটা পেয়েছিস দেখছি। তা কাপড়-চোপড় যা বের ক'রে ছড়িয়েছিলি বিছানায় সেগুলো আবার গুছিয়ে রেখেছিস্ ত?

বিভা। হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। তোমার নিজের সব গোছান হয়েছে ত?

রাজেন। সে ত স্নমি দিয়েছে সব ঠিক ক'রে।... আচ্ছা, স্নমি, তাসজোড়া দিয়েছ?

স্নমি। দিয়েছি। আচ্ছা, আমি একটু বাবাকে দেখে আসি, তোমরা বস।

(ডানদিকের দরজাটা খোলাই ছিল, স্নমি বেরিয়ে গেল। বিভা ভিতরের দিকে স'রে এসে একটা চেয়ারে বসল।)

বিভা। শোন।

(রাজেন এগিয়ে এল তার দিকে।)

যদি বেশী হৈ-হল্লা না কর ত একটা কথা বলি।

রাজেন। যাবার মুখে একটা বাগড়া দেবার ফিকিরে আছিস বুঝি?

বিভা। পাগল! ঠিক তার উল্টো।

রাজেন। কি, কথাটা কি বল?

বিভা। কয়েকটা চিকেন পোকা বেরিয়েছে দু' হাতে। পিঠেও কয়েকটা বেরিয়েছে। ফুলহাতের জামা কি আর অমনি পরেছি? (হাসছে।)

রাজেন। কি সর্ব্বনাশ! আর এই নিয়ে তুই হাসছিস? দেখি, দেখি।

(বিভা জামার আস্তিন গুটিয়ে নিলে ঝুঁকে পড়ে দেখল।)

কি সর্ব্বনাশ। চিকেন পক্স ব'লেই ত মনে হচ্ছে! তুই তা হলে যাবি কি ক'রে এখন?

বিভা। কেন, ফুলহাতের জামা প'রে। কে জানছে?

রাজেন। কিন্তু রণধীরবাবু কোনো একসময় জানতে ত পারবেন? তখন ভয়ে তাঁর আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যাবে যে!

বিভা। (হাসতে হাসতে) বেশ হবে, খুব ভাল হবে। যাকে বলে, hoist with thy own petard, তাই তিনি হবেন। যেমন বোমার ভয় দেখিয়ে অন্যদের আত্মারাম খাঁচাছাড়া ক'রে এসেছেন এতদিন!

(দু'জনেই হাসছে।)

জানতে পেরে দেওঘর ছেড়ে যদি পালান ত তোমার অনেক খরচ বেঁচে যাবে দাদা।

রাজেন। সেইটি অবিশ্যি পেরে উঠবেন না। ওঁর স্ত্রীকে দেখেছিস ত? যেমন বুদ্ধিমতী, তেমনি সাহসী! চিকেন পক্সের ভয়ে স্বামীকে পালাতে দেবেন না।

বিভা। তা হলে ত আরও বেশী জমবে। উঃ, কি জব্দই যে হবেন ভদ্রলোক!

(তার হাসি আর থামতে চায় না। বাঁদিকের দরজায় টোকার শব্দ, সঙ্গে সঙ্গে রণধীরের গলা, "আসতে পারি?")

রাজেন। (উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিয়ে খুব গম্ভীর মুখে) আসুন, আসুন, নমস্কার!

(রণধীরের প্রবেশ।)

রণধীর। নমস্কার, নমস্কার!

(বিভা প্রতিনমস্কার করলে)

মনে হচ্ছে খুব একটা মজার কথা হচ্ছিল, আমি এসে বাধা দিলাম।

বিভা। (হেসে) মজারই কথা বটে, তবে কিনা দেওঘর না গেলে মজাটা পুরোপুরি জমবে না।

রণধীর। তা ত জানিই, আর সেইজন্যেই ত যাবার এত তাড়া।

(বিভা ও রাজেন দু'জনেই হাসছে।)

রাজেন। আপনি দাঁড়িয়ে কেন রইলেন? এসে বসুন না?

(Thanks বলে রণধীর এসে বসলে রাজেনও বসল তাঁর পাশে।)

রণধীর। বাড়ীতে আপনার শ্বশুরমশায়ের যা অবস্থা, তাতে একবার খবর নিতে আসতে হ'ল, আপনাদের আজ যাওয়ার প্ল্যানটা ঠিক আছে কি না।

রাজেন। প্ল্যান ঠিকই আছে। আর এখন বদলাবে না।

রণধীর। (বিভার দিকে ফিরে) আপনি কেমন আছেন আজ ?

বিভা। ভালই আছি। জ্বরটা ছেড়ে গেছে।

রণধীর। জ্বর হয়েছিল নাকি ? কি বিপদ্!

বিভা। জ্বর ছেড়ে গেলেও বিপদ ?

রণধীর। Eruptive fever অনেক সময় eruption বেরুবার মুখে ছেড়ে যায়। সেরকম কিছু নয় নিশ্চয়ই ?

(উঠে দাঁড়িয়ে বিভার দিকে একটু ঝুঁকে)

আপনার কপালের পাশে ওটা কি ?

বিভা। (একটু বিব্রতভাবে কপালের পাশটায় হাত দিয়ে) ও, ওটা ? মশা কামড়েছে।

রণধীর। কিন্তু কেমন যেন ফোস্কার মত দেখাচ্ছে !

বিভা। তা হবে না ? কত বড় বড় সব মশা এ বাড়ীতে !

রণধীর। কিন্তু—

বিভা। আর কিন্তু না। এবারে আপনি বাড়ী যান। বেশী দেরি করলে ট্রেন মিস্ করবেন।

রণধীর। এই যাচ্ছি। আচ্ছা, নমস্কার, নমস্কার ! স্টেশনে দেখা হবে।

রাজেন। নমস্কার ! হ্যাঁ, স্টেশনে দেখা হবে।

(রণধীর বেরিয়ে গেলেন বাঁদিক্ দিয়ে। বিভা আবারও হাসছে।)

বিভা। মজাটা যা হবে !

রাজেন। (দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে ফিরে এসে) তোর মুখে কি কেবল ঐ একটাই বেরিয়েছে ?

বিভা। (নিজের কপালে গালে হাত বুলিয়ে দেখে) তাই ত মনে হচ্ছে।

রাজেন। দেখি।

(চিবুক ধ'রে বিভার মুখটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে)

না, ঐ একটাই—আর বেরোয় নি। ভাগ্যিস্ ! না হলে ত তোকে বোরখা পরতে হ'ত।

বিভা। সারাদিন বৌদির চোখের সামনে ঘুরেছি, আশ্চর্য্য যে সে দেখতে পায় নি !

রাজেন। নিজের বাপকে নিয়েই হাবুডুবু খাচ্ছে ত ? আর তাছাড়া তোর অসুখ নিয়ে তোকে কিছু বললে তুই যেরকম তেড়ে মারতে আসিস্, ভয়েই হয়ত কিছু বলে নি।

বিভা। তা হবে।

(ডানদিক্ থেকে সুমির প্রবেশ।)

সুমি। রাতের রান্না আজ সকাল সকাল করিয়ে নিয়েছি, তোমরা একটু তাড়াতাড়ি খেয়েদেয়ে তৈরি হয়ে নাও। টিফিন্-কেরিয়ারে ক'রে দিতে পারতাম, কিন্তু ট্রেনে যা ভিড় হয় ব'লে শুনেছি, ব'সে খেতে পারবে ব'লে ভরসা হ'ল না।

(বাঁদিকে নেপথ্যের কাছে গিয়ে)

বন্ধু, বন্ধু !

(দূর থেকে বন্ধুর গলায়, যাই মা !)

ফ্লাস্কে খাবার জল দিয়েছি, মুখ ধোওয়া-টোওয়া কুঁজোর জলে ক'রো, ট্রেনের জল মুখে দিও না।

(বাঁদিক্ থেকে বন্ধুর প্রবেশ।)

বন্ধু, শোন। হল্‌ঘরে যে-সব মালপত্র নামানো রয়েছে সেগুলো গাড়ীতে তোল। যেখানে যত মাল ধরে তুলবে, গাড়ীতে এখন কেউ যাবে না, কেবল তুমি যাবে ড্রাইভারের পাশে ব'সে। স্টেশনে মাল নামিয়ে তুমি ব'সে পাহারা দেবে, ড্রাইভার ফিরে এসে আর এক ক্ষেপ মাল নিয়ে যাবে। তার পর তিনবারের বার বাকী জিনিস নিয়ে এঁরা যাবেন। বুঝলে ?

বন্ধু। আজ্ঞে হ্যাঁ, মা !

(বন্ধুর প্রস্থান, বাঁদিক্ দিয়ে।)

সুমি। তোমরা মুখহাত ধুয়ে তৈরি হয়ে নাও, খেতে বসবে।

(ডানদিক্ দিয়ে প্রস্থান।)

রাজেন। যাবার সময় যত কাছে আসছে ততই মনটা খিঁচড়ে যাচ্ছে কিরকম !

বিভা। তুমি এক আজব চিজ্। এই যাবার জন্যে পৃথিবী রসাতলে দিচ্ছিলে !

রাজেন। সুমি একলা কি ক'রে সামলাবে সব ?

বিভা। একলাই ত বরাবর সামলেছেন !

রাজেন। তা বটে, তবু মনটা কি একরকম করছে যেন ! যাওয়ার জন্যে সে উৎসাহটা যেন আর নেই।

বিভা। আমারও মনটা কিরকম করছে। আমারও যাওয়ার উৎসাহে ভাঁটা প'ড়ে আসছে এক-এক সময়।

রাজেন। কেন রে, তুই আবার কি ভেবে মন খারাপ করছিস ?

বিভা। দেওঘরে গিয়ে ঐ রণধীরবাবুটিকে দিনে

রেতে দেখতে হবে, এই কথা ভেবে। লোকটিকে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না।

(সাইরেণ বাজছে।)

রাজেন। ওরে চল্, চল্, নীচে চল্।

(বিভা উঠে গিয়ে জানালা বন্ধ করছে। রাজেন আলোটা নিবিয়ে দিয়ে ডানদিক্কার দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।)

বিভা। তুমি যাও দাদা, আমি একেবারে তৈরি হয়েই নীচে যাব।

রাজেন। কিন্তু আর শীগ্‌গির, দেরি করিসনে। আশা করি গাড়ীর সময়ের আগেই অল্ ক্লিয়ার দেবে। মানে মানে এখন বেরিয়ে পড়তে পারলেই বাঁচি। আর দুটো ঘণ্টা ভালয় ভালয় কাটিয়ে দাও, হে ভগবান্। (বলতে বলতে প্রস্থান।)

দৃশ্যান্তর।

তৃতীয় দৃশ্য

(রাজেন্দ্রের বাড়ীর একতলার হলঘর। কোলের ওপর একটা পাতা-খোলা বই নিয়ে সুমি ব'সে আছে একটা সোফায়, হুড্ দেওয়া তিনটে আলোর মাঝের-টার ঠিক নীচে। তার পাশে তার দিকে মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে রাতের নার্স, কিঞ্চিৎ স্থূলকায়া বয়স্কা মহিলা, গায়ের রঙ্ মিশ্ কালো।)

নার্স। রাত ত অনেক হ'ল, আপনি এবার গিয়ে শুয়ে পড়ুন। যদি হঠাৎ দরকার হয়, তখন ত আবার উঠতে হবে ?

সুমি। বাবার বিছানার পাশে রাত জেগে জেগে কেমন অভ্যাস হয়ে গিয়েছে, শুলেও এখনই ঘুম আসবে না।

নার্স। তা বললে কি হয় ? এখনো কতদিন এরকম চলবে কে জানে ? ফাঁকে ফাঁকে একটু ঘুমিয়ে না নিলে নিজে অসুখে পড়বেন যে !

সুমি। আপনি ঠিক কথাই বলছেন, কিন্তু ঘুম না এলে কি করব ?

নার্স। চোখ বুজে শুয়ে থাকলেও যে অনেকটা কাজ হয়।

সুমি। আচ্ছা, বাবা একলা রয়েছেন, আপনি এখন যান। ওঁকে ঘুমের ওষুধটা দেওয়া হয়েছে ?

নার্স। ওসব প্রশ্ন আমাকে করবেন না, দেখুন। পঁচিশ বছর নার্সের কাজ করছি, আমার কাজে কেউ গাফিলি ধরতে পারে নি কোনোদিন। আর ওঁকে একলা ফেলে কি অমনি এসেছি ? অঘোরে ঘুমোচ্ছেন দে'খে তবে না আসতে সাহস করেছি। আর সম্ভব হলেই রুগীকে একলা রাখতে হয়, জানেন ত ? তার ঘরের হাওয়ায় অন্য লোকের নিঃশ্বেস,—তা সে হ'লই বা নার্স, যত কম মেশে ততই ভাল কি না ?

সুমি। তবে না হয় একটা চেয়ার নিয়ে ওঁর দরজার সামনে করিডরে ব'সে থাকুন গিয়ে। উনি জেগে গেলে আমাকে এসে ডেকে নিয়ে যাবেন।

নার্স। ওঁকে জেগে থাকতে দিচ্ছে কে ? মাথায়, পিঠে, হাতে পায়ে হাত বুলিয়ে তখুনি আবার ঘুম পাড়িয়ে দেব না ?

সুমি। আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে ঐগুলো করবেন, আমি দূরে দাঁড়িয়ে দেখব। আমারও তা হলে শেখা হয়ে যাবে।

নার্স। এ ত খুব ভাল কথা। শিখে রাখতে হবে বৈকি ? নার্স ত আর চিরকালের জন্যে কেউ রাখে না ? শিখুন, খুব ভাল কথা। কত পাকা নার্সেরা আমার কাছে শিখছে।

সুমি। (বইটা বন্ধ ক'রে) মনে হ'ল বাবা যেন ডাকলেন।

নার্স। তাই নাকি ? না, না, কই, আমি ত শুনতে পাই নি ?

সুমি। আমার মনে হ'ল, আমি স্পষ্ট শুনলাম।

নার্স। তাই নাকি ? আমি যাচ্ছি, যাচ্ছি।

(সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলে সুমি একটু মুচকি হেসে আবার বই খুলে বসল। একটু পরে বাঁদিক্কার নেপথ্যে বঙ্কুর গলা শোনা গেল,—মা, একটু এদিকে দে'খে যাবেন ?)

কে ? বঙ্কু ? এসো বঙ্কু !

(বঙ্কুর প্রবেশ)

কি বঙ্কু ?

বঙ্কু। (নেপথ্যের কাছ-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে) ড্রাইভার আমাকে পাঠিয়ে দিলে মা, আপনাকে বলতে—কাল ভোরের গাড়ীতেই সে দেশে চ'লে যাচ্ছে।

সুমি। ও ! আচ্ছা। ওর মাইনে কত পাওনা হয়েছে জেনে এসে আমায় বল, আমি দিয়ে দিচ্ছি।

বঙ্কু। মাইনে সে বাবুর ঠেঙে হিসেব ক'রে নিয়ে নিয়েছে মা।

সুমি। ও !

বঙ্কু। আর মা, আমারও একটা আপত্তি আছে।

আমাকেও দিনকতকের ছুটি দিতে হচ্ছে। দেশে তেনারা বড় ভয় পাচ্ছেন কিনা?

সুমি। সবাই চ'লে যাচ্ছে, একলা তোমাকে কি ব'লে আমি ধ'রে রাখব? তা, আর দুটো দিন সবুর করতে পার না বঙ্কু? নিখিলবাবু হয়ত তার মধ্যেই এসে পড়বেন। তিনি এলে তারপর যেও?

বঙ্কু। সবুর ত এতদিন করলাম মা। আরও আগেই চ'লে যাচ্ছিলাম, বাবু অনেক ক'রে বলতে তাঁকে কথা দিয়েছিলাম, তিনি যতদিন না যাবেন, আমিও যাব না। তা আমার কথা ত আমি রেখেছি মা!

সুমি। তা অবিশ্যি তুমি রেখেছ। আচ্ছা বঙ্কু—তোমার মাইনেটার হিসেব এখনই করব কি? কাল ক'টায় তোমার ট্রেন?

বঙ্কু। বাবু ত আজ অবধি নিয়ে হিসেব ক'রে মাইনে দিয়েই গেছেন মা!

সুমি। ও! আচ্ছা।

(বইয়ের পাতা খুলে বসল, আধশোয়া হয়ে।)

বঙ্কু। মা, আপনারা সবাই চ'লে যাবেন ঠিক হতেই দেশে তেনাদের চিঠি দিয়েছিলাম, আমি যাব।

সুমি। (বইয়ের পাতার থেকে চোখ না তুলে) তুমি যখন খুশি যেতে পার বঙ্কু।

(বঙ্কুর প্রস্থান ও একটু পরে পুনঃ প্রবেশ।)

বঙ্কু। আচ্ছা, মা! এক কাজ করলে হয় না?

সুমি। (আধশোয়া হয়েই বঙ্কুর দিকে চোখ ফিরিয়ে) কি কাজ, বল।

বঙ্কু। আমার মুনিব ত শুধু বাবু নন, আপনিও ত আমার মুনিব?

সুমি। বল, কি বলতে চাও?

বঙ্কু। আপনি যদি আমাকে ছুটি না দেন।

(বঙ্কু ঠিক কি বলতে চাইছে বুঝতে না পেরে সুমি সোজা হয়ে উঠে বসল।)

সুমি। কিন্তু ছুটি যে তুমি চাইছ বঙ্কু?

বঙ্কু। ছুটি কি চাইলেই পাওয়া যায় মা? মুনিব নিজের সুবিধা-অসুবিধা দেখবেন ত?

সুমি। (হেসে) বুঝেছি বঙ্কু! আচ্ছা, তোমার ছুটি মঞ্জুর হ'ল না। তুমি থাক।

বঙ্কু। আমি থাকব মা। থাকতেই হবে; ছুটি না পেলে কি আর করব? তেনাদের লিখে দিচ্ছি ছুটি পাই নি, কিছু টাকাও পাঠিয়ে দিচ্ছি সেই সঙ্গে। বড় আশা ক'রে আছেন কিনা মা?

(বঙ্কুর প্রস্থান। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সাইরেণ। বঙ্কু ফিরে এসে হলের ভেতর দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল ডানদিকে। বাইরে ডানদিক থেকে দরজা-জানালা বন্ধ করার শব্দ। এরোপ্লেনের শব্দ।...একাধিক এরোপ্লেনের শব্দ।...দূরে একটা বোমা ফাটল।...আর একটু কাছে একটা বোমা ফাটল।...দূরে এ্যান্টিএয়ারক্রাফ্‌ট্‌, কাছে এ্যান্টিএয়ারক্রাফ্‌ট্‌।...সুমি ছুটতে ছুটতে উঠে গেল উপরে। বঙ্কু ডানদিক থেকে ছুটে এসে আলোগুলো নিবিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল বাঁদিক্ দিয়ে। হল অন্ধকার হয়ে গেল, তবে ল্যাণ্ডিং-এর ওপর থেকে অস্পষ্ট একটু আলো এসে পড়াতে সবকিছুই আবছা-আবছা চোখে পড়ছে।...এবারে খুব কাছেই একটা বোমা পড়ল ব'লে মনে হ'ল।...আরও একটা পড়ল। দূরে, কাছে, একসঙ্গে ভীষণবেগে এ্যান্টিএয়ারক্রাফ্‌ট্‌। শব্দে কানে তালা লেগে যাচ্ছে। সমস্ত বাড়ীটা কেঁপে-কেঁপে উঠছে যেন।...এর মধ্যেই নিখিল এসে ঢুকল। হলের চার-পাশটা দেখে নিয়ে হাতের র‍্যাশন্ ব্যাগ থেকে গুটি তিন-চার আপেল, কয়েকটা কমলালেবু, একগোছা আঙুর বের ক'রে সোফাসেটের টেবিলটার ওপর রাখল। তার পর সোফার একটা হাতার ওপর শরীরের ভর রেখে পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে রইল, দুটো হাত জোড় ক'রে সামনে ঝুলিয়ে।...এ্যান্টিএয়ার-ক্রাফ্‌টের শব্দ একটু পরে পরে হয়ে থেমে গেল।...এরোপ্লেনের শব্দও ক্রমে মৃদু হয়ে আসছে।...এবারে একটা মাত্র এরোপ্লেনের শব্দ আসছে দূর থেকে, আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। একটু পরে সব চুপচাপ।...সুমি নামছে-সিঁড়ি বেয়ে। নিখিল উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াল। সুমি বেশ তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে নামছিল, নিখিলকে দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়াল। নিখিল নড়ছে না, হাত তুলে নমস্কারও করল না, একদৃষ্টে সুমিকে দেখছে। সুমিও নিখিলকে দেখছে। তার দিক্ থেকে চোখ না ফিরিয়েই এক পা এক পা ক'রে রেলিং ধ'রে ধ'রে খুব আস্তে নীচে নেমে এল। নিখিল গিয়ে আলো জেলে দিয়ে এল, একটা ঘোমটা-পরা আলোর নীচেই দু'জনে এবার দাঁড়িয়েছে।)

সুমি। (একটু ম্লান হেসে) বসুন!

(নিখিল দাঁড়িয়েই রইল। যেন বসতে গেলেই চোখ ফেরাতে হয় ব'লেই বসল না।)

কখন এসেছেন?

নিখিল। কলকাতায় এসে পৌঁছেছি ঘণ্টা দুই হ'ল।

নার্সিং হোমে গিয়ে সব শুনলাম। সেখান থেকে এই আসছি। কেমন আছেন মেসোমশায়?

সুমি। বাঁদিকটায় একটু Paralysis-এর মতো হয়েছিল, সেটা সেরে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। আজ বাঁ পা'টা গুটোতে মেলতে পারছেন। বাঁ হাতের আঙুল-গুলোও মুড়তে পারছেন, যদিও মুঠিতে জোর নেই তেমন।

নিখিল। আপনি ভাববেন না, উনি সেরে উঠবেন। ওঁকে সারিয়ে তুলবার জন্তে প্রাণ পণ করবে এমন একজন মানুষ ওঁর কাছে ত ছিলই, এবার দু'জন থাকবে। দু'জনই বা কেন বলছি; বন্ধু বলছিল, তার আর ড্রাইভারের ছুটি নাকি মঞ্জুর হয়েই গিয়েছিল, কিন্তু বন্ধু আপনাকে ছেড়ে যাবে না। আর ড্রাইভারও নাকি শেষ পর্য্যন্ত যাবেই না এখন, ঠিক করেছে।

সুমি। বন্ধু যাবে না তা জানি। ড্রাইভারের কথাটা জানতাম না।

নিখিল। আর এদেরই আমরা ছোটলোক বলি। এরা ছোটলোক! আপনি জানেন, কর্ত্তব্য ব'লে নয়, কেবল আপনাকে ভালবাসে ব'লে ওরা প্রাণের মায়া না ক'রে আপনার কাছে থেকে যাচ্ছে, যে আপনি ওদের কেউ নন? আর এই ভদ্রলোকদের দেখুন!

(সুমি কোনো কথা না ব'লে অত্যন্ত করুণ মুখের ভাব ক'রে একটু হাসল।)

মনুষ্যত্ব কথাটার মানে এই ছোটলোকেরা জানে না, হয়ত কথাটা শোনেও নি কোনোদিন। একবারও ভাবছে না, খুব বড় একটা কিছু করছে, কিন্তু করছে।

সুমি। (ব'সে) নিখিলবাবু, বসুন। এই কথাগুলো এখন থাক। অন্ত কথা কিছু বলুন। কেমন ছিলেন দেওঘরে, কতরকমের অসুবিধা সেখানে হয়েছে, এইসব একটু শুনি।

(নিখিল এবার একটা চেয়ার টেনে এনে সুমির পাশে বসল।)

নিখিল। দেওঘরে ভাল ছিলাম না। আর কি অসুবিধা সেখানে আমার হয়েছিল, যদি সত্যিই আমি বলি, শুনতে আপনার হয়ত ভাল লাগবে না।

সুমি। তা হলে থাক।

নিখিল। কিন্তু আমার কি অসুবিধা হয়েছিল সেখানে, সেটা এখন আর বড় কথা নয়। আমি এখন ভাবছি, যদি আমি দেওঘর না যেতাম, মেসোমশায়ের এই stroke-টা হয়ত হ'ত না।

(সুমি ডানহাতের নখগুলো দেখছে।)

যতদিন বাঁচব, এ দুঃখ আমার মনে থাকবে।

সুমি। অপরাধটা সম্পূর্ণই কিন্তু আমার। আমিই আপনাকে দেওঘরে পাঠিয়েছিলাম।

নিখিল। না। অপরাধ আমার। আমি সেদিন কেন শুনলাম আপনার কথা? আমার কেন সাহস হ'ল না বলতে, যে-লোকগুলোর ভয়ে আপনি আমাকে নির্ব্বাসনে পাঠাচ্ছেন, তারা আপনার কে?

সুমি। আমি কিন্তু ভয় পেয়ে আপনাকে দেওঘরে পাঠাই নি, জানেন? আমি কেবল চেয়েছিলাম, আপনি যে কি, আপনি যে কত বড়, আপনি যে ওদের থেকে কত আলাদা, এইটি ওদের বোঝাব।

নিখিল। এও ত একরকমের ভয়। কি হ'ত ওরা আমাকে ভুল বুঝলে? কি তাতে আমার এসে যেত? কি হয়, যদি আপনি একলা আমাকে ঠিক বোঝেন আর পৃথিবীসুদ্ধ লোক আমাকে ভুল বোঝে?

(সুমির দিকে ঝুঁকে ব'সে)

একটা কথা বলব?

সুমি। (একটু যেন উস্‌খুস্‌ ক'রে উঠল।) আমাকে বিব্রত বা বিপন্ন বোধ করতে হবে না, এমন কথা যদি হয় ত বলুন।

নিখিল। (সোজা হয়ে ব'সে) যাক, আপনি আমার বলাটাকে সহজ ক'রে দিলেন। এরই কথা আমি বলতে যাচ্ছিলাম,—এই সব নানা ধরনের ভয়ের কথা। এই বিব্রত হবার ভয়, বিপন্ন বোধ করবার ভয়, বিভা হেঁয়ালিতে কি বলবেন সেই ভয়, রাজেনবাবুর বোমাকে ভয়, রণবীরবাবুর ছোঁয়াচে রোগকে ভয়। ভয়, ভয়, ভয়!

(উঠে দাঁড়াল সুমির সামনে গিয়ে)

আমি আপনাকে বলছি, পৃথিবীতে এই ভয়ের চেয়ে কুৎসিত কিছু নেই। এটা একটা ব্যাধি, কিন্তু কুষ্ঠ রোগেরই মতো কুৎসিত ব্যাধি, মনটাকে পচিয়ে দেওয়াই হচ্ছে এর কাজ।

সুমি। বসুন!

(ফিরে বসল এসে।)

আমাদের সকলের এই নানারকমের সব ভয়ের পরিণাম মেসোমশায়ের পক্ষে যে কি মারাত্মক হয়েছে তা দেখে আমার ত মনে হয়, এই ভয়ের চেয়ে বড় পাপও আর পৃথিবীতে কিছু নেই।

সুমি। (কপালে হাত রেখে মাথা নীচু ক'রে শুনছিল, এইখানটায় মুখ তুলে) ক'টা বাজল ?

নিখিল। ঐ একটা ভয় আমার নেই তা ত আপনি জানেন ! আপনি যান, শুয়ে পড়ুন গে। মেসোমশায়ের ঘুম যতক্ষণ না ভাঙে, আমি অপেক্ষা করব, বন্ধুকে সেটা বলা আছে। আমি যে ফিরে এসেছি, আছি, এটা ওঁকে না ব'লে আজ আমি যাব না। কিন্তু যাবার আগে আপনি বলুন, বিব্রত বা বিপন্ন বোধ করবেন না, তা হলে আমার অল্প আর যেটুকু বলতে বাকী আছে তা বলি।

সুমি। (চেয়ারে গা এলিয়ে ব'সে) বলুন।

নিখিল। (আবার সুমির দিকে ঝুঁকে) আপনার আর-একটু কাছে আসবার পথে অনেক রকমের অনেক বাধাই ত এতকাল আমার ছিল ? আজ আমি বুঝতে পারছি, তারও বেশীর ভাগ আমার মনের বাধা, ভয়ের বাধা। আমি তাই ঠিক করেছি, এ ভয়কে আর মানব না। আপনার যতটা কাছে আসতে পারি, আসব।

সুমি। খুব কাছেই ত আপনি রয়েছেন ! আপনি ত বাড়ীরই মানুষের মতন। উনিও যাবার আগে আজ ব'লে গেলেন তাই।...আপনাকে ত আমরা পর ভাবি না?

নিখিল। পর না হলেই কি মানুষ আপন হয় ? আর, এ বাড়ীর সবক'টি মানুষই কি আপনার সমান আপন ?

(সুমি উঠে গিয়ে টেবিল-হারমোনিয়মের ওপর রাখা ফুলদানীতে ফুলগুলিকে একটু অন্যরকম ক'রে সাজাচ্ছে, সেখানটায় আলো কম।)

সুমি। আপনি ত আগে কখনও এরকমভাবে আমার সঙ্গে কথা বলতেন না ?

নিখিল। (উঠে দাঁড়াল, কিন্তু সুমির কাছে গেল না।) তার কারণ, এখন আর আমি আগের মানুষ নেই।

সুমি। শুনে আমার যে ভয় করছে ! (শব্দ ক'রে হাসল।)

নিখিল। এ ভয়টাকে আমি ভেঙে দেব।

সুমি। কি ক'রে ভাঙবেন ? তা হলে আপনাকে ত আবার ঠিক আগের মানুষ হয়ে যেতে হয়, যে মানুষটাকে আমি চিনতাম, যাকে ভয় করতাম না। (শব্দ ক'রে হাসল।)

নিখিল। আপনি ঠাট্টা করছেন করুন। আপনি জানেন না, আমার মনটা কিরকম ভ'রে উঠেছে !

(সুমির দিকে দু'পা এগিয়ে গিয়েছিল, এমন সময় হঠাৎ আবার এরোপ্লেনের শব্দ এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এ্যান্টিএয়ারক্রাফট্। বাড়ীটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সব চুপচাপ। শব্দ সুরু হতেই সুমি সিঁড়ির দিকে যাচ্ছিল, শব্দ থেমে যাওয়াতে নিখিলের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে গেল।)

দেখছেন ত ? যে-কোনো মুহূর্ত্তেই সব শেষ হয়ে যেতে পারত। এখনও পারে, এই মুহূর্ত্তে। চারদিকে এই মৃত্যুর তাণ্ডব, এর মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটা সত্যি কথা বলতে কেন ভয় পাব ?

(সুমি তার চেয়ারটাতে ফিরে এসে বসলে তার পাশের চেয়ারটাতে ব'সে)

আর সেটা এমন কথা, যার দাম আমার বাঁচামরার চেয়েও আমার কাছে বেশী। মরি যদি, ব'লে মরতে চাই, আর যদি বেঁচে থাকি ত বেঁচে থাকবার জন্যেই আমাকে বলতে হবে।

সুমি। যথেষ্ট ত বলা হয়েছে। এবারে চুপ করুন লক্ষীটি, please !

(অল্ ক্লিয়ার দিচ্ছে। নিখিল উঠে গিয়ে বাকী আলো ক'টা জ্বেলে দিয়ে সুমির পাশে ফিরে এসে বসল।)

নিখিল। রাগ করলেন ?

সুমি। না, রাগ ঠিক করি নি, তবে—না, না, সত্যি কথাটাই বলব, রাগ একেবারেই করি নি।

নিখিল। (হেসে) সত্যি কথাটা বলতে প্রথমটা একটু ভয় হচ্ছিল, না ? তা সেটা কেটেই যখন গেছে, তখন আর আমাকে চুপ করিয়ে দিতে চেষ্টা করবেন না। আজকের দিনে এই যে বোমা পড়ছে, তার দু'একটা আমাদের ঘুণধরা দু'একটা সংস্কারের উপরে, দু'একটা অকারণ ভয়ের উপরে পড়ুক না ? আমরা মুক্ত হয়ে বাঁচি।

(হঠাৎ সুমির একটা হাত টেনে নিজের হাতে নিল। হাতটিকে আস্তে ছাড়িয়ে নিতে সুমির দেরি হ'ল কিছুক্ষণ।)

সুমি। তর্ক ক'রে নিজের মনের কথাটা আপনাকে বোঝাতে পারি, সে-সাধ্য আমার নেই। আমাকে ক্ষমা করুন।

(মাথা নীচু ক'রে নিখিল দুই করতলে মুখ ঢাকল। তার মাথায় হাত দিতে গিয়ে হাতটা ফিরিয়ে নিল সুমি।)

এ এমন সমস্যা, যার সমাধান্ নেই।

নিখিল। (এক ঝটকায় মুখ তুলে সোজা হয়ে ব'সে) আছে, আছে সমাধান, নিশ্চয় সমাধান আছে। (কথা-

গুলি খুব তাড়াতাড়ি বলছে) সাহস ক'রে সমস্তাটার মুখোমুখি দাঁড়াতে পারি না ব'লে আমরা সেটা দেখতে পাই না। আমার ভয় কেটে গেছে, তাই আমি বলছি, এ সমস্তার সমাধান আমি করবই, যদি বেঁচে থাকি। নিজের প্রাণের দায়ে করব, আর আপনাকে ভালবাসি ব'লে আপনার প্রতি কর্ত্তব্য হিসেবেও করব।

(সুমি উঠে গিয়ে সিঁড়ির নীচে টেলিফোনের কাছটায় হলের সবচেয়ে অন্ধকার জায়গাটাতে গিয়ে দাঁড়াল। নিখিলও গিয়ে দাঁড়াল তার পাশে।)

একটা কথা জিজ্ঞেস করব, উত্তর দেবেন ?

সুমি। দেব।

নিখিল। আমি ত পুরোপুরি ধরা দিয়েছি। আপনার মনের কষ্টিপাথরে আমার কি দাম উঠল, সেটা কি কোনোদিনই আমার জানা হবে না ?

সুমি। নাই বা জানলেন !

(বাইরে ট্যাক্সির হর্ণের শব্দ। সদর দরজা খোলার শব্দ। বাঁদিকে জুতোর শব্দ। দু'জনে উৎকর্ণ হয়ে বাঁদিকের দরজার দিকে তাকিয়ে আছে। দরজাটাকে ঠেলে খুলে রাজেন ঢুকল। সুমি এগিয়ে গেল তার দিকে।)

সুমি। কি ব্যাপার ?

রাজেন। সুমি। সুমি। কেমন আছ সুমি ?

সুমি। (একটা চেয়ার দেখিয়ে) বোস।...ট্রেণ মিস্ করেছ ?

রাজেন। না, না, ট্রেণ মিস্ করি নি। ট্রেণ কেন মিস্ করব ? কলকাতার উপরে কি ভীষণ রেড হয়ে গেল একটা জানো না। উঃ, কত লোক যে মরেছে ! স্টেশনে সবাই বলছিল, খিদিরপুরটা নাকি আর নেই !

(সোফাটায় ধপ্ ক'রে বসল।)

ওরে বাবা রে ! কি বিপদেই যে পড়েছিলাম ! অল্ ক্লিয়ার দিতেই চ'লে আসছিলাম ; তা বাড়ীর কাছাকাছি আসতেই আবার এরোপ্লেন, এ্যান্টিএয়ারক্রাফট্। তখন কোন্ গর্ত্তে যে সেঁধোই।...এক গেলাস জল দেবে সুমি ?

(সুমি জল আনতে যাচ্ছে। নিখিল টেলিফোনটার পাশে আধ-অন্ধকারে হাল্কা চেয়ারটায় বসল।)

না, না, থাক, যেও না। জল উপরে গিয়েই খাব এখন, এখানে এসে বোস একটু। ওরে বাবারে !

(সুমি তার পাশে বসল।)

সুমি। চ'লে কেন এলে ? ট্রেণও মিস্ কর নি বলছ ?

রাজেন। আরে, সে অনেক কথা। শুনতে চাও ত বলি।

সুমি। শুনতেই ত চাইছি।

রাজেন। সবাই বলছিল, শহরের বস্তিগুলোর ওপর বোমা ফেলতে ওরা নাকি চায় না। বোমাগুলোর দাম আছে ত ? ওরা নাকি ডক্, জাহাজ, স্টেশন, ট্রেণ এগুলোকে আগে শেষ করবে, যাতে ওদের সঙ্গে লড়বে যারা, তারা এক জায়গা থেকে অন্ত জায়গায় না যেতে পারে সহজে। খিদিরপুরের সব ডক্গুলোকে ত শেষ ক'রে দিয়েছে, এর পরেই নাকি হাওড়া স্টেশনটার পালা। আজই যে কোনো সময় হয়ত—

সুমি। (হেসে) তাই আর স্টেশনে থাকতে ভরসা হ'ল না, না ? ট্রেণেও হয়ত বোমা ফেলবে, ভয় হ'ল ?

রাজেন। তাই ওরা করবে সুমি, তুমি দেখে নিও। হাসি নয় !

সুমি। বিভা কোথায়, ওকে দেখতে পেলাম না ত ? ও কি ওপাশ দিয়ে সোজা নিজের ঘরে চ'লে গেল ?

রাজেন। আরে বল কেন ? সে এক বিপর্য্যয় কাণ্ড ! ওকে যত বলি, বিভা, তুই ফিরে চল্ আমার সঙ্গে, ও কিছুতেই শুনবে না, উল্টে সে কি রাগ ! এই মারে ত এই মারে। রণধীরবাবু কত বোঝালেন— বিদেশবিভুঁই জায়গা, হঠাৎ অসুখবিসুখ কিছু একটা করলে কত বিপদ্ হতে পারে বললেন, কিন্তু কারুর কোনো কথাই শুনবে না সে। সে যাবেই। অগত্যা তাকে রণধীরবাবুর স্ত্রীর জিম্মা ক'রে দিয়েই চ'লে আসতে হ'ল।...তা, নিখিল ওখানে থাকতে থাকতে যদি ওরা পৌঁছে যায়, ত বিভাকে অসুস্থ দেখেও ফেলে চ'লে আসতে সে পারবে না।

সুমি। কিন্তু নিখিলবাবু ত ফিরেই এসেছেন। ঐ ত নিখিলবাবু।

(নিখিল উঠে আলোর দিকে এগিয়ে এসে নমস্কার করল রাজেনকে।)

রাজেন। (গা এলিয়ে দিয়ে) এই রে !

সুমি। কেন, কি হ'ল ?

রাজেন। কি আর হতে বাকী রইল ? অমন একটা অসুখ নিয়েও বিভাটা যে নাচতে নাচতে চ'লে গেল, সেটা খানিকটা নিখিল সেখানে আছে সেই ভরসাতেই ত ? গিয়ে যখন দেখবে, নিখিল নেই দেওঘরে, কি ভীষণ জব্দ হবে বল ত ?

সুমি। তার এখন কি করা যাবে ? তোমার বোনের খিদ্মত করাটা আর ত নিখিলবাবুর কাজ নয় ?

রাজেন। সবচেয়ে জব্দ হবেন রণধীরবাবু। তাঁর স্ত্রী খুব ত দরদ দেখিয়ে বিভার সমস্ত ভার নিয়ে চ'লে গেলেন, কিন্তু দেওঘরে গিয়ে যখন প্রকাশ পাবে, বিভার চিকেন্ পক্স হয়েছে, তখন রণধীরবাবু হয়ত হার্টফেল ক'রেই মারা যাবেন।

সুমি। Passing of a Hero ব'লে আমি তখন ইংরেজীতে একটা কবিতা লিখব। অন্যদের ভয় পাওয়ানো যাদের কাজ, এই রকম শাস্তিই তাদের হওয়া উচিত।

রাজেন। সুমি, তোমার দয়ামায়া একেবারে নেই শরীরে!

সুমি। তোমার ত খুব বেশী আছে? তার এত পরিচয় দিয়েছ এতদিন ধরে যে সে-বিষয়ে আর কথা বলা চলে না।

রাজেন। (উঠে সোজা হয়ে ব'সে) দেখ সুমি, আমার দোষ হ'ল, আমি মানুষটা একটু ভীতু-স্বভাবের। ভয় পেয়ে পালাচ্ছিলাম, আবার ভয় পেয়েই ফিরে এলাম, পালাতেও পারলাম না। কিন্তু বিশ্বাস কর, আজ রেড সুরু হয়ে অবধি সারাক্ষণ তোমার কথা ভেবেছি। (নিখিলের দিকে ফিরে) তুমি এসে পড়েছ নিখিল, এতেও আমি খুশীই হয়েছি। সারা পথ ভাবতে ভাবতে আসছিলাম, সুমি একলা রয়েছে, ফিরে গিয়ে না জানি তাকে কি অবস্থায় দেখব।...কতক্ষণ এসেছ নিখিল?

(নিখিল এতক্ষণ একটু দূরে একটা গদিমোড়া চেয়ারের পেছনে হেলান দিয়ে এক পাশে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। রাজেনের কাছে এগিয়ে এল।)

নিখিল। রেড সুরু হবার প্রায় মুখেমুখেই।

রাজেন। বোস নিখিল!

(নিখিলের দিকে একবার তাকিয়ে সুমি একটা চেয়ারে বসলে, নিখিল বসল আর একটা চেয়ারে। রাজেন মাঝখানে, তার এক পাশে সুমি, আর এক পাশে নিখিল।)

রাজেন। নিখিল,..এত কাণ্ড ক'রেও শেষ অবধি কলকাতা ছেড়ে যাওয়া ত হ'ল না। ভাবছি, থেকেই যাব। পালাবার চেষ্টা আর করব না।...তোমাকে কিন্তু আমাদের আগলে থাকতে হবে নিখিল! তোমাকে না হলে আমাদের এমনিতেই চলে না, এর পর ত আরোই চলবে না। তুমি কাছে থাকলে মনে খুব একটা ভরসা থাকে।...আমি বলি কি, এই এয়ার-রেড-ফেডের হাঙ্গামা যতদিন না চুকে যায়, ততদিন তুমি আমাদের সঙ্গে এই বাড়ীতেই থাক না? শ্বশুরমশায়ের দেখাশোনাও তাহলে আরও অনেক ভাল ক'রে করতে পারবে!

নিখিল। (একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে তার পর সুমির দিকে চোখ রেখে) আপনি কি সত্যিসত্যিই চান যে, আমি কিছুদিন থাকি আপনাদের সঙ্গে?

রাজেন। আমি চাই মানে? আমরা সবাই তোমাকে চাই।...সুমি?

সুমি। আমাকে বাদ দিয়ে রেখেই তোমাদের এই আলোচনাটা হলে ভাল হয়।

নিখিল। (হেসে) আলোচনাটা চলবে না বেশীক্ষণ, ভয় নেই। উনি যখন শুনবেন সব কথা, তখন নিজেই আর আমাকে এ বাড়ীতে রাখতে চাইবেন না।

রাজেন। বিভার সেই-সব হেঁয়ালি ক'রে বলা কথা ত?

নিখিল। বিভা হেঁয়ালি ক'রে যা বলতে চাইতেন, আমি সেটা সোজাসুজিই বলছি।

(সুমি উঠে দাঁড়াল, বোঝা গেল সে পালাতে চায়। নিখিলও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল, তার পর সুমির পাশে গিয়ে শান্ত স্বরে)

এঁকে ভালবাসি আমি!

(রাজেন ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে একবার নিখিল ও একবার সুমির দিকে তাকাল, তার পর কি একটা বলতে গিয়ে না ব'লে, চেয়ারেই এলিয়ে পড়ল, উপরের দিকে মুখ ক'রে।)

সুমি। আমি চললাম। (সিঁড়ির দিকে যাচ্ছিল।)

নিখিল। (দৃঢ় স্বরে) যাবেন না, দাঁড়ান!

(তার সবচেয়ে কাছে তখন যে টেবিলটা ছিল, তার একটা প্রান্তে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল সুমি।)

ভালবাসাটা কি এতই বেশী ভয়ের জিনিস, যে তার নাম হতেই পালাতে হবে?

সুমি। (কাঁপা গলায়) আপনার মত নিরঙ্কুশ হওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব নয়!

রাজেন। (যে ভাবে গা এলিয়ে ছিল, সেই ভাবে থেকেই) নিখিল, তোমাকে আমি বরাবর অত্যন্ত বেশী বিশ্বাস ক'রে এসেছি। বিভা বার বার চেষ্টা ক'রেও সে-বিশ্বাস টলিয়ে দিতে পারে নি। আর তুমি...তুমিই শেষকালে, (সোজা হয়ে উঠে ব'সে)...তোমার একটু লজ্জাও করল না, কথাটা বলতে?...আশ্চর্য্য!

নিখিল। না, লজ্জা করে নি। একটুও লজ্জা করে নি। এতটা আমাকে বিশ্বাস করেন জেনেও যদি কথাটাকে লুকিয়ে আপনাকে প্রতারণা করতাম, সেইটেই লজ্জার কথা হ'ত।

রাজেন। (গলাটাকে যথাসাধ্য কর্কশ ক'রে) তা বেশ, লজ্জা কর নি, খুব বাহাদুরি হয়েছে। এখন আমাকে কি করতে হবে? স'রে যেতে হবে?

নিখিল। পৃথিবী শুদ্ধ মানুষ যদি ওঁকে ভালবাসে, ভালবাসতে পারে, আর আপনাকে সে কথাটা এসে বলে তখন স'রে আপনি কোথায় যাবেন?

রাজেন। তোমরা, আজকালকার ছেলেরা, আর-কিছু না শিখে থাক, গুছিয়ে কথা বলতে বেশ শিখেছ। এখন লাভের মধ্যে এই হ'ল, তোমার কাছ থেকে এই দুঃসময়ে একটু-আধটু সাহায্য যা আমরা পেতে পারতাম, বেচারা শ্বশুরমশায় পেতে পারতেন, তারও পথ বন্ধ হয়ে গেল।

নিখিল। খুব অবিচার হবে আমার ওপর, যদি সত্যিই তা হয়।

রাজেন। তুমি কি আশা কর, এই একটু আগে যা তুমি বলেছ, তার পরেও তোমাকে এ বাড়ীতে আর আমি আসতে দেব?

নিখিল। আমি ত সুরুতেই বলেছিলাম, দিতে আপনি চাইবেন না। কিন্তু কেন দেবেন না? কি করেছি আমি?

রাজেন। (চীৎকার ক'রে) কি করেছ তুমি? নিজের মুখে দোষ স্বীকার ক'রে আবার জানতে চাইছ, কি করেছ? আশ্চর্য্য!

(সুমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, তার কাছের একটা চেয়ার ঘুরিয়ে নিয়ে এদের দিকে প্রায় পেছন ফিরে বসল।)

নিখিল। এঁকে ভালবেসে একটুও দোষ করেছি ব'লে আমি মনে করি না।

রাজেন। (গর্জ্জন ক'রে) একে ভালবাসার কি অধিকার আছে তোমার?

নিখিল। রাজেনবাবু! অধীর হবেন না। মনে রাখবেন, একটা মানুষের জীবন-মরণ সমস্যা নিয়ে কথা হচ্ছে। আমার কোনো অধিকার আছে কি না, এ বিচার আমি করি নি, করা প্রয়োজন মনে হয় নি, তার কারণ, অধিকার-অনধিকারের কথা তখনই ওঠে, যখন মানুষের কিছু একটা দাবী থাকে। আমার দাবী ত কিছু নেই!

রাজেন। (ব্যঙ্গের সুরে) ও! দাবী কিছু নেই! তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে বল যে, তুমি একজন নিষ্কাম, নির্ব্বিকার, মহাপুরুষ!

নিখিল। না, তা নয়। আমার দাবী যেমন নেই, আমার কামনারও শেষ নেই। চাই আমি অনেক-কিছুই। চাই আপনাদের আরো অনেক বেশী কাছে পেতে, আপনাদের সমস্ত সুখদুঃখের ভাগ নিতে, আরও অনেক বেশী আপনাদের কাজে লাগতে, প্রয়োজন হলে আপনাদের জন্যে প্রাণ দিতে। আর···আর···তবে হ্যাঁ, এও সত্যি কথা, ওঁকে দেখতে পেলে আমার ভাল লাগে। জানি না, কেন এত ভাল লাগে, কিন্তু খুব বেশী ভালই লাগে। যদি আমাকে কাছে রাখেন, দেখতে ত পাবই। এখানেও আমার দাবী কিন্তু কিছু নেই। ভিখারী যখন ভিক্ষে চায়, ভিক্ষের ধনে তার দাবী আছে ব'লে কি চায়? না, ভিক্ষে চাইবার অধিকার তার আছে কি নেই ভাবে?

(রাজেন আবার চেয়ারে এলিয়ে পড়েছে।)

আজ এই যে পৃথিবীময় মারামারি, হানাহানি, মানুষকে যা পশুরও অধম ক'রে ছেড়ে দিচ্ছে, তার পাশে দাঁড় করিয়ে আমার এই ভালবাসাটাকে আপনি দেখুন, এর ঠিক চেহারাটা দেখতে পাবেন। তখন হয়ত এটাকে আমার একটা অপরাধ ব'লে আর আপনার মনে হবে না। বিশ্বাস করুন—আমার এ ভালবাসা সুস্থ, সুন্দর, সবল। তা যদি নাও হ'ত, আজকের দিনের এই সমস্ত সাইরেন, ব্ল্যাক আউট, এয়ার-রেড্, এ্যান্টি-এয়ারক্রাফটের চেয়ে অনেক বেশী শ্রদ্ধার জিনিস ব'লে তাকে আমি ভাবতাম।

রাজেন। (উঠে ব'সে) সুমি!

সুমি। (উঠে দাঁড়িয়ে, কারুর দিকে না তাকিয়ে) যদি তোমরা অনুমতি দাও, বাবার খোঁজ অনেকক্ষণ নেওয়া হয় নি, একবার তাঁকে দে'খে আসি।

নিখিল। (উঠে দাঁড়িয়ে) আমি যাচ্ছি। আপনারা বসুন।

রাজেন। সুমি, আর একটুক্ষণ ব'সে যাও। নিখিল, তুমি কি বলতে চাইছ, তা আমি এখন একটু একটু বুঝতে পারছি, কিন্তু বড় বিপদেই ফেললে যে তুমি আমাকে!

নিখিল। আপনাকে বিপদে ফেলতে আমি চাই নি।

রাজেন। (উঠে দাঁড়িয়ে) আচ্ছা, একটা কথা কেবল তুমি আমাকে বল, তুমি ঠিক কি চাও?

নিখিল। সে ত আমি বলেছি। তার পর খুশী-মনে যতটা আপনারা দিতে পারবেন ঠিক ততটাই আমার চাই। কিন্তু পাছে কৃপণতা বেশী করেন, তাই এও ব'লে রাখছি, যতটা কাছেই আমাকে আসতে দিন, আমা-হতে ওঁর বা আপনার সত্যিকারের কোনো অকল্যাণ কোনো-দিন হবে না।

(রাজেন হঠাৎ খুব হাসতে আরম্ভ করল। হাসতে হাসতেই আবার ব'সে পড়ল চেয়ারে। সুমির মুখ ভাবলেশহীন পাথরের মূর্ত্তির মত।)

রাজেন। এ বেশ এক অদ্ভুত পরিস্থিতি! এরকমটা যে হতে পারে, তা কল্পনাও করি নি কোনোদিন স্থমি!

স্থমি। এ আলোচনার মধ্যে আমি থাকব না, তা ত বলেইছি।

রাজেন। তোমাকে নিয়েই আলোচনা, তুমি তার মধ্যে থাকবে না কিরকম?

স্থমি। না, থাকব না। (যে-বইটা পড়ছিল, উঠে গিয়ে সোফার ওপর থেকে সেটা তুলে নিয়ে এল। তার পর একটা চেয়ারে ব'সে বইটার পাতা ওল্টাচ্ছে।)

রাজেন। (একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে) তোমরা মেয়েরা! সব অনর্থের মূল; কিন্তু ধরা-ছোঁওয়া না দিয়ে কেবল নিজেদের বাঁচিয়ে চলতে চাও! মানে, যা শত্রু পরে পরে!···আমি বলছিলাম, নিখিল যা বলছে তার মধ্যে তেমন বেশী দোষের ত কোথাও কিছু আমি দেখতে পাচ্ছি না।

(স্থমি নিঃশব্দে বইয়ের পাতা উল্টে চলেছে।)

আচ্ছা, ব'লো না কিছু, না যদি বলতে চাও। ভারি ত! সবকিছুতে তোমার পরামর্শ নিয়েই আমাকে চলতে হবে এমনই বা কি কথা আছে?

(বইয়ের একটা পাতায় এবার স্থমির দৃষ্টি নিবদ্ধ।)

নিখিল। রাত বোধ হয় প্রায় বারোটা বাজতে চলেছে। সেই সন্ধ্যা সাতটায় একমুঠো খেয়েছিলাম। ঐ অসময়ে কি মানুষের ক্ষিদে পায়, না যাবার মুখে তাড়াহুড়োর মধ্যে খেতে ইচ্ছে করে? ক্ষিদেয় এখন পেটটা চোঁ চোঁ করছে। খাওয়া-দাওয়ার কি হবে বল দিকি!

নিখিল। তার ব্যবস্থা কি বঙ্কু এতক্ষণ না ক'রে ব'সে আছে?

রাজেন। আমার হয়ত করেছে, কিন্তু তুমি? তুমি খাবে ত?

নিখিল। বাড়ী যাবার পথে নান্‌রুটি আর কাবাব কিনে নিয়ে যাব।

রাজেন। চমৎকার! নান্‌রুটি আর কাবাব দু-তিন রকম আনিয়ে নিচ্ছি, দু'জনেই তাই খাব, স্থমিকেও ভাগ দেওয়া যাবে, যদি অবশ্য স্থমি না বলে, আমাদের নান্‌রুটি আর কাবাবের মধ্যেও সে নেই। (হাসল।)···জানো নিখিল, আমার মনটা হঠাৎ কেমন হাল্‌কা হয়ে গিয়েছে। বিভার সেই হেঁয়ালিগুলো কেমন যেন ভার হয়ে চেপে থাকত মনের উপরে। ঠিক বিশ্বাস করতাম না, কিন্তু কিরকম একটা ভয় হ'ত। এই ভয়টা আজ কেটে গিয়েছে।

নিখিল। সব ভয়ের জিনিসের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়ালেই ভয়টা অনেক সময় কেটে যায়।

রাজেন। তুমি তা হলে তোমার চাকরটাকে ফোন্ ক'রে ব'লে দাও, রাত্রে তুমি এখানেই খাচ্ছ আর এখানেই শুচ্ছ।

নিখিল। না, না—

রাজেন। এত কথার পর এখন না না বললে আর শুনব না। আমি ঠিক করেছি, এর পর কিছুদিন এ-বাড়ীতেই তুমি থাকবে। শ্বশুরমশায়ের সব ভার নিয়ে তাঁর দেখাশোনা করবে, আর আমাদেরও বল-ভরসা একটু দেবে।···স্থমি!

স্থমি। বল।

রাজেন। স্থমি! আমার কি মনে হচ্ছে জানো? মনে হচ্ছে, আজ যেন আমার চোখ খুলে গিয়েছে। বুঝতে পারছি, নিখিল আমাদের—নিখিল আমাদের—মানে, সে আমাদেরই একজন। আজ থেকে নিখিল একেবারেই আমাদের বাড়ীর ছেলে।

স্থমি। খুব ভাল কথা!

রাজেন। আচ্ছা, নিখিল! তুমি বোস, একটু গল্প কর স্থমির সঙ্গে, আমি ততক্ষণ নান্‌রুটি আর কাবাবের ব্যবস্থাটা ক'রে আসি। বঙ্কু নিশ্চয় এতক্ষণে নাক ডাকাচ্ছে, এখান থেকে ডাকলে সাড়া দেবে না।

(ডানদিক্ দিয়ে প্রস্থান।)

স্থমি। আপনি সেই কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছেন। বসুন না?

নিখিল। (স্থমির পাশের চেয়ারটাতে ব'সে তার দিকে একটু ঝুঁকে) বলুন, খুশী হয়েছেন?

স্থমি। (বইটা বন্ধ ক'রে খুব করুণ মুখ ক'রে একটু হাসল।)

খুশী না হবার মতো কথা ত কিছু আপনি বলেন নি?

নিখিল। আজ মনটা এত ভাল লাগছে। সব কিছুকে এত ভাল লাগছে। আপনাকেও যেন অনেক বেশী সুন্দর দেখাচ্ছে আজ।

(স্থমি নীরবে আগেরমত ক'রেই একটু হাসল।)

হাতটা হাতে নেব একটু?

(স্থমি একটা হাত বাড়িয়ে দিলে নিখিল সেটাকে পরম যত্নে নিয়ে রাখল নিজের দু'হাতের মধ্যে। একটুক্ষণ চুপ ক'রে কাটল। স্থমি মুখ নীচু ক'রে আছে, নিখিল একদৃষ্টে তাকে দেখছে।)

স্থমি। উনি যদি হঠাৎ এখন এসে পড়েন, হাতটা আপনি ছেড়ে দেবেন না?

(নিখিল ত্রস্তে সুমির হাতটা ছেড়ে দিলে সুমি টেনে নিল সেটা। এবার একটু শব্দ করেই হাসল।)

নিখিল। এই অন্যায় ক'রে ফেললাম একটা।

সুমি। অন্যায় আপনি করতে পারেন না; অন্যায় কিছু হয় নি।

নিখিল। আপনি একটু যদি সামলে নেন আমাকে, দেখবেন, কোনোদিনই আমি সীমা ছাড়িয়ে যাব না।

(সুমি উঠে গিয়ে টেবিলের ওপর রাখা নিখিলের আনা ফলগুলিকে নাড়াচাড়া করছে। মাঝে মাঝে থেমে কি যেন ভাবছে। নিখিল উঠে গিয়ে তার পাশে দাঁড়াল।)

নিখিল। কি ভাবছেন?

সুমি। এই ভাবছি...নানা রকমের ভাবনা থাকে ত মানুষের?...সারাদিন না খেয়ে আছেন ত?

নিখিল। প্রায় তাই। পেট খালি, কিন্তু মনটা ভরা আছে।

সুমি। (করুণ ক'রে হেসে) বিকেলে কি খেয়েছিলেন?

নিখিল। চা খেয়েছিলাম বর্দ্ধমানে।

সুমি। শুধু চা?

নিখিল। হ্যাঁ। আমি চায়ের সঙ্গে আর কিছু যে খাই না, তা ত আপনি জানেন।

সুমি। একটা আপেল নিয়ে খেয়ে নিন না; অনেকগুলো ত রয়েছে।

নিখিল। আপনি ভুলে যাচ্ছেন, কাবাব আসছে কয়েক রকম। সেগুলোর সদ্ব্যবহার ক'রে যদি পেটে জায়গা থাকে; আপেলও না হয় একটা খাব।

(একটুক্ষণ চুপ ক'রে কাটল।)

সুমি। আচ্ছা, শুনুন। সেদিন আমি বলবামাত্র আপনি আমার একটা কথা রেখেছিলেন। আজ আর একটা কথা রাখবেন?

নিখিল। আপনার বলবার ধরন থেকে মনে হচ্ছে, খুবই দুরূহ কিছু একটা কাজের কথাই বলবেন।

সুমি। তা হোক না দুরূহ, আপনি ত ভয় পান না!

নিখিল। অন্ততঃ আপনাকে নিশ্চয়ই ভয় পাই না। বলুন কি কথা, রাখব।

সুমি। নান্‌রুটি আর কাবাব এলে, খেয়ে নিয়ে একটা কোনো ছুতো ক'রে বাড়ী চ'লে যাবেন।

নিখিল। (একটু ভেবে) মনে হচ্ছে, এইটেই সব নয়। তার পর?

সুমি। তার পর আমি না ডাকলে এ বাড়ীতে আর আপনি আসবেন না।

নিখিল। (আর্ত্তস্বরে) মেশোমশায়কে দেখতেও না?

সুমি। (ফিরে গিয়ে চেয়ারটায় ব'সে) আসতে পারেন, কিন্তু আমার সঙ্গে আপনার দেখা হবে না। আপনিও দয়া ক'রে চেষ্টা করবেন, দেখা যাতে না হয়।

নিখিল। (তার পাশে চেয়ারটায় ব'সে প'ড়ে) কেন কেন, কেন এই ভয়ঙ্কর শাস্তি দিচ্ছেন আমাকে?

সুমি। ভয় ত আপনি পান না, তা ছাড়া কথা দিয়েছেন, কথা রাখবেন।

নিখিল। (উঠে সুমির সামনে দাঁড়িয়ে) কথা আমি নিশ্চয়ই রাখব। কিন্তু আশ্চর্য্য হচ্ছি এই ভেবে যে, এততেও আপনার ভয় গেল না? এত ক'রে যে বোঝালাম—

সুমি। ভয় যায় নি, সেটা ঠিক।

নিখিল। কিন্তু কেন? কেন ভয়, কিসের ভয়, কাকে ভয়?...একবার ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখুন দেখি আমার মুখের দিকে,—দেখুন। কি দেখছেন? আমাকে খুব ভয়াবহ ব'লে মনে হচ্ছে কি? আমি বলছি, আমি কখনো সীমা ছাড়িয়ে যাব না।

সুমি। ভয় আপনাকে নয়।

নিখিল। (একদৃষ্টে খানিকক্ষণ সুমির দিকে তাকিয়ে থেকে) রাজেনবাবু কি ব'লে গেলেন, তা ত শুনলেন। তিনি যখন আমাকে ভয় পাচ্ছেন না, তাঁকেও আপনার ভয় নেই। তবে কি তাঁর বোনকে আপনি ভয় করছেন? আপনি ত জানেন, তিনি যা বলেন, বা যা করেন, তার আসল অর্থটা কি?

সুমি। এঁদের কারুও সম্বন্ধেই আমার মনে কোনো ভয় নেই, ছিলও না কোনোদিন।

নিখিল। তাহলে পৃথিবীতে এমন কে আর আছে, যাকে আপনি ভয় করেন, ভয় করতে পারেন?

সুমি। (একটুক্ষণ নিখিলের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে) আছে একজন।

নিখিল। কে সে?

সুমি। আমি!

(নিখিল আবার এসে চেয়ারটায় বসল। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সুমির দিকে। মনে হচ্ছে, যেন একটু ভয়ই পেয়েছে।)

আমি। আমি নিজে, আর কেউ নয়।...আমি

নিতান্তই একটা রক্তমাংসের মানুষ, আমার সাধ্যে কুলোবে না। আর সেইজন্যেই নিজেকে আমার ভয়। (এতক্ষণ খুব সহজ সুরে কথা বলছিল, হঠাৎ যেন সংযম হারিয়ে) আমি পারব না, পারব না, পারব না,—আমি কিছুতেই পারব না। আমি এতদিনই যে কি ক'রে পেরেছি, সে আমার অন্তর্য্যামী জানেন। (চেয়ারের একটা হাতার উপরে-রাখা বাহুমূলে একটুক্ষণ মুখ গুঁজে থেকে) আপনার মতো এত মনের জোর, এত সাহস আমার নেই, যে নিজেকেও ভয় পাব না। নিজের ওপর এত বেশী বিশ্বাস আমার নেই। আমি পারব না, পারব না, পারব না, আপনি ক্ষমা করুন আমাকে। (আবার বাহুমূলে মুখ গুঁজল) আপনি…আপনি চ'লে যান। (ফু পিয়ে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল।)

নিখিল। চ'লে যাওয়া এত সহজে যায় না, আপনি আমার একটা কথা শুহুন।

স্থমি। (মুখ না তুলেই মাথা নেড়ে) না, না, আর কোনো কথা না। (কাঁদছে।)

নিখিল। (একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে) আচ্ছা বেশ, যাচ্ছি।…কি জানি, হয়ত আমিই ভুল করছিলাম, একটা ভুলের স্বর্গ বানাচ্ছিলাম।…(হঠাৎ কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা) কিন্তু যদি বুঝি ভুল আপনি করছেন, আমার ফিরে আসা আপনি আটকাতে পারবেন না, ফিরে আমি আসবই।

(স্থমি বাহুমূলে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। নিখিল বাঁদিকের দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে।)

আপনি আর না ডাকলে আসব না, এই ত? কিন্তু মানুষ মুখের কথা দিয়েই ত কেবল ডাকে না,—অন্তর দিয়েও ডাকে। সে ডাকে যদি আমি সাড়া দিই, আপনি ঠেকাবেন কি রকম ক'রে? যদি সে ডাক কখনো আপনার শুনতে পাই, তক্ষুণি আসব, এক মুহূর্ত্ত দেরি করব না। তবে হয়ত আজকের এই মানুষটা সেদিন আসবে না। যে আসবে, সে হয়ত সেদিন এসে বলবে, আপনি এই যে নিজেকে ভয় পাচ্ছেন, এ ভয়েরও অর্থ কিছু নেই। ভয়ের কিছু নেই এ পৃথিবীতে, থাকতে পারে না। হয়ত সে এসে শোনাবে সেদিন অভয়-মন্ত্র, অভীরভীঃ।

যবনিকা।

বাংলা বানানে আধুনিকতা

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ

বাংলা বানান সরল করিবার জন্য ও বাংলা শব্দের বানান নির্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটি পণ্ডিতমণ্ডলী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সে আজ পঁচিশ বৎসরেরও অধিক দিনের কথা। তৎকালে উহা লইয়া পণ্ডিতে পণ্ডিতে বাদানুবাদ হইয়াছিল। উক্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর বিধান অনুসারে বাংলা শব্দের বানান কি নিয়ম ধরিয়া লেখা হইবে তাহার কয়েকটি সূত্র প্রস্তুত হয়। "বাংলা বানানের নিয়ম" যাহা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম সংস্করণে প্রকাশ করেন, পরবর্তী সংস্করণে তাহার কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য এই পর্যন্ত। ইহার পর লেখকদের ঐ নিয়ম মানিয়া লেখার পালা। ইহাদের মধ্যে কেহ প্রাচীন কেহ নবীন। প্রাচীনেরা পূর্বে যে শব্দের যে বানান লিখিতেন এখনও অনেক শব্দ সেই বানানেই লেখেন তাহাতে ভুল হয় না। কিন্তু নবীনেরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বানানের সূত্র না বুঝিয়া, অনেক স্থলে অদ্ভুত বানান লিখিয়া প্রমাদ ঘটাইতেছেন।

নূতন সরলীকৃত বানানে প্রধান পরিবর্তন রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব লোপ—যদিও দ্বিত্ব ব্যাকরণ সম্মত রূপ—অশুদ্ধ নহে। 'দ্বির্বা রেফাৎ ব্যঞ্জনম্ উষ্মবর্জম্'—উষ্মবর্ণ ব্যতীত অন্য ব্যঞ্জনবর্ণ রেফের পর বিকল্পে দ্বিত্ব হয়। উদাহরণ—

অর্চ্চনা মূর্চ্ছা কার্ত্তিক অর্দ্ধ সর্ব্ব
স্থলে— অর্চনা মূর্ছা কার্তিক অর্ধ সর্ব

(বাংলা বানানের নিয়ম দ্রষ্টব্য)

ইহারও আবার ব্যতিক্রম আছে। অর্থাৎ সর্বত্র নির্বিচারে দ্বিত্ব লোপ হইবে না। যদি শব্দের প্রকৃত প্রত্যয়ের জন্য আবশ্যক তবেই রেফের পর দ্বিত্ব হইবে—অন্যত্র হইবে না, যথা—কার্ত্তিক বার্ত্তা—কিন্তু বর্তমান পর্দা ইত্যাদি—

(প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৪২ দ্রষ্টব্য)

এই সংশোধিত পরবর্তী বিধানে কোষকার রাজশেখর বসু প্রমুখ নয়জন পণ্ডিত ব্যক্তির নাম আছে। তাঁহাদিগের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর ভট্টাচার্য, ডাঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য ও শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য আছেন। ইঁহাদের সকলের উপাধিই 'ভট্টাচার্য'—(য-এ য-ফলা রেফ) ছাপা হইয়াছে। অর্থাৎ যাঁহারা বিধান দিতেছেন দ্বিত্ব হইবে না, তাঁহারাই দ্বিত্ব দিয়াছেন। হইতে পারে, ইহা ছাপাখানার কম্পোজিটার মহাশয়ের প্রাচীন অভ্যাস। রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব ব্যবহার বাংলা লিপিতে সুপ্রাচীন। দ্বিত্ব না করিলে, সরল হয় ও লেখার সুবিধা হয়। কিন্তু ছাপাখানার অসুবিধা। যেহেতু প্রকৃতি-প্রত্যয়ের জন্য প্রয়োজন হইলে দ্বিত্বের ব্যবহার থাকিবে, সেই হেতু ছাপাখানাকে রেফযুক্ত দ্বিত্ব ও রেফযুক্ত অদ্বিত্ব দুই প্রকার টাইপ-ই রাখিতে হইবে। ভারাক্রান্ত বাংলা টাইপ-কেস আরও ভারী হইল। বহুকাল হইতে বাংলা টাইপের সংখ্যা কমাইবার জন্য আন্দোলন চলিতেছিল। এই ব্যবস্থায় উল্টা ফল হইল।

হাতের লেখায় রেফের পর দ্বিত্ব উঠাইয়া দেওয়া যত সহজ, ছাপাখানার বাংলা টাইপ-কেস হইতে উহাকে বাতিল করিয়া দেওয়া তত সহজ নহে। যেখানে যত বাংলা ছাপাখানা আছে এবং তাহাদের যত প্রকার বাংলা টাইপ আছে তাহা হইতে রেফযুক্ত দ্বিত্ব টাইপ সমস্তই ফেলিয়া দেওয়া হউক বলা অযৌক্তিক ও অসম্ভব। বিশেষতঃ যখন দ্বিত্ব অদ্বিত্ব দুই-এরই প্রয়োজন পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিয়ম নির্ধারণ করিবার পঁচিশ বৎসর পরেও ছাপার অক্ষরে দুই-ই চলিতেছে। যদি এ বিষয়ে অর্থাৎ দ্বিত্ব উঠাইয়া দিতে, আবার এক জোর আন্দোলন হয় তাহা হইলে কি হইবে বলা যায় না। কিন্তু যে ভাবে চলিতেছে এই ভাবে চলিলে এদ্বিত্ব একেবারে উঠিয়া যাইবে না। এস্থলে টাইপের বলে চলিতে হইবে—যে যুক্তিতে বিদেশী শব্দ লিখবার বেলায় ন্+ড ন্+ট টাইপ নাই বলিয়া ণ+ড (ণ্ড) ণ+ট (ণ্ট) ব্যবহার বিধান দেওয়া হইয়াছে। এসম্বন্ধে প্রবন্ধের অন্যত্র আলোচনা করিতেছি।

'কার্ত্তিক' শব্দটি লইয়া গোল দেখিতেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধানে দ্বিত্ব হইবে না। আবার উল্লিখিত 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত বিধানে হইবে। কোন্‌টি ঠিক, না

দুই-ই ঠিক? ছাপার অক্ষরে দুই প্রকার বানানই দেখিতে পাই।

বাংলা লিপিতে এই দ্বিত্ব রাখা বা উঠাইয়া দেওয়া লইয়া বহু বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। সে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। উঠাইয়া দেওয়াতে শিক্ষার্থী ছাত্রেরা কিছু গোলযোগে পড়িয়াছে। কোথায় থাকিবে আর কোথায় থাকিবে না, প্রকৃতি-প্রত্যয় করিয়া তাহা তাহারা ধরিতে পারে না। তাহারা বড়জোর শিষ্ট প্রয়োগ ও অভিধান দেখে। এত কষ্ট যাহারা না করে, তাহারা সংক্ষেপে জানিল দ্বিত্ব বাতিল হইয়া গিয়াছে।

একদা একটি ছাত্রের গৃহশিক্ষক মহাশয় ছাত্রটির হাতের লেখা সংশোধন করিয়া দিতেছিলেন। ছাত্র সম্ভবতঃ পূর্বেকার ছাপা বহি দেখিয়া লিখিয়াছিল। উহাতে সে সর্ব শব্দটি ব-এ-ব-এ-রেফ (র্ব্ব) লিখিয়াছিল। শিক্ষক মহাশয় সোৎসাহে ঐ অক্ষরটি ঘ্যাচ করিয়া কাটিয়া দিয়া বলিলেন, 'পুরানো বানান ভুলে যাও, ব-এ-রেফ লিখিবে। শিক্ষকও জানেন না ছাত্রও শিখিল না উভয় বানানই শুদ্ধ, সুবিধার জন্য একটা ব-এ-রেফ দেওয়া হাল নিয়ম হইয়াছে।

অনেক ক্ষেত্রে দুই-চারিটি শব্দে দেখা-দেখি দ্বিত্ব উঠান হইতেছে। 'পাশ্চাত্ত্য' লিখিতে অনেকে একটা ত ব্যবহার করেন, আবার কেহ ত্ত্য লেখেন। কোন্‌টা শুদ্ধ না দুই-ই শুদ্ধ? কলিকাতার একটি বিখ্যাত প্রেক্ষা-গৃহের নাম 'উজ্জ্বলা'। ব-ফলা হীন 'উজ্জলা' কি করিয়া তৈয়ারী হইল? অর্থই বা কি?

সর্বাপেক্ষা বেশী আধুনিকতা দেখিতেছি ং-এর ব্যবহার ক্ষেত্রে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম—

যদি ক খ গ ঘ পরে থাকে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে ং অথবা ঙ বিধেয়। যথা—অহংকার ভয়ংকর সংগীত সংঘাত অথবা অহঙ্কার ভয়ঙ্কর সঙ্গীত সঙ্ঘাত। বাঙ্গলা বাঙ্গালা বাঙ্গালী ভাঙ্গন এবং বাংলা বাঙলা বাঙালী ভাঙন প্রভৃতি উভয় প্রকার বানানই চলিবে। হসন্ত ধ্বনি হইলে বিকল্পে ং বা ঙ বিধেয়। যথা—রং রঙ্, সং সঙ্, বাংলা স্বরান্বিত হইলে ঙ বিধেয়। যথা—রঙের বাঙালী ভাঙন।

ব্যাকরণের, অর্থাৎ সংস্কৃতের নিয়মে পাই—

বর্গীয় বর্ণ পরে থাকিলে যে বর্গের বর্ণ পরে থাকে পদান্ত ম্ স্থানে বিকল্পে সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ অথবা ং হয়। যথা—কিম্+কর=কিংকর কিঙ্কর, শম্+কর=শংকর শঙ্কর, সম্+গীত=সংগীত সঙ্গীত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধান ও ব্যাকরণের নিয়ম এই পর্যন্ত। অথচ কোনো কোনো আধুনিক লেখক বিশেষ করিয়া নভেল লেখক, পাঠ্যপুস্তকের ও উহার অর্থপুস্তক লেখকেরা নির্বিচারে ঙ-এর সহিত ব্যঞ্জনবর্ণ স্থানে ঐ ঙ-কে ং বানাইতেছেন। ইহারা পঙ্ক অঙ্ক পালঙ্ক অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ অঙ্গার অঙ্গুলি রঙ্গ ব্যঙ্গ সকল স্থলেই ঙ হঠাইয়া পংক অংক পালংক অংগ বংগ কলিংগ অংগার অংগুলি রংগ ব্যংগ চালাইতেছেন! কলিকাতায় কোনোও এক বিশিষ্ট কলেজের অধ্যাপকের লিখিত অর্থপুস্তকে বঙ্কিম (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)কে বংকিম দেখিলাম। ইনিও কি পূর্ববর্ণিত গৃহশিক্ষকের মত সংক্ষেপে বুঝিয়াছেন হাল বানানে ক বর্গের পঞ্চম বর্ণ ঙ লুপ্ত হইয়া উহার স্থলে ং হইয়াছে?

এইরূপ বেপরোয়া ং অতি আধুনিক বা নোতুন কিছু হইলেও অশুদ্ধ হইবে না কি? চোখে দেখিতে ও উচ্চারণ করিতে অসুবিধার কথা না হয় নাই ধরিলাম। কলিকাতার অনতিদূরে চব্বিশ-পরগণা জেলায় গোবর-ডাঙ্গা একটি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ গ্রাম। আরও প্রসিদ্ধ হইয়াছে বঙ্গবিভাগের পর এইস্থানে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইয়া। এত কালের গোবরডাঙ্গা স্থানীয় কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞপ্তিতে গোবরডাংগা হইয়াছে। অতঃপর নারিকেলডাঙ্গা, উল্টাডাঙ্গা ঘুঘুডাঙ্গা চুয়াডাঙ্গাদের নারিকেলডাংগা, উল্টাডাংগা ঘুঘুডাংগা চুয়াডাংগা হইবার পালা।

ইহা কি হিন্দীর অন্ধ অনুকরণে ং-এর সর্বাত্মক ব্যবহার? রেফের পর দ্বিত্ব তুলিয়া দিবার একটা যুক্তি ছিল হিন্দী প্রভৃতি কয়েকটি ভারতীয় লিপিতে এই দ্বিত্ব নাই। এক্ষেত্রেও কি লেখকেরা স্থির করিয়া লইলেন যে হিন্দীর মত ংএর ব্যপক ব্যবহার চালাইবেন? হিন্দী লিপিতে ঙ ঞ ন ণ ম যুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণের স্থলে সর্বত্র ং লেখার পদ্ধতি। লেখার এ নিয়ম হইলেও পরিবার বেলায় ং স্থলে পরবর্তী ব্যঞ্জন বর্ণের পঞ্চম বর্ণই পড়া হয়। যথা—পংক সংগ পংচ পংডিত কংঠ দংড ইংদ্র চংদ্র থাকিলেও পরা হয় পঙ্ক সঙ্গ পঞ্চ পণ্ডিত কণ্ঠ দণ্ড ইন্দ্র চন্দ্র।

বাংলার নব্য লেখকেরা তাঁহাদের নব্য বানানে আপাততঃ ঙ কে বাতিল করিয়া ং চালাইতেছেন। ক্রমে কি তাঁহারা অপর পঞ্চম বর্ণগুলিকেও অপসারিত করিয়া উহার স্থলে ং কে প্রতিষ্ঠিত করিবেন?

আধুনিক ও প্রগতিলোলুপ লেখকদিগের ভাষা ও বানানের সমালোচনা না হয় নাই করিলাম। তাঁহারা হয়ত নিজদিগকে নিরঙ্কুশ মনে করেন। কিন্তু এই ধরনের বানান যদি ছাত্রদের জন্য নির্বাচিত পাঠ্যপুস্তকে থাকে তাহা হইলে কোন্ বানান শুদ্ধ তাহা ছাত্রেরা কি করিয়া শিখিবে?

পুরাতন বানান পরিবর্তনের যুক্তি ছিল বানান সরল করা, কিন্তু সরল করিতে গিয়া অশুদ্ধ করা নহে। কাজেই

বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানের নিয়মে যে বিধান দেওয়া হইয়াছে সেই বিধানের মধ্যে থাকিয়া ং ব্যবহার করিতে হইবে—অন্যত্র নহে। সম্প্রতি ং-এর এত বেশী যথেচ্ছ-ব্যবহার হইতেছে যে উহার নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক। এ নিয়ন্ত্রণ একমাত্র শিক্ষাবিভাগ হইতে পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের সময়ই হওয়া উচিত। আকাঙ্খা কে আকাংখা লিখিতে দেখিলে আতংক হয়। সংগে অংগহীন কংকণ একাংক নাটক বাংময় দেখিলে শব্দ ধরিতে রীতিমত মাথা ঘামাইতে হয়।

যদি লিখি মংগল পংকজ বংকিম সাংগ পাংগ লইয়া শংখ বাজাইতে লাগিল আমার অংক কষা গংগায় গেল।

অথবা—(হিন্দীর অনুকরণে)

অংগং গলিতং পলিতং মুংডং।
দংত বিহীনং জাতং তুংডং॥

তাহা হইলে বাংলা বানানের সংস্কার হইবে-না সংহার হইবে?

সেকালের পাঠশালায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বিতীয় ভাগ পড়িতেই হইত। তাহাতে শৈশবেই শুদ্ধ বানানে অভ্যস্থ হইবার একটা ভিত্তি গঠিত হইত। একালের পাঠ্যপুস্তক শিক্ষাবিভাগের নির্দিষ্ট সিলেবাস অনুসারে স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে রচিত হয়। ইহা হয়ত বিজ্ঞানসম্মত, কিন্তু ছাত্রেরা যে ইহাতে বানান শিখিতে পারে না তাহা দেখিতেছি।

গত পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিককাল হইতে বাংলা লিপির পরিবর্তন, উচ্চারণ অনুসারে বানান, প্রভৃতি নানা প্রকারের আন্দোলন চলিয়া আসিতেছিল। যোগেশচন্দ্র রায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথও এই আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই নিজ-নিজ মত অনুসারে বানান লিখিতেন। এক সময় সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাংলা হরফের পরিবর্তে রোমান হরফ চালাইবার প্রস্তাবও তুলিয়াছিলেন। কেহ কেহ সর্বভারতীয় দেবনাগরী হরফের পক্ষেও ছিলেন। এ সকল আন্দোলন প্রধানতঃ উচ্চ পর্যায়ের পণ্ডিত ব্যক্তিদিগের বিচার বিবেচনার জন্য। নিম্নস্তরে ছাত্রদিগের মধ্যে তাহার ঢেউ লাগে নাই। তাহারা সেই পুরাতন বাংলা অক্ষরে প্রচলিত বানানে বাংলা শব্দ লিখিত। অতঃপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিধান দিয়া বানান আন্দোলন থামাইয়া দিলেন। বাংলা লাইনো-টাইপ হইয়া লিপি আন্দোলনও প্রশমিত হইল।

বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা শব্দের বানান সম্বন্ধে যে বিধান দিলেন, তাহা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই বিকল্প বানান। প্রাচীন বানানও শুদ্ধ, নূতন বানানও শুদ্ধ। তবে নূতন বানান কিছু সরল—লেখায় সুবিধা। ছাপাখানার ইহাতে কি অসুবিধা হইল তাহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। যাহা হউক, আজকাল অনেকেই সরলীকৃত নব্য বানান লিখিতেছেন, তাহাতে কিছু কিছু ভুলও হইতেছে। কাজেই রেফযুক্ত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব, অদ্বিত্ব ও ং সাবধানে ব্যবহার করা উচিত। সাধারণে, বিশেষ করিয়া ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রণীত নিয়ম ঠিকমত বুঝিয়া বানান স্থির করে না, তাহারা লেখকদিগের লেখা ছাপার অক্ষরে দেখিয়া উহারই অনুকরণ করে। তাহাদের সম্মুখে ভুল বানান ধরিলে ভুলই শিখিবে। এইখানেই লেখকদের দায়িত্ব।

অল্পবয়স্ক ছাত্রদের বাংলা পাঠে অনেক বিভ্রান্তিকর বিষয় প্রবেশ করিয়াছে। তাহাদিগকে পূর্বেকার ছাঁদের টাইপে ছাপা ও আধুনিক নূতন চেহারার লাইনো টাইপে ছাপা পড়তে অভ্যাস করিতে হইবে। তাহার পর সাধু বাংলা ও চলিত বাংলা রচনা পড়িতে হইবে। সর্বোপরি মারাত্মক হইতেছে কোনোও কোনোও লেখকের 'কথা কয় ওরা' 'ঘড়িটার দিকে তাকায় সে' জাতীয় অপূর্ব বাক্যবিন্যাস। বাক্যের মধ্যে কর্তা কর্ম ক্রিয়া বিশেষণ প্রভৃতির যে নির্দিষ্ট স্থান আছে, এই প্রকারের রচনা হইতে কি ছাত্রেরা তাহা শিখিতে পারিবে? এই সকল অব্যবস্থার ফলে সাধারণ ছেলেমেয়েরা যুক্তাক্ষর ঠিকমত লিখিতে পারে না। কি সাধু বাংলা কি চলিত বাংলা কোনোওটাতেই সাজাইয়া-গোছাইয়া দুই-চারি কলম লিখিতে পারে না। আমাদের শিক্ষাবিভাগের এদিকে দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য এবং এই দুর্বিপাক নিরসনের উপায় স্থির করা প্রয়োজন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্তিত নিয়মে—

বৈদেশিক শব্দে ণ বর্জনীয়। কিন্তু কয়েক স্থলে বাঙ্গালা টাইপের বশে চলিতে হইবে ণ্ট ণ্ড ণ্ঠ। ষ্ট স্থানে স্ট স্থানে স্ট এই এই নূতন যুক্তাক্ষর আবশ্যক। যথা স্টকহল্‌ম্‌।

—প্রবাসী শ্রাবণ ১৩৪২ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'বাংলা বানানের নিয়ম'।

ইহার অর্থ বৈদেশিক শব্দে ন লিখিতে হইবে। কিন্তু যেহেতু ন্‌+ট, ন্‌+ড প্রভৃতি কোনও যুক্তাক্ষর বাংলা টাইপে নাই, সেই হেতু টাইপের বশে ণ্‌+ট (ণ্ট) ণ্‌+ড (ণ্ড) ইত্যাদি লেখা চলিবে। ন-এর বেলায় যদি এই বিধান হয় স-এর বেলায় (st লিখিতে) টাইপের বশে ষ্ট (ষ্‌+ট) হইতে দোষ কি? ইহার জন্য একটি নূতন যুক্ত টাইপ স্ট আমদানীর বিধান হইল। বাংলা টাইপ কেসে আরও একটি টাইপ বাড়িল।

ষ্টেশন, পোষ্ট-অফিস, মাষ্টার, মিষ্টার, ষ্ট্রীট, ষ্টোভ, ষ্ট্যাম্প প্রভৃতি শব্দ বহুদিন হইতে ষ্ট দিয়া লেখা চলিতেছিল। হয়ত ইহাতে মূল ইংরাজী শব্দের উচ্চারণ ঠিক পাওয়া যায় না। তাহা হইলেও লিখিবার পড়িবার বিশেষ কিছু ব্যাঘাত হইতেছিল না। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, বিদেশী শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করিবার সময় কোনোও কোনোও শব্দ বাংলা লিপি ও উচ্চারণের প্রকৃতি মানিয়াই কিছুটা বিকৃত হয়। কেবল বাংলা ভাষা নহে অন্য ভাষা সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। অবশ্য এ বাদানুবাদ এখন নিষ্প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধানে ষ্ট নাকাজ হইয়া স্ট আসিয়াছে—যদিও কার্যতঃ ষ্ট নাকাজ হইয়া যায় নাই। বেশীর ভাগ সাধারণ লোকের লেখায় পুরাতন ষ্ট চলিতেছে ও চলিতে থাকিবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট বিধান যেন প্রয়োজন অপেক্ষা আধুনিকতার স্পৃহা। এক ভাষার শব্দ অন্য ভাষার লিপিতে লিখিতে নূতন টাইপ প্রস্তুত বাংলায়ই বোধহয় প্রথম। হাতের লেখায় স্ট লেখা অপেক্ষা ষ্ট লেখা সহজ তাহাও বিচার্য। যাহা হউক, স্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের সুপারিশ লইয়া বাংলা অক্ষর পরিবারে আসিয়াছেন, তাঁহাকে অবশ্যই সম্মান দিতে হইবে। তবে তিনি অক্ষর পরিবারের অন্তরঙ্গ কখনও হইতে পারিবেন কি না সন্দেহ।

স্ট যে একাই আসিলেন তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে রেফ্, র-ফলা, ঋ-ফলা ও উ-কার যুক্ত স্ট-ও বাংলা টাইপ কেসে আসিলেন।

স্ট চালু হইবার ইতিহাস আছে। বহু কাল আগে প্রথম প্রথম রেল কোম্পানীর বিজ্ঞপ্তিতে স্‌ট ছাপা হইত। 'স্টেশন' পাল্টাইয়া 'স্‌টেশন' ছাপা আরম্ভ হইল। ক্রমে 'স্ট' এই যুক্ত টাইপ প্রস্তুত হইল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধানের পরও স্ট ষ্ট দুই-ই চলিতেছে ও চলিবে। বরং ষ্ট অপেক্ষা স্ট-র মূল বাংলা অক্ষর-মণ্ডলীতে বেশী গভীর। 'ষ্টার থিয়েটার'কে 'স্টার থিয়েটার' লিখিলে কি তাহার আভিজাত্য বাড়িবে, না চিনিতে পারিবার বেশী সুবিধা হইবে?

প্রসঙ্গতঃ লেখায় ও ছাপায় একটি চিরাচরিত প্রথার কথা বলিতেছি। যদিও ইহার সহিত নব প্রবর্তিত বানানের কোনোও সম্পর্ক নাই।

য-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের পর উ বা ঊ-কার থাকিলে ছাপার অক্ষরে তাহা উ বা ঊ যুক্ত ব্যঞ্জনের পর ্য (য-ফলা) দেওয়া হয়। ইহা ছাপাখানার টাইপ সাজাইবার প্রথা—লেখার প্রথা নহে। ছাপার অক্ষরে মৃত্যু দ্যুতি অধ্যুষিত প্রভৃতিতে উ-কার য-ফলার পূর্বে যাইতেছে। ইহাতে বর্ণের পূর্ব-পর ঠিক থাকে না এইরূপ ছাপা বিশ্লেষণ করিলে পাই—

মৃত্যু = ম্ + ঋ + ত্ + উ + য

দ্যুতি = দ্ + উ + য + ত্ + ই ইত্যাদি

অথচ হওয়া উচিৎ—ম্ + ঋ + ত্ + য + উ = মৃত্যু

দ্ + য + উ + ত্ + ই = দ্যুতি ইত্যাদি

'মিথ্যা' ঠিকই ছাপা হয় (থ্ + য্ + আ) কিন্তু 'মিথ্যুক' ছাপিবার বেলায় ছাপা হয় 'মিথ্যু' (য-ফলার পূর্বে উ-কার চলিয়া যায়)।

এইরূপ হইবার কারণ ছাপাখানায় তু থু দু ধু (ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত উ-কার যুক্ত) টাইপ থাকে। সাজাইবার সময় এই উ-কার-যুক্ত টাইপের পর ্য (য-ফলা) বসানো হয়। ইহাতে টাইপ সাজানো কিছু সহজ হইলেও শব্দটি ঠিক পাওয়া যায় না। লেখকেরা য-ফলা দিয়া পরে উ-কার লিখিলেও ছাপা হয় উ-কারের পর য-ফলা লোকে পড়ে অভ্যাস ও অনুমানের সাহায্যে। প্রথম শিক্ষার্থী ভিন্ন কেহই বর্ণের পর বর্ণ যোজনা করিয়া শব্দ নির্মাণ করিয়া পড়ে না কাজেই এ ত্রুটিও ধরা পড়ে না। হাতের লেখা ও ছাপার অক্ষরে এই পার্থক্য বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। উচ্চারণ অনুসারে শব্দের বানান লিখিতে হইলে ইহার সংশোধন আবশ্যক।

ইহাও ঠিক যে হরফে ্য (য-ফলা) দিয়া পরে উ-কার বা ঊ-কার সাজাইলে ঐ উ-কার বা ঊ-কার ছাপিবার সময় ভাঙ্গিয়া যাইবার আশঙ্কা। এ স্থলে য ফলা + উ-কার (্যু) ও য-ফলা + ঊকার (্যূ) এই দুইটি যুক্ত টাইপ প্রস্তুত করিয়া লইলে সে আশঙ্কা থাকে না। দুইটি হরফ বাড়িলেও ছাপা শুদ্ধ হইবে।

বাংলা বানানে যে কয়েকটি অনাচার অসঙ্গতি চোখে পড়ে তাহারই উপস্থাপনা করিলাম। বিধানের ভার ভট্টাচার্য মহাশয়দের উপর।

দ্রষ্টব্য—প্রবন্ধ লেখাতে রেফ যুক্ত ব্যঞ্জন দ্বিত্বহীন লিখিলেও ছাপাতে সর্বত্র ঐ নীতি টাইপের বশে রক্ষা করা যায় নাই।

বাসাংসি জীর্ণানি

(প্রতিযোগিতার গল্প)

শ্রীসমর বসু

চিঠিটায় নতুন করে আর পড়বার কিছু নেই 'টাইপ' হবার আগে ওর খসড়াটাই হাতে এসে পড়েছিল। অনেকবার সেটা পড়া হয়েছে গোপনে, চুপি চুপি অনেক আলোচনা হয়েছে বন্ধুদের সঙ্গে, নিজের মনের সঙ্গেও। তবুও চিঠিটা আবার না পড়ে পারলেন না হেমেনবাবু। হেমেন্দ্রকুমার মল্লিক—Anglo Burma Trading Corpn. এর Import Section-এর ১৫ বছরের এ্যাসিষ্টাণ্ট। ঠিকই আছে, ভাষার এতটুকু নড়চড় হয় নি।

......বিদেশী দ্রব্য আমদানী আশঙ্কাতীত ভাবে হ্রাস পাওয়ায় ব্যবসায়ের ব্যয় সঙ্কোচিত করিতে করপোরেশন বাধ্য হয়েছে, এবং Import Section-এর প্রয়োজনহীনতা উপলব্ধি হওয়ায় গভীর দুঃখের সঙ্গে করপোরেশন তাঁকে কর্মচ্যুত করতে বাধ্য হ'ল। তাঁর দীর্ঘদিনের কর্মনিষ্ঠার পুরস্কারস্বরূপ তাঁকে কিছু অর্থ উপহার দেওয়া হবে: অবশ্য তাকে ক্ষতিপূরণ বলে বিবেচনা করা উচিত হবে না। দু'মাসের বেতন এবং তৎসহ আরও নগদ কিছু টাকা।

দু'দিন ধরে অনেক চেষ্টা করে হেমেনবাবু এই নিষ্ঠুর অবিচারকেই মেনে নেবেন বলে মনটাকে তৈরি করেছিলেন: কিন্তু শেষ মুহূর্তটাকে আর অতিক্রম করা গেল না। হাতের ঘামে ভিজে গেল চিঠিটা, বুকের স্পন্দন বেড়ে গেল। ঠক্ ঠক্ করে কেঁপে উঠল শরীরের সমস্ত স্নায়ুগুলো। স্ফুরিত ঠোঁট দুটো পরস্পর আবদ্ধ হয়ে কেনোক্রমে একটা গভীর আর্তনাদকে যেন রোধ করল। হাত-পায়ের সমস্ত গ্রন্থিগুলো এমন শিথিল হয়ে এল যে, স্থির হয়ে তিনি আর দাঁড়াতে পারলেন না। সর্বস্বহারা বিদেশী পথিকের মতো নিতান্ত অসহায় ভাবে একটা চেয়ারে বসে পরে যাঁর নাম তিনি স্মরণ করলেন—তিনি হচ্ছেন পরম-কারুণিক সর্বমঙ্গলময় পরমেশ্বর, যাঁর বিধান সব সময়েই দুরধিগম্য এবং বোধ করি সেই জন্যই মঙ্গলদায়ক।

ছাতিটা বগলে নিয়ে, ছোট্ট চটের থলেটা হাতে তুলে নিয়ে রাস্তার নেমে এলেন হেমেনবাবু। দেখলেন সবই ঠিক আছে। ঐ ত রামলাল, তার ছোট্ট দোকানে বসে বসে পানের উপর খয়েরের লাঠিটা ঘষছে,—যেমন কাল ঠিক এই সময়েই ঘষেছিল। ঐ ত সেই মুচিটা—মাথা হেঁট-করে কার জুতোতে যেন পেরেক ঠুকছে। দু'সপ্তাহ আগে হেমেনবাবুর ছেঁড়া জুতোটা ঐ ত সারিয়ে দিয়েছিল। এখনও সেটা পায়ে রয়েছে। আর কতদিন থাকবে কে জানে!—আর ঐ ত লাইট-পোষ্টে হেলান দিয়ে প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় জীবের মত সেই আফগান 'শাইলক'টা লম্বা লাঠি নিয়ে শকুন-দৃষ্টিতে কাকে যেন খুঁজছে! কিছু দিন আগে ওর সঙ্গে আড়ালে দুটো কথা কইবার ইচ্ছা হয়েছিল হেমেনবাবুর কিন্তু সে ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে তিনি দমন করতে পেরেছিলেন। সন্ধ্যের দিকে একটা টিউশনি যোগাড় করে সে ইচ্ছাটাকে আর কোনোও দিনই মাথা তুলতে দেন নি হেমেনবাবু। নইলে আজকে ঐ শকুন-চোখদুটো হয় ত তাঁকেই ছিঁড়ে খেত।

নেতাজী সুভাষ রোড ধরে দক্ষিণ দিকে একটু একটু করে এগিয়ে চললেন হেমেনবাবু। 'বামার লরীর' ঘড়িতে ১২-৩৫ মি:, এখনো অনেক সময় কাটাতে হবে। সকাল সকাল বাড়ী ফিরে যাওয়া চলবে না। মনের এই অবস্থায় বাড়ীর সকলের অজস্র কৌতূহলের সামনাসামনি হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, বোধ হয় উচিতও নয়। অফিস ফেরতা যেমন ছ'টা নাগাদ বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছন,—ঠিক সেই সময়েই ফিরতে হবে। সুতরাং এই দীর্ঘ সময়টার বোঝা বয়ে বয়ে এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াতে হবে তাঁকে। 'ফুটপাথ' ধরে একটু একটু করে এগিয়ে চললেন হেমেনবাবু।

সব ঠিক আছে। মানুষের ব্যস্ততা, গাড়ীগুলোর দৌড়াদৌড়ি, আর কাপড়ের উপর পণ্য-সম্ভার বিছিয়ে দিয়ে ফেরীওয়ালাদের পরিত্রাহি চীৎকার। সব ঠিক আছে। যেমন গতকাল ছিল, কিংবা হয় ত যেমন আগামীকাল থাকবে। কোথাও কোনো বিশৃঙ্খলা নেই, সর্বত্রই সমান চঞ্চলতা। অসাড়তা শুধু হেমেনবাবুর মনে, একটা বরফ-গলা চিন্তা ধীরে ধীরে মনটাকে তাঁর অসাড় করে দিচ্ছে। বুকের পাঁজরাগুলো যেন ভেঙে পড়ছে। টলতে টলতে আরও এগিয়ে চললেন হেমেনবাবু।

দু'দিন ধরে বাড়ীতে তিনি ভাল করে কথাই কন নি কারোর সঙ্গে। কাউকে জানতে দেন নি ভেতরে কী দাবানল জ্বলছে, বুকের ভেতরটা পুড়ে ছাই-ছাই হয়ে গেলেও কেউ তা টের পাবে না। সামান্য সান্ত্বনার বাষ্পবিন্দুর তুচ্ছ সহানুভূতির অশ্রুজল এ আগুন নেভাতে পারবে না। এর জন্য চাই বিকল্প কোনোও ব্যবস্থা,—যা দিয়ে পাঁচটা পেটকে ভরানো যায়। গা-ঢাকার আবরণ জোটে। সান্ত্বনা আর অনুকম্পার প্রাণ-গলান ভাষাগুলো অশ্রুধারে ঝরে পড়লেও বিশেষ কিছু সুবিধে হবে না। তাই সান্ত্বনার আশা করেন না হেমেনবাবু।

এই পরিবর্তিত অবস্থা একদিন সয়ে যাবে। যেমন সয়ে গেছে ডালহৌসি স্কোয়ারের মধ্যদিয়ে ট্রাম-চলাচলের ব্যবস্থা। অভিযোগ চাপা পড়ে যাবে, প্রতিরোধের কণ্ঠ রোধ হবে। সূর্য কারোর জন্য বসে থাকে না। দিনের পর রাত্রি আসেই। মানুষের মনের এই কুৎসিত পরিবর্তন আজ কত সহনীয়। হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলো কেমন শুকিয়ে কুঁকড়ে ধীরে ধীরে মরে যাচ্ছে—পঞ্চাশ সালে—রাস্তার রাস্তায় লোকগুলো যেমন মরে যেত। নইলে পনেরো বছরের চাকরি একটা কলমের আঁচড়েই চলে যায়। আরও দক্ষিণ দিকে এগিয়ে চললেন হেমেনবাবু। ওল্ড কোর্ট হাউসের রাস্তা ধরে এগিয়ে চললেন এসপ্ল্যানেডের দিকে।

প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেই তাকে বিদায় নিতে হয়। অন্ততঃ বিদায় নেওয়া উচিত। অপ্রয়োজনের বোঝা হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে বিদায় নেওয়া অনেক ভাল। এই ত ওয়েষ্ট এণ্ড ওয়াচ কোং—কে না জানত তার নাম—অথচ এদেশে কি সত্যই ওর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল! হেমেনবাবুরও প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল তার অফিসে! সে ফুরিয়ে যাওয়াটাকে কি কোথাও কোনোও চক্রান্তে তরান্বিত করে তোলে নি! শিরদাঁড়া-বাঁকা একটা কুব্জ প্রশ্ন মনের কোণে উঁকি দেয়, জুগুপ্সায় সত্য চাপা থাকে না। রোদের তাপে বরফ গলবেই।

বিদায়ী সাহেবকে বিদায় অভিনন্দন জানাতে গিয়ে স্বরচিত যে ইংরেজী কবিতাটি পাঠ করেছিলেন হেমেনবাবু সেটা কি নতুন সাহেবের মনের কোণে এক টুকরা ঈর্ষার আশ্রয় গড়ে তুলেছিল! হেমেনবাবু বোধ হয় লক্ষ্য করেছিলেন, আর সে লক্ষ্যও বোধ হয় ভ্রান্ত নয় যে, তিনি যখন অকুণ্ঠ ভাষায় আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন শ্বেতদ্বীপবাসী মহানহৃদয় বন্ধুবৎসল সেই মানুষটাকে, যাঁকে তিনি বলেছিলেন, ডেভিড হেয়ারের বংশধর, ডিরোজিওর আত্মীয়, বাঙালী মনের সঙ্গে যাঁদের মন একশ' বছর ধরে বাঁধা পড়ে গেছে এক গভীর প্রীতির বন্ধনে,—তাঁদের একজন, এখন তাঁর পার্শ্বে উপবিষ্ট আর একজন শ্বেতদ্বীপবাসীর নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হয়ে উঠেছিল, চোখ ঈষৎ রক্তিম,—চাপা ঠোঁটে দুঃসহ বিরক্তির ব্যঞ্জনা।

মানুষে মানুষে কী প্রভেদ! একজনের প্রশংসা অপরকে ক্রুদ্ধ করল, দুরাত্মার ছলের অভাব হ'ল না। আর তার সঙ্গে সংযোগিতা করল হেমেনবাবুরই স্বদেশবাসী। বিদেশীকে খুশী করতে কী জঘন্য মীরজাফরী চক্রান্ত! ...আশ্চর্য্য! মীরজাফর আজও বেঁচে আছে মানুষের মনে, অথচ—মোহনলাল!—কবে মরে গেছে! সবই শুনেছিলেন হেমেনবাবু, কিন্তু প্রতিবাদ করেননি। প্রতিবাদ করতেও ঘৃণাবোধ হয়েছিল তাঁর। ধন ও শক্তির প্রতি মানুষের কি দুর্বার লোভ! পশুর নীচে নেমে যেতেও সঙ্কোচ নেই। সমাজের বেশীর ভাগ লোক যখন সেই স্তরে নেমে যায় তখন সব সয়ে যায়। অস্বাভাবিক স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। দাম দিয়ে খাঁটি জিনিস না পাওয়াটাই যেমন আজ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। হাতে কিছু বাড়তি না দিলে কোনোও কাজ পাওয়া যায় না, এ ধারণাটা আর অস্বাভাবিক নয়।

কার্জন পার্কটাকে কি এখন আর খারাপ দেখায়! মাঝখানে কেমন ট্রাম কোম্পানীর গুমটি অফিস, চারিদিক দিয়ে ট্রাম চলছে। স্থানে স্থানে ঘোমটা খুলে দিয়ে মুচকি মুচকি হাসছে মরশুমী ফুলের সুন্দর বধূরা। আগের কার্জন পার্কটাকে আর মনেই পড়ে না। বাইরের চাকচিক্য মানুষকে কেমন ভুলিয়ে রাখে।

হোয়াইট ওয়ে লেড্‌ল আর নেই—মেট্রোপলিটন ইনস্যুরেন্স। এইখানে অমূল্য জীবনটার মূল্যায়ন নির্দ্ধারিত হয়েছে হেমেনবাবুর। মরণটাকে রোধ করার জন্য নয়,—মরে গেলে কাঁদবার লোকেরা যেন কান্নাটাকে ভুলতে পারে। বস্তুজগতে বস্তুর মূল্য বুঝতে যেন দেরি না হয়! গরু মরে গেলে চামড়াটা কাজে লাগে। হাড়গুলোও ফেলা যায় না! মানুষের চামড়া দিয়ে জুতো বাক্স হচ্ছে নাকি কোথাও, হাড় দিয়ে চিরুণী বোতাম কিংবা অন্য কিছু! হতেও পারে—আজ না হয় কাল। তখন হয়ত হেমেনবাবুরা আর থাকবেন না,—আরও অনেক হেমেনবাবুরা এসে দেখবে সে সব দিন। কিন্তু গালিসি ম্যাচিওরড হতে এখনও পাঁচ বছর বাকী। আরও পাঁচ বছর পরে কতকগুলো

টাকা পাবেন হেমেনবাবু। সেই টাকা পেলে তবে সুধার বিয়ে হবে, আরও কত কি হবে,—কিন্তু পাঁচটা বছর টিকিয়ে রাখতে হবে পলিসিটাকে—। একটি প্রদীপের তেল নিয়ে নিভু-নিভু-হয়ে-আসা আরও কয়েকটা প্রদীপকে প্রজ্বলিত করে রাখা। সুন্দর ব্যবস্থা! কিন্তু এখনও পাঁচটা বছর—! একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস!

একটু নিরিবিলি গাছের তলায় এসে বসলেন হেমেনবাবু। সঙ্গে সঙ্গে কারা যেন সব ছুটে এল, অফিস থেকে ফিরলে ছেলেমেয়েরা যেমন করে আসে ঠিক তেমনি। তফাৎ শুধু ছেলেমেয়েরা জিজ্ঞেস করে—কি এনেছ বাবা! আর এরা বলে,—বাবু চা খাবেন, মসলামুড়ি, কেউ বা বলে,—বাবু কানট পরিষ্কার করে দেব। মানুষের সেবা করার পেশা নিয়েছে এরা। এদের কাছে মানুষের আমদানী বোধ হয় কোনোও দিনই কমবে না। আমদানী বিভাগ বন্ধ হবে না কোনোও দিন। শরীর ভাল থাকলে পেশা চলবেই,—প্রয়োজনের অতিরিক্ত হলেও।

টিফিন খাবার সময় হয়ে গেছে। পকেট থেকে একটা ডিবে বার করলেন হেমেনবাবু। চারখানা ছোট ছোট রুটি, একটু তরকারী। আর এক টুকরো ভেলি গুড়! গাছতলায় বসে এই রুটি খাওয়া,—নতুন জীবনের সঙ্গে কেমন যেন সুন্দরভাবে খাপ খেয়ে গেল। একটু হাসি পেয়ে গেল হেমেনবাবুর। এক ভাড় চা দিতে বললেন—চাওয়ালাকে।

বিশ বছর ধরে দেশের চেহারাটাই শুধু বদলে যায় নি। মানুষের মনের চেহারাটাও বদলে গেছে অনেকখানি। সংসারের বিস্তৃতি সঙ্কীর্ণ হতে হতে পাশ্চাত্যের অনুকরণে তা এখন শুধু স্বামীস্ত্রীতেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু এই অবস্থা যে কতখানি অসত্য,—মানুষের কাছে মানুষকে আত্মীয় করে তোলা যে কতখানি অর্থহীন, প্রাচ্যের ভূমিতে এই আদর্শের মূল প্রবিষ্ট হতে দেওয়ার যে কতখানি কুফলপ্রসূ, তা এই মুহূর্তে যেন বুঝতে পারলেন হেমেনবাবু। নইলে হঠাৎ তাঁর দাদা-বৌদিকে মনে পড়ে গেল কেন!

পিতৃমাতৃহীন নাবালক ভাইবোনদেরে বুকে তুলে নিয়ে কত গভীর স্নেহে, কত নিবিড় ভালবাসায় দাদা-বৌদি তাদেরকে বড় করে তুলেছিলেন। এতদিন সে কথা কি করে ভুলেছিলেন হেমেনবাবু, স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে তাঁর মনটা কি এতই আবিষ্ট হয়ে পড়েছিল যে, দাদাদের একটু খোঁজখবর নেওয়ার মতো তাঁর সময় ছিল না? এ কথা ত সত্যি নয়, পরকে ফাঁকি দেওয়া যায়, কিন্তু নিজের মনকে?

আজ তাঁর দুরবস্থার কথা জানিয়ে দাদাকে একটা চিঠি লিখবেন নাকি হেমেনবাবু!—দাদা হয়ত তাঁকে আবার বুকে-তুলে নেবেন, কিন্তু অতি নীচ স্বার্থপরের মতো এতদিন পরে এ সব কথা কি করে তাঁকে লিখবেন তিনি। দাদার সংসারে সাহায্য করার মত সংস্থান হয়ত তাঁর ছিল না, দাদারও হয়ত প্রয়োজন ছিল না সে সাহায্যের। কিন্তু সে মনও কি ছিল হেমেনবাবুর? বৌদির অসুখের সময় একবারও কি তিনি দেখতে গিয়েছিলেন। ট্রেন ভাড়ার যুক্তি দিয়ে মনকে আঁখি ঠেরেছিলেন তিনি।

এইভাবে সমস্ত স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তিগুলোকে তিনি আস্তে আস্তে মরে যেতে দিয়েছেন। নিজের সংসারের প্রতি প্রত্যেকেরই একটা গভীর মোহ থাকে,—সে সংসার অসচ্ছল হলেও,—হেমেনবাবুরও তাই ছিল। সেই মোহেই কি এতদিন আচ্ছন্ন থেকে দাদা-বৌদিদের সম্পূর্ণ ভুলে বসেছিলেন তিনি, কিংবা ইচ্ছা করেই তাঁদের ভুলতে চেয়েছিলেন! সত্যের সামনে মুখোমুখি দাঁড়াতে কেমন যেন ভয় পেয়ে গেলেন হেমেনবাবু।

দাদার সংসারটা ছোট নয়। নিজের ছেলেমেয়ে ছাড়া আছে বিধবা বোন নীলিমা। নীলিমা হেমেনবাবুর বোন। নীলিমার প্রতিও কি হেমেনবাবুর কোনোও কর্তব্য ছিল না? হেমেনবাবু যখন কলকাতায় চাকরি নিয়ে দাদার কাছ থেকে চলে এলেন, তখন দাদারই আদেশে, ছোট বোন সুধাকে নিয়ে এলেন সঙ্গে। দাদা রইলেন বিদেশে কর্মস্থলে, নীলিমার তখনও বিয়ে হয় নি। দুই বোনের দায়িত্ব নিতে হয়েছিল দুই ভাইকে। নীলিমা যখন বিধবা হয়ে এল তখন দাদাকে দোষারোপ করে যে চিঠি লিখেছিলেন হেমেনবাবু, তার সব কথাগুলোএখনও তাঁর কানে বাজে। টাকা দিতে হবে না…বলে একজন বৃদ্ধের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল নীলিমার, ফলে সে বিধবা হয়েছে। এখন তার যাবতীয় ভার দাদাকেই নিতে হবে। এর পর থেকে ধীরগতিতে দাদার সঙ্গে সমস্ত সংস্রব ঘুচে গেল। বছরে একটি মাত্র চিঠি দেওয়া—বিজয়া দশমীর প্রণাম জানান, তাও বোধহয় দু'বছর হ'ল বন্ধ হয়ে গেছে। এতখানি অবিশ্বাস্য পরিবর্তন তাও সম্ভব হ'ল, তাও সয়ে গেল।

হেমেনবাবুর সংসারটাও বেড়েছে, সুধার বিয়ের বয়স হয়েছে; তবুও তাকে পাত্রস্থ করবার কোনোও ব্যবস্থাই করতে পারেন নি হেমেনবাবু। নিজের চেষ্টায় বাড়ীতে

বসে পড়াশোনা করেছে সুধা, প্রাইভেটে বি. এ. পাস করেছে। হেমেনবাবু বাধা দেন নি। অফিসে একদিন কে যেন গল্প করেছিল, একটি শিক্ষিতা মেয়েকে দেখতে গিয়ে ছেলে তাকে পছন্দ করে আসে। ছেলের বাবাকে যখন দেনা-পাওনার কথা জিগ্যেস করা হয়, ছেলেটি তখন বলেছিল, যাকে সে বিয়ে করবে তার কাছে চিরদিনের জন্য কিছুতেই সে ছোট হয়ে থাকতে পারবে না। তার ধারণা ছিল, শিক্ষিতা মেয়ের সংস্কারমুক্ত মন রক্ষণশীলতার পরিচয় পেলে তাকে অশ্রদ্ধা করবেই। এ যুক্তিটা খুব মনে ধরেছিল হেমেনবাবুর। তাই সুধাকে তিনি লেখা-পড়া শিখতে দিয়েছিলেন। হয়ত তিনি ভেবেছিলেন, কোনোও উদার-হৃদয় যুবক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সুধার সমস্ত ভার গ্রহণ করে তাঁকে দায়মুক্ত করবেন। হেমেনবাবু বোধ হয় জানতেন না—নৈবেদ্যের সম্ভারে দক্ষিণার হার কমান যায় না। 'এনাং কন্যাং সম্প্রদদে'—বললেই, 'গৃহ্লামি' কেউ বলবে না। সে কন্যা সালঙ্কারা হওয়া চাই, তার পাশে দানসামগ্রী থাকা চাই, আর থাকা চাই রজত মুদ্রা। অফিসে যা শুনেছিলেন তিনি, সেটা গল্প; সত্যঘটনা অবলম্বনে হলেও। কিম্বা অন্য কোনোও উদ্দেশ্য ছিল হেমেনবাবুর। সুধা শিক্ষিতা হয়ে উঠলে নিজের ছেলেমেয়েদের জন্যে আর 'প্রাইভেট টিউটর' রাখতে হবে না। সুধাকে দিয়েই সব কাজ করান যাবে। এই ধরনের একটা স্বার্থপর চিন্তা সাপের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে মনের অবচেতন অন্ধকার গুহার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল নাকি! নাঃ, নাঃ এ সম্ভব নয়! এ ধরনের চিন্তা করতেই পারেন না হেমেনবাবু। বড় ভাল মেয়ে সুধা—দাদা-অন্ত প্রাণ। অত বড় সংসারটা কেমন সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ঐ ত ক'টা টাকা, সুধা তাকেই মন্থন করে সংসারের জীর্ণ চাকাটাকে সব সময় তৈলসিক্ত করে রেখেছে। সুধার হাতে টাকা যেন 'ইলাষ্টিক'—টান দিলেই বাড়ে। হেমেনবাবুর স্ত্রীকেও কিছু দেখা-শোনা করতে হয় না। ছেলেমেয়েদের স্নান করান, জামা-প্যান্ট পরান থেকে সুরু করে তাদের খাইয়ে-দাইয়ে স্কুলে পাঠান, তাদের পড়াশোনা দেখা, স্কুল থেকে ফিরলে পঞ্চাশ রকমের বায়না—সব ঝক্কি একাই সামলায় সুধা। দাদা-বৌদিদের সংসারে সে গলগ্রহ হয়ে আছে বলেই কি তাঁদের সে খুশী করতে চায়? এর মধ্যে কি আন্তরিকতা কোথাও নেই! শুধু কি কর্তব্যনিষ্ঠা!

না, না, সুধা সম্বন্ধে এ ধারণা করা অন্যায়। আজকের যুগ হৃদয়কে অস্বীকার করে, মানুষের চিন্তাশক্তিকে পর্যন্ত বস্তুকেন্দ্রিক করে তুলেছে। এ যুগ বলে, ভক্তি, ভাল-বাসা, স্নেহপ্রীতি সমস্তই মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে একান্ত-রূপেই সংশ্লিষ্ট, আর সেই অস্তিত্বটাই জৈব নিয়মাধীন। আজকের মানুষ বাইরের জগতে অনেক অগ্রসর হলেও অন্তর্জগতে এখনও সে অন্ধগুহাশ্রয়ী। কিন্তু সুধা, সুধা ত একটা ব্যতিক্রমও হতে পারে। জীবনের মূল্যবোধের আধুনিক নীতিতে 'এক্সসেপ্‌শন' বলে কি কিছুই নেই! পরিশ্রমক্লান্ত হেমেনবাবুর দিকে চেয়ে সুধা যখন দীর্ঘশ্বাস ফেলে, ছোট ভাই হলে সে তার দাদাকে আজ কত সাহায্য করতে পারত—এই বলে অভিমান প্রকাশ করে। দাদা যদি অনুমতি দেয়, এখনই সে চাকরি করতে পারে। এ কথা সে যখন জোরগলায় বলে, তখন? তখনও কি সুধা স্বার্থপর!

চাকরি নেই, একথা সুধাকে কিছুতেই বলতে পারবেন না হেমেনবাবু। শুধু সুধাকে কেন! সংসারের কেউ যেন না জানতে পারে যে, হেমেনবাবুর চাকরি নেই। অফিস থেকে বাড়তি যে টাকাগুলো পাওয়া গেছে, ব্যাঙ্কে তা জমা রাখতে হবে। প্রতি মাসের শেষে মাসিক বেতনের মত তুলে নিতে হবে। মাস দু'য়েক এই ভাবে চালাতে পারলে একটা কিছু নিশ্চয়ই জুটে যাবে। জুটিয়ে নিতে হবে অন্ততঃ। নইলে সুধা যখন জানতে পারবে, তখন ও নিজেই হয়ত বেরিয়ে পড়বে রাস্তায়। যে-কোনও কাজ হয়ত যোগাড় করে নেবে—প্রায়ই ত একথা বলে সুধা। চাকরি করে সংসারের আয় বাড়ান অমর্যাদাকর নয়। আজকাল ত কত মেয়েই চাকরি করছে। হেমেন-বাবু যদি হঠাৎ কোনোও ভারী অসুখে পড়ে যান—তখন কি হবে? ওষুধ-পথ্য ত দূরের কথা—দু'বেলা দু'মুঠো ভাতও জুটবে না। কিন্তু সুধাকে কিছুতেই চাকরি করতে দিতে পারেন না হেমেনবাবু। রাস্তা দিয়ে ও যখন যাবে দু'পাশের লোকগুলো চোখ দিয়ে চাটবে ওর দেহটাকে। ট্রামে-বাসের ভিড়ে সুযোগ-সন্ধানী যাত্রীরা ওর অসহায় শরীরটাকে নিষ্পিষ্ট করে দিয়ে মনে মনে একটা পশুচিত আনন্দে মেতে উঠবে। উচ্ছৃঙ্খল অপরিণত বয়স্ক ছেলেরা অশ্লীল মন্তব্যে নোংরা করে রাখবে ওর চলার রাস্তাটাকে। না, না, এই অস্বাস্থ্যকর আবর্জ্জনার মধ্যে কিছুতেই তাঁর বোনকে তিনি ঠেলে দিতে পারেন না। যে-কোনোও অসম্মান থেকে বোনকে রক্ষা করা তাঁর নৈতিক কর্তব্য। কিন্তু নীতি-দুর্নীতির ব্যবধানটা কি আশ্চর্য দ্রুতগতিতেই না সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ছে। সেদিন হয়ত আর বেশী দূরে নয় যেদিন আপেক্ষিকতার নিয়মাধীন হয়ে এই নীতিপ্রশস্ত ব্যবধানটাও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। মানুষের জীবনরস একেবারে শুকিয়ে যাবে। জীবনের

চেয়ে জীবিকা হবে বড়। প্রেমের চেয়ে শক্তি বাইরের বেদীতে হবে অন্তরের বলিদান।

বেলা কত হ'ল কে জানে! আশেপাশে কোথাও একটা ঘড়ি নেই। মেট্রোপলিটনের টাওয়ার ক্লকটা ঠিক নজরে আসে না। নিজের হাত-ঘড়িটা পড়ে আছে সেই চীনেমাটির কেট্‌লীতে। চা তৈরি করার জন্যে কেনা হয়েছিল কেট্‌লীটা। কিন্তু যতদূর মনে পড়ে একদিনও তাতে চা হয় নি। সুচসুতো, টিপকল, বোতাম, সেফটি-পিন্, মাথার-কাঁটা, আর তাদের সঙ্গে একেবারে অকেজো-হয়ে-যাওয়া সেই হাত-ঘড়িটা স্তূপীকৃত হয়ে আছে ঐ কেট্‌লীর মধ্যে। একটা অপ্রয়োজনীয় আবর্জনা কোনো দিনই লাগবে না কোনোও কাজে। তবুও তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয় নি বাইরের জঞ্জালে। প্রয়োজন তার ফুরিয়ে গেছে, তবু আশ্রয়টুকু তার ঘোচে নি। অথচ হেমেনবাবু আজ বেকার। ঘড়িটার মত আন্‌সার্ভিস্‌-এ্যাবল্ নন তিনি। সার্ভিস দেবার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে তাঁর। তবুও হাত থেকে খুলে তাকে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হ'ল রাস্তার আবর্জনায়। কিন্তু কোনোও লোভী কি নেই সেটাকে কুড়িয়ে নিয়ে যায়; এই গাছতলা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলেই ত সেটা চলতে সুরু করবে! 'অয়েলিং ক্লিনিং'-এর খরচা জুগিয়ে চললেই এখনও বিশ বছর সে কাজ করে যাবে। কিন্তু কেউ আসে না!

গাছতলা থেকে উঠে পড়লেন হেমেনবাবু। কর্ম-জীবনের প্রথম দিকে কি একটা ব্যাঙ্ক-এ একটা সেভিংস্‌ অ্যাকাউণ্ট খুলেছিলেন তিনি। স্বপ্ন ছিল, সাধ ছিল অনেক। সে বয়সে কারই বা না থাকে। তার পর 'মিনিমাম্ ব্যালেন্স' বুকে ধরে সে অ্যাকাউন্ট অচল হয়ে পড়ে আছে, কতদিন হ'ল তারও হিসাব মনে নেই। আজ সেই অ্যাকাউন্টটাকে পুনর্জীবিত করতে হবে। পুনর্জীবনের মন্ত্র তার পকেটে। খস্ খস্ করছে তাজা নোটগুলো। বেশীক্ষণ সঙ্গে রাখা নিরাপদ নয়। অবশ-হয়ে-যাওয়া পা দুটোকে কে যেন চাবুক মারল। হেমেন-বাবু একটু তাড়াতাড়ি চলতে সুরু করলেন।

যথাসময়েই বাড়ী ফিরলেন হেমেনবাবু। যথারীতি সুধা এল ছুটে। হাত থেকে কেড়ে নিল ছাতি আর থলে। ছেলেমেয়েরা এসে ঘিরে দাঁড়াল। কোথাও যেন কিছু হয় নি। কর্মিষ্ঠ আর কর্মহীনে ব্যবধান অনেক। কিন্তু হেমেনবাবুর মধ্যে সে ব্যবধান কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। আশ্চর্য অভিনয়-ক্ষমতা হেমেন-বাবুর। অভিনেতা হিসেবে যে হেমেন মল্লিক একদিন সুনাম অর্জন করেছিলেন, অভিনয় নিয়ে মেতে থাকার জন্যে শেষ পর্যন্ত যাঁর ইণ্টারমিডিয়েট পাস করাই হ'ল না, সেই হেমেন মল্লিক আজও বেঁচে আছে। সংসারের বিশমণী পাথরটা সে প্রতিভার উৎসমুখে এখনও বাধা সৃষ্টি করতে পারে নি। ভেতরের ঝড় ভেতরেই বইছে, মুখের রেখায় কোথাও ফুটে উঠছে না সে আলোড়ন। সুজি আর চা নিয়ে এল সুধা। তার দিকে চেয়ে মুচকে হাসলেন হেমেনবাবু। ঘি ফুরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সুজি হয়েছে, এবং সে সুজিও ঘৃতগন্ধী! কমপক্ষে কতখানি পুঁজি হাতে থাকলে পরবর্তী সংগ্রহের রিকিউ-জিশন্ 'ইস্যু' করে সুধা, এ তথ্য অনুসন্ধান করলেন তিনি। এই নিয়ে ভাইবোনে হাসাহাসি হ'ল অনেকক্ষণ। বিচক্ষণ বুদ্ধিমতী সুধা মুহূর্তের জন্যেও বুঝতে পারল না—দাদা আর সে দাদা নেই।

যেমন নিত্যকার অভ্যেস ঠিক তেমনি—সকালের আধপড়া কাগজটা নিয়ে খুলে বসলেন হেমেনবাবু। হঠাৎ যেন তার বিশ বছর বয়স কমে গেল। যে পড়াগুলো এতদিন অবজ্ঞাভরে উল্টে দেখে নি, সেই 'সিচুয়েশন্ ভেকেণ্ট'-এর পাতাটার উপরই হুমড়ি খেয়ে পড়লেন হেমেনবাবু। বিশ বছর আগের সেই উৎসাহে যেন এতটুকু ভাঁটা পড়ে নি।

কিন্তু কোথাও কিছু মিলল না। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হয়ে এল। রাতও ফুরোবে। সকাল হবে; সুরু হবে সংসার-মঞ্চে হেমেন্দ্র মল্লিকের অভিনয়। কিন্তু কতদিন! ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স ফুরিয়ে গেলেই ত পাদপ্রদীপ যাবে নিভে। তখন ত আর অভিনয় করা চলবে না। পরচুলা-গোঁফ-দাড়ি আর সাজ-পোশাক ফেলে রেখে মঞ্চ ছেড়ে দর্শক-মহলে নেমে আসতে হবে বেকার হেমেন্দ্র মল্লিককে। তখন কি জবাব দেবেন হেমেনবাবু! কিন্তু তার আগে কি কিছুই জুটবে না? এতদিনের অভিজ্ঞতা,—কিছুই কি মূল্য নেই তার। ক্লৈব্যংমাস্মগমঃ—ক্লৈব্য ত্যাগ করতে হবে। চেষ্টা করতে হবে, প্রাণপণ চেষ্টা।

প্রচণ্ড চেষ্টার কালো ছাপ পড়ল শরীরে। চোখ ঢুকে গেল। উঁচু হয়ে উঠল চোয়ালের হাড়। ক্রমশঃ শুকিয়ে-যাওয়া হেমেনবাবুর রুক্ষ মুখের দিকে চেয়ে খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছেন তাঁর স্ত্রী। দিন দিন রোগা-হয়ে-যাওয়া দাদার চেহারার দিকে তাকিয়ে সুধাও খুব চিন্তিত। আর কোনোও নিষেধই সে শুনবে না। এমন করে অকাল-মৃত্যুর দিকে দাদাকে সে ঠেলে দিতে পারবে না। তাকেও বাইরে বেরুতে হবে। নিয়ে আসতে হবে মুঠো মুঠো টাকা। অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়েছে বলে

ত পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মেয়েরাও নেমেছে পথে। শিক্ষা যদি কাজেই লাগল না,—সেশিক্ষার প্রয়োজন কি ছিল!

সুতরাং বৌদির সঙ্গে পরামর্শ করে কোনোও একটা সরকারী অফিসে একটা দরখাস্ত ছেড়ে দিয়েছে সুধা। চাকরিটা যদি পেয়ে যায়, দাদাকে টিউশনি করা থেকে অন্ততঃ সে মুক্তি দিতে পারবে। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে এসে আবার গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করা এত পরিশ্রম সইবে কেন! দুধ-ঘি ত পেটে কিছুই পড়ে না! পরিশ্রম কমাতে পারলে শরীরের ক্ষয়-ক্ষতিটাও কমবে অনেকখানি! সুধা দিন গুণতে লাগল, কবে সে দরখাস্তের উত্তর আসে।

এতদিন এ সব কথা গোপন রাখা হয়েছিল হেমেনবাবুর কাছে। আজ দরখাস্তের উত্তর এসেছে। অফিস থেকে দেখা করতে বলেছে সুধাকে। এখন আর গোপন রাখা যায় না। গোপন করা উচিতও হবে না। আনন্দে গদগদ হয়ে সমস্ত কথা হেমেনবাবুকে জানালেন তাঁর স্ত্রী। যেন মস্ত বড় একটা রাজ্য জয় করে এসেছেন তিনি। হেমেনবাবু ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর দুর্বল শরীরে বেশী পরিশ্রম সইছে না বলেই এ ব্যবস্থা করা হয়েছে—এ কথা বলেও তাঁকে শান্ত করা গেল না। তাঁকে অপমান করার কি অধিকার আছে সুধার। দাদার গরীব সংসারে থাকতে সত্যিই যদি সুধার কষ্ট হয়ে থাকে, নিজের সাধ-আহ্লাদ মিটছে না বলে মনে মনে যদি সে ক্ষুব্ধ হয়ে থাকে, তবে সে জেনে রাখুক যে, তার দাদা যথাশীঘ্রই তার বিয়ের ব্যবস্থা করবেন। বিয়ের পর যা খুশী সে করতে পারে! কিন্তু এই সংসারে তার এতখানি ঔদ্ধত্য কিছুতেই সহ্য করবেন না হেমেনবাবু।

সুধা কেঁদে উঠল। চব্বিশ বছরের তরুণী ছোট্ট মেয়ের মতো কাঁদতে কাঁদতে আছড়ে পড়ল বৌদির বুকে। বৌদিও আঁচলে মুখ লুকোলেন। মুহূর্তে কোথা দিয়ে কি যেন হয়ে গেল। আনন্দোচ্ছল সুন্দর পরিবেশটুকু অকস্মাৎ এই নির্মম আঘাতে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। একটা কুৎসিত অভিশাপ হিংস্র শ্বাপদের মতো তার তীক্ষ্ণ নখর-দন্ত বিকশিত করে একটু একটু করে গড়ে ওঠা। স্নেহপ্রীতির মাধুর্যভরা এই ছোট্ট নীড়টুকু যেন ছিঁড়ে কুটি কুটি করে দিল। এতক্ষণে হেমেনবাবু বুঝতে পারলেন, এতখানি উত্তেজিত হওয়া তাঁর উচিত হয় নি। কিন্তু হঠাৎ তাঁর মুখ থেকে এই রূঢ় কথাগুলো কেন বেরিয়ে এল! চাকরির জন্যে পথে পথে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে কোনোও পার্কে বসে বসে তিনি অনেকদিন ভেবেছেন, সংসারটা তার অনেক বড়...। যাদের খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করে তোলবার সামর্থ্য তাঁর নেই, তাদের কেন তিনি টেনে নিয়ে এসেছেন এই সংসারের নরকে? নিজেকে অনেকবার ধিক্কৃত করেছেন। স্ত্রীর উপরেও রাগ হয়েছে তাঁর। একটা মানুষ সারাদিন খেটে খেটে প্রাণান্ত করছে, আর তার দিকে নজর নেই কারও। কেন যে মানুষটা গুম হয়ে বসে থাকে—কেউ কি কোনোও দিন জিজ্ঞেস করেছে। আর ঐ সুধা, বিরাট একটা বোঝার মতো ঘাড়ে চেপে বসে আছে। মুখে দেখায় কত দরদ,—অন্তরে কি আছে—কে জানে। সুধার উপর তখন রাগও হয়েছে। কিন্তু সে সব কথা ত এখন আর ভাবেন না হেমেনবাবু। তবে কি সেই জঘন্য চিন্তাটা এখনও বেঁচেছিল মনের অতলান্ত অন্ধকারে। শ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ হয়ে মরে যেতে সে পারে নি। ছিঃ ছিঃ ছিঃ, এত নীচ কি করে হতে পারলেন হেমেনবাবু। সুধাকে ত সত্যই তিনি ভালবাসেন। পর পর কতকগুলো ভাইবোন মরে যাবার পর সুধা হয়েছিল। তাই ও সকলকারই আদরের। হয়ত সেই জন্যেই ও একটু বেশী অভিমানী। চব্বিশ বছর বয়স হয়েছে ওর, কিন্তু একদিনও হেমেনবাবু ওকে ধম্‌কে কথা বলেন নি। ধমক দিয়ে কথাই বলা যায় না ওকে। বড় ভাল মেয়ে সুধা, বড় নরম। দাদার কষ্টলাঘবের জন্যেই ও চেয়েছে চাকরি করতে, দাদাকে একটু বিশ্রাম দিতে, আর সেই দাদাই কিনা ওকে এমন কতকগুলো কথা শুনিয়ে দিল যা শোনানোর আগে ওর দাদার মৃত্যু হ'ল না কেন? ছিঃ ছিঃ ছিঃ—হেমেনবাবু এত নীচ!

মেঝের উপর শুয়ে-থাকা সুধার মাথাটা কোলে তুলে নিলেন হেমেনবাবু। সুধারই কাপড়ের কোণ দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিলেন, সান্ত্বনা দিলেন তাকে। তার কাছ থেকে ক্ষমা চাইলেন। সুধা উঠে বসে প্রণাম করল দাদাকে। ঝড় থেমে গেল। শান্ত হ'ল সমস্ত পরিবেশ। কিন্তু সেই স্তব্ধ ঘরের গুমোট বাতাসে অনেকক্ষণ ধরে ভেসে বেড়াল একটা করুণসুরের মর্মস্পর্শী রাগিনী। অনেকক্ষণ...! অনেকক্ষণ!...

সুধার মনে আঘাত দেওয়ার প্রতিক্রিয়াটা জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে হেমেনবাবুর মনে। কিছুতেই তিনি স্থির হতে পারছেন না। চাকরি তাঁকে একটা পেতেই হবে—একটা চাকরি, দশটা-পাঁচটায় একটা নির্দিষ্ট জায়গায় বসে থাকা। ঘুরতে আর পারছেন না তিনি। লোকের কাছ থেকে আশা আর আশ্বাস পেয়ে পেয়ে মন তার জর্জরিত হয়ে পড়েছে। সব আশাগুলোই ভুয়ো, সব

আশ্বাসগুলোই মিথ্যে। যে ভদ্রলোক দেখা করতে বলেছেন আগামী সোমবারে—তার কাছে যেতেও লজ্জা-বোধ করেন হেমেনবাবু। লজ্জাবোধ করেন, তিনি লজ্জা পাবেন বলে।

লোকের অক্ষমতা আর অসামর্থ্যের কথা শুনে শুনে একটা করুণ নৈরাশ্য নেমে আসছে তাঁর মনে, তবুও দিনের পর দিন চেষ্টা চলেছে তাঁর। শ্রান্ত শরীর, ক্লান্ত মন, আশ্চর্য —তবুও তারা ভেঙে পড়ছে না—এখনও অটুট, এখনও দৃপ্ত! এখনও হাত পাততে হয় নি কারোর কাছে। কিন্তু ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স ফুরোতেও ত আর বেশী দেরী নেই! আজ কত তারিখ। চাকরি-বাকরি না থাকলে তারিখটাও মনে থাকে না। ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকালেন হেমেনবাবু। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেল তাঁর চোখ দুটো। বিদেশ-বিভুঁয়ে বেড়াতে গিয়ে সর্বস্ব লুণ্ঠিত কোনোও লোক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে দেখতে পেয়ে যেমন করে থমকে দাঁড়ায়, ঠিক তেমনি করে থমকে দাঁড়াল হেমেন-বাবুর চকচকে চোখ দুটো। ডুবে যাওয়া মানুষটা যেন খুঁজে পেলেন একটুকরো কাঠখণ্ড! কে. সি. রায় এ্যাণ্ড সন্স ক্যালেণ্ডারের উপর বড় বড় করে লেখা অক্ষরগুলো জ্বল-জ্বল করে উঠল—যেন হাজার 'পাওয়ারে'র বাতি।

ক্ষিতীশ রায় হেমেনবাবুর বাল্যবন্ধু। একই গ্রামের ছেলে। মাঝে মাঝে এখনও দেখা হয় কলকাতার রাস্তায়। চলতে চলতে কিছু খবরাখবর নেওয়া—তার পর আবার ছাড়াছাড়ি। বেলেঘাটার কোথায় একটা 'গ্লাস ওয়াকস' খুলেছেন ক্ষিতীশবাবু। ক্যালেণ্ডারটা তিনিই দিয়েছিলেন হেমেনবাবুকে। কে. সি. রায় এণ্ড সন্স।

শৈশবের বন্ধুত্বের দাবী—প্রৌঢ়ত্বের উপান্তেও বোধ হয় তাঁবাদী হয় না। অন্ততঃ ক্ষিতীশের কাছে সে দাবী একবার করতে পারেন হেমেনবাবু। ক্ষিতীশ সেই ধরনের মানুস নয়—যাঁরা পয়সা হলে বদলে যায়। যখনই দেখা হয়েছে ক্ষিতীশের সঙ্গে তখনই সে মন খুলে কথা কয়েছে। এতটুকু সঙ্কোচ বোধ করেন নি হেমেনবাবু। ভাবতেই পারেন নি যাঁর সঙ্গে তিনি কথা কইছেন তাঁর জাত আলাদা। বরং মনে হয়েছে কৈশোরের সীমা ছাড়িয়ে এতটুকুও এগোতে পারেন নি ক্ষিতীশ। সেই উচ্ছলতা, সেই চাপল্য আর সেই অহৈতুক হাসি। কার-খানার মালিক আর অফিসের কেরাণী, শুধু পোশাকের মধ্যেই সে প্রভেদ, আচরণে কোথাও না। কেনই বা হবে? ক্ষিতীশ রায় যে সেই ধরনের বন্ধু—সংস্কৃত শ্লোকে যাকে বলা হয়েছে—'উৎসবে ব্যসনে চৈব...।' সুতরাং চাকরি জুটল হেমেনবাবুর। কে. সি. রায় এণ্ড সন্স অফিসের একটা চেয়ার দখল করে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসলেন তিনি। মাথার উপর আবার পাখা ঘুরতে সুরু করল, কাগজের উপর কলম চলল দৌড়ে।

খুব খুশী হয়েছেন ক্ষিতীশবাবু। বন্ধুর প্রয়োজনে লাগতে পেরেছেন বলে তিনি নিজেই যেন ধন্য। এত দিন তাঁর কাছে কেন আসেন নি হেমেনবাবু! মিছিমিছি কত কষ্ট পেয়েছেন। ক্ষিতীশ রায়ের কত অনুযোগ। হেমেন্দ্র মল্লিকের ঝাঁঝরা-হয়ে-যাওয়া বুকখানা যেন আনন্দে ভরে উঠল। আবার তাঁকে স্মরণ করলেন তিনি যাঁর নাম পরম কারুণিক সর্বমঙ্গলময় পরমেশ্বর। যাঁর বিধান সব সময়েই মঙ্গলদায়ক।

হেমেনবাবু যেন কোনও সময়েই না মনে করেন যে, তিনি ক্ষিতীশের কর্মচারী। কোনোও সঙ্কোচ, কোনোও কুণ্ঠা মনে যেন তাঁর স্থান না পায়। সব সময়েই তিনি ক্ষিতীশ রায়ের বন্ধু। বন্ধুর মতোই তিনি যেন অফিসের সমস্ত কাজকর্ম দেখেন। সবলের প্রতি যেন একটু নজর রেখে চলেন। কেন না হেমেন বাবুর মত এত আপনার লোক এই অফিসে ক্ষিতীশের আর কেউ নেই।

এতটা কিন্তু আশা করেন নি হেমেনবাবু। পয়সা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনটা ছোট হতে থাকে এই ধরনের একটা সংস্কারে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। ক্ষিতীশবাবুও যদিও একটা ব্যতিক্রম তবুও এতদিন পরে এত-খানি ভালবাসা—আশা করতে পারেন নি হেমেন-বাবু। সমস্ত অবসাদ, সমস্ত নৈরাশ্য মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নতুন উদ্দীপনায় কাজ সুরু করলেন তিনি। সংসারের চেহারাটা বোধ হয় এতদিনে বদলাতে পারা যাবে। ক্ষিতীশের সাহায্যে সুধার বিয়েটাও বোধ হয় দিতে পারবেন তিনি। এতদিন ক্ষিতীশের কথাটাই তাঁর মনে পড়ে নি। আশ্চর্য; এমন একজন পরমাত্মীয়, এত কাছে থাকতে হন্যে কুকুরের মতো পরের দোরে দোরে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। নিজের উপরেই অভিমান হ'ল হেমেনবাবুর। ক্ষিতীশের এই ঋণভার যদিও কোনোও দিনই পরিশোধ করা যাবে না, তবুও যথেষ্ট কাজ দিয়ে তিনি তা যথাসাধ্য শোধ করতে চেষ্টা করবেন। ক্ষিতীশ যেন কোনোও দিনই না ভাবে তার কাছ থেকে ফাঁকি দিয়ে কিছু আদায় করে নিয়েছেন হেমেনবাবু।

তাই নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই অফিসে আসেন তিনি। নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে বাড়ী যান। হেমেনবাবুর মতো একজন কর্মদক্ষ লোক পেয়ে খুবই খুশী

হয়েছেন ক্ষিতীশ রায়। ক্ষিতীশের মত এমন উদার হৃদয় বন্ধুমনিব পেয়ে হেমেনবাবুও কম খুশী হন নি।

কয়েকদিন যেতেই কে. সি. রায় এণ্ড সন্স অফিসের মাইনের দিন এসে গেল। মাইনেটা হাতে এলেই টিউশনিটা ছেড়ে দেবেন হেমেনবাবু। সমস্ত অফিসটার পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর। তিনি এখন ঠিক কেরাণী নন। কে. সি. রায় এণ্ড সন্স-এর ম্যানেজার। কিংবা তার চেয়েও কোনোও উচ্চতর পদের অধিকারী। এই ক'দিনেই বুঝতে পেরেছেন হেমেনবাবু যে, ক্ষিতীশের বাণিজ্যে লক্ষ্মী বসতে। পুরনো মডেলের গাড়ীটা বিক্রী করে নতুন গাড়ী যেদিন কেনা হ'ল সেদিন ক্ষিতীশের চেহারা দেখেই এ বিশ্বাস তাঁর দৃঢ় হয়েছে। সুতরাং এর পর টিউশনি না করলেও চলবে।

বেলা পাঁচটার পর হেমেনবাবুকে ডেকে পাঠালেন ক্ষিতীশ রায়, একটা 'ভাউচার ফর্মে' রেভিনিউ ষ্ট্যাম্প আঁটা। ভাউচারটায় কিছু লেখা নেই। ক্ষিতীশবাবুর নির্দেশে হেমেনবাবু তাতেই সই করলেন। আগে কত মাইনে পেতেন হেমেনবাবু, এ-কথা জিগ্যেস করে নিয়ে অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষিতীশবাবু বললেন—যে অত টাকা তাঁর পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। ব্যবসার অবস্থা ত হেমেনবাবুর কিছু অজানা নেই! তাছাড়া এতদিন ত তাঁকে বেকার হয়েই থাকতে হ'ত। হেমেনবাবু ইণ্টারমিডিয়েট পাশও করেন নি। ইচ্ছা করলে ঐ টাকাতেই গ্র্যাজুয়েট পেতে পারতেন তিনি। কিন্তু তা নয় করে ক্ষিতীশবাবু হেমেনবাবুকেই নিয়েছেন—সুতরাং সবদিক বিবেচনা করে হেমেনবাবু যেন কিছু মনে না করেন।

নাঃ, কিছুই মনে করেন নি হেমেনবাবু! কিছু মনে করার মতো মন তাঁর ছোট নয়। শুধু ভাবলেন, সে দিন ডুবে-যাওয়া মানুষটা কাষ্ঠখণ্ড বলে যাকে আশ্রয় করেছিল সেটা কাষ্ঠখণ্ড নয়, সূর্যকিরণ-প্রত্যাশী একটা জন্তুর পৃষ্ঠদেশ, অনেক গভীর জলে যার বাস। বন্ধুর সঙ্গে বেতন সম্বন্ধে আগে কোনোও কথা কইবার প্রয়োজন তিনি মনে করেন নি, পরেও সে সম্বন্ধে কোনোও আলোচনা করতে তাঁর প্রবৃত্তি হ'ল না।

কিন্তু ঐ শুচিশুদ্ধ প্রবৃত্তি নিয়ে কি আর বেঁচে থাকা যায়! ছোঁব না ছোঁব না করে সরে থাকলেই কি জনতার ভিড়ে স্পর্শ বাঁচান যায়। জীর্ণ হয়ে আসছে সব পুরণো প্রত্যয়। ঐ ত রাস্তার ধারের ঐ পোড়ো বাড়ীটার একটা দেওয়াল ধ্বসে পড়ল। দু'জন লোকও নাকি মারা গেছে। জীর্ণতার নীচে আশ্রয় নিয়েছিল ওরা, মৃত্যু দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করেছে। প্রাণান্তকর পরিশ্রমের বিনিময়ে মুষ্টিভিক্ষা পেয়ে প্রতিবাদ করার মত প্রবৃত্তি হ'ল না হেমেনবাবুর। প্রতিবাদ থেকে নাকি বিবাদ জন্মায়! বিবাদে চিত্ত অশুদ্ধ হয়। বিত্তহীনেরাই চিত্তের গর্ব করে। কিন্তু শুদ্ধচিত্তের কাজই ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোজা হয়ে দাঁড়ান। অবিচারককে সহ্য না করা। নীতির প্রতি এত নিষ্ঠা হেমেনবাবুর অথচ তিনি এই নৈতিক কর্তব্যটুকু ভুলে গেলেন! ভীরুতাকে আশ্রয় করে এতখানি দুর্বল হয়ে পড়েছেন তিনি।

হঠাৎ দৃপ্ত পদক্ষেপে অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন হেমেনবাবু। পুরোন সংস্কারগুলো মাঝে মাঝে টেনে ধরছিল পা দুটোকে, কিন্তু একটা দৃঢ় সঙ্কল্পের প্রাবল্যে, একটা তীব্র আত্মসচেতনতায় সমস্ত দুর্বলতাকে অতি অনায়াসেই অতিক্রম করে ঠিক সময়েই বাড়ীতে এসে পৌঁছুলেন হেমেনবাবু। সুধা বেরিয়ে এল। স্তব্ধ হ'ল দাদাকে দেখে! মনে হ'ল দাদা যেন একটা নতুন মানুষ। কাছে গিয়ে হাত থেকে থলেটা নিতেও সাহস হ'ল না তার। ঘরের মধ্যে ঢুকে, থলেটা মেঝের উপর রেখে সুধাকে ডাকলেন হেমেনবাবু—অত্যন্ত সহজ, স্পষ্ট ভাষায় বললেন—"ইণ্টারভ্যুটা তুই দিয়ে আয় সুধা।"

সুফী সাধিকা রাবেয়া ও তাঁহার মরমিয়া সাধনা

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

১

সুফী সাধনার কথা :—মুসলমানগণ এক অদ্বিতীয় নিরাকার ঈশ্বরের উপাসক। তাঁহারা ঈশ্বরের কোনো আকারে বা প্রতীককে বিশ্বাস স্থাপন করেন না। অথচ তাঁহারা ঈশ্বরের ন্যায়বত্তা, কৃপাময়তা, প্রেমময়তা, সর্বশক্তিমত্তা ও সৌন্দর্য, মাধুর্য প্রভৃতি গুণে বিশ্বাস করেন। এই হিসাবে তাঁহারা আমাদের সগুণব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মভক্তগণের সহিত তুলনীয়। গীতাঞ্জলি সগুণব্রহ্মের গান, এবং রবীন্দ্রনাথ তাহার পুরোধা।

মুসলমানগণও অদ্বৈতবাদী। 'ওয়াহিদাহু লা শরিক' অর্থাৎ—একমেবাদ্বিতীয়ম্। কিন্তু এই অদ্বৈতবাদ আমাদের শঙ্করের অদ্বৈতবাদ কিম্বা রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সহিত তুলনীয় নহে। কারণ তাঁহাদের অদ্বৈতবাদ শুধু একেশ্বরবাদ। লা ইলাহা (=নাই প্রভু) ইল্লালাহা (=প্রভু ছাড়া) অর্থাৎ ঈশ্বর একমাত্র, এবং অদ্বিতীয়, দ্বিতীয় বা প্রতিদ্বন্দ্বী বলিতে তাঁহার কেহ নাই—"There is no God but God."

সকল ধর্মের ন্যায় মুসলমানধর্মেও ঋষিকল্প মহাপুরুষগণ আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহাদের আধ্যাত্মিক সাধনার গুরুকে 'পীর' বলা হয়। পীর, পীরম্পীর, পীর পয়গম্বর প্রভৃতি নামে সেই সকল পরমভক্ত ও সাধকগণ পরিচিত।

মুসলমান সাধকগণের মধ্যে সুফীগণ, মরমী (mystic) সাধক। সুফীরা গুরুবাদী, গুরুর নির্দেশকে শাস্ত্রের বা শরীয়তের উপরেও স্থান দেন।

শরীয়ৎ অর্থে হজরত মহম্মদের প্রণীত ও প্রবর্তিত সামাজিক ও ধর্ম বিষয়ক শাস্ত্রীয় বিধান।

"সুফীরা মুসলমানধর্মের চারিটি স্তর নির্দেশ করিয়াছিলেন। শরীয়ত, তরীকত, হকীকত, মারোফাৎ। ইহার প্রথমটিতে হইতেছে নামাজ, রোজা প্রভৃতি কোর্ আন্-হাদিস নির্দেশিত ধর্মাচার যথাযথ ভাবে পালন। অবশিষ্টগুলিতে, মোটের উপর আত্মিক উৎকর্ষ ও উপলব্ধির উপর বেশী জোর দেওয়া হইত।"

('ব্যবহারিক শব্দ কোষ'—কাজি আবদুল ওদুদ)

সুফীগণ গুরুকে শাস্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যাতা জ্ঞান করেন। হাফিজ, রুমি প্রভৃতি সুফী কবিদের রচিত সাহিত্যকে সুফী সাহিত্য বলা হয়।

সুফীদের আচার নিষ্ঠা ত্যাগ তপস্যা বৈরাগ্য ঈশ্বরের প্রতি প্রেমভক্তি ও আধ্যাত্মিক উচ্চতা অলৌকিক ও অসাধারণ ছিল।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের নির্দেশে গিরিশচন্দ্র সেন বহু পরিশ্রম করিয়া মূল পারস্য ভাষায় লিখিত 'তেজকরতোল আওলিয়া' নামক গ্রন্থ হইতে মুসলমান সুফী সাধকগণের জীবনচরিত বঙ্গভাষায় অনুবাদ করেন।

'Rabia the Mystic and Her Fellow Saints in Islam' (1928)—গ্রন্থখানি লিখিয়া Margaret Smith কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'Ph. D' উপাধি লাভ করেন। তাঁহাকে সাহায্য করেন—Sir Thomas Arnold এবং অন্যান্য মনীষিগণ।

যেমন সকল ধর্মেই সাধু মহাজনদের নানাবিধ অলৌকিক শক্তি ও অপ্রাকৃত বিভূতির কথা শোনা যায় সেইরূপ মুসলমান সাধু-সন্তদের সম্বন্ধেও শোনা যায়। কিন্তু প্রকৃত সাধুগণ সকলেই এই শক্তিকে বা বিভূতিকে আধ্যাত্মিক পথের অন্তরায় বলিয়াই মনে করেন। এই সব অলৌকিকতাকে মুসলমান সাধুগণও হেয়জ্ঞান করিয়াছেন। ইহাকে যাদুবিদ্যার সহিত তুলনা করিয়াছেন।

মহাত্মা আবু হোসেন আলি বলিয়াছেন, "ঈশ্বর যাঁহাকে ইন্দ্রিয় সংযমনে সক্ষম করিয়াছেন, তিনি আকাশবিহারী বা জলচারী লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" ('তাপসমালা'—গিরিশচন্দ্র সেন প্রণীত)

'তেজ করতোল আওলিয়া'র—বঙ্গানুবাদ, 'তাপসমালা'—নামক গ্রন্থে গিরিশচন্দ্র সেন মুসলমান সাধক মহাপুরুষদিগের জীবনচরিত ছয় ভাগে সঙ্কলন করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, 'শরহোল কল্ব' 'কশফোল আস্রার', 'মারফতোন্নফস্' ও 'অরূরব' নামক তিনখানি গ্রন্থে মুসলমান সাধুগণের জীবনচরিত ও উপদেশাবলী বিবৃত হইয়াছে। ঐ সকল গ্রন্থের সার সঙ্কলন করিয়া তেজ করতোল আওলিয়া (সাধুদিগের প্রসঙ্গ) নামক পারস্য গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে। 'তাপস-

মালা' গ্রন্থখানি এই শেষোক্ত গ্রন্থখানি অবলম্বনে সঙ্কলিত।

তাপসমালার প্রথম খণ্ডে ১৪টি জীবনী, তন্মধ্যে তাপসী রাবেয়ার জীবনী আছে। বাকি পাঁচ খণ্ডে ৮২টি জীবনী, সবই পুরুষ সাধকগণের। সুতরাং এই ৯৬টি জীবনী সম্বলিত তাপসমালা গ্রন্থের মধ্যে একটি মাত্র নারী, যিনি স্থান পাইয়াছেন, তিনিই মহীয়সী তাপসী রাবেয়া।

সাধক-জীবনীপাঠের উপকারিতা :—তেজ্ব করতোল আওলিয়া গ্রন্থের রচয়িতা মওলানা শেখ ফরিহুদ্দীন অত্তার সাহেবের ভূমিকা গিরিশচন্দ্র সেন অনুবাদ করিয়াছেন তাঁহার তাপসমালা গ্রন্থের ষষ্ঠ বা শেষ খণ্ডের ভূমিকায়। আমি তাহা হইতে উক্ত সাধুপুরুষদের জীবনীপাঠের উপকারিতা সম্বন্ধে কিছু সার সঙ্কলন করিতেছি। উদ্ধৃতাংশে উদ্ধৃতির চিহ্ন দেওয়া হইল।

"কোনো কথাই ধর্মাত্মা মহর্ষিদিগের কথা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। তাঁহাদের উক্তিসকল তাঁহাদের জীবনের কার্য ও জীবনের অবস্থার ফলস্বরূপ। সে সমস্ত মৌখিক কথামাত্র নয়, সে সকল জীবনে অভিব্যক্ত হইয়াছে; সে সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্বকথা, বাগিন্দ্রিয়ের বর্ণনামাত্র নয়, তর্কের কথা নয়। তৎসমুদায় হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে হইয়াছে, যত্ন-চেষ্টায় হয় নাই; সে সকল কথা ঈশ্বর-প্রেরণা-জ্ঞানসম্ভূত হয়, শ্রমোপার্জিত জ্ঞানপ্রসূত নয়।"

এই প্রসঙ্গে অস্মদ্দেশীয় নীতিকথা মনে পড়ে। সাধুগণকে আমরা জ্ঞানালোক প্রদানে সূর্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছি যথা :

রবিশ্চ রশ্মিজালেন দিবা হন্তি বহিস্তমঃ।
সন্তঃ স্বক্তিমরীচ্যোঘৈর্ধ্বান্তং ঘ্নন্তি হি সর্বদা॥

সূর্য দিনে আলোক দিয়া বাহিরের তমসা দূর করেন। সাধুসন্তগণ সু-উক্তি মরীচি (আলোক) দ্বারা দিন-রাত্রি নির্বিশেষে সর্বদা অন্তরের অন্ধকার দূর করেন। সেজন্য :

সদা সন্তোঽভিগন্তব্যাযদ্যপ্যুপদিশন্তি ন
তেষাং স্বৈরকথালাপোঽপ্যুপদেশায় কল্পতে।

অর্থাৎ সাধুগণের সঙ্গ সর্বদা করিবে, হয়ত তাঁহারা সর্বদা উপদেশ দিবেন না বটে, কিন্তু তাঁহাদের স্বেচ্ছায় কথিত অতি সাধারণ কথাবার্তাও আমাদের উপদেশের কাজ করিয়া থাকে।

সাধকদের শ্রেণীবিভাগ :—সাধুদের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলেন :

"ঈশ্বরগতপ্রাণ সাধুগণ বিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত। কতক মহর্ষি তত্ত্বজ্ঞ, কতক মহর্ষি কর্মী, কতক বা প্রেমিক, কতক আত্মনিষ্ঠ, কতক সাধু সমগ্র ভাব ও বিশ্বাস সমন্বিত"।

এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকগুলিও স্বতঃ স্মরণপথে আসে :

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদ তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

যিনি তত্ত্বজ্ঞ বা তত্ত্ববিদ্ তিনি পরমতত্ত্ব ঈশ্বরকে প্রধানতঃ ত্রিবিধ ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপে উপলব্ধি করেন; কেহ তাঁহাকে সর্বব্যাপী ব্রহ্ম নির্গুণ বা সগুণ বা উভয়লিঙ্গ বলিয়া জ্ঞান করেন, কেহ তাঁহাকে চিন্ময় প্রাণময় পরমাত্মারূপে ধ্যান করেন, কেহ বা তাঁহাকে সর্বব্যাপী হইয়াও চিদ্ঘন অশেষ কল্যাণ-গুণসম্পন্ন ভগবৎ স্বরূপে ধ্যান করেন আর কেহ বা 'তিনেই এক এবং একেই তিন'—ভগবৎ সম্বন্ধে এইরূপ সামঞ্জস্যসম্পন্ন জ্ঞান লাভ করিয়া যে কোন ভাবে অবস্থিত হইতে পারেন।

যিনি কর্মী তিনি কর্ম করেন ভগবত্তুষ্টির জন্য, গীতার মতে 'মৎ কর্মকৃৎ' হইয়া, ফলাকাঙ্ক্ষায় আসক্ত না হইয়া। যিনি ভগবৎ প্রেমিক তিনি গীতার 'মৎ পরমঃ', 'মদ্ভক্তঃ'। যিনি আত্মনিষ্ঠ তিনি গীতার "আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ"—এইরূপ অবস্থায় অবস্থিত।

যিনি সমগ্র ভাব ও বিশ্বাস সমন্বিত তিনি ঈশ্বরকে দেখেন গীতায় বর্ণিত :

'গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥'—রূপে।

জীবনীগ্রন্থের সার্থকতা :—মুসলমান তাপসদের জীবনী সংকলনে প্রবৃত্ত হইয়া তেজ করতোল্ আওলিয়ার গ্রন্থকার তাঁহার প্রচেষ্টার যে কারণ নির্দেশ করিয়াছেন তাহা হইতে কয়েকটি উল্লেখ করিতেছি :

পাঠকগণ ঐ গ্রন্থে উপকৃত হইয়া গ্রন্থকারকে স্মরণ করিবেন এবং তাঁহাকে আশীর্বাদ করিবেন।

সাধুদের জীবনীপাঠে পাঠকদের সাধনপথে সাহস বৃদ্ধি হয় এবং প্রার্থনা সতেজ হয়।

মহাপুরুষদের জীবনীপাঠে তাঁহাদের মহান্ চরিত্রের আদর্শে অহংকার চূর্ণ হয়, ধর্মাভিমান দূরীভূত হয়, তাঁহাদের আদর্শের তুলাযন্ত্রে ওজন করিলে নিজের আত্মার আর্তি এবং দৈন্য লাভ করা সহজ হয়।

সাধু-সঙ্গের প্রয়োজনীয়তা :—সাধুদিগের প্রসঙ্গে ঈশ্বরের করুণা অবতীর্ণ হয়—তাই দেবর্ষি নারদও বলিয়াছেন ভক্তি লাভের উপায় :

"মহৎকৃপয়ৈব ভগবৎকৃপালেশাদ্বা"—অর্থাৎ মহৎ কৃপা

দ্বারা অথবা ভগবৎকৃপালেশের দ্বারা ভক্তিলাভ সম্ভব হয়।

কোরাণ, হদিস্ প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রপাঠের জন্য ভাষাজ্ঞান এবং ব্যাকরণ অভিধানাদির সাহায্য প্রয়োজন হয়, এবং তৎসত্ত্বেও অনেকেই তাহাদের যথার্থ মর্মাবধারণে অক্ষম হন। কিন্তু সাধুদের উপদেশ সুগম এবং সুখবোধ্য—তাঁহাদের আচরণ আমাদের পথনির্দেশক পদচিহ্নস্বরূপ। তাই আমরাও বলি, "ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ"।

সাধু শেখ বুওয়ালি বলিয়াছেন, "আমার এই দুইটি বাসনা যে, আমি ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কথা শুনি অথবা তাঁহার কোনো লোককে দেখি। আমি অশিক্ষিত, লিখিতে ও পড়িতে পারি না। আমার এমন লোক চাই যিনি তাঁহার কথা আমাকে বলেন আমি শুনি অথবা আমি বুলি তিনি শ্রবণ করেন। যদি স্বর্গলোকে তাঁহার প্রসঙ্গ না হয়, বুওয়ালির স্বর্গে প্রয়োজন নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবত উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, যে কর্ণে ভগবৎকথা প্রবেশ করে না—'কানাকড়ি ছিদ্র সেই কান' ("বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য"।) যে জিহ্বা হরিকথা গান করে না সে জিহ্বাও বৃথা—'সে রসনা ভেকজিহ্বা সম', ("জিহ্বাসতী দার্দুরিকেব সূত ন চোপগায়ত্যুরুগায় গাথাঃ"।)

মহাবীর হনুমান ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের নিকট অমরত্বের বরলাভ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—'ঠাকুর! আমার কিন্তু একটি সর্ত আছে। আমি ততদিনই অমর হইয়া পৃথিবীতে থাকিব যতদিন পৃথিবীতে তোমার রামায়ণী কথা গীত হইবে—তাহা না হইলে আমি থাকিতে পারিব না।'

"যাবত্তব কথা লোকে বিচরিষ্যতি পাবনী
তাবত্তিষ্ঠামি মেদিন্যাং তবাজ্ঞামনুপালয়ন্॥"

ইহাই সর্বত্র সকল ধর্মে ভক্তের স্বভাব এবং রীতি।

সাধু-সঙ্গে সংসারাসক্তি নিবৃত্ত হয়, পরলোকের কথা স্মরণ হয়, অন্তরে ভগবৎপ্রেমের উদয় হয় এবং তাহাই পারলৌকিক পথের সম্বল। তাই আচার্য শংকর বলেন: "ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।"

কিন্তু হায় বর্তমান সময়ে প্রকৃত সাধুপুরুষও "লোহিত গন্ধকের ন্যায় দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছেন।"*

বিদ্যালয়ে সাধু-জীবনের আদর্শ:—সাধু-সঙ্গে ভীরু কাপুরুষ ও সিংহতুল্য পরাক্রম লাভ করিয়া আধ্যাত্মিক রণক্ষেত্রে প্রবল পরাক্রান্ত ষড়্‌রিপুকে জয় করিতে পারে। শিক্ষালাভ জ্ঞানলাভ প্রভৃতি সকলেরই মূল উদ্দেশ্য হইতেছে চরিত্রগঠন এবং সে বিষয়ে বিদ্যালয়গুলিকে চরিত্রগঠনের কারখানা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন:

"The end of all knowledge must be building up of character. A school or college is a sanctuary where there should be nothing that is base or unholy. Schools and Colleges are factories for the making of character."

সাধুগণের জীবনীপাঠ ছাত্র-জীবনে চরিত্রগঠনের বিশেষ সহায়ক।

বাল্যজীবনে নীতিশিক্ষা ও চরিত্রগঠন না হইলে আমরা সাধু-সঙ্গের মর্যাদাবোধ ও তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে প্রবৃত্তি লাভে বঞ্চিত হই।

রাবেয়ার জীবনী:—আমি 'রাবেয়া'র জীবনীর সহিত পরিচিত হই ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে, তখন যে-সব ছাত্রেরা সংস্কৃত না লইয়া বাংলা লইতেন তাঁহাদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বাংলায় একটি পাঠসংকলন (Selection) পাঠ্যরূপে মুদ্রিত করিতেন। আমার এক সহপাঠী বাংলা লইয়াছিলেন এবং তাঁহার পাঠ্যপুস্তকেই রাবেয়ার জীবনীটি আমি পড়িয়া মুগ্ধ হই। অনেক চেষ্টা করিয়াও সে গ্রন্থখানি সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। রাবেয়ার তথ্যপূর্ণ ঐতিহাসিক জীবনী পাওয়া যায় না, যাহা পাওয়া যায় তাহা কিংবদন্তীপূর্ণ। ঘটনাবলী সঠিক না মিলিলেও তাঁহার মূল জীবনী সম্বন্ধে সকলেই একমত।

সাধু টি. এল. ভাসোয়ানি তাঁহার 'Prophets & Saints' নামক গ্রন্থে রাবেয়াকে বলিয়াছেন 'Mira of Islam' বা ইসলাম ধর্মে পরম বৈষ্ণবী ভক্তিমতী মীরার প্রতিচ্ছবি। মীরা রাজরাণী ছিলেন কিন্তু দারিদ্র্য বরণ করিয়াছিলেন। রাবেয়া দরিদ্র মধ্যবিত্ত গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অল্প বয়সেই পিতৃহীনা হন। দুর্ভিক্ষের সময় এক দুর্বৃত্ত দাসব্যবসায়ী বালিকা বয়সেই তাঁহাকে অপহরণ করিয়া সামান্য কয়েকটি মুদ্রার বিনিময়ে ক্রীতদাসীরূপে বিক্রয় করিয়া দেয়। যখন তাঁহাকে মহীয়সী সাধ্বীরূপে লোকে চিনিতে পারিল তখন অনেক আমীর ওমরাহ তাঁহাকে অপরিমেয় ঐশ্বর্য ও অসংখ্য আশরফি প্রদান করিতে চাহিলেও তিনি কিছুই গ্রহণ করিতেন না। পর্ণকুটিরে অতি দরিদ্রের জীবন যাপন করিয়া ভগবদ্ভজনে জীবন যাপন করিতেন।

তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে যেটুকু জানা যায় তাহা সংক্ষেপতঃ এইরূপ—যদিও তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে নানাবিধ মতভেদ আছে। তাঁহার জন্ম হয় বাসোরায় আনুমানিক

৭১৭ খ্রী: এবং মৃত্যু হয় ৮০১ খ্রীষ্টাব্দে—৮৪ বৎসর বয়সে। ইঁহার পিতার নাম অজ্ঞাত। সাধ্বী রাবেয়ার জন্মের ৫০ বৎসর পূর্বে মারা যান আর এক রাবেয়া, তাঁহার পিতার নাম ছিল ইস্‌মাইল এবং তজ্জন্য আরবী ভাষায় তাঁহাকে বলা হইত 'রাবেয়া বিন্ত ইসমাইল' অর্থাৎ ইসমাইলের কন্যা রাবেয়া। সাধ্বী রাবেয়া শুধু বাসোরার রাবেয়া নামেই পরিচিত। ইঁহার পিতামাতা বাল্যকালেই মারা যান। ইনি পিতামাতার চতুর্থী কন্যা ছিলেন বলিয়া ইঁহার নাম হয় 'রাবেয়া'। আরবী ভাষায় 'রাবা' শব্দে চতুর্থ বুঝায়। ক্রীতদাসী হইয়া তিনি এক বিলাসী মদ্যপ ধনীর আশ্রয়ে পরিচারিকারূপে নিযুক্তা হন।

একদিন তাঁহার মনিব কয়েকজন বন্ধুকে পানভোজনে আমন্ত্রণ করেন। রাবেয়া তাঁহাদের পরিবেশন করিতেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে তাঁহাদের মধ্যে মনুষ্যদেহের নির্মাণ-কৌশলের কথা উঠে এবং মনুষ্য-নির্মিত দরজা-জানালার কব্জা অপেক্ষা মনুষ্যদেহের বাহু জানু প্রভৃতির গ্রন্থির গঠন-চাতুর্যের কথাও উঠে। যেমনি মনে কৌতূহল উঠিল অমনি প্রমত্ত প্রভু আদেশ করিলেন যে,রাবেয়ার জানুগ্রন্থি কাটিয়া দেখা হউক, তাহার গ্রন্থির গঠন কিরূপ। সেকালে ক্রীতদাস বা দাসীদের উপর এইরূপ অত্যাচার সহজেই করা যাইত, তাহাদের হত্যা করিলেও কোন দণ্ড বিহিত হইত না। যখন রাবেয়ার দেহে অস্ত্রপ্রয়োগ করিয়া তাহার জানুগ্রন্থি কাটিয়া দেখা হয়—তখন সে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিতে থাকে। গ্রন্থি কাটা হইলে—প্রমত্ত প্রভুর আসুরিক কৌতূহল নিবৃত্তি হইলে—সে সেই মত্তাবস্থায় বলিয়া উঠে—"হে করুণাময় খোদাতালা, তোমার কি বিচিত্র রচনা-কৌশল—কি অসীম তোমার করুণা!"

রাবেয়া বলেন, সেই যন্ত্রণায় অভিভূত অবস্থাতেও তিনি তাঁহার প্রভুর মুখে খোদাতালার করুণার কথা শুনিতেই যেন তিনি তাঁহার অন্তরের গভীরে সকল জ্বালা-জুড়ান ঔষধের প্রলেপের মত ঈশ্বরের স্পর্শ অনুভব করিলেন। তিনি তখন হইতে ঈশ্বরের নাম ও তাঁহার ধ্যান অবলম্বন করিয়া তাঁহার করুণায় আত্মসমর্পণ করিলেন। এই মুহূর্ত যেন তাঁহার জীবনের এক অনন্ত মুহূর্তে পরিণত হইল—তিনি ঈশ্বরের স্পর্শ লাভ করিলেন --এবং ইহাই হইল তাঁহার সুফি সাধনার প্রথম সোপান বা দীক্ষা।

কোন রূপে আরোগ্যলাভের পর প্রভুর গৃহের যাহা কিছু দৈনন্দিন শ্রমসাধ্য কর্ম তাহা সমাপন করিয়া তিনি রাত্রির তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত প্রার্থনা করিয়া তবে শয্যা গ্রহণ করিতেন। একদিন তাঁহার প্রভুর মানসিক অশান্তি বশত: নিদ্রা না হওয়ায়, গভীর রাত্রে তিনি পদচারণা করিতে করিতে রাবেয়ার শয়নকক্ষে আলো জ্বলিতেছে দেখিয়া সেখানে গিয়া তাহাকে প্রার্থনা-নিরত অবস্থায় দর্শন করিলেন। তিনি দেখিলেন রাবেয়ার চতুষ্পার্শে এক অলৌকিক অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির্মণ্ডলী বেষ্টন করিয়া আছে। এইরূপ আধ্যাত্মিক জ্যোতিকে ক্রীশ্চানরা বলেন 'হ্যালো' (halo)—মুসলমানগণ বলেন—'শাকিনা'। —রাবেয়া শয্যা গ্রহণ করিবার পূর্বে শেষ প্রার্থনা করিল —"হে ঈশ্বর তুমি আমার গৃহস্বামীর কল্যাণ কর—তাঁহার প্রতি করুণা কর—কারণ তাঁহার প্রসাদেই তো আমি তোমার গভীর করুণা অন্তরের অন্তস্তলে অনুভব করিয়া তোমার শরণাপন্ন হইতে পারিয়াছি।" অতঃপর তাঁহার প্রভু রাবেয়ার অন্তরের প্রকৃষ্ট পরিচয় লাভ করিয়া তাঁহার অসীম উদারতা ও অলোকসামান্য মহিমা অবগত হইয়া তাঁহাকে দাসীত্ব হইতে মুক্তি দিতে চাহিলে তিনি বলিলেন - "প্রভু, আমি তো আপনার আশ্রয়ে সুখে এবং শান্তিতেই আছি—বিশ্রামকালে স্বচ্ছন্দে খোদাতালার 'দোয়া' ভিক্ষা (করুণা ভিক্ষা) এবং 'দোয়াদ্রুদ্' (মহিমা কীর্তন) করিতেছি। • যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তো আমাকে আপনার আশ্রয়ে রাখিয়া আপনার অন্যান্য ক্রীতদাস-দাসীকে মুক্তি দান করুন।" তাঁহার প্রভুর চক্ষে যেন নূতন আলোকসম্পাত হইল। তিনি তাঁহার সকল দাস-দাসীকে মুক্তিদান করিলেন --এবং রাবেয়াকে 'পীর' বা ঈশ্বরের কৃপাপ্রাপ্ত মহাজন বলিয়া চিনিতে পারিলেন।

রাবেয়ার নিষ্কাম প্রেমের স্পর্শ লাভ করিয়া ও তাঁহার সান্নিধ্যলাভ করিয়া, তাঁহার প্রভুর জীবনেও মহান্ পরিবর্তন সাধিত হইল। তিনিও ঈশ্বরের মহিমা অনুভব করিয়া নিজের অবশিষ্ট জীবন সাধুভাবে যাপন করেন।

তিনি রাবেয়াকে ভজন সাধনের জন্য গৃহ নির্মাণ করিয়া দিতে চাহিলেও রাবেয়া তাহা গ্রহণ করেন নাই। তিনি অতি সামান্য একটি পর্ণকুটীর নির্মাণ করিয়া মৃৎ-পাত্রেই পান-ভোজন করিতেন—জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করিতেন এবং অতি দীনদরিদ্রের মতই জীবন যাপন করিতেন।

তাঁহার সমাধি জেরুসেলামের পূর্বাংশে জেবেল এৎ তওর পর্বতের উপর বর্তমান। উহা এখন তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

"তাপসী রাবেয়া ঈশ্বর-প্রেমের অন্তঃপুরে বৈরাগ্য

যবনিকার অন্তরালে বাস করিতেন। তিনি পরম বিশ্বাসিনী ঈশ্বরানুরক্তা রমণী ছিলেন।"—(তাপসমালা)

রাবেয়া দিবারাত্র কোরাণের আলোচনা ও ভজনালয়ে ধ্যানে ও যোগাভ্যাসে নিমগ্ন থাকিতেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি শেষজীবনে দীর্ঘকাল মক্কাতে অতিবাহিত করেন।

রাবেয়া বাসোরায় মহর্ষি হোসেন বসোরীর সহিত ধর্ম্মালোচনা করিতেন এবং মক্কাতে এব্রাহিম আদমের সহিত ধর্ম্মশাস্ত্রালোচনা ও ভগবৎ-কথালাপ করিতেন। চিরকৌমার্য ব্রত ধারণ করিয়া তিনি ঈশ্বর-সেবায় আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

মহর্ষি হোসেন বলিয়াছেন যে, রাবেয়া কাহারও নিকট শিক্ষা-দীক্ষা না পাইয়া অপরের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া কেবল প্রার্থনা দ্বারা ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার অন্তর ভগবৎ-প্রেরিত আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল।

হোসেন রাবেয়াকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাঁহার বিবাহের ইচ্ছা আছে কি না, তদুত্তরে রাবেয়া বলিয়াছিলেন, "শরীর থাকিলে ত বিবাহ, আমার শরীর মন উভয়ই আমি ঈশ্বরকে অর্পণ করিয়াছি, সর্বতোভাবে আপনাকে ঈশ্বরের নিকট উৎসর্গ করিয়াছি, সুতরাং এখন আর বিবাহের কোনো প্রশ্নই উঠে না।"

মৌসুম বাহার বা ঋতুরাজ বসন্তের আবির্ভাবে একদিন কেহ রাবেয়াকে বলিয়াছিলেন কুটিরের বাহিরে গিয়া নিসর্গের সৌন্দর্য দর্শন করিবার জন্য; তদুত্তরে রাবেয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, আপনি ভিতরে আসিয়া চক্ষু নিমীলন করুন, সৃষ্টি অপেক্ষা স্রষ্টার সৌন্দর্য কত অধিক এবং অতুলনীয় তাহা দেখিতে পাইবেন। হোসেন তাঁহাকে প্রশ্ন করেন, তিনি এত উচ্চ অবস্থা কিরূপে পাইলেন; রাবেয়া বলেন,"আমার বলিতে যাহা কিছু ছিল তাহার বিনিময়েই পাইয়াছি।" ইহা ঠিক ভগবদ্গীতার 'মামেকং শরণং ব্রজ'-র অবস্থা—যাহা কিছু আছে, "তৎ কুরুষ্বমদর্পণম্" শ্রীভগবান যেন jealous husband, তিনি আপনার বলিতে কিছুই রাখিবেন না, সব তিনি, সর্বত্র তিনি, বিশ্বে তিনি, বিশ্বরূপে ব্যাপ্ত হইয়া বিদ্যমান, "ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্"—(গীতা)।

হোসেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি ঈশ্বরকে কিরূপে জানেন বা কিরূপে তাঁহার ধ্যান-ধারণা করেন; তাহাতে রাবেয়া বলেন, "কেহ তাঁহাকে 'এরূপ', কেহ-বা তাঁহাকে 'ওরূপ' জানেন, আমি তাঁহাকে অরূপ এবং অপরূপ বলিয়া জানি, তিনি বিশ্বরূপ, তিনি অসীম এবং অনন্ত—তাঁহার সহিত তুলনা দিবার মত কিছুই জানি না।" ইহা যেন উপনিষদেরই বাণী, "ন তস্য প্রতিমা লোকে যস্য নাম মহদ্‌যশঃ" অথবা গীতার ভাষায় "অনাদি মৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে।" বাংলা গানের ভাষায় "তোমারি তুলনা তুমি এ-মহীমণ্ডলে।"

কেহ রাবেয়াকে প্রশ্ন করেন যে, তিনি যে ঈশ্বরকে পূজা করেন তাঁহাকে কি প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন? উত্তরে রাবেয়া বলেন, "আমি তাঁহাকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি না করিলে তাঁহার পূজা করিতাম না।"

রাবেয়ার অন্তর প্রেমে এবং করুণায় পরিপূর্ণ ছিল। পাপ-কলুষিত ব্যক্তিকেও তিনি ঘৃণা করিতেন না, করুণার চক্ষে দেখিতেন। প্রশ্ন করা হয়—তিনি কি শয়তানকে ঘৃণা করেন না? উত্তরে তিনি বলেন, "আল্লার করুণায় তাঁহার অন্তরে ঘৃণার জন্য কোনো স্থান খালি নাই। সব স্থানই প্রিয়তমের প্রেমে পূর্ণ হইয়া আছে।'

ধনী ব্যক্তিরা স্বর্ণ-রৌপ্যাদি উপহার দিতে আসিলে তিনি প্রত্যাখ্যান করায় হোসেন তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রাবেয়া বলেন,—'করুণাময় পরমেশ্বর নাস্তিক ঈশ্বর-দ্বেষী ব্যক্তিগণকেও কৃপা করেন, খাইতে-পরিতে এবং সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকিতে দেন, সুতরাং যে তাঁহাকে একান্ত ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছে তাহার ভরণ-পোষণের ভার কি তিনি গ্রহণ করিবেন না? আমি তাঁহার শরণ লইয়া অবধি মানুষের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া তাঁহার পানেই চাহিয়া আছি, কারণ মানুষের ত নিজের কিছুই নাই—তিনি না দিলে কেহই কিছু দিতে পারে না!"

সুফী সাধনার মূলসূত্র :—রাবেয়া আপনাকে ঈশ্বরের দাসী মনে করিতেন, এবং সেই দাসীত্বের বিনিময়ে তাঁহার করুণা এবং প্রেম ব্যতীত আর কিছুই আশা করিতেন না। গীতার "যোগক্ষেমং বহাম্যহম্"—শ্রীভগবানের এইরূপ প্রতিশ্রুতির প্রতি তাঁহার একান্ত বিশ্বাস ছিল। তিনি বলিতেন—"এই বিশ্ব বিশ্বনাথের এবং আমার নাথের—তিনি আমায় যাহা দিবেন, আমার প্রতি যাহা করিবেন তাহাই আমার একান্ত কাম্য এবং তাহাতেই আমার আনন্দ।" তাঁহার ত্যাগ এবং বৈরাগ্যের মূলে এই পরম অনুরাগ এবং বিশ্বাস ছিল, তাই তিনি কোন বস্তু বা ব্যক্তির জন্য কোন আশা বা আকাঙ্ক্ষা রাখিতেন না।

তিনি নরকের ভয়ে বা স্বর্গের কোনো ভোগ-সুখের কামনায় ঈশ্বরোপাসনা করিতেন না, ঈশ্বরপ্রেম তাঁহার অস্থিমজ্জাগত ছিল, তাঁহার সত্তায় ওতপ্রোতভাবে ছিল

—যাহাকে বাংলা লৌকিক প্রেমের গানের ভাষায় বলা যায় :—

"ভালোবাসিবে বলে ভালোবাসি নে—
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানি নে।"

তাঁহার অন্তরে ছিল ঈশ্বর-প্রেমের ক্ষুধা এবং পিপাসা। সংসারে কিছু চাহিবার বা পাইবার জন্ম তাঁহার কোন প্রকার আকাঙ্ক্ষার লেশমাত্র ছিল না। ঈশ্বরের নিকট আত্মনিবেদন করিয়া তিনি আপন সত্তা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন।

তাঁহার প্রার্থনা ছিল—"হে ভগবান! তুমি নরকের ভয় আমাকে দেখাইও না, তোমার প্রেম বক্ষে লইয়া—তোমার বিরহ ব্যতীত অন্য কোনো ভয় আমার নাই; স্বর্গের মোহে আমাকে লুব্ধ করিও না, কারণ তুমি ব্যতীত আমার কাম্য কামনা কিছুই নাই, আমার কামনা তোমার প্রেম, আমার প্রেম তোমারই কামনা। আমার স্বর্গ তোমার নাম, তোমার ধ্যান, তোমার মিলন। আমার নরক তোমার বিরহ।"

এই পরম প্রেম—মরমিয়া সাধনা বা সুফী সাধনার, খ্রীশ্চান mystic সাধনার, তথা হিন্দুর বৈষ্ণব বা শাক্ত সাধনার একমাত্র আশ্রয় বা অবলম্বন। ভক্তের ঈশ্বরই সব এবং সর্বস্ব। এই ধর্মবুদ্ধিবাদী বা যুক্তিবাদী নহে, ইহা হৃদয়ের ধর্ম, অন্তরের ধর্ম, মরমের ধর্ম।

মীরার ভজনও তাই "মেরে তো গিরিধারী গোপাল দুসরা না কোই।" চক্ষু যাহা দর্শন করে তাহা নশ্বর চঞ্চল জাগতিক—অন্তর যাহা উপলব্ধি করে তাহা অবিনশ্বর ধ্রুব এবং শাশ্বতিক। সূর্যের আলোক বাস্তবস্তু দেখিবার জন্য, অন্তরের আলোক ঈশ্বরের সত্য শুভ ও সুন্দর স্বরূপ উপলব্ধি করিবার জন্য। তাঁহার যতটুকু 'অণোরণীয়ান্' অংশ জীবের পাত্রে ধরে তাহাতেই সে আনন্দে এবং অমৃতে পরিপূর্ণ ও পরিপ্লুত হইয়া যায়। ঈশ্বরের প্রতি অনুরক্তি যে-পরিমাণে বাড়ে, বিষয়ের প্রতি বিরক্তিও সেই অনুপাতে বাড়ে, কারণ "মধুকর পেলে মধু চায় কি সে জলপানে?" ঈশ্বরের প্রেমলাভ না করিয়া শুধু বিচারবুদ্ধিতে ভোগ্যবস্তুর ত্যাগ খুবই শুষ্ক, খুবই রুক্ষ এবং কঠোর মনে হয়, পরন্তু ঈশ্বর-প্রেমের মধুরাস্বাদ লাভ করিলে পর ভোগ্য বিষয়ের ত্যাগ, যেন 'রসগোল্লা' 'রাজভোগ' প্রভৃতি মিষ্টান্ন লাভ করিয়া, শুষ্ক শর্করা ত্যাগ করার মতোই সহজসাধ্য হয়। ইহার জন্য চরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে :

অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান নিম্বফলে
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্রমুকুলে
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্ক জ্ঞান
কৃষ্ণ প্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান।

একই কারণে গীতায় বলা হইয়াছে, ভক্তিযোগাধ্যায়ে :

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তাহি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥

'নেতি'বিচারপূর্বক, নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক দ্বারা ভোগ্যবস্তু বর্জন করা প্রথমতঃ ক্লেশকর, দ্বিতীয়তঃ 'মিথ্যাচার' হয়, কারণ তখনও অম্লরসের উল্লেখ করিলে মুখে লালাস্রাব হয়, তার পর 'রসোঽপ্যস্ত পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে।' তখন প্রাথমিক ত্যাগের অবশ্যম্ভাবী মিথ্যাচার ভূমার আস্বাদনের পর সত্যাচারে অর্থাৎ স্বাভাবিক শান্তিপূর্ণ নির্বেদে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন আর পতনের বা পদস্খলনের আশঙ্কা থাকে না।

রাবেয়ার অন্তর ঈশ্বর-প্রেমে পরিপ্লুত ছিল, তাই "Passions were uprooted from her soul,—desires were extirpated." কারণ ঈশ্বরের আনন্দময় অমৃতময় সত্তা তাঁহার অন্তরকে নিষিক্ত করিয়াছিল,—সেখানে অন্য ক্ষুধা, অন্য পিপাসা, অন্য বাসনা-কামনার স্থান কোথায়? "তালবৃন্তেন কিং কার্যং লব্ধে মলয় মারুতে?" মলয়ানিল প্রবাহিত হইতে থাকিলে কে অনর্থক তালবৃন্ত নাড়িতে থাকে?

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ভোগে জড়বস্তুর অতি ক্ষীণ এবং ক্ষণস্থায়ী ভোগমাত্র হয়। অন্তরে ভূমার আনন্দময় স্পর্শ লাভ হইলে মর্মের পরতে পরতে দিব্যসুখের অনুভূতি হয় এবং তখন "ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি"—তাঁহার প্রতীতি হয়। ভূমার প্রতি অনুরাগ এবং তুচ্ছের প্রতি তাচ্ছিল্য এবং অবজ্ঞা স্বতঃসিদ্ধ হয়।

তাই গীতা বলেন :

যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥

যাহা লাভ হইলে তাহা অপেক্ষা অধিকতর লভ্য আর কিছুই থাকে না এবং যাহা লব্ধ হইলে পর লব্ধা আর কোনো গুরুতর বা গুরুতম দুঃখেও বিচলিত হন না।

ঈশ্বরের স্পর্শ আমরা লাভ করিতে পারি—বুদ্ধিবিচার বা যুক্তির দ্বারা নহে, অন্তরের আর্তি বা আকুতি দ্বারা :

"He may be found alone
By love of thine heart
Not by reason"— (*Vaswani*)

ইহাও উপনিষদেরই কথা 'ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন'। তাই ভক্ত বৈষ্ণব বলেন :

"তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং
কল্পকোটিসুকৃতৈন লভ্যতে।

ভক্তির লালসা বা লৌল্যই ভক্তির একমাত্র মূল্য।

তাই ভক্ত সাধক নিদ্রায় সময় নষ্ট করিতেও কষ্ট বোধ করেন। সুফি সাধিকা রাবেয়া নিজেকে ডাকিয়া বলেন—

O my soul! How long? How long wilt thow sleep?

কবীর বলেন—

"জাগোরি মেরি সুরত সোহাগিন্ জাগরি।
ক্যা তুম শোতো, শুনো শ্রবণ দে;
উঠ্কে ভজনিয়ামে লাগরি।"

রামপ্রসাদ বলেন:

"শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান,
(ওরে) আহার কর মনে কর আহুতি দিই শ্যামা মারে।"

রবীন্দ্রনাথ বলেন:

"সে যে কাছে এসে বসেছিল তবু জাগিনি
কি ঘুম তোরে ধিরেছিল হতভাগিনি!"

রাবেয়া কি বেহেস্ত বা স্বর্গ চাহেন না? তাহার উত্তরে রাবেয়া বলেন, আমি ঈশ্বরের অট্টালিকা বা তাঁহার সাজ-সজ্জা সামগ্রী লইয়া কি করিব? আমি তাঁহার চরণোপান্তে স্থান পাইতে চাই, আমি তাঁহাকেই চাই।

সুফি সাধক এবং সাধিকাদের বাণী এইরূপ:

যে সংসারের কিছুই চায় না সে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়।

যে নির্জন ভালবাসে সে শান্তি পায়।

যে দেহের ভোগসুখকে পদদলিত করিতে পারে সে মুক্তিলাভ করে।

যে শম দম তিতিক্ষা উপরতি—সাধনা করে সে ভূমানন্দের আস্বাদ পায়।

যে দয়িতের বিরহে জাগিয়া রাত্রি কাটায় সে তাঁহার আহ্বান শুনিতে পায়।

যে তাঁহার বিরহে রাত্রি জাগিয়া অশ্রু বিসর্জন করে ঈশ্বর তাঁহাকে আশ্রয় দিয়া আপনার জন বলিয়া গ্রহণ করেন।

সাধকজীবনের উন্নত অবস্থা কিরূপ? তাহার উত্তরে রাবেয়া বলেন:

যাহার অন্তর নির্মল নিকলুষ হইয়াছে;

যাহার প্রার্থনা ও প্রেম নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম;

যে ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর আপনাকে একান্তভাবে সমর্পণ করিয়াছে;

যে ঈশ্বরের ধ্যানে এবং মহিমা-কীর্তনে আপনাকে নিমজ্জিত করিয়াছে; অর্থাৎ গীতায় যেরূপ বলা হইয়াছে:

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে। ৯,১৪

তাঁহার অন্তরের কি কামনা জিজ্ঞাসা করায় রাবেয়া বলেন—"আমি আমার প্রভুর দাসীমাত্র, আমার একমাত্র কামনা যেন আমার সকল কামনা তাঁহার ইচ্ছাতেই লয় হয়। আমার যদি অন্য কোনও পৃথক কামনা থাকে তবে আমি অবিশ্বাসী, আমি নাস্তিক, আমার প্রভুভক্তিতে ধিক্! আমার একমাত্র কামনা যে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

"তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামী···দাও দুখ, দাও তাপ, সকলি সহিব আমি" (রবীন্দ্রনাথ) অর্থাৎ "তোমার ইচ্ছায় কর মোর ইচ্ছা লয়" (অক্ষয় বড়াল)।

ইহাই ছিল রাবেয়ার অহরহ একান্ত প্রার্থনা।

O God! My God! I have but one desire,--
To sing Thy Name . . . . and meet thee face to face
And only chant—"Thy will be done"
* * O God! My God! The stars are shining
And the eyes of men are in slumber closed
And every lover is alone with his beloved
And here am I alone with Thee—My Beloved!
(from '*Rabia*'—Margaret Smith.)

হে ভগবান! আমার একমাত্র ইচ্ছা তোমার নাম করি, তোমায় মুখোমুখি দর্শন করি এবং গান করি, হে প্রভো যে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক! আকাশে তারা জলছে সকল লোক সুপ্তিমগ্ন,—প্রেমিকেরা পরস্পর মিলিত হয়েছে—আমি তোমার ধ্যানে তোমার উপাসনায় উপবিষ্ট, হে দয়িত, আমি একাকী মিলনার্থী হয়ে তোমার কাছে এসেছি।

রাবেয়ার ছিল জাগ্রত মন এবং উদ্ভাসিত অন্তর। তাঁহার জীবন ছিল ভগবৎপ্রেম এবং মরমিয়া সাধনায় পরিপূর্ণ—'rich in the mystical elements of love and adoration. (Vaswani).

আরবীয় 'সুফী' বা মরমী সম্প্রদায় ভক্তি ও প্রেমের মধুর রসাত্মক ভজনকেই তাঁহাদের একমাত্র সাধনা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। "The Souls' longing to be united with the Beloved"—মিঃ ডেভিস্ তাঁহার 'The Persian Mystics' গ্রন্থে বলিয়াছেন: "The Sufi recognised this fact, and his supreme desire was to be reunited with the Beloved."

সুফী সাধকের পরম এবং চরম ইচ্ছা প্রিয়তমের সহিত মিলিত হওয়া। তাঁহারা বলেন :

"And whoever in Love's city enters
Finds but room for one
And but in one-ness Union."

সুফী ধর্মের ভক্তি সাধনায় অন্য ধর্মের প্রভাব :—এই সুফী ধর্ম ঠিক কোরাণ হইতে আসে নাই—Maurice De Wulf তাঁহার History of Mediaeval Philosophy-তে বলিয়াছেন : "It is the issue of three great combining influences, the Indian, the Neo-platonic and the Christian influences." অর্থাৎ ইহা ভারতীয়, গ্রীসীয় এবং ক্রীশ্চান সাধনার ভাবধারার সম্মিলিত ফল।

সুফী সাধনা—মধুর ভাবের সাধনা :—ক্রীশ্চান মরমী সম্প্রদায় ও বৈষ্ণবগণের মধুর সাধনার অনুবর্তী হইয়া প্রিয়তম ভগবানের সহিত প্রেমের পরম প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া—বর (bridegroom) এবং বধুর (bride) সম্পর্ক পাতাইয়া তাঁহারা প্রেমের সাধনা করিয়াছেন। এ বিষয়ে mysticism এর বহু গ্রন্থ আছে যথা—Evelyn Underhill-এর Mysticism. Dr. Inge প্রণীত Cristian Mysticism, E. Allison Pears প্রণীত Spanish Mysticism' এবং T. Whittaker, C. Bigg, ও James Adam প্রণীত বিভিন্ন পুস্তক।

মধুর সাধনার ক্রম :—

Ruys Broek তাঁহার On the Seven Grades of Love গ্রন্থে প্রেমের সাতটি সোপান নির্দেশ করিয়াছেন—('ভালবাসা ও ভগবৎ-প্রেম'—স্বামী অভেদানন্দ)

[১] শুভেচ্ছা [good-will]
[২] নিষ্কিঞ্চনতা [voluntary poverty]
[৩] শুচিতা বা ব্রহ্মচর্য [chastity]
[৪] বিনয় বা দৈন্য [humility]
[৫] ঈশ্বরের ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের প্রতি পরমাসক্তি [desire for the glory and love of God]
[৬] অনন্যা ভক্তি ও মনের বস্ত্রহরণ বা নগ্নতা [divine contemplation and nudity of mind]
[৭] সমস্ত জ্ঞান ও চিন্তার অনির্বচনীয় বিলয়াবস্থা [the ineffable and unnamable state] অর্থাৎ চরিতামৃতের 'না সোরমণ—না হাম রমণী' অবস্থা।

তিন সাগর

শ্রীব্রজমাধব ভট্টাচার্য

১১

প্যারী থেকে লণ্ডনে যাবার বর্ণনা মনকে কতদিন কত সুখে মাতিয়েছে। হঠাৎ মনে পড়ে যায় খি্-মাস্কেটিয়ার্সের সেই বিচিত্র বর্ণনা। টেল অব টু সিটিজ; সেই সব ঘোড়ায় ছোটার দিন, ষ্টেজ কোচের দিন।

বই পড়তে পড়তে মনে হয়ে যায় রিপ-ভান্-উইঙ্কল্। যদি এসে সেই প্যারী আর লণ্ডনে দেখি নিদারুণ স্পাড, মন যেন প্রবাসী হয়ে যায়। তবু প্যারী থেকে বেরিয়ে বার বার প্রশ্ন করেছি মনকে প্যারীকে কেন অভিনব মনে হ'ল না। বাঙ্গাল হয়েও, দেখাবার লোক থাকতেও, 'হাইকোর্ট' কেন দেখলাম না; কেন পেলাম না পায়ে পায়ে বিস্ময়ের বোগদাদ, চমকের দামাস্কাস্, কাঞ্চন-মালার দেশ, মায়াপাহাড়! প্যারী যেন বেজায় পারী; জানা নয় তত, চেনা অনেকখানি। ফরাসী মন, ফরাসী শালীনতা, ফরাসী রুচি, সবটাই যেন পুরনো কামিজের মত সমস্ত স্বভাবকে সহজ ভাবেই জড়িয়ে ধরল।

পড়া-পড়া বেলার ঝকঝকে সোনার আলোর মাঝে পুব থেকে পশ্চিমে চলেছে প্লেন। নিঃশ্বাস ফেলতে না ফেলতে এসে যাবে লণ্ডন। যেখান দিয়ে যাই তার তলায় প্রতিটি মাইলে একালের শত ইতিহাস পোঁতা আছে; এই সব শান্তির ছবির হাড়ে হাড়ে অশান্তির ঘুণ কাটছে।

তা নৈলে গেরাঁ আজ বৈরাগী কেন? কেবল গেরাঁর কথা মনে হয়। অত বড় সুস্থসবল মানুষটা এয়ার-পোর্টে এসে কাঁদতে থাকে! ওর সঙ্গে আমার কোনই সম্পর্ক নেই, এমনকি আমি ওর জন্য কিছু করতে অবধি পারি নি। তবু যখন বলল, "সব আশা জীবন থেকে মিটে গেছে। এ যুগের য়োরোপ আশা নিবিয়ে দিতেই ঝড় তুলেছে।...তবু একটা আশা এখনও লোভ দেখায়। সব বেচে দিয়ে ভারতবর্ষে গিয়ে তোমাদের কাছাকাছি থাকি। ভারতবর্ষ নূতন স্বাধীনতা পেয়েছে। এখনকার ভারতবর্ষ আশার দেশ। এখনকার য়োরোপ আতঙ্কের দেশ!"

আমি জানি গের। যতই আরাম পাক ভেবে যে আমার কাছে এসে থাকবে, শেষ অবধি তা পারবে না। পারলেও বুড়ো বয়সে আবার প্যারী-প্যারী করে কষ্ট পাবে। তবু মনে হয় 'ভগবান, ওকে শান্তি দাও'।

প্লেন চলেছে আকাশ-পথে। দূর থেকে য়োরোপ দেখছি। আর মনে হচ্ছে গেরাঁর বুকের আর্তনাদ যেন সারা য়োরোপের আর্তনাদ! "করুণাঘন ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।" আমার মনে গেরাঁর চোখ ছলছল্ চেহারা যেন সারা য়োরোপের চেহারা হয়ে দেখা দিল।

লণ্ডনে যাচ্ছি। সেখানে শান্ত বাসায়, গরম নরম বিছানা পাতা আছে আমার প্রতীক্ষায়। আমি যাব এই আনন্দে অপেক্ষা করছে মধুমতী আর তার স্বামী হেমরঞ্জনী। সবই ত আনন্দের ব্যাপার! তবু মন ভারী হয়। চোখের পাতায় ব্যথা ডেকে আনে কে!

পাশের ভদ্রলোকের বয়স অন্ততঃ ষাট হবে। চক্চকে শাদা কলারের সঙ্গে আঁট করে বাঁধা উলের একটা টাই। তার তলায় হাল্কা সার্জের তিন-পীস্ স্যুট। নাকে যে চশমাটা তার ফিতে গলায় প্যাঁচানো। মুখে একটা দামী হোল্ডারে জলছে সিগারেট। মৃদু মৃদু টান দেবার পর কখন যে ধোঁয়া বেরুচ্ছে লক্ষ্য না করলে বোঝার জো নেই। নাকের ডগাটা টস টস করছে লাল। তার ওপরে বিজলী বাতি পড়ে বেজায় চক্চক্ করছে। এক রাশ ধোঁয়ায় ভরতি ডগাটা দেখলে অনেক-ঘাটের-জলে ডোবা কলমী শাকের ডগা মনে পড়ে। ঘড়ির মোটা চেনটা পেটের ভাঁজে চক্চক্ করছে। হাতে-ধরা Onlooker-খানায় চোখ বোলাচ্ছেন। গাম্ভীর্যটা ভয়ঙ্কর রকম সুড়সুড়ি দেয় আমাকে। ধীরে ধীরে বলি. "আপনি লণ্ডনেই থাকেন মনে হয়। বলতে পারেন, শুট-অপ-হিল্ পৌঁছুতে কত দেরী লাগবে?"

তাড়াতাড়ি অনলুকারখানা রেখে উনি বলেন, "সেই কিলবার্ণ! যদিও লণ্ডন এয়ারপোর্টে নামছি, ওয়াটারলু টার্মিনাল যেতে হবে। পৌঁছেই আমাকে ট্রেন ধরতে হবে। ওয়েডস্ডনের, এল্‌স্‌বারির কাছে। তবে শুট-আপ হিল্স যাবার পক্ষে ট্যাক্সিই ভালো হবে। লণ্ডনে প্রথম যাবার সময়ে কোনো পরিচিত লোক না থাকলে রাতে কষ্ট হবে।"

লক্ষ্য করলাম, একবারও একটিও প্রশ্ন করলেন না, কেবল কথা বলতে লাগলেন।

আমি শেষ পর্যন্ত নিবেদন করলাম যা সবচেয়ে বেশী যন্ত্রণা দিচ্ছিল।

উনি শুনে বলেন, "হ্যাঁ, আমরা বিরক্ত করতে চাই না বলেই বিরক্তি ভালোবাসি না। পরিচিত লোকদের সামলানোর মতো ধৈর্য সংগ্রহ করার জন্যই পরিচয়ের সীমাকে লঘু করাটা কাজে দেয়।"

"আমি বিরক্ত করেছি। ক্ষমা করবেন।"—ক্ষমা একটুও না চাওয়ার গলায় কেবল কথা ক'টা আউড়ে গেলাম।

"আপনি ভারতবর্ষের লোক। প্রথম লণ্ডন যাচ্ছেন। রাতে যাচ্ছেন। সুবিধে হলে সাহায্য করতাম। আমার গাড়ী ধরার হাঙ্গামা না থাকলে আপনাকে নিশ্চয় সাহায্য করতাম। এটা বিরক্তি নয়।"

"আচ্ছা ধরুন যদি লণ্ডনে অপরিচিত লোকেদের সঙ্গে কথা বলতে চাই, বিরক্তিকর না হয়ে কি করে কথা বলব?"

"বন্ধু-বান্ধবের মারফৎ ছাড়া উপায় নেই। তবে যদি কথা বলেনই জবাব পাবেন। এ যুদ্ধের পর ইংরেজ সমাজে, বিশেষ লণ্ডন সমাজে অনেক রদবদল হয়েছে।"

যখন লণ্ডনে প্লেন নামল তখন রাত ন'টা।

লণ্ডন এয়ারবেসে—ওয়াটালু এয়ার-টার্মিনাল থেকে হেমরজনী তার করেছে যে, টার্মিনালে দেখা হবে। নিশ্চিন্ত হলাম, যদিও চিন্তিত খুব ছিলাম না।

কিন্তু দেরী হ'ল কাষ্টমসে এসে। রাশি রাশি মাল বিজলীর দৌলতে নীচের তালা থেকে ওপর তালায় ঘুরন্ত ফিতের চেপে আসছে। তা থেকে নিজের নিজের জিনিস পোর্টারদের ইঙ্গিত করতেই তারা তুলে রাখছে।

ওরই মধ্যে এক ভদ্রলোকের বাক্স দেখে ছেড়ে দেবার আগে হঠাৎ কাষ্টমসের একজন ভদ্রলোক বললেন, "আপনার হাতে ওটা কি?"

আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম ব্যাপারটায়। তাই মনেও আছে, বলছিও।

লম্বা, সুদর্শন, চমৎকার স্যুটে ঢাকা চেহারা। হাতে একটা পুরনো জুতোর বাক্সের মতো বাক্স, পাতলা টয়েন-সুতো দিয়ে বাঁধা। সেটা ঝুলছে।

প্রথমতঃ লোকটি বিরক্ত হলেন।

"কি জানি কি! খুলে দেখুন।" বাক্সটা অবহেলা ভরে ফেলে দিলেন।

কাষ্টমস অফিসার দামী সিগারেট কেস বার করে একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, "আনছেন আপনি; জানি না বললে চলে কি? আমরাই বা করি কি, জিজ্ঞাসা ত করতেই হয়।"

মুখে বলছেন। এদিকে পোর্টারকে ইঙ্গিত করেছেন: সে বাক্সটা খুলছে।

খুব একটা নির্বেদ দেখিয়ে ভদ্রলোক তখন বলছেন, "কি করে জানব বলুন। একটা ডাক্তারখানায় প্যারীতে একটা ওষুধ নিতে গিয়ে তাড়া লাগিয়েছিলাম। বললাম, দেরী করো না, প্লেনের সময় হয়ে যাচ্ছে। ডাক্তারটি বললেন, 'যদি কষ্ট না হয় আমার ভায়ের জন্য একটা ছোট প্যাকেট দেবো যদি নিয়ে যান।' নিয়ে এসেছি, কি আছে জানি না। বলেছে—'কাষ্টমসের হাঙ্গামা নেই'।"

সত্যিই তেমন কিছু ছিল না। কি একটা ওষুধের খালি খালি বাক্স। কোনো ইন্‌জেকশন্‌। অনেক ব্যবহার করা লেবেল, তার সঙ্গের কাগজপত্র, হিজিবিজি, বাতিল মাল। এমন কিছু নয়।

লোকটি দেখে আর হাসে—"ডাক্তার তো ভাল ভাল জিনিস ভাইকে পাঠিয়েছে দেখছি।"

কাষ্টমস্ অফিসার বলেন, "ডাক্তার বোধ হয় ফরাসী।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"ভাইয়ের ঠিকানাটা কি?"

"তা তো জানি না। সে আমার ঠিকানায় এসে নিয়ে যাবে এমনি কথা আছে।"

"ও, তা হলে আপনি ওকে আমাদের পুলিসের হেড-কোয়ার্টার্সের ঠিকানা দিয়ে দিন্ আর তিনি যতদিন না আসেন আমাদের ওখানেই আপনিও থাকুন।"

সঙ্গে সঙ্গে দু'জন পুলিস দু'দিকে দাঁড়াল।

এদিকে আমাদের ডাক পড়েছে। বাসে চড়তে হবে। আর নাটক দেখা গেল না। চলতে হ'ল।

ভায়া মাখনলালের কথা মনে পড়ছে তখন। জীবন-ভোর তার আঁদরেল বিশ্বাস তিনটি বস্তুর ওপর। এক ত 'মা যা বলেন তা বেদবাক্য', দোসরা 'মার্ক্স যা বলেন তা গুরুবাক্য' আর তেসরা 'ইংরেজ মার্কা ওষুদে কখনও ভেজাল থাকে না।' ভাগ্যি মাখন ভায়া কাষ্টমস্ অফিসে এই ম্যাজিক দেখেন নি। তা হলে মার জন্য ওষুধ কিনতে গিয়ে মেড ইন্ ইংল্যাণ্ড ছাপ দেখার জন্য স্বর্গ মর্ত্য পাতাল এক করতেন না। সাধে কি আর বলে "কাবুলেও গাধা পাওয়া যায়"।

কিন্তু ভাবছি, কি তীক্ষ্ণ পারদর্শিতা! অত ভীড়ের

ছোট্ট মধ্যে প্যাকেটটা ঠিক ধরেছে; ভদ্রলোকের ভাঁওতায় একটু পড়ল না। নিজের কাজ ধীরভাবে করে গেল; মানুষটাকে একটুও অপমান না করে, ঠগটাকে আইনের হাতার মধ্যে পুরে।

সর্বনাশ, আমিও যে ঠগের পাল্লায় পড়ি পড়ি! মানে কণ্ডাক্টার পয়সা চাইছে এয়ার টার্মিনালে যাবার। কমনওয়েলথ বলে সব ভুলেছি; সুন্দরীর মুখ দেখে সব ভুলেছি; কাষ্টমসে নাটক দেখে সব ভুলেছি। পকেটে ফরাসী পয়সা ঝন্ ঝন্ করে। এখন পাক্কা দুটো শিলিং দিই কোথা থেকে? ভ্যাবাচাকা খেয়ে গোবরগণেশ বনে যাই। "দেব গো দেব। এয়ার টার্মিনালে গিয়ে দেব। আগে এগুলো পাল্টে নিই।"

পকেটে ফ্রাঙ্কগুলো নাড়াচাড়া করি। আর কথাগুলো বলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করি। কিন্তু হায় ভগবান, গলা-দে রা-টি বেরোয় না যে! বাক্যি যে হরে গেল। পাশের লোকটি প্লেনে সস্তায় মদ খেয়ে বুঁদ হয়ে বসে আছে। সে আরেক কল্কি অবতার; কখন কি মাতলামি করে। সেই বুড়ো তো কখন লা-পত্তা হয়ে গেছে কথা নেই। কণ্ডাক্টারটি আবার আসে "কি, কত্তা, পয়সা হ'ল?"

বলি তখন, "পয়সা তো চেঞ্জ করাই নি ভাই। টার্মিনালে গিয়ে…"

কণ্ডাক্টর বলে, "সেই "তাসের দেশে" এর বাক্যি 'নিয়ম, নির্দেশ, প্রথা, আইন!'—কিন্তু আমাদের নিয়ম যে…"

কটমট করে তাকায় সেই ভদ্রলোক মাতাল। ভাবখানা "দু'শিলিংয়ের খপ্পরে ফেলে কি আমার দশ শিলিং-এর মৌতাতটার গলা টিপে মারবি তোরা?"

কণ্ডাক্টরের হাতে দুটো শিলিং দিয়ে বলে—"যাও, তোমার নিয়মের কবর দাও এই দিয়ে।"

বলেই মাথাটি হেঁট করে ডুবে গেল মাতাল পানকৌড়ি তার রসের পুকুরে।

আমি বলি, "আপনার ঠিকানাটা?"

আমার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ভদ্রলোক এমন এক "হুঁ:" করে উঠলেন, যদি রবারের বেলুন হতাম, এক 'হুঁ' এর গুঁতোতেই চ্যাপ্টা হয়ে যেতাম।

"কিন্তু…" আমি আবার হারানো রাজ্য সামলাবার তালে গুড়গুড়িয়ে ওঠার চেষ্টা করি।

মাতাল ভদ্রলোক বললেন, "মশায় ক্ষমা করবেন, উই আর নট্ ইন্ট্রোডুস্‌ড", বলে মুচকী হেসে বললেন, "লাভ মি টু মাই ড্রামজ।" বলে চুপ করলেন।

২০

বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছে না। মধুমতী রান্নাঘরে কাজ করছে। সঙ্গে সঙ্গে গুন্‌গুন্ করে গীতা পড়ছে। মাদ্রাজী ধূপের গন্ধ আসছে নাকে।

পায়ের ধারের জানালাটা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি ঝকঝকে পাতে-মোড়া রোদের দানা ঝুলে আছে থোলো থোলো গাছের মাথায়। জায়গাটি যে লণ্ডন মালুম হচ্ছে না। মনে হচ্ছে, বালিগঞ্জের দিদির বাড়ীতে সকাল হয়েছে ভাইফোঁটার পরের দিন।

কেবল নেই কলকাতার ট্রামের ঘড় ঘড় শব্দ, মোটর যাতায়াতের শব্দ, আর শহরের কোলাহল।

এই নিঃশব্দতাই লণ্ডনে আমায় সবচেয়ে চমকে দিয়েছিল। কম নয় ত—সাড়ে তিরাশী লক্ষ লোকের বাস শহরতলি নিয়ে; লণ্ডন কর্পোরেশনে সাড়ে তেত্রিশ লক্ষ। কলকাতায় শহরতলি নিয়ে সাড়ে পঁচিশ লক্ষ। অথচ এই অতি প্রকাণ্ড শহরের সকালটা বোলপুরের সকালের মতই সহজ, সিমলার সকালের মতই নরম, পুরীর সকালের মতই ঝকঝকে বলে বোধ হ'ল।

চায়ের টেবিলে টোষ্ট, মাখন, ডিমের সঙ্গে একরাশ দুধ, এক ছড়া পাকা কলা। "খাও খাও। এখানকার দুধ-দই খাও। খাদ্যে ভেজাল এদের নেই। এত বড় শহর, দুধ দেখ খেয়ে; অথচ গয়লা চোখে দেখবে না। রাতের বেলায় খালি বোতল আর কুপন রেখে দাও দরজার বাইরে। সকালে টাট্‌কা দুধে-ভরা বোতল পাবে। যেন ভুতুড়ে কারবার। অথচ কলকাতায় চোখের ওপর দুধ দুইয়ে নাও, তাও ষাঁড়ের দুধ!"

হেমরজনীর কথা শুনে হাসি।

মধুমতী বলে, "দুপুরে দই খাওয়াব, দেখো।"

"দুপুরে?" আঁৎকে উঠি। "দুপুর-টুপুর নয় বাবা। আমি ভবঘুরে, ঘুরতে এসেছি। সারাদিন ঘুরে সেই ঘুমুবার আগটিতে আসব। ছেকল বেঁধ না বাবা! ও চলবে না।"

মধুমতী মুচকি হেসে বলে, "শুধু আমার হিয়া বিরাম পায় নাকো!"

তাই সই! ঠাট্টাই সই।

টেলিফোনটা বেজে ওঠে।

হেমরজনী উঠে কার সঙ্গে কথা বলে, লক্ষ্য করি না। বলে, "দেখ ত, কে মহিলা ডাকছেন তোমায়।"

"মহিলা ডাকছেন? লণ্ডনেও মহিলা ডাকছেন। নাঃ, রোহিনী নক্ষত্রে জন্মটা একেবারে বৃথা যায় নি।"

ওরা দু'জনেই হাসে।

আমি উঠি। "—স্পীকিং"

আশ্চর্য হয়ে যাই টেলিফোনে শব্দ শুনে। "মুকুল! তুই! এখনও লণ্ডনে?"

আমার অন্তরঙ্গতমার চতুর্থ বোন; আমেরিকায় কোথায় কি কনফারেন্স করতে চলেছে। ও যে আমায় লণ্ডনে পাবে বলে দিন আগলে বসে আছে জানব কি করে! আমি জানি চলে গেছে। ও একেবারে হেমরজনীর কাছে ঘাঁটি ধরে বসেছিল।

লণ্ডনে আচমকা মুকুলকে পেয়ে ঘোরার আনন্দ যেন শতগুণ বেড়ে গেল। ওকে ইণ্ডিয়া আপিসে অপেক্ষা করতে বলে আমরা তাড়াতাড়ি টুবে করে এসে সোজা ট্রাফালগার স্কয়ারে উঠলাম। ট্রাফালগার স্কয়ার থেকে অলড্‌উইচ্‌ বেশী দূর নয়; তাড়াতাড়ি করে হাঁটছি। আটটার লণ্ডনের রূপই ঐ তাড়াতাড়ি। ছেলেমেয়ে, বুড়োবুড়ী সবাই মুখ গুঁজে ছুটেছে। ট্রাফালগার স্কয়ার থেকে অলড্‌উইচ পথটার নাম স্ট্র্যাণ্ড, অর্থাৎ থেমস্‌ এমবাঙ্কমেণ্ট দূরে নয়। এককালে এই পথটার পরেই থেমস্‌ নদী বয়ে যেত। আমার মনে হ'ল ষ্ট্রাণ্ডে আর বৌবাজারের পথে বিশেষ প্রভেদ নেই, বিশেষ করে যে পাড়ায় বৌবাজার চিৎপুরে মিলছে। ভিড় ষ্ট্রাণ্ডে বেশী কিন্তু তেমনি পুরনো পুরনো গন্ধ; তেমনি আগা-পাছতলা দোকানদারীতে ভর্তি পথ।

তখন অন্য কিছু দেখার সময় নেই। ইণ্ডিয়া হাউসে মুকুলকে পেলাম। মহা খুশি! অফিসের মধ্যেই হেঁট হয়ে পায়ের ধুলো নিল। ভাবল আমি খুশী। খুশী হয়েছি, তবে ঐ হেঁট হয়ে ধুলো নেওয়ার জন্য নয়; ওটা আমি ভারী বিরক্তিকর এবং পরিহার্য ব্যবহার বলে বোধ করি। যদি এও জানি যে, আমার বেলায় ও ব্যবহারটায় ও নিজেও খুশীতে ভরে যায়। সঙ্গে আমেরিকার সাথী অন্য এক ভদ্রলোক, বিহারের কোনো সিন্‌হা। গলাবন্ধ কোট পরে দিব্য গোলমুখে বাদামী হাসি হেসে "নমস্তে" করলেন।

ইণ্ডিয়া হাউস ত ইণ্ডিয়া হাউস! গেলেই যেন মনে হয় নয়া দিল্লীর নর্থ ব্লকের কোনো দপ্তরে ঢুকেছি। অনেক চেনা মুখ। আমরা সে দিনের মতো বিদায় নিলাম। হেমরজনীকে বলে দিলাম রাতে দেখা হবে।

বাসে করে চলেছি টাওয়ারব্‌ লণ্ডন।

সেদিন সন্ধ্যায় মুকুলের জাহাজ ছাড়বে। আর সব দেখে নিয়েছে; টাওয়ার বাকী।

আমি হঠাৎ বলি, "এখানে নেমে যাই। একটু হেঁটে চলি। নইলে নতুন দেশ দেখার মানে হয় না।"

মুকুলের হাঁটা দেখে প্রফুল্লবাবু টিপ্পনী ছাড়তেন,—"দেবীর উষ্ট্রে দৌড়ন!"

সত্যিই জোরে হাঁটে। ভালওবাসে হাঁটতে। ওদিকে পল্‌তার ঝোলের মতো অহিংস মুখে সিন্‌হা তথাস্তু মুদ্রায় ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে দেখছেন।

বিশাল জংশন, যেন চৌরঙ্গী। ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীট, চীপসাইড, প্রিন্সেজ ষ্ট্রীট, লম্বার্ড ষ্ট্রীট, কর্ণবীল্‌ রোড, ওলড্‌ ব্রড ষ্ট্রীট মিশছে। ব্যাঙ্ক অব লণ্ডন, রয়াল্‌ একস্‌-চেঞ্জের গমগমে ভিড়। তাবৎ দুনিয়া কেনা হচ্চে, বেচা হচ্চে। দশটার ক্লাইব ষ্ট্রীটের মোড়্‌।

নেমে হকচকিয়ে গেলাম। কোথায় এলাম? ঠিক ত সেই ধর্ম তলার ফলের দোকান দেখতে পাচ্ছি, কে. সি. দাশেরতলায় ভেগুরদের দোকান দেখতে পাচ্ছি। বাঙ্গালীনী সেই সব মেয়েরাই, তবে শাড়ী-পরা নয়, গাউন; সেই বাবুরাই, তবে স্যুট-পরা, ধুতি নয়। সেই ব্যস্ততা, সেই অনবসরের তাড়ায় দৌড়োন। গলি-গলি ভাব যেখানে-যেখানে, সেখানে-সেখানেই ঠেলাগাড়ীতে ফল, সব্জা, গেঞ্জী, খেলনা। "দো দো আনা; দো-আনা"র লুঙ্গীমার্কা হৈ চৈ নেই। তার বদলি প্রতি জিনিসের ওপর কাঠিতে গাঁথা কাগজে দাম লেখা। একজন আমেরিকান একটি মালিকসমেত ঠেলাগাড়ীর ছবি তুলছে। গাড়ীর মালিক ভারি খুশী। হ্যাট মাথায় দিয়ে যে খুশীর হাসি হাসছে তা বৌবাজার ধর্মতলার ফলওলা ফকির মিঞা বা রামলালের চোখে দেখেছিলাম।

কিং উইলিয়ম ষ্ট্রীট ধরে লণ্ডন ব্রীজের দিকে যেতে যেতে একজন পুলিসকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিলাম ঠিক পথেই চলেছি। "ফিশ ষ্ট্রীট হিল্‌ থেকেই মনুমেণ্ট ষ্ট্রীট বেরিয়েছে ত? কিং উইলিয়ম ষ্ট্রীটের ওপরেই বোধ করি মনুমেণ্ট ষ্ট্রীট?" পুলিসটি সব গুছিয়ে বলে দিতে আবার এগিয়ে চলতে লাগলাম।

"মনুমেণ্ট কি?" মুকুল জিজ্ঞাসা করে। "যাব ত টাওয়ারে। আবার মনুমেণ্ট কেন? স্লিম্‌ নেমন্তন্ন করেছে দুপুরে খাবার। ঠিক সময়ে পৌঁছুতে হবে। দেরী করবেন না যেন!"

এখানেও তুমি জীবন-দেবতা!...এখানেও তাড়া।

"বামুনের নাম রাখলে বটে জিদ্দে! লণ্ডনেও এসে নেমন্তন্ন গাঁটছড়ায় বেঁধেছ?"

"গাঁটছড়া ত বাঁধা হ'ল না জীবনে। নেমন্তন্নও খেতে দেবেন না নাকি? কোথায় চললেন?"

"ওগো টাওয়ার গো টাওয়ার। পথেই পড়বে এই মনুমেণ্ট। কিছুই নয় অক্টারলোনী মনুমেণ্টের মতো।

দু'শো ফুট উঁচু, প্রায় সাড়ে তিনশো সিঁড়ি। কুতুব মিনারের দেশের লোকের কাছে ও খড়কে কাঠি। কিন্তু এই জায়গা-বরাবর সেই প্রসিদ্ধ অগ্নিকাণ্ড, যার প্রসাদে প্লেগের দাপট পুড়ে ছারখার হয়েছিল লণ্ডনে; পুরনো লণ্ডনের কুপ্রসিদ্ধ ঘিঞ্জিপনা দূর হয়েছিল।"

"এ লণ্ডনও ত কম ঘিঞ্জি দেখছি না।"

মিঃ সিন্‌হা সঙ্গে। কথা ইংরিজীতেই বলছি। হিন্দীতে কথা বলা চলতে পারত। কিন্তু মুকুল অস্বস্তি বোধ করত।

মিঃ সিন্‌হা কি ইংরিজী, কি বাংলা, কি হিন্দী সবতাতেই সমান "ন ভাগতে"র পালিশে চকচকে করে রাখলেন ভরন্ত গাল। কোনো অর্থবোধ বা রসবোধের কচিৎ বিকৃতি দেখা গেল না সেই নিস্তরঙ্গ মুখে।

"এ ঘিঞ্জি কিছু নয় রে; সে ঘিঞ্জির ডাক নাম ছিল সারা য়োরোপে। লণ্ডনের গ্লামকে সেলাম জানায় নি এমন পর্যটক নেই। তবু কলকাতার কাছে এ হার মানে।"

শহরের এ অংশটাই শুধু নয়, যতই লণ্ডন ডকের দিকে যাওয়া, ততই ঘিঞ্জিপনার বাড়। লণ্ডন শহরকে সুশ্রী শহর বলবে এক নয় চাটগেঁয়ে—ছিলইট্টা নাবিক, নয় ত সায়েব খেলিয়ে বাবুর দল। বাঙ্গালী বাবুকেও আমি ইংরিজীখানার তারিফ করতে শুনেছি! দুনিয়ায় ফ্যাশনের কামড়ানিতে লোকে কি না বলেছে, কি না করেছে।

মনুমেন্টের ওপরে চড়লে লণ্ডনের ঘিঞ্জিপনা স্পষ্ট করে দেখা যায়। তা আর চড়ি নি। ১৬৬৬-তে প্রসিদ্ধ স্থপতি স্যর ক্রিষ্টফার রেন্ অগ্নিকাণ্ডের স্মৃতিরক্ষায় এটা রচনা করেন। এত খারাপ এবং এত ঘিঞ্জি স্তম্ভ এর আগে আমি দেখি নি। অশোকস্তম্ভ আর চিতোরের জয়স্তম্ভের দেশের লোকের চোখে এ ছেলেখেলা কোনো উৎসুকতার সৃষ্টি করল না। এগিয়ে গেলাম লোয়ার থেম্‌স্ ষ্ট্রীট ধরে। ডান ধারে এক এক জায়গায় সিঁড়ি নেমে গেছে সরু গলি সৃষ্টি করে। দু'ধারে বড় বড় জাহাজী কোম্পানীর দপ্তরখানা-বাড়ী। দেখে দেখে মনে পড়ে সিমলার মাল্ থেকে লোয়ার বাজারে যাবার সরু সরু সিঁড়ি-গলির কথা।

মুকুলের ছাপা-মুর্শিদাবাদী শাড়ী লণ্ডনের পথে বিভ্রম ঘটিয়েছে। তার ওপরে গায়ে দামী একখানা কাশ্মীরী শাল। ওর পায়ে নতি হবে না তো কি আমার পায়ে হবে? লণ্ডনের পথ কোনোকালে পাথরের ইঁটে বাধান ছিল। এখনও অনেক জায়গায় তাই; তবে বেশীর ভাগই ম্যাকাডেমাইজড। এতো সরু পথ যে সর্বত্রই এক-তরফা গাড়ী চলার পথ। কোলকাতার পথ লণ্ডনের মতো হলে মানুষ-মারা কল হিসেবে কর্পোরেশনের খ্যাতি অনেক বেশী বেড়ে যেত।

টাওয়ার হিল তো সেই পুরাকালের ব্যাপার। কত ঘাড় মটকেছে, কত ঘাড় লটকেছে। ফাঁসীতে কখনও, কখনও চিতায় টাওয়ার হিলের বুকে অনেক রক্তপাত হয়ে গেছে, অনেক আর্তনাদে মুখর এর বাতাস। স্যর টমাস্ মুর, টমাস্ ক্রমওয়েল, আর্ল অব সারে, ড্যুক অব মন্‌মাথ—কতো কথা মনে পড়ে যায়।

এই ত লণ্ডন, সেদিনের লণ্ডন! উনিশ শ' বছর আগে এর পাত্তা ছিল না। সীজার যখন ইংলণ্ড জয় করেন তখন সেটা কেউ ধর্তব্যের মধ্যেই আনে না। আনবে কেন? একটা নেহাৎ ওঁচা জেলেদের দেশ। মুটেরা যেমন ঝাঁকায় করে পরের মাল বয়ে দিন কাটায় তেমনি, নৌকা-জাহাজ তৈরি করে এদেশের মাল ওদেশে নিয়ে দিন গুজরাণ করে। ওদেশের খবরও কেউ রাখত না। মাঝে মাঝে বাসিলোনায়, নেপল্‌স্-এ, মানুষ বিক্রী করে যেত জলদস্যুরা—তাই জানত সবাই একটা দ্বীপ আছে, মেয়েগুলো সুন্দর, টাটকা রং, নীল নীল চোখ, সোনালী চুল।

তখন লণ্ডন কোথায়? রোম্যানরা এসে থেমসের মুখে একটা গাঁ দেখতে পায়। মাঝি-মাল্লা থাকে। কাঠে, খড়ে, দরমায়-ছাওয়া ঘিঞ্জি কয়েকটা ঘর। থেমসেরই জল বেঁধে তার চারধারে থাকে। জায়গাটার নাম "পূ-ল্"। রোম্যানরা থেম্‌সের বুকে এক সেতু বেঁধে দেবার পর থেমসের উভয়তীরে যাতায়াত সুগম হ'ল। লোকজন থাকতে লাগল। কেল্টিক্ নাম 'লণ্ডিনিয়াম্' জন্ম নিল। যেন সুতানটী আর গোবিন্দপুরের তাল-বেতাল গড়ে তুলল কোলকাতা শহর। লণ্ডিনিয়ামের অন্য কোনও খ্যাতি নেই। রোম্যান্ জাহাজ আসে, দাঁড়ায়; সৈন্য আর সাঁজোয়া নামায়, নিয়ে যায় এদেশ থেকে নানা পণ্য, ক্রীতদাস, টিন। তখন ইংলণ্ডের টিনের নাম খুব। বডিসিয়া সহজে রোম্যানদের আড্ডা গাড়তে দেয় নি। সিরাজের মতো বডিসিয়াও মার খেয়েছিলো। কিন্তু পারে নি। লোপাট হয়ে গিয়েছিলো। রোম্যানরা ইংলণ্ডে সভ্যতা, সংস্কৃতি, বিদ্যা, বাণিজ্য—সবই আনল। বড় বড় পথ গড়ে দেশে দেশে যাতায়াতের সুবিধা করলো। সে সব পথের, স্থাপত্যের, সংস্কারের চিহ্ন ত আজও আছে—লণ্ডন থেকে ডোভারের পথ, লণ্ডন থেকে ইয়র্কের পথ; হাড্রিয়ানের প্রাচীর। কিন্তু রোম্যান বাতি নিবল। সঙ্গে সঙ্গে ডেন্‌রা, স্যাক্সনরা, আড্ডা গাড়ল। শেষ অবধি নরম্যানরা। নরম্যানদের

ইংরেজরা বিদেশী মনে করে না। আজ করে না। সেদিন করেছিলো। হেষ্টিংসের প্রান্তরে ১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দে সপরিবার হ্যারল্ড বীরের মতো প্রাণ দেয়। সেদিন নরম্যানদের কেউ "দেশীয়" ইংরেজ বলে মনে করে নি। করবে কেন? যদিও সত্য যে নর্মাণ্ডিতে ইংলণ্ড থেকেই রিফিউজীরা গিয়ে বসবাস করেছে। ডেন্-স্যাক্সনরা যখন দেশে ভীষণ আক্রমণ চালিয়েছে, তখন পরিত্রাণ পাবার আশায় রিফিউজীরা নর্মাণ্ডিতে এসে বসবাস করেছে। তারাই আবার উইলিয়ামের নেতৃত্বে হ্যারল্ডকে আক্রমণ করে। তবু তারা সেদিন ইংরেজ বলে স্বীকৃত হয় নি। তারা ফরাসী বলত, ফরাসী কায়দা জানত ফরাসী রীতিতে জমিদারী সৃষ্টি করে ছিল ফরাসী অভিজাতদের জমি ঘুষ দিয়ে।

লণ্ডন কিন্তু ক্রমশঃ বড়ো হয়ে উঠেছিল। লণ্ডনকে বাঁচাবার জন্য রোম্যানরা শহর লণ্ডনের চারধারে দেয়াল তুলে দেয়। দিল্লীতে যেমন দেয়াল ছিল, কলকাতায় যেমন ছিল ডিচ। সে ডিচ যেমন আজ সার্কুলার রোড,—দিল্লীর সে দেয়াল যেমন আসফ আলি রোড, তেমনি লণ্ডনের সে দেয়াল এখন অলড্‌গেট হাই ষ্ট্রীট, অলডার্স গেট ষ্ট্রীট। সে প্রাচীরের অবশিষ্ট স্মৃতি "লণ্ডন ওয়াল" এখনও আছে। যেমন আছে দিল্লীতে কাশ্মীরী গেট, দিল্লী গেটের পাশে পাশে কিছু কিছু পাঁচিল। শহরে ঢোকার জন্য যে সব গেট ছিল তার নাম এখনও পাওয়া যায়—নিউ গেট, লাড গেট, বিলিংস্ গেট, ক্রিপল গেট, অলডার্স গেট, মূর গেট, বিশপস্ গেট, অলড গেট।

তখন কতটুকুই বা লণ্ডন! এক মাইল অর্থাৎ এক বর্গমাইল জায়গা জুড়ে শহর। কি যে সে ঘিঞ্জি ত কল্পনা করা যায় আজকের লণ্ডন দেখে। ১৬৬৬-র আগুনই জানি আমরা। তা নয়। ঐ কাঠ-পাতার শহরে আগুন লাগা নিত্য ঘটনা। সাত থেকে দশ শতাব্দীর মধ্যে লণ্ডনে আগুন লেগেছে চারবার। সে দিনের শহরের কোনো চিহ্ন থাকার কথা নয়। আছে ঐ দেয়াল, পথ, আর টাওয়ার লণ্ডনের দেয়াল। এত প্রাচীন জিনিস লণ্ডনে আর কিছু নেই। আছে বটে ক্লিওপাত্রার নীডল্। তবে তা অন্যদেশের। স্থাপত্যে এ সব স্মৃতি লণ্ডনের প্রাচীনতম। অত আগুনের পর, ১৯১৪-র যুদ্ধে ধ্বংস হয়েছে লণ্ডন, তার পর ১৯৪০-৪৫-এর মধ্যে লণ্ডন বেদম মার খেয়ে গুড়িয়ে গেছে। তার পর নব নব নৃপতিরা লণ্ডনকে পরিষ্কার করতে উঠে-পড়ে লেগেছেন; তবু লণ্ডন, অর্থাৎ সেই এক বর্গমাইল ক্ষেত্রের লণ্ডনের যা ঘিঞ্জি আজও আছে, দেখলে বুঝতে কষ্ট হয় না যে সে দিনের লণ্ডন কত ঘিঞ্জি ছিল। অতো যে জ'াক অষ্টম হেনরীর গোঁয়ার্তুমীর, এলিজাবেথের মেজাজের, চার্লস-প্রথমের সময়কার অত যে কাণ্ড-কারখানা সবই এই অলি-গলির পথে পথে হয়েছিল।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের সঙ্গে মিল খাইয়ে এদের ইতিহাস দেখতে গেলে মাথার ঠিক থাকে না। দিল্লী থেকে আগ্রা, জৌনপুর থেকে পাটনা, আওরাঙ্গাবাদ থেকে গোলকোণ্ডা, বিজাপুর, সাতারা—কথায় কথায় আমরা পাড়ি জমাই। অথচ লণ্ডন থেকে ক্যান্টারবারি, কেণ্ট, মিডলেসেক্স, এমন কি ব্রিষ্টল কলকাতা থেকে তারকেশ্বর! ব্যস্। নয় ত বরানগর-বালিগঞ্জ, করোল-বাগ-লোদী কলোনী। এক মাইলের লণ্ডন শহর!! আগ্রাফোর্টটাই ঐ মাপের কাছাকাছি, গোয়ালিয়র ফোর্ট লণ্ডন শহরের চেয়ে কিছু বড়। চিতোর ফোর্ট অনেক বড়।

কাজেই এখানে দেখা চোখের দেখা নয়, মনের দেখা—অন্ততঃ ভারতীয়ের পক্ষে। আর মনের দেখার জন্য লণ্ডনে এত জিনিস আছে যা বছরের পর বছর দেখে ফোরানো যায় না। পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ মুাজিয়ম, বৃহৎ লাইব্রেরী, বৃহৎ পশুশালা এই লণ্ডনে। বিখ্যাত চিত্রশালা পর পর কয়েকটা। লণ্ডনের পথে পথে ইতিহাস, মনীষা, বৈদগ্ধ্য চেয়ে থাকে; দেখতে জানতে হয়, কথা বলতে জানতে হয়। মনে রাখতে হয় মিল্টন সারা জীবন লণ্ডনে কাটিয়েছেন; চার্লস্ল্যাম্ব সারা জীবন লণ্ডনে থেকে গেছেন। লণ্ডনের হ্যাজলীট, চেষ্টারটন্, নেলসন্, ডিকেন্স, গ্লাডষ্টোন, ডিজ্‌রেলী।

এ ছাড়া লণ্ডনে বিখ্যাত ক্লাব, বিখ্যাত হোটেল, বিখ্যাত পার্ক—সবই ঐতিহাসিক অর্থে বিখ্যাত। দেখতে, শুনতে, ভাবতে যেন শেষ হয় না। পৃথিবীর ইতিহাসে বিরাট বিবর্তন আনার ব্যাপারে সেকালে আর্যরা আর রোমানরা, একালে স্পানীয়রা আর ইংরেজরা। অতি আধুনিক কালের পৃথিবীর আজব আজব ইংরেজদের পরিচয়, ছাপ। আর সেই নতুন ইতিহাসের মর্মস্থল এই লণ্ডন। এখানে এসে তাই সারা পৃথিবীর ইতিহাসের গন্ধ পাই।

অল্প অল্প বৃষ্টির আমেজে এক শিলিং দামে টিকেট কিনে যখন ঢুকি লণ্ডন টাওয়ারে, প্রথমেই সাক্ষাৎ পাই টুডর আমলের লীভারি-পরা টাওয়ারের রক্ষীর। ১০৬৬এ হেষ্টিংসের লড়াই—১০৭৮-এ উইলিয়ম স্ত কন্কারার হোয়াইটাওয়ারের পত্তন করে এটাকেই রাজ-রাজপ্রাসাদ হিসেবে ব্যবহার করতে লাগলেন। এই

নর্মাণ স্থাপত্যের খুব ঝোঁক ইংরেজদের মনে। এ সময়কার স্থাপত্য আমাদের দেশে খুঁজতে গেলে পাওয়া যাবে অশোকস্তম্ভ, বেসনগরের গরুড়স্তম্ভ, দিলওয়ারে জৈন মন্দির, ভুবনেশ্বর, কোনারক, বিজয়নগর, মাদুরা, তাঞ্জোরের আশ্চর্য আশ্চর্য স্থাপত্য। টাওয়ারের মতো টাওয়ারের রক্ষীরাও দেখবার জিনিস। এই রক্ষীদের ইয়োমেন ওয়ার্ডার্স বলা হয়। এদের পোশাক তৈরি করিয়ে দেন সপ্তম হেনরী। সেই থেকে এদের সেই পোশাকের ধরন বদলায় নি। এখন এদের সংখ্যা একশো। এরাও টাওয়ারের নানা দর্শনীয় সামগ্রীর অন্যতম। এদের মধ্যে দুটো দল আছে। একটা ইয়োমেন ওয়ার্ডার্স; অন্যটা ইয়োমেন অব দি গার্ডস্। প্রায় একই পোশাক। এক দল বেল্ট বাঁধে আড়াআড়ি, অন্যদল বেল্ট বাঁধে কোমরে ঘুরিয়ে।

ওদের দেখে মুকুল ত খানিক হতভম্ব। ম্যাট্রিক্ পাস করার সময় পড়েছে ওদের কথা। এখন দেখতে অবাক লাগছে। কিন্তু শ্রীমান্ সিন্‌হা জিজ্ঞাসাই করলেন। এ সব ব্যাপার আজকালকার দিনে কেমন অসহ্য বোধ হয়।"

আমার হয় না। ট্রাডিশন-প্রীতি আর অচলায়তনও যেমন এক নয়; তেমনি শৃঙ্খলা আর তাসের দেশও এক নয়। আমার ঐতিহাসিক মন ট্রাডিশন ভালবাসে। মরা খুঁটির ট্রাডিশন নয়; জ্যান্ত গাছের শেকড়ের মতো।

ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ চলে গেল অথচ ভারতবর্ষ পেরু হ'ল না, মেক্সিকো মেরে গেল না, অস্ট্রেলিয়া নিউগিনী, ক্যানাডার মতো একেবারে হজমীকৃত হয়ে গেল না ,এ কেবল ভারতবর্ষের মোক্ষম ট্রাডিশন-প্রীতির কৃপা। অংগ্রেজীপনা শহরে শহরে রং ধরালেও গ্রামের নাড়ীর রক্তে জল ঢোকাতে পারে নি। ইংরেজও তেমনি শত দুর্বিপাকে শেষ এবং মোক্ষম সমরে জীবনে হার খায় নি, কারণ ওর ট্রাডিশন প্রীতির বামুনপনা, মোক্ষম কাষ্ট-সিষ্টেম্, কাষ্ট-কনশাস্‌নেশ। এমন কুলীন আর গোঁড়া কুলীন জাত ইউরোপে আর নেই। যত ছিল নাড়াবুনে সব কীর্ত্তনে বনে গেল সারা ইউরোপে। কিন্তু ভেক বদলালেও ভিক্ ছাড়ে নি ইংরেজ। জাত মারতে দেয় নি; কুলকর্মোয় পাকা দুরুস্ত্। ওদের অমর করে রেখেছে বাজখাঁই প্রথার কুলীনপনা।

"আজকাল এদের কাজ কি?" জিজ্ঞাসা করে মুকুল।

"কেন? গাই ফক্‌স্ ডেতে পার্লামেন্টের হাড়-পাঁজরা তল্লাস করা। মাণ্ডি মণি বিলুনো। রাজার জুলুসে হাজির থাকা। 'বীফ্ ঈটার' এদেরই আদুরে ডাক নাম।"

"গাই ফক্‌স্ ডে—মানে সেই পাঁচুই নবেম্বরের আগুন জ্বালানো? জেম্‌সের রাজত্বে গান পাউডার প্লট ফাঁস হয়ে যাবার উৎসব?"

"গাই ফক্‌সকে জ্বালিয়ে মারা হয়েছিল। তারই এফিজি এখনও বাচ্চা বুড়ো মিলে পোড়ায়। সেও এক ট্রাডিশন। এমনি ট্রাডিশন ওদের লণ্ডন লর্ড মেয়রের ব্যাপার। সেই ১১৮৯ থেকে লর্ড মেয়রের জুলুস এদের এক মস্ত ব্যাপার। পুরনো জুলুসে ইংরেজদের ভক্তি আমাদের রথযাত্রার মেলাকে হার মানায়। আমার বাপু বেশ লাগে।"

এক গাদা ছেলেমেয়ে উরষ্টারের ক্যাথলিক স্কুল থেকে এসেছে। সঙ্গে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী। ইয়োমেন অব গার্ডটি যুবক, সুশ্রী। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বোঝাচ্ছে। এবার দাঁড়াল ট্রেটর্স গেটের সামনে। ওপরের ঘর দেখিয়ে বলছে ঐ ঘরে ওয়াল্‌টার রালে তাঁর বন্দীদশায় বসে হিষ্ট্রি অব দি ওয়ার্লড লিখেছিলেন।"

তিরিশ ফুট চওড়া দেয়ালে ঘেরা তেরো একর জমির মধ্যে কিংগস হাউস, টাওয়ার গ্রীন, সেণ্ট জন শ্যাপেল্ সব দেখা গেল। ম্যুজিয়ামে ইন্‌স্ট্রুমেনটস অব টর্চার। শেষে লাইনবন্দী দাঁড়ালাম ক্রাউন জুয়েলস্ দেখব ওয়েকফীলড টাওয়ারে। তার আগে সেণ্ট পীটর শ্যাপল দেখে নিলাম।

টিপি টিপি বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করেছে। লম্বা লাইনের সারি। কত দেশের কত লোক দেখতে এসেছে ইংরেজ-রাজ-পরিবারের সংগৃহীত এবং অপগৃহীতও নানা রত্ন-মাণিক্য-স্বর্ণ বিলাস। আমরা বেকুবের মত ঐ অদর্শনীয়ের দর্শন প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে কাকভেজা ভিজছি।

মুকুল ভারী হুঁশিয়ার মেয়ে। পোশাক-আসাকে মেয়েরা বরাবরাই হুঁশিয়ার। ও আবার তারই মধ্যে একটু বিশেষ। ও বিশেষ করে ভেবেচিন্তে এমন অবিশেষ পোশাক করে যাতে সবিশেষ ওকেই দেখা যায় বেশী, ওর পোষাককে নয়। লণ্ডনের বুকে বসে এমন এক রাম-টিপ লেপেছে কপালে যে, মানুষ চোখ খুলে নয়, যেন চোখ উপড়ে দেখছে।

ও ব্যবস্থা করে এনেছে প্লাষ্টিকের বর্ষাতি। আমি এসেছি রাম খোকার মতো বগল বাজিয়ে। সিন্‌হা-ও বর্ষাতি। মুকুল আমায় বর্ষাতি দান করে নিজে ঢাকল সবুজ দোশালাখানা।

এই লেনদেন ভাল লাগল না সুমুখে দাঁড়ান সাত ফুট লম্বা আমেরিকান অবলাটির। "মশায়ের দেহে শিভ্যালরির বড় অভাব দেখছি কিন্তু?"

"ঠিক উল্টো? শিভ্যালরি আছে বলেই এমন রংদার দোশালাটি গায়ে দেবার অবিকল সুযোগ দিয়ে ওকে যেমন দর্শনীয় এবং লোভনীয় করে দিলাম, ওর এই আড়াই ফুটি প্লাষ্টিকের আবরণ স্বীকার করে নিয়ে নিজেকে তেমনি দর্শনীয় ও হর্ষণীয় করে তুললাম। বোন্ আমার বিলক্ষণ জানেন যে, দোশালায় ওঁর খোল্‌তাই হবে।

ফিসফিসিয়ে ভদ্রমহিলা মুকুলকে বললেন—"ভারি মুখফোঁড় ত—আপনার দাদা?"

আমি যোগ করি—"ইন্ ল।"

হাসেন ভদ্রমহিলা।

আমি বলি, "কি দুর্ভোগ! কোন্ রাজা কবে কোন মাণিক্য পরেছিলেন দেখার জন্য ধর্ণা দিয়ে কাক ভেজা ভিজছি। অথচ মন্দিরের দোরে ঠাকুরদেখার জন্য দাঁড়ালে বদনাম হ'ত মূর্তি উপাসনা!"

ভদ্রমহিলার সঙ্গে দাঁড়িয়ে অপর একটি মহিলা। যেন কড়ার সসেজ, এক মাচার লাউ, একই মইয়ের দুটি বাঁশ। তিনি বললেন, "লণ্ডনে এসে ক্রাউন জুয়েল্‌স্ দেখতে ভাল লাগে তাই দেখা। নৈলে সিনেমায় এ সবই আমাদের দেখা।" ভাবখানা সিনেমায় দেখাটার মতো মডার্নিজম্ আর নেই!

অপর মহিলাটি শেষ অবধি প্রশ্ন করেই ফেলেন, "সিনেমা নিশ্চয়ই দেখেছেন আপনারা? ভারতবর্ষে সিনেমা আছে নিশ্চয়!"

উত্তর দিয়েছিলাম। কিন্তু ভাবলাম ভারতবর্ষ সম্বন্ধে, —ভারতবর্ষই বা বলি কেন ইউ-এস-এ আর পশ্চিম য়োরোপ ছাড়া তাবৎ দুনিয়া সম্বন্ধে এদের জ্ঞানের সীমা কত সঙ্কীর্ণ! ভারতবর্ষের সাধারণ স্কুলের ছেলে-মেয়েরাও যা জানে, এরা তা জানতে চায় না। এটা ওদের মস্তিষ্কের স্থূলতা নয়: মনেরই সঙ্কীর্ণতা; নিরেট অহঙ্কার। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের—বিশেষ এশিয়া-আফ্রিকা সম্বন্ধে কিছু জানবার যে আছে এও ওরা আমল দেয় না।

কথার মোড় ফেরাবার অছিলায় ভদ্রমহিলা বললেন, "চমৎকার ইংরেজী বলেন ত আপনার দাদা!"

মুকুল বলে, "বিশ বছর ধরে ইংরেজী পড়ালে আমিও ভাল বলতে পারতাম। ওতে বাহাদুরির কিছু নেই।"

"না, বলছিলাম বলার কায়দা। খুব স্পষ্ট আর ভদ্র।"

আমি বলি, "আপনাদের বলা দেখে মনে হয় আমেরিকার কেণ্টাকি বা ঐ রকম কোথাও!"

মুকুল আমেরিকা যাচ্ছে শুনে ওরা ঠিকানা বদল করে।

আমাদের বারি এসে গেল। সরু সরু ঘষে-যাওয়া বিশ্রী সিঁড়ি দিয়ে ঘুট-ঘুটে অন্ধকার ঘরে এসে ঢুকি। একটা আলমারির মধ্যে বৌবাজারের গিনি-হাউসের শো-কেশের মতো সাজান ঝল্‌মল্ করছে নানা পাথর-আঁটা গহনা। রাজার, রাণীর, দরবারের, অভিষেকের ইত্যাদি ইত্যাদি। হাতে ধরবার রাজদণ্ড, বৃত্তাকার দুনিয়ার প্রতীক, রাজছত্র, অভিষেকে তেল ছিটোবার পাত্র, ধূপ-পোড়াবার, হেনার-তেনার, সাত-সতের। মুকুল জানতে চায়।

"এ সব যা দেখছিস সবই সিদ্দনের করা—চার্লস সেকেণ্ডের অভিষেকের সময়ে নতুন করে গড়ান হয়েছে। নৈলে আগেকার যা কিছু ছিল রাজকীয় ক্রম্‌ওয়েল্ তা সব গলিয়ে ফেলে দেশের কাজে লাগিয়েছিল। ওই কয়েক বছরের শাসনের ফলে ক্রম্‌ওয়েল্ ইংলণ্ডের প্রতিপত্তি বহু গুণ বাড়িয়ে গেল। এখনকার ব্রিটিশ নেভীর গোড়াপত্তন করে গেয়েছিলেন ক্রম্‌ওয়েল্। পার্লামেণ্ট ত তাঁকে 'রাজা' করতে রাজীই ছিল। তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। আর চার্লস সেকেণ্ড তার মৃতদেহ ওয়েষ্ট মিনষ্টার এ্যাবে থেকে খুঁড়িয়ে বার করিয়ে আবার ফাঁসী দিয়েছিল। সেই চার্লস সেকেণ্ডের সময়কার এই সব অভিষেক সামগ্রী - দু'একটা ছাড়া।"

"কোনগুলো?" জিজ্ঞাসা করে মুকুল।

"ঐ যে নুনের পাত্রটা দেখছিস ওটা রাণী এলিজাবেথের। ওই যে বিরাট মুকুটখানা, ওটা প্রথম এডোয়ার্ডের। ওটা ব্যবহার করা হয় না, ওজনের জন্য। ওটার ওজন পাঁচ সেরের ওপর। মাথায় ধরে রাখা দুষ্কর। রাণীর পোশাক পরে অভিষেক করাতে গিয়ে অনেকে ওজনের চোটে ভিরমী খেয়েছেন। কম তো নয় ওজন! আর তেলের পাত্রটা, আর একটা চামচ—এ কটা যে কেন গালান থেকে বেঁচে গেল জানি নে।"

দাঁড়াতে পারি না। দাঁড়াবার হুকুম নেই। কেবল নড়ো, চড়ো, এগিয়ে যাও। দাঁড়াবে না। শান্ত্রী শাসায়, "তফাৎ যাও—তফাৎ যাও।"

পুরুৎগিরি যেখানে, বুজরুকিও সেখানে থাকবে; আপত্তি কি? রং আর আকারের পার্থক্য থাকলেও কুমীরের স্বভাব সর্বত্রই এক হবে, এতে বৈচিত্র্য কোথায়? আড়ম্বরপ্রিয়, ভড়ংবাজ, পুতুলভক্ত বলে অখ্যাতি যাঁরা
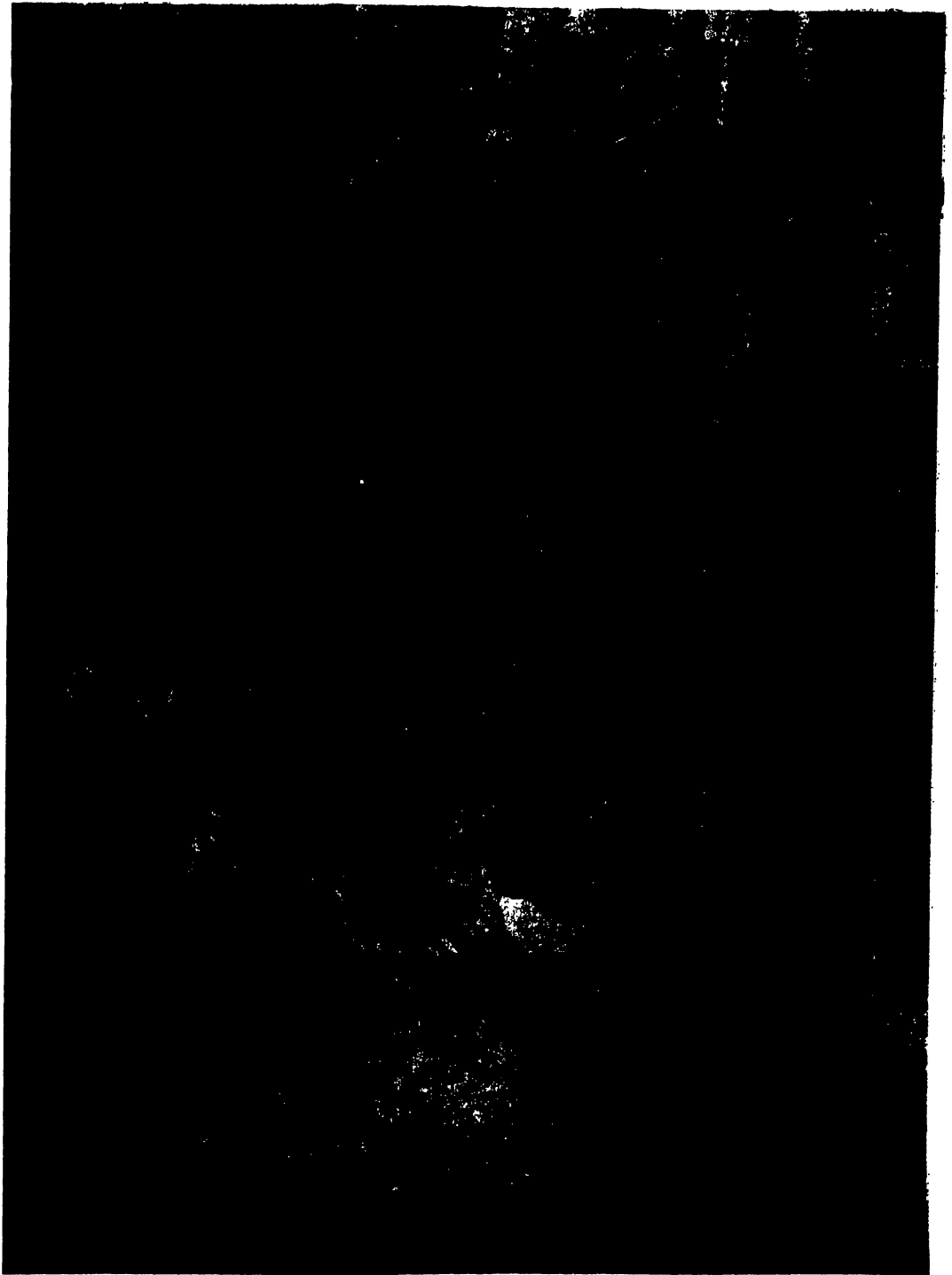
প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

জয়দেবের মেলা— কেন্দুলী

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

(প্রবাসী ১৩৩০, ভাদ্র হইতে পুনর্মুদ্রিত)

বাউল (বামে)
শ্রীরথিন মৈত্র

দেরাদুনের পথে (উপরে)
শ্রীগোপাল ঘোষ

কর্ম্মে রত (দক্ষিণে)
শ্রী পি. সি. সাগর

দেন তাঁদের এ সব কীর্ত্তিকলাপ দেখতে দেখতে মনে হল রাই হতে পারলে কলঙ্কও গহনা হয়ে যায়।

তার ওপর শাস্ত্রীদের তাড়া। যেন জগন্নাথের মন্দিরে ভিড়-ঠেলা পুলিস। বলে, "দাঁড়াবে না; কেবল সরো আর সরো। দাঁড়াবে না।"

কোহিনুরের তিন অবস্থা দেখাব মুকুলকে। হল না। চললাম। তার পরে অন্যান্য কোঠায় সেকেলে সব আসবাব, সাজা-দেবার যন্ত্রপাতি, পোশাক ইত্যাদি রাখা। ঘরগুলো বেজায় ছোট ছোট। দিল্লী আগ্রার ঘরের ধারে-কাছেও যায় না। কত দরিদ্র রাজত্ব ছিল সেকালের ইংরেজদের। সে তুলনায় বর্ত্তমান ইংরেজের স্ফীতি দেখলে চমকাতে হয়! সবই ত বাণিজ্য, কলোনী আর হুকুমৎ প্রসাদাৎ!

ক্রমশঃ

—: * :—

কৃষি-পরিকল্পনায় পাখীর স্থান

শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায়

তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষি উন্নয়নকে দ্বিতীয় স্থান দেওয়া হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ একদিন গর্ব্ব করিয়া আমাদের এই ভুবনমনমোহিনী দেশকে বলিয়াছিলেন—"দেশ দেশ বিতরিছ অন্ন"। আজ আমরা দেশে দেশে অন্ন ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছি। দেশে অন্নের উৎপাদন কমিয়াছে, না কালোবাজারী অসুর-প্রকৃতির জন্য পরিবেশনে মরিচা ধরিয়াছে, ইহা তর্কমূলক।

গত যুদ্ধের সময় রাজনৈতিক প্যাঁচ কষিয়া খাদ্যের অভাব ঘটাইবার পর ইংরেজ শাসক, লেখক ও অর্থনীতি-বিদ ধুয়া তুলিলেন যে, ভারতের জনসংখ্যার বৃদ্ধির হারের সঙ্গে ধরিত্রীর উর্ব্বরতা তাল রাখিতে পারিতেছে না, সুতরাং জন্মনিয়ন্ত্রণ করা দরকার। ইংরেজের পদলেহী ভারতীয় আমলাতন্ত্র কংগ্রেসী কর্ত্তাদের সেই মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। ১৯৫৯ সনে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী কর্মরকর বলিলেন—"লোকবৃদ্ধির সমস্যাটাই আমাদের জরুরী সমস্যা।"

শ্রীযুক্ত হলডেন ইহার উত্তরে বলিলেন—"জীবতত্ত্ববিদ হিসাবে আমি এ মত সমর্থন করি না। এ দেশের জরুরী সমস্যা হইল খাদ্যসমস্যা। এবং পাঁচ বৎসরে এ সমস্যার সমাধান করা যায়; যদি বৈজ্ঞানিক নীতি নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসৃত হয়।" খাদ্য উৎপাদন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "খাদ্যোৎপাদন প্রসঙ্গে কীট পতঙ্গ ও অন্যান্য প্রাণীর জীবন রহস্যের গবেষণা কেতাবী বিদ্যার বিষয় নহে, ঐ বিদ্যার বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ অত্যন্ত জরুরী।...পশ্চিম দিক হইতে পঙ্গপালের আবির্ভাব ভারতের অর্থনীতিতে যে বিপর্য্যয় সৃষ্টি করিবে, দলে দলে মানুষ বাস্তুহারার আগমনে তাহা সম্ভব নহে।"

শ্রীযুক্ত হলডেন সেই জন্য animal demography বা প্রাণীসুমার বিষয়ে গবেষণাকে কৃষি-পরিকল্পনার ক্ষেত্রে প্রথম ও প্রধান স্থান দিতে পরামর্শ দিয়াছেন। এদেশের মন্ত্রীরা করদাতার পয়সায় দেশবিদেশে ছুটাছুটি, নাচানাচি, মাল্য গ্রহণ করিয়া বেড়ান। সেক্রেটারী আমলাদের শিখান-বুলি তোতাপাখীর মতো বলিয়া বেড়ান। স্বয়ং বিষয় মধ্যে প্রবেশের জন্য যে অভিনিবেশ, অধ্যয়ন ও চিন্তার দরকার—তাহার তপস্যা করেন না। ভারতের রাষ্ট্র তাই কেরাণীর নোটের উপর চলিতেছে। হলডেনের উপদেশ মাঠে মারা গিয়াছে। নহিলে পাতিল সাহেব আমাদের এই দুর্দ্দিনে গম ও চালের জন্য আমাদের এক শত কোটি মুদ্রা আমরিকার কাছে বন্ধক দিয়া ফেলিতেন না! সাধারণ নাগরিক হিসাবে আমরা বুঝি যে, এই এক শত কোটি টাকার একটা বিরাট অঙ্ক আমলারা ও ঠিকাদাররা আত্মসাৎ করিবে এবং ভারতীয় নাগরিকের উদরে বিশ কোটি মূল্যের খাদ্য যদি পৌঁছিতে পায়, তাহা ভাগ্য বলিয়া গণনা করিতে হইবে।

রাসায়নিক সার উৎপাদনে ভারত গভর্ণমেণ্ট কাছা আঁটিয়া লাগিয়াছেন। সিন্দ্রীর বিশাল ও বিরাট যন্ত্রপাতির জন্য কোটি কোটি টাকা বিদেশকে খয়রাত করিতেছেন। যদি কৃষক সেই সার ব্যবহারের জন্য তার চাহিদা অনুযায়ী পায়, ভালকথা। উৎপাদন বৃদ্ধি কাম্য। কিন্তু ক্ষেত্রে উদ্ভিদের উন্মেষ হইবার পর, ফসল ফলিবার আগে ও

পরে কীটাদির দ্বারা যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তাহা ত সিন্ধ্রীর কারখানায় বা অনুরূপ যন্ত্রগৃহে গৌরীসেনের টাকা অপব্যয় করিয়াও ঠেকান যাইবে না। এবার (১৯৬০) ভারতে যে ভাবে পঙ্গপালের অভিযান আসিয়াছে সেরূপ আর দুই-একবার আসিলে সিন্ধ্রীর মন্দির ঠুঁটো জগন্নাথের আস্তানা হইয়া দাঁড়াইবে।

হলডেন বলিয়াছেন—"পাঁচ বৎসরে খাদ্য সমস্যার সমাধান হইবে।" ধীবর, পাতিল, গোবিন্দবল্লভ, প্রফুল্ল সেনদের একথার যাথার্থ্য পরীক্ষা করার সময় বা উদ্বেগ কই। থাকিলে—কৃষি-পরিকল্পনায় কীটতত্ত্ববিদ ও পক্ষিতত্ত্ববিদের আহ্বান করা হইত।

কৃষি-পরিকল্পনায়, খাদ্য সংরক্ষণের সমস্যাটার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে। এবং তজ্জন্য কৃষির সহায়ক ও অপকারক বিভিন্ন কীট-পতঙ্গ পাখী ও অন্যান্য প্রাণীর জন্ম, বৃদ্ধি ও সংহারের রহস্য বিশেষ ভাবে আলোচনা করিতে হইবে। ভারত গবর্ণমেণ্ট এ কার্য্যে এ পর্য্যন্ত কোনোও সিরিয়াস প্রচেষ্টা করিতেছেন বলিয়া শুনি নাই।

কেন এ চেষ্টা করা উচিত, এই প্রবন্ধে তাহার সম্বন্ধে ইঙ্গিতমাত্র করিব এবং পক্ষিতত্ত্বের রসিক হিসাবে ফসলরক্ষা কার্য্যে পক্ষিজীবনের আলোচনা কেন প্রয়োজন তাহার উল্লেখ করিব।

আমেরিকা, ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়া খাদ্য পরিরক্ষণের উদ্দেশ্যে animal demography গভীর অভিনিবেশের সহিত আলোচনা করিতেছে। পৃথিবীতে কীটপতঙ্গের সংখ্যা প্রায় গণনার বাহিরে, ইহাদের বৃদ্ধির হার শুনিলে হতভম্ব হইতে হয়। ইহাদের ঔদরিকতা প্রায় অবিশ্বাসনীয়। ইংরেজ গবেষকদের অনুকম্পায় আমরা জানিতে পারি যে, ভারতভূখণ্ডে প্রায় ত্রিশ হাজার বিভিন্ন প্রকারের কীটপতঙ্গাদি আছে। প্রাণী ও উদ্ভিদ উভয় ইহাদের খাদ্য। কলোরেডো বীটল্‌স নামক এক প্রকার কীট আছে, যাহাকে পোটেটো বাগস বলে —কেননা এরা বেশীর ভাগ আলুর ভক্ত। ইহাদের ২০,০০০ স্পিসিস বা জাতি পাওয়া যায়। ভারতবর্ষেও যথেষ্ট আছে। এক প্রজনন ঋতুতে ইহাদের এক জোড়া কীট ৬০ কোটি উত্তরাধিকারী সৃষ্টি করে। মার্কিন রাইলী সাহেব গবেষণায় প্রমাণ পাইয়াছেন যে, তৃণ, ভুট্টা, যব প্রভৃতি ধ্বংসকারী Hop Aphis কীট এক বৎসরে তের পুরুষ বৃদ্ধি পায়। দ্বাদশ পুরুষে এক জোড়া এফিস হইতে ৬০ কোটি উৎপন্ন হয়। ইহাই পুরাণের রক্তবীজ। পঙ্গপালরা ছোট ছোট খাপের মধ্যে ডিম্ব উৎপন্ন করে। এক একটি খাপে (capsule) এক শত ডিম্ব থাকে। ইহারা যেখানে যায় সেখানে এই ক্যাপস্থলগুলি মাটিতে পুঁতিয়া রাখিয়া দেয়। দক্ষিণ আফ্রিকার একটি ৩,৩০০ একরের খামারে একবার পঙ্গপালের প্রাদুর্ভাব হয়। ভূমিকর্ষণের ফলে ১৪ টন ক্যাপস্থল বাহির হয়। বিনষ্ট না হইলে ১২৫ কোটি পঙ্গপাল জন্মলাভ করিত। এই ভয়াবহ সংখ্যাবৃদ্ধি হইতেই অনুমান করা যায় যে, ইহারা কি পরিমাণ খাদ্য ধ্বংস করিতে সক্ষম। যাঁহারা রেশমের জন্য গুটিপোকার চাষ করেন তাঁহারা জানেন যে, রেশমের শুঁয়া প্রত্যেকে দিনে নিজ দেহের দ্বিগুণ ওজনের পাতা আহার করে। পঙ্গপাল ত কয়েক ঘণ্টায় এক বিরাট প্রান্তরকে বৃক্ষাদিশূন্য করিয়া মরুভূমিতে পরিণত করিতে পারে।

আমাদের আমলাচালিত মন্ত্রীরা হয় ত বলিবেন—"এর জন্য ব্যস্ত হইবার কি আছে? ডি-ডি-টি ত আছে! দেশেও অনেক কীটঘ্ন [insecticide] প্রস্তুত হইতেছে। বিদেশ হইতেও আসিতেছে।"

কীটঘ্ন রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার সম্বন্ধে পিটার ফার্ব নামক এক মার্কিন লিখিয়াছেন—"কীটাদির জন্মহারের বৃদ্ধি দেখিলে মনে হয় যে, সর্ব্বদা ইহাদের প্রতি নজর রাখিয়া ইহাদের বিনষ্ট করিবার চেষ্টা না করিলে, অনতি-কালের মধ্যেই ধরিত্রীর পৃষ্ঠ হইতে উদ্ভিদ জীবন শেষ হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

"রাসায়নিক কীটঘ্ন দ্রব্যের দ্বারা ইহাদিগকে নিঃশেষ করা যাইবে না। ইহা শুভ হইলেও ক্ষেত্র বিশেষে অশুভ হইয়া পড়ে। কোনও কোনও কীটের ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে ডি-ডি-টি ব্যবহারের পর ইহাদের মধ্যে এমন বংশের উদ্ভব হইল যাহাদের আর মারিয়া ফেলা যায় না। অনেক বাড়ীতে দেখা গিয়াছে যে, দশ বৎসর পূর্ব্বে যে শক্তির ডি-ডি-টি দ্বারা মাছি মরিয়াছে এখন তদপেক্ষা হাজার গুণ তীব্র ডি-ডি-টি না হইলে মাছি মরে না।

"আবার ইহাও দেখা গিয়াছে, পূর্ব্বে যে সব কীটের সংখ্যা তাহাদের প্রাকৃতিক শত্রুর জন্য সীমাবদ্ধ ছিল, ডি-ডি-টি ব্যবহারের পর তাহাদের বংশবৃদ্ধি হইতেছে।

"রাসায়নিক দ্রব্যের মারণশক্তি ইহারা যেমন যেমন অতিক্রম করিবার ক্ষমতা লাভ করিতেছে, বৈজ্ঞানিকরা আরও তীব্র রাসায়নিক দ্রব্য আবিষ্কার করিয়া দেখিতেছেন যে, সেগুলি মানুষের জীবননাশক। রাসায়নিক উপায়ে সংরক্ষিত খাদ্য যাহাতে ব্যবহারকারির ক্ষতি না করে তার জন্য শ্যেনদৃষ্টি রাখিতে হয়।

"কিন্তু কীটঘ্ন প্রাণী হইতে খাদ্যদ্রব্য বিষাক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই এবং তাদের হাত হইতে নিস্তার পাইবার

জন্য কোনও কৌশল বা জৈবিক শক্তিও এরা লাভ করিতে পারে না।

"ফলশস্যাদির পোকা লাগা বন্ধ করিবার জন্য এখন জৈবিক প্রক্রিয়া প্রয়োগের জন্য (biological control) গবেষণা চলিতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইংলণ্ডে টোমাটোর শত্রু "হোয়াইট ফ্লাই" মারিবার জন্য এক ভীমরুল আকৃতির পরভৃত কীট গবেষণাগারে উৎপাদন করা হইতেছে। ইহারা টোমাটো বিনষ্টকারী কীটের দেহে সংশ্লিষ্ট হইয়া তাহাদের রস চুষিয়া নিঃশেষ করে। কীটতত্ত্ববিদরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এমন কীটের বংশবৃদ্ধি করাইতেছেন যাহারা প্রায় ত্রিশ প্রকার শস্য ও ফলের শত্রুকীট ঐ ভাবে বিনষ্ট করিতে পারে।"

কীটঘ্ন প্রাণীদের মধ্যে প্রধানতম স্থান পাখীর। শুধু আমাদের চিত্তবিনোদনের জন্য ইহাদের অস্তিত্বের মূল্য তাহা নহে। আমাদের কৃষিজাত প্রধান খাদ্যগুলির সংরক্ষণে ইহাদের দান বা অবদান অমূল্য। পঙ্গপালের কথাই ধরা যাক। এমন অনেক পাখী আছে যাহারা পঙ্গপাল ধ্বংস করিতে পারদর্শী। সাদা মাণিকজোড় (white stork) বিখ্যাত পঙ্গপালবিনাশী। ইহারা মৃত্তিকানিহিত ডিম্বের কোষগুলি মাটি আঁচড়াইয়া বাহির করিয়া গলাধঃকরণ করে। পঙ্গপালের প্রজননভূমি মধ্য-এশিয়ায় ভগবানের ব্যবস্থায় Rosy Pastorএরও প্রজনন ভূমি। পঙ্গপালের ডিমই এই পাখীর শাবকের প্রধান খাদ্য। পশ্চিমাঞ্চলে এদের পাউই বলে। একবার এলাহাবাদের টেগোর টাউনে পঙ্গপালের আবির্ভাব হয়। কাক, পাউই ও শালিকদের সেদিন উৎসাহ দেখিয়াছিলাম। শালিকও যে পঙ্গপাল খায় সেদিন দেখিলাম।

পক্ষিশাবকের ক্ষুধা রাক্ষসের মত। ২৪ ঘণ্টায় একটা পক্ষিশাবক নিজদেহের ওজনের বেশী খাদ্য খায়। শালিক গোত্রের পাখী দিনে ৩৭০ বার নীড়ে খাদ্য বহন করে—শুঁয়া, ফড়িং, পঙ্গপাল। ইংরেজ কীটতত্ত্ববিদ Collinge লক্ষ্য করিয়াছেন যে, চড়ুই পাখী দিনে ২২০-২৬০ বার নীড়ে খাদ্য বহন করে। এক জার্মান পক্ষিতত্ত্ববিদ পরীক্ষা করিয়াছেন যে এক জোড়া টিট্ (Tit) পাখী ও তার শাবকগণ বৎসরে দশ লক্ষ কীটের ডিম বা দেড় লক্ষ শুঁয়ো ও অন্য পুকী (Pupae) ধ্বংস করে।

পোকামাকড়েরও প্রজননঋতু আছে এবং প্রকৃতি পাখী দ্বারা ইহাদের বিনাশের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে। ভারতীয় পক্ষিতত্ত্ববিদ আলী সাহেব বলেন—"যেখানেই পাখীরা জীবনধারণে বাধা প্রাপ্ত হয় না, সেখানেই তারা অনিষ্টকারী কীটদের সংখ্যাধিক্য নিবারণ করে।"

প্রথম ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পর বিধ্বস্ত বেলজিয়মের পুনর্গঠনের জন্য যখন মিত্রশক্তি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, তখন British Ornithological Union নামক সমিতির নিকট হইতে একজন পক্ষী সম্বন্ধে পরামর্শদাতা কৃষি-কমিশনে আহ্বান করেন। যুদ্ধের সময় গাছপালা ও কৃষিক্ষেত্র বিনষ্ট হইয়া থাকে। শুধু কর্ষণ যন্ত্রাদি, রাসায়নিক সার প্রভৃতি দ্বারা দ্রুত দেশের উদ্ভিদ সম্পত্তির পুনরুত্থান হয় না। পাখীর সহায়তাও প্রয়োজন। উক্ত যুদ্ধের পর ইরাকের উন্নয়নের জন্য পক্ষিতত্ত্ববিদ সামরিক অফিসারদের সাহায্য লওয়া হইয়াছিল।

শুধু কীটপতঙ্গ নয় কতকগুলি প্রাণীও আমাদের ক্ষেত্রজাত ও গোলাজাত খাদ্য বিনষ্ট করে। যেমন ইঁদুর ও ছুঁচো। এরা শুধু রোগ জীবাণুর বাহক নহে। কৃষিজাত বস্তুর পরম অনিষ্টকারক। পাকিস্তানের সিন্ধুপ্রদেশে ইহাদের উৎপাত সম্বন্ধে ইংরেজ আমলে গবেষণা হইয়াছিল। এ প্রদেশে ধান্যই প্রধান শস্য। দেখা যায় উৎপন্ন শস্যের শতকরা দশভাগ হইতে (স্থান বিশেষে) পঞ্চাশ ভাগ ইহাদের দ্বারা ধ্বংস হয়। নেংটি ইঁদুরের অনিষ্টকারিতা তথৈবচ।

কিরূপ হারে ইহাদের বংশবৃদ্ধি হয়, শুনিলে বিশ্বাস করা কঠিন। এক জোড়া বড় ইঁদুর বৎসরে ছয়বার বাচ্চা দেয়। এক প্রসবে প্রায়ই আটটি শাবক হয়। সাড়ে তিন মাস বয়সেই এই শাবক প্রজননক্ষম হয়। সুতরাং এক জোড়া ইঁদুর হইতে বৎসরে ৮৮০টি ইঁদুর সৃষ্টি হইতে পারে। পাঁচ বৎসরে এক জোড়া হইতে বহু কোটি বংশধর উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু হইলে পৃথিবীতে মানুষ লুপ্ত হইত। কিন্তু প্রাকৃতিক বিধানে ইহাদের বংশবৃদ্ধি নিয়মিত হয়। দেখা যাইতেছে যে, এক জোড়া ইঁদুরের বিনাশে, বৎসরে ৮৮০টি ইঁদুরের জন্মনিয়ন্ত্রিত হইতেছে। আমাদের পেঁচা ও বাজ ইঁদুর ছুঁচোর বংশ ধ্বংস করে। পেচক ত প্রায় স্রেফ ইঁদুর খাইয়াই জীবন ধারণ করে। পাখীর হজমশক্তি বেশী। শীঘ্র শীঘ্র ইহাদের খাদ্য পচিত হয়। তবু যখনই হুতোমপেঁচার পেট চিরিয়া দেখা গিয়াছে তাহাতে ২।৩টা ইঁদুর প্রত্যেক বারই পাওয়া গিয়াছে।

ইংরেজরা আমাদের দেশের যতই অপকার করিয়া থাকুক, অনেক কাজের কাজ করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। তার মধ্যে পাখীর পেট চিরিয়া কোন্ পাখা কৃষির অনিষ্টকারী বা ইষ্টকারী কোন্ কোন্ কীট উদরসাৎ করে তাহার ফিরিস্তি রচনা করে। স্বাধীন ভারতে কৃষির উন্নয়নের জন্য চিৎকার শোনা যায়, কিন্তু এই অত্যাবশ্যক

গবেষণার ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া শোনা যায় নাই। Mason ও Lefroy লিখিত Food of Indian Birds প্রত্যেক কৃষিকলেজে পাঠ্য হওয়া উচিত। বইখানি পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বে ব্রিটিশ শাসকের অধীন ভারতীয় কৃষি বিভাগ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। এই বই তৎপরে আর মুদ্রিত হয় নাই বা পাওয়াও যায় না। আমি একাধিক কৃষিকলেজ লাইব্রেরীতে খোঁজ করিয়া বইখানি জোগাড় করিতে পারি নাই।

এ সম্বন্ধে ভারতীয় কৃষিবিভাগে যে নূতন করিয়া কোনও গবেষণা ও পরীক্ষা হইতেছে তাহার কোনও লক্ষণ দেখিতেছি না। কে. এম. মুন্সীর কবি-মস্তিষ্কে একদিন বনমহোৎসবের খেয়াল চাপে। তাঁর প্রচেষ্টায় প্রত্যেক রাজ্য ও কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট আজ পর্য্যন্ত বহু কোটি টাকা অপব্যয় করিয়াছেন। রাজ্যপালরা ঘটা করিয়া বর্ষাকালে তাঁহাদের প্রাসাদ-উদ্যানে চারা রোপণ করেন। পদলেহী কলা-সমিতির কন্যারা নৃত্য করে, অফিসারমণ্ডল ঢাক-ঢোল বাজায় ও সংবাদপত্র ছবি ছাপাইয়া তৃপ্ত হয়। আজ দ্বাদশ বৎসর ভারতে পরিভ্রমণ করিতেছি। ছায়াহীন রাস্তাগুলি তদবস্থায় আছে— ঊষর জমি পাদপহীন পড়িয়া আছে। টাকা ঠিকাদার ও অফিসারদের মধ্যে বাঁটোয়ারা হইতেছে। তাই আমলা-তন্ত্র বনমহোৎসবে খুব উৎসাহশীল।

কৃষিপরিকল্পনায় কত টাকা ব্যয়িত হইবে তাহার হিসাব জনসাধারণকে শুনাইয়া ঢাক লাগান হইয়াছে। কিন্তু যে ধরনের মন্ত্রীরা গাদতে বিরাজ করিতেছেন, তাঁরা আমলাতন্ত্রের ও ঠিকাদারদের ক্রীড়নক মাত্র। টাকা খরচ হইলে সে টাকায় মোদ্দা কিরূপ ফল লাভ হইল তাহার যতদিন পরিমাপ হইবে না, ততদিন টাকা ব্যয় হইবে, কাজ হইবে না। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ব্যয় ও নিয়োজিত অর্থের ব্যয়ের প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখা হয়। ব্যবসায়িক বুদ্ধি ও শিক্ষাযুক্ত মন্ত্রী না হইলে আমলাতন্ত্র টাকার ছিনিমিনি খেলিতে থাকিবে। প্রত্যেক রাজ্যে ও কেন্দ্রে একাউণ্টাণ্ট জেনারেলদের রিপোর্ট পড়িলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। কিন্তু মন্ত্রীরা আমলাদেরই পিঠ চাপড়াইয়া চলিয়াছেন।

সেই জন্যই কৃষি-পরিকল্পনায় পক্ষিজীবন সম্বন্ধে অত্যাবশ্যক গবেষণার কথা আজ পর্য্যন্ত শ্রুতিগোচর হয় নাই।

আমি ত দেখিয়াছি, বিদেশী ডিগ্রীওয়ালা পণ্ডিতবাবুরা ডিরেক্টর অফ এগ্রিকালচার পদ অধিকার করিয়া কর-দাতার পয়সায় মোটা মাহিনা, বড় বড় বাড়ী, বড় বড় গাড়ী, চাকর, পিয়ন লইয়া নবাবী জীবন যাপন করিতেছেন। কিন্তু কৃষি উন্নয়নে কৃষককে, ফলের বা ফুলের বাগানের জন্য গৃহস্থকে কোনও সাহায্য করিতে দেখি নাই। তাঁহারা "সাহেব" হইয়া এক-একটা স্ফীতনিতম্ব হবুচন্দ্র রূপে আত্মম্ভরিতায় জেলায় জেলায় শোভমান।

কৃষির উন্নয়নের জন্য পাখীর জীবনের আলোচনা ও পরীক্ষা এবং কতক পাখীর প্রশ্রয় ও কতক অনিষ্টকর পাখীর সংহার প্রয়োজন।

একথা দাবী করা হইতেছে না যে, পাখীমাত্রই আমাদের কৃষির পক্ষে ইষ্টকর। "টিয়া" পাখীকে ত মহাকবি কালিদাস মহাশয় মানুষের একটা "ঈতি" (অমঙ্গল) বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। শস্য নষ্ট করিতে বন্য হাঁস, টিয়া সুপটু। হাঁসের মাংস খাইয়া ও টিয়াকে খাঁচায় পুরিয়া আমরা ইহার জন্মনিয়ন্ত্রণ করি। কতকগুলি পাখী বাগানের কলা, আম, পেয়ারা দিয়া পেট পূরায়। চড়াই অনেক ইষ্টকর কীট উদরসাৎ করে, এবং শস্য, তরকারী ও ফুলের বাগানে ডাকাতি করে। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে চীনরাষ্ট্র ইহাদের পাইকারী সংহারের ব্যবস্থা করিয়াছিল। কাক, মাছরাঙা, চিল, বাজ, মেছোবাজ বাঙালীর প্রিয় খাদ্য মৎস্যবিনাশী। ইহাদের নিয়ন্ত্রণও কৃষি-পরিকল্পনার বিষয়ীভূত হওয়া উচিত।

তবু, আলী সাহেবের ভাষায় বলিতে হয়—

"Considering everything there can be no doubt that the good they do far out weighs the harm—which must be looked upon as no more than the labourer's hire."

ইহা নিঃসন্দেহ যে, পাখী আমাদের অমঙ্গল যটুকুত করে তার বহুগুণ মঙ্গল সাধন করে। ক্ষতি যাহা করে ধরিয়া লউন সেটা তাহাদের মজুরী।

—•—

সবার উপরে

শ্রীসীতা দেবী

২১

আজ তাদের যাত্রা শেষ। সকালে উঠে ভিড় জমবার আগে সুমনা স্নান সেরে এল। কি পরে নামতে হবে, সব বিজয়ের নির্দ্দেশ অনুসারে বার করে গুছিয়ে রাখল। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হ'ল, তবে সুমনা কিছুই প্রায় খেতে পারল না।

বিজয়কে বলল, "কখন আমরা পৌঁছব তা বন্ধু-গুলোকে জানালে কেন? বেশ নিজেরা নিজেরা যেতাম?"

বিজয় বলল, "কি আর হয়েছে, কতক্ষণই বা থাকবে তারা? অমন সুন্দরী বৌ নিয়ে যাচ্ছি, লোকের কাছে একটু দেখাতে সখ হয় না?"

সুমনা বলল, "ঠিক ছোটবেলা আমি যেমন ডলি পুতুল নিয়ে করতাম! বাবা হয়ত মার্কেটে নিয়ে গিয়ে কিনে দিলেন, তার পর যতক্ষণ না বাড়ী এসে ভাইবোনদের দেখাতে পারলাম, ততক্ষণ আর আমার শান্তি রইল না। তাদের একটু ঈর্ষা জাগাতে না পারলে আমার খেল্‌না পাওয়ার সুখটা যেন পুরোপুরি হ'ত না।"

বিজয় হাসতে লাগল। বলল, "সাদৃশ্য খানিকটা আছে বটে। ডলি পুতুলের চেয়ে আমার জিনিসটার দাম অবশ্য বেশী, এবং দেখাবার আগ্রহটাও বেশী। ঈর্ষা তাদের হয়েছে কিনা জানা যাবে না চট্ করে। তবে পুরুষের জাত, বেরিয়ে পড়বে কথাটা দু'চার দিনের মধ্যে।"

সুমনা বলল, "এঁদের মধ্যে বাঙালী কেউ আছেন নাকি?"

বিজয় বলল, "ঐ যিনি আমার সঙ্গে এক বাড়ীতে থাকতেন আগে, তিনি আছেন। অন্যরা সব গুজরাটী, পার্শী, ইত্যাদি।"

শেষ পর্য্যন্ত ট্রেন এসে দাঁড়াল 'ভিক্টোরিয়া টারমিনাসে'। সুমনা বিজয়ের নির্দ্দেশমত সেজেগুজে তৈরি হয়ে নিল। সেই সোনালী শাড়ী, সেই গহনা। বিজয় বলল, "চন্দন পরিয়ে দেওয়ার লোক নেই ত, ওটায় সেদিন তোমাকে বড় মানিয়েছিল।"

সুমনা বলল, "অমন স্যুট-পরা বরের সঙ্গে অত খাঁটি বাঙালী কনে' মানায় না। এই ভাল।"

প্ল্যাটফর্ম্মে একটি ছোট দল প্রচুর ফুলের তোড়া নিয়ে দণ্ডায়মান। বিজয় বলল, "এই ত শ্রীমান্‌রা এসে গেছেন, দলে নিতান্ত কম ভারি নয়।"

ট্রেন থেকে নামবামাত্র সবাই এগিয়ে এসে তাদের ঘিরে দাঁড়াল। খানিকক্ষণ খালি নমস্কার, হাণ্ডশেক্ এবং ফুলের তোড়া গ্রহণ করার চোটে সুমনার প্রায় হাঁফ ধরে গেল। বিজয়ের চাকর এসেছিল, সে ফুলের বোঝা সুমনার হাত থেকে নিয়ে নিল। সামান্য জিনিস যা ছিল ট্রেনের কামরায়, তাও নামিয়ে রাখল। অতঃপর steward-এর ঘর থেকে জিনিস সংগ্রহ করা ও ট্যাক্সি ডাকার পর্ব্ব।

বিজয়ের বাঙালী বন্ধু অনিমেষ এসে বলল, "বৌদি, আমার কথা আপনি শুনে থাকবেন। ছিলাম এককালে বিজয়ের সঙ্গেই। তা বন্ধুবর বাড়ীতে লক্ষ্মীপ্রতিষ্ঠা করবার আগে বাড়ী ঝাঁট দিয়ে সব জঞ্জাল বিদায় করে দিয়েছেন।"

বিজয় বলল, "জঞ্জাল যে আগেই নিজে পলায়ন করলেন, সে দোষ ত আমার নয়? নিজেও ত আর তিনি লক্ষ্মীহীন হয়ে নেই।"

অন্য বন্ধুরা অতঃপর ফিরে চলল। একটি ছেলে 'Lucky Dog' বলে বিজয়ের পিঠে একটা চড় মেরে গেল।

বাড়ী এসে যখন পৌঁছল তখন আর তাদের সঙ্গে কেউ নেই। বাড়ীটা ঠিক তেমনি আছে ত? অবশ্য তিন-চার বছরে কিই বা বদ্‌লাবে? জিনিসপত্র তোলা হতে লাগল, সুমনা বারান্দায় চেয়ারে বসে বসে দেখতে লাগল।

চাকর এসে জানাল যে, সাহেব কিছু হুকুম না দেওয়া সত্ত্বেও সে কিছু খাবার করে রেখেছে, তাঁরা যদিই কিছু খেতে চান। সুমনার শরীরটা ক'দিনের অনিয়মে বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সে নামেমাত্র কিছু খেয়ে কাপড়-চোপড় সব বদ্‌লে ফেলে শোবার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। বিজয় নানা কাজে ঘুরতে লাগল, লোকজনও কিছু তার সঙ্গে দেখা করতে এল। অনেক বেলায় সেও এসে বিশ্রাম করার জন্যে শুয়ে পড়ল।

সুমনা তখন ঘুমুচ্ছে। বিজয় একবার হাতটা বাড়াল তার দিকে, তার পর তার পরিশ্রান্ত মুখ দেখে হাত সরিয়ে নিল। ঘুমোক বেচারী! তিন রাত ত জেগে আছে। শুয়ে শুয়ে নিদ্রিতা পত্নীর মুখ দেখতে লাগল।

কোথা থেকে এই ফুলের পাপড়ির মতো মানুষটা তার জীবনের মধ্যে এসে পড়ল? তাদের জানাশোনা হবার কোনো কথাই ছিল না। নিতান্তই হরিবাবুর উপকার করবার জন্য সে সুমনাকে পড়াতে গিয়েছিল।

তার পর কি করে তারা নিজেদের জীবনদুটোকে এমন মায়াফাঁসে বেঁধে ফেলল? এখন ত আর আলাদা জীবনের কথা ভাবতেই পারা যায় না। ট্রেনে সেদিন সুমনা জানতে চেয়েছিল, মৃত্যুর পরেই সব শেষ হয়ে যায় কি না। মৃত্যুর স্বরূপ ত ভাল করে জানা নেই, কিন্তু কিছু যদি মানুষের অবশিষ্ট থাকে, তাহলে এই ভালবাসাও থেকে যায়। এর বাস ত জীবনের অন্তরতম স্থানে, সে ত মৃত্যুর সঙ্গে শেষ হবার নয়।

বাইরে কার যেন কণ্ঠস্বর শোনা গেল। বেয়ারা কাকে যেন বোঝাতে চেষ্টা করছে যে, সাহেব এবং মেমসাহেব উভয়েই নিদ্রামগ্ন, তাদের সঙ্গে এখন দেখা হতে পারে না। বিজয় উঠে বেরিয়ে এল দেখতে যে কে এসেছে।

অনিমেষ সস্ত্রীক উপস্থিত। তাদের অভ্যর্থনা করে বসিয়ে সে বলল, "বসুন, আমি সুমনাকে ডেকে আনছি।"

বন্ধুপত্নী খুব রহস্যময় হাসি হেসে বললেন, "বড় অসময়ে এসে পড়েছি, না?"

বিজয় বলল, "আপনি যখন আসবেন তখনই সুসময়।"

ভদ্রমহিলা বললেন, "উনি গিয়ে এমনই বর্ণনা দিলেন আপনার বৌ-এর যে, আমি আর আজই না এসে থাকতে পারলাম না। এখানে পার্শী, গুজরাটী, মারাঠী সুন্দরীই খালি দেখি, বাঙালী সুন্দরী একটাও দেখি না। যা আছে তা আমার মতোই।"

বিজয় হেসে ভিতরে চলে গেল, লক্ষ্য করে গেল যে, বন্ধুপত্নী খুব সাজসজ্জা করে এসেছেন।

সুমনার গাল ধরে একটু নাড়া দিয়ে বিজয় বলল, "এমন সুন্দর ঘুমটা ভাঙিয়ে দিতে হ'ল, বন্ধু আর বন্ধুপত্নী এসে উপস্থিত হয়েছেন।"

সুমনা বলল, "যেমন আছি এমনিই যাই?" বলতে বলতে উঠে বসল।

বিজয় বলল, "একটু সাজলে হ'ত ভাল। ভদ্রমহিলা নিজে প্রাণপণে সেজে এসেছেন। কিন্তু তাতে অনেক দেবী হয়ে যাবে। এমনিই চল। তোমার সত্যি সাজের দরকার হয় না।"

"আঃ, কি যে বল, সাজের আবার কার না দরকার হয়?" বলে সুমনা বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে বসবার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হ'ল।

অনিমেষের স্ত্রী কিরণবালা একবার ভাল করে খুঁটিয়ে দেখে নিলেন সুমনাকে। একেবারেই সাজে নি, কিন্তু কি আশ্চর্য্য সুন্দর! কিন্তু সাজগোজ করেই নি বা কেন? শোনা ত গিয়েছে যে বেশ বড়লোকের মেয়ে। আর স্বয়ং বিজয়বাবুরও ত পয়সা-কড়ির কিছুমাত্র অভাব নেই।

সুমনার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ও মা! এমন বেশে বেরোলেন কেন আপনি নূতন বৌ? আমারই যে লজ্জা করছে এত সাজগোজ করে এসে।"

সুমনা বলল, "আপনাকে বসিয়ে রেখে সাজতে গেলে ত সেটা খুব ভদ্রতাসঙ্গত হ'ত না!"

অনিমেষ বলল, "আসল কথা কি জানেন? আপনি সেজে এলে উনি গহনা-টহনাগুলো দেখতে পেতেন আর কি? সেইটে হ'ল না।"

সুমনা বলল, "আমি ত রইলামই এখানে। দেখা-সাক্ষাৎ আবার কতবার হবে।" ক্রমাগত গহনার গল্প তার ভাল লাগছিল না।

বিজয় অতিথিদের চা দেবার জন্য চাকরকে বলে এল। তাদের সঙ্গে প্রচুর কলকাতার মিষ্টান্ন এসেছিল, সেগুলোও বের করা হ'ল। কিরণবালা বললেন, "পেটের ক্ষিদেটা অন্ততঃ ভাল করেই মিটল।"

খানিকক্ষণ গল্প-সল্প করে তাঁরা দিন দুই পরে বিজয় ও সুমনাকে খাবার নিমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় হয়ে গেলেন। সুমনা ঘরে ফিরে এসে বলল, "বাবাঃ, কি অদ্ভুত মানুষ!"

বিজয় বলল, "বেশীর ভাগই ত এমনি। খালি ঘরের কোণে বসে থাকে, বাহির জিনিসটা ওদের কাছে একেবারে অচেনা। সে রাজ্যের নিয়ম-কানুন এরা কিছুই জানে না।"

সুমনা বলল, "ছোট বৌদিটা প্রথম যখন এসেছিল, তখন খানিকটা ছিল এই ধরনের। অবশ্য এতটা বাজে নয়। কিন্তু চালাক-চতুর আছে ত? এখন স্মার্ট হয়ে উঠেছে বেশ।"

বিজয় বলল, "বড় বৌদির চেয়ে ছোট বৌদিকেই ত এখন ঢের পালিশ করা লাগে। গীতা দেবী একটু বেশী ভারিক্কি হয়ে গেছেন।"

সুমনা বলল, "তোমার ত ভাল লাগবেই। ছোট বৌদি তোমার নামে মূর্চ্ছা যায় কিনা?"

বিজয় বলল, "তুমিও কি তোমার ছোড়দার দলে ভর্ত্তি হলে নাকি? পত্নীর পক্ষপাতিত্বে তিনিও চটে গিয়েছেন শুনলাম।"

সুমনা বলল, "নিজের জিনিসের উপর অন্য লোকে চোখ দিলে ত মানুষ চটুতেই পারে।"

বিজয় বলল, "আমাকেও কি তুমি সুচিত্রা ঠাকরুণের স্বামীর মতো মনে করছ?"

সুমনা বলল, "আরে যাঃ, এমনি ঠাট্টা করছি। আমি কি তোমাকে চিনি না, না ছোট বৌদিকে চিনি না? ঐ লোকটার সঙ্গে তোমার তুলনা? কেন যে কাকা-কাকীমা অমন বরে চিত্রার বিয়ে দিলেন জানি না।"

বিজয় বলল, "এর চেয়ে কনে'গুলোকে বর পছন্দ করতে দিলে ঢের বেশী ভাল হয় না?"

সুমনা বলল, "হয়ই ত। আর কিছু চিহ্নক বা নাই চিহ্নক, লোকটা তাকে ভালবাসছে কিনা এটা ত বুঝতে পারে?"

বিজয় বলল, "সেটাও কি অত চট্ করে বুঝবার জিনিস? তুমি ত বুঝতেই পার নি অনেকদিন যে মাষ্টার-মশায় মাষ্টারী ছেড়ে দিয়েও কেন ক্রমাগত তোমার চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছেন। একটা কথা বলতে গেলে ত একেবারে মূর্চ্ছা যাবার জোগাড় করতে। এখানে বেড়াতে আসবার আগে জিনিসটা তোমার মাথায়ই ঢোকে নি এ আমি লিখে দিতে পারি।"

সুমনা একবার নিজের অতীত জীবনটার দিকে তাকিয়ে দেখল মনে মনে। বলল, "তুমি লিখে দিলেও কথাটা ঠিক নয়। আমি আগেই জানতাম।"

বিজয় বলল, "কি করে জানবে? কবার বা দেখা হয়েছে তোমার সঙ্গে, আর ক'টা কথাই বা হয়েছে? চিঠি লিখতাম মাঝে মাঝে, তাও ত 'কল্যাণীয়াসু' বলে, একবারও 'প্রিয়তমাসু' বলি নি।"

সুমনা বলল, "আমি যদি না জেনে থাকি তাহলে তুমিও জান নি; আমিও ত অত্যন্ত ভক্তিভরে তোমায় চিঠি লিখতাম। আর কথাবার্ত্তা তুমি যাও বা বলতে, আমি ত খালি শুনেই যেতাম।"

বিজয় বলল, "ঐ বড় বড় চোখদুটোর কথা ভুলে যাচ্ছ কেন? ওর ভিতর দিয়ে যে তোমার মনের ভিতর অবধি দেখা যেত।"

সুমনা বলল, "তোমারই চোখদুটো কম নাকি? চিত্রার বিয়ের দিন যে কিরকম করে তাকিয়েছিলে তা আমার এখনও মনে আছে।"

"তা অমন পরী সেজে দাঁড়িয়ে থাকলে মানুষ না তাকিয়ে আর করে কি বল? আগে ত এমন শাদাসিধে হয়ে থাকতে যে, মনে হ'ত এখুনি স্কুলের গাড়ী চড়ে পড়তে চলে যাবে।"

সুমনা বলল, "স্কুলে যাওয়াটা যখন চিরদিনের মতো চুকে গেল, তখন কিন্তু খারাপ লাগছিল বড়। এম-এটা দিলে পারতাম। তা যদি কিছুতে মন বসাতে পারলাম। এখন আবার মাঝে মাঝে সখ হয় পড়তে।"

বিজয় তার চুলের গোছা ধরে একবার নেড়ে দিয়ে বলল, "আর পড়ে না। এখন ঘর-সংসার করতে হবে।"

সুমনা বলল, "সে ত করবই। কিন্তু তার সঙ্গেও পড়া যায়। কত মেয়ে ত বিয়ের পরে পড়ে?"

বিজয় বলল, "ঘর-সংসার আছে, তা ছাড়া আমি আছি। এর ভিতর আবার পড়ার বইগুলো কোথায় জায়গা পাবে?"

সুমনা বলল, "আচ্ছা বাপু থাক, আর আমার পড়ে দরকার নেই। তবে যখন তুমি অফিসে বসে থাকবে তখন আমি কি করব?"

বিজয় বলল, "আমার ধ্যান।"

"তুমি কি ভগবান্ নাকি, যে তোমার ধ্যান করব?"

বিজয় খাটে বসে পড়ে সুমনাকে নিজের কাছে টেনে আনল। তার মুখটা তুলে ধরে বলল, "এখন সিংহাসন-চ্যুত হয়ে গেছি বুঝি? এককালে মনে হ'ত মানুষ আমিকে তুমি দেখতেই পাও না, আমার দেবতার রূপটাই তোমার মনকে অধিকার করে আছে। এখন মানুষের উৎপাতে দেবতা বুঝি মন্দির ছেড়ে চলে গেছেন?"

সুমনা বলল, "দেবতা কি যান কখনও? যতক্ষণ পূজারিণীর ভক্তি আছে, ততদিন ত নয়।"

"ভক্তি কিছুই কমে নি, সত্যি বলছ?"

সুমনা বলল, "একেবারে খাঁটি সত্যি। কেন, তোমার কি মনে হয়েছে আমার কোনো ব্যবহারে, যে আমার ভক্তি কমে গিয়েছে তোমার উপর? সত্যি বল।"

বিজয় তার মুখটা এতক্ষণ দুই হাতে ধরে ছিল। এবার ছেড়ে দিয়ে বলল, "আমার কোনো কিছুই মনে হয় নি এ বিষয়ে। এ সব ভাববারই আমার কোনো অবকাশ ছিল না। যা পেয়েছি তাই নিয়েই ধন্য ছিলাম, কোন্‌রূপে পাচ্ছি তা নিয়ে মাথা ঘামাই নি।"

সুমনা খানিক চুপ করে থেকে বলল, "চল বেড়িয়ে আসি, ঘরে বসে থাকতে ভাল লাগছে না।"

বিজয় বলল, "এখন আর কতক্ষণই বা বেড়ান যাবে? সন্ধ্যা ত হয়ে এল। আচ্ছা চল, বালির চরেই ঘুরে আসি। যেখানে যেখানে তোমাকে নিয়ে সেবারে

বেড়িয়েছিলাম, সব ক'টা জায়গাই ঘুরে আসতে ইচ্ছা হয়, চল।" বলে উঠে পড়ল।

সুমনা বলল, "দাঁড়াও, চুলটা অন্ততঃ বেঁধে নিই। এখানে ত আর কপালকুণ্ডলা সাজলে চলবে না? এটা নিতান্তই সৌখীন জায়গা। আচ্ছা, ওখানে যে ছবিগুলো তুলেছিলে সেগুলো ত দেখালে না?"

বিজয় বলল, "বড্ড বেশী রোদ ছিল, ভাল ওঠে নি। তোমারটাই ভাল ওঠে নি দেখে আমি আর ওগুলো বেশী print করাই নি। দু'চারটে আছে, আমার কোনও একটা কোটের পকেটে, খুঁজে দেখতে পার।"

বেড়াতে ত বেরোন হ'ল, কিন্তু বেশী ঘুরতে সুমনার ভাল লাগল না। বলল, "ট্রেনের ক্লান্তিটা যায় নি এখনও। এইখানটাতে একটু বসি চল। এই আলোর মালাটা ভারি সুন্দর দেখতে, তবে 'Queens necklace' নামটার মধ্যে কোনো কবিত্ব নেই, আমি হলে 'সাঁঝের তারার মালা' নাম রাখতাম।"

বিজয় বলল, "এখানকার অধিবাসীরা কবিত্বের জন্য বিখ্যাত নয়।"

সুমনা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা, বাবাকে টেলিগ্রাম করা হয়েছে?"

বিজয় বলল, "এতক্ষণে বুঝি মনে পড়ল? সে আমি কখন পাঠিয়েছি। ভদ্রলোক না জানি কেমন আছেন। তোমাকে এত বেশী ভালবাসেন।"

সুমনার চোখ দুটো ছলছলিয়ে এল, বলল, "কোনো যে উপায় নেই, নইলে এইরকম করে কোনো মেয়ে কি ছেড়ে আসতে পারত? ছেলেদের যদি এইরকম বৌ-এর জন্যে নিজের ঘর আর মা-বাবা ছেড়ে আসতে হ'ত তাহলে ক'জন বিয়ে করত কে জানে?"

বিজয় বলল, "করত সকলেই, তবে কয়েকদিন শ্বশুর-বাড়ী থেকেই রাতারাতি বৌকে নিয়ে পালিয়ে যেত।"

"আমরা যদি পালাতে চাই, তাহলে বররা সঙ্গে যেতেই চাইবে না।"

বিজয় বলল, "তাও যাবে প্রথম প্রথম।"

সুমনা বলল, "আবার ঐ কথা। আচ্ছা, এটা এত বেশী করে তোমার মনে আসে কেন? জিনিসটা এতই কি ক্ষণস্থায়ী আর ক্ষণভঙ্গুর! প্রথম কয়েকটা দিনের বেশী আর থাকে না?"

বিজয় বলল, "তুমি আজ বড় বেশী serious হয়ে উঠেছ। বাপের বাড়ীর জন্যে মন খারাপ হয়ে আছে?"

"না, তুমি বল না, কি মনে হয় তোমার? কিছুই থাকবে না?"

বিজয় বলল, "নিজের কথা বলতে পারি, আমার চিরদিনই থাকবে, যদি না আমি একেবারে অন্য মানুষ হয়ে যাই। তবে তোমার কথা কি করে বলব?

বিজয়ের হাতে একটু চাপ দিয়ে সুমনা বলল, "আমার কথা কি আর আমি তোমায় বলতে বলছি? সে ত আমিই সবচেয়ে বেশী জানি।"

বিজয় বলল, "কি জান?"

"সে মুখে বলে কি হবে, অহঙ্কারের মত শোনাবে। দেখতেই ত পাবে।"

বিজয় বলল, "তুমি ত বল ভালবাসা চোখে দেখা যায় না। মনে নেই তোমার?"

সুমনা বলল, "মনে আছে। বাজে কথা ত জীবনে ঢের বলেছি। চোখে দেখা যায় না। কিন্তু শুধু চোখ দিয়েই বা দেখবে কেন? মন দিয়েও দেখতে পাবে। ভালবাসা জিনিসটা এমন নয় যে, কেউ তাকে লুকিয়ে রাখতে পারে। নিজেই বলতে যে, আমি লুকোতে গিয়েও কিছু লুকোতে পারি নি। তখন যা বুঝেছিলে এখন আর বুঝবে না? ছোট ঝরণা যে দেখতে পায় সে কি মহাসাগরকে দেখতে পায় না?"

বিজয় বলল, "বলেছ ভাল। কিন্তু ও আলোচনা থাক, এইরকম ভীড়ের মধ্যে বসে তোমার অত মিষ্টি কথার উত্তর দেওয়া যায় না। অন্য গল্পই কর কিছু। আচ্ছা, অন্য লোকজনের সামনে আমাকে ডাকতে হলে তোমার বড় অসুবিধা হয়, না? বুড়ী গিন্নীদের মত 'কর্ত্তা' বলে উল্লেখ করা আর 'ওগো' বলে সম্বোধনটার মধ্যে মিষ্টতা কিছু নেই, আবার 'বিজয়' বলে ডাকতেও লজ্জা করে।"

সুমনা বলল, "অমন নাম ধরে ডাকা আমার দ্বারা হয়ে উঠবে না। তুমি আমার চেয়ে কত বড়।"

বিজয় বলল, "তুমি বৃথাই বিংশ শতাব্দীতে জন্ম নিয়েছিলে আর অত পড়াশুনো করেছিলে। আচ্ছা, নামকরণ একটা করে নাও, যেটা জনসমাজে ব্যবহার করতে পারবে। একসঙ্গে ঘর করতে হলে ডাকতে ত হবে পরস্পরকে? আমার কোনো অসুবিধে নেই। তুমি নাম একটা তৈরিই করে নাও বেশ মিষ্টি দেখে।"

সুমনা বলল, "বেশী মিষ্টি হলেই ত বিপদ, আবার আড়ালে লুকিয়ে রাখতে হবে। না হলে নাম তোমার একটা দিয়েই রেখেছিলাম 'শেষের কবিতা'র লাবণ্যের অনুসরণ ক'রে।"

"কি সেটা শুনি?"

সুমনা বলল, "'অমিত' যেমন 'মিতা' হয়েছিলেন,

আমার 'বিজয়' হয়েছিলেন 'জয়', অবশ্য ইংরেজী অর্থে। সত্যিই এর চেয়ে ভাল নাম আর আমার কাছে তোমার হতে পারে না। জীবনের আনন্দটাই সবচেয়ে যোগ্য-নাম।"

বিজয় বলল, "রবীন্দ্রনাথের ভক্ত পাঠিকা অনেক আছেন বাংলা দেশে, কিন্তু তোমার মত পাঠের সদ্ব্যবহার আর কেউ করেছেন কিনা জানি না। কিন্তু ডাকবেই না যদি ত অমন নামকরণ করে কি হবে?"

"থাকল মনের মধ্যে, নাম জপ করার যখন দরকার হবে তখন ডাকব।"

এমন সময় বিজয়ের পরিচিত দু'তিন জন ভদ্রলোক সেখানে এসে উপস্থিত হওয়াতে তাদের কথাবার্ত্তা থামিয়ে আলাপ করবার জন্যে উঠে পড়তে হ'ল। রাত হয়ে আসছে, সুমনাও ক্লান্ত হয়ে আছে, অল্প একটুক্ষণ পরে তারা বাড়ী ফিরে চলে গেল।

দু'জনেই ক্লান্ত, ঘুমিয়ে পড়তে তাদের দেরি হ'ল না। কিন্তু সুমনা আজকাল আর একটানা ঘুমোতে পারে না, থেকে থেকে জেগে ওঠে। পাশে নিদ্রিত স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। সে নিজে যে সুন্দরী তা ত সারাক্ষণ শুনছে, কিন্তু এও যে সুন্দর কতখানি তা কি অন্য লোকে দেখতে পায় না? না সুমনার চোখেই মায়া অঞ্জন এসে লেগেছে?

সুমনা তাকে আর ভক্তি করে না একথা বিজয়ের মনে হ'ল কেন? মানুষ প্রিয়তম আর দেবতা কি তার কাছে আলাদা? একেবারেই নয়। তার পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে একজন কে ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন, তাঁর কথা মনে পড়ল সুমনার। সেই ভক্তিরসের স্রোত কি তার রক্ত-ধারায়ও অদৃশ্যভাবে মিশে আছে? একে ত বুকে করে রাখতেও তার যেমন ইচ্ছে করে, এর পায়ের উপর মাথা রেখেও পড়ে থাকতে ইচ্ছে করে তেমনিই। কিন্তু এ নিয়ে ত তার মনে বিরোধ কিছুই নেই। শুধু দেবতা বা শুধু মানুষ হলে কি তার বুক এমন ক'রে ভরে উঠত?

খুব সন্তর্পণে নিজের মুখটা একবার বিজয়ের পায়ের উপর রাখল। চমকে বিজয়ের ঘুমটা ভেঙে গেল। স্ত্রীকে এক হাতে কাছে টেনে এনে বলল, "কি হচ্ছে শুনি?"

সুমনা বলল, "এই একটা প্রণাম করলাম।"

বিজয় বলল, "সিংহাসনচ্যুত দেবতাকে আবার প্রতিষ্ঠা করছ? আমি কিন্তু মানুষের দাবিটা ছাড়ব না।"

সুমনা বলল, "কেই বা তোমায় ছাড়তে বলছে? সিংহাসনচ্যুত কবে হলে তাও ত জানি না। যেখানে গোড়াতে ছিলে ঠিক সেখানেই আছ। এটাকে আমার একটা পাগ্লামি বলে মেনেই নাও না তুমি?"

বিজয় বিছানার উপর উঠে বসল। সুমনার চুলের উপর হাত বুলোতে বুলোতে বলল, "পাগ্লামি কেন মনে করব সুমনা? তোমার মতো মন আমাদের দেশে যুগ-যুগান্তর ধরে আছে। কাব্যে, সাহিত্যে তার উদাহরণ কিছুই বিরল নয়। কিন্তু আমি ত ভক্তির যোগ্য নই?"

সুমনা বলল, "যোগ্য কিনা তার বিচার কি তুমি করবে?"

বিজয় বলল, "তা করব না, কিন্তু ভয় হয় তোমার জন্যে, যখন দেখবে ভক্তির পাত্রটি একেবারেই মর্ত্ত্যের মৃত্তিকা দিয়ে গড়া, তখন ভয়ানক আঘাত পাবে।"

সুমনা বলল, "অমন দিন আমার জীবনে আসবে না, তার আগে আমি ম'রে যাব।"

বিজয় বলল, "তাই কি কখনও হয়?"

সুমনা বলল, "আমার বেলায় হবে। জীবনের আমার ঐ একটাই অবলম্বন। সেটা যদি ছেঁড়ে ত আর কি নিয়ে বাঁচব? তোমাকে ভালবাসতে না পারলে বাঁচব না, কিন্তু ভক্তি করতে না পারলে ভালবাসতেও পারব না। তুমি যা আছ তাই থাক। এর বেশী আমি চাই না, এর বেশী আমার জীবনে ধরবে না।"

২২

দু'তিনটে মাস চলে গেল কালের স্রোতে ভেসে। সুমনা ক্রমে ক্রমে ঘর সংসারের দিকে মন দেবার চেষ্টা করছে, তবে হয়ে উঠছে না খুব ভাল করে। তার মন বসে না কাজে, বিজয় যখন অফিসে থাকে তখন কেমন যেন উন্মনা হয়ে ঘুরে বেড়ায়। শরীরটাও তার ভাল থাকে না।

কলকাতার চিঠি প্রায়ই পায়। বাবা লেখেন, বৌদিরা লেখে, দুই দাদা চিঠি লেখার জন্যে বিখ্যাত নয়, তারাও লেখে। মা একবার বাবার চিঠির শেষে আশীর্ব্বাদ জানিয়ে দুই ছত্র লিখেছিলেন, কিন্তু সেটা যে রাসবিহারী তাড়া দিয়ে লিখিয়েছেন তা এতই স্পষ্ট যে, পড়ে সুমনার হাসি সামলান দায় হয়ে উঠল। বিজয় হাসল না, সুমনার মা যে এখনও তাকে ভাল মনে গ্রহণ করতে পারছেন না, এটা তাকে একটু ক্ষুণ্ণই করত।

বিকেল হয়ে গেছে। বিজয় এখনই এসে পড়বে বোধহয়। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সুমনা রাস্তা দেখছে। রোজই এই সময় এখানে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। আজ

তার চুল বাঁধা হয়নি, মুখটাও কেমন যেন শুকনো দেখাচ্ছে —কয়েক দিন থেকেই তার শরীর ভাল যাচ্ছে না।

বিজয়ের ট্যাক্সি এসে পড়ল। নিজে একটা গাড়ী কিনবে ভাবছে। তবে এখনও ভাবনাটা কার্য্যে পরিণত হয় নি। দু'মিনিটের মধ্যে সিঁড়ি উঠে এসে বলল, "এ কি, তোমার চেহারাটা এত শুকনো দেখাচ্ছে কেন?"

তার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকে সুমনা বলল, "শরীর ত ভাল কিছুদিন থেকেই থাকছে না।"

বিজয় বলল, "নাঃ, আমারই দোষ, এর আগেই ডাক্তার দেখান উচিত ছিল। কালকেই নিয়ে যাব তোমাকে।"

সুমনা তার পাশে এসে খাটের উপর বসে পড়ল। বিজয়ের একটা হাত মুঠি করে ধরে বলল, "আর নিয়ে যেতে হবে না, আমিই দেখিয়ে এসেছি আজ।"

বিজয় বলল, "সেকি? কাকেই বা দেখালে, আর একলাই বা যেতে গেলে কেন? আমার জন্যে আর একটু অপেক্ষা করলেই ত হ'ত?"

সুমনার মুখটা যেন লাল হয়ে উঠল। অন্য দিকে তাকিয়ে বলল, "ঐ ত দুটো বাড়ী পরে যে মিস্ হ্যারিসন্ থাকেন, তাঁর কাছেই গিয়েছিলাম। দূর ত নয় কিছু?"

বিজয় তার মুখটা ধরে নিজের দিকে ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "ব্যাপার কি? ও ভদ্রমহিলার কাছে কেন?"

"গেলাম এমনি।"

"তিনি কি বললেন?"

সুমনা তার পিঠে মুখটা লুকিয়ে বলল, "তোমার একটি ভাগীদার আসছেন আর কি? আমার সব সময়টা আর তোমার জন্যে থাকবে না।"

বিজয় খানিকক্ষণ সহাস্যমুখে তার দিকে তাকিয়ে রইল। তার পর সুমনার গালে কয়েকটা টোকা মেরে বলল; "ভাল, ভাল, সময় কাটাবার জন্যে আর আমার ধ্যান করতে হবে না। আমাকে ভুলেই যাবে এরপর।"

সুমনা বলল, "তা আর নয়? তার জন্যে একটা গোয়ানীজ আয়া রেখে দেব, সেই সব করবে। আমি যেমন আছি তাই থাকব।"

"হ্যাঁ, সবাই যেমন আগের মত থাকে, তুমিও তাই থাকবে। আমিই যাব ভেসে, যিনি আসছেন তিনিই একাধিপত্য করবেন।"

সুমনার শরীরটা সত্যিই ভাল ছিল না, সে এবার শুয়ে পড়ে বলল, "যাও, ও রকম করো না। তাহলে আমার যাও বা আনন্দ এসেছিল মনে তাও থাকবে না।"

বিজয় তার গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, "আর তোমাকে যদি এই রকম ভুগতে হয়, তাহলে আমারও একটুও আনন্দ হবে না। তবে তোমার গণেশজননী মূর্ত্তিটা দেখবার সখও হচ্ছে খুব।"

সুমনা তার হাতে একটা চড় মেরে বলল, "আঃ, কি একটা বাজে উপমা দিচ্ছ। মোটেই গণেশের মত হবে না, তোমার মত সুন্দর হবে।"

"এক তুমি ছাড়া আমার মধ্যে এত রূপ আর কেউ দেখতে পায় নি সুমনা। কিন্তু আমার মত দেখতে হতে যাবে কোন্ দুঃখে? তোমার মত টুকটুকে সুন্দর মেয়ে হবে। জন্মে কোন্ বেটা এক ছেলেকে কৃতার্থ করে দেবে।"

সুমনা বলল, "যাও, গিয়ে চা-টা খেয়ে এস। তার পর জল্পনা-কল্পনা পরে হবে।"

বিজয় অফিসের কাপড়-চোপড় ছেড়ে ফেলে তার পর চা খেতে গেল। ফিরে এল তিন চার মিনিট পরে। বলল, "চাকরটা বলছে তুমি দুপুরেও কিছু খাও নি, বিকেলেও কিছু খাও নি। এরকম করলে ত চলবে না।"

সুমনা বলল, "খেলে আরও কষ্ট হয়।"

সুমনার মাথাটা নিজের কোলে নিয়ে বিজয় বলল, "তুমি ত ভাবিয়ে তুললে দেখছি। আমি সারা দুপুর বাইরে কাটাব, আর তুমি একলা বাড়ীতে বসে ভুগবে, এ ব্যবস্থাটা কিছু চমৎকার মনে হচ্ছে না আমার কাছে। সম্বলের মধ্যে ত ঐ বোকা চাকর। সে কিই-বা জানে এবং কিই-বা বোঝে? আচ্ছা, কলকাতায় যাবে? এ সময় সবাই বাপের বাড়ী যেতে চায়।"

সুমনা অস্বীকৃতি জানিয়ে সজোরে মাথাটা একবার নাড়ল। তার পর বলল, "অসুখ করেছে বলে তাড়িয়ে দিতে চাইছ?"

বিজয় বলল, "হ্যাঁ, তাড়াবার জন্যেই ত এতকাল মাথা কুটে তোমায় নিয়ে এলাম। তোমার ক্রমেই বুদ্ধি বাড়ছে। আচ্ছা, তা হলে একটা নার্স কি ভাল আয়া ঠিক করি, তোমার কাছে থাকবে সারাদিন। নইলে আমি ত নিশ্চিন্ত মনে কাজই করতে পারব না।"

সুমনা ক্লান্তকণ্ঠে বলল, "তাই কর না হয়। আমারও একেবারে একলা থাকতে ভয় করে এখন।"

শরীরটা আজ বড়ই খারাপ, সে বেড়াতে যেতে চাইলই না। বিজয়ও বেরোল না, যেমন বসেছিল, তেমনি বসে বসে গল্প করতে লাগল।

বলল, "সুমনা, কলকাতায় জানাবে না? তোমার বাবা শুনলে খুশীই হবেন বোধ হয়।"

সুমনা বলল, "ওর মধ্যে বোধ হয় কিছুই নেই, খুবই

খুশী হবেন। দাদার ছেলেমেয়ে নিয়ে কেমন করেন দেখ না? মা কিন্তু আমার এই চূড়ান্ত অধঃপতন দেখে আরও চটে যাবেন।"

বিজয় বলল, "তোমার মায়ের বয়স ত অনেক হ'ল, কিন্তু জগৎ-সংসারকে কিছুই চিনলেন না, মানুষ যে কি, তাও বুঝলেন না। কতকগুলো কুসংস্কারকে আঁকড়ে ধরে মানুষ আমাদের দেশে দিব্যি জীবন কাটিয়ে দেয়। তা চিঠিটা কি তুমি লিখবে, না আমাকে লিখতে হবে?"

সুমনা বলল, "আমিই লিখব এখন বড় বৌদির কাছে। ওরা নিশ্চয় নিয়ে যাবার জন্যে জেদ করবে, কিন্তু লক্ষ্মীটি, তুমি কিছুতেই মত দিয়ো না।"

"সেটা আমার পক্ষে বড় স্বার্থপরের কাজ হবে না কি?"

সুমনা বলল, "তোমার অত সাধু সাজতে হবে না, থাম ত? তুমি নিঃস্বার্থপর হয়ে এখানে বসে থাক, আর আমি ওখানে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে মরি। তাতে আমার খুব উপকার হবে।

সুমনাকে নিজের খুব কাছে টেনে নিয়ে বিজয় বলল, "না না, রাগ কর না, তুমি যেখানে থাকতে চাও তাই থাকবে। এখানেও কোনকিছুর অভাব ত নেই। ভাল ডাক্তার, হাসপাতাল, নার্স সবই জোগাড় হবে। খালি বাড়ীতে যদি কোনো ভদ্রমহিলাকে পাওয়া যেত, তোমার কাছে থাকার জন্য। আমার ত মা নেইই, আর তোমারটি থেকেও নেই।"

সুমনা বলল, "আমার কাউকে দরকার নেই।"

বিজয় বলল, "এখন ভাবছ তাই, পরে মত বদলাতে পারে। অনিমেষটাকে রেখে দিলেই হ'ত, ফ্ল্যাটটা ছোট ত নয়? তাহলে একজন মহিলা অন্ততঃ কাছে থাকতেন।"

সুমনা বলল, "অমন মহিলায় আমার দরকার নেই। ওর মনে বড় বেশী হিংসে আর লোভ। কি রকম করে আমাদের দিকে তাকায় দেখ না?"

বিজয় বলল, "তুমি দেখি, বিয়ে করে চোখের ভাষাটা খুব শিখে গিয়েছ। কিন্তু ও হিংসে করবে কেন? ওর অভাব ত কিছুর নেই?"

"কিন্তু কে জানে অভাবটা কিসের। কিন্তু আমার দেখতে ভাল লাগে না। মনে হয় আমার যে অমন স্বামী আর সে যে আমাকে এত ভালবাসছে, সেটা শ্রীমতী কিরণের ভাল লাগছে না। সুচিত্রার স্বামী যে রকম করে আমার দিকে চেয়ে থাকত, ও যেন ঠিক তেমনি করে তোমার দিকে তাকায়।"

বিজয় বলল, "সর্ব্বনাশ! মেয়েদের আবার এ রোগ থাকে নাকি? এটা ওদের মানায় না। তাঁদের পিছনে হতভাগা পুরুষগুলো ছুটছে আর তাঁরা ধরা দিচ্ছেন না, এইটাই সঙ্গত। অন্নপূর্ণা কেন ভিখারিণী হতে যাবেন?"

"অন্নপূর্ণা বেশী হ্যাংলা হলে দৃশ্যটা উল্টো রকমও হতে পারে ত? এঁর বোধ হয় ঘরের ভাতে মন ওঠে না।"

বিজয় বলল, "যাকৃগে, ন মাসে ছ মাসে একবার ত দেখা হয়, কাজেই ও নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাতে হবে না! তবে অনিমেষ লোকটা মন্দ ছিল না, বিয়েটা আর একটু দেখে শুনে করলে পারত। সম্বন্ধ করা বিয়েতে আর কিছু সহজে বোঝা যায় না, তবে চেহারাটা অত unpleasant দেখেও অগ্রসর হওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।"

সুমনা হঠাৎ বলে বসল, "আচ্ছা, তোমার কখনও আগে বিয়ের সম্বন্ধ হয় নি? অত যোগ্যপাত্র ছিলে তুমি?"

"হয়েছে দু'চারবার, তবে আমি নিজে কোনো দিনই কনে দেখতে যাই নি। কেমন যেন রুচিতে বাধত। বোধ হয় এমন একটি ঐশ্বর্য্য পাব বলে ভগবান আমাকে একটা অদৃশ্য রক্ষাকবচ পরিয়ে রেখেছিলেন।"

রাত্রি হয়ে এল। টেবিলে খাবার দেওয়া হয়েছে বলে চাকর ডাকতে এল। সুমনা খেতে রাজী হ'ল না, বিজয় জোর করেই তাকে ধরে নিয়ে গেল। নামেমাত্র খেয়ে সে আবার এসে শুয়ে পড়ল। রাত্রে যতবার ঘুম ভাঙল দেখল, বিজয় তাকে বুকে চেপে ধরে আছে। সকালে উঠে ভাল নার্স কি আয়া কিছু পাওয়া যায় কি না তার সন্ধানে বিজয় খানিকটা ঘুরে এল। সুমনা বসে বসে গীতার কাছে একখানা চিঠি লিখতে লাগল। বাবাকে যেন সে খবরটা দাদার মারফতে জানিয়ে দেয়, সে অনুরোধও করল।

বিজয় আয়ার ব্যবস্থা করেই ফিরল। সারাদিন আপিসের কাজের ফাঁকে ফাঁকে তার কেবলই মনে হতে লাগল যে, সুমনা একলা আছে, আজও হয়ত কিছুই সে খাচ্ছে না এবং কষ্ট পাচ্ছে। নিজেকে একটু দ্বিধাগ্রস্তই বোধ হচ্ছিল। এ রকম সময়ে সুমনা কলকাতায় থাকলে তার নিজের পক্ষে ভাল ছিল। বিজয়ের খুবই কষ্ট হবে তাকে ছেড়ে থাকতে, কিন্তু এ ধরনের কষ্ট ত কয়েক বছর ধরেই সে করেছে। সত্য বটে, তখনও সুমনা তার সমস্ত প্রাণটাকে এমন করে জুড়ে বসে নি। আলাদা জীবন-যাপন তখনও একটু সম্ভব ছিল। কিন্তু সে যদি কষ্ট সহ্য করে থাকতে রাজীও হয়, সুমনা কিছুতেই যেতে

রাজী হবে না। তাকে জোর করে পাঠাতে গেলে তার এত মন ভেঙে যাবে যে, উপকারের চেয়ে অপকারই হবে বেশী।

বাড়ী ফিরে এসে দেখল, সুমনা শুয়েই আছে, তবে আয়াটা এসে জুটেছে এবং বেশ কাজকর্ম করছে। একটু নিশ্চিন্ত হ'ল, যা হোক সুমনাকে একেবারে একলা থাকতে হবে না। আয়া টেলিফোনও করতে জানে। যে মহিলা ডাক্তারটির কাছে সুমনা প্রথম গিয়েছিল, তাঁর বাড়ীটাও সহজেই তাকে চিনিয়ে দেওয়া হ'ল।

সুমনার বাপের বাড়ী থেকে চিঠি খুব শীগ্‌গিরই এসে পৌঁছল। গীতাই লিখেছে। সবাই খুব খুশী সেটা জানিয়েছে, বাবা যে তাকে অতি অবশ্য কলকাতায় যেতে বলেছেন, সেটাও জানিয়েছে। ঠাকুরজামাই যদি সময় করে নিজে পৌঁছে দিয়ে যেতে না পারেন, তা হলে জিতেন গিয়ে তাকে নিয়ে আসতে পারে। মা যে এ খবর শুনে কি বললেন, সে বিষয়ে কিছুই লেখে নি।

বিজয় আপিস থেকে ফিরে এসে দেখল, সুমনা বসবার ঘরে বসে চিঠিপত্র নাড়াচাড়া করছে। বিজয়কে দেখে বলল, "ঐ নাও বৌদির চিঠি।"

বিজয় চিঠি পড়ে বলল, "কি করবে? বাবা কি না নিয়ে গিয়ে ছাড়বেন?"

ডাগর চোখ দুটো আরও বড় করে সুমনা একবার তার দিকে চাইল। তার পর উঠে পড়ে হন্‌হনিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

বিজয় পিছন পিছন গিয়ে শোবার ঘরে ঢুকল। খাটের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে সুমনা কাঁদছে। তার সমস্ত শরীর ক্রন্দনের বেগে ফুলে ফুলে দুলে উঠছে।

তাড়াতাড়ি তাকে তুলে ধরে বিজয় বলল, "ও কি, অমন করে কাঁদছ কেন মাণিক, তোমার শরীর আরও খারাপ করবে যে?

সুমনা তার কোলের উপর শুয়ে পড়ে বলল, "দাও, দূর ক'রেই দাও। একেবারে মেরে ফেল্‌তে চাও যখন, তখন তাই কর।"

বিজয় তার চুলের উপর চুমো খেয়ে বলল, "ঠিক তাই। তোমাকে মেরে না ফেললে আমার চলবেই বা কি করে?"

সুমনার কান্না থামল না। বিজয় তার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, "আর তোমার যাবার কথা কোনোদিন আমার মুখ থেকে বেরোবে না, তোমায় কথা দিলাম। আমি যেখানেই থাকি তুমি সেখানেই থাকবে। লোকালয়েই থাকব নিশ্চয়, সেখানে মেয়েদের সন্তান হওয়ার ব্যবস্থা না থেকেই পারে না। তুমি থাম লক্ষীটি, থাম। নিজের সম্বন্ধে এত অসাবধান হওয়া এখন আর চলবে না।"

সুমনা কান্না থামাল বটে, কিন্তু অনেকক্ষণ উঠল না। তার পর উঠে বসল। বলল, "কলকাতায় না লিখলেই হ'ত। এখন এই নিয়ে কতদিন যে চিঠি লেখালেখি করতে হবে তা কে জানে? তবে আমিই লিখব, তোমাকে আর বিরক্ত হতে হবে না।"

বিজয় বলল, "বাঁচালে বাপু, এই নিয়ে এখন তোমার বৃদ্ধ বাপের সঙ্গে চিঠি লেখালেখি করতে হলে আমার আর embarassment-এর সীমা থাকত না। যতটা পার মিষ্টি করে লিখ, মনে যেন কোনো কষ্ট না পান।"

সুমনা বলল, "মনে কষ্ট দিতে কি আমারই ইচ্ছা করে নাকি? তবে নিজেকে একেবারে শেষ করে দিতে পারি না ত? পাঁচ-ছ'বছর জ্বলে-পুড়ে যদি বা একটু ঠাঁই পেলাম তোমার পাশে, তখনি আবার ডাক পড়ল ফিরে যাবার। এর জন্যে অত যন্ত্রণা পেতে হবে তা কিন্তু ভাবি নি।"

বিজয় বলল, "আঃ, ও বেচারীর উপর রাগ করছ কেন? ও কি আর জানে নাকি যে, তার মাঠাকুরাণী অত পতি-পরায়ণা? যাক্, আর এ নিয়ে তোমাকে কোনো যন্ত্রণা পেতে হবে না। তোমাকে আমি কোথাও পাঠাব না। একটু অসুবিধা ঘটতে পারে মনে হচ্ছে, কিন্তু সেও তোমার এই কান্না দেখার চেয়ে ভাল। তোমার চোখের জলটা আমি একেবারেই সহ্য করতে পারি না। ঐ একটি অস্ত্র তোমার হাতে আছে, যা একেবারে অব্যর্থ। এক্ষেত্রে আমাকে চিরকালই হার মানতে হবে।"

সুমনা বলল, "ও, তুমি বুঝি ভাব আমি লোক দেখান কান্না কাঁদি? আসলে আমার কান্না আসে না?"

বিজয় বলল, "না না, তা ভাবতে যাব কেন? আমার কথার কি তাই মানে হয়? আর লোক এখানে আছেই বা কে? চল, আজ একটু বেড়াবে?"

সুমনা বলল, "এখনও অতটা ভাল হই নি। তোমার ভাল লাগে না বুঝি বাড়ী বসে থাকতে? যাও না একটু বেড়িয়ে এস। যখন বিয়ে কর নি তখন সন্ধ্যাবেলা নিশ্চয়ই বাড়ী ব'সে থাকতে না?"

"মাঝে মাঝে থাকতাম, মাঝে মাঝে বেড়াতেও যেতাম। তবে কোন্‌দিকে যে তাকাতাম, আর কাকে দেখতাম তা জানি না। মনে হ'ত তুমিও আমার পাশে পাশে হেঁটে চলেছ।"

"তুমি আমার চেয়ে ছিলে অনেক ভাল, নিজেকে নিয়ে নিজে থাকতে পেরেছিলে। আর আমি ছিলাম হাটের মধ্যে বসে, জনতার অপবিত্র কৌতূহলের ঠিক সামনে। একে ত নিজের কষ্ট, তার উপর এই উৎপাত। আমাদের দেশের মত অসভ্য আর বর্ব্বর দেশ এদিক্ দিয়ে পৃথিবীর আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ।"

বিজয় বলল, "কাকে মনে করে এত গালাগালি দিচ্ছ?"

সুমনা বলল, "এই আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সকলকেই। মনে হ'ত আমার প্রাণের ভিতর যে বীজমন্ত্র আছে, যা আর কারো সামনে উচ্চারণ করাও বারণ, তাকেও ওরা অপবিত্র করে দিচ্ছে।"

"দিনগুলো তোমার মোটেই ভাল যায় নি দেখছি, সাধে অমন চেহারা হয়েছিল?"

সুমনা বলল, "চমৎকার গিয়েছে, সে আর বলতে। তাই ত এখন ছেড়ে যাবার নামে আমার এত ভয়। তখন যা সয়েছি এখন তাও আর পারব না। 'মিলন সমুদ্রবেলায়, চিরবিচ্ছেদ জর্জ্জর মজ্জা' জীবনে একবারই হয়। মানুষের প্রাণ একবারের বেশী এ যন্ত্রণা সহ্য করতে পারে না।"

এমন সময় খবর এল অনিমেষবাবুরা দেখা করতে এসেছেন, কাজেই সুমনাকে উঠতেই হ'ল। বিজয় গিয়ে তাদের বসাল। অনিমেষ-গৃহিণী বললেন, "আপনার স্ত্রীর খুব শরীর অসুস্থ শুনলাম?"

বিজয় বলল, "খুব অসুস্থ নয়, তবে শরীর খারাপ হয়েছে বটে। ও আসছে এখনি।"

কিরণবালা বললেন, "তা উনি কি কলকাতায় চললেন নাকি এখন?"

বিজয় বলল, "না, সেরকম এখনও কিছু ঠিক হয় নি। এখানেই হয়ত থাকবেন।"

অনিমেষ বলল, "আপনার খুব সাহস মশায়। আমরা হলে পাঠিয়ে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতাম। ও কি কম ঝামেলা?"

এই সময় সুমনা এসে ঘরে ঢুকল। কিরণ বললেন, "খুব রোগা হয়েছেন দেখছি। কর্ত্তা ত অফিসে বসে থাকেন, আপনাকে দেখাশোনা কে করে?"

সুমনা বলল, "তত দেখাশোনার দরকার হয় না এখনও। আমি ত একেবারে শয্যাগত নই? তা ছাড়া একটা ভাল আয়া পেয়ে গেছি, সেও দেখাশোনা করে।"

অনিমেষ-গৃহিণী বললেন, "আমি দুপুরে এসে থাকতে পারি, তিন-চার ঘণ্টা। দুপুরে আমার কোনো কাজ থাকে না।"

বিজয়ের হাসি পেল, সুমনা কি ভাবছে, সেইটা আন্দাজ করে।

সুমনা বলল, "না না, এখনই কিছু মানুষকে অত বিরক্ত করার দরকার নেই। পরে দরকার হলে জানাব।"

অনিমেষ বলল, "আপনি যান না চলে কলকাতায়, আপনার যখন অত সুবিধে রয়েইছে। আপনার কর্ত্তা আবার পুনর্মুষিক হবেন এখন। আমার বাড়ীতেও থাকতে পারেন ইচ্ছা করলে, ঢের জায়গা আছে। একলা বাড়ীতে ভূতের ভয় করে যদি।"

সুমনা মনে মনে বলল, "ভূতের ভয় তোমার বাড়ীতেই বেশী।"

বিজয় বলল, "আমার মত ভূতের কাছে কোনো ভূত আসে না। তা ছাড়া বাড়ীটা আগ্‌লাবার লোকও ত চাই?"

তারা চলে যেতেই সুমনা বলল, "তোমার বন্ধু-পত্নীটি বেশ জবরদস্ত গোছের মহিলা। ভাব তিনি করবেনই তোমার সঙ্গে।"

বিজয় বলল, "একহাতে যেমন তালি বাজে না, তেমনি একজন মানুষে ভাবও হয় না। দুটো লোক ত চাই?"

পরদিন অফিস থেকে এসে বলল, "আর এক গোল-মাল বাধল। কিন্তু ভয় পেয়ে যেও না আগের থেকে, তোমার কলকাতা যাওয়ার কথা নয়।"

সুমনা বলল, "কথাটা কি তাই শুনি না?"

"সামনের মাসে দু'মাসের জন্যে আমাকে রেঙ্গুনে যেতে হচ্ছে অফিসের কাজে। ভয় নেই তোমার, তোমাকে নিয়েই যাব। সেখানেও মানুষ বাস করে এবং জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ সবই ঘটে থাকে। সমুদ্রযাত্রায় যদি আবার অসুস্থ হয়ে পড় সেই একটু যা ভয়।"

সুমনা বলল, "না, কিচ্ছু হবে না। আমি ত ভালই হচ্ছি ক্রমে। আয়াটা বলে, আর পনেরো-কুড়ি দিনের ভিতর আমি অনেকটাই ভাল হয়ে যাব।"

ক্রমশঃ

বিপ্লবীর জীবন-দর্শন

প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী

কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার পি. মিত্র (প্রমথনাথ মিত্র) ছিলেন অনুশীলন সমিতির আদিপুরুষ ও প্রতিষ্ঠাতা। তাঁকে আমাদের দেশের বিপ্লবী-সমিতির জনকস্বরূপ বলা যায়। বিপ্লবী-সমিতি গঠনের উৎসাহ-দাতা ছিলেন বলে বাল গঙ্গাধর তিলকের সঙ্গেও পি. মিত্র মহাশয়ের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

পি. মিত্র নিজে খুব বড় বক্তা ছিলেন না। তিনি সেকালের শ্রেষ্ঠ বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পালকে সঙ্গে নিয়ে প্রচারে বার হ'তেন। বিপিন পালের অনেকগুলি বক্তৃতা শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তাঁর বজ্রকণ্ঠে আবৃত্তি শুনলাম—"ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে, মোদের বাঁধন টুটবে ততই।" পরে সভায় রবীন্দ্রনাথের এ নতুন গানটি গীত হ'ল। আর একবার মুন্সিগঞ্জের এক সভায় বললেন, ষ্টীমারে পদ্মানদী দিয়ে আসবার সময় চতুর্দিকের শ্যাম-শোভার দিকে তাকিয়ে আমার মনে হ'ল—

"আর বাজাইও না ঐ মোহন বাঁশী,
রুদ্ররূপে ভীমবেশে প্রকাশ পরাণে আসি,
রুদ্ধকর সব ললিত ছন্দ......" ইত্যাদি।

তিনি নিজে কবিতা রচনা করতে পারতেন। গ্রামে গ্রামে সমিতিগঠন ও বিপ্লবান্দোলনের কথা জ্বালাময়ী ভাষায় ব্যক্ত করতেন। সমিতির প্রচারকার্যে বিপিনচন্দ্র পালের দান অপরিসীম। ঢাকায় ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমের ষড়যন্ত্র মামলায় পুলিনবাবু, আশুদাস, ললিতমোহন রায় প্রভৃতি বহু লোক আসামী হন। মোকদ্দমার রায়ে জজসাহেব উল্লেখ করেন যে, বিপিনচন্দ্র পাল হলেন অনুশীলন সমিতির সহ-ষড়যন্ত্রকারী (Co-Conspirator)। প্রত্যেক সভার পর উদ্বুদ্ধ জনগণের মধ্য থেকে নিপুণতার সঙ্গে লোক বাছাই করতেন পি. মিত্র। নির্দেশ দিতেন পুলিন দাসের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হও।

পুলিনবাবুর সঙ্গে পি. মিত্রের সাক্ষাৎ ও সহকর্মী হওয়ার ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আগে থেকেই পুলিনবাবু ও অপর কয়েকজন স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য সংঘবদ্ধ হওয়ার কথা চিন্তা করছিলেন। তখন বিপিন পাল এলেন ঢাকায় বক্তৃতা দিতে। এই সম্পর্কে তাঁর কাছে পরামর্শ চাইলে তিনি জানালেন যে, পি. মিত্র ময়মনসিং যাবেন মোকদ্দমা উপলক্ষে এবং তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করবার উপদেশ দিলেন।

ময়মনসিং যাওয়া ও ফেরা উভয় পথেই পি. মিত্র মহাশয় ঢাকায় নেমে কর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তিনি অনুশীলন সমিতি নাম গ্রহণের পরামর্শ দিলেন। জানালেন যে, কলিকাতায় অনুশীলন সমিতি স্থাপনের উদ্যোগ আয়োজন সমস্তভাবে সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে এবং একই নামেও পরিচালনায় দেশব্যাপী সমিতি গঠন করা উচিত। পূর্ববঙ্গে কাজের ভার কাকে দেওয়া যায় সে সম্বন্ধে পি. মিত্র উপস্থিত সকলের পরামর্শ চাইলেন। প্রায় সকলেই পুলিনবাবুর নাম প্রস্তাব করেছিল। মিত্র মহাশয় প্রথমে পুলিনবাবুর সংঘ গঠনক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়েছিলেন। কিন্তু সকলের সমবেত মতকে অগ্রাহ্য না করে পুলিনবাবুর উপরই পরিচালনার ভার অর্পণ করে যথাযথ উপদেশ দান করে কলিকাতায় ফিরে গেলেন। জানিয়ে গেলেন, পুলিনবাবু যেন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই পুলিনবাবুর কর্মশক্তি পি. মিত্রকে মুগ্ধ করে। তিনি একবার অতি সামান্য সময়ের মধ্যে দেখতে চাইলেন সমস্ত সভ্য ও অসংখ্য অনুগামীদের সমাবেশ। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই পুলিনবাবু তা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। পি মিত্রের আদেশে পুলিনবাবু পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে নিজে দল গঠন করতে গেলেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমিতির শাখা স্থাপিত করে সহস্র সহস্র সভ্য সংগ্রহ করলেন এবং এমন সুপরিচালিত ও সুসংগঠিত করে তুললেন যে, কর্তৃপক্ষ ও দেশের জনগণ বিস্মিত হ'ল।

এই সময়ে পূর্ববঙ্গের লাটসাহেব স্যার বমফিল্ড ফুলার ও বিপিনচন্দ্র পাল একই দিনে ঢাকায় এলেন। লাটসাহেবকে অভিনন্দন ও স্বাগত জানাতে জনকয়েক খোসামুদে ধামাধরা ছাড়া আর কেউ এল না। আর এদিকে বিপিন পালকে স্বাগত জানাতে পুলিনবাবুর নেতৃত্বে সারা ঢাকা শহরের লোক যেন ভেঙ্গে পড়ল

ষ্টেশনে। সেই বিপুল জনসমাবেশ দেখে কর্তৃপক্ষ চিন্তিত হয়ে পড়েছিল।

কলিকাতায় মাঝে মাঝে মফঃস্বলের কর্মীরা সমবেত হতেন। পুলিনবাবুও উপস্থিত থাকতেন। তখন দেশে বিপ্লবী-কর্মীদের দলাদলি ছিল না। পি. মিত্র, শ্রীঅরবিন্দ, রাজা সুবোধ মল্লিক উপস্থিত থাকতেন। কর্ম পরিচালনা সম্বন্ধে নানা আলোচনার পর যা স্থির হ'ত তা সমিতির সমস্ত শাখা-প্রশাখায় জানিয়ে দেওয়া হ'ত। সমস্ত দেশের জন্য একই কর্মসূচী ও প্রণালী স্থির হত। একবার এমনি এক সভায় শপথ গ্রহণ সম্বন্ধে আলোচনা করে এই প্রথা প্রবর্তন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরে শপথপত্র রচনার কথা উঠতেই পুলিনবাবু জানালেন যে, তিনি ইতিমধ্যেই তাঁর পরিচালিত সমিতিগুলিতে শপথ গ্রহণপ্রথা প্রবর্তন করেছেন। তিনি আদ্য ও অন্ত প্রতিজ্ঞাপত্র দু'খানা সকলের সম্মুখে উপস্থিত করলেন। আলোচনার পর এই প্রতিজ্ঞাপত্র গ্রহণই স্থির হয়।

পূর্ববঙ্গে মফঃস্বলে সভ্যদের শিক্ষার জন্য ঢাকাকেন্দ্র থেকে লোক পাঠাতেন পুলিনবাবু। মাঝে মাঝে তিনি নিজেও যেতেন এবং সার্কুলার পাঠাতেন। সময় সময় অপেক্ষাকৃত উন্নত শাখা থেকেও লোক পাঠানর নিয়ম ছিল। নারায়ণগঞ্জের পরিচালনাধীনে নিকটস্থ হরিহরপাড়া বন্দর, শহরতলী ও নিকটবর্তী গ্রামে শাখা-সমিতি ছিল। এ সব জায়গায় আমাকেও পাঠান হ'ত লাঠি-ছোড়া, তলোয়ার খেলা, ড্রিল শিক্ষা ও নিয়মানুবর্তিতা সম্বন্ধে সকলকে অবহিত করার জন্য। যদিও প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী সকল সভ্যকেই পরিচালকের আদেশপালনের জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকতে হত, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সে-ভাবে সকলকে প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী গঠিত হতে সময় লাগত। কিন্তু এরই মধ্যে কেউ কেউ উৎসাহ, উদ্যম, নিষ্ঠা ও একাগ্রতা দেখিয়ে পরিচালকের নিকট বিশ্বাসী ও বেশী অগ্রসর বলে প্রতিপন্ন হ'ত। নারায়ণগঞ্জ সমিতিতে সীতানাথ দাস, অশ্বিনীকুমার ঘোষ, গুণেন্দ্র সেন, হেমেন্দ্র ধর, আদিত্য দত্ত, বাণী ব্যানার্জি, আমি ও আরও কয়েকজন এমনি সভ্যশ্রেণীভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলাম। এজন্য বিশ্বাসযোগ্য ও দায়িত্বপূর্ণ কার্যে আমরাই নিযুক্ত হতাম। অবশ্য একটা বিষয়ে সকলেই লক্ষ্য করত যে, নির্দিষ্ট সাঙ্কেতিক আওয়াজ পাওয়ামাত্র সমিতির সভ্য যে যেখানে যে অবস্থায় থাকত ছুটে এসে একত্র হতে হত। সকলেই লক্ষ্য করল যে, দেশে এমন একদল ছেলে প্রস্তুত হচ্ছে যারা আহ্বানমাত্র সকলে একত্রিত হয় এবং একই আদেশে নিয়মানুবর্তী হয়ে চলতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

সমিতির ছেলেদের ছোট-বড় সর্বপ্রকার কাজই অকাতরে করবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হত। সময়ে সময়ে রেল-ষ্টীমার ষ্টেশনে কুলিগিরি, পুকুরের পানা, রাস্তা ও জঙ্গল পরিষ্কারের কাজ আমরা করেছি। এসব কাজ করে যা উপার্জন হত তা পরিচালকের হাতে সমর্পণ করতাম সমিতির কার্যে ব্যয় করবার জন্য।

জনগণের সেবা ও বিপন্নের রক্ষাসমিতির সভ্যদের অবশ্যকর্তব্যকার্য ছিল। কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত লোকের সেবা করার লোক পাওয়া কঠিন হ'ত। খবর পাওয়ামাত্র সমিতির ছেলেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সেবার ভার গ্রহণ করত।

কলিকাতায় সেবার অর্দ্ধোদয়-যোগ উপলক্ষ্যে মফঃস্বল থেকে লক্ষ লক্ষ স্নানার্থী সমাগত হয়। যাত্রীগণের সেবা ও রক্ষার কাজ স্বেচ্ছাসেবকরা এমন সুশৃঙ্খলার সঙ্গে করেছিল যে, সারা বাংলা দেশ তাদের প্রশংসায় মুখরিত হয়ে উঠল। বিদেশী সরকারের দরদ দেশবাসীর প্রতি না থাকলেও দেশের যুবকগণ আমাদের রক্ষা ও সেবার জন্য প্রস্তুত আছে, এ ভরসা লোকের মনে জাগ্রত হ'ল। অগণিত গ্রাম্য বৃদ্ধারা দু'হাত তুলে স্বেচ্ছাসেবকদলকে আশীর্ব্বাদ করেছে এ আমি নিজের চোখেই দেখেছি।

নারায়ণগঞ্জ থেকে কিছু দূরে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত লাঙ্গলবন্দ গ্রাম ছিল প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র। এখানে বৈশাখ মাসের অষ্টমী তিথিতে লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী ব্রহ্মপুত্র নদে স্নান করে। তাদের সেবা ও রক্ষার কাজ সমিতির সভ্যদের গ্রহণ করতে হ'ত।

মেলায়, বারোয়ারী উৎসবে, যাত্রা-থিয়েটার, যেখানেই লোক-সমাগম হ'ত, সেসব জায়গায় আমরা শান্তি রক্ষা করতাম। মেয়েদের প্রতি অত্যাচার না হয় সেদিকে নজর থাকত। নারায়ণগঞ্জের থানা কম্পাউণ্ডে দারোগাদেরই উদ্যোগে প্রতি বৎসর সরস্বতী পূজা উপলক্ষে সাতদিনব্যাপী উৎসব হ'ত। যাত্রা-থিয়েটার, কবিগান প্রভৃতি হ'ত। সে সময় পর্যন্ত থানার কর্তৃপক্ষ শান্তিরক্ষার জন্য সমিতির নিকট আবেদন করত।

সেবা-সমিতি, পিকেটিং, বিপন্নের রক্ষায় দুর্বৃত্তের উপর বলপ্রয়োগ, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সময় আক্রান্ত-রক্ষার কার্য অনুশীলন সমিতির নামে করা হ'ত না। সমিতির সভ্যগণ পরিচালকের অনুমতি নিয়ে এসব কাজে যোগ দিতে পারত। সমিতি এসব কাজে গঠিত সঙ্ঘের দায়িত্ব দৃশ্যত গ্রহণ করত না। কারণ, এই সমস্ত কার্যে প্রবৃত্ত

হয়ে সরকারের সঙ্গে প্রায়ই বিরোধ বেধে যেত। বিপ্লবের জন্য গোপনে ও যতদূর সম্ভব প্রকাশ্যে প্রস্তুতিই ছিল অনুশীলন সমিতির উদ্দেশ্য। কাজেই যতদূর সম্ভব ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে বৃহৎক্ষেত্রে প্রস্তুতির পথে বাধা সৃষ্টি করা বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করা হ'ত না।

সমিতির ছাত্র-সভ্যরা যাতে লেখাপড়ায় অমনোযোগী না হয় সেদিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি থাকত। রীতিমত লেখা-পড়া শিখছি কিনা দেখবার জন্য কয়েকবার পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যে পড়াশুনা ছেড়ে গৃহত্যাগ করে আসবে সে যেমন নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সঙ্গে সমিতির কাজ করবে, তেমনি যে ছাত্র তাকেও নিষ্ঠার সঙ্গে লেখাপড়া করতে হবে। নির্দিষ্ট কর্মে অবহেলা করলে তা সমিতির কার্যেও এসে বর্তাতে পারে এবং বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করতে পারে।

সমিতির সভ্য হবে সর্ববিষয়ে আদর্শচরিত্র। নিজের চরিত্রবলেই তাকে দেশের চিত্ত জয় করতে হবে। ব্যক্তিগত জীবনে এবং ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমাদের প্রধান অস্ত্র ও সম্বল হবে চরিত্রবল। তাই সমিতির সভ্যদের চলাফেরা ও সঙ্গী-সাথার খবর কর্তৃপক্ষ রাখতেন এবং চরিত্রহীনের সঙ্গে না মিশতে পারে সেদিকে প্রখর দৃষ্টি দিতেন।

পরবর্তীকালে যখন ব্রিটিশের দমননীতি সুরু হয়, অনুশীলন সমিতি যখন সম্পূর্ণ গুপ্ত সমিতিতে পরিণত হয়, যখন সমিতির সভ্য হওয়াই বিপদজনক ছিল—জেল-ফাঁসি-দ্বীপান্তর সবই হতে পারত—পরিবারকে পরিবারই বিনষ্ট হতে পারত, তখন অনেক অভিভাবক ছেলেকে সমিতির সভ্য হওয়ার জন্য নানাপ্রকার নির্মম নিষ্ঠুর অত্যাচার করেছেন। তখনও আমরা এই সমস্ত পরিবারের সভ্যকে উপদেশ দিতাম যেন তারা অভিভাবকের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না করে। তাহারা কোনোমতেই শত্রুর পর্যায়ে পড়তে পারে না। তারা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। তাহারা ও তোমরা দুই কালের মানুষ। মত, আদর্শ ভিন্ন হবেই। ভুল বুঝে বা না বুঝে ছেলের মঙ্গলের জন্যই অতি নিষ্ঠুর নির্যাতন করেন। নিজেরা সত্যনিষ্ঠ ও আদর্শে অটল থাকলে পিতামাতা একদিন তোমাদের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইবেন। বিপ্লবীদের ভালবাসিবেন। বাস্তবক্ষেত্রে এমন অনেক ঘটতে দেখেছি।

সকলকেই নির্ভীক হওয়ার শিক্ষা দেওয়া হ'ত। বিপদ-আপদের সম্ভাবনা দেখে কর্তব্যচ্যুত হবে না, এই ছিল সমিতির শিক্ষা। অন্ধকার রাত্রিতে একাকী শ্মশানে যাওয়া, ভূত অস্বীকার করা, যে রাস্তা বা গাছের নীচ দিয়ে যেতে লোকে ভয় পায় সেপথে যাওয়া সমিতির সভ্যদের অবশ্যকর্তব্য ছিল। প্রশস্ত তরঙ্গমুখর খরস্রোতা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়া বা সাঁতরে পার হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। ঝড়ের রাতেও ছোট ডিঙ্গি নৌকোয় পদ্মানদী পার হতে শঙ্কিত হবে না, এই ছিল সমিতির শিক্ষা। লাঙ্গলবন্দের অষ্টমী স্নানপর্বে সেবাকার্য করতে গিয়ে প্রায় প্রতি বৎসরই পুলিসের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ হ'ত। যে সভ্য অস্ত্রধারী পুলিসকে বাধা দিতে সাহসী হ'ত না, বা লাঞ্ছনার ভয়ে ভীত হ'ত, সে দুর্বলচিত্ত বলে নিন্দিত হ'ত।

আসল কথা, সমিতির সভ্যকে সর্বকার্যে দক্ষতা লাভের শিক্ষা দেওয়া হ'ত। নৌকা চালান, সাইকেল-ঘোড়ায় চড়া, রোদ-জল অগ্রাহ্য করে কর্দমাক্ত পিচ্ছিল পথে অক্লান্তভাবে সারাদিন পায়ে হেঁটে যাওয়ার অভ্যাস করতে হ'ত। কষ্টসহিষ্ণু, কঠোর পরিশ্রমী এবং আহার-নিদ্রা জয় করতে না পারলে আদর্শ সভ্যরূপে গণ্য হ'ত না। সম্পূর্ণ গুপ্ত সমিতিব যুগে এসব গুণের প্রয়োজন হয়েছিল খুবই বেশী।

ড্রিল প্যারেডের সঙ্গে সঙ্গে বহুসহস্র লোককে শৃঙ্খলার সঙ্গে সুপরিচালিত করার শিক্ষাও দেওয়া হ'ত। শুধু সমতল মাঠে নয়, ভগ্ন জঙ্গলাকীর্ণ রাস্তায়, খাল, বিল, পুকুর, ঝোপঝাড়ে সমাকীর্ণ স্থানেও শৃঙ্খলার সঙ্গে পরিচালনার শিক্ষা দেওয়া হ'ত। সামরিক কায়দায় কৃত্রিম যুদ্ধের সময় এ সবের পরীক্ষা হ'ত। এই সামরিক যুদ্ধ অতি চমৎকার আকর্ষণীয় হ'ত। এই যুদ্ধ দেখতে দেশের সহস্র সহস্র লোক সমবেত হ'ত। এবং প্রয়োজন হ'ত বিরাট আয়োজনের।

সাধারণ যুদ্ধের মতোই দুটো দল হ'ত আক্রমণকারী ও রক্ষী। এক এক পক্ষে সহস্রাধিক যোদ্ধা যোগদান করত। রক্ষী বাহিনীর কর্তব্য হ'ত একটা বাছাই করা স্থানকে রক্ষা করা শত্রুর আক্রমণ থেকে। এই বাছাই করা স্থানের নাম হ'ত দুর্গ। দুর্গের নিশান উড়ত কোনো সুউচ্চ বৃক্ষের শীর্ষে কিংবা এমন কোনোস্থানে যেখানে আক্রমণকারীদল সহসা যেতে না পারে। জলপূর্ণ দীঘি, পুকুর, খাল দ্বারা বেষ্টিত স্থানই নির্বাচিত করা হ'ত। কতকটা হয় ত দুর্গম জলাকীর্ণ বা উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত এবং প্রবেশপথ সংকীর্ণ আর সংখ্যায় দু'একটার বেশী নয়। আক্রমণ করে কেউ দখল করতে না পারে এজন্য এগুলি আরও সুরক্ষিত করা হ'ত। এই দুর্গের উপর যে নিশান উড়ত তা যদি

আক্রমণকারীদল নামিয়ে নিজেদের নিশান উড়িয়ে দিতে পারত তবে তাদের যুদ্ধ জয় হ'ল বলে ঘোষণা করা হ'ত।

উভয় পক্ষই এক একজন সেনাপতির অধীনে থাকত। এই সেনাপতি আবার তাঁর আজ্ঞাধীনে আরও সহকারী নিয়োগ করতেন সাধারণ সেনা-বিভাগের অনুকরণে।

সহস্রাধিক যোদ্ধা দুর্গ-প্রহরায় নিযুক্ত থাকত এবং প্রবেশপথগুলিতে নানা বাধার সৃষ্টি করে বহুসংখ্যক লোক পাহারা দিত। বৃক্ষশীর্ষ বা কোনো সুউচ্চ স্থান থেকে দুরবীণ নিয়ে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করা হ'ত। শুধু তাই নয়, এডভান্স পার্টি ও পেট্রোল পার্টি থাকত। তারা শত্রুর গতিবিধি ও শক্তির পরিমাণ নির্ণয় করে প্রধান কেন্দ্রে তাড়াতাড়ি খবর পাঠিয়ে দিতে সাইকেল-আরোহী সৈন্য থাকত। অনেক সময় পথের জঙ্গলে লুকিয়ে থেকেও শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করা হ'ত।

যোদ্ধাদের পোশাক হ'ত অতি সাধারণ। মালকোচা করে ধুতি এবং শার্ট কিংবা পাঞ্জাবী। পায়ে জুতো পরার কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। মাথায় একটা পাগড়ি পরতে হ'ত। দু'পক্ষের পাগড়ির রং হ'ত আলাদা।

যোদ্ধাদের অস্ত্র হিসেবে থাকত লাঠি। বন্দুকের মাথায় সঙ্গীন চড়ালে যতটা লম্বা হয় লাঠিটার মাপও হ'ত ততটা। এই লাঠির মাথায় ন্যাকড়া জড়িয়ে একটা পুটুলির মত করা হ'ত এবং যার যার রংগোলা বালতির মধ্যে ডুবিয়ে নিতে হ'ত। বিপক্ষের শরীরে এই রং লাগলে তাকে মৃত বা আহত মনে করে সরিয়ে ফেলা হ'ত।

সহস্রাধিক আক্রমণকারী নানা জায়গা থেকে মার্চ করে এসে দলে দলে নানা দিক থেকে দুর্গ আক্রমণ করত। বেয়নেট চার্জের ধরনের আক্রমণ করা হ'ত। যদিও প্রথমে নিয়মমাফিক আক্রমণ হ'ত কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে কোথাও কোথাও মারামারি হয়ে গিয়েছে এবং অনেক লোক প্রকৃতপক্ষেই আহত হয়েছে। মাথা ফেটে যেত; হাত পাও ভাঙত। সঙ্গে সঙ্গেই চিকিৎসার ব্যবস্থা হ'ত। ডাক্তার, শুশ্রূষাকারী, ঔষধপত্র, ব্যাণ্ডেজ ও ষ্ট্রেচার সবই প্রস্তুত থাকত। পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থাও থাকত।

সাধারণত সমিতির বহির্ভূত অথচ সহানুভূতিশীল গণ্যমান্য লোকরাই বিচারক নিযুক্ত হতেন। প্রত্যেক সংগ্রামক্ষেত্রেই এরা উপস্থিত থাকতেন এবং নিহত ও আহতদের সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করতেন।

যুদ্ধ সমাপ্তির পর দুই পক্ষের সেনাপতিগণ একত্র মিলিত হয়ে আক্রমণ ও প্রতিরক্ষা নীতি এবং যুদ্ধ-কৌশল আলোচনা করতেন। দোষত্রুটীর আলোচনা হ'ত। যে প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য তেমন লোককে সম্মানিত করা হ'ত। অনেক সময় পুরস্কারও দেওয়া হ'ত। যুদ্ধের সময়ে নিয়মানুবর্তিতা, নির্ভীকতা, আদেশ পালনে প্রস্তুতি প্রভৃতি সবই লক্ষ্য করা হ'ত। যার মধ্যে এসবের অভাব দেখা যেত তার শাস্তি গ্রহণ করতে হ'ত।

এবম্বিধ যুদ্ধের জন্য সমিতির কোনো খরচ হ'ত না। পোশাক ত যার যার নিজস্ব। যাতায়াতের খরচ নিজেকেই বহন করতে হ'ত। যথাসম্ভব পায়ে হেঁটেই চলার বিধি। নেহাত প্রয়োজনে নৌকো কিংবা গাড়ীতে উঠত। নিজের নিজের খাদ্য নিয়ে আসতে হ'ত কিংবা অন্য কোন উপায়ে নিজেরই ব্যবস্থা করতে হ'ত। যে খাদ্য আসত তা সবাই মিলে আহার করত।

আমি দু'বার এমনি কৃত্রিম যুদ্ধে যোগদান করেছি। একবার ঢাকার স্বামীবাগের কাছে একটা জায়গায় সেখানে ছিলাম আক্রমণকারীদলে। গিয়েছিলাম নারায়ণগঞ্জ থেকে মার্চ করে আক্রমণ করতে। আর একবার যোগ দিয়েছিলাম নারায়ণগঞ্জ লক্ষ্মীনারায়ণজীউর আখড়ার সম্মুখস্থ জায়গায়—সেখানে ছিলাম দুর্গরক্ষীদলে সাধারণ সৈন্য হিসেবে একেবারে সম্মুখের সারিতে। সংগ্রামের সময় আঘাতও পেয়েছি কিন্তু লাইন পরিত্যাগ করা নিয়ম ছিল না। যত বড় বিপদই আসুক না কেন পরিচালকের আদেশ ভিন্ন পিছিয়ে গেলে কিংবা পলায়ন করলে কিংবা নিরাপদ স্থান বেছে নিলে ভীষণ অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে শাস্তি পেতে হ'ত।

সমিতির কেন্দ্রে ও শাখা সমিতিতে মাঝে মাঝে প্রতিযোগিতামূলক তরবারি, লাঠি ছোরা খেলা এবং ড্রিল প্যারেডের প্রদর্শনী হ'ত। এমনি প্রদর্শনীতে আমিও অনেকবার যোগ দিয়েছি। সঙ্গে স্বদেশ-প্রেমোদ্দীপক ও বীরত্বপূর্ণ কবিতা আবৃত্তি করা হ'ত। নিজেদের লিখিত ছোট ছোট নাটক, কিংবা কোনো নাটকের অংশ-বিশেষও অভিনয় করতাম। এ উপলক্ষে বহু লোক নিমন্ত্রিত হয়ে আসতেন।

সমিতির তরফ থেকে জনসাধারণের জন্য মাঝে মাঝে কথকতার ব্যবস্থা করা হ'ত। এ প্রসঙ্গে কলিকাতা থেকে আগত শ্যামাচরণ পণ্ডিতের কথা উল্লেখ না করে পারছি না। আমরা প্রচার করতাম যে, কথকতার বিষয় হবে বৃত্রাসুর বধ, শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ, ধ্রুব চরিত্র, প্রহ্লাদ বা মহাভারতের উপাখ্যান। শ্যামাচরণবাবু কথক ঠাকুরদের মতই ধূপধুনা জ্বালিয়ে উচ্চ স্থানে পদ্মাসন বা সিদ্ধাসনে

বসে, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ধারণ করে কপাল রক্তচন্দনে লিপ্ত করতেন। তার পর দু'একটা কথা ঘোষিত বিষয় সম্পর্কে বলেই ব্রিটিশ রাজত্বের ধ্বংস ও ইংরেজ নিধন-পর্বে এসে পড়তেন। তাঁর গান ও কথকতার গুণে লোকে মুগ্ধ হয়ে শুনত। তাঁর গানের দু'একটা লাইন এখনও মনে আছে :

সার্দ্ধ শত বর্ষ গত দেশের সন্তান কত
একবার করেছিল পণ

* * *

আবার মিরাট তোল জাগাইয়া
আবার হলদিঘাটে উঠ্‌করে নাচিয়া
আবার দেবীর পূজা সমাপিয়া
কালিঘাট রক্তে রাঙা কর না।
ঝাঁসি হতে লক্ষ্মীবাই, মালব হতে তাঁতিয়া
চিতোর হতে নানা সাহেব উঠেছিল গর্জিয়া
বিহার হতে কুমারসিংহ ঘোচাতে মার বন্ধন।

ইংরেজের হস্তে ভারতীয় নারীর লাঞ্ছনা, অপমান, শ্বেতাঙ্গের পদাঘাতে কুলিদের প্লীহা ফাটিয়া মৃত্যু প্রভৃতি সম্বন্ধেও তাঁর রচিত গান ছিল।

মুকুন্দদাসের সঙ্গে আমাদের সমিতির সভ্যদের, বিশেষ করে বরিশাল জেলার সভ্যদের, ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, সম্পূর্ণ গুপ্ত সমিতির যুগেও যখন আমরা পলাতক জীবন যাপন করছি তখনও তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ করতে দ্বিধা করি নি। তাঁর যাত্রাভিনয় ও গান আমাদের সমিতির আদর্শ প্রচারে এবং সামাজিক দুর্গতি দূরীকরণে এবং রাজনৈতিক জাগরণে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল।

দেশের জনগণের উপর সমিতির প্রভাব-প্রতিপত্তি খুব বৃদ্ধি পেল। স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য এক সৈন্যদল প্রস্তুত হচ্ছে, এ বিশ্বাসও লোকের মনে বদ্ধমূল হ'ল। ব্রিটিশ সরকার শঙ্কিত হলেন এবং সমিতির কার্যাবলী লক্ষ্য করবার জন্য শলকল্ড (Salkold) নামক এক আই-সি-এস অফিসার নিযুক্ত হ'ল।

বঙ্গ-বিভাগের ফলে কলিকাতার বাইরে পূর্ববঙ্গেই আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করল! ভীষণ অত্যাচারী ও যথেচ্ছাচারপরায়ণ আসাম-পূর্ববঙ্গের লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণর স্যার বমফিল্ড ফুলার অত্যাচারের ষ্টিমরোলার চালালেন, এজন্য বহুদিন পর্যন্ত যে কোনো অত্যাচারী শাসনকে ফুলারী শাসন বলত। বরিশাল কনফারেন্স তিনি আঘাতে ভেঙে দিলেন, সেকথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু অসংখ্য বাঙালী যুবক নেতৃবর্গ-সহ রাস্তায় নিষিদ্ধ মিছিল বার করে বন্দেমাতরম ধ্বনি করতে লাগল। পুলিসের আঘাতে মাথা ফাটল কিন্তু বন্দেমাতরমে আকাশ ধ্বনিত হতে লাগল। প্রসিদ্ধ নেতা মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা ভীষণভাবে আহত হলেন। তিনি একহাতে পুত্র চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতা ও অপর হাতে সুহৃদ সমিতির কর্মী ব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলীকে ধারণ করে সভায় গর্বের সঙ্গে বক্তৃতা দিলেন। সুরেন্দ্রনাথ, কৃষ্ণকুমার মিত্র, জে. চৌধুরী, কাব্যবিশারদ, বিপিনচন্দ্র, অশ্বিনীকুমার দত্ত সকলেই নির্ভীকতা দেখিয়ে সমগ্র জাতির প্রাণে সাহসের সঞ্চার করলেন। নেতা হিসেবে সুরেন্দ্রনাথ গ্রেপ্তার হলেন এবং তার জরিমানা হ'ল।

আন্দোলন ক্রমশঃ বিপদজনক আকার ধারণ করল। ব্রিটিশ রাজনীতি তখন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপ্রচারে যত্নবান হয়ে শীঘ্রই সফলতা লাভ করল। পূর্ববঙ্গের নানা স্থানে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বেধে গেল। কুমিল্লা ও ময়মনসিংহে কলহ ভীষণ আকার ধারণ করল। জামালপুর শহরে হিন্দুবাড়ী লুঠ হ'ল এবং কালী-প্রতিমা ভগ্ন হ'ল। কলিকাতা থেকে প্রকাশিত বারীনবাবুদের কাগজ 'যুগান্তরে' ভগ্নকালীর ফটো বার হ'ল—নীচে লেখা "দেখ মা যা হইয়াছেন"। ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস-সাহেবগণ প্রকাশ্যে হিন্দুর বিরুদ্ধাচরণ ও মুসলমান দাঙ্গা-কারীর সাহায্য করতে লাগল। নানা স্থানে হিন্দুনারী লাঞ্ছিত হতে লাগল। তখনকার দিনের সুহৃদ সমিতির একটা প্রসিদ্ধ কয়েক লাইন আজও মনে আছে—

আপনার মান রাখিতে জননী
আপনি কৃপাণ ধরগো,
পরিহরি চারু কনক ভূষণ
গৈরিক বসন পরগো।
আমরা তোদের কুটি কুসন্তান,
গিয়াছি ভুলিয়া আত্ম-অভিমান,
করে মা পিশাচে তোর অপমান
নেহারি নীরবে সহিগো।...

কুমিল্লাতে প্রবল অশান্তির মধ্যে একজন মুসলমান গুলীর আঘাতে নিহত হয়েছিল। এই অপরাধে নিবারণ নামে এক হিন্দুর প্রাণদণ্ডাদেশ হয়। ফাঁসির হুকুমের প্রতিবাদে সারা বাংলায় হুলস্থূল পড়ে যায়। প্রতিবাদ হিসেবে আমরা সকল স্কুলের ছাত্র ক্লাস পরিত্যাগ করে এলাম এবং একদিনের জন্য স্কুল বন্ধ থাকে। নিবারণের পক্ষ সমর্থন করে ঢাকায় বিখ্যাত উকিল ও রাজনৈতিক নেতা আনন্দচন্দ্র রায় অশেষ কীর্তি অর্জন করেন। হাইকোর্টে নিবারণের ফাঁসির হুকুম রদ হয়েছিল।

সরকারের উৎসাহে উৎসাহী হয়ে ঢাকায় গুণ্ডা-

প্রকৃতির মুসলমানগণ পুলিনবাবুর বাসা আক্রমণ করে-ছিল। বাড়ীতে তখন অল্প কয়েকজন সভ্যমাত্র উপস্থিত ছিল। গুণ্ডারাও এই সুযোগই কাজে লাগাবার চেষ্টায় ছিল। কিন্তু এরাই বিস্ময়কর লাঠিচালনায় শত শত মুসলমান গুণ্ডাকে আঘাতে জর্জ্জরিত করে হটিয়ে দিয়েছিল। ঢাকায় বেশ কিছু মুসলমান নেতার কর্মকেন্দ্র হলেও এ আক্রমণ শোচনীয় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ায় ঢাকা শহর ও জেলায় দাঙ্গা একেবারে থেমে যায়। আর একটা প্রত্যক্ষ ফল হ'ল এই যে, মুসলমান গুণ্ডারা শহরের রাস্তায় সমিতির সভ্য কাউকে একলা পেলেই পূর্বে মার-ধর করত, তাও বন্ধ হ'ল। জন্মাষ্টমীর মিছিল উপলক্ষে সমবেত গুণ্ডাদল ভীষণভাবে প্রহৃত এবং একজন গুণ্ডা নিহত হওয়ায় পুলিনবাবুর বাড়ী খানাতল্লাসী হয় এবং পুলিস কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। কারুর বিরুদ্ধেই কিছু প্রমাণিত হয় নি।

আত্মরক্ষার জন্য হিন্দুরা দলে দলে সমিতির সভ্য হতে লাগল। অভিভাবকেরা ব্যক্তিগতভাবে এসে পুত্র ও অন্যান্য ছেলেদের সমিতির সভ্যশ্রেণীভুক্ত করাতে লাগলেন এবং নিজেরাই তাদের হাতে অস্ত্র দিয়ে পল্লীরক্ষার কার্যে পাঠিয়ে দিতে সুরু করলেন। আমরা দিবারাত্র নানা অস্ত্র হাতে নিয়ে, একরকম আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করে, হিন্দুপল্লী পাহারা দিয়েছি। অবশ্য সমিতির কর্তৃপক্ষ একটা বিষয়ে সতর্ক থাকতেন, যেন আমরা আমাদের আসল শত্রু ব্রিটিশ বিতাড়নের আয়োজন থেকে বিপথ-গামী না হই। মুসলমানদের সঙ্গে দাঙ্গা বা শত্রুতা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই মাতৃভূমি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত আমরা এবং সাম্প্রদায়িকতা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। তবে আক্রমণকারী যেই হোক না কেন, তাকে রোধ করতেই হবে, এটাই আমরা কর্তব্য মনে করতাম। আর একটা বিষয়ে আমরা সতর্ক থাকতাম, যাতে সমস্ত সমিতি এই হাঙ্গামায় জড়িয়ে না পড়ে। কারণ, তাহলে সমিতির সকলকে গ্রেপ্তার করবার সুযোগ পাবে সরকার। শুধু অনুশীলন সমিতির সভ্যরাই হিন্দুদের রক্ষা করবে, তাই একমাত্র কাজ তাদের নয়। যদিও নিপীড়িতের রক্ষায় অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে তারা সর্বদাই প্রস্তুত, তবুও হিন্দুদের নিজেদেরই সমগ্রভাবে আত্মরক্ষার জন্য দাঁড়াতে হবে।

এই দাঙ্গার ফলে শুধু হিন্দুরাই বিপদের সম্মুখীন হওয়ার সাহস অর্জন করল তা নয়, অনুশীলন সমিতির উপর জনসাধারণের আস্থা বৃদ্ধি পেল এবং জনবল বৃদ্ধি হ'ল। দুর্গতের সহায়, বিপদের বন্ধু বলে সমিতির সভ্যদের দেশের লোক আপনজন বলে গ্রহণ করল। এক কথায় সমিতি দেশের লোকের চিত্ত জয় করে নিল।

কিছুদিন পর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থেমে যায় বটে, কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয় মোসলেম লীগ্। তার প্রভাবে ভারতীয় রাজনীতিতে ভেদ-বুদ্ধি সুদৃঢ়ভাবে অনুপ্রবেশ করে ভারতভূমিকে দ্বিধা বিভক্তই করল না, লক্ষ লক্ষ ভারত-বাসী ধন-মান-প্রাণ বিসর্জন দিয়ে উদ্বাস্তু হয়ে চরম দুর্দশায় পতিত হ'ল। ক্রমশঃ
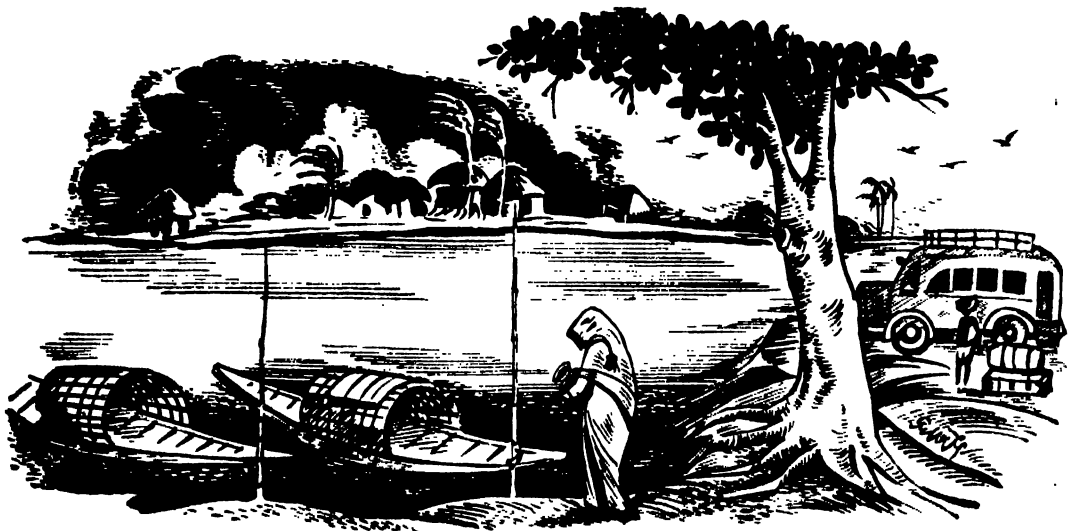
পরশুরামের রাজ্যে

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

মাদুরা থেকে দুটি পথে কন্যাকুমারী যাওয়া যায়। প্রথমটি তিনেভেলি হয়ে—দ্বিতীয়টি ত্রিবান্দ্রাম ঘুরে। দুটি ষ্টেশনই দক্ষিণ রেলের শেষ প্রান্তে। রেল লাইনের পরও পঞ্চাশ-বাহান্ন মাইল বাস বা ট্যাক্সির যাত্রা। তিনেভেলির পথটি হ্রস্বতর, কিন্তু সৌন্দর্য্যে ত্রিবান্দ্রাম-পথের তুলনা নাই। পীচ-বাঁধানো ঢেউখেলানো সোজা রাস্তা ডাইনে-বাঁয়ে আম, কাঁঠাল, কাজুবাদাম আর নারিকেল-কুঞ্জের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে। মাঝে মাঝে উদার প্রসারিত মাঠে সবুজের প্রাণবন্যায় উথল-পাথাল, উপরে দৃষ্টি তুললে নীলের সমারোহ। কাছেপিঠে ছোটখাটো খাড়া খাড়া পাহাড়—দূরেরগুলি ধোঁয়া-মাখানো, নৈবেদ্যে চূড়াকৃতি। আর মাঠে গ্রামে প্রতিটি কুটিরের পাশে বয়ে যাচ্ছে সরু সরু খাল—যেন খালেরই বুহুনি দিয়ে এক-একটি আবাসগৃহকে ফল-ফুলুরির বাগানসমেত গেঁথে ফেলা হয়েছে। কেরল দেখলে বাংলার সুজলা-সুফলা ভূমির কথা মনে পড়বেই। কিন্তু বাংলার চেয়ে আরও মনোরম এর পরিবেশ। নদীনালা, ঝোপঝাড় মিলিয়ে যে পতিত জমি চোখে পড়বে—তাকে কৃষিপণ্যে শস্যগর্ভা করার জন্য কি অক্লান্ত চেষ্টাই না চলছে। বাংলার মতো কলকারখানার মাথায় ধূম-মলিন আকাশ ভাসছে না, বনের মাথায় লতাগুল্মের ঝোপ একরাশ অন্ধকার জমাচ্ছে না, হাঁটুভোর কাঁটা গাছ বা সর্পসঙ্কুল ভাঙা ইমারতের ইঁটের স্তূপ কোথাও চোখে পড়ছে না, চারিদিকে খোলামেলা দিগন্ত আকাশে আর আলোয় মাখামাখি দিগন্ত। তীরবেগে বাস ছুটলে মাইল গণনা সুরু হবে, আর ফলভারে অবনত গাছগুলির স্নিগ্ধ স্বপ্ন-ছোঁয়ায় সারা চিত্ত পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠবে। দু'পাশে শুধু ছবি-আঁকা প্রকৃতি—যাত্রী উড়ে চলে তারই মাঝখান দিয়ে। জমি যত বসতিবিরল হয়ে আসে, পাহাড়ের সংখ্যা ততই বাড়তে থাকে, আর দিগন্ত ইঙ্গিত জানায় একটি সূচীমুখ ভূমি ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। সেই সূচীবিন্দুতে যাত্রা শেষ—মানুষের এবং ভারতভূমিরও।

উদ্যানময় শহর ত্রিবান্দ্রাম—নূতন কেরলের রাজধানী। সৌধবিলাসিনী শহরের অঙ্গসজ্জা কোথাও চোখে পড়বে না। ষ্টেশনে পৌঁছলে মনে হবে এ কোন্ তরুছায়াঘন কুঞ্জভবনের মাঝখানে এসে পড়লাম! এক বাস ষ্টেশন আর ট্যাক্সির বাহুল্যে শহরের আভাসটুকু যা ধরা যায়। সুন্দর পথগুলি এঁকেবেঁকে গাছের আড়ালেই অদৃশ্য হয়েছে—অট্টালিকারা কোথাও আকাশ ধরার স্পর্দ্ধা জানাচ্ছে না। বামদিকের পথটি অপেক্ষাকৃত সোজা, চওড়া আর লোকচলাচল মুখরিত। ওই দিকেই কোর্ট-কাছারী আর কেরলের কুলদেবতা শ্রীপদ্মনাভের মন্দির। ওই দিকে বাস-ষ্ট্যাণ্ডে সারি সারি বাস দূরগামী যাত্রীদের আহ্বান জানাচ্ছে—শহরের মধ্যে স্বল্প দূরের পাল্লাতেও যাতায়াত করছে। দোকানপাট আছে, পথচারী আছে, ট্রাফিক পুলিস যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করছে—তবুও অন্য শহরের সঙ্গে এর চেহারাটা মিলবে না। যেন পুরোপুরি শহর নয় ত্রিবান্দ্রাম—গ্রামে-শহরে মেশানো এর মূর্ত্তি—আধুনিক ও প্রাচীন দুই কালের দ্বৈত-রূপের প্রকাশ। পথে যারা চলছে তাদের বেশভূষা বাহুল্যহীন। যেমন নিরাবরণ দেহ, তেমনি উপানৎহীন শ্রীচরণ। প্রাচীন বাংলায় টোল-প্রভাবিত সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলিতে শিখা-তিলকধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ধুতি-উত্তরীয় শোভিত যে ছবি মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে—তাঁদের পা থেকে খড়ম ও চটিজুতা খুলে নিলে বেশীর ভাগ কেরলের মানুষকে তাঁদেরই আত্মীয় বলে বোধ হবে। প্রৌঢ় ট্যাক্সি-চালক সামনে দাঁড়াতে একটু চমকেই উঠেছিলাম—ধুতিপরা চাদর গায়ে নগ্নপদ কোনো পণ্ডিতই বুঝি সামনে এসে দাঁড়ালেন। আবার পথে দেখছি স্কুল-কলেজের ছেলে-মেয়েরা আধুনিক বেশবাসে সজ্জিত হয়েও নগ্নপদ। খুব অল্প লোকের পায়েই জুতা। এরা বিংশ শতকের অর্দ্ধপাদ অতিক্রম করেও কয়েক শতাব্দীর পিছনকার আচার-নিয়মকে নিঃশেষে পরিত্যাগ করেন নি—এটা আশ্চর্য্যই লাগে।

শ্রীপদ্মনাভের মন্দিরের সামনে এলে এর মূলসূত্রটি ধরা যায়। সারা কেরলের কুলদেবতা হলেন শ্রীপদ্মনাভ। রাজারা তাঁরই নামে করতেন রাজ্যশাসন। এমন সর্ব্ব-জনমান্য দেবতা এই ভূমিতে আর দুটি নাই। তাঁকে দর্শন করতে আসার আগে পোশাকের বাহুল্য বর্জ্জন করা রীতি। শুধু নগ্নপদ হলে চলবে না—নগ্নগাত্রও প্রয়োজন।

বাইরের সমস্ত জাঁকজমক আর উপাধি মন্দির-দুয়ারে ফেলে আসতেই হবে। অন্তরের বাসনা-কামনার শিখাগুলিকে নম্র আলোয় প্রশান্ত স্নিগ্ধ করে নেওয়ার প্রস্তুতি কিনা কে জানে—প্রণাম নিবেদনে কিন্তু ভুমিতে সাষ্টাঙ্গ হওয়ার বিধি নাই। প্রণাম করেছিলাম মাথা নামিয়ে—পূজারী দু'হাতে মাথাটি তুলে ধরে ঈষৎ তিরস্কারের ভঙ্গিতে বলেছিলেন, হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম কর।

যেমন বিরাট মন্দির—তেমনি দেবতাও বিরাট। শেষ শয্যাশায়ী বিষ্ণুমূর্ত্তি—যা শ্রীরঙ্গমে দেখেছি। তিনটি দুয়ার দিয়ে মূর্ত্তির তিন অংশ দেখা নিয়ম। প্রথম দুয়ারে শ্রীচরণ, দ্বিতীয়ে হৃদয়, আর শেষ দুয়ারে শ্রীমুখমণ্ডল। পালকরূপী ভগবান বিষ্ণু—কেরলকে শস্যভারে সমৃদ্ধ করেছেন—তাঁর অকৃপণ দানে প্রকৃতিকে সাজিয়েছেন অপরূপ করে। কৃতজ্ঞ কেরলবাসীর অন্তরে তাই ভক্তির সীমা-পরিসীমা নাই।

ঘুরে দেখবার অনেক কিছুই আছে এ শহরে। আছে প্রাদেশিক বস্তুসংগ্রহ-সমৃদ্ধ যাদুকর। সামুদ্রিক মাছের প্রদর্শনী-গৃহ (অ্যাকুইরিয়াম)—যদিও এটি বোম্বাই-এর তারা পোলওয়ালা সংগ্রহশালার মতো বৃহৎ নয়, আছে রাজপ্রাসাদ, সমুদ্রতীর আর দেশীয় শিল্পালয়। এদেশের কাঠের ফুলদানি, চন্দনকাঠের বাক্স, নারিকেলমালার কৌটা, মাদুরের ভ্যানিটি ব্যাগ, প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকা পেপার-কাটার, হাতীর দাঁত আর মহিষশৃঙ্গের নানাবিধ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রভৃতি চেয়ে দেখবার ও ঘর সাজাবার মতোই।

পঞ্চপাণ্ডব বনবাসকালে ভারত-ভ্রমণ করতে করতে কেরলে এসে শ্রীপদ্মনাভ দর্শন করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এসেছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব; এসেছিলেন শ্রীযামুনাচার্য্য, শ্রীরামানুজাচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণব সমাজ শিরোমণির দল।

কেরলের রাজবংশ নাকি পরশুরাম হতে উদ্ভূত। পুরাণ বলে—অত্যাচারী রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন নিহত হলে দেবতারা সন্তুষ্ট হয়ে পরশুরামকে বরদান করেছিলেন, তোমার হাতের কুঠার যতদূর ছুঁড়তে পারবে ততটা জমিই তোমার।

কুঠার নাকি কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত গিয়েছিল—যার ফলে সমগ্র মালাবার উপকূল হয়েছিল পরশুরামের সম্পত্তি।

এই বংশেই জন্মগ্রহণ করেন ভারতবিখ্যাত চিত্রকর রবিবর্ম্মা—যাঁর পৌরাণিক ছবি এককালে প্রত্যেক সংস্কৃতিবান ভারতীয়ের ঘরের শোভাবর্দ্ধন করত।

কেরলকে খুঁটিয়ে দেখার অবকাশ আমরা পাই নি—সুতরাং তার প্রত্যেকটি দ্রষ্টব্য স্থান ও বহিরঙ্গের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিতে পারব না, তবে তার সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিচয় প্রাচীনকাল থেকেই সুবিদিত।

সেই প্রাচীন ধারাকে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত যাঁরা সগৌরবে বহন করে নিয়ে চলেছেন—তাঁদের মধ্যে এ দেশের কবি-সম্রাট ভাল্লাথোলের নাম সম্ভবতঃ সর্ব্বদেশের সারস্বত সমাজে সুবিদিত। সম্প্রতি ইনি লোকান্তরিত হয়েছেন। এঁর পরেই কৃষ্ণ পিল্লাই-এর নাম মনে আসে—যাঁর গান ও কবিতার আদর সর্ব্বত্র। কথা-সাহিত্যে জনপ্রিয় লোক শিবশঙ্কর পিল্লাই, রমণ পিল্লাই, নীলকণ্ঠ পিল্লাই প্রভৃতি। ঐতিহাসিক গোবিন্দ পিল্লাই আর সমালোচক বালকৃষ্ণ পিল্লাইও যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছেন। ভাষা-জননী সংস্কৃতের পুত্রপৌত্রস্থানীয় হ'ল মালায়ালাম। তামিলের মতো পুরাতন বা সমৃদ্ধশালী না হলেও সাংস্কৃতিকক্ষেত্রে এর মৌলিক অবদান প্রচুর। আবার প্রগতিবাদের ধ্বজা-পতাকা উড়িয়ে কালের যাত্রায় স্বচ্ছন্দে পা ফেলেও চলেছে সমান তালে। ট্রেনে ফিরবার পথে একজন কেরল-দেশীয় শিক্ষকের সঙ্গ পেয়েছিলাম প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা। তাঁর মুখেই শুনেছিলাম ওদেশের যৎসামান্য সমাচার। বাংলা নাকি ওঁদের ভাল লাগে। মাটির সঙ্গে বহিঃপ্রকৃতির যোগ-সামঞ্জস্য আছে বলে নয়—মানুষের সঙ্গে মানুষের আন্তর-প্রকৃতির গূঢ় সম্পর্কটি কেমন করে না জানি গড়ে উঠেছে। কেরল দেখে আমাদের বাংলাকে বার বার মনে পড়েছিল। কেরলের মানুষগুলি বেশবাসে, চেহারায়, ভদ্র আচরণে আমাদেরই যে নিকট-আত্মীয় তাতেও অণুমাত্র সন্দেহ জাগে নি। রামায়ণ আর মহাভারত, পুরাণ আর গীতা সারা ভারতবর্ষকে সাহিত্যে, শিল্প-কাহিনীতে, ধর্ম্মবোধে, সংস্কৃতিতে, জীবনযাত্রার মানে এমন করেই জড়িয়েছে—যা নাকি ভাষার প্রাচীর তুলেও ভাবের তরঙ্গকে প্রতিরোধ করতে পারে নি। কন্যাকুমারীতেও এই আত্মীয়তাবন্ধনের স্বাদ পেয়েছিলাম পুরোমাত্রায়।

এইবার ত্রিবান্দ্রাম থেকে কন্যাকুমারী যাত্রার কথা বলি। ত্রিবান্দ্রাম সেন্ট্রাল স্টেশনের গায়েই বাস স্টেশন। রীতিমত টাইম টেবিল অনুযায়ী বাস যাতায়াত করে নাগের কইল-এ। নাগের কইল-এর দূরত্ব বিয়াল্লিশ মাইল। সেখানে বাস বদল করে কন্যাকুমারীগামী বাস ধরতে হয়—ওখান থেকে মাত্র বারো মাইল গেলেই কন্যাকুমারী। ত্রিবান্দ্রাম থেকে অতি প্রত্যুষে একখানি মাত্র বাস সরাসরি কন্যাকুমারী যায়—আসেও একখানি।

বাস আবার দু'রকম আছে—একস্প্রেস ও প্যাসেঞ্জার। বলা বাহুল্য, একস্প্রেস বাসের ভাড়া বেশী। নাগের কইল-এ হ'ল কন্যাকুমারীর পথে একটি বড় শহর—বাস বদলের বড় জংশন স্টেশন। তিনেভেলির বাসও এইখানে এসে কন্যাকুমারীর পথ ধরে। তবে একথা নির্ভরসায় বলা চলে—বাস বদলে হাঙ্গামা কিছু নাই—সামান্য কুলি খরচ বহন করা ছাড়া—যে পরিমাণ মালপত্রই থাক না—বাসের মাথায় বিনা মাশুলে উঠিয়ে দিলে কেউ আপত্তি করে না।

আমরা সকাল সাড়ে আটটায় একস্প্রেস বাসে চেপে নাগের কইল-এ আসি। বিয়াল্লিশ মাইল পথের মাঝে একবার মাত্র বাস থেমেছিল দশ মিনিটের জন্য। আর সময় লেগেছিল দু'ঘণ্টারও কম। বাকী বারো মাইল পথ কন্যাকুমারী পৌঁছতে লেগেছিল এক ঘণ্টা। বহু জায়গায় থামার দরুণ হয়ত অতটা সময় লাগে।

পূর্ব্বেই বলেছি—বাসের রাস্তাটি অতি মনোরম। বিশেষ করে রাত্রিতে কয়েক পশলা বর্ষণ হয়ে যাওয়াতে চারিদিক ধুয়ে-মেজে কে যেন পরিষ্কার করে রেখেছিল। মিষ্ট হাওয়া বইছিল—আর মাঠের আলে আলে কুলুকুলু জলের স্রোত নামছিল নালা বয়ে। নালাগুলি এক হয়ে কোথাও নদীর রূপ নিয়েছে—কোথাও বা কূলকিনারা-হীন সমুদ্র হয়েছে। অফুরন্ত সবুজ মাঠে—অফুরন্ত জল আর উপরে অফুরন্ত নীল—বাসে করে হাওয়ার ঠেলায় আমরা ভেসে চলেছিলাম তারই উপর দিয়ে। রোদ চড়ে নি বলে—সমস্ত শরীর-মন দিয়ে উপভোগ করছিলাম এই পুলকবন্যাকে।

কন্যাকুমারীর মাত্র আট মাইল দূরে শুচিন্দ্রম দেব-দেউল। এর ইতিহাসও কন্যাকুমারী প্রসঙ্গে আসবে, আপাততঃ বেলা এগারটার মধ্যেই কন্যাকুমারীতে পৌঁছব আশা করছি।

পথে খাবারের মধ্যে মেলে কলা আর কাজুবাদাম। আর একটি উপাদেয় জিনিস—যার নাম এদেশে 'মুঙ্গে'। অজানা নামের খাদ্যদ্রব্য কেমন হবে এই সন্দেহে বিক্রেতাদের চীৎকারে কর্ণপাত করি নি, কিন্তু কন্যা-কুমারী থেকে ফিরতি বেলায় অধিকাংশ যাত্রীকে এর আস্বাদ গ্রহণ করতে দেখে প্রলুব্ধ হয়ে ছিলাম। তরল পানীয় ভর্ত্তি গ্লাস হাতে তুলে দেখি এ যে বাংলা দেশের অতি পরিচিত তালশাঁস। কচি শাঁসে ও জলে পরিপূর্ণ একটি গ্লাস—গ্রীষ্মপীড়িত তৃষ্ণার্ত্ত যাত্রীর সামনে যদি এ গিয়ে আসে—তাহলে বঙ্গসন্তান হয়ে তাকে প্রত্যাখ্যান করা সহজ নাকি? 'মুঙ্গে'র অপূর্ব্ব আস্বাদ আজও ভুলতে পারি নি।

ঠিক এগারটার মধ্যেই কন্যাকুমারীতে পৌঁছলাম।··· সে কন্যাকুমারী নয়—এ যেন মুক্তির মোহনায় অবগাহন করলাম। এখানে ভারতবর্ষের ভূমি ফুরিয়ে গেছে—সমুদ্রে আর আকাশে চলছে প্রাণভরা কোলাকুলি। সমুদ্রে ঢেউ তুলছে শত শত, পাহাড় সৈকতে ঢেউ ভাঙছে শব্দ করে—মাথার উপরেও নিঃশব্দ নীল তরঙ্গ বয়ে চলেছে অবিরাম গতিতে। এক নীল শব্দমুখর—অন্য নীলে সঙ্গীত সঙ্কেত। সৃষ্টি স্থিতি বিলয়ের গভীর অর্থব্যঞ্জনায় বিশ্বলীলার প্রকাশ চলছে অহরহ। উদাত্ত গম্ভীর স্তব-মন্ত্রে বন্দনা চলছে পরমপুরুষের—যিনি সর্ব্বভূতান্তরাত্মা—নিখিল চরাচরের ওজ-শক্তি-চেতনা।

সামনেই সরকারী ছত্রম্।···চারিদিক খোলামেলা—ঘরগুলি নূতন—বিদ্যুৎ আলোর ব্যবস্থা আছে, একই ব্লকে শোবার, রান্নার আর ভাঁড়ার ঘর।

বিদেশে এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আশা করাই ভুল। অথচ অনেক যাত্রীকেই খুঁত খুঁত করতে দেখেছি। কিন্তু তাঁরা হয়ত এটা ভুলেই যান যে, নিজের রুচি পছন্দমত সাজানো-গোছানো ঘরখানিকে মোটঘাটের মত সঙ্গে বয়ে নিয়ে যাওয়া চলে না। বিদেশে—বিশেষ করে তীর্থ-ভূমিতে—ধুলোতে পাততে হয় আসন, সকলের সঙ্গে পংক্তি-ভোজনে বসতে হয়, সম্ভ্রমবোধকে সঙ্গীনের মতো খাড়া করে রাখলে সেই খোঁচা নিজের দেহেই বেঁধে। এখানে নিজেকে যে পরিমাণে প্রকৃতির হাতে সমর্পণ করতে পারবে সেই পরিমাণে স্বাচ্ছন্দ্যভোগ অনিবার্য্য। আরও একটি কথা, যেখানে চিরকালের মৌরসীপাট্টা নিয়ে বসবাস করতে আসে নি মানুষ—সেখানে ক্ষণ-কালের জন্য মোহজাল রচনা করে লাভ বা কতটুকু? পথের দেবতা প্রসন্ন দাক্ষিণ্যে যা দেন—তা হাত পেতে গ্রহণ করতে পারলে কোনো অভিযোগই মাথা তুলতে পারে না।

কন্যাকুমারীতে এসে যাত্রী যা লাভ করে তার মূল্য গৃহসুখ, আরাম শয্যা বা ভোজনবিলাসের দ্বারা পরিমাণ করা ভুল। সে পাওনা একান্তভাবে মনেরই। সেখানে অন্নময় কোষের দাবিটা তুচ্ছ—আনন্দময় কোষেই দেওয়া-নেওয়ার হিসাব। দেওয়ার সুযোগ বা কতটুকু—সবই ত প্রাপ্তির আনন্দ। বঙ্গোপসাগরের সূর্য্যোদয়, আরব সমুদ্রে সূর্য্যাস্তশোভা আর ভারত সমুদ্রতীরে মাতৃতীর্থে প্রকৃতি-রচিত শৈল-প্রাচীরঘেরা স্নানঘাটে অতি শিষ্ট সমুদ্রতরঙ্গে গা ঢেলে দেওয়া—সারা জীবনে এই মাহেন্দ্র-

ক্ষণ হয়ত এক বারই আসে। পিছনে কাজের তাড়না নাই—ঘাটে বসে যাত্রী দেখে সমুদ্রের তরঙ্গলীলা—শোনে শিলা-সংঘাত-সুরোত্থিত সলিলের বিচিত্র গীতি-আলাপ। রাশি রাশি ফেন পুষ্পাঞ্জলি ফুটিয়ে ভাঙা ঢেউ আছড়ে পড়ছে শিলাকীর্ণ বেলাভূমিতে—সেই শোভাই কি দুটি চোখে দেখে দেখার তৃষ্ণা মেটে! অনন্ত আকাশ, অগাধ জলরাশি আর নিরবচ্ছিন্ন লীলা যাত্রীর মনকে এমনি করেই ভরিয়ে তোলে। অনাড়ম্বর কুমারীমন্দির দেখে শিল্প-ঐশ্বর্য্য দেখা হ'ল না বলে আক্ষেপ করার অবকাশ থাকে না।

কন্যাকুমারী নামটি কেন হ'ল—সেটা পুরাণ-প্রসঙ্গে না এলে জানা যাবে না। পুরাণ অবশ্য একটি নয়—ভিন্ন পুরাণের বিভিন্ন কাহিনী।

এক পুরাণে আছে ভরত রাজা ছিলেন আসমুদ্র-হিমাচলের অধিপতি। তাঁর নাম থেকে এই ভূমির নাম হয়েছে ভারতবর্ষ। ভরত রাজার ছিল আট পুত্র ও এক কন্যা। কন্যার নাম কুমারী। রাজা তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যকে নয় ভাগে ভাগ করে দিয়েছিলেন। কুমারীর অংশে পড়েছিল দক্ষিণ দেশের এই অংশটি এবং তাঁরই নামানুসারে এই ভূমি কন্যাকুমারী নামে খ্যাত হয়েছে।

মূল পুরাণের কাহিনী—এক অত্যাচারী অসুরের কাহিনী—যাকে দমন করতে পরমাশক্তির আবির্ভাব হয়েছিল এই ভূমিতে।

এক সময়ে বানাসুর দেবতার বর লাভ করে অজেয় হয়ে উঠেছিল। দেব-দানব-যক্ষ-রক্ষ-কিন্নর-নর-নারী-গন্ধর্ব্ব কারও বধ্য ছিল না সে। শুধু তাচ্ছিল্যভরে কুমারীকন্যার কথাটি বর গ্রহণের সময় সে উল্লেখ করে নি। সেই ফাঁক ধরে নিপীড়িতজনের একাগ্র কামনায় দেবী আবির্ভূতা হলেন নরদেহে। ক্রমে বয়:প্রাপ্তা হলে লৌকিক প্রথানুযায়ী তাঁকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করার চেষ্টা চলতে লাগল। সম্বন্ধ ঠিক হ'ল দেবাদিদেব কৈলাসনাথের সঙ্গে। পরম-পুরুষ আসবেন শত শত যোজন ক্রোশ পথ ভেঙে। কিন্তু একটি সর্ত্ত তাঁর রইল —যথা নির্দ্দিষ্ট লগ্নে এই বিবাহ সুসম্পন্ন হওয়া চাই। যদি পথের কোনখানে দৈব-দুর্ব্বিপাকবশতঃ রাত্রি প্রভাত হয়ে যায় তাহলে আর পদমাত্র অগ্রসর হবেন না তিনি।

এদিকে দেবতারা দেখলেন বিবাহের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ—যথা দিনে বিবাহ হবার কোনো বাধা নাই। কিন্তু বিবাহ হলেই ত দেবী আর কুমারী থাকবেন না, তাহলে অসুরনিধনের কি হবে? যুক্তিপরামর্শ করে তাঁরা নারদকে পাঠালেন এই বিবাহ পণ্ড করতে।

পরম-পুরুষ যথাসময়ে যাত্রা করলেন। সারা পথ নির্ব্বিঘ্নে এসে মাত্র আট মাইল দূরে শুচিন্দ্রমে ক্ষত্রি আশ্রমে নারদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হ'ল। নারদ কৌশল করে শাস্ত্রালোচনা জুড়ে দিলেন এবং সে আলোচনা শেষ হতে না হতে রাত্রি প্রভাত হ'ল। শুচিন্দ্রমে স্থাণু মূর্ত্তিতে রয়ে গেলেন মহাদেব।

আশাহত কুমারী জপমালা হাতে বসলেন তপস্যায়। সেই অপরূপ লাবণ্য দেখে মুগ্ধ হ'ল অসুর। দেবীর পাণি প্রার্থনা করল। দেবী জানালেন তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা—যিনি যুদ্ধে পরাজিত করবেন তাঁরই গলায় অর্পণ করবেন বরমাল্য। যুদ্ধ হ'ল। অসুর নিহত হ'ল সেই যুদ্ধে। যুদ্ধ অন্তে দেবী পুনরায় তপস্যায় বসলেন।

সেই তপস্যার স্থানটি ঘিরেই উঠেছে একটি অনাড়ম্বর মন্দির। বিমানের চমক নাই, শিল্পকলার :চমৎকারিত্ব নাই। সাধারণ পাঁচিল ঘেরা ছোটমত একটি দেউল। দেউলে পূর্ব্ব দুয়ারটি একেবারে সমুদ্রের গা ঘেঁষে উঠেছে। প্রথানুযায়ী দেবীও পূর্ব্বমুখী। কিন্তু বিশেষ একটি পর্ব্বদিন ছাড়া এই দুয়ার সারা বছর অর্গলাবদ্ধ থাকে। উত্তর দুয়ার দিয়ে যাত্রীরা যায় দেবীদর্শনে। এই দিকে ফলের দোকান, ছবির দোকান, নিত্য প্রয়োজনীয় আনাজপাতি ও মুদিখানার যাবতীয় দ্রব্য পাওয়া যায়। রেষ্টুরেণ্ট ও হোটেলও যেন দু'একটি আছে। ছোট্ট জায়গা কন্যাকুমারী—যাত্রীরা বেশীক্ষণ থাকে না, বাসিন্দাদের আহার ও চালচলন সাদাসিধা—সেই অনুযায়ী দোকান, বাজার ও বিক্রেয় পণ্যের অজটিল সমাবেশ।

•

দেউল অপরূপ নয়, কিন্তু এমন জীবন্ত কন্যা-মূর্ত্তি সারা ভারতবর্ষ খুঁজলে মিলবে না। শত শত প্রজ্জ্বলন্ত দীপের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন কন্যা। হাতে জপমালা, শিরে মণিময় মুকুট, গলদেশে কুসুমমাল্য, সুন্দর ভঙ্গিতে পরা ক্ষৌমবস্ত্র। বেদীর 'পরে ন্যস্ত যুগল পদারবিন্দ, ভক্তের মনমধুপ সেইখানেই নীরব গুঞ্জনে সমাহিত চিত্ত। গর্ভগৃহে দীপান্বিতার রাত্রি। সেখানে পৌঁছলেই মুগ্ধকণ্ঠে বলতেই হবে—চমৎকার! দেবী কুমারী কিন্তু ইনিই সেই সুরনরবন্দিতা নিখিল বিশ্বের আদি জননী যিনি:

বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা চ স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতস্য জগন্ময়ে॥

তিনটি সমুদ্র মিলে এই লীলাকে প্রত্যক্ষ করাচ্ছে অহরহ। এক সমুদ্রে সূর্য্য উঠছেন—অস্ত যাচ্ছেন আর এক সমুদ্রে, মাঝখানে জীবনরূপী সমুদ্র দুটি বাহু মেলে ধরে আছে

জন্ম-মৃত্যুর দুটি প্রান্ত। এইখানেই ভারতবর্ষের সুরু—ভারতবর্ষের প্রাণ-রহস্য।

কুমারীমন্দিরের দক্ষিণদিকে ভারত মহাসমুদ্র—সেইখানেই স্নান করেন যাত্রীদল। এই স্নানঘাটের নাম মাতৃতীর্থ। পুরাণ বলে, এই ঘাটে স্নান করে মাতৃহত্যার পাতক থেকে মুক্ত হয়েছিলেন পরশুরাম। প্রকৃতি রচিত পাথর দিয়ে ঘেরা এই ঘাট—সোপানগুলি অবশ্য মানুষের তৈরী। তারই মধ্যে ভাঙা ঢেউগুলি ঈষৎ চঞ্চল হয়ে কখনো ফুলে উঠছে—কখনো বা অত্যন্ত নিরীহভাবে সমুদ্রে ফিরে যাচ্ছে। পাথরের ওপারে ঢেউয়ের আস্ফালন আর গর্জ্জন—এপারে নর্ম্মক্রীড়া-উচ্ছল স্নানার্থীর হর্ষ-কোলাহল; দৃষ্টি, শ্রুতি আর অন্তর সমস্তই সমুদ্রের মতো পরিপূর্ণ।

এই স্নানঘাটের পশ্চিমে সম্প্রতিকালে তৈরি হয়েছে গান্ধী-স্মারক মন্দির। কন্যাকুমারীতে এলে এটি সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-যজ্ঞের পুরোহিত মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী—তাঁরই চিতাভস্মের উপর তৈরি হয়েছে এই অপূর্ব্বদর্শন সৌধ। সৌধ নয়, মন্দির—জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রতিটি ভারতবাসীর তীর্থ-ক্ষেত্র। মন্দিরে মূর্ত্তি নাই, মূর্ত্তির চেয়েও উজ্জ্বল হয়ে আছে বৈদিক ভারতের অমরবাণীমূর্ত্তি

সত্যমেব জয়তি।

আবার পূর্ব্বদিকেও রয়েছে—ভারত-আত্মার আর একটি শাশ্বতরূপ। সেও প্রকটিত বাণীমূর্ত্তিতে:

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

সেখানে মানুষ তৈরি করে নি কোন দেউল—প্রকৃতিই সমুদ্রের বুকে যুগ্ম শৈলের ফলকে বহন করছে সেই পুণ্যস্মৃতি ভার।

একদা স্বামী বিবেকানন্দ এসেছিলেন এই স্থলবিন্দুতে। সাঁতার দিয়ে উঠেছিলেন এই যুগ্ম শৈলে—ধ্যানের আসন বিছিয়ে প্রজ্ঞা দৃষ্টিপাতে প্রত্যক্ষ করেছিলেন ভারতবর্ষের পরিপূর্ণ মহিমাকে। তাঁরই নামে চিহ্নিত এই যুগ্ম শৈল—বিবেকানন্দ রক। মাদ্রাজী-বন্ধুরা তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে 'বিবেকানন্দ লাইব্রেরী ও রীডিংরুম' স্থাপন করেছেন।

একদিন এক মাদ্রাজী যুবক এসে আমন্ত্রণ জানালেন পাঠাগার দেখবার জন্য। সরকারী ছত্রমের নীচেই চমৎকার এক টুকরো জায়গায় ছোট্ট একটি বাড়ী—সামনে মরসুমী ফুলের কেয়ারী করা একটু লন। কাঠের ফলকে উৎকীর্ণ বিবেকানন্দ লাইব্রেরী ও রীডিংরুম। ওঁরা স্বামীজীর স্মৃতিকে আরও উজ্জ্বল করে ধরে রাখার চেষ্টা করছেন। পাঠাগারে এসে বসলাম। টেবিল ঘিরে সংবাদপত্র পড়ছেন বহু পাঠক। সারি সারি কাচের আলমারীতে রয়েছে ইংরেজী, বাংলা, তামিল, তেলেগু, মালয়ালম্ প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত রামকৃষ্ণ সাহিত্য—স্বামী বিবেকানন্দের সমগ্র রচনাবলী। বাংলার প্রজ্ঞা আর মনীষা ভারতবর্ষের শেষপ্রান্তে এমনি করেই গৌরবের আসনখানিতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হয়েছে। আমরা যত অখ্যাত আর সামান্য হই না কেন মনে হ'ল এই গৌরবের অংশভাগী আমরাও।

কয়েকখানি মন্তব্য বই এঁরা দেখালেন। তাতে দেখলাম, ভারতবর্ষের বহু মনীষী শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন স্বামীজীকে। খুব বড় জায়গা নয় কন্যাকুমারী: মাত্র সাত হাজার মানুষের বাস। তার মধ্যে পাঁচ হাজার খ্রীষ্টান। এদের গীর্জ্জা রয়েছে, হোটেল রয়েছে। সরকারী রেষ্ট-হাউস ছাড়া ঘর ভাড়াও পাওয়া যায়। আমিষ-নিরামিষ দু'রকম খাদ্যই মেলে। মোটকথা অসুবিধা বিশেষ ভোগ করতে হয় না। যা কিছু দেখাশোনা দু'এক ঘণ্টার মধ্যেই শেষ করা যায়। তবু পুরাতন হয় না কন্যাকুমারী। এই তিনটি সমুদ্র মিলে চিরনূতন করে তুলেছে স্থানটিকে! অপরূপ প্রকৃতিকে দেখে দেখেও ক্লান্ত হয় না চোখ—মন বলে না পূর্ণকাম হয়েছি, আর না।

তিনটি দিন মাত্র ছিলাম এই পুণ্যভূমিতে—মনে হয়েছিল আরও কয়েকটা দিন যদি থাকতে পারতাম! সমুদ্র পুরীতে দেখেছি, মাদ্রাজে দেখেছি, রামেশ্বরম্ বা দ্বারকায় দেখেছি কিন্তু কন্যাকুমারীর তিন সমুদ্রের মিলিত রূপ অনন্য। এখানে যেন ভারতবর্ষকে দেখিয়ে দেবার, চিনিয়ে দেবার জন্য শক্তিশালী দূরবীণ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন কুমারী মাতা। সকলের চোখে লাগে না এই যন্ত্র, কিন্তু যার চোখে ধরে সে আর্য্য-সংস্কৃতির পরিপূর্ণ রূপটিকে উপলব্ধি করতে পারে তার অন্তর্নিহিত বাণী-মন্ত্রকে—জ্ঞান ও কর্ম্মযোগের দ্বারা বাহিরের বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে। তেমনি করেই ভারতবর্ষের পরমসত্তাকে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই চিকাগো ধর্ম্ম মহাসভায় ভারতের অমরবাণীকে পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন পরিব্রাজক বিবেকানন্দ।

কন্যাকুমারী থেকে একদিন অপরাহ্ণে শুচিন্দ্রম দেব-দেউল দেখতে গিয়েছিলাম। দূরত্ব মাত্র আট মাইল—অনবরত বাস যাতায়াত করছে। সুস্থির হয়ে দেখার পক্ষে এইটিই ভাল। যাঁরা ট্যাক্সি করে ত্রিবান্দ্রাম থেকে

কন্যাকুমারীতে আসেন তাঁরা সুযোগ ঘটলে কয়েক মিনিটের জন্য শুচিন্দ্রম-দেউলে কটাক্ষপাত করে যান। সে দেখার লাভ তাঁরাই বলতে পারেন। অবশ্য এ কথাও তাঁরা বলতে পারেন—দক্ষিণের প্রত্যেকটি দেউল খুঁটিয়ে না দেখলেই বা ক্ষতি কি! সেই একই ধরনের গোপুরম —গোপুরমে পৌরাণিক কাহিনীর সমাবেশ, স্তম্ভে, অলিন্দে যে শিল্পকার্য্য তারও ধারাটা সর্ব্বত্র প্রায় অভিন্ন। দেবতার সামনে নন্দীকেশ্বর বৃষ কিংবা গরুড় মূর্ত্তি, স্বর্ণাকৃতি স্তম্ভ, অলিন্দ-চত্বর, লিঙ্গমূর্ত্তির গঠন রীতি একই ধরনের, আর প্রধান মূর্ত্তি ঘিরে অসংখ্য দেব-দেবীরাও সকল গোত্রের—লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণপতি, সুব্রহ্মণ্য, নবগ্রহ, চন্দ্র, সূর্য্য, ইন্দ্র প্রভৃতি। ভোগ আরতি পূজা চলে বাঁধাধরা নিয়মে—নারিকেল ভোগ কর্পূরের আরতি বিভূতিপ্রসাদ আর দক্ষিণার জন্য পুরোহিতের ভণিতা। বাইরে থেকে উপর উপর দেখতে গেলে এইটাই মনে হয়, কিন্তু তারকেশ্বরে মহাদেবকে দেখে আমরা বৈদ্যনাথ বা বিশ্বেশ্বরকে দেখতে ছুটি কেন? কেন পশুপতিনাথ, অমরনাথ, কেদারনাথ প্রভৃতি দুর্গম শৈলতীর্থে জীবন-মৃত্যুর দোলায় দুলতে দুলতে ধেয়ে বেড়াই। স্থান-মাহাত্ম্য আছে বলেই ত দক্ষিণ দেশেও রামেশ্বরম্ দেখে মাদুরা দেখতে ভুলি না, কিংবা মাদুরা দেখেও শ্রীরঙ্গনাথজীকে দেখতে আসি। এ সব মন্দির কেউ বিশালতায়, কেউ সৌন্দর্য্যে—কেউ বা ব্যাপ্তিতে খ্যাতি লাভ করেছে। শিল্পরীতি, দ্রাবিড়ী হলেও—কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য প্রতিটি মন্দিরে আছেই। তেমনি বৈশিষ্ট্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শুচিন্দ্রম মন্দির। একে কয়েক মিনিটের দৃষ্টিপাতে চিনে নেওয়া কঠিনই।

পুরাণ-কথায় জানা যায়—এইখানে অত্রি মুনির আশ্রম ছিল। তাঁর স্ত্রী সতী শিরোমণি অনসূয়াকে পরীক্ষা করতে এসেছিলেন ব্রহ্মা বিষ্ণু আর মহেশ্বর মিলে। সতীত্বের পরীক্ষা। ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে অতিথি হয়ে এসেছিলেন ওঁরা। কঠিন একটি সর্ত্ত তুলে ধরেছিলেন সতী অনসূয়ার সামনে।

আমরা অতিথি—সৎকৃত হবার আগে একটি সর্ত্ত আছে আমাদের, সেইটি কিন্তু পালন করতে হবে।

কি আপনাদের সর্ত্ত বলুন—আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব তা পালন করতে। বলেছিলেন অনসূয়া।

আমরা খাদ্য পানীয় গ্রহণ করব তোমার হাতে—যদি সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে সেগুলি পরিবেশন করতে পার।

অকূল পাথারে পড়লেন অনসূয়া। অতিথি ব্রাহ্মণ—দেবতা—তাদের বিমুখ করলে ধর্ম্মচ্যুতি, এদিকে নারীর

কন্যাকুমারী মন্দির

শালীনতা বিসর্জ্জন দিয়ে অতিথিসৎকার—তাতেও ধর্ম্মহানির আশঙ্কা। তুলাদণ্ডে দুই-ই সমভার। অনেকক্ষণ পরে চিন্তা করলেন অনসূয়া শেষে স্থির করলেন অতিথিদের বিমুখ করবেন না কোনমতেই। স্বামী আর নারায়ণকে স্মরণ করে অতিথি ঈপ্সিত বেশেই আসবেন খাদ্য পানীয় নিয়ে। সত্যকারের ধর্মে যদি তাঁর মতি থাকে ধর্ম্মই রক্ষা করবেন। এই সঙ্কটে ধর্ম্মই রক্ষা করলেন। অনসূয়া যখন খাদ্য পানীয় নিয়ে এলেন, ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণরা তখন রূপান্তরিত হয়েছেন তিনটি সদ্যোজাত শিশুতে। জননী অনসূয়া এসে বসলেন তাদের সামনে। চারিদিকে উঠল জয় জয় ধ্বনি। শিশুরূপী সেই তিন দেবতা মিলেই শুচিন্দ্রমের শিব মূর্ত্তিতে প্রকাশ।

শিল্প-ঐশ্বর্য্যেও এ মন্দির অপূর্ব্ব। দক্ষিণী রীতি অনুযায়ী এর বিশাল গোপুরম, কারুকার্য্যমণ্ডিত স্তম্ভ, প্রশস্ত অলিন্দ, ভোগমণ্ডপ, অতিকায় নন্দীকেশ্বর প্রভৃতি। দেবতা থাকেন অন্ধকার গর্ভগৃহে—সেখানে অনুজ্জ্বল প্রদীপের আলোয় আরও রহস্যময় তিনি। তাঁকে নারিকেল ভোগ দিয়ে কর্পূরের আরতিতে প্রসন্ন করে ললাটে বিভূতি লেপনই প্রশস্ত বিধি। তার পর অন্যান্য মূর্ত্তিকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করে বেড়ানো। মন্দির ক্ষুদ্র নয়—কাজেই সমস্ত দেবদেবীকে প্রদক্ষিণ করতে বেশ খানিকটা সময় লাগে।

দুটি আশ্চর্য্য জিনিস রয়েছে শুচিন্দ্রম-দেউলে। একটি অতিকায় মহাবীর মূর্ত্তি—দ্বিতীয়টি সুরস্রাবী স্তম্ভ। মহাবীর মূর্ত্তিটি উচ্চতায় অনেকখানি। এমন বৃহৎ মূর্ত্তি দক্ষিণের অন্য কোন মন্দিরে দেখি নি—এমনকি উত্তর-ভারতে রামসীতার জন্মভূমিতেও বিরল। ত্রিবেণী তীরে এলাহাবাদ দুর্গের পূর্ব্বপ্রান্তে একটি শায়িত মহাবীর
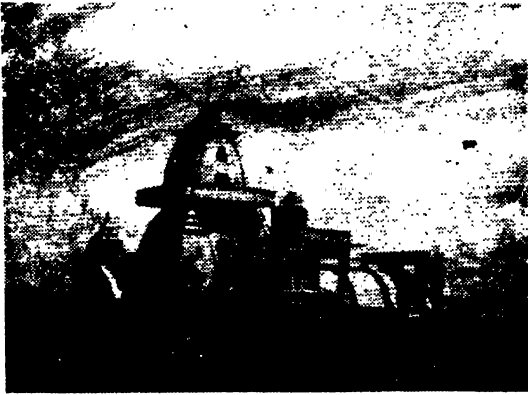
গান্ধী স্মৃতি মন্দির

মূর্ত্তি আছে—সেও এমন বিশাল নয়। আরও একটি বিরাট মহাবীর মূর্ত্তি দেখেছি নৈমিষারণ্যে—এটি তার চেয়েও বড়। শুধু বড় বলে নয়—মহাবীরের বলদৃপ্ত ভঙ্গিমাটি শিল্প-স্বাক্ষরের একটি চমৎকার নিদর্শন।

আর সুরশ্রাবী স্তম্ভ। পূর্ব্বেই বলেছি, মাদুরা মন্দিরের মোটা গোপুরমের কাছে এই ধরনের পাঁচটি স্তম্ভ আছে। বাইশটি সরু থামে মিলিয়ে এক-একটি মোটা থাম—যেন ঝুড়ি নামা বটগাছ। ওই উপ-স্তম্ভগুলিতে কান রেখে আঙুলের আঘাত করলে সুরময় যন্ত্রধ্বনি বার হবে। প্রতিটি স্তম্ভে বিভিন্ন সুর—স্বরদ গান্ধার ঋষভ নৈঠকের আরোহ অবরোহে শ্রুতিপূর্ণ হয়ে উঠবে।

প্রসঙ্গতঃ একটি কথা মনে পড়ছে। সম্প্রতিকালে একজন সাহিত্যিক ভারতবর্ষের বাইরে বেড়াতে গিয়ে এমনি সুরশ্রাবী স্তম্ভ দেখে আশ্চর্য্য হয়ে মন্তব্য করেছেন, এমন অপূর্ব্ব স্তম্ভ নাকি আর কোথাও দেখেন নি। আশ্চর্য্য হবারই কথা, দেশের সম্পদ কোথায় কি আছে ভারতীয় সংস্কৃতির ধারাটি কোন যুগ থেকে আরম্ভ হয়ে—কি ভাবে পরিপুষ্ট হয়েছে—এবং তার গতিটাই বা কোন মুখে—এ হিসাব রাখা সহজসাধ্য নয়।

এই মন্দিরের শুচিন্দ্রম নামটি আর একটি প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান থেকে সার্থক হয়েছে বলা যায়। কথিত আছে—গৌতমের শাপে অহল্যারূপমুগ্ধ ইন্দ্র ব্যাধিগ্রস্ত হয়েছিলেন—এই শুচিন্দ্রমে শিবপূজা করে তিনি শুদ্ধ হন। তারই স্মরণে এখনও প্রতি রাত্রিতে এখানে ইন্দ্রপূজা হয়।

দক্ষিণের অন্যান্য মন্দিরের মতো এই মন্দিরের শিল্পরীতি অভিন্ন। তবু আশ্চর্য্য লাগে ভাবতে কেমন করে সরল একটি ছেনি-হাতুড়ির সাহায্যে শিল্পীদল দিনের পর দিন ধরে বলিষ্ঠ রেখার বিন্যাসে সজীব করেছেন মূর্ত্তিগুলিকে—পাষাণপটে এঁকেছেন পুরাণ-কাহিনী। এসব ছবি শুধু অতীতের কথা বলে না, জীবনের কথাও বলে। সেকালের মানুষের সমাজনীতি, আচার, প্রথা প্রভৃতি চিন্তা সব কিছুকে পাষাণগাত্রে ফুটিয়ে তুলে একালের মানুষের লোকযাত্রার ছন্দটিকে সম্পূর্ণ করার প্রেরণা দেয়। ওই অতীত আর বর্ত্তমান মিলিয়ে যে ভারতবর্ষ তারই দীর্ঘকালব্যাপী পরমায়ুর হিসাবটা যেন দেব-দেউলের পাষাণগাত্রে তুলে ধরা হয়েছে। এক নিমেষে অনেক দূরকে দেখার আলো জ্বালা রয়েছে মন্দিরে মন্দিরে। সেই আলোয় আমরা দেখছি—শত শত বছরে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে উঠছে অসংখ্য ঢেউ, প্রচণ্ড ঝড় বয়ে যাচ্ছে এই সুপ্রাচীন ভূমির উপর দিয়ে; কত আক্রমণ, লুণ্ঠন, যুদ্ধ, হত্যা, ধ্বংস, ধর্ম্মান্তরিতকরণ—আগুন, তরবারি, বারুদ আর বিস্ফোরণের তাণ্ডবলীলায় থর থর করে কেঁপে উঠেছে আসমুদ্রহিমাচল—কিন্তু নিশ্চিহ্ন করতে পারে নি এই দেবভূমিকে—বা স্পর্শ করতে পারে নি তার প্রাণসত্তাকে। কি অজেয় প্রাণশক্তিতে কালের ভ্রূকুটি ঠেকিয়ে কালজয়ী হয়েছে—তার সূত্র উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম আর মধ্যভারতের অসংখ্য মন্দির, মঠ, স্তম্ভ, শিলালেখ, মাটি, কাঠ, পাথর, ধাতু প্রভৃতি শিল্পকর্ম্মে, সাধুসন্ত মহাপুরুষের কর্ম্মে ও বাণীতে ছড়িয়ে রয়েছে। অতীতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অধ্যায়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য দেব-দেউলের সঙ্গে শুচিন্দ্রম-দেউলও বেশ একটু স্থান করে নিয়েছে বইকি।

শুচিন্দ্রম দেখে কন্যাকুমারীতে ফিরতে রাত হয়েছিল। সেই রাত্রিতে তারাখচিত আকাশের নীচের শুয়ে তিনটি সমুদ্রের তরঙ্গ-সঙ্গীত শুনতে শুনতে ওই উপকরণের কথাই মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল—জীবন-রহস্যের কথা,—নিরবধিকালের কথা। কালসমুদ্রে কত অসংখ্য জীবন-তরঙ্গই না উঠে বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

> তোরে উঠি পুন—তোয়ে সমারাত
> সাগর লহরী সমানা।

তাই ত নিরবধিকালের লীলা নানা বস্তুকে আশ্রয় করে নব নব বৈচিত্র্যে নিত্য প্রকাশমান। আকাশে যেমন তারা, সমুদ্রে যেমন ঢেউ, পৃথিবীতে তেমনি আমরা অনন্ত লীলায় ক্ষণিক উপাদান হয়েও চিরজীবী। এই লীলাসূত্রটি বিধৃত রয়েছে যার তর্জ্জনীতে, সেই পরম-পুরুষের খেলার আনন্দে প্রতিদণ্ডে পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে ধরণীর বুক। আমরা মিলিয়ে যাচ্ছি বটে, জেগে উঠছিও পরমুহূর্ত্তে। আমরা যে অমৃতের সন্তান।

মিশর—নীলনদের দান

যাদুসম্রাট পি. সি. সরকার

কায়রোর যাদুঘরে এক অদ্ভুত-দর্শন প্রতিকৃতি নজরে পড়ল। একজন স্থূলকায় পুরুষমানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছেন কিন্তু তাঁর বক্ষে মেয়েদের মত স্তন (যা' দিয়ে তিনি তাঁর সন্তানের দেহপুষ্টি করবেন)। তাঁর এক হাতে রয়েছে একটি জলের পাত্র আর অন্য হাতে একটি থালার মধ্যে মাংস, মুরগী, ফল এবং নানারকম তরিতরকারি। খাঁটি মুসলমানের দেশে এই পৌত্তলিকতা কিসের দ্যোতক বুঝতে না পেরে আমার গাইডকে এই অদ্ভুতদর্শন মূর্ত্তির কথা জিজ্ঞাসা করলাম। গাইড তখন শ্রদ্ধাবনত দৃষ্টিতে উত্তর দিল—"এটাই আমাদের মিশরের নীল দেবতা হাপী, এটাই হচ্ছে মিশরের ইষ্টদেবতা সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের—(ত্রয়ীর) সংমিশ্রণ।

প্রাচীন পণ্ডিত হেরোডোটাস বলে গিয়েছেন, "মিশর হচ্ছে নীল নদের দান" (Egypt is a gift of the Nile) কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্যি। মিশর দেশের অস্তিত্ব, এর সমৃদ্ধি সমস্ত কিছুই এই নীল নদের উপর নির্ভর করে। ঊষর মরুভূমি (সাহারা)-র উত্তপ্ত বালুভূমির উপর দিয়ে তর তর করে বয়ে চলেছে নীলনদ—দু'কূল প্লাবিত করে সে তার দুই তীরে সুজলা-সুফলা-শস্য শ্যামলা তৃণভূমির সৃষ্টি করেছে। অতি দীর্ঘ এই নীলনদ, কোথায় এর উৎপত্তি কেউ তা জানত না। প্রাচীন মিশরীয়রা জানতেন স্বর্গ থেকে উৎপত্তি হয়েছে এই নীলনদের—তার পর তাদের দেশের অতি দক্ষিণে নীচে নেমে এসে (বর্ত্তমান আসোয়ান বাঁধের কাছাকাছি জায়গা থেকে) পর্ব্বত ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে। পরবর্ত্তী কালের মিশরীরা বিশ্বাস করতেন যে, আবিসিনিয়ার অন্তর্গত "চাঁদের পাহাড়" (Mountain of the Moon) থেকে উদ্ভূত হয়েছে। বর্ত্তমানকালের বৈজ্ঞানিক, ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিকগণ নীলনদের প্রকৃত উৎস সন্ধান করে ফেলেছেন—উগাণ্ডা রাজ্যের অন্তর্গত ভিক্টোরিয়া হ্রদের দক্ষিণ পশ্চিমে জিন্‌জা শহরের কাছে হয়েছে নীলনদের উৎপত্তি—রিপণ সাহেব প্রথম সেই ঝরণা ধারা বের করেছিলেন—(আমরা গত বৎসর আফ্রিকা ভ্রমণকালে সেই "রিপন ফলস্" দেখে এসেছি)।

সেই নীলনদের উৎস মূল থেকে ভূমধ্যসাগরে এর মোহনা পর্য্যন্ত এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৪০০০ চারি হাজার মাইল। ভৌগোলিকদের মতে এই নীলনদই হচ্ছে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম নদ। সবচাইতে বড় হচ্ছে মিসিসিপি মিসৌরী নদী এবং তাও মাত্র এর চেয়ে দুই-তিন শত মাইল বেশী লম্বা।

পিরামিডের সম্মুখে লেখক

প্রত্যেক বৎসর এই নীলনদে একবার করে ভীষণ জলবেগ আসে। অতি প্রাচীনকালের মিশরীয় পুরোহিত (যাদুকর) প্রত্যেক দিনের সূর্য্যোদয় এবং সূর্য্যাস্তকে পাথরের উপর দাগ কেটে কেটে হিসাব করে বুঝতে পেরেছিল যে ৩৬৫টি সূর্য্যাস্ত হবার পর একদিন (বর্ত্তমানে

হিসাব করে দেখা গিয়েছে ১৮ই জুন) হঠাৎ নীলনদের জল দু'কূল ভাসিয়ে দিয়ে নেমে আসে। যাদুকর পুরোহিত নিজের বুদ্ধিবলে ঐদিনকে আগেই বের করে —ফারাউদের সম্মুখে নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি ও যাদুকরী প্রতিভার জন্য সম্মানিত হয়েছিলেন। তখন থেকেই দিন বর্ষ-পঞ্জী-ক্যালেণ্ডারের বা পঞ্জিকার হিসাব সুরু হ'ল— প্রমাণ হ'ল ৩৬৫ দিনে বছর ঘুরে ঘুরে আসে। সেকালে মিশরীয়রা বিশ্বাস করতেন যে দেবী ইয়াসিয়া তাঁর মৃত স্বামী ওসিরিস-এর জন্য কাতর ক্রন্দন করেন এবং প্রতি বৎসর ১৮ই জুন তারিখে ঐ দেবীর পবিত্র অশ্রুর একবিন্দু নীলনদে পড়লেই নীলনদের জল ফুলে ফুলে উঠে ক্রমেই বেশী হয়ে শেষে দুই কূল ভাসিয়ে নিয়ে যায়। দেবীর কাতর ক্রন্দনের এক ফোঁটা অশ্রুবিসর্জ্জন সারা মিশরের পক্ষে হয়ে উঠে এক বিরাট আশীর্ব্বাদ বিশেষ—তাই সারা মিশরবাসী এই দেবী ইয়াসিয়াকে পূজা করতেন। বর্ত্তমানে এরা খাঁটি মুসলমান—পৌত্তলিকতা বিশ্বাস করে না, তবুও এই ১৮ই জুনের রাত্রিকে "Night of the Drop" দেবীর অশ্রুঝরার রাত্রি বলে এখনও স্মরণ করে থাকে।

মিশর নীলনদের দান। নীলনদ বয়ে গিয়েই সাহারায় আজ গোলাপ ফুল ফুটেছে। সাহারার (মিশরীয় ভাষায় সাহারা অর্থ 'মরুভূমি' আর সাহেরা অর্থ 'যাদুকর'—তাই উহারা 'সাহারা'য় 'সাহেরা'র আগমন বার্ত্তাকে অনুপ্রাসের অনুপম ছন্দে পত্রিকায় পত্রিকায় প্রকাশ করেছিল) বালুকাভূমিতে এখন সবরকম ফলফুল জন্মায়। এখানে যে তুলা জন্মায়—তা সারা পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। জলের গুণে মরুভূমিও যে এত উর্ব্বরা হতে পারে তা না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবেন না।

এই নীলনদের জন্যই মিশর তার সমৃদ্ধি, অস্তিত্ব আর বৈশিষ্ট্য নিয়ে বেঁচে রয়েছে। নীলনদের বন্যাকে বন্ধ করবার জন্য, নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য হাজার হাজার বৎসর আগে থেকেই যে দুরপনেয় চেষ্টা হয়েছিল তা থেকেই এদেশে hydralic engineering and science of land surveyingয় বিদ্যার প্রথম উন্মেষ হয়। এরা আকাশের তারা দেখে দেখে, দিন গুণে গুণে নীলনদের বন্যার দিন তারিখ সালের হিসাব করে করে এক eternal calenderএর আবিষ্কার করেছিল। নীলনদের বন্যার তারিখ হিসাব করবার উদ্দেশ্যে তাদেরকে ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষারম্ভ করতে হয়েছিল। নীলনদের উভয় পার্শ্বের ভূমিগুলিই হচ্ছে সর্ব্বাধিক উর্ব্বরা—কিন্তু বৎসরান্তে যখন দু'কূল ভাসিয়ে নীলনদের বন্যা আসে, তখন প্রত্যেক জমির মালিকদের সীমারেখা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়—চিহ্নমাত্রও থাকে না। ফলে এরা নিজেদের জমির পরিমাণ বর্গ হিসাবে লিপিবদ্ধ করতে এবং জ্যামিতিক হিসাবে বিধিবদ্ধ করতে শিখেছে। এদের মধ্যে চিরস্থায়ী স্বত্ব এবং ন্যায়ের শাসন এই ভাবেই প্রবর্ত্তনে সহায়তা করেছে এদের নীলনদ। আর এই ভাবেই নীলনদের মাধ্যমে এ দেশের সামাজিক, আইনগত এবং রাজনৈতিক সর্ব্ববিধ উন্নতি ও চর্চ্চা এই ভূখণ্ডে প্রবর্ত্তন হয়েছে—শত সহস্র বৎসর ধরে। মিশরের পিরামিড প্রাচীন পৃথিবীর অত্যাশ্চর্য্য বস্তুর অন্যতম। যেখানে এই মানুষের তৈরী পর্ব্বত গড়া হয়েছে তার হাজার মাইল দূরে রয়েছে পর্ব্বত। নীলনদের জলপথে প্রাচীন মিশরীয়রা তাদের কিস্তি চালাত আর ঐ জলপথেই সুদূর দক্ষিণের পর্ব্বত থেকে বিরাট বিরাট পাথরের খণ্ড বয়ে নিয়ে এসে তৈরী হয়েছিল এদেশের পিরামিড-গুলি।

মিশরে পিরামিড আছে অনেকগুলি। বর্ত্তমান রাজধানী কায়রো শহরের অনতিদূরে (মাত্র সাত মাইল) গেলে অনেকগুলি পিরামিড এবং স্ফিনিক্স দেখতে পাওয়া যায়। ঐগুলি সত্যি সত্যি যেন মানুষের হাতে সৃষ্ট পর্ব্বত (man-made mountains) বিশেষ। ইংরেজীতে প্রবাদ আছে যে "A country unsun, is a country unknown" অর্থাৎ যে দেশে কখনও যাওয়া হয় নি সে দেশের কিছুই জানা হয় নি। তা বাদেও এই বিপুলা ধরিত্রীর কতটুকুই বা আমরা জানি? এতকাল জানতাম পিরামিড হচ্ছে এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। ত্রিভুজাকৃতি এক অদ্ভুত-দর্শন মন্দির মধ্যে সেকালের ফারাউ বা রাজা রাণীদের মৃতদেহ (ম্যমী) একপ্রকার "ম্যমীকেসের" কফিনের মধ্যে সংরক্ষিত হত। এই পিরামিড হচ্ছে সেকালের রাজাদের স্মৃতিসৌধ বিশেষ। তারা মনে করতেন, মৃতদেহের আত্মা—ঐ দেহের আসে-পাশেই বিচরণ করে থাকে—তাই প্রাচীন মিশরীয়রা মৃতদেহকে সযত্নে রক্ষা করতেন—তার চারিপাশে ধন-দৌলত খাট-পালঙ্ক সব কিছু সাজিয়ে রাখতেন। কথা-গুলি সবই সত্যি—তবে এই পিরামিডের প্রস্তুত কৌশল, এর আয়তন প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ধারণা খুব কমই ছিল। আমার পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই হয়ত জানেন যে, কায়রো শহরের পাশে গিজা নামক এলাকায় যে অনেকগুলি পিরামিড আছে—তার মধ্যে তিনটি হচ্ছে সব চেইতে বড়। খ্রীষ্টজন্মের ২৬৯০ বৎসর পূর্ব্বে রাজা খুফু (চিওপস্) যে পিরামিডটা তৈরী করেন তাতে ঐ

একটি পিরামিডে ২'৩ লক্ষ প্রস্তরখণ্ড ব্যবহৃত হয়েছে যার প্রত্যেকটি খণ্ডের ওজন ২॥ টন প্রায় ৬৭ মণ। ঐ পিরামিডের প্রকৃত উচ্চতা হচ্ছে ৪৮১ ফুট এবং ৪,৯০,২৭,৭৯২ বর্গফুট স্থান অধিকার করে রয়েছে। দৈর্ঘ্য প্রস্থ হিসাব করলে দেখা যাবে এই পিরামিড প্রস্থে ৭৪৬ ফুট। কিভাবে ঐ বিরাট্ বিরাট্ পাথরগুলি হাজার মাইল দূর থেকে আনা হল আর সাহারার বালুকা-ভূমিতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সাজিয়ে সাজিয়ে এই বিরাট্ স্তূপ সৃষ্ট হ'ল এটা এক মহা বিস্ময় বিশেস! অপর দুইটি পিরামিডের মধ্যে একটি ওর ৪০ বৎসর পর সৃষ্ট (খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২৬৫০)। সিফারেন কর্তৃক তৈরি পিরামিডের উচ্চতা ৪৭০ ফুট অর্থাৎ মাত্র ১১ ফুট কম এবং তৃতীয় পিরামিডের উচ্চতা হচ্ছে ২১৭ ফুট এবং ২৬০০ খ্রীষ্টপূর্ব্ব সময়ে, অর্থাৎ দ্বিতীয়টির পঞ্চাশ বৎসর পর এইটি তৈরী হয়েছিল। এর পাশেই রয়েছে The sphinx—এবং কবে কার হাতে এটি তৈরী হয়েছিল সে কথা কেউ বলতে পারেন না। পিরামিড তৈরির অনেক আগে থেকেই এর অস্তিত্ব রয়েছে, আর এর আয়তনও কম নয়, ১৬০ ফুট লম্বা, ৬৬ ফুট উচ্চতায় এবং এর এক একটা কানই হচ্ছে ৪॥ ফুট লম্বা।

"স্ফিনিক্স" হচ্ছে প্রাচীন মিশরীয়দের একটি দেবমূর্ত্তি। পৌত্তলিকতা বিশ্বাসীদের ঐ প্রতিমূর্ত্তি কালের প্রহরী হয়ে এখনও যুগযুগান্ত ধরে নীরবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পৌত্তলিকতা-বিরোধীদের হাতে ক্ষত-বিক্ষত নাসিকাচ্যুত হয়ে "Father of Terror" মূর্ত্তি এখনও প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ দর্শককে পৃথিবীর কোন কোণ থেকে যাদুকরে টেনে নিয়ে আসছে। এখানে বৃষ্টি হয় না বললেই চলে—কাজেই এদেশের প্রতিমূর্ত্তিগুলি সব অমর, অক্ষয় হয়ে রয়েছে। পাঁচ হাজার বৎসর আগেকার সামগ্রী, আঁকা পট, কারুকার্য্য এখনও ঝক্ ঝক্ করছে। কায়রো যাদুঘরে প্রাচীনকালের কারুশিল্প, প্রাচীরচিত্র, মূর্ত্তি, তৈজসপত্রাদি যেভাবে সুরক্ষিত হয়েছে তার থেকে পাঁচ হাজার বছর আগেকার সময়কার সমস্ত নিদর্শন, ইতিহাস, জীবনযাত্রার মান এবং প্রণালী স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়।

ওদের প্রাচীরচিত্র থেকে (আমাদের অজন্তা ইলোরার মতো ওদের পাথরের মূর্ত্তি মন্দিরের গায়ে খোদিত কারুকার্য্য—পুরী, কোনারক, ভুবনেশ্বর মন্দিরের মতো), ওদের প্রাচীন তৈজসপত্র ব্যবহৃত অন্যান্য দ্রব্যাদি (আমাদের মহেঞ্জোদারোর মতো) দেখে দেখে প্রাচীন মিশরের জীবনযাত্রার ইতিহাস খুঁজে বের করা হয়েছে। সেকালের দ্রাক্ষাবন, কিভাবে সেকালের রাজা-রাণী ফারাউরা নৌকাবিলাস করতেন, চাষ-আবাদ করা হ'ত

কায়রো শহরে একটি আকাশ-চুম্বী বাড়ী

কিভাবে আঙ্গুর থেকে সোমরস তৈরি করা হ'ত, তাদের শস্য মাড়াই করা হ'ত সব কিছুই ওদের প্রাচীন চিত্র থেকে জানতে ও বুঝতে পারা যায়। আজ মিশরে ৩০।৩৬ তলা বাড়ী তৈরি হচ্ছে, আজ এর শহরে আলো ঝলমল করছে—মরুভূমির শহরে কৃত্রিম ফোয়ারার জল উঠে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের জয় ঘোষণা করছে। কিন্তু এই মিশর তার এই সমৃদ্ধি সব কিছুই অতি প্রাচীন যুগ থেকে পেয়ে এসেছে—সবই এই নীলনদের দৌলতে।

এককালে পৃথিবীতে দুইটি শহর সমৃদ্ধিশালী ছিল—একটি রোম এবং অপরটি আলেকজান্দ্রিয়া। দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দার যখন তাঁর রাজধানী নির্ম্মাণের জন্য প্রকৃষ্ট স্থানের খোঁজ করছিলেন, তখন ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ কূলে নীলনদের মোহনায় যে স্থানটি নির্দ্দেশ করেন সেইটিই

'আলেকজান্দ্রিয়া' নামে প্রসিদ্ধ। মিশরীরা বলেন—"সেকেন্দ্রিয়া"—এটি বর্ত্তমান মিশরের দ্বিতীয় রাজধানী। নীল নদের অববাহিকা এলাকায় স্থষ্ট আলেকজান্দ্রিয়া শহর এখনও বিশেষ সমৃদ্ধিশালী। প্রায় ২৩০০ বৎসর আগে (৩৩৩ খ্রীষ্টপূর্ব্ব) দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দার দি গ্রেট তৎকালে পারসীয়দিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করে এই নগরীর পত্তন করেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান গরিমায় এখানকার শিক্ষা-কেন্দ্র জগৎপ্রসিদ্ধ। অতি প্রাচীনকালে এখানে জ্যোতিষ শাস্ত্র, ভূগোল, জ্যামিতি, হাইড্রোষ্টাটিকস্ প্রভৃতি বিদ্যার উন্মেষ হয়েছিল। আলেকজান্দ্রিয়ায় লাইব্রেরী জগৎ-প্রসিদ্ধ। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে Demetrius Phalerus – the orator পৃথিবীশ্রেষ্ঠ বাগ্মী, Appelles and Antiphilus—the painter সেকালের পৃথিবী-শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী, Euclid, Archimedes ও Eratothenes—the mathematician পৃথিবীশ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ-গণ, Erasistratus ও Herophilus—the physicians পৃথিবীশ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণ, Aristarchus—the grammarian পৃথিবীশ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণিক, Sosigenes—the astronomer, পৃথিবীশ্রেষ্ঠ জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ্, Demetrius—the philosopher পৃথিবীশ্রেষ্ঠ দার্শনিক, Strabo the traveller & historian, পৃথিবীখ্যাত পরিব্রাজক ঐতিহাসিক এরা সকলেই এই আলেক-জান্দ্রিয়ার শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষালাভ করে গিয়েছেন। কালের নির্ম্মম ইতিহাসে কত শক্তির উত্থান-পতন হয়েছে। দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দারের মৃতদেহ (৩২৩ খ্রীঃ পূঃ) ব্যাবিলোন থেকে এনে এই নীলনদের তীরে সমাহিত করা হয়েছে। এখানে এন্টনী-সুন্দরী ক্লিয়োপেট্রা থেকে আরম্ভ করে আধুনিককাল পর্য্যন্ত ফারুক রাজত্ব করে গিয়েছেন। নীলনদকে যতই দেখি ততই এর অসীম করুণার কথা বার বার স্মরণে আসে। সত্যি, মিশর এই নীলনদেরই দান।

—০—

বসন্তাগমে

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

আমি শুনিলাম হাজার মিলিত গীতি
কুঞ্জে যখন বসিনু সঙ্গোপনে,
মধু মনোভাবে তখন সুখদ স্মৃতি
দুঃখ চিন্তা আনিল আমার মনে।

প্রকৃতি তাহার শোভন সৃষ্টি সাথে
মানবাত্মারে মিলালো যা মোর মাঝে,
এই ভেবে মোর হৃদি কাঁপে শোকাঘাতে
করেছে মানব কি-না মানবের কাজে!

সবুজ কুঞ্জে ভাঁটের গুচ্ছ মাঝে
মালতীলতায় জড়িয়ে ধরেছে তারে;
মোর বিশ্বাস—হেথা যত ফুল রাজে
ভুঞ্জে বাতাস, শ্বাস-নিশ্বাস ছাড়ে।

পাখীগুলি মোর চারিধারে নাচে খেলে,
বুঝিতে পারি না তাহাদের মনোভাব—
ছোট্ট গতিটি যাহা করে অবহেলে
বুঝিনু সুখের হয়েছে আবির্ভাব।

কচি শাখাগুলি ছড়ায়ে তাদের পাতা
মৃদু-বায়ু তারা সাদরে ধরিয়া রহে;
অবশ্য এই জানি, কথা নহে যা-তা,
সেথা আনন্দ সেথা আনন্দ বহে।

স্বর্গের থেকে এলো বিশ্বাস এই,
প্রকৃতির পূত মতলব এই সাজে,
তা হোলে খেদের কারণ কি মোর নেই
করেছে মানব কি-না মানবের কাজে!

(William Wordsworth-এর "Written In Early Spring" কবিতাবলম্বনে।)

কেরালার অধিবাসী

শ্রীভারতজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

আগেকার ত্রিবাঙ্কুর আর কোচীন রাজ্য দুটি মিলে এখনকার কেরালা প্রদেশ গঠিত। পাহাড়ে ঘেরা এই ছোট্ট প্রদেশটিতে বাস করে বহু আদিম নরগোষ্ঠি। বিচিত্র তাদের জীবনযাত্রা। বিচিত্র তাদের সামাজিক আচার বিচার। সভ্যতার সংস্পর্শ থেকে বহু দূরে পাহাড়ের উপর গভীর অরণ্যে তারা বাস করে। শহর-সভ্যতার মাপকাঠিতে তারা যদিও অশিক্ষিত কিন্তু জীবন তাদের শান্তিময়, এই শান্তিপ্রিয় আদিম জাতিরা নিজেদের প্রয়োজন মতো কেরালার পার্ব্বত্য অঞ্চলগুলিকে ভাগ করে নিয়েছে। কেউ কারও সীমানার মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করে না। নিজেদের মধ্যে তাই কোনও দ্বন্দ্ব নেই। প্রত্যেকটি গোষ্ঠির এক-একটি করে নাম আছে। যেমন কাদার, মালয়ালী, ইজুড়া, কোঙ্কনী। জাতি হিসাবে যদিও তারা বিভিন্ন কিন্তু তাই বলে একে অন্যকে হিংসা করে না। তাই এদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ বড় একটা দেখা যায় না।

আগেকার কোচীন রাজ্যের নেল্লীয়াথপাত্তি আর কোতাসেরী পাহাড়েই সাধারণতঃ কাদারদের ঘন বসতি। তা ছাড়া কোয়েম্বাটুর জেলার অন্নামালাই পার্ব্বত্য অঞ্চলেও এদের সামান্য বসবাস দেখা যায়। কোচীনের বসবাসকারী কাদাররা এক মিশ্র ভাষায় কথা বলে। এর মধ্যে তামিল আর মালায়ালম ভাষার অনেক শব্দ দেখতে পাওয়া যায়। যারা আন্নামালাই অঞ্চলে বাস করে তাদের ভাষা একটু অন্য রকম। এই ভাষাটিকে বলা হয় মালাসির। মনে হয় এই ভাষা তামিলেরই অপভ্রংশ।

অন্যান্য আদিবাসীদের তুলনায় কাদারদের সংখ্যা অনেক কম। মাত্র ৩১০ জন। এর মধ্যে ১৬১ জন পুরুষ আর বাকী ১৪৯ জন স্ত্রীলোক।*

ডাঃ টোপিনার্ড তাঁর বিখ্যাত পুস্তকে ভারতের জনসমষ্টি প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন কৃষ্ণ, মোঙ্গলিয় আর আর্য্যবংশ সম্ভূত। দাক্ষিণাত্যের পার্ব্বত্য অঞ্চলগুলিতে যে কৃষ্ণবর্ণের আদিবাসী দেখা যায় তাঁর মতে এরাই হ'ল সেই কৃষ্ণগোষ্ঠির বংশধর। কিন্তু গায়ের রং ছাড়া কৃষ্ণগোষ্ঠির আর কোনও পরিচয়ই এদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না। এই কারণেই টোপিনার্ডের সঙ্গে এই ব্যাপারে অনেকে একমত হতে পারেন নি। নৃতাত্ত্বিক ডেনিকারের মতে এরাই হ'ল প্রাচীন দ্রাবিড় গোষ্ঠির অশিক্ষিত বংশধর। আন্নামালাই পার্ব্বত্য অঞ্চল বহুকাল ধরে আদিম অধিবাসীদের রক্ষা করেছে আর্য্য আক্রমণের হাত থেকে। তাই এই অঞ্চলেই দেখতে পাওয়া যায় পুল্যা, থড়ুবা গোষ্ঠীর লোকেদের, দেখতে পাওয়া যায় কাদারদের নিশ্চিন্তচিত্তে বাস করছে নিজেদের সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। ডেনিকার এ সম্পর্কে আরও বলেন,

There is good evidence to show that the first arrivals in India were a black people, most probably Negritos, who made their way from Malayasia round the Bay of Bengal to the Himalayan foot Hills, and thence spread over the Peninsula without ever reaching Ceylon. At present there are no distinctly Negrito communities in the land . . . . . . but distinctly Negrito features crop up continually in all the uplands from the Himalayan slopes to Cape Comorin over again Ceylon. . . . . . . Certainly many thousands of years ago.*

বহুকাল আগে নেগ্রীটো গোষ্ঠী এদেশে এসেছিল। যদিও বর্ত্তমানে তার কোনও চিহ্ন নির্দ্দিষ্ট ভাবে নেই। তবুও যদি এখনকার ঐ পার্ব্বত্য কৃষ্ণকায় অধিবাসীদের নেগ্রীটো-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে যদি ধরে নেওয়া যায় তবে তা খুব ভুল হবে না। আর্য্যরা এদেরকে কোনও দিনই পরাজিত করতে পারে নি। তাই আর্য্য-সভ্যতার কোনো চিহ্নই এদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না।

মানুষ কি কারণে সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করবার প্রেরণা পায় এ কথার সদুত্তর দেওয়া বোধ করি আজও কঠিন। তবে মনে হয় ব্যক্তিগত নিরপত্তার প্রয়োজনেই মানুষ দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করবার প্রয়োজন অনুভব করে। সম্ভবত এই আত্মরক্ষার জন্যই কাদার-রাও

* Census Report.

*Races of man.

দলবদ্ধ হয়ে বসবাস আরম্ভ করে। বসবাস করার জায়গা সম্পর্কে কিন্তু এরা বড় সচেতন। বনের কাছে যেখানে নদী আছে অথবা জঙ্গল, যেখানে একটু পাতলা সেই রকম জায়গা দেখে তবেই এরা বসবাস করা ঠিক করে। গ্রামকে এরা বলে পাথী। দশ থেকে পনেরটি ঘর নিয়ে একটি গ্রাম বা পাথী হয়। ঘরের দেওয়াল বেশীর ভাগই বাঁশের তৈরী। আবার দু'একটা কাঠের দেওয়ালও চোখে পড়ে। ঘরের চালও তৈরী হয় বাঁশের ছ্যাঁচা দিয়ে। চেরা বাঁশ কাঠের ফ্রেমের মধ্যে আটকিয়ে তৈরী হয় ঘরের দরজা। জানালার কোনও বালাই নেই। একটি দরজা দিয়েই তাদের সব রকম কাজ সারা হয়। ঘরের চালা বাঁধবার জন্যে জঙ্গল থেকে সংগৃহীত শুকনা বন্য-লতা অথবা এক রকমের লম্বা ঘাস তারা ব্যবহার করে। এই ত গেল ঘরের বাইরেকার অবস্থা। ঘরের মধ্যে মেঝের খানিকটা অংশ একটু উঁচু করা থাকে। ঐ অংশতে শোওয়ার ব্যবস্থা। ঘাসে-বোনা এক রকম চাটাইয়ের বিছানাই একাধারে তাদের লেপ, তোষক আর কাঁথার অভাব দূর করতে সাহায্য করে। বর্ষার সময় ঘরের মেঝে ভিজে যখন স্যাঁত-স্যাঁতে হয়ে যায় তখন আবার এই বিছানা সহজেই সরিয়ে ফেলতে পারে কোনও নিরাপদ জায়গায়। এ ছাড়াও ঐ উঁচু জায়গা বর্ষার নানারকম বিষাক্ত পোকার কামড়ের হাত থেকেও তাদের রক্ষা করে। ঘরের মধ্যে কোণের দিকে থাকে জলন্ত এক অগ্নিকুণ্ড। এ ছাড়া ঘরের মধ্যে থাকে গৃহস্থালির সামান্য উপকরণ যেমন—হাতে-বোনা কয়েকটা বাড়তি চাটাই, রান্নার জন্যে কাঠের হাতা বা দু'একটা মাটির বাসন। প্রয়োজন যেমন তাদের কম, আসবাবও তেমনি অত্যন্ত অল্প।

জঙ্গলে যাদের বাস তাদের কাছে আগুনের দরকারই বোধ হয় সব চাইতে বেশী। জঙ্গলের মধ্যে যদি হঠাৎ আগুনের দরকারই হয় তখন কোথায় বা পাবে দেশলাই। দেশলাই-এর ব্যবহারও তাদের মধ্যে নেই। যা আছে তাই দিয়ে আগুন জ্বালানও ত কম হাঙ্গামার ব্যাপার নয়। চকমকি পাথরের উপর লোহার টুকরো ঠুকতে হবে অনবরত, ঠুকতে ঠুকতে যদি বা একটু আগুনের ফুলকি বেরুল তাও হয়ত আবার হাতের চেটোয় বন্দি শোলার গায়ে লাগল না। তখন আবার ঠোকো! এই ভাবে বাড়ে বাড়ে ঠুকে শেষটায় আগুন হয়ত ধরল, কিন্তু ততক্ষণে আগুনের দরকারও বোধ হয় শেষ হয়ে গিয়েছে। এই কারণেই দেখা যায় আদিবাসীরা আগুন জ্বালিয়ে রাখতে সব সময়েই সচেষ্ট। নিউগিনির পাপুয়াই হউক, বা অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীই হউক অথবা আমাদের দেশের কাদার উপজাতিই হউক, সবার কুটীরেই দেখা যায় অগ্নিদেব বিরাজ করছেন সর্ব্বক্ষণ আর বেশ গৌরবের সঙ্গেই। ভক্তের দলও তাঁর ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যে সদাই ব্যস্ত। এ ব্যাপারে মেয়েদের দায়িত্বই সব চাইতে বেশী। জল রাখবার ব্যবস্থাটিও বড় সুন্দর। মস্ত বড় একটা বাঁশের টুকরোকে দু'দিকের দুটো গিঁটশুদ্ধ কাটা হয়। টুকরোটা লম্বায় প্রায় দুই থেকে তিন গজ। পরে বাঁশের মধ্যেকার গিঁটগুলোকে গরম লোহার শিক দিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হয়। তখন এই টুকরোকে বলা হয় "কুস্তম্"। কুস্তম্ যে কেবল ঘরেই থাকে তাই নয়; দূরপথে যাবার সময় এটাকে আবার কাঁধে করে বয়ে নিয়েও যাওয়া চলে। আমরা যেমন কোথাও যেতে হলে জলভর্ত্তি একটা ফ্লাস্ক, কাদাররাও তেমনি সঙ্গে নিয়ে যায় জলভর্ত্তি একটা কুস্তম্। দু'তিন দিনের জল এতে সহজেই ধরে। দূর-পথে পাড়ি দিতে এদের কোনো অসুবিধাই হয় না। কারণ পথের ধারের জঙ্গলে বাঁশ অথবা শুকনো পাতার ত আর অভাব নেই। পথের উপর তাই দিয়ে ঘর বাঁধতে আর কতক্ষণ। আর সঙ্গে ত জল আছেই। তবে আর ভাবনা কি? পথে যাওয়ার কথা যদি ধরা যায় তাতেই বা ভাবনা কোথায়। জঙ্গলে প্রচুর কচুগাছ আছে। দরকারমত দু'চারটা কচু তুলে নিয়ে বেশ করে থেঁতলে জলের সঙ্গে মেখে খেলেই ত হ'ল। জীবন-যাত্রার ব্যবস্থা এত সহজ বলেই বোধ হয় কাদারদের রোজগারের সন্ধানে লোকালয়ের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না।

কাদারদের জীবনযাত্রা যেমন সাদাসিদে, তাদের বিয়ের ব্যবস্থাও তেমনি অতি সাধারণ। মন্ত্রতন্ত্রের বড় একটা বালাই নেই। বাপ-মাকেও বিয়ের জন্যে অনাবশ্যক দুশ্চিন্তা ভোগ করতে হয় না। কারণ বিয়ের ব্যবস্থা পাত্র-পাত্রীরা নিজেরাই ঠিক করে নেয়। মেয়ে বড় না হলে এদের মধ্যে বিয়ে হয় না। আর মেয়ে যখন বড় তখন নিজের স্বামীকে কেনই বা নিজে দেখে পছন্দ করে নেবে না? তাই বলে যাকে খুশী তাকেই বিয়ে করবার কোনও উপায় নেই। এ ব্যাপারে সামাজিক আইন কিন্তু বড়ই কড়া। প্রথমতঃ পাত্রী যদি পাত্রের বাবার কোনও আত্মীয়া হয়, যেমন পিসীমার অথবা ঠাকুরদার বোনের মেয়ে হয় তবে সেই মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হবে না। আবার যদি প্রকাশ পায় যে, পাত্র-পাত্রী একই গোষ্ঠীর তবে বিয়ে তখুনিই নাকচ হবে। বিয়ের ব্যাপারে এই দুটি আইন সবাইকেই মানতে হয়।

এ ছাড়া আর কোনও আইন বিশেষ একটা চোখে পড়ে না। মেয়ে বড় হলেই তার জন্যে তৈরী হয় একটা নতুন কুঁড়ে ঘর। পুরো ছ'দিন তাকে ঐ ঘরে একলা থাকতে হয়। সাত দিনের দিন স্নান করে তবে মেয়েটি শুদ্ধ হয়। ঐ দিন কাদারদের কাছে বিশেষ উৎসবের দিন। সাত দিন আগের কোনও দিনে যদি মেয়েটি স্নান করে, তবে যে পুকুরে সে স্নান করবে সেই পুকুরের জলও কেউ ভয়ে ছোঁবেন না পাছে তাদেরকে ভূতে ধরে।

বিয়েতে এদের বিশেষ কোনও যৌতুক দেবার নিয়ম নেই। কেবল মেয়ের বাবা আর মাকে একটি করে নতুন কাপড় দিতে হয়। পাত্রের অবস্থা যদি ভাল হয় তবে মেয়ের কাকা, ভাই আর বোনেদের ভাগ্যেও কিছু উপহার মিলে যেতে পারে।

নির্দ্ধারিত দিনে বর তার বন্ধুবান্ধব নিয়ে যায় কনের বাড়ী। পাত্রীপক্ষ অভ্যর্থনা করে নিয়ে যায় বরযাত্রীদের বিয়ের আসরে। এগিয়ে দেয় তাদের ঘাসের মাদুর বসবার জন্যে। শুরু হয় নাচগান আর খাওয়া-দাওয়া। শেষে আরম্ভ হয় বিয়ের আসল অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটি বড়ই সুন্দর। প্রথমে বরকনে সামনাসামনি গিয়ে দাঁড়ায় বিশেষ ধরনের তৈরী নতুন মঞ্চের উপর। মঞ্চটি কনের ঘরের সামনে থাকে। বরকনেকে ঘিরে শুরু হয় আবার একপ্রস্থ নাচ আর গান। নাচগানের পর ছেলের মা সোনা অথবা রূপার হার বেঁধে দেয় পাত্রীর গলায়, মেয়ের বাবা বরের মাথায় পরিয়ে দেয় একটা নতুন কাপড়ের পাগড়ি। দু'জনের কড়ে আঙুল সূতো দিয়ে বাঁধা হয়ে গেলে পর বর-বৌ একবার মঞ্চের চারিপাশ প্রদক্ষিণ করে। এর পর তারা দু'জন গিয়ে বসে মাদুরের উপর। এখানে কনে হাতের পান-সুপারী বরের হাতে দেয়। বরও আবার তাই ফিরিয়ে দেয় তার গিন্নির হাতে। বিয়ের অনুষ্ঠানও রাত্রের মতো এখানেই শেষ হয়ে যায়। পরের দিন বর-বৌ চলে যায় তাদের নিজেদের গাঁয়ে। সেখানেও চলে খাওয়া-দাওয়া আর নাচ-গান দু'দিন ধরে।

এদের মধ্যে অন্যভাবেও বিয়ে হয়। যেমন কোনো ছেলে গ্রাম ছেড়ে চলে গেল অন্য কোনো গ্রামে। এক বছর সেখানে ঘর করে বাস করল। এরই মধ্যে সে ঠিক করে নেয় কোন্ মেয়েকে সে বিয়ে করবে। বছরের শেষে নিজের বাড়ী ফিরে গিয়ে প্রথমে অনুমতি নেয় গ্রামের মোড়লের কাছে। যদি অনুমতি মেলে তবেই কিন্তু বিয়ে হবে। বিয়ের অনুষ্ঠান কিন্তু একই রকম। তফাতের মধ্যে হ'ল এই যে, পাত্রকে যৌতুক দিতে হয় তার ভাবী পত্নীকে। পরিমাণ ঠিক করা হয় পাত্রের এক বছরের আয়ের উপর। এদের প্রথার সঙ্গে আফ্রিকার বুসম্যান-দের বিয়ের অনুষ্ঠানের বেশ একটা মিল চোখে পড়ে।

বিয়ে হয়ে যাবার পর বর-বৌকে কঠোর নিয়ম মেনে চলতে হয়। কোনোওরকম বাচালতা যদি কারুর চোখে পড়ে তবেই বিপদ। কঠোর সামাজিক দণ্ড তখন তাদের ভোগ করতেই হবে। এই সমস্ত কারণেই বোধ হয় কাদার রমণীদের দৈহিক পবিত্রতা অনেকটা প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে। এখনও দেখা যায় দিনের পর দিন স্বামী-স্ত্রী বাস করছে একই ঘরের মধ্যে অথচ তাদের মধ্যে কোনোরকম কথাবার্ত্তাই নেই। দেখে মনে হয়, তাদের মধ্যে এমনি ঝগড়া হয়েছে যে, বাক্যালাপ পর্য্যন্ত একেবারে বন্ধ। ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। এদের সামাজিক আইনই হ'ল যে, কর্ত্তা-গিন্নী নিজেদের মধ্যে কথা বলবে খুবই কম। আর তাই এরা নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলেছে সেই মান্ধাতার আমল থেকে। বিয়ের পর কাদার-গৃহিণীদের দেখা যায়, তারা কাপড় পরছে কোমরে গিট বেঁধে। কাঁধের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে গিয়ে কোমরের কাছে আঁচল গুঁজে রেখেছে। সন্তান ধারণের সময়ে তারা একটু অন্যরকম ভাবে কাপড় পরে। তখন দেখা যায় তারা বুকের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেশ শক্ত করে এঁটে এমনভাবে কাপড় পরে যাতে করে প্রায় গোড়ালি অবধি ঢাকা পড়ে। সন্তান প্রসবের জন্যে তৈরি হয় এক নতুন কুঁড়ে ঘর। প্রসবের আগে ভূতের ওঝাকে ডাকা হয়, সে এসে আগে মন্ত্র পড়ে ঘর থেকে অপদেবতা তাড়িয়ে দেয়। ঘর পবিত্র হলে পর প্রসূতি ঘরের মধ্যে যেতে পারে। এদের মধ্যে পেশাদার ধাত্রী নেই। সাধারণতঃ বৃদ্ধারাই এই কাজ করে থাকে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর স্নান করিয়ে দেওয়া হয় গরম জল দিয়ে। তিন মাস ধরে মাকে খাওয়ান হয় ঘরের-তৈরি ওষুধ। পথ্যের ব্যবস্থা হ'ল ভাত আর নারকেল তেল। আঁতুড় ছেড়ে মা তার ছেলেকে নিয়ে ঘরে ঢুকবার অনুমতি পায় প্রায় দশ দিন পরে। ছয় থেকে সাত মাস অবধি শিশু একমাত্র মাতৃদুগ্ধ ছাড়া আর কিছুই খেতে পায় না। সাত মাস পর তাকে ভাত আর কাঁজির জল খেতে দেওয়া হয়। নামকরণ হয় জন্মের ঠিক এগার মাস পরে। আত্মীয়দের আনন্দধ্বনির মধ্যে ছেলের বাবা শিশুর মুখে তিনবার জল ছিটিয়ে দেয়। ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে কোনোও নাম ধরে তিনবার খুব জোরে জোরে ডাকে। এত জোরে ডাকে যে সেই নাম উপস্থিত সবাই যেন শুনতে পায়। সবাই তখন ছেলেটির

ঐ নামই মেনে নেয়। নামকরণের পর বাবা ছেলের মুখে একটু ভাত দিয়ে দেয়। অন্নপ্রাশন এই ভাবেই শেষ হয়। এই উৎসবে ছোটখাট রকমের ভোজেরও ব্যবস্থা থাকে। নিয়ম হ'ল গ্রাম্য বৃদ্ধদের আমন্ত্রণ জানাতেই হবে। কাদারদের মধ্যে মেয়েদেরও অন্নপ্রাশন হয়। সেই সঙ্গে মেয়েদের কানও বিঁধিয়ে দেওয়া হয় ভবিষ্যতে গয়না পরবার জন্যে। কানে ছুঁচ বিঁধবার আগে মেয়ের কাছে জলন্ত প্রদীপ রেখে মন্ত্র পড়ে পূর্ব্ব-পুরুষদের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনার পর ছুঁচ ফুটিয়ে দেওয়া হয়। সামাজিক অবস্থা এদের মোটামুটি এইরকম।

আর্থিক অবস্থা কিন্তু এদের মোটেই ভাল নয়। জঙ্গল থেকে কাঠ কুড়িয়ে এনে কাছাকাছি বাজারে বিক্রি করাই হ'ল এদের প্রধান উপার্জ্জনের উপায়। সেই আদিম যুগ থেকে আরম্ভ করে প্রায় ইংরেজ আমলের আগে অবধি এই অবস্থাই চলে আসছিল। ইংরেজ আমলেই অবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন দেখা দেয়। এই সময়ে অনেক ইংরেজ শিকারী তাদের দেশে আসত শিকার করতে। শিকারীদের পথ দেখিয়ে দিয়ে তারা কিছু বকশিস লাভ করত। শিকারী যদি লোক ভাল হ'ত তবে তাদের ভাগ্যে মোটা বকশিসই মিলে যেত। কখনও কখনও বুনো হাতী ধরার কাজে সাহায্য করেও এরা আয় বাড়াবার সুযোগ পেত।

কাদারদের মধ্যে শিক্ষার অভাব লক্ষ্য করে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে এক মিশনারী প্রতিষ্ঠান শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করে। উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হয় নি তার প্রমাণ মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই ছাত্র অভাবে মিশন স্কুলটিকে উঠিয়ে দেওয়া হয়। অবশ্য বর্ত্তমানে অবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন হয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের উপজাতি কল্যাণ দপ্তর এদের আর্থিক আর সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্যে সচেষ্ট হয়েছে। বলা বাহুল্য, প্রয়োজনের তুলনায় তা অতি সামান্য।

অবস্থা তাদের যাই হোক না কেন একথা আমাদের মানতেই হবে যে, এরাই সত্যিকারের ভারতবাসী। ইতিহাস-পূর্ব্ব যুগের কথা জানতে হলে এদের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার আমাদের মানতেই হবে। কারণ এরাই হ'ল আমাদের দেশের "ইতিহাস-পূর্ব্ব যুগের জীবন্ত উদাহরণ"।*

* Races of Man.

এ মোর মনপক্ষী ভীরু উড়ুক ডানা মেলে

শ্রীবিভা সরকার

রুদ্ধ আশার গোলাপ আমার
এমনি করেই ফুটবে কি
হায়! বিরহের কণ্টকাকুল কুঞ্জকানন তলে!
আসবে কি সে ফুল ফোটাতে
গন্ধমদির মৌ লোটাতে
ভুল ভোলাতে আপন চোখের জলে?
জমেছে আজ অনেক ধুলো
অনেক ফাঁকি এলোমেলো
অনেক ব্যথা চিত্ত নদীর তলে।
শূন্য হৃদয় পাত্র মম
করবে কি তায় পূর্ণতম
এই জীবনের অমৃত রস ঢেলে।

সব ভোলানো আসবে যে আজ
সত্য করি সকল অকাজ
মোর দিগন্তে রভস আভাস মেলে!
দু'পায় দলি পথের কাঁটা
শেখাও প্রিয় পথে হাঁটা
রেখ না আর আমায় দূরে ফেলে
চলতে পথে কতই মানা
সে ত তোমার নয় অজানা
চলতে শেখাও সকল বাধা ঠেলে।
এস এস অন্ধকারে ওগো জ্যোতির্ম্ময়
ঘুচাও বৃথা লজ্জা আমার, আমার সকল ভয়
এবার মনপক্ষী ভীরু উড়ুক ডানা মেলে!

নবজাতকের প্রতি*

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

অজানা রহস্যে ঘেরা অনন্তের কূল হতে ভাসি'
যে প্রাণকণিকাটুকু পৃথিবীর প্রান্তে পড়ে আসি
পৃথিবী পরম স্নেহে বক্ষ পুটে লয় তারি তুলি।
মর্ত্ত্যের অন্তরখানি হৃদয়ের দ্বার দেয় খুলি,
সূর্য্য দেয় তারই তরে অফুরাণ আলো। উপচার
বাতাস তাহারই তরে বহে আনে প্রাণ পারাবার
মৃত্তিকা জোগায় তারে অমৃতের প্রসন্ন প্রসাদ
নদাজল তারই লাগি' আপনারে করে মধুস্বাদ
আকাশ ধরিয়া রাখে সীমাহীন চির ভালবাসা
পথের পাথেয় দেয় অনির্ব্বাণ মাতৃবক্ষ আশা।

নিখিল বিশ্বের ধন
আমার ঘরের ধন হয়ে,
যে ঘর করেছ আলো পূর্ণিমার রংখানি লয়ে,
বিশ্বের সমস্ত গান কলকণ্ঠে ভর নিয়ে চুপে'
অপূর্ব্ব সুরের জালে বিকশিছ নিত্য নবরূপে
তাইতো পাই না ভেবে উচ্চারিব কোন মন্ত্রখানি
যে মন্ত্রে ধ্বনিত হবে তোর উপযুক্ত আশীর্ব্বাণী।
তবু ওরে শিশু ভোলানাথ
অজস্র আশিস মোর
রাখিতেছি সবাকার সাথ
সহস্র প্রাণের স্পর্শে দীপ্ত হোক প্রাণশিখা তব
সহস্র কর্ম্মের মাঝে সে শিখা জ্বলুক অভিনব।

* তপতী চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

মুক্তির সন্ধানে ভারত—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। তৃতীয় সংস্করণ—১৩৬৭। ৫৫৪ পৃঃ। দাম দশ টাকা।

কুড়ি বৎসর পূর্বে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ভূমিকা ও আশীর্বাদ লইয়া এই গ্রন্থখানি প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। পাঁচ বৎসর পরে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয়। তিন-চার বৎসরের মধ্যেই এই সংস্করণও নিঃশেষিত হয়। সুদীর্ঘকাল প্রায় বারো বৎসর পরে ইহার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, উপন্যাসপ্রিয় বাঙালী পাঠকসমাজেও এই গ্রন্থের আদর হইবে। তাঁহার বাণী সার্থক হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি যে বঙ্গ সাহিত্যের একটি বিশেষ অভাব পূরণ করিয়াছে সে বিষয়ে ইহা অপেক্ষা দৃঢ়তর প্রমাণ আর কিছু হইতে পারে না।

যখন এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় তখন ভারত মুক্তির সন্ধানে ব্যস্ত ছিল। ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগস্ট সেই মুক্তি লাভ হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে এই সময় পর্যন্ত ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহা কেবল মুক্তি সংগ্রামের কাহিনী নহে। পারিপার্শ্বিক যে সমুদয় ঘটনার সাহায্যে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছিল—এবং ধীরে ধীরে শিক্ষা, সাহিত্য, ও ধর্মের প্রভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ক্রমশঃ পরিবর্তন করিতে সমর্থ হইয়াছিল—সে সমুদয়ই লেখক সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে ভারতে যে নবযুগের সূচনা হইয়াছিল তাহার চিত্রও এই গ্রন্থে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে।

স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলিয়াছিলেন যে, বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি। কথাটি খুবই সত্য। সেই জন্যই ঊনবিংশ শতাব্দীর গৌরবময় ইতিবৃত্ত বাঙালীর নিকট সুপরিচিত নহে। এই যুগে বাংলাই যে ভারতের শিক্ষাগুরু ছিল এবং বাংলা দেশেই নবযুগের সূচনা হইয়া ক্রমে ক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষে বিস্তৃত হইয়াছিল, এই গ্রন্থে তাহার কতকটা পরিচয় পাওয়া যাইবে। কংগ্রেসের পূর্ব যুগে ইংরেজী শিক্ষার ফলে কিরূপে বাঙালীর রাষ্ট্রচেতনা প্রবুদ্ধ হইয়াছিল, এবং তাহার ফলেই যে সঙ্ঘবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত ও বিকাশ হয়, গ্রন্থের প্রথমেই ইহা বিবৃত হইয়াছে। এই নবযুগের প্রবর্তক রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া নিখিল ভারতের মধ্যে এক রাষ্ট্রীয় চেতনার স্রষ্টা সুরেন্দ্রনাথের ভারতসভা প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে আলোচিত হইয়াছে। অনেকে মনে করেন যে, কংগ্রেসই নিখিল ভারতের প্রথম রাজনৈতিক অনুষ্ঠান এবং হিউম সাহেবই ইহার জনক। কিন্তু ভারতসভার উদ্যোগে ১৮৮৩ সনে কলিকাতায় যে জাতীয় সম্মেলনের অধিবেশন হয় তাহাকেই নিখিল ভারতের প্রথম রাজনৈতিক সম্মেলন বলা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। আলোচ্য গ্রন্থে এই সম্মেলনের উল্লেখ আছে কিন্তু ভারতের মুক্তি সংগ্রামে ইহার গুরুত্ব কত তাহা বিশেষ ফুটিয়া উঠে নাই। কংগ্রেসের উৎপত্তি সম্বন্ধে গ্রন্থকার যাহা লিখিয়াছেন—তাহার সম্বন্ধেও আপত্তি করার যথার্থ কারণ আছে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

প্রথম কুড়ি বৎসরে কংগ্রেসের বিভিন্ন অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত বিবরণের পরে গ্রন্থকার বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের কালে সমগ্র ভারতে রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা, আদর্শ ও কর্মধারার কিরূপ পরিবর্তন সাধিত হইয়া ভারতে প্রকৃত জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল সে সম্বন্ধে বেশী কিছু বলেন নাই। বঙ্গে বিপ্লববাদের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধেও বিশেষ আলোচনা করেন নাই। কিন্তু এ সমুদয় ত্রুটি সত্ত্বেও এই খণ্ডে গ্রন্থকার ঐ যুগের কাহিনী বেশ নিরপেক্ষভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তার পরে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পটভূমিকায় যে দ্রুত পরিবর্তন হয় গ্রন্থকার তাহার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস দিয়াছেন। তিনি মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। কিন্তু ইহার যে প্রথম সূত্রপাত বা অনুষ্ঠান হয় খিলাফতের জন্য—ভারতের মুক্তির জন্য নয়—সে সম্বন্ধে পাঠকের মনে স্পষ্ট কোনো ধারণা করা সম্ভব হইবে না। যে কারণে সত্যাগ্রহ স্থগিত হইল সেই প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে গ্রন্থকার বিশেষ কিছু বলেন নাই। ১৯৩৪ সনে সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখা সম্বন্ধেও এই আপত্তি করা যাইতে পারে। কোনো কোনো স্থলে গ্রন্থকারের সাধারণ উক্তি ভ্রান্তি সৃষ্টি করার সম্ভাবনা। ১৯৩৭ সনের নির্বাচন সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন যে, "নির্বাচনের শেষে সকলেই বুঝিল জনগণের চিত্তে কংগ্রেসের আসন অটল" (৩৯৪ পৃঃ)। কিন্তু এ মন্তব্য কেবল হিন্দুর সম্বন্ধে প্রযোজ্য, মুসলমান জনগণের সম্বন্ধে নহে। ১৯৩৭ সনের পর হইতে স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত এই দশ বৎসরের ইতিহাস বেশ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, আলোচ্য গ্রন্থখানিতে ব্রিটিশ-যুগে ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে বহু তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার তথ্যসংগ্রহের দিকেই ঝোঁক দিয়াছেন, বিচারমূলক আলোচনা যথাসম্ভব বর্জন করিয়াছেন। ইহা বুঝাইবার জন্যই এরূপ কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়াছি। গ্রন্থকার সম্ভবতঃ মনে করেন যে, এইরূপ বিচার বিতর্কের সময় এখনও আসে নাই। সুতরাং তাঁহার গ্রন্থখানি পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার ইতিহাস বলিয়া ধারণা করিলে তাঁহার প্রতি অবিচার করা হইবে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন—ইহা ইতিহাসের একটি কাঠামো মাত্র। গ্রন্থখানিকে সেই দিক দিয়াই বিচার করিতে হইবে। গ্রন্থকার ইতিহাস না লিখিলেও বহু পরিশ্রম ও আয়াস সহকারে যে সমুদয় উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের কাজে লাগিবে। আর যাঁহারা সংক্ষেপে আমাদের জাতীয় জাগরণের ক্রমবিকাশের মূল তথ্যগুলি জানিতে চান তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিলে বিশেষ উপকৃত হইবেন। দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণতা সত্ত্বেও যে যোগেশবাবু এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত করিয়াছেন তাহার জন্য দেশবাসীর পক্ষ হইতে আমি তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইতেছি।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

স্মৃতিচারণ—শ্রীদিলীপকুমার রায়। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং, প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা। পৃঃ ৩১৩। দাম বার টাকা।

দিলীপকুমার রায়ের কৈশোর ও যৌবনকালের বিপুলায়তন স্মৃতিকথা বিশেষ করে উপভোগ্য এ জন্যে যে, তিনি নিজের কথা "রসিয়ে" ও "ভজিয়ে" বলতে গিয়ে তার সঙ্গে বলেছেন এমন অনেক মানুষের কথা যা পড়তে, জানতে, বুঝতে পাঠকের ভাল লাগে। সমস্ত গ্রন্থখানা জুড়ে যার ব্যক্তিত্ব ও মাহাত্ম্য সবচেয়ে বেশি ফুটে উঠেছে, তিনি দিলীপকুমার নিজে নন, তাঁর পিতৃদেব, নাট্যকার, কবি, সঙ্গীতপ্রিয়, হাস্যরসিক ও স্বাধীনচেতা নির্ভীক, বুদ্ধিচালিত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। শৈশবে মাতৃহারা দিলীপকুমার পিতার স্নেহে, বন্ধুত্বে মানুষ হন। তাঁর মানস-গঠনে পিতৃদেবের যতটা প্রভাব ততটা আর কারুর নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য-নাটক-বিচারে তিনি হয়ত স্থানে স্থানে ক্ষমণীয় পক্ষপাতিত্বে দুষ্ট, কিন্তু যে গভীর শ্রদ্ধা ও তথ্য-নিষ্ঠার সঙ্গে পিতৃ-চরিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন তার সাহিত্যিক মূল্য অনেক। সঙ্গে সঙ্গে শৈশব ও কৈশোরের কথা বলতে গিয়ে তিনি অন্যান্য যাঁদের সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী তথ্য ও তত্ত্ব পরিবেশন করেছেন তাঁদের মধ্যে নিশিকান্ত লাহিড়ী, নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদার, লোকেন্দ্রনাথ পালিত, এবং সুরেশচন্দ্র সমাজপতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। দিলীপকুমারের কাহিনী-বর্ণনার মৌলিক বিবরণ আছে, তিনি পাঠককে নির্দিষ্ট মানুষটির বড় কাছে এনে উপস্থিত করতে পারেন। দ্বিতীয় খণ্ডে যাঁদের কথা তিনি বলেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন কীর্তিমান অনেকে, যথা : সুভাষচন্দ্র বসু, আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু, প্রমথ চৌধুরী, অতুলপ্রসাদ সেন, সপত্নী ড. ধর্মবীর, শরৎকুমার দত্ত, রোমাঁ রোলাঁ, বার্ট্রাণ্ড রাসেল, রবীন্দ্রনাথ। তাঁর কয়েকজন সঙ্গীতশিক্ষক, যথা : সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, জানকী বাই, অচ্ছন বাই, নন্দুবাবু। ধর্মপ্রসঙ্গে তিনি যাঁদের কথা বলেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন বরদাচরণ মজুমদার ও সাহেব-বৈষ্ণব শ্রীকৃষ্ণপ্রেম। সবাই জানেন দিলীপকুমার বিদগ্ধ অথচ অনুভূতিপ্রবণ স্পন্দনময় মন নিয়ে দেশে-বিদেশে যত জ্ঞানী, গুণী ও মানীর সঙ্গে মিশেছেন, ভারতবর্ষে ততো বোধ করি আর কেউ করেন নি। বলবার ও লিখবার বস্তু তাঁর অপর্যাপ্ত এবং উভয় কর্মই তার প্রিয়।

দিলীপকুমারের জীবন নদীর মত, যত চলে তত বলে। শৈশব থেকে অনেক বড় মানুষের নিবিড় সান্নিধ্যে তিনি এসেছেন ; এঁরা সবাই ছায়া রেখে গেছেন তাঁর মনে। কিন্তু বহু কূল স্পর্শ করেও তিনি চলেছেন আপন গতিতে, যেমন চলে নদী মোহনার টানে, যে-মোহনার নাম দিলীপকুমারের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। ছোটবেলা হতে ধর্মের প্রতি তাঁর যে নিগূঢ় অনুরাগ, তা তাঁকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এনেছে ; তাঁর স্বধর্মে সুপরিণতি হয়েছে। সাহিত্য, কলা, দেশপ্রেম, সঙ্গীত সব কিছুর কথা বলতে গিয়ে বার বার তিনি ধর্মের অবতারণা করেছেন যেহেতু জীবনে অনেক পাথেয় পাবার সৌভাগ্য সত্ত্বেও ধর্মকে তিনি শ্রেষ্ঠ পাথেয় রূপে বরণ করেছেন। ফলে এই স্মৃতিচারণের একটা প্রধান আকর্ষণ ধর্মপ্রাণ বা ধর্মে অনুরক্ত পাঠকের জন্য যতটা রক্ষিত, সাধারণের জন্য ততটা নয়। এর সাহিত্যিক মূল্য প্রচুর, যা নিয়ে আমরা স্বভাবত এর বিচার করব। দিলীপকুমার বাংলা দেশের, ভারতের ও য়ুরোপের সাহিত্য-সঙ্গীত-রাজনীতি-ক্ষেত্রে অনেক মহান চরিত্রের সঙ্গে পাঠকের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিয়েছেন ; সঙ্গীত সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক ও চিন্তাকর্ষক কথাও কম বলেন নি। তাঁর জীবনবেদ ধর্মীয় হলেও জীবনকে রসিকের দৃষ্টিতে তিনি দেখেছেন, সাধু-সন্তের চোখে নয়। তিনি যোগী, কিন্তু প্রধানতঃ তিনি শিল্পী।

তাঁর কলমে অনেকের চরিত্র সুন্দর ফুটে উঠেছে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি সুন্দর হয়ে ফুটেছে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পরে অতুলপ্রসাদের চরিত্র। এই বিশিষ্ট মানুষটির কথা দিলীপকুমার যদি আরও বিস্তৃতভাবে বলেন, কিংবা তাঁর কাব্য-সঙ্গীত-জীবন ও আশ্চর্য মানবিকতা নিয়ে সম্পূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন, তা হলে বঙ্গসাহিত্য উপকৃত হবে। পিতৃদেবের পরে দিলীপকুমার যে পরম প্রতিভাশালী মানুষের ব্যক্তিত্বে ও আদর্শে যৌবনে সবচেয়ে বেশি প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন তাঁর নাম সুভাষচন্দ্র বসু। সুভাষচন্দ্রের কথা স্মৃতিচারণে অনেক আছে, কিন্তু দিলীপকুমার অন্যত্রও এসব কথা একাধিকবার বলেছেন বলেই হয়ত মনকে তা খুব বেশি দোলা দেয় না। বীর-চরিত্রকে (হিরো) আদর্শের দৃষ্টিতে দেখা দিলীপকুমারের মজ্জাগত অভ্যাস ; যেহেতু জীবন রহস্যময় এবং মনুষ্য-চরিত্র পরস্পরবিরোধী ধারায় প্রবাহিত, সেহেতু এই আদর্শ-নিষ্ঠ দৃষ্টি না সম্পূর্ণ, না সর্বাংশ বাস্তব। জীবনী লিখতে গিয়ে আমাদের দেশে মানুষকে কেবল বড় করে দেখানই রীতি ; নিষ্ঠার সঙ্গে দিলীপকুমার এ রীতি মেনে চলেছেন। ফলে তিনি যা দিয়েছেন তা পর্যাপ্ত হলেও প্রায় কোনও ক্ষেত্রে পূর্ণ পরিচয় নয়। বোধ হয় তিনি নিজেও জানেন না যে, এ মন্তব্য তাঁর নিজের কৈশোর ও যৌবন সম্বন্ধেও কিছুটা প্রযোজ্য। ভূমিকায় তিনি সাফাই দিয়েছেন যে, নিজের কথা বিরাট করে বলা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। পাঠক কিন্তু ভাববেন, আরও ফলাও করে তাঁর বলা উচিত ছিল অনেক কথা। অনেক কিছু তিনি বলেছেন যা না বললে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু নিজের সঙ্গীত, সাহিত্য, শিল্পী-জীবন সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া তাঁর কর্তব্য ছিল মনে করি।

দিলীপকুমার স্মৃতিচারণে নিজের পরিচয় দিয়েছেন "সুর-সুধাকর"। নিজের কথা বলতে গিয়ে তিনি অহমিকা-দোষে দুষ্ট হন নি, বরং বার বার বিনয় প্রকাশ করেছেন, যার প্রয়োজন ছিল না। তাঁর চেয়ে অনেক লঘু-কর্ম বাঙালী বর্তমান কালে আত্মজীবনী রচনা করেছেন ; এক্ষেত্রে তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠিত। যে-কালে বাঙালী প্রধানত সঙ্গীত-বিমুখ ছিল, সেকালে সঙ্গীতের সুর-ও-ভাব-সুধা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে দিলীপকুমার যে অগ্রণীর কাজ করেছেন তাতে আত্মজীবনী রচনার অধিকার খোপার্জিত। বাঙালী এখনও জীবনী রচনা করে না, তাই স্বধর্মে স্থিতকীর্তি মানুষদের বসে বসে আত্মজীবনী লিখতে হয়। তাতে তাঁরা নিজের কথা হয়ত একটু "ফলিয়ে' বা "ভজিয়ে" বলেন, কিন্তু যা তাঁরা দেন তার সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক মূল্য অনেক। দিলীপকুমার কবি, সাহিত্যিক, বাগ্মীবাহ, সাধক। কিন্তু তিনি যদি স্ব-মূল্যায়ন "সুর-সুধাকর" নির্ধারণ করে থাকেন, তাঁকে সাবাস দেব। কারণ উত্তরকালের বাঙালী তাঁকে এই ভূমিকাতেই জানবে, মানবে।

পরিশেষে বলতে হবে, স্মৃতিচারণের রচনা-শৈলীতে কষ্টদায়ক দোষ আছে, পরবর্তী সংস্করণে যার শোধন অবশ্যকর্তব্য। সর্বাপেক্ষা পীড়াদায়ক এর আপাত শেষহীন পুনরাবৃত্তি। সাময়িক পত্রে প্রকাশের সময় দিলীপকুমার আবেগভরে লিখে গেছেন, বার বার একই কথা বলেও হয়ত ধরতে পারেন নি। কিংবা পাঠকের কাছে ঐ পুনরাবৃত্তি স্বাগতই হয়েছে। কিন্তু পুস্তকাকারে প্রকাশের আগে সমস্ত পাণ্ডুলিপির সুষ্ঠু সম্পাদনা করা যেমন ছিল তাঁর কর্তব্য, তেমনই প্রকাশকের। বস্তুতঃপক্ষে, পুনরাবৃত্তি সবগুলি বাদ গেলে স্মৃতিচারণ অধিকতর সুখপাঠ্য হবে,

আয়তন অনেক কমবে, সঙ্গে সঙ্গে মূল্যও। বর্ত্তমানে রবীন্দ্রনাথের একই কবিতাংশ দুই বার উদ্ধৃত, যীশুখ্রীষ্টের একই বাণী বারংবার; একই প্রসঙ্গ, একই কথা, এক চিন্তা বহুবার। দিলীপকুমারের রচনাভঙ্গীর অন্যান্য দোষ দেখাবার মানে হয় না, কেননা আমরা এঁদের সঙ্গে বহু পরিচিত, এবং এসব সত্ত্বেও ভাষার লালিত্য, চিন্তার তীক্ষ্ণতা, মননের স্বচ্ছতা, অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির ব্যাপকতা ও সর্বোপরি নিবিড় সত্যনিষ্ঠা উঁর সাহিত্য-কর্ম্মের প্রতি বারংবার আমাদের আকর্ষণ করেছে। তথাপি তাঁকে স্মৃতিচারণ সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন করি: তিনি ওয়ার্ডসওয়ার্থ থেকে শ' পর্যন্ত যতগুলি উদ্ধৃতি দিয়েছেন তার অধিকাংশের কি কোনোও প্রয়োজন আছে?

শ্রীচাণক্য সেন

ভারত-কোষ—(নমুনা সংখ্যা): বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-প্রকাশিত। পৃঃ ১৬

বাংলার মনন সাহিত্য ও গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অবদান অতুলনীয়। সম্প্রতি পরিষৎ সাধারণ শিক্ষিত বাঙালীর উপযোগী একখানি প্রামাণিক কোষ-গ্রন্থ প্রণয়নে ব্রতী হইয়াছেন। ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে উহা প্রকাশিত হইবে। গ্রন্থোদ্দেশ্যে বাংলার খ্যাত পণ্ডিতজনের সমন্বয়ে একটি সম্পাদক সমিতি গঠিত হইয়াছে। গ্রন্থটি প্রকাশ করিতে অন্যূন দুই বৎসরকাল সময় লাগিবে।

সম্প্রতি উক্ত কোষ-গ্রন্থের একটি নমুনা সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদের অভিমত সংগ্রহই উহার প্রধান উদ্দেশ্য। নমুনা-স্বরূপ ভারত-কোষের কয়েকটি প্রসঙ্গ উহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। উহাতে বাংলার চিন্তাশীল মনস্বীগণের রচনা স্থান পাইয়াছে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার-লিখিত 'বৌদ্ধধর্ম্ম', শ্রীরাজেশ্বর মিত্রের 'ভারতীয় সঙ্গীত', শ্রীত্রিদিবনাথ রায়ের 'ভারতের ইতিহাস বৃটিশ যুগ', ভবতোষ দত্তের 'ভারতের মুদ্রা ব্যবস্থা' শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের 'মাকড়শা ও রকেট' এবং প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ্ শ্রীনির্ম্মল কুমার বসুর 'মানববিদ্যা' প্রবন্ধগুলি পাঠক সাধারণের চিন্তার খোরাক জোগাইবে সন্দেহ নাই। এইরূপ সুলিখিত প্রবন্ধের সমন্বয়ে ভারত-কোষ প্রকাশিত হইলে বাংলা মনন সাহিত্যে উহা এক বিশিষ্টতম অবদানরূপে গৃহীত হইবে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-কর্তৃপক্ষের এই নবতম প্রচেষ্টার জন্য তাঁহারা বাঙালী-মাত্রেরই অভিনন্দনযোগ্য।

শ্রীগোপিকামোহন ভট্টাচার্য্য

নয়া মানবতাবাদ—(একটি ইস্তাহার) মানবেন্দ্রনাথ রায়। অনুবাদক গোপাল দাস। রেনেসাঁস বুক ক্লাব পাবলিসার্স। কলিকাতা - ১৯ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৩্, পৃষ্ঠা ৭৬।

মানবেন্দ্রনাথ রায় (পিতৃ দত্ত নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য) প্রণীত New Humanism এর অনুবাদ। মানবেন্দ্রনাথ কেবলমাত্র রাজনৈতিক নেতা বা বিপ্লবী যোদ্ধা ছিলেন না তিনি এযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক ও জড়বাদী দার্শনিক। তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি নয়া মানবতাবাদের দর্শন। চলতি মার্কসবাদ ও গণতন্ত্রবাদ ত্যাগ করিয়া তিনি যেদিন নয়া মানবতাবাদের পথ খুঁজিয়া বাহির করিলেন, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় চিন্তার ইতিহাসে সে দিনটি স্মরণীয়। রুশ কম্যুনিজমের তাত্ত্বিক ভিত্তিহীনতার অগণতন্ত্রতার নিষ্ফলতা তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। রুশ মার্কা সমাজতন্ত্রের বিকল্প পন্থা পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র। এবস্তুটিও মেকি বাক-সর্ব্বস্ব নির্ব্বাচকেরা ভোট দিয়াই খালাস সব কিছু করণীয় নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের। ব্যক্তি-স্বাধীনতা সংবিধানে সুরক্ষিত কিন্তু বাস্তবে নয়। এই জন্যই ফ্যাসিবাদের উৎপাত দেখা দিয়েছিল। এম এন. রায় কম্যুনিজম্ ও পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের বাহিরে তৃতীয় পথের সন্ধান দিয়াছেন। "স্থানীয় পঞ্চায়েতের উপর ভিত্তি করে যখন এক পিরামিড্ আকারের রাষ্ট্র গড়ে উঠবে তখনই রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে জনগণ সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণের সুযোগ পাবে।"

এ বিকেন্দ্রীয় স্বায়ত্তশাসনের কল্পনা নূতন নহে। শ্রীঅরবিন্দ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মহাত্মা গান্ধী, সম্প্রতি জয়প্রকাশ নারায়ণ এই কথাই বলিতেছেন। এম এন রায়ের বৈশিষ্ট্য এই বিকেন্দ্রিত রাষ্ট্র-কল্পনাকে ভাবালুতা হইতে মুক্ত করিয়া খাঁটি যুক্তির উপরে দাঁড় করান এবং ইহার স্বপক্ষে একটি আন্দোলন সৃষ্টি করা। প্রায় বার বৎসর পূর্ব্বে মানবেন্দ্রনাথ যে বীজ পুঁতিয়াছিলেন আজ আমরা উহার অঙ্কুর উদ্গম হইতে দেখিতেছি। ফললাভ করিতে এখনো বহু দেরী।

পুস্তকের প্রথম দিকে সংক্ষেপে (৩৬ পৃষ্ঠা) মানবেন্দ্রনাথ রায়ের (১৮৮৭-১৯৫৪) জীবনী দেওয়া হইয়াছে। বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে এযুগে বহু বিপ্লবী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু একাধারে বিপ্লবী, রাজনৈতিক নেতা, দার্শনিক এবং আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্ম্মবীর ও চিন্তানায়ক খুব কমই দেখা যায়। এরূপ অদ্ভুত মানুষ মানবেন্দ্রনাথের একখানি পূর্ণাঙ্গ জীবনী আজও বাংলা ভাষায় লিখিত হয় নাই। ১৯১৫ হইতে ১৯৩০ নাগাদ পর্যন্ত তিনি পৃথিবীর নানা দেশে নানা বিপ্লবের মধ্যে এবং শ্রেষ্ঠ বিপ্লব নায়কগণের সম্পর্কে কাটাইয়াছেন। লেনিন, ষ্ট্যালিন, ট্রটস্কি, বরোদিন কেহই বাদ যায় নাই। কিছুকাল রাশিয়ার সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মপরিষদের তিনি অন্যতম সদস্য ছিলেন। মেক্সিকো, চীন, এশিয়া ও ইয়োরোপের নানা দেশ তিনি ইচ্ছায় এবং অনিচ্ছায় বসবাস এবং ভ্রমণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহার জীবনের অভিজ্ঞতা এবং গভীর জ্ঞানানুশীলনের ফলস্বরূপ তাঁহার নব মানবতাবাদ দর্শন সম্বন্ধে এযুগে শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে রায় মহাশয় অধ্যাত্মবাদী ছিলেন না তিনি জড়বাদী দার্শনিক বা materialistic philosophers এজন্য তাঁহার মতে "যাকে আত্মা বলা হয় তা জীবনের বিভিন্নমুখী বিকাশের যোগফল মাত্র। জীবন হচ্ছে পদার্থিক একটা রাসায়নিক প্রক্রিয়া।"

নয়া মানবতাবাদের মূল সূত্র বাইশটি। ইহাতে "যুক্তিকে একটা জৈবিক বৃত্তি" "চিন্তা দৈহিক ক্রিয়া মাত্র" বলা হইলেও বলা হইয়াছে "মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও সত্যানুসন্ধিৎসা মানবপ্রকৃতির মূল প্রেরণা।" সুতরাং এম-এন রায়ের দর্শন অধ্যাত্মবাদীর মতে অ-নীতিক হইলেও দুর্নীতিক নহে। তাঁহার বস্তুবাদ-জড়বাদ কিন্তু ইহা অদ্বৈতবাদী দর্শন সন্দেহ নাই।

পুস্তকে এম-এন রায়ের যৌবনের একখানি ছবি দেওয়া হইয়াছে। 'পরিচিতি' লিখিয়াছেন ঐতিহাসিক ডাঃ অতীন্দ্রনাথ বসু এম-পি।

এইরূপ সদগ্রন্থের আগামী মুদ্রণে আমরা নির্ভুল ছাপা ও সুন্দর বাধাই আশা করিব। মানবেন্দ্রনাথের গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া শ্রীগোপাল দাস বাংলা রাজনৈতিক সাহিত্য সমৃদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

রম্যাণি বীক্ষ্য—শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্ত্তী। এ. মুখার্জ্জী অ্যাণ্ড কোং (প্রাইভেট) লিঃ। ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ মূল্য সাত টাকা।

বিশাল দেশ এই ভারতবর্ষ। হাজার হাজার বছর ধরে বহু মনীষী ও ঋষি-কবির অবদানে এর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলটি পরিপুষ্ট হয়েছে। দেশের ভূমি-প্রকৃতির মতো এটিও বৈচিত্র্য ভরা। লোকযাত্রার ছন্দটিকে সুসম রাখার উদ্দেশ্য হলেও এই সংস্কৃতির মূলদেশ প্রসারিত রয়েছে সমুমণ্ডলের অভ্যন্তর ভাগে। সাহিত্যে, শিল্পকর্ম্মে, দেবার্চ্চনায়, পূজা-পার্ব্বণ-ব্রত উৎসবাদিতে, সামাজিক নিয়মপ্রথার অনুষ্ঠানে প্রতিদিন এর প্রকাশ লক্ষণীয়। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কিংবা পরমার্থসাধনে এটি তুল্য ভাবেই সমাদৃত। তবুও অখণ্ড ভারতবর্ষের প্রাণসত্তা বিধৃত রয়েছে নানা খণ্ড অংশে প্রাচীন সাহিত্য বেদ উপনিষদ পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে। চৈত্য বিহার মঠ মন্দির মিনার মসজিদের শিল্পকর্ম্মে, শিলালেখে, স্তূপ আলেখ্য সমাধি সৌধ মুদ্রা প্রভৃতির অলঙ্করণে। এইভাবে বহিঃপ্রকৃতির রূপের সঙ্গে অন্তরপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যকে মিলিয়ে তৈরী হয়েছে রমণীয় ভারতবর্ষ। খোলা চোখ ও খোলা মন নিয়ে এই ভারতবর্ষকে দেখার সহজতর উপায় হচ্ছে ভ্রমণ। আবার প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপের উপর শ্রদ্ধাবুদ্ধি জাগ্রত থাকলে এই ব্যাপারটি হয় সুন্দরতর।

আলোচ্য গ্রন্থের লেখক এই ভাবে বিশাল বিচিত্র ভারতবর্ষকে প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা করেছেন। ইতিপূর্ব্বে কয়েকটি খণ্ডে প্রকাশিত রম্যাণি বীক্ষ্য গ্রন্থে বিভিন্ন কয়েকটি অংশের কথা তিনি বলেছেন, বর্ত্তমান খণ্ডটি হল দ্রাবিড়-পর্ব্ব। সম্পূর্ণ দ্রাবিড়-পর্ব্ব এটি নয়। দক্ষিণ ভারত-পর্ব্বের এর খানিকটা, কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত, ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হয়েছে। আলোচ্য দ্রাবিড়-পর্ব্বের আরম্ভ বাঙ্গালোর মহীশূর থেকে, শেষ ইলোরা অজন্তার শিল্পতীর্থে। এর মধ্যে রয়েছে চামুণ্ডি পাহাড়ের মহিষমর্দ্দিনী দেবী, নন্দীকেশ্বর বৃষ, নয়নাভিরাম বৃন্দাবন উপবন, শ্রবণবেলগোলার অতিকায় গোমতেশ্বর, বেলুর হালেবিদের মন্দির-পরিচয়, শ্রীরঙ্গপত্তনের কথা। ইতিহাস প্রসঙ্গে এসেছে হায়দর আলি, টিপুসুলতান, বাহমণি, বিজয়নগর, চালুক্য, যাদব, রাষ্ট্রকূট, হয়শাল, ককাতিয় প্রভৃতি রাজবংশ। উত্থান-পতনের সংক্ষিপ্ত বিবরণীতে এইগুলিকে যথাযথভাবে উপস্থিত করা হয়েছে; কানাড়া সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও রয়েছে।

এ ছাড়াও ভ্রমণ পর্ব্বটিকে সহজসাধ্য করার জন্য রেল, মোটর, মোটর-বাস প্রভৃতি যানবাহনের যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং আহার আশ্রয়াদির নির্ভরযোগ্য তথ্যাদিও দিয়েছেন লেখক।

কাহিনীটিকে অনায়াস গতি দেবার জন্য প্রণয়রমা একটি পটভূমিকা রচিত হয়েছে। হয়তো পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জের টেনেই এইটির বিন্যাস।

প্রাচীন ভারতবর্ষের শিল্প সাহিত্য ইতিহাস জীবন-বোধের ধারাটিতে আধুনিক কালের এই প্রবণতা সুপ্রযুক্ত হয়েছে কি না—সে হিসাব না করেও ওধী পাঠক কয়েকটি পার্শ্ব চরিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হবেন। দৃশ্যান্তরের সঙ্গে সঙ্গেই এরা মন থেকে মুছে যায় না। কুর্গ-কন্যা তাপ্তি, রেল-দপ্তরের পদস্থ অফিসার কান্তিনাথ, বহুতর বন্যজন্তু শিকার-গর্বী সেই শিকারী পুরুষ, শ্বেতভূমিকাশ্রয়া রামশর্ম্মা, সেকেন্দ্রাবাদের বিশ্রামাগারের বাঙালী দম্পতি কিংবা ভারতবর্ষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ভ্রাম্যমাণ ফরাসী যুবকটি···এরা সকলেই রমাপতি বাঁড়ুজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ। মোটের উপর পর্ব্বটি সুখপাঠ্য।

প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় ও সুমুদ্রণে বইটি উল্লেখযোগ্য।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

বাংলা রামচরিত মানস—মূলানুগত বাংলা পদ্যে তুলসীদাসী রামায়ণ। কুচবিহার কলেজের অবসরপ্রাপ্ত দর্শনাধ্যাপক শ্রীবীরেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য্য, এম, এ,। প্রকাশক—শ্রীবীরেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য্য। ১১২, সোনারপুরা, বারাণসী। মূল্য কাপড়ে বাঁধাই ৮৲, কাগজে বাঁধাই ৬৲।

হিন্দীভাষীদিগের মধ্যে বিশেষ সমাদৃত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ রামচরিত মানস বা তুলসীদাসী রামায়ণ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়া বাঙালী পাঠকের নিকট উপস্থাপিত করিবার চেষ্টা আজ প্রায় একশত বৎসর যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। হরিমোহন গুপ্ত কৃত বালকাণ্ড ও অযোধ্যাকাণ্ডের অনুবাদের দুইটি সংস্করণ ১৭৮৯ ও ১৭৯০ শকে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা ছাড়া ভুবনচন্দ্র বসাকের গদ্যানুবাদ (অরণ্যকাণ্ড—১৮৯১ খ্রীঃ), হরিনারায়ণ মিশ্রের বিনামূল্যে বিতরণার্থে প্রকাশিত অনুবাদ (১৩১০ বঙ্গাব্দ), মদনমোহন চৌধুরীর পুরুলিয়া হইতে প্রকাশিত অনুবাদ (বালকাণ্ড—প্রথম খণ্ড ১৩২২ বঙ্গাব্দ), খাদি প্রতিষ্ঠান হইতে প্রচারিত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্তের গদ্যানুবাদ (প্রথম সংস্করণ ১৩৪০, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৫২ বঙ্গাব্দ), জলপাইগুড়ি হইতে প্রকাশিত (১৯৫৭ খ্রীঃ) হরিহর-প্রসাদ সাহার অনুবাদ, কবিরাজ শিবকালী ভট্টাচার্য্যের সঠিক অনুবাদ (বালকাণ্ড প্রথম খণ্ড ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ) এবং বসুমতী সাহিত্য মন্দির হইতে প্রকাশিত শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুবাদ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই অনুবাদ সাহিত্যে সাম্প্রতিকতম সংযোজন সমালোচ্য গ্রন্থখানি। এই সমস্ত অনুবাদগ্রন্থের বেশির ভাগই ভক্তসম্প্রদায়ের জন্য লিখিত। সাধারণ সাহিত্যরসিক অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার প্রয়াস ইহাদের মধ্যে অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। ফলে এতগুলি অনুবাদ থাকা সত্ত্বেও তুলসীদাসী রামায়ণ বাঙালী সমাজে যথোচিত প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে নাই। এই অবস্থার অন্যতম প্রধান কারণ অনুবাদগ্রন্থগুলির ভাষা ও ছন্দ—দুই একখানি বাদে ইহারা প্রাচীন ধরণের পদ্যে লিখিত। সাধারণ পাঠক এইরূপ পড়িতে বিশেষ উৎসাহ বোধ করে বলিয়া মনে হয় না। তাহা ছাড়া, ইহার মধ্য দিয়া তুলসীদাসের সাহিত্য-সৌন্দর্য্য ঠিক ফুটিয়া উঠে না। এই সকল অসুবিধা যাহাতে দূর হইতে পারে, অনুবাদ যাহাতে সুখপাঠ্য ও চিত্তাকর্ষক হইতে পারে—তুলসীদাসের মহাকাব্যের বিবিধ বৈশিষ্ট্যের প্রতি যাহাতে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে পারে, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অনুবাদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে ভাল হয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

অন্ধ কাহাকে বলিব ?

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

অন্ধ ব্যক্তি মাত্রেই 'একেবারে দৃষ্টিহীন' এরূপ মনে করা বা বলা বোধ হয়, ঠিক নয়। অনেক অন্ধ ব্যক্তিই কিছুটা "দেখিতে" পায় অন্ততঃ যাহা প্রত্যক্ষ দেখে না তাহাও সে দেখে 'মনের' বা 'স্মৃতির' চক্ষু দ্বারা। একশতজন অন্ধের মধ্যে মাত্র চারিজনের বয়স কুড়ি বৎসরের নীচে এবং যাহারা পাঁচ বা আরও অল্প বয়সে অন্ধ হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা আরও কম, সুতরাং এই বয়সের মধ্যে (অর্থাৎ যতদিন তাহাদের দৃষ্টিশক্তি ছিল) তাহারা চারিদিকের পৃথিবীর অনেক কিছু দেখিয়া মনের মধ্যে ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছে। পৃথিবীতে চক্ষুষ্মান এবং চক্ষুহীন বা অন্ধ লোকের হার প্রতি লক্ষে ৩৫০ জন, কিন্তু পাঁচ বৎসরের নিম্নবয়স্ক অন্ধের সংখ্যা এক-লাখে সাতজন মাত্র।

অন্ধ কানে শুনিতে পায়, স্পর্শ দ্বারা আঘ্রাণ লইয়া দৃষ্টিহীনতা সত্ত্বেও নিজের অভ্যন্তরের আলোর সাহায্যে চতুর্দ্দিকে নিজের পৃথিবী গড়িতে পারে। এই সকল বিশেষ গুণ ও সামর্থ্য থাকার দরুণ তাহার চারিদিকের অন্যান্য মানুষ অপেক্ষা সে একটা "পৃথক-জীব" এরূপ মনে করা ভুল, বরং সকলে তাহার প্রতি যে অহেতুক দয়া, সহানুভূতি, সমবেদনা, দরদ বা অনুকম্পা দেখায় তাহাও অনেক সময় বেশ একটু বাড়াবাড়ি।

অন্ধের কি দরকার, তাহার প্রতি সমাজের কি কর্ত্তব্য এবং সমাজের নিকট তাহার কি দাবি বা প্রাপ্য—এই সকল প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদয় হয় এবং এই জন্যই সমাজে অন্ধ ব্যক্তির প্রকৃত স্থান নির্ণয় করা প্রয়োজন। একেবারে সম্পূর্ণ বা নিরেট অন্ধ ব্যক্তির সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প, এজন্য কাহারও দৃষ্টিশক্তি লোপ বা হ্রাস পাইলে কোন্ অবস্থায় তাহাকে কোন্ পর্য্যায়ে ফেলিতে হইবে ইহা একটি সমস্যা। এ জন্য চক্ষুহীন বা অন্ধকে তাহার কর্ম-ক্ষমতার দিক হইতে বিচার করা হয় এবং অন্ধ তাহাকেই বলা হয় "যে দৃষ্টিহীনতার দরুণ স্বাভাবিকভাবে জীবন-যাপন করিতে সক্ষম নহে"।

প্রশ্ন দাঁড়াইতেছে "অন্ধ কে?" অনেকে একেবারে আলো দেখিতে পায় না। কেহ কেহ আলো ও ছায়ার পৃথক সত্তা টের পায়। কেহ কেহ চড়া আলোতে বিভিন্ন রং বুঝিতে পারে, কিন্তু দ্রব্যের আকার দেখিতে পায় না, আবার কেহ কেহ দ্রব্যের আকার দেখিতে পায়, কিন্তু দ্রব্যগুলির পরস্পর অবস্থান বুঝিতে পারে না। দৃষ্টি-হীনতার আরও অনেক রকম জের আছে। কেহ প্রভাত সময়ে একরূপ ভালই দেখে বলা চলে, কিন্তু রাত্রে প্রায় দেখিতে পায় না—চলতি ভাষায় ইহাদের 'রাতকাণা' বলা হয়। কাহারও কাহারও এম্‌নিতে চোখের দৃষ্টি বেশ ভাল, কিন্তু কখনও কখনও চোখের তারা অনিচ্ছা-কৃত কম্পনের জন্য (ইংরেজীতে যাহার নাম nystagmus) দৃষ্টিহীনতা সাময়িকভাবে হয়। অনেকে সোজা-সুজি বেশ দেখে, কিন্তু আশেপাশে কম দেখিতে পায়। যদিও এই সকল লোককে ঠিক অন্ধ বলা যায় না, কিন্তু ইহারাও স্বাভাবিক জীবন-যাপন করিতে অর্থাৎ দৈনন্দিন কাজ করিতে, পড়িতে কিংবা অপর সাধারণের মতো স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিতে পারে না। ফরাসী ভাষায় aveugle বলিতে যাহা বুঝায় ইহারা তাই অথচ অন্ধ নহে।

অন্ধত্ব সম্বন্ধে কোনো ধারণা করিতে গেলে প্রধানতঃ দৃষ্টিশক্তির কথাই আসে। একটি স্বাভাবিক চক্ষু দ্বারা সম্মুখের অনুভূমিক অক্ষে (horizental axis) ১৩৫ ডিগ্রী বা অংশ দেখা যায় এবং দুই চোখে ১৮০ ডিগ্রী বা অংশ দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু উল্লম্ব অক্ষে (vertical axis) মাত্র ১০৫ ডিগ্রী বা অংশ দেখা যায়, কারণ চোখের ভ্রূ দৃষ্টি রোধ করে। 'অন্ধত্ব' সম্বন্ধে আলোচনাকালে এবং ইহার সংগা দেওয়ার সময় বিভিন্ন দেশে দৃষ্টিশক্তির উক্ত মাপকাঠি প্রয়োগ করিয়া থাকে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে আইনতঃ তাহাকেই অন্ধ বলা হয় যাহার কেন্দ্রীয় দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক অপেক্ষা একশত অংশের দশ ভাগ হইতেও অল্প, অথবা দৃষ্টির পরিধি ২০ ডিগ্রী বা অংশ অপেক্ষাও কম।

ফরাসী সংজ্ঞায় অন্ধ তাহাকেই বলা হয় যাহার কেন্দ্রীয় দৃষ্টিশক্তি, এমনকি চশমা দ্বারা সংশোধিত হওয়ার পরেও, স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তির ২০ ভাগে পৌঁছয় না অর্থাৎ স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি যাহা ২০ মিটার দূরে দেখিতে পায়, তাহা সে এক মিটার দূরেও দেখিতে পায় না।

জার্মাণ আইন বেশ কঠোর। সে দেশের আইনে

স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তির ৬০ ভাগের মাত্র ১ ভাগ দৃষ্টিশক্তি থাকিলে তবে ব্যক্তি অন্ধত্বের জন্য আইনসম্মত সাহায্যের অধিকারী হয়। ব্যাভেরিয়ার আইন আরও কড়া। এখানে স্বাভাবিক দৃষ্টির ১০০ ভাগের মাত্র ১ ভাগ মানিলে তবে অন্ধ বলিয়া স্বীকার করা হয়।

অনেক দেশেই সাধারণতঃ হাত প্রসারিত করিলে যতটা দূরত্ব হয় সেখানে আঙুল গণিতে পারার পরীক্ষা দ্বারা অন্ধত্বের পরিমাপ করা হয়। এই দূরত্ব কোথাও এক মিটারের কম ধরা হয় না। মিশরে অল্পদিন পূর্ব্বেও এই দূরত্ব তিন মিটার ধরা হইত। অন্ধত্বের পরিমাপ সম্পর্কে সুইজারল্যাণ্ড ও ভারতের মধ্যে ব্যবধান সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। সুইজারল্যাণ্ডে ব্যক্তির নিজ কাজের জন্য যে দৃষ্টিশক্তির দরকার তাহার অভাবের দরুণ সে কর্ম্মে অক্ষম হইলে তাহাকে অন্ধ বলিয়া স্বীকার করা হয়। কিন্তু ভারতে একেবারে দৃষ্টিহীন না হইলে সে অন্ধ নহে।

অন্ধত্ব নিরূপণের নানারূপ মাপকাঠি থাকার দরুণ যে অসুবিধা তাহা দূর করিবার জন্য পৃথিবীর সকল দেশে মাত্র একটি মানের আবশ্যকতা সকলেই স্বীকার করেন। এরূপ করিলে কাজের অনেক সুবিধা হয়। একমাত্র আন্তর্জ্জাতিক চুক্তির দ্বারাই ইহা সম্ভব। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে U. N. Social Affairs Division উহার বিবরণীতে এরূপ একটি সর্ব্বজনীন মানের সংজ্ঞার খসড়ার প্রস্তাব প্রকাশ করিয়াছিল। এই বিবরণী ঐ বৎসরেই World Council for Welfare of the Blind-এর প্যারীর সাধারণ অধিবেশনে উপস্থাপিত করা হয়। এই প্রস্তাবে বলা হইয়াছিল যে, অন্ধত্বের জন্য কোনরূপ আর্থিক বা অন্যান্য সাহায্য সেই সকল ব্যক্তিকে দেওয়া উচিত যাহাদের স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তির (চশমা নেওয়ার পরেও) ৩।৬০ মাত্র অবশিষ্ট আছে অথবা যাহাদের দৃষ্টিশক্তি এতটা লোপ পাইয়াছে যে, উহার ৩।৬০ অংশ মাত্র কাজে লাগিতেছে।

বিভিন্ন দেশের অন্ধত্বের মান বিভিন্ন থাকায় এক দেশের সহিত অপর দেশের তুলনা চলে না। এজন্য আমেরিকার সঙ্গে ফরাসী দেশের সংখ্যানুপাতিক তুলনা সম্ভব নহে—আমেরিকায় অন্ধের সংখ্যা বেশী, কারণ সেদেশে দৃষ্টিশক্তির মান ১।১০ আর ফরাসী দেশে উহা ১।২০ অংশ মাত্র। বৃটেনে দৃষ্টিহীনগণের উপকারার্থে নূতন আইন প্রবর্ত্তন করার পরে রেজিষ্ট্রীকৃত অন্ধের সংখ্যা ২৮ ০০০ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৬০,০০০ হইয়াছে। চীন, মিশর এবং ভারতে অন্ধের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী, কিন্তু সংখ্যাবিদগণ এই সকল দেশের সংখ্যা নির্ভরযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না।

স্বতঃই মনে প্রশ্ন জাগে তবে পৃথিবীতে অন্ধের সংখ্যা কত? ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে রোমে World Council for Welfare of the Blind-এর নিকট উপস্থাপিত বিবরণীতে পৃথিবীর মোট অন্ধের আনুমানিক সংখ্যা দেওয়া হইয়াছিল ৯৫,০০,০০০ (?) অর্থাৎ প্রতি হাজারে ৩'৫৮ জন। ইহাদের মধ্যে ৭০,০০,০০০ জন গ্রামে বাস করে। এই বিবরণীতে আরও বলা হইয়াছে যে, ইহাদের মধ্যে ৩৬,০০,০০০ জনকে কাজে লাগান যায়, ২০,০০,০০০ জন কৃষিকাজ করিতে সক্ষম।
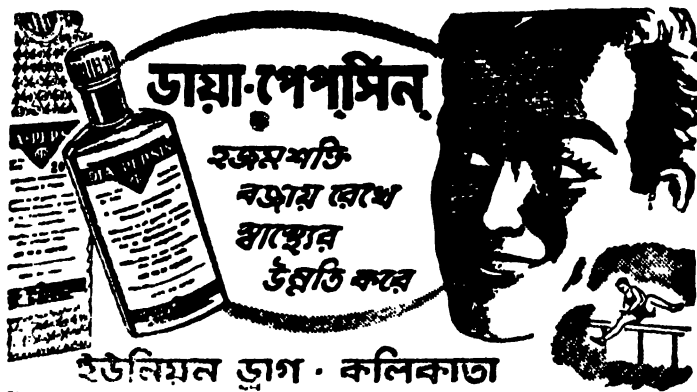
ইতিহাসের উপাদান ঃ লোকসংস্কৃতি

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

আগে কোনো দেশের ইতিহাস বলতে আমরা বুঝতাম, সেই দেশের রাজরাজড়াদের বৃত্তান্ত, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত পরাক্রমশালীদের সুকৃতি এবং দুষ্কৃতির ফিরিস্তি। আজ সে ধারণার পরিবর্ত্তন হয়েছে। একথা স্বীকৃত হয়েছে যে, ইতিহাসে আজ অতীতের রাজা মহারাজা এবং বর্ত্তমানের বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ প্রভৃতির স্থান হবে গৌণ ; মুখ্য স্থান অধিকার করবে জনসাধারণ। কোন দেশের ইতিহাস রচনায় তার সামাজিক, আর্থনীতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের উপর আলোকপাত করতে হবে। ইতিহাস তখনই হয়ে ওঠে জীবন্ত যখন তা বর্ণনা করে সাধারণ মানুষের কথা, জাতির অগ্রগতিতে তাদের অংশগ্রহণের কাহিনী, যখন তাতে প্রতিফলিত হয় সমাজ-জীবনের বহু বিচিত্র রূপ।

আমাদের বর্ত্তমান হচ্ছে অতীতের ধারাবাহিকতার ক্রমবিকশিত রূপ, এই বর্ত্তমানই আবার নিয়ন্ত্রিত করে ভবিষ্যৎকে। কত উত্থান-পতন, ভাঙা গড়ার ভেতর দিয়ে একটা নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে এগিয়ে চলে দেশ ও জাতি। এই অগ্রগতির ইতিহাসের অন্তর-সত্তায় ওতপ্রোত রয়েছে সাধারণ মানুষের কর্ম্মপ্রচেষ্টা, আত্মত্যাগ এবং আত্মদানের শত শত কাহিনী। সেগুলো এবং সামাজিক আচার অনুষ্ঠান, সমাজ-জীবনের বিবর্ত্তন ইত্যাদির বৃত্তান্ত বিধৃত রয়েছে বিভিন্ন দেশের লোকসংস্কৃতির ভাণ্ডারে। ইতিহাসের উপাদান আহরণ করতে হবে সেই যুগযুগান্তর সঞ্চিত ভাণ্ডার থেকে। লোকগীতি, লৌকিক উপাখ্যান, লোকনৃত্য, লোকশিল্প ইত্যাদি তাই গণ্য হওয়া উচিত ইতিহাসের অপরিহার্য্য উপাদান বলে।

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেরই লিপিবদ্ধ ইতিহাসের একেবারে প্রাথমিক উপকরণ হচ্ছে শিলালিপি ও তাম্রলিপি। স্মরণাতীত কাল থেকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আত্মগোপন করে ছিল তারা বিস্মৃতির অন্ধকারে, তার পর পুরাতত্ত্ববিদ্ যখন তাদের পাঠোদ্ধার করলেন তখন আলোকপাত হ'ল ইতিহাসের কোনো বিশেষ অধ্যায়ের ওপর ; ভিত্তিপত্তন হ'ল ইতিহাস-রচনার। কিন্তু তারও পূর্ব্বে কোন্ বিস্মৃত যুগ থেকে লোকের মুখে মুখে রচিত হয়েছে ইতিহাসাশ্রয়ী কত গান, লৌকিক কাহিনী, কিংবদন্তী প্রবাদ, ছড়া ইত্যাদি।

এমনি করে যুগে যুগে, দেশে দেশে সমৃদ্ধতর হয়েছে লোকসংস্কৃতির ভাণ্ডার—এই লোকসংস্কৃতি ইতিহাসের অন্যতম ধারক ও বাহক—সকল মানুষের অধিগম্য বলে তার প্রসারও হয়েছে ব্যাপক।

পৃথিবীর সকল দেশেই প্রাচীন মন্দিরসমূহে লিখিত বিবরণী রাখবার প্রথা ছিল। সেগুলোতে অনেক অলৌকিক কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু ঐতিহাসিক উপকরণও থাকত। এদেরও বলা চলে লোকসাহিত্যের অঙ্গ। গোড়াকার দিকের ইতিহাস-রচয়িতারা এগুলো থেকেও উপকরণ আহরণ করেছিলেন। ইতিহাসের জনক হচ্ছেন হেরোডোটাস। কিন্তু তাঁর পথ কতটা সুগম করে রেখে ছিলেন তাঁর পূর্ব্বগামীরা। তাঁদের উক্তিগুলি মুখ্যতঃ সংগৃহীত হয়েছিল সমসাময়িকদের প্রমুখাৎ। লোকের মুখে মুখে তাঁর যে সকল ছড়া, গাথা ইত্যাদি শুনেছিলেন সেগুলোকেই গদ্যে রূপান্তরিত করে তাঁরা ইতিহাস রচনার গোড়াপত্তন করলেন।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাস মূলতঃ লোকসংস্কৃতিভিত্তিক। কালক্রমে কিন্তু ইতিহাসে যখন রাজরাজড়াদের বৃত্তান্ত, সন-তারিখ যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদি প্রাধান্য লাভ করল তখন ইতিহাস-রচনায় লোকসংস্কৃতির প্রতি উপেক্ষামূলক মনোভাব প্রকট হয়ে উঠল। ফলে ইতিহাস হয়ে উঠল অপূর্ণাঙ্গ। কিন্তু ইতিহাসে কোনো দেশ ও জাতির প্রাণসত্তার বহুধা-বিচিত্র বিকাশের সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ পরিচয় পেতে হলে যে তার লোকসংস্কৃতির ভাণ্ডারে নিহিত অমূল্য এবং অজস্র উপকরণ আহরণে তৎপর হতে হবে এ কথা আজ দেশবিদেশের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে। আমাদের দেশের ঐতিহাসিক-শিরোমণি আচার্য্য যদুনাথ সরকারও এর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

বাংলা দেশে স্মরণাতীত কাল থেকে যে লোকসংস্কৃতির ভাণ্ডার গড়ে উঠেছে তা বিরাটত্বে যেমন বিস্ময়কর, বৈচিত্র্যেও তেমনি অতুলনীয়। বাংলার লোক-গাথা লৌকিক কাহিনী, ছড়া, গান, পাঁচালী, ব্রতকথা, কথকতা, যাত্রা, কবিগান, তরজা, বাউল গান, ভাটিয়ালী সঙ্গীত, পটশিল্প, প্রবাদ, কিংবদন্তী, ক্রীড়াকৌতুক ইত্যাদি এবং লোকসংস্কৃতির আরো বিভিন্ন শাখায় নিহিত রয়েছে

দেশ-বিদেশের কথা

ভারতের বাইরে সর্ব্বপ্রথম সংস্কৃত ও পালি নাট্যাভিনয়

ভারতবর্ষের সঙ্গে বিশ্বের সম্পর্ক বিশেষ করে সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যের মাধ্যমে সংগঠিত। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ ও বহির্বিশ্বের মধ্যে বহু সাংস্কৃতিক দলের বিনিময় হওয়া সত্ত্বেও কোনও দিন ভারতবর্ষের বাইরে সংস্কৃত অভিনয় হয় নি। এবারে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ প্রাচ্য গবেষণাগার প্রাচ্যবাণী মন্দিরের সুদক্ষ নাট্যদল সেই অভাব আজ দূর করলেন।

পালি নাটকের একটি দৃশ্যে যশোধরা ও পুরোহিত

এই দলটি বিগত বড়দিনের বন্ধে রেঙ্গুনে এসেছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন সোসাইটির আহ্বানে দুটি সংস্কৃত ও একটি পালি নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য। নাটকগুলির সবই ভক্তিধর্ম্মমূলক এবং কলিকাতার সর্ব্বজনবরেণ্য সংস্কৃত গবেষক, কবি ও বাগ্মিবর ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী বিরচিত। এরূপে ২৭, ২৮, ২৯শে ডিসেম্বর তিন দিন পর পর রামকৃষ্ণ মিশনের সুপ্রশস্ত হলে রেঙ্গুনের বাঙালী ও অবাঙালী বিদগ্ধ দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখে যথাক্রমে শ্রীশ্রীমা সারদামণি, শ্রীশ্রীযশোধরা গোপা এবং শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার পুণ্য জীবনী অবলম্বনে বিরচিত সংস্কৃত নাটক শক্তিসারদম্, পালি নাটক বিম্বসুন্দরী পটিবিম্বনম্ এবং সংস্কৃত নাটক ভক্তি বিষ্ণুপ্রিয়ম্ সাতিশয় সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন কলিকাতা, যাদবপুর বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ের কৃতী অধ্যাপক এবং ছাত্রছাত্রীগণ। এরা পূর্ব্বে ডাঃ চৌধুরী বিরচিত বহু সংস্কৃত নাটক ভারতবর্ষের নানা স্থানে অভিনয় করে প্রভূত যশও অর্জ্জন করেছেন। এবারও সর্ব্বপ্রথম ভারতের বাইরে তাঁরা তাঁদের সেই গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। তাঁদের অতি সুন্দর বিশুদ্ধ পালি উচ্চারণ, গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ভাবময় অভিনয় এবং উচ্চাঙ্গের ভাবভঙ্গি সকলকেই বিশেষ মুগ্ধ করে। হলে প্রবেশ করার জন্য, ছাত্রপত্র পাওয়ার জন্য যে ব্যাকুলতা আমরা দেখেছি, তাতে এ নাটকগুলি যে রেঙ্গুনে সকলের চিত্ত জয় করেছে, তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত করে।

নাটকগুলি আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম, উজ্জ্বলতম শ্রেষ্ঠ রত্নগুলির সঙ্গে তুলনা করলেও অন্যায় হয় না। ভাষার লালিত্যে, ভাবের মাহাত্ম্যে, কবিতার ছন্দোমাধুর্য্যে, সঙ্গীতের ঝঙ্কারে পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর মতই তর্ তর্ বেগে বেয়ে চলেছে তারা। প্রত্যেক দিনই আড়াই ঘণ্টা যেন চলে গেল আড়াই মিনিটের মধ্যেই। বস্তুতঃ, ডাঃ যতীন্দ্রবিমল ও ডাঃ রমা চৌধুরী প্রত্যেক দিনই তাঁদের অতি ছন্দোময়ী মধুর ভাষায় যে মাতৃলীলা-তত্ত্ব দিয়ে আরম্ভ করেছিলেন, তারই সুর থেকে গেল শেষ পর্য্যন্ত—যা আজও রেঙ্গুনের অনেকের মনেই অনুরণিত হচ্ছে অপূর্ব্ব তানে।

বিশেষ করে পালি নাটকটি সম্বন্ধে সকলেরই আগ্রহ ছিল সমধিক। কারণ এটি আড়াই হাজার বৎসরের পুরাতন সুবিশাল পালি সাহিত্যের সর্ব্বপ্রথম পালি নাটক। আরো একটি বিশেষ আনন্দের বিষয় এই যে, এই নাটকের মাধ্যমে জননী যশোধারার সাধারণে অজ্ঞাত

সুন্দর জীবনও নবারুণ সংপাতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ পালি নাটকটি সমগ্র ভবিষ্য প্রচারের জন্য টেপ-রেকর্ড করে রেখেছেন।

সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যের মহিমা শাশ্বত। যাঁরা এগুলিকে মৃত ভাষা বলেন, তাঁরা যে কতদূর ভুল করেন, তার প্রমাণ আজ দিয়ে যাচ্ছেন ভারত ও ভারতের বাইরে প্রাচ্যবাণী মন্দিরের এই অভিনেতৃবৃন্দ। তাঁদের এই সাধু প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হোক্।

শ্রীসুশান্ত চৌধুরী

ক্যাপ্টেন জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

[গত ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৬০, রবিবার, বিকাল ৪টায় 'অল বেঙ্গল ফিজিক্যাল কাল্‌চার অ্যাসোসিয়েশন' কর্তৃক 'জিতেন্দ্র ব্যায়াম মন্দিরে' (৫, কৃষ্ণবিহারী সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭) বাংলার মহাবলী ক্যাপ্টেন জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এর আগে ভারতবর্ষে আর কোনো বলবান ব্যক্তির জন্য এরূপ স্মরণোৎসব হয় নি। অতএব, অল বেঙ্গল ফিজিক্যাল কাল্‌চার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগ ভারতীয় শরীর চর্চ্চার ইতিহাসে নিঃসন্দেহে এক নতুন পদক্ষেপ।]

মহাবলী জিতেন্দ্রনাথের শৌর্য্য সাহস ও শক্তির কীর্ত্তি এক সময়ে বাংলাদেশে বহু কিংবদন্তীর সৃষ্টি করেছিল। অথচ তিনি কদাপি পেশাদার ব্যায়ামবীর ছিলেন না, অ্যামেচার শোম্যানও ছিলেন না। অতএব তাঁর পক্ষ থেকে কেউ কখনও প্রচার কার্য্যও চালায় নি। এমন কি, গায়ের জোর জাহির করে জনচিত্ত জয় করাকে তিনি নিজেও মনে মনে ঘৃণা করতেন। তবু, অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে বাংলার তরুণ মহলে তিনি প্রায় 'শক্তির অবতার' বলে পূজা পেয়েছিলেন।

জিতেন্দ্রনাথের জন্ম হয়েছিল কলকাতার তালতলা পল্লীতে ১৮৬০, ২০শে অক্টোবর। লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৯-১৮৭০) ছিলেন তাঁর বাবা। পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে জিতেন্দ্রনাথ ছিলেন সর্ব্ব-কনিষ্ঠ। তাঁর মেজদাদা স্যার সুরেন্দ্রনাথ (১৮৪৮-১৯২৫) ছিলেন ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে অবিসংবাদী নেতা এবং ভারতের রাষ্ট্রগুরু। শরীর সাধক এবং বলবান্ পুরুষ বলেও তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তাঁরই ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তে জিতেন্দ্রনাথ দেহচর্চ্চার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং অন্যতম ব্যায়াম সাধক লালচাঁদ মিত্রের প্রত্যক্ষ উৎসাহ ও চেষ্টায় ব্যায়াম সুরু করেন। তিনি সাধারণতঃ ডন বৈঠক এবং মুগুর ব্যায়াম করতেন। তবে শক্তি পরীক্ষার জন্য কুস্তি এবং আত্মরক্ষামূলক বিদ্যা হিসাবে লাঠিখেলাও শিখেছিলেন। আরও পরে বিলাতে পশ্চিমী প্রথার মুষ্টি-যুদ্ধেও দক্ষতা অর্জ্জন করেছিলেন।

লণ্ডনে একবার জিতেন্দ্রনাথের সামান্য অসুখ হয়। ডাক্তার এসে ঔষধের ব্যবস্থা দিয়ে গেলেন। হঠাৎ তাঁর খেয়াল হ'ল, পথ্যের কথা ত জেনে নেওয়া হয় নি! তাড়া-তাড়ি বাইরে গিয়ে দেখলেন, ডাক্তারের দুই ঘোড়ার গাড়ী ছুটে চলেছে। লণ্ডনের রাস্তায় হাঁক-ডাক নিষিদ্ধ। অগত্যা তাঁকে ছুটে গিয়ে গাড়ীর পিছনটা টেনে ধরতে হ'ল। এক মুহূর্ত্তে গাড়ীর গতি বন্ধ, ডাক্তার হতভম্ব! সব শুনে ডাক্তার হেসে বললেন, 'যে রোগী আমার ছুটন্ত গাড়ী টেনে রাখতে পারে, সে ত জীবন্ত হারকিউলিস্! তার আবার পথ্য কি? সে সব খেতে পারে।'

যত দূর জানা যায়, পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিধর পুরুষ ফ্রান্সের আপোলোন ১৮৮৬-৮৭ অব্দের দিকে প্রথম মোটর থামিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু জিতেন্দ্রনাথের এ কীর্ত্তি ছিল তারও পূর্ব্ববর্ত্তী।

তিনি ১৮৮০ অব্দে বিলাত যান এবং ১৮৯১ অব্দে ব্যারিষ্টার হয়ে এসে কলকাতার হাইকোর্টে যোগদান করেন। সুরেন্দ্রনাথ কলেজের আইন বিভাগে তিনি অধ্যাপনাও করতেন এবং স্যর সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর ১৯২৫ অব্দ থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি এই কলেজের উপদেষ্টা সঙ্ঘের সভাপতি ছিলেন। কিছুকাল তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' পদেও ছিলেন। অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তাঁর সংস্রব ছিল।

১৯০৬ অব্দে তিনি প্রেসিডেন্সী ভলাণ্টিয়ার রাইফেল ব্যাটেলিয়নের 'ল্যান্স কর্পোর্যাল' হন; কর্ম্মপটুতার গুণে পরে তিনি 'কলার সার্জ্জেন্ট'ও হয়েছিলেন। ১৯১১, ১২ই ডিসেম্বর তিনি 'দরবার মেডেল' পান। ১৯১৪ অব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ উপলক্ষে 'বাঙালী বাহিনী' গঠনের জন্য তিনি আত্মনিয়োগ করেন এবং ১৯১৮ অব্দে 'ভলাণ্টিয়ার লং সার্ভিস মেডেল' পান; পরের বছর 'ওয়ার ব্যাজ' লাভ করেন। ১৯২০ অব্দে তাঁকে 'ক্যাপ্টেন' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করা হয় এবং ১৯১৫, ১লা এপ্রিল থেকে তাঁকে এ সম্মান দেওয়া হ'ল বলে ঘোষণা করা হয়।

১৯৩৫, ২২শে অক্টোবর ৭৫ বছর বয়সে এই সিংহপুরুষ মহাবলী জিতেন্দ্রনাথ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি অকৃতদার পুরুষ ছিলেন।

ক্ষেত্রমণি পাল স্মৃতি বক্তৃতা উদ্বোধন

ঝাড়গ্রামের পল্লীপ্রান্তে অনাড়ম্বর প্রাকৃতিক পরিবেশে সৎসঙ্গ মিশনের প্রজ্ঞামন্দিরের ব্যবস্থাপনায় এবং ডাক্তার দেবব্রত পালের বদান্যতায় তদীয় মাতামহীর স্মৃতিরক্ষা-কল্পে গত ২৫শে ডিসেম্বর অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারী চক্রবর্ত্তী মহাশয় সেবায়তন আশ্রম প্রাঙ্গণে ৺ক্ষেত্রমণি পাল বক্তৃতা-মালার উদ্বোধনী ভাষণ 'মহাভারতে আদর্শ নারী' বিষয় হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতাদান করেন। উদ্বোধনকালে আচার্য্য স্বামী সত্যানন্দগিরি মহারাজ, স্বামী প্রেমানন্দগিরির পৃষ্ঠপোষিত পল্লীপ্রান্তে প্রতিষ্ঠিত এই প্রজ্ঞামন্দিরের আদর্শ ও কার্য্যক্রম সম্পর্কে বিবরণ দান করেন। বক্তৃতা শেষে প্রজ্ঞামন্দিরের প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীরত্নেশ্বচন্দ্র সেন অভিভূতভাবে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বক্তৃতার জন্য এবং ডাঃ পালের ভারতের সাধনা ও কৃষ্টির প্রতি অনুরাগ প্রদর্শনের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে শ্রদ্ধা ও প্রীতির অর্ঘ্যস্বরূপ পুস্তকাদি উপহার প্রদত্ত হইবার পর কুমারী মঞ্জুশ্রী চক্রবর্ত্তী ভজন গান করিয়া সকলের মনোরঞ্জন করেন।

ক্ষেত্রমণি পাল

ডাঃ মীরা সেন

বরিশাল (অধুনা পূর্ব্ব পাকিস্থান) ব্রজমোহন কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ও চট্টগ্রাম জিলার (অধুনা পূর্ব্ব পাকিস্থান) অন্তর্গত ধলঘাটগ্রাম নিবাসী শ্রীরমণী-রঞ্জন সেন মহাশয়ের দ্বিতীয় কন্যা ডাঃ মীরা সেন পশ্চিম-বঙ্গ রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ট্রেণিং রিজার্ভ হিসাবে লণ্ডনস্থ রয়াল কলেজ অব সার্জ্জনস্ এ. এফ. আর. সি. এস. পড়িবার জন্য, বিশেষ করিয়া প্লাষ্টিক সার্জ্জারীতে ট্রেণিং লইবার জন্য ১৮ই জানুয়ারী তারিখে বোম্বে থেকে "সিডনী" জাহাজযোগে লণ্ডন যাত্রা করিয়াছেন। তিনি নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজে প্রথমে সার্জ্জিকাল এবং পরে এ্যানাটমি ডিপার্টমেণ্টের সাথে যুক্ত ছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে, ডাঃ সেন ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের একজন কৃতী ছাত্রী এবং ঐ কলেজ হাসপাতালের সার্জ্জিকাল ডিপার্টমেণ্টের রেসিডেণ্ট সার্জ্জন (আর. এস.) ছিলেন।

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

মা যশোদা
মোগল-রাজপুত চিত্র

:: ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬০শ ভাগ
২য় খণ্ড

চৈত্র, ১৩৬৭

৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

কঙ্গো মুখে ভারতীয় সমরবাহিনী

স্বাধীনতা লাভের পর বোধ হয় এই প্রথম ভারতীয় যুদ্ধবাহিনী বিদেশে প্রেরিত হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে কোরিয়া, লাওস, ইস্রায়েল-মিশর সীমান্ত ইত্যাদিতে ভারতীয় সৈন্য গিয়াছে, কিন্তু সে সকলেরই উদ্দেশ্য ছিল আহত ও পীড়িতের সেবা ও রক্ষণাবেক্ষণ। সামরিক উদ্দেশ্যে যুদ্ধবাহিনীর ব্যবহার এতদিন যে ভারতের বাহিরে কোনোও দেশে প্রেরিত হইয়াছে মনে হয় না। এইবারে যে ব্রিগেড কঙ্গো অঞ্চলে প্রেরিত হইতেছে তাহার সংখ্যা কিঞ্চিদধিক তিন হাজার এবং ইহা সশস্ত্র ও রণাঙ্গনের জন্য পূর্ণভাবে সজ্জিত ও শিক্ষিত—যাহাকে ইংরেজীতে combat troops বলে।

কঙ্গোতে শীতযুদ্ধের প্রকোপে রাষ্ট্রসঙ্ঘের কার্য্যক্রম সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত। সেখানে সোভিয়েট ও লাল চীন ভূতপূর্ব্ব প্রধানমন্ত্রী লুমুম্বাকে সর্ব্বপ্রকার সহায়তা দিবার আয়োজন করে। এই আয়োজনের প্রতিক্রিয়ায় মার্কিনী কর্ত্তৃপক্ষ পরোক্ষ ভাবে লুমুম্বার প্রতিপক্ষকে সাহায্য করিতে থাকেন। এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাজে বিশেষ বাধা উপস্থিত করেন। সেই সুযোগে বেলজিয়ান চক্রান্তকারীরা তাহাদের হাতে-ধরা একদলকে সামরিক সাহায্য—অর্থাৎ অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক অফিসার, গোলন্দাজ, বিমানচালক ও সামরিক বৈমানিক ইত্যাদি দিয়া কঙ্গোর সমৃদ্ধতম অঞ্চল পুনরায় দখল করিবার ব্যবস্থা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েটের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়া ফেলেন, ফলে রাষ্ট্রসঙ্ঘের বাহিনী অতি শোচনীয় অবস্থায় আসিয়া পড়ে।

ইতিমধ্যে মার্কিন সাহায্যপ্রাপ্ত দল লুমুম্বা ও তাঁহার সহকারিদিগকে বন্দী করে এবং মার্কিন কর্ত্তৃপক্ষের পরোক্ষ সহায়তার উপর নির্ভর করিয়া লুমুম্বা ও তাঁহার সঙ্গী-দিগের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়া, ফেব্রুয়ারীর গোড়ায় হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডের কথা রাষ্ট্র হইলে সারা জগতে এক প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়। প্রথমে সোভিয়েট রাষ্ট্রসঙ্ঘের সচিব হ্যামারশোল্ডকে পদচ্যুত করার জন্য এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের বাহিনীকে কঙ্গো হইতে অপসারণের জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘে আন্দোলন আরম্ভ করেন। তাঁহারা নিজে প্রত্যক্ষভাবে কঙ্গোতে হস্তক্ষেপ করিবেন এ কথাও স্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট তাহাতে প্রকাশ্যে বলেন যে, সোভিয়েট যদি ঐরূপে কঙ্গোতে নামে তবে মার্কিন দেশ বসিয়া দেখিবে না—অর্থাৎ যুদ্ধ বাধিবে।

এই অবস্থায় আফ্রো-এশীয় দলের মধ্যে ভিন্ন রকমে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়। তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, কি সোভিয়েট, কি মার্কিন দেশ, কাহারও কঙ্গোতে শান্তি স্থাপনের দিকে বিন্দুমাত্র উৎসাহ নাই, আছে শুধু পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতায় শীতযুদ্ধকে অগ্ন্যুৎপাতে পরিণত করায়। বলা বাহুল্য, এই ব্যাপার প্রায় সকল ক্ষেত্রেই চলে এবং কঙ্গোর ব্যাপারে রাষ্ট্রসঙ্ঘের তর্কের মধ্যে ঐ দুই পক্ষ নিজের দিকে অন্যদের টানিবার চেষ্টাই করিয়াছেন। এবং এইরূপ অবস্থার পরিণামে কঙ্গোতে স্থিত রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেনাবাহিনী ক্রমে ক্ষীণ হইতে আরম্ভ করে। এই সেনাবাহিনী সংখ্যায় প্রথমে ছিল ২০,০০০ এবং নানা দেশের দল চলিয়া যাওয়ায় এখন হইয়াছে

১৬,৫০০। অন্য কয়টি দেশও সৈন্য সরাইবার ইচ্ছা জানাইয়াছে, যাহার ফলে রাষ্ট্রসঙ্ঘবাহিনীর সৈন্যদলের সংখ্যা আরও তিন হাজার কমিতে পারে।

কঙ্গোতে রাষ্ট্রসঙ্ঘকে এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত করায় অনেকেরই হাত ছিল, এমন কি আমাদের শ্রীকৃষ্ণ মেননও বাদ পড়েন না।

শেষে, ফেব্রুয়ারীর তৃতীয় সপ্তাহে, আফ্রো-এশীয় দলের তিন সভ্য, আরব যুক্তরাষ্ট্র, লাইবেরিয়া এবং সিংহল এক প্রস্তাব আনেন যে, রাষ্ট্রসঙ্ঘ কঙ্গোতে অবস্থার অবনতি রোধের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করুক এবং প্রয়োজন হইলে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া ওখানে রাষ্ট্রবিপ্লব প্রতিরোধ করুক। বলা বাহুল্য, এই প্রস্তাব সোভিয়েট বা মার্কিন রাষ্ট্র, কাহারও মনঃপূত হয় নি। কিন্তু বাধা দিতে গেলে রাষ্ট্রসঙ্ঘেরই হার হইবে এবং নিজের দল হইতে আফ্রো-এশীয় সমর্থন চলিয়া যাইবে বুঝিয়া দুই পক্ষই, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থন দিয়াছেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সিকিউরিটি কাউন্সিলে সোভিয়েটের প্রস্তাব ১ (সোভিয়েট) বনাম ৮ ভোটে ব্যর্থ হয়, আরব যুক্তরাষ্ট্র ও সিংহল ইহাতে ভোট দেয় নাই। পরে ঐ আফ্রো-এশীয় ত্রিশক্তির প্রস্তাব ৯—০ ভোটে গৃহীত হয়। এই ভোটের সময় সোভিয়েট ও ফ্রান্স কোনোও ভোট দেয় নাই। রাষ্ট্রসঙ্ঘে এই প্রথম, আক্রান্ত দেশের অনুরোধ বিনা শক্তি-প্রয়োগের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় পণ্ডিত নেহরু রাষ্ট্রসঙ্ঘের বাহিনীকে শক্তিশালী করিবার জন্য এক ব্রিগেড রণসেনা পাঠাইতে রাজী হইয়াছেন।

কঙ্গোতে বর্ত্তমানে যে অবস্থা তাহাতে যদি রাষ্ট্রসঙ্ঘ সরিয়া আসে তবে হয় উহা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভিক রণক্ষেত্রে পরিণত হইবে, না হইলে উহা কঙ্গোর আদিম অসভ্য অবস্থায় ফিরিয়া যাইবে, যেখানে বেলজিয়ান ঔপনিবেশীর দল পুনর্ব্বার দখল দিবার সুযোগ পাইবে। বর্ত্তমানে ঐখানে চারটি সশস্ত্র দল লড়িবার উদ্যোগ করিতেছে, যথা :

কঙ্গোর লিওপোল্ডভিল এবং ইকুএটর প্রদেশে জোসেফ কাসাভুবুর অধীনে কমপক্ষে ৭,৫০০ সৈন্য রহিয়াছে। অনেক সংবাদদাতার মতে ঐ সৈন্যসংখ্যা ১৫,০০০-ও হইতে পারে। কাসাভুবু পশ্চিমী (মার্কিন) দলের কাছে কঙ্গোর প্রেসিডেণ্ট রূপে স্বীকৃতি পাইয়াছেন এবং বর্ত্তমানে মালাগাসী গণতন্ত্রের রাজধানী টানানারিভে (মাদাগাস্কার) যে বিভিন্ন কঙ্গোলিজ নেতৃবর্গের কয়েকজন মিলিত হইয়া কঙ্গোর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কথাবার্ত্তা চালাইতেছেন তাঁহাদের মধ্যে ইনিও আছেন।

লুমুম্বার সহকর্ম্মী এবং রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে তাঁহার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত আঁতোয়ান গিজেঙ্গা। ইঁহার ৭,০০০ সৈন্য, ও রিয়েঁতাল এবং কিভু প্রদেশের সমস্ত অঞ্চল এবং কাটাঙ্গা ও কাসাই প্রদেশের কিছু অংশ—অর্থাৎ কঙ্গোর প্রায় অর্দ্ধেক অধিকার করিয়া আছে। ইনি লুমুম্বার সমর্থনকারী।

বেলজিয়ান চক্রান্তকারীদিগের হাতে-ধরা প্রেসিডেণ্ট মোয়াসে শ্যোম্বে। ইঁহার ৫,০০০ সৈন্যের বেলজিয়ান সামরিক শিক্ষাদাতা ও সামরিক অফিসার আছে। ইনি খনিজ সম্পদ পূর্ণ কাটাঙ্গা অঞ্চলকে পৃথক করিয়া রাখিবার চেষ্টা চালাইতেছেন—বলা বাহুল্য, বেলজিয়ান-দিগের পূর্ণ সহায়তায় এলবেয়ার কালোঞ্জি নামে আরেক পৃথক রাষ্ট্র-নির্ম্মাণে ইচ্ছুক নেতা। ইঁহার হাতে প্রায় ১,০০০ সৈনিক আছে এবং ইঁহার অধিকার দক্ষিণ কাসাই অঞ্চলে।

এই চারটি দলকে অন্তর্বিপ্লব হইতে নিবৃত্ত করিয়া দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা আনিতে হইলে রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধীনে অন্ততঃ ২০,০০০ শিক্ষিত ও সশস্ত্র যোদ্ধসেনা প্রয়োজন। বর্ত্তমানে সেরূপ সৈন্য ১৫,০০০ আছে কি না সন্দেহ। তবে এখনকার শেষের খবরে জানা যায় যে, ভারতের ৩,০০০ সৈন্য পাঠাইবার উদ্যোগের ফলে অন্য কয়টি আফ্রো-এশীয় রাষ্ট্র ও সশস্ত্র সৈন্য পাঠাইতে সম্মত হইয়াছে। রাষ্ট্র-সঙ্ঘের কর্ত্তৃপক্ষ অনুমান করেন যে, ঐ সকল সৈন্য আসিলে রাষ্ট্রসঙ্ঘ বাহিনীতে ২৪,০০০ সৈন্য একত্র হইবে।

এই লেখার সময় টানানারিভ হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, সেখানে উপস্থিত যাঁহারা আছেন তাঁহা-দের সম্মিলিত অধিকার কঙ্গোর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের মতো। তাঁহাদের মতে সমস্ত কঙ্গোতে একটি যুক্তরাষ্ট্র স্থাপন এখন অসম্ভব। তাঁহারা একটি কঙ্গোলিজ রাজ্য-সঙ্ঘ স্থাপন করিতে ইচ্ছুক, যাহার একজন কেন্দ্রীয় প্রেসিডেণ্ট থাকিবে—বোধ হয় কাসাভুবু নিজে—কিন্তু প্রত্যেকটি রাজ্যের পৃথক সত্তা ও পূর্ণ স্বাতন্ত্রও থাকিবে। লিওপোল্ডভিলকে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত অঞ্চল করিয়া সেখানে এই সঙ্ঘের যোগস্থল রূপে রাখা হইবে। সেখানে এই যোগ একটি কেন্দ্রীয় বিধনসভা বা 'চালক' সংস্থার মারফৎ করা হইবে, তবে সেটা কি ভাবে ও কাহারা চালাইবে তাহার কোনো পন্থা স্থির করা হয় নাই। বলা হইয়াছে, প্রায় বারটি পৃথক কঙ্গোলিজ রাজ্য এই ভাবে মিলিত হইবে। ঐ পরামর্শকারী নেতৃবর্গের মধ্যে আছেন

কাসাভুবু, লিওপোল্ডভিল অঞ্চলের প্রধানমন্ত্রী জোসেফ ইলিও, কাটাঙ্গার প্রেসিডেণ্ট শোম্বে ও দক্ষিণ-কাসাইয়ের কালোঞ্জি। ইঁহারা রাষ্ট্রসঙ্ঘকে জানাইয়াছেন যে, কঙ্গোতে ভারতীয় যুদ্ধসেনা প্রেরণে তাঁহারা বিরোধী এবং বেলজিয়ানদিগের ক্রীড়াপুত্তলি শোম্বে এক প্রস্তাব আনিয়াছেন যে, কঙ্গোতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিরুদ্ধে সম্মিলিত ভাবে অভিযান গঠিত করা হউক। ইতিপূর্ব্বে বেলজিয়ান দল, যাহারা এই রাষ্ট্র-বিপ্লবের প্রধান উদ্যোক্তা, সরাসরি জানাইয়া দিয়াছে যে, তাহারা কঙ্গো ছাড়িবে না।

বলা বাহুল্য, এই অবস্থা স্থষ্টির জন্য মার্কিনী দলের দায়িত্ব খুব বেশী এবং শোনা যায় ব্রিটিশ কমনওয়েলথেরও কয়েকটি সভ্য এই চক্রান্তের মধ্যে আছে। ভারতের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার কিছুদিন যাবৎ চলিতেছে। এখন তাহা ব্যাপক ভাবে চালাইবার চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে।

লুমুম্বার সমর্থনকারী দল, অর্থাৎ আঁতোয়ান গিজেঙ্গার দল, এই পরামর্শকারীদিগের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে এবং নিজেদের শক্তি গঠনে সচেষ্ট হইয়া আছে।

বাজেট ও অসহায় ক্রেতা

প্রতি বৎসর বাজেটের মুখে কলিকাতার ব্যবসায়ী দল—যাদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জন মুনাফাবাজীতে সিদ্ধহস্ত—অসহায় জনসাধারণের উপর এক হাত কালোবাজারের জুয়া খেলিয়া থাকে। এবারেও ঠিক তাহাই হইয়াছে এবং ঠিক পূর্ব্বেকার মতো কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বাঁধা গৎ গাহিয়া আমাদের মনপ্রাণ পুলকিত করিয়াছেন। সেই একই তান "মুনাফাবাজে লুটে নিল সখী, বল কি করি?"

এবারের বাজেটে দরিদ্র সাধারণের ঘাড়ে যে বোঝা সরকারী তরফ হইতে চাপাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে তার উপর সাধারণ দোকানী এবং পাইকার আরও কিছু চাপাইয়াছে, ক্রেতা অসহায় ও নিরুপায়। আমাদের সংবাদপত্রগুলিতে এই বিষয়ে বিপক্ষ দলের আস্ফালন ও তর্ক-বিতর্কের ফিরিস্তি দিয়াই ক্ষান্ত। শুধুমাত্র একটি বিদেশী-পরিচালিত দৈনিকের নিজস্ব বিবরণে এই বারের অবস্থার বিশদ বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে। সরকারী পক্ষ থেকে অবশ্য বলা হইয়াছে যে, বহু নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দর অযথা চড়ানো হইয়াছে। সরকারী দল আরও বলেন যে, ঐ সবের খুচরা দাম অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রায় একই থাকা উচিত ছিল। তাঁহারা বলেন:

চায়ের দাম, এই নূতন কর বৃদ্ধির দরুণ, প্যাকেট বা টিন হিসাবে প্রতি কিলোগ্রাম এক হইতে দুই নয়া পয়সা বৃদ্ধি হওয়া উচিত। আরও এক রকম চায়ের শুল্ক নাকি প্রতি কিলো আধ নয়া পয়সা কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। খোলা বিক্রি চায়ের উপর শুল্ক ৫ হইতে ৮ নয়া পয়সা প্রতি কিলো বাড়িয়াছে। কফির দাম, সরকারী হিসাবে, কাগজের প্যাকেটে প্রতি কিলো ৬৲ টাকা ৬৪ নয়া পয়সা হওয়া উচিত বলা হইয়াছে। বনস্পতি জাতীয় তৈলের দাম প্রতি কিলো তিন নয়া পয়সা বাড়িতে পারে, দিয়াশলাইয়ের দামের একেবারেই কোনো প্রভেদ হওয়া উচিত নয় এবং উৎকৃষ্ট কেরোসিনের দাম বোতল পিছু দুই নয়া পয়সা বাড়িলেও সাধারণ (লালচে) কেরোসিনের দামের বৃদ্ধি অকারণ। কাপড়ের শুল্ক যাহা বাড়িয়াছে তাহাতে মাঝারি রকমের কোরা শাড়ী বা ধুতির দাম প্রতিটিতে নয় নয়া পয়সা বাড়িতে পারে। তিন গজ ধোয়া সার্টিং কাপড়ের দাম ১ নয়া পয়সা, অর্থাৎ গজ পিছু ⅓ নয়া পয়সা বাড়িতে পারে। এই ত সরকারী বক্তব্য।

কিন্তু কাজের বেলায় কি দেখা যায়? বাজেটের খবর বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বাজার হইতে অত্যাবশ্যকীয় নানা জিনিস ভেল্কিবাজীর মতোই উঠিয়া যায়। দোকানে—অর্থাৎ যে কয়টি দোকান এখনও প্রাচীনপন্থী বাঙালীর দোকান এখনও পাড়ায় পাড়ায় আছে—জিজ্ঞাসা করলে উত্তর আসে মাল নেই এবং পাইকাররা ছাড়ে নাই। অবশ্য কালোবাজারের দালাল দল—যথা হকার ও পানওয়ালা, যাহারা বাড়ী তোলে কিন্তু এক পয়সা ট্যাক্স দেয় না—বিক্রি করে সেই সব জিনিসই চড়া দরে। দিয়াশলাইয়ের দর আট নয়া পয়সা ত প্রায় সর্ব্বত্রই হইয়াছিল এবং কাপড় চোপড় ত আড়তেই ও কলেই মুনাফাবাজী এখনও চলিতেছে।

কর্ত্তৃপক্ষ শুধু মুনাফাবাজী চলিতেছে বলিয়া ক্ষান্ত। মুনাফাবাজীর বিরুদ্ধে আইন-কানুন নাকি নাই। কেন নাই তাহার উত্তর দেওয়ারও প্রয়োজন নাই। তবে যাঁহাদের চিন্তাশক্তি আছে তাঁহারা বুঝিতে পারেন কেন নাই।

ভারতের যত কয়টি দল আছে, দক্ষিণের রামরাজ্য হিন্দু মহাসভা হইতে বামের কম্যুনিষ্ট পার্টি পর্য্যন্ত সকল দরগায় সিন্নী দেয় ঐ কালোবাজারের দল এবং ঐ সকল পার্টিরই চাঁইয়ের দল সেই কারণে ইঁহাদের চোরাকারবারের সহায়ক ও পোষক—কেহবা প্রত্যক্ষ ভাবে কেহবা পরোক্ষ ভাবে।

সামনেই নির্ব্বাচনের পরীক্ষা আসিতেছে। ওই একমাত্র সময় যখন এইরূপ শোষণ ও দলনের প্রতিকারের পথ পাওয়া যায়। এবারের নির্ব্বাচনে পুরানো ঘাগী ও পাপীদের বিদায় করা উচিত এবং সেই সঙ্গে উচিত, বিদায় দেওয়া সেই বোবাকালার দলকে যাঁরা শুধু পালের গোদার ইঙ্গিতে চলেন। এবং এই ব্যবস্থা সকল পার্টির বেলায়ই হওয়া উচিত! কেন না বাহিরের মুখোস যাহাই হউক, ইহারা সবই সেই একই প্রকারের স্বার্থসর্ব্বস্ব জীব। নির্ব্বাচনের বেলায় প্রতিশ্রুতি সকলেই দিয়া থাকেন। তার পর—?

বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্য আকাদামী

এ বৎসর নয়াদিল্লীর সাহিত্য আকাদামী জানাইয়াছেন ১৯৫৭-১৯৫৯ সনে বাংলা, কাশ্মিরী, ওড়িয়া, সংস্কৃত, সিন্ধি ও তামিল ভাষায় এমন কোনোও পুস্তক রচিত বা লিখিত হয় নাই, যাহাকে সাহিত্য আকাদামী পুরস্কার দিবার যোগ্য মনে করিতে পারেন। এই ঘোষণায় পশ্চিম বাংলার কয়েকটি সংবাদপত্র কিছু রুষ্ট হইয়াছেন মনে হয় এবং কিছু মিঠে-কড়া মন্তব্যও নানাক্ষেত্রে করা হইয়াছে। বাঙালী সাহিত্যিকদিগের নানা আসরে এ বিষয়ে আরও কঠোর মন্তব্য অতি স্পষ্ট ভাষায় করা হইয়াছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমরা হিন্দী সাহিত্যিকদিগের মধ্যেও সাহিত্য আকাদামী পুরস্কার সম্পর্কে নানাপ্রকার মন্তব্য শুনিতে পাইয়াছি। বাংলা সাহিত্যিকদিগের নিকট গত দুই বৎসর যাবৎ সেই কথাই শুনিতে পাইতেছি। সবাই একই কথা বলেন—সাহিত্য আকাদামীর সাহিত্য বিচারে খোসামোদ ও তদ্বির ভিন্ন আর কিছুই নাই, বাহিরে একটা বিচারের ঢঙ সাজিয়ে রাখা হয় লোক দেখাইবার জন্য।

অবশ্য যাঁহাদের কাছে এইরূপ কথা শোনা যায় তাহাদের মধ্যে অনেকেই ঐ পুরস্কারপ্রার্থী; হিন্দী ও বাংলা সমকালীন সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁহাদের অনেকেরই অধিকার আছে। কিন্তু বিগত কয় বৎসর সাহিত্য আকাদামী পুরস্কার যেরূপ বইয়ের উপর দেওয়া হইয়াছে তাহাতে তাঁহাদের কথা একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না। এবং এবারের অর্থাৎ এই বৎসরের ঘোষণায় ত আমাদের ধারণা দাঁড়াইতেছে যে, ঐ সব কথাবার্ত্তার ষোল আনা না হোক ৮০ নয়া পয়সা সত্য।

এবারের বিষয়ে শোনা যায় যে, বাংলায় দুইজন লেখকের তদ্বির সমান জোরালো হওয়ায় বিচারকমণ্ডলী একটু ফাঁপরে পড়িয়া গিয়াছিলেন এবং সেই মুখে বাংলার এক সাহিত্যিকের ট্রাঙ্ককল মারফৎ পরামর্শ পাইয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত মনে বাংলা সাহিত্যের গত তিন বৎসরের ফসল সবই অখাদ্য বলিয়া নিস্তার পাইয়াছেন। আসল খবর আমরা অবশ্যই জানি না। প্রশ্ন এই যে, আসল খবর প্রকাশিত হয় কি না, অর্থাৎ বিচারপদ্ধতির ও তাহার ফলাফলের।

ঘরের কাছে রবীন্দ্র-পুরস্কার বিচারে ত এতদিন এক ব্যবহারজীবী নিজের ইচ্ছামতো দিনকে রাত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ক্ষেত্রে বিচারের পন্থার প্রধান লক্ষ্য ছিল পরিচিত জনের পোষণ ও সমর্থন, এবং সে বিষয়ে তিনি তাঁহার তর্কের মধ্যে ব্যবহারজীবীর কৌশল যতটা দেখাইয়াছিলেন ততটা তাঁহার সাহিত্য বিচারের দিকে দেখান নাই, যদিও সে বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান ও রুচি দুই-ই ছিল। জানি না এখন ঐ বিষয়ে কি ব্যবস্থা হইবে।

চার বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় এক নববর্ষের সাহিত্য-সম্মেলনে বাংলার সাহিত্যে কৃতিত্বের স্বীকৃতি দিবার জন্য কয়েকটি পুরস্কার ঘোষিত হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে ঐ নববর্ষ সম্মেলনে পুরস্কার ও স্বীকৃতি নিদর্শন দিবার পর বাংলার একজন মন্ত্রী, যাঁহার লেখনী গল্প বা কবিতা না হউক, অন্যদিকে বাংলা সাহিত্যের কিছু নিদর্শন দিয়াছে—ঐ স্বীকৃতির বিষয়ে বলেন যে, অর্থের পরিমাণ হিসাবে সরকারী টাকার তোড়া বেশী ভারি হইতে পারে কিন্তু সাহিত্য বিচারের পর্য্যায়ে ঐ নববর্ষের পুরস্কারের আসন বহু উচ্চে, কারণ সরকারী বিচারে সাহিত্যের গুণাগুণের কথা সব সময় দেখা হয় না, অন্য নানা বিষয় তাহাতে আসিয়া পড়ে।

তাহার পর আসে প্রশ্ন, সাহিত্য বলিতে নয়াদিল্লীর ও লালদীঘির বিদগ্ধ চূড়ামণিবৃন্দ কিরূপ বস্তু বোঝেন। গালগল্প, উপন্যাস ও কবিতাই কি সাহিত্যের সবকিছু? অবশ্য এখানে বিজ্ঞানের ব্যাপারেও একটা পুরস্কার দেওয়া হয় শুনিয়াছি। বিচারক কে বা কাহারা সে প্রশ্ন এখানে আসে না, কেন না নয়াদিল্লীর ও লালদীঘির অধিকর্ত্তাবৃন্দ লাড্ডু তৈয়ারীর ও মাছের কালিয়ার যে ফরমাইস দিবেন তাহার পাক যদি উক্ত বিদগ্ধ চূড়ামণি-দিগের পছন্দসই না হয় তবে কারিগর ও পাচক বদলাইতে কতক্ষণ?

সে যাহাই হউক এখন প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, নয়াদিল্লীর বিচারকমণ্ডলী কি হিসাবে ১৯৫৭-১৯৫৯ এই তিন বৎসরে বাংলা সাহিত্যের ও লেখকের সকল প্রয়াসকেই নস্যাৎ করিয়াছেন? "দেশ" লিখিয়াছেন:

"আকাদামীর বিচারে অসমীয়া, ইংরেজী (এমন কী ইংরেজী !), গুজরাতী, হিন্দী কন্নাদ, মালয়ালম, মারাঠি, তেলেগু এবং উর্দু—এই ন'টি ভাষায় রচিত বই পুরস্কারযোগ্য হয়েছে। কিন্তু ১৯৫৭, ১৯৫৮, ১৯৫৯—এই তিন বছরে যেসব বাংলা বই প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে একখানিও আকাদামীর বিচারে যথেষ্ট সাহিত্য-গুণসম্পন্ন বিবেচিত হয় নি। বিচার কঠোর, বিচারের ফলাফল নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যানুরাগীদের কাছে হতবুদ্ধিকর। আকাদামীর শ্রেষ্ঠ স্বীকৃতিলাভের যোগ্যতা বিচার কঠোর হোক আপত্তি নেই ; অপক্ষপাত হওয়া আরও একান্ত ভাবে কাম্য ! কিন্তু বিচারপদ্ধতিটা যে কী সে বিষয়ে সাহিত্যরসিকদের নিঃসংশয় করা আকাদামীর কর্তব্য। ১৯৫৭—১৯৫৯, এই তিন বছরে প্রকাশিত কোন্ কোন্ বাংলা বই-এর গুণাগুণ আকাদামী পরীক্ষা করেছেন, কারা বিচারার্থ বই-এর তালিকা প্রস্তুত করেছেন এবং পুরস্কারযোগ্যতা সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে কী পদ্ধতিতে—এ সমস্ত কিছুই জানবার উপায় নেই। আকাদমীর ঘোষণা থেকে শুদ্ধ এইটুকু জানা যাচ্ছে যে, ১৯৫৭—১৯৫৯ সালে এমন একখানিও বাংলা বই প্রকাশিত হয় নি, যার সাহিত্যিক গুণাগুণ পুরস্কারযোগ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেতে পারে।

"সমকালীন বাংলা সাহিত্যের এতদূর অধোগতি সম্বন্ধে সাহিত্য আকাদামী যতটা নিশ্চিত হতে পেরেছেন, বাংলা সাহিত্যানুরাগীরা ততখানি নিশ্চিত হতে পারেন না। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বাংলা ও বাঙ্গালীর দীনতা নানা দিকে ; কিন্তু সাহিত্যিক সৃজননিপুণতার বৈচিত্র্যে এবং ব্যাপ্তিতেও বাঙ্গালী যে আজ কাঙ্গালীতে পরিণত হয়েছে, একথা সমকালীন বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত যাঁরা, তাঁরা কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না। অথচ সাহিত্য আকাদামীর রায় থেকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এমন একটা অন্যায্য ধারণা প্রশ্রয় পাবে যে, আর ন'টি ভারতীয় ভাষা যে সাহিত্যিক সাফল্য অর্জন করেছে, বাংলায় তার সমতুল কৃতিত্বের স্বাক্ষর নেই ; বাংলার মত সবচেয়ে ঐতিহ্যসমৃদ্ধ প্রাণোচ্ছল সাহিত্যের সৃজনক্ষমতা ক্লান্ত, রিক্ত, নিঃশেষিত ! আকাদামীর ঘোষণার এই নিগূঢ় ইঙ্গিত কেবল বাংলা সাহিত্যের অমর্যাদাসূচক নয় ; এর মধ্যে আকাদামীর বিচার-বিভ্রাটের লক্ষণও সুপরিস্ফুট।

"একথা বলি না যে, আকাদামীর সাহিত্যিক পুরস্কার প্রত্যেক বছরেই তালিকাভুক্ত প্রত্যেকটি ভাষায় প্রকাশিত কোন না কোন বইকে দেয়া উচিত। পুরস্কার সাহিত্যিক শ্রেষ্ঠত্বের জন্য, ভাষাগত প্রতিনিধিত্বের সমতারক্ষার জন্য নয়। আকাদামী পুরস্কার লাভের জন্য বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার মধ্যে প্রতিযোগিতার প্রশ্নই উঠে না ; কারণ আকাদামীর ব্যবস্থা অনুযায়ী তালিকাভুক্ত প্রত্যেকটি ভাষার জন্য আলাদা আলাদা পুরস্কার নির্ধারিত, প্রত্যেকটি ভাষার সমকালীন সাহিত্য কৃতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সন্ধানের দায়িত্ব পৃথক পৃথক বিচারকমণ্ডলীর। কাজেই গুণাগুণ বিচারে এক ভাষায় রচিত বই-এর সঙ্গে অন্য ভাষায় রচিত বই-এর তুলনামূলক প্রতিযোগিতার কোন সম্ভাবনা নেই। অতএব নিঃসন্দেহে ধরে নেওয়া যায়, এবছর আকাদামী পুরস্কার-যোগ্যতায় বাংলাসাহিত্যের ব্যর্থতা ঘোষণা করে যে রায় দেয়া হয়েছে, সে রায়টি রচনা করেছেন বাংলাভাষাভিজ্ঞ সুধী বিচারকমণ্ডলী। তাঁদের রায়ের নীচে আকাদামীর কর্ম-পরিষদ শীলমোহরের ছাপমাত্র দিয়েছেন।"

"বিচারকমণ্ডলী সমকালীন বাংলা সাহিত্যিক প্রয়াসের উল্লেখযোগ্য নিদর্শনগুলির সঙ্গে সুপরিচিত কি না, অভিনিবেশ সহকারে সাহিত্যিক কৃতিত্বের নিদর্শন করেছেন কি না, এ-প্রশ্ন স্বভাবতই উঠবে এবং উঠেছে। তার চেয়ে বড় কথা বিচারের মানদণ্ড।"

বিচার-পদ্ধতি ও মানদণ্ড বিষয়ে "দেশ" যে প্রশ্ন করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত সমীচীন। বিচারক কে বা কাহারা সেকথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করার প্রয়োজন নাই, কেন না এমনিতেই "তদ্বিরের" চাপে দিনকে রাত দাঁড় করানো হইতেছে।

কলিকাতা

পণ্ডিত নেহেরু কবে কোথায় বলিয়াছিলেন যে, কলিকাতা নগরী তাঁহার নিকট একটা দুঃস্বপ্নের মতো। এই মহানগরী বিরাট প্রাগৈতিহাসিক আকৃতিতে নিজ দেহে বহু লক্ষ দুর্দ্ধর্ষ অধিবাসীকে ধারণ করিয়া লম্বা শুইয়া আছে, এবং তাঁহার মতে এই অতিকায় পুরীর কোনো উন্নতি সম্ভব নয়। পণ্ডিত নেহরুর অনুকরণে আরও অপর প্রধান প্রধান লোকে কলিকাতার সম্বন্ধে হতাশা-সূচক মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, এবং সেই সকল মতামত শুনিয়া ও বিতরণ করিয়া কলিকাতার সমালোচকজনের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। অন্ততঃ নেহরুর দরবারে। ইণ্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি শ্রী রুসি মোদি কিছুদিন হইল এই শহরের ব্যবসাদারদিগকে লইয়া একটা জল্পনা-সভা করেন ও সেই স্থলে শহরের কি করিয়া উপযুক্ত বর্দ্ধন ও নিয়ন্ত্রণ হইতে পারে

তাহার আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, এই শহরের অন্তরে যে বাধাপ্রাপ্ত ও অসফল আবেগ ও কামনাজাত জমাট বিস্ফোরক পরিস্থিতি ক্রমশঃ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা যদি আরও বাড়িয়া উঠে তাহা হইলে শহরের অবস্থা বিশেষ বিপদজনক হইয়া দাঁড়াইবে এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য অসম্ভব হইবে। বোম্বাই হইতে প্রকাশিত "কমার্স" পত্রিকায় এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, শ্রী নেহরু ও শ্রী মোদির কথা হইতে মনে হয় যে, এই সাট লক্ষাধিক অধিবাসীর কর্ম্মভূমি, কলিকাতা, নিজ বিভিন্ন সমস্যা ও অভাবের তাড়নায় শেষ অবধি আর একটি চীন-বিপ্লব পূর্ব্বের সাংহাই হইয়া দাঁড়াইতে পারে। এই মহানগরীর দুর্গন্ধ অলিগলি, বস্তি প্রভৃতি দুঃখ ও দৈন্যের কেন্দ্র। বেকার-সমস্যা, নিদারুণ অর্থকষ্ট ও অভাবের গা ঘেঁষিয়া এখানে ভোগ ও ঐশ্বর্য্যের জাঁকজমক প্রকট ভাবে দেখা যায়। বিপ্লব যদি ঘটে ত কলিকাতাতেই ঘটিতে পারে। এই সকল কথা চিন্তা করিয়াই কলিকাতার উন্নতির জন্য ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শতাধিক কোটি মুদ্রা ব্যয় করিবেন মনস্থ করিয়াছেন। অতঃপর "কমার্স" দেখাইয়াছেন যে, ২০০।৩০০ কোটি মুদ্রা ব্যয় করিয়া কলিকাতা পরিবর্দ্ধিত আকৃতি লাভ করিয়া নিজ সমস্যা সকলের সমাধান করিবে। বড় বড় রাস্তাঘাট, দুই আড়াই লক্ষ নূতন গৃহ, অসংখ্য ড্রেন ও অপর্য্যাপ্ত জল-সরবরাহের ব্যবস্থা এই পুনর্গঠিত কলিকাতায় থাকিবে। পরিষ্কার করিয়া না বলিলেও এই সকল কথার সারমর্ম্ম বোধ হয় এই যে, যথাযথ বাসস্থান, ড্রেন, জল-সরবরাহ, রাস্তা প্রভৃতি গড়িয়া দিলেই কোনো শহরের মানসিক স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক সমস্যার চিকিৎসা ও সমাধান সম্পূর্ণ হইয়া যায়।

আমাদের মতে তাহা হয় না। শহরের যাহারা স্বাভাবিক অধিবাসী তাহাদিগকে যদি যথাযথরূপে জীবন-পথে সুপ্রতিষ্ঠিত না রাখা হয় তাহা হইলে শুধু ড্রেন গড়িয়া শহরের বিস্ফোরক অবস্থা সুসংযত হইতে পারে না। কলিকাতা বাংলা দেশের মানসিক, অর্থনৈতিক ও কৃষ্টির কেন্দ্র। এই নগরীর ইতিহাসের সহিত বর্ত্তমান ভারতের ইতিহাস অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আছে। রাজা রামমোহন রায়, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, ও অপরাপর মহাপুরুষদিগের কর্ম্মক্ষেত্র কলিকাতা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মহাকেন্দ্র ছিল। পূর্ব্বকালীন ব্রিটিশ রাজকর্ম্মচারী ও সওদাগর মহলে বাঙালীর স্থান যাহা ছিল তাহা নষ্ট হইয়া পরবর্ত্তী যুগে হিন্দুস্থানী ও মাড়োয়ারী অধিকৃত রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক পরিবেষ্টনে বাঙালীর অবস্থা বিশেষ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়। ইহা যে ন্যায় ও ধর্ম্ম সাপেক্ষ ভাবে হইয়াছে তাহাও বলা যায় না। অন্যায় প্রতিযোগিতা, শঠতা, কুটিলতা, দুর্নীতি, উৎকোচদান, সুদখুরি ইত্যাদি নানান পাপের ইতিহাস বাঙালীর দুর্দ্দশার ইতিহাসের সহিত জড়াইয়া আছে। সুতরাং আমাদের মনে হয় না যে, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় রাস্তা, ঘর, ড্রেন, জলের কল ইত্যাদি নির্ম্মাণ করাইয়া কলিকাতার বাঙালীর অবস্থা উন্নত করিয়া দিবেন। কর্ম্মক্ষেত্রে, ব্যবসায়ে ও অপরাপর স্থলে বাঙালী যদি ন্যায়তঃ, ধর্ম্মতঃ নিজের পূর্ণ অধিকার ফিরাইয়া না পায় তাহা হইলে এই শহর নির্ম্মাণ কার্য্যে আরও অনেক অবাঙালীর লাভ হইবে ও বাঙালীর অবস্থা একই থাকিয়া যাইবে। ডাঃ বিধানচন্দ্রের এই ভাবে অবাঙালীকে বাঙালীর খরচে বাড়াইবার একটা বিশেষ প্রতিভা আছে দেখা যায়। তাঁহার গবর্ণমেণ্ট হিন্দুস্থানী ও মাড়োয়ারীদিগের অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল এবং সেই গবর্ণমেণ্টের দ্বারা কলিকাতার জনসাধারণ যে নিজ অধিকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়া কলিকাতার মানসিক স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনিবে এই আশা করা ভুল।

যদি কেহ কলিকাতাকে নিজ গৌরবে পুনর্ব্বার বসাইয়া দিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে বাঙালী নিজস্ব প্রতিভা বিসর্জ্জন না দিয়াও সসম্মানে নিজের জীবনযাত্রা অতিবাহিত করিতে পারে। কলিকাতার জলে লবণের অংশ কমান, গঙ্গায় পলিপড়া নিবারণ ইত্যাদি এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া মনে হয় না। শত শত কোটি মুদ্রা কর্জ্জ করিয়া কলিকাতাকে আরও পূর্ণরূপে পরহস্তে তুলিয়া দেওয়ার ব্যবস্থাই ডাঃ রায় করিতেছেন বলিয়া মনে হয়। অ

বাজেট ও কালো বাজার

ভারতের কালো বাজারগুলি ভারতের শেয়ার বাজার ও কারখানা জগতের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। অর্থাৎ যাহারা কালো বাজারে কারবার করিয়া খাজনা-মাশুল না দিয়া অবাধে ক্রোড়ের উপর ক্রোড়ে ঐশ্বর্য্য সঞ্চয় করিয়া চলিয়াছে, সেই লোকগুলিই শেয়ার বাজারে লম্প-ঝম্প করিয়া ও জুয়া খেলিয়া লাভ-লোকসান করে। তাহারাই আবার কারখানার সাহায্যে মাল প্রস্তুত করিয়া কালো বাজারে সেই মাল ছাড়িয়াও অন্যান্য অন্যায় ও অধর্ম্মের পথে চলিয়া কারখানা হইতে

নিজ প্রাপ্য অপেক্ষা অধিক লইয়া ও নিজের দিবার অংশ হইতে অল্প দিয়া, ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া থাকে। ভারতের কালো বাজার, জুয়ার বাজার, উৎকোচের বাজার ও অন্যসকল অধর্ম্মচালিত বাজার ও ব্যবসায় পরস্পরের সহিত মিলিত ও সংযুক্ত। সেইজন্য যখন মুরারজী দেশাই তাঁহার বাজেট বাহির করিলেন তখন এককালীন কালো বাজার, শেয়ার বাজার ও কারখানা বাজারে আনন্দের রব জাগ্রত হইয়া উঠিল। কারণ, বহু বিদেশ হইতে আমদানী মালের উপর বর্দ্ধিত মাশুল বসানতে চোরা আমদানী ও কালো বাজারে আমদানী মাল ছাড়িবার নূতন সুযোগের সৃষ্টি হইল। দেশে প্রস্তুত মালের উপর শুল্ক বৃদ্ধি হওয়াতে সেই সকল মাল বিক্রয়ের লাভ ও তাহার কালো বাজারে গতিবিধি আরও লাভজনক হইল; কারণ ক্রেতারা গরীব ও অশিক্ষিত এবং দোকানদাররা, পাইকার ও পাইকাররা, মহাজন ও মহাজনরা মালিকদিগের সহিত মাসতুতো ভাই সম্পর্কে সম্পর্কিত। মুরারজীর বাজেট প্রধানতঃ কালো বাজারের ও সাধারণকে ঠকাইবার মালিক যাহারা তাহাদিগের সুবিধা করিয়াছে। হয়ত সেই বাজেট হইতে ভারত সরকারের আয়বৃদ্ধি হইবে, কিন্তু হইলেও সেই অর্থে আরও দুই-চারিটি শ্বেত হস্তী পালিত হইবে, কিংবা পণ্ডিত নেহরুর আত্মমর্য্যাদাবোধ পুষ্ট হইবে। গরীবের শুধু ক্ষতিই হইবে বলিয়া মনে হয়। মধ্যবিত্ত লোকের অভাব-অনটন বাড়িয়া যাইবে। অর্থ যাহাদের আছে, তাহাদের মধ্যে যে কয়টি সাধুলোক তাহাদিগেরও ক্ষতি হইবে। অন্যায় ও অধর্ম্ম আরও জোরাল হইয়া উঠিবে।

অ

কলিকাতা সংস্কৃতি ও পরিবর্দ্ধন

ব্রিটিশ আমলে যখন কলিকাতার সংস্কৃতি ঘটিয়াছিল তখন শত শত বাঙ্গালী নিজেদের ভিটামাটি উচ্ছন্ন করিতে দিতে আইনত বাধ্য হইয়াছিলেন। ক্ষতিপূরণ হিসাবে যে অর্থ তাঁহারা পাইয়াছিলেন তাহাতে নব-নির্ম্মিত রাজপথের উপর তাঁহারা জমি ক্রয় করিয়া নিজেদের বাসস্থান সেইসকল স্থলে স্থাপিত করাইতে সক্ষম হন নাই। কারণ ঐ সকল নব নব রাজপথের জমির মূল্য তাঁহাদিগের ক্রয়ক্ষমতার সীমার বাহিরে ছিল। পুরাতন গৃহাদি ভাঙ্গিয়া যে সকল এলাকার সৃষ্টি হইল সেই সকল এলাকা মাড়োয়ারী-পাড়া হইয়া জমিয়া উঠিল এবং বাঙ্গালীরা সরিয়া দূরে গিয়া সস্তায় ঘরবাড়ী বানাইয়া বসিলেন। কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের খাতাপত্র দেখিলে বুঝা যাইবে যে, কত বাঙ্গালীর ঘর-বাড়ী ক্রয় করিয়া শহর সংস্কার করা হইয়াছে ও কত বাঙ্গালীর পরিবর্ত্তে কত অবাঙ্গালী সেই সেই স্থলে আসিয়া বসিয়াছে।

বর্ত্তমানে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় যে অর্থ ব্যয় করিবেন মনস্থ করিয়াছেন, তাহাতে কত সহস্র বাঙ্গালী পুনর্ব্বার গৃহহীন হইবে ও কত অবাঙ্গালী সেই খরচে নিজেদের সুবিধামতো ঘরবাড়ী কলিকাতায় নির্ম্মাণ করাইবে সে কথা আমাদিগের এখন হইতে চিন্তা করা প্রয়োজন। যদি এই সকল পরিকল্পনার ফলে গরীব বাঙ্গালীদের ঘর-দুয়ার বিক্রয় করিয়া আরও দূরে চলিয়া যাইতে হয় ও তাহাদিগের ভিটার উপর কারবারী অবাঙ্গালীরা আসিয়া নিজেদের গৃহাদি স্থাপন করে, তাহা হইলে আমাদিগকে এখন হইতে চেষ্টা করিয়া সেই প্রকার পরিণতি বন্ধ করিতে হইবে। এমন আইন করিতে হইবে যাহাতে যাহাদিগের এককাঠা জমি কিনিয়া লওয়া হইবে তাহাদিগকেই সেই স্থলের অতি নিকটে এক কাঠা জমি দিতে গবর্ণমেণ্টকে বাধ্য থাকিতে হয়। এবং মূল্য যাহা দেওয়া হইবে কোনোও প্রকার তেজী-মন্দী না খেলিয়া সেই মূল্যে অথবা তাহার অতি নিকট মূল্যে সেই সকল লোককেই বাসস্থান নির্ম্মাণ করাইয়া দিতে হইবে। অবশ্য পৃথক পৃথক গৃহের পরিবর্ত্তে "ফ্ল্যাট" অথবা "ম্যানশন" দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু গৃহের মালিক অপরদেশীয় লোকে হইবে না, ইহা অবশ্য স্থির করিতে হইবে। ভিন্ন দেশীয় লোকেদের কলিকাতায় আসিয়া জমিজমা ক্রয়-বিক্রয় ও বাড়ীভাড়ার ব্যবসায় ইত্যাদি অনায়াস সাধ্য না হইলেই দেশের মঙ্গল। সেইজন্য কলিকাতা সংস্কৃতি ও পরিবর্দ্ধনের নামে অপর দেশীয় টাকার খেলোয়াড়দিগের সুবিধা করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন নাই। এমন কি বাঙ্গালী খেলোয়াড়দিগকেও এই খেলায় বাধা দিলে মন্দ হয় না। অর্থাৎ সাধারণের অর্থে যে সকল বিরাট গঠন-কার্য্য করা হইবে তাহার দ্বারা কোনো প্রকার বড় ধরনের জমিজমা ও ঘরবাড়ীর ব্যবসায় চালাইবার সুবিধা কাহাকেও না দেওয়া উচিত। পরিবর্দ্ধিত ও সংস্কৃত কলিকাতার জমি, ঘরবাড়ী কলিকাতার পুরাতন বাসিন্দা ও বাঙ্গালীদিগের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য প্রথমত দেওয়া প্রয়োজন। তৎপরে বাংলার ব্যবসায়ের জন্য ও যাহারা বাংলা দেশের অধিবাসী তাঁহাদের ব্যবহারের জন্য সেই সকল স্থান বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন। অর্থাৎ কলিকাতার জমি, ঘরবাড়ী প্রভৃতি ক্রয়-বিক্রয়ের নিয়ম-কানুন এমন করা

প্রয়োজন যাহাতে শহরটি ক্রমশঃ অবাঙ্গালীর হস্তে চলিয়া না যায়। কেন না তাহা হইলে কলিকাতা পণ্ডিত নেহরুর দুঃস্বপ্ন হইতে আরও ঘোরতর দুঃস্বপ্নে পরিণত হইবে বলিয়া আমাদিগের ধারণা। অ

রাশিয়ার নিকট টাকা ধার

মুসলমান মোল্লাদিগের এক সময় কথাবার্ত্তার এমন একটা ধরন ছিল যে, মনে হইত ঈশ্বর তাঁহাদের সহিত নিয়মিত বাক্যালাপ করিয়া থাকেন। কোনোও বিষয়ে ঈশ্বরের মত কি তাহা জানিতে হইলে মনে হইত কোনো মোল্লাকে জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন যে, ঐ বিষয়ে ঈশ্বর তাঁহাকে কিছু বলিয়াছেন কি না। কারণ তাঁহারা ছিলেন স্বয়ং নিযুক্ত ঈশ্বরের প্রতিনিধি।

কম্যুনিষ্ট দলের কোনো কোনো ব্যক্তি ঐরূপ রাশিয়ার স্বয়ং নিযুক্ত প্রতিভূ বলিয়া প্রচারিত হইতে ইচ্ছা করেন। মোল্লাদিগের বিষয়ে যেরূপ ঈশ্বর কিছু জানিতেন না, ইঁহাদিগের বিষয়েও তেমনি রাশিয়ার শাসনকর্ত্তারা কিছু জানেন না। এবং ইঁহাদিগের কথার জন্য রাশিয়া কোনোরূপে দায়ী নহেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে এক কম্যুনিষ্ট নেতা ভারত সরকারকে একটা লম্বা উপদেশ প্রদান করেন। এই উপদেশের সারমর্ম্ম এই ছিল যে, ভারত সরকারের আমেরিকার নিকট আর টাকা ধার না করিয়া রাশিয়ার নিকট ধার করা উচিত; তিনি রাশিয়ার সহিত পরামর্শ করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন কি না আমরা জানি না। কিন্তু সম্ভবতঃ তাহা করেন নাই, কেন না রাশিয়া ভারতকে ধার দিতে বিশেষ ব্যগ্র নহেন। যে স্থলে আমেরিকা ভারতকে এখন অবধি ৩,০০০ কোটি প্রমাণ টাকা ধার দিয়াছেন ও আগামী ৬বৎসরে আরও ২,৫০০ কোটি টাকা দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, সেই স্থলে রাশিয়া একশত কোটি টাকা এখনও ভারতকে কর্জ্জ দেন নাই ও আগামী পাঁচ বৎসরে আরও ৬০ কোটি টাকা দিবেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। আমেরিকার সহিত টাকা ধার দিবার জন্য রাশিয়া ভারতে পাল্লা দিতে আসিবেন না। চীনকে রাশিয়া টাকা ধার যথেষ্ট দিয়া থাকেন এবং তাহা দিয়া ভারতকে দিবার জন্য রাশিয়ার টাকা আরও অনেক থাকে না। এ কথা সর্ব্বজন গ্রাহ্য। অ

ইংরেজী ধরনের স্কুল

কিছুকাল পূর্ব্বে ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ এক বক্তৃতায় বর্ত্তমান কলিকাতার ইংরেজী ধরনের স্কুলগুলির উপর নিজের অনাস্থা ও অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তাঁহার মতে ইংরেজী ফ্রক পরিয়া ভারতীয় বালিকারা যদি ইংরেজী ভাষায় কথাবর্ত্তা বলে ইংরেজীর সাহায্যে বিদ্যালাভ করে, তাহা হইলে বাংলা ভাষা ও ভারতীয় সভ্যতার সর্ব্বনাশ হইবে। ডঃ ঘোষ নিজে ইংরেজী শিক্ষার সাহায্যে এত বড় হইয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বহু ভাষা ও সংস্কৃতির সেবক ইংরেজীতে শিক্ষালাভ করা সত্ত্বেও ভারতীয় কৃষ্টির উন্নতির কারণ হইয়াছেন এবং তাঁহার পরেও বহু লেখক, চিত্রকর, ভাস্কর বিজ্ঞানবিদ ও সমাজ সেবক ইংরেজী পাঠ করিয়া, ইংরেজী বস্ত্র পরিধান করিয়া, এমন কি ইংরেজী খানা খাইয়াও দেশের কোনো লজ্জার কারণ হন নাই। ডঃ ঘোষের ইংরেজীর প্রতি বিরুদ্ধ ভাব মনে হয় একটা মানসিক ভঙ্গিমাত্র। কারণ, কোনো পুনর্গঠিত ভাষার আশ্রয়ে শিক্ষা গ্রহণ আমাদের মতে শিক্ষার উৎকৃষ্ট পন্থা। হিন্দী অথবা সাঁওতালি ভাষায় শিক্ষালাভ করিতে যাওয়া কাঠের ক্ষুর দিয়া ক্ষৌরকার্য্য করার মতোই সহজ ও সরল। বাংলা অপেক্ষাকৃত উন্নততর স্তরের ভাষা হইলেও বাংলায় বহু বিষয়ের উপযুক্ত পুস্তকাদি নাই ও বাংলার সাহায্যে অনেক কিছুই এখনও ঠিকমতো ব্যক্ত হয় না, কারণ বাংলায় সেই সকল বিষয়ের কেহ আলোচনা ও ব্যাখ্যা করেন নাই। ডঃ ঘোষ যদি নিজের মাতৃভাষার জন্য এতটা গভীর ভালবাসা পোষণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার উচিত অকারণে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নিজের মূল্যবান সময় নষ্ট না করিয়া দেশের ভাষা ও কৃষ্টির জন্য আরও প্রকৃষ্ট ভাবে আত্মনিয়োগ করা। তাঁহার নিজেরও এখনও ইংরেজী ধরনের চিন্তা ও প্রকাশভঙ্গি। অবশ্য ইংরেজী পোশাক তিনি পরেন না। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে বলা প্রয়োজন যে তাঁহার এই সকল ছোট কথায় থাকা উচিত নহে।

অ

কঙ্গো-জবাহর

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু চরখা ঘুরাইয়া নিজের রাষ্ট্রীয়-জীবন আরম্ভ করিয়া থাকিলেও তিনি কোনো সময়েই নিজের চরখায় তেল দেওয়া নীতি ঠিক মতো শিখিতে পারেন নাই। বাংলা ভাষায় তাঁহার ব্যুৎপত্তি নাই; কিন্তু তিনি নিজের যন্ত্রে তেলদান সম্বন্ধে ইংরেজী প্রবাদটি নিশ্চয়ই জানেন এবং দানধর্ম্ম যে নিজগৃহে আরম্ভ করাই সুরীতি তাহাও ইংরেজী ভাষায় শুনিয়াছেন। তবুও তিনি সর্ব্বদাই অপরের এলাকায় গমন করিয়া

পরের ঝগড়া ও পরের শত্রু ঘরে তুলিয়া আনেন কেন, এ কথার উত্তর দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। কাশ্মীরে যখন "কাবালি" সাজিয়া পাকিস্থানের সেনাদল শ্রীনগর অভিমুখে ধাবমান হইল, তিনি তখন কাশ্মীর অধিপতির অনুরোধে সেই দেশে ভারতীয় সৈন্য পাঠাইয়া তাহার বহু অংশ শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা করেন। পরে ইউ. এন.-কে ডাকিয়া আনিয়া সেই দেশের অর্দ্ধেক পাকিস্থানের হস্তে তুলিয়া দেন। ইউ. এন. কাশ্মীরে নিজ সৈন্য পাঠাইবার প্রস্তাব করিলে ভারত সরকার তাহাতে আপত্তি জানান। বর্ত্তমানে কঙ্গোদেশে যে গোলযোগ চলিতেছে তাহাতে পণ্ডিত নেহরু আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া কঙ্গোর পঙ্ক নিজ অঙ্গে লেপন করিতেছেন। প্রথমতঃ, কঙ্গোতে বেলজিয়াম প্রভৃতি ইউরোপের দেশগুলি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রহিয়াছে যে কেমন করিয়া ঐ দেশের উপর নিজেদের প্রভাব বিস্তার করা যায়। জানিয়া-শুনিয়া, চক্ষু বুজিয়া এই কথাটি অস্বীকার করিয়া চলাতে ইউ. এন. কঙ্গোর গোলমাল আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছেন। যখন বেলজিয়ান শিক্ষিত ও চালিত সৈন্যগণ ভারতীয় ও অপরাপর ইউ. এন. কর্ম্মচারীদিগকে প্রহার করে, তখন পণ্ডিত নেহরুর উচিত ছিল ভারতীয় সকল সেনা ও কর্ম্মচারীদিগকে কঙ্গো হইতে ফিরাইয়া আনা। তিনি তাহা না করিয়া অপমান হজম করিয়া বসিয়া রহিলেন। আজ তিনি হঠাৎ কয়েক সহস্র ভারতীয় সৈন্য কঙ্গোতে ইউ. এন.-এর সাহায্যের জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন। অতঃপর পাকিস্থানের সহিত ভারতের দ্বন্দ্ব ঘটিলে ইউ. এন. আমেরিকান-রুশিয়ান সৈন্য ভারতে পাঠাইলে, ভারতের আপত্তি করার পথ থাকিবে না। নিজের জন্য এক প্রকার আইন ও অপরের জন্য অন্য প্রকার হইতে পারে না। তার পর ভারতের সেনার অপর দেশের ঝগড়ায় প্রাণ নাশ ঘটিলে তাহা কোন্ আইনে শুদ্ধ করা হইবে? অ

গোবিন্দবল্লভ পন্থ

জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের অগ্রণী নায়ক ও নব্যভারতের অন্যতম রূপকার পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ গত ৭ই মার্চ্চ পরলোকগমন করিয়াছেন। গত ২০শে ফেব্রুয়ারী তিনি 'সেরিব্রাল থ্রমবসিস' রোগে আক্রান্ত হন। সেই হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার জ্ঞান আর ফিরিয়া আসে নাই।

মাতামহ রায়বাহাদুর পণ্ডিত বদ্রিদত্ত যোশী সদর আমিনের কাজ করিতেন। আলমোড়ায় তাঁহারই গৃহে ১৮৮৭ সনের ১০ই সেপ্টেম্বর গোবিন্দবল্লভের জন্ম হয়।

পিতা শ্রীমনোরথ পন্থ রাজস্ব বিভাগের অফিসার ছিলেন।

ছাত্রাবস্থাতেই গোবিন্দবল্লভ বিপ্লবীর মন্ত্রে দীক্ষিত হন। ইহার পর দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দায়িত্ব তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হয়। প্রথম জীবনে তিনি গ্রাজুয়েট হইয়া এবং ওকালতি পাস করিয়া নৈনিতালে আইন-ব্যবসা সুরু করেন। ১৯১৬ সনে 'কুমায়ুন পরিষদ' নামে এক সংস্থা গঠন করিয়া তিনি যে আন্দোলন সুরু করেন, তাহার ফলেই শাসনতন্ত্র বহির্ভূত অনগ্রসর পার্ব্বত্য এলাকাগুলি নিয়মতান্ত্রিক শাসনের এক্তিয়ারে আসে, এবং সে-সব স্থানে যুগোচিত শিক্ষা-দীক্ষার পটভূমি সৃষ্টি হয়। ইহাই পন্থজীর জীবনে প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজনীতিক কর্ম্ম। ইহার পর ১৯২১ সনে গান্ধীজীর সহিত মিলিত হন।

পন্থজীর দীর্ঘ ও বিচিত্র কর্ম্মজীবনের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে দেখিতে পাই, অনলস কর্ম্মসাধনাকেই তিনি জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে এমন নেতার সংখ্যা বেশী নয়, যাঁহারা জীবনের সুরু হইতেই একান্তভাবে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ঐশ্বর্য্য এবং পদাধিকার বলে যাঁহারা ক্ষমতার শীর্ষস্থান অধিকার করেন, পণ্ডিত পন্থ সে দলে ছিলেন না। তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তা এবং ব্যক্তিত্বই তাঁহাকে বড় করিয়াছিল। তিনি ছিলেন নিরহঙ্কার ও নিরলস কর্ম্মী। তিনি জীবনে কখনও হার মানেন নাই। কর্ম্মময় জীবনে তিনি প্রতিকূল অবস্থার সহিত নিরন্তর সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। এমনি সংগ্রাম করিয়াছিলেন, সাইমন বয়কটে নেতৃত্ব করিতে গিয়া। যাহার ফলে, তিনি মাথায় এবং পায়ে দারুণ আঘাত পাইয়াছিলেন। উত্তরকালে সেই আঘাতের চিহ্নস্বরূপ তাঁহাকে শিরঃকম্পন ও খঞ্জ পা লইয়া সারাজীবন কাটাইতে হয়। কিন্তু তাঁহাকে কখনো বিচলিত হইতে দেখি নাই। এমনি ছিল তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর জটিল গুরুভার এবং দুরূহ কর্ত্তব্য সম্পাদনে তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও কঠোর নিয়মনিষ্ঠা সকলেরই প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে। সবচেয়ে বড় কথা, স্বাধীনতা পূর্ব্বযুগ ও স্বাধীনতা পরবর্ত্তী যুগের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য জাতীয় নেতৃত্বের গুরুদায়িত্ব পালনে পণ্ডিত পন্থের ধীর স্থির ভূমিকা ও সুদক্ষ পরিচালনা-কৌশল ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। ভারতবর্ষের এই অগ্রযাত্রার দিনে দৃঢ়ব্যক্তিত্ব ও প্রত্যয়সম্পন্ন নেতার প্রয়োজন আজ যখন সর্ব্বত্র অনুভূত হইতেছে, তখন তাঁহার মতো মানুষের বিদায় নিতান্তই বেদনাদায়ক।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

বাংলার অন্যতম সাহিত্যসাধক ও খ্যাতনামা ব্যবহারজীবী অতুলচন্দ্র গুপ্ত গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী পরলোক গমন করিয়াছেন।

অতুলচন্দ্র যে সাহিত্যসাধক ছিলেন, ইহা তাঁহার আংশিক পরিচয় মাত্র। তাঁহার প্রতিভা ছিল বহুমুখী। শুধু সাহিত্যেই নহে, জীবনের আরও অনেকক্ষেত্রে সেই প্রতিভার স্পর্শ পড়িয়াছে। সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম্মশাস্ত্র, ব্যবহার শাস্ত্র ইত্যাদি বহু বিষয়েই তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। 'সবুজপত্র'-এর সময় হইতে তাঁহার জীবনের অন্ত্য-অধ্যায় পর্য্যন্ত প্রতিটি পর্ব্বেই তাঁহার সরস-চিত্ততার পরিচয় পাওয়া যায়। দেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার সহিত তাঁহার নিবিড় যোগ-সম্পর্কের কথাও কাহারও অজানা নয়। অর্থ দিয়া, উৎসাহ দিয়া এদেশের সংস্কৃতি-চর্চ্চার ঐতিহ্যটিকে, অতিশয় যত্নভরে তিনি লালন করিয়া গিয়াছেন।

১৮৮৭ সনে রংপুর শহরে অতুলচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা উমেশচন্দ্র রংপুরের একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন। অতুলচন্দ্রের আদিবাড়ী ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইলের অন্তর্গত ছোটবিন্নাক গ্রামে।

রংপুরে থাকিতেই, অতুলচন্দ্র বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগ দেন। তিনি তখন ছাত্র। এইখান হইতে তিনি এণ্ট্রান্স পাস করিয়া কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িতে আসেন। এম. এ. ও ওকালতি পাস করিয়া, তিনি কিছুদিন ন্যাশনাল স্কুলে মাষ্টারি করেন। ইহার পর ১৯১৪ সনে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আসেন। ওকালতি করিতে করিতে অধ্যাপনার কাজও করিতে থাকেন।

কাব্যের প্রতি ছিল তাঁহার বাল্যকাল হইতেই আকর্ষণ। ১৩২১ সালে প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। অল্পদিনের মধ্যেই প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে অতুলচন্দ্রের সৌহার্দ্দ্য হয় এবং অতুলচন্দ্রও সবুজপত্র-গোষ্ঠীর একজন হইয়া উঠেন। অতুলচন্দ্রের প্রথম গ্রন্থ 'শিক্ষা ও সভ্যতা'। ইহার পর তিনি অনেক গ্রন্থই লিখিয়াছেন, যেমন: 'কাব্যজিজ্ঞাসা', 'নদীপথে', 'জমির মালিক', 'সমাজ ও বিবাহ', 'ইতিহাসের মুক্তি' প্রভৃতি।

সংস্কৃতিক্ষেত্রের এমন একটি আসন আজ শূন্য হইয়া গেল, যাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে।

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

প্রখ্যাত নাট্যকার এবং প্রগতিবাদী চিন্তাধারার অন্যতম প্রবক্তা শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত গত ৫ই মার্চ্চ পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৭ বৎসর হইয়াছিল।

১৮৯৩ সনে খুলনা জেলার সেনহাটি গ্রামে শচীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ছাত্রজীবন সুরু হয় রংপুরে। সেই সময় স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ বাংলার সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। স্কুলের পাঠ শেষ করিয়া, উচ্চশিক্ষা-লাভার্থে তিনি কলিকাতায় চলিয়া আসেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে তিনি বিপ্লবী আন্দোলনের সহিত নিবিড়-ভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়েন। সে সময় অনুশীলন সমিতির অন্যতম নায়ক শ্রীমাখনলাল সেনের সংস্পর্শে আসিয়া, বিপ্লব আন্দোলনের কাজে বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলা পর্য্যটন করেন।

প্রথম জীবনে তিনি সাংবাদিকরূপে আত্মশক্তি, বিজলী, নবশক্তি, বৈকালী, ঘরে-বাইরে প্রভৃতি সাময়িক পত্রের সম্পাদনা করেন। পরে অধুনালুপ্ত 'কৃষক' ও 'ভারত' দৈনিকপত্রের সম্পাদকীয় বিভাগে অনেকদিন কাজ করেন। সাংবাদিক হিসাবে এই সময় তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। অকালমৃত্যু না হইলে 'ভারত' আজ শ্রেষ্ঠ দৈনিকপত্রের মর্য্যাদা লাভ করিত। এমনি নির্ভীক তেজোদ্দীপ্ত কলম ছিল শচীন্দ্রনাথের। নাটক লেখাতেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। এক কথায় কলমকে তিনি খেলাইতে জানিতেন। নাট্যকার হিসাবেই তাঁহার আসল পরিচয়। তাঁহার প্রথম নাটক 'রক্তকমল'। পরে তিনি অনেক নাটক লিখিয়াছেন, যেমন: গৈরিক পতাকা, ঝড়ের রাতে, জননী, সতীতীর্থ, স্বামী-স্ত্রী, তটিনীর বিচার, প্রলয়, আবুলহাসান, নার্সিং হোম, সংগ্রাম ও শান্তি, সুপ্রিয়ার কীর্ত্তি, রাষ্ট্রবিপ্লব, কাঁটা-কমল, ধাত্রী পান্না, নরদেবতা, কালো টাকা, বাংলার প্রতাপ, সিরাজদ্দৌল্লা প্রভৃতি। ইহা ছাড়া অনেকগুলি উপন্যাসের নাট্যরূপও তিনি দিয়াছেন, যেমন, পথের দাবী, রজনী, সাহেব বিবি গোলাম, কৃষ্ণকান্তের উইল, দেবদাস প্রভৃতি।

নাট্য আন্দোলনে তাঁহার অসামান্য দানের স্বীকৃতি স্বরূপ শচীন্দ্রনাথকে দিল্লীর কেন্দ্রীয় নৃত্য-নাট্য-সঙ্গীত একাডেমীর সদস্য করা হয়। তিনি পশ্চিমবঙ্গ শান্তি পরিষদের সহ-সভাপতি ছিলেন। শান্তি পরিষদের প্রতি-নিধিরূপে চীন, রাশিয়া এবং ইউরোপের কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করেন। সহৃদয় তেজস্বী ও আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন পুরুষরূপে বন্ধুসমাজে তাঁহার যে আদরণীয় আসনটি ছিল, তাহা আজ শূন্য হইয়া গেল।

চরিত্র ও স্বাস্থ্য

শ্রীগৌতম সেন

'একটা গোটা মানুষের মানে চাই।' কবি ঠিকই বলেছেন—সেই মানুষকেই পূর্ণ-মানুষ বলব, যার চরিত্র আছে, স্বাস্থ্য আছে, আর সেই সঙ্গে আছে শিক্ষা। এই তিনের সমন্বয়ই হ'ল একটা গোটা মানুষ।

স্বাস্থ্য কি? দেহ ও মনের সুস্থতাই হ'ল স্বাস্থ্য। দেহকে নীরোগ করতে হবে এবং সেই সঙ্গে করতে হবে সবল। দেহ নীরোগ থাকে কিসে? সেটা নিজের হাতে। আমরা দেহকে সুস্থ রাখতে জানি না। রোগ হয় কেন? এই 'কেন' বা কারণকে দূর করা চাই। মিথ্যা আহার এবং বিহার রোগ-সৃষ্টির কারণ। এই আহার এবং বিহারের নিয়মানুবর্তিতাই সুস্থ থাকার উপায়। অনিয়ম না করলে কখনো রোগ হয় না। অনিয়ম শুধু দেহেই নয়, মনেও। মনকেও সুস্থ রাখতে হয়। তাই স্বাস্থ্য-রক্ষার প্রথম কথাই হ'ল নিয়মপালন। নিয়মে খাওয়া, নিয়মে শোয়া, নিয়মে ওঠা-বসা-চলা সবকিছু। অনিয়ম জীবন, উচ্ছৃঙ্খল জীবন—এই অনিয়ম মানুষকে প্রলুব্ধ করে। এই প্রলোভন ত্যাগ করার নামই সংযম। সংযম মানুষের পরমায়ু বৃদ্ধি করে, জীবনকে সংরক্ষণ করে।

এই স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়ে যিনি যে ভাবেই বলুন, মূলতঃ সেই একই কথা সকলে বলেছেন—নিয়মপালন।

খেলেই শরীর ভাল হয় না। অল্প-আহারেও শরীর রক্ষা হয় যদি তা নিয়মিত হয়। পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন নেই—এমন কথা বলছি না, তবে সেই খাদ্য না হলে শরীর রক্ষা হবে না—একথা মানতে রাজি নই। মাঠে যারা চাষ করে—দেখেছি, শুধু ডাল-ভাত খেয়েও তাদের লোহার মতো শরীর। প্রত্যেক খাদ্যের মধ্যেই প্রাণ-শক্তি আছে, আমরা অযথা ব্যবহারে তার গুণাগুণ নষ্ট করি।

একটা লোক যতটুকু খাদ্য গ্রহণ করতে পারে, তার অতিরিক্ত হলেই সেটা হবে অনিয়ম। অতিরিক্ত কিছুই ভাল নয়। অতিরিক্ত ব্যায়ামও ভাল নয়, অতিরিক্ত বিশ্রামও ভাল নয়।

সবকিছুকে নিয়মে বাঁধতে হবে। প্রকৃতিও চলে নিয়মের ধরা-বাঁধা কাঁটায়। সেই একই নিয়মে সূর্য ওঠে, আবার একই নিয়মে অস্ত যায়।

প্রাচীন ঋষিরাও এই নিয়মকে বেঁধেছিলেন। সেই একই সময়ে শয্যাগ্রহণ, একই সময়ে শয্যাত্যাগ। জীবনের সর্বক্ষেত্রে নিয়মানুবর্তিতা। প্রাচীন ব্যক্তিরা দীর্ঘায়ু ছিলেন ঠিক এই কারণে—তাঁরা শরীরকে রক্ষা করতে জানতেন।

এই দীর্ঘায়ু হওয়া কি মুখের কথা! এর পিছনে যে কতবড় সংযম রয়েছে, আমরা চিন্তা করেও দেখি না। শুচিতা—দেহকে সুস্থ রাখার আর একটা বড় কারণ। এ শুচিতা শুধু বাইরের নয়—চাই অন্তর্বাহিরের শুচিতা। অন্তরকে নির্মল না করতে পারলে, বাইরের শুচিতা তার উপদ্রবই হয়ে দাঁড়ায়। নির্মল অন্তঃকরণের নির্মল অভিব্যক্তি। অন্তরের বিষ শুধু অন্তরকেই দগ্ধ করে না—দেহকেও ক্ষয় করে।

অবশ্য সেকালে খাদ্য-সুখ ছিল। কিন্তু প্রাচীন ব্যক্তিরা কি শুধু সেই কারণেই দীর্ঘায়ু ছিলেন? ধর্ম-প্রাণ জাতি—ধর্মের সঙ্গে তাঁরা নিজের জীবনকে বেঁধে-ছিলেন। এই ধর্মই তাঁদের শিক্ষা দিয়েছে, শরীর রক্ষাই হ'ল প্রধান ধর্ম।

শরীরকে রাখতে হলে পরিশ্রম করতে হবে। পরিশ্রম দেহেরও দরকার, মনেরও দরকার। নইলে মনের বিকাশ হয় না। আবার পরিশ্রমও যেমন চাই, বিশ্রামও তেমনি চাই। আমরা বিশ্রাম করতে জানি না। যেটা জানি, সেটা অতি বিশ্রাম।

দেহের সঙ্গে মনের সম্বন্ধ অনেকখানি। দেহ ভাল না থাকলে, মন ভাল থাকে না—আবার মনের ভাল-মন্দের ওপর দেহের সুস্থতাও নির্ভর করে। মনের বলই আসল বল, দেহের বল তার কাছে অতি তুচ্ছ।

স্বাস্থ্যের প্রথম কথা হ'ল ব্রহ্মচর্য। ব্রহ্মচর্য চাই-ই চাই। ব্রহ্মচর্যেই হয় মহাশক্তির বিকাশ। উপনিষদের ঋষিদের মতো ঈশ্বরের কাছে আমাদেরও প্রার্থনা করতে হবে—'ওজো দেহি মে, বীর্যং দেহি মে, তেজো দেহি মে।' যে নির্বীর্য সে পৃথিবীর ভারস্বরূপ—তার দ্বারা জগতের কোনো কল্যাণই হবে না।

এই তেজ দেখতে পাই মহাভারতের প্রতিটি চরিত্রে। ভীষ্মদেব পিতার তৃপ্ত্যর্থে সারা জীবন বিবাহ করলেন না

এবং বিশাল সাম্রাজ্য ও তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অনায়াসে ত্যাগ করলেন।

এই ত্যাগ এবং সংযম না থাকলে মানুষের চরিত্র গঠিত হয় না—এই সংযমের মধ্যেই আছে পূর্ণ মানবতা।

চরিত্র গঠনের প্রথম কথা, পরিবেশ সৃজন। আমাদের পরিবেশকে গড়ে তুলতে হবে। এমন সমাজ গড়া চাই, যেখান থেকে সুস্থ শিক্ষিত চরিত্রবান মানুষ জন্মলাভ করবে। প্রাচীন ভারতের আদর্শ ছিল, গুরুগৃহে বাস। তখন এই গুরুগৃহ থেকেই ছেলেদের চরিত্র গড়ে উঠত। গুরুর নিয়ত সান্নিধ্যে তাঁর প্রভাবই সংক্রামিত হ'ত শিষ্যের মধ্যে। পরিবেশও ছিল আশ্রমোচিত পবিত্র।

উপযুক্ত গুরুর যোগ্য প্রতিনিধি হয়ে তারা যখন ঘরে ফিরে আসত, রূপে-গুণে-চরিত্রে-স্বাস্থ্যে একটি পূর্ণ মানব।

এই গুরুগৃহে তাদের কেবল শাস্ত্র-শিক্ষাই দেওয়া হ'ত না। তারা শিখত, ব্রহ্মচর্য পালনের বিধি-নিষেধ, শস্ত্র-শিক্ষার বিবিধ কৌশল। একটি সর্বতোমুখী প্রতিভার পাশে বসে পাঠ গ্রহণ। কিন্তু সকল শিক্ষার প্রথম পাঠই ছিল তখন স্বাস্থ্যরক্ষা। কারণ, স্বাস্থ্য না থাকলে তার সকল পরিশ্রমই হ'ত বৃথা।

এ আদর্শ নেই আমাদের বর্তমান শিক্ষার মধ্যে। এ শিক্ষা আমাদের বর্জন করতে হবে। পরিশ্রমকে ভয় করলে চলবে না। ঐ পরিশ্রমের মধ্যেই আছে সত্যিকার প্রাণ-শক্তি। ঐ মুটে-মজুরের মতোই আমাদের শারীরিক পরিশ্রম করে জীবিকা সংগ্রহ করতে হবে। কে বলেছে ওরা স্বতন্ত্র? তোমার খাবার তুমিই সংগ্রহ করবে। স্বাস্থ্য আছে ঐখানে—খাটো, খাও। ব্যায়াম করলেই দেহ গঠিত হয় না—চাই ঐ সঙ্গে ব্রহ্মচর্য। এই ব্রহ্মচর্যের দ্বারাই মনের বিকাশ হয়। যে মনের সঙ্গে আছে দেহের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ।

ব্রহ্মচর্য কি, আমাদের জাতীয় জীবনে, আমাদের জাতীয় চরিত্রে তার কতখানি প্রয়োজন সে কথা আজ আমরা ভুলে গিয়েছি বলেই আজ এতবড় একটা জাতের এই অধঃপতন। আজ বাংলার তরুণ-তরুণীদের খুঁজে বের করে নিতে হবে সেই ব্রহ্মচর্যের কি আদর্শ, কি তার বিধি-নিষেধ, কি তার রীতি-নীতি। এই রীতি-নীতির মধ্যেই আছে সত্যিকারের জীবনধারণের পরমানন্দ, আছে সঞ্জীবনমন্ত্র—যে-মন্ত্রে বিধৃত হয়ে আছে মানুষের সমগ্র ঐতিহাসিক অস্তিত্ব।

একথা সত্যি, খাদ্যের মধ্যে আছে প্রাণ-শক্তি। কিন্তু খাদ্য কোথায়? আজ ভাল ঘি-দুধ পয়সা দিয়েও পাওয়া যায় না। তেলের মধ্যেও ভেজাল। অর্থলোভে জাতীয় চরিত্র আজ এত নীচে নেমে গিয়েছে যে, মানুষের খাদ্যে বিষ মেশাতেও সে কুণ্ঠিত নয়।

আজ দেশে খাদ্য নেই, মানুষ বাঁচবে কিসের জোরে? মানুষ আজ আর মানুষ নয়, জল্লাদ! পরস্পরের অলক্ষ্যে সে ছুরি শানাচ্ছে। আজ সমাজকে সেই দায়িত্বই নিতে হবে—যা একদিন বিবেকানন্দ নিয়েছিলেন, মানুষ গড়ার কাজ।

রোগ-বিচার করে ঔষধের ব্যবস্থা করতে হবে। আজ ব্যাধি সর্বত্র। কোথা থেকে কাজ সুরু হবে, সেই জটিল গ্রন্থিই আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। আজ মানুষের মননশক্তিতেই শুধু নয়, তার মননকেন্দ্রে ধরেছে ভাঙন। তার চরিত্রে ধরেছে ঘুণ।

আজ যারা শিশু, যারা কিশোর-কিশোরী, যারা তরুণ, আজও যারা রয়েছে কাঁচা—আজ জাতির সমগ্র শক্তি ও দৃষ্টি দিয়ে তাদের গড়ে তুলতে হবে, যাতে তারা আগামী যুগের যোগ্য মানুষ বলে পরিচিত হতে পারে। তাদের জন্যে চাই নতুন বিদ্যালয়, নতুন শিক্ষা-পদ্ধতি, নতুন পাঠ্যপুস্তক এবং নতুন শিক্ষক, নতুন পরিবেশ। যাঁরা তাদের কতকগুলো বই-এর পড়াই পড়াবেন না—তাদের স্বাস্থ্যের সঙ্গে চরিত্র গড়ে তুলবেন।

স্বাধীন ভারতে আজ প্রথম এবং প্রধান কর্তব্যই হবে, এমনি একটি আদর্শ-জাতিকে গড়ে তোলা।

ব্যক্তিগত মানুষের চরিত্রের মতন প্রত্যেক জাতির একটা চরিত্র আছে। কোন্ জাতির চরিত্র কি তা বোঝা যায়, সেই জাতির সাধারণ লোকের প্রতিদিনের হাব-ভাব, কথাবার্তা, চালচলন থেকে। বাঙালী জাতির চরিত্র কি, তা বোঝা যাবে না সুভাষচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথকে দেখে, বাঙালী জাতির চরিত্র কি তা বোঝা যাবে ট্রেনের প্যাসেঞ্জারদের ব্যবহার থেকে, পথে-ঘাটে, বাজারে, সিনেমায়,খেলার মাঠে, অফিসে, স্কুলে প্রতিদিনের সাধারণ জীবনের ছোট-খাট ঘটনা থেকে। প্রতিদিনের ছোট-খাট ঘটনায়, আপনি আমি, রাম-শ্যাম-হরি-যদু যে কথা বলি, যে-কাজ করি, যে ভঙ্গি দেখাই, তারই মধ্যে ফুটে ওঠে আমার জাতীয় চরিত্রের রূপ।

ব্যক্তিগত মানুষের জীবনে যখন দুঃখ আসে, বেদনা আসে—তখনই প্রকৃতভাবে বোঝা যায় লোকটির আসল স্বভাব কি, আসল চরিত্র কেমন। তেমনি জাতির জীবনে যখন আসে সুগভীর বেদনা, যখন আসে ঘন-অন্ধকার, তখনই বোঝা যায় সেই জাতির আসল পরিচয়। হয়ত ঢাকা থাকতে পারে, কিন্তু জাতীয় দুর্দৈবের সময় জাতির আসল পরিচয় অভ্রান্তভাবে আপনা থেকে ফুটে বেরোয়।

প্রত্যেক জাতিকে বোঝা যায় তার জাতীয় দুর্দৈবের দিনে, কি ভাবে সে সেই দুঃখকে নেয়, সেই বেদনার আঘাতে কি ভাবে সে সাড়া দেয়, তারই মধ্যে অভ্রান্ত-ভাবে ফুটে ওঠে তার জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। যেদিন হিটলারের বিমানবহর লণ্ডনের আকাশকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, যেদিন জার্ম্মান ব্লিৎজ্‌ক্রীগের ধাক্কায় লণ্ডনের প্রত্যেকটি ইট আর পাথর নড়ে উঠেছিল সেদিন ইংলণ্ডের প্রতিদিনের সাধারণ লোকের ক্রন্দনহীন স্তব্ধ মৌন বীর্য্যের মধ্যে ফুটে উঠেছিল ইংরেজ জাতির আঘাত-সহ কঠিন শৌর্য্যের মূর্ত্তি; যেদিন সেই হিটলারেরই সুবিশাল মৃত্যু-বাহিনী জীবন্ত প্রলয়ের মতন স্টালিনগ্রাদের ওপর এসে পড়েছিল, সেদিন সেই আশা-হীন প্রলয়ের মধ্যে সাধারণ রুষ-নাগরিক সত্যিকারের পরিচয় দিয়েছে তাদের দেশ-প্রেমের। তার পর যেদিন নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসস্বরূপ সেই হিটলারের জার্ম্মানী গেল ছিন্নভিন্ন হয়ে, সমগ্র জার্ম্মান জাতি অস্ত্রহীন, অন্নহীন, বস্ত্রহীন, মহা দুর্ভিক্ষের মধ্যে বিজিত জাতির দয়ার ওপর শুধু কোনো রকমে বেঁচে থাকতে বাধ্য হ'ল, জার্ম্মানীর সেই নিদারুণ পরাভব আর মর্ম্মান্তিক দৈন্যের মধ্যেও সেদিন সাধারণ নাগরিকের জীবনে ফুটে উঠল জার্ম্মান-জাতির চরিত্রের আসল বিভব। পরাজিত ধ্বংসসর্ব্বস্ব জার্ম্মানী কিভাবে তার এই নিদারুণ দুঃখকে গ্রহণ করেছে, তার পূর্ণ কাহিনী আজ জগৎ জানে না, কিন্তু মাঝে মাঝে সেই নিদারুণ অভিজ্ঞতার যে টুকরা টুকরা বিবরণী আমরা পেয়েছি, তার ভেতর থেকেই বোঝা যায়, পরাভবের মধ্যেও এই জাতি কতখানি মহত্ত্বের সঙ্গে তার তার দুর্দৈবকে বহন করছে। সেই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ আর লাঞ্ছনার মধ্যেও দেখা যায় কিভাবে বেঁচে আছে এই দুর্দ্ধর্ষ জাতির প্রাণ-শক্তি। সেই মূল প্রাণ-শক্তির যেদিন মৃত্যু ঘটবে, সেই দিনই ঘটবে জার্ম্মান জাতির মৃত্যু।

আমেরিকান অধিকৃত জার্ম্মানীর এক আপিসে বসে আছেন আমেরিকান সেনাপতি, সেই অঞ্চলের সর্ব্বময় কর্ত্তা তিনি। বহুকষ্টে বহুদিনের চেষ্টার ফলে একটা-আধটা করে কারখানা আবার খুলছে। হাজার হাজার জার্ম্মান যুবক অন্নহীন শীর্ণ দেহে অপেক্ষা করে আছে কাজের জন্যে। প্রত্যেক অঞ্চলে বেকার জার্ম্মান যুবকদের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। তালিকার ক্রমিক সংখ্যা অনুযায়ী তাদের একে একে চাকরি দেওয়া হচ্ছে। হাজার জন যেখানে অপেক্ষা করে আছে, সেখানে একজন মাত্র পাচ্ছে চাকরি, বাকি ন-শো নিরানব্বই জন লোক উপবাস-শীর্ণ দেহে শুধু মৌনভাবে অপেক্ষা করে আছে, কখন আসবে তার পালা। পালা আসবার আগেই অনেকের আয়ু যাচ্ছে ফুরিয়ে। তবুও অপেক্ষমান সেই শতসহস্র যুবকদের মধ্যে নেই ঠেলাঠেলি, নেই সামনের লোককে ডিঙ্গিয়ে যাবার কুৎসিত ব্যগ্রতা।

একদিন সেই আমেরিকান সেনাপতির আপিসে জীর্ণবেশ একজন জার্ম্মান-যুবক কর্ম্মকর্ত্তার সামনে এসে দাঁড়াল। যুবকের মুখের চেহারা থেকে আজ আর বোঝবার উপায় নেই, তার বয়স কত। উপবাসে মুখের মাংস সব ঝুলে ঝুলে পড়েছে।

যুবকের হাতে একটা কাগজ। কাগজখানি নীরবে আমেরিকান কর্ম্মকর্ত্তার হাতে দেয়।

চিঠিখানি পড়ে আমেরিকান অফিসার অবাক হয়ে যান। দীর্ঘদিন অপেক্ষা করে থাকার পর, আজ মাত্র এক সপ্তাহ হ'ল যুবকটি চাকরি পেয়েছে। কিন্তু আজ যুবক এসেছে স্বেচ্ছায় সেই চাকরিতে ইস্তফা দেবার জন্যে।

আমেরিকান অফিসার অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, এর মানে কি? চাকরি ছাড়া মানে, উপবাসে মৃত্যু, তা নিশ্চয়ই জান। তবে চাকরি ছাড়ছ কেন?

যুবক স্থিরকণ্ঠে বলে, আমি জানি, চাকরি ছাড়া মানে কি। আর এ চাকরি করতে আমার কোনো অসুবিধাই নেই। তবুও আমি নিরুপায়।

কেন?

যুবক উত্তরে জানায়, আমি আর আমার বন্ধু এক জায়গাতেই থাকি। দু'জনেই আজ এক বছর ধরে কোনো রকমে বেঁচে আছি। আমার সৌভাগ্য, এক সপ্তাহ আগে, আমারই প্রথম চাকরিতে ডাক আসে। কিন্তু বাইরে আসবার মতন আমার কোনো পোশাক ছিল না। তাই আমার বন্ধু তার এই প্যাণ্ট আর জুতো আমাকে ব্যবহার করতে দেয়। কাল তার ডাক এসেছে, সে চাকরি পেয়ে গিয়েছে। তাই তার পোশাক আমাকে ফিরিয়ে দিতেই হবে। সুতরাং আমার আর রাস্তায় বেরুনো মোটেই সম্ভব নয়। সেই জন্যেই আপনাকে জানাতে এসেছি, আমার জায়গায় অন্ততঃ আর একজন এখুনি চাকরি পেয়ে যাবে।

এই বলে যুবক চলে গেল।

এটা কোনো কাহিনী নয়। আমেরিকান সেনাপতি ব্রাড্‌লি নিজের আত্মচরিতে এই সত্য ঘটনাকে লিপি-বদ্ধ করেছেন।

এই সামান্য ঘটনার ভিতর, সেই অসীম বেদনা আর নির্যাতনের মধ্যে জার্ম্মান-যুবকটির মনের যে পরিচয় ফুটে উঠেছে, তার মধ্যেই জার্ম্মান-জাতি আজো বেঁচে আছে।

আজ বাংলা দেশে এসেছে তেমনি দেশজোড়া ঘন অন্ধকার আর নিষ্করুণ দুর্দৈবের ঘনতামসী-রাত্রি।

এই জাতীয় দুর্দৈবের মধ্যে আমরা প্রত্যেকে যেভাবে আচরণ করছি, তার মধ্যেই প্রমাণ ফুটে উঠছে, আমরা বেঁচে আছি, না মরে গিয়েছি।

আমরা প্রত্যেকে নিজের নিজের আচরণ থেকে নিজেরাই উপলব্ধি করছি, আমরা কোথায় আছি, কোথায় চলেছি—

আমিই সবচেয়ে বেশী জানি, আমি আমার জাতির লজ্জার কারণ, না গৌরবের বাহন?

স্বাধীনতার ফলে যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা যাচ্ছে, তা সাময়িক। সাময়িক হলেও তার গতি-বেগ দুরন্ত। হঠাৎ বাঁধ-ভাঙার আনন্দে বন্যার জল যখন দিক্-বিদিক হারা হয়ে ছুটতে থাকে, তখন তাকে সংহত করা সবচেয়ে শক্ত অথচ ততবেশী প্রয়োজনীয়। এই উচ্ছৃঙ্খল জলস্রোতে শুধু ধ্বংস ও আবিলতার প্রশ্রয় দেয়। প্রথম আবেগ কমলে তবেই পলি পড়ে দু'পারের তীরে, তাতে বীজ ছড়ালে ফসলে পূর্ণ হয়ে ওঠে।

গতিশক্তির এই হঠাৎ-উচ্ছ্বসিত আবেগে আমাদের দৈনন্দিন জীবনও আজ বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছে। এই উচ্ছৃঙ্খলতা যে প্রগতি নয় তা আমরা প্রতি মুহূর্ত্তেই অনুভব করছি। কিন্তু এর উন্মত্ত আত্ম-প্রকাশ যে আমাদের ঔদাসীন্যে আজ মানুষের জীবন-ধর্ম্মকে কলঙ্কিত ক'রে তুলছে, সেকথা বুঝবার মতো শক্তিও আমাদের নেই।

মাত্র কিছুদিন আগেও দেখেছি, এই দেশেরই প্রত্যেকটি লোকের মনে ছিল উদার নির্ভীকতা, চোখে অসীম অঙ্গীকার। ইংরেজী শিক্ষা-ব্যবস্থার ত্রুটি থাকতে পারে, কিন্তু আহরিত জ্ঞানের মধ্যে ত কোনো দোষ ছিল না। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন এক রাষ্ট্রীয় অধীনতায় কলঙ্কিত হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তার অগ্রগমন ত কোনোদিন প্রতিহত হয় নি!

আজ সমাজের প্রতিটি স্তরে, প্রতি পদক্ষেপে যে উচ্ছৃঙ্খলার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হলে আমাদের নূতন করে সাধনা করতে হবে।

অথচ ভারতবর্ষ এমন একটি দেশ, যে-দেশের মনীষীরা প্রচার করেছেন ত্যাগ ও সেবার আদর্শ, আজ সেই দেশের জনসাধারণের চরিত্রে নীতিভ্রষ্ট অসংযমের পরিচয় ফুটে উঠেছে। সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা ও নীচতা সমাজ-জীবনের সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে।

মানুষের সমাজ-বন্ধনের গোড়ার কথা ছিল পারস্পরিক সহযোগিতা। যেদিন প্রথম সে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বাস করতে সুরু করল, সেদিনের বর্ব্বর মানুষের চরিত্রে সমবেদনশীলতার অভাব ছিল না। প্রয়োজন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ল বটে, কিন্তু জীবনের অন্তঃশীলায় যে প্রাণ-প্রবাহ বয়ে চলেছে তাকে সে ভোলে নি। জীবনের মাধুর্য্য উপভোগের শক্তি আজ এক অতৃপ্ত কামনামুখর উচ্ছ্বাসের মুখে বাধা পেয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে।

আমাদের সমাজের সবচেয়ে বড় কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে —যেটুকু পাওয়া যায় আগে নিতে হবে। ব্যবসায়ী ক্রেতাকে ঠকিয়ে, পুলিসকে ঘুষ খাওয়াইয়া ভাবে জিতে গিয়েছি। প্রবঞ্চিত ক্রেতাও দুঃসাধ্য মূল্যে গোপনে কোনো বস্তু ক্রয় করে আনন্দে স্ফীত হয়ে উঠল—ভাবলে, জিতে গিয়েছি। ছাত্র কোনো গতিকে নোট মুখস্থ করে পরীক্ষা পাস করে ভাবলে—বেঁচে গেছি। কোনো গতিকে ছাত্রকে উত্তীর্ণ করিয়ে অধ্যাপকও ভাবেন, ফাঁড়া কাটল। হীন তোষামদে চাকুরির লিষ্ট পেয়ে কেরাণীর যে আনন্দ, কুৎসিত চক্রান্তে রাজনীতিক জয়লাভে যে আনন্দ, মাতাল ও সংজ্ঞাহীন 'রাতের অতিথি'র পকেট রিক্ত করে রূপোপজীবিনীরও ঠিক সেই আনন্দ। মূলতঃ কোনো ভেদ নেই।

কিন্তু মানুষের অধিকার বোধেরও একটা সীমা আছে। একটি মানুষকে নিয়ে যখন সমষ্টি গড়ে ওঠে না, তখন প্রত্যেকটি মানুষের স্বতন্ত্রভাবে বেঁচে থাকার দাবিকে স্বীকার করে নিতে পারাই মানবতা। অসহিষ্ণুতা মানুষকে কাম্যবস্তু ত দেয়ই না, বরং জীবনে স্থায়ী ক্ষতের সৃষ্টি করে। যার সঙ্গে মতের মিল হবে না, তাকে হাতুড়ি মেরে খুন কর, অমুক ব্যক্তি আজ ময়দানে বক্তৃতা দেবেন, এ্যাসিড-বাল্‌ব মেরে সভা ভেঙে দাও, অমুক লোকের সঙ্গে রাজনীতিক মতভেদ ঘটেছে, অতএব তার চরিত্রহীনতার সতেরটা প্রমাণ বার কর।

অথচ এ আমরা নই। আমরা এর চেয়ে অনেক বড়। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র আমাদের মধ্যে থেকেই এসেছেন। আমরা পরম-পুরুষ রামকৃষ্ণ ও ত্যাগী দেশবন্ধুকে দেখেছি—দেখেছি মৃত্যুঞ্জয়ী সন্ন্যাস-

বাদীরা বাংলার বুকে রক্ত ঢেলে দিয়েছে। বিবেকানন্দ ও নেতাজী আজও আমাদের আদর্শ।

জীবনে আদর্শ না থাকলে কোনো মানুষ, কোনো জাতি বড় হতে পারে না। আর বুদ্ধির স্থৈর্য্য না এলে এই আদর্শকে ধরে রাখাও যায় না, ত্যাগের প্রেরণা এলে তবেই আনন্দকে উপভোগ করা যায়।

মানুষ যেমন দেহকে সাজাতে ভালবাসে, তেমনি করে সাজাতে হয় জীবনকে। সুন্দর হতে চাইলে সৌন্দর্য্যের আর্টকে জানতে হয়। জীবনও তেমনি মানুষের শিল্প-সাধনার ক্ষেত্র।

জীবনের ভিত্তিমূলে আজ মানুষ জোর করে প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছে তেল-নুন-লকড়ীকে। কিন্তু একথা তারা বুঝল না, সেই তেল-নুন-লকড়ী কোনো দিনই পারে নি জীবনের বিরাট ভার বহন করতে। অন্নের দুঃখকে, বস্ত্রের দুঃখকে, অর্থের অভাবের দুঃখকে আজ আমরা এমন একান্তভাবে বড় করে দেখেছি যে, আমাদের সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত মন সেই অন্ন আর বস্ত্রে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে। এবং তার ফলে যে আমরা অন্ন আর বস্ত্রের দুঃখকে দূর করতে পেরেছি এমন নয়, বরং প্রত্যেক চেষ্টার সঙ্গে সেই দুঃখ আরও ব্যাপক, আরও গভীর হয়ে উঠেছে। যুদ্ধের অশান্তিকে দূর করবার জন্যে আমরা দু-দুবার বিশ্বযুদ্ধ করেছি এবং আণবিক বোমা নিয়ে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি। উৎপাদন বৃদ্ধি করবার জন্যে আমরা বিজ্ঞানের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছি। তার ফলে নিজেদের এমন অবস্থায় এনেছি, যেখানে এক দেশে উৎপন্ন শস্যকে পুড়িয়ে নষ্ট করে ফেলে দিতে হচ্ছে, অথচ দশহাত দূরের লোকে শস্য অভাবে মারা যাচ্ছে।

আজ জগতে এমন কোনো দেশ নেই, এমন কোনো রাষ্ট্র নেই, এমন কোনো রাজনৈতিক দল নেই—যারা অন্ন, বস্ত্র, আর অশান্তির সমস্যায় পীড়িত নয়। জগতের এক প্রান্ত পর্য্যন্ত শুধু সমস্যা আর সমস্যার কথা। প্রত্যেক দেশই এই সব বাস্তব অভাবকে দূর করার জন্যে অন্য সব চিন্তাকে অবাস্তব বলে দূরে সরিয়ে রেখেছে। এই সব অভাবই হ'ল আজকের জগতে একান্ত বাস্তব ব্যাপার। অন্য সব হ'ল অবাস্তব।

মানুষের প্রতিদিনের জীবনে একদিন ধর্ম্ম, মায়া, ক্ষমা, তিতিক্ষা, প্রার্থনা ও পূজার একটা বিশেষ বাস্তবমূল্য ছিল। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে ও ব্যবহারে চরিত্র বলে একটা জিনিস ছিল, যার দ্বারা তার সমস্ত বাস্তব কর্ম্ম পরিচালিত হ'ত। একদিন প্রয়োজনীয় বলে, মূল্যবান বলে ব্রহ্মচর্য্য, বন্ধুতা, ধার্ম্মিকতা, ভক্তি, শ্রদ্ধা, আচার, নিষ্ঠা ও সন্তোষকে প্রভূত চেষ্টায় আয়ত্ত করবার চেষ্টা করত এবং মনে করত, এদের অভাবই হ'ল জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা বড় অভাব। সেদিন মানুষ তার চরিত্রকে সম্পূর্ণ ভাবে আত্মিকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হ'ত এবং জয়-পরাজয়ের মূল্য এই চরিত্রের আত্মিক মূল্যেই নির্দ্ধারিত হ'ত। সমস্ত মানব-সমাজের চিন্তাই ছিল এই চরিত্রের আত্মিকতা।

সেই চরিত্রই আমরা হারিয়েছি। চরিত্র না হারালে, একটা জাতকে এমন করে কেউ বাঁধতে পারে না। আমাদের পরাধীনতার এই হ'ল মর্ম্মান্তিক কারণ।

জাতি দরিদ্র হয়, জাতি নিঃস্ব হয়, সমস্যা-সঙ্কুল হয়ে ওঠে জাতির অস্তিত্ব, কিন্তু এক মুঠো অন্নের জন্যে, একখানা শাড়ির জন্যে যদি বিকিয়ে দিতে হয় জাতির ঐতিহ্য, ইতিহাস, তাহলে পৃথিবীভরা অন্ন আর ধরণী-বেষ্টন-করা শাড়িতেও সে জাতকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। সকলের সঙ্গে আপোষ চলে, সকলকে করা যায় প্রবঞ্চনা—আপোষ মানে না মহাকাল, সহ্য করে না প্রবঞ্চনা।

সবাই আমরা চোখ বুজে আছি আর দায়ী করছি অপরকে। দেশ অধঃপতনের পথে এগিয়ে চলেছে, এ আমরা প্রত্যেকেই জানি। কিন্তু জানি না, কার দোষে এই বিষ-বীজ সমাজে প্রবেশ করছে। সবাই বলছেন দায়ী তুমি, এমনি করে একদল অপর দলকে দোষী করছেন—কিন্তু একজনও আসল লোকটির নাম বলছে না!

সেই আসল ব্যক্তিটি হ'ল সে নিজে। জাতির যে অধঃপতনই ঘটে ঘটুক, তার জন্যে দায়ী আমি নিজে। আজ দেশের মধ্যে অধঃপতনের যে নিবিড় ছায়া প্রতিদিনই ঘনতর হয়ে উঠছে, তার জন্যে আমরা প্রত্যেকেই দায়ী, কিন্তু আমরা সবাই নিজেকে বাদ দিয়ে অপরের দিকে আঙুল দেখিয়েই নিশ্চিন্ত হতে চাই। এর চেয়ে ভয়াবহ অধঃপতন আর কিছু নেই। এইখানেই রয়েছে আমাদের অধঃপতনের মূল-শিকড়।

যেদিন আমরা প্রত্যেকে সজ্ঞানে নিজেদের অপরাধ সম্বন্ধে সত্যিকারের সচেতন হতে পারব এবং অপরের দিকে আঙুল দেখানকে চরম অসভ্যতা আর দুর্ব্বলতা বলে বুঝতে পারব, সেই দিনই সুরু হবে আমাদের সত্যিকারের জাগরণ।

বন্ধু বিলেত থেকে ঘুরে এসে বললেন, বিলেতের যেটা সব চাইতে দেখবার জিনিস—সেটা তার জাতীয় চরিত্র। এই চরিত্রের মধ্যে আছে সে-জাতির আসলপরিচয়।

তারা জানে, কি করে জাতকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। তাই তাদের জাতীয়জীবনে নেই এতটুকু গলদ। সামান্য মুটে-মজুরের মধ্যেও রয়েছে তাদের জাতীয় সহযোগিতা। যা আমাদের দেশে একান্তই দুর্লভ। আমরা জানি নিজেকে—দেশ বলতেও সেই আমি নিজে, জাত বলতেও সেই।

বন্ধু বললেন, ঘুম ভেঙে দেখি, আমার দরজায় আমার প্রয়োজনীয় জিনিস সব রাখা আছে। প্রতিদিনের নিয়মিত লেন-দেন। দুধ আছে, রুটি আছে, মাখন আছে, ফলমূল তরিতরকারিও আছে—নিরুপদ্রব সহ-যোগিতা। বঞ্চনা নেই, হঠকারিতা নেই।

এই চরিত্রের জন্যেই ইংরেজ আজ এত বড়। সে চেষ্টা করেছে—শতাব্দীর চেষ্টা তার পিছনে।

চরিত্র সহজাত নয়, তাকে গড়ে তুলতে হয়। গান্ধীজী বলতেন, আমার মধ্যে অলৌকিক শক্তি কিছু নেই—চেষ্টা করে নিজেকে একটু একটু করে গড়ে তুলেছি। প্রত্যেক মানুষই পারে এই শক্তি অর্জ্জন করতে।

ঠিক এইরকম দেশব্যাপী একটা অরাজকতা দেখা দিয়েছিল ইতিহাসের প্রথম যুগে। পণ্ডিতেরা সেই যুগকে বলেন, মাৎস্যন্যায়ের যুগ। সেই নিদারুণ জাতীয় দুর্য্যোগের রাতে, সেদিন জাতি নিজের ভেতর থেকে সেই সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে বার করেছিল। নেতার মুখের দিকে চেয়ে তারা বসেছিল না, তারা নিজেদের ভেতরের দিকে চেয়ে দেখেছিল।

তেমনি করেই আজ আমাদের প্রত্যেককে সেই ভেতরের দিকেই চেয়ে দেখতে হবে।

মানুষের প্রধান সংজ্ঞাই হ'ল তার চরিত্র।

দেবতা এসেছেন প্রার্থী হয়ে।

রাজা দান করছেন, কিন্তু দেবতা সে দান নিলেন না—বললেন, দেবে যদি তোমার চরিত্র দাও।

প্রার্থীকে রাজা ফেরাতে পারেন না; তবু বলেন, চরিত্র দিলে আমার থাকবে কি?

থাকে না কিছুই। দেবতার নির্ম্মম পরিহাস!

আজ বাঙালীর ভাগ্যেও এসেছে সেই দুর্দ্দিন। জানি না, কোন্ অদৃশ্য দেবতার বিপাকে পড়ে তাকে আজ চরিত্র হারাতে হ'ল!

কিন্তু বাঙালীর মনে কি আজ সে প্রশ্ন উঠেছে—চরিত্র গেলে তার থাকবে কি?

সে প্রশ্ন যদি আজ তার উঠত তবে জাতি আজ এমন করে মরে যেত না। আজ বাঙালী তার জাতীয় অস্তিত্বের যে সোপানে এসে নেমেছে, সেখান থেকে আর এক পা বাড়ালেই, সুগভীর ঘন অন্ধকার—যে অন্ধকারে নিশ্চিহ্ন হয়ে তলিয়ে গিয়েছে কত জাতি, কত সম্প্রদায়, কত ধর্ম্ম। আজ বাঙালীর ইতিহাসে দেখা দিয়েছে, কোনো রাজনৈতিক সমস্যা নয়, আজ আমাদের ইতিহাসে দেখা দিয়েছে অস্তিত্বের সমস্যা, দেখা দিয়েছে সেই চরম আকাঙ্ক্ষা অস্তিত্বের সঙ্কট, বেঁচে থাকা না-থাকার সর্ব্বশেষ সঙ্কট।

গ্রাহকদের প্রতি নিবেদন

যাঁহারা সন ১৩৬৭ সালে প্রবাসীর গ্রাহক আছেন, আশা করি, আগামী ১৩৬৮ সালেও তাঁহারা গ্রাহক থাকিবেন।

গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক আগামী বর্ষের বার্ষিক মূল্য ১২৲ (বার টাকা) মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইয়া দিবেন। মনি-অর্ডার কুপনে তাঁহাদের স্ব-স্ব গ্রাহকনম্বর উল্লেখ না করিলে টাকা জমার পক্ষে অসুবিধা হয় এবং তিনি নূতন না পুরাতন গ্রাহক ইহা ঠিক করিতে না পারায় ভি-পিও চলিয়া যায়।

অতএব প্রার্থনা, যেন তাঁহারা গ্রাহকনম্বরসহ টাকা পাঠান, অন্যথায় পূর্ব্ব গ্রাহকনম্বরে ভি-পি যাইতে পারে; তাহা ফেরত দিবেন।

যাঁহারা আগামী ২২শে চৈত্রের মধ্যে টাকা পাঠাইবেন না তাঁহাদের নামে বৈশাখ সংখ্যা ভি-পিতে পাঠানো হইবে।

যাঁহারা অতঃপর গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক তাঁহারা দয়া করিয়া আমাদিগকে ২০শে চৈত্রের পূর্ব্বেই জানাইয়া দিবেন।

ভি-পিতে টাকা পাইতে কখনও কখনও বিলম্ব ঘটে, সুতরাং প্রবাসী পাইতে গোলমাল হয়। মনি-অর্ডারেই টাকা পাঠানো সুবিধাজনক। ইতি

প্রবাসী-ম্যানেজার

তন্ত্র-পরিচয়

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত

বঙ্গদেশ তন্ত্রশাস্ত্রেরই দেশ। অতি প্রাচীনকাল হইতে এখানে বেদ অপেক্ষা তন্ত্রশাস্ত্রের প্রভাব অধিক লক্ষিত হইয়াছে। সুদীর্ঘ অতীত কালের প্রসারে এখানে বৈদিক আচার সন্দীপন জন্য মধ্যে মধ্যে চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু তাহা কখনও স্থায়ী ফলপ্রসূ হয় নাই। কথিত আছে, রাজা আদিশূরের সময়ে এদেশে বহু (প্রবাদ অনুসারে সাত শত ঘর) ব্রাহ্মণ থাকিলেও তিনি বৈদিক যজ্ঞ বা যজ্ঞ বিশেষ করিবার জন্য তাহাদের মধ্য হইতে ক্রিয়াবিদ্ পুরোহিত সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। অগত্যা তাঁহাকে তজ্জন্য কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনাইতে হইয়াছিল। ইঁহারা এবং পরে কান্যকুব্জ হইতে ইঁহাদের পুত্রাদি এ দেশে আসিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হন। যাবতীয় রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা ইঁহাদেরই বংশধর বলিয়া প্রথিত। বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরাও বোধ করি বঙ্গের বাহির (একদল দক্ষিণ ও একদল পশ্চিম) হইতে আসিয়া এখানে প্রতিষ্ঠিত হন। এই তিন শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা সকলেই মূলে বেদাচারী হইলেও কালক্রমে স্থানীয় সংস্কার অনুবর্ত্তন করিয়া তান্ত্রিক আচার বরণ করিয়াছিলেন। উহা একটা নিকৃষ্ট কল্প বলিয়া অবশ্যই করেন নাই, উহার মর্য্যাদা অনুভব করিয়া করিয়াছিলেন। উত্তর কালে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যও বৈদিক আচার দৃঢ়ীকরণ জন্য বিপুল চেষ্টা করিয়াছিলেন। তৎপ্রণীত ও তদানীন্তন সকল বিদ্বজ্জনসমাদৃত নানা 'তত্ত্ব' গ্রন্থ তাহার প্রমাণ। কিন্তু অশৌচ, প্রায়শ্চিত্ত, শ্রাদ্ধাদি কয়েকটি ব্যাপার ভিন্ন অন্য ক্ষেত্রে তাঁহার মত বোধ করি কতকটি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। ইঁহারাও অবশ্য তান্ত্রিক আচার সর্ব্বাংশে ত্যাগ করেন নাই।

পরিবর্ত্তনশীল কালে বৈদিক আচার, রীতি, নীতি—এক কথায় বৈদিক আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা মনু এবং অন্যান্য সংহিতাকারগণ করিয়াছেন। উহার বিষয় সামান্য আলোচনা করিলে বুঝা যায়—বঙ্গদেশে উহার প্রভাব কত অল্প ছিল। এ বিষয়ে অধিক আলোচনা এস্থলে সম্ভব হইবে না। মনু উপনয়ন ভিন্ন দ্বিজাতির অন্যবিধ দীক্ষার আবশ্যকতা স্বীকার করেন নাই। বিবাহ ব্যতীত অন্যবিধ সংস্কার (যথা—উপনয়ন) দ্বিজাতির স্ত্রীদিগের পক্ষেও নিষেধ করিয়াছেন। দ্বিজাতির সেবা ভিন্ন শূদ্রের কোনোও ধর্ম্ম তাঁহার অনুমোদিত নয়। কিন্তু বঙ্গদেশে তৎসন্নিহিত কয়েকটি প্রদেশাংশে অতি প্রাচীন কাল হইতে তান্ত্রিক দীক্ষার প্রচলন ছিল। ব্রাহ্মণ দিগের পক্ষেও ধর্ম্মচর্য্যায় গায়ত্রীমাত্র জপ যথেষ্ট বিবেচিত হইত না। ব্রাহ্মণাদি সকল জাতির (এমন কি তথাকথিত অন্ত্যজ জাতিদিগেরও) অন্তর্গত বয়ঃপ্রাপ্ত স্ত্রী-পুরুষ প্রত্যেকে তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণ অবশ্যকর্ত্তব্য জ্ঞান করিতেন। এইরূপে এ অঞ্চলে কুলগুরুপ্রথা প্রবর্ত্তিত হয়।

এই প্রসঙ্গে অনেকের হয়ত বাঙ্গালীদের মৎস্যপ্রিয়তার কথাও মনে হইবে। কেন না বঙ্গাঞ্চল ব্যতীত ভারতের সর্ব্বত্র উচ্চবর্ণের লোকেরা নিরামিষাশী। বস্তুতঃ কিন্তু মৎস্য মাংস বর্জ্জন বৈদিক আচার নহে। মনু ও অন্যান্য সংহিতায় সাধারণ ভাবে মৎস্য মাংস বর্জ্জনের উপদেশ থাকিলেও মনুতেই আছে—"পাঠীন (বোয়াল), রোহিত, রাজীব (বর্ত্তমান নাম অনিশ্চিত) শকুল মৎস্য এবং আঁইস্ বিশিষ্ট যাবতীয় মৎস্য ভক্ষণ করিতে পারা যায়। কিন্তু সমস্ত ভক্ষ্য মাংসই দেব পিতৃ উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া ভোজন করিতে হইবে।" (মনু, ৫ম অধ্যায়, ১৬) ইহার প্রতিধ্বনি হারীত যাজ্ঞবল্ক্যাদি সংহিতায়ও আছে। ইঁহাদের উক্তি হইতে বুঝা যায়, দেব সেবায়, মৎস্য দান করা চলিত, বলির নানা মাংসের ত কথাই নাই।* যতদূর নির্ণয় করিতে পারা গিয়াছে খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দী হইতে বৃহত্তর বঙ্গের বাহিরে—উচ্চবর্ণের মধ্যে মৎস্য মাংস ভোজন বর্জ্জিত হইয়াছে। ইহা জৈন ধর্ম্মের প্রভাবের ফল বলিয়াই মনে হয়, অবশ্য অহিংসার প্রশংসা হিন্দুশাস্ত্রে চিরদিনই ছিল এবং যতি, ব্রতী, বিধবারা সর্ব্বত্র চিরদিনই হবিষ্যাশী ছিলেন এবং এখনও আছেন। বঙ্গদেশেও কোনোও কালে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় নাই। সে যাহা হউক মৎস্যভোজী বলিয়া বঙ্গসন্তানদের আপনাদিকে নিন্দনীয় মনে করিবার

---

* এই বিষয়ে শ্রীমান্ এস. সেনগুপ্ত লিখিত Food Prohilbtion in Smriti Texts শীর্ষক একটি মনোজ্ঞ ও বহুতথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ Journal of the Asiatic Society (Vol. XXII No. 2. 1956-তে প্রকাশিত হইয়াছিল। কৌতূহলী পাঠক উহা দেখিতে পারেন।

কোনোও হেতু নাই। উহা তাহাদের শাক্ততন্ত্র সমর্থিত দেশাচার। আধুনিক কালেও শ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবা (নিম্বার্কীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়), শ্রীগম্ভীরনাথ বাবাজী (শৈব যোগী সম্প্রদায়) এবং আরও কোনোও কোনোও অবাঙ্গালী মহাপুরুষ তাঁহাদের বাঙালী শিষ্যদের মৎস্যভোজন অনুমোদন করিয়াছেন।

তন্ত্রও অতিপ্রাচীন শাস্ত্র। বেদ অপেক্ষা উহার মর্য্যাদা কম নয়। বস্তুতঃ ইহা চিরদিন শ্রুতির বা তত্তুল্য সম্মানই প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। মনু সংহিতায় কয়েক স্থলে "ইত্যেষা (অথবা ইতীয়ং) বৈদিকীশ্রুতিঃ"— বৈদিক শ্রুতির মত এইরূপ—এই বাক্যটি পাওয়া যায়। ইহার ব্যাখ্যাবসরে একজন প্রামাণিক টীকাকার বলিয়াছেন, "শ্রুতির্হি দ্বিবিধা, বৈদিকী তান্ত্রিকী চ"— শ্রুতি দুই প্রকার, বৈদিক এবং তান্ত্রিক। সে যাহা হউক আধুনিক কালে কতিপয় অল্পজ্ঞ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত কর্তৃক নিন্দিত ও উপেক্ষিত হইবার ফলে এ দেশেরও অনেকে তন্ত্রশাস্ত্রসমূহকে অর্ব্বাচীন ও তুচ্ছ বলিয়া গণ্য করেন। সৌভাগ্যক্রমে মহামনীষী বিচারক উডরফ গুরু শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌমের উপদেশের আলোকে তন্ত্রশাস্ত্র গভীর ভাবে আলোচনা করিয়া এবং তৎসম্বন্ধে অনেকখানি গ্রন্থ সম্পাদন ও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া পূর্ব্বতর পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতবর্গের নিন্দামূলক মতের অসারতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাই আজকাল তন্ত্রের কথা কিছু কিছু শুনা যায়, যদিও এবিষয়ে বহুজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সংখ্যা অদ্যাপি অতি অল্প।

"তন্ত্র" বলিতে আজকাল সাধারণতঃ শৈব ও শাক্ত এই দুই ধারার গ্রন্থাবলীই বুঝায়। সেই জন্য বলা আবশ্যক যে, বৈষ্ণব তন্ত্রও আছে। মহাভারত ভাগবত ধর্ম্মের মূলরূপে "পঞ্চরাত্রের" উল্লেখ আছে। "পাঞ্চরাত্র সংহিতা" বা "পাঞ্চরাত্র তন্ত্র" নামে বৈষ্ণব তন্ত্রের গ্রন্থ সকল প্রসিদ্ধ। শ্রীরামানুজাচার্য্যের পরম গুরু শ্রীযামুনাচার্য্য তাঁহার 'আগম প্রামাণ্য' নামক গ্রন্থে বৈষ্ণবাগমের (বৈষ্ণব তন্ত্রের) প্রামাণ্য স্থাপন ও বেদের সহিত উহার অবিরোধ প্রদর্শন জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছেন। বৈষ্ণব তন্ত্র সাহিত্যও বিপুলাবয়ব। ডক্টর অটো শ্রেডার তাঁহার সম্পাদিত ও মান্দ্রাজ আডিয়ার হইতে প্রকাশিত 'অহির্বুধ্ন্য সংহিতা'র পৃথক্ পুস্তকাকারে মুদ্রিত ভূমিকায় (Introduction to Pancharatra) প্রায় দুই শত পাঞ্চরাত্র গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

বঙ্গদেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে শাক্ততন্ত্রশাস্ত্রের ব্যাপক প্রচার থাকিলেও তদ্বিষয়ক অল্প গ্রন্থই মুদ্রিত হইয়াছে। যতদূর জানি, এক সময়ে ঢাকা হইতে এক ব্যক্তি কয়েকখানি তন্ত্রের বই ("বিশ্বসারতন্ত্র", "কুব্জিকাতন্ত্র" ইত্যাদি ছাপাইয়াছিলেন। সেই বোধ করি প্রথম, এবং আর্থার এভেলন (বিচারপতি উডরফ) ও আর্নল্ড এভেলন সম্পাদিত কয়েকখানি গ্রন্থ বাদ দিলে, এক্ষেত্রে সেই শেষ উদ্যম বলা যায়। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণের অল্পতাহেতু শাক্ততন্ত্রের নির্ভরযোগ্য বিবরণ ও ব্যাখ্যাযুক্ত পুস্তকও বঙ্গভাষায় (এবং ইংরাজীতেও) অল্পই রচিত হইয়াছে। উল্লেখযোগ্য পুস্তক (বিচারপতি উডরফের কয়েকখানি বই ব্যতীত) একখানিই দেখিয়াছি, সেটি হইতেছে অটলবিহারী ঘোষ প্রণীত Spirit and Culture of the Tantras।* বারাণসী সরকারী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ তন্ত্রশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত। তিনি কয়েকটি মহামূল্য প্রবন্ধ মাত্র লিখিয়াছেন। সেগুলি আবার কাশীর "উত্তরা" পত্রে প্রকাশিত হওয়ার দরুণ বঙ্গদেশে বেশী লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই।

কাশ্মীরে এককালে শৈবতন্ত্র অধিক প্রচলিত ছিল, এবং তথায় তৎসম্বন্ধে বহু গ্রন্থও রচিত হইয়াছিল। উহাদের কয়েকখানি ভূতপূর্ব্ব কাশ্মীর রাজের গ্রন্থাগার হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ রাজ্যের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের এককালীন অধ্যক্ষ সম্প্রতি পরলোকগত জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইংরেজীতে Kashmir Saivism নামে একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। উহাতে কাশ্মীরীয় শৈবাগমের অনেক তত্ত্ব সংক্ষেপে ও মনোরম ভাবে উপন্যস্ত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ঐ পুস্তকখানিও কাশ্মীর রাজের গ্রন্থাগার হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

তন্ত্রের দুইভাগ শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ: একটি আগম, অন্যটি নিগম। আগমের বক্তা শিব, শ্রোত্রী গিরিজা। নিগমের বক্ত্রী গিরিজা, শ্রোতা শিব—এইরূপ বলা হইয়া থাকে। কার্য্যতঃ তন্ত্রশাস্ত্রের গ্রন্থমাত্রই আগম নামেই অধিক প্রসিদ্ধ। মহাযানী বৌদ্ধেরাও ঐ শব্দটি আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। উহার বিবরণ এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক।

শৈবাগমের উৎপত্তি সম্বন্ধে কাশ্মীরীয় তন্ত্রে বলা হইয়াছে শ্রীকণ্ঠ (শিব) উহার প্রবর্ত্তক। তিনি ঐ শাস্ত্র প্রকাশ জন্য প্রথম শিষ্যরূপে যাঁহাকে নির্ব্বাচন করেন তাঁহার নাম দুর্ব্বাসাঃ (দুর্ব্বাসস্)। পুরাণে দুর্ব্বাসাঃ (বাঙ্গালায় দুর্ব্বাসাই লেখা হয়) একজন অতি কোপন-

---

* অন্য একজন বিজ্ঞ ব্যক্তির লিখিত পুস্তকের নাম ইচ্ছা করিয়াই উল্লেখ করিলাম না। উহাতে তন্ত্রশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের গভীরতর পরিচয় নাই

স্বভাব এবং সর্ব্বদা অভিশাপদানে উন্মুখ ব্যক্তি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তথায় তাঁহার পরিচয় তাঁহার স্বমুখে এইরূপ দৃপ্ত নির্লজ্জ ভাষায় প্রদত্ত হইয়াছে—"অক্ষান্তিসার-সর্ব্বস্বং দুর্ব্বাসসম্ অবেহি মাম্"—আমাকে দুর্ব্বাসা বলিয়া জানিও অক্ষমা যার সারসর্ব্বস্ব। শৈবতন্ত্রে দুর্ব্বাসা শ্রীকণ্ঠের জগদুদ্ধার ব্রতের সহায় পরম কারুণিক ঋষি। এই উভয় দুর্ব্বাসাই যদি কাল্পনিক পুরুষ (mythical being) না হন, তাহা হইলে বিভিন্ন ব্যক্তিই হইবেন। দুর্ব্বাসস্ শব্দটির সাধারণ অর্থ যে, মলিন বসন পরিধান করিয়া থাকে। এটি বিবরণাত্মক নামই হইবে, প্রকৃত নাম বোধ করি নয়। সে যাহা হউক, শাক্ততন্ত্রেও দুর্ব্বাসা অতি বিশিষ্ট পদের অধিকারী; এবং দত্তাত্রেয়, অগস্ত্য, লোপামুদ্রা, কামদেব প্রভৃতি শ্রীবিদ্যার দ্বাদশ প্রাচীনতম উপাসক ও প্রতিনিধিরূপে গণ্য ব্যক্তিগণের অন্যতম।

অপৌরুষেয় (অর্থাৎ যাহা মানুষের কৃত নয় এরূপ) শাস্ত্রের প্রকাশ কি প্রকারে হয়, এস্থলে তাহার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইহা তন্ত্রশাস্ত্রের অঙ্গও মনে করা যাইতে পারে; ইহাতে জগৎ সৃষ্টি প্রক্রিয়ার আভাস পাওয়া যাইবে। "চতুষ্টয়ী শব্দানাং প্রবৃত্তিঃ"—শব্দের প্রবৃত্তিতে অর্থাৎ প্রকাশের ধারায় চারিটি অবয়ব বা স্তর আছে। আর যেহেতু বিশ্বজগৎটাই শব্দ ও শব্দমূলক চিন্তাদ্বারা জ্ঞেয় ও প্রকাশ্য (শব্দ হইল বাচক, জগৎ বাচ্য; বাচ্য বাচকেই ওতপ্রোত), সেইজন্য জগতের বিকাশের অন্তরালেও শব্দের চতুরবয়ব প্রবৃত্তি স্বীকার্য্য। প্রথ স্তরটি হইতেছে "সূক্ষ্মা বাগ্ অনপায়িনী"—সূক্ষ্ম ওম অবিনশ্বর বাক্। উহাকে পরা বাক্ বলা হয়। উহাই শব্দব্রহ্ম নামে প্রসিদ্ধ। অদ্বৈততন্ত্রে উহা পরমেশ্বরের স্বাতন্ত্র্য শক্তিরই নামান্তর; উহা চিদ্রূপা অর্থাৎ জ্ঞানময়ী। অনুচ্চারিত চিন্তা এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের সূক্ষ্ম অভিজ্ঞতা-রূপে উহা পরা দেবতায় (এখানে তাঁহাকে পরম শিবই বলা যাক্) অবস্থিতা। জগদ্বিকাশের সূচনায় পরম শিবের স্বাতন্ত্র্য হইতেই তাহাতে ভাবান্তর ঘটে। জগৎ যেরূপে অভিব্যক্ত হইবে তাহারই যেন একটি ছবি (দর্পণে দৃশ্যমান নগরীর ছায়ার ন্যায়) ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ভাসমান হয়। অবশ্য শব্দ বা বাণীই ইহার স্বরূপ। এই ছায়ারূপা বাণীর নাম "পশ্যন্তী" দেওয়া হইয়াছে। ইহা স্বয়ং প্রকাশ, অক্ষরবিন্দু ইহার নামান্তর। বর্ণমালার (মাতৃকার) অ আ ক খ ইত্যাদি রূপে বিভাগের অভাবে ইহার প্রকাশে কোনোও ক্রম (order) থাকে না। পশ্যন্তী হইতেছে শব্দের দ্বিতীয় স্তর। উহা তখনও ইন্দ্রিয়ের (বাগিন্দ্রিয় ও মন উভয়ের) অতীত, কেবল সৃষ্টিকর্ত্তার অন্তর্দৃষ্টিতে ভাসমান। জগতের বিকাশ অগ্রসর হইতে থাকিলে উহা যখন মনের ভাবনাযোগ্য, চিন্তা ও অভিজ্ঞতার আকার প্রাপ্ত হয়, তখন উহাতে এটি ওটি এইরূপ বিভাগ অভিব্যক্ত হইতে থাকে। ইহাকে পরামর্শজ্ঞানও বলা হয়। বাণী তখন অব্যাকৃত (un-evolved) ছায়াদশা হইতে নির্গত হইয়া যে ভাব প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম "মধ্যমা"। এটি শব্দের তৃতীয় স্তর। উহা "পশ্যন্তী" ও "বৈখরী"র (ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রকাশ ও গ্রহণযোগ্য) সুস্পষ্ট বাণীর মধ্যবর্ত্তী বলিয়াই মধ্যমা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। "বৈখরী"ই শব্দের চতুর্থ স্তর। উহা প্রাণের (শ্বাসপ্রশ্বাসের) বৃত্তি আশ্রয় করিয়া প্রবৃত্ত হয়, আকাশ ও বায়ু উহার প্রকাশে সাহায্য করে।

শৈবাগম শ্রীকণ্ঠের অন্তরস্থিত মধ্যমা দশা হইতে তাঁহার পঞ্চমুখ দ্বারা পঞ্চ ধারায় বৈখরীরূপে নির্গত হইয়াছে। এই পঞ্চ ধারায় তাঁহার পঞ্চবিধ শক্তি বা বিভূতি প্রকাশিত হইয়াছে, যাহাদের পারিভাষিক নাম হইতেছে—চিৎ, আনন্দ, ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া। যথাক্রমে এই পঞ্চমুখ বা শক্তি অনুসারে শ্রীকণ্ঠের বিভেদাপন্ন নাম হইতেছে—ঈশান, তৎপুরুষ, সদ্যোজাত, অঘোর ও বাম।

দুর্ব্বাসা করুণাময় শ্রীকণ্ঠের কণ্ঠ হইতে বৈখরীরূপে নির্গত চিৎ, আনন্দ ইত্যাদি পঞ্চ বিভূতিযুক্ত সমগ্র শৈবা-গমই জগৎকে প্রদান জন্য প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু তিনি দেখিলেন যে, উহার মধ্যে তিনটি ধারার উৎস আছে—যাহা কোনোও একজন শিষ্যের পক্ষে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া সকলকে শিক্ষাদান দুর্ঘট। উহা করিতে গেলে ধারা-গুলির বিশিষ্টতা ও বিশুদ্ধতা অব্যাহত রাখা সম্ভব হইবে না, দোষযুক্ত সাঙ্কর্য্য (মিশ্রণ) আসিয়া পড়িবে। এই তিন ধারা বা প্রস্থানকে অদ্বৈত (বা অভেদ), দ্বৈত (বা ভেদ) এবং দ্বৈতাদ্বৈত (বা ভেদাভেদ) নাম দেওয়া হইয়াছে। অনেক পাঠকই বোধ করি জানেন যে, বেদান্ত দর্শনেও উক্তরূপ নামযুক্ত তিনটি প্রস্থান আছে। শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈত প্রস্থানের, মধ্বাচার্য্য দ্বৈত প্রস্থানের এবং নিম্বার্কাচার্য্য দ্বৈতাদ্বৈত প্রস্থানের শিক্ষক। রামানুজাচার্য্য কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত মতের নাম বিশিষ্টাদ্বৈত, উহা দ্বৈতাদ্বৈতেরই প্রকারবিশেষ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে প্রচলিত মতের নাম অচিন্ত্য-ভেদাভেদ। এই সকল মতবাদের মধ্যে আপোষে মীমাংসার চেষ্টা দেখা যায় না; প্রত্যেক সম্প্রদায়ই স্বমতের প্রাধান্য ও অন্য মতের ব্যাবর্ত্তক প্রামাণ্য স্থাপনে ব্যগ্র। তবে নিরপেক্ষ পরীক্ষকগণ দেখেন যে, শেষ পর্য্যন্ত (in the last analysis) সকল মতই কোনোও না কোনোও প্রকারে

অদ্বৈতে পর্য্যবসানের যোগ্য।* আর বহুর মধ্যে একের (unity in diversity) অনুসন্ধান হিন্দু-সংস্কৃতির চিরন্তন ধর্ম্ম।

ভবিষ্যদ্দর্শী মহামনীষী দুর্ব্বাসা শৈবাগমের তিন ধারা পৃথক করিয়া এক একটি ধারার (প্রস্থানের) শিক্ষাদান ও প্রচার জন্য একটি করিয়া তিনটি মানসপুত্র উৎপাদন করিলেন। যিনি অদ্বৈতমতের ভাবী প্রচারকরূপে উৎপন্ন হইলেন তাঁহার নাম ত্র্যম্বক, যিনি দ্বৈতাগমের মত প্রচার করিবেন তাঁহার নাম আমার্দ্দক, আর যিনি দ্বৈতাদ্বৈত মত শিক্ষা দিবেন তাঁহার নাম শ্রীনাথ।

সাধারণ পাঠক প্রশ্ন করিতে পারেন, এই সকল ভেদ অভেদাদি শব্দের অর্থ কি—কিসের সঙ্গে কিসের ভেদ বা অভেদ? বেদান্ত দর্শনে একদিকে ব্রহ্ম অন্যদিকে জীব (এবং জগৎও) এই দুয়ের পরস্পর সম্বন্ধ নিয়া যে বিচার আছে তাহার প্রকৃতি অনুসারে ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে। অর্থাৎ জীব (ও জগৎ) ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কি অভিন্ন, কিংবা ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন বা অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন, ইহাই সেখানে বিচারের বিষয়। বস্তুতঃ আচার্য্যগণের দৃষ্টিভঙ্গির বিভেদ হইতেই তিন প্রস্থানের উৎপত্তি হইয়াছে।†

শৈবাগমেও মূল শিক্ষক একজন বলিয়া স্বীকৃত হইলেও আচার্য্যগণের দৃষ্টিভঙ্গির ভেদ হইতে তিন প্রস্থানের উদ্ভব হইয়াছে। শিব ও শক্তির (পারিভাষিক শব্দ প্রকাশ ও বিমর্ষের) ভেদ বা অভেদের প্রশ্ন উহার অন্তর্গত। পূর্ব্বে যে তিনটি ধারার উৎসের কথা বলা হইয়াছে তাহাও ঐ দৃষ্টিভঙ্গির বিভেদ দ্যোতক। মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ বলেন, প্রাচীন আগম শাস্ত্রে শৈবমতের তিন ধারা: শিব ধারা (বা শৈবাগমের ধারা), রৌদ্র ধারা (বা রুদ্রাগমের ধারা) এবং ভৈরব ধারা (বা ভৈরবাগমের ধারা) এই তিন নামেও প্রসিদ্ধ ছিল। প্রথমটি দ্বৈত, দ্বিতীয়টি দ্বৈতাদ্বৈত, তৃতীয়টি অদ্বৈত। শিবধারায় দশটি তন্ত্র, রৌদ্রধারায় আঠারোটি তন্ত্র এবং ভৈরব ধারায় চৌষট্টিটি তন্ত্রের নাম পাওয়া যায়।

মহামহোপাধ্যায় ডক্টর কবিরাজের মতে শাক্ততন্ত্রেও তিনটি ধারা ছিল; ইহা প্রাচীন টীকাকারগণের আলোচনা এবং অতি প্রাচীন, লুপ্তপ্রায় আগম সাহিত্য হইতে বুঝিতে পারা যায়। তবে ইহা স্বীকার্য্য যে, অতি প্রাচীন কাল হইতেই শাক্ততন্ত্রে অদ্বৈত সিদ্ধান্তেরই প্রাধান্য অঙ্গীকৃত। বস্তুতঃ প্রাচীন মতানুসারে শিব ও শক্তিতে তাত্ত্বিক ভেদ কিছু নাই।

বঙ্গদেশে শাক্তাদ্বৈতবাদই চিরকাল প্রচলিত আছে। বিচারপতি উডরফ এক স্থানে বলিয়াছেন, এই জন্যই এই বাঙ্গালীরা স্বভাবতঃ অদ্বৈতমতের পক্ষপাতী। আমরা প্রবন্ধে শৈবাগম ধরিয়াই কথা বলিতেছি, বোধ করি উক্ত কারণেই উহার অদ্বৈতপ্রস্থানের প্রতি আমাদের পক্ষপাত অধিক। সুবিধা হইলে পরে দ্বৈতাগম সম্বন্ধেও কিছু বলিব।

অদ্বৈত শৈবাগমের এক নাম ত্রিক বা ষড়র্দ্ধ (ছয়ের আধা) শাস্ত্র। ঐ নাম হইতেছে, পতি, পাশ ও পশু বা শিব, শক্তি ও অণু এই তিন তত্ত্ব হইতে। এই প্রবন্ধে এই সকলের বিশ্লেষণ সম্ভব হইবে না। এখন ত্রিক শাস্ত্রসমূহের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করি। এই সকল শাস্ত্রের মোট ভাগ তিনটি:

(১) আগমশাস্ত্র: মৃগেন্দ্র, মালিনীবিজয়, বিজ্ঞানভৈরব, উচ্ছুষ্ম ভৈরব, আনন্দ ভৈরব, মাতঙ্গ, নেত্র, স্বায়ম্ভুব, রুদ্রযামল ইত্যাদি। শিবসূত্র এই আগমের একটি অতি প্রধান গ্রন্থ। ইহার বৃত্তি, বার্ত্তিক (ভাস্কর-কৃত), টীকা ইত্যাদি আছে।

(২) স্পন্দশাস্ত্র: ইহাতে শিবসূত্র অপেক্ষা বিস্তৃততর রূপে মূল তত্ত্বগুলি বিবৃত হইয়াছে। পুস্তকের নাম স্পন্দকারিকা বা স্পন্দসূত্রাণি, বসুগুপ্ত প্রণীত। ইহারও বৃত্তি আছে।

(৩) প্রত্যভিজ্ঞা শাস্ত্র: ইহা এই প্রস্থানের বিচার শাস্ত্র। প্রাচীনতম গ্রন্থের নাম শিবদৃষ্টি (সোমানন্দ প্রণীত)। সোমানন্দের শিষ্য উৎপল প্রণীত প্রত্যভিজ্ঞা সূত্র সংক্ষিপ্ততর বলিয়া গুরুর পুস্তককে স্থানচ্যুত, এমন কি লুপ্তপ্রায় করিয়াছেই বলা যায়। আচার্য্য অভিনব গুপ্ত প্রত্যভিজ্ঞা বিমর্ষিণী আরও প্রসিদ্ধ।*

কাশ্মীরীয় শৈবতন্ত্র সাহিত্যে আচার্য্য অভিনব গুপ্তের (খ্রীঃ ১০ম-১১শ শতাব্দী) স্থান অতি উচ্চ।* অলঙ্কার

---

* মধ্বাচার্য্যের সুস্পষ্ট দ্বৈতমতেও, তাঁহার নিজ রচনায় অদ্বৈতাভাস আছে ইহা একজন সুপ্রসিদ্ধ বিশেষজ্ঞের মুখে শুনিয়াছি।

† আধুনিক কালেও দৃষ্টিভঙ্গীর বিভেদ ভুলিয়া গিয়া অনেকে বিচার করিতে বসেন কোনও একটি শ্রুতিবাক্য বা স্মৃতিবাক্যের শঙ্করের ব্যাখ্যা ঠিক কি রামানুজের ব্যাখ্যা ঠিক। ভুল এইখানে যে শঙ্কর মূলতঃ দার্শনিক (essentially a philosopreh) আর রামানুজ মূলতঃ ঈশ্বরবাদী (theist) স্ব স্ব মতানুসারে শ্রুতিস্মৃতির ব্যাখ্যায় অধিকার এদেশে স্বীকৃত।

* উপরি উক্ত গ্রন্থাবলীর বিভাগ ও নাম স্বর্গীয় জগদীশ চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তক হইতে গৃহীত হইয়াছে।

* শঙ্করাচার্য্য যেমন শঙ্করের অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ, অভিনব গুপ্ত সেইরূপ শঙ্করাচার্য্যের (অতএব মূলতঃ শঙ্করেরই) অবতার বলিয়া কথিত হন। তাঁহার ভক্তগণ তাঁহার নামোল্লেখ করিতে বলেন, "শ্রীমন্ মহামাহেশ্বরাচার্য্যবর্য্য শ্রীমদ্ অভিনব গুপ্তাচার্য্য।

শাস্ত্রেও (যথা কাব্য প্রকাশ) ধ্বনি-বিচারে তাঁহার মত পরম শ্রদ্ধার সহিত উল্লিখিত হয়। তৎপ্রণীত 'তন্ত্রালোক' একখানি অতি বিস্ময়কর গ্রন্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ। উহাতে সকল দিক হইতে শৈবতন্ত্রের ব্যাখ্যা ও বিচার করা হইয়াছে। পুস্তকখানি অতি বিস্তৃত এবং সকলের বিশেষতঃ যাঁহারা তর্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত নহেন তাঁহাদের পক্ষে উহা আয়ত্ত করা দুঃসাধ্য বলিয়া তিনি উহার বিষয়-বস্তু সংক্ষিপ্ত ও তীক্ষ্ণতর্ক বর্জ্জিত করিয়া—'তন্ত্রসার' নামে আর একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 'তন্ত্রালোক' দেখি নাই। 'তন্ত্রসার' আমার আছে। উহার—গোড়াতেই গ্রন্থকার বলিয়াছেন—

বিততন্তন্ত্রালোকো বিগাহিতুং নৈব শক্যতে সর্ব্বৈঃ।

ঋজুবচনবিরচিতম্ ইদং তু তন্ত্রসারং ততঃ শৃণুত ॥

বস্তুতঃ ইদানীং তন্ত্রালোকের পঠন পাঠন প্রায় হয় না; 'তন্ত্রসার'ই অধিক পঠিত হয়।

ভুলি নাই

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

ভুলে গেছি তোমা ?—এ যে বৃথা অভিমান !
ভুলিবারে কেবা চায় !
অক্টোপাশের বাহুসম স্মৃতি তব
ঘিরিয়া আছে আমায় !
জীবনের পথে সম্মুখে যতো চলি,—
মরা অতীতের কঙ্কাল পায়ে দলি',
পুরাতন প্রেম চোরকাঁটাসম ততো
বিঁধে রয় এ হিয়ায় !

মধুর স্বপ্ন ভুলে যায় যথা লোকে—
নিশি যবে হয় ভোর,
ভেবেছ তেমনি টুটিয়াছে আজি মোর
ভাবের ভাঙের ঘোর ?
একটি আকাশে হেরিয়া হাজার তারা
ভেবেছ কি তার মাঝে হ'য়ে গেছ হারা ?
জানো নাকি নারী, সকল তারার সেরা—
ধ্রুবতারা তুমি মোর ?

কোকিল পালায়ে যায় পিঞ্জর ছেড়ে,—
কানে বাজে গীতি তার !
ঐ মতো তুমি চলে গেছ বহুদূর
রাখিয়া স্মৃতির ভার।
তাইতো আজিও মাঝে মাঝে মনে হয়
এ জীবন নহে শুধুই দুঃখময় !—
নর্ম্মে কর্ম্মে ঢালিছ মর্ম্মে মোর
শান্তির সুধা-ধার।

আগুনের দাহে জ্বলে দেহ ক্ষণকাল,—
তবু রহে তার দাগ ;
ধুয়ে পুঁছে ফেলি কেমনে চিহ্ন তব,—
সে কি হোলির ফাগ ?
ভুজগদষ্ট অঙ্গুলিটির প্রায়
মর্ম্ম উপাড়ি' ফেলিব কেমনে হায় !
লুপ্ত নহে সে,—গুপ্ত—ফল্গুসম
এ আমার অনুরাগ !

তাই ভালো—যদি ভুল ক'রে ভেবে থাকো
তোমারে গিয়েছি ভুলে,—
ক্ষণিকের তরে বাজায়েছি বাঁশি তব
হৃদিকালিন্দীকূলে !
কেমনে জানিবে হায় গো বুদ্ধিহীনা,—
হৃদয়েরে বোঝা যায় না হৃদয় বিনা !
কাগজের পুঁথি হ'ত যদি মোর মন,—
দেখাতাম পাতা খুলে !

একটি হাতের কান্না

শ্রীহরিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

আজই আমাদের শেষ দিন! এর পরেই সুরু হবে 'লে-অফে'র পালা। মেশিনের ধারে গ্যাস-চুল্লির কাছে আমরা ক'জনে মন-মরা হয়ে বসে আছি। আমরা যেন শ্মশানে এসে মৃতদেহকে শেষ বারের মতো আগলে রেখে জীবনের অনিশ্চিয়তার কথা ভাবতে সুরু করেছি। আমরা যেন দেবতার কাছে নিবেদিত জীব, শুধু বলি-দানের অপেক্ষায় আছি। আমাদের দেবদারু পাতার সামিলও বলা চলে। উৎসব-শেষে ঝরা দেবদারু পাতার কথা ক'জন আর মনে রাখে! কেউ দেখবে না এতগুলো মানুষ 'লে-অফে'র চক্রব্যূহে পড়েছে। শীতের রাতে মা-হারা বেড়াল বাচ্চার মতোই আমাদের অসহায় অবস্থা। তবু অসহায় জীবের ওপরও মানুষের অনুকম্পা জাগে—অন্ততঃ একবারও নিজেকে অপরাধী মনে হয় বৈকি। কিন্তু মানুষের দুঃখে বুঝি অনুকম্পা জাগে না। জাগলে বুঝি এতগুলো শ্রমিকের এই হাল হ'ত না। কাঁচামালের অভাব, সুতরাং 'অনিচ্ছাকৃত বেকারত্ব' মেনে নিতে হবেই। বিরাট যন্ত্রপুরী আজ নিস্তব্ধ নিঝুম। শুধু একপাল বাঁদর ইলেকট্রিক ক্রেনের পাতা লাইনে সার দিয়ে বসে আছে। মানুষগুলো শুধু নিবিষ্ট মনে বাঁদরের এই জীবনযাত্রা দেখছে। বাঁদরগুলো এ-ওর গায়ের পোকা বেছে দিচ্ছে। লিষ্টার-ট্রাকের আওয়াজ নেই, ক্রেনের ঘড়-ঘড়ানি নেই, নেই হাতুড়ির মর্ম্মভেদী শব্দ। শুধু রবার্টসন সাহেবের টেলিফোনটা থেকে থেকে কচি ছেলের মতো ককিয়ে উঠছে। অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য কারখানার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক থাকবে না। কবে কাঁচামাল সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে,ফরেন এক্সচেঞ্জের বেড়া ডিঙ্গিয়ে ইমপোর্টারদের খুশী করে আমাদের কারখানায় আসবে—তার পর সুরু হবে কাজ। আমা-দের বেকারত্ব ঘুচে অমরত্ব লাভ হবে। আটটা-পাঁচটা করতে পাব। চিমনির ধোঁয়াটা গাঢ় হবে—জোরে হুইসেল পড়বে, রেলওয়ে গুমটির রামভকত সিং আর গাঁজার মাত্রা চড়াবে না। চারিদিকে কর্ম্মচাঞ্চল্য দেখা দেবে। শনিবার হপ্তার পর কারখানার ধারে 'হপ্তা-মার্কেট' বসবে। জামা, কাপড়, সাবান, লেবু, কলা, কপি মায় আই-সি-আই কোম্পানীর ছারপোকা মারা পাউডার পর্য্যন্ত।

হঠাৎ আমার দৃষ্টি পড়ল, দেখি, আমরা সবাই মৌচাকের মৌমাছির মতো এক জায়গায় আছি—শুধু ব্রজদাই নেই। তবে ব্রজদা গঙ্গায় ঝাঁপ দিল না তো? আমার মনে এই আশঙ্কাটা প্রবল হ'ল। এ আমার চিরদিনের স্বভাব। যে দুঃস্বপ্নটা দেখতে চাই না—তবু অশুভ ঘটনার আভাস দিয়ে ঘুমন্ত আমি-মানুষটাকে ভীতগ্রস্ত করে তোলে। অথচ পরিত্রাণও নেই। ব্রজদার কোনো অনিষ্টকর চিন্তা আমি কোনোদিনই করিনি—তবু আজ কেন জানি না একটা অপয়া চিন্তা যেন আমাকে ঘিরে ফেলল। একদিকে বেকার-জীবনের চিন্তা—অপর দিকে ব্রজদার চিন্তা। সব চিন্তাকে ছাপিয়ে যেন ব্রজদার চিন্তাটাই আমাকে পেয়ে বসল। তার একমাত্র কারণ, ব্রজদাকে আমরা ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি। সব চিন্তা আসতে আসতে আমার মন থেকে মুছে গেল, শুধু ব্রজদার মুখটাই আমার কাছে জ্বল জ্বল করতে লাগল। গলায় কণ্ঠির মালা, শীত নেই—বর্ষা নেই—গায়ে একটা পাতলা উড়ানি। বাঁধান দাঁতের জন্য ফাঁকা কথাগুলো খুব সহজেই যেন বেরিয়ে আসে। গলায় তিনটে খাঁজ। খাঁজের পরতে পরতে নুন-ঘাম জমে থাকে। ডান হাতটা ব্রজদার নেই। কনুয়ের ওপরে গোল পয়সার মতো টিকে নেওয়ার দু'নম্বর দাগটা ঘেঁসে হাতটা বাদ চলে গেছে। মনে হয় ঐ কাটা জায়গাটা যেন ছাঁচে ফেলে কাটা হয়েছে। ট্রেনের সিগন্যালের মতো কাটা হাতটা শুধু নামান আর ওঠান চলে। ব্রজদার মুখে একটা বিনয়ের হাসি সব সময় লেগে থাকে। হাসিটা খুবই আপন হয়ে গেছে। মুখের সামনে পাঁচটা আঙুল রেখে কথা বলে ব্রজদা। কোথায় ব্রজদা? মন আমার আনচান করে উঠল। ছুটে চাতালে এলাম। কোথাও ব্রজদার নাম-গন্ধ নেই। শুধু লকারের খোলা পাল্লাটা বাতাসে নড়ছে। আর একটা মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে। লকারের প্রথম তাকে রামদাস বাবাজীর ছবি। ছবিতে আজও মালা পড়েছে। একটা ধূপ এখনও জ্বলছে। ধোঁয়াটা

পাকিয়ে পাকিয়ে সারাটা লকার ভরিয়ে রেখেছে। তা হলে ব্রজদা এখানে এসেছিল। হোমিওপ্যাথিক ঔষধেপূর্ণ একটা গৃহচিকিৎসা-বাক্স লকারের দ্বিতীয় তাকে আছে, আর আছে একটা পাঁজি। এক তাড়া খাম, পোষ্টকার্ড, মণি অর্ডার ফরম, একটা গুলিসুতো, একটা ছুঁচ, ব্রজদার কারখানার পোশাক—এগুলো শেষ-তাকে সাজান আছে—একতাড়া মনিঅর্ডার রসিদ একেবারে সামনে রাখা। মেয়েলী ধাঁচের হাতের লেখায় সই করা 'নন্দা দেবী'। আমার মনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল। তবে কি ঐ কষ্টির আড়ালে উড়ানির ছদ্মবেশের পিছনে কোনো গোপন রহস্য আছে? আবার চোখে পড়ল একতাড়া চিঠি—নন্দা দেবী কোনো এক সুধন্য মামাকে চিঠি লিখেছে। কোথায় কারখানার চিন্তা মাথায় ঢুকল—কোথায় সঙ্গে সঙ্গে ব্রজদা এসে পড়ল—আর তার সঙ্গে নন্দা দেবী, সুধন্য মামা—মাথাটা আবার কেমন গুলিয়ে উঠল।

আর আধ ঘন্টা আছে। এর পর হপ্তা দেওয়া সুরু হবে। এখনকার মতো এই আমাদের শেষ হপ্তা নেওয়া। টি-বয়গুলো ম্লান মুখে বসে আছে। কান টানলেই মাথা আসে। লে-অফের টানে ওরাও ভেসে গেল। ব্রজদাকে এমন ভাবে খুজে পাব এটা আমার ধারণা ছিল না। হাইড্রোলিক প্রেসারের বড় হ্যামারটার গায়েই চুপচাপ বসে আছে ব্রজদা। খড়ি দিয়ে আপন মনেই বাঘবন্দী খেলছে। মেশিনের গায়ে লাল রং দিয়ে বড় বড় করে লেখা শ্রীশ্রীবিশ্বকর্ম্মা বাবার শ্রীচরণে ভরসা। বাবা বিশ্বকর্ম্মাও লে-অফ ঠেকাতে পারল না। ভাস্ত মার্কারের মেহনত করে লেখাই বৃথা হ'ল। আস্তে আস্তে ব্রজদার পাশে গিয়ে বসলাম। গত কালও ব্রজদা ঐ হ্যামারের হ্যাণ্ডেল ধরে কাজ করেছে। কালও হ্যামারটাকে কত দুর্দ্ধর্ষ, কত দুর্ব্বার না মনে হয়েছিল—কত ভয় না পাই ওটাকে দেখে। ফারনেস থেকে লাল টকটকে লোহার পিণ্ডটা সাঁড়াশী দিয়ে বার করা, তার পর হ্যামারের নীচে ছাঁচের ওপর বসিয়ে দেওয়া। একটা হিস হিস শব্দ—একটা ডেঞ্জার আলো জ্বলা। হ্যামারটার কাজ একবার শুধু লোহার তালটাকে দলিত-মথিত করে আবার শূন্যে উঠে যাওয়া। হ্যামারটাকে মনে হয় একজন আদিম বর্ব্বর পুরুষ, আর লোহার পিণ্ডটাকে একটি নিষ্পাপ পাহাড়ী মেয়ে। বর্ব্বর পুরুষ আর নারীর চিরন্তন যুদ্ধ ব্রজদাকে দেখতে হয়। হ্যামার-হ্যাণ্ডেল ধরে বসে-থাকা কাজ ব্রজদার। ওয়েলডিং সপের কাছে আজ চোখ বাঁচিয়ে পথ চলতে হবে না। ঐ চোখ-গেলর দেশ আজ শান্ত। কারখানা যেন কার যাদুস্পর্শে শান্ত হয়ে গেছে। আমার টেবিলের ওপর কাঁচের গ্লাসটা পৌষ মাসের বৃদ্ধের মতো ঠক্ ঠক্ করে কাঁপে; যেন চিরন্তন মৃত্যুপুরী আগাদীর দেশে আমরা কাজ করি।

ব্রজদার উড়ুনির খুঁটটা পাকাতে পাকাতে শান্ত স্বরে ব্রজদাকে ডাকলাম।

—দাদা, চল, আর এখানে মায়া বাড়িয়ে লাভ কি? ঘরে চল।

—ঘর! ও হ্যাঁ। ব্রজদা আবার চুপ করে গেল; আমি আমার আসার উদ্দেশ্যটা এবার খুলে বললাম।

—হপ্তা নিতে হবে দাদা, রবার্টসন সাহেব তোমায় খুঁজছে।

অত শান্ত মানুষটা হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। রাগত-স্বরে ব্রজদা বলে উঠল—

—খুঁজুক, চান করাবার ডাক পড়েছে বুঝি প্রথম বলির পাঁঠার?

এবার আমার মুখের সবটুকু মধু এক সঙ্গে ঢেলে দিলাম, তাতে কাজ হ'ল। ব্রজদা কাটা হাতটা নিয়ে শরীরটাকে ছন্দের তালে তালে এগিয়ে নিয়ে চলল। সোজা এসে দাঁড়াল রবার্টসন সাহেবের কাছে। ফিস ফিস করে বলে উঠল—

—নিন, হপ্তা দিন হাজরিবাবু।

কাছারির হাঁক পাড়ার মত হাজরিবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন—

—ওয়ান জিরো থিরি—ব্রজলাল।

অর্থাৎ টিকিট নম্বর আর নাম। হপ্তার খামটা রবার্টসন ব্রজদার দিকে এগিয়ে ধরল। খামে লেখা আছে, 'খুলিও না, আগে ভিতরে যা আছে দেখ' ব্রজদা খামটা অনাসক্তের মতো হাতের মুঠোর মধ্যে নিল। কোনো স্পৃহা নেই। শুধু উদাস দৃষ্টিতে একবার কারখানার চারিদিকটা দেখে নিল। আদরের জিনিসকে নিবিষ্ট মনে দেখে নেওয়ার মতো। আমাদের সব কাজ শেষ হয়ে গেল। রবার্টসনের মুখে সিগারেট—হাজরিবাবু বাকী টাকার হিসেব ঠিক করায় ব্যস্ত, চেয়ে দেখি, কেবল ব্রজদা আর আমি। কোথাও কেউ নেই, একটু আগে মানুষের উত্তাপে জায়গাটার প্রাণ ছিল—এখন যেন প্রাণহীন হয়ে গেছে বিরাট কারখানাটা!

ব্রজদার কান্নাভেজা গলার চমক ভেঙ্গে গেল।

—একটু দাঁড়িয়ে যা বিশু, একটা রিকসা যে ডেকে দিতে হচ্ছে ভাই।

—কেন দেব না ব্রজদা, নিশ্চয় দেব। আমি বললাম।

আস্তে আস্তে দু'জনে চাতালে এলাম। লকারের

পাল্লাটা ধরে বিহ্বল দৃষ্টিতে রামদাস বাবাজীর ছবির মধ্যে কি যেন খুঁজলো ব্রজদা। কান্না-হাসির একটা অপূর্ব্ব মিলন ব্রজদার মুখে ফুটে উঠল। জিনিসপত্তর সব খুঁটিনাটি—সেগুলো একে একে পুঁটলী বাঁধা হ'ল। তার পর লকারের চাবিটা বন্ধ করে ব্রজদা আমার হাতে চাবির গোছাটা এগিয়ে ধরল। দু'জনে আস্তে আস্তে এগিয়ে চললাম। চারিদিকে হপ্তার খামগুলোর ছেঁড়া টুকরোগুলো পড়ে আছে। কিছুদূর যাবার পর ব্রজদা দাঁড়িয়ে পড়ল। আমার পিঠে হাত রেখে বলল—

—একটু দাঁড়িয়ে যা বিশু, কি জানি, হয়ত আর নাও আসতে পারি।

—সেকি ব্রজদা! কাঁচামাল এলেই তো কাজ পাব আমরা। আমি ব্রজদাকে অভয় দেবার চেষ্টা করলাম। ব্রজদা আমার কথা শুনে একটু হাসল, তার পর সেই হাসিটা মুখের চারিদিকে যখন ছড়িয়ে পড়ল তখন ব্রজদা বলল—

—তোরা সব লেখাপড়াই শিখেছিস, ঘটে বুদ্ধি একটুও নেই। রবার্টসন সাহেবের যুগ আর নেই, এখন দেখবি ইউনিয়ন-ঘেঁষা বুড়োহাবড়াদের আর গেটের ভেতরে আসতে দেবে না—

—তোমাকেও?

আমার বিস্ময়টা ঐখানেই। ব্রজদা কোম্পানীর এত প্রিয়পাত্র হয়েও যদি না আসতে পারে—তবে কাদের জন্য এই কারখানা? আমার মুখের ভাব লক্ষ্য করে ব্রজদা বলল—

—হ্যাঁ, আমাকেও, এসব এখন মালিকের খেল, তোরা বুঝবি না।

আবার দু'জনে চুপচাপ হাঁটা সুরু করলাম। মাঝে মাঝে সবুজ ঘাস বেরিয়েছে। কোম্পানীর দরওয়ান প্রীতম সিং ছাগলটাকে দড়ি বেঁধে চুপচাপ বসে আছে। এত বড় বিরাট কারখানাটা ওদের হেপাজতে থাকবে এবার। প্রীতম সিং-এর দেহটা মনে হয় এখানে পড়ে আছে। মনটা হয়ত পাঞ্জাবের ছোট্ট একটা গ্রামে, কোনো গমের ক্ষেতের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নয় ত কল্পনার কাজল পরে প্রিয়জনদের ছবি দেখছে। থুতনিটা হাঁটুর ওপরে, দৃষ্টিটা কাছে থেকে দূরে চলে গেছে। গঙ্গার ধারে পাঁচিলের ওপর শকুনির দলগুলো লাইন দিয়ে বসে আছে। ওরা যেন দলপতির নির্দ্দেশে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। লোহার তারে ইছু মিঞার লুঙ্গিটা ঝোলান আছে। বাতাসে পত্ পত্ করে উড়ছে। মিঞা সাহেব লুঙ্গিটা নিতে ভুলে গেছে। বাতাস থেকে সাঁই সাঁই করে একটা শব্দ উঠছে, মনে হয়, লুঙ্গি যেন মিঞাকে করুণ সুরে ডাকছে। আবার ব্রজদার ডাক পড়ল।

—এই ফাঁকা জায়গাটায় একটু দাঁড়া বিশু, এখানে আমার সর্ব্বস্ব গেছে রে!

ব্রজদা আর আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। দু'জনার মুখে কথা নেই। ব্রজদা চিমনির ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে রইল। নীল আকাশের বুকে দুটো চিল চক্রাকারে ঘুরে চলেছে। কামারশালের ছোট চিমনির ওপর দিয়ে ভেপার উড়ে চলেছে। কখনও বৃষ্টির ধারার মতো জল হয়ে চোখেমুখে এসে পড়ছে। ঘাসের ওপর দিয়ে একটা ধাড়ি ইঁদুর চলেছে—পিছনে তার কতকগুলো বাচ্চা। বাচ্চাগুলোর চোখ ভাল করে ফুটেছে কি না সন্দেহ। তবুও এরই মধ্যে পেটের চিন্তায় ওদের বেরুতে হয়েছে। কয়েকটা কাক বাচ্চাগুলোর দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। ওদের দেখাই সার। ইঁদুরগুলো গর্ত্তে চলে গেল। ব্রজদা আবার মুখ খুলল—

—আজ অনেক দিন পরে, বুঝলি বিশু, আমি আমার কাটা হাতটা যেন দেখতে পাচ্ছি রে—আর মনে পড়ছে তার কথা।

—কার কথা ব্রজদা?

—নন্দার কথা রে, হাতের কথা মনে পড়লেই তার কথা মনে পড়ে। ব্রজদার স্বরটা কেমন ভারি হয়ে গেল।

—থাক্ ও-সব কথা ব্রজদা, মিছেমিছি মন খারাপ হয়ে যাবে—তার চেয়ে চল, বাড়ী যাই।

একটু থেমে ব্রজদা বলল, কষ্ট হবে। বিশু, তুই যদি শুনিস তা হলে বুকটা হাল্কা হয় রে! মানুষটাকে যদি দেখতে পেতিস। আহা! সাক্ষাৎ প্রতিমা রে!

অশ্বত্থগাছের বাঁধান চাতালে আমরা দু'জনে এসে বসলাম। গাছের ডালে একজোড়া ঘুঘু-দম্পতী বসে আছে। ব্রজদা ঘুঘু দম্পতীর দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল। একটা মুরগী একপাল বাচ্চা নিয়ে নেপালী কোয়ার্টারের ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কতকগুলো ছেলেমেয়ে খেলাতে মেতে আছে। হঠাৎ ব্রজদার কথায় চমক ভাঙল—

—পশুপাখিদেরও ঘর আছে বিশু, আমার কিছুই নেই। অথচ সবই আমার ছিল, সব হারিয়ে গেল।

—তোমার হাতের গল্প বল ব্রজদা। আমি প্রসঙ্গ ঘোরাতে ব্যস্ত হলাম।

—আঠার বছর আগেকার কথা বিশু, তোদের কি ভাল লাগবে? তখন রক্তের তেজ ছিল, আর ছিল একটা ডোণ্ট কেয়ার ভাব। এখনকার মতো এই চিমড়ে-পোড়া শরীর ছিল না, চেহারাটা দশাসই ছিল। মুহুর্মুহু

সিগারেট ফুঁকতাম, ফিনফিনে ধুতি, আদ্দি-পাঞ্জাবি পরে কারখানায় আসতাম। কোম্পানীর পোশাক লকারে থাকত। তবু মনে শান্তি ছিল না রে। যৌবনের জ্বালা বড় জ্বালা। মনটাকে ভোলাবার জন্যে যাত্রা করতাম, কীর্ত্তনের দলে মেতে থাকতাম। কিন্তু মনটা থেকে থেকে হঠাৎ কেমন ঝিম মেরে যেত। বন্ধু-বান্ধবদের সব বিয়ে হয়ে গেল, তারা বউ নিয়ে ঘর-সংসার পাতল। আমার পাতা হ'ল না। ভদ্রলোকের ছেলে, কারখানার কাজ বলে লোকে আড়ালে ঘৃণা করত। আত্মীয়রা মুখ টিপে হাসত, আমি বুঝতাম।

স্থান-মাহাত্ম্য এমনি জিনিস! স্মৃতি-কথা সহজে ভোলা যায় না। অনর্গলভাবে পুঞ্জীভূত কথা যেন বহিরাগমনের জন্য মাথা খুঁড়ে মরে! তাই ব্রজদাও মুক্তি পাবে কি করে?

—তার পর নন্দার চিন্তা আমায় পেয়ে বসল। মৌমাছির মধু খোঁজার নেশার মতো আমাকে পেয়ে বসল। ছায়া-ঢাকা মাটির পথ দিয়ে সাইকেল চালিয়ে চলেছি। ছ'টা-ছুটো ডিউটি। অন্ধকার, বুঝি সাড়ে পাঁচটা হবে। গাছ থেকে টুপ-টাপ শিশির ঝরছে চারিদিকে। একটা পুজো-পুজো গন্ধ। আকাশে-বাতাসে যেন মা'র আসবার কথা জানিয়ে রেখেছে, শীতের প্রথমটা বেশ লাগছে। হঠাৎ কি যেন হয়ে গেল।

ব্রজদা চুপ করে গেল। চুপ করতেই হ'ল। একটা ফুটফুটে নেপালী ছেলে ব্রজদার কোলে এসে বসল। হাত বাড়িয়ে গলার কন্ঠির মালাটা দেখল। তার পর কাটা জায়গাটাতে চোখ পড়তেই ছেলেটা কেমন বিবর্ণ হয়ে গেল। হাসিখুশি মুখটা কান্নায় যেন ভিজে গেল। এক ফাঁকে দৌড়ে পালাল। ব্রজদাও হেসে উঠলেন।

—ছেলেটা ভয় পেয়েছে রে বিশু! প্রথম দিন নন্দাও এই কাটা হাত দেখে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল রে! কোথা থেকে আমরা এসেছি, কোথায় আবার চলে যাব তার ঠিক-ঠিকানা নেই। হ্যামারের হ্যাণ্ডেল টানতে টানতে ভুলে গিয়েছিলাম যে আমিও একটা মানুষ। একটা মেসিনের মতো আমিও বোবা হয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ আমার সাইকেলটা গিয়ে পড়ল নন্দার ওপর। সাজি থেকে শিউলি ফুলগুলো মাটিতে ঝরে গেল। পায়ের চাপে কতকগুলো ফুল দলা পাকিয়ে গেল। ছেঁচা-ফুলের একটা গন্ধে জায়গাটা ভরে গেল। তখন নন্দা রাগে ফেটে পড়েছে। লোহাকাটা, অসভ্য জানোয়ার বলে ভাঙা সাজিটা নিয়ে দৌড়ে পালাল। গালাগাল, সে ত আমার গা-সওয়া জিনিস। ছুটো ফুল কুড়িয়ে পকেটে পুরলাম। তোরা এক জাহাজ লেখা-পড়া শিখেছিস, তোদের সময়টাই পাল্টে গেছে রে! তোদের জন্য দেশের নেতাদের ঘুম নেই। এখন ছেলেদের কাছে কারখানাই স্বপ্ন। আর আমাদের লোহাকাটা, চটকলিয়া—কত সব নাম ছিল। তবু আমার জীবনে ঐ ঝরা ফুলই যেন নতুন ভাবে ফুটে উঠল।

রোদ্দুরটা বাঁকা হয়ে নেপালীদের উঠোনের মাঝখানে পড়ল। একটা নেপালী বউ সোয়েটার বুনছে। ছুটো কচি ছেলে দোলনায় শুয়ে আছে। শুধু ঠকঠক করে পাওয়ার-হাউস থেকে মেসিনের একটানা শব্দ ভেসে আসছে—ওরা যেন সমস্বরে কাঁদছে। সেই সুরের একটা আমেজ যেন ব্রজদার গলায় ধরা পড়েছে।

—তার পর যা কিছু দেখতাম সব আমার ভাল লাগত। দুপুরে কারখানা থেকে ফিরলাম। সকালের ফুলগুলো শুকিয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। মনে হ'ল আমার মনের যে ফুলটা শুকিয়ে গিয়েছিল সেটা বুঝি নন্দার স্পর্শ পেয়ে জেগে উঠেছে। নরম স্যাঁত স্যাঁতে মাটিতে দু' একটা পায়ের ছাপ। বোধ করি নন্দারই। সেই ছাপ-ভাঙা শিবমন্দিরের পাশ দিয়ে চলে গেছে পাড়ার মধ্যে। পরের দিন দূর থেকে লাল-পেড়ে শাড়ি আর সাজি দেখতে পেলাম। আঠার বছর আগেকার ঘটনা, মনে হচ্ছে বুঝি এখনই সে ছবি দেখছি। নন্দা নাম জেনেছিলাম পরে। মুখটা নন্দার একটা প্রশান্ত হাসিতে চাপা, ঠিক আধ-ফোটা পদ্মের মতো। নন্দা গুন-গুন করে গান গাইছে। হেঁটেই চললাম। শুধু ঘাড় বাঁকিয়ে দেখল একবার। গালাগাল দিল না, ছুটে পালাল না। হাঁটতে হাঁটতে কচুবন-ঘেরা ঝোপটা পার হয়ে গেলাম। শেওড়ার ঝোপ, ভাঙা মন্দির খুব ভাল লাগল। একটা ভাললাগা চোখ দিয়ে দেখতে গিয়ে পৃথিবীর সবকিছু ভাল লাগল যেন।

ব্রজদা থামল। পাঁজিটা একবার নেড়েচেড়ে দেখলাম। প্রসঙ্গটা শোনবার মতো আমার মনের অবস্থা নেই। লে-অফের ব্যথাটা আমার বুকে কাঁটার মতো বিঁধে আছে ঘরে মা, ভাই, বোন। এরা পথ চেয়ে বসে আছে। চাকরি নেই—কতদিন ঘরে বসে থাকতে হবে কে জানে! ব্রজদাকে নিরস্ত করতে আমার মন চাইল না। বলুক, একজন মানুষ যদি ছুটো কথা বলে শান্তি পায়—মিছে বাধা দিই কেন? একটা কান্না যেন দানা বেঁধে উঠছে। তবু একবার জার্নালের কথা পাড়লাম।

—দাদা তোমার ছবি বেরিয়েছে কোম্পানী কাগজে, দেখেছ ?

—জাহান্নামে যাক ছবি ! আমার তাজা হাতটার কথা শোনরে ছোঁড়া। কোম্পানীর কাগজে ব্রজর ছবিটা বেরিয়েছে শুধু—কোথায় গঙ্গার ওপর পুল হয়েছে, ব্রজ খেটেছে,ব্রজর ছবি দিয়ে ওঁনারা কৃতার্থ করছেন আমাকে। আর ঐ রবার্টসন ছোকরা আমার ছেলের সমান। ব্যাটা ত কই লে-অফের হিড়িকে পড়ল না ! মুখে রক্ত তুলে, শরীরের সব কিছু বিসর্জ্জন দিয়ে কাজ করব—একটা ছবি ছাপিয়ে দিলেন। ব্যস, উদ্ধার হয়ে গেলাম আর কি ! কার জন্যে ছবি নেব ? কে দেখবে ? দেখবার কেউ নেই বিশু। সেই নন্দা, তার পর ভাব জমল, মুচকি হাসি, অকারণে হুড়মুড় করে চলে যাওয়া—সখিদের শুনিয়ে শুনিয়ে আমাকে কথা বলা। চটকলিয়া তখন ধ্যান হ'ল। সাইকেলের ঘণ্টি যে বার করেছিল তাকে আমার হাজার প্রণাম। ঐ ঘণ্টি শুনলেই নন্দা শিব-মন্দিরের কাছ থেকে ছুটে আসত। শেষে একদিন এই হাতটা করল কি জানিস ? নন্দার খোঁপায় একটা ফুল পরিয়ে দিল। সেদিন যদি জানতাম সেই শেষ ফুল দেওয়া ! নন্দা নিজের পেতলের আংটিটা খুলে দিল। একটা বিয়ে না হওয়া মেয়ের দুঃখ জানলাম। নন্দা নিজেকে উজার করে দিল। সংসারে, বিশু, পাওয়া জিনিস অনেক সময় হারিয়ে যায়। আমারও তাই হ'ল। বুক-ভরা ভালবাসা পেলাম। মন দিলাম, মন পেলাম। সব পেয়ে, সব হারালাম।

বটগাছের ছায়াতে একটা কুকুর শুয়ে আছে। ঘুমিয়ে পড়েছে। একটু জিব বেরিয়ে আছে। একটা কাক কুকুরটার গায়ে ঠুকরে ঠুকরে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। একটা শালিক লাফিয়ে লাফিয়ে ফড়িং ধরছে। সারাটা কারখানায় শান্ত পরিবেশ। ছুঁচ পড়ার আওয়াজ বুঝি আজ শোনা যাবে। ব্রজদা এই ফাঁকে উঠল। একটু ঘুরেফিরে নিল। নিজের মনটাকে আজ শান্ত করা যেন খুবই অসম্ভব হয়ে উঠেছে ! জলের কলে মুখটা ধুয়ে নিল ব্রজদা। তার পর এসে বসল। সুরু হ'ল গল্প।

—ডান হাতটাকে সেদিন থেকে খুব ভালবাসলাম। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিজের হাতটা নিজের চোখের সামনে তুলে ধরতাম। নিজের হাতকে মানুষ এত ভালবাসে সেদিন প্রথম বুঝলাম। বাঁ-হাতটা যেন কত পর হয়ে গেল ! তার কারণ আছে বিশু। এই ডান হাতটা আজ কেটে দু-টুকরো হয়েছে বটে, কিন্তু সেদিন এর মতো ভাগ্যবান আমিও ছিলাম না। নন্দার স্পর্শ পেয়েছিল এই হাত ! নন্দার খোঁপায় ফুল দিয়েছিল এই হাত। তাই নিজের হাতকে আদর করতাম, বিভোর হয়ে থাকতাম। দূরের মানুষগুলো কত কাছের হয়ে গেল। নন্দার তখন কোনো সঙ্কোচ নেই, কোনো দ্বিধা নেই। আমি শুধু নন্দার ধ্যানে মগ্ন রইলাম। প্রাণে জোয়ার এল, কাজে স্ফূর্ত্তি হ'ল। ভালবাসায় কত স্বাদ আছে, কত ব্যথা আছে, আনন্দ আছে, মাঝে মাঝে কারণে-অকারণে একটা কান্নার মতো কি যেন উঠে আসত। কান্না নয়, হাসি নয়—হাহাকার বলতে পারিস। তুইও বুঝবি বিশু, যদি সময় পাস।

—তার পর ব্রজদা, থামলে কেন ? আমি খেই ধরিয়ে দিলাম।

—সব সময় মন আমার আনমনা হয়ে থাকত। সেই আনমনা অবস্থাই আমার কাল হ'ল। ঐ ফাঁকা জায়গাটায় একটা হামার ছিল। সাপুড়ে যেমন সাপের হাতে মরে আমারও সেদিন তাই হয়েছিল। জীবনের অতগুলো বছর হামার টানলাম। কোনো গলদ নেই, আর আঠার বছর আগে এক অঘটন ঘটে গেল। চারিদিকে শ্রমিকদের ভিড়। জল, পাখা—সরে যান, সরে যান। ডান হাত থেতলে গেছে। আজও মাসে একবারও ডান হাতের দুঃস্বপ্ন দেখি। কাঁদি, ঘুম ভেঙে গেলে হাসি। কাউকে সেরকম হাসতে কোনোদিন না হয়।

একটা দরওয়ান উঁকি দিয়ে দেখে গেল। গঙ্গার ওপরে নৌকো ভেসে চলেছে। স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি বসে চলেছে। কম বয়স। মেয়েটা কারণে-অকারণে হেসে গড়িয়ে পড়ছে। ব্রজদা সেদিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। তার পর নিজের কথা সুরু করল—

—তার পর হাসপাতাল। অনেক দিন পরে ফিরে এলাম। আজকের মতো সেদিনও এসে দেখি কারখানার দরজা বন্ধ। কারণ, আমি আন-ফিট্। ছল ছল চোখে কারখানার বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম। বছর ঘুরে তখন শিউলি ঝরার দিন আবার ঘনিয়ে এসেছে। সহকর্ম্মীরা সমবেদনা জানাল। কিন্তু মানুষ সব যেন যন্ত্র হয়ে গেছে। আমার সঙ্গে যারা কাজ করত ক্রমে তারা এড়িয়ে চলল। মানুষ এখন নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে এনেছে। বুঝলাম, যতক্ষণ আমার অভাব নেই ততক্ষণ পৃথিবীতে সবাই আমার বন্ধু-স্বজন। কিন্তু মানুষ যেই একটা মানুষকে দেখল যে মানুষটার অভাব আছে—কিছু পেতে চায়, ঠিক তখনই তারা সরে পড়ে। দূরে চলে যায়। কাছে থাকলে শুধু মধু-ঢালা কথা বলে, আসলে কথার

আড়ালে নিজেকে তফাতে রাখে। পৃথিবীকে সেদিন চিনলাম বিশু!

একটা চিল পাওয়ার-হাউসের দেওয়ালের একটা ফোকরে ঢুকে গেল। মাদী চিলটা ফোকরের ভেতর থেকে পুরুষ চিলটার মুখ থেকে কাঠিটা নিয়ে নিল। ঘর বাঁধার পালা শেষ হলে অনেকটা কাজ সারা হবে। একটা ডোরা-কাটা চড়ুই পাখী নাচতে নাচতে ব্রজদার কাছে এগিয়ে এল। ওদের আজ ভয়-ডর কিছু নেই। ওরা বন্ধনমুক্ত, স্বাধীন। বেপরোয়া। ব্রজদা শুধু একবার উড়ুনিতে মুখটা মুছে নিল, তার পর সুরু করল গল্প—

—হাত গেল, জোয়ান শরীরের খিদে দ্বিগুণ হয়ে গেল। আর নন্দার তখন খবর জানি না। সে নাকি তার মামার বাড়ীতে ছিল—তখনও হয়ত আমার আস্ত হাতটার ধ্যানে মগ্ন ছিল। কোথায় চলে গেল হাতটা। মানুষকে একটু সোহাগ জানাতে পারব না—হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করাও চলবে না। শেষে অনেক ভেবে গোমেজ সাহেবের স্মরণাপন্ন হলাম। কারখানায় সাহেবের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, বাঘে-গরুতে জল খায় বুঝি গোমেজ সাহেবের নাম শুনলে। রোঁদে বেরুলে ফুদে ফোরম্যানদের ডাইবিটিস হবার লক্ষণ দেখা দিত। বাবুর্চী খবর দিল লোয়ার সারকুলার রোডের কবরখানায় সাহেবকে পাকড়াও করতে হবে। যে কথা সেই কাজ। এক চাঁদনি রাতে গোমেজ সাহেবকে কবরখানায় ঘেরাও করলাম। সাহেব তখনও ধ্যানমগ্ন।

মারোয়াড়ী গোলায় পায়রার ভিড় জমেছে। একটা পুরুষপায়রার বুকটা ফুলে ফুলে উঠছে। সূর্য্যের আলো পড়ে সেই ফোলা বুকের পালকগুলো কেমন রঙীন হয়ে উঠছে। ছুটো পায়রা কার্নিসের ধারে ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে বসে আছে। দুজনের চোখ আধ-বোজা। দুধ-ছানিতে দুজনের আধ-চোখ ঢাকা। ব্রজদা এসব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। তার পর সুরু হল—

—চুপি চুপি গিয়ে কবরখানার মধ্যে বসলাম। আহা! আমার কবর যদি হ'ত, কি মজাই না হ'ত! ফুলের তাজা গন্ধে ভরপুর। কাটা হাতটা আকাশের তারার দিকে তুললাম। পূর্ণচন্দ্রের মধ্যে যেন নন্দাকে ফিরে পেতে মন চাইল। কোথা থেকে রাত-জাগা পাখী ডেকে উঠল। চাঁদের সুন্দর একটা আলো গোমেজ সাহেবকে ঘিরে আছে। জোনাকির ঝিকিমিকি, ঝিঁঝির কলতান—আমার মনটা তখন ভাঙা মন্দিরকে ঘিরে নন্দার চিন্তায় বিভোর। হঠাৎ শুনলাম—মিলায়ে মাইজী। চেয়ে দেখি ভিখিরী পরিত্রাহি চেঁচিয়ে চলেছে। আমারও ঐ হাল হবে নাকি! এই চিন্তায় মন ভার হয়ে উঠল। গাছের ডাল থেকে শুকনো পাতা একটা পড়ল। ঠিক তার পরেই সাহেব উঠল।

অশ্বত্থগাছের মাথার ওপর দিয়ে সূর্য্যের একটা রশ্মি এসে পড়ছে। একটা ছায়া-ঘেরা জায়গায় সবুজ ঘাসগুলো কেমন সাদাটে হয়ে গেছে। গাধা-বোটগুলো নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। পাটাতনে বসে মাঝিরা গঙ্গার জলে বালতি ডুবিয়ে স্নান সারছে। জলের দেশের মানুষ। জলের ছোঁয়া পেলে মনটা ওদের বুঝি পদ্মা-মেঘনার দেশে চলে যায়। গঙ্গার বুকে পদ্মার মেয়ে ফতেমার মুখটা হয়ত ভেসে ওঠে! ছোকরা মাঝি চোখে সুর্ম্মা টানছে। বুড়ো মিঞা নামাজ পড়ছে। ইহজীবন আর পরকালের চিন্তায় দু'জন বিভোর। ব্রজদাও ঠাকুরের নাম নিলে, তার পর সুরু হল—

—শেষে গোমেজ সাহেবের ধ্যান ভাঙল। তাঁর হাত দুটো জড়িয়ে কাঁদলাম। সাহেবের চোখে জল এল। শেষে কাজ হ'ল, কোম্পানীর ডিসপেনসারিতে পুরিয়া বানাতাম। তার পর অফিসারদের হাজিরা নেওয়া—শেষে ভিকি সাহেবের জন্য আবার হামার হ্যাণ্ডেল চালাবার কাজ পেলাম। তখনকার সাহেবগুলো মন্দ ছিল না। তার পর একদিন অনেক রাতে নন্দার সঙ্গে চুপি চুপি দেখা করলাম। আমার কাটা হাত দেখে কাঁদল। সে কি কান্না! যে জিনিস গেছে তাকে মূল্যবান হাজার জিনিস দিয়েও ফিরে পাব না। আমার সঙ্গে নন্দার বিয়ে হ'ল না।

হাইকোর্টের ফ্ল্যাগটা পতপত করে উড়ছে। কত জীবনের পালা ওখানে সুরু হচ্ছে আবার শেষ হয়ে যাচ্ছে। কত মানুষের চোখের জল—কত মানুষের আনন্দের হাসি, জয়ের রেশ হাইকোর্টের প্রতিটি ইটের পাঁজরে লেখা আছে। জি. পি. ও-র মাথায় রোদ পড়ে সাদা রঙটাকে কেমন তেলতেলে মনে হচ্ছে। দু' একটা কার্গো জাহাজে চিমনি থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। কত সাগরের নোনা জল ঐ জাহাজের গায়ে এসে আছড়ে পড়েছে। আর মানুষের চোখের বিন্দু বিন্দু নোনা জলের হিসাব রাখবার অবসর কই? ষ্টিম-লঞ্চটা দাঁড়িয়ে আছে—সারেং বেচারী বিনা কাজে ঘুমে অচেতন! আবার সুরু হ'ল গল্প:

—সেই নন্দার বিয়ে হ'ল অন্য লোকের সঙ্গে। বিয়ে করে রুগ্ন-স্বামী আর ছেলে নিয়ে বড় হয়রাণ হ'ল নন্দা। শেষে সেই ভাঙা শিব মন্দিরের পাশে চালা-বাড়ীতে নিয়ে

এসে উঠল। মনটা আমার আনচান করে উঠল। শেষে বুদ্ধি করে ওর এক মামার নামে মণি-অর্ডার পাঠালাম। মামার বাড়ীর গ্রাম থেকে। মামা কিছু টাকা নিল আমার কাছে। নন্দা আজও আসল লোককে জানে না। জানতে দিই নি। এবার মামা হয়ত গিয়ে খুলে বলে আসবে। টাকার টান পড়লে মামার কাছে ঘন ঘন চিঠি যাবে। তখন মামাকে খোলাখুলি সব কথা খুলে বলতেই হবে। টাকা চাই। নন্দার খোকার স্কুল আছে, পেটে খিদে আছে। ভাগ্য ভাল স্বামী রোগমুক্ত হয়েছে, কিন্তু রাহুমুক্ত হয় নি। বেকার আছে। বেকার জীবন ব্রহ্মশাপেরও অধম!

—তার পর ব্রজদা?

—রবার্টসন সাহেবকে বুঝিয়ে বলেছি। লে-অফের পর নন্দার স্বামী এখানে আমার বদলী কাজ পাবে—সাহেব পাইয়ে দেবে। কথা দিয়েছে।

—আর তুমি? তোমার কি করে চলবে ব্রজদা?

রামদাস বাবাজীর ছবিটা দেখিয়ে বলল—

—পোস্তার রাণীর বাড়ী ওঁকে একদিন দেখেছিলাম—ওঁর কীর্ত্তন কোনো দিন ভুলবো না।

—উনি?

কথাটা শেষ করবার আগেই বুঝে নিল ব্রজদা।

—হ্যাঁ উনিই আসল পথ বলে দেবেন। নন্দাকে ভালবাসি বলেই নন্দার ভাল চাই—যাকেই তুমি ভালবাসবে তাঁর ইষ্ট চিন্তায় মন রেখ—এই তো ঠাকুরের শিক্ষা।

ব্রজদা একটা রিকসায় উঠল। কাসুন্দে, শিবতলা পেরিয়ে, বালক সঙ্ঘের মাঠ পেরিয়ে রিক্সা ঠুং ঠুং করে এগিয়ে চলবে। ব্রজদার পুটলিতে রামদাস বাবাজীর ছবি—হোমিওপ্যাথিক বাক্স। এটা-ওটা-সেটা। রিক্সা চলবে। শিউলী গাছকে দেখে আর বোধ হয় সাইকেলের ঘন্টির কথা মনে পড়বে না। হয় ত রিক্সার ঠুং ঠুং আওয়াজ শুনে ব্রজের রাখালবালককে মনে পড়বে। রিকসার ঠুং ঠুং আওয়াজকে ছাড়িয়ে মনে পড়বে যেন গরুর গলার ঘন্টি বাজছে। হঠাৎ আমাদের চমক ভাঙ্গল। কোম্পানীর নোটিশ বোর্ডে ব্রজদার ছবিটা মারা আছে। ছবির নীচে ব্রজদার সংক্ষিপ্ত জীবনী। মেসিন-সপের বুড়ো রমজান মিস্ত্রীর ছবিও আছে—আছে অনেকের। ছবিতে ব্রজদার কি খবর আছে জানি—শুধু নেই একটি হাতের কান্নার কথা।

এই সন্ধ্যা

শ্রীকরুণাময় বসু

এই সন্ধ্যা চিরশান্ত যেন এক শাশ্বতী করুণা,
হৃদয়ের মুখোমুখি বসে থাকে নির্জন জীবনে;
রঙের আল্পনা আঁকা ক্লান্ত মেঘ ভেসে ভেসে যায়
কোন দিগন্তের শেষে কতদূর অস্তগিরি পারে?

সন্ধ্যার নিঃসঙ্গ মেঘ এ হৃদয় পার হয়ে যায়,
যেখানে নক্ষত্র-মন খেলা করে সৌর কেন্দ্রলোকে
কিশোর স্বপ্নের মতো ফুল ঝরা বসন্তের শেষে
যেন এক পাখি ডাকা ছায়া আঁকা আশ্চর্য বেদনা!

মনে পড়ে একদিন কতদূরে, কতকাল আগে
একটি কিশোরী মেয়ে এঁকেছিল নরম আঙুলে
নতুন জীবন-স্বপ্ন; এক জোড়া ঘন কালো চোখে
বনের মমতা ছিল পাতা ঘেরা কুঁড়ির মতন।

সেই মন আজ নেই, কিশোরীর সেই মুখ আজ
মিশে গেছে সায়াহ্নের ঘরে ফেরা মেঘের আড়ালে;
শুধু শান্তি, স্তব্ধতার ছায়াঘন নির্জন বাসরে
এ হৃদয় চুপ করে বসে থাকে আকাশের নিচে।

মন বলে, ওরে ফুল, ওরে পাখি, আয় বুকে আয়,
যত সুখ এ জগতে, তার চেয়ে আরো কথা আছে,
আরো তারা আকাশের, আরো কত স্মৃতি মায়াময়;
সব মিলে একাকার, সব মিশে অনন্ত জীবন।

এই ক্ষণ হৃদয়ের বাসাভাঙা পাখির মতন
কোথায় চলেছে উড়ে মহাশূন্যে নক্ষত্র আলোকে?

শিলাইদহে একদিন

শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়

১

ইংরেজী ১৯৩১, বাংলা ১৩৩৮ সালের ভাদ্র মাস। অল্প দিন হ'ল পাবনা এসেছি। বিকেলে বেড়াতে যাই পুরান নীলকুঠির পিছনে বাঁধের উপর; ছুটির দিনে সকালেও যাই। তখন পাবনা থেকে ঈশ্বরদি পর্য্যন্ত পীচের রাস্তা হয়নি; শহরের সবাই বেড়াতে যান ঐ বাঁধে। বাঁধের উপরে মিউনিসিপ্যালিটির পাতা কাঠে বেঞ্চে বসে' সামনে তাকাই। হু হু করে ছুটে চলেছে গেরুয়া জলরাশি, বাঁধের নীচে শত আবর্ত্ত রচনা করে; বহু দূরের তীরতরুরাজি পর্য্যন্ত তার অবাধ বিস্তার। শুনতে পাই, সাত মাইল। ভাল করে নজর চলে না ওপারে, তবু বর্ষাশেষের নির্ম্মল আকাশের গায়ে দেখতে পাই উচু ঝাউ গাছের মাথা। শুনি ঐ শিলাইদহ, রবীন্দ্রনাথের 'কুঠিবাড়ী' ওখানেই।

"শিলাইদহ"! এ নাম ছেলেবেলা থেকে মর্ম্মে গাঁথা। নাম শুনলে চমক লাগে মনে। মনে হয়, তরুণ রবির উদয় হয়েছে পূব গগনে, তার অরুণ আলো লুটিয়ে পড়েছে বাংলা দেশের মাঠে-ঘাটে, পথে-প্রান্তরে, নগরে-গ্রামে, নদীর জল ঝিকিমিকিয়ে উঠেছে সেই আলোতে। এই সাদাসিধে, অতি-সাধারণ নামটি যে কি অসাধারণই লেগেছে, যখন ছেলেবেলায় মায়ের মুখে শুনেছি এই নাম 'রবিঠাকুরের' নামের সঙ্গে, মায়ের মুখে শোনা তাঁর কবিতাবলীর সঙ্গে। এ নাম শুনলেই মনে হ'ত—

> "গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা;
> কূলে একা বসে' আছি, নাহি ভরসা।"

কিংবা—

> "ও-পারেতে বৃষ্টি এল, ঝাপসা গাছপালা;
> এ-পারেতে মেঘের মাথায় একশো মাণিক জ্বালা।"

বড় হয়ে যখন পরিচয় হয়েছে ঘনিষ্ঠ রবীন্দ্ররচনাবলীর সঙ্গে, তাঁর নানা লেখার মধ্যে পেয়েছি এই নাম, তখন থেকেই 'রবীন্দ্রনাথ' এবং 'শিলাইদহ' অবিচ্ছেদ্য হয়ে রয়েছে মনে।

সেই শিলাইদহ এত কাছে! দেখতে পাচ্ছি তার ঝাউগাছ এবং অপরাপর গাছের সারি; কিন্তু মাঝে "একা নদী বিশ ক্রোশ"। তখন ভরা বর্ষায় 'বিশ ক্রোশের' মতোই লাগত, একটা ছোটখাটো সমুদ্রের মতো। মাঝে বাড়ী-ঘর, গ্রাম, ধানের ক্ষেত, কিছুই ছিল না এখনকার মতো। বর্ষাশেষে জল সরে গিয়ে কাঁচি চর জেগে উঠত; এখনকার মতো উঁচু নয়, এমন শস্যশ্যামল নয়। শুধু ধূ ধূ করছে বালু-বিস্তার; চাপ চাপ মিহি বালু, উপরটা জমাট সরের মতো, চলতে গেলে মুড়মুড়িয়ে গুঁড়ো হয়ে যায়; মাঝে মাঝে অনেক দূর ধরে বেঁটে ঝাউয়ের ঝোপ, অপূর্ব্ব তার শোভা! সেই তরঙ্গায়িত বালুচরের উপর ঘুরে বেড়াই আর ঝাউ ঝোপের মধ্যে চলি এঁকেবেঁকে, পথ খুঁজে খুঁজে, আপন মনে পরম আনন্দে। হঠাৎ মুখ তুলতে চোখে পড়ে অনেক দূরে শিলাইদহের উন্নতশীর্ষ ঝাউগাছগুলি; আগের চেয়ে আরও ঝাপসা, স্বপ্নের মতো, যেন ডাকছে হাতছানি দিয়ে।

কিন্তু যাই কি করে? অচেনা দীর্ঘ পথ, সঙ্গী-সাথী যানবাহনের অভাব, দেহ ও মনের যত জড়তা ও আলস্য ভিড় করে পথ আগলে দাঁড়ায়। শিলাইদহের দিকে তাকিয়ে বলি, "এখনও আমার সময় হয়নি।"

২

সময় হ'ল দীর্ঘ পনর বছর পরে; ইংরেজী ১৯৪৬, বাংলা ১৩৫২ সালের ফাল্গুন মাসে, স্বাধীনতার এক বছর আগে। শিলাইদহের অধিবাসী, পাবনার উকীল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় সাদর আমন্ত্রণ জানালেন, তিনি ছুটিতে বাড়ী যাচ্ছেন, আমি তাঁর সঙ্গে গেলে তিনি পরম আপ্যায়িত হবেন। সঙ্গে যাবেন সোদরপ্রতিম শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র গুহ, উকীল, যাঁকে কাণ্ডারী করে আমি ছয় মাইল বালুচর এবং এক মাইল নদীর চেয়ে অনেক বড় বড় বাধা অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়েছি। এত বড় সুযোগ ছাড়া যায় না; কিন্তু সময় সঙ্কীর্ণ। ঠিক হ'ল, শেষরাত্রে রওনা হয়ে সকালে শিলাইদহ পৌঁছে, সন্ধ্যার আগেই সেখান থেকে রওনা হয়ে সন্ধ্যার পর আমি ও জগদীশ-বাবু পাবনা ফিরে আসব।

শেষরাত্রে উঠে তৈরী হয়ে আছি। জগদীশবাবু আসতেই বেরিয়ে পড়া গেল। সুষুপ্ত পুরীর নির্জ্জন পথে চলেছি আমরা দু'জন; পূব আকাশে জ্বল্ জ্বল্ করছে শুকতারা, শুক্লা চতুর্দ্দশীর চাঁদ তখনও দিগন্তে হেলে পড়ে

নি একেবারে। চারিদিক নিস্তব্ধ! মৃদু জ্যোৎস্নার মধ্য দিয়ে পৌঁছলাম সুরেনবাবুর বাড়ীতে। ডাকতেই সাড়া পাওয়া গেল। সুরেনবাবুর পরমাত্মীয় কবিশেখর শচীন্দ্র মোহন সরকার (উকীল) দরজা খুললেন, নিয়ে গেলেন দোতলায় তাঁর কবিকুঞ্জে।

এদিকে আমাদের কবিতীর্থের পাণ্ডা সুরেনবাবু তখন একতলার বারান্দায় উবু হয়ে বসে নিতান্ত অকবি-জনোচিত ভাবে শেষরাত্রের ছিলিমটুকু উপভোগ করতে ব্যস্ত। জগদীশবাবুর সবল কণ্ঠের প্রচণ্ড তাড়াতেও তাঁর কোনোও ভাবান্তর দেখা গেল না। ধীরেসুস্থে শেষ-টানটুকু দিয়ে মেয়েকে বললেন, হুঁকো-কলকে, তামাক-টিকে ইত্যাদি তাঁর থলেয় পুরে দিতে। তার পর সেই থলে নিয়ে 'দুর্গা' বলে পা বাড়ালেন, আমাদের 'যাত্রা হ'ল সুরু।'

৩

শহরের সীমানা প্রায় পেরিয়ে এসেছি। চাঁদের আলো আরও ম্লান হয়ে এসেছে। পূবদিকে ভোরের আলো ফুটি ফুটি করছে। দুই অলোয় জড়ান একটা মায়াময় পরিবেশের মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি। ঘুমভাঙা দুটো-একটা পাখী তখন থেকে থেকে ডেকে উঠছে নিদ্রা-জড়িতস্বরে। শহর ছাড়িয়ে চরে এসে পড়লাম। একটা অখণ্ড নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে চারিদিকে—স্থলে, জলে, আকাশে। যেন কোন্ বিরাট পুরুষ এই বিশাল চরে আসন পেতে ধ্যানে বসেছেন রাত্রিশেষে। ক্রমে ভোরের আলো আরও ফুটে উঠল, ভোরের বাতাসে শরীর-মন জুড়িয়ে গেল। আসন্ন সূর্য্যোদয়ের আভাস পূব আকাশে দেখা দিল, পশ্চিমে তখন চাঁদ ডুবু ডুবু। সুরেনবাবুর ইচ্ছা হ'ল আমাদের এক আকাশে অস্তমান চন্দ্র এবং উদয়োন্মুখ সূর্য্য দেখাবেন; এমন তিনি অনেকবার দেখেছেন এই পথে যেতে। আমরা উন্মুখ হয়ে রইলাম; কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে পূব আকাশটা ক্রমে মেঘলা হয়ে এল, সূর্য্যোদয় দেখা গেল না। চাঁদেরও আর অপেক্ষা করবার সময় ছিল না, সে ডুবে গেল। সুরেনবাবু অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হলেন। তাঁকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করে বললাম, চাঁদকে কিছু-ক্ষণ আগেও দেখেছি পশ্চিম আকাশে, পূব আকাশ ত রয়েইছে, উদীয়মান সূর্য্যও অনেক দেখা গেছে এর আগে, এখন কল্পনায় দুটো জুড়ে নিলেই তো ছবিটা সম্পূর্ণ হ'ল। কিন্তু সুরেনবাবুর মন এই 'কাল্পনিক' প্রবোধে প্রসন্ন হ'ল না।

সুরেনবাবু দুর্ব্বল মানুষ; তাঁর বোঝা ক্রমে ভারী হয়ে উঠল। উঠবার কথাও। কারণ, 'অনুসন্ধানে জানা গেল' তাঁর হুঁকো কলকে এবং কাপড়চোপড় ছাড়াও, পাড়াগাঁয়ে আমাদের আহারের আয়োজনের সব জিনিস পাওয়া যাবে না আশঙ্কা করে একটা মুদিখানার জিনিসই তিনি নিয়ে চলেছেন তাঁর থলিতে। যাইহোক, বন্ধুবর জগদীশচন্দ্র পরের বোঝা বইবেন বলে নিজের বোঝা নামিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। আমার বোঝা, সামান্য কাপড়-গামছা ইত্যাদি সমেত একটি ঝোলান ব্যাগ, ইতিপূর্ব্বেই তাঁর কণ্ঠলগ্ন হয়েছিল; এখন সুরেনবাবুর ঐ বিরাট থলেও তিনি ঝুলিয়ে নিলেন তাঁর লাঠির আগায়, লাঠি কাঁধে ফেলে। আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে পথ চলতে লাগলাম। পূবের সেই মেঘলা ভাবটা ক্রমশঃ সারা আকাশে ছড়িয়ে পড়ল এবং দক্ষিণ-পূব থেকে জোরে বাতাস বইতে লাগল, আমাদের পথ চলতে কোনোও কষ্ট হ'ল না। যাঁর স্থান দর্শন করতে চলেছি তাঁর গান মনে বাজতে লাগল,

"পান্থ তুমি পান্থজনের সখা হে,
পথে চলা সেই তো তোমায় পাওয়া।"

কিন্তু ছ'মাইল পথ কি কম পথ, বিশেষতঃ, খোলা চরের মধ্য দিয়ে? এখন চরে চাষ-আবাদ হয়েছে, চর উঁচু হয়ে মাঝে মাঝে গ্রাম বসেছে। একটা প্রকাণ্ড চক পেরিয়ে একখানা গ্রাম পাই, তার পরেই আবার প্রকাণ্ড একটা চক। এমনি তিনটে বিরাট চক এবং তিনখানা গ্রাম ছাড়িয়ে প্রায় নদীর কাছে এসে পড়লাম। কিন্তু কাছে এসেই মস্ত এক বাধা। বাধাটা একটা লম্বা খালের মতো, জলে ভরা, ডাইনে-বাঁয়ে চলে গিয়েছে আমাদের পথ আগলে। বাঁয়ে দূরে যেখানে শেষ হয়েছে সেখানটা দেখতে পাওয়া যায়; কিন্তু ডাইনে এঁকে বেঁকে কোথায় গিয়েছে তার ঠিকানা নেই। খালের নাম শুনলাম "সরস্বতীর থাপাল।" "পা"-টা এখানে নিতান্তই অনধিকার প্রবেশ করেছে; কিন্তু আমরা পা বাঁচিয়ে একে পার হই কি করে? বাঁদিক দিয়ে ঘুরে আবার এই পথে আসতে অনেক দেরি হয়ে যাবে; আবার সোজা গেলে জল ভাঙতে হবে। কতখানি জল কে জানে? এমন সময় ওপার থেকে একটা লোক পথ বেয়ে এসে জলে নামল এবং এপারে এসে উঠল। দেখা গেল জল তার হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত হ'ল। সুতরাং সাহস করে জলে নামাই স্থির হ'ল। মল্লকচ্ছ হয়ে, জুতো-লাঠি উঁচুতে তুলে ধরে জল পেরোতে লাগলাম। কিন্তু জলে পা দিয়েই দেখা গেল, সমস্ত চরটা বালুময় হলেও খালের তলাটায় বালি নেই; এক রকম আঠার মতো চিটকে কাদামাটি, তাতে পা দিলেই পা খানিকটা বসে গিয়ে

আটকে যায়, এক পা ছাড়িয়ে আবার আরেক পা ছাড়িয়ে চলতে হয়। এ অবস্থায় উরু-প্রমাণ জল ঠেলে, জুতো-লাঠি নিয়ে উর্দ্ধবাহু হয়ে চলতে ভারসাম্য বজায় রাখা খুবই কঠিন হচ্ছিল এবং প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে হচ্ছিল কাত হয়ে জলে পড়ে যাব। খালটা নেহাত কম চওড়া নয়। ওপারে গিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম; সঙ্গে সঙ্গেই মনে হ'ল আবার তো এই পথেই ফিরতে হবে!

খাল পার হওয়ার কিছু পরেই মাটির চেহারা বদলে গেল। ওদিকটা ছিল বালির সঙ্গে পলিমাটি মেশানো, এদিকে বালির ভাগই বেশী। ক্রমশঃ শুধু বালি আর ঝাউ-ঝোপ, পাবনার ওদিকটা আগে যেমন ছিল। ক্রমে নদী কাছে এল, বাতাস প্রবল হয়ে উঠল, বর্ষশেষের তপঃশীর্ণা পদ্মা দেখা দিল বালুকা-শয্যায় শুয়ে। জোর বাতাসে তার বুক হয়ে উঠেছে অশান্ত, ঢেউগুলো ছুটে এসে আছড়ে পড়ছে এপারে, হাওয়াতে জলের ছিটে উড়ছে, আকাশে মেঘলা ভাব আছেই। ওপারে শিলাইদহের ঘরবাড়ী স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। নদীতে নৌকো বড় বেশী নেই। ওপারে যেখান থেকে শিলাইদহের খেয়া-নৌকো ছাড়ে তার উল্টো দিকে আমরা বসে রইলাম, "পার করে নাও খেয়ার নেয়ে"। কিন্তু খেয়া-নৌকোর দেখা নেই। কিছুক্ষণ পরে এপারেই কিছু দূরে একটা লোক একটা ছোট নৌকো একেবারে ধার ঘেঁসে ঠেলে নিয়ে আসছে দেখে সুরেনবাবু তার দিকে এগোলেন, আমরা ওখানেই বসে রইলাম তাঁর ফেরার প্রতীক্ষায়। সুরেনবাবু চলেছেন জলের ধার দিয়ে; জগদীশচন্দ্র স্থির হয়ে বসে থাকবার লোক নন, তিনিও এই ফাঁকে উঠে গেলেন; আমি একা বসে অন্যমনে চেয়ে রইলাম পদ্মার দিকে। এত কাছে বসে এমন করে পদ্মাকে দেখি নি এর আগে। বিশেষতঃ এইখানে, যেখানে একদিন সে ছিল বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ কবির প্রিয়া, যেখানে একদিন দু'জনের নিবিড় মিলনে ছন্দিত হয়ে উঠেছিল কত গান, কত গাথা, সেখানে বসে ভুলে গেলাম দিনক্ষণ, মন চলে গেল সেই 'হেমন্তের দিনে' যেদিন 'গোধুলির শুভলগ্নে' পশ্চিমের অস্তমান সূর্য্যকে সাক্ষী করে তরুণ কবি "নতমুখী বধূসম শান্ত বাক্যহীন" এই পদ্মাকে প্রাণ সমর্পণ করেছিলেন। আমি যেখানে বসে আছি, "বালুকা-শয়ন পাতা নির্জ্জন এ-পারে" এখানেই হয়ত তিনি আসতেন 'সন্ধ্যাঅভিসারে', এখানেই হয়ত দু'জনের হ'ত সেই দ্বৈত-গান, "দুই তীরে কেহ যার পায় নি সন্ধান"। এ নদীকে আমি শুধু একটি জলপ্রবাহ মাত্র মনে করতে পারলাম না, কবিপ্রেমে মহিমময়ী এই নদীর কাছে সম্ভ্রমে মাথা নত করলাম।

জগদীশবাবুর ডাকে স্বপ্ন ভাঙল। সুরেনবাবু নৌকো পান নি; লোকটা তাঁকে বলেছে এই তুফানের মধ্যে ঐ ছোট নৌকো নিয়ে এই নদী পার হওয়া অসম্ভব এবং আরও জানিয়েছে যে, এ ঘাটের খেয়া উঠে গিয়েছে, ডান দিকে আধমাইলটাক গেলে খেয়া মিলবে। আমরা সেইদিকে চললাম।

খেয়াঘাটে বড় একটি খেয়া-নৌকো দেখা গেল; অনেক লোক উঠেছে তাতে। মনে হ'ল তখনি ছাড়বে। পড়ি-কি-মরি করে ছুটে গিয়ে উঠলাম, পদ্মার জলে পা ডুবিয়ে। কিন্তু নৌকো ছাড়ল না; খেয়ার মাঝি নৌকো থেকে নেমে পড়ল বিনা বাক্যব্যয়ে, হেলে দুলে তীরে গিয়ে উঠল। প্রথমটা মনে হ'ল ঘাটের কোনো কাজ সেরে নিতে ভুল হয়েছে, সেরে নিয়ে তখনি আসবে। কিন্তু সে চলেছে তো চলেইছে। তার ভাবে মনে হ'ল না এই খেয়া-নৌকোর সঙ্গে কিংবা এতগুলো আরোহীর সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক আছে। নৌকো থেকে ডাক উঠল, "মাঝি, ও মাঝি।" মাঝি কিন্তু ফিরেও চাইল না, ক্রমশঃ অনেকদূরে বাঁধা কতকগুলো জেলে-নৌকোর কাছে গিয়ে মিলিয়ে গেল। নৌকোর লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, বোধহয় মাছ আনতে গেছে। কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন তার দেখা পাওয়া গেল না, তখন সাব্যস্ত হ'ল যে নিজেরাই নৌকো বেয়ে নিয়ে যাওয়া হবে ওপারে এবং সেখানে গিয়ে খেয়াঘাটের ইজারা-দারকে তার এই অপূর্ব্ব ব্যবস্থার জন্য 'দেখে নেওয়া যাবে'। নৌকোর আরোহী বেশীর ভাগই চাষী, মজুর বা গ্রাম্য ব্যবসায়ী; তাদের মধ্যে বসে আমরা আমাদের স্বতন্ত্র সত্তা ভুলে গিয়ে খানিকক্ষণের জন্য একটা উদার সরলতার মধ্যে মুক্তি পেলাম। তাদের মধ্যে দু'জন সবল যুবা ধরেছে দাঁড়, একজন ধরেছে হাল। তাদের পেশীবহুল হাতের চালনায় পদ্মার প্রবল স্রোত, বাতাস এবং ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করে নৌকো পৌঁছল ওপারের খেয়াঘাটায়। খেয়ার ঠিকাদার এগিয়ে এল; মহা-কলরবে হ'ল তার সংবর্দ্ধনা। সুরেনবাবু স্পষ্টতঃই জানিয়ে দিলেন যে, এমনভাবে চললে তিনি এষ্টেটের ম্যানেজারকে জানিয়ে তার ঠিকেদারি ঘুচিয়ে দেবেন। সে কিন্তু নির্ব্বিকার; সুরেনবাবুর কাছে একটু মামুলি ক্ষমা চেয়ে ঘুরে ঘুরে পয়সা আদায় করতে লাগল। অবাক হয়ে দেখলাম, একটু আগে নৌকোয় বসে যারা তার মুণ্ডপাত করছিল তারা কেউ তাকে ফাঁকি দিল না। আমার মনে হ'ল এই নৌকোয় লোক তুলে মাঝির সরে পড়া এটা এদের পূর্ব্বপরিকল্পিত। নৌকোর লোকদের

নিজেদের গরজেই এ-পারে আসতে হবে নৌকো বেয়ে; ইজারাদার এবং মাঝি দু'পারে থেকে খবরদারি করবে এবং পয়সা আদায় করবে। না হলে ঐ একটি মাঝির সাধ্য কি এই এতবড় নৌকোখানা এই তরঙ্গের মধ্যে বার বার পদ্মা পার করে?

৪

নদীর খাড়া পাড় ভেঙে উপরে উঠলাম। সুরেনবাবু পথ দেখিয়ে চললেন পাড়ের উপর দিয়ে। অবশেষে শিলাইদহ এসে পৌঁছলাম।

"প্রবেশিনু নিজ গ্রামে,
কুমোরের বাড়ী দক্ষিণে ছাড়ি, রথতলা করি বামে,
রাখি হাটখোলা, নন্দীর গোলা, মন্দির করি পাছে।"

সুরেনবাবু সব দেখাতে লাগলেন। সবই আছে, কিংবা ছিল; তবে কবি যেভাবে পর পর উল্লেখ করেছেন সেভাবে হয়ত নেই। তাতে কিছু আসে যায় না; কারণ ভৌগোলিকের ভূগোল এবং কবির ভূগোল যে একই হতে হবে তার কোনো মানে নেই। ভৌগোলিকের ভূগোলের কালক্রমে পরিবর্ত্তন হতে পারে, কিন্তু কবির ভূগোল চিরন্তন ও শাশ্বত; সে হিসেবে কবির ভূগোল ভৌগোলিকের ভূগোলের চেয়ে সত্য।

ক্রমে এসে পড়লাম সেই ঝাউগাছগুলির কাছে, দীর্ঘ পনর বছর ধরে যারা আমাকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে। স্বপ্ন আজ সত্য হ'ল, শিলাইদহের মাটিতে দাঁড়িয়ে ধন্য হলাম। পথের ধারে কবি-পিতা মহর্ষিদেবের নামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়। তার পরে জমিদারের কাছারী-বাড়ী পেরিয়ে পথ ছেড়ে আমবাগানের মধ্য দিয়ে এসে পৌঁছলাম সুরেনবাবুর পল্লীভবনে। দরজার পাশেই চালার নীচে সুচিক্কণদেহা অলসনয়না কপিলা গাই বাঁধা। ভেতরে ঢুকে চোখ জুড়িয়ে গেল। পরিষ্কার করে নিকোনো উঠোনের ধারে, গৃহস্থের প্রয়োজনীয় শাক-সব্জীর সঙ্গে একপাশে ফুটে আছে রক্তগোলাপের ঝাড়। তকতকে ঝকঝকে উঁচু মাটির দাওয়ার উপর পুরু খড়ে ছাওয়া ঘরগুলির লীলায়িত ভঙ্গি অতি আধুনিক কংক্রীটের বাড়ীর আড়ষ্ট ঋজুতাকে লজ্জা দেয়। আশেপাশে তেমন বাড়ীঘর নেই; শুধু আছে আম, কাঁঠাল, বেল, সুপারি ইত্যাদি নানা গাছের বাগান। এই নিবিড় শ্যামলতার মধ্যে, এই অনাড়ম্বর গৃহশ্রীর পরিবেশে যেন "সুন্দরী জননী বঙ্গভূমি'কে ফিরে পেলাম; পদ্মাতীরের "স্নিগ্ধ সমীরে" জীবন জুড়িয়ে গেল।

সুরেনবাবু জলযোগের তাড়া দিতে লাগলেন। মুক্ত প্রান্তরে এবং নদীর হাওয়ায় এতক্ষণ থাকার পর আপত্তিও ছিল না বিশেষ। পাবনা থেকে আনা মুদী-খানার দ্রব্যসামগ্রী অপূর্ব্ব কৌশল ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে নানাবিধ রসনাতৃপ্তিকর খাদ্যসম্ভারে পরিণত হয়ে যথা-স্থানে পৌঁছল। বাল্যভোগ সমাধা করে বেরোন গেল গ্রাম-পরিক্রমায়। সুরেনবাবু পথপ্রদর্শক। প্রথমেই যাওয়া হ'ল সেই কাছারীবাড়ীতে। ঠাকুরদের আমলের পুরান কাছারীবাড়ী, তখন ভাগ্যকুলের কোনো জমি-দারের হাতে এসেছে জমিদারীর সঙ্গে। রাস্তার ধারে একসারি দোতলা পাকা দালান। ভিতরে প্রশস্ত প্রাঙ্গণের একপাশে একটি শৈবালসমাকুল মাঝারী পুকুর; তার পাড়ে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের ঘরবাড়ী। ম্যানেজার এখন এখানে থাকেন না; থাকেন কুঠিবাড়ীতে, যেখানে জমিদাররা থাকতেন। এখান থেকে সোজা চলে গেলাম সেই বাড়ীতে, গাছের সারির মধ্য দিয়ে পাকা পথ ধরে। ক্রমে ফুটে উঠল চোখের সামনে সেই বাড়ী, যা ছিল এতদিন শুধু বইয়ের পাতার ছবিতে, চোখে যা দেখার জন্য এতদিনের উদগ্র বাসনা আজ তৃপ্ত হ'ল। ফটক দিয়ে হাতায় ঢুকতেই সামনে পড়ে একটি মাঝারীগোছের দোতলা বাড়ী। মাটি থেকে মেঝে খুব উঁচু নয়, দেখতেও এমন অসাধারণ কিছু নয়; বিশেষত্বের মধ্যে দোতলার ঘরগুলির সামনের দিকের ঢাকা বারান্দাটি, গোল করে সামনের দিকে বাড়ানো, এবং দোতলার উপরে তেতলায় মাত্র একখানি ছোট ঘর, চারদিক খোলা, সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ।

বাড়ীতে ঢুকে বৈঠকখানায় বসলাম। এই ঘরে রবীন্দ্রনাথ বসতেন মনে করে একটা শিহরণ জাগল মনে। পুরান ঘর, পুরান কালের কিছু আসবাব। ঘরের একপাশে ছাদের নীচে অনেকখানি জায়গা জুড়ে শেওলা জমেছে, কতক পলস্তারা খসে পড়েছে—বোধহয় ছাদে বৃষ্টির জল জমে। আসবাবগুলি ছেঁড়া, ভাঙা, অযত্ন-রক্ষিত। সুরেনবাবু উপরে খবর পাঠালেন ম্যানেজারকে। খানিক বাদে অনুমতি এল উপরে যাবার। ভিতরে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে উপরে গেলাম। একটি বড় ঘরের মধ্য দিয়ে সামনের গোল বারান্দায় যেতে হ'ল, ম্যানেজার যেখানে বসে আছেন। ঘরটির মেঝের সিমেন্ট উঠে গেছে, উঠে গেছে খোয়া-সুরকি। সমস্ত মেঝেটা দেখতে হয়েছে যেন একটি চষা ক্ষেত। বারান্দায় ম্যানেজার বসে আছেন আরাম-কেদারায়; বাতের প্রকোপে চলৎশক্তি-রহিত হয়েছেন, অন্ততঃ তখনকার মতো। সামনে চেয়ে দেখলাম বাড়ীর হাতার বাইরে বিস্তীর্ণ প্রান্তর, অদূরে নদীর আভাসও পাওয়া যায়। মনে হ'ল এইখানে—হয়ত এই আরামচেয়ারে বসে—রবীন্দ্রনাথ চেয়ে থাকতেন

রৌদ্রালোকিত বা মেঘমেদুর বা জ্যোৎস্নাপ্লাবিত ঐ প্রান্তর এবং আকাশের দিকে। কল্পনায় এই ম্যানেজারের চেয়ারে তাঁকে বসিয়ে সমস্ত দেহমন সঙ্কুচিত হয়ে উঠল। উঠে একটু এদিক-ওদিক ঘুরে দেখলাম, বাড়ীর প্রশস্ত প্রাঙ্গণে—যা হয়ত এককালে নানা ফুলে সুশোভিত ছিল সেখানে—শোভা পাচ্ছে একরাশ বাঁধাকপি!

ম্যানেজারকে নমস্কার জানিয়ে নেমে এলাম। তেতলায় যে ঘরে রবীন্দ্রনাথ নিরালায় তাঁর অনেক লেখা লিখেছেন সেখানে যাবার অনুমতি পাই নি, চাইও নি। সেটি নাকি তখন ম্যানেজারবাবুর শয়নকক্ষ। বাড়ীর ডান দিকে, কিছু দূরে, বাঁধান ঘাটযুক্ত একটি সুন্দর পুষ্করিণী। বাড়ীর অন্দরমহল থেকে ঘাটে যাবার দরজা আছে, রাস্তা আছে; এখন সেই পথঘাট ম্যানেজারবাবুর বাসন মাজবার ঝি ব্যবহার করে। ঘাটের প্রশস্ত চাতালের দুই পাশে দুটি ঘনপল্লব বকুলগাছ শাখা-প্রশাখায় জড়াজড়ি করে একটি ছায়াভরা বৃক্ষবাটিকা রচনা করেছে; তার নীচে গিয়ে বসলাম আমরা দু' পাশের বাঁধান উপবেশনীতে। কত জ্যোৎস্নাপুলকিত, বকুলগন্ধে বিভোর বৈশাখী রজনীতে কবি-দম্পতি এসে বসেছেন এই ঘাটের চাতালে; কত নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে এর ছায়াশীতল বেদীতলে অঙ্গ লুটিয়ে দিয়ে শুনেছেন ঘুঘুর একটানা করুণ সুর। শুনলাম কবি-পত্নী শিলাইদহে এলে বোটে না থেকে এই বাড়ীতেই বেশী থাকতেন এবং এই ঘাটটি ছিল তাঁর প্রিয় স্থান। সংস্কারের অভাবে ঘাটটি জীর্ণ হয়ে গিয়েছে, আর বেশীদিন পুরণো স্মৃতিকে বহন করে এর দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা নেই। পুকুরের জলের ধারে ধারে জন্মেছে আগাছা; পাড়ের ঢালু জমিতে ফুটেছে নাম-না-জানা কত বন্য ফুল। পুকুরের পরে, বাড়ীর সীমানার বাইরে চলে গেছে খোলা মাঠ, নদীর দিকে।

পুকুর থেকে আবার বাড়ীর দিকে ফিরলাম। ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে শেষবারের মতো দেখে নিলাম আপন মহিমায় সমুন্নত নিঃসঙ্গ নির্জ্জন বাড়ীটিকে। অনেক দিনের বাসনার পরিতৃপ্তির সঙ্গে কেমন একটা অনির্দ্দিষ্ট বেদনার ছায়া ধীরে ধীরে ছেয়ে ফেলল মনটাকে। নিঃশ্বাস ফেলে ফিরে দাঁড়ালাম। ফটকের সামনে থেকে চলে গিয়েছে তরুবীথির মধ্যবর্ত্তী একটি পথ মুক্ত প্রান্তরের মধ্য দিয়ে। শুনলাম কবি এই পথ দিয়ে পায়ে হেঁটে বেড়াতেন সকালে-বিকেলে। কল্পনায় দেখলাম তাঁর দীর্ঘ ঋজুদেহ রাজমহিমায় এগিয়ে চলেছে ধীর পদক্ষেপে এই পথ দিয়ে, অনুভব করলাম তাঁর বিশাল চোখ দু'টির গভীর দৃষ্টি সমস্ত দেহে-মনে। স্বপ্নাকুলের মতো চললাম সেই পথ দিয়ে। কিছুদূর গিয়ে পথটি শেষ হয়েছে শিলাইদহ থেকে যে বাঁধান রাস্তা ঠাকুররা করে দিয়েছিলেন কুষ্টিয়ার অপরপারে কয়া পর্য্যন্ত, সেই পথে গিয়ে। আমরা সেই পথে খানিকটা এগিয়ে আবার ফিরে চললাম গ্রামের হাটখোলার দিকে।

খানিকটা খোলা মাঠ পার হয়ে গ্রামে ঢুকলাম। দু'পাশে জঙ্গল, পোড়ো বাড়ী, বা খালি ভিটে আর শুকন পুকুর। রাস্তাঘাট আর পোড়োবাড়ীর সংখ্যা থেকে মনে হয় জায়গাটি আগে বেশ সমৃদ্ধ ছিল। ক্রমে আমরা যেখানে এসে পৌঁছলাম তার একপাশে হাটখোলা, একপাশে গোপীনাথের মন্দির-প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের একধারে একটি বেশ বড় বাঁধান পুকুর; সামনে অনেকখানি খোলা জায়গা, একপাশে গোপীনাথের বাঁধান স্নানবেদী। এখন যদিও রথ হয় না, তবুও এইটিই "দুই বিঘে জমি"-র 'রথতলা' তাতে সন্দেহ নেই। এখান থেকে একটি রাস্তা চলে গেছে অন্যদিকে, তার প্রান্তে আছে "গুঞ্জাবাড়ী", যেখান পর্য্যন্ত রথ টেনে নেওয়া হ'ত এবং যেখানে গোপীনাথ বিশ্রাম করতেন, পুরীর 'গুণ্ডিচাবাড়ীর' মতো। এই 'রথের তলা'-তেই, এই স্নানবেদীর কাছে এখানকার বিখ্যাত 'স্নানযাত্রার মেলা' বসে। এখানেই তখন হর্ষোৎফুল্ল শিশুর মুখে "বাজে বাঁশী, পাতার বাঁশী আনন্দস্বরে"। এখানেই আবার "একটি রাঙা লাঠি" কিনবার একটি পয়সার অভাবে একটি ছেলের ক্রন্দনারুণ নয়ন দুটি হাজার লোকের মেলাটিকে করুণ করে তোলে।

ঠাকুরবাড়ীতে গেলাম। ঢুকতেই বেশ বড় এবং সুদৃশ্য একটি তোরণ; তার দুইপাশে পাকাঘরের সারি, কোনোটিতে বালিকা বিদ্যালয়, কোনোটিতে ইউনিয়ন বোর্ডের অফিস, কোনোটিতে বা ঠাকুরবাড়ীর আসবাব-পত্র ইত্যাদি। ভিতরের প্রাঙ্গণের একধারে দুটি জীর্ণ এবং পরিত্যক্ত মন্দির,—অপূর্ব্ব তাদের কারুকার্য্য। এই দুটি মন্দির থেকে কিছু খোদাই-করা ইটের অলঙ্কার বাইরের গেটের গায়ে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাতেই তার শোভা হয়েছে মনোরম। মন্দির দুটি দেখে আমার বড়ই ভাল লাগল। ভুবনেশ্বরের গৌরীকেদারে যে অপরূপ শিল্পসম্ভারসজ্জিত মন্দিরগুলি আছে, খানিকটা তাদেরই মতো। সেগুলো লাল পাথরের, কাজেই কালের কঠোর স্পর্শ সহ্য করে এখনও অনেকখানি টাটকা আছে; আর এগুলি লাল ইটের, এর মধ্যেই জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, শীঘ্রই হয় ত ধ্বসে যাবে একেবারে। প্রাচীন

মন্দির থেকে গোপীনাথকে সরিয়ে রাখা হয়েছে আধুনিক একটি সর্ব্বপ্রকার শিল্পশ্রীবর্জ্জিত দালানে। শুনলাম মূর্ত্তি অতি মনোহর; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মন্দির বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দেখতে পেলাম না। বারান্দায় একটি কাঠের কারুকার্য্যখচিত প্রাচীন সিংহাসন ছিল, সেটি দেখে চোখ জুড়োল। প্রাচীন বাংলার শিল্পকলার অপরূপ নিদর্শন এই আসনখানি। রথ যখন হ'ত, তখন রথের গায়ে যেসব কাঠের পুতুল লাগান হ'ত তার কিছু রাখা আছে একটি ভাঙা মন্দিরে।

মোটের উপর, এই মন্দির, এর সংলগ্ন জলাশয়, অদূরবর্ত্তী গুঞ্জাবাড়ী এবং এর সবকিছুতে উড়িষ্যার মন্দিরের প্রভাব বেশ একটু অনুভব করলাম। বিস্ময়ের সঙ্গে শুনলাম, এর প্রতিষ্ঠাতা নাকি শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে হত্যা দিয়ে পড়েছিলেন জগন্নাথকে না নিয়ে কিছুতেই দেশে ফিরবেন না; অবশেষে গোপীনাথকে প্রতিভূ দিয়ে জগন্নাথ রক্ষা পান।

এ মন্দিরের তোরণ পর্য্যন্ত নাকি রবীন্দ্রনাথ আসতেন। ভেতরের মূল মন্দিরের প্রাঙ্গণে না গিয়ে ভাঙা মন্দিরগুলিও দেখতেন। বোধ হয় তাদের মনোহর শিল্পকলাই তাঁর শিল্পী-মনকে আকৃষ্ট করত।

মন্দির থেকে বেরিয়ে চললাম পুকুরের পাড় ঘুরে 'খোরসেদ পীরের দরগা'-র দিকে। এই পথে শিলাইদহের সাহিত্যিক, "সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ"-রচয়িতা শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র অধিকারীর বাড়ী। ছাত্রজীবনে কুষ্টিয়ায় পরিচয় ছিল। শচীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে; দেখা হ'ল না।

খোরসেদ পীরের দরগা একটি নিভৃত স্থানে, গাছের ছায়ায় একটি বাঁধান বেদী। এটি একটি অতি পবিত্র স্থান, হিন্দু-মুসলমান সকলেরই উপাসিত। এই মুসলমান পীরই শিলাইদহের রক্ষা ও পালনকর্ত্তা; এঁর নামেই এই স্থানের আসল নাম 'খোরসেদপুর'। 'শিলাইদহ' বলে কোনো মৌজা নাকি কাগজপত্রে পাওয়া যায় না; 'শেলি' নামে কোনো নীলকর সাহেবের নামের সঙ্গে অদূরবর্ত্তী পদ্মার একটি 'দহ' যুক্ত হয়ে কুঠিবাড়ী, ডাকঘর ইত্যাদির পাড়াটির নাম হয় 'শেলিদহ' বা 'শিলাইদহ'।

খোরসেদ পীরের দরগাকে সেলাম জানিয়ে এগোতে লাগলাম বনের পথ দিয়ে। কিছুদূর গিয়েই একটি বিরাট গাছের নীচে দেখলাম একটি প্রাচীন 'কালীর আসন'। খুব জাগ্রত দেবী নাকি ইনি। এত কাছে পীরের দরগা এবং কালীর আসন দুটি বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ের কাছে সমান ভক্তি-শ্রদ্ধা পেয়ে এই নির্জ্জন বনভূমিতে নিজেদের সত্তা বজায় রেখেছে দেখে বিস্মিত হলাম। হয় ত দেশের আসল সংস্কার এইটেই; হানাহানির যে উন্মাদনা আসে মাঝে মাঝে তা নিতান্তই বাইরের জিনিস, রাজনৈতিক প্রয়োজনে তার সৃষ্টি।

মা-কালীকে প্রণাম করে আবার অগ্রসর হলাম। এবার পথ ছেড়ে এগোতে হ'ল বনের মধ্যের সুঁড়িপথ দিয়ে। কত বাঁশঝাড়, কত ঝোপ-ঝাপ পেরিয়ে এলাম "সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথের" সেই 'উমা বৈষ্ণবী'র পোড়ো ভিটেয়। তার কিছু আগে থেকেই পেলাম মনোরম তমাল গাছের সারি। এমন নয়ন-ভুলানো, কালো কুচকুচে, সবল সতেজ তমাল গাছ বৃন্দাবনেও দেখি নি। উমা বৈষ্ণবীর ভিটের পরেই একটি সরু অথচ গভীর খাল, এখন শুকনো। এককালে যখন কাছেই ছিল পদ্মার জলধারা, তখন এই খাল দিয়ে নাকি জল আসত গ্রামের সমস্ত পুকুরে। এখন নদী দূরে সরে গিয়েছে, ভরা বর্ষায় কিছু জল আসে। এই খালের ওপারেই সুরেনবাবুদের বাড়ী। স্বেচ্ছাপ্রবাহিনী পদ্মা যখন এখান দিয়ে বইত, তখন ওঁদের বাড়ীর কাছেই নাকি বাঁধা থাকত "বাবুমশায়ের" (অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের) বোট। ওঁরা ছেলের দল উকিঝুঁকি মারতেন, দেখতেন কবি বোটের ছাদে আরামকেদারায় বসে আছেন অথবা বোটের ভিতর চেয়ার-টেবিলে বসে কি লিখছেন। এগিয়ে গিয়ে দেখে এলাম সেই জায়গাটা। বোট বাঁধবার জায়গা পেলাম, উমা বৈষ্ণবীর বাড়ী পেলাম; কিন্তু সুরেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম "রেমণি" (বোধ হয় 'রাইমণির' অপভ্রংশ) বৈষ্ণবীর বাড়ী এ পাড়ায় নয়, দূরে। সুতরাং শচীন্দ্র অধিকারীর লেখামত দুই বৈষ্ণবীতে কলহ বাধাবার কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে হতাশ হলাম।

বাড়ী ফিরে এসে স্নানপর্ব্ব সমাধা করে ভূরিভোজন। বন্ধুবর জগদীশচন্দ্র সকালবেলার আহারের সময় খানিকটা বিনয় দেখিয়ে এ বেলা বিপদে পড়লেন। আমরা শহর থেকে এসেছি; সেই অনুসারেই আমাদের চাল নেওয়া হয়েছিল এবং সে চাল অত্যন্ত মিহি চাল। প্রচুর মুখ-রোচক ব্যঞ্জনের সহযোগে বন্ধুবরের পাতের ভাত নিমেষে অদৃশ্য হ'ল। 'রিজার্ভ' যা ছিল তাও সেই পথে গেল। বন্ধু আর মুখ ফুটে কিছু বলেন না; কিন্তু আমি তাঁর খাদ্যপরিমাণের সঙ্গে পরিচিত, বুঝলাম তাঁর অর্দ্ধেকও হয় নি। সুরেনবাবুকে বললাম, "মশায়, এ কাকে কি খেতে দিয়েছেন? এই মিহি চালের এইটুকু ভাত দিয়ে আপনি যে সুপ্ত সিংহকে জাগ্রত করেছেন তাকে সামলান এইবার!" সুরেনবাবু অপ্রতিভ, বাড়ীর লোক অপ্রস্তুত,

জগদীশবাবুর মুখে অসহায়, ক্ষীণ প্রতিবাদ। অবশেষে মোটা আউসের চালের ভাত দিয়ে তাঁর প্রদীপ্ত জঠরানলকে শান্ত করা হ'ল।

খাবার পর সুরেনবাবুদের বৈঠকখানা ঘরে বিশ্রাম। সুরেনবাবু বর্ণচোরা কবি, অগ্নিমান্দ্যের একটা শুষ্ক আবরণ দিয়ে ভিতরের কাব্যরস লুকিয়ে রাখেন। একখানা 'চয়নিকা' জোগাড় করে দিলেন; রবীন্দ্রনাথের স্থানে এসে রবীন্দ্র-কবিতা যেন আরও মধুর, আরও সরস লাগল। বন্ধুবর জগদীশচন্দ্রের নাসিকা-গর্জ্জনে তার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয় নি।

বেলা পড়ে এল, আর সময় নেই। সুরেনবাবুদের ছোট সংসার। তাঁর নিজের পরিবারের আর সবাই পাবনায় থাকেন: এখানে থাকে শুধু তাঁর ছেলে, পাবনার নামজাদা পালোয়ান, সুঠামদেহ সুদর্শন যুবক বাঁশী,—এখানে গ্রাম-সংগঠন নিয়ে আছে। আর থাকেন তাঁর ছোট ভাই এবং ভাই-বৌ। ভাইটি অতি অমায়িক, মাটির মানুষ। ভাই-বৌ তরুণী বধূ; নিজেকে সঙ্গোপনে রেখে নিঃশব্দে সারাদিন ধ'রে অতিথিদের তৃপ্তিবিধানে তার সকুণ্ঠ আগ্রহ আর নিরলস পরিশ্রম আমাদের হৃদয় স্পর্শ করেছিল। এদের দেখেই ত কবি বলেছেন, "মা বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে জল আসে ভরে।" বাড়ীর সবাই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করলেন আর অন্ততঃ একটি দিন থেকে যেতে: কিন্তু "নাই যে সময়, নাই নাই।"

৫

সুরেনবাবুর সঙ্গে বেরোলাম। এবার জগদীশবাবুর বোঝা একটি কম। আমি নিজেই একটি বোঝা, তাই আমার বোঝা থেকে তিনি এবারও আমাকে মুক্তি দিলেন। পদ্মাতীরে এসে দেখা গেল তেমনি জোর হাওয়া, নদী তেমনি তরঙ্গ-সমাকুল। দূরে খেয়া-নৌকা ছেড়েছে, ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করে এগোতে পারছে না বিশেষ। ওপারে পৌঁছে আবার ফিরে এসে আমাদের পার করে দিতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। "সরস্বতীর খাপালে"র কথা মনে করে শরীর কণ্টকিত হয়ে উঠল। এমন সময় ওপার থেকে একখানি জেলে-ডিঙি এসে আমাদের কাছেই কূলে লাগাল এবং তার থেকে নেমে এলেন দু'জন ভদ্রলোক। সুরেনবাবু দেখেই বললেন, "যাক, উপায় হয়েছে।" আগন্তুকদের মধ্যে একজন তাঁর সম্পর্কে কাকা, জমিদারের আমিন। জমিদারের এলাকায় জলের জেলে এবং মাঠের চাষার কাছে তাঁর হুকুম জমিদারের হুকুমের চেয়েও প্রবলতর। তিনি সব শুনে জেলেদের হুকুম করলেন, "বাবুদের এখনি ওপারে রেখে আয়।" বাস্, নিশ্চিন্ত! নমস্কারাদি শেষ করে জেলে-নৌকায় ঢেউয়ের মাথায় নাচতে নাচতে ওপারে পৌঁছান গেল; বেলা তখন অবসানপ্রায়। "সরস্বতীর খাপাল" মনে একটা বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে। দু'জনে নৌকা থেকে নেমে খুব জোরে হেঁটে চললাম, দিনের আলোতেই অন্ততঃ ও-বাধাটা যাতে পার হয়ে যেতে পারি। কিন্তু তখন খেয়াল ছিল না যে, এবার সুরেনবাবু সঙ্গে নেই এবং এই দিশাহারা চরের পথে সঙ্গে পথজানা লোক না থাকার যে বিপদ্ তারও খেয়াল ছিল না। খেয়াল হ'ল তখন, যখন দু'জনেই বুঝতে পারলাম যে, পরম নির্ভরের সঙ্গে ঠিক পথেই চলেছি এই বিশ্বাসের সঙ্গে অনেক পথ চলে, আসল পথ থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছি। "সরস্বতীর খাপাল" পেলাম বটে; কিন্তু সে আমাদের পথ থেকে অনেক দূরে এবং সেখানে খালটি এত চওড়া এবং গভীর যে পার হবার কোনো উপায় ছিল না, সাঁতার ছাড়া। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে এল। পাবনা থেকে বেরোবার সময় কবিশেখর সাবধান করে দিয়েছিলেন চরে ডাকাতের ভয় আছে এবং আসবার সময় সুরেনবাবু আমাদের ডাকাতের গাঁ-খানাও দেখিয়ে দিয়েছিলেন, খাল থেকে বেশী দূরে নয়। জগদীশবাবু তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে ডাইনে অনেক দূরে আমাদের পথ আবিষ্কার করলেন। মাঝে চষা জমি; কোথাও পায়ে-চলা পথ আছে, কোথাও নেই। মরিয়া হয়ে ছুটলাম দু'জন সেই চষা-ক্ষেতের ঢিলের উপর দিয়ে। যেমন করেই হউক, একটুখানি দিনের আলো থাকতে খাল পার হতেই হবে। রুদ্ধশ্বাসে, স্পন্দিত হৃৎপিণ্ডে খালের পাড়ে এসে যখন পৌঁছলাম তখন কালো ছায়া নেমে আসছে মাঠে, ঘাটে, জলে। দেরী না করে জলে নেমে পড়লাম। এবার একটু অভ্যস্তপদে অপেক্ষাকৃত কম সময়ে খাল পার হওয়া গেল। ওপারে গিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে চললাম দুই বন্ধু রাতের অন্ধকারে। পূর্ণিমার রাত, কিন্তু মেঘের জন্য জ্যোৎস্না ফুটছে না। খানিকটা এগোতেই এতক্ষণের ছুটোছুটির প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হ'ল। তৃষ্ণায় দু'জনের গলা কাঠ হয়ে গিয়েছে, আর লাগছে অসহ্য গরম। একটু জলের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠল। কোথায় জল পাই? মনে পড়ল, একটু আগে পথের ধারে জমিদারের একটি ছোট কাছারী আছে। এগিয়ে গিয়ে পথ থেকে নেমে সেখানে গেলাম। আমিনের নাম করতেই জমিদারের কর্ম্মচারী চেয়ার ছেড়ে উঠলেন,

কুয়ার জল আনিয়ে দিলেন, দু'জনে প্রাণভরে খেলাম সেই ঠাণ্ডা জল। ধন্য আমিন, ধন্য তোমার শক্তি!

জমিদারের কর্ম্মচারীকে ধন্যবাদ দিয়ে আবার এগোলাম দু'জনে। জনশূন্য বিরাট প্রান্তরের মধ্য দিয়ে চলেছি। মাঝে মাঝে দু'এক দল লোকের সঙ্গে দেখা হচ্ছে আলোছায়ার মধ্যে। মাঝে মাঝে দু'একটি গ্রামের দু'একটি বিচ্ছিন্ন কুটির থেকে মানুষের সাড়া পাচ্ছি।

শহরের কাছে এসে শুনতে পেলাম হরিসংকীর্ত্তন আর 'হোলি হ্যায়!' আজ দোল-পূর্ণিমা।

শহরের বিদ্যুতালোকিত পথে আমরা চলেছি। সর্ব্বাঙ্গে ধুলোবালি, রুক্ষ চুল বাতাসে উড়ছে। চোখের কোলে কালি, পা আর চলতে চায় না। মনে কিন্তু অপূর্ব্ব আনন্দ, তীর্থ-প্রত্যাগত যাত্রীর মতো ক্লান্ত, সার্থকতায় অন্তর পরিপূর্ণ। বাড়ীতে যখন পৌঁছলাম তখন রাত্রি আটটা।

(এই লেখাটির পরই বাংলা দেশ দু'ভাগ হয়েছে, শিলাইদহ পূর্ব্ব-পাকিস্তানে পড়েছে। শুনতে পাই, পাকিস্তান সরকার কুঠিবাড়ীর সংস্কার ও তাতে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি-সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। সেরূপ হয়ে থাকলে তাঁরা দেশ ও জাতি নির্বিশেষে রবীন্দ্র-অনুরাগীমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।)

দর্পণে

শ্রীকালিদাস রায়

দর্পণে দেখি না মুখ, সর্ব দর্প করে সে হরণ
জরাজাল স্মরায় মরণ।
ধনীদের বৈঠকখানায়,
বড় বড় বিপণির দেওয়ালের গায়
বিরাজে দর্পণ যত গৃহসজ্জা লাগি
সারা দেহটার ছবি অকস্মাৎ উঠে তায় জাগি।
চমকিয়া উঠি, যেন প্রেতমূর্তি দেখি
চক্ষু বুজি, ভাবি তায়,—একী—
সেই দেহ, যে দেহে একদা সাজি বর
বিবাহে চলিয়াছিনু পরিয়া টোপর!
চূর্ণ হয় সব অভিমান,
সব ক্ষোভ পায় অবসান।
কেন অনাদর
করে এত তরুণেরা, পাই তার যথার্থ উত্তর।
বীভৎস যা আপনারি চোখে,
তাহারে বাসিবে ভাল কেন অন্য লোকে?

পদ্মবন ধ্বস্ত করে করী সরোবরে
কার চিত্ত মুগ্ধ তাহা করে?
সে দৃশ্যে আনন্দ কেবা পায়?
চক্ষু মুদি দর্শকেরা করে হায় হায়।
ভগ্ন জীর্ণ দেবতামন্দির
অনাদৃত। সেথা কভু ভক্তগণ করেনাক ভিড়।
মনের মাধুরী দিয়া অসুন্দরে বানাতে সুন্দর
পারে শুধু শিল্পী-কবি, অন্যে কেন করিবে আদর
মৃত্যু ছাড়া কারো ভাল লাগিবার নয়
এ দেহ, এ মনে তাতে রহে না সংশয়।
মহাপথ যাত্রিবেশ মোর আত্মা করেছে ধারণ
চিনিতে পারে না তাই পুরাতন বান্ধব-স্বজন।
এই দেহ লুকাবার, দেখাবার নয় ত সভায়
সংসারেও শোভা নাহি পায়।
তাই বুঝি বিবেচক স্থবিরেরা থাকে লুকাইয়া
সমাজ সংসার ছাড়ি দূরতীর্থে গিয়া।

রামানুজমতে সাধন

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

কর্ম

বদ্ধ জীব দুই শ্রেণীর : বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু। বুভুক্ষু জীব সকাম কর্মে রত হয়ে বারংবার জন্মজন্মান্তর ভাগী হয়, মুক্তি তার নিকট সুদূরপরাহত। মুমুক্ষু জীব নিষ্কামকর্মকারী, এবং সাধন মার্গাবলম্বন করে সে মোক্ষাধিকারী হয়।

অন্যান্য বৈদান্তিকদের ন্যায়, রামানুজের মতেও, কর্ম মুক্তির সাক্ষাৎ উপায় নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও, কর্মই মুক্তি মার্গের প্রথম সোপান। কারণ, চিত্তশুদ্ধি মুক্তিলাভের অবশ্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ, এবং এই চিত্তশুদ্ধি লাভের উপায় হল নিষ্কাম-কর্ম-সাধন। সেজন্য মুমুক্ষু একদিকে সকাম কর্ম, অন্যদিকে অলস জীবন সমভাবে পরিত্যাগ করে, শাস্ত্রোপদিষ্ট নিত্য (স্নান, আচমন প্রভৃতি)ও নৈমিত্তিক (শ্রাদ্ধ প্রভৃতি) কর্ম, যাগযজ্ঞাদি, ও আশ্রমবিহিত কর্ম সম্পূর্ণ নিষ্কাম ভাবে সাধন করেন। ফলে, তাঁর চিত্তশুদ্ধি হয়, এবং একমাত্র শুদ্ধচিত্তেই জ্ঞানভক্তিরূপ সাক্ষাৎ মোক্ষোপায়ে উদয় হতে পারে। সুতরাং এরূপ নিষ্কাম কর্ম জ্ঞানবিরোধী ত নয়ই, উপরন্তু জ্ঞানসহায়ক—একমাত্র সকাম কর্মই জ্ঞানবিরোধী। তাঁর "শ্রীভাষ্যে" জ্ঞান ও ভক্তির সঙ্গে কর্মের প্রকৃত সম্বন্ধ নিরূপণ করে, রামানুজ ১-১-১ ভাষ্যে বলছেন—

"এবং নিয়মযুক্তস্যাশ্রমবিহিত কর্মানুষ্ঠানেনৈব বিদ্যা-নিষ্পত্তিঃ।"

"তদেবং ব্রহ্মপ্রাপ্তি-সাধনভূতং জ্ঞানং সর্বাশ্রম-ধর্মাপেক্ষম্।"

"জ্ঞানবিরোধি চ কর্ম পুণ্য-পাপরূপম্। ব্রহ্ম-জ্ঞানোৎপত্তি-বিরোধিত্বেনানিষ্ট-ফলতয়া উভয়োরপি পাপ শব্দাভিধেয়ত্বম্।...অতশ্চ জ্ঞানোৎপত্তয়ে পাপং কর্ম নিরসনীয়ম্। তন্নিরসং চ অনভিসংহিত-ফলেনানুষ্ঠিতেন ধর্মেণ।"

"এবংরূপয়ো ধ্রুবানুস্মৃতেঃ সাধনানি যজ্ঞাদীনি কর্মাণি।"

"যদ্যপি বিবিদিষন্তী যজ্ঞাদয়ো বিবিদিষোৎপত্তৌ বিনিযুজ্যন্তে, তথাপি তস্যৈব বেদনস্য জ্ঞানরূপস্যাহরহর-নুষ্ঠীয়মানস্যাভ্যাসাধেয়াতি শায়স্যাপ্রয়াণাদনুবর্তমানস্য ব্রহ্ম প্রাপ্তি সাধনত্বাৎ তদুৎপত্তয়ে সর্বাণ্যাশ্রম কর্মানি যাবজ্জীব-মনুষ্ঠেয়ানি।"

অর্থাৎ, নিষ্কাম ভাবে, নিয়মানুসারে, আশ্রম-কর্মাদি সাধনদ্বারাই বিদ্যার উৎপত্তি হয়।

ব্রহ্ম প্রাপ্তির সাধন স্বরূপ যে জ্ঞান, তা নিষ্কাম ভাবে আশ্রমধর্ম পালনের উপরই নির্ভর করে।

পুণ্য ও পাপকর্ম, বা সকাম কর্মই জ্ঞান-বিরোধী—সেজন্য প্রকৃতপক্ষে অনিষ্টজনক বলে উভয়েই পাপ-শব্দবাচ্য। সেজন্য যাতে জ্ঞানোৎপত্তি হতে পারে, তজ্জন্য পাপকর্ম পরিত্যাগ করতে হবে। নিষ্কাম কর্ম বা ধর্ম দ্বারাই এরূপ সকাম পাপকর্ম বিদূরিত হতে পারে।

ধ্যান বা ভক্তির সাধন যজ্ঞাদি প্রমুখ নিষ্কাম কর্ম।

এরূপ নিষ্কাম কর্ম কেবল জ্ঞান ও ধ্যান লাভের ইচ্ছাই সৃষ্টি করে না, জ্ঞান ও ধ্যানেরও উৎপত্তি করে। সেজন্য আজীবন জ্ঞান ও ধ্যান প্রয়োজন বলে, নিষ্কাম ভাবে আশ্রমকর্ম সাধনও সমভাবে আজীবন অত্যাবশ্যক।

এরূপে, রামানুজের মতে, মোক্ষের সাক্ষাৎ সাধন জ্ঞান ও ধ্যানের সঙ্গে নিষ্কাম কর্মের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এরূপ নিষ্কাম কর্মের কার্য তিনটি—(১) চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন করা, (২) শুদ্ধচিত্তে জ্ঞান ও ধ্যানের জন্য আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করা, (৩) স্বয়ং জ্ঞান ও ধ্যানের উৎপত্তির পথে সহায় হওয়া।

সাধারণ ভাবে নিষ্কাম কর্মের উল্লেখ ব্যতীতও রামানুজ সাতটি প্রধান নিষ্কাম কর্মের বিষয় তাঁর "শ্রীভাষ্যে" বলেছেন (১-১-১,), যথা : বিবেক, বিমোক, অভ্যাস, ক্রিয়া, কল্যাণ, অনবসাদ ও অনুদ্ধর্ষ। অশুদ্ধ পানাহার বর্জন 'বিবেক'। আসক্তিহীনতা 'বিমোক'। দুঃসাধ্য সাধনের জন্য পুনঃ পুনঃ অভ্যাস, এবং কোনো শুভ বিষয় অবলম্বনে পুনঃ পুনঃ চিত্তসমাবেশ 'অভ্যাস'। পঞ্চ-মহাযজ্ঞানুষ্ঠান 'ক্রিয়া'। নৃযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ ও ব্রহ্মযজ্ঞ এই পঞ্চ-মহাযজ্ঞ। সাধারণ ভাবে ও সংক্ষেপে বলতে গেলে, এদের অর্থ হ'ল, যথাক্রমে, নরনারায়ণ-সেবা, পিতৃপুরুষদের তর্পণ, সর্ব-জীবের সেবা, দেবারাধনা ও বেদপাঠ। সত্য, আর্জব বা সরলতা, দয়া, দান, অহিংসা ও অনভিধ্যা বা পরদ্রব্যে নির্লোভতার সমাহার 'কল্যাণ'। মানসিক দৈন্য, দৌর্বল্য ও অবসাদের অভাব, অথবা মানসিক বল, উৎসাহ ও প্রফুল্লতা 'অবসাদ'। অতিসন্তোষের অভাব; অথবা একদিকে মানসিক দুর্বলতা ও অসন্তোষ, অন্যদিকে অতিপ্রত্যয় ও অতিসন্তোষ, এই উভয় চরম অবস্থা বর্জন করে' মধ্যম পন্থা অবলম্বন।

"যতীন্দ্র-মত-দীপিকা"য় অবশ্য দ্বিবিধা ভক্তির উল্লেখ

আছে—সাধনভক্তি ও ফলভক্তি—"উক্তসাধনজন্যা সাধন-ভক্তিঃ, ফলভক্তিস্ত্বীশ্বরকৃপাজন্যা।"

অর্থাৎ, সাধনভক্তি সপ্তসাধনোদ্ভূত, ফলভক্তি ঈশ্বর-প্রসাদোদ্ভূত। কিন্তু "শ্রীভাষ্যে" যেরূপ পরিষ্কার ভাবে আছে যে, ভক্তি সপ্তসাধন প্রমুখ নিষ্কাম কর্মেরই মুখাপেক্ষী তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, রামানুজের মতে, কেবল অহেতুক কৃপাদ্বারা ভক্তিলাভ হতে পারে না। সেজন্য এই শেষোক্ত ভক্তি প্রপত্তিরই অঙ্গ, এবং "যতীন্দ্র-মত-দীপিকা"তেও ভক্তি ও প্রপত্তির একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, প্রথম প্রকারের ভক্তিতে মুমুক্ষুর স্বতন্ত্র প্রচেষ্টা বেশী, দ্বিতীয় প্রকারে কম—এইমাত্র প্রভেদ।

জ্ঞান

এই ভাবে, নিষ্কাম কর্ম-সাধন দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হলে, এবং ব্রহ্মজ্ঞানের ইচ্ছা জাগ্রত হলে, মুমুক্ষু তত্ত্বজিজ্ঞাসু হয়ে, সদ্‌গুরুর নিকট থেকে শাস্ত্রশ্রবণ বা শাস্ত্রাধ্যায়ন করে, 'মনের' দ্বারা, স্বীয় বিচারবুদ্ধি অনুসারেও তা গ্রহণ করে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। কিন্তু জ্ঞানকে মুক্তির ধ্যান বা ভক্তিরূপে গ্রহণ করলেও, রামানুজ ভক্তিবাদী শঙ্করের ন্যায় শুদ্ধজ্ঞানবাদী নন। তাঁর মতে, কেবল জ্ঞানে মুক্তি নেই, ভক্তি বা ধ্যানও অত্যাবশ্যক। বস্তুতঃ, জ্ঞান ও ধ্যান অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে আবদ্ধ—জ্ঞানের চরমোৎকর্ষ ধ্যান, ধ্যানের প্রারম্ভ বা মূল জ্ঞান—কেবল শুদ্ধ জ্ঞানে নয়, কেবল জ্ঞানবিহীন ধ্যানে নয়, কিন্তু জ্ঞানমূলক ধ্যানের মাধ্যমেই হতে পারে মানব-জীবনের পরমা সিদ্ধি লাভ।

রামানুজের মতে "ভক্তি" শব্দের অর্থ 'ধ্যান'। 'ধ্যানের' একটি সুন্দর সংজ্ঞা দিয়ে তিনি "শ্রীভাষ্যে" (১-১-১) বলছেন—

"ধ্যানং চ তৈলধারাবদবিচ্ছিন্ন-স্মৃতি-সন্তানরূপা ধ্রুবা স্মৃতিঃ।...সা চ স্মৃতির্দর্শন-সমানাকার।"

"সেয়ং-স্মৃতি দর্শনরূপা প্রতিপাদিতা দর্শনরূপতা চ প্রত্যক্ষতাপত্তি।"

অর্থাৎ, ধ্যান তৈলাধারের ন্যায় অবিচ্ছিন্না, স্মৃতি-প্রবাহময়ী ধ্রুবা বা স্থিরা স্মৃতি। অথবা, একই বিষয়ে অনন্যচিত্তে, ক্রমাগত, বিরামবিহীন ভাবে, নিরন্তর স্মরণ বা চিন্তা করার নাম হল 'ধ্যান'।

এরূপ 'ধ্যান' প্রত্যক্ষ জ্ঞানের তুল্য। অথবা, এই ভাবে ধ্যানের দ্বারা ধ্যাতা ধ্যেয় বস্তুটিকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ বা দর্শন করেন—এরই দার্শনিক নাম 'সাক্ষাৎকার'।

বস্তুতঃ, রামানুজের মতে, জ্ঞান, বিদ্যা, বেদন, ধ্যান, উপাসনা, ভক্তি প্রভৃতি শব্দ সমার্থক। সাধারণতঃ, ভক্তিবাদ অনুসারে, আমরা বলে থাকি যে, পরমেশ্বরের বিষয়ে আমাদের 'জ্ঞান' লাভ হলে, আমাদের মনে স্বতঃই সেই মহান্ পুরুষের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি ও শ্রদ্ধার উদ্রেক হয় এবং সেই মানসিক ভাবকেই বলা হয় 'ভক্তি'। পুনরায়, এই 'ভক্তি' থেকে তাঁকে নিরন্তর 'ধ্যান' বা 'উপাসনা' করবারও প্রবৃত্তি জাগে। এরূপে, সাধারণতঃ, 'জ্ঞান', 'ভক্তি' ও 'ধ্যান'কে সাধন মার্গের একটির পর একটি বিভিন্ন স্তর বলেই গ্রহণ করা হয়। কিন্তু, এই সাধারণ তত্ত্বটিকে স্বীকার করে নিয়েও, রামানুজ পুনরায় এই তিনটির অতি নিকট অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ পরিস্ফুট করবার জন্য এদের সমার্থক বলেও গ্রহণ করেছেন। সেজন্য 'শ্রীভাষ্যে' (১-১-১) তিনি বলছেন—

"এবংরূপা ধ্রুবানুস্মৃতিরেব ভক্তিশব্দেনাভিধীয়তে, উপাসনপর্যায়ত্বাদ্ভক্তিশব্দস্য"।

অর্থাৎ, এরূপ ধ্রুবানুস্মৃতি বা স্থির স্মরণই বা 'ধ্যান'ই 'ভক্তি' এবং 'ভক্তি' 'উপাসনা'রই নামান্তর মাত্র।

এরূপে, ব্রহ্মের স্বরূপ ও গুণাবলীর সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করে। মুমুক্ষু ধ্যান বা উপাসনায় রত হন এবং ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করে, মোক্ষাস্বাদে ধন্য হন।

প্রপত্তি

নিম্বার্কের ন্যায়, রামানুজও প্রপত্তিকে মোক্ষের স্বতন্ত্র সাধন রূপে গ্রহণ করেছেন। এসম্বন্ধে, নিম্বার্কের সঙ্গে তিনি একমত।

রামানুজ তাঁর "গদ্যত্রয়" নামক গ্রন্থে কেবলমাত্র প্রপত্তি সাধনের বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন। অতি সুন্দর ভাবে, তিনি শরণাপপত্তির মন্ত্রোচ্চারণ করে বলছেন—

"অপার-কারুণ্য-সৌশীল্য-বাৎসল্যৌদার্যৈশ্বর্যসৌন্দর্য-মহোদধে, শ্রীমন্-নারায়ণ-অশরণ্য-শরণ্য! তৎ পদারবিন্দ-যুগলং শরণমহং প্রপদ্যে।"

"নানাবিধানন্তাপচারান্ আরব্ধকার্যান্, অনারব্ধ-কার্যান্ কৃতান্ ক্রিয়মাণান্ করিষ্যমাণাংশ্চ সর্বান্ অশেষতঃ ক্ষমস্ব।"

"দাসভূতঃ শরণাগতোঽস্মি তবাস্মি দাস—ইতি বক্তারং মাং তারয়।"

অর্থাৎ, হে পরম করুণাময়, আমি তোমার পাদপদ্মে শরণ নিলাম। তুমি আমার সমস্ত পাপ, সমস্ত সকাম কর্ম মার্জনা কর। তোমার দাস আমি শরণাগত—আমাকে উদ্ধার কর।

"যতীন্দ্র-মত-দীপিকা"য় প্রপত্তির দুটি অঙ্গের উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থের মতে প্রপন্ন দ্বিবিধ—একান্তী ও পরমৈকান্তী। যিনি মোক্ষের সঙ্গে সঙ্গে অন্য ফলও ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন, তিনি একান্তী।

ন জ্ঞান ও ভক্তি ব্যতীত অন্য কোনো ফল প্রার্থনা করেন না, তিনি পরমৈকান্তী। পরমৈকান্তীও দ্বিবিধ— দৃপ্ত ও আর্ত। যিনি দেহপাত পর্যন্ত মুক্তির জন্য অপেক্ষা করতে প্রস্তুত, তিনি দৃপ্ত। যিনি প্রপত্তির পরমুহূর্তেই মোক্ষকামী, তিনি আর্ত।

প্রপত্তি সাধন সম্পর্কে শ্রীসম্প্রদায়ে দুটি বিভিন্ন মতবাদ দৃষ্ট হয়। রামানুজ সম্প্রদায়ভুক্ত উত্তরদেশীয় বড়গলৈ সম্প্রদায়ের মতে, প্রপত্তিতে মুমুক্ষুর স্বীয় প্রচেষ্টাও অত্যাবশ্যক। এই মতবাদ "মর্কট-ন্যায়" নামে সুপরিচিত। অর্থাৎ, মর্কট-শিশুকে মর্কট-মাতা একস্থান থেকে অন্যত্র বহন করে নিয়ে যায়, সত্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও, মর্কট-শিশুকে স্বপ্রচেষ্টায় মাতার বক্ষোলগ্ন হয়ে থাকতে হয়। একই ভাবে, ভগবৎ-প্রপন্ন জীব সর্বতো-ভাবে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হলে, তিনি অবশ্যই তাঁর উদ্ধার সাধন করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, জীবের নিজের প্রচেষ্টারও প্রয়োজন, অর্থাৎ, নিজের কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির দ্বারা তাকে পরমেশ্বরের তুষ্টি সম্পাদন করতে হয়।

কিন্তু দক্ষিণদেশীয় তেঙ্গলৈ সম্প্রদায়ের মতে, প্রপত্তিতে জীবের স্বীয় প্রচেষ্টার আবশ্যক নেই। এই মতবাদ "মার্জার-ন্যায়" নামে খ্যাত। অর্থাৎ, মার্জার-শিশুকে মার্জার-মাতা যখন একস্থান থেকে অন্যত্র বহন করে নিয়ে যায়, তখন সেই শাবকটির দিক থেকে কোনো স্বতন্ত্র প্রচেষ্টার বিন্দুমাত্রও প্রয়োজনীয়তা থাকে না। একই ভাবে, মুমুক্ষু ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করলেই তার সব কর্তব্য করা হয়, আর অন্য কোনো সাধনের আবশ্যকতা নেই।

গুরূপসত্তি

রামানুজ সম্প্রদায় গুরূপসত্তি-সাধনও স্বীকার করেন। যেমন, "অর্থপঞ্চকে" "আচার্যাভিমানযোগ" নামক সাধনের উল্লেখ আছে।

"গুরূপসত্তির" অর্থ হ'ল গুরুতে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-নিবেদন। যাঁরা ঈশ্বরে পর্যন্ত সাক্ষাৎ ভাবে আত্মসমর্পণ করতে পারেন না, তাঁরা ঈশ্বরের মূর্ত প্রতিচ্ছবি গুরুর শ্রীপাদপদ্মেই তা' করেন; এবং গুরুই তাঁদের ঈশ্বর-সমীপে উপনীত করেন এবং মোক্ষলাভ করিয়ে দেন।

এই ভাবে, বিভিন্ন মুমুক্ষু শক্তি ও ইচ্ছা অনুসারে বিভিন্ন সাধন মার্গ অবলম্বন করতে পারেন। এই ভাবে, সকলের জন্যই উপযুক্ত ব্যবস্থা করে রামানুজ তাঁর অন্তর্নিহিত উদারতার পরিচয় দিয়েছেন।

অভিজ্ঞান

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

কত ভোলা-গানের যে সুর আমার কানে আসে রে,
কত প্রিয়-মুখের আদল আমার প্রাণে ভাসে রে।
কত চেনা কণ্ঠ সাড়া,
করে আমায় আত্মহারা,
জীবন জীবন জোগানে ধন কেনা ভাল বাসে রে!

২

যুগের পরে যুগ চলে যায়, যায় রেখে যায় অনেকই,
স্নেহ প্রেমের মুক্তা মণি শেস করা যায় গণে কি?
নিবিড় গভীর প্রীতি যা পাই
এক জনমে ফুরায় কি ভাই?
দাগ রাখে না জাতিস্মর এই মানব মনের কোণে কি?

৩

সাত জনমের নয়ন জলই ঝরছে আমার আঁখিতে,
শত জনম শোনা গানই গাইছে বনের পাখীতে।
সুদূর সুখ ও দুঃখ যে হায়—
বুকে দেখা দিয়েই পালায়
পাঁজের দাগে আসে ও যায় হয় না তাদের ডাকিতে।

৪

এই যে ছোট মানব হৃদয় অপূর্ব্ব দান বিধাতার,
বিশ্বরূপের বিশাল ছায়া পড়ছে তাতে অনিবার।
ক্ষুদ্র যেমন তেমনি বড়
মহৎ হতে মহত্তরও,
বিন্দুতে তার উ কি মারে প্রেমামৃতের পারাবার।

চক্রবৎ

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

নাট্যোল্লিখিত চরিত্র

পুরুষ

বিমান চৌধুরী—প্রসিদ্ধ জমিদার নরহরি চৌধুরীর একমাত্র বংশধর।

হরিহর—ঐ পুরাতন ভৃত্য।

শিব রায়—ঐ ভূতপূর্ব্ব নায়েব।

গণেশ রায়—ঐ পুত্র

রামেশ্বর—প্রখ্যাত লেখক 'নীলকণ্ঠ' (ছদ্মবেশী বিমান চৌধুরী)

সনাতন গাঙ্গুলী—বিমানের বসতবাটী ক্রয়েচ্ছুক জনৈক ধনী ব্যক্তি।

কেষ্টধন—দালাল।

দুলাল সেন—বিমানের প্রতিবেশী।

স্ত্রী

বিজয়া—বিমানের স্ত্রী।

শৈল—দুলাল সেনের স্ত্রী।

প্রথম দৃশ্য

(চৌধুরীদের শেষ বংশধর বিমান চৌধুরীর লাইব্রেরী ঘর। বিমান একমনে বসে লিখছে। স্ত্রী বিজয়া এসে উপস্থিত হ'ল। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে স্বামীর মুখের পানে চেয়ে থেকে এক সময় বিরক্ত হয়ে উঠল।)

বিজয়া। একটা লোক যে এতক্ষণ ধরে ঘরে এসে দাঁড়িয়ে আছে তাও কি তোমার হুঁশ নেই?

বিমান। বিরক্ত কর না—যাও।

(এগিয়ে এসে হাতের কলম চেপে ধরল বিজয়া)

বিমান। কি ছেলেমানুষী করছ বিজয়া! দেখতে পাচ্ছ আমি লিখছি আর এই সময় তুমি এলে আমাকে বিরক্ত করতে।

বিজয়া। উপায় থাকলে তোমাকে বিরক্ত করতে আসতাম না।

(একটু নড়ে ঠিক হয়ে বসে)

বিমান। কি বলবে বল। আমি প্রস্তুত।

বিজয়া। তোমার ঘুম ভাঙবে কবে তাই জিজ্ঞেস করছি। সংসার যে সত্যিই এবারে অচল হয়ে পড়বে।

বিমান। এ আর নতুন কি শোনালে বিজয়া? লোকজন নেই...নায়েব-গোমস্তা নেই। আত্মীয়-পরিজনের ভিড় নেই। কেউ কোথাও ব্যস্ত হয়ে ছুটাছুটি করছে না। আছ তুমি, আছি আমি, আর আছে ঐ হতভাগা হরিহর। মাইনে পায় না তবু পড়ে আছে। ও কি, তুমি হাসছ? এটা কি তোমার কাছে হাসির কথা হ'ল বিজু!

বিজয়া। তোমার রকম দেখে না হেসে পারি নে বাপু।

বিমান। কিন্তু আমি হাসতে পারি না। ভয় পাই।

বিজয়া। খুব চালাকি শিখেছ। আমার কথাটাই ঘুরিয়ে বলা হ'ল।

বিমান। বোকা লোকগুলো সব সময়ই ধরা পড়ে যায় বিজু। আচ্ছা বল—তোমার কথা আজ আমি শুনব।

বিজয়া। বলছিলাম কি...মানে, যদি সবটা না পার অন্ততঃ কিছু ছেড়ে দিয়ে চল এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যাই। আমি আর এখানে টিকতে পারছি না।

বিমান। (উত্তেজিত কণ্ঠে) তুমি কি ক্ষেপেছ বিজয়া। পিতৃপুরুষের ভিটে বিক্রি করব? বিশ্বাস করে ঠকেছি—তার সান্ত্বনা আছে কিন্তু টাকার জন্য গৌরব আর সম্মান খোয়াতে আমি রাজি নই। না বিজু, এ অনুরোধ তুমি কোনো দিন আর করো না। আমার এই সামান্য সম্বলটুকু কেড়ে নেবার চেষ্টা তুমি করো না।

বিজয়া। তোমাকে দুঃখ দিতে আমি চাই না, কিন্তু বিশ্বাস কর, এ ছাড়া অন্য কোন সহজ পথ আমার চোখে পড়ছে না।

বিমান। এর নাম সহজ পথ!

বিজয়া। লক্ষ্মীটি, মিথ্যা অভিমান ছাড়। আমার কথা শোন। অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলায় লজ্জা নেই।

বিমান। ওটা তোমাদের পক্ষেই সম্ভব। সব অবস্থার সঙ্গে মেয়েরাই মানিয়ে চলতে পারে। কিন্তু আমি পুরুষ—তোমার এ উপদেশ আমাকে শুধু দুঃখই দিচ্ছে না, মর্ম্মান্তিক আঘাত করছে। সত্যিই আমি বুঝি না, কেন তুমি এত অল্পে ভেঙে পড়ছ।

বিজয়া। কেন সেকথা তোমাকে আমি বলতে চাই

প্রতীক্ষমানা ফটো : শ্রীরামকিঙ্কর সিংহ

খবরদার ফটো : শ্রীরামকিঙ্কর সিংহ

ইয়েসনায়া পলিয়ানায় টলস্টয়ের মিউজিয়াম

টলস্টয় মিউজিয়াম দর্শনান্তে যাত্রিদল

। কিন্তু চোখ মেলে চেয়ে আর কবে তুমি দেখবে ?

বিমান। বেশী দেখতে চাইলেই বেশী দুঃখ পেতে হয় বিজু।

বিজয়া। তাই বুঝি চোখ বুজে স্বপ্ন দেখতে ভালবাস তুমি ?

বিমান। মিথ্যে বল নি বিজু। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, আবার আমাদের পূর্ব্বগৌরব ফিরে পাব। আবার তেমনি করে একদিন নহবৎ বেজে উঠবে।

বিজয়া। নহবৎ বেজে উঠবে ?

বিমান। হ্যাঁ গো হ্যাঁ···নহবৎ বেজে উঠবে, পুণ্যাহের সময় নজরানা নিয়ে তোমার বাড়ীর প্রাঙ্গণে প্রজাদের ভিড় লেগে যাবে। আর তুমি কল্যাণী মূর্ত্তিতে তাদের মধ্যে উপস্থিত হয়ে যে হাতে গ্রহণ করবে সেই হাতেই করবে বিতরণ। কথাটা ভাবতে কত যে ভাল লাগে বিজু।

বিজয়া। কিন্তু আমার লাগে না। চারিদিকে এত অভাব—স্বপ্ন দেখব কখন, ঘুমই হয় না যে।

বিমান। তুমি আজকাল খুব ভাবতে সুরু করেছ বিজু।

বিজয়া। বাধ্য হয়েছি। আচ্ছা, তোমার কি কারুর কোন কথাই কানে আসে না ?

বিমান। আসে—কিন্তু কান দি' না।

বিজয়া। দিলে ভাল করতে। তোমার সংসারের চেহারাটা চোখে পড়ত।

বিমান। তুমি আমায় কি মনে করো বিজু ?

বিজয়া। তা শুনলে তুমি দুঃখ পাবে তাই বলতে পারি না। তুমি লেখার মধ্যে ডুবে থাক। আমি বাধা দিই না—পাছে তোমার সাধনায় বিঘ্ন ঘটে তাই চুপ করে থাকি। কিন্তু আমি চুপ করে থাকি বলে তুমি কিছু দেখবে না ? কেমন করে দিন কাটছে তার খোঁজ করবে না ?

বিমান। খোঁজ নিলেই কি তোমার দুঃখ ঘুচবে বিজয়া ?

বিজয়া। তা জানি না। তবে সান্ত্বনা পাব। একলা সত্যিই আমি আর পারছি না। তোমার দায়িত্ব তুমি নাও।

বিমান। তোমার এ কথার মানে ?

বিজয়া। জলের মত পরিষ্কার। আয় নেই ব্যয় আছে। কোথা থেকে আসে টাকা এ কথাটাও কি বলে দিতে হবে ?

বিমান। তার মানে তোমাকেই ব্যবস্থা করতে হচ্ছে ? কিন্তু কি করে শুনি ?

বিজয়া। পরে শুনো। সময় হলে সব কথাই তোমাকে বলব।

বিমান। আপত্তি থাকলে বল না—কিন্তু, চৌধুরী বাড়ীর মান-সম্মানে আঘাত লাগতে পারে এমন কাজ নিশ্চয় তুমি করতে পার না।

বিজয়া। ও ভয় তোমার চেয়ে আমারও কম নয়। তাই চলে যাবার কথা বলেছি। অনেক বড় দুঃখের হাত থেকে বাঁচবার জন্যেই একটা ছোট দুঃখকে মেনে নিতে বলছি।

বিমান। তার মানে এই বসতবাড়ীখানি বেচে দিয়ে চলে যেতে বলছ।

বিজয়া। হ্যাঁ—আমি উপোষ করতে ভয় পাই না, কিন্তু এ বাড়ীতে বসে নয়।

বিমান। তুমি দুঃখের কাছে হার মেনেছ বিজয়া। খুব অসুবিধে মনে করলে তুমি না হয় বাপের বাড়ী চলে যাও, তবু এ অসঙ্গত আবদার আর করো না।

বিজয়া। দরকার হলে তাই যাব। বাবা তাঁর মেয়েকে ফেলে দেবেন না। তুমি দায়িত্ব এড়াবার কথা ভাবতে পারলেও বাবা পারবেন না। কিন্তু তোমার দিন চলবে কি করে শুনি ?

বিমান। সে ভাবনা আমার।

বিজয়া। তাই বল—শুধু স্ত্রীর কথাটাই তুমি ভাবতে চাও না।

বিমান। নাঃ···তুমি আমাকে না তাড়িয়ে ছাড়বে না বিজয়া।

[প্রস্থান]

(সঙ্গে সঙ্গে হরিহরের প্রবেশ)

হরিহর। অমন চ্যাচাতে চ্যাচাতে কোকাবাবু কনে গ্যালেন বৌরাণীমা ?

বিজয়া। তোমার বাবুই তা জানেন।

হরিহর। তোমারে দুকুড়ি বার কইছি ওনারে ত্যাক্ত কইরো না মা। তা মোর কতা তুমি কানে ওঠাবার চাও না। ভাবনায় চিন্তায় কোকাবাবু মোর পাটকাটির মতো হইয়া গেছেন। সব গ্যাচে কিন্তু কর্ত্তা-বাবুর রক্ত বইছেন না দ্যাহে ? ভাবনা চিন্তা সইবে ক্যান।

বিজয়া। তুমি ত সব জান হরিদা। চুপ করে আর কতদিন থাকব। হাতে তুলে তোমাকে একটা পয়সা দিতে পারি না অথচ···

হরিহর। ছাড়ান দাও মা ছাড়ান দাও। দশ জনে দশ কথা কয়, কিন্তু পরাণডা যে মানা মানে না। মোর কোকাবাবুর চান্দমুখখান না দ্যাখলে যে থাকবার পারি না। ট্যাকা-পয়সার কথা কইয়া মোরে আর সরম দিও নি বৌরাণীমা।

বিজয়া। আমি যে সরমে মরে যাই হরিদা।

হরিহর। হঃ…সরমে মইরা যাই…তোমার আবার সরমডা কিসের? বৌরাণীমা তোমারে মুই সাফ কথা কইবার লাগছি—ঐ ট্যাকা-পয়সার কথা কইয়া তুমি মোরে গাইল-মন্দ কইরো না। মোর পরাণডায় দুঃখু পায়।

বিজয়া। গাল-মন্দ করব কেন হরিদা। আমাদের এখানে পড়ে থেকে মিথ্যে কষ্ট পাচ্ছ। তার ওপর তোমার ছেলেও অসন্তুষ্ট হয়, তাই বলছিলাম।

হরিহর। হঃ, শয়তানডা বুঝি এই সব কথা কয়? অর মুখ দশ্‌শন করি ত…

বিজয়া। আহা-হা, তুমি ছেলের উপর খামোকা রাগ করছ কেন? সে কিছু অন্যায় কথা বলে না। সব ছেলেরই এ কথা বলা উচিত।

হরিহর। তোমারগো উচিত কথা মুই শুনবার চাই না। কোথায় ছ্যালো ঐ শয়তানড়া যখন কোকাবাবু আমার পিঠে চড়তেন, কান মলতেন, সোহাগ করতেন। মোর অন্তরের কথা তোমারে কইবার পারতিছি না বৌরাণীমা…মুই কইবার পারছি না। [প্রস্থান]

বিজয়া। রাগ করে চলে গেল। আমার হয়েছে মহা জ্বালা।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(সময় বৈকাল। স্থান—বিজয়ার ঘর। শৈলর প্রবেশ)

শৈল। বিজুদি…ও বিজুদি…ওমা তুমি এখানে? আর আমি ডেকে ডেকে সাড়া হয়ে গেলাম। কি করছ তুমি জানলার কাছে দাঁড়িয়ে?

বিজয়া। মেঘ দেখছিলাম। কেমন সেজেগুজে এসেছে দেখেছ শৈল?

শৈল। ঐ সাজ-গোজই—বৃষ্টি হবে না এ আমি বলে দিতে পারি। তোমার কর্ত্তাটি কোথায় বিজুদি?

বিজয়া। বোধ হয় লাইব্রেরী ঘরে আছেন। লাইব্রেরী নয় ত, আমার সতীন। দিনরাত ঐ নিয়েই আছেন। কিন্তু তুমি এমন অসময়? দুলালবাবু ছেড়ে দিলেন যে বড়?

শৈল। ছেড়ে দেবার মালিক কি তিনি? তোমার সঙ্গে আমার দেখা করা দরকার—চলে এলাম।

বিজয়া। কি দরকার শৈল?

শৈল। মাগো মা…তুমি আমায় ধুলো পায় বিদায় করতে চাও নাকি বিজুদি! এলাম, দু'দণ্ড আরাম করে বসি, একটু খোসগল্প করি, তার পরে না হয় দরকারের কথাটা শোন।

বিজয়া। বেচারা ভদ্দরলোক, পথ-চেয়ে বসে থাকবেন যে…এ তোমার ভারী অন্যায় শৈল।

শৈল। অন্যায় না হাতী—আমার ত বাপু ভাবতেও বেশ মজা লাগে। আমি বসে বসে হাসিগল্প করব আর তিনি হাঁ করে পথের পানে চেয়ে থাকবেন।

বিজয়া। তুমি কেমন মেয়ে শৈল?

শৈল। তোমার মতো নই।

বিজয়া। তা সত্যি। আমি হলে কিন্তু পারতাম না।

শৈল। পুরুষ নিয়ে ঘর করতে গেলে এমন অনেক কিছু পারতে হয়, নচেৎ রসগোল্লাও তেতো লাগে। সাধ করে কি আর পালিয়ে এসেছি বিজুদি!

বিজয়া। খুব যে বুড়ো ঠানদির মতো কথা বলতে সুরু করেছ শৈল।

শৈল। তোমার যা খুশি বলতে পার…তাই বলে লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে কতক্ষণ বেহায়াপনা সহ্য করব। ছেলেটা পর্য্যন্ত বাপের কাণ্ড দেখে খিল্ খিল্ হাসছিল বিজুদি।

বিজয়া। খুব বুঝি হাসছিল? তোমার মুখেও যে হাসি ধরছে না শৈল। ছেলের বাপের বেহায়াপনা খুব তেতো লেগেছে বলে ত মনে হচ্ছে না।

শৈল। (গভীর কণ্ঠে) চুপি চুপি বলছি বিজুদি… খুউব ভাল লাগে, কিন্তু আস্কারা দিতে ভয় পাই। বেহিসেবী হয়ে ওঠেন। এই দেখ না আজই কি কাণ্ড করে বসে আছেন। নিয়ে এলেন এই ফিকে রঙের শাড়ীখানা। বললাম, এই ত সেদিনে অত দাম দিয়ে একটা আনলে। বললেন, নতুন ডিজাইনের বেরিয়েছে —পরলে নাকি খুব মানাবে।

বিজয়া। দেখি…দেখি…সত্যিই কাপড়খানি সুন্দর। যেমন পাড়টি মানানসই তেমনি রংটি অদ্ভুত নরম। খাসা মানিয়েছে তোমায় শৈল।

শৈল। উনিও ঠিক এক কথা বললেন। তর সয় না—বলেন এখনি পরে এস। পরতেই হ'ল। কাছে এসে দাঁড়াতেই একমুখ হেসে বললেন, খাসা—তার পরে সে এক কাণ্ড। মাগো মা—ঘেন্নায় মরে যাই, বলেন কি না, আরও কাছে সরে এস। তার পরে বুঝতেই ত

পারছ বিজুদি…পালাতে পথ পাই না। আর একরত্তি ছেলেটা কি না মার দুর্দ্দশা দেখে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল…কিন্তু…কিন্তু…তোমার কি হ'ল বিজুদি…চোখে জল কেন…

বিজয়া। ও কিছু নয় শৈল। চোখে কি পড়ল, তাই।

শৈল। তোমাকে আমি মুখেই দিদি বলি না বিজুদি।

বিজয়া। তা আমি জানি। সেই জন্যেই যখন-তখন তোমার কাছেই ছুটে যাই, কিন্তু কথাটা তা নয় শৈল। আমি অন্য কথা ভাবছিলাম।

শৈল। বিজুদি—

বিজয়া। হ্যাঁ রে হ্যাঁ। জানিস শৈল, ছেলেবেলায় পুতুল নিয়ে সংসার পেতেছি—সে সংসারকে ভেঙ্গেছি আবার গড়েছি। যেমন করে শুইয়েছি—শুয়েছে, দাঁড় করালে দাঁড়িয়েছে। আজও আমার সেই পুতুল-খেলাই চলেছে, কিন্তু একটা জীবন্ত আর অবাধ্য পুতুলকে নিয়ে। কথা বললে তর্ক করে—না বললে দুঃখ পায়। প্রশ্রয় দিলে নিজেকেও ভুলে যায়। আঘাত করলে দূরে সরে যায়। একে নিয়ে আমি কি করব বলতে পারিস শৈল?

শৈল। বড় আঘাতই বড় পরিবর্ত্তন ঘটাতে পারে বিজুদি।

বিজয়া। ওকে আঘাত করতে গেলে সে আঘাত আবার আমার বুকেই ফিরে আসে শৈল। নইলে এ কথা না জানে কে যে, থাকবার মধ্যে অবশিষ্ট আছে বসতবাড়ীটি, তবু যদি না বোঝার ভান করে আত্ম-নিপীড়ন করেন তাহলে আমি কি করতে পারি।

শৈল। কিন্তু এ ভাবে ক'দিন চলতে পারে বিজুদি?

বিজয়া। সে কি আমি বুঝি না? আমার আবার ভবিষ্যৎ কি! বর্ত্তমানও একটু একটু করে পিষে মারছে।

শৈল। বিমানবাবুকে সব কথা খুলে বল না কেন?

বিজয়া। বলেছি—তবে ঠিক বুঝিয়ে বলতে হয়ত পারি নি।

শৈল। পারবেও না কোনদিন। তার চেয়ে এক কাজ কর বিজুদি।

বিজয়া। কি কাজ?

শৈল। দিন কয়েকের জন্য বাপের বাড়ী চলে যাও।

বিজয়া। কথাটা আমিও ভেবেছি শৈল, কিন্তু মনের সায় পাই নি। আমার সোনার গহনাগুলিই বাধা দিচ্ছে। ওগুলোর দিকে চোখ পড়লেই মনটা নরম হয়ে যায়! এগুলো যতদিন আছে এ বাড়ীর মায়া কাটিয়ে একদিনের জন্যেও অন্য কোথাও গিয়ে আমি থাকতে পারব না ভাই।

শৈল। পারলে ভাল করতে।

বিজয়া। কাজটা কি খুব সহজ শৈল? তুইও ত স্বামীকে নিয়ে ঘর করিস—তুই পারতিস এ কাজ করতে?

শৈল। হয়ত পারতাম বিজুদি।

বিজয়া। তুই ত ওঁকে জানিস শৈল। এত বড় সর্ব্বনাশা উদাসীন লোককে জেনে-শুনে আমি কেমন করে ফেলে রেখে যাই ভাই, যাঁকে ডেকে কাছে বসে না খাওয়ালে খাওয়ার কথাটাও মনে থাকে না।

শৈল। সেই জন্যেই দিন-কয়েকের জন্য তোমাকে চলে যেতে বলছি। এ লোককে চোখ রাঙিয়ে তুমি নিজের মতে আনতে পারবে না। অভাববোধই ফেরাতে পারবে।

বিজয়া। অস্বীকার করছি না। কিন্তু মন বিপরীত কথা শোনায় শৈল। যে লোক চিরদিন লোক খাটিয়ে এসেছেন তাঁর পক্ষে—

শৈল। তোমার মুখে এ কথা শুনব এ আমি ভাবতে পারি নি বিজুদি। পড়ে গিয়ে পা ভাঙ্গলে মানুষকে লাঠির সাহায্য নিতে হয়। এটা দাঁড়াবার জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু। কিন্তু কথায় কথায় বড্ড দেরী হয়ে গেল বিজুদি। উনি হয়ত পথ চেয়ে বসে আছেন। পারত একবার সময় করে যেও।

তৃতীয় দৃশ্য

(বিমানের ঘর। বিমান ও বিজয়া উপস্থিত আছে।)

বিমান। মিছি মিছি রাগ করে থেক না বিজু। নিজের কথাটা যেমন ভাবছ আমার কথাটাও একবার ভেবে দেখ।

বিজয়া। না ভেবে আমি কোনো কথা বলি নি।

বিমান। একদিন কিন্তু তুমিই উল্টো কথা বলেছিলে। যথাসর্ব্বস্ব যেদিন শিব রায় গ্রাস করল সেদিনের কথা তোমার মনে পড়ে?

বিজয়া। পড়ে।

বিমান। আমারও পড়ে বিজয়া। জমিদারী নিলাম হয়ে গেল। আমি অপরাধীর মতো তোমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললাম, আমাদের সব গেল বিজু। তুমি আমার হাত ধরে বললে, চিন্তা কর না, আবার হবে। সংসার আমার, তার ভাবনাও আমাকে ভাবতে দিও। সেদিন

থেকে এক দিনের জন্তেও তোমার সে অধিকারে আমি কি—

বিজয়া। (বাধা দিয়ে) থাম। একদিন না বুঝে দুটো কথা বলেছিলাম বলে আজীবন তুমি সেই কথার জের টেনে চলবে নাকি? শুধু কথায় দিন চলে না, এ বুঝবার মতো তোমার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে।

বিমান। আমাকে তুমি কি একেবারেই অবুঝ মনে কর বিজয়া?

বিজয়া। যারা দেখেও দেখে না, বুঝেও বুঝতে চায় না, তাদের ও ছাড়া আর কি বলে?

বিমান। এই একটা কথা ছাড়া আর সব কথাই তুমি ভুলে গেছ বিজয়া?

বিজয়া। ভুলব কেন! চাপা পড়ে গেছে। এক এক সময় আমার দম আটকে আসে। তুমি আমাকে এ অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাও। আমি আর পারি না।

বিমান। বিজয়া—

বিজয়া। আমি হাসতে ভুলে যাচ্ছি—কাঁদতেও ভয় পাই। এ জীবন আমি চাই না। তুমি শুধু আমার পাশে এসে মাটিতে পা রেখে দাঁড়াও। আমাকে ভালবাসতে দাও—ভালবাসা গ্রহণ করতে দাও।

বিমান। তুমি কি পাগল হয়ে গেলে বিজয়া?

বিজয়া। না, হই নি এখনও। শোন···একবার আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখ ত! বেশী কিছু আমি চাইছি না। অন্ততঃ কিছু তুমি কর। তাতেই আবার আমি আনন্দ ফিরিয়ে আনব। শৈলর কাছে আমি বাঁচার মন্ত্র শিখেছি। তোমাকে শেখাব।

বিমান। বিজু—

বিজয়া। না না, অমন করে ডেকে আমাকে সব ভুলিয়ে দিও না। তোমার কথা আমি অনেক শুনেছি অনেক ভেবেছি, তাতে তুমিও অনেক দূরে সরে গেছ আর আমিও হাড়িয়ে যাচ্ছি।

বিমান। তুমি এত বোঝ, এত দেখ আর আমার মনের চেহারাটা তোমার চোখে পড়ে না বিজু?

বিজয়া। দেখতে পাই বলেই অন্য কোথাও চলে যাবার কথা তোমায় বলতে পেরেছিলাম।

বিমান। পালিয়ে না হয় গেলে, কিন্তু নিজেদের কি কৈফিয়ৎ দেব?

বিজয়া। তাদের বলবে তোমার অতীত বলে কোনো দিন কিছু ছিল না। যা মনে পড়ছে ওটা নিছক স্বপ্ন—বাস্তব তোমার কাছে বিজু। তাকে সুখী করবার জন্যেই তুমি বর্ত্তমানকে মেনে নিয়েছ।

বিমান। তুমি কি চুপ করবে না বিজু?

বিজয়া। জোর করে আমার মুখ বন্ধ করে দিও না তুমি। আমার কথা শোন। দেখবে, জীবনটা কত সুন্দর। শৈলকে আমি হিংসা করি। কত অল্পে ওরা কত বড় জিনিসকে মুঠোর মধ্যে ধরে রেখেছে।

বিমান। একখানা লটারীর টিকিট কিনেছি বিজয়া। টাকা পেলে এই ভাঙ্গা বাড়ীর কি ভাবে রূপান্তর ঘটাব তার একটা নক্সাও তৈরি করে ফেলেছি। একবার দেখবে নাকি?

বিজয়া। তুমি অত্যন্ত নির্লজ্জ তাই এ ভাবে ঠাট্টা করতে তোমার আটকাল না। তুমি—যাও···যাও। যে কথা এত দিন বলি নি তা আর আমাকে দিয়ে বলিও না। তুমি যাও— (বিমানের প্রস্থান)

বিজয়া। আশ্চর্য্য! নিঃশব্দে চলে গেল! এই মানুষটিকে নিয়েই আমি শৈলর মতো সংসার গড়ে তুলবার স্বপ্ন দেখেছি? শৈলর ছেলের মতো একটি দুষ্ট ছেলের কাল্পনিক হাসি শুনবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছি? মিথ্যা ...সব মিথ্যা...আমার জীবনে মিথ্যাটাই সত্য হয়ে রইল।

(পটক্ষেপ)

চতুর্থ দৃশ্য

(সময় প্রাতঃকাল। পাখীর কলকণ্ঠে চতুর্দ্দিক মুখরিত। স্থান: সদর রাস্তা)

কেষ্টধন। বলি ও হরিহর ভায়া, এত হন্তদন্ত হয়ে যাচ্ছ কোথায়? আরে দাঁড়াও হে, একটা বিড়ি খেয়ে যাও।

হরিহর। কেডা ডাকতিছেন? অ···কিষ্টধনবাবু! কন্ কি কইবার চান্?

কেষ্টধন। মাথার ঝুড়িটা নামাও। চল, ঐ কিনারে গিয়ে বসে দুটো সুখ-দুঃখের কথা বলি।

হরিহর। এই...এই নামালাম কর্তা। অখন দ্যান দেহি এট্টা কড়া বিড়ি। তার পর কন্ আপনার সুখ-দুঃখের কথা।

কেষ্টধন। তা দিচ্ছি···কিন্তু···বাঃ, খাসা চাল এনেছ ত হরিহর ভায়া। তোমার খোকাবাবু এখনও এই চালই খান বুঝি?

হরিহর। তা আর খাবেন নি? উনি হলেন নরহরি চৌধুরী মশাইর ছাওয়াল। উনি খাবেন নি ত তুমি খাবা?

কেষ্টধন। বটেই ত...বটেই ত। কত বড় জমিদার ছিলেন আমাদের নরহরি চৌধুরী। তার ছেলে হ'ল

গিয়ে আমাদের বিমান চৌধুরী। সাপের বাচ্চা সাপই। শুধু বিষ দাঁতটাই ভেঙ্গে গেছে।

হরিহর। কি কইলা কর্ত্তা ?

কেষ্টধন। বলছিলাম···জাত সাপের বাচ্চা জাত সাপই হয়। বিষ দাঁত ভেঙ্গে গেলেও তার রূপ ত আছে···গর্জ্জন ত করে। তা হ্যাঁ ভাই হরিহর, তোমার মাইনে-টাইনে ঠিক মতো পাও ত ?

হরিহর। তিনি ছান না ত তুমি ছাও কিষ্টধনবাবু ?

কেষ্টধন। আ-হা-হা, তুমি অত রাগ কর কেন হরিহর। দিন-দুঃখী মানুষ আমরা, তাই জিজ্ঞেস করছিলাম। নইলে তুমি না পেলেও আমি দিতে যাব না আর পেলেও আমাকে দিতে আসবে না। দশ জনে দশ কথা বলে তাই···

হরিহর। কি কয় দশ জনে একবার কওছেন শুনি—

কেষ্টধন। না না, ওসব কথা শুনলে তুমি দুঃখ পাবে। ও শুনে তোমার কাজ নেই। মানুষের নিন্দা করা যাদের স্বভাব তারা কারণেও করবে অকারণেও করবে। তোমাদের ঐ নায়েব মশাইর কথা বলছিলাম হরিহর ভায়া।

হরিহর। ও সুমুন্দির কথা মোরে কইও না কিষ্টধনবাবু। হালায় পাতিশিয়াল। তলে তলে কোকাবাবুরে মোর পথে বসাইছে।

কেষ্টধন। শেয়াল বলে শেয়াল, আবার ঢাক পিটে কি বলে বেড়াচ্ছে জান ?

হরিহর। না কর্ত্তা, ঢাকের বাড়ি ত মোর কানে যায় নাই—

কেষ্টধন। আরে না না, সত্যিই কি ঢাক বাজাচ্ছে—এ হ'ল কথার ঢাক। এই যে তুমি চাল-ডাল আর হাঁসের ডিম নিয়ে যাচ্ছ···শিব রায় কি বলে জান ?

হরিহর। আইজ্ঞে না কর্ত্তা।

কেষ্টধন। সবই নাকি তোমার নিজের পয়সায়।

হরিহর। নিজের পয়সায়···পয়সাডা আলো কোহানথনে শুনি···

কেষ্টধন। হরিহর ভায়া, তুমি বাপু একটুতেই বড় রেগে যাও। কুলোকে কু-কথা বললে রাগ করবার কি আছে। সকলে ত আর চৌধুরীদের নিমকহারাম নায়েব নয়। বুঝলে হরিহর, হাতী কাদায় পড়লে ব্যাঙেও লাথি মারে। তা বলে হাতী কখনও ব্যাঙ হয় না। কিন্তু ঐ দেখ, কথায় কথায় ভুল হয়ে গেছে। তোমাকে এখনও বিড়ি দেওয়া হয় নি ত। এই নাও।

হরিহর। দাও কর্ত্তা।

কেষ্টধন। হুঁ, ধরিয়েছ···এবারে মৌজ করে দুটো টান দিয়ে নাও। তার পরে শোন—

হরিহর। বিড়িডা বেশ মিঠা-কড়া আছে। হঃ, তার পর কওছেন শুনি তোমার ঐ শিবে নাইব আর কি কন।

কেষ্টধন। শুধু শিব নায়েব কেন তোমাদের নিধু কিষাণ পর্য্যন্ত মুখ খুলেছে।

হরিহর। নিধে কিষাণ! যারে মোর কোকাবাবু তিন সনের খাজনা মুকুব···

কেষ্টধন। আরে হ্যাঁ হ্যাঁ সেই নিধু কিষাণ। সে আবার আরও সরেস। বলে, তুমি নাকি ঘরের জিনিস লুকিয়ে নিয়ে এসে খোকাবাবুর সংসার চালাও। আর এই নিয়ে তোমার ছেলের সঙ্গে রোজ লাঠালাঠি চলেছে।

হরিহর। দুইনাডা দিন দিন কি হ'ল কওছেন কিষ্টধনবাবু। মাইনষি মাইনষির ভাল দেখবার পারে না—

কেষ্টধন। রাগ না কর ত একটা কথা বলি হরিহর।

হরিহর। কও কিষ্টধনবাবু।

কেষ্টধন। মানুষের আর দোষ কি। তুমি যদি নিজের সন্তানদের মুখের অন্ন কেড়ে এনে মুনিবকে খাওয়াতে চাও—একলা একলা পুণ্য···

হরিহর। চুপ দ্যাও কর্ত্তা। মোরে আর পাপ-পুণ্যি শিখাইবার চাইও না। শিখাও গিয়া তোমার ঐ হারামজাদা নাইব আর নিধে কিষাণরে।

কেষ্টধন। ভাল ভাল···কথাটা শুনে বড় খুশী হলাম হরিহর। একটা বলছিলাম কি জান, বিষ দাঁত ত শিব রায় আগেই ভেঙে দিয়েছে। দেখেশুনে মনে হচ্ছে ফণাটাও চুপসে গেছে, কিন্তু কোমর ভাঙ্গার আগে আমার কথায় রাজি হয়ে যেতে বল, মোটা হাতে পাইয়ে দেব।

হরিহর। তুমিও আবার ত্যারা-ব্যাকা কথা কও কেন কিষ্টবাবু। কিসের কথা কইবার চাও দালাল মশাই ?

কেষ্টধন। তুমি ত বিমানবাবুকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছ হরিহর।

হরিহর। আসল কথাডা কইয়া ফ্যালাও কর্ত্তা। মোরা সিধা কথার মানুষ।

কেষ্টধন। তোমাকে মান্যগণ্যও করে শুনেছি—

হরিহর। আরে দূর তোর মান্যিগণ্যি।

কেষ্টধন। বড় অধৈর্য্য তুমি হরিহর। তাহলে বলেই ফেলি, কি বল। কথাটা হচ্ছে তোমার খোকা-

বাবুর ঐ বসতবাড়ীটা নিয়ে। শিব রায় মশাইর বড় ইচ্ছে ওটা যেন আর অন্য হাতে গিয়ে না পড়ে।

হরিহর। (গর্জ্জন করে) ওরে আমার বউরূপি সাপ—তুমি রং পালটাবার লাগছ। হালা শত্তুরের গুষ্টি দালালি খাইবার চাও···(গলা টিপে ধরল)

কেষ্টধন। (আর্ত্তস্বরে) তুমি কি ক্ষেপে গেলে? অমন করে গলা টিপে ধরেছ কেন? ছাড় ছাড়··· আঃ···আঃ···

হরিহর। নে হালার বউরূপি সাপ দালালি খা খা, থুঃ থুঃ···

কেষ্টধন। উরে বাপরে বাপরে বাপ। শেষ করে ফেলেছিল আর কি। আরে রাম রাম সারা মুখময় আমার থুতু ছিটিয়ে দিয়ে গেল ব্যাটা চাষা।

পঞ্চম দৃশ্য

(শিব রায় ও সনাতন গাঙ্গুলী বিমানের বাড়ীর একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আলোচনারত)

শিব রায়। কেষ্টধন আপনাকে সব কথাই খুলে বলেছে গাঙ্গুলী মশাই, আমি আর বিশেষ কি বলব। শিব রায়ের নাগপাশ থেকে অন্ততঃ চৌধুরীদের বসত-বাড়ীটা যাতে রক্ষা পায় তার জন্যেই আপনার শরণাপন্ন হতে হয়েছে।

সনাতন। আমার হাতে গেলেও ত রক্ষা পাবে না রায় মশাই। তা ছাড়া নায়েব মশাই জানতে পারলে আপনাদেরও ত গৃহবিবাদ দেখা দিতে পারে। আপনি যখন তার সহোদর ভাই।

শিব রায়। তাই বলে এত বড় পাপকে চিরদিন চোখ বুজে সইতে হবে গাঙ্গুলী মশাই?

সনাতন। আপনি ঠিক জানেন, বিমানবাবু তার বসতবাড়ী বিক্রি করে এখান থেকে চলে যেতে চান?

শিব রায়। না গিয়ে তার উপায় নেই। তাছাড়া আমরা আছি কি করতে।

সনাতন। ঠিক বুঝতে পারছি না। তবু চলুন দেখি, একবার দেখেই আসি।

শিব রায়। দেখবার কিছুই নেই গাঙ্গুলী মশাই। এইখান থেকেই সুরু হয়েছে চৌধুরীদের বাড়ীর সীমানা। এখান থেকে সোজা পোয়াটাক মাইল গিয়ে বেঁকে গিয়েছে আরও শ-তিনেক গজ।

সনাতন। চৌধুরীদের বসতবাড়ীর সীমানা ত সামান্য নয় রায় মশাই।

শিব রায়। সামান্য কি বলছেন। এ তল্লাটে এত বড় বাড়ী আজ পর্য্যন্ত কেউ চোখে দেখে নি।

সনাতন। এত বড় যাঁদের বসতবাড়ী তাঁদের আয়ের পরিমাণ নিশ্চয় প্রচুর ছিল। কিন্তু গেল কি করে সব।

শিব রায়। দুনিয়ায় এক জাতের মানুষ জন্মায় যারা যোগ করতে বসে চোখ বুজে শুধু বিয়োগ করে। আর আশে পাশের মানুষগুলো ভাগ্য ফিরিয়ে নেয়।

সনাতন। গোবিন্দ, গোবিন্দ···কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না রায়মশাই।

শিব রায়। সোজা কথা গাঙ্গুলীমশাই। নরহরি চৌধুরীর বিষয়বুদ্ধি তাঁকে যোগ করতে শিখিয়েছিল। আর বিমান চৌধুরীর নির্ব্বুদ্ধিতা তাকে নির্ভুল বিয়োগ করতে শেখাল।

সনাতন। পরিষ্কার হ'ল না রায় মশাই।

শিব রায়। ডাকসাইটে নরহরি চৌধুরীর ছেলে গেলেন লেখক হতে আর দার্শনিক হতে।

সনাতন। বুঝলাম—গোবিন্দ···গোবিন্দ···

শিব রায়। বুঝবেন বইকি গাঙ্গুলী মশাই। সেখানেও যে ঐ যোগবিয়োগের খেলা। পই পই করে বললাম, ছোটবাবু টাকা-পয়সার ব্যাপারে নিজেকেও বিশ্বাস করা উচিত নয়। বড় নিমকহারাম এই টাকা। হেসে উড়িয়ে দিলেন। বললেন, মানুষকে বিশ্বাস করার মধ্যেও একটা আভিজাত্য আছে।

সনাতন। নমস্য ব্যক্তি···হ্যাঁ তার পর?

শিব রায়। কিন্তু কে কার কথা শোনে। গাঙ্গুলী মশাই, দুনিয়ায় একশ্রেণীর লোক আছে যারা চোখ চেয়ে ঘুমায়, আর স্বপ্ন দেখে। তারা বোঝে না যে, জীবনটা নিছক স্বপ্ন নয়। এখানে কাড়াকাড়ি করে বেঁচে থাকতে হয়।

সনাতন। সবই তোমার ইচ্ছা গোবিন্দ—হুঁ, তার পর?

শিব রায়। সুযোগ নিলেন শিব রায়। বিমানবিহারী যখন চোখ বুজে বিয়োগ করছেন, নায়েব মশাই তখন সাবধানে বিচক্ষণতার সঙ্গে যোগ করে গেলেন। অঙ্কশাস্ত্র বড় অদ্ভুত গাঙ্গুলী মশাই। একদিকে শূন্য আর একদিকে···

(চীৎকার করতে করতে কেষ্টধনের উপস্থিতি)

কেষ্টধন। ওরে বাপরে বাপরে বাপ···ওরে বাপরে বাপরে বাপ! এক খুনে ডাকাতের কাছে আমাকে পাঠিয়েছিলেন নায়েব মশাই। আমার পৈতৃক প্রাণটা প্রায় গেছিল ম···ম···শাই। হে···হে···আপনিও এখানে আছেন তা হলে···হচ্ছে যে গাঙ্গুলী মশাই···হে হে···

শিব রায়। কেষ্টধন—(রুষ্টকণ্ঠে)

সনাতন। ওঁকে মিথ্যে ধমকাচ্ছেন রায় মশাই। গোবিন্দ বল…গোবিন্দ বল…তাহলে দাঁড়াল কি শেষ পর্য্যন্ত? এই শেষ সৎকাজটিও অনায়াসে আপনি নিজেই করতে পারতেন নায়েব মশাই। আমাকে দয়া করে ডেকে আনালেন কেন? ব্যাপারটা যে ক্রমশঃই হেঁয়ালী হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

শিব রায়। কথাটা যখন জেনেই ফেলেছেন তখন খুলেই বলি। সম্পত্তিটা সত্যিই বিক্রি করতে ইচ্ছুক কিনা সেইটে জানবার জন্যেই আমাকে—

সনাতন। এই খেলাটা খেলতে হয়েছে…কি বলেন নায়েব মশাই? মনে হচ্ছে আরও কিছু গোপন রহস্য এর মধ্যে আছে। ও কি শিববাবু, মাথা নিচু করছেন কেন? আপনারও তাহলে লজ্জা আছে। গোবিন্দ, গোবিন্দ।

শিব রায়। গাঙ্গুলী মশাই—(চীৎকার করে)

সনাতন। আমাকেও আপনার খাস তালুকের প্রজা ভাবছেন নাকি? চোখ রাঙ্গাচ্ছেন কাকে? আপনার সংসার আছে না…ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করেন না আপনি? ছিঃ ছিঃ—

শিব রায়। আপনি মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন মশাই।

সনাতন। রাধে গোবিন্দ…রাধে গোবিন্দ…রায় মশাই আপনি নমস্য ব্যক্তি একবার সোজা হয়ে দাঁড়ান ত দু'চোখ ভরে দেখি। ছিঃ ছিঃ, আপনার মুখ দেখলেও পাপ হয়। (প্রস্থান)

কেষ্টধন। উনি যে চলে গেলেন বড়বাবু। তা যাক গে—বেটা একেবারে ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির।

শিব রায়। চুপ কর বেকুব। আমার পাকা ঘুটিকে…

কেষ্টধন। আজ্ঞে বড়বাবু, আমার কি তখন মাথার ঠিক ছিল। তাছাড়া ঘুটিই নেই তার আবার কাঁচা আর পাকা। কিন্তু ওই গোঁয়ারগোবিন্দ হরিহর গলা টিপে ধরে আমার মুখময় থুতু ছিটিয়ে দিলে…

শিব রায়। উপযুক্ত দক্ষিণা পেয়েছ—যাও, দূর হয়ে যাও আমার চোখের সুমুখ থেকে। (প্রস্থান)

কেষ্টধন। যা বাব্বা, ইনিও যে চলে গেলেন। টাকা দশটার কথাও বেমালুম ভুলে গেলেন। কলি—ঘোর কলি। কিন্তু আমার নামও কেষ্টধন। তোমার টাকার গরম আমি বরফ চাপা দিয়ে ঠাণ্ডা করে দেব, হুঁ।

পটক্ষেপ

ষষ্ঠ দৃশ্য

(বিমানের বাড়ী। বিমান বাইরে দাঁড়িয়েছিল)

বিমান। কে, কে ওখানে? ও তুমি, হরিদা। তা অমন চোরের মতো দাঁড়িয়ে আছ কেন? তোমার মাথায় ওসব কি?

হরিহর। আর দাদা কইও না। তোমার ঐ যে গো নিধু কিষাণ আর করিম শ্যাক্! অরগো কাণ্ড! কথা কি শুনতি চায়। মুই যত কই কোলাবাবু গোসা হইবেন তত মোরে ল্যাক-প্যাকাইয়া ধরলে।

বিমান। বড় বেশী কথা বল তুমি হরিদা।

(বিজয়ার প্রবেশ)

হরিহর। এইযেগো বৌরাণীমা, তুমিও আইছ। শোন মোর দাদায় কি কইবার লাগছে। হরিহর নাকি মিথ্যা কথা ছাড়বার পারে নাই।

বিমান। কানেও আজকাল কম শোন দেখছি।

হরিহর। কথাডা শ্যাষ করবার দিবা তো—

বিজয়া। সত্যিই ত। ওকে কথাটা শেষ করতে দেবে ত।

হরিহর। তুমিই শোন মা—ঐ যে ঐ নিধু কিষাণ আর করিম শ্যাকের কথা কইছিলাম। কিছুতেই ছাড়ব না। আমিও না করবার পারলাম না। কয় গরীব-গুড়া মানুষ মোরা। পরাণ চাইলেও কিছু করবার পারি না।

বিমান। শুনলে ত বিজয়া—তবুও বলবে ও বেশী কথা বলে না।

বিজয়া। ওঁর কথা শুনো না। তুমি আমাকে বল হরিদা।

হরিহর। নিধু কয়—পোলাপানের মুয়ে যে চাট্টি দিতে পারতিছি তা ছোডোকত্তার কেরপায়। খ্যাতের নতুন ফসল তেনারে না দিয়া খাবার পারমু না। কত্তার দুঃখী পরজার সামান্য নজরানা।

বিমান। শোন শোন বিজয়া। আর তোমার ঐ করিম শেখ কি বললে?

হরিহর। শ্যাকের পো আরও সরেস। কয়—মুই আল্লা জানি না চাচা। ছোডোকত্তার সেবায় লাগছে জানলেই মোর হাসের আণ্ডা পাড়া সাত্থক হইবো।

বিমান। নিশ্চয় সেবায় লাগবে হরিদা। ওদের কি আমি দুঃখ দিতে পারি? ওদের ভালবাসার দান আমার কাছে অমূল্য সম্পদ। আমার কথাটা ওদের তুমি জানিয়ে দিও হরিদা। নিধু আমাকে নজরানা পাঠিয়েছে, করিম শেখ আমাকে নজরানা পাঠিয়েছে। আজ আমার বড় আনন্দের দিন বিজয়া, আজ আমার বড় আনন্দের দিন। [প্রস্থান]

বিজয়া। হরিদা—

হরিহর। কিছু কবার চাও বৌরাণীমা?

বিজয়া। হ্যাঁ হরিদা। কাজটা খুব অন্যায় করলে।

হরিহর। অন্যায়ডা তুমি কোথায় ছাখলা?

বিজয়া। এই মানুষকে ঠকাতে তোমার দুঃখ হয় না হরিদা? মিথ্যা কথায় তোমার দাদাবাবুকে ঠকাতে পারলেও আমাকে পার নি। তুমি বুড়ো মানুষ। তোমাকে আর কি বলব, কিন্তু কথাটা কোনদিন যদি উনি জানতে পারেন তাহলে দুঃখের তার সীমা থাকবে না। তাছাড়া তোমার নিজের ছেলেপিলেদের মুখের গ্রাস এ ভাবে কেড়ে নেবার কোন অধিকার তোমার নেই। আমার একথাটা ভবিষ্যতে কোনদিন ভুলো না।

হরিহর। বৌদিরাণী—

বিজয়া। বল।

হরিহর। তোমার কথা আমি বোঝবার পারি না। কোকাবাবুরে মুই কোলে-পিঠে কইরা মানুষ করি নাই? মোর পরাণডা অর জন্যি কান্দে না? নিজের কথাডা বোঝবার পার আর মোর দুঃখডা বোঝবার পার না? মনিষ্যি না মোরা…

[পটক্ষেপ]

সপ্তম দৃশ্য

(সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। বিজয়া দরজা খুলে বার হ'ল। দরজা খোলার এবং বন্ধ করবার শব্দ শোনা যাবে)

বিজয়া। উঃ, কি মেঘ করেছে। দু'হাত দূরের মানুষকেও দেখা যাচ্ছে না। আর আমি চৌধুরী বাড়ীর কুলবধূ অন্ন চিন্তায় পথে বার হয়েছি। রাত্রির অন্ধকারই আমার পরম বন্ধু। কেউ জানবে না আমি কোথায় চলেছি। কেন যাচ্ছি। (দমকা হাওয়া হু হু করে বইতে সুরু হবে) আর পারি না। শৈল ঠিক কথাই বলে। আমার নিজের দুর্ব্বলতাই আমাকে আরও অন্ধকারের মধ্যে ঠেলে নিয়ে চলেছে। কিন্তু ঐ অসহায় আপন-ভোলা লোকটিকে একলা ফেলে রেখে কেমন করে আমি চলে যাই একথা বোঝে না।

(সহসা আশেপাশে শিয়াল এবং কুকুরের ডাক শোনা গেল এবং সেই সঙ্গে শঙ্কিত পক্ষীকুলের পাখার ঝটপট শব্দ হতে থাকে)

এখুনি হয়ত বৃষ্টি আসবে। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। তার আগেই আমাকে পৌঁছুতে হবে। ঐ যে শৈলর বাড়ী দেখা যাচ্ছে। আলো জলছে ওর ঘরে। জানলার পাশ থেকে দুলালবাবু সরে গেলেন। হ্যাঁ, ঠিক তাই। এবার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ঐ ত শৈলর কোলের উপর শুয়ে পড়েছেন। শৈল ওঁর চুল টেনে দিচ্ছে। নাঃ, উচিত হবে না। এ সময় ওখানে আমি যেতে পারি না। কিন্তু বৃষ্টি এল যে! হ্যাঁ, এই দরজার আড়াল থেকে ওদের দুটিকে একটু দেখি। বড় সুখে আছে ওরা। সুখে থাক শৈল।

(প্রচণ্ড শব্দ করে মেঘ ডেকে উঠল সেই সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকাল।)

শৈল। কে, কে ওখানে…ওমা বিজুদি! তুমি এই ঝড়-জল মাথায় করে এসেছ? আমাকে ডাকলে না কেন? তোমার কাপড়-চোপর ভেজে নি ত?

বিজয়া। না রে না। বিষ্টি আসবার আগেই পৌঁছে গেছি, কিন্তু দুলালবাবু, আপনি চলে যাচ্ছেন কেন?

দুলাল। আমি না গেলে আপনি ঘরে আসতে পারছেন না যে বিজুদি!

বিজয়া। সেই জন্যে আপনাকে চলে যেতে হবে? আমরাই বরং ও ঘরে যাই।

শৈল। কথা বাড়িও না বিজুদি। যাচ্ছে যাক না। চল, ঘরে যাই।

বিজয়া। তোর ছেলেটাকে জাগিয়ে দেব শৈল?

শৈল। দোহাই বিজুদি, এখুনি এমন চীৎকার সুরু করবে যে, তোমার সঙ্গে বসে দুটো কথা বলতেও পারব না।

বিজয়া। তাহলে থাক। জানিস, তোদের আমি লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছিলাম। লোভ সামলাতে পারি নি। এখন ক'টা বাজে শৈল? সাতটা? তাই হবে। সেই জন্যেই বোধ হয় মনটা দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল। আজকের কত তারিখ জানিস? এই দিনেই আমার বিয়ে হয়েছিল কি না।

শৈল। বিজুদি…

বিজয়া। মিথ্যে নয় শৈল। আমি নিজেকে তোদের মধ্যে হাড়িয়ে ফেললাম। তোর মধ্যে আমি নিজের চেহারা দেখে মুহূর্ত্তের জন্য সব ভুলে গেলাম। মেঘ ডাকল, বিদ্যুৎ চমকাল, আমার ভুলও ভাঙল। আমার চতুর্দ্দিক আবার অন্ধকার হয়ে গেল।

শৈল। তুমি দিন দিন কি হচ্ছ বিজুদি?

বিজয়া। লুকিয়ে লুকিয়ে তোদের আনন্দের ভাগ নিচ্ছিলাম। তুই রাগ করলি বুঝি?

শৈল। রাগ করব কেন। কিন্তু দিন দিন তুমি বড্ড স্পর্শকাতর হয়ে উঠছ। তোমাকে নিয়ে সত্যিই আর পারা যাবে না।

বিজয়া। আমার বোধ হয় মাথা খারাপ হয়ে যাবে

বোন। কখন যে কি কথা বলি তার ঠিক-ঠিকানা নেই। অভিশাপের আগুনে আমার সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তাই বিপরীত কিছু চোখে পড়লে সেখান থেকে নড়তে পারি না শৈল।

শৈল। বিমানবাবু ত তোমাকে যথেষ্ট ভালবাসেন বিজুদি।

বিজয়া। হয়ত বাসেন কিন্তু যে ভালবাসায় বিশ্বাস নেই—শ্রদ্ধা নেই, সে ভালবাসা কিছু দিতে পারে না। আমি মানুষ শৈল।

শৈল। তুমি হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠেছ বলেই এ কথা ভাবতে পেরেছ।

বিজয়া। আমি উত্তেজিত হয়ে উঠি নি বোন।

শৈল। আচ্ছা বিজুদি—

বিজয়া। থামলে কেন, বল?

শৈল। বিমানবাবুর ভালবাসায় যদি তোমার বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা না থাকবে তাহলে একদিনের জন্যেও তাকে ছেড়ে যেতে পারছ না কেন?

বিজয়া। ওটা ত আমার কথা শৈল।

শৈল। আশ্চর্য্য! তুমি কি বলতে চাও এ বস্তু কখনও একলা একলা বেঁচে থাকতে পারে? আমি কিন্তু উল্টো বুঝি। শ্রদ্ধাই শ্রদ্ধাকে বাঁচিয়ে রাখে, বিশ্বাসই বিশ্বাস করতে শেখায়।

বিজয়া। আমিও ঠিক তোর মতো করে ভাবতাম। কিন্তু আমার ভাবনার সে উৎসমুখ শুকিয়ে গেছে। জোর করে ভাবতে গেলে রক্ত উঠে আসে। আমি বড় ক্লান্ত, আজ যাই বোন।

শৈল। এই ঝড়-জল মাথায় করে কি শুধু এই কথা বলবার জন্যেই এসেছিলে বিজুদি?

বিজয়া। ও আর নতুন করে বলব কি—এই দু'গাছা চুড়ি রইল। দুলালবাবুকে দিস।

শৈল। একটা কথা বলব বিজুদি।

বিজয়া। বল।

শৈল। উনি বলছিলেন···মানে···ছাড়িয়ে আনবার কোনো ব্যবস্থাই যখন হচ্ছে না তখন মিথ্যা সুদ গুণে কি হবে?

বিজয়া। বেচে দিতে বলছেন বুঝি?

শৈল। ঠিক তা নয়। তোমার মতামত জানতে চাইছিলেন। তুমি রাগ করলে না ত?

বিজয়া। দূর পাগল! রাগ করব কেন। উনি আমার ভালর জন্যই একথা বলেছেন। তবুও কি জানিস শৈল —জিনিসগুলো একেবারেই যাবে, ভাবতে দুঃখ পাই।

শৈল। তাহলে থাক বিজুদি। আর হ্যাঁ, ভাল কথা, একটু দাঁড়াও। এই কফিটা আর সুগন্ধি চাল চাট্টিপানি নিয়ে যাও। অসময়ের কফি একলা খেয়ে আনন্দ পাব না।

বিজয়া। তোর ভালবাসাকে আমি অপমান করতে চাই না বোন, তাই নিলাম। কিন্তু এমন কাজ আর কোনদিন করিস নে শৈল।

(পটক্ষেপ)

অষ্টম দৃশ্য

বিমান। হরিদা—হরিদা—

হরিহর। যাইগো দাদাবাবু। ডাকতিছ ক্যান? হঃ, তোমার মুয়ের থনে কিসের গন্ধ আইছে। কেডা তোমারে ছাইভস্ম খাওয়াইয়া দিল কওছেন মোরে। হালার কেল্লাডা ছিড়া লইয়া আহি।

বিমান। চুপ···হরিদা চুপ কর। তোমার ঐ শিব রায়ের লোক আমাকে বই প্রকাশ করবার মিথ্যে লোভ দেখিয়ে নিয়ে গেল। সরবতের সঙ্গে একটু একটু করে দিচ্ছিল। বলে, সই কর।

হরিহর। দাদাবাবু—

বিমান। ভয় পেও না—সই আমাকে দিয়ে করাতে পারে নি। আমি নরহরি চৌধুরীর ছেলে। আমার সঙ্গে জালিয়াতি···টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি সে দলিল।

হরিহর। তোমার চক্ষু দুইডা অমন লাল ক্যানো?

বিমান। আঃ আস্তে কথা বল হরিদা। আমি মাতাল হই নি। নেবু পাতার গন্ধে প্রথমে বুঝতে পারি নি। কিন্তু দু'গ্লাস সরবৎ খেতেই সব পরিষ্কার হয়ে গেল। বিজয়া কোথায়?

হরিহর। তিনি ঝড়-বিষ্টি আসবার আগেই বার হইয়ে গ্যালেন। শৈলদিদির বাড়ীতে।

বিমান। এখনও তাহলে ফিরলেন না কেন? তুমি একবার দেখে এস। বল, আমি অনেকক্ষণ ফিরেছি।

হরিহর। যেমন হুকুম দাদাবাবু।

(প্রস্থান)

(হরিহর বার হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে অস্থির ভাবে বিমান পায়চারী করতে থাকবে, তার জুতোর আওয়াজ হতে থাকে। অল্পক্ষণের মধ্যেই বিজয়ার প্রবেশ)

বিজয়া। তুমি কতক্ষণ ফিরে এসেছ? প্রকাশকের সঙ্গে কোনো ব্যবস্থা হ'ল?

কেষ্টধন। তাই বলে নিজের বাপকে গাল দিচ্ছেন!

গণেশ। হুঁ···দিচ্ছি, নইলে পরের বাপকে গাল দিয়ে কি মার খাব কেষ্টধনবাবু। আমি মদ খাই বটে, কিন্তু মাতাল হই না···

কেষ্টধন। তাহলে চলুন না স্কুলবাড়ীর উৎসবটা একটু দেখেশুনে আসি গিয়ে।

গণেশ। তুমি আমার খুব বন্ধুলোক ত কেষ্টবাবু। আমি শিব রায়ের ছেলে বটে, কিন্তু শিব রায় নই। বুঝলে কেষ্টধনবাবু ঐ চক্ষু-লজ্জা আর বুঝলে কিনা···ওখানে যাবার আমি উপযুক্ত নই। যেতে হয় তুমি যাও···ও বাব্বা, এ যে দেখছি আবার হরিহরবাবু আসছেন···হাতে পাকা লাঠি...চল···চল কেষ্টধনবাবু, পালিয়ে চল···

কেষ্টধন। পালাতে যাব কিসের জন্য।

গণেশ। সেদিন ত পালিয়েই ছিলে বাবা...মুখময়...

কেষ্টধন। থামুন···সে আপনার বাবার জন্য—

গণেশ। এই, চুপ, পরের বাপকে নিয়ে টানাটানি কর না, এখুনি রক্তারক্তি হয়ে যাবে, হু···কিন্তু, ঐ হরিহরকে আমি বড্ড ভয় করি কেষ্টধনবাবু···চল চল, এই বেলা সরে পড়ি। (টলতে টলতে প্রস্থান)

একাদশ দৃশ্য

(সভাপতি অনিবার্য্য কারণবশতঃ আসতে পারেন নি। সভাপতির লিখিত ভাষণ পাঠ করছেন রামেশ্বর রায়। এঁর হাত দিয়েই ভাষাটি পাঠিয়েছেন সভাপতি—সুসাহিত্যিক "নীলকণ্ঠ"।)

প্রিয় ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ আপনাদের কথা দিয়েও উপস্থিত হতে না পারার জন্য আপনারা সকলে অনুগ্রহ করে আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি দূর থেকে আপনাদের এই উদ্যোগকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং এই অনুরোধ করছি যে, বিমানবাবুর ভাগ্যে মানুষের দেওয়া যত দুঃখ যত বেদনা জমা হয়েছিল তা আজ পরম আনন্দে রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু এই আনন্দকে চিরস্থায়ী করতে আপনারা তাঁর গ্রামবাসী বন্ধু-বান্ধবেরাই পারেন। আপনারা ভুলে যাবেন না যে, একটা জিনিস পাওয়া যত সহজ তাকে বাঁচিয়ে রাখা তার চেয়ে ঢের বেশী শক্ত। আমার অনুরোধ, শিক্ষায়তনের মধ্যে আপনারা কোনো দিন নোংড়া রাজনীতিকে প্রবেশ করতে দেবেন না। তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন আপনারাই। আপনাদেরই ভবিষ্যৎ বংশধরেরা। ক্ষতিগ্রস্ত হবে আমাদের দেশ। কারণ দূষিত শিক্ষা দূষিত করবে দেশকে। পরিশেষে আপনাদের কাছে অকপটে জানাচ্ছি এ অনুরোধ "নীলকণ্ঠে"র নয় আপনাদের বিমানের। বিমান আর নীলকণ্ঠ একই ব্যক্তি। নমস্কার।

(ডায়াসের পাশে দাঁড়িয়েছিল হরিহর। অভিভাষণ সমাপ্ত হতেই হরিহর চঞ্চল হয়ে উঠল। পাশে দণ্ডায়মান এক ব্যক্তিকে উদ্দেশ করে বলল)

হরিহর। তুমি কেডা গো কর্ত্তা? চউক্ষে আর তেমন ঠাহর পাই না।

দুলাল। আমি দুলাল সেন।

হরিহর। আমাগো শৈলদিদির—

দুলাল। (বাধা দিয়ে) এই ত ঠিক চিনেছ হরিহর।

হরিহর। আইচ্ছা কওছেন দাদা এই বক্তিমে দেলেন ইনি কেডা? বোঝলা দাদাঠাকুর ওনারে একবার ছল-ছুতা কইরা তোমার বাড়ীতে উঠাইতে পার নি? একবার ভাল কইরা দেখবার চাই।

দুলাল। কি দেখতে চাও হরিহর।

হরিহর। তোমারে কানে কানে কই দাদা মোর মন কইছেন উনি আমার খোকাবাবু—

দুলাল। কথাটা বলার পরে আমারও কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে হরিহর। আমি যেমন করে হউক ওকে কিছুক্ষণের জন্য নিয়ে আসছি, তুমি আমার বাড়ী চলে যাও।

(পটক্ষেপ)

দ্বাদশ দৃশ্য

(দুলাল সেনের বাড়ী। দুলাল, শৈল, হরিহর ও রামেশ্বরবেশী "নীলকণ্ঠ" অর্থাৎ বিমান চৌধুরী।)

রামেশ্বর। হঠাৎ এমন অদ্ভুত সন্দেহের হেতু কি দুলালবাবু?

শৈল। আপনি কি আমাদের সন্দেহকে মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিতে পারেন?

রামেশ্বর। মিথ্যে হলে উড়িয়ে দিতে পারব না কেন?

হরিহর। উড়াইয়া দিবার চাও কোকাবাবু? দেহি কেমন উড়াইবার পার। এই ধরলাম তোমার হাত—এইবার দ্যাওছেন কেমন উড়াইয়া দিবার পার। তোমারে মুই কোলে-পিঠে কইরা মানুষ করছি। দাড়ি রাখছ চউক্ষে চোশমা দিছ। ভাবছ, কেউ ঠাহর করবার পারব না? হঃ—

রামেশ্বর। (গভীর কণ্ঠে) দুলালবাবু, যুক্তি নয় ওর বিশ্বাসের কাছে আমাকে হার মানতে হ'ল। এবার আমায় বিদায় দিন ভাই।

শৈল। বিজয়াদি কেমন আছেন বিমানবাবু—

রামেশ্বর। (নিঃশ্বাস ফেলে গভীর কণ্ঠে) পরম শান্তিতে আছেন সেন। না না, চমকে উঠবেন না আপনারা। সত্যিই তিনি যথাস্থানে আছেন। একটা অন্ধকে দৃষ্টি দান করে তার চোখের তারায় বন্দী হয়ে আছেন। মরবার ভয় নেই—হারিয়ে যাবার শঙ্কা নেই।

হরিহর। কোকাবাবু—

রামেশ্বর। চুপ কর হরিদা। তার পরে শুনুন—এখান থেকে ত একদিন চলে গেলাম। কিন্তু যাব কোথায়? বিজয়াকে আমার চাই। সম্ভব অসম্ভব সর্ব্বত্র পাগলের মতো খুঁজে বেড়ালাম, তার পর একদিন অবাক হয়ে অনুভব করলাম কাকে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি। দুলালবাবু, আমি থামলাম, আমি স্থির হলাম। বিজয়া তার ইচ্ছে দিয়ে, তার স্বপ্ন দিয়ে বিমানকে রূপান্তরিত করল "নীলকণ্ঠে"। দেখুন দেখি, বোকা হরিদা ছেলে-মানুষের মতো কাঁদতে সুরু করেছে। আশ্চর্য্য তুমি বোন শৈলও ওর সঙ্গে যোগ দিলে। দেখ দেখি, যত গোল-যোগ আপনি বাধালেন দুলালবাবু—এই কান্নাটা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারি না। বুঝলে শৈল, আমি বরং এখুনি চলে যাই। আমাকে তোমরা বিদায় দাও।

শৈল। (চোখ মুছে) না না, যাবেন না। এভাবে চলে গেলে বুঝব সকলে মিলে আমরাই আপনাকে জোর করে আবার তাড়িয়ে দিলাম। আপনাকে বসতেই হবে। কিছুতেই আপনাকে ছাড়ব না। (রামেশ্বর হতাশ ভাবে বসে পড়ল)।

যবনিকা পতন

সুফী সাধিকা রাবেয়া ও তাঁহার মরমিয়া সাধনা

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

মধুর রস বা প্রেমভক্তির ভারতীয় দার্শনিক তত্ত্ব:

শাণ্ডিল্য ঋষি তাঁহার ভক্তি সূত্রে বলিয়াছেন—

"অনন্যভক্ত্যা তদ্‌বুদ্ধিলয়াদত্যন্তম্"—(শাণ্ডিল্য সূত্র ৯৬)। নারদ বলেন—"অন্যস্মাৎ সৌলভ্যং ভক্তৌ"—(নারদভক্তি সূত্র)। গীতায় ক্ষর ও অক্ষর তত্ত্বের উপর পুরুষোত্তমকে প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। তিনি কি নির্গুণ? না, এ বিষয়ে ভাগবত বলিয়াছেন যে, তিনি এমন অনির্বচনীয় গুণ-বিশিষ্ট যাহাতে আত্মারাম মুনিগণও তাঁহার প্রতি—অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥" ভা ১।৭।১০

সাধকের যতক্ষণ নিজের 'অহং'—লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকে ততক্ষণ এই 'দিব্যং পরমং পুরুষং' রূপে ভগবান তাহার সমগ্র সত্তাকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন, তাই তিনি 'কৃষ্ণ' বা 'পুরুষোত্তম।' যখন ছান্দোগ্য উপনিষদের নুনের পুতুল সমুদ্রে মগ্ন হইয়া লীন হইয়া যায় 'তখন না সো রমণ না হাম রমণী'।

তাই অদ্বৈত বেদান্তের শিরোমণি মধুসূদন সরস্বতীও তাঁহার গীতাভাষ্যের শেষে বলিয়াছেন—"কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে।" কারণ, জানার এবং বলার শেষ এই পর্যন্তই—ইহার পর মূকাস্বাদনবৎ অনির্বচনীয়—'অবাঙ্‌মনসগোচর'—'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।'

"মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ।"

প্রেমানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ:

প্রেম কোথা হইতে আসে? এই প্রশ্নের উত্তরে রাবেয়া বলেন—প্রেম অনাদি এবং সে অনন্তপথের যাত্রী, ইহার আদিও নাই অন্তও নাই—"Love cometh from Eternity and is a pilgrim to Eternity." প্রেমের শেষ ফল—প্রেমই, তাই নারদ ভক্তিসূত্রে বলেন—'স্বয়ং ফল রূপতেতি।' ব্রহ্মানন্দ আস্বাদ করে যাঁরা আত্মারাম হয়েছেন তাঁরা প্রেমানন্দ আস্বাদ করে বলেন—

ঋদ্ধিঃ সিদ্ধি ব্রজ বিজয়িতা সত্যধর্ম্মা সমাধিঃ।
ব্রহ্মানন্দো গুরুরপি চমৎকারয়ত্যেব তাবৎ॥
যাবৎ প্রেম্নাং মধুরিপুবশীকারসিদ্ধৌষধীনাং
গন্ধোঽপ্যন্তঃকরণসরণিপান্থতাং ন প্রয়াতি।

সারার্থ এই যে ব্রহ্মানন্দ তাবৎ কাল পর্যন্ত চিত্ত চমৎকারের কারণ হয় যাবৎ না প্রেমানন্দ আসিয়া অন্তঃকরণ পথের পথিক হয়। এই কথাই রামপ্রসাদ বলেছেন,—"ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় মন চিনি খেতে ভালবাসি।"

এ প্রসঙ্গ এইখানেই থাক, কারণ এ রাজ্য কথার গণ্ডীর বাহিরে সুতরাং আমাদের অধিকারের বাহিরে। শ্রুতি বলেন "ন যত্র বাক্‌ প্রভৃতি মনোযত্রাপি কুণ্ঠিতম্।" ইহাকে ক্রীশ্চান মরমীয়া সাধক বলেন—"ecstatic communion with the Divine." ইহা সান্দ্রানন্দময় মহা মিলন।

প্রেম ও স্বর্গসুখ :

রাবেয়া কি স্বর্গসুখ চাহেন না? তদুত্তরে তিনি বলেন—"Restrain your carnal desires and remember God"—এবং বলেন, "It is the Lord of the House I need, what have I to do with the House?" তিনি নন্দনের আনন্দময় মালিককেই চান—স্বর্গের আরামকক্ষ লইয়া তিনি কি করিবেন—তাঁহার কোনও প্রকার ভোগসুখ বাঞ্ছা নাই।

গোপীপ্রেম ও রাবেয়া :

চৈতন্য চরিতামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন—"আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি ইচ্ছা নাই গোপিকার" রাবেয়ার প্রেম ও ব্রজগোপীদের প্রেমের সমধর্মী, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। তিনি বলেন—"I am no longer 'I' I exist in Him, I am altogether His." বৈষ্ণব পদকর্তা বলেন—ব্রজ গোপীর মুখে—

"সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও,—
জিয়ন্তে মরিয়া যে আপনারে খাইয়াছে,
তারে তুমি কি আর বুঝাও?"

ইহা এক প্রকার annihilation of the 'ego' or 'self' অর্থাৎ—যেন আপনাকে খাইয়া ফেলার অবস্থা—'I exist in Him' ইহাও গীতার সহিত তুলনীয়—"ততো মাংতত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্‌"—বিশতে অর্থাৎ আমাতেই প্রবেশ করে, আমাতেই থাকে, আপনার পৃথক সত্তা হারাইয়া যায়—I am no longer 'I'. 'আমি' তখন 'আমার' নয়,—একান্ত ভাবে তাঁরই।

অতীন্দ্রিয় অনুভূতি :—

T. L. Vaswani বলেন, In Sense-experience you contact an object in space. In Mystical experience you contact the Divine Life in the heart within,—the heart transcends time and space, matter and mechanism." ইহাও উপনিষদের প্রতিধ্বনি—

শ্রুতি বলেন—পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ
ততঃ পরাং পশ্যতি নান্তরাত্মন্‌
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষৎ
আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্‌॥

ইহার সারার্থ এই যে,বিধাতার সৃষ্ট স্বভাবতঃ বহির্মুখ ইন্দ্রিয়গণকে অন্তর্মুখ করিয়া, ধীর সাধক চক্ষু নিমীলিত করেন ও অমৃতত্ব আস্বাদন করেন।

রাবেয়ার আত্মনিবেদন :

ক্রীশ্চান মরমিয়াগণ রাবেয়াকে St. Teresa-র সঙ্গে তুলনা করেন কারণ Love with Rabia was dedication—a total dedication of the will to the Will-Divine." তাঁহার অবস্থা ছিল সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণের অবস্থা—"মামেকং শরণং ব্রজ"র পরিপক্ক পরিণাম বা পরাকাষ্ঠা।

নিষ্কিঞ্চন হইয়া ভগবানের উপর একান্ত নির্ভর করাকে সুফীগণ 'তাওয়াকুল' বলেন। অনুক্ষণ নাম জপ করাকে 'ঢিকার' বলা হয়। এবং ভগবৎ সাক্ষাৎকারকে 'মারিফা' বলা হয়। কৃতকর্মের জন্য মানসিক অনুশোচনাকে 'তওবা' বলে। ঈশ্বর ও ভক্তের মধ্যে যে অনির্বচনীয় প্রেম ভাব—তাহা 'হাব'।

মীরা ও রাবেয়া :

মীরার ন্যায় রাবেয়াও আপনাকে ঈশ্বরের দাসী বলিয়া মনে করিতেন—'a servant of the Lord'—তিনি মানুষের দয়া-দাক্ষিণ্যের প্রতি বিমুখ হইয়া একান্ত ভাবে 'তওয়াকুল' বা ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, "Why should I ask for worldly things from men to whom the world does not belong?" পৃথিবীর মালিক থাকিতে—পৃথিবী যাহাদের নহে—তাহাদের নিকট হাত পাতিব কেন?

ঈশ্বর কখন তাঁর দাস বা দাসীর প্রতি সন্তুষ্ট হন? ইহার উত্তরে রাবেয়া বলেন— সম্পদ পাইলে—সুখ পাইলে—লোকে ঈশ্বরকে যেরূপ ধন্যবাদ দেয়—যখন বিপদে পড়িয়া এবং দুঃখ পাইয়াও ঈশ্বরকে সেইরূপ ধন্যবাদ দিতে পারে তখন ঈশ্বর সেই সেবকের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। রবীন্দ্রনাথের গানেও ঠিক এই ভাবই প্রকাশিত হইয়াছে।

"আমি সুখ দুখ সব তুচ্ছ করিনু প্রিয় অপ্রিয় হে—
তুমি নিজ হাতে যাহা সঁপিবে তাহা মাথায় তুলিয়া লব—
ওহে জীবন বল্লভ!"

অথবা : "তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামী! * *
অশ্রুসলিল ধৌত হৃদয়ে থাক দিবসযামী। * *
মোহপাশ ছিন্ন কর কঠিন আঘাতে—
দাও দুখ দাও তাপ সকলি সহিব আমি"

রাবেয়ার জীবন দর্শন :

রাবেয়া একবার পীড়িত হইলে তাঁহাকে আরোগ্যের

জন্ত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে বলা হইলে তিনি বলেন যে, যিনি পীড়া দান করিয়াছেন—তিনি ঈশ্বর। পীড়া তাঁহার ইচ্ছাতেই হইয়াছে সুতরাং আরোগ্যের প্রয়োজন হইলে তিনিই দিবেন, আমি তাহার জন্ত প্রার্থনা করিয়া তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিব কেন ?

রাবেয়া অতি দীন দরিদ্রের মত জীবনযাপন করিতেন —কেহ কোনোও ধনসম্পদ উপহার দিতে চাহিলে প্রত্যাখ্যান করিতেন। বলিতেন, করুণাময় ঈশ্বর অবিশ্বাসী নরনারীদেরও খাইতে দেন, তিনি আমাকেও প্রয়োজনমতো গ্রাসাচ্ছাদন অবশ্যই দিবেন—তিনি ধনীদের কি ধনী বলিয়াই মনে রাখিবেন এবং আমাকে কি দরিদ্র বলিয়া ভুলিয়া যাইবেন ?

তিনি সকল সময়ে ঈশ্বরের উপাসনায় '(দুয়ায়)' নিমগ্ন থাকিতেন এবং দিব্য ভাবসমাধিতে তাঁহার সহিত কথা বলিতেন '(মোনাজাত)', উপাসনার অন্তরায় বলিয়া তিনি নিদ্রাকেও শত্রুবৎ পরিহার করিতেন, যখন শিথিল অবসন্ন দেহে এলাইয়া পড়িতেন তখন সেই অল্পকাল মাত্র নিরুপায় হইয়া নিদ্রামগ্ন থাকিতেন।

কোনোও ফকির তাঁহার নিকট সংসার ও সংসারী ব্যক্তিগণের নিন্দা করিলে—তিনি তাঁহাকেই নিন্দা করেন এবং বলেন যে, তিনি নিজে একজন সংসারাসক্ত ব্যক্তি, তাহা না হইলে ভগবৎপ্রসঙ্গ না করিয়া, তাঁহার নামগুণ-গান না করিয়া অহরহ সংসারের প্রসঙ্গ করেন কেন ? শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলিতেন—

"যাহারে দেখিলে মুখে স্ফুরে কৃষ্ণনাম
তাহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব প্রধান।"

রাবেয়ার কথাও ঠিক তাই। শ্রীরামকৃষ্ণ এইরূপ পরনিন্দা পরচর্চা করাকে 'মূলা খাইয়া তাহার ঢেঁকুর তোলা'র সহিত তুলনা করিতেন। যে অন্তরে ঈশ্বরকে চিন্তা করে এবং ঈশ্বরকে একান্ত ভক্তি করে,সে সকল সময় ঈশ্বরের প্রসঙ্গ করিতেই ভালবাসে। ঈশ্বরভক্ত বলেন—

"আন কথায় কি প্রয়োজন—
রাম বল মন।"

রাবেয়া স্বগতোক্তি করিতেন—"O soul how long wilt thou sleep ? Soon wilt thou sleep a sleep from which thou shalt not wake again until the trumpet-call on the day of Resurrection." আমাদের সাধকেরাও গেয়েছেন—"সাধের ঘুমঘোর কভু কি ভাঙিবে না। কাল বিছানায় শুয়ে মায়ার চাদরে ঢাকা কেটে গেল কত কাল পাশ ফিরে দেখ না"...ইত্যাদি।

রাবেয়ার প্রার্থনা ছিল এইরূপ,—"Thou art enough for me.—If I worship Thee for fear of Hell burn me in Hell,—if I worship Thee for hope of Paradise, exclude me thence, but if I worship Thee for thine own sake then withhold not from me Thy Eternal beauty." অর্থাৎ "হে ভগবন! যদি নরকের ভয়ে তোমার উপাসনা করি, তা হলে আমায় অনন্ত নরকে নিক্ষেপ কর, যদি স্বর্গের লোভে তোমার পূজা করি তাহা হইলে আমায় স্বর্গ হইতে চিরবঞ্চিত কর—কিন্তু যদি আমি মনেপ্রাণে তোমাকেই চাই তাহা হইলে, হে প্রভু, তুমি তোমার অনন্ত রূপ রস মাধুর্য হইতে আমাকে বঞ্চিত করিও না।"

আগুনের পরশমণি :

রাবেয়ার চক্ষে ঈশ্বর তাঁহার দুঃখের আগুন এবং আনন্দের আলো—"Her Lord was the Fire of Pain and Light of Joy to her Soul."

ভারতের সাধক ও তাঁহার উপাস্যকে অগ্নি, সূর্য এবং চন্দ্রের সহিত তুলনা করিয়াছেন। "এনসাং দহনমঞ্জসা তমো হারি হর্ষ পরিবর্ধনং নৃণাম্।" অর্থাৎ তিনি অগ্নিবৎ, কারণ তিনি পাপ দহন করেন। তিনি সূর্যবৎ, কারণ তিনি অজ্ঞান অন্ধকার দূর করেন। তিনি চন্দ্রবৎ, কারণ তাঁহার রূপের জ্যোৎস্নাকণায় অন্তর আনন্দে পরিপূর্ণ হয়।

সুফী সাধক প্রেমিক ঈশ্বরের সহিত লৌকিক প্রেমিকার মত অবিচ্ছেদ্য অলৌকিক মিলনে মিলিত হন। "Spiritual Marriage of Lover and the Beloved." বিরহাগ্নির দাহিকাশক্তি সকল ভক্তকেই দহন করে। স্পেনের মিষ্টিক সাধক সেণ্ট জন (St. John of the Cross) বলেন :—

"Love has set the Soul on Fire and transmuted it into love, Love has annihilated and destroyed all that is not love."

ইহাই রবীন্দ্রনাথের 'আগুনের পরশমণি' যাহা জীবনকে ধন্য করে এবং পুণ্য করে দহন-দানে। রাবেয়া ভূমানন্দে মিলনানন্দে ধন্য হইয়াছিলেন। মার্গারেট স্মিথ বলেন :—"Rabia reached the exalted state. She had attained the goal of her quest. She was at last and for ever with her Friend, she beheld the Everlasting Beauty."

ভাবার্থ এই যে রাবেয়া বোধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার ঈপ্সিত ধনকে পাইয়াছেন, তাঁহার বন্ধুর সহিত

চিরমিলনে মিলিত হইয়াছেন এবং সেই অরূপের অপরূপ সৌন্দর্যও দর্শন করিয়াছেন।

সমন্বয় দর্শন :

প্রবন্ধে তুলনামূলক যে সমস্ত বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা সমন্বয়ের জন্যই করিয়াছি। বক্তব্য এই যে, যিনি যে ভাবেই ব্রহ্ম সংস্পর্শ লাভ করুন না কেন, সকলের মুখে একই কথা—"আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।"

সুফী সাধক মামুদ শাবিস্তারি বলেন—"Beneath the Veil of each atom is the Soul ravishing beauty of the Face of the Beloved."

মধুমতী ঋকৃও বলেন—"মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।" রাবেয়ার মত—ফরাসী ক্রীশ্চান মিষ্টিক সাধিকা ম্যাদাম গাঁয়োও সৃষ্টির সৌন্দর্য দেখিয়া স্রষ্টার সৌন্দর্যের দিকেই মুখ ফিরান —"The beauty of the Giver far outweighs the beauty of His gifts." গাঁয়ো বলেন—"Far from enjoying what these scenes disclose—

"* * * Their form and beauty but augment my woe
I seek the Giver of the charms they show."
—(Translated by Margaret Smith.)

অর্থাৎ

প্রকৃতির রূপ কহ অপরূপ সে রূপের কোথা তুলনা
যাহার পরশে রূপসী পৃথিবী সে রূপ কেমন বল না,—
এরূপ দেখিয়া সেরূপের লাগি অনুরাগে হিয়া কাঁদে গো
সে-রূপ নয়ন মন বিমোহন এরূপে নয়ন ধাঁধে গো।

(মৎকৃত অনুবাদ)

বিশ্বনাথের বিশ্বব্যাপী নিসর্গ সৌন্দর্যে (Pantheism) মুগ্ধ হইয়া কবি জামি তাঁহার ইউসুফ উ জুলেখা কবিতায় বলেন—

Each speck of matter did He constitute
A mirror causing each one to reflect
The beauty of His visage. * * *
Each shining lock
Of Lyla's hair attracted Majnu's heart
Because some ray Divine reflected shone
In her fair face. 'Twas He to Shirin's lips
Who lent that sweetness, which had power to steal
The heart from Parriz and from Farhad life.
His beauty everywhere doth show itself
And thro the forms of earthly beauties shines
Obscured as thro a veil. * * *
Wherever thou seest a veil
Beneath that veil He hides.
—(Translated by E. G. Browne: **Religious Systems of the World,** p. 329.)

ইহা ভগবদ্রূপের এবং প্রেমের বিশ্বরূপ-দর্শন, তাহাতে সন্দেহ কি?

রাবেয়ার চক্ষে পাপ ভীষণ এবং জুগুপ্সিত—তাহা নরকের শাস্তির ভয়ে নহে, তাহা ঈশ্বর-সান্নিধ্য হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করে বলিয়া।

যত মত তত পথ :

সুফী সাধকরা উদারমতবাদী। আবু তালিব বলেন —"There are myriad ways to God. * * *The ways to God are as many as the believers." ইহা শ্রীরামকৃষ্ণের "যত মত তত পথ" বা গীতার—"মম-বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ"। অথবা :

মহিম্নস্তবের "নৃণামেকোগম্যস্ত্বমসি পয়সার্ণব ইব"

পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যা :

সুফী সাধক পুঁথিগত জ্ঞানে সেরূপ বিশ্বাসী নহেন—যেরূপ উপলব্ধিলব্ধ প্রত্যক্ষ জ্ঞানে বা ঈশ্বরদত্ত জ্ঞানে বিশ্বাসী। আবু তালিব বলেন—"The Gnostic is not one who commits to memory the Quran. He takes his knowledge from his Lord, without having to learn or study it. He has no need of a book and he is the true spiritual Gnostic."

উপনিষদও চতুর্বেদকে অপেক্ষাকৃত অপরা বিদ্যার মধ্যে গণ্য করিয়া বলিয়াছেন—"অথ পরা যয়া তদক্ষর-মধিগম্যতে"—অর্থাৎ যে জ্ঞানের দ্বারা অক্ষর ব্রহ্মের পরিচয় হয়, তাহাই পরাবিদ্যা। দেবী সূক্তে যাহাকে বলা হইয়াছে "চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাং।"

শিরাজের সুফী সাধক বাবা কুহি বলেন—

"In the market place and cloister,—in the valley and the mountain,—only God I saw
In favour and fortune and tribulation,—in prayer and praise and contemplation,—only God I saw.
Like a candle I was melting in His fire,—
Amidst the flames outshining, I saw my sire,—
I pass into nothingness and vanish
I find I'm living in eternal bliss—when only God I saw."

দ্বৈতাদ্বৈত অনুভূতি—ব্রহ্মসাযুজ্য ও ব্রহ্মনির্বাণ :

• ব্রহ্ম সাযুজ্য Unification-কে সুফী সাধক বলেন—Tawhid.—তৌহিদ।

"Unity involves cessation of human volition and affirmation of the Divine Will, so as to exclude all personal initiative. Transformation of the individual outlook into the universal outlook,—the complete surrender of man's personal striving to the overruling Will of God and thus the linking up of all the successive acts of daily life with the Abiding."

—(E. Underhills' **Man and the Supernatural**, p. 246.)

এই Unification ব্রহ্মসাযুজ্য ও Union ব্রহ্ম নির্বাণ এক নহে। Unification বা তৌহিদের মধ্যে ঈষৎ দ্বৈতাভাস থাকে, কিন্তু Union বা ব্রহ্মনির্বাণের মধ্যে দ্বৈতের লেশমাত্রও থাকে না।

[Tawhid is 'unification' not yet 'union',—when 'Thou' and 'I' cease to exist. Tawhid is symbolized by a drop of water merged in the ocean—]

অর্থাৎ তৌহিদ অবস্থায় যেন "জলের বিম্ব জলে উদয় জল হয়ে সে মিশায় জলে"—the spark is absorbed in the flame—বৈষ্ণব দর্শন বলেন—"ঈশ্বরের স্বরূপ হয় জলিত জলন্, জীবের স্বরূপ তাহে স্ফুলিঙ্গের কণ (চৈতন্য-চরিতামৃত) তৌহিদ অবস্থায় স্ফুলিঙ্গ অগ্নির মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে—'the part becomes one with the whole' অংশ অংশীর মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে কিন্তু তবুও সম্পূর্ণরূপে স্বকীয় 'স্বত্ব' এবং 'সত্তা' হারায় নাই—

["Not losing its identity but returning to its source,—the spirit of man made one with the Eternal Spirit. It is the natural life of the saints they seem to melt and pass away into the will of God."]

অনন্ত শরণ হইয়া "ময়ি চানন্ত যোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী" অবলম্বন করিয়া একান্ত ভাবে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করার নাম তাওয়াকুল 'Tawakkul' অর্থাৎ ইহা complete dependence and trust in Him. ইহা জাগতিক ব্যাপার পরিত্যাগপূর্বক তাঁহার ইচ্ছায় নিজের ইচ্ছা লয় করার স্বাভাবিক পরিণতি—অর্থাৎ

Tawakkul is the natural consequence of renunciation of this world and the abnegation of the individual will.

—(St. Bernard: **On the Love of God**, pp. 44-45.)

Unification-এর পরে Union হয় তখন—যখন ব্রহ্ম-নির্বাণ লাভ করায় জীবের আর পৃথক সত্তা থাকে না ব্রহ্মবিদ্‌ব্রহ্মৈব ভবতি,—ইহা ভক্তের আকাঙ্ক্ষিত নহে।

[The soul has reached the highest degree of sanctity, when she sees God only in all things and has no interests but His interests.]

—(E. Underhill: **Man and the Supernatural**, p. 245.)

ইহা আত্মার পবিত্রতার পরাকাষ্ঠা, সর্বত্র ঈশ্বর-দর্শন এবং তদর্পিতাখিলাচারিতা বা তৎ (তাঁহাতে) অর্পিত অখিল আচার এর অবস্থা। সুফী ও মরমিয়া মিষ্টিক সাধক বলেন—

['You should be to God,—as if you were not,—and God should be to you as One Who was and is and shall be to eternity.]

ভক্তের চক্ষে তাওয়াকুল ও তৌহিদ প্রায় সমার্থক।

[To a servant of God—Tawakkul is practically identical with the Sufi conception of Tawhid—for—a suckling knows only its mother's breast'—]

কারণ—স্তনন্ধয় শিশু মাতার স্তনমাত্রই জানে।

পাপ ও পুণ্য :

রাবেয়া পাপ পুণ্য দুইই একান্ত পরিহার করিতে বলিতেন—Cancel your good deeds, as you Cancel your evil deeds. শ্রীরামকৃষ্ণ পাপ-পুণ্যকে লোহের ও স্বর্ণের শৃঙ্খল বলিতেন—যেহেতু উভয়ই বন্ধনের হেতু। গীতা বলেন, 'নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং নচৈব সুকৃতং বিভুঃ। অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ। অর্থাৎ পাপ ও পুণ্য অজ্ঞান-প্রসূত, জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম কিছুই গ্রহণ করেন না।

সুফী সাধনার শেষ কথা প্রেম :

সুফী উপসনার শেষ কথা—প্রেম, শেষ গম্য এবং শেষ কাম্যও প্রেম।

Contemplation of the vision of God,—unveiled in all His Beauty and the abiding union of the lover with the Beloved.

সুফী সাধক সর্বাবস্থায় সন্তুষ্ট, গীতোক্ত 'সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ় নিশ্চয়ঃ। ময্যর্পিত মনোবুদ্ধির্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।" ১২।৪

সুফীরা বলেন—

["That man is a Sufi, who is satisfied with whatever God does, so that God will be satisfied with whatever He does.]

সেই সুফী যে ঈশ্বর যাহা করেন তাহাতেই সন্তুষ্ট,

ফলে ঈশ্বর ও তাহার প্রতি 'যাহা ইচ্ছা তাহা' নিজের সন্তোষমতে করিতে পারেন, যাহা তাঁহার খুশি।

তিনি বলেন—

If thou dost chastise me,—I will love thee. If thou dost have compassion on me, I will love thee.

শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরচিত শ্লোক—'যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎ প্রাণনাথস্ত স এব নাপরঃ' এই অবস্থারই পরিচায়ক। 'পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম আনন্দের সিন্ধু, মোক্ষাদির আনন্দ তারন হে এক বিন্দু' তাই ভক্ত অবাধে অবাধ্য প্রেমিক ভগবানকে লম্পট বলেও সর্বস্ব অর্পণ করেছেন।

সেই লম্পট যাহাই করুক না কেন সেই আমার হৃদয়-সর্বস্ব। এই প্রেমের ফলে হয় সত্য শিব সুন্দরের দর্শন। সুফী বা মিষ্টিক মরমী সাধকগণেরও সেই কথা। Love leads to Beatific Vision. তাহা প্রাপ্তির ক্রম যথা: —From knowledge to Love, from Love to Sight, from Sight to Union. বৈষ্ণব সাধনার ক্রমও এইরূপ 'এখনও তারে চোখে দেখিনি শুধু বাঁশী শুনেছি' এইরূপ তাঁহার সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান, নাম শ্রবণ, চিত্রপট দর্শন প্রভৃতি পূর্বরাগের উদ্রেক করে। কবি বায়রণও বলিয়াছেন—

"To know her is to love her,—
Love but her for ever—
For Nature made her what she is,
And never made another."

তাহাকে জানিলে তাহাকে ভালবাসিতেই হইবে এবং তাহাকে ভালবাসিলে সকল ভালবাসা তাহাতেই পর্যবসিত হইবে কারণ তাহার মতো আর কেহই নাই এবং তাহা ব্যতীত আর কিছুই নাই।

[All its desires now are to be lost in Him . . . The choice the effort, the self-stripping, the purging and transmuting fires . . . . even the darkness, desolation and abandonment, the bitterness of spiritual death . . . constitute the tests for Him—about its courage and truth.]

—(**The Spiral Way, p. 113.**)

হিন্দুর পূজায় যজ্ঞে দীক্ষায় যে 'স্বাহা' শব্দটি প্রযুক্ত হয় তাহার অর্থ একান্ত ভাবে আত্ম সমর্পণ। 'স্বং আত্মু হোমি' অর্থাৎ আপনাকে সম্পূর্ণ ও সমগ্রভাবে পূর্ণাহুতি দিলাম। কবির ভাষায়, সকল সুখের সকল দুঃখের প্রদীপ জেলে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পঞ্চ প্রদীপে তাঁহার আরতি করা এবং তাঁহার নিকট নিঃশেষে আত্ম-নিবেদন করাই প্রেমের তাৎপর্য।

ক্রীশ্চান মিষ্টিক John of Ruysbroeck এই মহা-মিলন সম্বন্ধে বলেন:

["The spirit through love plunges into the depth and through this intimate feeling of union—melts itself into the unity and through dying to all things, into the life of God and there it feels to be one-life with God."]

অর্থাৎ যেন ছান্দোগ্যের ভাষায় নুনের পুতুল ব্রহ্মসাগরে নিমজ্জিত হয়ে যাওয়ার মতো। যেন রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'রূপসাগরে ডুব দিয়ে অরূপরতন প্রাপ্তি', যদিও প্রাপ্তির আশার কথাই তিনি বলিয়াছেন, কারণ প্রাপ্তির স্বরূপ 'অবাঙ মনস গোচর।' ক্রীশ্চান মিষ্টিক ইহাকে অমৃতাগ্নির সহিত তুলনা করিয়াছেন।

["The flame of the Love of God consumes all. And in this Love we shall burn without end through eternity,—for herein lies the blessedness of all spirits." (Ibid).]

নারদ ভক্তি সূত্রে ইহাকে মূকাস্বাদনবৎ বলিয়াছেন। চলতি কথার কৌতুকোক্তিতে যেমন বলা হয়—"বোবায় কয় কালায় শোনে, অন্যে কি তার মর্ম জানে?"

শঙ্করাচার্যও বলিয়াছেন—

"চিত্রং বটতরোর্মূলে বৃদ্ধাঃ শিষ্যা গুরুর্যুবা।
গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যা স্তুচ্ছিন্ন সংশয়াঃ॥
(দক্ষিণামূর্তিস্তোত্রম্)

অর্থাৎ অক্ষয় বট তরুর মূলে এক যুবা গুরুর চতুর্দিকে বৃদ্ধ শিষ্যগণ সমবেত। গুরু মৌন হইয়াই ব্যাখ্যা করিতেছেন এবং তাহাতে শিষ্যগণের সংশয়ভঞ্জন হইতেছে—এই বিচিত্র ব্যাপার।

আত্তার রাবেয়া সম্বন্ধে বলিয়াছেন—'that woman on fire with love and ardent desire consumed with her passion for God'—অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি প্রেমের অগ্নিশিখায় তাঁহার সমগ্র সত্তা এবং আকাঙ্ক্ষা যেন জ্বলিতেছে। রাবেয়ার প্রেম, অকৈতব বা অকপট নিখাদ প্রেম—যেন জাম্বুনদ হেম'—নন্দন কাননের লোভে নহে—নরক যন্ত্রণার ভয়ে নহে স্বতঃসিদ্ধ প্রেম—'neither in hope of eternal reward nor in fear of eternal punishment.'

রাবেয়ার 'বেহেশ্‌ত্‌' বা নন্দনকানন ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার—"Paradise is the Vision of the Beloved, not a place for sensual joys."

রাবেয়ার 'দোজখ' বা নরক—তাঁহা হইতে বিচ্ছেদ 'Hell is separation from God, not a place of punishment.'

রাবেয়া বলেন যে তাহার ঈশ্বর-সেবা সার্থক নহে যে শাসনের ভয়ে বা পুরস্কারের লোভে ঈশ্বরের পূজা করে।

সাধারণ ভয় (রাহ বা) জীবকে ভয়ের বস্তু হইতে দূরে লইয়া যায়। কিন্তু ঈশ্বর-ভীতি বা holy dread, সুফীদের মতে, জীবকে ঈশ্বরের নিকটেই লইয়া যায়—He who fears a thing flees from it, but he who truly fears God flees unto Him. অনন্যাশ্রয় শিশুর মতো মাতা শাসন করিলেও শিশু মাতাকেই গিয়া জড়াইয়া ধরে। যেহেতু রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

"আমার পরাণ যাহা চায়, তুমি তাই তুমি তাই গো—
তোমা ছাড়া আর এজগতে মোর কেহ নাই কিছু
নাই গো।"

ভগবৎ প্রেমলীলাও লৌকিক প্রেমের মতো করিয়াই বুঝিতে হয়। বেদান্ত সূত্রে পাই "লোকবত্তু লীলা কৈবল্যম্।" কারণ রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

"আর পাব কোথা—দেবতারে প্রিয় করি
প্রিয়েরে দেবতা।"

যাহা লৌকিক তাহাই ঈশ্বরের প্রতি প্রযুক্ত হইয়া অলৌকিক প্রেমে পরিণত হয়। তাই নারদ ভক্তিসূত্রে পাই—"তদর্পিতাখিলাচারঃ সন্ কামক্রোধাভিমানাদিকং তস্মিন্নেব করণীয়ং তস্মিন্নেব করণীয়ম্।"

সুফীরাও বলেন—

["Love, Hope and Fear are bound up together. Love is not perfect without fear, nor fear without hope, nor hope without fear."]

লৌকিক প্রেমের মতোই ইহারা এই প্রেম আশা এবং আশঙ্কা, অন্যোন্যাশ্রয়ী হইয়া বিচিত্র মাধুর্যের সৃষ্টি করে।

রাবেয়া বলিতেন আমাদের ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ সেই দিনই বিশুদ্ধরূপে হয় যেদিন আমরা সুখ দুঃখ সম্পদ বিপদকে ঈশ্বরের দেওয়া বলিয়া সমান ভাবে গ্রহণ করিতে পারি—

["When our pleasure in prosperity is equal to our pleasure in adversity."]

রাবেয়া বলিতেন স্বর্গের পথ দগ্ধ করিতে তিনি অগ্নি চাহেন, এবং নরকাগ্নি নির্বাণ করিতে তিনি চাহেন জল—কারণ উভয়েরই সহিত তিনি নিঃসম্পর্ক। প্রথমটির আশায় বা দ্বিতীয়টির আশঙ্কায় তিনি ঈশ্বরের ভজনা করেন না। যিনি করেন তিনি ঈশ্বরের অনুরক্ত সেবক নহেন। পুরাণেও পাই প্রহ্লাদের মুখে "ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্।" বাংলা গানেও শুনি তাহারই প্রতিধ্বনি—

"যে দেয় প্রেম করে ওজন, সেজন প্রেমিক নয়কো কখন,
সংসারের বণিক সেজন থাকে সংসারে॥"

রাবেয়াকে প্রশ্ন করা হয়—'তিনি কি শয়তানকে ঘৃণা করেন না? তিনি কি হজরৎ মহম্মদকে ভালবাসেন না? তাহার উত্তরে তিনি বলেন, আমার অন্তর ঈশ্বর প্রেমে পূর্ণ হইয়াছে, তাহাতে শয়তানকে ঘৃণা করিবার মতো ঘৃণার জন্য কোনো স্থান নাই, হজরৎকে ভালবাসিবার জন্যও কোনো স্থান নাই—

["My love to God has so possessed me that no place remains for loving or hating any save Him."]

অর্থাৎ "ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট সে তরী,
আমারি সোনার ধানে গিয়াছে ভরি।"
(রবীন্দ্রনাথ)

তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত বৃত্তি ঈশ্বরমুখী, ইহাই 'তদর্পিতাখিলাচারিতা,' তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত প্রেম ঈশ্বরে সমর্পিত—অন্য কিছুরই এবং অন্য কাহারও স্থান নাই।

রাবেয়ার একমাত্র প্রার্থনা ছিল, যেন ঈশ্বর তাঁহাকে সকল প্রলোভন, সকল প্রতিবন্ধক হইতে আকর্ষণ করিয়া তাঁহার সকল বৃত্তি ঈশ্বরাভিমুখী করিয়া দেন, কারণ ঈশ্বরই তাঁহার একমাত্র আশ্রয়—'I take refuge in Thee' বা "নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ" বা "তস্মাত্ত্বমস্ত শরণং মম দীনবন্ধো।"

ভারতবর্ষে সুফী সাধনা:

এস্. ওয়াজেদ আলী বলিয়াছেন—ভারতবর্ষে ইসলামের আধ্যাত্মিক প্রভাব "মুখ্যতঃ সুফীপন্থী দরবেশদের সাধনার ফল।" ইঁহাদের "প্রধান এবং প্রথম হচ্ছেন সুলতান উল্ হিন্দ্ খাজা মইন্ উদ্দীন চিস্তী" আজমীর শরিফে ইঁহার 'মজার' বা সমাধি আছে, ইহা ভারতবর্ষে মুসলমানদের সর্ব প্রধান তীর্থ। গওসুল আজম আবদুল কাদের জিলানী ছিলেন সর্ব প্রথম সুফী এবং সুফীমতবাদীদের গুরু, এইজন্য ইঁহাকে পীরম্ পীর বা গুরুদের গুরু বলা হয়। আজমীরের খাজা মইন্ উদ্দীন ছিলেন ইঁহার প্রশিষ্যদের অন্যতম। ('পশ্চিম ভারতে'—এস ওয়াজেদ আলী)। আজও ইসলাম জগতে সুফী সাধনা আধ্যাত্মিক সাধনার উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত।

শীত

শ্রীসীতা দেবী

পশ্চিমবঙ্গের একটি ছোট শহর। ইচ্ছা করিলে ইহাকে বড় গ্রামও বলা যায়। শহরের সুখসুবিধা কিছু কিছু আছে। দু'তিন বৎসর হইল এখানে ইলেকট্রিক আলো আসিয়াছে। যাঁহারা পাকা বাড়ীতে বাস করেন, তাঁহারা অনেকেই এখন নিত্য কেরসিনের লণ্ঠনের চিম্‌নি পরিষ্কার করার হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন।

এইরকম একটি বাড়ীর বাহিরের ঘরে একটি যুবক অত্যন্ত বিরক্তমুখে বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়াছে। সকাল হইয়াছে কিছুক্ষণ হইল, তবে ছুটির দিন বলিয়া জয়ন্তের উঠিবার তাড়া ছিল না। রাত্রিটা একরকম আধ-ঘুম, আধ-জাগরণের ভিতর দিয়াই কাটিয়াছে। দারুণ শীত পড়িয়াছে এবার, কিন্তু জয়ন্ত যে লেপখানি ব্যবহার করে তাহা শতছিন্ন, ভাল করিয়া শীত নিবারণ হয় না। বাবা-মাকে বলিয়া কিছু লাভ নাই, তাঁহারা তখনই সংসারের অভাব-অনটনের কথা পাড়িয়া কাঁদুনি গাহিতে বসিয়া যাইবেন। অথচ অভাব বিশেষ হইবার কোনো কারণ নাই, তাহা জয়ন্ত ভাল করিয়াই জানে।

কাল ত ঘুম হয়ই নাই। ইহার পর শীত কিছুদিন বাড়িবে বই কমিবে না। মাঘ মাস পড়িবার মুখে। পুরা মাসটাই শীত যাইবে, ফাল্গুনের গোড়ার দিকেও শীত খানিকটা থাকে।

কাল পর্য্যন্ত ছেঁড়া লেপের উপর একটা র‍্যাপার চাপা দিয়া জয়ন্ত কোনোমতে রাত কাটাইয়াছে। র‍্যাপারটি তাহার দিনেরবেলার ব্যবহার্য্য শীতবস্ত্র, কাজেই রাত্রে এভাবে গায়ে জড়াইয়া শুইতে তাহার ইচ্ছা করে না, কিন্তু উপায়ই বা কি? দিনেরবেলা ঝাড়িয়া, ভালভাবে পাট করিয়া, হাতের পালিশে যথাসাধ্য ইস্ত্রি করিয়া সে সেটিকে জাতে তুলিতে চেষ্টা করে, তবে খুব যে ভাল ফল হয় তা বলা যায় না।

মিনিট কয়েক বিছানায় বসিয়া থাকিয়া সে আস্তে আস্তে পা নামাইয়া চটিজোড়া খুঁজিতে লাগিল। ইঃ, একেবারে যেন বরফের টুক্‌রা দুটা। মুখখানা আরো ব্যাজার করিয়া সে বারান্দায় বাহির হইল। বাল্‌তিতে তোলা জল থাকে, হাতমুখ ধুইবার জন্য। আগে আগে খোলা পড়িয়া থাকিত, কাকে মুখ ডুবাইত, কুকুরে মুখ দিয়া যাইত। জয়ন্ত বকাবকি করার ফলে জলটা এখন একটা কাঠের পিঁড়া দিয়া ঢাকা থাকে।

মুখ-হাত ধুইয়া ঘরে আসিয়া বসিতেই তাহার ছোট বোন সরলা আসিয়া ঘরের ছোট টেবিলটার উপরে এক পেয়ালা চা এবং কানা-ভাঙা পিরীচে দুইটি মুড়ির মোওয়া রাখিল। বলিল, "তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও, এখনি জুড়িয়ে যাবে, সেই কোন্ সকালে চা হয়!"

জয়ন্ত বলিল, "যা না ছিরির চা, তা আবার তপ্ত না ঠাণ্ডা। আর মুড়ির মোওয়াতে ত দাঁত ভেঙে যায়। এটা কোন্ সালে তৈরী রে?"

সরলা মুখ হাঁড়ি করিয়া বলিল, "কে জানে বাপু! তোমার ত বাড়ীর কোনো জিনিস পছন্দ না। তা কি আর হবে, গরীবের সংসার!"

কথাটা তাহার মায়ের কথারই অনুকরণ, না হইলে সরলার বয়সে কথার বাঁধুনি ওরকম হইবার কথা নয়। জয়ন্ত বিরক্ত মুখেই একটা মুড়ির মোওয়া ও আধ-পেয়ালা চা শেষ করিয়া বাহিরে যাইবার জন্য পা বাড়াইল।

এক কালে ত অবস্থা তাহাদের ভালই ছিল। তাহার নিজের মা বড়লোকের মেয়ে ছিলেন। বসতবাড়ীখানি জয়ন্তের দাদামশায় মেয়েকে যৌতুক দিয়াছিলেন, এবং জামাইয়ের নামে কিছু ধানের জমিও কিনিয়া দিয়াছিলেন। নগদ টাকা পণ দেওয়ায় তিনি বিশ্বাস করিতেন না, বলিতেন, "ও ত বুড়োবুড়ী খেয়ে বসে থাকবে, না হয় নিজের মেয়ের বিয়ে দিতে খরচ করে দেবে। আর আমার মেয়ে বসে আঙুল চুষবে! তার চেয়ে বাড়ীঘর, জমিজমা করে দি, ও সব লোকে যখন-তখন নষ্ট করে না। আখেরে কাজে লাগবে।"

জয়ন্তের বাবা চাকরিও করিতেন তখন। সব মিলিয়া তাহারা ত ভালই ছিল। ভাল খাইত, ভাল পরিত, রাত্রেও এরকম বুকে হাঁটু দিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে প্রহর গুণিতে হইত না। তাহাদের দুই ভাই বসন্ত ও জয়ন্তকে পাড়ার অন্যান্য ছেলেরা ক্ষ্যাপাইত বড়লোকের ছেলে বলিয়া।

মা মারা যাইতেই সব যেন ওলট-পালট হইয়া গেল। এমন কোনো আত্মীয়া ছিলেন না, যিনি আসিয়া সংসারের

হাল ধরিতে পারেন। বাবা বড় অবুঝ ও অক্ষম মানুষ, কোনো কিছুই গুছাইয়া করিতে পারিলেন না। মাঝ হইতে পীড়িত হইয়া পড়িয়া চাকরিটিও খোওয়াইলেন।

মা মারা যাইবার সময় বসন্তের বয়স ছিল ষোলো, এবং জয়ন্তের তেরো। ইহারাই পড়িল বিষম মুস্কিলে। সংসার ত চিড়িয়াখানা হইতে বসিয়াছে, তাহারা না পায় সময়ে খাইতে, না পায় স্কুল-কলেজে যাইতে। মরিয়া হইয়া শেষে দু'জন মামার বাড়ীর আশ্রয় লইবে কিনা ভাবিতে লাগিল।

দাদামশায় তখন বাঁচিয়া নাই, দিদিমাই সংসারের মাথা। তিনি বাধা দিলেন। বলিলেন, "অমন কাজ করিসনে লক্ষ্মী দাদারা আমার! তোর বাপের কোনো সুবুদ্ধি নেই, তোরা চলে গেলে সে সব নষ্ট করে ফেলবে। বাড়ী তোদের, সে বেচতে পারবে না, কিন্তু দরজা-জানলা, কড়ি-বর্গা সব লুকিয়ে লুকিয়ে বেচবে। তোরা কষ্ট করে সংসারে থাক, তা হলে যেমন করে হোক, দু'বেলা দু' হাঁড়ি ভাত তাকে সেদ্ধ করে নিতে হবেই। ধানের জমিটা রেখেই দেবে, যদি ঘটে কোনো বুদ্ধি থাকে!"

বসন্ত বলিল, "আমরা কি পড়াশুনো করব না, গোমুখ্যু হয়ে থাকব?"

দিদিমা বলিলেন, "কেন? বসন্ত ম্যাট্রিক পাস করেছে ত? সে কলেজে ভর্ত্তি হোক, জয়ন্তও তোদের ওখানের স্কুলে পড়ুক। স্কুলটা ত ভালই, বছর বছর অনেক ছেলে পাস হচ্ছে।"

বসন্ত বলিল, "পড়াশুনো করার খরচ কম নাকি? কলেজের, স্কুলের মাইনে আছে, বই কেনার খরচ আছে, পরীক্ষায় fees দেবার খরচ আছে। আর কাপড়-চোপড়ের যা দশা—এ পরে কিছু ভদ্র সমাজে বেরনো যায় না। তার পর আমাদের এখান থেকে যারা পাশের শহরে কলেজে পড়তে যায় তারা ভাগাভাগি করে পয়সা দিয়ে ঘোড়ার গাড়ী করে যায়।

দিদিমা বলিলেন, "সবের ব্যবস্থা হচ্ছে, তোমরা আমার কথামত থাকত বাপের বাড়ী আঁকড়ে! থাকাটা আর খাওয়াটা যদি চালিয়ে নিতে পার, বাকি সব কিছুর খরচ আমি দেব।"

বসন্ত বলিল, "কোথা থেকে দেবে? তোমাদেরই ত এখন অবস্থা ভাল যাচ্ছে না? মামাবাবু রাগ করবেন।"

দিদিমা বলিলেন, "মামাবাবুকে রাগ করতে হবে কেন? তার কিছু আমি কেড়ে নিতে যাচ্ছি না ত? তোর মায়ের গহনা রয়েছে না আমার কাছে? সে ত শেষ যেবার আসে বাপের বাড়ী, সব আমার কাছে রেখে গিয়েছিল। চিনত ও তোর বাপকে? বলেছিল তোদের বৌদের দিতে। তা লেখাপড়া শিখে মানুষ না হলে বউ আসবে কোথা থেকে? তোদের যুগ্যি বউ হওয়া চাই ত?"

দুই ভাই সানন্দে রাজী হইল, এবং ফিরিয়া বাপের বাড়ী চলিয়া গেল।

ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, বাপের মতিগতির একটু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। দুই ছেলেই রাগ করিয়া মামার বাড়ী চলিয়া যাওয়াতে তাঁহার একটু আঁতে ঘা লাগিয়াছিল। এক প্রতিবেশিনী বৃদ্ধাকে তিনি জোগাড় করিয়াছিলেন খাওয়া-পরার লোভ দেখাইয়া। ইনি দুই বেলা রান্না করিয়া দিবেন ও বাসন-কোষণ মাজিয়া দিবেন। ঘরদোরের অন্য কাজগুলি কে করিবে তাহা বুঝা গেল না। যাহা হোক, এও মন্দের ভাল।

ছেলেরা আবার পড়াশুনা সুরু করিল। কোথা হইতে খরচ আসিতেছে তাহা বাপ আর জিজ্ঞাসা করিলেন না, আন্দাজে বুঝিয়া লইলেন।

এই ভাবে অনেকগুলি দিন কাটিয়া গেল। বসন্ত পড়াশুনার বেশী ভক্ত ছিল না, তবে করিয়া খাইতে হইবে বলিয়া সে পড়াশুনা চালাইয়া চলিল। জয়ন্ত পড়ায় বেশ ভাল ছিল, সেও এবার স্কুল ছাড়িয়া কলেজে ভর্ত্তি হইল।

এমন সময় অনেকগুলি ব্যাপার ঘটিয়া গেল। বসন্ত-জয়ন্তের প্রৌঢ় পিতা আবার বিবাহ করিয়া বসিলেন একটি দরিদ্র ঘরের বয়স্থা মেয়েকে, এবং জয়ন্তের দিদিমা মারা গেলেন। তবে মারা যাইবার আগে কন্যার শেষ গহনা-গাঁটি বিক্রয় করিয়া টাকা তিনি বসন্তের হাতে দিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন, "পড়াশুনো ছাড়িসনে দাদারা। পেটে বিদ্যে থাকলে সে মানুষ না খেয়ে মরে না।"

সৎমা বাড়ী আসায় বাড়ার শ্রী একটু ফিরিল বটে, তবে হাঙ্গামা বাড়িল অন্য দিকে। জয়ন্তের বাবা রামপ্রসন্ন একটু সেবাশুশ্রূষার লোভে বিবাহ করিয়াছিলেন। বধূ পিতৃগৃহ হইতে কিছু খাটিবার ক্ষমতা এবং একটি ক্ষুরধার রসনামাত্র যৌতুকস্বরূপ আনিয়াছিলেন। ভাত-তরকারি তিনি পূর্ব্বের বৃদ্ধা পাচিকা অপেক্ষা ভালই রাঁধিতেন, ঘরে ঝাঁটপাটও দিতেন। কিন্তু তাঁহাকে কোনো সুখ বা সম্পদ দিতে অক্ষম স্বামীর সহিত সারাদিনই প্রায় ঝগড়া করিতেন। সেবা পাওয়া ত চুলায় গেল, ঘরে বসিয়া থাকাই রামপ্রসন্নর অসম্ভব হইয়া উঠিল।

স্ত্রী মুখ নাড়া দিয়া বলিলেন, "বাড়ীও ত শুনেছি তোমার ছেলেদের। তা যখন তুমি থাকবে না, তখন কি আমি রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব ?"

রামপ্রসন্ন বলিলেন, "ওরা ছেলে ভাল, তোমায় ফেলে দেবে না। আর জমি-জমা ত আছে ?"

পত্নী ঠোঁট উল্টাইয়া বলিলেন, "আহা, কত বড় না জমিদারী, তাতেই আমার সব চলবে! আর সতীনপোতে যা আমায় দেখবে, তা জানা আছে। কি কুঁড়ে মনিষ্যি গো তুমি, একটু ঘর ছেড়ে নড়তে চাও না? বাইরে গেলে দুটো পয়সা ত আনতে পার? পড়াশুনো ত করেছিলে বলে শুনি!"

রামপ্রসন্নকে অতঃপর সে চেষ্টাও করিতে হইল। খুব যে উপার্জ্জন করিতে পারিলেন তাহা নয়, তবে বাড়ীর বাহিরে অনেকটা সময় কাটিত বলিয়া কান দুইটা একটু শান্তি পাইত।

নূতন গৃহিণীর একটি কন্যা হইল। বাড়ীর কাজ এখন আর ভাল করিয়া হয় না, সারাদিন কলহ লাগিয়া থাকে। শিশুর ক্রন্দনে ও ঝগড়ার আস্ফালনে বাড়ীতে কান পাতা ভার হইয়া উঠিল।

বসন্ত রাগী মানুষ, সে কয়েকদিন সহ্য করিল, তাহার পর বাবাকে বলিল, "আমি আর পড়ব না, চললাম। এ বাড়ীতে শেয়াল-কুকুর টিঁকতে পারে না ত মানুষ! আমি কাজ একটা পেয়েছি হালি শহরে, সেখানে যাচ্ছি, এ রকম শাকসেদ্ধ ভাত জুটে যাবে।"

বাবা বলিলেন, "তা ত বলবেই, এখন হাত-পা গজিয়েছে কি না? বুড়ো বাপের প্রতি একটা কর্ত্তব্যনেই?"

বসন্ত বলিল, "কর্ত্তব্য করতে আমায় দিচ্ছে কে? সে পথ আর তুমি রেখেছ?"

যাইবার সময় ভাইকে বলিল, "টাকাকড়ি যা আছে তা দিয়ে তোর এম-এ, পাস করা হয়ে যাবে। তুই পড়ায় অত ভাল, কিছুতেই পড়া ছাড়িস নে। তখন যদি একটু সুখে থাকতে পারিস! এখানে না টিঁকতে পারিস ত আমার মতো পালাবি।"

জয়ন্ত টিঁকিয়া রহিল, কারণ তাহার মেজাজটা ভাইয়ের মতো উগ্র ছিল না। শাক-ভাত খাইয়াই সে পড়াশুনা চালাইয়া চলিল। অবস্থা কিন্তু উত্তরোত্তর খারাপই হইতে লাগিল, কারণ, বিমাতা ক্রমে ক্রমে সংসারকে তিনটি কন্যা উপহার দিয়া বসিলেন। কান্না-কাটির শব্দ ও ঝগড়ার শব্দ আরও বাড়িল।

এখন জয়ন্ত চাকরি করে পাশের শহরের কলেজে, কিন্তু খাওয়া-থাকার সুখ আর তাহার হইল না। বাবা একেবারে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছেন, কাজেই প্রধানতঃ তাহার আয়েই সংসার চলে। ইহাদের ত্যাগ করিয়া সে যাইতে পারে না, তাহা হইলে সত্যই ইহারা না খাইয়া মরিবে। সেটা চোখে দেখা যায় না। নিজের কষ্ট সে সহ্য করিয়াই যায়। খাওয়াও ক্রমেই খারাপ হইতেছে। পরিবার কাপড়ও মা-বাবার সহিত ঝগড়া করিয়াই কিনিতে হয়, না হইলে কাজে যাওয়া যায় না। আর কোনো খরচ তাহার করিবার জো নাই, বাড়ীতে তাহা হইলে মড়াকান্না পড়িয়া যায়।

অন্য সময় চলে এক প্রকার, কিন্তু শীতের সময় বড় কষ্ট। বাবা দরজা-জানলা বন্ধ করিয়া ঘরের ভিতর বসিয়া থাকেন দুইটা ছেঁড়া কম্বল গায়ে জড়াইয়া, বিছানা ছাড়িয়া প্রায় কোনো সময় নড়েন না। মা শাড়ীর আঁচল তিন পাকে অঙ্গে জড়াইয়া ঘোরেন। তাহাতেও না শানাইলে, আধখানা ছেঁড়া র‍্যাপার তাহার উপর জড়ান। কন্যা তিনটি যাত্রার দলের সং সাজিয়া বেড়ায়; যতটা পারে রান্নাঘরে বসিয়া থাকে। জয়ন্তকে বাহিরে যাইতে হয়, তাহারই কষ্ট বেশী। পশ্চিমবঙ্গের মফঃস্বল শহরের শীত, এ যাঁহারা উপভোগ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন। তীক্ষ্ণ, তীব্র, হিম বাতাস যেন হাড়-পাঁজর এফোঁড়-ওফোঁড় করিয়া ফেরে। ঘরের বাহির হইতে ভয় করে। রোদ যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই বাহিরে চলাফেরা করা, তাহার পরেই ঘরের ভিতর আশ্রয় লইতে হয়। রাত্রির খাওয়া খাইয়া কতক্ষণে বিছানার ভিতর ঢুকিতে পারা যায়, ইহাই একমাত্র ভাবনা।

জয়ন্ত তাকাইয়া দেখিল, রোদটা ভালই উঠিয়াছে। এখন বাহিরে ততটা খারাপ লাগিবে না। ঘরে বসিয়া কান্না ও চীৎকার শুনিয়া কি-ই বা হইবে, তাহার চেয়ে কিছুক্ষণ মাখনদের বাড়ী বেড়াইয়া আসা যাক। মাখন তাহার নিকটতম প্রতিবেশী এবং ঘনিষ্ঠতম বন্ধুও বটে।

চটিতে পা ঢুকাইয়া ও র‍্যাপারখানা ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া গায়ে দিয়া সে বাহির হইয়া পড়িল। রোদ থাকিলে কি হয়, হাওয়া যেন মানুষকে একেবারে পাড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে! হন্ হন্ করিয়া কয়েক মিনিট হাঁটিয়া সে একটা বাড়ীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। খোলা সদর দরজার সামনে আসিয়া ডাকিল, "মাখন উঠেছিস?"

ভিতর হইতে আহ্বান আসিল, "আয় ভিতরে, উঠেছি ত অনেকক্ষণ!"

জয়ন্ত ভিতরে ঢুকিল। মাখন বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া রোদে পিঠ দিয়া চা খাইতে বসিয়াছে। জয়ন্তকে দেখিয়া

একটা মোড়া অগ্রসর করিয়া দিয়া হাঁকিল, "বৌদি, আর এক পেয়ালা চা দিয়ে যাও, জয়ন্ত এসেছে।"

আধ-ঘোমটা দেওয়া একটি বৌ চা আর পরটা লইয়া ঘরে ঢুকিল। জয়ন্তের সামনে সব নামাইয়া দিয়া বলিল, "ঠিক সময় এসেছ জয়ন্ত ঠাকুরপো, নইলে আমি ত চায়ের পাট তুলে দিতে যাচ্ছিলাম।"

জয়ন্ত চায়ের পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়া বলিল, "আঃ, এটাকে চা বলে বটে!"

মাখন বলিল, "কেন, তোদের বাড়ী চা ভাল হয় না? বাড়ীতে বৃদ্ধ রুগী থাকলে ত চা সারাক্ষণই করতে হয়।"

জয়ন্ত বলিল, "সারাক্ষণই করে হয়ত। কিন্তু যা তৈরী হয় সেটা চা নয়, খড় সেদ্ধ-টেদ্ধ কিছু হবে। অন্ততঃ খেতেও সেই রকমই লাগে।"

বৌটি বলিল, "ওমা, তাই নাকি? এ দিকে ত শুনি তোমার মা বেশ ভাল রাঁধতে পারেন।"

জয়ন্ত বলিল, "তা হবে। তবে বাড়ীতে আমরা সে গুণের কিছু পরিচয় পাই না। অবশ্য পাথরকুচির মতো চাল আর উঠোনের ঘাসপাতা দিয়ে কি সুখাদ্যই বা তৈরী করা যায় বল?"

মাখন বলিল, "সব অদ্ভুত তোদের। নিজেদের বাড়ী-ঘর রয়েছে, বছরের ধানটা রয়েছে, বাড়ীতে গরু রয়েছে। পিছনের জমিটাতে ঝিঙে, বেগুন, লঙ্কা, কাঁচকলা ফলে আছে সারাক্ষণ দেখি। মাইনে পাস এমন কিছু কম নয়। তবু এত খাবার কষ্ট হবে কেন? হতে দিবি কেন? থাকত বসন্তদা এখানে ত পিটিয়ে খাওয়া ভাল করত।"

জয়ন্ত বলিল, "পিটব আর কাকে বল? ঐ বুড়ো বাপকে না ঐ রণচণ্ডী সৎ মাকে? মেয়েগুলো ত এখনও মানুষ নামের যোগ্যই হয় নি।"

মাখনের বৌদি বলিল, "তোমার মা দারুণ হিসেবী বাপু। কিন্তু মানুষকে পেটে খেতে না দিয়ে হিসেব, এ আবার কোন্ দেশী হিসেব? আমাদের মা বলেন যে, ওবাড়ীর গিন্নি তলে তলে টাকা জমাচ্ছেন, আলাদা বাড়ী করার জন্যে আর মেয়েদের বিয়ে দেবার জন্যে।"

জয়ন্ত বলিল, "তা হবে, করে যদি ত দোষ দিতে পারি না। বাবা যে তাদের জন্যে কিছু রেখে যাবেন বিশেষ, তার কোনো সম্ভাবনা নেই। মানুষের সংখ্যা আর না বাড়িয়ে যান তা হলেই রক্ষে। ঐ রক্ষাকালীর বাচ্চাগুলি পাড় হবেন কি করে সেও এক প্রশ্ন।"

মাখন বলিল, "তোমাদের ঘাড়ে ফেলে দিয়ে কেটে পড়বেন. দেখ এখন।"

জয়ন্ত বলিল, "ঘাড় পেতে বসে যদি থাকি তাহলে অবশ্য সে রকম কিছু ঘটে যেতেও পারে। তবে অতদূর বোকামি করব বলে মনে হয় না।"

মাখন বলিল, "কি, বসন্তদার পথ ধরবে না কি?"

জয়ন্ত বলিল, "এক এক বার ইচ্ছা ত করে তাই। এই খাওয়া আর পরার কষ্ট আর সহ্য হয় না। শীত পড়ে আরও যেন সোনায় সোহাগা হয়েছে। কিছুতে যদি বুড়োকে "হ্যাঁ" বলাতে পারলাম একটা নতুন লেপ করার প্রস্তাবে!"

মাখনের বৌদি এই সময়ে রান্নাঘরে ফিরিয়া চলিয়া গেল। মাখন বলিল, "দুনিয়ায় সবাই শক্তের ভক্ত নরমের যম রে ভাই। এই একবার খরচ বন্ধ করে দাও, তখন তোমার সব প্রস্তাবে হাঁ বলতে তর সইবে না বুড়োর।"

জয়ন্ত বলিল, "ঐ বেড়ালছানার মতো মেয়ে তিনটের দিকে চেয়ে তা পারি না। ওগুলো এখন থেকেই খেতেও পায় না; পরতেও পায় না। শিক্ষাদীক্ষা কিছুই তাদের হচ্ছে না, তাদের দুঃখে সারাক্ষণ যে আমার প্রাণ কাঁদছে তা নয়, তবে একেবারে না খেয়ে মরে যাক এটা দেখতে পারব না।"

মাখন বলিল, "তবে ভোগ বসে। না হয় বিয়ে করে আলাদা সংসার কর। অবশ্য তোমার বড় ভাইয়ের এখনও বিয়ে হয় নি, সে একটা বাধা বটে।"

জয়ন্ত বলিল, "ও সব বাধা আবার কে মানে আজকাল? চিঠি লিখে একটা অনুমতি নিয়ে নিলেই হবে। কিন্তু এই ত সংসারের শ্রী, এর মধ্যে পরের মেয়েকে এনে কষ্ট দেওয়া কি উচিত?"

মাখন বলিল, "তুই একটা ক্যাবলা রে! তুই কি সত্যি ভাবিস যে, তোর মাইনের সব টাকা ওরা খরচ করে? অর্দ্ধেকের বেশী জমিয়ে রাখে। সেইরকম হিসেব করে দিবি, বাকীটা নিজেরা খরচ করবি। তোর সৎ মা গরুর দুধ, গাছের ফল, বাগানের তরকারি সব বিক্রি করে টাকা জমাচ্ছে, একথা সবাই বলাবলি করে। তুই টাকা কমিয়ে দিলেও তারা মরবে না, এই ভাবেই চলবে।"

জয়ন্ত বলিল, "তা চলবে ঠিকই। কিন্তু আমাদের গিন্নী-ঠাকরুণ সপ্তমে গলা তুলে এমন চেঁচাবেন যে, পাড়ায় কাক-চিল বসবে না আর। নতুন বৌয়ের এমন পিলে চমকে যাবে যে, সে আর থাকতেই চাইবে না। নইলে টাকার অভাবটা আসল বাধা নয়। টাকা আমি ওদের কম দিতে পারি, আয় বাড়বেও আমার শীগগিরই।

মাইনে বাড়ছে কিছু, তা ছাড়া ওরা 'কোচিং ক্লাশ' খুলছে, তাতেও কাজ করব, সব জড়িয়ে শ' খানিক টাকা বাড়বে মাস দুই-তিন পরে।"

মাখনকে এবার কি একটা কাজে উঠিতে হইল। কাজেই জয়ন্তও উঠিয়া পড়িল। তখনই বাড়ী যাইতে ইচ্ছা করিল না। আর কাহারও বাড়ী না ঢুকিয়া মাঠে, পথে, পুকুরের ধারে খানিকটা ঘুরিয়া তবে সে বাড়ী ফিরিল।

এর পর স্নান-খাওয়ার পালা। স্নান পুকুরে করিয়া আসা যায়, বাড়ীতে কুয়া আছে, কয়েক বাল্‌তি জল তুলিয়া সেখানে স্নান করা যায়। গ্রীষ্মকালে এইভাবেই সে স্নান করে। কিন্তু আজ গায়ের জামা-কাপড় খুলিতে তাহার একেবারেই ইচ্ছা করিল না। গরম জলের পাট এ বাড়ীতে নাই, সেরকম প্রস্তাব করিলে মা হয়ত আকাশ হইতে পড়িবেন। মেয়েদের জন্যও তিনি জল গরম করেন না, তাহারা তারস্বরে চীৎকার করিতে করিতে ঠাণ্ডা জলেই স্নান সারে। অবশ্য তাহারা খোলা জায়গায় স্নান করে না, এই যা রক্ষা। গরম জলের অধিকারী একমাত্র গৃহস্বামী রামপ্রসন্ন। তা তিনি শীতের তিনটা মাসে তিনবারের বেশী স্নান করেন না, কাজেই গৃহিণী এ অত্যাচার সহ্য করিয়া যান।

জয়ন্ত বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়াই শুনিল, ছোট খুকী তরলা প্রাণপণে হাঁ করিয়া চীৎকার করিতেছে, সরলা তাহাকে স্নান করাইতেছে। জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করিল, "একেই আগে কেন? বিমলির স্নান হয়ে গেছে?"

সরলা বলিল, "হ্যাঁ, বিমলিকে আবার আমি চান করাব! তাকে ধরতে পারলে ত? সে এতক্ষণ তিনটে মাঠ পাড় হয়ে গেছে, তার সঙ্গে কি আমি ছুটতে পারি?"

জয়ন্ত বলিল, "নাঃ, তুমি আর পারবে কি করে, বুড়ো মানুষ! তা একে শীগগির শীগগির নিষ্কৃতি দাও, দিয়ে ঘরটা ছাড়, আমি একটু হাত-মুখটা ধুয়ে নিই।"

সরলা বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "ও মা, তুমি চান করবে না?"

জয়ন্ত বলিল, "নাঃ, আমি মেলেচ্ছ মানুষ, আমার অত চানের দরকার হয় না।"

সরলা ছেঁড়া গামছা দিয়া বোনের গা মুছাইতে মুছাইতে বলিল, "আমরা হলে মা পাখা-পেটা করত মেলেচ্ছ, পিচেশ বলে। তোমরা বড় হয়েছ, তোমাদের সবই মজা।"

জয়ন্ত বলিল, "হ্যাঁ মজায় খাবি খাচ্ছি একেবারে। যা বেরো দেখি এখান থেকে।"

বোনেরা বাহির হইয়া গেল। হাত-মুখ ধুইয়া এবার জয়ন্ত রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া বলিল, "ভাতটা বেড়ে দাও আমার।"

রান্নাঘরটা বেশ গরম, এখানে বসিয়া খাইতে মন্দ লাগে না। খাইবার মতো কিছু ভাল জিনিস থাকিলে আরো ভাল লাগিত বোধ হয়। যাহা হোক, যা জুটিল তাহাই খাইয়া সে উঠিয়া পড়িল। ঘরে গিয়া বসিয়া প্রথম একখানা বই পড়িবার চেষ্টা করিল। কিন্তু চক্ষু যেন জড়াইয়া আসিতে লাগিল। চিঠিপত্র দু' একখানা লিখিবার ছিল, তাহাও লিখিতে ইচ্ছা করিল না, গুটিসুটি মারিয়া সে বিছানায় শুইয়া পড়িল।

নাঃ, এখানেও কোনো আরাম নাই। গায়ে যেন কে হিমের সূঁচ ফুটাইতেছে। হাত-পা বরফের মতো হইয়া আসিতেছে। ইহার চেয়ে হাঁটা-চলা করিলে ভাল থাকা যায়। ছেঁড়া লেপ ফেলিয়া দিয়া সে উঠিয়া বসিল।

মাখন কথাটা মন্দ বলে নাই। এমন করিয়া যন্ত্রণা ভোগ করার চেয়ে বিবাহ করিয়া আলাদা হইয়া যাওয়া ভাল। বিমাতা প্রাণপণে চীৎকার করিবেন, এবং মেয়েদের প্রহার করিবেন। তাহার কর্ণ বড়ই পীড়িত হইবে, কিন্তু অন্যদিকে আরাম পাওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

আচ্ছা, বিবাহের জোগাড় কিভাবে করা যায়? বাবাকে বলিলে তিনি ত এখনই লাফাইয়া উঠিবেন, এবং পত্নীর সাহায্যে কনে' খুঁজিতে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া যাইবেন। তাঁহার নিজের বাড়ীর বাহির হইবার ক্ষমতা নাই, কাজেই কন্যা পছন্দ করা, দেখিতে যাওয়া প্রভৃতি কাজ বিমাতাই করিবেন। জয়ন্তের অদৃষ্টে এ ব্যবস্থায় ভাল কিছু ঘটিবে এমন মনে করিবার কোনো কারণ নাই। গৃহিণী ভাল পাত্রী বলিতে বোঝেন এমন বালিকা যে কম খাইবে, এবং খুব বেশী কাজ করিবে। কর্তা বোঝেন এমন বালিকা, যাহার পিতা পণ স্বরূপ প্রচুর অর্থ দিতে রাজী হইবে। জয়ন্তর ইহাতে লাভ কোন্‌খানে? নিজে দেখিয়া বিবাহ করার রেওয়াজ ত এই আধা-পাড়াগাঁয়ে নাই? বররা কনে'কে দেখেই না অনেক সময়। আর দেনা-পাওনার আলোচনাও বররা করে না, পিতৃদেবরা করেন এবং লুট-তরাজের মাল তাঁহারাই উপভোগ করেন। জয়ন্তের মনটা বিমুখ হইয়া গেল।

রোদ যত পড়িয়া আসিতে লাগিল, জয়ন্তের মনও ততই অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। আজ যেন আরো বেশী শীত পড়িবে মনে হইতেছে। কি উপায় করা যাইবে তাহা হইলে? দরজা-জানলা সবই ত বন্ধ করিয়ে

হয়, সেটাই যথেষ্ট অস্বাস্থ্যকর, তাহার উপর আগুন ত জ্বালান যায় না? বিষাক্ত গ্যাসে মরিয়া থাকিবার সম্ভাবনাটা স্বীকার করা যায় না। তাহার বাবার শুইবার ঘরে এইরকম ব্যাপার ঘটে বলিয়া তাহার ধারণা। তবে বিমাতা ইহা অস্বীকার করেন। তাঁহার ঘরের সব ক'টি জানলার শার্সিই ভাঙা, সুতরাং মারাত্মক দুর্ঘটনা এখনও কিছু ঘটে নাই।

সন্ধ্যা হইতে না হইতেই সরলা, বিমলা ও তরলা গিয়া উনুনের ধার আশ্রয় করিল, তাড়া খাইয়াও আর নড়িল না। রামপ্রসন্ন দরজা-জানলা সব বন্ধ করিয়া ঘরে বসিয়া কাশিতে লাগিলেন। তাঁহার অনুরোধে গৃহিণী একবার করিয়া আসিয়া তাঁহার কম্বলের উপর তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র যাহা কিছু ছিল, সব এক এক করিয়া চাপাইয়া দিয়া যাইতে লাগিলেন, শুধু নাকটা তাঁহার বাহির হইয়া রহিল, এই ছিন্ন মলিন বস্ত্র-স্তূপের ভিতর হইতে। ব্যাপার দেখিয়া জয়ন্ত হাসিবে কি কাঁদিবে স্থির করিতে পারিল না। তাহার নিজের অবস্থাও এ-দিকে বাপেরই কাছাকাছি হইয়া আসিল যে!

সন্ধ্যা বেশী অগ্রসর হইতে না হইতেই সেও বোনদের সঙ্গে বসিয়া খাইয়া লইল। গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এ রকম ক'রে রয়েছ কি ক'রে মা? হাত পা জমে যাচ্ছে না?"

তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সুমধুর জবাব দিলেন, "কি করব বাছা, শাল-দোশালা কোথায় পাব? গরীবের সংসার।"

জয়ন্ত বলিল, "গরীবের সংসার নয়, নির্ব্বোধের সংসার, কাণ্ডজ্ঞানহীনের সংসার। ঢের গরীব আছে এখানে আমাদের মত, তারা এই রকম ক'রে থাকে না, প্রাণের মায়া রাখে।" বলিয়া বিরক্তভাবে নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

গৃহিণী গজর গজর করিতে লাগিলেন, "দেখলে একবার কথা শোনানোর ঘটা? আমি কি ওর টাকা নিয়ে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিচ্ছি? বলতে পারে না বাপকে? বুড়ো বসে বসে খায়, একটা পয়সা আনে না?"

তরলা বলিল, "আর আমরা বুঝি খাই না?"

"চুপ কর্ ছুঁড়ি", বলিয়া মা তাহার গালে একটা ঠোনা মারিয়া দিলেন।

জয়ন্ত গিয়া বিছানা পাতিয়া ফেলিল, সরলার জন্য অপেক্ষা না করিয়া। ময়লা মশারীটাও টাঙাইয়া লইল। এত আগে সে কোনো দিনই শোয় না, আজ কিন্তু আর কিছু করিয়া জাগিয়া থাকিবার চেষ্টাটাও অসহ্য লাগিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি ছেঁড়া লেপটা গায়ের উপর টানিয়া দিয়া সে শুইয়া পড়িল।

শুইয়াই তাহার মনে হইল সে বরফ-গলা জলের কুণ্ডে ডুবিয়া গিয়াছে। হাত-পা শীতে যেন বাঁকিয়া যাইতেছে, ব্যথায় গলা বুজিয়া আসিতেছে। এ কি ব্যাপার! অসুস্থ হইয়া পড়িবে নাকি সে? তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। গায়ে গরম কোট দিয়া, র‍্যাপারটা ধুতির মত করিয়া জড়াইয়া লইল। পায়ে পরিল একজোড়া গরম ছেঁড়া মোজা। আবার আসিয়া শুইয়া পড়িল। এবার আর তত খারাপ লাগিতেছে না, তবে আরামও কিছু লাগিতেছে না। বাহিরের ঠাণ্ডার অনুপাতেই যেন তাহার মেজাজ উত্তপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। ছিঃ, ইহাকে কি জীবন বলে? একটা কৃতবিদ্য বয়ঃপ্রাপ্ত মানুষ সে, তাহার এইটুকু মনুষ্যত্ব নাই যে, সে এই অবস্থার প্রতিবিধান করিতে পারে?

সারারাত কাটিল অর্দ্ধেক বসিয়া, অর্দ্ধেক শুইয়া। শীতকালের রাত সহজে কাটিতেও যেন চায় না। অবশেষে পাখী ডাকিল, কাক ডাকিল এবং এই যন্ত্রণাময় রাত্রির অবসান হইল। একটা অত্যন্ত কঠিন মুখের ভাব লইয়া সে উঠিয়া বসিল। মুখ-হাত ধুইয়া ফেলিল। কাপড়-চোপড় যাহা কিছু পরা সম্ভব সব পরিয়া বাহিরে যাইবার জন্য পা বাড়াইল।

সরলা ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "ও কি ছোড়দা, চা খাবে না? হয়ে গেল বলে!"

জয়ন্ত বলিল, "থাক, চা আমি বাইরেই খাব এখন। তোমরা খাও।" বলিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

সরলা বলিল, "বাবাঃ। ছোড়দারও যা মেজাজ হচ্ছে দিনের-দিন! মা বড়দার যেমন গল্প ক'রে ঠিক সেই রকম।"

মা শুনিতে পাইয়া বলিলেন, "হবে না? খেতে দিচ্ছেন, তেজ দেখাবেন না? যাক আর দুটো বছর কোনো রকম ক'রে, তার পর কে কাকে তেজ দেখায় বোঝা যাবে।"

জয়ন্ত জোরে জোরে পা চালাইয়া মাখনদের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। মাখন সবেমাত্র উঠিয়াছে তখন। জয়ন্তকে দেখিয়া বলিল, "কি রে, সাত-সকালে যে? বোস্, চা খা। অ বৌদি, জয়ন্ত এসেছে।"

জয়ন্ত বলিল, "দেখ, তোর কথাই ঠিক। বিয়েই আমি করব, তাতে আলাদা হতে হয়, হব। এ অবস্থা আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে, এ রকম ক'রে

মানুষ বাঁচে না। আমি অতি অপদার্থ যে এতদিন সয়েছিলাম !"

মাখন বলিল, "তাই বল ব্রাদার, পথে এস। শীতটা যা পড়েছে এতে আইবুড়ো থাকা ঝকমারি মনে হয় বটে। তবে বল ত কনে দেখি। না কি বুড়োবুড়ীদেরই শরণ নেবে ?"

জয়ন্ত বলিল, "আরে রামঃ, ছিঃ। তাঁদের ব'লে কি হবে ? তাঁরা শুধু নিজেদের সুবিধে ক'রে নেবেন, আমি থাকব যে তিমিরে সেই তিমিরে। এমন কি তিমিরটা আরও বেশী প্রগাঢ় হয়ে যেতে পারে। এ তোকেই ভার নিতে হবে এবং সাতদিন মাত্র সময় পাবি। এর মধ্যে আমার বিয়ে দিয়ে দিতে হবে।"

মাখন বলিল, "আরে ক্ষেপে গেলি নাকি ? এত তাড়াতাড়ি বিয়ে হয় ? কথায় বলে লাখ কথা ছাড়া বিয়ে হয় না। তা, কি রকম কনে চাই বল ? সম্ভব হয় ত সাতদিনে হয়েও যেতে পারে। বাংলা দেশে না হচ্ছে কি ? এখানে এক ঘণ্টার নোটিশে বিয়ে হতে দেখেছি, আর মাঘ মাস ত, রোজই প্রায় লগ্ন আছে।"

জয়ন্ত বলিল, "কনে তুই যেমন পারিস্ ঠিক কর। একটু ভদ্রঘরের হয় আর লেখাপড়া খানিকটা জানে, এই হলেই হবে।"

মাখন বলিল, "ভাল, কোনো আধিক্যতা নেই তোমার demand-এ। আর বউয়ের সঙ্গে কি চাইছ ?"

জয়ন্ত বলিল, "বেশী কিছু নয়। পণ নেব না, গহনা-গাঁটি জিনিসপত্র তাঁরা মেয়েকে যা খুশী দেবেন, না দিলেও কিছু বলব না। এখন না পারেন, পরে দিলেও কিছু বলব না। আমাকে খালি ভাল খাট বিছানা আর খুব ভাল লেপ দিতে হবে। দুটো গরম স্যুট দিতে হবে, এবং বিয়ের পোশাকে ভাল শাল এবং ভাল গরম পাঞ্জাবী দিতে হবে। আর সর্ত্ত থাকবে যে, খোলা সভায় আমায় কেউ কাপড় বদ্‌লাতে বলবে না। আর যদি তাদের সাধ্যের মধ্যে হয়, তা হলে ঘরের জন্যে যেন একটা ইলেক্‌ট্রিক্ হীটার দেয়।"

মাখন হা হা করিয়া হাসিয়া প্রায় গড়াইয়া পড়িল। বলিল, "আচ্ছা, যাহোক ! seriously বলছিস্ না মস্করা ?"

জয়ন্ত বলিল, "তোর গা ছুঁয়ে বলছি ভাই, ঠাট্টা নয়। বড় কষ্টে পড়েছি আমি। জগতে যে আমার কেউ আছে তা আর মনে হয় না। আর তাদের এ আশ্বাসও দিস্ যে বরযাত্রী-টরযাত্রীর হাঙ্গামও নেই। আমি যাব, দাদা যাবে—যদি এসে উঠতে পারে, আর তুই যাবি। পুরুত আর নাপিত অবশ্য যাবে।"

মাখন তখনও হাসিতেছে। হাসিতে হাসিতে বলিল, "তোর কনে পাওয়া যাবে না ত পাওয়া যাবে কার ? সব রকম লোভের অতীত। হয়ে যাবে, ভড়কাস্‌নে। ওবেলা খবর নিস্ কলেজ থেকে এসে।"

জয়ন্ত কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাতে আছে নাকি কেউ ?"

মাখন বলিল, "আরে আমিও যে আইবুড়ো তা ভুলে যাস্ কেন ? খবর শুনছি ত সারাক্ষণই। তোমাকে পেলে তারা আর আমাকে চাইবে না। ঐ পাশের বাড়ীর গিন্নীরই একটি ভাইঝি আছে, মাকে ভজান হচ্ছে ক'দিন থেকে। দেখি, তোর সঙ্গে লাগিয়ে দিতে পারি কি না। আই. এ. পাস, তোর অপছন্দ হবে না। মা তাকে দেখেছেনও কয়েক বছর আগে, বললেন, মন্দ নয়। আবার কি দেখার কথা তুলব ?"

জয়ন্ত বলিল, "না, না, ওতেই হবে। আমি নিজে কিছু কন্দর্প নয়, ডানাকাটা পরী চাইছি না। শেষে আমাকে পছন্দ হবে না। তুই দেখ আমার সর্ত্তগুলোয় রাজী আছে কি না।"

মাখন বলিল, "ওতেও যে রাজী না হবে সে বৃথাই মেয়ের বাপ হয়েছে। ও ঠিক হবে এখন। তুই দাদাকে চিঠি লেখ আর বুড়োকে জানাতে চাস্ ত জানিয়ে দে।"

জয়ন্ত বলিল, "চিঠি লিখব আজই। বাবাকে বিয়ের দিন জানালেই হবে, তিনি ত যাবেন না, আগে জেনে করবেনই বা কি ? আর পুরুত ইত্যাদি ঠিক রেখ। আচ্ছা চলি, কলেজ আছে ভাই।"

মাখন বলিল, "আরে বস, চা-টা খেয়ে যা, ঐ যে বৌদি আসছে।"

একটা কথা পাকাপাকি দিয়া ফেলিয়া জয়ন্তের মন খানিকটা ভাল হইয়া গেল। চা খাইয়া সে বাড়ী ফিরিয়া আসিল, দাদাকে তাড়াতাড়ি একটা চিঠি লিখিয়া দিল। তাহার পর গম্ভীর মুখে স্নানাহার সারিয়া কলেজে চলিয়া গেল।

আজও শীত কমার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। জয়ন্ত কলেজ হইতে ফিরিয়া চা খাইল, এবং কোনো মন্তব্য না করিয়া মাখনের বাড়ী যাত্রা করিল। বিমলা বলিল, "ছোড়দা সকাল থেকে রেগেই আছে।"

মা উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "কি যেন একটা মতলব আঁটছে মনে হচ্ছে। যা আমার কপাল, এও না পালায় !"

জয়ন্তকে দেখিবামাত্র মাখন বলিল, "বরাতজোর আছে রে তোর ! হয়ে যেতে পারে।"

জয়ন্ত ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা হ'ল? তুই গিয়েছিলি?"

মাখন বলিল, "আমি যাই নি, মা গিয়েছিলেন। তোর নাম শুনে ত কনের পিসীমা লাফিয়ে উঠলেন, বললেন, 'ও ছেলেকে পেলে ত আমরা আকাশের চাঁদ হাতে পাই। জন্মাবধি দেখছি এমন ভাল ছেলে হয় না, বাপটা ভাল না, এই যা খুঁৎ! যাক্, রোজগারী ছেলে, কালে নিজের সংসার হবে।' তিনি আজ রাত্রেই যাচ্ছেন বাপের বাড়ী, কাল তুই পাকা কথা পেয়ে যাবি। গায়ের মাপ, পায়ের মাপ সব ঠিক রাখিস্, কালই চাইবে হয়ত।"

জয়ন্ত বলিল, "আচ্ছা আচ্ছা, সে-সবের জন্যে আটকাবে না। তবে ভাই, বিয়েটায় কিছু কিছু অঙ্গহানি হবে, তাঁরা যেন মনে কিছু না করেন। তত্ত্ব করা, আশীর্ব্বাদ করা এ সব হবে না।"

মাখন বলিল, "বসন্তদাকে জোর তলব লাগা না, না হয় খরচ করে টেলিগ্রামই কর। এসে যা হোক একটু কিছু করুক, একমাত্র ছোট ভাইয়ের বিয়ে।"

"তাই করে দেখি", বলিয়া জয়ন্ত বাড়ী চলিয়া আসিল। রাত্রিটা আজও অতি কষ্টে কাটিল। টেলিগ্রাম একখানা লিখিয়া রাখিল, সকালে উঠিয়াই পাঠাইতে হইবে।

পরদিন বিকালে ভাল খবর পাইয়া মনটা অনেক ভাল হইয়া গেল। কন্যাপক্ষ রাজী, আর চারদিন পরে বিবাহ। জয়ন্ত যেখানে কাজ করে সেই শহরেই কন্যার পিতার বাড়ী। তাঁহারা জয়ন্তের সব খবরই জানেন, খোঁজ করিবার প্রয়োজন হইল না। মাখন বলিল, "তোর পছন্দমতো সব জিনিসই পাবি, তবে কলকাতা থেকে যা করিয়ে আনতে হবে—এই যেমন, গরম স্যুট্, তাতে দু' পাঁচ দিন দেরি হতে পারে।"

জয়ন্ত বলিল, "তা হোক্। এখন ত ক'দিন ছুটি নিচ্ছি কলেজ থেকে, তার পর ওসব দরকার। ঘরে ত আর স্যুট পরব না!"

বসন্ত টেলিগ্রামের উত্তরে স্বয়ং আসিয়া হাজির হইল। সব সংবাদ শুনিয়া বলিল, "বেশ করেছিস্। একজনও সংসারী না হলে চলে? আমার পরে হবে এখন, তোরটা আগে হয়ে যাক্।"

জয়ন্ত বলিল, "একটা নিয়মরক্ষা-গোছের আশীর্ব্বাদ ত করতে হয়। কিন্তু কিই বা দেওয়া যায়?"

বসন্ত বলিল, "দিদিমা দু'জোড়া ইয়ার-রিং দিয়ে গিয়েছিলেন আমার কাছে, দুই বউয়ের জন্যে। তারই এক জোড়া দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে আসছি, তার আর কি? আচ্ছা, আমি মাখনের সঙ্গে পরামর্শ করে সব ঠিক করছি, তোকে ভাবতে হবে না। তুই বরমানুষ, চুপ করে থাক।"

সে চলিল মাখনের বাড়ী। এদিকে জয়ন্তের নিজের বাড়ীতে প্রায় মড়াকান্না লাগিয়া গেল। দুই ভাই মিলিয়া যে ভিন্ন হইয়া যাইবে, এবং বাপ-মাকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিবে, এ বিষয়ে আর সন্দেহ রহিল না। গৃহিণী ফোঁস্ ফোঁস্ করিতে লাগিলেন। কর্ত্তা চোখ কপালে তুলিয়া বসিয়া রহিলেন।

বসন্ত ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "সব গুছিয়ে এলাম। কাল আমি আশীর্ব্বাদ করে আসব। পরশু ওরা আশীর্ব্বাদ করবে। তবে মাখনের ওখানেই হবে, এ বাড়ী আনতে বারণ করে দিয়েছি। টাকাও কিছু দিয়ে এলাম, গায়ে-হলুদের শাড়ী, মাছ আর মিষ্টি কিনে পাঠিয়ে দেবে।"

দুই ভাইয়ের পরামর্শ খালি চলিতেছে, আর বাড়ীর আবহাওয়া বেশী করিয়া থম্‌থমে হইয়া উঠিতেছে। অথচ কর্ত্তা-গৃহিণী ভরসা করিয়া কিছু জিজ্ঞাসাও করিতে পারিতেছেন না ছেলেদের। মন্দ সংবাদ যতক্ষণ না শুনিয়া থাকা যায়!

পরদিন জয়ন্ত কলেজ হইতে ছুটি লইয়া আসিল। বিকালবেলা বসন্ত সাজিয়াগুজিয়া বাহির হইয়া গেল, বলিল, "বাইরে চায়ের নেমন্তন্ন আছে।" কেহ কিছু সন্দেহ করিল না।

কিন্তু পরদিন আসল ব্যাপার ফাঁস হইয়া গেল। বিমলা শীতের প্রকোপ অগ্রাহ্য করিয়া পাড়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল, মাখনদের বাড়ীর কাছে আসিয়া শঙ্খধ্বনি শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। কৈ, এ বাড়ীতে ত কিছু হওয়ার কথা তাহারা শোনে নাই? উঁকি মারিয়া দেখিল তাহার দাদাকে কেন্দ্র করিয়াই ব্যাপারটা ঘটিতেছে। ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে বাড়ী আসিয়া খবর দিল।

এ যে পৃথক হওয়ার সমানই সাঙ্ঘাতিক খবর। বউ আসিলে ত সবই ফাঁস হইয়া যাইবে? পুরুষ বেটাছেলে, সংসারের অত খুঁটিনাটির খবর রাখে না, বাহিরে বাহিরে ঘোরে। কিন্তু বউয়ের কাছে লুকোচুরি চলিবে না। সে মেয়েমানুষ, আসিয়া পাওনাগণ্ডা বুঝিয়া লইবে, কত ধানে কত চাল হয়, তাহার জানা থাকিবে। সঙ্গে থাকিলে বউয়ের হাততোলায় থাকিতে হইবে, আর পৃথক হইয়া গেলে ত একেবারে সব চুকিয়া গেল।

মরিয়া হইয়া রামপ্রসন্ন বসন্তকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা

করিলেন, এ সব কি শুনছি? ছোট্‌কার নাকি বিয়ে হচ্ছে?"

বসন্ত বলিল, "হ্যাঁ হচ্ছে।"

"তা আমাকে জানান হয় নি কেন? আমি তার বাবা নয়? কথাবার্ত্তা কার সঙ্গে হ'ল? আমার মত নেই বিয়েতে।"

বসন্তের ত মেজাজ একেবারে সপ্তমে চড়িয়া গেল। বলিল, "দেখ বাবা, আপনার মান আপনার হাতে। কেন এগিয়ে গিয়ে অপমান হবে? তোমার মত চাইছে বা কে? যার বিয়ে সে নিজেই কথাবার্ত্তা বলে ঠিক করেছে। কিছুই নিচ্ছে না, কাজেই তুমি বঞ্চিত হলে মনে করে কাতর হবার কিছু নেই। তোমার চুপ করে থাকাই ভাল।"

জয়ন্তের ইচ্ছা ছিল কনে কেমন দেখিল তাহা বসন্তকে একটু জিজ্ঞাসা করে। লজ্জায় পারিল না। দাদা নিজে হইতে শুধু বলিল, "বেশ ভাল, ভদ্র, শিক্ষিত পরিবার। তুই ঠকিস্ নি রে।"

বিয়ের দিন সকালে বসন্ত কাপড়ের দোকান হইতে একখানা লালপেড়ে তসরের শাড়ী আনিয়া মায়ের হাতে দিল। বলিল, "বৌ তোলার সময় এখানা পোরো।"

মনে মনে বৌয়ের মুণ্ডপাত করিতে করিতে শাড়ী-খানা গৃহিণীকে লইতে হইল। তিন বোনের জন্যও তিনটা ফ্রক আসিল, এবং তিন জোড়া রবারের চটি।

জয়ন্ত বলিল, "তুমি দেখি অঢেল টাকা খরচ করতে লেগে গেছ, আমি ত কিছুই এখন দিতে পারছি না।"

দাদা বলিল, "এর পর জমাতে আরম্ভ কর্, আমার বিয়ের সময় দিবি।"

বিবাহের দিন আসিয়া পড়িল। ঠকাইবার ইচ্ছা কন্যাপক্ষের নাই, তাহারা বর ও বরযাত্রীর জন্য গাড়ী পাঠাইয়াছে। যাত্রাটা বাধ্য হইয়া বিমাতা ঠাকুরাণীকে করাইয়াই দিতে হইল।

বিবাহবাসরে উপস্থিত হইয়া জয়ন্ত দেখিল তাহার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হইয়াছে। বরকে পোশাক বহুমূল্যই দেওয়া হইয়াছে। পাঞ্জাবীটা ভাল শাদা ফ্ল্যানেলের, তাহাতে সোনার বোতাম। ঘড়িও পাইল, আংটিও।

লোকজন বেশী ছিল না, গোধূলিলগ্নে বিবাহ হইয়া গেল। বরকন্যা অতঃপর বাসরে প্রবেশ করিল। এতক্ষণে জয়ন্ত ভাল করিয়া নববিবাহিতা পত্নীর মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিল। শুভদৃষ্টির সময় শুধু একজোড়া টানা চোখ ছাড়া মুখের আর কিছু দেখিতে পায় নাই। এখন দেখিল রঙ বেশী কালো কিছু নয়, তাহার নিজের চেয়ে এক পোঁচ ফরসাই হইবে। চোখমুখ মন্দ লাগিল না তাহার চোখে, রূপসী অবশ্য নয়।

শীতের আধিক্যে বাসর বেশীক্ষণ বসিল না। প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধারা বিদায় হইলেন, একটু নিয়মমতো ঠাট্টাতামাসা করিয়া। শিশুরা কান্না জোড়াতে যুবতীরাও প্রস্থান করিতে বাধ্য হইলেন। রাত দশটা বাজিতে না বাজিতে বাসরঘরে বাহিরের লোক আর কেহ রহিল না।

বর এতক্ষণ বরোচিত সলজ্জ মুখে একটা সোফার এক কোণে বসিয়া ছিল, অন্য কোণে নববধূ। সেও মাথা নীচু করিয়া বসিয়া আছে। জয়ন্ত এখন ঘরের চারিদিকে তাকাইয়া ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল। পালঙ্কটি ভাল, বিছানাও ভাল, কিন্তু ও হরি, লেপ নাই কেন? তাহার বদলে কম্বল কেন? জয়ন্ত আবার কম্বল দেখিতে পারে না, তাহার বড় গা কুটকুট করে।

গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিল, "সুলতা।"

বধূ তাহার দিকে ফিরিয়া তাকাইল। বরের মুখের ভাব দেখিয়া ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলছেন?"

জয়ন্ত বলিল, "আমার সঙ্গে যা কথা হয়েছিল, তা ত সব রক্ষা করা হয় নি?"

সুলতা উৎকণ্ঠিত ভাবে বলিল, "কি হয়েছে বুঝতে পারছি না ত?"

জয়ন্ত বলিল, "লেপ নেই কেন? ভাল লক্ষ্ণৌ-এর ছিটের লেপের কথা বলে দিয়েছিলাম যে? কম্বল আমি দেখতে পারি না।"

সুলতা হাসিয়া ফেলিল। বলিল, "এই ব্যাপার, বাবাঃ, যা ভয় লাগিয়ে দিয়েছিলেন, আমি ভাবলাম সত্যি বড় কিছু ত্রুটি হয়েছে। এখানে ভাল ছিট পাওয়া গেল না, তাই কলকাতায় করতে দেওয়া হয়েছে, কালকের মধ্যে এসেই যাবে। আজ রাত্রেও এই সময় একটা ট্রেন আছে, তাতেও আসতে পারে।"

বলিতে বলিতে সত্যই লেপ আসিয়া পৌঁছিল। কনের মা লেপ লইয়া ঘরে ঢুকিলেন। লেপ রাখিয়া কম্বল দুটি তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "একটু দেরি হয়ে গেল, কিছু মনে কোরো না বাবা।"

জয়ন্ত মুখে বলিল, "না না, এতে মনে করবার আর কি আছে?" কিন্তু শাশুড়ী বাহির হইয়া যাইবামাত্র দরজা ভেজাইয়া দিয়া, গায়ের শাল আলনায় রাখিয়া, খাটে গিয়া উঠিয়া বসিল। কোমর অবধি লেপ টানিয়া দিয়া বলিল, "সুলতা, ওখানে বসে রইলে কেন? তোমার শীত করছে না? গায়ে ত শালও নেই?"

সুলতা তাহার দিকে চাহিয়া ফিক্ করিয়া আবার হাসিল, বলিল, "সবাই কি আপনার মত শীত-কাতুরে ?

জয়ন্তও হাসিল, বলিল, "আমাকে হয় বোকা নয় পাগল ভাবছ, না ?"

সুলতা বলিল, "ওমা, তা কেন ভাবতে যাব ? আপনাকে কি আমরা চিনি না ? পিসীমার বাড়ী গিয়ে কতবার আপনাকে দেখেছি, আমাদের বাড়ীর সবাই জানে আপনাকে।"

জয়ন্ত বলিল, "যাক, আগে দেখেছ, এবং এখন বিয়ে করতে রাজী হয়েছ, এতে বুঝলাম যে অপছন্দ কর নি। আমিও না দেখেই এগোলাম। একেবারেই ঠকি নি কিন্তু। আচ্ছা, বড় শীত, এই বার লেপটা বেশ ভাল করে গায়ে দিয়ে নাও। সত্যি, ভাল লেপের তুল্য জিনিস নেই! আচ্ছা, লজ্জা পাচ্ছ কেন বল ত ? যথেষ্ট রাত হয়েছে, এখন ঘুমলে কিছু অন্যায় হবে না।"

—•—

সে এক

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

সে এক আদর্শ সুর
শুনেছি প্রত্যূষে।
শুকতারা অরণ্যশীর্ষে
জ্বলে জ্বলে ম্লান।
আতস সমান।
গলে যায় কঠিন পাষাণ॥

প্রদোষের অন্ধকার
হারাতে হারাতে
হার মানবে না জানি
সমুদ্র-সৈকতে।
নীল নীল দীপগুলি জ্বলে।
প্রবালের বাতিঘরে আলোর ফোয়ারা।
দূর প্রাচ্যে তারা নিশাচর :
অন্তরের স্বপ্ন আর আকাশ জ্যোতিতে
আগ্নেয় করেছে যারা ঘর।
তাল আর তমালের রাজ্য নয়।—
বালুঝড়
লুণ্ঠনের নিত্য সহচর !

গলে যাবে প্রদৃপ্ত পাষাণ,
অন্ধকার ক্ষয়ে যাবে
সে এক
নবীন প্রত্যূষে।
হয় তো
হবেও বা
বিদ্ধ প্রাণ—অনর্বাণ ক্রুশে !

দিল্লী

শ্রীজীবনকৃষ্ণ সান্যাল

পরিব্যাপ্ত অন্ধকারে ঘুরিতেছে কেবল বিলাপ।
ধ্বনি উঠে থেমে যায়, বলিতে পারে না কথা ভয়ে—
ঐশ্বর্য্য সম্পদ শক্তি ধূলিতলে, জাগে অভিশাপ—
প্রবাসী অতীত একা—ফিরিতেছে বেদনারে লয়ে।

এই দিল্লি ইন্দ্রপ্রস্থ, সম্রাটের সাজাহানাবাদ।
কত জয় পরাজয় বার বার রক্ত স্নান করি,
ভীষণ আহব মাঝে করিয়াছে আঘাত সংঘাত—
ইতিহাস অধিষ্ঠাত্রী, হাসিয়াছে জয়মাল্য ধরি॥

আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব, ষড়যন্ত্র দ্বার ভেঙ্গে আসে,
জনগণ দীর্ঘশ্বাস, মুক্তি মাগে অশান্ত ক্রন্দন—
শতাব্দীর ভগ্ন পথে, বিস্মৃতির পদশব্দ ভাসে—
তারি মাঝে ফুটিয়াছে সুন্দরের আত্মনিবেদন॥

বিজয়ী বিজিত আজ মৃত্যুঘুমে পাশাপাশি রহে,
শাণিত কৃপাণ স্তব্ধ, মুখরিত ঝিল্লি শিবারব—
বিদেহী অতৃপ্ত তৃষা, তমসার পাত্রহাতে কহে
কি দারুণ অগ্নি প্রাণে, হে বিধাতা শান্ত কর সব।

নিয়তি সাগর-তীরে দিল্লী ডাকে "আয় আয় বলে"
নির্ম্মম আহ্বান শুনি বীরদল আত্মভুলি চলে।

আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনের পঞ্চবিংশতি অধিবেশন : মস্কো ১৯৬০

শ্রীশিবদাস চৌধুরী

৯ই আগষ্ট, ১৯৬০ সন একটি স্মরণীয় দিন। এইদিন লেনিন পাহাড়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত মস্কো বিদ্যালয়ের বিরাট সুরম্য ভবনে আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিদেরা মিলিত হন। ১৬ই আগষ্ট অধিবেশন সমাপ্ত হয়। এইবারকার অধিবেশনে ৬০টি রাষ্ট্রের দুই সহস্রাধিক প্রাচ্যবিদ্যা ও আফ্রিকাবিদ্যাবিশারদ, অনুশীলনকারী ও অনুরাগীরা যোগদান করেন। ইহার মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে প্রায় ৪০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।[১] তাঁহাদের মধ্যে রহিয়াছেন ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক ক্ষেত্রেশ চট্টোপাধ্যায়, আর. এন. ডাণ্ডেকর, অধ্যক্ষ গৌরীনাথ শাস্ত্রী, ডঃ কালিদাস নাগ[২] ও শ্রীগোপাল হালদার। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ ব্যক্তিগতভাবে নিমন্ত্রিত হন। অন্যান্যেরা সরকারী প্রতিনিধি হিসাবে যান। এই সমস্ত অধিবেশনের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান করা—অদ্যাবধি অর্জিত তথ্যের হিসাব-নিকাশ করা; অজ্ঞাত অনাবিষ্কৃত ও অস্পষ্ট আবিষ্কৃত তথ্যসমূহের উপরে আলোক-সম্পাতের চেষ্টা করা। গবেষকের সমস্যা ও উপাদানের জটিলতার সমাধানের আন্তরিক প্রয়াস।

সমাগত অতিথিদের উপস্থিতিতে গত অধিবেশনের (মিউনিক) সভাপতি বৌদ্ধশাস্ত্রবিশারদ ই. বাল্ডস্মিড্ (E. Waldschmidt) সোবিয়েৎ প্রাচ্যবিদ্যা মন্দিরের অধ্যক্ষ, সোবিয়েৎ তাজিকিস্তানী ফার্সীভাষী প্রৌঢ় ও প্রাজ্ঞ বাবাযান্ গফুরেভের হস্তে আনুষ্ঠানিক ভাবে সভাপতিত্বের দায়িত্ব অর্পণ করেন। গফুরেভ সভাপতিত্ব গ্রহণ করিলে পরে আনাস্তাস্ মিকুয়ানকে (ইউ. এস. এস. আর-এর মন্ত্রীসভার প্রথম সহ-সভাপতি) সম্মেলন উদ্বোধন করিতে আহ্বান করা হয়। তাঁহার ভাষণ সকলকেই মুগ্ধ করে। বিনয়ের সহিত তিনি তাঁহার বিশ্বাস ও বর্তমান গবেষণার ধারায় মতামত ব্যক্ত করেন। কোথাও কোনো বক্রোক্তি নাই। শ্লেষ নাই। রাশিয়া ইতিহাসকে কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিয়া সভ্যতার বিকাশে এযাবৎ উপেক্ষিত সাধারণ মানুষের অবদানের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারের প্রচেষ্টা চালাইতেছেন। তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গি নূতন, সজীব। ভবিষ্যৎ এই প্রচেষ্টার সার্থকতা বিচার করিবে। তাঁহার বক্তৃতার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। কারণ ইহা প্রণিধানযোগ্য :

"The revolutionary turn in life of the peoples of the Asian and African countries radically changes the character and content of orientology. It can be stated forth-with that its new, fundamental distinction is the fact that now, as never before, the peoples of the East are **themselves** creating the science that treats of their history, culture and economics, and thus they have changed from the subject of science they had been in the recent past, into its creators."—(*Soviet Land*, No. 18, 1960. p. 29).

সম্মেলনের কার্য্যক্রম কুড়িটি বিভাগে ভাগ করা হয়। ইহাতে প্রায় ৭০০টি প্রবন্ধ গৃহীত হয়।

সোভিয়েট প্রাচ্যবিদদের ২৫০টি প্রবন্ধের মধ্যে ভারতবিদ্যা বিষয়ে ৮০টি। ইহার মধ্যে ৫০টি পাঠ করা হয়। সোভিয়েট প্রতিনিধিদের এক-তৃতীয়াংশ প্রবন্ধ পাঠের ও আলোচনার বন্দোবস্ত করা হয়। আর বাকী সময়টুকু ভিন্-দেশী প্রাচ্যবিদদের জন্য নির্দ্ধারিত করা হয়।

২

সোভিয়েট প্রাচ্যবিদ্‌দের ভারতীয় বিষয়ের আলোচনা বেশীর ভাগই আধুনিক ভারতের জীবন ও সংস্কৃতিতে নিবদ্ধ ছিল। নিবন্ধগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল : (১) ভারতের সমকালীন ইতিহাসের চিত্র; (২) অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশের ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের ভারতীয় গ্রামীণ সমাজ ও অর্থনৈতিক পরিচয়; (৩) আকবরের ধর্মসংস্কার; (৪) কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র

---

১ ডক্টর কালিদাস নাগ ব্যক্তিগত ভাবে আমন্ত্রিত হইয়া সম্মেলনে যোগদান করিবার জন্য নিজের খরচে মস্কো গিয়াছিলেন। ডক্টর নাগের 'Discovery of Asia' নামক গ্রন্থখানি তাঁহার বন্ধু শ্রীপ্রশান্ত মহলানবিশ ১৫ই আগষ্ট, ১৯৬০ তারিখে ইউ-এস-এস-আর একাডেমি অফ সায়েন্সকে উপহার পাঠান। উক্ত সংস্থার কর্তৃপক্ষ ডক্টর নাগকে নিমন্ত্রণপত্র প্রেরণ করেন।

২ ডক্টর নাগ তাঁহার নূতন গ্রন্থ 'Greater India' নিজ হস্তে কংগ্রেসকে উপহার দেন। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। ভারতের জাতীয় জীবনের পক্ষে স্মরণীয় আগষ্ট মাসে এই গ্রন্থ শেষ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া ডক্টর নাগ যে বিমল আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়াছেন সে কথা তিনি সমবেত সুধীজনসমক্ষে ব্যক্ত করেন।

ও গ্রীক ঐতিহাসিক মেগাস্থিনীসের ভারত-পুরাণে ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দের আলোচনা; (৫) ভারতের আধুনিক ভাষা ও সাহিত্যের সমস্যা; (৬) উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম; (৭) ভারতীয় রাষ্ট্রায়ত্ত কলকারখানার (Industry) পর্যালোচনা ও মধ্য এশিয়ার আবিষ্কৃত একটি ভারতীয় উপভাষা। ভারতীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১) ভারতীয় সভ্যতার বিকাশে চীনের প্রভাব ও (২) আর্মেণীয় বীরোপখ্যান ও মহাকাব্য বিষয়ে নিবন্ধ পাঠ করেন। ইহা ভারতবাসীর পক্ষে অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয় যে, তিনি বহির্ভারতীয় বিষয়গুলি আলোচনার জন্য স্থির করিয়াছেন, এই দুইটি প্রবন্ধই কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকাতে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। সুনীতিকুমার বর্তমানকালের মহাজন। তাই আশা করি, প্রাচীন বাক্য স্মরণ করিয়া (মহাজন যেন গতঃ সঃ পন্থা) তাঁহার অনুজেরা তাঁহার প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করিয়া বিশ্ব-জ্ঞানবিজ্ঞানের মন্দিরে প্রবেশ করিতে সচেষ্ট হইবেন।

ভারতীয় স্বার্থপরতা বা কূপমণ্ডুকতার বা ব্রীড়ার অপবাদ ঘুচাইতে ত্রুটি করিবেন না। সম্প্রতি আফ্রিকার সভ্যতা বিষয়ে কলিকাতা হইতে ডঃ চ্যাটার্জীর একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে বহু গবেষণা হইয়াছে ও হইতেছে। বহু সমিতি ও বিদ্বজ্জনসভাও রহিয়াছে। কোনটির নামের আগে আন্তর্জাতিক শব্দও রহিয়াছে। কিন্তু সকলেরই গবেষণার বস্তু ভারতবর্ষ। ইহার বাহিরে তাঁহারা এক পা অগ্রসর হইতে নারাজ। শাস্ত্রে সমুদ্র-লঙ্ঘন নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু শাস্ত্র ত মনকে ঘরের কোণে বাঁধিয়া রাখিতে বলেন নাই! আর সমুদ্র লঙ্ঘনের শাস্ত্রীয় নিষেধ শাস্ত্রীয় বিচারের কষ্টিপাথরেই খণ্ডন করা হইয়াছে; এবং বহু পূর্ব হইতেই আমাদের সাগরপারে যাতায়াত আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু মনের গতি এখনও আমাদের চত্বরে।

রবীন্দ্রনাথের আক্ষেপ এখানে উল্লেখযোগ্য:

"বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।
দেশে দেশে কত-না নগর রাজধানী –
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
কত-না অজানা জীব, কত-না অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে। বিশাল বিশ্বের আয়োজন;
মন মোর জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তারি এক কোণ।
সেই ক্ষোভে পড়ি গ্রন্থ ভ্রমণবৃত্তান্ত আছে যাহে
অক্ষয় উৎসাহে—
যেথা পাই চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী
কুড়াইয়া আনি।
জ্ঞানের দীনতা এই আপনার মনে
পূরণ করিয়া লই যত পারি ভিক্ষালব্ধ ধনে।"
(ঐকতান)

ইহার পূর্বে বৃহত্তর ভারতীয় সভ্যতার বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে বহির্ভারতীয় বিদ্যাচর্চার (অর্থাৎ চীন, তিব্বত, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া) কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন ৺শরচ্চন্দ্র দাস, ৺প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডঃ কালিদাস নাগ প্রমুখ কতিপয় পণ্ডিত। যদিও তাঁহাদের আলোচ্য বিষয় বিশেষ গণ্ডির বা দৃষ্টিভঙ্গির ভিতরে সীমিত ছিল—তথাপি সেই ধারাটুকুও বজায় রাখা বর্তমানে দুষ্কর হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী শিরে ধারণ করিয়া ও তাঁহাকে পুরোধা করিয়া আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর ও অন্যান্য গুণীজনের পৃষ্ঠপোষকতায় কয়েকজন পণ্ডিতের৩ চেষ্টায় কলিকাতাতে বৃহত্তর ভারত সমিতি (Greater India Society) ১৯৩৩ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহাও আজ নানা কারণে নির্বাণোন্মুখ। ১৯৫৪ সনে বসু-বিজ্ঞান মন্দিরের ডঃ অধ্যক্ষ দেবেন্দ্রমোহন বসুর উৎসাহে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া (South-East Asian Studies) গবেষণার নিমিত্ত এশিয়াটিক সোসাইটিতে একটি কেন্দ্র স্থাপন করিবার জন্য একটি পরিকল্পনা ভারত সরকারের দপ্তরে দাখিল করেন। উহা আজও সরকারী ফাইলের জগদ্দল পাথরের নীচে চাপা রহিয়াছে।

বিশ্বের সর্বত্র ভারতীয় সভ্যতার বিষয়ে চর্চা ও অনুশীলন চলিতেছে। গবেষকগণ তাঁহাদের মতামতও জ্ঞাপন করিতেছেন। কিন্তু আমরা অন্য দেশের জ্ঞানবিজ্ঞানের মূল্যায়নে এখনও নিশ্চেষ্ট রহিয়াছি। জ্ঞানের জগতেও পারস্পরিক আদান-প্রদান ব্যতীত জাতীয় চরিত্র পরিপূর্ণ ভাবে বিকাশ লাভ করে না।৪ তাই ডঃ চ্যাটার্জী

---

৩ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (সভাপতি), উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল (সম্পাদক), কালিদাস নাগ (যুগ্ম-সম্পাদক), সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৺প্রবোধচন্দ্র বাগচী, নলিনাক্ষ দত্ত ও জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহার মুখপত্র ডঃ ঘোষালের সম্পাদনায় ১৯৩৪ সনে আত্মপ্রকাশ করে --

৪ "To know my country in truth one has to travel to that age when she realised her soul, and thus transcended her physical boundaries; when she revealed her being in a radiant magnanimity which illumined the Eastern horizon making her recognised as their own by those in alien shores who

১৯৩৩ সনে রোপিত বীজে জল সিঞ্চন করিয়া উহাকে পুণর্জীবিত করিয়াছে—আশা করি, তাহা ফলে-ফুলে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে।

অন্যান্য নিবন্ধের মধ্যে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ অমলানন্দ ঘোষের 'প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার গঠনে বিভিন্ন জাতির অবদান'; হায়দারাবাদের ডঃ নাজিমুদ্দিনের 'আলবেরুণীর বিষয়ে'; রামশরণ শর্মার 'ভারতের ভূমিস্বত্ব'; গৌরী শাস্ত্রীর 'মধ্যযুগের বাঙ্গলায় সংস্কৃতচর্চা'; ডঃ কালিদাস নাগের 'দক্ষিণ-পূর্ব ভারতের সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব'; তামিল অধ্যাপক চেট্টিয়ার-এর 'প্রাচীন তামিল গ্রন্থ কুরল'; আলিগড়ের সরুর সাহেবের 'স্বাধীনতার পরবর্তী উর্দু সাহিত্য'; গোপাল হালদারের 'বাঙ্গালা ঐতিহাসিক রোমান্সের স্বরূপ' উল্লেখযোগ্য। আলোচনাতে অনেককেই সোৎসাহে যোগদান করিয়াছিলেন।[৫]

শান্তিনিকেতনের তরুণ মার্কিণ (চিকাগো) গবেষক অধ্যাপক ষ্টিফেন হের 'রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বিশ্ব' নিবন্ধটি পাঠের পরে বিতর্কের ঝড় উঠে। উহাতে ভারতীয় ও সোবিয়েৎ, রবীন্দ্রানুরাগীরা বিশেষ ভাবে অধ্যাপক হের প্রতিপাদ্য 'অপচেষ্টাকে' দৃঢ় ও সংযত ভাবে খণ্ডন করিয়া প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। অধ্যাপক হের-এর বক্তব্য ছিল যে, 'রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার পার্থক্য ও বৈপরীত্য দেখিয়ে প্রাচ্যের অধ্যাত্মবাণীর মহত্ত্ব ঘোষণা করেন এবং এই বাণীর ঋষিরূপেই তিনি পাশ্চাত্ত্য সমাজে পরিচিত ও আদৃত।' (দ্রঃ—গোপাল হালদার—পরিচয়, কার্তিক, ১৩৬৭)।—ভারত সোবিয়েতের যুক্তির নিকটে অধ্যাপক হেরকে নতি স্বীকার করিতে হইল। এই "the most outstanding and the most representative"[৬] সম্মেলনের দুইটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

—একটি হইল 'আফ্রিকীয় বিদ্যাশাখার উদ্বোধন। ইহার পূর্বে আফ্রিকার প্রাচীন মিশর ও আরব জগৎকেই একমাত্র প্রাচ্যের আত্মীয় হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছিল। 'কৃষ্ণ উপমহাদেশ'—'Dark Continent' বলিয়া কথিত আফ্রিকার ভূখণ্ড অপাংক্তেয় ছিল। মস্কো অধিবেশন এই লৌহ-যবনিকা উত্তোলন করিয়া 'কৃষ্ণ আফ্রিকা'কে 'বিদ্বৎসমাজে স্বীকৃতি ও মানব-সভ্যতার' বিকাশের স্বরূপ উদ্ঘাটন ও ইতিহাস-রচনার মহাযাত্রায় যোগদানের পথ প্রশস্ত করিয়াছিল। আফ্রিকাকে পূর্ণ মর্য্যাদা দিয়া আফ্রিকার সভ্যতার বিকাশের ঐতিহাসিক আলোচনার সূত্রপাত হইল।

আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হইল পশ্চিমের তথাকথিত মুক্ত দুনিয়ার কুলীন পণ্ডিতেরা আর লৌহ-যবনিকার "লাল চীন" এই সম্মেলনে যোগদান করেন নাই। ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। ইহা ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে লেনিনগ্রাডে অনুষ্ঠিত তৃতীয় প্রাচ্য বিদ্যা সম্মেলনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তখন "কুলীন ও প্রাজ্ঞ পণ্ডিত"দের অনেকেই সেই সম্মেলন বর্জন করেন।

এই সম্মেলনে আলোচনা ত্রিমুখী ধারাতে চলে। প্রথমে বিভিন্ন বিষয়ে যে সমস্ত গবেষণা হইয়াছে তাহার ঐতিহাসিক মূল্যায়ন ও হিসাবনিকাশ। দ্বিতীয়তঃ, নবাবিষ্কৃত বিষয়ের আলোচনা। তৃতীয়তঃ, প্রাচ্যবিদ্‌দের সমস্যা ও সমাধানের সম্ভাবিত পন্থা।

বর্তমান সম্মেলনের সভাপতি গফুরভ বলেন যে, সোবিয়েৎ তথ্য ও সত্যানুসন্ধানীরা তাঁহাদের মতামত কোনো বিদেশী সহযাত্রী বা বর্তমান সম্মেলনের উপর চাপাইয়া দিতে চেষ্টা করিবেন না। কিন্তু সোবিয়েৎ প্রাচ্য-বিদ্যা-গবেষকেরা মার্ক্স ও লেনিনের প্রদর্শিত পথ অনুযায়ী তাহাদের সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চেষ্টা করেন তাহাও লুকাইবার চেষ্টা করিবেন না। কারণ তাঁহারা বিশ্বাস করেন উহাই মহাজনের পন্থা। তাই অনুসরণীয়।

(মস্কো নিউজ, শনিবার জুলাই ৩০, ১৯৬০; পৃঃ ৫)

৪

ইহার পূর্বে রাশিয়াতে আর একবার এই প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলন হইয়াছিল ১৮৭৬ খ্রীঃ-এ লেনিনগ্রাদে (তখনকার সেণ্ট পিটার্সবুর্গ)।

মূল এশিয়া ভূ-খণ্ডে এ পর্যন্ত একবারও ইহার কোনো সম্মেলনের অধিবেশন বসে নাই। ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। যাহা বর্তমান সম্মেলনে স্থির হইয়াছে যে, পরবর্তী অধিবেশন ভারত সরকারের আতিথ্যে

---

were awakened into a great surprise of life; and not now when she has withdrawn herself within a narrow barrier of obscurity, into a miserly pride of exclusiveness, into a poverty of mind that dumbly revolves round itself in an unmeaning repetition of a past that has lost its light and has no message to the pilgrims of the future"—(Rabindranath Tagore—Foreward to Journal of *Greater India Society*, Vol. I, No. 1.)

৫ সাহিত্য ও রসতত্ত্ব (Aesthetics) বিভাগে ডঃ কালিদাস নাগ সভাপতিত্ব করেন ও আন্তর্জাতিক রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জী রচনার জন্য আবেদন জানান।

৬ "এস. কে. চ্যাটার্জি, সোভিয়েট ল্যাণ্ড, নং ১৮, ১৯৬০

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হইবে। ভারতের পক্ষে আমেরিকা ও যুক্ত আরব রাজ্য তাহাদের আবেদন প্রত্যাহার করেন।

৫

এই সম্মেলন প্রথম আরম্ভ হয় প্যারিসে। ১৮৭৩ খ্রী: লিও ডি রোসনির সভাপতিত্বে ১ হইতে ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অধিবেশন বসে। প্রথম পাঁচদিন চীন-জাপান বিষয়ে আলোচনা ও প্রবন্ধ পাঠ হয়। অন্যান্য বিষয় বাকী তিন দিনে। রবিবারে অধিবেশন স্থগিত ছিল। সম্মেলনে যোগদানকারীদের ১০ শিলিং চাঁদা ধার্য করা হইয়াছিল। এই চাঁদার ভিতরেই তিন খণ্ডে প্রকাশিত সম্মেলনের আলোচ্য নিবন্ধগুলি বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। এই প্রথম সম্মেলনে ভারতবর্ষ হইতে যে সমস্ত প্রতিনিধি যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহারা হইলেন :

(১) ই. সি. বেইলী, সিমলা
(২) উইলিয়ম হাণ্টার, কলিকাতা
(৩) জেমস বার্জেস, বোম্বাই
(৪) আর্থার বার্নেল, মাদ্রাজ
(৫) ডেভিড লেইনগ বার্ণস, এলাহাবাদ
(৬) লেপেল এইচ গ্রিফিন্, লাহোর
(৭) আর. টি. এস. গ্রিফিথ্, বারাণসী
(৮) রেভা: জেমস্ লঙ্, কলিকাতা।

মি: বেইলী ও রেভা: লঙ্ এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিনিধিত্ব করেন।

এই সম্মেলনে অন্যান্য সভ্যদের মধ্যে এমিল বুর্ণফ এবং মাস্পেরুর নাম এদেশে একেবারে অপরিচিত নহে।

দ্বিতীয় অধিবেশন হয় লণ্ডনে৭ (১৮৭৪ খ্রী:)। তৃতীয় অধিবেশন হয় সেণ্ট পিটার্সবুর্গে (১৮৭৬ খ্রী:)। এই তৃতীয় অধিবেশন নানা দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য। তাই এ সম্বন্ধে দুই-একটি কথা লিখিতে হইতেছে। লণ্ডন সম্মেলনের বহু সদস্যের অমতেই লেনিনগ্রাদের তৃতীয় সম্মেলনের স্থান নির্বাচিত হয়। রাশিয়ার সম্রাট সানন্দে তাঁহাদের প্রস্তাবে রাজী হন ও দশ দিনব্যাপী অধিবেশনের সমস্ত ব্যয় বহন করেন। কিন্তু চিঠিপত্র লেখালেখিতে বহু সময় অতিবাহিত হয়। তাই সম্মেলন ১৮৭৫ খ্রী: বসিতে পারে নাই। কিন্তু রাশিয়ার নিজেদের বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর কোন্দল সত্ত্বেও এই অধিবেশন সমস্ত দিক হইতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইলেও—পরিবেশটিতে থমথমে ভাব ছিল।

এই অধিবেশন জার্মান পণ্ডিতেরা বর্জন করিয়াছিলেন। এমনকি প্রখ্যাত অধ্যাপক সিফনার এবং বোথলিংও অনুপস্থিত ছিলেন। পালির পণ্ডিত মিনায়েফ৮ লেনিনগ্রাদে ছিলেন—কিন্তু সভাতে যান নাই। বিদেশী পণ্ডিতেরা তাঁহার বাড়ীতে গিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা জানায়। ইহার মূলে ছিল বিশ্ববিদ্যালয়গোষ্ঠী ও একাডেমী অব সায়েন্সের সদস্যদের মধ্যে সম্মেলনের কর্তৃত্ব লইয়া রেষারেষি।

এতদ্ব্যতীত অধিবেশন খুব সুন্দর ভাবেই চলিয়াছিল। আদর-আপ্যায়নের কোনও ত্রুটি ছিল না। সভ্যদের ঢালাও নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। দৈনন্দিন কার্যাবলীর বিষয়ে সভ্যদের সকল সময়ে ওয়াকিবহাল রাখা হইত।

কাউণ্ট ভোরোনজোফ-দশকোভ সভাপতিত্ব করিতে অস্বীকৃত হইলে এই অধিবেশনে সেণ্ট পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গ্রেগরিয়েফ পৌরোহিত্য করেন। সাধারণ সম্পাদক ছিলেন ব্যারণ ওষ্টেন-সাকেন ও অন্যতম সম্পাদক ছিলেন আরবী-ভাষাবিদ্ ব্যারণ ভিক্টর রোসেন। দক্ষিণ-এশিয়া শাখায় সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ্ হেনরী কার্ণ (মহামতি কর্ণ)।

চতুর্থ অধিবেশন হয় ফ্লোরেন্স শহরে (১৮৭৮ খ্রী:)। এই অধিবেশনেই সর্বপ্রথম একজন ভারতবাসী কর্মপরিষদের সদস্য হন। তিনি হইলেন গোয়ার ডা: গারসন ডি কুন্হা (প্রথমে ব্রাহ্মণ পরে খ্রীষ্টান)। তিনি ভারতীয় শাখার সম্পাদক হন। ইহার পূর্বে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিতেন ইংরেজ পণ্ডিতেরা। ভারতীয় শাখার সভাপতিত্ব করেন ডঃ আর. রথ। এ. এফ. বেবার ও ফ্রেচিয়া সহ-সভাপতিদ্বয় ছিলেন। সকলেই ভারততত্ত্ববিদ হিসাবে নমস্য।

ইহার পরে আরও ২০টি অধিবেশন হয় ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে৯, একটি ইস্তাম্বুলে (১৯৫১) ও একটি আলজেরিয়ারে (১৯০৫)। ২৪তম অধিবেশন হয় ১৯৫৭

৭। এই অধিবেশনে ডঃ রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকর ও শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন।

৮। আইভান পাভ্লোভিচ মিনায়েফ (১৮৪০-১৮৯০) তিনবার ভারত ভ্রমণ করেন, ১৮৭৪-৫, ১৮৮০, ১৮৮৫-৬। ভ্রমণকাহিনী ইংরেজীতে প্রকাশিত হয় কলিকাতা হইতে ১৯৫৮ সনে।

৯। বার্লিন (১৮৮১), লাইডেন (১৮৮৩, ১৯৩১), ভিয়েনা (১৮৮৬), ষ্টকহোম (১৮৮৯), লণ্ডন (১৮৯২); গেনফ (১৮৯৪) প্যারী (১৮৯৭, ১৯৪৮), রোম (১৮৯৯, ১৯৩৫), হামবুর্গ (১৯০২), কোপেনহাগেন (১৯০৮), এথেন্স (১৯১২), অক্সফোর্ড (১৯২৮) ব্রুসেল্স (১৯৩৮) ও কেম্ব্রিজ (১৯৫৪)।

সনে মিউনিকে। আজকাল সাধারণতঃ প্রতি তিন বৎসরে একবার ইহার অধিবেশন বসে।

৬

রুশ-ভারত সাংস্কৃতিক যোগাযোগ আজিকার নয়। এই যোগাযোগের ইতিহাসকে তিন পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্বে হইল গোড়ার কথা অথবা সূচনা—যেখানে ইতিহাসের ছাপ অত্যন্ত ক্ষীণ। দ্বিতীয় পর্ব সুরু হইল ভগবদ্গীতার রুশ-অনুবাদ প্রকাশকাল হইতে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দার মধ্যভাগ হইতে,—যখন হইতে ইতিহাসের পদধ্বনি স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। তৃতীয় পর্ব আরম্ভ হইল বিপ্লবোত্তর যুগ হইতে।

এই বিপ্লবোত্তর যুগে জাতির ইতিহাস ও সমাজ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন হইয়াছে। এই পরিবর্তন একাডেমিশিয়ান ভি. ভি. ষ্ট্রুভের প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য। ইহার প্রতিটি ছত্র প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা সম্বন্ধে সহমর্মিতার পরিচায়ক। (Soviet Land, পৃঃ ২, আগষ্ট, ১৯৬০) এই দরদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতেই আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলন হইয়াছে মস্কো শহরে। ফলে রুশ-ভারত সাংস্কৃতিক যোগাযোগ আরও ঘনিষ্ঠ হইতে চলিয়াছে।

এই সম্মেলনের বৈশিষ্ট্য ও মূল সুর সম্মেলনের সাধারণ সম্পাদক ডঃ আই. এম্. ডিয়াকোনফ-এর এক প্রবন্ধে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে (Soviet Land, XIII, p. 7, 1960)। তিনি বলেন :

"The times when the study of Asia and Africa was a monopoly of Western scholars are now past. The path of independent development the Afro-Asian peoples have taken to is accompanied by changes not only in their political and economic life, but also by a radical remoulding in their spiritual outlook. The achievement of independence proved to be a mighty stimulus of national advancement accompaied by a development in science and culture, new progress in literature and art, and an understandable interest in their past is displayed in all countries of the East. The scholars of these countries are endeavouring to unravel the truth about the intricate path of development covered by their peoples, discarding, together with the progressive scholars of the West, the conceptions of the eternal backwardness of the Afro-Asian peoples. . . . . An important feature of oriental studies of today is its change-over to contemporary problems, to events which life imperatively sets before science. Now-a-days wide-scale research cannot be restricted to the tradittional fields of orientalism—philology, ancient and medieval history. Scholars who base themselves on real facts of life cannot ignore the events of world-historic significance connected with the building of new Asia and Africa. Most of the more important research papers published recently testify that scholars devote more attention to the part played by the people in the major political events in the countries of the East. The people are the makers of history and this truth has been confirmed by mankind's whole historic development. It can be said with confidence that quite a few reports at the coming Congress will be devoted to the part played by the popular masses in shaping the historic destinies of Asia."

এ যেন কবিগুরুর মর্মবাণীকে রূপ দিবার অকৃত্রিম প্রয়াস :

"এস সুরি, অখ্যাত জনের
নির্বাক মনের।
মর্মের বেদনা যত করিও উদ্ধার।
প্রাণহীন এ দেশেতে গানহীন যেথা চারিধার,
অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি
রসে পূর্ণ করি দাও তুমি।
অন্তরে যে উৎস তার আছে আপনারি
তাই তুমি দাও তো উদ্বারি।
সভ্যতার* ঐকতান-সংগীত সভায়
একতারা যাহাদের তারাও সম্মান যেন পায়—
মূক যারা দুঃখে সুখে,
নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে।
ওগো গুণী,
কাছে থেকে দূরে যারা, তাহাদের বাণী যেন শুনি।"

—[ঐকতান, ১৯৪১]

* "সাহিত্যের" স্থানে "সভ্যতার" প্রয়োগ করা হইয়াছে।

—০৪০—

সবার উপরে

শ্রীসীতা দেবী

২৩

সুমনা রেঙ্গুন যাবার ব্যবস্থা করতে গিয়ে নিজের অসুস্থতার কথাও ভুলে গেল। ভয়টা তার সম্পূর্ণ যায় নি। বিজয় আশ্বাস দিয়েছে বটে যে, তাকে সে কোথাও পাঠাবে না, কিন্তু যদি সে কথা রাখা সম্ভব না হয়? তার বাবা বড় জেদ করছেন নিয়ে যাবার জন্যে। তাঁকে না হয় সে অনুনয়-বিনয় করে ঠেকিয়ে রাখল, কিন্তু নিজেই যদি বেশী অসুস্থ হয় তাহলে কি বিজয়কে বাধ্য করা উচিত তাকে নিয়ে যেতে? বিদেশে সে ত দারুণ বোঝা হয়ে উঠবে! বিজয় যাচ্ছে কাজ করতে, রুগ্না স্ত্রী নিয়ে তার কাজে বড়ই ব্যাঘাত হবে।

ডাক্তার, নার্স যে যা বলল সবই সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলতে লাগল। আশ্চর্য্যের বিষয়, শরীরটা তার সেরেই উঠতে লাগল। বিজয় বলল, "আমাকে কোনো সুবিধা তুমি দেবে না দেখছি। ভাবছিলাম শরীর খারাপের অছিলায় তোমাকে ফেলে পালাবার একটা শেষ চেষ্টা করব।"

"ইঃ, পালাতে আর হয় না। কথা দিয়েছ মনে থাকে যেন। না, আমাকে পাঠিয়ে দিয়ে এবার বন্ধুপত্নীর সঙ্গে ভাব করবে?"

"ভাবই যদি করব ত তাঁর সঙ্গে কেন? আমার রুচি কি এতই খারাপ? অবশ্য মিষ্টি অতিরিক্ত খাওয়া হয়ে গেলে মাঝে মাঝে ঝাল-চচ্চড়ি খেতে ইচ্ছা করে বটে।"

সুমনা তার পিঠে একটা চড় মেরে বলল, "যাঃ, তোমরা সবই সমান। মুখেই যত ভালবাসা, এ দিকে পেটে পেটে কুবুদ্ধি। আমি কিন্তু এ কথাটা ঠাট্টা করেও মুখ দিয়ে বার করতে পারি না, কেমন যেন গলায় আটকে যায়।"

"তোমার সঙ্গে কার তুলনা? আমরা হলাম বিষকুম্ভ পয়োমুখমের জাত।"

রাসবিহারী সোজাসুজি এবার মেয়েকে লিখেছেন তাঁর কাছে যেতে। মাও দু লাইন লিখেছেন, তবে সেই আগেরই মতো সুরে। বৌদিরাও চিঠি লিখেছে। সুমনা যথাসাধ্য সাবধানে সবাইকার চিঠির জবাব দিচ্ছে পরে যাবার আশ্বাস দিয়ে দিয়ে। এখানকার বাড়ী তার নূতন আয়ার জিম্মায় থাকবে। তার স্বামীও এসে থাকবে। যিনি ঐ আয়াকে দিয়েছিলেন তিনি সার্টিফিকেট দিয়েছেন যে, লোকটি খুবই বিশ্বাসী। বিজয়ের চাকর সঙ্গেই যাবে। সব রকমের কাজই পারে বলে বিদেশে একে নিয়ে গেলে আর কোনো ভাবনা থাকে না।

বিজয় জিজ্ঞাসা করল, "অল্প কটা দিন ত? হোটেলে উঠবে? ঝামেলা অনেক কম হবে। খরচ বেশী, তা সে খরচ ত অফিস দেবে, আমাদের কোনো ভাবনা নেই তার জন্যে।"

সুমনা বলল, "আবার ঐ হাটের মধ্যে বসে থাকতে হবে? সে আমার ভাল লাগবে না। খুব ছোট একটা ফ্ল্যাট নাও। এমন কি একখানা ঘর হলেও হবে। জিনিসপত্র ত কিছুই নেব না। দু'চারটে চেয়ার টেবিল খাট ভাড়া করে নিলেই হবে। চাকরটা যাচ্ছেই ত? তোমার অফিস যে পাড়ায়, সেখানেই ঘর দেখতে বোলো।"

বিজয় তাকে রাগাবার জন্যে বলল, "এই দেখ, একলা গেলে আমি কি আরামে যেতাম। তা তুমিও হয়েছ তেমনি স্বার্থপর।"

সুমনা বলল, "অত একলা থাকার সখ যখন তোমার তা আমাকে ডুবোতে গিয়েছিলে কেন? থাকলেই পারতে একলা?"

বিজয় বলল, "চোখে দেখতে বড় ভাল লেগেছিল। ভেবেছিলাম প্রেমট্রেম করে তার পর পালিয়ে যাব, তা তোমার ঐ ছোট ছোট হাত দুখানায় এত জোর তা কে জানত? ধরে ত রাখলে।"

সুমনা বলল, "কিছুতেই তুমি serious হতে জান না, না।"

"তুমি একলাই এত সিরিয়াস যে আমিও যোগ দিলে ঘরে সারাক্ষণ চোখের জলের বান ডেকে যেত। চোখের জল জিনিসটিকে বড় ভয় করি আমি।"

সুমনা কথা ঘুরিয়ে বলল, "কলকাতা হয়ে তবে ত যেতে হবে?"

বিজয় বলল, "সেইটেই সোজা পথ। তবে এখান

থেকে জাহাজে উঠে, সারা ভারতবর্ষে ঘুরেও যেতে পার। কলকাতা যাবার ইচ্ছা নেই?"

সুমনা বলল, "খুব যে আছে তা নয়। বাবাকে দেখতে খুবই ইচ্ছা করছে, তবে গেলেই তিনি ধরে রাখবার চেষ্টা করবেন। মায়ের তিক্ততা-মাখান মুখটা মনে করলে আর ওমুখো হতে ইচ্ছা করে না।"

"যেদিন জাহাজ ছাড়বে, তার ঠিক আগের দিন গিয়ে পৌঁছব। কেউ রাগ দেখাবারও সময় পাবে না, আর থাকবার জন্যে অনুরোধ-উপরোধ করারও সময় পাবে না। দেখো, তোমার বাবাও বেশী কিছু বলবেন না; অল্প বয়সে মানুষ কি রকম পাগল হয়, তা ওঁর এখনও মনে আছে।"

যাত্রার ব্যবস্থা সেই ভাবেই হতে লাগল। দামী জিনিস বাড়ীতে বেশী কিছু রাখা হ'ল না। খানিক রইল ব্যাঙ্কে, খানিক বন্ধুবান্ধবের বাড়ীতে। নিজেরা জিনিস খুবই কম নিল সঙ্গে। তার পর একদিন বেরিয়ে পড়ল।

হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছে দেখা গেল, গৌরাঙ্গিনী বাদে বাড়ীর আর সকলেই তাদের অভ্যর্থনা করতে এসে উপস্থিত হয়েছে।

রাসবিহারী ষ্টেশনের মধ্যেই মেয়েকে জড়িয়ে ধরে অনেক আদর করে ফেললেন। বিজয় মনে মনে ভাবল, সংসার জায়গাটা বড় নিষ্ঠুর। কি রকম করে এঁর কোল থেকে তাঁর এত আদরের ধনটিকে ছিঁড়ে নিয়ে গেলাম। আমারও দিন আসছে। মেয়েই যদি আসেন আমার ঘরে, তবে আমারও এই বৃদ্ধের দশাই একদিন হবে।

কিন্তু তখন শালা-শালাজদের হাজার রকম রসিকতার উত্তর দিতে গিয়ে তার আর নিভৃত চিন্তার অবকাশ রইল না।

বাড়ীতে পৌঁছে সুমনা আর বিজয়কে একবার গৌরাঙ্গিনীর সামনে পড়তে হ'ল। মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে গৌরাঙ্গিনী দেখলেন, সেখানে কোনো চিহ্নই নেই অনুতাপের, জামাইয়ের মুখও হাস্যোজ্জ্বল। কোনো মতে জিজ্ঞাসা করলেন, "ভাল আছ ত বাবা?" মেয়েকে কোনো কথা বললেন না।

সুমনার পুরনো ঘরই তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। থাকবে ত মোটে এক রাত। বৌদি ও বোনের দল খানিকক্ষণ সুমনাকে এমন ছেঁকে রইল যে, বিজয়কে কিছুক্ষণ একলাই পড়তে হ'ল। সেই ফাঁকে রাসবিহারী একবার এসে তার কাছে বসলেন। বললেন, "মনুকে রেখে গেলে হ'ত না বাবা, এই প্রথম বার? পরে তুমি ফিরে এলে না হয় আবার বোম্বাইয়ে তোমার কাছে ফিরে যেত?"

আর কিছু বলবার না পেয়ে বিজয় সত্য কথাটাই বলে বসল। "এত কান্নাকাটি করছে যে, রেখে যেতে সাহস করছি না।"

রাসবিহারী খানিক চুপ করে থেকে বললেন, "তবে যাক তোমারই সঙ্গে। তবে শেষের দিকটা এখানেই নিয়ে এস। তুমি নিজেও ছুটি নিয়ে এস।"

বিজয় বলল, "তা নিশ্চয় আসব।"

পরদিন যাত্রার সময় সুমনা জোর করেই হাসিমুখে রইল। বাবাকে অনেক করে আশ্বাস দিল, রেঙ্গুন থেকে ফিরে এসে সে অন্ততঃ মাস দুই এখানে কাটাবে। বিজয়ও যতটা ছুটি পায় এখানেই থাকবে।

জাহাজে ওঠাটা সুমনার কাছে নূতন, বাড়ীর অন্য মেয়েদেরও তাই। উঠে পড়ে কেবিন খুঁজে'বার করা, জিনিসপত্র গোছান, সকলের কাছে বিদায় নেওয়া, ব্রহ্মদেশ থেকে কার জন্য কি রঙের সিল্ক আর কি রকম জুতো আর ছাতা আনতে হবে তার ফর্দ্দ নেওয়া শেষ হতে না হতেই জাহাজ ছাড়বার বাঁশী বাজল। যারা যাবার তারা এবার হুড়মুড় করে নেমে গেল। সকলকে বিদায় দেবার জন্যে সুমনা আর বিজয় এসে ডেকের রেলিঙের ধারে দাঁড়াল।

আস্তে আস্তে ঘুরে গিয়ে জাহাজটা মাঝ গঙ্গায় একটু দাঁড়াল। বিজয় বলল, "চল, কেবিনে যাই, আর ত ওদের মুখও দেখা যাচ্ছে না।"

ভিতরেই গিয়ে বসল তারা। সুমনা বলল, "তিন রাতের জন্যে এই আমাদের ঘর। কি ছোট্ট, ঠিক যেন 'ডল্‌স্ হাউস্'।"

বিজয় বলল, "তবু ত জিনিসঠাসা নয়। এক একটা কেবিনে এত জিনিস আর এত মানুষ যে মনে হয় মালগাড়ী।"

সুমনা বলল, "ভারতবর্ষ ছাড়লাম এই প্রথম, জানি না অচেনা দেশটা কি রকম লাগবে।"

বিজয় বলল, "একটা চেনা জিনিস ত সঙ্গেই রইল, কাজেই খুব বেশী ভয় পাবে না। শহরটা দেখতে ত ভালই শুনি। আর দেখতে দেখতে এই কটা দিন কেটে যাবে। দু'মাসও পুরো না লাগতে পারে। কাজটা কত তাড়াতাড়ি হয়ে যায় তার উপর নির্ভর। তুমি যদি বেশ সুস্থ থাকতে তাহলে বর্ম্মার অন্যান্য দ্রষ্টব্যগুলিও তোমাকে দেখিয়ে আনতাম।"

সুমনা বলল, "আস্তে আস্তে সেরে ত উঠছি।"

"তাহলেও এ যাত্রা তোমায় রেঙ্গুন দেখেই ফিরতে হবে। তোমাকে নিয়ে যেখানে-সেখানে ঘুরবার মতো সাহস আমার হবে না। ওসব ভবিষ্যতের জন্য তোলা রইল।"

তার পর জাহাজে নাওয়া-খাওয়ার ব্যবস্থা করা। সুমনা বলল, "ভাগ্যে এখন আমার বিশেষ কিছু খেতে ইচ্ছে করে না, নইলে এদের খাদ্যতালিকা যা দেখছি বেশীর ভাগ দিনই আমার না খেয়ে কাটবে। গো-মাংসের যা ছড়াছড়ি। আমার মা আর আমার ছায়াই মাড়াবেন না এর পর। তাঁর মতে যত রকম অনাচার আছে, সবই ত আমি করে বসলাম।"

বিজয় বলল, "আশ্চর্য্যের বিষয়, এমনিতে তোমাদের দুজনের ভিতর দেহ বা মনের কোনোই সাদৃশ্য নেই মনে হয়। কিন্তু দুজনের চিন্তাধারার বেশ সাদৃশ্য আছে এক এক জায়গায়। সেটা অবশ্য আমি ছাড়া কেউ কোনো দিন বুঝবে না।"

সুমনা বলল, "কোন্‌খানে সাদৃশ্য দেখলে? মায়ের মতে আমি ত একেবারে ধর্ম্মজ্ঞানহীন, অনাচারী।"

"এই তোমার স্বামী সম্বন্ধে মনোভাবটা, এটা একেবারে আধুনিক নয়। কিন্তু তুমি এ বিষয়ে একেবারে আধুনিক হও, তাও আমি বিন্দুমাত্রও চাই না। লাভটা সবই আমার দিকে। তবে ঠকিয়ে আমি কিছু নিতে চাই না।"

সুমনা বলল, "ঠকালে কোথায়? আমার মনে যা আছে, সেটা নিজের থেকেই আছে, তুমি ত আর সেটা ঢুকিয়ে দাও নি? আর স্বামী সম্বন্ধে মনোভাবটাও আমাকে কেউ শিখিয়ে দেয় নি। স্বামীকে আজকাল যে শুধু খেলার সাথী বলে দেখা হয়, সেটা আমার ভাল লাগে না। এ দিক দিয়ে আমি খুবই হয়ত পুরনো type-এর। কিন্তু সবই তুমি আমার স্বামী হয়েছ বলে, অন্য রকম মানুষ হলে তাকে কি চোখে দেখতাম জানি না। মানুষটা আমার কাছে সব চেয়ে বড়, তার সঙ্গে সম্পর্কটা তত বড় নয়।"

এ নিয়ে বেশী কথা বলা চলে না সুমনার সঙ্গে। বিজয় অন্য কথাই তুলল। বলল, "চল, একটু ডেকটা ঘুরে আসি। এখন অবধি গঙ্গা বেয়েই চলছে জাহাজটা, কিন্তু সমুদ্রে পড়লে হয়ত দুলতে আরম্ভ করবে, তখন কি রকম থাকবে তুমি তা কে জানে?"

সুমনা বলল, "একেবারে স্নানটা সেরে যাই। 'বয়'টা বলছিল একটু বেলা হলেই স্নানের ঘর নিয়ে বড় হুড়োহুড়ি লাগে। বেড়িয়ে এসে খাব এখন, যদি খাবার মতো কিছু খুঁজে পাই।"

দু'জনে স্নানের পর্ব্ব শেষ করে, কেবিনে তালা দিয়ে উপরের ডেকে বেড়াতে গেল। ছত্রিশ জাতের ভিড়, শব্দে কান পাতা যায় না। বেড়াবার সুবিধা খুব নেই, তবে হাওয়ার ঝাপটাটা সুমনার ভালই লাগল। কিন্তু ডেক্‌যাত্রিণীদের অবস্থা দেখে সুমনার দুঃখ হ'ল। এই ভিড়ের মধ্যে, কত লোলুপ দৃষ্টির সামনে কি ভাবে তারা বসে আছে। এই ভাবে তিন দিন তাদের কাটাতে হবে। কোথাও নিজেকে একটু আড়াল করবার তাদের উপায় নেই।

দু'ধারের তীর দেখা যাচ্ছে। ক্রমেই তটভূমির শেষ সীমায় এসে পড়ছে। এর পর তীরহীন অকূল সাগর।

জলের ভৈরব কল্লোল ক্রমেই বাড়ছে। সাগর দ্বীপ এসে পড়ল।

সুমনা বলল, "এবার ফিরে যাই চল।"

কেবিনে গিয়ে সামান্য কিছু খেয়ে সে শুয়ে পড়ল। বিজয়কে বলল, "বিয়ের আগে তোমার সঙ্গে একবার চলে যেতে চেয়েছিলাম মনে আছে?"

বিজয় বলল, "তা আর মনে নেই? অমন লোভনীয় প্রস্তাবটা তখন গ্রাহ্য করতে পারলাম না বলে দুঃখও হয়েছিল। সত্যিই তাই বলে তুমি আসতে না, আমি যদি রাজী হতামও?"

"ঠিক যেতাম, যদি একটুও আগ্রহ তুমি দেখাতে। এমন অসহ্য হয়ে উঠেছিল অবস্থাটা—ভাবতাম না-হয় কেউ আর কোনোদিন আমার মুখ দেখবে না, তবু তোমার কাছে ত থাকতে পাব?"

বিজয় বলল, "না, এটা মোটেই আর্য্য-নারীর মতো কথা হচ্ছে না, তোমার মা শুনলে একটুও খুশী হবেন না।"

"মা আর আমার কোন্ কথায় বা কাজে খুশী হচ্ছেন? ওঁর সঙ্গে সত্যিই মনোগত সাদৃশ্য খুব বেশী নেই আমার। তবে বাড়ীর আবহাওয়াটা আমাদের অত্যন্ত প্রাচীন-পন্থী, সেটার প্রভাব কিছুটা পড়েছে আমার চরিত্রের উপর। ঠাকুরমা, দিদিমারা সেই পৌরাণিক যুগের আদর্শেই চলেছেন। তবে বাবারও মেয়ে ত? আর পড়াশুনাও অনেক দিন করেছি। কাজেই একেবারে তাঁদের মতো হব কেমন করে? পতি বলে একজনকে ত একবার খাড়াও করা হয়েছিল আমার জীবনে। তা তাঁকে ত পতিও ভাবতে পারি নি, দেবতাও ভাবতে পারি নি। ভালও বাসি নি। তুমিও যদি আগে-ভাগে পতি হয়ে ঢুকতে হবে, তা হলে তোমাকেও কি এত ভালবাসতে

পারতাম? আগেই সারা জীবন জুড়ে বসলে, তার পর স্বামী বলে পেলাম। তোমায় দেবতা ভাবা ত এখন খুব সহজ।"

বিজয় বলল, "পূর্ব্ব ও পশ্চিমকে বেশ সুবিধা মতো মিলিয়ে নিয়েছ তুমি। কিন্তু কথাটা এমন শ্রেণীর যে, আলোচনা করতে একটু সঙ্কোচ লাগে আমার। ওটা তোমার মনেই থাক, বেশী প্রকাশ করো না। আমার অহঙ্কার বেড়ে যাবে। কিন্তু ঘুম কোথায় গেল তোমার?"

সুমনা বলল, "তুমি ঘুমোও না, ঘুমোতে ইচ্ছা হয় যদি। আমার এখন খালি বক্ বক্ করতে ইচ্ছা হচ্ছে।"

"আমি ঘুমোলে আর কার সঙ্গেই বা বক্ বক্ করবে তুমি? জাহাজে একটাও ত চেনা মানুষ নেই যাকে ডেকে আনা যায়।"

জলের ঢেউগুলি এখন যেন লাফ দিয়ে কেবিনের ভিতর আসতে চায়। সাগরের রং ক্রমে কালির মতো গাঢ় নীল হয়ে উঠছে। দুলতেও আরম্ভ করেছে বেশ জাহাজটা। দোলানির চোটে কথা বলতে বলতেই কখন এক সময় সুমনা ঘুমিয়ে পড়ল।

'বয়' চা এনে হাজির করাতে বিজয় সুমনাকে তুলে দিল। ডাক্তারের হুকুম, সকাল-বিকাল দুবেলা সুমনাকে নিয়ে বেড়ান। অতএব আর একবার তারা উপরে চলল বেড়াতে। ঝড়ের মতো হাওয়া দিচ্ছে। সুমনা বলল, "বাবা রে, একেবারে উড়িয়ে নিয়ে যাবে নাকি?"

বিজয় বলল, "বাঙালী পরিচ্ছদে এলে না হয় গাঁটছড়া বেঁধে ঘোরা যেত। দেখ, বেশী রোগা হওয়া কিছু নয়, বেশ সারবান্ চেহারা হলে এ সব ভয় থাকে না। কিন্তু এরই মধ্যে ত অন্ধকার হয়ে এল। চল, নেমে যাই। বেশ চাঁদটা উঠেছে সোনার থড়োর মতো, কিন্তু তোমায় নিয়ে বেশীক্ষণ এখানে থাকা চলবে না।" তারা নেমেই গেল।

সুমনার শরীরটা সৌভাগ্যক্রমে ভালই থাকল, দু'দিন। তিন দিনের দিন তারা নামবে। জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে তারা প্রতীক্ষায় রইল কখন জাহাজ তীরে ভিড়বে।

রেঙ্গুনের বন্দরটি দেখতে সুন্দর কিছুই নয়। সুমনার ভাল লাগল না কিছুই। গাছের সারির উপর দিয়ে 'শোয়েডাগন প্যাগোডা'র চূড়াটা রাজমুকুটের মতো ঝকঝক করে উঠল। তার পরেই মাদ্রাজী কুলীদের মাল নেবার জন্য প্রচণ্ড উৎপাত আর জাহাজের চাকর-বাকর সকলের বখশিসের আশায় আবির্ভাব।

রেঙ্গুন শহরটা দেখতে ভালই। বেশ সাজান, পুতুলের ঘরের মতো সব বাড়ী। ভারতীয় ঢঙের বাড়ীরও অভাব নেই। রাস্তায় রিকৃশ চলছে খুব, অন্য যানবাহন কম।

বিজয়ের এখানকার অফিসের বেয়ারা দারোয়ান দু'চারজন এসেছিল তাদের অভ্যর্থনা করতে, কাজেই অসুবিধা কিছু হ'ল না। খুব বড় রাস্তায় দোতলা একটি বাড়ীর ছোট একটা ফ্ল্যাটে তারা গিয়ে উঠল। দু'খানা ঘর, বারান্দা একটা, রান্নাঘর আর বাথরুম্।

সুমনা বলিল, "প্রায় আমার জাহাজের কেবিনেরই সমান দেখছি।"

বিজয় বলল, "সেখানে তিনদিন ছিলে এখানে হয়ত ত্রিশদিন থাকবে, কিংবা আরও দু'চার দিন বেশী হতে পারে।

সুমনা বলল, "তুমি না বললে যে দু'মাস থাকবে?"

বিজয় বলল, "তুমি চাও নাকি বেশী দিন থাকতে? আমার কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরে যেতেই ইচ্ছা করছে। ওখানকার ঘরগুলোর জন্যে এখনই মন কেমন করে।"

"ঘরের জন্যে মন কেমন ক'রে কেন? ঘরের মানুষটা ত সঙ্গেই রয়েছে।"

"কি জানি? জীবনের খুব বেশী আনন্দের দিন অনেকগুলি ওখানে কেটেছে বলেই বোধ হয়।"

সুমনা বলল, "'The best is yet to be'; এখনি ত শেষ হয়ে যায় নি আনন্দের দিনগুলি?"

ঘর-করণা গুছিয়ে নিয়ে বসতে সারাটা দিন কেটে গেল। বিজয় অল্প একটুক্ষণের জন্য অফিসও ঘুরে এল। পরদিন থেকে অল্প-স্বল্প বেড়ানও চলতে লাগল। অফিসের সহকর্ম্মীদের ভিতরে কয়েকজন বাড়ীতে এসে দেখাও করে গেল। দোকানে দোকানে ঘুরে সকলের জন্য রঙীন রেশমের টুকরো, জুতো, ছাতা, ব্রহ্মদেশীয় কাঠের কাজ প্রভৃতি সুমনা সংগ্রহ করে ফিরতে লাগল।

বেশী দিনের জন্যে আসা নয়, দিনগুলো কেটে যেতে লাগল একটা একটা ক'রে। রেঙ্গুন শহরে দেখবার জিনিস খুব বেশী নেই, ঐ প্যাগোডা ছাড়া। তবে সুন্দর লেক আছে একটা, সেখানে বেড়ান যায়, দোকান-গুলিতেও বেড়াতে ভালই লাগে। চিড়িয়াখানা আছে একটা, কিন্তু সেখানকার কঙ্কালসার অর্দ্ধমৃত জানোয়ার-গুলোকে সুমনার একেবারেই ভাল লাগল না।

কলকাতা থেকে চিঠি প্রায়ই আসে। রাসবিহারী

মেয়ের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হয়ে প্রায়ই প্রশ্ন করেন। দুই বৌদি নানা রসিকতা করে চিঠি লেখেন। সুচিত্রার চিঠিও একটা এল। তার প্রধান বক্তব্য, সিল্ক ও ছাতা যেন তার জন্যেও আনা হয়। একটি মেয়ে হয়েছিল তার, সুমনার বিয়ের কাছাকাছি সময়, সেও যেন বঞ্চিত না হয়।

চিঠিটা পড়ে সুমনা বলল, "চিত্রাটা বড় বোকা হয়ে যাচ্ছে। চিঠিপত্র লেখে একেবারে পাড়াগেঁয়ের মতো। সঙ্গ-দোষে বেশীর ভাগ মানুষই নষ্ট হয়ে যায়।"

বিজয় বলল, "বিয়ের আগে কি উনি বুদ্ধির জন্য খুব বিখ্যাত ছিলেন? সব দোষটাই কি ভদ্রলোকের?"

"বুদ্ধির জন্য বিখ্যাত কোনো দিনই নয়, তবে আজকাল মনে হয় যেন মনোজগৎ বলে ওর কিছু নেই। সংসারের উপরেই ভেসে আছে।"

বিজয় বলল, "বেশীর ভাগ মানুষকে ঐ ভাবেই দিন কাটাতে হয়, মনের খবর নেবার সময় ক'জনের আছে? ইংরেজী লেখক বলেছেন, আত্মার বিশালতা না থাকলে তাতে বড় জিনিস ধরে না, বিশেষ করে বড় কোনো প্রেমের প্রকাশ তার মধ্যে হয় না। আমরা বেশীর ভাগই ক্ষুদ্রচেতা মানুষ, দৈনিক অভাব-অভিযোগের উপরে যে জগৎ আছে তার খবর নেবার সময় পাই না, প্রয়োজনও যে আছে তাও জানি না।"

"নিজেকে আবার দয়া করে ঐ দলে টানছ কেন?"

বিজয় বলল, "স্বভাবে একটু বিনয় থাকা ভাল সুমনা।"

অফিস থেকে সেদিন বিজয় একটু তাড়াতাড়িই ফিরে এসেছিল। বলল, "চল, একটা সিনেমা-শো দেখে আসি। এখানে ত এক পা বাড়ালেই সিনেমার হল। ভাল না লাগলে মাঝপথেই উঠে হেঁটে চলে আসা যায়।"

একেবারে বাড়ীর পাশে না হলেও, একটু দূরেই একটা ভাল হল ছিল। সেইখানে গিয়ে দুজনে ছবি দেখতে বসল।

ছবিটা খুব বেশী ভাল নয়। অর্দ্ধেকটা হয়ে যাবার পর বিজয় বলল, "চল, বেরিয়ে যাই। শুধু শুধু অন্ধকার ঘরে বসে থেকে ভাল লাগছে না।"

দুজনে বাইরে এসে দাঁড়াল। ট্যাক্সির জন্যে বিজয় সামান্য একটু এগিয়ে গেল, সামনে অল্প দূরেই গোটাকত গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে।

হঠাৎ একট অস্ফুট আর্ত্তনাদের শব্দে চমকে উঠে সে পিছন ফিরে তাকাল। কি হয়েছে সুমনার? মনে হচ্ছে সে এখনই অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে।

ছুটে এসে তাকে ধরে ফেলে জিজ্ঞাসা করল, "কি হয়েছে সুমনা? শরীর খারাপ লাগছে?"

সুমনা রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বলল, "ঐ যে, সামনের বাড়ীর দোতলায়।"

বিজয় তাকিয়ে দেখল, একজন শ্যামবর্ণ যুবক দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাদের দিকে চেয়ে আছে। পাশে একটি ব্রহ্মদেশীয় যুবতী।

জিজ্ঞাসা করল, "কে ও?"

সুমনা বলল, "নির্ম্মল।" বলেই মূর্চ্ছিত হয়ে বিজয়ের গায়ের উপর পড়ে গেল।

২৪

মূর্চ্ছিতা সুমনাকে ট্যাক্সি করে বাড়ী নিয়ে এসেই বিজয় ডাক্তার ডাকতে পাঠাল। নিজের মনের মধ্যে তখন তার প্রলয়ের ঝড় বয়ে যাচ্ছে। কিন্তু নিজেকে নিয়ে নাড়াচাড়া করবার সময় তখন তার নেই। সুমনাকে বাঁচাতে হবে। তাকে আড়াল করে দাঁড়াতে হবে। আঘাত যা আসছে তা বুক পেতে বিজয়কেই নিতে হবে।

ডাক্তার এসে দেখলেন সুমনাকে। কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করে মোটামুটি এই দৈব দুর্বিপাকের ইতিহাস শুনলেন। রোগিণীর যে সন্তান-সম্ভাবনা সেটাও তাঁকে জানাল হ'ল। অনেক ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করে এবং সুমনাকে একেবারে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দিতে বলে তিনি বিদায় নিলেন।

সুমনার জ্ঞান ফিরে এসেছিল বাড়ী আসতে না আসতেই। বিজয়ের দিকে সে তাকাল, যেন কি বলতে চায়। বিজয় তাকে কথা বলতে দিল না। বলল, "ডাক্তার তোমায় বলে গেছেন খানিকক্ষণ একেবারে বিশ্রাম নিতে। তুমি ঘুমোও; এমনিতে না পার, ওষুধ দিচ্ছি। কথা পরে হবে, ঢের সময় আছে।"

সুমনা ওষুধ খেল। তার পর তন্দ্রাচ্ছন্নের মতো বিছানায় পড়ে রইল। ঘুমিয়ে গিয়েছে না ওষুধের ক্রিয়ায় খালি নিস্তেজ হয়ে আছে তা বোঝা গেল না। বিজয় শোবার ঘরের মধ্যে পায়চারি করে ঘুরতে লাগল।

ঘণ্টাখানিক এক ভাবে পড়ে থেকে সুমনা চোখ খুলে তাকাল। বলল, "আমি পারছি না ঘুমোতে। আমাকে কথা বলতে দাও। আমার কাছে এসে বসো, তোমার মুখ দেখতে পাচ্ছি না আমি।"

বিজয় এসে তার পাশে বসল। ডাকল, "সুমনা।"

"কি বল?"

"তুমি ওকে ঠিক চিনেছ? ও নির্ম্মল?"

সুমনা বলল, "ঠিকই চিনেছি, ওই নির্মল।"

বিজয় বলল, "সুমনা। বৃথা প্রবোধ দিয়ে কোনো লাভ নেই আর। ও যদি নির্মলই হয়, তা হলে আইনতঃ ওই তোমার স্বামী, আমি কেউ নয়। যদি নিতে চায় তোমাকে, তুমি কি যাবে ওর কাছে?"

বাণবিদ্ধ পাখার মতো তীব্র আর্তনাদ করে সুমনা বিছানার উপর লুটিয়ে পড়ল। বলল, "না, না, না! ও আমার কেউ নয়। ও একটা কালো ছায়া, আমার জীবনের উপর কয়েকটা দিন এসে পড়েছিল। আমার স্বামী একমাত্র তুমি। তোমাকে আমি সমস্ত প্রাণের ভালবাসা দিয়ে স্বামী বলে গ্রহণ করেছি। তোমার সন্তান রয়েছে আমার গর্ভে। কোথায় যাব আমি তোমাকে ছেড়ে? কিন্তু তুমি কি চাইছ যে, আমি দূর হয়ে যাই তোমার জীবন থেকে? তোমার ভালবাসা কি আজ মুখ ফিরিয়েছে?"

বিজয়কে সুমনা কোনোদিন চোখের জল ফেলতে দেখেনি। আজ দেখল, তার দু'চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়ছে। সুমনার মুখের উপর নিজের অশ্রু-প্লাবিত মুখ রেখে সে রুদ্ধকণ্ঠে বলল, "আমি চাইছি তোমাকে বিদায় করতে? এই কি তুমি আমায় চিনেছ এত দিন আমার বুকে থেকে? সাত বছর তপস্যা করে তবে আমি তোমাকে পেয়ে ছিলাম। তখন থেকে কি একাগ্রতা নিয়ে আমি তোমাকে ভালবেসেছি, তা এক-মাত্র ভগবান জানেন। তুমিই ত আমার সর্বস্ব? আজ একটা দেশাচারের খাতিরে আমি নিজের হৃৎপিণ্ড উপড়ে ফেলে দেব? তোমাকে বাদ দিলে আমার জীবনে কি থাকবে? আমার প্রাণের নিশ্বাস-বায়ু তুমি। তোমাকে হারালে আমার মৃতদেহ ছাড়া আর কিছু বাকি থাকবে না।"

সুমনা বলল, "একনিষ্ঠ ভালবাসার কিছু যদি মূল্য থাকে ভগবানের কাছে, তাহলে জন্মজন্মান্তরেও আমি তোমার থাকব। এ জীবনের শেষে কিছু যদি আমার বেঁচে থাকে সে তোমাকে জড়িয়ে থাকবে। আর যদি কোনো অশুভক্ষণে এ জীবনে এক মুহূর্তের জন্যও আমার মন তোমার দিক থেকে টলে, সেই মুহূর্তে যেন বিধাতা আমাকে একেবারে ধ্বংস করেন। এ অসতীর কোনো চিহ্ন যেন আর জগৎ-সংসারে না থাকে। আমার আত্মারও যেন অনন্ত নরকবাস হয়।" এবারে সে কান্নায় যেন শতধা বিদীর্ণ হয়ে এলিয়ে পড়ল।

বিজয় উঠে বসে তার মাথাটা নিজের কোলের উপর তুলে নিল। নিজের চোখের জল মুছে ফেলে বলল, "এ রকম করে কেঁদো না সুমনা, তোমার শরীর এমনিতেই ভাল নেই। আমার মুখ চেয়ে চুপ কর। যে সন্তান আসছে আমাদের, তার কথা মনে করে চুপ কর। আর কোনো অমঙ্গলকে ডেকে এনো না এখন। তুমি সুস্থ হও, শান্ত হও। কিছু ভয় আর করো না। তোমার ভাল-বাসায় এক দিনের জন্যেও আমি সন্দেহ করি নি। আমি মূর্খ নয়। কিন্তু ভয় ছিল, পাছে অন্ধ সংস্কারের বসে তুমি আত্মহত্যা করে বস। এ সবের বিষ মানুষের রক্তের সঙ্গে মিশে থাকে। তুমি তোমার মায়ের সন্তান ত? মনে করতে পারতে যে, নির্মলের কাছে ফিরে যাওয়াই এখন তোমার কর্তব্য। কিন্তু ভগবানকে ধন্যবাদ, তোমার শুভবুদ্ধিকে তিনি নষ্ট হতে দেন নি। তুমি আমারই আছ, চিরকাল আমারই থাকবে। আমার কাছ থেকে তোমাকে কেড়ে নিতে পারে এমন শক্তি কিছুরই নেই। তবে সমাজ, দেশাচার রাষ্ট্রীয় আইন সবই আমাদের বিপক্ষে দাঁড়াবে এখন। কিন্তু তাদের ক্ষমতাও ত সীমাবদ্ধ! যেটুকু শাস্তি তারা দিতে পারে, তা দেবার চেষ্টা করুক। আমি ভয় পাই না সুমনা। যখন হাত বাড়িয়েছিলাম প্রথম তোমার দিকে, তখন থেকে ত জানি এই রকম বিপদের সম্মুখীন আমাকে হয়ত হতে হবে। এর জন্যে যতদূর ভাববার তা আমি ভেবেছি, আর নিজেকে প্রস্তুত করেছি। আজ যদি মূল্য দেবার দিন এসে থাকে, আমি পিছিয়ে যাব না। আর ভগবানের নামে শপথ করে বলছি যে, কোনো কিছুর প্রলোভনে বা কোনো কিছুর ভয়ে তোমার হাত আমি কোনো দিন ছাড়ব না।"

সুমনা বিজয়ের একটা হাত তুলে নিয়ে একবার চুম্বন করল। তার কান্নাটা আস্তে আস্তে থেমে গেল। তবু অনেকক্ষণ স্বামীর কোলে মাথা রেখে চুপ করে রইল। তার পর বলল, "এইবার একটু ঘুম আসছে। তুমি বসে থেকো না। একটু ঘুমিয়ে নাও।"

বিজয় বলল, "এখন শুলেও আমি ঘুমোতে পারব না। তুমি ঘুমোও, একেবারে কোনও ভয় মনে রেখো না। তোমার কোনো অমঙ্গল আমি হতে দেব না।

সুমনা সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ল। বিজয় সেইখানেই বসে রইল তার মাথা কোলে নিয়ে। মনে হতে লাগল, আজ যেন প্রথম সে তার প্রিয়াকে পরিপূর্ণ করে পেল। হয় ত আরো কিছু সংঘাত অপেক্ষা করে আছে তার জন্য। তা থাক। ভগবান যতখানি মূল্যই তার কাছে আদায় করুন, সে শোধ করে দেবে, ঋণী থাকবে না।

মাঝরাত্রে আবার একবার সুমনার ঘুম ভাঙল।
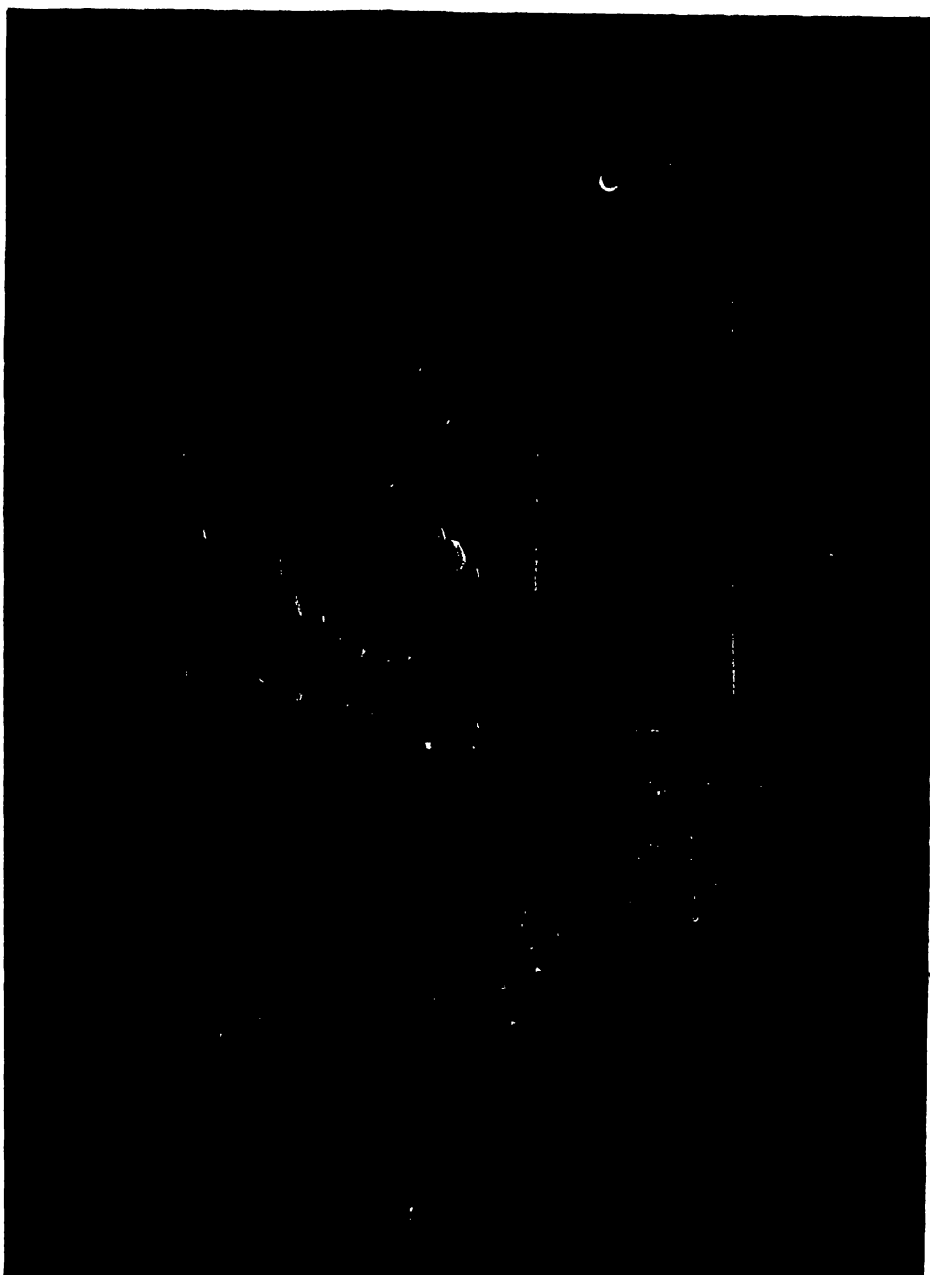
প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

মুসাফের-খানায়
শ্রীঅসিতকুমার হালদার

(প্রবাসী চৈত্র, ১৩৩০ হইতে পুনর্মুদ্রিত)

টেলিভিসনের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট মিঃ কেনেডি ও গণনারত কর্মিকে দেখা যাইতেছে

সুদূর কালিফোর্নিয়ায় একজন মেষপালকের সঙ্গে আলাপরত সেন্সাস কর্মি

মাথা তুলে বিজয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি তখন থেকে এই এক ভাবেই বসে আছ? বড় কষ্ট দিলাম তোমাকে?"

বিজয়ের স্বাভাবিক প্রফুল্লতা অনেকখানিই ফিরে এসে ছিল, সে বলল, "তোমার আর এখন আমার সঙ্গে ভদ্রতা করতে হবে না। এই কষ্ট করবার অধিকার থেকে ভগবান কোনোদিন আমায় যেন না বঞ্চিত করেন।"

সুমনা বলল, "একেবারে সারারাত বসে থাকবে? আমি এখন ভাল আছি, কোনো কষ্ট নেই আমার।"

বিজয় শুয়ে পড়ে বলল, "আচ্ছা, দেখি, একটুক্ষণ চোখ বুজে শুয়ে থেকে, ঘুম আসে কি না। কিন্তু তুমিও শুয়ে থাক, উঠে ঘুরতে আরম্ভ করো না যেন।"

সুমনা শুয়ে রইল। কিন্তু চোখে ঘুম আর তার এল না। নিদ্রিত বিজয়ের মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। এর কাছে যা এক জীবনে সে পেল তার ঋণ শোধ করবে কি দিয়ে? শুধু ভালবাসায় হবে কি? আজ যদি বিজয়ের জন্যে মরে যাবার অধিকার ভগবান তাকে দিতেন ত সে হাসতে হাসতে মরতে পারত। ভবিষ্যতে কি অপেক্ষা করে আছে তা কে জানে? কিন্তু ভয়কে মারা মার আজ তার খাওয়া হয়ে গেল, আর কোন্ জিনিসকে সে ভয় করবে? বিজয়ের সঙ্গে বিচ্ছেদের যে দুঃখ, তার চেয়ে বড় কোনো দুঃখ সে কল্পনায়ও আনতে পারল না। বিজয়ের বুকের কাছে মাথাটা রেখে কখন এক সময় সেও একটু ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোরের আলো যখন খোলা জানলার পথে এসে তাদের মুখের উপর পড়ল তখন দুজনেরই ঘুম ভেঙে গেছে। সুমনা বলল, "এবার উঠে হাত মুখ ধুয়ে ফেলি? সত্যি খারাপ আর লাগছে না।"

বিজয়ও উঠে বসল। বলল, "তা যাও, কিন্তু একটুও দুর্ব্বল লাগলে এসে শুয়ে পড়বে। আমার এখন অনেক কাজ পড়বে ঘাড়ে, সে-সব সমাপ্ত করে তবে তোমাকে নিয়ে আমি এখান থেকে পালাব। কাজেই শরীর-টরীর খারাপ করে আমায় ব্যতিব্যস্ত করো না।"

সুমনা তার পাশে বসে বিজয়ের আঙুলগুলোর উপর হাত বুলোতে লাগল। বলল, "ভগবান যদি আমাকে দেহেমনে আর একটু ক্ষমতা দিতেন।"

বিজয় বলল, "দেহের ক্ষমতা বাড়াবার ত উপায় আছে ঢের। আগে তোমার এ পর্ব্ব শেষ হোক, তখন তার চেষ্টা দেখো। আর মনের ক্ষমতা কম ত নয় কিছু? এতটা তোমার সইবে কি না সে ভয় আমার খুবই ছিল।"

সুমনা বলল, "মনে হচ্ছে যেন মরণ-সাগরের তীর থেকে আবার তোমার কাছে ফিরে এলাম। তুমি গ্রীক্ পুরাণের অরফিয়াসের সমকক্ষ, তবে তিনি যা পারেন নি তুমি তা পারলে। নিশ্চিত মরণের হাত থেকে আর কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারত না।"

বিজয় বলল, "এ পথে তোমাকে টেনে নামিয়ে ছিলাম আমিই, এখন তোমায় ফেলে পালালে খুবই বীরোচিত কাজ হ'ত সেটা?"

"তুমি আমায় টেনে নামাও বা নাই নামাও, আমি খুঁজতে খুঁজতে ঠিক তোমার কাছে এসে পৌঁছতাম।"

এমন সময় পাশের ঘরে চা এসে পড়ায় দু'জনেই উঠে পড়ল। চাকর সব কিছু সাজিয়ে দিয়ে ঘর থেকে চলে গেল। সুমনা চা ঢালতে ঢালতে বলল, "এবার বাইরের দিকটা আমায় একটু বুঝিয়ে দাও। নির্ম্মল যদি আমাকে চিনতে পেরে থাকে ত কি করতে পারে সে?"

"আদালতে নালিশ করতে পারে, নিজের অধিকার ফিরে পাবার জন্যে এবং রায়টা তারি পক্ষেই হবে। তবে ঐ পর্য্যন্তই, রায়টাকে জোর করে কাজে খাটানো সম্ভব নয়।"

"আচ্ছা, তোমার বা আমার নামে আর কোনো নালিশ চলে?"

"না, কারণ আমরা কোনো প্রতারণা করি নি। নির্ম্মলকে মৃত জেনেই আমাদের বিয়ে হয়েছিল।"

"তা হলে লোকনিন্দা ছাড়া আর কিছুকে আমাদের ভয় পাবার নেই?"

বিজয় বলল, "ভয় আর কি? এটা মধ্যযুগ নয়। কে বা মাথা ঘামাচ্ছে অন্যের ঘরের খবর নিয়ে? আত্মীয়-স্বজনরা খানিকটা মর্ম্মাহত হবে, এইটাই ভাবতে একটু খারাপ লাগছে। আমার বাবা ত সংসারের সব ভাবনার উপরে উঠে গেছেন, এক ঠাকুর তাঁর একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। এ সব তাঁর কানে যাবে কি না সন্দেহ। তবে তোমার বাবার কথা ভাবলে কষ্ট হয়। তিনি পৃথিবীতে তোমাকেই বোধ হয় সব চেয়ে ভালবাসেন, তোমার এ রকম অপযশ হলে সেটা তার মনে বড় লাগবে। কিন্তু উপায় আর কি বল? রিক্ত হাতে এত বড় জিনিস পাওয়া যায় না। ভগবান মূল্য নিয়েই নেন এর। কিন্তু সে মূল্য দেওয়ার মধ্যেও সুখ আছে।"

সুমনা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তার পর বলল, "আর যে আসছে আমার কোলে, তাকে কি অনাদর পেতে হবে, ঘৃণা পেতে হবে?"

বিজয় বলল, "একেবারেই না। কে অনাদর করবে তার? আমরা ত নয়। তাকে এমন ভাবে মানুষ

করতে হবে, যে এ সব লোকনিন্দা তাকে স্পর্শও করবে না। বিশ্ব জগৎটা খুব বড় জায়গা সুমনা এবং হিন্দু সমাজ ছাড়াও সমাজ আছে। হিন্দু সমাজের মধ্যেই এমন সব সম্প্রদায় আছে, যারা এ সব আইন মেনে চলে না। আর তোমাকে যা বলছি, এ সব নিয়ে মাথা ঘামাবার অবসর আজকাল কম লোকের আছে। অন্দরমহলে বা ভাঁড়ার ঘরে এর আলোচনা হবে বটে, কিন্তু সে খবর তোমার কানে পৌঁছবে না।"

চা খাওয়া শেষ করে তারা উঠে পড়ল।

সুমনাকে বেশী ঘুরে বেড়াতে বিজয় দিল না। বলল, "আজ আর কাল এ দু'দিন তোমায় সাবধানেই থাকতে হবে। ভাল থাকলে তার পর ঘুরতে পার, বাইরেও যেতে পার। আমাকে একবার ঘণ্টা দুইয়ের জন্যে বেরতে হবে। দু'ঘণ্টার বেশী কিছুতেই করব না। টেলিফোনের নম্বর রেখে গেলাম, নীচের দোকানে টেলিফোন আছে, দরকার হলেই চাকরকে দিয়ে ফোন করিও। ডাক্তার ত এই পাড়ারই, তার ডিস্‌পেন্‌সারিও আছে। নার্সও একটা অনেকক্ষণ থাকে। দরকার হলেই তাঁকে ডাকবে। বলে রাখলাম সবই, কিছুই তোমার প্রয়োজন হবে না। আর নিজে নেয়ে-খেয়ে চুপ করে শুয়ে থাকবে।

সুমনা বলল, "আশ্চর্য্য মানুষের মন। এই আমিই কাল রাত্তিরে ভেবেছি যে, এই আমার শেষ রাত, আর সূর্য্যোদয় আমাকে দেখতে হবে না। কিন্তু কাল রাত্রিও কাটল, ভোরও হ'ল, এখন বসে বসে তোমার সঙ্গে নাওয়া-খাওয়ার গল্প করছি।"

বিজয় বলল, "অত ভয় পেতে নেই। পৃথিবীতে বিপদ-আপদ আছেই মানুষের জীবনে।"

সুমনা বলল, "একি সহজ বিপদ নাকি? পৃথিবীটাই যদি পায়ের তলার থেকে সরে যায়, তাহলে সেই মহা-শূন্যে পড়ে মানুষের প্রাণ কি রকম করে? তুমি আমাকে আরো খানিকটা কাঁদতে দিলে না কেন? বুকের ভিতরটা এখনও আমার ভার হয়ে রয়েছে।"

বিজয় তার পাশে বসে তার মাথাটা আবার নিজের বুকের উপর টেনে নিল। বলল, "কাঁদতে ইচ্ছে হতে পারে বটে। আমারই হচ্ছে ত তোমার। কিন্তু শরীর যে তোমার ভাল নয়? উত্তেজনাও ভাল নয় শরীরের পক্ষে। মনটাকে এমনিই হাল্‌কা করে ফেল তুমি। তোমার ভয় ত ছিল পাছে আমার কাছ থেকে কেউ তোমায় কেড়ে নেয়? তা কেউ নিতে পারবে না, মানুষে অন্ততঃ নয়। আমার সময় থাকলে বসে বসে তোমার গান শুনতাম। কতদিন ত গাও নি। অমন সুন্দর গলাটা ব্যবহারের অভাবে নষ্ট করে ফেল না। এর পর ঘুমপাড়ানী গান ত গাইতেই হবে?"

সুমনার মুখে ক্ষীণ একটু হাসি দেখা দিল। বলল, "এখন গলা দিয়ে আর্ত্তনাদ ছাড়া আর কিছু কি বেরুবে? এখনও মনে হচ্ছে একটা মরণ-ফাঁসির মতো কিছু গলায় আটকে রয়েছে। আচ্ছা, আমাকে যে জিজ্ঞাসা করলে যে আমি নির্ম্মলের কাছে যেতে চাই কি না, কি করতে তুমি যদি আমি যেতে চাইতাম, পারতে আমাকে যেতে দিতে?"

বিজয় বলল, "সে কথা জেনে হবে কি সুমনা? শেষ অবধি আশা ত যায় নি যে তুমি আমায় ছাড়বে না? কিন্তু যদিই যেতে, আমি কি করতাম জানি না। আমার কল্পনাও সে সম্ভাবনার থেকে ভয়ে পিছিয়ে এসেছে।

সুমনা দুই হাতে তাকে জড়িয়ে ধরল। বলল, "আমিও জানতে চেয়েছিলাম বটে, যে তুমি আমাকে দূর করে দিতে চাও কি না। যদি বলতে হ্যাঁ, তাহলে কালই আমি মরতাম, যেমন করে হোক। বেঁচে থাকা আর আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হ'ত না। আত্মহত্যা লোকে পাপ বলে, কিন্তু ভগবান এত বড় শাস্তি দিলেও মানুষ না মরবে কেন? এটুকু স্বাধীনতা তার থাকা উচিত। নিজের ইচ্ছায় আমরা জন্মাই না, কিন্তু নিজের ইচ্ছায় চলে যাবার অধিকারটা ত থাকবে?"

বিজয় বলল, "সে অধিকার ত রয়েছে, এবং অনেক হতভাগা মানুষকে এর সুযোগ নিতেও হচ্ছে। কিন্তু মানুষকে বুদ্ধিও ভগবান দিয়েছেন। দুঃখকে জয় করবার ক্ষমতাও দিয়েছেন। নইলে জগৎ-সংসারে দুঃখ যে পরিমাণ, তাতে ক'টা মানুষ বেঁচে থাকত বল? কিন্তু এ সব কথা থাক সুমনা। আমারও মনে হচ্ছে কে যেন গলাটা টিপে ধরছে।"

সুমনা বলল, "থাক তবে। তোমার মুখে হাসি ছাড়া আর কিছু কোনোদিন দেখি নি। চোখে জল দেখলে মনে হয় আমার বুকের মধ্যে লোহা পুড়িয়ে কে ছেঁকা দিচ্ছে।"

বিজয় বলল, "তা ঠিক, কাঁদলে পুরুষজাতিকে সুন্দর দেখায় না। তোমাকে যে রকম শিশিরসিক্ত পদ্মের মত দেখায়, সে রকম একেবারেই না।"

সুমনা কথা না বলে অনেকক্ষণ তার বুকের উপর পড়ে রইল। তার পর উঠে বসে বলল, "যাও, কোথায় যেতে চাইছিলে যাও। যেতে যত দেরি করবে, আসতেও ততই দেরি করবে। তুমি ফিরে এলে তবে খেতে বসব এখন।"

"সেরেই আসি কাজগুলো," বলে বিজয় উঠে পড়ল। "আর দেখ, কেউ দেখা-টেখা করতে এলে বিদায় করে দিও। আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত কেউ যেন বাড়ীর ভিতর না ঢোকে।" সে স্নান করতে চলে গেল।

সুমনা বালিশে ঠেশ দিয়ে বসেই রইল। যে ঝড় তার দেহ-মনের উপর দিয়ে কাল বয়ে গিয়েছে, তার চিহ্ন খানিকটা রেখেই গেছে পিছনে। এখনও হাঁটতে, চলতে তার ভাল লাগে না। বহুদিন বিস্মৃত একটা গানের কলি হঠাৎ তার মনে গুঞ্জন করে ফিরতে লাগল। বিজয় গানের কথা তোলাতেই এটা তার মনে পড়ল বোধ হয়। "আমার নিতিসুখ ফিরে এস, আমার চিরদুখ ফিরে এস, আমার সব সুখদুখ মন্থন ধন, অন্তরে ফিরে এস।" কিন্তু গান গাইবার ক্ষমতা আজ ত নেই। আরব সাগরের সামনে নিজের সেই নিভৃত নীড়টিতে ফিরে গেলে আবার হয়ত গলায় গান আসবে। এ দুঃস্বপ্নের জের অতদিনও কি তার জীবনে থাকবে?

স্নান সেরে বেরিয়ে এসে বিজয় বলল, "অমন বিরহিনী যক্ষপত্নীর মতো মুখ করে কি ভাবা হচ্ছে?"

সুমনা বলল, "মনে মনে কাব্যচর্চ্চা করছি।"

বিজয় বলল, "ঘুরে আসি, তার পর আমিও না-হয় যোগ দেব তোমার সঙ্গে। যা বলেছি সব মনে রেখ কিন্তু," বলে সে বাইরে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে নিয়ে চলে গেল।

কাল খুব কমই ঘুম হয়েছে সুমনার। তার চোখ দুটো ক্রমে ভারি হয়ে আসতে লাগল। শেষে ঘুমিয়েই পড়ল। কাজকর্ম্ম সেরে বিজয় যখন দুপুরবেলা ফিরে এল, তখন অবশেষে তার ঘুম ভাঙল। জিজ্ঞাসা করল, "আগাগোড়াই ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলে নাকি?"

"ভালই ত করলাম। তুমি যতক্ষণ বাইরে থাকবে ততক্ষণ ঘুমই ত ভাল। স্বাস্থ্যও ভাল থাকে, সময়ও কেটে যায়।"

বিকালে আবার বিজয় বেরোবার জোগাড় করছে দেখে সুমনা জিজ্ঞাসা করল, "আবার কোথায় চললে?"

বিজয় বলল, "আসল কাজই ত এখনও বাকি। নির্ম্মলের খোঁজ করতে হবে, তার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে। এই নিদারুণ নাটকের ত শেষ হবে না, তা না হলে? কিন্তু ওর নাম করলেই তোমার মুখ একেবারে শাদা হয়ে যায় কেন? ইচ্ছা করে তোমার কোনো অপকার করতে আসে নি সে। তোমার ভাইদের কাছে যা শুনেছি তাতে মানুষটা ভদ্রস্বভাবের বলেই মনে হয়। অবশ্য নিজের অধিকার রক্ষার চেষ্টা ও করবে না, এতটা ভদ্র না হতেও পারে। দেখা যাক।"

সুমনা বলল, "আমাকে কি তার সামনে দাঁড়াতে হবে? কথা বলতে হবে?"

বিজয় বলল, "তা হতে পারে। তুমি যে ফিরে যাবে না এটা সে তোমার মুখ থেকেই শুনতে চাইবে। কিন্তু এতে ভয় পেলে চলবে কেন?"

সুমনা বলল, "না, না, ভয় পাব না। তুমি কাছে থেকো, যাকে যা বলতে বলবে আমি বলব।"

আচ্ছা, আমি যাব আর আসব। খুব বেশী দেরি আজ হবে না। যদি বাড়ীতে না থাকে তা হলে ঠিকানা দিয়ে আসব। সেই যুবতীটি কে বুঝতে পারছি না। খুব গা ঘেঁসেই ওর দাঁড়িয়েছিল।"

"হবে বৌ-টৌ কেউ। সাত-আট বছর ও কি আর একলা কাটিয়েছে?"

"সেটা প্রায় কেউই কাটাতে চায় না, নির্ম্মলও ত মানুষ।

যতক্ষণ সে বাইরে থাকবে সুমনা ভেবেছিল, ততক্ষণ দেরি হ'ল না। এক ঘণ্টার মধ্যেই বিজয় ফিরে এল।

সুমনা দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। বিজয় বলল, "তাকে বাড়ীতে পেলাম না। সেই মেয়েটি ছিল, তার কাছে নাম-ঠিকানা দিয়ে এসেছি, দেখা করতে বলে এসেছি।"

সুমনা ফিরে আবার ঘরে ঢুকল। বিজয় তার পিছন পিছন এসে বলল, "আজ খেয়ে-দেয়ে সকাল সকাল ঘুমোতে হবে। কাল ত সারারাত জেগেই কাটল।"

খাওয়া-দাওয়া সকাল সকালই হয়ে গেল। শুয়ে পড়ে সুমনার চুলের ভিতর আঙুল চালাতে চালাতে বিজয় বলল, "এইবার ঘুমিয়ে পড়। সকালে উঠে দেখবে মনটা অনেকটা হাল্‌কা হয়ে গেছে।"

সুমনা উত্তর দিল না। বিজয়ই আগে ঘুমিয়ে পড়ল। মাঝরাতে একবার ঘুম ভেঙে দেখল সুমনা তার পাশ থেকে উঠে গিয়ে তার পায়ের উপর মাথা রেখে শুয়ে আছে। ভাবল তাকে টেনে নিজের বুকের উপর নিয়ে আসে। তার পর কিছু করল না। ভাবল থাক, এ প্রণাম ত আমাকে নয়। সে তার দেবতার কাছেই আশ্রয় ভিক্ষা করছে। নিজে যে জেগে আছে তা সুমনাকে জানতে দিল না।

২৫

সিনেমার বাড়ীর সামনের দোতলার ফ্ল্যাটে নির্ম্মল একলা বসে কি সব আকাশ-পাতাল ভাবছিল। তার

সঙ্গিনীটি এঘর থেকে ওঘর করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তখনও শোবার ঘরের টুকিটাকি জিনিসপত্র নেড়ে রাখছে, কখনও বসবার ঘরে এসে এটা-সেটা উল্টোচ্ছে। চিত্তের অস্থিরতা তার প্রতি পদক্ষেপে ফুটে বেরচ্ছে।

নির্ম্মল খানিক পরে ডাকল, "পুষ্প, তুমি একটু আমার কাছে এসে বস। অত অস্থির হয়ে ঘুরো না, ওতে আমার চিন্তাগুলোও কেমন যেন জড়িয়ে যাচ্ছে।"

যুবতীর নাম মা পান, ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় পুষ্প। নির্ম্মল তাকে পুষ্প বলেই ডাকে, বলে, "পান বলতে ভাল লাগে না। বাংলা ভাষায় ওর মানেটা ভাল নয়।" যুবতীও এখন ঐ নামটাই গ্রাহ্য করে নিয়েছে।

পুষ্প এসে তার পাশে বসে পড়ল। বলল, "কাল থেকে তুমি কথাই বলছ না আমার সঙ্গে, তা পাশে বসে কি করব?"

"বলতে পারছিলাম না বলেই বলছিলাম না। কিন্তু বলতে হবেই এখন। নইলে এ সমস্যার সমাধান হবে না।"

যুবতী বলল, "বল।"

নির্ম্মল বলল, "মাস দুই আগে যখন আমার স্মৃতিশক্তি ফিরে এল, তখন বলেছিলাম না যে, কয়েক বছর আগে আমি একটি বালিকাকে বিবাহ করেছিলাম! যে দুর্ঘটনায় আমি প্রায় মরতে বসেছিলাম, তার অল্পদিন আগেই। তার পর ত সব স্মৃতিই আমার চলে গেল, কিছুই মনে রাখতে পারি নি। আমাকে যারা উদ্ধার করেছিল তারা যদি অত তাড়াতাড়ি হায়দ্রাবাদ ছেড়ে বর্ম্মায় না চলে আসত, তা হলে আমার এবং আমার বালিকাবধূর আত্মীয়েরা নিশ্চয়ই আমার কোনো খোঁজ পেতেন। খোঁজ করবার চেষ্টার ত্রুটি নিশ্চয়ই তাঁরা করেন নি। তার পর এতগুলো বছর কেটে গেল, আমি নূতন একটা জীবনের মধ্যেই দিন কাটিয়ে এসেছি। তোমার সেবা-যত্ন ভালবাসা সব গ্রহণ করেছি, না জেনে যে, সে ভালবাসা নেবার আমার কোনো অধিকারই নেই।"

পুষ্প বলল, "ভালবাসা পাবার অধিকার আবার কোন্ মানুষের না থাকে?"

নির্ম্মল বলল, "কিন্তু পেলেই হয় না ত শুধু! ভালবাসার প্রতিদানও মানুষে চায়। কিন্তু যে পুরুষ বিবাহিত, যার স্ত্রী বেঁচে রয়েছে, সে কি প্রতিদান তোমাকে দিতে পারে?"

"তোমার স্ত্রী কোথায়?"

"কাল যে মেয়েটিকে তুমি দেখলে সিনেমার গেটের কাছে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে যেতে, সেই আমার স্ত্রী সুমনা।"

"মেয়েটি খুবই সুন্দর দেখতে, আমার চেয়ে অনেক বেশী সুন্দর।"

"সুন্দর সে চিরকালই, এখন আরো সুন্দর হয়েছে। কিন্তু তোমার চেয়ে বেশী বা কম সুন্দর সে কথাটা এর মধ্যে উঠছে কোথায়?"

পুষ্প বলল, "এমনি বললাম, মেয়েমানুষে অমন বলে থাকে। ওকে একজন খুব সুদর্শন ছেলে কোলে করে উঠিয়ে নিয়ে গেল, সে কে?"

নির্ম্মল বলল, "চিনি ত না, সন্দেহ হচ্ছে, আমাকে মৃত জেনে সুমনা আবার বিবাহ করেছে।"

"যদি করে থাকে তাহলে সে বিয়ে কি আইনের চোখে সিদ্ধ নয়?"

নির্ম্মল বলল, "আমাদের দেশের আইনে ত নয়। তবে ও যদি আমার কাছে ফিরে আসতে অস্বীকার করে, তবে আইনের জোরে ওকে আমি ধরে আনতে পারি না।"

"কি তুমি করতে চাও?"

"কিছুই ঠিক করতে পারছি না। যদি বলি ওর প্রতি কোনো লোভ আমার নেই, সেটা মিথ্যা বলা হবে। তা ছাড়া কর্ত্তব্য বলে জিনিস একটা আছে। সুমনা যদি জানতে পারে যে আমি বেঁচে আছি, তাহলে সে আশা করতে পারে যে আমি তাকে ফিরে নেব।"

পুষ্প বলল, "তোমাদের সমাজ ত ভয়ানক গোঁড়া বল। যে স্ত্রী অন্য স্বামী গ্রহণ করেছে, হয়ত তার সন্তানের মা হয়েছে, তাকে নিলে তোমার নিন্দা হবে না?"

"হবেই খানিকটা। প্রায়শ্চিত্তের বিধান-টিধান আছে, কিন্তু তাতে লোকনিন্দা কমে না! খানিকটা অপমান সয়ে থাকতে হবে।"

"পারবে?"

"জানি না, ঠিক অবস্থাটার মধ্যে পড়লে তবে বুঝতে পারি। আমার আত্মীয়-স্বজন সকলের মনে কিরকম প্রতিক্রিয়া হবে সেটাও জানি না। আমি ত এখন সহায়-সম্পদহীন, দেশে ফিরে গেলে খানিকটা নির্ভর তাঁদের উপর করতে হবে। সুমনাকে তাঁরা কিভাবে গ্রহণ করবেন সেটাও আন্দাজ করতে পারছি না।"

"আমার কথাটা একবারও ভেবেছ?"

"একবার কেন, সারাক্ষণই ভাবছি। ভেবে কুল পাচ্ছি না। তোমার কাছে কত দিক দিয়ে আমি ঋণী। স্মৃতিহীন জীবনে ছিলাম যখন তখন তুমিই আমার একমাত্র সম্বল ছিলে। তোমায় তখন খুবই ভালবাসতাম।

সেটার কোনো স্মৃতি আমার নেই, কিন্তু সে সম্বন্ধে বিশ্বাস আমার আছে। একবার এই জটিল সমস্যার সমাধান হলে আমি সহজেই আবার সে জীবনের মধ্যে ফিরে যেতে পারি। এখন সুস্থ হয়েছি, আমাকে আবার মানুষের মতো করে বাঁচতে হবে। কিন্তু এই চারটে মানুষের জীবনে যে জট পাকিয়ে গেছে, তার গ্রন্থিগুলো খোলা যায় কেমন করে? তুমি আমাকে কি করতে বল?"

পুষ্প বলল, "আগে সুমনাকে খুঁজে বার কর। সেই একমাত্র পারে এ সমস্যার সমাধান করতে। সে তোমাকে না চায় যদি তাহলে ত সহজেই সব মিটিয়ে ফেলা যায়। তোমার এমনিতে ত দেশে ফেরার কোনো ইচ্ছা নেই?"

"বিশেষ নেই, তবে মা-বাবা যদি বেঁচে থাকেন তবে হয়ত আবার দেখা করব। সুমনা যদি ফিরে আসে আমার কাছে, তাহলে ত অবশ্য দেশে প্রথমতঃ ফিরতেই হবে।"

"সে ফেরে কি না সেটাই আগে দেখ। খোঁজ পাবে কি করে?"

নির্ম্মল বলল, "তাই ত ভাবছি। কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে আসতে পারে আমার খোঁজে, যদি আসা দরকার মনে করে। না হলে ত ডিটেক্‌টিভ লাগিয়ে খোঁজ করতে হয়। লোক-জানাজানি করলে সহজেই খবর পাওয়া যায়, ওর বাপের বাড়ীর সাহায্যে। কিন্তু এতটা এখনি করবার প্রয়োজন নেই। তা ছাড়া ওসব অর্থ-সাপেক্ষ ব্যাপার। তোমাকে হয়ত ছাড়তে হবে যে মানুষের জন্য, তারই খোঁজ করার জন্য তোমায় টাকা দিতে বলতে পারি না।"

পুষ্প বলল, "কিছু দিতে পারি। তাকে খুঁজে পেলেও সে হয়ত আসবে না, এই আশায় দেব। ঐ যুবকটি যদি ওর স্বামী হয়, তাহলে না আসার ইচ্ছা হওয়াই স্বাভাবিক।"

"কেন, আমি দেখতে ভাল নয় ব'লে?"

পুষ্প বলল, "দেখতে ভাল হওয়া একটা সৌভাগ্যের জিনিস জান? ওতে প্রথমেই মানুষের মনকে টানে। মানুষের গুণ, বুদ্ধি, এ সব জানতে সময় লাগে, রূপটা এক মুহূর্ত্তেই আকর্ষণ করে। ও ছেলেটি বেশ ভাল দেখতে, যে কোনো মেয়ের মন ওর দিকে সহজেই আকৃষ্ট হতে পারে। সুমনা যদি ওকে বিয়ে ক'রে থাকে, যদি ছেলেপিলে তার হয়ে থাকে তাহলে সহজে ঐ স্বামীকে সে ছাড়বে না।"

নির্ম্মল বলল, "একটু দূরে একজন বাঙালী উকীল থাকেন, তাঁর সঙ্গে সামান্য পরিচয় হয়েছে। ভাবছি তাঁর সঙ্গে একটু পরামর্শ করব। তোমার আপত্তি আছে?"

পুষ্প বলল, "আপত্তি থাকবে কেন? আমি কি খুব সুখে আছি? এর একটা নিষ্পত্তি হয়ে গেলে আমি ত বাঁচি। আমাকে বেঁচেও থাকতে হবে, ভবিষ্যৎ জীবনের ব্যবস্থাও করতে হবে। তবে চা খেয়ে যাও। সন্ধ্যার আগে ফিরে এস।"

তারা চা খেতে বসল। অল্পক্ষণ পরে নির্ম্মল বাইরে যাবার কাপড় চোপড় পরে বেরিয়ে গেল। পুষ্প আবার ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে কে একজন বাইরের দরজায় ঠক্‌ঠক্‌ করে কড়া নাড়ল।

দরজা খুলে পুষ্প বাইরে তাকাল। একটি দীর্ঘাকৃতি সুদর্শন যুবক বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। পুষ্পকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, "নির্ম্মলকুমার রায় বলে কেউ এ বাড়ীতে আছেন?"

পুষ্প বলল, "আছেন, কিন্তু মিনিট দশ আগে তিনি বেরিয়ে গেছেন, ফিরে আসতে ঘণ্টাখানিক দেরি হবে। তিনি এলে কি বলব?"

যুবকটি পকেট থেকে একটা কার্ড বার করে তাতে একটা ঠিকানা লিখল। পুষ্পর হাতে কার্ডটা দিয়ে বলল, "এই আমার নাম আর ঠিকানা রেখে গেলাম। অত্যন্ত জরুরী কাজে দেখা করতে এসেছিলাম। তাঁকে বলবেন, যদি তিনি নিজে দেখা করতে না যান, তাহলে এই ঠিকানায় খবর দিলেই আমি আসব। নিজে যান যদি আরো ভাল, কাল সন্ধ্যার মধ্যেই যান যেন," বলে পুষ্পকে অভিবাদন জানিয়ে সে চলে গেল।

এই ছেলেটিই সেদিন মূর্চ্ছিতা সুমনাকে কোলে করে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। প্রায় নিশ্চিত করেই বলা যায় যে সে সুমনার দ্বিতীয় স্বামী। একে ছেড়ে সুমনা নির্ম্মলের কাছে আসবে না সহজে। কতদিন তাদের বিয়ে হয়েছে কে জানে?

নির্ম্মল ফিরে এল ঘণ্টাখানিক পরে। বিজয়ের কার্ডটা নিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখল। অফিসের ঠিকানাটাও তাতে দেওয়া আছে। বলল, "বড় চাকুরে বলে বোধ হচ্ছে।"

পুষ্প বলল, "নির্ম্মল, তোমার ঐ স্ত্রীর প্রতি সত্যিই কি ভালবাসা আছে?"

নির্ম্মল বলল, "তাকে ভালবাসবার আমি অবকাশ পেলাম কোথায়? বিয়ের রাত থেকে সে পীড়িত, আর দেড় দু'মাসের মধ্যেই ত accident হয়ে আমি অন্তর্দ্ধান

করলাম। তবে সুন্দরী মেয়ে, এবং আমার বিবাহিতা স্ত্রী, তাকে পাবার আকাঙ্ক্ষা একেবারে নেই তা বলতে পারি না। কিন্তু কেন এত কথা জানতে চাইছ?"

"চাইছি নিজের প্রাণের দায়ে। ঐ ছেলেটি সুমনার দ্বিতীয় স্বামীই হবে। ওকে ছেড়ে সুমনা আসবে বলে ত মনে হয় না।"

নির্ম্মল বলল, "ওর আর আমার মধ্যে তুলনা করলে আমার দিকে কেউ ভোট দেবে না তা ঠিক। কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েদের মন বড় বিচিত্র। স্বামী জিনিসটাকে তারা ঠিক কি যে ভাবে তা জানি না, কিন্তু ঐ নামটা সম্বন্ধে দারুণ একটা মোহ আছে ওদের মনে। শুধু বিবাহিত স্বামী বলেই চলে আসা বিচিত্র নয়। তবে আর একবার বিয়ে যখন করেছে তখন খুব গোঁড়া মতামত তার আছে বলে মনে হয় না। যাক্, কালই এ নাটকের যবনিকা পতন হবে। যাই হোক, আর মাঝপথে ঝুলে থাকতে হবে না, এ একটা লাভ।"

২৬

ভোরের আলো ঘরে এসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সুমনা চোখ খুলে তাকাল। বিজয় আগেই জেগেছে, তার মাথার কাছে বসে আছে। মাঝে মাঝে সুমনার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

জিজ্ঞাসা করল, "সকাল বেলাই আবার ঘুম পাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছ কেন? এখন উঠব না?"

"উঠবে ত অবশ্যই। তবে যতক্ষণ ঘুমিয়ে থাক, ততক্ষণ মুখ দেখে মনে হয় একটু শান্তি পেয়েছ। সেই জন্যে তাড়াতাড়ি তুলতে চাই নি।

সুমনা বলল, "শান্তিটাই ত সব নয়। চোখ খুলে তাকাতে হয় আনন্দের সন্ধানে।"

"যার দিকে তাকিয়ে আনন্দ পাও, আমিই বোধহয় সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি। বোম্বাইয়ে থাকতে আমার নামকরণও সেইরকম করেছিলে, যদিও একদিনও ডাক নি সে নামে। কিন্তু দুঃখও ত কম এল না তোমার জীবনে আমি সেখানে আবির্ভূত হবার পর। নামটা বদলাবার সময় এসেছে বোধ হয়।"

সুমনা উঠে বসে বলল, "মোটেই না, ঐ নামই চিরকাল থাকবে তোমার আমার কাছে। নাম বদলাতে হলে অনেক বড় বড় কথা বলতে হয়। অত বড় নাম ধরে ডাকা শক্ত, এমন কি মনে মনেও। তার চেয়ে 'আনন্দ' ডাকটা কত সুন্দর, "joy"টাও সুন্দর। ছোট একটা হীরের মতো সুন্দর।"

বিজয় তার গালটা টিপে দিয়ে বলল, "হয়েছে, হয়েছে থাম। আমারই মুখ লাল হয়ে উঠছে, কিন্তু তোমার মুখ দিয়ে কথাগুলো বেশ অক্লেশেই বেরুচ্ছে। আর এত সুন্দর শোনাচ্ছে যে থামিয়ে দিতেও কষ্ট হচ্ছে। তুমি দেখতেও যেমন কবিতার মতো, শুনতেও তেমনি কবিতার মতো। এ রকম স্ত্রী নিয়ে ঘর করার অসুবিধা আছে কতগুলো। নিজেকে বড় বেশী grass মনে হয়।"

বাইরের ঘরে চা নিয়ে আসার শব্দ শোনা গেল। অগত্যা সুমনাকে উঠে পড়তে হ'ল। বলল, "আজ ত রবিবার, তোমাকে ত অফিস যেতে হবে না?"

"অফিস যেতে ত হবে না, তবে অন্য কাজে বেরুতে হতে পারে। যদি নির্ম্মল আমাদের এখানে না আসতে চায়, তাহলে আমাকেই যেতে হবে। তবে এলেই ভাল করত, তোমার নিজের মুখ থেকে শুনে যেতে পারত যে, তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে না।"

সুমনার শরীরের উপর দিয়ে কেমন একটা শিহরণ খেলে গেল। তার হাতটা নিজের হাতে নিয়ে বিজয় বলল, "অমনি হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল? এত ভয় পেলে চলবে না সুমনা। নির্ম্মল মানুষই, সে ভূত নয় যে তার নামেই আঁৎকে উঠতে হবে।"

সুমনা বলল, "আমার কাছে ভূতই ও, আমার অতীতের ভূত।"

"হ'লই না-হয়। তোমার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ যিনি, তিনিও ত সঙ্গেই রয়েছেন, সুতরাং অত ভয় পেয়ো না। চল চা খাবে চল।"

সুমনার মন থেকে ভয়টা তখনও যায় নি। চা ঢালতে গিয়ে হাত কেঁপে দু'তিনবার চা পড়ে গেল। বিজয় তার হাত থেকে টি-পটটা নামিয়ে রাখল। বলল, "মন শক্ত করতে হবে সুমনা। ভয় কেন পাচ্ছ? আমাদের দেশের মেয়ে জহরব্রত করেছে পরপুরুষের লালসার থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য। তারা তোমার চেয়ে বেশী করে ভালবাসে নি। কিন্তু সাহস তাদের কোথাও ত্যাগ করে নি। তোমাকে শুধু কয়েকটা কথা বলতে হবে, আর কিছু নয়। আর যদি কিছু বলবার বা করবার দরকার হয়, তার জন্যে আমি ত আছি? তবে কথা যে-ক'টা বলবে তা এরকম শাদা মুখ নিয়ে বল না। এমন করে বলো যাতে নির্ম্মল বুঝতে পারে যে, এগুলো তোমারই মনের কথা, আমি তোমাকে শিখিয়ে পড়িয়ে বলাচ্ছি না।"

সুমনা বলল, "না, আর ভয় করব না। ভয় আমি কেন করব? আমি ত কোনো অপরাধ করি নি, করতে

যাচ্ছিও না। দেখ, পুড়ে মরতে আমিও পারতাম। মরব ত ঠিকই করেছিলাম। আমাকে যদি তুমি ছেড়ে দিতে তার পর চব্বিশ ঘণ্টাও আর আমার কাটত না। আত্মহত্যা পাপ কি না আমি ঠিক বুঝতে পারি না, কিন্তু আত্মহত্যাই আমি করতাম। আমাকে জোর করে নিয়ে যাবার ক্ষমতা যদি থাকতও কারো, ত সে আমার প্রাণহীন দেহটা বড় জোর নিতে পারত।"

বিজয় বলল, "থাক, ওসব কথা আর মুখে এনো না। মরবার কথা কি করে ভাবতে পারলে? মা হতে যাচ্ছ না তুমি? তাকেও হত্যা করতে?"

বকল বটে স্ত্রীকে, কিন্তু নিজের চোখেও তার প্রায় জল এসে পড়ল।

"আমি তখন আর কিছুই ভাবি নি। খালি এইটুকু মনে জেগেছিল যে, চিরদিনের মতো আমার জীবনের সূর্য্য অস্ত গেল, অন্ধতামস নরকে পড়ব এবার।"

চাকর হঠাৎ বাইরের থেকে বলল, "একজন বর্ম্মী মেয়েলোক বৌদির সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছে।"

সুমনা বলল, "আমি ত এখানের কাউকে চিনি না?"

বিজয় উঠে পড়ে বলল, "দেখছি। বোধ হয় সেই মেয়েটি যে নির্ম্মলের সঙ্গে থাকে। ওর সঙ্গে কথা বলতে ভয় করবে না ত?"

"আর কারো সঙ্গে কথা বলতেই ভয় করবে না। সত্যি ভীরু আমি নই। ওটা আমার শরীরেরই দুর্ব্বলতা, কিন্তু ওটাকে আমি কাটিয়েই উঠব এবার।"

বিজয় বাইরে গিয়ে দেখল, পুষ্প দাঁড়িয়ে আছে। বিজয় বলল, "আসুন আপনি, ভিতরে।"

পুষ্প তাদের খাবার ঘরে এসে ঢুকল। সুমনা তখনও বসে বসে চায়ের পেয়ালায় চামচ নাড়ছে। বিজয় বলল, "এই আমার স্ত্রী।"

পুষ্প বলল, "জানি, আমি সিনেমার সামনে সেদিন ওঁকে দেখেছিলাম। ওঁর সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে চাই, আপত্তি আছে?"

বিজয় বলল, "আমার কোনো আপত্তি নেই।"

পুষ্প বলল, "শুধু উনি থাকলেই ভাল হয়।"

বিজয় হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুমনার পাশে একটা চেয়ার টেনে পুষ্প বসল, তার পর ভাল করে সুমনাকে দেখে নিয়ে বলল, "নির্ম্মল যখন তোমায় বিয়ে করেছিল, তখন তোমার বয়স কত ছিল?"

সুমনা বলল, "প্রায় ষোলো বছর।"

"একে বিয়ে করেছ কতদিন?"

"তা পাঁচ মাস হয়েছে প্রায়।"

"ছেলে পিলে হবার সম্ভাবনা আছে কিছু?"

সুমনা মুখটা লাল করে বলল, "আছে।"

পুষ্প বলল, "তোমার প্রথম স্বামী নির্ম্মল যদি তোমাকে ফিরে নিতে চায়, তাহলে যাবে?"

"না, যাব না।"

"কেন যাবে না? আইনতঃ ঐ বিয়েটাই সিদ্ধ, দ্বিতীয় বিয়েটাকে ত সমাজ এবং আইন স্বীকার করবে না?"

"নাই করল স্বীকার। আমার কাছে দ্বিতীয় বিয়েটাই একমাত্র বিয়ে, আগের বিয়েটা পুতুলখেলা মাত্র। আমার স্বামী বিজয়কে আমি নিজে ভালবেসে বিয়ে করেছি। তাঁকে আমি ছাড়তে যাব কেন?"

"ছাড়তে অবশ্য না পার। যতদূর জানি, জোর করে কেউ তোমাকে বাধ্য করতে পারে না। তবে অনেক রকম অসুবিধা ভোগ করতে হবে।"

"করতে হয় করব। একে ছেড়ে গেলে আমি বাঁচবই না, সুতরাং সুবিধা নিয়ে আর আমার তখন হবে কি?"

পুষ্প খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তার পর বলল, "ভগবান বুদ্ধ তোমার কল্যাণ করুন। আমাকেও তুমি বাঁচালে। তুমি হয়ত জান না, ঐ নির্ম্মলকে আমিও স্বামী বলে গ্রহণ করেছি। তুমি অত্যন্ত সুন্দরী, সে লোভে পড়ে হয়ত তোমাকে ফিরে পাবার চেষ্টা করত, কিন্তু সেটা তার মহাপাপ হ'ত। এখন আমার সঙ্গের সম্পর্কটাই থেকে যাবে। তোমার স্বামীকে বলো, নির্ম্মল তাঁর সঙ্গে সন্ধ্যাবেলা দেখা করতে আসবে। আমি যে এখন এসেছি তা সে জানেও না। যাই তবে।" বলে বেরিয়ে চলে গেল।

বিজয় ঘরের মধ্যে এসে বলল, "রেঙ্গুনের বাড়ীগুলোর এই একটা বড় সুবিধা যে একঘরে বসে দিব্যি অন্য ঘরের কথা শোনা যায়। বেশ ত তেজ দেখালে। এখন সন্ধ্যাবেলার পরীক্ষায় এই রকম full marks পেয়ে উৎরে যাও, তবেই না?"

সুমনা, বলল, "ঠিক উৎরব দেখো। মরার আগে আর ভয়ে মরছি না।"

বিজয় বলল, "যাক্, আমাদের এখানের পর্ব্ব ত শেষ হতে চলল, কাজকর্ম্ম যা বাকি আছে, তা শেষ করতে দিন দুই-তিন লাগতে পারে। তার পর ফিরে যাওয়া। আমার এখন আর কলকাতার ভিড়ের মধ্যে পড়তে ইচ্ছা করছে না। কিন্তু তা ছাড়া উপায়ই বা কি?"

সুমনা বলল, "ঐ আসবার সময় যেমন একদিন থেকে

এসেছিলাম এবারেও তাই করব। দাদাকে আগে একটা টেলিগ্রাম করে দিও, 'সিট' রিসার্ভ করে রাখবে। বাবাঃ, নিজের বাড়ীতে গিয়ে একবার বসতে পারলে বাঁচি। আর দশ বছরের মধ্যে নড়ছি না ওখান থেকে।"

বিজয় বলল, "এমনিতেই কথা দিয়ে এসেছ যে আর চার মাস পরে গিয়ে দু'মাস থেকে আসবে। সে কথাটার কি হবে?"

সুমনা একটু বিপন্ন মুখ করল, তার পর বলল, "আচ্ছা যাব, কিন্তু তোমাকে সঙ্গে থাকতে হবে। না হলে ওরা আমাকে মিথ্যাবাদীই বলুক আর যাই বলুক, আমি তোমাকে ছেড়ে নড়ছি না।"

বিজয় বলল, "যাক, সে পরের কথা পরে হবে। এখানকার ভাবনাটার শেষ ত হোক। সন্ধ্যার interviewটা চুকলে তবে হাঁফ ছেড়ে বাঁচা যায়। লোকটির স্বভাব-চরিত্র কি রকম তা কিছুই জানি না। বেশী unpleasant না হয়ে ওঠে। ভদ্রতা রক্ষা করে আশা করি চলতে পারবে। সম্প্রতি নেয়ে-খেয়ে একটু ঘুমিয়ে নাও। একেই ত ছিলে একমুঠো ফুলের মতো, ক'দিনের ভয়ে আর strainএ শুকিয়ে আরো আধমুঠো হয়ে গেছ। তবে বড় জোর আধ ঘণ্টার ব্যাপার, এই ভেবে মনটাকে স্থির রেখো।"

সুমনা বলল, "তুমি থাকবে কিন্তু ঘরে আমার সঙ্গে।"

বিজয় বলল, "নিশ্চয়। ওর সামনে তোমাকে একলা ছেড়ে দেব নাকি আমি? ভাবছি তোমার কপালে একটা কাজলের টিপ পরিয়ে রাখব। সবাই বড় নজর দিচ্ছে।"

সুমনা বলল, "তোমার কপালেও একটা দিলে হয়। এক্ষেত্রেও নজর দেবার লোকের অভাব নেই।"

"এমন একটি রক্ষাকবচ থাকতে আমার উপর নজর দিয়ে আর হবে কি? তোমাকে আমি প্রাণ থাকতে ছাড়ব না এটা তোমার দিকে তাকালেই বুঝতে পারবে সবাই। তবে আমাকে তুমি ত্যাগ করতে পার কি না সেটা আমার চেহারা দেখেই অত সহজে বোঝা যাবে না। মানুষের মতো চেহারা বটে, তবে কার্ত্তিকের মতো নয়।"

"আমার কার্ত্তিকের মতো চেহারায় কাজ নেই। বড় বোকা বোকা দেখতে।"

দিনটা আস্তে আস্তে সন্ধ্যার দিকে এগোতে লাগল। সুমনা খেতে কিছুই পারল না, তবে বিজয় জোর করে তাকে শুইয়ে রেখে দিল। বিকেলের দিকে বলল, "চুল বেঁধে কাপড়-চোপড় বদলে ঠিক হয়ে থাক। দেখে যেন কারো মনে না হয় যে তুমি একটু বিচলিত হয়েছো।"

সুমনা উঠল। চুল বাঁধল, কাপড়-চোপড় বদলে তৈরি হ'ল। গলার কাছটায় কি যেন আটকে আছে আর ভিতরটা শুকিয়ে উঠছে! মনে মনে জপ করতে লাগল, "আমি ভয় করব না, ভয় করব না।"

নির্ম্মল সময়মতো এসে উপস্থিত হ'ল। বিজয়কে নমস্কার ক'রে বলল, "সন্ধ্যার মধ্যেই আসতে বলেছিলেন। দেরি হয় নি ত?

বিজয় বলল, "না, বসুন আপনি। আমি সুমনাকে ডেকে আনছি।"

সুমনা এসে ঘরে ঢুকল। নির্ম্মল তার দিকে তাকাল। নমস্কার করল না। জিজ্ঞাসা করল, "ভাল আছ সুমনা?"

সুমনা বলল, "ভালই আছি।"

দু'তিন মিনিট তিনজনেই চুপ করে রইল। তার পর নির্ম্মল বলল, "আমার এই আট বৎসর পরে আকস্মিক আবির্ভাবের একটা explanation দরকার। আমি সেই রেল দুর্ঘটনায় ভয়ানক ভাবে আহত হই। কয়েক জন লোক আমায় জল থেকে তুলে নিয়ে বাঁচায়। তারা নিরক্ষর মানুষ, ব্যবসা-বাণিজ্য করে খেত। আমায় যেখানে তারা নদীর থেকে তোলে সেটা বড় শহর থেকে বেশ খানিকটা দূরের জায়গা, কাজেই তখন তখন যাঁরা খোঁজ করেছিলেন, তাঁরা আমার কোনো খোঁজ পান নি। ঐ লোকগুলি যদি ওখানেই থেকে যেত, তাহলে কালে আমার সন্ধান আমার আত্মীয়েরা পেয়েই যেতেন। তবে তাঁরা তখন দেশ ছেড়ে বার্ম্মায় আসতে ব্যস্ত, এখানেই তাদের বেশীর ভাগ কারবার। আমি তখন অত্যন্ত পীড়িত, স্মৃতিশক্তি একেবারেই লোপ পেয়েছিল।

"ভাল করে যখন সারলাম, তখন আমি তাদের সঙ্গে রেঙ্গুনে এসে উপস্থিত হয়েছি। স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছিলাম কিন্তু স্মৃতি ফিরে পাই নি। যে মেয়েটিকে আমার বাড়ীতে বিজয়বাবু দেখেছেন সে পাশের বাড়ীতে থাকত। আমার সেবাযত্ন সেই বেশীর ভাগ করেছে। আমার সঙ্গে সঙ্গেই থেকেছে এতদিন।

"মাসদুই আগে হঠাৎ আমার পূর্ব্বস্মৃতি ফিরে আসে, তখনই দেশে ফিরি নি। অনেকটা ঐ মেয়েটির খাতিরে। কিন্তু নিজের অনেক কর্ত্তব্য অসমাপ্ত রেখে আমি অন্তর্হিত হয়েছিলাম, সেগুলো ভিতরে ভিতরে তাগিদ দিচ্ছিল। তার পর এই দু'দিন আগে সুমনাকে দেখলাম। এখন জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, আমাদের কি করা উচিত? চারজন

লোকও এই ট্র্যাজেডির জালে জড়িয়েছি, মুক্তির উপায় কি? আমার মা-বাবার কোন খবর কি জান সুমনা।"

সুমনা বলল, "বহু বৎসর কোনো খবরই রাখি না। গোড়ার দিকে শুনেছিলাম, আপনার মা মারা গিয়েছেন, এবং বাবা আবার বিবাহ করেছেন।"

নির্ম্মল খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তার পর বলল, "দেশে ফিরবার কারণ তা হলে আর বেশী কিছু নেই। এক তোমার জন্মে যদি ফিরে যাই। তুমি যাবে আমার সঙ্গে?"

সুমনা অত্যন্ত সংক্ষেপে বলল, "না।"

"কিন্তু তুমি ত জান যে, তোমার দ্বিতীয় বিবাহ এখন আইনতঃ অবৈধ হয়ে যাবে।"

সুমনা কঠিন সুরে বলল, "জানি তা। তবে আমার মতে আমার এই দ্বিতীয় বিবাহটাই একমাত্র বিবাহ। অন্য বিবাহটাকে আমি স্বীকার করছি না। সেটা একটা প্রাণহীন আচারমাত্র, আমার তাতে কোনো অংশ ছিল না। আপনাকে স্বামী বলে কোনোদিন আমি ভাবতে পারি নি। কোনো দিকের কোনো সম্বন্ধই আমাদের মধ্যে হয় নি।"

"কিন্তু ভেবে দেখেছ কি, ইনি যদি কোনো দিন সরে দাঁড়ান তা হলে তোমার অবস্থা কি হবে? সংসারে সমাজে তোমার স্থান কোথায় হবে? সন্তান-সন্ততিদের position কতটা নীচু হবে?"

সুমনা বলল, "সমস্ত ভেবেছি এবং ভেবে স্থির করেছি যে আমার বা আমার সন্তানদের অবস্থা যাই হোক, আমি এঁর সঙ্গেই থাকব এবং চিরদিন এঁকেই স্বামী বলে পরিচয় দেব।"

নির্ম্মল বিজয়ের দিকে ফিরে বলল, "ইনি কথাটা বলছেন হৃদয়াবেগের দিক থেকে। ওঁর বয়স অল্প, সংসারের সঙ্গে পরিচয় কম। আপনি পুরুষ মানুষ, জগৎ-সংসারকে চেনেন। আপনি কি বলেন? চিরদিনের জন্মে এঁর সব ভার আপনি নিতে রাজী আছেন?"

বিজয় বলল, "রাজী আছি। আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে ইনি কিছু বলছেন না।"

নির্ম্মল বলল, "তা হলে এটা মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। মামলা-মোকদ্দমা করে আপনাদের উপর খানিকটা উৎপাত করা যায় বটে, তবে সে ইচ্ছা নেই এবং frankly সে সামর্থ্যও নেই। এঁকে জোর করে নিতে পারব না, পারলেও নিয়ে কোনো লাভ হবে না। নাটকের villain হবার মত দেহ বা মনের গঠন আমার নয়। নিজে একেবারে unattached হলে কিছু trouble হয়ত দিতাম। কিন্তু আমার প্রাণদাত্রী মেয়েটির কথাও ভাববার আছে। প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি আমার নেই, কারণ আপনি যখন এঁকে গ্রহণ করেছিলেন, তখন আমি মৃত জেনেই করেছিলেন। আর কি কিছু বলবার আছে?"

সুমনা বলল, "বলবার আর কি থাকবে? ভগবান আপনার কল্যাণ করুন। আপনি আমাকেও মুক্তি দিলেন নিজেও মুক্ত হলেন, এবার জীবনটার সদ্ব্যবহার করতে পারবেন।"

"পারব হয়ত। আচ্ছা, আসি সুমনা।" বিজয়ের দিকে ফিরে বলল, "নমস্কার মশায়। সংস্কৃতে বলে, উদ্যোগী পুরুষসিংহকেই লক্ষ্মী গ্রহণ করেন। আমি উদ্যোগীও নয় এবং পুরুষসিংহও কোনো দিন ছিলাম না, কাজেই লক্ষ্মী আপনাকেই বরণ করলেন। তাঁর রুচিটা ভাল, এটা স্বীকার করেই যাচ্ছি।" বলে হন্ হন্ করে বেরিয়ে চলে গেল।

সুমনা খানিকক্ষণ পাথরের মূর্ত্তির মতো বসে রইল, তার পর উঠে শোবার ঘরে গিয়ে বিছানায় মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল। বিজয় তার পিছন পিছন এসে বলল, "কি হ'ল আবার? চুকে ত গেল। শরীর খারাপ লাগছে?

সুমনা বলল, "না, কিন্তু বেশী সাহস দেখাতে গিয়ে এখন বুক কাঁপছে। তুমি আমার কাছে বসো ত একটু। তোমার বুকে মাথাটা একটু রাখতে দাও।"

বিজয় নিজের বুকের উপর তুলে নিল সুমনার মাথাটা, নিজের মুখ নেমে এল সুমনার মুখের উপর। সুমনা একটু পরে বলল, "আচ্ছা, কোনোও অন্যায় ত আমরা করলাম না?"

বিজয় বলল, "না, অন্য কিছু করলেই অন্যায় হ'ত।"

সুমনা বলল, "একটা দুঃখ আমার রয়ে গেল জান? আমার বিয়ের রাতে আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম যে, তোমার জন্মে প্রাণ দেওয়ার সৌভাগ্য যেন আমার হয়, সেইটা পারলাম না।"

বিজয়ের চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা জল সুমনার চুলের উপর পড়ল। সে বলল, "ভগবান শুধু তোমার প্রার্থনাটাই শোনেন নি, আমারটাও শুনে থাকবেন। প্রাণ ত তুমি দিচ্ছিলেই, নিতান্ত তাঁর দয়াতে সেটা আমার হাতে ফিরে এল আবার।"

সুমনা একটু পরে বলল, "সকালে মনে হচ্ছিল, একটা করাল ধূমকেতু এগিয়ে আসছে আমার দিকে। আগুনের ঝাঁটা দিয়ে একেবারে ধ্বংসের মধ্যে ফেলে দিয়ে যাবে।"

বিজয় এবার স্বাভাবিক স্বরে বলল, "ল্যাজের ঝাপটা একটু যে লাগে নি তা বলা যায় না। তবে ধ্বংস যা হ'ল

তা আমাদের ভয় আর সংশয়। এর পর অভয়-লোকে নূতন জন্মলাভের দিন।"

সকাল বেলা সুমনা স্নান করবার জন্যে চুল খুলছে, এমন সময় চাকর আবার এসে খবর দিল, সেই ব্রহ্ম-দেশীয়া মহিলা আবার এসেছেন।

আবার কেন? একটু ভীত এবং বিস্মিত হয়ে সুমনা বসবার ঘরে গিয়ে দাঁড়াল। পুষ্প বসেছিল, উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমরা আজই সিঙাপুর চলে যাচ্ছি। তোমাকে ধন্যবাদ দিতে এলাম এবং একটা উপহার দিতে এলাম। আমি তোমার বড় বোনের মত। নেবে ত?"

সুমনা বলল, "নিশ্চয়। কি দেবেন দিন্।" নিজের ব্যাগ থেকে পুষ্প একটি ছোট্ট বুদ্ধমূর্ত্তি বার করল, রূপোর তৈরি, সোনার জল করা। বলল, "এইটি রাখ। আমাদের পরিবারে এটি বহু পুরুষ ধরে আছে। যতদিন তোমার কাছে থাকবে, তোমার বা তোমার স্বামী ও সন্তানের কোনো অকল্যাণই হবে না। তুমি আমায় বাঁচিয়েছ আজ, তাই আমার কাছে যা খুব মূল্যবান তাই তোমায় দিলাম। ভগবান বুদ্ধ তোমায় আশীর্ব্বাদ করুন।" বলে মেয়েটি বেরিয়ে চলে গেল।

সুমনা বুদ্ধমূর্ত্তিটি হাতে করে খানিক দাঁড়িয়ে থেকে আবার শোবার ঘরে ফিরে গেল। বিজয় তখন অফিসে যাবার জোগাড় করছে, জিজ্ঞাসা করল, "কি লাভ হ'ল?"

সুমনা মূর্ত্তিটি তার হাতে তুলে দিল। সেটিকে নেড়ে চেড়ে সুমনার হাতে ফিরিয়ে দিল বিজয়, বলল, "তাকেও তুমি মহাভয় থেকে বাঁচিয়েছ সুমনা। সেও পেল সব চেয়ে বেশী যা চেয়েছিল, তুমিও পেলে সব চেয়ে বেশী যা চেয়েছিলে।"

সুমনা কিছুক্ষণ কি ভাবল বসে বসে, তার পর বিজয় যখন বেরিয়ে যাচ্ছে তখন তার কাছে গিয়ে বলল, "শোন।"

বিজয় বলল, "শুনছি। বল।"

"কলকাতায় গিয়ে এ সব কথা কি কাউকে বলব? বাবাকে অন্ততঃ?"

বিজয় মিনিটখানিক ভেবে নিল, তার পর বলল, "থাক সুমনা। নির্ম্মল ত নিজের ফিরে আসাটাকে আবার মুছেই দিয়ে গেল, আমরা আর সেটার দাগ নিজেদের জীবনে কেন ধরে রাখি? সে ত আর তার আগেকার জীবনকে ফিরে পেতে চায় না। আমাদেরই বা কি দরকার ঐ স্মৃতিটাকে টেনে নিয়ে ফিরবার? সে কোনোখানে ছিল না আমাদের মিলিত জীবনে, কোনোখানে থাকবেও না।"

সমাপ্ত

শুক্তি

শ্রীসুধীর গুপ্ত

সমুদ্রের তরঙ্গের সহস্র সংঘাতে
বিক্ষোভিত হতে হতে সহসা সৈকতে
বালু-স্তরে পড়িলাম আসি' কোন মতে;
ঝলকিয়া উঠিলাম সূর্য্য-রশ্মি-পাতে।
লবণাক্ত সিন্ধু-জল স্বর্ণাভ-প্রভাতে
কখন শুষিয়া গেল; শুষ্ক বালু হতে
সাদরে কে বক্ষে নিল; আনন্দের ব্রতে
মাতিলাম শুভ্র শুক্তি দিব্য অর্চ্চনাতে।
করপুটে ধরি নিত্য ভক্তির চন্দন,—
বিগ্রহে আগ্রহে নিত্য নিবেদন করি।
সহিয়াছি ক্ষুব্ধ যত সিন্ধু-আলোড়ন...
বালু-ব্যথা দিব্য-ভাবে গিয়েছি বিস্মরি'।
বুঝিয়াছি—দৈবায়ত্ত বিচিত্র জীবন,
যার ধন সেই তোলে তার মত গড়ি'।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

শ্রীকানাইলাল দত্ত

নিমতলা শ্মশানঘাটে—২৭শে অক্টোবর, ১৯০৭, যে শবটি দাহ হয় তাহা বাঙালী-প্রধান ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের। সমাজভুক্ত হন। কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পর (১৮৮৪) মাত্র ২২ বৎসর বয়সে ভবানীচরণ সিন্ধুদেশে প্রেরিত হন ব্রাহ্মধর্ম

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

পূর্বে তাঁহার নাম ছিল ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্ম হুগলী জেলার খন্যান গ্রামে—১৮৬১ সনের ১১ই ফেব্রুয়ারী। ভবানীচরণ প্রথম বয়সে কেশবচন্দ্র সেনের সংস্পর্শে আসেন এবং ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়া নববিধান প্রচারের জন্য। সেখানে খ্রীষ্টান পাদ্রীদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। ধর্মে খ্রীষ্টান হইলেও বসনে ইনি চিরকাল ভারতীয়ই ছিলেন। ভারতীয় হিন্দু সন্ন্যাসীর গৈরিক বসনেই ইনি পাশ্চাত্ত্য দেশে যান এবং

বেদান্ত প্রচার করেন। বর্ণাশ্রম ধর্ম ও বেদান্তের প্রতি ইঁহার বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা কোনোদিনও বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নাই। এ হেন লোকের শবদেহ সমাধিস্থ না করিয়া দাহ করাই হয়ত সমীচীন হইয়াছিল।

মৃত্যু জীবনের ক্রমিক পরিণতি, একথা যেমন সত্য তেমনি সত্য, মৃত্যু শূন্যতা সৃষ্টি করে। যে মৃত্যু যত বড় শূন্যতা সৃষ্টি করে তার জন্য শোক তত গভীর এবং ব্যাপক হয়। ব্রহ্মবান্ধবের মৃত্যু তখন এতই শোকাবহ হইয়াছিল যে, বহু সহস্র লোক তাঁহার শবদেহের অনুগমন করিয়াছিলেন। শবাধার যখন সার্কুলার রোড, হ্যারিসন রোড, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট হইয়া 'সন্ধ্যা' কার্যালয়ে উপস্থিত হয়, তখন উহা জনসাধারণের পুষ্পার্ঘ্যে পরিপূর্ণ। তৎকালীন কলিকাতার রাজনৈতিক অবস্থা, সামাজিক পটভূমি ও জনসংখ্যার বিচারে শবযাত্রার এ বিপুল সমারোহ খুবই বিস্ময় সঞ্চার করে। ব্রহ্মবান্ধব চরমপন্থী রাজনীতিক দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। রাষ্ট্রীয় অধিকার ত্যাগ, সেবা ও সহনশীলতার দ্বারা অর্জন করিতে হইবে; ইহা ভিক্ষালব্ধ সামগ্রী নহে, এই কথা ব্রহ্মবান্ধব অকুতোভয়ে সর্বজন-বোধগম্য ভাষায় দিনের পর দিন তারস্বরে প্রচার করিয়াছেন। কলিকাতার বাবু-সমাজ, বিশেষতঃ সরকারী ও সওদাগরী হৌসের বাবুরা ডালহৌসী বা এসপ্লানেডের মোড়ে 'সন্ধ্যা' হকারকে দেখিয়াই "নো গুড!" "নো গুড!" বলিয়া অন্যপথ ধরিতেন আর ওয়েলিংটন স্কোয়ারে আসিয়াই তাড়াতাড়ি এক খণ্ড কিনিয়া পকেটে পুরিতেন। আবার বহু আভিজাত্যগর্বী তথাকথিত ভদ্রলোক প্রকাশ্যে 'সন্ধ্যা' পড়িতে কুণ্ঠিত ছিলেন। ভাবটা এই, ওটা কুলি-মজুরের কাগজ—ও কি ভদ্রলোকে পড়ে! কিন্তু গোপনে খুব আগ্রহের সঙ্গেই পড়িতেন। শেষের দিকে ইঁহাদের লজ্জা কিন্তু বহুলাংশে কমিয়া গিয়াছিল। ব্রহ্মবান্ধবকে শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেই ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন।

'সন্ধ্যা' ব্রহ্মবান্ধবের সর্বপ্রধান সৃষ্টি বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। ইতিপূর্বে 'সোফিয়া' ও 'টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী' নামক ইংরেজী পত্র-পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করিয়াছেন। কিন্তু বাংলা দৈনিক 'সন্ধ্যা' প্রকাশের প্রথম দিন হইতেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। এই কাগজে ইউরোপীয়দের একটিমাত্র নামে অভিহিত করা হয়—ফিরিঙ্গি। যে সব ইংরেজ কর্মচারীর নামোচ্চারণ করিতেও সাধারণ মানুষ সাহসী হইত না তাহাদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষেরই ভাষায় লেখা শ্লেষ-ব্যঙ্গোক্তি, কটূক্তি কাগজটিকে প্রথমাবধিই খ্যাতির মধ্যগগনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল। অচিরেই ইহার প্রচার-সংখ্যা বারো হাজারের কোঠায় পৌঁছায়। আজকালকার সংবাদপত্রের প্রচার-সংখ্যা দেখিয়া ইহাকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর মনে হইতে পারে। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সেই যুগে সংবাদপত্র বলিয়া আজ যাহা বুঝি তাহার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত-পাঠক এবং বিজ্ঞাপনদাতা-সমাজ ছিল না। ইহা গড়িয়া উঠিয়াছে মুখ্যত 'সন্ধ্যা' প্রভৃতি সেই সময়কার পত্র-পত্রিকাদির দৌলতে। ব্রহ্মবান্ধব প্রত্যহ সকাল সাড়ে পাঁচটা হইতে বারোটা পর্যন্ত নিয়মিত 'সন্ধ্যা'র কপি প্রস্তুত করিতেন। তাহার পর ইহার মুদ্রণ ও প্রকাশ। অনেক দিন এমন হইত যে, সময়াভাবে কাগজের এক পৃষ্ঠা আর ছাপা হইল না, সাদাই রহিয়া গেল। রোটারী যন্ত্র তখন ছিল না। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, জলধর সেন ও সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রভৃতি ব্রহ্মবান্ধবকে 'সন্ধ্যা'র লেখা ব্যাপারে সাহায্য করিতেন। শ্যামসুন্দর পরে ব্রহ্মবান্ধবের সম্মতিক্রমে 'বন্দেমাতরমে' যোগদান করেন। 'সন্ধ্যা'র ফাইল কপি এখন আর পাওয়া যায় না। পুলিশী তাণ্ডবে তাহা সম্পূর্ণই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

ব্রহ্মবান্ধবকে মোট ৪টি মামলার আসামী হইতে হয়। এক নম্বর ও দুই নম্বর 'সন্ধ্যা' সিডিশন মামলার পূর্বে যে দুইটি মামলা হয় তাহা সাধারণ মোকদ্দমা মাত্র। প্রকাশনের পরিবর্তিত ঠিকানা বিজ্ঞাপিত না করিবার জন্য একটি মামলা সরকার দায়ের করেন। অপরটি দায়ের করেন মানহানির দাবিতে রাজসাহীর এক রেশম-কুঠীর সাহেব ম্যানেজার। বিখ্যাত সিডিশন মামলা দ্বারা ব্রহ্মবান্ধবকে 'সায়েস্তা' করিবার যে আয়োজন শ্বেতাঙ্গেরা দীর্ঘদিন যাবৎ করিতেছিল তাহা কার্যে পরিণত করিবার পূর্বে 'অন্য উপায়ে' ব্রহ্মবান্ধবকে হাত করিবার চেষ্টা হয়। ব্রহ্মবান্ধবের এক আত্মীয় তখন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি দুইজন বন্ধুসহ হঠাৎ একদিন এই সময় ব্রহ্মবান্ধবের সহিত দেখা করিতে আসেন। নানা কথাবার্তার পর প্রস্তাব করিলেন, কাগজের সুরটি একটু নরম করিলেই সরকারী সাহায্য (?) পাওয়া যাইতে পারে। ব্রহ্মবান্ধব এইরূপ অসাধু প্রস্তাব গ্রহণে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে বিদায় দিলেন। অচিরেই আর এক দফা পুলিস-তল্লাসী এবং পরে ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে ম্যানেজার, মুদ্রাকর এবং ব্রহ্মবান্ধব নিজে ধৃত হইল। আরম্ভ হইল সন্ধ্যার ঐতিহাসিক রাজদ্রোহ মামলা।

ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশ (পরে দেশবন্ধু) ম্যাজিষ্ট্রেট

কিংসফোর্ডের আদালতে ব্রহ্মবান্ধবের পক্ষে কৌঁসুলী ছিলেন। তিনি আদালতের সমক্ষে ব্রহ্মবান্ধবের যে বিবৃতি উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহার একস্থানে ছিল— I do not want to take any part in the trial, because I do not believe that in carrying out my humble share of God appointed mission of Swaraj. I am now in any way accountable to the alien people…এই আত্মপক্ষ সমর্থনে অনিচ্ছা-হেতু শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল তাঁহার "মুক্তি সন্ধানে ভারত" গ্রন্থে ব্রহ্মবান্ধবকে ভারতের সর্বপ্রথম অসহযোগী বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন।

এই মামলা চলাকালীন কিংসফোর্ড দুই নম্বর সন্ধ্যা সিডিশন মামলা দায়ের করাইয়াছিলেন। প্রথম মামলায় তবুও ব্রহ্মবান্ধব জামিন পাইয়াছিলেন। দ্বিতীয় মামলায় কোনো জামিন মঞ্জুর হয় নাই। কিন্তু আসলে ব্রহ্মবান্ধবকে পুলিস-হাজতে প্রেরণ করা সম্ভবও ছিল না। কারণ তিনি তখন ক্যাম্পবেল হাসপাতালে কঠিন রোগে শয্যাশায়ী। সরকার তাই অনন্যোপায় হইয়া তাঁহাকে পুলিস-প্রহরায় হাসপাতালেই রাখেন। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ব্রহ্মবান্ধব আর জীবিত অবস্থায় হাসপাতাল হইতে বাহির হন নাই। তাঁহার উক্তি : I will not go to the jail of Firingi to work as a prisoner—এমন মর্মান্তিক নিষ্ঠুর সত্যে পরিণত হইবে তাহা কেহ পূর্বে ভাবিতে পারে নাই। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' সেদিন তাই সত্যই বলিয়াছিল—We do not know whether to rejoice.

কিংসফোর্ড ভারতে ইংরেজ সরকারী কর্মচারী-বর্গের একাংশ অত্যন্ত প্রভুত্বপ্রিয় ও নির্মম হইয়া উঠেন। কিংসফোর্ড ছিলেন এই শ্রেণীরই মানুষ। একে ব্রহ্মবান্ধব ইংরেজদের ফিরিঙ্গি ভিন্ন বলিতেন না—তার পর অন্য যে সব মধুর (!) সম্ভাষণে তিনি তাহাদিগকে তাঁহার 'সন্ধ্যা' কাগজে আপ্যায়িত করিতেন তাহা নির্বিকারে হজম করা বড় শক্ত ছিল। কিংসফোর্ডের ঘৃণার পেয়ালা কানায় কানায় পূর্ণ হইল যখন স্কুলছাত্র সুশীল সেনকে তিনি ১৫ঘা বেত্রদণ্ডাদেশ দিবার পর ব্রহ্মবান্ধব কর্তৃক 'কসাই কাজী কিংসফোর্ড' 'পাজি—পাজির পাজি' নামে জ্বালাময়ী প্রবন্ধ মুদ্রিত করিলেন।

ব্রহ্মবান্ধব ছিলেন মূলত বিপ্লব-সাধক। তথাপি তিনি কাহার কোনো আহ্বানকে উপেক্ষা করেন নাই। প্রকৃত সন্ন্যাসীর মতোই স্থানকালভেদ না করিয়াই প্রত্যেকটি কল্যাণকর্মকে স্বীয় শ্রম দ্বারা যতদূর সম্ভব আগাইয়া দিয়াছেন। জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কে যখন আমাদের ধারণা স্পষ্ট নহে—একটা কিছু করিবার ব্যাকুলতা মাত্র হৃদয়ে অনুভব করিতেছি—ব্রহ্মবান্ধব বাস্তব পরিকল্পনা পেশ করিলেন। পরিকল্পনা রূপায়ণের বিপুল অর্থ কোথা হইতে পাওয়া যাইবে? এই সন্ন্যাসীই তাহা সংগ্রহের পথ দেখাইলেন। স্বদেশী সভায় বক্তৃতা দিবার লোক প্রয়োজন—ব্রহ্মবান্ধব বক্তা খুঁজিতেছেন, বক্তা তৈরি করিতেছেন। বন্দেমাতরমের তহবিল নাই—সন্ন্যাসী ভিন্ন আর কে ভিক্ষা করিবে? রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপনের কথা অনেক দিন যাবৎ ভাবিতেছেন, মনের মতো লোক পান না, অবশেষে কোনো সূত্রে ব্রহ্মবান্ধবের সঙ্গে পরিচয় হইল।

রবীন্দ্রনাথের ধারণা হইল ব্রহ্মবান্ধব সাহায্য করিলে তাঁহার ধ্যানের বিদ্যালয় বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করিতে পারে। রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে ব্রহ্মবান্ধব চলিলেন শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় গঠন করিতে। ১৩০৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে ব্রহ্মবান্ধব শান্তিনিকেতনে আসিলেন, কিছু ছাত্র ও অধ্যাপক তিনিই জুটাইলেন। "…রবীন্দ্র-নাথের পরিকল্পিত বোর্ডিং বিদ্যালয়কে যথার্থ ব্রহ্মচর্যাশ্রমে রূপদান করিলেন ব্রহ্মবান্ধব।…কর্মের সকলগুলি রজ্জু গিয়া পড়িল ব্রহ্মবান্ধবের হাতে, সুতরাং প্রতিষ্ঠানটিকে তিনি আপনার আদর্শেই গড়িতে প্রবৃত্ত হইলেন।"

(রবীন্দ্র-জীবনী—২য় খণ্ড, ২য় সং, পৃ: ২৯)

ব্রহ্মবান্ধব আশৈশব অত্যন্ত শ্রমসহিষ্ণু ছিলেন। যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষালাভের জন্য ব্রিটিশ ভারতের সেনাবাহিনীতে যোগদান করিতে না পারিয়া একদা কিশোর বয়সে তিনি এটোয়া হইতে গোয়ালিয়র পর্যন্ত ৭২ মাইল দুর্গম পথ একটানা পদব্রজে অতিক্রম করিয়াছিলেন—করদ রাজ্যের সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের অভিপ্রায়ে। যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়া দেশ স্বাধীন করিতে হইবে—এই ছিল তাঁহার বাসনা। শ্রমসহিষ্ণু ব্রহ্মবান্ধব জানিতেন, শ্রমকাতর লোক দ্বারা কোনো কাজই হয় না। অতএব ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের ছাত্রদের তিনি শ্রমসহিষ্ণু করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। সামনে বড় আদর্শ না থাকিলে মানুষ বড় হয় না। ব্রহ্মবান্ধব যখন বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র, দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন সেখানকার অধ্যাপক। সুরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে ছাত্ররা প্রায়ই শুনিতেন "কে কে তোমরা গ্যারিবাল্ডি, ম্যাটসিনি হইতে চাও?" ছাত্ররা অবশ্য সমস্বরে "সকলেই, সকলেই" বলিয়া ইহাকে স্বাগত করিতেন। পরাধীন জাতির যুবকদের চিত্তে গ্যারিবাল্ডি, ম্যাটসিনির অমর আদর্শ তখন হইতেই অক্ষয় হয় এবং জীবনে ও কর্মে ইহা অমোঘ প্রভাব বিস্তার করে। ব্রহ্ম-

বান্ধবের জীবনে এই প্রভাব কর্মের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো এই বিদ্যালয়-পরিকল্পনায়ও ক্রিয়াশীল দেখি।

"ব্রহ্মবান্ধবের ব্যবস্থায় ছাত্ররা সরল কঠোর জীবন-যাপন করিতে বাধ্য হইল, জুতা ছাতার ব্যবহার নিষিদ্ধ; নিরামিষ ভোজন সার্বজনিক, আহারস্থানে বর্ণভেদ মানাই ছিল রীতি। প্রাতে ও সায়াহ্নে গায়ত্রীমন্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া ধ্যানের জন্য প্রদত্ত হইত, রন্ধন ব্যতীত প্রায় সকলপ্রকার শ্রমসহিষ্ণু কর্ম ছাত্রদের পক্ষে আবশ্যিক। প্রাতঃস্নানের পর উপাসনান্তে বর্তমান গ্রন্থাগারের মধ্যের ঘরটিতে ছাত্রেরা বেদমন্ত্র গাহিত। অতঃপর ছাত্রেরা অধ্যাপকগণের পদধূলি লইয়া প্রণাম করিয়া বনচ্ছায়া তলে গিয়া পাঠ আরম্ভ করিত।" (রবীন্দ্র-জীবনী)

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ স্বীয় ধ্যানের বিদ্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার পূর্ণ দায়িত্ব নিশ্চিত নির্ভরতায় ব্রহ্মবান্ধবের উপর ন্যস্ত করিয়া এই বিরল প্রতিভাধর সন্ন্যাসীর কর্মদক্ষতার পূর্ণ মর্যাদা দান করিয়াছেন। সন্ন্যাসী-জীবনও নূতন এক গৌরবে উজ্জ্বল হইয়াছে।

জ্ঞান যেমন চর্চার দ্বারা গভীর এবং স্পষ্ট হয় তেমনি প্রতিভাধর পুরুষের চরিত্র আলোচনার দ্বারা আমাদের নিকট উহা উজ্জ্বলতর হয়। মহাপুরুষদের জীবন ও কর্ম দ্বারা সমাজ ও দেশ উন্নত হয়। আমরা মূঢ় জনেরা তাঁহাদের সঞ্চয়ের উপর নির্ভর করিয়া কালাতিপাত করি। অযোগ্যের অভ্যুদয় এবং স্বার্থবাদী লোভতন্ত্রের চক্রান্তের ফলে সমাজ ভুল পথে চালিত হইলে এই শান্ত নির্ভরতার ব্যাঘাত ঘটে। সমসাময়িক কালে কোনো মহাপুরুষ বর্তমান থাকিলে তাঁহার কর্মের মধ্য দিয়া পূর্ব-সূরীদের কর্মকৃতি নবরূপ ও নবশক্তি লাভ করে। কিন্তু কখনই কল্যাণপথ ত্যাগ করে না। ব্রহ্মবান্ধব বলিয়াছেন:

It matters not whether a man who wants to serve his country is illeterate or anything else. But he must possess one quality and that is a pure and holy life. He who comes forward to serve his country without it ends by doing more harm than good.

অর্দ্ধশতাব্দীর পরেও উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের এই উক্তির সারবত্তা আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছি।

শীতের বৃষ্টি

শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী

ভোরের মেঘ ছায়ায় কালো, আলোর দুটি চোখ
হারিয়ে গেছে অন্ধকারে ধূসর কুয়াশায়;

তীক্ষ্ণ হাওয়া তুষার হিম; কঠিন হতাশায়
জীবন খুঁজি। আকাশে নীল বুকের জমা শোক—
নিবিড় ব্যথা হেমন্তের অশ্রু হ'য়ে ঝরে।
অশ্রু ঝরে, মৃত্তিকার আঁধার ঢাকা মনে
অর্থহীন জীবন; ফুল শুকিয়ে যায় বনে
হঠাৎ চোখ উপচে ওঠে অকাল নির্ঝরে।

সকাল থেকে ছায়া, আলোর আকাশে নেই আশা
বাতাসে হিম শিশির, বুক ছাপিয়ে নামে ধারা;
বৃষ্টি—শীত ফুরিয়ে এসে বৃষ্টিতে তার সাড়া,
জীবন তবু স্বপ্ন দেখে, তবুত' প্রত্যাশা!
আঁধার, হিম, বাতাস, ম্লান বিষণ্ণ মেঘ ঝরে
বৃষ্টি, নীল বৃষ্টি—শীত—নিরুদ্ধ অন্তরে।

তিন সাগর

শ্রীব্রজমাধব ভট্টাচার্য

২১

এঁর পরেই এলাম National Gallery।

National Gallery, Trafalgar Square, W. C. 2—এই ঠিকানায় ১৮৩২ সনে কিছু ছিল না। রাজার আস্তাবল ছিল কবে কে জানে; জায়গাটার নাম ছিল King's Mews। Angerstein নামে এক ধনীর নিজের ছবির সখ ছিল। তাঁর সংগৃহীত আটত্রিশখানা ছবি কেনা হয় সাতান্ন হাজার পাউণ্ডে। আর তখন এই সৌধ নির্মাণ করে এতে রাখা হয়। দিনে দিনে এ সৌধের শ্রী ও সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্বের প্রসিদ্ধ চিত্রশালার অন্যতম। এর ভেতরে ছবি দেখতে দেখতে একটা দুপুর কাটান বেশ আনন্দের ব্যাপার। প্রসিদ্ধ ছবির মধ্যে মনে আছে হনথর্ষ্টের 'ক্রাইষ্ট বিফোর দ্য হাই প্রীষ্ট'; আলো আর অন্ধকারের এমন সুন্দর ছবি দেখি নি। মানুষ মাত্র একটি কারণ। আসল কাজ অন্ধকার আঁকা। শিল্পী অন্ধকার এঁকেছেন। করেগ্‌জিওর ভীনাস্‌-মার্কারি এণ্ড কিউপিড একেবারে র‍্যাফালাইট ছবি। এর কাজ দেখলে মনে পড়ে ইনগ্রেসের 'বে-এ-দর্‌'-এর চামড়ার সোনালিতা। রুবেসের বন্ধু, প্রখ্যাত চিত্র 'সারাগুার অব্‌ ব্রেডা'র শিল্পী, ভেলাৎ কোয়েৎ-এর আঁকা 'দ্য রকৃবি ভীনাস্‌' যত প্রখ্যাত তত ভাল লাগে নি, বিশেষ করে ইনগ্রেসের কাজ দেখার পর। তবু ছবিখানা ন্যাশনাল গ্যালারির সম্পদ। কার্ডিনাল রিশল্যুর পর্ট্রেট অনেক ক'খানাই আছে। প্রতিখানাই ভাল। চার্লস ফাষ্টের বিখ্যাত পর্ট্রেটখানাও এখানে। কিন্তু ন্যাশনাল গ্যালারির সম্পদ টার্ণারের ছবিগুলো। অনেক ক'খানা পর পর। কী অপূর্ব বিশালতা, কি ভাবময়তা, আকাশ-বাতাস, আলোছায়া, মেঘ-রৌদ্র, সীমা-অসীম—এ যেন শিল্পীর ছোঁয়ায়, হ্যাঁ ছোঁয়ায়—এত হাল্কা বোলান তুলির যে মনেই হয় না কোনোও জায়গায় পুরো রেখাপাতও ঘটেছে—ছোঁয়াই কেবল; তবু সেই ছোঁয়াতেই সব যেন গান গেয়ে উঠেছে।

বাইরে বেরিয়েছি। তখনও ঝিকমিক্‌ বেলা। ন্যাশনাল গ্যালারির বারান্দায় রোদ এসে পড়েছে। মুকুলের একটি ছবি নিলাম। বাইরে পেভমেন্টে নানা রং দিয়ে ছবি এঁকে বসে আছে পেভমেন্ট-পেন্টারের দল। মুকুল এ বস্তুর খোঁজ রাখত না। টুপীর মধ্যে পয়সা রাখা। আমরাও কিছু রেখে চলে আসি।

এই প্রসঙ্গে কথা ওঠে লণ্ডনে ভিখিরীর অবস্থা। আমাদের দেশ ত চিরদিনের ভিখিরীর দেশ। শিব-শঙ্কর-ভোলা ত "ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী" করে গানই জুড়ে দিলেন। আমাদের দেশের ভাগ্যবস্তুকে কৌপীন-বস্ত হতে হবে। ব্রাহ্মণদের ষট্‌কর্মের মধ্যে দুটি—"দান ও গ্রহণ"। ভিক্ষা থেকে ভিক্ষু সম্প্রদায়—বৌদ্ধ, জৈন—সবই ভিক্ষুকে, যতিকে বড় মান দেখিয়েছেন।

কিন্তু যে ভিক্ষা জীবিকা ছেড়ে উপজীবিকায় দাঁড়িয়ে ধনীর ধনকে উলঙ্গ করে দিল, ভারতে ব্রিটিশ সুশাসনকে যে ভিক্ষা বিদেশীর চোখে হাস্যাস্পদ করে দিল, সে ভিক্ষার ইতিহাস কে আর তলিয়ে দেখছে! সে ইতিহাসের পরিচয় কিছু কিছু ভলটেয়ার, রুশো, এঙ্গেলস্‌, মার্কস রেখে গেছেন। আমাদের দেশে সে ইতিহাস কিছু রেখে গেছেন রমেশ দত্ত তাঁর 'Economic History of British India'তে আর সেই নিরঙ্কুশ ধনতান্ত্রিকতার সদর কাছারি লণ্ডন। লণ্ডনে ভিখিরী নেই Poor House আছে। আর Poor House আছে বলেই একদিকে জেলও আছে, অন্যদিকে Trumps-ও আছে। শাফট্‌স বেরীর ষ্ট্যাচুর তলাতেই টুপী পেতে বুড়ো বেহালা বাজাচ্ছে। রাতের লণ্ডনে ঘুরে দেখেছি স্মিথ ফিল্‌ড, সাউথ ওয়াটার, স্টেপনীর গলির মধ্যে যাদের দেখেছি তাদের বিশেষ খাদ্য বা বাসস্থান আছে বলে মনে হয় না। লণ্ডনের খাতায় আনেমপ্লয়েডের সংখ্যা এক লক্ষের বেশী। ওরা যে একেবারে আনেমপ্লয়েড তা ওল্ড বেলীতে একটি দুপুর কাটাবার পর তত বোধ হয় না। আমি ইচ্ছে করে আলাপ করেছিলাম এক বুড়ো ফটো-গ্রাফারের সঙ্গে।

ঘটনাটা বলি।

খুব ভোর তখন। সবে সূর্য উঠছে। ওয়েষ্ট মিনষ্টর ব্রীজের একটা কোণে বসে বসে ভেসে-আসা পন্টসুগুলো দেখছি। চমৎকার একটি ক্লিভল্যাণ্ড ঘোড়া একটি গাড়ী ভরতি দুধের বোতল নিয়ে চলেছে। তার পায়ের নালের

বোলে ঠন্ ঠন্ করে বাজছে পথ। ওয়ার্ডস্বার্থের লাইন-গুলো ভাবছি। সামনে বিগ বেন। ওপারে লণ্ডন কাউন্টি হলের চুড়ায় রোদের ছোঁয়া লেগেছে। আর. এ. এফ-এর মেমোরিয়াল দেখা যাচ্ছে। ওয়াটার্লু ব্রীজের রেখাটা চোখে পড়ে। মন খুশী!

যে লোকটি টুপী ছুঁয়ে দাঁড়াল তার পোশাক মানে শত ছিন্ন সার্জের প্যান্টের ওপর চিত্র-বিচিত্র তালি, আর ব্রাউন টুইডের বেমানান কোট। একটা তৈলাক্ত টাই। রং বোঝা যায় না। কোটের বোতামের মতো অনেক-গুলো দাঁতই নেই। যে কটি আছে গোড়া ক্ষয়া আর তামাটে কালো। শনের মতো লম্বা চুল কিন্তু শনের মতো শাদা নয়, তামাটে। বয়সটা ষাটের এপারে কিছুতেই নয়। চোখের তলা আর পাতা এত ফোলা যে কুৎকুতে ভাবে চায়। কাঁধে ঝোলান একটি কাঠের ফ্রেমের গায়ে ছোট একটি কালো বাক্স ফিট করা। মাথার ক্যাপটা ছুঁয়ে কথা বলতে গেল। স্বর শুনে বুঝলাম অনেক মদের স্রোত বয়ে যাবার ফলে চোঙ্গাটা ঘষে গেছে। জিজ্ঞাসা করে, "ছবি তুলবে?"

আমার ক্যামেরা দেখিয়ে আমি বলি, এই যে দেখতে পাচ্ছ না!" বলে হাসি।

মনে মনে বলি—"চার্চিল নয়, এলিয়ট নয়—তোমাকেই ত চাইছিলাম। একটু এধার-ওধার হলেই তুমিই হয়ে যেতে ওয়েল্‌স্ বা কনরাদ্।" মন খুশী!

ওরা লণ্ডনের বাসিন্দে। ঐ ক্লিভল্যাণ্ড ঘোড়ার মতো ওর পায়ের নালের দাগে ক্ষত-বিক্ষত ওয়েষ্ট মিনষ্টার ব্রীজ। ঘাগী লড়িয়ে। বলে, "তোমার তোলা ছবি অনেক উঠবে, উঠেওছে ওতে। তোমার ছবি তুলবে কে? এক মিনিটে একেবারে তোমার হাতে তুলে দেব ছবি।"

পাহাড়গঞ্জের মোড়ে, পরেশনাথের মন্দিরে, চাঁদনী-চকে, জৈন মন্দিরের পাটরিতে কে না দেখেছে এই বুড়োর দোকানদারী? যারাই গেটওয়ে অব ইণ্ডিয়ার কাছে গেছে এ বুড়োর কাছিমী কামড় খেয়েছে।

ও মা! পুলের অপর ফুটপাথেও যে আরেক বুড়ো! —না, না—আরেক বুড়ো, আরেক বুড়ো—অনেক কটাই যে! এ কি! সবগুলোই বুড়ো কেন? লণ্ডনে কি ফটোগ্রাফীর লাইসেন্স বুড়ো ছাড়া কারুকে দেয় না নাকি?

"এক মিনিটে যা ওঠে দু' মিনিটে তা চলে যায় ভাই।"

"তুমি বুঝি ইণ্ডিয়ান?"

"হ্যাঁ, তবে আমেরিকার ইণ্ডিয়ান নই।"

"না, না—ইণ্ডিয়া; গ্যাণ্ডী, নেয়রু, বুড্ডা, বুড্ডা।"

হেসে বলি—"হ্যাঁ ভাই, বুদ্ধের দেশের ছাওল্ আমি। গাঁধী মহারাজের চেলা। নেহেরুর সঙ্গে প্যার করি।"

"আরে তোমার দেশ আমার ঢের জানা। এই দেখ না, কত ছবি তুলেছি, কত সার্টিফিকেট।"

দরকার ছিল না। তবে আওতাই না করলে আত্মার খবর পাব কি করে?

বিদেশে বসে নামগুলো পড়তে বেশ লাগে। একটা নাম মনে আছে—মেজর সেন। লিখছেন—"The man is for better than the photographer"—ঠিকানা লিখছেন India, now Bharat, আর তারিখটা দেখতে পেলাম না—ছিঁড়ে গেছে জায়গাটা। আর একজন, মনে আছে—"My photograph! I love my face so much the more!" ও যে নিজে বিশেষ লেখাপড়া জানে না বুঝলাম।

আমি ফিরিয়ে দিয়ে বললাম—"অনেক রাজা-মহারাজের ছবি নিয়েছ ত! সব এক মিনিটে? কতদিন এ কাজ করছ?"

"বেশীদিন নয়। বছর দশ-বারো হবে কি? যুদ্ধের পর থেকে।"

"তার আগে?"

"বেহালা বাজাতাম কনসার্টে।"

"ছেড়ে দিলে যে?"

পকেট থেকে বাঁ হাতটি তুলে দেখায়। সে হাত কব্জী থেকে কাটা।

আমি হঠাৎ চমকে গেলাম। এতটা আশঙ্কা করি নি।

"তোমার এই সার্টিফিকেটের খাতা দেখে ভাবছিলাম অনেকদিনের কারিগর তুমি।"

"এগুলো আমি পেয়েছি আর এক জনার কাছ থেকে। ক্যামেরাটাও তার। এক হাতে কাজ করি বলে ক্যামেরাটি একটি ফ্রেমে বাঁধিয়ে নিয়েছি।"

সার্টিফিকেটের মালিকও বদলে গেছে!

"যুদ্ধে গেছে হাত?"

পকেট থেকে একটি পাইপ নিয়ে ধরিয়ে বলে—"তা যদি যেত মশায়, পেনসন্ নিয়ে ঠাট্‌সে বসে থাকতাম! আপনার সঙ্গে এত তকরার করতে হ'ত না।"

আমি তাড়াতাড়ি বলি,—"না ভাই, আমি তোমায় কষ্ট দিতে চাই না। বিদেশী। পথে বন্ধু পেয়ে দুটো কথা বলতে চেয়েছি মাত্র। আমাদের দেশে হলে তোমাকে কাজ করতে হ'ত না।"

"কি করতাম ?"

"তোমার কাটা হাত। ঐ ত তোমার বসে খাবার সার্টিফিকেট। পথে দাঁড়ালেই লোকে দিত। আমাদের ন্যাশনাল পেনসন্ সাধারণের হাত দিয়ে আসে।"

"ওহে ছোকরা লজ্জা পাও কেন! ভিক্ষে বলছ ত! ও বরং ভাল। গ্যাণ্ডী-বুড়ার দেশ কিনা। সবই শাদা-মাটা। এদেশে ভিক্ষে নেই। সে বেআইনী।"

"কিন্তু পুয়োর হাউস ?"

"সে ত জেলের বাড়া। বাইরে থেকেই লোকেরা দেখতে গেলে ভারি গুছিয়ে দেখায়। আমি এই ফুট-পাথে মারা যাব। ওখানে যাব না।"

"কিন্তু কতই বা পাও।"

"আমার ফটোর দাম নেই জান? যে যা দেয়। ওটাকে আর ত ভিক্ষে বলে না।"

দু'জনেই হাসি। দু'জনেই বুঝি।

"কিন্তু ভিক্ষে বে-আইনী এ ত ভাল কথা। এতে তুমি রাগ করছ কেন? ভারতবর্ষে ভিক্ষে আছে বলে আমাদের কত লজ্জা করে। অবশ্য সারা এশিয়াতেই ভিক্ষে, এ যেন এশিয়ার একটি হক্কের রোজগার!"

"এশিয়া! লর্ডের জন্মস্থান! ওখানে সবই সত্য। হবেই ত। আমাদের ভিক্ষে বে-আইনী! যদি জানতে! যাক্—ফটো তুলবে ?"

"তোল।"

বলতে লাগল—"বে-আইনী। ভিক্ষে বে-আইনী। শোন ভোর পাঁচটায় কভেণ্ট গার্ডেন মার্কেটে বেচা-কেনা আরম্ভ হয়। রাত-ভোর গাড়ী আসে বোঝাই হয়ে। কেবল ফল, শব্জী আর নানা খাবার। মালগাড়ীগুলো যেখানে নামায় তার ফাঁকে ফাঁকে যদি রাত একটা থেকে তিনটের মধ্যে যেতে পার—পারবে না, পারবে না। শক্ত পুলিস পাহারা। সে পাহারা এড়াতে পারে ছোট ছোট বাচ্চারা। খিদে-পাওয়া ছেলে ঘুমের পাহারা এড়িয়ে যেমন মায়ের বুকে মুখ রাখে। ভিক্ষে দেখবে লণ্ডনে? বে-আইনী ভিক্ষে? এস আমার সঙ্গে সাউথ ওয়ার্কে নিয়ে যাব। যাবে?" হি হি করে ফোকলা দাঁতে হাসে। "ভিক্ষে—টাওয়ার হিলের চেয়েও পুরনো; থেমসের চেয়েও জীবন্ত।"

বেলা পড়ে আসে। শূই আপ্ হিলে যাব। মুকুলকে কিছু জিনিস দেব। সন্ধ্যের সময়ে ওকেও দু'এক জায়গায় এমনি কাজে যেতে হবে। সিন্‌হা আর মুকুলকে বিদায় দিয়ে এবার লণ্ডনে আবার একা হলাম।

আপিস-ফেরতা হেমরজনী এল। তখন সন্ধ্যা সাতটা। দিব্যি মজা করে দাল-রোটি এবং ঢেঁড়শের তরকারি খাওয়া গেল। তার পর বেরুলাম "পাড়া-বেড়াতে"—অর্থাৎ হেমরজনীকে বলেই রেখেছিলাম, "ইংরেজ-পাড়ায় ইংরেজ-জীবন দেখব গো। লণ্ডন আমার দেখা। কিন্তু বিলেত দেশটি যে মাটির এ প্রত্যয়টা আমায় সংগ্রহ করতেই হবে।"

"কেন? অন্য কিছু মনে হয় নাকি তোমার ?"

"দেশে গিয়ে বাবুরা এমন সব তাপ্পা ছাড়েন যে মনে হয় না আছে এদেশে ল' কোর্ট, না ওল্ড বেইলি, না পকেটমার, না মিথ্যেবাদী।"

"তাই নাকি? তবে এত বড় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গড়ল কারা ?"

সে কি হেমরজনী? চোর-ছ্যাচড়ে গড়েছে ব্রিটিশ রাজত্ব?

"নয় ত কি? মে ফ্লাওয়ারের যাত্রীরা, এলিজাবেথান্ বম্বেটেরা, চার্লস্ ফার্ষ্টের এয়ার দোস্তরা, তাবৎ ইংলণ্ডের নির্বাসিত গুণ্ডার দল—সবাই ত জড়ো হ'লই দিকে দিকে, তার পর পাদ্রী-সনাথ মিষ্টার ব্লিস্‌রা বাণিজ্য করতে এসে ব্ল্যাক-বার্ডেন কাঁধে নেবার সুকার্যে লেগে গেলেন। ওদের সাম্রাজ্য ত পাউণ্ডের সাম্রাজ্য।"

"কিন্তু যাঁদের ভাষা দেশে শুনে আমরা অভ্যস্ত, তাঁদের ভাষায় মনে হয় যেন সুয়েজ পেরুবার পরই ওঁদের নানা বদাচরণে পেয়ে বসে। বোধ হয় গরমে মাথা খারাপ হয়ে যায় তাই। না হইলে সুয়েজের এপারে ওঁরা নোক্কীটি—ভাজা মাছ ওলটাতে জানেন না। অমন civics—টনটনে ফিটিং মানুষ আর হয় না।"

মধুমতী বাধা দিয়ে বলে—"কিন্তু বাজার হাটে যাই, দেখি ত, দরকারও আছে, বিদেশী বলে ঠগাবার চেষ্টাও আছে। সব্জী-বাজারের ঝামেলাও আছে। নেহাৎ ঠেকার করে ভিড়ে না গেলে ঠগ্‌তে হয়। অনেক ভারতীয় গিন্নীদের ঠগতেও দেখেছি।"

হেমরজনী চিমটি কেটে বলে,—"কেবল উনি ঠগেন না।"

"কে বলল ঠগি না। এক জায়গায় ত বেশ ঠগে গেছি।"

হেমরজনী বলে, "সে ত দেশে। এদেশে নয়।"

"এদেশে ঠগার চেষ্টায় আছি। ভাল ঠগ পাচ্ছি না।"

"তবেই ত ওদেশের ঠগই সেরা।"

হাসি আমরা।

"এই ব্যাপারে বটে, এবং আমার ব্যাপারে বটে। অন্য ব্যাপারে এরা বাপু স্রেফ মানুষ এবং বনিয়া।"

২২

পর দিন সকাল। মুকুল চলে গেছে।

লণ্ডন দেখতে হবে। প্রথমেই মনে হয় পার্লামেণ্ট হাউস দেখি। তখন বেলা পৌনে আটটা হবে। ভাবছি যদি আজও একটা ফোটোগ্রাফার পেয়ে যাই। প্রথমেই অলড্-উইচ যাই। পথঘাট বেশ জানাশোনা হয়ে গেছে। সমারসেট হাউসের তলায় এসে দাঁড়িয়েছি। ষ্ট্রাণ্ড থেকে নিয়ে থেমস্ পর্যন্ত বিশাল বাড়ীখানা দেখলে কলকাতার ষ্ট্রাণ্ড আর ক্লাইব ষ্ট্রীটের মোড়ের অনেক বাড়ী মনে পড়ে যায়। কিন্তু জানি না তো সে সব বাড়ীর ইতিহাস। জানি ডুাক অব সমারসেট ছিলেন ষষ্ঠ এডোয়ার্ডের মামা। তখনকার জমিদারদের বঞ্চিত করে গরীবদের জন্য সুবিধা করে দেবার ফলে ষড়যন্ত্রে পড়ে গর্দান দিতে হয়। বড় সাধ ছিল সেই ফার্ষ্ট ডুাক অব সমারসেটের যে ইংরেজরা বেনে আর দোকানদারের জাত থেকে একটু ভদ্র জাত হোক। ভদ্রলোকেরা লেখাপড়া শিখুক আর অশিক্ষিতরা ভদ্রতা শিখুক। সেই সমারসেট হাউস এখন রেভিন্যু আর রেজিষ্ট্রীর বিরাট আফিস। সমারসেটের গর্দান যাবার পর তার প্রাসাদ রাজার সম্পত্তি হয়ে যায়। এনী রাজা প্রথম জেম্সের রাণী। জাতে ডেন্—ওলোন্দাজ। জেম্স ঐ প্রাসাদের নামকরণ করেন "ডেনমার্ক হাউস্"। কিন্তু পরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে সে প্রাসাদ ধূলিসাৎ করে এই সরকারী দপ্তরখানা তৈরী হয় ১৭৭৬-এ। এখন সেই প্রাসাদে কেবল সম্পত্তির রেজিষ্ট্রী আর ট্যাক্স আদায়ের শুঁড় নড়বড় করছে।

সমারসেট হাউসের দিকটি অর্থাৎ পথের ডান দিক ধরে চলেছি, বহুকালের শোনা 'টেম্পলস্' দেখতে যাই। দেখব আর কি! রোম ত নয়, যে মরা শহর! এ জীবন্ত শহর। মরা ভাষার ব্যাকরণ মুখস্থ করে ভাষার জাল ছড়ান চলে। নতুন ভাষার ব্যাকরণ রোজ বদলাচ্ছে। তা মুখস্থ করা চলে না। জীবন্ত শহরের প্রাসাদ দেখা যায় না, জীবন্ত দেহের নাড়ীভুঁড়ি নিয়ে নাড়া যায় না। তবু টেম্পলবার মনকে নাড়িয়ে দিয়ে যায়। মাইকেল, স্তর সুরেন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, চিত্তরঞ্জন এখানে তাঁদের ছাত্র-জীবন কাটিয়েছেন। ১৮৭৮ পর্য্যন্ত অপরাধীর ছিন্নমুণ্ড Temple Bar গেটে টাঙ্গিয়ে জনসাধারণকে সু-শিক্ষা দেওয়া হ'ত। তাই এর অপর নাম ছিল "সিটি গল্-গোথা"। চান্সেরী লেন আর ফ্লীট ষ্ট্রীটের মোড়ে এই গেটটি ছিল। এখন সেই মুণ্ড-পূত গেটটি চেষ্ট-নাট্-এর থিওবোল্ড পার্কে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

আসলে টেম্পল্ নাম এসেছে নাইট্ টেম্পলারদের চার্চ ছিল তাই, তারও আগে ছিল রোম্যান্ মন্দির। সেই মন্দিরের কাঠাম আজও আছে। চার্চ গত যুদ্ধে ধ্বংস হয়। এখন মেরামৎ হচ্ছে। আমি কেবল সুন্দর বাগানটাই দেখতে পেলাম। বাকী সব তারা বাঁধা। কাছেই পথের ওপারেই প্রায় রয়্যাল কোর্টস্ অব জাষ্টিস্। এখানেই ষ্ট্রাণ্ড শেষ আর বিখ্যাত ফ্লীট ষ্ট্রীট আরম্ভ। এখানেই ইংলণ্ড সাংবাদিকতার সহস্রার। ফ্লীট ষ্ট্রীটের জার্নালিষ্টের কাছে মাথা নীচু করবে না এমন না আছে রাজা, না প্রেসিডেণ্ট, না মন্ত্রী, না জজ, না চোর, না বাণিয়া। একালের স্বর্গ-নরক রচনা করার শ্রীক্ষেত্র। "চেশাযার চীজ" ওয়াইন্ অফিস কোর্টের একটি চায়ের দোকান। ডক্টর জনসনের আড্ডা দেবার জায়গা। এক-বার না দেখে পারি নি, সেকালের বিখ্যাত সেই বসন্ত কেবিন আজও আছে। মনে পড়ে যায়, বসওয়েল্ গোল্ড-স্মিথ—গ্যারিক আর রেমব্রাণ্ট।

লাড গেট হিল্ পার হবার আগেই সেণ্ট পল দেখতে পেয়েছি। সেণ্ট পলের সবটাই জানা এইন্টস ওয়ার্থের "টাওয়ার অব লণ্ডন" এবং "ওল্ড সেণ্ট পল্স্"য়ের প্রসাদে—যেমন নতার্দেম-এর গীর্জা জানা ভিক্তর হ্যুগোর হাঞ্চ-ব্যাকের প্রসাদে। তবু সেণ্ট পল্, সেণ্ট পল্। গত যুদ্ধে এর চার পাশে বোমা পড়েছে; গ্রেশাম ষ্ট্রীট টিপ সাইড, ক্যাননৃ ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীট, থেকে নিয়ে লম্বার্ড ষ্ট্রীট ঘুরো ব্যাঙ্ক অঞ্চল বোমায় একেবারে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে। তবু অদম্য উৎসাহে আবার গড়া চলছে। লণ্ডন আবার নতুন কলেবরে আগামী যুদ্ধের জন্ত বাগমারী তৈরি করছে। কেবল মানুষগুলো জানছে না কি তৈরি করছে।

সেণ্ট পলের দক্ষিণটি পুরো চার্চ ইয়ার্ড। ইংলণ্ডে সেণ্ট অগষ্টিন খ্রীষ্টধর্ম আনেন ৫৯৭-তে; তখনই ক্যাণ্টার-বারির গির্জার প্রতিষ্ঠা হয়। আর ৬১০ খ্রীষ্টাব্দেই বর্তমান সেণ্ট পল গির্জার পত্তন হয়। তার পর, পর পর দু'শো বছরে বিখ্যাত গির্জা সেণ্ট পল গড়ে ওঠে। সে গির্জা আজ আর নেই। ১৬৬৬-র আগুনে জ্বলে যাবার পর স্তর ক্রিষ্টফর্ রেন রচনা করেন তাঁর জীবনের বৃহত্তম, সুন্দরতম কীর্তি। আমায় যদি কেউ বলে লণ্ডনের সবচেয়ে সুন্দর সৌধ কোন্‌টি, বলব, "সেণ্ট পল", যদি বলে কোন্ দুটি বলব, "সেণ্ট পল" আর "পার্লামেণ্ট হাউস্"। আঁদরেল শেল্-ম্যাক্স বিল্ডিংকে ভাল বলবে ২৪৫৭-র কোনো পর্যটক। তখন এর বিচার চলবে।

১৬৭৩ থেকে ১৭১০ পর্যন্ত সতের বছরে রেন এই অদ্ভুত সৌধ নির্মাণ করেন। এর চূড়ার উচ্চতা ৩৬৫ ফুট, এর

বেড় ১৫ ফুট; মাথায় সোনার ক্রস্। পশ্চিম দিক থেকে প্রবেশপথ। চওড়া চওড়া সিঁড়ি—ধাপের পর ধাপ উঠে গেছে। নদীর দিকের টাওয়ারে সতের টনী ঘণ্টা বিগ পল্। সমগ্র ক্যাথিড্রাল ৫১৫ ফুট লম্বা। বোমায় এর গর্ভগৃহ বিধ্বস্ত হয়েছিল। প্রায় মেরামত শেষ। লর্ড নেলসন আর লর্ড ওয়েলিং গটনের স্মারক এখানেই আছে। জেনারেল গর্ডন, আমার প্রিয় শিল্পী টার্ণার—এখানে সমাহিত। আর সমাহিত এই সৌধের শিল্পী—স্যর ক্রিষ্টফর্ রেন। তাঁর সমাধির গায়ে লেখা—"মানুষটাকে দেখতে চাও ত চারদিকে চেয়ে দেখো।" চমৎকার কথাটি।

সেণ্ট পল্সের পূর্বে সত্যিকার লণ্ডন; লণ্ডনের নাড়ী। স্যাক্সন্ কথা cepa মানে merchant, cepian মানে to buy আর ceap mann মানে trades man। cheapside সেই স্যাক্সন আমলের বাজার, বাণিজ্য-কেন্দ্র। আজ লোকে ভাবে সস্তায় মাল কেনার জায়গা। চীপসাইড থেকে আপার থেমস্ লোয়ার থেমস্ ষ্ট্রীট পর্যন্ত জায়গাতেই সেই রোম্যান আমলের "পুল"—। এখানেই জলের ধারে মাছওয়ালাদের বাস ছিল। বেড়া দেওয়া কাঠ-কাটরার গাঁ ছিল। ল্যাম্বেথ ফিশ মার্কেট আজও সে পরিচয় বহন করে। তখনই রোম্যানরা এইখানে ব্রিজ তৈরি করে থেমসের এপার ওপার। সে ছিল ওল্ড লণ্ডন ব্রীজ। তার ছিল উনিশটা খিলান। খিলানের দুধারে দোতালা বাড়ী, দোকান, মোটা মোটা সিংহদরজা ছিল। সে সব দরজার সঙ্গে গাঁথা থাকত বিশ্বাসঘাতকদের ছিন্নমুণ্ড। সে ব্রীজের আজ চিহ্নও নেই। ১৭৩৭-এ সেটা ভেঙে ফেলা হয়। ১৮৩৭-এ বর্তমান ব্রীজ গড়া হয়। কিন্তু অল্পদিন হ'ল চওড়া করা হয়েছে ব্রীজটা। তাই দু' পাশের রেলিংগুলো বেশ নতুন নতুন লাগে। এই লণ্ডনই লণ্ডন। এর পথে পথে ঘুরতেই ভাল লাগে। কি দেখব স্পে ফেয়ারে, গ্রস্ভিনর স্কয়ারে, হাইড পার্ক কর্ণারে? এই লণ্ডনের পথই ইংরেজের মান, মর্যাদা, মাটি; এই লণ্ডনের পথই শেক্সপীয়ার, স্যর ফিলিপ সিডনী, ওয়াল্টার রালে, স্পেন্সর মিল্টনের লণ্ডন। এই লণ্ডনের পথ দিয়ে এলিজাবেথ ঘোড়ায় চড়ে বেড়িয়েছেন, চার্লস-প্রথমকে গাড়ী হাঁকাতে দেখা গেছে, ক্রমওয়েলের আয়রণ সাইডস্ বুক ফুলিয়ে বেড়িয়েছে। এরই একধারে ব্যাঙ্ক তল্লাটের বিষম ব্যস্ততা, অন্যদিকে লণ্ডন ওয়ালের স্তব্ধতা, অন্যদিকে ক্যানন ষ্ট্রীট ষ্টেশনের ভিড়।

প্রায় আড়াই মাইল পথ হেঁটেছি। তবু মন ভরে নি। আজ কোনো বন্ধু জোটাতে পারা যায় নি। কাষ্টমস্ হাউসের কাছে একটা জেটী। জেটীর মুখে ঠেলাগাড়ীতে একটা লোক ফল বেচছে। গিয়ে কিছু ফল কিনলাম। একটা কলা নিল আট পেনী। আপেল ওজন করল, আঙুরও।

সুবিধে হচ্ছে না। গল্প করার মৌকা পাচ্ছি না। তলায় একটা খালের ধারে বুড়ী বসে আঙুরের পেটি থেকে আঙুর বাছছে, বড়োবাজারে এ দৃশ্য অনেকবার দেখেছি, দিল্লীতে ত যেখানে-সেখানে।

দেখছি দেখে বুড়ী হাসে।

আমিও হাসি।

"রোজ ত তোমায় দেখি না।" আন্দাজে এক ঢিল মারলাম। যদি রোজ আসেও, আমি যে দেখব এমন কি কথা? কাজেই কথাটা আরম্ভ হিসেবে ভাল।

"রোজ ত আসি না, ব্লাক ফ্রায়ার্স ব্রিজের দোকানে থাকি।"

"ও হ্যাঁ, তাই চেনা চেনা মনে হচ্ছে।"

"কেন, ব্লাক ফ্রায়ার্সে যাও নাকি?"

"বাঃ, কতদিন ফল কিনেছি।"

"ভাল দেখতে পাই না।"

"তা ছাড়া, তোমার কত খদ্দের। মুখ কি মনে থাকে?"

"তুমি ত লণ্ডনে থাক না।"

হাসি, "কি করে বুঝলে?" একটা সিগারেট এগিয়ে দিই।

ও হাত বাড়িয়ে সিগারেট নেয়।

"থ্যাঙ্কস্।"

দেশলাই জ্বালিয়ে মুখের কাছে ধরি।

একমুখ ধোঁয়া। "থ্যাঙ্কস্"।

"তোমার ইংরেজী বাপু লণ্ডনের নয়।"

"আমি লণ্ডনের ইংরিজী ভালবাসি না।"

"তবে লণ্ডনকেও ভালবাসবে না।"

"তোমায় ভালবাসি কি করে তবে?"

"ওস্তাদ বটে!" খিলখিলিয়ে হাসতে থাকে বুড়ী।

অন্য একটা বুড়ী এসে জুটেছে। "কি হ'ল। হাসিস্ কেন?"

কিছু বলার আগেই আবার একটা সিগারেট বার করি।

"থ্যাঙ্কস।" একবার ভাল করে চেয়ে দেখে। ওর দৃষ্টি একটুও ভাল লাগে না। যেন মাদাম্ ডুফার্জ চাইছে।

"বলছে, শোন্ না। আমায় ও ভালবাসে।"

ভ্রূ কুঁচকে দ্বিতীয়া বলে—"ইণ্ডিয়ান্?"

যেন সবে নরক থেকে উঠে এসে ওদের ঘাড়ে চাপার উপক্রম করেছি।

"হ্যাঁ, আমায় জিজ্ঞাসা করছে লণ্ডনে কতদিন আছি? অনেক দিন আছি বিশ্বাসই করছে না। বলছে, ভাষায় গোল আছে।"

"কি পড়তে এসেছ—মেডেসিন্ না ল'?"

নাঃ, এ বুড়ীটা ত জ্বালালে দেখছি! আমার এত চেষ্টা, আশা—সব বৃথা।

"না, পড়তে আসি নি, ব্যবসা করতে এসেছিলাম। ডেনমান্ ষ্ট্রীটে আমার ভারতীয় খানার রেস্তরাঁ ছিল।

"ডেনমান্ ষ্ট্রীট? শাফটবারিতে?"

"হ্যাঁ।"

"ছিল বলছ যে।"

"বিক্রি করে দিয়েছি।"

"কেন?"

"আমি সাউথ আমেরিকা যাচ্ছি।"

"প্রসপেক্‌টিং?"

"হ্যাঁ, ডায়মণ্ড।"

"তবে আর কি! হাঁকড়াবে।"

"তলাতেও পারি।"

"জীবন ত জুয়া।"

"লণ্ডনকে ভুলে যাবে?"

"ভোলা যায়?"

প্রথম বুড়ী চেঁচিয়ে ওঠে—"যায়, যায়—খুব ভোলা যায়। এই জীবনেই লণ্ডনকে দু-দু'বার ভেঙে পড়তে দেখলাম। কত রাজা রাণী বদল দেখলাম। কত বার কত ইলেকশানে গিয়ে ভোট দিলাম। কিন্তু সারা জীবনে ত একটি দিন শান্তি নিয়ে বাস করলাম না। দেখ না, খাটছি, খেটেছি, খেটেও যাব। ও আমার মেয়ের ছেলে। মেয়ে গেছে ওর জন্মের পরেই। জামাই জাহাজে ডুবে মরেছে। ছেলে কেবল জেলেতেই রইল। স্বামী আফ্রিকায় গেল, আর এল না। যখন বিয়ের বয়স ছিল তখন কেউ বিয়ে করল না, যুদ্ধের পর করব। আর দুটো যুদ্ধের মধ্যে ব্যবসার এমন দশা হ'ল যে, বিয়ে কি, খাবার জোটে না। শান্তি চাই, শান্তি চাই! কেবল মরে গেলেই শান্তি হবে, তার আগে হবে না?—যাও যাও—ঐ সব দেশে যাও। ওরা কাপড় পরে না, খেতে পায়, শান্তিতে আছে।"

দ্বিতীয়া হাসতে থাকে। "তোর স্বামীর অভাব কবে হ'ল?"

বুড়ী বলে, "চিরকাল। পুরুষ নিয়ে থাকা আর বিয়ে করা এক নয়। তোর মতো ভাগ্যবতী কে?"

আমি কথার মোড় ফেরাবার জন্য উস্কে দিই—"এবার শান্তি হবে। ওয়েলফেয়ার ষ্টেট হয়েছে।"

"বল না, বল না। ওরা শুনতেই লেবার আর টোরি। আসলে পরে একই কোট। বীভান্, গ্যাট্‌সকেল—এ দুটোই মানুষ। তবে এরা যদি ক্ষমতা পায় তবে ত?"

"পাবে, তোমরা না দিলে পাবে কেন?"

"আমরা? আমরা চিরদিনই লেবারকে দিয়েছি, দেব। ওরা ন্যাশানালাইজ করার ব্যাপারটা যদি অত জোর না লাগাত—এবার দেখবে। সুয়েজ গেল, আলজিরিয়া নিয়ে লেগেছে, আর এই হাউড্রজেন বোমার কাণ্ড চলেছে, এবার দেখ না কি হয়। লণ্ডনে একটি টোরি ভোট পাবে না।

[পরে লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিলে লেবার জয়ের খবর পেয়েছিলাম]

"যাক, তোমরা ভোটাভুটি কর। আমার আর তোমার হাতের আপেল খাওয়া হবে না। চললাম।"

"বোন্‌ভয়াজ"—আমি সোজা একটা বাসষ্ট্যাণ্ডে এসে বাসে চড়লাম। ক্রমশঃ

স্লিপিং পিল

শ্রীমণি গঙ্গোপাধ্যায়

রাতে ভাল ঘুম হয় না। ভোর হলেও ক্লান্তি থেকে যায়। আকাশে আলো যখন ফুটি ফুটি তখন কেমন একটা আবেশের আমেজ আসে। ফলে আবার ঘুমিয়ে পড়ে প্রদ্যোত। এমনি করে প্রদ্যোতের ভাগ্যে প্রত্যুষ দেখা অনেকদিন শেষ হয়ে গেছে।

অনেকদিন বলতে অবশ্য গত কয়েকটা বছর। সারা-দিন পরিশ্রমের পর বিছনায় পড়েই ঘুমিয়ে পড়া—এই সেদিনও তার জীবনের একটা অঙ্গ এবং অন্যতম নিশ্চিন্ত আরামের আশ্রয় ছিল। সুস্থ দেহে, খুশী মনে, ভোরের আকাশে আলপনা পড়ার সেই সব বিগত দিনের ছবি আজও মাঝে মাঝে তার স্মৃতির প্রান্ত ছুঁয়ে যায়। এই ত সেদিন, মাত্র সেদিন ছেদ পড়ল জীবনযাত্রার এমন একটা বাঁধাধরা ছন্দে। ঠিক বিয়ের পরই জীবনের অনেক অভ্যাসের মতোই এটাও পাল্টে গেল।

সেদিন রোমান্সের রোমাঞ্চ হয়ত ছিল কিন্তু তার চেয়ে বেশী ছিল বোকা বনে যাবার ভয়। ঠিক দশ আনা ছ'আনার ভাগাভাগিতে মোটা আর মিহির পাশাপাশি থাকার মতো। সহধর্মিণী পাশে এলে সহাবস্থানের নীতি মেনে চলতেই হয়। আর সেই চলতে গিয়ে অনেক নিদ্রাহীন আঁধার রাতকে আকাশ পার হয়ে চলে যেতে দিতে হয়েছিল। জেগে থাকতে যে সব সময় ভাল লাগত তা নয়। কিন্তু ভাল লাগছে এ কথা বার বার পার্শ্ববর্তিনীকে বলতে হ'ত। মুখে কথা বললে যে চোখে ঘুমের বালাই থাকে না, এর পর এ কথা বলাই অবান্তর।

অভ্যাসটা অবশ্য পাকাপাকি হ'ল সংসার ফলে-মূলে সমৃদ্ধ হবার পর। নিদ্রাহীনতা তখন রোমান্সের পর্যায় ছাড়িয়ে রোগে পরিণত হয়েছে। চপল যৌবন যে চঞ্চল চিন্তাকে পথ ছেড়ে দিয়ে কখন চলে গেছে তা জানাই যায় নি। চিন্তা, একটার পর একটা চিন্তা। আয় আর ব্যয়ের মধ্যে একটা বড় ফাঁক পড়ছে প্রতি মাসে, অথচ অর্থনীতির এই ফাঁকিটা যে কোথায় তা ধরা যাচ্ছে না। প্রায়ই ধার করতে হচ্ছে, ফলে যারা ধার দিচ্ছে তারা দ্বিতীয়বার আর ধারেকাছে আসছে না। বউ-ছেলের মন রাখতে গিয়ে বন্ধুবিচ্ছেদ হচ্ছে, আপিসে, বাড়ীতে কোথাও আর মান থাকছে না। ছেলেগুলো মানুষ হবার সম্ভাবনা থাকলেও বা সান্ত্বনা ছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে পাড়ার রকে একবার আড্ডা গাড়লে আর পড়ায় মন বসে না। বড় থেকে ছোট সকলেরই ঝোঁক ঐ রকের দিকে।

প্রতিদিন রকের চিন্তা করতে গিয়ে রাত গড়িয়ে যায়। সমস্যার সমাধান হয় না। সমস্যা বরঞ্চ বেড়েই যায়। বেলায় ঘুম থেকে উঠে ঠিক সময়ে আপিসে যাবার সমস্যা।

সেদিনও যথানিয়মে আপিসে যেতে দেরী হ'ল প্রদ্যোতের। খুব নীচের তলার কর্মচারী হলে এমন একটা নিয়মিত অভ্যাস, নীতিবিরুদ্ধ হলেও, অন্যায় বলে বিবেককে ব্যস্ত করবার কারণ থাকত না। অন্যান্যের মত একবার মাথা নেড়ে বললেই চলত—যা মাইনে মেলে তাতে মাসের সব ক'টা দিন যে হুজুরে হাজির থাকছি, এই যথেষ্ট! কিন্তু মাঝের তলার লোকেদের পক্ষে ব্যাপারটা একটু আলাদা। নিম্নমধ্য বেতন মেলে তাই নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে একটু সচেতন থাকতে হয়। 'আপনি আচরি ধর্মে'র পালা গাইতে গেলে রোজ 'লেট' হওয়া চলে না। কিন্তু প্রদ্যোত হয়।

আর হয় বলেই আপিসের প্রথম প্রহরে তার প্রত্যহই চলে বিরক্তির বাজনা বাজিয়ে নানা ঝামেলার পালা।

সেদিনও নিয়মের ব্যতিক্রম হ'ল না। মাঝে কিন্তু বাদ সাধল পাশের টেলিফোনটা। প্রদ্যোত ভ্রূ কুঁচকে রিসিভার তুলে নিল—এখুনি কোনো সাহেবের সদম্ভ হুমকি শুনতে হবে না কি! দু'চারটে কথা বলে, রিসিভার রেখে, একটু নড়েচড়ে বসল। ধীরে ধীরে সারা মুখে তার ছড়িয়ে পড়ল হাল্কা হাসির আলো।

খবরটা পেয়ে খুশী হ'ল প্রদ্যোত। ছোট ভাই শশাঙ্কের পদোন্নতির খবর। দু'ভাই তারা, চাকরি করে একই বিভাগের দুই বিভিন্ন দপ্তরে। এতদিন দু'জনের পদমর্যাদাও সমান সমান ছিল। এখন, এইমাত্র খবরটা পাবার পর একটু পরিবর্তন হ'ল। শশাঙ্কর মান শুধু বাড়ল না, মাইনেটাও হ'ল মোটা রকমের। ভালই হ'ল। সংসারের আর্থিক সমস্যাগুলোর কিছু সুরাহা হবে···। ভাবতে গিয়ে সামলে নিল প্রদ্যোত। সুসংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এমন স্বার্থপরের মতো চিন্তাকে প্রশ্রয়

দেওয়া চলে না। তবু সব মিলিয়ে সত্যিই খুশী হ'ল সে। বার বার মনে মনে বলল—ভালই হ'ল, খুব ভাল হ'ল।

বাড়িতেও সেদিন খুশীর হৈ-হুল্লোড়। একান্নবর্তী মধ্যবিত্ত পরিবারে এমন একটা সংবাদে আনন্দের ঢেউ উথলে উঠবে বৈকি! ছেলেবুড়ো সকলের মুখেই হাসির ছটা আর তার সঙ্গে উপরি লাভ মিষ্টির ছড়াছড়ি। এক প্লেট মিষ্টি সামনে নিয়ে বসে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল প্রদ্যোত। হঠাৎ কেন কে জানে মনে হ'ল—মিষ্টিমুখের এই সুন্দর প্রথাটা এখনও মরি মরি করে বেঁচে আছে। তাদের সংসারে মা যতদিন আছেন ততদিন ঠিকই থাকবে। তার পর···

চমক ভাঙল সুমিতার কথায়। ঠাকুরপোর সাফল্যে সুমিতার মনের আনন্দ মুখে উপচে পড়ছিল। কেমন যেন নতুন মনে হ'ল অনেক দিনের চেনা সুমিতাকে।

—আচ্ছা, কত মাইনে বাড়ল ঠাকুরপোর? বাইরেটা উঁকি মেরে একবার দেখে নিয়ে হাসতে হাসতেই প্রশ্ন করল সুমিতা।

—তা শ' দুয়েকের মতো হবে।

—অ্যাঁ, বল কি গো! একলাফে একেবারে দুশো টাকা!

মুখে কিছু না বলে হাসতে হাসতে মাথাটা নাড়ল প্রদ্যোত। অর্থাৎ তাই ত মনে হচ্ছে!

—বাঁচা গেল বাবা; মাসের শেষে আর মাথায় হাত দিয়ে বসতে হবে না!

—মাথায় হাত দিয়ে তুমি আবার কবে বসতে? সে ত বরঞ্চ আমি···

—তা সে যাই হোক—এবার তবু মন খুলে মাসে দুটোর জায়গায় চারটে সিনেমা দেখা যাবে।

—তা যাবে।···বলে বউকে কাছে টেনে নিল প্রদ্যোত।

—ছাড়, ছাড়। কি যে কর তার ঠিক নেই! ঠাকুরপোর বন্ধুরা সব বসে আছে, তাদের খাবার দিতে হবে···

হাসতে হাসতে হাতটা ছাড়িয়ে নিল সুমিতা। তার পর কাপ, প্লেট, গ্লাস গুছিয়ে তুলে নিয়ে স্বামীর পানে চেয়ে বলল—আজ তোমার প্রমোশন হলে কিন্তু আরও ভাল হ'ত, আমার আরও বেশী আনন্দ হ'ত।···

—শোনো, শোনো···। বলতে বলতে খাটের পাশে একটু ঝুঁকে স্ত্রীর আঁচলটা ধরতে গেল প্রদ্যোত। পারল না; সুমিতা ততক্ষণে ঘরের দরজা ছাড়িয়ে সিঁড়ির পথে পা বাড়িয়েছে। স্মিথমুখে বিছানায় এলিয়ে পড়ল সে। সব কিছুই বেশ ভাল লাগছিল তার। সংসারের আকাশে জমাট মেঘের ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে চমকে ওঠে এমনি আশার আলোর ঝলকানি, মনে হয় আড়ালের সূর্য অবারিত হতে বুঝি আর দেরী নেই। আর এই সব মুহূর্তে জীবনটা এক অপূর্ব উষ্ণতায় ভরে ওঠে।

কিন্তু মেঘের আড়ালে সূর্যই ত শুধু মুখ লুকিয়ে থাকে না, স্তব্ধ প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করে অগ্নিগর্ভ বিদ্যুৎ! সেই বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে উঠল পরের দিন সকালে, চমকে উঠল সুমিতার চোখে।

আপিস যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল প্রদ্যোত। খাটের গায়ে রুমালটা নেই দেখে এধার-ওধার চোখ ফেরাল। অমন প্রায়ই হয়। ছেলেদের পকেটে ঢুকলে দু'চারদিন খোঁজ থাকে না। তার পর আবার যথাস্থানে ফিরে আসে।

—রুমালটা কোথায় গেল বল ত? বাধ্য হয়ে সুমিতাকে জিগ্যেস করল প্রদ্যোত।

—একটু আগে ত দেখলাম রয়েছে। কেউ আবার নিয়ে গেল বোধ হয়। একটু কেমন যেন নির্বিকার ভাব সুমিতার।

—তা আমাকেও ত একটা নিয়ে যেতে হবে। আলমারি থেকে একটা বার করেই দাও না হয়।

—আলমারিতে আর নেই। সেই কবে পুজোর সময় চারটে রুমাল কিনেছিলে। কেচে কেচে আর কতদিন চলবে?

—কি বিপদ! দেখছ বেলা হয়ে গেছে, আর এখন কি না বক্তৃতা শুরু করলে! আছে কি নেই সেইটেই বল না!

···আমি 'কথা বলতে গেলেই ত বক্তৃতা। কেন, আর খান চারেক রুমাল কিনলেই বুঝি রাতারাতি গরীব হয়ে যাবে?

হঠাৎ সুমিতার গলাটা কেমন কর্কশ শোনাল। প্রদ্যোত অবশ্য কানে নিল না, হাল্কা হেসে বলল···গরীব-বড় লোকের কথা আবার আসছে কেন? তুমি যখন বলছ, আজই কিনে আনব।

—হ্যাঁ, আমি বললেই তুমি আনবে! আমার সব কথাটাই তুমি শুনছ, শুধু বাকি এই রুমালটুকু কেনা।

—কোন্ কথাটা আবার শুনছি না? বিস্মিত প্রদ্যোত প্রশ্ন না করে পারল না। সুমিতার এই আকস্মিক ধৈর্যচ্যুতির হদিস পাচ্ছিল না সে, বুঝতে

পারছিল না এই ক্রমবর্দ্ধমান বিষোদ্গারণের উৎস কোথায়।

—শুনলে আর এই হাল হ'ত না আমার। বিশ বছর হতে চলল বিয়ে হয়েছে, কিন্তু অভাব আর গেল না। আমার আর কি বল! ঝিয়ের মতো সকাল-সন্ধ্যে খাটছি আর তার বদলে দু'বেলা দুমুঠো ভাত দিচ্ছ। এই ত!

—আপিস যাবার সময় কি আরম্ভ করলে বল ত? কি হয়েছে তাই খুলেই বল না ছাই।···বাধ্য হয়ে একটু গম্ভীর গলায় কথা কটা বলে প্রদ্যোত ঘরের বাইরে যাবার জন্যে পা বাড়াল। রুমালের আশায় থাকলে ওধারে চাকরির মায়া ছাড়তে হবে।

—আজ বিশ বচ্ছর এই এক চালে চলছ তুমি। আমি কথা বললেই, হয় হেসে উড়িয়ে দেবে আর নয়ত মুখ গম্ভীর করে আমাকে দূরে সরিয়ে দেবে। এত তাচ্ছিল্য ভাল নয়! কাল একটা মনের কথা বলতে গেলাম তা উনি হেসেই খুন। যেমন আমার বরাত! তা হয়েছেও তেমনি···

—কি হয়েছে? প্রদ্যোত জুতোয় পা গলাতে গলাতে একটু বিরক্ত স্বরে জানতে চাইল। সুমিত্রা তার আগেই কান্নায় ভেঙে পড়েছে। এই ক্রোধ, আবার এই কান্না—এমন একটা অদ্ভুত পরিস্থিতিতে বিভ্রান্ত প্রদ্যোতের মুখ দিয়ে প্রশ্নটা আবার বেরিয়ে এল—কি হয়েছে বল ত?

—কি হয় নি তাই বল। এতদিন তোমার গোমড়া মুখ ছিল, এখন আবার ছোট বৌ মুখনাড়া দিলে, তাও শুনে যেতে হবে। যতই হোক, ও হচ্ছে অফিসারের বউ আর আমি···

প্রদ্যোত শেষটা না শুনেই তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। বিশ বছর বিয়ের পর বিষের উৎসটা যে এমন একটা বিশ্রী ব্যাপার নিয়ে ব্যক্ত হবে, এটা সে কল্পনাই করতে পারে নি। অবশ্য সংসারটাই যে এত সঙ্কীর্ণ সব চাওয়া-পাওয়ার মুখ চেয়ে চলে সেটাও ত শিখতে হচ্ছে, অনেক কল্পনাকে হারিয়ে, অনেক আদর্শকে হত্যা করে। দূর ছাই, বাঁচতে গেলে এসব হবেই আর তার জন্যে হা-হুতাশ করেও কোন লাভ নেই—মনে মনে এই ধরনের একটা সান্ত্বনা খাড়া করে, মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে মনের গ্লানিটা ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করল প্রদ্যোত। আপিসের সময় পার হয়ে গেছে, বাসে বাদুড়-ঝোলা হয়ে যেতে হবে। এখন আর সুমিতার কথা নিয়ে মাথাব্যথার মানে হয় না।

মানে না থাকলেও মনে পড়ে। সেদিনই আপিস থেকে ফেরার পথে সকালের ঘটনাগুলো আবার স্মৃতির পথে ঘুরেফিরে আসতে শুরু হ'ল। অন্তর জুড়ে তখন আগের দিনের আনন্দের স্থান নিয়েছে এক বেদনাময় বিষাদ। হাল্কা কুয়াশার আবরণের মতো ভাসছে বিষাদের আবরণটা। মনে হচ্ছে মুক্তির হাওয়া লেগে এখুনি উড়ে যাবে ওটা, আর তা হলেই আবার স্পর্শ পাওয়া যাবে আনন্দ-শিহরণের। কিন্তু তা হচ্ছে না, বোধ হয় যুক্তিগুলো তেমন জোরালো হচ্ছে না বলে।

আর যুক্তি দেবার আছেই বা কি! ছোট ভাই বড় পদে উন্নীত হয়েছে, এতে উত্তেজিত হবার কিই-বা থাকতে পারে? সমগ্রভাবে দেখলে সংসারের কিছু উন্নতি হবে এইটাই ত বড় কথা। বড় ভাই হিসেবে তার মনে যে গর্বও হচ্ছে না, তা নয়। সংসার আর সংস্কার এ দুটোর একটাকেও চোখ রাঙিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া যায় না। অবশ্য অনেক অভাবিত সম্ভাবনার আশঙ্কাও যে নেই এমন নয়। পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দু'ভায়ের পথও আলাদা হয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ একান্নবর্তী সংসারের বাইরে গিয়ে বাসা বাঁধতে পারে শশাঙ্ক। কিন্তু তা হলেই বা এসে যাচ্ছে কি! বাইরে কোথাও বদলীও ত হয়ে যেতে পারত শশাঙ্ক। মূলে, অন্তরের গভীরে যে আনন্দের সাড়া সে পাচ্ছে, সেটা সংসারের ভাল-মন্দকে কেন্দ্র করে নয়—সেখানে সেই অব্যক্ত পুলকের উৎস হচ্ছে তার মৌল রক্তের প্রতিটি রেড কর্পাসলে মেশানো অন্ধ সংস্কার।

সংস্কারের মতো স্বার্থও বোধ হয় অন্ধ। তা না হলে ক্ষীণ পুলক প্রস্রবণের পাশেই আসছে মৃদু বেদনার রেশ. সদ্য-ফোটা ফুলের গায়ে জড়িয়ে-থাকা ভোরের শিশিরের মতো। শিশির ঝরে যায়, মুছে যায় রোদের ছোঁয়া লেগে। কালের স্রোতে এ বেদনটুকুও ভেসে যাবে, হারিয়ে যাবে আগামী দিনের অসংখ্য ঘাত-প্রতিঘাতের আঘাতে; আজ কিন্তু তার অস্তিত্ব অস্বীকার করবার নয়। একটু লজ্জা যে হচ্ছে না, তা নয়—ক্ষীণ ঈর্ষাকে পোষণের লজ্জা। কিন্তু করাই বা যাবে কি! মানুষ ত, তাই বিধাতার কাজটুকু ঠিক মনের মতো না হলে, সামান্য ক্ষোভ, একটুখানি অভিমান অগ্রাহ্য করা যায় না। দুই সহোদর ভাই, চাকরির পদমর্যাদাও দু'জনের সমানই ছিল। সুতরাং অগ্রজের পদোন্নতিটা আগে হলে মহাভারত অশুদ্ধ হ'ত না নিশ্চয়ই। আর কিছু না হোক আজকের এই মানসিক বিভ্রান্তিটুকুর অবসান হ'ত তা হলে।

হঠাৎ প্রদ্যোতের খেয়াল হ'ল ট্রামটা বিবেকানন্দ

রোডের মোড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। শ্রমিকদের একটা মিছিল চলেছে সামনে দিয়ে, পতাকাবাহী মানুষদের মুখে ধ্বনিত হচ্ছে বাঁচবার মতো মজুরীর দাবী। দেখতে দেখতে কখন আবার নিজের চিন্তায় ডুবে গেল প্রদ্যোত। সব বাসনাই চেঁচিয়ে ব্যক্ত করা যায় না। শিরায় শিরায় মৌল রক্তের স্পন্দন নেই, তাই সুমিতা উত্যক্ত হতে পারে। কিন্তু সে তা পারবে না। সে জানে যে, তার বুকের এই মৃদু বেদনার আড়ালে ঈর্ষার ইঙ্গিত নেই। ছোট ভাই শশাঙ্কর প্রতি স্নেহে বিধুর, সহানুভূতিতে করুণ, এ এক আশ্চর্য অনুভূতি।

ক্লান্ত দেহ আর ক্লিষ্ট মন নিয়ে বাড়িতে ঢুকে সুমিতার হাসি মুখ দেখে প্রদ্যোত আশ্বস্ত হ'ল। চা জলখাবার খেয়ে একটা বই নিয়ে বসবে, ঘরে ঢুকল সুমিতা। এ সময় সারাদিনের একটা রিপোর্ট আদান-প্রদান হয়। সুমিতাই কথা বলে। ছেলেদের হালচাল সম্বন্ধে কিছু অভিযোগ আর স্বামীর অমনোযোগ নিয়ে কিঞ্চিৎ অনুযোগ, এ দুটো তার প্রাত্যহিক বক্তব্যের অন্যতম অঙ্গ। কিন্তু ওটুকু যে অবান্তর, প্রদ্যোত তা জানে। দিনান্তে এই ক্ষণ-অবসরে পরস্পরের কাছে আসার আলাদা একটা আনন্দ আছে। তাই এই আলাপটুকু তার ভালই লাগে।

—নতুন কি খবর আছে বল? এটাই সুমিতার আনন্দের অতি পরিচিত আরম্ভ।

—আপিসে আর কি খবর থাকবে বল! আর যা আছে তা ত সেই জরুরী চিঠির জোরকদমে ড্রাফট করা আর সাহেবের ডাকে সাড়া দেওয়া।

—তাই বল না। বড় সাহেব কি বলল বল না।

—বড় সাহেবের ডাকই পড়ে নি।

—আচ্ছা, বড় সাহেব চেনেন ত?

—তা চেনেন বৈকি।

—তা হলে তোমার প্রমোশন হচ্ছে না কেন?

একটু সচকিত হ'ল প্রদ্যোত। সামনে একটা অন্ধকার পর্দা যেন দুলছে। ওই পর্দার আড়ালে কি আছে কে জানে! একটু সাবধান হয়ে স্মিতমুখে উত্তর দিল—হবে না কে বলেছে। সময় হলেই হবে।

—সময় আর কবে হবে বল ত? বুড়ো বয়সে যারা বাড়ি-গাড়ি চায় আমি কিন্তু তাদের দলে নই।

এর পর কি কথা বললে ভাল হবে সেটাই ভেবে নিচ্ছিল প্রদ্যোত। একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। ভাবতেই পারে নি যে সুমিতা মুখবন্ধের শুরুতেই এমন মুখর হবে।

—আমার ঠাকুমা বলতেন না—বাইরে গেলে নব-যৌবন, ঘরকে এলেই বুড়া। তোমারও তাই হয়েছে। আমার সঙ্গে কথা বলতে গেলেই ভাবনার আকাশ তোমার মাথায় ভেঙে পড়ে।

সুমিতার কণ্ঠে চাপা উত্তেজনার রেশ কান এড়াল না প্রদ্যোতের। চেষ্টা করে একটু উজিয়ে উঠে সে উত্তর দিল—আমার ত মনে হচ্ছে এতক্ষণ তোমার সঙ্গেই কথা বলছিলাম।

—কথা বল নি, কাক তাড়াচ্ছিলেন। এ সব উড়ো উড়ো উত্তরের মানে কি আমি বুঝি না···খবর নেই, সময় হলেই হবে···

—যা সত্যি তাই বলেছি।

—আর যুধিষ্ঠির সেজে কাজ নেই! সময় হয় না—সময় হওয়াতে হয়।

—কিসের সময় বল ত? প্রদ্যোত একটু গম্ভীর হয়ে বলবার চেষ্টা করল।

—কেন, প্রমোশনের! সকলের হচ্ছে আর তোমারই বা হবে না কেন? চোখ বুজে যারা ঝিমোয় তাদের বৌদের বরাতে ঝি-বৃত্তি ছাড়া আর কি লেখা থাকবে বল! আমারও যেমন খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, এসেছি তোমার কাছে মনের কথা বলতে!

বেশ একটু জোরে জোরে পা ফেলে বেরিয়ে গেল সুমিতা।

অন্ধকার পর্দার আড়াল থেকে ফোঁস করে উঠেছে একটা কালো সাপ। কালকের সেই সাপটা। যে বাঁশির সুরেও শান্ত হয়ে নিজেকে গুটিয়ে নেবে, সে সুর প্রদ্যোতের এই মুহূর্তে জানা নেই। ভাগ্যের হাতের বাঁশিতে কবে সুর উঠবে, তাই বা কে জানে। মাসের দিনগুলোয় ও ফণা তুলবে, হেলবে, দুলবে, তীব্র জ্বালায় চাবুকের মতো ছোবল মারবে ভাগ্যের কঠিন পাষাণের গায়ে। তিলে তিলে ক্ষয় হবে ওর বিষের সঞ্চয়।

সে বিষের জ্বালায় প্রদ্যোতকেও জ্বলতে হবে। বিষের নেশায়, অব্যক্ত বেদনার ভারে, বোবা কান্নার ক্লান্তিতে, এর পর থেকে রাতের ঘুমটা তার গভীর থেকে গভীরতর হবে।

বিপ্লবীর জীবন-দর্শন

প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী

অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা পি. মিত্রের সমিতি পরিচালনা ক্ষেত্রে দু'জন সহকারী ছিলেন। পূর্ব ও উত্তর বঙ্গ পরিচালনার ভার ছিল পুলিন দাসের উপর এবং কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের জন্য ছিলেন সতীশচন্দ্র বসু। সতীশবাবু পরিচালিত সমিতির কেন্দ্র ছিল ৪৯ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে। সেকালে সংগঠক হিসেবে সতীশবাবু কলকাতায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা ছিলেন। কলকাতা এবং নানা জেলায় তিনি সমিতি সুপ্রতিষ্ঠিত করে সবিশেষ শক্তিশালী করে তোলেন।

অনুশীলন সমিতি যখন সুপ্রতিষ্ঠিত সেই বিপ্লবান্দোলনের প্রথম পর্বে বিপ্লবীদের মধ্যে দলাদলি ছিল না। বরং এক রকমের ঐক্যই ছিল। সমস্ত বাংলার প্রধান কর্মীদের নিয়ে কনফারেন্স হ'ত। পি. মিত্র, অরবিন্দ ঘোষ, সুবোধ মল্লিকের সঙ্গে পুলিনবাবু ও বারীনবাবুও উপস্থিত থাকতেন। এক সঙ্গেই পরামর্শ করে ভবিষ্যত কর্মপন্থা স্থির করতেন। অনুশীলন ছিল একমাত্র বিপ্লবী সমিতি। সেকালের বিপ্লবীদের সকলেই অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন। বিপ্লবান্দোলনের সংস্থার নাম ছিল অনুশীলন সমিতি আর বিপ্লবান্দোলনের মুখপত্র এবং প্রচার বিভাগের নাম ছিল 'যুগান্তর'। বারীন ঘোষ, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ ভুপেন দত্ত, পুলিনবাবু সকলে এই কথাই বলেন। পরবর্তীকালে 'যুগান্তর দল' বলে পরিচিত দলীয় নেতা ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ও তাই বলেছেন। যুগান্তর পার্টি বলে কোন দল ছিল না। পরবর্তী কালে বাঙ্গলাদেশে যুগান্তর পার্টি বলে যে দল পরিচিত হয়েছিল তাদের সঙ্গে বারীনবাবু, উপেনবাবু পরিচালিত যুগান্তর কাগজের বা তাঁদের দলের কোন সম্পর্ক ছিল না।

বারীনবাবু ও তাঁহাদের সহকর্মী সকলেই অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন। তাঁরা ছিলেন সমিতির সভ্যদের কাছে পূজনীয় আদর্শ বিপ্লবী। মৃতপ্রায় যুবশক্তির মধ্যে প্রাণসঞ্চার করে এরাই যুবকদের মরণজয়ী ত্যাগী বীর করে তুলেছিলেন। কিন্তু কালক্রমে পুলিনবাবু ও সতীশ ঘোষের কার্য্য-প্রণালীর সূচীক্রমের উপর গুরুত্ব আরোপণের দিক দিয়ে একটা পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। তাঁরা বোমা নিক্ষেপ, গুলী করা প্রভৃতি ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। এ সমস্ত চমকপ্রদ কার্যাবলীর একটা পরম স্বার্থকতাও ছিল। পরাধীনতার জালে জর্জরিত সম্বিতহারা দেশবাসীর সংগা ফিরিয়ে আনবার জন্য, মরণভীতু মানুষের মৃত্যুভয় দূর করবার জন্য, চরম এবং চূড়ান্ত আত্মত্যাগের প্রয়োজন ছিল।

পুলিন দাস পরিচালিত অনুশীলনের কর্মপদ্ধতি ছিল অন্যরূপ। শক্তি সংগ্রহ করে ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়ী হয়ে স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে চাই জনবল, অস্ত্রবল ও অর্থবল। এ.জন্য চাই সামরিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত একটা বেসরকারী প্রকাণ্ড সুসংগঠিত সৈন্যদল এবং অস্ত্র নির্মাণ ও সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় সৈন্যদলকে বিপ্লবীদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত করা। এ ছাড়াও দেশের লোকের সহানুভূতি আকৃষ্ট করতে হবে সমিতির প্রতি সভ্যদের নিজ নিজ চরিত্রবল, সেবাপরায়ণতা, নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের আদর্শ দ্বারা। এ সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করেছি।

পুলিন দাস ও সতীশ বসু পরিচালিত অনুশীলন সমিতি আর বারীনবাবু ও তার সহকর্মীদের মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য ছিল এই যে, বারীনবাবুরা ছিলেন সম্পূর্ণ গুপ্ত। মাণিকতলা বোমার কারখানা আবিষ্কার ও বারীনবাবুদের সকলের গ্রেপ্তারের পূর্বে তাঁদের কোন কথাই দেশবাসী জানতে পারে নি। তাঁদের প্রকাশ্য কার্য কিছুই ছিল না। তাই যেদিন সব প্রকাশিত হয়ে পড়ল সেদিন দেশবাসী চমকিত হ'ল এবং বিপ্লববাদের দিকে আকৃষ্ট হ'ল। দেশবাসী বুঝতে পারল যে তাদের যুবশক্তি দেশের পরাধীনতা শৃংখল মোচনের জন্য মরণ-খেলায় মেতে উঠেছে। সেই যে জনচিত্তে আগুনের পরশমণি ছোঁয়া লাগল তা দেখতে দেখতে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ল।

অনুশীলনের প্রধান কার্যক্রম ছিল প্রকাশ্য। কেননা সারা দেশের জনসাধারণকে নিয়ে বেসামরিক সৈন্যদল গড়ে তোলার মত কাজ গোপনে হতে পারে না। তখনকার দিনে সংগঠনবিরোধী এত আইন-কানুন ছিল না।

তাই পি. মিত্র, পুলিনবাবু এবং সতীশবাবু মনে করলেন যে, দেশে আগেই অশান্তি সৃষ্টি করে ইংরেজকে হুঁসিয়ার হতে না দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সামরিক শক্তিসংগ্রহ করে বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। এমন কিছু করা সমীচীন হবে না যার ফলে সমিতিকে অঙ্কুরেই বিনাশ করবার সুযোগ ইংরেজ পায়। সমিতি যে বলপ্রয়োগের কাজ করে নি এমন নয়, সংগঠনের দিক থেকে যারা প্রতিবন্ধক হয়েছিল তাদের হত্যা করা হ'ত। শুধুমাত্র চমক সৃষ্টির জন্য কোন সন্ত্রাসের কাজ করা হয় নি। দলের লোক ইংরেজের চর হয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বলে জানতে পারলে তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হ'ত। এবং মৃতদেহ সরিয়ে ফেলা হ'ত। এরূপ একটা হত্যাকাণ্ডের সংবাদ ঢাকা ষড়যন্ত্রের মামলায় উঠেছিল। সুকুমার নামে এক সভ্য পুলিসকে গুপ্ত খবর জানাবার অপরাধে হত্যা করা হয়। ঢাকা শহরের উত্তরে পল্টনের এক নির্জন অংশে তার মৃতদেহ পাওয়া যায়। ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এলেন সাহেব সমিতির ভিতরের অনেক কথা সংগ্রহ করেছিলেন এই সমস্ত গুপ্তচরের মারফতে। একই কারণে তাকেও গোয়ালন্দ ষ্টেশনে গুলী করা হয়েছিল।

এই সমস্ত কারণেই আলিপুর বোমার মামলার পর অনুশীলন সমিতিরই বারীনবাবুদের অংশটা একেবারে ভেঙ্গে যায়—লুপ্ত হয়। আর অনুশীলন সমিতি বেআইনী ঘোষিত হওয়ার পরেও বহু বড় বড় ষড়যন্ত্র মামলা, সহস্র সহস্র লোকের গ্রেপ্তার প্রভৃতি বড় বড় আঘাত ক্রমাগত বৎসরের পর বৎসর সহ্য করেও ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীদল হিসেবে, অন্তত ইংরেজ রাজত্বের অবসান পর্যন্ত, একটা জীবন্ত সংঘ হিসেবে সতেজ অস্তিত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিল।

স্বদেশী যুগে পূর্ববঙ্গে সুহৃত সমিতি নামে আর একটা সংঘও প্রসিদ্ধি লাভ করে ছিল। অবশ্য অনুশীলনের মতো বিস্তৃত ছিল না। ময়মনসিংহ শহর, চাঁদপুর এবং অন্য কোনো কোনো জায়গায় শাখা ছিল। নেতৃবর্গের মধ্যে কেদার চক্রবর্তী ও ব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলী সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই সমিতি গঠনের প্রেরণা আসে রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী সরলাদেবীর কাছ থেকে। কেন্দ্র ছিল ময়মনসিংহ শহরে।

সরলাদেবী সেকালের প্রসিদ্ধ বীরাষ্টমী উৎসবের প্রচলন করেন। দুর্গাপূজার অষ্টমী তিথিতে এই উৎসব হ'ত। ঐ দিন যুবকগণ লাঠি, ছোরা, তরবারি খেলা এবং নানারকম ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শন করত। শুনেছি সরলা দেবী নাকি নিজেই তরবারি চালনা করতে পারতেন। তিনি এই উৎসব উপলক্ষে যুবকদের বীর ও নির্ভীক হতে উপদেশ দিতেন। সভ্যদের মধ্যে নিয়মিত লাঠি ছোরা খেলা এবং ড্রিল প্যারেডের ব্যবস্থা ছিল।

সংগঠন কার্যে অনুশীলন সমিতির মতো কৃতকার্যতা দেখাতে না পারলেও আর একদিকে সে যুগে এদের অবদান ছিল অতুলনীয়। স্বদেশ-প্রেমোদ্দীপক চমৎকার গান এঁরা নিজেরাই রচনা বা সংগ্রহ করে ছোট বড় সভায় শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে চারণদের মত গেয়ে বেড়াতেন এবং জনগণকে মাতিয়ে তুলতেন। এদের পরিধানে থাকত গেরুয়া বস্ত্র, মাথায় পাগড়ি, হাতে লাঠি এবং গলায় ঝুলত হারমনিয়াম। এদের কণ্ঠে আজও যেন শুনতে পাই—কবি হেমচন্দ্রের, "বাজরে শিঙ্গা বাজ এই রবে, সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে, সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে, ভারত শুধু ঘুমায়ে রয়···যোগতপ আর পূজা আরাধনা, এ সকলে এবে কিছুই হবে না, হবে না, হবে না; খোল তরবার, এ সব দৈত্য নহে রে তেমন;" এ সমিতিরই সভ্য ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উকিল কামিনী সেনের স্বরচিত গান—"অবনত ভারত চাহে তোমারে, এস সুদর্শনধারী মুরারী", "জাগো ওগো বিষাদিনী জননী", "শাসন সংযত কণ্ঠ জননী, গাহিতে পারি না গান, তাই মরম বেদনা লুকাই মরমে আঁধারে ঢাকি মা প্রাণ", "আপনার মান রাখিতে জননী আপনি কৃপাণ ধর গো"। বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম", রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত সেন, কালিপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ রচিত গান ছাড়াও মনমোহনবাবুর "দিনের দিন সবে দীন" এবং ভাটিয়ালী ও রামপ্রসাদী সুরে গ্রাম্য-কবি রচিত গান গেয়ে জনগণকে মুগ্ধ করতেন—"পেটের ক্ষিধায় জইলা মইলাম, উপায় কি করি"; "দেশের কি দশা হইল, দেশের কি দশা হইল; সোনার দেশে শয়তান আইয়ারে, দেশে আগুন লাগাইল"; "জাগ ভারতবাসীরে কত ঘুমে রবে রে, বল সবে হয়ে একমন—বন্দেমাতরম; ভাইরে ভাই—মেড়ারে মারিলে চুষ, সেও ফিরে করে রোষ রে; আমরা এমন জাতি, খাইয়ে ফিরিঙ্গি লাথি, ধুলা ঝারি চলে যাই ভবন—বন্দেমাতরম"। এই সমিতির অনেক গায়কের মধ্যে ব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলী ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ।

বেআইনী বলে ঘোষণার পর সুহৃদ সমিতি লুপ্ত হয়ে যায়। নেতৃবর্গ গুপ্ত সমিতি গঠন করে আর বিপ্লব আন্দোলনে অগ্রসর হন নি। কেদার চক্রবর্তী সমাজসংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

সাধনা সমিতি নামে ময়মনসিংহ শহরে আর একটা

সংঘ ছিল। স্বদেশী যুগের প্রসিদ্ধ হেডমাষ্টার কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা। পরিচালক ছিলেন হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী। এই সমিতির সুরেন্দ্র-মোহন ঘোষ পরবর্তী কালে বাংলার কংগ্রেসী রাজনীতি ক্ষেত্রে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ময়মনসিংহ শহরের বাইরে এই সমিতির শাখা ছিল না।

স্বদেশ-বান্ধব সমিতি স্থাপিত হয় বরিশালে অশ্বিনী-কুমার দত্তের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং ঢাকা-বিক্রমপুরের প্রফেসর সতীশ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। জনগণের মধ্যে স্বদেশী ভাব প্রচার ও স্বদেশী দ্রব্য প্রচলনের কাজ খুব সুন্দর ভাবে করেন।

বরিশালে আর একটি গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের (সতীশ মুখার্জি) নেতৃত্বে। এই সমিতির শ্রেষ্ঠ নায়ক ছিলেন নোয়াখালী-নিবাসী নরেন্দ্রমোহন ঘোষ চৌধুরী ও বরিশালের মনোরঞ্জন গুপ্ত যিনি পরবর্তী কালে বাংলা দেশের একজন বিপ্লবী নেতারূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পুলিনবাবুর কাছে শুনেছি স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ এবং নরেন ঘোষ অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন।

আত্মোন্নতি নামে এক প্রভাবশালী সমিতি স্থাপিত হয় মধ্য কলিকাতায় এবং পরে বারীনবাবুদের অংশের সঙ্গে এক হয়ে যায়। সতীশ সেন ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিচালক। যুবকগণের শারীরিক ও মানসিক উন্নতির জন্য প্রকাশ্যে সমিতি স্থাপিত হলেও আসলে এটি একটি বিপ্লবীদল ছিল। এই সমিতিরই বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী বাংলা দেশের একজন বিপ্লবী নেতা হিসেবে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বারীনবাবুদের দল আলিপুর বোমার মামলার ফলে ভেঙ্গে গেলে পশ্চিমবঙ্গে যারা বিপ্লবী ভাব ও আদর্শ জীবিত রাখেন, নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে যারা পুনরুজ্জীবিত এবং শক্তিশালী করে তোলেন তার মধ্যে বিপিন গাঙ্গুলী একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। পশ্চিমবঙ্গে শ্রীমতিলাল রায়, যতীন মুখার্জি, অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রফেসর যতীশচন্দ্র ঘোষ বিপ্লবী নায়ক হিসেবে খুব প্রসিদ্ধ ও শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

পরবর্তী কালে পূর্ণচন্দ্র দাসের নেতৃত্বে মাদারীপুরে এক শক্তিশালী গুপ্ত সমিতি স্থাপিত হয়। বিপ্লবী নেতা হিসেবে পূর্ণ দাস খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অনুশীলনের এক বিচ্ছিন্ন অংশ নিয়ে প্রথমে মাদারীপুরের দল গঠিত হয়। যথাস্থানে এর বিশদ আলোচনা করব।

অনুশীলন সমিতি সমগ্র বাংলা দেশে এবং তার বাইরেও কোনো কোনো জায়গায় বিস্তৃত হয় এবং শক্তি-শালী প্রতিষ্ঠান হওয়ার খ্যাতি অর্জন করে। এ প্রসঙ্গে মহারাষ্ট্র দেশের সঙ্গে যোগাযোগের কাহিনী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯০৭ সনেই বোধ হয় কলকাতায় ছত্রপতি শিবাজী উৎসব হয়। জনমনে যে স্বদেশ-প্রেম ও জাতীয়তা বোধ জাগ্রত হচ্ছিল সেই প্রেরণাই শিবাজী উৎসবের প্রধান কারণ। তার গরিলা যুদ্ধ-প্রণালী আমাদিগকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করে এবং আমরা মনে করতাম যে, তার পথ অনুসরণ করে আমরাও ব্রিটিশের বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারব।

এ শিবাজী উৎসব উপলক্ষে সমগ্র ভারতের জাতীয়তা-বাদী নেতৃবর্গ নিমন্ত্রিত হন। মহারাষ্ট্র থেকে আসেন বালগঙ্গাধর তিলক এবং তাঁর সহকর্মীগণ—খাপার্দে ও ডাঃ মুঞ্জে। এ উপলক্ষে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রসিদ্ধ 'শিবাজী' কবিতা রচনা করেন এবং সম্ভবত পাঠ করেন। "এক ধর্ম-রাজ্য পাশে বেঁধে দেব আমি" তার প্রতীক হয়ে জনগণের মনে প্রতিষ্ঠিত হ'ল শিবাজীর গৈরিক পতাকা। সভাপতির আসন অলংকৃত করেছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, অরবিন্দ ঘোষ এবং পি. মিত্র প্রভৃতি উৎসবে যোগদান করেন—যদিও পি. মিত্র মহাশয় কোনো প্রধান ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেন নি। সঙ্গে সঙ্গে একটা স্বদেশী প্রদর্শনী খোলা হয় এবং তাতে অনুশীলন সমিতির তরফ থেকে লাঠি, ছোরা, তরবারি খেলা এবং সামরিক কুচকাওয়াজ দেখান হয়।

এ সময়ে পুলিনবাবুও কলকাতা এসেছিলেন। তখন সমস্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ একত্র হয়ে বৈপ্লবিক সমিতি গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এরূপ সমিতির সংগঠন ও নিয়মাবলী সম্বন্ধে অরবিন্দ ঘোষ ও বিপিনচন্দ্র পাল দু'খানা স্বতন্ত্র খসড়া রচনা করেন এবং সভায় আলোচিত হয়। বিপিনচন্দ্র পালের খসরাই অনুশীলন সমিতি পছন্দ করে। বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেও শেষ পর্যন্ত কোনো খসরাই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় না। আসলে অনুশীলন সমিতি ও বারীনবাবুর দল নিজেদের প্রয়োজনে কাজের ভিতর দিয়ে অভিজ্ঞতা বিচার করে নিজেদের নিয়মাবলী নিজেরাই রচনা করেন।

লোকমান্য তিলকের কলকাতার উপস্থিতি পূর্ণমাত্রায় সদ্ব্যবহার করবার জন্য পি. মিত্র মহাশয় তাঁর বাড়ীতে তিলক মহারাজ, ডাঃ মুঞ্জে, খাপার্দে, সখারাম দেউরকর এবং পুলিন দাশের সহিত একত্রিত হন। এই সভা হয় একান্ত গুপ্তভাবে এবং গোপনীয়তা রক্ষার ভার গ্রহণ করেছিলেন পুলিনবাবু। তাঁকে পি. মিত্র মহাশয় সকলের

কাছে বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী দল-সংগঠক বলে পরিচয় করিয়ে দেন। ভারতবর্ষে বিপ্লবী দল গঠন ও সশস্ত্র অভ্যুত্থান এ সভায় আলোচিত হয়। ভারতীয় সৈন্যদলের মধ্যে বিপ্লবী মনোভাব জাগ্রত করে কি ভাবে তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকে আকৃষ্ট করা যায় এবং কি ভাবেই বা বিদেশ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করা যায় কার্যোদ্ধারের জন্য তাও বিশদভাবে আলোচিত হয়। বাংলা দেশে অনুশীলন সমিতির সংগঠন, প্রভাব-প্রতিপত্তি বৈপ্লবিক কার্যকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা করে সকলেই অনুশীলনকে নিজেদের বিপ্লবী সংগঠন বলে গ্রহণ করেন এবং মহারাষ্ট্রের বিপ্লবীদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ করে দেন। এর পর থেকে পরবর্তী কাল পর্যন্ত অনুশীলন সমিতির সঙ্গে মহারাষ্ট্রের বিপ্লবী সমিতির ঐক্যসূত্র কোনোদিন ছিন্ন হয় নি।

এই সময়ে অরবিন্দ ঘোষের সম্পাদনায় সুবোধ মল্লিক ইংরেজি দৈনিক "বন্দেমাতরম্" প্রকাশ করেন। বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, ব্যারিষ্টার বি. সি. চ্যাটার্জি-এর সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করতেন এবং নিয়মিত লিখতেন। এই বন্দেমাতরম্ এবং বারীন ঘোষ ও তাঁর সহকর্মীদের দ্বারা প্রকাশিত বাংলা দৈনিক যুগান্তর পত্রিকা দু'খানা ব্যবসায় হিসেবে বা কারুর অর্থ উপার্জনের জন্য বার করা হয় নি। বিপ্লববাদ প্রচারের জন্যই এদের প্রকাশ। অনুশীলন সমিতি এই কাগজ দু'খানাকে নিজেদের কাগজ মনে করে এবং প্রচার বৃদ্ধির জন্য সহায়তা করে। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' এবং মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার 'নবশক্তি' ও বিপ্লববাদও বিপ্লবীদের সমর্থন করে। এ প্রসঙ্গে সেকালের দৈনিক ও সাময়িক পত্রপত্রিকার সাধারণ আলোচনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

একমাত্র ইংরেজ মালিকদের সংবাদপত্র ছাড়া সেকালের প্রায় সমস্ত সংবাদপত্রই স্বদেশী আন্দোলনের সহায়ক ছিল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বেঙ্গলী" বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ও স্বদেশী আন্দোলনের মুখপত্র হিসেবে সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল। এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত "লিডার", লাহোরের "ট্রিবিউন", মাদ্রাজের "হিন্দু" প্রভৃতি ইংরেজী কাগজ নরমপন্থী উদারনীতিক কাগজ বলে পরিচিত ছিল। বিপিনচন্দ্র পালের "নিউ ইণ্ডিয়া", মতিলাল ঘোষের "অমৃতবাজার পত্রিকা", বাল গঙ্গাধর তিলকের "কেশরী" চরমপন্থী কাগজ বলে প্রসিদ্ধ ছিল। 'বন্দেমাতরম্' ও 'যুগান্তর' ছাড়াও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা', মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার 'নবশক্তি' ও 'আত্মশক্তি' বিপ্লববাদী সংবাদপত্র বলে প্রসিদ্ধ ছিল। এদের মধ্যে আবার যুগান্তরই সর্বপ্রধান ছিল। দু' পয়সা দামের কাগজ দু' টাকা দামেও বিক্রয় হতে দেখেছি। মানিকতলা বোমার কারখানা ও ষড়যন্ত্র যখন প্রকাশ হয়ে পড়ে তখনকার এক সংখ্যা যুগান্তরে (বোধ হয় শেষ সংখ্যা) একটা কবিতার কয়েক লাইন আজও মনে আছে।

না হইতে মা বোধন তোমার
ভাঙিল রাক্ষস মঙ্গল ঘট
জাগো রণচণ্ডী জাগো মা আমার
আবার পূজিব চরণতট॥

সাময়িক নৈরাশ্যের মধ্যেও কিন্তু এই কবিতা বিপ্লবীর লেখা বলে লোকের মনে আশার সঞ্চারও করে। সংবাদপত্র সম্পাদকদের মধ্যে যুগান্তর সম্পাদক ডাঃ ভুপেন্দ্রনাথ দত্তই প্রথম কারাবরণ করেন।

দৈনিক 'সন্ধ্যা' বাংলা সংবাদপত্রে একটা নতুন আদর্শ স্থাপন করেছিল। সহজ বাংলায় এবং প্রচলিত উপমা ও অলঙ্কার দিয়ে বিপ্লবী আদর্শ প্রচার ও ব্রিটিশ শাসনের তীব্র সমালোচনা বার করত। এজন্য 'সন্ধ্যা'র জনপ্রিয়তাও ছিল খুব। বিপ্লবীদের সঙ্গে উপাধ্যায় মহাশয়ের যোগাযোগ ছিল। তার মতো তেজস্বী, নির্ভীক, স্বদেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী জননেতা খুব কম ছিল। সম্পাদক হিসেবে রাজদ্রোহের মোকদ্দমায় তিনি গ্রেপ্তার হলেন। খুব দৃঢ়তার সঙ্গেই তিনি ঘোষণা করলেন যে, ফিরিঙ্গীর কারাগারে তাকে কেউ আবদ্ধ করতে পারবে না। হ'লও তাই। তিনি বিচার কালেই দেহত্যাগ করেন। ঘৃণাভরে তিনি ইংরেজদের ফিরিঙ্গী বলে 'সন্ধ্যা' কাগজে লিখতেন।

'বন্দেমাতরম্' কাগজকেও কয়েক বার রাজদ্রোহের মোকদ্দমায় পড়তে হয়েছে। একবার এক রাজদ্রোহের প্রবন্ধ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করায় বিপিনচন্দ্র পালের ছয় মাস কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়।

সাপ্তাহিকগুলির মধ্যে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের 'হিতবাদী', 'বঙ্গবাসী', 'বসুমতী' এবং প্রসিদ্ধ জননেতা কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'সঞ্জীবনী' প্রভৃতি স্বদেশী আন্দোলনে প্রভূত কাজ করেছিল এবং দেশের অশেষ কল্যাণসাধন করেছে। গ্রাম্য জনসাধারণ বেশী পয়সা দিয়ে দৈনিক কাগজ কিনতে পারত না। গ্রামে গ্রামে এই সমস্ত সাপ্তাহিক কাগজের খুব প্রচার ছিল। কোন গ্রামে হয়ত হাটে বা বাজারে একখানা মাত্র সাপ্তাহিক কাগজ যেত। সবাই মিলে সেই কাগজের সংবাদই গ্রহণ করত।

'সঞ্জীবনী' স্বদেশী প্রচার ছাড়াও সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধীয় কুসংস্কার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় প্রবন্ধ লেখা হ'ত। সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় খুব সাধু প্রকৃতির, চরিত্রবান, নির্ভীক, স্বদেশ-প্রেমিক জননেতা ছিলেন।

মাসিক পত্রিকাগুলির মধ্যে 'প্রবাসী', 'মডার্ণ রিভিয়ু', 'ভারতী', 'সাহিত্য', নব পর্যায়ে 'বঙ্গদর্শন' 'নব্য-ভারত', 'সুপ্রভাত' প্রভৃতি কাগজগুলি ভাষার সেবার সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশীও প্রচার করত। দৈনিক ও সাময়িক অধিকাংশ পত্রিকারই আমি নিয়মিত পাঠক ছিলাম।

ক্রমশঃ

বেহুলা

(প্রতিযোগিতায় মনোনীত গল্প)

শ্রীপুষ্পদল ভট্টাচার্য

"কাল তোমাদের বেহুলা দেবীকে দেখলাম অমলকাকা।"

"কি চমৎকার নাচ বাস্তবিক! তাও এ বয়সে, যখন আমাদের মা-কাকীরা বাতের বেদনায় কাতরাচ্ছেন।" রঙ্গিলা কটাক্ষ করে সায়টিকা রোগগ্রস্তা সুভদ্রা কাকীমার দিকে। "এই জন্যেই আমি আরও নাচের ক্লাশ ছাড়তে চাইছি না। আমাদের মেয়েদের জীবনে ব্যায়ামের সুযোগ নাচ ছাড়া আর কিছুতেই নেই।"

"হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। দেখা যাবে বিয়ের পর তুমি কত নাচের চর্চা বজায় রাখ। সুখেন্দু যতই বড়লোক আর বিলাত-ফেরৎ হোক না কেন। তুমি যদি সাত সকালে উঠে পায়ে নূপুর বেঁধে ধিনতা-ধিনা আরম্ভ কর তাহলে সে যে খুব খুশী মনে এসে তোমার সঙ্গে তবলা বাজাবে তা ত মনে হয় না। আর দু' একটা কোলে-কাঁধে এলে তখন ত—।"

রঙ্গিলা কি একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, মৃদুলা তাকে বাধা দিল—"আঃ রঙ্গী, আজেবাজে বকুনি থামা দেখি। ভালও লাগে দিনরাত সকলের সঙ্গে তর্ক করতে।" বোনকে ধমক দিয়ে সে অমলবাবুর দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল—"আচ্ছা কাকু, তুমি যে বেহুলা দেবীর নাচের গল্প কর ইনিই কি সেই বেহুলা দেবী? তিনিই! আশ্চর্য, এমন অপূর্ব নাচের ক্ষমতা নিয়ে এতদিন কোথায় ডুব মেরেছিলেন ভদ্রমহিলা?"

অমলবাবু উত্তর দেবার আগেই সুভদ্রা বললেন—"ভদ্রমহিলা স্বেচ্ছায় ডুব মারেন নি। একটু নাম হতেই উনি এত বেশী 'ড্রিঙ্ক' করতে আর সেই সঙ্গে ছেলে-ছোকরায় কাঁচা মাথা চিবোতে আরম্ভ করেন যে, 'পাবলিক'ই ওঁকে ত্যাগ করে। কোনো শহরে ওঁর নাচের আয়োজন হবে শুনলে সেখানের মেয়েরা হলের সামনে 'পিকেটিং' করবে বলে ভয় দেখাত।"

"থাম ভদ্রা, কি সব বাজে বকছ?" এতক্ষণে অমলবাবু তাঁর স্বপ্নালু চোখ দু'টি বইয়ের থেকে তুলে ঘরের সকলের মুখের উপর বুলিয়ে জানালার বাইরে দৃষ্টি মেলে দিলেন।

"বাজে বকছি? তোমার বেহুলাসুন্দরীর কাহিনী আজও লোকে ভোলে নি। বছর কয়েক আগের যে-কোনো দিনের খবরের কাগজ খুললেই বেহুলা-সংবাদ দেখতে পাবে।"

"রমলার উপর আজও তোমার রাগ গেল না দেখছি।"

"কেন যাবে শুনি। সে কি আমার কম সর্বনাশ করেছে। যার নিন্দা আজও সইতে পারছ না সে ত তোমাকে দিব্যি বোকা বানিয়ে সরে পড়েছে।"

"ভদ্রা!" অমলবাবু বইটা সশব্দে বন্ধ করে ফিরে চাইলেন সুভদ্রার দিকে। সে দৃষ্টির সামনে সঙ্কুচিত হবে না এমন লোক অমলবাবুর পরিচিতদের মধ্যে কমই আছে। রাগ হলে তিনি কখন বকাবকি করেন না। অপরাধীর নাম ধরে গম্ভীর সুরে ঐ আহ্বান আর তাঁর চোখের পাথরের মতো স্থির দৃষ্টি অপরাধীকে শঙ্কিত আর তটস্থ করে তোলে।

সুভদ্রাও কিছুক্ষণ নত চোখে বসে রইলেন। কাপড়ের আঁচলটা মুচড়ে মুচড়ে পাকিয়ে তুলেও মনের আবেগ দমন করতে পারলেন না। ঠোঁট দু'টি থরথরিয়ে কেঁপে

উঠতেই দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে তিনি ঘরের বাইরে চলে গেলেন।

রঙ্গিলা আর মৃদুলা বিস্মিত দৃষ্টি বিনিময় করল। এই সদা হাসিখুশী দম্পতির জীবনে ভেতরে ভেতরে যে এতখানি খাদ মেশানো আছে আজকের আগে কখন বুঝতে পারে নি এরা। হলেই বা অনাত্মীয়! অনেক দিনের প্রতিবাসী ত। সেই দশ-এগার বছর বয়স থেকে একই বাংলো-বাড়ীর দুই অংশে পাশাপাশি বাস করতে করতে অমলবাবুরা যে তাদের আপন কাকা-কাকী নয় একথা ভুলেই গিয়েছিল তারা। আজকের আগে এ'দের কোনো রকম দাম্পত্য-কলহের আভাসও পায় নি তারা। সুভদ্রা একটু অভিমানী বলে অমলবাবু পারতপক্ষে কোনো কথাতেই তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেন না। তিনি কোনো অন্যায় আবদার ধরলেও ছেলেমানুষকে বোঝানর মতো করেই বুঝিয়ে তাঁকে শান্ত করেন অমলবাবু। কিন্তু আজ একি হ'ল? সুভদ্রাকাকীমা না জেনে অমলকাকার মনের কোনো গভীর বেদনার স্থানে আঘাত দিলেন না কি? কিন্তু তাই বা কি করে হবে? কাকীমার কথায় ত মনে হ'ল তিনি জেনে-বুঝেই এ আঘাত দিলেন অমলকাকাকে।

রঙ্গিলা মৃদুলার পায়ে নিজের পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে একটা চাপ দেয়, ইশারা করে—"দিদি চল।" সত্যি, এ সময়ে এ বাড়ীতে বেশীক্ষণ বসে থাকা অন্যায় হবে। ওঁদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা মিটমাট করে নেবার সুযোগ দেওয়া উচিত। কিন্তু দুই বোনে উঠে দাঁড়াতেই অমলকাকা বই থেকে মুখ তুললেন। তখনও তাঁর মুখ-চোখের আরক্ত ভাব মেলায় নি। তবু হাসিমুখেই বললেন—"ও কি, উঠে দাঁড়ালি যে? বস, বস। কাল বেহুলার নাচ কেমন দেখলি তাই বল? খুব কি বুড়ী হয়ে গেয়েছে সে? মাথার চুল পেকে গিয়েছে?"

"দূর, দূর! একটুও না।" রঙ্গিলা হেসে আবার বসে পড়ল। "ওঁর চুল আমাদের চুলের থেকেও কালো। অবশ্য কলপ দেওয়া কি না বলতে পারি না। আর চেহারা দেখলে কে বলবে কুড়ি-বাইশের বেশী বয়স ওঁর। তাই ত দিদি বলছিল, 'এ নিশ্চয় অন্য কোনো বেহুলা দেবী। অমলকাকাদের পরিচিতা, তিনি হলে কখনই এত অল্পবয়সী হতেন না।' আমি বললাম, "ঠাকুরমার কাছে গল্প শুনিস নি, অপ্সরারা কখন বুড়ো হয় না? ভাল নাচিয়ে ছেলেমেয়েরাও তেমনি গন্ধর্ব আর অপ্সরার জাত। তারা কখন বুড়ো হয় না। নয় কাকু?"

অমলবাবু সস্নেহে রঙ্গিলার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন—"ঠিকই বলেছিস মাঈ। কিন্তু একটা কথা জেনে রাখ, অপ্সরাই বল আর গন্ধর্বই বল, শিল্পী কখনও পারিবারিক জীবনে সুখী হয় না। তাই বোধ হয় কবি, সাহিত্যিক আর চিত্রশিল্পীদের উপাস্য-দেবী সরস্বতী চির নিঃসঙ্গ। একথা বলছি কেন জান? তোমাদের দুই বোনকে সাবধান করতে। মৃদুলা সেতার আর তুমি নাচ নিয়ে এমনই ব্যস্ত হয়ে থাক যে, সময় সময় তোমাদের আচরণে সুবিমল আর সুখেন্দুকে দুঃখ পেতে দেখেছি। তাই বলছি মা, জীবনের একটা পথ বেছে নাও। হয় প্রিয়-পরিজন নিয়ে সুখের সংসার গড়, আর না হয় দেবী সরস্বতীর চরণে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন কর। দুকূল বজায় রাখতে গিয়ে প্রিয়জনের কষ্টের কারণ হয়ে নিজেরাও কষ্ট পেও না।"

অমলকাকার কথায় দুই বোনেই লজ্জা পায়। এদের দু'জনেরই বিয়ের কথা পাকা হয়ে আছে। অথচ দুই বোনেই নাচ-গান আর সভা-সমিতি নিয়ে এত ব্যস্ত যে, এদের দাদা, বৌদি বা পাত্ররা নিজেরাও কিছুতেই বিয়ের দিন স্থির করতে পারছে না। বিয়ের কথা উঠলেই দুই বোনেই বলবে—এত তাড়া কিসের? এ বছরটা আরও যাক না। এদিকে পাত্র পক্ষের মা-বাবা আর অপেক্ষা করতে চাইছেন না। এদের দাদা আবার পিতৃ-মাতৃহীনা এই বোন দুটিকে এতই ভালবাসেন যে, ওদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কাজই করতে চান না। নিরুপায় হয়ে কাল তিনি অমলকাকার শরণ নিয়েছিলেন।

ওদের দাদার কথা ভেবেই হোক কিংবা নিজের জীবনের কোনো বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করেই হোক অমলবাবু তাঁর এই দুটি স্নেহ-পাত্রীকে শিল্পী-জীবনের বেদনার দিকটা দেখিয়ে সাবধান করে দিতে চাইলেন।

মৃদুলা লজ্জায় কোনো কথাই বলতে পারল না। কিন্তু চঞ্চলা রঙ্গিলা সহজেই আত্ম-সংবরণ করে বলল—"আচ্ছা কাকু, আপনি ত বেহুলা দেবীকে চিনতেন। আপনি নাকি ওঁকে কিছুদিন পড়িয়েও ছিলেন। আজ বলুন না বেহুলা দেবীর গল্প?"

অমলবাবুর চোখের কোল দুটি রক্তাভ হয়ে উঠল। কিন্তু তিনি চেষ্টা করে সহজ সুরেই বললেন—"বেশ, তার কথা আমি যতটা জানি বলছি। হয়ত তার কথা শুনলে তোমাদের কিছু উপকারই হবে।" তিনি আবার জানালার বাইরে দৃষ্টি প্রসারিত করে দিলেন।

বাড়ীর এ পাশে অনেকখানি সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠ। মাঠের প্রান্তে যমুনার নীল জলের রেখা নীল আকাশের

গায়ে মিশে আছে। জানালা দিয়ে ভরা বরষার নদীর তরঙ্গগুলি দেখা যায়। কান পেতে শুনলে নিস্তব্ধ রাত্রে বা মধ্যাহ্নে নদীর কলকল গানও শোনা যায়। সেই দিকে চেয়ে কতকটা আত্মগত ভাবেই গল্প আরম্ভ করলেন অমলবাবু:

চার মেয়ে আর দুই ছেলের জন্মের পর বার বছর কেটে গেলে যখন আর সন্তান জন্মের সম্ভাবনা নেই ভেবে মিত্তির-দম্পতি নিশ্চিন্ত হয়েছেন তখনই জন্ম নিল আর একটি মেয়ে। তাঁদের সব ক'টি সন্তানই সুদর্শন কিন্তু এই মেয়েটি কেবল যে সুশ্রী তাই নয়, দুধ-আলতা বর্ণেরও অধিকারিণী সে। বুড়ো বয়সে সন্তান জন্মের লজ্জা ভুলে মা-ও মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকলেন মেয়ের দিকে। বাপ আদর করে নাম রাখলেন রমলা।

অতি অল্প বয়স থেকেই রমলার একটা বিশেষত্ব সকলে লক্ষ্য করেছিল। সে যতই কান্নাকাটি আর আবদার করুক না কেন, এমন কি যখন সে দারুণ জ্বর আর শরীর খারাপ নিয়ে ছটফট করছে, তখনও যদি কেউ মিষ্টি সুরে গান গাইত কিংবা গ্রামোফোনে কোনো বাজনার রেকর্ড বাজাত অমনই সব কান্না আর ছটফটানি ভুলে শান্ত হয়ে শুনত রমলা। আর একটু বয়স হলে যখন সে অল্প অল্প চলতে আরম্ভ করেছে সে সময়ে গান-বাজনা শুনলেই সে হাত ঘুরিয়ে পায়ে তাল দিয়ে নাচের চেষ্টা করত। সদা কর্মব্যস্ত বাড়ীর লোকেরা কখন কখন এ দৃশ্য দেখে খুশী হয়ে মেয়েটাকে একটু আদর করে যেতেন। কিন্তু বেশীর ভাগ সময়ই তাঁরা বলতেন—'খুকু অমন কোর না, পড়ে যাবে।'

"রমলাদের পাশের বাড়ীতে থাকতেন আমার জ্যাঠামশায়রা। তাঁর ছেলে ভবেশের বয়স তখন আঠারো-উনিশ। তিনি কলেজে পড়েন আর সেই সঙ্গে করেন গান-বাজনার চর্চা। গুরুজনদের লুকিয়ে মাঝে মাঝে নাচের স্কুলেও যান। তাছাড়া বাড়ীতে গুরুজন বলতে ছিলেন ত একমাত্র তাঁর মা। আমার জ্যাঠামশায় বছর দুই আগে স্বর্গে গিয়েছিলেন। তিনি যে বিত্ত রেখে গেয়েছিলেন তা এক ছেলের পক্ষে যথেষ্ট থেকেও কিঞ্চিৎ বেশীই ছিল। তাই ভবেশদা নিশ্চিন্ত মনেই মা সরস্বতীর সেবায় লেগেছিলেন। তাঁর মা-ও গান বাজনা ভাল বাসতেন। তাই ছেলে যতক্ষণ বাড়ী থাকতেন, কখনো তানপুরার ম্যাও-ম্যাঁও, কখনো তবলার লহরায়, কি সেতারের ঝঙ্কারে পাড়া মাতিয়ে রাখতেন।

"মাকে শোনাবার জন্যই মাঝে মাঝে বিখ্যাত কীর্তনিয়া আর সঙ্গীতবিদদের বাড়ীতে আমন্ত্রণ করে গান-বাজনার আসর বসাতেন ভবেশদা। এই রকম একটি গান বাজনার আসরে ছোট্ট রমলার সঙ্গীত ও নৃত্য-প্রীতি দেখে মুগ্ধ হলেন তিনি। সেই দিন থেকেই শিশু রমলা ভবেশদার গান-বাজনার সঙ্গী হয়ে উঠল। সকালে সঙ্গীত সাধনায় বসবার আগে পাশের বাড়ী থেকে রমলাকে নিয়ে এসে সামনে বসিয়ে রাখতেন তিনি। আশ্চর্য এই যে, অতটুকু মেয়ে পরম শান্ত হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গান বাজনা শুনত। এতটুকু চাঞ্চল্য দেখাত না একভাবে বসে থাকতে। ভবেশদা তাকে নাচ শেখাতে আরম্ভ করলেন। ঐ বয়সেই সে তবলার তালে তালে পা ফেলতে শিখে গেল। এই ভাবে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রমলা নাচ, গান, বাজনায় ভবেশদার প্রিয় শিষ্যা হয়ে দাঁড়াল।"

সুভদ্রা এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "আজ কলেজ যাবে না?" তাঁর মুখেচোখে তখনও অশ্রুর আভাস রয়েছে।

অমলবাবু উঠে তাঁকে পাশের চেয়ারে বসিয়ে সস্নেহে বললেন, "আচ্ছা পাগল ত? রাগ হয়েছে বলে কি আমায় রবিবারেও কলেজে পাঠাবে নাকি?"

"ওমা, তাই ত, আজ যে রবিবার! আর আমি এদিকে তাড়াতাড়ি রাঁধতে বলে এলাম ঠাকুরকে। যাই, বারণ করে আসি।"

অমলবাবু বাধা দিলেন—"এখান থেকেই ঠাকুরকে ডেকে বলে দাও। তার পর শান্ত হয়ে বোস। রমার প্রতি আমার মনোভাব সম্বন্ধে তোমার যে ভুল ধারণা তা আজ আমি দূর করবই।"

অমলবাবু আবার মেয়েদের দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন—"রমলা যতদিন ছোট ছিল তার নাচ শেখায় তার মা বাবা আপত্তি করেন নি। কিন্তু মেয়ে যখন বারো ছাড়িয়ে তেরোয় পা দিল তখন তার বাবা আপত্তি জানিয়ে বললেন—'আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজে আজও বয়স্থা মেয়েদের নাচ-গান শেখা অনেকে ভালবাসে না। তাই নাচ জানা মেয়েদের বিয়ে দিতে অনেক সময় কষ্ট পেতে হয়।'

মিত্তির মশাইকে বাধা দিয়ে ভবেশদা বললেন—'ভাববেন না কাকাবাবু। রমার লেখা-পড়া, নাচ-গান শেখার খরচ এখন যে ভাবে চলছে, তার বিয়ের খরচও সেই ভাবেই চলে যাবে। বেশ ভাল ঘরেই তার বিয়ে দেব আমি। আপনাকে ত আগেই বলেছি, তার সব ভার আমার।'

"ভবেশদার মুখে দ্বিতীয় বার এই প্রতিশ্রুতি পেয়ে মিত্তির মশায় নিশ্চিন্ত হলেন। ভবেশদাকে প্রসন্ন রাখতে পারলে তাঁর অন্যান্য লাভও আছে। কেবল

রমলারই নয়, তার ছোড়দারও পড়ার খরচ দিচ্ছেন ভবেশদা।”

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটা সিগারেট ধরিয়ে আবার বললেন অমলবাবু, “কেবল রমলাদেরই নয়, আমার পড়ার খরচও দিতেন ভবেশদা। তাঁরই স্নেহের আশ্রয়ে মানুষ আমি। ভবেশদার কাছে থেকেই আমি এম-এ পাস করে ঐ শহরেই প্রফেসারী আরম্ভ করি। রমলা তখন ম্যাট্রিক পাস করে আই-এ পড়ছে। কিন্তু লেখাপড়ার থেকে নাচের দিকেই তার বেশী ঝোঁক। এরই মধ্যে একটি বিখ্যাত নাচের দলের সঙ্গে গোটা ভারত ঘুরে সে বেশ নাম করে ফেলেছিল।”

মৃদুলা জিজ্ঞাসা করল—“নাচের দলের সঙ্গে মেয়েকে বাইরে যেতে দিতে আপত্তি করেন নি রমলার মা বাবা।”

“না। তার কারণ ভবেশদা ঐ দলের সঙ্গে ছিলেন। বিখ্যাত সরোদ-বাদক বি. বসুর বাজনা তোমরা শোন নি মৃদুলা। কিন্তু এক সময়ে তিনি যে দলে থাকতেন সে দলের টিকিট বিক্রি বেড়ে যেত। অবশ্য ভবেশদা ঐ ভাবে কোনো দলে যোগ দিয়ে বাইরে ঘুরে বেড়ানর থেকে নিজের বাড়ীর নিভৃতে বসে গান বাজনার চর্চাই বেশী ভালবাসতেন। তিনি ঐ সব দলে যোগ দিতেন রমলার জন্য। তার আগ্রহ দেখে তিনি নিষেধ করতে পারতেন না। অথচ একটি অল্প বয়সী মেয়েকে অভিভাবকহীন অবস্থায় কোনো দলের সঙ্গে ছেড়ে দিতেও পারেন না। তাই একান্ত অনিচ্ছাতেই তিনি ঐ সব দলে যোগ দিতেন।

“রমলার নাচ-গানের চর্চায় এইভাবে উৎসাহ দিলেও ভবেশদা তার লেখাপড়ার দিকটাতেও ঢিল দেন নি। নিজেই পড়াতেন তাকে, কারণ লেখাপড়ায় অমনোযোগী রমলা একমাত্র তাঁর সামনেই পড়ার বইয়ে মন দিত। আমরা তাকে পড়াতে বসলে নানা আজেবাজে কথা বলে সময় নষ্ট করবে। অথচ এজন্য তাকে কিছু বলারও উপায় ছিল না। ভবেশদার তিরস্কার সে মাথা পেতে নীরবেই সহ্য করত। কিন্তু আমরা কেউ কিছু বললেই হয় সমানে সমানে তর্ক করবে, নয় কেঁদে ভাসাবে।”

সুভদ্রা চাপা সুরে মন্তব্য করলেন—“আহা, সেই রাঙা মুখের চোখের জল কি সহ্য করা যায়? তাই ত তাকে বকতে পারা যেত না। মুখ বুঁজে তার সব অত্যাচার সইতে হ'ত। অথচ আমাদের বেলায়—।”

চাপা গলায় বললেও তাঁর কথা অমলবাবুর কানে গিয়েছিল। তিনি হেসে সুভদ্রার দিকে চেয়ে বললেন—“তা ঠিক। সবাইকে কি সব মানায়? কিন্তু তোমার মন্তব্যটা যে ঠিক সেই কলেজ গার্ল সুভদ্রা দত্তর মতোই হ'ল।

রঙ্গিলা আর মৃদুলার কৌতূহলী প্রশ্ন—“কাকীমা কি তোমার সঙ্গে পড়তেন, না তোমার ছাত্রী ছিলেন কাকা?”

“আমাদের সময়ে ছেলেমেয়েদের সহশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না রে মাঈ। ওসব প্রথম দেখা দেয় এই এঁদের সময় থেকে। তাই ত সুভদ্রা, রমলা এণ্ড কোম্পানীর অধ্যাপনার দুরূহ ভার এসে পড়েছিল আমার মতন নিরীহ অধ্যাপকদের উপর। তাছাড়া রমলার ওর প্রতি ঈর্ষা দেখে বুঝছিস না যে, ওঁরা ছিলেন সহপাঠিনী।”

রঙ্গিলা প্রতিবাদ করে—“বারে, সহপাঠিনীরা বুঝি পরস্পরকে কেবল ঈর্ষাই করে। ভালবাসে না”

“বাসে বই কি। যতক্ষণ না স্বার্থে আঘাত লাগে ততক্ষণ সুভদ্রা আর রমলা হরিহর আত্মা। দুটি বন্ধুতে বুঝি এমন ভালবাসা আর হয় না। তার পর যেই স্বার্থে সংঘাত বাধে অমনই—।” সুভদ্রা রাগ করে উঠে পড়তেই অমলবাবু তার হাত চেপে ধরলেন—“আরে চললে কোথায়? আচ্ছা আর বলব না। বোস।”

সুভদ্রা বসলে তিনি মেয়েদের দিকে ফিরে আবার গল্প আরম্ভ করলেন—“ভবেশদার সাহায্য আর অক্লান্ত চেষ্টাতেই রমলা সেবার খুব সম্মানের সঙ্গেই আই-এ পাস করল।”

সুভদ্রা আবার টিপ্পনী কাটলেন—“আহা, একমাত্র ভবেশদার চেষ্টাতেই বই কি। তোমরা যারা সেবার আমাদের পরীক্ষক ছিলে, তাঁরা ওর সুন্দর মুখের জন্য ওকে বেশী নম্বর দাও নি যেন। তা না হলে ঐ মেয়ে কখখনো রেকর্ড মার্ক পেয়ে পাস করত না।”

“অন্যদের কথা জানি না ভদ্রা, আমি অন্ততঃ তার বা তোমাদের কারো খাতাতেই কখনো নম্বর দেবার সময়ে কোনোরকম পক্ষপাতিত্ব করি নি।”

অমলবাবু গম্ভীর সুরে বললেন—“আজ পর্যন্ত কোনো কারণেই কখন পরীক্ষকের দায়িত্বের অপমান করি নি আমি, তা তুমি ভাল করেই জান। সে যাই হোক, রমলা আই-এ পাস করার পরই ভবেশদা তাঁর একজন বিদেশী প্রফেসারের আহ্বান পেয়ে বিলাত যাত্রা করলেন। এঁর অধীনে থেকে সমাজ-দর্শনে গবেষণা করার সখ ছিল ভবেশদার অনেক দিনের। কিন্তু নানা রকম বাধা পড়ায় এতদিন সে সাধ পূর্ণ হয় নি তাঁর। এখন গুরুর আহ্বানে তিনি আনন্দিত হলেন।

“ভবেশদার বিলাত যাত্রার সংবাদ শুনে মিত্তিরমশাই

বললেন,—'তুমি বিলাত যাবার আগে রমলার বিয়ে দিয়ে যাও ভবু। কারণ তুমি এখানে না থাকলে ও মেয়েকে বশে রাখার সাধ্য নেই আমার। অতি আদর দিয়ে তুমিই ওর স্বভাব বিগড়ে দিয়েছ।"

"মিস্তির মশাই মিথ্যা বলেন নি। রমলার একগুঁয়ে স্বভাবের জন্ম তার মা, বাবা, কি দাদা যখনই তাকে শাসন করতে চেয়েছেন তখনই সে আমাদের বাড়ী পালিয়ে এসেছে। শেষে ভবেশদা তাকে অনেক বুঝিয়ে বাড়ী পাঠিয়েছেন। রমলার ছেলে বেলায় কয়েকবার তার বাবা মা তাকে ঘরে বন্ধ রেখে এ বাড়ী পালিয়ে আসার পথ রোধ করেছিলেন। কিন্তু দেখা গেল, এই শাস্তিতে রমলার যত না কষ্ট হয় ভবেশদা কষ্ট পান তার থেকেও বেশী। কারণ ঐটুকু আট দশ বছরের মেয়েই ভবেশদার সঙ্গীই কেবল নয় তাঁর সেবিকাও হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তিনি কলেজ থেকে ফিরলেই রমা এসে দাঁড়াবে কাছে, নিজের হাতে তাঁর জলখাবার এনে দেবে। ভবেশদার সামান্য মাথা ধরলেও রমা ব্যস্ত হয়ে পড়ত। কি করলে তিনি একটু আরাম পাবেন তারই চেষ্টায় বাড়ী সুদ্ধ সকলকে ব্যস্ত করবে।

"বয়স বাড়ার সঙ্গে, বিশেষ করে ভবেশদার মা মারা যাবার পর, ভবেশদার সেবার সব ভারই নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল রমলা। এমন কি, ভবেশদার প্রিয় খাবার তাঁকে রেঁধে খাওয়াবে বলেই সে রান্না শিখেছিল। নিজের বাড়ীতে তার মা তাকে কোনোদিন রান্না ঘরে নিতে পারেন নি। অথচ আমাদের বাড়ী প্রতিদিনই আমার মায়ের কাছে শিখে ভবেশদার প্রিয় কোনো না কোনো খাবার সে রাঁধবেই। এই নিয়ে একদিন ভবেশদা তাকে বকে বললেন—"রমা, রান্নাঘরে আমার জন্যে যতটা সময় নষ্ট কর তার অর্ধেকটাও যদি পড়ার বইয়ে দিতে তা হলে বেশী খুশী হতাম।'

"রমলা ভবেশদার আসনের সামনে ভাতের থালা রাখতে রাখতে বলল, কেন, পড়ি ত?'

"পড়, কিন্তু মন দিয়ে নয়। নইলে এবারের ত্রৈমাসিক পরীক্ষার ফল এত খারাপ হ'ল কেন? খবরদার, কাল থেকে আর রান্নার দিকে যাবে না তুমি।'

পর দিন রমার মা এসে খবর দিলেন, 'রমা কাল থেকে উপোস করে আছে। অথচ কিসের জন্যে যে রাগ তাও তো জানি না বাবা! বাড়ীতে তো কার সঙ্গেই রাগারাগি হয় নি।'

"তাঁর কথায় আমাদেরও খেয়াল হ'ল, সত্যিই তো, কাল দুপুরের পর থেকে রমা আর এ বাড়ী আসে নি। স্পষ্টই বোঝা গেল, রাগটা ভবেশদার উপরই। রাগের কারণ জেনে রমার মা বললেন, 'তোমার কাজ করতে গিয়ে রমা যদি সংসারের কাজ শেখে সে তো ভালই হবে ভবু। বাড়ীতে তো আলু কেটেও দু'খানা করে না। আমি ভেবে সারা হচ্ছিলাম, সংসারের কাজ না শিখলে এ মেয়ের বিয়ে দেব কি করে।'

"তাঁর এ কথার উত্তর ভবেশদা দিলেন না। কারণ তিনি ততক্ষণে তাঁর প্রিয় শিষ্যার অভিমান ভাঙ্গাতে যাত্রা করেছেন। উত্তর দিলেন আমার মা, 'তোমার তো সংসারের কাজে সাহায্য করার আরও দুটি মেয়ে আছে দিদি। এ মেয়েটাকে আমাকেই দিয়ে দাও তুমি।' ভবেশদার মাও যত দিন বেঁচে ছিলেন, বলতেন, 'রমুকে তুমি কেবল জন্মই দিয়েছ বোন, কিন্তু সে আমারই মেয়ে। আগের জন্মে আমার মা ছিল, এ জন্মে এসে আমার কোল জুড়েছে।'

"এই ভাবে রমলা আমাদের বাড়ীর মেয়েই হয়ে গিয়ে ছিল। তাই মিস্তির মশায় বললেন, তুমি কত দিনে বিলাত থেকে ফিরবে তার কিছু ঠিক নেই। ততদিন এই জেদী বয়স্থা মেয়েকে আমি শাসনে রাখব কি করে? তার চেয়ে তুমি যাবার আগে রমার বিয়ে দিয়ে যাও।'

"ভবেশদা বললেন, "আমার ইচ্ছা ছিল রমা বি-এ পাস করবার পর তার বিয়ে দেব। কিন্তু আপনি যা বলছেন তাও মিথ্যা নয়। বেশ আপনি পাত্র স্থির করুন।'

"কিন্তু বরপক্ষ থেকে মেয়ে দেখতে এলে রমা বেঁকে বসল। সে কিছুতেই কনে-দেখা দেবে না। বাপ-মার ধমকামি, ভবেশদার অনুরোধ উপরোধ সব উপেক্ষা করে রমা ঘরে দোর দিয়ে বসে রইল। এদিকে ভবেশদার বিলাত-যাত্রার দিন স্থির হয়ে গিয়েছে। রমা জেদ ধরল, "আমিও তোমার সঙ্গে বিলাত যাব ভবেশদা।'

"ভবেশদা তাকে বোঝালেন, একজন অনাত্মীয়া মেয়েকে সঙ্গে করে বিদেশে যাওয়া দু'জনের কারো পক্ষেই সম্মানজনক নয়। এক রমা যদি তাঁর ভাইকে বিয়ে করে তাঁর আত্মীয়া হয় তাহলেই তিনি তাদের দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন। বিলাতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে এরা দু'জনেও লেখাপড়া করবে।" কিন্তু রমা এ প্রস্তাবেও রাজী হ'ল না। বলল, 'বেশ, আমি বিলাত যেতে চাই না। কিন্তু বিয়েও করব না। তোমরা যদি এ নিয়ে জোর কর তা হলে আমি বাড়ী ছেড়ে কোথাও চলে যাব।'

"রমার এই ভয় দেখান একেবারে নিরর্থক ছিল না। কয়েকটি নাচের দল আর সিনেমা পার্টি থেকে এরই মধ্যে

রমলাকে বার বার আহ্বান জানাচ্ছিল। তার বাবাকেও টাকা দেবার লোভ দেখিয়েছিল। ভবেশদা না থাকলে মিত্তির মশায় কিছুতেই এ প্রলোভন দমন করতে পারতেন না। কাজেই রমলার বাড়ী ছেড়ে যাবার ভয় দেখানতে কাজ হ'ল। ভবেশদা বললেন, 'তাই হবে। তুমি নিজে হতে যত দিন না বিয়ে করতে চাইবে ততদিন আমরা আর জোর করব না। কিন্তু তোমাকেও কথা দিতে হবে, আমার অনুপস্থিতিতে তুমি ঐ সব নাচের দল বা সিনেমা পার্টিতে যোগ দিতে যাবে না। মন দিয়ে লেখাপড়া করবে। তোমার খরচ যাতে ভাল ভাবে চলে যায় সে জন্যে ব্যাঙ্কে তোমার নামে টাকা রেখে যাব।'

"মেয়ের কোনো খরচই তাঁকে বহন করতে হবে না জেনে রমার বাবাও এ ব্যবস্থায় রাজী হলেন। কেবল তার মা বললেন—'ভবেশ নিজে যদি রমাকে বিয়ে করেন তাহলে বোধ হয় সে বিয়েতে অমত করে না।'

"শুনে ভবেশদা হেসে উঠলেন—'পাগল হলেন নাকি? আমার ভাইয়ের মতোন সুপাত্রকে যে পছন্দ করল না, সে আমার মতো বুড়োকে পছন্দ করবে? তা ছাড়া রমাকে যে আমি কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছি কাকীমা।'

"রমার মা আর কিছু বললেন না। কিন্তু আমরা যারা রমাকে ছেলেবেলা থেকে দেখেছি তারা বুঝেছিলাম কাকীমা মেয়ের মনোভাব বুঝতে ভুল করেন নি।'

মৃদুলা হঠাৎ প্রশ্ন করল—"ভবেশদার যে ভাইয়ের কথা বললেন সে কি তাঁর আপন ভাই?"

অমলবাবুর মুখ রাঙা হয়ে উঠল। তিনি শেষ হয়ে আসা সিগারেটটা নিভিয়ে জানালার কাছে উঠে গেলেন। জানালা গলিয়ে সিগারেটটা ফেলে দিয়েও বেশ কিছুক্ষণ ঘরের সকলের দিকে পেছন ফিরে নদীর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। পেছন থেকে সুভদ্রার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এক্সরের মতন তাঁর পিঠ ভেদ করে মনের কথা পড়বার চেষ্টা করতে লাগল। রঙ্গিলা সেই দিকে ইশারা করে চাপা গলায় বলল—"দিদি, তুই বড় বোকা। বুঝলি না কোন ভাইয়ের কথা বলছিলেন।" সুভদ্রার দিকে চেয়ে দুই বোন হাসি গোপন করতে মাথা নীচু করল।

কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না। তার পর রঙ্গিলাই জিজ্ঞাসা করল,—"আচ্ছা কাকীমা, অমলকাকা যে বললেন আপনি আর রমা একসঙ্গে পড়তেন আর আপনাদের খুব ভাব ছিল। কেন সে বিয়ে করতে চায় না, সে বিষয়ে আপনাকে কিছু বলে নি রমলা?"

"বলবার ত কিছু দরকার ছিল না। যার চোখ আছে সেই বুঝত রমলার মনের কথা। কেবল যাঁর বোঝবার সেই মানুষটিই চিরদিন অবুঝ রইলেন।" একটু কি ভেবে সুভদ্রা আবার বললেন—"তবে একেবারে যে বোঝেন নি তাও ত নয়। হাজার হোক অল্প বয়স থেকেই রমাকে দেখছিলেন ত। মনে আছে, একদিন রমা কি একটা কাজে নিজের বাড়ী চলে গেলে ভবেশদার বন্ধু সরোজদা ঠাট্টা করে বলেছিলেন—"ভবেশ নাম তোমার সার্থক। অমন পার্বতী—!' ভবেশদার প্রচণ্ড ধমকে থতমতো খেয়ে কথাটা শেষ করতে পারেন নি সরোজদা। আমার মনে হয় রমার এই ভালবাসাও তার অন্য সব খামখেয়ালের মতোই ছেলেমানুষী আকর্ষণ বলেই ধরে নিয়েছিলেন ভবেশদা। ভেবেছিলেন তাঁর চোখের সামনে থেকে সরে গেলেই সে মোহ মুক্ত হবে। তাই অত ব্যস্ত হয়ে দীর্ঘদিনের জন্য বিলাত যাত্রা করেছিলেন তিনি।"

কৌতূহলী মৃদুলা জানতে চাইল—"রমলা নিজে হতে এ বিষয়ে কিছু বলে নি?"

"না। রমা অন্য সব বিষয়ে খোলামেলা হলেও ভবেশদার সম্বন্ধে কখন কার সঙ্গে আলোচনা করত না। কেবল সহপাঠিনীই নয়, একই পাড়ার মেয়ে আমরা। ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে খেলা করেছি। ভবেশদার আর তাঁর এই ভাইটির কাছে একসঙ্গে লেখাপড়াও করেছি দু'জনে। তবু সে কোনোদিন আমার সঙ্গে ভবেশদার কথা আলোচনা করে নি। কেবল কেউ তাঁর নিন্দা করলেই সে রেগে উঠত।"

অমলবাবুর দিকে কটাক্ষ করে সুভদ্রা হাসলেন—"অথচ তাঁর এই ভাইটির পেছনে লাগতে, হাজারো রকমে একে নাকাল করতে রমলার জুড়ি ছিল না। এক-একদিন এই নিয়ে আমার সঙ্গে ঝগড়া বাধত। বলতাম—"এই নিরীহ মানুষটার পেছনে কেন লাগিস বল ত?"

"দেখিস নি ভূতের রোজারা ভূত তাড়াবার জন্যে ভূতগ্রস্ত মানুষকে কতভাবে নাকাল করে? আমিও অমলদার মনের ভূত তাড়াবার জন্য একটু রোজাগিরি করি।'

"আর তোর মনের ভূত কে তাড়াবে শুনি?"

"'আমাকে ত ভূতে পায় নি। ব্রহ্মদত্যিতে পেয়েছে। তার কোনো রোজা নেই।' বলে সে ঘর ছেড়ে সরে পড়ত।"

মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সুভদ্রা বার বার স্বামীর পিঠের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিলেন। এবার তাঁকে লক্ষ্য করে তীর ছুড়লেন। "ছোট ভাইটির এই

মনের ভূতের খবর ভবেশদারও ত অজানা ছিল না। তাই বোধ হয় তাকে বঞ্চিত করে রমাকে বিয়ে করতে চান নি ভবেশদা। তাই তার মনের কথা বুঝেও না বোঝার ভান করতেন।"

সুভদ্রার নিক্ষিপ্ত তীর ব্যর্থ হ'ল না। অমলবাবু ফিরে তাকালেন। বিরক্তিতে তাঁর মুখ থমথম করছে। কিন্তু তিনি কিছু বলার আগেই বাইরে থেকে তাঁর কয়েকজন বন্ধু ডাক দিলেন—"অমল আছ নাকি?" বাধ্য হয়েই মেয়েদের সে ঘর ছেড়ে সরে যেতে হ'ল।

বেহুলা সম্বন্ধে তাদের অদম্য কৌতূহল নিয়ে পরদিন বিকালে বাড়ীর এই অংশে এসে অমলবাবুকে না পেয়ে সুভদ্রাকেই চেপে ধরল দুই বোনে। "অচ্ছা, কাকীমা, আপনারা কবে প্রথম বুঝেছিলেন যে রমলা ভবেশদাকে ভালবাসে!" রঙ্গিলাই প্রশ্ন আরম্ভ করে।

"ঠিক যে কি ভাবে একথা আমাদের মনে হয়েছিল আজ এতদিন পরে তা বলতে পারব না। একদিনের কথা বলি। তখন তোমার এই কাকার সঙ্গে রমলার বিয়ের কথা সবে উঠেছে। তাই নিয়ে কলেজে মেয়েদের 'কমনরুমে' কয়েকজন মেয়ে রমলাকে ঠাট্টা করতেই সে বলল,—'বয়ে গিয়েছে আমার ঐ মাকাল ফলকে বিয়ে করতে।' শুনে আমার রাগ হ'ল। বললাম—'মাকালই হোন, আর যাই হোন। বুড়ো বরের থেকে ঢের ভাল।'

"অন্য মেয়েরা ভাবল আমি রমলার দুই দিদির দ্বিতীয় পক্ষের স্বামীদের কথা বলছি। কিন্তু রমা বুঝেছিল আমার ইঙ্গিত। সে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বলল,—'শিবকে কেন চির-তরুণ বলা হয় তা বুঝতে হলে তাঁকে পার্বতীর দৃষ্টি দিয়েই দেখতে হবে ভদ্রা। নইলে নবযুবকের ছদ্মবেশী মহাদেবকেও পার্বতী কেন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তা বুঝবে না।'

"ঘরের মেয়েরা তার এই কথায় মজা পেয়ে হৈ হৈ করে উঠল,—'তাই নাকি রে রমা? তুই বুঝি এরই মধ্যে পার্বতীর দিব্যদৃষ্টি লাভ করেছিস? তা কবে দেখাবি তোর মহাদেবটিকে?'

"তাদের হাত থেকে রক্ষা পেতে রমলা কলেজ-লাইব্রেরীতে আশ্রয় নিল।"

"সুভদ্রার কথা শুনে দুই বোনে দৃষ্টি বিনিময় করল। আগের রাত্রে এঁদের কথা আলোচনা করার সময় রঙ্গিলা বলছিল—"এও সেই প্রেমের চিরন্তন উল্টো পুরাণ রে দিদি। সুভদ্রা ভালবাসেন অমলকে। অমল তাঁকে স্নেহ করলেও হৃদয় দান করেছেন পাশের বাড়ীর সেই নৃত্য-গীত পটীয়সী রূপসীকে যে তাঁর মনোভাব বুঝে চিরদিন বিদ্রূপ আর অপমানই করল তাঁকে।"

মৃদুলা বোনের কথা বিশ্বাস করতে চায় নি। কিন্তু সুভদ্রার কথায় আজ আর সন্দেহের অবকাশই রইল না। অমল রমলার করা অপমান মুখ বুঁজে সইলেও সুভদ্রা সহ্য করতে পারতেন না। এই নিয়েই দুই বান্ধবীতে তর্কাতর্কি হতে হতে শেষ পর্যন্ত মুখ দেখাদেখিও বন্ধ হয়ে যায়।

"আচ্ছা, অমলকাকার সঙ্গে রমলার বিয়ের প্রস্তাব প্রথমে কে করেছিল?"—রঙ্গিলাই জানতে চায়।—"রমলার বাবা?"

"না তোমার কাকার মা। ছেলের মনের কথা বুঝে রমলাকে পুত্রবধূ করার ইচ্ছা জানান ভবেশদাকে। ভবেশদাও খুশী হয়েই রমলার কাছে এই বিয়ের প্রস্তাব করেন। কিন্তু রমলার একান্ত অনিচ্ছা দেখে তাকে আর দ্বিতীয়বার কোনো অনুরোধও করেন নি তিনি। আমার ত মনে হয় এ নিয়ে রমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করার মতন মনের জোরও বোধ হয় ছিল না ভবেশদার। রমা কাউকে বিয়ে করতে না চাওয়ায় এক ধরনের স্বস্তি আর আনন্দই পেয়েছিলেন তিনি।"

"আর তুমি?" মৃদুলা হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করে—"রমলা অমল—কাকাকে বিয়ে করতে রাজী না হওয়ায় তুমি বুঝি আনন্দিত হও নি?"

"আমার আর আনন্দ করার কি আছে বল? তোমার কাকা কি আর নিজের ইচ্ছায় আমাকে বিয়ে করেছেন? ওঁর মাই জোর করে এ বিয়ে দিয়েছেন। তিনি জোর না করলে উনি বোধ হয় ওঁর মানসীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে চির-কুমারই থেকে যেতেন।" সুভদ্রার কণ্ঠে ক্ষোভ ঝরে পড়ে।

"তাও কি মায়ের কথাতেই সহজে রাজী হয়েছিলেন? ভবেশদা বিলাত যাবার বছর খানেক পরে রমা হঠাৎ বাড়ী ছেড়ে একটা নাচের দলের সঙ্গে চলে যাওয়ার পর ওঁর চোখ পড়ে আমার দিকে। তার পর বোধহয় আমার উপর করুণা করেই মায়ের কথায় রাজী হলেন বাপ-মা-হারা, মামা-মামীর গলগ্রহ এই কালিন্দী মেয়েটাকে বিয়ে করতে।" ধরা গলায়, ছলছল চোখে সুভদ্রা চুপ করেন।

কিছুক্ষণ তিনজনেই নীরবে থাকে। তার পর রঙ্গিলা জিজ্ঞাসা করে—"ভবেশদাকে কথা দিয়েও রমলা বাড়ী ছেড়ে গেলেন কেন?"

"তোমার কাকার কাছে শুনেছি, এই সময়ে ভবেশদার

একজন বিলাত ফেরৎ বন্ধু নাকি এসে খবর দেয় যে, ভবেশদা তাঁর প্রফেসারের কন্যা এলিসের প্রেমে পড়েছেন। শীঘ্রই তাঁদের বিয়ে হবে। খবরটা অবশ্য মিথ্যাই ছিল। আসলে ওঁরা দু'জনেই একই বিষয়ে রিসার্চ করছিলেন তাই দু'জনে অনেক সময়ে এক সঙ্গে লেখাপড়া করতেন। সেই জন্যে এ ধরনের গুজব রটিয়েছিল ভবেশদার বন্ধুরা। কিন্তু রমা তাঁদের কথা বিশ্বাস করে ফেলল। কারণ ইদানীং থিসিস লেখায় ব্যস্ত ভবেশদা আর আগের মতন তাড়াতাড়ি আর বড় চিঠি লিখতেন না রমাকে।

রমা ভাবল ভবেশদা ইচ্ছা করেই তাকে অবহেলা করছেন। তাই সেও তাঁকে আঘাত দেবার জন্য এ ভাবে বাড়ী ছেড়েছিল। তা ছাড়া রমা ছিল সত্যিকার নৃত্য-শিল্পী। ভবেশদার পরই সে যা ভালবেসেছিল তা এই নাচের চর্চা। নাচের মধ্যে ডুবে সে তার মনের সব ক্ষোভ, সব দুঃখ ভুলে যেত। কতদিন নিজের ঘরের নিভৃতে একেবারে একলাই তাকে তন্ময় হয়ে নাচতে দেখেছি। রমা বলত,—'নাচবার সময়ে আমার নিজের সব কথাই আমি ভুলে যাই। কেবল যে রূপটা, যে ভাবটা নাচের মধ্য দিয়ে ফোটাতে চাই সেটাই আমার মন আচ্ছন্ন করে রাখে'।"

"রমলাদেবী নিজের নাম বদলে বেহুলাদেবী নাম নিলেন কেন?" রঙ্গিলার অদম্য কৌতুহল কিছুতেই শেষ হতে চায় না।

"রমলাকে প্রথম যখন নাচের দলে নিয়ে যান ভবেশদা তখন রমার আর তাঁর একটা সংযুক্ত নাচ ছিল। নাচটা ভবেশদাই শিখিয়েছিলেন তাকে। অবশ্য ভবেশদা কেবল মৃত লখিন্দরের পার্টই করেছিলেন। নাচ বা অভিনয় যা কিছু করেছিল রমলাই একা। এই নাচটি তার এত ভাল হয়েছিল যে, কেবল এরই জন্য তার খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সেই থেকে ভবেশদা অনেক সময়ে রমলাকে ঠাট্টা করে বেহুলা দেবী বলে ডাকতেন। বোধ হয় ভবেশদাকে বেশী আঘাত দেবার জন্যই রমা বেহুলা নাম নেয়।"

রঙ্গিলা বলল, "সেদিন আমার নাচের টিচার বলছিলেন, 'বেহুলা দেবী' একজন রহস্যময়ী নারী। যখন ওঁর খ্যাতি প্রতিপত্তি সব থেকে বেশী, ইউরোপ, আমেরিকা থেকেও ডাক আসছে ঠিক তখনই উনি কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। আবার দেখ এত বছর বাদে এতখানি বয়সে নাচের আসরে দেখা দিয়েই দু'দিনে কেমন আসর মাত করে তুলেছেন।"

সুভদ্রা মন্তব্য করলেন—"রমা কি সাধে নিরুদ্দেশ হয়েছিল? ওর রূপ দেখে ওদের দলের নেতা শর্মাজী রমাকে বিয়ে করবার জন্য পাগল। রমা রাজী না হওয়ায় সে করে বসল আত্মহত্যা। আরও কয়েকটি বড় ঘরের ছেলে তখন সব সময়ে রমার পিছনে পাগলের মতন ঘুরছে। শর্মাজীর বাগদত্তা বধূ ঊর্মি ছিল একটা মহিলা সমিতির সভানেত্রী, সে ঐ সব ছেলেদের আত্মীয়াদের নিয়ে একটা দল গড়ল। যখন যেখানে বেহুলা দেবীর নাচের আয়োজন হয় তখনই সেখানে গিয়ে এরা হলের সামনে পিকেটিং করতে বসে। রমার নামে নানা রকম নিন্দা প্রচার করে। শেষ পর্যন্ত আর সইতে না পেরে বেহুলা দেবী নাচের আসর ছেড়ে সরে পড়লেন।"

অমলবাবু কখন এসে ঘরের বাইরে বারান্দায় বসেছিলেন তা এরা কেউ জানত না। তিনি সেখান থেকেই বললেন—"তুমি ভুল বলছ ভদ্রা। রমা অত সহজে নাচের দল ছেড়ে যায় নি। সে গিয়েছিল অন্য কারণে।"

সুভদ্রা একটা টেবিল-ক্লথে ফুল তুলছিলেন। সেটা হাতে নিয়েই বারান্দায় এসে জিজ্ঞাসা করলেন—"সে কেন, কি করেছে, কি করে জানলে?"

তাঁর কণ্ঠস্বরের সন্দেহ ও ঈর্ষার আভাস উপেক্ষা করেই অমলবাবু একটা খামের চিঠি দেখিয়ে বললেন,—"ভবেশদার চিঠি। খানিক আগের ডাকে এসেছে। ভবেশদা শীঘ্রই ভিয়েনায় যাবেন চিকিৎসার জন্য সেই খবর দিয়ে লিখেছেন:

অমল, রমার সম্বন্ধে আমার মতোই তোমাদেরও অনেক ভুল ধারণা থাকতে পারে। তাই আজ তার কথা সবিস্তারেই জানাচ্ছি তোমাকে। যদি পার ত আমার এই দুঃখিনী শিষ্যাকে ক্ষমা কর তুমি।

আমি বিলাত যাবার কিছুদিন পরেই রমার গৃহত্যাগের খবর পাই। তার চরিত্রের অবনতির নানা অতিরঞ্জিত কাহিনীও আমার কানে আসতে থাকে। কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করি নি। কারণ, আমার নিজের হাতে গড়া এই মেয়েটিকে ভাল করেই চিনতাম। জানতাম, সে আর যাই করুক পাঁকের পথে পা দেবে না। এই সময়ে হঠাৎ ঊর্মিদেবী কি করে আমার প্রতি রমার মনোভাবের কথা জেনে আমার চোখে রমাকে ছোট করে শর্মার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য আমাকে শর্মা আর বেহুলার অন্তরঙ্গতার, বেহুলার ভক্তদল সহ নানা অনাচারের কাহিনী এমন ব্যথাভরা ভাষায় লিখে জানায় যে, তার প্রতি সহানুভূতিতে আমি রমাকেও সন্দেহ করে বসি। সেই দিনই রমাকে একটা চিঠি লিখি। তাতে ছিল মাত্র

ছুটি কথা—"মানুষের জীবন নিয়ে এ কি খেলা আরম্ভ করেছ? ছিঃ ছিঃ।"

আমার এই নাম-সম্বোধনহীন চিঠিটা আমার মনের সবটা ঘৃণাই উপুড় করে দিয়েছিল রমার অন্তরে। সে পরে আমাকে বলেছিল—'তোমার চিঠি পড়ে কিছুক্ষণের জন্য আমার সমস্ত অনুভূতি আর ভাববার ক্ষমতাই লোপ পেয়েছিল। একবার মনে হ'ল শর্মা যে কেন আত্মহত্যা করেছে সেই খবরটাই জানাব তোমাকে। লিখব, কি ভাবে রাত্রে আমার ঘরের খোলা জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকে সে ঘুমন্ত অবস্থায় আমাকে অপমান করার চেষ্টা করে। আমি যে বালিশের নীচে ভোজালি নিয়ে শুই সে তা জানত না। অন্ধকারে কে তা না জেনেই আমি আততায়ীকে ভোজালির আঘাত করি। সে আঘাত লাগে তার চোখে আর নাকে। ফলে তার একটা চোখ ত কাণা হয়ই, নাকেরও খানিকটা কেটে যায়। পরদিন সকালে ধরা পড়লে আমার দলের লোকেরা, যারা কিছুদিন ধরেই নানা কারণে শর্মার উপর চটেছিল, তাকে আস্ত রাখবে না। একথা বুঝেই শর্মা নিজেকে গুলী করে আত্মহত্যা করে।"

অমলের কথা শুনে কৌতূহলী মৃদুলা আর রঙ্গিলাও বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল। তারা এবার চেয়ার টেনে নিয়ে বসে সুভদ্রাকেও ডাকল দলে যোগ দিতে। সুভদ্রা চেয়ারে বসতে বসতে জিজ্ঞাসা করল—"রমা এতদিন কোথায় ছিল সে কথা কিছু লেখেন নি ভবেশদা?"

"বৃন্দাবনের কোনো একটা আশ্রমে ছিল নাকি।" অমলবাবু আবার চিঠির দিকে চেয়ে বললেন, "এই আশ্রমের কথা রমা ভবেশদাকে বলেছে—

"নাচের দল নিয়ে যখন বৃন্দাবনে যাই সে সময়ে এক দিন এক বৃদ্ধা মহিলা আমার সঙ্গে দেখা করে আমাকে তাঁর ইষ্ট-দেবতা কানুহাইয়াজীর সামনে নাচবার অনুরোধ জানান। কিন্তু তিনি দলের অন্য কাউকে আমন্ত্রণ করতে রাজি হলেন না। বললেন—'তোমার মতো ওদের নাচে ভক্তের স্পর্শ নেই। তুমি একলাই রাত্রে আরতির সময়ে এলে সুখী হব।'

"রাত্রে আশ্রমে গিয়ে দেখলাম সেখানে কেবল আশ্রমবাসিনী মেয়ে আর শিশুদেরই ভিড়। বাইরের লোক কেউই নেই। আমার নাচের পর আরতির সময়ে দেখলাম বৃদ্ধা নিজেই আরতি করলেন। সাধারণ আরতি নয়, কঠিন আরতি নৃত্য। সে যে কী গভীর আত্মনিবেদনের নাচ! এতদিন আমার মনে নাচের গর্ব ছিল। সেদিন এই বৃদ্ধার নাচ দেখে সে অহঙ্কার দূর হয়ে গেল।

"পরিচয় নিয়ে জানলাম তাঁর পালিকা মা ছিলেন দেবদাসী। দাক্ষিণাত্য থেকে দেবদাসী প্রথা উঠে গেলে তিনি বৃন্দাবনে এসে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। সংসারের নানা ক্ষেত্রে নানা ভাবে নির্যাতিতা পথভ্রষ্টা যে মেয়েরা আর পাঁকের পথে চলতে চায় না, তারা আর পথে-কুড়িয়ে পাওয়া অনাথ শিশুরা এই আশ্রমে শান্ত ও সুস্থ জীবন যাপন করবার সুযোগ পায়। আমাকে যিনি আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন তাঁকে সবাই বলে 'দেবীমাঈ'। দেবীমাঈও নাকি এই রকম পথে কুড়িয়ে পাওয়া অনাথ শিশু ছিলেন। আশ্রম প্রতিষ্ঠাত্রী তাঁকে পথ থেকে কুড়িয়ে এনে মানুষ করেন। দেবীমাঈকে আনবার পরই তিনি আশ্রমের বর্তমান রূপ দিতে আরম্ভ করেন। মৃত্যুকালে তিনি আশ্রম পরিচালনার ভার দিয়ে যান দেবীমাঈকে।

সে রাত্রে মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য সেই আশ্রমে গিয়ে আমি যে আনন্দ আর শান্তি পেয়েছিলাম তা আর কখন পাই নি। তাই তোমার চিঠি পড়ে সমস্ত সংসারের প্রতি যখন বিতৃষ্ণায় আমার অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠেছে তখনই মনে পড়ল দেবীমাঈয়ের কথা। ছুটে গেলাম তাঁর স্নেহের আশ্রয়ে। তাঁর কানুহাইয়াজীর সেবায়, আশ্রমবাসিনীদের একটু আনন্দ দিতে, শিশুদের মানুষ করে তোলার কাজে নিজেকে এমন ভাবেই বিলিয়ে দিয়েছিলাম যে, বাইরের জগতের কোনো খবরই আর রাখি নি।

"কয়েকমাস আগে হঠাৎই একটা পুরাণ খবরের কাগজ হাতে পড়ে। বাংলা কাগজ দেখে কৌতূহল হওয়ায় সেটা খুলে পড়তে গিয়ে দেখি এলাহাবাদের কাছে একটা বিলাত-প্রত্যাগত প্লেন দুর্ঘটনায় বহু লোক হতাহত হয়েছে। এদের তালিকায় তোমার নাম। প্রথমে ভাবলাম ডক্টর ভবেশ বসু বোধ হয় আর কেউ। কিন্তু পরে ভাল করে খোঁজ নিয়ে জানলাম তুমিই সেই লোক। সংবাদদাতা বললেন—ডক্টর বসু নিজের সমস্ত সম্পত্তিই বাংলা দেশের বাস্তুহারাদের পুনর্বসতির জন্য দান করে দিয়েছেন। অথচ ওঁর শিরদাঁড়ায় যে রকম প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে তার ফলে ওঁকে হয়ত আজীবন শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হবে। শুনেছি কলিকাতার বড় ডাক্তাররা নাকি বলেছেন ইউরোপে গিয়ে চিকিৎসা করাতে পারলে হয়ত ডক্টর বসু সুস্থ হতে পারেন। কিন্তু অত খরচ করে তাঁকে কেই-বা বিদেশে নিয়ে যাবে?

ওঁর আত্মীয়রা কলিকাতার কোনো একটা নার্সিং হোমে রেখে ওঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন।"

অমলবাবু একটু থেমে একবার সকলের দিকে চেয়ে তাদের মনোভাব বোঝবার চেষ্টা করলেন. তার পর আবার ভবেশদার চিঠি পড়তে লাগলেন—

অমল, আমার অসুখের খবর শুনে রমা আর আত্মগোপন করে থাকতে পারে নি। সে এখানে এসে আমার ডাক্তারদের সঙ্গে দেখা করে জানতে পারে যে, সত্যই ভিয়েনায় এই রকম রুগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। চিকিৎসার ও যাতায়াতের খরচ যদি কেউ দেয় তাহলে ডাক্তারদের কেউ একজন আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারেন।

রমা ডাক্তারদের বলে—'টাকার জন্যে ভাববেন না। আপনারা ওঁর কাছে বিদেশ যাত্রার কথা বলে দেখুন। কিন্তু আমার নাম করবেন না। তাহলে হয়ত উনি যেতে চাইবেন না।'

ডাক্তাররা যখন আমার কাছে বিদেশ যাবার কথা তুললেন, আমি বললাম—"অত টাকা কোথায় আমার?"

"আপনার আত্মীয়েরা কি কিছুই দিতে পারবেন না?"

"তেমন বড়লোক আত্মীয় কোথায়? এই নার্সিং হোমে রেখে আমার চিকিৎসার খরচ চালাইতেই আমার ভাই অমলকে না জানি ক কতষ্ট পেতে হচ্ছে।"

ডাক্তারদের কাছে আমার অমতের কারণ জেনে রমা নিজেই এল আমার সঙ্গে দেখা করতে। তার জীবনের সব কথা জানিয়ে আমার ক্ষমা চেয়ে সে বলল, "তুমি যদি অনুমতি দাও ত আমি একটু চেষ্টা করে দেখি। হয়ত নাচের সাহায্যে কিছু অর্থ সংগ্রহ করতে পারব।"

বললাম—"পাগল নাকি, এ বয়সে তুমি নাচবে? কতদিন হ'ল নাচের চর্চা ছেড়ে দিয়েছ। পারবে কেন?"

"তুমি আশীর্বাদ করলেই পারব। কারণ নাচের চর্চা আমি ছাড়ি নি। আশ্রমে কানুহাইয়াজীকে নাচ দেখাতাম আমি।"

রমার আগ্রহ দেখে শেষ পর্যন্ত মত দিয়েছিলাম। তারই ফলে এতদিন বাদে আবার বেহুলা দেবী নাম নিয়ে নাচের আসরে নেমেছে রমা। কয়েক দিন আগে সে এসে যে হিসাব দিল তাতে মনে হয় আমার চিকিৎসার খরচের বেশীর ভাগ টাকাই সে এরই মধ্যে তুলে ফেলেছে। সে বলল—"যদি কম পড়ে ত আমেরিকাতেও নাচের দল নিয়ে গিয়ে আরও টাকা তুলে আনব। কেবল তুমি যেন কোনো কারণেই আমাকে ঘৃণা কর না।"

অমল, রমার মুখ দেখে আমি আর কথা বলতে পারি নি। তার মাথাটা বুকে টেনে নিয়েছিলাম। ছেলেবেলায় একদিন রমা মৃত লখিন্দরকে বাঁচিয়ে তোলার অভিনয় করেছিল। আজ বুঝি সে সত্যই সেই ব্রত মাথায় তুলে নিয়েছে।

আমি অন্ধ। তাই নিজের বয়সের আর সম্মানের মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে রমার এই অপূর্ব ভালবাসার কথা বুঝি নি। তাই বারবার ওর ভালবাসাকে অপমান করেছি। কিন্তু আর নয়। এবার যদি সুস্থ হতে পারি ত আমার শিষ্যাকে আমার জীবন সঙ্গিনীর স্থানই দেব।

চিঠি শেষ করে পকেটে রেখে অমলবাবু বাইরের দিকে চাইলেন। আকাশে তখন অস্ত সূর্যের সঙ্গে পশ্চিম আকাশের সলজ্জ পুলকের খেলা চলেছে। কিছুক্ষণ সকলেই সেই দিকে চেয়ে রইল। তার পর সুভদ্রা বললেন—"শুনলাম রমা কালই এ শহর ছেড়ে যাবে। চল তার সঙ্গে দেখা করে আসি।"

"চল। রমা বোধ হয় জানে না যে আমরা এখানে আছি। নইলে নিজেই দেখা করতে আসত।" অমলবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন।

"রঙ্গিলা আর মৃদুলাও ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। রঙ্গিলা বলল, "দিদি চল আমরাও কাকুদের সঙ্গে গিয়ে বেহুলা দেবীকে প্রণাম করে আসি। তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে এলে তোর আর সুবিমলদার বিবাহিত জীবন সুখেরই হবে।"

মৃদুলা লজ্জিত হয়ে বলে, "আহা, যেন আমার একলারই বিয়ে। আর কাউকে যেন কনের পিঁড়িতে বসতে হবে না?"

"হবে বই কি। তাই ত যাচ্ছি কাকুদের সঙ্গে।" অদম্য রঙ্গিলা রঙ্গভরে কটাক্ষ করে কাপড় ছাড়তে যায়।

——০*০——

ওলাবিবি

শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

ওলাবিবি নিম্ন বঙ্গের একটি বিখ্যাত লৌকিক দেবী, এঁর পূজার আধিক্য দেখা যায় চব্বিশ-পরগণা জেলার দক্ষিণ অংশে। ঐ অঞ্চলে প্রায় প্রত্যেক পল্লী ও অর্দ্ধ-শহরে ওলাবিবির নিত্য পূজার স্থায়ী মণ্ডপ বা 'থান' বর্ত্তমানেও দেখা যায়। প্রসিদ্ধি জনভক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির দিক হইতে ব্যাঘ্রদেবতা বলিয়া পূজিত দক্ষিণ রায় ও শিশুরক্ষক দেবতা পঞ্চানন্দের পরই এই দেবীটির স্থান।

পল্লীর জনসাধারণের বিশ্বাস ওলাবিবি ওলাউঠা বা কলেরা রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

সংক্ষেপে 'ওলাবিবি' বলা হইয়া থাকে, এঁর পূর্ণ নাম 'ওলাউঠাবিবি'। ওলাউঠা চলতি কথা। 'ওলা' ও 'উঠা' দুইটি কথার সমষ্টি। 'ওলা' মানে নামা বা দাস্ত হওয়া এবং 'উঠা' কথার অর্থ হইল উঠিয়া যাওয়া বা বমন হওয়া। অর্থাৎ যে রোগে দাস্ত ও বমন উভয়ই হইয়া থাকে তাহা ওলাউঠা, শুদ্ধ কথায় এই রোগকে বিসূচিকা এবং ইংরেজীতে কলেরা (cholera) বলা হয়।

অন্যান্য লৌকিক দেবদেবীর মত ওলাবিবির পূজা কাহারও গৃহে বা বাস্তু-ভূমিতে হয় না বা ইষ্টক নির্ম্মিত মন্দিরে ইনি প্রতিষ্ঠিত হন না। ওলাবিবি পল্লীর বৃক্ষতলে পর্ণকুটীরে এঁর অপর ছয় ভগ্নীর সহিত থাকেন; সেইজন্য ওলাবিবির থানকে 'সাতবিবি'র থানও বলা হয়।১ সাত ভগ্নীর মধ্যে ওলাবিবিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমাদৃত। ওলাবিবির উদ্দেশ্যে ভক্তজন পূজা বা হাজোত উৎসর্গ করেন, এঁর অপর ভগ্নীরাও পূজার ভাগ পাইয়া থাকেন।

ওলাবিবি সাত ভগ্নীদিগের নাম যথাক্রমে, ওলাবিবি, ঝোলাবিবি, আজগৈবিবি, চাঁদবিবি, বাহড়বিবি, ঘেটুনে-বিবি। কোনো কোনো পণ্ডিতের অভিমত, এই লৌকিক দেবীভগ্নী সকল অর্থাৎ 'সাতবিবি' শাস্ত্রীয় মতে পূজিত 'সপ্ত-মাতৃকা' (ব্রাহ্মী মহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, বরাহী, ইন্দ্রাণী,

ওলাবিবি

ইত্যাদি) হইতে আসিয়াছে, কিন্তু সপ্ত-মাতৃকার সহিত সাতবিবির বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায় না, তবে বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলার পল্লী অঞ্চলে পূজিত 'সাত-বউনী' বা সাতটি বনদেবী (চমকিনী, সজকিনী, রঙ্কিনী প্রভৃতি) এবং জঙ্গল-মহলের অন্যান্য পল্লীতে পূজিত 'জামমালা' দেবীর সাত ভগ্নীর (বিলাসিনী, কাজিজাম, বাশুলি, চণ্ডী ইত্যাদি) সহিত আকৃতিতে ও পূজার পদ্ধতিতে বেশ সাদৃশ্য দেখা যায়।

শ্রদ্ধেয় শ্রীবিনয় ঘোষ বলেন, 'এই বনদেবীরা দক্ষিণ বঙ্গে আসিয়া মুসলমান আমলে 'সাতবিবি' হইয়াছেন।

১। ওলাবিবিকে দুই একটি স্থানে (থানে) তাঁর ঝোলাবিবি নামক একটি মাত্র ভগ্নী সহ দেখা যায়; ঐ সকল ক্ষেত্রে ওলাবিবিকে বিসূচিকার এবং ঝোলাবিবিকে হাম-বসন্ত রোগের অধিষ্ঠাত্রী বিশ্বাসে ভক্তরা পূজা বা হাজোত দিয়া থাকেন ও উভয় ভগ্নীকে সমান মর্যাদা দেন।

"Ola and Jhola are believed to be two sisters, the former presides over the disease of cholera and the latter that of small-pox.

The worship of deities Ola Jhola and Bonbibi in Lower Bengal". Mr. Sunderlal Hora, I P. A. S. B. XXIX—1933.

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলিব—নিম্নবঙ্গের বহু লৌকিক দেবতার সহিত দক্ষিণ ভারতের গ্রাম্য দেবতাদিগের কোনো কোনোটির বিস্ময়কর সাদৃশ্য দেখা যায়—যেমন নিম্নবঙ্গের দক্ষিণ রায়ের 'বারা' মূর্ত্তির সহিত কুত্তনদেবরের, পঞ্চানন্দের সহিত তিরুবয়র বিগ্রহের সেইরূপ দক্ষিণ ভারতের গ্রাম্য দেবী সপ্তকালিং গেস্ এবং মীনাক্ষী ও তাঁর ছয় ভগ্নীর কয়েকটি দিক হইতে উক্ত সাতবিবির মিল দেখা যায়। কোনো রোগের প্রাদুর্ভাবকালে দক্ষিণ ভারতের কুডালোর অঞ্চলে এই সাতদেবীর বিশেষ ভাবে পূজা দেওয়া হয়। ওলাবিবি ও তাঁর ভগ্নীদিগের বিশেষ পূজা হয় গ্রামে কলেরা রোগের আধিক্যের কালে। দক্ষিণ ভারতের 'মারাম্মা' 'আনকাম্মা' ও উড়িষ্যার 'যোগিনী দেবী' কলেরার দেবীরূপে পূজিত। ইঁহাদের পূজা-পদ্ধতি ওলাবিবির অনুরূপ।

এই সপ্তমাতৃকা বা সাতটি দেবীর একত্র অবস্থায় পূজার প্রথা প্রাগৈতিহাসিক যুগেও প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। মহেনজোদারো হইতে প্রাপ্ত একটি মৃন্ময়-ফলক বা শীলের উপর সাতটি নারীমূর্ত্তি পাশাপাশি দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখা যায়। Mr. Earnest Machay তাঁর 'Early Indus Civilization' নামক পুস্তকে উক্ত সাতটি নারী-মূর্ত্তিকে দেবীর বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন; তাঁর মত ঐ শীলে উৎকীর্ণ মূর্ত্তিগুলি শীতলা ও তাঁর ছয় ভগ্নীর।

কোনো কোনো মনীষী মনে করেন, ঐ মূর্ত্তিগুলি 'সপ্ত-মাতৃকা'র যাঁহারা পরবর্ত্তী কালে 'সাত-বউনী' ও মুসলমান যুগে 'সাতবিবি'তে রূপান্তরিত হইয়াছেন।২

ওলাবিবি ভগ্নীদিগের মূর্ত্তি দুই প্রকার দেখা যায়। হিন্দু-প্রধান অঞ্চলে ইঁহাদের মূর্ত্তি লক্ষ্মী-সরস্বতীর মতো, তবে মস্তকের আবরণ ও অলঙ্কারে মুসলমানী প্রভাব কিছু দেখা যায়, আবার মুসলমান-প্রধান পল্লীতে এই সাত-ভগ্নীর আকৃতি ও পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পূর্ণ মুসলমান কুমারী বালিকাদিগের ন্যায়। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই এই সাত-ভগ্নীর নাম একই। তবে কোনো কোনো স্থলে ইঁহাদের অন্যতমা ভগ্নীকে 'আজগৈবিবি' না বলিয়া 'আসানবিবি' বলা হয়, এবং কোনো কোনো স্থলে ওলাবিবিকেই 'আসানবিবি' বলিতে শুনা যায়।

ওলাবিবির গাত্রবর্ণ ঘন-হরিদ্রা, ত্রিনেত্র, দুই হস্তে বরদমুদ্রা। আসনে উপবিষ্টা অবস্থার মূর্ত্তির ক্রোড়ে একটি শিশু থাকে; দণ্ডায়মানা ওলাবিবির বিগ্রহের সহিত কোনো শিশু মূর্ত্তি থাকে না।

চব্বিশ-পরগণা জেলার পল্লী অঞ্চল ব্যতীত অন্যত্র—এমন কি কলিকাতা শহরে ও হাওড়া জেলার কয়েকটি অর্দ্ধ-শহরে ওলাবিবির স্থায়ী স্থান বা মন্দির আছে এবং বহু পূর্ব্ববর্ত্তী শতাব্দী হইতে বর্ত্তমান কালেও নিত্য পূজিত হন। বর্দ্ধমান-বীরভূমের দুই-একটি পল্লীতে অন্যান্য গ্রাম্য দেবতার সহিত পূজিত হইয়া থাকেন।

মধ্য কলিকাতার ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটের দুই পার্শ্বস্থিত দুইটি মন্দিরে ওলাবিবির মূর্ত্তি পূজিত হয়।

সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জি ষ্ট্রীটের শীতলা মন্দিরে ও বাঞ্ছারাম অক্রুর লেনের 'বাঁকা রায়' বা ধর্ম্মঠাকুরের মন্দিরে ওলাবিবির মূর্ত্তি আছে। এই ধর্ম্মঠাকুরের মন্দিরটি কলিকাতার আদিকালের বলিয়া কথিত এবং এঁর জন্য মধ্য কলিকাতার ঐ অঞ্চলের নাম ও পরে রাস্তার নাম ধর্ম্মতলা হইয়াছে; অতএব মনে হয় উক্ত মন্দিরে অবস্থিত ওলাবিবির বিগ্রহটিও বহু প্রাচীন কালের।

উত্তর-পূর্ব্ব কলিকাতায় বেলগাছিয়া পল্লীর ওলাবিবি বা ওলাইচণ্ডী বিশেষ বিখ্যাত ও প্রাচীন কালের। ওলাইচণ্ডী দেবী অন্যান্য দেবদেবীর সহিত এই বেলগাছিয়া মন্দিরে নিত্য পূজিত হন। এর মূর্ত্তি নাই—একটি ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড ওলাইচণ্ডীর প্রতীক রূপে প্রতিষ্ঠিত আছে। সেবায়াৎগোষ্ঠী বিশেষ ধনী ও অভিজাত বংশীয়, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ হইলেও অযথা গোঁড়ামি নাই; সেই জন্য ওলাইচণ্ডী দেবীকে যে কোনো সম্প্রদায়ের ব্যক্তি পূজা দিতে পারেন—হিন্দু, মুসলমান এমন কি দেশী খৃষ্টানও। বিশেষ পূজার দিনে—শনিবার বা মঙ্গলবার ওলাইচণ্ডীর পূজায় ছাগ বলি হয়।

এই ওলাইচণ্ডীর সেবায়েৎদিগের নিকট হইতে জানা যায়, উক্ত দেবী ঐ স্থানে বহু শতাব্দী অধিষ্ঠিত আছেন, তাহা প্রমাণ করিবার মতো বিশেষ নিদর্শন তাঁহাদিগের নিকট বর্ত্তমানে নাই, তবে পরবর্ত্তী কালের যে সকল

২। ওলাইচণ্ডী মুসলমান যুগে ওলাবিবি হইয়াছেন এইরূপ ধারণা হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু 'শ্রীচৈতন্যভাগবত', 'তারকেশ্বর-শিবতত্ত্ব' প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে উক্ত যুগে বা উহার কিছু পরবর্ত্তী কালে বাংলার পল্লীতে পূজিত বহু লৌকিক দেবতার কথা আছে, তন্মধ্যে ঐস্লামিক প্রভাবিত কোন হিন্দু দেবতার নাম পাওয়া যায় না। 'তারকেশ্বর-শিবতত্ত্ব' গ্রন্থে এই বিসূচিকার দেবীকে 'ওলাইচণ্ডী'ই বলা হইয়াছে।

"কালিকা মূর্ত্তি কোথায় শীতলা দেবিকা।
কোথায় মনসা দেবী মন্দিরেতে একা॥
কোথায় ওলাইচণ্ডী মাথাল জলায়।
বৃক্ষতলে মহাপ্রভু স্থান দৃষ্ট প্রায়॥"

সং মণীন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, 'তারকেশ্বর-শিবতত্ত্ব', পৃষ্ঠা ৯২।

কাগজপত্রাদি আছে তাহা হইতে জানা যায়—ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানীর আমলে যখন কলিকাতার ঐ অঞ্চল ব্যাঘ্র ও বন্য শূকর প্রভৃতি জন্তুতে পূর্ণ গভীর অরণ্যে আবৃত ছিল এবং বেলগাছিয়ার ঐ অঞ্চল দিয়া বিদ্যাধরী-নদী বা উহার কোনো শাখা প্রবাহিত ছিল সেই কালে, মিষ্টার ডনকিং নামক জনৈক ইংরেজ (সম্ভবতঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানীর পদস্থ কর্ম্মচারী বা কুঠিয়াল) এই দেবীর প্রতি ভক্তিবশতঃ এই স্থানে ওলাইচণ্ডী দেবীর একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন—বর্ত্তমান মন্দিরটি উহার নব সংস্করণ।

হাওড়া শহরের দক্ষিণ প্রান্ত কাসুন্দিয়া ওলাবিবি লেনে অবস্থিত 'ওলাবিবি' বিশেষ বিখ্যাত। মন্দির নাই, তবে স্থায়ী থান আছে, পূজক মুসলমান ফকির, দেবীর মূর্ত্তি নাই—প্রতীক রূপে থানের মধ্যে সাতটি ক্ষুদ্রাকৃতি স্তূপ বা ঢিপি পূজিত হয়। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই পূজা দিয়া থাকে।

দক্ষিণ কলিকাতাস্থ আদিগঙ্গার তীরের সন্নিকটে টালিগঞ্জে বাবুরাম ঘোষের স্ট্রীটের ওলাবিবি ঐ অঞ্চলে বিখ্যাত, পূজক মুসলমান ফকির। পূজার কক্ষটি ক্ষুদ্র হইলেও বেশ সুন্দর, কক্ষের মধ্যে তিনটি সমাধি স্তূপ আছে, তন্মধ্যের একটি ওলাবিবির প্রতীক রূপে পূজিত হয়। কক্ষের মধ্যে ক্ষুদ্রাকৃতি কয়েকটি ঘোড়ার ছলন মূর্ত্তি ও জানলার নিকট মানত করা ঢিল দড়ি দিয়া বাঁধা অবস্থায় ঝুলানো দেখা যায়।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার—নামখানা, কাকদ্বীপ, করঞ্জলী, জয়নগর, বারুইপুর প্রভৃতি গ্রামে ওলাবিবির স্থায়ী থান আছে—নিত্য পূজিত হয়। ঐ সকল থানের পুরোহিত ব্রাহ্মণেতর জাতি, কোনো কোনো স্থলে মুসলমান, কিন্তু বর্ণ হিন্দুরা বা মুসলমানরা সর্ব্বত্রই পূজা বা হাজোত দিয়া থাকে, পূজান্তে নৈবেদ্যও ভক্ষণ করেন।

জয়নগরের রক্তাখাঁ পল্লীর 'ওলাবিবি' বা 'বিবিমা' ঐ অঞ্চলে সর্ব্বাধিক বিখ্যাত। ওলাউঠা বা কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাবকালে বহু দূরস্থ পল্লীর লোকরাও আসিয়া জয়নগরের এই ওলাবিবিকে পূজা বা হাজোত দিয়া থাকে। এই স্থানের থানটি বেশ প্রাচীন এবং বিগত শতাব্দীতে গঙ্গানদীর ধারা এই অঞ্চলের যে স্থান দিয়া প্রবাহিত ছিল তাহার অতি নিকটে অবস্থিত। এই থানে ওলাবিবির কোনো মূর্ত্তি বা বিগ্রহ নাই, পূজা কক্ষের মধ্যে দুইটি ক্ষুদ্রাকৃতি সমাধি আছে, তন্মধ্যের একটি ওলাবিবির প্রতীক রূপে পূজিত হয় অপর সমাধিটি ওহাবী আন্দোলনের অন্যতম নেতা রক্তাখাঁ গাজীর বলিয়া অনুমিত হয়।

"মেদিনীপুর গড়বেতা রাজকোট দুর্গের চারিটি দেব-দেবী আছেন প্রহরীর মতো—গোরখাঁ পীর, লড়াইচণ্ডী, বাঘ রায় বায়ভুঞা এই স্থানেও ওলাইচণ্ডীর পূজা হইয়া থাকে।"

বীরভূম জেলার বোলপুর ও শ্রীনিকেতন মধ্যস্থ প্রাচীন নীলকুঠীর সন্নিকট একটি থানে ওলাবিবি অন্যান্য লৌকিক দেবদেবীর সহিত পূজিত হন।

ওলাবিবির পূজার আধিক্য লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় উহার উৎপত্তি-কেন্দ্র দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, বিস্তারণ ক্ষেত্র সঠিক নির্দ্ধারণ করা না যাইলেও দেখা যায় উক্ত জেলার প্রান্তিক স্থান হইতে বাংলা দেশের উত্তর-পশ্চিম জঙ্গলমহাল পর্য্যন্ত কম-বেশী প্রায় সর্ব্বত্রে ওলাবিবির অস্তিত্ব আছে।

সর্ব্বত্রই ওলাবিবি বা ওলাইচণ্ডীর পূজার পদ্ধতি প্রায় একই রূপ, তবে নিত্যপূজা ও বিশেষ পূজায় পার্থক্য আছে। নিত্যপূজায় কোনো আড়ম্বর বা অধিক জাঁক-জমক হয় না—স্থায়ী ভক্ত ও পুরোহিতদের সাধ্যমত ব্যয়ে হয়। কিন্তু বিশেষ পূজায়, ছাগ-বলি, গান, উৎসব ও নানারূপ মূল্যবান নৈবেদ্য প্রদান ইত্যাদি হয়। এই বিশেষ পূজার অনুষ্ঠান হয় যখন গ্রামে বা পল্লীতে ওলাউঠা রোগ মহামারী রূপে দেখা দেয়। পল্লীর লোকেরা ঐ সময় সমষ্টিগতভাবে ও গ্রাম্য মোড়লের নায়কত্বে বিশেষ আড়ম্বরের সহিত পূজা বা হাজোত দিয়া থাকে, এই পূজার একটি বিশেষ নিয়ম বা প্রথা আছে—উহার নাম 'মাঙন করা'।৩ বিশেষ পূজার উদ্যোক্তারা বা গ্রাম্য মোড়ল (গোষ্ঠীপতি) প্রতিবেশী-দিগের গৃহে গৃহে যাইয়া 'মাঙন' অর্থাৎ পূজার জন্য অর্থ, ফুল, ফল ইত্যাদি ভিক্ষা করিয়া তদ্দ্বারা গ্রামের প্রতিনিধি

৩। এই মাঙন বা মাঙ্গন শব্দ সম্ভবতঃ মাঙ্গা বা মাগ্না হইতে আসিয়াছে, উহার অর্থ চাওয়া, বিনামূল্যে পাওয়া (বা খাজনা আদায়) যাহাই হউক এই মাঙন প্রথাটির বিষয় বহু মনীষী মন্তব্য করিয়াছেন যে, উহা মধ্য-প্রস্তর যুগীয় Proto Austroloid বা নিষাদ জাতির food gathering ঐতিহ্যের একটি নিদর্শন। উক্ত বিষয়ে আরও একটি কথা মনে হয়—প্রাচীন যুগে সমাজ-ব্যবস্থায় প্রাকালে খাজনা হিসাবে দ্রব্য বা ফসল লেন-দেন হইত, ঐ সময় Rent collection-এর একটি term হয়ত 'মাঙন করা' ছিল। কিছু কাল পূর্ব্বেও বাংলা দেশে 'জমিদারী মাঙন' প্রথা প্রচলিত ছিল, কোন কোন জমিদার পুত্র-কন্যার বিবাহ বা পিতা-মাতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে নির্দ্ধারিত খাজনা ব্যতীত যাহা প্রজাদিগের নিকট আদায় করিত তাহাকে 'জমিদারী মাঙন' বলা হইত।

রূপে পূজা করেন ; পল্লীর গায়নরা সারা রাত্রি উক্ত দেবীর মাহাত্ম্য গান করিয়া থাকে। এইরূপ পূজার 'ছলন' অর্থাৎ ক্ষুদ্রাকৃতি ওলাবিবির মূর্ত্তি কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রাকৃতি ঘোড়া বা হাতীর মূর্ত্তি ওলাবিবির কক্ষে বা কক্ষের বাহিরে স্থাপন করার রীতিও আছে এবং রোগমুক্তি বা কোন বিশেষ মনস্কামনা সিদ্ধ হইবার জন্য এই সময় ভক্তজন দেবীর পূজা-কক্ষের জানলার গরাদে বা নিকটস্থ বৃক্ষে একটি করিয়া ঢিল ঝুলাইয়া দেয়, ইহাকে 'ঢিল-বাঁধা' মানত করা বলে। মনস্কামনা পূর্ণ হইলে বা রোগমুক্তির পর ভক্ত ওলাবিবিকে বিশেষভাবে পূজা দিয়া থাকে।

অন্যান্য লৌকিক দেবতা পূজায় যেমন কোন সাম্প্রদায়িকতা নাই, ওলাবিবির বেলায় তদ্রূপ, সেই জন্য দেখা যায় ওলাবিবির পূজার ফলে হিন্দু-মুসলমান এক সঙ্গে একই পুরোহিতের হস্তে পূজার নৈবেদ্য ও হাজোত দিতেছে। পুরোহিত নিম্নবর্ণের হিন্দু এমনকি মুসলমান হইলেও বর্ণহিন্দু বা মুসলমান কেহই তাহার নিকট হইতে পূজান্তে প্রাপ্ত নৈবেদ্যের দ্রব্যাদি গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করে না। ওলাবিবির নৈবেদ্য অতি সাধারণ—সন্দেশ, বাতাসা, পান-সুপারি। কোন কোন স্থলে আতপ চাউল, পাটালী।

ওলাবিবির পূজায় বিশেষ কোন মন্ত্র নাই, তবে কোন কোন হিন্দু পুরোহিত পূজার সময় 'এস মা ওলাবিবি, বেহুলা রাঢ়ির ঝি' এই কথা আবেদন রূপে বলিয়া থাকেন ; ইহার অর্থ কি তাহা বুঝা যায় না, উক্ত পুরোহিতরাও বলিতে পারেন না। কোন কোন গ্রাম্য বৃদ্ধের বিশ্বাস ওলাবিবি নাকি ময়দানবের স্ত্রী, তাঁহাদিগের এই ধারণার কারণ কি তাহা জানা যায় না।

ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী মূল্য ছয় টাকা।

চিন্তাশীল চিন্তাহরণ বাবু এই গ্রন্থে ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি সম্বন্ধে কতকগুলি জ্ঞানগর্ভ নিবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। নিবন্ধগুলি সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, প্রবাসী ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

ভাষা সম্বন্ধে রচিত প্রবন্ধগুলিতে লেখক শব্দের যথাযথ প্রয়োগ, শুদ্ধাশুদ্ধি, বাক্যের গঠন-বিচার, বাংলা পরিভাষা, নব শব্দগঠন ইত্যাদি সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা কেবল শিক্ষার্থীদের নয় সাহিত্যিকদেরও প্রণিধানযোগ্য। শিক্ষকগণ এই নিবন্ধগুলি মনোযোগ দিয়া পাঠ করিলে নিজেরাও উপকৃত হইবেন শিক্ষার্থীদেরও ভাষা সম্বন্ধে সুশিক্ষা দিতে পারিবেন। সাহিত্যিকরা দিন দিন ভাষা সম্বন্ধে বেপরোয়া হইয়া পড়িতেছেন এই নিবন্ধগুলি হইতে তাঁহাদের অনেক কিছু শিখিবার আছে। সংস্কৃত শব্দ তাঁহারা বর্জন করিতে পারিতেছেন না যতই চলতি ভাষাতে লিখুন। সংস্কৃত তৎসম শব্দের প্রয়োগ যদি করিতেই হয় তাহা হইলে সংস্কৃত ব্যাকরণকে মানিয়া চলিতেই হইবে। ছাত্রাবস্থায় যাঁহারা সংস্কৃত ব্যাকরণ মন দিয়া পাঠ করেন নাই তাঁহারা পরে সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠ করিয়া ভাষাকে বিশুদ্ধ, গাঢ়বদ্ধ, সরল, সরস করিয়া তুলিবেন এ প্রত্যাশা করা যায় না। তাঁহারা চিন্তাহরণ বাবুর মতো সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় নিষ্ণাত সুলেখকদের ভাষা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি পড়িলে খুবই উপকৃত হইবেন।

এই গ্রন্থে সাহিত্য সম্বন্ধে, বিশেষ করিয়া প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধেও অনেক নূতন তথ্য সমাবিষ্ট হইয়াছে। বত্রিশ সিংহাসন, বিদ্যাসুন্দর ইত্যাদি গ্রন্থের বাংলায় রূপান্তরের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। পাঁচালি সাহিত্য ও অন্যান্য লোক সাহিত্য সম্বন্ধে লেখক নূতন তথ্য পরিবেষণ করিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত বাংলা সাহিত্যের যোগাযোগ সম্বন্ধে আলোচনা লেখকের সুচিন্তিত অনুশীলনের ফল।

অর্বাচীন সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা বিশেষরূপ কৌতূহলোদ্দীপক। সংস্কৃত সাহিত্য রচনায় মুসলমানদের প্রেরণা বাংলার পুরাণ-কাহিনী লেখকের গবেষণামূলক রচনা।

সংস্কৃত সাহিত্য, রূপান্তর সাহিত্য, লোক সাহিত্য ও প্রাচীন বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনার মধ্য দিয়া ভারতের বিশেষ করিয়া বাংলার সাংস্কৃতিক আবেষ্টনীর সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

নিবন্ধগুলি জ্ঞানগর্ভ ও প্রাঞ্জল ভাষায় বিরচিত। এই শ্রেণীর প্রবন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য ও বিষয়বস্তুর গুরুত্বই প্রধান—তাহাতে রচনা নীরস হইয়া

পড়িবার কথা। কিন্তু লেখকের রচনাশৈলীর গুণে নিবন্ধগুলি সরস হইয়াছে।

বাঙলা ভাষায় বর্ত্তমান যুগে যে অপচার ও স্বৈরাচার চলিতেছে—তৎসম্বন্ধে লেখকের মন্তব্যগুলিকে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। সকল ভাষাই একটা discipline মানিয়া চলে— সাহিত্য রচনায় ইহার অভাব অসুন্দর বলিয়াও আমরা শৃঙ্খলানিষ্ঠতার পক্ষপাতী। লেখকের এ সম্বন্ধে বক্তব্য সম্পর্কে লোক শিক্ষক এবং বালক শিক্ষক উভয় শ্রেণীর শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। লেখক বলিয়াছেন—

"আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ— সাহিত্য সেবার অধিকার লাভ করবার জন্য গুরুর উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইবে। * * সকল সময় জীবিত গুরু বরণ না করিলেও চলিতে পারে। কেবল বিচার করা দরকার, যাঁহাকে গুরুরূপে বরণ করিতেছি, গুরু হইবার উপযুক্ত গুণ তাঁহার আছে কি না।"

গুরু বরণ ব্যতীত যে কোনো সাধনা সার্থক হয় না—নিরন্তর অনুশীলন ও অধ্যবসায় ছাড়া যে কোনো ব্রতই উদ্‌যাপিত হয় না তাহা 'ভুঁইফোঁড়' সাহিত্যিকদের জানা উচিত বৈকি!

শ্রীকালিদাস রায়

কাউণ্ট লিও টলস্টয়—ডঃ নারায়ণী বসু। ক্যালকাটা বুক হাউস, ১।১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। মূল্য ২.৫০ নয়া পয়সা।

পৃথিবীর ইতিহাসে কাউণ্ট লিও টলস্টয় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত একটি অত্যুজ্জ্বল নাম। শুধু নিপুণ শিল্পী ও স্রষ্টা সাহিত্যিক হিসাবে এই নামটি পৃথিবীখ্যাত নয় এই মহাজীবন ছিল খৃষ্ট প্রেম ধর্ম্মের আদর্শে উদ্বুদ্ধ। ধনী অভিজাত পরিবারের সন্তান টলস্টয়; ধন মান যশ প্রতিষ্ঠা বিলাস বৈভব, এক কথায় জাগতিক সুখ ঐশ্বর্য্য কিছুই অভাব ছিল না তাঁর, অথচ এই সবের মোহ ভোগসর্ব্বস্ব জীবনকে জীবনান্ত কাল পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করে রাখতে পারে নি। পঞ্চাশোর্দ্ধের জীবনে বিশ্বব্যাপী এক বিরাট সত্তাকে উপলব্ধি করার ব্যাকুলতা তাঁকে ঘর-ছাড়া করেছিল। ত্যাগ ও ভোগের অন্তর্দ্বন্দ্ব ত ছিলই— এ ছাড়া সে কালের জার-শাসিত রাশিয়ার রাষ্ট্রশাসন ক্ষেত্রে ও ধর্ম্মমণ্ডলে যে স্বৈরাচার ও অনাচার লক্ষ লক্ষ মানুষকে দুঃখ-দুর্দ্দশার ক্লেদপঙ্কে নিমজ্জিত করে পশুজীবন যাপন করতে বাধ্য করছিল —তারই বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ধ্বনি তুলেছিলেন টলস্টয়। শুধু সাহিত্য-সাধনার মাধ্যমে নয়, সর্ব্বস্ব ত্যাগের সঙ্কল্পে অটল হয়ে আরম্ভ করেছিলেন জীবন-দর্শনের সাধনা। সর্ব্ববিধ সঞ্চয়ের বিরুদ্ধে ছিল তাঁর তীব্র বিরাগ এবং খৃষ্টান পাদরীদের তথাকথিত অন্তঃসারশূন্য ধর্ম্মানুষ্ঠানের উপর ছিলেন বীতশ্রদ্ধ। পারতপক্ষে তিনি গীর্জ্জায় পদার্পণ করেন নি— মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আচার-সর্ব্বস্ব এই ধর্ম্মকে তিনি অস্বীকার করেছিলেন— অথচ খৃষ্ট-আচরিত প্রেম ধর্ম্মের আদর্শ-ই তাঁর জীবন-জিজ্ঞাসাকে সর্ব্বাধিক প্রভাবিত করেছিল। এই জিজ্ঞাসা—মহা জীবনের পাথেয়— প্রাচ্যের যোগী সন্ন্যাসীর আচরিত মার্গ। ভোগসর্ব্বস্ব প্রতীচ্যের পরিমণ্ডলে টলস্টয়ের বৈরাগ্য-ব্যাকুল জীবন এক আশ্চর্য্য ব্যতিক্রম।

পৃথিবীতে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার কল্পনায় অনুপ্রাণিত ও অন্তর্দ্বন্দ্বক্লিষ্ট এই বিচিত্র জীবনকে প্রকাশ করার দায়িত্ব যেমন আছে, তেমনি একে যথাযথ ভাবে চিত্রিত করাও কঠিন। আলোচ্য গ্রন্থের লেখিকা কিন্তু এই দায়িত্ব শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করেছেন। টলস্টয়ের সাহিত্য প্রতিভা ও জীবন-জিজ্ঞাসার ক্রমবিবর্ত্তন স্বল্প পরিসরে সুন্দর ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। টলস্টয়ের সাহিত্যকীর্ত্তি যুদ্ধ ও শান্তি, আনা কারেনিনা, ক্রুয়েটসার সোনাটা, পুনর্জন্ম প্রভৃতি কালজয়ী কাহিনীগুলিকে সংক্ষেপে বর্ণনা করার সঙ্গে সঙ্গে রচনার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ও বাস্তব-ভূমিকার অংশটুকু বিশ্লেষণ করেছেন লেখিকা। সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সুন্দর ও সর্ব্বজন বোধ্য হয়েছে। আরও টলস্টয়ের জীবন-দর্শনকে - 'সমাজ ও রাষ্ট্র', 'জীবন জিজ্ঞাসা', 'আলোর তপস্যা' প্রভৃতি কয়েকটি অধ্যায়ে বিবৃত করেছেন প্রাঞ্জল ভাষায়। তাঁর বাল্য কৈশোর ও বিবাহিত জীবন, পারিবারিক ঘটনা সাহিত্য প্রতিভার উন্মেষ, সে কালের সাহিত্য-সমাজ ও সাহিত্যিক পরিচয়, ভক্তমণ্ডলীর প্রভাব যে কোনো কল্পিত কাহিনীর মতোই কৌতূহলোদ্দীপক।

একদা টলস্টয় যে মহৎ মানব সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন— আজকার বিজ্ঞান-শাসিত পৃথিবীতে তার প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর কি না— এই প্রশ্ন শুধু বিচার-বিতর্কের বিষয়টিকে নয়— পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রটিকেও প্রসারিত করে রেখেছে। এই পথেই পদক্ষেপ করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী, আচার্য্য বিনোবাজী আজও চালিয়ে যাচ্ছেন সেই পরীক্ষা। সুতরাং টলস্টয় তাঁর জীবন-সাধনাকে সফল করতে পারেন নি বলে ওই আদর্শ মূলহীন বা ভ্রান্ত এ কথা ঘোষণা করার সময় এখনও আসে নি। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই ভাবের একটি মহৎ আদর্শকে সত্যাসত্যের কষ্টি-পাথরে ফেলে যাচাই করার চেষ্টা চলেই আসছে - চলবেই। টলস্টয়ের জগৎ হ'ল খৃষ্ট প্রেমানুরঞ্জিত আদর্শ জগৎ তাঁর জীবন-দর্শন সর্ব্বকালের মানব-মনের পরম প্রশ্ন যার উত্তর মানব মৈত্রী ভাবনার কর্ণমূলে অনুস্যূত রয়েছে। সুলিখিত এই জীবনী গ্রন্থের মাধ্যমে টলস্টয়ের জীবন-দর্শনকে যথাযোগ্য আলোচনার ক্ষেত্রে উপস্থাপিত করার গৌরব লেখিকার। তাঁকে আমাদের সাধুবাদ জানাই।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

কম্যুনিষ্ট পার্টি ও কেরল—ওয়ার্কার্স পাবলিকেশন হাউস প্রাইভেট লিমিটেড, ২০, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১। মূল্য ২১। পৃষ্ঠা ১৫৮।

বোম্বে ডিমক্রেটিক রিসার্চ্চ সার্ভিস কর্ত্তৃক প্রণীত "Kerala under Communism" নামক পুস্তকের অনুবাদ অনুবাদিকা গায়ত্রী দাশগুপ্তা।

১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল সারা ভারত কম্যুনিষ্ট পার্টি সাধারণ নির্ব্বাচনের মাধ্যমে কেরলের শাসন ক্ষমতা পাইয়াছিল। কিন্তু মাত্র দুই বৎসর পরে ৩১শে জুলাই, ১৯৫৯, রাষ্ট্রপতি এই মন্ত্রীসভাকে গদীচ্যুত করিয়াছিলেন। কম্যুনিষ্ট শাসনের বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থানের দরুণ রাষ্ট্রপতিকে এই কার্য্য করিতে হইয়াছিল। কম্যুনিষ্ট পার্টি অবশ্য সারা পৃথিবীতে এবং ভারতে নিজেদের নির্দ্দোষ এবং কংগ্রেসকে দোষী বলিয়া প্রচার করিয়া ছিল। বর্ত্তমান পুস্তকে কেরলে কম্যুনিষ্ট মন্ত্রিসভার ব্যর্থতা ও কম্যুনিজমের প্রকৃত স্বরূপ দেখান হইয়াছে।

আলোচ্য বিষয়গুলি নয়টি অধ্যায়ে ভাগ করা হইয়াছে যথা— কেরলের জনসাধারণ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ, কেরল ১৯৪৮-৫৭, কম্যুনিষ্টদের ক্ষমতা-গ্রহণ, শাসনের ভূমিকায় কম্যুনিষ্ট পার্টির ব্যর্থতা - শাসন, শিক্ষা, খাদ্য, ভূমি-সংস্কার এবং পুলিশ, গৃহযুদ্ধের হুমকি, কম্যুনিষ্ট পরিচালিত সমবায় আন্দোলন ইত্যাদি। আলোচনা তথ্যপূর্ণ প্রথম তিনটি অধ্যায়ে পাঠক কেরলের অতীত ও বর্ত্তমান ইতিহাস, জন[illegible] ও তাহাদের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে এবং কোন্ বিশেষ কারণে কম্যুনিষ্ট দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা-দখলে সমর্থ হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারিবেন।

কেরলের ঘটনাবলীকে সাম্প্রতিক এবং একটি প্রাদেশিক ঘটনা মাত্র বলিয়া অল্প গুরুত্ব দিলে ভুল করা হইবে। এক নায়কত্বের আদর্শ সমগ্র

ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইলে কিরূপ অবস্থা হইবে কেরলের স্বল্পকালীন কম্যুনিষ্ট শাসন হইতে তাহা অনুমেয়।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

সোম-সবিতা—শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী। অটো-প্রিণ্ট এণ্ড পাবলিসিটি হাউস, ৪৯, বলদেও পাড়া রোড, কলিকাতা-৬। মূল্য—৪৲।

শ্রীযুক্ত রায় চৌধুরীর পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। ইতিপূর্ব্বে তিনি বহু উপন্যাস লিখিয়া যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। সমালোচ্য উপন্যাসখানি দ্বিতীয় মুদ্রণ।

উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীরা বর্ত্তমান কালের নয়। তখনও ভারতবর্ষ স্বাধীন হয় নাই। দেশব্যাপী প্রবল আন্দোলনের ঢেউ বহিয়া চলিয়াছে।

উপন্যাসের প্রধান নায়ক হেরম্ব একজন দেশকর্ম্মী। দেশের কাজই তার একমাত্র সাধনা—যার ফলে বছরের বেশীর ভাগ সময়ই তাহাকে জেলে কাটাইতে হয়। আর উমা নায়িকা- হেরম্বর অবসর সময় ছাত্রী। প্রয়োজনে তার সহকর্ম্মী। হেরম্বর হাজতবাস-কালে তার উপদেশ মতো কাজ করিয়া যাওয়াই তার প্রধান লক্ষ্য। লবণ আন্দোলন সত্যাগ্রহে যাত্রার প্রাক্কালে হেরম্ব উমাকে এবারে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে উপদেশ দিয়া গেল এবং উমার পড়াশুনার সকল দায়িত্ব বন্ধু অম্বুজাক্ষের উপর পড়িল। এইখান হইতেই উপন্যাসের সুরু। তার পর নানা ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া উমা বি-এ পাস করিল ও অবস্থার বিপর্য্যয়ে তাহাকে শহরে গিয়া শিক্ষয়িত্রীর কাজ গ্রহণ করিতে হইল। আর তার সুখ-দুঃখের অংশ গ্রহণ করিল অম্বুজাক্ষ। অম্বুজাক্ষ উমাকে গভীর ভাবে ভালবাসিল, কিন্তু তার ভালবাসা একমুহূর্ত্তের জন্যও জোর করিয়া কিছু দাবি করিল না, উমাকে হেরম্ব ভালবাসিত কিন্তু তাকে জীবনসঙ্গিনী রূপে কখনও চাহে নাই। হেরম্ব ও অম্বুজাক্ষের ভালবাসার গতি প্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা। অম্বুজাক্ষের প্রেম শেষ পর্য্যন্ত অনেক বড় হইয়া উঠিয়াছে। হেরম্ব উপন্যাসের প্রধান নায়ক হইলেও অম্বুজাক্ষের চরিত্রটিই বেশী উজ্জ্বল।

উমার হেরম্বর প্রতি যথেষ্ট আকর্ষণ থাকিলেও সংসারের বন্ধনের ভিতর দিয়া তাহাকে সে কোনোদিন পাইতে চাহে নাই, অথচ অম্বুজাক্ষকে বিবাহ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াও শেষ পর্য্যন্ত হেরম্বের অন্তর্দ্বন্দ্বকে উপলক্ষ্য করিয়া উমা অম্বুজাক্ষের নিকট মুক্তি চাহিল। উমার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইবার শক্তি অম্বুজাক্ষের নাই। তার প্রেমের মধ্যে রহিয়াছে ত্যাগ—এই ত্যাগ তাহাকে শক্তি যোগাইল। উমা হেরম্বর রোগ শয্যা পাশে উপস্থিত হইবার জন্য যাত্রা করিল। এইখানেই উপন্যাসখানি শেষ হইয়াছে।

সুন্দর প্রচ্ছদ। ঝরঝরে ছাপা।

অপরাজেয়—শ্রীরমেশচন্দ্র সেন। নিউস্ক্রিপ্ট, ১৭২।৩, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯। মূল্য—৩.৫০।

বাস্তবধর্ম্মী লেখক রমেশচন্দ্র সেন সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত। তাঁর লেখা শতাব্দী, কুরপালা যথেষ্ট সমাদৃত হইয়াছে।

সমালোচ্য উপন্যাসখানি "দামোদর মিলে"র শ্রমিক ও কর্ত্তৃপক্ষদের মধ্যে এক সংঘর্ষের উপর কেন্দ্র করিয়া লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই সংঘর্ষের রূপ সম্পূর্ণ আলাদা। এখানের লড়াই লাঞ্ছনা ও অপমানের বিরুদ্ধে। গোটা বইয়ের রচনা হয় মিল-ম্যানেজার বলাইচাঁদকে নিয়ে। বলাইচাঁদ উচ্ছৃঙ্খল। বহু শ্রমিক তরুণী তার লালসায় ইন্ধন জুগাইয়াছে। তার বিশ্বাস, এই ইন্ধন ধনীর লালসা-যজ্ঞের যোগ্য সমিধ। আর এই সমিধ হওয়াই দরিদ্র তরুণীর জীবনের চরম সার্থকতা। কিন্তু এই বিশ্বাসে বাধা হইয়া দাঁড়াইল পদ্মনাভর স্ত্রী রুক্মিণী কিন্তু ম্যানেজারের লোকবল আর অর্থবল তাকে চূর্ণ করিতে উদ্যত হইল। রুক্মিণীর সম্মান বাঁচিলেও, লাঞ্ছনার অন্ত রহিল না, যার ফলে তার গর্ভস্থ ভ্রূণ অকালে বিনষ্ট হইল। রুক্মিণী শয্যার আশ্রয় লইল এবং নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে সে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইয়া চলিল।

আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়াই আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সেই আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়িল সমস্ত শ্রমিকেরা আর তাদের পাশে থাকিয়া বুদ্ধি আর সাহস যোগাইল পার্থ নামে এক নিঃস্বার্থ কর্ম্মী। পার্থ পাশে না থাকিলে একের পর এক কঠিন পরাজয়ের কাছে তাদের নতি স্বীকার করিতে হইত। শেষ পর্য্যন্ত পার্থের বুদ্ধি তাদের বুকে সাহস ও শক্তি যোগাইয়া জয়ের পথ পরিষ্কার করিয়া দিল।

লেখা প্রাঞ্জল- বাহুল্য বর্জ্জিত ঘটনাবিন্যাস- চরিত্রসৃষ্টি সুন্দর তবে একটি বিষয়ের প্রতি শ্রীযুক্ত সেন মহাশয় দৃষ্টি দিলে ভাল করিতেন। অশিক্ষিত শ্রমিকদের মুখ হইতে যে ধরনের বক্তৃতা শোনান হইয়াছে তাহা লেখকের জবানীতে প্রকাশ করিলেই বোধ হয় ভাল করিতেন।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

লালসন্ধ্যা—শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত, গ্রন্থম, ২২।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য ৬ৎ টাকা।

'লালসন্ধ্যা' একখানি মনোরম উপন্যাস। গল্পাংশ গতানুগতিক পথ ধরিয়া চলে নাই। বিশেষ করিয়া চরিত্র-বিশ্লেষণের মুন্সিয়ানা লেখকের অসাধারণ শক্তিরই পরিচয় দেয়। যাঁহারা শুধু গল্প শুনিতেই ভালবাসেন, তাঁহারা এই মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসখানিকে কিভাবে গ্রহণ করিবেন জানি না, তবে রসিক-পাঠক মাত্রই ইহার তারিফ করিবেন নিঃসন্দেহে।

জমিদার বংশ। জমিদারের আভিজাত্য এবং দাপট যে-খাতে এতকাল চলিয়া আসিয়াছে, তাহার ব্যতিক্রম ঘটিল কেদার মুন্সীর পুত্র কল্যাণ মুন্সীর বেলায়। কল্যাণ বলিতেন, যুগ বদলাইলে মতও বদলায়। কেদার মুন্সী তাহা মানিতে চান না। চোখ রাঙ্গাইয়া শাসনে না রাখিতে পারিলে, নিজেকেই হারাইতে হয়। ইহাই ছিল তাঁহার নীতি। কল্যাণের অপরাধ, জমিদারের পুত্র হইয়া তিনি মানুষের স্বভাবধর্ম্মকে প্রাধান্য দিয়াছিলেন। এই অপরাধেই তাঁহাকে গৃহত্যাগ করিতে হয়। কল্যাণ যখন গৃহত্যাগ করেন, তখন তাঁহার একমাত্র শিশুপুত্র অতনুর বয়স দুই বৎসর। অতনুকে শৈশবকাল হইতেই তাঁহার ঠাকুরদাদা কেদার মুন্সী যে-পাঠ দিলেন, তাহাতে তাহার সকল সুকুমার বৃত্তিগুলিই লোপ পাইল।

অতনুকে আমরা যখন পাইলাম, তখন তাঁহার হৃদয়ে দয়া, মায়া, ক্ষমা বা দুর্ব্বলতা বলিয়া কোনো জিনিস নাই। একথা অতনু তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতীর নিকট স্বীকার করিয়াছেন। এবং তিনি বলিয়াছেন, "আমি বড্ড লোভী, কিন্তু আমার লোভের জাত আলাদা শ্রী, এখানে আমি ঠাকুরদার মন্ত্র শিষ্য। সহজ-লভ্যে মন ওঠে না, বরং বিপথগামী হয়।"

তবে এত কথা বলিয়াও, তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন, "একদিন হয়ত কোন কথাই তোমার কাছে অবাস্তব মনে হবে না। তখন ভয় পেয়ো না—পিছিয়ে যেয়ো না। তোমার সাহস আছে, মনের জোরও আছে।"

'পিছিয়ে যেও না' কথাটি শ্রীমতী কোনো দিনই ভুলে নাই। আদর্শবাদী পিতার কন্যা শ্রীমতীর ছিল একটি স্বাধীন সত্তা। এই ব্যক্তিত্ব লইয়াই সে স্বামীর ঘরে আসিয়াছিল। অতনু এই ব্যক্তিত্বকেই সহ্য করিতে পারে নাই। সংঘর্ষ বাধিল সেইখানেই। কারণ, দুই ভিন্ন-ধর্ম্মী একত্র থাকিতে গেলেই সংঘাত আসিবেই।

এই পরিবারে একজন আত্মীয়ের মতো সহানুভূতি সম্পন্ন ব্যক্তিকে দেখিতে পাই, তিনি ডাক্তারবাবু। শ্রীমতী এই ডাক্তারবাবুর স্নেহের কাছে সম্পূর্ণরূপে ধরা দিল। এই ডাক্তারবাবুকে পাওয়া শ্রীমতীর পরম-লাভ। অতি বড় দুর্দ্দিনেও. শ্রীমতী এই ডাক্তারবাবুর অকৃপণ সাহায্য পাইয়া বাঁচিয়া গিয়াছিল।

নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে অতনু জমিদারী হারাইয়া ব্যবসায়ে আত্ম-নিয়োগ করিল। যুদ্ধের দৌলতে ফুলিয়া-ফাঁপিয়া বহু টাকার মালিক হইল অতনু। টাকার গর্ব্বে স্ফীত হইয়া অতনু যেন চাবুক লইয়া সংসারে প্রবেশ করিয়াছে। অংশীদার হিসাবে আগরওয়ালা ও ডানকানকে আমরা দেখিতে পাই। ইহারাই শেষ পর্য্যন্ত কারবারে ঘুণ ধরাইয়াছিল। আর একটি চরিত্রকে গ্রন্থকার অতি নিপুণভাবে আঁকিয়াছেন- যার নাম মিত্রা। শ্রীমতীর স্বাধীন সত্তার প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্যই মিত্রাকে গোয়েন্দাগিরি কাজে অতনু নিয়োগ করিয়াছিল। ইহার ফলেই শ্রীমতী পিত্রালয়ে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। ডাক্তারবাবুর পত্রে অতনুর সকল খবরই শ্রীমতী রাখিত। কারবারকে ঠেকাইয়া রাখা গেল না— সর্ব্বনাশের শেষ ধাপে আসিয়া যখন পৌঁছিয়াছে তখন শ্রীমতী ডাক্তার-বাবুকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। শ্রীমতীর পিতা প্রণব ডাক্তারবাবুকে দেখিয়া চমকাইয়া উঠিলেন। পরিচয় গোপন রহিল না, এই ডাক্তারবাবুই অতনুর পিতা কল্যাণ মুন্সী।

গ্রন্থকার অতি কৌশলে এই কল্যাণ মুন্সীকে আড়াল করিয়া গিয়াছেন। এই চিত্রটি আঁকিতে তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

ডাক্তারবাবুর শেষ কথাতেই আমরা জানিতে পারি, তিনি এতকাল শুধু নীরব দর্শকমাত্রই ছিলেন না। তিনি বলিতেছেন, "বাবার মৃত্যুর পরেই আমি অতনুর কাছে কাছে থেকে ওর চরিত্রের দুর্ব্বল অংশের সন্ধান নিয়ে চাকা ঘোরাতে আরম্ভ করি। এমনি দিনে হঠাৎ খবর পেলাম, শ্রীমান বিবাহ করেছেন—এবং তা' আবার আমারই বাল্যবন্ধু প্রণব মাষ্টারের মেয়েকে। বড় আনন্দ হ'ল খবরটা পেয়ে। আমার কাজ আরও সহজ হবে ভেবে উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। কিন্তু বাবার শিক্ষার প্রভাব অতনু কাটিয়ে উঠতে পারল না। সে ভালবাসা চায়, কিন্তু শ্রদ্ধা দিতে জানে না। শ্রীমতী চেষ্টা করেও ঠিক কায়দা করতে না পেরে একদিন চরম আঘাত হেনে চলে এল। এমনি আঘাত পাবার তার প্রয়োজন ছিল প্রণব। অতনুর অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে গেল।

শ্রীমতীকে লইয়া ডাক্তারবাবু যখন পৌঁছিলেন, তখন চক্রান্তকারীরা শেষ সর্ব্বনাশ করিবার জন্য কারখানায় আগুন লাগাইয়া দিল। এই আগুনই অতনু-চরিত্রে অগ্নিশুদ্ধির কাজ করিল।

গ্রন্থকারের নাম আছে। এই গ্রন্থ তাঁহার খ্যাতিকে আরও উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছে। অতুলনীয় গ্রন্থের অতুলনীয় প্রচ্ছদপট—দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মতো।

শ্রীগৌতম সেন

নূতন বৎসরের প্রবাসী

বাংলা ১৩৬৮ সালের বৈশাখ মাস থেকে প্রবাসীর প্রকাশনার একষষ্টিতম বর্ষ সুরু হবে। এই সুদীর্ঘকাল ধ'রে বাংলা সাময়িক পত্রিকার ক্ষেত্রে প্রবাসী যে গৌরবময় ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছে, শিক্ষিত দেশবাসী তার সঙ্গে সুপরিচিত। নূতন বৎসর থেকে প্রবাসী যাতে অধিকতর চিত্তাকর্ষক ও সর্বজন-মনোরঞ্জক হয় তার আয়োজন করা হয়েছে। এ বৎসর প্রবাসীর মাধ্যমে পরিবেশিত হবে তিনটি উপন্যাস—লিখবেন শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় ও শ্রীচাণক্য সেন। বৈশাখ থেকে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে থাকবে দুটি উপন্যাস।

পুরস্কার প্রতিযোগিতা

এ ছাড়া উৎকৃষ্ট গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা এবং অন্যান্য বিচিত্র রচনাসম্ভারে প্রতিটি সংখ্যা প্রবাসীকে সমৃদ্ধ করবার সঙ্কল্পও আমাদের আছে। এই উদ্দেশ্যে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদির প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। গল্প-প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কার ১০০৲ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার ৭৫৲ এবং তৃতীয় পুরস্কার ৫০৲ টাকা নির্দ্ধারিত হয়েছে। পুরস্কারপ্রাপ্ত না হলেও যে সকল গল্প প্রবাসীতে প্রকাশযোগ্য ব'লে বিবেচিত হবে তাদের রচয়িতাদের প্রত্যেককে ৩০৲ টাকা ক'রে দক্ষিণা দেওয়া হবে।

উৎকৃষ্ট কবিতা প্রকাশেও প্রবাসীর কৃতিত্বের কথা সুবিদিত। স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অজস্র শ্রেষ্ঠ কবিতা প্রকাশিত হয়েছে প্রবাসীতে। কবিতাকে যথোচিত মর্য্যাদা-দানের উদ্দেশ্যে উৎকৃষ্ট কবিতার জন্যও নিম্নলিখিত হারে পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়েছে:

প্রথম পুরস্কার ১০০৲ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার ৫০৲ টাকা এবং তৃতীয় পুরস্কার ২৫৲ টাকা। যে-সকল কবিতা পুরস্কার পাবে না, কিন্তু প্রকাশযোগ্য ব'লে বিবেচিত হবে, তাদের প্রত্যেকটির জন্য ১০৲ ক'রে দক্ষিণা দেওয়া হবে।

শুধু রসসাহিত্য নয়, মননসাহিত্য পরিবেশনও প্রবাসীর লক্ষ্য। চিন্তাশীল প্রাবন্ধিকদের উৎসাহবর্দ্ধনের উদ্দেশ্যে রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সাহিত্য, ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ক প্রবন্ধের জন্যও পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাঁচটি পুরস্কারের হার যথাক্রমে:

প্রথম পুরস্কার ১০০৲, দ্বিতীয় পুরস্কার ৭৫৲, তৃতীয় পুরস্কার ৫০৲, চতুর্থ পুরস্কার ৪০৲, পঞ্চম পুরস্কার ৩০৲ টাকা। এই সকল রচনার সঙ্গে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি ফোটোর জন্যে লেখকরা পাবেন অতিরিক্ত আরো পাঁচ টাকা।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতামূলক সত্য ঘটনা অনেক সময় গল্প উপন্যাসের চেয়েও চিত্তাকর্ষক হয়। পাঠকগণ যাতে নিজ নিজ জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা অথবা অভিজ্ঞতার কথা লিখতে উৎসাহিত হন সেই উদ্দেশ্যেও আমরা পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছি। মনোনীত প্রত্যেকটি রচনার জন্য ২৫৲ টাকা করে দক্ষিণা দেওয়া হবে। রচনা যাতে প্রবাসীর দু' পৃষ্ঠার বেশী না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। লেখার সঙ্গে প্রেরিত যে সকল ছবি প্রবাসীতে ব্যবহৃত হবে তাদের প্রত্যেকটির জন্য ৫৲ টাকা করে দেওয়া হবে।

উপরিউক্ত প্রতিযোগিতাগুলির জন্য প্রেরিত রচনা ১৩৬৮ সালের ৩২শে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত গৃহীত হবে। **"প্রতিযোগিতার জন্য"** এই কথাটি রচনার উপর লিখিত থাকা প্রয়োজন।

পুনরুজ্জীবিত ভারতীয় চিত্রকলার ধারক ও বাহকরূপে এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়বিধ পদ্ধতির চিত্র-পরিবেশনে জন্মকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত প্রবাসী শুধু বাংলার নয়, সমগ্র ভারতের সাময়িক পত্রিকা-জগতে শীর্ষস্থান অধিকার ক'রে আছে। চিত্রশিল্পীদের উৎসাহদানও প্রবাসী তার একটি প্রধান কর্ত্তব্য ব'লে মনে করে। স্থিরীকৃত হয়েছে যে, যে সকল চিত্র প্রবাসীতে গ্রহণযোগ্য ব'লে বিবেচিত হবে তাদের প্রত্যেকটির জন্য ১০০৲ টাকা ক'রে মূল্য দেওয়া হবে।

নূতন বৎসর থেকে প্রবাসীকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে প্রকাশের এই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নবীন প্রবীণ সকল শ্রেণীর লেখক-লেখিকা এবং পাঠক-পাঠিকার আন্তরিক সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

'প্রবাসী' মাসিক সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকার ও অন্যান্য বিশেষ বিবরণ প্রতি বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ তারিখের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিতব্য :—

ফরম্ নং ৪

(রুল নং ৮ দ্রষ্টব্য)

১।	প্রকাশিত হওয়ার স্থান—	কলিকাতা (পশ্চিমবঙ্গ)
২।	কিভাবে প্রকাশিত হয়—	প্রতি মাসে একবার
৩।	মুদ্রাকরের নাম—	শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস
	জাতি	ভারতীয়
	ঠিকানা	১২০।২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯
৪।	প্রকাশকের নাম	ঐ
	জাতি	ঐ
	ঠিকানা	ঐ
৫।	সম্পাদকের নাম	শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
	জাতি	ভারতীয়
	ঠিকানা	১২০।২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯
৬।	(ক) পত্রিকার স্বত্বাধিকারীর নাম	প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
	ঠিকানা	১২০।২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯
	এবং	
	(খ) সর্বমোট মূলধনের শতকরা এক টাকার অধিক অংশের অধিকারীদের নাম-ঠিকানা—	১। শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ১২০।২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯
		২। মিসেস্ অরুন্ধতী চট্টোপাধ্যায় ১২০।২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯
		৩। মিস্ রমা চট্টোপাধ্যায় ১২০।২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯
		৪। মিসেস্ সুনন্দা দাস ১২০।২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯
		৫। মিসেস্ ঈষিতা দত্ত ১২০।২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯
		৬। মিসেস্ নন্দিতা সেন ১২০।২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯
		৭। শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় ১২০।২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯
		৮। মিসেস্ কমলা চট্টোপাধ্যায় ১২০।২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯
		৯। মিস্ রত্না চট্টোপাধ্যায় ১২০।২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯
		১০। মিস্ অলোকানন্দা চট্টোপাধ্যায় ১২০।২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯
		১১। মিসেস্ লক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায় ১২০।২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

আমি, প্রবাসী মাসিক সংবাদপত্রের প্রকাশক, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরি-লিখিত সব বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

তারিখ—১৫।৩।১৯৬১ ইং

প্রকাশকের সহি—স্বাঃ শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা